১৫শ বর্ষ] বৈশাখ, ১৩৪৩ [১ম সংখ্যা

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের উদ্দেশে

পুরাণেই শুনেছিনু ভক্তগণ বহু সাধনায়
সহস্র বর্ষের তপে এক দিন ভগবানে পায়।
অগাধ বিশ্বাসশক্তি এ হৃদয়ে আছিল শৈশবে,
বিশ্বাস করিয়াছিনু। পুরাণ কি মিথ্যা কথা ক'বে ?

কৈশোর-যৌবনে হায় তার পর নানা গ্রন্থ প'ড়ে,
সে বিশ্বাস হারাইনু বিজাতীয় শিক্ষা-মোহঘোরে।
সহস্র বর্ষের তপ মনে হলো উপকথা বলি,
ধ্রুব-প্রহ্লাদের কথা কবিদের কল্পনা-কাকলী।

যদি র'ন ভগবান, ধরি তিনি মানব-বিগ্রহ
মানুষে দিবেন দেখা, এ কি কভু হয় যুক্তিসহ ?
এই মনোভাব পুষি এ জীবন হ'তো মরুভূমি
করুণামৃতের ধারা যদি তায় না বর্ষিতে তুমি।

এই নিরীশ্বর যুগে অবিশ্বাসে অন্ধমূঢ় মনে
বসাইলে ভগবানে পুনঃ তাঁর নিজ সিংহাসনে।
প্রমাণ করেছ তুমি মিথ্যা নয় পুরাণের কথা,
ব্যর্থ নয়, ভ্রান্তি নয় অকপট ভক্তের আর্ত্ততা।

দিলে জ্ঞান, দিলে আলো, দিলে পূর্ণ সত্যের সন্ধান,
ব্যথিতে সান্ত্বনা দিলে, নৈরাশ্যের হলো অবসান।
শৈশব ফিরিয়া পায় পুন মোর পলিত হৃদয়,
সহস্র বর্ষের তপ মিথ্যা বলি মনে নাহি হয়।

সহস্র বৎসর ধরি এ ভারত তপশ্চরণে,
দেখিতে পাইল পুনঃ ভগবানে তোমার জীবনে।

শ্রীকালিদাস রায়।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-দেব

অষ্টম পরিচ্ছেদ

নানাভাবে দর্শন—পরমহংসত্ব লাভ—সখীভাবের সাধন।

বেদান্তমতে সাধনকালে ঠাকুর নানাপ্রকার আশ্চর্য্য দর্শন লাভ ও আশ্চর্য্য ভাবসমূহ অনুভব করিতে লাগিলেন। তিনি দেখিলেন চিদাকাশে কোটি ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি—আবার উহাতেই লয় হইতেছে। এই উৎপত্তি ও লয়-প্রকরণ বুঝাইতে উপমাস্বরূপ তিনি বলিয়াছেন, "যেমন ঘণ্টার টং শব্দ—ট-অ-অ-অ-ম্। শব্দ ক্রমে ক্রমে থামিয়া গেল, যেন লীলা থেকে নিত্যে লয়—স্থূল, সূক্ষ্ম কারণ থেকে মহা জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি থেকে তুরীয়ে লয় হ'লো। আবার ঘণ্টা বাজিল, যেন মহাসমুদ্রে একটা গুরু জিনিষ পড়্‌লো, আবার নিত্য থেকে লীলা আরম্ভ হ'ল, মহাকারণ থেকে স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ শরীর দেখা ই তুরীয় থেকেই জাগ্রত স্বপ্ন সুষুপ্তি সব অবস্থা এলো। আবার মহাসমুদ্রের ঢেউ মহাসমুদ্রেই লয় হলো। নিত্য ধ'রে ধ'রে লীলা, আবার লীলা ধ'রে ধ'রে নিত্য। চিৎসমুদ্র অনন্ত। তাই থেকে এই সব লীলা উঠ্‌লো, আবার ওতেই লয় হয়ে গেল।" *

সর্ব্বভূতে এখন ঠাকুর দর্শন করিতে লাগিলেন ঈশ্বরকে। এক দিন বেলপাতা তুলিবার সময় গাছের খানিকটা ছাল উঠিয়া গেল। তাহাতে তিনি দেখিলেন, গাছ চৈতন্যময়—গাছের কষ্ট হইতেছে। বেলপাতা আর তুলিতেন না। দূর্ব্বা-দলের উপর দিয়া এক দিন এক জন মাড়াইয়া যাইতেছিল, তাহাতে ঠাকুর সর্ব্বাঙ্গে মাড়ানর ব্যথা অনুভব করিয়াছিলেন। এক দিন ফুল তুলিতে গিয়া দেখিলেন যে, গাছগুলি ফুটন্ত ফুল সমেত এক একটি জীবন্ত তোড়া বিরাট মূর্ত্তির মাথায় সাজানো। বিরাটের পূজা এই ভাবে অহরহঃ আপনা আপনি হইতেছে। তবে আর ফুল তোলার ও পূজার প্রয়োজন নাই, এই ভাবিয়া ঠাকুর ফুল তোলা বন্ধ করিলেন। এক দিন শিব গড়িয়া পূজা করিবার সময় শিবের মাথায় বজ্র দিবার সময় ঠাকুর দেখিলেন, এই বিরাট মূর্ত্তিই শিব। এইরূপে তাঁহার শিবপূজাও উঠিয়া গেল। মহামায়ার মায়া দেখিলেন। ঘরের মধ্যে একটু ছোট জ্যোতিঃ ক্রমে ক্রমে বর্দ্ধিত হইয়া, সমস্ত জগৎ ঢাকিয়া দিল।
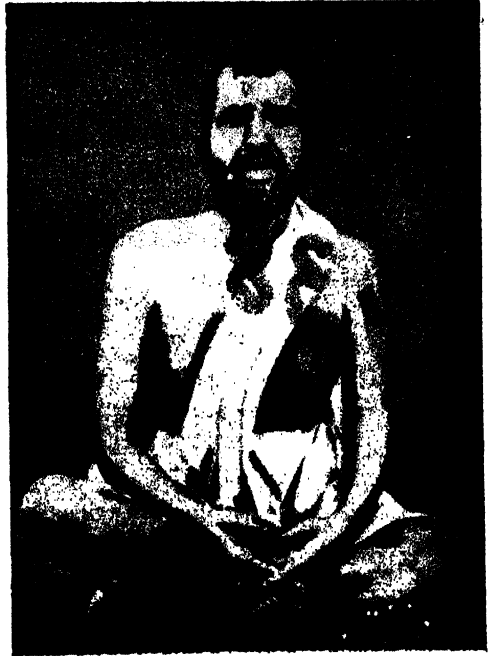
শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-দেব

তাঁহার মায়ামোহ নাশ হইল এবং হৃদয়ে জ্ঞানাগ্নি জ্বলিয়া উঠিল। এই ঘটনাটি ঘটে কুঠীর পিছনে, উত্তরদিকে। ঠাকুর চলিয়া যাইতেছিলেন, হঠাৎ গায়ে যেন কেহ হোমাগ্নি জ্বালিয়া দিল বোধ হইল। ঠাকুর প্রায়ই বলিতেন, জ্ঞানাগ্নি দ্বারা এই অজ্ঞান-কাঁটা পোড়াইতে হয়—অজ্ঞান-কাঁটা যাহা জীবকে সর্ব্বদা ত্রিতাপে যন্ত্রণা দিতেছে। বটতলায় বসিয়া

* শ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত 1, 13, 6.

যখন ঠাকুর ভগবান-চিন্তা করিতেন, তখন মা নানা দেব-দেবীর মূর্ত্তি ধারণ করিয়া, গঙ্গাগর্ভ হইতে উথিত হইয়া, ঠাকুরের কাছে আসিতেন—তাঁহার সহিত কথা কহিতেন, হাসিতেন, এমন কি, খেলার ছলে ঠাকুরের অঙ্গুলীও টিপিয়া বা মটকাইয়া দিতেন।

এক দিন ঠাকুর দেখিলেন, গঙ্গাগর্ভ হইতে দুর্গামূর্ত্তি উঠিলেন। ঠাকুর সেই দেবীকে পূজা করিলেন, তার পর মূর্ত্তি আবার গঙ্গামধ্যে ডুবিয়া গেলেন। ঠাকুর প্রথমে মনে করিলেন,

মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত—মাষ্টার মহাশয়

এ মূর্ত্তিদর্শন বুঝি তাঁর ভাবের খেলা বা চক্ষুর ভুল। কিন্তু কি আশ্চর্য্য, তখন নিজের চক্ষুতেই দেখিলেন, সম্মুখের ধূলার উপরে মায়ের চরণ-চিহ্ন সব বর্ত্তমান! ঐ দর্শন তাঁহার বাহ্য দৃষ্টিতেই হইয়াছিল।

ব্রাহ্মণী ঠাকুরকে বলিয়াছিলেন, তিনি নিতাইয়ের খোলে গৌরের সত্তা। ঠাকুর যখন একাধারে পুরুষ-প্রকৃতিভাবে গৌরাঙ্গের ভাবে থাকিতেন,—তখন এক দিন দেখিলেন, গঙ্গা হইতে, শ্রীগৌরাঙ্গের সঙ্কীর্ত্তন-দল পঞ্চবটীতে উঠিয়া আসিলেন এবং কীর্ত্তন করিতে করিতে পঞ্চবটীর দিক্ হইতে সেই দল বকুলতলার অভিমুখে যাইতে লাগিলেন। ঠাকুর গৌর ও নিত্যানন্দকে পরিবেষ্টন করিয়া, নৃত্যপরায়ণ সেই দলের প্রত্যেককেই চিনিতে পারিলেন। দেখিলেন, সেই দলেরই দুই জন তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গ হইয়া এবারে আসিয়াছেন। তাঁহাদের এক জন মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত আর এক জন বলরাম বসু। ইহাও শুনা যায়, মহেন্দ্রনাথ শ্রীচৈতন্যপার্ষদ্ মুরারি গুপ্তেরই নব প্রকাশ।

এক দিন ঠাকুর দেখিলেন যে, সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডেই এক চৈতন্য খেলা করিতেছেন। তিনি দেখিলেন, তাঁহার চারিদিকে

বলরাম বসু

চতুর্ব্বিধ অন্ন, বিষ্ঠামূত্র সব পড়িয়া রহিয়াছে। হঠাৎ তাঁহার ভিতর হইতে জীবাত্মা বাহিরে আসিয়া একটি লক্-লক্ জিহ্বা অগ্নিশিখারূপে সে সকলের আস্বাদ গ্রহণ করিলেন;—বিষ্ঠামূত্র কিছুই বাদ গেল না। ঠাকুর জানিলেন, সব এক—অভেদ। চৈতন্য ব্যতীত কোথাও অন্য কিছুই নাই। আমরা যে জড় ও চৈতন্যে ভেদ করি, তাহা আমাদের অজ্ঞতা ও আধ্যাত্মিক দৃষ্টির অভাব বশতই করি।

আর এক দিন ঠাকুর দেখিলেন, এক বিরাট দীঘি—নির্ম্মল জলবিশিষ্ট; কিন্তু পানাতে জল আবৃত। বায়ু-প্রবাহে পানা সরিতেছে আর একবার জল দেখা যাইতেছে—আবার ঢাকা পড়িতেছে এই জল সচ্চিদানন্দ—পানা

মহামায়া। মহামায়া সচ্চিদানন্দকে ঢাকিয়া রহিয়াছেন বলিয়া জীব সে আনন্দ বোধ করিতে পারিতেছে না। ঠাকুর কখনও দেখিতেন, চারিদিকে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ—কখনও দেখিতেন, চারিদিক সব জ্যোতির্ময়—সমস্ত বস্তু ঝক্-ঝক্ করিতেছে—যেন চারিধারে পারার হ্রদ বা গলান রূপা ঢালা রহিয়াছে। কখনও তিনি দেখিতেন, চারিদিকে যেন রঙ্গ-মশালের আলো জ্বলিতেছে—উজ্জ্বল আলো—কখনও রঙ্গীন্, কখনও বর্ণহীন। আবার এই ব্রহ্মজ্যোতিঃসমুদ্রমধ্যে কেশবচন্দ্র সেন ও তাঁহার দল এবং নরেন্দ্রাদি ভক্তগণের স্বরূপ দর্শন করিয়াছিলেন—তাঁহারা তখনও তাঁহার কাছে আসেন নাই—তাঁহাদের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে ঠাকুরের দেখা-সাক্ষাৎ হয় নাই। কেশব সেনকে দেখিলেন, যেন একটি সুন্দর ময়ূর পাখা বিস্তার করিয়া বসিয়া রহিয়াছেন। পাখা তাঁহার দলের লোক, তাঁহারা চারিদিকে ময়ূরকে বেষ্টন করিয়া আছেন। ময়ূরের মাথায় লালমণি—লাল রজোগুণের লক্ষণ,—ময়ূরকে দিয়া মা অনেক কার্য্য করাইবেন। ঠাকুর আরও দেখিলেন, কেশব সেন তাঁহার দলকে বলিতেছেন—"তোমরা এঁর (ঠাকুরের) কথা শোনো।" তখন মাকে ঠাকুর জিজ্ঞাসা করিলেন, এই সব ইংরেজি ভাবাবলম্বীদের সঙ্গে তিনি আবার ভবিষ্যতে কি কথা কহিবেন। মা বলিলেন যে, হাঁ, ইংলিশম্যানদের সঙ্গেও তাঁহার ভাবের আদান-প্রদান চলিবে। দেশ, কাল ও পাত্র অনুসারে ইহার যে যথেষ্ট প্রয়োজন হইয়াছে, মা তাহা বুঝাইয়া দিয়াছেন। মা'র কথা অবশ্য শেষে ফলিয়াছিল। কেশব বাবুও ঠাকুরের নিকট হইতে মা'য়ের নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন ; ব্রহ্ম ও শক্তি একই বুঝিয়াছিলেন। মা কেশবের দল হইতে সাধারণের জন্য বিজয়কে টানিয়া বাহিরে আনিয়াছিলেন ; কিন্তু ঠাকুর বলিয়াছেন যে, মা আদি সমাজে গেলেন না।

নরেন্দ্রকেও ঠাকুর সাক্ষাৎলাভের পূর্ব্বেই দর্শন করিয়াছিলেন। দেখিয়াছিলেন, ধ্যানপরায়ণ ভক্তগণ জ্যোতির্ম্মধ্যে বসিয়া আছেন, মাঝে সেই জ্যোতিঃ আবার দুই ভাগে বিভক্ত ; এক ভাগে আছেন সাকারবাদী ভক্তগণ কেদার, চুণি প্রভৃতি আর এক ধারে নিরাকারবাদিগণ, বিশেষ করিয়া নরেন্দ্র। লাল সুরকীর রঙের জ্যোতির্ম্মধ্যে নরেন্দ্র উপবিষ্ট—সমাধিস্থ। ঠাকুর নরেন্দ্র নরেন্দ্র বলিয়া ডাকিতে নরেন্দ্র একটু মাত্র চাহিলেন। তাহাতেই ঠাকুর বুঝিলেন যে, নরেন্দ্রও তাঁহার ডাকে অবতীর্ণ হইয়াছেন এবং সিমলায় কায়স্থদের ঘরে বালক নরেন্দ্র জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। তখন ঠাকুর মাকে বলিলেন, "মা, শীঘ্র ওকে মায়াবদ্ধ কর, নৈলে নরেন্দ্র দেহত্যাগ করবে সমাধিস্থ হয়ে।" নরেন্দ্র অতি উচ্চ অখণ্ডের ঘর, তাহা ঠাকুর পূর্ব্বেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন।

এই অদ্বৈতসাধন-সময়ে বাঙ্গালায় এক প্রাকৃতিক বিপ্লব হয়, যাহার কথা ঠাকুর বলিতেন,—সেটি 'আশ্বিনে ঝড়'। ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দের ৫ই অক্টোবর আশ্বিনে ঝড় হয়। এই আশ্বিন মাসের ঝড়ে সমগ্র বাঙ্গালার অতিশয় ক্ষতি হয়। বহু গৃহ ভূতলশায়ী হয় এবং অনেক লোকও অকালে লীলা সম্বরণ করে। দক্ষিণেশ্বরে অনেক গাছপালা পড়িয়া যায়। অনেক বেলায় সে দিন ঠাকুরদের ভোগ হইয়াছিল। ঠাকুর ভক্তদের জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—কেউ সে ঝড়ের কথা স্মরণ করিতে পারেন কি না। মহেন্দ্র বলেন, তাঁহার স্মরণ আছে, তিনি তখন দশ বৎসর বয়স্ক বালক। সেই দুর্য্যোগের সময় একটি ঘরে বসিয়া কাতরভাবে তিনি ভগবানকে ডাকিতেছিলেন।

বেদান্তমতে সিদ্ধকে পরমহংস বলে। এই সময় হইতে ঠাকুরের পরমহংস অবস্থা দেখিয়া সাধু ও ভক্ত লোকে ক্রমে তাঁহাকে পরমহংস রামকৃষ্ণ বলিয়া অভিহিত করিতে আরম্ভ করিলেন। সেই সর্ব্বসন্তাপহারী পতিত উদ্ধারকারী নাম এখন সমগ্র জগতে চলিতেছে।

দক্ষিণেশ্বরে বিষ্ণু-ঘরে এত দিন হলধারী পূজা করিতেছিলেন। হঠাৎ এই সময় এক দিন বিষ্ণুঘরের ঠাকুরদের গহনা চুরি হইল। রাধাকান্তের গহনা, রাধারাণীর গহনা চোরে মন্দিরের তালা ভাঙ্গিয়া চুরি করিয়া লইয়া গেল। মথুর বাবু আসিলেন এবং ঠাকুরকে সঙ্গে লইয়া দেখিতে গেলেন। তিনি রাধাকান্তদেবকে গহনা রক্ষা করিতে অসমর্থ দেখিয়া, রহস্যচ্ছলে তিরস্কারও করিতে লাগিলেন। বাঁশবেড়ের হংসেশ্বরীর মন্দিরে চোর চুরি করিতে আসিয়া গহনাদি লইবার পর কেমন ধাঁধা লাগিয়া পথ খুঁজিয়া না পাইয়া মন্দিরে আটক থাকে, তজ্জন্য প্রাতে ধরা পড়ে। তাই হংসেশ্বরী কেমন গহনা রক্ষা করিয়াছিলেন, তাহাও রাধাকান্তকে শুনাইতে মথুর ছাড়িলেন না। ঠাকুর মথুরের কথা কতকটা রহস্যময় হইলেও শুনিয়া তাহা সমর্থন করিলেন

না, বরং দেবতাকে লক্ষ্য করিয়া এরূপ কথা বলা ভালো নয়, ঠাকুর তাহা মথুরকে বলিয়া প্রতিবাদ করিলেন। তিনি বলিলেন, ধনীরা ধন ভালবাসে, তাই ধনের আদর ও দাম তাহাদের কাছে এত। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান, ধনেশ্বরী লক্ষ্মী যাঁর সহচরী ও শক্তি, তাঁর কি আর কোন ঐশ্বর্য্যের অভাব আছে? এ সব ঐহিক হীরা, মুক্তা, সোনা তাঁর চক্ষুতে মাটী বা তাহার বিকার ছাড়া আর কিছুই নহে। এই সকল পাথর মাটী রক্ষার জন্য রাধাকান্তদেবের চিন্তা হইবার কোন হেতু ঠাকুর দেখিলেন না। 'কথাগুলি হয় ত' মথুর বুঝিলেন। এই চুরির পরেই হলধারী কর্ম্মত্যাগ করিলেন এবং রামকুমারের পুত্র অক্ষয় আন্দাজ ১৭ বৎসর বয়সে বিষ্ণুঘরে পূজা আরম্ভ করিলেন।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, অক্ষয় ভূমিষ্ঠ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই তাহার মাতৃবিয়োগ হয়, এই জন্য রামকুমার অক্ষয়কে বড় কোলে পিঠে করিতেন না। কারণ, একে ত ছেলে জন্মিবার পরই মাতার জীবন গেল, তার উপর আবার জ্যোতিষশাস্ত্রের সাহায্যে রামকুমার দেখিয়াছিলেন যে, অক্ষয় অল্পায়ু। এই সব কারণে তিনি পুত্রের প্রতি খুব মমতাবান্ হন নাই। ঠাকুর কিন্তু অক্ষয়কে ভালবাসিতেন, কোলে পিঠে করিতেন। অক্ষয় কিছু কিছু সংস্কৃতাদি বিদ্যাও শিক্ষা করিয়াছিলেন এবং উত্তম ভাগবত পাঠ করিতে পারিতেন, অতিশয় ভক্তি সহকারে তিনি রঘুবীরের সেবা করিতেন—বাল্য হইতেই রামভক্ত ছিলেন। অক্ষয় দক্ষিণেশ্বরে বরাবর নিজের হাতে পাক করিয়া খাইতেন এবং অবসরকালে বিষ্ণুমন্দিরে বসিয়া ভাগবত পাঠ করিতেন। এক দিন তিনি ভাগবত পাঠ করিতেছেন, এমন সময় ঠাকুর বিষ্ণুমন্দিরে আসিলেন। পাঠ শুনিয়া তাঁহার ভাব হইল; তখন ভাবচক্ষুতে দেখিলেন যে, একটা জ্যোতির স্রোত অক্ষয়, ভাগবত গ্রন্থ ও রাধাকান্তবক্ষ এই তিন স্থান সমকালেই স্পর্শ করিয়াছে। ঠাকুর বুঝিলেন, ভাগবত—ভক্ত—ভগবান এ তিন একই বস্তু। চারি বৎসর পরে অক্ষয়ের বিবাহ হয়। বিবাহের কয়েক মাস পরে তিনি দেশে যান এবং পীড়িত হন। পীড়া উত্তরোত্তর বাড়িতে থাকে এবং সেই জন্য তাঁহাকে কলিকাতায় চিকিৎসার্থ আনান হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ এখানে অক্ষয়ের রোগবৃদ্ধি হইয়া মৃত্যু ঘটে। ঠাকুর অক্ষয়ের মৃত্যুতে বড় কষ্ট বোধ করিতে লাগিলেন, যেন তাঁহার হৃদয়ের মধ্যে "বিল্লীতে আঁচড়াচ্ছে।" অক্ষয়কে তিনি অনেকটা দর্শন স্পর্শন করিয়াছিলেন, এ জন্যই সেই মায়ার তাড়নায় তাঁহার এরূপ যন্ত্রণা। অক্ষয়ের মৃত্যুর পর ঠাকুর কুঠীর নীচের ঘর ত্যাগ করিলেন। ঐ ঘরে অক্ষয়ের মৃত্যু হইয়াছিল। এখন যে ঘরটি আমরা ঠাকুরের ঘর বলিয়া জানি, যাহা দ্বাদশ শিবমন্দিরের ঠিক উত্তরে, উহা তখন রাধাকান্তের ভাঁড়ার ঘর ছিল। পরে মথুরবাবুর আদেশে ঠাকুরের জন্য ভাঁড়ার স্থানান্তরিত করিয়া

দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের ঘর (সম্মুখ দৃশ্য)

ঐ ঘর ঠাকুরকে খালি করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। ১৮৬২ খৃষ্টাব্দ হইতে নরলীলার শেষাশেষি পর্য্যন্ত ঠাকুর ঐ ঘরেই ছিলেন। যাঁহারা শ্রীঠাকুরের দর্শনলাভে বঞ্চিত হইয়াছেন, এই ঘরখানি তাঁহাদের নিকট বৈকুণ্ঠ, কৈলাস, কাশী বা বৃন্দাবনের মত পবিত্র!

দক্ষিণেশ্বরে কিছু দিন ধরিয়া এই সময়ে বেদান্তবাদী সাধু ও সন্ন্যাসীর সমাগম ঘটিতে লাগিল। ঠাকুর নিরবচ্ছিন্ন বেদান্ত-চর্চ্চা আরম্ভ করিলেন। একদা এক বেদান্তবাদী সাধু আসিলেন, তিনি মেঘ দেখিয়া নাচিতেন,

দৃষ্টিতে আনন্দ বোধ করিতেন। ধ্যানের সময় কেহ নিকটে গেলে ভারী রাগ করিতেন, এমন কি, ঠাকুরকেও ধ্যানের সময় নিকটে যাইতে দেখিলে বিরক্ত হইতেন। তাঁহার হাতে একটি কাচের ঝাড়ের কলম থাকিত। ঝাড়ের কলমের মধ্য দিয়া দেখিলে আলোকের নানা রং দেখা যায়, কিন্তু বাস্তবিক এক সূর্য্যের শাদা আলোই আছে, রং বাহিরে কোথাও নাই। মায়াতেই সেই রকম এ ব্রহ্মাণ্ড নানা বৈচিত্র্যে পরিপূর্ণ দেখাইতেছে, কিন্তু পদার্থ এক ব্রহ্ম। ঝাড়ের কলম সাধুর মনে এই চিন্তা সর্ব্বদা জাগাইয়া রাখিত, সেই জন্য উহা তিনি সঙ্গে রাখিতেন। কোন জিনিষই এই সাধু একবারের বেশী দেখিতেন না, পাছে সে জিনিষে মায়া হয়। এক দিন পোস্তার ধারে সানাইয়ের শব্দ শুনিয়া ঠাকুরকে বলিলেন যে, যাঁহার ব্রহ্ম-দর্শন হইয়াছে, তাঁহার ঐ শব্দ শ্রবণে সমাধি হইতে পারে। তিনি তিন দিন মাত্র দক্ষিণেশ্বরে ছিলেন।

ঠাকুরের ঘরে যে সকল দেব-দেবীর ও সাধু-ভক্তের ছবি ছিল, অতঃপর ঠাকুরের ইচ্ছায় সব নামান হইল। এ অবস্থায় ঠাকুরের সজ্‌নে, তুলসী এক বোধ হইতে লাগিল। মন অখণ্ডে লয় হইয়া যাইতে লাগিল। নিজের মাথাটা নিরাকার বোধ করিতে লাগিলেন। ঠাকুর ঈশ্বরীয় রূপ দেখা পরিত্যাগ করিলেন; কেন না, রূপ দর্শনের মধ্যে ছেদ আছে। কেবল অখণ্ড সচ্চিদানন্দে থাকিতে তাঁহার ইচ্ছা হইল এবং সেইভাবে রহিলেন। এইরূপ কিছুদিন নিরবচ্ছিন্ন অদ্বৈত-চিন্তায় মগ্ন থাকার ফলে তাঁহার খুব পেটের অসুখ হইল। দর্শন কিন্তু ছাড়িল না, নানা ভাবের দিব্য-দর্শনও হইতে লাগিল। আর যে দিন বেশী দর্শন হইত, রোগও সেই দিন বাড়িয়া যাইত। শেষে রূপ দর্শন হইলে ঠাকুর থু থু করিতেন, যাহাতে আর মূর্ত্তি সব কাছে না আসে। মাকে পূজা-প্রণাম করিতে, কালীমন্দিরে গিয়া দেখিতেন, সব চিন্ময়—যেন সচ্চিদানন্দরসে রসিয়া রহিয়াছে;—ছোট বড় সমস্তরই ভিতরে, এমন কি, পিপড়ে-মাছিটির ভিতরও সেই সচ্চিদানন্দ। পেটের অসুখে আহার করিতেন সামান্য পুরাতন তণ্ডুলের অন্ন ও তৎসহ গাঁদালের ঝোল বা কই মাছের ঝোল। কই মাছগুলি একটি পাত্রে জীয়ান থাকিত—তখন এও দেখিতেন, কই মাছগুলি কতকগুলি খোল—যার মধ্যে সেই সচ্চিদানন্দই রহিয়াছেন, —খোলগুলি মাত্র বদ্‌লায়—তাহারা হত হয় না, তাহাদের "ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে।"

ক্রমে অসুখ বাড়িয়া গেলে নাটাগোড়ের রাম কবিরাজকে আনাইয়া দেখান হইল। তিনি আসিয়া দেখিলেন যে, ঠাকুর হাড়সার হইয়া গিয়াছেন, সেই অবস্থার ভিতরই বিচার চলিতেছে, "ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা বা অস্তি-ভাতি-প্রিয়।" কবিরাজ অবাক্! ভাবিলেন, এ রোগী মানুষ না পাগল! হৃদয় মুখুয্যেও মাঝে মাঝে ঠাকুরকে খোঁটা দিয়া বলিতেন, "তোমার ভাবও যেম্নি, রোগও তেম্নি।" ঠাকুরের পেটের অসুখ আরাম হইতেছে না দেখিয়া মথুর বাবু গঙ্গাপ্রসাদ কবিরাজকে দিয়া শেষে চিকিৎসার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। গঙ্গাপ্রসাদ স্বর্ণ-পর্পটি ব্যবস্থা করেন। এই ঔষধ সেবন করিলে জলপান চলে না, রাত্রে ত একেবারেই নয়, শুধু দুগ্ধ পান বা বেদানার রস পান করিয়া থাকিতে হয়। ঠাকুর রোক্ করিয়া তাহাই করিলেন। রহস্য করিয়া বলিলেন, "পরমহংসও হংস ত'! হাঁস, দুধে জলে মিশানো থাকিলেও কেবল দুধ খায়। আমিও তাই করবো, কেবল দুধ খাবো।" এই চিকিৎসার ফলে কিছুদিনের জন্য তাঁহার রোগ অনেকটা উপশম হইয়াছিল।

এই সময় তিনি কালীঘর হইতে পঞ্চবটী পর্য্যন্ত এক অদ্ভুত মূর্ত্তি দর্শন করিয়াছিলেন। তবে কি মূর্ত্তি ও কি ভাবে দর্শন করেন, তাহা কিছুই বলেন নাই। এইমাত্র আভাসে বলিয়াছিলেন যে, তিনি দেখিয়াছিলেন, কালীবাড়ীর সবই যেন মোমে গড়া। মন্দির, মূর্ত্তি, ঘর, লোকজন, পরিচারক, দৌবারিক সবই মোমের, সমস্তই এক সত্তা।

১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে ঠাকুর একবার তীর্থে গমন করেন। তখন সবেমাত্র কাশী পর্য্যন্ত রেল খুলিয়াছে। ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে প্রথম ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেল খোলা হয়। প্রথমে গাড়ী হুগলী পর্য্যন্ত যাইত। পরে লাইন রাণীগঞ্জ পর্য্যন্ত বাড়ান হয়। ক্রমে তাহা কাশী পর্য্যন্ত লইয়া যাওয়া হয়।

ঠাকুর নিজের মাতৃদেবী চন্দ্রমণি দেবীকে সঙ্গে লইয়া গিয়া কাশী দর্শন করেন; প্রয়াগও এ যাত্রায় দর্শন হইয়াছিল। ব্যয়ভার মথুর বহন করেন। মথুরের ছেলেরা ও বিষ্ণুঘরের সহকারী পূজক রাম চট্টোপাধ্যায়ও এই দলে ছিলেন। এ তীর্থযাত্রার বিশেষ বিস্তৃত বিবরণ

পাওয়া যায় না। বোধ হয়, মাতৃদেবীকে কাশী প্রয়াগ দর্শন করানই ছিল ঠাকুরের প্রধান উদ্দেশ্য। অল্পসময়-মধ্যেই এই তীর্থভ্রমণ শেষ হয়। ঠাকুর আবার কালী-বাড়ীতে ফিরিয়া আসিলেন।

ঠাকুরের সাধন-ভজন কার্য্য এখনও চলিতেছিল। এই-বার আবার অদ্বৈতসাধন পরিত্যাগ করিয়া ঠাকুরের ভক্তির সাধন নানা ভাবের বৈষ্ণব-সাধন আরম্ভ হইল। তিনি কর্ত্তা-ভজা-সাধন প্রথমে আরম্ভ করিলেন। কর্ত্তাভজা কি না—কর্ত্তা গুরুকে ঈশ্বরবোধে পূজা। এই সাধনে সাহায্য করিলেন বৈষ্ণবচরণ ও ব্রাহ্মণী। ইতিপূর্ব্বে কাছির বাগানে ঠাকুরের বৈষ্ণবচরণ সঙ্গে গমনের কথা বলা হইয়াছে। কর্ত্তাভজা-সাধনে সিদ্ধ অবস্থার নাম 'সহজ' হওয়া। এই সহজ বা সিদ্ধ অবস্থার লক্ষণ কৃষ্ণগন্ধ গায়ে থাকিবে না, অর্থাৎ বাহ্য-লক্ষণে আর সাধক বলিয়া জানা যাইবে না। সমস্ত ভাব ভিতরে থাকিবে। সহজের আর একটি লক্ষণ—তিনি জিতেন্দ্রিয় হইবেন—পদ্মে ভ্রমর বসিবে বটে,—কিন্তু মধু পান আর করিবে না। এঁদের মন্ত্র হচ্ছে "মন তোর" অর্থাৎ সবই তোমার নিজের মনের উপর নির্ভর। এঁদের মতে "যার ঠিক মন,—তার ঠিক করণ,—তার ঠিক লাভ।"—ঠাকুরের এই সাধনকালে সেই সহজ অবস্থা হইল।

সহজিয়া সাধন-সময়ে পণ্ডিত বৈষ্ণবচরণ সর্ব্বদাই দক্ষিণেশ্বরে যাতায়াত করিতেন। তিনি ঠাকুরকে যতই দেখিতে লাগিলেন, ততই তাঁহাকে মিষ্ট হইতে মিষ্টতর বোধ হইতে লাগিল। শাস্ত্র পড়া—পাণ্ডিত্য লাভ করা আর গুরুমুখে শোনায় তফাৎ যেমন ছায়াচিত্র দর্শনে ও অভিনয় দর্শনে তফাৎ;—যেমন ভূচিত্র দর্শন ও প্রকৃত স্থান দর্শনের পার্থক্য। গুরুমুখে না শুনিলে শাস্ত্রের আসল মর্ম্মার্থ-বোধই হয় না, ছাপার অক্ষরে মনে ছাপ দিতে পারে না। তাই বৈষ্ণবচরণ বলিতেন যে, যদিও ঠাকুরের কথা সবই শাস্ত্রে আছে, তথাপি তাঁহার মুখে সেই কথাগুলি সজীব হইয়া উঠিত এবং তাহা শুনিয়া তিনি যথেষ্ট উপকৃত হইতেন বলিয়া এত আনাগোনা করিতেন।

তার পর বাউল সাধন। এই সাধনের সময় অনেক বাউল আসিতে লাগিলেন। বাউলদের সিদ্ধকে বলে সাঁই, সাঁইএর পর আর নাই। ঠাকুর সাঁই হইলেন। সাঁইরা ভগবানকে 'আলেখ' বলেন। আলেখ অর্থাৎ ব্রহ্ম। যাঁহাকে এই চক্ষে দেখা যায় না। তাঁহারা কুণ্ডলিনীর জাগরণকে বলেন 'হাওয়ার খবর'। ষট্‌চক্র যোগশাস্ত্রে আছে, এঁরা বলেন, ছয় পৈঠা। বাউলদের মুক্ত অবস্থার লক্ষণ—জোঁকের মুখে চূণ দিলে যেমন জোঁক আপনি খসিয়া পড়িয়া যায়, তেমনি এই মতে সিদ্ধ হইলে সাধকের ইন্দ্রিয় শিথিল হইয়া যায়। 'রমণীর সঙ্গে থাকে, না করে রমণ' এই রকম অবস্থা। আর এক সাধন আছে, যাহাকে বলে রাধাতন্ত্রের মতে সাধন। তান্ত্রিক সাধনেরই মত ইহা পঞ্চতত্ত্ব লইয়া সাধন। এই মতে মল, মূত্র, রজঃ, বীজ এই সব লইয়া সাধন করিতে হয়। ঠাকুর এরূপ সাধনকে বলিতেন, নোংরা সাধন। তবে তাহাতেও কেহ কেহ সিদ্ধ হইয়া ভগবান লাভ করেন। ঠাকুর বলিয়াছেন, এই সাধনায় সিদ্ধিলাভ করা ঠিক যেন পায়খানার দ্বার দিয়ে বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করা, নোংরা স্থান ও পথ দিয়া গন্তব্যস্থানে এসে পৌঁছান।

অদ্বৈত ভূমিতে থাকিবার কালে ঠাকুর ভক্তি ও ভক্ত ত্যাগ করিয়া কেবল বেদান্তবিচার করিয়াছিলেন। এই সময় বিচার করিয়া তিনি কামিনী ও কাঞ্চন মন হইতে সম্পূর্ণ দূর করিয়া দেন। পঞ্চবটীতে হাতে টাকা লইয়া টাকা মাটী, মাটী টাকা, সোনা মাটী, মাটী সোনা ইত্যাদি কথা বারংবার বলিতে বলিতে ঠাকুর সত্য সত্যই দেখিলেন, টাকা বা সোনা যাহা সমস্ত জগৎসংসারকে ঘুরাইতেছে, তাহা মাটী ছাড়া আর কিছুই নয়; এবং উভয় দ্রব্যই গঙ্গায় বিসর্জ্জন দিলেন। মাকে এ-ও জানাইয়া দিলেন, "মা, আমি আজ থেকে টাকা কি না ধন ঐশ্বর্য্য চিরদিনের জন্য ত্যাগ করিলাম।" কিন্তু তাঁহার ভয় হইল—পাছে মা রাগ করিয়া খাওয়া বন্ধ করিয়া দেন। তখন আবার মাকে বলিলেন, "মা, তুমি আমার হৃদয়ে লক্ষ্মীরূপে বাস করো, মা।" কামিনীও তিনি বিচার করিয়া ত্যাগ করিলেন। নারীর দেহে এমন কিছু আছে কি যাহার জন্য মানুষ পাগল হয়? ঠাকুর বিচার করিলেন, তাহাতে হাড়, মাংস, নাড়ী, মল, মূত্র, রস এ সব ছাড়া অন্য কিছুই নাই। এই শরীর লইয়া রমণ শুধু মূঢ় অন্ধরাই করিতে পারে। এই শরীর তিনি কখনও ভোগ করিতে চাহিবেন না, চিরদিনের জন্য সে দেহসুখ ত্যাগ করিলেন। ঠাকুর বলিতেন, "যে মাগসুখ ত্যাগ করেছে, সে জগৎসুখ ত্যাগ করেছে।" এই সব চিন্তার ফলে

তাঁহার নিদ্রা চলিয়া গেল—দেহ অসুস্থ হইয়া পড়িল। এ সময় তাঁহার আরও দু একটি নূতন উপসর্গও হইয়াছিল; একটি সর্ব্বগ্রাসী ক্ষুধা—যতই খান—যতবারই খান, ক্ষুধা আর যায় না। তাহা নিবারণ করিলেন ব্রাহ্মণী। এক দিন তাঁহার ঘরে নানাবিধ খাবার জিনিষ যথেষ্ট পরিমাণে সাজাইয়া দেওয়া হইল এবং তাঁহাকে যখন যাহা ইচ্ছা তখন তাহা খাইতে বলা হইল। ঠাকুর তাহাই করিলেন, তাঁহার সে দৃষ্টিক্ষুধাও চলিয়া গেল। আর একটি অবস্থা এই সময়ে তাঁহার হইয়াছিল। তাঁহার চক্ষুতে পলক পড়িত না। কাহারও কাহারও মতে তিনি কিছুদিন উদয়াস্ত সূর্য্যবিম্বের দিকে চাহিয়া থাকিতেন, তাহার ফলে এইরূপ হইয়াছিল। এই অপলক দৃষ্টির অবস্থাও মাকে জানাইতে চলিয়া গেল। এই অবস্থা দেখিয়া কোন কোন সাধু বলিয়াছিলেন, কোন কোন যোগীর এই দিব্য অবস্থাও হইয়া থাকে। দ্বিতীয় উন্মাদসময়েও তাহার পর কিছুদিন তাঁহাকে দারুণ গাত্রদাহ ভোগ করিতে হয়। এ গাত্রদাহ চন্দন মাখা ও সুগন্ধি ফুলের মালা ধারণ দ্বারা ক্রমে ক্রমে আরোগ্য হইয়াছিল। এতদ্ভিন্ন এই সময়ে এক তান্ত্রিক ব্রাহ্মণ—নাম রামকানাই ঘোষাল—যিনি শিবানন্দ স্বামীর পিতা—তিনি ঠাকুরকে ইষ্টকবচ ধারণ করিতে বলিয়াছিলেন। ঠাকুর খুব সম্ভব এই সময় হইতে ইষ্টকবচ ধারণ আরম্ভ করিয়াছিলেন; তাহাতেই সুফল লাভ করিয়াছিলেন।

বৈষ্ণব-সাধনার সময় তাঁহার দিব্যভাব জাগ্রত হইল। সুন্দরী যুবতী দেখিলে মা'র একটি রূপ মনে করিয়া তিনি পূজা করিতেন। একবার এমনি একটি ব্রাহ্মণকন্যা সতের আঠার বৎসর-বয়স্কা দক্ষিণেশ্বরে আসেন। তাঁহাকে বড়ই সুলক্ষণা দেখিয়া ঠাকুর তাঁহাকে নিজ গৃহে লইয়া গিয়া গলায় মালা ও ধূপ-ধূনা দিয়া পূজা করিতে লাগিলেন। সেই নারীও তৎক্ষণাৎ ভাবসমাধিতে ডুবিয়া গেলেন। ঠাকুর তাঁহাকে টাকা দিয়া প্রণাম করিয়াছিলেন। ভাবান্তে যুবতীর আনন্দাশ্রু বিগলিত হইতে লাগিল। যুবতীর এই অবস্থা বা স্বভাবের নাম ঠাকুর বলিয়াছেন দৈবী স্বভাব। ঠাকুর অনেকবার কুমারী-পূজাও করিয়াছিলেন। মা কালীর নাটমন্দিরে ভৈরবী-পূজাও করিয়াছিলেন, তাহা ইতিপূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। অনেক ভৈরবীও তাঁহার কাছে আসিতেন।

এই সময়ে অতি আশ্চর্য্য বাৎসল্যভাবের আর এক সাধন করিবার জন্য মা তাঁহাকে নিযুক্ত করিলেন। এক দিন এক সাধু দক্ষিণেশ্বরে আসিলেন, তাঁহার কাছে এক অষ্টধাতু-নির্ম্মিত গোপালমূর্ত্তি ছিল, নাম "রামলালা"। সাধু ভিক্ষালব্ধ দ্রব্যাদি রন্ধন করিয়া রামলালাকে ভোগ দিতেন আর সাধু দেখিতেন, রামলালাও তাহা পরিতোষ সহকারে গ্রহণ করিতেছেন। এই দৃশ্য কিন্তু সাধুই কেবল দেখিতে পাইতেন আর দক্ষিণেশ্বরে সাধু আসিলে পর এই দৃশ্য দেখিতে পাইতেন পরমহংসদেব। ক্রমে রামলালা প্রায়ই ঠাকুরের কাছে আসিতেন, বসিতেন, ঘাড়ে কোলে উঠিতেন এবং কিছু কিছু অন্যবিধ চাঞ্চল্যও প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিলেন। ঠাকুরের রামলালাকেও বড় ভাল লাগিত। ক্রমে রামলালার উপর ঠাকুরের ভালবাসাও জন্মিতে আরম্ভ করিল। ৪।৫ বৎসরের সুন্দর নবঘনশ্যাম বালকমূর্ত্তি রামনারায়ণ,—সুকুমার তনু,—দেখিলে মন আনন্দরসে আপ্লুত হয়, চক্ষু জুড়াইয়া যায়। এই ঘনিষ্ঠতা এতদূর বাড়িয়া গেল যে, সাধু অন্নাদি রাঁধিয়া ভোগ নিবেদন করিয়া বসিয়াই থাকেন,—রামলালা আর খাইতে আসেন না—অনেক সময় তাঁহাকে খুঁজিয়া আনিতে হয়। সাধু রামলালার এই ছাড়-ছাড় ভাব দেখিয়া ব্যথা বোধ করিতে লাগিলেন। রামলালা প্রেম-ভক্তির অধিকারী সেই রামাৎ সাধুর মনোব্যথা বুঝিয়া তাঁহার প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ করিবেন স্থির করিলেন এবং শেষে এক দিন রামলালা সাধুর সাধন-ভজন পূর্ণ করিয়া, তাঁহাকে দিব্য রাজারামের মূর্ত্তিতে দর্শন দিয়া বলিলেন, "তুমি অতঃপর সিদ্ধ হইয়া সর্ব্বদা আনন্দপূর্ণ হৃদয়ে থাকিবে, তোমার আর সাধন দরকার নাই, কিন্তু আমি এইখানেই থাকিব।" ইহাতে সাধু আর দুঃখবোধ করিলেন না। রামলালাকে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের হাতে সমর্পণ করিয়া সাধু প্রস্থান করিলেন। এক্ষণে ঠাকুর রামলালাকে লইয়া অতিমাত্র ব্যস্ত থাকেন। নিজে নারিকেল-সন্দেশ প্রস্তুত করিয়া রামলালাকে খাইতে দিতেন আর বলিতেন, "তুমি রাজার ছেলে,—আমি গরীব ব্রাহ্মণ, তোমার জন্য রাজভোগ কোথায় পাইব? এই সামান্য উপহারেই সন্তোষলাভ কর।" রামলালা সানন্দে সেই উপহৃত দ্রব্য গ্রহণ করিতেন। ঠাকুর রামলালাকে নাওয়াইতেন, খাওয়াইতেন, শোয়াইতেন এবং অতিশয়

চাঞ্চল্য প্রকাশ করিলে ধমক দিতেও ছাড়িতেন না। রামলালাও কম দুষ্ট ছিল না। স্নান করিতে ঠাকুরের সঙ্গে গঙ্গায় গিয়া এতই জলে ঝাঁপাঝাঁপি ও লাফালাফি করিত, ডুবিত উঠিত যে, কখনো কখনো ঠাকুর তাহাকে অসুখ হইবার ভয় দেখাইয়া জোর করিয়া জল হইতে তুলিয়া আনিতেন। ঠাকুরের উন্মাদ অবস্থা প্রায় কমিয়া আসিয়াছিল, কিন্তু রামলালাকে লইয়া আবার মত্ততা হইতেছে,—তাই ঠাকুরের আবার এইরূপ ভাবান্তর দেখিয়া চন্দ্রমণি দেবী মধ্যে মধ্যে তাঁহাকে বলিতেন, "বাবা, তুমি আবার সন্ন্যাসীর ঠাকুর নিয়ে পাগল হবে নাকি? এতটা আর করিও না।" ঠাকুর কিন্তু বলিয়াছিলেন যে, রামলালাকে লইয়া তিনি বাৎসল্যভাবের আতিশয্যে এক প্রকার উন্মত্তই হইয়াছিলেন বটে। *

এই রামগোপাল ভাবের সাধন-শেষে ঠাকুর ব্রজের ভাবের সাধন আরম্ভ করিলেন। কিছু দিন ব্রজরাখালের ভাবে থাকিলেন ও 'কানাই—কানাই, হা কানাই' বলিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। বিষ্ণুঘরে রাধাকান্ত বিগ্রহকে বসন-ভূষণ মালা দিয়া সাজাইতেন। তাঁহার হাতে বাঁশীটি দিতেন, তাঁর সঙ্গে কত কথাই কহিতেন—কখনও কখনও নানাবিধ সুমিষ্ট ফল লইয়া কানাইকে ভেট দিতেন—এবং "কানাই, খা ভাই, মিঠা ফল তোর জন্য সংগ্রহ ক'রে এনেছি, একটু খেয়ে দেখ।" ইত্যাদিভাবে অনুনয়-বিনয় করিতেন। তার পর রাধাকৃষ্ণভাবে সাধন আরম্ভ করিলেন। রাধাভাবে 'কোথা কৃষ্ণ' 'কোথা প্রাণবল্লভ দেখা দাও, দেখা দিয়ে আমার প্রাণ রাখ' এইরূপ ভাবে আর্ত্তি প্রকাশ করিতেন। এই সাধনের নাম মধুরভাবে সাধন। এ সাধনে ব্রজেশ্বরী সিদ্ধা হইয়াছিলেন। শুদ্ধা-ভক্তির সাধন ব্রজগোপী ছাড়া আর কেহ জানিতেন না, বা এ সাধনের অধিকারী নহেন। ক্রমে কৃষ্ণদর্শনের জন্য এবং তাঁহার বিরহে ঠাকুরের এমন অবস্থা হইত যে, তিনি শ্রীকৃষ্ণ-বিরহে মূর্চ্ছিত হইয়া যাইতেন। শ্রীকৃষ্ণ-বিরহে তাঁহার মধ্যে প্রচণ্ড বিরহাগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। তিনি তিন দিন তিন রাত্রি অজ্ঞান হইয়া থাকিতেন। হুঁস হইলে বামনী তাঁহাকে স্নান করিতে লইয়া যাইতেন, কিন্তু তাঁহার শরীরে এত উত্তাপ যে গায়ে হাত দিতে পারিতেন না। গায়ের চাদর ধরিয়া ব্রাহ্মণী তবে লইয়া যাইতেন। অজ্ঞান অবস্থায় ঠাকুরের গায়ে যে কাদা-মাটী লাগিয়া গিয়াছিল, পরে দেখা গেল, তাহা পোড়া মাটীর মত লাল হইয়া গিয়াছে। ঠাকুর বলিতেন যে, এমনি নাকি হয়—রূপসনাতনের বিরহাগ্নিতে যে গাছের তলায় তিনি বসিতেন, তাহার পাতা ঝলসিয়া গিয়াছিল। এইরূপ বিরহের পর তিনি ব্রজকিশোর রাধারমণ শ্রীকৃষ্ণের দর্শন লাভ করেন। শ্রীকৃষ্ণের দেহের রং বলিয়াছিলেন ঘাসফুলের রংয়ের মত। কিন্তু রাধারাণীর কৃপা না হলে, শ্রীকৃষ্ণের দেখা এমনি পাওয়া যায় না, রাধার প্রেম না হলে শ্রীকৃষ্ণদর্শন হইবার উপায় নাই। তাই তাঁহাকে আগে সখীভাবে সাধন করিতে হইল। ভক্ত হইবেন শ্রীরাধার সখী। এই সখীসাধন প্রকৃতিভাবে পরমাত্মার সহিত মিলনের সাধন—এটি নিষ্কাম সাধন, তাই অতি কঠিন। এই সখীসাধন করিবার জন্য—শ্রীকৃষ্ণের সখী সাজিবার জন্য যে প্রকার বেশভূষা প্রয়োজন, মথুর সে সমস্ত যোগাড় করিয়া দিলেন। মূল্যবান্ শাড়ী, ওড়না, কাঁচুলী, নানা অঙ্গের নানা গহনা, সুকুঞ্চিত কেশের পরচুলা প্রভৃতি সমস্ত দিয়া ঠাকুরকে সাজান হইল। এই সখীবেশে ঠাকুর চোখে কাজল, কপালে সিন্দুর-ফোঁটা, নাকে তিলক, কাণে দুল, গলায় অলঙ্কার ধারণ করিলেন। সে সাজে তাঁহাকে আর পুরুষ বলিয়া মনে হইত না, যেন ঠিকই ব্রজের গোপী। কখনও কখনও তিনি এই বেশে মায়ের মন্দিরে গিয়া মাকে ব্যজন করিতেন এবং তাঁহার কাছে রাধাপ্রেম চাহিতেন।

এই সময়ে তিনি বিরহাত্মক গান করিতেন, যথা—১। শ্যামের নাগাল পেলাম না যে সই। আমি কি সুখে আর ঘরে রই। ২। রাধার প্রেম কি পায় সকলে ইত্যাদি। এই সখীসাধনের সময় তিনি মধ্যে মধ্যে জানবাজারে মথুর বাবুর অন্তঃপুরে গিয়া কিছুদিন ধরিয়া বাস করিতেন। বাড়ীর মেয়েরা কেহই এ সময় তাঁহাকে পুরুষ মনে করিতেন না এবং তাঁহাকে দেখিয়া সে-জন্য পুরুষোচিত লজ্জাও করিতেন না। ঠাকুর নিজে বলিয়াছেন, তিনি আন্দীর সঙ্গে মথুর বাবুর মেয়েকে জামাইয়ের কাছে শোয়াইতে যাইতেন। যেমন স্ত্রীলোকরা সাধারণতঃ নব

* ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দে মা কালীর মন্দিরে এক ভীষণ চুরি হয়—মা ভবতারিণীর হীরা-মুক্তা-স্বর্ণ-নির্ম্মিত অলঙ্কার ও রূপার তৈজস-পত্রাদি চোরে চুরি করিয়া লইয়া যায়। ঐ সঙ্গে চিন্ময় বিগ্রহ রামলালাকেও চোরে স্বর্ণমূর্ত্তি ভাবিয়া লইয়া গিয়াছিল। আর পাওয়া যায় নাই।

পরিণীতার বিষয়ে করিয়া থাকেন। কখনো বা মথুর ও জগদম্বা দাসীর সঙ্গে একই শয়নকক্ষে রাত্রে শয়ন করিতেন। মথুর জিজ্ঞাসা করিতেন, "বাবা, আমরা যা কথা কই, তুমি কি শুনিতে পাও?" ঠাকুর বলিতেন, "পাই।" এই ভাবে সাধন করিতে করিতে ঠাকুরের স্বভাবাদিও স্ত্রীলোকের মত হইয়া গিয়াছিল। চলিবার সময় তাঁহার বাম পদ আগে পড়িত। এমন কি, শুনা যায়, এই সময় তাঁহার স্ত্রীলোকদের মত রজোদর্শন ঘটিত। সখীসাধনের সময় ঠাকুর মধ্যে মধ্যে দক্ষিণেশ্বরে গিয়াও মা'র সেবা করিতেন, ওড়না গায়ে মা'কে চামর ব্যজন করিতেন—মা'র সখীভাবে—দাসীভাবে,—আবার জানবাজারে আসিয়াও থাকিতেন। রাধামূর্ত্তি দর্শন করিয়া ঠাকুরের সখীভাবসাধনের শেষ হইল। পেশোয়াজ পরা, নানা অলঙ্কার-বিভূষিতা, সোনার বরণ—পরমাসুন্দরী রাধামূর্ত্তি তিনি দর্শন করেন। মূর্ত্তি উজ্জ্বল, তাহা হইতে জ্যোতিঃ তরঙ্গায়িত হইতেছে। এই মধুরভাবে সাধন-সময় তিনি পঞ্চবটীতে এক সাধু দর্শন করেন। তাঁহার মাথায় নয় হাত লম্বা চুল। তিনি অন্য পূজাপাট কিছুই করিতেন না—সন্ন্যাসী মুখে কেবল রাধে রাধে উচ্চারণ করিতেন। ঠাকুর পরে যখন বৃন্দাবন গিয়াছিলেন, তখন তথায় এক ভক্তিমতী—নাম গঙ্গামায়ী ঠাকুরকে সাক্ষাৎ রাধা বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তাঁহাকে 'দুলালী' (অর্থাৎ রাধা) বলিয়া ডাকিতেন।

এত দিনে ঠাকুরের দেহ প্রায় রোগশূন্য হইল। তাঁহার শরীর স্থূল ও বর্ণ অতিশয় উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সোনার রং আসিল তাঁর গায়ে। এ সময় তিনি উলঙ্গ থাকিতেন ও গায়ে একখানি মোটা চাদর ঢাকা দিয়া রাখিতেন। দেহ জ্যোতির্ম্ময় হইয়া উঠিয়াছে দেখিয়া তিনি ভীত হইলেন এবং নিজের শরীর আরও বেশী করিয়া চাদর ঢাকা দিয়া রাখিতে লাগিলেন। ভয়ের কারণ এই যে, লোকে সে দেহ দর্শন করিলে তাঁহাকে দৈবীমানুষ বলিয়া দর্শনমাত্রই বুঝিতে পারিবে এবং নানা প্রার্থনা পূরণের জন্য দিবারাত্র তাঁহাকে ব্যতিব্যস্ত করিবে। তাহার ফলে শেষে দক্ষিণেশ্বর হাসপাতাল, ডিস্পেন্সারী হইয়া উঠিবে। তখন তিনি মায়ের নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিলেন, "মা, ভেতরে চ'লে যাও, মা, ভেতরে চ'লে যাও। হাঙ্গামা বাধাইও না।" ক্রমে ক্রমে সে রূপ ও জ্যোতিঃ অদৃশ্য হইয়া গেল। ঠাকুর বলিয়াছেন, তার পর হইতে তাঁহার এমন দেহ হইয়াছে।

মথুরের স্ত্রী জগদম্বা—রাসমণির সর্ব্বকনিষ্ঠা কন্যা—এই সময় (১৮৬৫-৬৬) অতিশয় পীড়িতা হইয়া পড়িলেন। ডাক্তারগণ কিছুই করিতে পারিলেন না, শেষে তাঁহারা এক প্রকার ইঙ্গিতে জানাইলেন যে, রোগিণীর বাঁচিবার আশা নাই। মথুর এই বিপদে মনের বল হারাইয়া ফেলিলেন। তিনি ঠাকুরের কাছে আসিয়া কাঁদিয়া পড়িলেন, বলিলেন, 'বাবা, এ বিপদে তুমি ছাড়া আর আমার যে কেহ নাই। বাবা, জগদম্বা যদি চ'লে যায়, তাতে আমার যা হবার হোক, কিন্তু এই জমিদারীটা যদি অন্যের হাতে চ'লে যায়, তবে বাবা, তোমার সেবা কেমন ক'রে হবে?' এই কথা শুনিয়া ঠাকুর মাকে জগদম্বার কথা জানাইলেন। মা আশা দিলে ঠাকুর মথুরকে বলিলেন, "ভয় নাই, মা বলেছেন, জগদম্বা আরাম হ'বে।" অগাধ সমুদ্রে মথুর কূল-কিনারা পাইবার মত আশ্বস্ত চিত্তে জানবাজারে ফিরিয়া আসিলেন এবং সত্য সত্যই রোগ অতঃপর আরোগ্যের পথে যাইতে আরম্ভ করিল। জগদম্বা যথাসম্ভব শীঘ্র আরোগ্যলাভ করিলেন।

ইহার কিছু দিন পরে (১৮৬৭) ঠাকুর কামারপুকুর দর্শনে যাইলেন—সঙ্গে রহিলেন হৃদয় ও ব্রাহ্মণী। সেখানে পৌঁছিয়া শ্রীশ্রীমাকে জয়রামবাটী হইতে আনান হইল। মা এখন ১৪ বৎসর বয়সের ছোট কিশোরী বধূ মাত্র। ঠাকুরের দেশে তাঁর কোন বিষয়ে কিছুমাত্র অসুবিধা না হয়, মথুর আগে হইতে ভাবিয়া তাহার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন এবং হৃদয়ের উপর সমস্ত দেখিবার ভার দিয়াছিলেন। মেয়েকে শ্বশুরবাড়ীতে পাঠাইবার সময় সামর্থ্যবান্ পিতা যেরূপ দ্রব্যসম্ভারসহ কন্যাকে পাঠাইয়া থাকেন, ঠাকুরের দেশে আগমনকালে মথুর সেইরূপই দ্রব্য সঙ্গে তাঁহাকে বরাবরই পাঠাইতেন। বস্ত্র, চেলী, বেনারসী, মেওয়া-ফল, মিছরি, মিষ্টান্ন এই সব জিনিষ সঙ্গে থাকিতই এবং হৃদয়ের হাতে ব্যয়ের জন্য যথেষ্ট টাকাও মথুর দিয়া দিতেন। এবারে শ্রীমাকে আনা হইবে বলিয়া মথুর আরও অধিক পরিমাণে বেনারসী, ঢাকাই প্রভৃতি বস্ত্রাদি সঙ্গে দিয়াছিলেন। চন্দ্রমণি দেবী গঙ্গাতীর ছাড়িয়া দেশে ফিরিতে রাজী না হওয়ায় ঠাকুর তাঁহাকে দক্ষিণেশ্বরে রাখিয়া গেলেন। কামারপুকুরে শ্রীমার সেবা ঠাকুর এই প্রথম গ্রহণ করিলেন;—

নিজে পেট-রোগা ছিলেন বলিয়া কি কি তরকারী হইবে, তাহা মাকে আগে হইতে বলিয়া রাখিতেন, শ্রীমা সেইমতই রন্ধন করিতেন। ঠাকুর বামনীকে বরাবরই মা বলিতেন, কাযেই শ্রীমাও তাঁহাকে শাশুড়ীর মত ভয় ও ভক্তি করিতেন। ব্রাহ্মণী পূর্ব্বদেশীয়া, কাযেই নিজে যে তরকারী রাঁধিতেন, তাহা ঝালে পোড়া হইত। মাকে সেই তরকারী দিতেন খাইতে। মা ঝালের জন্য চোখের জল মুছিতেন আর সেই তরকারী খাইতেন এবং ব্রাহ্মণী জিজ্ঞাসা করিলে ভয়ে বলিতেন, রন্ধন বেশ ভালই হইয়াছে। কিন্তু রামলালের মা (রামেশ্বরের স্ত্রী) বলিতেন, "মা গো, কি তরকারীই হয়েছে, ঝালে পোড়া!" এই জন্য তাঁকে বামনীর ভাল লাগিত না। এক দিন চিনু শাঁখারীকে ঠাকুর খাইতে বলিয়াছিলেন। চিনু ঠাকুরের বাল্যকালের বন্ধু ও ভক্ত ছিল, এ কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। সেই জন্য ঠাকুর তাহাকে ভালবাসিতেন। বামনীরও চিনুকে ভাল লাগিল। আহারের পর বামুনবাড়ী বলিয়া চিনুকে স্থানটি পরিস্কার করিতে বলা হইল। বামনী বলিলেন, থাক, তিনিই ভক্তের উচ্ছিষ্ট পরিষ্কার করিবেন। হৃদয় তাঁহার এই আচরণে আপত্তি করিলেন। দুজনের মধ্যে ইহা লইয়া বচসা হইল। শেষে ঠাকুর আবার বিবাদ মিটাইয়া দিলেন। এইবারে ঠাকুর কয়েক মাস কামার-পুকুরে বাস করেন। তার পর শরীর ভাল হইলে দক্ষিণেশ্বরে ফিরিলেন। শ্রীমাকে লইয়া ঠাকুরের সঙ্গে মধ্যে মধ্যে ব্রাহ্মণীর নানা বিষয়ে মতভেদ ঘটিতে লাগিল। ঠাকুর বুঝিলেন যে, বামনীর সঙ্গে তাঁহার এখন ছাড়াছাড়ি ঘটাই মা'র ইচ্ছা। মা'র ইচ্ছা পূর্ণ হইল। ব্রাহ্মণী আর কলিকাতায় ফিরিলেন না। তিনি ঠাকুরের কথায় কাশী চলিয়া গেলেন। অল্পদিন পরে দক্ষিণেশ্বরে ফিরিয়া আসিয়াই আবার ঠাকুরের মন সাধনের দিকে ঝুঁকিতে আরম্ভ করিল।

এইবার ইসলামধর্ম্ম-সাধন বিষয়ে ঠাকুরের অভিলাষ জন্মিল। দমদমার নিকট এক ব্যক্তি বাস করিতেন—নাম গোবিন্দ রায়। ইনি গোপনে মুসলমানধর্ম্ম আচরণ করিতেন। এই সময়ে যেমন তাঁহার দক্ষিণেশ্বরে আসা-যাওয়া ঘটিল, অমনি উভয়ে উভয়ের মনের কথা জানিতে পারিলেন। গোবিন্দের নিকট ঠাকুর আল্লা-মন্ত্র গ্রহণ করিলেন। তিনি তিন দিন এই সাধনা করিলেন। তাঁহার অবস্থা বদলাইয়া গেল, কাছা খুলিয়া কাপড় পরিলেন, মুখে আল্লামন্ত্র জপ, মন্দির দর্শন বন্ধ, আহার পেঁয়াজ দিয়া রান্না ভাত-তরকারী। পেঁয়াজের তরকারী খাইতেছেন আবার বিচারও করিতেছেন—মন বোঝ, এরই নাম পেঁয়াজসংযুক্ত রান্না খাওয়া। অবশ্য খানা মথুর বাবুর নিযুক্ত বামুনেই রাঁধিত—কিন্তু তাহাকেও কাছা খুলিয়া পৈতা কোমরে গুঁজিয়া রান্না করিতে হইত। হৃদয় মামার এই বিধর্ম্মী আচারে অসন্তুষ্ট হইয়া তিরস্কার করিতে লাগিলেন, কিন্তু ঠাকুর তাহা শুনিলেন না। দিনশেষে আবার দক্ষিণেশ্বরে কালীমন্দিরের সদর-ফটক হইতে কিছু দূরে উত্তর-পূর্ব্বদিকে অবস্থিত এক ক্ষুদ্র মসজিদে গিয়া নেমাজও করিতেন। অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত তিনি ফিরিয়া না আসায় সেখান হইতে ভাবাবস্থায় হৃদয় তাঁহাকে ধরিয়া আনিয়াছিলেন। এইরূপ তিন দিন সাধনার পর ঠাকুর এক দীর্ঘশ্মশ্রু জ্যোতির্ম্ময় পুরুষ দর্শন করিলেন—তিনি বলিয়াছেন, ইনিই মহম্মদ, মুসলমান-ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক। মহম্মদকে দর্শনের সঙ্গে দেখিলেন যে, এক যায়গায় পশু জীবজন্তু সবই রহিয়াছে আর হিন্দু মুসলমান ইংরেজ প্রভৃতি নানা জাতির মানুষও রহিয়াছে। ঠাকুরও সেখানে, কুকুরও সেখানে, মুদ্দফরাসও সেখানে। সেইখানে ঐ দাড়ীওয়ালা মুসলমান হাতে সান্‌কি ও তাতে ভাত লইয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি তার পর সকলের মুখে দুটি দুটি ভাত দিলেন—ঠাকুরের মুখেও দুটি দিলেন। ঠাকুর তাহা হইতে ধারণা করিলেন যে, ভক্তরা এক জাতি এবং সকল ধর্ম্মের শেষ সেই অখণ্ড চৈতন্যের সঙ্গে মিলন। এ সময়ে তাঁহার আবার একটি অবস্থা হইয়াছিল। এঁড়েদার শ্মশান-ঘাট হইতে কিম্বা গঙ্গার ওপার হইতে যে মরা পোড়ার গন্ধ দক্ষিণেশ্বরের বাগানে আসিত, ঠাকুরের নিকট তাহা এত মিষ্ট লাগিত যে, তিনি সে গন্ধ টানিয়া লইতেন।

এই ভাবে ঠাকুরের সাধন-ভজন শেষ হইয়া আসিল। বাকি রহিল খৃষ্টিয়ান মতে সাধনা। পরে কেমন ভাবে মা তাঁহাকে তাহা করাইয়াছিলেন, তাহা যথাস্থানে বর্ণিত হইবে। [ক্রমশঃ

শ্রীদুর্গাপদ মিত্র।
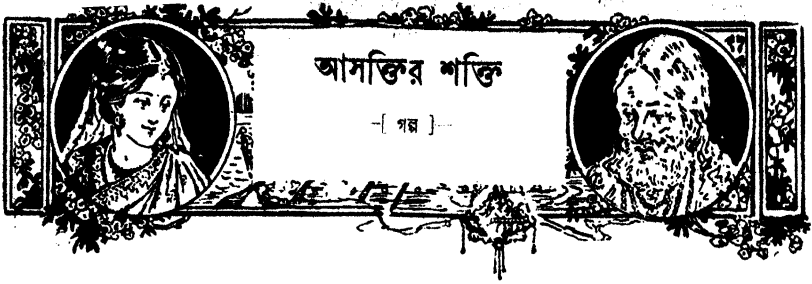
প্রথম পরিচ্ছেদ

—১২৮৬ সাল—

১২৮৬ সালের এক বৈশাখী অপরাহ্ণ। আকাশে কাল-বৈশাখীর সূচনা লক্ষ্য করিয়া বিন্দুবাসিনী তাড়াতাড়ি নদীর ঘাট হইতে গা ধুইয়া ও এক ঘড়া জল কাঁখে করিয়া দ্রুতপদে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিল।

ঘড়াটি দাওয়ার উপর রাখিয়া, রোয়াকের উপর উঠিয়া দাঁড়াইতেই বিমল কিছুক্ষণ তাহার দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া থাকিয়া কহিল—"ভগবান্ যাকে দেন, সব দিক দিয়েই দেন; আবার যাকে দেন না, কোন দিক দিয়েই দেন না; একেবারেই তারে নিঃস্ব করেই ছাড়েন।"

হাতের গামছাখানা নিংড়াইতে নিংড়াইতে বিন্দু কহিল,—"কি গো, গ্রন্থ-ট্রন্থ কিছু লিখতে সুরু করেছ বোধ হয়? ক'রে থাক যদি, তা হ'লে উপন্যাস কিছুতেই নয়,—নিশ্চয়ই কোন তত্ত্বকথা সম্বন্ধেই হবে। না গা?"

"ঠিকই তাই। সৃষ্টিতত্ত্ব। ভগবান্ এক জনকে—এই ধর গিয়ে, তোমাকেই—তাঁর ভাঁড়ারে যত রূপ ছিল, সব ঢেলে দিয়েই তৈরী করলেন, আর ওদের দুগ্‌গাটার সামান্য একটু রূপের জন্যে বিয়েই হচ্ছে না। চোদ্দ বছরের ধেড়ে মেয়ে হতে চল্লো, এখনও আইবুড়ো হয়েই রইল।"

"সত্যি, বড় অবিচার বটে।"

"তবে, তোমার ক্ষেত্রে, অবিচারটা যদি আর এক দিক দিয়ে জানিয়ে না দিতেন, তা হ'লে তার তীব্রতাটা বড়ই চোখে লাগতো।"

বিন্দু দালানের মধ্যে গিয়া ভিজা কাপড় ছাড়িল, তৎপরে রোয়াকে আসিয়া কহিল—"কি বলছো?"

"এই ধর, তোমার বাইরের রূপটা যত বড় ক'রে সৃষ্টি করেছেন, ভেতরের রূপটাও যদি সেই রকম বড় ক'রে সৃষ্টি না করতেন—"

"তা হ'লেই মাকাল-ফল হয়ে যেতুম। কিন্তু মাকাল-ফলও কি একটা ওষুধে লাগে শুনেছি। তা এখন সৃষ্টিতত্ত্ব রেখে দিয়ে, খানিকটা ঘুরে-ফিরে এস; নইলে ও-বেলার মত এ-বেলাও হয় ত ক্ষিদে হবে না।"

"বাইরে কোথাও আর যেতে ইচ্ছে করছে না। বাড়ীর মধ্যেই খানিক ছুটোছুটি করবো। লুকোচুরি খেলবো—তুমি আর আমি," বলিয়া বিমল বাহির-বাটীর দিকে গেল এবং সদরের দরজাতে খিল লাগাইয়া দিয়া আসিল। তার পর বিন্দুর মুখের দিকে চাহিয়া কহিল—"আমিই চোর। লুকোও গে। উঠোনের এই আমগাছটাই বুড়ী।"

মুখ টিপিয়া হাসিতে হাসিতে বিন্দু কহিল—"আমার সঙ্গে খেলায় কেবলই ত তুমি চোর হও। তোমার মত চিরকালের চোর নিয়ে ঘর করা—সত্যি বড় ভয়ের কথা।"

এই দু'টি স্বামি-স্ত্রীর—এই দু'টি যুবক-যুবতীর—এইরূপ লুকোচুরি খেলা আজ নূতন নহে। সংসারে আর দ্বিতীয় কেহ নাই। বিমল যখন ষোল বছরের আর বিন্দু নয় বছরের—তখন তাহাদের বিবাহ হইয়াছিল। তখন হইতে এক যুগ কাটিয়া গিয়া উভয়কে তরুণ-তরুণীর স্থান হইতে অনেকটা সম্মুখের দিকে ঠেলিয়া লইয়া গিয়াছে। এখন বিমলের বয়স—২৮, বিন্দুর ২১। এই বয়সে সদর দরজায় খিল দিয়া স্বামি-স্ত্রীতে লুকাচুরি খেলা—যেমন অসাধারণ, তেমনই বে-মানান। কিন্তু ইহারা খেলিত। উঠানের আমগাছকে বুড়ী করিয়া কখনও বিন্দু লুকাইত, বিমল চোর হইত; কখনও বিন্দু চোর হইত, বিমল লুকাইত। বিমলের স্বর্গীয় জননী, তাঁহার বড় আদরের একমাত্র কিশোর পুত্র ও পুত্রবধূকে এইরূপ ছেলেখেলা খেলিতে উৎসাহিত করিতেন। কোন জননীর পক্ষে ইহাও বোধ

হয়—অসাধারণ। কিন্তু বিমলের মাতা ইহাতে গভীর আনন্দ ও তৃপ্তি লাভ করিতেন। আজ তিনি বাঁচিয়া নাই এবং ইহারাও আজ তখনকার দিনের মত কিশোর-কিশোরী নয়, কিন্তু তবুও ইহাঁদের স্বল্পপূর্ব্বের সেই অভ্যাসটি একেবারে যায় নাই। মধ্যে মধ্যে প্রেম-দেবতার খেয়ালী হাতের নাড়া পাইয়া ইহাদের মনের মাঝে সেই ছেলেখেলার সাড়া পড়িয়া যায়। শোভন অশোভন, উচিত অনুচিত তাহারা ভাবে না; ভাবিবার আবশ্যক মনে করে না। সুপ্রশস্ত নির্জ্জন বাটীর মধ্যে এক জন মালকোঁচা ও আর এক জন গাছ-কোমর বাঁধিয়া লুকোচুরি খেলার সুরে ছুটাছুটি করে।

আজও তাহাই করিল।

অবশেষে সন্ধ্যার অন্ধকার নামিয়া আসিলে, 'আক্কা' দিয়া বিন্দু রোয়াকের এক ধারে বসিয়া পড়িল। বিমলও তাহার পার্শ্বে বসিয়া পড়িল। উভয়ের সুন্দর, স্বাস্থ্যপূর্ণ, শক্তিশালী দেহ ঘামে ভিজিয়া উঠিয়াছিল। কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর বিন্দু সন্ধ্যা দিতে উঠিয়া গেল, বিমল বসিয়া রহিল। তাহার মাথার উপর, আকাশের গায় এক ফালি চাঁদ উঠিয়াছিল। দক্ষিণের বাতাস পাঁচীলের ধারের নারিকেল গাছগুলির মাথায় উঠিয়া, তাহাদের পাতাগুলিকে অস্থির করিয়া তুলিতেছিল। দূরের কোন একটা গাছ থেকে একটা পাখী অনবরত একঘেয়ে সীস্ জুড়িয়া দিয়াছিল

রাত্রিতে আহারশেষে তামাক খাইতে খাইতে বিমল কহিল—"বিন্দু, বড় সুখেই আমি আছি, কিন্তু মাঝে মাঝে একটা ভয় হয় যে, এ সুখ যদি আমার হঠাৎ————। সুখই বলছি; যদিও পয়সা-কড়ি নেই, বিষয়-সম্পত্তিও নেই, কিন্তু তোমাকে স্ত্রীরূপে পেয়ে আমি ওসবের অভাবকে অভাব বলেই গ্রাহ্য করি না।" তার পর হুঁকাতে দুই চারিটা টান দিয়া আবার কহিল,—"আমি তোমায় পেয়ে সুখী বটে, কিন্তু তোমাকে ত সুখী করতে পারলুম না, বিন্দু। একখানা গয়না কি একখানা ভাল কাপড় পর্য্যন্ত তোমাকে দিতে পারিনি, পারবও না। তাই ভাবি যে, আমি সুখী বটে, কিন্তু তোমার দুঃখের আর অন্ত নেই। রাজা-জমিদারের ঘরেই তোমায় মানায়, বিন্দু, আমার মত দীন ভিখিরীর ঘরে তোমায় মানায় না।"

"তোমার কাছেই আমায় মানায়। আমি যে জন্ম-জন্মই তোমার। আমি কি তোমার ঘর ছেড়ে, অন্য কোথাও যেতে পারি? তুমি কি মনে কর, আমি শুধু এই জন্মেই তোমার স্ত্রী হয়ে এসেছি? তা মনেও করো না। জন্ম-জন্মই এই দু'টি পায়ের তলায় আশ্রয় পেয়ে এসেছি—জন্ম-জন্মই পাবো," বলিয়া বিন্দু বিমলের পায়ের উপর তাহার পদ্মমুখ রক্ষা করিল।

ঘরের এক কোণে পিলসুজের উপর মোটা পলিতা দেওয়া রেড়ির তৈলের প্রদীপ জ্বলিতেছিল। মুক্ত জানালা দিয়া, সন্ধ্যার সেই চাঁদের ফালিটুকু তখন পশ্চিমাকাশে অনেকখানি নামিয়া পড়িয়াছিল। তাহারই স্নিগ্ধ ক্ষীণালোক প্রদীপের স্নিগ্ধালোকের সহিত মিশিয়া গিয়াছিল। ও-পাশের বাড়ীর নন্দ বৈরাগী বাউলের সুরে তখন একখানা গান ধরিয়াছিল:—

সেই প্রেমেতে বাঁধ্ রে নাগরে।
যে প্রেমেতে ঊর্দ্ধে তারে যাবে নিয়ে—
বন্দী ক'রে রাখবে না ঘরে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

—১২৯০ সাল—

বেলা প্রায় দেড় প্রহরের সময় পাড়া হইতে দুইটি খবর সংগ্রহ করিয়া বিমল বাটী প্রত্যাগত হইল। প্রথম খবর—গাঙ্গুলী-বাড়ীর নূতন জামাই নরহরি আজ কয় দিন হইল শ্বশুরালয়ে আসিয়াছে এবং কয় দিনই আহারাদির পর সমস্ত মধ্যাহ্নকালটা, বহির্ব্বাটীর পরিবর্ত্তে তাহাকে অন্দরের ঘরের মধ্যেই স্থান দেওয়া হইতেছে এবং সে ঘরে তাহার নব-পরিণীতা বধূ বিরজাসুন্দরী না কি যাতায়াত করিয়া থাকে। গাঙ্গুলী-বাড়ীর এবম্বিধ অনাচার—অর্থাৎ দিবাভাগে স্বামি-স্ত্রীর মধ্যে এরূপ দেখা-সাক্ষাৎজনিত অপরাধের বিচার করিতে ও-পাড়ার লোক গোপনে কমিটী বসাইয়াছে এবং জয়কালী গাঙ্গুলীর প্রতি কি ভাবে এবং কোন্ শ্রেণীর সামাজিক শাস্তির প্রয়োগ বিধেয়, তাহারই কল্পনা-জল্পনা চলিতেছে। বিমলের নিকটও তাঁহারা পরামর্শ-প্রার্থী হইয়াছেন। অধিকাংশের যেরূপ মত হইবে, বিমলেরও তাহাই, এই কথা জানাইয়া বিমল চলিয়া আসিয়াছে।

দ্বিতীয় খবর এই যে, বিন্দুকে শীঘ্রই একবার কলিকাতায়

কালীঘাটে যাইতে হইবে এবং সেখানে কালীমন্দিরের অভ্যন্তরে—উত্তরদিকে যে সুবৃহৎ মনসাগাছ আছে, তাহাতে কাপড়ের ফালিতে বাঁধিয়া ঢেলা ঝুলাইয়া আসিতে হইবে।

ও-পাড়ার রাঙ্গা ঠান্‌দি বিমলকে ডাকিয়া আজ ধরিয়া বসিয়াছে যে, বিমল ও বিন্দু বৌকে তিনি রামসীতা বলিয়াই মনে করেন। তাঁর এইরূপ মনে করার মধ্যে কোন ভুলই নাই। তারা দু'টি ঠিকই ত্রেতার রামসীতা। দু' একটি ছেলে-মেয়ে না হইলে তাদের যেন মানাইতেছে না। তাই তাঁর উক্তরূপ আদেশ জারি হইয়াছে। কালীঘাটের মনসা-গাছে ঢেলা বাঁধিয়া দিয়া আসিলেই বিন্দুর কোলে লব-কুশের আগমন অবার্থ!

সমস্ত শুনিয়া, মুখে সাড়ীর অঞ্চল চাপা দিয়া বিন্দু ও-ঘরের দিকে পলাইয়া গেল। বিমল তাহার অনুসরণ দ্বারা গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া কহিল—"পালিয়ে এলে হবে না। রাঙ্গা ঠান্‌দির হুকুম,—তামিল করতেই হবে। নইলে, কবে হয় ত তিনি নিজেই তোমাকে টেনে নিয়ে হুগলীর ইষ্টিশনে গিয়ে রেলে উঠে বসবেন।"

এই কথার পর অনেক দিন বিন্দুর মনে চুপিসাড়ে কালীঘাট যাওয়ার কথা অনেকবার উঁকি দিয়া গিয়াছে। তাহার অন্তঃকরণে মা হইবার বাসনার একটা নাড়া আসিয়া লাগিয়াছে। এরূপ সময়ে, খানিক ভাবিয়া অবশেষে সে নিজের মনে বলিয়াছে—বেশ আছি, আর ছেলের দরকার নেই। এই অভাবের সংসারে আমাদেরই দুটো পেট চলা ভার, এর ওপর ছেলেপুলে না হয়েছে—ভালই হয়েছে। ওঁকে সুখী ক'রে, ওঁর পায়ের তলায় আ-মরণ এই ভাবে কাটিয়ে যেতে পারলেই আমার সাধ ষোল আনা পূর্ণ হবে। কালীঘাট!—হ্যাঁ, আছে বটে। মন্দিরের ঠিক উত্তরেই বাঁধানো ষষ্ঠীতলা। কত দেশ-দেশান্তরের মেয়েরা সেই মনসাগাছে ঢিল্‌ বেঁধে দিয়ে যায়। আমার বিয়ের আগে আমরা যে সেই গিয়েছিলুম! মা, ঠাকুরমা, বৌদিদি, ও-বাড়ীর গঙ্গা-পিসী, মোড়লদের ছোট-গিন্নী, ন'কাকা, আরও সব কত কে। মেমারী থেকে রেলে চেপে হাওড়ায় নামলুম; তার পর গঙ্গা পেরিয়ে কতকটা পথ ঘোড়ার গাড়ীতে এসে, এক যায়গাতে সব ট্রামগাড়ীতে উঠলুম। কেমন রেলগাড়ীর মত ছোট ছোট, দু'খানা ক'রে গাড়ী, একখানা এঞ্জিনে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। আগে আগে এক জন তুড়ুক-সওয়ার ঘোড়া ছুটিয়ে যেতে লাগলো। সে সব না কি এখন আর নেই,—এখন না কি ঘোড়াতেই গাড়ী টানে। কি যায়গা গো! আদিগঙ্গার ধারে হোগলা-ঘেরা ঘরে তিন দিন আমরা ছিলুম। কি নোংরা! পথের দু'পাশে কত বড় বড় পচা নর্দ্দামা! কত এঁদো পুকুর! আমাদের মোড়লপুর ওর চেয়ে সোণার চাঁদ যায়গা!

এই রকম ভাবিতে ভাবিতে বিন্দু এক বিষয় হইতে আর এক বিষয়ে আসিয়া পড়ে। তাহা হইলেও মূলে ঢেলা-বাঁধার কথাটা তাহার মনে ঠিকই উঁকি দিয়া যায়। যদি কোন দিন বিমল পুরাণো কথাটার উল্লেখ করিয়া উত্তরের প্রতীক্ষায় বিন্দুর মুখের দিকে তাকাইয়া থাকে, বিন্দু বলে—"কি হবে ছেলেপুলে? একে আমাদের এই গরীবের সংসার, তার পর ধর গিয়ে—" বলিয়া বিমলের কাণের কাছে মুখ লইয়া গিয়া চুপি চুপি বলে—"ছেলেপুলে হ'লে তোমার ওপর আমার ভালবাসার ভাগাভাগি হয়ে যাবে!" বলিয়াই মৃদু মৃদু হাসিতে হাসিতে বিন্দু ছুটিয়া পলাইয়া যায়।

সত্যই গরীবের সংসার। সাবেককালের পিতৃ-পিতামহ-পরিত্যক্ত প্রকাণ্ড বাড়ীখানাই আছে, আর কিছু নাই। তাহাও চারিধারে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে, মেরামতের পয়সা নাই। বিন্দু কোন কষ্টকেই কষ্ট বলিয়া গ্রাহ্য করে না, তাই সাংসারিক এই অস্বচ্ছলতাকে সে মোটে আমল দেয় না। আর বিমল বলে—'যার বিন্দু আছে, তার খাবার কষ্ট কি?' তবুও পাড়ার পাঁচ জনে ইহাদের উদ্দেশে বলে—"আহা!" এই 'আহা'র মানে—এমন সুন্দর স্বামি-স্ত্রী, এমন মধুর চরিত্র ইহাদের, যেন কলির লক্ষ্মী-নারায়ণ, কিন্তু দু'টি শাক-ভাতেরও বুঝি বা বারো মাসের সংস্থান এদের নাই।

বাঁড়ুয্যেদের ছোটকর্ত্তা বাড়ী আসিয়াছেন। গাঁয়ের মধ্যে একমাত্র তিনিই গাঁ ছাড়িয়া বাহিরে থাকেন। কলিকাতায় লাহাদের সূতার কারবার আছে, তিনি সেইখানে কায করেন। দেশ ছাড়িয়া কলিকাতায় থাকা, সকলেই দুরদৃষ্ট বলিয়া মনে করিত; কেহ থাকিতও না। বাঁড়ুয্যেদের ছোট-কর্ত্তা এবার ছয় মাস পরে বাটী আসিয়া বিমলকে ডাকিয়া কহিলেন—"আমাদের সূতোর কারবারে তোমার একটা কাযের ঠিক করেছি। খাওয়া পাবে, থাকবার যায়গা

পাবে, আর মাসে সাত টাকা ক'রে নগদ পাবে। তা' ছাড়া পূজোর সময় নতুন ধুতি-চাদর।" এই শুভ-সংবাদে পাড়ার সকলেরও আনন্দ হইল। সকলেই ইহাদিগকে ভালবাসে। বিমল ও বিন্দুর অন্তঃকরণ ছোটকর্ত্তার প্রতি কৃতজ্ঞতায় ভরিয়া গেল। এক জনের খোরাকটা বাঁচিয়া যাইবে; তার উপর বৎসরে প্রায় একশতটি করিয়া টাকা পাওয়া যাইবে। তা' হলেই আর কোন অভাব-অনটন থাকিবে না। উপরন্তু, দু'একটা ভালমন্দ জিনিষ বিন্দুকে দিতে পারা যাইবে।

ভিতরে ভিতরে সব বন্দোবস্ত হইতে লাগিল। বিন্দুর কাছে রাত্রিতে নেড়ার মা শুইবে। সে-ই দোকান-হাট করিয়া দিবে। বিমল ছ'মাস অন্তর ১৫ দিনের ছুটীতে বাটী আসিবে। কলিকাতা হইতে দল বাঁধিয়া এ অঞ্চলে প্রায়ই সব আসিয়া থাকে। আবুইহাটী, নলডাঙ্গা, ছাতিমপুর, বিলসরা, সিমলেগড়, সাতশিমুল প্রভৃতি গ্রামের অনেক লোক আজকাল দল বাঁধিয়া প্রায়ই কলিকাতা যায়-আসে। যাদের পয়সা আছে, তারা রেলে চেপেও যাতায়াত করে। কিন্তু তেমন লোক আর কয়টা? সবে ত বিশ পঁচিশ ক্রোশ পথ। হাঁটিয়া আসিতে দুইটা দিনের বেশী লাগে না। মধ্যে সেওড়াফুলিতে এক রাত না কাটাইলে সভ্যসভ্যই আসা যায়। তবে দশ-বিশ জন মিলিয়া একসঙ্গে না আসিলে হয় না। কেন না, পথে একটু ভয়ের কারণ আছে। তবে, ঠ্যাঙ্গাবাড়ীর মাঠে আগের চেয়ে ঠ্যাঙ্গাড়ের ভয় এখন অনেকটা ক'মে এসেছে, নেই বল্লেই হয়।

বিমলের কলিকাতা আসিবার দিন যতই কাছে আসিতে লাগিল, ততই তাহার মুখভাবে চিন্তা জমিয়া উঠিতে লাগিল। বিন্দুর সদা-প্রফুল্ল মুখেও হাসি যেন ক্রমেই অন্তর্হিত হইতে লাগিল। বাহিরে যাহাই হউক, অন্তরের অন্তরে একটা স্বস্তির নিশ্বাস উভয়ে নিশ্চয়ই ফেলিয়াছে। এইবার সংসারের অনটন আর বড় একটা রহিবে না, এইবার হয় ত বিমল বিন্দুর অঙ্গে দু'একখানা ভাল কাপড় পরাইতে পারিবে। দু'চার বৎসর পরে একখানা সোনার জিনিস হয় ত বিমল এইবার বিন্দুর গায়ে দেখিতে পাইবে।

কলিকাতা যাইতে আর ছয়টা দিন বাকী আছে। বাঁড়ুয্যেদের ছোট কর্ত্তা বিমলের কাছে আসিয়া বলিলেন—"গোছ-গাছ সব সেরে ফেল, বিমল।" বিমল কহিল—"সবই আমার ঠিক, কাকামশাই।"

আর পাঁচ দিন।

আর তিন দিন।

মধ্যে আর একটি দিন মাত্র বাকী।

যাইবার আগের দিনের সন্ধ্যা। বিন্দু বেলাবেলি রাত্রির আহার প্রস্তুত করিয়া, সন্ধ্যা হইতে না হইতে, নদীর ঘাট হইতে গা ধুইয়া, কাপড় কাচিয়া আসিয়াছিল। সেই সঙ্গে নদীর জলে দু'চার ফোঁটা চোখের জলও হয় ত মিশাইয়া আসিয়াছিল। এখন দালানের প্রদীপের সম্মুখে বিমলের কাছে নীরবে বসিয়াছিল। আজিকার রাত্রি-প্রভাতেই বিমল বাটী ছাড়িয়া চলিয়া যাইবে। বহুক্ষণ নীরবতার পূর্ব্বে সেই কথাই বোধ হয় দম্পতির মধ্যে হইতেছিল।

নীরবতা ভঙ্গ করিয়া বিমল কহিল—"সকাল সকাল খেয়ে নেওয়া যা'ক, ভাত দেবে চল। কিন্তু———"

বিন্দু কহিল,—"চল, ভাত দি; খেয়ে-দেয়ে নাও। তবে—"

বিমল একটু ম্লান হাসিয়া কহিল,—"আমার 'কিন্তু' আর তোমার 'তবে'—যা বলতে চায়, সেটা একই কথা না কি?" বলিয়াই বিমল উঠিয়া ঘরের মধ্যে যাইল এবং দুই টুকরা কাগজ ও দোয়াত-কলম আনিয়া, প্রথমে এক টুকরাতে নিজে কি লিখিল। তারপর অপর টুকরাটা বিন্দুর হাতে দিয়া বলিল—"তবে'র পর যেটা বলতে গিয়ে বললে না, সেটা সত্যি ক'রে এতে লেখ ত, বিন্দু! ঠিক লিখো; যেটা বলতে যাচ্ছিলে। মিথ্যে কিছু লিখো না—আমার দিব্বি। দেখি, আমার 'কিন্তু'র সঙ্গে মিলে যায় কি না।"

একইরূপ ম্লান হাসি হাসিয়া, বিন্দু কাগজখানিতে কি লিখিল। প্রদীপের আলোকে উভয় কাগজই একসঙ্গে বিমল মেলিয়া ধরিল। বিমল লিখিয়াছে—'কিন্তু তোমায় ছেড়ে কোথাও আমি থাকতে পারব না, সুতরাং আমি যাব না।' আর বিন্দু লিখিয়াছে—'তবে, তোমায় ছেড়ে বাঁচাটা কি আমার সম্ভব হবে? দুঃখ না ঘোচে, নাই ঘুচুক;—তোমার যাওয়া হবে না।'

হরি বোল্—হরি!

বাঁড়ুয্যেদের ছোটকর্ত্তা পরদিন প্রত্যূষে একাকীই চলিয়া গেলেন।

এ কয় দিনই বিমল কেবলই ভাবিয়াছে—কি করিলে

আর যেতে হয় না। হঠাৎ একটা খবর আসে যে, আর লোকের আবশ্যক নেই, তা' হলে সে বাঁচিয়া যায়। কিম্বা ছোট কর্ত্তা কোন কারণে বিরক্ত হয়ে না নিয়ে যান! ক'দিন ধ'রে খুব ঝড়-বৃষ্টি হয়!—কিছু না হয়, তবুও আমি যাব না—কিছুতেই যাব না।

আর বিন্দু এ কয় দিন কেবলই বলিয়াছে—'হে ঠাকুর, হঠাৎ এ কি হল? ওঁকে ছাড়া হয়ে আমি বাঁচবো কি ক'রে? আমাদের দুঃখু ঘুচে কায নেই, ওঁর যাওয়া যেন না হয়। যাবার আগে হঠাৎ যেন আমার খুব অসুখ করে।'

রাঙ্গা ঠানদি এক দিন আসিয়া বলিলেন—"ওরে, যেখানে লক্ষ্মী সেইখানেই যে নারায়ণ; কখনও কি ছাড়া-ছাড়ি হয়?"

ঠিক তখন, সেদিনের মত নন্দ বৈরাগীর সেই বাউল-গানখানা শুনিতে পাওয়া গেল—

সেই প্রেমেতে বাঁধ রে নাগরে।
যে প্রেমেতে উঙ্কে তারে – যাবে নিয়ে—
বন্দী ক'রে রাখবে না ঘরে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

—১৩০২ সাল—

দ্বাদশ বৎসর পরে:

এই এক যুগ সময়ের মধ্যে জগতে কত পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়া গিয়াছে। কত সুখের সংসারে দুঃখের বান ডাকিয়া, তাহাকে অথৈ জলের মধ্যে ডুবাইয়া দিয়াছে। আবার কত দুঃখের সংসারে, সুখসূর্য্য উদয় হইয়া, নব কিরণসম্পাতে তাহার আঁধাররাশিকে তাড়াইয়া দিয়াছে।

পলাশদীঘি গ্রামের বাঁড়ুয্যেদের ছোটকর্ত্তা সূতার কারবারে কায করিতে করিতে আজ বছর কয়েক হইল মারা গিয়াছেন। গাঙ্গুলীবাড়ীর সেই বিরজা বলিয়া মেয়েটি, যাহার সহিত নরহরির বিবাহ হইয়াছিল, সে বিধবা হইয়াছে। দুর্গার ভাল যায়গায় বিবাহ হইয়া, সে দুইটি ছেলে ও একটি মেয়ের মা হইয়াছে। তাঁতিদের প্রকাণ্ড কোঠা উঠিয়াছে। নদীতে কচুরিপানা জন্মিয়া তাহা বুজিয়া গিয়াছে, তাহার ঘাট ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। কেহ বড় একটা আর নদীতে স্নান করিতে বা কাপড় কাচিতে নামে না। মধ্যের পাড়ার চিরকালের বারোয়ারী পূজা, পরস্পর মনোমালিন্য হইয়া বন্ধ হইয়া গিয়াছে। নন্দীদের প্রকাণ্ড বাড়ী ভূমিসাৎ হইয়াছে। মুখুয্যেরা দেশ ছাড়িয়া, পশ্চিমের কোথাও গিয়া বাস করিতেছেন। তাঁহাদের 'আনন্দ-কাননে'—রাজ্যের সাপ, শিয়াল আর জংলী-গাছের আড্ডা হইয়াছে। রাঙ্গা-ঠানদির আসন্ন সময়; তিনি মৃত্যুশয্যায় শায়িতা। আর এক জন হঠাৎ মারা গিয়াছে। সে সেই নন্দ-বৈরাগী। মোট কথা,—বহুকালের ক্ষুদ্র গ্রামখানির উপর দিয়া, দ্বাদশ বৎসরের মধ্যে পরিবর্ত্তনের একটা ওলট-পালট খেলিয়া গিয়াছে।

বিমল ও বিন্দু,—তাহারা কিন্তু ঠিক তেমনই আছে। তাহাদের বাহিরের দেহ দু'খানাতে, বারো বৎসরের দুঃখ-কষ্টের বারো শ ঢেউ লাগিয়া হয় ত তাহাদের নাড়াইয়া দিয়া গিয়াছে, কিন্তু অন্তরে তাহারা দ্বাদশ বৎসর পূর্ব্বের মতই আছে। তবে, হয় ত তাহারা সন্ধ্যাবেলা, উঠানের আম-গাছকে বুড়ী করিয়া আগের মত লুকাচুরি আর খেলে না। হয় ত উভয়ের মনের ভাব, কাগজ-কলম লইয়া লিখিয়া দেখায় না। দুঃখ—দুই জনকে অনেক সহ্য করিতে হইয়াছে। তাহা বুঝিতে পারা যায়—তাহাদের উভয়েরই দৈহিক সৌন্দর্য্যের পরিপূর্ণ বিকাশ দেখিয়া। পূর্ব্বের সৌন্দর্য্যে বুঝি বা একটু জোয়ারের খরস্রোত ছিল, বুঝি বা একটু আবর্ত্তন ছিল, বুঝি বা একটু উচ্ছ্বাস, একটু চঞ্চলতা ছিল। দুঃখের ঘা খাইয়া এখন উভয়েরই তাহা—স্থির, ধীর, উচ্ছ্বাসহীন, আবেগহীন, অচঞ্চল। কয় বৎসর হইল, তাহাদের সদর বাটীর পাঁচীল পড়িয়া গিয়া, ভিতরের কতক অংশ পথেরই সামিল হইয়া গিয়াছিল। এখন পথিকেরা পথ চলিতে প্রায়ই দেখিতে পায়—এই দুটি প্রৌঢ়-প্রৌঢ়া, বৈকুণ্ঠের এই লক্ষ্মী-নারায়ণ, হয় বাহিরের রোয়াকে, নয় ত বা মুক্তদ্বার দালানের মধ্যে বশিষ্ঠ-অরুন্ধতীর মত বসিয়া রহিয়াছে।

আগের বছর এ অঞ্চলে মোটেই ফসল হয় নাই। লোকে অর্দ্ধাহারে, স্বল্পাহারে, অনাহারে কাটাইয়াছে। এ বছরও আকাশের লক্ষণ ভাল নয়। লোকের চোখে-মুখে একটা আতঙ্কের ভাব পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। উত্তরের দিকে না কি দুর্ভিক্ষ দেখাও দিয়াছে।

অনেকে গ্রাম ত্যাগ করিয়া অন্য কোথাও পলাইয়া যাইতেছে। যার কোথাও কেহ নাই, সে আকাশের দিকে

চাতকের ন্যায় চাহিয়া দিন কাটাইতেছে। বিমলের যে কয়টি খোরাকীর ধান ছিল, তাহা নিঃশেষ হইতে আর বড় বিলম্ব নাই।

বিন্দু কহিল—"তুমি ভাবছ কেন? যা ধান আছে, আমি যদি এক বেলা ক'রে খাই, তা হ'লে ওতে আমাদের দু'মাস চ'লে যাবে।"

বিমল বিন্দুর সীঁথির প্রশস্ত সিন্দুর-রেখা ও তদুপরিস্থ সাড়ীর লাল পাড়ের উপর দৃষ্টি ফেলিয়া কহিল—"তার পর?"

"তার পর ভগবান্ ব্যবস্থা ক'রে দেবেন।"

"ভগবান্ এবার আর ব্যবস্থা ক'রে দেবেন না, বিন্দু। আর তা ছাড়া, তুমি যে এক বেলা ক'রে খাবে, সে'ও ত আমি সহ্য করতে পারব না। চল, দিন থাকতে তোমায় মোড়লপুরে রেখে আসি। তোমার বাপের বাড়ীর দেশে 'ক্যানেলে'র জন্যে অজন্মা ত কোন বছর হয় না। ক'মাস সেখানে গিয়ে থাকলে, দু'বেলা পেট ভ'রে দু'টি খেতে পাবে।"

"আর তুমি?"

"কোন রকমে আমি নিজেকে চালিয়ে নেব, বিন্দু, দুঃখের এই দুর্দ্দিনে।"

"সুখের দিনে হ'লে, কোন রকমে কষ্ট স্বীকার ক'রে না হয় দিন কতকের জন্যে তোমায় ছেড়ে থাকতে পারতুম; কিন্তু দুঃখের মাঝে তোমায় ফেলে আমি একটি মুহূর্ত্তও যে কোথাও গিয়ে থাকতে পারব না,—স্বর্গে গিয়েও না।"

কিন্তু পরের মাসেই দেশের অবস্থা এমন শোচনীয় হইয়া পড়িল যে, শেষ পর্য্যন্ত যাহারা একটা সু-রাহার অপেক্ষায় ছিল, তাহাদের মধ্যেও অনেককেই দেশত্যাগ করিয়া অন্যত্র কোথাও গিয়া আশ্রয় লইতে হইল। এমনই সময়ে, অনেক বুঝাইয়া, অনেক প্রকারে স্তোকবাক্য দিয়া, মাত্র দু'টি মাসের করারে বিমল বিন্দুকে মোড়লপুরে রাখিয়া আসিল। বিমলের ফিরিয়া আসিবার দিন বিন্দু নির্জ্জন গৃহমধ্যে তাহার পায়ের উপর মুখ রাখিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল—"বিয়ের পর থেকে আমি কখনও ঠাকুর-দেবতাকে ডাকি নি। তুমিই আমার সাক্ষাৎ ঠাকুর, সহজ দেবতা। তোমাকেই সেবা ক'রে এসেছি, তোমাকেই পূজো ক'রে এসেছি। আজ তোমার কাছেই প্রাণের নিবেদন জানাচ্ছি—বেশী দিন আমাকে তোমা-ছাড়া ক'রে রেখো না।"

* * * *

বিন্দুকে রাখিয়া আসিবার পর বিমলের দুই মাস কাটিয়া গিয়াছে। সে এখন লক্ষ্মীছাড়া। সহস্র দুঃখ-কষ্টেও যে অনুপম শ্রী তাহার অক্ষুণ্ণ ছিল, এই দুই মাসের মধ্যেই সে শ্রী তাহার নষ্ট হইয়া গিয়াছে। ভাঙ্গা বাড়ীখানারও যেন আগে একটা সৌষ্ঠব ছিল, তা'ও যেন বুড়ী রাক্ষসীর মত ভাঙ্গা দাঁতে আজ তাহার বিকট মুখ হাঁ করিয়া ভয় দেখাইতেছে।

বিমল এক বেলা দু'টি ভাত সিদ্ধ করিয়া লয়। সেই সঙ্গে কোন দিন কিছু হেলেঞ্চা, কোন দিন কিছু কলমী, কোন দিন বা আধখানা কাঁচা কলা, কোন দিন বা গোটা-কতক ডুমুর তাহার মধ্যে ফেলিয়া দেয়। দিনান্তে একবার, অনেক বেলায় তদ্দ্বারাই উদরপূর্ত্তি করে। ঘরে-দুয়ারে আর ঝাঁটা পড়ে না; সন্ধ্যা দেখানো হয় না। তুলসী গাছ কয়েক গাছা শুষ্ক কাঠিতে পরিণত হইয়া, তুলসীতলার আচটু মাটীর উপরে কোনপ্রকারে দাঁড়াইয়া আছে। যে শাঁখ বহুকাল ধরিয়া প্রতি সন্ধ্যায় বিন্দুর মুখের ফুঁয়ে বাজিয়া উঠিত, আজ সে দীর্ঘ দিনের ছুটী পাইয়া, তাহার গর্ভে কুমুরে পোকাকে বাসা বাঁধিবার অধিকার দিয়া নিশ্চিন্তমনে কুলুঙ্গীর কোণে পড়িয়া আছে।

শুধু দ্বিপ্রহরটাতে বিমল ঘরের মধ্যে শুইয়া থাকে ও আকাশ-পাতাল কি যে ভাবে, তা সেই জানে। সমস্ত প্রভাতকাল, অপরাহ্ণ ও সায়াহ্ন সে নদীর ধারে ধারে, মাঠে মাঠে, পথে পথে, এখানে সেখানে,—উদ্দেশ্যহীন, আশাহীন কর্ম্মহীনের মত ঘুরিয়া বেড়ায়।

'বোল্লুর মাঠে'র বিলের ধারে, যেখানে কয়েকটা শিরীষ আর মাদার গাছ সমস্ত স্থানটাকে ছায়া করিয়া রাখিয়াছিল, সে দিন অপরাহ্নে বিমল সেইখানে গিয়া বিলের জলের দিকে মুখ করিয়া বসিল। পিছনের শিয়াকুল, বনযুঁই আর বৈঁচির ঘন ঝোপের অন্তরালে শ্রাবণের সূর্য্য তখন ঢলিয়া পড়িয়াছিল। পুবে হাওয়ায় বিলের জলে ছোট ছোট তরঙ্গ উঠিয়া, সম্মুখস্থ পাড়ের গায়ে ছলাৎ ছলাৎ শব্দে আঘাত করিতেছিল। সেইখানে পাড় হইতে কিছু দূরে জলের উপর পাশাপাশি দুইটি রক্তকমল ফুটিয়া তরঙ্গাভিঘাতে অনবরত আন্দোলিত হইতেছিল। একটি বড় কমলের পার্শ্বে অপেক্ষাকৃত একটি ছোট কমল। একের স্কন্ধদেশে অপরের ছোট মুখখানি ক্রমাগত ঢলিয়া পড়িতেছে। বিমল একান্তমনে সেই দিকে চাহিয়া রহিল।

ওপারে খেজুর-ঝোপের তলায় এক ঝাঁক ছাতার কিচির-মিচির জুড়িয়া দিয়াছিল। ডানার শব্দ করিয়া হঠাৎ তাহারা উড়িয়া গেলে, সোঁদাল গাছের ডাল হইতে উড়িয়া আসিয়া বসিল—এক জোড়া বন-কপোত-কপোতী। খানিকক্ষণ বিজয়ী বীরের ন্যায় গলা ফুলাইয়া আপন গৌরব-গান গাহিতে গাহিতে পায়চারী করার পর কপোতটি ওধারে উড়িয়া গিয়া বসিল। সঙ্গে সঙ্গেই কপোতী তাহার অনুসরণ করিয়া তাহার পার্শ্বে গিয়া বসিল ও তাহার কণ্ঠ-নিম্নে আপনার মুখখানি রক্ষা করিল। পরক্ষণেই উভয়ে একসঙ্গে অন্যত্র উড়িয়া গেল। তন্ময় হইয়া এই সব দেখিবার কিছুক্ষণ পরে একটি সুদীর্ঘশ্বাস ধীরে ধীরে নিজের অজ্ঞাত-সারে বিমলের অন্তর হইতে বাহির হইয়া গেল।

কয়েক দিন পরে হঠাৎ এক দিন কম্প দিয়া বিমলের খুব জ্বর আসিল। পাড়ার লোকে কেহই এ সংবাদ জানিতে পারিল না। তিন দিন ধরিয়া বিছানায় পড়িয়া সে ছটফট্ করিল। চতুর্থ দিনে কে জানিতে পারিয়া, গাঁয়ের ডাক্তারকে ডাকিয়া আনিয়া দেখাইল। ডাক্তার পরীক্ষা করিয়া কহিল—"অসুখটা সোজা নয়—নিউমোনিয়া। দুই দিকই বেশী রকম 'য়্যাফেক্‌ট' করেছে; ভাল রকম তদ্বির চাই।" গ্রামের দুই চারি জন পরামর্শ করিয়া, মোড়লপুর হইতে বিন্দুকে আনয়ন করিল। বিন্দু আসিয়াই স্বামীর শিয়রে স্থান গ্রহণ করিল। একবার ঝুঁকিয়া তাহার মুখের কাছে মুখ লইয়া গিয়া কহিল—"আমায় দূরে ঠেলে দিয়ে পালাবার যোগাড়ে আছ? কেন—কি অপরাধ আমি করেছি?" তাহার চোখের জলে বিমলের বুক ভিজিয়া উঠিল।

তার পর হইতে বিন্দুর সে কি অক্লান্ত স্বামিসেবা! দিনের পর দিন কাটিয়া যাইতেছে; স্নান নাই, আহার নাই, নিদ্রা নাই,—মরণপথযাত্রী স্বামীকে ফিরাইয়া আনিবার সে কি উদ্দাম ব্যাকুলতা! কি প্রাণপণ আয়াস!

রোগের যন্ত্রণা যখন একটু কম থাকে, তখন বিমল বলে—"এত করেও বুঝি আমাকে ফেরাতে পারলে না! কি ক'রে তোমায় ছেড়ে যাব আমি?" তাহার দুই চোখ ভরিয়া জল জমিয়া আসে। বিন্দু আঁচল দিয়া তাহা মুছাইয়া দিয়া অশ্রু-আকুলকণ্ঠে কহে—"হয় তোমায় ফিরিয়ে আনবো, আর তা যদি না পারি, ত একলা তোমায় যেতে দেবো না, দু'জনে একসঙ্গেই যাবো, এ তুমি ঠিকই জেনো।" বিমল চক্ষু বুজিয়া নির্জীবের মত কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকে, তার পর আপনা-আপনি বিড়-বিড় করিয়া বলিয়া যায়—"দু'টি রক্ত-কমল! একসঙ্গে—পাশাপাশিই আছে! একসঙ্গেই কাঁপছে, দুলছে! একটি ছোট—একটি বড়। একটির কণ্ঠে আর একটির মাথা। কি গভীর ভালবাসা! কি মধুময় প্রাণ! কি কোমল সে প্রাণের আকর্ষণ!—আর সেই? সেই দু'টি বন-কপোত-কপোতী! উঃ! বিন্দু—বিন্দু!"

"ওগো, কেন তুমি অমন কচ্ছ?" বিন্দু বিমলের মাথার বালিসে মুখ গুঁজিয়া অজস্রধারে কাঁদিয়া যায়।

সে দিন শুক্লা সপ্তমীর রাত্রি। সন্ধ্যা হইতেই বাদল লাগিয়াছিল। বৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে ঝড়েরও বিরাম ছিল না। মুহুর্মুহুঃ দমকা বাতাসের পাগল গর্জ্জন আর মুষলধারে বৃষ্টি-পতনের শব্দ, জগতে যেন আসন্ন প্রলয়ের বার্ত্তা জ্ঞাপন করিতে লাগিল। মধ্যরাত্রিতে সামান্য কিছুক্ষণের জন্য ঝড়-বৃষ্টি একেবারেই কমিয়া আসিল। কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে আকাশে ঘন ঘন বিদ্যুৎ চমকাইতে লাগিল। সেই সময় সারা পলাশ-দীঘি কাঁপাইয়া নিকটে কোথাও একটা ভয়ানক বাজ পড়িল। সেই শব্দে বিমল একবার কাঁপিয়া উঠিল। বিন্দু তাহার বুকটা চাপিয়া ধরিয়া, তাহার মাথার পার্শ্বে সোজা হইয়া বসিয়া রহিল।

পরদিন প্রাতে গ্রামের লোক শুনিল—গত রাত্রির দুর্য্যোগের মধ্যে বিন্দুর কোলে মাথা রাখিয়া বিমল পলাশ-দীঘির মায়া কাটাইয়া চলিয়া গিয়াছে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

—১৩১০ সাল—

হাওড়া জেলার ভাণ্ডারহাটির জমিদার শিবকালী রায় অপরাহ্নকালে তাঁহার বহির্বাটীর বসিবার ঘরে ফরাস-বিছানার উপর তাকিয়ায় দেহভার রক্ষা করিয়া ধূমপান ও সংবাদপত্র, একসঙ্গে দু'টি জিনিষই উপভোগের চেষ্টা করিতেছিলেন। তাঁহার বাম হস্তে সুদীর্ঘ গড়গড়ার নল এবং দক্ষিণ হস্তে সাপ্তাহিক সংবাদপত্র—'বসুমতী'। তামাকটা যে তিনি উপভোগ করিতেছিলেন, সে পক্ষে কোন সন্দেহ ছিল না। কিন্তু 'বসুমতী'র যে স্থানটা তাঁহার চোখের সম্মুখে খোলা ছিল, সে স্থানটা বর্ণমালার অক্ষরাবলীতে পূর্ণ

ছিল, কি কৃষ্ণবর্ণের রকমারি পোকা-মাকড়ের দল সরু সরু পায়ে সেখানটায় নিঃশব্দে চলিয়া বেড়াইতেছিল, তাহা তিনি ভিন্ন আর কাহারও সঠিকভাবে বলিবার শক্তি নাই। এ কথা বলিবার একটা কারণ আছে; এবং সে কারণটা এখনই জানিতে পারা যাইবে। তিনি ভৃত্য হরিদাসকে হাঁক দিলেন এবং সে আসিলে তাহাকে কহিলেন—"আজ আফিংটা বড্ড ধরেছে রে, হরিদাস। বাড়ীর ভেতর থেকে এক গেলাস গুড়ের সরবৎ আন্ দেখি। অমনি খবরটাও একবার নিয়ে আসিস্—বুঝতে পেরেছিস্?" হরিদাস সবই বুঝিয়াছিল; কিন্তু আমরা সকলকে একটু ভাল করিয়া বুঝাইয়া বলি:—

জমিদার শিবকালী বাবুর বয়স পঞ্চাশ ছাড়াইয়া গিয়াছে। তাঁহার গৃহিণীর ত্রিশ। অর্থাৎ তাঁহার প্রথম স্ত্রী কোন সন্তানাদি না রাখিয়া বছর পনর পূর্ব্বে মারা যাইলে, তিনি পুনরায় দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করেন। বর্ত্তমান স্ত্রীর গর্ভেও এ যাবৎ কোন সন্তানাদি না হওয়াতে স্বামি-স্ত্রীর অন্তরে দুঃখের আর অবধি ছিল না। কিন্তু সহসা তাঁহাদের এই পরিণত বয়সে ভগবান মুখ তুলিয়া চাহিয়াছেন। গৃহিণী গর্ভবতী এবং আসন্নপ্রসবা হইয়াছেন।

আজ দৈনন্দিন দিবানিদ্রার পর, যখন তিনি অভ্যাসমত নিত্যপরিচিত ক্ষুদ্র কৌটাটি খুলিয়া অহিফেন সেবন করিতে যাইবেন, সংবাদ পাইলেন, গৃহিণীর শরীর অসুস্থ—দাইকে খবর দিতে হইবে। কয় দিন হইতে এই অসুস্থতারই তিনি অপেক্ষা করিয়া আসিতেছিলেন। কারণ, সময় পূর্ণ হইয়াই আসিয়াছিল। যাহা হউক, এই সুসংবাদে তাঁহার মনে যুগপৎ হর্ষ, উৎকণ্ঠা ও ভয় আসিয়া দেখা দিল। তাড়াতাড়ি তিনি আজ মাত্রার অধিক অহিফেন সেবন করিয়া ফেলিলেন এবং তৎপরে 'বসুমতী'খানি হাতে লইয়া, খড়মের শব্দে চতুর্দ্দিক মুখরিত করিয়া, নীচে বসিবার ঘরে আসিয়া বসিলেন। তখন হইতেই তাঁহার এক হাতে গড়গড়ার নল এবং অপর হস্তে 'বসুমতী।' কিন্তু মৌতাতী মনটি তাঁহার এতদুভয়ের কোনটিতেই ছিল না। মন ছিল—অন্দরবাটীর এক পার্শ্বস্থিত ছোট্ট একখানি ঘরের মধ্যে—যেখানে খানিক পরেই হয় ত একটি সদ্যোজাত শিশু কাঁদিয়া উঠিবে—ট্যাঁ—ট্যাঁ—ট্যাঁ।

• যাহা হউক, যথাসময়ে তাঁহার কাছে সংবাদ আসিল—একটি ফুটফুটে কন্যা হইয়াছে।

তাহার পর আনন্দে, উল্লাসে, উৎসবে—দিনের পর দিন কাটিতে লাগিল। এইভাবে সাত মাস কাটিয়া গেলে অষ্টম মাসে কন্যার অন্নপ্রাশনের দিন আসিল। মহা ধূমধাম। বিশখানা গ্রামে 'সামাজিক' বিলি হইল। তল্লাটের লোককে নিমন্ত্রণ করা হইল। আহূত, অনাহূত, রবাহূত—অসংখ্য লোক ভূরি-ভোজনে পরিতৃপ্ত হইল। দূর-দূরান্তর হইতে বহু ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত এবং অধ্যাপককে 'পত্র' পাঠান হইয়াছিল; রায় মহাশয় স্বয়ং তাঁহাদের আদর-আপ্যায়ন করিলেন।

বর্দ্ধমান জেলার মোড়লপুর হইতে এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক আসিয়াছিলেন। রায় মহাশয় তাঁহাকে কুশলাদি জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি কহিলেন,—"জামাইটি ত বছর সাতেক হ'ল মারা গিয়াছে, সে ত আপনি শুনেছেন। তার পর আমার কাছেই বিন্দুকে এনে রেখেছিলুম। কিন্তু সে-ও আজ বছর দেড়েক হল——" বৃদ্ধ আর বলিতে পারিলেন না, তাঁহার চক্ষুর্দ্বয় জলে ভরিয়া উঠিল। রায় মহাশয় কহিলেন,—"মেয়েটিও আপনার মারা গিয়েছে? ছেলেবেলা তাকে সঙ্গে ক'রে প্রায়ই এখানে আসতেন, আমার মনে আছে; তখন আমিও ছেলেমানুষ। আহা—মেয়েটি আপনার———"

যে জল বৃদ্ধের চোখে জমা হইয়া উঠিয়াছিল, তাহা এক্ষণে দুই গণ্ড বহিয়া গড়াইয়া পড়িতে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গেই রায় মহাশয়ের মনের নূতন মরূদ্যানে একটি আট মাসের শিশুকন্যার কচি পদ্মমুখ ফুটিয়া উঠিল। অমনি তিনি দ্রুতপদে অন্দরের উদ্দেশে চলিয়া গেলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

—১৩১১ সাল—

"বাব্বা—বাব্বা—গোউ।"

শায়িত পিতার বুকের উপর চাপিয়া বসিয়া একটি দেড় বৎসরের মেয়ে, তাহার ননীর মত কচি হাতখানা মুক্ত জানালার দিকে বাড়াইয়া দিয়া বলিল,—"বাব্বা, বাব্বা—গো-উ।"—অর্থাৎ কি না, গরু। পথ দিয়া একটা গরু যাইতেছিল।

"নিনিরাণী!"

"বা-ব্বা!"

"তুমি দুদু খেয়েছ ?"

"গো-উ।"

"হ্যাঁ, গোউ দেখেছি ; তুমি দুদু খেয়েছ ?"

"গো-উ——গো-উ—"

"দেখিছি গো, দেখিছি—গরু দেখিছি। নিনিরাণু !"

"বাব্বা, ফু ! ফু ! ও ফু !"

—অর্থাৎ, জানালার বাহিরে গাছে ফু, তার মানে ফুল দেখিতে পাইয়াছে, তারই একটা চাই।

চাই-ই যখন, তখন ত আর উপায় নাই। রায়মহাশয় হাঁক দিলেন,—"হরিদাস !" হরিদাস আসিয়া খুকীর হাতে সেই ফুল আনিয়া দিল। কিন্তু অমনি খুকী সুবিধা পাইয়া পিতার প্রশস্ত বুকখানি অপছন্দ করিয়া হরিদাসের কোলের উপর ঢলিয়া পড়িল। তাহাকে জাপ্টাইয়া ধরিয়া কহিল,—"মা—মা—হাম !"

রায় মহাশয় কহিলেন,—"ক্ষিদে পেয়েছে বোধ হয় ; নিয়ে যা।"

খুকী হরিদাসের কোলে উঠিয়া, তাহার মুখে হাত বুলাইয়া, পুনরায় তাগিদ দিয়া বলিল,—"মা—মা—মা—ফু হাম।" মানেটা এইরূপ সম্ভব—শীগ্‌গীর মার কাছে নিয়ে চল, ফুলটা তাকে দিয়ে, হাম্ করবো—অর্থাৎ দুধ খাবো।

শিশুকন্যাটি সংসারে আসা অবধি রায় মহাশয়ের গৃহে আনন্দের অমৃতধারা প্রবাহিত হইয়াছে। সে ধারায় বহু দিনের শুষ্ক ক্ষেত্র কোমল, শ্যামল, নব দূর্ব্বাদলে ভরিয়া উঠিয়াছে। তথাকার মৃতপ্রায় তরুরাজী আজ নবীন পল্লবে মুঞ্জরিত। সেখানে আজ সুগন্ধের ভাণ্ডার বুকে পূরিয়া গুচ্ছে গুচ্ছে কুসুমরাজী ফুটিয়া উঠিয়াছে।

কর্ত্তা গৃহিণী আদর করিয়া কন্যাকে ডাকেন—নিনি।

ভাল নাম—মন্দাকিনী।

মন্দা—অমরার অমর-বাঞ্ছিত অমৃতের ধারা।

—

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

—১৩২৪ সাল—

মন্দাকিনী এখন আর শিশু নহে। এখন সে পঞ্চদশী কিশোরী। বছর পাঁচ সাত হইতে সে এক অদ্ভুত গণ্ডগোলের সৃষ্টি করিতে আরম্ভ করিয়াছে। সে বলে, পূর্ব্বজন্মে বর্দ্ধমান জেলার মোড়লপুরে সে জন্মিয়াছিল। পলাশদীঘিতে তাহার বিবাহ হয়। বাইশ বৎসর হইল, তাহার স্বামী অন্য কোন স্থানে আবার জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। তাহার পূর্ব্বজন্মের পিতাও এখন আর জীবিত নাই। এই ধরণের নানা কথা সে পিতামাতা এবং বড় পিসীর কাছে বলিয়া আসিতেছে।

প্রথম প্রথম রায় মহাশয় কথাগুলাকে তেমন গুরুভাবে লয়েন নাই। কিন্তু পরে আর উপেক্ষা করিতে পারেন নাই। নিনির প্রবল আগ্রহে ও-বছর তাহাকে লইয়া রায় মশায়কে বর্দ্ধমান জেলার মোড়লপুর গ্রামে ৺মহানন্দ মুখুয্যের গৃহে যাইতে হইয়াছিল। একটিবার হুগলী জেলার পলাশদীঘিতেও যাইতে হইয়াছিল। বিমলের পৈতৃক সেই ভাঙ্গা বাড়ীর উদ্যানমধ্যস্থ সেই আমগাছতলায় বসিয়া মন্দাকিনীর সে কি আকুল ক্রন্দন ! অনেক কষ্টে, অনেক চেষ্টায় তিনি কন্যাকে শান্ত করিতে সমর্থ হয়েন। সে ভগ্নগৃহ-স্তূপের উপর হইতে মন্দা কি ফিরিয়া আসিতে চাহে !

নিনি বিবাহের বয়সে আসিয়া পড়িলেও, দু'একটি কারণে আজ পর্য্যন্ত তাহার বিবাহ দেওয়া ঘটিয়া উঠে নাই। এক কারণ—রায় মহাশয় অতুল বিভবের মালিক এবং নিনি তাঁর একমাত্র উত্তরাধিকারী কন্যা। কোন সম-অবস্থাপন্ন ধনিপুত্রের সহিত কন্যার বিবাহ দিলেই তাঁহার নয়নের মণিকে নয়নের আড়াল করিতে হইবে। সেটা কি তাঁহার পক্ষে সম্ভব হইবে ? কোন দরিদ্র ঘরের ছেলের সহিতও তিনি নিনির বিবাহ দিয়া, জামাতাটিকে ঘরেই রাখিতে পারেন, কিন্তু সেরূপ পছন্দমত ছেলে অনেক খোঁজাখুঁজিতেও মিলিতেছে না। তার পর আর একটি বড় কারণ আছে। নিনি যাহার কাছে কিছুমাত্র লজ্জা করে না এবং যাহার কাছে তাহার মনের সকল কথাই অসঙ্কোচে খুলিয়া বলে, তাহার সেই বড় পিসীর কাছে সে বলে যে, তার পূর্ব্বজন্মের স্বামীর সঙ্গেই তাহার বিবাহ হইবে। তাঁহাকে ছাড়া সে আর কাহাকেও বিবাহ করিতে পারিবে না। তাহার সেই বাঞ্ছিত স্বামীকে সে দেখিলেই চিনিতে পারিবে। এ জন্মে কোথায় তিনি জন্মিয়াছেন, তাহা সে জানে না। কিন্তু তাঁহার সহিতই যে তাহার বিবাহ হইবে, তাহাতে আর কোন ভুল নাই।

এ কথা সে ঠিকই জানে, কিন্তু কেমন করিয়া জানে, তাহা সে কিছুই বলিতে পারিবে না।

এই সব কথা, রায় মহাশয় সাধ্যমত গোপনে রাখিতেই চেষ্টা করিয়া আসিয়াছেন, বাহিরে বড় একটা কেহ জানিতে পারে নাই।

গৃহিণী বলেন—"দেখ, নিনিও যেমন পাগল মেয়ে, তুমি আর ঠাকুরঝিও তেমনি পাগল হয়েছ। এক জন ভাল ডাক্তার দিয়ে ওকে একবার দেখাও দিকি। আমার বোধ হয়, এ-সব ওর মনের কোন রকম অসুখ ছাড়া আর কিছুই নয়।"

গৃহিণীর কথানুযায়ীই কায হইল। রায় মশায় নিনিকে লইয়া শীঘ্রই কলিকাতা আসিলেন এবং ভাল এক জন ডাক্তারকে দিয়া নিনিকে দেখাইলেন। ডাক্তার পরামর্শ দিলেন—"কন্যাকে সঙ্গে নিয়ে দিনকতক দেশভ্রমণ করিয়ে আনুন। নানা দেশের নানা বৈচিত্র্যের মধ্যে ঘুরে এলে এ-রকম ভাবটা সেরে যাবে।"

সেই ব্যবস্থাই হইল। রায় মশায় দুর্গাপূজার পরই কন্যা ও তাঁহার জ্যেষ্ঠা সহোদরাকে লইয়া দেশভ্রমণে বাহির হইলেন। মধুপুর, গিরিডি, গয়া, কাশী, বৃন্দাবন, আগ্রা, দিল্লী প্রভৃতি পশ্চিমের নানা স্থান ভ্রমণ করিলেন। ইহার ফলে সকলের স্বাস্থ্যের প্রভূতি উন্নতি হইল বটে, কিন্তু নিনিরাণীর মনের কোন পরিবর্ত্তন ঘটিল না, তাহার সেই একই কথা—'তাহার পূর্ব্বজন্মের স্বামীর সহিতই তাহার বিবাহ হইবে।'

পৌষের শেষে, গৃহে ফিরিবার পথে রায় মহাশয় আর একবার কাশী আসিলেন। এখান হইতে বরাবর দেশে ফিরিবেন, আর কোথাও দেরী করিবেন না। তিন মাস হইল তাঁহারা বাটীছাড়া, সুতরাং ফিরিবার জন্য সকলেরই মন অস্থির হইয়াছে।

এক দিন সকালে তিনি একলা বাহির হইয়া বিশ্বেশ্বরের গলি হইতে কতকগুলি জারমান-সিলভারের বাসন কিনিলেন। যে পরিমাণ মূল্যের বাসন কিনিবেন বলিয়া তাঁহার মনে ছিল, এটা-সেটা কিনিতে কিনিতে সে-মূল্য ছাপাইয়া গেল, সুতরাং তিনি যে-টাকা লইয়া গিয়াছিলেন, তাহাতে কুলাইল না, কিছু টাকা কম পড়িল। দোকানী এক বাঙ্গালী ভদ্রলোক। তিনি কহিলেন—"একটি ছেলেকে আপনার সঙ্গে দিচ্ছি, বাকী দামটা তার হাতে দিয়ে দেবেন।"

পুষ্পদন্তেশ্বরে রায় মহাশয়ের বাসা। তিনি ছেলেটিকে সঙ্গে করিয়া আনিলেন। তাহাকে নীচে সিঁড়ির কাছে দাঁড় করাইয়া রাখিয়া তিনি উপরে টাকা আনিতে গেলেন। সেই সময় নিনি এ-দিককার ঘরে ছিল। সে জানালার ফাঁক দিয়া একদৃষ্টে ছেলেটির দিকে দেখিতে লাগিল। তার পর টাকা লইয়া, সেই ঘরের মধ্য দিয়া আসিতে গিয়া রায় মহাশয় দেখিলেন, নিনি জানালার ধারে মেঝের উপর অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া আছে। তাঁহার মাথা ঘুরিয়া গেল। চীৎকার করিয়া বড় ভগ্নীকে তিনি ডাকিলেন। দয়াময়ী ছুটিয়া আসিল। হরিদাস ও বামার মা ঝি পাখা ও জল লইয়া ছুটিয়া আসিল। নীচে হইতে সেই ছেলেটিও আসিল। সকলের চেষ্টায় ও সেবায় মিনিট আট-দশের মধ্যেই নিনির জ্ঞান ফিরিয়া আসিল।

একটু সুস্থ হইলে সে বড়পিসীকে কহিল—"আমার পূর্ব্বজন্মের সেই স্বামী, বড় পিসী।" দয়াময়ী কহিলেন,—"কি বাজে কথা সব বলিস—বল্ ত?"

"ঠিক বড় পিসী ঠিকই। যা বলছি, এর এক বিন্দুও বাজে কথা নয়। ইনিই সেই। তোমরা জাতিস্মর জাতিস্মর বোলে আমার মাথা খারাপ ক'রে দাও খালি। জাতিস্মর হলে, পূর্ব্বজন্মের সব কথাই না হয় মনে থাকবে। ইনি ত নতুন জন্ম নিয়েছেন, এখন এঁকে আমি চিনতে পারলুম কি ক'রে? জাতিস্মর ছাড়া এতে এমন কিছু আছে, যা আমি তোমাদের কাছে ঠিক ক'রে বলতে পাচ্ছি না।" বলিতে বলিতে নিনির চোখ জলে ভরিয়া আসিল।

দয়াময়ীর মুখে সমস্ত কথা শুনিয়া, রায় মহাশয় তখনই সেই বাসনের দোকানের উদ্দেশে বহির্গত হইলেন। সেখানে গিয়া ছেলেটির সম্বন্ধে খোঁজ লইয়া যাহা জানিতে পারিলেন, তাহা এই :—

ছেলেটির নাম দেবব্রত চট্টোপাধ্যায়। বয়স বছর বাইশ কি তেইশ। দোকানী বাবুটিরই এক বন্ধুপুত্র। গত বৎসর ছেলেটি বি, এ পাশ করিয়াছে। এখানে তাহার বৃদ্ধা ঠাকুরমা কাশীবাস করিয়া আছেন। তাই তাঁহাকে মধ্যে মধ্যে দেখিতে আসিতে হয়। এদের দেশ—কলিকাতার দক্ষিণ রাজপুর গ্রামে। দেশেই বাপ-মা আছেন। সাংসারিক অবস্থা খুব ভালও নয়, খুব মন্দও নয়—মাঝামাঝি। দেবব্রত সর্ব্ববিষয়েই খুব সৎ এবং নূতন

বিজাতীয় ভাবধারার বিষস্রোতে নিজেকে ভাসাইয়া না দিয়া জাতীয় ধর্ম্ম, আচার-ব্যবহার এবং বৈশিষ্ট্যকে সব দিক দিয়াই মানিয়া এবং রক্ষা করিয়াই চলে। এখনও তাহার বিবাহ হয় নাই; খোঁজাখুঁজি, দেখা-শুনা, কথা-বার্ত্তা চলিতেছে।

রায় মহাশয় কাশীতে আর বিলম্ব করিলেন না। সকলকে লইয়া দুই এক দিনের মধ্যেই তিনি দেশে ফিরিলেন। দেশে গিয়াই তাঁহাকে একবার রাজপুর গ্রামে যাইতে হইল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

—১৩২৫ সাল—

গত ফাল্গুনের এক শুভদিনে দেবব্রতের সহিত মন্দাকিনীর শুভ বিবাহ সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। এ বিবাহে সকলেই সুখী হইয়াছে। গ্রামের সকলেই বলিতেছে—যেমন দেবীর মত মেয়ে, তেমনি দেবতার মত জামাই হইয়াছে। মন্দার এত দিনের রিক্ত হৃদয় যেন অমূল্য মণিমাণিক্যে ভরিয়া গিয়াছে। দয়াময়ী মন্দাকে কাছে টানিয়া, তাহার পিঠে হাত বুলাইয়া বলেন—"সম্পর্কের হিসেবে বলা চলে না বটে, কিন্তু আমার কাছে তুই ত কিছুই কখনও লুকোস নি, তাই আমিও বলি, নিনি, তোর ভালবাসা বটে! এত তার জোর যে, জন্মান্তরের স্বামীকে তুই অধিকার ক'রে তবে ছাড়লি।"

নিনি হাসিতে হাসিতে বলে—"বড় পিসী, সম্বন্ধটা যে তাই গো। জন্ম-জন্মই যে আমি ওঁর দাসী।"

বিবাহের পর গোটা চৈত্র মাসটা স্বামীর সহিত নিনির রাজপুরে কাটিয়াছে। সেখান হইতে বৈশাখ মাসে সে ভাণ্ডারহাটী আসিয়াছে। সম্মুখেই জামাই-ষষ্ঠী। দেবব্রতকে আনিবার জন্য লোক পাঠানো হইয়াছে।

বিবাহের পর এই প্রথম জামাই-ষষ্ঠী, সুতরাং রায়-বাড়ীতে আনন্দের ও উৎসবের স্রোত বহিতে লাগিল।

সন্ধ্যার সময় দ্বিতলের নির্জ্জন প্রশস্ত কক্ষমধ্যে রায় মহাশয় কন্যা-জামাতাকে লইয়া নানারূপ গল্প-গাছা করিবার পর উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিলেন,—"সন্ধ্যাহ্নিকটা সেরে নিই গে। বেজায় গুমোট করেছে আজ। এই বারান্দাটি আমার এমন যে, কোথাও হাওয়া না থাকলে এখানে একটু থাকবেই। তোমরা এইখানেই থাক।" যাইতে যাইতে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া কন্যা-জামাতার মুখের দিকে চাহিয়া আবার কহিলেন,—"আমার দিন ফুরিয়ে এসেছে। দিনও ফুরিয়েছে, কাযও ফুরিয়েছে। এইবার থেকে সকল ভার তোমাদের দু'টির ওপরেই পড়বে আর কি।"

সে দিন সন্ধ্যার কিছু পরেই চতুর্দ্দিক তরল জ্যোৎস্নায় ভরিয়া উঠিয়াছিল। সারাদিনের অসহ্য গুমোটের পর ঝির্-ঝির্ করিয়া স্নিগ্ধ বায়ু বহিতে সুরু হইল। কৃষ্ণা দ্বিতীয়ার চাঁদের আলো সারা বারান্দা ও ছাদের উপর আসিয়া পড়িয়াছিল। দেবব্রত কহিল,—"কি সব তুমি বল, মন্দা, আমি কিছুই বুঝতে পারি না। তবে এইটুকু বুঝি, তোমায় দেখে অবধি মনে হয় যে, বহুদিনের কি একটা হারিয়ে যাওয়া জিনিষ——না না মন্দা—আমি ঠিক ক'রে কিছু বুঝতেও পাচ্ছি না, বুঝিয়ে বলতেও পাচ্ছি না; যেন—যেন—মনের মধ্যেকার বহুদিনের একটা ফাঁক কাণায় কাণায় সহসা ভ'রে উঠেছে। কিন্তু তোমার সব কথা আমি ঠিক ধরতে বা বুঝতে পাচ্ছি না।"

উচ্ছ্বসিত পুলকে মন্দা কহিল,—"তোমার কিছু আর বুঝতে হবে না।" তাহার অগুরুবাসিত কুঞ্চিত অলকাবলী দেবব্রতর স্কন্ধে, পৃষ্ঠদেশে, বক্ষে লুটাইয়া পড়িয়াছিল। ছোট্ট মাথাটি স্বামীর বক্ষে রাখিয়া অসীম তৃপ্তিতে মন্দা কহিল,—"একবার লুকোচুরি খেলবে? আমগাছকে বুড়ী ক'রে? বল না—খেলবে একবারটি?"

"মন্দা!"

দেবব্রতের পায়ের ধূলা মাথায় লইয়া মন্দা তাহার কাণের কাছে মুখ আনিয়া চুপি চুপি কহিল,—"মন্দা নয়—বড় সাধ হচ্ছে, একবার বিন্দু ব'লে ডাক। ডাকবে?"

শ্রীঅসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়।

য়ুরোপের ভবিষ্যৎ

পৃথিবীতে সকল ভূমিখণ্ডের মধ্যে য়ুরোপ সভ্যতায় শ্রেষ্ঠ, ধনেও শ্রেষ্ঠ। অথচ এই অংশেই সর্ব্বদা অশান্তির আশঙ্কা; সর্ব্বদাই শান্তিভঙ্গের ভয়, সর্ব্বদাই যুদ্ধের ভয়। য়ুরোপ যেন আগ্নেয় গিরির শিখরদেশে অবস্থিত। অভ্যন্তরে গহ্বর-কটাহে নিরন্তর ক্রোধ, হিংসা, দ্বেষ, সংশয় ফুটিতেছে, যে কোন মুহূর্ত্তে জলন্ত অগ্নি-প্রবাহ উচ্ছ্বসিত, উদ্বেলিত হইয়া উঠিতে পারে।

সভ্যতার প্রধান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কি? শান্তি ও আপত্তির অবারিত উন্নতি। অসভ্য ও বর্ব্বর জাতিরা সর্ব্বদা যুদ্ধ, মারামারি, কাটাকাটি করে। যুদ্ধবিগ্রহই সভ্যতার বিরোধী। আফ্রিকায়, আমেরিকায় অসভ্য জাতিরা সর্ব্বদা যুদ্ধ করিত। মধ্য-আফ্রিকায় যে খর্ব্বকায় অসভ্য জাতি বাস করে, তাহাদিগকে বৃহদাকার অপর জাতিরা ভয় করে, তাহার কারণ, বামন জাতি বিষাক্ত তীর দিয়া হাতী পর্য্যন্ত বধ করে।

এ কথা সত্য যে, এখন যেমন যুদ্ধ হয়, পুরাকালেও এইরূপ হইত। জগতের প্রায় সকল মহাকাব্যের ভিত্তি যুদ্ধ। হোমর-রচিত ইলিয়ড, বাল্মীকির রামায়ণ, ব্যাসের মহাভারত সমস্তই যুদ্ধের ব্যাপার। পারিস্ হেলেনকে হরণ করে, এই জন্য ট্রোজান যুদ্ধ, রাবণ সীতাকে হরণ করিয়া লইয়া যায়, এই কারণে লঙ্কাযুদ্ধ। আত্মীয়বিচ্ছেদে কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধ।

যুদ্ধের অপর কারণ ব্যক্তিগত জিগীষা ও রাজ্যলোভ। ইহাতে বিবাদ-বিসম্বাদ অথবা অপমানের প্রতিশোধ, এ সকল কোন কারণ থাকে না, কেবল জয়ের আকাঙ্ক্ষা, কেবল বলপূর্ব্বক অপর দেশ গ্রহণের লালসা। গ্রীস দেশে মাসিডন ক্ষুদ্র প্রদেশ; ফিলিপের পুত্র আলেকজাণ্ডার কুড়ি বৎসর বয়সে সেই দেশের রাজা হইয়াছিলেন। প্রসিদ্ধ দার্শনিক এরিষ্টটল আলেকজাণ্ডারের শিক্ষক। তাঁহার কাছে ইলিয়ড মহাকাব্য পড়িয়া আলেকজাণ্ডারের যুদ্ধলিপ্সা হয়। ফিলিপের কালেই মাসিডোনিয়ার সৈন্যের ব্যূহরচনা প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। ত্রিশ হাজার পদাতিক ও পাঁচ হাজার অশ্বারোহী সৈন্য লইয়া আলেকজাণ্ডার দিগ্বিজয়ে যাত্রা করিলেন। পার্সী সম্রাট দরায়ুসকে পরাজয় করিয়া আলেকজাণ্ডার ফিরিয়া, মিশর, পারস্য দেশ জয় করিয়া ভারতবর্ষে পঞ্জাবে প্রবেশ করেন। বত্রিশ বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু হয়, কিন্তু যুদ্ধের ইতিহাসে তাঁহার তুল্য খ্যাতি কেহই লাভ করিতে পারে নাই। আটিলা,—যাঁহাকে লোকে ঈশ্বরের কশা বলিত, হুন জাতির সম্রাট; তিনি সমগ্র মধ্য-য়ুরোপ জয় করিয়া রোমান সাম্রাজ্য হইতে কর আদায় করেন। মোগল জঙ্গিস খাঁর দেশ-জয় ও হত্যাকাণ্ড স্মরণ করিলে এখনও হৃৎকম্প হয়। চীনদেশ লুণ্ঠন করিয়া তিনি তুর্কদিগকে তাড়না করিয়া য়ুরোপে প্রেরণ করেন, দক্ষিণ-রুসিয়া ও উত্তর-ভারত লুঠ করেন, বোখারা ও মর্ব্ব নগর লুঠ করিয়া সহস্র সহস্র নগরবাসীকে বধ করেন। তাঁহার নামের ভয়ে অনেক দেশ কাঁপিত। নাদির শাহ দিল্লী লুঠ করিয়া নগরবাসীদিগকে হত্যা করিয়াছিলেন, সে ঘটনা কখনও বিস্মৃত হইবার নয়। যে মসজীদে খড়্গ-হস্তে বসিয়া তিনি লুণ্ঠন ও হত্যার আদেশ করিয়াছিলেন, তাহা এখনও বর্ত্তমান আছে। অধিক কালের কথা নয়, নাপোলিয়ঁ প্রায় সমস্ত য়ুরোপ তাঁহার অধীনস্থ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার শাস্তি হইতেও বিলম্ব হইল না এবং জীবনের শেষ কয়েক বৎসর তাঁহাকে বন্দিভাবে যাপন করিতে হয়। সেই অবস্থায় কারাধ্যক্ষ তাঁহাকে সদাসর্ব্বদা লাঞ্ছিত ও অপমানিত করিতেন।

এ প্রকার ঘটনা চিরকালই ঘটিবে। কারণ, ব্যক্তিবিশেষের উদ্দাম আকাঙ্ক্ষা ও সর্ব্বগ্রাসী লোভ কিছুতেই নিবারণ করিতে পারা যায় না। অবসর ও সুযোগ পাইলেই ক্ষমতাশালী ও লুব্ধ ব্যক্তি এইরূপ আচরণ করিবে। জার্ম্মাণ সম্রাট দ্বিতীয় উইলিয়ামের কি উদ্দেশ্য ছিল, তাহা ঠিক বলিতে পারা যায় না, এখন তিনি পলাতক হইয়া হলণ্ড দেশে নগণ্য ব্যক্তির ন্যায় আশ্রয় পাইয়াছেন। এক সময় এই ক্ষুদ্র দেশকে তিনি ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখিতেন।

যুদ্ধেও সভ্য ও অসভ্য জাতি বিভিন্ন প্রণালী অবলম্বন করে। উত্তর-আমেরিকার তাম্রবর্ণ অসভ্য যোদ্ধা বিজয়ী হইলে শত্রুর মস্তকের কেশশুদ্ধ চর্ম্ম কাটিয়া লইয়া কটিদেশে ঝুলাইয়া রাখিত। জুলু ইন্দ্দী শত্রু জাতিকে আক্রমণ করিলে, গ্রামের একটি প্রাণীও রক্ষা পাইত না, পুরুষ, স্ত্রীলোক, শিশু সকলকেই বর্শায় বিদ্ধ করিয়া হত্যা করিত। অসভ্য রাক্ষস জাতি পরাজিত অথবা নিহত শত্রুকে বধ করিয়া উদরসাৎ করিত ও তাহাকে 'লম্বা শূকর' বলিত। সভ্যজাতি অকারণ হত্যা দোষের মনে করে, অসভ্য জাতি শত্রুর প্রাণ দান করে না। যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রু পরাজয় স্বীকার করিলে সভ্য জাতি শত্রুকে বন্দী করে, হত্যা করে না। যাহারা অস্ত্র গ্রহণ করে না, তাহাদিগকে আক্রমণ করা সভ্য জাতির পক্ষে নিষিদ্ধ।

য়ুরোপ সভ্যতার গর্ব্ব করে। অহঙ্কারশূন্য মানুষই বিরল। আমেরিকান লেখক তোমস্ বলিয়াছেন যে, সমুদ্রে যেরূপ লবণ, মনুষ্যপ্রকৃতিতে সেইরূপ অহঙ্কার। কোথা হইতে আসিল, কেহ বলিতে পারে না, অথচ সর্ব্বত্রই সমুদ্রের জল লবণাক্ত। অসভ্য যোদ্ধা যখন শত্রুকে হত্যা করে, সে সময় সদর্পে জয়গীতি গান করে। বিজ্ঞানের সহায়তায় য়ুরোপে যে প্রকার উন্নতি হইয়াছে, তাহাতে গর্ব্বের কারণ থাকিতে পারে।

সভ্যতার উন্নতির সঙ্গে যুদ্ধপ্রণালী কিরূপ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, তাহা বিবেচনা করিতে হয়। যুদ্ধ বলের পরীক্ষা। গুলতি ও ধনুক প্রথম অস্ত্র। মহাকাব্য-সমূহে ধনুর্বিদ্যার পরিচয় পাওয়া যায়; অসভ্য জাতিরা এখন পর্য্যন্ত তীর-ধনুক ব্যবহার করে। বাইবেলে কথিত আছে, ডেভিড অল্পবয়স্ক, প্রিয়দর্শন, যুবক; ফিলিষ্টাইন গোলিয়াথ দৈত্যাকৃতি, তাহার হস্তে তরবারি, বর্শা ও ঢাল। কিন্তু গুলতি দিয়া ডেভিড তাহাকে ধরাশায়ী করিয়া নিহত করেন। রোমের সৈন্যেরা তাম্র ও পিত্তলমিশ্রিত ক্ষুদ্র তরবারি দ্বারা যুদ্ধ করিত। য়ুরোপে মধ্যযুগে অশ্বারোহী সৈনিকরা লৌহের বর্ম্ম ধারণ করিত। বীরপুরুষরা অসহায় ও উৎপীড়িত রমণীদিগকে রক্ষা করিতেন। ডন কুইক্সট নামক গ্রন্থে সর্বান্টিস ইঁহাদিগকে বিদ্রূপ করিয়াছেন। বন্দুক ও গুলী আবিষ্কৃত হইলে বর্ম্মধারী অশ্বারোহীরা তিরোহিত হইল। সভ্য যুদ্ধরীতির ইহাই আরম্ভ।

য়ুরোপে যেমন যেমন সভ্যতা বাড়িয়াছে, সেইরূপ নূতন নূতন যুদ্ধের অস্ত্র ও কৌশল আবিষ্কৃত হইয়াছে। উদ্দেশ্য—বহুসংখ্যক লোককে হত অথবা আহত করা। বিজ্ঞানের বলে মানুষ যেমন দ্রুত গমন করিতে পারে, শূন্য আকাশে বিচরণ করিতে পারে, সেইরূপ বিজ্ঞানের সহায়তায় অবলীলাক্রমে মানুষ বধ করিতে পারে। গুলীগোলা বহু দূর নিক্ষিপ্ত হয়, তাহাতে অনেক দূরের মানুষ নিহত হয়। এত কাল জলে ও স্থলে যুদ্ধ হইত, এখন আকাশে ও জলের ভিতরে যুদ্ধ হয়। যাহারা যুদ্ধে যোগ দেয়, আর যাহারা যুদ্ধের ত্রিসীমানায় যায় না, এই উভয় শ্রেণীর লোকদিগের মধ্যে আর কোন প্রভেদ নাই। নগরে ও গ্রামে এয়রোপ্লেন হইতে বোমা নিক্ষিপ্ত হয় এবং তাহাতে নিরপরাধ শিশু ও স্ত্রীলোকদিগের প্রাণবিনাশ হয়। সভ্য জাতির যুদ্ধে যে সকল বিষাক্ত গ্যাস-বোমা ব্যবহৃত হয়, তাহার সহিত অসভ্য জাতির বিষাক্ত তীরের অথবা দক্ষিণ-আমেরিকার অসভ্য জাতির নলের মুখ হইতে নিক্ষিপ্ত বিষাক্ত ক্ষুদ্র তীরের তুলনাই হয় না। বিষাক্ত তীরে একটা লোকের মৃত্যু হইতে পারে, ক্লোরিন গ্যাসের বোমায় শত শত ব্যক্তি নিহত হইতে পারে।

ন্যায়যুদ্ধ অথবা তুল্য অস্ত্র লইয়া যুদ্ধ য়ুরোপের সভ্য জাতির মধ্যে আর দেখিতে পাওয়া যায় না। অসভ্য জাতিদের উত্তম অস্ত্র নাই, কিন্তু তাহাদের সহিত যুদ্ধ হইলে সভ্য জাতিরা বিজ্ঞানাবিষ্কৃত সকল প্রকার অস্ত্র প্রয়োগ করিতে কিছুমাত্র সঙ্কোচবোধ করে না। সভ্যতার বৃদ্ধির সহিত মানুষের শোণিতলিপ্সা বাড়িয়াছে; যুদ্ধে কেবল চেষ্টা—কত অধিকসংখ্যক শত্রু বধ করিতে পারা যায়। তোপের একটা বড় গোলা ফাটিয়া এক শত ব্যক্তিকে বধ করিতে পারে, একটা টর্পেডো শত শত যাত্রিপূর্ণ জাহাজ জলমগ্ন করিয়া তাহাদের প্রাণনাশ করিতে পারে। রণক্ষেত্রে সৈনিকদিগের সংখ্যা অসম্ভবরূপ বাড়িয়াছে। পুরাকালে এবং য়ুরোপে মধ্যযুগেও যোদ্ধাদের শ্রেণী স্বতন্ত্র ছিল। প্রাচীন ভারতে আর্য্যজাতিতে ক্ষত্রিয়েরা যুদ্ধ করিত। প্রাচীন ইরাণ দেশে জরথুস্ত্র ধর্ম্মাবলম্বীদের মধ্যে রথেস্তারগণ যুদ্ধ করিত, ধর্ম্মযাজক ও চাষারা যুদ্ধে লিপ্ত হইত না। জাপানে সামুরাই শ্রেণী যুদ্ধবৃত্তি অবলম্বন করিত। য়ুরোপের সভ্যতায় এবং প্রাচীন ভারত, ইরাণ,

চীন ও জাপানের সভ্যতায় অনেক প্রভেদ। য়ুরোপে এখন সমগ্র জাতি যুদ্ধে জড়িত হয়। য়ুরোপের সকল জাতিতে পুরুষমাত্রকেই যুদ্ধ শিক্ষা করিতে হয় এবং প্রয়োজন হইলে সকলকেই সৈন্যদলে যোগ দিতে হয়। ইংলণ্ডে সেরূপ আইন না থাকিলেও সৈনিকের অভাব হয় না। ১৯১৪-১৮ খৃষ্টাব্দের মহা লোকক্ষয়কর আহবে অনেক জাতির পুরুষসংখ্যা লুপ্তপ্রায় হইয়াছিল। কেবল যুবা ও মধ্যবয়স্ক পুরুষেরা যুদ্ধে যোগ দেয় নাই, স্কুল-কলেজের ছাত্রগণ দলে দলে রণযজ্ঞে আত্মদান করিয়াছিল। পুরাকালে ফিনিশিয়ান জাতিরা যেরূপ মোলক নামক দেবতার উদরে নরবলি হিসাবে মানুষকে নিক্ষেপ করিত, সেইরূপ এই সকল অল্পবয়স্ক বালককে যুদ্ধে আহুতি প্রদত্ত হইত। অনেকে শত্রুকে দেখিবার পূর্ব্বেই নিহত হইত। এই যুদ্ধে যে সকল কথার সৃষ্টি হয়, তাহারও অর্থ ভয়ানক। যেমন gun fodder—তোপের খাদ্য। সহস্র সহস্র যুবক ও কিশোর কেবল তোপের খাদ্য হইত, যুদ্ধ করিবার অবসর হইত না। অনেক দেশে পুরুষের এরূপ অভাব হইয়াছিল যে, স্ত্রীলোক-দিগকে পুরুষের কর্ম্ম করিতে হইত। যুদ্ধের পর লোকসংখ্যার সামঞ্জস্য করা একটা সমস্যা হইয়া উঠিয়াছিল। সভ্যতার উন্নতিতে ফল হইয়াছে এই যে, যুদ্ধে কেবল সর্ব্বস্বান্ত হইতে হয় না, সকল পুরুষকে অস্ত্র ধারণ করিয়া যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করিতে হইতে পারে। কুরুক্ষেত্র কেবল কাব্য-বর্ণনা নয়, আমাদের চক্ষুর সমক্ষে ঘটিতে পারে।

এই ভয়ঙ্কর প্রাণিক্ষয়ের ক্ষতিপূরণ কি, জাতির অসংখ্য লোক নিহত হইলে কি লাভ? য়ুরোপে কোন জাতি অপর কোন জাতির দেশ চিরকালের জন্য বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিতে পারে না। এক রুসিয়া ছাড়া নাপোলিয়োঁ সমস্ত য়ুরোপ জয় করিয়াছিলেন, কিন্তু ফ্রান্সের এক বিঘত জমি তিনি বাড়াইতে পারেন নাই। য়ুরোপের কয়েক দেশে তিনি রাজা নির্ব্বাচন করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি বন্দী হইয়া সেণ্ট হেলেনায় নির্ব্বাসিত হইলে পর সে সকল রাজাদের আর কোন চিহ্ন রহিল না। ১৮৭০-৭১ খৃষ্টাব্দে যুদ্ধের পর জার্ম্মাণী ফ্রান্সের আলসেস-লোরেন প্রদেশ অধিকার করে, কিন্তু ফ্রান্স এখন সে প্রদেশ গ্রহণ করিয়াছে। ফ্রান্স এইবারকার যুদ্ধের পর জার্ম্মাণীর সার নামক প্রদেশ অধিকার করিয়াছিল, এখন তাহা পরিত্যক্ত হইয়াছে। এক সময় অষ্ট্রিয়া ইটালীকে পরাজিত করিয়া পরাধীন করিয়াছিল, এখন ইটালী স্বাধীন, অষ্ট্রিয়ার রাজ্যলোপ হইয়াছে। য়ুরোপীয় যুদ্ধের সমস্ত লাভ-লোকসান য়ুরোপের বাহিরের সম্পত্তি লইয়া। এবার যুদ্ধে জার্ম্মাণীর আফ্রিকায় যাহা কিছু ভূ-সম্পত্তি ছিল, ফ্রান্স গ্রহণ করিয়াছে; ফিরিয়া পাইবারও কোন সম্ভাবনা নাই। কিন্তু য়ুরোপে এরূপ ঘটিতে পারে না।

কেবল কি যুদ্ধে কীর্ত্তিলাভ করিবার জন্য বার বার য়ুরোপে এরূপ ভয়ঙ্কর যুদ্ধ-বিগ্রহ হইতেছে? নাপোলিয়োঁর তুল্য সেনাপতি ইদানীং য়ুরোপে কেহই হয় নাই, তাঁহার পরিশেষে কি দশা হইল? বর্ত্তমান কালে কোন জাতি কিংবা কোন সেনাপতি কি আলেকজাণ্ডারের কীর্ত্তি পুনঃস্থাপিত করিতে পারে এবং য়ুরোপ হইতে সমস্ত এসিয়া জয় করিয়া ভারতবর্ষে প্রবেশ করিতে পারে? সবশুদ্ধ আলেকজাণ্ডারের সৈন্যসংখ্যা পঞ্চাশ হাজারও ছিল না। এ কালের যুদ্ধে উভয় পক্ষে লক্ষ লক্ষ সৈন্য থাকে, কিন্তু সেনাপতিদিগের নাম লোকে দুই দিনে ভুলিয়া যায়। ১৯১৪-১৮ খৃষ্টাব্দের জগদ্ব্যাপী যুদ্ধে এমন কোন সেনাপতি দেখিতে পাওয়া যায় নাই—যাহার নাম আলেকজাণ্ডারের ন্যায় চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে।

সভ্যতা বলিতে আমরা কি বুঝি? মানুষের সভ্য ও অসভ্য অবস্থায় কি প্রভেদ? সভ্যতা কি কেবল একটা বাহ্য আবরণ মাত্র, মানুষের মন, তাহার চিন্তা এবং প্রকৃতির কোন পরিবর্ত্তন হয় না? সভ্যতা বুদ্ধিকে নিম্নস্তর হইতে উচ্চতর স্তরে লইয়া যায়, মানুষের সহিত মানুষের সম্বন্ধ প্রকৃতরূপে নির্ণয় করে, উচ্ছৃঙ্খল চিত্তবৃত্তি সংযত করে, সামাজিক সম্বন্ধ স্থির করে, মানুষের বাহিরে কি আছে, তাহার জ্ঞান উৎপাদন করে এবং কলাবিদ্যার অনুশীলনে উৎসাহিত করে। মানুষ ও পশু উভয়ের পক্ষে যুদ্ধ পাশব বৃত্তি। কেবল আহার সংগ্রহ এবং জীবনধারণের জন্য যুদ্ধের সৃষ্টি নয়। হিংস্র জন্তু প্রধানতঃ উদরপূরণের নিমিত্ত অপর জীবকে বধ করে। কদাচ কখন শোণিতোন্মত্ত হইয়া অকারণে বহু প্রাণীর প্রাণ বিনাশ করে। পশু ও পক্ষীর মধ্যে যাহারা মাংসাহারী, তাহারা অন্য জীবকে মারিয়া আহার না করিলে অনাহারে মরিয়া যায়। মানুষের পক্ষে রাক্ষসের প্রবৃত্তি স্বাভাবিক নয়, কেন না, মানুষের আহারের

নানাবিধ সামগ্রী আছে। বিবেচনা করিয়া দেখিলে যুদ্ধের ব্যাপারে মানুষ পশুর অপেক্ষাও অধম। পশু হয় খাদ্যের জন্য প্রাণহিংসা করে অথবা নর পশুগণ মাদার জন্য যুদ্ধ করে। তাহারা অস্ত্র নির্ম্মাণ করিতে জানে না, অঙ্গে যে অস্ত্র আছে, তাহার দ্বারাই যুদ্ধ করে। কেবল মানুষ কারণে অকারণে যুদ্ধ করে ও তাহার দেহে কোনরূপ অস্ত্র না থাকায় অস্ত্রের সৃষ্টি করে। এমন কোন বুদ্ধিহীন অসভ্য জাতি নাই—যাহারা কোন অস্ত্র নির্ম্মাণ করিতে পারে না। তীর, ধনুক ও গুলতি ছাড়া আসেগাই নামক বর্শা, টোমাহক নামক কুঠার এবং অষ্ট্রেলিয়ার বুমিরাং সমস্তই অসভ্য জাতির অস্ত্র। যেমন যেমন সভ্যতা বাড়িতে থাকে, সেই অনুসারে ভীষণ অস্ত্র সমূহের সৃষ্টি হয়।

ধর্ম্মের সহিত কি সভ্যতার কোন সম্বন্ধ নাই? য়ুরোপ শুধু সভ্যতায় শ্রেষ্ঠ নয়, খৃষ্টান ধর্ম্মের মূলস্থান। সভ্যতা ব্যতীত য়ুরোপ ধর্ম্মেরও গর্ব্ব করে। য়ুরোপবাসীরা বলে, খৃষ্টধর্ম্ম সকল ধর্ম্মের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। এ অভিমান সকল ধর্ম্মেই আছে। ইহুদীরা যীশুখৃষ্টকে Messiah বলিয়া মানে না, তাহাদের ধর্ম্ম খৃষ্টান ধর্ম্মের অপেক্ষা অনেক প্রাচীন। জরথুষ্ট্রের শিষ্যগণ বলিবেন, তাঁহাদের ধর্ম্ম সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। হিন্দুরাও সেই কথা বলেন। বৌদ্ধধর্ম্মে কোনরূপ অহঙ্কার নিষিদ্ধ, কিন্তু বৌদ্ধদিগের বিবেচনায় তাঁহাদের ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ। ইসলাম-ধর্ম্মাবলম্বী সদর্পে প্রচার করেন যে, ইসলামের তুল্য ধর্ম্ম জগতে নাই।

এক তুর্ক দেশ ব্যতীত সমস্ত য়ুরোপ যীশুখৃষ্টের ভজনা করে। অতএব য়ুরোপনিবাসী সমস্ত জাতির জীবন, মনোভাব ও চরিত্র যীশুখৃষ্টের শিক্ষা দ্বারা শাসিত হইবে, এরূপ আশা করা অসঙ্গত নয়। খৃষ্টান প্রচারকরা এই ধর্ম্ম প্রচার করিবার জন্য জগতের সর্ব্বত্র গমন করেন। তাঁহারা প্রাণ উপেক্ষা করিয়া হিংস্র অসভ্য জাতিদের মধ্যে এই ধর্ম্ম প্রচার করেন। অনেকে প্রাণ হারাইয়াছেন, কিন্তু কাহারও ভয়ের লেশ নাই। ইঁহারা সকলের প্রশংসা ও শ্রদ্ধাভাজন। এক ধর্ম্মশিক্ষা প্রদান ব্যতীত এই সকল প্রচারকের আর কোন উদ্দেশ্য নাই। খৃষ্টধর্ম্মের শিক্ষা স্বর্গরাজ্যের স্থাপন, মর্ত্ত্যরাজ্যের কোন উল্লেখ নাই। একটা বিদ্রূপ উক্তি আছে যে, খৃষ্টান মিশনরীর পশ্চাতে ম্যাক্সিম তোপ যায়। কথাটা সত্য হইলেও ইহাতে মিশনরীর অপরাধ নাই। কিন্তু এই কারণে অপর জাতিরা মিশনরীদিগের প্রতি বিরক্ত। য়ুরোপের জাতিরা পৃথিবীর সমস্ত দেশই অধিকার করিতে চায়। আমেরিকা ও অষ্ট্রেলিয়ায় প্রথমে মিশনরী যায় নাই।

য়ুরোপের সমস্ত জাতি কিরূপভাবে যীশুখৃষ্টের শিক্ষা গ্রহণ করিয়াছে? প্রথম প্রথম খৃষ্টানদের উপর রোমানরা অত্যন্ত অত্যাচার করিত, তাহার পর খৃষ্টধর্ম্মেই সাম্প্রদায়িকতা ও বিরোধ আরম্ভ হয়। ধর্ম্মের নামে নানাবিধ নৃশংস অত্যাচার হইত। খৃষ্টানধর্ম্মযাজকদিগকে অনলে দগ্ধ করা হইত। ইনকুইজিসন নামক ধর্ম্মের বিচারালয়ে অপরাধীদিগের ভীষণ দণ্ড হইত। সকলের অপেক্ষা নিন্দনীয় ইহুদীদিগের প্রতি অত্যাচার। কিছুদিন এই অত্যাচারের হ্রাস হইয়াছিল, এখন আবার জার্ম্মাণীতে ইহুদীদিগকে পীড়ন আরম্ভ হইয়াছে। সমস্ত য়ুরোপে উহাদের নিগ্রহ হইত। নগরের উত্তম স্থানে তাহারা বাস করিতে পাইত না। রুসিয়ায় তাহাদের সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া বন্য পশুর ন্যায় তাহারা বিতাড়িত হইত। এখন আবার জার্ম্মাণীতে একটা নূতন মত প্রচারিত হইয়াছে যে, জার্ম্মাণরা আর্য্য জাতি, সুতরাং ইহুদীদের সহিত তাহারা বিবাহ করিতে পারে না। ইহুদীরা সমাজে মিশিতে পারে না। আইনষ্টেনের ন্যায় জগদ্বিখ্যাত বিজ্ঞানাচার্য্য জার্ম্মাণী হইতে পলায়ন করিয়া দেশান্তরে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। **Merchant of Venice** নাটকে সেক্সপীয়র শাইলকের মুখে যে সকল কথা দিয়াছেন, তাহা স্মরণ করা উচিত। য়ুরোপে তিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ খৃষ্টীয়ান গ্রন্থকার। যীশুখৃষ্ট স্বয়ং ইহুদী, তাঁহার প্রচারকরা সকলেই ইহুদী। তাঁহার মৃত্যুদণ্ডের আজ্ঞা ইহুদীরা দেয় নাই। তাহারা পরাধীন জাতি, কাহারও দণ্ডবিধান করিবার তাহাদের ক্ষমতা ছিল না। সে কালেও সকল ইহুদী জাতি যীশুখৃষ্টের বিরোধী ছিল না। যীশুখৃষ্টকে বধ করিবার আদেশ রোমান গবর্ণর পন্‌টিয়স পাইলেট দেন। ক্রুশে বিদ্ধ হইয়া যীশুখৃষ্ট বলিয়াছিলেন, পিতঃ, ইহাদিগকে মার্জ্জনা কর, ইহারা কি করিতেছে, তাহা জানে না। সেই মুহূর্ত্তে ইহুদীদিগের অপরাধের মার্জ্জনা হয়। ঈশ্বর মার্জ্জনা করিলেও খৃষ্টানরা ইহুদীদিগকে মার্জ্জনা করে নাই, পুরুষানুক্রমে তাহাদিগকে নিগৃহীত

করিয়াছে। ইহাতে স্বয়ং যীশুখৃষ্টের প্রার্থনা ও আদেশ লঙ্ঘন করা হইয়াছে।

ইহুদীদিগের প্রতি এরূপ বিদ্বেষ থাকিলেও খৃষ্টানরা নানা বিষয়ে তাহাদের নিকট ঋণী। খৃষ্টানদের গৃহে গৃহে এবং ধর্ম্মমন্দিরে যে ধর্ম্মগ্রন্থ পঠিত হয়, তাহার প্রথম অংশ ইহুদীদের ধর্ম্মপুস্তক। Old Testament ইহুদীদের ধর্ম্মগ্রন্থ। মূল বাইবেল পড়িতে হইলে হিব্রু ভাষা শিখিতে হয়। খৃষ্টানদের গির্জ্জায় যে সকল ধর্ম্মসঙ্গীত গীত হয়, তাহা সমুদয় ইহুদীদিগের রচিত। ডেভিডের গীত সকলের অপেক্ষা চিত্তহারী, তিনি ছিলেন ইহুদী রাজা। সম্রাট সলোমনের গীত প্রসিদ্ধ Book of Proverbs জ্ঞানের কথায় পরিপূর্ণ। উহা আদ্যোপান্ত ইহুদীদিগের রচনা। ইহার অনেক কথা ইংরেজি ভাষায় প্রচলিত হইয়াছে। ধর্ম্মে ও সাহিত্যে খৃষ্টান য়ুরোপ ইহুদী জাতির নিকট বিশেষভাবে ঋণী। সেই জাতিকে উৎপীড়ন করিয়া ঋণের শোধ হইতেছে।

য়ুরোপের খৃষ্টান জাতিরা কেবল ইহুদীদের প্রতি অত্যাচার করিয়া ক্ষান্ত হয় নাই : জগতের সর্ব্বত্র সকল জাতিকে তাহারা তাচ্ছীল্য ও ঘৃণা করে। জগতের অপর সকল জাতির অপেক্ষা য়ুরোপের জাতিরা উদ্ধত ও গর্ব্বিত। অঙ্গের বর্ণ, জাতি ও ধর্ম্মে তাহারা আপনাদিগকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিবেচনা করে। য়ুরোপের অনেক ভাষায় অপর জাতির প্রতি ঘৃণাব্যঞ্জক শব্দ প্রচলিত আছে। মার্ক টোয়েন এক স্থানে বিদ্রূপ করিয়া লিখিয়াছেন যে, বাইবেলে ইংরেজ জাতির উল্লেখ আছে, কারণ, যীশুখৃষ্ট বলিয়াছেন, The meek shall inherit the earth। ইংরেজ ও জার্ম্মাণ জাতি য়ুরোপের অপর সকল জাতির অপেক্ষা গর্ব্বিত, কিন্তু মসোলিনী যে কিছু কম, তাহা মনে হয় না। রোমানদের সহিত ইটালীয়ানদের কোন তুলনা হয় না।

নিরপেক্ষভাবে স্বীকার করিতে হইবে যে, য়ুরোপের বহুসংখ্যক ব্যক্তি ও অনেক পরিবার যথার্থ-ই যীশুখৃষ্টের শিক্ষা পালন করেন, কিন্তু জাতি অথবা রাজকর্ম্মচারিগণ স্বতন্ত্র। য়ুরোপের জাতির সমষ্টি বিবেচনা করিতে হইলে খৃষ্টান ধর্ম্মের কিছুমাত্র প্রতিষ্ঠা লক্ষ্য করিতে পারা যায় না। যীশুখৃষ্ট বিনয়ের শিক্ষা দিয়াছেন : য়ুরোপ গর্ব্বে ও দর্পে পরিপূর্ণ। যীশুখৃষ্ট সম্পত্তি ও রাজ্য তুচ্ছ জ্ঞান করিতেন, য়ুরোপের রাজ্যলালসা কিছুতেই পূর্ণ হয় না। যীশুখৃষ্টের শিক্ষার ফল য়ুরোপে কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না, বরং ইহুদীদিগের ধর্ম্মপুস্তকের প্রভাব সর্ব্বত্র দেখিতে পাওয়া যায়। Old Testament এ যেরূপ কেবল বিবাহ, রক্তপাত এবং ঈর্ষার বর্ণনা আছে, প্রকৃতপক্ষে য়ুরোপে তাহাই ঘটিতেছে। য়ুরোপে ভিন্ন ভিন্ন জাতির ব্যবহারে খৃষ্টান ধর্ম্মের কোন গুণ দেখিতে পাওয়া যায় না। সংশয় ও ঈর্ষা সর্ব্বদা জাগরূক। সকল জাতির লক্ষ্য যুদ্ধের প্রতি, শান্তির ভাব কোথাও স্থান পায় না। লীগ অব নেশন্সের বৃত্তান্ত বিদ্রূপ মনে হয়। ১৯১৪-১৮র যুদ্ধে এরূপ লোকক্ষয় হয় যে, যাহারা যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াছিল, সেই সকল জাতিই লীগ অব নেশন্স স্থাপন করে। একমাত্র উদ্দেশ্য, যাহাতে ভবিষ্যতে আবার যুদ্ধ না হয়, জাতীয় বিবাদ হইলে সালিসী করিয়া মিটিয়া যাইবে। এখনও সেই যুদ্ধের পর বিশ বৎসর অতীত হয় নাই, ইহারই মধ্যে লীগভুক্ত এক জাতি লীগভুক্ত অপর এক জাতির রাজ্য আক্রমণ করিয়া অধিকার করিবার প্রয়াস করিতেছে। সিনোর মসোলিনী য়ুরোপের সকল জাতিকে অবহেলা করিয়া আবিসিনিয়া অধিকার করিয়া ফ্যাসিষ্ট সাম্রাজ্য স্থাপন করিবার মনন করিয়াছেন। সভ্য জাতির যুদ্ধ কিরূপ, আবিসিনিয়া তাহা এখন অনুভব করিতেছে। আবার সেই ব্যাপার—যাহারা যুদ্ধে লিপ্ত নয়, তাহাদিগকে হত্যা, আকাশ হইতে বোমা নিক্ষেপ করিয়া স্ত্রীলোকের এবং শিশুর প্রাণবধ, হাসপাতালের উপর বোমা নিক্ষেপ—সভ্যতার অসীম বীরত্ব! আবিসিনিয়া কেবল লীগে যোগ দেয় নাই, আবিসিনিয়ার সম্রাট স্বয়ং খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী। লীগের কর্ত্তব্য পালন করিবার এই প্রথম সুযোগ। দেখা যাইতেছে, লীগ যুদ্ধ নিবারণ করিতে একেবারে অক্ষম। লীগের জন্য যে অর্থ-ব্যয় হইয়াছে, তাহা সম্পূর্ণ নিষ্ফল।

য়ুরোপের কোন জাতি অপর কোন জাতির বন্ধুত্ব অথবা সদ্ভাবের উপর নির্ভর করিতে পারে না। সন্ধি অথবা সদ্ভাব কেবল মতলবের জন্য। কোন দুই জাতির মধ্যে এমন বন্ধন নাই, যাহা এক মুহূর্ত্তে ছিন্ন না হইতে পারে। পরস্পরের বিশ্বাস ও যথার্থ বন্ধুভাব না থাকিলে কখন দৃঢ় ঐক্যতা হয় না। য়ুরোপে ইহা একেবারে অসম্ভব। এমন কোন জাতি নাই যে, আর কোন জাতিকে সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করে। য়ুরোপে এমন কোন বড় জাতি নাই যে,

কোন সময় না কোন সময় অপর জাতির সহিত যুদ্ধ করে নাই; কোন সন্ধি চিরস্থায়ী নয়, যে কোন সন্ধি ভঙ্গ করিলেই হইল। চোরাবালির উপর সন্ধির সৌধ নির্ম্মিত হয়, দেখিতে দেখিতে ভূগর্ভে লুপ্ত হয়। যে দুই জাতিতে প্রকাশ্যে অত্যন্ত সদ্ভাব, তাহারাও নিজেদের রাজ্যসীমায় দিবারাত্রি পাহারা দেয়। প্রত্যেক জাতির রাজ্যসীমা অত্যন্ত সাবধানে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এক জাতির সৈন্য অপর জাতির রাজ্যসীমা অতিক্রম করিলেই যুদ্ধের কারণ হইবে। যদি এক দেশের সীমা হইতে সৈন্য সরাইয়া লওয়া হয়, তাহা হইলে আর এক দেশের সৈন্য সে দেশে প্রবেশ করিতে পারে না। কিন্তু কে কাহাকে বিশ্বাস করে? অথচ য়ুরোপের এক জাতি অপর জাতির দেশ বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিতে পারে না। ফ্রান্স, ইংলণ্ড, জার্ম্মাণী সকলেই বলবান্ জাতি, কিন্তু য়ুরোপে ইহারা কেহই অন্য দেশের কোন অংশ অধিকার করিতে পারে না। ক্ষুদ্র, নির্দ্দ্বন্দ্ব, সুখী সুইটজরলণ্ডে না আছে রাজা, না আছে মসোলিনী, কিম্বা হিটলার, পাশের কোন একটা বড় দেশ এক গ্রাসে তাহাকে উদরস্থ করিতে পারে। এক দিকে জার্ম্মাণী, আর এক দিকে ফ্রান্স, দক্ষিণ-পূর্ব্বে ইটালী, যে কেহ গ্রহণ করিতে পারে। কিন্তু এই সকল দেশ চারিদিকে আছে বলিয়াই সুইটজরলণ্ডের রক্ষা। যাহা অনেকে চায়, তাহা কেহই পায় না। যদি কোন দেশের কোন আশঙ্কা না থাকে, তাহা হইলে সদাসর্ব্বদা এরূপ সন্দিগ্ধভাব কেন, প্রত্যেক রাজ্যসীমায় এরূপ দিবারাত্রি প্রহরা কেন, অবিরত সকল দেশের সৈন্যসংখ্যা বর্দ্ধিত হইতেছে কেন, বার বার সৈন্যবলের প্রদর্শনী হয় কেন, নিরবচ্ছিন্ন যুদ্ধের আয়োজন হয় কেন? এই সকল প্রশ্নের উত্তর সম্পূর্ণরূপে সহজেই দেওয়া যাইতে পারে।

জগতের ভূগোল-চিত্র দেখ। পৃথিবীর প্রাচীন অথবা নূতন বিভাগে এমন কোন স্থান নাই, যেখানে য়ুরোপীয়ান জাতিরা কোন দেশ অধিকার করে নাই। য়ুরোপ এবং এসিয়া প্রকৃতপক্ষে একই মহাদেশ। এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে যাইবার কোন বাধা নাই, কোথাও সমুদ্রের অথবা অলঙ্ঘ্য পর্ব্বতের ব্যবধান নাই। জাতিভেদে এই বৃহৎ ভূমিবিভাগ দ্বিখণ্ড হইয়াছে। আফ্রিকাও পূর্ব্বে য়ুরোপের সহিত সংলগ্ন ছিল, এখন সুয়েজ নহর হইয়া স্বতন্ত্র হইয়াছে। মিশরদেশ আফ্রিকায়। য়ুরোপীয় পণ্ডিতদিগের মতে প্রাচীন মিশর জাতির সভ্যতাই জগতের সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন সভ্যতা। সে সভ্যতা কিরূপ ছিল? পিরামিড পুনরায় নির্ম্মিত হইতে পারে না, শবদেহ সহস্র সহস্র বৎসর রক্ষা করিবার কৌশল এখন কেহ জানে না। ইহুদীরা মিশরের অধীন জাতি ছিল এবং মিশরবাসীরা তাহাদের প্রতি অত্যন্ত অত্যাচার করিত। মোজেজ ইহুদী জাতিকে প্যালেষ্টাইনে লইয়া যান এবং সেখানে তাহারা প্রবল ও প্রধান জাতি হইয়া উঠে। মিশরবাসীরা যে অপর দেশ বা অপর জাতিকে জয় করিবার চেষ্টা করিয়াছিল, তাহার কোন প্রমাণ নাই। প্রাচীন গ্রীক জাতি সাম্রাজ্য বিস্তার করে, কিন্তু তাহা ক্ষণস্থায়ী। রোমান সাম্রাজ্য কিছু অধিক কাল ছিল। য়ুরোপের আধুনিক জাতিরা যে ভাবে অন্য দেশ অধিকার করে, রোমানরা সেরূপ করিত না। জুলিয়াস সিজর প্রকাশ্যভাবে ব্রিটন জয় করিতে গমন করেন এবং কিয়দংশ রোমের অধীন হয়। স্যাক্সনদিগের সহিত পূর্ব্বে রোমানদিগের কোন রকম ব্যবসা-বাণিজ্য ছিল না। ভারতে ইংরেজের আগমন সামান্য বণিকরূপে। ইংরেজদের প্রতিনিধি স্যর টমাস রো মোগল সম্রাটকে যথাবিধি অভিবাদন করিয়াছিলেন। ইংরেজ একা আসে নাই; ফ্রেঞ্চ এবং পোর্টুগীজরাও ছিল। সেই সময়ে মোগল সাম্রাজ্য ভাঙ্গিতে আরম্ভ হইয়াছিল। ওদিকে অযোধ্যা, অপর দিকে সিন্ধিয়া, হোলকর, মহারাষ্ট্র স্বতন্ত্র রাজ্য হইয়া উঠিতেছিল। অক্ষম মোগল সম্রাটের সাম্রাজ্য লইয়া ভাগাভাগি, কাড়াকাড়ি উপস্থিত হইল। ইংরেজদের অধিক কৌশল, ভাগ্যলক্ষ্মী প্রসন্ন, ভারত তাঁহাদের ভাগ্যে লাভ হইল। ফ্রান্সের ও পোর্টুগালের নিদর্শন এখন পর্য্যন্ত বর্ত্তমান রহিয়াছে। ইংরেজরা তরবারি দিয়া ভারত জয় করিয়াছেন ও তরবারি দ্বারা ভারত শাসন করিতেছেন, ইহা সর্ব্বৈব কল্পিত কথা। এইরূপ করিয়া ঐতিহাসিক উপকথা রচিত হয়।

পৃথিবীর ভূগোল-চিত্র আবার দেখ। প্রাচীন জাতিরা যাহাকে নূতন জগৎ বলে, তাহার অস্তিত্বই জানিত না। আমেরিকা আবিষ্কৃত হইবার পরেই য়ুরোপীয় জাতিরা এক দেশের পর আর এক দেশ অধিকার করিতে আরম্ভ করিল। অষ্ট্রেলিয়া অথবা ওশিয়ানিয়া বহুসংখ্যক দ্বীপের

সমষ্টি; উহা প্রায় সমস্তই য়ুরোপীয় জাতির মধ্যে বিভক্ত হইয়া গিয়াছে। ইংলণ্ডের অংশ সকলের অপেক্ষা অধিক। উত্তর-আমেরিকা সম্পূর্ণরূপে তিনটি য়ুরোপীয় জাতির করকবলিত হইয়াছে:—ইংরেজ, মিশ্রিত য়ুরোপীয় জাতি এবং মেক্সিকোবাসী। ইহারা স্পেনবাসী ও আদিম মেক্সিকোর অসভ্য জাতি-মিশ্রিত। উত্তর-আমেরিকার পূর্ব্বে দক্ষিণ-আমেরিকা য়ুরোপীয় জাতি কর্তৃক আক্রান্ত হয়। স্পেনের লোকেরাই প্রধানতঃ আক্রমণ করে, কিন্তু ব্রেজিল পোর্টুগীজরা আক্রমণ করে। ইহারা সেই সকল দেশের লোকদের সহিত মিশ্রিত হইয়া আর একটা জাতি হয়। দক্ষিণ-আমেরিকাতেও ইংরেজদের ব্রিটিশ গায়েনা নামক উপনিবেশ আছে, তাহার পাশে ফরাসী ও হলণ্ডবাসীদের গায়েনা। আফ্রিকা হইতে কাফ্রী-জাতীয় দাসসমূহ আনিয়া উত্তর এবং দক্ষিণ-আমেরিকায় নিযুক্ত করা হইত। তাহাদিগের প্রতি য়ুরোপীয় জাতিরা কিরূপ নিষ্ঠুর আচরণ করিত, তাহা Uncle Tom's Cabin নামক পুস্তকে বর্ণিত হইয়াছে। ইদানীং দক্ষিণ-আমেরিকার জাতিদের মধ্যে কৃষ্ণ, শ্বেত ও পীতবর্ণ জাতিরা মিশ্রিত হইয়াছে। দক্ষিণ-আমেরিকায় কেবল অসভ্য জাতির বাস ছিল না। যে সময় স্পেনের লোকেরা উপস্থিত হয়, সে সময় পেরু দেশে সভ্যতা বর্ত্তমান। ইন্‌কা রাজাদের অধীনে ধর্ম্মযাজক যোদ্ধা শ্রেণী ছিল, কিন্তু ইহারা হীনবল হইয়া পড়িতেছিল, সুতরাং য়ুরোপ হইতে সমাগত স্পেন দেশের সৈন্যগণ উহাদিগকে অবলীলাক্রমে পরাজয় করিল। এখন দক্ষিণ-আমেরিকায় কোথাও রাজা নাই, সকল দেশেই প্রজাতন্ত্র এবং সকল জাতিই মিশ্রিত। কেবল বনে এবং অপর স্থানে কোথাও কোথাও আদিম জাতিরা বাস করে, তাহারা অপর জাতির সহিত বিবাহাদি করে নাই। এক জাতির সহিত অপর জাতির মিশ্রণ হওয়া দোষের না হইতে পারে, কেন না, পূর্ব্বকালেও এরূপ হইত। ভারতবর্ষে আর্য্য জাতি আসিয়া আদিমবাসীদের সহিত মিশিয়া গিয়াছিল; সেই আর্য্য জাতির আর এক ভাগ ইরাণে গিয়া সে দেশের লোকের সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছিল। য়ুরোপেও তাহাই ঘটিয়াছে। য়ুরোপের কোনও দেশে অবিমিশ্রিত খাঁটি জাতি নাই। কিন্তু আমেরিকায় এবং অষ্ট্রেলিয়ায় যাহা ঘটিয়াছে, তাহা ভয়ানক। য়ুরোপীয় জাতিদিগের আবির্ভাবে ঐ সকল দেশের আদিম নিবাসীরা লুপ্তপ্রায় হইয়াছে। উত্তর-আমেরিকা ও কানাডায় যে সকল তাম্রবর্ণ আদিম অসভ্য জাতি ছিল, তাহারা কি হইল? য়ুরোপ হইতে আনীত প্রচণ্ড সুরা অতিরিক্ত পান করিয়া তাহারা প্রায় নিঃশেষ হইয়াছে। তাহাদিগকে এই সুরা অকাতরে বিতরিত অথবা স্বল্পমূল্যে বিক্রীত হইত। অষ্ট্রেলিয়ার মাওরিগণ দেখিতে দেখিতে লোপ পাইতেছে। এই সকল জাতি দুর্ব্বল ক্ষীণজীবী ছিল না, বলিষ্ঠ ও অসাধারণ সামর্থ্যশালী, কিন্তু সভ্যতার প্রতাপে শুধু অসভ্যতা নয়, অসভ্য জাতি পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইয়াছে।

আফ্রিকায় কাফ্রী জাতির বাস। য়ুরোপীয় জাতিরা প্রায় সমস্ত আফ্রিকা অধিকার করিয়াছে। এই খণ্ডেও ইংরেজের অংশ অপর সকল জাতির অপেক্ষা অধিক, তবে গতবারের যুদ্ধের পর ফ্রান্স জার্ম্মাণীর সমস্ত উপনিবেশ অধিকার করাতে তাহারও ভাগে অনেক পড়িয়াছে। ক্ষুদ্র বেলজিয়ম প্রকাণ্ড কঙ্গো প্রদেশ গ্রাস করিয়াছে। পোর্টুগাল কিছু লইয়াছে। আবিসিনিয়া একমাত্র স্বাধীন রাজ্য ছিল, ইটালী তাহা বলপূর্ব্বক অপহরণ করিতেছে।

এসিয়ায় ভারতবর্ষ ইংরেজের অধীন, আরব্যদেশে এডেন এবং চীন দেশে হংকং, বঙ্গ সমুদ্রে আন্দামান ও নিকোবার দ্বীপপুঞ্জ ইংরেজদের। ম্যালেশিয়ায় Dutch East Indies হলণ্ডবাসীদিগের। ভূগোল-চিত্রে ইংরেজ সাম্রাজ্য লাল বর্ণে চিত্রিত করা হয় কেন? লাল শঙ্কার ও বিদ্রোহের চিহ্ন। লাল আলো দেখিলে রেলের গাড়ী থামিয়া যায়, ফরাসী বিপ্লবের সময় টুপিতে লাল চিহ্ন ধারণ করিত; বোলশেভিকরা কোটে লাল চিহ্ন ধারণ করে।

লাভ-লোকসানের একটা হিসাব করা ভাল। বৃটিশ সাম্রাজ্য এখনও বৃহৎ, কিন্তু আমেরিকার যুক্তরাজ্য ইংরেজের হস্তচ্যুত হইয়াছে, আয়ারলণ্ডের দক্ষিণ ভাগ স্বতন্ত্র স্বাধীন প্রজাতন্ত্র হইয়াছে। জার্ম্মাণীর সমস্ত উপনিবেশ গিয়াছে, রুসিয়া চীন দেশে পোর্ট আর্থর এবং সাইবিরিয়ায় ব্লাডিভষ্টক হারাইয়াছে।

যে প্রশ্ন উত্থাপিত হইয়াছিল, তাহার উত্তর এই। কেন য়ুরোপের সকল জাতি অন্য জাতিকে সন্দেহ করে, কেন লোকহত্যার জন্য ভীষণ অস্ত্র ও কৌশল আবিষ্কৃত হইতেছে, কেন সৈন্যসংখ্যা বাড়িতেছে, কেন সর্ব্বদা যুদ্ধের আয়োজন, কেন সময়ে অসময়ে সৈন্যবল সমবেত

হয়, এই সকল প্রশ্নের এই উত্তর। বাহিরে অতিরিক্ত লোভ হইলেই ঘরে সর্ব্বদা সংশয় হইবে। যদি সম্ভব হইত, তাহা হইলে য়ুরোপের জাতিরা সমস্ত পৃথিবী অধিকার করিত। যে সকল উপনিবেশে বাস সম্ভব, সেখানে তাহারা বাস করে এবং তাহাদের সংখ্যা দ্রুত বাড়িয়া যায়। যেখানে সেই সকল দেশবাসীর সহিত বিবাহাদি হয়, সেখানে অভিনব বর্ণ-সঙ্কর মিশ্রিত জাতির উৎপত্তি হয়, যেখানে য়ুরোপীয়রা আদিমবাসীদিগের সহিত মিলিত হয় না, সেখানে আদিম জাতি ক্রমশঃ লোপ পায়। এক ভারতবর্ষে এরূপ সম্ভাবনা নাই: ভারতবর্ষে বহু সাম্রাজ্য লুপ্ত হইয়াছে, আরও সাম্রাজ্য লুপ্ত হইবে, কিন্তু ভারতবাসীর লোপ পাইবার কোন আশঙ্কা নাই। য়ুরোপীয় জাতি যে সকল উপনিবেশে নিজেরা বাস করিতে না পারে, সেখানে বিজিত জাতির প্রতি অত্যাচার করে। বেলজিয়মের রাজা লিওপোল্ডের জীবদ্দশায় বেল-জিয়ানরা কঙ্গো প্রদেশের অসভ্য জাতিকে অত্যন্ত উৎপীড়ন করিয়াছিল। তাহার পর গতবারের যুদ্ধে জার্ম্মাণরা বেলজিয়মের কি দশা করিয়াছিল, তাহাও স্মরণ করা উচিত। প্রাচীন মিশরের যুগ হইতে আবহমানকাল এইরূপ হইয়া আসিতেছে। যেখানে প্রকাশ্য অত্যাচার হয় না, সেখানে দেশবাসীদিগকে সর্ব্বস্বান্ত করা হয়। দেশের যাহা কিছু সম্পত্তি থাকে, শোষণ করা হয়। অপর জাতির সহিত ব্যবহারেও অতি কুৎসিত আচরণ দেখিতে পাওয়া যায়। উত্তর-আমেরিকার বলিষ্ঠ জাতিসমূহ Fire water অর্থাৎ তীব্র মদিরা সেবন করিয়া নিঃশেষ হয়। সেই মদিরা য়ুরোপবাসীরা অকাতরে যোগাইত। প্রাচীন ও পরিশ্রমী চীন জাতি বহু সহস্র বৎসর সভ্যতা প্রাপ্ত হইয়াছে। তাহাদিগকে বলপূর্ব্বক অপরিমিত অহিফেন প্রদত্ত হইত। এই জন্য চীনের সহিত দুইবার যুদ্ধ হয়। তিন চার কোটি টাকা মূল্যের আফিম প্রতি বৎসর ভারতবর্ষ হইতে চীনদেশে চালান হইত। সমস্ত জগতে কঠিন প্রতিবাদ হওয়াতে এই পাপপূর্ণ বাণিজ্য রহিত হয়।

ক্রমাগত অকারণে, বিনা বিবাদে, ছলপূর্ব্বক বা বল-পূর্ব্বক পরস্ব অপহরণ করিলে, পরের দেশ অধিকার করিলে, অপর জাতির স্বাধীনতা হরণ করিলে, হিংস্র পশুর ন্যায় আক্রমণ করিলে, উদ্ধত ও গর্ব্বিত প্রকৃতি হইলে মানুষের স্বভাবে কি কি লক্ষণ দেখা যায়? সভ্যতার কি ইহাই শিক্ষা, জীবনের কি ইহাই উচ্চতর ও মঙ্গলতর আদর্শ? যে সকল জাতির এইরূপ ব্যবহার, তাহারা কখনও শান্তির মর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারে না, প্রতিবেশী অপর জাতির সহিত সদ্ভাবে বাস করিতে পারে না। তাহারা স্বয়ং লুব্ধ এবং এই কারণে অপরকে লুব্ধ মনে করে। যেমন তাহারা অপরের সম্পত্তি হরণ করিতে চায়, সেইরূপ তাহাদের মনে সর্ব্বদা সংশয় যে, অপরে তাহাদের সামগ্রী লইতে চায়। তাহাদের প্রকৃতি একেবারে পরিবর্ত্তিত হয়। মানুষের সরলতায়, সদাশয়তায় কিছুমাত্র বিশ্বাস থাকে না। বিশ্বাসের পরিবর্ত্তে সংশয় দ্বারা তাহারা অভিভূত হয়। এই জন্য য়ুরোপের সকল জাতি সর্ব্বদা সশস্ত্র, সর্ব্বত্র অস্ত্রের ঝন্‌ঝনা শুনিতে পাওয়া যায়। কেহ কাহাকে বিশ্বাস করে না, শান্তির কোন লক্ষণ নাই, সতত আশঙ্কা, সর্ব্বত্র প্রহরা। সম্মুখে সর্ব্বক্ষণ যুদ্ধের প্রচণ্ড মূর্ত্তি, শান্তচ্ছবি শান্তির দেখা নাই। ইটালী যুদ্ধে ব্যাপৃত, য়ুরোপে যে কোন মুহূর্ত্তে শান্তিভঙ্গ হইতে পারে।

য়ুরোপের অবস্থা এবং য়ুরোপের ভবিষ্যৎ স্মরণ করিলে চিত্তে অত্যন্ত অবসাদ হয়। হায়, মানব জাতিরও সভ্যতার কি এই পরিণাম? মিলনের এবং শান্তির যত উপাদান য়ুরোপে বর্ত্তমান, জগতের কুত্রাপি সেরূপ নাই। এক তুর্ক দেশ ব্যতীত সমস্ত য়ুরোপ এক ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছে। খৃষ্টধর্ম্মে বিভিন্ন সম্প্রদায় থাকিলেও মূল ধর্ম্মের কোন বিঘ্ন হয় না। এক অর্থ ও দারিদ্র্য ছাড়া অন্য কোন প্রকার জাতি-ভেদ নাই। সমস্ত য়ুরোপের বেশ একরূপ: আচার-ব্যবহার প্রায় একই রকম। এক জাতির সহিত অপর জাতির বিবাহাদিতে কোন বাধা নাই। ইংরেজ জার্ম্মাণকে বিবাহ করিতে পারে, ফরাসী রাসিয়ানকে বিবাহ করিতে পারে। সমাজের নিষেধ নাই—ধর্ম্মে বাধা নাই। কোন দেশ অপর কোন দেশ গ্রহণ করিতে পারে না, কোন জাতি অপর কোন জাতির স্বাধীনতা হরণ করিতে পারে না। যে কালে য়ুরোপে বহুসংখ্যক রাজ্য ছিল, তখন ভিন্ন ভিন্ন রাজবংশের মধ্যে বিবাহ-সম্বন্ধ স্থাপিত হইত। ইহাতে সেই সকল দেশে পরস্পরের মধ্যে প্রীতি হইবার কথা। প্রকৃতপক্ষে ঘটিয়াছে সমস্তই বিপরীত। যে ক্ষেত্রে সকল জাতীয় একতা স্থাপিত হওয়া কর্ত্তব্য, সেখানে কেবল পরস্পরের মধ্যে ঈর্ষা ও সংশয় উৎপন্ন হইয়াছে। অতিরিক্ত লোভ ও

লালসার এই ফল। রাজ্যলোভ ও অর্থলোভে সমস্ত য়ুরোপ উৎসন্ন হইবার উপক্রম হইয়াছে।

মহাভারতীয় মৌসল পর্ব্বে কথিত আছে, দ্বারকানগরে একদা মহর্ষি বিশ্বামিত্র, কণ্ব ও তপোধন নারদ উপনীত হইলে যদুবংশীয় সারণ প্রভৃতি কতিপয় মহাবীর ঋষিদিগের সহিত কৌতুক করিবার মানসে বাসুদেবতনয় শাম্বকে স্ত্রীবেশ ধারণ করাইয়া, ঋষিদিগের নিকট উপস্থিত হইয়া কহিলেন,—হে মহর্ষিগণ, ইনি অমিত-পরাক্রম বভ্রুর পত্নী! বভ্রু পুত্রলাভে নিতান্ত অভিলাষী হইয়াছেন, অতএব আপনারা বলুন, ইনি কি প্রসব করিবেন? তাঁহাদিগকে প্রতারিত করিবার চেষ্টা করাতে ঋষিগণ ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন, এই বাসুদেবতনয় শাম্ব বৃষ্ণি ও অন্ধকবংশ বিনাশের নিমিত্ত ঘোরতর লৌহময় মুসল প্রসব করিবে। ঐ মুসল-প্রভাবে মহাত্মা বলদেব ও জনার্দ্দন ভিন্ন যদুবংশের সকলেই এককালে উৎসন্ন হইবে। এই মুসল উদূখলে পেষণ করিবার মুসল-দণ্ড নয়, ইহা প্রাচীন ভারতের যুদ্ধাস্ত্রবিশেষ। ঋষিদিগের অলঙ্ঘ্য অভিশাপে পরদিবস শাম্ব এক ঘোরতর মুসল প্রসব করিলেন। ভীত হইয়া রাজপুরুষরা সেই মুসল চূর্ণ করাইয়া সমুদ্রে নিক্ষেপ করাইলেন। চূর্ণিত মুসল সমুদ্রতীরে এরকা (খাগড়া নয়) আকারে উৎপন্ন হইল। কিছুদিন পরে এক দিন যদুবংশীয় বীরগণ সুরাপানে উন্মত্ত হইয়া কলহ করিতে আরম্ভ করিলেন। প্রথমে সাত্যকি খড়্গ দ্বারা কৃতবর্ম্মার মস্তকচ্ছেদন করিয়া অন্যান্য বীরগণকে প্রহার করিতে লাগিলেন। বাসুদেব তাঁহাকে নিবারণ করিতে পারিলেন না। ভোজ ও অন্ধকদিগের সংখ্যা অধিক। বাসুদেবের সাক্ষাতেই প্রদ্যুম্ন ও সাত্যকি নিহত হইলেন। তখন বাসুদেব কোপাবিষ্ট হইয়া মুসল-চূর্ণজাত এক মুষ্টি এরকা গ্রহণ করিলেন তৎক্ষণাৎ উহা বজ্রতুল্য মুসল হইল। সকল বীরই এরকা উৎপাটন করিতে আরম্ভ করিলেন এবং তাঁহাদের হস্তে ঐ তৃণ মুসলে পরিণত হইল। এইরূপে যদুবংশ ধ্বংস হইল। মুসলং কুলনাশনম্।

য়ুরোপে সকল জাতিই বজ্রতুল্য মুসলধারী। বিজ্ঞানের সহায়তায় যে সকল অস্ত্র প্রস্তুত হইয়াছে, তাহাতে একেবারে সহস্র সহস্র লোক নিহত ও আহত হইতে পারে। বৃষ্ণি, অন্ধক এবং ভোজ-বংশের ন্যায় য়ুরোপের সকল জাতিতেই সম্পর্ক আছে। লোভ এবং ঈর্ষার অপরিমিত সুরাপানে য়ুরোপের সকল জাতি উন্মত্ত। তাহা হইলে কি ঋষিকথিত কুলনাশনের পুনরভিনয় হইবে? যিনি সর্ব্বান্তর্যামী, তিনিই জানেন।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ গুপ্ত।

কুসুম ও নারী

দু-দণ্ডের তরে ফুল আলো করে বন,
নেহারিয়া মানবের জুড়ায় নয়ন,
দুই দণ্ড পরে সে ত পড়িবে ঝরিয়া,
তবু তার স্তুতি গায় অলি গুঞ্জরিয়া।

কোমল বলিয়া তার এত সমাদর,
স্ফটিকের ফুলে কভু, বসে না ভ্রমর।
নারী ও কুসুম আমি, গণি সমতুল,
নর সম নারী গড়া, অতিশয় ভুল।

নরের কঠোর ভাব, নারীতে না সাজে,
কোমলতা বিনে নারী, লাগে কোন্ কাজে!
পুরুষ বাঁচিয়া আছে, নারী-ছায়াতলে,
কর্ম্মের পাষাণে নারী, উৎসরূপে খেলে।

নারীরে যে দিতে চায়, পুরুষের সাজ,
'ডালে বসি ডাল কাটা' বাতুলের কাজ।

শ্রীবিনয়ভূষণ সেনগুপ্ত

পাহাড়ে ঝড়

উপন্যাস।

১

যে ঘরে বসিয়া "ছোট সাহেব" কয় জন ছাত্রের সহিত সাহিত্যালাপ করিতেছিলেন, তথা হইতে তিনি ক্রমোচ্চ কণ্ঠস্বরে ডাকিলেন, "মণিকা!—মণি!—মা!"

একটু দূর হইতে নারীকণ্ঠে উত্তর আসিল, "কি, বাবা?"

"এঁরা সব যাচ্ছেন; দেখা ক'রে যাও।"

কন্যাকে আসিতে বলিয়া "ছোট সাহেব" ছাত্র কয় জনকে বলিলেন, "মা যেমন ছেলের খাবার করবার ভার আর কাউকে দিয়ে নিশ্চিন্ত হ'তে পারেন না, মণিকা তেমনই আমার খাবার আপনি না দেখে করতে দেয় না।"

তাঁহার কথা শেষ হইবার অল্পক্ষণ পরেই পার্শ্বের ঘর হইতে পিতার বসিবার ঘরে আসিবার দ্বারের পর্দ্দা ঠেলিয়া এক যুবতী তথায় আসিয়া দাঁড়াইয়া সকলকে নমস্কার করিল। তাহার বর্ণ তপ্ত-কাঞ্চনের মত বা বিকশিত পদ্মপলাশের মত নহে—কিন্তু গৌর;—গৌরের নানা ক্রম আছে, সে সকলের মধ্যে যাহাকে "মাজা" বলে, তাহাই; তাহার দেহে যৌবনের পূর্ণতায় লাবণ্য ঢল ঢল করিতেছে—স্বাস্থ্য তাহাতে আরও সৌন্দর্য্যযোগ করিয়াছে। সে হাসিবার সময় তাহার গালে "টোল" পড়ে। তাহার চক্ষুই সর্ব্বাগ্রে লোকের মুগ্ধ দৃষ্টি আকৃষ্ট করে—যাহাকে "চোখের খেলা" বলে, সে চক্ষুতে তাহা নাই—দৃষ্টি সরল, উজ্জ্বল, প্রফুল্লতাব্যঞ্জক—সে চক্ষুতে সেই দৃষ্টিই শোভা পায়। যুবতীর পরিধানে একখানি ছাপা শাড়ী—নক্সা মনোহর, শাড়ীর বর্ণ যুবতীকে মানাইয়াছে। সে যখন নমস্কার করিল, তখন দেখা গেল, তাহার হস্তে কোন শ্বেতবর্ণ চূর্ণদ্রব্য লিপ্ত—সে নিশ্চয়ই পিতার জন্য ময়দা মাখিতে যাইতেছিল—পিতার ডাকে আসিয়াছিল এবং আসিবার সময় অর্দ্ধ-সমাপ্ত কার্য্য ত্যাগ করিয়া হাত ধুইয়া আসা প্রয়োজন মনে করে নাই।

"ছোট সাহেবের" ছাত্রগণ যুবতীকে প্রতিনমস্কার করিল। যুবতী পর্দ্দার অন্তরালে চলিয়া গেল।

যুবকগণ অধ্যাপককে নমস্কার জানাইয়া বিদায় লইল।

"ছোট সাহেব" প্রৌঢ়। তাঁহার পিতা ডাক্তার হইয়া উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে (বর্ত্তমান যুক্তপ্রদেশে) আসিয়া সর্ব্বাপেক্ষা বড় ডাক্তার বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তখন ইংরেজী শিক্ষা বাঙ্গালায় যত ব্যাপ্ত হইয়াছে, তত আর কোন প্রদেশে নহে এবং বহু প্রদেশে বাঙ্গালীরাই সে শিক্ষার বার্ত্তাবহরূপে গমন করিয়াছিলেন। তখন ভারতবর্ষে শিক্ষকের কার্য্যে, সমাজ-সংস্কারে, দেশাত্মবোধ প্রচারে, ব্যবহারাজীবের কার্য্যে বাঙ্গালীই অগ্রণী।—কোন কোন সামন্ত রাজার দরবারে বাঙ্গালী মন্ত্রিত্ব করিতেছেন। "ছোট সাহেবের" পিতা যখন আগ্রায়, তখন তথায় আর যে সব বাঙ্গালী ছিলেন, তাঁহাদিগের মধ্যে "যমুনা-লহরী"-রচয়িতা গোবিন্দচন্দ্র রায় অন্যতম। তিনি তখন মোগল-প্রাধান্যের শ্মশানে—যমুনাতীরে—তাজমহলের ছায়ায় বসিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—

"কত কাল পরে বল, ভারত রে
দুখ-সাগর সাঁতারি পার হ'বে?"

তখনও "বাবু" সম্মানব্যঞ্জক ছিল; সেই জন্য "শ্রীযুক্তকে" স্থান দান করিয়া বার্নপ্রস্থ অবলম্বন অবশ্যম্ভাবী বিবেচনা করে নাই। ডাক্তার বাবু আগ্রায় "ডাগদার বাবু" বলিয়াই পরিচিত ছিলেন। তিনি যৌবনে নবপ্রচারিত ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। তাঁহার স্ত্রী বিনাবিচারে—কর্ত্তব্যবোধে স্বামীর ধর্ম্মমতই গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু স্বামী ও স্ত্রী কেহই হিন্দুর আচার ত্যাগ করেন নাই এবং স্ত্রী বিধবা হইয়া যে বর্ষাধিককাল জীবিতা ছিলেন, সে সময় হিন্দু বিধবার সব আচার নিষ্ঠাসহকারে পালন করিয়াছিলেন।

তাঁহাদিগের দুই পুত্র ও এক কন্যা। পুত্রদ্বয়কে ডাক্তার বাবু শিক্ষা-সমাপ্তির জন্য বিলাতে পাঠাইয়াছিলেন। জ্যেষ্ঠ বিলাতে কোন ইংরেজ-কন্যাকে বিবাহ করিয়া এবং সরকারী ডাক্তার হইয়া আসিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েন। কনিষ্ঠ "ছোট

সাহেব" শিক্ষা বিভাগে চাকরীই মনোমত বিবেচনা করেন। কন্যার বিবাহ বাঙ্গালায় হইয়াছিল।

সমরকুমার পালিত যখন আগ্রা কলেজে অধ্যাপক হইয়া আসিলেন, তখন তিনি ইংরেজি সাহিত্যের দ্বিতীয় অধ্যাপক বলিয়া "ছোট সাহেব" নামে পরিচিত ছিলেন। সে আজ অনেক দিনের কথা। তাহার পর তিনি কলেজে ইংরেজি সাহিত্যের প্রধান অধ্যাপক হইয়াছেন এবং অধ্যক্ষের পদ পাইয়াছেন। কিন্তু তিনি এখনও "ছোট সাহেব" নামেই পরিচিত।

তাঁহার অধ্যাপনার খ্যাতি দিকে দিকে ব্যাপ্ত হইয়া ছাত্রদিগকে আকৃষ্ট করে; কেবল যুক্তপ্রদেশের নানা স্থান হইতেই নহে, পরন্তু পঞ্জাব প্রভৃতি প্রদেশ হইতেও ছাত্রগণ—বিশেষ বাঙ্গালী ছাত্ররা তাঁহার নিকট অধ্যয়নের লোভে আগ্রার কলেজে শিক্ষার্থী হয়। দীর্ঘকালের মধ্যে বহু ছাত্র তাঁহার নিকট অধ্যয়ন শেষ করিয়া কর্ম্মজীবনে প্রবেশ করিয়াছে; কিন্তু কেহই তাঁহার অধ্যাপনা-পদ্ধতি ভুলিতে পারে নাই।

তিনি কলেজের প্রাঙ্গণেই একখানি বাঙ্গলোয় বাস করেন। সেখানি সুসজ্জিত উদ্যানের মধ্যে অবস্থিত—সকল সময়েই সে উদ্যানে ফুল দেখা যায়। যখন দারুণ গ্রীষ্মে যুক্তপ্রদেশের ভূমি ফাটিয়া যায়, তখনও তাঁহার বাগানের ইন্দারা হইতে জলসেচের ফলে গাছে গাছে ফুল ফুটিয়া থাকে। গৃহসজ্জায় আতিশয্য নাই—কিন্তু সবই মার্জ্জিত রুচির পরিচায়ক। গৃহসজ্জার সর্ব্বপ্রধান উপকরণ—রাশি রাশি পুস্তক। সব পুস্তকে তাঁহার পাঠ-পরিচয় তাঁহার স্বহস্ত-লিখিত মন্তব্যে ও ব্যাখ্যায় সপ্রকাশ। তিনি তাঁহার চারি পার্শ্বে জ্ঞানের পরিবেষ্টন সৃষ্টি করিতে জানেন—তাই ছাত্ররাও সেই পরিবেষ্টনের মধ্যে জ্ঞানার্জ্জনোৎসাহী হয়। তিনি কেবল কলেজেই ছাত্রদিগকে শিক্ষা দিয়া কর্ত্তব্য শেষ হইল, মনে করিতে পারেন না। তাই যে সব ছাত্র অধ্যয়নানুরাগী ও জ্ঞানলাভের জন্য অধ্যয়ন করে, তাহারা প্রায় প্রতিদিন অপরাহ্ণে তাঁহার কাছে আসিয়া থাকে। তাহাদিগের সহিত চা পান করিয়া তিনি তাহাদিগকে লইয়া বেড়াইয়া আসেন এবং তাহার পর তাহাদিগকে কোন পুস্তক পড়ান বা তাহাদিগের সহিত সাহিত্যালোচনা করেন।

"ছোট সাহেব" বিপত্নীক। তাঁহার স্ত্রী যত দিন বাঁচিয়া ছিলেন, তত দিন ছাত্রদিগের সম্বন্ধে অতিথিসৎকারে তাঁহার আগ্রহ ছাত্রদিগকে মুগ্ধ করিত। তাহার পর সে কাযের ভার কন্যা মণিকাকে গ্রহণ করিতে হইয়াছে। মণিকার এক ভাই আছে। সে পঞ্জাবে সেচ বিভাগে চাকরী করে।

মণিকাকে সুশিক্ষিতা করিতে "ছোট সাহেব" যত্নের ক্রটি করেন নাই; কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষায় তাহাকে অধিক দূর অগ্রসর হইতে দেন নাই। তিনি স্বয়ং ইংরেজিতে সুপণ্ডিত—কন্যাকে আপনি পড়াইয়াছেন। এখনও সে তাঁহার ছাত্রদিগের সহিত সমানভাবে সাহিত্যালোচনা করিয়া থাকে। আমরা যে দিনের কথা বলিতেছি, সে দিনও সে পিতার নিকট ছাত্রদিগের সহিত কবি টেনিশনের বন্ধুবিয়োগে রচিত অমর কাব্য পাঠ করিয়া নির্দ্দিষ্ট সময়ে পিতার জন্য আহার্য্য প্রস্তুত করিতে গিয়াছিল।

পিতা স্বাবলম্বন ভালবাসেন—কিন্তু তাঁহাকে অনেক বিষয়ে দুহিতার উপর নির্ভরশীল হইতে হইয়াছে। মণিকার ইচ্ছা ছিল, সে চিকিৎসাবিদ্যা অর্জ্জন করিবে; কিন্তু তাহা তাহার পিতার অভিপ্রেত নহে বুঝিতে পারিয়া সে সে ইচ্ছা ত্যাগ করিয়াছে। সে পিতার গৃহখানি চিত্রের মত করিয়া রাখে এবং যাহাতে পিতার কোন অসুবিধা না হয়, সে বিষয়ে অবহিত থাকে।

মণিকা পিতার আদরের কন্যা। সেই কারণে তাহার মনে অভিমান স্ফুরিত হইয়াছে; কিন্তু তাহা ব্যক্ত করিবার কোন কারণ ঘটিত না। পিতার কোন কার্য্যে সে কোনরূপ বাধা পাইত না। মা যত দিন জীবিতা ছিলেন, তত দিন কখন কখন মাতাপুত্রীতে মতভেদের কারণ ঘটিত—কারণ, কোন দুই জন মানুষের প্রকৃতি ঠিক একইরূপ হয় না। মাতার মৃত্যুর পর গৃহে তাহার কথাই আদেশ বলিয়া বিবেচিত হইয়া আসিতেছে।

তাহার বিবাহের কথা সময় সময় "ছোট সাহেবের" মনে উদিত হইত। কিন্তু তিনি ভগবানের উপর নির্ভর করিতে শিখিয়াছিলেন; মনে করিতেন, যে দিন ভগবানের অভিপ্রেত হইবে, সে দিন তাহার উপযুক্ত পাত্র মিলিবে।

ছাত্ররা অধ্যাপককে অত্যন্ত ভক্তি করিত। তাহারা তাঁহার নিকটে মণিকার সহিত মিশিত, কিন্তু মণিকার ব্যবহার আত্মসম্মানের যে ব্যবধান রক্ষা করিত, তাহা কখন লঙ্ঘিত হইত না।

২

অধ্যাপকের গৃহ হইতে ছাত্ররা যখন বাহির হইল, তখন আকাশে জ্যোৎস্না। ছাত্রদিগের মধ্যে এক জন বলিল, "চল, তাজমহলে যাওয়া যা'ক।"

আর এক জন বলিল, "না। ফিরতে দেরী হ'বে।"

তৃতীয় ছাত্র বলিল, "সরল বাবু কবি মানুষ—ওঁর কাছে তাজমহল কবিতা—কখন পুরাণ হয় না।"

সরলকুমার বলিল, "ও কি কখন পুরাণ হয়? আমি ত যত দেখি, ততই দেখ্‌তে ইচ্ছা হয়।"

"যেমন মমতাজকে দেখে শাহজাহানের কখন তৃপ্তি হয় নি এবং তাঁরই স্মৃতি জড়ান ব'লে তাজমহল দেখেও তিনি কখন তৃপ্ত হ'তে পারেন নি। রূপের এমনই মোহ।"

সরলকুমার বলিল, "রূপের সঙ্গে যে গুণ ছিল না, সে বিষয়ে কি আপনি নিশ্চিত প্রমাণ পেয়েছেন?"

"মোগল হারেমের কথা—প্রমাণ সবই অনুমান: তবে ইতিহাস সে বিষয়ে নির্ব্বাক্‌।"

"আজও নির্ব্বাক্‌; কিন্তু এর পর কি বলবে, বলা যায় না। মোগলদের অন্তঃপুরেও মহিলাদের লেখাপড়ার ও শিল্প চর্চ্চার অনেক প্রমাণ আছে।"

"আপনি মেয়েদের লেখাপড়া শেখার খুবই অনুরাগী।"

"নিশ্চয়। তা'তে মনের বিস্তৃতিসাধন হয়। দেখ্‌লেন ত, আজ মণিকা কেমন একটা নূতন ব্যাখ্যা করলেন। অথচ বাড়ীর কাযও তিনি কেমন ভাবে করেন, তা'র পরিচয় আজ নমস্কারের সময় তাঁ'র হাতেই পাওয়া গেল।"

"আপনি কিন্তু প্রশংসার পথে বড় দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছেন।"

"কেন?"

"প্রশংসা মানুষকে নানা দিকে নিয়ে যেতে পারে, যথা—কাউকে ভক্তির পথে, কাউকে শ্রদ্ধার পথে—যেমন আমরা 'ছোট সাহেবকে' ভক্তি করি, শ্রদ্ধা করি। আর কোন কোন ক্ষেত্রে তা' অনুরাগের পথেও উপনীত করতে পারে।"

এক জন বলিল, "অন্তার্থ—সরল বাবু, সাবধান।"

সরলকুমার বলিল, "সাবধান হ'বারই বা কারণ কি?"

"কি সর্ব্বনাশ! 'ছোট সাহেব' যে ব্রাহ্ম—জাতিভেদে বিশ্বাস করেন না।"

"সেটা কি বড় ত্রুটি বা অপরাধ?"

"তা' নয়?"

"সেকালে আর ফিরে যাওয়া চলবে না এবং সে যুগে যে সব প্রথা সমাজের প্রয়োজনে রচিত হয়েছিল, সে সব যে এই খৃষ্টীয় বিংশ শতাব্দীতেও ঠিক তেমনই থাকবে না—তা' মনে করা অপরাধ হ'তে পারে না। আমরা নিষিদ্ধ ভোজ্য দেখলে রসনায় রসসঞ্চার বন্ধ রাখতে পারি না; রেল, ষ্টীমার প্রভৃতিতে অস্পৃশ্যতা বজায় রাখতে পারি না; বর্ণবিভাগ কেবল বিয়ের সময় দরকার মনে করি—ইত্যাদি ইত্যাদি।"

"আপনি দেখছি, অনেকটা এগিয়ে গেছেন।"

আর এক জন বলিল, "অনুরাগের পথে?"

সকলে হাসিয়া উঠিল।

ততক্ষণে তাহারা ছাত্রাবাসের দ্বারে উপনীত হইয়াছে।

এই কয়টি বাঙ্গালী ছাত্র অন্যান্য স্থান হইতে আসিয়াছিল এবং কলেজের যথাসম্ভব নিকটে একখানি বাঙ্গলো ভাড়া লইয়া যৌথ হিসাবে বাস করে। যে স্থানে বাঙ্গলোখানি অবস্থিত, তাহাতেই আর একখানি ছোট বাঙ্গলো আছে এবং সরলকুমার সেখানি স্বতন্ত্রভাবে ভাড়া লইয়াছে। সকলের আহার ব্যবস্থা একসঙ্গে হয়; কেবল সরলকুমার স্বতন্ত্র বাঙ্গলোয় থাকে।

সরলকুমার পিতামাতার একমাত্র সন্তান। তাহার পিতা ভারত সরকারের দপ্তরে বড় চাকরীয়া ছিলেন। পুত্র একটু বড় হইলে বৎসরে কতকাংশ সিমলায় ও কতকাংশ দিল্লীতে থাকিলে তাহার পাঠের অসুবিধা হয় বলিয়া তিনি তাহাকে কলিকাতায় ছাত্রাবাসে রাখিয়াছিলেন। সে পূজার ছুটীতে সিমলায় ও বড়দিনের ছুটীতে দিল্লীতে পিতামাতার নিকট যাইত। একবার সিমলা হইতে আসিবার পথে রেল-দুর্ঘটনায় তাহার মাতার মৃত্যু হয়—পিতাও বিশেষ আঘাত পাইয়া কয় মাস পরে সব যাতনা হইতে অব্যাহতি লাভ করেন। পিতৃমাতৃহীন যুবক সরলকুমার অবিভাবকহীন অবস্থায় জীবনসংগ্রামে প্রবৃত্ত হয়। কেবল তাহার অর্থের অভাব ছিল না। পিতার চাকরীর সঞ্চয়, জীবনবীমার টাকা ও রেল কোম্পানীর নিকট হইতে প্রাপ্ত ক্ষতিপূরণের অর্থ—সব একসঙ্গে করিলে যাহা হয়, তাহার আয়ে যে কোন মিতব্যয়ী পরিবারের সুখস্বচ্ছন্দে চলিয়া যাইতে পারে। তাহার উপর—তাহার পিতা কলিকাতায়

পৈতৃক বাড়ীতে তাঁহার অংশ জার্ম্মাণ যুদ্ধের পরই দাঁওয়ে বিক্রয় করিয়া বালীগঞ্জ অঞ্চলে অনেকটা জমী লইয়া একখানি গৃহ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। সেখানি ভাড়া দেওয়া ছিল। সরলকুমার সেই ব্যবস্থাই রাখিয়াছিল। অধ্যয়নে তাহার প্রবল অনুরাগ ছিল—এখন জীবনে তাহার আর কোন অবলম্বন না থাকায় তাহা আরও বর্দ্ধিত হয়। আই, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া সে কাশ্মীরে বেড়াইতে গিয়াছিল—ফিরিবার পথে আগ্রায় আইসে। আগ্রা তাহার ভাল লাগে এবং "ছোট সাহেবের" অধ্যাপনার খ্যাতিতে আকৃষ্ট হইয়া সে আগ্রাতেই অধ্যয়ন করিতে থাকে।

তাহার পর দুই বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। বি, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া সরলকুমার শেষ পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতেছে—কোন্ ব্যবসা অবলম্বন করিবে এবং কোন ব্যবসা অবলম্বন করিবে কি না, তাহা সে স্থির করিতে পারে নাই। সে বিষয়ে সে "ছোট সাহেবের" উপদেশ চাহিয়াছিল: তিনি বলিয়াছেন, ভারতবর্ষের রাজনীতিক অবস্থার যেরূপ দ্রুত পরিবর্ত্তন হইতেছে, তাহাতে অল্পকালমধ্যেই রাজনীতিচর্চ্চায় লোক শাসন-কার্য্যে ক্ষমতা পাইবে; সে কায মন্দ হইবে না। তিনি বিলাতের এক জন প্রসিদ্ধ রাজনীতিকের উক্তি তাহাকে শুনাইয়াছিলেন—স্বায়ত্ত-শাসনশীল দেশে রাজসেবা দেশসেবা ব্যতীত আর কিছুই নহে। তাহা শুনিয়া সরলকুমার ইংরেজি সাহিত্যের সঙ্গে সঙ্গে রাজনীতি ও অর্থনীতিবিষয়ক পুস্তক পাঠ করিতেছিল। সে "ছোট সাহেবের" প্রিয় ছাত্র এবং তাঁহার বিশেষ স্নেহভাজন।

দুই বৎসরের অধিককাল সে "ছোট সাহেবের" আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া আগ্রায় আছে এবং তাঁহার সান্নিধ্যে বিশেষ আনন্দ লাভ করে। কিন্তু আজ তাহার সঙ্গীদিগের মুখে যে কথা সে শুনিল, তাহা সে কোন দিন ভাবিয়া দেখে নাই। আগ্রায় তাহার আকর্ষণের সঙ্গে কি মণিকার কোন সম্বন্ধ আছে?

সে কথা ইতঃপূর্ব্বে কখন তাহার মনে হয় নাই। আজ ছাত্রদিগের মধ্যে এক জনের কথায় তাহা মনে হইল। অতি ক্ষুদ্র বীজ হইতে বৃহৎ বটবৃক্ষ উৎপন্ন হয়; বিনা উদ্দেশ্যে উক্ত ছোট একটি কথা হইতে অনেক চিন্তার উদ্ভব হয়। আজ শয্যায় শয়ন করিয়া সরলকুমার নানা কথা ভাবিতে লাগিল। মুক্ত বাতায়নপথে চন্দ্রালোক আর কুসুমগন্ধামোদিত স্নিগ্ধ সমীরণ তাহার কক্ষ পূর্ণ করিতেছিল। সে দিকে তাহার লক্ষ্য ছিল না। দুই বৎসরের কিছু অধিক কাল সে মণিকাকে দেখিয়াছে—মণিকাকে সে যে প্রশংসা করে, তাহা সে কখন গোপন করে নাই। কিন্তু "ছোট সাহেবের" ব্যবস্থায় মণিকার সঙ্গে কোন ছাত্রের ঘনিষ্ঠতাই আতিশয্য লাভ করিতে পারে না। আগ্রায় ও তাহার নিকটে—চারিদিকে দ্রষ্টব্য গৃহাদির অভাব নাই; সে সকলের সহিত ঐতিহাসিক স্মৃতি বিজড়িত। "ছোট সাহেব" সময় সময় ছাত্রদিগকে লইয়া সে সব দেখিতে ও দেখাইতে যাইয়া থাকেন—মণিকা তখন সঙ্গে যায়। কিন্তু তিনি সঙ্গে না থাকিলে মণিকা কখন যায় না। তাহার সহিত ছাত্রদিগের আলাপ কখন শিষ্টাচারসঙ্গত আলাপের সীমা লঙ্ঘন করিতে পারে না।

কাযেই তাহার প্রশংসা যে অনুরাগেরই লক্ষণ, তাহা সরলকুমার মনে করিতে পারে না। কিন্তু—

সঙ্গী ছাত্রের কথায় সরলকুমারের নূতন চিন্তার রুদ্ধ পথ যেন মুক্ত হইয়া গিয়াছিল। সে যে পথের বিষয় জানিত না—সে পথের সন্ধান মিলিয়াছে। পিতৃমাতৃহীন যুবক—এত দিন ভৃত্যের উপর নির্ভর করিয়া সংসারের ব্যবস্থা করিয়া আসিয়াছে। তাহাতে দিন কাটে—বাধিয়া থাকে না, কিন্তু পারিবারিক সুখশান্তির যে আশা ও আকাঙ্ক্ষা মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক, তাহা পূর্ণ হয় না—হইতে পারে না। তাহার কল্পনা কবিতাপুষ্ট হইলেও সে কোন দিন সেই আশা ও সেই আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিবার কোন কল্পনা করে নাই। আজ—বাতায়নপথে তাহার কক্ষে চন্দ্রালোকের মত, সেই কল্পনা তাহার মনে প্রবেশ করিল এবং তাহার মনে হইতে লাগিল, তাহা বিকচ-কুসুমগন্ধামোদিত বাতাসেরই মত মধুর।

স্বদেশের ও বিদেশের বহু কবির রচনার কথা তাহার মনে হইতে লাগিল। স্কটলণ্ডের প্রসিদ্ধ কবি যাহা লিখিয়াছেন, তাহার মর্ম্মার্থ:—

"যাতনা-তাড়িত যবে—ব্যথিত যখন,
দেবীমূর্ত্তি হেরি তব, রমণী তখন।"

আর বাঙ্গালার 'মহিলার' কবি নারী-সৃষ্টির কল্পনা ভাষায় প্রকাশ করিয়াছেন—নবীন জন্মে জাগিয়া মানুষ—

"শূন্য-মনে বসি' শূন্য আকাশের তলে,
শূন্য দেখে—শোভিত সংসার;
নিরূপিতে নাহি পারে নিজ বুদ্ধিবলে
কিসে দুঃখী—কি অভাব তার।—
বুঝি ভাব মানবের
ধাতা তার মানসের
করিলেন প্রতিমা রচনা;—
ভূলোক পুলকপূর্ণ, জন্মিল ললনা।"

সরলকুমার তাহার মাতাকে দেখিয়াছে—আপনার সুখদুঃখের স্বাতন্ত্র্য পর্য্যন্ত তিনি যেন বিসর্জ্জন দিয়া স্বামীর সহিত অভিন্নতা লাভ করিয়াছিলেন। সে মণিকার কথা মনে করিল—যে যৌবনে চাঞ্চল্য স্বভাবতঃ মনে স্থান পায় এবং গতি হইতে ব্যবহার পর্য্যন্ত সর্ব্ববিষয়ে আত্মপ্রকাশ করে—সেই যৌবনে সে কি নিষ্ঠাসহকারে পিতার সেবাভার গ্রহণ করিয়াছে! তাহার মনে পড়িল, তাহাদিগের ছাত্রাবাসের পার্শ্বের গৃহে সে একটি বালিকাকে কি অসীম যত্নে রুগ্না মাতার সেবা করিতে—রোগজীর্ণার অকারণ তিরস্কার হাসিমুখে পুরস্কার মনে করিতে দেখিয়াছিল; সে তাহার কথা উচ্ছ্বসিতভাবে বলিলে তাহার মাসীমা কিরূপ বিদ্রূপ করিয়া ভগিনীকে বলিয়াছিলেন, "ছেলেকে ওখান থেকে সরিয়ে নাও।"

ভাবিতে ভাবিতে সরলকুমার ঘুমাইয়া পড়িল -কিন্তু তাহার নিদ্রা গাঢ় হইল না।

বাতায়ন মুক্ত ছিল—অরুণালোক যখন কক্ষে প্রবেশ করিল, তখন তাহার নিদ্রাভঙ্গ হইল—সে অন্য দিনের মত উদ্যানে যাইয়া একবার ফুলের গাছগুলি দেখিয়া আসিল। তাহার দিনের কায এইরূপেই আরম্ভ হইত—সে ফুল বড় ভালবাসে।

৩

অন্য দিনের মত অপরাহ্নে ছাত্রগণ "ছোট সাহেবের" গৃহে গমন করিল। তাহারা যখন বাহিরের দ্বার পার হইয়া কঙ্করাস্তৃত পথে উপনীত হইল, তখন "ছোট সাহেব" ও মণিকা গৃহের উদ্যান পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিলেন। ছাত্রদিগকে দেখিয়া মণিকা লঘু ও ক্ষিপ্র গতিতে বাঙ্গলোয় চলিয়া গেল। সে যে ছাত্রদিগের জন্য চা প্রস্তুত করিতে গেল, তাহা ছাত্ররা বুঝিতে পারিল। অন্য সকলের মত সরলকুমারও তাহার দিকে চাহিল; কিন্তু সে চাহিয়াই দৃষ্টি নত করিল। যখন মণিকা বারান্দায় টেবলের উপর চা'র পেয়ালা, পিরিচ, ও পাঁউরুটি টোষ্ট রাখিল, তখন তাহাকে ধন্যবাদ দিবার সময়েও সরলকুমার কেমন লজ্জানুভব করিল।

চা পান শেষ হইলে "ছোট সাহেব" বলিলেন, "আমি মণিকাকে বলছিলাম, অনেক দিন তাজমহল দেখতে যাওয়া হয় নি। যা' দেখতে বিদেশ হ'তে—কত দূরদেশ হ'তে লোক আসে, আমরা কাছে থাকি ব'লে তা'র যথেষ্ট আদর করি না। এর কারণ কি? হয়—ঘনিষ্ঠতা উপেক্ষা উৎপন্ন করে, নয় ত কবি ক্যাম্পবেলের সেই কথা—

'দূরত্বের ব্যবধান শোভা দান করে—
বর্ণের রঞ্জনে করে রঞ্জিত ভূধরে!'

কোন্‌টা ঠিক?"

এক জন ছাত্র বলিল, "সরল বাবু কবিতা লেখেন, উনি এ প্রশ্নের ঠিক উত্তর দিতে পারবেন।"

"ছোট সাহেব" বলিলেন, "আচ্ছা, সরল, তুমিই বল।"

সরলকুমার বলিল, "ঘনিষ্ঠতা সব ক্ষেত্রে উপেক্ষা উৎপন্ন করে না। মমতাজের সঙ্গে শাহজাহানের অবশ্য খুবই ঘনিষ্ঠতা ছিল—স্বামী আর স্ত্রী—কিন্তু তা'তে উপেক্ষা উৎপন্ন হয় নি; বরং সেই ঘনিষ্ঠতা শাহজাহানের প্রেমকে মৃত্যুঞ্জয়ী করেছিল—'মর্ম্মরে রচিত এই প্রেমের স্বপন' তাজমহল তা'র প্রমাণ। আমাদের না যাওয়াও প্রশংসার অভাব-ব্যঞ্জক নয়।"

সরলের উত্তর শুনিয়া "ছোট সাহেব" বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিলেন। তিনি শাহজাহানের পত্নীবিয়োগব্যথা আপনার হৃদয়ে অনুভব করিতেছিলেন; স্থির করিয়াছিলেন, তাঁহার পত্নীর স্মৃতিজড়িত বাঙ্গলোতেই জীবনের অবশিষ্ট কাল যাপন করিবেন—আর কোথাও যাইবেন না। তিনি সস্নেহে সরলকুমারের পৃষ্ঠে করতল স্থাপন করিয়া বলিলেন, "চমৎকার ব্যাখ্যা।"

যে ছাত্রটি ব্যাখ্যার ভার সরলের উপর দিয়াছিল, সে বলিল, "কবির ব্যাখ্যা বটে; কিন্তু—"

মণিকা যে সরলের কথা উৎকর্ণ হইয়া শুনিতেছিল, তাহা

কেহ বুঝিতে পারে নাই। এখন মণিকা জিজ্ঞাসা করিল—"কিন্তু—কি ?"

"কিন্তু শাহ্‌জাহানের এই স্মৃতিসৌধ রচনায় যে তাঁহার রাজগর্ব্বই প্রকাশ পায় নি—দিল্লীতে হুমায়ুনের সমাধিসৌধ, সিকান্দ্রায় আকবরের সমাধিসৌধ, লাহোরে জাহাঙ্গীরের সমাধিসৌধ—এসবগুলিকে সৌন্দর্য্যে পরাভূত করবে, এমন সৌধ রচনা করবেন, এই অভিমানই যে শাহজাহানকে এই তাজমহল রচনায় প্ররোচিত করে নি, তা' কে বলতে পারে ?"

মণিকা বলিল, "এ'রা ধর্ম্ম সম্বন্ধে নাস্তিকের মত—পেঁয়াজের খোশা ছাড়াতে ছাড়াতে শেষে আর কিছুই থাকে না, ধর্ম্মও তেমনই। কিন্তু ধর্ম্ম বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত।"

সরলকুমার নত দৃষ্টি তুলিয়া মণিকার দিকে চাহিল। মণিকার মনে হইল, দৃষ্টিতে প্রশংসার এমন অভিব্যক্তি সে আর কখন প্রত্যক্ষ করে নাই। ভক্তের দৃষ্টিতে ভক্তির পাত্রের প্রতি এই ভাবই বুঝি ফুটিয়া উঠে। কিন্তু মণিকার দৃষ্টির সহিত তাহার দৃষ্টি মিলিত হইতেই সরলকুমার দৃষ্টি নত করিল।

"ছোট সাহেব" বলিলেন, "চল, তাজমহলে যাওয়া যা'ক—কোন্ ব্যাখ্যা সমীচীন, তা' দেখে স্থির করা যা'বে।"

সকলে তাজমহল দেখিয়া ফিরিয়া আসিলে "ছোট সাহেব" তাজমহল সম্বন্ধে কোন ইংরেজ কবির একটি কবিতা পাঠ করিয়া বলিলেন, "ধনেশ, এখন কি বল ?"

ধনেশ বলিল, "দেখছি, সরল বাবুর পক্ষেই ভোট অধিক। আজকাল—এই গণতন্ত্রের যুগে যখন ভোটের আধিক্যে সব বিষয় স্থির হয়, তখন আমিই হার মানতে বাধ্য।" কিন্তু জানেন ত, কবি গোল্ডস্মিথের সৃষ্টি গ্রাম্য শিক্ষক—'যুক্তিতে হারিলে তবু তর্কেতে তৎপর।' আমি সেই রকম হ'তেও পারি।"

সকলে হাসিয়া উঠিলেন

পূর্ব্বদিন প্রত্যাবর্ত্তনপথে যে ছাত্রটি বলিয়াছিল—সরলকুমার প্রশংসার পথে বড় দ্রুত অগ্রসর হইতেছে, আজ প্রত্যাবর্ত্তনপথে সেই-ই বলিল, "আজ সরল বাবুর প্রবল সমর্থক আমাদের গুরুকন্যা—কুমারী পালিত।"

তাহার কথার কি কোন গুপ্ত ইঙ্গিত ছিল ?

তাহার কথায় কোন গুপ্ত ইঙ্গিত থাকুক আর না-থাকুক, সরলকুমারের মনে হইতে লাগিল, তাহার আপনার মনের ইঙ্গিত সম্বন্ধে তাহার আর সন্দেহ নাই। আগ্রার দুর্গমধ্যে সমাম বুরুজ বা জুঁই মহলের প্রাচীরগাত্র শিল্পী যেমন অসাধারণ নৈপুণ্য সহকারে নানা চিত্রে পূর্ণ করিয়া দিয়াছিল, তাহার মনও তেমনই নানা চিত্রে পূর্ণ হইয়াছিল। সে এত দিন তাহা লক্ষ্য করিতেই পারে নাই—সে তাহার আপনার দৃষ্টিপাতের দোষে।

আজ সে মনে করিল, এ সব চিত্র কোথা হইতে আসিল ? কে যেন তাহার সেই জিজ্ঞাসায় উত্তর দিল, "ফুলকলি বিকশিত হইবার পূর্ব্বে কে তাহার কেন্দ্র হইতে প্রতি পর্ণ যথাযোগ্য বর্ণে রঞ্জিত করে ?"

তাহার মনে হইতে লাগিল, তাহার সংসারের আদর্শ পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে—জীবনের উদ্দেশ্য সে সন্ধান করিয়া পাইয়াছে। অথচ সে পরিবর্ত্তন তাহার চেষ্টাসাধ্য হয় নাই, সে উদ্দেশ্য তাহাকে সন্ধান করিয়া বাহির করিতে হয় নাই। কিরূপে—ধীরে ধীরে তাহার মনে পুরাতনের স্থান নূতন অধিকার করিয়াছে, যাহা শূন্য ছিল, তাহা পূর্ণ করিবার আকাঙ্ক্ষা আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, যৌবন তাহার অতৃপ্ত ক্ষুধা লইয়া তৃপ্তি চাহিতে দেখা দিয়াছে—তাহা সে বুঝিতে পারে নাই। সে দিকে তাহার দৃষ্টিও ছিল না।

সে যত ভাবিতে লাগিল, তাহার মনের অভাব ততই তীব্র হইয়া উঠিতে লাগিল—সে অভাব দূর করিবার জন্য তাহার ইচ্ছাও তত প্রবল হইতে লাগিল। কিন্তু প্রণয়ের প্রথম বিকাশ যুবককে শঙ্কিত করে। এ ক্ষেত্রে তাহার শঙ্কা প্রবল হইবার বিশেষ কারণও যে ছিল না, তাহা নহে। সে যদি তাহার মনের বাসনা ব্যক্ত করে, তবে কি হইবে ? যদি "ছোট সাহেব" তাহাকে কন্যার উপযুক্ত পাত্র বিবেচনা না করেন বা তাহার সহিত বিবাহ মণিকার অভিপ্রেত না হয়, তবে তাহাকে আগ্রা ত্যাগ করিয়া যাইতে হইবে ; কেন না, তাহার পর আর তাহার পক্ষে পূর্ব্ববৎ "ছোট সাহেবের" গৃহে গতায়াত করা সম্ভব ও সঙ্গত হইবে না ; এবং সে অবস্থায় তাহার পক্ষে আর আগ্রায় থাকা সমীচীন হইবে না।

তাহাকে আগ্রা ত্যাগ করিতে হইতেও পারে, এই চিন্তায় সে যখন বেদনানুভব করিল, তখন সে বুঝিল,

আগ্রায় সে "ছোট সাহেবের" অধ্যাপনার দ্বারা আকৃষ্ট হইয়াছিল বটে, কিন্তু আজ যে সে আগ্রার আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া আছে, তাহার অন্য কারণও আছে—হয় ত সেই কারণই প্রবল ও প্রধান।

যাহাতে তাহার পক্ষে মণিকার সান্নিধ্যে থাকা অসঙ্গত হইতেও পারে, তাহা সে সাহস করিয়া করিতে পারে কি? সে যদি কোন কথা প্রকাশ না করে—উপাসক যেমন দূর হইতে দেবীর উপাসনা করিয়া আপনাকে কৃতার্থ মনে করে, তেমনই করে, তবে তাহাতে কি দোষ হইতে পারে? সে ত তাহাতে কাহারও কোন অনিষ্ট করিবে না। দিন যেমন কাটিতেছে, তেমনই কাটিবে; কেবল সে তাহার মনের গোপন ভাব গোপন রাখিবে। আর কিছুই নহে। সাহস করিয়া "ছোট সাহেবের" নিকট তাহার প্রস্তাব উপস্থাপিত করিবার সঙ্কল্প সে ত্যাগ করিল এবং সে আপনাকে আপনি বুঝাইবার চেষ্টা করিল—তাহাতেই সে শান্তিতে থাকিতে পারিবে।

তাহার পর সরলকুমার পূর্ব্ববৎ জীবন যাপনের চেষ্টায় ব্যাপৃত হইল—সেই অধ্যয়ন, সেই সাহিত্যালোচনা, সেই প্রতিদিন "ছোট সাহেবের" গৃহে গমন ও তথায় মণিকার সহিত সাক্ষাৎ, সেই আপনার ফুলগাছ প্রভৃতি দেখা—ইত্যাদি।

কিন্তু তাহার মনের মধ্যে যে পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছিল, তাহার কি হইবে?

[ক্রমশঃ

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ।

"—অন্ধকার জ্যোতির্ম্ময়ী ধরা"

দুরন্ত দারিদ্র্য আর দুর্ব্বিষহ অতৃপ্ত কামনা
শত লক্ষ ফণা ধরি জীবনেরে করিছে দংশন,
রূপে ভরা নিখিলের ছন্দ-গান করিছে শোষণ
বাঁচিবার তরে এই লজ্জাকর নির্লজ্জ সাধনা।

শুধু বেঁচে থাকা মাত্র দগ্ধোদরে অন্ন এক মুঠি,
প্রত্যহ ফেলিয়া দেওয়া, তার বেশী আর কিছু নয়,
তারি তরে এ সংগ্রাম—ছলনার হীন অভিনয়
করিতে হতেছে মোরে মর্ম্মভেদী অশ্রুজলে লুটি'!

সব ঠাঁই ঘৃণা আর দ্বিধাহীন অবজ্ঞার শর
আত্মারে করিছে বিদ্ধ সুনিপুণ অব্যর্থ সন্ধানে,
সহি' সদা অনাদর জ্বালামুখী আত্ম-অপমানে
মোহশূন্য হইতেছি অভিশপ্ত জীবনের 'পর।

ভগবান তুমি কোথা! কোথা তব করুণার ধারা
এ যে দেখি শুধু কালো, অন্ধকার জ্যোতির্ম্ময়ী ধরা।

কুমারী নীলিমা বসু ভারতী

ইতিহাসের অনুসরণ

"দীন-ই-ইলাহী"

পানিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধে পরাজিত ও বন্দী পাঠান সেনাপতি হীমুকে স্বহস্তে নিধন করিয়া "গাজী" হইবার জন্ম বৈরম খাঁ আকবরকে উপদেশ দিলেন; এবং কাফেরের রক্তে অসি রঞ্জিত করিয়া "গাজী" হওয়া পবিত্র কোরাণ শরীফ অনুমোদিত, সুতরাং প্রত্যেক ধর্ম্মপ্রাণ মুসলমানের বিশেষ কাম্য, ইহাও স্মরণ করাইয়া দিলেন। কিন্তু মহানুভব বালক আকবর দেখিলেন, কাফের শত্রু, চক্ষুতে তীর বিদ্ধ হওয়ার জন্ম যন্ত্রণায় সংজ্ঞাহীন, ধূল্যবলুণ্ঠিত দেহ, এরূপ অসহায় শত্রুর অঙ্গে অস্ত্রাঘাত করা নিতান্ত বর্ব্বরোচিত। এরূপ নিষ্ঠুর কর্ম্ম তাঁহার বিবেকানুমোদিত হইল না। এজন্ম মহাবীর হীমুকে হত্যা দ্বারা পবিত্র কোরাণের উক্তির অথবা ধর্ম্মপ্রাণ গুরুর উপদেশের সম্মান রক্ষা করিতে পারিলেন না। Elphinstone's "History of India" p 496.

আকবরের কার্য্যকলাপ আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, বাল্য-জীবনের অঙ্কুরিত সেই মনোবৃত্তি ভবিষ্যতে বৃহৎ কার্য্যবিধিতে পরিণত হয়। প্রচলিত পুরাতন প্রথা, পুস্তকের লিখিত উক্তি, অথবা জ্ঞানাভিমানীর উপদেশ, সর্ব্ব-সময়ে ও সর্ব্বাবস্থায় বিনা বিচারে ধ্রুব সত্য জ্ঞানে গ্রহণ না করিয়া নিজের বিবেক ও অতুলনীয় বিচার-বুদ্ধির কষ্টি-পাথরে যাচাই করিতেন; এবং তাঁহার বাস্তব জগতের কর্ম্মধারা এই নিয়মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়া তাঁহাকে জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রাজন্যগণের মধ্যে উচ্চাসনে সুপ্রতিষ্ঠিত করে। Malleson's "Akbar" p 147.

তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী মুসলমান বিজেতারা হিন্দুস্থানের সিংহাসন অধিকার করিয়াছিলেন, হিন্দুধর্ম্ম অমার্জ্জনীয় অপরাধ বিবেচনা করিয়া হিন্দুদের হত্যা, তাহাদের স্ত্রী-পুত্রকে ক্রীতদাস, এবং তাহাদের ধর্ম্মের উপর মহা অত্যাচার করিয়া পবিত্র কোরাণ শরীফের সম্মান রক্ষা করিয়াছিলেন; কিন্তু হিন্দুস্থানে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর রাজত্ব স্থাপন করা প্রয়োজন মনে করেন নাই। Vincent Smith's "Akbar the Great Mugul" p 356; Bloc Aim p 237 (note); Malleson's "Akbar" p 172. রাজ্যাভিষেকের পর আকবরের মন্ত্রীরা হিন্দুদের উপর ক্রমাগত উৎপীড়ন করিতে পরামর্শ দিলেন। তাঁহার পিতা হুমায়ুন কনোজের যুদ্ধে পরাজিত হইয়া হিন্দুস্থান ত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। পথিমধ্যে আকবর-জননীর আসন্ন-প্রসবের সম্ভাবনা। তদুপরি বিজয়দৃপ্ত শেরশাহের পশ্চাদনুসরণ হুমায়ুনকে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় করিয়া ফেলিল। তখন অমরকোটের হিন্দুরাজা শেরশাহের প্রতিহিংসা এবং নিজের সর্ব্বনাশের সম্ভাবনা উপেক্ষা করিয়া বিপন্ন হুমায়ুনকে আশ্রয় দিলেন। হিন্দুর এ মহত্ত্ব হুমায়ুনের অন্তরে রেখাপাত করিতে পারিল না। জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত হিন্দুদের উপর উৎপীড়ন ভিন্ন অন্য পন্থা নির্দ্দেশ করিতে পারিলেন না। আকবরের আতালিক ধর্ম্মপ্রাণ বৈরম খাঁ হিন্দুদের পদদলিত করিতে এবং উপযুক্ত সৈন্য-সমাবেশ ও শক্তিপ্রয়োগের দ্বারা রাজত্ব দৃঢ় করিতে পরামর্শ দিলেন।

স্বহস্তে রাজ্যভার গ্রহণের পর আকবর মোগল সাম্রাজ্য চিরস্থায়ী করিতে প্রয়াসী হইলেন। কিন্তু তৎপক্ষে পূর্ব্ববর্ত্তী বাদশাহের আদর্শ অথবা পূর্ব্বোক্ত পরামর্শ তাঁহার বিবেকানুমোদিত হইল না। তখন তিনি দেখিলেন যে, হিন্দুদের সহিত চিরবিবাদ অপেক্ষা তাহাদের সহানুভূতি ও আন্তরিক শ্রদ্ধা অর্জ্জন করা, তাহাদের অন্তর অধিকার করা, তাহাদের সহিত মিত্রতা স্থাপন করা অধিকতর প্রয়োজন। এজন্ম রাজনীতিজ্ঞ আকবর রাজপুত জাতির সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া অম্বররাজকে চিরসহায় করিয়া রাখিলেন। এরূপ ঘনিষ্ঠতা স্থাপনের পর আকবর তাহাদের গুণাবলী পর্য্যবেক্ষণ করিবার সুবিধা পাইলেন। তিনি দেখিলেন, রাজপুত জাতি প্রকৃতপক্ষে সত্যবাদী, কর্ত্তব্যপরায়ণ, কার্য্যক্ষম, সাহসী ও বিশ্বাসভাজন এবং মুসলমান অপেক্ষা কোন অংশে নিকৃষ্ট নহে; তাহাদের অন্তর অধিকার করিতে হইলে তাহাদের উপর অন্ধ সংস্কার বা হিংসাপ্রবৃত্তিবশে যে সকল উৎপীড়ন করা হইত, সেগুলি সত্বর দূর করা উচিত। এজন্ম হিন্দুস্থান হইতে বিজিত হিন্দুদের ক্রীতদাস করার প্রথা, তীর্থ-কর, এবং হিন্দুদের মহা কষ্টদায়ক জিজিয়া কর উঠাইয়া দিলেন। Beveridge Akbarnamah" II. p 243, 244, 295 & 317.

এ সকল সংস্কারের পরেও হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে বিবাদ দূর হইল না। বাদশা তাহার কারণ নির্ণয় করিলেন এবং দেখিলেন যে, কতকগুলি ধর্ম্মান্ধ মুসলমান সকল অশান্তির সৃষ্টিকর্ত্তা। ঐ সকল মুসলমানের ধারণা, তাহারা ধর্ম্মসম্বন্ধে অভ্রান্ত, তাহারা অব্যক্ত, অনাদি ও ধারণাতীত পরমব্রহ্মের ধারণা ও উপাসনা করে। হিন্দুরা ভ্রমান্ধ হইয়া অসত্য ও হীন ধর্ম্মের আচরণ করে, অবশ ও প্রাণহীন বিগ্রহের পূজা করে, অর্থহীন ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করে; হিন্দুদের পক্ষে ইস্লাম গ্রহণ করা এবং তাহার প্রাধান্য স্বীকার করা অবশ্য কর্ত্তব্য; অন্যথায় হিন্দুরা চিরদিন কঠোর অত্যাচার সহ্য করিতে বাধ্য। আকবর প্রথম কয়েক বৎসর এই মতের বশবর্ত্তী হইলেন। সুতরাং তাঁহার রাজ্যের সর্ব্বাংশে দেবমন্দির ভগ্ন, বিগ্রহ পদাঘাতে ভূলুণ্ঠিত, গোহত্যা, হিন্দুসতীর অবমাননা দৈনন্দিন ব্যাপার হইয়া উঠিল। তিনি নিজে শত শত ব্রাহ্মণকে ইসলাম গ্রহণ করিতে বাধ্য করিলেন। কিন্তু তাঁহার বিবেক তাঁহার ভ্রম দেখাইয়া দিল। তিনি বলিলেন, "Formerly I presented men into conformity with my faith and deemed it Islam. As I grew in knowledge I w..s overwhelmed with shame.

Not being a Muslim myself, it was unmeet to force others to become such. What constancy is to be expected from proselytes on compulsion?" Jarret, Ain-i-Akbari" III. p 384. অর্থাৎ "পূর্ব্বে মনে করিতাম, নির্য্যাতন দ্বারা সকলকে মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করাইতে পারিলে ইস্‌লামের প্রকৃত উদ্দেশ্য সাধিত হয়। কিন্তু জ্ঞানবৃদ্ধির সহিত নিজের ভ্রম বুঝিতে পারিয়া বিশেষ লজ্জিত হইতেছি। নিজে সর্ব্বান্তঃকরণে মুসলমান নহি, এরূপ অবস্থায় অপরকে মুসলমান হইবার জন্য বাধ্য করান আমার পক্ষে অনুচিত। বাধ্য হইয়া কেহ ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিলে তাহার নিকট হইতে গৃহীত ধর্ম্মের প্রতি স্থিরানুরাগ আশা করা বৃথা।" তখন তিনি দেখিলেন যে, ঐ সকল ধর্ম্মান্ধ মুসলমান অন্য ধর্ম্মের প্রতি নিরপেক্ষ বিচার করিতে অপারগ হইয়া, পাশবিক বলে এবং ব্যক্তিগত মতের বশে হিন্দুধর্ম্মকে হীন ও অসত্য বলিতেছে। Malleson, p 148. তিনি আরও দেখিলেন যে, হিন্দুধর্ম্ম বহু পুরাতন, প্রকৃতপক্ষে অসত্য হইলে বহু পূর্ব্বেই লোপ পাইত। এক ধর্ম্ম যাহা বলিবে, অন্য ধর্ম্ম তাহা অস্বীকার করিলে, দ্বিতীয়টি প্রামাণিক বলিবার কোন কারণ দেখিলেন না। পাশবিক বলে কোন ধর্ম্মকে হীন বা অসত্য বলা চলে না। সুতরাং যুক্তি তর্কের দ্বারা প্রতিপন্ন না হওয়া পর্য্যন্ত হিন্দুধর্ম্মের হীনতা বা অন্য ধর্ম্মের প্রাধান্য স্বীকার করিতে পারিলেন না। Badaoni II p 256; Bloch. p 79. তখন তিনি হিন্দুস্থানের সমস্ত ধর্ম্মের একে একে আলোচনা করিতে এবং প্রয়োজন হইলে একটি নূতন ধর্ম্ম প্রচার করিতে স্থিরসঙ্কল্প হইলেন। বাদশা কর্ত্তৃক নূতন ধর্ম্ম প্রচারের প্রচেষ্টা অশ্রুতপূর্ব্ব হইলেও আকবরের মৌলিক কল্পনা-প্রসূত নহে; এরূপ কল্পনার জন্য তিনি পাঠান সম্রাট আলাউদ্দীন্ খিলিজীর নিকট ঋণী। ধর্ম্মপ্রচার ব্যাপারে আলাউদ্দীনের চিন্তা ও কল্পনার বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

হজরত মহম্মদ তাঁহার চারি জন বন্ধুর সাহায্যে ইসলাম ধর্ম্ম প্রচার করিয়া জনসাধারণকে গ্রহণ করাইতে সমর্থ হইলেন। আলাউদ্দীন্ আশা করিলেন, উলুগখাঁ প্রভৃতি তাঁহার চারি জন বিশিষ্ট বন্ধুর সাহায্যে একটি নূতন ধর্ম্ম প্রচার করিয়া বল-প্রয়োগ দ্বারা জনসাধারণকে গ্রহণ করাইতে সমর্থ হইলে হজরত মহম্মদের ন্যায় তিনি পৃথিবীতে অমর হইয়া থাকিবেন। মদ্যপানের সময় বন্ধুদের মধ্যে আলাউদ্দীনের এইরূপ কথাবার্ত্তা হইত এবং তিনি গোপনে তাঁহার বিশ্বস্ত সভাসদগণের সহিত এ বিষয়ে পরামর্শ করিতেন। কিন্তু দিল্লীর কোতোয়াল আলাও-উল্-মুলক্ নিম্নলিখিত যুক্তি প্রয়োগ করিয়া আলাউদ্দীনকে ধর্ম্ম-প্রচারের বাসনা ত্যাগ করিতে পরামর্শ দিলেন। কোতোয়াল বলিলেন, "পৃথিবীর আদি-যুগ হইতে ধর্ম্মপ্রচার প্রত্যাদিষ্ট ব্যক্তির কর্ত্তব্য হইয়া রহিয়াছে। ধর্ম্মপ্রচার কখনও রাজার কর্ত্তব্য হয় নাই বা হইতে পারে না। প্রত্যাদিষ্ট ব্যক্তির হৃদয়ে ভগবৎতত্ত্বজ্ঞানের উন্মেষ আপনা হইতে হইয়া থাকে; এই তত্ত্বই ঈশ্বর-প্রকটিত সত্য, ইহার প্রচার ধর্ম্মপ্রচারের নামান্তর মাত্র। পাশবিক বল, যুক্তি, কল্পনা ও পরামর্শের দ্বারা মানবহৃদয়ে ধর্ম্মের বিকাশ হয় না। মুসলমানদের মোগল ধর্ম্মে দীক্ষিত করিবার জন্য চেঙ্গিজ খাঁর আজ্ঞায় রক্তের নদী বহিল, কিন্তু কোন মুসলমান মোগলধর্ম্মে দীক্ষিত হইল না; বরং অনেক মোগল মুসলমানধর্ম্ম গ্রহণ করিল।" আলাউদ্দীন অশিক্ষিত ও স্বেচ্ছাচারী হইলেও কোতোয়ালের এই যুক্তি ও পরামর্শ বিশেষরূপ বিবেচনা করিয়া দেখিলেন এবং অবশেষে ধর্ম্মপ্রচারের বাসনা চিরদিনের জন্য ত্যাগ করিলেন। Elliot & Dowson III p 168 & 169. এ ব্যাপার আকবরের অবিদিত ছিল না।

১৫৭৩ খৃষ্টাব্দে গুজরাট জয়ের পর আকবর রাজধানীতে প্রত্যাগত হইলে সেখ মবারক (আবুল ফজলের পিতা) তাঁহাকে মোগল সাম্রাজ্যের ধর্ম্মের ভবিষ্য নিয়ন্তা বলিয়া অভিনন্দন করিলেন। Beveridge A N. III p 56. এখন হইতে তিনি এই আশাকে হৃদয়ের মধ্যে প্রচ্ছন্নভাবে পোষণ করিলেও হিন্দুস্থান হইতে ইসলাম দূর করিয়া তাহার স্থানে অন্য ধর্ম্ম স্থাপন করিতে একেবারে অগ্রসর হন নাই।

১৫৭৫ খৃষ্টাব্দ হইতে ফতেপুর শিক্রির প্রসিদ্ধ "ইবাদাদখানা" বা ধর্ম্মমন্দিরে প্রতি বৃহস্পতিবার রাত্রিতে ধর্ম্মালোচনা আরম্ভ হইল। ধর্ম্মালোচনার সময় ধর্ম্মশাস্ত্রবিদ্ উলেমারা মকদম-উল্-মুলক্ ও আবদুল্-নবীর অধীনে দুই দলে বিভক্ত হইতেন। বাদশার মনে ইসলাম ধর্ম্ম ও কোরাণ-শরীফের অংশবিশেষের অর্থ সম্বন্ধে কতকগুলি সন্দেহ উপস্থিত হওয়াতে তিনি এই সকল সন্দেহ দূর করিবার জন্য উলেমাদের নিকট যাইয়া একে একে সকলকে প্রশ্ন করিতেন। এই সকল প্রশ্নের উত্তরে এক দল উলেমা যেরূপ মত প্রকাশ করিতেন, অপর দল প্রায়ই তাহার বিপরীত মত প্রকাশ করিতেন। নিজেদের মধ্যে কোনরূপ সন্তোষজনক মীমাংসা করিতে না পারিয়া উলেমারা পরস্পরকে মূর্খ, নাস্তিক ও ধর্ম্মদ্রোহী বলিতেন। উচ্চশিক্ষাভিমানী ও ধর্ম্ম-শাস্ত্র-অভিজ্ঞ উলেমাদের আচরণ দেখিয়া বাদশা স্তম্ভিত হইলেন। তিনি দেখিলেন, এই উলেমারা সকলেই উদ্ধতস্বভাব, রূঢ়ভাষী, এবং আত্মসম্ভ্রমজ্ঞানশূন্য। যাহারা বাদশার সমক্ষে এবং ধর্ম্মচর্চ্চার সময় নিজেদের কদর্য্য স্বভাব ও আচরণের পরিচয় দিতে লজ্জিত হয় না, তাহাদের মধ্যে প্রকৃত শিক্ষা বা মানসিক উৎকর্ষের সম্পূর্ণ অভাব; তাহাদের মধ্যে ধর্ম্মমত অপেক্ষা ব্যক্তিগত মতই প্রবল; ধর্ম্মাচরণের প্রকৃত উদ্দেশ্য সম্বন্ধে তাহারা অজ্ঞ; তাহাদের ধারণা বাহ্য আড়ম্বর, ক্রিয়ানুষ্ঠান ও বিধিনিয়মপালনের দ্বারা ধর্ম্মাচরণের প্রকৃত উদ্দেশ্য সাধিত হয়। যাহারা নিজেদের পর্য্যাপ্ত জ্ঞানাভাব বশতঃ ইসলামের পবিত্র উদ্দেশ্য এবং কোরাণ শরীফের প্রকৃত অর্থ ব্যাখ্যা করিতে অপারগ, তাহারা সকলেই অজ্ঞ, সকলেই ধর্ম্মোন্মত্ত। সুতরাং ইসলামের প্রকৃত উদ্দেশ্য এবং কোরাণ শরীফের প্রকৃত অর্থ ব্যাখ্যা করিবার লোকাভাব মনে করিয়া এবং এরূপ উলেমাদের উপর ধর্ম্মশিক্ষা বিষয়ে নির্ভর করা নিরাপদ নহে ভাবিয়া বাদশা ইসলামের মধ্যে তাঁহার অন্তরের তৃপ্তিসাধনের পক্ষে কোন উপায় দেখিলেন না; এবং কোরাণ শরীফের নানারূপ অর্থের মধ্যে সত্য নির্ণয় করিতে না পারিয়া অন্য ধর্ম্মের মধ্যে সত্যের অনুসন্ধান করিতে প্রয়াসী হইলেন। অবশেষে শুক্রবারের নামাজ ব্যতিরেকে ইসলামের সমস্তই পরিত্যাগ করিলেন। Blochmanns "Ain-i-Akbari p 171, 172 & 177 195; Jarret's "Ain-i-Akbari" vol III. p 369 & 304; Badaoni II p 239 & 259; Father

Pinheiro's letter frome Lahore father Pinheiro's letter dated 28th August, Lahore ; Malleson p 156.

তৎপরে খৃষ্টধর্ম্মের আলোচনা করিতে ইচ্ছুক হইয়া বাদশা বঙ্গপ্রদেশ হইতে Julian Perrira নামক পাদ্রীকে এবং সেই পাদ্রী সাহেবের পরামর্শে গোয়া হইতে Jesuit পাদ্রীদের ফতেপুর লইয়া আসিলেন। Jesuit পাদ্রীদের মধ্যে Rodolfo Aquaviva সাহেবের বিদ্যাবুদ্ধি এবং তর্কযুক্তি দ্বারা উলেমাদের সহজেই পরাজিত করিবার ক্ষমতা দেখিয়া বাদশা বিশেষ সন্তুষ্ট হইলেন এবং যীশুখৃষ্টের ধর্ম্মোপদেশ (Gospel) শ্রবণে তৎপ্রতি আকৃষ্ট হইয়া বাইবেলের (New Testament) অনুবাদ করিবার জন্য আবুল ফজলকে আদেশ দিলেন। কিন্তু পাদ্রীদের মধ্যে মকদম-উল-মুলক্-এর ন্যায় ধর্ম্মোন্মত্ততা ও ভিন্ন ধর্ম্মের প্রতি ঔদার্য্যের সম্পূর্ণ অভাব দেখিয়া ("As Friars & Mollas argued before him, he saw in his Christian visitors the same angry intolerance, the same universal condemnation of all outside their pale &c &c"...Oaten's "European Travellers in India"); এবং ধর্ম্মের অজুহাতে অন্য পাদ্রীদের দ্বারা অনুষ্ঠিত নিষ্ঠুর ও অন্যায় কর্ম্মের সংবাদ পাইয়া ("It is legitimate that the Emperor could not have allowed himself to be converted by the Missionaries, whose co-religionists were guilty of the horrors of the Inquisition of Goa, of which he must have heard"...Monserrates "Commentaries"—Translated by Hayland—Introduction p II) পাদ্রীদের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইলেন এবং ক্রমে ক্রমে খৃষ্টধর্ম্মের আলোচনা ত্যাগ করিলেন। Sir E D. Maclagan in Journal of Asiatic Society of Bengal vol LXV p 35-45 ; Hugh Murray's "Historical Account of Discoveries & Travellers in Asia", vol I p 86-96.

বাদশা অবগত ছিলেন যে, হিন্দুদের মধ্যে অনেক সংযতচিত্ত অদ্ভুত ক্ষমতাশালী, সর্ব্বশাস্ত্রে প্রগাঢ় পণ্ডিত, অধ্যাত্মতত্ত্ববিদ ও ভবিষ্যৎকালজ্ঞ লোক আছে। Badaoni II p 256। ঈশ্বর ও মনুষ্যের পরস্পর সম্বন্ধ, পৃথিবীর সহিত মানব-জীবনের সম্বন্ধ, মানব-জীবনের চরম সার্থকতা ও শেষ পরিণতি কি প্রভৃতি বিষয় বহুদিন হইতে হিন্দুদের চিন্তার বিষয় হইয়া রহিয়াছে এবং এই সকল জটিল সমস্যার গভীর চিন্তা-প্রসূত ব্যাখ্যা তাঁহাদের ধর্ম্ম-পুস্তকে দেখিতে পাওয়া যায়। হিন্দুধর্ম্ম শোক-সন্তপ্ত চিত্তকে সান্ত্বনা দেয়, জীবের কল্যাণকামনাই হিন্দুধর্ম্মের মূলমন্ত্র। পার্থিব ভোগবিলাসকে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া হিন্দুরা একাগ্রচিত্তে ভগবানের আরাধনা করে এবং নিজের অধ্যবসায় ও গভীর চিন্তার দ্বারা ঈশ্বরের স্বরূপ উপলব্ধি করে। বাদশা হিন্দুধর্ম্মের আলোচনা করিয়া মুগ্ধ হইলেন ; এবং ধর্ম্মাচরণের চরম উদ্দেশ্য-সাধনের পক্ষে হিন্দুধর্ম্ম-প্রদর্শিত পথ সুগম মনে করিলেন।

জোরাষ্টার (Zoraster) প্রবর্ত্তিত—পারসীক ধর্ম্মের মধ্যে সূর্য্যাগ্নিপূজা বাদশার সর্ব্বাপেক্ষা মনোরম বোধ হইল। এ জন্য রাজ-সভায় দিবারাত্রি অগ্নি প্রজ্বালিত করিয়া রাখিবার জন্য, আবুল ফজলের উপর ভারার্পণ করিলেন। Bloc. Ain, p 184.

জৈন সম্প্রদায়ের গুরু হরিবিজয় সূরী, ভানুচন্দ্র উপাধ্যায় প্রভৃতির সহিত ধর্ম্মালোচনার পর "বিনা কারণে জীবহত্যা, নিবারণ" বাদশার বিবেকানুমোদিত হইল এবং উক্ত গুরুদের পরামর্শে তিনি অনেক রাজবন্দী ও পিঞ্জরাবদ্ধ পশুপক্ষী মুক্ত করিয়া দিলেন। Monserrate's "Commentaries" Translated by Hayland—Introduction p iv.

হিন্দুস্থানের সমস্ত ধর্ম্মের আলোচনা করিয়া বাদশা স্থির করিলেন যে সমস্ত ধর্ম্মের মধ্যে কোন না কোন দোষ আছে। অধিকাংশের মধ্যে অপ্রীতিকর কর্ম্মকাণ্ড ও সাম্প্রদায়িকতাই সর্ব্বস্ব। ভিন্ন ধর্ম্মের প্রতি ঔদার্য্যের এবং আন্তরিকতার অভাব। ধর্ম্মাচরণের উদ্দেশ্য অর্থাৎ আত্মার উৎকর্ষসাধনের পর অন্তরমধ্যে ভগবানের স্বরূপ উপলব্ধি করিয়া তাঁহার চরণে আত্মনিবেদন করিবার প্রকৃষ্ট উপায় তিনি অতি অল্পই দেখিলেন।

তখন বাদশা হিন্দু, জৈন ও পারসিক ধর্ম্মের মনোরম অংশগুলির সমন্বয়ে এক নূতন ধর্ম্ম (Eclectic Religion) প্রচার করিতে স্থিরসঙ্কল্প হইলেন। কিন্তু তৎপক্ষে মুসলমান সম্প্রদায়ের গুরুতর আপত্তি হইবার আশঙ্কা করিয়া সুচতুর আকবর উক্ত সম্প্রদায়ের সম্মতি লওয়া আবশ্যক মনে করিলেন। এ জন্য ১৫৭৯ খৃষ্টাব্দে সেখ মবারক-লিখিত এবং অনেক আমীর ওমরাহদের স্বাক্ষরিত এক দলিল বা স্বীকারোক্তিপত্র সম্পাদিত হইল। এই দলিলের উক্তি-মতে আকবর "ইমাম-ই-আদিল," "ঈশ্বরের প্রতিনিধি" (Akbar is God's representative—Bloc Ain p 188) প্রভৃতি আখ্যা পাইলেন অর্থাৎ রাজকীয় ধর্ম্মের একচ্ছত্র নিয়ন্তা ও "জগদ্গুরু" হইলেন। দলিলের মধ্যে প্রকাশ রহিল যে, তিনি ধর্ম্মসম্বন্ধে যখন যেরূপ আদেশ প্রচার করিবেন, তাহা অমোঘ ও অলঙ্ঘ্য সাধারণ কর্ত্তৃক গৃহীত হইবে। ইহা দ্বারা মোল্লা ও উলেমাদের ধর্ম্মসম্বন্ধে কর্ত্তৃত্ব এবং সাধারণের আপত্তি করিবার অধিকার রহিত হইল। Beveridge "Akbarnama" vol III chap XLV, Bloc Ain p 186 & 187.

১৫৮২ খৃষ্টাব্দে "জগদ্গুরু" তাঁহার "দীন-ই-ইলাহী" নামক ধর্ম্ম এবং শিষ্যদের পালনের জন্য বিধি-ব্যবস্থা প্রচার করিলেন। কিন্তু ইসলাম ধর্ম্মের প্রতি মুসলমানের জন্মগত বিশ্বাস এবং নবধর্ম্মের গূঢ় আধ্যাত্মিক ভাব "দীন-ই-ইলাহী"র প্রসারের পক্ষে অন্তরায় হইল ; ফলে শিষ্যসংখ্যা অধিক হইল না। ব্লকম্যান সাহেবের হিসাব অনুযায়ী আবুল ফজল প্রভৃতি ১৭ জন বিশিষ্ট ও সম্ভ্রান্ত মুসলমান এবং হিন্দুদের মধ্যে একমাত্র রাজা বীরবল "দীন-ই-ইলাহী" গ্রহণ করিলেন। Bloc. Ain p 198, 206 & 209 ; Badaoni II p 312, 363 & 413 তবে অর্থের লোভে কতকগুলি নিম্নশ্রেণীর লোক শিষ্যত্ব গ্রহণ করিল। "He has already some followers but only by bribing" Father Pinheiro's letter D 28th 1595 from Lahore.

দীক্ষা-প্রণালী

"দীন-ই-ইলাহী" গ্রহণের আশায় গুরুর সমীপে উপস্থিত হইলে ভাবী শিষ্য নিজের উষ্ণীষ উন্মোচন করিয়া সমস্ত

অহঙ্কারত্যাগের নিদর্শনস্বরূপ, গুরুর পাদদেশে মস্তক রক্ষা করিত। তখন গুরু শিষ্যের মস্তক উত্তোলন করিয়া দীক্ষামন্ত্র ও উষ্ণীষে ধারণ করিবার জন্ম নিজের একটি ক্ষুদ্র প্রতিমূর্তি প্রদান করিলে শিষ্য গুরুর পাদোদক পান করিত। এখন হইতে শিষ্য গুরুর জন্ম নিজের জীবন, ধন, মান ও ধর্ম্ম ত্যাগ করিতে বাধ্য রহিল। Bloc Ain p 191, 203; Badaoni II p 338

শিষ্যদের পালনের জন্ম প্রচারিত বিধিনিয়মগুলির মধ্যে কয়েকটি নিয়ে প্রদত্ত হইল।

এখন হইতে প্রচলন হইল :—

১। "হিজরী" সালের পরিবর্ত্তে "ইলাহী" সাল, চান্দ্রিক মাসের পরিবর্ত্তে সৌর মাস। আকবরের রাজ্যাভিষেকের বৎসরে মেষ রাশিতে সূর্য্যের সংক্রমণের দিন নূতন বৎসরের প্রথম দিন বলিয়া গণনা করা হইল। ১২ মাসের আরবিক নামের পরিবর্ত্তে পারসীক নাম। Bloc. Ain p 195

২। সিজ্‌দা বা রাজার সমক্ষে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম। Do p 192

৩। মদ্যপান। Do Do

৪। হিন্দুদের অনুকরণে পূজার্চ্চনাকালীন রেশমের বস্ত্রাদি ও অলঙ্কার পরিধান। Do 195

৫। সমস্ত মুসলমান ধর্ম্মোৎসবের পরিবর্ত্তে জোরাষ্টার প্রবর্ত্তিত পারসীক ধর্ম্মের ১৪টি পর্ব্ব। Do 192

৬। দিবা-রাত্রির মধ্যে ৪ বার সূর্য্যোপাসনা। Do 200

৭। পত্রাদির শীর্ষদেশে "বিশমিল্লার" পরিবর্ত্তে "আল্লাহু আকবর" লিখন। Do 203

৮। শিষ্যদের পরস্পর সাক্ষাতের সময় প্রথম ব্যক্তির "আল্লাহু আকবর" এবং দ্বিতীয় ব্যক্তির "জাল্লা জাল্লাহু" বলিয়া অভিবাদন করিবার প্রথা। Do 205

৯। "সুন্নৎ" বা অঙ্গবিশেষের ত্বক্ ছেদন দ্বাদশ বৎসর পূর্ণ হইবার পর এবং ইচ্ছাধীন। Do 207

১০। শ্মশ্রুমুণ্ডন! Do 207

এখন হইতে নিষিদ্ধ হইল

১। গোমাংস, রশুন ও পেঁয়াজ ভক্ষণ। Do p 183

২। সম্পর্কে ভগিনী ও আত্মীয়কন্যার সহিত বিবাহ। Do p 195

৩। মুসলমানের তীর্থযাত্রা ও রমজান উপবাস। Do p 195

৪। মুসলমানের দিবারাত্রির মধ্যে ৫ বার উপাসনা। Do p 198

৫। আরবিক ভাষা পাঠ, শিক্ষা ও লেখা ও আরবিক নাম ধারণ। Do p 195 & 196

৬। রবিবারে ও আকবরের জন্মমাসে জীবহত্যা। Do p 200.

"দীন-ই-ইলাহী" প্রচারের উদ্দেশ্য

ঐতিহাসিক আবুল-ফজলের মতে হিন্দুস্থানে বাস্তববাদী ও অধ্যাত্মবাদী এই দুই শ্রেণীর লোক দেখিতে পাওয়া যায়। স্বভাবতঃ তাহারা একমতাবলম্বী না হইয়া বৈরিভাবাপন্ন হয়। এরূপ অবস্থায় রাজা স্বয়ং উভয় শ্রেণীর লোকের ধর্ম্মের নিয়ন্তা হইলে সাম্য স্থাপন করিতে পারেন এবং তাহা রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য। Bloc. Ain. Introductory Remarks to Ain 77. অর্থাৎ হিন্দুস্থানের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে ধর্ম্মপার্থক্যের জন্ম পুরুষানুক্রমিক বিবাদ দূর করা এবং রাজ্যময় শান্তি স্থাপন করিয়া মোগল সাম্রাজ্য চিরস্থায়ী করা দীন-ই-ইলাহী প্রচারের উদ্দেশ্য। আবুল্ ফজল বর্ণিত মহৎ উদ্দেশ্য সফল হইল। আকবর ধর্ম্মোন্মত্ত মুসলমানের অত্যাচার দমন করিয়া দুর্ব্বল হিন্দুদের রক্ষা এবং রাজ্যময় শান্তি স্থাপন করিলেন; এবং হিন্দু মুসলমান এক-জাতীয়ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া নিজেদের শোণিতদানে ব্রহ্মপুত্র হইতে কাবুল পর্য্যন্ত আকবরের বিজয়-বৈজয়ন্তী স্থাপন করিল। কিন্তু আকবরের ধর্ম্মপ্রচার-সম্পর্কীয় কার্য্যকলাপ এবং প্রচারিত বিধিনিয়মগুলি আলোচনা করিলে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, পূর্ব্বোক্ত মহৎ উদ্দেশ্যের সহিত অন্য উদ্দেশ্য জড়িত ছিল। আলাউদ্দীনের ন্যায় নূতন ধর্ম্ম প্রচারের দ্বারা অমরত্বলাভের এবং নিজেকে ঈশ্বরের প্রতিনিধির আসনে বসাইবার আশায় দীন-ই-ইলাহী প্রচারের প্রচেষ্টা। একাধারে রাজ্যশাসক, ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক, ও দীক্ষাগুরু হওয়া, শিষ্যদের রোগ-শোক দূর ও কামনা পূরণ করিবার জন্ম নিজেদের পাদোদক পান করিতে দেওয়া, তাহাদের উষ্ণীষে নিজের প্রতিমূর্তি ধারণ করান, শিষ্যদের সিজ্‌দা বা সাষ্টাঙ্গে প্রণাম গ্রহণ, অর্থের দ্বারা বশীভূত করিয়া নিম্নশ্রেণীর লোককে দীন-ই-ইলাহী গ্রহণ করান, নিজের প্রচারিত নূতন বৎসর ও নূতন ধর্ম্ম, "ইলাহী সাল" (ঐশ্বরিক বৎসর) ও "ইলাহীদীন" (ঐশ্বরিক ধর্ম্ম) নামে অভিহিত করা, এবং সর্ব্বোপরি অতি বড় স্পর্দ্ধাব্যঞ্জক ও দ্ব্যর্থ, "আল্লাহু আকবর" (এক অর্থে "আকবরই ঈশ্বর" অন্য অর্থে "ঈশ্বর মহৎ") আকবরের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সাক্ষ্য দিতেছে।

দীন-ই-ইলাহীর সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম

ঈশ্বর এক, অশেষ শক্তি ও করুণার আধার। মানুষ নিজের বিবেক ও বিচারবুদ্ধির সাহায্যে ঈশ্বরকে ধারণা করিয়া ভক্তি সহকারে পূজা করিবে। ক্রোধ ও ঘৃণিত * ভোগবিলাসের লালসা দূর করিয়া পূর্ব্বোক্ত প্রকারে ঈশ্বরচিন্তায় আত্মনিয়োগ করা দীন-ই-ইলাহী ভক্তের কর্ত্তব্য। মানুষমাত্রেই পাপের বশীভূত, ভুল হওয়া তাহার স্বভাবগত দোষ, সুতরাং মনুষ্যনির্দ্দিষ্ট ক্রিয়ানুষ্ঠানকে প্রকৃত ধর্ম্মাচরণ বলা যায় না। সাধারণ লোক পরম ব্রহ্মের ধারণা সহজে করিতে পারে না; অতএব ধর্ম্মাচরণের প্রথম সোপানস্বরূপ ঈশ্বরের তেজঃশক্তির প্রতীক সূর্য্যাগ্নির পূজা করিবে, পরে এবং ক্রমে ক্রমে পরম ব্রহ্মের ধারণা ও উপাসনা করিবে। কতকগুলি বিধিনিয়ম পালন করিলে মনের স্থিরতা ও শান্তি আনয়নে এবং ধর্ম্মাচরণের সাহায্য করে, এ জন্ম কতকগুলি বিধিনিয়ম প্রচারিত হইল। Beveridge's "Akbar

namah" III chap. XLV; Prof. Wilson's "Collected Works" Vol II; Jarrets "Ain-i-Akbari" III p 369 & 384; Elphinstone p 536; Malleson p 163

"জগদ্‌গুরু" আকবর ধর্ম্মযাজক ও সাধারণ-পূজামন্দিরের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিতে না পারিয়া নিজ শক্তি ও প্রভাবের দ্বারা লক্ষ লক্ষ লোককে একাকী দীক্ষিত করিতে অগ্রসর হইলেন। তাঁহার মতে যুগাবতার মহম্মদের বিধিনিয়ম পরিত্যাজ্য। আকবর বলিলেন, ধর্ম্মাচরণে কর্ম্মকাণ্ডের আশ্রয় লওয়া অবিধেয়, কিন্তু নিজে সূর্য্যাগ্নিপূজাকে দীন-ই-ইলাহীর প্রধান অঙ্গস্বরূপ গ্রহণ করিয়া, কর্ম্মকাণ্ডের আশ্রয় লইলেন। নিজের বিবেক ও বিচারবুদ্ধির সাহায্যে ঈশ্বরকে ধারণা করিয়া পূজা করিবার জন্য সাধারণ লোককে ব্যবস্থা দিলেন; এরূপ ব্যবস্থাপালন ঘোর দার্শনিকের পক্ষে সম্ভব হইতে পারে, কিন্তু সাধারণ লোকের পক্ষে একেবারে অসম্ভব, ইহা বিবেচনা করিলেন না। ভক্তের হৃদয়ের ভক্তি ও বিশ্বাস সমস্ত ধর্ম্মের ভিত্তি এবং সমস্ত যুক্তিতর্কের বাহিরে, এই চিরন্তন সত্য বিস্মৃত হইয়া যুক্তি, কল্পনা ও পরামর্শের দ্বারা মুসলমানের হৃদয় হইতে সহস্র বৎসর বদ্ধমূল ইসলাম প্রভাব দূর করিয়া তাহার স্থানে দীন-ই-ইলাহী স্থাপন করিতে প্রয়াসী হইলেন এবং তাঁহার বিবেক ও বিচারবুদ্ধির অনুমোদিত বাস্তব জগতের কার্য্যবিধির দ্বারা ধর্ম্মজগতের কর্ম্মধারা নিয়ন্ত্রিত হইতে পারে না, ইহাও উপলব্ধি করিতে পারিলেন না। বাস্তবজগতে নির্ব্বাচনের দ্বারা সুফল মিলিলেও, বিভিন্নধর্ম্মের নির্ব্বাচিত অঙ্গগুলির সমন্বয়ে সৃষ্ট, নূতন ধর্ম্ম, কোন সম্প্রদায়ের হৃদয়গ্রাহী হইল না। দীন-ই-ইলাহী সম্যক্ উপলব্ধি করিতে হইলে জ্ঞানমার্গের আশ্রয় লওয়া দরকার, এ জন্য কয়েক জন মাত্র শিক্ষিত লোক তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন। "পৃথিবীর আদিযুগ হইতে ধর্ম্মপ্রচার কখনো রাজার কর্ত্তব্য হয় নাই এবং যুক্তি, কল্পনা ও পরামর্শের দ্বারা মানব-হৃদয়ে ধর্ম্মের বিকাশ হয় না" আলাউদ্দীনের প্রতি কোতোয়ালের এই উপদেশ উপেক্ষা করাতে ইতিহাস-অভিজ্ঞ ও মহাশক্তিশালী আকবরের দীর্ঘকালব্যাপী আগ্রহ ও চেষ্টা সহজেই নিষ্ফল হইল। তাঁহার ধর্ম্মজগতের কর্ম্মধারার মধ্যে যেরূপ ভুল ও অসামঞ্জস্য দেখা যায়, বোধ হয়, তাঁহার বাস্তবজগতের কোন ব্যাপারে সেরূপ দেখা যায় নাই। মুসলমান ধর্ম্মজগতে প্রথম বিপ্লবকারী আকবরের মৃত্যুর পর দীন-ই-ইলাহীর অস্তিত্ব রহিল না।

শ্রীউপেন্দ্রনাথ ঘোষ।

উৎপল

উৎপল! উৎপল!
চঞ্চল-জলতটে
নির্ম্মল, স্বচ্ছল
সাগরের উল্লাস,
ঊর্ম্মির কল্লোল,
বাতাসের আকুলতা
তোমাতেই উচ্ছল।
উৎপল!

মেঘমালা সুনিবিড়,
জ্যোৎস্নার চাঁদুনি,
সাগরের পারিজাত
খাসা তব গাউনি
চঞ্চল-বায়ু-স্নাত,
পুষ্পের রেণুকা
ঘিরি তব দশদিক
বাজে কার বেণুকা?
চন্দ্রের লীলায়িত?
আলোকরা অঞ্চল,—
কুসুমিত বনভূমি
বনদেবী চঞ্চল,
সাগরের কুলবধূ
জাগো সদা উজ্জ্বল।
উৎপল!

ইন্দ্রের বাগানের
নিদ্রিতা বেতসী
মুদ্রিত নয়নে
কারে ভাব চেতসী?
গোলাপের পাপড়ি,
চামেলীর গন্ধ
তব রূপ-ছটা হেরি
তটভূমি অন্ধ!

চপলার অস্থির
নয়নের কাঁপুনি
বর্ষার ঝটিকায়
জলদের দাপুনি,
মদনের ফুলধনু,
রাধিকার দ্বন্দ্ব,
যৌবন-গীতিকার
একখানি ছন্দ!
মেঘলা আকাশের
উন্মনা উদাসী
নিরুপম বিলাসের
কে তুমি গো রূপসী?
কে জাগিছ আলো ক'রে
বিস্তৃত জলতল—
উৎপল! উৎপল!

শ্রীশ্যামাদাস মুখোপাধ্যায় (এম এ)।

দয়াময়

(গল্প)
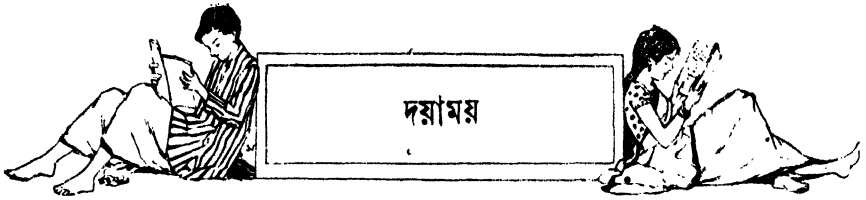
দয়াময়ের চিঠি পাইলাম—খুব ভাল সাধুর সন্ধান পাইয়াছি। শীঘ্র চলিয়া আসিবে। এ সাধুকে তোমারও ভাল লাগিবে।

দয়াময় যখন যেটাকে ধরে, তাহা শেষ না করিয়া ছাড়ে না। চাকুরীতে ঢুকিয়া সে দিন কতক এমন পড়াশুনা লইয়া পড়িল যে, তাহার খাওয়া-নাওয়ার সময় করাই দায় হইয়া উঠিল। কেহ কেহ তাহার অধ্যয়নের বাড়াবাড়ি দেখিয়া বলিত—ওটা শুধু একটা বাহাদুরী দেখান মাত্র। উহার মধ্যকার ভাবটা এই—দেখ আমি কত বেশী পড়ি; তোমরা কেহ এমন পড়িতে পার? যাহারা দয়াময়ের অন্তরঙ্গ ছিল, তাহারা জানিত, কি গভীর তাহার অধ্যয়নের পিপাসা, কি গাঢ় তাহার অনুরাগ। এক এক বিষয় লইয়া এক এক সময়ে সে পড়া সুরু করিত। সে বিষয়ে যথাসম্ভব জ্ঞান অর্জ্জন করিয়া—অন্ততঃ তাহার কৌতূহলকে চরিতার্থ করিয়া তবে সে অন্য বিষয় গ্রহণ করিত। সাহিত্যে ছোট গল্প, কবিতা, উপন্যাস, প্রবন্ধ, নাটক, সমালোচনা কোন জিনিষ সে বাদ দিত না। তাহার স্বল্প আয় হইতে যতগুলি মাসিক পত্র সম্ভব, ততগুলি সে কিনিত। বাকিগুলি বিভিন্ন লাইব্রেরীতে গিয়া পড়িত। প্রত্যেক মাসে বেতনের কিছু অংশের বহি না কিনিলে তাহার তৃপ্তি হইত না।

কিছুদিন সে থিয়েটার লইয়া পড়িয়াছিল। সে সময়ে তাহার থিয়েটারে অধ্যবসায় দেখিয়া সবাই অবাক্ হইয়া যাইত। যে নাটকের অভিনয় হইবার কথা ছিল, তখন কলিকাতার ষ্টেজে তাহার অভিনয় চলিতেছিল। অন্ততঃ ৫।৬ বার সে অভিনয় দয়াময় নিবিষ্ট-চিত্তে দেখিয়া তবে আপনার ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিল। ইহার পূর্ব্বেই বিলাতী ষ্টেজ-সংক্রান্ত ২।৩ খানি বই সে পড়িয়া ফেলিয়াছিল। যে রাত্রিতে আমাদের গ্রামে সে অভিনয় হইয়াছিল, সে রাত্রিতে যাহারা অভিনয় কিছু বুঝিত, তাহারা একবাক্যে বলিয়াছিল, এমন অভিনয় তাহারা কলিকাতার ষ্টেজেও খুব কম দেখিয়াছে। সত্যই সে রাত্রিতে চন্দ্রগুপ্তের অভিনয়ে তাহার চাণক্যের ভূমিকা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইয়াছিল। তার পর বৎসর দুই কি বিক্রম ও উৎসাহে তাহার অভিনয় চলিয়াছিল। তাহার পর সে পথ একেবারে ছাড়িয়া দিল। কেহ কখন ধরিয়া বসিলে বলিত—বড় আর্টিফিসিয়াল (অস্বাভাবিক); আর ভাল লাগে না।

কিছুকাল স্বদেশী হইয়া এমন কার্য্য করিয়াছিল যে, তাহার সঙ্গে রাস্তাঘাটে দেখা করা দায় হইয়াছিল; ভয় হইত, পুলিস ইহা লক্ষ্য করিতেছে কি না। সমস্ত বিদেশী দ্রব্য ও বিদেশী প্রথা বর্জ্জন করিয়া সে একেবারে খাঁটি স্বদেশী হইয়া পড়িয়াছিল। সিগারেট ছাড়িয়া বিড়ি, সাবানের বদলে বেসম ও দুধের সর, চিনির যায়গায় গুড় ইত্যাদি ব্যবহার করিয়া সে নেতাদেরও ছাড়াইয়া গেল। এই সময়ে বড় বড় বক্তাদের সঙ্গে সভাসমিতিতেও ছুটিতে লাগিল; পরিশেষে বিলাতী মার্চ্চেণ্টের আফিসের বেশী মাহিনার কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া দেশী মার্চ্চেণ্টের আফিসে কম মাহিনায় কায লইল। অবশ্য কায ছাড়িয়া সে ভালই করিয়াছিল, কারণ, আপনি কায না ছাড়িলে সাহেবরাই তাহাকে ছাড়াইয়া দিত। এক দিন আবার স্বদেশীও ত্যাগ করিল। কারণ, জিজ্ঞাসা করিলে বলিল, নেতারা সব ইনসিনসিয়র।

শেষটা দয়াময় এইবার ধর্ম্ম লইয়া পড়িয়াছে। সাধু-সন্ন্যাসীর নাম শুনিলে সে এখন উন্মত্তের মত সেখানে ছুটিয়া যায়। অন্ধের মত কিছুদিন তাহাকে অনুসরণ করে; তার পর যদি সেই সন্ন্যাসীর একটা বড় রকমের ত্রুটি বা লোভ তাহার অর্দ্ধনিমীলিত চক্ষুর সম্মুখে পড়িয়া যায়, সে দিন হইতে সেই সাধুর সঙ্গ সে বিষবৎ পরিত্যাগ করে। কিন্তু এইটুকুতেই তাহার শরীরের ও মনের মধ্যে যে বিপ্লব ঘটিয়া যায়, তাহাতে কিছুকাল তাহাকে ক্লিষ্ট, পরিশ্রান্ত ও নিষ্ক্রিয় করিয়া রাখে। তার পর যে দিন সে তাহার 'শোকশয্যা'

ত্যাগ করিয়া বাহিরে আসে, তাহাকে দেখিলে মনে হয়, যেন ছয় মাসের রোগশয্যা ছাড়িয়া সে আজই সদ্য উঠিয়া আসিতেছে। কয়েক মাস আগে সে এমনি এক সাধুর হাতে পড়িয়াছিল—যাহার মোহপাশ হইতে অব্যাহতি পাইয়া এক পক্ষকাল তাহাকে প্রায় 'রোগশয্যা' গ্রহণ করিতে হইয়াছিল।

দয়াময়ের পত্র পাইয়া বুঝিলাম, সে আবার এক 'সাধুর' সাক্ষাৎ পাইয়াছে—যাহাতে পূর্ব্ব-হতাশার আঘাত সে সামলাইয়া লইয়াছে। কিন্তু কদিনের জন্য? এক দিন এমন আঘাত আসিবে—যাহা সামলাইতে তাহাকে প্রাণান্ত শক্তির নিয়োগ করিতে হইবে।

ভবিষ্যতে যাহাই হউক, পত্র পাইয়া দেরী করিতে পারিলাম না। সন্ধ্যার ট্রেণেই কলিকাতা আসিলাম। দেখিলাম, প্ল্যাটফরমে দয়াময় দাঁড়াইয়া। কিন্তু একবারে নূতন বেশ। পরনে সাদা ধুতি, গায়ে একখানা মোটা দেশী চাদর, খালি পা, মুখে চুরুট নাই। তাহার চেহারায় এমন একটা বিশেষত্ব ছিল যে, এই বেশেও তাহাকে সুন্দর দেখাইতেছিল। তাহার খালি পা দেখিয়া মনে হইল সুদৃশ্য, সুকোমল ও মসৃণ জুতা স্বেচ্ছায় ফেলিয়া দিয়া সে যেন কোন এক মহৎ কার্য্য করিবার জন্য সোৎসাহে দাঁড়াইয়া আছে। মোটা চাদরে আবৃত তাহার দীর্ঘ, শীর্ণ, অথচ বলিষ্ঠ দেহের দিকে চাহিলেই মনে হয়, যেন ঐ স্থূল কর্কশ-বস্ত্রের অন্তরালে সে রাজবেশ লুকাইয়া রাখিয়াছে। যে সব কথা তখন মনে হইয়াছিল, সে সব বলিবার তখন অবসর ছিল না। যেমন কাছে আসিয়া দাঁড়াইলাম, দয়াময় হাত বাড়াইয়া আমার হাত ধরিল। দুই জনে হাত ধরাধরি করিয়া জনস্রোতে মিশিয়া বাহিরে রাজপথে আসিয়া দাঁড়াইলাম। একবার জিজ্ঞাসা করিলাম, তুমি কি ক'রে জানলে আমি এই ট্রেণেই আসব? সে সংক্ষেপে বলিল—মন বলছিল।

এই ট্রেণে যদি আমি না আসিতাম, তাহা হইলে সে যে ঐ একই স্থানে দাঁড়াইয়া ট্রেণের পর ট্রেণ অক্লান্ত ধৈর্য্যের সহিত লক্ষ্য করিয়া যাইত, তাহা আমরা দুই জনেই জানিলেও কেহ সে কথার উল্লেখ করিলাম না। তার পর নীরবে দয়াময়ের মেসে আসিয়া পৌঁছিলাম।

২

মেসে সবাই দয়াময়কে একটু সম্ভ্রমের দৃষ্টিতে দেখে। আমি দয়াময়ের বন্ধু, সেজন্য আপনা হইতেই আমার আহারের আয়োজনে একটু পারিপাট্যই হইতেছিল বলিয়া মনে হইল। অবশ্য দয়াময়ের সেজন্য কোন ব্যস্ততাই ছিল না। আহারের সময় কিন্তু যাহা দেখিলাম, তাহা আজ পর্য্যন্ত কোন দিন দেখি নাই। যতবার দয়াময়ের মেসে আসিয়াছি, উভয়ে পাশাপাশি বসিয়া খাইয়াছি, এবং তাহাতে অতুল আনন্দও পাইয়াছি। আজ সে আমাকে আহারের স্থানে ডাকিয়া আনিয়া আমাকে আসনে বসাইয়া কাছে দাঁড়াইয়া রহিল।

আমি সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলাম—"তুমি খাবে না?"

দয়াময় কিছু না বলিতেই—তাহার মেসের এক বন্ধু বলিল, "আপনি বুঝি শোনেন নি, দয়াময় হবিষ্যান্ন ধরেছে?"

আর এক জন বলিল, "এবং তাও স্বপাক।"

আমি সত্যই বিস্মিত হইলাম। দয়াময়ের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "সত্যি?"

সে একবার শুধু ম্লান হাসি হাসিল।

দয়াময়ের এ হাসি আমি খুব চিনি। এ তাহার বেদনার হাসি। বুঝিলাম, কোথাও সে একটা বড় রকমের ঘা খাইয়াছে, তাহাই ভুলিবার জন্য এই চেষ্টা ও আয়োজন। তাহার ধর্ম্মপিপাসা কিছুদিন হইতে তীব্রভাবে জাগিয়াছে, তাহা আমি জানিতাম; তাহারই টানে সে সাধু-সন্ন্যাসীর পিছনে ফিরিতেছে, ধর্ম্মসভায় ঘুরিতেছে ও কীর্ত্তনাদি শুনিতেছে, ইহাও শুনিয়াছি। কিন্তু কোন দিন ধর্ম্ম লইয়া তাহাকে কৃচ্ছ্রসাধন করিতে দেখি নাই। ইহার মূলে নিশ্চয়ই কোন গূঢ় বেদনা প্রচ্ছন্ন আছে, তাহাতে আমার কোন সন্দেহ রহিল না। সে অভুক্ত দাঁড়াইয়া থাকিবে, আর আমি রসনার প্রচুর তৃপ্তিসাধন করিব, ইহা আমার সহ্য হইতেছিল না। প্রথমটা স্থির করিয়াই ফেলিয়াছিলাম—রাগ করিয়া উঠিয়া পড়িব। জিজ্ঞাসা করিলে বলিব, আমিও ধর্ম্ম করিতে জানি। কিন্তু তাহার মুখে সেই বেদনাবিদ্ধ ম্লান হাসি দেখিয়া আমার মুখে অভিমানের কোন কথাই আসিল না। তাই বিনা বাক্যব্যয়ে কোনমতে আহার সারিয়া লইতে লাগিলাম। হয় ত বা একটা নিশ্বাস জোরে পড়িয়া থাকিবে, মুখের ভাবে মনের ভাবের কিয়দংশ

প্রকাশিত হইয়া থাকিবে। হঠাৎ দেখিলাম, সে আমার পাশে বসিয়া পড়িয়া আমার কাঁধের উপর নীরবে তাহার দক্ষিণ হস্ত রাখিল। তাহার মনের ভাব বুঝিতে আমার বিলম্ব হইল না। একবার মুখ তুলিয়া চাহিতে দেখিলাম, চশমার অন্তরালে তাহার আয়ত দীপ্ত চক্ষুর্দ্বয়ে দুই বিন্দু অশ্রু টলটল করিতেছে। তাহার হাতের মৃদুস্পর্শ, চক্ষুতে সেই অশ্রুবিন্দুর অস্তিত্ব আমার কণ্ঠ ক্ষণেকের জন্য অশ্রুবাষ্পজালে রোধ করিয়া দিল। দয়াময়েরই জয় হইল। তাহাকে অভুক্ত রাখিয়াও অভিমান ত্যাগ করিয়া আমি আহার সমাধা করিয়া উঠিয়া পড়িলাম। তথাপি এত দিন পরে আসিয়া একসঙ্গে খাইবার আনন্দ হইতে বঞ্চিত হওয়ার দুঃখ ভুলিতে পারিলাম না। হাত-মুখ ধুইয়া একসঙ্গে তাহার কক্ষে ফিরিয়া আসিলাম।

শয্যায় বসিয়া দয়াময়কে জিজ্ঞাসা করিলাম, "তুমি কি খাবে?"

"মিষ্টি খেয়ে জল খাব।"

"কি মিষ্টি?"

"আখের গুড়।"

"ভাল, কিন্তু আমাকে এ সব কথা বলা উচিত ছিল।"

"বল্‌লে আস্‌তে না?"

"হয় ত।"

"তা হলেই কি শান্তি পেতে?"

"হয় ত পেতাম না, কিন্তু এ দুঃখও সইতে হ'ত না।"

"দুঃখ ক'রো না।"

"আচ্ছা, এর কারণ কি, দয়াময়? এই শীতের রাতে তোমার খালি গা, খালি পা, অনাহার। এর মানে কি?"

"বল্‌ছি সব।"

দয়াময় উঠিয়া একটা মাটীর পাত্র হইতে খানিকটা আকের গুড় মুখে দিয়া এক গেলাস জল পান করিয়া ফিরিয়া আসিল। পরে বলিল, "তোমার কথাই ঠিক, শচীন।"

"কি কথা?"

"স্বামীজীর মধ্যে আড়ম্বরই বেশী।"

এতক্ষণে বুঝিলাম, কোথায় তাহার ব্যথা।

মনে আসিল অনেক কথা। বলিতে ইচ্ছা হইয়াছিল, তবু ভাল যে এত দিনে চোখ খুলেছে। যে আলেয়ার পিছে এত দিন ঘুরে বেড়াচ্ছিলে, তার যে সমাপ্তি হয়েছে, এই মঙ্গল।

কিন্তু তাহার মুখের দিকে চাহিয়া, তাহার কণ্ঠস্বর শুনিয়া মনের কথা আর মুখ দিয়া বাহির করিতে পারিলাম না। যে স্বামীজীর রূপ, গুণ, বাগ্মিতা, শিষ্যগণের উপর অসীম প্রভাব, যাহার তথাকথিত বদান্যতা ও ত্যাগ তাহার গর্ব্বের বিষয় ছিল, তাঁহার সম্বন্ধে এই কথা যে কি কষ্টে ও কি লজ্জায় তাহার মুখ দিয়া বাহির হইয়াছে, ইহা বুঝিয়া আমি স্তব্ধ হইয়া গেলাম।

কিছুক্ষণ পরে দয়াময় আবার বলিল, "এক জন সাধুর সম্প্রতি সাক্ষাৎ পেয়েছি, তাঁর নাম অনাথ দাস। আমরা সবাই অনাথদা ব'লে ডাকি। আমার বিশ্বাস, তাঁকে দেখে তুমি সুখী হবে। কাল ছুটী, সকালে তাঁর কাছে নিয়ে যাব। পরমানন্দ স্বামী সম্বন্ধে তুমি আমাকে মাঝে মাঝে সাবধান করাতে আমি তোমার উপর অনেকবার রাগ করেছি। তুমি আমার সে দোষ নিও না।"

দয়াময়ের স্বর গাঢ়। তাহাতে বেদনা ও অনুতাপের ভাব সুস্পষ্ট।

আমি বলিলাম, "ও কথা ভুলে যাও। সব ভুলে, এস আবার ছেলেবেলার মত ঘুমিয়ে পড়ি।"

আলো নিভাইয়া দয়াময় শুইয়া পড়িল।

যে বিষয় লইয়া দয়াময় এই কথা বলিতেছে, তাহা আমার মনে গভীরভাবে অঙ্কিত ছিল। ভবানীপুরে পরমানন্দ স্বামীর ওখানে দয়াময়ের সঙ্গে গিয়াছি। গিয়া দেখি, সম্মুখের ঘরে এক ঘর লোক বোঝাই। সবাই নীচে মেঝের উপর বসিয়া। কেবল অতি সুদৃশ্য পালঙ্কে গৈরিক বর্ণের রেশমী বস্ত্রাবৃত সুকোমল শয্যার উপর স্বামী পরমানন্দ সুখে উপবিষ্ট। মস্তকে কুঞ্চিত দীর্ঘ কেশভার। গোঁফ-দাড়ি অতি সুন্দরভাবে কামানো। মুখে কখনও করুণ গাম্ভীর্য্য, কখনও মৃদু হাসি অনুগত ভৃত্যের মত খেলিয়া যাইতেছে। নানাজনে নানাবিধ বিষয়ে তাঁহার মত চাহিতেছে। তিনি সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার মত দিয়া যাইতেছেন। যেন সমস্ত প্রশ্নই তিনি পূর্ব্ব হইতে জানিতেন এবং পূর্ব্ব হইতেই তাহার সমাধান করিয়া রাখিয়াছিলেন। ইমার্শন স্বাধীন চিন্তা সম্বন্ধে কি বলেন, শঙ্করাচার্য্যের মধ্যে কতখানি বিজীগিষা ও কতখানি সত্যকার ধর্ম্মতৃষ্ণা ছিল, হইতে সুরু করিয়া কোন রেসে কোন

ঘোড়াটির জিতিবার সম্ভাবনা ইত্যাদি কোন প্রশ্ন বা আলোচনা বাদ যাইতেছিল না।

পাশের ঘরে হাসির টুকরা ও শ্রুতিমধুর কথার স্রোতে বুঝা যাইতেছিল, মহিলারা ঐ কক্ষ আলো করিয়া আছেন। পরমানন্দ মাঝে মাঝে ঐ ঘরে যাইতেছেন ও তাঁহার অমৃতোপদেশ পরিবেষণ করিয়া আসিতেছেন। দয়াময় আসিতেই তিনি হাসিয়া তাহাকে অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন ও কিছুক্ষণ কেবল তাহার সঙ্গেই কথা কহিয়াছিলেন। ভক্তদের মধ্যে অনেকে যে তাহাকে বেশ ঈর্ষা করে, তাহা বুঝিতে আমার বিলম্ব হইল না। তার পর শীঘ্র শীঘ্র পট পরিবর্ত্তিত হইতে লাগিল। পেয়ালা পেয়ালা চা আসিল। রেকাবিতে করিয়া নতির বড়া আসিল। শুনিলাম, ইহা স্বামীজীর প্রিয় খাদ্য: সেজন্য ভক্তদেরও প্রিয়। স্বামীজীও পালঙ্কে বসিয়া শ্বেতপাথরের পেয়ালায় চা ও সুচিক্কণ কাল পাথরের রেকাবিতে তাঁহার প্রিয় খাদ্য সেবন করিলেন। ভক্তরা সবাই শ্রদ্ধা ও আদর করিয়া খাইলেন; কারণ, উহা শ্রীমা নিজ হস্তে তৈয়ারী করেন।

আমার সঙ্গেও স্বামীজী দুই চারিটি স্নেহাবৃত কথাবার্ত্তা কহিলেন। কথাগুলি এই ভাবের "তুমি দয়াময়ের বন্ধু, কাযেই আমাদের বন্ধু ও স্নেহের পাত্র। তোমাকে এই ঘরে যেন অনেক দিন ধ'রে আশা করেছিলাম। আজ তোমাকে পেয়ে সুখী হলাম। দয়াময়, এঁকে মাঝে মাঝে আনবে। এঁর মন এখনও তরঙ্গের উপর ভাসছে। একটু তলিয়ে যাওয়ার প্রয়োজন।"

দয়াময় ব্যতীত প্রায় সবাই আমার দিকে অনুকম্পাভরে চাহিল। চাহনিটা এই ভাবের যে, তাহারা সবাই বহুপূর্ব্বে হইতেই একবারে অথই জলে তলাইয়া গিয়াছে আর আমি এখনও ভাসিতেছি, এতখানি গাঢ় অনুকম্পা আমি আর সহিতে পারিলাম না। বলিলাম, "আশীর্ব্বাদ করুন, ভগবান্ যেন আমাকে সংসারে এই রকম ভাসাইয়াই রাখিয়া দেন। যেন কোন দিন তলাইয়া না যাইতে হয়।"

সকলেরই মুখে অনেকখানি অসহিষ্ণুতার ভাব ফুটিয়া উঠিল। দয়াময় একটু যেন কুণ্ঠিত হইয়া পড়িল—যাহা তাহার স্বভাবের সঙ্গে মোটেই খাপ খাইত না। "মায়ের সঙ্গে দেখা ক'রে আসি" বলিয়া সে একবার ভিতরে চলিয়া গেল। একটু পরে ফিরিয়া আসিল। দেখিলাম, মুখে সে একটা পাণ চিবাইতেছে, হাতেও কয়েকটা পাণ আছে। বুঝিলাম, মায়ের ডিপার্টমেণ্টে পাণও আছে। দয়াময় সে দিন হয় ত আমাকে বেশীক্ষণ রাখা নিরাপদ মনে করিল না; তাই স্বামীজীকে প্রণাম করিয়া উঠিয়া পড়িল। আমিও উঠিলাম —মাটীতে মাথা রাখিয়া প্রণাম করিয়া নহে, হাত তুলিয়া নমস্কার করিয়া।

রাস্তায় আসিয়াই দয়াময় বলিল, "তোমাকে না আনাই উচিত ছিল এখানে।"

আমি বলিলাম, 'সত্যি সত্যিই তাই।"

"মাথা নীচু ক'রে একটা প্রণাম করলে কি ক্ষতি হ'ত, শচীন?"

"ক্ষতি এই হ'ত যে, অনর্থক জোর ক'রে মাথাটাকে পীড়া দিতে হ'ত।"

"তার মানে?"

"কাকে প্রণাম করব? যা দেখে এলাম, সে ত শুধু বাহিরের জিনিষ, শুধু আড়ম্বর, শুধুই ভাবের ও ব্যবহারের বিলাসিতা।"

"বিলাসিতা?"—তীক্ষ্ণ কণ্ঠে দয়াময় কহিল।

"নয় ত কি? নরম বিছানায় চিকণ রেশমী চাদর, বালিসে ঝালর দেওয়া রেশমী ওয়াড়। অন্দরে পাণের ব্যবস্থা, তায় আবার জরদা দেওয়া। মাছ-মাংসও আছে তুমি বলো; কারণ, স্বামীজী না খেলে শ্রীমা খাবেন না। তোমার বিচারশীল মন কি ক'রে যে এ সব নির্ব্বিচারে গ্রহণ ক'রে নিল, তা আমি ভেবে পাইনে।"

মুহূর্ত্তে দয়াময় যেন আগুন হইয়া উঠিল। কঠিন স্বরে বলিল, "শচীন, গুরুর নিন্দা করো না। আজ থেকে তোমার আমার পথ একেবারে ভিন্ন। বুঝলে?"

"খুব" বলিয়া ভিন্ন পথই ধরিলাম। বরাবর শিয়ালদহ আসিয়া বাড়ী ফিরিবার গাড়ীতে উঠিয়া বসিলাম।

তার পর কলিকাতা আসিলেও বহু দিন দয়াময়ের সঙ্গে দেখা করি নাই। শেষে দয়াময়ের মা ও স্ত্রীর অনুরোধে বহু দিন পরে একবার আসি। কারণ, ধর্ম্মের বন্যায় তাহার মাহিনার টাকাকড়ি কোথায় ভাসিয়া গিয়াছিল এবং কয়েক মাস বাড়ীতে খরচ পর্য্যন্ত পাঠাইতে ভুলিয়াছিল। আসিয়াছি, টাকা লইয়াই চলিয়া গিয়াছি। ধর্ম্মচর্চ্চা করি নাই, তাহার আতিথ্যও লই নাই।

তার পরে বহু দিন পরে এই ভাবে আবার দুজনের সাক্ষাৎ।

ভাবিতে ভাবিতে কখন্ ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম, মনে নাই। ঘরের আলো নিভানো, রাজপথের দূরস্থিত আলোকের স্নিগ্ধ রশ্মি খোলা জানালা দিয়া আসিয়া ম্লান জ্যোৎস্নার মত ঘরটাকে ভরিয়া দিয়াছিল, কেবল এইটুকু মনে ছিল।

যখন জাগিলাম, দেখি দয়াময়—যে অত বেলায় উঠিত, কখন্ উঠিয়া স্নান পর্য্যন্ত সারিয়া কুশাসনে বসিয়া জপ করিতেছে।

৩

না জানি আবার কি ভাবের সাধুর কাছে লইয়া যাইবে, ভাবিতে ভাবিতে দয়াময়ের সঙ্গে চলিতেছিলাম। হ্যারিসন রোড্ ছাড়িয়া কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট ধরিয়া চলিতে চলিতে একটি গেটযুক্ত সুবৃহৎ অট্টালিকার সম্মুখে ক্ষণেকের জন্য দাঁড়াইয়া দয়াময় বলিল, এই হচ্ছে অনাথদাদের বাড়ী। ওঁর ভাইরা এখন এই বাড়ীর অধিকারী। বাড়ীটার দিকে একবার চাহিয়া দেখিলাম। সুন্দর বিশাল অট্টালিকা। ধনীর বিলাসগৃহ। সম্মুখে সুরচিত পুষ্পোদ্যান। দুই পাশে দুটি বিদেশী তালীকুঞ্জ। মাঝখানে কৃত্রিম ফোয়ারা হইতে অবিশ্রান্ত জল ঝরিয়া পড়িতেছে। নীচেকার সুপ্রশস্ত বারান্দায় দুটি মর্ম্মরনির্ম্মিতা অর্দ্ধনগ্না রূপসী তাহাদের অর্দ্ধ-নিমীলিত নেত্রে কটাক্ষ ভরিয়া কত কাল ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছে, কে জানে! ভাবিলাম, সত্যই যদি এই সব ছাড়িয়া গৃহস্বামী গিয়া থাকেন, হয় ত তাহা ধর্ম্মেরই সন্ধানে হইয়া থাকিবে। আর এ ত কেবল বাহিরের ঐশ্বর্য্য। হয় ত অন্তঃপুরে এখনও তাঁহার জন্য গভীরতর ঐশ্বর্য্য ব্যর্থপ্রতীক্ষার দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া কক্ষের পাষাণতল ক্লিষ্ট করিতেছে।

সে অট্টালিকা পিছনে ফেলিয়া অনেকখানি চলিয়া আসিলাম। অন্যপথ ধরিলাম। এইরূপে ঘুরিয়া ফিরিয়া একটা খোলার বস্তির মধ্যে পৌঁছিলাম। দুই একটি খোলার ঘর পার হইয়া একটি দুয়ারের কড়া নাড়িয়া দয়াময় ডাকিল—অনাথদা!

ভিতর হইতে কে বলিল, এই যে যাই। সঙ্গে সঙ্গে ভিতর হইতে দুয়ার খুলিয়া গেল। আগে দয়াময়, পিছনে আমি ভিতরে প্রবেশ করিলাম। সম্মুখে দেখিলাম, এক মহিলা—যাঁহার আকৃতি হইতে বয়স ঠিক অনুমান করা কঠিন, অনুমান করিয়া চেষ্টা করিতে গেলে মনে হয় ২৫ হইতে ৩৫ বৎসরের মধ্যে হইতে পারে। হয় ত বা কিছু বেশীই হইবে। কিন্তু দেখিলে তাহা মনে হয় না। মুখের পানে চাহিতেই মনে পড়িয়া গেল—বহুদিন আগেকার দেখা আমাদের পাড়ার জগদ্ধাত্রী-প্রতিমা। দীপ্ত তপ্ত কাঞ্চনের মত বর্ণ, ভাস্কর-ক্ষোদিত অপূর্ব্ব সুন্দর মুখমণ্ডল শক্তি ও স্নেহে উদ্ভাসিত। পরনে গেরুয়া রঙ্গের লাল পাড় সাড়ী, চরণদ্বয় অলক্তক-রঞ্জিত। ইহার বেশী তখন আর কিছু লক্ষ্য করিতে পারি নাই। দয়াময় প্রণাম করিল। আমি ইতস্ততঃ করিতেছিলাম প্রণাম করিব কি না; কিন্তু বিচার করিয়া কর্ত্তব্য স্থির করিবার পূর্ব্বে আমার শির আপনা হইতে তাঁহার চরণে নত হইয়া পড়িয়াছিল।

দয়াময় জিজ্ঞাসা করিল, "দাদা কোথায়?"

তিনি বলিলেন, চরকা কাট্‌ছেন। বলিয়া আগাইয়া চলিলেন। ক্ষুদ্র অঙ্গন। গোময়-লিপ্ত, মসৃণ ও সুন্দররূপে মার্জ্জিত। প্রাঙ্গণের মাঝখানে একখণ্ড গোলাকার তৃণাস্তীর্ণ ভূমি। দেখিলেই মনে হয়, বহু যত্ন করিয়া তৃণগুলিকে রোপণ করিয়া বাঁচাইয়া রাখিতে হইয়াছে। তাহার মধ্যস্থলে একটি অনুচ্চ তুলসীমঞ্চ। এই তৃণসমাচ্ছন্ন ভূমিখণ্ড ঘিরিয়া কয়েকটি ফুলের গাছ—বেলা, চামেলি, যূঁই ও রজনীগন্ধা। দুই পাশে দুটি শ্বেতকরবীর ঝাড়। বারান্দায় উঠিতে দেখিলাম, দুই পাশে দুটি লতা—মালতী ও মাধবী সেই খাপরার চালে উঠিয়া স্থানটিকে অনেকটা কুঞ্জবনের আকার দিয়াছে। লতাবিতানের এক দিকে রক্তবর্ণ মালতী, অপর দিকে শুভ্র মাধবীর গুচ্ছ সুশোভিত। আমরা কক্ষে প্রবেশ করিলাম।

খালি মেঝের উপর বসিয়া যিনি চরকা কাটিতে-ছিলেন, তিনি একহারা শ্যামবর্ণ মধ্যাকৃতি পুরুষ। গুম্ফ-শ্মশ্রু মুণ্ডিত। মাথার চুল অতি ছোট করিয়া ছাঁটা। পরনে একখানি কম বহরের মোটা থান;—বোধ হয়, আট হাতি হইবে। প্রথম দর্শনে একটু হতাশই হইলাম। ইনিই সাধু! একবারে বিশেষত্ববর্জ্জিত। পরমানন্দের তবু চেহারাটা ছিল।

আমাদিগকে কক্ষে প্রবেশ করিতে দেখিয়া তিনি মুখ তুলিয়া বলিলেন, "আমার কাম হয়ে গেল ব'লে। আর দু মিনিট।"

বলিয়া তিনি ক্ষিপ্রহস্তে চরকা চালাইতে লাগিলেন। আমরা তাঁহার পাশে বসিয়া তাঁহার চরকা চালানো দেখিতে লাগিলাম। ঠিক দু মিনিট হইতেই তিনি তুলার পাঁজগুলি ও চরকাটি একটি জলচৌকির উপর উঠাইলেন ও জলচৌকিটি ঘরের এক কোণে সরাইয়া রাখিলেন। তার পর আমাদের পানে চাহিয়া বলিলেন, "তোমরা মাটীতে বসলে! অন্তত পাটিটা অর্থাৎ তৃণাসনটা নিয়ে ব'স। নইলে যে গৃহস্থের দুর্নাম হবে, দয়াময়!" বলিয়া মৃদু হাসিলেন।

আমি একটি বিষয় লক্ষ্য করিয়া বিস্মিত হইলাম। এই সর্ব্বপ্রকার বিশেষত্ববর্জ্জিত মানুষটি হাসিবামাত্র মনে হইল, যিনি এতক্ষণ একমনে চরকা কাটিতেছিলেন, ইনি সে লোক যেন নন। মৃদু হাসিবামাত্র তাঁহার মুখমণ্ডলে এক অসাধারণ মৈত্রীভাব ফুটিয়া উঠিল। লক্ষ্য করিলাম, কথা কহিতে গেলেই ইঁহার চক্ষুতে এক অপার্থিব দীপ্তি খেলিয়া যায়।

তিনি এবার আমার দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "এত দিনে তুমি এলে, শচীন! তুমি আসছ আসছ ক'রে দয়াময় বড়ই ব্যস্ত হয়ে উঠেছিল।"

দয়াময় একটু লজ্জা পাইল। কিছু বলিল না।

আমি বলিলাম, "আমি কাল রাত্রে এসেছি।"

তিনি বলিলেন, "তুমি হয় ত ভাবছ, আমি তোমাকে চিন্‌লাম কি ক'রে? আমি কিন্তু তোমাকে অত্যন্ত চিনি। তোমার বাড়ীর চৌহদ্দী বল্‌তে পারি,—তুমি যে ঘরে ব'সে পড়, তার বিবরণ জানি। কবে তোমাদের ছেলের স্কুল খুলবে, এর আগে তুমি কোথায় কায করতে, কিছুই আমার অজানা নেই। দয়াময় তোমায় যেমন জানে, আমিও প্রায় তেমনি জানি।"

বুঝিলাম, দয়াময় আমার সম্বন্ধে যাহা কিছু বলিবার, বন্ধুত্বের মর্য্যাদা রাখিয়া সব কথাই সে বলিয়াছে। তথাপি আমি বিস্মিত না হইয়া পারিলাম না। বিস্ময়ের কারণ এ নহে যে, আমার মত লোকের জীবনচরিতের উপকরণ তিনি অল্প আয়াসেই সংগ্রহ করিয়া লইয়াছেন। ইহার কারণ অন্তবিধ। ইঁহার কথার সুরে এমন একটি অকৃত্রিম আত্মীয়তা মাখানো আছে—যাহাতে মন মুগ্ধ না হইয়া পারে না। হঠাৎ তিনি মহিলাটির দিকে চাহিয়া বলিলেন, "কই, আমাকে খেতে দিলে না? আমার যে প্রচুর ক্ষুধা আজ।"

দয়াময় তৎক্ষণাৎ বলিল, "আমারও প্রচুর ক্ষুধা। কিছুই খেয়ে বেরুই নি আজ।"

তিনি বলিলেন, "এবং শচীনকেও দিও। তাতে লজ্জা কি? যা দয়াময়কে দিতে পার, শচীনকেও তা দিতে বাধা নেই।"

একটু পরেই তিনি তিনটি মাঝারি পাথরের বাটিতে আধ বাটি করিয়া ভিজা ছোলা আনিয়া সকলের সম্মুখে রাখিয়া দিলেন। তাহার পর এক গ্লাস করিয়া জল আসিল।

আমি চাহিয়া দেখিলাম—অনাথদার বাটিতে সুধুই ভিজা ছোলা, আমাদের বাটিতে ছোলার সঙ্গে কয়েকটি করিয়া চীনাবাদাম দেওয়া।

অনাথ দাদা বেশ রুচিসহকারে ছোলাভিজাগুলি খাইতে লাগিলেন। দয়াময় বলিল, "দিদি, খানকয়েক বাতাসা দিন; সুধু ছোলাভিজাতে মিষ্টিমুখ হয় না।" দিদি একটি ছোট হাঁড়ির ঢাকনা খুলিয়া খানকয়েক বাতাসা আনিয়া দয়াময়কে দিলেন। আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমাকে দেব, ভাই?"

আমি বলিলাম, "আ-দিন্।"

আমার বাটিতে দিদি কয়খানা বাতাসা দিতে যাইবেন, এমন সময় দয়াময় হাত পাতিয়া তাহা অর্দ্ধপথে অধিকার করিয়া বলিল, "ও মিষ্টি ভালবাসে না, দিদি। এ কটা আমিই নিলাম।"

দিদি প্রসন্ন হাস্যে দয়াময়কে ক্ষমা করিয়া আমার জন্য আর কয়েকখানি বাতাসা আনিয়া দিলেন।

বুঝিলাম, দয়াময় এখানে অনেকখানি সান্ত্বনা পাইয়াছে। চাহিয়া দেখিলাম, অনাথ দাদা ইহারই মধ্যে ছোলাভিজা-গুলি শেষ করিয়া পরম পরিতোষ সহকারে একপাত্র জল পান করিয়া লইলেন।

আমি বাতাসা সংযোগে ভিজাছোলা চর্ব্বণ করিতে করিতে ঘরটির মধ্যে ভাল করিয়া দৃষ্টিপাত করিলাম। একখানি মাত্র ঘর। তাহাতেই সংসারের সব জিনিষপত্র যথাসম্ভব গুছানো।

স্বল্প আসবাবপত্র। দুখানি চৌকি পাশাপাশি করিয়া পাতা। শয্যার মধ্যে সম্বল কম্বল ও চাদর। ঘরের এক কোণে দুইগাছি দড়ি টাঙ্গানো। তাহাতেই দুই জনের বস্ত্রাদি থাকে। চৌকি অনেকটা উঁচু। তাহার নীচে বাক্স, বাসন এবং গৃহস্থালীর অন্যান্য স্বল্প উপকরণ। ঐটুকু ঘরেই একটা দিক

একেবারে খালি। এক কোণে একখানি কম্বল ভাঁজ করিয়া পাড়া। সম্মুখে একটি ছোট ডেস্ক—যাহার উপর বই বা কাগজ রাখিয়া বোধ হয় লেখাপড়া করা হয়। তাহারই ঠিক বাঁদিকে একটি কুলুঙ্গি—যাহার মধ্যে একটি সুপরিষ্কৃত পিলসুজ; উপরে একটি পিতলের প্রদীপ বসানো। পিলসুজটা একটি তক্তার ফালির উপর বসানো। পিলসুজের পাশে সেই তক্তার উপরেই আরও তিনটা প্রদীপ পাশাপাশি সাজানো। যেখানে বসিবার আসন, সেইখানে নীচে হইতে দেওয়ালে উপরি উপরি প্রায় খাপরার চাল পর্য্যন্ত কয়েকটি 'তাক্' সাজানো—খোলা আলমারীর কায করিতেছে। দেওয়ালের ঐ অংশটুকু ইট বসাইয়া সিমেণ্ট করিয়া লওয়া—যাহাতে বইতে সহজে উই না লাগে। তাক্‌গুলি সব বই ও পুঁথিতে বোঝাই।

অনাথ দাদা জলযোগ শেষ করিয়া হাত-মুখ ধুইয়া বসিলেন। আমরাও তাঁহার পন্থা অনুসরণ করিলাম।

অনাথ দাদা বলিলেন, "কাল রাত্রে ভাবছিলাম, দয়াময় অনেক দিন আসে নি। সকালে আসে ত ভাল হয়। তাই আজ সকালেই তোমার গলা শুনে ভারি আনন্দ হ'ল। শচীনকে দেখে আনন্দ আরও বেড়ে গেছে। কিন্তু ভগবানের ইচ্ছা, এমন যে আনন্দ বেশীক্ষণ ভোগ করতে পারা যাবে না। মিনিট দশেকের মধ্যেই আজ বেরুতে হবে।"

"কোথায় যাবেন হঠাৎ?"—দয়াময় জিজ্ঞাসা করিল।

"সিরাজপুর। সেই মামলাটা উঠেছে। খবর এসেছে, তার সাক্ষী নাকি পাওয়া যাচ্ছে না। তাই যেতে হবে এখনি।"

দয়াময়ের মুখ মুহূর্ত্তে মেঘাচ্ছন্ন হইয়া উঠিল। বলিল "সিরাজপুরের সেই ভয়ানক কাণ্ডের সাক্ষী পাওয়া যাচ্ছে না—যা অতগুলো লোকের সামনে ঘটেছে!"

"তাতে ক্ষোভ করলে কি হবে? এখানকার বিচারকের কাছে মুখের কথাই গ্রাহ্য। মুখ বন্ধ করলে বিচারই যে এগুবে না। মনের কথার আদালত যে একেবারে আলাদা, ভাই।"

দয়াময় মুহূর্ত্তে ক্রোধে চঞ্চল হইয়া উঠিল। তাহার মুখ-চোখের চেহারা দীপ্ত হইয়া উঠিল। বলিল, "এ যে ক্রমশঃ অসহ্য হয়ে উঠছে, অনাথদা। বাঙ্গালাদেশব্যাপী এই স্ত্রীলোকদের উপর পৈশাচিক অত্যাচার বাঙ্গালা দেশকে সমস্ত ভারতবর্ষের কাছে—এমন কি, পৃথিবীর কাছেও একেবারে হীন ক'রে দিচ্ছে। এর প্রতিকার হওয়া অত্যন্ত উচিত।"

"সহজে কি ক'রে এর প্রতিকার হবে, ভাই? যাঁদের হাতে প্রতিকারের ক্ষমতা ও ভার, তাঁরা যে অত্যন্ত মন্থর বিচারশীলতার সঙ্গে অগ্রসর হচ্ছেন।"

"এ-সব কায পরের হাতে ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকলে হয় না। দুয়ার খোলা রেখে পুলিসের উপর মূল্যবান্ সম্পত্তির রক্ষার ভার দিয়ে ঘুমুলে এই রকমই হয়ে থাকে। আমার মনে হয়, এখন প্রত্যেক দেশহিতৈষীর উচিত, কংগ্রেসের কায, গ্রামসংস্কারের কায, হরিজন উদ্ধারের কায ইত্যাদি সব কিছুদিন বন্ধ রেখে এই ছাগলালসা নিবারণের চেষ্টা করা। শুধু মোকদ্দমার ভয় না দেখিয়ে নারীরক্ষা সমিতির সভ্যরা যদি লাঠি নিয়ে রুখে দাড়ান, তা হ'লে এই মুহূর্ত্তে ভোজবাজীর বলে পিশাচরা সব এই পথ ছেড়ে দেয়।"

"ও সব সাংঘাতিক কথা আর বলো না, দয়াময়। শান্ত হও। এর উপায় হচ্ছে—মেয়েদের সাহস ও শক্তি বৃদ্ধি করা ও পুরুষদের মৃত্যুকে তুচ্ছ করতে শেখা। তা হ'লে উঠলাম, ভাই। খোঁজখবর নিও, দয়াময়। আবার এসো, শচীন। চার পাঁচ দিন পরে আমি ফিরব।"

একটি ছোট চাটাইয়ের ব্যাগ পূর্ব্ব হইতেই সজ্জিত ছিল। দড়ির উপর হইতে একটি চাদর টানিয়া লইয়া তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন। দিদির দিকে একবার চাহিয়া—"তা হ'লে চল্‌লাম" বলিয়া অনাথ দাদা কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

৩

বাসায় ফিরিয়া বলিলাম, "দয়াময়, অনাথ দাদাকে আমার বেশ ভাল লেগেছে। ওঁকে সত্যিকার কর্ম্মী বলেই মনে হয়। আমরা গেলাম, কথাবার্ত্তা কইলেন খাবার খেলেন, খাওয়ালেন, আবার ঠিক ঘড়ির কাঁটার মত কাযে বেরিয়ে গেলেন।"

দয়াময় আমার পানে একবার চাহিল। তাহার দৃষ্টিতে এইটুকু বুঝা গেল যে, সে এইরূপই প্রত্যাশ করিতেছিল।

আমি একটু ভাবিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "দিদির সঙ্গে ওঁর সম্বন্ধটা কি ?"

"দিদি—ওঁর স্ত্রী।"

"উনি ত সন্ন্যাসী—তবে স্ত্রী কেন ?"

"উনি বৈষ্ণব। সস্ত্রীক বৈষ্ণব ধর্ম্ম—করেছেন। তবে বিবাহের সামান্য একটা ইতিহাস আছে।"

"কি ইতিহাস ?—জান ?"

"সামান্য জানি। অনাথ দাদাই আমাকে গোপনে বলেন। পূর্ব্ব হ'তে ওঁর সঙ্গেই দাদার বিবাহের কথা স্থির হয়। মাঝখানে একটা বিঘ্ন প'ড়ে যায়। কে এক জন ধর্ম্মের ও নিষ্কাম কর্ম্মের লোভ দেখিয়ে দিদিকে বিবাহে বিরত করবার চেষ্টা করে। দিদিও সে দিকে খানিকটা ঝুঁকেছিলেন। এমন সময় তার স্বার্থের মুখোস খুলে যাওয়ায় দিদি বুঝতে পারেন, তার শুধু বিবাহে বাধা দেওয়া উদ্দেশ্য নয়, যেমন ক'রে হোক দিদিকে হস্তগত করাই তার উদ্দেশ্য ছিল। দিদি তখন ফিরে আসেন; কিন্তু বাড়ী ফেরার পথ তখন প্রায় রুদ্ধ। অনাথ দাদা তৎক্ষণাৎ সমস্ত দোষ নিজের ঘাড়ে নিয়ে দিদিকে রক্ষা করেন। দিদির মানসিক অবস্থা, সমাজের অনুশাসন, আত্মীয়বন্ধুর সম্মানরক্ষা, সব দিক থেকে বিবেচনা ক'রে এঁরা দু'জনেই বৈষ্ণব ধর্ম্মে দীক্ষা নিয়ে বিবাহ করেন। দিদি যে এক মুহূর্ত্তের জন্যও দাদার চেয়ে কোন এক কপট ধর্ম্মের নিশানধারীকে উচ্চ স্থান দিয়েছিলেন, এখনও তাঁর সে মনস্তাপ যায় নি। সে দিন থেকে আজ পর্য্যন্ত দাদার সেবা, দাদার যে কায, তাই সম্পন্ন করার প্রাণপণ চেষ্টা—এই নিয়ে আছেন।"

জিজ্ঞাসা করিলাম—"ওঁর বাবা আছেন ?"

দয়াময় বলিল,—"হাঁ, আছেন। তিনি এক জন লক্ষপতি বলতে গেলে। দিদি তাঁর একমাত্র মেয়ে।"

আমি বলিলাম,—"একমাত্র মেয়ে—তা হ'লে ছেলেও আছে ?"

দয়াময় বলিল,—"হাঁ, ছেলেও একটি। তবে দিদি প্রথম পক্ষের সন্তান। ছেলেটি দ্বিতীয় পক্ষের এবং তাহার মা বর্ত্তমান। বিবাহের কোন যৌতুকই দিদি পান নি এবং ভবিষ্যতেও যাহাতে কিছু না পান, সে দিকে ছেলের পক্ষদের কোন ত্রুটি নেই।"

জিজ্ঞাসা করিলাম, "অনাথ দাদারাও ত বড় লোক। তাঁর দিক থেকে এ বিবাহে কোন অসুবিধা ঘটে নি ?"

"ঘটেনি আবার ? এই বিবাহ নিয়ে সবাই তাঁর শত্রু হয়ে উঠে। তিনি সেজন্য তাঁর পিতৃব্য ও ভাইদের ব'লে এলেন যে, তাঁরা যেন ব্যতিব্যস্ত না হন; কারণ, তিনি সম্পত্তির একটু খুদ-কুঁড়াও চান না। তাঁর নামে যৎসামান্য যা টাকা ছিল, কেবল তাই তিনি নিয়েছিলেন; তার বেশী নয়। সে টাকাও তিনি গরীব-দুঃখীর সেবায় ব্যয় করেছেন ও কচ্ছেন। কোন রকমে দু'জনে গ্রাসাচ্ছাদন এক রকম ক'রে চালাচ্ছেন।"

"সাধারণতঃ কি কায করেন এখন ?"

"ওঁর সর্ব্বপ্রথম কায হচ্ছে অত্যাচারিত নারীদের রক্ষা করা; তার পর অসহায় রোগীদের সেবা করা।"

"অর্থ দিয়ে, না শরীর দিয়ে ?"

"দুই। যেখানে যা পারেন।"

"যে টাকা তাঁর ছিল, তাতে এখন পর্য্যন্ত চলে ?"

"না। এখন তাঁকে চাঁদা তুলে এ সব কায করতে হয়। তাঁর এমন অনেক অনুরাগী আছেন, যাঁদের কাছে তিনি দাঁড়াবামাত্র তাঁরা মুক্তহস্তে দেন। অনাথদা বলেন, তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস যে, ভাল কাযের জন্য প্রধান জিনিষ হচ্ছে উৎসাহ; সত্যিকার কায করবার লোক থাকলে উপায় বা টাকার অভাব কোন দিন হয় না। শুধু মুখে বলা নয়, কাযের দ্বারাও তিনি তা প্রমাণ করেছেন। ঐ ছোট্ট সংকীর্ণ খাপরার ঘরে ব'সে তিনি কত বড় কল্পনা কার্য্যে পরিণত করেছেন।"

"আচ্ছা, দয়াময়! এত বড় কায ও অসাধারণ—পিছনে এত উৎসাহে ঘুরছ, কিন্তু ছোট ও সাধারণ কাযে তোমার ত্রুটি কেন হচ্ছে আজকাল ?"

"কিছু দিন বাড়ী যাই নি, তাই এ কথা বলছ ? বাড়ী যেতে আর উৎসাহ পাই নে, শচীন।"

"এক সময়ে কি ক'রে পেতে ? সপ্তাহে দুই একবার তোমাকে বাড়ী যেতে দেখেছি। দারুণ শীতের সময়েও কত দিন 'ডেলি প্যাসেঞ্জারি' করেছ—তাও বোধ হয় ভুলে যাও নি ?"

"সব মনে আছে ভাই। তখন যেতাম—শান্তি পেতাম। সে শান্তি আর নেই।"

"কিসের জন্য সে শান্তি গেল, দয়াময়? তার জন্য কি একা বাড়ীর লোকই দায়ী? তোমার কি তাতে কোন দোষ নেই?"

"এ ত খালি দোষ-গুণের কথা হচ্ছে না; এ রুচির কথা। ভাল লাগা না লাগার কথা। শুধু ঘর-বাড়ী নিয়ে, শুধু সেবা নিয়ে—আর তৃপ্ত হ'তে পারছি না। আরও কিছু মন চায়। কেবলই গ্রহণ না ক'রে কিছু দেবার জন্যও মন মাঝে মাঝে ব্যাকুল হয়। তখন স্ত্রীর ও মায়ের অশান্তির জন্য মনকে আমি ফেরাতে পারি নে, চাইও নে।"

"কেন চাও না? তাঁদের অশান্তি দূর করা কি তোমার অন্যবিধ কর্ত্তব্য নয়?"

"অন্যবিধ বটে, কিন্তু একমাত্র নয়। তাঁদের অশান্তি দূর করবার জন্য আমি যে পরিমাণে দায়ী, তার চেয়ে ঢের বেশী পরিমাণে দায়ী তাঁরা এই অশান্তি রচনার জন্য। আমি তাঁদের দেখব, আমাকেও দেখব। শুধু শরীর বা মন নিয়ে আমি আর তৃপ্ত থাকতে পারছি নে। আমার আত্মারও প্রয়োজন। আমার সে প্রয়োজনে তাঁরাই বা কেন বাধা দেবেন?"

"তুমি তাঁদের দাবী অগ্রাহ্য করবে, তাঁদের সুখ-দুঃখে উদাসীন থাকবে—আর তাঁরা সব সময়ে তোমার সব প্রয়োজনে সচেতন থাকবেন, এই বা তুমি কি ক'রে আশা করতে পার?"

"তুমি জান, তাঁদের সব দাবী মেনে নিয়ে আমি এক দিন সে আশা করেছিলাম, আজ আর তা করি নে; কিন্তু ক্রীতদাস প্রথাও আমি মেনে নিতে পারিনে।"

"ক্রীতদাস প্রথা মানে?"

"আমাদের এই সর্ব্বগ্রাসী পারিবারিক সম্বন্ধ। পূর্ব্বের ক্রীতদাস প্রথার সঙ্গে এর এইটুকু প্রভেদ যে, আজকের প্রথা আগেকার চেয়ে একটু মার্জ্জিত। আগেও তাদের আপনার বলতে কিছু ছিল না, এখনও নেই। যদি থাকত বা থাকে, তা হলেই সেটা অমার্জ্জনীয় অপরাধ ব'লে আগেও গণ্য হ'ত, এখনও হয়।"

"দেখ দয়াময়, কথাগুলো শুনতে এমনি ভাল; কিন্তু কার সম্বন্ধে প্রযোজ্য, সেটা ভাববার বিষয়। সত্য কথা, কেউ কাউকে কেনেনি। তুমিও তাদের কেননি, তাঁরাও তোমাকে কেনেন নি। তোমার উচ্চাশায় বাধা পড়তে বা তাঁদের সহানুভূতি না পেতে তুমি ক্ষুব্ধ হচ্ছ। তাঁদের সামান্য ও সাধারণ আশায় ব্যাঘাত ঘটলে তাঁরাও ক্ষুব্ধ হচ্ছেন। তুমি ভাবছ, তাঁদের অন্নবস্ত্রের ব্যবস্থা ক'রে বাকি শক্তি ও সময় দিয়ে তুমি নিজের মনের প্রসার ও আত্মার কল্যাণ চাইছ, তাঁরা কেন তাতে বাধা দেবেন? তাঁরা ভাবছেন, তোমার সংসারের পায়ে তাঁদের সময়, শক্তি, স্বাস্থ্য—তাঁদের শরীর, মন, আত্মা সব জলাঞ্জলি দিয়েছেন ও দিচ্ছেন, আর তার পরিবর্ত্তে তোমার কাছ থেকে পাচ্ছেন অনাদর ও অবজ্ঞা। একবার তাঁদের চোখের দেখা দিতেও তোমার সময় হয় না এবং তার জন্য তোমার মনে দুঃখ আসে না, অনুশোচনাও জাগে না। তোমার মত তাঁরা হয় ত আত্মার কল্যাণের গর্ব্ব করতে পারেন না। কিন্তু তোমারই মত তাঁদেরও মন আছে। সেই মনে যদি তাঁদের অহরহ দুঃখ-জ্বালা বাড়তেই থাকে, তাঁরাও ত তোমাকে ঠিক এই ভাবেই দোষী করতে পারেন। তুমি যদি তোমার অধ্যয়নজনিত শিক্ষা—তোমার অভিজ্ঞতাসম্ভূত জ্ঞান সত্বেও তাঁদের সেটুকু শান্তি বা আনন্দ দিতে না পার, তা হ'লে তোমার দোষ কি তাঁদের চেয়ে বেশী হবে না? অনাথ দাদার মত তোমার মন দেশের অত্যাচারিত নরনারীর দুঃখে কাঁদছে; কিন্তু সেই মন তোমার মা ও স্ত্রীর দুঃখেই বা কাঁদে না কেন?"

"তুমি কোন্ হিসাবে তাঁদের দুঃখ বল?"

"কোন্ হিসাবে নয়? তাঁদের সংসার তোমাকেই কেন্দ্র করে। তোমার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য তাঁরা তাঁদের যথাসাধ্য করেছেন। সংসারের পেষণে তাঁদের বাইরের দিকে চেয়ে দেখবার সময় পর্য্যন্ত হয়নি ও হয় না। না আছে তাঁদের অধ্যয়নের অবসর, না আছে সুযোগ। তুমি বাড়ী যাবে, তোমায় দেখে, তোমায় কাছে পেয়ে তবে তাঁদের মনে একটু তৃপ্তি, একটু আনন্দ আসবে। তুমি যদি তাঁদের সেটুকু আনন্দ থেকে বঞ্চিত কর, তা হ'লে কি সেটা তোমার নিষ্ঠুরতা হবে না? তোমার হাতে যখন তাঁদের গড়বার ভার ছিল, তাঁদের গ'ড়ে তুলবার জন্য কি চেষ্টা তুমি করেছিলে? তুমি তাঁদের মনের কতখানি দেখেছিলে? তাঁদের তোমার তথাকথিত আত্মার কথা কতখানি ভেবেছিলে? যে সময়ে নিজে অবসরমত পড়াশুনা করেছ, সে সময়ে তাঁদের কেন পড়াওনি? নিজে যখন বড় কথা—বড় জ্ঞান শিখেছ.

তাঁদের কেন শিখাওনি ? তুমি যদি তোমার শিক্ষা—তোমার জ্ঞান সত্ত্বেও তাঁদের মন ও আত্মার সম্বন্ধে উদাসীন থাকতে পেরে থাক, শিক্ষাহীন ও জ্ঞানবিহীন তাঁরা কেন তা পারবেন না ?"

"হয় ত তোমার কথা ঠিক, শচীন্। হয় ত আমিও তাঁদের প্রতি অবিচার করেছি। কিন্তু আমি কি ভাবি জান? গাছ মাটীতে জন্মায়, সেখান থেকে রস নেয়, ঘ্রাণশক্তি নেয়, কিন্তু তাই ব'লে সেখানেই তার বৃদ্ধির শেষ হয় না। মাধবী তাকে স্নেহভরে আশ্রয় করুক, কিন্তু তাই ব'লে কঠিন বন্ধনে তাকে পঙ্গু ক'রে যেন তার শ্বাসরোধ ক'রে না দেয়। মাটীর রস ও মাধবীর স্পর্শ সত্ত্বেও সে তার শাখা-প্রশাখা বিস্তার ক'রে মাথা তুলে দীপ্ততর আলো ও উচ্চতর আকাশের পানেই ছুটে যায়। এই তার সত্যকার ধর্ম্ম। তার জন্য না মাটীর, না মাধবীর দুঃখ করা সাজে।"

"কিন্তু এটা নিছক উপমা। উপমা দিয়ে কোন জিনিষকে বুঝানো চলে, কিন্তু যুক্তিকে খণ্ডন করা চলে না। এটা তুমিও জান, আমিও জানি। যদি সত্যই তোমার কোন ক্রটি হয়ে থাকে মনে কর, সে ক্রটি দূর কর। তোমার মন ও আত্মার প্রসারের সঙ্গে এই সাধারণ কর্ত্তব্যের যেন সমন্বয় ঘটে।"

দয়াময় কিছুক্ষণ স্থির হইয়া ভাবিতে লাগিল। কোন উত্তর করিল না।

৪

পরদিন দিদির কাছ হইতে একটি ছোট ছেলে এক ছোট্ট চিঠি লইয়া আসিল—"দয়াময় একবার এস ; বিশেষ প্রয়োজন।" চিঠি পাইয়াই দয়াময় বলিল, চল, যাই।

দুই জনে তৎক্ষণাৎ বাহির হইলাম। দিদির বাসায় পৌঁছিয়া তাঁহাকে একটু ব্যস্ত দেখিলাম। তাঁহার স্বভাব-সুন্দর মুখে উদ্বেগের ম্লান ছায়া পড়িয়াছে। পাণিহাটি হইতে একটি লোক অনাথদার নামে এক চিঠি আনিয়াছে—"প্রভু, এখানে বড় বিপদ। কলেরা দেখা দিয়াছে। অনেকেই বিপন্ন। আপনি না আসিলে আমরা নিরুপায়।

সেবক—সনাতন দাস।"

এই সময়ে কৃষ্ণপুরে এক বিখ্যাত মেলা বসে। দেশ-বিদেশ হইতে কীর্ত্তনের দল আসে। কয় দিন ধরিয়া অষ্টপ্রহর কীর্ত্তনাদি হয়। প্রচুর লোকসমাগমও হইয়া থাকে। অনেক দোকান বসে ; ক্রয়-বিক্রয়ও বহু হইয়া থাকে। এমন সময় এই বিপদ।

দিদি বলিলেন, "এসো, ভাই। এখন বল কি করি ?"

দয়াময় বলিল, "দাদাকে এখনই একবার খবর দেওয়া দরকার। তিনি না এলে ত কোন উপায় নেই।"

দিদি বলিলেন, "কিন্তু তিনিও ত বিশেষ প্রয়োজনে গিয়েছেন। কায অসমাপ্ত রেখেই বা তাঁকে কি ক'রে আসতে বলি ?"

দয়াময় বলিল, "তা হ'লে কি করতে বল তুমি ?"

দিদি বলিলেন, "তাই ত ভাবছি ভাই। কৃষ্ণপুরে যাওয়া বিশেষ প্রয়োজন। তিনি নেই ব'লে তাঁর কায কি ক'রে পণ্ড হতে দিই ?"

দয়াময় বলিল, "তুমি বল ত আমি যাই ততক্ষণ। এদিকে দাদাকেও খবর দেওয়া যাক্। তিনি যেন ওখান থেকে বরাবর কৃষ্ণপুর চ'লে আসেন।"

দিদি চিন্তান্বিত-মুখে বলিলেন, "তোমাকেই বা একা কি ক'রে ছেড়ে দিই, ভাই ! সে হয় না। আমাকেও যেতে হবে।"

দয়াময় বলিল, "তুমি যাবে ?"

দিদি বলিলেন, "কেন যাব না ? তুমি যেতে পার, আর আমি বুঝি কেউ নই ? তাঁর অনুপস্থিতিতে কটা দিনের জন্যও যদি তাঁর কাযটা চালাতে না পারি, তবে তোমাদের দিদি হওয়াটাই আমার বৃথা।"

দয়াময় বলিল, "তার চেয়ে তুমি যদি বল, আমি এখনই সিরাজপুর চ'লে যাই। হয় তাঁকে নিয়ে আসি, না হয় সাক্ষাতে তাঁর উপদেশ নিয়ে যেমন বলেন, সেইমত কায করি।"

দিদি বলিলেন, "না দয়াময়, তাঁকে এ সময় বিরক্ত করা হবে না। তুমি আমাকেই নিয়ে চল। দেখি কিছু পারি কি না। তার মধ্যে উনিও এসে পড়তে পারেন।"

তাহাই স্থির হইল।

দয়াময় আমাকে বলিল, "তোমার ত এখন স্কুল বন্ধ। চল না, একসঙ্গে যাই। না কি আপত্তি আছে ?"

আমি বলিলাম, "আছে বৈ কি। তবুও চল, যাই।"

দয়াময় দিদিকে বলিল, "তুমি তৈরি হয়ে নাও, দিদি। আমি একটিবার বাসায় গিয়ে ছুটীর ব্যবস্থা ক'রে আসি।"

দিদি বলিলেন, "তা হ'লে আমি চাট্টি ভাতে ভাত চড়িয়ে দিই, এখান থেকেই খেয়ে যেয়ো।"

দয়াময় বলিল, "না, তুমি এখন ব্যস্ত। আমরা খেয়েই আসব।"

আমরা চলিয়া আসিলাম। আহারাদি তাড়াতাড়ি শেষ করিয়া লইলাম। দয়াময় আফিসের এক সহকর্মীর হাতে কয়েক দিনের জন্য ছুটীর দরখাস্ত পাঠাইয়া দিল। কয়েকখানা কাপড়, দুই জনের মত অতি সামান্য বিছানাও সে ঠিক করিয়া লইল। আর লইল একখানি কোষবদ্ধ দীপ্ত ছুরিকা। কোমরবন্ধের সঙ্গে জামার নীচে তাহা ঝুলাইয়া রাখিল।

"ওটার কি প্রয়োজন, দয়াময়?" জিজ্ঞাসা করিলাম।

দয়াময় হাসিয়া বলিল, "পরাধীন জাতির মনের অবস্থা এমনই হয়ে যায় যে, আত্মরক্ষার কোন অস্ত্র সঙ্গে নিতেও তার সঙ্কোচ হয়।"

জিজ্ঞাসা করিলাম, "এর কি কোন প্রয়োজন আছে?"

সে উত্তর দিল, "এটা কি নূতন প্রয়োজন? যেখানে মহামারী, সেখানেই চুরি-ডাকাতির প্রাদুর্ভাব। তা ছাড়া আমাদের থাকতে হবে একেবারে মাঠের মধ্যে। আত্মরক্ষার একটা উপকরণ থাকা প্রয়োজন। একা থাকলে নিতাম না, কিন্তু দিদি থাকবেন সঙ্গে, একেবারে অরক্ষিত থাকা উচিত নয়।"

পরে একটা মোটা লাঠি বাহির করিয়া বলিল, "এটা তুমি কাছে রাখ। চল, যাওয়া যাক্।"

দুজনে বাহির হইলাম। দিদি প্রস্তুত হইয়াই ছিলেন। তাঁহার বাসা হইতে তাঁহাকে উঠাইয়া লইয়া আমরা যথাসময়ে ষ্টেশনে পৌছিলাম।

বাহির হইবার পূর্ব্বে অনাথ দাদার কাছেও একটা খবর পাঠাইয়া দেওয়া হইল।

অপরাহ্নের পূর্ব্বেই আমরা কৃষ্ণপুরের মহোৎসবের কাছে পৌছিলাম। সে এক বিরাট ব্যাপার। দেশ-বিদেশের বৈষ্ণব সম্প্রদায় আসিয়া নামগান করিতেছেন। সাত দিন ধরিয়া দিন-রাত্রির মধ্যে স্বল্পক্ষণের জন্যও বিরাম নাই। সেই কীর্ত্তনের মাঠ পার হইয়া তবে আমাদিগকে আশ্রমের তাঁবুতে পৌছিতে হইবে। ইহারা পূর্ব্বে হয় ত আরও অনেকবার দেখিয়া থাকিবেন; কিন্তু আমি এই প্রথম দেখিতেছি। সেজন্য কিয়ৎক্ষণের জন্য চারি দিক ঘুরিয়া দেখিতে লাগিলাম। এক এক সম্প্রদায়ের এক এক দল। এক প্রকাণ্ড বটগাছের নীচে এক বৃহৎ দল কীর্ত্তনে মত্ত। কাছে আসিতেই দৃষ্টি পড়িল—এক দীর্ঘমূর্ত্তি উজ্জ্বল গৌরবর্ণ পুরুষ। দীর্ঘ কুঞ্চিত কেশ; অতি মসৃণভাবে ক্ষৌরীকৃত সুন্দর মুখমণ্ডল। চন্দন-রেখাঙ্কিত প্রশস্ত ললাট। দেখিবামাত্র চিনিলাম—পরমানন্দ স্বামী। তাঁহার দৃষ্টিও আমাদের প্রতি নিপতিত হইল। আমার পাশেই দিদি, পিছনে সামান্য দূরে দয়াময়। ক্ষণকালের জন্য তাঁহার মুগ্ধদৃষ্টি দিদির দিকে স্থির হইয়া রহিল। অথচ ইহার মধ্যেও তাঁহার নৃত্য ও কীর্ত্তনের বিরাম ছিল না। রাধেশ্যাম বলিয়া—দীর্ঘ বিশাল ঈষৎ রক্তাভ দুই বাহু তুলিয়া কি সে উদ্দাম অবিরাম নৃত্য! হাঁ, সুন্দর আকৃতি বটে! দেখিলে না মুগ্ধ হইয়া থাকা যায় না।

আমরা শীঘ্রই জনসমুদ্রে মিশিয়া গেলাম। মনে হইল, কীর্ত্তনের মধ্যেও তাঁহার দৃষ্টি যেন আমাদিগকে খুঁজিতেছিল। সে স্থান পার হইয়া আমরা সেবা-শিবিরে পৌছিলাম।

৫

সারি সারি খড়ের দোচালা ঘর। প্রত্যেক ঘর চারি জন রোগীর জন্য নির্দ্দিষ্ট। এই ভাবের পাঁচখানি ঘর। একখানি বড় আটচালা। তাহাতেও ষোল জন রোগীর স্থান সঙ্কুলান হয়। চাটাইয়ের দেওয়াল। রোগীর কক্ষ হইতে কিঞ্চিৎ দূরে ডাক্তার, শুশ্রূষাকারী ও শুশ্রূষাকারিণীর জন্য কয়টি কুটীর।

সনাতন দাস বৃদ্ধ। তবুও দিদিকে গড় হইয়া প্রণাম না করিয়া ছাড়িল না। সত্যকার স্নেহের সহিত আমাদিগকে আলিঙ্গন করিল। এই সবই আমাকে সবচেয়ে বিস্মিত করে। অপরিচিতের প্রতি এ স্নেহ মানুষের মনে কি করিয়া আসে? কে এই স্নেহ জাগাইয়া দেয়?

সনাতন দিদিকে বলিল, "আজ আপনি বিশ্রাম করুন, কাল থেকে দেখাশুনা করবেন। আপনি এসেছেন, আমি দেহে-মনে বল পেলাম।"

দিদি বলিলেন, "আমরা ওখান থেকেই এখানে আসছি;

আমাদের আর কি এত পরিশ্রম হয়েছে! চলুন, একবার ঘরগুলি দেখে আসি।"

প্রথম ঘরটিতে দিদি প্রবেশ করিলেন। দয়াময় দিদির পশ্চাৎ পশ্চাৎ গেল। আমি দুয়ারের গোড়ায় দাঁড়াইলাম। ঘরটিতে চার জন রোগী, এক জন নার্শ। তিনটি রোগীর অবস্থা একটু ভাল। হোমিওপ্যাথি চিকিৎসায় ফল হইয়াছে। চতুর্থটিকে সেলাইন্ ইন্‌জেকশান দেওয়া হইয়াছে; ফল এখনও স্থায়ী হয় নাই।

দরমার দেওয়াল। দরমা কাটিয়া পরদা লাগাইয়া জানালা করা হইয়াছে। প্রয়োজনমত পরদা গুটাইয়া রাখা বা ফেলিয়া দেওয়া হয়। জানালার কায একপ্রকার ইহাতেই চলিয়া যায়। অসুবিধা হইয়াছে মেঝে লইয়া। মাটীর মেঝে। জল পড়িলেই বিপদ। যাহাতে কোন জিনিষ মেঝের উপর না পড়ে, সেজন্য এনামেল করা স্বতন্ত্র পাত্রাদির ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

দুয়ারের পাশেই যে রোগীটি ছিল, সে একটি বালক। চোদ্দ পনেরো বৎসর বয়স হইবে। দিদি তাহার শয্যাপার্শ্বে বসিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন আছ, ভাই?"

শীর্ণ বালক। রোগে, যন্ত্রণায় ও নিরাশায় যেন শয্যার সহিত একবারে মিশিয়া গিয়াছে। দিদির মিষ্ট কথায় তাহার চোখে জল আসিল। দিদি স্নেহভরে তাহার ললাটে হাত রাখিলেন। বালক সেইটুকু স্নেহে ফোঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল। দিদি তখন তাহার শয্যাপার্শ্বে বসিয়া তাহাকে শান্ত করিলেন। বালক শান্ত হইয়া দিদির সঙ্গে কথা কহিতে লাগিল।

বালক বলিল, তাহার শরীর আগে হইতেই খারাপ ছিল। তাহার মা কিছুতে আসিতে দিবেন না। সে জোর করিয়াই আসিয়াছিল। রাগ করিয়া এক দিন খায় নাই; সেজন্য মা বাধ্য হইয়াই আসিতে দিয়াছিলেন। নহিলে তাঁহার আসিতে দিবার আদৌ ইচ্ছা ছিল না। এখন যদি সে না বাঁচে, মায়ের কি হইবে? মাকে কে দেখিবে? তাহার বাপ নাই, সেই জ্যেষ্ঠপুত্র, তাহারই শিরে বলিতে গেলে সংসারের ভার। সে যে মায়ের অমতে আসিয়াছে—হরি বুঝি তাহাকে তাই এই শাস্তি দিয়াছেন। এবার যদি সে বাঁচিয়া উঠে, আর কখনও মায়ের অবাধ্য হইবে না।

দিদি তাহাকে আরও সান্ত্বনা দিয়া, চোখের জল মুছাইয়া আর এক জনের কাছে গেলেন। সেটি এক বর্ষীয়সী নারী—বিধবা। তাহার পাশে বসিয়া বলিলেন, "আজ একটু ভাল আছ, মা?"

বিধবা বলিল, "আর ভাল, মা! ভাল হ'তে আর ইচ্ছাও নেই। মহাপ্রভুর মচ্ছব, ভাবলাম দেখে আসি। পাপের দেহ; এখানে এসেও পরের কষ্টের কারণ হয়েছি। দেখ না—কত জনকে কত কষ্ট দিচ্ছি। এখন ত মহাপ্রভু দয়া করলেই বাঁচি।"

দিদি বলিলেন, "মহাপ্রভু ত দয়া এক দিন করবেনই: তার জন্য ব্যস্ত কেন, মা? বেঁচে থাকলে তবে না মহাপ্রভুর কায করবে, তবে না দরিদ্রনারায়ণের সেবা করবে? আজ যদি কারও সেবা পেয়ে কুণ্ঠিত হয়ে থাক, মা, এর দশগুণ, যত দিন বাঁচবে, তত দিন পরের সেবা কোরো, কুণ্ঠা দূরে যাবে। মহাপ্রভুর দয়া পাবে।"

বিধবা হাত যোড় করিয়া মাথায় স্পর্শ করিয়া বলিল, "তাই যেন হয়, মা। সংসারে ত আর কেউ নেই। তাঁর দয়া থেকে যেন বঞ্চিত না হই।"

দিদি সেখান হইতে উঠিয়া তৃতীয় রোগীর কাছে আসিলেন—সে যুবক। বয়স হইবে বৎসর পঁচিশ। বলিষ্ঠ বিশাল দেহ। কিন্তু রোগে যেন মুহ্যমান হইয়া পড়িয়াছে। মস্তিষ্কে জড়তা আসিয়াছে।

দিদি তাহার কাছে দাঁড়াইয়া বার কয়েক ডাকিলেন। সে ডাক তাহার জ্ঞানেন্দ্রিয় পর্য্যন্ত পৌঁছিল না। দিদির মুখে চিন্তার রেখা ফুটিয়া উঠিল। কাছে বসিয়া তাহার কপালে, বুকে হাত বুলাইয়া দিলেন। সস্নেহে মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি বাবা, কি কষ্ট হচ্ছে? কথা কইতে পাচ্ছ না?"

মনে হইল, এ কথা কয়টা রোগী বুঝিল। কিন্তু কথার উত্তরে কিছু বলিতে পারিল না, কেবল তাহার দুটি চক্ষু জলে ভরিয়া আসিল। সে কক্ষের লোক সেখানেই বসিয়া ছিল; দিদি বলিলেন, "তুমি একবার ডাক্তারকে খবর দাও ত।"

লোকটি চলিয়া গেল। একটু পরেই ডাক্তার আসিলেন। তিনি পরীক্ষা করিয়া লক্ষণাদি দেখিয়া চিন্তিত হইলেন। আর এক জন ডাক্তারকে খবর দেওয়া হইল; তিনিও আসিলেন। দ্বিতীয়বার রোগীকে সেলাইন

ইনজেকসন দেওয়া হইল। ইহার পর হইতে দিদি সর্ব্বক্ষণ ইহারই শয্যাপার্শ্বে রহিলেন। কিন্তু কিছুতেই রোগ উন্নতির দিকে গেল না।

রাত্রি আসিল। রোগ বাড়িয়াই চলিল। শেষে রাত্রিতে মহাপ্রভুর নাম ও দিদির কাতর অশ্রুজলের মধ্যে অপরিচিত যুবকের ইহলোকের খেলা সাঙ্গ হইয়া গেল। প্রভাতের সঙ্গে সঙ্গে তাহার দেহ সেখান হইতে অপসারিত করা হইল। তাহার শেষ অশ্রুবিন্দু ও সকাতর দৃষ্টি দ্বারা সে শেষ মুহূর্ত্তে কাহাকে খুঁজিয়াছিল, তাহা কেহ জানিল না, বুঝিল না।

৬

দুই দিন দুই রাত্রি এই ভাবে কাটিয়া গেল। আজ তৃতীয় দিন। গভীর রাত্রি। দিনের উজ্জ্বল আলোকে যাহা পরিচিত ও ভয়লেশহীন, চন্দ্রালোকে যাহা মাধুর্য্যময়, তমসাচ্ছন্ন রাত্রিতে তাহাই ভয়ঙ্কর। তদুপরি জীবন-মৃত্যুর দৃশ্য এখানে পাশাপাশি।

প্রথম রাত্রিতে জ্যোৎস্নালোকে পথ-প্রান্তর প্লাবিত করিয়া চন্দ্র কখন্ অস্ত গিয়াছে। অন্ধকারে চারিদিক সমাচ্ছন্ন। হাসপাতালের কক্ষগুলির স্বল্পালোকে বাহিরের অন্ধকারকে আরও ভয়াবহ করিয়া তুলিয়াছে।

বোধ হয়, রাত্রি দুইটা বাজিয়া গিয়াছে দিদি এই খানিকটা আগে উঠিয়া গিয়াছেন। দয়াময়ের সঙ্গে বসিয়া একই কক্ষে রোগীর পরিচর্য্যা করিতেছিলাম। একটু নিদ্রার আবেশ আসিতে দেখিয়া দয়াময় বলিল, "তুমি উঠে যাও, একটু বিশ্রাম কর গে।"

সত্যই আমার সমস্ত শরীর, সকল ইন্দ্রিয় যেন নিদ্রাচ্ছন্ন হইয়া আসিতেছিল। মনে হইতেছিল যে, এই অর্দ্ধসিক্ত মাটীর মেঝের উপরেই শুইয়া খানিকটা চোখ বুজাইয়া লইতে পারিলে বাঁচিয়া যাই। দয়াময়কে একা রাখিয়া যাইতে পারিতেছিলাম না। কিন্তু তাহার কথায় আমি আর ইতস্ততঃ না করিয়া উঠিয়া গেলাম। শ্রান্ত, অর্দ্ধতন্দ্রাচ্ছন্ন দেহটিকে কোনমতে টানিয়া আপনার কক্ষে আনিয়া শয্যার উপর নিক্ষেপ করিলাম। পরমুহূর্ত্তে প্রায় নিশ্চিন্ত হইয়া নিদ্রাঘোরে চক্ষু মুদিলাম।

কতক্ষণ ঘুমাইয়াছি, মনে নাই। গভীর নিদ্রাবেশের মাঝখান হইতে কে যেন আমাকে টানিয়া তুলিতেছিল। অতি তীক্ষ্ণ কণ্ঠে কে যেন কহিয়া উঠিল—যাও, যাও। এত তীক্ষ্ণ সেই স্বর যে, সেই তীক্ষ্ণতার মধ্যে সে কণ্ঠ কাহার, এ চিন্তা যেন হারাইয়া গিয়াছিল।

দ্বিতীয়বার আবার সেই ক্রুদ্ধ, ক্ষুব্ধ, উত্তেজিত কণ্ঠস্বর শুনা গেল আমার সমস্ত নিদ্রা, তন্দ্রা, জড়তা এক মুহূর্ত্তে দূরে গেল পলকে শয্যার উপর উঠিয়া বসিলাম। শব্দ ত দূরে নয়, ঠিক পাশেই। ঐ না দিদির ঘর। তবে কি—?

বিদ্যুতের মত মনে সংশয় জাগিল। শয্যাত্যাগ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলাম।

তৎক্ষণাৎ কাণে আসিয়া বাজিল—"শান্ত হও বিজলী। পূর্ব্বকথা একেবারে ভুলো না। এখন যদি কেউ এসে পড়ে, আমার চেয়ে তোমার বেশী ক্ষতি।"

এক লাফে দুয়ারের কাছে আসিলাম।

এবার দিদির গলা স্পষ্ট শুনিতে পাইলাম,—"যাও, দুয়ার খোলো ; নয় ত আমাকে বাইরে যেতে দাও। দেবে না? দয়াময়!"

মুহূর্ত্তে দুয়ার খুলিয়া বাহিরে আসিলাম। দিদির ঘর লক্ষ্য করিয়া ছুটিলাম। ঘরের কাছাকাছি আসিতে ভিতরে যেন দ্রুত পদসঞ্চারের শব্দ শুনিলাম। হাঁসপাতালের দিক হইতে কে এক জন বিদ্যুদ্বেগে পাশ দিয়া ছুটিয়া গেল। ঘরের দুয়ার বন্ধ দেখিবামাত্র সে মূর্ত্তি জানালার পর্দ্দা ছিঁড়িয়া ভিতরে লাফাইয়া পড়িল।

তাহাকে দুয়ারের কাছে যেটুকু থামিতে হইয়াছিল, তাহাতেই সন্দেহ হইয়াছিল, সে দয়াময়।

পরমুহূর্ত্তে ভিতর হইতে দুয়ার খুলিয়া গেল। ভিতরে দৃষ্টি পড়িতেই ভয়ে বিস্ময়ে অবাক্ হইয়া গেলাম। পরমানন্দ স্বামী দিদির হাত ধরিয়া দাঁড়াইয়াছিল। ক্ষুধিত ব্যাঘ্রের মত দয়াময় পরমানন্দের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল। পরমানন্দ বাধ্য হইয়া দিদিকে ছাড়িয়া দিল এবং দয়াময়ের গলা চাপিয়া ধরিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। তাহার মুখে চোখে পিশাচের দৃষ্টি ফুটিয়া উঠিল। দয়াময় অসুরের মত শক্তিতে এক হাতে তাহাকে ধাক্কা দিয়া ঠেলিয়া দিল ও অপর হস্তে তাহার বস্ত্রাভ্যন্তর হইতে সেই ছুরিকাখানি বাহির করিয়া পরমানন্দের দেহ লক্ষ্য করিয়া আঘাত করিতে গেল।

দিদি আর্ত্তস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিলেন। আমি ভয়ে

শিহরিয়া উঠিলাম। নিবারণ করিবার শক্তি পর্য্যন্ত অন্তর্হিত হইয়াছিল; সময়ও ছিল না। সেই মুহূর্ত্তে নিমেষমধ্যে কে ক্ষিপ্রপদে কক্ষে প্রবেশ করিয়া দয়াময় ও পরমানন্দের মাঝখানে উদ্যত আঘাত নিবারণের জন্য বাহু তুলিয়া দাঁড়াইল। তৎক্ষণাৎ উদ্যত অস্ত্র প্রবেশকারীর বাহুমধ্যে প্রবিষ্ট হইল। রক্তধারা ফিন্‌কি দিয়া ছুটিল।

সঙ্গে সঙ্গে দয়াময় চকিত আর্ত্তকণ্ঠে চীৎকার করিয়া বলিল, "তোমাকে মারলাম, অনাথ দাদা?"

বলিয়া দয়াময় সেই বিদ্ধ ছুরিকা অনাথ দাদার রক্তাক্ত বাহুমূল হইতে উঠাইতে গিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া তাঁহার পদতলে লুটাইয়া পড়িল।

ছুরিখানা বাম হাতে এক টানে উঠাইয়া অনাথ দাদা ঘরের এক কোণে ছুড়িয়া ফেলিলেন ও আপনার রক্তাক্ত হাতের অঙ্গুলি দিয়া পরমানন্দকে বাহিরের দিক নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন। পরমানন্দ নতমস্তকে পদাহত কুক্কুরের মত ধীরে ধীরে কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল।

দিদি নিকটস্থ দড়ি হইতে একখানি পরিষ্কৃত বস্ত্রের খানিকটা তাড়াতাড়ি ছিঁড়িয়া ফেলিয়া অনাথ দাদার আহত স্থান বাঁধিয়া দিলেন। আমি দৌড়িয়া ডাক্তার ডাকিতে ছুটিলাম। ডাক্তার ব্যস্তভাবে আসিলেন; ঔষধ দিয়া অনাথ দাদার প্রসারিত হস্তে ব্যাণ্ডেজ বাঁধিয়া দিলেন।

ঘরের কোণে কলসী ছিল। অনাথ দাদা অপর হস্ত দিয়া দয়াময়ের চোখে মাথায় জল দিতে লাগিলেন। আমি বাতাস করিতে লাগিলাম।

একটু পরেই দয়াময় চক্ষু মেলিল। আত্মসমাহিতভাবে কি যেন ভাবিয়া লইল। উঠিয়া বসিতেই অনাথ দাদার ব্যাণ্ডেজ-বাঁধা হাত চোখে পড়িল।

দয়াময় দুই হাত দিয়া অনাথ দাদাকে জড়াইয়া ধরিয়া বালকের মত কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল, "তোমার দেহে আমি আঘাত করলাম, অনাথদা!"

অনাথ দাদা দয়াময়ের মাথায় পিঠে সস্নেহে হাত বুলাইতে বুলাইতে সজলনয়নে বলিলেন, "ছেলেমানুষি কোরো না, দয়াময়। দৈবাৎ আমার হাতে সামান্য একটু লেগেছে, তাতে কান্না কেন ভাই? তোমার দিদির তুমি মান বাঁচিয়েছ আজ। ঐ সেই লোকটা, যে তোমার দিদিকে এক দিন ভুল পথে নিয়ে যাবার চেষ্টা করেছিল, আবার আজ সুযোগ পেয়ে অপমান করতে এসেছিল।"

তখন অনেক লোক জড় হইয়া গিয়াছিল। দয়াময়ের দুঃখ ও অনাথ দাদার আঘাত—সে কক্ষের সকলের মর্ম্ম স্পর্শ করিয়াছিল। ব্যাণ্ডেজে আর রক্ত আসিতেছে কি না, তাহা ভাল করিয়া দেখিবার জন্য অনেককেই চক্ষু মুছিতে হইয়াছিল।

শ্রীমাণিক ভট্টাচার্য্য।

আবার আসিও ফিরে

আবার আসিও ফিরে, তুমি মোরে কর না ছলনা
কেমনে বিদায় দিব? এ মনেরে বুঝাব কেমনে?
অকারণে এই দুঃখ, কেন আমি সহিব বল না,
তুমিই কি পাবে সুখ, এ নির্ম্মম বন্ধন ছেদনে?
দূরে হের পৌর্ণমাসী, অতন্দ্রিত বিমলিন চাঁদে
সে কি বুঝিয়াছে ব্যথা আসন্ন বিরহ-ব্যথা মোর!
নক্ষত্র-সভায় আজ বিরহিণী অরুন্ধতী কাঁদে
শুকতারা না জানিতে বিষণ্ণ রজনী হবে ভোর!
যদি আর না আসিবে, কেন তবে এলে আজ প্রিয়
আসিবে বলিয়া মোর প্রতীক্ষা যে ছিল মধুময়

উদয়-পথের দৃষ্টি দিনে দিনে হ'ল রমণীয়
রবি অস্ত যাবে যদি, তার চেয়ে ভাল অনুদয়।
কেবল একটি রাত্রি, এ রাত্রির স্মৃতি সুমধুর
দিলে যদি আপনারে, ফিরাইয়া লবে কোন্ ছলে,
আপনি নিকটে আসি হেলায় করিবে মোরে দূর
নিজ হাতে মালা গাঁথি সাধিয়া পরালে যার গলে?
এখনও অধর মম তোমার সে অধীর চুম্বনে,
বিহ্বল হইয়া কাঁপে দুনয়ন অশ্রুভারাতুর,
আশ্লেষপরশ তব, সারা অঙ্গে জাগে ক্ষণে ক্ষণে
মিলন মুহূর্ত্ত হবে এখনই কি বিরহ-বিধুর?

আবার আসিও বঁধু আবার আসিও তুমি ফিরে
দু'টি আঁখি প্রতীক্ষায় জেগে রবে বৈতরণীতীরে।

শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়।

বাঙ্গালা সমালোচন-সাহিত্য

বাঙ্গালা দেশে যে-সমস্ত সাহিত্যিকের আবির্ভাব ইংরেজ আগমনের পূর্ব্বে হইয়াছিল, তাঁহাদের মানসিক বিকাশ পরিপূর্ণতা লাভ করে নাই, এবং তাঁহাদের দৃষ্টিও একটি অপরিসর রন্ধ্র-পথে পরিচালিত হইয়া তাঁহাদিগকে গতানুগতিক ও সঙ্কীর্ণ করিয়া রাখিয়াছিল। ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় ইংরেজ-আমলের পূর্ব্বের লেখকদের পুচ্ছগ্রাহী বলিয়াছেন, তাঁহারা পূর্ব্ববর্ত্তী লেখকের অনুকরণ করিয়াই চলিয়াছেন, নিজে কোনও নূতন ধরণের বা বিষয়ের অবতারণা বা সৃষ্টি করিতে পারেন নাই। বাঙ্গালা-সাহিত্যের প্রধান ধারা ছিল মঙ্গলকাব্য—চণ্ডীমঙ্গল, ধর্ম্মমঙ্গল, মনসামঙ্গল, শীতলামঙ্গল, রায়মঙ্গল ও পরবর্ত্তী কালে কৃষ্ণমঙ্গল ও চৈতন্যমঙ্গল। এক এক বিষয় লইয়া একাধিক কবি কাব্য রচনা করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে কাহারও নিজস্ব ব্যক্তিত্ব স্ফুরিত হইবার অবকাশ হয় নাই। গীতিকবিতা এই মঙ্গলকাব্যের প্রতিযোগী সাহিত্য এবং তাহার আদি কবি চণ্ডীদাস যেই পদ রচনা করিলেন, এবং মিথিলা হইতে তাহারই অনুরূপ বিদ্যাপতির পদ এ দেশে আমদানী হইল, অমনি কবির পরে কবি কেবল সেই নির্দ্দিষ্ট পথেই চলিতে আরম্ভ করিলেন, তাহার ছাঁচ ছাড়িয়া নূতন ভঙ্গীতে কিছু রচনা করিতে পারা যায়, ইহা কেহ আর ভাবিয়াও দেখিলেন না। আর একটি ধারা হইতেছে সংস্কৃত কাব্য বা শাস্ত্রের ভাবানুবাদ, যেমন মহাভারত, রামায়ণ, ভাগবত ইত্যাদি। এত যে বিভিন্ন ধরণের ও বিভিন্ন লেখকের রচনা চতুর্দ্দশ শতাব্দী হইতে আরম্ভ করিয়া অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ পর্য্যন্ত প্রচারিত হইল, তাহার দোষ-গুণ কোনও সাহিত্যিক বিচার করিয়া একটিও পুস্তক রচনা করিলেন না, সেই সকল রচনার ভাল-মন্দ বিচারের ভার অর্পিত হইয়াছিল সাধারণ শ্রোতা বা পাঠকদের উপরে, তাহাদের যাহা ভালো লাগিত, তাহা সমাদৃত হইয়া প্রচলিত থাকিত, এবং তাহাদের মনোরঞ্জন করিতে না পারিলে সেই রচনা ধীরে ধীরে বিস্মৃতিতে বিলুপ্ত হইয়া যাইত।

খৃষ্টীয় ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমে যখন এ দেশে শ্রীরামপুরের ক্রিশ্চান মিশনারীরা আসিয়া নিজেদের ধর্ম্মপ্রচারের সুবিধা হইবে বলিয়া বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষা করিবার জন্য বাঙ্গালা-সাহিত্যের সন্ধান করিতে লাগিলেন এবং পুথি সংগ্রহ করিয়া তাঁহাদের প্রতিষ্ঠিত ছাপাখানায় সেইগুলিকে ছাপিয়া প্রকাশ করিতে লাগিলেন, তখন তাঁহারা এই বাঙ্গালা ভাষা শিখিয়া ইংরেজি সাহিত্যের আদর্শে নানা বিষয়ের পুস্তক প্রকাশ করিতে লাগিলেন। ইহার পরে ১৮০০ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইলে গভর্ণমেণ্টের সিভিল সার্ভাণ্টদিগকে বাঙ্গালা শিখাইবার জন্য পাদরী কেরী সাহেব এবং কয়েক জন পণ্ডিত নিযুক্ত হইলেন এবং তাঁহারা গদ্য সাহিত্য সৃষ্টির কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন। ইংরেজদের সংস্পর্শে আসিয়া আমাদের দেশের লোকের বুদ্ধির মুক্তিলাভ হইল এবং তাঁহাদের দৃষ্টির ক্ষেত্রও প্রসারিত হইয়া চলিল।

এই সময়ে আবির্ভূত হইলেন মহামনীষী রাজা রামমোহন রায় এবং তিনি একাকী ত্রি-রথীর সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন—ক্রিশ্চান পাদরী, মুসলমান মৌলবী এবং হিন্দু পণ্ডিতদিগের সহিত তর্ক-বিতর্ক করিয়া সকল ধর্ম্মের সার-সমন্বিত প্রাচীনতম হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করিতে লাগিলেন। এই তর্কযুদ্ধের ফলে আমাদের দেশে প্রথম সমালোচনার উদ্ভব হইল, ইহা তখনও মতের সমালোচনা মাত্র, সাহিত্য-সমালোচনা তখনও আসরে আবির্ভূত হয় নাই।

ইহার পরে শ্রীরামপুরের মিশনারী সাহেবরা সংবাদপত্র

প্রকাশ করিলেন, তাঁহাদের সমাচারদর্পণে (১৮১৮) প্রথম সাহিত্যের সংবাদ, নূতন পুস্তক ও সাময়িক পত্রের বিবরণ এবং বাঙ্গালা ভাষায় বিরচিত পুস্তকগুলির ভাষা সম্বন্ধে নানা কথা প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হইল। ইহার পরে রাজা রামমোহন রায়ের সংবাদকৌমুদী (১৮২১) ও ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়-সম্পাদিত সমাচারচন্দ্রিকা (১৮২২) প্রভৃতি সংবাদ ও সাময়িক পত্রে সাহিত্যের অপরিপুষ্ট সমালোচনা হইতে লাগিল। ইহার পরে ১৮৩১ খৃষ্টাব্দে প্রতিভাবান্ কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত সংবাদ-প্রভাকর প্রকাশ করিলেন এবং তাহাতে সম্পাদক-কবি নিজে এবং অপরাপর লেখকরা সাহিত্যের সমালোচনা করিতে বিশেষভাবে প্রবৃত্ত হইলেন। ইহার পরে অন্যান্য সকল পত্রেই এই ধারা প্রচলিত ও প্রসারিত হইয়া চলিয়াছে।

রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮১৩—১৮৮৫) বিদ্যাকল্পদ্রুম প্রকাশ (১৮৪৬) করিয়া তাহাতে সাহিত্য-সমালোচনা রীতিমত আরম্ভ করিলেন। তাঁহার পরে রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র (১৮২১—১৮৯১) প্রসিদ্ধ সাময়িক পত্র বিবিধার্থ-সংগ্রহ প্রকাশ (১৮৫১) করিয়া তাহাতেও এই সমালোচনার রীতি বজায় রাখিয়া তাহার উন্নতি করিতে সাহায্য করিয়াছিলেন।

সাহিত্য-সমালোচনা করিয়া পুস্তক রচনা ও প্রকাশ সর্ব্বপ্রথমে করেন বোধ হয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় (১৮২০—১৮৯১)। তিনি 'সংস্কৃতভাষা ও সাহিত্য-বিষয়ক প্রস্তাব' নামে একখানি পুস্তক প্রকাশ করেন ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে।

তাঁহার পরে অক্ষয়কুমার দত্ত (১৮২১—১৮৮৭) তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদক হইয়া সেই পত্রে নানা বিষয়ের আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যের আলোচনা করিতে আরম্ভ করেন এবং তাঁহার 'ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়' গ্রন্থের ভূমিকায় সংস্কৃত-সাহিত্য ও ধর্ম্মশাস্ত্রের বিবৃতি ও সমালোচনা করিয়া তাঁহার পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়া গিয়াছেন।

দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ (১৮২০—১৮৮৪) সোমপ্রকাশ পত্রে (১৮৫৮) নিরপেক্ষ সাহিত্যসমালোচনা করিয়া বিশেষ যশস্বী হইয়াছিলেন।

অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয়ের পিতা গঙ্গাচরণ সরকার (জন্ম ১৮২৩) সর্ব্বপ্রথম 'বঙ্গসাহিত্য ও বঙ্গভাষা' নামে বঙ্গসাহিত্যের বিবরণ ও সমালোচনা প্রকাশ করেন (১৮৭৯))।

ইহার পরে রাজনারায়ণ বসু (১৮২৬—১৯০০) 'বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য-বিষয়ক বক্তৃতা' এবং 'বিবিধ প্রবন্ধ' প্রকাশ করেন।

বর্দ্ধমান জেলার রায়না-গ্রাম-নিবাসী কৈলাসচন্দ্র ঘোষ ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে 'বাঙ্গালা সাহিত্য' প্রকাশ করেন।

ভূদেব মুখোপাধ্যায় (১৮২৫—১৮৯৪) 'বিবিধ প্রবন্ধের' মধ্যে সংস্কৃত-সাহিত্যের নিপুণ বিশ্লেষণ ও সমালোচনা করিয়া সমালোচনার একটি আদর্শ স্থাপিত করেন।

সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সেকালের (১৮৩৪—১৮৮৯) 'যাত্রা সমালোচনা' করেন।

কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৩৮—১৯০৩) কবিবর মাইকেলের কাব্য সমালোচনা করিয়া প্রকাশ করেন ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে।

ইহার পরে মহারথ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের আবির্ভাব (১৮৩৮—১৮৯৪)। তিনি তাঁহার যুগান্তরকারী মাসিক-পত্র বঙ্গদর্শনে (১৮৭২) নানা ভাবে সাহিত্যের সমালোচনা করিয়া সাহিত্যের আদর্শকে শুচি ও উন্নত করিয়া তুলেন। তাঁহার বিবিধ প্রবন্ধের মধ্যে তাঁহার সমালোচনা-শক্তির কিঞ্চিৎ পরিচয় আছে। তাঁহার সমালোচনা এক দিকে যেমন কঠোর ছিল, অন্য দিকে আবার খাঁটি জিনিষের সমাদরও তিনি করিয়া গিয়াছেন। সেই জন্য বঙ্গদর্শনে কাহারও প্রশংসালাভ পরম সৌভাগ্য বলিয়া পরিগণিত হইত। কিন্তু যাহার নিন্দা করিতেন, তাহাকে এমন কঠিন ও তীক্ষ্ণ বিদ্রূপে বিদ্ধ করিতেন যে, তাহার মর্ম্মান্তিক ক্লেশ ও ভয় হইত এবং অক্ষম সাহিত্যিক সাহিত্যক্ষেত্রে অনধিকার প্রবেশ করিতে আর সাহস পাইত না। একখানি ক্ষুদ্রকায় পুস্তকের সমালোচন-প্রসঙ্গে তিনি লিখিয়াছিলেন—বইখানির আকার ৪ ইঞ্চি লম্বা ও ৩ ইঞ্চি চৌড়া, ইহা বোধ হয় গলিবরের পকেটে লিলিপুটদের দেশ হইতে আমদানী।

বঙ্কিম বাবুর সমসাময়িক লেখক ও বন্ধু চন্দ্রনাথ বসু (১৮৪৪—১৯১০) অনেকগুলি সমালোচনার পুস্তক লিখিয়া যশস্বী হইয়া আছেন—শকুন্তলা-তত্ত্ব, ত্রিধারা, ভারতরত্নমালা, বর্ত্তমান বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রকৃতি, পশুপতি-সম্বাদ ইত্যাদি।

অক্ষয়চন্দ্র সরকার (জন্ম ১৮৪৫) 'প্রাচীনকাব্য-সংগ্রহ' পুস্তকে বৈষ্ণব-পদাবলীর ও কবিকঙ্কণ চণ্ডীর পরিচয় দিয়াছেন। 'কবি হেমচন্দ্র' পুস্তকে তিনি কবির কাব্যপ্রতিভার

সমালোচনা করিয়াছেন। তাঁহার সম্পাদিত 'নবজীবন' ও 'সাধারণী' পত্রদ্বয়ে তিনি সাহিত্যের সমালোচনা করিয়া সাহিত্যাচার্য্য নামে সম্মানিত হইয়া রহিয়াছেন।

বিহারীলাল সরকার (১৮৫৫—১৯২১) বঙ্গবাসী পত্রের সংস্রবে বহু দিন সাহিত্যের সমালোচনা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার 'শকুন্তলা-রহস্য' চন্দ্রনাথ বসুর 'শকুন্তলা-তত্ত্ব' পুস্তকের পূর্ব্ববর্ত্তী। তাঁহার সম্পাদিত 'ভারতচন্দ্রের গ্রন্থাবলী' ও 'বাঙ্গালীর গান' পুস্তকদ্বয়ে কবিদের কাব্যপ্রতিভার এবং কাব্যের সৌন্দর্য্য-বিশ্লেষণ আছে। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জীবনচরিতের মধ্যেও বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সাহিত্যপ্রতিভার ও কর্ম্মজীবনের বিচার আছে।

রামগতি ন্যায়রত্ন (১৮৩১—১৮৯৪) সর্ব্বপ্রথম বিশদভাবে তৎকালে পরিজ্ঞাত সমস্ত সাহিত্যের ও সাহিত্যিকের পরিচয় দিয়া 'বাঙ্গালাভাষা ও সাহিত্য-বিষয়ক প্রস্তাব' (১৮৭৩) প্রকাশ করেন, এবং এই পুস্তক তাঁহাকে বঙ্গসাহিত্যের সমালোচকদিগের মধ্যে একটি উচ্চ সম্মানিত আসন দিয়াছে।

কালীপ্রসন্ন ঘোষ (১৮৪৩—১৯১১) 'বান্ধব' পত্র প্রকাশ করিয়া তাহাতে সাহিত্য-সমালোচনা করিতে থাকেন। তাহার মধ্যে কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'দশমহাবিদ্যা' কাব্যের সমালোচনা সমধিক প্রসিদ্ধ হইয়া আছে।

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী (১৮৫৩—১৯৩১) মেঘদূত সমালোচনা, বাঙ্গালা-সাহিত্য-সমালোচনা ও সাহিত্য-সমালোচনা সম্বন্ধে পুস্তক ও প্রবন্ধ লিখিয়া গিয়াছেন।

ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৪৯—১৯১০) ঠিক সাহিত্য-সমালোচনা না করিলেও তাঁহার পঞ্চানন্দ ও পাঁচুঠাকুর নামক বইয়ের মধ্যে রঙ্গ-ব্যঙ্গের ভিতর দিয়া তিনি অনেক সাহিত্যিকের সমালোচনা করিয়া গিয়াছেন।

পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী (১৮৪৭—১৯১৯) রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ (১৯০৪) পুস্তকে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধের বঙ্গসমাজ ও সাহিত্যের পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। এই পুস্তকখানিকে সেই সময়ের একখানি উজ্জ্বল দর্পণ বলা যাইতে পারে।

রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় (১৮৪৬—১৮৮৬) 'নানা প্রবন্ধ' লিখিয়া বঙ্গদর্শনে প্রকাশ করিয়াছিলেন।

ত্রৈলোক্যনাথ ভট্টাচার্য্য 'সংস্কৃত-সাহিত্যের ইতিহাস' (১৮৮৫) লিখিয়াছিলেন। বিশ্বেশ্বর দাস লিখিয়াছিলেন 'সংস্কৃত সাহিত্য-বিষয়ক প্রস্তাব'।

রমেশচন্দ্র দত্ত (১৮৪৮—১৯০৯) ইংরেজিতে বঙ্গসাহিত্যের ইতিহাস ও সমালোচনা লিখিয়া বঙ্গসাহিত্যকে বঙ্গের বাহিরে পরিচিত করেন। তাঁহার হিন্দুশাস্ত্র আলোচনাতেও সমালোচন-শক্তি প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন।

কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১) অতি বাল্যকাল হইতেই সমালোচনায় দক্ষতা ও প্রবণতা দেখাইয়া আসিয়াছেন। তাঁহার 'আলোচনা', 'সমালোচনা' নামক দুইখানি পুস্তক বাল্যরচনা হইলেও, তাহার মধ্যে সূক্ষ্ম পর্য্যবেক্ষণ-শক্তি, সাহিত্য-বিচারের উচ্চ আদর্শ, রসজ্ঞতা ও নিপুণ-বিশ্লেষণ-দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায় এবং এখনও অনেক বয়স্ক লেখক সেই রকম লিখিতে পারিলে নিজেকে ধন্য মানিবেন এবং তিনি সাহিত্যক্ষেত্রে স্থায়ী যশ রাখিয়া যাইতে পারিবেন। তাঁহার 'লোকসাহিত্যে' গ্রাম্য কবিদের রচনার আলোচনা, 'প্রাচীন-সাহিত্যে' সংস্কৃতসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কয়েকখানি বই ও চরিত্রের আলোচনা, 'আধুনিক সাহিত্যে' আধুনিক কালের কয়েকখানি খ্যাত ও অখ্যাত বইয়ের সমালোচনা আছে। তাঁহার 'পঞ্চভূত' নামক পুস্তকে সাহিত্য সমাজ রাষ্ট্র মনস্তত্ত্ব প্রভৃতি সমগ্র মানব-জীবনের নানাদিকের তন্ন তন্ন আলোচনা নানা দৃষ্টিকোণ হইতে বিবিধ পরিপ্রেক্ষিতের পরিবেশের মধ্যে করা হইয়াছে। জীবনস্মৃতি ও ছিন্নপত্রের মধ্যে কবি নিজের কাব্য-বিচার করিয়াছেন এবং প্রসঙ্গক্রমে সাহিত্যের নানা দিকের বিচার করিয়াছেন। তাঁহার 'ব্যঙ্গকৌতুকের' মধ্যে ব্যঙ্গের ভিতর দিয়া বহু বিষয়ের সমালোচনা করা হইয়াছে। ইহা ভিন্ন তাঁহার বহু প্রবন্ধ নানা বিষয়ের অসাধারণ সমালোচনায় পূর্ণ হইয়া আছে।

কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ (১৮৬১—১৯০৭) রবীন্দ্রনাথের কড়ি ও কোমল কাব্যের সমালোচনাত্মক বিদ্রূপ করিয়া একটি ছোট কাব্য লেখেন—মিঠেকড়া।

প্রিয়নাথ সেন (মৃত্যু ১৯১৬) পরম রসজ্ঞ সাহিত্য-সমালোচক ছিলেন। তাঁহার প্রবন্ধগুলি তাঁহার পুত্রেরা 'প্রিয়পুষ্পাঞ্জলি' নামে প্রকাশ করিয়াছেন।

রায় বাহাদুর ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন (১৮৬৬) তাঁহার বহু বিখ্যাত বঙ্গভাষা ও সাহিত্য লিখিয়া যশস্বী

হইয়া আছেন। ইহাতে তিনি বহু অজ্ঞাতপূর্ব্ব কবির ও কাব্যের পরিচয় বহু পরিশ্রমে সংগ্রহ করিয়া, অতি বিচক্ষণতার সহিত সমালোচনা করিয়া প্রথম আমাদিগকে জানাইয়াছেন। ইহার পরে তিনি 'রামায়ণী কথায়' রামায়ণের প্রধান চরিত্রগুলির নিপুণ বিশ্লেষণ ও বিচার করিয়াছেন। এই সব সমালোচনার ভাষা যেমন সুমিষ্ট, তেমনই বিষয়োপযোগী হইয়াছে। এই সব বই পড়িতে পড়িতে একই সঙ্গে সমালোচনার বিচার, বিশ্লেষণ ও কাব্য-রসাস্বাদ উপভোগ করা যায়। ইহার পরে তিনি 'ঘরের কথা ও যুগসাহিত্য', ময়মনসিংহ গীতিকার সৌন্দর্য্য-বিশ্লেষণাত্মক সমালোচনা প্রভৃতি বহু পুস্তক ও প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন।

দেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী ১৮৫৩—১৯২০) তাঁহার সম্পাদিত নব্যভারত মাসিকপত্রে 'সঙ্গণিকা' নামে প্রতি মাসে বহু বিষয়ের এবং প্রধানতঃ সাহিত্যের সমালোচনা করিতেন। এই নব্যভারতে আরও দুই জন লেখক সমালোচনা করিয়া ও সাহিত্যবিচার করিয়া নাম করিয়াছেন—ক্ষীরোদচন্দ্র রায় এবং সত্যসুন্দর দাস ছদ্মনামে কবি মোহিতলাল মজুমদার।

ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায় 'শারদীয় সাহিত্য' এবং পূর্ণচন্দ্র বসু 'কাব্যসুন্দরী,' 'কাব্যচিন্তা,' 'সাহিত্যচিন্তা' রচনা করিয়া এককালে সাহিত্য-সমালোচক বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছিলেন।

ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'আর্ট ও সাহিত্য' সম্বন্ধে পুস্তক লিখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার বহু সমালোচনাত্মক প্রবন্ধও আছে।

রামদয়াল মজুমদার 'কৈকেয়ী' নামক পুস্তকে কৈকেয়ীর চরিত্র সমালোচনা করিয়াছেন। নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত 'বিদ্যাপতি' সম্পাদন করিয়া তাহার ভূমিকায় বিদ্যাপতি সম্বন্ধে বহু আলোচনা করিয়াছেন এবং তাঁহার গোবিন্দদাস সম্বন্ধীয় বিতর্ক, উর্ব্বশী সম্বন্ধীয় প্রবন্ধ প্রভৃতি নানা মাসিকপত্রে বিক্ষিপ্ত হইয়া আছে।

বীরেশ্বর পাঁড়ে (১৮৪২—১৯১১) কবি নবীনচন্দ্র সেনের কাব্যত্রয় রৈবতক, কুরুক্ষেত্র ও প্রভাস সমালোচনা করিয়া 'ঊনবিংশ শতাব্দীর মহাভারত' নামে পুস্তক প্রকাশ করেন। হীরেন্দ্রনাথ দত্তও নবীনচন্দ্র সেনের কাব্যের প্রশংসাসূচক সমালোচনা লিখিয়াছিলেন।

সুরেশচন্দ্র সমাজপতি তাঁহার সাহিত্যপত্রে তীক্ষ্ণ ও বিদ্রূপ-বিদ্ধ সমালোচনা করিয়া সাহিত্যিকদের ভীতি ও শ্রদ্ধার পাত্র হইয়াছিলেন।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায় (১৮৬৩—১৯১৩) রবীন্দ্রনাথের 'সোনার তরী' কবিতার কঠোর বিদ্রূপাত্মক সমালোচনা করেন, আবার 'যেতে নাহি দিব' কবিতার উচ্ছ্বসিত প্রশংসাসূচক সমালোচনা করিয়া নিজের নিরপেক্ষতা প্রমাণ করিতে চাহিয়াছিলেন। তাঁহার কালিদাস ও ভবভূতি পুস্তকে ঐ দুই কবির কাব্য-নাটকের সৌন্দর্য্যবিশ্লেষণ ও চরিত্র-সমালোচন আছে।

বিজয়চন্দ্র মজুমদার (১৮৬১) রবীন্দ্রনাথের নাট্য-কাব্য চিত্রাঙ্গদার বিরুদ্ধ সমালোচনা করেন। কালিদাস, গণেশ ঠাকুর, শিব, দুর্গা প্রভৃতি সাহিত্য, দেবতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব, মনস্তত্ত্ব, প্রত্নতত্ত্ব ইত্যাদি বহু বিষয়ের সমালোচনা করিয়া তিনি দেশ-বিদেশে বিখ্যাত হইয়াছেন।

চিত্তরঞ্জন দাশ (১৮৭০—১৯২৫) তাঁহার সম্পাদিত 'নারায়ণ' পত্রে সাহিত্য সমালোচনা করেন এবং বৈষ্ণব কবিতা সম্বন্ধে সমালোচনা করিয়া একটি পুস্তিকা প্রকাশ করেন।

বিপিনচন্দ্র পাল কবি অক্ষয়কুমার বড়ালের 'এষা' ও 'শঙ্খ' কাব্যের প্রশংসাসূচক সমালোচনা করেন।

হারাণচন্দ্র রক্ষিত (১৮৭২—?) 'বঙ্গসাহিত্যে বঙ্কিম', 'ভিক্টোরিয়া যুগের বঙ্গসাহিত্য' প্রভৃতি পুস্তক প্রণয়ন করিয়া সাহিত্যক্ষেত্রে সুপরিচিত হইয়াছিলেন।

যতীন্দ্রনাথ দত্ত রচনা করেন 'বঙ্গসাহিত্যে হেমচন্দ্র'।

ধর্ম্মানন্দ মহাভারতী সাহিত্য সম্বন্ধে অনেক প্রবন্ধ লেখেন এবং সেগুলি ধর্ম্মানন্দ-প্রবন্ধাবলীর অন্তর্গত হইয়া আছে।

রাজকুমার বসু 'কবি কালিদাস', সুরেশচন্দ্র সেন 'কাব্য-কথা' রচনা করিয়াছেন।

মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি (মৃত্যু ১৯১২) 'অনুসন্ধান', 'পুরোহিত', 'অনুশীলন' প্রভৃতি পত্র সম্পাদন করেন এবং তাহাতে তিনি সাহিত্যবিষয়ক বিবিধ প্রবন্ধ লেখেন। তিনি বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকাতেও প্রাচীন সাহিত্য সম্বন্ধে কয়েকটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। তিনি অক্ষয়কুমার দত্তের জীবন-চরিত লিখিয়া অক্ষয়কুমারের সাহিত্য-প্রতিভা সম্বন্ধে সমালোচনা করিয়া গিয়াছেন।

যোগীন্দ্রনাথ বসু (১৮৫৭—১৯২৭) মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনচরিত লিখিবার প্রসঙ্গে কবির সমস্ত কাব্যের ও নাটকের দোষগুণ নির্ণয় করিয়া নিপুণ সমালোচনশক্তি প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন।

চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জীবনচরিত লিখিয়া তাহাতে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সাহিত্য-সৃষ্টির ইতিহাস দিয়াছেন।

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী (১৮৬৪—১৯১৯) বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরের গ্রন্থাবলীর ভূমিকায়, শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের ভূমিকায় এবং চরিতকথা প্রভৃতি পুস্তকে তাঁহার সাহিত্যবোধ ও সমালোচনশক্তির পরিচয় দিয়া গিয়াছেন।

যামিনীকান্ত সেনের 'আর্ট ও আহিতাগ্নি' আর্ট সমালোচনার একখানি উৎকৃষ্ট পুস্তক।

গিরিজাপ্রসন্ন রায়চৌধুরী (১৮৬২—১৮৯৫) 'বঙ্কিমচন্দ্র' নামক পুস্তক লিখিয়া বঙ্কিম বাবুর সমস্ত উপন্যাসের সমালোচনা করেন।

ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের নানা দিক সমালোচনা করিয়াছেন। তাঁহার কপালকুণ্ডলা-তত্ত্ব 'কৃষ্ণকান্তের উইলে বঙ্কিমচন্দ্র', 'কাব্যসুধা', 'সখী', 'সাধুভাষা বনাম চলিতভাষা', 'বানান-সমস্যা', 'ব্যাকরণ-বিভীষিকা', 'ফোয়ারা' প্রভৃতি পুস্তক সাহিত্য ও ভাষা-সম্বন্ধীয় আলোচনায় সমৃদ্ধ।

বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৭০—১৮৯৯) সাহিত্য, সমাজ, আর্ট ইত্যাদি বহু বিষয়ের প্রবন্ধ লিখিয়া অল্পবয়সেই বিশেষ যশস্বী হইয়া উঠিয়াছিলেন।

সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'সাধনা' মাসিক পত্রে প্রবন্ধ লিখিতেন এবং পরে 'প্রসঙ্গ' নামে তাঁহার প্রবন্ধ-পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে।

সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ (১৮৭০—১৯২০) 'ভবভূতি ও তাঁহার কাব্য' ইত্যাদি সম্বন্ধে পুস্তক ও প্রবন্ধ লিখিয়া গিয়াছেন।

কেদারনাথ মজুমদার (১৮৭০—১৯২৮) 'বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্য,' 'রামায়ণের সমাজ' নামক দুইখানি বৃহৎ পুস্তক তাঁহার গবেষণার ও সমালোচনার প্রকৃষ্ট পরিচয়।

নিত্যকৃষ্ণ বসুর 'সাহিত্যসেবকের ডায়ারি'র মধ্যে অনেক কবি ও কাব্যের ও সাহিত্যের সমালোচনা আছে।

অমৃতলাল গুপ্ত রবীন্দ্রনাথের কবিতার রস ও ভাব বিশ্লেষণ করিয়া কয়েকটি প্রবন্ধ নানা মাসিকপত্রে লিখিয়াছিলেন। সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তীও রবীন্দ্রকাব্য সমালোচনা করিয়াছেন। মোহিতচন্দ্র সেন রবীন্দ্রনাথের কাব্যগ্রন্থাবলী সম্পাদন করিয়াছিলেন এবং তাহার ভূমিকায় তিনি কবির কাব্য সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছিলেন। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় রবীন্দ্রনাথের 'চিত্রা' কাব্যের সমালোচনা করিয়াছিলেন। হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ রবীন্দ্রনাথের 'চৈতালী' কাব্যের বিরুদ্ধ সমালোচনা করেন এবং তাঁহার আরও অনেক অন্য সমালোচনাও আছে।

হরিমোহন মুখোপাধ্যায় বঙ্গভাষার লেখকদের পরিচয় একত্র পুস্তকাকারে প্রকাশ করিয়াছেন। অনাথকৃষ্ণ দেব বঙ্গের কবিতার সমালোচনা ও পরিচয় দিয়াছেন।

উমেশচন্দ্র বটব্যাল (১৮৫২—১৮৯৮) 'বেদপ্রবেশিকা' লিখিয়া তাহাতে বেদের সম্বন্ধে বহু গবেষণা করিয়া গিয়াছেন।

আবদুল করিম সাহিত্য-বিশারদ (১৮৭৪) প্রাচীন পুথির বিবরণ, গোরক্ষবিজয় কাব্যের ভূমিকা ইত্যাদি লিখিয়া প্রাচীন সাহিত্যের সহিত আমাদের পরিচয়সাধন করিতেছেন।

সতীশচন্দ্র রায় (১৮৮১—১৯০৪) অতি অল্পবয়সেই সমালোচনদক্ষতা দেখাইয়া মাত্র কয়েকটি সমালোচনা করিতে পারিয়াছিলেন। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'স্বপ্নপ্রয়াণ' কাব্যের ও রবীন্দ্রনাথের 'ক্ষণিকা' কাব্যের সমালোচনা এবং ইংরেজ কবি রবার্ট ব্রাউনিঙের "প্যারাসেল্‌সাস" কাব্য ও 'আরো একটি কথা' নামক কবিতার তিনি সমালোচনা ও বিশ্লেষণ করিয়া বিশেষ নিপুণ সাহিত্যরসজ্ঞ বলিয়া আজও সমাদৃত হইতেছেন।

অজিতকুমার চক্রবর্ত্তী 'রবীন্দ্রনাথে', 'কাব্যপরিক্রমা,' 'বাতায়ন' প্রভৃতি পুস্তকে তাঁহার সমালোচনা করিবার অসাধারণ ক্ষমতার পরিচয় রাখিয়া গিয়াছেন। তিনি যেরূপ নিপুণতার সহিত রবীন্দ্র-কাব্য-সাহিত্যের সমালোচনা ও সৌন্দর্য্য উদ্‌ঘাটন করিয়া গিয়াছেন, তাহা আজ পর্য্যন্ত অনতিক্রমণীয় হইয়া আছে।

ইন্দুপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায় অকালে জার্ম্মাণীর সঙ্গে যুদ্ধের সময়ে জার্ম্মাণ ডুবো জাহাজ হইতে টরপেডো আঘাতে লুসিটেনিয়া জাহাজ ডুবি হইয়া মারা যান। তিনি শিক্ষা

সমাপ্ত করিয়া আমেরিকা হইতে দেশে ফিরিতেছিলেন। ইনি অল্পদিনেই তাঁহার সাহিত্যসেবার দ্বারা সুপরিচিত হইয়া উঠিতেছিলেন। ইঁহার রচিত সদ্ভাবশতক-প্রণেতা 'কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের জীবনী', 'কবি রবীন্দ্রনাথের ঋষিত্ব', 'বঙ্গসাহিত্যের এক পৃষ্ঠা', 'কবি বলদেব পালিত' ইত্যাদি পুস্তকে তিনি তাঁহার সাহিত্যরসজ্ঞতা ও সমালোচনাশক্তির পরিচয় দিয়া গিয়াছেন।

নবকৃষ্ণ ঘোষের 'দ্বিজেন্দ্রলাল', দেবকুমার রায়চৌধুরীর 'দ্বিজেন্দ্রলাল', হেমচন্দ্র আচার্য্যের 'স্বভাবকবি গোবিন্দদাস' বই তিনখানি কবিদের জীবনকথার আলোচনা-প্রসঙ্গে কবিপ্রতিভারই সমালোচনা।

অমরেন্দ্র রায় 'রবিয়ানা' লিখিয়া কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথের রচনা হইতে অসঙ্গতি ও বিরুদ্ধ উক্তি দেখাইয়া তাঁহাকে নিন্দা ও বিদ্রূপ করিয়াছিলেন। কিন্তু বিষয় হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া একাংশ উদ্ধৃত করিলে সকলের লেখা হইতেই অসঙ্গতি ও বিরুদ্ধতা দেখানো যায়। এই বইখানি রবীন্দ্রনাথের নিন্দুক মহলে দিনকতক বেশ প্রসার জমাইয়া লইয়াছিল। কিন্তু ইহার মধ্যে কোনো পদার্থ না থাকাতে ইহার অকালমৃত্যু হইয়াছে, ইহা নামশেষ হইয়া আছে।

রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ 'কবি ভবভূতি, কালিদাস, শ্রীকণ্ঠ বা মাঘ' প্রভৃতি কাব্যের সৌন্দর্য্য বিশ্লেষণ ও সমালোচনা করেন। তিনি পরবর্ত্তী কালে ধারাবাহিকভাবে বাঙ্গালা-সাহিত্যের ইতিহাস লিখিতেছিলেন।

রায় বাহাদুর যতীন্দ্রমোহন সিংহ রবীন্দ্রনাথের লেখা উপন্যাস ও গল্পের মধ্যে অশ্লীলতার আভাস পাঁইয়া 'সাহিত্যের স্বাস্থ্যরক্ষা' করিবার জন্য সাহিত্যক্ষেত্রে কিছুদিন শোরগোল করিয়াছিলেন এবং তাহার জের এখনো মিটে নাই।

জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস মেঘনাদবধ কাব্য অতি বিচক্ষণ নিপুণতার সঙ্গে সম্পাদন করিয়া বাঙ্গালা বইয়ের মর্য্যাদা বৃদ্ধি করিয়াছেন। ইহাতে তাঁহার যেমন পাণ্ডিত্যের প্রকাশ আছে, সঙ্গে সঙ্গে তেমনি কাব্যরসাস্বাদনশক্তিরও পরিচয় আছে। এই বইখানি বাঙ্গালা সাহিত্যের এক অমূল্য সম্পদ। কিন্তু দুঃখের বিষয়, ইহার প্রকাশক মহাশয়রা আর ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ করা আবশ্যক বিবেচনা করেন নাই।

রায় বাহাদুর দীননাথ সান্যাল জ্ঞানেন্দ্র বাবুর পদাঙ্কানুসরণ করিয়া তাঁহারই আহৃত উপকরণের ঈষৎ অদল-বদল করিয়া পরে মেঘনাদবধকাব্য সম্পাদন করিয়াছেন। তিনি অবশ্য ইহার পরে বীরাঙ্গনা ও ব্রজাঙ্গনা কাব্যের সটীক সুন্দর সংস্করণ প্রকাশ করিয়াছেন এবং কুমারসম্ভবকাব্যেরও সমালোচনা ও সৌন্দর্য্যবিশ্লেষণ করিয়াছেন।

একরামউদ্দীন 'রবীন্দ্রপ্রতিভা' লিখিয়া রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ নাটক বিসর্জ্জনের অতি নিপুণ সমালোচনা ও বিশ্লেষণ করিয়াছেন। তাঁহার কৃষ্ণকান্তের উইল সমালোচনাও উপাদেয় গ্রন্থ।

শশাঙ্কমোহন সেন (১৮৭৩—১৯২৮) 'বঙ্গবাণী' পুস্তকে বঙ্গসাহিত্যের ও 'বিশ্ববাণী' নামক পুস্তকে বিশ্বসাহিত্যের (বিশেষ করিয়া ইংরেজি কাব্যসাহিত্যের) সমালোচনা ও রসগ্রহণ দক্ষতার সহিত করিয়াছেন। তাঁহার 'মধুসূদন' গ্রন্থেও কবি মাইকেল মধুসূদনের কবিপ্রতিভার ও কাব্যের নিপুণ বিচার ও বিশ্লেষণ আছে। কিন্তু তাঁহার আড়ষ্ট দুরূহ সংস্কৃতশব্দে ভারাক্রান্ত ভাষার জন্য তাঁহার এমন তিনখানি বইয়ের যথোচিত সমাদর হয় নাই। কিন্তু এই বই তিনখানি বঙ্গসাহিত্যের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

শিবরতন মিত্র (১৮৭১) বঙ্গীয় সাহিত্যসেবক নামে সাহিত্যসেবকদিগের পরিচয়ের একটি অভিধান সঙ্কলন করিতেছিলেন। তাহা কিছুদূর অগ্রসর হইয়া স্থগিত হইয়া গিয়াছে। ইহা আমাদের বঙ্গবাসী শিক্ষিত সম্প্রদায়ের লজ্জার কথা। এই পুস্তকে তিনি বহু লেখকের অজ্ঞাত জীবনকাহিনী, ইতিহাস, পুস্তকাবলীর নাম এবং বঙ্গসাহিত্যে তাঁহাদের স্থান নিরূপণ করিতেছিলেন। শুনিতেছি যে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ইহা বর্দ্ধিত পূর্ণতর আকারে প্রকাশ করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন। ইহা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয় বহু সৎকার্য্যের মধ্যে এই আর একটি সৎকার্য্য করিবেন এবং ইহার জন্য বর্ত্তমান ভাইস-চ্যান্সেলার শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বঙ্গবাসীর কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদভাজন হইয়া থাকিবেন।

সরোজরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় 'প্রাচীন বাঙ্গালাসাহিত্যের প্রকৃতি', অধ্যাপক রাধাকমল মুখোপাধ্যায় 'বর্ত্তমান বাঙ্গালাসাহিত্য' সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া প্রবন্ধ প্রকাশ করেন।

আধুনিক কালে বহু বিচক্ষণ সমালোচকের আবির্ভাব

হইয়াছে ও হইতেছে। ইহা বঙ্গসাহিত্যের পক্ষে বিশেষ আশার লক্ষণ। সমালোচনার দ্বারা লেখক নিয়ন্ত্রিত হন, পাঠকরাও তাঁহাদের রচনার ভালমন্দ বিচার করিয়া ভাল রচনার আস্বাদ ভাল করিয়া পাইয়া আনন্দিত হইতে পারেন। বর্ত্তমান সমালোচকদের মধ্যে প্রথম ও প্রধানভাবে নাম করিতে হয়—বীরবলের অর্থাৎ প্রমথ চৌধুরী মহাশয়ের। তাঁহার লেখা দেশী-বিদেশী সাহিত্যের রসবিশ্লেষণ পরম উপাদেয় ও উপভোগ্য।

পরশুরাম রঙ্গ-ব্যঙ্গের ভিতর দিয়া যে সমালোচনাশক্তি দেখাইয়াছেন, তাহার বহু অক্ষম অনুকরণ হইয়াছে, কিন্তু পরশুরামের যশ ও শক্তি অনতিক্রমণীয় হইয়া আছে।

প্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কেবল রসসাহিত্যেরই স্রষ্টা নহেন, তিনি 'নারীর মূল্য'ও নির্দ্ধারণ করেন এবং 'স্বদেশ ও সাহিত্য' সম্বন্ধে প্রবন্ধও লেখেন।

কবি কালিদাস রায়ের সাহিত্য-বিষয়ক প্রবন্ধাবলী 'সাহিত্য-প্রসঙ্গ' কেবলমাত্র প্রসঙ্গ নহে, সাহিত্যের মর্ম্ম ও রসের উৎসের সন্ধান দিয়াছে।

নলিনীকান্ত গুপ্তের 'সাহিত্যিকা', নরেশচন্দ্র সেনগুপ্তের 'আহুতি' অতি উচ্চাঙ্গের পুস্তক।

কাজী আবদুল ওদুদের 'সমাজ ও সাহিত্য' এবং ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহর 'ভাষা ও সাহিত্য' পুস্তকদ্বয়ে সাহিত্যের নানা দিকের আলোচনা আছে।

অক্ষয়কুমার দত্তগুপ্তের 'বঙ্কিমচন্দ্র', রামসহায় বেদান্তশাস্ত্রীর 'বঙ্কিমচিত্র' বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যসৃষ্টির সৌন্দর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিবার পক্ষে বিশেষ সহায়তা করে।

রাধারমণ চক্রবর্ত্তী ও সত্যকিঙ্কর মুখোপাধ্যায় 'চন্দ্রশেখর-তত্ত্ব' লিখিয়া বঙ্কিমচন্দ্রের একখানি উপন্যাসের সৌন্দর্য্য ও বিশেষত্ব উদঘাটন করিয়াছেন।

অবিনাশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ও হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত 'গিরিশ-প্রতিভা' বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়াছেন।

এক রবীন্দ্র-সাহিত্য সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া আধুনিক কালে বহু পুস্তক বিরচিত হইয়াছে। তাহাদের কতকগুলির নাম নির্দ্দেশ করিতেছি। 'জয়ন্তী-উৎসর্গ' বহু লেখকের বহু দিক হইতে রবীন্দ্র-সাহিত্য পর্য্যবেক্ষণের ফলসমষ্টি। 'কবি-পরিচিতি'ও এইরূপ। যতীন্দ্রনাথ সেন কবির 'কাব্য-পরিমিতি' কাব্যের মূল তত্ত্ব ও রসের পরিমাণ নির্দ্ধারণ করিয়াছে এবং বহুলভাবে রবীন্দ্রনাথের লেখা হইতে উদাহরণ ইহাতে দেওয়া হইয়াছে। বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়ের 'বিদ্রোহী রবীন্দ্রনাথ', প্রিয়লাল দাসের 'রবীন্দ্রনাথ' ও 'এবার কবি', সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তের 'রবি-দীপিতা', যোগেশচন্দ্র বর্ম্মণ রায়ের 'কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথের আদর্শ', কাজী আবদুল ওদুদের 'রবীন্দ্র কাব্যপাঠ', ননীলাল ভট্টাচার্য্যের 'রবীন্দ্রনাথের কাব্য', শিবকৃষ্ণ দত্তের 'রবীন্দ্রসাধনা', বিশ্বপতি চৌধুরীর 'কাব্যে রবীন্দ্রনাথ', ভারতচন্দ্র মজুমদারের 'জাতিগঠনে রবীন্দ্রনাথ', অপ্রকাশিতনামা লেখকের 'রবীন্দ্রসাহিত্যে ভারতের বাণী', ভোলানাথ সেনগুপ্তের 'রক্তকরবীর মর্ম্মকথা', 'অপ্রকাশিতনামা লেখকের 'গীতাঞ্জলি-সমালোচনা' এবং সাত জন 'সমসাময়িক কবির চোখে রবীন্দ্রনাথ', প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'রবীন্দ্র-জীবনী' প্রভৃতি রবীন্দ্র-সাহিত্যের বহু দিকের সৌন্দর্য্য, ঐশ্বর্য্য ও বিচিত্রতা পাঠকের সম্মুখে সুন্দরভাবে সুপরিস্ফুট করিয়া ধরিয়াছে।

সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্তের 'রবীন্দ্রনাথ', 'শরৎ-প্রতিভা' ও 'শরৎচন্দ্র' অতি উপাদেয় বই। ইহাতে নিপুণ ও সূক্ষ্ম সমালোচনা স্থান পাইয়াছে। অবনীনাথ রায়ের 'পাঁচমিশেলি' বইও রবীন্দ্রনাথের ও শরৎচন্দ্রের সাহিত্য-সমালোচনার সমষ্টি।

আধুনিক কালে বহু লেখক সূক্ষ্ম সমালোচনার পরিচয় দিতেছেন। তাঁহাদের সকলের নাম ও পরিচয় দেওয়া এখন ক্রমে দুঃসাধ্য ব্যাপার হইয়া উঠিতেছে। ইহা বঙ্গ-সাহিত্যের পরিপুষ্টির পক্ষে শুভ লক্ষণ। আমার এই প্রবন্ধ কেবল সাহিত্য-সমালোচনার একটি মোটামুটি ইতিহাসের দিগ্‌দর্শন মাত্র। ইহাতে অনেক দক্ষ সমালোচকের নাম হয় ত বাদ পড়িয়া গিয়াছে। তাহা যে ইচ্ছাকৃত নহে, অনবধানতা বা অজ্ঞানতাবশতঃ, তাহা জানাইয়া এই প্রবন্ধ শেষ করিতেছি। পরবর্ত্তী কোনো বিশেষ সন্ধানী লেখক আমার এই প্রবন্ধটিকে পাদপীঠ করিয়া যশের সিংহাসনে আরোহণ করিলে আমি নিরতিশয় সুখী হইব।

চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

[উপন্যাস]

বৈকালের দিকে কালবৈশাখীর ঝড়ে চারিদিক অন্ধকার হইয়া যাইবার পর সেই যে বৃষ্টির ধারা নামিয়াছে, তাহার আর বিরাম নাই। সাতটায় সন্ধ্যা, কিন্তু আকাশ এমনই মেঘাচ্ছন্ন যে, ছ'টা বাজিতে-না বাজিতেই অন্ধকার ঘনাইয়া আসিয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে অবিশ্রান্ত বারিবর্ষণ। সহরের পথঘাট কোথাও কোথাও জলমগ্ন, বিশেষ বালিগঞ্জ অঞ্চলে কোন কোন যায়গায় বাগানবাড়ীর পুকুরের জল ছাপাইয়া রাস্তার জলের সহিত একসা হইয়া গিয়াছে। সে দুর্য্যোগে পথে কুকুর-বিড়ালও বাহির হয় নাই, কেবল মাঝে মাঝে দুই একখানা মোটর-ট্যাক্সি ষ্টীমলঞ্চের মত জল কাটিয়া যাতায়াত করিতেছিল, তাহাদের ছিটানো জল দুই পাশের বাগানবাড়ীর ফটক পর্য্যন্ত পৌছিতেছিল। বর্ষার জলস্রোতের কলকল আওয়াজের সঙ্গে ভেকের মকমকানি পল্লীর নীরবতা ভঙ্গ করিতেছিল।

এই আধ ঘণ্টা আগে অসহ্য গুমোটে লোকের প্রাণ অতিষ্ঠ হইয়াছিল, বিজলী-পাখার হাওয়াও গরম লাগিতেছিল, প্রকৃতির লীলাবৈচিত্র্যে মুহূর্ত্ত ধারাবর্ষণে ধরিত্রী শীতল হইল, ঠাণ্ডা জোলো হাওয়ায় গায়ে কাপড় দিতে হইল।

বসিবার ঘরে জানালার ধারে একখানা ইজি-চেয়ারে অঙ্গ ঢেলাইয়া হিরণী একান্তে বহিঃপ্রকৃতির এই রুদ্রতাণ্ডব উপভোগ করিতেছিল। ভ্রাতৃজায়া অসুস্থ, ভ্রাতা গৃহে অনুপস্থিত, কাজেই সে একাকিনী। প্রথমে টলষ্টয়ের একখানি উপন্যাসে সে নিবিষ্টচিত্ত ছিল, কিন্তু ঝড় উঠিলে অন্ধকার ঘরে, যখন খানসামারা সাসী-খড়খড়ি বন্ধ করিতে আসিল, তখন হিরণী কেবল একটা জানালার সাসীটি বন্ধ করিতে বলিয়া কেতাব ফেলিয়া ঝড়ের সংহারমূর্ত্তির পানে তাকাইয়া মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় বসিয়া রহিল—সে ঝঞ্ঝা-বৃষ্টি বড় ভালবাসিত।

মেঘের গুরুগুরু গর্জ্জন, ঝুপ-ঝুপ অবিরল বর্ষণ, মাঝে মাঝে কড়-কড় শব্দে বজ্র-পতন। প্রকৃতির প্রলয়-নৃত্যের এই গাম্ভীর্য্যের শোভা হিরণীর বড় মিষ্ট লাগিতেছিল। চিন্তাধারার যোগসূত্র তাহার মনকে অতীতের কোন যুগ-যুগান্তরে বিরহী যক্ষের বর্ষার বিরহব্যথার অমর বর্ণনার দিকে টানিয়া লইয়া যাইতেছিল কি?

এক ঘণ্টা মুষলধারে বৃষ্টিপাতের পর হঠাৎ বৃষ্টির বেগ থামিয়া আসিল। তখন হিরণীদের সুবৃহৎ ঘুমন্ত পুরীর সমস্ত অভ্যন্তরভাগ যেন গল্পের রাজপুত্রের সোণার কাঠির স্পর্শে বাঁচিয়া উঠিয়া আলোক-সজ্জায় হাসিতে লাগিল। রাজপথে তখন একটিও আলোক জ্বলে নাই। অন্ধকারে সবই ঝাপসা দেখাইতেছিল।

হঠাৎ খানসামা দ্বারপথে আসিয়া মৃদুস্বরে বলিল,—"দিদিমণি!"

হিরণী পশ্চাতে ফিরিয়া বলিল, "কি চাও, মধু?"

মধু মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে বলিল, "না দিদিমণি, এমন কিছু না। এক জন লোক বাবুর সঙ্গে দেখা করতে চায়।"

হিরণী বিস্মিত হইয়া বলিল, "দেখা করতে চায়? এই জল-ঝড়ে? তা ষ্টুডিওতে নিয়ে যাও, এখানে কেন? দাদা হয় ত ফিরে এসেছেন।"

মধু বলিল, "আজ্ঞে না, বাবু ত ফেরেন নি।"

হিরণী বলিল, "তা আমি কি করতে পারি? তিনি চাইছেন দাদাকে। ওখানেই নিয়ে গিয়ে বসাও, দাদা এখনই আসবেন।"

মধু নড়ে না। হিরণী উত্তরোত্তর বিস্মিত হইয়া বলিল, "কি, দাঁড়িয়ে রইলে যে?"

মধু পুনরপি মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে বলিল, "আজ্ঞে, আজ্ঞে"—

হিরণী বলিল, "কি, কিছু বলতে চাও?"

মধু বলিল, "বড্ডো ভিজে এসেছেন মেয়েলোকটি দিদিমণি, একেবারে নেয়ে বল্‌লেই হয়"—

হিরণী উঠিয়া বসিল, সবিস্ময়ে বলিল, "মেয়েছেলে? কে সে? কি চায়?"

মধু বলিল, "তা ত জানি নি, দিদিমণি—দেখতে শুনতে ভদ্দর লোকের ঘরের মেয়ে, তবে বড্ড গরীব ব'লে মনে হোলো,—বোধ হয়, কিছু ভিক্ষে শিক্ষে করতে এসেছেন। নইলে এই জলঝড়ে—"

হিরণী বলিল, "আচ্ছা, নিয়ে এস এখানে।"

মধু চলিয়া গেলে হিরণীর ভ্রূ কুঞ্চিত হইল। সে ভাবিতেছিল, কে এই নারী? এই দুর্য্যোগে দাদার কাছে তাহার কি এমন জরুরী দরকার?

আগন্তুকাকে পৌঁছাইয়া দিয়া মধু চলিয়া যাইতেছিল, হিরণী ইঙ্গিতে নিষেধ করিয়া অন্দর হইতে এক জন দাসীকে ডাকিয়া দিতে বলিল। তাহার পর আগন্তুকার দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল, "ইস্! একবারে ভিজে নেয়ে এসেছেন যে! তা, এ দুর্য্যোগে না এলেই হোতো না?" কথাটায় একটু অনুযোগের সুর ছিল।

আগন্তুকার মুখে চোখে দুঃখ, ক্ষোভ বা ক্রোধ,—কোন লক্ষণই প্রকাশ পাইল না। তাহার মুখের ভাব দেখিয়া মনে হইল, সে যেন এ সকল অনুভূতির অতীত, যেন কোন কিছুতেই তাহার আগ্রহ বা ঔৎসুক্য নাই। সে দ্বারপ্রান্তে দাঁড়াইয়াছিল,—যদি তাহার বসনাঞ্চলের জলধারায় কক্ষের মূল্যবান্ কার্পেটখানি নষ্ট হইয়া যায়!

সে উদাসভাবে বলিল, "জল-ঝড়ে আমাদের কিছু হয় না। খুব দায়ে পড়েই এসেছি। আপনারা বড়লোক, গরীবের দরকারের কথা বুঝতে পারবেন না।"

দাসী এই সময়ে ঘরে আসিয়াছিল। হিরণী বলিল, "আগে আপনি এর সঙ্গে গিয়ে কাপড় ছেড়ে আসুন, তার পর আপনার কথা শুনবো। যান, দাঁড়িয়ে রইলেন যে? আমি কোন ওজর আপত্তি শুনবো না। কান্তর মা, তুমি এঁকে চানের ঘরে নিয়ে গিয়ে কাপড়-চোপড় ছাড়িয়ে নিয়ে এস, বুঝেছো? আমার জামা-কাপড় ঠিক হবে'খন।"

আগন্তুকা তবুও নড়ে না। সে কম্পিতকণ্ঠে বলিল, "আপনার কাপড় আমায় পরতে দেবেন? আমার পরিচয়—"

হিরণী অধীরভাবে বাধা দিয়া বলিল, "আপনি যেই হোন, মানুষ ত! যান, আপনার কোন কথা শুনবো না।"

কান্তর মা আগন্তুকাকে সঙ্গে লইয়া অন্দরের দিকে চলিয়া গেল। তখন বর্ষার প্রবল ধারা থামিয়াছে, বর্ষণলঘু মেঘের অঙ্গ হইতে বৃষ্টির জল ফোঁটা ফোঁটা ঝরিয়া পড়িতেছিল। হিরণী ভাবিতেছিল, এই অল্পবয়স্কা রমণী একাকিনী এই দুর্য্যোগে তাহার দাদার কাছে কি প্রয়োজনে আসিয়াছে? তবে কি—

সে ডাকিল, "মধু!"

মধু আসিলে সে বলিল, "চা—গরম—এখনই।"

মধু দৌড় দিল। এ বাড়ীতে বরং মনিব বা মনিব-গৃহিণীর আদেশ-পালনে বিলম্ব ঘটিলে পার আছে, কিন্তু দিদিমণির?

বেশপরিবর্ত্তনান্তে আগন্তুকা বসিবার ঘরে ফিরিয়া আসিল। তখন তাহার সহজকান্তি বিজলীর আলোকে যেন শতগুণ ফুটিয়া উঠিয়াছিল। হিরণী তাহাকে বসিতে বলিয়া চায়ের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিল, "চা খান ত? কিছু ফল মিষ্টি?"

আগন্তুকার সহজেই অপ্রসন্ন মুখ ঈষৎ প্রসন্ন হইয়া মুহূর্ত্তে ম্লান হইয়া গেল। সে বলিল, "বলেছি ত, আমার পরিচয় পেলে আমায় এ সব কিছুই করতে বলতেন না।"

হিরণী পাল্টা জবাবে বলিল, "আমিও ত বলেছি, আপনি মানুষ! নিন, এই জলে ভেজার পর চা'টা কায দেবে'খন, খান।"

অগত্যা আগন্তুকা চা-পানে মনোযোগ দিল। সে যে চা ও ফল মিষ্টান্ন বেশ উপভোগ করিল, তাহা তাহার মুখচক্ষুর ভাবই বলিয়া দিল। হিরণী জিজ্ঞাসা করিল, "আপনার নাম কি বললেন না ত? কোথায় থাকেন?"

আগন্তুকা বলিল, "বলতে দিলেন কৈ আমায়? হয় ত নাম-ধাম বলবার দরকারও হবে না। যে জন্যে এসেছি, আগে তার যা হয় একটা কিছু হয়ে যাক—"

হিরণী বাধা দিয়া বলিল, "সে তখন হবে'খন। আগে নিন দিকি ভাল ক'রে ওগুলো খেয়ে। আর দু'একটা মিষ্টি? দু'চারটে নোস্তা?"

আগন্তুকা একটু অভিভূতার মত হইয়া পড়িয়া ধরা-গলায় বলিল, "আপনার এ আদর-যত্নের কথা কখনও ভুলতে পারবো না—এমন ক'রে ত অযাচিত হয়ে বিনা স্বার্থে কেউ আমায় আদর করে নি। আপনি—আপনি—ঠিক যেন মার পেটের বোনের মত—"

তাহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল, তাহার নয়নকোণে অশ্রুবিন্দু টলটল করিতেছিল। হিরণী বিষম অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিল—এরূপ ভাবপ্রবণতায় সে অভ্যস্ত ছিল না। সে তাড়াতাড়ি বলিল, "ওঃ, বুঝতে পেরেছি, আপনি কি—"

আগন্তুকা তাহার কথা শেষ না হইতেই বলিল, "হাঁ, আমি পাবলিক ষ্টেজের অ্যাকট্রেসের মেয়ে, আমিও সিনেমা অ্যাকট্রেস। নাম শুনেছেন বোধ হয়—মিস চামেলীবালা—"

হিরণীর বিস্ময়ের সীমা রহিল না। চামেলী? সে ত প্যারাডাইজ ফিল্ম কোম্পানীর ষ্টার অ্যাকট্রেস! এই তরুণী—চামেলী?

যেন তাহার মনের কথা বুঝিতে পারিয়া চামেলী বলিল, "না, না, আমি প্যারাডাইজের চামেলী না, আমি বাল্মীকি ফিল্ম করপোরেশানে এক বছর ঢুকেছি—তবে বিক্রমোর্ব্বশীতে উর্ব্বশীর পার্টে কিছু নাম হয়েছে বোধ হয়। যা'ক, এসেছি এখানে অসীম ফিল্ম করপোরেশানের বিজ্ঞাপন দেখে। কোথায় ষ্টুডিও বললেন? সেইখানেই না হয় যাচ্ছি। মাপ করবেন, আপনাকে অনেক কষ্ট দিলুম—আমার কাপড়চোপড় বোধ হয় এতক্ষণ শুকিয়েছে? আপনি? ওঃ, আপনার কাছে আজ যা পেয়েছি—তা—যাক্; আমায় ষ্টুডিওটা দেখিয়ে দিতে বলবেন কি দয়া ক'রে?"

হিরণী বিস্মিত। এমন মেয়ে সে কখনও দেখিয়াছে বলিয়া মনে করিতে পারিল না। এই গম্ভীর, এই চপল,—যেন শরতের আকাশ! অল্পবয়সে এমন গম্ভীর,—মুখে যেন বিষাদের নিকষ-রেখা কে টানিয়া দিয়াছে। সংসারের ঝড়ঝাপটা এ কত না সহিয়াছে! আবার এখনই এক নিশ্বাসে সে আপনার কত পরিচয়ই না দিয়া গেল! হউক, তবুও প্রার্থিনী—নিতান্ত দায়ে না পড়িলে কেহ এই ঝড়-বৃষ্টি মাথায় করিয়া পথে বাহির হয় না। তাহার প্রতি করুণায় তাহার সমস্ত অন্তরটা ভরিয়া গেল!

হিরণী ব্যথিতহৃদয়ে তাহার হাত দু'খানি ধরিয়া মিনতি-ভরা স্বরে বলিল, "ছি ভাই—তোমার চোখে এখনও জল? কি কষ্ট তোমার, আমায় বলবে না? তুমি বোসো, আমি দেখে আসি দাদা এলেন কি না। অসীম ফিলমের মালিক অসীম বাবু আমার দাদা।"

হস্তে হস্ত বন্ধনমুক্ত করিয়া দাঁড়াইয়া উঠিয়া চামেলী বিস্ময়বিস্ফারিতনেত্রে তাহার দিকে চাহিয়া রহিল। হিরণী হাসিয়া বলিল, "কি দেখছো হাঁ ক'রে?"

চামেলী কিছুক্ষণ নীরবে রহিল। তাহার পর বলিল, "দেখছি আপনাকে। আপনি—"

হিরণী বলিল, "তা দেখবে'খন পরে, আমি এলুম ব'লে।"

উত্তরের প্রতীক্ষা না রাখিয়া হিরণী চলিয়া গেল। সেই দিন সে বন্ধুগৃহ হইতে ফিরিয়াছে, কাজেই বাড়ীর খবর কিছুই জানিত না। তাহার ভ্রাতৃজায়া অসুস্থ, ভ্রাতা ভোর হইতে অনুপস্থিত, ঘরের সকল খবর পাওয়া তাহার পক্ষে সম্ভব ছিল না।

বাগানের আর্দ্র তৃণশষ্পের উপর দিয়া হিরণী দ্রুত ষ্টুডিওর দিকে অগ্রসর হইল। পাদুকা জলসিক্ত হইয়া এমন নিঃশব্দ হইয়াছিল যে, সে যখন ষ্টুডিওর আফিস-ঘরে প্রবেশ করিল, তখন যে লোকটি আরাম-কেদারায় আরাম করিয়া দেহ এলাইয়া সিগারেটের ধূমরাশিতে কক্ষ আচ্ছন্ন করিতেছিল, সে তাহার হঠাৎ আগমনের বিষয় কিছুই জানিতে পারিল না।

হিরণী প্রায় ছুটিয়াই আসিয়াছিল, তাই শ্বাসরুদ্ধ কণ্ঠে ডাকিল, "দাদা!"

বোধ হয়, তীক্ষ্ণাগ্র সূচি দ্বারা বিদ্ধ হইলে মানুষ যে ভাবে চীৎকার করিয়া লাফাইয়া উঠে, হিরণীর অতর্কিত আহ্বানে লোকটা তদপেক্ষা অধিক আওয়াজ করিয়া চেয়ার ছাড়িয়া তীরের মত লাফাইয়া উঠিল এবং নিশ্চল প্রতিমার মত দ্বারদেশে দণ্ডায়মান হিরণীর দিকে নির্ব্বাক্ অপলক-নেত্রে চাহিয়া রহিল,—তাহার অর্দ্ধভুক্ত সিগারেটটা যে অঙ্গুলীভ্রষ্ট হইয়া অদূরে কার্পেটের উপর পড়িয়া গৃহদাহের সূচনা করিতেছে, সে দিকে তাহার নজর রহিল না। পরিধানে তাহার ঢিলা ইজের, পায়ে স্লিপার, অঙ্গে বোতামহীন একটা ঢিলা পিরিহান, মাথার পশ্চাদ্ভাগে কবিদের মত এক

ঝাঁকড়া চুল! কক্ষের বিজলী বাতি সবুজ সেডে আচ্ছাদিত, ভিতরের জিনিষগুলি অস্পষ্ট দেখাইতেছিল।

ক্ষিপ্রগতি অগ্রসর হইয়া হিরণী পাদুকা দ্বারা সিগারেটটা দলিত পিষ্ট করিয়া লোকটির দিকে ভাল করিয়া দেখিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল, পরে বলিল, "ওঃ, আপনই বুঝি শুভেন্দু বাবু? বোম্বাই থেকে এসেছেন না আপনি?"

শুভেন্দুর মাথাটা তখন ঘুরিতেছিল। মন যে কোথায় ছিল, তাহা সে নিজেই বুঝিতে পারিতেছিল না। গোটা কতক ঢোক গিলিয়া আমতা আমতা করিয়া সে নিজের ত্রুটির জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করিল—তাহার কথায় না আছে মাত্রা, না আছে বাঁধন, কি যে কতকটা আবোল-তাবোল বকিয়া গেল, তাহা সে পরে হয় ত নিজেই স্মরণ করিতে পারিবে না।

তাহার এই ভাবগতি দেখিয়া হিরণীর অধর ও নয়ন-কোণে দুষ্ট হাসি খেলিয়া গেল। কিছুক্ষণ প্রাণপণে সে হাসি চাপিয়া রাখিয়া শেষে অসহ্য হইলে প্রগল্‌ভতার পরিচয় দিতেছে জানিয়াও প্রাণ খুলিয়া উচ্চরবে হাসিয়া উঠিল। হাসির এমন একটা সংক্রামক প্রভাব আছে—বিশেষ তরুণদের মধ্যে—যে, শুভেন্দুও সে হাসিতে যোগ না দিয়া পারিল না।

এই হাসির হিল্লোলে অজানা অচেনা তরুণ-তরুণীর মধ্যে কক্ষের গুরুগম্ভীর ব্যবধানের পাষাণভার অনেকটা হাল্কা হইয়া গেল।

হিরণী আলোকের সেডটা সরাইয়া দিয়া কক্ষটিকে আলোকে উদ্ভাসিত করিয়া বলিল, "দাদা ফেরেননি এখনও? কখন্ ফিরবেন, বলতে পারেন কি আপনি?"

শুভেন্দু বলিল, "তা ত জানিনি। তবে ভোরে বেরিয়ে গেছেন ডায়মণ্ডহারবারে, এতক্ষণ ত ফেরবার কথা! বসুন!"

হিরণী বলিল, "না, বসবো না এখন, এক জনকে দাঁড় করিয়ে রেখে এসেছি। আচ্ছা, আপনি বলতে পারেন, আপনাদের ষ্টুডিওর জন্যে এক জন অ্যাক্‌ট্রেসের দরকার হবে কি না?"

শুভেন্দু বলিল, "না—হাঁ, হবে বোধ হয় নতুন ফিল্‌ম্‌-খানার জন্যে। আপনি কি—"

হিরণী বলিল, "হাঁ, আমি হিরণী, অসীম বাবুর বোন। নমস্কার।"

হিরণী আর দাঁড়াইল না—যেমন চপলাচমকের মত তাহার আবির্ভাব, তেমনই চপলাচমকের মত তাহার প্রস্থান,—স্থানটা কেবল একটা সুবাসে ভরিয়া রহিল। শুভেন্দু নির্ব্বাক্ বিস্ময়ে সেই সঞ্চারিণী পল্লবিনী লতার চলন্ত মূর্ত্তির দিকে চাহিয়া রহিল। ওয়ার্ডসওয়ার্থ প্রথম দর্শনে ডোরোথিতে যে 'ভিসান' দেখিয়াছিলেন, শুভেন্দুর নয়নেও কি হিরণী তাহারই রেখা টানিয়া গেল?

হিরণী তাহার বসিবার ঘরে ফিরিয়া আসিয়া চামেলীকে দেখিতে পাইল না। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিল, সে বেশ পরিবর্ত্তনান্তে কিছুই না বলিয়া চলিয়া গিয়াছে, যাইবার আগে একখানা চিঠি রাখিয়া গিয়াছে। চিঠিতে মাত্র দুইটি ছত্র,—"ক্ষমা করবেন, এর পর লিখে সব জানাবো। —চামেলী।"

প্রথমটা ক্রোধে হিরণীর সমস্ত অন্তর ভরিয়া উঠিল। এ কেমন মানুষ, যে নিজের দরকারে আসিয়া জবাবের অপেক্ষা না রাখিয়া চলিয়া যায়? অভাবগ্রস্ত দরিদ্র বলিয়া পরিচয় দেয়, অথচ স্নেহ-মমতা পাইলেও তাহা প্রত্যাখ্যান করিয়া দম্ভভরে দেখা না করিয়াই প্রস্থান করে? এমনই অকৃতজ্ঞ কি সমস্ত অভাবগ্রস্ত দরিদ্র? দূর হউক, কোথাকার কে সে, তাহার ভাবনা ভাবিয়া মন খারাপ করিবার দরকার?

হিরণী নানা কাযে আপনাকে ডুবাইয়া দিয়া আজিকার এই সাঁঝের বেলার ঘটনাটা ভুলিবার চেষ্টা করিল। ভ্রাতৃ-জায়ার ঘরে গিয়া দেখিল, তিনি তখন দীর্ঘ-নিদ্রাভঙ্গের পর গাত্রোত্থান করিয়াছেন! জিজ্ঞাসা করিয়া জানিল, মাথা ধরিয়াছিল, ঘুমাইয়া ছাড়িয়াছে, তিনি ভাল আছেন, শুশ্রূষার কোন প্রয়োজন নাই। অধিক রাত্রিতে দাদা ফিরিয়া আসিলে ভাই-ভগিনী যখন আহারে বসিল, তখন হিরণী সাঁঝের ঘটনার কথা জানাইয়া মনটা অনেক হাল্কা করিয়া ফেলিল। তাহার দাদাও জানাইল যে, সেই অ্যাকট্রেস মেয়েটির অনেক ইতিহাস আছে, সে তখন আর এক দিন বলিবে। আপাততঃ তাহাকে যে চাকুরী দেওয়াই ঠিক, এটা সে জানিয়া রাখিতে পারে। মুস্কিল, অন্য অ্যাকট্রেসদের মত উহার অন্যত্র থাকিবার স্থান নাই, এজন্য সে ষ্টুডিওতে স্থান চাহিয়াছে। হয় ত তাহার জন্য ষ্টুডিওর একটা উইং অ্যাকট্রেসদের জন্য পৃথক্ করিয়া দিতে হইবে।

কে নিবি গো কিনে ·”

শিল্পী—মিষ্টার ইমাম

দুঃখিনী চামেলীর চাকুরী হইবে শুনিয়া হিরণীর মনটা অনেক আশ্বস্ত হইল। রাত্রিতে ঘুমাইয়াও সে চামেলীর বিষাদচ্ছায়াচ্ছন্ন মুখখানা বার বার চোখের সম্মুখে ভাসিয়া উঠিতে দেখিল—অমনই তাহার মনটা কেমন এক দুশ্চিন্তার গুরুভারে অবসন্ন হইয়া পড়িল। সে ত চেষ্টা করিয়াও সেই বিষাদক্লিষ্ট নয়নযুগলের করুণ স্মৃতি ভুলিতে পারিল না!

৬

"এখন কেমন আছ? একটু ভাল বোধ করছ?"

অসীমের তন্দ্রালসজড়িত নয়ন বিস্ময়ে বিস্ফারিত হইল, সে ধড়মড়িয়া বিছানার উপর উঠিয়া বসিল। তাহার শয্যাপার্শ্বে অসময়ে ঊষারাণী! স্বাস্থ্যের কথা এমন করিয়া জিজ্ঞাসা করার পাঠ ত উঠিয়াই গিয়াছে। তবে? আজ দুই দিন হইল, সে ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগে আক্রান্ত—অসময়ে আহার ও শয়ন, তাহার পর জলে ভেজা, রোদে পোড়া,—শরীর ত লোহার নহে!

কি সুন্দর এই বিধাতার অসাধারণ সৃষ্টি ঊষা! নিশ্চিতই তাঁহার মানসী কল্পনা হইতে রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে এই প্রতিমা, না হইলে মানুষে কি এই রূপ সম্ভব হইতে পারে? এই দেবভোগ্য অপাপবিদ্ধ পবিত্র নির্ম্মাল্য কখনও কুক্কুরের পাপস্পর্শে পরিম্লান হইতে পারে না। সঙ্কীর্ণ তাহার মন!

ঊষা আবার বলিল, "কি ভাবছো? কথাটার জবাবও দেবে না?"

সে পাশের চেয়ারের উপর বসিয়া পড়িল। হঠাৎ কি জানি কেন, অসীম ব্যঙ্গের সুরেই বলিল, "মারাত্মক এমন কিছু হয় নি, যার জন্যে ঘটা ক'রে আমায় লোকের কাছে আহা উহু শুনতে হবে। কিছু দরকার আছে?"

ঊষারাণীর দিবাস্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল, কেন সে একটা বড় আগ্রহ লইয়া আসিয়াছিল? দূর হইতে মৃগ যেমন ধূ ধূ বালুকাবিস্তারের মধ্যে শস্যশ্যামল মরূদ্যানের শীতল প্রস্রবণে তৃষ্ণা দূর করিবার আশায় অগ্রসর হইয়া মরীচিকার নীরস কঠোর স্বরূপ দেখিয়া ব্যথাহত নিরাশ মনে ফিরিয়া যায়, তেমনই করিয়া ঊষারাণীর আশালুব্ধ মনটি প্রতিকূল বায়ুতে বিষম ধাক্কা খাইয়া পশ্চাতে ফিরিয়া আপনাতেই সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল। সে বলিল, "আর পাঁচ জনের মত খবরটা নিতে এসে যে মস্ত বড় একটা অপরাধ ক'রে ফেলেছি, তা জানলে আসতুমই না।"

অসীম বোধ হয় বুঝিল, ইচ্ছাপূর্ব্বক এই আঘাত দিবার কোন কারণই তাহার পত্নী করে নাই, তাই একটু নরম সুরে বলিল, "রাগ করলে? তামাসা করবারও অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েছি? শোন।"

ঊষা ফিরিয়া যাইতেছিল, ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসুনেত্রে তাকাইয়া রহিল।

এবার অসীম হাসিয়া বলিল, "ধর, যদি মারাত্মক ব্যায়রামই কখনও হয়, তা হ'লে?"

ঊষা সে কথাটা শেষ করিতে না দিয়াই তীব্র শ্লেষের সুরে বলিল, "মরা বাঁচাটা যদি কারুর হাতধরা হোতো, তা হ'লে না হয় কথাটার জবাব দেওয়ার দরকার হোতো। যখন তা হয় না, তখন ও কথা ভেবে মাথা ঘামাবার দরকার দেখছি না।"

অসীম গম্ভীর স্বরে বলিল, "হুঁ।"

কক্ষ ক্ষণকাল নীরব—হাওয়াটা কেমন যেন গুমোটের মত অতিষ্ঠ করিয়া তুলিল।

ঊষা আবার কক্ষত্যাগ করিতে উদ্যত হইল। এক পা অগ্রসর হইয়া নিতান্ত উদাসীনভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "কি খাবে এ বেলা, ডাক্তার কিছু ব'লে গেল?"

অসীম আবার একটু আঘাত দিয়া বলিল, "সেটা ব'সে শুনে গেলে হোতো না? আমারও ত কিছু জিজ্ঞাসা করবার থাকতে পারে? আচ্ছা, মরার কথা শুনে তোমার অমন রাগ হবার কারণ কি? মরা বাঁচা ত মানুষ জন্ম থেকেই সঙ্গে নিয়ে আসে। তবে তোমরা মরার কথা শুনলে একবারে অধীর হয়ে ওঠো কেন, বুঝতে পারি না।"

ঊষা বলিল, "না, তা পারবে না। দেখ, তোমরা বুঝতে পারো না, কেন ও কথাটা স্বামি-স্ত্রীর মধ্যে হ'তে নেই—বিশেষ ও কথাটা বলবার বা ও নিয়ে তামাসা করবারও একটা বয়েস আছে।"

অসীম বলিল, "তার মানে?"

ঊষা বলিল, "ভগবান মানুষকে যত কিছু সম্পদ দান করেন, তার মধ্যে স্বাস্থ্য ও যৌবনের কাছে আর কিছু নেই। যারা বলে, রূপ-যৌবন কিছু নয়, তাদের মত হাল্কা

কথা কেউ বলে না। যত দিন রূপ-যৌবন থাকবে, তত দিন মরার কথা মুখে আনতে নেই।"

অসীম ঈষৎ হাসিয়া বলিল, "কেন, মুখে আনাও পাপ?"

উষা দৃঢ়স্বরে বলিল, "নিশ্চয়ই! বিশেষ—তোমার আমার মধ্যে ও কথা ওঠাই পাপ। আমি যখন দেখবো বুড়ো হচ্ছি—তখন—তখন আত্মহত্যা ক'রে মরবো!"

অসীম এবার হো হো হাসিয়া উঠিল, উঠিয়া উষারাণীর আসনের পশ্চাদ্দিকে আসিয়া দাঁড়াইয়া তাহার কাঁধের উপর দুইখানা হাত রাখিয়া বলিল, "এই তুমিও ত ঐ নিষিদ্ধ কথাটা ব'লে ফেল্‌লে রাগের মাথায়। আমিও তা হ'লে রাগ করি? ছি, ছি, কাঁদছো?"

তীরের মত উঠিয়া উষা বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে বলিল, "কে কাঁদছে? বয়ে গেছে আমার কাঁদবার জন্যে!"

অসীম তাহাকে বুকের মাঝে টানিয়া লইয়া বলিল, "উষা!"

বৃষ্টির জল গাছের পাতার উপর সঞ্চিত ছিল, সেই জল ঝর্‌ঝর্ ঝরিয়া পড়িল। স্বামীর কাঁধের উপর মাথা রাখিয়া উষা খানিকটা ফোঁপাইয়া কাঁদিল। অসীম তাহার একরাশ মেঘের মত কালো চুলের উপর মৃদু করস্পর্শ করিতে লাগিল।

"দাদার কোন খবর পেলে মধুপুর থেকে?" উভয়ে প্রকৃতিস্থ হইবার পর অসীম কথাটা জিজ্ঞাসা করিল। সহসা যেন নির্ম্মল উজ্জ্বল আকাশ হইতে বজ্রধ্বনি হইল। উষা ভয়-চকিতস্বরে বলিল, "হাঁ, না,—কেন বল দিকি? তুমি শুনেছো কিছু?"

অসীম বলিল, "বিশেষ কিছু না। তবে এদ্দিন হয়ে গেল, পরিতোষ বাবুদের ওখানে—"

উষা তাড়াতাড়ি বলিল, "লিখেছে শীগ্‌গিরই আসছে কল্‌কাতায়—"

অসীম বাধা দিয়া বলিল, "থাক্ গে, ফিরে আসছে ত শীগ্‌গীর, তা হলেই হ'লো। দেখ, ক'দিন ধ'রে একটা কথা বোলবো ব'লে মনে করছি, কিন্তু—"

উষা হাসিয়া বলিল, "কিন্তু কি? ভয়ে বলতে পারছো না নাকি?"

অসীম বলিল, "কতকটা তাই বটে—তা' ছাড়া কেমন বাধো বাধো ঠেক্‌ছে। হয়েছে কি জান, নতুন এক জন অ্যাকট্রেসকে এনগেজ করেছি শুনেছো ত—ঐ হিরোকে যে চিঠি লিখে তার অনেক দুঃখের কথা জানিয়েছে গো—ঐ অ্যাকট্রেসটি, কি তার নাম? চামেলী, হাঁ! চামেলী আমাদের 'সবুজের জয়যাত্রা' ব'লে যে নতুন ফিল্‌মখানা হচ্ছে, তাতে যেন হিরোইনের পার্ট নিয়েছে। শুভেন্দু পোজ-টোজগুলো শেখাচ্ছে ভাল, কিন্তু ওর মাথায় সেগুলো ঠিকমত ঢুকছে না।"

উষা বলিল, "কেন, শুনেছিলুম ত খুব বড় অ্যাকট্রেসের মেয়ে?"

অসীম বলিল, "হাঁ, তা বটে। কিন্তু সে হ'ল একে ষ্টেজের অ্যাকট্রেস, তার উপর সেকালের, মডার্ণ টেষ্টের মত—বিশেষ টকি-সিনেমার কিছুই জানে না, কাজেই মেয়েকে শেখাবে কোত্থেকে?"

উষা বলিল, "তা, ও যেখানে ছিল, সেখানে কিছু শেখেনি?"

অসীম তাচ্ছীল্যভরে বলিল, "শিখবে না কেন, তাদের বিদ্যার দৌড় যতটুকু, ততটুকুই শিখিয়েছে, তার বেশী ত আর পারে না। আমাদের বাঙ্গালার টেষ্টে আর তাদের টেষ্টে আকাশ-পাতাল তফাৎ বিশেষ আমাদের বাঙ্গালীর ঘরসংসারের কথায়, বুঝলে?"

উষা বলিল, "তা ত বুঝলুম, কিন্তু এতে আমার পরামর্শের কি দরকার হ'ল?"

অসীম হাসিয়া বলিল, "তোমার পরামর্শ নেবো না? গৃহিণী সচিব সখী—যাক, বলছিলুম কি জান, আমাদের ঘরের মেয়েদের পোজগুলো যদি ওকে শিখিয়ে দিতে পারো!" অসীমের কণ্ঠে মিনতির সুর বাজিয়া উঠিল।

উষার বিস্ময়ের সীমা রহিল না। এমন প্রস্তাব সে কখনও স্বামীর কাছে প্রত্যাশা করে নাই। সে বলিল, "ও মা, সে কি কথা গো? আমরা পোজ শেখাবো থিয়েটারের অ্যাকট্রেসকে? ষ্টুডিওতে গিয়ে সকলের সামনে? ফিল্‌ম্ ফিল্‌ম্ ক'রে পাগল হ'লে না কি? ছিঃ ছিঃ!"

অসীম বাধা দিয়া বলিল, "আহা, সবটা শোনই না আগে। হিরো ওর বন্ধুদের সঙ্গে প্রাইভেটে প্লে করে না শুনেছি?"

উষা বলিল, "হাঁ, তাই ত এসেই ক'দিন সুনন্দাদের ওখানে গিয়ে রইলো।"

অসীম বলিল, "তাই ত বলছি গো—ও যখন প্রাইভেটে প্লেই করে, তখন এই ফিল্‌মটার জন্যে গোটা দুই পোজ শিখিয়ে দিক না একে—"

উষা চমকিয়া বলিল, "ও মা, সে কি কথা গো! বন্ধুদের বাড়ী বন্ধুদের সঙ্গে আপনা-আপনি পাঁচ জনের সামনে প্লে করে ব'লে—না, না, সে আমি করতে দেবো না, তোমার ফিল্‌মে পোজ-ফোজ দিতে দেবো না—আমি বরং বারণই কোরবো তাকে—"

অসীম বলিল,—"আহা-হা, আগে থাক্‌তেই শিউরে ওঠো কেন? শোনই না সবটা। কেবল তিনটে দৃশ্যে তাকে দরকার হবে। বাইরে কোথাও কারু সঙ্গে যেতে হবে না, আমার এই ষ্টুডিওর ভেতরেই পোজ দিলেই চল্‌বে। কেবল একবার বাগানে ঝিল্‌টার ধারে এলোচুলে, আর ঐ পাহাড়টার ওপরও তাই। না হ'লে কি আমি নিজে করতে বল্‌ছি আমার বোন্‌কে?"

উষা হাসিয়া বলিল, "কি ভাগ্যি যে আমায় বলনি পোজ দিতে।"

অসীম ক্ষণেক তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "তা সত্যিই, তোমায় মানাতো আরও ভাল, কিন্তু তোমার অভ্যাস নেই ওদিকে, টেষ্টও নেই।"

উষা হাসিতে হাসিতে বলিল, "আর তোমার বোনটির মত বুদ্ধি?"

অসীম বলিল, "যা বল। যাক্, পারবে ত ওকে রাজী করতে? তোমায় ও বড্ডো ভালবাসে, তোমার কথায় ওঠে বসে—"

উষা বলিল, "আর তোমায়? সে যে দাদা-অন্ত প্রাণ, দাদা বলতে অজ্ঞান!"

অসীম বলিল, "যাই বল, ও কথা আমি ওকে মুখ ফুটে বলতে পারবো না। পারবে না রাজী করতে? দেখ, এই যে অ্যাক্‌ট্রেসটি, এর ইতিহাসটা সব শুনেছো ত! ওর মা আর তার বন্ধুবান্ধবরা ওকে ওদেরই পথে নিয়ে যেতে চেষ্টা করেছিল, পারে নি। সত্যিই এই মেয়েটার ঝোঁক হচ্ছে সিনেমা টকির প্লের দিকে—স্কুলে প'ড়ে লেখাপড়াও অনেকটা শিখেছে গেরস্তো ঘরের মেয়েদের মত—ও-পথে যেতে চায় না তাই। তাই বলছি, ওকে যদি তোমরা একটু শিখিয়ে তৈরী ক'রে নাও—কখনও ত গেরোস্তো ঘরের শিক্ষা পায় নি—তা হ'লে ও একটা ষ্টার অ্যাক্‌ট্রেস নিশ্চয়ই হবে। কি বল, পারবে?"

আগ্রহের আতিশয্যে অসীম উষার কুসুমপেলব হাত দু'খানি দুই করে চাপিয়া ধরিল। উষার সর্বাঙ্গ দিয়া একটা তড়িৎ-শিহরণ বহিয়া গেল। কিন্তু উষা তাহা বাহিরে কিছুই জানিতে না দিয়া সহজকণ্ঠে বলিল,—"আচ্ছা, ভেবে দেখি। তবে কি জান, অ্যাক্‌ট্রেস! দেখো, ও নাকি বাড়ী ছেড়ে পালিয়ে এসেছে?"

অসীম বলিল, "হাঁ, হিরণী কিছু বলে নি? ওর উপর যখন বড় পীড়াপীড়ি চল্‌লো, যখন ওরা ওকে সত্যিসত্যিই পাপের পথে নামাবার জন্যে জোর-জবরদস্তি আরম্ভ করলে, তখন ও পালিয়ে এসে ওর এক স্কুলের বন্ধুর বাড়ী যায়—তারা ওকে দু'দিন লুকিয়ে রেখেছিল। কিন্তু সমাজের ভয়—কাযেই তারা আর রাখতে পারলে না—এখন রাস্তাই ওর ভরসা!"

উষার মনটা এই দুঃখিনীর কথায় ব্যথায় টন-টন করিলেও সে যে থিয়েটার-সিনেমার অ্যাক্‌ট্রেস, এ কথা সে ভুলিতে পারিতেছিল না। তাহার কথাটা আবার পাড়িতে যাইবে, এমন সময় দ্বারের দিকে চাহিয়া বলিল, "এই যে হিরো, সেই অ্যাক্‌ট্রেস মেয়েটি তোর কাছে এসেছিল আর?"

হিরণী বলিল, "সে হচ্ছে। দাদা কেমন আছো এখন?"

অসীম হাসিয়া স্নেহভরে চাহিয়া বলিল, "তবু ভাল, দাদাকে মনে পড়েছে এতক্ষণে—"

হিরণী অভিমানে ঠোঁট ফুলাইয়া বলিল, "বা রে, আমার দোষ হ'ল বুঝি? দু' দু'বার এসে দেখে গেলুম, দিব্যি ঘুমুচ্ছো। জ্বরটা আর আসে নি ত? ব্যথা?"

উষা বলিল, "ব্যথা খুবই আছে, তবে কাসিটা এ বেলা দেখছিনে বললেই হয়। আমরা বললে ত কথা মিষ্টি লাগে না—রোদে জলে রাতদিন ছুটোছুটি ত বন্ধ হবে না।"

হিরণীও অনুযোগের সুরে বলিল, "হাঁ দাদা, তুমি ভারী দুষ্টু,—বৌদির মনে খালি কষ্ট দাও—"

দরদের কেমন একটা আকর্ষণী শক্তি আছে, যাহাতে মানুষ ইচ্ছা না থাকিলেও অন্তরের রুদ্ধ অভিমানের অভিব্যক্তি করিয়া ফেলে। উষাও তাই হিরণীর কথাটাকে অবলম্বন করিয়া বলিল, "ওঁদের শরীরের কিছু হ'ল না হ'ল,

তাতে আমাদের কি সম্পর্ক থাকতে পারে, হিরো? যাই করুন ওঁরা, কারুর তাতে কিছু বলবার নেই। আয়, আমরা যাই।"

হিরণী বলিল, "সত্যিই ত দাদা,—এ তোমার ভারী অন্যায়! দেখ দেখি, ভেবে ভেবে বৌদির চেহারা কি হয়ে গেছে? এমন যে গোলাপ-ফুল ফুটে থাকে গালে, একবারে কালির বরণ হয়ে গেছে—তুমি ত দেখেও দেখ না।

তাহার বৌদিদি যে রূপের প্রশংসায় ভারী খুসী হইয়াছিল, তাহা হিরণী না বুঝিলেও তাহার দাদা বিলক্ষণ বুঝিয়াছিল, কেন না, ঊষারাণীর মুহূর্ত্ত পূর্ব্বের বিষাদ-অভিমান-জড়িত ভাবটা নিমিষে অন্তর্হিত হইয়াছিল এবং তাহার অনিন্দ্যসুন্দর পদ্মকোরকের মত মুখখানি আত্মপ্রসাদে উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছিল। এই হাসি, এই কান্না,—অদ্ভুত প্রকৃতিই বটে! অসীম এই কথাটাই ভাবিতেছিল। বলিল, "তাই না কি? তা এক কায কর্ তোরা দু'জনে। তুই তোর বৌদির রূপের ব্যাখ্যা কর্, আর তোর বৌদি তোর রূপের ঢাক পিটতে থাকুন; মাঝে থেকে এই নেহাৎ কাঠখোট্টা পুরুষ বেচারী তোদের মহাভারতের কথা অমৃত সমান শুনতে শুনতে পুণ্যবান্ হোক্, কি বলিস?"

ঊষা হাসিয়া ফেলিল। কিন্তু হিরণী কথাটা অন্য ভাবে গ্রহণ করিল, বিদ্রূপের ভঙ্গীতে বলিল, "নেহাৎ কাঠখোট্টা পুরুষমানুষরাও যে রূপটাকে নেহাৎ তুচ্ছতাচ্ছীল্য করেন, তাও ত দেখতে পাই না! জান বৌদি, সে দিন জল-ঝড়ের রাতে দাদাকে খুঁজতে গেলুম ষ্টুডিওতে চামেলীর জন্যে—ভাল কথা, চামেলীর আজ আসবার কথা আছে ষ্টুডিয়োতে—তা ষ্টুডিয়োতে উনি ছিলেন না, ছিলেন ওঁর বন্ধুটি। তিনি এমনই ভদ্রলোক যে, আমি দাদার কথা জিজ্ঞাসা করলুম, উনি তার জবাব না দিয়ে হাঁ ক'রে আমার মুখের দিকে চেয়ে রইলেন, যেন সাত জন্মে মেয়েছেলে দেখেন নি। ছিঃ ছিঃ! আর যা কর দাদা, তোমাদের পুরুষমানুষের বড়াই কোরো না বলছি।"

অসীম ট্রে হইতে এক টুকরা মিছরী তুলিয়া লইয়া বলিল, "বললি ত ফড়ফড় ক'রে অনেকগুলো কথা, কিন্তু জানলি, কেন গুডো অমন ক'রে তাকিয়ে ছিল তোর দিকে?"

হিরণী তাচ্ছীল্যভরে বলিল, "দরকার?"

অসীমও সমান ঔদাসীন্য দেখাইয়া বলিল, "তবে থাক, দরকার নেই যখন তোর জানবার! সাত বছর আগে যাকে সে দেখে গিয়েছিল এতটুকু—যাক্, চামেলীর আসবার কথা কি বলছিলি?"

হিরণী বলিল, "চিঠি লিখে জানিয়েছে আমায়, আজ আসবার কথা তার এখানে। আহা, বড় কষ্ট পেয়েছে বেচারী! ওর এখানে থাকার ব্যবস্থাটা শীগ্‌গীর ক'রে দাও না দাদা—তোমার দুটি পায়ে পড়ি!"

অসীম হাসিয়া বলিল, "দূর পাগলী কোথাকার! আমি ত সেই ব্যবস্থাই করছি রে"—

ঊষা বলিল, "তা করছো বটে, কিন্তু দেখো যেন খাল কেটে কুমীর এনো না ঘরে!"

হিরণী বলিল, "বা রে, বৌদি যেন কি!—লেখাপড়া শিখে যে ভাল পথটা বেছে নিচ্ছে, তাকে সাহায্য করা—উৎসাহ দেওয়া ভাল না বুঝি? জান, যাকে তুমি বলছো কুমীর, সে ম্যাট্রিক পাশ করেছে?"

ঊষা বলিল, "ওঃ, তাই না কি? তা, তোমাদের ভাই বোনের যদি ঐ ইচ্ছে হয়ে থাকে, সে ত ভাল কথা। কিন্তু তাকে ত শুধু পুষলে হবে না, সঙ্গে সঙ্গে তাকে ভদ্দর ঘরের মেয়ের মত ঘাড়ে নিতেও হবে তোমাকে।"

হিরণী বলিল, "আমাকে? তার মানে?"

ঊষা স্বামীর দিকে একবার চাহিয়া বলিল, "তার মানে, এঁদের নতুন ফিল্‌মে হিরোইনের পার্টটা তুই যদি ওকে দেখিয়ে ঠিক গেরোস্তোর ঘরের মত ক'রে তৈরী ক'রে দিতে পারিস"—

এই সময়ে অসীম ঝোপ বুঝিয়া কোপ মারিয়া বলিল,—"এই ধর না, পোজ-টোজগুলো যদি তোরা ঠিকমত দেখিয়ে দিস—"

ঊষা বলিল, "হাঁ, ধর না কেন, আমাদের বাঙ্গালীর ঘরের তোর মত শিক্ষিত মেয়েরা যেমন ক'রে চলাফেরা করে, সেই রকম—আর তোরা ত প্রাইভেটে প্লে করেই থাকিস—সেই রকম ক'রে দাঁড়া-বসা চলা-ফেরা শিখিয়ে দিস—"

হিরণী বলিল, "পারি না বুঝি তা? দাও না কি পার্ট দেবে, খুব পারি।"

অসীম সাগ্রহে বলিল, "ওঃ, তা হ'লে যা হয়—একবারে ফার্ষ্ট ক্লাশ! তোকে যা মানাবে হিরো—"

হিরণী উচ্চ হাসিয়া বলিল, "দাদা যেন কি! আস্ত পাগল! ভদ্দর লোকের মেয়েরা বুঝি ফিল্‌মে পোজ দেয়? দূর!"

উষা হাসিয়া বলিল, "কেন, দোষ কি?"

অসীম বলিল, "আচ্ছা, তোরা ঘরোয়া রঙ্গমঞ্চে উঠতে ভয় পাস নে, কিন্তু চলচ্চিত্রে অভিনয় করবার নামে শিউরে উঠিস কেন? যদি অভিনয় করাটা মস্ত একটা পাপ ব'লে মনে না করিস—যদি ওটাকে আর্ট ব'লে—একটা বিদ্যে ব'লে মনে করিস, তা হ'লে ঘরোয়া আর প্রকাশ্য অভিনয়ে তফাৎ দেখিস কি ক'রে? য়ুরোপে আমেরিকায় এখন ত বিস্তর ভদ্রঘরের মেয়ে অভিনয় করছেন প্রকাশ্যে। আমাদের দেশে এটা এখন নতুন ঠেকছে বটে, কিন্তু দু'দিন পরে ওটাও সয়ে যাবে। আগে কি ট্রামে-বাসে আমাদের ঘরের মেয়েরা চড়তো, না একলা যাওয়া-আসা করতো?"

হিরণী বলিল, "না দাদা, তোমার ও যুক্তি ঠিক নয়। নিজেদের মধ্যে যা করা যায়, বাইরের লোকের কাছে তা করা ঠিক নয়। আমাদের বৈশিষ্ট্য ছাড়ব কেন, দাদা?"

অসীম ঈষৎ রুষ্টস্বরে বলিল, "নাক ত তুলেই আছিস! কেন বল্‌ ত, বাইরের লোক এলেই তুই মুখখানা প্যাঁচার মত ক'রে থাকিস?"

উষা চোখ টিপিয়া স্বামীকে আর অগ্রসর হইতে নিষেধ করিয়া বলিল, "এ বাবু তোমাদের অন্যায়! ও কবে আবার প্যাঁচামুখ ক'রে রইলো? তোমাদের দুটিতে ঝগড়া যেন লেগেই আছে দেখছি!"

হিরণী ক্রোধকম্পিতকণ্ঠে বলিল, "দাদা মনে করে, পুরুষ মানুষরাই জগতের লাট বাদশা, আর তাদের মন বুগিয়ে চলবার জন্যেই আছি আমরা। কাযেই জানা নেই, শোনা নেই, পুরুষ-মানুষ বন্ধু যিনিই আসুন ওঁর ঘরে, অমনি তাঁদের সামনে আমাদের হেসে ঢ'লে পড়তে হবে, মন যুগিয়ে চলতে হবে, না?"

হিরণী যে বিষম ক্রুদ্ধ হইয়াছিল, তাহার মুখ-চোখই তাহা বলিয়া দিতেছিল। অসীম মনে মনে তাহার সেই অন্তরের উষ্মা খুবই উপভোগ করিতেছিল। কিন্তু বাহিরে গাম্ভীর্য্য দেখাইয়া বলিল, "বলেই আসছি ত বরাবর, মেয়ে-ছেলেদের প্রতিভা ব'লে কোন পদার্থই নেই। কেবল সেজেগুজে থাকার আর্টটা ওরা খুবই জানে আর পুরুষদের মন যুগিয়ে বাহবা নেওয়াই ওদের ব্যবসা!"

উষা কৃত্রিম কোপ দেখাইয়া হাসিয়া বলিল, "তুমি থাম বলছি। বুড়ো হ'তে চল্‌লে, তবু বোনের সঙ্গে খুনসুড়ি করার রোগ এখনও গেল না!"

অসীম বলিল, "কেন, মিথ্যে কি বলেছি? মা আর মেয়ে যদি সেজেগুজে কোথাও পার্টিতে বা এ্যাট হোমে গেলেন, আর যদি কেউ তাঁদের দু'জনকে দেখে বড় বোন ছোট বোন ব'লে গুলিয়ে ফেলবার ভাণ করলে,—অমনি মা আহ্লাদে আটখানা, বোধ হয় একখানা জড়োয়া গয়না পেলেও তাঁর তত আহ্লাদ হয় না!"

হিরণী রাগে ফুলিতেছিল, বলিল, "যাও, তুমি ভারী দুষ্টু, তোমার সঙ্গে কথা কইবো না।" রাগে গর গর করিতে করিতে বিদ্যুৎঝলকের মত সে ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গেল।

অসীম হো হো হাসিয়া বলিল, "ওরে শোন্‌, শোন্‌, পাগলী—না, দাঁড়ালো না!"

উষা বলিল, "হাঁ, দাঁড়াচ্ছে এই যে! যে তোমার মিষ্টি মধুর বচন—হাড় জ্বলে যায় একবারে!"

অসীম বলিল, "তা হোক! রাগলে ওকে আমার বড্ড ভাল লাগে। পাগলী! কথায় কথায় অভিমান!"

উষা বলিল, "হাঁ, বড্ড অভিমানী। আদর দিয়ে দিয়ে বোনটিকে যা ক'রে তুলেছো!"

অসীম বলিল,—"আর যিনি বল্‌ছেন, তিনি বড্ড কম! আদরের জিনিষকে আদর দেবো না? তুমি দাও কেন?"

উষা বলিল, "হাঁ, আমি না কি আদর দিই! তোমার ওপরেই ওর যত মান-অভিমান! তোমায় না দেখলে থাকতে পারে না। দেখ না, দেশে গিয়ে বাপের কাছে দু'দিন থাকতে পারে না, একটা ছুতো ক'রে কল্‌কাতায় চ'লে আসে!"

অসীম হঠাৎ গম্ভীর হইয়া ধরা গলায় বলিল, "মার পেটের বোন কি রকম, জানি নি, কিন্তু হিরো—রাগিয়েই দিই আর যাই করি, ওর মত আদরের জিনিষ আর কিছু আমার থাকতে পারে ব'লে মনেই করতে পারি নি। পাগলা!" অসীমের চোখ ছল-ছল করিতে লাগিল।

উষা বলিল, "পাগলীই বটে! কিন্তু পাগলীই হোক

আর যাই হোক, মনটি যেন দুধের মত সাদা। তা, ওর একটা বিয়ের—আঠারোয় ত পড়লো এ দিকে—"

পথে যাইতে যাইতে হঠাৎ সম্মুখে উন্নতফণা কালভুজঙ্গ দেখিয়া মানুষ যেমন চমকিয়া উঠে, তেমনই চমকিয়া উঠিয়া অসীম বলিল, "বিয়ে? কার বিয়ে, হিরোর? ওর যুগ্যি বর যাকে মনে কোরবো, তাকে ত এখনও দেখতে পাই নি আমি। যে হবে, সে এখনও কিছু দিন তপস্যা করুক!"

অসীমের কণ্ঠস্বর গাঢ় হইয়া আসিল।

উষা হাসিয়া বলিল, "অবাক! তোমার বোনটি বলেই ত আর দেব-কন্যাও নয় বা রাজ-কন্যাও নয় যে, দেশ-বিদেশের লোক ওকে পাবে ব'লে তপস্যায় ব'সে যাবে বা পায়ে এসে লুটিয়ে পড়বে? ঠাট্টা না, সত্যি ওর একটা সম্বন্ধ এখন থেকেই দেখতে আরম্ভ ক'রে দাও। কাকাবাবু ত তোমার ওপর ওর ভার দিয়েই নিশ্চিন্ত: তা ছাড়া নিজে অথর্ব মানুষ—নড়তে-চড়তে পারেন না।"

অসীম বলিল, "তা ঠিক। কিন্তু সময় ত বয়ে যায় নি। তবে একটা কথা তোমায় জানিয়ে রাখছি, ওর মত মেয়ে কাউকে ভাল না বাসলে বিয়ে করবে না, আর আমিও ওর মন না জেনে কখনও ওর বিয়ে দেবো না।"

উষা কিছুক্ষণ নীরব থাকিবার পর ছোট একটি হুঁ দিয়া বলিল, "সে ত ভাল কথা। কিন্তু—কিন্তু—যাক গে সে কথা, আমি বলছিলুম কি, ওর যা বিষয়-আশয় আছে, তার লোভে অনেক বরই ত ভালবাসার ভাণ দেখিয়ে ওকে খুঁজবে!"

অসীম বলিল, "খোঁজা এক কথা, আর পাওয়া অন্য কথা। মানুষ যা খোঁজে, সব সময় তাই যদি পেতো!"

কথাটা বলিয়াই অসীম হাঁড়ির মত মুখ ভার করিয়া দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিল।

উষা গম্ভীরভাবে কিছুক্ষণ নীরব থাকিবার পর বলিল, "কে না লিখেছেন, বিয়েটা একটা পরীক্ষা? মানুষ বিয়ে করে যখন, তখন লাল, নীল, গোলাপী, সবুজ কত আশা-আনন্দের রামধনুই দেখে! তার পর সখ মিটে গেলেই অবসাদ—হা-হুতাশ!"

অসীমের বিস্ময়ের সীমা রহিল না। এমন ত উষার মুখে সে কখনও শুনে নাই। আজ হঠাৎ—তখনই মনে পড়িয়া গেল সে দিনের ষ্টুডিওতে শুভেন্দু ও উষারাণীর বিশ্রম্ভালাপের কথা। মানুষের মনের মধ্যে যে হিংস্র পশু অনুক্ষণ আধিপত্য-বিস্তারের চেষ্টা করে, সেই পশুটা নখ-দন্ত বাহির করিয়া গর্জ্জিয়া উঠিল,—"হাঁ, অবসাদই আসে বটে। নারীদের কি হয় জানি না, তবে পুরুষের যে অবসাদ আসে, তার সম্বন্ধে বলতে পারি, সে অবসাদের গোড়া খুঁজতে গেলে অনেক দূর এগিয়ে যেতে হয় পেছন ফিরে—তার বর্ণনা কি তোমাদের ভাল লাগবে? মোটেই না।"

উষাও অনুযোগ করিল, "তা ত বলবেই, আমরা তোমাদের দেবতার আসনে বসিয়ে পূজো করি কি না! পূজো করি বলেই যা ইচ্ছে তাই বলতে সাহস পাও। মিথ্যে বলে না ত হিরণী! বল দিকি সত্যি ক'রে, আমাদের একটু স্পর্শ পেলে তোমাদের যত কিছু পশুত্ব, যত কিছু অন্যায়, যত কিছু পাপ,—দূর হয়ে যায় কি না? পুরুষ তোমরা কেবল নিজের সুখ-স্বার্থ টাই বড় ক'রে দেখো—তোমাদের মনের সে ময়লা আমাদের ভালবাসার আগুনে পুড়ে সাফ হয়ে ওঠে না কি?"

অসীম বলিল, "তা ঠিক, আমাদের ময়লা কেটে খাঁটি সোণা বার হয়ে পড়ে বটে, কিন্তু সে আগুন খুঁজে ত পাওয়া যায় না।"

উষা বলিল, "খোঁজো না, খোঁজা দরকার ব'লে মনে কর না, তাই পাও না। যাক, একটা কথা বলতে চাই, ভয়ে বোলবো, না নির্ভয়ে?"

অসীম বলিল, "তার মানে? এ আবার কদ্দিন থেকে হ'ল? যদ্দিন আমার আর্টিষ্ট বন্ধুটি এসেছেন, তদ্দিন না কি? নইলে সাতর কাঠী না হ'লে ত সমস্ত রাজ-কন্যা জেগে ওঠে নি!"

কথাটায় বেশ একটু খোঁচা ছিল, উষা তাহা বুঝিল কি না, সে-ই বলিতে পারে। সে কেবল বলিল, "তোমার আর্টিষ্ট বন্ধুর কথা তুমিই বলতে পারো। যাক, যে কথাটা বলতে এসেছিলুম, ব'লে যাই। দাদার খবর-টবর কিছু শুনেছ? এই খানিক আগে আমায় জিজ্ঞাসা করছিলে না? সত্যি, কিছু শুনে বুঝি কথাটা জিজ্ঞাসা করেছিলে?"

অসীম বিদ্রূপের ভঙ্গী করিয়া বলিল, "কে? দাদা? হার ম্যাজেষ্টির ডিয়ার ব্রাদার মিঃ ড্যাটা? ওঃ, খুব রাখি

খবর। তিনি ত ঠ্যাং ভেঙ্গে প'ড়ে রয়েছেন হাসপাতালে মধুপুরে—"

ঊষা কতকটা স্বস্তি অনুভব করিল, বলিল, "হাঁ গো হাঁ—তা এত ঠাট্টার দরকার কি? বলই না কেন, তার নাম শুনলেই তোমার হাড় জ্বালা করে!"

অসীম নিতান্ত লজ্জিত ও অপ্রতিভ হইবার ভাণ করিয়া বলিল,—"এঁ্যা, ঠাট্টা? কার সঙ্গে? মহামহিমময়ী শ্রীলা শ্রীমতী ঊষারাণী দেবীর অঞ্চলের একমাত্র নীলমণি ধন—"

ঊষা প্রায় কাঁদ-কাঁদ হইয়া বলিল, "দেখ, ওরকম খোঁচা আমার গা-সওয়া হয়ে গেছে—বাড়ীতে যে এখনও কাক-চিল বসছে, সেটা আমার গুণে—আর বাড়ীও ত ছেড়ে দিয়েছ একরকম ফিল্‌ম্ ফিল্‌ম্ ক'রে—তা এর পর কি চাকরবাকরের সামনেও এই রকম চল্‌তে থাকবে? ভেতরে আমাদের যাই থাকুক, বাইরের ঠাট্‌টাও ত বজায় রাখতে হবে। না, তাও নয়? খালি অশান্তি, খালি অশান্তি।—না হয়, চলেই যাচ্ছি আমি, কথার দরকার নেই।"

ঊষা দ্রুতপদে কক্ষ ত্যাগ করিতেছিল, অসীম বাধা দিয়া বলিল, "শোন! কথাটা যখন পাড়লে, তখন জবাবটাও শুনে যেতে হবে তোমায়। বাড়ী? বাঙ্গালীর যে বাড়ীর চেয়ে কিছু নেই—সে বাড়ী যদি আমার বাড়ী থাকতো—যাক, বাইরের ঠাটের কথা কি বলছিলে না? সেই বাইরের ঠাট থেকে চুণ খসেছে কি একটুও?"

ঊষা বলিল, "খসে নি? তোমার বন্ধু তোমার মনের মানুষ হ'তে পারেন, তা ব'লে তাঁর কাছে আমাদের ঘরের কথা—"

অসীম বলিল, "আমি বলেছি ঘরের কথা? বন্ধু যদি উপযাচক হয়ে ঘরের লোকের জন্যে সুপারিশ করতে আসে, তা হ'লে তাকে দু'কথা শুনতে হয় বৈ কি?"

ঊষা বলিল, "ঘরের লোকের জন্যে সুপারিশ?"

অসীম বলিল, "ঘরের লোকের সহোদর ভাইও যে, ঘরের লোকও সে ত! যাক, কি বলবে বলছিলে বল, এ সব ইতরের মত কথা-কাটাকাটি যত না হয়, ততই ভাল। বল, কি করতে হবে?"

ঊষা বলিল, "না, ব'লে কায নাই তা। তবে একটা কথা বলতে চাই, সেটায় তোমার হুকুম না নিলে হবে না বলেই বলছি। হাঁসপাতাল থেকে বেরিয়ে অবধি দাদার শরীরটে ভাল নয়। আমি দিন কতক তাকে এখানে এনে রাখতে চাই। তোমার এতে কোন আপত্তি আছে কি?"

অসীম গম্ভীরভাবে বলিল, "যখন হুকুমের কথা আনলে, তখন আমাকেও হুকুমদারের মত বলতে হচ্ছে যে, আমায় এ কথা জিজ্ঞাসা করবার মানে বুঝছি নে। দাদার বিয়ে পরামর্শ হ'ল অন্য যায়গায়, তার সম্বন্ধে ব্যবস্থা করবার ভারও পোড়লো সেইখানে, এখন দাদাকে এখানে আনা না আনার কথায় আমি কি বলবো? ইচ্ছে হয় স্বচ্ছন্দে নিয়ে এস।"

ঊষা বলিল, "ওটা ত হ'ল রাগের কথা, স্বচ্ছন্দের কথা নয় ত?"

অসীম ক্ষণকাল নীরব ও গম্ভীর হইয়া রহিল, পরে ধীরে ধীরে বলিল, "একটা কথা বলবো? ভয়ে বলবো না নির্ভয়ে?"

ঊষা শ্লেষের সুরে বলিল, "যেমন অভিরুচি! বাড়ীর মালিক তুমি!"

অসীম কথাটা শুনিয়াও শুনিল না, বলিল, "কথাটা খোলসা ক'রে বলাই ভাল মনে করছি, নইলে দু'জনের কেউই আমরা ঠিক দুজনকে বুঝতে পারবো না,—বিশেষ ক'রে দুজনের মধ্যে যখন কেবলই পাচীল খাড়া হয়ে উঠছে। নয় কি?"

ঊষা গম্ভীর-কণ্ঠে বলিল, "শুনছি, বল।"

অসীম বলিল, "তুমি ছাড়া তোমার দাদার আপনার বলবার কেউ নেই, কেমন না? আপনার বলেই বলছি, তার ভবিষ্যৎটা দেখা ত তোমার দরকার—যদিও সে তোমার চেয়ে বড়।"

ঊষা অধীরভাবে বলিল, "ঐ লম্বা লেকচার ছাড়া আর কিছু বলবার আছে তোমার? ও ত ঢের হয়ে গেছে। দাদার নিন্দে এক ঝুড়ি শুনতে আসিনি এখানে, আমার ঢের কায রয়েছে।"

অসীম বলিল, "আহা, সবটা শোনই আগে ছাই। এ সব যদি বই ক'রে লিখি, তা হলেই দাদার স্তবস্তুতি হয়ে যাবে, ঝুড়ি ঝুড়ি গুণ!"

ঊষা বলিল, "কাণ আছে শুনছি—বেঁধে মারলেও যখন আমাদের অন্য উপায় নেই—"

অসীম বলিল, "পিঠোপিঠি ভাইবোনকে রেখে বাপ-মা গেলেন স্বর্গে। যাবার আগে বোনটির ভার নেবার লোকও ঠিক ক'রে গেলেন বটে, কিন্তু ভাইটির ভার নেবার কোন ব্যবস্থা ক'রে গেলেন না। তবে তার নিজের ভার নেবার মত কিছু সংস্থানও যে ক'রে গেলেন না, তাও নয়। কেমন, ঠিক ত?"

কোন জবাব না দিয়া উষা গম্ভীর হইয়া বসিয়া রহিল। অসীম বলিয়া যাইতে লাগিল, "ভাইটি অত ভার বইতে না পেরে একে একে মাথা থেকে ভার নামিয়ে মোট খালাস করতে লাগলেন। দেশের কিছু ধেনো জমাজমি ছিল, সে ভার অতি অল্প দিনেই নামিয়ে ফেলে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচলেন। তার পর পৈতৃক ভদ্রাসন, বাগান, পুকুর বিক্রমপুর রওনা হ'ল। বিরক্ত হচ্ছো না বোধ হয়?"

ক্রোধে উষার বাক্‌স্ফূর্ত্তি হইল না। এবারও সে নীরব রহিল।

বিষব্রণের অস্ত্রোপচারে চিকিৎসক যেমন রোগীর কোনও আপত্তি গ্রাহ্য না করিয়া কর্ত্তব্য পালন করিয়া যান, অসীমও তেমনই দৃঢ়কণ্ঠে বলিয়া যাইতে লাগিল,—"শেষ আশ্রয়,—দিগম্বর সন্ন্যাসীর মত বৃক্ষতল আর উন্মুক্ত আকাশতল—না, না, স্নেহময়ী কনিষ্ঠা ভগিনীর অনুরক্ত অঞ্চল। আর—"

রুদ্ধ ক্রোধে ও অভিমানে উচ্ছ্বসিতকণ্ঠে উষা বলিল, "হ', ব'লে যাও, দয়া ক'রে একশো টাকা মাসহারা যোগাচ্ছ তাকে, ছয় মাস অস্‌লারের বাড়ী অ্যাপ্রেন্টিস রাখিয়ে দিয়ে তাকে ঘটা ক'রে বিলেত পাঠিয়েছিলে ইঞ্জিনিয়ারী শিখতে, রোগের ছুতো ক'রে পালিয়ে এলো সেখান থেকে—"

অসীম বাধা দিয়া বলিল, "সব ব'লে যাচ্ছ ঠিক, তবে একটা যায়গায় সুরটা বেখাপ্পা লাগলো। দয়ার কথা ত এর ভেতর কিছু নেই, সব কর্ত্তব্য। কিন্তু তুমি যেমন ওর প্রতি তোমার কর্ত্তব্য পালন করছ, ও কি তেমনই ক'রে তোমার প্রতি ওর কর্ত্তব্য পালন করছে ঠিকমত? সাধলুম ফিল্‌মের কাযে ঢুকতে—চেহারাখানা আছে ভাল, তা ওটা হ'ল উঞ্ছ কায! ম্যাট্রিক পর্য্যন্ত বিদ্যে, তবে কি হাইকোর্টের জজ?"

ধৈর্য্যচ্যুত হইয়া উষা বলিল, "তুমি ত খুলেই বলছ ওকে তাড়িয়ে দিতে। আচ্ছা, তাই হবে।"

উষা আবার চলিয়া যাইতেছিল, অসীম বাধা দিয়া বলিল, "দেখ, উল্টো বুঝো না। ওর ভাল-মন্দও দেখবে না? সে পথে চল্‌লে ক্রমে আরও নীচে নামতে হবে, সে পথ থেকে ওকে ফিরিয়ে আনবার চেষ্টা করা ভাল না?"

উষা বলিল, "কি করতে চাও বল।"

অসীম বলিল, "মধুপুরে কি করেছে, শুনেছো বোধ হয় পরিতোষ বাবুদের কাছ থেকে। যার মনটা এখনও এমন ময়লায় পোরা, তাকে ঘরে চাবী দিয়ে রাখাই উচিত না? এর পর কোন দিন যে পুলিস-কেসে পড়বে না, তাই বা কে বলতে পারে? তাই বলছিলুম কি, ওকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে ষ্টুডিওতে কাযে লেগে যেতে বল! কথা হচ্ছে, ওকে কোন রকমে আটকে ফেলা, তা হ'লে না ডাকলেও পরের ঘরে গিয়ে থাকতে পারবেও না, যেখানে সেখানে কেলেঙ্কারী ক'রে বেড়াতেও পারবে না। কি বল?"

ভিতরের সমস্ত কথাই তাহা হইলে প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে! অশনি পড়িবে পড়িবে করা হইতে অশনি পড়িয়া গেলে অনেকটা শান্তি পাওয়া যায়। উষার যেটুকু লুকাইবার ছিল, তাহা যখন প্রকাশ হইয়া পড়িল, তখন আর আতঙ্ক কি, সঙ্কোচই বা কি? তাই দৃঢ়কণ্ঠে উষা বলিল, "অর্থাৎ তুমি যে মাসহারা দিচ্ছ, তার একটা রিটার্ণ চাইছ, না?"

অসীম এইবার সত্যই ক্রুদ্ধ হইল, উচ্চৈঃস্বরে বলিল, "এই জন্যই ও-সব কথায় থাকতে চাইনে। যা ভাল বোঝো কর, আমি ওতে নেই।" অসুস্থ শরীরেও অসীম গো-ভরে বাহিরে চলিয়া গেল, উষা বাধা দিলেও শুনিল না। সে চলিয়া গেলে উষা ক্ষুব্ধমনে ভাবিতে লাগিল, কাযটা কি ভাল হইল? দূর হউক, যাহা হইবার হইবে, ভাল লাগে না ভাবতে কিছু।

ভারাক্রান্ত মনে আপনার ঘরে ফিরিয়া আসিয়া উষা দেখিল, তাহার দাদা প্রফুল্লমুখে স্বচ্ছন্দচিত্তে সোফার উপর অর্দ্ধশায়িত থাকিয়া পা দোলাইতেছে, আর মাঝে মাঝে একরাশ সিগারের ধোঁয়া ছাড়িয়া কক্ষটিকে অন্ধকার করিয়া দিতেছে। অযাচিত অতর্কিত আগমন—বিশেষতঃ মুহূর্ত্ত পূর্ব্বে ইহারই বিষয় লইয়া স্বামি-স্ত্রীর মধ্যে মনোমালিন্যের উদ্ভব—উষার সারা অঙ্গ দারুণ ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিল।

[ক্রমশঃ

শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার বসু (সাহিত্যরত্ন)।

শ্যাম-সুন্দরী

শ্যাম-রাজ্যকে বিধাতা দু'ভাগে বিভক্ত করিয়া রাখিয়াছেন। উত্তরাঞ্চল ব্যাপিয়া দীর্ঘ গিরিশ্রেণী চলিয়াছে; দক্ষিণা-ঞ্চলে ভূমি প্রায়-সমতল; গিরি-পর্ব্বত যা আছে, তাহা

শ্যামের সম্ভ্রান্ত মহিলা

নগণ্য। দক্ষিণে আছে প্রচুর উপত্যকা—শ্যামল স্নিগ্ধ; ধান্য-ধনে সমৃদ্ধিশালিনী। উত্তরের গিরিশ্রেণী আবার গিয়া মাথা তুলিয়াছে সেই পূর্ব্ব-কম্বোজে এবং আনামে।

কম্বোজ, আনাম প্রভৃতি প্রদেশগুলি ভূগোলে ইন্দো-চীন অন্তরীপ নামে অভিহিত।

শ্যাম, কম্বোজ প্রভৃতি ইন্দো-চীন প্রদেশ-সমূহে নারীর

শ্যাম-কামিনী

আসন, আচার-রীতি প্রভৃতিতে কথঞ্চিৎ সৌসাদৃশ্য আছে। এ-সব প্রদেশে ভারতীয় সভ্যতা ও কৃষ্টি এক দিন সমধিক প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল,—তার পর ভারতের সুদিন

যাদুকরের যাদু

অপগত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় কাল্‌চারের সংস্পর্শ হারাইয়া এ-সব প্রদেশ স্ব-ভাবে গড়িয়া উঠিয়াছে। এইটুকু বুঝিয়া রাখিলে এ সব প্রদেশের আচার, ধর্ম, নীতির কথা সহজে বুঝা হইবে।

ফরাশী-অধিকৃত ইন্দো-চীন এবং ব্রিটিশ-অধিকৃত ব্রহ্মদেশের মাঝে শ্যামরাজ্য অধিষ্ঠিত, অর্থাৎ শ্যামের পূর্ব্বে ও উত্তর-পূর্ব্বে ফরাশী ইন্দো-চীন; পশ্চিমে ও উত্তর-পশ্চিমে ব্রহ্মদেশ; দক্ষিণে শ্যাম-সাগর, চীনা উপসাগরের একাংশ; দক্ষিণ-শ্যামের গা ঘেঁষিয়া আছে মলয়-সীমান্ত।

শ্যামে নদী নালার সংখ্যা নাই। য়ুরোপীয়রা শ্যামকে ভেনিসের সঙ্গে তুলনা করিয়াছেন। পথ-ঘাট শ্যামে নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। প্রধান নদী মিনাম—এবং এই নদী বহু শাখা-প্রশাখা বজ্রশিখার মত শ্যাম প্রদেশের বুক চিরিয়া দিকে দিকে বিচ্ছুরিত হইয়াছে।

শ্যামবাসীরা শ্যামকে বলে 'মুয়াং থাই' প্রদেশ। মুয়াং থাই কথাটা মলয়জ; ইহার অর্থ,—স্বাধীনতার দেশ। শ্যামে শ্বেত হস্তী আছে প্রচুর: একজন য়ুরোপীয় শ্যামের নাম দিয়াছেন Land of the White Elephant।

শ্যামরাজ্যে পদার্পণ করিবামাত্র বিদেশীর নয়ন-মন সর্ব্বাগ্রে নিপতিত হয় বৌদ্ধ-মন্দির-পথযাত্রিণী পূজারিণী শ্যামা-রমণীদের দিকে। প্রাতে শ্যামা রমণীরা চা, চাউল, সিদ্ধ-বেণু-শাখা লইয়া মন্দিরে চলিয়াছেন—তাঁদের পিছনে চলিয়াছে অপর পূজারিণীর দল।

শ্যামের পরিচারিকা

বেশে-ভূষায় সারল্য থাকিলেও যে সব শ্যামা-রমণীর বিষয়-বুদ্ধি আছে, তারা চায় ধনী চীনাকে বিবাহ করিতে। অলঙ্কারের দিকে যাদের লোভ, চীনা ছাড়া স্বজাতিকে বিবাহ করিতে তাদের প্রবৃত্তি বড় একটা দেখা যায় না। শ্যাম-রমণীর বেশে কোনো মাধুর্য্য বা বৈচিত্র্য নাই—নগ্ন-বিলাসে তাহাদের দারুণ অরুচি। সাদা-সিধা বেশে-ভূষায় যে রুচি দেখা যায়, তাহা মনোরম।

ব্যাঙ্কক-বাসিনী শ্যামা রমণীর বেশ-ভূষা পুরুষের সমতুল। আমাদের দেশে পল্লী-বালকের দল ছুটাছুটি-হুড়াহুড়ি করিবার সময় যেমন মালকোঁচা দিয়া কাপড় পরে, শ্যামা রমণীরা সাধারণতঃ কাপড় পরেন ঠিক সেইভাবে। তার উপর মোটা চাদর থাকে বক্ষোবাস; সে বাসে নিম্ন-বক্ষ আবৃত রাখেন। এই বক্ষোবাস প্রায়ই উজ্জ্বল রঙীন কাপড়ে তৈয়ারী হয়। এ বেশে রূপ কান্তি খুলিত চমৎকার—যদি না তাঁরা পুরুষের মত এমন ছোট ছাঁদে চুল ছাঁটিতেন! শ্যামা রমণীর মাথার চুল ধনি-দরিদ্র-নির্বিশেষে এত

কিছুকাল পূর্ব্ব পর্য্যন্ত শ্যামরাজ্যে নারী ছিল সংসারে তৈজস-পত্রের সামিল। গৃহে কন্যার জন্ম হইলে আনন্দ উৎসবের কোনো সাড়া উঠিত না। বিবাহে কন্যা-বিক্রয়ের প্রথা বিদ্যমান ছিল।

এখন শ্যামের নারী-সমাজ ব্রহ্ম-বাসিনীর মত ব্যক্তিত্বলাভে সমর্থ হইয়াছে; স্বাধীনতা-সুখ ভোগ করিতেছে। বেশীর ভাগ সংসারে নারী জীবিকা অর্জ্জন করে। বেশে-ভূষায় শ্যামার বড় বেশী বিলাস নাই, আড়ম্বর নাই। গায়ের বর্ণ পীতাভ, মাথার কেশ নীলাভ-কালো, ছোট করিয়া ছাঁটা,—দাঁতগুলি প্রসাধনে তারা কালো করিয়া রাখে, যেন উচ্ছের বীজের মত—তথাপি স্নিগ্ধ মাধুর্য্যে ও লাবণ্যে চিত্ত-হারিকার মূর্ত্তি!

শ্যাম-পরিবার

ছোট করিয়া ছাঁটেন যে মাথায় চিরুণী-ব্রাশ চালাইলেও কেশাগ্র খাড়া থাকে —শূকর-কুচির মত। তাহাতে রমণীর সর্ব্ব-রমণীয়তা একেবারে বিনষ্ট হয়।

মাতৃত্ব-লাভের সময় শ্যাম-রমণীদের যেন অগ্নি-পরীক্ষা চলে। প্রসবের ঠিক এক মাস পূর্ব্ব হইতে অন্তর্বত্নী কামিনীকে প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ডের সামনে অষ্টপ্রহর বসিয়া থাকিতে হয়। কখনো অগ্নির দিকে মুখ ফিরাইয়া—কখনো বা পিছনে অগ্নি রাখিয়া বসিয়া থাকেন। যে ঘরে অগ্নিকুণ্ড জ্বালা হয়, সে ঘরে একটিমাত্র ছিদ্র-পথ থাকে মুক্ত—এই ধূম্রবাষ্প ও অগ্নির মধ্যে একমাস থাকিতে যে যাতনা হয়, তা অকথ্য! তবু এ রীতি চলিয়া আসিতেছে চিরযুগ ধরিয়া—কাজেই মেয়ে-জাতের তাহা সহিয়া গিয়াছে।

সন্তান ভূমিষ্ঠ হইলে গৃহের বর্ষীয়সী কোনো রমণী চাউলের তিনটি লাড্ডু পাকাইয়া তিন দিকে নিক্ষেপ করেন। নিক্ষেপের কারণ ভূত-প্রেত সরিয়া যাইবে—সদ্যোজাত শিশুর উপর তারা নজর দিবে না! পরে এই লাড্ডুগুলি কুড়াইয়া গৃহের বা পল্লীর কুকুর-বিড়ালকে খাইতে দেওয়া হয়।

সন্তান ভূমিষ্ঠ হইলে আচার্য্যের ডাক পড়ে। তিনি গণিয়া বলিয়া দিবেন, শুভ, না, অশুভ দিনে জন্ম হইল। ছেলের ও মেয়ের শুভাশুভ ভিন্ন দিনে নির্দ্ধারিত আছে। যে দিন কন্যার জন্মের পক্ষে শুভ, সে দিনে যদি কোনো পুত্র-সন্তানের জন্ম হয়, তাহা হইলে সে শিশুর ভবিষ্যতে মঙ্গল নাই—হিসাব করিয়া বহুকাল হইতে তাহা একেবারে নির্দ্ধারিত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু জন্মদিনকে তো কোনো রকমে বদলানো চলে না; বা তাহাতে কাহারো হাত নাই; কাজেই এমন বেয়াড়া দিনে পুত্র-সন্তান জন্মিলে ভাগ্য-বিধাতার চোখে ধূলি দিয়া সে ছেলেকে দুর্ভাগ্য হইতে রক্ষা করিবার উপায়ও নির্ণীত আছে! অর্থাৎ ছেলের নাম দেওয়া হয় মেয়েলি ছাঁদে। এ ক্ষেত্রে ছেলের নাম হয়,—'বেচারা খুকী-খোকা' (little she-male child); মেয়ের বেলায় নাম হয় তেমনি "খোকা-খুকী" (little she-boy বা little he-girl) এই নাম-করণের উপর ছেলেমেয়ের জীবন-মরণ নির্ভর করিতেছে—ইহাই শ্যামবাসীদের বিশ্বাস। এমন বিসদৃশ দিনে জন্মিয়া অনেক রাজাকে যৌবন-কাল পর্য্যন্ত নারীর বেশে থাকিতে হইয়াছে—দুর্ভাগ্যের নজর এড়াইবার জন্য—এমন কথা শ্যামরাজ্যের ইতিহাসে আমরা পাই।

পাঁচ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত শ্যামরাজ্যে মেয়েদের অঙ্গে বসন বা আবরণ চাপাইবার রীতি নাই। "সৌন্দর্য্যে নগ্ন বসনই" —এ বয়সের আবরণ! ছয় বৎসর বয়স হই*তে*

শ্যাম-কুমারী—কেশ-পাশ ছিন্ন হয় নাই!

মেয়েদের শাড়া দেওয়া হয় কোমরে জড়াইবার জন্য। সহরে বা নগরে যে সব মেয়ের বাস, তারা শাড়া ও বক্ষোবাস পরে ছয় বৎসর বয়স হইতে। বারো বৎসর বয়সের পূর্ব্বে মেয়েদের লেখাপড়া শিখাইবার রীতি নাই। তা না থাকিলেও তাদের গান শেখানো হয় এবং এগারো-বারো বৎসর বয়সের মেয়েরা গৃহের বাহিরে প্রেমের গান গাহিয়া

বেড়ায়, তাহাতে নিষেধ নাই, শাসন নাই। মেয়েদের কাজ শেখানো হয়। শ্যামে রেশম-কীট প্রচুর—সেই কীট-পালন ও গুটি হইতে রেশম বাহির করা, রেশমী সুতায় কাপড় বোনা—এ সব কাজে ছোট বেলা হইতে মেয়েরা বেশ পটু হইয়া ওঠে।

মেয়েদের জীবনে প্রথম ও প্রধান উৎসব—এগারো হইতে তেরো বৎসর বয়সের মধ্যে তাদের মাথার শিখা-

বনেদী ঘরের মেয়ে

কর্ত্তন! তেরো বৎসর বয়সের পরে মেয়েদের মাথায় দীর্ঘ কেশ রাখিবার বিধি নাই। ধনি-দরিদ্র-নির্ব্বিশেষে এই শিখা-কর্ত্তন-ব্যাপারে সমারোহ-উৎসব চলে। কন্যাকে সোনালি শাড়ী পরাইয়া, নানা ভূষণে ভূষিত করিয়া মিছিলসহ রাজ-প্রাসাদে আনা হয়। রাজা স্বয়ং এ উৎসবে পৌরোহিত্য করেন। রাজধানীর বাহিরে এ উৎসবে পৌরোহিত্য করেন রাজার কোনো উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী, তাঁহার প্রতিনিধি-রূপে। অতি-দরিদ্র ঘরের মা-বাপও কন্যার এই সৌভাগ্য-দিনটির প্রতীক্ষা করে আকুল—উল্লাস-কম্পিত অন্তরে।

নারীর জীবনে দ্বিতীয় উৎসব—চম্পা-উৎসব। এ-উৎসবে বিবাহার্থিনী কন্যা বরের পাণি প্রার্থনা করে। বিবাহের কথা ঘটকের মারফৎ আগে হইতে চলিয়া পাকা থাকে; তার পর বর, সেই সঙ্গে বর ও কন্যা-পক্ষের বহু তরুণ যুবাকে কন্যার গৃহে নিমন্ত্রণ করিয়া আনা হয়। কন্যা তাহাদের

পদস্থ কর্ম্মচারী ও তাঁহার পত্নী

সঙ্গে 'হোলি' খেলায় প্রবৃত্ত হয়। গৃহে ভোজের সমারোহ-আয়োজন—মহিষ ও শূকর বলি হয় অজস্র; এবং হোলি খেলার পর কন্যা আসিয়া নির্ব্বাচিত বরের সামনে দাঁড়ায়। কন্যার হাতে থাকে তাম্বূল, চালের গুঁড়ি, সুপারি, খদির, সিদ্ধ মাছ, রেশমী কাপড়, সূতির কাপড় প্রভৃতি। বর সেগুলি লইয়া কন্যার হাতে মূল্য দান করে—রূপার বাট। আর্থিক অবস্থানুযায়ী রূপার দান বেশ বাড়িয়া ওঠে—ভারী হইয়া। মূল্য-দানের পর বর ও কন্যা পাশা-পাশি
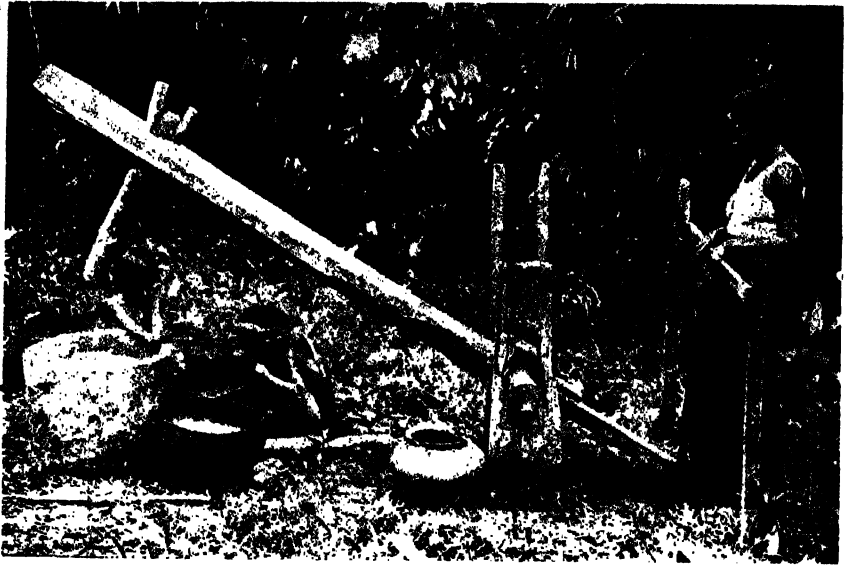
ঢেঁকিতে চাল ছাঁটা

বসে,—তাদের সামনে পিতলের পাত্রে দুটি ডিম, একটি মুর্গী, ও সুরা সংরক্ষিত হয়। দু'জনের হাতে পল্লী-যাদুকর সেগুলা তুলিয়া দেয়; তার পর বরের সঙ্গে কন্যার পিতা-মাতা ও আত্মীয়গণের পরিচয় করাইয়া দেওয়া হয়। পরিচয়-সাধনান্তে বধূকে লইয়া বর নিজ-গৃহে আসে। বরের গৃহে এ সময় বিশেষ সোপানশ্রেণী রচিত থাকে। বর ও কন্যাকে একসঙ্গে সমতালে পা ফেলিয়া এই সোপানে উঠা-নামা করিতে হয়। তিন দিন পরে বর আবার আসে বধূর সহিত বধূর গৃহে। এ গৃহ হইতে বধূর এবার চির-বিদায় লইবার পালা। বধূ বিদায় লইয়া চলিয়া যায় স্বামীর গৃহে নূতন সংসার পাতিয়া সেখানে বাস করিতে।

প্রাচীন রীতি-অনুসারে বিবাহের আর একটি বিধি আছে —কন্যা-হরণ। এ বিধিতে বেশ একটু বৈচিত্র্য আছে।

রাত্রে বাড়ীর সকলে শয়ন করিলে কন্যা ভাঁড়ার-ঘরে চালের ধামায় বা পাত্রে একটি রৌপ্য-মুদ্রা রাখে। মুদ্রা রাখার অর্থ, পালন-ব্যয় ধরিয়া দেওয়া হয়। মুদ্রাটি রাখিয়া নিঃশব্দে সে গৃহের বাহিরে চলিয়া আসে;

মন্দির-নর্ত্তকী

দ্বারে তার প্রতীক্ষায় বর থাকে দাঁড়াইয়া। কন্যা আসিলে তার হাত ধরিয়া বর তাকে একেবারে নিজের গৃহে লইয়া আসে। পিতৃ-গৃহের বাহিরে কন্যা বরের হাত ধরিবামাত্র তাহাদের বিবাহ হইয়া যায়। কন্যার পিতা-মাতা, ভ্রাতা বা অপর কোনো আত্মীয়-বন্ধু যদি সে সময়ে কন্যাকে বরের হাত হইতে ছিনাইয়া আবার তাকে ফিরাইয়া গৃহে আনিতে পারে, অবশ্য সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে—তাহা হইলে এ গান্ধর্ব্ব-বিবাহ সেই মুহূর্ত্তে নাকচ হইয়া যায়! নচেৎ এ বিবাহের বাঁধন অটুট থাকে।

শ্যামের বিবাহে ডিভোর্স আছে। স্বামীর তরফ হইতে ডিভোর্স ঘটিলে শ্বশুর-দত্ত উপহার-যৌতুকাদি স্বামীকে ফিরাইয়া দিতে হয়; কন্যার তরফ হইতে ডিভোর্স ঘটিলে কন্যার মূল্য-বাবদ বর যত অর্থ দেয়, কন্যাকে তার দ্বিগুণ অর্থ প্রত্যর্পণ করিতে হয়।

ব্যভিচারিণী বা কুলটার শাস্তি পূর্ব্বে ছিল,—উপপতি সহ নারীকে কশাঘাতে জর্জ্জরিত করা। এখন উভয়ে স্বামীকে খেশারৎ দিলেই পরিত্রাণ পায়। খেশারতের পরিমাণ নির্দ্ধারিত আছে—উপপতি দেয় বারো খানি রূপার বাট; কুলটা পত্নীকে দিতে হয় ছয় খানি।

দেবদাসী-নৃত্য

ধনি-সমাজে বহু-বিবাহ-প্রথা আজিও বিদ্যমান আছে। তবে মজা এই, যত বড় ধনী হৌক, বধূ-নির্ব্বাচনে পুরুষের কোন অধিকার নাই—বধূ বাছিয়া দেয় বরের আত্মীয়েরা।

মাতৃ-বিয়োগে কুকুর, চিংড়ী মাছ ও ভেকের মাংস ভোজনে নিষেধ আছে। ছেলেমেয়ে মরিলে মা-বাপের অশৌচ হয় না। পিতৃ-বিয়োগে ছেলে-মেয়েকে অশৌচ পালন করিতে হয় পনেরো মাস; মাতৃ-বিয়োগে অশৌচ থাকে তিন বৎসর। মা দশ মাস দশ দিন বহু কষ্টে সন্তানকে জঠরে ধারণ করেন, তার উপর প্রসবের বেদনা সহেন, তাই শ্যামরাজ্যে বাপের চেয়ে মা গৌরবে গরীয়সী। বাঁচিয়া থাকিতে মায়ের সম্মান তেমন না মিলিলেও মৃত্যুর পরে তাঁর প্রতি ছেলেমেয়েদের সম্মানের আর সীমা থাকে না।

মৃত্যু ঘটিলে মৃত দেহ শবাধারে রক্ষা করা হয়। শবাধারের পাশে নিকট-আত্মীয়দের বসিয়া প্রহরা দিতে হয়—

তার পর আসেন পুরোহিত। বিবিধ মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক মৃতের আত্মাকে স্বর্গে পাঠাইবার তিনি ব্যবস্থা করেন।

মন্ত্রোচ্চারণ-পর্ব্ব চুকিলে শবকে গৃহ হইতে বহিয়া কোনো মুক্ত প্রান্তরে বা নদীর তীরে আনা হয়। সেখানে সুগন্ধি কাষ্ঠ-ভারে—চন্দন ও ঈগল কাষ্ঠের ব্যবহারই সমধিক প্রচলিত—চিতা সজ্জিত হয়; চিতার পার্শ্বে মৃতের আত্মীয়-বন্ধু আসিয়া সমবেত হয়; অস্থাবর সম্পত্তির কিয়দংশ, মায় গৃহপালিত গো-মেষ-মহিষ-কুকুর-বিড়ালটিকে পর্য্যন্ত চিতার সামনে আনিতে হয়। অর্থাৎ মৃতের প্রতি যতখানি শ্রদ্ধা-সম্মান দেখানো সম্ভব, তাহাতে কোনো দিক দিয়া ক্রটি বা ব্যতিক্রম ঘটিতে দেওয়া হয় না।

আমাদের দেশের মত মৃতদেহ অগ্নিতে নিঃশেষে ভস্মীভূত করার বিধি শ্যাম-রাজ্যে প্রচলিত নাই। দগ্ধ দেহাবশেষ শবাধারে বহিয়া মন্দিরে আনিয়া মন্দির-সংলগ্ন ভূমিতে তাহা সমাহিত করিতে হয়। অবস্থা-বৈগুণ্যে যারা মৃতদেহ সমাহিত করিতে পারে না, তারা সে মৃতদেহ লইয়া কোনো বিজন প্রান্তরে ফেলিয়া দিয়া আসে; সে-দেহ শৃগাল বা শকুনি-গৃধিনীর ভক্ষ্য হয়।

দেশে মড়ক লাগিলে এত সমারোহে অন্ত্যেষ্টি-কৃত্য চলে না। মাটী খুঁড়িয়া কোনো মতে দেহ চাপা দিয়া শেষকৃত্য সারিয়া লয়। কারাগৃহ-বাসী অপরাধী, শিশু, নিঃসন্তানা রমণী, আত্মঘাতীর দল, কিম্বা অপঘাতে যাহাদের মৃত্যু ঘটে, তাহাদিগের মৃত্যুতে সম্মান-শ্রদ্ধা প্রকাশের বিধি নাই। নিরুপায় দীন-দরিদ্র ভিখারী, বা কারাগৃহের বন্দীদের মৃত-দেহ ব্যাঙ্ককের এক মন্দির-সংলগ্ন ভূমিতে ফেলিয়া দেওয়া হয়, সেখানে শকুনি-গৃধিনীর বিরাট অক্ষৌহিণী ওৎ পাতিয়া বসিয়া আছে, সারাক্ষণ—সে সব দেহ ভোজনের বাসনায় লোলুপ চিত্তে!

শ্যাম-রাজ্যে দেবদাসী-প্রথা এখনো প্রচলিত আছে। দেবদাসীর বিবাহ হয় দেবতার সঙ্গে; মন্দিরে তাদের বাস। নৃত্য-গীতে দেবতার তৃপ্তি-সাধন তাহাদের ব্রত। এ জন্য কঠিন দুশ্চর তপস্যার ভাবে তাহারা নৃত্য-লীলা শিক্ষা করে। শিশু-বয়সেই তাহাদের দেব-দ্বারে সমর্পণ করা হয়; পরে তাহাদের দেহ-মনের উপর যা-কিছু অধিকার, তাহা গিয়া বর্ত্তায় রাজা বা রাজ-বংশীয় পুরুষের হাতে! যৌবনোদয়ে রাজ-গণিকা হইয়া তাহারা প্রাসাদ-অন্তঃপুরে স্থান পায়।

"নববর্ষ"

নব প্রভাতের শুভ্র আলোক-ধারা
পরশি তাহার প্রাণময়ী হলো ধরা;
জাগিয়া উঠিল রূপ রস আর গানে,
সে বারতা আজ রণুক সবার প্রাণে।
তরুণ অরুণ প্রথম ছড়াল বাণী—
আকাশ, বাতাস করে শুধু কানাকানি
আনন্দ আজ মৃদুল সুরভি বায়ে
জাগে আনন্দ মেঘের অলক ছায়ে।
প্রথম প্রভাতে জাগিল জীবন-ধারা
চূর্ণ করিয়া শত বন্ধন কারা;
ভেদি কত শত অবসাদ আর গ্লানি
যৌবন রসে আনন্দ লয় টানি।

দিকে দিকে আজ জয় আনন্দ গান—
হৃদি-কারাতলে হঠাৎ জাগিল প্রাণ!
জীবনানন্দে মনের মানুষ জাগে
নব প্রভাতের পুণ্য প্রসাদ মাগে।
আপনার মাঝে যে আনন্দ আজ নাচে,
বাহিরের পথ মোর কাছে শুধু যাচে;
সে জয়গান আজ প্রীতি শুভেচ্ছা দানে
পাঠাইয়া দিনু তোমাদের মাঝখানে।
মায়া-কজ্জল যে মোর দিয়েছে চোখে,
রূপময়ী সে যে আমার কল্পলোকে;
হে মোর মানসী অতুল কণ্ঠে তব
দোলাইয়া দিনু প্রেমমালা অভিনব!

শ্রীবিমল বসু।

সর্ষের মধ্যে ভূত!

(সত্য ঘটনা)

আমাদের দেশে আফিং, গাঁজা, চরস প্রভৃতি যে সকল পণ্যদ্রব্য আবগারী আইন অনুসারে বিনা-লাইসেন্সে বিক্রয় নিষিদ্ধ, তাহা প্রচুর পরিমাণে নানা কৌশলে স্থানান্তর হইতে আমদানী হইয়া থাকে। রেলে, ষ্টীমারে, মোটর-কারে ঐ সকল দ্রব্য আমদানী হইলেও সন্ধানী গোয়েন্দার চেষ্টায় তাহা ধরা পড়িয়া যায়, সংবাদপত্রে নিত্য তাহার বিবরণ প্রকাশিত হইতে দেখি। অপরাধীরা শাস্তিও যথেষ্ট পায়; কিন্তু গোপন আমদানীর বিরাম নাই। রাজসাহীর নওগাঁ মহকুমার এলাকায় গাঁজার চাষ প্রচুর। সেই স্থান হইতে ঢাকে ঢোলে গাঁজা ভরিয়া লইয়া স্থানান্তরে চালান দেওয়া হয়, কিন্তু গোয়েন্দারা তাহাও ধরিয়া ফেলে। একবার উত্তরপশ্চিম প্রদেশ হইতে এক জন যাত্রী কুমড়োর ভিতর আফিং পুরিয়া, ঝোড়া-বোঝাই কুমড়ো লইয়া ট্রেণে যাইতেছিল; কিন্তু আবগারী বিভাগের কর্ম্মচারীরা তাহাও ধরিয়া ফেলিয়াছিল। এ সকল ত এ দেশের কথা, দেশান্তর হইতে জাহাজের সাহায্যে যেরূপ অদ্ভুত কৌশলে রাশি রাশি অহিফেন অন্য রাজ্যে চালান দেওয়া হয়, সেই কৌশলের তুলনায় এ দেশের অবলম্বিত এ সকল কৌশল যেন ছেলেখেলা! সম্প্রতি লণ্ডনের কোন বিখ্যাত মাসিকে জাহাজের সাহায্যে দেশান্তরে অহিফেন চালান দেওয়ার একটি কৌশলের বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। বর্ণনাকারী লেখকের সহকর্ম্মী, স্বয়ং ভুক্তভোগী; লেখক তাঁহার রচিত প্রবন্ধে অপরাধী ও তাহার সহযোগীকে ছদ্মনামে পরিচিত করিয়াছেন বটে, কিন্তু ঘটনাটি যে সম্পূর্ণ সত্য, তাঁহার বর্ণিত বিবরণের কোনও অংশে অত্যুক্তি নাই, ইহা তিনি দৃঢ়তার সহিত বলিয়াছেন। 'মাসিক বসুমতী'র পাঠক-পাঠিকাগণের মনোরঞ্জনের জন্য লেখকের উক্ত সহযোগীর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার বিবরণ নিম্নে অনূদিত হইল। সত্য ঘটনার এই বিবরণ কোন কাল্পনিক গোয়েন্দাকাহিনী অপেক্ষা অল্প কৌতুকাবহ নহে, এবং সত্য হইলেও অল্প বিস্ময়াবহ নহে।

লেখক মিঃ হ্যারী ওয়েন লিখিতেছেন—তাঁহার সহযোগী এবং তাঁহাদের জাহাজের প্রধান কর্ম্মচারী ঘটনাটির বিবরণ এই ভাবে বর্ণিত করিয়াছেন,—

"যে সময়ের ঘটনার কথা বলিতেছি, সে সময় আমার বয়স ছিল নিতান্ত অল্প। তখন আমি সবে মাত্র চাকরী পাইলেও জাহাজের প্রধান কর্ম্মচারীর পদে 'একটিনী' করিবার ভার পাইয়াছিলাম। যে জাহাজে আমার এই চাকরী, সেই জাহাজ তখন কাডিফের বন্দরে নঙ্গর করিয়া, প্রাচ্য দেশের জন্য কয়লার বোঝাই লইতেছিল। বয়োধর্ম্মে অন্যান্য যুবকের ন্যায় আমারও প্রবল উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছিল, এবং আশা করিতেছিলাম, আমিও এক দিন নিজের জাহাজের কর্তৃত্ব করিতে পাইব। একটি সুন্দরী তরুণী নিউকাসলে আমার প্রতীক্ষা করিতেছিল। আমার আশা ছিল, উপযুক্ত পরিমাণ অর্থ সংগ্রহ করিতে পারিলেই তাহাকে বিবাহ করিয়া ফেলিব।

বলিয়াছি, আমাদের জাহাজ তখন কাডিফের ডকে অপেক্ষা করিতেছিল। কাজ শেষ হইলে স্থির হইল, সেই দিনই আর চারি ঘণ্টার মধ্যে আমরা নঙ্গর তুলিয়া পূর্ব্বাঞ্চলে যাত্রা করিব। জাহাজের কাপ্তেন তখন তীরে থাকায় সাময়িকভাবে আমারই উপর জাহাজের ভার ছিল। রাত্রি প্রায় বারোটার সময় আমি জাহাজের 'রেলিং'এর উপর ভর দিয়া চারিদিক দেখিতেছিলাম। নৈশ প্রকৃতি তখন নিস্তব্ধ, এবং চতুর্দ্দিক্ নির্জ্জন।

সেই অন্ধকারের মধ্যে সহসা একখান মোটর-কারের মাথার আলো আমার দৃষ্টিগোচর হইল; পর-মুহূর্ত্তেই একখান বৃহৎ রোলস্ রয়েস্ গাড়ী জাহাজের পাশে আসিয়া দাঁড়াইল।

আমি মনে মনে বলিলাম, "এ আবার কি ব্যাপার!"

মুহূর্ত্ত পরে একটি লোক গাড়ীর দরজা খুলিয়া নীচে নামিয়া পড়িল; পশুলোমনির্ম্মিত একটি জমকাল কোটে তাহার দেহ আবৃত। লোকটিকে দেখিয়া সহজেই বুঝিতে পারিলাম, সে ধনী ত বটেই, পদগৌরবেও মাতব্বর।

আমাকে জাহাজের 'রেলিং'এ ভর দিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া আগন্তুক বলিল, 'তুমিই কি জাহাজের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী?'

আমি বলিলাম, 'আমার উপরেই জাহাজের ভার আছে; আমাকে কি করিতে বল?'

আগন্তুক বলিল, 'তোমার সঙ্গে আমার দুই একটা গোপনীয় কথা আছে।'

আমি তাহাকে জাহাজে উঠিয়া আসিতে বলিলাম।

লোকটা আমার সম্মুখে আসিয়া পূর্ণ দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চাহিল; তাহার পর গলার আওয়াজ খাটো করিয়া অসঙ্কোচে জিজ্ঞাসা করিল; 'কুড়ি পাউণ্ড উপার্জ্জন করিতে চাও কি?'

আমার সেই অবস্থায় কুড়ি পাউণ্ড অনেক টাকা। আমি বলিলাম, 'চাই ত বটেই, কিন্তু সেজন্য আমাকে কি করিতে হইবে বল শুনি।'

অপরিচিত আগন্তুক আমার প্রশ্ন শুনিয়া হাসিয়া বলিল, 'বেশী কিছু নয়। শুনিলাম, তোমরা পূর্ব্বাঞ্চলে যাইতেছ।'

আমি বলিলাম, 'হাঁ, ঠিকই শুনিয়াছ।'

লোকটা বলিল, 'আমার কথা এই,—টি—জাহাজের প্রধান কর্ম্মচারী অঙ্গীকার করিয়াছিলেন, তিনি আমার কয়েকটি ছোট

পার্শেল কোনও নির্দ্দিষ্ট স্থানে লইয়া যাইবেন; কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে আমার গাড়ীখান পথের মধ্যে হঠাৎ বিগড়াইয়া যাওয়ায় আমার এখানে আসিতে এরূপ বিলম্ব হইল যে, সেই জাহাজ ধরিতে পারিলাম না। পার্শেলগুলি যাহাতে ঠিক সময়ে বিলি হয়, সেজন্ত আমি ভারী ব্যস্ত হইয়া প'ড়য়াছি। শুনিলাম, তোমাদের জাহাজ আজ প্রত্যুষেই প্রাচ্য দেশে রওনা হইবে। এই জন্য আমার ইচ্ছা হইয়াছিল, এই জাহাজের কোন পদস্থ ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করি, তাঁহার নিকট এই উপকারটুকু আমি পাইতে পারি কি ?'

আমি বলিলাম, 'তুমি শুধু এই উপকারটুকু চাও—কয়েকটা পার্শেল যথাস্থানে পৌছাইয়া দেওয়া ?'

আগন্তুক বলিল, 'হাঁ, তাহাই; পার্শেলগুলি যাঁহার নিকট প্রেরিত হইতেছে, তাঁহার নিকট সেগুলি পৌছাইয়া দিলেই হাতের কায শেষ। কুড়ি পাউণ্ড পুরস্কারের তুলনায় এ কায বিশেষ কঠিন নহে; কি বল তুমি ?'

আমি বলিলাম, 'পার্শেলগুলি তাহা হইলে নিশ্চিতই খুব মূল্যবান্।'

লোকটি বলিল, 'সে কথা সত্য; মূল্যবান্ বলিয়াই ত আমি এই কাযের জন্য এত বেশী টাকা দিতেছি।'

এত সহজে এতগুলি টাকা পাওয়া যাইবে, আমি টোপ গিলিলাম! আমি তখন তরুণ যুবক, সাংসারিক অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিতে পারি নাই; বিশেষতঃ, পূর্ব্বেই বলিয়াছি—সে সময় কুড়ি পাউণ্ড আমার পক্ষে অনেক টাকা।

আমি বলিলাম, 'বেশ, আমি এই প্রস্তাবে রাজি।'

লোকটি বলিল, 'উত্তম, আমি অত্যন্ত বাধিত হইলাম। আমি পার্শেলগুলি জাহাজে লইয়া আসি; তার পর অন্যান্য কথার আলোচনা করিব।'

লোকটা তাহার গাড়ীতে ফিরিয়া গেল। সে তাহার প্রকাণ্ড কোটের পকেটগুলি পার্শেল-সমূহে পূর্ণ করিয়া জাহাজে পুনর্ব্বার উঠিয়া আসিল।

আমি তাহাকে বলিলাম, 'নীচে আমার কেবিনে চল।'

আমরা উভয়ে আমার কেবিনে প্রবেশ করিলাম। আগন্তুক তাহার পকেট হইতে কতকগুলি পার্শেল বাহির করিল; দেখিয়া মনে হইল, প্রত্যেকটি ছয় ইঞ্চি দীর্ঘ, এবং তিন চার ইঞ্চি প্রশস্ত।

আগন্তুক সেই পার্শেলগুলি টেবলের উপর পর পর সাজাইয়া রাখিয়া বলিল, 'এই দেখ মোট কুড়িটি পার্শেল, এগুলি বিলি করিতে হইবে; প্রত্যেকটির জন্ত এক এক পাউণ্ড পাইবে।'

পরীক্ষার জন্য একটা পার্শেল হাতে তুলিয়া দেখি—অসম্ভব ভারী! আমি ইহাতে বিস্মিত হইয়া লোকটার মুখের দিকে চাহিলাম।

আমার বিস্ময়ের কারণ বুঝিতে পারিয়া সে হাসিয়া বলিল, 'পার্শেলটা খুব ভারী মনে হইল কি ?'

আমি কিঞ্চিৎ উত্তেজিত স্বরে বলিলাম, 'কি আছে ইহাদের মধ্যে ?'

আগন্তুক বলিল, 'সত্য কথা আমি তোমার নিকট গোপন করিব না। এই পার্শেলগুলি চাপ-সম্পিষ্ট অহিফেন-পূর্ণ।'

বলিয়াছি, আমি তখন তরুণ যুবক মাত্র, বহুদর্শিতাও লাভ করিতে পারি নাই, এবং কুড়ি পাউণ্ড উপার্জ্জনের জন্ত আমার আগ্রহও যথেষ্ট ছিল; তথাপি এ জ্ঞান আমার ছিল যে, বে-আইনী আফিং চালান দেওয়া অত্যন্ত গুরু অপরাধ; বিশেষতঃ এই ব্যবসায়টা লজ্জাজনক বলিয়াই আমার ধারণা ছিল।

আমি সত্রাসে বলিলাম, 'ইহার মধ্যে আফিং আছে ? তাহা হইলে আমি এই ব্যাপারের সংস্রবে নাই, মিষ্টার! এই লক্ষ্মীছাড়া মাল তুমি অবিলম্বে জাহাজ হইতে অপসারিত করিলেই বাধিত হইব।'

আমার কথা শুনিয়া লোকটা অদ্ভুতভাবে আমার মুখের দিকে চাহিল, তাহার পর কোন কথা না বলিয়া দশখান স্বর্ণমুদ্রা পকেট হইতে বাহির করিল; সেগুলি সে টেবলের উপর ছড়াইয়া রাখিল। সেই উজ্জ্বল স্বর্ণখণ্ডগুলি যথেষ্ট প্রলোভনের সামগ্রী হইলেও আমি সঙ্কল্প করিলাম—এই লোভ সংবরণ করিব।

আমি বলিলাম, 'আমাকে সোনার টাকা দেখাইয়া কোন ফল নাই। ও কায আমি করিব না, করিতে পারিব না। তোমার মাল লইয়া তুমি জাহাজ হইতে নামিয়া যাও। কাপ্তেন জাহাজে আসিবার পূর্ব্বেই সরিয়া পড়।'

লোকটা মৃদু হাসিয়া বিদ্রূপভরে বলিল, 'ডকের ফটকে এক জন পুলিসম্যান দাঁড়াইয়া আছে। যদি আমি এই আফিং এখান হইতে লইয়া গিয়া গাড়ীতে রাখি, আর সে গাড়ী খানাতল্লাস করে, তাহা হইলে তোমাকেও হয় ত কুইয়ার ষ্ট্রীটে আসামীর কাঠরায় দাঁড়াইতে হইবে!'

তাহার এই কথার মর্ম্ম প্রথমে বুঝিতে পারিলাম না, কিন্তু তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে অধিক বিলম্বও হইল না। যদি সেই পুলিসম্যানটা তাহাকে জাহাজে আসিতে দেখিয়া থাকে, এবং গাড়ী পরীক্ষা করিয়া পুলিন্দায় সংরক্ষিত আফিংয়ের সন্ধান পায়, তাহা হইলে সেই নিষিদ্ধ সামগ্রী যে সে এই জাহাজ হইতে লইয়া যায় নাই, তাহা সপ্রমাণ করা কঠিন হইবে।

তাহার কথার মর্ম্ম বুঝিতে পারিয়াও আমি দৃঢ়স্বরে বলিলাম, 'নির্ব্বোধের মত যা তা বলিও না। এ জিনিষ তুমিই ত তোমার গাড়ী হইতে আনিয়া জাহাজে তুলিয়াছ! উহার সঙ্গে আমার কোনও সম্বন্ধ নাই।'

আগন্তুক বলিল, 'সে কথা সত্য; কিন্তু কে তোমার কথা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিবে? আমার যাহা বলিবার আছে—তাহা শুনিয়া পুলিস তোমাকেও সমান অপরাধী বলিয়াই মনে করিবে।'

আমি বলিলাম, 'আমার ঘাড়ে দোষ চাপাইবার জন্ত তুমি কি বলিবে—আফিংয়ের এই সকল বাণ্ডিল আমিই তোমাকে দিয়াছি ?'

সে পুনর্ব্বার হাসিয়া বিদ্রূপভরে বলিল, 'তোফা! আমার মনের কথা তুমি টানিয়া বাহির করিয়াছ!'

ক্ষণকালের জন্ত আমার ইচ্ছা হইল, সেই শয়তানকে তাহার কোটের কলার ধরিয়া ঊর্দ্ধে তুলিয়া, সমুদ্রে ছুড়িয়া ফেলি, তাহার আফিংয়ের সেই বাণ্ডিলগুলা তাহার অনুসরণ করুক। কিন্তু ধীরভাবে চিন্তা করিয়া আমি বুঝিতে পারিলাম, সেই কার্য্যের ফল অধিকতর বিড়ম্বনাজনক হইতে পারে! কি সঙ্কটেই পড়া গেল ভাবিয়া অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া পড়িলাম!

একখান চেয়ারে বসিয়া পড়িয়া আমি এই সঙ্কট হইতে পরিত্রাণের উপায় চিন্তা করিতে লাগিলাম; কিন্তু কোন ফন্দীই

মাথায় আসিল না। সেই হতচ্ছাড়া জিনিষ জাহাজে রাখিলেও বিপদ, না রাখিলেও ঠিক সেইরূপই বিপদ, কোনও দিকে পরিত্রাণ নাই!

আমি ভাবিয়া দেখিলাম, ডকের গেটের পাহারাওয়ালা যেখানে দাঁড়াইয়াছিল, জাহাজ হইতে সেই স্থানের দূরত্ব অধিক নহে; কিন্তু জাহাজের গন্তব্যস্থল বহু দূরে অবস্থিত। আমরা তত দূরে যাইতে যাইতে এই সঙ্কট হইতে পরিত্রাণের একটা উপায় হয় ত পার্শেলগুলি গ্রহণ করিব। কিন্তু এ কথা তুমি স্মরণ রাখিও যে, এই সঙ্কট হইতে পরিত্রাণ লাভের কোন উপায় স্থির করিতে না পারাতেই আমি এ কায করিতে সম্মত হইলাম।'

লোকটা আমার কথা শুনিয়া দাঁত বাহির করিয়া আবার হাসিয়া উঠিল। তাহার হাসি দেখিয়া আমার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া গেল; আমার ইচ্ছা হইল—কি ইচ্ছা হইল, তাহা বলিয়া কোন

সে একখানি ছিন্ন খামের অর্দ্ধাংশ বাহির করিল

আবিষ্কার করিতে পারিব।—সুতরাং যে পন্থা অবলম্বন করিলে, ভাবিয়া চিন্তিয়া একটা উপায় স্থির করিবার অবসর পাইব বলিয়া ধারণা হইল, সেই পন্থা অবলম্বনেরই সঙ্কল্প করিলাম।

অবশেষে আমি তাহাকে বলিলাম, 'তুমি আমাকে বিলক্ষণ কায়দায় পাইয়াছ, তাহা বুঝিতে পারিলাম। যদি আমার কোন সাক্ষী থাকিত, তাহা হইলে আমি পুলিস ডাকিয়া তোমাকে তাহার জিম্মা করিয়া দিতাম। তুমি কি রকম খেলোয়াড়, তোমার ব্যবহারে তাহাও বুঝিতে পারিয়াছি। আমার বিরুদ্ধে মিথ্যা কথা বলা, এবং সাক্ষী সংগ্রহ করিয়া তাহা সপ্রমাণ করা তোমার পক্ষে কঠিন হইবে না। এই প্রকার বিপদে পড়িয়াছি বলিয়াই তোমার লাভ নাই; কিন্তু সে আমাকে মুঠার ভিতর পাইয়া খুসী হইয়া বলিল, 'তুমি বিজ্ঞের মত কথা বলিয়াছ। কুড়ি পাউণ্ড তুচ্ছ করিবার বস্তু নহে; বিশেষতঃ, আমাকে এই ভাবে সাহায্য করিলে তোমার বিপদের কোন আশঙ্কা নাই।'

আমি বলিলাম, 'মনে কর, সমুদ্র-পথে কিছু দূর যাইবার পর তোমার এই বিষের কাঁড়ি যদি আমি সমুদ্রে ফেলিয়া দিই, তাহা হইলে কে সেই কার্য্যে বাধা দিবে?'

আফিংওয়ালা বলিল, 'খবর্দ্দার, ওরকম কায করিও না। এই মাল যাঁহার নিকট পাঠাইতেছি, নির্দ্দিষ্ট সময়ে তিনি ইহার প্রতীক্ষা করিবেন; কিন্তু যদি কোন কারণে পার্শেলগুলি পথিমধ্যে খোয়া

যায়, তাহা হইলে তোমার বিপদের সীমা থাকিবে না; তোমার প্রাণেরও আশঙ্কা থাকিতে পারে।'

আমি হতাশভাবে ব'ললাম, 'তুমি বড় সোজা মানুষ নহ; যাহা হউক, আমাকে আর কি করিতে হইবে বল।'

লোকটা তাহার কোটের আর একটা প্রশস্ত পকেটে হাত পূরিয়া দিয়া, আফিংয়ের বাণ্ডিল অপেক্ষা স্থূল একটি বাণ্ডিল বাহির করিয়া তাহার মোড়ক খুলিতে লাগিল। তাহার ভিতর সুদীর্ঘ এবং সুদৃঢ় রজ্জুবদ্ধ কুড়িটি ছোট ছোট রক্তবর্ণের ফাংনা ছিল। ফাংনার রজ্জু ফাংনার সহিত বিজড়িত। প্রত্যেক রজ্জুর শেষ মুড়ার কিঞ্চিৎ ঊর্দ্ধে এক একটি সীসার 'ভারা' (a leaden sinker) আবদ্ধ। (যাঁহারা মুগার সূতায় বঁড়শী বাঁধিয়া মৎস্ত শিকার করেন, এই শ্রেণীর ভারা তাঁহাদের সুপরিচিত।)

আফিংওয়ালা বলিল, 'সুয়েজ খাল পার হইবার পর এ বন্দরে তোমাদের জাহাজ ভিড়াইতে হইবে।'

আমি বলিলাম, 'তাহা আমার জানা আছে।'

'পূর্ব্বে সেখানে গিয়াছ কি?'

'হাঁ।'

'সেখানে বেতারের ষ্টেশন, এবং পাহাড়ের উপর শ্বেতবর্ণ মনুমেণ্ট আছে জান?'

'হাঁ।'

আফিংওয়ালা বলিতে লাগিল, 'বেশ, তোমাদের জাহাজ এ— বন্দরে ভিড়িবার পূর্ব্বে তুমি এক এক গাছ দড়ির মুড়ায় এক একটি পার্শেল বাঁধিয়া ফেলিবে; এ ভাবে বাঁধিবে যেন সীসার ভারাটি তাহার অদূরে থাকে। এই কায শেষ হইলে তাহা ঠিক মুহূর্ত্তে সমুদ্রে নিক্ষেপ করিবার জন্ত প্রস্তুত থাকিবে। তাহার পর যে সময় দেখিবে, জাহাজ চলিতে চলিতে সেই বেতার ষ্টেশন ও মনুমেণ্টের সমসূত্রে আসিয়া পড়িয়াছে, সেই সময় ফাংনা সহ পার্শেলগুলি ধীরে ধীরে সমুদ্রে নিক্ষেপ করিবে। ভারাগুলি এ—উপসাগরের তলা স্পর্শ করিতে পারে—তাহার উপযোগী করিয়াই রজ্জুগুলি দীর্ঘ করা হইয়াছে। আমার কথা বুঝিতে পারিলে কি?'

আমি বলিলাম, 'না বুঝিলে তোমার কবল হইতে মুক্তিলাভের উপায় কি?—এইখানেই খতম, না আরও কিছু আছে?'

'আর একটু বাকি'—বলিয়া আফিংওয়ালা কোটের ভিতরের পকেট হইতে একখান লেফাপা বাহির করিল। সে সেই লেফাপা দু'টুকরা করিয়া ছিঁড়িয়া এক টুকরা নিজের পকেটে ফেলিল, অন্ত টুকরা আমার হাতে দিয়া বলিল,'এই লেফাপা'র যে আধখান আমার পকেটে রাখিলাম, উহা লইয়া এক জন লোক তোমার সঙ্গে দেখা করিবে; তোমার নিকট লেফাপার যে আধখান থাকিল, তাহা তাহাকে দেখাইবে। সে দুই টুকরা মিলাইয়া যখন বুঝিতে পারিবে, উভয় টুকরা একই লেফাপার দুই অংশ, সেই সময় অবশিষ্ট দশ পাউণ্ড সে তোমাকে প্রদান করিবে। এই ভাবে দশ পাউণ্ড পাইবে, অবশিষ্ট দশ পাউণ্ড আমি তোমাকে দিয়া যাইতেছি। ইহাতেই বুঝিতে পারিবে—তোমাকে ফাঁকি দেওয়ার দুরভিসন্ধি আমার নাই।'

এই কথা বলিয়া সে টেবলস্থিত স্বর্ণমুদ্রাগুলির দিকে অঙ্গুলি প্রসারিত করিল। আমি একটা স্বর্ণমুদ্রা হাতে লইয়া তাহা বাজাইয়া দেখিলাম। তাহার 'ঝুন্' শুনিয়া বুঝিতে পারিলাম—মেকি নয়!

আফিংওয়ালা হাসিয়া বলিল, 'খাঁটি সভরীণ, তোমার প্রতারিত হইবার আশঙ্কা নাই। আমার উপদেশ অনুসারে কায করিলে অবশিষ্ট অর্থ পাইতে তোমার কোন অসুবিধা হইবে না।'

আমি মুদ্রাগুলি তুলিয়া লইয়া তাহাকে বলিলাম, 'বেশ, তাহাই হইবে। এখন জাহাজ হইতে নামিয়া যাও। কাপ্তেন তীর হইতে জাহাজে আসিয়া তোমাকে দেখিতে পাইলে, তুমি কি উদ্দেশ্যে জাহাজে আসিয়াছিলে, তাহা আমাকে জিজ্ঞাসা করিবেন। কাপ্তেন না আসিতেই তুমি সরিয়া পড়।'

লোকটা আমার মঙ্গল কামনা করিয়া চলিয়া গেল। দেখিলাম, তাহার গাড়ী ডকের ফটক পার হইতেই পাহারাওয়ালা তাহার গাড়ী আটক করিল। গাড়ীখান সেখানে কয়েক মিনিট দাঁড়াইয়া রহিল; তাহা দেখিয়া আমি বুঝিতে পারিলাম, পাহারাওয়ালা তাহার গাড়ী খানাতল্লাস না করিয়া ছাড়িল না। তখন বুঝিলাম, তাহার অনুরোধ প্রত্যাখ্যান না করিয়া ভালই করিয়াছি। তাহার জিনিষগুলি আমার জিনিষপত্রের মধ্যে লুকাইয়া রাখিলাম। আমার দুশ্চিন্তার কোন কারণ ঘটিয়াছে, ইহা কাহাকেও বুঝিতে দিলাম না। প্রত্যূষে পাঁচটার সময় আমরা সমুদ্রপথে যাত্রা করিলাম।

আমি জানিতাম, কোন কোন জাহাজের কাপ্তেন এই প্রকার বে-আইনী কার্য্যে অভ্যস্ত ছিল, এবং এই প্রকার উপার্জ্জনের লোভ সংবরণ করিতে পারিত না; কিন্তু আমাদের এই জাহাজের অধ্যক্ষটি খাঁটি মানুষ, জাহাজের আইন-কানুন লঙ্ঘন করিলে কাহারও অপরাধ তিনি মার্জ্জনা করিতেন না। যদি তিনি কোনরূপে ঐ সকল পার্শেলের সন্ধান পাইতেন, তাহা হইলে আমার বিপদের সীমা থাকিত না।

কতবার আমার মনে হইয়াছে, আফিংয়ের পুলিন্দাগুলি গোপনে সমুদ্রে ফেলিয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হই। কিন্তু তাহাতেও আমার বিপদের আশঙ্কা ছিল। আমার প্রণয়িনীর কথা স্মরণ হওয়ায় ঐরূপ কার্য্যে আমি প্রতিনিবৃত্ত হইয়াছিলাম। আমি কাপুরুষ না হইলেও ঐ সকল পুলিন্দার প্রাচ্যদেশীয় মালিকের ক্রোধভাজন হইবার জন্ত আমার আগ্রহ ছিল না। ইহাদের জিঘাংসা কিরূপ ভীষণ, তাহা আমার অজ্ঞাত ছিল না।

কিন্তু দুশ্চিন্তায় আমি ব্যাকুল হইলাম। যদি কাহারও নিকট আমার সঙ্কটের কথা প্রকাশ করিতে পারিতাম, তাহা হইলে বোধ হয়, একটু স্বস্তি পাইতাম; বিশেষতঃ কোন সহকর্ম্মীর সাহায্য ব্যতীত একাকী অন্যের অলক্ষ্যে রজ্জুবদ্ধ ফাংনা সহ পার্শেলগুলি নির্দ্দিষ্ট সময়ে কিরূপে সমুদ্রে নিক্ষেপ করিব—তাহা স্থির করিতে পারিলাম না। দুই জনের চেষ্টায় এই কার্য্য সহজে সম্পন্ন হইতে পারিত।

জাহাজ ক্রমশঃ যখন সুয়েজ খালের সন্নিকটবর্ত্তী হইল, তখন আমার উৎকণ্ঠা অসহ্য হইয়া উঠিল। অবশেষে স্থির করিলাম, ভাগ্যে যাহাই ঘটুক, এই কার্য্যে আমাকে এক জন বখরাদার জুটাইয়া লইতেই হইবে।

বিস্তর চিন্তার পর আমার সহযোগী কর্ম্মচারীর নিকট আমার গুপ্তকথা প্রকাশ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলাম। বর্ত্তমান আখ্যায়িকায় আমি তাহাকে 'স্মিথ' নামে পরিচিত করিব। আমার অপেক্ষা

তাহার বয়স অধিক। তাহাকে অনেক ঝড়-ঝাপটা সহ্য করিতে হইয়াছিল। তাহার সাহস ও উৎসাহ অসাধারণ। একটা বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ ছিলাম; সে বিবেক-টিবেকের ধার ধারিত না। বিশেষতঃ, পেটে বোমা মারিলেও তাহার পেটের কথা মুখ দিয়া বাহির হইত না। সুযোগ বুঝিয়া এক দিন তাহাকে আমার কেবিনে ডাকিয়া আনিলাম। তাহাকে পাশে বসাইয়া আমার গুপ্ত কথার আগাগোড়া খুলিয়া বলিলাম। আমার কথা শেষ হইলে সে কাতলা মাছের মত মুখব্যাদান করিয়া অদ্ভুত মুখভঙ্গী করিল। অবশেষে সে আমাকে সান্ত্বনা দানের জন্ম বলিল, আমি বুদ্ধির দোষে যখন একটা নোংরা কায করিয়া ফেলিয়াছি, তখন আর হা হুতাশ করিয়া ফল কি? যে উপায়ে হউক, শেষ রক্ষা করিতেই হইবে।

তাহার কথা শুনিয়া মনে একটু সাহস হইল; আমি বলিলাম, দেখ ভাই, এই নোংরা কাযটা শেষ করিতে পারিলে আমি এ—তে গিয়া যে পুরস্কার পাইব, তাহার অর্দ্ধেক লইয়া এই কার্যে আমাকে সাহায্য করিতে রাজী আছ?

স্মিথ উৎসাহভরে বলিল, 'আলবৎ! এ কাযে যে মজা আছে, তাহা বিলক্ষণ উপভোগ্য।'

সঙ্কল্পটা কি কৌশলে কার্য্যে পরিণত করিব, বিস্তর চিন্তাতেও আমি তাহা স্থির করিতে পারি নাই; কিন্তু স্মিথ চট্‌ করিয়া একটা ফন্দী বাহির করিয়া ফেলিল। এ সকল কাযে সে চমৎকার মাথা খাটাইতে পারিত। অতি প্রত্যূষে এ—উপসাগরে আমাদের প্রবেশ করিবার কথা। স্মিথ যে কার্য্যপ্রণালী স্থির করিল, তাহা কেবল সহজই নহে, বিলক্ষণ নিরাপদও বটে।

স্মিথ বলিল, 'জাহাজের পিছনে আলু রাখিবার একটা সিন্দুক আছে জান ত? সেই সিন্দুকটা এখন খালি হইয়াছে। আমি আজ দুপুর রাত্রিতে সেই দিকের পথে পাহারায় থাকিব, তুমি সেই পুলিন্দাগুলা মায় সরঞ্জাম সেখানে লইয়া যাইবে। তাড়াতাড়ি সমুদ্রে নিক্ষেপ করিতে পারা যায় এভাবে সেগুলি গুছাইয়া সেই সিন্দুকে লুকাইয়া রাখিবে। তাহার পর যাহা করিতে হয়, সে ভার আমার। তুমি অনর্থক দুশ্চিন্তায় কাতর হইও না।'

রাত্রি প্রায় বারোটার সময় পুলিন্দাগুলি, ফাৎনায় জড়ান দড়ি সমেত নির্ব্বিঘ্নে সেই সিন্দুকে লুকাইয়া রাখা হইল। অতঃপর আমার চিন্তাভার লঘু হইল। যত দিন সেগুলি আমার কেবিনে ছিল, তত দিন আমার মনে বিন্দুমাত্র শান্তি ছিল না। কিন্তু অবশিষ্ট রাত্রিটুকু মানসিক অস্থিরতায় আমি ঘুমাইতে পারিলাম না। আমি পরিচ্ছদে সজ্জিত হইয়া প্রভাত পর্য্যন্ত আমার কেবিনে ঘুরিয়া বেড়াইলাম। তাহার পর অশান্ত হৃদয়ে ডেকে চলিলাম।

আকাশ পরিষ্কার। অদূরে এ দেখিতে পাইলাম। উষা-কালে আমরা উপসাগরে প্রবেশ করিলাম। এ—র প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য মনোহর। নবোদিত অরুণের লোহিতালোক নগর-প্রাসাদের মিনার ও গম্বুজগুলিতে প্রতিফলিত হওয়ায়, এই নগর আরব্য রজনীর প্রমোদময় উৎসবপূর্ণ কোন মায়ানগরীর ন্যায় প্রতীয়মান হইল। কিন্তু সেই শোভার দিকে আমার তখন লক্ষ্য ছিল না। স্মিথ কাপ্তেনের অজ্ঞাতসারে কিরূপে সেই আফিঙের পার্শেলগুলি সমুদ্রের যথাস্থানে নিক্ষেপ করিবে, এবং তাহার গোপন চেষ্টা সফল হইবে কি না, এই চিন্তায় আমি তখন ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিলাম।

অল্পকাল পরে আমি বেতার ষ্টেশনটি দেখিতে পাইলাম, এবং আরও কয়েক মিনিট পরে একটি পাহাড়ের উপর বৃক্ষশ্রেণীর পুরোভাগে অবস্থিত শুভ্র মনুমেণ্ট আমার দৃষ্টিগোচর হইল। বুঝিলাম, আমাদের কার্য্যকাল উপস্থিত। আমি এক পাশে সরিয়া গিয়া, আমার মানসিক চাঞ্চল্য গোপন করিবার জন্ম জাহাজের পশ্চাদ্‌ভাগে দৃষ্টিপাত করিলাম।

কাপ্তেন জাহাজের ব্রীজ হইতে আমাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ব্যাপার কি মিষ্টার! ওদিকে কোন অদ্ভুত জিনিষ দেখিতে পাইয়াছ কি?' আমি বিব্রতভাবে বলিলাম, 'না, আমি সমুদ্রতট দেখিতেছিলাম।'

আরও কয়েক মিনিট পরে বেতার-ষ্টেশন এবং মনুমেণ্ট জাহাজ হইতে সমসূত্রে লক্ষিত হইল। সঙ্গে সঙ্গে সাগরজলে 'ঝপাং' শব্দ শুনিতে পাইলাম! আমি বক্র দৃষ্টিতে চাহিয়া সমুদ্রবক্ষে একটি ক্ষুদ্র লাল ফাৎনা ভাসিতে দেখিলাম। বুঝিতে পারিলাম, স্মিথ পার্শেলগুলি ফেলিতে আরম্ভ করিয়াছে।

ক্রমশঃ কুড়িটি পার্শেল নিক্ষিপ্ত হইল, প্রত্যেকটির শব্দ আমার কর্ণগোচর হইল। সঙ্গে সঙ্গে আমার সকল দুশ্চিন্তা দূর হইল। কিন্তু লাল ফাৎনাগুলি যেখানে ভাসিতেছিল, সেই স্থান হইতে আমি দৃষ্টি অপসারিত করিতে পারিলাম না। আমার আশা হইল, শীঘ্রই কোন বোট আসিয়া সেই ফাৎনাগুলির সাহায্যে আফিঙের পার্শেলগুলি সংগ্রহ করিবে; কিন্তু একখানিও বোট কোন দিকে দেখিতে পাইলাম না।

যথাসময়ে জাহাজ নঙ্গর করিয়া কাপ্তেন তীরে নামিলেন। দুই ঘণ্টার মধ্যে কোন ব্যক্তি আফিঙের পার্শেলগুলি সংগ্রহ করিতে আসিল না। আমি ইহার কারণ স্থির করিতে না পারায় চিন্তিত হইলাম। কোন রকম ভুল-চুক হইল না কি?

সহসা স্মিথ আমার সম্মুখে আসিয়া, তীরের দিকে অঙ্গুলি প্রসারিত করিয়া বলিল, 'ঐ দেখ একখান বোট; উহা আমাদের জাহাজের দিকেই আসিতেছে। য়ুনিফর্ম্মে সজ্জিত এক জন লোক বোটের মাথায় দাঁড়াইয়া আছে দেখিয়াছ? কি সর্ব্বনাশ! ওখানা যে পুলিসের বোট। আমি হলফ করিয়া বলিতে পারি, ঐ লোকটি পুলিসের কর্ত্তা। খোদ পুলিস সাহেব আমাদের জাহাজে আসিতেছে!'

আমার বুকে যেন হাতুড়ি পড়িতে লাগিল। কোন ফ্যাসাদে পড়িতে হইবে না কি?

স্মিথ আমার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, 'কেহ হয় ত জাহাজে গোয়েন্দাগিরি করিতে আসিতেছে; তবে ইহা আমার অনুমান মাত্র। আমাদের বিরুদ্ধে উহারা কোন প্রমাণ সংগ্রহ করিতে পারিবে না। যদি আমাদিগকে কেহ জেরা করে, তাহা হইলে কোন কথা স্বীকার করিব না; বিন্দুমাত্র চাঞ্চল্যও প্রকাশ করিব না। বুঝিয়াছ?

আমি বলিলাম, 'বুঝিলাম ত; কিন্তু মিথ্যা কথা যে আমার মুখে আসে না।'

স্মিথ বলিল, 'তুমি কখনও মানুষ হইতে পারিবে না; যাও, নীচে যাও, যাহা বলিতে হয়, আমিই বলিব।'

আমি আমার কেবিনে আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। বোটখানি অবশেষে জাহাজে ভিড়িলে জমকালো পরিচ্ছদধারী এক জন পুলিস-কর্ম্মচারী জাহাজে উঠিল। ভয়ে, দুশ্চিন্তায় আমার বুকের ভিতর কাঁপিতে লাগিল, ভাবিলাম, পুলিসের জেরায় হয় ত সকল কথা প্রকাশ হইয়া পড়িবে। তাহার পর? তাহার পর কি হইবে, তাহা আমার অজ্ঞাত ছিল না। গোপনে অহিফেন আমদানী কিরূপ অপরাধ, এবং তাহার দণ্ড কিরূপ কঠোর, তাহা আমার সুবিদিত।

কিন্তু আমার আশা ছিল, চতুর স্মিথ ধাপ্পা দিয়া সেই পুলিস-কর্ম্মচারীকে তাড়াইতে পারিবে। হয় ত পুলিসের কর্ত্তাটি অন্য কোন কাযে জাহাজে আসিয়াছিলেন। যাহা হউক, আমি পাঁচ মিনিট উৎকণ্ঠাকুল চিত্তে আমার কেবিনে বসিয়া রহিলাম; তাহার পর কেবিনের দ্বারে করাঘাত শুনিয়া লাফাইয়া উঠিলাম। রুদ্ধশ্বাসে বলিলাম, 'ভিতরে এস।'

স্মিথকে দেখিয়া আমি আশ্বস্ত হইলাম বটে; কিন্তু সে মুখভঙ্গী করিয়া বলিল, 'বহু চেষ্টাতেও তোমাকে আড়ালে রাখিতে পারিলাম না, ভাই! তোমাকে যাইতেই হইবে, পুলিসের কর্ত্তাটি তোমার সঙ্গে আলাপ করিতে চায়।'

বন্ধুর কথা শুনিয়া ঘামিয়া উঠিলাম; তাহাকে বলিলাম, 'কি চায় সে?'

স্মিথ বলিল, 'কি করিয়া বলি? আমার নিকট সে কথা সে প্রকাশ করিল না; কেবল বলিল, প্রথম অফিসারের সঙ্গে তাহার দেখা না করিলে নয়, তাহার নিজের কি জরুরী দরকার।'

আমি রুদ্ধ নিশ্বাসে বলিলাম, 'রকম বড় ভাল নয়! কি বল?'

স্মিথ বলিল, 'তাহার স্ফূর্ত্তি দেখিয়া আমার কিন্তু হিংসা হইল। সে যাহাই হউক, তুমি হতাশ হইও না। তোমাকে জেরা করিলে শপথ করিয়া বলিবে—কিছুই তুমি জান না; কিন্তু সে যেন জেরায় তোমাকে ঘাল করিতে না পারে। তাহা হইলে তুমি তাহার সকল চেষ্টা বিফল করিয়া বিজয়ী বীরের মত তোমার কামরায় ফিরিতে পারিবে।'

কি করি? দেখা না করিলে ত উপায় নাই! অগত্যা সাহসে বুক বাঁধিয়া স্মিথকে বলিলাম, 'পুলিসের কর্ত্তাটাকে এখানেই পাঠাইও, আমি আমার কেবিনের বাহিরে পা বাড়াইতেছি না।'

স্মিথ চলিয়া গেল; কিন্তু কয়েক মিনিট পরেই 'দীর্ঘদেহ বৃষস্কন্ধ মহাভুজ' এক পুলিস প্রভুসহ আমার কেবিনে প্রবেশ করিল। ভদ্রলোক পুলিসের কেতায় আমাকে এক সেলাম ঠুকিয়া স্মিথকে কেবিন ত্যাগ করিতে ইঙ্গিত করিল। স্মিথ আমাকে সতর্কভাবে কথা বলিতে ইঙ্গিত করিয়া কেবিনের বাহিরে পা বাড়াইবামাত্র বিশালদেহ পুলিসটি কেবিনের দ্বার ভিতর হইতে রুদ্ধ করিয়া আমাকে প্রশ্ন করিল, 'তুমিই এই জাহাজের প্রথম অফিসার?'

আমি বলিলাম, 'হাঁ।'

পুলিসের কর্ত্তা বলিল, 'আমি নিজেই তোমার নিকট নিজের পরিচয় দিই। আমি এ—র পুলিসের অধ্যক্ষ, (Chief of Police.)'

আমি সম্ভ্রমভরে অভিবাদন করিলাম।

সে পুনর্ব্বার বলিল, 'তোমার কেবিনে অনধিকারপ্রবেশের জন্য আমি তোমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি। কিন্তু একটি তুচ্ছ বিষয় সম্বন্ধে তোমার সঙ্গে আমি গোপনে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিতে চাই।'

আমি যথাসাধ্য সংযত স্বরে বলিলাম, 'সে ত ভাল কথা; আপনার কি বলিবার আছে বলুন।'

'উত্তম। আমার বিশ্বাস, তুমি কার্ডিফ হইতে আসিতেছ।'

'আপনার অনুমান সত্য।'

পুলিসের কর্ত্তা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চাহিয়া গম্ভীর স্বরে বলিল, 'কার্ডিফ হইতে এই জাহাজ প্রাচ্যদেশে যাত্রা করিবার কিছুকাল পূর্ব্বে একটি ভদ্রলোক এই জাহাজের উপর তোমার সঙ্গে দেখা করিয়া কুড়িটি ছোট ছোট পার্শেল তোমার জিম্মা করিয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার অনুরোধ ছিল—সেই পার্শেলগুলি তুমি এ—তে আনিবে।'

আমার মাথায় যেন বজ্রাঘাত হইল! বুঝিতে পারিলাম, কোন লোক আমার অজ্ঞাতসারে সকলই লক্ষ্য করিয়াছিল; সম্ভবতঃ তাহারই নিকট গোপনে সংবাদ পাইয়া বে-আইনীভাবে রপ্তানী অহিফেনের সন্ধান লইবার জন্যই এই পুলিস-প্রভুর এখানে আগমন!

আমি জগৎ অন্ধকার দেখিলাম; কিন্তু স্মিথের উপদেশ অনুসরণ করা ভিন্ন আমার পরিত্রাণের আর কোন উপায় নাই, সেই সঙ্কটময় মুহূর্ত্তেও এ কথা ভুলিলাম না।

আমি ন্যাকা সাজিয়া বলিলাম, 'আপনার ও কথার মর্ম্ম বুঝিতে পারিলাম না, কারণ, আমি ও বিষয়ের কিছুই জানি না।'

পুলিসের কর্ত্তাটি বলিল, 'ন্যাকামী রাখ। আমি জানি, সকল কথাই তুমি জান। সেই ভদ্রলোক তোমাকে দশটা সভ্‌রীণ দিয়া বলিয়াছিলেন, অবশিষ্ট দশ 'সভ্‌রীণ' তুমি এখানে পাইবে।'

সর্ব্বনাশ! সকল খবরই পুলিস জানিতে পারিয়াছে! এখন বাঁচিবার উপায় কি? চক্ষুর সম্মুখে সর্ষের ফুল দেখিলাম; কিন্তু তখনও হাল ছাড়িলাম না। মাথা নাড়িয়া বলিলাম, 'না মহাশয়, আপনি ভুল করিয়া আমার কাছে আসিয়াছেন। অর্থাৎ হয় আপনি ভুল সংবাদ পাইয়াছেন, না হয়, আপনার জাহাজ ভুল হইয়াছে। কোন্ জাহাজে উঠিতে কোন্ জাহাজে উঠিয়াছেন।'

পুলিসের কর্ত্তাটি আমার প্রতিবাদে কর্ণপাত না করিয়া বলিল, 'তুমি বৃথা আমার নিকট সত্য গোপন করিতেছ। এই ব্যাপার-সংক্রান্ত সকল বিষয়ই আমার সুবিদিত। আমি জানি, সেই সকল পুলিন্দায় অহিফেন প্রেরিত হইয়াছে। তুমি সেই ভদ্রলোকটির উপদেশ অনুসারে ফাৎনা-বাঁধা রজ্জুর সহিত আবদ্ধ সেই পার্শেল-গুলি মনুমেণ্টের বিপরীত দিকে নিক্ষেপ করিয়াছ। তুমি যে নির্দ্দিষ্ট স্থানেই সেগুলি জাহাজ হইতে সমুদ্রে নিক্ষেপ করিয়াছ—এ কথা অস্বীকার করিয়া তোমার কোন লাভ নাই; এবং তুমি অস্বীকার করিলেও আমি তাহা বিশ্বাস করিব না।'

আমি অভিনয়ের ভঙ্গীতে টেবলে সবেগে মুষ্ট্যাঘাত করিয়া তীব্র স্বরে বলিলাম, 'আপনাকে আমি পুনর্ব্বার বলিতেছি, আপনি ভুল করিয়া আমাকে জেরা করিতেছেন!'

পুলিসের কর্ত্তা আমার এই ক্রোধাভিনয়ে বিন্দুমাত্র বিচলিত না হইয়া তাহার কোটের পকেটে হাত পুরিয়া দিল, এবং একখান লেফাপার অর্দ্ধাংশ বাহির করিয়া গোঁফে তা দিতে দিতে মুরুব্বীয়ানার

ভঙ্গীতে বলিল, 'এই ছেঁড়া লেফাপার আর আধখানা কোথায় আছে, বাহির কর।'

সেই আধখানা লেফাপা তাহার হাতে দেখিয়া আমার মনের ভাব কিরূপ হইল, তাহা প্রকাশ করা আমার অসাধ্য। বুঝিলাম, সেই বে-আইন আফিং চালান-সংক্রান্ত সকল ব্যাপারই পুলিসের গোচর করা হইয়াছে। যাহার নিকট আমি আফিংয়ের বাণ্ডিলগুলি পাইয়াছিলাম, সম্ভবতঃ সে পুলিসের হাতে ধরা পড়িয়াছে, এবং পুলিসের নিকট আমার নাম প্রকাশ করিয়া, অপরাধের প্রধান প্রমাণ ঐ আধখানা লেফাপাও পুলিসের হস্তে অর্পণ করিয়াছে। আমার সঙ্কট ক্রমশঃ ঘনীভূত হইয়া উঠিল; কিন্তু আমি সঙ্কল্প ত্যাগ করিলাম না। যে যাহাই বলুক, আমি কোন কথা স্বীকার করিব না।

আমি বলিলাম, 'লেফাপার অবশিষ্ট আধখানা আমার কাছে আছে, আপনার এরূপ ধারণার কারণ কি?'

উত্তর হইল, 'কার্ডিফে যখন তোমাকে অহিফেনের পার্শেলগুলি এবং 'সভরীণ' দশটি দেওয়া হয়, সেই সময় সেই আধখানা লেফাপা তোমার হাতে দিয়া বলা হইয়াছিল, অবশিষ্ট আধখানার সঙ্গে তাহা ঠিক মিলিলে তোমাকে বাকী টাকা দেওয়া হইবে।'

আমি বলিলাম, 'আপনি বৃথা সময় নষ্ট করিতেছেন। আপনার কথাগুলি অর্থহীন, প্রলাপ বলিয়াই আমার মনে হইতেছে; আমি কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না!'

পুলিসের কর্ত্তাটি হো হো শব্দে হাসিয়া পকেট হইতে দশটি স্বর্ণমুদ্রা বাহির করিয়া টেবলের উপর ছড়াইয়া দিল, এবং অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, 'প্রথম দফার দশ সভারীণ পাওয়ার কথা এখন স্মরণ হইতেছে কি?'

আমি কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়ের ন্যায় তাহার মুখের দিকে চাহিয়া দেখি, তাহার মুখে পূর্ব্বের ঔদ্ধত্য ও গাম্ভীর্য্য আর নাই; চক্ষুর দৃষ্টিও কোমল, যেন সে অন্য লোক!

আমি বিস্মিতভাবে বলিলাম, 'আপনি কি তবে সত্যই—'

পুলিসের কর্ত্তা আমার কথায় বাধা দিয়া বলিল, 'হাঁ, আমি সত্যই সেই লোক, অর্থাৎ পার্শেলগুলি নির্দ্দিষ্ট স্থানে পৌঁছাইয়া দিলে যাহার নিকট হইতে বাকি দশ সভরীণ তোমার পাইবার কথা ছিল। তুমি আমাদের যে উপকার করিয়াছ, সে জন্য তোমাকে সহস্র ধন্যবাদ। তুমি কায শেষ করিয়াছ, এখন এই স্বর্ণমুদ্রাগুলি গ্রহণ কর।'

আমি বিস্ময়-বিস্ফারিত-নেত্রে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম; মনে হইল, আমি জাগিয়া স্বপ্ন দেখিতেছি! ইহা কি সত্য, না আমাকে ফাঁদে ফেলিবার জন্য ইহা পুলিসের দুর্ব্বোধ্য চাল?

পুলিসের কর্ত্তাটি আমার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া হাসিয়া বলিল, 'তুমি কি ভাবিতেছ, তাহা আমি বুঝিতে পারিয়াছি। তোমার আশঙ্কা হইয়াছে, আমি কৌশলে তোমার মুখ হইতে সত্য কথা বাহির করিয়া লইয়া হয় ত তোমাকে ফাঁদে ফেলিব। কিন্তু আমি অঙ্গীকার করিতেছি—সে ভাবে তোমাকে বিপন্ন করিব না। তুমি তোমার অঙ্গীকার পালন করিয়াছ—এ জন্য আমি তোমার প্রশংসা করি। যদি তুমি কথার খেলাপ করিতে, তাহা হইলে আমি তোমাকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য পরোয়ানা আনিতাম।'

তাহার ব্যবহারে কপটতা নাই বুঝিয়া আমি সেই লেফাপার বাকি আধখানা বাহির করিয়া তাহার হাতে দিলাম। সে দুই খণ্ড একত্র জোড়া দিয়া বলিল, 'চমৎকার! এই দুই খণ্ড সে একই লেফাপার দুই অংশ, তাহা বোধ হয় বুঝিতে পারিয়াছ; কিন্তু একটা বিষয় আমি বুঝিতে পারি নাই।'

আমি বলিলাম, 'কোন্ বিষয়?"

পুলিসের কর্ত্তা বলিল, "যাহারা এই ভাবে পার্শেল-বহন কার্য্যে সাহায্য করে, তাহাদিগকে সেই কার্য্যের জন্য এক শত পাউণ্ড পুরস্কার দেওয়া হয়। কিন্তু তুমি কেবল কুড়ি পাউণ্ড পাইলে কেন?"

আমি বলিলাম, "সে আমাকে কুড়ি পাউণ্ড মাত্র দিতে চাহিয়াছিল।'

উত্তর হইল, 'বড় অন্যায়। সম্ভবতঃ আমাদের ইংরেজ এজেন্ট তোমাকে নূতন লোক পাইয়া এই ভাবে ফাঁকি দিয়াছে। এই কার্য্যে অভিজ্ঞ লোককে সে এ ভাবে প্রতারিত করিতে পারিত না।'

অনন্তর সে কেবিনের বাতায়নের ভিতর দিয়া সমুদ্রের দিকে আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট করিয়া বলিল, 'ঐ দিকে চাহিয়া দেখ।'

আমি জাহাজের বাহিরে দৃষ্টিপাত করিয়া সবিস্ময়ে দেখিলাম, সেই প্রকাশ্য দিবালোকে পুলিসের লোক পুলিস-বোট লইয়া সমুদ্রগর্ভ হইতে অহিফেন-পূর্ণ পার্শেলগুলি বোটের উপর টানিয়া তুলিয়াছিল!

আমি কৌতূহল দমন করিতে না পারিয়া বলিলাম, 'অদ্ভুত বটে! যে রক্ষক, সে-ই ভক্ষক?'

উত্তর হইল, 'এই ব্যাপার কি তোমার নিকট নূতন?'

আমি বলিলাম, 'হাঁ, নূতন; এ রকম বে-আইনী কায পূর্ব্বে কোন দিন করি নাই, এবং ভবিষ্যতেও কখনও করিব না। ইহাই আমার প্রথম ও শেষ দুষ্কর্ম্ম।'

পুলিসের কর্ত্তা বলিল, 'কেন? এ কায কি তুমি পছন্দ কর না?'

আমি বলিলাম, 'এ কায আমি অন্তরের সঙ্গে ঘৃণা করি!'

ভদ্রলোক হাসিয়া বলিল, 'তোমার বড় আশ্চর্য্য মনে হইতেছে যে, আমি স্বয়ং পুলিসের কর্ত্তা হইয়া ব্যক্তিগতভাবে এই অবৈধ ব্যবসায়ে লিপ্ত আছি।'

আমি বলিলাম, 'হাঁ, আমার আশ্চর্য্য বোধ হইতেছে। আপনি পুলিসের কর্ত্তা, কোথায় এই সকল বে-আইন কায বন্ধ করিবেন, অপরাধীদের গ্রেপ্তার করিয়া তাহাদিগকে কঠোর দণ্ডে দণ্ডিত করিবার ব্যবস্থা করিবেন—না আপনি স্বয়ং—'

পুলিসের কর্ত্তা হাসিয়া বলিল, 'তুমি এখনও বয়সে তরুণ, সংসার সম্বন্ধে এখনও অভিজ্ঞতা লাভ করিতে পার নাই। বয়স অধিক হইলে, সংসার সম্বন্ধে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা লাভ করিলে তোমার এই ধারণার পরিবর্ত্তন হইবে।'

যে মন্ত্রপূত সর্ষে দিয়া ভূত তাড়াইতে হয়, সেই সর্ষের ভিতর ভূতের অধিষ্ঠানের দৃষ্টান্ত সংসারে বিরল নহে, এবং এই ভাবেই সংসার চলিতেছে।

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়।

চিঠি

(গল্প)

চেম্বারে বসিয়া মস্ত একটা মামলার কন্‌শাল্‌টেশন্‌ সারিয়া কৌঁশুলী নিকুঞ্জ দত্ত গৃহে ফিরিলেন। রাত্রি তখন আটটা বাজিয়া গিয়াছে।

একজন এটর্নি বসিয়া ছিলেন মক্কেল-সমেত; দেখিয়া দত্ত সাহেব বলিলেন,—আজ মাপ করো, ভাই। এইমাত্র একগাদা কেতাব ঘেঁটে ফিরছি—একটি মিনিট আজ বিশ্রাম করতে পারিনি! তাছাড়া তোমার মকদ্দমার তো দেরী আছে—এখনো ওয়ার্নিং লিষ্টে। সামনের হপ্তা কেটে যাবে'খন—আমার নিজেরই দুটো কেশ আছে। দুটোই টপ-লিষ্টে—রীতিমত কুট্‌কচালে ব্যাপার···কি বলো? অসুবিধা হবে না, বোধ হয়?

—বেশ! বলিয়া এটর্নি উঠিলেন।

দত্ত সাহেব আসিলেন দোতলার কামরায়। গৃহিণীর দেখা পাইলেন না। বিছানায় পড়িয়া আছে পুত্র, অশেষ। তার জ্বর। অশেষের বয়স আট বৎসর। তার পাশে বসিয়া বেয়ারা রামু—অশেষকে গল্প বলিতেছে।

দত্ত-সাহেব ছেলের ললাটে হাত রাখিয়া দেখিলেন—তেমন গরম নয়। বলিলেন,—জ্বর এবেলায় ওঠে নি?

রামু কহিল—না। ডাক্তার বাবু একটু আগে এসে দেখে গেছেন। বলে গেছেন, ঐ ওষুধই চলবে। কাল সকালে তিনি আবার আসবেন।

দত্ত সাহেব কহিলেন,—নার্শ?

রামু কহিল—তিনি খেতে গেছেন।

—ও!

দত্ত সাহেব একটা নিশ্বাস ফেলিলেন।

এ কি গৃহ! ছেলে জ্বরে পড়িয়া আছে—তার সেবা করিতেছে নার্শ! ছেলের মা গিয়াছেন মিটিং করিতে! উপায় কি! যে-সোসাইটিতে মিশিয়াছেন, সে সমাজে কর্তব্যগুলার চেহারাই অন্য রকমের!

তিনি ডাকিলেন অশু···

—বাবা···

—কি তোমার চাই? বলো।

ছেলের ম্লান মুখে দীপ্তি ফুটিল। অশেষ কহিল—আমার সে ব্যাগাটেলটা গেছে ভেঙ্গে···আমার নতুন শেট্ চাই ব্যাগাটেলের!

দত্ত সাহেব কহিলেন,—অল্ রাইট।

আহারাদির পর ঘরে আসিয়া দত্ত সাহেব দেখিলেন, অশেষ ঘুমাইয়াছে—স্ত্রী তখনো ফেরেন নাই।

অশেষের বিছানার পাশে পড়িয়াছিল একখানা মহাভারত—বহুকালের পুরানো বই!

কি খেয়াল হইল, মহাভারতখানা হাতে লইয়া তিনি আসিলেন নিজের ঘরে। ভাবিলেন, ছেলেবেলায় এই বই আর রামায়ণ—ইহাই ছিল অবসর-যাপনের একমাত্র উপায়! এখনকার দিনে ছাই-পাঁশ কত বই নিত্য বাহির হইতেছে—ছেলেরা সে-সব বই লইয়া মাতিয়া মশগুল; রামায়ণ-মহাভারতের পরিচয় যা মেলে, তা স্কুলের পাঠ্যগ্রন্থ হইতে! অথচ তাঁর ছেলেবেলায়···

অশেষকে সে দিন বলিয়াছিলেন—ও-সব "আফ্রিকার জঙ্গলে কাফ্রীর দল" কিম্বা "মায়াপুরীর রাক্ষস" না পড়ে' রামায়ণ-মহাভারত বই দু'খানা পড়িস। সত্যি, তোরা বাঙালীর ছেলে—সাহেব নোস্! লিভিংষ্টোন হবি নে, হ্যানসেনও হবি নে—এর পরে চাকরি-বাকরি করে সংসার প্রতিপালন করতে হবে···

এ-কথায় বেয়ারাদের ধরিয়া ছেলে পুরানো আলমারি হইতে পুরাকালের এই 'মহাভারত' বইখানা বাহির করাইয়াছে। এখনো পড়া হয় নাই। কে পড়াইবে? মায়ের নানা কাজ···ছেলেকে মহাভারত পড়িয়া শুনাইবেন, সে অবসর তাঁর নাই!

মহাভারতের পাতা উল্টাইতে উল্টাইতে সহসা বইয়ের মধ্যে পাওয়া গেল পুরানো ক'খানা কাগজ। কোনোটায় হিসাব কষা···একখানা ক্যাশ মেমো—ওয়ার্ডশওয়ার্থের পোয়েমস্ কিনিয়াছিলেন তাহারি দরুণ; একটা পোষ্টকার্ড; দু'ছত্র কবিতা···নিজের কবিত্ব-সাধনার নিদর্শন; একখানা খাম—আঁটা। ভিতরে চিঠি রহিয়াছে! খামে কাহারো নাম লেখা নাই···

হাসি পাইল! এগুলা আরো একবার দেখিয়াছিলেন—ফেলিতে পারেন নাই—ছেলেবেলাকার স্মৃতি···থাকুক! এই ব্যস্ত-বিপুল কর্ম্মপ্রবাহের মাঝে এগুলো যেন ছোট ছোট মায়া-দ্বীপ···আজিও এ দ্বীপগুলায় মন যেন একটু আরাম পায়! এ দ্বীপ যেন সেই রূপকথার মায়া-কুহকে ভরিয়া আছে!

পলকের জন্য পুরানো স্মৃতি মনের উপর দিয়া বসন্ত বাতাসের মত বহিয়া গেল! মা···বাবা···দিদি···প্রাইজের বই লইয়া হাসি-মুখে সেই বাড়ী ফেরা···

সে-সবে যে সুখ, যে আনন্দ ছিল, আজ কর্ম্ম-জগতে অর্থ, মান-খ্যাতির অজস্রতায়—কৈ সে সুখ? কৈ সে আনন্দ? ···কিন্তু এ কার চিঠি? কতকাল পড়িয়া আছে এই মহাভারতের মধ্যে?

খাম ছিঁড়িয়া দত্ত সাহেব চিঠি বাহির করিলেন। এ যে তাঁর লেখা। এ চিঠি···

মনে বহিয়া আসিল কোথা হইতে পুষ্প-সুরভি-ভরা এক ঝলক বাতাস! আর···

এ চিঠি তিনি লিখিয়াছিলেন বিন্দুকে···

বিন্দু! ছেলেবেলায় খেলার সাথী বিন্দু! হাসি-মুখে যে বিন্দু তাঁর কত অত্যাচার নীরবে সহ্য করিয়াছে···ছোট-বড় সকল আদেশ নিরলস চিত্তে পালন করিয়াছে! তাঁর হইয়াছে মাছ ধরিবার সখ, নখে মাটী খুঁড়িয়া বিন্দু কেঁচো আনিয়া বঁড়শীতে গাঁথিয়া দিয়াছে: কাঁচা আম তিনি পাড়িয়া দিয়াছেন, বিন্দু সে আম কুটিয়া ছেঁচিয়া লঙ্কা মাখাইয়া আনিয়া ধরিয়াছে তাঁর মুখে···হাতে লঙ্কার কষ! ভুলিয়া কখন্ চোখে হাত দিয়াছে, বিন্দুর দুই চোখে কি জল না ঝরিয়াছিল!

সে এক দিন! তবু বিন্দুর মুখে হাসি এতটুকু মলিন হয় নাই!

সেই বিন্দু!···

গ্রামের স্কুলে পড়া শেষ করিয়া দত্ত সাহেব আসিলেন স্কলারশিপ লইয়া কলিকাতার কলেজে পড়িতে। ছেঁড়া কাপড়ের পুঁটলিতে মাটীর ভাঁড় বাঁধিয়া বিন্দু চুপি চুপি তাঁর গাড়ীতে তুলিয়া দিয়াছে···ভাঁড়ে আচার আর কাশুন্দি। সে বয়সে দত্ত সাহেব এই আচার-কাশুন্দি ভালো বাসিতেন প্রাণের চেয়ে···

এ চিঠি তিনি লিখিয়াছিলেন বিন্দুকে কলিকাতা হইতে। কি লিখিয়াছিলেন?

দত্ত সাহেব চিঠি পড়িতে লাগিলেন—

বিন্দু

আজ এখানে খুব বর্ষা নামিয়াছে। আকাশ একেবারে কালোয় কালো! আর বৃষ্টি যা ঝরিতেছে, সারা পথ জলে জলময়!

তোমার কথা আজ বড় বেশী মনে পড়িতেছে! এ বর্ষায় কেন কি জানি, মনে হইতেছে, তুমি যদি কাছে থাকিতে! হষ্টেলে বন্ধু আছে অনেক—তাদের সঙ্গ ভালো লাগিতেছে না। শুধু মনে হইতেছে, তুমি যদি কাছে থাকিতে!

পাশের ঘরে একটি বন্ধু গান ধরিয়াছে,—

এমন দিনে তারে বলা যায়
এমন ঘন ঘোর বরিষায়···

ও গান শুনিয়া আমার মনে হইতেছে,—গানের ঐ 'তারে' আর কেহ নয়—তুমি! কিন্তু তোমাকে কি বলা যায়? কোন্ কথা? তাই ভাবি!

যে কথা মনে জাগে—তোমায় না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না! রাগ করিয়ো না! সে কথা,—তোমায় আমি ভালোবাসি—খুব বেশী ভালোবাসি!

বর্ষার আকাশের পানে চাহিয়া কি দেখিতেছি—জানো? দেখিতেছি, তুমি আমি দুজনে আরো বড় হইয়াছি। আমি পাশের পড়া শেষ করিয়া পয়সা রোজগার করিতেছি—ডেলি-প্যাসেঞ্জারি করিয়া নিত্য অফিসে আসি—আবার সন্ধ্যায় বাড়ী ফিরি। ফিরিবামাত্র দেখা হয় তোমার সঙ্গে—উঠানে তুলসী-মঞ্চে প্রদীপ জালিয়া তুমি শাঁখ বাজাইতেছ,—দুজনে চোখো-চোখি হইল—হাসিয়া তুমি মাথায় ঘোমটা টানিয়া দিলে—তোমার সে হাসিতে আমার সারা দিনের খাটুনির ব্যথা, অফিসের বড় বাবুর বকুনির গ্লানি—সব যেন নিমেষে কোথায় ঝরিয়া গেছে···

সত্যি,—এমনি কল্পনা আমার মনে জাগে। যেন, আমোদের ছেলেবেলাকার ভালোবাসা স্বামি-স্ত্রীর গভীর প্রেমে গাঢ় ঘন হইয়া উঠিয়াছে!

তোমার বোধ হয় খুব লজ্জা করিতেছে! খুব রাগ হইতেছে! বলিতেছ, অসভ্য কোথাকারের! এমন সব কথা চিঠিতে লেখে কখনো! যদি কেহ এ চিঠি খুলিয়া পড়ে?

কিন্তু এ বর্ষায় আমার মনের সে সঙ্কোচ-ভয়—সব ধুইয়া মুছিয়া গেছে! সত্যি বিন্দু, যদি আমাদের বিবাহ না হয়…

বঙ্কিমবাবু বলিয়া গিয়াছেন, বাল্য-প্রণয়ে বুঝি অভিসম্পাত আছে! আমরা দুজনে প্রমাণ করিয়া দিব জগৎ-সভায়, না, বাল্য-প্রণয়ে অভিসম্পাত নাই! আছে শুধু সুখ—আছে চির-জীবনের আরাম!

আচ্ছা, যদি বিবাহ না হয়—বলো তো, তুমি কি সুখী হইবে? না, আমিই সুখী হইব?

তোমার সঙ্গে বিবাহ না হইলে আমি এ জীবনে বিবাহ করিব না—দারুণ ব্রহ্মচারী হইয়া দেশ ত্যাগ করিয়া যাইব!

এ বারে বাড়ী গিয়া তোমার উপর কোনো পীড়ন অত্যাচার করিব না—বকিব না; শুধু মিষ্ট কথা বলিব, আর আদর করিব!

তোমাদের ওখানেও এমন বৃষ্টি হইতেছে? আজ রবিবার। এখন বেলা দুটা বাজিয়া বারো মিনিট। আমায় লিখিয়ো। আর লিখিয়ো, আমার মতো তোমার মনও এ বৃষ্টিতে আমায় পাশে চাহিতেছে কি না?

লক্ষ্মীটি, লজ্জা করিয়ো না—লিখিয়ো!…

নিকুঞ্জ

চিঠি এইখানে শেষ।

পাঠানো হয় নাই; খামে ভরিয়া ঠিকানা লিখিতে গিয়া মন দ্বিধায় ভরিয়া এতটুকু হইয়া গেল। বিন্দুকে কোনো দিন চিঠি লেখেন নাই! বিন্দু কাহারো কাছ হইতে কোনো চিঠি পায় না! সহসা তার নামে এ চিঠি—ডাক-পিয়ন তাদের গৃহে লইয়া গেলে একটা কলরব পড়িয়া যাইবে! কে চিঠি লিখিল? বলিয়া চারিদিকে কৌতূহল একেবারে রথচক্রের মতো ঘর্ঘর করিয়া উঠিবে!

তার চেয়ে ছোট-একখানা চিঠি আগে লিখিয়া এ চিঠির সম্বন্ধে তাকে মনোযোগী করিয়া রাখিলে ডাক-পিয়ন আসিবা-মাত্র নিঃশব্দে সে গিয়া এ-চিঠি…

পরক্ষণে আবার মনে হইয়াছিল,—না, তাও হয় না! তার চেয়ে বাড়ী গিয়া তাকে বলিবেন, একদিন দারুণ বর্ষায় যে-সব কথা মনে জাগিয়াছিল! চিঠিতে তাহাই লিখিয়া রাখিয়াছেন! ডাকে সে চিঠি দেওয়া হয় নাই! তার কারণ, পাছে বিন্দু লজ্জা পায়…এবং এই চিঠি বিন্দুর হাতে দিবেন; তাঁর সামনে বসিয়া বিন্দু চিঠি পড়িবে! পড়িবার সময় তার দুটি কপোলে লজ্জার রক্তিম আভা…

বায়োস্কোপের ছবির মতো সমস্ত ঘটনাগুলা সুশৃঙ্খল ধারায় মনের পর্দা বহিয়া ঝরিয়া চলিল…

এ চিঠি-লেখার মাসখানেক পরে তিনি বাড়ী আসেন। বিন্দুর সঙ্গে দেখা হয় নাই। বিন্দু গিয়াছিল তার মামার বাড়ী—মাতামহীর অসুখ। তার পর মাতামহী মারা গেলেন। তাঁর শ্রাদ্ধ-শান্তি…

ছুটী ফুরাইলে দত্ত সাহেব ফিরিয়া আসিলেন কলিকাতার হস্টেলে…

তারপর গুড-ফ্রাইডের ছুটী…পূর্ব্বে চার দিনের ছুটীতে কখনো তিনি বাড়ী যান নাই—সেই প্রথম! বিন্দুর জন্য মনে জাগিয়াছিল নিদারুণ আকুলতা! অনেক দিন তার সঙ্গে দেখা হয় নাই।

দেশে আসিলেন। আসিয়া শুনিলেন, বিন্দুর বিবাহের কথা হইতেছে। পাত্রটি দোজবরে—পশ্চিমে কোথায় সামান্য চাকরি করে—এক পয়সা যৌতুক দিতে হইবে না। পাত্রটির বাড়ী বিন্দুর মামার বাড়ীর দেশে—সেইখানেই প্রজাপতি কেমন করিয়া দূতীয়ালী করিয়াছে…

দত্ত সাহেবের মন যেন দশ-হাত বসিয়া গেল! এ কি কথা…!

মার কাছে তিনি বলিলেন—অমন মেয়েটার হাত-পা ধরে রাতুল কাকা জলে ফেলে দিচ্ছেন!

মা বলিলেন,—বালাই! অমন কথা বলিস্ নে! পাত্র মাইনে পায় আশী টাকা করে। দোজবরে হলেও আর-পক্ষের ছেলে-মেয়ে নেই। এক পয়সা যৌতুক দিতে হবে না—সে কি কম লাভ! অন্য জায়গায় বিয়ে দিতে হলে এক কাঁড়ি টাকা ঢালতে হবে…সে টাকা দেবার সামর্থ্য রাতুল ঠাকুরপোর নেই!

বুক ঠেলিয়া একটা কথা কণ্ঠ-নালীতে আসিয়া জমিল। দত্ত সাহেবের মনে হইল, বলেন,—কেন, তুমি পারো না তোমার ছেলের সঙ্গে বিন্দুর বিবাহ দিতে? বিন্দুকে যে এত ভালোবাসো! তার এ উপকারটুকু যদি না করিতে পারো তো তোমার এ-ভালোবাসার দাম?

কিন্তু এত স্পষ্ট করিয়া সে কথা বলা গেল না। কোথায় যেন বাধিল! কেন বাধিল, আজ এ বয়সে তাহা ভাবিয়া দত্ত সাহেবের বিস্ময়ের আর সীমা রহিল না!

তারপর বিন্দুর সঙ্গে দেখা হইয়াছিল। এ চিঠিখানাও হাতে ছিল। কিন্তু বিবাহের কথা বলিবামাত্র বিন্দু হাসি-মুখে জবাব দিল,—বা রে, বড় হয়েছি—বিয়ে হবে না?

বিন্দুর সেই স্পষ্ট দ্বিধাহীন কণ্ঠস্বর—অমন অমলিন হাসি! দত্ত সাহেব কেমন ভড়কাইয়া গেলেন—চিঠির কথা আর তুলিতে পারিলেন না।

তার পর বিবাহ···

দত্ত সাহেবের মনে আছে, বিন্দুর বিবাহের সময় দত্ত সাহেব দেশে গিয়াছিলেন।

কতবার মনে হইয়াছিল, উপন্যাসের নায়িকার মতো গভীর রাত্রে সকলে ঘুমাইলে বিন্দু আসিয়া কাঁদিয়া ডাকিবে, —নিকুঞ্জদা···

এ আশায় দত্ত সাহেব নিজের ঘরের দ্বার খুলিয়া রাখিয়াছিলেন! দ্বার খুলিয়া জোর করিয়া রাত্রি জাগিয়াছিলেন—এবং গভীর রাত্রি যখন স্তব্ধতায় ভরিয়া গেল, তখন উৎকর্ণ বসিয়াছিলেন কখন্ মৃদু চরণধ্বনি জাগে দ্বারের বাহিরে··· বসিয়া ভাবিতেছিলেন, তিনি কি করিবেন? বিন্দু আসিয়া কাঁদিয়া যখন বলিবে, আমায় এমনি ভাবে ঠেলে বিদায় করে দেবে, নিকুঞ্জদা···? আমি যে অনেক স্বপ্ন দেখতুম! তোমার অত ভালোবাসা···সে শুধু খেলা?···একটা নারীর মন ভেঙ্গে চূর্ণ হয়ে যাবে তোমার এ খেলার লীলায়?

কি জবাব? তিনি এমন কি জবাব দিবেন?

রক্ত-মাংসে গড়া মানুষের মতো তিনি চুপ করিয়া থাকিবেন না—কখনো না···! উপন্যাসের নায়কের মতো বলিবেন,—না, না বিন্দু, তোমায়-আমায় এই যে ভালোবাসা —এ ভালোবাসা অক্ষয় অম্লান থাকিবে চিরকাল···! জানো বিন্দু, কলিকাতার হষ্টেলে বসিয়া এক দারুণ বর্ষার দিনে অসঙ্কোচে আমার মনকে মেলিয়া ধরিয়াছিলাম তোমারি উদ্দেশে! এই ছাখো, তোমায় লক্ষ্য করিয়া মনের অকপট কি কথা আমি চিঠির ছত্রে লিখিয়াছিলাম···

তখন এ চিঠি ধরিয়া দিবেন বিন্দুর অশ্রু-সজল চোখের সামনে!

তার পর···?

মাকে গিয়া সাফ বলিবেন—বিন্দু···এই বিন্দুকে আমি ভালোবাসি! আমি তাকে বিবাহ করিব। আমি ভিন্ন আর কাহাকেও সে স্বামিত্বে বরণ করিতে পারে না! বরণ করা তার পক্ষে সম্ভব নয়। দুটা বুক এমন করিয়া তোমরা ভাঙ্গিয়া দিয়ো না মা···

মা যদি সে কথা না শোনেন? বিদ্রোহ···

তাই! স্বামি-স্ত্রীর মনে থাকে যদি নিবিড় ভালোবাসা, সংসারে কোথায় তবে অভাব রহিল? বড় বাড়ী, গাড়ী, ব্যাঙ্কের মোটা তবিল, দাস-দাসী—সেগুলায় কি এমন সুখ! সেগুলা না থাকিলেও সংসার দিব্য চলিয়া যায়···

কিন্তু হায়রে, অধীর প্রতীক্ষায় সারা রাত্রি কাটিয়া গেল, দ্বারে বিন্দুর পায়ের ধ্বনি জাগিল না! বিন্দু আসিল না!

বেচারী···

হয়তো ভয়ে আসে নাই!

সকালে তিনি গেলেন বিন্দুদের বাড়ীতে। হাসি-মুখে বিন্দু আসিয়া দেখা করিল। পরণে লাল-পাড় শাড়ী···মাথায় খোঁপা, সে খোঁপায় রূপার কাজল-লতা গোঁজা···

বিন্দুর হাসি-মুখ দেখিয়া দত্ত সাহেব যেন কুণ্ঠিত হইয়া পড়িলেন।

বিন্দু কহিল,—মুখ অমন শুক্‌নো কেন, নিকুঞ্জদা? রাত জেগে এগজামিনের পড়া পড়ছিলে, বুঝি?

পড়া! হায় মূঢ় বালিকা! রাত্রি জাগার ঐ একটা কারণই শুধু জানিয়া রাখিয়াছ! বুকের মধ্যে···

বিন্দু কহিল—বিয়ে দেখে যাচ্ছ তো?

মুখে জোর করিয়া হাসির রেখা আঁকিয়া দত্ত সাহেব বলিলেন,—হুঁ।

বিন্দু কহিল,—কতদূরে চলে যাবো—তোমার বিয়ের সময় জ্যাঠাইমাকে বলে আমায় আনিয়ো—সত্যি, নিকুঞ্জ-দা, নাহলে তোমার সঙ্গে জন্মের মতো আড়ি হয়ে যাবে···

সেই বিন্দু···

আজ কোথায় সে আছে? কেমন আছে, কে জানে! ···আশী টাকার উপর সংসারের নির্ভর···

ছোট একটা নিশ্বাস!

বিন্দুর বিবাহ হইয়া গেল। উপন্যাসের নায়কের মতো লুচি পরিবেষণ করিয়া অত্যুগ্র হাসির উচ্ছ্বাসে দত্ত সাহেব

কাহারো বিরক্তি জাগাইয়া তোলেন নাই···বিবাহ-বাড়ীর শঙ্খরোল শুনিয়া কাঁদিয়া বিচঞ্চল হন নাই !···

কোথায় চলিয়া গেল বিন্দু···এ চিঠি তাকে দেওয়া হইল না। চিঠিখানা কেন যে রাখিয়া দিলেন···এবং কোথা হইতে এ চিঠি ঘুরিয়া ফিরিয়া গিয়া এই পুরানো মহাভারতের মধ্যে নিরাপদ নীড় বাঁধিয়াছে, মনে পড়ে না !···

কলেজের পড়া, এগ্জামিনের মাতন···দিনগুলা কোথা দিয়া কোন্ পথে তখন চলিয়াছিল···

এম-এ পাশ করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে যে কীর্ত্তি রাখিলেন, সে কীর্ত্তির ফলে গৃহদ্বারে আসিয়া দেখা দিলেন মৃগাঙ্ক মিত্র রায় বাহাদুর : তাঁর কন্যা শ্রীমতী অন্নপূর্ণা দেবী বর-মাল্য লইয়া দাঁড়াইয়া আছেন—দত্ত সাহেবের প্রতীক্ষায়···দেবীর অঙ্গে মণি-মাণিক্যের বিচিত্র ভূষা ! এবং বরকে আমন্ত্রণ করিয়া লইয়া যাইতে রায় বাহাদুরের হাতে ছিল নগদ দশ হাজার মুদ্রা এবং আনুষঙ্গিক আরো বহু অর্ঘ্যভার !

মন হইতে সরিয়া বিন্দু তখন পশ্চিমের কোন্ সহরে দোজবরে স্বামীর ঘরে বাস করিতেছে···সঙ্গে সঙ্গে কোথায় সরিয়া গিয়াছে সেই এক বর্ষা-দিনের তীব্র কাব্যোচ্ছ্বাস ! রায় বাহাদুরের কথায় চোখের সামনে জাগিতেছিল আলো-ঝলমল প্রশস্ত রাজপথ ! সে পথে চলিয়াছে প্রমত্ত গৌরবে নিকুঞ্জর মোটর-গাড়ী প্রাসাদ-ভবন লক্ষ্য করিয়া···

ভাবিতেছিলেন, এ পথে আসিয়া কি পাইয়াছি ? পয়সার পিছনে নিত্য দিন ছুটিয়া সারা হইতেছি, যেন শীকারী কুকুর ! শীকারের সন্ধানে ছুটিয়া ছুটিয়া দিনের শেষে শীকারী কুকুর যেমন ফিরিয়া তার বদ্ধ ঘরে আশ্রয় পায়,—সে ঘরের কোথাও প্রাণ নাই, প্রীতি নাই, হাসি নাই, আলো নাই—আলোর যেটুকু ঝলক অঙ্গে আসিয়া লাগে, তা ঐ পথে মৃগয়ায় বাহির হইয়া···তাঁর ভাগ্যেও তাই ! এ-গৃহে কোথায় স্নেহ ? প্রেম ? দরদ-প্রীতির সে আরাম-সুধা ? জীবনটা চলিয়াছে যেন কলের মতো—একেবারে রুটীনের লাইন ধরিয়া !

যে জীবনের স্বপ্ন দেখিতেন, চিঠিতে যে জীবনের আভাস···অনাড়ম্বর কামনা···সহজ তৃপ্তি···সরল আনন্দ ! দাস-দাসীর কলরব না থাকিলেও সন্ধ্যায় প্রদীপ-হাতে প্রিয়ার চোখে চোখ পড়িবামাত্র অধরে হাসির সে জ্যোৎস্না-লহর তার কাছে আজিকার এই···

শুধু সে দিন নয়, চিরদিন মনে হইত, মানুষের সব-কামনার সার্থকতা সেই হাসির বিজলী-প্রভায় !

নীচে গাড়ীর শব্দ। দত্ত সাহেবের চমক ভাঙ্গিল।

শ্রীমতী অন্নপূর্ণা দেবী আসিলেন।

আকাশে জ্যোৎস্না···চিঠিতে ছিল যেন পুষ্প-সুরভি ! সে-সুরভি দত্ত-সাহেবের মন হইতে তখনো ঝরিয়া মিলাইয়া যায় নাই ! একটু প্রীতি, একটু দরদ, একটু হাসির প্রত্যাশায় মন আকুল···

ভালো লাগে না ! সত্যই ভালো লাগে না কর্মচক্রের নীচে মনকে দুর্লঙ্ঘ্য গতি-বশে ধরিয়া দিয়া তাকে পিষিয়া চূর্ণ করিয়া নিত্য এমন পয়সা সংগ্রহ করার বিপুল সাধনা···

দত্ত-সাহেব নিশ্বাস ফেলিলেন। শ্রীমতী অন্নপূর্ণা দেবীর পানে চাহিয়া কোমল সরস কণ্ঠে কহিলেন,—আজ তোমাদের মিটিং এ কি হলো ?

ভ্রূকুটি-ভঙ্গীতে শ্রীমতী অন্নপূর্ণা চাহিলেন স্বামীর পানে ···বলিলেন,—হ্যাঁ, ক্ষিদেয় সারা হয়ে যাচ্ছি—খাওয়া-দাওয়া রেখে এখন তার রিপোর্ট দিতে বসি তোমায় !

শ্রীমতী অন্নপূর্ণা দেবী চলিয়া গেলেন, বেশ-বদল করিতে···

দত্ত সাহেব দাঁড়াইয়া রহিলেন নির্ব্বাক, নিস্পন্দ···

ও ঘর হইতে শ্রীমতী অন্নপূর্ণা দেবী প্রশ্ন করিলেন,—আজকের টাকা-কড়ি তুলেছ ? না, পড়ে আছে সেই ব্রীফ-ব্যাগে ?

দত্ত-সাহেব কোনো জবাব দিলেন না···মনের অবস্থা এমন যে, মন এ-পৃথিবী ছাড়িয়া যেখানে হোক, পলাইতে পারিলে বাঁচে !

একরাশ মেঘ আসিয়া আক্রোশ-ভরে আকাশের চাঁদকে দিল ঢাকিয়া···চারিদিকে কালো ছায়া নামিল···

দত্ত-সাহেব একটা নিশ্বাস ফেলিলেন—এই কালো ছায়াই জীবনে সব-চেয়ে বড় সত্য হইয়া রহিল, ভগবান !

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

হিমালয়ে পাঁচ ধাম

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর

মন্দিরের অভ্যন্তরভাগে যে ঘরে "বদরী-বিশালজী" বিরাজ করিতেছেন, তাহার সম্মুখেই আর একটি ঘর, সেটি অপেক্ষাকৃত প্রশস্ত, অনেকটা নাট-মন্দিরের মত হইলেও আচ্ছাদনযুক্ত থাকায় ভিতরের ঘরটি যেন কতকটা অন্ধকার করিয়া দিয়াছে। এ জন্য বাহির হইতে হঠাৎ কোন যাত্রী মূর্ত্তি-সম্মুখে উপস্থিত হইলে কিয়ৎকাল তাঁহাকে স্থির হইয়া দাঁড়াইতে হয়। অবশ্য অহোরাত্রই সেখানে ঘৃত-প্রদীপ জ্বলিতে থাকে।

মন্দিরের পশ্চিমাংশে কোণের দিকে ভোগ-রান্নার ঘর ও তৎপার্শ্বে লক্ষ্মীদেবীর মন্দির বিরাজমান। বেলা বাড়িয়া যাওয়ায়

মন্দির-প্রাঙ্গণে যাইতে বহির্দ্বারের এক পার্শ্ব

ঐ দিনে আমরা ইঁহাদের দর্শন-পূজাদি শেষ করিয়াই বাসায় ফিরিয়াছিলাম। নির্দ্দিষ্ট পাণ্ডা "সূর্য্যপ্রসাদ-রামপ্রসাদ"এর দ্বিতল বাটীর নীচের একখানি ঘরে আশ্রয় লওয়া হয়। সে সময়ে পাণ্ডা ঠাকুরের ওখানে যথেষ্ট যাত্রী, তন্মধ্যে চন্দননগরনিবাসী জনৈক ভদ্রলোকের দল উল্লেখযোগ্য। ইঁহার সঙ্গে এককালীন ১৪ খানি ডাণ্ডিতে ১৪ জন সওয়ার এবং কতক জন বা ঘোড়ার উপরে সওয়ার হইয়া হরিদ্বার হইতে এখানে আসিয়াছিলেন। জিজ্ঞাসায় জানিলাম, প্রত্যেক ডাণ্ডির ভাড়া সওয়ারের ওজন হিসাবে ১১০৲ টাকা হইতে ১৩০৲ টাকা পর্য্যন্ত দিতে হইবে। "চানাচবেনি" ইত্যাদি স্বতন্ত্র। ইঁহাদের তদ্বীর করিতেই পাণ্ডা ঠাকুর সে সময় বিলক্ষণ ব্যস্ত ও বিব্রত ছিলেন। দেখিলাম, আহার-ব্যাপারে এখানে বেশীর ভাগ যাত্রীই ভোগের প্রসাদের উপরেই নির্ভর করিয়া থাকেন। জগন্নাথক্ষেত্রের মত 'ছড়িদার'রা মন্দির হইতে কেবল মহাপ্রসাদই বহন করিয়া আনিতেছিল, সে কি হুড়াহুড়ি ও দৌড়াদৌড়ি ব্যাপার! ভাত, ডাল, তরকারী, চাট্‌নি হইতে পায়সান্ন, পাঁপর পর্য্যন্ত কোন জিনিষ যেন আর বাকী নাই, বিশালজীর ভোগের ব্যবস্থা কতই না বিশাল! শুনিলাম, কেবলমাত্র এই বদরীনাথের ভোগেই দৈনিক ১৫২।৵০ ব্যয় নির্দ্দিষ্ট আছে। বড় সাধারণ কথা নহে। "প্রসাদং হরি-নৈবেদ্যং ভুঞ্জীয়াদ্ভক্তিতৎপরঃ" এই শাস্ত্রবচনানুযায়ী অনেকেই যে এ বিষয়ে যথেষ্ট ভক্তিপরায়ণ, তাহা দ্বিপ্রহরে ভোগের পরে সে সময়কার অবস্থা দেখিলেই সহজে উপলব্ধি হইয়া থাকে।

"বদরীবনমধ্যে বৈ বদরী-নায়কো হরিঃ" এই শাস্ত্রবচনানুযায়ী অতীত যুগে কোন্ সময়ে এই বদরিকা-ক্ষেত্র বদরী-বনে পরিপূর্ণ ছিল, বলিবার উপায় নাই, তবে ইদানীন্তন এই চতুর্দ্দিকে পাহাড়বেষ্টিত বৈকুণ্ঠ-ভবন যেন একটি মানব-সৃষ্ট 'ছোট-খাটো' সহরের মতই পরিণত হইয়াছে বলিলে অত্যুক্তি হয় না। রাস্তার দুধারেই সারি সারি অজস্র দোকান। নানাবিধ দ্রব্যসম্ভারে দোকানগুলি পরিপূর্ণ—খেলানা, ছবি, ফটো, মনিহারী দ্রব্য, তীর্থ-পুস্তক, পুরী হালুয়া-মিঠাইএর দোকান, মুদীখানা—এমন কি, দেশের খবর লইবার সংবাদপত্র পর্য্যন্ত যাঁহার যে জিনিষের প্রয়োজন, সমস্তই খুঁজিয়া পাইবেন। সরকারের অনুগ্রহে খাবারের দোকানের পাশে পাশে পাইপ-সংযোগে জলের ব্যবস্থা, ধর্ম্মশালা, পোষ্ট আফিস, তার-ঘর—কিছুরই ত অভাব দেখিলাম না। এমন সহজসাধ্য ও সুখের বৈকুণ্ঠ-ভবনে বৈকুণ্ঠনাথ-দর্শনে অবহেলা করিলে বাস্তবিকই সে ব্যক্তি কলিযুগে বঞ্চিতই হইয়া থাকেন সন্দেহ নাই। শাস্ত্রেই উল্লিখিত রহিয়াছে,—

"আগচ্ছন্ বদরীং যস্তু কৃতকৃত্যত্বমাপ্নুয়াৎ।
ন নমংশ্চ হরিং দেবং বঞ্চিতোঽত্র কলৌ যুগে।"

অর্থাৎ যে ব্যক্তি বদরিকাশ্রমে আগমন করিয়াছে, তাহার কৃতকার্য্য লাভ অর্থাৎ সিদ্ধি হয়, কিন্তু কলিযুগে যে ব্যক্তি ইঁহাকে প্রণাম না করিয়াছে, সে বঞ্চিতই হইয়াছে।"

এ স্থানে আসিলে যাত্রিগণ পঞ্চতীর্থে * স্নান, পঞ্চশিলায় † নমস্কার ও শ্রীশ্রীআদি কেদারেশ্বর শঙ্করকে দর্শন করিয়া থাকেন। এখানে আমরা ত্রিরাত্র বাস করিয়াছিলাম। দ্বিতীয় দিবস প্রাতে আমরা "তপ্তকুণ্ডে" স্নানেচ্ছু হইয়া সেখানে উপস্থিত হইলাম। কুণ্ডটি একটি প্রকাণ্ড চৌবাচ্চার মত, উপরে টিনের আচ্ছাদন দেওয়া আছে। কথিত আছে, এক সময় এই বহ্নি-তীর্থে আসিয়া অগ্নি হরির আরাধনা করিয়াছিলেন ;—

"বহ্নি তীর্থসমাযুক্তং বিষ্ণুলোকপ্রদং শিবে,
বহ্নি-তীর্থং যত্র দেবি বহ্নিনারাধিতো হরিঃ।"

অর্থাৎ "হে শিবে! ইহা বিষ্ণুলোকপ্রদ বহ্নিতীর্থযুক্ত। যে বহ্নি-তীর্থে অগ্নি হরির আরাধনা করিয়াছিলেন।" এই স্থানে যাত্রীদের ভিড়ের সহিত পাণ্ডাদের ভিড়ও যথেষ্ট দেখিলাম। স্নান করিবার উচ্চাকাঙ্ক্ষা যাত্রীর মনে যতটুকুই থাকুক না কেন, সঙ্কল্প করাইবার জন্য এই পাণ্ডাগণের যেন উচ্চাকাঙ্ক্ষা অনেক বেশী! কুণ্ডমধ্যে উষ্ণ জলের প্রবাহ, শীতের দিনে স্নান কতকটা আরামপ্রদও বটে! তুষারকিরীটি হিমালয়ের ইহাও এক অপূর্ব্ব বৈভব সন্দেহ নাই। বৈজ্ঞানিকগণ যাহাই বলুন না কেন, তুষার-শীতল জলের পার্শ্বেই যখন দেখি, এই উষ্ণ জলের ধারা প্রস্রবণ, বিচিত্র সমাবেশ ভিন্ন তখন আর কি বলা যাইতে পারে! স্নান করিয়া উপরে উঠিবার কালে সম্মুখেই আদি কেদারেশ্বরের পবিত্র মন্দির দেখা যায়। মন্দিরের পার্শ্বেই তথাকথিত "রাওল" বা বিশাল-লালের পূজারীর প্রাসাদ। এই স্থানেই "ত্রোটকাচার্য্যের গদি" ও "কাছারীবাড়ী"—যেখানে যাত্রিগণ সাধারণতঃ বিশালজীর পূজা বা ভোগের দরুণ সামর্থ্য ও রুচি হিসাবে ভেট দিয়া রসিদ লইয়া আসেন।

তপ্তকুণ্ডে স্নান ইত্যাদির পরে আমরা এ দিন পুনরায় মন্দিরে উপনীত হইয়াছিলাম। বিশালজীর স্নানকালীন দর্শন মধুর ও উপভোগ্য জানিয়া বহু সাধ্যসাধনায় কর্ত্তৃপক্ষকে আপ্যায়িত করিয়া মন্দিরমধ্যে প্রবেশলাভ করি। পদ্মাসনে উপবিষ্ট ভগবানের চতুর্ভুজ মূর্ত্তির এই সময়েই ত যাত্রীরা সমস্ত রূপ সুস্পষ্ট দেখিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়া থাকেন। রাওল বা পূজারী নিজেই দণ্ডায়মান থাকিয়া স্বহস্তে শ্রীঅঙ্গের স্নানাদি কার্য্য সম্পাদন করেন, সে সময় দর্শকবৃন্দ যথার্থই সেই বিশ্বনিয়ন্তা বৈকুণ্ঠনাথের জাগ্রত স্বরূপ দর্শনে যেন বৈকুণ্ঠধামের আনন্দ লইয়াই বাসায় ফিরিয়া আসেন, ফিরিবার কালে দর্শন প্রত্যাগত যাত্রিগণের মুখে কেবল এই কথাই পুনঃ পুনঃ শ্রুত হইয়াছিলাম।

এই ভোগৈশ্বর্য্যমণ্ডিত বিশালজীর আয় বড় কম নহে। ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত রাজা, মহারাজা, ধনী ও সাধারণ—লক্ষ লক্ষ হিন্দুসন্তানই প্রতি বৎসর এ সময়ে এখানে আগমন করিয়া সামর্থ্যানুযায়ী পূজা ও ভেট ইত্যাদি অর্পণ করেন। নারায়ণের শ্রীপাদপদ্মে দানের পরিমাণ কত উঠিয়া থাকে, অভিজ্ঞতার দিনে কমেই হয় ত ইহার খবর রাখেন না। আমরা রাওলের বিশিষ্ট কর্ম্মচারি-প্রমুখাৎ সে সময় প্রথমতঃ যতদূর অবগত হইতে সমর্থ হইয়াছি, পাঠকবর্গের অবগতির নিমিত্ত এখানে তাহার আয়-ব্যয়ের একটু সংক্ষিপ্ত আভাস দেওয়া অপ্রাসঙ্গিক মনে করিলাম না।

আয়ঃ—

রাজস্ব বা রেভিনিউ বিভাগ হইতে আনুমানিক বাৎসরিক আদায়	১৫,০০০৲
রাজা মহারাজা হইতে " "	২৫,০০০৲
এবং	
যাত্রী হইতে আনুমানিক বাৎসরিক আদায়	১০,০০০০৲
আনুমানিক সর্ব্বসমেত আয়	১,৪০,০০০৲

ব্যয়ঃ—

ইহার অধীন ২২টি মঠের দেবতা ইত্যাদির—

১।	পূজা এবং ভোগ ইত্যাদি বাবদ প্রত্যহ ১০০৲ টাকা হিসাবে বাৎসরিক	৩৬,৫০০৲
২।	বদরী-বিশালজীর ভোগ বাবদ প্রত্যহ ১৫৭৸০ হিসাবে "	৫৭,১০৮৲
৩।	মাসিক বেতন খাতে — রাওল ২০০৲, নায়েব রাওল ১০০৲, অন্যান্য কর্ম্মচারী, চাকরবৃন্দ ৫০০৲ — ৮০০৲ হিসাবে	৯,৬০০৲
৪।	দপ্তরী বিভাগ ও স্বত্ব-সাব্যস্ত বিভাগ ইত্যাদিতে "	৫০০০৲
৫।	মঠ ইত্যাদির বাটী মেরামত ইত্যাদি খাতে মাসিক ৩০০৲ হিসাবে "	৩৬০০৲
৬।	গড়বাল জেলার স্কুল বিভাগের স্কলারশিপ খাতে মাসিক ১০০৲ টাকা হিসাবে "	১২০০৲
৭।	দরিদ্রদিগকে বিতরণ খাতে "	১০০০৲
৮।	ঔষধ বিভাগে মাসিক ৫০৲ টাকা হিসাবে "	৬০০৲
	আনুমানিক সর্ব্বসমেত ব্যয়	১,১৩,২০৮৲

রাওল—কর্ম্মচারীর এই উক্তি যদি অসত্য না হয়, তবে উল্লিখিত হিসাব দৃষ্টে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, আয় হইতে এই সকল ব্যয় বাদ দিয়াও বিশালজীর ভাণ্ডারে প্রতি বৎসরেই প্রায় পঁচিশ হইতে কমবেশী ত্রিশ হাজার টাকা পর্য্যন্ত উদ্বৃত্ত থাকিয়া যায়। তুষারকিরীটী হিমালয়ের নিভৃত তুষারক্ষেত্রে সেই ধনাধিপতি কুবেরের বাসস্থান কোথায় লুক্কায়িত আছে, এ যুগে তাহা জানিবার আদৌ উপায় নাই, কিন্তু পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখিলে এই বদরী-বিশালজীর বিশাল বিশ্ববন্দিত চরণ-পদ্মে যে যক্ষের ধনের মত প্রতি বৎসরেই অগণিত অর্থ ও বৈভবাদি জমা হইতেছে—মানব-চক্ষুতে ইহার চাক্ষুষ প্রমাণ এইখানেই, ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। অনন্তশয্যায় শায়িত, মুদিত-পদ্মনেত্র চতুর-চূড়ামণি শ্রীহরির চরণ পার্শ্বে যেখানে মূর্ত্তিমতী স্বয়ং চঞ্চলা দেবী সেবা-নিরতা বিরাজ করেন, সেখানে লক্ষ লক্ষ পরিশ্রান্ত যাত্রীর

---

* পঞ্চতীর্থ যথা,—ঋষিগঙ্গা, কূর্ম্মধারা, প্রহ্লাদধারা, তপ্তকুণ্ড ও নারদকুণ্ড।

† পঞ্চশিলা যথা,—নারদশিলা, বারাহীশিলা, নারসিংহীশিলা, মার্কণ্ডেয়শিলা ও গারুড়ীশিলা।

ভক্তিনিবেদিত অর্ঘ্য সম্ভার বিপুল বৈভবরূপেই যে দিন দিন আত্ম-প্রকাশ করিবে, বিচিত্র কি !

যেখানেই লক্ষ্মীমায়ের কৃপাদৃষ্টি থাকে, সেখানে প্রায় সর্ব্বত্রই কোন না কোন রকমে একটু বিবাদের সৃষ্টি দেখা যায়।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, একমাত্র রাওলই এ স্থানের পূজা ইত্যাদি সকল কার্য্যেই হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতার মতই উচ্চাসনে বসিয়া হুকুম চালাইয়া থাকেন। পূর্ব্বে এই বদরিকানাথ স্বাধীন টিহিরী-রাজ্যের সীমাভুক্ত ছিল। গত ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে "গুরখা-যুদ্ধের" পর হইতে এ স্থান বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের এলাকামধ্যেই নির্দিষ্ট হইয়াছে। সদাশয় বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট প্রজাদিগের ধর্ম্ম সংক্রান্ত ব্যাপারে চিরদিনই নিরপেক্ষ থাকা হেতু এই নিয়মানুযায়ী তথা-কথিত রাওল বা

বদরীনাথ-মন্দিরের আর এক দরজা

পূজারীর দ্বারাই তদবধি এ বদরীনাথ তীর্থের পূজা ও ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় আয়-ব্যয়ের ব্যাপারকার্য্য সুনির্ব্বাহ হইয়া আসিতেছে। টিহিরী রাজ দরবার-পক্ষ, এ স্থানের এলাকাভুক্ত না থাকিলেও রাওল কর্ত্তৃক আয়ব্যয়-সংক্রান্ত সমস্ত বিষয়ই পরীক্ষা (Audit) করিবার জন্য গভর্ণমেণ্ট হইতে সম্মতি লাভ করিয়াছেন। সম্প্রতি গত ১৯২৩ খৃষ্টাব্দ হইতে দরবার-পক্ষ ও রাওল মহাশয়ের খুবই "মন কষাকষি" চলিতেছে শুনিলাম। দরবার-পক্ষের কথা—"ঐ সময়ে তাঁহাদের নির্দ্দিষ্ট কোন কর্ম্মচারী মন্দিরসম্বন্ধীয় কোন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে গেলে রাওল মহাশয় উহার ব্যবস্থা মানিয়া লইতে অস্বীকার করেন। ফলে দরবার-পক্ষ মন্দিরের অর্থ ভাণ্ডার ঘরের (Treasury door) দরজায় রাওলের অমতে চাবিবন্ধ করায় সেই সুযোগে রাওল মহাশয় স্থানীয় বৃটিশ ফৌজদারী আদালতে টিহিরী-রাজ-বিরুদ্ধে ফৌজদারী মোকর্দ্দমা আনয়ন করিয়াছিলেন। বিচারে সে সময়ে প্রকৃতপক্ষে দরবার-পক্ষই পরাস্ত হইয়া যান।

তখন হইতেই রাজদরবার স্পষ্টতঃ বৃটিশ গভর্ণমেণ্টকে জানাইয়া আসিতেছেন যে, "যত দিন পর্য্যন্ত এই বদরীনাথের দেওয়ানী ও ফৌজদারী বিভাগ তাঁহার রাজ্যে হস্তান্তরিত না হইবে, তত দিন তিনি এ তীর্থ-সম্বন্ধীয় ব্যবস্থা বা আয়-ব্যয়ের প্রকৃত তথ্য পর্য্যবেক্ষণ বিষয়ে অত্যন্ত অসুবিধা বোধ করিবেন ইত্যাদি।" দরবারপক্ষ হইতে মুদ্রিত, "বদরীনাথ মন্দির সংস্কার" সংক্রান্ত কাগজখানি পাঠ করিলে জানা যায়, এ বিষয়ে ইউ, পি, গভর্ণমেণ্ট ভারতের সমগ্র সনাতনী হিন্দু জনসাধারণের মতামত কি, জানিতে

তপ্ত কুণ্ড

চাহিয়াছেন। এই হস্তান্তর উদ্দেশ্যে দরবারপক্ষ ইতিমধ্যেই বহু স্থানের হিন্দু-সভার মতামত সংগ্রহ করিয়াছেন দেখিলাম। অবশ্য রাওল মহাশয়ও তাঁহার নিজের প্রাধান্য যাহাতে অক্ষুন্নই থাকে, সেজন্য নিশ্চেষ্ট বসিয়া আছেন বলিয়া মনে হইল না। ফলাফল সূক্ষ্ম-দৃষ্টি বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের আদেশের উপরেই নির্ভর করিতেছে সন্দেহ নাই। আমরা কিন্তু এ স্থলে যাত্রীর পক্ষ হইতে কর্ত্তৃপক্ষকে কেবল ইহাই সুস্পষ্ট জানাইতে বাধ্য হইব, "যুগ-যুগান্তর হইতে যে মন্দির ভারতের সমগ্র হিন্দুজাতির গৌরব ও পারত্রিক নিস্তারের একমাত্র কারণ, সে মন্দিরে যাত্রি-লব্ধ এত অধিক ধন-সম্পত্তি সঞ্চিত থাকিতে যাত্রিগণ সেখানে কোনও বিষয় কোনও প্রকার অব্যবস্থা বা অবহেলা না দেখিলেই প্রকৃতপক্ষে সুখী হয়। এইটুকু জানিয়াই যেন কর্ত্তৃপক্ষ সুব্যবস্থার দিকে দৃষ্টিপাত করেন।

টিহিরীরাজ দরবার পূজা বিভাগের কর্ত্তা রাওল মহাশয়ের নিকট হইতে এ ক্ষেত্রে মন্দির-সংক্রান্ত কোন বিষয়ে ব্যবস্থার ত্রুটি দেখিয়াছেন (যাহার জন্ম এই মনোমালিন্যের সৃষ্টি হইয়াছে), তাহাও জনসাধারণের নিকটে সুস্পষ্ট জানাইয়া দেওয়া, সর্ব্বপ্রকারেই সুসঙ্গত বলিয়া মনে হয়।

মুনিজনসেবিত এই শ্রেষ্ঠধাম বদরিকাশ্রমে যে দিকেই দৃষ্টিপাত করা যায়, সকল স্থানই এক একটি তীর্থে পরিণত হইয়াছে বলিলে অত্যুক্তি হয় না। এ স্থানের মাহাত্ম্য একমুখে বর্ণন করা অসম্ভব। শাস্ত্রকার বলিয়াছেন,—

"মাহাত্ম্যং কেন শক্যেত বক্তুং বর্ষশতৈরপি।
যত্র গঙ্গা মহাভাগা বদরীনাথশোভিতা।"

অর্থাৎ যে স্থানে মহাভাগা গঙ্গা বদরীনাথের শোভা সম্পাদন করিয়া থাকেন, সে স্থানের মাহাত্ম্য শতবর্ষেও কেহ বলিতে সমর্থ হয়েন
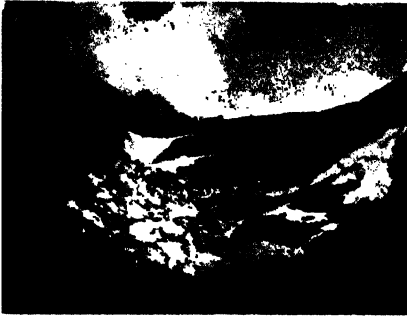
বদরীর নিকটে তুষার-দৃশ্য

না। পিতৃপুরুষগণকে পিণ্ডদানের নিমিত্ত "ব্রহ্মকপাল" এ স্থানের আর একটি বিশিষ্ট তীর্থবিশেষ। মন্দিরের উত্তরভাগে একেবারে অলকনন্দার তটের উপরেই ইহা অবস্থিত। কথিত আছে, এক সময়ে সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা উন্মত্ত অবস্থায় স্বীয় মানস-কন্যার রূপদর্শনে মোহিত হইয়া তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হন। সে সময়ে দেবাদিদেব মহাদেব স্বয়ং সেই সৃষ্টিকর্ত্তা পঞ্চবক্ত্রের একটি মুণ্ড ছেদন করেন। অতঃপর ব্রহ্মহত্যাজনিত পাপক্ষালনের নিমিত্ত এ স্থানে আসিয়া স্নান করিলে তিনি পাপমুক্ত হন। এই অলকনন্দার তটেই সে ছিন্নমুণ্ড পতিত হইয়াছিল, সেই কারণে এ স্থানের "ব্রহ্মকপাল" নাম হইয়াছে। তদবধি এ স্থানে পিণ্ডদান-প্রথা চলিয়া আসিতেছে।

"যৈরত্র পিণ্ডবপনং কৃতং জলসুতর্পণম্।
তারিতাঃ পিতরস্তেন দুর্গতা অপি পাপিনঃ।
কিং গয়াগমনাদ্দেবি কিমন্যতীর্থতর্পণৈঃ।"

অর্থাৎ "যে ব্যক্তি এই স্থানে পিণ্ডবপন বা জল দ্বারা তর্পণ করে, তাহার পিতৃপুরুষগণ হীনগতি প্রাপ্ত হউক অথবা পাপী হেতু নরকেই পড়িয়া থাকুক, তাহাদের জন্ম গয়াগমন বা অন্য তীর্থে তর্পণের আবশ্যক কি? ব্রহ্মকপালে পিণ্ডদানমাত্র তাহারা মুক্ত হইয়াছে।" সেখানকার প্রথানুযায়ী 'মহাপ্রসাদ' খরিদ করিয়া তদ্দ্বারাই পিণ্ডদানকার্য্য সম্পন্ন করিতে হয়। বলা বাহুল্য, আমরাও তৃতীয় দিনে তপ্তকুণ্ডে উপস্থিত হইয়া "কর্ম্মধারায়" প্রথমে স্নানাদি কৃত্য শেষ করিয়া লইলাম, তার পর ক্রীত মহাপ্রসাদ দ্বারা যথারীতি এইরূপে পিণ্ডদান কার্য্য শেষ করিয়া বাসায় ফিরিয়াছিলাম। দেখিয়াছি, "ব্রহ্মকপালে" প্রত্যহই যাত্রীর যথেষ্ট ভিড়। সকলেই তীর্থগুরুর দ্বারা এখানে এ কার্য্য সম্পন্ন করিয়া থাকেন।

বাজারের মধ্যভাগে একটু নিম্নদেশে আসিয়া "ত্রিধারা"। তাহার জল পানীয় হিসাবে উৎকৃষ্ট—আরও একটু আগে উত্তরদিকে রামানুজ সম্প্রদায়ের একটি স্থান তাহাকে "রামানুজ কোট" বলা হয়। এই বাটীর মধ্য হইতেই আবার "প্রহ্লাদধারা" বাহির হইয়াছে। ইহার জল না গরম না ঠাণ্ডা। "ঋষিগঙ্গার" দক্ষিণে

বরফগলিত ধারা নদীতে নামিয়াছে

পর্ব্বতপার্শ্বে "উর্ব্বশী" দেবীর মন্দির, ঋষিগঙ্গা পর্ব্বতের উপরিভাগে "চরণ-পাদুকা", নর-পাহাড়ে "শেষ-নেত্র" ও ব্রহ্মকপাল হইতে এক মাইল আন্দাজ উচ্চে প্রস্তরক্ষোদিত "মাতা-মূর্ত্তি" প্রভৃতি কত তীর্থের কথাই শ্রুত হইলাম। বলা বাহুল্য, আমাদের সময়ের অল্পতা নিবন্ধন সে সব তীর্থ দেখিয়া আসা কোনমতেই সম্ভবপর হয় নাই। বদরীনাথ হইতে দুই মাইল আগে গেলে "মানা-গ্রাম" এবং তথা হইতে মাত্র ৪ মাইল দূরে "বসু-ধারা" দর্শনের খুবই ইচ্ছা ছিল, কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ আমাদের সহযাত্রী পূজনীয় অগ্রজ মহাশয় পাঁচ ধাম দর্শনের পর শুধু পরিশ্রান্ত নহে, বিলক্ষণ অসুস্থ হইয়াও পড়িয়াছিলেন, এই সব কারণে বলিতে কি, আগে যাওয়ার আশা একবারেই পরিত্যাগ করিতে হইয়াছিল। তার পর, বসুধারা হইতে আরও উপরের কথা যদি কেহ জিজ্ঞাসু হন,—সে ত তপোবলসম্পন্ন মহাপুরুষ মুনিঋষিগণেরই শেষ আকাঙ্ক্ষিত "সত্য-পথ" ও "স্বর্গারোহণ" বলিয়াই শাস্ত্রগ্রন্থে নির্দ্দিষ্ট আছে। বলা বাহুল্য, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের মত তপঃশক্তিসম্পন্ন মহাপুরুষই সে পথের পথিক হইতে পারেন, আমাদের পক্ষে তাহা কেবল একমাত্র কল্পনা ও প্রস্ফুটিত আকাশকুসুম ভিন্ন আর কি হইতে পারে?

এই বদরিকাশ্রম সমুদ্রগর্ভ হইতে প্রায় ১০৪৮০ ফুট উচ্চে

অবস্থিত। খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে এ স্থানে এই বিশালজীর মূর্ত্তি শঙ্করাচার্য্য কর্ত্তৃক স্থাপিত হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ। এ দিকে মহাভারতাদি প্রাচীন ধর্ম্মগ্রন্থে বদরী-বিশালজীর সম্বন্ধে নানা স্থানে উল্লেখ থাকায়, "আচার্য্য স্থাপিত এই মূর্ত্তি সে মূর্ত্তি নহে" "সেইটিই আসল, এ কালে লুক্কায়িত অবস্থায় আছেন" ইত্যাদি অন্য প্রকারের আভাসও লোক-মুখে শুনা যায়। এমন কি, কাহারও কাহারও ধারণা, আসল বদরীনারায়ণের মূর্ত্তিটি সুদূর তিব্বতে লামা-কবতলগত বৌদ্ধ-বিহার "থুলিং মঠে" সুরক্ষিত আছে, এরূপ সন্দেহও মনে উদয় হইয়া থাকে। আজন্ম মূর্ত্তি-উপাসক হিন্দুদিগের দৃষ্টিতে দেবমূর্ত্তির কোন্‌টি 'আসল', কোন্‌টি 'নকল', এ বাদ-বিচার, যুক্তি-তর্ক কোনমতেই সমীচীন বলিয়া

বদরীনাথ যাইতে এক স্থানে নদীর দৃশ্য

লেখকের আদৌ ধারণা নাই। সাক্ষাৎ শঙ্করাবতার শঙ্করের স্থাপিত যে মূর্ত্তি সুদীর্ঘ সহস্র বৎসরাধিক কাল হইতে এই নরনারায়ণ-শোভিত বদরিকাশ্রমের তপে মহিমা-মণ্ডিত পুণ্যভূমিতে লক্ষ লক্ষ ভক্তের দ্বারা এইরূপে পূজিত হইয়া আসিতেছে—সেই মূর্ত্তি বদরী-বিশালজীর আসল মূর্ত্তি হইতে কোন্ কোন্ অংশে পৃথক্ হইতে পারে? আজিকার যুগের মদ-মোহান্ধ সংশয়সমাকুল-চিত্ত মানুষ আমরা! আমরা কোন্ ছার! মূর্ত্তি-উপাসক হিন্দু-মহাত্মারা কোন যুগেই যে এ বিষয়ে উত্তর দিতে সমর্থ হইবেন না, ইহা নিঃসংশয়েই বলা যাইতে পারে। অবিমুক্ত কাশীক্ষেত্রের মহত্ত্ব বা 'কাশীত্ব' যাঁহাকে লাভ করিয়া—সেই মঙ্গলময় বিশ্বেশ্বরের 'আসল' মূর্ত্তিই ত 'জ্ঞান-বাপী'র অতল-তলে চির-নিমগ্ন রহিয়াছে; কিন্তু তাহা বলিয়া কাশীক্ষেত্রের চিরন্তন মহিমা ও গৌরব উদ্ভাসিত করিতে যে মূর্ত্তি বিশ্বনাথ-মন্দিরে প্রতিদিন অসংখ্য ভক্তের দ্বারা অর্চ্চিত ও পূজিত হইয়া আসিতেছেন, সে মূর্ত্তি কি সেই একচ্ছত্র অদ্বিতীয় মুক্তি-সম্রাটের নিজস্ব মূর্ত্তি হইতে পৃথক্ মনে করা যায়?

আমার পুরাতন বন্ধু, কৈলাসযাত্রার সহযাত্রী কালিকানন্দ স্বামীজীর সহিত হঠাৎ এখানে এক দিন সাক্ষাৎ হইয়া গেল। উভয়েই উভয়ের কুশলাদি জিজ্ঞাসা করিবার পর যখন তিনি শুনিতে পাইলেন, "আমরা একযাত্রায় পাঁচ ধাম দর্শনে বাহির হইয়াছি, ইহাই আমাদের এক্ষণে শেষ ধাম", তখন তিনি যুগপৎ আনন্দিত ও বিস্মিত হইয়াই জিজ্ঞাসা করিয়া উঠিলেন, "পাণ্ডয়াজীর পথ দিয়াই ত আসিয়াছেন?" উত্তরে সে পথের দুর্দ্দশার কাহিনী ব্যক্ত করিলাম। তিনিও সে সে পথকে এই একইরূপ "কঠিন!" "সঙ্কট-জনক!" ইত্যাদি মনে করিয়া থাকেন, তাহা সে সময়কার ভাবে ও ভাষায় শত মুখেই ব্যক্ত হইয়াছিল।

এই শেষ-ধাম বদরীনাথ পর্য্যন্ত পৌছিতে আমাদের সর্ব্বসমেত প্রায় ৪২৬ মাইল পথ আসা হইয়াছে। ইতিপূর্ব্বে মসৌরী হইতে যমুনোত্তরী তক ৯৬ মাইল পথ এবং যমুনোত্তরী হইতে আবার গঙ্গোত্তরী তক ১০০। মাইল পথের হিসাব সংক্ষিপ্তভাবে প্রকাশ করিয়াছি, এক্ষণে গঙ্গোত্তরী হইতে কেদারনাথ পর্য্যন্ত ১২৩ মাইল পথ ও কেদারনাথ হইতে এই বদরীনাথ পর্য্যন্ত ১০৬। মাইল * পথেরও সংক্ষিপ্ত হিসাব পাঠকবর্গের অবগতির নিমিত্ত স্থানান্তরে লিপিবদ্ধ করিলাম।

এখানে আসা নিবন্ধন আমরা ডাণ্ডিওয়ালা ও বোঝাওয়ালা কুলীগণকে প্রত্যেকেরই ইনাম, খিচুড়ী প্রভৃতি হিসাবমত চুক্তি করিলাম। বলা বাহুল্য, তাহারা সকলেই পাঁচ ধাম দর্শন করাইতে যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়াছে। এইবার নির্ব্বিঘ্নে ফিরিবার যাত্রা-পথটুকু (সে-ও বড় কম নহে!) শেষ হইলেই ত তাহাদের ছুটী!

"স্বয়ম্প্রসাদ" পাণ্ডা ঠাকুরকে কিছু 'মোটা' দক্ষিণাই স্বীকার করিতে হইল। তাঁহার দেওয়া ভগবান্ সিং (ছড়িদার) এই দুর্গম পথে বরাবরই ত এ যাবৎ সাথী রহিয়াছে। বাকী পথটুকুও পার করিবার জন্য তিনি ভগবানকে আদেশ দিতে বিস্মৃত হইলেন না। এইরূপে তাঁহার নিকট হইতে 'সুফল' ইত্যাদি সংগ্রহ করিয়া আমরা একে একে ২৮শে জ্যৈষ্ঠ রবিবার প্রাতে শেষ ধাম হইতে বিদায় গ্রহণ করিলাম।

বারো মাইল পথ নামিয়া আসিয়া বেলা বারোটা আন্দাজ সময়েই "ঘাট" চটীতে মধ্যাহ্নের আহারাদি সে দিন সম্পন্ন করা হইল। বৈকালের দিকে আকাশে দুর্য্যোগ দেখিয়া এ স্থানেই রাত্রি-বাস করা হয়। পরদিন প্রাতে ৫।টা আন্দাজ সময়ে বাহির হইয়া সাতটায় বিষ্ণুপ্রয়াগে বিষ্ণুগঙ্গার পুল অতিক্রম করিলাম। দক্ষিণে অলকনন্দার সুমধুর কল-কল-ধ্বনি এখান হইতে চড়াই পথের উঠিবার কালে ক্রমশঃই যেন ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া আসিল। দুধারেই অলকাস্পর্শী পর্ব্বত-প্রাসাদের চূড়ায় চূড়ায় নবোদিত সূর্য্যরশ্মি খেলিয়া বেড়াইতেছিল। সম্মুখেই এই চড়াইটুকু শেষ করিতে পারিলেই "যোশীমঠে" উপস্থিত হইব। সেই আচার্য্য

* "তুঙ্গনাথ" ও "গুপ্তকাশী" এই দুই তীর্থে যাওয়ার দরুণ আমা-দিগকে প্রায় ৬। মাইল অতিরিক্ত যাইতে হইয়াছিল। নতুবা এ পথের দূরত্ব আনুমানিক ১০০ মাইলের বেশী নহে।

শঙ্করের স্থাপিত সহস্রাধিক বৎসরের প্রাচীন মঠ! কোন্ অতীত কালের সুমধুর পবিত্র স্মৃতি এ স্থানের প্রস্তরে প্রস্তরে আজও যেন সমানভাবে মিশ্রিত রহিয়াছে! ধর্ম্মের পথে, সাধনার সোপান অতিক্রম করিয়া এক দিন এখানে হয় ত মনুষ্যকর্ণে স্বর্গের দুন্দুভি-নিনাদই শ্রুত হইয়াছিল! সে দিন কোথায়। ধীরে ধীরে দুই মাইল প্রায় চড়াই শেষ করিয়া সেই শঙ্কর-মহিমা-মণ্ডিত সুপ্রসিদ্ধ যোশীমঠে উপস্থিত হইলাম।

আচার্য্যের স্থাপিত চারিটি মঠের মধ্যে এই যোশী মঠ হইতেছে অন্যতম। * এখানে মন্দির-মধ্যে অনেক দেবদেবীই বিরাজ করিতেছেন। তন্মধ্যে "নৃসিংহ" ভগবানের মূর্ত্তিটি সর্ব্বাপেক্ষা মনোরম ও দেখিতে সুন্দর মনে হইল। দ্বাদশাঙ্গুলি-পরিমিত মসৃণ শালগ্রাম-শিলায় নির্ম্মিত এই মূর্ত্তিটি বীরাসনে বিরাজ করিতেছেন, বামহস্তে শঙ্খ ও দক্ষিণহস্তে চক্র সুশোভিত। সৌভাগ্যক্রমে ইঁহার স্নান-কালেই আমরা দর্শনলাভ করি। পূজারী মহাশয় বলিলেন, আচার্য্য শঙ্কর এই মূর্ত্তি স্বয়ং পূজা করিতেন। ইঁহারই দক্ষিণে বদরী-বিশালজীর অষ্টধাতুনির্ম্মিত সুন্দর মূর্ত্তি, ক্রোড়ে উদ্ধবজী এবং বামে রাম লক্ষ্মণ সীতার কৃষ্ণপ্রস্তর-মূর্ত্তি, বহির্ভাগে বৃহৎ কাষ্ঠক্ষোদিত চণ্ডীমূর্ত্তি ও সম্মুখে চারিটি শালগ্রাম-শিলা বিরাজ করিতেছেন। মন্দির-বাহিরে "নৃসিংহ-ধারা"। যাত্রিগণ এখানে স্নান করিয়াই দর্শনাদি করিয়া থাকেন। এখান হইতে আর একটু উপরে উঠিলে আর একটি মন্দির দৃষ্ট হয়। তাহাতে ভগবান্ বাসুদেবের ন্যূনাধিক পাঁচ হাত উচ্চ এক কৃষ্ণপ্রস্তরমূর্ত্তি শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম-শোভিত চতুর্ভুজরূপে দণ্ডায়মান। "জয়া" ও "বিজয়া" ঐ একই প্রস্তরে একসঙ্গে ক্ষোদিত মনে হইল। পার্শ্বে "ভূ"-দেবী ও "শ্রী"দেবী বিরাজিতা। দক্ষিণভাগে আবার দণ্ডায়মান বলদেবের নয়নাভিরাম মূর্ত্তি শোভিত রহিয়াছে। এই সকল দেব-দেবী দর্শন করিয়া মন্দিরপ্রদক্ষিণকালে দক্ষিণ ভাগের একটি মন্দিরে আবার নবদুর্গার নয়টি মূর্ত্তি নিরীক্ষণ করিলাম। তাহা ছাড়া আরও এ স্থানের অন্যান্য মূর্ত্তির মধ্যে "হর-পার্ব্বতীর" মূর্ত্তি—(শিবমূর্ত্তির হস্তে বেষ্টিত অবস্থায় পাষাণপ্রতিমা পার্ব্বতী) ও গণেশজীর অষ্টভুজ "তাণ্ডব-মূর্ত্তি" দুইই দেখিতে অতি সুন্দর মনে হইল। শুনিলাম, এ স্থানের মন্দিরাদিতে প্রত্যহ প্রায় এক মণ চাউলের ভোগ দিবার ব্যবস্থা আছে। অবশ্য প্রাতঃকালের ভোগের জন্য সে সময়ে আমরা সেখানে বিশেষ কিছু আয়োজন দেখিলাম না! বদরিকাক্ষেত্রের মন্দিরদ্বার যখন রুদ্ধ থাকে, এই যোশীমঠেই তখন নারায়ণের পূজাদি কার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে। এখান হইতে কতকটা পূর্ব্বাভিমুখী হইয়া উত্তরদিকে একটি স্বতন্ত্র রাস্তা গিয়াছে। কেহ কেহ সে রাস্তা ধরিয়া মানস-সরোবর তীর্থে (তিব্বতে) যাইবার ক্লেশ স্বীকার করিয়া থাকেন। তাহাতে "নীতি-পাস" অতিক্রম করিতে হয়। ধর্ম্মশালায় আহারাদি শেষ করিয়া এ দিন আমরা সোজা-পথে একেবারে "পাতাল গঙ্গায়" আসিয়াই রাত্রিযাপন করিলাম। ঘাট চটী হইতে পাতালগঙ্গার দূরত্ব প্রায় ১৯ মাইল হইবে। তৃতীয় দিনে দুই বেলায় আমরা ১৫ মাইল পথ অতিক্রম করিয়া "মঠ" চটীতে অবস্থান করি।

এখানে ডাণ্ডিওয়ালা ফতে সিং ও বোঝাওয়ালা কর্ণ সিং উভয়েরই জ্বর ও রক্তামাশয় দেখা দেওয়ায় দ্রুতগতি ফিরিবার পথে আমাদের এক নূতন চিন্তা উপস্থিত হইয়াছিল। পরদিন দুই মাইল দূরে "লালসাঙ্গা"য় আসিয়া এবার নূতন পথের সম্মুখবর্ত্তী হইলাম। এ স্থানটি কেদার, বদরী ও কর্ণপ্রয়াগ এই তিনটি পথের মিলনস্থান। এখান হইতে "মেইল চৌরী" প্রায় ৫০ মাইল হইতেছে। এইটুকু পার হইতে পারিলেই ত এই সকল কুলী-দিগের নিকট হইতে অব্যাহতি লাভ করা যায়। অলকনন্দাকে দক্ষিণে রাখিয়া আমরা বরাবর দক্ষিণমুখে দুই মাইল আগে আসিতে "কুবের" চটী পাইলাম। এই স্থানে একটি ঝরণার উপরে কাষ্ঠ-পুল ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় নূতন করিয়া নির্ম্মিত হইতেছিল। তার পর আর একটি চটী (নাম মঠিয়ানা) অতিক্রম করিয়া প্রায় ৫ মাইল দূরে "নন্দ-প্রয়াগে" যখন উপস্থিত হইলাম, তখন বেলা প্রায় সাড়ে নয়টা হইবে। এ স্থানটি নন্দা ও অলকনন্দার সঙ্গম-স্থল। নন্দা নদী গ্রামের দক্ষিণদিক হইতে আসিয়া পশ্চিমে

বদরীনাথ যাইতে তুষারের পথে যাত্রী

অলকনন্দার সহিত মিলিত হইয়াছেন; রাজা নন্দদেব পূর্ব্বকালে এ স্থানে যজ্ঞ করিয়াছিলেন বলিয়া প্রকাশ। নন্দদেবের মন্দির-সম্মুখে একটি নূতন দোকানঘরে সে দিন আমাদের মধ্যাহ্নের আহারাদি শেষ করা হয়। নাড়ুগোপালের পিত্তলের মূর্ত্তি-শোভিত "গোপাল মন্দির" এ স্থানের একটি দ্রষ্টব্য স্থান।

এখান হইতে "গরুড়" চটী যাইবার স্বতন্ত্র পথ নির্ম্মিত হইয়াছে। সে পথের দূরত্ব প্রায় ৪৪ মাইল হইবে। এই গরুড় চটী হইতে যাত্রিগণ মোটরযোগে ষ্টেশনে উপস্থিত হইতেও পারেন শুনা গেল। তবে সে পথের চটীগুলি তত সুবিধার নহে এবং সে পথে গেলে "কর্ণ-প্রয়াগ" ও "আদি-বদরী" প্রভৃতি তীর্থদর্শন বাকী রহিয়া যায়, এজন্য যাত্রিগণ "গরুড়" চটীতে সাধারণতঃ যাইতেই চাহেন না। এই নন্দ-প্রয়াগ হইতে কর্ণ-প্রয়াগের দূরত্ব মাত্র বারো মাইল। বলা বাহুল্য, আমরা এই গ্রামের দক্ষিণাংশের পুল পার হইয়া পাহাড়ের গা দিয়া দিয়া এবার পশ্চিমাভিমুখী রাস্তা ধরিলাম। প্রায় সাড়ে সাত মাইল দূরে "জয়কান্তি" চটীতে আসিয়া এ দিন রাত্রিযাপনের স্থির হইল। মধ্যে তিন মাইল দূরে "সোনলা" এবং তথা হইতে আরও তিন মাইল আগে গিয়া "লাঙ্গাসু" চটী পার হইয়াছিলাম। এই জয়-কান্তি হইতে "মেইল চৌরীর" দূরত্ব মাত্র ৩৩ মাইল হইবে। পরদিন ৪।০ মাইল মাত্র দূরে কর্ণের তপস্যাস্থল

* তিনটি যথা,—দক্ষিণে তুঙ্গাতীরে "শৃঙ্গেরী," পশ্চিমে দ্বারকায় "শারদা" এবং পূর্ব্ব-প্রান্তে পুরীতে "গোবর্দ্ধন" মঠ স্থাপিত আছে।

"কর্ণ-প্রয়াগে" প্রভাতেই উপস্থিত হইলাম। মধ্যে 'উমডী' নামে আর একটি চটী পড়িয়াছিল। দেখিলাম—কর্ণ-প্রয়াগ স্থানটি দৃশ্য হিসাবেও বেশ সুন্দর। "পিণ্ডর-গঙ্গা" ও অলকনন্দার সঙ্গম-স্থলে যাত্রিগণ এখানে সচরাচর স্নান করিয়া থাকেন। সে স্থলে দুই নদীতীরেই নানা বর্ণের কত প্রকার সুন্দর 'নুড়ি' বিস্তৃতভাবে পড়িয়া রহিয়াছে. তাহা দেখিলেই সমতলদেশবাসী যাত্রীর কুড়াইয়া লইবার স্বতঃই ইচ্ছা জন্মে। এ স্থানেরই পর্ব্বত-সমীপে কর্ণ সূর্য্যদেবের দর্শন পাইয়া তাঁহার নিকট হইতে অভেদ্য কবচাদি বর লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া প্রকাশ। সঙ্গমস্থলে স্নান করিয়া উপরিভাগে "কর্ণ-শিলা" কর্ণদেবের মন্দির ও উমা-মহেশ্বরের মন্দির প্রভৃতি দর্শনান্তে আবার আমরা আগে যাত্রা করি। এখান হইতে

যোশী মঠ

"দেব-প্রয়াগের" রাস্তা স্বতন্ত্র, প্রায় ৬০ মাইল দূরে শুনিলাম,—পাঁচ ধাম যাত্রার সুদীর্ঘ পথ-ক্লেশের পর সে তীর্থ দর্শন করিয়া আবার হরিদ্বার পর্য্যন্ত যাওয়া আমাদিগের পক্ষে বিশেষ কষ্ট-সাধ্য মনে হওয়ায়, আমরা পূর্ব্ব হইতেই আমাদের কুলীগণের সহিত মেইল চৌরী তক পৌঁছাইয়া দিবার সর্ত্ত করিয়াছিলাম। যাত্রীর পক্ষে ইহাই ত নিকটতম পথ। অলকনন্দা দেবপ্রয়াগ অভিমুখেই ছুটিয়া চলিয়াছেন, সুতরাং সে পবিত্রতোয়ার সুমধুর কল-কল-ধ্বনি এখান হইতে একবারেই কোথায় লীন হইয়া গেল।

আমাদের পাঁচ ধাম যাত্রার সুরু হইতে শেষ পর্য্যন্ত সাথী ভগবান সিং আজ কয় দিন হইতে জ্বরে পড়িয়াছে. তথাপি তাহার প্রভুদ্বয়ের আদেশমত সে অসুস্থাবস্থায়ই আমাদের সঙ্গে এ পর্য্যন্ত বরাবরই চলিয়া আসিতেছিল! দেব-প্রয়াগের পথেই তাহার বাটী এবং এখান হইতে খুবই কাছে পড়ে শুনিয়া, আমরা আর তাহাকে আমাদের সহিত আসিয়া কষ্ট করিবার প্রয়োজন নাই, এইরূপ বলিয়াই একেবারে বিদায় দিলাম। এত দিনের সুখ-দুঃখের সাথীকে কিছু কিছু বখশিশও দেওয়া হইল, ইহা অবশ্য তাহার পক্ষে অতিরিক্ত লাভ,—সন্দেহ নাই।

মেইল চৌরীর আর ২৯ মাইল মাত্র বাকী জানিয়া দ্রুতগতি কর্ণপ্রয়াগ হইতে আমরা এ দিনে আরও ৮ মাইল আন্দাজ আসিয়া "ভটৌলী"তে রাত্রি কাটাইলাম। মধ্যে প্রায় ৪ মাইল দূরে "সেমনী" চটী হইতে "পাড়" নদীর তীর ধরিয়া বরাবর সমতল পথ পাইয়াছি। সেখান হইতে ভটৌলী আসিতে মধ্যে "সিরোলী" নামে আরও একটি চটী ছিল।

পরদিনের যাত্রা-পথে প্রভাতেই "আদি-বদরী" উপস্থিত হইলাম। ভটৌলী হইতে ইহার দূরত্ব কিঞ্চিদধিক ৪ মাইল হইবে। মধ্যে "উজ্জলপুর" ও "তাল" বলিয়া দুইটি ছোট চটীও এ পথে দৃষ্ট হয়। আদি-বদরীতে মন্দিরগুলি অতি প্রাচীন। মন্দিরে আদি-বদরীর কৃষ্ণপ্রস্তরমূর্ত্তিটি অতি সুশোভন দেখিলাম। আশে-পাশে লক্ষ্মীনারায়ণ, গরুড়জী, কেদারনাথ ও গণেশজী প্রভৃতি বিরাজ করিতেছেন। কতকগুলি ভগ্ন মূর্ত্তিও ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্তভাবে পড়িয়া আছে। তিন চারটি চটী ও দোকান আছে। মন্দির হইতে একটু আগের পথে একটি ছোট মন্দির শঙ্খ চক্র-গদা-পদ্মধারী শ্বেতপ্রস্তরনির্ম্মিত সত্যনারায়ণজীর মূর্ত্তিটিও দেখিতে সুন্দর লাগিল—উত্তরাখণ্ডের পাঁচটি বদরীতীর্থের মধ্যে ইহাই হইল আমাদের যাত্রা-পথে তৃতীয় বদরী। প্রথম দুইটি হইতেছে পাণ্ডুকেশর বা যোগ-বদরী এবং বদরী-বিশালজী। ইহা ছাড়া যোশীমঠ হইতে বিভিন্ন পথে গিয়া "ভবিষ্য বদরী" এবং "হিলং" হইতে কিছু দূরে "বৃদ্ধ বদরী" এই সর্ব্বসমেত পাঁচটি বদরীর উল্লেখ দৃষ্ট হয়।

আদি-বদরী হইতে আবার যাত্রা করিয়া আমরা এ দিনে "ক্ষেতী" "জঙ্গল", "কালীমাঠি", "রসিয়াগড়" ও "খোয়াড়" এই পাঁচটি চটী ক্রমান্বয়ে কোথাও চড়াই বা কোথাও উতরাই পথে অতিক্রম করিয়া, "ধোবীঘাটে"র একটি সুন্দর বারান্দাযুক্ত দ্বিতল-ঘরে রাত্রি যাপন করিলাম। দৃশ্য হিসাবে এ স্থানটি বেশ মনোরম। চারিদিকেই চোখের আগে পাহাড়গুলি এখান হইতে স্তরের পর স্তর কেমন ভাবে অনন্তে মিশিয়া রহিয়াছে দেখা যায়। সম্মুখেই উন্মুক্ত প্রশস্ত সমতল ভূমি, সুতরাং আলো-বাতাস যথেষ্ট। দোকানদার ঘরগুলিকে বেশ খটখটে ও পরিষ্কার রাখিয়াছে। নীচেই জলের ঝরণা পাইপ সংযোগে ধরা আছে। সম্মুখেই দু'একটি পাহাড়ী 'চুলু' বৃক্ষ। বলিতে কি, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা দেখিয়া এ স্থানটিতে স্বতঃই থাকিবার ইচ্ছা জন্মে। আদি-বদরী হইতে ইহার দূরত্ব প্রায় ১০।০ মাইল হইবে।

পরদিন প্রভাতে আমাদের ডাণ্ডিওয়ালা কুলীগণের প্রত্যেকেই অত্যন্ত প্রসন্নচিত্ত—দ্বিগুণ উৎসাহে ডাণ্ডি বহন করিয়া লইয়া যাইতেছিল, আর সাত মাইল মাত্র দূরে "মেইল চৌরী" উপস্থিত হইলেই তাহাদের এ পরিশ্রমের শেষ হইয়া যায়। প্রভাতে সওয়ার-স্কন্ধে প্রথম হইতেই ফতে সিং-এর বুলি—"মাজী! আজ শেষ দিন,—প্রত্যেককেই এক একখানি করিয়া "কপড়া" (কাপড়) বখশিস্ দিতে হইবে।" মিষ্ট কথায় মায়েদের মন ভুলাইতে সে খুবই অভ্যস্ত! তাহা ছাড়া এই দুর্গম শৈল-শিখরে আরোহণ অবরোহণে অনভ্যস্ত সমতলদেশবাসীর নিকট হইতে তীর্থপথযাত্রার একমাত্র অবলম্বন ও ভরসাস্থল এই বহনকারী কুলীরা যে সহজেই দয়া ও সহানুভূতি আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইবে, ইহাতে বিস্ময়ের কিছুই নাই। বলা বাহুল্য, তাহাদের শেষ সাধ অপূর্ণ রহিল না। যোগি-ঋষি-বাঞ্ছিত মহাপ্রস্থানের পথে যত কিছু দুর্লভ পবিত্র তীর্থ ও ধাম দর্শনের তীব্র আকাঙ্ক্ষা জাগে, ইহারা না থাকিলে এ যুগে আমাদের মত গৃহী যাত্রীর পক্ষে তাহা যে একবারেই অপূর্ণ থাকিয়া যায়। সুখের বিষয়, আজ এক মাইল আন্দাজ নামিয়া

আসিতেই "ধুনার ঘাট" নামক একটি বড় চটিতে সে দিন একটি কাপড়ের দোকান চোখে পড়ায়, সেখান হইতে প্রত্যেক কুলীর জন্ম এক একখানি কাপড় খরিদ করিয়া লওয়া হইল। দশ হাত প্রত্যেকখানি কাপড়ে দুই টাকা হিসাবে দাম স্বীকার করিতে হইয়াছিল। এইরূপে বেলা ৯টার মধ্যেই আমরা মেইল চৌরী আসিয়া উপস্থিত হইলাম। মধ্যে "দাড়মডালি" ও "সেঁইজি" নামক আরও দুইটি চটী পাইয়াছিলাম।

মেইল চৌরী পর্য্যন্ত আসিয়াই টিহিরী-রাজ্যের গণ্ডী শেষ হইয়াছে, তাই ডাণ্ডি ও বোঝাওয়ালা কুলীগণ এইখানে আসিয়াই তাহাদের সর্ত্তমত একবারেই ক্ষান্ত দিল। অগত্যা বোঝাওয়ালা প্রত্যেকেরই প্রাপ্য মজুরী (প্রতি মণ ১০৲ টাকা হিসাবে) যে যেমন মাল বহন করিয়া (ভাটোয়ারীতে ওজন হইয়াছিল) আনিয়াছে, সেইমত এইবার সমগ্র চুক্তি দিয়া তাহাদিগকে একবারেই বিদায় দিতে বাধ্য হইলাম। ডাণ্ডিওয়ালারাও নির্দ্দিষ্ট মজুরী আদায় লইয়া এইবার সানন্দে দেশে ফিরিবার উদ্যোগ করিতে লাগিল। ইহাদের পরিবর্ত্তে আমরাও আবার রাণীক্ষেত পর্য্যন্ত নূতন কুলী নিযুক্ত করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। কুলীর আদৌ অভাব নাই। এখান হইতে রাণীক্ষেতের দূরত্ব কমি-বেশী ৩১ মাইল হইবে। ইহার জন্য প্রতি ডাণ্ডি পিছু ১৮৲ টাকা দিবার স্বীকারে নূতন কুলী পাওয়া গেল। আর বোঝার জন্ম কুলীর পরিবর্ত্তে এবার ঘোড়া লওয়া সুবিধাজনক মনে হওয়ায় একটি ঘোড়াওয়ালার সহিত অনেক কষ্টে প্রতি মণ বোঝা পিছু ২।০ টাকা দরে কথাবার্ত্তা স্থির করিলাম। ৫ মণ বোঝার জন্ম দুইটি ঘোড়া সঙ্গে সঙ্গে আসিয়া উপস্থিত হইল। সেখানকার রীতি অনুযায়ী সরকারী বহিতে প্রত্যেক কুলীর নাম, ধাম, মজুরী ও মাল প্রভৃতির ওজন লিখাইয়া দিয়া আহারান্তে এ দিন আমরা বেলা তিনটা আন্দাজ সময়ে মেইল চৌরী হইতে আগে রওনা হইলাম।

প্রথমেই "রামগঙ্গা" নদীর পুল পার হইয়া কতকটা চড়াই পথে উপরে উঠিলাম। তার পর আবার উতরাই পথ ধরিয়া আড়াই মাইল আন্দাজ দূরে আসিতে "ইমল ক্ষেতের" কয়েকখানি দোকান-ঘর দেখা গেল। সেখান হইতে দুই মাইল আগে "নারায়ণ" চটী, তার পর একবারেই নিম্নভূমিতে দুই ধারে কেবল বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রভূমি দেখিতে দেখিতে আমরা "গনাই-চৌখুটিয়া" নামক এক স্থানের একটি দোকানীর দোকান-ঘরে আসিয়া রাত্রি অতিবাহিত করিলাম। পথিমধ্যে বিস্তৃত ময়দানের মাঝে আরও একটি শ্রীসম্পন্ন "রামপুর" চটী চোখে পড়িয়াছিল।

এই গনাই চৌখুটিয়া হইতে আগে দুইটি রাস্তা পড়ে, একটি দক্ষিণাভিমুখী বানদিকে রাণীক্ষেত গিয়াছে, তাহার দূরত্ব মাত্র ২৩ মাইল, অপরটি পশ্চিমাভিমুখী দক্ষিণদিকে "রামনগর" পর্য্যন্ত নির্দ্দিষ্ট আছে। ইহার দূরত্ব প্রায় ৫৬ মাইল হইবে। প্রায় ৩৩ মাইল অতিরিক্ত যাইবার ভয়ে আমরা রামনগরের রাস্তা না ধরিয়া বামদিকের রাস্তায় পরদিন দ্রুত আগে চলিলাম। "গোয়ালী" "মহাকালেশ্বর" চিত্রেশ্বর" ও "কৌলেশ্বরের" চটী ক্রমান্বয়ে পার হইয়া মোট ১০ মাইল দূরে "দ্বারাহাট" (চঁড়াহাটও কেহ কেহ বলিয়া থাকেন) আসিতে পথিমধ্যে তিন চারিটি ভাঙ্গা পুল পার হইতে হইয়াছিল। দ্বারাহাট হইতে রাণীক্ষেতের দূরত্ব মাত্র তেরো মাইল হইবে। এখানে দোকানপসার যথেষ্ট। বহু দিনের পর পাকা আম বিক্রয়ার্থ দেখিয়া এখান হইতে কিছু সংগ্রহ করা হইল। এ স্থানে মধ্যে মধ্যে স্তূপের উপরে কেবলই প্রাচীন মন্দির দেখিয়া জিজ্ঞাসায় জানিলাম, উহাতে কেদার, বদরীনারায়ণ, লক্ষ্মীনারায়ণ ও নৃসিংহ ভগবান্ প্রভৃতি বহু দেবতাই বিরাজমান আছেন। কত দিনের এ সকল স্থাপনা, বলিবার উপায় নাই। অতীত যুগের এ সকল হিন্দুকীর্ত্তি দেখিবার ইচ্ছা থাকিলেও আমরা এ যাত্রায় আর কাল-বিলম্ব না করিয়া, এখান হইতে আরও দুই মাইল আগে "চণ্ডেশ্বরে"ই আজ দ্বিপ্রহরের ভোজনাদি কার্য্য শেষ করিলাম।

প্রাতের দিকেই বারো মাইল পথ চলিয়া আসা হইল; কিন্তু বলিতে কি, পথ যেন আর শেষ হইতেই চাহে না! বিশ্রামকে আমরা একেবারেই মন হইতে দূর করিয়া দিয়া বৈকালের দিকে আবার তিন মাইল আন্দাজ উতরাই পথে "কফড়া চটী" উপস্থিত হইলাম। এইখানে আসিতে দূর হইতে অত্যুচ্চ পর্ব্বতগাত্রে রাণীক্ষেত সহরটি সম্মুখভাগে অগণিত শ্বেত-বিন্দুর মত যখন চোখের

বদরী-সন্নিহিত পাহাড়

আগে ফুটিয়া উঠিয়াছিল, তখন আমাদের প্রত্যেকেরই পরিশ্রান্ত, অবসাদগ্রস্ত চিত্তে ক্ষণেকের জন্ম কেমন একটা স্বস্তি ও আশার আলোক উদ্দীপ্ত হইয়াছিল, তাহা ভুক্তভোগী ভিন্ন অপর কাহারও বুঝিবার সামর্থ্য নাই। দুই মাসের আত্মীয়-স্বজন-স্বদেশ-বন্ধু-বান্ধব-পরিত্যক্ত যাত্রি-হৃদয়ে যখনই তীর্থ দর্শনের উৎকট আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইয়া যায়, সঙ্গে সঙ্গে তখন আজন্ম পরিপুষ্ট ঘরের দিকেই যে মন-প্রাণ স্বতঃই ঝুঁকিয়া পড়িবে, ইহাতে বিস্মিত হইবার কোন কারণ নাই। পাহাড়ের নিরন্তর ঘূর্ণিপাক এক্ষণে যেন একবারে আমাদের অসহ্য মনে হইতেছিল। কোন প্রকারে "দড়মার" পর্য্যন্ত চলিয়া আসিয়া এ দিনের যাত্রা শেষ করা হইল।

দড়মার হইতে মাত্র পাঁচ মাইল দূরে "রাণীক্ষেত"। কোন প্রকারে রাত্রি কাটাইয়া আমরা প্রভাত হইতে না হইতে এ স্থান পরিত্যাগ করিলাম। আজিকার পথটুকু কেবলই চড়াই। কিন্তু সত্যকথা বলিতে কি, সে দিকে আদৌ লক্ষ্য ছিল না। সকলেই ভাবিতেছিলাম, এই বেলার মধ্যেই আমাদের সুদীর্ঘ পাঁচ ধাম যাত্রার পথক্লেশের চির-অবসান ঘটিবে। তীর্থ-পথ-যাত্রী, প্রত্যক্ষদর্শীর যাত্রা সুসম্পূর্ণ হইলে, তাহার সকল শ্রান্তি ও অবসাদ কতই না সার্থক ও সুখের হইয়া থাকে। যাত্রার পূর্ব্বে

কাল যাহা প্রত্যেকেরই নিকটে না জানি কত ভয়াবহ ও ভীষণ দুর্গম ও বিপৎসঙ্কুল বলিয়া মনে হইয়াছিল, আজ দৈবানুগ্রহে ফিরিবার শেষ মুহূর্ত্তে—হউক না সে ভীষণ চড়াই, ইহা আর কতটুকু এবং কতক্ষণই বা! এই ধারণাই এক্ষণে প্রত্যেককে দ্রুতগতি আগে লইয়া যাইতেছিল। শুধু আমরা নহি, আমাদের ক্ষীণশরীরা বৃদ্ধা দিদি পর্য্যন্ত এই চড়াই পথে আজ সকলেরই অগ্রগামিনী হইয়া চলিয়াছেন। সকলেরই প্রাণে অপরিসীম আনন্দ; হৃদয়ের নিভৃত অন্তস্তলে ফিরিয়া তাকাইলে আজ সেখানে শুধু সন্তোষেরই মধুময় সুধা কানায়-কানায় ভরা মনে হইতেছিল। সেই হিমাচল-শীর্ষ-শোভি সুদূর যমুনোত্তরীর তুষার-শীতল প্রবাহ, অন্য দিকে কিবা তাহার নিরন্তর আবেগ-উচ্ছলিত নৈসর্গিক বিপুল উষ্ণ উচ্ছ্বাস মনে পড়িল। মনে পড়িল সেই রাজর্ষি ভগীরথ-আনীত হরিপাদ-নিঃসৃত ভাগীরথীর প্রথম-কল্লোল-মুখরিত মধুময় অবতরণ! সেই ত্রিযুগ-সঞ্চিত প্রজ্জলিত হোমাগ্নি! উপরন্তু সেই রজতগিরিনিভ শুভ্রোজ্জল চিরতুষারবেষ্টিত সুমহান্ জ্যোতির্লিঙ্গ ও সেই মুনিজনমনোহারী ভৃগুপদসুশোভনহৃদি শঙ্খচক্রধারী চতুর্ভুজ পাঁচধামের সকল দেবমূর্ত্তি ও তীর্থরাজির কথা ক্ষণেকের জন্য একে একে আজ স্মৃতিপটে আসিয়া উদয় হইল। এত সম্পদ্ ও নিত্য নবীন চিত্র-বৈচিত্র্য যেখানে বিরাজ করে, সেই মহাজন-প্রদর্শিত মহাপ্রস্থানপথের পবিত্র মহাতীর্থে যাঁহারা অনুগামী হইবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা সে দৃশ্যে আনন্দ ও বিস্ময়াপ্লুত না হইয়া কখনই থাকিতে পারেন না! আত্মীয়-স্বজন-স্বদেশ-বন্ধু-বান্ধব-পরিত্যক্ত যাত্রি-হৃদয় এইবার একবার ভক্তিগদগদচিত্তে সেই যোগি-ঋষিবাঞ্ছিত তপোমহিমামণ্ডিত পবিত্র হিমগিরির চরণোদ্দেশে শেষবার আপন আপন শ্রদ্ধা-অর্ঘ্য নিবেদন করিল। উচ্চকণ্ঠে বলিতে ইচ্ছা হইল, "হে চিরন্তন মহিমার হৈম-মুকুটধারী অমল-ধবল শুভ্রোজ্জল তুষার-শোভি হিমালয়! তোমাকে লাভ করিয়া শুধু হিন্দু নহে, সসাগরা ভারতভূমি হইতে পৃথিবী পর্য্যন্ত সকল দেশবাসীই তোমার দিকেই অনন্তকাল হইতে শ্রদ্ধানতচিত্তে মুগ্ধনেত্রে কেমন তাকাইয়া রহিয়াছে! তুমি পুণ্যভূমি ভারতের শিরোদেশে একমাত্র পবিত্র ভূষণ! তুমি অবিনশ্বর, প্রতাপী, অখণ্ড পুর্ণোজ্জল, সুমহান্ শ্রেষ্ঠ বিকাশ! যোগি-ঋষির নিয়ত ধ্যান ও ধারণার অতুলনীয় আধার ও অমূল্য সম্পদ বলিলে অত্যুক্তি হয় না। তোমাকে আজ শেষবার কোটি কোটি প্রণাম জানাইতেছি! তোমার ঐ অভ্রভেদী বিরাট অবয়বে দেব-মধুর লীলা-বৈচিত্র্য ও নিত্য-নবীন রুচিকর পবিত্র-মধুর দৃশ্য যুগ-যুগান্তর ধরিয়াই সমানভাবে ক্ষুদ্র মানবকে বিস্মিত, স্তম্ভিত ও মোহিত করিয়া রাখিবে সন্দেহ নাই!"

চড়াই-পথে "উরল্লা" ও "কোটলি" নামক দুইটি চটী অতিক্রম করিয়া বেলা সাড়ে সাতটার মধ্যেই আমরা লোক-কোলাহল-পূর্ণ রাণীক্ষেতে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। বদরীনাথ হইতে ইহার দূরত্ব প্রায় ১২৮ মাইল হইবে। স্থানান্তরে এ পথেরও সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিপিবদ্ধ হইল। উল্লিখিত হিসাব-দৃষ্টে জানা যায়, মসৌরী হইতে পাঁচ ধাম দর্শনান্তে এ পর্য্যন্ত ফেরত আসিতে সর্ব্বসমেত প্রায় ৫৫৪ মাইল (৪২৬+১২৮) পার্ব্বত্য-পথ আমাদিগকে অতিক্রম করিতে হইয়াছে।

রাণীক্ষেতে স্থানীয় সৈন্যদিগের রসদ ও বাহন প্রভৃতি যে দিকে থাকে, সেই পথ দিয়া আমাদিগের ডাণ্ডি ও ঘোড়াওয়ালা একটি ত্রিরাস্তার সন্নিকটস্থলে মোটরবাসের আড্ডায় আসিয়া উপস্থিত হইল। এইখানেই তাহাদের আপন আপন প্রাপ্য মজুরী চুকিয়ে দিয়া রেহাই পাইলাম। অসহায়ের সহায় ডাণ্ডি দুইখানি এইবার বোঝা হইয়া দাঁড়াইল। ইহার খরিদদার এ সময়ে কেহই ছিল না; অগত্যা শেষ মুহূর্ত্তে ইহাদিগকে স্থানীয় দুইটি "অনাথালয়ে" অর্পণ করাই সাব্যস্ত হইল। এই অপরূপ বাহন ও বাহকদিগের জন্য প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত বড় কম খরচ পড়ে নাই। হিসাব দৃষ্টে জানা গিয়াছে, প্রতি ডাণ্ডি পিছু ডাণ্ডিওয়ালাদের পশ্চাতে নির্দ্দিষ্ট মজুরী ২২৫৲ টাকা ছাড়া "চানা-চবেনি" "খিচুড়ী" ও ইনাম প্রভৃতিতে অতিরিক্ত আরও ৭৫৲ টাকা অর্থাৎ সর্ব্বসমেত প্রায় তিন শত টাকা লাগিয়াছে। এইরূপে আবার বোঝার জন্য বোঝা-ওয়ালাদিগকেও পাঁচধামের নির্দ্দিষ্ট মজুরী প্রতি মণ ৪০৲ টাকা হিসাবে দিয়াও, অতিরিক্ত প্রায় ৩০৲ টাকা অর্থাৎ প্রতি মণ ৭০৲ টাকার কমে আমরা পার পাই নাই। পাঁচ ধাম যাত্রার ইহাই হইল প্রধান খরচ; অবশ্য পদব্রজে যাত্রীর শুধু বোঝার জন্যই (ডাণ্ডির নহে) খরচ লাগিয়া থাকে। তার পর রেলভাড়া, বাস্‌ভাড়া, নিত্য আহার্য্যদ্রব্যাদি খরিদ, দান-খয়রাত, পূজা, ভেট, প্রণামী ও পাণ্ডার দক্ষিণা ইত্যাদি উপরন্তু খরচ তাহা ত সমস্তই শক্তি অনুসারে যেখানে যেরূপ করা চলে, সকলকেই বহন করিতে হয়।

এখান হইতে "কাঠগুদাম" রেল ষ্টেশন প্রায় ৫২ মাইল হইবে। মোটর-বাসে জন পিছু ভাড়া ২৸০ স্বীকারে, সকলেই একে একে মালপত্রসহ বেলা ১০টা আন্দাজ সময়ে পুনর্ব্বার রওনা হইলাম। অপরাহ্ণ নাগাইদ ষ্টেশনে আসিয়া রাণীক্ষেত হইতে ক্রীত ফলমূলাদির দ্বারা এ দিনের ক্ষুৎ-পিপাসা দূর করা হইল। সময়াভাবে এদিন অন্নাহার জুটে নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

দীর্ঘ দুই মাস পরে ৬ই আষাঢ় মঙ্গলবার সকলেই নিরাপদে কাশী প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছি। এ স্থলে একটি বিষয় না জানাইয়া আমি আমার এই দীর্ঘ ভ্রমণকাহিনীর পরিসমাপ্তি করিতে পারিতেছি না—এই আগা-গোড়া যাত্রাপথের যে সকল দৃশ্য ক্রমান্বয়ে পাঠকবর্গের নিকটে একে একে উপস্থিত করিতে সমর্থ হইয়াছি, তাহার জন্য আমি তিন জনের নিকটে প্রকৃতপক্ষে ঋণী আছি। প্রথম ব্যক্তি কাশী-নিবাসী শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ চক্রবর্ত্তী—ইনি আমাদিগেরই সময়ের সহযাত্রী, বর্দ্ধমানের ধর্ম্মপ্রাণা শ্রীযুক্ত রাণী মাতার সহিত বদরী-কেদার দর্শনে বাহির হইয়াছিলেন। দ্বিতীয় ব্যক্তি এলাহাবাদনিবাসী শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ বাগচী (ইহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ জনৈক "আর্টিষ্ট", মাসিক পত্রিকায় ছবি ইত্যাদি প্রকাশ করিয়া থাকেন) গঙ্গোত্রী পথে পথিক ছিলেন এবং তৃতীয় ব্যক্তি কলিকাতানিবাসী শ্রীযুক্ত গৌরচন্দ্র মিত্র—ইহার সহিত "গৌরীকুণ্ড" তীর্থে আলাপাদি হয়। ইহাদের প্রত্যেককেই এজন্য ধন্যবাদ জানাইয়া, আমি এ যাত্রায় পাঠকবর্গের নিকটে বিদায় লইলাম।

শ্রীসুশীলচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

সমাপ্ত

চতুর্থ পল্লব

গ্রেপ্তার

জন প্যারাডাইন মিঃ ব্লীডের সহিত সাক্ষাতের পর লিঙ্কন্‌স ইন্ ফীল্ডস্ হইতে প্রস্থান করিবার সময় স্বস্তিবোধ করিল। মিঃ ব্লীডের নিকট অপরাধ স্বীকার করিবার পর তাহার বুকের উপর হইতে যেন পাষাণভার অপসারিত হইল। শনিবার রাত্রিকালে যে ভীষণ কাণ্ড সংঘটিত হইয়াছিল, তাহার স্মৃতি তাহার হৃদয় অশান্তিপূর্ণ করিয়াছিল। সে মিঃ ব্লীডের নিকট সেই সকল কথা প্রকাশ করিয়া যেন হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল। মিঃ ব্লীড তাহার কথা বিশ্বাস করিয়াছেন, তিনি তাহার পক্ষাবলম্বন করিবেন, এই বিশ্বাসে তাহার মন প্রফুল্ল হইল; কিন্তু সেই প্রৌঢ় ব্যবহারাজীব মামলা-মকদ্দমা-সংক্রান্ত ব্যাপারে তাঁহাব মক্কেলগণের পক্ষসমর্থন করিয়া থাকেন; কিন্তু সুচতুর ও সুদক্ষ ডিটেক্‌টিভ ভিন্ন অন্য কেহ এই জটিল হত্যারহস্য ভেদ করিয়া তাহাকে বিপজ্জাল হইতে মুক্ত করিবে, তাহার সম্ভাবনা ছিল না। এ অবস্থায় মিঃ ব্লীড কিরূপে তাহাকে সাহায্য করিবেন, তাহা সে বুঝিতে পারিল না; তথাপি তাহার হৃদয় আনন্দে ও উৎসাহে পূর্ণ হইয়াছিল।

প্যারাডাইন পথে আসিয়া পশ্চিমদিকে চলিতে চলিতে এইরূপ সিদ্ধান্ত করিল যে, মিঃ ব্লীড নিশ্চিতই এই জটিল সমস্যা সমাধানের কোন উপায় স্থির করিয়াছেন। টেরিই যে হত্যাকারী, এ বিষয়ে সংশয়ের অবকাশ নাই। যদি তাহার অপরাধ সপ্রমাণ হয় এবং বিচারালয়ে তাহার প্রতি যথাযোগ্য দণ্ডের আদেশ হয়, তাহা হইলে প্যারাডাইন নিরপরাধ প্রতিপন্ন হইবে। যদি সে পুলিসের নিকট সকল কথা প্রকাশ করিতে পারিত, তাহা হইলে তাহারা টেরিকে সম্ভবতঃ গ্রেপ্তার করিত; কিন্তু প্যারাডাইন পুলিসের নিকট কোন কথা প্রকাশ করিতে সাহস না করায় তাহার গ্রেপ্তারের আশা করিতে পারিল না।

প্যারাডাইন তাহার ভবিষ্যৎ অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন দেখিলেও সেই অন্ধকারে ক্ষীণ আলোকরশ্মি দেখিতে পাইল। তাহার মহাজন জেম্‌স্ ফারমিন তাহাকে এই ভয়প্রদর্শন করিয়াছিল যে, যদি সোমবারমধ্যে সে দুই শত পাউণ্ড তাহার নিকট না পায়, তাহা হইলে সে মিঃ নিস্‌বেটের নিকট উপস্থিত হইয়া তাহার বিরুদ্ধে অভিযোগ করিবে; কিন্তু মঙ্গলবারেও প্যারাডাইনের মনিব মিঃ নিসবেট তাহাকে আহ্বান না করায় তাহার ধারণা হইল, ফারমিন শেষ মুহূর্তে সেই সঙ্কল্প ত্যাগ করিয়াছিল। সম্ভবতঃ তাহার মহাজন অতঃপর তাহাকে উৎপীড়ন করিবে না। প্যারাডাইন তাহার পিতার চিকিৎসার জন্য যে পঞ্চাশ পাউণ্ড ধার করিয়াছিল, সেই ঋণের জন্য সে ফারমিনকে পঁচাত্তর পাউণ্ড দিয়াছিল; সুতরাং প্যারাডাইনের ধারণা হইল, ফারমিন তাহাকে কায়দায় পাইয়া তাহার নিকট যত টাকারই দাবী করুক, তাহার ঋণ সে পরিশোধ করিয়াছে বলিয়াই প্যারাডাইনের ধারণা হইল।

প্যারাডাইন লিসেষ্টার স্কোয়ারে উপস্থিত হইয়া চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া অত্যন্ত ভীত হইল। সে সংবাদপত্রের প্ল্যাকার্ডের দিকে চাহিয়া দেখিতে পাইল, মোটা মোটা অক্ষরে লিখিত ছিল, 'উইনগেট্‌সের হত্যারহস্য', 'করোনারের তদন্ত।' প্যারাডাইন স্পন্দিত-বক্ষে একখানি কাগজ কিনিয়া লইল এবং রিউপার্ট ষ্ট্রীটের কোন নির্জ্জন অংশে উপস্থিত হইয়া কম্পিত হস্তে কাগজখানি খুলিয়া তাহা পাঠ করিতে লাগিল।

সে কাগজে যাহা পাঠ করিল, তাহা সমস্তই তাহার সুবিদিত। তাহার মনিব মিঃ নিসবেট করোনারের আদালতে যে জবানবন্দী দিয়াছিলেন, তাহাও সে পাঠ করিল। মিঃ

নিস্‌বেট সেই জবানবন্দীতে নিহত কর্ম্মচারীর বিশ্বস্ততার ও কর্ত্তব্যজ্ঞানের যথেষ্ট প্রশংসা করিয়াছিলেন। তিনি আরও বলিয়াছিলেন, এই কর্ম্মচারী বিগত ২০ বৎসর যাবৎ নিষ্ঠার সহিত তাঁহার সেবা করিয়া আসিয়াছিলেন। তিনি এই কর্ম্মচারীর খাতা-পত্রে কখন ভুলচুক আবিষ্কার করিতে পারেন নাই এবং কোনদিন তাঁহাকে অর্থকষ্ট অনুভব করিতে হয় নাই।

সাতটা বাজিতে তখনও কয়েক মিনিট বিলম্ব ছিল। প্যারাডাইন শরীরটা কিঞ্চিৎ বেজুত মনে হওয়ায় কোন পানাগারে গমন করিয়া হুইস্কি-সোডা পানে একটু চাঙ্গা হইয়া লইল। সেই সময় খবরের কাগজখানি তাহার হাতে থাকায় তাহার এক স্থানে তাহার দৃষ্টি সন্নিবিষ্ট হইল। সেই স্থানে সেয়ারের বাজারের রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছিল। আরানার নামটি পাঠ করিয়া সকল বিবরণ জানিবার জন্য তাহার কৌতূহল হইল; তাহার নীচেই সে দেখিল, "আরানা স্বর্ণক্ষেত্রের সেয়ারের মূল্য হু হু শব্দে চড়িতেছে!"

এই স্বর্ণক্ষেত্রের যে সেয়ারের মূল্য বহু বৎসর যাবৎ সৎসামান্য ছিল, তাহাই হঠাৎ চড়িয়া দুই পাউণ্ডে উঠিয়াছে। এই প্রকার আকস্মিক মূল্যবৃদ্ধির কারণ এরূপ রহস্যাবৃত যে, একখানি দৈনিক পত্রের প্রতিনিধি ইহার কারণ নির্ণয়ের জন্য এই কোম্পানীর ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ নিস্‌বেটের সহিত সাক্ষাৎ করিলে মিঃ নিস্‌বেট তাঁহাকে বলিয়াছিলেন,—

"কেব্‌লযোগে আমরা যে সংবাদ পাইয়াছিলাম, সেই সংবাদে নির্ভর করিয়া আমরা খনি হইতে যথেষ্ট অনুকূল রিপোর্টেরই আশা করিতেছিলাম। সেই রিপোর্ট গত শনিবার আমাদের আফিসে পৌঁছাইবার সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু মিঃ গার্ভিনের শোচনীয় হত্যাকাণ্ড নিবন্ধন—যে দুর্ঘটনায় আমার অপেক্ষা দ্বিতীয় কোন ব্যক্তির অধিকতর মর্ম্মাহত হইবার সম্ভাবনা নাই,—আমরা সেই রিপোর্টের অস্তিত্ব আবিষ্কার করিতে পারি নাই। আমাদের 'সেয়ার' লইয়া যে প্রকার দরবৃদ্ধির খেলা চলিতেছে, আমি তাহা নিন্দনীয় মনে করি এবং আমি এ কথা বলিতে বাধ্য যে, আরানার সেয়ারের জন্য এই প্রকার আকস্মিক এবং অভূতপূর্ব্ব চাহিদার পরিচয় পাইয়া আমার মন এরূপ সন্দেহে পূর্ণ হইয়াছে যে, এই ব্যাপার পুলিসের গোচর করাই কর্ত্তব্য বলিয়া আমার মনে হইতেছে। বস্তুতঃ, আরানার সেয়ারের বাজারের বর্ত্তমান অবস্থা দেখিয়া আমার ধারণা হইয়াছে যে, উক্ত রিপোর্ট যথাসময়ে আমাদের আফিসে আসিলে মিঃ গার্ভিনই তাহা নিজের নিকট রাখিয়াছিলেন; সেই রিপোর্ট তাঁহার নিকট হইতে চুরি গিয়াছে। যে তস্কর বা তস্করেরা তাহা চুরি করিয়াছে, তাহারা সেই রিপোর্ট পাঠ করিয়া জানিতে পারিয়াছে, আরানা স্বর্ণক্ষেত্র হইতে প্রচুর লাভের সম্ভাবনা আছে এবং এই সংবাদ দ্বারা তাহারা স্বার্থসিদ্ধির পথ প্রশস্ত করিয়াছে। এইভাবে তাহারা কোম্পানীর পরিচালকবর্গকে ক্ষতিগ্রস্ত করিয়া প্রবঞ্চনার সাহায্যে লাভবান্ হইতেছে।"

প্যারাডাইন এই প্যারাগ্রাফটি দুই তিনবার পাঠ করিল। সে ভাবিল, মিঃ গার্ভিনের হত্যাকাণ্ডের সময় উক্ত রিপোর্ট তাঁহারই জিম্মায় ছিল, মিঃ নিস্‌বেটের এরূপ ধারণার কারণ কি? তিনি ত জানিতেন যে, শনিবার অপরাহ্নে পশ্চিম-আফ্রিকার ডাকের চিঠি-পত্র তাঁহাদের আফিসে বিলি হইলে নিম্নপদস্থ কোন কেরাণীর সেই ডাক গ্রহণ করিবার ব্যবস্থা ছিল; তথাপি রিপোর্টখান মিঃ গার্ভিনের নিকট গচ্ছিত ছিল—মিঃ নিস্‌বেট এরূপ অনুমান কেন করিলেন? প্যারাডাইন ভাবিয়া চিন্তিয়া ইহাই সিদ্ধান্ত করিল যে, মিঃ নিস্‌বেট হয় ত মনে করিয়াছেন, মিঃ গার্ভিন রিপোর্টখানির গুরুত্বের কথা চিন্তা করিয়া, নিম্নপদস্থ কোন কেরাণীকে উহা আফিসের ডাক-বাক্স হইতে বাহির করিয়া লইবার ভার না দিয়া স্বয়ং সেই দায়িত্বভার গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং সম্ভবতঃ তাহা তিনি পকেটে লইয়া বাড়ী গিয়াছিলেন। সোমবারে যথাসময়ে আফিস খুলিলে মিঃ নিস্‌বেট প্যারাডাইনকে সেই রিপোর্ট সম্বন্ধে কোন কথা জিজ্ঞাসা না করায় সে অত্যন্ত বিস্মিত হইয়াছিল; সে তখন ইহার কারণ বুঝিতে না পারিলেও সংবাদপত্রে মিঃ নিস্‌বেটের মন্তব্য পাঠের পর তাহার মনের ধাঁধা অপসারিত হইল।

সে ঘড়ীর দিকে চাহিয়া দেখিল, সময় তখন স-সাতটা। সে হাতের কাগজখানি তাল পাকাইয়া সেই কক্ষের মেঝের উপর ফেলিয়া দিয়া পথের দিকে অগ্রসর হইল, এবং পাঁচ মিনিটের মধ্যে 'বুইনো' নামক ভোজনাগারে উপস্থিত হইল। সেই সময় তাহার মনে পড়িল, শেষ যে দিন সে সেই ভোজনাগারে আসিয়াছিল, সে দিন টেরি তাহার সহবাস শ্লাঘার বিষয় মনে করিয়া তাহাকে কতই

আদর-যত্ন করিয়াছিল। সপ্তাহে দুই তিন দিন টেরি সেখানে তাহাকে ভোজন করাইয়া আনন্দ লাভ করিত; সেইরূপ উৎকৃষ্ট ভোজ্যদ্রব্য ভোজনের সুযোগ সে জীবনে আর কখন পাইয়াছে বলিয়া তাহার স্মরণ হইল না। শেষ দিন ভোজনের সময় সে তাহাকে দুই শত পাউণ্ড উৎকোচ দানের প্রস্তাব করিয়াছিল।

প্যারাডাইন চঞ্চল-চিত্তে দ্বার খুলিয়া ভোজনাগারে প্রবেশ করিল। যদি সে সেখানে টেরিকে দেখিতে পায়, তাহা হইলে সে তাহার সহিত কিরূপ ব্যবহার করিবে, তাহাই ভাবিতে লাগিল। মিঃ ব্লীড্ যতক্ষণ সেখানে না আসেন, ততক্ষণ কি তাহার সঙ্গে গল্প চালাইবে? কিন্তু যে উদ্দেশ্যে টেরি তাহার মনোরঞ্জন করিত, তাহার সেই উদ্দেশ্য সফল হইয়াছিল; এখন কি টেরি তাহাকে চিনিতে পারিবে? তাহার সহবাস প্রার্থনীয় মনে করিবে? টেরির সহিত সে কোন্ বিষয়েরই বা গল্প করিবে? এই সকল কথা চিন্তা করিয়া তাহার মন অত্যন্ত দমিয়া গেল। কিন্তু সে যখন চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া টেরিকে দেখিতে পাইল না, তখন সে স্বস্তি বোধ করিল। প্যারাডাইন টেরির সহিত যে টেবলে ভোজন করিতে বসিত, সে সেই টেবলের নিকট উপস্থিত হইতেই একটা খানসামা ক্ষণকাল তাহার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া নতদৃষ্টিতে সেই কক্ষের অন্য প্রান্তে প্রস্থান করিল।

প্যারাডাইন চেয়ারে বসিয়া সমাগত অতিথিদের মুখের দিকে আর একবার চাহিয়া দেখিল। কিন্তু টেরি বা ব্লীড্ কাহাকেও সে দেখিতে পাইল না। সে ভোজ্য-দ্রব্যের তালিকাখানি সম্মুখে ধরিয়া শূন্য-দৃষ্টিতে সেই দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার মনে হইল, টেরি তাহাকে যে সকল উৎকৃষ্ট ভোজ্যদ্রব্য আহার করাইত, সে দিন তাহার তাহা ক্রয় করিবার সামর্থ্য হইবে না। বুইলোঁ ধনাঢ্য বিলাসীদের রেস্তরাঁ।

খানসামা তাহার নিকট ফিরিল না। প্যারাডাইন তালিকাস্থিত সর্ব্বাপেক্ষা সুলভ খাদ্যদ্রব্যগুলিই ভোজনের জন্য নির্ব্বাচিত করিতে লাগিল। সহসা কেহ তাহার স্কন্ধ স্পর্শ করিল। প্যারাডাইন মুখ তুলিয়া পশ্চাতে চাহিতেই যাহাকে দেখিতে পাইল, সেই ব্যক্তি তাহার সম্পূর্ণ অপরিচিত।

লোকটি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "আপনিই মিঃ জন প্যারাডাইন?"

আগন্তুকের প্রশ্ন শুনিয়া প্যারাডাইনের মন কি এক অজ্ঞাত আশঙ্কায় পূর্ণ হইল। কিন্তু সে সংযত স্বরে বলিল, "হাঁ, আমার নাম প্যারাডাইন। আমার নিকট আপনার কি প্রয়োজন?"

আগন্তুক বলিল, "আমি স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের ডিটেকটিভ। গত শনিবার উইনগেট্সের প্রিটোরিয়া ক্রেসেণ্টের নিজ বাড়ীতে মিঃ জেম্স গার্ভিন নিহত হইয়াছেন; আমি তাঁহার হত্যাকাণ্ডের তদন্তের ভার পাইয়াছি। সেই রাত্রিটা তুমি কোথায় কি ভাবে কাটাইয়াছিলে, এ সম্বন্ধে তোমাকে দুই একটি কথা জিজ্ঞাসা করিবার প্রয়োজন। এ জন্য আমার সঙ্গে তোমাকে থানায় যাইতে হইবে।"

আগন্তুকের সঙ্গে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা ছিল কি না, এবং তাহা না থাকিলে সে কোন্ অধিকারে তাহাকে থানায় ধরিয়া লইয়া যাইতে চাহে, প্যারাডাইন এ কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারিত; কিন্তু প্যারাডাইন তাহাকে সেরূপ কোন কথা জিজ্ঞাসা করিল না; আগন্তুকের কথা শুনিয়াই সে ভড়কাইয়া গেল, বুঝিতে পারিল—সে যে বজ্রাঘাতের আশঙ্কা করিতেছিল, সেই আশঙ্কা কার্য্যে পরিণত হইল। সে কম্পিতপদে উঠিয়া দাঁড়াইল। আগন্তুকের আদেশের প্রতিবাদ করিতেও তাহার সাহস হইল না। প্যারাডাইন তাহার টুপি ও লাঠী লইয়া আগন্তুকের সঙ্গে ভোজনালয় ত্যাগ করিয়া পথে আসিল। পথের ধারে একখান মোটর-কার দাঁড়াইয়া ছিল। গাড়ীর দ্বার-জানালা বন্ধ। ডিটেক্‌টিভ গাড়ীর দ্বার খুলিয়া প্যারাডাইনকে গাড়ীতে তুলিয়া দিল, তাহার পর সে তাহার পাশে বসিল। সঙ্গে সঙ্গে গাড়ী চলিতে আরম্ভ করিল। প্যারাডাইনের মনে হইল, ফাঁসীকাঠের অভিমুখে ইহাই তাহার প্রথম পদক্ষেপণ!

গাড়ীর এক দিকের জানালা অর্দ্ধোন্মুক্ত ছিল। ডিটেক্‌টিভ সেই জানালা বন্ধ করিবার জন্য হাত বাড়াইয়াছে—সেই সময় প্যারাডাইন সেই জানালা দিয়া পথের দিকে চাহিয়া এক জন দীর্ঘদেহ পথিককে দেখিতে পাইল, তাঁহার দেহ প্রাতর্ভ্রমণোপযোগী কোটে আবৃত, হাতে ছাতা। তিনি রেস্তরাঁর দিকে যাইতেছিলেন। এই পথিক মিঃ ব্লীড্।

সমুদ্রে নিমজ্জনোন্মুখ কোনও নাবিক দিগন্তসীমায়

ভাসমান জাহাজ দেখিতে পাইলে যেরূপ স্পন্দমান-বক্ষে এবং আশ্বস্ত-হৃদয়ে সেই জাহাজের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে, প্যারাডাইন গাড়ীর জানালা হইতে মাথা বাড়াইয়া সেই ভাবে মিঃ প্রীডের দিকে চাহিয়া আকুল-স্বরে ডাকিল, "মিঃ প্রীড্! মিঃ প্রীড!"

মিঃ প্রীড্ তাহার কণ্ঠস্বর শুনিয়া মুহূর্ত্তের জন্য সেই শকটের দিকে ফিরিয়া চাহিলেন; কিন্তু প্যারাডাইন তাঁহাকে কোন কথা বলিবার পূর্ব্বেই তাহার পার্শ্বোপবিষ্ট ডিটেক্‌টিভ তাহার গলার কলার ধরিয়া তাহাকে বাতায়ন-প্রান্ত হইতে টানিয়া আনিয়া আসনে বসাইয়া দিল, তাহার পর তাড়াতাড়ি জানালা বন্ধ করিল।

ডিটেক্‌টিভের এই ব্যবহারে প্যারাডাইন অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া জানালা খুলিবার চেষ্টা করিল, তাহা দেখিয়া ডিটেক্‌টিভ এক ধাক্কায় তাহাকে পুনর্ব্বার বসাইয়া দিয়া বলিল, "ভাল চাও ত স্থিরভাবে বসিয়া থাক, নতুবা তোমার অদৃষ্টে বিস্তর—"

কিন্তু প্যারাডাইন তাহার কথায় বাধা দিয়া উত্তেজিত স্বরে বলিল, "এ তোমার কি রকম ব্যবহার? আমি তোমার সঙ্গে থানায় যাইতে সম্মত হইয়াছি বলিয়াই কি আমার উপর অত্যাচার করিবে? গাড়ী থামাও, উনি আমার সলিসিটার। আমি উঁহাকে গাড়ীতে তুলিয়া লইব। থানায় লইয়া গিয়া যখন আমাকে জেরা করা হইবে, সে সময় আমার সলিসিটারকে নিকটে রাখিতে চাই, সে অধিকার আমার আছে। আমি কোন বে-আইনী কায করিতেছি না। তুমিই গায়ের জোরে বে-আইনী কায করিতেছ। রাখ গাড়ী!"

কিন্তু ডিটেক্‌টিভ তাহার কথায় কর্ণপাত করিল না; গাড়ী সবেগে গন্তব্য পথে ধাবিত হইল। প্যারাডাইন আবার উঠিয়া জানালা খুলিবার চেষ্টা করিল। তখন ডিটেক্‌টিভ এক ধাক্কায় তাহাকে আসনের উপর কাত করিয়া ফেলিতেই প্যারাডাইন ক্রোধ সংবরণ করিতে না পারিয়া, দুই হাতে ডিটেক্‌টিভের গলা চাপিয়া ধরিয়া তাহাকে গাড়ীর মেঝের উপর নিক্ষেপ করিবার চেষ্টা করিল। কিন্তু ডিটেক্‌টিভও বলবান্; সে দুই হাতে তাহার কাঁধ ধরিয়া তাহাকে গাড়ীর মেঝের উপর চিত করিয়া ফেলিল, এবং তাহার পেটের উপর হাঁটু চাপাইয়া, ভিজা স্পঞ্জ দিয়া তাহার নাক-মুখ চাপিয়া ধরিল। সে ডিটেক্‌টিভের উভয় চক্ষুতে প্রতিহিংসানল প্রতিফলিত দেখিল। প্যারাডাইন তাহার কবল হইতে মুক্তি লাভ করিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু মুহূর্ত্ত মধ্যে তাহার সর্ব্বাঙ্গ আড়ষ্ট হইল; তাহার চক্ষুর উপর অন্ধকার ঘনাইয়া আসিল, এবং তাহার চেতনা বিলুপ্ত হইল। ডিটেক্‌টিভের হাতের স্পঞ্জখানি ক্লোরোফর্ম্মসিক্ত ছিল; ক্লোরোফর্ম্মের প্রভাবে অতি অল্পসময়ের মধ্যেই তাহার এই অবস্থা হইল। প্যারাডাইন মোটর-গাড়ীর মেঝের উপর মৃতবৎ পড়িয়া রহিল, দেখিয়া ডিটেক্‌টিভ হী-হী শব্দে হাসিয়া তাহার পেটের উপর হইতে জানু অপসারিত করিল, এবং উঠিয়া সরিয়া বসিয়া তাহার বিবর্ণ মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

মোটর-গাড়ী পূর্ণবেগে ধাবিত হইল।

পঞ্চম পল্লব

নিরুদ্দেশ যাত্রা

মোটর-গাড়ী একটি বন্ধুর পথ দিয়া চলিবার সময় গাড়ীর রবারনির্ম্মিত টায়ারে পুনঃ পুনঃ ধাক্কা লাগায় গাড়ী ক্রমাগত দুলিতে লাগিল। সেই আন্দোলনে, বিশেষতঃ ক্লোরোফর্ম্মের উগ্রতা হ্রাস হওয়ায়, প্যারাডাইনের লুপ্ত চেতনা ধীরে ধীরে ফিরিয়া আসিল। চেতনাসঞ্চার হইলে সে বুঝিতে পারিল, তাহার চেতনা বিলুপ্ত হইলে তাহাকে গাড়ীর মেঝে হইতে তুলিয়া আসনের উপর কাত করিয়া ফেলিয়া রাখা হইয়াছিল। তাহার মাথার ভিতর যেন আগুন জ্বলিতেছিল। সে মাথায় হাত বুলাইবার আশায় যখন হাত তুলিবার চেষ্টা করিল, তখন সে বুঝিতে পারিল, তাহার চেতনা বিলুপ্ত হইলে তাহার উভয় হস্ত শৃঙ্খলিত করা হইয়াছিল তাহার পদদ্বয় অসাড় হইয়া গিয়াছিল; সে পদদ্বয় প্রসারিত করিতে গিয়া বুঝিতে পারিল, তাহার পদদ্বয়ও শৃঙ্খলিত হইয়াছে! এতদ্ভিন্ন তাহার গলায় একটা লোহার কলার আঁটিয়া দুই-গাছা লৌহশৃঙ্খল দ্বারা সেই কলার গাড়ীর কাষ্ঠাবরণের উভয় প্রান্তস্থিত লোহার হুকে আবদ্ধ করা হইয়াছিল। সুতরাং তাহার স্থান পরিবর্ত্তন করিবার উপায় ছিল না। সে নড়িতে পারিল না।

প্যারাডাইন সর্ব্বাঙ্গে যে অসাড়তা অনুভব করিতেছিল,

চেতনাসঞ্চারের পর তাহার প্রভাব অতিক্রম করিতে কিছু সময় লাগিল। তাহার মনে হইতেছিল—তাহার মস্তিষ্ক নিবিড় কুজ্ঝটিকাস্তরে সমাচ্ছন্ন হইয়াছে ; সেই কুজ্ঝটিকাস্তর ভেদ করিয়া স্মৃতির ক্ষীণতম রশ্মিও সেখানে প্রতিফলিত হইল না। পূর্ব্বকথা সে স্মরণ করিতে পারিল না ; কিন্তু ক্রমশঃ ধীরে ধীরে তাহার চিন্তাশক্তি ফিরিয়া আসিল। প্রথমে যাহা একটা উৎকট দুঃস্বপ্ন বলিয়া মনে হইতেছিল—তাহা যে স্বপ্ন নহে, সত্য, অতি কঠোর সত্য—ইহা সে বুঝিতে পারিল। সঙ্গে সঙ্গে বুইলোঁ রেস্তরাঁর কথা তাহার স্মরণ হইল। সেখানে সে যে টেবলে বসিয়া টেরির সহিত ভোজন করিত, ভোজন করিতে করিতে সে কত সুখ-দুঃখের কথার আলোচনা করিত, সেই টেবলের কথাও তাহার মনে পড়িল। তাহার স্মরণ হইল, সে মিঃ প্রীডের উপদেশ অনুসারে সেই ভোজন-টেবলে বসিয়া তাঁহার প্রতীক্ষা করিতেছিল, সেই সময় এক জন অপরিচিত লোক তাহার অজ্ঞাতসারে পশ্চাতে আসিয়া তাহার স্কন্ধ স্পর্শ করে। সে মিঃ গার্ভিনের হত্যাকাণ্ডের প্রসঙ্গে তাহাকে কোন কোন কথা জিজ্ঞাসা করিবার জন্য তাহার সঙ্গে থানায় যাইতে অনুরোধ করে। সে তাহার অনুরোধে তাহার সঙ্গে রেস্তরাঁর বাহিরে আসিলে যে সকল অদ্ভুত ব্যাপার সঙ্ঘটিত হইয়াছিল, তাহা স্মরণ হওয়ায় সে শিহরিয়া উঠিল। সে মোটর-গাড়ীতে উঠিয়া কিছু দূর অগ্রসর হইলে, মিঃ প্রীড্‌কে রেস্তরাঁর দিকে যাইতে দেখিয়াছিল ; সে গাড়ীর জানালা দিয়া তাঁহাকে দেখিতে পাওয়ায় তাঁহার দৃষ্টি আকৃষ্ট করিবার জন্য তাঁহাকে আহ্বান করিয়াছিল, ইহাতে ডিটেক্‌টিভ ক্রুদ্ধ হইয়া তাহার প্রতি কিরূপ পৈশাচিক ব্যবহার করিয়াছিল, এবং তাহার ফলে তাহার অবস্থা কিরূপ শোচনীয় হইয়াছিল, তাহাও তাহার স্মরণ হইল।

সেই ডিটেক্‌টিভ অথবা জাল ডিটেক্‌টিভ তাহাকে আক্রমণ করিয়া গাড়ীর মেঝের উপর ফেলিয়া দিয়াছিল ; সে সেই আততায়ীর কবল হইতে নিষ্কৃতিলাভের চেষ্টা করিবার পূর্ব্বেই সেই নরপিশাচ তাহার পেটে হাঁটু চাপাইয়া ক্লোরোফর্ম্মসিক্ত স্পঞ্জ দ্বারা তাহার নাক-মুখ আবৃত করিয়াছিল। ক্লোরোফর্ম্মের প্রভাবে তাহার চেতনা বিলুপ্ত হইলে তাহার অবস্থা কিরূপ হইয়াছিল, তাহা সে স্মরণ করিতে পারিল না ; তবে চেতনাসঞ্চারের পর সে বুঝিতে পারিল, তাহার হাত-পা শৃঙ্খলিত করা হইয়াছে, তাহার গলায় পর্য্যন্ত লোহার কলার আঁটিয়া তাহাও শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়াছে। ক্লোরোফর্ম্মের প্রভাব অতিক্রম করিতে তাহার যথেষ্ট সময় লাগিয়াছে। সে তখনও মস্তকে অসহ্য যন্ত্রণা অনুভব করিতেছিল, এবং অসমান পথে গাড়ী চলিতে থাকায় তাহা ক্রমাগত যে ভাবে আন্দোলিত হইতেছিল, তাহার ফলে তাহার মাথা গাড়ীর দরজার প্রান্তভাগে পুনঃ পুনঃ ঠুকিতে থাকায় তাহার মস্তকের যন্ত্রণা বর্দ্ধিত হইয়াছিল ; কিন্তু মাথা বাঁচাইবার জন্য তাহার দূরে সরিয়া বসিবার উপায় ছিল না। তাহার অবস্থা তখন হাঁড়িকাঠে আবদ্ধ বলির পাঁঠার অবস্থার অনুরূপ! সেই অবস্থায় গাড়ীর আসনের উপর কাত হইয়া পড়িয়া থাকিয়া পথিকদের সাহায্য-প্রার্থনার জন্য তাহার চীৎকার করিবার ইচ্ছা হইল, কিন্তু সেরূপ করিলে তাহার নির্য্যাতনের মাত্রা বর্দ্ধিত হইতে পারে—এই আশঙ্কায় সে নীরব থাকাই বাঞ্ছনীয় মনে করিল।

প্যারাডাইন বিভিন্ন ডিটেক্‌টিভ-উপন্যাস পাঠ করিয়া সরকারী ডিটেক্‌টিভদের কার্য্য-প্রণালী সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিল, সেই অভিজ্ঞতা হইতে তাহার ধারণা হইয়াছিল, স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের ডিটেক্‌টিভরা যদি কোন সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে জেরা করিবার জন্য তাহাকে সঙ্গে লইয়া অদূরবর্ত্তী কোন থানায় যাওয়া আবশ্যক মনে করিত, তাহা হইলে তাহাকে গাড়ীর ভিতর পুরিয়া পথিমধ্যে ক্লোরোফর্ম্ম প্রয়োগে অচেতন করিত না, এবং তাহার হাত-পা শৃঙ্খলিত করিয়াও তাহার উত্থানশক্তি রহিত করিত না। সুতরাং তাহার ধারণা হইল, স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের ডিটেক্‌টিভ বলিয়া নিজের পরিচয় দিয়া যে ব্যক্তি তাহাকে গাড়ীতে পুরিয়া লাঞ্ছিত করিয়াছে, সে সত্যই ডিটেক্‌টিভ নহে এবং তাহাকে থানায় লইয়া যাইবার প্রস্তাবও ধাপ্পাবাজি। তাহার কোন শত্রু তাহার সর্ব্বনাশের জন্য এই চাল চালিয়াছে। তাহার মনে পাপ ছিল বলিয়াই সে তাহার ধাপ্পায় ভুলিয়াছে, বুদ্ধির দোষে নিজের সর্ব্বনাশের পথ প্রশস্ত করিয়াছে। সে যে ফাঁদে পড়িয়াছে, তাহা হইতে উদ্ধার-লাভের উপায় কি, তাহা সে ভাবিয়া স্থির করিতে পারিল না। কে কি উদ্দেশ্যে তাহাকে এইভাবে প্রতারিত ও বিপন্ন করিয়াছে, তাহা সে বুঝিতে না পারিলেও টেরিই যে তাহার এই দুর্গতির মূল, এ বিষয়ে তাহার সন্দেহ রহিল না।

প্যারাডাইন ভাবিল, টেরি তাহাকে উইনগেট্‌সএ দেখিয়াছিল। হত্যাকাণ্ডের তদন্তের ফলে যদি সত্য প্রকাশিত হইয়া পড়ে, তাহা হইলে টেরির অবস্থা কিরূপ সঙ্কটপূর্ণ হইবে, তাহাও সে বুঝিতে পারিয়াছিল। টেরি যদি রিপোর্টখানি হস্তগত করিবার জন্য মিঃ গার্ভিনকে হত্যা করিয়া থাকে, তাহা হইলে যে রাত্রিতে মিঃ গার্ভিন নিহত হইয়াছিলেন, সে রাত্রিতে যে ব্যক্তি তাহাকে উইনগেট্‌সে উপস্থিত থাকিতে দেখিয়াছিল, সে পুলিসের নিকট বা আদালতে সে কথা প্রকাশ করিতে না পারে, ইহারই ব্যবস্থা করা প্রথম কর্ত্তব্য বলিয়া তাহার ধারণা হওয়াই স্বাভাবিক। তদ্ভিন্ন, যদি এ কথা প্রকাশ হইয়া পড়ে যে, রিপোর্টখানি হস্তগত করিবার জন্য সে প্যারাডাইনকে উৎকোচদানে বশীভূত করিবার চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু তাহার চেষ্টা সফল হয় নাই; তাহার পরই মিঃ গার্ভিনের হত্যাকাণ্ড, এবং রিপোর্টখানি অপহৃত হইবার কোন প্রমাণ না থাকিলেও আরানা স্বর্ণখনির সেয়ারের আকস্মিক মূল্যবৃদ্ধি; তাহা হইলে পুলিসের তদন্তকালেও এই সকল প্রমাণে টেরির বিপন্ন হইবার আশঙ্কা ছিল। এ অবস্থায় টেরি যদি তাহাকে লোকচক্ষুর অন্তরালে সরাইয়া দিতে পারে, তাহা হইলে তাহার বিপদের আশঙ্কা দূর হইবে, ইহা বুঝিতে পারিয়া টেরি তাহাকে কৌশলে ফাঁদে ফেলিয়াছে বলিয়াই প্যারাডাইনের ধারণা হইল।

কিন্তু প্যারাডাইনের এই অনুমানই যদি সত্য হয়, তাহা হইলে টেরি মিঃ গার্ভিনের হত্যাকাণ্ডের তিন দিন পরে হঠাৎ তাহাকে এ ভাবে ফাঁদে ফেলিবার চেষ্টা করিল কেন? হত্যাকাণ্ডের পরদিনই ত সে এই পন্থা অবলম্বন করিতে পারিত। প্যারাডাইন সেই দিনের সকল ঘটনার কথা মনে মনে আলোচনা করিতে লাগিল। সে দিন সে যথানিয়মে আফিসে উপস্থিত হইয়াছিল। আফিসে তাহার যে সকল কায ছিল, তাহা সে শেষ করিয়াছিল; কিন্তু প্রতি মুহূর্ত্তেই তাহার আশঙ্কা হইতেছিল, তাহার মনিব মিঃ নিস্‌বেট হয় ত তাহাকে তাঁহার সহিত সাক্ষাতের জন্য আদেশ করিবেন, তাহাকে ডাকিয়া পাঠাইবেন, আরানা রিপোর্ট সম্বন্ধে তাহাকে প্রশ্ন করিবেন, অথবা সে তাহার মহাজনের নিকট কি জন্য কত টাকা ধার করিয়াছিল, এবং সে সেই ঋণ পরিশোধের কি ব্যবস্থা করিয়াছিল, তাহা হয় ত জানিতে চাহিবেন; কিন্তু আফিসে সেরূপ কোন কাণ্ডই ঘটে নাই। বেলা সাড়ে পাঁচটা পর্য্যন্ত সে আফিসে ছিল, এবং সারাদিন নির্ব্বিঘ্নেই কাটিয়াছিল। অফিসের ছুটীর পর সে টেলিফোনে মিঃ গ্রীডের নিকট তাঁহার সহিত সাক্ষাতের অনুমতি গ্রহণ করিয়া লিঙ্কন্‌স ইন্ ফীল্ডে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিল।

প্যারাডাইন ভাবিল, সেই সময় তাহার অজ্ঞাতসারে কি কোনও সন্দেহজনক ব্যাপার ঘটিয়াছিল? সে যখন মিঃ গ্রীডকে টেলিফোনে কথা বলিতেছিল, সেই সময় সম্ভবতঃ কেহ তাহার সে সকল কথা শুনিতে পাইয়াছিল, তাহার পর লিঙ্কন্‌স ইন্ ফীল্ড পর্য্যন্ত তাহার অনুসরণ করিয়াছিল। তাহাকে সলিসিটারের অফিসে প্রবেশ করিতে দেখিয়া টেরি বা তাহার দলের কোন লোক বুঝিতে পারিয়াছিল, সে তাহার সলিসিটারের নিকট কোন্ বিষয় সম্বন্ধে উপদেশ গ্রহণ করিবে, সলিসিটার তাহাকে যে উপদেশ দান করিবেন, তাহার ফলে টেরি বিপন্ন হইতে পারে—এই আশঙ্কায় টেরি তাহার সম্বন্ধে কি করা উচিত, তাহা স্থির করিয়াছিল।

অতঃপর প্যারাডাইন বুইনোঁ রেস্তরাঁয় উপস্থিত হইলে টেরি বা তাহার কোন অনুচর সেখানে তাহার অনুসরণ করিয়াছিল এবং তাহাকে কার্য্যক্ষেত্র হইতে অপসারিত করিবার জন্য যাহাকে নিযুক্ত করিয়াছিল, সে স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের ডিটেকটিভের ভূমিকা গ্রহণ করিয়া তাহাকে থানায় লইয়া যাইবে বলিয়া ধাপ্পা দিয়া রেস্তরাঁর বাহিরে আনিয়া গাড়ীতে তুলিয়াছিল। এখন সে সেই গাড়ীতে বন্দী, সম্পূর্ণ অসহায়, এবং শৃঙ্খলিত। এই সঙ্কট হইতে তাহার উদ্ধারলাভের কোন সম্ভাবনা নাই। নৈশ অন্ধকারে গাড়ী তাহাকে লইয়া কোথায় ছুটিয়া চলিয়াছে—তাহা অনুমান করাও তাহার অসাধ্য। যে নরপিশাচ এইভাবে তাহাকে মুঠায় পুরিয়াছে, সে আরানা স্বর্ণ-ক্ষেত্রের রিপোর্ট হস্তগত করিবার জন্য মিঃ গার্ভিনকে অসঙ্কোচে হত্যা করিয়াছে। সেই রিপোর্টের সাহায্যে সে বিপুল অর্থ-সঞ্চয়ের উপায় উদ্ভাবন করিয়াছে। আরানা স্বর্ণক্ষেত্রের সেয়ারের মূল্য পূর্ব্বমূল্য অপেক্ষা ছয়গুণ বর্দ্ধিত হইয়াছে; টেরিই তাহার ফলভাগী হইবে। কিন্তু এই গুপ্তরহস্য কেবল প্যারাডাইনেরই সুবিদিত। সে যাহাতে এ সম্বন্ধে কোন কথা কাহারও নিকট প্রকাশ করিতে না পারে, টেরি এবং তাহার দলভুক্ত

চক্রান্তকারীদের ষড়্যন্ত্র সম্বন্ধে কোন কথা কাহাকেও বলিতে না পারে, এই উদ্দেশ্যে তাহারা তাহাকে কৌশলে বন্দী করিয়াছে। তাহারা আত্মরক্ষার জন্য তাহার কণ্ঠরোধ করিবে, সুতরাং জীবন থাকিতে সে মুক্তিলাভ করিবে, তাহার সম্ভাবনা কোথায়? তাহাকে হত্যা করাই তাহাদের সঙ্কল্প, এ বিষয়ে তাহার সন্দেহ রহিল না।

সহসা কাহারও কণ্ঠস্বর শুনিয়া প্যারাডাইনের চিন্তা-স্রোত অবরুদ্ধ হইল, তাহার মাথার উপর হইতে কে গম্ভীর স্বরে বলিল, "হাতের কায তাড়াতাড়ি শেষ কর। আরও এক জনের চিকিৎসার প্রয়োজন। আমাদিগকে ফিরিয়া গিয়া তাহাকেও সংগ্রহ করিতে হইবে! আজ রাত্রিতে আমাদের বিস্তর কায, বিশ্রামের আশা নাই।"

লোকটা ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া বলিল, "মোড় ঘুরিয়া বাঁ ধারে যাইলেই আমাদের আড্ডা।"

আর এক জন বলিল, "কেহ আমাদের অনুসরণ করিতেছে না কি?"

উত্তর হইল, "চুলোয় যাক অনুসরণ! কে আমাদের অনুসরণ করিবে, বল ত শুনি?"

দ্বিতীয় ব্যক্তি বলিল, "তোমারই তাহা ভাল জানা থাকিতে পারে। তুমি যে কায আরম্ভ করিয়াছ, তোমাকেই তাহা শেষ করিতে হইবে। শত্রুর শেষ রাখিতে নাই।"

প্রথম ব্যক্তি হাসিয়া বলিল, "সকল কথা জানিলে ত অন্যে শত্রুতা করিবে; আর কেহ কিছু জানে না। গুপ্ত কথা প্রকাশের ভয় নাই।"

প্যারাডাইনের উদ্ধস্থিত আসনের পশ্চাদ্ভাগ হইতে খস্ খস্ শব্দ হইল। গাড়ীর পশ্চাতে যে ক্ষুদ্র গবাক্ষ ছিল, সেই গবাক্ষের ভিতর দিয়া এক জন লোকের মাথা ও দুই কাঁধ ঝুঁকিয়া পড়িতে দেখিয়া প্যারাডাইন তাড়াতাড়ি চক্ষু মুদিয়া ধ্যানস্থ হইল।

মুহূর্ত্ত পরে সে শুনিতে পাইল, "সব ঠিক আছে, কেহই কোন দিকে নাই।"

গাড়ীখান হঠাৎ দুলিয়া উঠিয়া বাঁ দিকে ঘুরিল। অসমান কঠিন ভূমির উপর দিয়া চলিতে গাড়ীর চাকার টায়ারের ধপ্ ধপ্ শব্দ হইল। তাহার পরই গাড়ী থামিয়া গেল। তৎক্ষণাৎ প্যারাডাইন একসঙ্গে দুইটি দ্বার খুলিবার শব্দ শুনিতে পাইল; কাহারও পদশব্দও তাহার কর্ণগোচর হইল।

প্যারাডাইনের দুর্ব্বল হৃদয় আতঙ্কে পূর্ণ হইল। বিপদের সহিত সংগ্রামে সে অভ্যস্ত ছিল না; বিপদের পর বিপদের আক্রমণে সে অবসন্ন, অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিল। তাহার ধারণা হইল, আর সে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারিবে না তাহার নিরুদ্দেশ যাত্রার অবসান হইয়াছে; এবার তাহার জীবনযাত্রারও অবসান হইবে। তাহার ভীতিবিহ্বল বক্ষঃ ভেদ করিয়া একটা হতাশ আর্ত্তনাদ শুষ্ক কণ্ঠ অতিক্রম করিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু সে দাঁতে দাঁত চাপিয়া তাহা ওষ্ঠের বাহিরে নিঃসারিত হইতে দিল না। তাহার মস্তকের পশ্চাদ্ভাগে শকট-দ্বার উদ্ঘাটিত হইলে সুশীতল নৈশ সমীরণ-প্রবাহ তাহার বেদনা-ক্লিষ্ট, ব্যথিত ললাটে যেন স্নেহাঞ্চল বুলাইয়া দিল। প্যারাডাইন অর্দ্ধ-নিমীলিতনেত্রে দেখিল, যে ব্যক্তি স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের ডিটেকটিভ পরিচয়ে তাহাকে ধাপ্পা দিয়া গাড়ীতে তুলিয়াছিল, সে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাহার মুখভাব লক্ষ্য করিতেছিল।

সে মৃদুস্বরে বলিল, "না, ক্লোরোফর্মের পাক্কা এখনও সামলাইয়া উঠিতে পারে নাই; স্বাভাবিক জ্ঞান ফিরিয়া আসিতে আরও কিছু বিলম্ব হইবে। ভালই হইয়াছে, প্রাণরক্ষার চেষ্টায় আর উহাকে ব্যাকুলভাবে ধস্তাধস্তি করিতে হইবে না। উহার গলার কলারের শিকল খুলিয়া দাও।"

এক জন লোক প্যারাডাইনের দুই হাত ধরিয়া তাহাকে গাড়ী হইতে টানিয়া নামাইয়া লইল। তাহার শৃঙ্খলিত পদদ্বয় অসাড়ভাবে মাটীতে লুটাইতে লাগিল। সে তখন চেতনা লাভ করিলেও মূর্চ্ছিতের ভাণ করিবে কি না, তাহাই ভাবিতে লাগিল। তাহার মনে হইল, যদি তাহার আততায়ীরা বুঝিতে পারে—তাহার মূর্চ্ছাভঙ্গ হয় নাই, তাহা হইলে তাহারা তাহার হস্ত-পদের বন্ধন মোচন করিতেও পারে। যদি বন্ধনশৃঙ্খল অপসারিত হয়, তাহা হইলে সে আত্মরক্ষার জন্য শেষ চেষ্টা করিবে। এইরূপ চিন্তা করিয়া প্যারাডাইন মূর্চ্ছিতের ন্যায় পড়িয়া রহিল।

জাল ডিটেক্টিভের সঙ্গী বলিল, "উহার হাত-পায়ের শিকল খুলিয়া দিব কি?"

জাল ডিটেক্টিভ বলিল, "তাহাতে আমাদের কি সুবিধা হইবে?"

উত্তর হইল, "সুবিধা? একটু সুবিধা আছে বৈ কি।

পুলিস যদি ঐ অবস্থায় উহার মৃতদেহ আবিষ্কার করে, তাহা হইলে তাহারা আত্মহত্যা বলিয়া মনে করিবে না; সুতরাং তাহারা হত্যাকারীর সন্ধানের জন্য তদন্ত আরম্ভ করিতে পারে। তাহাদিগকে সেরূপ সুযোগদানের প্রয়োজন কি? বিশেষতঃ, ঐ শিকল-জোড়াটা ওভাবে নষ্ট করিলে চলিবে না, আমাদের কায এখনও শেষ হয় নাই, অবিলম্বেই উহার প্রয়োজন হইবে।"

জাল ডিটেক্‌টিভ তাহার সহযোগীর প্রস্তাব সঙ্গত মনে করিয়া বলিল, "বেশ, তাহাই হউক। শিকল-জোড়াটা খুলিয়া লইয়া উহার হাত পা ঐ ভাবে দড়ি দিয়া বাঁধিয়া রাখ, তাহা হইলে জলে পড়িয়া ভাসিয়া উঠিবার চেষ্টা করিতে পারিবে না, ডুবিয়া মরিবে।"

দ্বিতীয় ব্যক্তি বলিল, "হাতে পায়ে দড়ি বাঁধা অবস্থায় উহার মৃতদেহ আবিষ্কৃত হইলে আত্মহত্যা বলিয়া কাহারও সন্দেহ হইবে না!"

জাল ডিটেক্‌টিভ হাসিয়া বলিল, "তুমি যে ভয়েই মরিলে, জলের ভিতর পড়িয়া থাকিলে দড়ি পচিয়া গিয়া উহার হাত-পা হইতে খসিয়া যাইবে, তখন আর কে কাহাকে সন্দেহ করিবে? আর তর্ক করিও না। শিকল খুলিয়া লও।"

প্যারাডাইনের হস্তপদ রজ্জুবদ্ধ করিয়া তাহারা শিকল-জোড়াটা তাহার হাত-পা হইতে খুলিয়া লইল।

[ক্রমশঃ।

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়।

অভিসার

আজি শুধু মনে পড়ে সে সুদূর অতীতের কথা,
শুধু সেই নীপ-কুঞ্জ, দুটি আঁখি, বুক-ভরা ব্যথা,
একখানি বাঁশীর মূর্চ্ছনা,
যমুনার বিজন পুলিনে একখানি হৃদয়-অর্চ্চনা।
লতা-কুঞ্জে তরুর মর্ম্মরে
সচকিত দুটি আঁখি চারি দিকে খুঁজিত কাহারে
বংশী হতে খসিত অধর
পূর্ণিমার রাত্রি-খানি কেমনে কাঁপিত নিরন্তর
থর-থর
তারি ছায়া ভাসে আঁখি'পর।
মনে পড়ে, সন্তর্পণে দু'খানি চরণ
বিজন বিপিন-মাঝে কেমনে করিত বিচরণ
অতি ধীরে, অতি সন্তর্পণে,
নিধুবনে;
কোকিল-কূজিত তরুতলে
যমুনার লহরের অশ্রান্ত কল্লোলে
প্রেমভরে টলে;
গগনে নেমেছে আঁধিয়ার
যমুনার
ঘিরে দুই তরু-শ্যাম পার।

গরজিছে মেঘ গুরু-গুরু
বর্ষণের পূর্ব্বরাগ করিয়াছে সুরু
সুবিপুল আড়ম্বর করি,
বিদ্যুতের জয়ধ্বজা সগৌরবে ঊর্দ্ধে তুলে ধরি।
গগনের ঘনঘটা হেরি,
কাঁপে থরথরে,
পুলকেতে বক্ষ রাধিকার।
সময় করিতে অভিসার
উপনীত তাহার দুয়ার
পূর্ণ করিয়াছে বিধি দিবসের প্রার্থনা তাহার
তাড়াতাড়ি তাই
সুনীল বসনে যারা তনু ঢাকিয়াই
ললাটে সিন্দুর-বিন্দু সুলিখিত করি'
নীরবে নিঃশব্দে চলে বনপথ ধরি।
নীপতরু-মূলে
নবীন নীরদবামে যমুনার কূলে
অবনতা যৌবনের ভারে
বিদ্যুৎলতিকা এক মেলে আসি ধীরে
ত্রস্তপদ, ত্রস্তবেশ, মুক্তকেশ দক্ষিণ সমীরে।

শ্রীবিমলকান্তি সমাদ্দার।

হুগলী জেলার ইতিহাস

[পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর

হুগলী ও মহারাজ নন্দকুমার

মহারাজ নন্দকুমার অনুমান ১৭০৫ খৃষ্টাব্দে বর্ত্তমান বীরভূম জেলার ভদ্রপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করে। ভদ্রপুর ব্রাহ্মণী নদীর তীরে অবস্থিত। ব্রাহ্মণী নদী বর্ত্তমান সময়ে লোপ পাইয়াছে। নন্দকুমারের পিতার নাম পদ্মনাভ, রাঢ়ী শ্রেণীর কশ্যপ গোত্র। তাঁহার পিতামহের আদি নিবাস জকুল গ্রামে। পিতামহের বিবাহের পর তাঁহারা ভদ্রপুর আসিয়া বাস করেন। বাল্যকাল হইতেই তিনি বুদ্ধিমান, সাহসী ও উদ্যোগী ছিলেন। তিনি বাঙ্গালা, সংস্কৃত ও তদানীন্তন পারস্য ভাষায় ব্যুৎপন্ন ছিলেন। তাঁহার পত্নীর নাম ক্ষেমঙ্করী। নন্দকুমার বিবাহের পূর্ব্বেই পিতার সহিত থাকিয়া বিষয়কার্য্য শিক্ষা করেন। বিবাহের পর পুনরায় পিতার অধীনে থাকিয়া ফতে সিং, ঘোড়াঘাট ও আন্তপাইকা পরগণার নায়েব হন।

নন্দকুমার যখন দূরদেশে ছিলেন, তখন বৃদ্ধ জগৎশেঠ ফতেচাঁদ, রায় রাঁইয়া আলমচাঁদ ও আলীবর্দ্দীর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সরফরাজের প্রধান মন্ত্রী হাজী মহম্মদ, আলীবর্দ্দীকে বাঙ্গালার নবাব করিবার জন্য সরফরাজের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করিতেছিলেন এবং গিরিয়ার যুদ্ধে ঐ চক্রান্ত সফল হইল—নবাব সরফরাজ ঐ যুদ্ধে নিহত হইলেন। উমিচাঁদ ও দীপচাঁদও এই ষড়যন্ত্রে ছিল। এই সময় নন্দকুমারের বয়স ৩৭ বৎসর। বিপ্লব শেষ হইলে নবাব আলীবর্দ্দী নন্দকুমারকে হিজলী মহিষাদলের রাজস্ব আদায়ের ভার দিলেন, ঐ সময় হিজলী প্রভৃতি স্থানে বর্গীর আক্রমণ হয়। রাজস্ব আদায় দুষ্কর হইয়া পড়িল অথচ নবাবের টাকা চাই। ৮০ হাজার টাকা বাকী পড়িল। চিন্ময় রায় নামে জনৈক বাঙ্গালা নন্দকুমারকে টাকা অনাদায় জন্য কর্ম্মচ্যুত করিয়া কারাগারে

নন্দকুমারের বংশ-তালিকা

- রামগোপাল (১)
  - হরিকৃষ্ণ রায়
    - পদ্মনাভ (১ম পত্নীর পুত্র)
      - বিষ্ণুপ্রিয়া
      - কৃষ্ণপ্রিয়া
      - মহারাজ নন্দকুমার
        - রাজা গুরুদাস গৌড়পতি, পত্নী জগদম্বা, রাজা কৃষ্ণচন্দ্রদুহিতা
        - শ্যামমণি, স্বামী জগৎচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
          - রাজা মহানন্দ
            - রাজা বিনয়কৃষ্ণ
              - কুমার কৃষ্ণচন্দ্র
                - দুর্গানাথ
                  - শ্রীদেবেন্দ্রনাথ
            - জয়কৃষ্ণ
            - রামকৃষ্ণ
        - আনন্দময়ী
          - রতনমণি
        - কিনুমণি, স্বামী রাধাচরণ
          - রাজারাম বন্দ্যোপাধ্যায় (২) (সয়াবাদনিবাসী)
      - রাধাকৃষ্ণ
      - নবকৃষ্ণ
      - কেবলকৃষ্ণ
  - চণ্ডীচরণ রায়
    - রঘুনাথ রায় (২ পত্নীর পুত্র)
      - শম্ভু
      - নৃসিংহ

(১) রামগোপালের আরও দুই জ্যেষ্ঠ সহোদর ছিলেন। মথুর মজুমদার ইঁহার শ্বশুরের নাম। তিনিও কশ্যপ গোত্র ছিলেন। পদ্মনাভের পিতা রামগোপাল মাতৃপ্রতিশ্রুতি পালনের জন্য সগোত্রে বিবাহ করেন।

(২) হেয়ার স্কুলের প্রধান শিক্ষক ৺কৃষ্ণচন্দ্র রায় ইঁহার প্রপৌত্র ছিলেন। কলিকাতা আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটে থাকিতেন।

পাঠাইলেন। নন্দকুমারের পিতা এই টাকা দিয়া তাঁহাকে মুক্ত করেন। নন্দকুমার অনন্য-উপায় হইয়া হোসেনকুলী খাঁর নিকট কর্ম্ম-প্রার্থী হইলেন। কিন্তু তাহাতে চিন্ময় রায় বাধা দিলেন। বিফল-মনোরথ হইয়া সেনাপতি মুস্তফা খাঁর নিকট যাতায়াত আরম্ভ করিলেন। কারণ, সেনাপতির উপর চিন্ময় রায়ের কোন আধিপত্য ছিল না। এই সময় মুস্তফার সহিত আলীবর্দ্দীর মনোমালিন্য চলিতেছিল। কারণ, আলীবর্দ্দী মুস্তফাকে প্রতিশ্রুতি দেন যে, তিনি নবাব হইলে, মুস্তফাকে বিহারের শাসনকর্ত্তা করিবেন। আলীবর্দ্দী ঐ প্রতিশ্রুতি পালন করেন নাই। মুস্তফা সৈন্যদিগের বেতন চাহিয়া পাঠাইলেন। নবাব হুকুম দিলেন, জমিদারির রাজস্ব আদায় করিয়া লইতে। জমিদারগণ নন্দকুমারের আশ্রয় লইলেন এবং তিনি তাঁহাদের জামিন হইলেন। এই উদারতাই তাঁহার কালস্বরূপ হইল। টাকা আদায় না হওয়াতে মুস্তফা নন্দকুমারকে বন্দী করিয়া চিন্ময় রায়ের নিকট পাঠাইতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। নন্দকুমার কোন উপায় না দেখিয়া কলিকাতায় চলিয়া গেলেন। ইহাই তাঁহার প্রথম কলিকাতা আগমন।

১৭৪৬ খৃষ্টাব্দে মুস্তফা সমরক্ষেত্রে নিহত হন এবং চিন্ময়েরও ঐ সময় মৃত্যু হয়। নন্দকুমার পুনরায় মুর্শিদাবাদে আসিলেন। অনুমান ১৭৪৮ খৃষ্টাব্দে তিনি হুগলীতে আসেন। নবাব গুণগ্রাহী ছিলেন, মুর্শিদাবাদ অবস্থানকালে তিনি আলীবর্দ্দীর সুনজরে পড়িয়াছিলেন। নবাব তাঁহাকে হুগলীর দেওয়ানী পদ দিলেন। হেদায়েৎ আলি তখন হুগলীর ফৌজদার নন্দকুমারের সহিত তাঁহার সদ্ভাব ছিল না। এই সময় চারিদিকে যুদ্ধ; নবাবের কাছে সকল সংবাদ পৌঁছিত না। নন্দকুমার হেদায়েতের হাত এড়াইতে না পারিয়া পুনরায় মুর্শিদাবাদ ফিরিয়া গেলেন। এই সময় লহরীমল হুগলীর দেওয়ান হইলেন। লহরীমলের পদচ্যুতির পর মুন্সী সাদকউল্লার বিশেষ সহায়তায় হুগলীর ফৌজদার মহম্মদ ইয়ারবেগের সময় নন্দকুমার পুনরায় হুগলীর দেওয়ানী পদ পাইলেন। এই সময়েই তিনি "দেওয়ান নন্দকুমার" নামে অভিহিত হইলেন। তখন হুগলীর ফৌজদারের হস্তে হুগলী, ২৪ পরগণা প্রভৃতি প্রদেশ ছিল। ফৌজদারের পরেই দেওয়ানের পদ। ফৌজদারকে সর্ব্বদা বৈদেশিক বণিকদিগের কার্য্যকলাপ ও পণ্যদ্রব্যের উপর শুল্ক সংগ্রহ ও পরস্পরের বিবাদ হইতে নিবৃত্ত করিতে হইত। বৈদেশিক বণিকরা ফৌজদার ও দেওয়ানকে অর্থ দিয়া বিনা শুল্কে অনেক সময় ব্যবসা চালাইত (৩)। এই সময় বৃদ্ধ আলীবর্দ্দী সিরাজকে উত্তরাধিকারী স্থির করেন। সিরাজ কিছুদিন হুগলীতে থাকিয়া মুর্শিদাবাদ ফিরিয়া যান।

কয়েক বৎসর পরে ইয়ারবেগ হুগলীর ফৌজদারী পদ ত্যাগ করিয়া নন্দকুমারকে সঙ্গে লইয়া মুর্শিদাবাদে হিসাব বুঝাইয়া দিতে গেলেন। নন্দকুমারেরও দেওয়ানী পদ চলিয়া গেল। কারণ, ফৌজদারই দেওয়ান নিযুক্ত করিতেন। এই সময় ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দের ৯ই এপ্রিল আলীবর্দ্দীর মৃত্যু হয়। মৃত্যুসময়ে তিনি সিরাজকে ইংরেজ হইতে সাবধান হইতে বলেন (৪)।

(৩) ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ফৌজদারকে বার্ষিক ২৭হাজার টাকা দিতেন।' Long's selection p. 8.

(৪) Parker's Evidence p. 34.

সিরাজের সিংহাসন আরোহণের পূর্ব্বেই তাঁহার বিরুদ্ধে চক্রান্ত আরম্ভ হয়। অনেকে বলেন, রাজা রাজবল্লভ ইংরেজের সহিত মিলিত হইয়া সিরাজের মাতৃস্বসা ঘসিটী বেগমের নামে বঙ্গদেশ শাসন করিতে সঙ্কল্প করেন। রাজা রাজবল্লভ নিজ পুত্র কৃষ্ণদাসকে বহু ধনরত্ন দিয়া কলিকাতায় পাঠাইলেন। কৃষ্ণদাস নবাবের ভয়ে পুরী তীর্থ যাইবার ভাণ করিয়া কলিকাতায় ইংরেজের আশ্রয় লইলেন। সিরাজ সিংহাসন আরোহণের ১৫ দিন পরেই ইংরেজকে জানাইলেন যে, তাঁহারা যেন কলিকাতার দুর্গ ভাঙ্গিয়া ফেলেন এবং কৃষ্ণদাসকে মুর্শিদাবাদে ফেরত পাঠান। এই কৃষ্ণদাসই ক্ষুদ্র অগ্নিস্ফুলিঙ্গ, পরে ভীষণ দাবানলে পরিণত করাইয়া মুসলমান রাজ্যের পতনসাধন করান। ড্রেক সাহেব কৃষ্ণদাসের কথা চাপিয়া নবাবকে জানাইলেন, তাঁহারা নগরের চারিদিকে প্রাচীর বেষ্টিত করেন নাই। সিরাজ ক্রুদ্ধ হইয়া কলিকাতা আক্রমণ করিলেন। ইংরেজ পরাজিত হইয়া শিবপুর, ফলতা প্রভৃতি স্থানে আশ্রয় লইলেন। অবশিষ্ট বন্দী হইলেন। সিরাজ কৃষ্ণদাসকে সম্মানের সহিত গ্রহণ করিলেন। সিরাজের এ মহত্ত্ব অস্বীকার করা যায় না।

নবাব কলিকাতা অধিকার করিয়া বর্দ্ধমানের দেওয়ান মাণিকচাঁদকে (৫) কলিকাতার ভার দিয়া মুর্শিদাবাদ ফিরিয়া গেলেন। এই সময় হুগলীর ফৌজদার মহম্মদ আলি। নবাব কিন্তু তাঁহার অকর্ম্মণ্যতা দেখিয়া সেখ উমরউল্লাকে হুগলীর ফৌজদার এবং নন্দকুমারকে দেওয়ান নিযুক্ত করিলেন। নন্দকুমার যখন হুগলীতে আসেন, তখন ইংরেজ বণিক ফলতায় থাকিয়া মাদ্রাজ হইতে সাহায্যের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। নবাব ভাবিয়াছিলেন, ইংরেজ আর কিছু করিবে না, সে জন্য ফলতা হইতে উহাদের তাড়াইয়া দেন নাই। এই সামান্য ভুলের জন্য বাঙ্গালা ইংরেজের হইয়াছিল। সিরাজ মাণিকচাঁদ ও নন্দকুমারের উপর কলিকাতার ভার দিয়া কিছুদিন নিশ্চিন্ত ছিলেন। এই সময় পূর্ণিয়ার নবাব সকতজঙ্গকে দমন করিতে নবাব ব্যস্ত ছিলেন।

নন্দকুমার হুগলীর ফৌজদার হইয়াই হুগলীর প্রবেশপথ রক্ষা করিতে আয়োজন করিতে লাগিলেন। বজবজ দুর্গের সংস্কার করিলেন এবং ইংরেজের আগমন রোধ করিবার জন্য কলিকাতার দক্ষিণ আলিগড়ে নূতন কেল্লা স্থাপন করিলেন এবং ইহার অপর পারে থানা (৬) দুর্গ মেরামত করিলেন। এই দুই দুর্গের মধ্যে গঙ্গা নদী অপ্রশস্ত ও অগভীর ছিল। তিনি ঐ স্থানে ইষ্টকপূর্ণ জাহাজ জলমধ্যে ডুবাইয়া রাখিবার জন্য দুইখানি জাহাজ ক্রয় করিলেন। ঐ স্থান বুজিয়া গেলে ইংরেজের জাহাজ হুগলী আসিতে পারিবে না। অপর দিকে বিশ্বাসঘাতক মাণিকচাঁদ ইংরেজের সহিত মিলিত হইয়া ফলতায় হাট বসাইলেন—যাহাতে ইংরেজের খাদ্যাভাব না হয়। এই সময়েই ক্লাইব মাদ্রাজ হইতে সৈন্যসহ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মাণিকচাঁদ লোকলজ্জার খাতিরে সৈন্য লইয়া বজবজ আসিলেন; সামান্য যুদ্ধও হইল। শেষ মাণিকচাঁদ বজবজ রক্ষা না করিয়া কলিকাতায় পলাইয়া আসিলেন এবং হুগলী হইয়া মুর্শিদাবাদে গিয়া শ্রান্তিদূর করিলেন। মাণিকচাঁদের অভাবনীয় পলায়ন, নন্দকুমারের চিন্তার অতীত—ঐ

(৫) মাণিকচাঁদ বর্দ্ধমানের রাজা তিলকচাঁদের আত্মীয়।

(৬) বর্ত্তমান শিবপুর বোটানিকেল গার্ডেন।

ইষ্টকপূর্ণ জাহাজ আর গঙ্গায় ডুবাইবার সময় পাইলেন না। ইংরেজ অবাধে সৈন্য লইয়া কলিকাতায় আসিলেন। নায়কবিহীন সৈন্যগণ কিছুক্ষণ যুদ্ধ করিয়া পলাইল—ক্লাইব কলিকাতা দখল করিলেন।

সিরাজ মাণিকচাঁদের কাছে কলিকাতা দখলের কথা শুনিয়া নন্দকুমারকে তিন হাজার সৈন্য হুগলীর রক্ষার জন্য পাঠাইলেন; হুগলীতে নন্দকুমারের দুই হাজার সৈন্য ছিল। তিনি হুগলী সুরক্ষিত করিতে লাগিলেন। মাণিকচাঁদ মুর্শিদাবাদ পৌঁছিয়া ইংরেজের বলবীর্য্য এমন ভাবে বর্ণনা করিলেন—যাহাতে সৈন্যগণ ভীত হইয়া পড়িল এবং ঐ ভীত সৈন্যই নন্দকুমারের কাছে পাঠান হইল। ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দের ৫ই জানুয়ারী ইংরেজ হুগলী আক্রমণে বাহির হইলেন—মেজর কিলপ্যাট্রিক সেনানায়ক হইলেন। তিনি ভাবিয়াছিলেন এক জোয়ারেই হুগলী আসিবেন, কিন্তু একখানি জাহাজ চড়ায় লাগিয়া কয়েক দিন দেরী হইল। ১০ই জানুয়ারী তিনি হুগলী আক্রমণ করিলেন। হুগলীতে একটি মোগল কেল্লা ছিল। ইংরেজ রাত্রি পর্য্যন্ত গোলা বর্ষণ করিয়া একটি স্থান ভাঙ্গিয়া ফেলিল। পরদিন প্রভাতে বড় দরজার দিক দিয়া ইংরেজ ভাল করিয়া আক্রমণ করিল। মোগল সৈন্য ঐ দিক রক্ষার জন্য দৌড়িল, এ দিকে পূর্ব্বোক্ত ভগ্নস্থান দিয়া ইংরেজ সৈন্য প্রবেশ করিল। নবাবের সৈন্যগণ পলাইল। দুর্গজয় করিয়া কাপ্তেন কুট কতকগুলি সৈন্য লইয়া ব্যাণ্ডেল লুঠ করিতে গেলেন। নন্দকুমার এই স্থানে ইংরেজকে ঘেরিয়া ফেলিলেন। শেষ কুট কলিকাতায় পলাইয়া আসিলেন।

নবাব হুগলী আক্রমণ ও গ্রামাদি লুণ্ঠন ও দহনের সংবাদ পাইয়া ইংরেজ দমনের জন্য প্রস্তুত হইলেন। তিনি ১৮ হাজার অশ্বারোহী ও ৬০ হাজার পদাতিক এবং ৫০টা কামান লইয়া কলিকাতার নিকট হালসী বাগানে (৭) উপস্থিত হইলেন। ইংরেজ ইতিপূর্ব্বে জগৎশেঠের নিকট দেড় কোটি টাকা ঋণ গ্রহণ করেন। ইংরেজ শেঠের আশ্রয়ে গেলেন। শেঠ দেখিল, ইংরেজ ধ্বংস হইলে তাঁহাদের টাকা মারা যায়, সে জন্য রণজিৎ রায় নামে এক ব্যক্তিকে নবাবের নিকট ইংরেজের পক্ষ হইয়া সন্ধির প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন। সন্ধি কার্য্যে পরিণত হইল না। ৫ই ফেব্রুয়ারী ক্লাইব হঠাৎ নবাবশিবির আক্রমণ করিলেন। এ যুদ্ধে যদি মীরজাফর, রায়দুর্লভ নবাবের মান রক্ষা করিয়া যুদ্ধ করিতেন, তাহা হইলে পলাশীর অভিনয় হইত না। হতাবশিষ্ট সৈন্য লইয়া ক্লাইব কলিকাতা দুর্গে প্রবেশ করিলেন। উমিচাঁদ (আমিনচাঁদ) ও জগৎ শেঠের কর্ম্মচারী রণজিৎ রায়ের সাহায্যে সন্ধির প্রস্তাব হইল। নবাব দেখিলেন, সেনাপতিদিগের বিশ্বাসঘাতকতা, সুতরাং অগত্যা সন্ধি স্থাপিত হইল।

চন্দননগর ও নন্দকুমার :—এই সন্ধি হইবার পর দুইটি বিশিষ্ট ঘটনা হয়—১ম সংবাদ আসে, আবদুল্লা কান্দাহার হইতে উত্তরভারতে আসিয়াছেন এবং তিনি বাঙ্গালা আক্রমণ করিবেন। ২য় য়ুরোপে ইংরেজ ও ফরাসীতে যুদ্ধ বাধিয়াছে। নবাব সন্ধির কথামত আসন্ন বিপদের জন্য ক্লাইবের নিকট সৈন্য-সাহায্য চাহিলেন। এ সময় বাঙ্গালায় ইংরেজ ও ফরাসীতে কোন যুদ্ধ হয় নাই—সদ্ভাবই ছিল। কিন্তু ক্লাইব মনে করিলেন, যদি ফরাসী নবাবের সাহায্য পায়, তবে ইংরেজকে ধ্বংস করিবে; সুতরাং ফরাসী ধ্বংস করা উচিত। ক্লাইব যেন নবাবকে সাহায্য করিতে যাইতেছেন এই ভাব দেখাইয়া চন্দননগর আক্রমণের উদ্যোগ করিলেন। নবাব নন্দকুমারকে কিছু সৈন্য পাঠাইলেন—ভাবিলেন, ক্লাইব যদি হুগলী আক্রমণ করেন। এ সময় নবাবের ফরাসী-প্রীতি ছিল স্বীকার করিতে হইবে। নন্দকুমারের সৈন্য আসিলে ক্লাইব নবাবকে জানাইলেন, তিনি বুঝি ফরাসীকে সৈন্য সাহায্য পাঠাইলেন।' নবাব জানাইলেন, ফরাসী তাঁহাকে এককড়া কড়িও দেয় নাই—সৈন্য নন্দকুমারের জন্যই পাঠান হইয়াছে; ফরাসী ইংরেজের অভিপ্রায় বুঝিয়াছিল। ফরাসীরা কয়েকখানি অকর্ম্মণ্য জাহাজ গঙ্গায় ডুবাইয়াছিল—যাহাতে ইংরেজের জাহাজ বাধা পায়। কিন্তু অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন হইলে কিছু অসুবিধা থাকে না। Sub-Lt Terranean নামে এক ফরাসী বিশ্বাসঘাতক ওয়াটসন সাহেবের নিকট ঘুষ লইয়া ঐ সংবাদ দেয়। ইংরেজ সতর্ক হইল—যুদ্ধ হইল—ফরাসী পরাজিত হইল। এই যুদ্ধের সময় জনৈক ইংরেজ লেখক বলেন, "নন্দকুমারকে ইংরেজ ১২ হাজার টাকা ঘুষ দিয়াছিল, সেই জন্য নন্দকুমার হুগলীতে নিরপেক্ষ হইয়া বসিয়াছিলেন।" এই অভিযোগ সম্বন্ধে দেশী লেখকগণ নীরব। কিন্তু মুতাক্ষরীণ-লেখক গোলাম হোসেন—যিনি নন্দকুমারের দোষ দেখাইতে শতমুখ, তিনি এ সম্বন্ধে কিছুই লেখেন নাই। নন্দকুমার নবাবকে জানাইয়াছিলেন, "ফরাসীর ইংরেজ আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করা অসম্ভব, পাছে আপনার বিজয়ী সৈন্যের অবমাননা হয়, আমি সেজন্য সৈন্যদিগকে হুগলী আনিয়াছি।" নন্দকুমার ইহাও ভাবিয়াছিলেন, বিশ্বাসঘাতক সেনাপতির অভাব নাই, বিশেষতঃ মাণিকচাঁদ ও অন্যান্য সেনাপতি অনেক দূরে অবস্থান করিতেছে, তাহাদের সাহায্য পাওয়াও অসম্ভব। এ অবস্থায় নিরপেক্ষ থাকাই শ্রেয়ঃ। এ দিকে নবাবের কাছে সংবাদ গেল, নন্দকুমার ইংরেজের নিকট ঘুষ লইয়া ফরাসীকে সাহায্য করে নাই। অথচ নবাবের হুকুমও ছিল না যে, ফরাসীকে সাহায্য কর। নবাব নন্দকুমারকে পদচ্যুত করিলেন। নন্দকুমার সম্বন্ধে ইংলণ্ডের লেখক অর্ম্মি সাহেব বলেন, নন্দকুমার হুগলীর ফৌজদার থাকিলে ইংরেজ মুর্শিদাবাদ পর্য্যন্ত যাইতে পারিতেন না।" পলাশীর যুদ্ধের সঙ্গে নন্দকুমারের কোন সংস্রব ছিল না, সুতরাং সে সম্বন্ধে কিছু বলা অনাবশ্যক।

নন্দকুমার সিরাজ কর্ত্তৃক পদচ্যুত হইয়া কলিকাতায় চলিয়া গেলেন। ইহার পর ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দের ২৩শে জুন পলাশীর যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এ সম্বন্ধে বলিবার কিছু নাই—ঐ যুদ্ধে ইংরেজ বিজয়ী হন—মীরজাফর বাঙ্গালার সিংহাসনে বসেন। নন্দকুমার সিরাজ কর্ত্তৃক পদচ্যুত হইলেও জগৎ শেঠ ভবনে ঘৃণিত ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন নাই, কোন লেখক তাঁহার সম্বন্ধে দোষারোপ করেন নাই—তাঁহার চরিত্রের ঐ একটা গৌরবজনক বিশিষ্টতা। মীরজাফর দেখিলেন, তিনি নবাব হইয়াছেন সত্য, কিন্তু ক্লাইবের হস্তে ক্রীড়নক মাত্র। মন্ত্রী রায়দুর্লভ বিশ্বাসঘাতক। সেইজন্য তিনি মন্ত্রীকে ইহজগৎ হইতে অপসারিত করিতে মনস্থ করিলেন। ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দের বর্ষার অবসানে মীরজাফর পূর্ণিয়ার বিদ্রোহ দমন ও পাটনায় রামনারায়ণের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রার আয়োজন করিতে লাগিলেন এবং রায়দুর্লভকে সঙ্গে যাইবার হুকুম দিলেন। মন্ত্রী অসুস্থতার

(৭) উহা উমিচাঁদের বাগান, বর্ত্তমান সময়ে ঐখানে "পরেশনাথের" জৈন মন্দির আছে।

ভাগ করিলেন। নবাব ভাবিলেন, তিনি যদি মন্ত্রীকে ফেলিয়া যান, কি জানি, ক্লাইবের সহিত যোগ দিয়া তাঁহাকে সিংহাসনচ্যুত করেন, সেই জন্ম তিনি ক্লাইবকে আসিতে অনুরোধ করিলেন। ক্লাইব নন্দকুমারকে সঙ্গে লইয়া মুর্শিদাবাদ আসিলেন—মন্ত্রীর অসুখ সারিয়া গেল। রায়দুর্ল্লভ নন্দকুমারকে বিশেষরূপ চিনিতেন, সে জন্ম তাঁহাকে উকীল নিযুক্ত করিলেন—পাছে মীরজাফর তাঁহার বিরুদ্ধে ক্লাইবকে কিছু বলেন। নন্দকুমার ক্লাইবের সঙ্গেই রহিলেন।

নবাব দুর্ল্লভরাম, ক্লাইব ও নন্দকুমার সৈন্য লইয়া পাটনা যাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে পূর্ণিয়ার বিদ্রোহ দমন করিয়া পাটনায় রামনারায়ণের বিরুদ্ধে চলিলেন। রামনারায়ণও সৈন্য লইয়া অপেক্ষা করিতেছিলেন, কিন্তু তিনি ক্লাইবকে এক পত্র দিলেন যে, তিনি মধ্যস্থ হইয়া বিবাদ মিটাইয়া দিন। নবাব ভাবিয়াছিলেন, রামনারায়ণকে ভয় দেখাইয়া বশীভূত করিবেন। নবাব যুদ্ধ করিতেও ইতস্ততঃ করিতেছিলেন—কি জানি, দুর্ল্লভরাম দ্বিতীয় পলাশীর অভিনয় করে। নবাব রামনারায়ণকে নির্ভয় হইতে বলিলেন, কিন্তু তাঁহাকে পদচ্যুত করিয়া মীরণকে নবাব করিলেন, রামনারায়ণকে দেওয়ান করিলেন। এই ব্যাপারে নন্দকুমার যেরূপ বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহাতে ক্লাইব, রামনারায়ণ, এমন কি, নবাবও তাঁহার অনুরক্ত হইয়াছিলেন। য়ুরোপীয় সমাজে যেমন ক্লাইব 'কর্ণেল ক্লাইব' নামে খ্যাত হন, জনসমাজে নন্দকুমারও সেইরূপ "কালা কর্ণেল" নামে খ্যাত হন।

ক্লাইব কিছু দিন পাটনায় থাকিয়া নন্দকুমারকে সঙ্গে লইয়া মুর্শিদাবাদে চলিয়া আসিলেন। নন্দকুমার ক্লাইবের অনুমোদনে হুগলীর দেওয়ান হইলেন। পলাশীর যুদ্ধের পর ক্লাইব মীরজাফরের নিকট তাঁহার পাওনা টাকা চাহিলে, নবাব তাহা দিতে না পারায়, হুগলী, বর্দ্ধমান ও নদীয়ার রাজস্ব আদায় করিয়া লইতে অনুমতি দিলেন। ক্লাইব ঐ গোলযোগের ভিতর না গিয়া নন্দকুমারের উপর ঐ রাজস্ব আদায়ের ভার দিলেন। ১৭৫৮ খৃঃ ১৯শে আগষ্ট নন্দকুমার ইষ্ট ইণ্ডিয়ান কোম্পানীর তহশীলদার হইলেন। এই সময় হেষ্টিংস বর্দ্ধমানের রেসিডেণ্ট ছিলেন। তিনি রাজস্ব আদায় করিয়া মুর্শিদাবাদে পাঠাইতেন। ইহাতে তাঁহার অনেক সুবিধা ছিল। নন্দকুমার বর্দ্ধমানরাজকে রাজস্ব হুগলীতে তাঁহার নিকট পাঠাইয়া দিতে হুকুম দিলেন। হেষ্টিংস ক্লাইবকে পত্র দিলেন। ক্লাইব নন্দকুমারকে সমর্থন করিলেন। এই দিন হইতেই হেষ্টিংস নন্দকুমারের শত্রু হইলেন।

নন্দকুমার যখন হুগলীতে, তখন মুর্শিদাবাদে নবাব ও রায়দুর্ল্লভের মধ্যে বিশেষ মনোমালিন্য চলিতেছিল, উভয়েই উভয়কে হত্যা করিতে চেষ্টিত ছিলেন। রায়দুর্ল্লভ আত্মরক্ষার জন্ম নন্দকুমারকে সংবাদ দিলেন। তিনিও কিছু সৈন্য লইয়া মুর্শিদাবাদ আসিলেন। হেষ্টিংস এই সুযোগে ক্লাইবকে লিখিলেন—নবাব নন্দকুমারের উপর অসন্তুষ্ট। ক্লাইব জবাব দিলেন, নন্দকুমার ইংরেজপক্ষ, সেই জন্ম নবাব অসন্তুষ্ট। নবাবের অসন্তোষ, আমিরবেগের ফৌজদারি পদত্যাগ জন্য, নন্দকুমার দেওয়ানী ছাড়িয়া দিয়া কলিকাতায় চলিয়া গেলেন।

নন্দকুমার, রায়দুর্ল্লভ ও আমিরবেগ তিন জনেই কলিকাতায় একত্র মিলিত হইলে নবাবের উৎকণ্ঠা বৃদ্ধি হইতে লাগিল। তিনি ওলন্দাজদিগের সাহায্যে ইংরেজ ধ্বংস করিতে বাসনা করিলেন। দূরদর্শী ক্লাইব ওলন্দাজের চুঁচুড়া আক্রমণ করিয়া ওলন্দাজ ধ্বংস করিলেন। ইংরেজ মীরজাফরকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া মীরকাশিমকে সিংহাসনে বসাইলেন। মীরজাফরের নবাবী, তিন বৎসর চারি মাস মাত্র হইয়াছিল। মীরজাফর অনন্যোপায় হইয়া পূর্ব্ব-বৈরতা ত্যাগ করিয়া নন্দকুমারের আশ্রয় লইলেন। বৃদ্ধ নবাব প্রতিশ্রুতি দিলেন, তিনি পুনরায় নবাব হইলে তাঁহাকে মন্ত্রী করিবেন। গবর্ণর ভ্যান্সিটার্ট ও হেষ্টিংসের আক্রোশ বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। নন্দকুমার কর্ণেল কুটের আশ্রয় লইলেন। কুটের প্রস্তাবে নন্দকুমার তাঁহার সহিত ১৭৬১ খৃষ্টাব্দে পাটনায় যাত্রা করিলেন। ইহার পর নন্দকুমার হেষ্টিংস ও ভ্যানসিটার্ট দ্বারা দুইবার বন্দী হন। মীরকাশিম পদচ্যুত হইলে মীরজাফর পুনরায় নবাব হইলেন। ইংরেজের অনুমতি লইয়া নন্দকুমার নবাবের সঙ্গে মুর্শিদাবাদ আসিলেন। ইহার পর তিনি বাঙ্গালা, বিহার, উড়িষ্যার দেওয়ান হন। মীরজাফর যত দিন জীবিত ছিলেন, নন্দকুমার তাঁহার মঙ্গলের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াছিলেন। সেই জন্য কোন ইংরেজ লেখক নন্দকুমারের চরিত্রে দোষারোপ করিতে ত্রুটি করেন না। মীরজাফর ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দের ১৪ই জানুয়ারী দেহত্যাগ করেন। মৃত্যুসময়ে নন্দকুমারের অনুরোধে কিরীটেশ্বরীর চরণামৃত পান করিয়াছিলেন। নন্দকুমার বাদশাহের নিকট হইতে সনন্দ আনাইয়া নাজিমউদ্দৌলাকে বাঙ্গালার সিংহাসনে বসাইলেন। এই সময় হইতে নন্দকুমারের সহিত হুগলীর কোন সম্বন্ধ ছিল না; সুতরাং সে সম্বন্ধে লেখা অনাবশ্যক।

এত দূর পর্য্যন্ত যাহা লিখিলাম, তাহা তাঁহার রাজনৈতিক জীবনকাহিনী; পারিবারিক জীবনচরিত এবং শেষ জীবনকাহিনী না লিখিলে উহা অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে, সেজন্য লেখা আবশ্যক। মহারাজের পারিবারিক জীবন সুখকর ছিল। লক্ষ্মীস্বরূপিণী পত্নী ক্ষেমঙ্করী আদর্শ-পত্নী ছিলেন। তাঁহার ভ্রাতারা জ্যেষ্ঠের আজ্ঞাবহ ছিলেন—সকলেই একত্রে বাস করিয়া আনন্দে দিন কাটাইতেন। তাঁহার একমাত্র অশান্তি ছিল—তাঁহার জামাতা জগচ্চন্দ্রের জন্য। মহারাজ তাঁহাকে পুত্র গুরুদাসের অধীনে পেস্কার-কার্য্যে নিযুক্ত করেন। এই জামাতাই নন্দকুমারের বিরুদ্ধে অর্থলোভে বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া তাঁহার মৃত্যুর অন্যতম কারণ হইয়াছিলেন। অপর জামাতা রাধাচরণ বিপদে সম্পদে মহারাজের সঙ্গে ছায়ার মত থাকিতেন আর জগচ্চন্দ্র বিশ্বাসঘাতক হইয়া সর্ব্বদাই দূরে থাকিতেন। নন্দকুমারের পূর্ব্বপুরুষগণ শাক্তধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন; কিন্তু তিনি বৈষ্ণবমতাবলম্বী হন; পরন্তু শাক্তকে কখনও ঘৃণা করিতেন না। তিনি হুগলীর কার্য্যে অবসর পাইলেই হালিসহরে আসিয়া ভক্ত রামপ্রসাদের সঙ্গে মিলিত হইয়া মার নামগান করিতেন; নাটোরের রাজা রামকৃষ্ণের সহিত একত্র বসিয়া মহামায়ার উপাসনা করিতেন। ধর্ম্ম সম্বন্ধে তাঁহার এতই উদারতা ছিল।

অদ্যাবধি যে কার্য্য কেহ করিতে পারেন নাই, মহারাজ সেই কার্য্য করিয়াছিলেন—লক্ষ ব্রাহ্মণের পদধূলি-গ্রহণ। তাঁহার রাজোচিত প্রাসাদে লক্ষ ব্রাহ্মণকে আহ্বান করিয়া তাঁহাদের পদধূলি লইয়াছিলেন। দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ মাতৃশ্রাদ্ধে ২১ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়াছিলেন; কিন্তু লক্ষ ব্রাহ্মণকে আহ্বান করিতে পারেন নাই।

যিনিই অত্যাচারপীড়িত হইয়া তাঁহার আশ্রয় লইয়াছিলেন, তাঁহাকেই তিনি সাহায্য করিতেন—নিজের শুভাশুভ দেখিতেন না—ইহাই তাঁহার চরিত্রের বিশিষ্টতা ছিল এবং এই বিশিষ্টতাই তাঁহার মৃত্যুর কারণ হইয়াছিল। অত্যাচারী, লোভী, অর্থগৃধ্নুগণ তাঁহার বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া সেই মহামানবকে ধ্বংস করিয়াছিল। জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন কোন সময়ে রাজা কৃষ্ণচন্দ্র কর্তৃক উৎপীড়িত হইয়া মহারাজের আশ্রয় লন। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র তাঁহার বৈবাহিক হইলেও তিনি তাঁহার বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছিলেন—এ কি কম নৈতিক বল? ১১৭৬ সালে (ইংরেজি ১৭৭০ খৃষ্টাব্দ) বাঙ্গালায় ভয়ানক দুর্ভিক্ষ হয় এবং যাহাকে অদ্যাবধি ছিয়াত্তরের মম্বন্তর বলে। এই দুর্ভিক্ষে বাঙ্গালাদেশ শ্মশানে পরিণত হইয়াছিল (৮)। এই সময় তিনি ভদ্রপুর ও মালিহাটী গ্রামে সমস্ত লোককে রক্ষা করেন, অধিকন্তু যে কেহ তাঁহার আশ্রয়ে আসিয়াছিল, সেই রক্ষা পাইয়াছিল। এই দুর্ভিক্ষের প্রধান কারণ রেজাখাঁ ও ইংরেজ বণিক। ইহারা ধান্য একচেটিয়া করিয়া দুর্ভিক্ষের সৃষ্টি করে (৯)। এই দুর্ভিক্ষে অনেকে আত্মবিক্রয় করিয়াছিল—নিম্নে একখানি আত্মবিক্রয়পত্রের নকল দিলাম।

"শ্রীলালা গুরুদাস রায় অওলাদে শ্রীযুক্ত মহারাজ নন্দকুমার রায় ইবনে পদ্মনাভ রায় সচ্চরিত্রেষু লিখিতং শ্রীচারু বেওয়া অওলাদে তীতু গোপ ইবনে গঙ্গারাম গোপ বন্দা আটাবিপত্র মিদং সন ১১৭৭ এগার শত সাতাত্তরি অব্দে লিখনং কার্য্যঞ্চ আগে অকালে অন্নাভাবে মরি মহাশয়ের নিকট আত্মবিক্রয় হইলাম, ভরণপোষণ করিয়া দাস্যে দাখিল করিবেন, একরায় বিকাইলাম ইহাতে পলাইয়া যাই ধরিয়া আনিয়া শাস্তি করিবেন এতদর্থে বন্দা আটাবিপত্র দিলাম ইতি সন সদর বত্তারিখ ৫ জমাদিলৌন মোতাবেক"। "শ্রীচারুবেওয়া সংযকস্য" (১০)

মহারাজের শেষ জীবন

যে নন্দকুমার এক দিন বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ান ছিলেন, আশ্রিতকে আশ্রয়দান যাঁহার জীবনের ব্রত ছিল, যিনি দরিদ্রের মা-বাপ ছিলেন, তাঁহার শেষ জীবন বড়ই দুঃখময়। হেষ্টিংসই তাঁহার মৃত্যুর কারণ। মহারাজ হেষ্টিংসের অত্যাচারকাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়া কাউন্সিলে দিয়াছিলেন। হেষ্টিংস আত্মরক্ষার্থে তাঁহার অনুচরগণ দ্বারা তাঁহার বিরুদ্ধে জাল মোকদ্দমা সৃষ্টি করিয়া, তাঁহাকে দোষী সাব্যস্ত করাইয়া ফাঁসী দেওয়াইয়াছিলেন। (তখনকার আইনে জাল মোকদ্দমায় ফাঁসী হইত)।

বুলাকিদাস নামে এক জন শেঠের কাছে মহারাজ কতকগুলি মূল্যবান্ দ্রব্য বিক্রয় করিতেছেন, কিন্তু উহা মীরকাশিমের সঙ্গে ইংরেজের যুদ্ধের সময় নষ্ট হইয়া যায়। এজন্য বুলাকি, নন্দকুমারকে এক অঙ্গীকারপত্র লিখিয়া দেয় যথা—"আমি বুলাকিদাস। এক ছড়া মুক্তার হার, একখানি কল্কা, একটি শিরপেঁচ, চারিটা আংটি দুইটা হীরার, দুইটা মাণিকের। রঘুনাথ জীউ মহারাজ নন্দকুমার বাহাদুরের পক্ষ হইয়া ১১৬৫ সালের আষাঢ় মাসে আমার মুর্শিদাবাদের কুঠীতে বিক্রয় জন্য গচ্ছিত রাখেন। নবাব মীর মহম্মদ কাশীম খাঁ সৈন্যের পরাজয়ের পর উপর উক্ত মহারাজ পূর্ব্বকথিত গচ্ছিত জহরত আমার নিকট দাওয়া করেন, আমার অবস্থা ভাল না হওয়াতে জহরত ফিরাইয়া বা তাহার মূল্য দিতে অক্ষম হই। আমি অঙ্গীকার করিতেছি ও লিখিয়া দিতেছি যে, কিঞ্চিদধিক দুই লক্ষ টাকা যাহা আমার কোম্পানীর কাছে প্রাপ্য আছে, সেই টাকা প্রাপ্ত হইলেই আটচল্লিশ হাজার একুশ সিক্কা টাকা জহরতের মূল্য আমার কাছে পাওনা আছে, সেই টাকার সহিত টাকা প্রতি ।০ আনা সুদ দিব। এ বিষয় আমি মহারাজার কাছে কোন ওজর আপত্তি করিব না। ১১৭২ সালের ৭ই ভাদ্র লিখিত হইল।"

সাক্ষী
মহাতাব রায়

সাক্ষী
শীলাবত বুলাকি দাসের
উকিল

সাক্ষী
অবদেওকমল
মহম্মদ

আলাব
বুলাকিদাস

বুলাকি দাসের মৃত্যুর পর তাঁহার উত্তরাধিকারী পদ্মমোহন ও গঙ্গাবিষ্ণুকে সঙ্গে লইয়া মহারাজ ইংরেজ কোম্পানীর নিকট হইতে বুলাকি দাসের পাওনা টাকা আদায় করিয়া দেন এবং বুলাকির বিধবা পত্নী মহারাজের দেনা শোধ করিয়াছিলেন। চিরপ্রথানুসারে মহারাজ ঐ পত্রগুলির কোণ ছিঁড়িয়া ফেরৎ দেন।

---

(৮) দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে লর্ড মেকলে সাহেব স্বয়ং দেখিয়া যাহা লিখিয়াছেন, তাহা এইরূপ—"Tender and delicate women, whose veils had never been lifted before the public gaze, came forth from their inner chamber in which Eastern jealousy had kept watch over their beauty, threw themselves before the passersby & with loud wailing, implored a handful of rice for their children. The Hooghly rolled down every day thousands of corps closed to the porticos & gardens of the English conquerors. The very street of calcutta were blocked by the dying & the dead. The lean & feeble survivors had not energy enough to have the bodies of their kindred borne to the funeral pile or to the holy river or even to scare away the jackels & vultures which fed on human remains in the face of the day" Essay on Lord Clive.

(৯) "Before the famine reached its height, almost all the rice in the country was bought up by the servants of the Company." History of India By H. Beverage vol II p 285.

"The gomastas of the English gentlemen, not barely for monopolizing grain but for compelling the poor ryots to sell even the seed requisite for the next harvest". Auber's British power, vol 1 p 355

(১০) আওলাদে—পিতা ও ইবনে পিতামহ। একটি বিশেষত্ব এই যে, এখন যেমন স্ত্রীলোকের নামের পূর্ব্বে "শ্রীমতী" লেখা হয়, তখনকার দিনে শুধু "শ্রী" লেখা হইত। এখন আবার ঐ "শ্রী" কথা ব্যবহার চলিতে আরম্ভ হইয়াছে—"শ্রীমতী" লেখা হয় ত লোপ পাইবে। ১১৪৩ সালের একখানি কাগজে দেখিয়াছিলাম, "আওলাদের" স্থানে "ওলদে"ও আছে।

বুলাকির বিধবা পত্নী ও পদ্মমোহনের মৃত্যুর পর মোহনপ্রসাদ ও অন্যান্য অংশীদারগণ গঙ্গাবিষ্ণুকে উত্তেজিত করিয়া মহারাজের বিরুদ্ধে ক্ষতিপূরণের মোকদ্দমা আনিলেন। এ মোকদ্দমা দেওয়ানী আদালতে হইল। মোহনপ্রসাদের উদ্দেশ্য ছিল, যদি ঐ টাকা আদায় হয়, তবে সে শতকরা ৫৲ টাকা পাইবে—না পাইলেও পাইবে এই বন্দোবস্ত হয়। পক (Palk) সাহেব মোকদ্দমার বিচারের পূর্ব্বেই মহারাজকে কারাগারে দিলেন। এই সময় রেজার্থার মোকদ্দমা চলিতেছিল। হেষ্টিংস দেখিলেন, নন্দকুমার ব্যতীত উদ্ধার নাই, সুতরাং কারাগার হইতে তাঁহাকে আনা হইল। কার্য্যোদ্ধার হইয়া গেলে তিনি পুনরায় কারাগারে প্রেরিত হইলেন। পরে পূর্ব্বোক্ত দলিল জাল হইয়াছে বলিয়া মহারাজকে ফৌজদারী মোকদ্দমায় ফেলিয়া সুপ্রিম কোর্টে (১১) মোকদ্দমা আরম্ভ হইল। এই ঘটনা ১৭৭৫ খৃষ্টাব্দের ৬ই মে শনিবার আরম্ভ হয় এবং প্রথম বিচারের দিন ৮ই জুন পড়িল। মোকদ্দমার সম্পূর্ণ বিবরণ দেওয়া অনাবশ্যক। সরকার পক্ষের সাক্ষী—মোহনপ্রসাদ, কমলউদ্দীন ও তাহার ভৃত্য হোসেন আলি, খোজা পিত্রুস, সদরউদ্দীন, সহবৎ পাঠক, কৃষ্ণজীবন দাস ও মুন্সী পরে রাজা নবকৃষ্ণ। এই সকল সাক্ষীর দ্বারা প্রমাণিত হইল যে, (১) বলাকি দাসের অঙ্গীকারপত্রোক্ত তিন জন সাক্ষীর মধ্যে কমলউদ্দীন খাঁই মহম্মদ কমল, (২) মহাতাব রায় নামে কোন ব্যক্তি ছিল না, (৩) শীলাবতের মৃত্যু হইয়াছে। মহারাজের সাক্ষী—তেজরায় বর্দ্ধমান রাণীর পেস্কার, রূপনারায়ণ চৌধুরী, লালা তোমন সিং, চৈতন্যদাস ও ইয়ারবক্স মহম্মদ। মহারাজের সাক্ষীরা বলেন, কমল মহম্মদ মরিয়া গিয়াছে, এ সে কমল নহে! কমলকে জিজ্ঞাসা করায় সে বলে, নবাব নজামউদ্দৌলার সময় কমলউদ্দীন আলিখাঁ উপাধি লাভ করেন এবং ঐ নামের মোহর ব্যবহার করেন। কমলের কথা সমর্থন করে খোজা পিত্রুস ও সদর উদ্দীন। শীলাবতের সহি জাল, ইহা সাক্ষী দ্বারা প্রমাণ করিলেন সহবৎ পাঠক ও মুন্সী নবকৃষ্ণ। মহারাজের পক্ষে সাক্ষী শেষ হইতে না হইতে হুজুরিমল ও কাশীপ্রসাদকে সাক্ষ্যের জন্য ডাকা হইল। সকলেই মহারাজের বিরুদ্ধে সাক্ষী দিল।

(১১) কলিকাতার ঘোড়দৌড়ের মাঠের দক্ষিণ সারকুলার রোডের উপর বর্ত্তমান গোরা হাসপাতালই (station hospital) সুপ্রিমকোর্ট ছিল।

এই মোকদ্দমার বিচারক ছিলেন লেসেষ্টার ও হাইড সাহেব এবং প্রধান বিচারপতি ছিলেন সার ইলাইজা ইম্পে। ইম্পে হেষ্টিংসের সহপাঠী ও বন্ধু ছিলেন। জুরীরা সকলেই ইংরেজ, দেশী জুরীর প্রার্থনা করিলেও ইংরেজি আইনমতে সকলই ইংরেজ জুরী গৃহীত হয়। ১৬ই জুন ১৭৭৫ খৃষ্টাব্দে মহারাজ জাল অপরাধে অপরাধী ঘোষিত হইল ও মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা বাহির হইল। ৯ই আগষ্ট কলিকাতার কুলীবাজারে (এই স্থানের বর্ত্তমান নাম হেষ্টিংস, খিদিরপুর পুলের উত্তর দিক) মহারাজের ফাঁসী হইল। ব্রাহ্মণের এই প্রথম ফাঁসী। মহাত্মা সক্রেটিসের মৃত্যুর পূর্ব্বে তাঁহার এক শিষ্য বলিয়াছিলেন—"বড়ই পরিতাপের বিষয়, আপনি নির্দ্দোষ, তবু মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা হইল।" ইহাতে সক্রেটিশ বলিয়াছিলেন, "তুমি কি আমায় দোষী দেখিলে সুখী হইতে?" মহারাজ নন্দকুমারের মৃত্যুর জন্য দুঃখ করিবার কিছু নাই। কারণ, তিনি নির্দ্দোষ হইয়া মৃত্যুর কবলে গিয়াছিলেন। *

কলিকাতায় মহারাজের স্মৃতিচিহ্ন কিছুই নাই। ‡ মুন্সী নবকৃষ্ণ রাজা উপাধি পাইলেন, তাঁহার নামে রাস্তা আছে, এমন কি, হুজুরিমলের নামে বহুবাজারে "হুজুরিমল লেন" আছে। মহারাজ কিন্তু বাঙ্গালীর হৃদয় জুড়িয়া বসিয়া আছেন ইহাই তাঁহার স্মৃতিচিহ্ন—আর ঐ হেষ্টিংস বা কুলীবাজার।

মহারাজ নন্দকুমারের জীবনচরিত এক অদ্ভুত কাহিনী। তাঁহার জীবনকাহিনী আলোচনা করিলে দেখিতে পাই, পুরুষকারের ও অদৃষ্টের ভীষণ যুদ্ধ—শেষ পুরুষকারের পরাজয়, অদৃষ্টের জয়। তিনি দেশের জন্য—দেশের উপকারের জন্য কখনও পশ্চাৎপদ হন নাই। বাঙ্গালীর ভিতর তিনি শ্রেষ্ঠ রাজনীতিক, অদ্ভুত ও অক্লান্তকর্ম্মী, নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ, দেশসেবক, প্রভুভক্ত ও দরিদ্রপ্রতিপালক ছিলেন, এ কথা অস্বীকার করা চলে না।

শ্রীউপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (জ্যোতীরত্ন)

* সোমড়ার রাজা রামচন্দ্র নন্দকুমারের বন্ধু ছিলেন। নন্দকুমারের মৃত্যুর প্রতিশোধ লইবার জন্য তিনি হেষ্টিংসকে হত্যার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু ঐ চেষ্টা ব্যর্থ হয়। "চাঁদরাণী" দেখুন।

‡ তমলুকের দক্ষিণে "নন্দকুমার" নামক স্থান এখনও রহিয়াছে। আর কাঁথিতে "নন্দকুমার" পুষ্করিণী আছে।
দৈনিক বসুমতী ২২শে ভাদ্র, ১৩৪২ সাল—লেখক আদিত্যকুমার, বাকুড়া।

কমলা-তর্পণ

বলিবার মত কিছু নাহি আজ, মৌন হয়েছে বাণী,
স্বর্গ তোমারে ডাকে ইসারায়, যাও অমরায় রাণী।

দীন ভারতের নন্দিনী মোরা, তোমারে প্রণাম করি,
মরণে যে দীপ জ্বালাইয়া গেলে, আমরা লইব বরি।
মোরা ভুলে গেছি প্রেমের মাঝারে, ত্যাগের মাধুরী আছে,
সে বাণী আজিকে পৌঁছায়ে দিলে, তুমি আমাদের কাছে।

অশ্রুতে আজ রুধিব না পথ, সে জল শুকায়ে যাক্,
তোমার পথের মহা আদর্শ, উজ্জ্বল হয়ে থাক্!
নয়নের আগে, এ মহা ভারতে বাজালে যে ব্যথা-বীণ,
তোমার প্রাণের অতৃপ্ত কামনা তার সাথে হোক লীন।

শ্রীমতী অমিয়া সেন

স্বয়ংসিদ্ধা

তৃতীয় উল্লাস

১

বাগুলীর এই খেয়ালী জমিদারটির প্রভাব, প্রতিপত্তি ও দপদপা দেখিয়া সারা পরগণার লোকে ভাবিত, জন্মান্তরের অতি বড় পুণ্যের জোর না থাকিলে মানুষ এতটা ভাগ্যবান হইতে পারে না। কিন্তু তাহারা যদি এই ভাগ্যধরটির পারিবারিক সুখ-সৌভাগ্যের খবর রাখিত, তাহা হইলে তাহারা বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া দেখিতে পাইত, বিপুল ধন-সম্পত্তি ও প্রায় সমগ্র পরগণার অধিপতি হইয়াও এই অতিমানুষটির দুঃখের অন্ত নাই।

শৈশবে হরিনারায়ণ বাবু পিতৃহীন হন, কিন্তু স্নেহময়ী জননীর আদর ও আশ্রিতা আত্মীয়াগণের বিপুল পরিচর্য্যায় তিনি পিতার অভাব উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। যৌবনে যখন মাতৃহীন হইলেন, সহধর্ম্মিণী সুলোচনার সাহচর্য্য তাঁহাকে সান্ত্বনা দিয়াছিল। কিন্তু যৌবনের অপরাহ্ণে যে দিন সুলোচনা তাঁহার বাহুপাশ ছিন্ন করিয়া পরলোকের পথে মহাপ্রস্থান করিল, বিশাল জমিদারী, বিপুল ঐশ্বর্য্য, দুর্ব্বার দপদপা তাহাকে রক্ষা করিতে পারিল না, সেই দিন হরিনারায়ণ বাবু প্রথম উপলব্ধি করিলেন শোকের মর্ম্মন্তুদ যাতনা—প্রিয়বিরহে সহস্র অতীত স্মৃতির নিদারুণ দংশনের জ্বালা। বিশাল ভবনে আশ্রিত প্রতিপালিত আত্মীয় অনাত্মীয়দের সংখ্যা হয় না, কিন্তু কে দিবে সান্ত্বনা! সাধ্বী সুলোচনা যে তাহার অঞ্চলখানি প্রসারিত করিয়া ইহাদিগকে রক্ষা করিয়াছেন, করুণাময়ী আশ্রয়দাত্রীর অকাল-বিয়োগে সকলেই আত্মহারা। দুই বৎসরের শিশু, সুলোচনার একমাত্র উপহার গোবিন্দকে বিশাল বক্ষোমধ্যে চাপিয়া হরিনারায়ণ বাবু পত্নীশোক ভুলিতে প্রয়াস পাইলেন,—পারিলেন না। পুত্র পিতার আদরে ভুলিল না, অসংখ্য পরিচারিকা ও পরিজনরা শোকার্ত্ত শিশুকে লইয়া বিব্রত হইয়া উঠিল, শিশু কিছুতেই প্রবোধ মানিতে চাহে না, তাহার মুখে শুধু আকুল উচ্ছ্বাস—মা কাছে যাবো।

শোকাতুর পিতা স্তব্ধ হইয়া ভাবেন, তিনিও ত শৈশবে পিতৃহারা হইয়াছিলেন, যৌবনে মাকে হারাইয়াছিলেন, কিন্তু এমন ভাবে ত আত্মহারা হন নাই!

পৌরুষের অভিমান তৎক্ষণাৎ চল্লিশ বৎসরের উচ্চাকাঙ্ক্ষী ভূস্বামীর চিত্তে তুলিল বিক্ষোভ! সাধারণ দশ জনের মত তিনিও শোকমথিত দেহখানি লইয়া লোকের মৌখিক সহানুভূতির ভিখারী হইবেন! যাহারা তাঁহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইতে সাহস পায় না, এই সূত্রে ঘনিষ্ঠতা গাঢ় করিবার অবকাশ পাইবে! এই চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে শোকের আবর্ত্তকে সবলে রুদ্ধ করিয়া তিনি প্রচণ্ড উৎসাহে জমিদারীর কাযে লিপ্ত হইলেন। সদ্যঃশোকাতুর হুজুরের এই আকস্মিক উদ্দাম কর্ম্মলিপ্সায় সেরেস্তায় শিহরণ উঠিল। পরিজন ও পরিচারিকাদের উপর কঠোর আদেশ হইল,—ছেলের কান্না তিনি পছন্দ করেন না, অতএব সাবধান!

সকলেই কর্ত্তার সম্বন্ধে সচেতন থাকিত। জানিত, এখানে পাণ হইতে চূণটুকু খসিলেই মুস্কিল; খোকার কান্না যদি কোনও দিন হুজুরের কাণে গিয়া বাজে, কাহারও নিস্তার থাকিবে না। কিন্তু খোকা কিছুতেই দু'দণ্ড চুপ করিয়া থাকে না। শেষে কান্না থামাইবার উপায় স্থির হইয়া গেল। এক পরিচারিকা কলিকাতার কোনও এক

রাজপরিবারে কিছুদিন কায করিয়াছিল। রাজবাড়ীর রোরুদ্যমান শিশুদের সহজে শান্ত করিবার কৌশলটুকু শিক্ষা করিয়াই সে বাগুলীর বাবুদের বাড়ীতে ঢুকিয়াছিল। তাহার ব্যবস্থায় সেই কৌশলটুকু এ ক্ষেত্রে কাযে লাগিয়া গেল, পরিমাণমত মরফিয়া দুধের সহিত যোগ দিয়া শিশুকে সহজে ঘুম পাড়াইয়া দিল। অতঃপর শিশু সর্ব্বক্ষণই ঘুমায়, কর্ত্তার কাণে কান্না তাহার পৌঁছায় না।

বাহিরে কর্ত্তা খুবই কঠিন, সকলেই ভাবে, কি সহ্য গুণ; অত বড় শোকটায় একটু আঁহা উহু নাই! কিন্তু ভিতরটির কি অবস্থা, কে তাহার সন্ধান রাখিবে! প্রত্যূষে অশ্রুসিক্ত উপধানটি উপলক্ষ করিয়া এই কঠিন পুরুষের মনোবৃত্তি নির্ণয় করিবার অবসর কেহ পাইত কি?

ছয়টি মাস এই ভাবে কাটিল। কঠিন পুরুষ বাহিরের সেরেস্তায় জমিদারী গদীতে বসিয়া কঠোরভাবে জমিদারী শাসন করেন, মধ্যাহ্নে ও নিশীথে নিজের সুসজ্জিত কক্ষের কোমল শয্যায় দেহখানি ঢালিয়া দিয়া স্বর্গীয়া সহধর্ম্মিণীর স্মৃতি লইয়া ভাবেন! কিন্তু ভাবনাটুকুরও পরিসমাপ্তি হইয়া গেল এক অপ্রত্যাশিত ঘটনায়!

অষ্টকোটের রাজার কোপে ও কন্যাকুলের ধনকুবের মহাজনের ঋণের চাপে পড়িয়া পার্শ্ববর্ত্তী পরগণার অন্যতম ব্রাহ্মণ ভূস্বামী রাজা রেবতীমোহন রায়চৌধুরী বাগুলীর গাঙ্গুলী বাবুর শরণাপন্ন হইলেন। হরিনারায়ণ বাবু প্রায় এগার লক্ষ টাকা বাহির করিয়া দিয়া রাজাকে যেমন রক্ষা করিলেন, কৃতজ্ঞ রাজাও তেমনই তাঁহার এষ্টেট পরিচালনার সর্ব্বময় কর্ত্তৃত্ব তাঁহার রক্ষাকর্ত্তার উপর অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন। এই সূত্রে দুইটি বর্দ্ধিষ্ণু পরিবারের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা গাঢ় হইয়া উঠিল এবং এক দিন সকলেই সবিস্ময়ে শুনিল, রাজা রেবতীমোহনের সপ্তদশী তরুণী কন্যা মাধুরী দেবী বাগুলীর গৃহিণী-শূন্য শুদ্ধান্তে রাণীর মর্য্যাদায় প্রবেশ করিতেছেন।

হরিনারায়ণ বাবুর খেয়ালের অন্ত ছিল না সত্য, কিন্তু খেতাবের মোহ কোনও দিন তাঁহাকে আকৃষ্ট করিতে পারে নাই। তাঁহার অসংখ্য প্রজার তিনি প্রাণের রাজা,—পরগণার সর্ব্বত্র তাঁহার আখ্যা—বাগুলীর রাজাবাবু। কোনও সরকারী প্রতিষ্ঠানে অর্থ প্রদানের প্রয়োজন হইলে তিনি সেই সঙ্গে কলেক্টর বা কমিশনারকে লিখিয়া পাঠান—টাকার বিনিময়ে তাঁহাকে যেন কোনও খেতাব দিয়া লজ্জিত না করা হয়।

যে খেয়ালের বশে হরিনারায়ণ বাবু বিবিধ অসাধ্যসাধন করিয়া থাকেন, রাজা রেবতীমোহনের বয়স্থা কন্যাকে এ ভাবে সহসা বিবাহ করাও তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ খেয়ালের অন্তর্গত। অষ্টকোটের রাজা বংশমর্য্যাদায় হীন হইয়াও রাজা রেবতীমোহনের কন্যার পাণিপ্রার্থী হন এবং এই সূত্রেই কন্যাকুলের ধনী মহাজন রাজা বাহাদুরকে বিব্রত করিয়া তুলেন। হরিনারায়ণবাবু রাজা রেবতীমোহনকে ঋণমুক্ত করিলেন বটে, কিন্তু অষ্টকোটের চরিত্রহীন দুর্দ্ধর্ষ রাজা অষ্টপাদের মত অষ্টপদ বিস্তার করিয়া রাজ-কন্যাকে আয়ত্ত করিতে বদ্ধপরিকর হইয়া উঠেন। রাজা রেবতীমোহন বাহুবাহুল্যে রাজোচিত মর্য্যাদাটুকু রক্ষা করিতে যে পরিমাণে সচেতন ছিলেন, মামলাবাজী বা লাঠালাঠি ব্যাপারে সেই অনুপাতে ছিল ঔদাসীন্য। অষ্টকোটকে এ বিষয়ে বেপরোয়া দেখিয়া তিনি সভয়ে দ্বিতীয়বার হরিনারায়ণ বাবুর শরণাপন্ন হইলেন। অষ্টকোটের রাজাদের সহিত বাগুলীর বাবুদের বংশানুক্রমে একটা মনোমালিন্য চলিয়া আসিতেছিল। সমস্ত শুনিয়া খেয়ালী জমিদারের রক্ত উষ্ণ হইয়া উঠিল; তলে তলে অষ্টকোটের যখন এই চেষ্টা চলিয়াছিল, তখন সকলকে চমৎকৃত করিয়া অসংখ্য লাঠিয়াল-পরিবেষ্টিত নবপরিণীতা রাজকন্যার শিবিকা বাগুলীর প্রাসাদে প্রবেশ করিল।

* * * *

তাহার পর আরও বাইশটি বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। বাগুলীর প্রাসাদে বহু পরিবর্ত্তন হইয়াছে। মাতৃহীন দুই বৎসরের শিশু গোবিন্দ এখন চব্বিশ বৎসরের যুবা। মাতৃবিয়োগের পর এই শিশু পিতার মনে যে সংশয় তুলিয়াছিল, আজও তাহাকে লইয়াই যত আশঙ্কা, যত সমস্যা ও সংশয়।

অবশ্য এই বংশের আকৃতিগত সৌন্দর্য্য হইতে গোবিন্দকে বিধাতাপুরুষ বঞ্চিত করেন নাই। তবে এই বয়সে এত বড় অভিজাত বংশের ছেলের চেহারায় যে লাবণ্য ও কমনীয়তা থাকা উচিত, গোবিন্দের দেহে তাহার অভাব দেখা যায়। দেহের রং খুব সুন্দর হইলেও কেমন যেন ফ্যাকাসে, মুখখানি যদিও বেশ ঘোরালো, কিন্তু কোমলতা

বর্জ্জিত ; ত্বক্ রুক্ষ ও কর্কশ, এই বয়সেই রীতিমত পাকিয়া গিয়াছে। গোঁফের চুলগুলি পিঙ্গলবর্ণ, মাথার চুলেও তাহার আভা। এইগুলি যেমন তাহার আকৃতিগত ত্রুটি, তেমনই কয়েকটি বিশেষত্বও পৌরুষের দিক দিয়া প্রশংসনীয়। গোবিন্দের ছয় ফুট দীর্ঘ দেহযষ্টি, আজানুলম্বিত দুটি বাহু, অসাধারণ টিকোলো নাসিকা ও একযোড়া দীর্ঘায়ত চক্ষু সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

ইহা ত গেল আকৃতির কথা। কিন্তু প্রকৃতির দিক দিয়া তাহার ত্রুটি প্রচুর। মানসিক ব্যাধি ও মস্তিষ্কের দুর্ব্বলতায় সে একবারেই অকর্ম্মণ্য। বাহিরের কাহারও সহিত তাহার মিশিবার অধিকার নাই, ক্ষমতাও নাই। বিষয়-সংক্রান্ত কোনও কার্য্যেই এ পর্য্যন্ত কর্ত্তার তরফ হইতে তাহার উপর ডাক পড়ে নাই। নামেই সে বাড়ীর জ্যেষ্ঠ সন্তান, বিষয়বুদ্ধি ত দূরের কথা, আত্মসম্মান বজায় রাখিবার জ্ঞানটুকুর পর্য্যন্ত তাহার অভাব। পরিচারক-পরিচারিকারা তাহাকে গ্রাহ্য করে না, আশ্রিত আত্মীয় পরিজনরা তাহাকে উপেক্ষা করিয়া চলে। কেহ আদেশ অবহেলা করিলে তাহার মনে অভিমান আসে না, আদেশ কেহ অবহেলা করিলেও তাহার চক্ষুর ভ্রূ দুইটি কুঞ্চিত হইয়া উঠে না। সুতরাং এমন নির্ব্বিকার নিস্তেজ নগণ্য বংশধরকে লইয়া যে এই বংশের মালিকের চিত্ত বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিবে, তাহাতে আর কথা কি !

পক্ষান্তরে, কর্ত্তার দ্বিতীয় পক্ষের পুত্র গোবিন্দের বৈমাত্রেয় ভাই—নিবারণ বয়সে প্রায় চারি বৎসরের কনিষ্ঠ হইয়াও যেন সকল বিষয়েই জ্যেষ্ঠকে বহু পশ্চাতে ফেলিয়া কৃতী পিতার ঠিক পাশটিতে গিয়াই দাঁড়াইয়াছে। প্রয়োজন পড়িলে, কর্ত্তা তাহাকে কত গুরুতর কাযেই নিয়োগ করেন, —পিতার বহু গুণ পুত্রে বর্ত্তাইয়াছে ; কি তাহার দাপট এই তরুণ বয়সেই ; সেরেস্তার কর্ম্মচারিগণ ভয়ে তটস্থ, বাড়ীর মধ্যে দাস-দাসী আত্মীয়-পরিজন তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া কথা কহিতে কাঁপিয়া অস্থির হয় ; পুত্রের প্রতাপ ও ঔদ্ধত্য পিতারও পরম প্রীতিপ্রদ, প্রায়ই সমর্থন করিয়া বলেন,— এই ত চাই, গোড়ায় দাপট দেখাতে পারলে তবেই শেষে নামের জোরে শাসন চলে।

জ্যেষ্ঠের প্রতি কর্ত্তার একান্ত উপেক্ষা ও কনিষ্ঠের প্রতি আন্তরিক সহানুভূতি লক্ষ্য করিয়া এষ্টেটের সকলের মনেই এই ধারণা বদ্ধমূল হইয়া উঠিল যে, অদূর-ভবিষ্যতে কনিষ্ঠ নিবারণই তাহাদের ভাগ্যবিধাতা হইবে।

এই ধারণাটুকু মনে সুদৃঢ় হইবার মূলে যে কারণটুকু ছিল, তাহা এইরূপ ;—

পুরুষানুক্রমে এই বংশের প্রচলিত পদ্ধতি—সম্পত্তি বিভক্ত হইবার উপায় নাই। বংশের জ্যেষ্ঠই এষ্টেটের উত্তরাধিকারী হইয়া সর্ব্বময় কর্ত্তৃত্ব গ্রহণ করেন, কনিষ্ঠগণ নির্দ্ধারিত বৃত্তির অধিকারী থাকেন মাত্র। ঊর্দ্ধতন বহু পুরুষ ধরিয়া এই প্রাচীন বিধি অনুসারে বাগুলীর গাঙ্গুলীবংশ ও তাঁহাদের অধিকৃত বিপুল সম্পত্তি পরিচালিত হইয়া আসিতেছে। ঐশ্বর্য্যসূত্রে এই গাঙ্গুলী পরিবারের যে পরিমাণ বাড়বাড়ন্ত, বংশবৃদ্ধির দিক দিয়া তাহার অভাব দেখা যায়। বিধাতা-পুরুষ যেন ভাবিয়া চিন্তিয়া হিসাব করিয়াই বরাবর এই বংশে একটি করিয়া পুত্র যোগান দিয়াছেন। কেবল বর্ত্তমান বংশপতি হরিনারায়ণ গাঙ্গুলীর দুর্দ্দার দাপটেই যেন বিধাতার নিয়মভঙ্গ হইয়াছে। এ বংশে একমাত্র ইনিই দুই পক্ষে দুই পুত্র পাইয়াছেন এবং এই সূত্রে এই প্রথম উত্তরাধিকার সম্বন্ধে একটা সংশয় আত্মপ্রকাশ করিয়াছে।

২

শ্যামপুরের নায়েবের পত্রে চণ্ডীর সম্বন্ধে বিস্তারিত সংবাদ পাইয়াই হরিনারায়ণ বাবু গৃহিণী মাধুরী দেবীকে কহিলেন,— চমৎকার একটি মেয়ের সন্ধান পেয়েছি।

ইতিপূর্ব্বেই মাধুরীদেবী স্বামীকে উপদেশ দিয়াছিলেন, গোবিন্দের যে রকম মতিগতি, বুদ্ধিশুদ্ধির অভাব, তাতে কিছুতেই তার বিয়ে দেওয়া উচিত নয়।

স্ত্রীর কথায় হরিনারায়ণ বাবু কিছুক্ষণ তাঁহার দিকে চাহিয়া একটি সুদীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিয়াছিলেন,—কথাটা ভাববার মত বটে।

ইহার পরেই উঠে গোবিন্দকে রাখিয়া নিবারণের বিবাহের কথা। কর্ত্তা গৃহিণীর কথা শুনিয়া হেঁয়ালীর ভাষায় যে মন্তব্য প্রকাশ করিতেন, তাহাই তাঁহার প্রাণের কথা ভাবিয়া মাধুরীদেবী মনে মনে ইহাই সাব্যস্ত করিয়া লইয়াছিলেন যে, জ্যেষ্ঠের মর্য্যাদাটুকু লইয়াই গোবিন্দ বৃত্তিভোগী অবস্থায় তাহার নিঃসঙ্গ জীবনটা কাটাইয়া দিবে, স্বাস্থ্য, প্রকৃতি ও পরমায়ু সম্বন্ধে সন্দেহভাজন এই ছেলেটি

যেমন সংসারধর্ম্মে লিপ্ত হইতে বিরত থাকিবে, তেমনই বাশুলীর রাজগদীর সংস্পর্শ হইতে দূরেই থাকিয়া যাইবে।

সুতরাং কর্ত্তা যে চমৎকার মেয়েটির প্রসঙ্গ তুলিলেন, সেটি নিজপুত্র নিবারণের সম্পর্কেই সাব্যস্ত করিয়া মাধুরীদেবী নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া কহিলেন,—শুধু ত দেখতে শুনতে চমৎকার হ'লে চলবে না, ঘরও চমৎকার হওয়া চাই।

কর্ত্তা হাসিয়া কহিলেন,—কিন্তু শাস্ত্রকাররা লিখে গেছেন—স্ত্রীরত্নং দুষ্কুলাদপি।

গৃহিণী ঝঙ্কার দিয়া কহিলেন,—সে শাস্ত্র পুড়িয়ে ফেলো! রাজকন্যা না হলে নিবারণের মনে ধরবে না, আর আমারও এই ধনুর্ভঙ্গ পণ; সে ত তুমি জানই। মেয়েটি কোথাকার শুনি?

কর্ত্তা গম্ভীরভাবেই কথাটার উপসংহার করিলেন,—তা হ'লে আর শুনে কায নেই! তোমার এই ধনুর্ভঙ্গ পণটির কথা আমার মনে ছিল না; যাই হোক, এর পর তোমার এ পণ মনে রেখেই আমি নিবারণের কনে খুঁজব।

দুই দিন পরেই কর্ত্তা গৃহিণীকে ডাকিয়া কহিলেন,—গোবিন্দের বিয়ের দিনস্থির ক'রে এলুম, আসছে সাতাশে শুভকায।

কর্ত্তার কথাগুলি বজ্রধ্বনির মত গৃহিণীর কাণে নির্ঘাত হইয়া বাজিল। গোবিন্দের বিবাহ! তিনি কি ভুল শুনিলেন! বিস্ময়কম্পিতকণ্ঠে প্রশ্ন আসিল,—কার বিয়ে বললে?

সহধর্ম্মিণীর বিস্ময়াচ্ছন্ন মুখখানির উপর বদ্ধদৃষ্টিতে চাহিয়া কর্ত্তা উত্তর দিলেন,—তোমার বড় ছেলের।

পরক্ষণে শুষ্ককণ্ঠে গৃহিণীর সশ্লেষ উক্তি,—সত্যি! বড় ছেলের আইবুড়ো নামটাও তা হ'লে খণ্ডাবার জন্য কোমর বেঁধে লেগেছ বল! এটি আগেই প্রয়োজন বটে!

কোথায় গৃহিণীর ব্যথা, তাহা উপলব্ধি করিয়াই কথা-প্রসঙ্গে কর্ত্তার প্রত্যুত্তর,—এত দিন এটা প্রয়োজনীয় ব'লে মনে করিনি; কিন্তু কন্যাটিকে দেখেই যেমনই মনে হ'ল চমৎকার, তখনই তাকে নেবার কথাটা দিয়ে ফেলি। গরীবের মেয়ে, নিজের রূপগুণ যতই থাক, বাপের নাম-ডাক, খেতাব বা বড়মানুষীয়ানার কিছুই নেই। এ দিকে নিবারণের সম্বন্ধে তোমার ধনুর্ভঙ্গ পণ, যেমন তেমন ঘরের মেয়ে তোমার মনে ধরবে না—রাজকন্যা চাই; কাযেই নিজের মুখের কথাটুকু রাখবার জন্য গরীবের এই মেয়েটিকে গোবিন্দের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে তার আইবুড়ো নাম খণ্ডাবার ব্যবস্থা করা গিয়েছে।

অখণ্ড মনোযোগের সহিত স্বামীর কথাগুলি শুনিয়া মাধুরীদেবী এবার গম্ভীরভাবেই মন্তব্য প্রকাশ করিলেন,—ভালই হয়েছে, জমিদারের জড়ভরত ছেলে, আর গরীবের ঘরের চমৎকার মেয়ে,—দুয়ে মিলবে ভাল!

উৎসাহের সুরে কর্ত্তা কহিলেন,—ঠিক কথাই বলেছ তুমি, আমারও ঠিক এই মত; সেই জন্যই আমি অনেক ভেবেচিন্তে আমাদের এই বেকাম গাধাবোটখানার সঙ্গে একটা তেজীয়ান ষ্টীম-লাঞ্চ বেঁধে দেবার ব্যবস্থা করেছি। এর ফল হয় ত ভালই হবে, এক দিন জেটিতে গিয়ে ভিড়লেও ভিড়তে পারে।

এ সম্বন্ধে আর কোনও কথা উঠিবার অবকাশ পাইল না; কিন্তু যাহা উঠিল, বুঝিবার পক্ষে তাহাই যথেষ্ট। কর্ত্তার শেষের কথাগুলি মধুমক্ষিকার হুলের মত মাধুরীদেবীর বক্ষে বিদ্ধ হইয়া দাহ উপস্থিত করিল। দীর্ঘ বাইশ বৎসর এই সুবৃহৎ সংসারটির উপর প্রভুত্বের শকটখানি কি তিনি ভুল পথে চালাইয়াছেন? স্বামীর অন্তররাজ্যের রহস্যদ্বার কি এত দিন তাঁহার নিকট রুদ্ধ হইয়াই ছিল? চারিদিকের আটঘাট বাঁধিয়া প্রখর বুদ্ধির প্রভাবে অতি সন্তর্পণে পুত্র নিবারণের প্রতিষ্ঠার যে পথটুকু তিনি প্রায় নিরঙ্কুশ করিয়া তুলিয়াছিলেন, তাহা কি সত্যই ব্যর্থ-প্রয়াস?

৩

নির্দ্দিষ্ট দিনটির শুভলগ্নেই এই রহস্যময় বিবাহের মঙ্গল-শঙ্খ বাজিয়া উঠিল।

মধ্যবিত্ত অবস্থাপন্ন কন্যাপক্ষ কন্যার বিবাহ-ব্যাপারে অবস্থাকে অতিক্রম করিয়া যে পরিমাণ ঘটার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, সেই অনুপাতে ধনাঢ্য বরপক্ষের তরফ হইতে বিশেষ কিছু জাঁকজমকের পরিচয় পাওয়া গেল না। যাহারা ভাবিয়াছিল, খুব জমকালো মিছিল করিয়া যাত্রার দলের রাজার মত সাঁচ্চার পোষাক পরিয়া বর আসিয়া সভায় বসিবে, তাহারা যেন আকাশ হইতে পড়িল। পাল্কী হইতে নামাইয়া বরকে যখন সভায় বসান হইল, তখন সকলেই সবিস্ময়ে দেখিল, বরের পরনে বেনারসী ধুতি, গায়ে

তাহারই পিরাণ ও চাদর। বিশেষত্বের মধ্যে গলায় ঝুলিতেছিল, বড় বড় মুক্তার এক ছড়া দীর্ঘ মালা। বরের চেহারা দেখিয়া যাহারা বলিল—বেশ, কিছুক্ষণ পরে তাহারাই আবার ভাবভঙ্গী দেখিয়া বরপক্ষের অন্তরালে মত প্রকাশ করিল—বোধ হয় মাথায় আছে ছিট্।

কিন্তু শুভদৃষ্টির সময় এমনই এক অপূর্ব্ব ভাবে বরের চক্ষু দুইটি বিস্ফারিত হইয়া উঠিল যে, সেই মুহূর্ত্তেই তাহা বধূর মর্ম্মস্পর্শ করিল। বধূও ঠিক এই মাহেন্দ্রক্ষণে অন্তর্ভেদী উজ্জ্বল দৃষ্টিতেই বরের দিকে চাহিয়াছিল। তাহার মনে হইল, এই অপরিচিত মানুষটি যেন অতি পরিচিতের মতই সকরুণ দৃষ্টিতে তাহার অন্তরের দ্বারটি উদ্ঘাটিত করিয়া কোনও কাম্য বস্তুর সন্ধান করিতেছে। চণ্ডীর দীর্ঘায়ত চক্ষু দুটি পল্লবভারে ধীরে ধীরে অবনমিত হইল।

বাসরেও বর আসরের মত সকলের মনেই সংশয় তুলিল। মুখে কথা নাই, তীক্ষ্ণ উপহাস-বিদ্রূপে দৃক্পাত নাই, তরুণীদের লাস্যলীলায় তাহার মুখে হাসির কোন চিহ্নটিও কেহ দেখিল না। বাসর-সঙ্গিনীদের সকল প্রয়াসই যখন ব্যর্থ হইয়া গেল, বরের হৃদয়-বর্ম্ম ভেদ করিতে পারিল না, তখন তাহারা বেণাবনে মুক্তা ছড়ানো বিফল ভাবিয়া—মুক্ত অবগুণ্ঠন মাথায় তুলিয়া বাসর হইতে বাহির হইয়া গেল।

অবগুণ্ঠনের ভিতর দিয়া চণ্ডী এ পর্য্যন্ত বক্রদৃষ্টিতে বরের দিকে চাহিয়াছিল। মেয়েরা সকলেই চলিয়া গেলে সে মুখখানি অবগুণ্ঠনমুক্ত করিতেই বরের সহিত তাহার চোখোচোখি হইয়া গেল। শুভদৃষ্টির পর পরস্পরের পরিপূর্ণ দৃষ্টির এই পুনরায় সংযোগ।

বরই প্রথমে কথা কহিল, বালকের ন্যায় তরল কৌতূহলের সুরে প্রশ্ন করিল,—তোমার নাম বুঝি চণ্ডী?

বরের মুখে বালকসুলভ ভঙ্গীতে এই প্রশ্ন শুনিয়া চণ্ডী মনে মনে কৌতুক অনুভব করিয়া বিদ্রূপের সুরে অসঙ্কোচে কহিল,—হাঁ। তুমি বুঝি মনে মনে এই কটা কথা এতক্ষণ মুখস্থ করছিলে?

দুই চক্ষু অস্বাভাবিক উজ্জ্বল করিয়া বর কহিল,—বিয়ে করতে এসে বুঝি কেউ পড়া মুখস্থ করে!

বরের কথায় চণ্ডীর চক্ষুর ভ্রূ দুটি কুঞ্চিত হইয়া উঠিল, তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া প্রশ্ন করিল,—বরকে তা হ'লে কি করতে হয়?

মুখের ভঙ্গীর সহিত হাতের একটি অঙ্গুলী তুলিয়া বর উত্তর দিল,—চুপটি ক'রে বাবু হয়ে বসে থাকতে হয়।

অনুরূপ কৌতুকভঙ্গীতে চণ্ডী কহিল,—তাই বুঝি এতক্ষণ চুপটি ক'রে চোরটির মত বসেছিলে, সাত চড়েও কথা কও নি?

বর কহিল,—ওরা যে মেয়েমানুষ!

চণ্ডী কহিল,—আর আমি বুঝি পুরুষমানুষ?

বর এবার হাসিমুখে কহিল,—উহুঁ, তুমি যে আমার বউ।

চণ্ডী নিরুত্তরে নিষ্পলকনয়নে কিছুক্ষণ তাহার পার্শ্বে উপবিষ্ট সেই নির্ব্বোধটির মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার বুঝিতে বিলম্ব হইল না, নিষ্ঠুর অদৃষ্ট তাহাকে কাহার পার্শ্বে আনিয়া বসাইয়াছে; সঙ্গে সঙ্গে তাহার পৃষ্ঠে কে যেন চাবুক মারিয়া স্মরণ করাইয়া দিল, তাহার শ্বশুরের দেওয়া সোনার চাবুক আর সেই সঙ্গে তাঁহার কথা—আমার বাড়ীতে আছে একটা ভারি বেয়াড়া গাধা, সেটাকে সায়েস্তা করবে তুমি; সেই জন্যই এই চাবুক। চণ্ডীর দুই চক্ষু বিস্ফারিত হইয়া উঠিল।

পরক্ষণে তাহার মনে পড়িল, রাজকন্যা বিদ্যাবতীর গল্প। পণ্ডিতদের চক্রান্তে মূর্খ কালিদাসের সহিত তাহার পরিণয়-রহস্য! কিন্তু রাজকন্যা মূর্খ স্বামীকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন, আর সেই উপেক্ষিত মূর্খ কঠোর সাধনায় জয়পতাকাহস্তে বিদ্যামন্দিরের শিখরে দাঁড়াইয়া পণ্ডিতা পত্নীর দর্প ভাঙ্গিয়া দিয়াছিলেন। সেই পরীক্ষা কি আজ তাহাদের সম্মুখেও উপস্থিত!

চণ্ডীকে নিরুত্তর দেখিয়া বর তাহার দন্তপাটি বিকাশ করিয়া কহিল,—দেখো, আজকে আমার ভারি আহ্লাদ হচ্ছে, সত্যি।

উচ্ছেদ্য চিন্তাজাল যেন সবলে ছিঁড়িয়া ফেলিয়া চণ্ডী ব্যগ্রকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল,—কেন বল ত?

বর গভীর লজ্জায় হাত দুইখানি কচলাইতে কচলাইতে চণ্ডীর মুখের দিকে চাহিয়া কহিল,—এই তোমাকে বে ক'রে, তোমাকে দেখে, আর তোমার সঙ্গে কথা ক'য়ে—

চণ্ডী মুখ টিপিয়া হাসিয়া কহিল,—আমাকে তা হ'লে তোমার পছন্দ হয়েছে বল?

ধেৎ! আমার লজ্জা করে।

আচ্ছা, ও কথা না হয় থাক্; তা হ'লে আমার কথাগুলো ত ভাল লাগছে?

হুঁ; এমন ক'রে কেউ ত আমার সঙ্গে কথা কয় না!

কেন—বাবা?

বাবা ত' দেখলেই বকেন।

দেখলেই বকেন বুঝি? কিন্তু মা?

মুখে কিচ্ছু বলবে না, কিন্তু চোখ পাকিয়ে এমনি চাইবে, বাবা রে! তোমার মত কি চায় ভেবেছ, সে চাউনি—

শুধুই রাগ ক'রে চান, আদর-যত্ন করেন না মোটেই?

কেন করবেন বল ত? আমি যে মুখ্যু, মানুষ হয়েও গাধা, আমার ত গুণ কিছু নেই।

তুমি বুঝি পড়াশুনাও কিছু করনি?

নাঃ! করব কোত্থেকে? রোজ রোজ মাষ্টার আসত আমাকে পড়াতে, কিন্তু এমনই মজা, যে এক দিন আসত, আর তার টিকিও দেখতে পেতুম না—

কেন?

কি করবে এসে বল না? আমার মাথায় নাকি গোবর পোরা, ব'লত, ওর কিচ্ছু হবে না। কিন্তু তোমাকে বলি, আমার ভারি ইচ্ছে করত পড়তে—

নিজেই কেন পড়তে না?

পড়ব কি ক'রে? খোকা রাজা ছুটে এসে বই কেড়ে নিয়ে যেত; বলত, তুই পাগল, বই নিয়ে বসলে মাথা গুলিয়ে যাবে। আবার বাবাকে বলত, ওর কিছু হবে না।

খোকা রাজাটি তোমার কে?

জান না? আমার ছোট ভাই, ঐ যে নতুন মার কথা বললুম, তাঁর ছেলে। আমার নিজের মা ত নেই।

ও! বুঝেছি। আচ্ছা, বাবাকে তুমি কিছু বলতে না?

উহুঁ! খোকা রাজা তা হ'লে পিঠের চামড়া আস্ত রাখত না। এক এক দিন যা মারে—

মারে! তুমি না তাঁর বড় ভাই!

বড় ভাই হ'লে কি হয়—সেই যে রাজা হবে, তা বুঝি জান না?

সে কি? আর তুমি?

আমি যে বোকা, পাগল, জড়ভরত। তাই কেউ আমাকে ভালবাসে না, ভালকথা বলে না, তাই না তোমাকে এত ভাল লাগছে তোমার কথা শুনে! তুমি আমাকে ভালবাসবে ত?

চণ্ডীর বুকের ভিতর যে ঝড় বহিতেছিল, দুই হাতে তাহার গতি রুদ্ধ করিয়াই যেন সে বাষ্পার্দ্রকণ্ঠে কহিল,—বাসব বই কি।

অসহায় শিশুর মত আবদারের স্বরে বর কহিল,—ওদের মত মারবে না ত,—নতুন মার মত চোখ দিয়ে বকবে না বল,—এমনি ক'রে গল্প করবে আমার সঙ্গে?

কণ্ঠস্বর সংযত করিয়া চণ্ডী কহিল,—করব, তুমি যাতে সুখী হও, তাই করব আমি।

বিপুল উল্লাসের আবেগে বর কহিল,—সত্যি? বাঃ! তা হ'লে কি মজা হবে! আমি কিচ্ছু করব না, শুধু তোমার কথা চুপটি ক'রে ব'সে ব'সে শুনব।

চণ্ডী মুখে হাসি টানিয়া কহিল, তা শুনো। অনেক গল্প আমি জানি, তোমাকে সবই শোনাব, কিন্তু তোমাকেও আমার একটি কথা রাখতে হবে।

চণ্ডীর মুখের উপর চক্ষু দুইটি তুলিয়া জিজ্ঞাসু নয়নে বর চাহিয়া রহিল। চণ্ডী কহিল,—তোমাকে মানুষের মত মানুষ হ'তে হবে।

বরের মুখে কথা নাই, দুই চক্ষুর বিস্ময়ভরা দৃষ্টি পার্শ্ববর্ত্তিনী বধূর মুখেই নিবদ্ধ; সেই দৃষ্টি যেন প্রশ্ন করিতেছিল—সে আবার কি?

চণ্ডী তখন বিস্মিত বরকে রাজকন্যা বিদ্যাবতীর গল্পটি শুনাইয়া দিল। বর পরমাগ্রহে সে গল্প শুনিল। মূর্খ কালিদাস কঠিন সাধনায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি হইয়াছিলেন শুনিয়া বর ব্যগ্র উল্লাসে কহিল,—বাঃ! বাঃ! কি মজা! শুনে এমনি আহ্লাদ হচ্ছে আমার!

চণ্ডী স্বামীর দিকে পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া প্রশ্ন করিল,—তোমার ঐ রকম হ'তে ইচ্ছা করে না?

সহর্ষে বর কহিল,—আমার! হ্যাঁ, হয়। কেউ যদি আমাকে শেখায়, আমার ভার নেয়, সত্যি, আমিও তা হ'লে মানুষ হ'তে পারি।

দৃঢ়স্বরে চণ্ডী কহিল,—মানুষ তোমাকে হতেই হবে। আমি তোমার ভার নেব, এর জন্য আমি করব কঠোর সাধনা।

শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়।

কাচ-তন্তু

কাচ হইতে তন্তু উৎপাদন আরম্ভ হইয়াছে। এই তন্তু তুলা-তন্তু অপেক্ষা শক্ত। পশম বা তুলা-তন্তুর ন্যায় কাচতন্তুও কাযে লাগিবে। এই কাচতন্তু কেশরাজি অপেক্ষা ২০ গুণ ছোট। কাচের এই সূক্ষ্মতম তন্তুগুলিকে নানা বর্ণে রঞ্জিত করা চলে। অবশ্য কাচ গলাইবার সময়ই এই তন্তু প্রস্তুত করিতে হয়—

কাচ-তন্তু

বর্ণানুরঞ্জিত করিতে হয়। কাচতন্তুজাত বস্ত্র অত্যন্ত লঘুভার হয়। বৈদ্যুতিক তার প্রভৃতির জন্য ইহার প্রয়োজনীয়তা অত্যন্ত বেশী। কারণ, এই তন্তুজাত তার আগুনে পুড়িবে না। ওয়েলস্ ইলিনয় গ্লাস কোম্পানী এই তন্তু প্রস্তুত করিতেছে। কাচতন্তুজাত ব্যাগ প্রভৃতির মূল্য খুবই অল্প।

বিচিত্র-দর্শন বিমান

অপেক্ষাকৃত স্বল্পমূল্যে ও স্বল্প ব্যয়ে পরিচালিত বিমান নির্ম্মিত হইয়াছে। এই বিমান ৯০ অশ্বশক্তিযুক্ত মোটর দ্বারা চালিত এবং ঘণ্টায় ইহা ১ শত ৩২ মাইল পথ অতিক্রম করিয়া থাকে। সমগ্র বিমানটির ওজন ১ হাজার ৮ শত পাউণ্ড। অল্প ব্যয়ে এই বিমান পরিচালিত হইয়া থাকে।
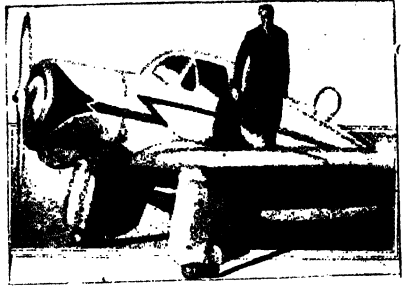
বিচিত্র-দর্শন বিমান

অভিনব জার্ম্মাণ মোটর-গাড়ী

জার্ম্মাণীতে সম্প্রতি একখানি দ্রুত ও দীর্ঘপথগামী মোটর-গাড়ী নির্ম্মিত হইয়াছে। এক যাত্রায় এই গাড়ী আড়াই হাজার মাইল পথ অতিক্রম করিতে পারিবে। ঘণ্টায় এই গাড়ী ৭৮ মাইল পথ চলিবে। এই শ্রেণীর যে গাড়ী ফ্রান্সে নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহা

অভিনব জার্ম্মাণ মোটর-গাড়ী

ঘণ্টায় ৬৪ মাইল চলিত। বাতাসের বেগ প্রতিহত করিবার ব্যবস্থা এই গাড়ীতে আছে।

নূতন ধরণের সাগর-পোত

হল্যাণ্ড আমেরিকা লাইনের জন্য একখানি ৩৩ হাজার টন জাহাজ নির্ম্মিত হইতেছে। উহা এমন ভাবে নির্ম্মিত হইবে যে,
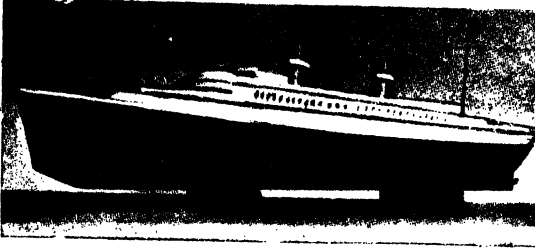
নূতন ধরণের জাহাজ

জলস্রোত ও বায়ুপ্রবাহের গতিবেগ তাহার গতিবেগকে বাধা দিতে পারিবে না। জাহাজের দৈর্ঘ্যতা ৭ শত ৫১ ফুট। উহা প্রস্থে ৮৮ ফুট। গভীরতা ৫৫ ফুট। ১১ শত যাত্রী এই জাহাজে স্থান পাইবে। জাহাজটিতে যাহাতে কোনও-রূপে আগুন লাগিতে না পারে, তাহার জন্য সর্ব্বপ্রকার ব্যবস্থা হইতেছে।

নৌ-বিভাগীয় রণ-বিমান
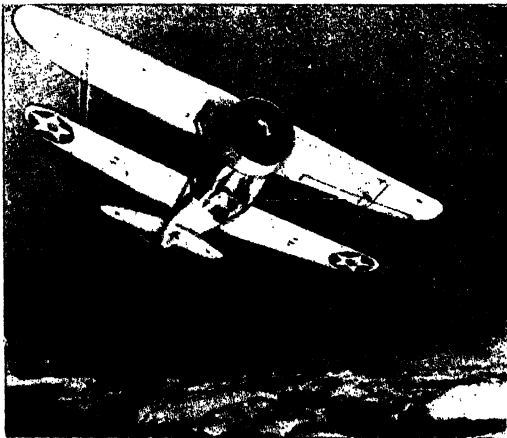
যুক্তরাষ্ট্রের নৌ-বিভাগের জন্য অধুনা এক শ্রেণীর রণ-বিমান নির্ম্মিত হইয়াছে। আকাশ পথে উহা যখন ধাবিত হয়, তখন উহার ভূমিতলে নামিবার চাকাগুলি দৃষ্টিপথের অতীত হইয়া থাকে, এমন ব্যবস্থা আছে। এখানে যে চিত্র প্রদত্ত হইল, আলোক-চিত্রকর, তাহা বিমানের শূন্য-পথে চলিবার সময় গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই রণ-বিমানগুলি নাকি বিশেষ কার্য্য-উপযোগী হইয়াছে।

নৌ-বিভাগীয় নূতন রণ-বিমান

অতি দ্রুতগামী বৃটিশ বিমান

রয়াল এয়ার ফোর্সের বিমানবিদ্ লেফটেনাণ্ট বুলম্যান নূতন রণবিমান চালনা করিয়া তাহার গতিবেগ দেখাইয়াছেন। জগতে এত দ্রুতগামী বিমান আর নাই। বাতাসের বিরুদ্ধ গতি-বেগে যাহাতে বিমানের গতিবেগ হ্রাস না পায়, এমন ভাবে এই বিমান নির্ম্মিত হইয়াছে। ছবি দেখিলেই বিমানের আকার বুঝিতে পারা যাইবে
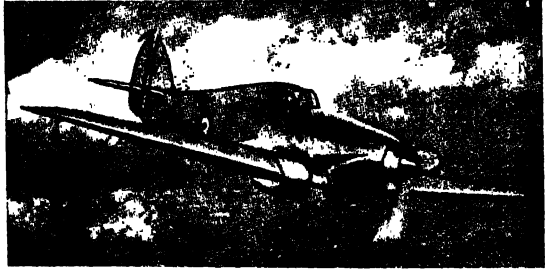
অতি দ্রুতগামী বৃটিশ বিমান

দেড় অশ্বশক্তিবিশিষ্ট দ্বিচক্রযান

এক গ্যালন তৈলে এই দ্বিচক্রযান এক শত মাইল পথ অতিক্রম করিবে। এই গাড়ীর চাকা ছোট,

দেড় অশ্বশক্তিবিশিষ্ট দ্বিচক্রযান

অথচ চড়িয়া আরাম আছে। দুইটি পেডাল গাড়ীকে চলমান করে, অথবা থামাইয়া দেয়। ডান দিকের পেডালটি ব্রেকের মত ব্যবহৃত হয়, বামদিকের পেডাল গাড়ীকে চালায়। এই গাড়ীতে দেড় অশ্বশক্তি বিদ্যমান। উহা ঘণ্টায় ২৫ মাইল বেগে ধাবিত হয়। উহার ওজন ১ শত ৭০ পাউণ্ড, দৈর্ঘ্যে ৮০ ইঞ্চি মাত্র।

বিষবাষ্প-প্রতিষেধক গ্যাস

প্যারীর এক জন বৈজ্ঞানিক বিষ-বাষ্প-প্রতিষেধক এক প্রকার গ্যাস লইয়া গবেষণা করিতেছেন। এই গ্যাস কালো গুঁড়ার ন্যায়—উহা সহজে ব্যবহার করা চলে। এই চূর্ণ বাতাসে ফুঁ দিয়া মিশাইয়া দেওয়া যায়। তাহার পর ইহার ক্রিয়া চলিতে থাকে।

বিষবাষ্প-প্রতিষেধক গ্যাস

একটা সমগ্র অট্টালিকার যাবতীয় অধিবাসীকে এই গ্যাস অনেক ঘণ্টা কাল বিষবাষ্পের প্রভাব হইতে রক্ষা করিবে। পরীক্ষাকালে একটা ইন্দুরকে কার্ব্বনিক অক্সাইড গ্যাসে প্রভাবিত করা হয়। তার পর উক্ত প্রতিষেধক গ্যাসের সাহায্যে ইন্দুরের প্রাণরক্ষা ঘটে। এই প্রতিষেধক গ্যাসের নাম অক্সিকার্বোজোম।

অন্ধকার রঙ্গালয়ে আলোকচিত্র গ্রহণ

অদৃশ্য আলোকের সাহায্যে অন্ধকারাচ্ছন্ন রঙ্গালয়ে আলোকচিত্র গ্রহণ করা যায়! দর্শকদিগকে বিন্দু মাত্র বিরক্ত না করিয়া
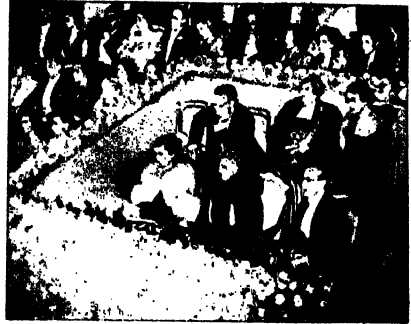
অন্ধকারে আলোকচিত্র গ্রহণ

একজন লোক ক্যামেরা সাহায্যে থিয়েটার-গৃহে রাণী মেরীর এই ফটোগ্রাফ তুলিয়াছেন। রঙ্গালয় তখন অন্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল। রাণী তখন রাজকীয় বক্সে বসিয়াছিলেন।

যুক্তরাষ্ট্রের আধুনিক ডেষ্ট্রয়ার

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের এই নূতন পোত-ধ্বংসকারী জাহাজ সম্প্রতি মেসাচুসেটস্‌এর কুইন্সিতে আনীত হইয়াছে। ইহার দৈর্ঘ্য ৩ শত ১২ ফুট। ডেষ্ট্রয়ার-জাতীয় পোতগুলির মধ্যে ইহা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ভূতপূর্ব্ব এডমিরাল উইলিয়ম্ ও মফেটের স্মৃতির উদ্দেশ্যে উহার ঐ নামকরণ হইয়াছে। ঐ দিনেই নিউইয়র্কে আরও একখানি ডেষ্ট্রয়ার বাহির করা হইয়াছে। ইহার ওজন ১৫ শত টন। প্রথমখানি অপেক্ষা ইহা ৩ শত ৮০ টন কম। দ্বিতীয়খানি লেফ্‌টেনাণ্ট এনড্‌ রয়েড কমিংসএর নামে পরিচিত।

যুক্তরাষ্ট্রের আধুনিক ডেষ্ট্রয়ার

রজ্জুবদ্ধ-বিমান-ধাবন

বিমান-চালকদিগের কৃতিত্ব দেখাইবার জন্ম নৌ-বিভাগের তিনখানি বিমানকে রজ্জুবদ্ধ করিয়া আকাশপথে ছাড়িয়া দেওয়া হয়।

রজ্জুবদ্ধ-বিমান-ধাবন
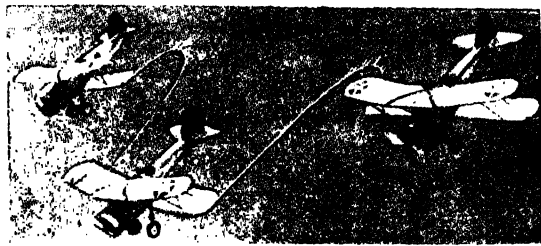
শৃঙ্খলার সহিত ঠিক ইংরেজি ভি অক্ষরের ন্যায় এই তিনখানি বিমান দীর্ঘপথ উড়িয়া ঠিক অনুরূপ শৃঙ্খলার সহিত ভূমিতলে অবতীর্ণ হয়। উড়িবার সময় বন্ধনরজ্জু একবারও ছিন্ন হয় নাই এবং তাহারা যথাবিধ শৃঙ্খলার সহিত মাটীতে নামিয়া আসিয়াছিল।
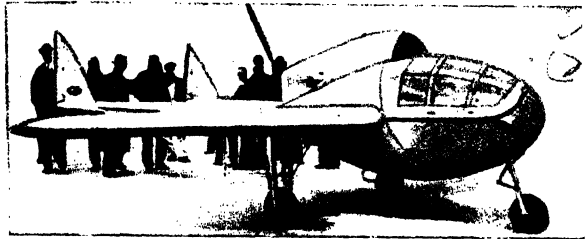
রসমোর পাহাড়ের অতিকায় মুণ্ড

রসমোর পাহাড়ে যে অতিকায় মুণ্ড ক্ষোদিত হইয়াছে, তাহার কাছে মিশরের স্ফিংকস্ মুণ্ড ক্ষুদ্র বলিয়া মনে হইবে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে, ওয়াসিংটনের মুণ্ডে যে নাসিকা আছে, স্ফিংকসের নাসিকা অপেক্ষা তাহা দুই ফুট দীর্ঘ। দশ হাজার টন পাথর কাটিয়া বাহির করিয়া তবে ওয়াশিংটনের নাসিকা ক্ষোদাই হইয়াছে। ৫ লক্ষ টন পাথর কুঁদিয়া তবে ওয়াশিংটন, জেফারসন্ ও লিঙ্কলনের মুণ্ড পাহাড়ে ক্ষোদিত হইয়াছে। পাঁচ মাস পরিশ্রমের পর ঐ কার্য্য সম্পাদিত হয়।

রস্মোর পাহাড়ের অতিকায় মুণ্ড

বিচিত্র-দর্শন বিমান

এই বিমান অপেক্ষাকৃত অল্পব্যয়ে নির্ম্মিত হইয়াছে। এই বিমানের পশ্চাদ্ভাগ ডিম্বাকার। এই ডিম্বাকার কক্ষের উপরিভাগে বিমান পরিচালনার জন্ম মোটর অবস্থিত। বিমানের পশ্চাতে এঞ্জিন স্থাপিত হওয়ায় পরিচালক চারিদিক ভাল করিয়া দেখিতে পায় এবং কক্ষের মধ্যে এঞ্জিনের শব্দও হ্রাস পায়। সেণ্ট জোসেফ্-এ এই বিমান নির্ম্মিত হইয়াছে। এক গ্যালন তৈলে এই পোত ২৫ মাইল চলে। ঘণ্টায় ইহা ১ শত ২৫ মাইল অতিক্রম করিয়াছিল। কেবিনের মধ্যে দুই জন আরোহীর স্থান আছে। হেডেন ক্যাম্বেল উহার নির্ম্মাতা।

বিচিত্র-দর্শন বিমান

ভাঁজ করা দ্বিচক্রযান

বিংশ শতাব্দীর নূতন বৈজ্ঞানিক দান এই বিচিত্র ভাঁজ করা দ্বিচক্রযান। বেশ করিয়া ভাঁজ করিয়া সাধারণ আকারের দ্বিচক্রযানকে থলির মধ্যে ভরিয়া মানুষ বেশ পদব্রজে যেখানে খুসী যাইতে পারে। এই দ্বিচক্রযান উদ্ভাবয়িতা এক জন ফরাসী ভদ্রলোক। ছবি দেখিলেই বুঝিতে পারা যাইবে, দ্বিচক্রযানকে ভাঁজ করিয়া উহার অধিকারী কেমন পথ চলিতেছেন। যখন ইচ্ছা হইবে,

ভাঁজ করা দ্বিচক্রযান

থলি হইতে বাহির করিয়া লইলেই হইল। তার পর উহাতে চড়িয়া যতদূর ইচ্ছা ভ্রমণ করা চলিবে।

গুরুভার বুদ্ধমূর্ত্তি

চৈনিক শিল্পপ্রদর্শনীর জন্য লণ্ডনে একটি গুরুভার বুদ্ধমূর্ত্তি আনীত হইয়াছে। উহাকে খাড়া করিতে প্রদর্শনকারীদিগকে অত্যন্ত অসুবিধায় পড়িতে হইয়াছিল। প্রদর্শনী হল-ঘরে ৫ শত ৫০ মণ ওজনের এই অতিকায় বুদ্ধমূর্ত্তি স্থাপন করিতে অনেক কসরত করিতে হইয়াছিল। এই মূর্ত্তিটি খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে নির্ম্মিত হইয়াছিল।

অতিকায় এবং গুরুভার বুদ্ধমূর্ত্তি

অঙ্গুলির ছাপ-পরীক্ষার ব্যবস্থা

অঙ্গুলির ছাপ বড় করিয়া মুদ্রিত করিলে সনাক্ত করিবার বিশেষ সুবিধা হইয়া থাকে। সেজন্য অঙ্গুলির ছাপ বড় করিয়া ছাপিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। ইহাতে অঙ্গুলির রেখাগুলির বক্রতা প্রভৃতি সহজে ধরা পড়িয়া যাইবে। যে যন্ত্রের সাহায্যে এই কার্য্য সম্পাদিত হইতেছে, তাহার সহায়তায় হাতের লেখা বা জাল নোটও ধরা পড়িয়া যাইবে।

অঙ্গুলির ছাপ-পরীক্ষার ব্যবস্থা

জীবন-রক্ষাকারী পরিচ্ছদ

এই পরিচ্ছদ রবারের নির্ম্মিত, ভিতরে গরম কাপড়ের আস্তর দেওয়া। রবারের একটা বন্ধনী গলদেশে এমন ভাবে সন্নিবিষ্ট যে,

জীবন-রক্ষাকারী পরিচ্ছদ

জল কোনও মতে প্রবেশ করিতে পারে না। উহা ধারণ করিলে দুই দিন অনায়াসে জলের উপর ভাসিয়া থাকা যাইবে এবং শীতে শরীরের কোনও অনিষ্ট করিতে পারিবে না। পরিচ্ছদের এক স্থানে খাদ্যদ্রব্য ও জল রাখিবার ব্যবস্থা আছে। সীসা পরিচ্ছদের সহিত এমন ভাবে সন্নিবিষ্ট যে, উহার সাহায্যে মানুষ উপর-দিকে মুখ রাখিয়া ভাসিয়া থাকে।

সৈনিকের পৃষ্ঠদেশে রেডিও যন্ত্র
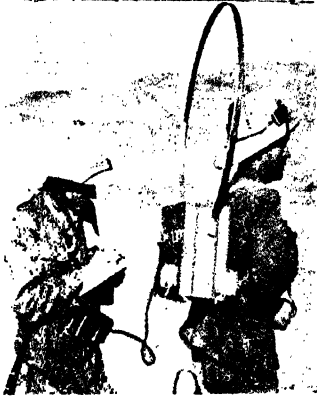
ইথিওপিয়ায় ইটালীয় সৈনিকগণ যাহাতে প্রধান সৈন্যশিবির হইতে সর্ব্বদা আদেশ জানিতে পারে, এ জন্য তাহাদের পৃষ্ঠদেশে রেডিও যন্ত্র সন্নিবিষ্ট করা হইয়াছে। এক জন সৈনিকের পৃষ্ঠে যন্ত্র থাকে, অপর জন তাহার পশ্চাতে থাকিয়া, প্রধান সেনাবাস হইতে যে সকল আদেশ বেতারবার্ত্তায় আসে, তাহা লিপিবদ্ধ করিয়া লয়। তদনুসারে অগ্রগামী ও পশ্চাদ্‌ভাগস্থ সেনা-দলকে পরিচালিত করিবার সুবিধা হয়।

সৈনিকের পৃষ্ঠদেশ-সংলগ্ন রেডিও যন্ত্র

বিমানপোতে ব্যবহারোপযোগী ছোট মোটর-সাইকেল

কোনও স্থানে বিমান যদি বাধ্য হইয়া ভূমিতলে অবতীর্ণ হয়, সেরূপ ক্ষেত্রে পোত-চালকের ব্যব-হারের জন্য ক্ষুদ্র মোটর-সাইকেল নির্ম্মিত হইয়াছে। এই মোটর দ্বিচক্রযান এমন লঘুভার যে, এক জন অনায়াসে তাহা বহন করিয়া লইয়া যাইতে পারে। বিমান-চালক ঐ ক্ষুদ্র মোটর দ্বিচক্রযানে আরোহণ করিয়া সাহায্যের জন্য তাড়াতাড়ি অন্যত্র যাইতে পারে। উক্ত যানের ওজন মাত্র ৯০ পাউণ্ড।

ছোট মোটর-দ্বিচক্রযান

হৃদ্‌রোগ-পীড়িতের উপযোগী দোলা-চেয়ার

সম্প্রতি এক প্রকার দোলা-চেয়ার বাহির হইয়াছে। উহাতে হৃদ্‌রোগপীড়িতরা বেশ আরামে থাকেন। ঐ দোলা-চেয়ার বৈদ্যুতিক শক্তিতে একবার উপরে উঠে, আবার নীচে নামে। অবশ্য অত্যন্ত ধীরে ধীরে। ইহার ফলে রোগীর রক্ত সমস্ত শরীরে সঞ্চালিত হয় এবং রোগীর হৃদযন্ত্র-সংক্রান্ত যন্ত্রণা প্রশমিত হইয়া থাকে।

হৃদ্‌রোগ-পীড়িতের উপযোগী দোলা-চেয়ার

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

স্রোতের মুখে

রোজা এখানে আছে ছ'মাস। আপনার খেয়াল-ভরে সে চলে! ফুল্লরা শাসন-নিষেধ তুলিত, এখন আর তোলে না। একবার রোজা বলিয়াছিল,—তোমার যদি সহ্য না হয়, আমাকে দাও পাঠিয়ে বোর্ডিংয়ে।...অন্য মেয়েরা যে-ভাবে মানুষ হচ্ছে, আমি কেন সে-ভাবে হবো না, এইটে আমি বুঝতে পারি না!

ফুল্লরার সময় আজ-কাল কম। স্কুল লইয়া সে মাতিয়া উঠিয়াছে। সেই সঙ্গে আরো পাঁচটা পাব্লিক কাজ আছে—মহিলা সমিতি, সংস্কৃতি পরিষদ, পল্লী-আশ্রম। বড় হইলে চারিদিক হইতে ডাক আসে। ফুল্লরার সে ডাক আসিয়াছে। সে ডাকে সাড়া না দিয়া থাকিবার উপায় নাই। এবং যে ভাবে ফুল্লরা নিজের মনকে গড়িয়া তুলিয়াছে, সংসারের দায়ে সে মনকে ডুবাইয়া দেওয়া চলে না—দিবার প্রয়োজন নাই।

সুশীল চাটার্জ্জী ও ফুল্লরা—যদি কেহ দুজনকে নিরীক্ষণ করিয়া কখনো দেখে,—একালের আইনের লাইন ধরিয়া, তাহা হইলে তার বুঝিবার বিলম্ব ঘটিবে না, পার্টনারশিপ বলিয়া যে-কারবার আছে, স্বামি-স্ত্রীর কাজ-কারবারে সেই পার্টনারশিপ পুরামাত্রায় বিদ্যমান। পার্টনাররা যেমন ব্যবসার স্থলে মিলিয়া মিশিয়া হাসি-মুখে কাজ করিয়া সন্ধ্যার পর নিজ নিজ নীড়ে ফিরিয়া যায়, এখানেও ঠিক তেমনি ব্যবস্থা! স্বামি-স্ত্রী সন্ধ্যায় পাশাপাশি বসেন। হাসি হয়, কথা হয়, বেশ সদ্ভাব আছে, কিন্তু এ মেলামেশার অন্তরালে পার্টনারদের যেমন স্বতন্ত্র সত্তা বিদ্যমান, তেমনি স্বামি-স্ত্রীর এ মেলামেশার অন্তরালে আপন-আপন বিশিষ্ট স্বতন্ত্র সত্তা আছে। তার মাঝখানে স্বামী বা স্ত্রীর প্রবেশ-লাভ ঘটে না।

অর্থাৎ স্বামী সুশীল চাটার্জ্জী সারা দিন তাঁর মক্কেল, এটর্ণি, ব্রীফ, আইনের কেতাব, কোর্ট লইয়া মাতিয়া মশগুল্ হইয়া থাকেন—সন্ধ্যায় আসিয়া স্ত্রীর কাছে একবার বসেন, দুটো হাসি গল্প চলে, তার পর আবার নিজের কাজের আহ্বানে দূরে সরিয়া যান; স্ত্রী ফুল্লরা তেমনি স্কুল, পল্লী, আশ্রম, মহিলা সমিতির পাঁচটা কাজ লইয়া তাহারি মধ্যে নিজেকে মগ্ন রাখিয়াছে! যেন রুটীনে বাঁধা লাইনে জীবনকে ছাড়িয়া দিয়াছে। নিত্য-চলার ফলে সে পথ আজ মসৃণ, সমতল; চলিতে কোথাও বাধা-বন্ধ বা হুঁচোট খাইবার সম্ভাবনা বা আশঙ্কা নাই! রোজাও এ সংসারে নিজের একটা বাঁধা পথ তৈয়ার করিয়া লইয়াছে এবং সেই পথে সে-ও চলিয়াছে নিঃশঙ্ক সঙ্কোচহীন স্বাধীন ভঙ্গিমায়!

গ্রীষ্মের ছুটীতে রোজা আসিয়া ফুল্লরাকে ধরিল, সে একবার শীলোন ঘুরিয়া আসিতে চায়। বহু দিন যায় নাই।

ফুল্লরা কহিল,—কিন্তু বড়দা কোথায়, কোনো খপর নেই, সেখানে কার কাছে যাবে?

রোজা কহিল,—আমার জানা লোকের অভাব নেই। বাবার বন্ধু-বান্ধব আছে, আমারো বন্ধু আছে।

ফুল্লরা কহিল,—বড়দা না বললে কোথায় পাঠাবো?

রোজা গম্ভীর দৃষ্টিতে ফুল্লরার পানে চাহিল। ফুল্লরা কহিল,—যাওয়া হতে পারে না। হাজার হোক্, তুমি মেয়ে মানুষ...

এইটুকু শুনিবামাত্র রোজা একেবারে ফোঁশ করিয়া উঠিল,—মেয়ে মানুষ!...মেয়ে মানুষ বুঝি মানুষ নয়?... ছেলেরা যেতে পারে, আর আমি পারি না?

এ কথায় ফুল্লরার মনে জাগিল নিজের ছেলেবেলাকার স্মৃতি! সেও ঠিক এই কথা বলিত।

মনে কেমন দ্বিধা জাগিল। কথাটা সত্য নয় কি? মেয়ে

মানুষ বলিয়া ঘরের মধ্যে বন্দী থাকিবে? পথে বাহির হইবে না? ভয়! কিসের ভয়? পুরুষ যদি নিজের ভার গ্রহণ করিতে পারে, মেয়েরাই বা কেন পারিবে না?

চট করিয়া রোজার কথায় সে কোনো জবাব দিতে পারিল না।

রোজা কহিল,—আমি যাবো পিশিমা। আমার বড্ড ইচ্ছা করচে! এখানে আমার ভারী একঘেয়ে লাগচে।

—একঘেয়ে!

রোজা কি ভাবিল, ভাবিয়া কহিল,—একঘেয়ে ঠিক নয়। মানে, কলকাতার কথা সেখানে গিয়ে সকলকে বলবার জন্য মন খুব চঞ্চল অধীর হয়েছে! কি জানি, কেবল মনে হচ্ছে, একটু চেঞ্জ!···তোমার কিসের আপত্তি,—শুনি?

কথার সঙ্গে সঙ্গে অত্যন্ত দরদ-ভরে যেন স্নেহ কামনা করিয়াই রোজা চাহিয়া রহিল ফুল্লরার পানে।

ফুল্লরার মন হইতে সকল বিমুখতা কোথায় যেন সরিয়া গেল। রোজা কথা শোনে না—ফুল্লরা যেমন ভাবে চায়, তেমন ভাবে সে থাকে না—এজন্য ফুল্লরার মনে সত্যই একটু বিরূপতা জাগিয়াছিল। এখন রোজার চোখের দৃষ্টিতে স্নেহের প্রার্থনা উপলব্ধি করিয়া তার প্রাণ দুলিয়া উঠিল। রোজা—এ রোজা তার ভাইয়ের মেয়ে! পর নয়—খুবই আপন-জন! এক রক্ত বহিতেছে দুজনের শিরায়—যাকে বলে, রক্তের সম্পর্ক!

রোজার মা খৃষ্টান! তাহাতে কি আসিয়া যায়? আমরা কত নীচু-জাতের দাস-দাসীকে যে স্নেহ করি! জাতি বা ধর্ম্ম মানিয়া স্নেহ-ধারা তৃপ্ত বা বঞ্চিত করে না!

এমনি চিন্তার তরঙ্গ বহিয়া ফুল্লরার মন···

সহসা রোজার স্বরে এ তরঙ্গ মিলাইয়া গেল। রোজা কহিল,—কিছু বলচো না কেন? রাগ করেছ আমার উপর? না, অভিমান? তোমার কথা শুনি না বলে? সত্যি পিশিমা, এবার থেকে তোমার কথা শুনবো, খুব লক্ষ্মী হবো—তুমি দেখো। বলো, আমাকে শীলোনে যেতে দেবে?

ফুল্লরা কহিল,—একলা তোমায় ছেড়ে দিতে পারবো না, রোজা···

রোজা কহিল,—কিন্তু জানো, শীলোনে আমি একা কত ট্রিপ করে বেড়িয়েছি!···এতখানি পথ···তুমি ভাবচো, আমার ভয় করবে! কিন্তু কিসের ভয়, শুনি? চোর? ডাকাত? রোজা উচ্চ-কণ্ঠে হাসিল।

চোর নয়, ডাকাত নয়—তাদের আক্রমণ অট্টরবে জাগিয়া ওঠে! তা নয়। পথে তাদের ভয় তত নাই, যত ভয় মিষ্টভাষী বিনয়াবনত কুশলী-দরদী বন্ধু-সাজে সজ্জিত পুরুষকে। হাসিতে বাঁশীতে মশগুল করিয়া এমন অব্যর্থ লক্ষ্যে ইহারা মর্ম্মভেদ করে যে গোড়ায় সে আক্রমণ বুঝিবার সামর্থ্য কাহারো থাকে না! শেষে ইহাদের মিষ্ট-হাসিমাখা আঘাত একেবারে সাংঘাতিক হইয়া ওঠে!

অথচ এ সব কথা লইয়া রোজার সঙ্গে তর্ক বা আলোচনা করা চলে না। ফুল্লরা কহিল,—তোমার পিশেমশায় আসুন, তাঁকে জিজ্ঞাসা করো, তিনি যা বলবেন,—তাই হবে!

—আবার পিশেমশায়! বেশ, তাই হোক!

কথাটা সেদিনকার মত এইখানেই বন্ধ রহিল।

পরের দিন। ফুল্লরা স্কুলে বাহির হইতেছে, সহসা ছবি আসিয়া হাজির।

ফুল্লরা কহিল,—আশ্চর্য্য! It is an age since you left. (তুই যাবার পর যেন যুগ বয়ে গেছে!)

হাসিয়া ছবি কহিল,—এত ঝঞ্ঝাটের মধ্যে ছিলুম সত্যি, তোকে একটা খপর দেওয়া উচিত ছিল! পারিনি ভাই···

ফুল্লরা কহিল,—আজ হঠাৎ মনে পড়লো যে! আবার কোনো episodes (কাহিনী) না কি? না, pure business (নিছক কার্য্যসূত্রে)?

ছবি কহিল,—তোর গাড়ী তৈরী দেখচি! বেরুচ্ছিস?

—হ্যাঁ! স্কুলে যাবো।

—বটে! শুনেছি, স্কুল খুলে তার পরিচর্য্যায় একেবারে মেতে উঠেছিস!

—একটা কাজ তো করা চাই! না হলে মানুষ বাঁচবে কি করে?

ছবি কহিল,—একটু বসবি নে? মানে, অবসর হবে না? সেখানে ক্লাশ পড়াবি?

ফুল্লরা কহিল,—তা নয়। তবে দুপুরবেলাটা একা বসে থাকতে ভালো লাগে না, এ একটা কাজ নিয়ে বেশ ব্যস্ত থাকি!

ছবি কহিল,—সত্যি ভাই, এ যেন penalty! লেখাপড়া শিখে সংসারে শিকড় গাড়তে না পারার শাস্তি এ। কাকেও

দেখছি, ছাড়লো না !···বোস্ না একটু···আমি আবার কাল হয়তো চলে যাবো ! আবার কবে দেখা হবে, তার কোনো ঠিক-ঠিকানা নেই !

ফুল্লরা বসিল, কহিল,—কোথায় আছিস এখন—শুনি !

ছবি কহিল,—তা ঘুরে এসেছি খুব ! মাদ্রাজ, বোম্বাই···

—সেই ক্যানভাশিংয়ের কাজে ?

—তাই !···কিন্তু তার আগে আর একটু খপর দেওয়া দরকার···

ছবির কণ্ঠ বাধিয়া গেল। দুই কপোলে লজ্জার রক্ত-আভা।

ছবি কহিল,—সেই শোভন বিশ্বাসের episode থেকেই আমি গা-ঢাকা দিই ! তোর মনে বোধ হয় কৌতূহলও কিছু জমে আছে ! মানে, সকালে তোর কাছে আসবো, ঠিক করেছিলুম। ব্যাঘাত ঘটলো ! সকালে ঘুম ভাঙ্গতে শুনি, একজন ভদ্রলোক এসে বসে আছেন ভোর থেকে। মুখ-হাত ধুয়ে বসবার ঘরে এলুম—দেখি, শোভন বিশ্বাস ! আমি চমকে উঠলুম।

ফুল্লরা কোনো কথা কহিল না—ছবির পানে শুধু নিঃশব্দে চাহিয়া রহিল।

ছবি বলিল,—ক্ষমা প্রার্থনার কি সমারোহ! Admirtion, enchantment মোহ ; ভ্রান্তি! এমনি কতকগুলো বড় বড় কথা বলে শেষে বলে, allow me please to make amends (প্রায়শ্চিত্ত করিতে দাও)! কি সে প্রায়শ্চিত্ত ? বললে, let us marry (বিবাহ হোক)!

বিস্ময়ে, ফুল্লরার দুই চোখ বিস্ফারিত হইয়া উঠিল। ফুল্লরা কহিল,—বিয়ে করেছিস ?

ছবি কহিল,—করিনি। করবো। বললুম, বিয়ের আগে তোমায় পরীক্ষা করবো।

—পরীক্ষা !

—তাই ! বললুম, এসো আমার সঙ্গে বোম্বাই। একটা কাজ পেয়েছি !···আসলে কাজ পাইনি—শুধু বোম্বাই ঘুরে আসা ছিল উদ্দেশ্য ! সে রাজী হলো। তাকে বললুম, We would live like strangers (দুই জনে অপরিচিতের মত থাকিব)—এ পরীক্ষায় যদি উত্তীর্ণ হও, বিবাহ করবো।

সবিস্ময়ে ফুল্লরা কহিল,—তার পর ?

হাসিয়া ছবি কহিল,—সে রাজী হলো। আমার মনে ছিল মস্ত অভিসন্ধি—শোধ দেবো খুব বেশী রকমের। পুরুষ মানুষ—পয়সা আর গায়ের জোর আছে বলে ভেবেছিল, চাইবামাত্র নারী-জাতটাকে আয়ত্ত করবে !···গেলুম বোম্বাই। দুজনে সেখানে আলাদা হোটেলে রইলুম। দেখাশুনা হতো, বেড়ানো, গল্প করা। শেষে একদিন বললুম,—আমি ফিল্মে নামবো ঠিক করেছি ! কলকাতায় থাকতে একজন ভাটিয়া ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। তিনি একদিন বলেন, ভদ্রমহিলাদের নিয়ে যদি ফিল্ম কোম্পানি ষ্টার্ট করা যায়, তাহলে আর্ট আর অর্থ—দুটো বস্তু একসঙ্গে লাভ হবে।···

ফুল্লরা কহিল,—তুই ফিল্মে নামচিস ?

—নেমেছি একটা বোম্বাইয়া ফিল্মে। "সতী অনসূয়া"—শ্রীমহালক্ষ্মী ফিল্ম কোম্পানির ছবি। দু'হাজার টাকা নেট্ লাভ হয়েছে।

ফুল্লরা যেন স্তম্ভিত ! ছবি কহিল,—যা বলছিলুম··· শোভন বিশ্বাস একদিন বললে, আর কত দিন প্রতীক্ষা করবো ? আমি বললুম—ফিল্ম-ষ্টারকে বিবাহ করবে ? সে চমকে উঠলো। বললে, ফিল্ম-ষ্টার ! আমি বললুম—হ্যাঁ ! সতী অনসূয়া ছবিতে আমি সতী অনসূয়া সেজেছি !···নিশ্বাস ফেলে শোভন বিশ্বাস দাঁড়িয়ে রইলো। আমি বললুম,—একটা কথা মনে রেখো মিষ্টার বিশ্বাস—পুরুষ মানুষ খেয়াল-ভরে চাইবামাত্র মেয়ে-জাতকে পায় না ; মেয়ে-জাতেরও খেয়াল আছে, মর্জ্জি আছে ! আমি বেছে নিয়েছি এই ফিল্ম কেরিয়ার—the way to fame and riches for women (মেয়েদের খ্যাতি ও সম্পদ লাভের এই পরম পথ)!

ফুল্লরা কহিল,—চলে এলো বিশ্বাস ?

—নিরাশ চিত্তে।

—বেচারী ! তোকে ভালোবেসেছিল, সত্যি।

ছবি হাসিল, কহিল,—ভালোবাসা !···তাতে সংসারে নন্দনের সৃষ্টি হয় না, ফুলু ! আগে চাই স্বাধীনতা—এবং সেই সঙ্গে পয়সা !···

বাধা দিয়া ফুল্লরা কহিল,—বিয়ের কথা যে বলছিলি !

ছবি কহিল,—বোম্বাইয়ে আলাপ হয় আনওয়ার-সাহেবের সঙ্গে। মস্ত ডিরেক্টর। তিনি যাচ্ছিলেন মাদ্রাজ। আমাকে এনগেজ করেন, "হংসবতী" ফিল্মে নামবার জন্য। তেলেগু ফিল্ম। নগদ তিন হাজার টাকা remuneration. ট্রেণে দুজনে আলাপ হলো···দুজনেই বুঝলুম,—যদি

একসঙ্গে এই ফিল্মে যোগ দিই···খ্যাতি আর অর্থ প্রচুর লাভ হবে। স্থির হয়ে গেল বিবাহ! তাই সাত দিনের ছুটী নিয়ে এসেছি। বিয়ে হবে লক্ষৌয়ে গিয়ে। আনওয়ারের বাড়ী লক্ষৌএ। তারপর দুজনের নাম, বুঝলি—ফেয়ারব্যাঙ্কস আর মেরি পিকফোর্ড!

—

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

নিঃসঙ্গতা

রোজা শীলোনে গিয়াছে। সুশীল চাটার্জী কোনো আপত্তি তোলেন নাই; তবে মাষ্টার মশায় রামগোপালবাবুকে রোজার সঙ্গে পাঠাইয়াছেন। লক্ষৌয়ে বিবাহ সারিয়া ছবিও কলিকাতা হইয়া মাদ্রাজে গিয়াছে।

ফুল্লরা বসিয়া বসিয়া অনেক কথা ভাবে। এই যে ঘটনাগুলা ঘটিতেছে—কাল-চক্রের আবর্ত্তন, সন্দেহ নাই! কিন্তু কোথায় কিসের পানে লক্ষ্য!

বিবাহ করিতে বাংলা দেশে ছবি পাত্র পাইল না—বিবাহ করিল লক্ষৌয়ের কোন্ আনওয়ার সাহেবকে! সুবিধা! জীবনটাকে সে আরামে কাটাইয়া দিতে চায়।

প্রশ্ন করিতে ছবি স্পষ্ট ভাষায় জবাব দিল—বিবাহের ফলে একগাদা ছেলেমেয়ে লইয়া তাদের পরিচর্য্যা—ইহাই যদি সংসারের আদর্শ হয় তো সে সংসারের কামনা মানুষ করিবে কিসের লোভে! প্রাতে উঠিয়া সেই রন্ধনের তদ্বির—সারাক্ষণ পুরুষগুলার পরিচর্য্যা করিয়া তবে মিলিবে দু'মুঠা অন্ন গিলিবার অবসর! তাও হয়তো তাহাতে পূর্ণ পরিতৃপ্তি মিলিবে না। সংসারে স্বামী দেবতা—স্ত্রীলোকের পরম গুরু; আর স্ত্রী তাঁর পদসেবা করিয়া পদে পদে শুধু আঘাত সহিবে! জীবন হইতে রূপ, রস, গন্ধের সকল চিহ্ন বিলুপ্ত করিয়া যন্ত্রের মত পড়িয়া থাকিবে! সে বিবাহ, সে সংসার, সে সুখে ছবির বিরাগ চিরদিন। এ-জীবন উপভোগের জন্য। আরাম, বিলাস,—জীবনের সার্থকতা শুধু তাহাতেই!

অকুণ্ঠিত স্বরে এ-কথা সে বলিয়া গেল।

বিবাহের উদ্দেশ্য শুধু ইহ-জীবনকে আরামে কাটাইবার জন্য সুযোগ-সংগ্রহে! সুখ শুধু এই আরামে!

তাই যদি তো পৃথিবীর সাহিত্যে সীতার মত স্ত্রীর সৃষ্টি কি করিয়া সম্ভব হইল! রাজার কন্যা! এই সীতা! রাজার বধূ সীতা! অথচ আরাম-বিলাস ত্যাগ করিয়া বনচারী স্বামীর সঙ্গে বনে চলিলেন! কত যুগের কত কবি সীতার এই দুঃখ-দারিদ্র্য বরণের স্তুতি গাহিলেন! সে স্তুতিগান তো কাহারো কাছে পুরানো হইল না—কোনো দিন কটু লাগিল না! ডেশডেমনা—কালো মুর ওথেলোর অমন পীড়ন কি করিয়া সে সহিল? পোর্শিয়া···

বেচারী পোর্শিয়া! স্বামী ক্রটাশ জানিয়া রাখিয়াছিল শুধু রোম! রোমের মুখ চাহিতে গিয়া পোর্শিয়ার মুখের পানে কতটুকু চাহিয়াছিল! তবু পোর্শিয়া কোনোদিন অনুযোগ তোলে নাই—অভিমানের বেদনাবিদ্ধ শরে স্বামীর চিত্ত কণ্টকিত করে নাই!

আরাম-উপভোগের সুযোগ সন্ধান করিয়া বুঝিয়া সুঝিয়া যদি স্বামী সংগ্রহ করিতে হইত, তাহা হইলে এতকাল ধরিয়া মানুষের গৃহ-সংসার, সমাজ টি'কিয়া আসিল কিসের জোরে!

নিজের কথা মনে পড়িল। সুশীল চাটার্জ্জীকে যে সে বিবাহ করিয়াছে,···কেন? সুশীল চাটার্জ্জী মস্ত ব্যারিষ্টার ···তাই? সে যে চিরদিন পণ করিয়া বসিয়াছিল, বিবাহ করিবে না। নিজের শক্তির উপর নির্ভর করিয়া জীবন অতিবাহিত করিবে! সে পণ কোথায় রহিল? বিবাহের সময় বড় গলা করিয়া বলিয়াছিল,—বিবাহ করিলেও নিজের সত্তা সে বিসর্জ্জন দিবে না। স্বামী থাকিবেন তাঁর career লইয়া, সে থাকিবে নিজের career লইয়া।

আজ পর্য্যন্ত সে অভীষ্টসিদ্ধির জন্য সে কি করিয়াছে? স্বামীর বিরাট ঐশ্বর্য্যপুটের তলায় নিরাপদ নিশ্চিন্ত নীড় রচিয়া পরম আরামে দিন কাটাইতেছে!

ইহাই যদি সাধ ছিল তো কিসের জন্য ডিগ্রী লইল? স্বামী সুশীল চাটার্জ্জী···তিনি তাঁর নিজের কাজ-কর্ম্ম লইয়া আছেন! বিবাহের পূর্ব্বে যে-কথা বলিয়াছিলেন, সে কথা নিষ্ঠা-ভরে রক্ষা করিতেছেন! আর সে?

কৃপাকৃতার্থ অন্তরে স্বামীর অনুকম্পা বহিয়া পড়িয়া আছে—বেচারীর মত!

স্কুল! এ তো ছেলেখেলা! বড় লোক স্বামীর স্ত্রী সে—তাই তাকে ডাকিয়া আনা হইয়াছে! স্বামীর খ্যাতি-মান ধরিয়া স্কুল তাহাকে অবলম্বন করিয়া নিজেকে প্রতিষ্ঠা করিতে চায়! বড়লোকের বাড়ীর চাকর-বেয়ারাদের সঙ্গে আলাপ করিয়া, তাদের খাতির দেখাইয়া এ যেন দরিদ্র প্রতিবেশীর বড় সাজিবার হাস্যকর প্রয়াস!

নিজেকে লইয়া সে কত কি করিবে, ভাবিয়াছিল; তার কোন্‌টা ঘটিল! শুধু বিপুল ঔদাস্যে-আলস্যে গা ঢালিয়া স্বামীর খ্যাতির প্রসাদভোগী হইয়া পড়িয়া আছে!

এর চেয়ে ছবির প্রাণ-মন লইয়া অজানার কোলে ঝাঁপ দিয়া এ্যাডভেঞ্চার-অভিযানও যে ঢের ভালো ছিল! তাহাতে জীবন আছে···সদা-জাগ্রত বেশে উজ্জ্বল, দীপ্তিমান্ হইয়া!

স্কুলের কাজে অবসাদ জাগিল। প্রাণহীন—প্রাণহীন পরিচর্য্যা! মন দিনে দিনে আকুল অধীর হইতেছিল। এমন সময় রোজার কাছ হইতে একখানি পত্র আসিল। সে লিখিয়াছে,—

পিশিমা, আমায় ক্ষমা করিয়ো। আমি এখন আরো দু'চারি মাস এই-খানে থাকিব। মাষ্টার মশায় বলেন,তাঁর পক্ষে অত দিন থাকা সম্ভব নয়; কাজেই তিনি কলিকাতায় ফিরিতেছেন। আমি ফিরিব দু'চারি মাস পরে।

বাবা এখানে নাই—জিবরালটার গিয়াছেন জরুরি কাজে। আমার সঙ্গে দেখা হয় নাই। মাসখানেক পরে ফিরিবার কথা—পাঁচজনের মুখে শুনিতেছি। বাবার সঙ্গে দেখা না করিয়া ফিরিতে ইচ্ছা হইতেছে না।

আশা করি, তুমি ও পিশেমশায় ভালো আছ। ভালোবাসার সহিত

তোমার প্রিয় ভ্রাতৃ-কন্যা
রোজা

সুশীল চাটার্জ্জী পত্র পাইয়া কহিলেন—জন্মভূমির মায়া! বেশ, যদি ইচ্ছা হয়ে থাকে তো দু'চার মাস থেকেই আসুক।

আরো পাঁচ-ছয় দিন পরের কথা।

মিসেস দত্ত আসিয়া বলিলেন,—ব্যাপার কি ফুল? কাল তুমি কমিটি মিটিঙে গেলে না? দরকারী কতকগুলা কাজ ছিল।

ম্লান হাস্যে ফুল্লরা কহিল,—আমার শরীর আর মন—দুটোই কেমন ভালো ছিল না, মিসেস দত্ত।

কুতূহলী দৃষ্টিতে ফুল্লরার পানে ক্ষণেক চাহিয়া থাকিয়া মিসেস দত্ত কহিলেন,—কেন বলো তো?

ফুল্লরা কহিল,—তা ঠিক বলতে পারি না। কেমন যেন অবসাদ!

মিসেস দত্ত কহিলেন,—ভাইঝীর জন্যে মন কেমন করচে, নিশ্চয়! তা, এ melancholia তো ঘরে বসে থাকলে সারবে না। এ রোগ সারে পাঁচজনের সঙ্গে মেলামেশায়।

ফুল্লরা কহিল,—কি জানি, আমার যেন বাড়ী থেকে নড়তে ইচ্ছা করে না!···দু'দিন বিশ্রাম নিই—তার পর একটু সুস্থ বোধ করলে যাবো'খন! এ রকম অসুস্থ পঙ্গু মন নিয়ে কোনো কাজ করা যাবে না।

মিসেস দত্ত কহিলেন,—সে কথা সত্য! তা বেশ, দু'দিন বিশ্রাম নাও তুমি।

কোর্ট হইতে ফিরিয়া সুশীল চাটার্জ্জী কহিলেন,—পরশু রেঙ্গুন যেতে হবে, ফুল!

রেঙ্গুন!

সুশীল চাটার্জ্জী কহিলেন,—একটা বড় মকর্দ্দমা পেয়েছি আজ। সেখান থেকে টেলিগ্রাম এসেছিল, এটর্ণি ম্যাকনিলের কাছে—তার দুজন বড় কৌঁশুলীর নাম করে জানিয়েছে—চায় উডষ্টক সাহেব আর সুশীল চাটার্জ্জীকে। দেবে পঞ্চাশ হাজার টাকা। প্রায় দেড় মাস থাকতে হবে। এত বড় লোভ সামলাতে পারিনি। তোমাকে না জানিয়ে জবাব দিয়েছি।

—অলরাইট।

—কালই টেলিগ্রাফিক-মনি অর্ডারে তারা পাঠাবে দশ হাজার টাকা। তাদের এজেণ্ট এখানে আছে কলকাতায়··· সিনাগগ ষ্ট্রীটে কে মা-পো—তার কাছে!

চমৎকার! জগতে সকলের সামনে পড়িয়া আছে বিশাল মুক্ত পথ! সে শুধু জন্ম লইয়াছে, বন্দী ভাবে এমনি অলস পড়িয়া থাকিবার জন্য!

হায় রে নারীর পণ! হায়,তার দুরাশা-স্বপ্ন! মনের মধ্যে একরাশ নিশ্বাস যেন ঘূর্ণী বেগে ফুঁপিয়া ফুঁপিয়া ফুলিয়া উঠিল।

সুশীল চাটার্জ্জী কহিলেন,—তোমার আপত্তি আছে—আমার রেঙ্গুন যাওয়ায়?

—না, না। সে কি! এমন কথা তো কোনোদিন ছিল না যে তোমার জীবনের পথে আমি তুলবো পাহাড়ের বাধা! তা নয়। তোমার মান, খ্যাতি, অর্থ,—তা থেকে তোমায় বঞ্চিত করবো আমি—বিবাহ-সূত্রে ভাগ্যক্রমে তোমার স্ত্রী হয়ে এ ঘরে এসেছি বলে'···?···না!

শেষের দিকে ফুল্লরার কণ্ঠ কাঁপিল।

সুশীল চাটার্জ্জী অবিচল দৃষ্টিতে স্ত্রীর পানে চাহিয়া রহিলেন। অভিমান? রাগ?

সেন্টিমেণ্ট! সেন্টিমেণ্ট ছাড়া এ আর কিছু নয়! মেয়েরা কতখানি সেন্টিমেণ্টাল, তাহা তাঁর জানিতে বাকী নাই!

[ক্রমশঃ

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

তোতা সয়তান

(চরিত্র-চিত্র)

প্রথম দৃশ্য

সুমতি। ওগো শুনছ! ঘরে চাল বাড়ন্ত।

সভাপতি। বেশ ত! ভাতে-ভাত চড়িয়ে দাও।

সু। কি জ্বালা, মা! বাড়ীতে এক কণা চাল নেই, বলে ভাতে-ভাত চড়িয়ে দাও! তাই দিচ্ছি। সকাল-সকাল নেয়ে এস—গরম-গরম খাবে।

স। তুমিও নেয়ে ফেল না—পেসাদ পাবে।

সু। নাইব বৈ কি! তিন দিন জ্বর আসছে, নাইব না!

স। তিন দিন! কৈ, আমি ত কিছু জানি নি!

সু। জানবে কি ক'রে? চব্বিশ ঘণ্টা পরের কাযে ব্যস্ত, ঘরের দিকে দৃষ্টি দেবার সময় কোথা? তা হক! আমার এ ম্যালেরিয়া জ্বর।

স। সে ত যমের দোসর।

সু। সে ত ভালই! তোমার তাতে ক্ষতি কি? বরং লাভ! পরের কাযে ঘোরবার অবসর বাড়বে।

স। সুমতি, তুমি অভিমান করেছ! কি জান—পরোপকার পরম ধর্ম্ম।

নেপথ্যে—রক্ষ মাং দক্ষিণা কালী, দক্ষযজ্ঞা, মোক্ষদায়িনী! ভায়া আছ?—সভাপতি?

স। স্মৃতিরত্ন-দা'? যাই।

স্মৃ। সব কুশল? আচ্ছা, তোমার এ সভাপতি নামটি নির্ব্বাচন করলে কে? অনেক দিন থেকে মনে ক'রে আছি জিজ্ঞাসা করব, কিন্তু বয়স-দোষে মনে থাকে না, ভুলে যাই।

স। দাদা, এ নাম আমার অন্নপ্রাশনের। বাবা দিয়ে গেছেন।

স্মৃ। সভাপতি নাম?

স। আজ্ঞে হাঁ—সভাপতি। আমাদের বংশের সনাতনী ধারা, পতি শব্দের যোগে নাম রাখা। যেমন শ্রীপতি, নৃপতি, বিশ্বপতি। ক্রমে পুরুষানুক্রমে সব পতিই শেষ হয়ে গেল। আমার বেলা বাকি রইল কেবল, দম্পতি, শালীপতি আর ভগ্নীপতি। পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে অনেক বাগ্-বিতণ্ডা, তর্ক-বিতর্কের পর শেষ সাব্যস্ত হ'ল—সভাপতি। এ নামে আমার নির্ব্যূঢ় স্বত্ব—কায়েমী দখল। কিন্তু আপনার ফিরতে এত দেরী হ'ল কেন?

স্মৃ। তার প্রথম কারণ, শ্রাদ্ধ-বাসরে অধ্যাপক-পণ্ডিত বিদায়ের ভার আমার উপর পড়ল। আরে রাম রাম!, বড় বড় পণ্ডিত, কিন্তু এক জনের মুখেও সংস্কৃত দেব-ভাষার বিশুদ্ধ উচ্চারণ শুনতে পেলুম না!

স। তবে ত বেজায় বিপদে পড়েছিলেন!

স্মৃ। আরে ভাই, বিপদ ব'লে বিপদ! দেব-ভাষার নাম সংস্কৃত, কি না শুদ্ধ ভাষা—তার বিশুদ্ধ উচ্চারণ চাই। বাঙ্গলার বেলা ত কোন কথা কই নি।

স। সত্য! ভাল পণ্ডিতের মুখে আমি বিশুদ্ধ চণ্ডীপাঠ শুনেছি। স্মৃতি-দা, সত্যই অপূর্ব্ব, কি সুমিষ্ট!

স্মৃ। হবে না! প্রত্যেক অক্ষরটি স্পষ্ট স্পষ্ট উচ্চারণ!

স। অনেকে বলে বোঝা যায় না।

স্মৃ। আরে দাদা! সদ্য বিলেত-ফেরতের উচ্চারণ বোঝে কার বাপে! বরং আহেলা বিলাতী সাহেবের কথা বোঝা যায় ত সদ্য বাঙ্গালী সাহেবের ইংরেজি উচ্চারণ! ও-বাবা!

স। ওরা বলে কি জানেন, স্মৃতি-দা, যদি বোঝাই গেল, তবে আর এত খরচ ক'রে, সাত সমুদ্র পারে গিয়ে ক'রে এলুম কি? আমি ইংরিজি কইব, যদি কেউ বুঝতে পারে, বাজি রাখতে রাজি আছি।

স্মৃ। ঠিক! আমি গোবর্দ্ধন স্মৃতিরত্ন, আমায় দেখে ঐ পঞ্চুসাহেব বল্‌লে, হ্যা লো গ্যাবারড্যানা!

স। আপনি কিছু বল্‌লেন না?

স্মৃ। বললুম, তোমার বাপ-ঠাকুর্দ্দা, ইতিপূর্ব্বে তুমি, পুরুষানুক্রমে যা ব'লে এসেছ, গোবর্দ্ধন-খুড়ো, তাই বল না কেন?

স। তা কি জবাব দিলে ?

স্মৃ। বললে—ইডিয়ট্ !

স। বটে, বটে ! সাদাসিদে নাম একটা বিট্‌কেল্ রকমে না দাঁড় করাতে পারলে, ওদের সবই বৃথা ! আমাদের বাংলা উচ্চারণ আর সংস্কৃত উচ্চারণে যখন এত প্রভেদ, তখন ও-কথা ছেড়ে দিন।

স্মৃ। ক্রমে পণ্ডিত-সভায় শাস্ত্রীয় বিচার আরম্ভ হলো। প্রথমেই পুরোহিত বল্‌লেন, আপনারা বিচার ক'রে বলুন, আমার গত যজমানের বিধবা পুনরায় বিবাহ করতে পারেন কি না ? এ প্রশ্ন তিনিই করেছেন। কিছু পূর্ব্বেই ষোড়শের বিনামার ভাগ-বাঁটোয়ারা নিয়ে তাঁর সঙ্গে আমার একটু বচসা হয়ে গিয়েছে। প্রশ্ন অতি গভীর। উপস্থিত পণ্ডিতমণ্ডলীর কেউ বল্‌লেন, গুরুর, কেউ বল্‌লেন পুরোহিতের।

স। বাঃ, প্রশ্ন বটে ! যেমন বেঁটে, তেমনি গেঁটে ! কি সিদ্ধান্ত হ'ল ?

স্মৃ। একটু ধৈর্য্য ধরতে হবে, ভাই। তুমুল তর্ক ! কিছুতেই আর মীমাংসা হয় না। আমার শিষ্য-পত্নীটি প্রখরা প্রতিভাশালিনী। তিনি অন্তঃপুর হ'তে দৃশ্য করলেন, গুরু-পুরোহিতের অধিকার ন্যায়সঙ্গত-বিচার করতে হলে, বিধবা-বিবাহ ভণ্ডুল হয়ে যায়। তিনি তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্রকে দিয়ে ব'লে পাঠালেন, দুজনকে দুপাটী ভাগ ক'রে নিতে বল। পুরোহিত প্রশ্ন করলেন, কার ভাগে কোন্ পাটী ? সদ্যো-বিধবা বল্‌লেন, তা যাঁর যে পাটী ইচ্ছা বা দরকার। তবে এক কথা মনে রাখতে হবে। যিনি দক্ষিণ পদ গ্রহণ করবেন, তিনি আর স্বতন্ত্র দক্ষিণা পাবেন না। আমি শিষ্যের জ্যেষ্ঠ পুত্রকে প্রশ্ন করলুম, কেন ? তিনি জবাব দিলেন, চটীর ডান পাটী প্রায় বাঁ-পাটীর ডবল। আমি জিজ্ঞাসা করলুম, এরূপ হবার কারণ ? জ্যেষ্ঠ উত্তর দিলেন, কেন, আপনি ত জানেন, তাঁর ডানপায়ে গলগণ্ড ছিল। কে এক জন অর্ব্বাচীন বল্‌লেন, পায় গলগণ্ড ? আমি দেখলুম, এ আবার এক ফ্যাকড়া। বললুম, না হবে কেন ? তবে আর কলিকাল বলেছে কিসের জন্য ? বেশ ! ঐ জুতই দক্ষিণাস্বরূপ গণ্য হবে।

স। তা যা বলেছেন, স্মৃতি-দা ! তার পর বিধবা-বিবাহ সম্বন্ধে কি স্থির হ'ল ?

স্মৃ। আমি বল্‌লুম, কালাশৌচ না গেলে, সপিণ্ডীকরণ না হ'লে ত কিছুই স্থির হ'তে পারে না। এখন এক বৎসর অপেক্ষা করতে হবে।

জ্যেষ্ঠ বললেন, মা বলছেন, শরীরের ভদ্রাভদ্র আছে। অনুকল্প বিধানে ছ'মাসেই সপিণ্ডীকরণ সেরে ফেল্‌তে হবে। আমাদের শাস্ত্রেই ত বিধান আছে— "সর্ব্বনাশে সমুৎপন্নে অর্দ্ধং ত্যজতি পণ্ডিতঃ।" এক বৎসর অপেক্ষা না ক'রে ছ-মাসে কাম সেরে ফেলা যায়; তাই কর্ত্তব্য। কেন না, মা এক বৎসরমধ্যে মারা যেতে পারেন; তাঁর মনোমত নির্ব্বাচিত পাত্র বেহাত হয়ে যেতে পারে, মারাও পড়্‌তে পারে। তাই "শুভস্য শীঘ্রং" বিধি।

স। ঠিক্ ত ! ত্রেতা যুগে রাবণ ঠকেছিল। তার পর এত দিন ধ'রে আমরা যে অভিজ্ঞতা লাভ করেছি, কিসের জন্য ? স্বর্গের সিঁড়িই যদি গড়্‌তে না পারব, তা হ'লে সবই বৃথা ! কিরূপ বিচার হল ?

স্মৃ। সভায় এক জন দিগ্‌গজ পণ্ডিত উপস্থিত ছিলেন। নাম শুন্‌লুম, গড়েঁশ গজানন ভস্‌ম-ভুষঁড়।

স। রসুন, রসুন, স্মৃতি-দা ! গণেশ গজানন ভস্মভূষণ। তিনি যে দিগ্‌গজ পণ্ডিত। গত বৎসর এম-এ, দিয়ে ফার্ষ্ট ক্লাশে ফার্ষ্ট হয়ে ডক্টরেটের জন্য থিসিস্ লিখছেন—

স্মৃ। হাঁ-হাঁ। তিনিই। বিধবা-বিবাহ সম্বন্ধেই থিসিস্ না থাইসিস্ কি লিখছেন, শুন্‌লুম বটে !

স। তিনি কি বল্‌লেন ?

স্মৃ। তিনি বল্‌লেন, বিধবা-বিবাহ কেবল শাস্ত্রসঙ্গত নয়, বেজায় শাস্ত্রসঙ্গত। এক টোলের অধ্যাপক অমনি ফোঁস্ ক'রে উঠ্‌লেন, প্রমাণ ? আপনি বোধ হয়, পরাশরের সেই পচা শ্লোক—"নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে" —এই প্রমাণ দেবেন ? গজানন বল্‌লেন, আমি তার চেয়ে বড় প্রমাণ দেব, যা হিঁদুর কাছে অকাট্য। বরং কুমারী-বিবাহই অশাস্ত্রীয়—অসঙ্গত। কেবল অসঙ্গত নয়, বেজায় অসঙ্গত। কুমারী-বিবাহ রঘুনন্দনের অদূরদর্শী, অপরিপক্ক মস্তিষ্ক-প্রসূত ! রঘুনন্দনকে ঐরূপ বলাতে আমার রাগ হয়ে

গেল। জিজ্ঞাসা করলুম, আপনার প্রমাড়ঁ? তিনি বললেন, আমার প্রমাণ শিববাক্য! মহানির্ব্বাণ তন্ত্রে মহাদেব বলেছেন—"অজ্ঞাতপতিমর্য্যাদামজ্ঞাত-পতিসেবনাম্। নোদ্বাহয়েৎ পিতা বালামজ্ঞাত-ধর্ম্মশাসনাম্॥" পরিণয় না হ'লে পতির সেবা-মর্য্যাদা বুঝবে কেমন ক'রে? আমি প্রশ্ন করলুম, আপনি বলছেন, কুমারী-বিবাহ অসঙ্গত, একমাত্র বিধবা-বিবাহই শাস্ত্র-সঙ্গত। কিন্তু একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে পারি কি? বিবাহ না হ'লে বিধবা হয় কিরূপে? ভস্ম ভূসঁড় বললেন, এর ব্যবস্থা হচ্ছে, বিবাহের পূর্ব্বে প্রতিনিধি পতি গ্রহণ ক'রে শিক্ষালাভ, তৎপরে বিবাহ।

তাই স্থির হ'ল। আমিও তাড়াতাড়ি বাড়ী রওনা হলেম।

স। ও, সেই জন্যে এত বিলম্ব?

স্ব। শুধু তাই নয়, ভায়া। যাত্রা নিশ্চয় অশুভক্ষণে করা হয়েছিল। অকস্মাৎ পদ্মা-বক্ষে তুমুল তুফান!

স। যাক্ দাদা, প্রাণটা যে বেঁচে গিয়েছে—এ কি! এও যে তুমুল কাণ্ড। পদ্মলোচন ব্যাকরণ সরস্বতী বশিষ্ঠ চাষার কাছা ধ'রে টেনে আনছেন কেন?

(পদ্মলোচন ও বশিষ্ঠের প্রবেশ)

পদ্ম। হারামজাদা চাষা—তুশ্চুড়িশ্চশাৎ। রাত দুপুরে অধ্যাপকের টোলে ঘুংরি-বালসা!

বশিষ্ঠ। মশাই, কাছা ছাড়ুন! নইলে ভদ্রসমাজে ব্যাভ্রম হব!

স। সরস্বতী-খুড়ো, ব্যাপারটা কি?

প। ব্যাপার পরে শুনবে। আগে বিচার কর। এই বেটা চাষা রাত দুপুরে আমার টোলে গিয়ে দোর ঠেলাঠেলি! বলে ঘুংরি-বালসা!

স্ব। ঘুংরি-বালসা নয়, ঘুংরি-বালসার ঔষধ। কেমন রে, বশিষ্ঠ?

ব। আজ্ঞে, ঠাকুর-মশাই! সভাপতি মশায় বললেন, পদ্মলোচনের টোলে কুরচি গাছ আছে, তার ছাল একটু এনে গলায় বেঁধে দাও, এখনি হাঁপের টান কমে যাবে।

প। বেটা গর্ভস্রাব! আজ তোর ঘুংরি-বালসার পিণ্ডদান, তোর কুরচির আদ্যশ্রাদ্ধ, আর তোর চৌদ্দ পুরুষের সপিণ্ডকরণ করে তবে কাছা ছাড়ব। বেটা—জড়দগব!

স্ব। তুমি বাপু ভুল করেছিলে। পশ্চিম পাড়ার পদ্মলোচনের টোলে কুরচি গাছ আছে। কেমন সভাপতি ভায়া?

স। আজ্ঞে তাই বটে, দাদা। সে কথা বিশেষ ক'রে ব'লে দিতে আমার ভুল হয়েছিল!

স্ব। তা না হয় ভুল করেই তোমার টোলে গিয়েছিল, খুড়ো! তাতে দোষ হয়েছে কি?

প। তুমি ত বেশ লোক হে, ভাইপো রত্ন! বুড়ো হলে, তবু আক্কেল হ'ল না? জেনে-শুনে ন্যাকা হচ্ছ? জান না, আমার ঘরে কালসাপ—দোজপক্ষের স্ত্রী।

স্ব। তা হলই বা দোজ পক্ষ, পদ্মলোচন খুড়ো! তা হলেই কি কুলে ভস্মার্পড়ঁ করতে হবে!

প। আরে কি তুমি আক্স, অক্স, আসম—অসম, কঁড়র, মড়র করছ। ও-সব আমরাও জানি! তবে ধরব—

"উক্ষারূঢ় গরলভক্ষ,
অক্ষমালা শোভিত বক্ষ
ভিক্ষালক্ষ, পিশাচপক্ষ,
রক্ষক ভবপারে!"

ম-ফলার উচ্চারণ শুনবে! তোমায় ছেয়ে দেব না—যস্মৈ কস্মৈ তথা তস্মৈ অস্মদ্ যুষ্মদ্ তথৈবচ। রুক্মিণী, পদ্মিনী লক্ষ্মী ধর্ম্মস্য সুক্ষ্মিকা গতিঃ!

এইবার মূর্দ্ধণ্য ণ ধরি—

কারড়েঁ করড়েঁ চৈব
মারড়েঁ, মরড়েঁ, রড়েঁ!
বাড়ীঁ, বীড়াঁ পাড়ি, বেঁড়ী,
রাঁড়ী প্রাঁড়ে, ভূড়েঁ তথা।

স্ব। বাপ্! ঘাট হয়েছে, খুড়ো, ক্ষমা দাও।

প। ফের! তবে আমিও ফিরে ফিরতি সুরু করি, মূর্চ্ছা ধরিয়ে দেব না! কিছু বলিনি বলে—বটে!
অপশ্মারে কুষ্মাণ্ডে বা ভস্মে ভীষ্মে তথা সমরে
তক্ষকে ভক্ষকে চাপি যথা পূর্ব্বং তথা পরম্॥

বশি। আপনারা মুখ চেপে ধরুন! আমার কাছা না ছাড়লে ছাড়্‌বেন না।

স্মৃ। ভায়া, ছেড়ে দাও, আঙুল কাম্‌ড়ে দেবে! খুড়ো এখন ক্রোধে উন্মত্ত!

বশি। দোহাই মশাইরা, ছাড়্‌বেন না!

প। চোপ ব্যাটা চাষা! ধর্ম্মনাশা, তুই বশিষ্ঠ কেন, বল্! বশিষ্ঠ! থান্ ইট মেরে মাথা ভেঙ্গে দিতে পারি, তবে গায়ের ঝাল মেটে!

বশি। আজ্ঞে, তা ভেঙ্গে দিন! এখন কাছা ছাড়ুন!

প। আগে বল্, তুই বশিষ্ঠ হয়েছিস কেন?

বশি। আজ্ঞে আমি হইনি। আমার বাবা হইয়েছেন। আমার পিতৃদত্ত নাম। আপনার ছি-চরণ পর্শ ক'রে বল্‌ছি—

প। দেখ চাষার পো! ভাল হবে না, বল্‌ছি! চাষার মুখে ছি-চরণ! সাধুভাষা! দেবভাষা! আর রত্ন-ভাইপো, তুমি তাই দাঁড়িয়ে শুন্‌ছ! বল্ ব্যাটা, রাত দুপুরে আমার টোলে ঢুকেছিলি কেন?

বশি। দোহাই বল্‌ছি, দা-ঠাকুর! কুরচি খুঁজ্‌তে!

প। কুরচি! ব্যাটা যমের অরুচি!

বশি। আমায় যে দিব্যি করতে বলবেন—

প। বল ব্যাটা, আমার পরিবার তোর কে?

বশি। আজ্ঞে, তিনি আমার ঠাকরুণ—

প। হারামজাদা সয়তান! শুনছ, সভাপতি, ব্যাটা মা-ঠাকরুণ বললে না!

স্মৃ। তা নাই বললে, খুড়ো!

প। নাই বল্‌লে! ব্যাটাকে খুন করেগা! লেয়াও লাঠি!

স। লাঠি আমার ঘরে নেই! দা আছে! আনব?

প। লেয়াও, আবি লেয়াও!

স্মৃ। তুমি ত আচ্ছা লোক, সভাপতি! ও এখন হচ্ছে শিয়াল—

প। হাঁ হাঁ! হাম্ হচ্ছে শেয়াল! আঁচড়ায়গা, কামড়ায়গা! খুন করেগা! ঘাড়ের রক্ত খাগা! চাষাকো খুন করেগা, দোজপক্ষকো খুন করেগা! রক্তগঙ্গা বহায়গা! দেখে গা, বামনীকো দেখে গা, স্ত্রী-হত্যা নেই মানে গা!

[পদ্মলোচনের প্রস্থান।

স্মৃ। দেখ ভায়া, তোমার সামান্য ভুলে কি কাণ্ড হয়ে গেল! বশিষ্ঠ, তুমি ত কাল রাত্রে খুড়োর টোলে গেছলে। তখন কিছু হাঙ্গাম্ না করে—

বশি। হাঙ্গাম করে নি আবার! লাঠি হাতে তেড়ে আসতেই আমি রড়্ দিলুম। আজ সকালে মাঠে শৌচে গিছি। সেইখান থেকে কাছা ধ'রে টেনে আনলেন।

স্মৃ। আচ্ছা ভায়া, ঐ উন্মাদ মানুষের হাতে তুমি দা এগিয়ে দিচ্ছিলে কি ব'লে! ক্রোধ চণ্ডাল, তখন কি হিতাহিত-জ্ঞান থাকে!

স। আমার অপরাধ কি, স্মৃতি-দা! উনি চাইলেন যে!

স্মৃ। চাইলেন ব'লে যে গলায় দড়ি দিতে চাচ্ছে, তার হাতে দড়ি এগিয়ে দেবে? যদি না তোমার হাত থেকে দা কেড়ে নিতুম, তা হ'লে যে একটা খুন-খারাপি হ'ত!

স। অতটা ভাবিনি, স্মৃতি-দা! আমি জানি, পারৎপক্ষে একজনের অনুরোধ রক্ষা করা কি উপকার করা পরম সৌভাগ্যের কথা!

স্মৃ। যাক্ ভায়া, পরোপকার করবার উৎসাহ, আগ্রহটা একটু খাটো কর। এই যে রাসবিহারী রেগে আসছে! ওর কোন উপকার করেছ না কি?

(রাসবিহারীর প্রবেশ)

রা। স্মৃতিরত্ন মশাই একটু দাঁড়িয়ে যাবেন। সভাপতি আজ কয়েক দিন আগে আমার কাছে গিয়ে বল্‌লেন, রাসবিহারী বাবু, এ বছর ঘরে ঘরে ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব, একটা ত বিধান করা উচিত! আমি বল্‌লুম, কি করতে চাও? সভাপতি বললেন, গ্রামের জলনিকাশ ভাল রকম হচ্ছে না, কয়েকটা খানা কেটে জলনিকাশের একটা ব্যবস্থা করতে পারলে জ্বর তাড়ানো যায়। আমি জিজ্ঞাসা করলুম, তা আমায় কি করতে বল? উনি বললেন, আপনার একটা জমির ওপর দিয়ে একটা পগার কাট্‌তে যদি দেন, তা হ'লে দেশের দশের উপকার হয়। দাসেরা দিয়েছেন, মিত্তিররা দিয়েছেন। আমার অপরাধ আমি স্বীকার হলুম। একটা পতিত ভূমি দেখিয়ে দিলুম। কেমন সভাপতি, জমি দেখিয়ে দিলুম কি না বল?

স। আজ্ঞে হাঁ! আমিও খানা কেটেছি কি না, বলুন!

রা। তা কেটেছ। কিন্তু কেবল ত খানা কাটনি, আমার গলা কেটেছ।

স্থ। কি রকম? কি রকম, রাসুবাবু?

রা। মশায়, একখানি চণ্ডীমণ্ডপ তুলব ব'লে একটি জমি ভরাট ক'রে চৌরস ক'রে রেখেছিলুম, উনি খানা কেটেছেন সেই জমির ওপর। আচ্ছা সভাপতি, তুমি ভরাট জমির উপর খানা কাটলে কি আক্কেলে?

স্থ। রাসুবাবু, তুমি কি জমি সভাপতিকে দেখিয়ে দাওনি?

রা। কেন দেব না? ওই বলুক না।

স। আমি কি অস্বীকার করছি? যে জমি উনি আমাকে দেখিয়ে দেন, সেটার ওপর ভারী জঙ্গল। সে আগাছা সাফ করতে অন্ততঃ একটি মাস সময় লাগ্‌ত।

স্থ। বেশ ত, ভাল, ওঁকে একবার তোমার বলা ত কর্ত্তব্য ছিল যে, ও-জমিটায় অসুবিধা কি!

স। তা কি না বলতুম! ওঁকেই জিজ্ঞাসা করুন না, উনি এখানে ছিলেন কি না?

রা। তা ছিলুম না বটে! বিশেষ দরকারে স্থানান্তরে যেতে হয়েছিল।

স। তবে? আমার দোষ কি বলুন না? আমি ভেবেছিলুম, যিনি এত বড় উদার, সহৃদয়, মহাত্মা যে, দশের কল্যাণে ভূমিদানে কৃতসঙ্কল্প, তিনি কি আর এ এ-জমিতে ও-জমিতে পক্ষপাত করবেন? তাঁর কাছে সব সমান। "পল্লী-কল্যাণ কমিটী"র সমস্ত সভ্যের মত নিয়ে এ কায করা হয়েছে। কথায় বলে, দশে মিলে করি কাজ, হারি জিনি নাহি লাজ।"

রা। ভায়া, তোমার লজ্জা যে নাই, সেটা আমি জানি।

স্থ। যাক্ রাসুবাবু! ভায়া যখন নিঃস্বার্থভাবে অনিষ্ট করেছেন, তখন খানাটা ওঁদের দ্বারাই বুজিয়ে নিয়ে রেহাই দাও।

দ্বিতীয় দৃশ্য

সুমতি ও সভাপতি।

সুমতি। ওগো শুনছ?

সভাপতি। বিলক্ষণ! শুনছি বৈ কি! কি বল না!

সু। তোমার এই পরোপকারের ঝোঁক, দশের কায করবার খেয়ালটা একটু কমাও! নইলে কোন্ দিন হয় তোমার হাতে দড়ী পড়বে, আর নয় আমাকে গলায় দড়ী দিতে হবে!

স। কেন, কি হয়েছে?

সু। আর লোকের গাল-মন্দ শুন্‌তে পারিনি!

স। কে গাল দেয়? রোজ বিকেলে কতকগুল মাগী আসে—কি করতে আসে তারা?

সু। তোমার যেমন নিঃস্বার্থ পরোপকার, এদের তেমনি নিঃস্বার্থ পরচর্চ্চা—পাড়ার মাগী-মিন্‌ষের কুচ্ছ করা।

স। আর তুমি তাই ব'সে ব'সে শোন?

সু। কি করব? আমার সময় কাটে কি ক'রে? তোমার দেখা পাই না যে দুদণ্ড কথা কব, সেবা করব; একটা গরু নেই যে, গো-মাতার সেবা ক'রে পুণ্য সঞ্চয় করব; একটা কুকুর-বেরাল নেই যে পালন করব; একটা পাখী-পক্ষী নেই যে যত্ন ক'রে পড়িয়ে সময় কাটাব; কি করি বল?

স। আচ্ছা, শীগ্‌গিরই আমি একটা উপায় করছি!

সু। রক্ষে কর! আর তোমার উপায় ক'রে কায নেই।

স। না, সুমতি! যখন মনে করেছি, তখন করবই!

সু। কি রকম উপায়? যেমন কাপড় রঙ্গিয়ে এনে দিয়েছিলে? ও-মা! নতুন রাঙ্গানো সাড়ী, একবার জলে ফেল্‌তেই ফরসা!

স। সে লোকটা যে এমন আনাড়ী জোচ্চোর, কেমন ক'রে জানব বল? সে বল্‌লে যে, মশাই, আমি খুব ভাল রং করতে জানি; একরঙ্গা বলুন, দোরঙ্গা বলুন, সব রকম জানি! মায় তেরঙ্গা চৌরঙ্গা পর্য্যন্ত করতে পারি।

স। আর তুমি অমনি বিশ্বাস করলে?

স। কি করব বল। মিথ্যে কথা কওয়া তার কায, বিশ্বাস করা আমার কায। দু'টতে গুলিয়ে ফেলছ কেন?

সু। তা জানি। তবু একটু খোঁজ-খবর নিতে হয়! কেউ তাকে জানে কি না, পাকা রং করতে পারে কি না, কোন খোঁজই ত করনি।

স। যা হয়ে গেছে, তার আর চারা কি? এবার ভাল রকম খোঁজ না ক'রে আর কোন কায করছি নি!

সু। তোমার মুখে কায শুনলে আমার গা শিউরে ওঠে! আর কারুর কাযে হাত দিয়ে কায নেই। আর লোকের

শাপ-মন্যি কুড়ুতে পারিনি। আমার আঁচল ভ'রে গিয়েছে!

স। কেন, কার কি করেছি?

সু। কিছু না! গরীব বিধবা, ভিক্ষে-শিক্ষে ক'রে তীর্থে যাবে ব'লে তোমায় মুরুব্বী ধরলে। তারা যাবে পশ্চিম, তুমি তাদের পুরীর গাড়ীতে তুলে দিয়ে এলে!

স। আমি কি জান্‌তুম সেটা পুরীর ট্রেণ?

সু। একটু খোঁজও ত নিতে হয়! ক্ষ্যান্ত পিসী ক'ড়ে রাঁড়ী! যেন বলেই ছিল, তোমাদের পল্লী-কল্যাণ কমিটীতে টাকা দেবে—

স। শোন শোন! শুধু তাই নয়! তার দেওর-ভাসুররা তাকে ঠকাচ্ছিল! তার শ্বশুরের বিষয়ের আয় মাসে হাজার টাকা, আর ও মাসহারা পেত মোটে ত্রিশ! এ-ত ফাঁকি দেওয়া!

সু। যাই হ্‌ক, তুমি তার মুরুব্বী হয়ে এমন মোকদ্দমা বাধিয়ে দিলে যে, গরীব বিধবা উদ্বাস্ত হয়ে এখন কাশীতে ভিক্ষে ক'রে খাচ্ছে।

স। বরাত ছাড়া পথ নেই, সুমতি! আমি চেষ্টা করলে কি হবে?

সু। কত বল্‌ব! পাড়ায় চোরের উৎপাত হ'ল। তোমরা দল গ'ড়ে পাহারা দিতে সুরু করলে। চোরের ভয়ে যত না হক, তোমাদের হাঁক্‌ডাকে পাড়া অস্থির। কেউ ঘুমুতে পেত না। শেষ এক জন নির্দ্দোষীকে চোর ব'লে ধ'রে জেলে দেবার উদ্যোগ। ভাগ্যিস প্রমাণ হ'ল যে, সে জমিদার-বংশের গুরু-পুত্র!—ওগো দেখ-দেখ, কেমন পাখী বেচ্‌তে যাচ্ছে!

স। দাঁড়াও দেখ্‌ছি! ঐটে তোমায় কিনে দেব। ওরে পাখীওলা!

(পাখীওলার প্রবেশ)

স। পাখী বেচ্‌বি?

পা-ও। এজ্ঞে! আপনি নেবেন?

স। নেব। রং-বেরঙ্গের ওটা কি পাখী?

পা-ও। ওটা পরোটা পাখী। বিলিতি ময়না! সে কালের তোতাপাখী।

স। বিলিতি ময়না, না, মাছরাঙ্গা? কথা কয় ত, বলে?

পা-ও। হুজুর, যা বলাবেন, তাই বল্‌বে, একবার যা শুন্‌বে, আর ভুল্‌বে? হুজুর পরখ করুন না!

স। নমস্কার! তুমি আছ কেমন?

তোতা। নমস্কার! তুমি আছ কেমন?

স। বাঃ! ঠিক আমার মত গলা। কত দাম?

পা-ও। হুজুর একশ'র এক পয়সা কম নয়। তবে আপনি পুরোপূরি পঁচিশই দেবেন।

স। পঁচিশ যে বড় বেশী হচ্ছে।

পা-ও। হুজুর, আগে গুণ পরখ করুন, তার পর দর দস্তুর। তোতা, একবার রসুন-চৌকি বাজাও ত!

[রসুন-চৌকি আলাপ ও পথে গোবর্দ্ধন স্মৃতি-রত্ন, পদ্মলোচন ব্যাকরণ সরস্বতী প্রভৃতি প্রতিবাসিগণের ভীড়।]

পদ্ম। পাখীটা পড়ে?

পা-ও। পড়ে! বিলিতি ময়না একবার যা কাণে শুনবে, তাই বল্‌বে!

পদ্ম। কই, বলাও দিকি, সহর্ণেঘঃ।

সভা। সহর্ণেঘঃ।

তোতা। সহর্ণেঘঃ। ক-চ-ট-ত-প। খ-ছ-ঠ-থ-ফ। গ-জ-ড-দ-ব। ঘ-ঝ-ঢ-ধ-ভ।

স্মৃতি। এ যে হুবহু বিদ্যাভূষণের মত কণ্ঠস্বর।

পা-ও। এ তোতা এক টোলে ছ' মাস ছিল।

পদ্ম। ওরে পাখীওলা! এ তোতা আমায় বেচবি?

স্মৃতি। তুমি নিয়ে কি করবে, খুড়ো?

পদ্ম। আমার টোলে কে আসে যায়, কি কথা কয়, সব হুবহু বল্‌বে ত?

স্মৃতি। বুঝেছি।

পদ্ম। কি কচু বুঝেছ?

স্মৃতি। তোমার দোজপক্ষের ওপর পাহারা থাক্‌বে ত?

পদ্ম। তাতে দোষ হয়েছে কি? ওরে বাপু, কত দাম?

পা-ও। ঠাকুরমশায়, পঁচিশ টাকায় হুজুর কিনেছেন।

পদ্ম। আমি তার ওপর এক আনা বেশী দেব। আচ্ছা, দু' আনা বেশী নে।

স্মৃতি। সভাপতি, গতিক ভাল নয়! যদি পাখী নেবার ইচ্ছা থাকে, বাড়ীর ভেতর পুরে ফেল।

সভা। এই নে পাখীর দাম। পাখী কি খায়?

পা-ও। ফল-পাকড়, পোকা-মাকড়, ভাত, রুটী সব খাবে। এক কায করবেন, হুজুর! রোজ পাখীকে ছান করিয়ে দেবেন।

সভা। নাইয়ে দেব?

পা-ও। এজ্ঞে হুজুর, নৈলে ওর স্ফূর্ত্তি থাক্‌বে না।

সভা। রোজ নাওয়াতে বল্‌ছ? জল লেগে পাখীর রং উঠে যাবে না ত?

পা-ও। রং উঠে যাবে কি, হুজুর! পাকা রং কি ওঠে!

সভা। আরে বাপু, থামো! ঢের পাকা রং দেখেছি! বড়বাজারের নাম-জাদা দোকান থেকে পাকা ছিট্ কিনে আন্‌লুম, তিন ধোপেই সাফ! মিয়াজানের দোকান থেকে পরিবারের জন্য সাড়ী রঙ্গিয়ে আনলুম, একবার জলে ডুবুতেই ফরসা!

স্মৃতি। তা ভায়া, পাখীকে ত আর তুমি ধোপার বাড়ী দিচ্ছ না যে, ভয় করছ!

সভা। তা বটে! তাই বলছি! সব খোঁজ-খবর নিয়ে কাম করা ভাল। সে সাড়ীর জন্য আজও আমি পরিবারের কাছ থেকে খোঁটা খেয়েছি, স্মৃতি-দা! ওরে বাপু পাখীওলা, তুই ত হিন্দু? আচ্ছা, এই ঠাকুরমশায়ের পা ছুঁয়ে বল্, নাওয়ালে পাখীর রং উঠবে না?

পদ্ম। সভাপতি, ওর কথায় প্রত্যয় করো না। কায়েতের ভাত খেলেই ওর রং উঠে যাবে।

স্মৃতি। ভয় নেই ভায়া, রঙ্গের জন্য আমি দায়ী

তৃতীয় দৃশ্য

স্মৃতি। ওহে সভাপতি, তোমার পাখীর রং ওঠেনি?

সভা। আজ্ঞে, আপনাদের আশীর্ব্বাদে ঠিক আছে, স্মৃতি-দা! আর কোন ভয় নেই ত, দাদা?

স্মৃতি। আর বছর অতীত হয়ে গেল। রোজ স্নান করাচ্ছ ত?

সভা। আজ্ঞে হাঁ।

স্মৃতি। তবে আর ভয় কি? পোষ মেনেছে ত?

সভা। আজ্ঞে, তা খুব! আমার স্ত্রীর কাছে ছাড়াই থাকে। কিন্তু পাখীটার স্ফূর্ত্তি নেই, স্মৃতি-দা!

স্মৃতি। কেন বল দিকি, ভায়া?

সভা। জানেন ত? আমার বাড়ীতে রোজ বিকালে মেয়ে-মজলিস্ বসে? তাদের সব কথা-বার্ত্তা কাণ খাড়া ক'রে শোনে! কিন্তু কোন কথায় পুনরুক্তি করে না। তারা বলে, পঁচিশ টাকা জলে ফেলেছিস, কায়েৎ-বৌ! পাখীটা বোবা! তুই সাধ ক'রে নাম রাখলি, তোতা! সব বৃথা হ'ল!

চতুর্থ দৃশ্য

সুমতি। ওগো, ওগো, শীগ্‌গির এস! তোতা উড়ে গেছে! ঐ ওদের বকুল-গাছে গিয়ে বস্‌ল।

সভা। উড়ল কেমন ক'রে?

সু। ডানা বার ক'রে।

স। আহা, তা ত জানি! ডানা বার ক'রে নয় ত কি ঠ্যাং ছড়িয়ে উড়বে? রোজ ত ডানা বার করে না, আজকে নতুন কি হ'ল যে ডানা বার করলে?

সু। আমাদের খিড়কীর বাগানে একটা ছেলে দোদমার আওয়াজ করতেই—

সভা। আহা, তুমি একেবারে কেঁদে ফেল্‌লে যে!

সু। তোমার মতন ত আমার পরোপকারী প্রাণ নয়, আর দেশের দশের কাযের বুকও নয়। আমাদের প্রাণে মমতা আছে, বুকে দরদ আছে। তুমি ত এক দিনের তরেও তাকে আদর করেছ, গা-মাথায় হাত বুলিয়েছ, মুখে খাবার তুলে দিয়েছ, তুমি কেমন ক'রে স্থির আছ, তাই ভাবি। ভগবান্ পেটে একটা দেননি যে, তাই নিয়ে থাক্‌ব। একটা পাখীর ওপর মায়া, তাতেও তোমার ঠাট্টা! ক্ষিদে পেলে হুবহু তোমার মত গলা ক'রে ডাক্‌ত—সুমতি!

সভা। তুমি চুপ কর, সুমতি! আমি যেমন ক'রে পারি, তাকে ফেরাব।

সু। ও-গো, ঐ শোন! ঠিক বিন্দু-ঠাকুরঝির মত গলা, বল্‌ছে—

মিত্তির গিন্নি, মিত্তির গিন্নি,
কর্ত্তা মলে দেবে সিন্নি।

ঐ শোন বল্‌ছে—

দাস গিন্নির দাঁত ফোক্‌লা,
কথা যেন কাঠের চোক্‌লা।

স। এ কে বলে ?

সু। শোননি, পুরুত-পিসির গলা !

ঐ শোন—

ভাত যোটে না বামুন মাসী,

কথায় মারেন লাখ পঁচাশি।

স। এ কে ?

সু। ও-পাড়ার ন-গিন্নী ! ঐ শোন ঠিক রাঙ্গা বৌয়ের গলা—

কান্তকাকা—পুণ্যির ঝাঁকা

পুরুত বাড়ী পেসাদ পেয়ে

পেন্নামী দেন মেকি টাকা।

ঐ আবার শোন—

স। আর শুনে কায নেই ! তোমরা ত এই সব শ্লোক রচে পরচর্চ্চা নিত্যি কর আর শোন !

সু। কি করব বল ? এক রকম ক'রে দিন কাটাতে হবে ত ? আমাদের ত আর পরোপকার-ব্রত নেই।

(স্মৃতিরত্নের প্রবেশ)

স্মৃ। (নেপথ্যে) সভাপতি ভায়া ! বেজায় গোল ! পাড়ার মেয়ে-মদ্দ সব হন্তে হয়ে চেলা কাঠ, ঝাঁটা হাতে ক'রে আস্‌ছে। তুমি এখন বেরিয়ো না।

(প্রতিবেশিগণের প্রবেশ)

পদ্ম। ধর্, ঐ বকা-বেটার কাছা টেনে। ছিষ্টিধর, খবরদার ছাড়িসনি ! ও বেল্লিক-বেটা সন্ধ্যার সময় সীঁথে কেটে, শিষ দিতে দিতে আমার টোলের চার ধারে ঘোরে কেন ? পাষণ্ড বেটা এক দিন ভেতরে ঢুকেছিল, দেশালাই চাইতে—চুরট খাবে ! বেটার মুখে আগুন ধরিয়ে দে।

আন্দখুড়ো। তবে রে শালা ষষ্ঠীদাস ! তোতার মুখে তোর পরিবারের গলা ! খুন করব !

ষষ্ঠীদাস। তুই আমায় খুন করবি ! কামড়ে তোর নাক ছিঁড়ে নেব না !

স্মৃতি। সভাপতি ভায়া, ষষ্ঠীদাস আন্দখুড়োর নাক কামড়ে ধরেছে ! বড় বেজায় হ'ল !

আন্দখুড়ো। ছাঁড় বেঁটা নাঁক, ছাঁড় !

পদ্ম। ছিষ্টিধর, ছেড় না ! ও-বেটাও পাজী ! বিধান জান্‌বার অছিলা ক'রে আমার টোলের মাটী চষে ফেল্‌লে !

গুট্‌কে ভট্‌চায। তোর বোন মেয়ে মজলিসে গিয়ে আমার কুচ্ছ ক'রে ছড়া শেখায় ! মল্, শালা, কাণ মল্ !

স্মৃতি। সভাপতি, বড় বেগতিক ! গুট্‌কে ভট্‌চায হীরু ঘোষালের ছুটো কাণই মুটো ক'রে ধরেছে !

গুট্‌কে। মল্, শালা, কাণ মল্ !

হীরু। তবে রে গুট্‌কে, কাণ মল্‌ব ! তোর লম্বা টিকি উপড়ে নেব না !

স্মৃতি-সভা। এদিকে ঘোষাল ধরেছে গুট্‌কের টিকি ! ভায়া, ও-দিকে হিড়িম্বা ঠাক্‌রুণ উমো বামুনীর ঝুঁটি ধ'রে ঝাঁটা পেটা করছে !

হিড়িম্বা। তোতাকে শিখিয়েছ, আমি পাড়া-বেড়ানী ! এই এক-ঘা, এই দু'ঘা, এই তিন-ঘা ! আমার ভাত জোটে না ! এই চার-ঘা।

উমো। ঝুঁটি ছাড়।

হিড়িম্বা। ছাড়ব ? দশ হাত মেপে নাকখত্তা দে !

উমা। নাকখৎ দেব ! তোর চোখ উপ্‌ড়ে নেব না ! দেখি তুই কেমন হিড়িম্বা ! তোর কোন্ ভীম এসে রক্ষে করে !

স্মৃতি। ভায়া, এবার পাড়ার মুরুব্বী হোড়্‌দং খুড়ো গুণো অধিকারীর চুলের মুটি ধরেছে !

পদ্ম। হোড়্‌দং চুল ধরলে হবে না, কাছা টেনে ধর ! তুমি বড় মানুষ, তোমার ভয় কি ! গুণো ব্যাটা আজ ক'দিন ধ'রে আমার খিড়কির পুকুরধারে ছিপ হাতে ক'রে ঘোরে !

সুমতি। ওগো, তোতা আবার কি বল্‌ছে শোন—

পরের মাথায় কাঁটাল ভেঙ্গে হোড়্‌দংএর ও টাকার কাঁড়ি।

ঘরের খবর সবার জানি ভেঙ্গে দেব হাটে হাঁড়ি।

স্মৃতি। ভায়া, সভাপতি, তোমার তোতা-পাখী না সয়তান ! তোতার শেষ ছড়ায় বাজী মাৎ ! হোড়্‌দং আগে পালালো ! পেছনে পেছনে মেয়ে-মদ্দ দল্‌কে-দল্ ! ভায়া, বেরিয়ে এস ! আর ভয় নেই ! আমি তোমার পাখী ধ'রে দিচ্ছি ! খাঁচায় কিছু খাবার দিয়ে দেখালেই সুড়সুড় ক'রে এসে ঢুক্‌বে। এখন বেপরোয়া পরোপকার কর। তোতা থাক্‌তে তোমার ভয় নেই ! মা ভৈঃ !

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বসু।
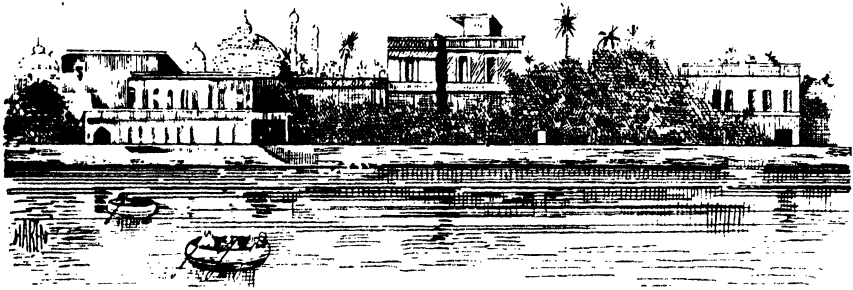
ফরাসী ইন্দোচীন

ইন্দোচীনের উত্তর সীমান্তে পার্বত্য বনভূমি বিরাজিত। এই অঞ্চল যেন পরীরাজ্য বলিয়া মনে হইবে। হাজার বৎসর পূর্ব্বে দক্ষিণী সঙ্ঘরা ইন্দোচীনে চাম বা আনামাইট-দিগের মধ্যে শান্তিস্থাপনের জন্য একটা কূটনীতিক দৌত্য প্রেরণ করিয়াছিল। সেই সময় উল্লিখিত উত্তর সীমান্তের রমণীয়তার কথারও তাহারা উল্লেখ করিয়াছিল।

মিঃ মেনার্ড ওয়েল উইলিয়মস্ নামক জনৈক মার্কিণ পরিব্রাজক মোটরযোগে ফরাসী-অধিকৃত ইন্দোচীন পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন। স্থানীয় গভর্ণর জেনারল পাস্কার, মিঃ উইলিয়মস্ ও আলেকজাণ্ডার আইয়াকভলেফকে সমগ্র অঞ্চলের পর্য্যবেক্ষণকার্য্যে সহায়তা করিবার জন্য আমন্ত্রণ করেন। তাঁহারা থাই, মান্, লোলো এবং মেও উপজাতি-দিগের অধ্যুষিত অঞ্চলগুলি সম্বন্ধে যাবতীয় জ্ঞাতব্য তথ্য সংগ্রহের জন্য নিযুক্ত থাকেন। উল্লিখিত উপজাতি-গুলি উত্তর সীমান্ত অঞ্চলের অধিবাসী।

টানকিন্ রঙ্গালয়

মিঃ মেনার্ড উইলিয়মস্ জনৈক স্থানীয় চলচ্চিত্র ফটোগ্রাফারের সহিত বর্ষণস্নাত প্রভাতে কাওবাং নামক অঞ্চলে যাত্রা করেন। আইয়াকভলেফ এবং জনেট, জিয়ান ইভেস্ ক্লেস নামক প্রসিদ্ধ প্রত্নতাত্ত্বিকের সহিত পূর্ব্বেই গন্তব্য স্থানে চলিয়া গিয়াছিলেন। উঁহারা মার্কিণ ঐতিহাসিক ও পরিব্রাজক মিঃ উইলিয়মস্কে পথিপ্রদর্শকরূপে সাহায্য করিবেন বলিয়া গবর্ণর জেনারেল ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন।

নির্দিষ্ট গ্রামে পৌছিয়া পরিব্রাজক স্থানীয় পার্কের ধারে অবস্থিত বস্ত্রাবাসে আশ্রয় গ্রহণ করেন। বৃষ্টি সত্ত্বেও নংস্, থেইস্, মানস্ প্রভৃতি উপজাতির প্রতিনিধিগণকে তিনি তথায় দেখিতে পান। এক জন উপজাতীয় লোকের হাতে তিনি সেকেলে বন্দুক দর্শন করেন।

কতকগুলি নেড়া মাথা নারীকেও তিনি তথায় দেখিয়াছিলেন। মুণ্ডিতশীর্ষ নারীদিগের মাথায় কাপড় ভাঁজ করিয়া বাঁধা ছিল। তাহাদের দেহে ভারী রূপার অলঙ্কারও ছিল।

কাও বাং এ পৌছিয়া মিঃ উইলিয়মস্ উপজাতিদিগের আলোকচিত্র গ্রহণ করেন, তিনি মোটর-গাড়ীতে ইগিয়াছিলেন। পার্ব্বত্য গ্রামগুলির নারীরা সহসা লোকলোচনে আসিতে চাহে না, নববর্ষের দিন শুধু তাহাদের দেখা পাওয়া যায়। এই নববর্ষকে দেশীয় ভাষায় "টেট্" বলে। অনেক সাধ্য-সাধনার পর কয়েক দল নারী আলোকচিত্র গ্রহণে সম্মতি জানাইল। মিঃ মেনার্ড উইলিয়মস্ এক জন সর্দ্দারের কন্যার ফটোগ্রাফ লইবার সুযোগ পাইয়াছিলেন।

এলং উপসাগরের একটা দৃশ্য

সুয়েন্‌বিন্ গ্রামে গিয়া মিঃ উইলিয়মস্‌কে বিশেষ বেগ পাইতে হইয়াছিল। সেখানকার ঐন্দ্রজালিক ও পুরোহিতগণ শাসকদিগের আদেশ মানিতে প্রস্তুত নহে। তাহারা দেবতাদের নির্দ্দেশ পালনের কথাই জানে।

উহাদিগের ফটোগ্রাফ লইবার কথা ছিল। কিন্তু তাঁহাদের আগমন-সংবাদ পাইয়াই তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ এমন ভাবে জপ তপে আসন গ্রহণ করিয়াছিল যে, সে সময় তাহাদিগের ধ্যান ভঙ্গ করা অপরাধজনক বলিয়া মিঃ উইলিয়মস্ মনে করিয়াছিলেন।

অবশেষে তিনি সদলবলে এক ঐন্দ্রজালিকার গৃহে গমন করেন। ইন্দ্রজালবিদ্যা ও ধর্ম্মের এমন অঙ্গাঙ্গী সংস্রব এ অঞ্চলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, তাহাতে বিস্মিত হইতে হয়। ফরাসী শাসকরা ইহাদের কোনও কার্য্য-ব্যবস্থায় হস্তক্ষেপ করেন না। কারণ, তাহাতে গোলযোগ বাধিতে পারে।

মিঃ উইলিয়মস্ সেই ভবনে চারি জন ঐন্দ্রজালিকাকে দেখিতে পান। চারি জনের মধ্যে তিন জন তরুণী। তাহাদের শিরোভূষণের উপর শাদা ফিতা আবদ্ধ। সকলেরই দেহে রেশমী পরিচ্ছদ। প্রত্যেকেরই হাতে একটি করিয়া তারের যন্ত্র। অঙ্গুলীর আঘাতে প্রতি তারে ঝঙ্কার তুলিয়া তাহারা মাঝে মাঝে দুলিয়া দুলিয়া স্তোত্র আবৃত্তি করিতেছিল। প্রত্যেক তারের যন্ত্র সর্পচর্ম্মের দ্বারা মণ্ডিত। চতুর্থ ঐন্দ্রজালিকা একটু দূরে উপবিষ্টা ছিল। একটি

ধূপদানীতে সুগন্ধি বাষ্প উত্থিত হইতেছিল। এই ঐন্দ্রজালিকা একটি মালা ফিরাইতেছিল। একটি পালিশকরা ক্ষুদ্র পাত্রে সে মাঝে মাঝে লোহিতবর্ণের তরল পদার্থ ঢালিয়া দিতেছিল এবং চায়ের-পেয়ালা মুখে তুলিয়া ধরিতেছিল। ঐন্দ্রজালিকার কালো দন্তশ্রেণী কিন্তু দেখা যাইতেছিল না। ঐন্দ্রজালিকা খুবই তাম্বুল-ভক্ত।

মিঃ উইলিয়মস্ যতক্ষণ সেখানে ছিলেন, ঐন্দ্রজালিকারা একবারও তাঁহার দিকে ফিরিয়া তাকায় নাই। যেন তাহারা কোনও মানুষের উপস্থিতি পর্য্যন্ত অনুভব করে নাই, এমনই একাগ্রভাবে মন্ত্রোচ্চারণ করিয়া যাইতেছিল। অতঃপর তাঁহারা সেখান হইতে নিঃশব্দে প্রত্যাবর্তন করেন।

শ্যামদেশের কৃত্রিম শবশোভাযাত্রা

হানই ফরাসী ইন্দোচীনের রাজধানী। দেশীয় রাজপথগুলির দুই ধারে স্বর্ণকার, কুমার, রেশমী কাপড়ওয়ালা, হস্তিদন্ত প্রভৃতির দোকান। সহরের মধ্যস্থ হ্রদের ধারে চায়ের দোকানে নৃত্যগীত ও বাদ্যযন্ত্রের সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যাইবে।

হ্রদের এক দিকে পুষ্পাভরণা তরুণীরা বৃক্ষতলে কলহাস্যে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। তাহাদের টুপীতে ফুলের মালা, হাতে ফুলের তোড়া। হানই-এ শীতের প্রভাব মন্দ নহে।

আনাম নারীরা অত্যন্ত তাম্বুলপ্রিয়। পাণের রসে তাহাদের দন্তপংক্তি কালো হইয়া থাকে। তবে ইদানীং কোন কোন তরুণী মুক্তাসদৃশ সমুজ্জ্বল দন্তপাতি রাখিতেছে।

মিঃ উইলিয়মস্ রাজধানীতে জনৈক রাজপুত্রের ভবনে অতিথি হইয়াছিলেন। সেখানে তরুণী নর্ত্তকীরা বীণা বাজাইয়া নৃত্যগীতে তাঁহাদিগকে পরিতৃপ্ত করিয়াছিল। রাজকুমারের নাম প্রিন্স বু লায়েম্। তাঁহার কন্যা কাইয়ু নিহ বেশ সুন্দরী।
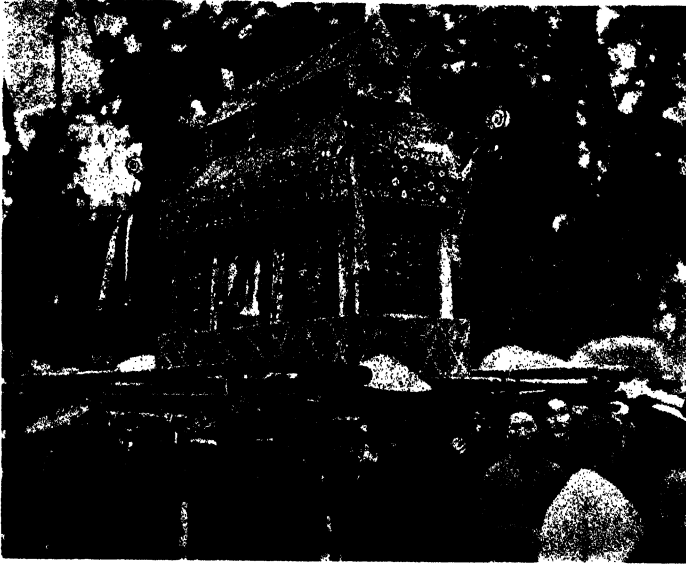
মিঃ উইলিয়মস্ ইন্দোচীনের নৌজীবন সম্বন্ধে লিখিয়াছেন:—"এক দিন অপরাহ্নে ছায়াচ্ছন্ন খালের ধারে আমি গিয়াছিলাম। গণ্ডোলা জাতীয় একখানি সাম্পান লইয়া দুই জন দাঁড়ি সেখানে আসিল। খালে তেমন স্রোত ছিল না। নানা জাতীয় জলজ গুল্ম জলের উপর ভাসিতেছিল। নৌকায় চড়িয়া আমি নীরবে শান্ত জীবনের আস্বাদ পাইলাম।"

হিউ ইন্দোচীনের আর একটি প্রসিদ্ধ সহর। একটি প্রাসাদোপম অট্টালিকায় এক যাদুঘর আছে। এই যাদুঘরে বহু মূল্যবান বস্তু সংগৃহীত হইয়াছে।

এই নগরে প্রতীচ্য দেশ হইতে বাও-দাই প্রত্যাবর্তন করেন। তাঁহারই চেষ্টায় আইন সুসংস্কৃত হইয়াছিল। তিনিই জাতীয় শিক্ষা-সংসদ গঠন করেন। দেশের বহুবিধ উন্নতিকর ব্যাপারে তিনি আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন।

স্বর্ণ-খচিত পরিচ্ছদে দেহ আবৃত হইলেও, তিনি নগ্নপদ

ইন্দোচীনের পুরুষবেশী তরুণী ভোজনে ব্যাপৃতা

আনামাইট অভিনেত্রী

পীতবসন-পরিহিত বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর দল

টনকিন পার্ব্বত্য কিশোরীত্রয়

টনকিনের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার দৃশ্য

চারি জন ঐন্দ্রজালিক

প্রজাবৃন্দের সেবকের স্থান গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি প্রথমেই বালিকাদিগের জন্য একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন এবং ব্যবসা-বাণিজ্য শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করেন। এত দিন নারীর জন্য কোন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান এখানে ছিল না, পুরুষরাই শুধু শিক্ষা পাইত।

অপার টনকিনের ভাঁড় অভিনেতা

ইন্দো-চীনের রাজস্ব হইতে একটা মোটা টাকা শিক্ষার জন্য ব্যয়িত হইয়া থাকে। চীনা, সংস্কৃত এবং পালি ভাষায় প্রাচ্যধর্ম্ম ও দর্শনের শিক্ষা ব্যবস্থার সহিত প্রতীচ্য বিজ্ঞানও শিক্ষার ব্যবস্থা আছে। তবে দেশবাসীরা যাহাতে তাহাদের চিরাচরিত অভ্যাস, চিন্তাধারা ও জীবনযাত্রা হইতে বঞ্চিত না হয়—দেশীয় বৈশিষ্ট্য-ভ্রষ্ট না হয়, সে দিকেও শিক্ষাবিভাগের পরিচালকবর্গের বিশেষ দৃষ্টি আছে।

হিউ হইতে পরিব্রাজকগণ আঙ্গকর অভিমুখে যাত্রা করেন। লেয়স পার্ব্বত্য প্রদেশ অতিক্রম করিয়া, মেকং নদ পার হইয়া কাম্বোডীয় অরণ্যের মধ্য দিয়া তাঁহাদিগকে অগ্রসর হইতে হইয়াছিল। প্রথম রাত্রি তাঁহারা সাভান্না-খেটএ যাপন করিয়াছিলেন। সেখানকার কমিশনার ও ম্যাদমসেল দেত্রী তাঁহাদিগকে সমাদরে অভ্যর্থিত করেন।

লায়োটিয়ানরা কুলীর কার্য্য করিতে সম্মত হয় নাই। সে জন্য সমতল ক্ষেত্র হইতে আনামাইট কুলীদিগকে সংবাদ দিয়া আনিতে হইয়াছিল। আনামাইটরা লায়োটিয়ান-দিগকে জীবনসংগ্রামে পরাজিত করিতেছে। লায়োটিয়ানরা আদিম অধিবাসী; কিন্তু তাহারা অত্যন্ত গর্ব্বিত। এ জন্য পৈতৃক জমি হইতেও ক্রমশঃ তাহারা বঞ্চিত হইতেছে। লাওয়সরা দেখিতে সুন্দর এবং তাহাদের কার্য্যও ভঙ্গীযুক্ত।

সহরের এক প্রান্তে একটি প্যাগোডা অবস্থিত স্থানটি সাধারণতঃ নির্জ্জন। শত শত নারী ঐ প্যাগোডায় যাইবার পথে পুষ্পমুকুল প্রসারিত করতলে রাখিয়া দাঁড়াইয়াছিল। মিঃ উইলিয়মস্ আলোকচিত্র তুলিবার জন্য সেখানে গমন
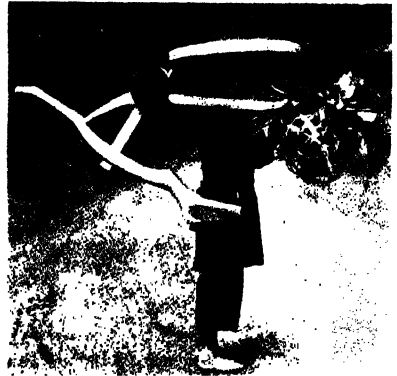
লাঙ্গল স্কন্ধে টনকিন নারী

পায়ের লড়াই—ইন্দোচীনের অভিনব আমোদ
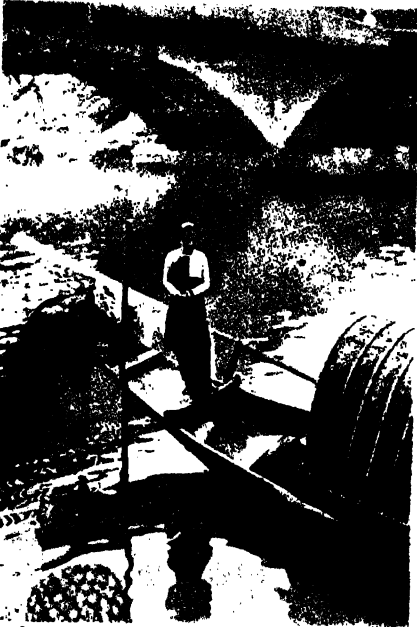
করিয়াছিলেন। কিন্তু কমিশনার দেত্রীর চেষ্টা সত্ত্বেও যতক্ষণ নারীরা তাহাদের পূজা সাঙ্গ না করিয়াছিল, ততক্ষণ আলোক-চিত্র গ্রহণের কোনও সুবিধা হয় নাই। পুষ্পমুকুলগুলি দেবতার উদ্দেশে অর্ঘ্য না দেওয়া পর্য্যন্ত নারীরা ললাটে যুক্তকর রাখিয়া সোজা দেবতার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া দাঁড়াইয়াছিল। অর্ঘ্য নিবেদিত হওয়ার পর তাহারা স্বাভাবিকভাবে পরস্পরের সহিত কথাবার্ত্তা কহিয়াছিল।

আনামের আধুনিকা নারী

উল্লিখিত উৎসবকালে দুই জন বলিষ্ঠ যুবক পা তুলিয়া পরস্পরের বল পরীক্ষা করিয়াছিল। সেই সময় অর্দ্ধনগ্ন পুরুষ এবং সমুজ্জ্বল-বেশধারিণী নারীরা প্যাগোডার চারি-দিকে বৃত্তাকারে দাঁড়াইয়াছিল। মন্দিরের পাদদেশে ত্রিশ জন বাদক যন্ত্র বাজাইতেছিল।

সাভান্নাখেটএর সন্নিহিত স্থানে বুনো হাতীর খুব দৌরাত্ম্য ঘটিয়া থাকে। অজগর সর্পেরও বাহুল্য এই অঞ্চলে যথেষ্ট। অজগর সর্পের চর্ম্ম দ্বারা আধুনিকা নারীর পাদুকা প্রস্তুত হইয়া থাকে। এক এক জোড়া পাদুকার মূল্য এক ডলার। মিঃ উইলিয়মস্ কিন্তু তাঁহাদের গমনপথে ব্যাঘ্র, বুনো হাতী বা অজগর সর্প একটিও দেখিতে পান নাই।

পাক্‌সে হইতে পরিব্রাজকরা মেকং পার হইয়া ওয়াটফু অভিমুখে যাত্রা করেন। এইখানে এক জন ব্রাহ্মণ বৌদ্ধের বাসস্থান। সন্নিকটে একটি পবিত্র ঝরণা বিদ্যমান। তাঁহারা যে পথে চলিয়াছিলেন, সে পথে এ পর্য্যন্ত কোনও মোটর-গাড়ী যায় নাই। নদীর উপর মাঝে মাঝে কাঠ ও বাঁশের সেতু।

এইরূপ এক বাঁশের সেতুর উপর দিয়া মোটর চালাইবার সময় তাঁহারা দেখিলেন, সমগ্র সেতুটি অসম্ভব-ভাবে দুলিতেছে। গাড়ীর চাকা সেতুর ফাঁকে বসিয়া গেল, সৌভাগ্যক্রমে সেখানে স্থানীয় এক যুবককে দেখিতে পাইলেন। সে তাঁহাদিগকে ডাব পাড়িয়া আনিয়া তাঁহাদের তৃষ্ণা দূর করিল। তার পর চাকার নীচে গাছের ডাল আড়া-আড়ি ভাবে পাতিয়া দিল। সেতু উত্তীর্ণ হইতে তাঁহাদের এক ঘণ্টা সময় লাগিয়াছিল।

ইন্দোচীনের যাত্রাদলের অভিনেতা অভিনেত্রী

আনাম রাজধানীর সন্নিহিত খালে কাপড় কাচা

মেকং নদের তীরদেশব্যাপী সু-খাও গিরিশৃঙ্গ দেখিতে পাওয়া যাইবে। এই পর্ব্বত অতি পবিত্র স্থান। ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে চেনলা রাজারা এই পর্ব্বতে নরবলি দিতেন। পরবর্ত্তী যুগে ব্রাহ্মণরা বিরাট লিঙ্গ হিসাবে ঐ পর্ব্বতকে পূজা করিতেন। এখন এখানে একটা বৌদ্ধ মঠ বিদ্যমান।
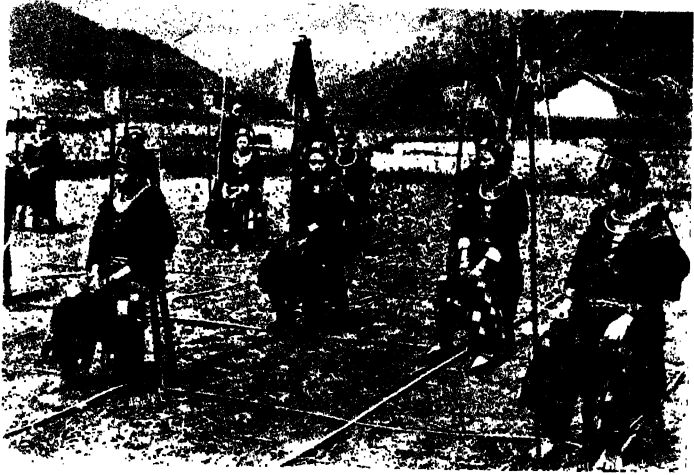
অরণ্যবেষ্টিত এই স্থানটিতে তিন ধর্ম্মের উপাসনা চলিয়াছিল। পবিত্র উৎসের চারিদিকে ব্রাহ্মণ ও বৌদ্ধগণ

লৌহ পাহাড়ের শ্রমিকদল

লাওচীয় কুটীর

ভাবে একটি লিঙ্গকে অভিষিক্ত করিত। এই লিঙ্গটি ক্মোর মন্দিরের উপাসকগণ লিঙ্গ-পর্ব্বত বলিয়া অভিহিত করিত।

এইখানে যে মন্দির ছিল, তাহার প্রাচীরগাত্রে বহুবিধ কারুকার্য্য বিদ্যমান। তবে মন্দিরের ছাদ অনেক ক্ষেত্রেই পড়িয়া গিয়াছে। একস্থানে বৌদ্ধ দেবতাদিগের হাস্যবদন এখনও দেখিতে পাওয়া যাইবে।

পীতবসনধারী সন্ন্যাসীরা এখানে কুটীর বাঁধিয়া বসবাস করিতেছেন। মেকং নদের তটভূমি হইতে এই স্থানের উচ্চতা ৪ শত ফুট।

পাক্‌সে হইতে মোটরযোগে মিঃ উইলিয়মস্ সদলবলে অরণ্যের মধ্য দিয়া আঙ্গকর অভিমুখে যাত্রা করেন। তখন গ্রীষ্মকাল। এই পথে কোনও ভদ্রলোক তাঁহাদের পূর্ব্বে গমন করেন নাই।
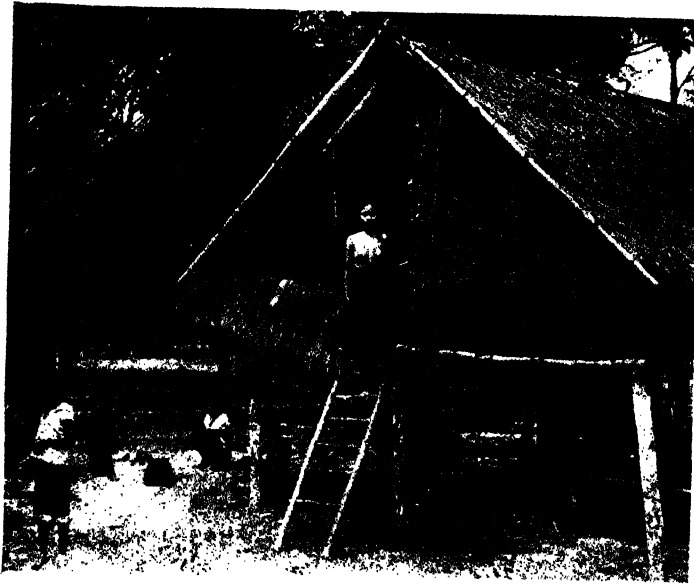
বহু শতাব্দী ধরিয়া শান্তিতে বসবাস করিয়াছিল। পর্ব্বতের এক পার্শ্বে যে উৎসটি বিদ্যমান, তাহার সলিলধারা অবিশ্রান্ত

ছদ্মশ্মশ্রু চীনা অভিনেতা

কাম্বোডিয়ার নাগদেবতা

তরুণীদিগের সম্মুখে পুরুষের প্রেমনিবেদন অভিনয়

বেনটিয়াই শ্রীমন্দিরে প্রাপ্ত মূর্ত্তি
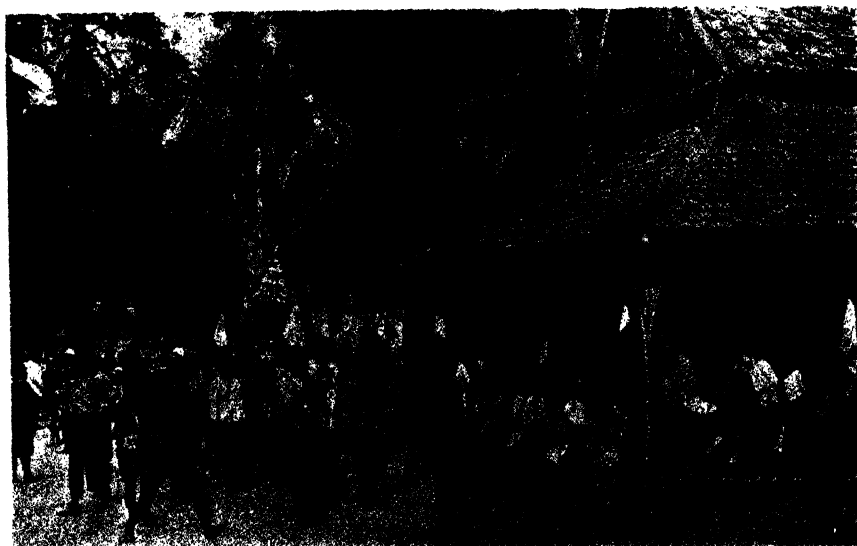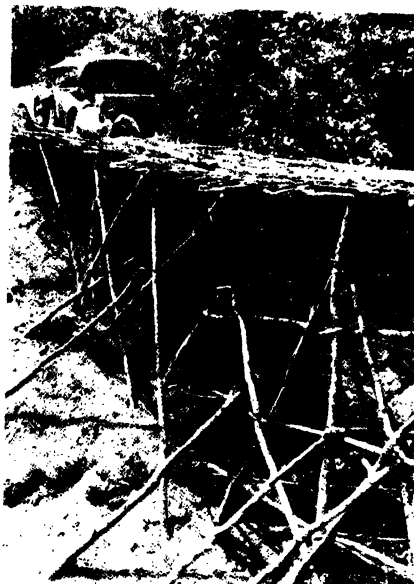
মেকং নদের উপরিস্থিত বাঁশের সেত

হস্তীর দল নদী পার হইতেছে

কোমপদ্‌থস্‌এর রেসিডেণ্ট অরণ্য-পথে তাঁহাদিগকে পথ দেখাইয়া চলিলেন। তাঁহার সহিত প্রচুর ঔষধের সরঞ্জাম ছিল। স্থানে স্থানে অধিবাসীদিগের কুটীর, তিনি সেখানে উপস্থিত হইলেই গ্রামবাসীরা ঔষধের জন্য তাঁহার কাছে সমবেত হইতে লাগিল। ফরাসী ইন্দোচীনের অধিবাসীর সংখ্যা ২ কোটি ১৫ লক্ষ। তন্মধ্যে তাঁহার কাছে এ যাবৎ ৩০ লক্ষ লোক চিকিৎসার্থ আসিয়াছিল।

সেগন্‌, নাটাং ও হানই সহরে সিভিল ও মিলিটারী হাসপাতাল আছে। ক্ষিপ্ত পশুর দংশনপীড়িত নরনারীর জন্য চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানও বিদ্যমান। জনসাধারণের স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য এরূপ প্রচেষ্টা প্রয়োজনীয়।

আঙ্কোরে প্রাপ্ত দশম শতাব্দীর ক্ষোদিত দৃশ্য

কাঠ-কয়লার আগুনে রুটী সেঁকা হইতেছে

প্রস্তরে ক্ষোদিত রণদৃশ্য
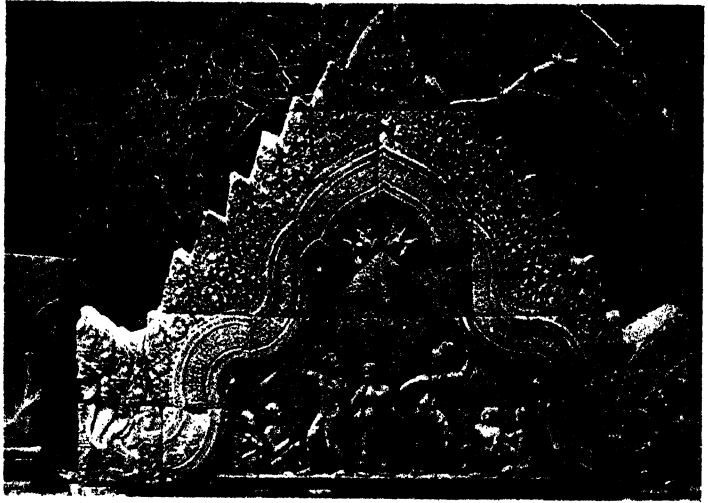
আনামের বাঁকওয়ালা

বিমান যোগে কলেরা, আমাশয় ও জলাতঙ্ক রোগের প্রতিষেধক ঔষধ ও টীকা লইবার বীজ বিনা মূল্যে গ্রামবাসিগণের মধ্যে বিতরিত হইয়া থাকে।

রজনীর অন্ধকার সমাগত হইবার কিছু পূর্ব্বে পরিব্রাজকগণ প্রাগাঁর মন্দিরে উপনীত হইলেন। বহু দিন ধরিয়া এই মন্দির অরণ্য-মধ্যে আত্মগোপন করিয়াছিল।

যাহারা সর্ব্বপ্রথম অরণ্যের কুক্ষিগত ক্ষেমার মন্দির আবিষ্কার করিয়াছিলেন, তাহারা তখন সবিস্ময়ে দেখিয়াছিলেন, কারুশিল্পের কি বিচিত্র নিদর্শন এই মন্দিরে বিদ্যমান। এক দিন বিজন অরণ্যের উপর মানুষের সভ্যতা বিজয়-বৈজয়ন্তী উড্ডীন করিয়াছিল,ক্ষেমার মন্দির তাহারই

পুরোহিতের সম্মুখে পূজার উপচার

কাম্বোডীয় তীর্থযাত্রী মস্তক মুণ্ডন করিতেছে

নমুনা। ক্ষেমারগণ অতি রহস্যজনকভাবে যখন এই স্থান হইতে অন্তর্হিত হইয়া যায়, মার্কোপোলো তখন এখানে আসিতে পারেন নাই, মন্দিরগুলি দেখিবার সুযোগ পান নাই। তখন চারিদিকে গভীর দুর্ভেদ্য অরণ্য। মানুষ স্থান ত্যাগ করিয়াছিল, তাহার শূন্য স্থান অরণ্য অধিকার করিয়াছিল।

যে বৎসর পোলো ভেনিসে প্রত্যাবর্ত্তন করেন, সেই বৎসর চৌ টা-কুয়ান্ আঙ্কর আগমন করেন। কুবলয় খাঁর দরবারে মার্কো-পোলোর সহিত তাঁহার পরিচয় ঘটে। চৌ টা-কুয়ান্ সেই সময় ক্ষেমারদিগের বিবরণ ওজস্বিনী ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছিলেন।

তিনি লিখিয়াছিলেন, "রাজা যখন বাহির হইয়া যান, তখন তাঁহার দেহ লৌহের দ্বারা আবৃত থাকে। সুতরাং ছোরার তীব্র ফলা অথবা তীরের তীক্ষ্ণ মুখ তাঁহার দেহে আহত হইয়া কোনও ক্ষতি করিতে পারিত না। অশ্বারোহী সেনাদল তাঁহার অগ্রে অগ্রে গমন করিত। তাহার পর পতাকাবাহী দল আসিত। পরে বাদকদল

সুমধুর বাদ্য করিতে করিতে অগ্রসর হইত। প্রাসাদের তন্বী কুমারীরা—তাহাদের সংখ্যা তিন শত হইতে পাঁচ শত—পুষ্পাভরণে সজ্জিতা হইয়া, কেশে, গলদেশে ফুলের মালা দুলাইয়া, প্রজ্বলিত বর্ত্তিকা ধারণ করিয়া রাজার অনুবর্ত্তিনী হইত। দিবাভাগেও তাহারা বাতি জ্বালিত।

"মন্ত্রিদল ও আমীর-ওমরাহগণ সম্মুখভাগে হস্তিপৃষ্ঠে গমন করিতেন। তাঁহাদের লোহিত ছত্রের সংখ্যা ছিল না।

হিউ সংবের সম্পান

তাঁহাদের পরেই রাজার পত্নী ও উপপত্নীর দল শিবিকারোহণে বা শকটে চড়িয়া আসিতেন। কেহ কেহ হস্তিপৃষ্ঠেও সুখাসীন থাকিতেন। তাঁহাদের স্বর্ণমণ্ডিত ছত্রের সংখ্যা শতাধিক ছিল। তাঁহাদের পশ্চাতেই হস্তিপৃষ্ঠে সরলভাবে বসিয়া রাজা আসিতেন। তাঁহার হস্তে মহামূল্য তরবারি।"

অনেক মন্দিরের নামই প্রা খাঁ। গভীর অরণ্যের মধ্যে আঙ্গকরের পূর্ব্বভাগে একটা মন্দির আছে। তাহার প্রাচীর, কক্ষ প্রভৃতি অরণ্যের বাহুপাশে যেন আলিঙ্গিত। এই দৃশ্য দেখিলেই বুঝিতে পারা যাইবে, পূর্ব্বে ধ্বংসপ্রায় আঙ্গকর কিরূপ বিরাট ও সুন্দর ছিল।

মধ্য-যুগের প্রাঙ্গণতলে বৃক্ষমূল সর্পাকারে বিসর্পিত। তাহাদের প্রভাবে বড় বড় প্রস্তর সরিয়া বিশ্লিষ্ট হইয়া গিয়াছে। হাস্যবদনা দেবীদিগের দেহ বৃক্ষলতার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম তন্তু বা শিরা দ্বারা আচ্ছন্ন। দেবীদিগের ক্ষীণ কটিতট ও সুপুষ্ট হৃদয়ের চারিদিক তন্তুবেষ্টিত হইয়া তাহাদের দেহ-সৌন্দর্য্যকে বিশ্লিষ্ট করিয়া দিয়াছে। পাষাণ প্রাণহীন। তাহারা কথা কহে না। কিন্তু নাম-গোত্রহীন শিল্পীরা এই অন্তর্হিত সভ্যতার প্রাণ-প্রতিষ্ঠায় যে শিল্পনৈপুণ্য প্রকাশ করিয়াছিল, এখনও যেন জনহীন মন্দিরে তাহাদের বিজয়বাদ্য প্রতিধ্বনিত হইতেছে।

খেমার রাজসভায় যে সকল চিত্র প্রাচীরগাত্রে দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতে সে যুগের জীবনযাত্রার পরিচয় অভিজ্ঞ দর্শকের দৃষ্টিপথ অতিক্রম করিতে পারে না। ৩২টি নরকের যে বর্ণনা চিত্র-সাহায্যে সমুজ্জ্বল হইয়া আছে, তাহাতে দান্তের নরক-বর্ণনা ম্লান হইয়া যায়।

কাম্বোডীয় নর্ত্তকীরা আঙ্গকর মন্দিরে ক্ষোদিত নৃত্যপদ্ধতি অবলম্বন করিয়া তাহাদের নৃত্যকলার পরিচয় দিয়া

থাকে। কাম্বোডীয় নৃত্য শুধু চমৎকার নহে, অতি বিচিত্র ও মধুর। গেইসা নর্ত্তকীরা তাহাদের কাছে দাঁড়াইতে পারে না।

মিঃ উইলিয়মস্ কাম্বোডীয় নৃত্য দর্শনকালে দেখিয়াছিলেন, এক জন ৩৮ বৎসর বয়স্কা বৃদ্ধা যে নৃত্যকলার পরিচয় দিয়াছিলেন, তাঁহার তরুণী শিষ্যাদের কেহই তেমন কলাবিদ্যার পরিচয় দিতে পারে নাই। জনকয়েক নর্ত্তকী এই নৃত্যকলা আয়ত্ত করিয়াছে। সহসা যদি তাহারা ইহলোক হইতে অন্তর্হিত হইয়া যায়, তাহা হইলে কাম্বোডীয় রঙ্গালয়ের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইয়া যাইবে।

সেগং এ রবার বৃক্ষ পর্য্যাপ্ত পরিমাণে বিদ্যমান। দুগ্ধবতী গরুর বাঁট হইতে যদি নিয়মিতভাবে দুগ্ধ দোহন বন্ধ থাকে, তাহা হইলে গরুর দুগ্ধ শুকাইয়া যায়। সেইরূপ রবার বৃক্ষের রস শুকাইয়া যাইতে দিতে নাই। নিয়মিতভাবে উহার রস সংগ্রহ করিতে হয়। এই রস হইতেই রবার জন্মে। রবার-রস-সংগ্রহকারীরা প্রত্যেকে প্রত্যহ দুই শত হইতে চারি শত বৃক্ষ হইতে নির্য্যাস সংগ্রহ করিয়া থাকে। সে জন্য তাহারা প্রত্যেকে ৪০ সেণ্ট পারিশ্রমিক পায়। টনকিন হইতে উৎকৃষ্ট শ্রেণীর সংগ্রাহকরা এখানে আসিয়া থাকে।

সেগন্‌এ একটি সুন্দর উদ্যান আছে। নানা জাতীয় দুষ্প্রাপ্য বৃক্ষলতা এখানে বিদ্যমান। একটি সুদৃশ্য যাদুঘরও এখানে দেখিতে পাওয়া যাইবে। এই যাদুঘরের মধ্যে

মহিষপৃষ্ঠারূঢ় বালক

বিশাল পুস্তকাগারও বিদ্যমান। সহরের বাহিরে অনেকগুলি আরণ্য রেস্তোরাঁ আছে। সেই সকল রেস্তোরাঁয় নাচিবার ছাদ ও সন্তরণের জলাশয়ও দেখিতে পাওয়া যাইবে।

শ্রীসরোজনাথ ঘোষ।

নিদাঘে

(মহাকবি কালিদাসের অনুসরণে)

নিঠুর নিদয় নিদাঘসূর্য্য খরশরজাল আজিকে হানে,
তৃষ্ণাকাতরা তাপিত ধরণী মূর্চ্ছিতা তা'র তীক্ষ্ণ বাণে।
শুষ্ক সরসী পল্বল নদী শস্যশূন্য রিক্ত মাঠ,
কোন্ সে তাপসী জ্বেলেছে অনল—কবে হ'বে তা'র
শান্তিপাঠ?

নববিকসিত কুসুমফুলের সিন্দুর আভাদীপ্ত হ'য়ে
দিকে দিকে আজি ছুটে দাবানল বনভূমি হ'ল আকুল ভয়ে;
দগ্ধতাম্র আজি দিগন্ত ধূলিপিঙ্গল বিভলাকাশ
পাটলপরাগ মাখিয়া অঙ্গে সুরভি হইল বনবাতাস।
স্নিগ্ধচ্ছায়ায় সুলভ নিদ্রা রম্যমধুর সন্ধ্যাকাল
শীতলসলিলে স্নান সুখকর, সুন্দর নিশা চন্দ্রভাল;
শশীর কিরণ স্পৃহণীয় প্রিয়ে! প্রীতিকর ধারাযন্ত্রস্নান
মরকতময় গৃহচত্বরে শয়নলুব্ধ কা'র না প্রাণ?

তৃষ্ণার দেশে জাগে নির্ঝর নিদাঘের তাপে শিরীষফুল
শিরীষ-পেলব অঙ্গ তোমার কর্ণে দুলাও তাহার দুল;
অয়ি বিজয়িনি! ফুটে চম্পক বিকসিত তব অঙ্গলতা
স্বর্ণ-চাঁপার বর্ণ জাগিছে তনুতে তোমার স্বর্ণলতা।
তোমারি মুখের মদিরা হরিয়া সুরভিত হ'ল বকুলবন
তব কুন্তল-গন্ধ লভিয়া উতল আকুল কবির মন:
কবরীতে পরো কনক-চাঁপা, মেখলা করো গো বকুলমালা
কুঙ্কুমে আঁকো পত্রলেখাটি—চারু সুষমায় সাজো লো বালা!
সূক্ষ্ম দুকূলে অঙ্গের বাস—বুকে লহ বীণা মধুর-স্বনি
ললিত সুতানে উঠুক কাকলী, জাগাও অতনু হে মোর ধনি!
নাগকেশরের শাখার শিখরে হউক উদয় পূর্ণ শশী
হৃদ্‌গগনের হে রাকা আমার, তুমি রহ চিরচতুর্দ্দশী!

শ্রীউমানাথ ভট্টাচার্য্য (বি-এ)।

আসন্ন সংগ্রাম

শীঘ্রই য়ুরোপে আবার একটা প্রবল সমরানল জ্বলিয়া উঠিবে, এইরূপ আশঙ্কা অনেকের মনে উদিত হইতেছে। মধ্য য়ুরোপে রণসজ্জা ত্বরিতগতিতে অগ্রসর হইতেছে। জার্ম্মাণীতে, ইটালীতে এবং ছোট মিত্ররাজ্যমধ্যে সামরিক সাজসজ্জা লক্ষ্য করিলেই তাহা বুঝা যায়। ছোট-মিত্ররাজ্যসঙ্ঘ বা আঁতাতে বলিতে জেচোশ্লোভেকিয়া, জুগোশ্লেভিয়া এবং রুমেনিয়া এই ত্রিশক্তির মিলনকে বুঝায়। মধ্য-য়ুরোপ এই দিকে যে ভাবে সমরসজ্জা এবং আত্মরক্ষার জন্য আয়োজনের ঘটা দেখা যাইতেছে, তাহাতে মনে হইতেছে যে, ঐ দিকের প্রায় সকল রাজ্যের লোক আশঙ্কা করিতেছেন যে, অচির-ভবিষ্যতে য়ুরোপে ব্যাপকভাবে সমরানল জ্বলিয়া উঠিবে এবং তাহার ফলে হয় ত পাশ্চাত্য খণ্ডের সমস্ত সভ্যতাস্পর্দ্ধী জাতিই ভস্মীভূত হইয়া যাইতে পারে। বিগত য়ুরোপের মহাসমরে জার্ম্মাণী ঠিক পরাজিত হইয়াই শত্রুহস্তে আত্মসমর্পণ করে নাই। কারণ, জার্ম্মাণী যখন সম্মিলিত ত্রিশক্তির নিকট আত্মসমর্পণ করিয়াছিল, তখনও জার্ম্মাণী ফ্রান্সের বুকের উপর পা দিয়া দাড়াইয়াছিল; জার্ম্মাণী পরাজিত হইয়াছিল মিত্রশক্তির বেড়াজালের ফলে; মিত্রশক্তিবর্গ জার্ম্মাণীকে এমনভাবে ঘিরিয়া ফেলিয়াছিল যে, সেই বেড়াজাল ভেদ করিয়া বাহির হইতে জার্ম্মাণী এক মুঠা খাদ্যও আমদানী করিতে পারে নাই। পেটের দায়ের চেয়ে দায় আর নাই। জার্ম্মাণীকে তাই বিপদে পড়িয়া পরাজয় স্বীকার করিতে হইয়াছিল। তাই জার্ম্মাণী সেবারকার সেই ত্রুটি এখন শোধরাইয়া লইবার চেষ্টা করিতেছে বলিয়া কেহ কেহ প্রকাশ করিতেছেন। ভোলক্ উণ্ড রেইশ সংবাদপত্র মধ্য-য়ুরোপে একটি কেন্দ্রখণ্ড (Central European bloc) গঠন করিবার কথা কিছু দিন পূর্ব্বে বলিয়াছিলেন। হল্যাণ্ড, জার্ম্মাণী, লাক্সেমবার্গ, বেলজিয়মের কিয়দংশ এবং সুইজারল্যাণ্ড এই ভূখণ্ডের পশ্চিম সীমা হইবে, পূর্ব্বদিকে রিগা ওডেসা সীমান্ত এবং দক্ষিণদিকে পূর্ব্ববর্ত্তী অষ্ট্রোহাঙ্গেরীয় সাম্রাজ্যের দক্ষিণ সীমা একেবারে রুমেনিয়া পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইবে। আর্থিক ব্যাপারের দিক হইতে এই কয়টি রাজ্যকে সমস্বার্থে স্বার্থবান্ করিতে হইবে। উক্ত সংবাদপত্রের সংবাদদাতা ডক্টর ম্যাক্স হান (Max Hahn) এক জন বিশিষ্ট ব্যক্তি। বাণিজ্য-ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে তাঁহার যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা আছে। গত দশ বৎসর ধরিয়া ইনি এই বিষয়ে প্রচারকার্য্য চালাইয়া আসিতেছেন। এই কেন্দ্র ভূমিখণ্ডে প্রায় ২২ কোটি লোকের বাস থাকিবে। আর্থিক এবং রাজনৈতিক দিক দিয়া ইহা একটি শক্তিশালী রাষ্ট্রসঙ্ঘে পরিণত হইবে। যদি মধ্য-য়ুরোপে এই রাজ্যগুলি পরস্পর নিবিড়ভাবে সংযুক্ত হয়, তাহা হইলে উহারা কি রুসিয়া, কি মার্কিণ, কি বৃটিশ সাম্রাজ্য কাহাকেও গ্রাহ্য করিবে না। পণ্য উৎপাদনের নিমিত্ত কাঁচা মালের জন্য তাহা হইলে আর এই রাজ্যকে পরমুখাপেক্ষী থাকিতে হইবে না, অথবা সাগরপার হইতে পণ্য আমদানী করিতে হইবে না। অন্য কেহ তখন সাহস করিয়া এই সম্মিলিত রাষ্ট্রগুলির কাহাকেও আক্রমণ করিতে চাহিবে না। এইরূপ ব্যবস্থা করিলে বিগত যুদ্ধের পূর্ব্বে জার্ম্মাণী যে ভুল করিয়াছিল, সে ভুল আর করা হইবে না। এ সংবাদ কতদূর সত্য, তাহা বুঝা কঠিন। য়ুরোপীয় কুশাগ্রবুদ্ধি রাজনৈতিকদিগের চক্ষু এড়াইয়া এই কল্পনা কার্য্যে পরিণত করা সম্ভব হইবে, ইহা কিছুতেই মনে করা যাইতে পারে না। আবার যদি ভবিষ্যৎ যুদ্ধে জার্ম্মাণীকে অবরুদ্ধ হইতে হয়, তাহা হইলে যাহাতে জার্ম্মাণীতে খাদ্যাভাব না ঘটে এবং শত্রুকরে আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হইতে না হয়, তাহার জন্য জার্ম্মাণীতে বিশেষভাবে চেষ্টা চলিতেছে। যে সকল খাদ্য জার্ম্মাণদিগের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজন অথচ যাহা জার্ম্মাণদিগকে বিদেশ হইতে আমদানী করিতে হয়, তাহার অনুকল্প কোন খাদ্য রাসায়নিক পদ্ধতিতে প্রস্তুত করা যাইতে পারে কি না, তাহার পরীক্ষা করা হইতেছে। এই বিষয়ের অনুসন্ধানকল্পে একটি রাসায়নিক বিভাগ খোলা হইয়াছে। ফ্রেডরিক বর্জ্জিয়াস নামক এক জন বিখ্যাত রাসায়নিক উহার পরিচালনভার পাইয়াছেন। এই ব্যক্তি নোবেলপ্রাইজ পাইয়াছেন। নানা দেশে ইহার রাসায়নিক শাস্ত্রজ্ঞান সম্বন্ধে খ্যাতি আছে। ইনি কয়লা হইতে তৈল নিষ্কাশনের একটা পদ্ধতি আবিষ্কৃত করিয়াছেন। ঐ পদ্ধতি বর্জ্জিয়াস পদ্ধতি নামে পরিচিত।

শুনা যায়, ইনি কাঠ হইতে রাসায়নিক পদ্ধতিতে মানুষের এবং পশুর খাদ্য প্রস্তুত করিবার জন্য প্রায় বিশ বৎসর ধরিয়া চেষ্টা করিতেছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, তিনি ঐ কার্য্যে কতকটা সাফল্যলাভ করিয়াছেন। কতকগুলি খারাপ কাঠ রাসায়নিক পদ্ধতিতে দ্রবীভূত করিয়া তাহা হইতে মানুষ এবং পশুর আহারোপযোগী অনেক বস্তু পাওয়া যায়। কতকগুলি কাঠ হইতে এরূপ 'পালো' বাহির করা যায়, যাহার গুণ এবং উপকারিতা বার্লি বা যবের ছাতুর মত। ফলে জার্ম্মাণী এবার চারিদিক সামলাইয়া রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবার সঙ্কল্প করিতেছে। জার্ম্মাণী সম্বন্ধে এখন অনেক আজগুবি কথাও প্রচারিত হইতেছে, সুতরাং ইহার কতখানি সত্য, তাহা বলা অত্যন্ত কঠিন। তবে এ কথা সত্য যে, মধ্য-য়ুরোপে একটা মধ্যখণ্ড গঠিত করিবার চেষ্টা জার্ম্মাণীর পক্ষে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। কিন্তু ইহাতে বাধাও অনেক। জার্ম্মাণ সাম্রাজ্যের অধিবাসীরা যে এক অখণ্ড জাতিভুক্ত, এই শিক্ষা দিবার জন্য হার হিটলার প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছেন। জার্ম্মাণীর জাতীয় বিপ্লবের ইহাই লক্ষ্য। যত দূর বুঝা যাইতেছে, তাহাতে মনে হইতেছে, জার্ম্মাণী এখন যুদ্ধার্থ সম্পূর্ণ প্রস্তুত হইতে পারে নাই। ম্যাঞ্চেষ্টার গার্জ্জেন পত্রে এক জন সংবাদদাতা আভাসে প্রকাশ করিয়াছেন যে, জার্ম্মাণীর রণবিমানবহর সম্পূর্ণ করিতে এক বৎসর এবং স্থলে সামরিক আয়োজন সম্পূর্ণ করিতে দুই বৎসর লাগিবে। রণপোত সম্পূর্ণ করিতে কত বৎসর লাগিবে, তাহার স্থিরতা নাই! এই উক্তি অনেকটা সত্য বলিয়া মনে হয়।

সম্প্রতি জার্ম্মাণী তাহার রাইনল্যাণ্ড অঞ্চলে সাহসে ভর করিয়া কতকগুলি সৈন্য পাঠাইয়াছিল বলিয়া অনেকের ধারণা জন্মিয়াছে যে, জার্ম্মাণী বুঝি যুদ্ধার্থ অনেকটা প্রস্তুত হইয়াছে। সে ধারণা মিথ্যা। সম্প্রতি এই মর্ম্মে একটা সংবাদ পাওয়া গিয়াছে,—জার্ম্মাণীর এই কার্য্যের অন্তরালে ইটালীর মুসোলিনীর একটা চা'লবাজী আছে। ফরাসীদিগের দৃষ্টি যাহাতে আবিসিনিয়ার উপর যাইয়া না পড়ে,—সেই জন্য মুসোলিনী হার হিটলারকে ঐ কার্য্য করিতে পরামর্শ দিয়াছিলেন। এই ঘটনার কিছু দিন পূর্ব্বেই মার্কিণের জনৈক সংবাদদাতা না কি ঐ সংবাদ জানিতে পারিয়াছিলেন। তিনি বলেন যে, পৃথিবীর রাজনীতিক ক্ষেত্রে জার্ম্মাণী এবং মঙ্গোলীয় এই দুইটিই প্রধান ঝটিকাকেন্দ্র। ইহার কোথাও গম্ভীর ঝটিকা-রব শ্রুত হইলেই ফরাসী প্রভৃতির মন সেই দিকে আকৃষ্ট হইবে,—ইটালী সেই অবসরে সমস্ত সামরিক নীতি লঙ্ঘন করিয়া আবিসিনিয়া দখল করিয়া লইবে, সেই জন্য মুসোলিনী হিটলারকে পরামর্শ দিয়া ঐ ভাবে ভার্শাইল সন্ধি ভঙ্গ করিতে পরামর্শ দিয়াছিলেন। হার হিটলারও সেই পরামর্শ বিশেষ কারণে গ্রহণ করিলেন। নাৎসিদলের যুবকরা ঐ সময়ে তাহাদের দেশের আর্থিক অবস্থা বিবেচনা করিয়া অতিশয় চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল। তিনিও উহাদের মন ঐ দিক হইতে ফিরাইবার জন্য রাইনল্যাণ্ডে সৈন্য পাঠাইলেন। ফলে জার্ম্মাণীর সেই যুব-আন্দোলন তখনকার মত নিবৃত্তি পাইয়াছিল; জার্ম্মাণী এক তুরুপেই হ'কুড়ি সাতের খেলা রাখিতে সমর্থ হইল। ইটালী এই আবিসিনিয়ার ব্যাপার লইয়াই ফরাসীদিগের উপর অসন্তুষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল। সে সেই জন্য বলিয়াছিল যে, ইটালী স্বয়ং কয়েদী হইয়া আর জার্ম্মাণীর উপর পাহারাওয়ালার কায করিতে পারিবে না। যখন ফরাসী র‍্যাডিকালরা লাভালের নীতি সমর্থন করিতে চাহে নাই, তখন হইতেই ইটালী জার্ম্মাণীর দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছিল। পরে ফরাসীরা তাহা বুঝিতে পারিয়াছিল, সেই জন্য তাহারা ইটালীর বিরুদ্ধে শাসন প্রবর্ত্তিত করিতে অসম্মত হয়। ফলে য়ুরোপের রাজনীতিক গগনে নানারূপ এড়ো বাতাস বহিয়া যাইতেছে। ইহার ফল কি হইবে, কে বলিতে পারে?

এ সম্বন্ধে ক্রমশঃ অনেক সংবাদ প্রকাশ পাইতেছে। অষ্ট্রিয়ার সীমান্তে সত্বর একটা হাঙ্গামা বাধিবে বলিয়া সংবাদ পাওয়া যাইতেছে। অষ্ট্রিয়ায় এক দল নাৎসী আছেন, ইহারা জার্ম্মাণীর সহিত অষ্ট্রিয়ার মিলন চাহেন। কিছু দিন পূর্ব্বে ইহারা পরাজিত হইয়াছিলেন বটে,—কিন্তু তাই বলিয়া ইহাদের বিষদন্ত ভগ্ন হয় নাই। ইহাদের সে চেষ্টা এখনও আছে। ভিয়েনাতে গুজব যে, হিটলার অষ্ট্রিয়ায় অভিযান করিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছেন। এ কথা কিন্তু সকলে বিশ্বাস করিতেছেন না! আবার একটা গুজব শুনা যাইতেছে যে, হাঙ্গেরীর সহিত জার্ম্মাণীর একটা গুপ্ত সন্ধি হইয়া গিয়াছে। জার্ম্মাণী অষ্ট্রিয়া আক্রমণ করিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছেন। কয়েক সপ্তাহ পূর্ব্বে প্রিন্স ষ্টারেমবার্গ এবং অষ্ট্রিয়ার চান্সলার ডক্টর সুচনীগ অষ্ট্রিয়া নাৎসী দলের প্রভাব সম্বন্ধে সেনর মুসোলিনীর সহিত আলোচনা করিয়াছিলেন। সম্প্রতি প্রকাশ পাইয়াছে যে, হার হিটলারের সহিত হাঙ্গেরীর প্রধান মন্ত্রী সেনাপতি গোম্বোজের ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে এক গুপ্ত সন্ধি হইয়া গিয়াছে। এই সন্ধিতে স্থির হইয়াছে যে, হাঙ্গেরী যখন জেকোস্লাভেকিয়া আক্রমণ করিবে, তখন জার্ম্মাণী হাঙ্গেরীকে

হার হিটলার

অষ্ট্রিয়ার চান্সলার ডাক্তার সুচনীগ

সৈন্য-সামন্ত দিয়া সাহায্য করিবে। উহার প্রতিদানে হাঙ্গেরী জার্ম্মাণীর পূর্ব্বাধিকৃত রাজ্যগুলি ফিরাইয়া দিবে। এইরূপ নানা জাতির মধ্যে কত যে গুপ্ত সন্ধি হইয়াছে, তাহার আর ঠিকানা নাই। কেহ কেহ সংবাদ দিতেছেন যে, য়ুরোপের পাঁচটি জাতি শীঘ্রই এক মহাসমরে লিপ্ত হইবে। এই পঞ্চরাষ্ট্রের নাম অষ্ট্রিয়া, জেকোস্লাভেকিয়া, ফ্রান্স, রুসিয়া এবং জার্ম্মাণী। জার্ম্মাণীর সহিত অন্য শক্তিচতুষ্টয় রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবে। এ সংবাদ ঠিক বিশ্বাস করিয়া উঠিতে পারা যায় না। জার্ম্মাণী সহসা এতগুলি রাজ্যের সহিত যুদ্ধ করিতে যাইবেন বলিয়া মনে হয় না। তবে রাজনীতিক পরিস্থিতি বহু দিন একরূপ থাকে না; উহা নিত্য পরিবর্ত্তনশীল! সেই জন্য উহার সম্বন্ধে কোন কথা নিশ্চিতভাবে বলা যায় না। তাহার পর জাতিসঙ্ঘ য়ুরোপের, তথা পৃথিবীর, সর্ব্বত্রই রাজনীতিক অবস্থা জটিলতর করিয়া তুলিতেছে! পৃথিবীর ৫৮টি রাজ্য জাতিসঙ্ঘের সদস্য। কিন্তু তাহা হইলেও জাতিসঙ্ঘ নিরপেক্ষভাবে এবং জোর করিয়া কোন বিষয়েরই মীমাংসা করিয়া দিতে পারিতেছে না। নিতান্ত অকর্ম্মণ্য প্রতিষ্ঠানরূপে ইহা বজায় না রাখিয়া ইহাকে উঠাইয়া দেওয়াই উচিত।

মধ্য-য়ুরোপের অবস্থা ত এইরূপ। কিন্তু এ দিকে আবিসিনিয়ার

ব্যাপার লইয়া ইটালীর সহিত গ্রেটবৃটেনের মনোমালিন্য দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। ইটালী আবিসিনিয়ার টানা বা সানা হ্রদের নিকট আসিয়া পড়িয়াছে। উহারা ঐ দেশ দখল করিয়া লইয়াছে। এই স্থানে বৃটিশ জাতির বিশেষ স্বার্থ রহিয়াছে। ইহার কথা পূর্ব্বে বৈদেশিক প্রবন্ধে বিশেষভাবে বলা হইয়াছে। ফলে এখন য়ুরোপের যেরূপ অবস্থা, তাহাতে কখন্ কি হয়, তাহা বলা কঠিন হইয়া দাঁড়াইতেছে। এখন অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তির মতে য়ুরোপে ত শীঘ্রই একটা যুদ্ধ বাধিবে এবং সেই যুদ্ধের ফলে য়ুরোপের বর্ত্তমান সভ্যতা, কৃষ্টি এবং চিন্তার ধারা সমস্তই বিপর্য্যস্ত হইয়া যাইবে! তবে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, গ্রেট বৃটেন এখন সহসা কোন যুদ্ধে লিপ্ত হইবেন না। কারণ, ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে গ্রেট বৃটেনের অবস্থা যেরূপ ছিল, এখন আর সেরূপ নাই।

প্রিন্স ষ্টারেমবার্গ

হাঙ্গেরীর প্রধান মন্ত্রী গোম্বোচ

এ দিকে বৃটিশ বজেটে য়ুরোপে এই সমরশঙ্কার বিষয় বিশেষভাবে প্রতিবিম্বিত দেখা যায়। গ্রেট বৃটেনের রাজস্ব-সচিব মিষ্টার নেভিল চেম্বারলেন বহিঃশত্রু কর্ত্তৃক আক্রমণ প্রতিহত করিবার জন্য এবার গত বৎসর অপেক্ষা ৮ কোটি ৪০ লক্ষ পাউণ্ড বেশী বরাদ্দ করিয়াছেন। এবারকার এই বজেটকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইবার বজেট বলা হইয়াছে। তথায় আয়করের এবং চায়ের উপর ধার্য্য করের হার বাড়াইয়া দেওয়া হইতেছে। ইহা দেখিয়াই মনে হইতেছে যে, অচির-ভবিষ্যতে সমরশঙ্কা একেবারে ভিত্তিশূন্য নহে। এই সম্বন্ধে চিন্তা এবং উদ্বেগ সমস্ত সভ্য জাতিকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিতেছে।

প্রাচীতে সমর-শঙ্কা

আমরা এ কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, সুদূর প্রাচীতে মঙ্গোলীয়ান এবং মাঞ্চুকুয়ান সীমান্তে আবার একটি সমরানল জ্বলিয়া উঠিবার সম্ভাবনা জন্মিয়াছে। এ সম্বন্ধে পূর্ব্বে আমরা অনেক কথাই বলিয়াছি। জাপান মাঞ্চুরিয়া অধিকৃত করিয়া তাহাদেরই অধীনে মাঞ্চুকুয়ো সরকার খাড়া করিবার পর হইতে ঐ অঞ্চলে রুসিয়ার সহিত জাপানের সঙ্ঘর্ষ বাধিবার বিশেষ আশঙ্কা হইয়াছে। এই ব্যাপারে পাশ্চাত্য লেখকরা জাপানকেই বেশী অপরাধী বলিতেছেন। বলা বাহুল্য, এই অঞ্চলের সকল সংবাদ পাওয়া যায় না। কাজেই আমাদের পক্ষে প্রকৃত ব্যাপার কি, তাহা বুঝা কঠিন হইয়া পড়িতেছে। একটা দৃষ্টান্ত এখানে দেওয়া আবশ্যক। বিগত ১০ই জানুয়ারী তারিখে জাপানীদিগের একখানি রণবিমান রুস-জাপান অধিকারের সীমান্তরেখা পার হইয়া প্রায় ২২ মাইল দূরে রুসিয়ার অধিকারস্থ এক পল্লীগ্রামে যাইয়া পতিত হয়। উহাতে দুই জন জাপানী সামরিক কর্ম্মচারী ছিল। রুস পক্ষ প্রচার করেন, তাহারা প্রথম হইতে এক জন কৃষককে ধরিয়া লইয়া আসিয়া তাহার নিকট হইতে সংবাদ সংগ্রহের চেষ্টা করে। কৃষকটি জাপানী সামরিক কর্ম্মচারীর তরবারিখানি কোনরূপে হস্তগত করিয়া তাহাকে জখম করিয়া একখানা গাড়ী করিয়া সহরে লইয়া যায়। পথে ঐ কৃষক কয়েক জন রুস প্রহরী সৈনিককে ঐ কথা বলে। প্রহরী সৈন্যেরা আসিয়া সেই রণবিমানখানি এবং অপর সামরিক কর্ম্মচারীকে গ্রেপ্তার করিয়া লইয়া যায়। পরে জাপান রুসিয়াকে লিখিয়া পাঠায় যে, দৈবদুর্য্যোগ বশতঃ উহা ঐ স্থানে অবতরণ করিতে বাধ্য হয়। তাহার পর রুসিয়ার কর্ত্তৃপক্ষ ঐ দুই জন জাপানী সামরিক কর্ম্মচারীকে ছাড়িয়া দেন। এইরূপে তিলকে তাল করিয়া উভয় পক্ষের মনোমালিন্য বৃদ্ধির চেষ্টা পাইতেছে। এই ব্যাপারে যেমন হয়, তাহাই হইতেছে; পরস্পর পরস্পরের উপর দোষারোপ করিয়া আপনাকে জগৎসমক্ষে নির্দ্দোষ বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা পাইতেছে। এরূপ অবস্থায় যুদ্ধ যে যখন-তখন বাধিতে পারে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। উভয় পক্ষই সীমান্তপ্রদেশে সৈন্য সমাবিষ্ট করিতেছে। জাপান বলিতেছে যে, রুসিয়া মাঞ্চুকুয়ো সীমান্তের সান্নিধ্যে প্রচুর সৈন্য জমায়েৎবস্ত করিতেছে বলিয়া জাপানীরা তাহাদের সীমান্তপ্রদেশে সৈন্য লইয়া যাইতে বাধ্য হইতেছে। রুসিয়াও আবার জাপানের উপর ঐরূপ দোষারোপ করিতেছে। জাপানের দোষ এই যে, জাপান এসিয়াবাসী হইলেও হাত কচলাইয়া "আজ্ঞা হাঁ" "আজ্ঞা হাঁ" বলিতেছে না! সে রুসিয়ার তুল্য-মূল্যভাবে কথা কহিতেছে।

এদিকে জার্ম্মাণী রুসিয়ার সোভিয়েট সরকারের ঘোর বিরোধী। সেই জন্য জার্ম্মাণী জাপানের সহিত এক সন্ধি-সর্ত্তে আবদ্ধ হইয়াছে। রুসিয়া যদি জাপানকে আক্রমণ করে, তাহা হইলে জার্ম্মাণী

পশ্চাদ্দিক হইতে রুসিয়াকে আক্রমণ করিবে, উভয়ের মধ্যে এইরূপ কোন সর্ত্ত হইয়াছে বলিয়া অনেকে প্রকাশ করিতেছে। রুসিয়ার সহিত ফ্রান্সের সন্ধি হইয়া গিয়াছে! জার্ম্মাণী যদি রুসিয়াকে আক্রমণ করে, তাহা হইলে ফ্রান্স পশ্চাদ্দিক হইতে জার্ম্মাণীকে আক্রমণ করিবে। রুসিয়া যদি জাপানকে আক্রমণ করে, তাহা হইলে জার্ম্মাণী রুসিয়াকে পশ্চাদ্দিক হইতে আক্রমণ করিবে। এইরূপে একটা পৃথিবীব্যাপী সমরানল প্রজ্বলিত হওয়া অসম্ভব নহে। শুনা যাইতেছে যে, জাপান রুসিয়ার ভাডিভষ্টক বন্দরটি অধিকার করিয়া লইবার চেষ্টা করিতেছে। ইহাই পূর্ব্বদিকে রুসিয়ার একমাত্র বন্দর, যে বন্দর বরফে আবদ্ধ হয় না। জাপান তাহা দখল করিতে গেলেই রুসিয়ার সহিত জাপানের সঙ্ঘর্ষ অনিবার্য্য। ফলে পূর্ব্বাঞ্চলের অবস্থাটা অত্যন্ত উদ্বেগজনক। রুসিয়া ক্রমশঃ দৃঢ়ভাব ধারণ করিতেছে। উভয় পক্ষই যুদ্ধের জন্য বিশেষভাবে প্রস্তুত হইতেছে। এক কথায় সমস্ত শক্তিশালী রাজ্যে যেন সামরিক উন্মত্ততা দেখা গিয়াছে। যুদ্ধের জন্য ছোট বড় সকল জাতিই প্রস্তুত হইতেছে। এখন বিধাতার মনে যাহা আছে, তাহাই ঘটিবে; মানুষ তাহা কিছু ভাবিয়া ঠিক করিতে পারে না।

জাতিসঙ্ঘের ক্লীবতা

বিগত য়ুরোপীয় মহাযুদ্ধের যখন অবসান হইয়াছিল, তখন পাশ্চাত্য খণ্ডের বড় বড় রাজনীতিক বলিয়াছিলেন যে, এইবার তাঁহারা এমন ব্যবস্থা করিবেন যে, তাহার ফলে পৃথিবীতে আর কখনও যুদ্ধ হইবে না, ধরণী আর নরশোণিতে অভিষিক্তা হইবেন না। সে বড় অধিক দিনের কথা নহে। ১৯২০ খৃষ্টাব্দে জাতিসঙ্ঘ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। যাঁহারা ভার্শাই সন্ধিসর্ত্তে স্বাক্ষর করিয়াছিলেন, তাঁহারাই হইয়াছিলেন ইহার আদি এবং অকৃত্রিম সদস্য। তাহার পর উহার সদস্য হইয়াছেন ৫৪টি হোমরা-চোমরা জাতি। ইটালী ইহার আদি সদস্য হইয়াছিল। তখন কথা হইয়াছিল যে, এক জাতির সহিত অন্য জাতির যাহাতে মনোমালিন্য না ঘটে, পরস্পর পরস্পরের সহিত যাহাতে সম্প্রীতির সহিত বাস করিতে পারে, সমস্ত মানবজাতির শান্তি যাহাতে অক্ষুণ্ণ থাকে, তাহারই জন্য ঐ জাতিসঙ্ঘ প্রতিষ্ঠিত হইল। বলা হইয়াছিল যে, যদি এক জাতির সহিত অন্য জাতির স্বার্থ লইয়া দ্বন্দ্ব বা কলহ বাধে, তাহা হইলে,—সেই বিবাদ মীমাংসার জন্য জাতিসঙ্ঘের হস্তে সমর্পণ করিতে হইবে, এবং জাতিসঙ্ঘ কি ভাবে উহার মীমাংসা করিয়া দেন, তাহা দেখিবার জন্য ছয় মাস কাল অপেক্ষা করিতে হইবে। যদি ছয় মাসের মধ্যে মীমাংসা না হয়, তাহা হইলে আরও তিন মাস উহার জন্য অপেক্ষা করিতে হইবে। রাজনীতিক্ষেত্রের তখনকার নল, নীল, গয়, গবাক্ষ যখন খুব নাটকেপণা করিয়া এই প্রতিষ্ঠানটি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, তখন অনেকে ভাবিয়াছিলেন যে, এইবার বুঝি স্বর্গরাজ্য ধরাতলে নামিয়া আসিল! আমরা কিন্তু তখনই বুঝিয়াছিলাম যে, ঐ প্রতিষ্ঠান সফল হইবে না। মার্কিণের তদানীন্তন প্রেসিডেণ্ট ডক্টর উইলসন উহার গোড়ায় গলদ ছিল বলিয়া উহাতে যোগদান করেন নাই! কিন্তু অদৃষ্টের এমনই উপহাস যে, ঐ প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হইবার পর ১৫ বৎসর যাইতে না যাইতে উহার নিষ্ফলতা এবং অসারতা যে এরূপ নগ্নভাবে লোকের নয়নসমক্ষে প্রকাশিত হইবে, তাহা কেহই ভাবে নাই। যে ইটালী ইহার মূল সভ্য, সেই ইটালী নিতান্ত হীনতাসূচক স্পর্দ্ধার সহিত এই সঙ্ঘের অন্য এক জন দুর্ব্বল ও দরিদ্র সদস্যের উপর অকারণ গায়ে পড়িয়া যুদ্ধ বাধাইল, এবং যুদ্ধনীতির সমস্ত সঙ্গত নিয়ম অমান্য করিয়া রোগিনিবাসে এবং ধর্ম্মনিকেতনে রাক্ষসোচিত বিক্রম দেখাইয়া অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক বিষবাষ্পপূর্ণ বোমা নিক্ষিপ্ত করিতে থাকিল, আপনাদের ঘৃণ্য কাপুরুষতাকে বীরত্ব বলিয়া ধরার বক্ষে দাঁড়াইয়া স্পর্দ্ধা করিতে লাগিল, আর জাতিসঙ্ঘ নিতান্ত অক্ষম দর্শকের ন্যায় ফ্যাল-ফ্যাল করিয়া উহা দেখিতে লাগিলেন। ন্যায়বিচার-প্রার্থীর রক্ষার জন্য, দুষ্কৃত জাতির শাস্তিবিধানের জন্য, কিছুই করিতে পারিলেন না। পয়সা খরচ করিয়া এইরূপ নামমাত্র প্রতিষ্ঠান রাখিবার কি প্রয়োজন আছে? ন্যায়ধর্ম্ম উপেক্ষাকারীর শাস্তিবিধানের জন্য যে ব্যবস্থা করা হইল, তাহাও অপরাধী জাতি ভ্রূভঙ্গী সহকারে উপেক্ষা করিল, জাতিসঙ্ঘ এবং তাহার সদস্যবৃন্দ তাহাও পরিপাক করিলেন। তাহার পর তের জন সদস্যের কমিটী বিবাদ-মীমাংসার জন্য যে ব্যবস্থা করিতে চাহিলেন, তাহাও ক্ষমতাস্পর্দ্ধী ইটালী অট্টহাস্য হাসিয়া অগ্রাহ্য করিয়া দিল। জাতিসঙ্ঘ লজ্জাবনত-বদনে জগৎসমক্ষে এই অপমান সহ্য করিতে বাধ্য হইল। ইটালী সন্ধি না করিবার যে হেতু দেখাইয়াছে, তাহার অসারতা বালকেও বুঝিতে পারে। সে সব কথার আলোচনা অনাবশ্যক। সর্ব্বশেষে ইথিওপীয়ার রাণী গলদশ্রুনয়নে, গললগ্নীকৃতবাসে সমস্ত জগদ্‌বাসীকে জানাইয়াছিলেন,—"ওগো, জগদ্‌বাসী, আমরা কাহারও কোন অনিষ্ট করি নাই। আজ দস্যু আসিয়া অকারণ অস্ত্রহীন আমরা, আমাদিগকে হত্যা করে! আর সময় নাই! আমাদিগকে রক্ষা কর!" সে কাতর নিবেদন অনন্তশূন্যে মিশাইয়া গেল! যে বীরত্ববোধের অনুপ্রেরণায় রাণী কর্ণাবতীর রাখী পাইয়া হুমায়ুন অবিলম্বে সসৈন্যে তাঁহার উদ্ধারার্থ ধাবিত হইয়াছিলেন, বর্ত্তমান সভ্যতার যুগে বীরত্বের সে আদর্শ মুছিয়া গিয়াছে! এখন কেবল বোমা আর বিষময় বাষ্পের ব্যবহারই বীরত্বের নিদর্শন! প্রতারণাই বীরত্বের অঙ্গাভরণ। এখন লীগ অব্ নেশন্স বা জাতিসঙ্ঘ সংগঠন করিয়া লাভ কি? উহার ক্লীবত্ব জাজ্বল্যমানভাবে সুপ্রকাশ!

মিশরের নরপতি পরলোকে

মিশরের রাজা ফুয়াদ গত ১৫ই বৈশাখ পার্থিব দেহ ত্যাগ করিয়া অনন্তধামে মহাপ্রয়াণ করিয়াছেন। ইনি যে এক জন বিশিষ্ট নৃপতি ছিলেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। বর্ত্তমান পারিপার্শ্বিক অবস্থায় মিশরের যতদূর উন্নতিসাধন করিতে পারা যায়, তাহা করিবার জন্য তাঁহার একান্ত চেষ্টা ছিল। তিনি ছিলেন এক জন অক্লান্ত কর্ম্মী। ইনি বিদ্যোৎসাহী, শিক্ষানুরাগী এবং মিশরের প্রথম নিয়মনিয়ন্ত্রিত রাজা। ইনি খেদিব ইস্মাইলএর দ্বিতীয় পুত্র ছিলেন। ইঁহার পূর্ব্বজগণ সকলে খেদিব বলিয়া অভিহিত হইতেন। তাঁহারা ছিলেন তুর্ক সুলতানের প্রতিনিধি। রাজা ফুয়াদই কেবল রাজ উপাধিতে ভূষিত হইয়াছিলেন। ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসের ২৬শে তারিখে ইনি জন্মগ্রহণ করেন এবং

বাল্যকালে ইনি ইঁহার পিতার প্রতিষ্ঠিত রাজবিদ্যালয়ে বিদ্যারম্ভ করিয়াছিলেন। যখন ইঁহার বয়স ১০ বৎসর, তখন তিনি জেনিভার টৌডিকন (Toudikon) বিদ্যালয়ে শিক্ষাপ্রাপ্তির জন্য প্রেরিত হইয়াছিলেন। তাহার পর তিনি টুরিনে গমন করেন এবং ইটালীর রাজা ভিক্টর ইমানুয়ালের সতীর্থ থাকিয়া গোলন্দাজী বিদ্যায় বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে ইনি এক বৎসরের জন্য তুরস্ক সুলতান আবদুল হামিদের এডিকং বা পার্শ্বচরের কার্য্য করেন। সুলতান আবদুল হামিদ ইঁহাকে ভিয়েনাস্থিত অটোমান দূতাবাসের সামরিক কর্ম্মচারী করিয়া পাঠাইয়াছিলেন। ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে তিনি কায়রো নগরে ফিরিয়া আসেন

মৃত রাজা ফুয়াদ

মিশরের নূতন রাজা ফারুক

এবং ঐ বৎসরেরই মধ্যভাগে তিনি তাঁহার পিতার (তদানীন্তন খেদিবের) পার্শ্বচর-পদে নিযুক্ত হন। তিনি দেখিলেন যে, তাহার দেশে কালোপযোগী শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের বড়ই অভাব, সেই জন্য তিনি মিশর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠায় অবহিত হইয়াছিলেন। ১৯০৮ খৃষ্টাব্দের শেষভাগেই এই বিশ্ববিদ্যালয় গঠিত এবং ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে উহাকে চারি শাখায় বিভক্ত করা হয়। যথা—আইন শাখা, ভৈষজ্য শাখা, স্থাপত্য শাখা এবং বিজ্ঞান শাখা। ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে তিনি রয়্যাল (রাজকীয়) রাজনীতিক, অর্থনীতিক এবং বৈজ্ঞানিক সমিতি প্রতিষ্ঠিত করেন। ঐ বৎসরেই তিনি মিশরে রয়্যাল মেডিক্যাল এসোসিয়েসন প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। তিনি এথেন্সের প্রাচ্য বিদ্যাসমিতিতে যোগদান করিলে ঐ সমিতি তাঁহাকে ডক্টর উপাধি দিয়াছিলেন। ১৯২৩ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে তিনি তাঁহার পিতার প্রতিষ্ঠিত রয়্যাল জিওগ্রাফিক্যাল ইনষ্টিটিউটের সভাপতি হইয়াছিলেন। ফলে ইনি এক জন শিক্ষিত এবং শিক্ষাবিস্তারের পক্ষপাতী ও বিদ্যোৎসাহী নরপতি ছিলেন।

ইঁহার অগ্রজের মৃত্যুর পর ইনি মিশরের সুলতান হইয়াছিলেন। মহম্মদ আলি পাশা হইতে গণনা করিলে ইনি দশম নরপতি হন। ইনিই খেদিব (প্রতিনিধি রাজা) এই নাম ঘুচাইয়া সুলতান বা রাজা নাম ধারণ করেন। ইনি এক জন বিশিষ্ট নিয়মনিষ্ঠ নরপতি ছিলেন। তাঁহার ধর্ম্মনিষ্ঠা অনন্যসাধারণ ছিল। স্বয়ং সমস্ত রাজকার্য্যই পরিদর্শন এবং অপরাহ্নে নিয়মিতভাবে সংবাদপত্র পাঠ করিতেন। শয়ন করিতে যাইবার পূর্ব্বে তিনি নিয়মিতভাবে উপাসনা করিতেন। তিনি স্বয়ং সুশিক্ষিত ছিলেন এবং শিক্ষিত ব্যক্তিদিগের সঙ্গ করিতে ভালবাসিতেন। চলচ্চিত্র দেখিতে তাঁহার বিশেষ ঝোঁক ছিল। রাজপ্রাসাদে তিনি রাজ্ঞী এবং রাজপরিবারের সহিত মিলিত হইয়া চলচ্চিত্র দেখিতেন। ইনি এক জন দানশৌণ্ড ছিলেন। মিশর সরকারের নিকট হইতে ইনি সংসারখরচ বাবদ যে টাকা পাইতেন, তাহার একটা মোটা অংশ যোগ্য পাত্রে দান করিতেন, ইঁহার পরলোকগমনে মিশরের বিশেষ ক্ষতি হইল, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। ইঁহার পর ইঁহার পুত্রই মিশরের সুলতান হইলেন। আমরা তাঁহার দীর্ঘ জীবন কামনা করি।

আসন্ন সমর ও গ্রেট বৃটেন

পৃথিবীতে আবার একটা সমর আসন্ন হইয়া পড়িয়াছে,—এ কথা সকলেই বলিতেছেন। ইহা লক্ষণ দেখিয়া অনুমান মাত্র। তবে যেরূপ মেঘাড়ম্বর, তাহাতে দুই চারিটি বজ্রপাত এবং কিছু করকাপাত না হইয়া যে যাইবে, তাহা মনে হয় না। কিন্তু এখন জিজ্ঞাস্য হইতেছে, যদি সত্য সত্যই একটা বড় রকমের যুদ্ধ বাধে, তাহা হইলে গ্রেট বৃটেন সেই যুদ্ধে লিপ্ত হইবেন কি না? বর্ত্তমান কালে কেহ ইচ্ছা করিয়া যুদ্ধে লিপ্ত হইতে চাহে না,—তবে গ্রহের ফেরে বা অজ্ঞতার ফলে অথবা অবস্থার তাড়নায় লোককে যুদ্ধে লিপ্ত হইতে হয়। বৃটিশ সেনা-বিভাগের জনৈক সেনাপতি হেনরী রোয়ান রবিনসন সম্প্রতি Security (নিব্বিঘ্নতা) নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন,—"নানা কারণে আমাদের পক্ষে শান্তিই প্রয়োজনীয়। একটি কারণ, আমরা ধনাঢ্য জাতি, সুতরাং যুদ্ধ হইলে আমাদের কোন দিকেই লাভ নাই, বরং সকল দিকে লোকসান হইবার সম্ভাবনা। দ্বিতীয় কারণ, সাগরপথের এবং বিমানপথের নানা দিক দিয়া আমাদের আক্রান্ত হইবার আশঙ্কা অত্যন্ত অধিক। তৃতীয় কারণ, আমরা যদি সত্য সত্যই যুদ্ধে জড়িত না হই, তাহা হইলেও যুদ্ধের ফলে বাণিজ্যের বাজারে এবং আর্থিক ব্যাপারে

যে গোলযোগ ঘটিবে, তাহার ফলে আমাদের পণ্য বেচিবার পথ রুদ্ধ হইবে।" কথাগুলি খুবই সত্য। গ্রেট বৃটেন কোনমতেই সংগ্রাম কামনা করিতে পারেন না। ইহা ভিন্ন আরও কতকগুলি কারণ আছে। বিগত য়ুরোপীয় মহাযুদ্ধের পূর্ব্বে গ্রেট-বৃটেনের যে অবস্থা ছিল, এখন আর ঠিক সে অবস্থা নাই। তখন নৌবলে গ্রেট বৃটেন অপর যে কোন দুই শক্তির সমকক্ষ ছিলেন। এখন আর সে অবস্থা নাই। এখন গ্রেট বৃটেন রণপোতে মার্কিণের তুল্য, অর্থাৎ মার্কিণ রণপোতের সংখ্যা বাড়াইয়া এখন গ্রেট বৃটেনের সমকক্ষ হইয়া উঠিয়াছে। তাহা ভিন্ন ফ্রান্স, ইটালী এবং জাপান তাহাদের নৌবল দ্রুত বৃদ্ধি করিয়াছে এবং করিতেছে। ভূমধ্যসাগরে এখন ইটালী গ্রেট বৃটেনের সহিত পাল্লা দিবার স্পর্দ্ধা করিতেছে। জার্ম্মাণী অনেক রণপোত নির্ম্মাণ করিতেছে। এখন যদি ফরাসী এবং ইটালীয় রণপোত সম্মিলিত হয়, তাহা হইলে ভূমধ্যসাগর দিয়া উহারা বৃটিশের ভারতে আসিবার পথ রুদ্ধ করিতে পারে। তাহার পর আর একটা ব্যাপার ঘটিয়া গেল। বিগত মহাযুদ্ধের পূর্ব্বে বৃটিশ নৌবাহিনীর সর্ব্বত্র কয়লা লইবার আড্ডা ছিল। কয়লাও তাহাদের যথেষ্ট ছিল। এখন জাহাজ তেলে চলে। এখন গ্রেট বৃটেনকে তাহার প্রয়োজনীয় তেলের শতকরা ৬০ ভাগ মার্কিণ, ইরাণ এবং ইরাক হইতে আমদানী করিতে হয়। ইরাক এবং ইরাণের তৈল বৃটেনের হাতে আসিয়াছে সত্য; কিন্তু তাহা বিদেশে অবস্থিত। তথায় যাইতে হইলে ভূমধ্যসাগর দিয়া যাইতে হইবে। যুদ্ধ বাধিলে সে পথ আক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা আছে। কেবলমাত্র তৈল সরবরাহের দিক হইতে বৃটিশ নৌবাহিনীর বিশেষ অসুবিধা ঘটিতে পারে।

যুদ্ধের পর আবার একটা ব্যাপার হইয়াছে। এখন বিমান দ্বারা আকাশপথে আক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা বড়ই বাড়িয়াছে। এখন নৌশক্তি দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছে। তাহার উপর শিল্প এবং বাণিজ্যের ক্ষেত্রে গ্রেট বৃটেনকে এখন প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতার সম্মুখীন হইতে হইয়াছে। যুদ্ধের পূর্ব্বেই মার্কিণ এবং জার্ম্মাণী শিল্প বাণিজ্যে গ্রেট বৃটেনের সহিত ঘোর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে আরম্ভ করে। যুদ্ধের পর সেই প্রতিদ্বন্দ্বিতা বৃদ্ধি পাইয়াছে। এখন মার্কিণ, ফ্রান্স, ইটালী ও জাপান শিল্প এবং বাণিজ্যের ক্ষেত্রে গ্রেট বৃটেনের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী। তাহার পর আর্থিক ব্যাপারে গ্রেট বৃটেনের যে নেতৃত্ব ছিল, তাহাও যেন কতকটা হ্রাস পাইয়াছে। ইংরেজের ইঙ্গিতেই এখন আর টাকার বাজার সম্পূর্ণ চালিত হয় না। সত্য বটে, বহু দেশে গ্রেট বৃটেনের যত টাকা খাটিতেছে, অন্য কোন দেশের তত টাকা বিদেশে খাটিতেছে না। তাহা হইলেও টাকার বাজারে ইংরেজের প্রভাব যেন কিছু কমিয়াছে। এই সকল কারণে ইংরেজ সাধ্যপক্ষে ইচ্ছা করিয়া রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবেন না।

হাবসী-সংগ্রাম শেষ

হাবসী-সংগ্রাম শেষ হইয়া গেল। দুই হাজার বৎসরের একটি প্রাচীন রাজবংশের আজ বিলোপ ঘটিল। সরল বিশ্বাসী খৃষ্টভক্ত একটি জাতির বাসভূমি আজ মহাশ্মশানে পরিণত হইল। ইথিওপিয়া আজ রাক্ষসী ক্ষুধায় বিস্ময়জনক বীরত্ব প্রদর্শন করিয়া আত্মবলি দিল। য়ুরোপীয় সভ্যতার বাহ্য চাকচিক্যের অন্তরালে বর্ব্বরতার এবং পৈশাচিকতার যে মূর্ত্তি লুকাইয়া রহিয়াছে, ইটালী তাহার নগ্নতা আজ সমস্ত মানব-সমাজ-চক্ষুতে ধরিয়া দেখাইয়াছে। ধন্য ইটালী! ধন্য তোমার বর্ব্বরতার বহর! তোমার এই বর্ব্বরতার বিজয়-কাহিনী মানবজাতির ইতিহাসকে চিরকলঙ্কিত করিয়া রাখিবে; সপ্তসিন্ধুর এবং সহস্র সহস্র সরিতের সলিলরাশি তোমার সেই রক্তময় কলঙ্ক ধুইয়া ফেলিতে পারিবে না। যদি মানবজাতির মনুষ্যত্বের কিছু অবশেষ থাকে, তাহা হইলে তাহারা তোমার এই কার্য্য দেখিয়া লজ্জায় অধোবদন হইয়া থাকিবে।

যুদ্ধবিগ্রহ চিরকালই আছে এবং থাকিবে। প্রবলের লালসাগ্নি-কুণ্ডে দুর্ব্বল চিরকালই আপনাকে আহুতি দিয়া আসিতেছে। ইহা কি বিধাতার বিধান বলিয়া মনে হয়? কিন্তু আজ ইটালী পৈশাচিক বিজ্ঞানের সাহায্যে যে রাক্ষসিক মারণাস্ত্র প্রস্তুত

মুসোলিনী

করিয়াছে, যে বিমান এবং বিষবাষ্পপূর্ণ বোমা আবিষ্কৃত করিয়া সহস্র সহস্র শৌর্য্যশালী এবং স্বদেশপ্রেমিক, কিন্তু রাক্ষসযুদ্ধ করিতে অসমর্থ, বরেণ্য বীরকে অশেষ যন্ত্রণা দিয়া মারিয়াছে, জানিও, তাহার প্রায়শ্চিত্ত তাহাকে করিতেই হইবে। বিশ্বেশ্বরের রাজ্যে কিছুই বিলুপ্ত হয় না, কোন কুকীর্ত্তিই ঢাকা পড়ে না। এই বিশ্বে একটি ক্ষুদ্র প্রাণী যে বেদনা-কাতর ধ্বনি তোলে, জানিও, তাহা অনন্তকাল, এই অনন্ত মহাকাশে ইথার-কম্পনে ধ্বনিত এবং প্রতিধ্বনিত হইতে থাকে। উহা বিশ্বপাতার শ্রুতিমূলে পৌঁছিতে বিলম্ব হয় না। তোমার রণবিমান, মাষ্টার্ড গ্যাস প্রভৃতি স্বদেশপ্রেমিক বীরেন্দ্রবৃন্দকে যে ভাবে অশেষ যন্ত্রণা দিয়া মারিয়াছে, তুমি যে ভাবে গীর্জ্জা, হাসপাতাল প্রভৃতির উপর যুদ্ধের সমস্ত নীতি লঙ্ঘন করিয়া উহা নিক্ষেপ করিয়াছ, তাহাতে তোমার কাপুরুষতা ও পৈশাচিকতাই প্রকাশ পাইয়াছে। তোমার ঐ হলাহলের বিজয়-মুকুট কস্মিনকালেও তোমার

যশোভাতি বৃদ্ধি করিবে না। তুমি এখন তাহা বুঝিতে না পার, পরে তাহা বুঝিবে। মনে পড়ে কি ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে হেগের মধ্যস্থ সভায় রুসিয়ার জার দ্বিতীয় নিকলাস যাহা বলিয়াছিলেন? তাঁহার কথা যে বর্ণে বর্ণে সত্য হইয়াছে, তাহা অস্বীকার করা যায় না। তিনি বলিয়াছিলেন, ঐ সকল বৈজ্ঞানিক নারকীয় অস্ত্র ব্যবহার করা নিষিদ্ধ করিতে হইবে। নতুবা উহার অগ্নিতে য়ুরোপ ছারেখারে যাইবে। ইহার ফলে য়ুরোপের নৈতিক দুর্গতি এবং বর্ব্বরতার পুনরাবির্ভাব কিরূপ হইবে, তাহা হার্ব্বার্ট স্পেন্সার, এলফ্রেড রাসেল ওয়ালেস প্রভৃতি উদাত্ত স্বরে ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন। সুধী হার্ব্বার্ট স্পেন্সার তাঁহার Facts and Comments নামক বিখ্যাত গ্রন্থের ১৩২-৩৩ পৃষ্ঠায় প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে লিখিয়া গিয়াছেন।—

Thus on every side we see ideas and feelings and institution appropriate to peaceful life replaced by those appropriate to fighting life. In all places and in all ways there has been going on during the past fifty years a recrudescence of barbaric ambitions, ideas and sentiment, an unceasing culture of blood thirst. If there needs a striking illustration of the result, we have it in the dictum of the peoples Laureate that the "lordliest life on earth" is one spent in seeking to bag certain of our fellow men.

ইহার মর্ম্মার্থ—এইরূপ আমরা সর্ব্বত্রই দেখিতেছি যে, (পূর্ব্ববর্ত্তী) শান্তিময় জীবনযাপনের পক্ষে আবশ্যক ধারণার, মনোভাবের এবং প্রতিষ্ঠানের স্থানগুলি যুদ্ধে নিরত জীবনের উপযোগী ধারণা, মনোভাব এবং প্রতিষ্ঠান আসিয়া দখল করিতেছে। গত পঞ্চাশ বৎসর ধরিয়া সর্ব্বস্থানে ভদ্রসমাজের অযোগ্য উচ্চাভিলাষ, ধারণা, ভাবাবেগ এবং রক্তপিপাসার অনুশীলন দেখা দিতেছে। ইহার ফল সম্বন্ধে যদি জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্তের প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে আমি রাজকবির কথায় বলিব যে, স্বজাতিকে শিকার করাই ধরাতলে সর্ব্বাপেক্ষা অহঙ্কৃত জীবন এই কথার মধ্যে তাহা রহিয়াছে। স্পেন্সার ঐ প্রবন্ধের নাম দিয়াছেন বর্ব্বরতার পুনরাবির্ভাব (Rebarbarization)।

হাবসী সম্রাট

হাবসী সম্রাজ্ঞী

সত্য বটে, আজ শ্বেতাঙ্গ জাতিরা কৃষ্ণকায় জাতিদিগের জন্য বিন্দুমাত্রও ব্যথিত নহেন, কিন্তু তাহা হইলেও এই ব্যাপার দর্শনে তাঁহারা নিজ নিজ ভবিষ্যৎ ভাবিয়া উদ্বিগ্ন। ইটালী যে ভাবে অন্তরীক্ষ হইতে স্বদেশপ্রেমিক হাবসী জাতির উপর সানন্দে মাষ্টার্ড গ্যাস, তরলীকৃত অগ্নি, হৃদ্‌রোধক বাষ্প প্রভৃতি নিক্ষেপ করিয়াছে, য়ুরোপে আসন্ন যুদ্ধে যদি শ্বেতাঙ্গ জাতিরা মরিয়া হইয়া পরস্পর পরস্পরের উপর ঐ সকল মারাত্মক এবং ঘোর যন্ত্রণাদায়ক প্রহরণ নিক্ষেপ করে, তাহা হইলে য়ুরোপের দশা কি দাঁড়াইবে? এখন এই চিন্তাই শ্বেতাঙ্গ জাতিদিগের মধ্যে প্রবল হইয়া পড়িয়াছে। এই জগতে যে কাঠায় মাপ, সেই কাঠায় তাহার শোধ হয়, ইহা জানা কথা। য়ুরোপের রণচণ্ডী এবার ছিন্নমস্তারূপে তাঁহার স্বীয় রুধির (য়ুরোপীয় সভ্যতা) পান করিবেন,—এই আশঙ্কা স্বতঃই সকলের মনে উদিত হইতেছে।

শেষ দিকে দুই তিন সপ্তাহ ধরিয়া যুদ্ধের যে সংবাদ আসিতেছিল, তাহাতেই সকলের মনে শঙ্কা জন্মিয়াছিল যে, ইথিওপিয়ার স্বাধীনতা-সূর্য্য অস্তাচলে যাইতে আর বিলম্ব নাই। যুদ্ধের ধারা সর্ব্বত্রই প্রায় একরূপই ছিল, প্রভেদ কেবল স্থানের এবং ফলের। শেষ দিকে সংবাদ পাওয়া যায় যে, ইটালীয় সৈন্য সদম্ভ পদবিক্ষেপে অগ্রসর হইয়া ক্রমশঃ দেসি, জিজিগা, হারার অধিকৃত করিয়া আদ্দিস আবাবার দিকে অগ্রসর হইতেছে! সর্ব্বত্রই হাবসী সৈন্য ইটালীয় সেনাকে বাধা দিতেছে। ইটালীয় সৈন্য বিমান হইতে বোমা নিক্ষেপ করিয়া অসহায় শৌর্য্যশালী হাবসী সৈন্যদিগকে বিধ্বস্ত করিয়া দিতেছে। সকল রণক্ষেত্র হইতে সেই একই কথা। হাবসী নরনারীরা স্বদেশ-রক্ষার্থ জীবন বিসর্জ্জন করিতেছে,—আর ইটালীয়ান বীরপুঙ্গব ইন্দ্রজিতের ন্যায় অন্তরীক্ষে থাকিয়া তাহাদের উপর ঘোর যন্ত্রণাদায়ক মারাত্মক প্রহরণ নিক্ষিপ্ত করিয়া সেই নিরপরাধ লোকদিগকে হত্যা করিতেছে। আদ্দিস আবাবা দখলের প্রায় পক্ষাধিক কাল পূর্ব্বে জিজিগা নামক স্থান ইটালীয় সৈন্যদিগের দখলে আইসে। এই সময় সত্যনিষ্ঠ ইটালীয়ানরা ঘোষণা করেন যে, সম্রাট হাইলাস সিলাসি যুদ্ধে নিহত হইয়াছেন। সংবাদটি সম্পূর্ণ

মিথ্যা। ঠিক এই সময়ে ইটালীর 'পিপলো ডি ইটালীয়া' নামক আধা সরকারী পত্রে প্রকাশ পায় যে, ইটালী সমস্ত আবিসিনিয়া রাজ্যটি অধিকার করিয়া লইতে চায়। নতুবা তাহারা আবিসিনিয়ার অধিবাসীদিগকে বর্ব্বরোচিত অত্যাচার হইতে রক্ষা করিতে পারিবে না; তাহার পর হাবসীরা নাপেলীর উত্তরে এক দল ইটালীয় সৈন্যকে ছত্রভঙ্গ করিয়া দিয়াছিল। ঐ যুদ্ধে ২২০ জন য়ুরোপীয় সৈন্য মরিয়াছিল। ১৫ই এপ্রিলের সংবাদে প্রকাশ—ওগাডেনে উভয় পক্ষের ঘোর সংগ্রাম হইয়া গিয়াছে। দেদজাসমাস এবং ওহাইব পাশা এই স্থানে হাবসী সৈন্যদিগকে পরিচালিত করিয়াছিলেন। এই স্থানে ইটালীয়ানরা প্রচণ্ডভাবে বোমাবর্ষণ করিয়াও কিছু করিতে পারে নাই। হাবসীরা দেসদির বিমানের আড্ডা আক্রমণ করিয়া ইটালীর ১৭ খানি রণবিমান ধ্বংস করে। এইরূপ ওয়ারা হাচুতে এবং মোলামোদা গিরিবর্ত্মে উভয় পক্ষের ভীষণ যুদ্ধ হয়। সামাচেনেও ঘোর যুদ্ধ হয়। সর্ব্বত্রই ইটালীয়ানরা বোমাবর্ষণ করিয়া জয়লাভ করে। হাবসীদিগের বিস্তর সৈন্য ক্ষয় হয়। কিন্তু যখন দেখা যায় যে, আর উপায় নাই, তখন হাবসী-রাজমহিষী এবং হাবসী-রাজদুহিতা সাশ্রুনয়নে সমস্ত সংবাদপত্রের সংবাদদাতাকে এবং মহিলা-সমাজকে হাবসী জাতিকে রক্ষা করিবার জন্য অনুরোধ জানাইয়াছিলেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। অঘটনঘটনপটীয়সী মহামায়া কি উদ্দেশ্যে কোন্ কার্য্য করেন, তাহা বুঝিবার সাধ্য মানুষের নাই।

কিন্তু যখন সম্রাট রাস তাফারি দেখিলেন যে, তাঁহার মত প্রায় নিরস্ত্র জাতির আর ইটালীর ন্যায় মারণাস্ত্রে সুসজ্জিত জাতির সহিত যুদ্ধ করিয়া জয়লাভের আশা নাই,—তখন তিনি রাজমহিষী এবং রাজপরিবারবর্গকে জিবুটীতে পাঠাইয়া দিয়া স্বয়ং রাজধানীতে থাকিবেন সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। কিন্তু শেষকালে রাজ্ঞী এবং রাজপরিবারের সকলের বিশেষ পীড়াপীড়িতে তিনি রাজধানী পরিত্যাগ করিয়া তাঁহাদের সহিত জিবুটী যাত্রা করেন। প্রথমে সংবাদ আসিয়াছিল যে, রাজ্ঞী জেরুজিলামে যাইবেন। তাহার পরে সংবাদ পাওয়া যায় যে, রাজপরিবারের সকলেই সম্রাটসহ ফ্রান্সে যাইয়া আশ্রয় লইবেন। কিন্তু তাহা হয় নাই। প্রকাশ—সম্রাট গত ৪ঠা মে জিবুটী হইতে বৃটিশ রণতরী 'এণ্টারপ্রাইজে' আরোহণ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। তিনি কোথায় গিয়াছেন, তাহা এখনও প্রকাশ নাই। তবে শুনা যাইতেছে যে, তিনি প্যালেষ্টাইনের হাইফা নগরে গিয়াছেন। সম্রাট চলিয়া যাইবার পর আদ্দিস আবাবায় ঘোর অরাজকতা এবং লুঠতরাজ আরম্ভ হইয়াছিল। সহরের অধিকাংশ অগ্নিযোগে ভস্মীভূত হইয়া গিয়াছে। বিদেশী, বিশেষতঃ য়ুরোপীয়দিগের উপর উন্মত্ত জনতা গুলী বর্ষণও করিয়াছে। সেনাপতি রাস নাসিবু এবং তুর্ক সামরিক পরামর্শদাতা ওহাইব পাশা গত ৫ই মে দিরেদোয়া হইতে আদ্দিস আবাবায় ফিরিয়া গিয়াছেন। ফলে ইটালীয়দিগকে বাধা দিবার সমস্ত ব্যবস্থাই নষ্ট হইয়া গিয়াছে। ২২শে বৈশাখ মঙ্গলবার অপরাহ্নে ইটালীয় সৈন্য আদ্দিস আবাবায় প্রবেশ করিয়াছে। আপাততঃ প্রকাশ—সম্রাট হাইলাস সিলাসি প্যালেষ্টাইনেই থাকিবেন। কিন্তু তথায় থাকিয়া তিনি আর আবিসিনিয়ার ব্যাপার সম্বন্ধে কিছু করিবেন না।

হাইলাস সিলাসি শেষ পর্য্যন্ত তাঁহার রাজ্যের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য প্রাণপণে এবং অকুতোভয়ে চেষ্টা করিয়াছেন। এই যুদ্ধে তাঁহার অনেক লোকক্ষয় হইয়া গিয়াছে। ইহাতে মনে হইতেছে যে, তিনি এক জন জনপ্রিয় রাজা ছিলেন। ইটালীরও এই যুদ্ধে অনেক লোকক্ষয় হইয়াছে; কিন্তু ইটালী রণক্ষেত্রে ইরিট্রিয়া এবং সোমালী-দেশীয় সৈন্যদিগকে প্রথমে শত্রুর সম্মুখীন হইতে পাঠাইতেন। সেই জন্য তাঁহাদের শ্বেতাঙ্গ সৈনিক অধিক ক্ষয় হয় নাই। এখন অনেক কথা চাপা আছে, ক্রমে সমস্তই প্রকাশ পাইবে।

এখন এই ব্যাপারের তরঙ্গতাড়না কোথায় যাইয়া পড়িবে, কে বলিতে পারে?

"ওয়াল্‌টেয়ার"

তুলি দিয়ে আঁকা ছবির মতন নীল সাগরের কূলে
কে যেন যতনে খেলাঘর পেতে রয়েছে ভুবন ভুলে!
কল-কোলাহল হইতে বিজনে
আমরা চলিয়া এসেছি দু'জনে
ডাগর তোমার অতল নয়নে সাগর উঠিছে দুলে!
মোর খেলাঘর ও দুটি ডাগর নয়ন-সায়র-কূলে!

নির্জন শৈল, বিজন বনানী, অসীম সলিলরাশি!
শীতল পবন সন্ধ্যার কাণে কি সুরে বাজায় বাঁশী!
ঘনায় আঁধার উপরে ও নীচে,
ঘনায় আঁধার সম্মুখে পিছে,
মোর মন হ'তে মুছে নেয় ধরা ও কালো আঁখির হাসি!
ভুবন ভুলিয়া রহিয়া তন্ময় নেহারি' আঁধাররাশি!

দূর মন্দির হ'তে আরতির মৃদুল ঘণ্টা আসে!
কালো সিন্ধুর কোলে "ভাইজাগ" শিশুটির মত হাসে!
আঁচলে ঢাকিয়া মাতা যেন তায়
ঘুম-পাড়ানীয়া ছড়া-গান গায়
দুরন্ত শিশু ঘুমাতে না চায় খল্ খল্ করি হাসে!
জনপদ হ'তে জনরব তাই আরতি ধ্বনিতে ভাসে!

চলি ধীরে-ধীরে বালু-বেলা-তীরে, আকাশের আঙ্গিনাতে
দিগ্বালিকারা তারাদীপ জ্বালে জ্যোৎস্না ধোওয়ানো হাতে!
কালো শিলা আর ঢেউয়ের লীলায়
আলো-ছায়া জ্বলি' উঠিয়া মিলায়
হাসি-মুখে চাঁদ উঁকি দিয়ে চায় নিরালা মধুর রাতে!
সে-হাসি-জ্যোৎস্না মিতালী পাতায় মাটীর কবির সাথে!

শ্রীরামেন্দু দত্ত।

সাময়িক প্রসঙ্গ

অস্ত এবং উদয়

পৌর্ণমাসী রজনীর শেষ হইলে দেখা যায় যে, চন্দ্রদেব এক দিকে ম্লান-কিরণে অস্তাচলে যাইতেছেন, অন্যদিকে সবিতৃদেব পূর্ব্ব-গগনকে জবাকুসুমবর্ণে অনুরঞ্জিত করিয়া উদিত হইতেছেন। জগতের ইহাই নিয়ম। যে অস্তে যায়, তাহার তেজ ম্লান হয়,—যাহার উদয় হয়, তাহার তেজ যেন পলে পলে বৃদ্ধি পায়। সম্প্রতি ভারতের রাজনীতিক গগন হইতে লর্ড উইলিংডনের অস্তগমন এবং তাঁহার স্থানে লর্ড লিন্‌লিথ্‌গোর উদয় এই ব্যাপারেই পরিলক্ষিত

লর্ড লিন্‌লিথ্‌গো

লর্ড উইলিংডন

হইয়াছিল। মনে পড়ে, পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে এই লর্ড উইলিংডন ভারতের রাজনীতিক আকাশে যখন নববিভাকররূপে উদিত হইয়াছিলেন, তখন তিনি এ দেশবাসীকে কত আশার বাণীই শুনাইয়াছিলেন! আজ একে একে তাঁহার কথাগুলি মিলাইয়া লইলে কি দাঁড়ায়, তাঁহার বিদায়কালে আমরা তাহার আর আলোচনা করিব না! ইতিহাস তাহা লোককে বিশেষভাবে বুঝাইয়া দিবে। এ কথা সত্য যে, লর্ড রেডিংএর শাসনকালে যে দমননীতি প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল, লর্ড উইলিংডনের আমলে তাহাই চরমে চড়িয়াছিল। ইনি সিভিলিয়ানী প্রভাবে সম্পূর্ণভাবে পতিত হইয়াছিলেন। ইঁহার যে কোন ব্যক্তিগত বিশেষত্ব ছিল, তাহা মনে হয় না। ইনি যত অধিক দিন ভারতের বিভিন্ন ক্ষেত্রে শাসন-তরণীর কর্ণধার-রূপে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, এত আর কেহই ছিলেন না। ১৯১৯ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯২৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ইনি মাদ্রাজের, তৎপূর্ব্বে ১৯১৩ হইতে ১৯১৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ইনি বোম্বাইয়ের শাসনকর্ত্তা হইয়াছিলেন। তাহার পর ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে তিনি ভারতের রাজপ্রতিনিধি এবং গভর্ণর জেনারল হইয়া আসেন। যাঁহার জীবনের পরিণতিকালের দীর্ঘ ১৫ বৎসর ধরিয়া ভারতের শাসনকার্য্য পরিচালনে উৎসর্গীকৃত হইয়াছিল—তাঁহার নিকট ভারতবাসী যেরূপ আশা করিয়াছিল, সেরূপ কিছুই তাহারা পায় নাই। সে জন্য ভারতবাসীর দুঃখ স্বাভাবিক। যখন ভারতে তাঁহার কার্য্যকালের অবসান হইয়া আসিতেছিল, তখনও তিনি তাঁহার সাম্রাজ্যবাদ-সুলভ দাম্ভিকতা ত্যাগ করেন নাই। গত নভেম্বর মাসের শেষভাগে মিউনিসিপ্যাল বোর্ডের প্রদত্ত অভিনন্দন-পত্রের উত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন, "যে শাসন-সংস্কার আসিতেছে, তাহাতে ভারতবাসী আপনাদের কার্য্যকরী ক্ষমতার এবং উন্নতি-সাধনের শক্তি কতখানি, তাহার পরিচয় দিবার মত সমস্ত পন্থা উন্মুক্ত করা হইবে।" এই রাজনৈতিক ছেঁদো কথার মর্ম্ম সকল ভারতবাসীই বুঝিতে পারে। ভারতবাসীরা সে যোগ্যতার পরিচয় দিতে পারিয়াছে কি না, তাহার পরিচয় দিতে তাহারা ত্রুটি করে নাই। অনেক বিশিষ্ট য়ুরোপীয় সে পরিচয় পাইয়াছেন বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। অধ্যাপক সীলি (J R. Seeley) সেই পরিচয় পাইয়াই তাঁহার গ্রন্থে (Expansion of England) লিখিয়াছেন—We are not cleaver than the Hindu : our mind are not richer or larger than his. অর্থাৎ হিন্দুদিগের অপেক্ষা আমরা (অর্থাৎ ইংরেজরা) অধিকতর তীক্ষ্ণবুদ্ধি নহি; হিন্দুদিগের অপেক্ষা আমাদের বুদ্ধি অধিকতর উর্ব্বর অথবা মহত্তর নহে। লর্ড মর্লে একবার 'নাইন্টিন্থ সেঞ্চুরী এণ্ড আফটার' নামক প্রসিদ্ধ মাসিক পত্রে লিখিয়াছিলেন যে, হোয়াইট হলের সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট লোক যেমন কার্য্যক্ষম, ভারতীয় রাজপুরুষরা (অর্থাৎ রাজকার্য্যে নিযুক্ত ভারতবাসীরা) সর্ব্ববিষয়ে সেইরূপই যোগ্য ব্যক্তি। সুতরাং ভারতবাসীদিগের আর কার্য্যক্ষেত্রে যোগ্যতার পরিচয় দিতে হইবে না। তবে সাম্প্রদায়িকতার অনুরোধে অথবা অন্য কোন কারণে যদি সরকার দায়িত্বপূর্ণ পদে যোগ্যতম ভারতবাসীদিগকে নিযুক্ত না করেন, এবং তাহার ফলে যদি কার্য্যক্ষেত্রে কোন রাজপদে অধিষ্ঠিত ভারতবাসী যোগ্যতার পরিচয় না দিতে পারেন, এবং লম্বা সেলাম করিয়া চাকুরী বজায় রাখিবার চেষ্টা করেন,—তাহা হইলে তাঁহার অযোগ্যতার জন্য সমস্ত ভারতবাসীকে অযোগ্য বলিয়া লাঞ্ছিত করা কখনই সঙ্গত হইতে পারে না। পৃথিবীতলে কোন জাতির সকল লোকই তুল্য যোগ্যতা লাভ করিতে পারে না। যোগ্য ব্যক্তিরা সাধাপক্ষে তোষামোদ করিয়া কার্য্যসিদ্ধি করিতে,—বাবা'আমার জয়ে জয় গাহিতে চাহিবে না। যত দিন ঠিক যোগ্যতা দেখিয়া রাজপদে ভারতবাসীদিগকে

নিয়োগ করা হইয়া আসিতেছিল, তত দিন কর্ম্মক্ষেত্রে হিন্দু-মুসলমাননির্ব্বিশেষে সকল ভারতবাসীই যোগ্যতা প্রকটিত করিতে সমর্থ হইয়াছিল। তত দিন মুসলমান ভারত, হিন্দু ভারত, বৌদ্ধ ভারত প্রভৃতি শব্দ ভারতীয় ভাষায় স্থান পায় নাই।

লর্ড উইলিংডনকে বিদায়কালে অভিনন্দিত করিয়াছিলেন বোম্বাইয়ের মুসলমান সম্প্রদায়। অভিনন্দনকারীরা বলিয়াছিলেন,—"মুসলমানদিগের কল্যাণকল্পে এবং রাজনীতিক উন্নতি-সাধনে আপনি মুসলমানদিগের প্রাপ্য অধিকার প্রদানের জন্য যে বিশেষ মনোযোগী হইয়াছিলেন, সে জন্য মুসলেম ভারত আপনার নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞ।" ইহাতেই তাঁহার শাসননীতির অনেক কথাই প্রকাশ পাইয়াছে। মুসলমান ভারত, খৃষ্টান ভারত, বৌদ্ধ ভারত প্রভৃতি কত ভাগে ভারতকে বিচ্ছিন্ন করা হইবে? মুসলমান ভারত কবে কাহার দ্বারা পত্তন হইয়াছিল? মুসলমান রাজত্বকালের কোন মুসলমান লেখক কি মুসলমান ভারত নামক অপূর্ব্ব চীজের উল্লেখ করিয়াছেন?

ভালই হউক আর মন্দই হউক, লর্ড উইলিংডন ভারত ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছেন। তাঁহার স্থানে আসিয়াছেন মার্কুইস অব লিনলিথগো। ইনি কৃষিবিদ্যায় পারদর্শী; ইঁহার মত এই যে, কৃষি-সম্পদই ভারতের আদি এবং অকৃত্রিম সম্পদ। এই কৃষিকে বনিয়াদ করিয়াই ভারতের আর্থিক অবস্থার সমুন্নত সৌধ গড়িয়া উঠিয়াছে। শাসকদিগের মুখে এ কথা নূতন শুনা যাইতেছে না। এই কথা লর্ড মেয়োর আমল হইতে লর্ড লিনলিথগো পর্য্যন্ত প্রায় সকল শাসকদিগের মুখেই আমরা শুনিয়া আসিতেছি। ইহাতে সহজেই বুঝা যায় যে, শাসকবর্গ ভারতবর্ষকে চিরকালই কৃষিপ্রধান দেশে পরিণত করিয়া রাখিতে চাহেন। কিন্তু কেবল কৃষিমাত্রসম্বল দেশ কখনই কোন উচ্চ অঙ্গের সভ্যতাসমুজ্জ্বল দেশের সমকক্ষতালাভে সমর্থ হয় না। তাহা যদি হইত, তাহা হইলে মার্কিণ আজ কৃষির উপর শিল্পের সৌধ রচনা করিবার জন্য বিশেষ মনোযোগী হইত না। রুসিয়াও ছিল কৃষিপ্রধান, এখন সে শিল্পপ্রধান হইবার চেষ্টা করিতেছে। কেন তাহারা তাহা করিতেছে? কারণ, কেবল কৃষিই যে দেশের লোকের বৃত্তি, সে দেশ কখন প্রজ্ঞায়, প্রতিভায় এবং মনীষায় বড় হইতে পারে না। পাখী যেমন দুইটি পক্ষ সঞ্চালন করিয়া গগনে উড়িয়া যায়, সেইরূপ মানুষও কৃষি এবং শিল্প এই দুইটি বৃত্তি আশ্রয় করিয়া উন্নতিলাভ করিতে পারে। ভারত চিরকালই কৃষি-প্রধান দেশ কি না,—সে প্রশ্ন আমরা এখানে আর তুলিব না। তবে এ কথা যখন সত্য যে, কোন দেশই গোড়ায় শিল্পপ্রধান হয় নাই,—গোড়ায় কৃষিপ্রধান হইয়াই সকল দেশ পরে শিল্পপ্রধান হইয়াছে, তখন ভারতকেও তাহাই হইতে হইবে। আমরা শাসকদিগের নিকট হইতে সেইরূপ প্রতিশ্রুতি পাইতে এবং সেই প্রতিশ্রুতি পালনের চেষ্টা দেখিতে চাই।

লর্ড লিনলিথগো রাজপ্রতিনিধির তক্তে বসিয়াই মামুলী প্রথামতে এক বাণী প্রচার করিয়াছেন। সাম্রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার ঘোষণাবাণী হইতে এ পর্য্যন্ত এইরূপ অনেক আশ্বাসবাণী আমরা শুনিয়া আসিতেছি। জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে কেবল গুণ দেখিয়া লোকের সমাদর করা হইবে, সরকারী পদে প্রতিষ্ঠিত করা হইবে,—সকল সম্প্রদায়ের সহিত সমান ব্যবহার করা হইবে,—কোন পক্ষকে অনুগ্রহ করিয়া কোন বিষয়ে ধর্ত্তা (weightage) দেওয়া হইবে না,—প্রভৃতি প্রতিশ্রুতি কি রক্ষিত হইয়াছে না হইতেছে? তবে আর এ-সব কথা বলিয়া লাভ কি? লর্ড লিনলিথগো বলিয়াছেন যে, তাঁহার পাঁচটি সন্তান, তাহাদের প্রত্যেকের প্রকৃতি বিভিন্ন। কিন্তু তিনি সকলের সহিত সমান ব্যবহার করিয়া থাকেন,—কাহাকেও তিনি অধিক আদর বা অনুগ্রহ করেন না। এ গুণ যে কেবল তাঁহারই আছে, আর কাহারও নাই, তাহা নহে। আরও অনেকের সে গুণ আছে। কিন্তু ভারতের শাসন-কর্ত্তার মসনদে বসিয়া মূর্ত্তিমান ন্যায়বিচারকরূপে সর্ব্বসম্প্রদায়ের উপর ন্যায়বিচার বিতরণ করা কি সম্ভব হইবে? আইন যে তাহার পথ রোধ করিবে। তবে সে কথা বলিয়া লাভ কি? সত্য বটে, ভারতে বহু জাতির এবং বহু ভাষা-ভাষী লোকের বাস। কিন্তু য়ুরোপে এবং মার্কিণে কি তাহা নাই? মার্কিণে যত বিভিন্ন-জাতীয় লোক আছে, বিভিন্ন-ভাষা-ভাষী লোকের বাস, ভারতে তত বিভিন্ন জাতি এবং বিভিন্ন-ভাষা-ভাষী লোক নাই। কানাডায় ১ শত ৭৮ রকমের ভাষা, ৫৩টি বিভিন্ন জাতি আর উনআশী প্রকার বিভিন্ন ধর্ম্মবিশ্বাস প্রচলিত। কিন্তু এই দুই রাজ্যের কোথায় শাসন-সম্পর্কিত আইনে ভারতের ন্যায় ঠিক সাম্প্রদায়িক ব্যবস্থা আছে? কোথায় ভোট-দানে এবং চাকুরীর দাবীতে কেবল ধর্ম্ম-বিশ্বাসভেদে সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের জন্যও ধর্ত্তা বা ধরাট (weightage) ধরিয়া দিবার ব্যবস্থা আছে? লর্ড লিনলিথগো যখন শাসনসংস্কার আইন গঠনের সমিতিতে ছিলেন, তখন নিশ্চয়ই তিনি সে সব কথা জানেন। সুতরাং পিতা হইয়া তিনি সকল সন্তানের উপর যে সমদর্শিতা দেখাইতে পারিয়াছেন, ভারতের শাসন-কর্ত্তার আসনে বসিয়া সর্ব্বসম্প্রদায়ের প্রজাদিগের উপর সেইরূপ সমদর্শিতা দেখাইতে পারিবেন কি?

লর্ড লিনলিথগোর প্রচারিত অভিভাষণ সুন্দর হইয়াছিল। তিনি আইন এবং শৃঙ্খলারক্ষার প্রয়োজনীয়তার কথা বিশেষভাবে বলিয়াছেন। শাসকদিগের পক্ষে আইন এবং শৃঙ্খলারক্ষার জন্য সর্ব্বপ্রথমে চেষ্টা করা কর্ত্তব্য, এ কথা আমরা স্বীকার করি। সে চেষ্টার জন্য সরকারকে কেহই নিন্দা করিতে পারে না। কিন্তু এই সম্বন্ধে মিষ্টার জিনা যে কথা বলিয়াছেন,—তাহাও লর্ড লিন্‌লিথগোর ভাবিয়া দেখা উচিত। মিষ্টার জিনা বলিয়াছেন যে, বড়লাট বাহাদুরের এই শান্তি এবং শৃঙ্খলাভঙ্গের কারণতত্ত্ব বিশেষ-ভাবে চিন্তা করিয়া দেখা উচিত। আমাদের দেশে একটা কথা আছে যে, "বিনা বাতাসে গাছ নড়ে না।" অকারণ জন-সমুদ্র বিক্ষুব্ধ হয় না। ইহার কারণতত্ত্ব অনুসন্ধান করিয়া ইহার প্রতিকার করিবার ব্যবস্থা চিন্তা করা উচিত। সরকার পক্ষ যাহাই বলুন না কেন, এ দেশের লোক দেখিতে পাইতেছে যে, লোক দিন দিন অধিক দরিদ্র হইয়া পড়িতেছে। কতকগুলি লোক একেবারে দিশাহারা হইয়া উঠিতেছে। ইহার প্রতিকার হওয়া আবশ্যক। কেবল কৃষক-সমাজের উন্নতিসাধন করিলে তাহা হইবে না। কৃষক-সমাজের উন্নতিসাধনের সঙ্গে সঙ্গে শিল্পীদিগেরও উন্নতিসাধন করিতে হইবে। কারণ, কৃষি যদি লাভজনক হয়, তাহা হইলে সকল লোকই কৃষিসেবা করিতে চাহিবে। জমির চাহিদা বৃদ্ধি পাইবে। চাষের জমি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত হইয়া পড়িবে। ফলে লোকের যে কষ্ট, সেই কষ্টই আসিয়া দাঁড়াইবে। নূতন বড়লাট

এ কথা ভালরূপই বুঝেন ; সুতরাং এ সম্বন্ধে আমরা আর অধিক কথা বলিব না। তিনি আমাদের সর্ব্বপ্রধান শাসনকর্ত্তা হইয়া আমাদের দেশে আসিয়াছেন। আমরা তাঁহাকে সাদরে অভিনন্দন করিতেছি। তিনি প্রসন্নচিত্ত এবং অটুট স্বাস্থ্যের অধিকারী হইয়া অকপটভাবে ভারতের হিতসাধন করিতে থাকুন, ইহাই আমাদের আন্তরিক কামনা। আমরা তাঁহার সকল কথার আলোচনা করিলাম না। কারণ, এখন তাহা করিয়া লাভ নাই! কার্য্যক্ষেত্রে কার্য্য দ্বারাই মনোগত ভাবের প্রকৃত পরিচয় পাওয়া যায়। নতুবা কেবল বাক্য দ্বারা কাহারও মনোভাব বুঝা যায় না।

Where Natures end of language is declined
And man talk only to conceal the mind

রাজনীতিক্ষেত্রে কি তাহাই হয় না?

—

পণ্ডিত জওহরলালের অভিভাষণ

গত ৩০শে চৈত্র রবিবার লক্ষ্ণৌ সহরে কংগ্রেসের অধিবেশন আরম্ভ হয়। ঐ দিন উহার নির্ব্বাচিত সভাপতি পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু এক সুদীর্ঘ বক্তৃতা পাঠ করিয়াছিলেন। তাঁহার বক্তৃতায় প্রধানতঃই সমাজতন্ত্র-বাদের সমর্থন ছিল। পণ্ডিত জওহরলাল স্বয়ং সমাজতন্ত্রবাদী, কেবল সমাজতন্ত্রবাদী নহেন, তিনি একেবারে সর্ব্বস্বত্ববাদী (কমিউনিষ্ট)। তিনি তাঁহার অভিভাষণের এক স্থানে বলিয়াছেন :—"আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই যে, সোশ্যালিজম্ দ্বারাই জগতের এবং ভারতের সমস্যাগুলির মীমাংসা করা সম্ভব। কেবলমাত্র ফাঁকা সেবা-ধর্ম্মের দোহাই দিয়া আমি এই কথা বলিতেছি না, অর্থ-নীতিক এবং বৈজ্ঞানিক দিক্ দিয়াই এই কথা বলিতেছি। সোশ্যালিজম্ একটি আর্থিক নীতিমাত্র নহে। ইহা এক নূতন জীবনবেদ ; এই জন্যই আমি ইহার অনুরাগী। সোস্যালিজম্ ভিন্ন ভারতের দারিদ্র্য, বেকার-সমস্যা, পরাধীনতা এবং অধঃপতনের প্রতিকারের আর কোন পন্থা আমি দেখি না।" যাঁহার এই ধারণা, তিনি রাজ-নীতি-ক্ষেত্রে নেতার আসনে বসিয়া যে সোস্যালিজম্ বা সমাজতন্ত্র মতের প্রচার করিবার সুযোগ পরিত্যাগ করিবেন না, তাহা সহজেই বুঝা যাইতে পারে। তিনি অন্য পন্থা দেখিতেছেন না বলিয়া যে অন্য পন্থা নাই, তাহা মনে করা ভুল। সমাজ-তন্ত্রবাদের মূল নীতির সহিত ভারতীয় চিরন্তন ভাবধারার সামঞ্জস্যসাধন করা সম্ভব হইবে কি না, তাহা তিনি নিবিষ্টচিত্তে ভাবিয়া দেখিয়াছেন কি? তিনি স্বয়ং বলিয়াছেন ;—"ভারতবাসীদিগকে সমাজ-তন্ত্রবাদের আদর্শকে তাহার জাতিগত স্বাভাবিকী বুদ্ধির সহিত খাপ খাওয়াইয়া লইতে হইবে (adept the ideal to the genius of her race)।" কিন্তু তেলে জলে মিশ খাওয়ান কি সহজ? যে দেশের লোক অদৃষ্ট, কর্ম্মফল এবং জন্মান্তরবাদে যুগযুগান্তর ধরিয়া বিশ্বাসী, যাহা তাহাদের অন্তঃপ্রকৃতির সহিত একেবারে গাথা হইয়া গিয়াছে, তাহার সহিত নিরীশ্বরবাদ এবং ইহকালসর্ব্বস্বতাবাদের সামঞ্জস্যসাধন একেবারেই অসম্ভব। সভাপতি স্বয়ংই তাঁহার অভিভাষণে বলিয়াছেন : "সমাজ-তন্ত্র-বাদের প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে আমাদের রাজ-নীতিক এবং সামাজিক কাঠামোর সমস্তই বদলাইয়া ফেলিতে হইবে, ভূসম্পত্তির এবং শিল্পের কায়েমী স্বার্থগুলির এবং দেশীয় রাজ্যের উচ্ছেদ করিতে হইবে। সমাজে ব্যক্তিগত সম্পত্তি এবং ব্যক্তিগত লাভ-সম্পর্কিত আর্থিক ব্যবস্থার বিলোপ করিতে হইবে। তৎস্থানে পরস্পর পরস্পরের সেবাকার্য্যে রত হইতে হইবে।" ইত্যাদি কথাগুলি শুনিতে অতি সুন্দর এবং মনোহারীও বটে। কিন্তু এই ভালমন্দ-জড়িত জগতে উহার বিনিয়োগ করা কি সম্ভব হইবে? সমাজতন্ত্রীরা মানব-সমাজ হইতে পারস্পরিক প্রতিদ্বন্দ্বিতাকে নির্ব্বাসিত করিয়া তাহার স্থানে পারস্পরিক সেবার এবং তুল্য ব্যবস্থা করিয়া ধরাতলে স্বর্গসুখ আনিবার কল্পনা করিতেছেন। কবি-কল্পনায় উহা বেশ মানায়, কিন্তু এই মরজগতে উহা আনা সম্ভব হইবে কি? নিখিল পৃথিবীর লোক কি তপোধনের ন্যায় হিংসা-দ্বেষ ত্যাগ করিয়া একেবারে সত্ত্বগুণাবলম্বী হইয়া যাইবে? হায় জওহরলাল, তাহা হইবার নহে। এক জন বিচক্ষণ পাশ্চাত্য পণ্ডিত এ বিষয়ে কি বলিয়াছেন শুনুন ;—"Envy, ambition, the sin by which the angles fell are natural : it is idle to condemn them. Let us find in them commendable aspect and regard them as the source of progress and the legitimate motive for self sacrifice and effort ইহার মর্ম্মার্থ—স্বর্গীয় দূতদিগের যে পাপে পতন ঘটিয়াছিল, সেই দুইটি পাপ ঈর্ষ্যা এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষা ; উহা স্বাভাবিক, উহাকে নিন্দা করা বৃথা। উহার মধ্যে ভাল দিক কি আছে, তাহাই আমাদের দেখা আবশ্যক এবং উহাকে উন্নতির নিদান ও আত্মত্যাগের এবং আত্ম-চেষ্টার মূল কারণ বলিয়া বিবেচনা করা উচিত। হিন্দুদিগের মতেও ঈর্ষ্যাই শক্তিশালী অসুরদিগের পতনের কারণ হইয়াছিল। প্রকৃতি যাহা মানব-প্রকৃতিতে দৃঢ়ভাবে গাথিয়া দিয়াছেন, তাহাকে অস্বীকার করা পাগলামি। মানুষকে ঐ দুইটি দোষ পরিহার করিবার জন্য কিরূপ কঠোর তপস্যা করিতে হয়, তাহা বিশ্বামিত্রের কাহিনীতে বর্ণিত আছে। সভাপতি নিজেই বলিয়াছেন, "যে সোভিয়েট রুসিয়ায় আমরা এই অভিনব সভ্যতার আভাস পাই, কিন্তু তথায় অনেক ব্যাপার ঘটিয়াছে—যাহার জন্য আমি মনে ব্যথা পাইয়াছি। আমি উহার সমর্থন করি না।" কি জন্য পণ্ডিত নেহেরু মনে এরূপ ব্যথা পাইয়াছেন, তাহা তিনি খুলিয়া বলেন নাই বা আভাসে প্রকাশ করেন নাই। সোভিয়েট সরকার ধর্ম্মের অবমাননা করিয়াছেন, খৃষ্টানদিগের গির্জ্জার অপব্যবহার করিয়াছেন, মুসলমান-দিগের মসজেদগুলিকে অশ্বশালায় পরিণত করিয়াছেন বলিয়া তাঁহার মনে ব্যথা লাগিয়াছে, ইহা মনে হয় না। কারণ, পণ্ডিত জওহরলাল যে ধর্ম্মবিশ্বাসের ধার ধারেন না, সে কথা তিনি বহুবারই বলিয়াছেন ; সুতরাং সে জন্য তাঁহার মনে বেদনার সঞ্চার হইবার সম্ভাবনা নাই। তবে কি জন্য তাঁহার মনে বেদনার সঞ্চার হইল? সোভিয়েট সরকার যে ভাবে লোকমত প্রকাশের এবং স্বাধীন চিন্তার পথে বাধা দিয়াছেন এবং দিতেছেন, তাহাতেও যে তিনি মনে বেদনা পাইয়াছেন, তাহাও মনে হয় না। কারণ, প্রতিবাদী দল সভা করিয়া মত প্রকাশ করিতে গেলে যিনি বা যাঁহার দলস্থ লোকরা অন্যায়রূপে সেই সভা ভাঙ্গিয়া দিতে দ্বিধা করেন না, তাঁহার বা তাঁহাদের সে জন্য মনে ব্যথা লাগিবার সম্ভাবনা আছে, ইহা বিশ্বাস করা যায় কি? যদি বলা হয় যে, সোভিয়েট পুলিসের এবং সোভিয়েট কর্ত্তৃপক্ষের জবরদস্তিই তাঁহার মনে বেদনা দান

করিয়াছে, তাহা হইলে সে কথা তাঁহার স্পষ্ট বলা উচিত ছিল। তাঁহার জানা উচিত যে, মনুষ্য-প্রকৃতির সহিত সমঞ্জসীভূত করিয়া যে সকল ব্যবস্থা এবং প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তোলা হইয়াছে, তাহার বিলোপসাধন করিয়া অস্বাভাবিক ব্যবস্থা এবং প্রতিষ্ঠান প্রবর্তিত করিতে যাইলেই জোর-জবরদস্তি করিয়া তাহা করিতেই হইবে। তিনি রুসিয়ায় গিয়াছেন, রুসিয়া দেখিয়াছেন এবং তাহাতে মজিয়াছেন, সুতরাং তিনি ইহা নিশ্চিতই জানেন যে, জারের আমলের ব্যবস্থা প্রভৃতি অস্বাভাবিক হইলেও সে আমল অপেক্ষা সোভিয়েট সরকারের আমলে অধিক সৈন্য-সামন্ত ও সমরায়োজন প্রস্তুত রাখিতে হইয়াছে। কেন, তাহা পণ্ডিত নেহেরু একান্তে বসিয়া ভাবিয়া দেখিবেন কি?

পণ্ডিত নেহেরু ভারতবাসীদিগকে তাহাদের জাতীয় ভাবধারা, জাতীয় মনোবৃত্তি এবং জাতীয় রুচি অনুসারে আকার দিয়া সমাজ-তন্ত্রবাদকে গ্রহণ করিবার উপদেশ দিয়াছেন। যেখানে ভারতের জাতীয় ভাবধারা, জাতীয় মনোবৃত্তি ও রুচি এবং সমাজ-তন্ত্রের মূল সূত্রগুলি পরস্পর সম্পূর্ণ বিপরীতমুখ, সেখানে উপায় কি হইবে? পণ্ডিত নেহেরু অবশ্য স্বীকার করিবেন যে, ভারতীয় মনীষা যে ভাবে পারিবারিক জীবনকে গঠিত করিয়া তুলিয়াছে, তাহা অতি সুন্দর। অনেক বিদেশীও তাহার ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। কিন্তু সোস্যালিজম্ চাহে তাহার মূলে কুঠারাঘাত করিতে। অস্কার ওয়াইল্ড (Oscar Wilde) লিখিয়াছেন:— Socialism annihilates family life for instance. With the abolition of private property, marriage in its present form must disappear. This is part of the programme, দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় যে, সমাজ-তন্ত্রবাদ পারিবারিক জীবনের অস্তিত্ব লোপ করিয়া দেয়। ব্যক্তিগত সম্পত্তির উচ্ছেদের সহিত বর্তমান আকারের বিবাহ লোপ পাইবেই; ইহা সমাজতন্ত্রবাদীদিগের কার্য্য-তালিকার অন্তর্গত বিষয়। পণ্ডিত নেহেরু এই ব্যবস্থা এ দেশের লোকের ধাতু-প্রকৃতির সহিত খাপ খাইবে কি না, তাহা ভাবিয়া দেখুন। যে মতবাদের মূলনীতির সহিত দেশের লোকের মূল প্রকৃতি খাপ খায় না,—যে মূল-প্রকৃতি সহস্র সহস্র বৎসর ধরিয়া আবেষ্টনের এবং সাধনার বা সংস্কৃতির দ্বারা গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহার পরিবর্তনসাধন করা কি সহজ? যৌবনসুলভ হঠকারিতার সহিত এই সকল বিষয়ের চরম সিদ্ধান্ত করা সঙ্গত নহে। সমাজ-তন্ত্রবাদ এ দেশের লোকের ধাতুপ্রকৃতির সহিত খাপ খাওয়াইয়া চালান সম্ভব হইবে না।

পণ্ডিত জওহরলাল ও বিপ্লববাদ

বিপ্লববাদ অর্থাৎ হিংসামূলক বিপ্লববাদ সম্পর্কে পণ্ডিত জওহরলাল কি বলেন, তাহা জানিবার জন্য কেহ কেহ বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করেন। রাজপুরুষদিগের মধ্যে হয় ত কেহ কেহ মনে করিতে পারেন যে, তিনি যখন সর্বস্বত্ববাদী, তখন তিনি হয় ত হিংসামূলক বিপ্লববাদের উপর বিশেষ বিরূপ নহেন। কিন্তু কংগ্রেসের সভাপতির আসন হইতে তিনি তারস্বরে ঘোষণা করিয়াছেন যে, হিংসাশ্রয়ী বিপ্লববাদ রাজনীতিক অর্বাচীনতার ফল। তিনি বলেন, যেখানে গণশাসন প্রবর্তিত নাই, সেখানে প্রতিষ্ঠিত শাসনপ্রণালীর প্রতি অনুরাগ যেমন রাজনীতিক ভীমরতির লক্ষণ, হিংসাপন্থী বিপ্লববাদও সেইরূপ রাজনীতিক অর্বাচীনতার বা অপরিণতবুদ্ধির লক্ষণ। আমাদের রাজনীতিক আন্দোলন বহুকাল পূর্ব্বে সেই অর্বাচীনতার সীমানা পার হইয়া গিয়াছে। পূর্ব্বে যাঁহারা বিপ্লববাদী ছিলেন, আজ তাঁহারা সেই দারুণ সাংঘাতিক মতবাদকে পরিত্যাগ করিয়াছেন। কংগ্রেস শান্তিময় (অহিংস) এবং কার্য্যকর আন্দোলনে জোর দিয়া দেশের তরুণদলকে তাঁহাদের দলে টানিয়া আনিয়াছেন। কিন্তু সরকারের অবলম্বিত নীতি যদি উহার মূলে সার না যোগাইত, তাহা হইলে হিংসামূলক বিপ্লববাদ এত দিন এ দেশ হইতে অন্তর্হিত হইত। কংগ্রেসের সভাপতির আসন হইতে পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু যে কথা বলিয়াছেন, তাহা বর্ণে বর্ণে সত্য। কিন্তু এ দেশের রাজপুরুষগণ তাহা বুঝিতে চাহিবেন না। তাঁহাদের এই মনোবৃত্তি কেন হয়, তাহা আমরা বুঝিতে অসমর্থ। তাঁহারা তাঁহাদের নয়নসমক্ষে দেখিতেছেন যে, যাহারা হিংসামূলক বিপ্লবী বলিয়া ধরা পড়িয়া কারাদণ্ড বা নির্ব্বাসনদণ্ড ভোগ করিয়া ফিরিয়া আসিয়াছে, তাহাদের মধ্যে প্রায় সকলেই এখন হিংসামূলক কার্য্য ত' পরিহার করিয়াছেই, অধিকন্তু সরকারী নীতির বিশেষ সমর্থক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আমরা লর্ড লিনলিথগো এবং লর্ড জেটল্যাণ্ডকে এই কথাগুলি বিশেষভাবে চিন্তা করিয়া দেখিতে বলি। সভাপতির এই কথাগুলি দেশবাসীরই কথা। তিনি শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসুর আটক সম্পর্কে এই কথাগুলি বলিয়াছেন। সুভাষ বাবু যে কস্মিন্‌কালেও হিংসাশ্রয়ী বিপ্লববাদে দীক্ষিত হইয়াছিলেন, সে বিষয়ে প্রমাণাভাব। ব্যবস্থা-পরিষদে হোম সেক্রেটারীর উক্তি পড়িয়াই মনে হইয়াছিল যে, মহাত্মা গান্ধীর সেক্রেটারী মিষ্টার কৃষ্ণদাসের পত্রখানিই সরকার পক্ষের প্রাপ্ত প্রমাণের একমাত্র না হউক, প্রধান অবলম্বন। সেই কৃষ্ণদাসই তাঁহার দ্বিতীয় পত্রে বলিয়া দিয়াছেন যে, সুভাষ বাবু কলিকাতার এবং লাহোরের কংগ্রেসে গান্ধীজীর মতের প্রতিকূল মত ব্যক্ত করিয়াছিলেন, সেই জন্য গান্ধীভক্ত আমরা শ্রীযুত বসুর উপর বিরাগভাব পোষণ করিতাম। যে যাহাকে দেখতে নারে, সে তাহার চলন বাঁকা চিরকালই দেখে। তাহার পর কৃষ্ণদাস বলিয়াছেন,—কিন্তু কতকগুলি লোক সর্ব্বদাই আমাদের কাণে ফিস্‌ফিস্ করিয়া বলিত যে, শ্রীযুত বসুর প্রকৃত প্রতিকূলতার মূল কারণ তিনি অহিংসা নীতির বিরোধী, আমরাও সেই কথা অবিচারিতভাবে মানিয়া লইয়াছিলাম। (Some people often whispered into our ears that Sj Bose's real opposition centred round the Congress creed of nonviolence which many of us readily believed) যে কয় জন লোক যখন-তখন (often) তাঁহার কাণে কাণে বলিত, সুভাষ বাবু অহিংসা মন্ত্রের বিরোধী, তাঁহাদের নাম নিশ্চয়ই কৃষ্ণদাসের মনে আছে। ইঁহারা কিরূপ প্রকৃতির লোক এবং কি উদ্দেশ্য-সাধনের জন্য ঐ কথা বলিয়াছিলেন, তাহা কৃষ্ণদাস এত দিনে নিশ্চিতই বুঝিতে পারিয়াছেন। সেই জন্য এত দিন চুপ করিয়া থাকিয়া অনুশোচনার তীব্র বৃশ্চিক-দংশনে তিনি কি সেই কথা প্রকাশ করিয়াছেন? সে কথা তিনিই জানেন। আমাদের দেশের ইতর মনোবৃত্তিসম্পন্ন লোকের স্বভাবই এই যে, তাহারা বৃথা অপবাদ দিয়া প্রতিপক্ষকে বিপন্ন করিবার চেষ্টা করে। সেই জন্য আমরা সরকারকে সুভাষ বাবুর কথাটা আর একবার ভাবিয়া দেখিতে বলি।

পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু

পণ্ডিত নেহেরু ও সাম্প্রদায়িকতা

কংগ্রেসের সভাপতি পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু সমাজতন্ত্রবাদী, সেই জন্য তিনি সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারার সমর্থন করেন না। তিনি বলিয়াছেন, "সাম্প্রদায়িকতা ভারতবর্ষকে নানা বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত করিতে এবং উহা ধর্ম্মবিশ্বাসের বনিয়াদের উপরই প্রধানতঃ প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহে। উহা গণ-শাসনের এবং আর্থিক নীতির বিকাশসাধন দুরূহ করে। প্রকৃতপক্ষে সাম্প্রদায়িক বিভাগ আর সাধারণতন্ত্রের কখনই সামঞ্জস্য করা সম্ভবে না।" তাঁহার এই কথাগুলির সহিত কোন চিন্তাশীল রাজনীতিজ্ঞ ব্যক্তির মতভেদ হইতে পারে না। কিন্তু তাহার পরই তিনি যাহা বলিয়াছেন, তাহার সহিত কোন নিরপেক্ষ ব্যক্তিই একমত হইতে পারেন না। তিনি তাহার পরেই বলিয়াছেন যে,—"আমাদের এ কথা স্বীকার করিতে হইবে যে, বর্ত্তমান অবস্থায়, বিশেষতঃ যত দিন আমাদের রাজনীতি মধ্যবর্ত্তী শ্রেণী কর্ত্তৃক প্রভাবিত হইয়া থাকিবে, তত দিন আমরা সাম্প্রদায়িকতাকে পরিহার করিতে পারিব না।" ইহাকেই বলে "এক গাঁয়ে ঢেঁকি পড়ে, আর এক গাঁয়ে মাথাব্যথা।" মধ্যবর্ত্তী শ্রেণীরা রাজনীতিক্ষেত্রে প্রভুত্ব করিতেছে বলিয়া সাম্প্রদায়িক নির্ব্বাচকমণ্ডলী, অনিষ্টজনক হইলেও, বজায় রাখিতে হইবে, ইহার অর্থ কি? পৃথিবীর সকল সভ্য দেশেই এক কালে মধ্যবর্ত্তী সম্প্রদায় রাজনীতিক ব্যাপারে কর্ত্তৃত্ব করিয়া আসিয়াছে। এখনও অধিকাংশ দেশে ঐ সম্প্রদায় তাহা করিতেছে। কিন্তু কোন্ দেশে এইরূপ ভাবে ধর্ম্ম অনুসারে রাজনীতিক্ষেত্রে অধিকার নির্দ্দেশ পূর্ব্বক বৃতি বাঁধিতে হইয়াছে? কানাডায় এবং মার্কিণে অধিবাসীদিগের মধ্যে ধর্ম্মমতগত, ভাষাগত, আচার ও সংস্কৃতিগত এবং জাতিগত বহু ভেদ ছিল এবং এখনও আছে, কিন্তু ঐ সকল দেশের কোথাও কি কস্মিন্‌কালেও ঐরূপ সাম্প্রদায়িক বৃতি গড়িয়া মান-পশার বজায় রাখিতে হইয়াছে? তাহা যদি না হইয়া থাকে, তাহা হইলে রাজনীতিক কার্য্যে মধ্যবর্ত্তী সম্প্রদায়ের কর্তৃত্বের সহিত সাম্প্রদায়িক বৃতি রচনার যে দুশ্ছেদ্য সম্বন্ধ বিদ্যমান, ইহা সপ্রমাণ হয় না। সুতরাং আমাদের দেশে উহা হইবে কেন?

তাহার পর শ্রীযুত নেহেরু বলিয়াছেন যে, আমাদের মুসলমান এবং শিখ বন্ধুদিগের জন্য আবশ্যক ব্যতিক্রম করা এক কথা, কিন্তু এই দোবাবত ব্যবস্থা অন্য বহু সম্প্রদায়-মধ্যে প্রসারিত করিয়া নির্ব্বাচক মণ্ডলকে ও ব্যবস্থা পরিষদকে নানা প্রকোষ্ঠে বিভক্ত করা অত্যন্ত বিপজ্জনক প্রস্তাব। কিন্তু এক সম্প্রদায়ের জন্য ঐরূপ ব্যবস্থা করিলে অন্য সম্প্রদায় উহা চাহিবেই চাহিবে। ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা বিপজ্জনক। সেই জন্য উহা করা কর্ত্তব্য নহে। শিখরা ত' বলিতেছেন যে, মুসলমানদিগের জন্য যদি ঐরূপ সাম্প্রদায়িক আনুকূল্য না করা হয়, তাহা হইলে তাঁহারাও উহা চাহিবেন না। ইহাতে দোষ কোথায়, তাহা বুঝা যায়। যাঁহারা এই সাম্প্রদায়িক ব্যবস্থার বিরোধী, তাঁহাদের সম্বন্ধে ইনি বলিয়াছেন যে, তাঁহাদের কার্য্যফলে উহার প্রতীকার করা সম্ভব হইবে না,—বরং উহা স্থায়ী করা হইবে। কংগ্রেস শ্যাম রাখি কি কুল রাখি, এই মনে করিয়া উহাতে মৌন সম্মতি দিতেছেন, তাহাতেই বা তাঁহারা মীমাংসার পথে কতটুকু অগ্রসর হইয়াছেন, তাহা নেহেরুজী বলিয়া দিবেন কি?

মন্ত্রিত্ব গ্রহণ

কংগ্রেসের বর্ত্তমান সভাপতি শ্রীযুত জওহরলাল নেহেরু স্বয়ং মন্ত্রিত্ব বা অন্য সরকারী পদ গ্রহণের বিরোধী। তিনি বলিয়াছেন:—"এই প্রসঙ্গে স্বভাবতঃই ১৯২০ খৃষ্টাব্দের কথা মনে পড়ে। তখন আমরা শাসনসংস্কারের লাভের পুরাতনের ব্যর্থনীতি বর্জ্জন পূর্ব্বক এক নির্ভর-নীতি অবলম্বন করিয়াছি। এত দিন অকুতোভয়ে সংগ্রাম করিয়া আমরা আবার কি সেই পরিত্যক্ত পুরাতন পথই ধরিব? আমরা যে দুঃখ-কষ্ট স্বীকার করিয়াছি, যে সাফল্য-লাভ করিয়াছি, যে সাধনা করিয়াছি, তাহার স্মৃতি পর্য্যন্ত কি আজ একেবারে নিশ্চিহ্ন করিয়া ধুইয়া মুছিয়া ফেলিব?" অপিচ "আমরা যদি শাসন-সংস্কার ঝাড়ে-মূলে গ্রহণ করিতে অস্বীকার করি, তাহা হইলে উহার সহিত সর্ব্ববিধ সংস্রব-বর্জ্জনই আমাদের পক্ষে কর্ত্তব্য নহে কি? বরং আমাদের পক্ষে সর্ব্বপ্রযত্নে উহাতে বাধাদান করাই বিধেয়। মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করিলে উহা অগ্রাহ্য করিবার প্রস্তাব একেবারে ব্যর্থ হইয়া যাইবে।" কংগ্রেসের গৃহীত নীতি অনুসারে তাঁহার এই কথাগুলি যে সমীচীন, তাহা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু কংগ্রেস এখনও এ বিষয়ে কোন স্পষ্ট সিদ্ধান্ত করিতে চাহিলেন না। তাঁহারা কোন রকমে এই বিষয়টা ধামা চাপা দিয়াই রাখিলেন। কেহ কেহ সেই জন্য অনুমান করিতেছেন যে, কংগ্রেস বোধ হয় শেষকালে মন্ত্রিত্ব গ্রহণের দিকেই ঝুঁকিবেন।

রাজনীতিক লুকোচুরি

অন্ধ্র দেশের ডাক্তার শ্রীযুত পট্টভি সীতারামিয়া কংগ্রেসের এক জন বিশিষ্ট জননায়ক এবং মহাত্মা গান্ধীর একজন একান্ত ভক্ত। অসহযোগ আন্দোলনেরও তিনি এক জন নামী পাণ্ডা। সম্প্রতি তিনি মহাত্মাজী সম্বন্ধে যে কথা বলিয়াছেন, তাহা শুনিলে বিস্মিত হইতে হয়। তাঁহার কথাও একেবারে অবিশ্বাস করা যায় না। সম্প্রতি মসলিপট্টমের এক সভায় তিনি বলিয়াছেন যে, মহাত্মাজী বাহিরে কংগ্রেসের সহিত তথা রাজনীতির সহিত সকল সংস্রব ত্যাগ করিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ থাকিলেও ভিতরে ভিতরে তিনি কংগ্রেসে তাঁহার কলকাঠি নাড়িতেছেন। একথা অন্য লোক বলিলে হয় ত লোক অবিশ্বাস করিত, কিন্তু ডাক্তার সীতারামিয়া যখন বলিয়াছেন, তখন উহা একেবারে উড়াইয়া দেওয়া চলে না। তিনি বলিয়াছেন যে, মহাত্মাজী যাঁহাদের হস্তে কংগ্রেস সঁপিয়া দিয়া বানপ্রস্থ অবলম্বন করিয়াছেন, তাঁহারা মহাত্মাজীরই অনুগত লোক; সুতরাং তিনি নামে কংগ্রেসের বাহিরে থাকিলেও কাযে উহার সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়াই আছেন। অথচ যখন তিনি রাজনীতিক্ষেত্র হইতে বানপ্রস্থ অবলম্বন করেন, তখন তিনি বলিয়াছিলেন যে, তিনি রাজনীতিক্ষেত্রে, বিশেষতঃ কংগ্রেসে থাকিলে কেহ আর স্বাধীনভাবে কোন বিষয় ভাবিয়া দেখিতে চাহে না, তিনি কি বলেন, তাহাই শুনিবার জন্য তাঁহারই মুখ চাহিয়া থাকে। উহা গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের পক্ষে ভাল কথা নহে। সেই জন্য তিনি কংগ্রেসের এবং দেশের হিতার্থ রাজনীতিক ক্ষেত্র হইতে সরিয়া দাঁড়াইলেন। এখন রাজনীতিক ব্যাপার সম্বন্ধে তিনি কোনরূপ মতামত প্রকাশ করিতেও চাহেন না। কিন্তু ডাক্তার পট্টভি সীতারামিয়া

বলিতেছেন যে, তিনি পণ্ডিত জওহরলালকে কংগ্রেসের সভাপতি করিবার জন্য প্রবলভাবে প্রচারকার্য্য চালাইয়াছিলেন। এমন কি, সভাপতি হইবার জন্য অন্য যাহাদের নাম করা হইয়াছিল, তাহাদিগকে তিনি নির্ব্বাচন-প্রতিদ্বন্দ্বিতা হইতে সরিয়া দাঁড়াইবার জন্য অনুরোধপত্রও লিখিয়াছিলেন। ইহা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে তাঁহার কথায় এবং কাজে সামঞ্জস্য কোথায়, তাহা বুঝা যায় না। মহাত্মাজী আরও বলিয়াছিলেন যে, কংগ্রেসে সমাজতন্ত্রবাদী-দিগের প্রভাব বৃদ্ধি হইতেছে দেখিয়া তিনি কংগ্রেস হইতে সরিয়া দাঁড়াইলেন, তবে তিনি সমাজতন্ত্রবাদী জওহরলালকে কংগ্রেসের সভাপতি হইয়া সমাজতন্ত্রবাদের পক্ষে ওকালতি করিবার অবকাশ দিলেন কি মতলবে? এখানেই বা তাঁহার কথায় এবং কাজে সামঞ্জস্য কোথায়? কংগ্রেসের পার্লামেণ্টারী বোর্ড গঠন-কালে মহাত্মাজী ভাবভঙ্গীতে প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, তিনি দলবিশেষের আগ্রহাতিশয্যের জন্যই কংগ্রেস-সদস্যদিগকে ব্যবস্থাপক সভাগুলিতে প্রবেশ করিবার প্রস্তাবে মত দিয়াছিলেন। এখন ত দেখা যাইতেছে যে, তাঁহার অন্তরঙ্গ প্রায় সকলেই মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করিবার জন্য অতিশয় ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। ইহাতে কি তাঁহার অসহযোগ আন্দোলনের ভাবশুদ্ধি রক্ষিত হইতেছে? মহাত্মাজীর মনোনীত সভাপতি জওহরলালজীর মন্ত্রিত্বগ্রহণে ঘোর আপত্তি বলিয়া কি ঐ প্রস্তাবটি এখন মুলতবী রাখা হইল? গণতন্ত্রের ভাবশুদ্ধি অনুযায়ী কার্য্যপদ্ধতি বটে!

নিমায়ারের কমিটীর রিপোর্ট

বর্ত্তমান সময়ে ভারতবর্ষ অত্যন্ত দরিদ্র দেশ। কিন্তু এই দেশের শাসন-কার্য্য নির্ব্বাহের ব্যয় অতিশয় অধিক। এ দেশের

সার অটো নিমায়ার

এক এক জন রাজপুরুষ যত অধিক বেতন পান, পৃথিবীর আর কোন দেশের তাঁহাদের সমপদস্থ রাজপুরুষরা তত অধিক বেতন পান কি না, সে বিষয়ে সন্দেহ। কাজেই এই দেশের জমা-খরচ মিল করা কঠিন কাজ। বিশেষতঃ যতবার শাসন-সংস্কার করা হইতেছে, ততবারই ইহার ব্যয়ের বাহুল্য বৃদ্ধি পাইতেছে। এবারও শাসন-সংস্কারের জন্য অনেক ব্যয় বাড়িবে, কাজেই আয়-ব্যয়ের একটা সমতা রক্ষার জন্য বিশেষজ্ঞগণের একটা পরামর্শ গ্রহণ আবশ্যক। কারণ, অবস্থা এরূপ আসিয়া দাঁড়াইয়াছে যে, সহজ-বুদ্ধিতে সকল দিক্ রক্ষা করিয়া এই আয়-ব্যয় ঠিক করিবার সাধ্য নাই। তাই নূতন শাসন-সংস্কার প্রবর্ত্তিত হইলে কেন্দ্রী সরকারের সহিত প্রাদেশিক সরকারের কিরূপ আর্থিক বিলিব্যবস্থা করা হইবে, তাহা নির্দ্ধারণের জন্য কর্ত্তৃপক্ষ এক কমিটী গঠন করেন। সেই কমিটীর সভাপতি সার অটো নিমায়ারের নাম অনুসারে ঐ কমিটী নিমায়ার কমিটী নামে অভিহিত। সেই কমিটী তাঁহাদের রিপোর্ট প্রকাশ করিয়াছেন। পাঠক উহার মর্ম্ম মূল রিপোর্টে দেখিয়া লইবেন। ঐ রিপোর্টে বলা হইয়াছে যে, ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ আয়-ব্যয়ের বিষয় যত দূর মনে হয়, তাহাতে বলা যায় যে, উপযুক্ত বিলি-বন্দোবস্ত করিতে পারিলে ক্রমশঃ এমন ব্যবস্থা করা সম্ভব যে, তদ্দ্বারা ভারতবাসীরা সংস্কৃত শাসনযন্ত্রের ব্যয় বহন করিতে সমর্থ হইবে। অর্থাৎ এখনও উটের পিঠ ভাঙ্গিয়া পড়িবার মত হয় নাই। রিপোর্টখানির বাহাদুরী এই যে, কেবলমাত্র শাসকজাতি ভিন্ন আর কেহই ইহার প্রশংসা করিতে পারিবেন না। দেশের জাতিগঠন-মূলক কার্য্যে যাহাতে পর্য্যাপ্ত অর্থ বরাদ্দ করা যায়, তাহার কোন উপায় ইহাতে নির্দ্ধারিত করা হয় নাই। যেন সেটা এই কমিটীর কাজ নহে। কি প্রকারে কোন্ রকমে কেন্দ্রী সরকারের এবং প্রাদেশিক সরকারের পরিচালন-কার্য্য করিয়া যাওয়া যাইতে পারে, তাহারই অবধারণ করাই যেন এই কমিটীর কাজ। কমিটী সেই কার্য্যই বেশ ভাল রকমে করিয়াছেন। কেন্দ্রী সরকারের পাকা খরচগুলি যাহাতে বিশেষভাবে সুরক্ষিত হয়, কমিটী তাহা ভাল ভাবে নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন। সমরবিভাগ যে রাক্ষসের ক্ষুধা লইয়া ভারত সরকারের আয়ের অধিকাংশ গ্রাস করিয়া ফেলিতেছে, সে বিষয়ে কমিটী একটা কথাও বলেন নাই। সেটা যেন তাঁহাদের অধিকার-বহির্ভূত।

এবার অনেক লোকই আশা করিয়াছিলেন যে, মেষ্টনী ব্যবস্থার ফলে বঙ্গপ্রদেশের উপর যে ঘোর অবিচার করিয়া আসা হইতেছে, নিমায়ার কমিটী তাহার বিষয় বিবেচনা করিয়া কিছু সংশোধন-প্রস্তাব করিবেন। কিন্তু কমিটী সে পথ দিয়াও হাঁটেন নাই। বাঙ্গালা প্রদেশ বরাবরই এই দাবী করিয়া আসিতেছে যে, পাটরপ্তানী বাবদ যে শুল্ক আদায় হয়, তাহার সমস্তই বাঙ্গালার ন্যায্য প্রাপ্য। বাঙ্গালার এই দাবীর ন্যায্যতা কেহই এ পর্য্যন্ত অস্বীকার করিতে পারেন নাই। উহা অবশ্য বাঙ্গালার সর্ব্বনিম্ন দাবী। কিন্তু নিমায়ার কমিটী বাঙ্গালীর সেই দাবীর যৌক্তিকতা খণ্ডন করিবার জন্য বিন্দুমাত্রও চেষ্টা করেন নাই,—তাঁহারা যুক্তির গ্রন্থি খুলিতে অসমর্থ হইয়া যেন আলেকজাণ্ডারের ন্যায় স্বৈরিতায় এক কোপে উহা ছেদন করিয়া বলিয়াছেন, "না, তাহা হইবে না।" ইতঃপূর্ব্বে ভারত সরকার বাঙ্গালাকে পাটরপ্তানী শুল্কের শতকরা ৫০ টাকা দিতে সম্মত হইয়াছিলেন,—সার অটো নিমায়ার তাহার উপর আর শতকরা সাড়ে বারো টাকা হারে ঐ শুল্ক হইতে বাঙ্গালাকে অধিক দিতে বলিয়াছেন। বাঙ্গালার কৃষক রোদে পুড়িয়া, জলে ভিজিয়া, জ্বরে ভুগিয়া, এমন কি, প্রাণে মরিয়া যে পাট উৎপাদন করে, সেই পাটের রপ্তানী-শুল্ক বাঙ্গালা পাইবে না, অন্যে পাইবে, ইহাকেই বলে

"যার ধন তার ধন নয় নেপো মারে দই।" সরকারী তহবিলে ন্যায়-বিচার করিবার মত টাকার অভাব, কিন্তু নূতন প্রদেশ গঠনের ত অন্ত নাই! ইহাতে পরোক্ষভাবে সাম্প্রদায়িকতার তুষ্টি ও পুষ্টি হইতে পারে, কিন্তু জনসাধারণের তুষ্টি ও পুষ্টি হইবে না। ভারত সরকারকে তিন কোটি টাকা দিতে হইবে ভিন্ন ভিন্ন নাভোয়ান প্রদেশকে। তন্মধ্যে নবগঠিত সিন্ধুপ্রদেশকে দিতে হইবে ১ কোটি ৫ লক্ষ টাকা, উত্তর-পশ্চিম সীমান্তপ্রদেশকে ১ কোটি টাকা, উড়িষ্যাকে প্রথম বৎসর ৫৭ লক্ষ টাকা, দ্বিতীয় বৎসর হইতে ৪ বৎসর ৫৩ লক্ষ টাকা করিয়া এবং তাহার পর বার্ষিক ৫০ লক্ষ টাকা করিয়া। যুক্তপ্রদেশকে বার্ষিক ২৫ লক্ষ টাকা করিয়া পাঁচ বৎসর এবং আসামকে ৩০ লক্ষ টাকা। এ টাকা আসিবে কোথা হইতে? এই বাঙ্গালা হইতে আদায়ী পাটের রপ্তানী-শুল্ক এবং আয়কর বাবদ আদায়ী টাকা হইতে। অথচ সার অটোই স্বীকার করিয়াছেন যে, বাঙ্গালার শাসনকার্য্য পরিচালনের মাপকাঠিখানি বড় খাটো। পাটের ভবিষ্যৎ বড় ভাল নয়। উহার সঙ্কোচ করিবার চেষ্টা হইতেছে। উহা হইতে বাঙ্গালার আয় যে ক্রমবর্দ্ধমান হইবে, সে আশা নাই। সুতরাং কস্মিন্‌কালেও যে বাঙ্গালার জনসাধারণের কল্যাণকর ব্যবস্থাগুলির উন্নতি সাধিত হইবে, সে আশা দুরাশা।

সার অটো নিমায়ার কেবল কেন্দ্রী সরকারের আর্থিক অবস্থা যাহাতে অক্ষুণ্ণ থাকে, সেই দিকেই দৃষ্টি রাখিয়া সমস্ত পরামর্শ দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, কেন্দ্রী সরকারের আর্থিক অবস্থা যাহাতে অক্ষুণ্ণ থাকে, তাহা সর্ব্বদা মনে রাখিয়াই তিনি ঐ প্রস্তাবগুলি করিয়াছেন। কেন্দ্রের খরচ উপস্থিত যে পরিমাণে কমান হইয়াছে, তাহা অপেক্ষা কম করা নিরাপদ নহে। সুতরাং দেশের লোকের ভাগ্যে যে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠলাভ ঘটিবে, তাহা ত জানা কথা। তিনি ভারত সরকারের সামরিক বৃকের ক্ষুধা এবং অযথা বেতন-পুষ্ট সিভিলিয়ানদিগের লালসা মিটাইয়া প্রদেশগুলিকে দিবার জন্য মোট ২ কোটি টাকা রাখিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, উহাই প্রদেশগুলিকে বাঁটিয়া দিলেই যথেষ্ট হইবে। বাঙ্গালাকে পূর্ব্ব-ঋণের দায় হইতে মুক্তি দিয়া আর ৭৫ লক্ষ টাকা বাড়াইয়া দিবার প্রস্তাব ইনি করিয়াছেন। তাহার পর তিনি আর একটা লোভ দেখাইতে কসুর করেন নাই। যদি আয়করের আয় এবং রেলওয়ের আয় একুনে ১৩ কোটি টাকার অধিক কস্মিন্‌কালে হয়, তাহা হইলে সেই অতিরিক্ত টাকাটা ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশকে নিম্নলিখিত হারে ভাগ করিয়া দেওয়া হইবে। উহা কি ভাবে ভাগ করিয়া দেওয়া হইবে, তাহাও বাৎলাইয়া দিতে তিনি ভুল করেন নাই। যথা—সেই অতিরিক্ত টাকায় শতকরা ২০ টাকা হারে বোম্বাই এবং বাঙ্গালা প্রত্যেকেই পাইবে। মাদ্রাজ এবং যুক্তপ্রদেশ প্রত্যেকে শতকরা ১৫ টাকা হিসাবে, বিহার শতকরা ১০, পঞ্চনদ শতকরা ৮, মধ্যপ্রদেশ শতকরা ৫, আসাম, সিন্ধ এবং উড়িষ্যা প্রত্যেকে শতকরা ২ এবং উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ শতকরা ১ টাকা হারে উহার ভাগ পাইবে। তিনি সার চার্জ্জগুলি তুলিয়া না দিয়া উহা বহাল রাখিবার পরামর্শ দিয়াছেন। উহা তুলিয়া দিবার কথাই আছে, এত দিন বজায় রাখাই ঘোর অনুচিত হইয়াছে। সার চার্জ্জ বজায় রাখিয়া প্রদেশগুলিকে কিছু অর্থদান করিবার প্রস্তাব যেন লোভ দেখাইয়া ধান ভানাইবার চেষ্টার মত বলিয়াই মনে হয়। দ্বিতীয়তঃ রেলওয়ের খরচ কমাইয়া উহার আর্থিক উন্নতিসাধন করিতে কত কাল যাইবে, তাহার ঠিক নাই। তাহার পর ত' প্রাদেশিক সরকারদিগকে আয়করের অংশ বাঁটিয়া দেওয়া হইবে। সে এখন অনেক দূরের কথা। কিন্তু সেই কথা বলিয়া পূর্ব্ব-প্রতিশ্রুতি উপেক্ষা পূর্ব্বক সার চার্জ্জ বহাল রাখা কোনমতেই সঙ্গত হইতে পারে না। সার পুরুষোত্তমদাস ঠাকুরদাস যথার্থই বলিয়াছেন যে, যদি কেহ বলে যে, ভারতবর্ষ এই রিপোর্টে সন্তুষ্ট হইবে—তবে সে হয় অজ্ঞ, না হয় তাহার উদ্দেশ্য অসৎ। আমরাও তাহাই বলি।

অদ্ভুত যুক্তি

সরকার যে সকল লোককে বিনা বিচারে আটক রাখিয়াছেন, তাহাদিগকে মুক্তি দিবার জন্য কংগ্রেসপক্ষীয় সদস্যরা ব্যবস্থা-পরিষদে প্রস্তাব করেন। সেই প্রস্তাবের উত্তরে ভারত সরকারের স্বরাষ্ট্রসচিব সার হেনরী ক্রেক যে অদ্ভুত যুক্তির অবতারণা করিয়াছিলেন, তাহা শুনিয়া বিস্মিত না হইয়া পারা যায় না। তিনি ১৯৩০ খৃষ্টাব্দ হইতে এ পর্য্যন্ত যত সরকারী এবং বেসরকারী লোক হিংসাশ্রয়ী বিপ্লববাদীদিগের দ্বারা নিহত বা আহত হইয়াছেন, তাহার তালিকা দিয়া বলিয়াছেন যে, সরকারী এবং বেসরকারী য়ুরোপীয়, ফিরিঙ্গী, মুসলমান, হিন্দু এবং নারী হিংসাশ্রয়ী বিপ্লবীদিগের দ্বারা নিহত হইয়াছে এমন কি, বিদ্যালয়ের শিক্ষক, রেলওয়ে কর্ম্মচারী, পোষ্ট আফিসের লোক, মোটরগাড়ীচালক, নিম্নস্তরের রাজকর্ম্মচারী পর্য্যন্ত বহু লোক ঐ শ্রেণীর বিপ্লবীদিগের হস্তে নিহত এবং নির্য্যাতিত হইয়াছে; কিন্তু ব্যবস্থা-পরিষদের কোন সদস্য কি দেখাইতে পারেন যে, কোন্ কংগ্রেসওয়ালা উহাদের হস্তে নিহত বা উহাদের দ্বারা নির্য্যাতিত হইয়াছেন? এক জন কংগ্রেসওয়ালার বাড়ীতে ডাকাতী হইয়াছে, ইহাও কেহ দেখাইতে পারিয়াছেন কি? কংগ্রেসওয়ালাদের মধ্যে নিহত, নির্য্যাতিত এবং লুণ্ঠিত হইয়াছেন, এমন কোন ব্যক্তির নাম পাওয়া যায় না। কংগ্রেসওয়ালারাই কেবল হিংস্র বিপ্লবীদিগের অত্যাচার হইতে নির্ম্মুক্ত! অতএব কংগ্রেসওয়ালারা যে হিংসাশ্রয়ী বিপ্লবীদিগকে মুক্ত করিতে চাহিবেন, তাহাতে বিস্মিত হইবার কারণ নাই। কংগ্রেসের সহিত হিংসাশ্রয়ী বিপ্লবীদলের গূঢ় সম্বন্ধ আছে, ইহাই যেন সার হেন্‌রী ক্রেক দেখাইতে গিয়াছেন। তাঁহার এই বিদ্‌কুটে লজিক দেখিয়া আমরা বিস্মিত। যদি কেহ জিজ্ঞাসা করে যে, উদারনীতিক দলের অর্থাৎ লিবারাল ফেডারেশনের কোন সদস্য কি হিংসাপন্থীদিগের হস্তে নিহত হইয়াছেন বা মুস্লিম লীগের কোন ব্যক্তি কি উহাদের দ্বারা নিহত, আহত বা আক্রান্ত হইয়াছেন, তাহা হইলে সার হেন্‌রী কি বলিবেন? তবে ত ক্রেকী-লজিকের দ্বারা সপ্রমাণ হয় যে, ঐ সকল প্রতিষ্ঠানের সদস্যদিগের হিংসাশ্রয়ী বা বিভীষিকাস্রষ্টা যুবকদিগের সহিত সহানুভূতি আছে। সার হেন্‌রী কি বলেন? বরং পুনা সহরে কংগ্রেসের সর্ব্বেসর্ব্বা মহাত্মাজীকে লক্ষ্য করিয়া এক বোমা নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল। পুলিস বলে যে, উহা বিপ্লবীদিগের কায। আর এক কথা, সকল জিনিষ বিকৃত হইয়াই উহা রোগে দাঁড়ায়। ভালবাসা, প্রণয় প্রভৃতি নির্ম্মল মনোবৃত্তিগুলিও বিকৃত হইয়া এমন উৎকট

রোগে পরিণত হয় যে, তাহার ফলে মানুষ খুন, জখম প্রভৃতি অপকর্ম্ম করিয়া বসে। অনেক বড় বড় রাজপুরুষও ত স্বীকার করিয়াছেন যে, হিংসাশ্রয়ী বিপ্লববাদ বিকৃত স্বদেশপ্রেম হইতে উদ্ভূত একটা সাংঘাতিক রোগ। সুতরাং বিপ্লবীরা তাহাদের বিকৃত বুদ্ধিবশে যাহাদিগকে ভ্রান্ত স্বদেশপ্রেমিক বলিয়া মনে করে, তাহাদিগকে হয় ত' খুন-জখম করে না। জারের আমলে রুসিয়ার অনেক রাজপুরুষ এবং অরাজপুরুষ নিহিলিষ্টদিগের হস্তে নিহত হইয়াছিল, কিন্তু যাহারা দেশভক্ত বলিয়া বিদিত অথচ হিংসাপন্থী নহে, তাহাদের মধ্যে কয় জনকে তাহারা খুন-জখম করিয়াছিল? সার হেনরীর এই যুক্তি কেবল অদ্ভুত নহে, অশোভন।

নূতন প্রদেশ

নূতন শাসন-সংস্কারের আমলে দুইটি নূতন প্রদেশ গঠিত হইল;—একটি সিন্ধু আর একটি উড়িষ্যা। নূতন প্রদেশ গঠন করিলেই সরকারী শ্বেতাঙ্গ আমলাদিগেরই লাভ,—কারণ, উহার ফলে তাহাদের কয়েকটি বড় বড় চাকুরী জুটিবে—সুতরাং ইহাতে তাহাদের আনন্দ। কিন্তু ভারতবাসীদিগের তাহাতে ক্ষতি ভিন্ন বিন্দুমাত্রও লাভ নাই। কারণ, এই দরিদ্র-দেশবাসীর কষ্টে প্রদত্ত কর হইতে নূতন প্রদেশের সরঞ্জামী খরচ বাবদ বিস্তর টাকা ব্যয় হইবে, উহাতে ভারতবাসীর কোন লাভ হইবে না। যে নূতন সিন্ধু-প্রদেশ গঠিত হইল, উহাতে যে কস্মিন্‌কালেও আর্থিক স্বচ্ছলতা হইবে, তাহা মনে করিতে পারা যায় না। ইহার আয়তন ৪৬ হাজার ৫ শত বর্গ-মাইল, লোকসংখ্যা ৩২ লক্ষের অধিক হইবে না। তথায় মুসলমান অধিবাসীদিগের সংখ্যা ২৮ লক্ষ, হিন্দুর সংখ্যা প্রায় সাড়ে ৮ লক্ষ। মুসলমানরা সাধারণতঃ গরীব; হিন্দু আমিনদের অবস্থা কিছু ভাল। প্রথম গোলটেবল সভাতেই এই অঞ্চলকে বোম্বাই প্রদেশ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া স্বতন্ত্র প্রদেশে পরিণত করিবার প্রস্তাব হয়। এক সময়ে ইহা হিন্দুরাজ্য ছিল, কিন্তু খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে ইহা আরব জাতির অধিকারে আসে। ১৭৮২ খৃষ্টাব্দে ইহা বেলুচিস্থানের তালপুরদিগের অধিকারে আসে। ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে ইংরেজ এই দেশ অধিকার করেন। ইহার হিন্দু অধিবাসীদের মধ্যে অনেকেই মুসলমানভাবাপন্ন। এই ক্ষুদ্র অঞ্চলকে কেবল সাম্প্রদায়িকতার অনুরোধে একটি স্বতন্ত্র প্রদেশে পরিণত করিয়া ভারত সরকারের তহবিল হইতে বৎসর বৎসর ১ কোটি ৫ লক্ষ টাকা দানের বরাদ্দ করিবার কি প্রয়োজন হইয়াছিল? প্রায় ৪ বৎসর পূর্ব্বে সিন্ধুবিচ্ছেদবিরোধী সমিতির সভাপতি সর্দ্দার সম্পুরণ সিং বলিয়াছিলেন যে, সিন্ধুদেশকে কস্মিন্‌কালেও অনুগ্রহ পূর্ব্বক অর্থদান করিতে হয় নাই। কিন্তু এই দেশটিকে স্বতন্ত্র-প্রদেশে পরিণত করিলে যদি ইহার অর্থে ইহার ব্যয়ভার না কুলায়, তাহা হইলে আর একটি মুসলমান-প্রধান প্রদেশ গঠন করিবার উদ্দেশ্যে অন্য প্রদেশের করদাতাদিগের প্রদত্ত কর ইহার জন্য ব্যয় করা উচিত হইবে না। স্বাগতকারিণী সভার সম্পাদক মুখী (মুখ্য?) গোবিন্দরাম বলেন, সিন্ধুকে একটি স্বতন্ত্র প্রদেশে পরিণত করিলে উহা ভারতের মানচিত্রে কৃষ্ণবর্ণে লাঞ্ছিত প্রদেশ হইবে। কিন্তু ইহারা হিন্দু ও শিখ। ইহাদের কথা কেই বা শুনে! কাযেই সম্প্রদায়-বিশেষের অহমিকা চরিতার্থ করিবার জন্য এই ক্ষুদ্র অঞ্চলকে একটি প্রদেশে পরিণত করা হইল। সিন্ধু অপেক্ষা উড়িষ্যার স্বতন্ত্র প্রদেশে পরিণত হইবার দাবী অনেকটা সমীচীন। কিন্তু তথাপি আমরা ব্যয়বাহুল্যের জন্য ইহাতে আপত্তি করি। ভারত-গৌরীসেনের অর্থ সাম্প্রদায়িক দেমাক চরিতার্থ করিবার জন্য যেরূপভাবে ব্যয়িত হইতেছে, এরূপ আর কোথাও হয় কি?

কলিকাতার মেয়র নির্ব্বাচন

১৬ই বৈশাখ সার হরিশঙ্কর পাল কলিকাতার মেয়র এবং মিষ্টার আবদার রহিম ডেপুটী মেয়র নির্ব্বাচিত হইয়াছেন দেখিয়া আমরা

সার হরিশঙ্কর পাল

প্রীতিলাভ করিয়াছি। দুই জন ব্যতীত করপোরেশনের কংগ্রেসী কাউন্সিলারগণ ঐ দিনের নির্ব্বাচন সভায় যোগদান করেন নাই। সার হরিশঙ্কর পাল কলিকাতার বিশিষ্ট অধিবাসী—বিশ্ব-বিশ্রুত-নামা বটকৃষ্ণ পাল কোম্পানীর অন্যতম স্বত্বাধিকারী—বহু জন-হিতকর প্রতিষ্ঠানের পরিচালক ও সভাপতি। আমরা আশা করি, তাঁহার মত সুযোগ্য, সদ্ব্যবসায়ীর নেতৃত্বে—প্রচেষ্টায় কলিকাতা করপোরেশনে বহুতর অনাচারের অবসান হইবে;—তিনি করদাতৃগণের কল্যাণসাধন করিয়া আশীর্ব্বাদভাজন হইবেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের পুস্তক ব্যবসা

গত ৪ঠা এপ্রেল বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্ট্রার বিজ্ঞাপন প্রচার করিয়া জানাইয়াছেন যে, (১) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় শীঘ্রই বাঙ্গালা—উর্দ্দু—আসামী—হিন্দী—ইংরেজি ভাষায় নিম্নের ১৭টি বিষয়ে প্রবেশিকা পরীক্ষার জন্য পাঠ্যপুস্তক রচনার নির্দ্দেশ-কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবেন—(১) ভারতবর্ষ ও ইংলণ্ডের ইতিহাস, (২) ভূগোল, (৩) অঙ্ক—পাটীগণিত ও প্লেন জ্যামিতি, (৪) প্রাথমিক বৈজ্ঞানিক জ্ঞান, (৫) প্রাথমিক পদার্থবিদ্যা ও রসায়ন, (৬) পরিমিতি ও জরিপ, (৭) প্রাথমিক কলকব্জা ব্যবহার, (৮) প্রাথমিক স্বাস্থ্যতত্ত্ব, (৯) ব্যবসা-পদ্ধতি ও পত্রব্যবহার, (১০) প্রাণিতত্ত্ব, (১১) ব্যবহারিক ভূগোল, (১২) ভারতের শাসন-পদ্ধতি (প্রাথমিক), (১৩) গার্হস্থ্য বিজ্ঞান (?) ও গার্হস্থ্য স্বাস্থ্যনীতি, (১৪) সেলাই ও সেলাই শিল্প, (১৫) ভারতীয় সঙ্গীত, (১৬) প্রতীচ্য সঙ্গীত, (১৭) অঙ্কন ও ললিতকলার অন্তঃপ্রবেশ।

এক বীজগণিত ব্যতীত অপর কোন বিষয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বজ্ঞ রেজিষ্ট্রারের নির্দ্দেশ হইতে বাদ পড়িয়াছে বলিয়া মনে হইল না। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় পরলোকগত এন, এন, ঘোষকে অর্থ দিয়া "ভারতে ইংলণ্ডের কার্য্য" নামে রাজভক্তি-সংহিতা প্রণয়ন করাইয়া—প্রকাশ করিয়া লাভবান্ হইতেছিলেন। প্রবেশিকা পরীক্ষার নূতন বিধি অনুসারে ভবিষ্যতে উহা আর পাঠ্যপুস্তক থাকিবে না। ইহাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা। এজন্য বিশ্ব-বিদ্যালয় কোন লোককে দিয়া বীজগণিত প্রণয়ন করাইয়া প্রকাশ করিয়া লাভবান্ হইবেন।

(২) প্রত্যেক পুস্তকের ১৫ খানি ৩০শে সেপ্টেম্বরের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ে দাখিল করিতে হইবে এবং ৩১শে অক্টোবরের পর দাখিল করিলে চলিবে না। এই এক মাস "গ্রেস", বোধ হয়, কতক-গুলি বিশেষ লেখককেই প্রদত্ত হইবে।

জনরব, বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘোষণা প্রচারের পূর্ব্বেই কোন কোন ভাগ্যবান্—অবসরপ্রাপ্ত সাব জজ হইতে শিক্ষক পর্য্যন্ত—পুস্তক রচনা করিয়া ছাপাইয়া ফেলিয়াছেন। ইহারা কিরূপে পূর্ব্বেই "সিলেবাস" ও "পরিভাষা" পাইয়াছিলেন?

(৩) বৈজ্ঞানিক বিষয়ে পুস্তক রচনাকালে যে সব পরিভাষা ব্যবহার করিতে হইবে, সে সব সম্বন্ধে লেখকরা রেজিষ্ট্রারের নিকট জানিতে পারিবেন। পুস্তকের ভাষা, আকার প্রভৃতি সম্বন্ধীয় সংবাদও পাওয়া যাইবে। কিন্তু এ সকল পরিভাষা প্রণয়ন সম্বন্ধে বিশ্ববিদ্যালয় মনীষী সাহিত্যিকগণের অভিমত গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া আমাদের জানা নাই। পুস্তকের ভাষা কিরূপ হইবে, তাহাও যে রেজিষ্ট্রার সাহিত্যিকগণকে বুঝাইয়া দিবেন—ইহা অশোভন স্পর্দ্ধা বলিয়াই মনে করা যাইতে পারে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আজ পর্য্যন্ত কোন্ অবদানে বঙ্গসাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিয়াছেন যে, আজ এই সম্মান দাবী করিতে পারেন?

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় যে ভাবে পাঠ্যপুস্তক রচনা—মুদ্রণ—প্রকাশ—বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহাতে কি ছাত্র—গ্রন্থকার—গ্রন্থপ্রকাশক—বিক্রেতার প্রতি অবিচার—অনাচার করা হইতেছে না?

ছাত্রদিগের প্রতি অবিচার—ছাত্ররা যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট পুস্তক পাঠ করিবে, সে আশা নির্ম্মূল হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাপ দেওয়া পুস্তক—ভাল মন্দ যেমনই হউক পাঠ করিতেই হয়। আর সে জন্য যে মূল্য দিতে হয়, তাহা পুস্তকের উৎকর্ষ ও আকারের তুলনায় অত্যধিক।

গ্রন্থকারদিগের প্রতি অবিচার—তাঁহাদের অনুশীলন ও যোগ্যতা যথাযথভাবে প্রযুক্ত হইতে পারে না।

প্রকাশকগণের প্রতি অবিচার—তাঁহারা যে উপযুক্ত পাঠ্য পুস্তক প্রকাশ করিয়া লাভবান্ হইবেন, সে পথ বন্ধ।

পুস্তক-বিক্রেতার প্রতি অবিচার—বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকাশিত পাঠ্যপুস্তক বিক্রয় করিয়া তাঁহাদের নির্দ্ধারিত কমিশন পাইতে হইলে সঙ্গে সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়-প্রকাশিত সেই পরিমাণে কতকগুলি অ-পাঠ্য পুস্তক না লইলে কমিশন পাইবার উপায় নাই।

শেষোক্ত উপায়ে ব্যবসাবুদ্ধিসম্পন্ন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় "গুদাম সাবাড়" করিয়াও লাভবান্ হইবার চমৎকার ব্যবস্থা করিয়াছেন।

সমাজতন্ত্রবাদীদিগের পরাজয়

এবার কংগ্রেসের সকল কথা প্রকাশ করা সম্ভব হইল না। তবে মোটের উপর এই কথা বলা যায় যে, সমাজতন্ত্রবাদীরা এবার কোন

শ্রীমতী কমলা দেবী

প্রস্তাবেই জয়লাভ করিতে পারেন নাই। তাঁহাদের দুইটি প্রস্তাবই বিষয়নির্ব্বাচন সমিতিতে অগ্রাহ্য হইয়া গিয়াছে। তাঁহাদের প্রস্তাবের লক্ষ্য ছিল শাসন পদ্ধতির ধ্বংসসাধন। শ্রীমতী কমলা দেবীর সংশোধন-প্রস্তাবের অনুকূলে ২০টি এবং প্রতিকূলে ৪৮টি

ভোট হইয়াছিল; সুতরাং উহা বাতিল হয়। স্বামী সম্পূর্ণানন্দের সংশোধন প্রস্তাবের অনুকূলে ২৩টি এবং প্রতিকূলে ৪৪টি ভোট হওয়ায় উহাও অগ্রাহ্য হইয়া যায়। এই দুইটি প্রস্তাবই সমাজতন্ত্রবাদীদিগের পক্ষ হইতেই উপস্থিত করা হইয়াছিল। শ্রীযুত অমৃতলাল শেঠ প্রস্তাব করেন যে, কন্‌ষ্টিটিউয়েণ্ট এসেম্ব্লি বা পূর্ণায়তন গঠনকামী সমিতিতে ভারতীয় রাজন্যবর্গের রাজ্য হইতে প্রতিনিধি গ্রহণ করা হউক। সে প্রস্তাবের অনুকূলে ২৮টি এবং প্রতিকূলে ৩৭টি ভোট হওয়ায় তাহা অগ্রাহ্য হয়। পণ্ডিত বালকৃষ্ণ শর্ম্মার কাউন্সিল বর্জ্জন প্রস্তাবের পক্ষে কেবলমাত্র ২টি ভোট হইয়াছিল। শেঠ গোবিন্দ দাস প্রস্তাব করেন যে, আগামী নির্ব্বাচনের পূর্ব্বেই যেন মন্ত্রিত্ব-গ্রহণের সম্বন্ধে একটা হেস্তনেস্ত করা হয়। কেবলমাত্র ১৭ জন সদস্য তাঁহার প্রস্তাব সমর্থন করিয়াছিলেন। কংগ্রেসের কার্য্যকরী সমিতি ভারত-সরকারের শাসন-সংস্কার আইন অগ্রাহ্য করিবার যে প্রস্তাব গ্রাহ্য করিয়া লইয়াছিলেন, তাহাই বিষয়নির্ব্বাচন সমিতি গ্রাহ্য করিয়া লইয়াছেন। তাহার অনুকূলে ৮৩টি এবং প্রতিকূলে ৫টি মাত্র ভোট হইয়াছিল। এবার পার্লামেণ্টারী বোর্ড উঠাইয়া দেওয়া হইল। এখন হইতে নিখিল ভারতীয় কংগ্রেস-কমিটী তাহার কার্য্য সম্পাদন করিবেন। মন্ত্রিত্ব-গ্রহণের প্রস্তাব কংগ্রেস মুলতুবীই রাখিয়াছেন। তবে ভাবে ভঙ্গীতে মনে হইতেছে যে, কংগ্রেস মন্ত্রিত্ব-গ্রহণ প্রস্তাবে শেষকালে মত দিবেন।

পুনার দাঙ্গা

পুনার দাঙ্গার ব্যাপার সত্য সত্যই বিস্ময়জনক। তথাকার সোনিয়া মারুতি মন্দিরে উৎসব হয়। বাদ্য সে উৎসবের অপরিহার্য্য অঙ্গ। উৎসবের পাণ্ডারা সে জন্য স্থানীয় ম্যাজিষ্ট্রেটের অনুমতি চাহিয়াছিলেন। ম্যাজিষ্ট্রেটও নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য মৃদু বাদ্য করিবার অনুমতি দিয়াছিলেন। উৎসবে তাহাই করা হইয়াছিল। তবে এই ব্যাপারে দাঙ্গা-হাঙ্গামা ও খুন-জখম হইল কেন? তথায় নিকটবর্ত্তী একটি মসজেদ হইতে হিন্দুদিগের উপর অকারণ প্রস্তর নিক্ষিপ্ত হয়। ফলে যে দাঙ্গা বাধে, তাহাতে তথাকার ৫টি হিন্দু-মন্দির মুসলমানরা নষ্ট করিয়া দিয়াছে। জিজ্ঞাসা করি, কোন্ সাহসে ম্যাজিষ্ট্রেটের আদেশ সত্ত্বেও একদল লোক এইরূপ দাঙ্গা করিতে সাহস পায়? যাহাতে এইরূপ না হইতে পারে, তাহার জন্য সরকারই বা কি ব্যবস্থা করিতেছেন? যাঁহারা মুসলমান-বন্ধুদিগের জন্য লক্ষ্ণৌ প্যাক্ট হইতে সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদ পর্য্যন্ত সমস্ত গণতন্ত্রবিরোধী ব্যবস্থার কার্য্যতঃ সমর্থন করিতেছেন, তাঁহারাই বা এই ব্যাপারে কি বলেন? তাই বলি, ধীরে রজনী ধীরে। বাঙ্গালার জলপাইগুড়ি হইতেও ঐরূপ একটি সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। ব্যাপার কি?

খোর্দ্দ-গোবিন্দপুরের মামলা

রাজসাহী খোর্দ্দ-গোবিন্দপুরে ৪০ জন মুসলমানের বিরুদ্ধে একটি হিন্দু পরিবারের প্রতি পৈশাচিক অত্যাচারের অভিযোগে যে মামলা হইয়াছিল, তাহার কথা আর যিনিই কেন বিস্মৃত হউন না, খোর্দ্দ-গোবিন্দপুরের হিন্দুরা ও 'বসুমতীর' পাঠকরা কখনই ভুলিতে পারেন নাই। এই মামলায় রাজসাহীর দায়রা জজ জুরীর সহিত একমত হইয়া ৮ জন আসামীকে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের ও অবশিষ্ট আসামী-দিগকে ১০ বৎসর কারাদণ্ডের আদেশ করেন। এই মামলার সম্বন্ধে মতপ্রকাশ করায় বাঙ্গালা প্রবন্ধ সম্বন্ধে তিন জন য়ুরোপীয় জজের বিচারে 'দৈনিক বসুমতীর' পূর্ব্বজামিন বাজেয়াপ্ত করিয়া ৬ হাজার টাকা জামিন দাখিল করিবার আদেশ বহাল থাকে এবং মুসলমান পত্র 'হানাফী' বিচারকে প্রতিহিংসা সন্দেহ প্রকাশ করিয়া আদালতের ঘোর অবমাননার জন্য অভিযুক্ত হইয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া মাত্র ৫ শত টাকা দণ্ড দিয়া অব্যাহতি লাভ করেন।

তাহার পর মামলার পুনর্ব্বিচারের প্রার্থনা হাইকোর্টে আসামী-দিগের পক্ষ হইতে করা হয়। গতকল্য হাইকোর্টের ২ জন ইংরেজ জজ, জাষ্টিস কানলিফ ও জাষ্টিস হেণ্ডার্শন সেই আবেদন সম্বন্ধে রায় দিয়াছেন।

রায় পাঠ করিয়া বুঝিতেছি, বিচারকদ্বয় মনে করিয়াছেন, বিচারে ত্রুটির সম্ভাবনা উপেক্ষা করা যায় না। তাঁহারা যখন সেই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, তখন তাঁহাদিগের পক্ষে মোকর্দ্দমার পুনর্ব্বিচারের আদেশ করা কখনই অসঙ্গত বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না। বিচারক হয় ত জুরীকে মামলা যথারীতি বুঝাইয়া দিতে কোন ত্রুটি করিয়াছিলেন এবং অভিযোগ হয় ত' যথারীতি বিবেচিত হয় নাই। কিন্তু বিচারকরা যে বলিয়াছেন—এ কথা প্রথমেই বলা যায় যে, বিচারক হিন্দু এবং জুরাররাও হিন্দু—ইহাতে আমরা বিস্মিত ও ব্যথিত হইয়াছি। হিন্দু জজ ও হিন্দু জুরাররা যে কোনরূপ সাম্প্রদায়িকতার প্রভাবমুক্ত হইতে পারেন না, এ বিশ্বাস আমাদিগের নাই। পরন্তু আমাদিগের মনে হয়, মুসলমানদিগের বিরুদ্ধে মামলায় হিন্দু জজ ও জুরী এবং হিন্দুর বিরুদ্ধে মামলায় মুসলমান জজ ও জুরী—পাছে লোকের মনে কোনরূপ সন্দেহের ছায়াপাত হয়, সেই ভয়ে—অতিমাত্র সতর্কতা সহকারে বিচার করিতে পারেন।

বিচারকদ্বয়ের নির্দ্দেশ—

(১) এই মোকর্দ্দমার পুনর্ব্বিচার হইবে। কিন্তু রাজসাহীতেও নহে, হাইকোর্টেও নহে—জলপাইগুড়ীতে। বাঙ্গালাদেশে বহু স্থানের মধ্য হইতে কি জন্য জলপাইগুড়ীই বিচারস্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহা আমরা জানি না। কিন্তু আমাদিগের মনে হয়, যদি কোন কারণে রাজসাহীতে বিচার বিচারকদিগের অনভিপ্রেত হয়, তবে হাইকোর্টে মামলা হওয়াই ভাল ছিল। বিচার হাইকোর্টে হইলে আসামীদিগের অত্যন্ত অধিক ব্যয় হইবে বলিয়া বিচারকদ্বয় মামলা হাইকোর্টে আনেন নাই। কিন্তু জলপাইগুড়ী যখন রাজসাহী নহে—তখন তথায় ৪০ জন আসামীর কুটুম্বভবন না থাকিলে, তথায়ও তাহাদিগের ব্যয় নিতান্ত অল্প হইবার কথা নহে। বিশেষ, হিন্দু সাক্ষীদিগকেও তথায় যাইতে হইবে।

(২) এবার বিচার জুরীর সাহায্যে না হইয়া এসেসর লইয়া হইবে। এই ব্যবস্থার কারণ কি? জুরীর বিচার যে বিচার হিসাবে এসেসরের বিচার অপেক্ষা আদরণীয় ও আদৃত, তাহা বলা বাহুল্য। অথচ এবার সেই জুরীর বিচারই বর্জ্জন করা হইবে!

(৩) সরকারকে বিচারকদ্বয় বিবেচনা করিতে বলিয়াছেন—বিচারক য়ুরোপীয় ও খৃষ্টান হইবেন। এই ব্যবস্থায় কি বুঝিতে হইবে, হিন্দু ও মুসলমান বিচারকদিগের নিরপেক্ষতায় সাম্প্রদায়িক মামলায় নির্ভর করা যায় না? কিন্তু য়ুরোপীয় আসামী কি

য়ুরোপীয় বিচারকের নিকটই বিচারের দাবী করিতে পারে না? এই ব্যবস্থাই কি এদেশে বিচারেও third partyর অধিকার কায়েম করা হইবে না?

ডাকমাশুলে করুণা-কণা বিতরণ

অসম্ভব ডাকমাশুল বৃদ্ধির ফলে কি ভাবে এই দরিদ্র দেশে সুলভ সৎসাহিত্য প্রচারের পথরোধ—ভিঃপিঃ ব্যবসায়ের শ্বাস রুদ্ধ হইয়া শিক্ষা-বিস্তারের উপর পরোক্ষভাবে ট্যাক্স নির্দ্ধারিত হইয়াছে, তাহা গত ফাল্গুন সংখ্যায় 'ডাক-মাশুলে সরকারী করুণা' প্রসঙ্গে আলোচনা করিয়াছি। এবারের বাজেটে সরকারী ডাকবিভাগে ১৯ লক্ষ টাকা উদ্বৃত্ত হওয়ায় ১লা এপ্রেলের ইস্তাহারে যে প্রসাদকণাটুকু সাধারণের উপকারার্থে বিতরিত হইয়াছে—সিন্ধুর তুলনায় তাহা বিন্দুমাত্র।

পূর্ব্ববর্দ্ধিত হারে খামের চিঠি আড়াই তোলা পর্য্যন্ত পাঁচ পয়সা মাশুলে যাইত, এখন এক তোলা পর্য্যন্ত এক আনা এবং পরবর্ত্তী প্রত্যেক তোলা বা অংশের জন্য আধ আনা মাশুল দিতে হইবে। অর্থাৎ দেড় বা দুই তোলার জন্য ছয় পয়সা, আড়াই তোলার জন্য দুই আনা মাশুল দিতে হইবে। সুতরাং খামের চিঠির মাশুল বাড়িয়াছে বলিয়াই মনে করা যাইতে পারে।

সংবাদপত্র ৮ তোলা পর্য্যন্ত এক পয়সা মাশুলে যাইত, তাহাই এখন ১০ তোলা পর্য্যন্ত এক পয়সায়, ২০ তোলা পর্য্যন্ত দুই পয়সায় যাইতে পারিবে। কিন্তু ২০ তোলার পরে আরও ২০ তোলা বা তাহার অংশের জন্য এক আনা মাশুলই দিতে হইবে। বিচক্ষণ সরকার বিশেষ হিসাব করিয়া দেখিয়াছেন যে, বাঙ্গালা-দেশের অতিকায় মাসিক-পত্রিকাগুলি সাধারণতঃ ৩০ তোলা হইয়া থাকে। মাসিক-পত্রিকাগুলিও সংবাদপত্রশ্রেণীর অন্তর্গত। এজন্য অতি সাবধানী সরকার সংবাদপত্রের প্রত্যেক ১০ তোলা ওজনের জন্য এক পয়সা হিসাবে মাশুল নির্দ্ধারিত করিতে পারেন নাই—একেবারে অনধিক ৪০ তোলার ব্যবস্থা করিয়াছেন। ডাক-মাশুলের দিক দিয়া ত' সরকার মাসিকপত্রকে কোনরূপ সুবিধা দেওয়াই আবশ্যক বলিয়া মনে করেন নাই—পরন্তু অন্যদিক দিয়া রক্ষাশুল্কের অজুহাতে মাসিকপত্রগুলি যে কাগজে ছাপা হয়, তাহার প্রত্যেক পাউণ্ডের উপর পাঁচ পয়সা হারে ডিউটী বসাইয়া প্রত্যেক মাসিকপত্রখানির উপর গড়ে প্রায় আড়াই পয়সা হারে ডিউটী আদায় করিতেছেন বা ভারতের বিদেশী কাগজের কলওয়ালাদের আদায় করিবার উপায় করিয়া দিয়াছেন। ভারতীয় কাগজশিল্পের সংরক্ষণের দোহাই দিয়া এই ট্যাক্স আদায় হইলেও ইহাতে দেশবাসী কোন কালে উপকৃত হইবেন, এমন কথা মনে করিবার কোন যুক্তিযুক্ত কারণ নাই। ইহার উপর ডাক-বিভাগে নিয়মিতভাবে বহুসংখ্যক মাসিকপত্র খোয়া যায়, তাহার কোন পাত্তা করাই সম্ভব হয় না।

সংবাদপত্রের ওজনও যে সরকার দুই তোলা বর্দ্ধিত করিয়াছেন, তাহাও নিরর্থক বলিয়া মনে হয় না। দেশী কাগজের দাম বেশী বলিয়া সংবাদপত্রকে বিদেশী কাগজ আনাইতেই হয়, এজন্য সুলভ-মূল্যের সংবাদপত্রে কাগজ বেশী বা মোটা দিলে ওজনে ভারী হইলে সেই তুলনায় সরকারকে ডিউটীও বেশী যোগাইতে হইবে। সুতরাং মাশুলে সুবিধা দিয়া সরকার ডিউটীতে পোষাইয়া লইতে পারিবেন।

বুকপোষ্ট—পার্শ্বেল—ভিঃপির অত্যধিক মাশুল সম্বন্ধে সরকার কোনরূপ বিবেচনা করা আবশ্যক বলিয়া মনে করেন নাই। ১০ তোলা ওজনের সংবাদপত্রের মাশুল এক পয়সা, কিন্তু পুস্তক হইলেই ১০ তোলার মাশুল পাঁচ পয়সা এবং ২০ তোলা সংবাদ-পত্রের মাশুল দুই পয়সা, পুস্তকের মাশুল নয় পয়সা—পার্শ্বেলের সর্ব্বনিম্ন মাশুল ২০ তোলার জন্য ৵০ আনা, তাহার পর ৪০ তোলার জন্য চার আনা মাত্র। পুস্তক, ঔষধ, সৌখীন দ্রব্যাদি সাধারণতঃ ভিঃ পিতেই সমধিক বিক্রয় হইত; কিন্তু আনরেজিষ্টারী ভিঃপির পরিবর্ত্তে প্রত্যেক ভিঃপি রেজেষ্টারী করিবার সুব্যবস্থা প্রবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে রেজেষ্টারী ও মণিঅর্ডার ফিঃ বাড়াইয়া দেওয়ায় এ সকল ব্যবসা বন্ধ হইবার উপক্রম হইয়াছে। একখানি দুই আনা মূল্যের পুস্তক ভিঃ পিতে লইতে সাত আনা মাশুল দিবার বিধান বিধিবদ্ধ হইয়াছে। ইহার উপর পুস্তকের কাগজের উপর এক দফা অত্যধিক হারে ডিউটী ত' আছেই।

সুলভে সৎসাহিত্য প্রচার—সাহিত্যের আধারে সার্ব্বজনীন শিক্ষাবিস্তার—মফঃস্বলবাসীর সুবিধার জন্য ভিঃ পিতে ঔষধ ও দ্রব্যাদি সরবরাহ যদি সরকারের অভিপ্রেত না হয়, তবে পাঠক—গ্রাহক—গ্রন্থকার—প্রকাশক—বিক্রেতাকে এভাবে ক্ষতিগ্রস্ত না করিয়া, সরকার ভিঃ পির বিধান তুলিয়া দিলেই ত' পারেন। দেশবাসীর সঙ্গে ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ও নিশ্চিন্ত হইয়া সরকারের জয়গান করিতে পারে।

বাঙ্গালা-ব্যাপী দুর্ভিক্ষ

বাঙ্গালার প্রায় সকল স্থান হইতে দুর্ভিক্ষ, জলকষ্ট এবং অন্ন-কষ্টের সংবাদ পাওয়া যাইতেছে। সর্ব্বত্রই হাহাকার এবং আর্ত্তনাদ। অনেক লোক ঘোর অন্ন-কষ্টে পতিত হইয়াছে। কিছুদিন পূর্ব্বে বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসনের সভাপতি মহারাজাধিরাজ স্যার বিজয়চাঁদ মহতাব, বেঙ্গল ল্যাণ্ড হোল্ডার্শ এসোসিয়েসনের সভাপতি মহারাজাধিরাজ কামেশ্বর সিংহ, বেঙ্গল চেম্বার অব কমার্শের সভাপতি স্যার এডোয়ার্ড বেন্থল, কলিকাতা ট্রেডস এসোসিয়সনের সভাপতি মিষ্টার প্রাট, বেঙ্গল ন্যাসানাল চেম্বার অব কমার্শের সভাপতি স্যার হরিশঙ্কর পাল, ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসনের সভাপতি শ্রীযুত যতীন্দ্রনাথ বসু প্রমুখ বহু গণ্যমান্য সম্ভ্রান্ত লোক কর্ত্তৃক স্বাক্ষরিত একখানি আবেদনপত্র পশ্চিমবঙ্গের দুর্ভিক্ষপীড়িত ব্যক্তিদিগের সাহায্যার্থ প্রচারিত হইয়াছিল। পশ্চিমবঙ্গে যে অনশনে অর্দ্ধাশনে বহু লোক কষ্ট পাইতেছে, তাহা এই সকল সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির স্বাক্ষরিত আবেদনপত্রেই প্রকাশ। তাহার পর বাঁকুড়া হইতে দুর্ভিক্ষ-কাতর জনগণের আর্ত্তনাদ শুনা যাইতেছে। বাঁকুড়া সম্মিলনীর সভাপতি এবং 'মডার্ণ রিভিউ'-পত্রের সম্পাদক, প্রবীণ সাহিত্যিক শ্রীযুত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রকাশ করিয়াছেন, বাঁকুড়া জিলার ১১ লক্ষ অধিবাসীর মধ্যে ৫ লক্ষ লোক জঠরজ্বালায় দগ্ধ হইতেছে। নানাস্থান হইতেই এই ভাবের দুর্ভিক্ষ ও দারুণ জল-কষ্টের সংবাদ শুনা যাইতেছে। ব্যবস্থাপরিষদে স্যার গিরিজাশঙ্কর বাজপেয়ী

যে সরকারী পত্রের নকল দাখিল করেন, তাহাতে বীরভূম, বাঁকুড়া, বর্দ্ধমান, মুর্শিদাবাদ এবং হুগলী জিলার বহু স্থানে অন্নকষ্ট এবং তাহার ফলে শোচনীয় অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে, ইহা বলা হইয়াছে। খুলনা জিলার শ্যামনগর থানার গ্রামগুলি হইতে অন্ন-কষ্টের হাহাকার উঠিয়াছে। তথায় অনেক লোক তেঁতুলের বীজ-সিদ্ধ, কচি কলার পাতা, থোড় সিদ্ধ প্রভৃতি খাইয়া কোনরূপে জীবন ধারণ করিতেছে। আমাদের বিশ্বাস, সমস্ত পশ্চিম এবং মধ্যবঙ্গে কয়েক বৎসর যথাযথভাবে বৃষ্টিপাত না হওয়ায় ঘোর অন্নকষ্ট উপস্থিত হইয়াছে। সরকার বর্দ্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, বাঁকুড়া প্রভৃতি জিলার কোন কোন স্থানে দুর্ভিক্ষ হইয়াছে বলিয়া ঘোষণা করিলেও পশ্চিম-বঙ্গের বিভিন্ন জিলার দুর্ভিক্ষের কথা আজও স্বীকার করেন নাই। সরকার কোন কোন দুর্ভিক্ষপীড়িত অঞ্চলে সাহায্যদানের ব্যবস্থা করিয়াছেন সত্য, কিন্তু সর্ব্বত্রই যখন বেড়া আগুন লাগিয়াছে, তখন দুই এক স্থানে সাহায্য করিলে বিশেষ কি লাভ হইবে? বাঙ্গালার প্রায় সর্ব্বত্রই অতি দরিদ্র লোক এবং নিঃস্ব ভদ্রসন্তানগণ অন্নাভাবে ঘোর কষ্টে পড়িয়াছেন। সত্বর ইহার প্রতিকারে অবহিত না হইয়া, সরকার দুর্ভিক্ষের কারণ অনুসন্ধানের জন্য উচ্চ বেতনে কমিশনার নিয়োগ করিয়াছেন জানিয়া আমরা অত্যন্ত বিস্মিত হইয়াছি। এক বাঁকুড়া জিলায় দুর্ভিক্ষ দমনের জন্য অন্ততঃ ১৫ হইতে ১৬ লক্ষ টাকার প্রয়োজন। ইহা ভিন্ন নানা স্থান হইতে দারুণ জল-কষ্টের সংবাদও পাওয়া যাইতেছে। দেশের সকল শ্রেণীর লোকের মধ্যে ঘোর কষ্ট উপস্থিত। এরূপ অবস্থায় সরকার এবং ধনাঢ্য ব্যক্তিরা যদি অর্থ-সাহায্য না করেন, তাহা হইলে অবস্থা অতিশয় শোচনীয় হইয়া উঠিবে। বাঙ্গালার এই দুর্দ্দিনে শাসনযন্ত্রের বিরাট ব্যয় হ্রাস করিয়া—মন্ত্রীর আধিক্য—শৈলাবাসের ব্যয় পরিহার করিয়া দুর্ভিক্ষপীড়িত অঞ্চলে যথোচিত সাহায্যদান করা কি সরকারের একান্ত কর্ত্তব্য নহে?

বিস্ময়ের বিষয় এই যে, "ফেমিন ট্রাষ্ট" অনেক চিন্তার পর স্থির করিয়াছেন, আপাততঃ মাত্র ২৫ হাজার টাকা বাঙ্গালাকে দেওয়া হইবে—আর সঙ্গত মনে করিলে আরও ২৫ হাজার টাকা দেওয়া হইবে; কিন্তু ইহাই কি বাঙ্গালার ন্যায্য প্রাপ্য?

ডাক্তার আন্সারী

গত ২৭শে বৈশাখ, সুপ্রসিদ্ধ চিকিৎসক—স্বদেশসেবক, কংগ্রেস-কর্ম্মী ডাক্তার মুক্তার আমেদ আন্সারী প্রায় ৬০ বৎসর বয়সে, মুসুরী হইতে দিল্লীতে প্রত্যাবর্ত্তনের সময়ে ট্রেণে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন। ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে হকিমসাহেব গাজীপুরের যে পরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, চিকিৎসা-বিজ্ঞান-সাধনার জন্য সেই বংশ চির-প্রসিদ্ধ। তিনি এলাহাবাদে শিক্ষালাভের পর ১৯০০ খৃষ্টাব্দে নিজাম কলেজ হইতে উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া, চিকিৎসা-বিদ্যা শিক্ষার জন্য বিলাতে গমন করেন। ১০ বৎসর লণ্ডনে অবস্থান-কালে তিনি বিভিন্ন হাসপাতালের সহকারী ডাক্তার হইয়াছিলেন। বিলাত হইতে ফিরিয়া তিনি দিল্লীতে চিকিৎসাকার্য্য আরম্ভ করেন—অল্পদিনেই যথেষ্ট প্রতিপত্তি লাভ করেন। সুচিকিৎসক বলিয়া নহে—তিনি দেশানুরাগের জন্যই খ্যাতি ও শ্রদ্ধা লাভ করিয়াছিলেন। তুর্কীর সহিত ইটালীর যুদ্ধকালে তিনি মেডিকেল মিশনে যে কার্য্য করিয়াছিলেন, তাহা স্মরণীয়। সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধির সঙ্কীর্ণতা তিনি চিরদিন পরিহার করিতেন। হিন্দু-মুসলমানের ঐক্যের জন্য—দেশের মুক্তির জন্য তিনি চিরদিন সংগ্রাম করিয়া গিয়াছেন।

ডাক্তার আন্সারী

১৯২৭ খৃষ্টাব্দে তিনি মাদ্রাজ কংগ্রেসের এবং পরবৎসর কলিকাতার সর্ব্বদল-সম্মেলনের সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন। মাদ্রাজে কংগ্রেসের অধিবেশনে তিনি হিন্দু-মুসলমান-বিরোধের বিস্তৃত সমালোচনা করিয়া সুমীমাংসার প্রয়াস পাইয়াছিলেন ১৯৩০ ও ১৯৩২ খৃষ্টাব্দে তিনি রাজনীতিক কারণে কারাবরণ করিয়াছিলেন। বিনা বিচারে আটক বন্দিগণের মুক্তি তাঁহার একান্ত কাম্য ছিল। বর্ত্তমান সাম্প্রদায়িকতা বিস্তারের মোহময় যুগে তাঁহার মত জাতীয়তাবাদী নেতার অতর্কিত মৃত্যু দেশের দুর্ভাগ্যের পরিচায়ক।

সুরেন্দ্রনাথ মল্লিক

গত ২৮শে চৈত্র, শুক্রবার রাত্রি ২টার সময় ৬৫ বৎসর বয়সে সুরেন্দ্রনাথ মল্লিক মহাশয় পরলোকগমন করিয়াছেন। তাঁহার মত পল্লী-কল্যাণব্রতে আত্মনিবেদিত—বাঙ্গালার সুসন্তানের মৃত্যুতে আমরা সুহৃদ্-বিয়োগ-বেদনা অনুভব করিয়াছি।

সুরেন্দ্রনাথের পিতা রাজেন্দ্রনাথ ভবানীপুরের সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার ছিলেন;—দানশীলতার জন্য তিনি উল্লেখযোগ্য সঞ্চয় রাখিয়া যাইতে পারেন নাই। শিক্ষালাভের পর সুরেন্দ্রনাথ আলিপুর আদালতে ওকালতী আরম্ভ করেন এবং প্রতিভাবলে অল্পদিনেই প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করেন। যৌবনে তিনি দেশপূজ্য সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়া কংগ্রেসে যোগদান করেন। নূতন মিউনিসিপাল আইন প্রবর্ত্তনের পূর্ব্বে সুরেন্দ্রনাথ কলিকাতা করপোরেশনের প্রথম বে-সরকারী চেয়ারম্যানের পদ গ্রহণ করিয়া—অসাধারণ যোগ্যতার পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন।

ইহার পর তিনি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য নির্ব্বাচিত হইয়া গভর্ণর কর্ত্তৃক মন্ত্রী মনোনীত হইয়াছিলেন, কিন্তু স্বরাজ্যদলের প্রচেষ্টায় তাঁহার নির্ব্বাচন নাকচ হয়। ব্যবস্থাপক সভার সভ্য থাকিবার সময় তিনি সরকারের ব্যয়বাহুল্য নিবারণের জন্য যথাসম্ভব প্রয়াস পাইয়াছিলেন।

১৯২২ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালা সরকার ব্যয়সঙ্কোচের উপায় নির্দ্ধারণের জন্য সার রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়কে সভাপতি করিয়া যে কমিটী নিযুক্ত করিয়াছিলেন—সুরেন্দ্রনাথ তাহার অন্যতম সদস্য ছিলেন। বৎসরে বাঙ্গালা সরকারের ১ কোটি ৯০ লক্ষ ২৫ হাজার ৮ শত ১০ টাকা ব্যয় কমান সম্ভব বলিয়া এই কমিটী নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য, সরকার কমিটীর সকল নির্দ্ধারণ গ্রহণ করেন নাই। এই কমিটী কমিশনারের পদ লোপ করিতে এবং গভর্ণরের বডিগার্ড বাবদ বৎসরে ১ লক্ষ ২০ হাজার টাকা ব্যয় হ্রাস করিবার জন্য পরামর্শ দেন।

১৯২৬ খৃষ্টাব্দে সুরেন্দ্রনাথ বিলাতে ভারত-সচিবের পরামর্শ-পরিষদের সদস্য নিযুক্ত হন। বিলাতে অবস্থানকালে তিনি ভারতীয়—বিশেষতঃ বাঙ্গালী ছাত্রদিগের অভিভাবকস্বরূপ ছিলেন। বিলাত হইতে ফিরিবার পূর্ব্বেই তিনি স্থির করেন যে, তিনি আর রাজনীতিক কার্য্যে যোগদান করিবেন না—তাঁহার চিরদিনের সাধনা পল্লী-সংস্কার—সমাজ-সেবার কার্য্যে আত্মনিবেদন করিবেন। শেষ জীবনে নিঃসন্তান সুরেন্দ্রনাথ ও তাঁহার সাধ্বী পত্নী ইহাই তাঁহাদের জীবনব্রতরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন।

হুগলী জিলার সিঙ্গুর থানার অপূর্ব্বপুরে সুরেন্দ্রনাথ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। পঠদ্দশায় তিনি তথায় নৈশ-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়া স্বয়ং শিক্ষকতা করিতেন। স্বগ্রামে তিনি ম্যালেরিয়া-নিবারণ-সমিতি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। শেষ জীবনে তিনি স্বগ্রামে লক্ষ টাকা ব্যয়ে পিতার স্মৃতিপূজার জন্য রাজেন্দ্রনাথ হাসপাতাল এবং মাতার স্মৃতির সম্মানে ৪০ হাজার টাকা ব্যয়ে গোলাপমোহিনী বালিকা-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন।

সুরেন্দ্রনাথ মল্লিক

কলিকাতার কয় জন বাঙ্গালীর উদ্যোগে যে দিন বড় লাট লর্ড রেডিংকে ভোজে আপ্যায়িত করা হয়, সেই দিনই শ্রীমতী বাসন্তী দেবী প্রভৃতিকে গ্রেপ্তারের সংবাদ পাইয়া, সরকারের কার্য্যের প্রতিবাদস্বরূপ সুরেন্দ্রনাথ প্রীতিভোজের টেবল ত্যাগ করেন।

অসুস্থ হইবার কয়েক দিন পূর্ব্বে বিশেষ অনুরোধে তিনি ৪ মাসের জন্য বাঙ্গালার শাসন-পরিষদের সদস্যপদ গ্রহণে সম্মত হইয়াছিলেন।

শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত

কলিকাতা, ১৬৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, বসুমতী রোটারী মেসিনে শ্রীশশিভূষণ দত্ত মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

"অঙ্গে অঙ্গে যৌবনের তরঙ্গ উচ্ছল
লাবণ্যের মায়ামন্ত্রে স্থির অচঞ্চল।"

[শিল্পী—মিষ্টার টমাস

১৫শ বর্ষ] জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৩ [২য় সংখ্যা

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-দেব

নবম পরিচ্ছেদ

তীর্থযাত্রা—কাশীধাম—শ্রীবৃন্দাবন-দর্শনে আনন্দলাভ

জগদম্বা দাসীর অসুখের কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। তাঁহার শরীর ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল, কিছুতেই পূর্ব্বস্বাস্থ্য ফিরিয়া আসিতেছিল না। তাই স্থির হইল যে, দুর্গাপূজার পরে তীর্থ-ভ্রমণে মথুর বাবু সপরিবারে বাহির হইবেন, এক যাত্রায় ধর্ম্ম ও স্বাস্থ্য উভয়ই অর্জ্জন করা হইবে।

দুর্গাপূজার সময়ে শ্রীঠাকুর জানবাজারে আসিলেন। তিনি পূজায় উপস্থিত না থাকিলে মথুর দুর্গাপূজা করিয়া সুখ বা আনন্দলাভ করিতেন না। কখনো কখনো এরূপ হইত যে, ঠাকুর পূজার চণ্ডীপাঠ শুনিতে আরম্ভ করিলেই ভাবস্থ হইতেন এবং এমনও ঘটিত যে, পূজার নৈবেদ্য কখনও বা ভাবাবেশে নিজেই গ্রহণ করিতেন। তাহাতে মথুর ভীত বা সঙ্কুচিত বোধ না করিয়া, মনে মনে ভাবিতেন যে, তাঁহার পূজা সার্থক হইয়াছে; মা—ঠাকুর যাঁহার সচল প্রতিমা, তিনি প্রত্যক্ষভাবেই পূজা গ্রহণ করিয়াছেন। পুরোহিতগণ কিন্তু ইহাতে বড়ই বিরক্ত হইতেন, তবে 'কর্ত্তার ইচ্ছায় কর্ম্ম',—কিছুই বলিতে বা করিতে সাহস করিতেন না; কোনরূপে ত্রুটি সারিয়া পূজা-কার্য্য চালাইয়া লইতেন। চন্দ্র হালদার নামে কালীঘাটের এক হালদার মথুরের এক জন তীর্থপুরোহিত বা পাণ্ডা ছিল। কালীঘাটে যখন মথুর যাইতেন, হালদার চন্দ্র বেশ দুই পয়সা উপার্জ্জন করিত এবং মথুর বৎসরে অনেকবারই কালীঘাটে যাইতেন। ঠাকুরকে পাইয়া মথুর এখন কালীঘাটে যাওয়া খুব কমাইয়া দিয়াছেন, যদিই বা কখন মাকে দর্শন করিতে যান, তাও বাবার সঙ্গে। কাজেই চন্দ্রের খাতির ও আদায় উভয়ই কমিয়া গিয়াছিল। চন্দ্র সে রাগ মনের মধ্যে পোষণ করিতেছিল। পূজার সময় ঠাকুর আসিয়াছেন। এক দিন তিনি ভাবে জড়বৎ হইয়া একটি ঘরে পতিত রহিয়াছেন; দেখিয়া চন্দ্র সেই, নির্জ্জন ঘরে আসিয়া, প্রতিশোধ লইবার উত্তম সুযোগ উপস্থিত বুঝিয়া. প্রথমে ঠাকুরকে সজোরে ধাক্কা দিতে আরম্ভ করিল। চন্দ্রের মনের ভাব এই যে, সে মথুরকে দেখাইবে যে, ঠাকুরের এ সব ভাবটাব কিছু নয়, শুধু বুজরুকি বা ভাণ-মাত্র—বড়লোক হাত করার ইহা এক প্রকার কৌশল। কিন্তু যাহা সত্য, তাহা স্বর্ণ-অক্ষরে প্রকাশিত থাকে এবং সত্য চিরকালই জয় লাভ করে। ঠাকুর সে প্রহার ও ধাক্কা খাইয়াও অচল, অটল ও বাহ[illegible]! শেষে ক্রোধবশে ও প্রতিশোধ লইবার জন্য চন্দ্র সেই কোমল দেহে বিনামার গোঁজা দিতে আরম্ভ করিল। ঠাকুরের দেহের কোমলতার কথা আর কি বলিব! একদা লুচি খাইতে

গিয়া কর্ড়া লুচির ধারে তাঁহার অঙ্গুলী কাটিয়া গিয়াছিল। সে দেহ নবনীত-সুকোমল ছিল বলিলে অত্যুক্তি হয় না। ঠাকুরের গায়ে নানা স্থানে সে আঘাতের দাগ হইয়া গেল; কিন্তু তবুও আঘাতে তাঁহার চৈতন্য উদয় হইল না। শেষে লোকজন আসায় ধরা পড়িবার ভয়ে, চন্দ্র সরিয়া পড়িল, ঠাকুরও ক্রমে ক্রমে প্রকৃতিস্থ হইলেন। তিনি তখন নিজের দেহের অবস্থা দেখিয়া, সমস্ত ব্যাপারই বুঝিতে পারিলেন, কিন্তু চন্দ্রের আচরণ সম্বন্ধে তখন চুপ করিয়া থাকিলেন। পরে সমস্তই মথুর বাবুর কর্ণগোচর হইল। সমস্ত জানিয়া তিনি গর্জ্জন করিয়া বলিতে লাগিলেন, "আঃ, শালাকে তখন কাছে পেতুম—যখন এই অপকর্ম্ম সে করছিল, তা হ'লে তার মুণ্ড নিতুম।" বলা বাহুল্য, চন্দ্রকে তিনি অবিলম্বে পরিত্যাগ করিলেন; অন্য তীর্থ-পাণ্ডা বা তীর্থ-গুরু নিযুক্ত করিলেন; ঠাকুরের সহিষ্ণুতা ও করুণা দেখিয়া মথুর মুগ্ধ হইয়া গেলেন।

নবমী-পূজার দিন ঠাকুরের দেহে বারংবার ভাব-তরঙ্গ খেলিতে লাগিল। জগদম্বা তখন তাঁহাকে নানা অলঙ্কারে ও বেনারসী শাড়ীতে সাজাইয়া আস্তে আস্তে ধরিয়া প্রতিমার নিকট লইয়া আসিলেন। ঠাকুর আসিয়া মা দুর্গাকে চামর-ব্যজন করিতে লাগিলেন। তাঁহার দেহ ও মুখ তখন দিব্য জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। একে স্ত্রীবেশ, তাহাতে তাহা জ্যোতির্ম্ময়, সুতরাং তাঁহার চেহারা এককালে পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। এমন কি, মথুরও তাঁহাকে তখন চিনিতে পারিলেন না। রাত্রিতে স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন—যিনি দেবীর নিকট চামর ব্যজন করিতেছিলেন, তিনি কোন্ মহিলা? মথুরের কথা শুনিয়া জগদম্বা হাস্য করিতে করিতে বলিলেন, "তুমি বাবাকেও দেখে চিনতে পারলে না?" মথুর মনে করিলেন, তা বটে! বাবাকে চেনা এতই সহজ কি না? বাবাকে এখনও চিন্‌তে পারি নাই সত্য, আর কখনও চিন্‌তে পারবো কি না, তাও জানি না।

মথুর বাবাকে পাইয়া অবধি আর তীর্থ-পর্য্যটন সম্বন্ধে তত অবহিত ছিলেন না; কিন্তু জগদম্বার আগ্রহাতিশয্যে শেষে রাজী হইলেন। সমস্ত যোগাড় করিতে মাঘ মাস হইয়া গেল। ১২৭৪ সালে (১৮৬৮ খৃঃ) শুভদিনে সকলে বাহির হইলেন। সঙ্গে লোক, চাকর, বামুন,

শ্রীশ্রীবৈদ্যনাথ-মন্দির—সিংহদ্বার হইতে

পাইক, দরোয়ান প্রভৃতিতে একটি ক্ষুদ্র দল হইয়া গেল। ঠাকুর ও হৃদয়কে লইয়া সপত্নীক মথুর ও জগদম্বা বাহির হইলেন। ঠাকুর বৃদ্ধা মাতার অনুমতি লইলেন এবং তাঁহার অনুপস্থিতিতে মাতার সেবার বন্দোবস্ত করিয়া গেলেন। মা ভবতারিণীর আদেশ লইয়া তবে যাত্রা করিলেন।

এ যাত্রায় প্রথমে সকলে বৈদ্যনাথে আসিলেন। এখানে থাকাকালীন এক দিন কোন এক গ্রামমধ্যে ভ্রমণ করিতে গিয়া, গ্রামবাসীদের অন্নহীন শীর্ণ দেহ, মলিন বদন এবং ছিন্ন বসন দেখিয়া তাহাদের দুঃখে ঠাকুর কাঁদিতে লাগিলেন এবং বলিলেন, "মথুর, এদের দুঃখে আমি বড়ই কাতর হইয়াছি। তুমি ইহাদিগকে পরিতোষ পূর্ব্বক খাওয়াও ও একখানি করিয়া বস্ত্র দান কর।" প্রথমে মথুর ব্যয়াধিক্য আশঙ্কা করিয়া, ঠাকুরের আদেশমত কার্য্য করিতে ইতস্ততঃ করিতেছিলেন; তখন ঠাকুর মথুরকে ভর্ৎসনা করিয়া বলিলেন, "এ সব ধন-দৌলত তোমার নিজস্ব মনে করিয়াছ? এ সব আমার মা'র, তুমি কেসিয়ার মাত্র। খরচ হবে আমার মা'র, তোমার যাবে না কি?" এবং ঠাকুর শেষে যখন বলিলেন যে, মথুর তাঁহার কথামত কার্য্য না করিলে তিনি বৈদ্যনাথ হইতে আর নড়িবেন না, তখন মথুর তাঁহার আজ্ঞা পালন করিতে বাধ্য হইলেন। সমস্ত গ্রামবাসীকে ভূরি ভোজন করান হইল ও মথুর প্রত্যেককে একখানি করিয়া বস্ত্র দান করিলেন।

বৈদ্যনাথ বা দেওঘর হইয়া শিবদর্শনান্তে সকলে পরে কাশীতে আগমন করেন। এখানে কেদারঘাটের নিকট দুইখানি বাড়ী ভাড়া করিয়া মথুর বাবু সদলে বাস করিতে লাগিলেন। মথুর কাশীতে রাজা-রাজড়ার মত চালেই থাকিতেন। যখন বাহির হইতেন, এক দল দরোয়ান, চোপদার আশাসোঁটা হস্তে বাহির হইত ও ভৃত্যরা তাঁহার মাথায় রূপার ছাতা ধরিয়া লইয়া যাইত। ঠাকুর কোমলাঙ্গ, হাঁটিতে পারিতেন না, সেই জন্য তাঁহার জন্য সর্ব্বদা পাল্‌কী থাকিত। তিনি যখন যেখানে ইচ্ছা পাল্কীযোগে গমন করিতেন। গঙ্গায় ভ্রমণ করিবার জন্য

বিশ্বেশ্বরের মন্দির—কাশী
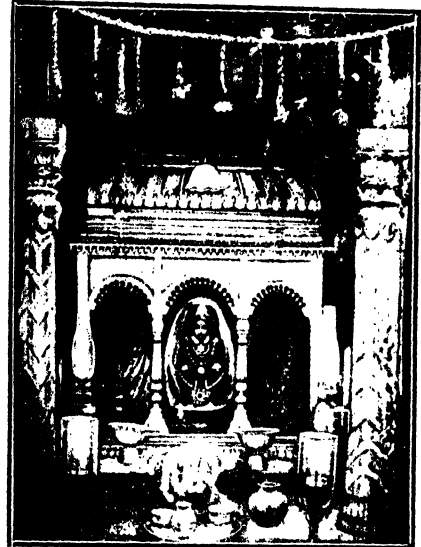
অন্নপূর্ণা-মন্দির—কাশী
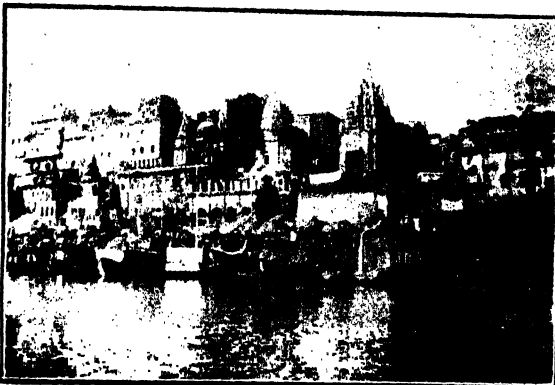
দশাশ্বমেধ ঘাট—কাশী

বজরা ভাড়া করা ছিল। বজরা করিয়া এক দিন মথুর, হৃদয় ও ঠাকুর যখন মণিকর্ণিকার ঘাটের সম্মুখ দিয়া গমন করিতেছিলেন, তখন ঠাকুর শ্রীবিশ্বনাথ-শিবদর্শন করেন। তিনি দেখিলেন, শিবের রজত-গিরিনিভ গম্ভীর মূর্ত্তি ;—যাহাদের মৃত্যু হইয়াছে, তাহাদের নিকটে স্বয়ং গমন করিয়া, তাহাদের দক্ষিণকর্ণে তারকব্রহ্ম নাম দিতেছেন এবং নিজের সাকার রূপ তাহাদিগকে দেখাইয়া পরে অখণ্ডসচ্চিদানন্দে মিলাইয়া যাইতেছেন। তাহারাও

এইরূপে পাশমুক্ত হইয়া দিব্যগতি লাভ করিতেছে। ঠাকুর নৌকায় দাঁড়াইয়া এই দর্শনের সময় সমাধিস্থ হন। শিব প্রথমে ছিলেন দূরে, ক্রমে তাঁহার শরীরেই প্রবেশ করিলেন। কাশীতে আর এক দিন ভাবে দেখিলেন, যেন তিনি সন্ন্যাসীর হাত ধরিয়া এক ঠাকুরবাড়ীতে প্রবেশ করিলেন -- সেখানে তাঁহার সোণার অন্নপূর্ণা-দর্শন হইল।

কাশীতে এক দিন সেজো-বাবু অর্থাৎ মথুর বাবু ঠাকুরকে রাজাবাবুদের বৈঠকখানায় লইয়া গিয়াছিলেন। সেখানে তাহারা কেবলি বিষয় আশয়, টাকাকড়ি, লাভ-লোকসান এই সব কথা বলাবলি করিতে লাগিল। তাহাতে ঠাকুরের বড়ই কষ্ট-বোধ হইতে লাগিল এবং তিনি মাকে ডাকিয়া বালকের মত কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগি-লেন, "মা, তুমি আমায় এ কোথায় আন্‌লে? আমি যে দক্ষিণেশ্বরে বেশ ভালই ছিলাম। এখানে যে কেবল কামিনী-কাঞ্চনের কথা, মা! সেখানে ত' আমাকে এ সব শুনিতে হয় নাই।" ঠাকুরের ঈদৃশ ভাব দর্শন করিয়া অবিলম্বে মথুর তাঁহাকে বাহির করিয়া লইয়া আসিলেন।

ঠাকুর কাশীতে দুর্গাবাড়ীর নিকটে নানকপন্থী সাধুদের মঠ দর্শন করিয়াছিলেন। দেখিলেন যে, মঠের মোহান্তদের ভারী মান। বড় বড় তোমরা-চোমরা খোট্টারা হাত যোড় করিয়া দাঁড়াইয়া মোহান্তের আজ্ঞা প্রতীক্ষা করিতেছে এবং নিজেদের দত্ত উপহার গ্রহণ করিলে আপনাদিগকে কৃতার্থ বোধ করিতেছে। এইখানে এক সাধুকে ঠাকুর দর্শন করেন--বয়স ২৮।২৯। এই সাধুটি ঠাকুরকে বলিতেন, "প্রেমী সাধু"। এক দিন সাধু ঠাকুরকে নিমন্ত্রণ করিলেন। মঠের মোহান্তটিও যেন একটি গিন্নী--এমনি সকল বিষয়ে তাঁহার লক্ষ্য ও নিপুণতা। এই সাধু ঠাকুরকে বলিয়াছিলেন যে, 'কলিতে উপায় নারদীয় ভক্তি।'
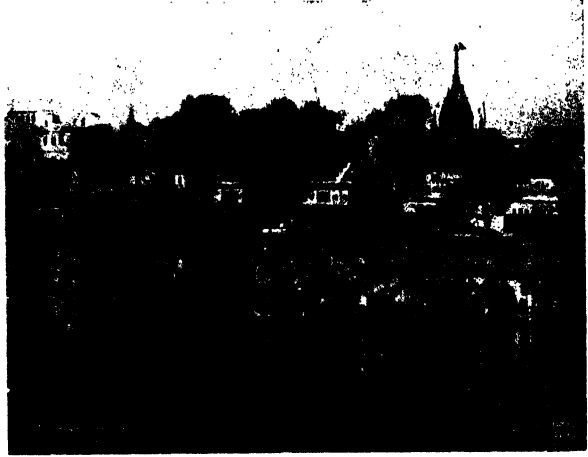
মণিকর্ণিকা-ঘাট

সিন্ধিয়া-ঘাট—কাশী

গীতা পাঠ করার সময় সাধু সেজো বাবুর দিকে পশ্চাৎ ফিরিয়াছিলেন, কিন্তু ঠাকুরের দিকে চাহিয়াছিলেন--বিষয়ীর মুখ দেখবার ইচ্ছা নাই, সেই জন্য এইরূপ আচরণ। ঠাকুর বলিয়াছিলেন, ইনি মুলতানী সাধু ছিলেন।

মথুর বাবু এই যাত্রায় ঠাকুরকে এক দল বেদান্তী তার্কিক পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে লইয়া গিয়াছিলেন। সেখানে তাঁহারা ঠাকুরের কথা শুনিয়া—ভাব-সমাধির অবস্থা দেখিয়া অতিশয় চমৎকৃত হইলেন। তখন তাঁহাদের দলপতি বলিলেন যে, তাঁহারা যে এত কষ্ট করিয়া শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছেন, তাহা বৃথাই হইয়াছে, বৃথা পরিশ্রম করিয়া শাস্ত্র ঘাঁটিয়াই জীবনটা খরচ করিয়াছেন, কিন্তু যে উদ্দেশ্যে শাস্ত্রপাঠ, সে আনন্দবস্তু ঠাকুরই লাভ করিয়াছেন। ভগবানের কৃপা পাইলে মূর্খও বিদ্বান্ হয়, বোবারও বোল ফোটে। এই বাক্য যে অতি সত্য, ইহাও তাঁহারা উপলব্ধি করিলেন। শুধু বই-পড়া বিদ্যার সাহায্যে সাধন-ভজন বিনা কখনো আনন্দলাভ হয় না, ইহাও তাঁহারা বুঝিলেন।

পঞ্চগঙ্গা-ঘাট—কাশী

কাশীতে গঙ্গার ধারে তান্ত্রিকদের এক ভৈরবীচক্রে ঠাকুর একবার গমন করিয়াছিলেন। এক জন ভৈরবের পাশে এক জন করিয়া ভৈরবী উপবিষ্টা। প্রথমে কারণ করা হইল। ঠাকুরকেও 'কারণ' করিতে বলায়, তিনি বলিলেন যে, তিনি 'কারণ' ছুঁইতে পারেন না। অনেকক্ষণ 'কারণ' করিবার পর ভৈরব-ভৈরবীগণ ধ্যান-জপ না করিয়া নাচিতে আরম্ভ করিলেন। ঠাকুর তাহা দেখিয়া ভয় পাইলেন, পাছে ভৈরব-ভৈরবীগণ নেশার ঝোঁকে গঙ্গায় পড়িয়া পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হন। ভৈরবীচক্রে সাধন-ভজন ঐ স্থানেই শেষ হইল। এই জন্য পরে ঠাকুর বলিতেন যে, তান্ত্রিকদের বীর-ভাবের সাধন প্রায়ই সাধককে উত্তম মার্গে লইয়া যাইতে পারে না, তাহা অবশেষে নারী-সংসর্গে প্রায়ই ব্যভিচারে স্বৈরাচারে- পর্য্যবসিত হয়।

ললিতা-ঘাট

কাশীতে ঠাকুর মৌনাবলম্বী ত্রৈলঙ্গ স্বামীকে দর্শন করেন। তাঁহাকে দেখিয়া ও তাঁহার সঙ্গে আলাপ করিয়া সুখী হইয়া ঠাকুর বলিয়াছিলেন যে, ইনিই জ্ঞান-ঘনমূর্ত্তি, যোগিরাজ, কাশীরাজ মহেশ্বরের রাজ্যে জ্ঞানী পরমহংস-রূপে কাশীর মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াছেন। মথুর বাবুকে দিয়া ঠাকুর স্বামীজীকে নিমন্ত্রণ করান এবং নিজ হস্তে তাঁহাকে উত্তম পরমান্ন খাওয়াইয়াছিলেন।

কাশীতে মথুর বাবু বহুল পরিমাণে দানব্রত আচরণ

শ্রীশ্রীমৎ ত্রৈলঙ্গ স্বামী
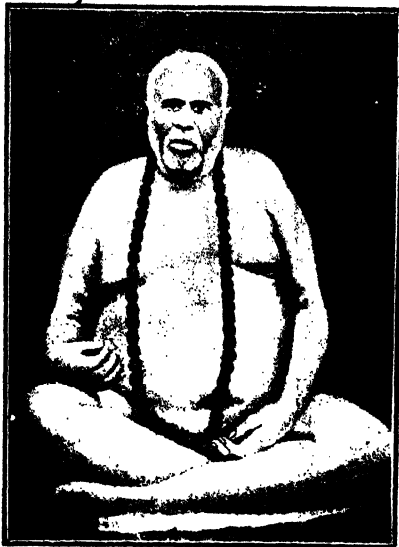
করিয়াছিলেন। সাধুদিগকে কমণ্ডলু-কম্বল দান, দুঃখীদিগকে বস্ত্র ও আহার্য্য দান, বিদ্যার্থীকে পুস্তক দান প্রভৃতি নানাপ্রকার দান ও অন্যবিধ সৎকার্য্য কাশীতে সম্পাদন করিয়াছিলেন।

শুনা যায়, ঠাকুর কাশীতে চৌষট্টি যোগিনীতে এক বৃদ্ধার সেবায় নিযুক্তা অবস্থায় ভৈরবী ব্রাহ্মণীকে দর্শন করেন এবং তাঁহাকে কাশীতেই জীবনের শেষাংশ কাটাইতে উপদেশ দেন। কেহ কেহ বলেন, বৃন্দাবন দর্শনে যাইবার সময় ঠাকুর ব্রাহ্মণীকে সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলেন এবং ফিরিবার কালে তাঁহাকে আবার কাশীতে রাখিয়া আসিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণীর শেষে কাশীপ্রাপ্তি হইয়াছিল, এইরূপ শুনিতে পাওয়া যায়।

কাশী হইতে মথুর বাবু সদলে প্রয়াগ গমন করেন এবং সেখান হইতে প্রয়াগকৃত্যাদি করিয়া ও ত্রিরাত্র যাপন করিয়া, আবার কাশীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। কাশী হইতে সকলে অতঃপর বৃন্দাবন দর্শনে গমন করিলেন। বৃন্দাবন যাইতে হইলে মথুরার মধ্য দিয়া যাইতে হয়। ধ্রুবঘাটে যখন তাঁহারা আসিলেন, তখন ঠাকুরের ভাব উদয় হইল। ভাবে দেখিলেন যে, বসুদেব শিশু কৃষ্ণ কোলে করিয়া যমুনা পার হইতেছেন। সেই ভাবরসে নিমজ্জিত অবস্থাতেই ঠাকুর পাল্কী-যোগে বৃন্দাবনে প্রবেশ করিলেন। এখানে নিধুবনের নিকটে মথুর বাবু বাসা লইলেন। ঠাকুর আনন্দে

শ্রীগোবিন্দজীউর পুরাতন-মন্দির—বৃন্দাবন
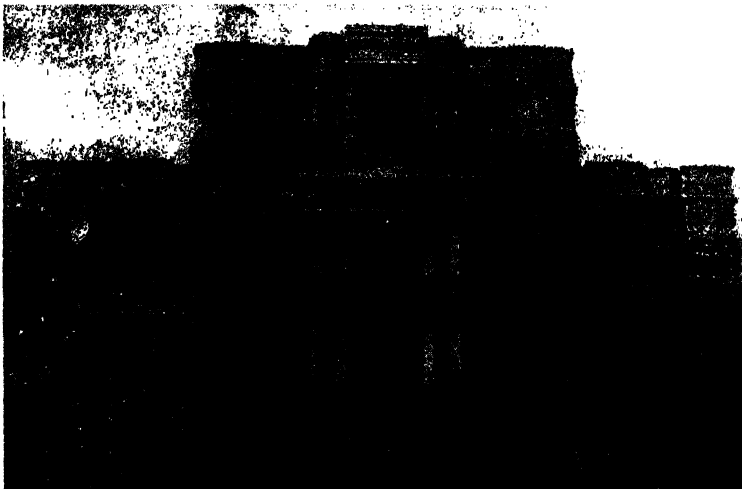
মন্দিরে মন্দিরে ঠাকুর দেখিতে লাগিলেন। গোবিন্দজীকে দেখিয়া তাঁহার তত ভাব হইল না; কিন্তু বঙ্কুবিহারীকে দেখিয়া তাঁহার এমন ভাবাবেশ হইল যে, ভাবে মূর্ত্তিকে আলিঙ্গন করিতে গিয়াছিলেন। এক দিন সন্ধ্যার সময় যখন যমুনাপুলিনে বেড়াইতে যান, তখন দেখিলেন যে, গোধূলির সময় রাখালরা গাভী লইয়া গোষ্ঠ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছে এবং গাভীরা হাঁটিয়া যমুনা পার হইতেছে। যেমন এই দৃশ্য দেখা, অমনি ঠাকুর ভাবাবেশে—"কোথা কৃষ্ণ" "কৈ কৃষ্ণ" বলিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। বলিলেন—"কৃষ্ণ রে, সেই সব রয়েছে, কিন্তু তোমাকে কেন দেখতে পাচ্ছি না?" কাঁদিতে কাঁদিতে ঠাকুর বেহুঁস হইয়া গেলেন।

শ্যামকুণ্ড রাধাকুণ্ড দেখিবার জন্য মথুর ঠাকুরের জন্য পাল্কীর ব্যবস্থা করিয়া দিলেন এবং হৃদয়কে দিলেন তাঁহার সঙ্গে রক্ষকরূপে। পথ অনেকটা, পাল্কীতে তাই খাবার দেওয়া হইল—লুচি, জিলেপী প্রভৃতি। মাঠ পার হইবার সময় ঠাকুর কাঁদিতে লাগিলেন এই বলিতে বলিতে—"কৃষ্ণ রে! তুমি নাই, কিন্তু সেই সব মাঠ রয়েছে—যে মাঠে তুমি ধেনু চরাতে।" শ্যামকুণ্ড ও রাধাকুণ্ডে গমন করিয়া ঠাকুর দেখিলেন, সাধুদের ঝুপড়ি বা ছোট ছোট পর্ণকুটীর। সেখানে সাধুরা পশ্চাৎ ফিরিয়া বসিয়া সাধন-ভজন করিতেছেন। বাহিরের লোক দেখিবেন না—তাহাতে ভাব নষ্ট হইয়া যায়—এই কারণে পিছন ফিরিয়া আছেন।

গিরি গোবর্দ্ধন দেখিয়া ভাবে ঠাকুর হুঙ্কার দিয়া একেবারে গিরির উপরে গিয়া চড়িয়াছিলেন এবং বাহ্যজ্ঞান শূন্য হইয়াছিলেন। ব্রজবাসীরা পরে গিরি'পরে গমন করিয়া তাঁহাকে ধীরে ধীরে নামাইয়া আনিলেন। বৃন্দাবনে ঠাকুর রাখাল-কৃষ্ণকে স্বপ্নে দেখিয়াছিলেন। মথুর এবং হৃদয়ও স্বপ্নে শ্রীকৃষ্ণ দর্শন করিয়াছিলেন।

শ্রীরাধামদনমোহনজীউর মন্দির—বৃন্দাবন

নিধুবনে গঙ্গামায়ী নামে এক বৃদ্ধা ভক্ত ব্রজবাসিনী ছিলেন। ইনি ঠাকুরকে দেখিয়াই আনন্দে উন্মত্তপ্রায় হইয়া,—'দুলালী' 'দুলালী' বলিয়া ঠাকুরকে হাত ধরিয়া নিজের বাসায় লইয়া গেলেন। দুলালী অর্থে রাধা। ঠাকুরের ভাব দেখিয়া গঙ্গামায়ীর মনে হইয়াছিল যে, শ্রীরাধা এই মূর্ত্তিতে আবার অবতীর্ণা হইয়াছেন। ঠাকুরেরও গঙ্গামায়ীকে এত ভাল লাগিল যে, তিনি তাঁহাকে দর্শনাবধি নাওয়া-খাওয়া বা বাসায় যাওয়া ভুলিয়া যাইতেন। এমন প্রায় ঘটিত যে, ঠাকুরের খাবার হৃদয় আনিয়া গঙ্গামায়ীর কুঞ্জে ঠাকুরকে খাওয়াইয়া আবার ফিরিয়া যাইতেন।
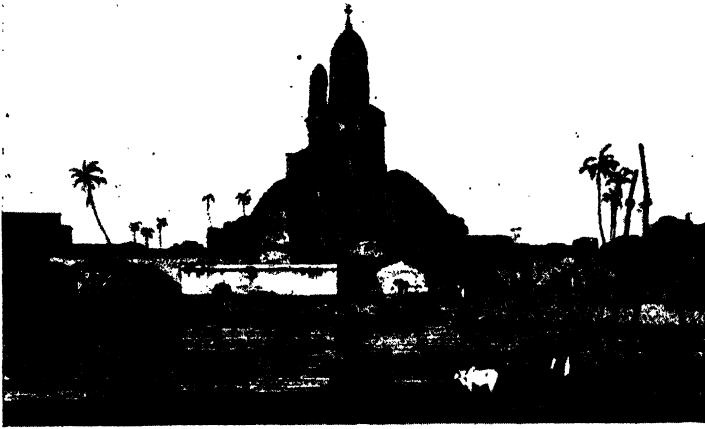
মদনমোহনের মন্দির—বৃন্দাবন

শ্যামকুণ্ড

গঙ্গামায়ীও কখনো কখনো নিজে খাবার তৈয়ার করিয়া ঠাকুরকে খাওয়াইতেন। গঙ্গামায়ীকে পরিত্যাগ করিয়া আর ঠাকুরের ফিরিতে ইচ্ছা ছিল না। তিনি ভাবিলেন যে, কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়া আর শূদ্রের অন্ন তিনি খাইবেন না, গঙ্গামায়ীর কাছেই থাকিবেন। হৃদয় ঠাকুরের ভাব দেখিয়া বলিলেন,—"মামা, তুমি এখানে থাকবে বলছো, কিন্তু তোমার পেটের অসুখ লেগেই রয়েছে। অসুখ হ'লে দেখবে কে ?" গঙ্গামায়ী বলিলেন, তিনি অসুখ করিলে

রাধাকুণ্ড
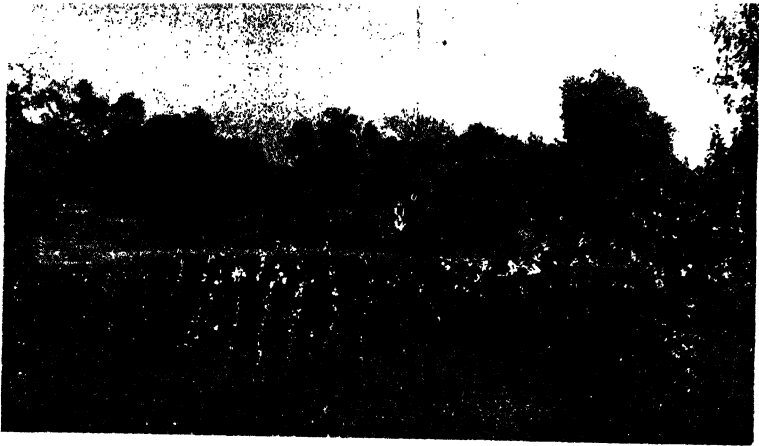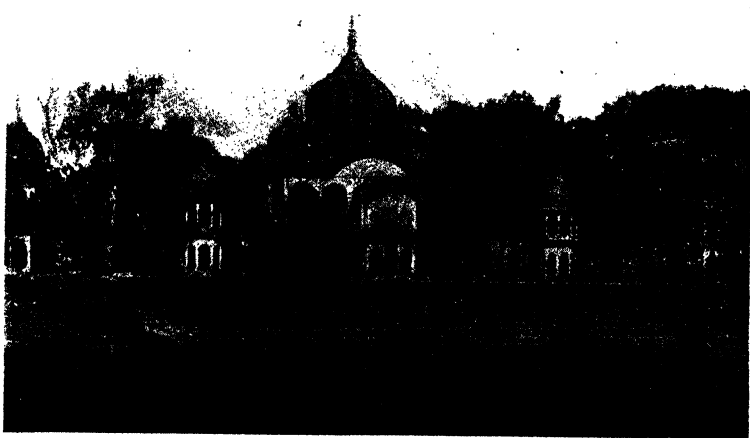
কুসুম-সরোবর—গোবর্দ্ধন

ঠাকুরের সেবা করিবেন। মথুর দেখিলেন বড়ই বিপদ। তীর্থ করিতে আসিয়া শেষে কি বাবাকে হারাইয়া মণিহারা ফণীর ন্যায় শূন্যপ্রাণে কলিকাতায় ফিরিয়া যাইবেন? মা ভবতারিণি, আমায় এ কি বিপদে ফেলিলেন? মথুর বাবু এইরূপ ভাবিতে লাগিলেন। হৃদয়ও ছাড়িবে না, গঙ্গামায়ীও ছাড়িবেন না—ঠাকুরকে লইয়া শেষে এমনই টানাটানি চলিতে লাগিল। এমন সময় ঠাকুরের স্মরণ হইল তাঁহার বৃদ্ধা মাতাকে—তাঁহাকে তিনি একাকী দক্ষিণেশ্বরে রাখিয়া

মানসী গঙ্গা—গোবৰ্দ্ধন
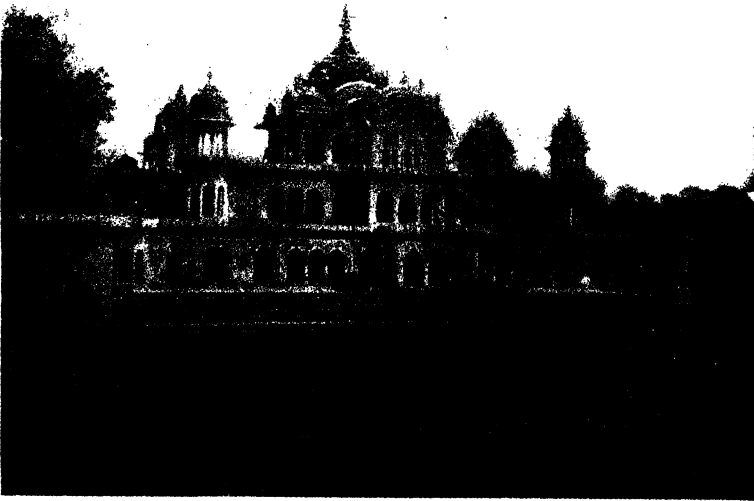
ছত্রী বলবন্ত সিং—গোবৰ্দ্ধন

আসিয়াছেন। মার চিন্তা থাকিলে ঈশ্বরচিন্তা হইবে না। অতএব ঠাকুরের আর বৃন্দাবনে থাকা চলিল না। মথুরকে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতে বলিলেন। মথুরের শূন্যদেহে প্রাণ আসিল। পরমানন্দে প্রত্যাবর্ত্তনের সমস্ত আয়োজন করা হইয়া গেল এবং সদলে তাঁহারা আবার কাশীতে ফিরিয়া আসিলেন। বৃন্দাবনে ঠাকুর বৈষ্ণবের ভেক ধারণ করিয়াছিলেন এবং তিন দিন সেই ভেক রাখিয়াছিলেন। বৃন্দাবনে ঠাকুর পনর দিন ছিলেন।

ব্রহ্মচারি-মন্দির—বৃন্দাবন
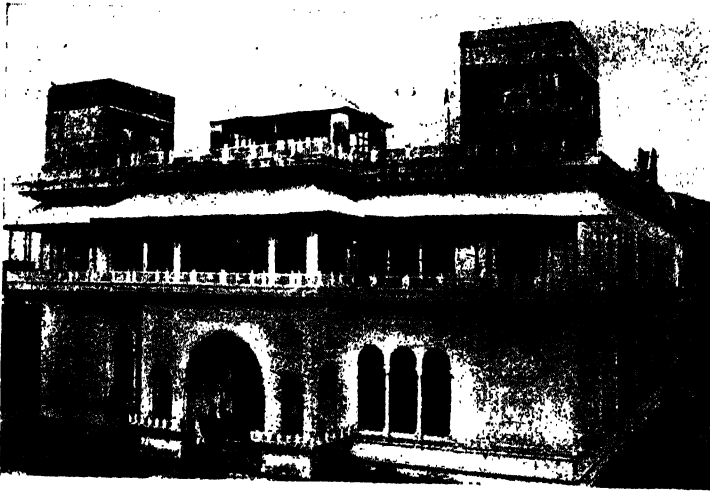
লালা বাবুর মন্দির—বৃন্দাবন

কাশীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া, ঠাকুরের হঠাৎ বীণ শুনিতে ইচ্ছা হইয়াছিল। মায়ের ইচ্ছায় সেই সময় কাশীর মদনপুরা পল্লীতে—মহেশচন্দ্র সরকার নামে এক প্রসিদ্ধ বীণ-বাদক ছিলেন। এক দিন ঠাকুর তাঁহার বীণ শুনিতে গেলেন এবং বীণ শুনিয়া পরম সন্তুষ্ট হইলেন। শুনিতে শুনিতে তাঁহার ভাবোদ্রেক হইবার উপক্রম হইলে, তিনি

শেঠজীর মন্দির—সোণার তালগাছ সম্বলিত

চীরঘাট—বৃন্দাবন

মাকে বলিলেন, "মা, আমাকে অজ্ঞান ক'রো না, আমি বীণ শুন্‌বো, মা।" অনেকক্ষণ বীণ শুনিয়া তৎপরে ঠাকুর ও মথুর বাসায় ফিরিলেন।

আরও কিছুদিন কাশীতে থাকার পর তাঁহারা কলিকাতা অভিমুখে যাত্রা করিলেন। পথে গয়ায় নামিতে ও গয়া-কৃত্য করিতে মথুর বাবুর ইচ্ছা ছিল। কিন্তু ঠাকুর জানিতেন

কেশীঘাট যমুনা—বৃন্দাবন

যে, তাঁহার শরীর গয়া হইতে আসিয়াছে—আবার গয়ায় গমন করিলে বোধ হয় ভাব-সমাধির আধিক্যে দেহ চলিয়া যাইবে—তিনি আর ফিরিতে পারিবেন না। তাঁহার কায এখন সমস্ত বাকী, এখন শরীর গেলে চলিবে না। তাই ঠাকুর গয়ায় যাইতে অস্বীকার করায় মথুর বাবুরও আর সে-যাত্রায় গয়ায় যাওয়া হইল না। সকলে বরাবর কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন।

যে কারণে ঠাকুর গয়ায় গমন করেন নাই, ঠিক সেই কারণে ঠাকুর পুরীতে শ্রীজগন্নাথ দর্শন করিতে গমন করেন নাই। নীলাচল বিশেষ করিয়া শ্রীচৈতন্যের লীলাক্ষেত্র। এখানকার বহু স্থান ও বস্তু শ্রীচৈতন্যের উদ্দীপন করিয়া থাকে। ঠাকুর নিজেই শ্রীচৈতন্য ছিলেন, সেই কারণে সেই সব উদ্দীপনের জন্য ভাবের আধিক্যে তাঁহার দেহত্যাগের অতিশয় সম্ভাবনা। এই সব ভাবিয়া তাঁহার আর পুরী-দর্শন হইল না।

কলিকাতায় আগমনের পর মথুর বাবু এক বৃহৎ ভাণ্ডারা দিলেন, তাহাতে বহু সাধু, ভক্ত, বৈষ্ণব সকলকে সদক্ষিণ ভূরি-ভোজন দেওয়া হইল। শুনা গিয়াছে, এই তীর্থভ্রমণ উপলক্ষে মথুর বাবুর অর্দ্ধ-লক্ষের উপর টাকা খরচ হইয়াছিল।

ঠাকুর বৃন্দাবন হইতে একটি মাধবীলতার চারা সযত্নে আনয়ন করেন এবং সেইটিকে পঞ্চবটীতে রোপণ করিয়াছিলেন। সেইটি বটগাছে উঠিয়া এখন অতি বৃহৎ আকার ধারণ করিয়াছে। ভক্তরা সেইটিকে অতি পবিত্র মনে করেন এবং এখনও মাধবীকে দর্শন স্পর্শন করিয়া থাকেন। ঠাকুর বৃন্দাবন হইতে সযত্নে ব্রজের রজঃ আনিয়াছিলেন। সেই ধূলি তিনি পঞ্চবটীতে ছড়াইয়া দিয়াছিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে ইহাও বলিয়াছিলেন- "এ স্থান এখন থেকে বৃন্দাবনের ন্যায় পবিত্র হ'লো।" ঠাকুরের হাতে গড়া এই নব-বৃন্দাবন এখনও ভক্তজনের সাধন-ভজন-ক্ষেত্ররূপে দক্ষিণেশ্বরে বিরাজিত—শত শত ভক্ত সে স্থানে গিয়া দর্শন করিয়া তাপিত প্রাণ শীতল করিতেছেন।

ঠাকুর দুইবার তীর্থদর্শন করিয়া, তীর্থদর্শন যে সাধক-জীবনের তপস্যার একটি অঙ্গ, তাহা দেখাইয়া দিলেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও বলিয়াছিলেন যে, অনুরাগবিহীনমনে তীর্থে গমন করিলে স্থায়ী ফল লাভ করা যায় না। তিনি রহস্য করিয়া বলিতেন, "তীর্থে দেখলাম সেই আমগাছ, সেই তেঁতুল-পাতা—তবে তফাৎ এই যে, সেখানকার পশ্চিমাদের বাহ্যেগুলি ভুসীর মত!" অর্থাৎ যে মনে ঈশ্বরে অনুরাগ বা কোন মূর্ত্তিবিশেষে ভক্তি নিষ্ঠা জন্মে নাই, সে

মনে তীর্থ বিশেষ ছাপ দিতে পারে না। স্থানমাহাত্ম্যে বা নূতন আবহাওয়া ও পারিপার্শ্বিকের ফলে ক্ষণিক ভাবান্তর ঘটে মাত্র। তাহার পর আবার সেই মন পুনরায় স্ব স্বভাব প্রাপ্ত হয়। কলিতে গঙ্গা-ব্রহ্মবারি মহাতীর্থ—গঙ্গাস্নানে সর্ব্ববিধ পাতক নাশ হয়। অথচ নিত্য গঙ্গাস্নান করে, এমন ব্যক্তিও নানা অসৎকর্ম্ম করে কেমন করিয়া? ঠাকুর বলিতেন, ইহার কারণ এই যে, মানুষটা যখন গঙ্গাস্নানে যায়, তখন সমস্ত পাতকগুলি তাহাকে ত্যাগ করিয়া তীরবর্ত্তী বট-অশ্বত্থ গাছের মাথায় উঠিয়া বসিয়া থাকে। স্নানে পাপ ধৌত হইয়া মানুষটি যখন প্রত্যাবর্ত্তন করে, তখন ঐ পুরাতন পাপগুলি আবার তাহার ঘাড়ে লাফাইয়া পড়ে; ফলে মানুষটি যাহা ছিল, তাহাই থাকিয়া যায়। অনুরাগ, ভক্তি, বিশ্বাস ব্যতীত আচরিত কোন ধর্ম্ম-কার্য্যেরই স্থায়ী সুফল হয় না—এই কথা ঠাকুর তাই বারংবার বলিতেন; এবং 'প্রভু বিনে অনুরাগ, করে যজ্ঞ-যাগ, তোমাকে কি যায় জানা?' এই ব্রহ্মসঙ্গীতও ভক্তদিগকে স্মরণ করাইতেন।

[ক্রমশঃ।

শ্রীদুর্গাপদ মিত্র।

শ্রীরামকৃষ্ণ-গীতি

শতেক বরষ পরে, কে পুনঃ আইল ওরে
কার বাঁশী বাজে আজ ভুবন ভ'রে?
গগনে পবনে শুনি, কার ঐ জয়ধ্বনি,
চমকি জাগে ধরণী হরষভরে!
দিকে দিকে মহোৎসব—"জয় রাম-কৃষ্ণ" রব,
আনন্দে বিহ্বল সব, নারী ও নরে!
নামামৃত-সুধাপানে, মৃতেরে জাগায় প্রাণে,
আলোক বিতরি দুঃখ-তামসী হরে।
মনে জাগে সেই দিন, এ কি সেই দীন-হীন,
কাঁদিলা যে নিশিদিন সবার তরে।
সর্ব্বত্যাগী দিগম্বর—ফিরে নিত্য ঘর ঘর
নাহি বাছে আত্মপর—প্রেমের ভরে—
জীবের পাপের ভার করি নিজ কণ্ঠহার
জগতের জীবগণে সুধা বিতরে।
সেই দীন হতে দীনতম, দীনের ঠাকুর মম,
আজি কিবা অনুপম রূপ সে ধরে!
রাজ-রাজেশ্বর-বেশে—দাঁড়ায় সম্মুখে এসে
তবু এই রূপাবেশে মন না সরে—
মনে পড়ে সেই মুখ—কেন রে বিদরে বুক—
ভুলি সব দুঃখ-সুখ নয়ন ঝরে!

শ্রীমণীন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত।

জীব-জন্তুর পরিচ্ছন্নতা

পশুপক্ষীরা যে সর্ব্বদা খুব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকে, তাহা আমি "পশুদিগের চিকিৎসা-জ্ঞান" শীর্ষক প্রবন্ধে কিঞ্চিৎ আভাস দিয়াছি। বনে-জঙ্গলে ধূলি-কর্দ্দমের মধ্যে বাস করিলেও কোনও জীব-জন্তুর দেহ কখনও অপরিষ্কার দেখা যায় না। পশুপক্ষী-দিগের দেহ অপরিচ্ছন্ন দেখিলেই তাহাদের অসুস্থতা বুঝিতে হইবে। এরূপ ক্ষেত্রে সুস্থ হইবার জন্য উহারা কিরূপ আচরণ করে, তাহা আমি পূর্ব্বোল্লিখিত প্রবন্ধে কতকটা আলোচনা করিয়াছি। পশুরা গাত্ররোম এবং পক্ষীরা পতত্রকে মসৃণ ও পরিচ্ছন্ন রাখিবার জন্য কি উপায় অবলম্বন করে, বর্ত্তমান প্রবন্ধে তাহাই বিবৃত করিব।

দেহকে পরিষ্কৃত রাখিবার জন্য পশু-পক্ষীরা নিয়মিতরূপে স্নান, গাত্ররোমাদি মার্জ্জন ও অঙ্গ-লেহনাদি করিয়া থাকে। আমাদের পরিচিত কাকরা প্রত্যহ যথানিয়মে নদী ও পুষ্করিণীর জলে স্নান করে। এই স্নান উহারা মধ্যাহ্ন ও অপরাহ্নেই সমাপন করে। ইডেন-গার্ডেনে ভ্রমণ করিবার সময় ঝিলের জলে আমি বহুদিন কাকের বৈকালিক স্নান লক্ষ্য করিয়া আনন্দ লাভ করিয়াছি। জলাশয় না পাইলে ইহারা গৃহস্থের বাটীতে প্রবেশ করিয়া এবং টবের জলে মাথা ডুবাইয়া স্নানের কার্য্য সারিয়া লয়। দেহের পালখকে পরিচ্ছন্ন রাখিবার উদ্দেশে ইহারা প্রাতঃকাল, মধ্যাহ্ন ও অপরাহ্নের যে কোনও সময়ে স্নান করিয়া থাকে।

চটকরা অঙ্গে ধূলি মাখিয়া স্নানের কার্য্য সমাপন করে। শালিক ও কুক্কুটরাও এই রীতিতে স্নান করে। ধূলির মধ্যে পালখগুলিকে মার্জ্জনা করিয়া ইহারা দেহের পোকা ও বীজাণুকে বিদূরিত করিয়া থাকে। তিত্তির পাখীরাও ধূলিস্নান করিতে বিশেষ আনন্দ পায়। অশ্বরা ময়দানের ঘাস ও ধূলির উপর গড়াগড়ি দিয়া অঙ্গ মার্জ্জনা করিয়া থাকে। কুকুররাও মাঝে মাঝে ভূমির উপর লুটাইয়া দেহরোমকে মার্জ্জিত করিয়া লয়। এই ধূলিস্নানে ইহাদের দেহ মলিন না হইয়া বরং পূর্ব্বাপেক্ষা চাকচিক্য লাভ করে এবং দেহস্থিত বীজাণু ও কীটাদি বিদূরিত হইয়া থাকে।

হংস প্রভৃতি জলচর পক্ষীরা যে কতবার স্নান করে, তাহা সকলেই অবগত আছেন। প্রতিবার স্নানের পর হংসরা বিশেষ যত্নের সহিত দেহের সমস্ত পালখে তৈল মাখাইয়া থাকে। ইহাদের পুচ্ছের নিকট একটি তৈলগ্রন্থি বা oil gland আছে। এই গ্রন্থির উপর চঞ্চু দ্বারা চাপ দিয়াই ইহারা তৈল বাহির করে এবং সেই তৈল চঞ্চু দ্বারা যথাক্রমে সমস্ত পালখে মাখাইয়া পতত্রকে মসৃণ করিয়া রাখে। বন্য হংসরা লোণা জলের মধ্যে আহার অন্বেষণ করিলেও জলাশয় ও ক্ষুদ্র নদী প্রভৃতির স্বচ্ছ সলিলে স্নান করিতে ভালবাসে। এই নির্ম্মল স্বাদু জলের সন্ধানে ইহারা বহুদূর পর্য্যন্ত উড়িয়া যায় এবং এই জলে বহুক্ষণ ধরিয়া স্নান করিবার পর অঙ্গের প্রত্যেক পালখটিকে মুছিয়া ও তৈলাক্ত করিয়া সুবিন্যস্ত করিয়া রাখে। বৃষ্টির বা ঝর্ণার জল পাইলে ইহাদের আনন্দের সীমা থাকে না। এই জলেই ইহারা স্নান করিতে বিশেষ ভালবাসে। বৃষ্টি পড়িতে আরম্ভ করিলেই ইহারা পক্ষ বিস্তার করিয়া সমস্ত পালখকে ধৌত করিয়া ফেলে। পরে জল হইতে উঠিয়া পূর্ব্বোক্ত পদ্ধতিতে পতত্রপ্রসাধন সম্পন্ন করিয়া থাকে।

গৃহপালিত শুক, পারাবত প্রভৃতিরা বহু সময় পতত্র-মার্জ্জনায় কাটাইয়া দেয়। শুক প্রভৃতি পক্ষীরা পতত্র-প্রসাধনে নখকে চিরুণীর মত ব্যবহার করে। আহারের পর শুকরা এক একটি করিয়া দেহের প্রত্যেক পালখের উপর নখর চালনা করিয়া পালখকে সুবিন্যস্ত করে এবং চঞ্চু দ্বারা মলিন ও নিষ্প্রভ পালখকে তুলিয়া ফেলিয়া দেয়। কাকাতুয়ারাও দেহ-মার্জ্জনায় শুকের রীতি অবলম্বন করে। গৃহপালিত কাকাতুয়াকে বহু সময় এই কার্য্যে অনন্যমনে ব্যাপৃত থাকিতে দেখা যায়। কপোতরাও দিনের মধ্যে বহুবার চঞ্চু দ্বারা "খুঁটিয়া খুঁটিয়া" পালখকে সুবিন্যস্ত করিয়া রাখে।

মহিষরা পুকুরের জলে দীর্ঘকাল স্নান করিয়া দেহকে পরিচ্ছন্ন রাখে। জলে নামিতে না পাইলে ইহারা অস্থির হইয়া পড়ে। হস্তীর পক্ষে স্নান অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। স্নান করিতে না পাইলে হস্তী বাঁচে না। গাভীরা গাত্র-লেহন করিয়া রোমকে পরিষ্কৃত রাখে। গাভী যে কিরূপ যত্নের সহিত বৎসের গাত্র লেহন করে, তাহা আর বলিতে হইবে না। এই প্রকার লেহনে গাভী যে শুধু প্রবল অপত্য-স্নেহের পরিচয় দেয়, তাহা নহে, শাবকের দেহলগ্ন নানাপ্রকার কীটাদি ও বীজাণু গাভীর কর্কশ জিহ্বার প্রবল ঘর্ষণে বিদূরিত হইয়া থাকে। সদ্যঃপ্রসূত শাবকের অঙ্গক্লেদ গাভী ও মহিষরা লেহন দ্বারা পরিষ্কৃত করিয়া থাকে।

বিড়ালরাও দেহকে পরিচ্ছন্ন রাখিতে এই রীতি অবলম্বন করে। জিহ্বার দ্বারা ক্রমাগত দেহরোমকে মার্জ্জনা করে বলিয়া বিড়ালের একটি নাম হইয়াছে মার্জ্জার। দিনের মধ্যে বহুবার বিড়ালকে অঙ্গলেহন করিতে দেখা যায়। ব্যাঘ্ররাও এই উপায়ে দেহরোমকে পরিষ্কৃত রাখে। আহারের পর ব্যাঘ্র কিরূপ ভাবে পদতল ক্রমাগত লেহন করিয়া মুখমণ্ডল পরিষ্কৃত করে, তাহা বোধ হয় অনেকেই পশুশালায় লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন। ব্যাঘ্র ও বিড়ালরা মধ্যে মধ্যে বৃক্ষের ত্বকে নখর ঘর্ষণ করিয়া নখরকে তীক্ষ্ণ ও পরিষ্কৃত করে। শিকারকালে নখরের কোনও অংশ ছিন্ন হইয়া লাগিয়া থাকিলে বা নিহত পশুর রক্ত-মাংস নখরে সংলগ্ন হইয়া থাকিলে নখরের ছিন্ন অংশ ও রক্তমাংসকে চরণ হইতে বিদূরিত করিবার উদ্দেশ্যেই ব্যাঘ্র ও বিড়ালরা বৃক্ষগাত্রে নখর ঘর্ষণ করে। বনের মধ্যে এক একটি বৃক্ষগাত্রে ব্যাঘ্রের নখরের বহু দাগ থাকিতে দেখা যায়। নখ "শাণ" দিবার জন্য

ব্যাঘ্রেরা এক একটি বিশেষ বিশেষ বৃক্ষ বাছিয়া লয় এবং নখর শাণিত করিবার উদ্দেশে প্রতি রাত্রিতেই সেই সেই বৃক্ষের তলে আসিয়া উপস্থিত হয়। পশ্চাতের পদদ্বয়ের উপর দণ্ডায়মান হইয়া ব্যাঘ্রেরা সম্মুখ-চরণের নখর "ধার" দিয়া থাকে। এই কারণে এই সকল গাছের ত্বকে খুব লম্বা লম্বা দাগ দেখিতে পাওয়া যায়।

বিড়াল ও ব্যাঘ্রের মত সিংহরাও সম্মুখ চরণের "প্যাডটি" লালায় সিক্ত করিয়া এবং তাহা মুখমণ্ডল ও কর্ণের পশ্চাদ্ভাগে বারংবার চালনা করিয়া ঐ সকল স্থানের রোমাদি পরিচ্ছন্ন করিয়া থাকে। আহারের পরই ইহারা এই কর্ম্মে ব্যাপৃত হয় এবং বহুক্ষণ ধরিয়া অঙ্গমার্জ্জনা করিয়া থাকে। গাত্রের অপরাংশের রোমাদি ক্রমাগত লেহন করিয়া ইহারা ক্লেদ বিদূরিত করে।

শিকারের পর শিকারী কুকুররা জিহ্বার দ্বারা ক্রমাগত লেহন করিয়া গাত্রের ধূলি-কর্দ্দমাদি দূর করে। ঝোপ বা খড়ের "গাদা" নিকটে পাইলে তাহার উপর পৃষ্ঠ ঘর্ষণ করিয়া ইহারা রোম হইতে কর্দ্দমাদি ছাড়াইয়া লয়। পরে জিহ্বার সাহায্যে উহাকে মসৃণ ও পরিচ্ছন্ন করিয়া থাকে।

বিলাতের শ্রু (shrew) এবং এ দেশের ছুছুন্দরীরা ভূমির অভ্যন্তরে বাস করিলেও ইহাদের দেহকে কখনও ধূলি-মলিন দেখা যায় না। আহারাদির পর ইহারা বহুক্ষণ ধরিয়া অঙ্গাদির প্রসাধনে ব্যাপৃত থাকে। কোনও দিন এই কার্য্যের বিরাম ঘটে না। এই সময়ে ইহাদিগকে রোমাবলীর উপর জিহ্বা চালনা করিয়া প্রতি রোম হইতে ধূলিকণা-সকল সযত্নে বিদূরিত করিতে দেখা যায়। দেহের রোমসকল এইরূপে পরিষ্কৃত হইলে ইহারা সম্মুখ ও পশ্চাতের চরণগুলির প্রত্যেক অঙ্গুলী বিস্তৃত করিয়া সেগুলিকে ক্লেদমুক্ত করে এবং শেষে ক্ষুদ্র পুচ্ছকে পরিষ্কৃত করিয়া উহার রোমাবলীকে সুবিন্যস্ত করিয়া রাখে।

আহারের পর বাসবৃক্ষে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া বাদুড়রা বিশেষ যত্নের সহিত অঙ্গাদির প্রসাধনে মনোনিবেশ করে। আলিপুর পশুশালার উত্তর দিকের কয়েকটি ঝাউবৃক্ষে আমি ইহাদের অঙ্গমার্জ্জনাদি বিশেষ কৌতূহলের সহিত বহুবার লক্ষ্য করিয়াছি। শাখায় নতশিরে দোদুল্যমান থাকিয়া এবং অঙ্গকে বারংবার লেহন করিয়া ইহারা দেহরোম পরিষ্কৃত করে। রোমাবলী পরিষ্কৃত হইলে পর দুইটি "পক্ষ" বিস্তৃত করিয়া উহার উপরে পতিত ঝুল বা ধূলিকণাসকল সযত্নে বিদূরিত করে। এইরূপে দেহরোম ও "পক্ষদ্বয়" পরিষ্কৃত হইলে ইহারা "পক্ষ" গুটাইয়া নিদ্রিত হইয়া পড়ে। কোনও দিন ইহাদের এই অঙ্গমার্জ্জনাদির বিরাম ঘটে না। দেহের উপর রৌদ্র আসিয়া পড়িলেই ইহারা এই কর্ম্মে লিপ্ত হইয়া থাকে। এই অঙ্গ-প্রসাধনে ইহারা যে কত সময় অতিবাহিত করে, তাহা শাখা-বিলম্বিত বাদুড়কে কয়েকবার লক্ষ্য করিলেই বুঝিতে পারা যাইবে।

আহারের পর ব্যাঘ্র ও বিড়ালরা যেমন থাবা দ্বারা মুখ-মার্জ্জনা করে, ফলভোজনের পর পক্ষীরাও সেইরূপ বৃক্ষশাখায় চঞ্চু ঘর্ষণ করিয়া চঞ্চুকে পরিষ্কৃত করে। কাক, শালিখ প্রভৃতি প্রতিবার আহারের পর কেমন করিয়া চঞ্চু মার্জ্জিত করে, তাহা অবশ্য প্রত্যেকেই লক্ষ্য করিয়াছেন। অবসরসময়ে আবার বায়স-মিথুনকে পরস্পরের দেহ হইতে উকুন প্রভৃতি বাছিয়া দিতে দেখা যায়। বানররাও অবসরকালে পরস্পরের গাত্রে উকুন বাছিয়া রোমকে পরিচ্ছন্ন রাখিতে প্রয়াস পায়।

পিপীলিকা ও বোলতকরা (বোল্‌তা) মাঝে মাঝে শুণ্ডের উপর সম্মুখের চরণ দুইটি চালনা করিয়া এবং মক্ষিকারা পশ্চাতের চরণ দ্বারা পক্ষদ্বয় মার্জ্জনা করিয়া ঐ সকল অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে পরিষ্কৃত রাখে। মধুচক্র নিরীক্ষণ করিলে উহার নির্ম্মাণ-কৌশলে শুধু যে জ্যামিতিক রীতির পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা নহে, চক্রের মধ্যে স্বাস্থ্য-বিজ্ঞানেরও কিঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যায়। প্রবল গ্রীষ্মের দিনে চক্রে তাপাধিক্য ঘটিলে শ্রমিক মক্ষিকাদিগের এক শ্রেণী চক্রের বহির্ভাগে অবিরত পক্ষবিধূনন করিয়া চক্রের মধ্যে বায়ুচালনা করিয়া থাকে। চক্রের মধু ভক্ষণ করিবার উদ্দেশ্যে কোনও কীট-পতঙ্গ চক্রে প্রবেশ করিলে উহারা দংশন করিয়া তাহাকে মারিয়া ফেলে এবং মৃত্যুর পর তাহার মৃতদেহকে বাহির করিয়া ফেলিয়া দেয়। মৃত কীট-পতঙ্গের দেহ চক্র হইতে বাহির করিতে অশক্ত হইলে মধুমক্ষিকারা মৃত জীবের দেহ মধুপ্রক্ষিত করিয়া সম্পূর্ণভাবে আবৃত করিয়া ফেলে। ইহার ফলে মৃত জীবের দেহ পচিয়া গলিয়া চক্রের বায়ুকে দূষিত করিতে পারে না।

মাছরাঙ্গা, পেচক, বক, কাঠঠোক্‌রা প্রভৃতির নীড় ব্যতীত অপর পক্ষীদের নীড়ের মধ্যেও বেশ পরিচ্ছন্নতা লক্ষিত হইয়া থাকে। নীড়ে মৃত শাবক ও শাবকাদির বিষ্ঠা পক্ষীরা চঞ্চুর দ্বারা বাহির করিয়া ফেলিয়া দেয়। এ বিষয়ে গৃহপালিত ক্যানারি পক্ষীর আচরণ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কাক-চিলরা আহারান্বেষণ ও শাবক-প্রতিপালনের পর অবশিষ্ট সময় নীড়ের পরিচ্ছন্নতা ও সৌষ্ঠব সম্পাদনে অতিবাহিত করিয়া থাকে।

কীট-পতঙ্গের মধ্যে কতক শ্রেণী মৃতকে মৃত্তিকার মধ্যে সমাহিত করিয়া থাকে। পিপীলিকারা মৃত ও মুমূর্ষুকে স্থানান্তরিত করে। কুকুর-বিড়ালরা মৃত্তিকা-খনন করিয়া মলত্যাগ করে এবং পরে মৃত্তিকা দ্বারা বিষ্ঠা আবৃত করিয়া দেয়।

জীবজন্তুদিগের মধ্যে দেহের পরিচ্ছন্নতা-সাধনে সাহচর্য্যও লক্ষিত হইয়া থাকে। "zig zag" পক্ষীরা কুম্ভীরের দন্ত-সংলগ্ন জলৌকাকে ভক্ষণ করিয়া এবং আফ্রিকার "Rhinoceros bird" ও "Buffalo bird" গণ্ডার ও মহিষের গাত্র-সংলগ্ন পোকা-মাকড় উদরস্থ করিয়া উহাদের ত্বককে পরিষ্কৃত করিয়া দেয়। এ দেশে কাক, শালিখ এবং বিলাতে বায়স ও ষ্টার্লিং প্রভৃতি পক্ষীরা গো, মেষ, মহিষ প্রভৃতির রোম হইতে পোকা-মাকড় ভক্ষণ করিয়া উহাদের দেহকে পরিচ্ছন্ন রাখিতে যথেষ্ট সহায়তা করে। জীব-জগতে সকল জীবজন্তুই নানা উপায়ে দেহকে পরিষ্কৃত রাখিয়া প্রকৃতির সৌষ্ঠব সম্পাদন করে। এমন কি, শৃগাল, নকুল, মূষিক প্রভৃতি মৃত্তিকার মধ্যে বাস করিলেও উহাদের দেহকে কখনও ধূলিমলিন বা কর্দ্দমাক্ত থাকিতে দেখা যায় না।

শ্রীঅশেষচন্দ্র বসু (বি, এ)।
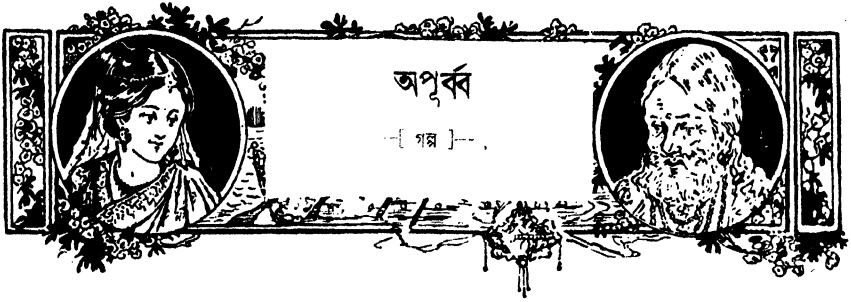
হেমন্ত কাছারী হইতে উঠিল বেলা ৪টার একটু পরে। গিয়াছিল বেলা ১১টায়। ১টা, এমন কি, বেলা ১২টায় ফিরিতেও তাহার কোন বিশেষ বাধা ছিল না। অবিশেষ বাধা অবশ্য কিছু ছিল; নহিলে মিছামিছি চারি ঘণ্টা-কাল মানুষ কেন বসিয়া থাকিবে? দুই চারিবার পেস্কারের কাছে ঘুরিয়া, বার লাইব্রেরীতে কিছুক্ষণ ইটালী ও আবিসিনিয়ার যুদ্ধের বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আলোচনা ও গবেষণা করিয়া, 'হুজুরের' খাস্‌কামরায় একবার সন্তর্পণে 'ঢ়' মারিয়া, অদূর-ভবিষ্যতে কোন কমিশন মিলিতে পারে কি না, তাহা জানিবার জন্য কিছুক্ষণ বৃথা চেষ্টা করিবার পরও হেমন্ত দেখিল—বেলা মোটে দুইটা। মুখ, ততোধিক বুকটা অন্যদিনের মতই শুকাইয়া আসিতেছিল। গোটা দুই পাণ মুখে দিয়া হেমন্ত মুখটাকে কিছু সরস করিল। বুকটা যেমন তিলে তিলে ভিতরে শুকাইয়া উঠে, তেমনি উঠিতে লাগিল। ইহার মধ্যে কেবল এইটুকুই ভরসার কথা যে, সে কথা তাহার শুষ্কপ্রায় বুকখানা এবং যিনি ঐ ক্লিষ্ট বুকখানা ও তাহার গভীর ব্যথা সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তিনি ব্যতীত আর কেহ তাহা জানিল না ও জানিবে না।

যাহাদের কাম আছে, তাহারা তখন এজলাসে। যাহাদের নাই, তাহারা লোকমত অগ্রাহ্য করিয়া বাসায় ফিরিয়াছে। তাহাদের মধ্যে অন্ততঃ এইটুকু ভরসা আছে যে, চাউল ও দাল ত বাড়ী হইতে আসিবে। বাকি খরচটা উদ্বৃত্ত শস্য বিক্রয় করিয়া চলিবে। তাহাতেও যদি কিছু বাকি থাকিয়া যায়, তখন দেখা যাইবে।

হেমন্তের সে সব ভরসা নাই। তাহার যে সবটাই বাকি! তবু সে আরও খানিকটা অপেক্ষা করিল। বার লাইব্রেরীর চাঁদা করা খবরের কাগজখানা ধীরে-সুস্থে পড়িয়া শেষ করিল। "Wanted"গুলি অভিনিবেশ সহকারে বার বার পড়িল। এমন কি, তাহার কয়েকটা অংশ মুখস্থ পর্য্যন্ত হইয়া গেল। ইহার পরে চারিদিকে চাহিয়া হেমন্ত দুইটি চাকুরী খালির বিজ্ঞাপন আপনার নোট-বহিতে টুকিয়া লইল। প্রথমটি ফরিদপুর অঞ্চলে ৪০ টাকায় অঙ্কশাস্ত্রে সুপণ্ডিত এক জন এম-এ শিক্ষকের প্রয়োজন। দ্বিতীয়টি পান্না ষ্টেটের জন্য ৪৫ টাকায় জমিদারী কার্য্যে দক্ষ এক জন আইনজ্ঞের প্রয়োজন। কত বিজ্ঞাপনই সে এই ভাবে নোট-বহিতে টুকিয়া লইয়াছে; কত ডাক-খরচই সে এই ভাবে করিয়াছে। একটিতেও সুফল হয় নাই। আজিও যে হইবে না—সে বিষয়েও তাহার বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না। তথাপি রত্নান্বেষীর প্রস্তর দেখিলেই তাহা একবার কুড়াইয়া দেখিবার অনিবার্য্য অভ্যাসের মত সে চাকুরীখালির বিজ্ঞাপনটা না লিখিয়া পারিল না। এমন সময় কাহার পায়ের শব্দ হইল। নোট-বহি পকেটে ফেলিয়া হেমন্ত দ্বিতীয়বার সম্পাদকীয় স্তম্ভে দৃষ্টিনিবেশ করিল।

এক জন সহকর্ম্মী প্রবেশ করিলেন; জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হে? কি খবর?"

হেমন্ত বলিল, "আর খবর! য়ুরোপ আর আমেরিকা ছাড়া পৃথিবীর কোথাও আর স্বাধীন দেশ থাক্‌বে না।"

সহকর্ম্মী বলিল, "বলা যায় না হে! এদের যুদ্ধের ধারাই হয় ত আলাদা। পিছিয়ে এসে এসে হয় ত এক দিন এমন এগিয়ে যাবে যে, ইটালীর চক্ষুস্থির হয়ে যাবে।"

হেমন্ত বলিল, "ক্ষেপেছ? এখন কি আর শুধু মাথা-গুণতি সৈন্য নিয়ে যুদ্ধ-জয় হয়? ইটালীর অসংখ্য এরোপ্লেন, বোমা

ও বিষাক্ত গ্যাসের কাছে এবিসিনিয়ার অসহায় সাহস কি আর টেঁকে ?

"কিছুই বলা যায় না হে। জার্ম্মাণ যুদ্ধের সময় কেউ কি ভেবেছিল যে জার্ম্মাণ হারবে ?"

"জার্ম্মাণ যুদ্ধের কথা ছেড়ে দেও। সে এক রকম অভিমন্যু-বধ বল্লেও হয়। সপ্তরথী একসঙ্গে জুটেছিল, তাই। নইলে পৃথিবীর হিষ্ট্রী ও জিওগ্রাফি দুটোই অন্যভাবে বদ্‌লে যেত।"

"দেখা যাক্ কি হয়! যাই, আবার ছোট মুন্সেফের কোর্টে একটা কেস্ আছে।"

বলিয়া উকিলটি চলিয়া গেল।

হেমন্ত ভাবিল, আহা, সেও যদি এমন গর্ব্বভরেই বলিতে পারিত যে, অমুকের কোর্টে এখনি আমার একটা কেস্ আছে, তাহা হইলে জীবনটার কি পরিবর্ত্তনই হইত!

কিন্তু যাহা হয় নাই, শুধু চিন্তা ও কল্পনার বলে তাহা কোন দিন হয় না, হইবেও না। আজিও হইল না।

হেমন্ত বসিয়া ভাবিতে লাগিল ; সিদ্ধির চেয়ে অন্যরূপ পদার্থ বুঝি আর কিছুই নাই। কোথায় যে এই সিদ্ধি গোপনে রক্ষিত আছে, আজ পর্য্যন্ত তাহার নিরাকরণ হইল না। কাণে কলম গুঁজিয়া ঘরময় কলম খুঁজিয়া ক্লান্ত হইবার মত দুর্ভাগ্যও কত লোকের হইয়াছে ও হইতেছে। লেখার গাড়ী যখন ট্রেণের ষ্টেশন ছাড়িয়া উধাও হইয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছে, তখন হতভাগ্য কলম আসিয়া পৌঁছিল—ততোধিক হতভাগ্য লোকটার হাতে। এমনই করিয়া কত বুদ্ধি কত শক্তি কত লোকের সুযোগ ফুরাইয়া গেলে যোগাইতেছে ; কত লোকের তাহাও যোগাইতেছে না। জ্ঞানী লোকরা ইহাকেই অভিজ্ঞতা বলিয়া থাকেন। জগতের বুঝি বা ১৫ আনা লোক জীবনের অকৃতকার্য্যতার বিনিময়ে জীবনের সায়াহ্নে এই অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়া নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইতেছে। কে তাহাদের সংখ্যা রাখে ? আমার অসিদ্ধির অভিজ্ঞতার কথা শুনিয়া অপরের কল্যাণ হইবে, অপরে সিদ্ধিলাভ করিবে, এই আধ্যাত্মিক সান্ত্বনায় কয় জন মহাত্মা তৃপ্তিলাভ করিতে পারিবেন ? দেখিয়া শুনিয়া মনে হয়, সবাই সিদ্ধির খনি খুঁজিতেছে ; লটারির টিকিটের স্তূপের মধ্য হইতে কোথাও কোন্ দিন দৈবাৎ এক জনের হাতে 'সিদ্ধি' লেখা কাগজখানি মিলিয়া যাইতেছে সেই তখন বিজ্ঞ, সুদর্শন, সুবক্তা, এমন কি, সুলেখক পর্য্যন্ত হইয়া যাইতেছে।

এমনই কত কি ভাবনা হেমন্ত ভাবিতে লাগিল, যে ভাবনায় কোন সুখ নাই, কোন শান্তি নাই—যাহা জীবনকে অধিকতর অশান্ত ও অভিশপ্ত করিয়া তুলে। এইরূপে সময় কাটাইয়া ৪টা বাজিয়া কয়েক মিনিট হইবামাত্র হেমন্ত সেখান হইতে উঠিল ও সাড়ে ৪টা আন্দাজ বাড়ী পৌঁছিল।

২

হেমন্তের স্ত্রী মণিকা ছেলেমেয়েদের গরম জামাগুলি সেলাই করিতেছিল। স্বামীর আয় অল্প—শুধু অল্প নয়, অতি অল্প। দুটি মেয়ে ও ৪টি ছেলের সত্যকার গরম জামা কিনিতে গেলে যেগুলি টাকার প্রয়োজন, তাহাতে অর্দ্ধেক মাসের খরচ চলিয়া যায়। ৩ বৎসর আগের কেনা গরম জামাগুলি সেলাই করিয়া বড়র জামাটা মেজকে দিয়া মেজরটা সেজকে এই ভাবে বদলাইয়া দিলে, দেখিতে তেমন শোভন না হইলেও, কায চলিয়া যাইবে। শীতের হাত হইতে ছেলেমেয়েগুলি বাঁচিবে। বাকি থাকিবে বড় মেয়ে। মণিকার নিজের গরম জামাটা তাহার জন্য রাখিয়া দিয়াছে। খানিকটা বড় হয় বটে ; তা হউক, তাহাতে বিশেষ কিছু আসিয়া যায় না। তাহার নিজের জন্য গরম জামার দরকারই নাই। মাত্র একটা ঠিকা ঝিয়ের সাহায্যে তাহাকেই গৃহস্থালীর সব কায করিতে হয়। উদয়াস্ত খাটিতে খাটিতে এক-এক সময় মাথা এমন গরম হইয়া পড়ে যে, গায়ের সেমিজটাও যেন অসহ্য হইয়া পড়ে।

বাঁদিকের স্তূপীকৃত ছেঁড়া জামাগুলি হইতে এক-একটি তুলিয়া লইয়া মণিকা সেলাই করিতেছিল ও সেলাই শেষ করিয়া ডানদিকে রাখিতেছিল। প্রায় অর্দ্ধেক জামা সেলাই হইয়াছে, অর্দ্ধেক তখনও বাকি, এমন সময় হেমন্ত ফিরিল। একটু আশান্বিতমুখে মণিকা স্বামীর পানে চাহিল। স্বামীর চক্ষু উজ্জ্বল হইয়া উঠিল. না, তাহার হাতও পকেটে গেল না। মণিকা বুঝিল, আজ কিছুই মিলে নাই। স্বামীর জন্য দুঃখ হইল না, তাহা নহে ; কিন্তু সংসারের অভাব ও ছেলেমেয়েদের কষ্ট সে দুঃখ ছাপাইয়া তাহার স্বভাব-সুন্দর মুখখানি ভার ও তাহার উজ্জ্বল চক্ষুর্দ্বয় ম্লান করিয়া দিল। মনোভঙ্গ-জনিত দীর্ঘশ্বাস গোপন রাখিয়া মণিকা যেমন সেলাই করিয়া যাইতেছিল, তেমনই যাইতে লাগিল।

হেমন্ত বুদ্ধিহীন নহে, সব বুঝিল; আঘাতও পাইল। কিন্তু সে-ও আঘাত গোপন রাখিয়া আপনার কক্ষে গিয়া বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিয়া আসিল।

ইহারই মধ্যে জল-খাবার সজ্জিত রাখা হইয়াছিল। যে কক্ষে মণিকা কায করিতেছিল, সেই কক্ষেরই মধ্যস্থলে একখানি আসন পাতিয়া সম্মুখে হাত মার্জ্জনা করিয়া খাবারের পাত্রটি রক্ষিত। পার্শ্বে সুপরিষ্কৃত কাঁসার গ্লাসে জল। খাবার বেশী কিছু নয়—ছয়খানি ছোট ছোট লুচি ও খান-কয়েক আলু ভাজা; এক পাশে সামান্য একটু চিনি।

মণিকা ছেঁড়া জামার স্তূপ ফেলিয়া—একখানি পাখা লইয়া খাবারের সম্মুখে বসিয়া আছে

হেমন্ত নিঃশব্দে আসিয়া আসনে বসিল। সম্মুখের ঘরটায় বড় মেয়েটি ছাড়া আর সব ছেলেমেয়েই ৪ খানি আলুভাজা সহযোগে বয়স হিসাবে ১ বা ২ খানি রুটী খাইতে বসিয়া গিয়াছে। অভ্যাসমত হেমন্ত আজ আর কনিষ্ঠ পুত্র হইতে সুরু করিয়া কাহাকেও ডাকিল না। কারণ, ইহা জানাই আছে যে, ডাকিলেই প্রথমে তাহারা বলিবে যে, তাহারা খাইতেছে এবং পরে পীড়াপীড়ি করিলে আসিবে এবং এক এক খণ্ড প্রসাদী লইয়া মায়ের ভ্রূকুটির অন্তরালে সরিয়া যাইবে।

একখানি লুচি খাইয়া একটু জল পান করিয়া হেমন্ত উঠিয়া পড়িল। মণিকা বলিল, "খেলে না?"

'ক্ষিদে নেই' বলিয়া হেমন্ত হাত ধুইতে গেল। মণিকা কথাটা বিশ্বাস করিল না। একটু গম্ভীর হইয়া পূর্ব্বস্থানে উঠিয়া গেল। হেমন্ত ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "কাল থেকে আমার জন্য লুচি ক'রো না। লুচি খাবার অবস্থা আমার নয়।"

মণিকা একটু তীক্ষ্ণস্বরে বলিল, "তাতে কত টাকা বাঁচবে?"

"যা বাঁচে। একটা পয়সাও ত বাঁচবে। অন্ততঃ এই সুবিধেটা হবে যে, তোমাকে তাড়াতাড়ি ছেলেমেয়েদের একটুকরা রুটী দিয়ে আমার সামনে থেকে সরিয়ে নিয়ে যেতে হবে না।"

বলিয়া হেমন্ত অপ্রসন্নমুখে আফিস-ঘরে চলিয়া গেল।

মণিকা বেশী বাদানুবাদ ভালবাসিত না। সে জন্য মনের মধ্যে ক্রোধ ও ক্ষোভ হইলেও সে চুপ করিয়া গেল।

স্বামীর সম্মুখে দুখানা রুটী ধরিয়া দিতে তাহার বড়ই কষ্ট হয়। পাওনাদারদের অতি কষ্টে সামলাইয়া, সংসারের সব কিছু অতি কষ্টে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখিয়া, ছেলেমেয়ে-গুলা দু'বেলা দু'মুঠা যাহাতে পেট ভরিয়া খাইতে পায়, এজন্য তাহাকে যে কি হাড়-ভাঙ্গা পরিশ্রম সহিতে হয়, তাহা সে-ই জানে। হেমন্ত এ সব জানিলেও সব সময়ে যেন বুঝিতে চায় না। এই তাহার দুঃখ। বুঝিলে এ সব দুঃখ তৃণজ্ঞান হয়। না বুঝিলে পাষাণের মত যেন বুকের উপর জুড়িয়া বসে।

হঠাৎ স্বামীর উচ্চকণ্ঠ শুনা গেল—"যা সব, ও-ঘরে যা।" ক্ষণপরে কতকগুলি দ্রুতপদধ্বনি শ্রুতিগোচর হইল। সঙ্গে সঙ্গে দুয়ার বন্ধ করার শব্দ আসিল। মণিকা বুঝিল, ছেলে-মেয়েরা অভ্যাসমত স্বামীর আফিস-ঘরে গিয়াছিল, তাই তাহাদের তাড়াইয়া দুয়ার বন্ধ করা হইল।

একটু পরে মণিকা উঠিয়া মাঝের কক্ষ পার হইয়া বারান্দায় আসিল। দেখিল, স্বামীর কক্ষটি ভিতর হইতে বন্ধ। দ্বারের সম্মুখে সেজ মেয়ে নীলিমা ম্লানমুখে খোকাকে কোলে করিয়া দাঁড়াইয়া। তাহার দুই চক্ষু দিয়া জলধারা গড়াইতেছে। ৪ বছরের ছেলে বিকাশের মুখ শুকাইয়া গিয়াছে। তাহার চোখেও দুই বিন্দু জল। মাকে দেখিবামাত্র দুই জনেই উচ্ছ্বসিতকণ্ঠে কাঁদিয়া উঠিল। কোলের খোকা বেগতিক দেখিয়া মায়ের কোলে ঝাঁপাইয়া আসিল।

দুঃখে ক্ষোভে মণিকার বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল। একবার শুধু সে বলিল, "কেবল রুটী খেলেই ছেলেমেয়েদের কষ্ট হয়; আর কুকুর-বেড়ালের মত দূর ক'রে দিলে সুখের সীমা থাকে না!" কথাটা বলিয়াই মণিকা ছেলেমেয়েদের ভিতরে লইয়া আসিল। যে অশ্রুধারা অনিচ্ছা সত্ত্বেও চোখ দুটা ছাপাইয়া আসিতে চাহিতেছিল, জোর করিয়া তাহা নিশ্চিহ্নভাবে মুছিয়া ফেলিল ও কঠিন স্বরে স্বল্প কথায় ছেলেমেয়েদের বলিয়া দিল যে, ও ঘরে যেন আর কোন দিন যাইবার তাহারা স্পর্দ্ধা না রাখে। তাহার পর খোকাকে নীলিমার কোলে দিয়া সে আবার আপন মনে সেলাই লইয়া বসিল।

দিনের আলো প্রায় ফুরাইয়া আসিল। তবুও মণিকা খোলা জানালার ধারে বসিয়া সেই ম্লান আলোকে সেলাই

করিয়া যাইতে লাগিল। মনের একাগ্রতা নষ্ট করিয়া এক কায হইতে অন্য কাযে যাইতে তাহার আজ ইচ্ছা করিতেছিল না। এমন সময় বড় মেয়ে মায়ের ঘরে আলোক রাখিয়া দিয়া বলিল, "আঁচ বয়ে গেল মা, রান্না চড়াবে না?"

বড় গোছের একটা নিশ্বাস ফেলিয়া মণিকা হাতের কায ছাড়িল ও পুঁটলি করিয়া সব জামা পৃথক করিয়া দুই ভাগে বাঁধিয়া উঠিয়া পড়িল।

৩

কিছু দিন ইহা লইয়া স্বামি-স্ত্রীর মন-কষাকষি চলিল। দু'জনের মধ্যে বড় একটা কথাবার্ত্তা হয় না। যদিও বা হয়, তাহা হইলেও কথাবার্ত্তায় ব্যবহৃত ক্রিয়াগুলির কর্ত্তা তৃতীয় ও মধ্যম পুরুষের অন্তর্গত হইত। যথা—"আমার জন্য আজ খাবার করার দরকার নেই" —ইত্যাদি।

ঘরের হাওয়া ক্রমশঃ এমনই ঘন হইয়া উঠিল, যাহাতে স্বামি-স্ত্রীর জীবন যেন হাঁফাইয়া উঠিতেছিল। তবু ছেলেমেয়েরা আগে ছিল বন্ধ ঘরের ছোট্ট জানালার মত। দুই এক দিন হইতে সেগুলিও যেন বন্ধ হইয়া গিয়াছে। তাহারাও ক'দিন হইতে কাছে আসে না—তাহা ভয়েই হউক বা উপদেশেই হউক।

এমন সময় হঠাৎ বাহিরে একটা কমিশন পাইয়া হেমন্ত যেন বাঁচিয়া গেল। একটা উইলের মামলা। এক বৃদ্ধ ডাক্তার তাহার এক জন অছি। তিনি রুগ্ন, উত্থানশক্তিরহিত। তাঁহার সাক্ষ্য লওয়া দরকার।

ডাক্তারটির সাক্ষ্য লইবার জন্য অফিসের লোকজনই সেখানে উপস্থিত ছিল। এক দিনেই সাক্ষ্য শেষ হইবার সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু ডাক্তারের শরীর এতই দুর্ব্বল যে, কিছুক্ষণ ক্রমাগত কথা কহিয়া তিনি ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন। তাঁহার চিকিৎসক সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি বলিলেন, আজ আর ইঁহার কথা কহিবার ক্ষমতা নাই। যদি আরও কিছু জিজ্ঞাস্য থাকে, তাহা হইলে তাহা কাল হইবে। আজ আর কিছুতেই নহে।

রোগী সম্বন্ধে ডাক্তারের মতের উপর কাহারও কথা চলে না। আর সাক্ষী যে দুর্ব্বল, সে বিষয়ে কাহারও কোন সন্দেহ ছিল না।

সে দিনের কায শেষ করিয়া তাহারা ষ্টেশনের পথে ফিরিতেছিল। খুব বেশী দূরের পথ নহে: আজ ফিরিয়া গিয়া আবার কাল আসিলেও কায চলে। থাকিবার স্থান পাইলে আজ থাকিয়া কাল একেবারে কায সারিয়া গেলেও ক্ষতি নাই। সঙ্গে দুই পক্ষের লোকই ছিল। তা ছাড়া আজিকার দিনটা থাকিয়া যাইবার জন্য অনুরোধও করিতেছিল। কিন্তু কমিশনের জন্য যিনি যান, তিনি সে দিনের জন্য হাকিম জাতীয়। কোন পক্ষেরই আতিথ্য গ্রহণ করা তাঁহার অবিধি। কাযেই তাঁহাকে যদি থাকিতে হয়, ডাক-বাংলোতেই তাঁহার থাকা উচিত। ষ্টেশনের অদূরে একটা ছোট বাংলোও ছিল। অনেকখানি খোলা যায়গার মধ্যস্থলে বাড়ীখানি। বামদিকে যে খালি জমি, তাহার ধারে ধারে পুরাণো বড় বড় গাছ। বড় রাস্তা হইতে নামিয়া গজ কুড়িক ছোট পথ বাহিয়া সেখানে পৌঁছিতে হয়।

পরদিন ১১টায় ফিরিবেন বলিয়া দুই পক্ষের লোকজন উকিল ইত্যাদি চলিয়া গেলেন। হেমন্ত স্থির করিল, রাত্রিটা এইখানেই কাটাইয়া দিবে। যদি এই ডাক-বাংলোতে স্থান পাওয়া যায় ভালই, নহিলে অন্য ব্যবস্থা করিবে।

ছোট পথ বাহিয়া হেমন্ত ডাক-বাংলোতে আসিল। ইহাতে আছে মাত্র দুটি ঘর—একটি বড়, একটি ছোট। বারান্দাটি বেশ প্রশস্ত। মিলিয়া মিশিয়া থাকিলে ৫।৬ জন লোক একসঙ্গে থাকিতে পারে। বড় অফিসার আসিলে তাঁহার সবখানিই দরকার। দুই জন সরকারী কর্ম্মচারী আসিলে ভাগাভাগিও চলে।

একটু দূরে রান্নার ঘর ও চৌকিদারের বাসা। হেমন্তকে দেখিয়া সে আগাইয়া আসিল। হেমন্ত জিজ্ঞাসা করিল, ঘর খালি আছে কি না।

চৌকিদার বলিল, খালি আছে, বাবু। তবে যদি সাহেব-সুবো আসেন, তা হলেই মুস্কিল। তখন ছেড়ে দিতে হবে। তবে আপনি ছোট ঘরটায় থাকুন। বড় ঘরটা ত খালি আছে। যদি কেউ আসেন, ঐটাতেই উঠবেন। সন্ধ্যার মধ্যে কেউ এলেন ত এলেন, নইলে বেশী রাতে আর কেউ আস্‌ছেন না।

হেমন্ত ছোট ঘরটাই অধিকার করিল। সঙ্গে তাহার কেবল একটা ব্যাগ ও ছোট একটা বিছানা। রাত্রিটা

এক রকমে কাটাইয়া দিলেই চলিবে। ব্যাগ ও বিছানা ঘরের মধ্যে রাখিয়া হেমন্ত সম্মুখের যায়গাটায় পায়চারী করিতে করিতে ভাবিতে লাগিল।

কলেজে পড়িবার সময়ে কত বড় কথাই ভাবিত: কত বড় কল্পনাই করিত। উচ্চপদ পাইবে। সস্ত্রীক টুর করিবে; কিন্তু দেশী ভাবে। Plain living and high thinking—ইহাই হইবে জীবনের আদর্শ। ডাক-বাংলোয় আসিয়া উঠিবে, কিন্তু ডাল-ভাত রাঁধিয়া খাইবে। রাত্রিকালে কত গভীর আলোচনা করিবে। নীল আকাশে পরিপূর্ণ চন্দ্র উঠিবে। শুভ্র জ্যোৎস্নায় চারিদিক ভাসিয়া যাইবে। স্বামি-স্ত্রী দুই জনে হাত-ধরাধরি করিয়া সম্মুখে পাশে বেড়াইবে। রাত্রি গভীর হইবে। দুই জনে ভিতরে আসিবে। কথায়, গল্পে, তর্কে, কবিতায় রাত্রি কাটিয়া যাইবে।

কিন্তু সে সব নিছক কল্পনাতেই রহিয়া গেল। ভাল করিয়া এম-এ পাশ করিল; ল পাশ করিল। সরকারী চাকরীও জুটিল না, সস্ত্রীক 'টুর' করিবার সৌভাগ্য ত দূরের কথা, স্ত্রীকে লইয়া স্বচ্ছল অবস্থায় গৃহবাস করাও ঘটিল না। একটু ভালভাবে অন্নবস্ত্রের সংস্থান করাও দুরূহ হইয়া উঠিল।

এত কাল পরে জীবনে এই প্রথম ডাক-বাংলোতে বাস; তাও একা। স্ত্রীকে বলিয়াও আসা হয় নাই যে, সে আজ ফিরিবে না। উৎকণ্ঠায় স্ত্রীর সারারাত্রি কাটিবে: অভাব-ম্লান দাম্পত্যজীবন ইহাতে হয় ত আরও মলিন হইয়া উঠিবে।

আজ ফিরিয়া গিয়া কাল আবার আসিলেও চলিতে পারিত, এই ভাবের চিন্তা যখন তাহার মনের মধ্যে উঁকি মারিতেছে, এমন সময় একখানি মোটর বড় রাস্তা বাহিয়া যাইতে ঠিক ডাক-বাংলোর সম্মুখে মুখ ফিরাইয়া ভিতরে প্রবেশ করিল। সম্মুখটায় গাড়ী আসিয়া থামিতে চৌকিদার দৌড়িয়া আসিল। গাড়ী হইতে নামিলেন ইংরেজি বস্ত্র-পরিহিত এক বাঙ্গালী যুবক। নামিবামাত্র যুবকের সঙ্গে হেমন্তের চোখোচোখি হইয়া গেল।

"তুমি! হেমন্ত!" বলিয়া যুবক এক প্রকার ছুটিয়া হেমন্তের কাছে আসিল।

হেমন্ত সাশ্চর্য্যে বলিল—"বিজয়!"

মুহূর্ত্তে দুই জন আলিঙ্গনবদ্ধ হইল। ধীরে ধীরে দুই জন ঘরের মধ্যে আসিল।

তার পর বিশ্রম্ভালাপ।

"তুমিই তা হ'লে বি দাস। একজিকিউটিভ এন্‌জিনিয়ার বি-দাস নাম শুনেছিলাম বটে; কিন্তু সে যে তুমি, তা মনে হয়নি।"

"তুমি প্লীডার। বেশ! Right man in the right place. কিন্তু সবডিভিজনে কেন বসলে? জেলায় এস।"

"আর Right man! সে সব গৌরবের স্বপ্ন ভেঙ্গে গেছে, বিজয়! প্লীডার এই পর্য্যন্ত। পসার একটুও নেই। জেলায় দুবছর বৃথা নষ্ট ক'রে এখানেই বসেছি। ফল পূর্ব্ববৎ।"

"তুমি প্লীডার অথচ পসার নেই! আমরা যে কত বলাবলি করেছি, তুমি উকিল বা ব্যারিষ্টার হ'লে ঠিক হবে। তোমার কলেজের সময়কার যুক্তি-তর্ক সব ভেসে গেল?"

"সব। তার সঙ্গে আমি ভেসে গেলেও ভাল হ'ত! পসারের আশা আর বড় করিনে। যে মুন্সেফি এক দিন ঘৃণা করেছি, সে আজ আমার কাছে স্বর্গের মত কাম্য।"

"So sad and strange! মানুষের ভাগ্যের মত বিস্ময়কর জিনিষ পৃথিবীতে আর কিছুই নেই। তুমি উকিল হয়ে পসার করতে পারবে না, এ আমরা কেউ স্বপ্নেও ভাবিনি।"

"ভাগ্যের কথা আর বল কেন? মুন্সেফ দয়া ক'রে মাঝে মাঝে কমিশন দেন, তাই অতি কষ্টে দুমুঠো খেতে পাই। নইলে যে কি হ'ত, তাই ভাবি।"

"বল কি, হেমন্ত! এত দূর? তা হ'লে ত বড় কষ্টের কথা।"

"কষ্টের কথা আর কেন বল? এই ভুলচুক বেছে নেওয়ার জন্য পারিবারিক শান্তি পর্য্যন্ত নষ্ট হ'তে বসেছে। দারিদ্র্যের মত ভীষণ জিনিষ পৃথিবীতে আর কিছু নেই।"

"আচ্ছা, তুমি ত এম-এতে বেশ ভাল করেছিলে। প্রফেসারী কেন চেষ্টা করনি?"

"কারণ—দুরাশা। তোমরা আমার সম্বন্ধে যেমন আশান্বিত ছিলে, আমিও পূর্ব্বে তেমনই ছিলাম। কাযেই প্রফেসারী তুচ্ছ মনে করেছিলাম। এখন তার ফলভোগ করছি।"

বি দাসের জীবন কৃতকার্য্যতায় ভরা। ভাল করিয়া Engineering পাশ করিয়া ইহারই মধ্যে সে ইংলণ্ড হইতে আপনাকে কৃতবিদ্য করিয়া আনিয়াছে। চাকুরীও পাইয়াছে ভাল। ভবিষ্যতে আরও বেশী আশা রাখে। কিন্তু বন্ধুর ব্যর্থতার কথা শুনিয়া নিজের কৃতকার্য্যতার কোন কথাই সে আজ মুখে আনিতে পারিল না। কেবল মোটামুটি কোথায় থাকে ইত্যাদি দুই চারি কথা বলিল।

কাল বেলা ১টার মধ্যে হেমন্তের কায শেষ হইবে শুনিয়া বিজয় বলিল, "তবে ভাই, কাল তোমার কায শেষ হওয়া পর্য্যন্ত আমি অপেক্ষা কর্‌ব। তার পর তোমায় নিয়ে চুঁচুড়ায় ফির্‌ব।"

"আমার যে আজই ফিরবার কথা ছিল। কালও যদি না ফিরি, তা হ'লে সবাই বড় ব্যস্ত হয়ে উঠবে। বলেও আসিনি কিছু।"

"তা হোক্। কাল যারা ফিরবেন, তাঁদের হাত দিয়ে একটা চিঠি পাঠিয়ে দিও; তা হলেই মার্জ্জনা পাবে। আর যদি না-ও পাও, কিছু শাস্তি নিও। শোনা যায়, দাম্পত্য শাস্ত্রে শাস্তি অনেক সময় মার্জ্জনার চেয়ে মিষ্ট।"

নিশ্বাস ফেলিয়া হেমন্ত বলিল, "ও সব কথা একেবারে ভুলে গেছি, বিজয়। রহস্য, আমোদ, পরিহাস এ সব আমার জীবন থেকে একেবারে ছুটী নিয়েছে।"

বন্ধুর মুখে এতখানি নিরাশার সুর শুনিয়া বিজয়ের মুখে কিছুক্ষণ কোন কথা আসিল না। কিছুক্ষণ পরে হেমন্তের একখানি হাত হাতের মধ্যে লইয়া বলিল, "তবু কাল তোমাকে যেতে হবে, ভাই। একটা দিন মাত্র! পরশু সকালেই চ'লে যেও।"

হেমন্ত আর আপত্তি করিতে পারিল না।

৪

পরদিন বেলা ৪টায় বিজয়ের গাড়ী যখন চুঁচুড়ায় তাহার বাসার মধ্যে আসিয়া থামিল, তখন ভিতর হইতে ৪।৫টি সুন্দর সুসজ্জিত বালক-বালিকা ছুটিয়া আসিয়া গাড়ীখানি ঘিরিয়া দাঁড়াইল।

অপরিচিত হেমন্তের মুখের দিকে চাহিতে তাহাদের আনন্দ অনেকখানি কুণ্ঠিত হইয়া পড়িল। বিজয় হাসিয়া বলিল, "তোমরা কেউ চিন্‌তে পারছ না। কেমন জব্দ! ইনি হচ্ছেন আমার ছেলেবেলাকার বন্ধু হেমন্ত বাবু—তোমাদের কাকা। যাও, তোমাদের মাকে বল গে।"

ছোটরা লাফাইতে লাফাইতে ছুটিয়া ভিতরে গেল। বড়রা তাহাদের চঞ্চল ছন্দের অনুসরণ করিল। পিছন পিছন দুই বন্ধু উঠিয়া আসিল।

বিজয়ের স্ত্রীর নাম মীরা। মীরা সুন্দরী, হাস্যময়ী ও বিদুষী। স্বামীর আহ্বানে সে বাহিরে আসিল। পরিচয় করাইয়া দিল—"এই হেমন্ত! আমার কলেজের সহপাঠী ও বন্ধু! চিন্‌লে ত?"

মীরা হাসিয়া বলিল, "তোমার কলেজ-জীবনের গল্প যে শুনেছে, সে ওঁকে চিন্‌বেই চিন্‌বে। হঠাৎ কোত্থেকে ওঁকে সংগ্রহ করলে?"

বিজয় বলিল, "ভগবান্ মিলিয়ে দিলেন বল্‌তে পার। বিষ্ণুপুর ডাক-বাংলোতে পৌঁছেই দেখি, হেমন্ত দাঁড়িয়ে কি ভাবছে। কত কাল পরে দেখা। তবু কি আস্‌তে সহজে রাজী হয় হেমন্ত। বলে—বাড়ীতে ভাববে ইত্যাদি। যেমন তোমাদের স্বামীরা ব'লে থাকে আর কি! অর্থাৎ আমিও যেমন বল্‌তাম।"

"তা উনি আর অন্যায় কথাটা কি বলেছেন? তোমাদের স্ত্রীরা ভাবেন বই কি এই রকম। অর্থাৎ আমি হলেও ঐ রকম ভাবতাম আর কি!"

বলিয়া মীরা স্বামীর পরিহাসটুকু ফিরাইয়া দিল।

মীরা হাস্যময়ী। হেমন্ত দেখিল, স্বচ্ছল অবস্থা ও স্বামীর সোহাগ তাহাকে রসিকাও করিয়াছে। মণিকার চেয়ে যে মীরা সুন্দরী, তাহা নহে; কিন্তু দারিদ্র্য, অভাব ও দুঃখের নিষ্পেষণে যে সৌন্দর্য্য সেখানে ম্লান ও অসম্পূর্ণ রহিয়া গিয়াছে—আনন্দ, স্বাধীনতা ও স্বচ্ছলতার মধ্যে এখানে তাহা পুষ্ট, সতেজ ও পরিপূর্ণ হইয়াছে। হেমন্ত ভাবিল, যদি সুযোগ ও সুবিধা থাকিত, মণিকা মধুর স্বভাব ও মিষ্ট আপ্যায়নে মীরাকেও ছাড়াইয়া যাইত।

পরিচয়ের পর আরম্ভ হইল আগেকার গল্প। তাহার আর যেন শেষ হয় না। মীরার সহিত বিজয়ের বিবাহের মধ্যে বেশ একটু বৈচিত্র্য ছিল। এঞ্জিনিয়ারিং পড়িবার সময়ে একবার excursionএ গিয়া সে মীরাকে প্রথম দেখে। তার পর মায়ের অনুমতি লইয়া এক রকম নিজেই চেষ্টা-চরিত্র করিয়া সে মীরাকে বিবাহ করে। এ সব কথাও

বিজয় মীরাকে সানন্দ লজ্জায় ভূষিত করিয়া হেমন্তের কাছে

বিজয় হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা হেমন্ত, তোমার কি মনে হয়—প্রথম দৃষ্টিতে প্রেম বা প্রণয় আমাদের দেশে স্বাভাবিক কি অস্বাভাবিক? সুলভ কি দুর্লভ?"

হেমন্ত বলিল, "কথাটা একটু অপাত্রে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে। কাযেই উচ্চাঙ্গের উত্তর হয় ত পাবে না। আমার ধারণা কি জান? মানুষের মন অল্পবিস্তর সব যায়গাতেই সমান। সামাজিক ব্যবস্থা ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার উপর এই প্রেম বা প্রণয়ের পরিণতি অনেকটা নির্ভর করে। তবে প্রেম ও প্রণয় এই দুটো কথাই আমরা একটু ব্যাপকভাবে ব্যবহার করি। অনেক সময় আমরা সাময়িক আকর্ষণকেই প্রেম বা প্রণয় ব'লে ভুল করি। সৌন্দর্য্য দেখে আকৃষ্ট হলেই প্রেম জন্মে না।"

"তোমার মতে প্রেম কখন্ জন্মায় তা হ'লে?"

"যখন সেই আকর্ষণ পরিচয় ও পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা নিয়ে আসবে, তখনই প্রেমের সম্ভাবনা থাকবে।"

"প্রেম অবুঝ, প্রেম অন্ধ, এই যে সব কবির উক্তি— এ-সব কি তুমি তা হ'লে নিছক কল্পনা ব'লে মনে কর?"

"আমি বলি, একটা সূচনামাত্র। ও সব আকর্ষণ— প্রেমের বীজমাত্র। জমী থাকায় সে বীজ অঙ্কুরিত হ'ল না। অঙ্কুরিত হ'ল ত আলো, বাতাস বা জলের অভাবে অঙ্কুরেই বিনষ্ট হ'ল। প্রেমের ভাগ্যেও এইরূপ হয়ে থাকে। অভাব ও দারিদ্র্যে প্রেম ধীরে ধীরে স'রে যায়, এ আমি বিশ্বাস করি।"

এবার মীরা আলোচনায় যোগ দিল। বলিল, "এমনও ত মনে করা যেতে পারে যে, প্রেম মরে না, তার বাইরেটা কেবল শুকিয়ে যায়, যেমন উপরের ডাল শুকিয়ে গেলেও কোন কোন গাছের মূল তখনও বেঁচে থাকে।"

হেমন্ত বলিল, "তা হ'লে রস অভাবে মূলকেও এক দিন শুষ্ক হ'তে হবে।"

বিজয় বলিল, "ধর, আমি যদি প্রেমের কোন আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা না ক'রে শুধু বলি, প্রেম মানে গভীর অনুরাগ, তাতে কি ক্ষতি? কারও মনে শরীরের সৌন্দর্য্য দেখে অনুরাগ জাগে, কারও জাগে গান শুনে, কারও বাঁশী শুনে, কারও গল্প বলার শক্তি দেখে। কেউ বা অনুরক্ত হয় কোন অসাধারণ শক্তি বা গুণের পরিচয় পেয়ে। এ সবকেই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় বলতে হয়। কোনটিই ত ইন্দ্রিয়াতীত নয়।"

হেমন্ত বলিল, "তা যদি বল, তা হ'লে প্রথম দর্শনে 'প্রেম' হওয়া বিচিত্র নয়। তোমার প্রেম মানে হচ্ছে সাধারণ অনুরাগ। তবে সঙ্গে সঙ্গে এটাও ভেবে রাখতে হবে যে, এ প্রেম যেমন সহজে এসেছে, তেমনই সহজে চ'লে যেতেও পারে। সে আজই যাক, কালই যাক বা দশ পনেরো বছর পরেই যাক, অবশ্য জীবনভর না যেতেও পারে।"

"সহজে যাবেই, এ কথাই বা তুমি কেন মনে করছ?"

"কেন করব না? প্রেম যদি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পদার্থ হয়, তার সহজে যাওয়া খুবই সহজ। বেলফুল দেখে আমি মুগ্ধ হলাম। পরে গোলাপফুল দেখে একেবারে মূর্চ্ছিত হলাম। তখন বুঝলাম, গোলাপফুলের তুলনায় বেলফুল কিছুই নয়। তা হ'লে তোমার তথাকথিত প্রেমের পরমায়ু আর কতটুকু?"

এবার মীরা বাধা দিয়া বলিল, "আপনাদের এ তত্ত্ব বহুদূর অগ্রসর হয়েছে এবং আরও হয় ত হ'তে পারে। কাযেই এটা এখন বন্ধ রেখে রসনেন্দ্রিয়ের প্রতি একবার দৃষ্টিপাত করলে ভাল হয়। অতএব আমি তারই চেষ্টায় চল্‌লাম।"

মীরা উঠিয়া গেল। হেমন্তও হাত-মুখ ধুইতে গেল। কিছুক্ষণ পরে হেমন্ত ফিরিয়া আসিয়া দেখিল, বিজয় অফিস-ঘরে বসিয়া কায করিতেছে। বিজয়ের ৫।৬ বৎসরের ছেলে আসিয়া টেবিল হইতে একটা কাগজ লইয়া পেন্‌সিল দিয়া তাহার উপরে ২।৪টা কথা লিখিয়া গেল। ক্ষণপরে বৎসর চারেকের ১টি মেয়ে আসিয়া জ্যেষ্ঠের আদর্শ অনুসরণ করিল। বিজয় কাহাকেও কিছু বলিল না। বড়দের দেখাদেখি তাহার ২ বৎসরের ছেলেটি আসিয়া টেবল হইতে একখানা মোটা বই লইয়া সশব্দে নীচে ফেলিয়া দিল। বইটা কুড়াইয়া লইয়া টেবলের উপর রাখিয়া বিজয় হাসিমুখে বলিল, "বই ফেলো না, বাবু।" সে ছেলেমেয়েদের সবাইকে ডাকিয়া কিছুক্ষণের জন্য আপনার কাছে বসাইল, আদর করিল; তার পর প্রত্যেকের হাতে এক একখানি ছোট বই দিয়া বলিল, "যাও, এবার তোমরা খেলা কর গে।"

ছেলেমেয়েরা হাসিমুখে চলিয়া গেল।

হেমন্ত ভাবিতে লাগিল, বিজয় ত ছেলেমেয়েদের কাহাকেও তাড়াইয়া দেয় না; অথচ কাহারও ত আমার চেয়ে কম করে না। সুন্দর মূল্যবান্ পরিচ্ছদ, দাসদাসী এ সব না হয় অর্থাভাবে সে করিতে পারে না; কিন্তু সহিষ্ণু, সদয় ও সস্নেহ ব্যবহার ইহা তো দুর্ল্লভ হওয়া উচিত ছিল না। তাহার নিজের ব্যবহার মনে করিয়া নিজের কাছে নিজেই সে অপরিসীম লজ্জিত হইল। বন্ধুর হাস্যমুখ সুসজ্জিত পুত্রকন্যাদের সহিত তুলনা করিয়া নিজের ম্লানমুখ ছিন্নপরিচ্ছদ সন্তানদিগের স্মরণ করিতে তাহার বক্ষ বেদনায় পীড়িত হইয়া উঠিল। মণিকার কখন কখন অকস্মাৎ রুক্ষ মেজাজ ও কদাচিৎ তীক্ষ্ণবচনের কারণও সে খুঁজিয়া পাইল! সে মনে মনে বুঝিল, রুক্ষভাষণের জন্য মণিকাকে দোষ দেওয়া চলে না!

রাত্রিতে হেমন্ত বন্ধুর সঙ্গে বন্ধুর পুত্রকন্যাবেষ্টিত হইয়া ভোজনে বসিল। বন্ধুপত্নী নিজহস্তে পরিবেষণ করিল। ভোজনাগার হাস্যপরিহাসে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। বন্ধুর প্রদত্ত সস্নেহ সম্মান, বন্ধুপত্নীর মিষ্ট আলাপন, বন্ধুর পুত্র-কন্যাদের সভক্তি ব্যবহার—সবই তাহার মধুর লাগিল। কিন্তু এ সমস্তই তাহাকে ব্যথা না দিয়া ছাড়িল না। তাহার পুত্র-কন্যাদের ম্লান মুখ, সভয় ব্যবহার, মণিকার দুঃখ, বিরক্তি ও কষ্ট তাহাকে আজ সারাক্ষণ ক্লেশ দিতে লাগিল। রাত্রিতে স্বপ্নের মাঝেও পুত্রকন্যার ম্লান মুখ তাহার মনে উঁকি দিতে লাগিল।

পরদিন প্রভাতে সে সকলের নিকট বিদায় লইয়া বাহির হইল। পথে ছেলেমেয়েদের জন্য কিছু ফল ও কিনিয়া লইল। অপরাহ্নের দিকে বাসায় পৌঁছিল। ছেলেমেয়েরা তখন বারান্দায় দাঁড়াইয়াছিল। হয় ত শত অনাদরের মধ্যেও হতভাগ্যরা তাহারই প্রতীক্ষা করিতেছিল। কিন্তু বিজয়ের ছেলেমেয়েদের মত কেহই কলকোলাহলে ছুটিয়া আসিল না। হেমন্ত ভাবিল, ইহাদেরও হয় ত তেমনই চঞ্চলপদে ছুটিয়া আসিতে প্রাণ ফাটিতেছিল; কিন্তু বিরক্তি, তিরস্কার, হয় ত বা প্রহারের ভয়ে তাহারা সে উচ্ছ্বাস দমন করিয়াছিল। কেবল তাহার দ্বিতীয় পুত্রটি—যে তাহার কাছে কম ভর্ৎসনা পাইত, সেই সাহস করিয়া বারান্দা হইতে নীচে নামিয়া আসিল।

হেমন্ত অগ্রসর হইয়া ছেলেটিকে কোলে তুলিয়া লইল। বারান্দায় উঠিয়া তাহার অবশিষ্ট বিস্মিত সন্তানদিগের পৃষ্ঠে ও শিরে সস্নেহ হস্ত রাখিয়া তাহাদিগকে আপনার বসিবার কক্ষে ডাকিয়া আনিল। ছেলেটিকে কোলে করিয়াই সে ফল ও মিষ্টান্নের পাত্র খুলিয়া তাহার এতকালকার অনাদৃত পুত্র-কন্যাগণের হাতে প্রচুর পরিমাণে ফল ও মিষ্টান্ন তুলিয়া দিতে লাগিল। তাহারা দুই হাত ভরিয়া পিতৃদত্ত উপহার পাইয়া বিস্ময় ও হর্ষভরা নয়নে পিতার মুখের পানে চাহিল।

ঠিক সেই সময়ে মণিকা অভিমানভরে ছেলেমেয়েদের ডাকিতে আসিয়া দেখিল, খোকাকে কোলে লইয়া স্বামী স্নেহভরে সকলের মাথায় হাত রাখিতেছেন ও তাঁহার দুই চক্ষু দিয়া অশ্রুধারা গড়াইতেছে।

মণিকার মুখে যে অনুযোগের বাণী আসিতেছিল, এই অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিয়া তাহা মুহূর্ত্তে হারাইয়া গেল। সে ধীরে ধীরে দ্বারান্তরালে আসিয়া আপনার চক্ষু মার্জ্জনা করিল।

শ্রীমাণিক ভট্টাচার্য্য।

মায়াময়ী

জীবনের কোন্ যবনিকান্তরালে
রহিয়াছে সেই মায়াময়ী এক নারী,—
সন্ধান তার মিলিল না কোনোকালে
ক্রন্দন শুধু জাগে চিরদিন তারি।
ইঙ্গিত তার জাগে কভু নীলাকাশে,
সঙ্গীত জাগে পবনের সাত তারে,—
অঙ্গসুরভি ভাসে মাধবীর বাসে
স্নিগ্ধ লাবণী ঝরে জোছনার ধারে।

ঋতুর ছন্দে নন্দিত নব বেশে
জাগে সুন্দরী কোন্ সে মোহিনী রমা,—
মেঘপুঞ্জিত কুঞ্চিত কালো কেশে
প্রান্তর-শ্যাম-অঞ্চলা অনুপমা।
স্বপ্নাবরণে গুণ্ঠিতা মায়াবিনী,
জীবন ছেয়েছে নিবিড় ইন্দ্রজালে,—
অন্তর শুধু কহে যেন তারে চিনি—
সন্ধান তার মিলিল না কোনোকালে।

শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্ত (এম্-এ)।

দ্বিতীয় অধ্যায়

তৃতীয় পাদ

ন বিয়দ্ অশ্রুতেঃ (২।৩।১)

ন বিয়দ্—(আকাশের উৎপত্তি হয় নাই) অশ্রুতেঃ—(কারণ, শ্রুতিতে আকাশের উৎপত্তি উল্লিখিত হয় নাই)।

ছান্দোগ্য উপনিষদে সৃষ্টির বিষয়ে এইরূপ বলা হইয়াছে—"সৎ এব সোম্য ইদম্ অগ্র আসীৎ, একম্ এব অদ্বিতীয়ম্" (৬।২।১) হে সৌম্য, এই জগৎ পূর্ব্বে সৎ (ব্রহ্ম) মাত্র ছিল, সেই একমাত্র সৎ বস্তুই ছিলেন, আর কিছুই ছিলেন না; "তৎ ঐক্ষত" (৬।২।৩) সেই ব্রহ্ম সৃষ্টি করিবেন মনে করিলেন; "তৎ তেজঃ অসৃজত" (৬।২।৩) তিনি অগ্নি সৃষ্টি করিলেন। এখানে প্রথমে অগ্নির সৃষ্টি উল্লেখ করা হইয়াছে। তাহার পূর্ব্বে আকাশের সৃষ্টির উল্লেখ নাই (পরেও নাই)। অতএব আকাশের সৃষ্টি হয় নাই। এই সূত্রটি পূর্ব্বপক্ষ।

অস্তি তু (২।৩।২)

ছান্দোগ্যে আকাশের সৃষ্টির কথা নাই, কিন্তু তৈত্তিরীয় উপনিষদে আছে (অস্তি তু)। ঐ উপনিষদে দেখা যায়—"সত্যং জ্ঞানম্ অনন্তং ব্রহ্ম" (২।১।১) ব্রহ্ম সত্যস্বরূপ, জ্ঞানরূপ এবং অনন্ত; তাহার পর "তস্মাৎ বা এতস্মাৎ আত্মনঃ আকাশঃ সম্ভূতঃ" অর্থাৎ সেই আত্মস্বরূপ ব্রহ্ম হইতে আকাশের উৎপত্তি হইল।

গৌণী অসম্ভবাৎ (২।৩।৩)

তৈত্তিরীয়তে যে আকাশের সৃষ্টি উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা "গৌণী", "অসম্ভবাৎ"—কারণ, আকাশের সৃষ্টি কখনও সম্ভব হইতে পারে না। বৈশেষিক দর্শনে ইহা প্রতিপাদন করা হইয়াছে যে, আকাশের কখনও সৃষ্টি হইতে পারে না, কোন্ বস্তু হইতে আকাশের উৎপত্তি হইবে? আকাশের স্বজাতীয় অন্য কোনও দ্রব্য নাই—যাহা হইতে আকাশের উৎপত্তি হইতে পারে। অতএব লোকে যেমন গৌণভাবে বলে "স্থান কর" (make room), সেইরূপ বেদ গৌণভাবে বলিয়াছেন যে, আকাশের উৎপত্তি হইল। এই সূত্রও পূর্ব্বপক্ষ।

শব্দাৎ চ (২।৩।৪)

শব্দ অর্থাৎ বেদ হইতেও জানা যায় যে, আকাশ "অজ" বা জন্মহীন; সুতরাং আকাশের যে উৎপত্তির উল্লেখ আছে, তাহা গৌণভাবেই বুঝিতে হইবে। বৃহদারণ্যক উপনিষদে আছে—"বায়ুশ্চ অন্তরিক্ষং চ এতৎ অমৃতং" (২।৩।৩) অর্থাৎ বায়ু এবং আকাশ, ইহারা অমৃত। যাহা অমৃত, তাহা অবশ্যই অজ। ইহাও পূর্ব্বপক্ষ।

স্যাৎ চ একস্য ব্রহ্মশব্দবৎ (২।৩।৫)

পূর্ব্বে তৈত্তিরীয় উপনিষদের বাক্য উদ্ধৃত হইয়াছে যে, ব্রহ্ম হইতে "আকাশঃ সম্ভূতঃ" অর্থাৎ আকাশের উৎপত্তি হইয়াছে, তাহার পরেই আছে "আকাশাৎ বায়ুঃ, বায়োঃ অগ্নিঃ, অগ্নেঃ আপঃ, অদ্ভ্যঃ পৃথিবী, পৃথিবীভ্যঃ অন্নম্" ইত্যাদি অর্থাৎ আকাশ হইতে বায়ু সম্ভূত বা উৎপন্ন হইয়াছে, বায়ু হইতে অগ্নি, অগ্নি হইতে জল, জল হইতে পৃথিবী, পৃথিবী হইতে অন্ন ইত্যাদি। এই সকল স্থলে "সম্ভূত" শব্দ গৌণভাবে প্রয়োগ হয় নাই। আকাশ সম্বন্ধে সম্ভূত শব্দ গৌণভাবে প্রয়োগ হইল এবং তাহার পরেই বায়ু, অগ্নি প্রভৃতির সম্বন্ধে মুখ্যভাবে প্রয়োগ হইল, ইহা সঙ্গত কি না সন্দেহ হইতে পারে। কিন্তু এক স্থলেই এক শব্দের গৌণ ও মুখ্য উভয় ভাবে প্রয়োগ হইতে পারে। মুণ্ডক উপনিষদে প্রথম খণ্ডে অষ্টম শ্লোকে আছে—"তপসা চীয়তে ব্রহ্ম" ইত্যাদি, অর্থাৎ "ব্রহ্ম সংকল্প দ্বারা সৃষ্টি করিবার ইচ্ছা করিলেন"; এখানে "ব্রহ্ম" শব্দ মুখ্যভাবে প্রয়োগ হইয়াছে, অর্থাৎ পরব্রহ্মকে বুঝাইতেছে। তাহার পরের শ্লোকে আছে—

যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিদ্ যস্য জ্ঞানময়ং তপঃ।
তস্মাৎ এতৎ ব্রহ্ম নামরূপম্ অন্নং চ জায়তে॥

"যিনি সর্ব্বজ্ঞ এবং সর্ব্ববিদ্, জ্ঞানই যাঁহার তপস্যা, তাঁহা হইতে এই ব্রহ্ম, নাম, রূপ এবং অন্নের উৎপত্তি হয়।"

এখানে ব্রহ্ম শব্দ পরব্রহ্মকে লক্ষ্য করিতে পারে না, হিরণ্যগর্ভ বা চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মাকে লক্ষ্য করিতেছে। সুতরাং এখানে ব্রহ্ম শব্দ মুখ্যভাবে প্রয়োগ করা হয় নাই, গৌণভাবে প্রয়োগ করা হইয়াছে। এক স্থলেই ব্রহ্মশব্দ মুখ্য এবং গৌণভাবে প্রয়োগ করা হইয়াছে। সেই প্রকার তৈত্তিরীয় উপনিষদেও এক স্থলে "সম্ভূত" শব্দ মুখ্য ও গৌণভাবে প্রয়োগ হইতে পারে। এই সূত্রও পূর্ব্বপক্ষ।

প্রতিজ্ঞা-অহানিঃ অব্যতিরেকাৎ শব্দেভ্যঃ (২।৩।৬)

প্রতিজ্ঞা-অহানিঃ—(প্রতিজ্ঞার হানি হয় না), অব্যতিরেকাৎ—(যদি ব্যতিরেক না হয়), শব্দেভ্যঃ—(শ্রুতিতেও ইহা আছে)

এই সূত্রে সিদ্ধান্ত স্থাপন করা হইতেছে। সে সিদ্ধান্ত এই যে, ব্রহ্ম হইতে আকাশের উৎপত্তি হয়। এক ব্রহ্মকে জানিতে পারিলে জগতের সকল বস্তু জানিতে পারা যায়, এইরূপ প্রতিজ্ঞা বেদান্তে বহু স্থলে দেখা যায়। যথা ছান্দোগ্যে—"যেন অশ্রুতং শ্রুতং ভবতি, অমতং মতং, অবিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতং" (৬।১।৩) যাঁহার দ্বারা অশ্রুত বস্তু শ্রুত হয়, অচিন্তিত বস্তু চিন্তিত হয়, অবিজ্ঞাত বস্তু বিজ্ঞাত হয়। বৃহদারণ্যকে আছে—"আত্মনি খলু অরে দৃষ্টে শ্রুতে মতে বিজ্ঞাতে ইদং সর্ব্বং বিদিতং" (৮।৪।৬) অর্থাৎ আত্মাকে দর্শন করিলে, শ্রবণ করিলে, চিন্তা করিলে, জানিতে পারিলে এই সর্ব্বই জানা যায়। মুণ্ডক উপনিষদে আছে "কস্মিন্ নু ভগবো বিজ্ঞাতে সর্ব্বম্ ইদম্ বিজ্ঞাতং ভবতি" (১।১।৩) হে ভগবন্, কাহাকে জানিলে এই সব বিজ্ঞাত হয়? এই প্রতিজ্ঞার "অহানি" অর্থাৎ হানি হয় না। "অব্যতিরেকাৎ" অর্থাৎ যদি ব্রহ্ম ব্যতিরিক্ত কোনও বস্তু না থাকে। বেদে বলা হইয়াছে—এই সবই ব্রহ্ম। সুতরাং বুঝিতে হইবে যে, অগ্নির উৎপত্তি যেরূপ যথার্থ, আকাশের উৎপত্তিও সেইরূপ যথার্থ। তৈত্তিরীয়কে যখন আকাশের সৃষ্টির স্পষ্ট উল্লেখ আছে, তখন ছান্দোগ্যে আকাশের সৃষ্টির উল্লেখ নাই বলিয়া ইহা সিদ্ধান্ত করা যায় না যে, আকাশের সৃষ্টি হয় নাই।

যাবদ্ বিকারং তু বিভাগো লোকবৎ (২।৩।৭)

যে সকল স্থলে একটি বস্তুর সহিত আর একটা বস্তুর বিভাগ বা প্রভেদ দেখা যায়, সেই স্থলে ইহাও দেখা যায় যে, বস্তুগুলি অপর বস্তুর বিকার। বিকার না হইলে বিভাগ হইতে পারে না। আকাশকে যখন পৃথিবী, জল প্রভৃতি হইতে বিভক্ত দেখা যায়, তখন আকাশও অন্য বস্তুর বিকার বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। এই প্রসঙ্গে শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন যে, এরূপ তর্ক করা যায় না যে, আত্মা হইতে যখন আকাশকে বিভক্ত বলিয়া বোধ হয়, তখন আত্মাও অন্য বস্তুর বিকার। কারণ, শ্রুতিতে আত্মার পরে আর কোনও বস্তুর উল্লেখ নাই। আত্মাকে যদি বিকার বলা হয়, তাহা হইলে বলিতে হইবে যে, আত্মা (এবং আকাশাদি সকল বস্তু) শূন্য হইতে উৎপন্ন। ইহাই বৌদ্ধ দর্শনের শূন্যবাদ। অতএব ইহা অশ্রদ্ধেয়। আত্মার অস্তিত্ব কিছুতেই অস্বীকার করা যায় না। যে অস্বীকার করিবে, তাহাকেই আত্মার স্বরূপ বলিতে হইবে। আকাশাদি সকল বস্তু প্রমাণের দ্বারাই সিদ্ধ হয়। আত্মা কোনও প্রমাণের দ্বারা সিদ্ধ হয় না, আত্মা স্বয়ংসিদ্ধ। আত্মা সকল প্রমাণের আশ্রয়। সুতরাং কোনও রূপ প্রমাণ প্রয়োগ করিবার পূর্ব্বেই আত্মার অস্তিত্ব সিদ্ধ হয়। তাহা অস্বীকার করা যায় না। আকাশ দীর্ঘকালস্থায়ী বলিয়া আকাশকে অমৃত বলা হইয়াছে।

এতেন মাতরিশ্বা ব্যাখ্যাতঃ (২।৩।৮)

এতেন—(ইহার দ্বারা), মাতরিশ্বা—(বায়ু), ব্যাখ্যাতঃ—(ব্যাখ্যা হইল)। যে ভাবে আকাশের উৎপত্তি হয়, এই সিদ্ধান্ত স্থাপিত হইয়াছে, সেই ভাবে এই সিদ্ধান্তও স্থাপিত হইবে যে, বায়ুরও উৎপত্তি হইয়াছে।

অসম্ভবস্তু সতঃ অনুপপত্তেঃ (২।৩।৯)

সতঃ—(ব্রহ্মের—উৎপত্তি), অসম্ভবঃ—(সম্ভব নহে) অনুপপত্তেঃ (কারণ, ইহা যুক্তিযুক্ত নহে)।

ব্রহ্ম সৎ মাত্র। তাঁহার উৎপত্তি হইতে পারে কোথা হইতে? যাহা সৎমাত্র, তাহা হইতে ব্রহ্মের উৎপত্তি হইতে

পারে না ; কারণ, যাহা হইতে উৎপত্তি হয়, এবং যাহা উৎপন্ন হয়, উভয়ের মধ্যে প্রভেদ থাকা প্রয়োজন ; উভয়েই সৎ-মাত্র হইলে প্রভেদ হইবে কিরূপে ? সৎ-বিশেষ হইতে সৎ-মাত্রের উৎপত্তি হইতে পারে না। কারণ, সামান্য হইতেই বিশেষের উৎপত্তি হয়, বিশেষ হইতে সামান্যের উৎপত্তি হয় না। অসৎ হইতেও সৎ-মাত্র ব্রহ্মের উৎপত্তি হইতে পারে না। অসৎ (যাহা নাই), তাহা হইতে সৎ-এর উৎপত্তি অসম্ভব। শ্রুতিও বলিয়াছেন—"কথম্ অসতঃ সৎ জায়েত"—অসৎ হইতে কিরূপে সতের উৎপত্তি হইতে পারে ?

তেজঃ অতঃ তথাহি আহ (২।৩।১০)

তেজঃ—(অগ্নি), অতঃ—(বায়ু হইতে উৎপন্ন হইয়াছে) তথাহি আহ (বেদ ইহা বলিয়াছেন)।

অগ্নি বায়ু হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, অথবা স্বতন্ত্রভাবে ঈশ্বর কর্তৃক সৃষ্ট হইয়াছে, ইহা সন্দেহ হইতে পারে। ছান্দোগ্যে আছে—"তৎ তেজঃ অসৃজত" অর্থাৎ ব্রহ্ম অগ্নি সৃষ্টি করিলেন, এজন্য মনে হইতে পারে যে, ব্রহ্ম স্বতন্ত্রভাবে অগ্নি সৃষ্টি করিয়াছিলেন, বায়ু হইতে অগ্নি সৃষ্টি করেন নাই ; তবে যে তৈত্তিরীয়কে বলা হইয়াছে "বায়োঃ অগ্নিঃ", তাহার অর্থ এই যে, বায়ুর পর অগ্নি সৃষ্ট হইয়াছিল। কিন্তু এই সিদ্ধান্ত যথার্থ নহে। প্রথমে বলা হইয়াছে, "আত্মনঃ আকাশঃ সম্ভূতঃ" অর্থাৎ আত্মা হইতে আকাশের উৎপত্তি। এখানে "আত্মনঃ" এই শব্দে অপাদানে পঞ্চমী বিভক্তি হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে পরে বলা হইয়াছে, "পৃথিব্যাঃ ওষধয়ঃ," পৃথিবী হইতে ওষধি, ওষধি হইতে অন্ন ইত্যাদি। এ সকল স্থানেই অপাদানে পঞ্চমী। অতএব মধ্যস্থলে "বায়োঃ অগ্নিঃ" বায়ু হইতে অগ্নি, এখানেও অপাদানে পঞ্চমী। ব্রহ্মই বায়ুরূপে আবির্ভূত হইয়া তাহা হইতে অগ্নি সৃষ্টি করিয়াছিলেন।

আপঃ (২।৩।১১)

ব্রহ্ম অগ্নিরূপে পরিণত হইয়া অগ্নি হইতে জল সৃষ্টি করিয়াছিলেন।

পৃথিবী অধিকাররূপশব্দান্তরেভ্যঃ (২।৩।১২)

ছান্দোগ্যে আছে, "তা আপঃ ঐক্ষন্ত বহ্ব্যঃ স্যামঃ প্রজায়েমহি ইতি তা অন্নম্ অসৃজন্ত" (৬।২।৪) অর্থাৎ সেই জল সংকল্প আলোচনা করিল "বহু হইব, জন্মগ্রহণ করিব," তাহারা "অন্ন" সৃষ্টি করিল। সন্দেহ হয়, এখানে অন্ন শব্দের অর্থ যব গম প্রভৃতি খাদ্যদ্রব্য, না পৃথিবী ? এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত এই যে, এখানে অন্ন শব্দের অর্থ পৃথিবী। "অধিকার-রূপশব্দান্তরেভ্যঃ", অর্থাৎ অধিকার, রূপ এবং অন্য শ্রুতি বাক্য হইতে এই সিদ্ধান্ত করা প্রয়োজন। "অধিকার" এইরূপ। পূর্বোদ্ধৃত বাক্যের পূর্বে অগ্নি এবং জলের সৃষ্টি উল্লিখিত হইয়াছে। সুতরাং এখানে মহাভূত সকলের সৃষ্টির প্রসঙ্গ হইতেছে। সেই প্রসঙ্গে "অন্নের" উৎপত্তি যখন উক্ত হইয়াছে, তখন বুঝিতে হইবে, অন্ন শব্দের দ্বারা একটি মহাভূতকে লক্ষ্য করা হইতেছে, খাদ্যদ্রব্যকে নহে। "রূপ"—পূর্বোদ্ধৃত বাক্যের পরে বলা হইয়াছে, "যৎ কৃষ্ণং তৎ অন্নস্য" অর্থাৎ, জগতে যে কৃষ্ণবর্ণ দেখা যায়, তাহা "অন্নের"। কিন্তু ব্রীহি যব প্রভৃতির বর্ণ কৃষ্ণ নহে। পৃথিবীর বর্ণ কোনও কোনও স্থলে শ্বেত বা লোহিত হইলেও অধিকাংশ স্থলেই কৃষ্ণ। "শব্দান্তরেভ্যঃ", অন্য শ্রুতিবাক্যেও দেখা যায় যে, জল হইতে পৃথিবীর উৎপত্তি হইয়াছে। তৈত্তিরীয়কে আছে—"অদ্ভ্যঃ পৃথিবী" অর্থাৎ জল হইতে পৃথিবীর উৎপত্তি হইয়াছে। বৃহদারণ্যকে আছে, "তৎ যৎ অপাং শর আসীৎ তৎ সমহন্যত সা পৃথিবী অভবৎ"—সেই জলের যে শর ছিল, তাহা কঠিন হইয়া পৃথিবী হইল। এই সকল কারণে বুঝিতে হইবে যে, এখানে অন্ন শব্দের অর্থ পৃথিবী।

তৎ অভিধ্যানাৎ এব তু তৎ লিঙ্গাৎ সঃ (২।৩।১৩)

পূর্বে বলা হইয়াছে, আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে অগ্নি, অগ্নি হইতে জল প্রভৃতির উৎপত্তি হয়। এখানে সন্দেহ হয়—আকাশ, বায়ু প্রভৃতি কি নিজ হইতেই এই সকল বস্তু উৎপাদন করে ? অথবা, ব্রহ্মই আকাশ প্রভৃতি রূপে অবস্থান করিয়া বায়ু, অগ্নি প্রভৃতি সৃষ্টি করেন ? এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত এই যে, ব্রহ্মই আকাশ প্রভৃতিরূপে অবস্থান করিয়া বায়ু প্রভৃতি সৃষ্টি করিয়াছেন। "তৎ অভিধ্যানাৎ" অর্থাৎ ব্রহ্মের সংকল্প হইতেই এই সকল সৃষ্টি হয়। "তৎ লিঙ্গাৎ" সেই প্রকার চিহ্ন বেদে দেখা যায়,—যথা বৃহদারণ্যকে "যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্, পৃথিব্যা অন্তরঃ, যং পৃথিবী ন বেদ, যস্য পৃথিবী শরীরং, যঃ পৃথিবীং অন্তরো যময়তি" (৫।৭।৩) অর্থাৎ যিনি পৃথিবীতে অধিষ্ঠিত হইয়া পৃথিবীর মধ্যে থাকেন, পৃথিবী যাহাকে জানে না, পৃথিবী যাহার শরীর, যিনি

অন্তরে থাকিয়া পৃথিবীকে সংযত করেন। ইহা হইতে বোঝা যায় যে, ব্রহ্ম কর্তৃক অধিষ্ঠিত হইয়াই অচেতন বস্তু প্রবৃত্তিযুক্ত হয়। তৈত্তিরীয়কেও আছে, "সঃ অকাময়ত বহু স্যাং প্রজায়েয়" (২।৬।১) অর্থাৎ তিনি কামনা করিলেন, "বহু হইব, জন্মগ্রহণ করিব"। "সৎ চ ত্যৎ চ অভবৎ" অর্থাৎ (ব্রহ্মই) প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ সকল প্রকার বস্তু-রূপে পরিণত হইলেন।

বিপর্য্যয়েণ তু ক্রমঃ অতঃ উপপদ্যতে (২।৩।১৪)

"বিপর্য্যয়েণ তু ক্রমঃ" (ইহার বিপরীত ক্রম) উপপদ্যতে (ইহা উপপন্ন হয়)।

যে ক্রমে সৃষ্টি হইয়াছে, তাহার বিপরীত ক্রমে প্রলয় হয়। প্রলয়ের উপক্রম হইলে পৃথিবী জলে পরিণত হয়, জল অগ্নিতে পরিণত হয়, অগ্নি বায়ুতে পরিণত হয়, বায়ু আকাশে পরিণত হয়, আকাশ ব্রহ্মে পরিণত হয়। "উপপদ্যতে চ" যে ক্রমে সৃষ্টি হয়, তাহার বিপরীতক্রমে প্রলয় হয়, ইহাই যুক্তিযুক্ত। মৃত্তিকা হইতে ঘট হয়, ঘট ভাঙ্গিলে মৃত্তিকায় পরিণত হয়।

অন্তরা বিজ্ঞানমনসী ক্রমেণ তল্লিঙ্গাৎ
ইতি চেৎ ন অবিশেষাৎ (২।৩।১৫)

"অন্তরা বিজ্ঞানমনসী ক্রমেণ"—উৎপত্তির যে ক্রম বলা হইল, তাহার মধ্যে বুদ্ধি এবং মনের উৎপত্তি হয়, "ইতি চেৎ"—যদি ইহা বলা যায়, "ন"—না, তাহা হয় না; "অবিশেষাৎ"—এইরূপ সিদ্ধান্ত করিবার কোনও কারণ নাই।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, ব্রহ্ম হইতে পঞ্চভূতের উৎপত্তি হইয়াছে। মনে হইতে পারে যে, আকাশ প্রভৃতি পঞ্চভূতের উৎপত্তির পূর্ব্বেই (ব্রহ্ম হইতেই) বুদ্ধি ও মনের উৎপত্তি হইয়াছিল। কিন্তু ইহা যথার্থ নহে। পঞ্চভূত হইতেই বুদ্ধি ও মনের উৎপত্তি হইয়াছে। কারণ, শ্রুতি বলিয়াছেন—"অন্নময়ং হি সোম্য মনঃ" হে সৌম্য, মন অন্নময়, "আপোময়ঃ প্রাণঃ" প্রাণ জলময়, "তেজোময়ী বাক্" বাক্ অগ্নিময়। সুতরাং পঞ্চভূতের উৎপত্তির পরে বুদ্ধি ও মনের উৎপত্তি হইয়াছে।

রামানুজের মতে ব্রহ্ম (বা ব্রহ্মের প্রকৃতি) হইতে মহান্ বা বুদ্ধিতত্ত্ব, মহান্ হইতে অহঙ্কার, তাহা হইতে পঞ্চভূতের উৎপত্তি হয়। তিনি বলেন যে, বর্ত্তমান সূত্রে নিম্নলিখিত শ্রুতিবাক্যের অর্থ বিচার করা হইয়াছে।

এতস্মাৎ জায়তে প্রাণো মনঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি চ।
খং বায়ুঃ জ্যোতিঃ আপঃ পৃথিবী বিশ্বস্য ধারিণী॥
(মুণ্ডক ২।১।৩)

"এই ব্রহ্ম হইতে প্রাণ, মন, ইন্দ্রিয় সকল, আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল, পৃথিবী এই সব উৎপন্ন হইয়াছে।"

মনে হইতে পারে যে, এই বাক্যে ব্রহ্ম হইতে সকল বস্তুর উৎপত্তি উক্ত হয় নাই, কি ক্রমে উৎপত্তি হইয়াছে, তাহাই বলা হইয়াছে। কিন্তু তাহা যথার্থ নহে। এখানে কি ক্রমে উৎপত্তি হইয়াছে, তাহা বলা হয় নাই। সকল বস্তুর উৎপত্তি ব্রহ্ম হইতেই হইয়াছে, ইহাই বলিবার উদ্দেশ্য; কারণ, "এতস্মাৎ জায়তে" অর্থাৎ ইহা হইতে উৎপন্ন হয়, এই বাক্য "অবিশেষে" সকল বস্তুর সম্বন্ধে সংযুক্ত আছে, ইহা বুঝিতে হইবে।

চরাচরব্যপাশ্রয়স্তু স্যাৎ তদ্ব্যপদেশো ভাক্তঃ
তদ্ভাবভাবিত্বাৎ ২।৩।১৬

"তদ্ব্যপদেশঃ" জন্ম ও মরণের উল্লেখ "চরাচরব্যপাশ্রয়ঃ তু স্যাৎ" স্থাবর ও জঙ্গম দেহকে আশ্রয় করিয়া বলা হইবে, "ভাক্তঃ" গৌণ, "তদ্ভাবভাবিত্বাৎ" দেহের প্রাদুর্ভাব ও তিরোভাব হইলে জন্ম ও মরণ শব্দ প্রযুক্ত হয়।

অমুক ব্যক্তির জন্ম বা মৃত্যু হইলে এইরূপ উক্তি সাধারণতঃ প্রচলিত আছে। কিন্তু তাহা হইতে ইহা সিদ্ধান্ত করা যায় না যে, জীবের জন্ম ও মৃত্যু হয়। দেহের সহিত জীবের সংযোগ হইলে বলা হয় যে, জীবের জন্ম হইল। বিয়োগ হইলে বলা হয়, মৃত্যু হইল। জীবের বাস্তবিক জন্ম ও মৃত্যু হয় না, জন্ম ও মৃত্যু গৌণভাবে প্রয়োগ করা হয়।

ন আত্মা অশ্রুতেঃ নিত্যত্বাৎ চ তাভ্যঃ (২।৩।১৭)

"ন আত্মা"—জীব ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হয় নাই। "অশ্রুতেঃ"—শ্রুতিতে ইহা উল্লিখিত হয় নাই। "তাভ্যঃ"—ঐ শ্রুতিবাক্য হইতে, "নিত্যত্বাৎ চ"—জীবের নিত্যত্ব জানা যায়।

শ্রুতিতে কোনও কোনও বাক্য হইতে মনে হইতে পারে যে, জীব ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। যথা, "যথা

প্রদীপ্তাৎ পাবকাৎ বিস্ফুলিঙ্গাঃ সহস্রশঃ প্রভবন্তে সরূপাঃ, তথা অক্ষরাৎ বিবিধাঃ সোম্য ভাবাঃ প্রজায়ন্তে তত্র চৈবাপি যন্তি" (মুণ্ডক ২।১।১) যেরূপ সুদীপ্ত অগ্নি হইতে সহস্র সহস্র সমানজাতীয় বিস্ফুলিঙ্গ উৎপন্ন হয়, সেইরূপ অক্ষর ব্রহ্ম হইতে বিবিধ বস্তু উৎপন্ন হয় এবং অক্ষরেই তাহারা বিলীন হয়। এখানে সমানজাতীয় বস্তুর উৎপত্তি উল্লিখিত হইয়াছে, এ জন্য মনে হইতে পারে যে, জীবের উৎপত্তি লক্ষ্য করা হইয়াছে। কারণ, জীব ও ব্রহ্ম উভয়েরই চৈতন্য আছে, এ জন্য উভয়কে সমানজাতীয় বলা যায়। কিন্তু শ্রুতিতে বহু স্থলে যখন সুস্পষ্ট উল্লেখ আছে যে, জীবাত্মার উৎপত্তি নাই, বিনাশ নাই, তখন এই বাক্য হইতে অনুমানের সাহায্যে সিদ্ধান্ত করা উচিত হয় না যে, জীবের উৎপত্তি আছে। বুঝিতে হইবে যে, এই বাক্যে "ভাব" শব্দে জীবকে লক্ষ্য করা হয় নাই, অন্য পদার্থকে লক্ষ্য করা হইয়াছে, তাহাদের সহিত ব্রহ্মের কোনও সাদৃশ্য আছে বলিয়া "সরূপা" বলা হইয়াছে। সাদৃশ্য এইরূপ, ব্রহ্মের সত্তা আছে, এই সকল পদার্থেরও সত্তা আছে। নিম্নোদ্ধৃত শ্রুতিবাক্যগুলিতে স্পষ্টভাবে বলা হইয়াছে যে, জীবের উৎপত্তি ও বিনাশ নাই ;—ন জীবো ম্রিয়তে (ছান্দোগ্য ৬।১১) জীবের মৃত্যু নাই ; ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চিৎ (কঠ ২।১৮),—বিদ্বানের জন্ম ও মৃত্যু নাই : অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণঃ (কঠ ২।১৮) জীবের জন্ম নাই, জীব নিত্য ও চিরস্থায়ী। প্রশ্ন হইতে পারে, জীব যদি ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন না হয়, তাহা হইলে ব্রহ্মকে জানিলে সকল পদার্থ কিরূপে জানা হইবে? ইহার উত্তর এই যে (শঙ্করের মতে), জীব ও ব্রহ্ম অভিন্ন।

এই সূত্র রামানুজ ভিন্ন প্রকারে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাঁহার মতে জীব ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হয় না বটে, কিন্তু জীব ব্রহ্মের বিকার। প্রলয়ের সময় জীবের জ্ঞান সঙ্কুচিত থাকে এবং জীব ব্রহ্মের সহিত এক হইয়া থাকে। প্রত্যেক জীবের একটা বিশিষ্ট নাম ও রূপ আছে, সেই নাম এবং রূপের দ্বারা প্রত্যেক জীবকে ব্রহ্ম হইতে ভিন্নভাবে নির্দ্দেশ করা যায়। কিন্তু প্রলয়ের সময় নাম ও রূপ ধ্বংস হইয়া যায়, সুতরাং জীবকে ব্রহ্ম হইতে পৃথক বলিয়া নির্দ্দেশ করিবার কোনও কারণ থাকে না। এ জন্য শ্রুতি বলেন যে, প্রলয়ের সময় জীব ব্রহ্মের সহিত এক হইয়া থাকে। সৃষ্টির সময় জীবের জ্ঞান-বিকাশ হয়,—কর্ম্মফল ভোগ করিবার জন্য যতটুকু জ্ঞানের বিকাশ প্রয়োজন, ততটুকু বিকাশ হয়। এই ভাবে জীবকে ব্রহ্মের বিকার বলা যায়, এবং এ জন্য ইহাও বলা যায় যে, ব্রহ্মকে জানিলে সবই জানা যায়, "সর্বম্ ইদম্ বিজ্ঞাতং ভবতি"। জীব ও জগৎ ব্রহ্মের শরীর, ব্রহ্ম তাহাদের আত্মা। অচেতন জগতের বিকার এবং সচেতন জীবের বিকার, উভয়ের মধ্যে কিছু পার্থক্য আছে। প্রলয়ের সময় আকাশ প্রভৃতি অচেতন পদার্থ একবারেই থাকে না, সৃষ্টির সময় সেই সকল পদার্থের আবির্ভাব হয়। কিন্তু জীবের সেরূপ উৎপত্তি হয় না। প্রলয়ের সময় জীবের জ্ঞান সঙ্কুচিত থাকে, সৃষ্টির সময় সেই জ্ঞান কিছু বিকাশ পায়, এই পর্য্যন্ত। জগৎ,—অচেতন এবং ভোগ্য ; জীব—চেতন এবং (সুখ-দুঃখের) ভোক্তা ; ব্রহ্ম—চেতন, কিন্তু সুখ-দুঃখভোক্তা নহেন, তিনি জীব ও জগতের নিয়ন্তা। তাঁহার স্বরূপের কখনও পরিবর্ত্তন হয় না। কিন্তু তাঁহার শরীর (জীব ও জগৎ) সৃষ্টির সময় একরূপ অবস্থায় থাকে, প্রলয়ের সময় তাহার অবস্থা ভিন্ন হয়। প্রলয়ের সময় জীব ও জগৎ সূক্ষ্মদশা প্রাপ্ত হয়, নাম ও রূপ থাকে না, এ জন্য ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন বলিয়া নির্দ্দেশ করিবার যোগ্যতা থাকে না। সৃষ্টির সময় জীব ও জগৎ স্থূলদশা প্রাপ্ত হয়, নাম ও রূপ থাকে, তখন তাহাকে ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। ইহাই বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের সিদ্ধান্ত।

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় (এম-এ)।
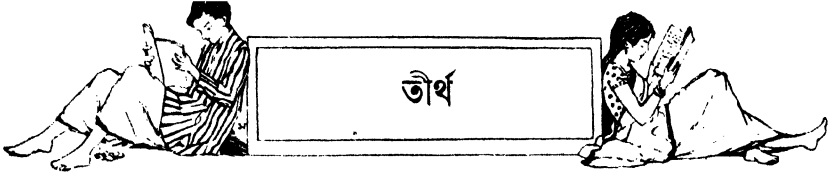
তীর্থ

বড়দিনের ছুটীতে এবার কোথায় যাওয়া হইবে, অপ্রকাশ এখনও ঠিক করিয়া উঠিতে পারে নাই। রবিবার আহারের পর দ্বিপ্রহরে, ইজিচেয়ারে পা ছড়াইয়া তাই খোলা জানালার ভিতর দিয়া গঙ্গার দিকে চাহিয়া ভাবিতেছে: ছুটী প্রায় আসিয়া পড়িল, আর ঠিক না করিয়া ফেলিলে চলে না। অথচ অন্যবার কত আগেই ঠিক হইয়া যায়। ছোট ছেলে বিশু চেয়ারের হাতাটা ধরিয়া হাঁটি হাঁটি পা-পা করিয়া চলিবার চেষ্টা করিতেছে। তাহাকেই শেষে জিজ্ঞাসা করা হইল, "কোথা যাবি রে, বিশু? তোর মা এক যায়গায় যেতে চায়, পিসীমা আর এক যায়গায় যেতে চায়, তোর দাদারা কলকাতা ছাড়া যাবেই না বলে, এখন কি করি বল্ ত। কোন্ দিকে যাবি?"

বিশু শুধু হাসিয়া বলিল,"হামি যাব—যাব—যাব উই," তাহার ছোট ছোট কচি আঙ্গুল দেখাইয়া দেয়—গঙ্গার তীরে ঘাটের উপর ক'টি বাঙ্গালী যাত্রীর দিকে। বোধ হয়, কোন সুদূর বাঙ্গালার পল্লীর লোক, কাশী আসিয়াছে বিশ্বনাথ দর্শন করিতে, এখন গঙ্গাস্নান করিয়া উঠিতেছে। দেখিলেই মনে হয়, নিতান্ত গ্রাম্য কয়েকটি স্ত্রীপুরুষ,—অনাড়ম্বর, সরল, সাধারণ জীবনযাত্রার ছাপ চোখে-মুখে মাখা। কাশীর যা কিছু দেখিয়াই যেন দৃষ্টি বিস্ময়ে পুলকে মুগ্ধ। মেয়ে ক'টির মুখে শান্ত, স্নিগ্ধ একটি সহজ ভাব, যেন বাঙ্গালার মাটী বাঙ্গালার জলে মূর্ত্তি গড়িয়া প্রাণপ্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে। কাশীর মন্দিরে মন্দিরে, ঘাটে ঘাটে এমন ত কতই দেখা যায়!

অপ্রকাশ পুত্রকে বলিল,—"ওরা যে আমাদের বাঙ্গালা দেশের লোক বিশু, কলকাতার ত নয়। ওদের কাছে পাড়াগাঁয়ে কি যাওয়া যায়? সেখানে বাড়ী নেই, ঘর নেই, দোকান-পাট নেই—জল-হাওয়া বিশ্রী।"

বলিতে বলিতে অপ্রকাশ থামিয়া গেল। শ্যামবর্ণ, শান্ত, সুচেহারা একটি প্রৌঢ়া স্ত্রীলোক দুই হাত যোড় করিয়া, স্নান করিয়া ঘাটের উপর দাঁড়াইয়া সূর্য্য-বন্দনা করিতেছেন, নজরে পড়িল। অত যে ঘাটে লোক, কিন্তু তাঁহার যেন সে চৈতন্য নাই। সবই তাঁহার যেন মুছিয়া গিয়াছে। কেবল গঙ্গার উপরে যে তাঁহার ইষ্ট-দেবতা তাঁহার পূজা লইবার জন্য দাঁড়াইয়া,—এই সম্বিৎটুকু আছে মাত্র।

অপ্রকাশের আর বসিয়া থাকা হইল না। সে উঠিয়া জানালার কাছে গিয়া দাঁড়াইল। এমনই যেন সে কবে কোথায় দেখিয়াছে। অন্তরের অন্তস্তল আলোড়িত হইয়া উঠিল। স্মরণে তাহার মাথা ভক্তিতে, শ্রদ্ধায়, সম্ভ্রমে নত হইল। মনের মধ্যে যেন কত দিন পরে আজ আবার একটি পুরান ঘরে, প্রদীপ জ্বালিয়া, বড় পুরান পরিচিত মানুষ প্রবেশ করিল। এই আধা-বয়সী স্ত্রীলোকটির সঙ্গে যেন তাঁহার সাদৃশ্য আছে, অমনই কালো কোমল চেহারা, অমনই তন্ময় তদ্গত ভাব।

অপ্রকাশ বিশুকে কোলে তুলিয়া, সেই স্ত্রীলোকটিকে দেখাইতে লাগিল, বলিল, "ঐ মায়ের বাড়ী যাবে,—না বিশু?"

শিশু নিজের খেয়ালে সমর্থন পাইয়া খুসী হইয়া বলিল, "বাবা যাব, বাবা যাব—উই মা যাব।"

পাণ হাতে উত্তরা ঘরে ঢুকিয়া দেখিল, বলিল,—"বাপ-বেটায় কি পরামর্শ হচ্ছে? কোথায় বিশু যাবে?"

পত্নীর দিকে চাহিয়া অপ্রকাশ কহিল, "বিশু হুকুম করেছে, এবার বাঙ্গালা দেশে যেতে হবে আমি ত মত দিয়েছি।"

উত্তরা ছেলের মাথায় আদরের চাটি মারিয়া বলিল, "আর মামার বাড়ী বুঝি যেতে হবে না, বিশু? সেই যে দিদিমা মামা মামী। কেমন বিশু, সেখানে যাবে ত?"

বিশু ঘাড় নাড়িয়া চোখ বড় বড় করিয়া বলিল,—"না না।"

"ঐটুকু ছেলে—বুদ্ধি দেখ। এরি মধ্যে কলকাতার বায়না নিতে শিখেছে। দাদা-দিদির দলে যোগ দেওয়া

হচ্ছে। তুই কি বুঝিস বল্ ত। কলকাতার কোন্ মজাটা তুই জানিস?"

অপ্রকাশ বলিল,—"বিশু বাঙ্গালায় যেতে চাইছে, কলকাতায় নয়।"

"ও মা—কলকাতা আবার বাঙ্গালা নয় কি গো? আমরা পশ্চিমে লোক ব'লে কি বুঝি না কিছু,—কলকাতায় কত বার গেছি,—প্রায় তিরিশ বছর বয়সই যে হ'ল। বলা হচ্ছে—কলকাতা বাঙ্গালা নয়—। কলকাতাই বাঙ্গালার মাথা।' আর যা সব, সে না থাকলেই ভাল ছিল,—কেবল ম্যেলেরিয়া, জ্বরজারি—সাপ-ব্যাং—হিন্দু-মুসলমানের ঝগড়া-ঝাঁটি আর নিজেদের গাঁয়ের দলাদলি,—পড় নি সেই শরৎবাবুর পল্লী-সমাজ?"

—"হয় ত সেটা তুমি ঠিক বুঝতে পার নি। হয় ত ঐ দলাদলি, দৈন্য-দুঃখের গরল এক হাতে, আর এক হাতে স্নেহের মমতার শ্রদ্ধার অমৃত নিয়ে বাঙ্গালার প্রাণ তার পল্লীর মধ্যেই প'ড়ে আছে। আজ সেই পল্লীর মায়েদের কথাই আমার মনে হচ্ছে। এই দূর-বিদেশেও সেই মায়েরই যত্নে, স্নেহে জীবনটা যে বেঁচে আছে, মনে পড়ছে।"

—"বেশ বেশ, এখন তুমি কাব্যি চর্চ্চা কর, আমি যাই। আমি ত কবিতাও নই, রূপসী পল্লীবাসিনীও নই, আমায় আর এখন কি দরকার? অতই যখন সাধ হয়েছে, একবার কলকাতায় নিয়ে গিয়ে তোমায় বাঙ্গালার পাড়াগাঁর রূপ দেখিয়ে আনব'খন। আমরা সেবার ত ডায়মণ্ডহারবার পর্য্যন্ত গেছলুম,—নেহাৎ মন্দ নয়। নদীগুলো বেশ চওড়া; রাস্তা আমাদের এখানকার মাঝামাঝি রকমের চেয়ে একটু নিরেশ, তবে মোটর চলে—।"

—"আমি বলছিলুম যে, তোমাদের লক্ষ্ণৌয়ে যাবার ব্যবস্থা ক'রে দিয়ে, আমি না হয় দিদিকে কলকাতায় পৌঁছে দিয়ে, দুচার দিন কোন একটা সত্যি পাড়াগাঁয়ে নিরিবিলিতে বেড়িয়ে আসি। কখনও যাইনি। এমনি একটি যায়গার কথা অনেক দিন শুনেছি, মনে পড়ছে, সেটা বেশী দূর নয় কলকাতা থেকে।"

—"আচ্ছা, তোমার আজ হলো কি? এত দিন বিয়ে হয়েছে, কত বার আমি এখানে ওখানে যেতে বলেছি, কখনও ত যেতে পারনি। আজ এমন ছটফট করছ কেন? কি অপরাধই বা করলুম আমরা যে, বাপের বাড়ী পাঠিয়ে নিজে নির্ব্বাসনে যেতে চাইছ?"

শীতের সমাগমে উত্তরার রূপ স্বাস্থ্যে ও সৌন্দর্য্যে ঝলমল করিতেছিল। এই পরিণত বয়সেও স্বামীটি যে একবারে তাহার আঁচলে বাঁধা, উত্তরা ভালই জানিত। অপ্রকাশের হাত ধরিয়া উঠাইয়া, বিছানার কাছে আনিয়া বলিল,—"তুমি একটু শোও দেখি। আমি কাছে ব'সে খোকাকে ঘুম পাড়াই। জান ত উপরওয়ালার নিয়ম; সেখানে যাওয়া হয় না হয়, পরে ঠিক করব'খন।—ও মা, তোমার চোখ চক্‌চক করছে যে। শরীর খারাপ হ'ল না কি? নাম করতেই জ্বর আসছে বোধ হয়। এমনি লোক—বাঙ্গালা-দেশের পাড়াগাঁয়ে না গেলে চলবে কি ক'রে?"

ব্যস্ত উদ্বেগে উত্তরা স্বামীর কপালে বুকে হাত দিয়া দেখিল, কিন্তু কোথাও গরম টের না পাইয়া আশ্বস্ত হইল। নিজের অত্যুগ্র আশঙ্কা প্রকাশ করিয়া একটা দুর্ব্বলতা দেখাইয়া ফেলিয়াছে, তাই যেন নিজেরই কাছে একটা জবাব-দিহি করিতে হয় ভাবিয়া বলিল,—"আজ আর বেলায় ঘুমিয়ো না বাবু। সত্যি যদি এই বড়দিনের আগে জ্বর হয়, ভারী মুস্কিল। পূজায় ত কোথায় বেরুবার জো নেই। রাজ্যের আত্মীয়-স্বজন এখানে এসে জড় হন! এই বড়দিনে যা কোথাও যাওয়া-আসা।"

এইবার জানান উচিত, এই দম্পতিটি কাশীর এক বিখ্যাত বাঙ্গালী পরিবারের। অপ্রকাশের পিতামহ সিপাই-বিদ্রোহের আমলে সরকারী কাযে এখানে আসিয়া সুবিধামত এই অঞ্চলে জমিদারী করিয়া গিয়াছেন। কন্যা অনেকগুলি ছিল, সকলেরই তিনি এ অঞ্চলের বাঙ্গালী পরিবারে বিবাহ দিয়াছিলেন; কিন্তু একমাত্র পুত্র শিবচন্দ্রের বিবাহ কলিকাতায় দিয়া বাঙ্গালার সহিত সম্পর্ক রাখিয়াছিলেন। বৃদ্ধ সুরসিক ছিলেন, বলিতেন, "শেষে কি নাতী-নাতনীর নামগুলো পর্য্যন্ত ছাতুর দেশে মিশিয়ে যাবে? এক বাঙ্গালীর বিয়েতে গিয়ে,—অযোধ্যায় গিয়ে শুনি, পাত্রের নাম দিল-মোহন, পাত্রীর নাম শ্যাম-কুমারী, উচ্চারণে আবার কোঙারী! আমার বংশের ছেলেদের সব বিয়ে বাঙ্গালা দেশে দিতে হবে!" তাঁহার সে সাধ পূর্ণ হয় নাই। অপ্রকাশের পিতা শিববাবুর দ্বাদশটি পুত্রকন্যা; তাহার মধ্যে কেবল একটি ছেলে ও দুটি মেয়ের

বিবাহ তিনি কলিকাতায় দিয়াছিলেন। পশ্চিমের সহিত সম্পর্ক, বিহার ও যুক্তপ্রদেশবাসী বাঙ্গালী পরিবারের ভিতর দিয়া যেমন বাড়িতেছিল, বাঙ্গালার সহিত যোগ তেমনই কমিয়া আসিতেছিল। ছেলেমেয়েরা সকলেই কাশীতে মানুষ হইয়াছিল, পড়াশুনাও সেইখানেই করিয়াছিল, ছেলেবেলায় কখনও বা মামার বাড়ী যাইত। বড় হইয়া কাযে বা সখ করিয়া বেড়ান ছাড়া কলিকাতায় যাওয়ার কোন আবশ্যক ছিল না। তবে ধনী পরিবার তীর্থস্থানে থাকায় কোন কোন আত্মীয়-কুটুম্ব মাঝে মাঝে তাহাদের বাড়ী উঠিতেন। ছেলেমেয়ের বিবাহের সময় এক আধবার নিমন্ত্রণ করিতে হয় ত কলিকাতায় তাঁহাদের খোঁজ লওয়া হইত। তা ছাড়া বাড়ীতে পুরাতন দাসী ও চাকর দু' একটি ছিল, যাহারা বাঙ্গালার সহিত বন্ধন একবারে লুপ্ত হইতে দেয় নাই।

উত্তরারও বাপের বাড়ী লক্ষ্ণৌয়ে সেখানেও তাহার জন্ম; তাহাদের পরিবারও এই অঞ্চলে প্রাচীন এব বাঙ্গালার সহিত সম্বন্ধ তাহারও বড় বেশী নয়। উত্তর-ভারতের আবহাওয়া, শিল্প-কলা, গান-বাজনা, স্বাস্থ্য-সৌন্দর্য্য তাহার ভিতর যেন মূর্ত্তি পাইয়াছে; তাই নামটা ঠিকই মানাইয়াছিল। কেবল বেশভূষা ও কথাবার্ত্তায় উত্তরা বাঙ্গালী। তবে সাহিত্যের মধ্যে ও কলিকাতার ভিতর দিয়া, বাঙ্গালীর মনের সঙ্গে সামান্য পরিচয় ছিল। বিবাহের পর এই পরিচয়টি প্রখর হইয়া উঠিয়াছে তাহার স্বামী অপ্রকাশকে লইয়া। সে টের পাইয়াছে যে, 'স্বামীটি নেহাৎ বাঙ্গালী এবং এই বলিয়া মাঝে মাঝে ঠাট্টাও করে অপ্রকাশকে।

প্রকৃতই শিববাবুর অন্য কয় ছেলে দেখিয়া, অপ্রকাশকে কেহ তাহাদের ভাই মনে করিতে পারে না। না আছে তাহার সেই বিশাল বপু, না সেই হিন্দী বুলি, না সেই পশ্চিমা মেজাজ। কোথা হইতে যেন একটু বাঙ্গালার জল-হাওয়া এই হিন্দুস্থানীর দেশেও তাহার মুখে-চোখে নিজস্ব ছাপ মারিয়া দিয়াছে। বাঙ্গালীর সৌকুমার্য্য অপ্রকাশের দেহ-মনে যেন বড় স্পষ্ট ফুটিয়া উঠিয়াছে। যে পর্য্যন্ত না তাহার বিদ্যা-বুদ্ধির পরিচয়ে বড় বড় হিন্দুস্থানী রাজা-মহারাজও মামলার খাতিরে তাহার কাছে আনাগোনা করিতে লাগিল, এই সূক্ষ্মবুদ্ধি সূক্ষ্মশরীর লোকটিকে এই পরিবারের এক জন হিসাবে সকলেই একটু অবজ্ঞার দৃষ্টিতেই দেখিত। সকলের এই ভাবটা দেখিয়া প্রথমে অপ্রকাশ নিজেও নিজের উপর বিশ্বাস কমই রাখিত। পাঁচ ভাই-ই তাহার চেয়ে অনেক বড় ছিল। এমন কি, দু' চারটি ভাইপো বয়সে প্রায় তাহার সমান ছিল। তাই দাদাদের কাছে, উকিল ও লিখিয়ে-পড়িয়ে হিসাবে ছাড়া, অপ্রকাশ কোন পাত্তা পায় নাই। দিদি ও বৌদিরা কেহই তাহার সমবয়সী ছিল না। সকলে যে তাহাকে কোলে-পিঠে করিয়া মানুষ করিয়াছে, সেই কথাই অপ্রকাশ শুনিত। যখন উত্তরা প্রথম আসিল, অপ্রকাশ ভাবিল, এইবার স্ত্রীর নিকট হইতে সে তাহার ন্যায্য সম্মান পাইবে। উত্তরার প্রেম সে পাইল বটে, কিন্তু এমনই বাড়ীর আবহাওয়া যে, স্বামীর সম্মান তাহার নিকটও অপ্রকাশ পর্য্যাপ্ত পরিমাণে পাইল না। অল্পদিনের মধ্যেই সে স্ত্রীর মুখে শুনিল, "তুমি মেয়েমানুষ হয়ে জন্মালে, আর আমি পুরুষ হলেই তবে নেহাৎ যখন আমার হাতে পড়েছ, তখন একবারে আটকাবে না। চালিয়ে নেব কোন রকমে।"

সেই হইতে উত্তরা চালাইয়াই আসিতেছে এবং অপ্রকাশ চলিয়াই আসিতেছে। স্বামী যে দেখিতে সাবালক, লোকের মুখে শুনিতে বুদ্ধিমান ও কার্য্যত বিশেষ উপায়ক্ষম হইয়াও নাবালকের অধম, ইহাই উত্তরার স্থির ধারণা। তবে ভাজেরা যখন আড়ালে জানায় যে, এ বাড়ীর ঐ রকম মেনী-মুখো পুরুষ আর দুটি নাই, তখন স্বামীর মনটি যে বড় দুর্ব্বল স্মরণ করিয়া মাঝে মাঝে সে অপ্রকাশকে অনুযোগ করে। কিন্তু স্বামীর পত্নী-নিষ্ঠার সহিত কোথাও যে এই নেহাৎ বাঙ্গালী রকমের দুর্ব্বলতার একটা যোগ আছে, এইটুকু বুঝিয়া সে অপ্রকাশকে ক্ষমা করিয়াছে।

রূপে, ঐশ্বর্য্যে, গর্ব্বে উত্তরা ইন্দ্রাণীর মত মাথা উঁচু করিয়া চলে। আজও যে আহারে বসিয়া মেজ যাকে সে কথা দিয়াছে যে, লক্ষ্ণৌয়ের পথে বড় দিনের সময় অপ্রকাশ তাহাদের সকলকে এলাহাবাদ পৌঁছাইয়া দিবে। বিধবা মেজ যা আশ্বস্ত হইয়াছেন, এতগুলি টাকা বাঁচিয়া যাইবে,—অপ্রকাশ কিছু খরচের জন্য হাত পাতিবে না। উত্তরার নিজেরও বৃদ্ধা মা আছেন, ভাই ভাজ সব আছে,—অবস্থা পড়িয়া গিয়াছে। অপ্রকাশ যাইলে সকলেই কত

খুশী হইবে এবং অপ্রকাশও কিছু তাহাদের শুধু হাতে দেখিতে যাইবে না। হঠাৎ কোথায় কি হইয়া যাইতেছে, স্বামীর যাওয়া-আসার উপর আগ্রহ কি করিয়া উত্তরার কম হইতে পারে? তবে উত্তরার নিজের উপর বিশ্বাস অসীম। তাহার তূণে যে নানা রকম বাণ আছে, সহজে যে অপ্রকাশ কিছু করিতে পারিবে না, এ বিষয়ে উত্তরা নিঃসন্দেহ। ভাবিল, আগে খোকাটাকে ঘুম পাড়িয়ে দি—তার পর ওঁকে বশ করছি।

ইতিমধ্যে অপ্রকাশ আর স্থির থাকিতে পারিল না। উঠিয়া বলিল, "একবার ই-বি-আরএর টাইম-টেবলটা আনতে লোক পাঠিয়ে দিই গে। আমাদের এখানে নেই। ষ্টেশন থেকে নিয়ে আসুক।"

উত্তরা এবার সত্যই চটিয়া উঠিল; বলিল, "যা খুসী কর গে। এখনও তিন দিন দেরী—এখনি টাইম-টেবিল না পেলে আর যাবার সময় হবে না? সাত দিন পরে ত একটি দিন ছুটী পাও। একটু ব'সে যে কথা বল্‌ব, শুনবে—তারও উপায় নেই। সব সময়ই তাড়াহুড়ো আর লোক লেগেই রয়েছে। রাত্রে এমন হয়ে বিছানায় পড় যে, দুটো কথা বলতেও মায়া হয়; ভাবি, ক্ষীণজীবী লোক—সারাদিন খাটে—এখন একটু ঘুমোক। এখুনি ভাল মানুষের মত শোও—বলছি; আমার অনেক দরকারী কথা আছে। আমি বরং দাইয়ের কাছে খোকাকে দিয়ে আসি। একসঙ্গে আর ক'জনকে সামলাই—"

প্রতিবাদে ফল হইবে না জানিয়া অপ্রকাশ চাদর মুড়ি দিয়া বিছানায় শুইয়া পড়িল। উত্তরা ছেলেকে রাখিয়া আসিয়া স্বামীর পাশে আড় হইয়া শুইয়া বলিল, "কি মতলব খুলে বল ত। হঠাৎ কি এমন বাঙ্গালা দেশের টান ধরল, আর ই, বি, রেলের টাইম-টেবিল দরকার হ'ল? আমায় লুকিয়ে লুকিয়ে বুঝি কিছু করা হচ্ছে। আগে ত বলনি কোন দিন। আমি কিন্তু ব'লে রাখছি, যদি বাঙ্গালা দেশে যাও—আড়ি—আড়ি—আড়ি। এত দিন দেখছ,—চেন না যে তাও নয়।"

অপ্রকাশ পাশ ফিরিয়া অন্যদিকে মুখ করিয়া শুইল। এই উত্তরার জিদ যে সহজে কাটান সম্ভব হইবে না, সে ভালই বুঝিত। কিন্তু এখন আর তাহার স্ত্রীর সহিত কথা কাটাকাটি করিয়া মান-অভিমানের পালা তুলিবার ইচ্ছা ছিল না। বহু দূরের যে স্মৃতি আজ তাহার মনে হঠাৎ জাগিয়া উঠিয়াছে, নির্জ্জনে সে সেই স্মৃতির আলোকে নিজেকে দেখিতে চাহিতেছিল। টাইম-টেবলের ছুতায়, সেই নির্জ্জনতার সন্ধানই সে নিজের অজ্ঞাতে পাইতে চেষ্টা করিতেছিল। চোখ বুজিয়া অপ্রকাশ অসাড় হইয়া শুইয়া ভাবিতে লাগিল, হঠাৎ কি করিয়া তাহার মনের ঘড়ি আজ ত্রিশ বৎসর পিছাইয়া গেল।

এত বড় পরাজয় উত্তরার আর মনে পড়ে না। তাই স্বামীর খেয়ালে সে অত্যন্ত বিচলিত হইয়া উঠিল। বড় আদর, বড় সোহাগ বরাবর পাইয়া সে কখনও ভাবিতেই পারিত না যে, অপ্রকাশ তাহার কথা কাণে পর্য্যন্ত তুলিবে না। কোথায় সে চিরপরিচিত বিজয়ের আশায় বুক বাঁধিয়া বসিয়া আছে; এখন পুরান ঠাট্টা করিয়া অপ্রকাশের পরাজয়ে হাসিবে,—আর স্বামী এমন অসাড়, উদাসীন হইয়া শুইয়া আছে, তাহাকে একটা কথা পর্য্যন্ত বলা দরকার মনে করিতেছে না।

ধীরে ধীরে উঠিয়া উত্তরা শয্যা হইতে নামিল। কাঁদিতে পারিলে বোধ হয় তাহার মনে সান্ত্বনা আসিত। কিন্তু এত দিন বিবাহ হইয়াছে, চোখের জল ফেলিয়া কখনও যে সে দুর্ব্বলতা দেখায় নাই; আজই কি সে কাঁদিয়া জিতিবে? রাগে ক্ষোভে দরজাটা সশব্দে খুলিয়া চলিয়া যাইতেছে, এমন সময় শুনিল স্বামী ডাকিতেছেন। এই অবস্থায় অন্য দিন অনেক সাধ্য-সাধনার পর সে স্বামীকে মার্জ্জনা করিত। কিন্তু আজ অপ্রকাশের গলায়—কি যেন তাহার কাণে বাজিল,—উত্তরা আর স্থির থাকিতে পারিল না। ছুটিয়া আসিয়া স্বামীর পায়ে হাত রাখিয়া বলিল, "তোমার কি হয়েছে, বল আমায়। আমার কেমন ভয় হচ্ছে।" ভালবাসার সত্য দৃষ্টিতে সে টের পাইয়াছে, স্বামীর বুকে যেন কোথায় ব্যথা।

অপ্রকাশও পত্নীর এই বিহ্বলতা দেখিয়া তাহাকে যেন অনেক নিকটে পাইয়া বলিল, "তুমি আজ একটু আগে যে কথা জিজ্ঞাসা করছিলে, আমি নিজেকেও এতক্ষণ সেই কথা প্রশ্ন করছিলুম বলেই তোমায় তখনি বলতে পারিনি। জবাব পেয়েছি কি না, জানি না। যতটা মনে পড়ছে বলি, সব শুনে যদি ইচ্ছা হয়, আমায় যেতে দিও।

"এটা বোধ হয় জান যে, আমার জন্মের আগে মা'র অনেক ছেলে-মেয়ে ছিল,—আমি শুধু সকলের কনিষ্ঠ নয়;

সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত। দিদিদের বিয়ে হয়ে গেছে, দাদাদের বিয়ে হয়ে গেছে, ভাগ্নে ভাগ্নী আগেই হয়েছে, ভাইপো ভাই-ঝিরও সম্ভাবনা হচ্ছে, এই অবস্থায় প্রায় আট বছর অব্যাহতির পর যখন আমার জন্মের সম্ভাবনা হ'ল, শুনেছি, সে সময় মা আমায় নিতান্তই বিড়ম্বনা মনে করেছিলেন। যদি সকলের ইচ্ছায় ও ধিক্কারে আমার জন্মটা বন্ধ করা যেত, তবে নিশ্চয়ই আমি আজ মানবজন্মের সুখ-দুঃখের পরখ করবার জন্যে জগতে থাকতুম না।

"তা যখন হ'ল না, তখন মা ভাবটা এমনি দেখাতেন যেন বুড়োবয়সে ছেলে হয়ে একটা আপদ হয়েছে। খুব ছোট বেলাকার আবছা স্মৃতি যা আছে, তাতে মনে পড়ে, আমি মায়ের কোল ছেড়ে ধরম-মার কাছেই মানুষ হচ্ছি। পরে অবশ্য আমাকে মানুষ করার দাবী অনেক দিদি বৌদিই করেছেন; গঞ্জনাও শুনেছি,—'ছেলের করলুম জানলে না, বুড়োর করলুম মানলে না।' একটি আশ্রয় কিন্তু না মেনে উপায় ছিল না।

"তিনি ছিলেন বিধবা,—দিদিমার বাপের বাড়ীর দেশের লোক। একটিমাত্র মেয়ে মতিও যখন তাঁকে রেখে পালিয়ে গেল, তখন পঁচিশ বৎসর বয়সে কাশীবাসিনী হবার জন্যে মায়ের কাছে আসেন। সেই থেকেই আমাদের সংসারের এক জনের মতই ছিলেন। ঠাকুর সেবা ও নিরামিষ রান্নার ভার ছিল তাঁর উপর। প্রথম যতটা আমার মনে পড়ে,—দোহারা চেহারা, মুখে একটি শান্ত অথচ বলিষ্ঠ ভাব। স্বভাবটি নম্র অথচ তেজস্বী। চোখ দুটি যেন আমায় দেখে মমতায় ভ'রে উঠত।

"এটুকু স্পষ্ট মনে আছে, যখন মা লজ্জায় ক্ষোভে গর্জে বেড়াতেন, আর গিন্নার এই অদৃষ্টের কাছে নালিশে সকলে সায় দিত, একমাত্র মতির মা আমায় কোলে ক'রে সে পর্ব্বে যোগ না দিয়ে উঠে আসতেন। মাও মুখে গজগজ করলেও নিশ্চয়ই মনে ভাবতেন,—ভাগ্যিস মতির মা আমায় বাঁচালে। এখন আমার ধর্ম্মকর্ম্মের সময়, এ কি একটা পচা ছেলের পিছু থাকার সময়?

"নিজে যে স্নেহটুকু দেখাতে পারলেন না, মতির মাকে দিয়ে সে স্নেহটুকু করিয়ে যেন তাঁর মনটা হাল্কা হ'ল। ক্রমে এমনি ভাবটা দেখা গেল, যেন আমি মতির মারই ছেলে। রাত্রে শুতুম তাঁরই কাছে—খেতুম—চান করতুম, যা দরকার সবই তিনি করতেন। ছেলেবেলাটা আমার নানা রোগে কেটেছে, সেই জন্য বোনেরা বড় ছুঁতে চাইত না। বৌদিরা লোক-দেখান ভদ্রতা ক'রে মাঝে মাঝে আদর দেখাত বটে, কিন্তু কোথায় যে আমার সত্যি যায়গা, সেটা বুঝে নিতে আমার বেশী দেরী হ'ল না। মা না কি বলেছিলেন, 'মতির মা, তোকে ঐ ছেলেটা দিলুম। যদি ও বাঁচে, তোরই থাকবে।' বোধ হয়, আমি যে বাঁচব, সে আশা কারুর ছিল না। খুঁৎখুঁতে খিটখিটে রুগ্ন ছেলে ব'লে বাবাও কিছু বলতেন না। ভাইদের ত জানাই ছিল যে, আমি একটা অনাবশ্যক জীব।

"তাই সে দিনগুলো আমার সকলের কাছে তফাৎ করেই কাটিয়ে দিতুম—কেবল ঐ মতির মার আঁচলের তলায়। চারিদিককে ছাপিয়ে ছেঁটে কেবল নিজেকেই দেখতুম, আর মতির মাকে। ছোট ছেলের কাউকে রাত-দিন 'মা' না বল্লে চলে না। তাই মতির মাকেই 'মা' 'মা' করতুম। অনেক লোকের অনেক ঠাট্টা আজও মনে গাঁথা আছে। নিজের মা থাকতে পরকে মা বলে, এমন বোকা। দরকার ছিল বলেই ডাকতুম—সেটা কে বুঝত? বোধ হয়, তাঁরও লজ্জা হ'ত, বলতেন,—'আমি যে তোর ধরম-মা, অপু, আমায় তুই রাত-দিন মা মা করিস নি।'

"মা কিন্তু যেন দেখেও দেখতেন না যে, ছেলে পর হয়ে যাচ্ছে।

"চার পাঁচ বছর যখন বয়স হ'ল, তখন বাবার নজর পড়ল আমার উপর। যা হোক ছেলে ত বটে,—বংশের মান-মর্য্যাদার জন্যেও এবার তাকে একটু দেখাশুনো দরকার; বাঁচবার আশা যখন হয়েছে, তখন মুর্খ রাখলে ত চলবে না, আর মতির মার আঁচলচাপা থাকতে দিলেও মানাবে না,—ভেবেই বোধ হয় তিনি আমার সম্বন্ধে প্রথম সচেতন হয়ে উঠলেন। যে ঘরটায় বাবা আর ছোট'দা শুতেন, সেই ঘরেরই এক পাশে আমার বিছানা পড়বে—হুকুম হ'ল। আমি ত কেঁদেই ভাসিয়ে দিলুম। ধরম-মা বল্লেন, 'তুমি যে বাবা ব্যাটাছেলে, কাঁদতে আছে কি?' এমন ব্যাটাছেলে হবার জন্যে আমার কোন মাথাব্যথা ছিল না। মনে আছে, রাত্রে ধরম-মার বিছানায় শুয়ে ঘুমিয়ে পড়লে তিনি আমায় তুলে শুইয়ে রেখে আসতেন।

যত রাতই হোক, যখনই উঠেছি, দেখেছি, তিনি আমার দরজার গোড়ায় আমার জন্যে দাঁড়িয়ে। তাঁর রান্নার পিঁড়ির পাশেই ব'সে ব'সে গল্প শুনতুম, সেই বাঙ্গালা দেশের যেখানে তুলসীতলায় সন্ধ্যাবেলায় হরির লুট হয়, সন্ধ্যা-দীপ জেলে মেয়েরা ছেলে-মেয়ে নিয়ে প্রণাম করতে আসে। সকালে উঠে কীর্ত্তনের শব্দে লোকের ঘুম ভাঙ্গলেই, 'গৌর' 'গৌর' ব'লে ঠাকুরকে ডেকে লোকে জেগে উঠে। যেখানে আকাশে মেঘের আর মাটীতে ফুলের রূপের তুলনা নেই; যেখানে কাঁসর ঘণ্টা জলের শব্দে মিশে মানুষকে পাগল করে, ঘরে থাকতে দেয় না।

"বলতে ভুলে গেছি, আমার ধরম-মার শান্তিপুরের কাছে এক পাড়াগাঁয়ে বাড়ী। পনর বছর দেশে যান নি, কিন্তু কি মাধুর্য্য ঢেলেই সেই গাঁটির গল্প করতেন। যেন এই মহাতীর্থের মাঝখানেও সেই ছোট্ট গাঁটুকু তাঁর বুক ভ'রে ছিল। শুনে আর আমার আশ মিটত না! আমার চোখের উপর যেন সেই গাঁখানি ভেসে উঠত; দেখতুম, সেই শিবতলা, সেই চণ্ডীপুকুর, সেই মাঠ, ঘাট, বাট। সেই গাঁয়ের ছেলেরা যে নারকেল-মুড়ি আর বাতাসা খায়, আমার সেই খাবার সাধ হ'ত; তেমনি তাদের মত পুকুরে প'ড়ে হুটোপাটি ক'রে তেমনি ছড়া কাটতে কাটতে নিকানো দাওয়ায় এসে মাছ-ভাত খাবার জন্যে আমার জিভে জল আসত। তাদের শোনা গল্প-ছড়া-গান—আমি যেন প্রসাদ পাবার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠতুম। সে কি রূপ-কথা—সাত রাজার ধন মাণিক, বেঙ্গমা-বেঙ্গমী—কোটালের ছেলে রাজার ছেলে—পরীর দেশ—ছোট রাণী—কেশবতী রাজকন্যে—কি বুদ্ধিমান সব পাখী, শেয়াল—বাঘ-ভাল্লুক। আমার চোখের পলক পড়ত না। এ মেড়োর দেশে ত কত গল্পই পরে শুনলুম,—কোনটি আর সে-রকম লাগল না। মনে হ'ত, যদি বাঙ্গালী পণ্ডিত ম'শায় আসতেন, তবে অক্ষরগুলোও সহজ হয়ে যেত। এখানে মিছির ঠাকুর কি যে পড়াত,—না আমার, না ধরম-মার মনের মত।

"শোবার সময় আমার প্রধান কায ছিল যে, ধরম-মার নিজের সব কথা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞাসা করা। দেখতুম, কান্না শেষ হলেও চোখের পাতাটা যেমন ভিজে থাকে, তাঁর চোখ-মুখ তেমনি ভারী হয়ে উঠত। তবু আমার কৌতূহলের অন্ত ছিল না,—দাবীর শেষ ছিল না, তাঁরও শোনানোর বিরাম ছিল না। কেবল যখন মতির কথা হ'ত, দেখতুম, তাঁর গলা কাঁপছে। বেশ টের পেতুম যে, সেই মেয়েটি না থেকেও যেন ধরম-মার মনের মধ্যে আমার ভাগ নিয়ে কাড়াকাড়ি করছে। মতিকে ভোলাটাই যে তাঁর ছিল স্বস্তি, তখন বুঝতুম না। কেবল জানাতে চাইতুম, মতিটা মোটেই ভাল মেয়ে নয়।

"এমনি আমাদের দিন বেশ কেটে যাচ্ছিল,—দু'জনে দু'জনকে ভর ক'রে। কিন্তু হঠাৎ মায়ের কি মত বদ্‌লে গেল। তাঁর যে একটি ছেলে পর হয়ে গেছে, এই আক্ষেপ তাঁকে পেয়ে বসল এবং সেজন্য তিনি দোষী করলেন মতির মাকেই। দেখতে পেতুম, তিনি যেন ধরম-মার উপর রুষ্ট হয়ে উঠলেন এবং সুযোগ পেলেই কটু কটু কথা বলতে লাগলেন। বৌদিরা, দিদিরা সকলে জোট বেঁধে ঠিক করলে, মতির মার পাল্লায় না পড়লে আমি না কি বেশ জোয়ান, সাহসী আর দাদাদের মত দশকর্ম্মান্বিত পুরুষ হয়ে উঠতুম। রাত-দিন বাঙ্গালা দেশের ছাই-পাঁশ গল্প শুনেই আমি না কি ভয়-তরাসে, মেয়ে-ঘেঁসা, ক্যাঁকাসে হয়ে উঠেছি। একমাত্র বাবা এই অকৃতজ্ঞতার বোঝা বাড়াতে চাইলেন না। কিন্তু তাঁর আপত্তিতে মায়ের ঝোঁক আরও যেন বেড়ে উঠল। আমায় তিনি নিজের আয়ত্তে আনতে চেষ্টা করতে লাগলেন, সাত বছর বয়সে প্রথম খাইয়ে দিতে বসলেন,—আমার হিতের জন্যে যে তিনি ভাবিত, সেটা আমায় বোঝাতে চেষ্টা করলেন। কোনটাই আমার হিত বা মনোহারী মনে হ'ল না—বিপুল ক্ষোভে আমি তাঁদের সকলের চেষ্টা ব্যর্থ ক'রে দিয়ে ধরম-মার আশ্রয়ে পালিয়ে গেলুম। কিন্তু দেখলুম, তাঁর ভাগ্যে গালির মাপ বেড়ে উঠল।

"লুকিয়ে জিজ্ঞাসা করলুম, 'তোমায় ওরা সবাই অত মন্দ বলে কেন?'

"অশ্রুসিক্ত-নয়নে তিনি আমায় বল্লেন,—'এটা যে আমার পাওনা, তাই দেয়,—ধন! তুমি যে ওদের। আমি ওদের ফেলে-দেওয়া তোমার মন নিয়েছি, তবু ওরা ভাবে লুকিয়ে চুরি করেছি;—তাই ওরা রাগে।'

"আমি ক্রোধে নিষ্ফল আস্ফালন করতুম এবং আমার ক্ষুদ্র হৃদয়ের সকল শক্তি দিয়ে তাঁকে সান্ত্বনা দিতুম যে, বড় হয়ে আর আমি তাঁর কোন দুঃখ রাখব না। সত্যিই যে

আমি তাঁকে কত ভালবাসি, দেখিয়ে দেব। নিশ্চয়ই তাঁর সেই পাড়াগাঁয়ের বাড়ীতে ফিরে গিয়ে মস্ত একটা বাড়ী তুলে কেবল দুজনে থাকব,—আর কাউকে নেব না।

"শিশুর অত্যুক্তি বুঝে তিনি আমার কথায় সায় দিয়েই আমায় শান্ত করতেন।

"বাড়ীর গিন্নীর এবং সকল স্ত্রীলোকের বিরুদ্ধভাবের মধ্যেও তাঁর মত আত্ম-সম্ভ্রমসম্পন্না স্ত্রীলোক যে কেবল আমার স্নেহেই আবদ্ধ হয়েছিলেন, এটা এখন বেশ বুঝতে পারি। কখনই তিনি কোন কিছুর প্রত্যাশী ছিলেন না, তাঁর নিজের হাতেও কিছু টাকা ও গহনা ছিল। ইচ্ছা করলে কাশীর মত যায়গায় স্বচ্ছন্দে তিনি অন্যত্র স্বাধীনভাবে থাকতে পারতেন। তবু কোন কথা না ব'লে তিনি নিঃশব্দে সব সয়ে আমার দশ বছর বয়স পর্য্যন্ত আমায় আগলে রইলেন। দশ বছরে না কি আমার একটা ফাঁড়া ছিল। পরে শুনেছি, দুই মায়েই আমার জন্যে শঙ্কিত ছিলেন। এগারোয় পড়তে ধরম-মা আশ্বস্ত হলেন। নিজের মাও আর সবুর করতে পারলেন না। যে চরম-ব্যাপারটা এত দিন কোনমতে ঠেলে রাখা ছিল, সকলে মিলে সেটা উসকে দিতে লাগল। ধরম-মা জানালেন,—তাঁর আর কাশীবাসের ইচ্ছা নেই। দেশে ফিরে যেতে চান।

"আপত্তি আর কার?

"আমি তখন স্কুলে যাচ্ছি,—দাদাদের তুলনায় পড়াশুনা ভালই করছি, বাহিরের জগতের কিছু কিছু দেখা পেয়েছি,—অল্প রসও পেতে সুরু হয়েছে। তবু যেন মাথায় বাজ পড়ল। ছুটে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলুম—'সত্যি তুমি আমায় ছেড়ে যাবে?'

"তিনি হেসে বল্লেন, 'সত্যিই রে অপু।' আজও মনে পড়ছে, কান্নার চেয়ে করুণ সেই হাসিটি। চোখে আমার জল এল। হাত ধ'রে বল্লুম, 'তবে আমিও যাব।' তিনি ঘাড় নেড়ে বল্লেন, 'এখন যে পড়াশুনোর সময়, বাবা, এখন কি যেতে আছে? তুমি পরে যেয়ো। ছিঃ, কেঁদো না—লেখাপড়া শিখে, বড় হয়ে,—তবে না আমাকে রোজগার ক'রে খাওয়াবে? এখন যে সঙ্গে গেলে আমাকেই তোমার জন্য খাটতে হবে।' কথাটা বোধ হয় সেই সময় বিশ্বাস হয়েছিল;—কাঁদতে কাঁদতে তাঁকে ছেড়ে দিলুম।

"আর পরে দেখতে পাইনি। শুনেছিলুম, এক বছরের মধ্যে দেশে গিয়ে মারা গেছেন। দিন কতক পরে কে এক জন লোক, একটা পুরান সিল্কের রুমালে বাঁধা ক'খানি গয়না এনে দিয়ে বল্লে, 'মরবার আগে ব'লে গেছেন, এইগুলো অপুর বিয়ে হ'লে যেন বৌকে দেওয়া হয়।' শুনে খানিক দরজার আড়ালে লুকিয়ে কেঁদেছিলুম মনে পড়ে।

"তার পর কত দিন কেটে গেল। কত রকম ঘাত-প্রতিঘাতে জীবন নিজের স্রোতের বেগেই চলেছে। মনের যে রেখা কখনও মুছবে ভাবিনি, সময়ের ঢেউ তাতে পলি ফেলেছে। পাশ করেছি, বড় হয়েছি,—মনের মত স্ত্রী-পুত্র, পয়সা সবই পেয়েছি।

"হঠাৎ তিরিশ বছর পরে আজ বিশু দেখিয়ে দিলে, গঙ্গার তীরে তাঁরই মত মাথা উঁচু ক'রে করযোড়ে একটি নারী সূর্য্যের উপাসনা করছেন। ছেলেটা বল্লে, 'ঐ ঐখানে যাব।' মনে প'ড়ে গেল, আমারও একটা তীর্থ বাকি আছে। তাই ভাবছি, একবার দেখে আসি, যেখানে তিনি দেহ রেখেছেন। অমত কোরো না।"

উত্তর-ভারতের মেয়ের চোখে আজ বাঙ্গালার নারীর চোখের জল ঝরিতেছিল। উত্তরা শুধু রুদ্ধকণ্ঠে বলিল, "আমি যে কিছুই জানি না এ-সব। কেউ ত আমায় বলেননি। তুমি ত যাবেই,—আমিও সেই গয়না পরে তোমার সঙ্গে যাব। বল—নিয়ে যাবে?"

শ্রীরবীন্দ্রনাথ বসু (এম-এ)।
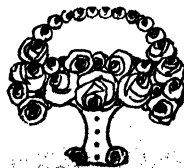
উপন্যাস-পাঠ

১

মানুষ সাধারণতঃ গল্প শুনিতে ভালবাসে ; ইহা মানবের স্মরণাতীত যুগের অভ্যাস। মানুষ সামাজিক—সমাজের কথা ও কাহিনী, সামাজিকবর্গের আচার-ব্যবহার, ক্রিয়া-কলাপ, সুখ-দুঃখ, প্রেম ও নৈরাশ্য, শৌর্য্যবীর্য্যগাথা ইহা মানুষের পরম প্রিয়। নাটকে, গাথায়, কাব্যে, উপন্যাসে, কথায়, ইতিহাসে, চরিত-কাহিনীতে মানবজীবনের কাহিনীই পরিকীর্ত্তিত। সভ্যতার ইতিহাসে দেখা যায় যে, পদ্যরচনাই সাহিত্যের প্রথম স্তর—সভ্যতার আদিযুগে মানব-জীবনের কাহিনী নানা অতিপ্রাকৃত ইতিহাস-সম্বলিত হইয়া মহাকাব্য ও খণ্ডকাব্যে প্রকাশিত হইয়াছে। এই সকল কাব্য সভায় সভায় কীর্ত্তিত হইত এবং এক সময়ে শত-সহস্র লোক ইহার রসাস্বাদ করিতে পাইত। সমাজের এক শ্রেণীর লোকের এই ভাবে কাব্য-প্রচার জীবিকা হইয়া উঠিয়াছিল। আমাদের দেশে কথক, গায়ক, চারণ, সূত, মাগধ প্রভৃতি এই কার্য্যে নিরত থাকিতেন। পাশ্চাত্যদেশে Tronbadour, Ironveres, প্রভৃতি গায়কচারণদল দেশে দেশে গান গাহিয়া বেড়াইতেন। গানের সঙ্গে সঙ্গেই নাট্যকলার উদ্ভব—তবে নাট্যকলার পরিণতি বা বিকাশ কাব্যসাহিত্যের কিছু পরে ঘটে। মানবের ধর্ম্মাঙ্গ হিসাবে নাট্যকলার উদ্ভব ; নৃত্য বা নাট্য প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দেশে ধর্ম্মাঙ্গরূপে বিবেচিত হইত। নাটকের মধ্যে ধর্ম্মপ্রভাব কমিয়া গিয়া লৌকিক নাট্য-সাহিত্যের উদ্ভব হয়। এই নাটকে মানব-জীবনের কাহিনী-বর্ণনা মধ্যযুগের বৈশিষ্ট্য বলিয়া অনুমিত হয়। নাটকীয় রচনায় অতি উচ্চাঙ্গের কলাকৌশলের প্রয়োজন—কেবল কথাবার্ত্তা (Dialogue) বা কর্ম্মচক্রের (action) মধ্য দিয়া উপাখ্যানের বর্ণনা প্রয়োজন। নাটকের সার্থকতা প্রয়োগের কৌশলের (representation) উপর নির্ভর করিয়া থাকে। এই প্রয়োগ-কৌশলের মধ্যে নানা কলার সমাবেশ দৃষ্ট হয়। যথারীতি আবৃত্তি (acting বা recitation), গীত, নৃত্য, বেশভূষা, বাদ্য, চিত্রকলা, আলোকপাত, ভাবভঙ্গী (gesticulation) প্রভৃতি নাট্যাভিনয়ের অঙ্গ। নাট্যকারের ক্ষমতা অত্যন্ত সীমাবদ্ধ, প্রতি মুহূর্ত্তে তাঁহাকে নিয়মের নিগড় মানিয়া চলিতে হয়। স্থান-কাল-পাত্রগত সঙ্গতি রাখিয়া নাটক লিখিতে হয়। উপন্যাস-লেখকের কিন্তু নাট্যকার অপেক্ষা স্বাধীনতা যথেষ্ট অধিক। যে স্থলে ব্যঞ্জনাশক্তি (suggestiveness) দ্বারা ঘটনা বা ভাব নাট্যে পরিস্ফুট করিতে হয়, তথায় ঔপন্যাসিক স্বয়ং নানা ব্যাখ্যা বা টীপ্পনী করিয়া চরিত্ররহস্য বা ঘটনাচক্র ভাল করিয়া বুঝাইয়া দেন। নাট্যকারকে অনেক স্থলে রাখিয়া ঢাকিয়া লিখিতে হয়, ঔপন্যাসিকের সে আপদ্ নাই—তিনি সকলই স্পষ্ট করিয়া বলিতে পারেন। চারি পাঁচ ঘণ্টার অভিনয়ে সমস্ত নাটকটি ফুটাইয়া তুলিতে হইবে ; সুতরাং নাট্যকার যে চিত্র অঙ্কন করিবেন, তাহার বস্ত্রপট অতি অল্প-পরিসর। উপন্যাসকার পত্রের পর পত্র লিখিয়া দ্বিতীয় মহাভারত লিখিতে পারেন—কারণ, তিনি নিরঙ্কুশ, সর্ব্ববাধাবিনির্ম্মুক্ত ও স্বাধীন। বহুস্থলে নাটকের সার্থকতা নটের প্রয়োগ-কৌশলের উপর নির্ভর করিয়া থাকে ; নাট্যকারের সর্ব্বদাই অভিনয়োপযোগী নাটক-সৃষ্টির দিকেই দৃষ্টি পড়িয়া থাকে। ফলতঃ অপর কলার সাহায্যে নাটকে যে পরিপূর্ণতা দৃষ্ট হয়, উপন্যাসে স্বতঃ সেই পরিপূর্ণতা থাকে। নাটকের ঘটনা সংক্ষিপ্ত, চরিত্র কার্য্যমুখে বা কথোপকথনে প্রকটীকৃত, রস-ব্যঞ্জনাশক্তি সাহায্যে উদ্ভূত হয়! নাটকপাঠে পাঠককে একটু কল্পনাশক্তির সাহায্য লইতে হয়—লিখিত ঘটনা মানসপ্রত্যক্ষ করিতে হয়। সাধারণ পাঠক এই সকল মানসিক শ্রম

স্বীকার করিতে পারে না বলিয়া অনেক সময় তাহার নাট্যপাঠ বিড়ম্বনা হইয়া পড়ে—এই কারণে সাধারণ লোকে নাটক "দেখে," "পড়ে" না। উপন্যাসের ঘটনা এরূপ সুসংহত নহে বলিয়া তাহা সহজেই সাধারণের হৃদয়গ্রাহী হইয়া থাকে। যে ভাল করিয়া গল্প বলিতে পারে, সেই বোধ হয় সাধারণতঃ "বাজার-চল" উপন্যাস লিখিতে পারে। নাটক লেখায় প্রভূত সংযম ও শিক্ষার প্রয়োজন—অধুনা এই শিক্ষা ও সংযমের অভাব বলিয়া নাটক এত বিরল হইয়া উঠিতেছে। * অপর দিকে উপন্যাস লেখা অপেক্ষাকৃত সহজ বলিয়া এবং শিক্ষাবিস্তারের সঙ্গে ও মাসিক-পত্রিকার প্রসার-প্রতিপত্তির সহিত উপন্যাস ও ছোট গল্পের প্রসার বাড়িয়া চলিয়াছে। এক্ষণে উপন্যাস ও গল্প-সাহিত্যের এরূপ অতিবৃদ্ধি ঘটিয়াছে যে, সাহিত্যের অপরাপর শাখার তাহাতে বিশেষ ক্ষতি হইতেছে। উপন্যাস-সাহিত্যের যেরূপ 'চাহিদা' ও তাহার প্রয়োজনাতিরিক্ত 'সরবরাহ' সাহিত্যকে ভারাক্রান্ত করিয়া তুলিতেছে। উপন্যাস-সাহিত্য আজ অপর সকল সাহিত্যকে পরাজিত করিয়া সাহিত্যক্ষেত্রে একচ্ছত্র সম্রাট হইয়া বসিয়া আছে।

উপন্যাস সকলেই পড়িয়া থাকে। কথামালা-বোধোদয় পর্য্যন্ত যাহার বিদ্যার দৌড়, সেও উপন্যাস পড়ে, আবার যিনি পরম পণ্ডিত, তিনিও উপন্যাস পড়িয়া থাকেন। বাড়ীর পাচক ব্রাহ্মণ হইতে বিশ্বপণ্ডিত পর্য্যন্ত সকলেই উপন্যাসের পাঠক—উপন্যাস পড়ে নাই কে? কিন্তু সাধারণ উপন্যাস-পাঠক ও সাহিত্য-রসিক পাঠকের পাঠের মধ্যে বহু পার্থক্য। সাধারণ পাঠক অবসর-বিনোদনের জন্য, একটু আমোদের জন্য, গল্পের নেশায় হয় ত' বা সময় কাটাইবার জন্য বা নিদ্রাকর্ষণের জন্য উপন্যাস পাঠ করিয়া থাকে। কিন্তু উপন্যাসের রস সম্যক্ উপলব্ধি করিতে হইলে কয়েকটি বিষয়ের উপর সাধারণতঃ দৃষ্টি রাখিতে হয়। উপন্যাসের প্রথম কথা—আখ্যান; লেখক ঘটনা-বিবৃতি সুন্দরভাবে করিতে পারিয়াছেন কি না, ঘটনা সম্ভব কি অসম্ভব, লেখার মধ্যে কোন অসামঞ্জস্য আছে কি না, লেখা কতদূর চিত্তাকর্ষক প্রভৃতি প্রশ্ন সহজেই উঠে। সাধারণ পাঠক গল্পের জন্য উপন্যাস পাঠ করিয়া থাকে—উপন্যাসে আখ্যান-ভাগের (plot) শ্রেষ্ঠতা সর্ব্বজনস্বীকৃত। দ্বিতীয় কথা—ঘটনার নায়ক-নায়িকা ও চরিত্র-সমূহ; এগুলি কতদূর স্বাভাবিক ও কতদূর চিত্তাকর্ষক, এ সকলের বিচার পরেই আসে। তৃতীয় কথা—এ সকল চরিত্রের বিকাশ কথোপকথনের মধ্যে। এই কথোপকথন কতটা সহজ, স্বাভাবিক, ওজঃ বা প্রসাদ-গুণবিশিষ্ট, ইহাও বিচার্য্য। চতুর্থ কথা—লেখকের লেখার ভঙ্গী, স্থান ও কালের যথাযথ সংস্থান, বিশেষতঃ ঐতিহাসিক উপন্যাসে এবং সাধারণতঃ অন্যান্য গ্রন্থে স্থান ও কালের সহিত সঙ্গতি রাখিয়া ঘটনার সন্নিবেশ করিতে হয়। পঞ্চম কথা—ঔপন্যাসিক উপন্যাসের মধ্য দিয়া মানবজীবনের কি সমালোচনা করেন (Criticism of life); ঔপন্যাসিক ইচ্ছা করুন বা না করুন, তাঁহার লেখার মধ্যে মানবজীবনের সমালোচনা আসিয়া পড়িবে, জীবন-সমস্যার সমাধানের একটা চেষ্টা থাকিয়া যাইবে। তিনি ঘটনা ও চরিত্র অবলম্বন পূর্ব্বক তাঁহার নিজ মত খানিকটা প্রকট করিবেনই। সুতরাং উপন্যাস পাঠ করিতে হইলে পাঁচটি বিষয়ের উপর লক্ষ্য রাখিতে হইবে,—

(১) আখ্যান (plot)

(২) চরিত্র (characters)

(৩) কথোপকথন (dialogue)

(৪) স্থান-কালের সঙ্গতি ও রচনারীতি (time and place of action and style)

(৫) মানবজীবনের সমালোচনা (criticism of life)

২

১। আখ্যান (Plot)

আখ্যানের বিচারে মূল উপাদানের কথা প্রথমতঃ উঠিয়া থাকে। জীবনে বহু ঘটনার সমাবেশ দেখা যায়, জীবনের নানা দিক্ সাহিত্যে আলোচিত হয়, জীবনের নানা সমস্যা সমাধানের চেষ্টা চলিতে থাকে, জীবনের নানা অবস্থা সাহিত্য-মুকুরে প্রতিফলিত হয়। জীবনের মধ্যে অনেক ঘটনা আছে, যাহা জীবনের পক্ষে নিতান্ত আবশ্যক নহে, বরং অবান্তর বা আগন্তুক, এ সকল ঘটনা উপন্যাসে স্থান পাইয়া থাকে বটে, কিন্তু তাহাতে উপন্যাসের মহিমা সমুজ্জ্বল হইয়া উঠে না।

* সামাজিক অবস্থার পরিবর্ত্তনও ইহার জন্য অনেকাংশে দায়ী। এলিজাবেথের যুগে যে সামাজিক সংস্থানের মধ্যে নাটকের উদ্ভব হইয়াছিল, তাহা আর নাই। বর্ত্তমান যুগের পক্ষে উপন্যাস এবং অধুনা গল্প-সাহিত্যের যুগ পড়িয়াছে।

নানা স্থান, নানা সময়, নানা ভাব, জীবনের নানা সম্পর্ক বা অবস্থা হইতে উপন্যাসের আখ্যান সংগৃহীত হইয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্র হইতে রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ হইতে শরৎচন্দ্র, শরৎচন্দ্র হইতে অতি আধুনিক তরুণ ঔপন্যাসিকদের উপন্যাসে যাইতে হইলে মনে হয়, যেন এক একটি নূতন জগতে আসিতেছি। বিষবৃক্ষ ও কৃষ্ণকান্তের উইল, ঘরে বাইরে ও গোরা, পল্লীসমাজ ও শ্রীকান্ত, শুভা, শান্তি ও বিপর্য্যয়ের সময়ের মধ্যে বিপর্য্যয় ব্যাপারই দাঁড়াইয়াছে! প্রত্যেক লেখকই নূতন জগতের সৃষ্টি করিয়াছেন, কিন্তু বড় লেখকদের লেখার মধ্যে এইটুকু দেখা যায় যে, তাঁহারা জীবনের কেবল অসার বা অবান্তর অংশ লইয়া উপাখ্যান রচনা করেন না। জীবনের অন্তর্নিহিত যে সকল বিশ্বজনীন ভাব বা সমস্যা বর্ত্তমান, তাহারই আলোচনা গ্রন্থের মধ্যে বিশেষভাবে দেখা যায়। জীবনের যে অংশ সারবান্ ও মহত্ত্বে পরিপূর্ণ, সেই অংশের বিকাশ সৎ-সাহিত্যের নিদর্শন। জীবন-সংগ্রামের কঠোরতার মধ্যে, সংসার ও সমাজের নানা বাধা-বিপত্তির বিরুদ্ধে, মনের নানা বিপরীতগামিনী বৃত্তির লীলায় মানুষের ঔদার্য্য, সৌন্দর্য্য, মহত্ত্বের পরিপূর্ণ প্রকাশই সৎসাহিত্যের মধ্যে সাধারণতঃ দৃষ্ট হইয়া থাকে। মানুষের জীবনের দুঃখ, দৈন্য, প্রেম, হিংসা, দ্বেষ, করুণা, মমতা, স্নেহ, সেবা প্রভৃতি মনের যতরূপ প্রবৃত্তি, সকলই সাহিত্যে সুন্দর ও বিশ্বজনীন হইয়া সাহিত্যরসিকের রসপিপাসা মিটাইতেছে। রসের অনুভূতির মধ্যে জাতি-দেশ-কাল-বিচার নাই—সকল দেশের সাহিত্যের প্রথম কথা রসোদ্বোধ। Macbeth, Othello নাটকে যে করুণ রস—Romeo Julietএ যে বিয়োগব্যথা, উত্তররামচরিতে যে অরুন্তুদ বিরহ-বেদনা—কৃষ্ণকান্তের উইলে পল্লীসমাজেও তাহা প্রকটিত। জীবনের মধ্যে যে রস নিত্য ও শাশ্বত, যাহা সার্ব্বজনীন ও সার্ব্বভৌম, তাহার বিকাশই সৎসাহিত্যের প্রতিপাদ্য।

উপন্যাসের মধ্যে যে লঘু বিষয়ের আলোচনা নাই, এ কথাও বলা যায় না। লেখকের গুণে অতি সামান্য ঘটনা লইয়া অতি সুন্দর চিত্তাকর্ষক উপন্যাস বা নাটক রচিত হইতে পারে। দুই যমজের সাদৃশ্য লইয়া Plautus ও তদবলম্বিত পথ অনুসরণ পূর্ব্বক Shakespeare কেমন সুন্দর নাটক রচনা করিয়াছেন! উপন্যাসেও অতি সহজ ও সাধারণ ঘটনা লইয়া সুন্দর আখ্যায়িকা রচিত হইতে পারে। উপন্যাস সাধারণ লোকে সৎ-সাহিত্য হিসাবে পাঠ করে না। অনেকের ধারণা, উপন্যাস শুধু মুহূর্ত্তের সুখের জন্য; অবসররঞ্জনের সহায়ক হিসাবে পঠনীয়। আরাম-কেদারায় শুইয়া বা প্রখর গ্রীষ্মের দ্বিপ্রহরে শীতল গৃহতলে গড়াইতে গড়াইতে তাম্বূল ও তাম্রকূটের সহিত একখানি উপন্যাস পাইলে দিনটা যাহা হউক কাটান যাইতে পারে, ইহাও কাহার কাহার ধারণা। একটু আনন্দ দিতে পারা, সংসারের দুঃখ-দৈন্যক্লিষ্ট মনকে একটু বৈচিত্র্যের আস্বাদ দেওয়া, একটু কল্পনার লীলা, একটু হাস্যরসের সমাবেশে মাধুর্য্যের বিস্তার—এইটুকু থাকিলেই হইল। সাধারণতঃ যে সকল উপন্যাস আমরা দেখি, তাহার মধ্যে এই আখ্যানভাগের সৌষ্ঠব—অর্থাৎ গল্পটা ভাল করিয়া বলিতে পারা এবং চিত্ত আকর্ষণের জন্য বিশেষ দৃষ্টি রাখা—এইটুকু থাকিলেই হইল। যে উপন্যাস পড়িতে পড়িতে থামিতে হয়—পড়িব বলিয়া আবার পড়িতে হয়, কতকটা পড়িয়াছি, অতএব শেষ করিতে হইবে, এই জন্যই পাঠ করিতে হয়, এই সকল উপন্যাসের কোন মূল্যই নাই। উপন্যাসের আখ্যানের মধ্যে সম্ভাব্যতা, স্বাভাবিকতা থাকা চাই, চরিত্রের মাধুর্য্যের বিকাশ দেখান চাই, লেখার পদ্ধতির মধ্যে মৌলিকতা বা দক্ষতার প্রয়োজন। এই সকল থাকিলে মোটামুটি উপন্যাস বাজার-চল হয় বটে; কিন্তু সৎ-সাহিত্যের (standard works) জন্য উপাদান-গৌরবের কথা ভুলিলে চলিবে না। উপাদানের গৌরব ও লেখকের কলাকৌশল (art)—বস্তু ও পদ্ধতি (matter & manner) এই দুই সম্মিলনে সৎ-সাহিত্যের উদ্ভব। উপাদান যৎসামান্য হইলেও দক্ষ শিল্পী সৌন্দর্য্যের সমাবেশে রচনা সুন্দর ও সমৃদ্ধ করিয়া থাকেন: কিন্তু উপাদানের গৌরব না থাকিলে তাহা মহত্ত্বে পরিপূর্ণ হয় না। মাটীর উপর ভাস্করের কায স্থায়ী নহে, প্রস্তরে তাহার পূর্ণবিকাশ; ইষ্টকের স্থাপত্য স্থায়ী নহে, তটের উপর সূচিশিল্প পণ্ডশ্রম মাত্র—এ সকল অস্থানে প্রযত্নের উদাহরণ। লেখকের দক্ষতা না থাকিলে উপাদান-গৌরবের কোন অর্থ নাই—সাহিত্যের প্রধান কথা কলাকৌশল। কাব্য, উপন্যাস, নাটক—সকলই কলাকৌশলের উপর নির্ভর করিতেছে—কলা-দক্ষতা যাহার নাই, তাহার রচনা সম্পূর্ণতঃ নিষ্ফল ও নিরর্থক।

এ ক্ষেত্রে ইহাও দ্রষ্টব্য যে, ঔপন্যাসিক যে উপাদান লইয়া লিখিবেন, তৎসম্বন্ধে তাঁহার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থাকার প্রয়োজন; নচেৎ লেখার মধ্যে মিথ্যা ও অযথার্থ ঘটনা উপস্থিত হয়। অবশ্য ইহাও স্বীকার্য্য যে, সকল বিষয়ে সকলের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থাকে না। অনেক সময় পুস্তক হইতে বা অপরের নিকট হইতে শ্রুত বস্তু হইতে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিতে হয়। ডিফোর রবিন্সন ক্রুশো উপন্যাসে সমুদ্রযাত্রার কি মনোরম বর্ণনাই না আছে; অথচ তিনি কখনও সমুদ্রগমন করেন নাই। প্রভাতকুমার একখানি উপন্যাসে তিব্বতের কথা লিখিয়াছেন অথচ তিনি তিব্বতে কখনও যান নাই। সন্ন্যাসী কবি দণ্ডী স্ত্রীসঙ্গ-বর্জ্জিত হইয়াও দশকুমারচরিতে স্ত্রীপুরুষ-ঘটিত ব্যাপারে চূড়ান্ত জ্ঞানের পরিচয় দিয়াছেন, ইহাও তাঁহার কবি-প্রতিভার পরিচায়ক। প্রতিভায় সকলই সম্ভব, প্রত্যক্ষ না দেখিলেও প্রতিভাবান্ লেখক ধ্যানশক্তিবলে সকলই প্রত্যক্ষ করিতে পারেন। এই ক্ষমতাবলে আধুনিক লেখক সুদূর অতীতের ঘটনা প্রত্যক্ষবৎ বর্ণনা করিয়া থাকেন। প্রতিভা কিন্তু সকলের থাকে না, সুতরাং যাঁহার যেরূপ অভিজ্ঞতা, সেইভাবেই তাঁহার লেখা উচিত। আজকাল এক শ্রেণীর লেখক আছেন, তাঁহারা গণতন্ত্রের দোহাই পাড়িয়া সমাজের অতি নিম্নশ্রেণীস্থ লোকের জীবন-কাহিনীর বর্ণনা লইয়া ব্যস্ত হইয়াছেন। কয়লার খাদে কুলীদের জীবন-কাহিনী লিখিতে খুবই ব্যস্ত, কিন্তু ইহারা জীবনে কখনও কোন কুলীর সহিত মিশেন নাই। ইহাদের নভেলে সামান্য কেরাণীপত্নী পর্য্যন্ত বার্ট্রাণ্ড রাসেলএর মত কথা কহে। নভেলের প্রত্যেক নায়িকাকে এক একটি 'মেয়ে জ্যাঠা' হইতেই হইবে, ইহাতে হয় ত' রসালাপের চিত্র দেওয়া সহজ হইবে; কিন্তু তাহা স্বাভাবিক হইবে কি? উপন্যাসের উপাদান স্বাভাবিক, সম্ভাব্য ও যথার্থ হওয়া উচিত—এই উপাদান লেখকের অভিজ্ঞতা-সম্ভূত হইলে বিশেষ ভাল হয়। ইংরেজ ঔপন্যাসিক জেন অষ্টেন আপনার অভিজ্ঞতা-বহির্ভূত কোন ঘটনা বর্ণনা করেন নাই—তিনি মাত্র পাঁচখানি উপন্যাস লিখিয়াছেন, ঐ পাঁচখানিই রত্ন-স্বরূপ; তাহাতে তিনি স্ত্রীলোকদের মধ্যে কথাবার্তা বা স্ত্রীপুরুষের কথাবার্তার বর্ণনা দিয়াছেন; কিন্তু কোনও স্থলে পুরুষের মধ্যে কথাবার্তার বর্ণনা দেন নাই। আপনার ক্ষমতার সীমা-সম্বন্ধে তাঁহার জ্ঞান এরূপ স্পষ্ট ছিল বলিয়াই তিনি এত বড় লেখিকা হইতে পারিয়াছিলেন। সমালোচক হাডসন বলেন—প্রত্যেকেই যদি আপন ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা যথাযথভাবে কলা-কৌশল সহকারে নিবদ্ধ করিতে পারেন, প্রত্যেকেই প্রায় অন্ততঃ একটি সুন্দর উপন্যাস লিখিয়া যাইতে পারেন।

উপন্যাস কেবল আখ্যান নহে, বলিবার ভঙ্গীই উপন্যাসের বৈশিষ্ট্য। এই রীতি, পদ্ধতি বা কলাকৌশল (art) ইহাই উপন্যাসের সারসর্ব্বস্ব। বলিবার ভঙ্গীতে বিষয়বস্তু বিশেষ-ভাবে চিত্তাকর্ষক হইবে—ঘটনার গতিপ্রবাহে মনকে টানিয়া লইয়া চলিবে, কোন স্থানে অস্বাচ্ছন্দ্য বা আড়ষ্টতা থাকিবে না; ইহার গতি হইবে সহজ ও সাবলীল, প্রতি-ক্ষণেই পাঠকের মনে কৌতূহল, ঔৎসুক্য বা প্রীতির সঞ্চার হইবে। গল্প সকলেই বলিয়া থাকে, কিন্তু লেখকের অসাধারণত্ব তাঁহার ভঙ্গীতে। অতি সাধারণ কাহিনীও কথকের বর্ণনার ভঙ্গীতে পরম উপাদেয় ও চিত্তাকর্ষক হইয়া উঠে। এই ভঙ্গী বা কলাকৌশল লাভের জন্য যে বিশেষ জ্ঞানের প্রয়োজন, তাহা নহে—ইহা দৈবদানবিশেষ, ইহাই প্রতিভা। ভাল করিয়া গল্প বলিতে পারা একটি বিশেষ ক্ষমতা। ইংরেজি সাহিত্যে চশার, ড্রাইডেন, স্কট, মরিস্ এজন্য বিখ্যাত। মেকলে সাহেব সামান্য ঘটনা অতি ঘোরঘটা পূর্ব্বক বর্ণনা করিতে পারিতেন; তাঁহার History of Englandএ Yrial of Seven Bishops ইহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। কবেকার ঘটনা পাঠ করিয়া মনে হয় যেন, কোন এক সদ্যোঘটিত ব্যাপারের বর্ণনা সংবাদপত্রে পড়িয়া যাইতেছি। ফরাসী লেখক ডুমার এই ক্ষমতা অসাধারণ। প্রায় সকল ফরাসী লেখকের মধ্যে এই ক্ষমতা বিশেষভাবে দৃষ্ট হয়। (তবে Ronge et Noir ইহার ব্যতিক্রম মাত্র) পরন্তু রুসীয় লেখকগণ এ বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন—টলষ্টয় বিশেষতঃ—প্রমাণ তাঁহার Anna Kranenin. আমাদের বাঙ্গালা দেশে সদ্য আবিষ্কৃত মৈমনসিং-গীতিকা বা পূর্ব্ববঙ্গ-গীতিকায় গল্প বলিবার ভঙ্গীর বৈশিষ্ট্য আছে।

আখ্যানবস্তু বলিবার দুইটি প্রকার আছে। কোন কোন লেখকের বিষয়বস্তু (plot) সুসংহত (organic), কাহারও বা অত্যন্ত অসংহত (loose)। লেখক যে স্থলে একটি ঘটনা ঘাতপ্রতিঘাতের মধ্য দিয়া ফুটাইয়া তুলিয়া

বিষয়বস্তুকে পরিস্ফুট, উজ্জ্বল ও সহজ করিয়া তুলেন—অবান্তর ঘটনাজাল আনিয়া বস্তুকে জটিল বা অনর্থক ভারাক্রান্ত করিয়া তুলেন না, তাহাই সুসংহত বিষয়। বঙ্কিমচন্দ্রের কপালকুণ্ডলা একটি সুসংহত আখ্যানের উদাহরণ। দুর্গেশনন্দিনীর মধ্যে দুইটি বিষয় থাকিলেও তাহা পরস্পরে বিজড়িত থাকায় ইহাও সুসংহত plotএর উদাহরণ। শরৎচন্দ্রের পল্লী-সমাজে এই সুসংহত আখ্যান রহিয়াছে। রবি বাবুর রাজর্ষিও সুসংহত আখ্যান, কিন্তু গোরা নহে। অসংহত আখ্যানে (loose plot) একটি ঘটনা বা কয়েকটি চরিত্রের চারিধারে নানা ঘটনা, নানা কথা, নানা ভাব দেখা দিতেছে—ইহার যে পরিণাম কি, বুঝা যাইতেছে না, কিন্তু লেখকের কলাকৌশলে সকলই সুন্দরভাবে চলিতেছে—রসোদ্বোধের বাধা ঘটিতেছে না, বরং বৈচিত্র্যের প্রভাবে মনোহারিত্ব বাড়িয়া চলিতেছে। বাঙ্গালায় শ্রীকান্ত ইহার প্রকৃষ্ট নিদর্শন। Dickensএর সকল নভেলই প্রায় অসংহত—Pick Wi k Papers ত' যেখান হইতে ইচ্ছা পড়া যায়। Gil Blas নামক ফরাসী গ্রন্থ এই ধরণের। ইংরেজ ঔপন্যাসিক থ্যাকারে আখ্যানের বিষয়বস্তু ঠিক করিয়া কখনও উপন্যাস লিখিতেন না; তিনি লিখিয়া চলিতেন, লেখনীর মুখে ঘটনা যেরূপ দাঁড়াইত, সেইরূপে তিনি আখ্যায়িকা লিখিতেন। রবীন্দ্রনাথের চোখের বালি, গোরা, যোগাযোগ এই ভাবের উপন্যাস। সুসংহত উপন্যাসে ঘটনা-বিন্যাস পূর্ব্ব হইতেই সঙ্কল্পিত থাকে। এই জন্য প্রায় ইহাতে একটু কৃত্রিমতার আবেশ থাকে। অপর দিকে অসংহত আখ্যান কলাকৌশলের দিক হইতে কতকটা হীন হইলেও স্বাভাবিকতায় ও বৈচিত্র্যে সুন্দর হইয়া উঠে।

সকল উপাখ্যান যে একটি আখ্যায়িকা লইয়া রচিত, তাহা নহে; এক একটি উপন্যাসে বিষয়বস্তু একের অধিক থাকিতে পারে এবং তাহারা পরস্পর ঘটনাসূত্রে গ্রথিত হইয়া একটি উপন্যাসের আকার ধারণ করে। যে স্থলে বর্ণনীয় বিষয় একটি ঘটনা লইয়া রচিত, তাহা সরল আখ্যান নামে (simple plot) অভিহিত। রমা ও রমেশের কথা লইয়া পল্লী-সমাজ—ইহা simple plot; অন্নপূর্ণার মন্দির সতী ও সাবিত্রীর কথা লইয়া রচিত—ইহা simple plot; গোরা অসংহত উপন্যাস হইলেও সরল, ঘরে বাইরে, চোখের বালি, রাজর্ষি প্রভৃতি সকলই সরল। বঙ্কিমচন্দ্রের কৃষ্ণকান্তের উইল সরল উপন্যাসের নিদর্শন। বঙ্কিমচন্দ্রের বিষবৃক্ষও সরল—দেবেন্দ্র দত্তকে লইয়া একটু তর্ক-বিতর্ক উঠিতে পারে। যে উপন্যাসে দুইটি আখ্যায়িকা থাকে—দুইটির আকর্ষণ প্রায় বিভিন্ন হইয়া পড়ে—তাহাই মিশ্র বা compound plotএর নিদর্শন। দুইটি আখ্যান উপন্যাসের কোন স্থলে কোন সূত্রে এক হইয়া যায়। চন্দ্রশেখর শৈবলিনী ও প্রতাপ চন্দ্রশেখরের মূল আখ্যায়িকা-মধ্যে দলনী ও মীরকাসিমের আখ্যায়িকা আসিয়াছে। এই দুইটির মিলন উত্তমরূপে হয় নাই—টানিয়া মিলন করা হইয়াছে। অপর দিকে কপালকুণ্ডলায় কপালকুণ্ডলা ও নবকুমারের আখ্যায়িকা মুখ্য, মধ্যে লুৎফ-উন্নিসার ঘটনা আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, নবকুমারকে কেন্দ্র করিয়া দুই ঘটনা মিলিয়া গিয়াছে। 'শ্রীকান্তে' 'শ্রীকান্ত ও রাজলক্ষ্মী' প্রধান, অন্নদা দিদি গৌণ, রেঙ্গুনের ঘটনা অভয়া ও রোহিণী গৌণতর হইয়া দাঁড়াইয়াছে। চরিত্রহীনে সাবিত্রী ও সতীশ, এ দিকে কিরণময়ী উপেনদাদা ও দিবাকর, (ইহার মধ্যে) উপেনদাদা ও তাহার সতীলক্ষ্মী সহধর্ম্মিণী ইহার মধ্যে তিনখানি আখ্যান রহিয়াছে—লেখক এক করিবার চেষ্টা করিলেও সে চেষ্টা সফল হয় নাই। এইরূপ double plot বা মিশ্রপটের ফলে বৈচিত্র্য বাড়ে, তুলনামূলক সমালোচনার সুবিধা হয়, গ্রন্থের একঘেয়ে ভাব (monotony) কমে, কোথাও বা একটু গম্ভীরভাব হইতে (tension) একটু বিশ্রাম পাওয়া যায় (Relief)। Shakespeareএর double plot অসাধারণ কলাকৌশলের পরিচয় পাওয়া যায়।

উপন্যাসে ঘটনাবিন্যাস-পদ্ধতিরও নানা প্রকারভেদ রহিয়াছে। লেখক স্বেচ্ছানুসারে সমগ্র ঘটনা বলিয়া যান, ইহাই সাধারণ ও সরল নিয়ম। বিষবৃক্ষ, মৃণালিনী, কপালকুণ্ডলা, চন্দ্রশেখর প্রভৃতি বহু গ্রন্থই এই ভাবে রচিত—উপন্যাস-রচনায় ইহাই সাধারণ নিয়ম। ইহাতে লেখক দুর্ঘটনার বর্ণনা, চরিত্র-সমালোচনা, ঘটনাবলীর স্থান-কালপাত্র সম্বন্ধে স্বীয় মতামত প্রকাশের বিশেষ সুবিধা পান, পাঠকও অনায়াসে লেখকের সাহায্যে বিষয়বস্তু আয়ত্ত করিতে পারে। কোন কোন গ্রন্থে ঘটনাবিন্যাসের ভিন্ন পদ্ধতি দেখা যায়—এই সকল গ্রন্থে চরিত্রমুখে ঘটনা বিন্যস্ত হয়। প্রত্যেক চরিত্র নিজেই নিজের কথা বলিয়া যাইতেছেন বা প্রধান চরিত্র তাঁহার জীবন-কাহিনী

বর্ণনা-প্রসঙ্গে সমগ্র ঘটনার বিবরণ দিতেছেন। 'শ্রীকান্ত' স্বীয় জীবনবর্ণন-প্রসঙ্গে প্রকাণ্ড উপন্যাসের অবতারণা করিয়াছেন। রবিন্‌শন্‌ক্রুশো জীবন-চরিতের আকারে সর্বজন-পরিচিত উপন্যাস, থ্যাকারের Esmond এবং ডিকেন্সের David Copperfield ঐ ভাবের উপন্যাস। কোটার ফলাফলের মধ্যে ঐ একই ভাবের নিদর্শন পাওয়া যায়। কোন কোন গ্রন্থে দেখা যায় যে, প্রত্যেক চরিত্রই নিজের কাহিনী বলিয়া যাইতেছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের কাণা ফুল-ওয়ালী রজনীর উপাখ্যানে এই পদ্ধতি অবলম্বিত হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসে প্রতি চরিত্র আপন কথা বলিয়া যান। এই সকল উপন্যাসে অনেক সময় চরিত্র ছাপাইয়া লেখকের ব্যক্তিত্ব বিশেষভাবে উঁকিঝুঁকি মারিতে থাকে। শ্রীকান্ত কি শরৎচন্দ্র, এ কথা যদি কেহ জিজ্ঞাসা করে, তাহা হইলে তাহাকে বিশেষ দোষ দেওয়া উচিত হয় না। কোন কোন স্থলে চরিত্রমুখে উপন্যাস বর্ণনায় চরিত্রগুলি ভাবপ্রবণ বা sentimental হইয়া পড়ে। সহজ ও সরলভাবে উপন্যাস লেখায় যে স্বাধীনতা পাওয়া যায়, তাহা জীবনচরিতের আকারে লিখিত উপাখ্যানে পাওয়া যায় না। পত্রাকারে লিখিত আর এক শ্রেণীর উপন্যাস অধুনা দেখিতে পাওয়া যায়। এইরূপ উপন্যাস আমাদের সাহিত্যে অধিক নাই; কিন্তু ইংরেজি ঔপন্যাসিক Richardson এই পদ্ধতি অবলম্বন-পূর্ব্বক তাঁহার উপন্যাস রচনা করিয়া গিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের মৃণালের কথা নামে আখ্যায়িকাও এইভাবে রচিত হইয়াছে।

[ক্রমশঃ

শ্রীনীরেন্দ্রকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় এম-এ (অধ্যাপক)।

ছদ্মবেশী

হে নিঠুর কুটিল অচেনা!
কখন তোমার সাথে,
সন্ধ্যায় দিবসে রাতে,
ছিল মোর কভু কি গো চেনা?
কেন তবে অকারণ,
নিশিদিন সারাক্ষণ,
তোমার সঘন ছায়া মোরে ছাড়িছে না?—
হে বধির প্রেমিক অচেনা!

হে পথিক অতিথ অজানা!
গোপনে আঙ্গিনা-মাঝে,
নিতি নব নব সাজে,
কেন কর এত আনাগোনা?
নূপুর বাঁশরী সনে,
মায়া হানি তনুমনে,
দ্বারে মোরে কেন দাও অবিরত হানা?—
অনাহূত অতিথ অজানা!

হে নিলাজ সুদূর-প্রবাসী!
কেন তুমি এত ক'রে,
করিছ ছলনা মোরে?
হে মায়াবী দূর-দেশবাসী!

পরম আত্মীয় মানি,
লই যারে বুকে টানি,
তারি মাঝে তোমা হেরি লাজ ভয় বাসি—
পলকে মিলায় মোর হাসি।

হে কৌশলী সন্ধানী চতুর!
ভিতর বাহির আর
করি তুমি একাকার,
নিতুই বাজাও তব সুর।
গহন অন্তরে মম
ফুটিছ অন্তরতম;
পশিলে কেমনে সেথা হে রূপ-বিধুর!—
কোন্ পথে এলে হৃদি-পুর?

হে প্রবল রসিক বিবাগী!
দশ দিক হ'তে হেন,
আমারে টানিছ কেন?
তুমি কি পাগল মোর লাগি?
নাহি লাজ ভয়-লেশ,
এস তবে হে অশেষ!
মুখামুখি পরিচয় দাও অনুরাগী!
হে অবুঝ শাশ্বত বিবাগী!

এস, আর, কর্ম্মকার (এম-এ)।

স্বখাত সলিলে

কুৎসিত তাহাকে বলা চলে না, সুন্দরীও নয়। কারণ, রং তাহার কালো। কিন্তু কপালক্রমে যেখানে তাহার বিবাহ হইল, সেখানে কালোর সম্পর্ক নাই বলিলেও চলে। স্বামী তাহার দিব্যকান্তি সুপুরুষ, স্থির হইয়া দু দণ্ড চাহিয়া থাকিবার মত চেহারা। তাঁহার দুই ভাই, এক বোন্, সকলেই বেশ গৌরবর্ণ। শ্বশুর বাঁচিয়া নাই, শাশুড়ীর পঞ্চাশের উপর বয়স হইয়াছে, তবু তাঁহার জগদ্ধাত্রীর মত রূপে চোখ যেন জুড়াইয়া যায়।

এ-হেন সংসারে উত্তরার মত কালো মেয়ের কেন যে বিবাহ হইল, সে সম্বন্ধে গবেষণা করিয়া লাভ নাই, আর সেটা এমন কিছু গবেষণার বিষয়ও নয়। তবু এই লইয়াই যে উত্তরার কত সুদীর্ঘ অলস মধ্যাহ্ন এবং রজনীর বিনিদ্র প্রহরগুলি কাটিয়া গিয়াছে, তাহার হিসাব করা যায় না। তাহার গায়ের রং যে খুব বেশী কালোও নয়, বাঙ্গালীর ঘরে সাধারণতঃ যাহাদিগকে সত্যকার কালো বলা হয়, তাহাদের তুলনায় তাহাকে যে ফর্সাই বলিতে পারা যায়, এ-ধরণের যুক্তি তাহার মনের মধ্যে কত যে বুদ্‌বুদের সৃষ্টি করিয়া আবার বুদ্‌বুদের মতই মিলাইয়া গিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। তবু, এটুকু সে মন হইতে মুছিয়া ফেলিতে পারে না যে, যে ঘরে তাহার বিবাহ হইয়াছে, তাহার অনুপাতে তাহার এই রংকেই যে দস্তুরমত কালো না বলিয়া উপায় নাই!

তাহার স্বামী সুপ্রতিম স্বভাবতঃ একটু গম্ভীর প্রকৃতির মানুষ; গেল-বছর ডাক্তারী পাশ করিয়া বড়বাজার অঞ্চলে একটা বড়-গোছের ডিস্‌পেনসারী খুলিয়া বসিয়াছে। তা ছাড়া হাসপাতালে একটা চাকরীও আছে। লেখাপড়া এবং নিজের ব্যবসা ইত্যাদি লইয়া সে সব-সময়েই ব্যস্ত। উত্তরা স্বভাবতঃই একটু লাজুক মেয়ে; ত্রস্তা হরিণীর মত মন যেন তাহার সর্ব্বদাই কোন্ অজ্ঞাত ব্যাধের পায়ের শব্দে চকিত হইয়া ফেরে।

শাশুড়ী ব্রজসুন্দরী থাকেন নিজের পূজা-আহ্নিক বারব্রত লইয়া। সুপ্রতিমের দূর-সম্পর্কের এক বিধবা বৌদিদি এ বাড়ীতে আশ্রিতা। বয়সে তিনি উত্তরার অপেক্ষা বছর পাঁচের বড়ই হইবেন। এই মেয়েটিকে দেখিয়াও উত্তরা যেন নিজের ভিতর খুব বেশী সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে। কি আশ্চর্য্য, এ ত ইহাদের নিজের সংসারের কেহ নয়, তবু ইহারও রূপের দীপ্তিতে চোখ যেন ঝল্‌সিয়া যায়। বিশেষ করিয়া গায়ের রং, রিক্তা বিধবার পোষাকে সে রংকে এতটুকু মলিন করিতে পারে নাই। উত্তরা কোন কোন বইয়ে পড়িয়াছে, সাদা বরফের উপর ঊষার রক্তাভা পড়িয়া যে রঙের সৃষ্টি হয়, তাই দিয়া মেয়েদের রূপ বর্ণনা ত' মিথ্যা নয়। ঐ মেয়েটির গায়ের রং দেখিয়া মনে হয়, কবিরা একটুও বাড়াইয়া বলেন নাই! রূপ যদি বলিতে হয়, তবে সে ইহাকেই।

সংসারের গৃহিণীপনার প্রায় সবটুকু ভারই পড়িয়াছে ঐ বিজয়ার উপর। তাহার রূপের সঙ্গে তাল রাখিয়া তাহার মিষ্ট ব্যবহারটুকু যেন এ-বাড়ীর ছোট-বড় সকলকেই জয় করিয়া ফেলিয়াছে।

সে দিন বিজয়া উত্তরার চুল বাঁধিতে বসিয়া বলিতেছিল,—"তোমার বুঝি বাপের বাড়ীর জন্যে মন কেমন করে গা? তাই এম্‌নি মন-মরা হয়ে থাকো?"

উত্তরা বলিল, "কৈ, না! কিছু ত হয়নি, দিদি, যে মন-মরা হয়ে থাক্‌বো?"

"হয়নি ত? তবু ভাল। তোমার মুখ দেখে আমার মনে হচ্ছিল, ঠাকুরপোর সঙ্গে ঝগড়া হয়েছে বুঝি?"

"ঝগড়া? কৈ, ঝগড়া ত হয়নি!"

উত্তরার জবাব দিবার ভঙ্গীতে বিজয়া হাসিয়া ফেলিয়া বলিল, "ঝগড়া হয়নি? তা হ'লে খুব ভাবই হয়েছে বুঝি?"

তাহার সে হাসিতে উত্তরার মুখখানা বিবর্ণ হইয়া গেল। ঝগড়া তাহাদের সত্যই হয় নাই, কিন্তু খুব বেশী ভাবও ত হয় নাই! সেইটুকু জানিতে পারিয়াই কি দিদি অমন করিয়া হাসিলেন? তবে কি স্বামী কিছু বলিয়াছেন দিদির কাছে? না হইলে দিদিই বা বুঝিবেন কেমন করিয়া?

বিজয়া তেমনই হাসিমুখেই বলিল, "ও মা! তোমার মুখখানা যে আবার পাংশুস্ হয়ে গেল। কি যে মেয়ে তুমি! —ঝগড়া হয়েছে বললেও তা মানবে না, আবার ভাব হয়েছে বললেও যেন ভয়ে এতটুকু হয়ে যাবে। ব্যাপারখানা কি বল দেখি তোমাদের?"

ব্যাপার কি, তা উত্তরা নিজেই জানে না, বিজয়াকে বলিবে কি! সুতরাং কোন জবাব খুঁজিয়া না পাইয়া চুপ করিয়াই রহিল।

বিজয়া শুধু মিষ্টভাষিণী নহে, সুরসিকাও বটে। মাত্র বছরখানেক হইল, উত্তরার বিবাহ হইয়াছে। এখনও সে নববধূ। নূতন বর ও বধূকে লইয়া রসিকতা করিতে বিজয়ার ভারী ভাল লাগে। কিন্তু তাহার রসিকতা বেশ জমিতে পায় না। কারণ, বয়সের অনুপাতে সুপ্রতিম এত বেশী প্রশান্ত যে, বিজয়ার কোন রসিকতাই সেখানে বিশেষ কোন ঢেউ তুলিতে পারে না। অতি গম্ভীর বর এবং অতি লাজুক বধূর মাঝখানে বিজয়া যেন কোন তৃপ্তিই পায় না। সেজন্য সময়ে সময়ে হঠাৎ সে গম্ভীর হইয়া পড়ে। যেন, হাসি এবং কৌতুকের বসন্ত-হিল্লোলের মাঝে মাঝে হঠাৎ এক-একবার শীতের কন্‌কনে স্তব্ধতা জমাট বাঁধিয়া উঠে। তখন তাহার মনে হয়, মিথ্যা এই হাস্যরসের প্রহসন, মিথ্যা সব! নিজের অধিকারের গণ্ডীটুকু মানিয়া না চলাতে সুখ ত নাই-ই, দুঃখই আছে বরং ঢের বেশী। তখন সে একেবারে ব্রজসুন্দরীর পূজার ঘরের চৌকাঠের কাছে আসিয়া বসিয়া পড়িয়া বলে, "মাসীমা! এই বোশেখে কিন্তু আমি ফলদানের ব্রত নেব তোমার কাছে। দেবে ত?"

উত্তরা একখানা খোলা বই হাতে লইয়া বিজয়ার ঘরে ঢুকিল। বিজয়া তখন কি-একখানা সাদা কাপড়ের উপর সিল্কের ফুল তুলিতেছিল। উত্তরা বলিল, "আচ্ছা দিদি, তুমি কৃষ্ণকান্তের উইল পড়েছ ত?"

বিজয়া সূচের দিকেই মন রাখিয়া বলিল, "পড়েছি বৈ কি! কেন বল ত?"

"এমনি। বেশ বই, না?"

"মন্দ নয়।"

"'মন্দ নয়' বলছো কেন, ভাই? এমন বই ত আমি দেখিনি। ভ্রমরের দুঃখে বুক ফেটে যায়।"

বিজয়া তেমনই অন্যমনস্কতার সহিতই বলিল, "গোবিন্দলালের দুঃখও ত কম নয়।"

উত্তরা যেন একটু হতবুদ্ধি হইয়া বিজয়ার মুখের পানে চাহিয়া বলিল, "তা বটে। তবে ভ্রমর--"

বলিয়া একটু চুপ করিয়া থাকিয়া হঠাৎ কি ভাবিয়া সে বলিল, "আচ্ছা, দিদি! ভ্রমর যদি কালো না হয়ে খুব সুন্দরী হ'ত, তা হ'লে অত কষ্ট তার কখনই হ'ত না। নয় কি বল?"

বিজয়া এবার হাসিয়া মুখ তুলিয়া বলিল, "তোমার এক ক্ষ্যাপামি! এর মধ্যে কালো-ফর্সার কথা এলো কোত্থেকে, তাই শুনি?"

উত্তরা বলিল, "নয় কেন? ভ্রমর কালো আর রোহিণী সুন্দরী বলেই ত এত কাণ্ড—"

বিজয়া হাসিয়া বলিল, "আমি কিন্তু ঠিক তা মনে করি না। ঠিক ঐ ঘটনাটা ঘটবার জন্যে রোহিণীর অতটা সুন্দরী না হলেও চলতে পারত।"

উত্তরা অবাক্ হইয়া বলিল, "কেন?"

"তার কারণ মোটামুটি এই যে, ভ্রমর কালোই হোক আর সুন্দরীই হোক, সে গোবিন্দলালের বিবাহিতা স্ত্রী, আর রোহিণী তা নয়।"

উত্তরার মুখ দেখিয়া বোঝা গেল, সে অতশত বুঝিতেছে না। সে বলিল, "তাতে কি হ'ল?"

বিজয়া বলিল, "যেটা একেবারে হাতের জিনিষ—নিজের নাগালের মধ্যে, তার চেয়ে যেটা দূরের জিনিষ—পাওয়া যাকে শক্ত, তারই আকর্ষণ ঢের বেশী দুর্ব্বার। এটা মানুষের স্বভাব—বিশেষ ক'রে পুরুষ জাতটার ত বটেই! ভ্রমর গোবিন্দলালের নিজের বস্তু, রোহিণী তা নয়, সেই ত তার মস্ত বড় সৌন্দর্য্য!"

এবার উত্তরা যেন কতকটা বুঝিয়া বলিল, "তা হোক্। কিন্তু সত্যিই ত রোহিণী ছিল সুন্দরী—"

বিজয়া বলিল, "হ্যাঁ। 'একে মনসা, তায় ধুনোর গন্ধ!' তাই ত আগুন জ্বলতে কোন দিক থেকেই আটকালো না। তা সে কথা যাক্। হঠাৎ থেকে-থেকে ঐ বইখানা নিয়েই পড়া হ'লো কেন? আগে পড়নি বুঝি?"

উত্তরা বলিল, "আগেও অনেকবার পড়েছি। ও বইখানা আমার পুরোণো হয় না।—ওটা কি হচ্ছে, ভাই?"

"ঠাকুরপোর জন্যে একটা টেবলক্লথ। যাঃ, ব'লে ফেললুম তোমায়! এখন যেন ব'ল না ভাই ওকে। সে দিন রুমালের ফুলটা ওর ভারী পছন্দ হয়েছে, তাই—"

উত্তরা বলিল,—"ঐ সব খুব ভালবাসে বুঝি ও?"

বিজয়া মাথা নীচু করিয়া স্থচের কায করিতে করিতেই বলিল, "তা আবার বাসে না? তবে ব্যভার ত করবে না, পুঁজি ক'রে তুলে রাখাতেই ওর সুখ। সেবার দু'রকমের দুটো সোয়েটার বুনে দিলুম, সে-সব বাক্সতেই প'ড়ে আছে, শ্রীঅঙ্গে আর উঠলো না। বলে, তুলে রাখাতেই ও সব জিনিষের মর্য্যাদা থাকে।"

উত্তরা বলিল, "যাই, ভাই। কথা কইলে তোমার কায এগুবে না।"

বিজয়া বলিল, "কেন, বোসো না, ভারী ত কায! এর জন্যে কারু ঘুম হচ্ছে না, এমন ত নয়!"

উত্তরা কিন্তু আর বসিল না; বলিল, "না দিদি, আজ আমি এ বইটা শেষ করবো।"

ঘরে আসিয়া বইখানাকে বুকের কাছে রাখিয়া উপুড় হইয়া শুইয়া সে পড়িবার চেষ্টা করিল বটে, কিন্তু আসলে একটা পাতাও তাহার পড়া হইল না। দৃষ্টি বইয়ের অক্ষরগুলি ছাড়িয়া শূন্য মেঝের একটা কালো দাগের উপর অত্যন্ত অকারণে নিবদ্ধ হইয়া রহিল। মেঝের ঐ যায়গা-টায় কবে খানিকটা কালী পড়িয়াছিল, এখনও সে দাগটুকু মিলাইয়া যায় নাই। ঐ কালো দাগটুকুকে কেন্দ্র করিয়া তাহার মনের মধ্যে কত এলোমেলো কথাই যে ঘুরিতে লাগিল! রোহিণী, ভ্রমর ও গোবিন্দলাল সম্বন্ধে বিজয়ার নূতন-ধরণের অভিমতটাকে সে ঠিক স্বীকার করিতে না পারিলেও একেবারে তুচ্ছ বলিয়া ফেলিয়া দিবার শক্তিও তাহার ছিল না। অবশ্য, ভ্রমর যদি রোহিণীর চেয়েও সুন্দরী হইত, অথবা রোহিণী হইত ভ্রমরের মতই কিম্বা তাহার চেয়েও কালো, তাহা হইলে রোহিণী-গোবিন্দলালের ঐ বিশ্রী ব্যাপারটা হয় ত ঘটিতে পারিত না, কিন্তু তবু রোহিণীর সবটুকু আকর্ষণ যে শুধু তাহার সৌন্দর্য্যই নয়, এ কথাটা একেবারে অস্বীকার করা চলে না ত!

ঐ বইখানা উত্তরা ইতিপূর্ব্বে অনেকবার পড়িয়াছে, এবং ওখানা বিশেষ করিয়া ভাল লাগার প্রধান কারণ এই যে, ভ্রমরের কালো রঙে সে নিজে খানিকটা স্বস্তি খুঁজিয়া পাইত। কালো হইয়াও ভ্রমর ঘর-বর ভালই পাইয়াছিল, সেও পাইয়াছে। স্বামীর যে অপরিসীম ভালবাসা ভ্রমর পাইয়াছিল, সে যদিও আজও তাহা পায় নাই, তবু তাহারই কল্পনা তাহাকে আনন্দে ভরপূর করিয়া রাখিত।

কিন্তু কেন স্বামী তাহাকে ভালবাসেন না? কালো হইলেই কি সে ভালবাসার অযোগ্য? না, বিজয়া যাহা বলিল, সে কথাটা এখানেও খাটে যে, স্ত্রী হাতের জিনিষ বলিয়াই অপর কোন দূরের বস্তুর প্রতি তাঁহার মন পড়িয়া আছে?

বোনার কায তিনি ভালবাসেন, কিন্তু কৈ, কোনও দিন তাহাকে ত কোন কিছু বুনিবার জন্য বলেন নাই? সে ত স্ত্রী, তবে বিজয়াই বা তাঁহার টেবলক্লথ আর রুমালে ফুল তুলিয়া দেয় কেন? বিজয়ার মত অত ভাল না পারিলেও সেও ত বুনিতে পারে? সে কথা ত তাঁহার অজানা নাই?

অভিমানে উত্তরার বুক ভরিয়া উঠিল। একবার মনে হইল, এই কথা লইয়া আজ খানিকটা কথা-কাটাকাটি করিবে, রাগারাগি হয়—হইবে, তাই বলিয়া এমন করিয়া মুখ বুজিয়া সে থাকিবে না। সে ত তাঁহার স্ত্রী, না, আর কেহ?

রাত্রিকালে যখন উত্তরা ঘরে আসিয়া ঢুকিল, তখন সুপ্রতিম ডেস্কের উপর ঝুঁকিয়া বসিয়া কি একখানা চিঠি লিখিতেছিল। অন্য দিন সে আসিবার আগে প্রায়ই সুপ্রতিম ঘুমাইয়া পড়ে, উত্তরা তাহার ঘুম ভাঙ্গাইতে সাহস করে না।

উত্তরা স্বামীর চেয়ারের পাশে দাঁড়াইতে সুপ্রতিম এক-বারমাত্র ঘাড় ফিরাইয়া দেখিয়া বলিল,—"কি খবর?"

তার পর আর কোন কথা না বলিয়া সে চিঠি লেখা শেষ করিল এবং উত্তরা চুপ করিয়া তেমনই দাঁড়াইয়া রহিল। চিঠিখানি খামের ভিতর মুড়িয়া ঠিকানা লিখিয়া প্যাডের তলায় রাখিয়া দিয়া উত্তরাকে বলিল, "দাঁড়িয়ে রইলে যে! শোবে না?"

বিছানায় শুইয়া উত্তরা আস্তে আস্তে বলিল, "আমায় একটা নিটীং-কেশ আনিয়ে দেবে ?"

সুপ্রতিম বলিল, "নিটীং-কেশ ? কেন দেব না ?"

তার পর আর কি বলিবে, উত্তরা খুঁজিয়া পাইল না। আলো নিবাইতে-নিবাইতে সুপ্রতিম বলিল, "আরও কি জিনিষ তোমার দরকার, কাল পণ্টুকে বলো, আমি তাকে ব'লে দেবোখ'ন।

পণ্টু সুপ্রতিমের ছোট ভাই।

শুইয়া শুইয়া উত্তরা ভাবিতে লাগিল, কেন এত দিনের ভিতর এই মানুষটিকে সে এতটুকু চিনিতে পারিল না ? এই যে না ঘৃণা, না প্রেম, এ ব্যবহারের অর্থ কি ? রং তাহার কালো, তাই ? না, যবনিকার অন্তরালে কোথায় কোন্ অদৃশ্য রোহিণী আত্মগোপন করিয়া আছে ?

কি একটা উৎসব-ব্যাপারে উত্তরা কয় দিন বাপের বাড়ী গিয়াছিল, সে দিন সন্ধ্যার সময় ফিরিয়া আসিল। আসিয়াই ঝির মুখে শুনিল, বড় বৌদির ক'দিন থেকে জ্বরে আর দিস্পিস্ নেই। কি যে হবে! দাদাবাবু ত ক'দিন রাত জেগে জেগে হাড়-মাস কালী ক'রে ফেল্‌লে।

কথাটা বলিয়া ঝি নিজের কাযে চলিয়া গেল। সুতরাং উত্তরার ইচ্ছা হইলেও এ সম্বন্ধে আর কোন কথা জিজ্ঞাসা করিবার উপায় রহিল না। সে কাপড় ছাড়িয়া মুখ-হাত ধুইয়া মুছিয়া বিজয়ার ঘরে আসিয়া দেখিল, তক্তপোষের উপর এলোমেলো বিছানায় বিজয়া শুইয়া আছে। হঠাৎ দেখিলে মনে হয়, অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া আছে। উত্তরা ডাকিল,—"দিদি।"

বিজয়া ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিয়া বলিল,—"কে? উত্তরা? এসেছ বোন্? এসো।—বড্ড জ্বর, ভাই। মনে হচ্ছে, এই আমার শেষ। তোমাদের সকলকে জ্বালাতন করা এত দিনে আমার সাঙ্গ হয়েছে। এবার আমি যেতে পারবো নিশ্চিন্ত হয়ে।"

"কি-সব বল্‌ছ, দিদি? তুমি আমাদের জ্বালাতন কর্‌ছো!"

"নয় ত কি, ভাই? ঠাকুরপো ডাক্তার মানুষ, তাই না হয় ওর কিছুতেই ক্লান্তি নেই, কিন্তু তবু ত মানুষ, দিন-রাত কেবল এই রোগের তদ্বির—"

উত্তরা চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

একটু পরেই সুপ্রতিম আসিয়া ঘরে ঢুকিল। গভীর একটা তৃপ্তির নিশ্বাস ছাড়িয়া বলিল, "এই যে, উত্তরাও এসে প'ড়েছ। আমি ভাবছিলুম, হয় ত আবার আন্‌তে লোক পাঠাতে হবে। বাঁচলুম!"

বিজয়া মাথার উপর কাপড় তুলিয়া দিল।

সুপ্রতিম বলিল, "দেখি একবার হাতটা? আজও ত জ্বর খুব বেড়েছে দেখছি—১০৪এর ওপর হবে। তুমি মাথায় একটু জলপটী দিয়ে দাও ত, উত্তরা! আর একটু বাদে টেম্পারেচারটা নিও।"

বলিয়া সে বাহিরে চলিয়া যাইতেছিল, দরজার বাহিরে বারান্দায় তাহার কম্পাউণ্ডারকে দেখিয়া বলিল, "এই যে, সুবোধ! ওহে, ও-বেলার প্রেস্‌ক্রপসনটাতেই আর্সেনিক ৪ ফোঁটা ক'রে দিয়ে রিপিট ক'রে দাও। বুঝলে?" বলিয়া সে ঘরের বাহির হইয়া গেল।

কয়েক দিনের মধ্যেই বিজয়া ভাল হইয়া উঠিল। ম্লান হাসিয়া সে সে দিন উত্তরাকে বলিতেছিল, "মনে করেছিলুম, এবার তোমাদের ছুটী দিয়ে যেতে পারবো, কিন্তু দেখছি, এখনও ভোগাবো সকলকে—"

কথাটা উত্তরার ভাল লাগিল না। মনে হইল, কথাটার ভিতর বড়-বেশী একটা ন্যাকামির সুর রহিয়াছে। বিতৃষ্ণায় তাহার মন ভরিয়া উঠিল।

বিজয়া বলিল, "কথা কচ্ছো না যে?"

উত্তরা হঠাৎ বলিয়া ফেলিল, "কি কথা কইব বল! তোমার খালি ঐ এক কথা! অথচ, কেন যে অমন ক'রে বল, তাও ত বুঝিনে। এ বাড়ীতে তোমাকে দেখবার লোকের কোনও দিন অভাব হয়নি—হবেও না। এটা তুমি নিজেও বেশ জানো। বরং আমারই অসুখ হ'লে রাত জাগবার লোক মিলবে না।"

ঝোঁকের বশে কথাটা বলিয়া উত্তরা যেন নিজেই অনেকখানি সঙ্কুচিত হইয়া গেল। আর বিজয়া হতবুদ্ধির মত উত্তরার মুখের পানে চাহিয়া রহিল। সেই মুখ-চোরা ভীরু মেয়েটির মুখে এ-ধরণের কথা সে কোন দিন শোনে নাই—শুনিবার আশাও কোন দিন করে নাই। তা ছাড়া, ঐ কথাটার ভিতর যে ইঙ্গিতটুকু প্রচ্ছন্ন ছিল, তাহার

আভাসমাত্রে বিজয়ার রোগদুর্ব্বল মস্তিষ্ক যেন ঝিম্‌-ঝিম্‌ করিয়া উঠিল। রাগের মুখে কোন কথাই তাহার মুখ দিয়া বাহির হইল না, শুধু অন্তরের ভিতর দিয়া একটা বিদ্যুৎপ্রবাহের মত খেলিয়া গেল। অনেক কষ্টে নিজেকে সামলাইয়া সে শুধু সংক্ষেপে এইটুকুই বলিতে পারিল, "এ কথা তুমি জানো ত যে, আমার সেবা করবার জন্যে আমি কাউকে কোন দিন মাথার দিব্যি দিতে যাই নি, বারণই বরং করেছি সকলকে!"

উত্তরা ইহার কি জবাব দিবে, যখন ভাবিয়া পাইতেছিল না, সেই সময় হঠাৎ সুপ্রতিম সেখানে আসিয়া পড়ায় সে এক দিকে যেমন স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিল, অপর দিকে তেমনই কি একটা অজ্ঞাত জ্বালায় তাহার বুকের ভিতর জ্বলিয়া উঠিতে লাগিল।

সুপ্রতিম বলিল, "সুবোধ ওষুধটা দিয়ে গেছে কি, বৌদি?"

বিজয়া তাহার কোন রকম উত্তর দিবার আগেই উত্তরা ধীরে ধীরে সেখান হইতে সরিয়া গেল। বাড়ীর ভিতর সর্ব্বস্থানে যেন একটা অসহ্য গুমোট বোধ হইতে লাগিল। সে তাই বরাবর উপরের খোলা ছাদে উঠিয়া আসিল। সেখানে আলসের গায়ে ভর দিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া তাহার এই কথাটাই মনে হইল, ভ্রমরের জীবনের সমস্যা তাহার নিজের জীবনেও জটিল হইয়া ফুটিয়া উঠিতে বুঝি আর দেরী রহিল না। কিন্তু কেমন করিয়া সহ্য করিবে সে? যাহার এতটুকু সোহাগ-আদরের আশায় তাহার দেহ-মন উন্মুখ হইয়া আছে, তাহার তরফ হইতে এই নিস্পৃহ উদাসীনতা সে কেমন করিয়া সহ্য করিবে? অথচ, সেই লোকটারই কত মাথাব্যথা ঐ বিজয়ার জন্য! কেন? বিজয়া সুন্দরী, আর সে কালো, তাই?

উত্তরার চোখের জল আলসের উপর ঝরিয়া-ঝরিয়া পড়িল। শুধুই এই গায়ের রঙের একটুখানি মলিনতার জন্য এত বড় শাস্তি তাহার?

বিজয়া সুপ্রতিমের সহিত সাধারণতঃ যে ভাবে কথা বলিত, আজ শুধু যে তাহারই ব্যতিক্রম দেখা গেল, তাহাই নয়, আজ যেন কিসের একটা কুৎসিত গ্লানিতে বিজয়ার মন ভরিয়া রহিয়াছে, এটুকু বুঝিতেও সুপ্রতিমের বিলম্ব হইল না; এবং সুপ্রতিম আসিতেই উত্তরার অমনভাবে নিঃশব্দে সরিয়া যাওয়ার সহিত বিজয়ার এই ব্যবহারেরও যে একটা প্রচ্ছন্ন সংযোগ রহিয়াছে, এটুকু অনুমান করাও তাহার পক্ষে কঠিন হইল না। সুপ্রতিম বুঝিল, উত্তরা ও বিজয়ার মধ্যে কি যেন একটা মনোমালিন্য সুরু হইয়াছে। হয় ত উত্তরা এ বাড়ীতে তাহার সত্যকার দাবীটুকু লইয়া বিজয়ার সহিত খুঁটিনাটি-ঝগড়া সুরু করিয়াছে এবং বিজয়া তাহাতে অপমান বোধ করিয়াছে। বিজয়া যখন জানালার বাহিরে আকাশের পানে উদাস শূন্য দৃষ্টি ছাড়িয়া দিয়া বেশ একটু দৃঢ়তার সহিত বলিল,—"আর আমাকে ওষুধ দিও না, ঠাকুরপো। এই তোমায় দিব্যি দিয়ে ব'লে রাখলুম। মরণই যার একমাত্র শান্তি, তার আবার ওষুধ খেয়ে বেঁচে থাকা কেন?" তখন সুপ্রতিম তাহার পানে স্থিরদৃষ্টি রাখিয়া স্তব্ধের মত দাঁড়াইয়া রহিল; এবং পরে জোর করিয়া একটুখানি হাসিয়া বলিল, "আচ্ছা, আচ্ছা, মরণের কোন্‌ রাস্তাটা সবচেয়ে সোজা, সেটা উদ্ভাবন ক'রে তোমায় না-হয় পরে খবর দেব, বৌদি; কিন্তু উপস্থিত তাড়াতাড়ি করো না। হঠাৎ পথ ভুলে গেলে পড়তে পারো!"

বলিয়া সে আর না দাঁড়াইয়া স্বাভাবিক ব্যস্ততার সহিত বরাবর নীচে নামিয়া গেল।

ডিস্‌পেন্সারীতে গিয়াও তাহার মাথার ভিতর বিজয়ার প্রসঙ্গটা এলোমেলোভাবে ঘুরিতে লাগিল; এবং এই কথাটাই তাহার মনে সমস্যার আকারে দেখা দিল যে, উত্তরা এবং বিজয়া—উভয়ের মধ্যে মনোমালিন্য যদি ধীরে ধীরে বাড়িয়া চলিতেই থাকে, তাহা হইলে উত্তরাকে লইয়া হয় ত কোন দুর্ভাবনার কারণ ঘটিবে না, কিন্তু বিজয়া? বিজয়ার স্বামী—তাহার বাল্যবন্ধু অমরনাথের সেই শেষ অনুরোধটুকু সে যে কোন দিনই ভুলিতে পারে নাই! "ওর কেউ রইল না, ওকে দেখিস্‌, ভাই!" মুমূর্ষুর এই কথাগুলি এখনও তাহার কাণে বাজিতেছে। তাই বিজয়ার প্রতি এতটুকু অসম্মান অপমান সুপ্রতিমের বুকে বড় বেশী করিয়াই বাজে। উত্তরা যদি তাহাকে দিনের পর দিন অপদস্থ করিতে সুরু করে? সে দোটানার মাঝে সুপ্রতিম নিজের কর্ত্তব্য স্থির করিবে কেমন করিয়া?

দিন কয়েক পরের কথা।

কম্পাউণ্ডার সুবোধ সুপ্রতিমকে জানাইল যে, বাড়ীতে

যে আর্শেনিকের ছোট শিশিটা ছিল, সেটা সে খুঁজিয়া পাইতেছে না। সুপ্রতিম যদি ভুলিয়া বাড়ীর ভিতরে কোথাও লইয়া গিয়া রাখিয়া থাকেন, একবার ভাল করিয়া খুঁজিয়া দেখিবার জন্য সুবোধ তাঁহাকে অনুরোধ জানাইল। সুপ্রতিম বলিল, "আমি কোথায় রাখব হে? ওষুধ-পত্র যা-কিছু, সব ত বাড়ীর নীচের ঘরেই থাকে। তুমিই হয় ত সেখান থেকে ডিস্‌পেন্সারী-ঘরে এনে রেখেছ।"

সুবোধ জানাইল,—"আজ্ঞে না। ডিস্‌পেন্সারীতে যে আর্শেনিকের বড় ফাইলটা থাকে, তাই আছে। ও শিশিটা বরাবর বাড়ীতেই থাক্‌তো।"

সে দিন ডিস্‌পেন্সারী হইতে বাড়ীতে আসিয়া সুপ্রতিম নীচেকার ঔষধের ঘরে ঢুকিয়া তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়াও আর্শেনিকের শিশিটার সন্ধান করিতে পারিল না। বাড়ীর সকলকেই একে একে জিজ্ঞাসা করিয়াও কোন কিনারা মিলিল না। উত্তরা শুধু ছোট করিয়া ঘাড় নাড়িল। বিজয়া হাসিয়া বলিল, "না ঠাকুরপো, তোমার ব্যবসাটি ফেল্ করবার কোনও বাসনা আমার নেই যে, তোমার ওষুধের শিশি সরিয়ে রেখে নিজে ডাক্তারী সুরু ক'রে দেব।"

বিজয়া আবার বেশ সুস্থ হইয়াছে। আবার তাহার মুখে পূর্ব্বের সেই হাসি ফিরিয়াছে। কিন্তু এটুকু সুপ্রতিম লক্ষ্য করিয়াছে যে, উত্তরা ও বিজয়ার মধ্যে আগের সে মেলামেশা—সে সহৃদয়তা নাই। উভয়েই যেন উভয়ের বহু দূরে দূরে সরিয়া থাকিতে চায়। সুপ্রতিম তাহাতে কষ্ট অনুভব করিলেও মুখ ফুটিয়া কাহাকেও কোন-কিছুই বলিতে পারে না। বিজয়া আবার পূর্ব্বের মত এ সংসারের গৃহিণী-পনা করিতেছে, আবার আগের মতই রহস্যের ঝঙ্কার তুলিয়া কথা বলিতেছে। কিন্তু উত্তরা আজকাল যেন অত্যন্ত আড়ালে-আড়ালে ঘুরিয়া বেড়াইতে ভালবাসে। নির্জ্জনে ছাদের উপর বসিয়া আকাশে তারার সমারোহ দেখিতে দেখিতে তাহার ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়া যায়। রাত্রিতে সুপ্রতিম হয় ত এক এক দিন তাহাকে জিজ্ঞাসা করে, "তোমার কি হয়েছে বল ত, উত্তরা?"

উত্তরা খুব ক্ষীণ একটু হাসিয়া বলে, "কি আবার হবে?"

সুপ্রতিম বলে,—"তবে?"

উত্তরা তাহার মুখের উপর ভাষাহীন স্থির চোখ দু'টি রাখিয়া জবাব দেয়,—"কি তবে?"

সুপ্রতিম ইহার পর আর কোন কথা গুছাইয়া বলিতে পারে না।

আর্শেনিকের শিশিটার সন্ধান কোথাও মিলিল না। সুপ্রতিম সে দিন ইহার জন্য সুবোধকে অত্যন্ত ধমক্ দিতেছিল। বেচারা সুবোধ কিছু বলিতে না পারিলেও মুখখানা তাহার কাঁদ-কাঁদ হইয়া উঠিয়াছিল। বিজয়া সে দিক্ দিয়া যাইতে-যাইতে দরজার বাহিরে দাঁড়াইয়া বলিল,—"মিছেই হয় ত ওকে বকা-ঝকা করছো, ঠাকুরপো! ঝি-চাকরে হয় ত ভেঙ্গে ফেলেছে, তার পর চুপি-চুপি কুড়িয়ে নিয়ে ফেলে দিয়েছে; এখন আর কি কেউ কবুল করবে?"

সুপ্রতিম হতাশার সুরে বলিল, "সেটা যে ভয়ঙ্কর বিষ, বৌদি!"

সেটা যে বিষ, এ কথায় বিজয়া দুই চোখ বিস্ফারিত করিয়া একবার সুপ্রতিমের মুখের পানে এবং একবার সুবোধের মুখের পানে তাকাইল। তার পর নিজের কাজে চলিয়া যাইতে-যাইতে শুধু বলিল, "যেমন সব অ-গোছালো ব্যাপার তোমাদের!"

কথাটা এক রকম চাপা পড়িয়াই গিয়াছিল। কিন্তু হঠাৎ অত্যন্ত বিশ্রী আকারে আবার আত্মপ্রকাশ করিল,—প্রায় মাস দেড়েক পরে।

কিছুদিন ধরিয়া উত্তরার ভিতর-ভিতর খুব বেশী রকম একটা পরিবর্ত্তন লক্ষিত হইতেছিল, শুধু তাহার মনে নয়, দেহেও।

সে যেন সর্ব্বদাই উদাস এবং উন্মনা হইয়া থাকে। সংসারের কোন জিনিষেই যেন তাহার আস্থা নাই। সুপ্রতিম কিছু জিজ্ঞাসা করিলে বলে, 'কৈ, কিছুই ত হয় নাই!' বেশী জিদ্ করিলে বলে, 'রোজই কেমন মাথা ধরে, আর সর্ব্বাঙ্গ জ্বালা করিতে থাকে। এ-ছাড়া আর ত কিছু হয় না।'

তাহার শাশুড়ীও তাহার জন্য চিন্তিত হইতে সুরু করিয়াছেন। সে দিন ছেলেকে ডাকাইয়া বলিলেন, "বৌমার কি হ'ল, না হয়, একবার ভাল ক'রে দেখো। সর্ব্বদাই যেন ঝিমিয়ে আছে, শুয়ে-শুয়ে থাকতে চায়। আগে-আগে মনে করেছিলুম, অন্তঃস্বত্বা; কিন্তু এখন ত তা মনে হয় না! তুমি ত কিছু দেখবে না!"

ছেলে অনুযোগের কণ্ঠে বলিল, "কি ক'রে দেখবো, তাই বল। যার অসুখ, সেই যদি মুখ ফুটে কিছু না বলে মা, আমি কার চিকিৎসা করবো ?"

মা বলিলেন, "জানিনে বাছা, তোমাদের সব কি যে কাণ্ড! অসুখের কথা তোমাকে যে ও কেন বলে না, তাও বুঝিনে! সেটাও ত ভাল কথা নয়!"

সুপ্রতিমের মনে হইল, মায়ের কথার ভিতর খুব ক্ষীণ অথচ সুস্পষ্ট একটু ভর্ৎসনা প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। মা যেন এই কথাটাই বলিতে গিয়া চাপিয়া গেলেন যে, স্বামীর কাছে স্ত্রীর অস্বাস্থ্যের কথা খুলিয়া না বলা, ইহাতে স্বামীর ত্রুটিও ত কম নয়! কিন্তু সে কি করিবে? সে ত কোন দিন উত্তরাকে অনাদর বা অবহেলা করে নাই! মুখ ফুটিয়া সে যখন যাহা চাহিয়াছে, তখনই আনাইয়া দিয়াছে। তবে সর্ব্বদাই সে নিজের কাযকর্ম্ম লইয়া ব্যস্ত; বাহিরের কর্ত্তব্য পূরাপূরি বজায় করিয়া সংসারের যাহার যতটুকু দাবী, তাহা মিটাইয়া দিতে সে কোন দিন কার্পণ্য করে নাই। তবু কেন উত্তরা তাহাকে পর ভাবে?

সে এক দিন উত্তরাকে জোর করিয়া ধরিয়া বলিল,—"কেন তুমি এমন হয়ে যাচ্ছো, বল ত সত্যি ক'রে? আমার এখানে তোমার ভালো লাগছে না? এখানে তোমার যত্ন হচ্ছে না বুঝি?"

উত্তরা একখানি ক্যাম্বিসের ইজিচেয়ারে নিস্পন্দ হইয়া পড়িয়াছিল। স্বামীর মুখের এ ধরণের কথা সে কখনও শুনিয়াছে বলিয়া মনে করিতে পারিল না। তবে কি স্বামী সত্যই তাহাকে ভালবাসিতে সুরু করিয়াছেন? তবে কি বিজয়া—

সুপ্রতিম ভর্ৎসনার সুরে বলিল, "কি যে ফ্যাল্‌ফ্যাল্ ক'রে তাকিয়ে থাকো! বল না, কি হয়েছে? তুমি কিছু বলবে না, আর মা আমাকে বকবেন!"

উত্তরা বলিল, "তোমাকে বকবেন মা?"

"বকবেন না? সে দিন দস্তুরমত বকেছেন যে, আমি তোমার পানে যথেষ্ট রকম নজর দিইনে।"

বলিয়া সে চুপ করিয়া দেয়ালের দিকে চাহিয়া চাহিয়া বলিল, "তবে এ কথাও ঠিক উত্তরা যে, আমি খুব একটা কাঠখোট্টা গোছের—নিতান্তই এই পৃথিবীর স্থূল মাটীতে তৈরী মানুষ। তোমরা সাধারণতঃ যাকে প্রেম, প্রণয় বা ভালবাসা বল, সে সব আমার মাথায় ঢোকে না। আমি জানি, স্বামী বা স্ত্রীর পরস্পরের কাছে পাওনা কতকগুলো কর্ত্তব্যের সমষ্টি। সে সব কর্ত্তব্যের অধিকাংশই বেশ মোটামুটি রকমের শুকনো এবং শক্ত; মধুরত্ব যা আছে, তা সামান্যই।"

বলিতে বলিতে সে উত্তরার মুখের পানে দৃষ্টি ফিরাইয়া দেখিল, সে নির্নিমেষ-নয়নে তাহার পানে চাহিয়া আছে!

সুপ্রতিম স্ত্রীর একখানা হাত নিজের হাতের মধ্যে টানিয়া লইয়া বলিল, "কি দেখ্‌ছো?"

উত্তরা ক্লান্তস্বরে চোখ নামাইয়া বলিল,—"কিছু না।"

সুপ্রতিম একটু চুপ করিয়া কি ভাবিয়া বলিল,—"আমি আমাদের কলেজের এক জন বড় ডাক্তারকে নিয়ে আসবো। আমাকে তুমি না বল্‌তে চাও, তাঁকে সব কথা তোমার বল্‌তে হবে।"

সে চলিয়া গেলে উত্তরা একা সেই ভাবেই ইজিচেয়ারে পড়িয়া পড়িয়া স্বামীর কথাগুলিকে বিশ্লেষণ করিয়া দেখিতেছিল। আশ্চর্য্য! স্বামি-স্ত্রীর সম্বন্ধ কেবল কতকগুলি কর্ত্তব্যের সমষ্টি-মাত্র! কেন এত নির্ব্বিকার? কেন? সে রূপসী নয়, এই তাহার একমাত্র কারণ নয় কি?

নীচে বৈঠকখানা-ঘরে সুপ্রতিম এবং তাহার কলেজের প্রবীণ অধ্যাপক ডাঃ বিশ্বাস কথা কহিতেছিলেন। দুজনেরই মুখ অতিরিক্ত রকম গম্ভীর এবং বিষণ্ণ। সুপ্রতিমের মুখে একটা বিবর্ণতা সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে।

ডাঃ বিশ্বাস বলিতেছিলেন, "এ সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ আর এক বিন্দু নেই। আর্সেনিকের লক্ষণ পেয়েছিলুম ব'লে তোমায় analyserএর রিপোর্ট নিতে বলেছিলাম। এখন ত তুমিও স্পষ্টই বুঝ্‌ছো!"

সুপ্রতিমের মাথার ভিতর তখন ঘুরিতেছিল—সেই হারানো আর্সেনিকের শিশিটা! কিন্তু সে কথা সে ডাক্তারের কাছে প্রকাশ করিয়া বলিতে পারিতেছিল না।

ডাঃ বিশ্বাস টেব্‌লের উপর আঙ্গুলের মৃদু টোকা দিতে দিতে বলিলেন, "এখন এই poisoningটা হ'লো কেন, সে হয় ত তুমিই ভালো বল্‌তে পারবে। আত্মহত্যার জন্যে নয়, এটা আমার দৃঢ় ধারণা। কারণ, তার জন্যে এত অল্প-অল্প ক'রে অগ্রসর হবার দরকার ছিল না।"

সুপ্রতিম রুদ্ধনিশ্বাসে বলিল, "তা হ'লে কি আপনি বলতে চান্ যে, এটা আর কেউ ওকে—"

ডাঃ বিশ্বাস বলিলেন, "বলাটা অন্যায় হবে হয় ত। কিন্তু ডাক্তারী অভিজ্ঞতা নিয়ে ঐ কথাটাই মনে আসে যে! লোকের চোখে ধূলো দিয়ে কায শেষ করতে আর্শেনিকের ব্যবহারটা খুবই বেশী। যাক্! সব কথা বলা হয় ত আমার উচিত হবে না। কিন্তু, এখন থেকে তোমায় দস্তরমত সতর্ক হ'তে হবে। তোমার স্ত্রীর খাবার জিনিষগুলি যাতে নিজের হাতে না হোক, নিজের সামনে তৈরী ক'রে দিতে পার, তার চেষ্টা ক'বো। আর, উপস্থিত ঐ প্রেস্‌ক্রপ্‌সন্‌টাই চল্‌বে।"

সুপ্রতিম একবারে হতবুদ্ধি হইয়া গিয়াছিল। উত্তরাকে বিষ দিয়াছে? কে? কাহার সঙ্গে তাহার এমন শত্রুতা যে, তাহাকে পৃথিবী হইতে সরাইতে না পারিলে—

ব্রজসুন্দরী সব কথা শুনিলেন। কিন্তু যাহাতে কোন-রকম কাণাকাণি না হয়, সে সম্বন্ধে সুপ্রতিম তাঁহাকে বিশেষ করিয়া সতর্ক করিয়া দিল। ব্রজসুন্দরীর দুই চোখ দিয়া দর-দর করিয়া জল গড়াইয়া পড়িল। আঁচলে তাহা মুছিতে-মুছিতে কপালে নিঃশব্দে করাঘাত করিতে লাগিলেন।

বিজয়া আসিয়া ব্রজসুন্দরীকে জিজ্ঞাসা করিল,—"উত্তরার কি হয়েছে, মাসী-মা? ডাক্তার কোনও কিছু খারাপ ব'লে গেলেন না কি?"

ব্রজসুন্দরী বলিলেন, "খারাপ এমন কিছু নয়। তবে হ্যাঁ—একটুখানি ভাববার কথা বৈ কি।"

ও সম্বন্ধে বিজয়াকে আর কোন প্রশ্ন করিবার অবকাশ না দিয়া ব্রজসুন্দরী নিজের কাযে চলিয়া গেলেন।

দুপুরবেলা সুপ্রতিম বাড়ীতে আসিলে তাহাকে নিরিবিলি পাইয়া বিজয়া ঐ প্রশ্নটাই করিল। সুপ্রতিম এক-বার যেন কেমন খাপছাড়াভাবে বিজয়ার মুখের দিকে তাকাইয়া গায়ের কোটটি খুলিতে খুলিতে বলিল,—"কি ক'রে বলবো বল! কি যে হয়েছে, তা এখনও নিশ্চয় ক'রে কিছু বলা যাচ্ছে না। তোমাকে কিছু বলে নি?"

বিজয়া যেন একটু মুস্কিলে পড়িয়া গেল। সে খানিকক্ষণ নতমুখে চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল,—"আমি ওকে জিজ্ঞাসা করিনি।"

সুপ্রতিম বলিল,—"ও!"

ঐ ছোট্ট একটি কথায় বিজয়ার যেন চমক্ লাগিল। ঐ একটি অক্ষরের উচ্চারণের ভঙ্গীতেই যেন কত কঠোর ভর্ৎসনা মেশানো রহিয়াছে। সে তেমনই নতমুখেই দাঁড়াইয়া রহিল।

আয়নার সম্মুখে দাঁড়াইয়া নেক্‌টাইয়ের ফাঁসটুকু আলগা করিতে করিতে সুপ্রতিম বলিল,—"আচ্ছা, তোমাদের ঝগড়াটা কিসের, তাও আমি শুনতে পাইনে, বৌদি?"

আয়নার ভিতর দিয়াই সে দেখিল, বিজয়া একবার সোজা তাহার পানে দৃষ্টি তুলিয়াছে। সে চোখে কেমন যেন একটা ত্রস্ত ব্যাকুলতা।

মুহূর্ত্তকাল নীরব থাকিয়া সে বলিল,—"কৈ, ঝগড়া ত কিছুই হয়নি, ঠাকুরপো! ও বলেছে বুঝি তোমায়? ওর যেমন সবতাতেই বাড়াবাড়ি!"

ঐ কথার পর আর সেখানে না দাঁড়াইয়া সে কার্য্যান্তরে চলিয়া গেল।

পোষাক ছাড়া ভুলিয়া সুপ্রতিম স্তব্ধের মত অনেকক্ষণ চেয়ারে বসিয়া রহিল। তাহার মাথায় আকাশ-পাতাল ভাবনা। উত্তরা যদি আত্মহত্যার চেষ্টায় আর্শেনিক না খাইয়া থাকে, তবে কে আর তাহাকে বিষ দিবে? এ বাড়ীতে কে আর আছে? উত্তরার প্রতি কাহার এমন মারাত্মক বিদ্বেষ যে—আর সে বিদ্বেষের উৎসই বা কোথায়?

উত্তরা প্রায় শয্যাগত হইয়া পড়িয়াছে। একে সে স্বভাবতই ক্ষীণাঙ্গী, তাহার উপর এই অদ্ভুত অসুখ—সে একবারে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। সর্ব্বদাই সে মুখ বুজিয়া আচ্ছন্নের মত বিছানায় পড়িয়া আছে। আগে যদি বা সুপ্রতিম তাহার অসুখ সম্বন্ধে অনেক কিছুই প্রশ্ন করিত, এখন আর এ-সম্বন্ধে সে বিশেষ কিছু বলে না। তবে এটুকু সে অনুভব করিতেছিল, আজকাল সুপ্রতিম অনেকখানি সময় বাড়ীতে থাকে, এবং যতক্ষণ থাকে, ততক্ষণ সে উত্তরার বিছানার পাশে ইজিচেয়ারে পড়িয়াই কাটাইয়া দেয়। উত্তরা এক একবার মুখ তুলিয়া বলে, "তুমি বেরুবে না?"

সুপ্রতিম বলে, "না। কেন?"

উত্তরা বলে, "এম্‌নি।"

সে দিন উত্তরা স্বামীকে হঠাৎ প্রশ্ন করিয়া বসিল,—"আচ্ছা, তোমায় একটা কথা জিজ্ঞোস্ করবো। সত্যি বলবে?"

"কি ?"

"আমি আগের চেয়ে অনেকটা ফর্সা হয়েছি কি না, সত্যি ক'রে বল !"

সুপ্রতিম খানিকক্ষণ তাহার মুখের পানে চাহিয়া থাকিয়া বলিল, "তা হয়েছে। ফ্যাকাশে হ'লে সবাই ফর্সা হয়।"

উত্তরা আর কোন কিছু বলিল না ; ধীরে ধীরে চোখ-দুটি বুজিয়া শুইয়া রহিল।

সে দিন ব্রজসুন্দরী বিজয়াকে ডাকিয়া বলিলেন,—"দেখ, বৌমা ! তুমি এখন দিনকতক না হয় আমাদের গাঁয়ে গিয়েই থাকো। সেখানকারও ত সবই অ-গোছালো হয়ে আছে। তুমি গেলে হয় ত খানিকটা উপকার হ'তে পারবে।"

এ-কথার জবাবে বিজয়া কি যে বলিবে, সহসা খুঁজিয়া না পাইয়া হতবুদ্ধির মত হইয়া পড়িল। ব্রজসুন্দরীও তাহার কোন রকম জবাবের অপেক্ষা না করিয়াই বলিলেন, "তা হ'লে কালই সকালে তুমি যাও। সুবোধকে বলেছি, সে তোমাকে রেখে আসবে।"

বিজয়া একবারে স্তম্ভিত হইয়া গেল, এবং এ-সম্বন্ধে আর কোন কিছু আলোচনা হইবার অবকাশ না দিয়া ব্রজসুন্দরী কার্য্যান্তরে চলিয়া গেলেন।

চোখ, কাণ ইত্যাদির অতিরিক্ত মানুষের একটা ইন্দ্রিয় আছে,—যাহার সাহায্যে কোন একটা জিনিষ না দেখিয়া, না শুনিয়াও বুঝিতে পারা যায়। বিজয়া অনুভব করিতে-ছিল, এই বাড়ীর আবহাওয়ায় কোথায় যেন একটা নিশ্বাস-চাপা ঘন বাষ্প জমিয়া উঠিয়াছে। ব্রজসুন্দরী হইতে সুরু করিয়া এ বাড়ীর ঝি-চাকর সকলের মুখেই যে একটা থমথমে ভাব, ইহার গ্লানি তাহাকে রীতিমত গভীরভাবেই স্পর্শ করিয়াছে। এক দিন যে বাড়ীর গৃহিণী হইতে দাসদাসী সকলেই তাহার সহিত হাসিমুখে ছাড়া কথা বলিত না, আজ যেন সে সে-সংসারের কেহ নয়, সম্পূর্ণ অনভিপ্রেত এক জন অনাত্মীয় ছাড়া কেহ নহে। সে জানে, উত্তরার বাড়াবাড়ি অসুখ ; কিন্তু তাহা ছাড়াও এমন একটা কিছু ঘটিয়াছে, যাহার সহিত তাহার নিজেরও যেন একটা কুটিল সংযোগ রহিয়াছে ; অথচ কেহই সে কথাটা স্পষ্ট করিয়া মুখ ফুটিয়া বলিতে চাহিতেছে না। উত্তরার কি অসুখ, ডাক্তার কি বলিতেছে, কেহই তাহাকে শুনাইতে চায় না। নিজে সে অনেক দিন উত্তরাকে এ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিবার চেষ্টা করিয়াও পারে নাই। কেমন একটা 'কিন্তু'র ভাব তাহাকে বাধা দিয়াছে। তা ছাড়া, এটুকু কেহ মুখ ফুটিয়া না বলিলেও সে সম্প্রতি অনুভব করিতেছে, উত্তরার সহিত তাহার মেলামেশা করাটা এ বাড়ীর কেহই যেন পছন্দ করে না ! কিন্তু কেন ? উত্তরার সহিত ত তাহার কোন শত্রুতা নাই ! শুধু তাহার সে দিনের সে কথাটাকে আজও বিজয়া মার্জ্জনা করিতে পারে নাই। সে কি তাহার দোষ ? কেন উত্তরা তাহার সম্বন্ধে ঐ হীন সন্দেহ ব্যক্ত করিতে সাহস করিল? সংসারে তাহার আপনার বলিতে কেহ নাই বলিয়াই ত অমন করিয়া সে বলিতে পারিল ? সে জানে, উত্তরা কি মনে করে। ছেলেমানুষ বলিয়া সে অবশ্য সে কথা গ্রাহ্য করে না, কিন্তু তবু সে মারাত্মক অপমান সে কখনই ভুলিতে পারিবে না।

মাসীমার হুকুম, কালই তাহাকে এ বাড়ী ছাড়িয়া যাইতে হইবে ! এ কি তাহার নির্ব্বাসন ? এ কি তবে উত্তরারই ব্যবস্থা ? না হইবেই বা কেন ? সে-ই ত এ বাড়ীর বড় বউ এবং সে দিক দিয়া গৃহিণীও বটে ! সে কি কিছু বলিয়াছে মাসীমার কাছে ? মনের যে কুৎসিত সন্দেহের সে সেদিন আভাসমাত্র দিয়াছিল, তাহাকেই ফেনাইয়া ফাঁপাইয়া মাসীমার কাছে একটা গল্পের সৃষ্টি করিয়াছে ? এবং সেই জন্যই তাহার এই শাস্তি ?

বিজয়ার বুক ফাটিয়া কান্না আসিল। নিশ্চয়ই তাই। আর, এই জঘন্য অপমান মুখ বুজিয়া সহ্য করিয়া সে ওদের দেওয়া শাস্তিটাকেই নির্ব্বিচারে মাথায় পাতিয়া লইয়া চলিয়া যাইবে ?

কিন্তু, তা' ছাড়া উপায় কি ? সর্ব্বস্বহারা রিক্তা যে সে ! তাহার যে কেহ নাই, কিছু নাই ! এই অহেতুক অপমানের বিরুদ্ধে একটা কথা বলিতে যে এ-সংসারে একটি প্রাণীও নাই।

হ্যাঁ, সহ্যই করিবে সে ! সে বিধবা—ধরিত্রীর মত তাহার সহিষ্ণুতা চাই—অপমানকে সে বরণ করিবে হাসির অর্ঘ্য দিয়া !

দিন-দুই পরের এক সন্ধ্যা।

সুপ্রতিম সুইচ্ টিপিয়া আলো জ্বালিয়া দিতে উত্তরা উঠিয়া বসিয়া হাত যোড় করিয়া ঠাকুরপ্রণাম করিয়া আবার শুইয়া পড়িল। তার পর খানিকক্ষণ চুপ করিয়া পড়িয়া থাকিয়া সুপ্রতিমকে ডাকিয়া বলিল,—"হ্যাগা, আমার খুব শক্ত অসুখ, না?"

সুপ্রতিম ঢোক গিলিয়া বলিল,—"শক্ত অসুখ হ'তে যাবে কেন? তবে ভারী দুর্ব্বল হয়ে পড়েছ কি না—"

উত্তরা কি যেন ভাবিতেছিল। আবার একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, "অচ্ছা, দেখ, দিদি আর কেন আমার কাছে একটিবারও আসে না? আগে যদি বা কখনও আস্তো, খাবার দিয়ে খেতে বলেই চ'লে যেতো। আমি ছেলেমানুষ, আমার ওপর তার এত রাগ? তুমি একবার তাকে বল্বে?"

"কি বল্বো?"

"দিদিকে একবার আমার কাছে এসে বস্তে?"

"সে ত এখানে নেই, উত্তরা। মা তাকে গাঁয়ে পাঠিয়ে দিয়েছেন।" কথাটা শেষ হইবার আগেই সুপ্রতিমের গলা যেন ধরিয়া আসিল।

"কেন? এখন সে চ'লে গেল কেন? আমার এই অসুখ, বাঁচ্বো কি না, আর সে আমাকে ফেলে চ'লে গেল?"

সুপ্রতিম একটু চুপ করিয়া থাকিয়া যেন অতি কষ্টে বলিল,—"মা মনে করেন, সে তোমাকে দেখ্তে পারতো না। সে-ই তোমাকে খাবারের সঙ্গে কি-সব দিত, যার জন্যে তোমার এই অসুখ। এত দিন তোমাকে বলিনি; ডাক্তাররা বলেন, অনেক দিন থেকে একটু-একটু ক'রে আর্শেনিক বিষ খাওয়ানোর জন্যই—"

উত্তরা নিস্পন্দ অবস্থায় বিছানায় পড়িয়াছিল। সমস্ত শরীরের কোথাও যেন এতটুকু জীবনের লক্ষণ নাই। শুধু চোখ-দুইটা তাহার অতিমাত্রায় বিস্ফারিত হইয়া পড়িয়াছিল। দেখিতে-দেখিতে সেই পলকহীন চোখের কোণে বড় বড় দুটি ফোঁটা জল মুক্তার মত জ্বলিতে লাগিল।

সুপ্রতিম তাড়াতাড়ি তাহার বিছানায় আসিয়া বসিয়া তাহার গায়ে ঝাঁকানি দিয়া বলিল,—"কি হয়েছে, উত্তরা? কাঁদ্ছো যে?"

উত্তরা ছেলেমানুষের মত কাঁদিয়া ফেলিল,—"ওগো! সব দোষ যে আমার! আমার নিজের দোষের জন্যে তাকে পেতে হ'লো শাস্তি!"

"তোমার কি দোষ, উত্তরা?"

"তোমার সেই আর্শেনিকের শিশিটা লুকিয়ে রেখে আমি নিজেই যে খেতুম একটু একটু ক'রে। শুনেছিলুম, ওতে নাকি ফর্সা হওয়া যায়। হ্যাঁ গো, আর কি দিদিকে ফিরিয়ে আন্তে পার না? আমি পায়ে ধ'রে কেঁদে পড়লেও কি সে আস্বে না?"

জানালার বাহিরে নিষ্পলক শূন্যদৃষ্টি ছাড়িয়া দিয়া সুপ্রতিম কাঠ হইয়া বসিয়াছিল; যেন সে রক্তমাংসের মানুষই নহে!

শ্রীপ্রফুল্লকুমার মণ্ডল

অমর পুষ্প

তোমারে তো চাহি নাই অশ্রুসিক্ত জীবনের বনে
বেদনার বৃন্ত পরে ফুটাইতে আনন্দের ফুল,—
সৌরভে যাহার আজি চিত্ত মোর বিমুগ্ধ-ব্যাকুল;
স্বর্গের আশিস্ সম পেয়েছিনু না জানি কেমনে।

পথ-মাঝে অকস্মাৎ মিলেছিনু মোরা দুই জনে,
তার পরে লভিলাম বিচ্ছেদের বিষাদ বিপুল
তবু মোরে দিয়ে গেছ অমরার অমৃত অতুল;
ক্ষণিক মিলন, তবু সেই স্মৃতি নিত্য র'বে মনে।

মনে পড়ে, কবে কোন্ মুখরিত বসন্তের দিনে
একসাথে চলেছিনু বাক্যহীন মোরা দুই জন।
তোমার তরুণ তনু, স্নিগ্ধ দুটা করুণ নয়ন
ক'য়েছিল কি-যে বাণী এ আমার হৃদয়ের কাণে
সেই দিন চিত্ত মোর চিরতরে লইয়াছ জিনে;
সে দিন অমর পুষ্প ফুটিয়াছে অন্তর-কাননে!

শ্রীসরোজরঞ্জন চৌধুরী

সে কালের স্মৃতি

২৩

আমরা যে সময় বরোদায় ছিলাম, তখন বরোদায় বাঙ্গালীর সংখ্যা নিতান্ত অল্প ছিল। ব্যবসায় ও চাকরী উপলক্ষে সে সময় বোম্বাই নগরে অনেক বাঙ্গালী বাস করিতেন। বোম্বাই হইতে বরোদার দূরত্বও অধিক নহে, বোম্বাই নগরে ভিক্টোরিয়া টার্মিনস্ ষ্টেশনের অদূরে বি, বি, সি, আই, রেলপথের কোলাবা ষ্টেশন। এই ষ্টেশনে রাত্রি দশটার সময় ট্রেণে চাপিলে প্রত্যূষে সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই বরোদায় উপস্থিত হইতে পারা যায়; অথচ বোম্বাই হইতে বরোদায় বাঙ্গালীর গতিবিধি ছিল না, এজন্য বরোদায় বাঙ্গালীর অভাব লক্ষ্য করিয়া বিস্মিত হইতাম। গিরীন্দ্র বাবু নামক এক জন বাঙ্গালী জুয়েলার এই সময় ব্যবসা উপলক্ষে বরোদায় বাস করিতেন। মিঃ ফাড়কের সহিত তাঁহার পরিচয় ছিল। আমি কোন কোন দিন অপরাহ্নে পণ্ডিতজীর সঙ্গে বেড়াইতে বেড়াইতে তাঁহার দোকানে যাইতাম। এক দিন দেখিলাম, গিরীন্দ্র বাবুর দোকানে তাঁহার কারিকররা স্বর্ণনির্ম্মিত এক জোড়া ব্রেসলেট হীরকখচিত করিতেছিল। ব্রেসলেটযুগলের শিল্পনৈপুণ্যে মুগ্ধ হইয়া আমি তাহা হাতে লইয়া পরীক্ষা করিতে লাগিলাম; ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্যুতিমান হীরকরাশি দ্বারা নির্ম্মিত একটি নাম ব্রেসলেটের ভিতর ঝক্‌মক্ করিতেছিল; তাহার উপর দীপালোক প্রতিফলিত হওয়ায় তাহার ঔজ্জ্বল্যে চক্ষু ধাঁধিয়া যাইতেছিল। আমি নামটি পাঠ করিলাম—'আমিনা তায়েবজী।' গিরীন্দ্র বাবুকে জিজ্ঞাসা করিলাম—'এ কাহার নাম?' গিরীন্দ্র বাবু বলিলেন, 'উনি বোম্বে হাইকোর্টের জজ বদরুদ্দীন তায়েবজীর কন্যা, এবং বরোদা হাইকোর্টের জজ মিঃ আব্বাস্ তায়েবজীর স্ত্রী।' বুঝিলাম, মিঃ আব্বাস তায়েবজী মিঃ বদরুদ্দীন তায়েবজীর কেবল ভ্রাতুষ্পুত্র নহেন, তাঁহার জামাতাও বটেন। মিঃ আব্বাস্ তায়েবজী তখনও স্বদেশপ্রেমিক বলিয়া খ্যাতি লাভ করেন নাই, এবং মহাত্মা গান্ধী তখনও দক্ষিণ-আফ্রিকাপ্রবাসী, সুতরাং তাঁহার সহিত ঘনিষ্ঠতার সুযোগ লাভ করিতে পারেন নাই। বরোদার শিক্ষিত সমাজে সে সময় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠার বিশেষ কোন পরিচয় পাই নাই। বোম্বাই অঞ্চলের কোনও দেশীয় রাজ্যে কংগ্রেস তখনও প্রতিপত্তি লাভ করিতে পারে নাই। একালেই বা কোন্ দেশীয় রাজ্য কংগ্রেসকে আমল দিতেছে? নাভার মহারাজা না কি কংগ্রেসভাবাপন্ন ছিলেন।

এই সময় শ্রীযুত অক্ষয়কুমার ঘোষ ইংলণ্ড হইতে বরোদায় আসিয়াছিলেন। শ্রীঅরবিন্দ অপেক্ষা তাঁহার বয়স কিছু অল্প ছিল। এক দিন অপরাহ্নে—কাহার নিকট শুনিলাম স্মরণ নাই—সংবাদ পাইলাম, বরোদা ক্যাম্পে এক জন সম্ভ্রান্ত বাঙ্গালী আসিয়া ডাক-বাংলোতে বাস করিতেছেন—তাঁহার নাম মুল্লার-ঘোষ। নাম শুনিয়া মনে হইল, ভদ্রলোক হয় ত এলফ্রেড বোসের মত বাঙ্গালী খৃষ্টান, দেশপর্য্যটন উপলক্ষে বরোদায় আসিয়াছেন। তথাপি তিনি আমার স্বদেশবাসী, এজন্য তাঁহাকে দেখিতে আগ্রহ হইল। অরবিন্দ বলিলেন, তিনি যখন বরোদায় আসিয়াছেন, তখন দেখা হইবেই। বস্তুতঃ এই আশা পূর্ণ হইতে অধিক বিলম্ব হইল না। দুই এক দিনের মধ্যেই তিনি আমাদের বাসায় অরবিন্দের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। শুনিলাম, তিনি আমাদেরই মত খাঁটি হিন্দু। এই সময়ের কয়েক বৎসর পূর্ব্বে মিস্ মুলার নাম্নী বিদুষী ইংরেজ-মহিলা এদেশে আসিলে, প্রতিভাবান্ উচ্চাভিলাষী অক্ষয়কুমার তাঁহার স্নেহলাভে সমর্থ হইয়াছিলেন, এবং তিনি স্বদেশে প্রত্যাগমনকালে অক্ষয়কুমারকে সঙ্গে লইয়াছিলেন। শুনিয়াছিলাম, অক্ষয়কুমার তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতার নিদর্শনস্বরূপ নিজের নামের সহিত তাঁহার নাম সংযোজিত করিয়াছিলেন, এবং এই জন্যই ইংলণ্ডে তিনি মুলার এ, কে, ঘোষ নামে পরিচিত হইয়াছিলেন, খৃষ্টধর্ম্মের সহিত এই নামের সংস্রব ছিল না। থিয়োলজি শাস্ত্রে তাঁহার ন্যায় অভিজ্ঞ সুপণ্ডিত, বিবেচক যুবক খৃষ্টধর্ম্মের প্রলোভনে মুগ্ধ হইবেন, ইহা

বদরুদ্দীন তায়েবজী

অসম্ভব বলিয়াই মনে হইয়াছিল, হিন্দুর সভ্যতা ও সংস্কৃতি যে বিশ্ববরেণ্য, এবং পৃথিবীর সকল সভ্যজাতির তাহা অনুসরণের যোগ্য, ইহা তিনি মনে প্রাণে বিশ্বাস করিতেন; কিন্তু কিছুকাল য়ুরোপে বাস করিয়া তিনি য়ুরোপীয় ভাবাপন্ন ও প্রতীচ্য সভ্যতার পক্ষপাতী হইয়াছিলেন। তাঁহার আন্তরিকতার পরিচয় পাইয়া অরবিন্দ অতি অল্পসময়ের মধ্যে তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন বলিয়াই মনে হইয়াছিল। অরবিন্দ আমাকে বলিয়াছিলেন, অক্ষয়কুমার খাঁটি মানুষ, তবে তিনি অল্পদিন য়ুরোপে বাস করায় য়ুরোপীয় সভ্যতা তাঁহার উপর যে প্রভাব বিস্তার করিয়াছে, তাহা স্থায়ী হইবে না; শীঘ্রই উঁহার প্রকৃতির পরিবর্ত্তন হইবে। কথায় কথায় জানিতে পারিলাম, অক্ষয়কুমার মিস্ মুলারের স্নেহে যত্নে লণ্ডনে বাস করিয়া উচ্চ শিক্ষা লাভ করিতেছিলেন; ইংলণ্ডের রাজনীতিক্ষেত্রে ও সাহিত্যেও তিনি সুনাম অর্জ্জন করিয়াছিলেন। তাঁহার ইচ্ছা ছিল, সিভিল সার্বিসে প্রবেশ করিবেন; এতদ্ভিন্ন তিনি ব্যারিষ্টারী পাশ করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। কিন্তু মানুষের সকল চেষ্টা সফল হয় না; কিছুদিন পরে মিস্ মুলারের

হঠাৎ মৃত্যু হওয়ায় অক্ষয়কুমার সেই সুদূর বিদেশে এরূপ অর্থ-সঙ্কটে পড়িলেন যে, ভবিষ্যৎ উন্নতির সকল আশাই ত্যাগ করিয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করিতে বাধ্য হইলেন। সৌভাগ্যক্রমে তিনি পার্শী-কুলভূষণ, জ্ঞানবৃদ্ধ, স্বর্গীয় দাদাভাই নৌরজীর স্নেহাকর্ষণে সমর্থ হইয়াছিলেন। অক্ষয়কুমারকে স্বদেশে প্রত্যাগমনোন্মুখ দেখিয়া দাদাভাই নৌরজী তাঁহার অনুকূলে বরোদার বর্ত্তমান মহারাজার নিকট এক সুপারিশ পত্র দিয়াছিলেন। এ সকল কথা পরে শুনিয়াছিলাম। ভিন্নপ্রদেশবাসী সে কালের বৃদ্ধরা একালের বৃদ্ধদের অপেক্ষা বাঙ্গালীর প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন ছিলেন।

অক্ষয়কুমার বরোদায় আসিয়া মহারাজার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন, এবং মহারাজা যদি কোন চাকরীবাকরী দিয়া তাঁহাকে সাহায্য করেন, এই আশায় তিনি অরবিন্দের সহিতও সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন; অরবিন্দ তাঁহাকে মহারাজার প্রিয় সুহৃদ এবং বরোদাসরকারের প্রধান কর্ম্মচারিগণের অন্যতম মিঃ খাসেরাও যাদবের সহিত পরিচিত করিয়াছিলেন। খাসেরাও সাহেবও অল্পসময়ের মধ্যেই অক্ষয়কুমারের পক্ষপাতী হইয়াছিলেন; এই নবাগত বাঙ্গালী যুবক সম্বন্ধে তাঁহার অনুকূল ধারণাই হইয়াছিল; কিন্তু খাসেরাও সাহেবকে বা অরবিন্দকে অক্ষয়-কুমারের অনুকূলে মহারাজার নিকট সুপারিশ করিতে হয় নাই। গুণ-গ্রাহী গায়কবাড় অক্ষয়-

দাদাভাই নৌরজী

কুমারের বিদ্যাবুদ্ধির পরিচয় পাইয়া অবিলম্বেই তাঁহার প্রার্থনা পূর্ণ করিয়াছিলেন। তবে বিদেশাগত অপরিচিত এক জন বাঙ্গালীকে বরোদা সরকারে বহু সুশিক্ষিত মারাঠা যুবকের আকাঙ্ক্ষিত উচ্চ-পদে নিযুক্ত করিতে মহারাজার আগ্রহ দেখিয়া, মহারাজার কোন কোন পদস্থ কর্ম্মচারী অক্ষয়কুমারের প্রতিকূলে কোন কোন কথা বলিলে, খাসেরাও সাহেব না কি অক্ষয়কুমারের সমর্থন করিয়াছিলেন; কিন্তু তাহার প্রয়োজন ছিল বলিয়া মনে হয় না। মহারাজা এরূপ দৃঢ়চিত্ত এবং নিজের বিচার-বুদ্ধিতে এরূপ নির্ভরশীল যে, তিনি যাহা কর্ত্তব্য মনে করেন, কাহারও প্রতিবাদে তাঁহাকে সেই পথ হইতে এক তিলও বিচলিত হইতে দেখা যায় না। বস্তুতঃ মহারাজা ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া অক্ষয়কুমারকে সিধপুরে অহিফেন বিভাগের উচ্চপদে নিযুক্ত করিলেন। সিধপুর গুর্জ্জরের একটি প্রধান তীর্থস্থান; এবং উক্ত অঞ্চল 'পিতৃগয়া' নামে পরিচিত। এই নগরে এবং ইহার চতুর্দ্দিকে নাগর ব্রাহ্মণ-গণের বাস। এই সকল গুজরাটী ব্রাহ্মণের অনেকেই অন্যবর্ত্তী মুসলমান রাজ্যে উচ্চ পদে প্রতিষ্ঠিত আছেন। স্থানীয় মুসলমানরা মাথা গণিয়া যোগ্য হিন্দুদের সহিত প্রতিযোগিতায় শতকরা নির্দ্দিষ্ট হারে উচ্চপদ অধিকার করিতে পারিত না বলিয়া এক-যোগে মাথা নাড়িয়াছে, বা কোন খাঁ বাহাদুরকে 'ন্যাতা' বানাইয়া তাঁহার নেতৃত্বে হিন্দুর বিরুদ্ধে ধর্ম্মঘট করিয়াছে, সে কালে এরূপ ভেদবুদ্ধি গজাইয়া তুলিবার মানুষ সেই সকল রাজ্যে কেহ ছিল বলিয়া মনে হয় না; এজন্য উক্ত অঞ্চলের মুসলমান নরপতি-শাসিত রাজ্যে হিন্দু রাজ-কর্ম্মচারিগণের প্রাধান্য অক্ষুণ্ণ থাকিলেও সাম্প্রদায়িক বিরোধের চিহ্নমাত্র কোথাও লক্ষিত হইত না; এবং হরিজনবর্গকে খোঁচাইয়া তাহাদের মস্তকে অশান্তির আগুন জ্বালিবার জন্য কাহারও হাতে পতিতোদ্ধারের মশাল না থাকায় তাহারা নিরুপদ্রবে শান্তির সহিত সংসারধর্ম্ম পালন করিতেছিল। গুর্জ্জরের আমেদাবাদ অঞ্চলে আজ যে উচ্চবর্ণের হিন্দুদের সহিত হরিজনদের কথায় কথায় লাঠালাঠী আরম্ভ হইতেছে, এবং পরস্পরকে ক্ষতিগ্রস্ত করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা চলিতেছে, উচ্চবর্ণের হিন্দু গৃহস্থের গাই বলদ গোশালায় মরিয়া, পচিয়া ফুলিয়া ঢাক হইতেছে, তাহা ভাগাড়ে ফেলিবার ব্যবস্থা হইতেছে না, আবার হরিজনেরা উচ্চশ্রেণীর হিন্দুদের ক্ষেতে খামারে, বেড়ায় বাগানে, মজুরী করিতে না পাইয়া অনাহারে শুকাইয়া কঙ্কালসার হইতেছে, প্রায় চল্লিশ বৎসরের পূর্ব্বে গুর্জ্জরখণ্ডে এরূপ দৃশ্যের সম্পূর্ণ অভাব ছিল। দেশ দিন দিন উন্নতির উত্তুঙ্গ শৈল-শিখরে আরোহণ করিতেছে—কে ইহা অস্বীকার করিবে?

অক্ষয়কুমার সিধপুরের অহিফেন কেন্দ্রে অবস্থিতি করিয়া বরোদা সরকারের অহিফেন বিভাগের কার্য্য পরিচালিত করিতে লাগিলেন। এই অঞ্চলে বরোদা সরকারের বিস্তর অহিফেন উৎপাদিত হইয়া সিধপুরে গোলাজাত হইয়া থাকে। বরোদা সরকারের ইহা লাভজনক ব্যবসায়গুলির অন্যতম।

আমি যখন বাঙ্গালায় প্রত্যাগমন করি, অক্ষয়কুমার তখনও বরোদা সরকারে চাকরী করিতেছিলেন। তিনি অবসর পাইলেই সিধপুর হইতে বরোদায় আসিয়া অরবিন্দের সহিত মিলিত হইতেন। তাঁহার কথা শুনিয়া বুঝিতে পারিতাম, এই চাকরীতে তাঁহার আনন্দ বা তৃপ্তি ছিল না। কেবল অর্থোপার্জ্জনই যাঁহাদের লক্ষ্য, তাঁহারা এই চাকরীতেই লিপ্ত থাকিতেন। অক্ষয়কুমারও কার্য্যদক্ষতাগুণে ক্রমশঃ উন্নতি লাভ করিয়া বরোদা সার্ভিসের শাসন-বিভাগের কোন উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া কর্ম্মজীবনের সাফল্য অর্জ্জন করিতে পারিতেন।

কিন্তু অরবিন্দের ন্যায় অক্ষয়কুমারেরও দাসত্বের স্পৃহা ছিল না। আমি বাঙ্গালায় প্রত্যাগমনের পর শুনিয়াছিলাম, তিনি বিলাতের ব্যয় নির্ব্বাহোপযোগী অর্থ সঞ্চয় করিয়া বরোদা সরকারের চাকরী ত্যাগ করিয়াছিলেন, এবং বিলাতে গিয়া কিছুকাল চেষ্টার ফলে ব্যারিষ্টারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া দেশে ফিরিয়াছিলেন। কলিকাতায় যখন আমি বসুমতীর সেবায় নিযুক্ত ছিলাম, সেই সময় অক্ষয়কুমারকে দুই এক দিন স্বর্গীয় সুহৃদ সুরেশচন্দ্র সমাজপতি মহাশয়ের বাড়ীতে দেখিয়াছিলাম; শুনিয়াছিলাম, তখন তিনি হাইকোর্টে ব্যারিষ্টারী করিতেছিলেন। কিন্তু আমাদের ন্যায় ক্ষুদ্র সাহিত্যিক তাঁহার ন্যায় বিদ্বান্ ও উচ্চসম্মানিত ব্যক্তির সহিত অসঙ্কোচে মিশিবার বা ভাবের আদান-প্রদানের যোগ্য নহে মনে করিয়া, সেই প্রাচীন পরিচয়ের খাতিরে ময়ূরপুচ্ছাবৃত হইয়া তাঁহার সহিত ঘনিষ্ঠতা করিতে সাহসী হই নাই বা সঙ্গত মনে করি নাই; কারণ, সুরেশ বাবু তাঁহার স্বাভাবিক সহৃদয়তা বশতঃ আমাদের ন্যায় সামান্য ব্যক্তির সহিত ঘনিষ্ঠভাবে মিশিয়া আত্মীয়তা

করিলেও তাহা যে সম্পূর্ণ আন্তরিক, ইহার বহু পরিচয় পাইয়াছিলাম; অধিক কি, আমার দুই কন্যার বিবাহে তিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়াই আমার মেহেরপুরের পল্লীভবনে পদধূলি দান করিয়াছিলেন। এক দিন আমার কাকা বলিয়াছিলেন, সুরেশ বাবুর শিষ্টাচারে তিনি মুগ্ধ হইয়াছিলেন। আমি তাঁহার এ কথার অর্থ বুঝিতে না পারায় প্রশ্নসূচক দৃষ্টিতে তাঁহার মুখের দিকে চাহিলে, তিনি বলিয়াছিলেন, সুরেশ বাবু আমাদের বৈঠকখানায়
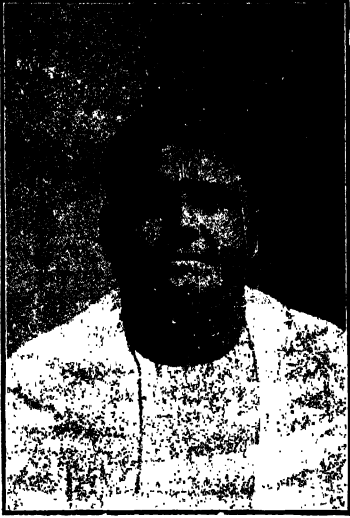
সুরেশচন্দ্র সমাজপতি

বসিয়া তাঁহার সম্মুখে সাধারণ ভদ্রলোকের ন্যায় ধূমপান করিয়াছিলেন। কিন্তু সুরেশ বাবুর সহিত তাঁহার পরিচয় হইবার পর সুরেশ বাবু কথায় কথায় যখন জানিতে পারিলেন, আমার কাকা তাঁহার পিতৃবন্ধু ও সতীর্থ, উভয়ে একত্র কৃষ্ণনগর কলেজে পাঠ করিয়াছিলেন, তাহার পর তিনি কাকাকে গুরুজনের প্রাপ্য সম্মান প্রদান করিয়াছিলেন, এবং তাঁহার সম্মুখে চুরুট স্পর্শ করেন নাই। কাকা বলিয়াছিলেন, এ কালের ছেলেদের নিকট তিনি কখনও সম্ভ্রম ও শ্রদ্ধাপূর্ণ ব্যবহার প্রত্যাশা করেন নাই। সুতরাং আমি সুরেশ বাবুর সহিত ঘনিষ্ঠভাবে মিশিলেও, তাঁহার কোন কোন সাহিত্যিক বন্ধুকে আমি সর্ব্বদা এড়াইয়া চলিতাম। কারণ, জানিতাম, তাঁহারা আমাদের ন্যায় ক্ষুদ্র ব্যক্তির সহিত সৌজন্যের সহিত আলাপ করিলেও, তাহা মৌখিক শিষ্টাচার মাত্র; তাঁহারা মনে মনে আমাদের অবজ্ঞা করেন। এই জন্য তাঁহাদের সহিত ঘনিষ্ঠতা করিবার জন্য কখনো আগ্রহ বা প্রবৃত্তি হয় নাই। পরে কখনো কখনো সাহিত্য-ক্ষেত্রে তাঁহাদের সহিত সহযোগিতা অবশ্য প্রয়োজন হইয়াছে বটে, কিন্তু যতদূর সম্ভব নিজেকে তফাৎ রাখিয়াই চলিয়াছি। কলিকাতায় আমি দীর্ঘকাল বাস করিলেও কলিকাতা হাইকোর্টের প্রবীণ ব্যারিষ্টার সে কালের বরোদাপ্রবাসী মিঃ এ কে ঘোষের সহিত অধিকবার আমার সাক্ষাৎ হয় নাই।

আমাদের বরোদা ক্যাম্পের বাসায় এক দিন প্রভাতে এক সুবেশধারী সাহেব লোকের আবির্ভাব হইল; তিনি ইটালীয়ান কি ফরাসী, চেহারা দেখিয়া বুঝিতে পারিলাম না। কিন্তু তাঁহার কথা শুনিয়া বুঝিলাম, তিনি আমাদেরই মত বাঙ্গালী। পরিচয়ে জানিতে পারিলাম, তিনি বিখ্যাত চিত্রশিল্পী শ্রীযুত শশিকুমার হেস। তিনি য়ুরোপ হইতে 'সঞ্জীবনী' নামক সাপ্তাহিক পত্রিকায় যে সকল পত্র প্রকাশ করিয়াছিলেন, দেশে থাকিতে তাহা মধ্যে মধ্যে দেখিতে পাইতাম, সুতরাং তাঁহার নাম আমার অপরিচিত ছিল না। তিনি য়ুরোপ হইতে ভারতে ফিরিয়াছেন, তাহা জানিতাম না, এ জন্য তাঁহাকে বরোদায় দেখিয়া বিস্মিত হইলাম।

একালের তরুণরা শশিকুমার বাবুকে হয় ত চিনিবেন না; কিন্তু বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভকালে তিনি সুদক্ষ শিল্পী বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার জীবনের ইতিহাস অতি বিচিত্র। প্রথম-যৌবনে তিনি ময়মনসিংহ জেলার কোন পল্লীর বাঙ্গালা স্কুলের পণ্ডিত ছিলেন; কিন্তু চিত্রশিল্পের প্রতি তাঁহার অসাধারণ অনুরাগ ছিল। ময়মনসিংহের স্বর্গীয় মহারাজা সূর্য্যকান্ত আচার্য্য চৌধুরীর অর্থানুকূল্যে তিনি য়ুরোপে গমন করেন, এবং বিভিন্ন দেশে শিক্ষা লাভ করিয়া এই সময় স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়াছিলেন। শুনিয়াছিলাম, তিনি স্বদেশে আসিবার সময় সার জর্জ বার্ডউডের নিকট হইতে মহারাজ গায়কবাড়ের নামে এক সুপারিশ চিঠি আনিয়াছিলেন; সেই পত্রানুসারে মহারাজা তাঁহাকে সম্ভ্রান্ত অতিথিরূপে গ্রহণ করিয়া বরোদার 'গেষ্ট হাউসে' তাঁহার বাসের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

বরোদার 'গেষ্ট হাউস'কে বঙ্গ ভাষায় 'অতিথিশালা' বলিয়া অভিহিত করিলে বোধ হয় তাহার অসম্মান করা হইবে। বাঙ্গালা দেশে অতিথিশালা বলিলে গ্রাম্য জমিদারদের গৃহ-বিগ্রহের মন্দিরের অদূরবর্ত্তী ঝাঁপের বেড়াবিশিষ্ট, বাতায়নবিহীন, অনুচ্চ কুটীর-শ্রেণীর কথাই আমাদের মনে পড়ে, গৃহস্থের গো-শালা অপেক্ষা তাহাদের অবস্থা উন্নত নহে; সংপ্রতি বাঙ্গালার জমিদারদের আর্থিক অবস্থা শোচনীয় হওয়ায় এই গ্রাম্য অতিথিশালাগুলিও ক্রমশঃ অদৃশ্য হইতেছে। বরোদা সরকারের 'গেষ্ট হাউস'কে অতিথিশালা বলিলে তাহার সম্মান ক্ষুণ্ণ হইবে। বরোদা নগরের এক প্রান্তে এই রাজ অতিথিশালা' সংস্থাপিত। উদ্যান-পরিবেষ্টিত এই সুরম্য হর্ম্ম্য আমাদের দেশের কোন ধনাঢ্য ও বিলাসী জমিদারের বিলাসিতাপূর্ণ প্রমোদভবন অপেক্ষা বহুগুণে শ্রেষ্ঠ। 'গেষ্ট হাউস' য়ুরোপীয়ের রুচির অনুসরণে য়ুরোপীয় প্রথায় সজ্জিত। ইহার ড্রয়িং-রুম, বিভিন্ন শয়ন-কক্ষ, বাবুর্চ্চিখানা, আস্তাবল প্রভৃতি দেখিলে মনে হয়, কোন য়ুরোপীয়ের সুরুচিসম্পন্ন বাসভবনে প্রবেশ করিয়াছি। পরিদর্শকের জিম্মায় নানা প্রকার উৎকৃষ্ট খাদ্য ও পানীয় এখানে সঞ্চিত থাকে। এখানে অনেকগুলি সম্ভ্রান্ত অতিথি কোন প্রকার অসুবিধা ভোগ না করিয়াও একত্র বাস করিতে পারেন। তাঁহাদের ব্যবহারের জন্য উৎকৃষ্ট গাড়ী-ঘোড়া সর্ব্বদাই প্রস্তুত থাকে, এবং সুবেশধারী কোচম্যান, সহিস তাঁহাদের পরিচর্য্যা করিয়া থাকে। বোম্বাই, শিমলা, কলিকাতা

(ভারতের রাজধানী তখন কলিকাতায় ছিল) প্রভৃতি স্থান হইতে নানা কার্য্যোপলক্ষে যে সকল য়ুরোপীয় অতিথি বরোদায় যাইতেন, তাঁহারা এই গেষ্ট হাউসেই বাস করিতেন। সম্ভ্রান্ত দেশীয় অতিথিরাও এখানে স্থান পাইতেন। স্বর্গীয় রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় বরোদার দেওয়ানী পদ গ্রহণের পূর্ব্বে একবার বরোদায় গমন করিয়া মহারাজার আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি গেষ্ট হাউসেই বাস করিতেন। শ্রীযুত শশিকুমার হেস মহাশয় বরোদায় উপস্থিত হইলে মহারাজার আদেশে গেষ্ট হাউসেই বাস করিতেছিলেন। সে সময় সেখানে অন্য কোন অতিথি ছিলেন না।

অরবিন্দের সহিত শশিকুমারের পরিচয় ছিল না। কিন্তু তাঁহারা পরস্পরের নাম জানিতেন। শশিকুমারের পিতা সেকেলে গোঁড় হিন্দু হইলেও, শশিকুমার সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজে যোগদান করিয়াছিলেন; এবং তিনি অরবিন্দের মেসো শ্রীযুত কৃষ্ণকুমার মিত্র মহাশয়ের পরম স্নেহ-ভাজন ছিলেন। এজন্য প্রথম পরিচয়ের পর তাঁহাদের ঘনিষ্ঠতা হইতে অধিক বিলম্ব হইল না। এক জন কবি, আর এক জন চিত্রশিল্পী; কিন্তু উভয়ের আকৃতি ও প্রকৃতিতে আকাশ-পাতাল প্রভেদ! আমি বলিলাম, "আপনাদের উভয়ের মধ্যে বয়সে কে বড়, বুঝিতে পারিতেছি না।" শশিকুমার অরবিন্দকে বলিলেন, "আপনি অনুমান করিতে পারেন, আমার বয়স কত? দয়া করিয়া আমাকে বুড়োর দলে ফেলিবেন না।" শুনিলাম, তাঁহার বয়স তখন ত্রিশ অতিক্রম করে নাই। অরবিন্দ পরে আমাকে বলিয়াছিলেন, শশিকুমারের চেহারা অনেকটা ইটালীয়ানের চেহারার অনুরূপ এবং চিত্রশিল্পীর আকৃতিগত বিশেষত্ব তাঁহার মুখমণ্ডলে পরিস্ফুট। শশিকুমারের জীবনযাপনের প্রণালীর পরিচয় পাইয়া আমার ধারণা হইয়াছিল, তিনি অত্যন্ত বিলাসপ্রিয়। আমি অরবিন্দকে আমার ধারণার কথা বলিলে তিনি বলিয়াছিলেন, "তোমার অনুমান সত্য। জগতের শ্রেষ্ঠ চিত্রকরমাত্রেই অল্লাধিক পরিমাণে বিলাসী; তাঁহাদের কেহই অবস্থানুযায়ী অল্পব্যয়ে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারেন না।" পরবর্ত্তী কালে শশিকুমারের জীবনযাপনের প্রণালীতেও অরবিন্দের এই উক্তি সত্য বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছিল।

রমেশচন্দ্র দত্ত

লর্ড লিন্‌লিথ্‌গো

শশিকুমার বঙ্গ-সাহিত্যের প্রতি অসাধারণ অনুরক্ত ছিলেন, কিন্তু তাঁহার চরিত্রে ইংরেজি সাহিত্য অপেক্ষা ফরাসী সাহিত্যের প্রভাব অধিক ছিল। ফরাসী ভাষায় তাঁহার অসামান্য অধিকার ছিল। কিন্তু তিনি ইংরেজি ভাষায় ফরাসী ভাষার ন্যায় অনর্গল আলাপ করিতে পারিতেন না; অরবিন্দের সহিত ইংরেজি ভাষায় আলাপ করিবার সময় তাঁহার অনেক কথা বাধিয়া যাইতেছিল; এবং উচ্চারণেরও ত্রুটি ছিল। দেখিয়া শুনিয়া আমার মনে হইয়াছিল—চিত্রশিল্পে অভিজ্ঞতা লাভের জন্য তিনি কিছু দিন ইংলণ্ডে বাস করিলেও ইংরেজি সাহিত্যের অনুশীলনে তাঁহার আগ্রহ ছিল না; ইংরেজের তিনি পক্ষপাতী ছিলেন না। রাজনীতিসংক্রান্ত অভিমতেও ফরাসী রাজনীতিকরাই তাঁহার গুরু ছিলেন বলিয়া মনে হইয়াছিল; কিন্তু অরবিন্দ কোন দিন তাঁহার সঙ্গে রাজনীতি সম্বন্ধে আলোচনা করিতেন না। রাজনীতি-ক্ষেত্রে ফরাসী জাতি কিরূপ উদার, তাহাদের সাম্যনীতি কিরূপ প্রশংসাযোগ্য ইত্যাদি কত কথারই তিনি আলোচনা করিতেন। অরবিন্দ সহিষ্ণু। শ্রোতার ন্যায় তাঁহার সকল কথা শুনিতেন, কিন্তু মতামত প্রকাশ করিতেন না। তবে শশিকুমার ফরাসী কাব্য উপন্যাস সম্বন্ধে যে অভিমত প্রকাশ করিতেন, অরবিন্দ তাহার সমর্থন করিতেন। শশিকুমার সুপ্রসিদ্ধ ফরাসী ঔপন্যাসিক ভিক্টর হুগোর যেরূপ প্রশংসা করিতেন, তাঁহার মুখে কোন দিন কোন ইংরেজ ঔপন্যাসিকের সেরূপ প্রশংসা শুনিতে পাই নাই।

শশিকুমার মহারাজার সম্মানিত অতিথিরূপে বরোদার গেষ্ট-হাউসে বাস করিতে লাগিলেন বটে, কিন্তু বরোদা সরকারের চিত্রবিভাগ-সংক্রান্ত কোন কার্য্যের ভার তাঁহার হস্তে প্রদত্ত হইবে, তাহা স্থির না হওয়ায় তাঁহার অবসরের অভাব ছিল না। এজন্য তিনি গেষ্ট হাউসের এক সুদৃশ্য ব্রুহামে চাপিয়া কোন দিন সকালে, কোন দিন অপরাহ্ণে বরোদা ক্যাম্পে আসিতেন। সে সময় মোটর-গাড়ী ভারতে আমদানী না হওয়ায় সম্ভ্রান্ত-সমাজে জুড়ি-গাড়ীই ব্যবহৃত হইত। কেবল সে কাল কেন, এ কালেও প্রধান প্রধান রাজকীয় উৎসবে মূল্যবান্ মোটর-গাড়ীর পরিবর্ত্তে সুসজ্জিত ঘোড়ার গাড়ীই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। সে দিনও ভারতের নূতন বড়লাট লর্ড লিন্‌লিথ্‌গো বোম্বাই হইতে স্পেশাল ট্রেণে ভারত-রাজধানী দিল্লীতে উপস্থিত হইয়া, ঘোড়ার গাড়ীতেই ষ্টেশন হইতে প্রাসাদে যাত্রা করিয়াছিলেন। ষড়্‌অশ্ব-পরিচালিত, সুসজ্জিত ও আড়ম্বরপূর্ণ ঘোড়ার গাড়ীর

সহিত যে সমারোহ ও সম্ভ্রমের ভাব বিজড়িত, বহু সহস্র মুদ্রা মূল্যের 'রোল্‌স রয়েস্‌' সিডান-কারে তাহা নাই।

শশিকুমার কোন কোন দিন অপরাহ্নে আমাদের বাসায় আসিয়া অরবিন্দকে এবং আমাকে তাঁহার সঙ্গে কিছু কাল বেড়াইয়া আসিবার জন্য অনুরোধ করিতেন। আমার মত সামান্য লোককে তিনি তাঁহার সহযাত্রী হইবার জন্য কি জন্য অনুরোধ করিতেন, তাহা বুঝিতে পারিতাম না; কিন্তু কেবল শিষ্টাচারের খাতিরে এরূপ করিতেন বলিয়াও মনে হইত না। আমি বঙ্গ-সাহিত্যের নগণ্য সেবক হইলেও তিনিও সাহিত্যসেবা করিতেন, এবং আমার রচনার পক্ষপাতী ছিলেন, এই জন্য তাঁহার অনুরোধ মৌখিক শিষ্টাচারমাত্র বলিয়া মনে হইত না; তাঁহার অনুরোধে আন্তরিকতার পরিচয় পাইয়া আমি তাঁহার অনুরোধ অগ্রাহ্য করিতে পারিতাম না। তিনি আমাদের উভয়কে সম্মানের আসনে বসাইয়া স্বয়ং বিপরীত দিকে বসিতেন। অরবিন্দ প্রতিদিন সন্ধ্যার পূর্ব্বে ঘরের বারান্দায় দীর্ঘকাল পাদচারণ করিতেন; ইহাই তাঁহার একমাত্র ব্যায়াম ছিল। যে দিন আমরা শশিকুমারের সহিত সান্ধ্য-ভ্রমণে বাহির হইতাম, সে দিন অরবিন্দ বারান্দায় পাদচারণে বিরত থাকিতেন। ভ্রমণে বাহির হইয়া শশিকুমার রাজনীতি, ধর্ম্মনীতি, সমাজনীতি, সাহিত্য, শিল্প প্রভৃতি সম্বন্ধে অনর্গল কত কথার আলোচনা করিতেন, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। অরবিন্দ সহিষ্ণুভাবে সকল কথা শুনিয়া যাইতেন, তিনি কদাচিৎ দুই একটি কথা বলিতেন; কিন্তু মতের অমিল হইলে শশিকুমার কোন দিন অরবিন্দের সহিত তর্ক করিয়া নিজের অভিমতের প্রাধান্য স্থাপনের চেষ্টা করিতেন না। তিনি অরবিন্দের অভিমত শ্রদ্ধার সহিত শুনিতেন। অরবিন্দের প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের প্রতি তাঁহার গভীর শ্রদ্ধা ছিল। রেল-ষ্টেশন, ঘোড়দৌড়ের মাঠ প্রভৃতি নানা স্থানে ভ্রমণ শেষ করিয়া আমরা গেষ্ট হাউসে উপস্থিত হইতাম। মহা-রাজার অতিথি সেখানে অতিথিসৎকারের যে ব্যবস্থা করিতেন, তাহাতে তাঁহার আন্তরিকতার ও গভীর আগ্রহের পরিচয় পাওয়া যাইত। ভোজন-টেবলে নির্দ্দোষ পানীয় ভিন্ন অন্য কোন পানীয়ের বোতলের আবির্ভাব হইত না। শশিকুমার সুরা স্পর্শ করিতেন না; কিন্তু গেষ্ট হাউসে নানা প্রকার বহুমূল্য দুষ্প্রাপ্য সুরার অভাব ছিল না। শশিকুমার সে পথের পথিক হইলে সুরার 'জলছত্র' বসাইতে পারিতেন। আমার মনে হইত, সেই সময় আমাদের দলে বাপুভাই মজুমদার থাকিলে তিনি আকণ্ঠ পূর্ণ করিয়া বোতলের সদ্ব্যবহার করিতে পারিতেন!

তৈল-চিত্রাঙ্কনে শশিকুমার কিরূপ দক্ষতা লাভ করিয়াছিলেন, প্রথমে তাহার কোন পরিচয় পাই নাই; তবে যিনি প্যারিস মিউনিক, ভিনিস প্রভৃতি প্রসিদ্ধ শিক্ষা-কেন্দ্রে চিত্রবিদ্যার অনুশীলনে দীর্ঘকাল অতিবাহিত করিয়াছিলেন, তাঁহার ন্যায় প্রতিভাবান সাধকের সেই সাধনা ব্যর্থ হইয়াছিল, ইহা অনুমান করিতে পারি নাই। বিশেষতঃ, এক দিন তিনি লণ্ডনস্থ তাঁহার 'ষ্টুডিও' প্রসঙ্গে যে কথা বলিয়াছিলেন, তাহা শুনিয়া আমাদের ধারণা হইয়াছিল, তাঁহার সাধনা ব্যর্থ হয় নাই। কথায় কথায় এক দিন তিনি বলিলেন, লণ্ডনের ষ্টুডিওতে তিনি স্বর্গীয় রমেশচন্দ্র দত্তের (কিংবা স্বর্গীয় মনোমোহন ঘোষের, এত দিন পরে ঠিক স্মরণ হইতেছে না) একখানি পূর্ণাকৃতি তৈলচিত্র অঙ্কিত করিয়া এরূপ স্থানে রাখিয়াছিলেন যে, সেই কক্ষে প্রবেশ করিলে সর্ব্বপ্রথমে সেই চিত্রের প্রতি দৃষ্টি আকৃষ্ট হইত! তখন সন্ধ্যার অন্ধকার নিবিড় না হইলেও সেই কক্ষে আলো-অন্ধকারের খেলা চলিতেছিল, আলো-অন্ধকারের সেই মিলনক্ষণে চিত্রার্পিত মূর্ত্তি চিনিতে পারা যাইতেছিল! সেই সময় শুভ্র দাড়ি-গোঁফ, শুভ্র কেশ, পারসীশ্রেষ্ঠ বৃদ্ধ দাদাভাই নৌরজী বেড়াইতে বেড়াইতে শশিকুমারের বাসায় উপস্থিত হইলেন, এবং তাঁহার স্নেহাস্পদ চিত্রকর ষ্টুডিয়োতে আছেন শুনিয়া, তিনি ষ্টুডিয়োতে প্রবেশ করিয়াই দেখিলেন, সম্মুখে দত্ত উপবিষ্ট! বৃদ্ধের ক্ষীণ দৃষ্টির পক্ষে ছায়া ও কায়ার পার্থক্য নির্ণয় করা কঠিন হইল, তিনি সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, "দত্ত, আপনি এ অসময়ে এখানে?"—শশি-কুমার তৎক্ষণাৎ বৃদ্ধের সম্মুখে আসিয়া তাঁহার ভ্রম সংশোধন করিয়া বলিলেন, তাঁহার তুলি আর কখনও এরূপ উচ্চ প্রশংসালাভ করিতে পারিবে না।

শশিকুমারের এই গল্প শুনিয়া আমি তাঁহাকে স্বর্গীয় নাট্যকার দীনবন্ধুর 'নীলদর্পণ' নাটকের অভিনয় সম্বন্ধে অনুরূপ একটি গল্প বলিয়াছিলাম। গল্পটি স্বর্গীয় সুরেশচন্দ্র সমাজপতি মহাশয়ের নিকট কি অন্য কাহার নিকট শুনিয়াছিলাম, স্মরণ নাই। স্বর্গীয় বিদ্যাসাগর মহাশয় ষ্টার থিয়েটারে এক দিন 'নীলদর্পণের' অভিনয় দেখিতে গিয়াছিলেন। সুপ্রসিদ্ধ অভিনেতা স্বর্গীয় অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফী মহাশয় নীলকর সাহেবের ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন। এ-কালের অনেকেই বোধ হয় জানেন না, অর্দ্ধেন্দু বাবু রঙ্গমঞ্চে 'সাহেব' নামেই পরিচিত ছিলেন, এবং যখন তিনি সাহেবী পোষাকে কোন য়ুরোপীয়ের ভূমিকা গ্রহণ করিয়া অভিনয় করিতেন, তখন তাঁহার অভিনয় এরূপ নিখুঁত হইত যে, কি কণ্ঠস্বরে, কি অভিনয়-কলায় দর্শকগণকে মুগ্ধ হইতে হইত। বরোদা হইতে ফিরিয়া 'ষ্টার রঙ্গমঞ্চে' আমি 'সাপ্তাহিক বসুমতীর' সম্পাদক হিসাবে নিমন্ত্রিত হইয়া স্বর্গীয় সুরেশচন্দ্র সমাজপতি, শ্রীযুত অরবিন্দ ঘোষ, শশিকুমার হেস প্রভৃতি কয়েক জন সম্মানিত বন্ধুর সহিত স্বর্গীয় ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের প্রসিদ্ধ নাটক প্রতাপাদিত্যের অভিনয় দেখিতে গিয়াছিলাম। অর্দ্ধেন্দু বাবু সে-দিন পর্ত্তুগীজ দস্যু রডার ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন। ভূমিকাটি ক্ষুদ্র, রডার বক্তব্য অধিক ছিল না; কিন্তু অভিনয়-ভঙ্গীতে তিনি আমাদের সকলের মনের উপর অদ্ভুত প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন। সুতরাং নীলদর্পণে নীলকর সাহেবের ভূমিকায় তিনি কিরূপ অভিনয়-নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়াছিলেন, না দেখিলেও তাহা অনুমান করা কঠিন নহে! সেই ইতর নীলকর যখন কৃষক-কন্যা অসহায়া গর্ভবতী ক্ষেত্রমণিকে কবলে পাইয়া তাহার প্রতি অত্যাচার করিতে উদ্যত হইয়া-ছিল, দর্শকগণ তখন স্তম্ভিত-হৃদয়ে মুস্তফী মহাশয়ের সেই অভিনয়-নৈপুণ্য লক্ষ্য করিতেছিলেন। দয়ার সাগর বিদ্যা-সাগর মহাশয় এতদূর উত্তেজিত হইয়াছিলেন যে, তিনি স্থান-কাল বিস্মৃত হইয়া সেই নারীনির্য্যাতক নীলকরকে লক্ষ্য করিয়া তাঁহার সর্ব্বজন-বন্দনীয় চটিজুতা ষ্টেজের উপর নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। মুস্তফী মহাশয় তাঁহার অভিনয়-সাফল্যের এই নিদর্শনে উৎফুল্ল হইয়া, সেই চটি শিরোধার্য্য করিয়া বলিয়াছিলেন, তাঁহার অভিনয়-সাফল্যের এরূপ প্রশংসা তিনি জীবনে কখনও লাভ করেন নাই।

শশিকুমার অতঃপর অরবিন্দের নিকট প্রস্তাব করিয়াছিলেন, তিনি অরবিন্দের একখানি তৈলচিত্র অঙ্কিত করিবেন, এজন্য তাঁহাকে তুই তিন বার 'সিটিং' দিতে হইবে। অরবিন্দ তাঁহার এই প্রস্তাবে সম্মতি জ্ঞাপন করিলে অরবিন্দ 'গেষ্ট হাউসে' আসিয়া তুই তিন দিন শশিকুমারের সম্মুখে বসিয়াছিলেন। অতি অল্প সময়ে শশিকুমার সেই চিত্রখানি শেষ করিয়াছিলেন, এবং তুলির তুই এক টানে অরবিন্দের মুখের প্রসন্ন ভাবটি এরূপ চমৎকার ফুটিয়া উঠিয়াছিল যে, কোন সাধারণ চিত্রশিল্পীর তুলিকায় তাহা অসাধ্য। শশিকুমারের

ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ

আন্তরিক শ্রদ্ধার সেই উপহার অতীত স্মৃতির নিদর্শন-স্বরূপ অরবিন্দ পরবর্ত্তী কালে সঞ্চিত রাখিয়াছিলেন কি কাহাকেও তাহা দান করিয়াছিলেন, তাহা আমার অজ্ঞাত। বরোদা ত্যাগকালে তিনি তাহা দেশে লইয়া আসিয়া থাকিলে তাঁহার আত্মীয়-স্বজন এবং ভক্তরা সম্ভবতঃ তাহা দেখিয়াছেন।

শশিকুমারের সহিত আমি তুই এক দিন বরোদার 'লক্ষ্মীবিলাস' প্রাসাদ দেখিতে গিয়াছিলাম। মলহররাও গায়কবাড় বহু লক্ষ মুদ্রা ব্যয়ে এই প্রাসাদ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। মলহররাও গায়কবাড় বহু অর্থব্যয়ে বহু মণ বিশুদ্ধ স্বর্ণ ও রৌপ্য দ্বারা এক জোড়া সোণার ও এক জোড়া রূপার কামান নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন বলিয়া, কোন ইংরেজ পর্য্যটক তাহা দেখিয়া মলহর রাওর চরিত্রের কঠোর সমালোচনা করিয়াছিলেন, লিখিয়াছিলেন, মলহররাও বিকৃতমস্তিষ্ক ও অপব্যয়ী ছিলেন; কিন্তু এই হতভাগ্য সিংহাসনচ্যুত নরপতির সৌন্দর্য্যানুরাগ এবং শিল্পকলার আদর্শ কিরূপ প্রশংসনীয় ছিল, তাহা লক্ষ্মীবিলাস প্রাসাদের শিল্প-নৈপুণ্য হইতেই বুঝিতে পারা যায়। ইংরেজ লেখকরা নিরপেক্ষভাবে তাঁহাকে চিত্রিত করিবেন—ইহা আশা করিতে পারা যায় না।

লক্ষ্মীবিলাস প্রাসাদের একটি সুপ্রশস্ত হলঘরে সুবিখ্যাত চিত্রকর রবিবর্ম্মার অঙ্কিত কতকগুলি বৃহৎ চিত্র আছে। শুনিয়াছিলাম, রবিবর্ম্মা বরোদায় আসিয়া কিছুদিনের জন্য গায়কবাড়ের আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং মহারাজার অভিপ্রায় অনুসারে লক্ষ মুদ্রা পারিশ্রমিকে ঐ সকল চিত্র অঙ্কিত করিয়াছিলেন। ঐ সকল চিত্রের প্রতিলিপি বাজারে বাহির হইয়াছিল কি না, জানি না। তুইখানি চিত্রের কথা এখনও আমার মনে আছে। একখানি চিত্রের বিষয় কুরুসভায় দ্রৌপদীর অপমান। তুঃশাসন দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ করিতেছিল; ভীষ্ম, দ্রোণ প্রভৃতি মহাবীররা সভায় অধোমুখে উপবিষ্ট, ভীম রাজকুল-বধূর অপমান দর্শনে নিরুপায় হইয়া ক্রোধে ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতেছিলেন; গাণ্ডীবধারী অর্জ্জুনের গাণ্ডীব নিষ্ক্রিয়। আর অপমানশঙ্কাকুলা অসহায়া দ্রৌপদী আতঙ্ক-বিস্ফারিত নলিন নেত্র ঊর্দ্ধে তুলিয়া করযোড়ে অগতির গতি অনাথের নাথ পাণ্ডব-সখা শ্রীকৃষ্ণের করুণা প্রার্থনা করিতেছেন। দ্রৌপদীর মুখে, চোখে, অর্দ্ধাবৃত দেহের প্রতি অঙ্গে তাঁহার ভয়, ক্রোধ, অভিমান এবং অন্তর্বেদনা চিত্রকরের তুলিতে কি চমৎকার ফুটিয়া উঠিয়াছে! বহুকাল পূর্ব্বে বাল্যজীবনে গ্রাম্য বারোয়ারীতলায় নবদ্বীপের প্রসিদ্ধ যাত্রাওয়ালা স্বর্গীয় মতি রায়ের 'দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণের' পালায় যে গানটি শুনিয়াছিলাম—তাহা হঠাৎ মনে পড়িল,—'এ ত সুধা নয় সুধা নয়, কুরুকুলক্ষয়কারী গরলরাশি, খেলার সাগরে সে রূপসী!' আরও মনে পড়িল বঙ্কিমচন্দ্রের সেই রচনা, যে রচনায় তিনি দ্রৌপদী-চরিত্রের সমালোচনা উপলক্ষে কুরুসভায় লাঞ্ছিতা দ্রৌপদীর ভগবানের প্রতি নির্ভরতাপূর্ণ উক্তির প্রসঙ্গে লিখিয়াছিলেন, "ইহা কবিত্বের চরমোৎকর্ষ!" ইহার উপর আর লেখনী চলে না।

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়।

"আর একটু, হাঁ ঐ রকম—ঐ বাঁ দিকে মাথা আর একটু হেলিয়ে, হাঁ, ঠিক হচ্ছে, উহুঁ, ও রকম না,"—শুভেন্দু হিরণীকে 'পোজ' দিতেছিল। সে তখন আর অজানা অচেনা অপরিচিত বাহিরের লোক নহে, বাড়ীরই পাঁচ জনের এক জন। সকলেই তাহাকে আপনার জন করিয়া লইয়াছিল,—এমন কি, পাবলিক ষ্টেজের এ্যাক্‌ট্রেস চামেলীও তাহার সহিত সমানের মত ব্যবহার করিয়া পরিচিত নিকট-আত্মীয়েরই মত হাসি-তামাসা করিত, তাহার পূর্ব্বের সেই আড়ষ্ট-গম্ভীর ও বিষাদগ্রস্ত ভাবটা শুভেন্দুর সাহচর্য্যে অন্তর্হিত হইয়াছিল।

কিন্তু শুভেন্দু আর সকলের কাছে অতি আপনার জন হইয়া গেলেও এখনও হিরণীর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের ত্রিসীমাতেও পৌঁছিতে পারে নাই। সেখানে অপরকে তফাতে রাখিবার এমন একটা তেজ ও গাম্ভীর্য্যের গণ্ডী-রেখা টানা ছিল যে, তাহার মধ্যে পাদমাত্র অগ্রসর হইবারও তাহার সাহস হইত না।

হিরণী অপ্রসন্ন দৃষ্টিতে অসীমের দিকে চাহিয়া বলিল, "এমন ক'রে অটোমেটনের মত থাকতে পারবো না, দাদা। ও আমার অভ্যাস নেই। ওর নাম পোজ দেওয়া ?"

হিরণী আসন হইতে নামিয়া দাঁড়াইল।

চামেলী বিস্মিত হইয়া বলিল, "কেন, কি হ'ল ? শুভেন্দু বাবু ত খুব ধৈর্য্য ধ'রে তুলছেন ফটোখানা !"

অসীম অ্যাস ট্রের উপরে জলন্ত সিগারেটটা রাখিয়া দিয়া বিরক্তির সহিত বলিল, "ধৈর্য্য ধ'রে,—না মাথা ধ'রে ! তোকে আমি কিছুতেই পারলুম না, শুভো ! ওরে গাধা, বেশী টানাটানি করলেই যে বাঁধন ছিঁড়ে যায়, তা তোকে কদিন বোঝাবো বল্ দিকি ?"

যাহাকে লইয়া এত কথা, সে কিন্তু তখনও বুঝিতে পারিতেছিল না যে, সে কি অপরাধ করিয়াছে। তাই সে কাচুমাচু-মুখে বলিল, "কেন, অন্যায় করলুম কিছু ? এ পোজটা ত এই রকমই হবে—না হ'লে পার্ফেকসানে দাঁড়াচ্ছে কৈ ?"

অসীম বলিল, "রাখ তোর পার্ফেকসান ! ইডিয়ট ! দেখ্‌ত, সাবজেক্ট কি রকম ঘেমে উঠেছে। মিস্ চামেলীকে অতক্ষণ রাখতে পারিস ?"

শুভেন্দু নিতান্ত অপরাধীর মত হিরণীর দিকে চাহিয়া কাতর মিনতিভরা স্বরে বলিল, "আপনি—আপনি রাগ করলেন না বোধ হয় ! দেখুন, ইনটেনশানালি আপনার কোন অসুবিধে"—

হিরণী তাহার অবস্থা দেখিয়া হাসিয়া ফেলিল ; বলিল, "আপনি যে রকম করছেন, তাতে মনে হচ্ছে, খুন-খারাপি যা হয় একটা কিছু ক'রে ফেলেছেন যেন !"

শুভেন্দু স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিল। পরে হাস্যোজ্জ্বল-মুখে বলিল, "ওঃ, তাই বলুন ! দেখুন, ফিলুমের একখানা ফটো তুলতে গেলে কতবার কত রকমের পোজ দরকার হয়"—

বাধা দিয়া অসীম বলিল, "নে, নে, বচনবাগীশ ! ও সব গুছিয়ে নে দিকি, সন্ধ্যার পর যেতে হবে ত্রিকমজীদের ওখানে, মনে আছে ?"

চামেলী নীরবে ছিল, আগ্রহভরে বলিল, "কেন ? আমার সম্বন্ধে কোন কথা উঠেছে কি ?" এ চামেলী যেন আগেকার সেই গম্ভীর উদাসীন বিষাদ-প্রতিমা চামেলী নহে। এ কি পরশ-পাথরের গুণ ?

অসীম বলিল, "না, তোমার সঙ্গে ওদের কনট্রাক্টের বাকী মাস দুটোর সম্বন্ধে একটা বন্দোবস্ত ক'রে নিয়েছি। ওদের ওখানে কিছু ফিলুম্ আর ফটো গুড্‌স্ আনতে যাচ্ছি, ফ্রেস মাল কিছু এসে পড়েছে।"

হিরণী দ্বারের দিকে পা বাড়াইয়া বলিল, "তা হ'লে আমি যাই ?"

অসীম বলিল, "আরে না, না,—যেটুকু ধরা হয়েছে, শেষ ক'রে ফেলো দুজনে। তার পর না হয় যাওয়া যাবে। কি বলিস, শুভো ?"

শুভেন্দু বলিল, "হাঁ, শেষ হোক এটা। যাবেন না দয়া ক'রে।"

হিরণী অনিচ্ছা-সত্ত্বেও ফিরিয়া আসিল, সে কাহারও ন্যায়সঙ্গত উপরোধ এড়াইতে পারিত না। কিন্তু ফিরিবার পূর্ব্বে দ্বারের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া একগাল হাসিয়া বলিল, "এই যে, বৌদি ! বাবা, বাবা,—ঘুম ভাঙ্গলো ?"

দ্বারদেশে দাঁড়াইয়া উষারাণী, পশ্চাতে ভ্রাতা বিভাসচন্দ্র ! মনে হইতেছিল, সে যেন ভয়ে ভয়ে ভগিনীর অঞ্চলের আশ্রয় লইয়া ঘরে ঢুকিতেছিল।

অসীম শ্লেষের কশাঘাত করিয়া বলিল, "আস্পদ্ধা কম নয় তোর, হিরো ! সাহেব মানুষ, মিড্‌ডে সিয়েস্তা—তার উপর টয়লেট"—

উষা আঘাত পাইয়া হিরণীর দিকে লক্ষ্য করিয়া রুষ্ট স্বরে বলিল, "তোমাদের ভাই-বোনের মত সবাই ত ফিল্‌ম্‌-পাগলা নয়,—গেরোস্ত মানুষ, সবাইকারই ঘরসংসার আছে।"

অসীম হাসিয়া বলিল, "তাই না কি ? তা, এত অনুগ্রহ ! তাই ত বলি, ঘরসংসারের জবর কায না থাকলে বেলা ৫টা বেজে গেলেও চার টে আসতে দেরী হবে কেন ? দেখ্‌ শুভো, এক এক দিন ভোরবেলায় দমদমায় যাবার সময় দেখতে পাই, ছাতুর দেশের হালুইকররা কোন্ রাত্তিরে উঠে চার কড়া হালুয়া তরকারী নামিয়ে কচুরীর কড়া চাপাচ্ছে। বোধ হয়, ভোরের মধ্যেই তাদের সব দোকানে হাজার টাকার মাল তৈরী হয়ে গিয়েছে। তখনও কিন্তু আমাদের বাঙ্গালী বাবুদের ঘুম ভাঙ্গেনি ! হয় ত কেউ কেউ উঠে আড়ামোড়া ভেঙ্গে হাই তুলে চাকরকে ডাকছেন উনুনটা ধরিয়ে চায়ের জল চাপিয়ে দিতে—তার পর তাঁদের হালুয়া-কচুরীর কড়া চাপবে ! সত্যি বলছি শুভো, এমন কাযের জাত যদি আর দুটি থাকে !"

শুভেন্দু, হিরণী ও চামেলীর কাছে এই শ্লেষোক্তি বিশেষ উপভোগ্য বলিয়া মনে হইলেও যাহাদের লক্ষ্য করিয়া এই উক্তি করা হইয়াছিল, তাহারা ইহাতে তৃপ্তি অনুভব করিল না। বিশেষতঃ গৃহস্বামিনী ত চটিয়া আগুন—তাঁহার আরক্তিম মুখচক্ষু এবং ক্রোধনিরুদ্ধ কণ্ঠই এ কথা বলিয়া দিতেছিল। কিন্তু যাঁহার গায়ে কিছু পড়িলে অম্লানবদনে ঝাড়িয়া ফেলার বিশেষ অভ্যাস ছিল, তিনি বিন্দুমাত্র অপ্রতিভ না হইয়া 'হঃ' 'হঃ' হাসিয়া বলিলেন,—"হোয়াট এ ফানি চ্যাপ ! সত্যি বলছি, মিঃ বাসু ! ইউ আর একসেলিং ইওরসেলফ্‌ ? হঃ হঃ !"

অসীম বলিল, "নিশ্চয়ই। কিন্তু তা হলেও তোমরা ভাইবোন আমার উপরে একসেল করেছো, মিঃ ডাটা। বাবা ! মধুপুরের এড্‌ভেঞ্চারটা কি কম ? এক দিকে দাদার"

দত্ত সাহেব একটু হাসিয়া বলিল, "সরি ! এতে সায় দিতে পারলুম না, মিঃ বাসু ! আই মে বি হোয়াট আই এ্যাম ; কিন্তু আমার সিষ্টার ? সি ইজ ওয়ান ইন্‌ এ থাউজ্যাণ্ড !"

হিরণী এই সময়ে ভ্রাতৃজায়াকে দৃঢ় আলিঙ্গনে আবদ্ধ করিয়া হর্ষ-গদগদ-কণ্ঠে বলিল, "পাঁচশো বার। তুমি ভারী অসভ্য, দাদা ! কি যে বল, দেখ দিকি বৌদির চোখ ছল-ছল করছে !"

সে সময়ে এক জনের প্রশংসমান সশ্রদ্ধ দৃষ্টি যে তাহার দিকে নিবদ্ধ হইয়াছিল, তাহা সে জানিতে পারিল না।

উষার নয়নপ্রান্তে অশ্রু টলটল করিতেছিল, ফোঁটায় ফোঁটায় নামিয়া আসিল। ক্রোধে অভিমানে প্রায় রুদ্ধকণ্ঠ হইয়া সে বলিল, "ভুলে যাচ্ছিস কেন হিরো, পৃথিবীটা ওঁদের জন্যেই হয়েছে, আমরা কেউ নই তার, কেবল তাবে থেকে হুকুম শোনা ছাড়া।"

অসীম বিস্মিত হইল। এমন ঝাঁঝ উষার কথায় ? জড় পাষাণে আগুন জ্বলে ? কি জানি কেন, এ আঘাত দিয়া ও পাইয়া সে কতকটা তৃপ্তি পাইল, বলিল, "অন্যায় বলেছি কিছু ? মাপ কর তা হ'লে। দেরী যদি হয়েই থাকে, তা হ'লে সে জন্যে কৈফিয়ৎ দাও শুভোর কাছে—কারণ, সে ডাটা সাহেবের পোজ নেবে ব'লে ব'সে রয়েছে।"

বিভাসচন্দ্র বলিল, "বেটার লেট দ্যান নেভার !—নিন, নিন, মিঃ মিটার, কি পোজ নেবেন নিন।"—

মুস্কিল আসান

জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৩]

[শিল্পী—শ্রীপূর্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

শুভেন্দু বলিল, "এই ফেডিং লাইটে? তা না হয় কাল সকালে হবে—এঁর একটু বাকী রয়েছে কি না!"

কথাটা বলিয়া সে সাগ্রহে হিরণীর দিকে দৃষ্টিপাত করিল।

হিরণী তাড়াতাড়ি বলিল, "কার—আমার? না, আজ আর না। চল বৌদি, যাই আমরা।"

অসীম বলিল, "বাঃ, গেলেই হ'ল? ভার যখন নিয়েছ—কলেজ খুলছে কবে?"

হিরণী বলিল, "বেশী দেরী নেই, সাত আট দিন হবে।"

অসীম বলিল, "তবে? নাও হে শুভো, ওরটা সেরে নাও এখনি। আয় হিরো, এদিকে এগিয়ে"

শুভেন্দু বলিল, "হাঁ, এই এ দিকে—এই লাইটটার দিকে।"

নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বে হিরণী সরিয়া দাঁড়াইল।

শুভেন্দু বলিল, "আর একটু ডাইনে স'রে—না, না" –

দত্ত সাহেব পা ফাঁক করিয়া দাঁড়াইয়া বিলাতী ধরণে সিগার টানিতেছিলেন, হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন, "ওঃ, হোপলেস! তাড়া দিলে অমন ক'রে, কন্‌ফাউণ্ডেড হয়ে যাবে লিট্‌ল গেয়্যাল! বেটার টেক মিস চামেলী।"

অসীম ধমক দিয়া বলিল, "থাম হে, লর্ড দত্ত! সব-তাতে ফুস্ কাট্‌তেই হবে তোমার? নে, নে, শুভো, বড্ড দেরী হয়ে যাচ্ছে।"

শুভেন্দু বলিল, "হাঁ—এক মিনিট—এই, এ দিকে মুখ ক'রে—চোখের দৃষ্টি বাঁকোণ দিয়ে ফেলে—"

আর্টিষ্টের আগ্রহভরে শুভেন্দু হিরণীর মৃণালের মত বাহুটি ধরিয়া এক পাশে একটু সরাইয়া দিল। সত্যই আর্টিষ্টের আগ্রহ ও উৎসাহ ছাড়া তাহার মনে অন্য কোন চিন্তা স্থান পায় নাই,—সে যে কোন তরুণীর হাত ধরিয়াছে, এ অনুভূতিই তাহার ছিল না। কিন্তু তাহার উদ্দেশ্য যতই সাধু হউক, ব্যাপারটা দাঁড়াইল বিপরীত!

সে কার্য্যেই নিবিষ্টচিত্ত ছিল, বহির্জগতে কি হইতেছে না হইতেছে, সে খবর সে রাখে নাই। হঠাৎ হিরণীকে অন্যমনস্ক ও আরক্তমুখ দেখিয়া বিস্মিতদৃষ্টি উন্নীত করিতেই যাহা দেখিল, তাহাতে তাহার হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া যেন মুহূর্ত্তে স্তব্ধ হইয়া গেল। হিরণীর যে অঙ্গে সে অতিমাত্র আগ্রহে অজ্ঞাতসারে হাত রাখিয়াছিল, দেখিল, হিরণী সেইখানেই দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া পাষাণমূর্ত্তির মত নিশ্চল হইয়া রহিয়াছে। হিরণীর দৃষ্টিতে ক্রোধ না ঘৃণা—কোন্‌টার অভিব্যক্তি হইতেছিল?

তাড়াতাড়ি হাতখানা সরাইয়া লইয়া সে নিতান্ত অপরাধীর মত কাঁচুমাচু-মুখে দাঁড়াইয়া রহিল তাহার করুণ ভয়চকিত দৃষ্টি হিরণীর নিকট ক্ষমাভিক্ষা করিতেছিল। আর সকলে মুহূর্ত্তের এই ঘটনা লক্ষ্য করে নাই ভাবিয়া সে পরম সৌভাগ্য বলিয়া মনে করিল। কিন্তু সে যাহাই ভাবুক, এ দৃশ্যটি অসীমের দৃষ্টি এড়াইয়া যায় নাই। সে একটু হাসিয়া বলিল, "নে নে, শীগ্‌গীর সেরে নে তোরা, শুভো।"

শুভেন্দু এবার নিজেই অসম্মতি প্রকাশ করিয়া বলিল, "না, আজ থাক। সত্যিই এ লাইটে ভাল উঠবে না।" তাহার কণ্ঠস্বর কম্পিত হইতেছিল।

হিরণী তাহার ভ্রাতৃজায়ার হাত ধরিয়া নীরবে কক্ষ ত্যাগ করিয়া গেল। তাহার মুখ-চক্ষু তখন অসম্ভব গাম্ভীর্য্য ধারণ করিয়াছিল।

অসীম একরাশ সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়িতে ছাড়িতে বলিল, "তুমিও যাও, লর্ড ডাটা, তোমাকে নিয়েই আর্টিষ্টের কারবার, তোমার বোনকে নিয়ে না।"

বিভাসচন্দ্র এই সুযোগই খুঁজিতেছিল। ভগিনীর পক্ষপুটে আশ্রয় লইয়া ভগিনীপতির সম্মুখীন হওয়া, আর একাকী ভগিনীপতির কঠোর শ্লেষবাক্যের তীক্ষ্ণ তীরের লক্ষ্য হওয়া, এক কথা নহে। তাড়াতাড়ি উঠিয়া একখানা হাত বাড়াইয়া সে বলিল, "সো লং! গুড ডে টু ইউ অল, গুড ডে, মিস চামেলী!" নিমেষের মধ্যে সে অদৃশ্য হইয়া গেল, যেন পিঞ্জরের পাখী—মুক্তি পাইয়া ডানা মেলিয়া আকাশ-বাতাসে ভাসিয়া হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল!

অসীম তাহার দিকে চাহিয়া কেবল একবার অস্ফুট স্বরে বলিল, "ইডিয়ট!"

চামেলী হঠাৎ বলিল, "আজ আর বোধ হয় আমার কোন দরকার হবে না? আমি আসতে পারি কি?"

অসীম বলিল, "না, তোমার কোয়ার্টার্শ ত ঠিক ক'রে দিইছি, আজ থেকে তুমি ঐখানেই থাকবে। ওটা ষ্টুডিওর এধার থেকে একবারেই আলাদা, তোমার কোন অসুবিধে হবে না।"

চামেলী কৃতজ্ঞ নয়নে চাহিয়া বলিল, "আমি ত আপনার কাছে সেই ভিক্ষেই চেয়েছিলুম। আপনার আশ্রয়ে"—

অসীম বাধা দিয়া বলিল, "ইস্, একবারে কেঁদেই ফেল্‌লে যে! দেখ, এতে অনুগ্রহ-নিগ্রহ বা আশ্রয়-অনাশ্রয়ের কথা নেই, এ একবারে সেরেফ লেন-দেন। আমি তোমার সব ভার নিচ্ছি, তুমি তার বিনিময়ে তোমার সমস্ত বিদ্যেবুদ্ধি ঢেলে দিয়ে প্রাণ খুলে আমার কাযে লেগে যাবে। দেখ্‌লে ত হিরণীর পোজ দেওয়া? কেমন লাগলো?"

চামেলী বলিল, "লাগলো? পোজ যত লাগুক না লাগুক, মানুষটাকে আমার যা লেগেছে, তা আর ব'লে কি জানাবো? এমন বড়লোকের ঘরের এমন মানুষ"—

তাহার কণ্ঠ বাষ্পরুদ্ধ হইল। তাহার অবস্থা দেখিয়া অসীম তাড়াতাড়ি কথার মোড় ঘুরাইয়া দিবার জন্য হো হো হাসিয়া বলিল, "কে, হিরণী? আমি ত জানি, ওর তেজের কাছে—ওর ঝাঁঝের কাছে আমিও এগুতে পারি নি, ও আবার একটা মস্ত মানুষ হলো? কি রে, শুভো, তুই কি বলিস?"

শুভেন্দু কি ভাবিতেছিল, তা সে-ই জানে। অতর্কিত প্রশ্নে চমকিয়া উঠিয়া সে বলিল, "এঁ্যা, কে—মিস বসু? তা, হ্যাঁ"—

অসীম হাসিয়া বলিল, "থাক, তোর আর এঁ্যাও-ম্যাও করতে হবে না। বল্‌ছিলুম কি, তোর এই নতুন ছাত্রীকে পোজ যা শেখাবার, কাল থেকে শেখাতে সুরু ক'রে দিস, আজ ত আণ্ডারষ্টাডি হয়ে কিছু কিছু দেখলে। দেখ, তোমার এই মাষ্টারটি পাকা লোক, তোমাদের শুধু পোজ শেখাবেন না, কোচও করবেন। খুব ভাল এ্যাক্টর নিজে,—বোম্বাই-এ ষ্টার এ্যাক্টর বলে এঁর নাম হয়েছে, বুঝলে?"

শুভেন্দু ঘামিয়া উঠিল।

চামেলী বলিল, "আমায় যেমন ক'রে শেখাবেন, আমি ঠিক তেমনই শিখে নেবো। ছেলেবেলা থেকে আমি যা একবার দেখি-শুনি, তা আর ভুলি নি। আজ তা হ'লে উঠি?"

অসীম যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইতেছিল, বসিয়া পড়িয়া বলিল, "যাবে? আমি আরও ভাবছিলুম, আজ ইনি তোমায় আর্ট গেলারীটা দেখিয়ে বুঝিয়ে দেবেন।"

চামেলী বলিল, "আচ্ছা, একবার বাসা থেকে ঘুরে আসছি। নতুন যায়গা, একবার দেখে শুনে নিই।"

অসীম বলিল, "তাই যাও। দেরী কোরো না কিন্তু; রাত্তির ৯টার মধ্যে গ্যালারী-ট্যালারী বন্ধ হয়ে যায়। কে আছ, এঁকে ওঁর বাসায় পৌঁছে দিয়ে এস।"

ভৃত্য চামেলীকে লইয়া চলিয়া গেল।

কিছুক্ষণ কক্ষ নিস্তব্ধ রহিল,—সিগারেটের ধূমে কক্ষ ভরিয়া গেল। তাহার পর অসীম বলিল, "কি রে, তোলো হাঁড়ির মত মুখখানা ক'রে রইলি কেন? কি, হ'লো কি?"

চোর চুরি করিতে গিয়া ধরা পড়িবার সম্ভাবনা হইলে তাহার মুখের ভাব যেমন হয়, তেমনই ভাবে ভীত-চকিত দৃষ্টি অবনমিত করিয়া শুভেন্দু বলিল, "অ্যাঁ, আমি?—আমার? না, কৈ, কিছু হয় নি ত!"

অসীম মৃদু হাসিয়া বলিল, "না হলেই ভাল। ভাবছি, আজ ত্রিকমজীর ওখানে না গিয়ে কাল সকালে দুজনেই যাব। দেখ্, অদ্ভূত এই অ্যাকট্রেসের ইতিহাস। যে চিঠি লিখেছিল হিরণীকে, তা যদি প'ড়ে দেখিস, তা হ'লে বুঝবি পাঁকে জন্ম হলেও পদ্মফুলের মত এ মেয়েটা দেবতার পূজোয় দেবার মত।"

শুভেন্দু বলিল, "তার মানে?"

অসীম বলিল, "মানে? কোনও অ্যাক্টার অ্যাক্ট্রেসের সঙ্গে মেশে না, কারুর সঙ্গে দরকার না হ'লে কথা কয় না, ভদ্দর ঘরের মেয়েদের মত লেখাপড়া করতে ভালবাসে, ভদ্দর গেরোস্ত ঘরের লোকেদের সঙ্গে কথাবার্ত্তা কইতে ভালবাসে। প্রথম এসেই যে ভাবে হিরোর ভালবাসা পেয়েছে, যদি এই ভাবে ও সুনজরে থেকে শিখতে পারে, তা হ'লে কালে ও আমাদের বাঙ্গালার ষ্টার এ্যাকট্রেস হবেই হবে।"

কথাটি বলিয়া সে বন্ধুর দিকে জিজ্ঞাসু নেত্রে চাহিয়া রহিল। কিন্তু শুভেন্দু হাঁ না কোন সাড়া না দিয়া নীরবে বসিয়া রহিল।

অসীম বলিয়া যাইতে লাগিল, "একে তৈরী ক'রে নে হিরোর সঙ্গে সঙ্গে রেখে হিরোর পোজগুলো দেখিয়ে। দেখছিস ত হিরো এতে প্রাণ খুলে যোগ দিতে চায় না—আর ওর কলেজও খুলে এলো। বাপ, আজ যা ক'রে তোর দিকে চেয়েছিল! আমার ভয় করে, কখন্ কি কড়া কথা

ব'লে ফেলে। ভেতরে ওর যাই থাকুক, দেখছিস ত, বাইরেটা কি রকম কড়া? বিয়ে যে কি ক'রে হবে, ভেবেই পাইনে,—নাক ত তুলেই রয়েছে, আর ওটা আমাদের বংশের ধারা, ওরই বা দোষ দেব কি! কি বলিস্?"

শুভেন্দু চমকিত হইয়া বলিল, "এঁ্যা, কি বলছো?"

অসীম বলিল, "না, বলছিলুম কি, ওর বিয়েটা কেমন ক'রে দেওয়া যায়? যে মেজাজ! তোর কি মনে হয়?"

শুভেন্দু মহা অস্বস্তি বোধ করিতেছিল, সে বলিল, "আমি? তা, তুমি যা বুঝবে"—

অসীম বলিল, "আরে, তা ত বুঝবোই। জানিস, এর মধ্যে আমারই বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে থেকে দু'তিনটে অফার এসেছে। তিনটেই ডিসাগ্রিবেবল ম্যাচ। সুধেন রায় সে দিন যার সঙ্গে তোর আলাপ-পরিচয় করিয়ে দিলুম রে এবার আই, এম, এস, পাশ ক'রে এসেছে, দেখতে শুনতে মন্দ না, বাপের কিছু আছেও বটে। তা, সে ত আমায় পাগল ক'রে তুলেছে একবারে। তা, আমি ব'লে দিইছি, আমি কিছু বলবো না আগে ওর মন না জেনে। কিন্তু কেউ ত সে দিকে এগুতে সাহস করছে না। মহা মুস্কিল! কি করি বল্ দিকি?"

শুভেন্দু একখানা বাঁধান ফটো তুলিয়া লইয়া নাড়াচাড়া করিতে লাগিল, ক্ষীণ কণ্ঠে বলিল, "আমি কি বলবো?"

অসীম বলিল, "বা রে, এদ্দিন রইলি—বাড়ীরই পাঁচ জনের এক জন হয়ে! সত্যিই তুই ত ওর দাদারই মতন। ওর ভালমন্দ যেমন আমরা দেখবো, তেমনই তুইও দেখবি ত?"

শুভেন্দু আমতা আমতা করিয়া বলিল, "তা ত ঠিকই। তবে আদার ব্যাপারী"

অসীম অৰ্দ্ধদগ্ধ সিগারেটটা অ্যাস-ট্রের উপর রাখিয়া দিয়া ধীরে ধীরে বলিল, "আদার ব্যাপারী জাহাজের খোঁজ রাখে না বটে, কিন্তু জাহাজের কর্ণধারের কনফিড্যান্ট হয় ত!"

কথাটার খোঁচায় ক্ষুব্ধ হইয়া শুভেন্দু বলিল, "বাড়ীর কর্ত্তাকে না জানিয়ে গিন্নীর হুকুমে মধুপুরে গিয়েছিলুম,—এ অপরাধের কৈফিয়ৎ ত হাজারবার দিয়েছি, তাতেও হয় নি?"

অসীম ঔদাসীন্যের সহিত বলিল, "হুকুম না মিষ্টি অনুরোধ—যাক, ও তুচ্ছ কথা নিয়ে আর নেবু কচ্‌লে কায নেই। উঠলুম এখন। ঐ চামেলীও আসছে, ওকে একবার আর্ট গ্যালারীটা ঘুরিয়ে নিয়ে আসিস। দেরী যে?"

চামেলী বলিল, "দেরী হয়েছে? কি করবো বলুন। নিজে যেখানে থাকব, সে যায়গাটা কেমন ক'রে সাজাতে গুছুতে হবে, তা দেখে নিচ্ছিলুম। দোষ করলুম কিছু?"

অসীম বলিল, "না, দোষের কথা কিছু হয় নি, তোমার আসতে একটু বেশী সময় গিয়েছে, তাই কথার কথায় বলছিলুম। যাক, আমি চললুম, তোমরা নতুন ফিল্মের বিষয়ে আলাপ কর।"

সে চলিয়া গেলে শুভেন্দু বলিল, "চলুন, এখনও লাইট আছে কিছু, গ্যালারীটা ঘুরিয়ে আনি।"

চামেলী যাইতে যাইতে বলিল, "আপনি আমায় আপনি মশায় করছেন, এটা—"

শুভেন্দু হাসিয়া বলিল, "কেন, অসীম আমায় আপনার গুরুমশাই বানিয়ে দিয়ে গেল ব'লে? আপনিও যেমন ক্ষেপেছেন ঐ পাগলের কথায়! দেখুন, ঐ যে পাহাড়ের মাথা হ'তে দিনের আলো নেমে যাচ্ছে একটু একটু ক'রে, আর তার লালচে আলোটা ছড়িয়ে দিয়ে যাচ্ছে গাছপালার মাথার উপর, ঐটে হ'ল ঠিক যাকে আমরা বলি গোধূলি, twilight. এ সময়ে শ্রান্ত পথিক যদি সারাদিন জলাজঙ্গল ভেঙ্গে একটা ডেরাডাণ্ডা পাবার আশায় হাঁপাতে হাঁপাতে এসে দেখে যে এক পাহাড় সামনে পথ আটকে দাঁড়িয়ে রয়েছে, তা হ'লে তার মনটা কেমন হয়?"

চামেলী ছবি দেখিতেছিল, বলিল, "আপনি যতক্ষণ আমায় আপনি আপনি করবেন, ততক্ষণ ত আমি আপনার কাছে কিছু শিখবো না, কিছু পরীক্ষার জন্য জিজ্ঞাসা করলেও জবাব দেব না।"

শুভেন্দু হাসিয়া বলিল, "ওঃ, এই কথা! অচ্ছা, তাই হবে। এখন যা জিজ্ঞাসা করলুম, তার জবাব দাও।"

চামেলী বলিল, "হাঁ, কি বলছিলেন, মনটা তখন কেমন হয়? খুব আশা ক'রে থেকে আশা পূর্ণ না হ'লে মন ভেঙ্গে যায়, বুক দ'মে যায়।"

শুভেন্দু বলিল, "তা ত যায়। কিন্তু সে ভাবটা মুখে-চোখে কি রকম ক'রে ফুটে ওঠে, অভিনয় করবার সময় সেই ভাবটা মুখে-চোখে আনাটাই হ'ল শক্ত, আর যিনি তা আনতে পারেন ঠিকমত, তিনিই হ'তে পারেন ষ্টার অ্যাক্টর

অ্যাকট্রেস। এই ছবিটেতে সেই ভাবটা ঠিক ফুটে রয়েছে না?"

চামেলী বলিল, "হাঁ, তা বটে। ঐ রকম করেই ত রাগ, হিংসা, লোভ, স্নেহ, ভালবাসা, ঘৃণা,—সবই দেখাতে হয়। মানে, সবগুলো একরকম ক'রে নয়, সব আলাদা আলাদা, কেমন, না?"

শুভেন্দু বলিল, "শুধু তাই নয়, টকিতে অ্যাক্টর-অ্যাকট্রেসদের কথা বলতে হবে, নাচতে হবে, গাইতে হবে, লাফাতে হবে, দৌড়ুতে হবে,—"

চামেলী বাধা দিয়া বলিল, "আমায় যার পোজ দেখে পার্ট শিখতে হচ্ছে, তিনি নাচতে গাইতে জানেন?"

শুভেন্দু বলিল, "গাইতে জানেন খুব ভাল, তা জানি, তবে নাচতে জানেন কি না, কি আর সব জানেন কি না, বলতে পারি না। তুমি নিশ্চয় জান বোধ হয়?"

চামেলী হাসিয়া বলিল, "নিশ্চয় আবার বোধ হয় কি রকম? হাঁ, অ্যাকট্রেস যখন পাবলিক ষ্টেজের, তখন সব শিখতে হয়েছে বৈ কি। দেখুন, আমাদের লাইফে অনেক আর্টিষ্টের সঙ্গে মিশতে হয়েছে, শিখতেও হয়েছে অনেক কিছু। গান করা, ছবি আঁকার ত কথাই নেই। ও মা গো!"

চামেলী চমকিয়া ভীতত্রস্তভাবে শুভেন্দুর একটা হাত ধরিয়া ফেলিল। শুভেন্দু তখন বিজলী বাতির সুইচ টিপিতেছিল, সে চামেলীর অস্ফুট আর্ত্তনাদ শুনিয়া এবং তাহার কম্পিত হস্তের স্পর্শ অনুভব করিয়া বিস্মিত হইয়া বলিল, "কি হয়েছে, অমন ক'রে উঠ্‌লে কেন?"

চামেলী তখনও কাঁপিতেছিল, বলিল, "কে যেন ঐ বড় ছবিখানার আড়ালে লুকুলো না?"

শুভেন্দু হাসিয়া বলিল, "লুকুলো? ষ্টুডিওর ভেতরে? পাগল!"

এই কথা বলিয়া সে চামলীকে বসিতে বলিয়া দ্রুতপদে তৈল-চিত্রখানার দিকে অগ্রসর হইল। কিন্তু তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়াও সে কোথাও কিছু দেখিতে পাইল না। তখন সে কক্ষ ও কক্ষসংলগ্ন গুদাম-ঘরের সমস্তটা অংশ ঘুরিয়া বেড়াইল, কিন্তু কোথাও জনপ্রাণী নাই। হাসিয়া সে ফিরিয়া আসিতেছিল, হঠাৎ বাগানে যাতায়াতের দ্বার-পথের দিকে দৃষ্টি পড়িতেই তাহার ললাটের রেখা কুঞ্চিত হইল—এ দ্বার ত রুদ্ধই ছিল, খুলিল কে? মনটা তাহার চিন্তা-ভারগ্রস্ত হইয়া রহিল। কিন্তু প্রকাশ্যে কোনরূপ চিত্তচাঞ্চল্যের ভাব প্রকাশ না করিয়া সে চামেলীকে সঙ্গে লইয়া আরও কয়খানি চিত্র দেখাইল এবং সঙ্গে সঙ্গে সেই চিত্র-সমূহের ভাবের অভিব্যক্তি বুঝাইয়া দিতে লাগিল। মানুষের ক্রোধ, হিংসা, লোভ, মোহ, শোক, দুঃখ, মান, অপমান, লজ্জা, ভয়, আতঙ্ক, সন্দেহ, অবিশ্বাস, জিঘাংসা, রিরংসার উদ্রেক হইলে মানুষ কি ভাবে হাসে, কাঁদে, রাগে, ভালবাসে, ঘৃণা করে, হিংসা করে, চলে, ফেরে, দাঁড়ায়, বসে,—সেই সমস্ত ভাবের অভিব্যক্তি এই সকল চিত্রে অঙ্কিত ছিল, অসীম বহু অর্থব্যয়ে এই সকল তৈল-চিত্র অঙ্কিত করাইয়াছিল। চিত্রগুলি দেখিতে বাস্তব বলিয়া মনে হওয়া বিচিত্র নহে।

চামেলীর সব দৃষ্টিটা যে সেই দিকে ছিল, এ কথা বলিলে সত্যের অপলাপ করা হয়। বসিবার ঘরে আসিয়া বিদায়কালে সে বলিল, "নমস্কার। আজ রাতে আর ষ্টুডিওতে আপনার যাওয়া দরকার হবে না বোধ হয়?"

শুভেন্দু বিস্মিত হইয়া বলিল, "কেন বল দিকি? ও, তুমি এখনও সেই ভুলটা পুষে রেখেছ বুঝি? হাঃ হাঃ! চল, তোমায় এগিয়ে দিয়ে আসি।"

চামেলী বলিল, "কি দরকার? ঐ ত বাগানটার ওপারে কোয়ার্টার? আপনি বসুন।" পরে ঈষৎ কম্পিত কণ্ঠে বলিল, "দেখুন, একবার লোকজন দিয়ে ষ্টুডিওটা ভাল ক'রে দেখে নেবেন আজকে।"

শুভেন্দু হাসিয়া বলিল, "আচ্ছা, তাই হবে।" চামেলী চলিয়া গেল।

শুভেন্দু ঘরে ফিরিয়া আসন গ্রহণ করিয়া ভাবিতে লাগিল, চামেলী কি দেখিল? সে কেন এমন সাবধান করিয়া দিয়া গেল?

মনটা কেমন একটু চঞ্চল হইয়া উঠিতে সে ষ্টুডিওতে গিয়া আলো জ্বালিয়া আর একবার ভাল করিয়া ঘরটা তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়া দেখিল। কোথাও কেহ নাই। চামেলীর ইহা নিশ্চিতই দৃষ্টিভ্রম। বাগানে যাইবার দ্বারপথ রুদ্ধ করিয়া বসিবার ঘরে ফিরিয়া সে ইজি-চেয়ারে অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় থাকিয়া সিগারেট ফুঁকিতে লাগিল। ইতিমধ্যে ভৃত্য আসিয়া জানাইয়া গেল, আহার্য্য প্রস্তুত করি[illegible]

কখন্, বাবু ফিরিয়া আসিলে, না অগ্রে? সে যথাযথ হুকুম দিয়া দিল, ভৃত্য ভিতরে সংবাদ দিতে গেল।

সকালের খবরের কাগজখানা একবার টানিয়া লইয়া দুই চারি ছত্র পড়িয়াই বিরক্তি বোধ করিয়া সেখানা সে পাশের টেবলে রাখিয়া দিল। তাহার মনে তখন অনেকগুলা কথা ভিড় করিয়া তাহাকে ভাবাইতেছিল,—হিরণীর কথা, চামেলীর কথা, অসীম উষার কথা, কত কি! কিন্তু অন্য সব কথা মনের দ্বারপথ দিয়া নিমিষে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেলেও হিরণীর কথাটা আজ সে কিছুতেই ভুলিতে পারিতেছিল না। কেন হিরণী অমন ক্রোধ ও ঘৃণার দৃষ্টিতে চাহিয়াছিল? কি এমন মস্ত অপরাধ করিল সে? সে দরিদ্র, তাহাদের বেতনভুক্ কর্মচারী,—এ কথা সত্য। কিন্তু সে ত ইচ্ছাপূর্ব্বক ধনবান্ জমিদারের কন্যা ও ভগিনীর হাতের উপর হাত রাখে নাই। তবে? সে ক্ষুদ্র, উহারা বৃহৎ; এ কথা সত্য। কিন্তু এই জগতে টাকা আনা পাই কি সব—আভিজাত্যগর্ব্বই কি সব? আর শিক্ষা-দীক্ষা, মনুষ্যত্ব, চরিত্র, প্রতিভা, যশোমান,—এ সব কিছু নহে? সব জিনিসেরই কি টাকার মূল্য অনুপাতে ওজন দর?

হঠাৎ তাহার চিন্তাস্রোতে বাধা পড়িল। সম্মুখে কক্ষ-প্রাচীরে বিলম্বিত দীর্ঘ দর্পণে সে যাহা দেখিল, তাহাতে তাহার সাহসী অন্তরাত্মাও মুহূর্ত্তের জন্য কম্পিত হইল। সে অতি বড় ধৈর্য্যশালী, নতুবা সে নিশ্চিতই আতঙ্কে চীৎকার করিয়া উঠিত।

দীর্ঘাকার একটা মানুষ—তাহার আসনের পশ্চাতে ধীর-পাদবিক্ষেপে অগ্রসর হইতেছে। তাহার মাথার পাগড়ীটা দিয়া মুখখানা এমন ভাবে বাঁধা যে, কেবল চোখ দুইটা তাহার মধ্য হইতে বাঘের চোখের মত জ্বল্‌জ্বল্ করিতেছে। যদি মানুষ খুন করার ইচ্ছা চোখের দৃষ্টিতে ব্যক্ত হওয়া সম্ভব হয়, তাহা হইলে ঐ মানুষটার চোখে যে সেই ইচ্ছা স্পষ্ট ব্যক্ত হইতেছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। লোকটা যে কখন্ সন্তর্পণে ধীরে ধীরে গুপ্ত স্থান হইতে বাহির হইয়া এত কাছে অগ্রসর হইয়াছে, তাহা শুভেন্দু কিছুই বুঝিতে পারে নাই।

অতি বড় শক্তিমান এবং দুর্জ্জয় সাহসী হইলেও এরূপ অতর্কিত বিপৎপাতের আশঙ্কায় যে কোনও মানুষের বুক-খানা আতঙ্কে কাঁপিয়া উঠিবেই। শুভেন্দু কিন্তু তৎসত্ত্বেও যেন কিছুই জানিতে পারে নাই, এইরূপ ভাব দেখাইয়া নির্ব্বিকারচিত্তে আততায়ীর আরও নিকট-সান্নিধ্যের জন্য প্রস্তুত হইয়া রহিল। সে একবারে তাহার আসনের পশ্চাতে আসিয়া দাড়াইতেই শুভেন্দু নিমিষে আসনত্যাগ করিয়া বাঘের মত তাহার ঘাড়ের উপর লাফাইয়া পড়িল। সে যুযুৎসুর কৌশলে অভ্যস্ত ছিল, অতি সহজেই আততায়ীকে ভূশয্যাশায়ী করিয়া ফেলিল। তাহার পর সে তাহার বুকের উপর চাপিয়া বসিয়া হাত দুইটা জানু দ্বারা চাপিয়া ধরিল।

লোকটা পশ্চিমা, বয়সে নবীন এবং খুব জোয়ান। সে খুব হাঁপাইতেছিল: শুভেন্দুও তাই। দুই জনেই নীরব, দুই জনেই অজগর-সর্পের মত ঘন ঘন শ্বাস ত্যাগ করিতেছিল।

ক্ষিপ্রহস্তে তাহার মুখের বাঁধনটা খুলিয়া ফেলিয়া উহা দ্বারাই শুভেন্দু তাহার হাত দুইটা বাঁধিয়া ফেলিল। পাগড়ীর একাংশ রক্তে রঞ্জিত হইয়া গিয়াছিল, বোধ হয় পড়িয়া যাইবার সময় লোকটার মাথাটা দেরাজে ঠুকিয়া গিয়াছিল কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে, লোকটা আঘাত পাইয়াও তাহাকে বাধা দিবার বা প্রতি-আক্রমণ করিবার কোন চেষ্টা করিল না।

শুভেন্দু হিন্দীতে জিজ্ঞাসা করিল, "কে তুই?" সে যে বাঙ্গালী নহে—তাহা শুভেন্দু প্রথম হইতেই বুঝিয়াছিল।

লোকটা সে কথার কোন জবাব না দিয়া প্রায় কাঁদো-কাঁদো স্বরে বলিল, "জানকী—বাবুজী, আমার জানকী! তোমার কাছে ভিক্ষে চাইছি, আমার জানকীকে ফিরিয়ে দাও সেই কলকাতার বাবুকে ব'লে—নইলে"—কথাটা বলিয়া সে ফুকারিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

শুভেন্দু তখনই তাহাকে ছাড়িয়া দিল, সঙ্গে সঙ্গে বাঁধনটাও খুলিয়া দিল—বলিল, "উঠে বোসো। তুমি কি মনুয়া—মধুপুরের?"

লোকটা কান্নাজড়িত স্বরে বলিল, "হাঁ বাবুজী—আমার জানকীকে ফিরিয়ে দাও, তোমার পায়ে পড়ছি, বাবুজী।" সে মাথাটা শুভেন্দুর পায়ের উপর রাখিয়া দুই হাতে পা দুইটি জড়াইয়া ধরিয়া ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল। মাথার ক্ষত হইতে রক্তধারা ঝরিতেছিল—সে দিকে তাহার লক্ষ্য ছিল না।

শুভেন্দুর মনটা এই দরিদ্র নিরক্ষর গ্রামবাসীর দুঃখে সমবেদনায় ভরিয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে কলিকাতার সাহেব বাবু বিভাসচন্দ্রের প্রতি দারুণ ঘৃণায় তাহার মনটা তিক্ত হইয়া উঠিল। মানুষ—সভ্য শিক্ষিত মানুষ—এত নীচ, এত হৃদয়হীন হইতে পারে? সে খানিকটা টিঞ্চার আইওডিন আনিয়া মনুয়ার ক্ষতস্থানটা বাঁধিয়া দিল, তাহার পর বলিল, "ঠিক ক'রে বল্‌, মনুয়া, এখানে এসেছিস কেন? তোর জরুকেই বা এখানে খুঁজছিস কেন? কিছু খেয়েছিস? কবে এসেছিস? তোর জানকী এখানে আছে, কে তোকে বলেছে?"

মনুয়া কতকটা অভিভূতের মত হইয়া পড়িয়াছিল। জানকীর নাম হইতে সে তীরের মত উঠিয়া দাঁড়াইল, তাহার চোখ দু'টা ধকধক্‌ জ্বলিয়া উঠিল। সে চীৎকার করিয়া বলিল, "শয়তান! ঐ বাবুই আমার জানকীকে নিয়ে এসেছে! রাগ ক'রে বাপের ঘরে চ'লে যাবো ব'লে গিয়েছিল। সেখানেও যায় নি। নিশ্চয়ই ঐ কুকুর-বাচ্ছা ওকে চুরি ক'রে এনেছে! ওর খুন দেখবো বাবুজী, খুন দেখবো!"

"এ কি? কে ও? কি চায়? কার খুন দেখতে চাইছে ও?"—কথাটা বলিতে বলিতে অসীম অতর্কিতভাবে কক্ষে প্রবেশ করিল, তাহার পশ্চাতে দুই তিনটা কুলী, ঝাঁকায় মাল বোঝাই, সঙ্গে খানসামা চাকর।

শুভেন্দু যে ভয় করিতেছিল, তাহাই ঘটিয়া গেল। তাড়াতাড়ি লোকটাকে আড়াল করিয়া সে বলিল, "না, ও কিছু না—লোকটা ভিক্ষে করতে এসেছিল—যা, যা, চ'লে যা, এই নে রেলভাড়া।"

মনুয়া নড়িল না, বরং সম্মুখে বাহির হইয়া আসিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিল, "না, বাবুজী, ভাড়া চাইনে—আমি জানকীকে চাই, মধুপুর থেকে সাহেব জানকীকে নিয়ে এসেছে, বাবু—"

অসীমের বিস্ময়ের সীমা রহিল না। সে একবার মনুয়া ও একবার শুভেন্দুর দিকে চাহিয়া বলিল, "ব্যাপার কি? মধুপুর—জানকী?—ওঃ!"

মুহূর্ত্ত পরে অসীম গম্ভীরকণ্ঠে লোকজনকে মাল রাখিয়া কক্ষত্যাগ করিতে হুকুম দিল। তাহার পর আসন-গ্রহণ করিয়া বলিল,—"মধুপুর থেকে এসেছ তুমি? কে তোমার জানকী? কি চাও? রাত্রি দশটার সময় ভিখিরী এসেছে ভিক্ষে করতে? শুভো, শাক দিয়ে মাছ ঢাকছিস্‌, না?"

শুভেন্দু নতমস্তকে নীরবে বসিয়া রহিল। অসীম একটা সিগারেট ধরাইয়া পাখাটা খুলিয়া দিয়া বলিল, "তোর নাম কি রে, ছোকরা? কি চাস?"

তখন মনুয়া তাহার পদপ্রান্তে পড়িয়া অশ্রুসিক্তনয়নে, বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে ঝড়ের মত এক রাশ অনুযোগের কথা নিবেদন করিল। অসীমের দৃষ্টির উপর হইতে একটা রহস্য-যবনিকা অপসারিত হইয়া গেল। মনুয়া কটিদেশে লুক্কায়িত তীক্ষ্ণধার হাসুলিখানা বাহির করিয়া যখন তাহাকে বুঝাইয়া দিল যে, সে সত্যই আজ তাহার পত্নী-হরণকারীকে হত্যা করিতে আসিয়াছিল, তখন অসীমের মুখমণ্ডল আরও গম্ভীর আকার ধারণ করিল। ক্ষণকাল নিস্তব্ধ নিঝুমভাবে বসিয়া থাকিবার পর সে বলিল, "আচ্ছা, তুমি যাও এখন, কাল সকালে এসো, এর ব্যবস্থা করবো। তোমায় খুনে চোর ব'লে পুলিসে ধরিয়ে দিতে পারতুম, কিন্তু তা দেবো না। যে তোমার চেয়েও মস্ত বড় খুনে চোর, আগে তার শাস্তি হওয়া দরকার। যাও, কাল সকালে এইখানে দেখা ক'রো।"

আশ্চর্য্য! যে লোকটা এতক্ষণ কাঁদিয়া কাটিয়া শুভেন্দুকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিল, অসীমের একটি কথায় সে আশ্বস্ত হইয়া নীরবে চলিয়া গেল, যাত্রাকালে কেবল বলিয়া গেল, "আমার জানকী, বাবুজী! জানকী!"

অসহ্য গুমোট হইলে প্রাণ যেমন অতিষ্ঠ হইয়া উঠে, কক্ষের গম্ভীর অসহনীয় নীরবতা তেমনই দুইটি প্রাণীকে অতিষ্ঠ করিয়া তুলিল। অসীম ক্রমাগত চুরুট টানিয়া যাইতে লাগিল, শুভেন্দু বহু চেষ্টা করিয়াও বন্ধুর দিকে দৃষ্টি উন্নীত করিতে পারিতেছিল না। সহসা অসীমের অস্বাভাবিক কর্কশ কণ্ঠস্বরে শুভেন্দু চমকিয়া উঠিল। অসীম বলিল, "আড়াল দিয়ে পাপকে ঢেকে রাখবার গোপনে পরামর্শ খুবই ভাল হ'তে পারতো, যদি না পাপের স্বভাবই হোতো আপনিই প্রকাশ হয়ে পড়া।"

এ হেঁয়ালির কথা শুনিয়া শুভেন্দুর মনটা বড়ই আলোড়িত হইয়া উঠিল। সে ভাবিল, বোম্বাই ছাড়িয়া চলিয়া আসা তাহার পক্ষে আদৌ বুদ্ধির কার্য্য হইয়াছে কি?

"মানুষের মনই হইল সব। মনের স্বাস্থ্য-অস্বাস্থ্যের উপর মানুষের জীবনের অনেক কিছু নির্ভর করে। এই হেতু যাহা কিছু সত্য, শিব ও সুন্দর, তাহার প্রভাবের প্রয়োজন মনের উপর খুবই আছে, অন্যথা মনের স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ন রাখা সম্ভবপর হয় না। পাপের চিত্র জগতের সমস্ত চারুশিল্পীই কুৎসিত আকারে চিত্রিত করিয়াছেন, কোথাও পাপকে সুন্দর করিয়া দেখাইবার চেষ্টা হইয়াছে কি না সন্দেহ। খৃষ্টানদের শয়তানের মস্ত দুইটা শিং, সে দেখিতে অতি কদাকার। কেবল মেরী করেলি শয়তানকে সুন্দর চেহারা দিয়াছেন বটে, কিন্তু উহা নিয়মের ব্যতিক্রম।

"মানুষের মন কিন্তু ভিন্নরূপ। নীতিবিদ কাগজে-কলমে পাপকে জঘন্যরূপে চিত্রিত করেন বটে, মানুষের মন কিন্তু পাপকে পরম লোভনীয় দেখিয়া থাকে বলিয়াই তাহার দিকে আকৃষ্ট হয়। কতকটা রাজ-শাসন ও সমাজ-শাসন আর কতকটা পরকালের শাস্তির ভয় সেই লোভকে দমন করিয়া রাখে। যদি সে ভয় না থাকিত, তাহা হইলে সমাজে শৃঙ্খলা বা বন্ধন বলিয়া কোন জিনিষ থাকিত না, আর মানুষ ও পশুতে কোন প্রভেদ থাকিত না।"

কেতাবখানা মুড়িয়া রাখিয়া হিরণী অবজ্ঞাভরে বলিল, বাবিস! এ সব লেখা পুড়িয়ে ফেলাই দরকার।"

উষা কার্পেটের উপর ফুল তুলিতেছিল, বলিল, "কি লেখা লো?"

হিরণী ঈষৎ উষ্ণ স্বরে বলিল, "দেখ বৌদি, তোমাদের ঐ ডাকগুলো বড় বিশ্রী লাগে, ও সব এ যুগে অচল।"

উষা হাসিয়া বলিল, "কি আবার অচল হ'ল এ যুগে? লো ব'লে ডাকা? তা আমরা সেকেলে বুড়ো-হাবড়া মানুষ—"

হিরণী বলিল, "দেখ, মিছে বোকো না বলছি! ভারী বুড়ী হয়েছেন যেন!"

উষা বলিল, "আচ্ছা, আচ্ছা, আমি না হয় তোর মত একালের মেয়েই হলুম। তা, ও লেখাটা রাবিস হ'ল কেন? ও লেখাটা ত শুভেন্দু বাবুর, এ মাসের 'দরদী'তে বেরিয়েছে না?"

হিরণী বলিল, "হাঁ তাই। এ লেখার কি সবই উল্টো দিদি? মানুষের মন বুঝি পাপের দিকে ঝুঁকেই আছে? মানুষ বুঝি কেবল কুৎসিতই দেখে—কুৎসিতই চায়? তবে মানুষ ফুল ভালবাসে কেন, চন্দনের গন্ধ খোঁজে কেন? দেবতাকে ধূপ-ধুনো দিয়েই বা পূজো করে কেন? যা তারা সব চেয়ে ভালবাসে, ভক্তি করে, তাই দিয়ে তবে দেবতার পূজো দেয় কেন? রাবিস নয়?"

উষা বলিল, "তা শুভেন্দু বাবু ত ভালর দিকটাও বলেছেন।"

হিরণী বলিল, "হাঁ, বলেছেন, কিন্তু ঢোক গিলে। দেখ, জগতের সৃষ্টি হয়ে অবধি যত বড় বড় বই বেরিয়েছে, সব-তাতেই মহৎ মানুষের চরিত্র আঁকা হয়েছে। মানুষ রাম-লক্ষণের সীতাসাবিত্রীর কথা শুনতে ভালবাসে বলেই রামায়ণ-মহাভারতের সৃষ্টি হয়েছে, ভীমার্জ্জুন কিম্বা সুভদ্রাদ্রৌপদীর চিত্র অঙ্কিত হয়েছে বলেই যুগ যুগ ধ'রে মহাভারত মানুষের কাছে পূজো পেয়ে আসছে। মানুষের মন ভালই খোঁজে, কুৎসিত নয়।"

উষা বলিল, "তবে রাবণ-ইন্দ্রজিতের সৃষ্টি হ'ল কেন? দুর্য্যোধন, দুঃশাসন, শকুনি, কর্ণই বা এলো কেন? মানুষ চোর-ডাকাত হয় কেন? পুরুষ লম্পট আর মেয়েমানুষ বেশ্যা হয় কেন?"

হিরণী বলিল, "ও সব নিয়মের ব্যতিক্রম। আলোটাকে ফোটাবার জন্যেই অন্ধকার আনতে হয়।"

উষা বলিল, "না ভাই, আমার উল্টো যুক্তি। আমি বলি, পাপটাই—কুৎসিতটাই নিয়ম, আর সব ব্যতিক্রম। জগতে বেশীর ভাগটাই ত পাপ, বেশীর ভাগ লোক ত পাপ নিয়েই আছে, তবে কেউ বা চক্ষুলজ্জার খাতিরে লুকিয়ে পাপ করে, কেউ বা পাপ করাটাকে মস্ত কাষ মনে ক'রে দেখিয়ে বেড়ায়।"

হিরণী বিস্মিত হইয়া বলিল, "কি বলছো, বৌদি? তা হ'লে চামেলী পাপের ঘরে জন্মেও অমন ভাল হ'ল কেমন ক'রে?"

উষা বলিল, "পাঁকে পদ্ম জন্মে না? তা ছাড়া চামেলীর আর একটা দিক দেখতে হবে। মানুষ যদি এমন একটা জিনিষ পায়, যাকে আশ্রয় ক'রে তার পাপের দিকের ঝোঁকটা খাটো হয়ে যায়, তা হ'লে অমন দু'একটা দৈত্যকুলে প্রহ্লাদ দেখা দিতে পারে। কিন্তু যাদের সে সুবিধে না হয়?"

বলিল, "কি, সুবিধে কি ?"

উষা বলিল, "এই ধর না, যেমন ভালবাসা। না হয় ধর না, একটা নেশা, যেমন লেখাপড়া, গান-বাজনা।"

হিরণী বলিল, "বুঝেছি। তুমি বলতে চাও, চামেলীর ঝোঁকটা সিনেমা-টকির দিকে ঝুঁকেছে ব'লে সে অভিনয়ে তন্ময় হয়ে আছে—"

উষা বলিল, "হাঁ, তাই। না হ'লে যেখানে ও জন্মেছে, যে হাওয়ায় বাস করছে, সে দিকে ঝোঁক হওয়াই ত ওর পক্ষে স্বাভাবিক।"

হিরণী বলিল, "হুঁ। দেখছি, শুভেন্দু বাবুর সঙ্গে তোমার আইডিয়াগুলো মিলে যাচ্ছে তিনি ঐ প্রবন্ধেই পরে লিখছেন,—'প্রভাব আর অভ্যাস মানুষকে প্রলোভনের আকর্ষণ হইতে বাঁচাইয়া রাখে। ইহার অভাবে মানুষের উদ্দাম উচ্ছৃঙ্খল চঞ্চল মন সংযত হইতে পারে না'।"

উষা বলিল, "তা ঠিকই ত।"

হিরণী বলিল, "তুমি ত বলবেই তা। তার পর শোনো তিনি কি লিখছেন, 'যে আবহাওয়া বা আবেষ্টনীর মধ্যে মানুষের মন গড়িয়া উঠে, তাহার প্রভাব সারা মনের উপর বিস্তৃত হয়। এই জন্য যতরূপে সম্ভব, যাহা কিছু সত্য, যাহা কিছু শিব ও যাহা কিছু সুন্দর, তাহার দিকে মনকে লইয়া যাইবার চেষ্টা করাই হইতেছে প্রকৃত মনুষ্যত্ব, মানুষের প্রকৃত কর্ত্তব্য। চেষ্টা ব্যর্থ হইতে পারে, তাহাতে ক্ষতি নাই। এই জন্য পুনঃ পুনঃ চেষ্টার প্রয়োজন। এই পুনঃ পুনঃ চেষ্টাই অভ্যাস নামে অভিহিত হইয়া থাকে।' আহা, ঠিক যেন মাষ্টার মশাই বেত নিয়ে পড়াতে বসেছেন স্কুলের ছেলেদের! চেষ্টা আবার করে না কে?"

উষা বলিল, "ঢের লোকে করে না, আর করে না বলেই এত অনাছিষ্টি, এত পাপ।"

হিরণী বলিল, "তাই বটে! আমার ত মনে হয়, মানুষের মন এত ছোট নয় যে, কেবল আঁস্তাকুড়ের দিকেই ছুটবে!"

উষা বলিল, "সে পরীক্ষা ত হয়নি এখনও। পরীক্ষা হ'লে বোঝা যায়, কার কতটা দৌড়।"

হিরণী বলিল, "তার মানে?"

উষা বলিল, "তার মানে আবার কি? যা ঘটে, তাই বললুম। তোর সঙ্গে আমি তর্কো করতে পারিনি বাপু, সে ক্ষমতাও আমার নেই। কিন্তু যাই হোক, সত্যি বলতে কি, চামেলীকে আমার বড্ডো ভাল লাগছে ক্রমে ক্রমে। ওর মুখে যখন ওদের ঘরের কথা শুনি, তখন মনে হয়, ভালবাসা ব'লে জিনিষটা ওরাই ভোগ করে, দুটো প্রাণের মধ্যে মিল হলো না ব'লে ওদের জীবনটা ব্যর্থ হয়ে যায় না।"

হিরণী এ কথায় কেবল বিস্মিত হইল না, ক্রুদ্ধও হইল। দৃপ্ত-কণ্ঠে বলিল, "ওদের ঘরে ভালবাসা? তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে না কি, বৌদি? চামেলীর সঙ্গে ও সব কথা হয় না কি তোমার? কৈ, আমায় ত বলতে সাহস করে না।"

উষা হাতের বোনাটা ফেলিয়া দিয়া উচ্চরবে হাসিয়া বলিল, "পোড়ারমুখী! এই মাত্তর মাষ্টার মশায়ের কথা বলছিলি না? তুইও ত তাই। বাবা, তোদের যে বড়-মানুষি রাশভারি চাল! পরকে আপনার ক'রে নিতে না জানলে সে তার মনের কপাট তোর কাছে খুলবে কেন? এই দেখ না, আমি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ওদের ঘরের কথা তুলি, তাই ত ও আমায় সব কথা বলে।"

হিরণী মুখ ভার করিয়া বলিল, "তুমি যা-ই বল বৌদি, ওর সঙ্গে বেশী মেশামিশি ভাল না।"

উষা উচ্চহাস্য করিয়া বলিল, "সত্যিই তা হ'লে তুই মাষ্টার মশাই হলি দেখছি। বেতগাছটা এনে দেব হাতে?"

"কি, বেত চাই না কি? তা বেতের দরকার হয়েছে বটে এ বাড়ীতে"—কথাটা বলিতে বলিতে অসীম কক্ষে প্রবেশ করিল। রুক্ষ কেশ, আরক্ত চক্ষু, শুষ্ক মুখ,—সে ভাল করিয়া মেঝের উপর পা রাখিতে পারিতেছিল না।

হিরণী উৎকণ্ঠিতভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "কি হয়েছে, দাদা? আবার অসুখ করেছে?"

অসীম তাড়াতাড়ি একখানা সোফায় বসিয়া পড়িয়া বলিল, "অসুখ? হুঁ, সুখ কবে হ'ল, তা ত মনে করতে পারছি না! একটা কথা বলতে এসেছিলুম, ফুরসুৎ হবে কি তোমার বৌদির? মধুপুরের সেই ছোটলোকটা আবার এসেছিল আজ। কাকে খুঁজছে, বোধ হয় বলতে হবে না?"

কক্ষাভ্যন্তর একবারে নীরব। ক্ষণ পরে হিরণী ক্ষীণ-স্বরে বলিল, "এ খবর বৌদিকে দেবার কি দরকার, তা ও

বুঝতে পারছি না। তুমিই ত ও সম্বন্ধে যা হয় ব্যবস্থা করতে পার।"

অসীম বিরক্তিভরে বলিল, "হাঁ, এর একটা হেস্ত-নেস্ত আমি করতে চাই। এমন ক'রে একটা ছোটলোকের চোখ-রাঙ্গানি হজম করা আমার অভ্যাস নেই, বিশেষ যখন সে চোখরাঙ্গানির সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নেই।"

হিরণী অস্বস্তি বোধ করিয়া কক্ষত্যাগ করিয়া যাইতেছিল, অসীম বাধা দিয়া বলিল, "যেও না। কথা যা হয়, তোমার সামনে হয়ে যাওয়াই ভাল। সব শুনেছ বোধ হয়?"

হিরণী ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, সে শুনিয়াছে। অসীম বলিল, "বেশ, ভালই হয়েছে। এখন তোমার বৌদি কি করতে চান, তাই জানতে এসেছি।"

উষা এতক্ষণে কথা কহিল, গম্ভীরভাবে বলিল, "কি করতে হবে, বল।"

অসীম মুখ বিকৃত করিয়া বলিল, "বলাবলি এতে আমার কি থাকতে পারে? তুমি যখন এ বাড়ীর সুনাম-দুর্নামের মালিক, তখন ব্যবস্থা ত তোমাকেই করতে হবে।"

উষা কঠিনস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "মানে?"

অসীমও কঠোরকণ্ঠে বলিল, "মানে—যার জন্যে সুনাম-দুর্নাম—আপদ-বালাই এসে জুটছে এ বাড়ীতে, তোমার আমার হ'লে তাকে নিয়ে ঘর-সংসার করতে আমাদের কোন আপত্তি ছিল না। যা হ'তে সুনাম-দুর্নাম—হাঙ্গামহুজ্জৎ—তা আমাদের উপর দিয়েই হয়ে যেত। কিন্তু আমরা একলা নই, মনে রাখতে হবে—আমার বোন রয়েছে এ বাড়ীতে"—

হিরণী বাধা দিয়া বলিল, "এ কি কথা বলছ, দাদা? আমি কি বৌদির পর? তোমাদের মান-অপমানে আমার কিছু নেই?" কথাটা বলিবার সময়ে সে দুই হাতে তাহার বৌদিদির কণ্ঠ আলিঙ্গন করিয়া রহিল।

অসীম কিন্তু সে কথায় কাণ না দিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিল, "হাঁ, তোর জন্যেই যত কিছু। একটা চরিত্রহীন লম্পট মাতাল বাইরে হাঙ্গাম বাধিয়ে এসে ঘরের বুকের ভেতর রাত্তদিন যাওয়া আসা করবে—আর সেই বাড়ীর ভেতরে থাকবে আমার বোন—এ হতেই পারে না। এই সে দিন তোকেই অপমান করতে ছাড়েনি সে"—

হিরণী তাহার ভ্রাতৃজায়ার অভিমানাহত ছলছল নয়ন দুইটির দিকে চাহিয়া ভীত হইয়া তাড়াতাড়ি বলিল, "না, না, তখন ত বিভাসদার জ্ঞান ছিল না, দাদা"—

অসীম চীৎকার করিয়া বলিল, "জ্ঞান ছিল না? জ্ঞান ছিল না বললেই দায়ে খালাস? আমার বোনের হাত ধরে ও কোন্ সাহসে? সে দিন আমি বাড়ী থাকলে ওর রক্ত দর্শন করতুম—কোথাকার কে ও—না, ঢের সহ্য করেছি"—

উদ্গত অশ্রুবিন্দু বহু কষ্টে রুদ্ধ করিয়া বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে উষা বলিল, "বেশ, আমরা ভাইবোনেই এ বাড়ী ছেড়ে চ'লে যাচ্ছি এখনই—"

হিরণী দৃঢ় আলিঙ্গনে তাহাকে আবদ্ধ করিয়া অনুযোগের স্বরে বলিল, "তুমিও ক্ষেপে গিয়েছ, বৌদি? ছিঃ ছিঃ! দাদার না হয় মাথার ঠিক নেই। যাও, বাইরে যাও দাদা, যা করবার আমরা করবো, তুমি বাড়ীর ভেতরের কথায় থাকো কেন বল দিকি? যাও।" হিরণীর কণ্ঠে কঠোর কর্ত্তৃত্বের স্বর, নয়নে ভাস্বর দৃষ্টি!

অসীম হতবুদ্ধি হইয়া দাঁড়াইয়া উঠিয়া মৃদুকণ্ঠে বলিল, "তা যাচ্ছি, আমি ত ভেতরের কথায় থাকতে চাইনে। তবে যাবার সময় একটা কথা ব'লে যেতে চাই,—যত শীগ্‌গির হোক, এর একটা বিহিত না হ'লে আমিই বাড়ী ছেড়ে চ'লে যাব।"

অসীম কক্ষ ত্যাগ করিতেছে, এমন সময়ে উষা ক্রোধ-কম্পিতস্বরে ব্যঙ্গোক্তি করিল, "একলাই যাবে বাড়ী ছেড়ে, সঙ্গে কাউকে নিয়ে যাবে না?—যাদের সঙ্গ নইলে আজ-কাল দিন চলে না!—"

অসীমের মাথায় আগুন জ্বলিয়া উঠিল, থমকিয়া দাঁড়াইয়া দৃপ্তকণ্ঠে বলিল, "নিশ্চয়ই! নিশ্চয়ই নিয়ে যাব। যাকে খুশী তাকে নিয়ে যাব, তাতে তোমার শুভেন্দু বাবু বা তুমি পরামর্শ এঁটে কিছু করতে পারবে না।"

রাগে জ্ঞানশূন্য হইয়া অসীম নিমেষে বাহিরে চলিয়া গেল।

উষা ক্ষণকাল স্তম্ভিত হইয়া থাকিবার পর ননদীর কাঁধে মাথা রাখিয়া খুব খানিকটা ফুঁপাইয়া কাঁদিল। হিরণীও সস্নেহে তাহার মাথাটা বুকের মধ্যে টানিয়া লইল—যেন সে-ই সংসারের গৃহিণীরূপে সংসারের শান্তিরক্ষার জন্য দায়ী, সকলের দুঃখে তাপে সান্ত্বনাদায়িনী! স্নেহার্দ্রকণ্ঠে

বলিল, "ইস্, রাগ ত নয়, যেন দুর্ব্বাসা! সাত চড়ে কথা কয় না দাদা—"

উমা হিরণীর বাহুপাশ হইতে মুক্ত হইয়া বাষ্প-রুদ্ধকণ্ঠে বলিল, "আমি ত বলছি, তোমাদের জমিদারের ঘরে আমাদের মত ছোটলোকের স্থান নেই—আমরা আপনিই বিদায় হয়ে যাচ্ছি। যেখানেই থাকি, তাকে ত ভাসিয়ে দিতে পারিনি—মার পেটের ভাই ত!" উমা ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল।

হিরণী বলিল, "ছি বৌদি, এখনও রাগ পড়লো না? বিদায় নিলেই হ'ল? তোমার বাড়ী, তোমার ঘর, বিদায় দেবে কার কাছে শুনি?"

উমা তেমনি কাঠ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল, কর্কশকণ্ঠে বলিল, "রাগ? বাড়ীর দাসী-বাঁদীদেরও রাগ করবার, অভিমান করবার অধিকার আছে বটে—আমার আবার রাগ কি, অভিমান কি? আমার শুভেন্দু বাবু! বেশ, তাই। উনি যা ইচ্ছে তাই বলবেন, আর আমরা মেয়েমানুষ, আমাদের ত মান-অপমান নেই, রাগ-অভিমান নেই!"

হিরণী বলিল, "এ তোমার অন্যায়, বৌদি। দাদার মত মেয়েমানুষের মর্য্যাদা কে রাখে বল ত? রাগের মাথায় দাদা যাই বলুক, কিন্তু সিনেমার অ্যাকট্রেসদেরও কত সম্ভ্রম রেখে দাদা কথা কয় বল দিকি?"

উমা বলিল, "জানি। জানি বলেই বলছি, আমি তোমার দাদার কাছে সিনেমা-টকির অ্যাকট্রেসদের চেয়েও অধম—আমি থাক, তর্কের দরকার নেই। যাতে আজ থেকেই তোমাদের চোখের শূল এ বাড়ী মাড়াতে না পারে, তার ব্যবস্থা ক'রে দিচ্ছি। আচ্ছা বল ত হিরো, দাদা তোমার কি অপমান করেছিল? ও যখন নেশাভাঙ্গ করে, তখন ওতে আর পশুতে কোন তফাৎ থাকে কি? কিন্তু নেশার ঘোরে তোমার হাত ধরেছিল ব'লে কতবার কুকুরের মত তোমার পায়ের তলায় প'ড়ে মাপ চেয়েছে বল ত? এততেও রাগ পড়লো না তোমাদের? আর সে দিন যখন শুভেন্দু বাবু ষ্টুডিওতে তোমার হাত ধরেছিল, তখন তুমি কটমটিয়ে চেয়েছিলে বটে, কিন্তু তা নিয়ে ত এত হৈ-চৈ হয় নি।"

হিরণী মস্ত একটা আঘাত পাইল। তাহার প্রাণসমা ভ্রাতৃজায়ার এত দিন যে উদার মনের পরিচয় পাইয়া আসিয়াছে, এ সুরের সহিত তাহার ত খাপ খায় না! ক্ষণকাল নীরবে থাকিয়া সে ধীরে ধীরে বলিল, "শুভেন্দু বাবু যে মস্ত একটা ভাল লোক বা তিনি যে সে দিন মস্ত বড় একটা ভাল কায করেছিলেন, এ কথা ত একবারও বলা হয় নি। তবে সে হাত ধরায় আর এ হাত ধরায় আকাশ-পাতাল তফাৎ আছে। আর্টিষ্ট তাঁর আর্টে তন্ময় হয়ে অজ্ঞানতে একটা কায ক'রে ফেলতে পারেন—সেটা তাঁর অন্যমনস্ক হবার ফল হ'তে পারে। কিন্তু শুভেন্দু বাবুর সে দিকে যে মুহূর্ত্তে দৃষ্টি পড়েছে, সেই মুহূর্ত্তেই ভুল শুধরে নিতে এক দণ্ডও দেরী করেন নি।"

উমা বাধা দিয়ে পরুষ-কণ্ঠে বলিল, "আর এ লোকটা মাতাল, লম্পট, ইতর, ছোট লোক,—একে পুলিসে দেওয়াই উচিত ছিল। দিলে না কেন তোমরা?"

হিরণী বলিল, "দিতুম, কেবল একটা কথা ভেবে দিইনি।"

উমা বলিল, "কি, আমার ভাই, তাই?"

হিরণী বলিল, "কতকটা তাই বটে। শুভেন্দু বাবু দাদার বন্ধু হ'তে পারেন, কিন্তু আমাদের কে? আজ আছেন, কাল নেই—ওঁর দোষগুণ নিয়ে আমাদের মাথা ঘামাবার দরকারও নেই। কিন্তু বিভাসদার কথা আলাদা—সে আমাদের আপনার জন। তাকে নিয়ে যখন আমাদের ঘর করতে হবেই, তখন ওর দোষগুণ নিয়ে নাড়াচাড়া করবার দরকার আমাদের খুবই আছে। বিভাসদা হাত ধরার সঙ্গে সঙ্গে কি বলেছিল শুনেছ?"

উমা বলিল, "না, কি কথা?"

হিরণী বলিল, "সে কথা শুনলে কাণে আঙ্গুল দিতে হয়। আরও শুনেছ বোধ হয়, মধুপুরে সেই রেলের কুলীটার কি সর্ব্বনাশ ক'রে এসেছে ও? তার স্ত্রীর সন্ধান আজও মিলল না। কুলীটা বিভাসদার সন্ধানে সেই জন্যে মোরিয়া হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। বিভাসদার পক্ষে এটাও ত খুব গৌরবের কথা নয়। এর একটা বিহিত করার দরকার ত? দাদা রাগই করুক আর যা-ই করুক, আপনার জন মনে করেই ত ওকে সামলাবার কথা বলছে।"

উমা বলিল, "সেটা ভালভাবেও ত বলা যায়। কিন্তু তাকে কুকুর-বেরালের মত রাতদিন দূর-ছাই করা—কেন, আমি কি কেউ নই বাড়ীর? তুমিই বল না হিরো, আমিই

কি দাদাকে এ সব কাণ্ডের জন্যে মিষ্টিমুখ দিয়েছি কোন দিন? পুরুষমানুষ, অত খুঁটিয়ে দেখতে গেলে—"

হিরণী বাধা দিয়া বলিল, "পুরুষমানুষ? তাতেই কি মাথা কিনে রেখেছে? ঐ কথাটা আমি মোটেই বরদাস্ত করতে পারিনি তোমাদের। পুরুষমানুষ! কেন, আর একটা বিধাতা সৃষ্টি করেছে বুঝি ওদের?"

উষা বলিল, "না, তা বলিনি—তবে মেয়েমানুষের সুনাম-দুর্নাম বাতাসের ভর সয় না, পুরুষদের তা হয় না। এই ধর না শুভেন্দু বাবুর কথা। উনি কি খুব ভাল কায করছেন? সিনেমার অ্যাকট্রেসকে আর্টের পোজ শেখাচ্ছেন রাতদিন কি ভাবে? এতে ত কোন কথা হয় না!"

হিরণী ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া গম্ভীরভাবে বলিল, "আর যে যা বলে বলুক ওঁর সম্বন্ধে, তুমি ও কথা ব'ল না, বৌদি। তোমার জন্যে উনি কি না করেছেন বল দিকি!"

উষা বলিল, "তা ত আমি অস্বীকার করছিনি, ভাই। কিন্তু তুই-ই বল না, উনি অবিবাহিত—ওঁর মত বয়সের লোকের রাতদিন একটা যোমত্ত বয়সী অ্যাকট্রেসের সঙ্গে মেলামেশাটা কি খুবই ভাল দেখায়?"

হিরণী স্তম্ভিত হইল। অন্ধ দাদুয়েহ তাহার উদারমনা দাতৃজায়াকে কত নিম্নস্তরে নামাইয়া দিয়াছে! সে গম্ভীরকণ্ঠে বলিল, "এই খানিক আগে তুমিই চামেলীর কত প্রশংসা করছিলে। খারাপ আকরে জন্মেছে, এই তার দোষ, নইলে তার ভাল হবার যে আগ্রহ, তাতে সকলেরই ওকে হাত বাড়িয়ে ভালর স্তরে টেনে তুলে নেওয়া উচিত নয় কি? অথচ ওকে নিয়ে তুমি শুভেন্দু বাবুর সম্বন্ধে কি কুৎসিত ইঙ্গিতই না করলে! এইমাত্র দাদাকেও তুমি ঐ ভাবের বিশ্রী কথা বলেছ। তোমার হয়েছে কি? বিভাসদাই কি তোমার সব, আর কেউ কিছু নয়? দেখ, যেখানে যথার্থ শ্রদ্ধা বা ভালবাসা, সেখানে অবিশ্বাসের বা সন্দেহের স্থান হয় না।"

উষা রুষ্টস্বরে বলিল, "আমিই সন্দেহ করছি, অবিশ্বাস করছি? মন্দ নয়।"

হিরণী বলিল, "যাক্ গে বৌদি, ও সব পরের কথা নিয়ে তর্কাতর্কির দরকার নেই। বলছিলুম কি, বিভাসদার সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা করবে?"

উষা চীৎকার করিয়া বলিল, "করবো আবার কি? এ বাড়ীতে আর ওকে ঢুকতে দেব না,—যেখানে খুসী চ'লে যাক ও।"

হিরণী বলিল, "ওটা ত হ'ল রাগের কথা, সত্যিই ত আর তা করতে পারবে না। তার চেয়ে ওকে দাদার কথামত ফিল্ম কোম্পানীর কাযে ঢুকিয়ে দাও না—এ রকম অ্যামেচর না, রীতিমত লেগে থাকতে হবে ওকে এতে। তা হ'লে রাতদিন সাবধানে চোখে চোখে থাকবে সকলের। সত্যিই মধুপুরে কোন কাণ্ড বাধিয়ে আসুক না আসুক, কুলীটা যখন অমন ক'রে পেছু নিয়েছে, তখন কোন্ দিন কি একটা ক'রে না বসে!"

উষা বলিল, "এ তোমাদের বাপু অন্যায় কথা! কোথায় কোন্ ছোট লোক কুলীর বৌ পালালো, তার জন্যে দায়ী হ'ল দাদা! তোমাদের কি একটু বিচার-বিবেচনা নেই? কায নেই বাপু, ওকে আজই দিচ্ছি তাড়িয়ে বাড়ী থেকে!"

হিরণী ক্ষুণ্ণ হইল। এত করিয়া বুঝাইলেও যে বুঝিবে না, তাহার কাছে আর বাক্যব্যয় করা বৃথা! সে ত ভালই বলিয়াছিল। যাইবার সময় ক্ষুণ্ণমনে বলিয়া গেল, "যা ভাল বোঝ, কর, বৌদি। একটা কথা যাবার সময়ে ব'লে যাচ্ছি, যাই কর, বাইরের জঞ্জাল এনে সবের শান্তি নষ্ট কোরো না।" হিরণী চলিয়া গেল।

উষা গুম হইয়া বসিয়া রহিল, কথার জবাব দিল না, তাহাকে যাইতে নিষেধও করিল না। সে ভাবিতেছিল, তাহার দিকটা ত কেহ দেখিল না! তাহার সহোদর ভ্রাতা, এ বাড়ীতে তাহার কথার কোন মূল্য নাই, আর কোথাকার একটা কুলী—তাহার কথাই হইল বেদবাক্য? কি অবিচার!

"হ্যালো! ইউ ডিয়ার—তুমি এখানে? তোমাকেই খুঁজছিলুম যে আমি রাণী,—গোটা ত্রিশ টাকা—"

মুখের কথা মুখেই রহিয়া গেল, মিঃ দত্ত সাহেবকে আর অধিক অগ্রসর হইতে হইল না। ক্রুদ্ধা ব্যাঘ্রীর মত গর্জ্জন করিয়া উষারাণী বলিল, "তোমার লজ্জা করে না মুখ দেখাতে—এসেছো আবার হাত পাততে? যাও, দূর হয়ে যাও—পুরুষ-মানুষ, রোজগার ক'রে আনতে পার না?" রুদ্ধ ক্রোধ ও অভিমানের বহ্নির জ্বালা সমস্তটাই গিয়া

পড়িল অতর্কিত অপ্রত্যাশিতভাবে বেচারী বিভাসচন্দ্রের উপরে!

বিভাসচন্দ্র থতমত খাইয়া ফেল-ফেল-নেত্রে ভগিনীর মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল। এ মূর্ত্তি ত সে কখনও দেখে নাই। কিন্তু মুহূর্ত্তমাত্র, তাহার পরেই সে স্বভাবসিদ্ধ তরলতার সহিত হাসিয়া বলিল, "ওঃ! এ টিফ বিটুইন কর্ত্তা-গিন্নী? তার জন্মে মুখ ভার করতে নেই, বোন!" সঙ্গে সঙ্গে সে ভগিনীর হাতের উল্টা পিঠটা আস্তে আস্তে চাপড়াইতে লাগিল।

এত দুঃখেও উষা হাসিয়া ফেলিল। এ লোককে লইয়া সে কি করিবে? যথাসম্ভব গাম্ভীর্য্য রক্ষা করিয়া সে বলিল, "দেখ, একটা পাতরকে বোঝানও বরং সহজ, কিন্তু তোমায় নিয়ে আমি আর পেরে উঠিনি। মধুপুরে কি কীর্ত্তি ক'রে এসেছ বল দিকি? ছোট লোক কুলী—সেও তোমার নামে নালিস করে? তাও শুনতে হবে? ছিঃ ছিঃ!"

বিভাসচন্দ্র যেন আকাশ হইতে পড়িল, এই ভাব দেখাইয়া বলিল, "মধুপুর? কুলী? হাউ ফানি!"

উষা সক্রোধে বলিল, "দেখ, ন্যাকামি কোরো না বলছি, যা বলি, শোন। বলছিলে না, অলিম্পিক হোটেলে বোর্ডিং লজিংএর ব্যবস্থা ভাল? আজই সেখানে থাকবার ব্যবস্থা ক'রে এসো শুভেন্দু বাবুর সঙ্গে গিয়ে, টাকার জন্মে ভেবো না। এখানে তোমার থাকা হবে না। যা করেছ করেছ, ভালয় ভালয় কুলীটার সঙ্গে মিট-মাট ক'রে ফেলো।"

চক্ষু আকর্ণ বিস্তৃত করিয়া বিভাসচন্দ্র বলিল, "হোটেল? অফুলি সরি, যদি কিছু অফেন্স দিয়ে থাকি, উষা। কিন্তু হোটেল? বুঝতে ত পারছি না কিছু।"

উষা চীৎকার করিয়া বলিল, "বুঝেও কাম নেই কিছু তোমার। যা বলছি কর, নইলে কোন সম্পর্ক নেই তোমার সঙ্গে আমার—"

গর্ব্বিতা রাজহংসীর ন্যায় পাদবিক্ষেপ করিয়া উষা চলিয়া গেল।

বিভাসচন্দ্র ক্ষণকাল বিমূঢ়ের ন্যায় বসিয়া থাকিয়া, দুই হাত উল্টাইয়া বলিল, "হোপলেস! হোয়াট এ টপসি-টারভি ওয়ার্লড ইট ইজ। নাঃ, মিস হিরণই এই স্টর্মে সেফ হারবার!"

[ক্রমশঃ।

শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার বসু (সাহিত্যরত্ন)।

তুমি মোরে ভালবাস

তুমি মোরে ভালবাস এই জানি সার,
আর কিছু প্রয়োজন নাহি জানিবার!
জীবনের যত কিছু জানা আছে মোর:-
কল্পনার স্বপ্নরাশি, চক্ষে ঘুম-ঘোর,

অতল সাগর-তলে পাতালে গহ্বরে,
অলঙ্ঘ্য অচল ওই হিমাচল পরে,
চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ তারা ত্রিদিব-আলয়ে,
অথবা গন্ধর্ব্ব যক্ষ রক্ষের নিলয়ে,

যত কিছু এ বিশ্বে মোর জানিবার আছে,
কোন-কিছু তুল্য নয় এ জানার কাছে।
এ বিশ্বাস দেয় মোরে আশা, শান্তি, বল,
কর্ম্মক্ষেত্রে নবোদ্যম, চিত্ত অবিচল।

অবিশ্বাসী বাণী সব মূক হয়ে যাক,
তুমি মোরে ভালবাস এই জানা থাক!

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মণ্ডল

বিজ্ঞান-জগৎ

পুলিস-অশ্বে আলোকদীপ্ত রেকাব

যানবাহন ও পথচারী নিয়ন্ত্রণ উপলক্ষে আমষ্টারডামএ অশ্বারোহী পুলিস-প্রহরীর একটি রেকাবে আলোক জ্বালিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। এই আলোকাধার ক্ষুদ্র, সুতরাং অশ্ব অথবা অশ্বারোহী পুলিসের ইহাতে কোনও অসুবিধা হয় না। আলোকাধার হইতে সমুজ্জ্বল লাল আলো নির্গত হইতে থাকে। তাহা দেখিয়া মোটর-চালকরা

অশ্বারোহী পুলিসের রেকাবে প্রদীপ্ত আলোক

সতর্কভাবে মোটর চালনা করিয়া থাকে। . একটি ছোট ব্যাটারী হইতে আলোকপ্রবাহ সরবরাহ হইয়া থাকে।

দ্রুতগামী যাত্রিবাহী বিমান

জার্ম্মাণীতে সম্প্রতি যাত্রিবাহী অতি দ্রুতগামী বিমান নির্ম্মিত হইয়াছে। এই বিমানে যুগ্ম এঞ্জিন সংযুক্ত আছে। এই নব-নির্ম্মিত দ্রুতগামী যাত্রি-বিমানে দশ জন যাত্রী ও দুই জন পোতচালকের স্থান আছে। ঘণ্টায় ২ শত ৫০ মাইল গতিতে এই বিমান ধাবিত হইয়া থাকে
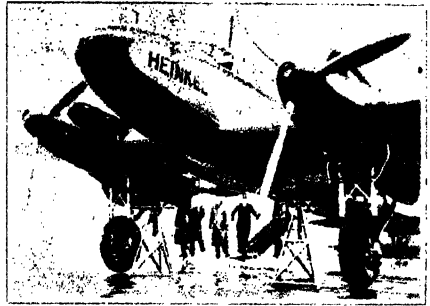
দ্রুতগামী যাত্রিবাহী বিমান

সমুদ্রতীর-রক্ষক বিমানপোত

বৃটিশ সমুদ্রতীর রক্ষার জন্য বৃটেনের রয়াল বিমান বিভাগ কতিপয় যুগ্ম মোটর-পরিচালিত বিমান নির্ম্মাণ করিতেছেন। কেবিনের

সমুদ্রতীর-রক্ষক বিমানপোত

পশ্চাতে যেখান হইতে কামানের গুলী নিক্ষিপ্ত করা হইবে, সেখানে কাচনির্ম্মিত একটি পর্য্যবেক্ষণ-কক্ষ নির্ম্মিত হইবে।

বাষ্পচালিত দ্বিচক্রযান

মিয়ামিতে বাষ্প-চালিত দ্বিচক্রযান দেখা দিয়াছে। ইহা নিঃশব্দে পথ অতিক্রম করে। শুধু প্রথম চলিবার সময় সামান্য শব্দ হইয়া থাকে। ঘণ্টায় উহা ৫০ মাইল পথ অতিক্রম করে। এক গ্যালন গ্যাসোলিন বা কেরোসিনে ৫৫ মাইল পথ অতিক্রম করা
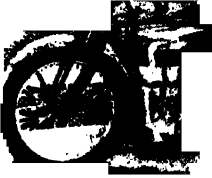
বাষ্পচালিত দ্বিচক্রযান

যায়। দুই চোঙ্গবিশিষ্ট ষ্টিম এঞ্জিনের দ্বারা উহা চালিত হয়। ইহাতে জলের ট্যাঙ্ক, তেলের ট্যাঙ্ক প্রভৃতি আছে। এঞ্জিন যখন ঠাণ্ডা অবস্থায় থাকে, তখন উহাকে গরম করিতে ২০ মিনিট লাগে। একটি পেডালে চাপ দিলেই গাড়ী চলিতে থাকে। পেডাল হইতে পা সরাইয়া লইলেই গাড়ী থামিয়া যায়!

ডাঙ্গায় সন্তরণ-ভঙ্গী শিক্ষার ব্যবস্থা

জলে না নামিয়াও সাঁতার শিখিতে পারা যায়, বিংশ শতাব্দীতে সে ব্যবস্থাও হইয়াছে। যে চিত্রখানি এখানে প্রদত্ত হইল, তাহাতে
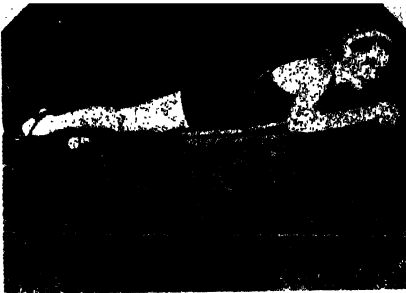
জলে না নামিয়াও সাঁতার শিক্ষা

দেখা যাইবে যে, সন্তরণ-শিক্ষার্থিনী তরুণী একটি যন্ত্রের উপর উপুড় হইয়া রহিয়াছেন। তিনি হাত নাড়িলেই যে পাটাতনের উপর তিনি শায়িতা এবং চরণযুগল যাহার উপর রক্ষিত, তাহা সম্মুখে ও পশ্চাতে আন্দোলিত হয়। এইভাবে হাত-পা নাড়িয়া তিনি সাঁতার শিখিতে পারেন।

মাছের খড়্গ হইতে তরবারি

একজাতীয় সামুদ্রিক মৎস্য আছে, তাহাদের শিরোদেশে খড়্গাকার বস্তু জন্মিয়া থাকে। ম্যাসাচুসেটসের প্রভিন্‌টাউন নামক স্থানের জোসেফ আগনা নামক এক জন যুবক উক্ত মৎস্যের খড়্গ লইয়া তরবারি নির্মাণে অবহিত হইয়াছেন। উক্ত খড়্গে শাণ দিয়া,

মৎস্য-খড়্গ-নির্ম্মিত সুদৃশ্য তরবারি

পালিস করিয়া, বর্ণরঞ্জিত কাঠের হাতল দিয়া তিনি এমন সুদৃশ্য করেন যে, উহা মৎস্য-খড়্গ হইতে নির্ম্মিত, তাহা মনে হয় না। এইরূপ একখানি তরবারি তিনি প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টকে উপহার দিয়াছেন।

চলমান আফিস

লস্ এঞ্জেলেসের এক জন একাউণ্টাণ্ট তাঁহার মক্কেলদিগের সুবিধার জন্য চলমান কার্য্যালয় রাখিয়াছেন। একটি মোটর-চালিত ট্রাকের পশ্চাৎদিকে তাঁহার তিনটি কার্য্যালয় অবস্থিত। আপিসে ডেস্ক,
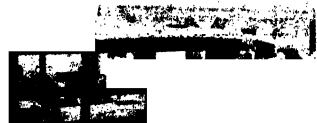
চলমান আপিস

টাইপরাইটার, গণনা করিবার যন্ত্র, বুককিপিংএর যাবতীয় বস্তু এবং আরও নানাপ্রকার দ্রব্যাদি আছে। মক্কেলের প্রয়োজন অনুসারে তিনি এই চলমান আফিস লইয়া তাঁহার কাছে উপস্থিত হন। এগার বৎসর ধরিয়া তিনি এইভাবে হিসাবকার্য্য সম্পাদন করিয়া আসিতেছেন।

চন্দ্র-ঘটিকা

বার্লিন সহরের উপকণ্ঠে একটি গির্জ্জায় এক অপূর্ব্ব গোলাকার যন্ত্র সংযোজিত হইয়াছে। উহা গোলাকার, সুবৃহৎ এবং আলোকিত। ইহাতে ছায়াযুক্ত বিভাগ আছে। মাসের কোন্ কোন্ সময়ে রাত্রির অবস্থা কিরূপ হইবে, ইহা তাহারই নির্দ্দেশক। ঐ
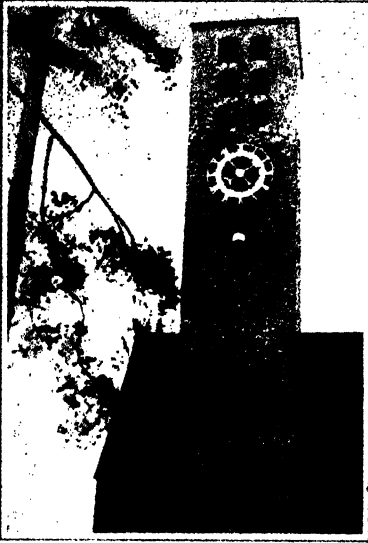
চন্দ্র-নির্দ্দেশক ঘটিকা

গোলকের উপরিভাগে একটি বৃহত্তর ঘটিকাযন্ত্র সংস্থাপিত। সেই ঘটিকাযন্ত্র সময়-নির্দ্দেশের জন্য। প্রতিপদ হইতে আরম্ভ করিয়া পূর্ণিমা এবং অমাবস্যা পর্য্যন্ত চন্দ্র যে দিন যে সময়ে যে ভাবে আকাশে উদিত হইবে, তাহা এই আলোকিত গোলক দেখিয়া বুঝিতে পারা যাইবে।

নূতন ধরণের বাদ্যযন্ত্র

এই বাদ্যযন্ত্রের নাম "সলফিয়া"। বায়ুস্পন্দনে এই যন্ত্র বাজিয়া উঠে। পিয়ানোর ন্যায় ইহাতে "চাবী" আছে। রবারের নল সংযোগে, নিশ্বাস সাহায্যে এই যন্ত্র হইতে মধুর সুরতরঙ্গ জাগিয়া উঠিবে। অবশ্য হারমোনিয়ামের ন্যায় "বেলো" করিলেও চলে।

নূতন ধরণের বাদ্যযন্ত্র

হানস্ কউলবারসচ এই যন্ত্রের উদ্ভাবয়িতা। ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের জন্য এই "সলফিয়া" পরিকল্পিত। ইহার মূল্য অত্যন্ত অল্প।

মোটর-চালিত নখ পালিশ করা যন্ত্র

সুন্দরীদিগের নখের প্রসাধন এ যুগে অপরিহার্য্য অঙ্গ। এ যাবৎ নানাপ্রকার নখ-প্রসাধক যন্ত্র উদ্ভাবিত হইয়াছে সত্য; কিন্তু তাহাও পর্য্যাপ্ত নহে, দেখিয়া জনৈক বৈজ্ঞানিক মোটর বা বিদ্যুৎচালিত

নখ-প্রসাধক বৈদ্যুতিক যন্ত্র

নখ প্রসাধন যন্ত্র বাজারে বাহির করিয়াছেন। উহা যেন ইন্দ্রজালের ন্যায় নখের উপর দিয়া স্বকার্য্য সাধন করিয়া যায়।

বিজ্ঞাপনের কৌশল

জনৈক স্পেনদেশীয় বণিক কার্ডবোর্ডের সাহায্যে একটা পূর্ণকায় ষণ্ডের মূর্ত্তি তৈয়ার করিয়া তাঁহার দ্বিচক্রযানের এক পার্শ্বে তাহাকে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। সেই ষণ্ডের দেহে তিনি কি কি জিনিষ বিক্রয় করিয়া থাকেন, তাহার বিজ্ঞাপন দিয়া, রাজপথের ভিতর দিয়া গাড়ী চালাইয়া যান। ইহাতে তাঁহার কাযের খুবই সুবিধা হইয়া থাকে।

বিজ্ঞাপনের কৌশল

তূলাসঞ্জাত মেঘ-সৃষ্টি

মেঘ-সমুদ্রে দুর্গ নির্ম্মাণও এখন আর কল্পনা-জগতের কথা বলা
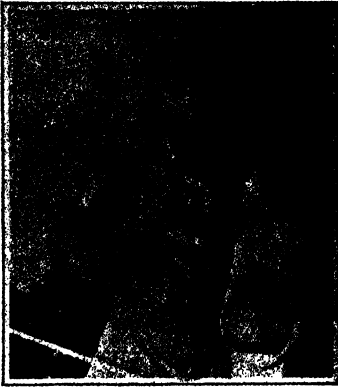
চলচ্চিত্রের জন্য শিল্পী তূলার মেঘ রচনা করিতেছেন

চলে না। কারণ, চলচ্চিত্রে শিল্পীরা পেঁজা তূলার সাহায্যে মেঘের সৃষ্টি পর্য্যন্ত করিতেছেন। পেঁজা তূলাকে মেঘের আকার দিয়া ধীরে ধীরে ক্যামেরার সম্মুখ দিয়া চালাইয়া দিলে দেখিতে কোনও পার্থক্য বুঝাইবে না। সম্প্রতি কোনও চলচ্চিত্রে এইভাবে মেঘ দেখান হইয়াছে।

ক্যামেরায় আলাস্কার সূর্য্যের দৃশ্য

ডিসেম্বর মাসে আলাস্কার সূর্য্যদেব আকাশে ৪ ঘণ্টাকাল আলো দান করিয়া থাকেন। সেই সময় ক্যামেরার সাহায্যে সূর্য্যের

আলাস্কায় সূর্য্যের দৃশ্য

আলোকচিত্র গৃহীত হইয়াছে। সেখানে বেলা ৯টা বাজিয়া ৫২ মিনিটে সূর্য্যদেব আকাশপ্রান্তে দেখা দেন। বেলা ২টা বাজিয়া ৮ মিনিটে সূর্য্যদেব অস্ত যান। প্রতি ১৫ মিনিট অন্তর ২২শে ডিসেম্বর (আলাস্কায় সর্ব্বাপেক্ষা ছোট দিন) আলোকচিত্র গৃহীত হইতে থাকে। প্রথমেই দেখা যায় যে, রেইজ পর্বতের পশ্চাৎ হইতে সূর্য্যদেব উঁকি দিতেছেন। তার পর ক্রমে ক্রমে আকাশপথে উদিত হইয়া দিক্‌চক্রবালে অন্তর্হিত হন। সূর্য্যের আকার কখন্ কিরূপ দেখায়, এই চিত্রে তাহা দেখিতে পাওয়া যাইবে।

বর্ত্তমান আগ্নেয়াস্ত্রের পিতামহ ধনুঃশর

আধুনিক কলের বন্দুক উদ্ভাবিত হইবার তিন শত বৎসর পূর্ব্বে চীনা শিকারী এবং যোদ্ধারা কার্ম্মুক হইতে পুনঃ পুনঃ যেন ফুৎকার সাহায্যে শর নিক্ষেপ করিতে পারিত। লস্ এঞ্জেলেসের যাদুঘরে এই জাতীয় প্রাচীন প্রহরণ রক্ষিত হইয়াছে। এই কার্ম্মুক কালো কাঠ হইতে নির্ম্মিত, উহা ৪ ফুট দীর্ঘ। এই অস্ত্রের উপরিভাগে বিশটি শরপূর্ণ তূণ সন্নিবিষ্ট। একটি শর নিক্ষিপ্ত হইবামাত্র আর একটি শর শূন্য স্থান আপনা হইতে অধিকার

করিবে, এমনই ব্যবস্থা ইহাতে আছে। এই জাতীয় কার্ম্মুকই বর্ত্তমান আগ্নেয়াস্ত্রের পিতামহ।

বর্ত্তমান আগ্নেয়াস্ত্রের পিতামহ ধনুঃশর

দূরবীক্ষণের অতিকায় মধুচক্র-কাচ

মাউণ্ট পালোমার পর্য্যবেক্ষণাগারে যে অতিকায় দূরবীক্ষণ যন্ত্র স্থাপিত হইবে, তাহার কাচের আয়তন ২ শত ইঞ্চ। ঐ কাচকে একটি ইস্পাতের বেষ্টনীর দ্বারা সুরক্ষিত করা হইয়াছে। এই

অতিকায় মধুচক্রবিশিষ্ট দূরবীক্ষণের কাচ

কাচের চাকতির ওজন ২০ টন, অর্থাৎ ৫ শত ৫০ মণ, এত বড় কাচ আজ পর্য্যন্ত নির্ম্মিত হয় নাই। কাচখানি মধুচক্রের ন্যায় দেখিতে।

সিংহের আনন্দক্রীড়া

ক্যালিফোর্ণিয়ার কোনও সিংহপালকের আড্ডায় সিংহশাবকদিগকে আনন্দ দিবার জন্য আবর্ত্তনশীল রোলারের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

সিংহের আনন্দ-ক্রীড়া

যখনই একটা সিংহ লম্ফ দিয়া এই রোলারের উপরে উঠে, অমনই প্রকাণ্ড চাকা আবর্ত্তিত হইতে থাকে। দেখাদেখি অন্য সিংহ উহার মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়িলে সেও মহানন্দে আবর্ত্তনজনিত সুখ অনুভব করিয়া থাকে।

দুঃসাহসিক ক্রীড়া

হামবার্গের চারিটি হস্‌টুমাই ভ্রাতা মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের সার্কাসে
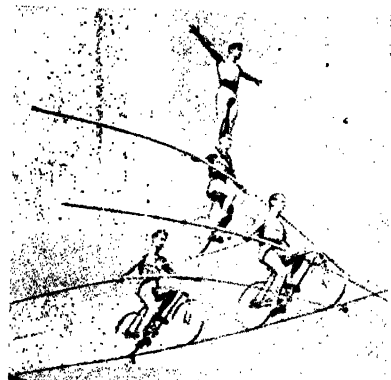
দুঃসাহসিক ক্রীড়া

অদ্ভুত ক্রীড়া দেখাইতেছেন। মাটী হইতে ৯০ ফুট উর্দ্ধে তারের উপর দিয়া দ্বিচক্রযানে তাঁহারা পিরামীডের খেলা দেখাইতেছেন। ভারী ও দীর্ঘ কাঠের দণ্ড সাহায্যে তাঁহারা ভারসাম্য রক্ষা করিয়া থাকেন।

বিদ্যুৎচালিত অশ্ব

বিদ্যুৎচালিত অশ্বযন্ত্রে আরোহণ করিয়া আরোহণ-কৌশল শিক্ষার ব্যবস্থা হইয়াছে। ইহাতে আরোহণ করিয়া বালকরাই শুধু

বিদ্যুৎচালিত অশ্ব

আনন্দ অনুভব করে না, বয়স্কগণও অশ্বারোহণ-কৌশল শিক্ষা করিতে পারে, বল্গাকে আকর্ষণ করিবামাত্র অশ্ব যে কোনও পাঁচ প্রকার চলনভঙ্গী দেখাইবে—মৃদু কদমে চলা হইতে আরম্ভ করিয়া দ্রুতধাবন পর্য্যন্ত।

মরুভূমিতে টাউনহল, ডাকঘর

মোজাভা মরুভূমিতে, স্যালটন সমুদ্রের ৫০ মাইল উত্তরপশ্চিমে একটি ১৫ ফুট অট্টালিকায় টাউনহল অবস্থিত। উপরে জলের ট্যাঙ্ক আছে এবং উক্ত অট্টালিকার একাংশে ডাকঘরও বিদ্যমান। মরুভূমির মধ্যস্থ অধিবাসীর সংখ্যা ১ শত জনেরও কম।

মরুভূমিতে টাউনহল, ডাকঘর

দ্রুতগামী রণবিমান ও ট্যাঙ্কগাড়ী

ওয়ালটার জে, ক্রিষ্টি দ্রুতগামী বিমান ও ট্যাঙ্ক একসঙ্গে নির্ম্মাণ করিয়াছেন। সামরিক প্রয়োজনে ট্যাঙ্ক বিমানে সংযুক্ত হইয়া নির্দ্দিষ্ট স্থানে নীত হইবে। ভূমিতে বিমান অবতীর্ণ হইবামাত্র, ট্যাঙ্কগাড়ীকে খুলিয়া লইয়া স্বাধীনভাবে গন্তব্য স্থান অভিমুখে ছাড়িয়া দেওয়া হইবে। এই ট্যাঙ্কগাড়ী ঘণ্টায় ৬৫ মাইল পথ বন্ধুর স্থান দিয়াও অতিক্রম করিতে পারিবে। সরল পথে উহা

দ্রুতগামী
রণবিমান ও ট্যাঙ্কগাড়ী

সহরের ঘণ্টায় ৯৫ মাইল পথ অতিক্রম করিবে। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র এইভাবে সমরায়োজন করিতেছেন।
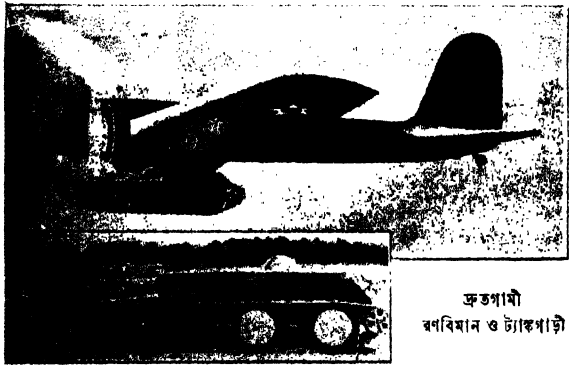
স্বয়ংসিদ্ধা

চতুর্থ উল্লাস

১

আসরে বর আসিয়া বসিলে তাহার সম্বন্ধে যে সকল অপ্রীতিকর কথা উঠে এবং বাসরে বরের মুখে একটি কথাও না শুনিয়া মেয়ের দল যে সব কথা রটায়, সে সমস্তই চণ্ডীর বাবা, মা ও পরিজনদের কাণে যথাযথভাবেই উঠিয়াছিল। এই অপ্রত্যাশিত সংযোগ তাঁহাদিগকে যেমন আনন্দে অভিভূত করিয়া তুলিয়াছিল, বরের সম্বন্ধে নানা কণ্ঠের অপ্রিয় মন্তব্য তেমনই নিষ্ঠুর আঘাতে তাঁহাদের মনের উল্লাস মুসড়াইয়া দিয়াছিল। কিন্তু হরিনারায়ণ বাবুকে এ সম্বন্ধে কোনও কথা কেহ জিজ্ঞাসা করিতে পারে নাই, কিম্বা তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া বরের সম্বন্ধে কোনও অপ্রিয় মন্তব্য প্রকাশ করিবার মত সাহসটুকুও কাহারও দেখা যায় নাই।

বিবাহের পরদিন প্রত্যূষে পূজার দালানে পরিজনরা সমবেত হইয়াছেন। বরের বিষয় লইয়াই তুমুল আলোচনা চলিয়াছে। বাসর হইতে যে সব তরুণী মুখ ভারী করিয়া ফিরিয়াছিল, বাসর-জাগানীর দক্ষিণা আদায়ের জন্য তাহারাও আসিয়া দল ভারী করিয়াছে। এক জন মন্তব্য প্রকাশ করিল,—এ যেন ঠিক সেই—ওঠ ছুঁড়ি, তোর বে—হ'ল! খোঁজ-খবর নেই, জিজ্ঞেসাবাদ নেই, অমনি হয়ে গেল পাকাপাকি কথা,—হ'লই বা বড় লোক?

করালী বাবু রুক্ষস্বরে কহিলেন,—এ সব কথা এখন কেন? তোমরা কি এই নিয়ে একটা কেলেঙ্কারী বাধাতে চাও? ভবিতব্যের বিধান কে কবে খণ্ডন করতে পেরেছে শুনি!

এই সময় প্রাতঃকৃত্যাদি সারিয়া চণ্ডী ধীরে ধীরে দালানের ভিতরে আসিয়া দাঁড়াইল। সকলের মুখের কথা একবারে থামিয়া গেল, প্রত্যেকেরই আগ্রহপূর্ণ দৃষ্টি পড়িল চণ্ডীর মুখের উপর। কিন্তু সে মুখে বিষাদের কোনও চিহ্ন নাই, চিন্তার একটিও রেখা তাহার সেই দৃপ্ত মুখখানির উপর পড়িয়া এতটুকু বিকৃত করে নাই, এমন একটা অপরিসীম তৃপ্তি ও প্রসন্ন হাসির দীপ্তিতে চণ্ডীর মুখখানি ভরিয়া উঠিয়াছিল—বিয়ের পরদিন সেটুকু কোনও মেয়ের মুখেই দেখিবার আশা করা যায় না।

মেয়ের প্রকৃতি পিতামাতার অবিদিত নয়; তাঁহারা উভয়েই চণ্ডীর মুখ দেখিয়া স্বোয়াস্তির নিশ্বাস ফেলিলেন। বুঝিলেন, বাসরে কোনও অনর্থ বাধে নাই, আর-সকলে হাল ছাড়িয়া দিয়া চলিয়া আসিলেও, তাঁহাদের মেয়ে জামাইকে যাচাই করিতে অবহেলা করে নাই; নিশ্চয়ই বর চণ্ডীর পছন্দ হইয়াছে, নতুবা কখনই সে হাসিমুখে এখানে আসিয়া দাঁড়াইত না।

তখন নানামুখে জিজ্ঞাসাবাদের বন্যা ছুটিল,—বর কেমন হয়েছে? কথাবার্ত্তা কইতে পারে কি না? বাসরে বসেও কি নেশা চালিয়েছে? তোর মুখে যে বড় এমন হাসি?—এমনই নানা প্রশ্ন, অপ্রিয় প্রসঙ্গ—নানা বয়সের প্রতিবেশিনী ও তরুণী বাসরসঙ্গিনীদের মুখে।

চণ্ডীর মুখে তখনও হাসি, রাগ বা বিরক্তির কোন চিহ্নই দেখা দিল না। সে হাসিমুখেই এক কথায় সকলের কথার উত্তর দিল,—ভগবান্‌কে বিশ্বাস ক'রে যে যা চায়, তিনি তাই তাকে দেন; আমার ত নালিশ করবার কিছুই নেই, তবে এ সব কথা কেন?

প্রশ্নকারিণীদের কৌতুকোজ্জ্বল মুখগুলি একবারে ছাইয়ের মত বিবর্ণ হইয়া গেল ; বর্ষীয়সী প্রতিবেশিনীরা বিস্ময়ে নিজ নিজ মুখ বিকৃত করিয়া পরস্পর অর্থপূর্ণ দৃষ্টি-বিনিময় করিলেন। আমাদের পূর্ব্বপরিচিতা মিত্রগৃহিণী কৌতূহলী হইয়া কহিলেন,—তবে যে এরা বলছিল, জামাই যেন একটি জন্তু, কারুর সঙ্গে কথাটি পর্য্যন্ত বলেনি,—হাঁও নয়, হুঁও নয়—

কথাটায় মনে মনে আঘাত পাইলেও, সে ভাব কাটাইয়া চণ্ডী একটু কঠিন হইয়া উত্তর দিল,—হাঁ, ওরা তাঁকে বুনো জন্তু ভেবেই তাঁর সঙ্গে অমন অভদ্র ব্যবহার করেছিল, কিন্তু তিনি মানুষ বলেই চুপ ক'রে ছিলেন।

এক তরুণী ঝঙ্কার দিয়া উঠিল,—তুমি ধন্যি মেয়ে বাবা!

চণ্ডী হাসিয়া উত্তর দিল,—আমিও ত চুপ করেই বসেছিলুম ; নাচিওনি, বেহায়াপনাও করিনি কিছু ; ঠোক্কর দিলে শুনব কেন ?

আর একটি মেয়ে মুখখানি মচকাইয়া কহিল,—বাসরে গিয়ে ব'সে ব'সে কেউ ইষ্টমন্তর জপ করে না।

চণ্ডী কহিল,—তা ব'লে অমন 'হুল্লোড়' কেউ করে না তোদের মত।

মিত্রগৃহিণী চণ্ডীর এই কথায় সায় দিয়া কহিলেন,—তা মিছে নয়, তোমরা বাছা দিন দিন ভারী বেহায়া হয়ে উঠছ, এ কিন্তু ভাল নয়। এ সব বিষয়ে চণ্ডীর কাছে তোমাদের শিক্ষা করবার ঢের আছে। হাঁ রে চণ্ডী, জামায়ের সঙ্গে কথাবার্ত্তা কিছু হয়েছে তোর ?

চণ্ডী কিছুমাত্র সঙ্কোচ না করিয়াই কহিল,—কেন হবে না ?

এক বর্ষীয়সী অমনই গণ্ডে হাতখানি বিচিত্র ভঙ্গীতে রাখিয়া বিস্ময়ের সুরে কহিলেন,—বাবা! শোন মেয়ের কথা! কালে কালে এ সব হ'ল কি ?

চণ্ডী ছেলেমানুষের মত আবদারের সুরে কহিল,—বা রে! তোমরা বিয়ে দিতে পারলে, তাতে দোষ হ'ল না; যত দোষ আমাদের ঐ নিয়ে কথা কইলেই! বেশ ত!

মিত্র-গৃহিণী মুখ টিপিয়া হাসিয়া প্রশ্ন করিলেন,—কি কথা তোর সঙ্গে হ'ল, বল্ না শুনি ?

চণ্ডী কহিল,—সে সব কথা এখন নাই বা শুনলে, পিসীমা।

পিসীমা কহিলেন,—নেশা-ভাঙ্গের কথা শুনতে পেলি কিছু ?

পিসীমার কথায় চণ্ডীর মুখে ক্লেশের চিহ্ন ফুটিয়া উঠিল ; কিন্তু তৎক্ষণাৎ সে ভাব গোপন করিয়া সহজ সুরেই উত্তর দিল, এ কথা আমাকে জিজ্ঞাসা না ক'রে, যাঁর ছেলে, তাঁকেই জিজ্ঞাসা করা উচিত। তা হ'লে এখনই মীমাংসা হয়ে যায়।

আবার সকলের মুখে বিস্ময়ের চিহ্ন,—প্রতিবেশিনীদের অধিকাংশেরই মনের আনন্দ পুনরায় বিষাদে রূপান্তরিত হইল। যাহারা প্রকৃতই এ বাড়ীর হিতার্থী, তাহাদের মনের আকাশ হইতে দুশ্চিন্তার একটা গভীর মেঘ সরিয়া গেল।

করালী বাবু কহিলেন,—এই জন্যই আমি কোন কথা কইনি, কাউকে কোন প্রশ্ন করিনি। চণ্ডীর মুখে না শুনে আমি এ কথায় কোনও কথা কইব না, এই ছিল আমার সঙ্কল্প। চণ্ডীকে দেখেই আমি বুঝেছি, ও সব মিছে কথা, কোনও ভিত্তিই ওর নেই।

চণ্ডী মনে মনে তখন হাসিতেছিল। অল্পবয়সে বাপ-মা পরিজন ছাড়িয়া মেয়েদের পরের ঘরে যাইতে হয়। যে সব মেয়ের বুদ্ধিশুদ্ধি থাকে, তাহারা বুদ্ধি খেলাইয়া হিসাব করিয়া কথা কয়। স্বামী ও শ্বশুরবাড়ীকে খাটো করিতে চায় না, বাপের বাড়ীর মর্য্যাদাটুকুও ছোট হইতে দেয় না। দাদামহাশয়ের কাছে ছেলেবেলা হইতেই চণ্ডী দুই কুলের মর্য্যাদা বজায় রাখিবার শিক্ষাটুকু যেমন পাইয়াছিল, চির-প্রচলিত লজ্জা ও সঙ্কোচের মোহটুকুও তেমনই কাটাইতে অভ্যস্ত হইয়াছিল।

বাসরসঙ্গিনীদের মনের ক্ষোভটুকুও কিছুক্ষণ পরে একবারে নিশ্চিহ্ন হইয়া গেল,—যখন চণ্ডীর শ্বশুরের নিকট হইতে বাসরে রাত্রি-জাগরণের জন্য একটি করিয়া মোহর মর্য্যাদাস্বরূপ তাহাদের প্রত্যেকের হাতে আসিয়া উঠিল! বহু বাসরে তাহারা রাত্রি-যাপন করিয়াছে, প্রচুর আনন্দ পাইয়াছে, কিন্তু চণ্ডীর বিয়ের বাসরে যদিও তাহারা খুসী হইতে পারে নাই, কিন্তু বাসর-জাগরণের এমন উচ্চ দক্ষিণার কথা তাহারা কখনও শুনে নাই, তখন তাহাদের আনন্দ দেখে কে!

* * * *

বিদায়ের পূর্ব্বক্ষণে মায়ের হাতে মেয়ের কনকাঞ্জলি দিবার প্রথা। চণ্ডী এই প্রথার বিরুদ্ধে মাথা তুলিয়া সকলকে অবাক্ করিয়া দিল। পিতলের একখানা থালায় চাল, সুপারি ও একটি টাকা রাখিয়া প্রথামত তাহাকে বলা হইল,—মায়ের হাতে দিয়ে বল্, মা! তোমার ঋণ শোধ ক'রে চললুম।

এ সময় সকল মেয়ের মনটি বিচ্ছেদের ব্যথায় আর্ত্ত হইয়া উঠে, চক্ষু দিয়া অশ্রুর প্রবাহ ছুটিতে থাকে। চণ্ডীরও দুই চক্ষু অশ্রুসিক্ত হইয়া উঠিয়াছিল, তবে পল্লী-গ্রামের সাধারণ মেয়েদের মত সে যে ক্রন্দনের প্রবল উচ্ছ্বাসে পরিজনদের পর্য্যন্ত আকুল করিয়া তুলিয়াছিল, এ কথা কখনই বলা চলে না। মাতৃঋণ পরিশোধের কথা কয়টি তাহার কাণে যেন তীক্ষ্ণ খোঁচার মত আঘাত দিল। সে উত্তর দিল,—আমি ত ও-কথা বলতে পারবো না।

একাধিককণ্ঠে প্রতিবাদ উঠিল,—ও মা, এ কি কথা রে চণ্ডী, এ যে 'নেম কন্ম'—ঐ ব'লে মায়ের আঁচলে ঐ থালা শুদ্ধ সব দিতে হয়।

চণ্ডী উচ্ছ্বসিত স্বরে কহিল,—মায়ের ঋণ কি কখনও শোধ হয় যে, এমন মিছে কথা বলব?

মায়ের ব্যথিত চিত্তটিও বুঝি মেয়ের কথায় উল্লাসে নাচিয়া উঠিল, কিন্তু সে ভাব দমন করিয়া তিনিই বিধান দিলেন,—না, না, ও কথা তোকে বলতে হবে না,—তুই শুধু বল্ যে—অন্নজলের ঋণ শোধ ক'রে চললুম।

চণ্ডী কহিল,—এই একথালা চাল, গোটাকতক সুপারি আর একটি টাকাতেই তোমার অন্নজলের ঋণ শোধ হবে, মা?—তাও নিজে থেকেই ত দিচ্ছ আমাকে—তোমার হাতে দেবার জন্য। না মা, আমি এ দিয়ে তোমার অন্ন-জলের ঋণ শোধ করতে পারবো না কিছুতেই।

তখন সকল বয়সের সমবেত সকল মেয়ের কণ্ঠগুলিই গভীর বিস্ময়ে কল্লোলিয়া উঠিল,—ও মা, এমন সৃষ্টিছাড়া কথা ত কখনও শুনিনি বাপু!

পূজার দালানের নীচেই প্রাঙ্গণটির উপর দুই বৈবাহিক এবং দুই পক্ষের ঘনিষ্ঠ মাতব্বররাও এই স্মরণীয় সন্ধিক্ষণটিতে সমবেত হইয়াছিলেন এবং দুজুর বৈবাহিক যেন জোর করিয়াই সঙ্কোচের ব্যবধানটুকু আজ কাটাইয়া দিয়াছিলেন। চণ্ডী তাহার আপত্তি অস্ফুটস্বরে ব্যক্ত করে নাই, সুতরাং প্রাঙ্গণে যাহারা অন্য কথার আলোচনায় উন্মনা ছিলেন, চণ্ডীর কথায় তাঁহারা প্রত্যেকেই উৎকর্ণ হইয়া উঠিলেন। কথার আঘাতটি যথাস্থানে গিয়াই বাজিল। হরিনারায়ণ বাবু উৎফুল্ল হইয়া উল্লাসের সুরে কহিলেন,—খাসা কথা বলেছ মা তুমি, এই ত চাই। বরাবর যে ভুল হয়ে আসছে, সেইটেই যে চোখ বুজিয়ে চালিয়ে যেতে হবে, এমন কি কথা! ঠিকই ত, ঐ দিয়ে কি কখনও অন্নজলের ঋণ শোধ হ'তে পারে,—তার ওপর কি না, যার শিল যার নোড়া, তাই দিয়ে তারই দাঁতের গোড়া ভাঙ্গবার ব্যবস্থা! দাঁড়াও মা, দাঁড়াও, এখনই এর উপায় আমি ক'রে দিচ্ছি; তুমি আমার মস্ত ভুল ধ'রে দিয়েছ মা,—বাঃ! বাঃ!

বাড়ী শুদ্ধ সকলকে অবাক্ করিয়া দিয়া—বাহিরের ঘর হইতে জনৈক কর্ম্মচারীকে ডাকাইয়া হরিনারায়ণ বাবু তৎক্ষণাৎ পুত্রবধূর উপযুক্ত কনকাঞ্জলির ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। করালী বাবু মিনতির ভঙ্গীতে বহু আপত্তি করিলেন, কিন্তু তাহা টিকিল না। হরিনারায়ণ বাবু হাসিয়া কহিলেন,—মা চণ্ডীর মুখ দিয়ে যে যুক্তি আমরা শুনেছি বেয়াই, তার খণ্ডন করবার ক্ষমতা আমাদের কারুর নেই। আর এ বিষয়ে আপনার আপত্তি বৃথা, এতে কুণ্ঠিত হবার কি আছে? আপনি নিজের ইচ্ছায় আহ্লাদ ক'রে আপনার জামাতাকে রূপোর থালায় ভ'রে, এক রাশ টাকা, সেই সঙ্গে আরও কত কি সামগ্রী যৌতুক দিয়েছেন, আমি ত প্রত্যাখ্যান করিনি কোনটি। তবে আমার বধূও যদি তার জননীর উদ্দেশে সত্যকার কনকাঞ্জলি দেয়, তা কেন গ্রাহ্য হবে না বলুন!

হরিনারায়ণ বাবুর এমন যুক্তিযুক্ত কথার উপর কাহারও আর কথা তুলিবার সাহস হইল না। সুতরাং চণ্ডী শ্বশুর-দত্ত পাঁচ শত গিনি-পূর্ণ থলিটি উজাড় করিয়া মায়ের উদ্দেশে রীতিমত কনকাঞ্জলি দিয়া কহিল,—এখান-কার অন্ন-জলের ঋণটুকুই শুধু শোধ ক'রে বিদায় নিচ্ছি, মা!

সঙ্গে সঙ্গে চণ্ডীর স্বর আর্ত্ত হইয়া উঠিল, দুই চক্ষুর উচ্ছ্বসিত অশ্রু বাঁধ-ভাঙ্গা স্রোতের মত দুর্ব্বার হইয়া ছুটিল। সকলের চক্ষু তখন অশ্রুসিক্ত,—কন্যার এ বিদায়-দৃশ্য চিরদিনই সকল সংসারে সকলেরই মর্ম্মস্পর্শী!

* * * *

পূজার দালানে যে সময় বিদায়-পর্ব্বের নিয়ম-কর্ম্ম চলিতেছিল, সে সময় বাড়ীর সম্মুখে সুদীর্ঘ রাস্তাটির উপর এমন এক বিরাট মিছিল নানা জাতীয় বাদ্যভাণ্ডাদি ও যানবাহনসহ শ্রেণীবদ্ধ হইতেছিল, এ অঞ্চলে যাহা সত্যই অভূতপূর্ব্ব। বাজনা-বাদ্যের ঘটা না করিয়া বিনাড়ম্বরেই বিবাহবাড়ীতে বরাগমন হওয়ায় যাহারা বিক্ষুব্ধ হইয়াছিল, বিবাহের পরদিন বর-বিদায়ের সময় এই অপ্রত্যাশিত মিছিলের বাহার তাহাদিগকে শুধু যে চমৎকৃত করিয়া তুলিল, তাহা নহে, খেয়ালী জমিদারের সম্বন্ধে এই ধারণাই তাহাদের মনে দৃঢ় করিয়া দিল,—

"যা কিছু শুনেছি, যা কিছু বুঝেছি
তারো চেয়ে তুমি উপরে,
কামনা ভাবনা কল্পনা মোদের
পারে না ধরিতে তোমারে।"

কনকাঞ্জলি দিয়া সুসজ্জিতা বধূ বরের সহিত বাহিরে আসিতেই হরিনারায়ণ বাবু বৈবাহিককে উদ্দেশ করিয়া কহিলেন,—পাকা দেখার দিনটিতে চণ্ডীমার কাছে বাক্‌বন্দী হয়ে আছি। তৈরী বিদ্যামন্দির দেখিয়ে যদি ওঁকে খুসী করতে পারি, তবেই না আমার নিষ্কৃতি। কাযেই এই সঙ্গে এ বাড়ীর সকলকেই ওখানে পায়ের ধূলো দিতে হবে। মিছিলে এ জন্য পাল্কীর বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়েছে।

কন্যাপক্ষ হইতে এ সম্বন্ধে আপত্তি উঠিলেও শেষ পর্য্যন্ত টিকিল না। হরিনারায়ণ বাবু কহিলেন,—আমরা ত আর কন্যাপক্ষকে সরাসরি বাগুলীতে জোর ক'রে ধ'রে নিয়ে যাচ্ছি-না, তাঁদেরই কন্যার মন্দিরপ্রতিষ্ঠা দেখে তাঁরা ফিরে আসবেন, এতে আর বাধা কি?

অগত্যা কোনও বাধাই আর রহিল না। কন্যাপক্ষের পুরুষগণ সুসজ্জিত শকটে উঠিলেন, মহিলারা মূল্যবান্ কিংখাপের আস্তরণ-মণ্ডিত শিবিকার ভিতরে ঢুকিলেন। কেবল চণ্ডীর মা বাড়ীতে রহিয়া গেলেন। কন্যার হাতের কনকাঞ্জলি লইয়া কন্যার মা আর পিছনের দিকে না তাকাইয়াই চলিয়া যান, ইহাই প্রথা। পদ্ধতির কথা বুঝিয়া বৈবাহিক তাঁহাকে আর পীড়াপীড়ি করিলেন না।

এ দিকে যেমন বিবাহের সমারোহ চলিয়াছিল, বারোয়ারীতলায় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার আয়োজনও তেমনই ঘটা করিয়া সম্পন্ন হইতেছিল। বিবাহ অপেক্ষা এইখানেই পল্লীবাসীর আগ্রহ অধিক;—একটি পক্ষের মধ্যেই পোড়ো জমির উপর একখানা ইমারত খাড়া করিয়া তোলা পল্লী অঞ্চলে কতটা সম্ভবপর, হরিনারায়ণ গাঙ্গুলী নির্দ্দিষ্ট দিনটির মধ্যে কি ভাবে তাঁহার পণ রক্ষা করিবেন, এই অদ্ভুত খেয়ালী মানুষটির যে সকল দুঃসাধ্য কার্য্য হেলায় সমাধা করিবার গল্প তাহারা এ পর্য্যন্ত শুধু কাণেই শুনিয়াছে—এখন সত্যই তাহারা প্রত্যক্ষ করিয়া চক্ষু-কর্ণের বিবাদ মিটাইতে পারিবে কি না—এই সব কথাই প্রধান আলোচনার বিষয় হইয়া শ্যামাপুর গ্রামখানির সহিত চারিপার্শ্বের সন্নিহিত আরও দশখানি গ্রামের অধিবাসিগণকে সচকিত করিয়া তুলিয়াছিল। সকলেই বিপুল আগ্রহে আকাঙ্ক্ষিত দিনটির প্রতীক্ষা করিতেছিল। বারোয়ারীতলার সুবিশাল প্রাঙ্গণের চারিদিক সুউচ্চ কানাত দিয়া এমন সন্তর্পণে পরিবেষ্টন করা হইয়াছিল যে, ভিতরে ইমারতের কায কি ভাবে সম্পন্ন হইতেছে, সে সম্বন্ধে কিছুমাত্র আভাস পাইবার কোনো সম্ভাবনাই ছিল না;—কাযেই জনসাধারণের কৌতূহল উচ্ছ্বসিত হইবারই কথা।

স্বদেশী ও বিদেশী বিবিধ বাদ্যের আবর্ত্তে সারা গ্রামখানি কাঁপাইয়া বিশাল মিছিল বারোয়ারীতলার সম্মুখে আসিতেই যুগপৎ কয়েকটি বন্দুকের আওয়াজ হইল এবং রঙ্গমঞ্চের যবনিকা যে ভাবে সহসা উপরে উঠিয়া যায়, সেইরূপ তৎপরতায় সেই সুবৃহৎ প্রাঙ্গণের চারিপার্শ্বের সু-উচ্চ কানাতগুলি একসঙ্গে খুলিয়া গেল। পরক্ষণে সুন্দর অঙ্গন-সমন্বিত বিচক্ষণ শিল্পীর পরিকল্পিত সদ্যঃসম্পন্ন মনোরম বিদ্যামন্দিরের নির্ম্মাণ-পারিপাট্য সকল কৌতূহলী চক্ষুকেই চমৎকৃত করিয়া দিল।

দুইটি সপ্তাহ পূর্ব্বেও যে পতিত জমিটির উপর পল্লীর গরু-বাছুর চরিয়া বেড়াইত, সেখানে আজ আরব্য রজনীর উপাখ্যানের মত এক আশ্চর্য্য অট্টালিকা যেন যাদুমন্ত্রের প্রভাবেই মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছে।—অঙ্গনের সম্মুখেই বিদ্যামন্দিরের প্রশস্ত সোপানশ্রেণী, তাহার দুই ধারে দুইটি সুদীর্ঘ চাতাল অট্টালিকার উভয় প্রান্ত পর্য্যন্ত বিস্তৃত। সোপানশ্রেণীর উপরেই ভেলভেটের একখানি সুবৃহৎ পর্দ্দা দৃশ্যপটের মত পড়িয়া ছিল। কার্নিশের নিম্নেই বড় বড় হরফে উৎকীর্ণ করা হইয়াছে—মা চণ্ডীর বিদ্যামন্দির।

দেউড়ীর সম্মুখে আসিয়া মিছিল থামিতেই হরিনারায়ণ বাবু অগ্রবর্ত্তী হইয়া বর-বধূ ও কন্যাপক্ষীয়দের সহিত সোপানশ্রেণী অতিক্রম করিয়া পর্দ্দার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। কৌতূহলী জনতায় বিশাল অঙ্গন তখন ভরিয়া গিয়াছে।

হরিনারায়ণ বাবু বধূর দিকে চাহিয়া হাসিমুখে কহিলেন,—তোমার হাতের পরশ না পেলে এ পর্দ্দা ত উঠবে না মা, পর্দ্দাখানা তুলে তোমাকেই যে আগে প্রবেশ করতে হবে তোমার মন্দিরে।

চণ্ডীর সর্ব্বাঙ্গ ব্যাপিয়া তখন যেন একটা অপূর্ব্ব পুলকের শিহরণ উঠিয়াছে। কোনও দিকে দৃষ্টি না দিয়া, সে তাহার হাতের কাজললতাখানি প্রথমে কটিদেশে গুঁজিয়া রাখিল, তাহার পর সবল দুইখানি হাত দিয়া সেই বিশাল পর্দ্দাখানি গুটাইতে আরম্ভ করিল।

হরিনারায়ণ বাবু হাসিয়া কহিলেন,—মা আমার কিছুতেই পেছুতে চান না, নিজেই হাত লাগিয়েছেন কোনও-দিকে দৃকপাত না ক'রে। বাস্—মা, হয়েছে। তোমার স্পর্শটুকুই ছিল দরকার,—এবার তুমি ছেড়ে দাও, মা।

কুলীর সাহায্যে পর্দ্দাখানি উপরে টানিয়া তুলিবার যথোচিত ব্যবস্থাই ছিল। পরক্ষণেই ক্ষিপ্রগতিতে সেখানি উপরের দিকে উঠিয়া যাইতেই বিদ্যামন্দিরের সুসজ্জিত সুবৃহৎ হলঘরখানি সকলের চক্ষুর উপর প্রকাশ হইয়া পড়িল।

ইমারতের সংখ্যা এ অঞ্চলে নিতান্ত অল্প না হইলেও এই ধরণের প্রশস্ত দরদালানযুক্ত পরিচ্ছন্ন অট্টালিকা সম্পূর্ণ অভিনব। দালানখানি পত্রপুষ্প ও নানাবিধ চিত্রপটে সুসজ্জিত, তাহার তিন দিকেই তিনখানি করিয়া বড় বড় ঘর, প্রত্যেক ঘরেই পালিস্ করা সারি সারি সুশ্রী বেঞ্চি, পুরোভাগে টেবল ও শিক্ষয়িত্রীর কেদারা: দেওয়ালে কালো রঙ্গের বোর্ড ও ভারতবর্ষের মানচিত্র টাঙ্গানো। হলে প্রবেশ করিতেই দুই পাশের দুইখানি ঘর অন্য প্রকারে সজ্জিত। একখানি ঘরে আফিসের যাবতীয় সাজ-সরঞ্জাম; বড় বড় দুইটি আলমারীর মধ্যে খাতা কাগজ পেনসিল দোয়াত কালি কলম, নানা দেশের নানাবিধ মানচিত্র, রাশি রাশি শ্লেট, প্রাথমিক শিক্ষায় অপরিহার্য্য বিদ্যাসাগরের প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ, ধারাপাত, শুভঙ্করী, চাণক্য-শ্লোক, ঘরের এক পার্শ্বে অনেকগুলি চরকা, প্রচুর তূলা প্রভৃতি। অপর পার্শ্বের ঘরখানির দরজা ও জানালা কয়টি বাদ দিয়া সর্ব্বস্থান আলমারীতে ভরা। তবে আলমারীগুলি ঘরের দেওয়ালগুলি ভরাইয়া তুলিলেও, তাহাদের গহ্বরগুলি তখনও পুস্তকে ভরিয়া উঠে নাই।

চণ্ডীকে অগ্রবর্ত্তিনী করিয়াই সকলে হলে প্রবেশ করিলেন। হরিনারায়ণ বাবু ধীরে ধীরে বধূর অনুগমন করিতে করিতে কহিলেন,—বুঝতেই পেরেছ মা, তোমার এই স্কুলটির নামকরণ হয়েছে—মা চণ্ডীর বিদ্যামন্দির কেমন মা, ঠিক নাম হয়নি?

চণ্ডীর মুখখানি তখন পরিতৃপ্তির উল্লাসে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে। বৃদ্ধ তাহা লক্ষ্য করিয়া কহিলেন,—দেখ মা, মানুষ লোকের দৃষ্টিতে যতই হেয়, দুর্ব্বল বা অসহায় হোক না কেন, তার মনটি যদি হয় সবল আর নির্ম্মল, তা হ'লে সেখান থেকে যে প্রার্থনা ওঠে শ্রীভগবানের উদ্দেশে, তা কখনও ব্যর্থ হ'তে পারে না; তাঁরই প্রেরণায় তখন উপযুক্ত লোক ছুটে আসে তার সেই কাযটুকু উদ্ধার ক'রে দিতে। নিজের স্বার্থের দিকে চেয়ে ত তুমি তাঁর দোরে প্রার্থনা পাঠাওনি মা, দেশের দুঃখমোচনের জন্য—দশের কল্যাণের কথা ভেবে কোমল হৃদয়টি তোমার দুলে উঠেছিল, দুই চক্ষু দিয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়েছিল, ভগবান্ কি স্থির হয়ে থাকতে পারেন, মা!—এই যে পাঠশালা-প্রতিষ্ঠা, এর মূলে তোমারই মনের গভীর সাধনা;—তুমি যে মা স্বয়ংসিদ্ধা।

২

বিবাহের পর শ্বশুরবাড়ীতে আসিয়াই চণ্ডী নানা সূত্রে উদ্ধান্তের সর্ব্বময়ী রাণী মাধুরীদেবীর চিত্তে দারুণ বিরাগ সৃষ্টি করিয়া বসিল।

বিবাহ-রাত্রিতে বাসরে নির্ব্বোধ স্বামীর মুখে তাহার জীবন-পদ্ধতি শুনিয়া চণ্ডী মনে মনে শ্বশুরালয়ে তাহার কর্ম্মপদ্ধতির একটা খসড়া করিয়া ফেলিয়াছিল। সে বুঝিয়াছিল, প্রতিপক্ষদের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্যই বিধাতা তাহাকে সৃষ্টি করিয়াছেন। শ্যামাপুরে আসিয়া অবধি বরাবরই সে অন্যায়ের বিরুদ্ধে মাথা তুলিয়াছে, এ জন্য কত নিন্দা, কত অনুযোগই না তাহাকে শুনিতে হইয়াছে; কিন্তু সে

কোনও দিকেই দৃক্‌পাত করে নাই। বাসরে স্বামীর মুখে যে কাহিনী সে শুনিয়াছে, তাহার সহিত কত বড় বিপদ, কত বিপ্লব, কত সব কলহের সম্ভাবনা যে জড়াইয়া রহিয়াছে, তাহা উপলব্ধি করিতে চণ্ডীর বিলম্ব হয় নাই। স্বামীর যেখানে কোনও সম্মান নাই, কিছুমাত্র আদর নাই, কোনওরূপ প্রতিষ্ঠা নাই,—দরিদ্রের কন্যা সে, সেই স্বামীর সহধর্ম্মিণী হইয়া সেখানে চলিয়াছে; কি ব্যবহার পাইবে, তাহার আত্মমর্য্যাদার উপরেও আঘাত আসিবে কি না, কে বলিতে পারে! এই সব ভাবিয়াই চণ্ডী তাহার সঙ্কল্প আগে হইতেই স্থির করিয়া লইয়াই বাগুলীর প্রাসাদে প্রবেশ করিয়াছিল।

কিন্তু প্রাসাদের ভিতর রাণী মাধুরীদেবীর প্রতাপের অন্ত ছিল না। প্রাসাদের কর্ত্তা তাঁহার অসংখ্য প্রজা ও সেরেস্তার কর্ম্মচারীদের মুখে 'হুজুর' সম্বোধন শুনিয়াই সন্তুষ্ট থাকিতেন, রাজা আখ্যা তিনি পছন্দ করিতেন না। কিন্তু খেতাবধারী রাজার কন্যা মাধুরী দেবী স্বামীর এই ত্যাগ-টুকুকে খ্যাতিলাভের পথে একটা প্রকাণ্ড ত্রুটি বলিয়াই সাব্যস্ত করিয়াছিলেন, এবং স্বামীর এই ত্রুটিটুকুর পরিপূরণ করিতে তাঁহার চেষ্টার ত্রুটি দেখা যায় নাই। সংসার-তরণীখানির হাল ধরিয়াই তিনি শুদ্ধান্তের সকলকেই জানাইয়া দিলেন, বাপের বাড়ীতে তিনি ছিলেন রাজকন্যা, এখানে—রাণী। সুতরাং এক কর্ত্তা ভিন্ন সকলের মুখেই গুঞ্জন উঠিল—রাণী-মা। মায়ের খ্যাতির অংশে পুত্রও বঞ্চিত হইল না, রাণীর ইচ্ছানুসারে পুত্র নিবারণ খোকা-রাজা আখ্যা পাইল।

গোবিন্দের বিবাহপ্রসঙ্গে রাণী প্রসন্ন হইতে পারেন নাই। তবে তাহার মনে এইটুকুই সান্ত্বনা ছিল যে, বধূ দরিদ্রের মেয়ে, এখানে আসিয়াই অবাক্ হইয়া যাইবে, ঐশ্বর্য্য তাহার দুই চক্ষু ঝলসিয়া দিবে; এ রকম মেয়েকে দাসী-বাঁদীর মত পদানত করিয়া লইতে অসুবিধা হইবে না। সুতরাং মনের ভাব গোপন রাখিয়া গোবিন্দের বিবাহে মুখে তিনি খুবই উৎসাহ দিলেন, আনন্দ প্রকাশ করিলেন, তাহার মধ্যে দীর্ঘনিশ্বাসের সহিত গভীর মর্ম্মব্যথাটুকুও সকলকে শুনাইয়া দিলেন,—ছেলেটা পাগল ব'লে, একটা যা তা ঘরের গরীবের মেয়ে আসছে তার বউ হয়ে! মেয়েটারও ঝকমারী, না পারবে ভরসা ক'রে মিশতে,—পায়ে পায়ে জড়িয়ে মরবে; ছেলেটারও হবে নাকালের একশেষ।—আশ্রিতা, আত্মীয়া, অনাত্মীয়া, পাচিকা, পরিচারিকা প্রভৃতি বিভিন্ন অবস্থা ও বয়সের মেয়েরাও রাণীর দেখাদেখি গরীবের এই মেয়েটির ভাগ্যের কথা ভাবিয়া একটি করিয়া নিশ্বাস ফেলিতে ভুল করে নাই।

কিন্তু প্রথম দর্শনেই বধূর কুণ্ঠাশূন্য প্রতিভাদৃপ্ত মুখখানি মাধুরীদেবীর দৃঢ়চিত্তে সংশয়ের একটা নিবিড় রেখা টানিয়া দিল। নববধূসুলভ অপরিসীম লজ্জা ও আড়ষ্টতার প্রভাব কাটাইয়া সহজ স্বচ্ছন্দভাবেই বধূ যখন প্রাসাদের সিংহদ্বারে চতুর্দ্দোলা হইতে নামিল, বাগুলী-প্রাসাদের বিপুল ঐশ্বর্য্যের নানা নিদর্শনই সেখানে বিকীর্ণ হইয়াছিল। কিন্তু রাণী নিষ্পলক-নয়নে দেখিলেন, দরিদ্রের এই মেয়েটির চক্ষু দুইটি চক্ষুচমৎকারী ঐশ্বর্য্যের কোনও দিকেই আকৃষ্ট নহে; বরং তাহার দৃষ্টিতে যেন দম্ভের একটা ভঙ্গী ও মুখে তাহারই আভাস পরিস্ফুট। অথচ তাহার দিক দিয়া শিষ্টাচারের কোনও অভাব দেখা গেল না। মাধুরীদেবী বধূর চরণ দুইখানির উপর প্রথা অনুযায়ী হরিদ্রা-বারি ঢালিবামাত্রই বধূ তৎক্ষণাৎ নত হইয়া তাঁহার পদধূলি লইয়া মাথায় দিল, তাহার পর যুক্ত হাত দুইখানি ললাটে তুলিয়া স্মিত-বদনে সমবেত মহিলাদের উদ্দেশে শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়াই সম্মুখে আস্তৃত রক্তবর্ণ বনাতমণ্ডিত পথে বরের পার্শ্ববর্ত্তিনী হইয়া অসঙ্কোচে অগ্রসর হইল, কাহাকেও কোলে তুলিয়া লইবার অবসর দিল

মাধুরীদেবীই শুধু তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে দেখিলেন, অন্যের অলক্ষ্যে অপূর্ব্ব কৌশলে বধূ তাহার জড়প্রকৃতি বরটির পাশে থাকিয়া তাহাকে চালনা করিয়াছে। সেই মুহূর্ত্তেই স্তব্ধ বিস্ময়ে রাণী উপলব্ধি করিলেন,—এ বংশের বধূর অধিকারটুকু পাইয়াই যেন এই অদ্ভুত মেয়েটি অতীতের যাহা কিছু সমস্ত মুছিয়া ফেলিয়া মহিমময়ী রাজ্ঞীর মতই পুরীর ভিতরে চলিয়াছে,—রাজ্য তাহার বুঝিয়া লইতে! মাধুরী-দেবীর মনে পড়িল, বধূর বয়সে তিনিও ঠিক এইভাবে এই তেজোদৃপ্ত মনোবৃত্তি লইয়া এই স্থানে আসিয়া দাঁড়াইয়া-ছিলেন।

পরিজনদের উপর মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানগুলির ভার দিয়া নিজের মহলায় নির্জ্জন কক্ষে আসিয়া মাধুরীদেবী শয্যার আশ্রয় লইলেন। পরিচারিকারা পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিয়া আসিয়াছিল, তিনি তাহাদিগকে ফিরাইয়া দিলেন। উপধানের

উপর মুখখানি চাপিয়া বহুক্ষণ তিনি নির্জ্জীবের মত পড়িয়া রহিলেন। নিজের অজ্ঞাতে অবিরল অশ্রুধারায় উপধান সিক্ত হইতে তিনি শিহরিয়া উঠিয়া বসিলেন, অঞ্চলে চক্ষু দুটি মুছিয়া নিজের মনে কহিলেন,—'ছি, ছি, এ আমার হ'ল কি? এক রত্তি একটা মেয়েকে আমার প্রতিদ্বন্দ্বিনী ভেবে আমি কেঁদে সারা হচ্ছি!'—জোর করিয়া নিজের দেহখানিকে টানিয়া রাণী অলিন্দে আসিয়া দাঁড়াইলেন। কিন্তু সেখানে উৎসব-সজ্জায় সজ্জিত বিশাল পুরীর সৌন্দর্য্য তাঁহার দুই চক্ষুর উপর যেন দুর্ভেদ্য ধূম্রজাল বিস্তার করিতেছিল। তখন তাঁহার কণ্ঠের অস্ফুটস্বর প্রশ্নের মত শুনাইল,—দোষ কার? এ কি প্রকৃতির প্রতিশোধ?

অস্থিরপদে সুদীর্ঘ অলিন্দে কিছুক্ষণ পদচারণার পর পুনরায় রাণী স্থির হইয়া দাঁড়াইলেন, সঙ্গে সঙ্গে আর্ত্তকণ্ঠের পুনরুচ্ছ্বাস,—দুর্জ্জয় পণের জন্যই না আমার এই পরাজয়! নিবারণের পাশেই ত আজ এই বধূটির দাঁড়াইবার কথা!—তৎক্ষণাৎ কর্ত্তার মুখের কথা দৈববাণীর মত তাঁহার কাণে ঝঙ্কার দিয়া উঠিল,—গাধাবোটখানাকে টেনে নিয়ে যাবে বলেই এই ষ্টীমলঞ্চের ব্যবস্থা।—রাণীর বুকখানি অমনই উদ্বেলিত হইয়া উঠিল, তিনি যেন কল্পনার দৃষ্টিতে দেখিতে-ছিলেন,—এই তেজীয়ান্ ষ্টীমলঞ্চের সহায়তায় গাঙ্গুলী-পরিবারের অকর্ম্মণ্য গাধাবোটখানি ধীর মন্থরগতিতে বাগুলীর রাজ-গদী লক্ষ্য করিয়া অগ্রসর! শিহরিয়া দুই হাতের করপুটে মাধুরীদেবী নিজের ম্লান মুখখানি লুকাইলেন।

পরক্ষণে কাণে বাজিল নিবারণের নিদারুণ তীক্ষ্ণ স্বর,—মা! শুনেছ নতুন বৌএর আস্পর্দ্ধার কথা!

নিজের মর্ম্মব্যথা প্রচ্ছন্ন রাখিয়া চকিতভাবে মা দুই চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া চাহিলেন, অপ্রতিহতপ্রভাব পুত্রের এমন ব্যথাতুর বিবর্ণ মুখ তিনি কোনও দিন দেখেন নাই। তাঁহার ওষ্ঠে কথা স্ফুরিত হইল না, কিন্তু দুই চক্ষুতে প্রশ্ন ফুটিয়া উঠিল।

নিবারণ কহিল,—দেখাশোনার সময় বাবা না কি বউকে একগাছা চাবুক দিয়ে বলেছিলেন, এই দিয়ে একটা গাধাকে সায়েস্তা করতে হবে। খেলার আসরে বউ সবার সামনে বলেছে—সে গাধা আমি। আমাকেই সে খুঁজছিল।

মনের ভাব গোপন করিয়া মুখে সকৌতুক হাসির ঝিলিক তুলিয়া মাধুরীদেবী কহিলেন,—আজকের দিনের কথা কি গায়ে মাখতে আছে পাগল! তুই হচ্ছিস্ দেওর, তাই ঠাট্টা করেছে বউ।

নিবারণ কঠিনস্বরে কহিল,—আমি ত আর ঠাট্টা বুঝি না! ওকে ঠাট্টা বলে না, দিব্যি ঝাঁঝিয়ে ও কথা বলেছে, তেজ দেখিয়েছে; আমিও তোমাকে ব'লে রাখছি, মা, এ তেজ যদি না ভাঙ্গতে পারি—আমি খোকা-রাজা নই।

মাধুরীদেবী স্তম্ভিত-বিস্ময়ে অবাক্ হইয়া নিবারণের গমন-গতির দিকে তাকাইয়া রহিলেন, তাহাকে ডাকিয়া ফিরাইতে বা প্রবোধ দিয়া বুঝাইতে তাঁহার মুখে কথা ফুটিল না।

* * * * *

রাণীর নিকট নিবারণ বধূর বিরুদ্ধেই একতরফা অভিযোগ করিয়া গেল এবং অভিযুক্তের শাস্তির ব্যবস্থা সে যে নিজের হাতেই করিবে, সে কথাটুকুও দম্ভের সহিত ব্যক্ত করিতে দ্বিধা করিল না। কিন্তু সেই অপ্রীতিকর প্রসঙ্গে সে নিজেও যে কতখানি অপরাধী, সে কথা সে নিজেও যেমন চাপিয়া গেল, প্রত্যক্ষদর্শীর দলও তেমনই খোকা-রাজার অপরাধ সম্বন্ধে নিরুত্তরই রহিল। যাহাদের সাহস একটু বেশী ও উচিতবক্তা বলিয়া কিঞ্চিৎ খ্যাতি আছে, তাহারা এ প্রসঙ্গে যে নির্ভীক এজাহার দিল, তাহার মর্ম্ম এইরূপ,—গোড়ার দিকে খোকা রাজার কথা-গুলো একটু মুখ-আলগা-গোছের হয়েছিল। কিন্তু তা না হয় হ'ল; তা ব'লে কি টস্ দেখিয়ে অমন ক'রে কথা বলা বউ-মানুষের মুখে সাজে? হাজার হোক, তুই ত বাছা গরীবের ঘরের মেয়ে, তার ওপর বিয়ের কনে, আর উনি হচ্ছেন ঘরের ছেলে—রাজপুত্তুর।

কিন্তু এই অপ্রীতিকর ব্যাপারটির প্রকৃত বিবরণ এইরূপ,—মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানগুলি যখন প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে, সেই সময় তরুণী-সমাজে চাঞ্চল্য উঠিল। বেশ বুঝা গেল, সে স্থলে এমন কোনও মাতব্বর ব্যক্তির আগমন হইতেছে, যাহার সম্বন্ধে অধিকাংশ মেয়ের মনে লজ্জার অন্ত নাই। বিভিন্ন কণ্ঠ হইতেই চাপা সুরের অস্ফুট নির্দেশ—খোকা-রাজা! খোকা-রাজা! এতক্ষণ যাহারা ঘোমটা খুলিয়া অসঙ্কোচেই এই আনন্দ অনুষ্ঠানে যোগ

দিয়াছিল, আগন্তুকের নামেই তাহারা শশব্যস্ত হইয়া মাথার কাপড় টানিয়া তাহার মধ্যে মুখ লুকাইল।

বধূ এতক্ষণ অবনতমুখী হইয়া নির্দ্দেশমত মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানগুলিতে লিপ্ত ছিল। সাপের নাম শুনিলে মানুষ যে ভাবে চমকিত হইয়া উঠে, খোকা-রাজা নামটি শুনিতেই বধূও ঠিক সেইরূপ সচকিত ভঙ্গীতে সোজা হইয়া বসিয়া তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে দ্বারের দিকে চাহিল। বিবাহ-বাসরে স্বামীর মুখের কথাগুলি তখনও সে ভুলে নাই,—'খোকা-রাজা তা হ'লে পীঠের চামড়া আমার আস্ত রাখবে না, এক এক দিন যা মারে!'—সেই লোকটি আসিতেছে তাহারই সম্মুখে!

ভাবভঙ্গী, গতিবিধি ও সর্ব্বাঙ্গে আভিজাত্যের নানা নিদর্শন লইয়া সেই সুবৃহৎ হলটির ভিতর দেখা দিল খোকা-রাজা নিবারণ। তরুণীদের সঙ্কোচ ভাব ও সহসা অবগুণ্ঠনবতী হইবার প্রয়াস তাহার দৃষ্টি অতিক্রম করে নাই। রুক্ষস্বরে সে কহিল,—আমি কি বাঘ যে আমাকে দেখেই সবাই ভয়ে জড়সড়!

আরও কি বলিতে যাইতেছিল নিবারণ, কিন্তু ঠিক এই সময় নববধূর দীর্ঘায়ত দুইটি চক্ষুর সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টির সহিত হইল তাহার বিচিত্র চক্ষুযুগলের বিষম সংঘাত! বিচিত্র চক্ষু বলিবার অর্থ এই যে, নিবারণের দুই চক্ষুর তারকায় বিড়ালের চক্ষুর মত অপূর্ব্ব বর্ণবৈচিত্র্য দেখা যায় এবং ইহাই এই সুন্দর সুগঠিতদেহ তরুণ যুবাটির আকৃতিগত একটা বিষম খুঁত অথবা বিশেষত্ব।

তাহাদেরই তালুকের এক সাধারণ প্রজার মেয়ে এ বংশের বধূর মর্য্যাদা লইয়া আসিয়াছে,—কিন্তু বংশের কলঙ্ক বিকৃতমস্তিষ্ক বড়খোকার পার্শ্বে বধূটি কেমন খাপ খাইয়াছে, তাহা দেখিতেই সদম্ভ কৌতূহলে খোকা-রাজার এই মহিলা-মজলিসে আবির্ভাব হইয়াছিল। কিন্তু আসিবামাত্রই এ ভাবে বধূর সহিত তাহার চোখোচোখি হইবে ও বধূ সকল সঙ্কোচ কাটাইয়া পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে তাহার দিকে তাকাইবে, ইহা সে কল্পনাও করে নাই। বধূর সঙ্কোচশূন্য প্রখর দৃষ্টি, সুন্দর সপ্রতিভ মুখ ও সর্ব্বাঙ্গের অনবদ্য সুষমা নিবারণের মস্তিষ্কের ভিতর কেমন একটা জ্বালা ধরাইয়া দিল। ক্ষণকাল বধূর দিকে বদ্ধ-দৃষ্টিতে চাহিয়া সহসা বিদ্রূপের সুরে সে কহিল,—খাসা বউ ত বাগিয়েছে আমাদের গবা পাগ্‌লা,—তবে এটা ঠিক বাঁদরের গলায় মুক্তোর মালার মতই মানিয়েছে।

পরের বাড়ী, অপরিচিত স্থান, চারিধারে অনাত্মীয়ের সমাবেশ, নিজের অসহায় অবস্থা সেই মুহূর্ত্তেই চণ্ডী সমস্ত ভুলিয়া গেল; যে নিষ্ঠুর মানুষটির কদর্য্য চিত্র সে মানস-পটে কল্পনার তুলিতে আঁকিয়া রাখিয়াছিল, তাহাকে চাক্ষুষ দেখিবার জন্যই তাহার চক্ষু দুইটি অবাধে বিস্ফারিত হইয়া উঠে। কিন্তু দৃষ্টিবিনিময়ের সঙ্গে সঙ্গেই যে সেই মানুষটি তাহাকেও অভদ্রের মত এরূপ আঘাত দিবে, এ ধারণা তাহার মনে আসে নাই। উত্তেজনায় চণ্ডীর সর্ব্বাঙ্গে শিরায় শিরায় তখন রক্ত উষ্ণ হইয়া ছুটিয়াছে, মনের ভিতরের সমস্ত জ্বালাটুকু তাহার দুইটি চক্ষুতে তখন দীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে; সেই প্রোজ্জ্বল দৃষ্টি স্বামীর মুখের উপর স্থাপন করিয়াই কিন্তু সে শিহরিয়া উঠিল; দেখিল, সে মুখ একেবারে নিষ্প্রভ, ছাইয়ের মত বিবর্ণ; সর্ব্বাঙ্গ তাহার থর্‌থর্‌ করিয়া কাঁপিতেছে; মুখে কোনও কথা নাই, কিন্তু দুইটি কাতর চক্ষুর আর্ত্ত দৃষ্টিতে একটা অব্যক্ত আতঙ্ক যেন ফুটিয়া উঠিতেছে!

স্বামীর সহিত চোখোচোখি হইতেই একটি মর্ম্মভেদী নিশ্বাস ফেলিয়া চণ্ডী তাহার উত্তেজনাদীপ্ত মুখখানি নত করিল, সেই সঙ্গে আস্তে আস্তে মাথার উপর অবগুণ্ঠন টানিয়া দিল।

বরবধূর সান্নিধ্যেই বসিয়াছিল নিবারণের মাতুল-কন্যা মৃণালিনী। সপ্তদশী তরুণী, রূপও তাহার প্রচুর; বেথুনে পড়িয়া একটা পাশও করিয়াছে। সহরের অভিজাত ঘরের আদব-কায়দা পদে পদে সে মানিয়া চলে। নিজে মৃণালিনী খেতাবধারী রাজার আদরিণী নাতনী, স্বামীও কেউকেটা নয়,—নামজাদা ব্যারিষ্টারের ছেলে এবং নিজেও ব্যারিষ্টার হইবার জন্য বিলাতে থাকিয়া পড়াশুনা করিতেছে। এ অবস্থায় পল্লী অঞ্চলে মহিলা-সমাজে মৃণালিনীর সর্ব্বক্ষণই নাকটি উঁচু করিয়া থাকিবার কথা,—যাহার তাহার সহিত সে বড় একটা কথা কহে না, নিজের মর্য্যাদা দম্ভের সহিত রক্ষা করিতে সে সর্ব্বদা সচেতন। রাণী মাধুরীদেবী এই স্পর্দ্ধিতা ভ্রাতৃকন্যাকে অন্তরের সহিত ভালবাসেন। তিনি বলেন,—আভিজাত্যের অহঙ্কারটুকুই বড় ঘরের মেয়েদের একটা উঁচু রকমের সৌন্দর্য্য; বিলাত

হইতে স্বামী ফিরিয়া না আসা পর্য্যন্ত এই সৌন্দর্য্যময়ী ভাইঝিটিকে রাণী সযত্নে নিজের কাছেই রাখিয়াছেন।

বধূকে সহসা অবগুণ্ঠন টানিতে দেখিয়া মৃণালিনী মুখ টিপিয়া হাসিয়া কহিল,—কথার এমনি খোঁচা দিলে দাদা যে, বউ একবারে লজ্জাবতী লতা!

বধূর দিকে বক্রদৃষ্টিতে চাহিয়া নিবারণ কহিল, কোথায় ওঁকে দেব বাহবা—ওঁর সাহস দেখে, কিন্তু উনিও শেষে ওঁদের দলে ভিড়ে গেলেন,—মেপে একটি হাত ঘোমটা, একবারে কলাবউ!

মৃণালিনী নিবারণের কথায় সায় দিয়া হাসিমুখে কহিল, —তাই ত, এ যেন গোড়া কেটে আগায় জল ঢালা হ'ল!

সহর্ষে নিবারণ কহিল,—ঠিক বলেছিস মিনা, অমন ক'রে চোখ মেলে দেখবার পর ও লজ্জা এখন আর খাটবে না, ওকে বাতিল করা চাই: ঘোমটাখানা তুই খুলে দে আগে।

মৃণালিনী নিবারণের কথায় তাহার দীর্ঘ অবগুণ্ঠনের প্রান্তভাগ স্পর্শ করিতেই বধূর হাতখানি তাহার কনুইটির উপর হেলিয়া পড়িল; পরমুহূর্ত্তেই বিদ্যুৎস্পৃষ্টবৎ মৃণালিনীর সর্ব্বাঙ্গ আড়ষ্ট, নিদারুণ যন্ত্রণায় সে আর্ত্তনাদ তুলিল,—মা গো!

তাহার ফিটের ব্যামো ছিল, সকলেই ভাবিল, মৃণালিনীর ফিট হইয়াছে। পার্শ্ববর্ত্তিনীরা চঞ্চল হইয়া উঠিল। কিন্তু একটু পরেই তাহার সে ভাব কাটিয়া গেল, সে প্রকৃতিস্থ হইয়া অবগুণ্ঠনবতী বধূর দিকে সংশয়াতঙ্ক-দৃষ্টিতে চাহিল।

নিবারণ কহিল, -কি হ'ল তোর মিনা,—অমন ক'রে নেতিয়ে পড়লি যে!

মৃণালিনীর দেহখানি তখনও ঠক্‌ঠক্ করিয়া কাঁপিতেছিল। কণ্ঠের স্বরও তাহার প্রভাব অতিক্রম করিতে পারে নাই। মৃদুস্বরে সে উত্তর দিল,—বউএর ঘোমটাখানি ধ'রে যেই তুলতে যাব, অমনি একটা ঝাঁকুনি পেলুম সর্ব্বাঙ্গে; কে যেন শিরাগুলো জোর ক'রে টানা-হেঁচড়া করতে লাগলো। ভাবলুম, ফিট বুঝি এলো, কিন্তু তা নয়। আমার মনে হয়, বউ কিছু কারসাজি করেছে!

নিবারণ ব্যঙ্গের সুরে কহিল,—তা মিছে নয়, শুনেছি কবরেজের মেয়ে, তুক তাক হয় ত অনেক কিছুই জানে। —কিন্তু তুই যে ভয়ে স'রে এলি, ঘোমটাখানা ত খুলে দিলি নি!

মৃণালিনী কহিল, আবার! আমার দ্বারা হচ্ছে না দাদা, ইচ্ছে হয়, তুমি নিজে খুলে দাও।

নিবারণ স্বর তীক্ষ্ণ করিয়া কহিল,—ঘোমটাখানি নিজেই খুলবে, না আমাকেই খুলে দিতে হবে নিজের হাতে?

বধূ নির্ব্বাক্, নিষ্প্রাণ প্রতিমার মত নিশ্চল। শ্লেষের সুরে নিবারণের পুনরায় প্রশ্ন,—গোড়ায় তীরটি ছুড়ে তার পর হঠাৎ এমন বৈরাগ্য কেন শুনি?

মৃণালিনীও এবার ঝঙ্কার দিয়া কহিল,—ঢস্ দেখে আর বাঁচি না; দেওরকে দেখে এতই যদি লজ্জা, চোখের পর্দ্দা তুলে অমন ক'রে আগেই চেয়েছিলে কেন?

অবগুণ্ঠনমধ্যে বধূর কণ্ঠস্বর এবার ঝঙ্কার দিয়া উঠিল,—কেন অমন ক'রে চেয়েছিলুম তখন, তাই জানতে চান?

বধূর কথায় সকলেরই মনে গভীর বিস্ময়, বিপুল কৌতূহল।

বধূ দৃঢ়স্বরে কহিল, বাবা আমাকে দেখতে গিয়ে একটা চাবুক যৌতুক দিয়েছিলেন।

কাহারও মুখে কথা নাই, বধূর কথা শুনিতে সবাই উৎকর্ণ।

বধূ কহিল,—বাবা বলেছিলেন, তাঁর বাড়ীতে একটা বেয়াড়া গাধা আছে, তাঁর দেওয়া চাবুক দিয়ে তাকে সায়েস্তা করতে হবে। সেই গাধাটাকে দেখবার জন্যই আমি তখন অমন ক'রে চেয়েছিলুম!

বধূর মুখের কথা শুনিয়া সকলেই একেবারে স্তব্ধ। অবগুণ্ঠনের মধ্য দিয়া তরুণীরা নির্ব্বাক্-বিস্ময়ে দেখিতেছিল— নিবারণের সুন্দর মুখখানির উপর কে যেন এক ঝলক কালি ঢালিয়া দিয়াছে!

শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়।

হুগলী জেলার ইতিহাস

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

জাল প্রতাপচাঁদের মোকদ্দমা *

বর্ত্তমান সময়ে ভাওয়াল সন্ন্যাসীর যেমন হইতেছে, উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে এইরূপ একটি বড় মোকদ্দমা হুগলী আদালতে হইয়াছিল এবং ১৮৫২ খৃষ্টাব্দের ২৪শে নভেম্বর মেদিনীপুরের রাজা রুদ্রনারায়ণের এই ভাবের আর একটি মোকদ্দমা হইয়াছিল। † এই মোকদ্দমাটি হুগলী জেলার নহে বলিয়া উহার বিবরণ দিলাম না। তখনকার দিনে প্রত্যেক লোকমুখে প্রতাপচাঁদের মোকদ্দমার কথা হইত—তাঁহার স্বপক্ষে ও বিপক্ষে অনেক আলোচনা হইত। প্রায় শতকরা ৯৯ জন লোক প্রতাপের পক্ষে কথা বলিতেন। এই মোকদ্দমায় বড় বড় সাহেব, রাজা, জমিদার, সরকারী উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারিগণ সাক্ষী ছিলেন। এরূপ চাঞ্চল্যকর মোকদ্দমা হুগলী জেলায় আর হয় নাই।

প্রতাপচাঁদ বর্দ্ধমানের মহারাজা তেজচন্দ্রের জ্যেষ্ঠপুত্র—নানকী মহারাণীর একমাত্র পুত্র। মহারাণী প্রতাপের শৈশবেই দেহত্যাগ করেন। প্রতাপের কতকগুলি দোষও ছিল—গুণের ভাগ অধিক ছিল। প্রতাপ কোন একটা মহাপাতক করিয়াছিলেন, সেই জন্য পণ্ডিতরা ব্যবস্থা দেন যে, ১৪ বৎসর অজ্ঞাতবাসই প্রায়শ্চিত্ত। প্রতাপ এই প্রায়শ্চিত্ত মানিয়া লইলেন। প্রতাপ বাড়ী হইতে পলাইলেন। কিন্তু মহারাজ তেজচন্দ্র তাঁহার সন্ধান পাইয়া রাজমহল হইতে তাঁহাকে ধরিয়া আনিলেন। এইখানেই বলিয়া রাখি, প্রতাপ এক জন হঠযোগী ছিলেন। তিনি অসুখের ভাণ করিতে পারিতেন, এমন কি, মৃত্যুর ভাণও করিতে পারিতেন। ডাক্তার-কবিরাজ কিছুতেই উহা ভাণ কি সত্য ধরিতে পারিতেন না।

এক দিন স্নানান্তে প্রতাপ জ্বরের ভাণ করিলেন। জ্বর ক্রমে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ডাক্তার-কবিরাজ আসিলেন, কেহই কিছু করিতে পারিলেন না—শেষ কালনায় গঙ্গাযাত্রার ব্যবস্থা হইল। মহারাজ সঙ্গে যান নাই। গঙ্গার ঘাট কানটে ঘেরা হইল। রাত্রিতে মৃত্যুর কথা রাষ্ট হইল। প্রতাপ কিন্তু পলাইলেন।

প্রতাপের পলায়নের পর মহারাজ প্রায়ই বলিতেন—"প্রতাপ আবার আসিবে।" লোকে বলিত, মহারাজ শোকার্ত্ত হইয়াই ঐ কথা বলিতেছেন। প্রতাপ তখন পূর্ণযুবা।

১৪ বৎসর অতীত হইলে ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে এক জন সন্ন্যাসী বর্দ্ধমানে প্রবেশ করিলেন। এইখানে গোপীনাথ ময়রা প্রথম তাঁহাকে চিনিয়া ফেলিল। চারিদিকে কথা ছড়াইয়া পড়িল। মহারাজা ইহার ৭।৮ বৎসর পূর্ব্বেই দেহত্যাগ করিয়াছেন। মহারাজার শ্যালক (এবং শ্বশুরও বটে, কারণ, শ্যালক-কন্যাকে তিনি বৃদ্ধবয়সে বিবাহ করেন) পরাণ বাবু (পুরাতন সংবাদপত্রে প্রাণবাবু উল্লেখ আছে) লাঠিয়াল লাগাইয়া সন্ন্যাসীকে দামোদর নদ পার করিয়া তাড়াইয়া দিলেন। মহারাজার মৃত্যুর পূর্ব্বে মহারাজ তেজচন্দ্র পরাণবাবুর নাবালক পুত্রকে পোষ্যপুত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন। পরাণবাবুই তাঁহার অভিভাবকরূপে কার্য্য চালাইতেছিলেন।

প্রতাপ বিষ্ণুপুরের রাজার নিকট চলিয়া গেলেন—তিনি প্রতাপকে চিনিয়া বিশেষ যত্ন করিয়া আশ্রয় দিলেন। সেখানে ৩ মাস রহিলেন। রাজা পরামর্শ দিলেন, বাঁকুড়ার ম্যাজিষ্ট্রেটের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহার হুকুম লইয়া বর্দ্ধমানে যাওয়াই শ্রেয়ঃ। প্রতাপ সন্ন্যাসিবেশেই বাঁকুড়া গেলেন। ম্যাজিষ্ট্রেটের ডাকবাংলোর কাছে একটি তেঁতুলতলায় সাহেবের প্রতীক্ষায় বসিয়া রহিলেন। এই সময় বাঁকুড়ায় জঙ্গলী লোকের একটি বিদ্রোহ হয়। সেজন্য ফৌজও আসিয়াছিল। ইতিমধ্যে চারিদিকে রাষ্ট হইয়াছিল যে, বর্দ্ধমান-রাজকুমার প্রতাপ দেশে ফিরিয়াছেন—রাজা ক্ষেত্রনাথ সিংহ তাঁহাকে চিনিয়াছেন। সুতরাং চারিদিক হইতে ঐ সন্ন্যাসীকে দেখিবার জন্য জনতা হইতে লাগিল। ম্যাজিষ্ট্রেট ইলিয়েট বলিলেন, ঐ ফকিরই 'আলেক সা' বিদ্রোহীর নেতা। ফৌজের কর্ত্তা লিটিল সাহেব যুদ্ধে আসিলেন। সন্ন্যাসীকে গ্রেপ্তার করা হইল। বিচারের দরকার হইল না। প্রতাপকে জেলে দেওয়া হইল। লিটিল সাহেবের বীরত্ব সংবাদপত্রে ঘোষিত হইল। এই ঘটনা ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে হয়। প্রতাপের দুর্ভাগ্যের এটি তৃতীয় পর্ব্ব—প্রথম পর্ব্ব সন্ন্যাসী হওয়া ; দ্বিতীয় পর্ব্ব বর্দ্ধমান হইতে তাড়িত হওয়া।

কয়েকমাস জেলে থাকিয়া মুক্তিলাভ করিয়া প্রতাপ কলিকাতায় গেলেন। সেখানে বন্ধুদের সহিত পরামর্শ করিয়া স্থির হইল, নৌকাযোগে কোন আড়ম্বর না করিয়া প্রতাপ বর্দ্ধমান যাইবেন। এই সময় ১৩ই ফেব্রুয়ারী ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে প্রতাপ ডেপুটী গভর্ণর আলেকজাণ্ডার রস্ সাহেবকে এক দরখাস্ত করেন যে, বর্দ্ধমানে যাইলে যেন তাঁহাকে উপযুক্ত সাহায্য দেওয়া হয়,

* সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত "জাল প্রতাপচাঁদ" ও Hooghley Past and Present পুস্তক হইতে মর্ম্ম গৃহীত হইল।

† ২২।১২।১৮৫২ সালের "সংবাদপূর্ণচন্দ্রোদয়ে" উহা পাইবেন।

যাহাতে তাঁহার কোন বিপদ বা প্রাণহানি না হয়। কিন্তু ৫ই মার্চ্চ গভর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী মিঃ ফ্রেড্রিক হ্যালিডে (পরে ছোটলাট হইয়াছিলেন) ঐ দরখাস্ত নামঞ্জুর করেন। তবুও প্রতাপ ভগ্ন-মনোরথ না হইয়া বর্দ্ধমান যাত্রা করিলেন। আড়ম্বর খুব কমই হইল। তবুও ৪০।৫০ খানি নৌকা এবং ২।৩ খানি বজরা লইয়া তিনি প্রথম কালনায় ১৩।৪।১৮৩৮ তারিখে পৌছিলেন। তাঁহার উকিল 'শ' সাহেব ও সিঙ্গুরের নবাববাবু (শ্রীনাথবাবু) স্থলপথে যাত্রা করিলেন। ইহা ২রা বৈশাখের ঘটনা। পরাণ বাবুও ঐ সংবাদ পাইয়াছিলেন। তিনি প্যারীলাল নামে জনৈক ক্ষত্রিয়কে কালনায় পাঠাইলেন। তাহার বন্দোবস্তে, প্রতাপ যখন কালনায় পৌছিলেন (৮ই বৈশাখ), তখন প্রতাপের লোকজনকে খাদ্যদ্রব্য বিক্রয় করা হইল না। প্যারীলাল পুলিসকে হাত করিলেন এবং এক জন দেশী খৃষ্টানকে হাত করিলেন। প্রতাপ যখন কালনায় অবতরণ করিয়া চারিদিকে ঘুরিতে লাগিলেন, তখন দারোগা মহিবুল্লা * লোকজন লইয়া চলিলেন, হটো হটো শব্দে দিগন্ত কাঁপাইলেন। ম্যাজিষ্ট্রেট, পাদরী আলেকজাণ্ডার সাহেবকে ঐ বিষয় জানিবার জন্ত পত্র দিলেন এবং একটু নজর রাখিতে অনুরোধ করিলেন। পাদরী সাহেব তাঁহার জনৈক খৃষ্টানকে ঐ বিষয়ের তদন্ত করিতে বলিলেন। ঐ খৃষ্টান (যাহাকে প্যারীলাল হস্তগত করিয়াছিল) যাহা বলিল, পাদরী সাহেব তাহাই ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবকে জানাইলেন। তিনি রিপোর্ট দিলেন, প্রতাপ উন্মুক্ত অসি হস্তে † এক শত অস্ত্রধারী, তাহার দ্বিগুণ লাঠীয়াল ও প্রায় ৪।৫ হাজার লোক লইয়া আইন-বিরুদ্ধ জনতার সৃষ্টি করিয়াছিল। কর্ম্মঠ দারোগা মহিবুল্লা উহাদিগকে বাধা দিয়াছে! এই সময় উকিল 'শ' সাহেব ম্যাজিষ্ট্রেটকে প্রতাপ সম্বন্ধে জানাইবার জন্ত আসিয়াছিলেন। প্রতাপকে ও শ সাহেবকে গ্রেপ্তার করা হইল। শুধু তাহাই নহে, প্রায় ৩।৪ শত অধিবাসীকেও ধরা হইল। তাহাদের মধ্যে বৃদ্ধা স্ত্রীলোকগণও বাদ পড়ে নাই। সকলেরই চালান হইল হুগলীতে। শ সাহেব, সাহেব বলিয়া অতি কষ্টে রেহাই পাইলেন। খবরের কাগজে উঠিল, কালনায় একটা মস্ত বিদ্রোহ হইয়াছিল—বিদ্রোহীরা গ্রেপ্তার হইয়াছে।

স্যামুয়েল সাহেব হুগলীর ম্যাজিষ্ট্রেট—কিছুদিন পূর্ব্বে বর্দ্ধমানে ছিলেন। পরাণ বাবুর সহিত তাঁহার বিশেষ পরিচয় হইয়াছিল। প্রতাপ যখন প্রথম বর্দ্ধমানে গিয়াছিলেন, স্যামুয়েল সাহেব তখন বর্দ্ধমানে ছিলেন। পরাণ বাবু তাঁহাকে বুঝাইয়াছিলেন, প্রতাপ এক জন জুয়াচোর। এখন প্রতাপকে হাতে পাইলেন। ইতিপূর্ব্বে গোয়াড়ির শ্যামলাল ব্রহ্মচারীর পুত্র কৃষ্ণলাল নামে এক জন জুয়াচোর ৪।৫ বৎসর নিরুদ্দেশ হইয়াছিল। এখন সেই ব্যক্তিই জালরাজা সাজিয়াছে, অতএব সনাক্তের জন্ত নদীয়ার ম্যাজিষ্ট্রেট হালকোট সাহেবকে পত্র দিলেন। হালকোট সাহেব লোক পাঠাইলেন, কিন্তু তাহারা কৃষ্ণলাল বলিয়া সনাক্ত করিতে পারিল না। সুতরাং পুনরায় চিঠি গেল। এবার সরকারী কর্ম্মচারীদিগকে পাঠান হইল।

* Mohiboollah, the worthy Darogah of Culna, the constituded authority who can neither read nor write, nor walk nor run" (এত বড় কর্ম্মঠ) "Petition to the Nizamut Audalot."

† প্রতাপ ক্ষত্রিয় রাজকুমার, সেজন্ত তরবারি সঙ্গে থাকিত।

এই সময় কলিকাতা দ্বারিকানাথ ঠাকুরকে স্যামুয়েল সাহেব এক পত্র দিলেন। * তখনকার দিনে সাক্ষীর জবানবন্দী কাহাকেও শুনান হইত না। অনেক সময় আসামীর অনুপস্থিতে সাক্ষী লওয়া হইত। জালরাজার বিরুদ্ধের সাক্ষীদের জবানবন্দী 'সমাচার দর্পণে' ছাপা হইত এবং গ্রামে গ্রামে পাঠান হইত; কিন্তু জালরাজার স্বপক্ষের সাক্ষীদের জবানবন্দী কোথাও পাঠান হইত না।

স্যামুয়েল সাহেব ১লা সেপ্টেম্বর জালরাজার মোকদ্দমা আরম্ভ করেন। জালরাজাকে বলিলেন, "তুমি আপনার নাম গোপন করিয়া অসৎ অভিপ্রায়ে মহারাজাধিরাজ প্রতাপচাঁদ নাম ব্যবহার করিয়াছ। সেই জন্ত তোমাকে আসামী করা হইয়াছে।" রাজা অবাক্। ইহার কিছুদিন পূর্ব্বে কালনায় তাঁহাকে প্রতাপচাঁদ বলিয়া অন্যায় জনতার সৃষ্টি করা অপরাধে গ্রেপ্তার করা হইল আর এখন জালরাজা! ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব বলিলেন, অপরাধ গুরুতর,—জামিন দেওয়া হইবে না—চারি মাস হাজতে কাটিল। আরও আশ্চর্য্য এই যে, প্রতাপের নাম ব্যবহার করায় যাহাদের ক্ষতি হইবে, তাহারা কেহ নালিশ করিল না, পরাণ বাবু নালিশ করিলেন না, তবে গবর্ণমেণ্টের এত কি গরজ, এই কথা লোকে বলিতে লাগিল।

তিন বিষয়ের সাক্ষ্য লওয়া হইয়াছিল। ১ম জালরাজার সনাক্ত সম্বন্ধে, ২য় প্রতাপের মৃত্যু সম্বন্ধে, ৩য় জালরাজা গোয়াড়ির কৃষ্ণলাল কি না? এই তিন চার্জ্জ দিয়া দায়রা-সোপর্দ্দ করা হইল। প্রতাপের সঙ্গে আরও কয়েক জনকে আসামী করিয়া গেপ্তার করা হইল, যথা—রাধাকৃষ্ণ ঘোষাল (প্রতাপের মোক্তার), হাফেজ ফতেউল্লা, সাগরচন্দ্র ধর, কালীপ্রসাদ সিং, জুমন খাঁ ও রাজা নরহরিচন্দ্র। গবর্ণমেণ্ট প্রায় ৬ মাস পূর্ব্বে বিগনেল সাহেবকে ৫০০৲ টাকা বেতনে ডেপুটী লিগাল রিমেমব্রেনসার নিযুক্ত করিয়াছিলেন। হালিডে সাহেব তাঁহাকে পাঠাইয়াছিলেন। মর্টন সাহেব ও শ সাহেব আসামীর পক্ষে ছিলেন। মর্টন সাহেব ম্যাজিষ্ট্রেটকে দরখাস্ত করিলেন যে, তিনি আসামীর পক্ষে থাকিবেন,

* My dear Dwarkanath—I was disappointed at your non-arrival, as I think you could speak more decidedly than any of the other witnesses to the man's non-identity, but it is not of much consequence. I have no objection to make a bargain with you. I will let you off altogether, if you will procure me the names of half a dozen good respectable witnesses from Baranagore, who know him as Kristolal. I dare say you could do this through Kalinath Roy Choudhury, Mathuranath Mukerjee or any of your own servants. Let me know what you say to this. What scoundrel that Buddinath Roy is! If I had known his character, I wonld rather have gone without evidence altogether than have had his.

Remember I must have the evidence from Baranagore within a week or so. Persuade Mathooranath also to come. His hoormut and izzut shall be nereck soorut se vahal.

4th. Sept. 1838 Hooghly. Yours truly
E. A. Samuells

তাহাতে তাঁহার আপত্তি আছে কি না? ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব বিগনেল সাহেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন। বিগনেল সাহেব বলিলেন, গবর্ণমেণ্ট সেরূপ কোন আপত্তি করিতে নিষেধ করিয়াছেন। মর্টনের দরখাস্ত মঞ্জুর হইল। আদালতে চিনারি (এক জন ফরাসী চিত্রকর প্রতাপের চেহারা অঙ্কিত করিয়াছিল) অঙ্কিত প্রতাপের ছবি আনা হইল।

প্রথমে গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদের লোকদের সাক্ষী পাঠাইলেন। সেক্রেটারী প্রিন্সেপ, দেওয়ানীর জজ হাচিসন, বোর্ডের মেম্বার প্যাটেল ঐরাবতী জাহাজে চড়িয়া হুগলী আসিলেন। দ্বারিকানাথ ঠাকুর নিজের ষ্টীমারে হুগলী আসিলেন।

সনাক্ত:—গবর্ণমেণ্ট সাক্ষী C. T. Trower বলিলেন, অপর ঘরে যে ছবি আছে, তাহা দেখিবামাত্র প্রতাপকে মনে পড়ে; কিন্তু এ আসামী প্রতাপ নহে। প্রতাপের চক্ষু কটা ছিল, এই ব্যক্তির চক্ষু লাল।...কিন্তু ডাক্তার হ্যালিডে (তখন তিনি কাশীতে ছিলেন) বলিয়াছিলেন, এই আসামীই প্রতাপচাঁদ। দায়রায় বলিলেন, এই আসামী কখনই প্রতাপ নহে।

প্রিন্সেপ সাহেব (গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী) বলিলেন, প্রতাপ বেঁটে ছিলেন, এ লোকটা লম্বা। দায়রায় বলিলেন যে, জেনারল আলার্ড (রণজিৎ সিংহের সেনাপতি) ফ্রান্স হইতে ফিরিয়া আসিলে পর আমায় এক দিন বলিয়াছিলেন, লাহোরের নিকট আসামীর সঙ্গে অনেক দিন তাঁহার সাক্ষাৎ হইয়াছিল, আসামী তখন ফকিরের বেশে বেড়াইতেন।

প্যাটেল সাহেব (James Patel বোর্ডের মেম্বর) বলিলেন, "এই ছবির সহিত আসামীর কোন সাদৃশ্য নাই।"

বিচার সাহেব (John Beecher) বলিলেন, "মাপিয়া দেখিলাম, ছবির প্রতাপ আর আসামী প্রতাপ একইরূপ লম্বা। দায়রায় এই সাক্ষীকে সাক্ষী দেওয়া হয় নাই।

ওভারবিক (D. A. Overbeck) সাহেব ওলন্দাজগবর্ণর প্রতাপের ছবি দেখিয়া বলিলেন, "এখন আমি আসামীকে চিনিলাম, —ইনি আমার পূর্ব্বপরিচিত ছোট রাজা...তাঁহার দক্ষিণ চক্ষুর বামভাগে মেহগ্নিরঙের একটি ক্ষুদ্র দাগ ছিল। তিনি উর্দ্ধে চাহিলে সেটি দেখা যাইত। এই আসামীর ঠিক সেইখানে সেই দাগ আছে।......

দ্বারিকানাথ ঠাকুর বলিলেন, "প্রতাপচাঁদের সহিত আমার বড় বন্ধুত্ব ছিল...প্রতাপের ছবি আদালতে দেখিলাম, তাহার সঙ্গে এই আসামীর সাদৃশ্য আছে। আমি ঠিক বলিতে পারি না, এই আসামী প্রতাপচাঁদ কি না, তবে আমার বোধ হয়, ইনি প্রতাপচাঁদ নহেন।

রাজা বৈদ্যনাথ বলিলেন, ইহাকে প্রতাপ মনে করিয়াছি, টাকা কর্জ্জ দিয়াছি। ডাঃ হ্যালিডে জেনারল আলার্ড এইরূপই বলিয়াছিলেন—এই সেই প্রতাপচাঁদ।

গোপীমোহন দেব বলিলেন, "এ ব্যক্তি নিশ্চয়ই প্রতাপচাঁদ।" পরাণ বাবুর সকল সাক্ষীই বলিল—এ প্রতাপচাঁদ নহে।

সনাক্ত সম্বন্ধে আসামী প্রতাপচাঁদের সাক্ষী:—

ডাক্তার স্কট (Robert Scott 37th Madras Native Infantry) বলিলেন, "আমি ১৮১০ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮১৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বর্দ্ধমানে ছিলাম।...প্রতাপের সমস্ত লক্ষণ দেখিয়া বলিতেছি, এই সেই প্রতাপচাঁদ।

রিডলি (John Ridley), বিবি হ্যারিয়েট, সফিয়াক্রেন, ফ্রানসুয়া সুলিমান (ফরাসী), হাজী আবু তালেক, আমীর উদ্দীন, আগা আব্বাস, ডেভিড হেয়ার, রাজা ক্ষেত্রমোহন সিংহ (বীরভূমের রাজা) সকলেই বলিলেন—এই সেই প্রতাপচাঁদ।

পরাণ বাবুর লোকরা প্রতাপের মৃত্যুর তারিখ পর্য্যন্ত বলিয়াছিল, কিন্তু তাহার বারো বৎসর পরে মহারাজা তেজচন্দ্রের মৃত্যুর খবর বলিতে পারে নাই। প্রতাপ যে মৃত্যুর ভাণ করিতে পারিতেন তাহা অনেক বড় বড় ডাক্তার বলিয়াছিলেন। প্রতাপ বলিলেন, তিনি মৃত্যুর ভাণ করিয়া পলাইয়াছিলেন। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব তাহা বিশ্বাস করিলেন না। এই মোকদ্দমা যখন চলিতেছিল, তখন "হরকরা" কাগজে লেখে—"Some curious evidence transpired concerning the portrait that novel mute witness—the prosecution certainly seen to have unwittingly subpraonaed in this portrait a rather hostile witness...Long odds in favor in the Raja and no takers. Prawn Babu is quite a Dark horse however; and may prove a winner. পরাণ বাবুর সাক্ষীদের কথায় ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব বিশ্বাস করিয়া বলিলেন, The proof here is of the strongest description of the witnesses. নিজামত আদালতে প্রতাপ জামিন দিয়া খালাস চাহিলেন, সে হুকুমও হইল, কিন্তু কার্টিস সাহেব নিজামতের হুকুম শুনিলেন না। যাহারা জাল রাজার সঙ্গে জেলে গিয়াছিল, তাহাদের ৭ মাস পরে ছাড়িয়া দেওয়া হইল।

মোকদ্দমার রায়:—এই সময় হুগলীর জজ সাহেব জাল রাজার সম্বন্ধে যে এস্তেমেজাজ করিয়াছিলেন, তাহা নিজামত আদালতে পেস করা হইল। জজরা বড় বিপদে পড়িলেন; ভাবিলেন, আসামীকে কি করিয়া সাজা দেওয়া যায়? শেষ কাজী সাহেব রক্ষা করিলেন। তিনি বলিলেন যে, আত্ম-উপকারের নিমিত্ত যদি কেহ অন্যের নাম ব্যবহার করে, তাহা হইলে মহম্মদী ব্যবস্থানুসারে সে ব্যক্তি অপরাধী। জজরা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিলেন—হুকুম দিলেন যে, মৃত মহারাজাধিরাজ প্রতাপচাঁদ বাহাদুরের নাম ব্যবহার করার নিমিত্ত আসামী আলেকশা ওরফে প্রতাপচাঁদ ওরফে কৃষ্ণলাল ব্রহ্মচারীর এক হাজার টাকা জরিমানা করা গেল এবং অনাদায়ে ছয় মাস কারাবাস হইবে। আরও প্রকাশ থাকে যে, অন্যান্য চার্জ্জ হইতে তাহাকে মুক্তি দেওয়া গেল। এই রায়ের উপর প্রতাপ দরখাস্ত করিলেন, নিজামত আদালত উহা অগ্রাহ্য করিলেন। নিজামত আদালত হুকুম দিলেন, মোকদ্দমা নিষ্পত্তি হইয়া গিয়াছে এক্ষণে আর এ সম্বন্ধে কোন কথা শুনা যাইবে না। দরখাস্তকারী ভবিষ্যতে প্রতাপচাঁদ বলিয়া দরখাস্ত করিলে তাহা আর গ্রহণ করা হইবে না। কেন না, বিচারে নিষ্পত্তি হইয়া গিয়াছে যে, দরখাস্তকারী প্রতাপচাঁদ নহে। এই হুকুমই প্রতাপের সর্ব্বনাশের মূল। প্রতাপের সকল পথ বন্ধ হইল। প্রতাপ যে ফকির, সেই ফকিরই হইলেন। প্রতাপের মোকদ্দমা শেষ হয় ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দের ২০শে সেপ্টেম্বর।

শেষ যবনিকা:—প্রতাপ কিছুদিন কলিকাতার চাঁপাতলায় ছিলেন। তাহার পর কলুটোলায় গোবিন্দ প্রামাণিকের বাটীতে

২৩ মাস ছিলেন। গোবিন্দ প্রতাপের জন্য সর্ব্বস্ব ব্যয় করিয়াছিলেন। পরে কিছুদিন শ্যামপুকুরে ছিলেন। ঐ সময় লাহোরে লড়াই বাধে। গভর্ণমেণ্ট প্রতাপের উপর তীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখিতে লাগিলেন। তিনি অগত্যা ফরাসী চন্দননগরের বোড়াই চণ্ডীতলায় আসিয়া বাস করিলেন। তাহার পর তিনি শ্রীরামপুরে আসেন। তখন শ্রীরামপুর দিনেমারদের অধিকারে। এখানে ৬।৭ বৎসর ছিলেন। এই সময় তিনি ঠাকুর সাজিয়া সমস্ত দিন ঝারায় বসিয়া থাকিতেন। বেশ্যারা পঞ্চপ্রদীপ লইয়া তাঁহাকে সন্ধ্যার সময় আরত্রিক করিত। প্রতাপ বিশিষ্ট বুদ্ধিমান, শাস্ত্রজ্ঞ ও রাজনীতিক ছিলেন। তিনি ফরাসী ও রুস রাজনীতি সকলকে বুঝাইতেন। বেদান্ত লইয়া পণ্ডিতদিগের সহিত আলোচনা ও মীমাংসা করিতেন। লোকের ধারণা হইয়াছিল, তিনি সাক্ষাৎ দেবতা। এই সময় তাঁহার অনেক মন্ত্র-শিষ্যও হইয়াছিল। তিনিই বর্ত্তমান "ঘোষপাড়ার দলের" সৃষ্টিকর্ত্তা। মৃত্যুর আট মাস পূর্ব্বে বরাহনগরে আসিয়া বাস করেন। ১৮৫২ কিম্বা ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে * ময়রাডাঙ্গার পল্লীতে দুই তিনটি লোক-পরিবেষ্টিত হইয়া তাঁহার প্রাক্তন কর্ম্মফল শেষ হয়। তাঁহার শবযাত্রার সময় চোখের জল ফেলিবার কেহ ছিল না। তাই বলি, হে পুরুষকার, তুমি কিছুই নও। তোমায় আশ্রয় করিয়া মানুষ ক্ষতবিক্ষত হইয়া থাকে, শেষ মনস্তাপ ভোগ করিয়া ইহলীলা সম্বরণ করে! তাই বলি "বিধিরহো বলবান্ ইতি মে মতিঃ!"

পুরাতন সংবাদপত্রে প্রতাপের কথা

"জেনেরল আলার্ড ও বর্দ্ধমানের রাজা"

"জ্ঞানান্বেষণ প্রকাশিত এক পত্রে লেখে যে শ্রীযুত জেনারল আলার্ড সাহেব † ভগলীর কারাগারে যাইয়া রাজা যিনি কারাগারে বদ্ধ আছেন, তাঁহাকে সম্পূর্ণরূপে চিনিলেন; অনুমান তিন ঘণ্টা বেলার সময়ে শ্রীযুত সৈন্যাধিপতি তত্রস্থ কয়েক জন সাহেবের সমভিব্যাহারে কারাগারে প্রবেশ করিবাতে রাজা তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে চিনিয়া সমাদর পূর্ব্বক চৌকিতে বসাইলেন, পরে অনেক কথোপকথন হইল, তাহাতে শ্রীযুত কহিলেন যে, তোমার দুর্ভাগ্য দেখিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলাম এবং সাধ্যমত যদি কোন সাহায্য করিতে পারি, তবে করিব। অনন্তর বেলা ৪।৫টার সময়ে শ্রীযুত প্রস্থান করিলেন। ১১২১ সংখ্যা কলম ১৯, ৭ই জানুয়ারী ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দ "সমাচার দর্পণ" হইতে উদ্ধৃত।

"শ্রীযুত জ্ঞানান্বেষণ-সম্পাদক মহাশয়েষু"

"শ্রীযুত জেনারল আলার্ড সাহেব যে ভগলীর কারাগারে শ্রীযুত মহারাজ প্রতাপচন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন, আপনি এই সংবাদ প্রকাশ করিয়াছেন; কিন্তু তাহার বিস্তারিত বিবরণ প্রকাশ হয় নাই, অতএব আমি বিশেষ করিয়া লিখিতেছি অনুগ্রহ পূর্ব্বক জ্ঞানান্বেষণে অর্পণ করিবেন।

ঐ শ্রীযুত জেনরল সাহেব কলিকাতাতে আসিয়া প্রথমে শ্রীযুত মহারাজের উকীলের বাসাতে লোক প্রেরণ করেন, তাহাতে উকিলবাবু শ্রীযুত রাধাকৃষ্ণ ঘোষাল সাহেবের গরে গিয়া সাক্ষাৎ করিবাতে সাহেব রাজার সমাচার জিজ্ঞাসা করিয়া কহিলেন, তুমি সন্ন্যাসীর নিকট গিয়া আমার সংবাদ জ্ঞাপন কর এবং তিনি যদি পত্র লেখেন তবে আমি তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে যাইব। পরে শ্রীযুত রাধাকৃষ্ণ ঘোষাল ৬ই পৌষ ভগলীতে গিয়া শ্রীযুত মহারাজকে সংবাদ কহিবাতে শ্রীযুত মহারাজ তৎক্ষণাৎ সাহেবকে পত্র লেখেন, তাহারই পরে সাহেব হুগলীতে গমন করেন।

শ্রীযুত জেনরল সাহেব হুগলীতে উত্তীর্ণ হইলে পর শ্রীযুত মহারাজ সাহেবকে সমাদর পূর্ব্বক গ্রহণার্থ রাধাকৃষ্ণ ঘোষালকে অগ্রে পাঠাইয়া দিলেন এবং শ্রীযুত সাহেব কারাগারের মধ্যে প্রবিষ্ট হইলে রাজা আপন বাসগৃহের বাহিরে আসিয়া সাহেবকে গ্রহণ করেন। প্রথম সাক্ষাতে সাহেব রাজাকে অগ্রে সেলাম করিলেন, পরে মহারাজ শ্রীযুতের হস্তধারণ পূর্ব্বক বক্ষঃস্থলে রাখিয়া আলিঙ্গন পূর্ব্বক শিষ্টাচার করত গৃহের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া বসিলেন, পরে সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনকার এরূপ দুর্দ্দশা কেন হইল? তাহাতে রাজা কহিলেন, 'আমার অসৌভাগ্যের কথা কেন জিজ্ঞাসা করেন? পাঞ্জাব হইতে আসিয়া কতক লোক সহিত আপন বাটীতে যাইতেছিলাম, এই অপরাধে বাঁকুড়ার ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব সঙ্গী লোকদিগের সহিত আমাকে কয়েদ করেন এবং সেইখানে ছয় সাত মাস কারাভোগ করিয়া দোষী লোকের ন্যায় ধৃত হইয়া ভগলীতে আসিয়াছিলাম, তাহাতে ভরসা ছিল, ভগলীতে আসিয়া খালাস পাইব; কিন্তু গ্রহবৈগুণ্য প্রযুক্ত এখানেও ছয় মাসের মিয়াদে কয়েদ হইয়াছি।"

শ্রীযুত রাজার ঐ সকল কাতরোক্তি শ্রবণে শ্রীযুত জেনরল আলার্ড সাহেব যে পর্য্যন্ত খেদ প্রকাশ করিলেন, আমি তাহা এ স্থলে বিস্তারিত করিয়া লিখিতে পারিলাম না। কিন্তু তিনি ঐ দিবস সন্ধ্যার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে যখন প্রত্যাগমন করেন, তখন শ্রীযুত রাজার হাত ধরিয়া কহিলেন, "আমি আপনার নিমিত্ত সাধ্যানুসারে চেষ্টা করিব এবং শ্রীযুত মহারাজ রণজিৎ সিংহের নিকট যে পত্রাদি লিখিত হইবে, তাহা প্রস্তুত করিয়া রাখিবেন, আমি আরও এক দিবস আসিয়া তাহা লইয়া যাইব।" সম্পাদক মহাশয়, ঐ দিবস শ্রীযুত জেনরল সাহেব কারাগারে প্রবিষ্ট হইবার পূর্ব্বাবধি কারাগারের চতুর্দ্দিকে ন্যূনাধিক তিন সহস্র লোক দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন এবং কারাগারের বাহিরে আসিবামাত্র ঐ লোকসমূহ সাহেবকে বলিতে লাগিলেন, আমরা ভাবিয়াছিলাম, আপনি শ্রীযুত মহারাজকে খালাস করিতে আসিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা না করিয়া মহাশয় চলিলেন। অতএব আমরা নিরাশ হইয়া মহাশয়কে অনুরোধ করিতেছি, যাহাতে রাজা খালাস হইয়া সিংহাসন প্রাপ্ত হইতে পারেন, আপনি অবশ্য তাহার চেষ্টা করেন। ...শ্রীযুত মহারাজ প্রতাপচন্দ্র এইক্ষণে বলিতেছেন, তিনি পঞ্জাবে থাকিতে শ্রীযুত শীকরাজ বর্দ্ধমানের বৃদ্ধ মহারাজকে যুবরাজের বিষয়ে এক পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহাতে বৃদ্ধ মহারাজ উত্তর লিখিয়া পঞ্জাব হইতে লালকবুতর আনিবার জন্য রণজিৎ সিংহের নিকট তিন জন আর্দ্দালী পাঠাইয়া দেন। সেই সময়ে বধুরাণীদিগের সহিত বিবাদ উপস্থিত হইয়াছিল, তাহার পরে শীকরাজা লালকবুতর শব্দের সঙ্কেতার্থ বুঝিয়া শ্রীযুত যুবরাজের বিশেষ সমাচার লিখিয়া ঐ তিন আর্দ্দালীকে

---

* জাল প্রতাপচাঁদে ঐ সাল লেখা আছে। কিন্তু Hooghly Past and Presentএ ১৮৫৩ সাল লেখা আছে।

† মহারাজ পঞ্জাবকেশরী রণজিৎসিংহের প্রধান সেনাপতি—ইনি ফরাসী ছিলেন।

বন্ধমান পাঠাইয়া দেন এবং ঐ পত্র আসিবামাত্রই বৃদ্ধ মহারাজ বধূরাণীদিগের সহিত আপস করেন এবং বধূরাণীরাও সেই পত্রের মর্ম্মার্থ শুনিয়া মুশহেরা পাইয়া চুপ করিয়াছিলেন, পরে বৃদ্ধ মহারাজ ঐ পত্র কোন গোপন স্থানে রাখিয়া যান ; কিন্তু লোকেরা এই সকল গোপন বিষয় জানে না। শ্রীযুত যুবরাজ কহেন, ঐ পত্র তাঁহার হস্তে আসিয়াছে, যদি গবর্ণমেণ্ট তাঁহার পক্ষে সুবিচার করেন, তবে ঐ পত্র এবং আরও অনেক দলিল গবর্ণমেণ্টকে দেখাইবেন, আর যদি তাহা না করেন, তবে ফকির ভাবেই থাকিয়া দেখিবেন।

এইক্ষণে কতিপয় পুরাতন আমলা আসিয়া যুবরাজের শরণাগত হইয়াছেন এবং বৃদ্ধ মহারাজ শীকরাজার নিকট যে তিন জন আৰ্দ্দালী পাঠাইয়াছিলেন, তাহারাও বর্ত্তমান আছে। অতএব যদি গবর্ণমেণ্ট সাক্ষ্যের অপেক্ষা করেন, তবে শ্রীযুত রাজার পক্ষে সাক্ষী অনেক পাইবেন এবং পূর্ব্বে সন্দেহ ছিল, ছয় মাস কয়েদ উত্তীর্ণ হইলেও শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র জামিন দিতে পারিবেন না। অতএব পুনরায় কয়েদ থাকিতে হইবেক, কিন্তু এইক্ষণে সে সন্দেহ দূর হইয়াছে, অনেক ভদ্র ভাগ্যধর লোক জামীন হইতে প্রস্তুত আছেন, আর এক মাস পরেই তাঁহার ব্যক্ত হইবেন, বিশেষতঃ শ্রীযুত জেনরল আলার্ড সাহেবের সুযোগে অনেক ইঙ্গরেজও পক্ষ হইয়াছেন।"...জ্ঞানান্বেষণ ; ১১২২ সংখ্যা কলম ১৯।১৪ জানুয়ারি ১৮৩৭ সাল "সমাচার দর্পণ"।

শ্রীউপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (জ্যোতীরত্ন)

সিংহলে সংস্কৃত-চর্চ্চা

কোন্ যুগে কি ভাবে ভারতের দেবভাষা সংস্কৃত সমুদ্র পার হইয়া সুদূর সিংহলে আপনার গৌরবের আসনে অধিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহার ইতিহাস নাই। রামের সিংহলযাত্রার সাক্ষী রামায়ণ, বিজয়সিংহের মহাবংশ, কিন্তু দেবভাষার অন্য সাক্ষী নাই, সে নিজেই কালের আবর্ত্তন উপেক্ষা করিয়া নিজের সাক্ষ্য বহন করিতেছে। মুখর মহাবংশ বিজয়সিংহের সিংহল-বিজয়ের পূর্ব্বক্ষণ হইতে আরম্ভ করিয়া জয়সিংহের হাতে সিংহলের সৌভাগ্য-রবির অস্তগমন পর্য্যন্ত সিংহলের সমস্ত কথা কহিয়া গিয়াছে, কিন্তু দেবভাষার শুভ পদার্পণের দিনটা বলে নাই। তথাপি ইহা স্বীকার করিতেই হইবে, তাহার শুভ পদার্পণের তারিখ বিজয়সিংহের সিংহল বিজয়ের মতই প্রাচীন।

যাহাই হউক, সংস্কৃত সিংহলে পৌঁছিয়াই সিংহলবাসীর সমাদর পাইয়াছিল। রামের মত, কিংবা বিজয়সিংহের মত নিজের গৌরব প্রতিষ্ঠার জন্য তাহার বলপ্রয়োগের দরকার হয় নাই। রাজা প্রজা সকলের কাছে সে সমান আদর পাইয়াছে। সেই সময়ে সংস্কৃতচর্চ্চা রাজপরিবার ও ধনী সম্প্রদায়ের আভিজাত্যের বিশেষ একটি লক্ষণ ছিল। এমন কি, ভারতবর্ষ হইতে বহু বারে সংস্কৃতজ্ঞ ব্রাহ্মণ অধ্যাপনার জন্য নীত হইতেন। ভারতবর্ষ হইতে নীত ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণের নিকট রাজকুমার পণ্ডুকাভয় ও রাজকবি কুমারদাসের সংস্কৃত-শিক্ষা ইহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। পরবর্ত্তী যুগে ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের নিকট সংস্কৃত শিক্ষা সিংহলবাসীদের গৌরবের বিষয় ছিল। তাঁহাদের সংস্কৃত-শিক্ষা শুধু বেদ-বেদাঙ্গে সীমাবদ্ধ ছিল না, আয়ুর্ব্বেদ, ধনুর্ব্বেদ প্রভৃতি নানা বিদ্যায় তাঁহারা পারদর্শিতা লাভ করিতেন। এই সব বিদ্যা আয়ত্ত না করিলে বিদ্বৎ-সমাজে কাহারও স্থান হইত না। কাযেই বাধ্য হইয়া উচ্চশিক্ষার্থীদিগকে সংস্কৃত শিখিতে হইত।

যে দিন সম্রাট অশোকের প্রচারে সিংহলে প্রথম বৌদ্ধধর্ম্মের আলোক-সম্পাত হইয়াছিল, সে দিন সিংহলে নূতন যুগের সূচনা হইয়াছিল ; সিংহলবাসীদের শিরায় শিরায় নূতন উদ্যমের ধারা বহিয়াছিল। সিংহলের বিদ্যার্থিগণ বেদ-বেদাঙ্গের অধ্যয়ন ছাড়িয়া নূতন ধর্ম্মের নূতন বার্ত্তা জানিবার জন্য পালিভাষা শিক্ষায় মনোযোগ দিয়াছিলেন। তাহাতে সংস্কৃতচর্চ্চার পূর্ণ জোয়ারে ভাটা পড়িয়াছিল বটে, কিন্তু তাহার অস্তিত্ব লুপ্ত হয় নাই। আশ্চর্য্যের বিষয়, পরবর্ত্তী সময়ে সেই সংস্কৃতচর্চ্চা বৌদ্ধ মঠেই পুনরুজ্জীবিত হইল। অবহেলার পরিবর্ত্তে তাহার সমাদর বাড়িল। সংস্কৃত ও পালি দুইটিই মঠসমূহে সমভাবে পঠিত হইতে লাগিল। পরস্পরের মধ্যে যে অকাট্য সম্বন্ধ রহিয়াছে, তাহা বুঝিতে বিলম্ব হইল না। একটিকে বাদ দিয়া অপরটির শিক্ষা যে অসমাপ্ত রহিয়া যায়, তাহা তাঁহারা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিলেন। প্রাচীনদের পন্থা অবলম্বন করিয়া এখনও সিংহলের প্রত্যেক পরিবেণে বা প্রাচ্য বিদ্যালয়ে সংস্কৃত ভাষা পালির সহিত বিশেষ স্থান পাইয়াছে। প্রাচ্য বিদ্যাসমিতি নামে সিংহলে যেই গবর্ণমেণ্ট পরীক্ষা-সমিতি বিদ্যমান আছে, তাহাতেও সংস্কৃত পরীক্ষার ব্যবস্থা রহিয়াছে।

এই অব্যাহত সংস্কৃতচর্চ্চার ফলে বিভিন্ন সময়ে সিংহলের বিভিন্ন প্রদেশে বহু সিংহলবাসী সংস্কৃত-সাহিত্যে গভীর পাণ্ডিত্য অর্জ্জন করিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে কাশ্যপ, অনবমদর্শী, রত্নশ্রী জ্ঞানাচার্য্য, সুরপদ, ধর্ম্মকীর্ত্তিপদ, মৌদ্গল্লায়ন, শারীপুত্র, পরাক্রমবাহু, বনরত্ন, ধর্ম্মকীর্ত্তি, রাহুল প্রভৃতি পণ্ডিতগণের নাম উল্লেখযোগ্য। উনবিংশ শতাব্দীতে যাঁহারা সংস্কৃত-সাহিত্যে গভীর জ্ঞানের পরিচয় দিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে শ্রীসুমঙ্গল, ধর্ম্মারাম, বটুবনতুডাবে প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সিংহলের আধুনিক সংস্কৃত পণ্ডিতদের মধ্যে বাগীশ্বর, বজ্রজ্ঞান প্রভৃতি কয়েক জন সমধিক প্রসিদ্ধ।

সিংহলবাসীরা শুধু সংস্কৃত-ভাষায় ব্যুৎপত্তিলাভ করিয়া ক্ষান্ত হন নাই, সংস্কৃত-সাহিত্যে তাঁহারা যথেষ্ট দান করিয়া গিয়াছেন। তাহাতে সংস্কৃত-সাহিত্যের গৌরব বৃদ্ধি হইয়াছে সন্দেহ নাই। তাঁহাদের রচনাগুলির নাম রচয়িতার নামের সহিত নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম :—

চন্দ্রপঞ্জিকা — রত্নশ্রীজ্ঞানাচার্য্য
বালাববোধন—কাশ্যপ স্থবির
দৈবজ্ঞ কামধেনু—অনবমদর্শী
জানকীহরণ—কুমারদাস

এতদ্ব্যতীত সিংহলে নামাষ্টশতক প্রভৃতি আরও অনেকগুলি সংস্কৃত কাব্য রচিত হইয়াছিল। তাহাদের মাত্র কয়েকটি অবশিষ্ট আছে। অন্যান্য কাব্যগুলি কোথায় কি ভাবে নষ্ট হইয়াছে, তাহা বলা কঠিন।

বলা বাহুল্য, সংস্কৃতচর্চ্চার ফলে সিংহলী সাহিত্যে সংস্কৃত-প্রভাব অত্যন্ত অধিক।

শ্রীশীলানন্দ সূত্রবিশারদ।
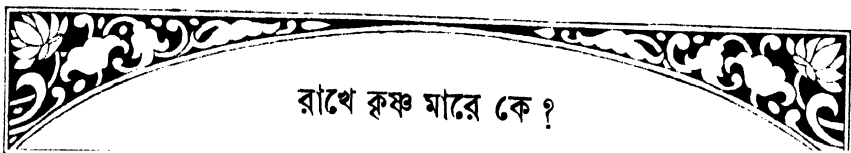
রাখে কৃষ্ণ মারে কে ?

(জার্ম্মাণ যুদ্ধসংক্রান্ত কাহিনী)

য়ুরোপীয় মহাযুদ্ধের সমসাময়িক ঘটনা। গ্রেট বৃটেন বিপন্ন। ইংলণ্ড হইতে আমেরিকায় 'স্পেশাল মিশন' পাঠাইবার প্রয়োজন অনুভূত হইয়াছে। মন্ত্রণা-সভায় স্থির হইল, মিঃ আর্থর বেল্‌ফোর এই মিশনের কর্তৃত্ব-ভার গ্রহণ করিবেন। মিঃ বেল্‌ফোর জার্ম্মাণ যুদ্ধের পর আর্ল অফ্ বেল্‌ফোর খেতাব লাভ করিয়া বৃটিশ মহামন্ত্রীর পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। শত্রুপক্ষের ষড়যন্ত্রে পুনঃপুনঃ তাঁহার জীবন বিপন্ন হইয়াছিল; কিন্তু প্রত্যেকবারই দৈবানুগ্রহে তাঁহার প্রাণরক্ষা হইয়াছিল। এই জন্য তিনি 'পঞ্চপ্রাণের অধিকারী' (the premier with five lives) বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন! শত্রুপক্ষের ষড়যন্ত্রে মিঃ বেল্‌ফোরের জীবন বিপন্ন না হয়, এজন্য স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের বহুদর্শী ও চতুর ডিটেক্টিভ মিঃ হ্যারল্ড ব্রষ্টকে তাঁহার দেহরক্ষী নিযুক্ত করা হইয়াছিল। ডিটেক্টিভ ইন্‌স্পেক্টর ব্রষ্ট মিঃ বেল্‌ফোরের দেহরক্ষী হইয়া লণ্ডন হইতে উক্ত স্পেসাল মিশনের সহিত নিউইয়র্কে যাত্রা করিয়াছিলেন। তাঁহার সতর্কতায় একাধিকবার মিঃ বেল্‌ফোর আততায়ীর ষড়যন্ত্র হইতে উদ্ধার লাভ করিয়াছিলেন। মিঃ ব্রষ্ট কিছুদিন পূর্ব্বে স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ডের কার্য্যভার ত্যাগ করিয়া অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার সতর্কতায় ও কার্য্যতৎপরতায় মিঃ বেল্‌ফোর স্বদেশে এবং দেশান্তরে শত্রুপক্ষের গুপ্তচরদের ষড়যন্ত্রের প্রভাব কি ভাবে অতিক্রম করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, সেই সকল কৌতুকাবহ বিবরণ যে-কোনও ডিটেক্টিভ উপন্যাসের ঘটনা-বৈচিত্র্যপূর্ণকাহিনী অপেক্ষা অল্প লোমাঞ্চকর নহে। মিঃ ব্রষ্ট রাজকার্য্য হইতে অবসর গ্রহণের পর সংপ্রতি লণ্ডনের কোন পত্রিকায় তাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তাঁহার বর্ণিত বিবরণের কিয়দংশ নিম্নে প্রকাশিত হইল। মিঃ ব্রষ্ট বলিয়াছেন, ইহার এক বর্ণও অতিরঞ্জিত নহে!

মিঃ হ্যারল্ড ব্রষ্ট

(প্রথম ঘটনা)

"সমরবিভাগের মন্ত্রণা-সভার (British War Cabinet.) 'মিটিং' শেষ হইল। ইংলণ্ডের সর্ব্বপ্রধান ব্যক্তিরা একটি সঙ্কীর্ণ দ্বারপথে ভীড় জমাইয়া লণ্ডনের ডাউনিং ষ্ট্রীটে বাহির হইয়া পড়িলেন।

আমি সেই গুপ্ত-সভার কোন সদস্যের দেহরক্ষার ভার পাইয়াছিলাম; তাঁহাকে নিরাপদে গৃহে ফিরিতে দেখিয়া নিশ্চিন্ত হইলাম।

কি বিপদেই দিনের পর দিন অতিবাহিত হইতেছিল! জাতীয় নেতৃবৃন্দের ভাগ্যাকাশ তখন ঘনঘটাচ্ছন্ন! আমরা স্কটল্যাণ্ডে ইয়ার্ডের 'স্পেশাল ব্র্যাঞ্চের' যে সকল কর্ম্মচারী তাঁহাদের জীবন-রক্ষার ভার পাইয়াছিলাম, সেই দায়িত্ব যে কিরূপ দুর্ব্বহ, তাহা হৃদয়ঙ্গম করিয়া উৎকণ্ঠাকুলচিত্তে কালাতিপাত করিতেছিলাম, তাঁহাদের জীবন আমাদের হস্তে অর্পিত হইয়াছিল। শতচক্ষু হইয়া প্রতি মুহূর্ত্তে আমাদিগকে ডিটেক্টিভের কর্ত্তব্য পালন করিতে হইতেছিল। স্পেশাল ব্র্যাঞ্চের কোনও কর্ম্মচারী কোন দিন প্রভাতে অনুমান করিতে পারিত না—তাহার টুপি সেই দিন রাত্রিতে কোথায় গিয়া বিশ্রাম লাভ করিবে।

এই জন্যই এক দিন 'ইয়ার্ডে' আমার কাযের রিপোর্ট দাখিল করিতে গিয়া, আমাদের বড় কর্ত্তার আদেশ শুনিয়া বিস্মিত হইলাম না। বড় কর্ত্তা বলিলেন, 'একটা ব্যাগে জিনিষপত্র গুছাইয়া লইয়া, লম্বা পাড়ি দেওয়ার জন্য প্রস্তুত হও! স্পেশাল মিশন। গন্তব্যস্থান গোপনীয়।'

আমি বাতাসে মাথা ঠুকিয়া বলিলাম, 'তা বটে; কিন্তু কোথায় যাইতেছি মহাশয়?'

'মিঃ বেল্‌ফোরের সঙ্গে—আমেরিকায়!'

আমার চক্ষু কপালে উঠিল! মিঃ বেল্‌ফোর তখন পররাষ্ট্র-সচিব।

বড় কর্ত্তা বলিলেন, 'আতসবাজীর দিকে লক্ষ্য রাখিও। তোমার ভাগ্য প্রসন্ন হউক।'

ইউষ্টন ষ্টেশনে উপস্থিত হইয়া আমার কর্ত্তব্যভার গ্রহণের ব্যবস্থা করিলাম। পররাষ্ট্রসচিব এবং স্পেশাল মিশনের অন্যান্য সদস্য সেখানে উপস্থিত হইবার অনেকখানি আগেই আমি সেখানে হাজির ছিলাম। মহাযুদ্ধে আমেরিকার যোগদান, এই স্পেশাল মিশনের তৎপরতার উপর নির্ভর করিতেছিল। তাঁহাদের আমেরিকাযাত্রার যে গোপন আয়োজন হইয়াছিল, তাহা একটি সঙ্কীর্ণ চক্রের বহির্ভূত কোনও ব্যক্তি জানিতে পারে নাই। কিন্তু জার্ম্মাণ গুপ্তচর বিভাগের কার্য্য-প্রণালীতে কিরূপ দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যাইত, তাহার একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত আমার নয়ন-সমক্ষে উদ্ভাসিত হইল। স্পেশাল মিশনের ট্রেণ যে প্ল্যাটফর্ম্ম

হইতে যাত্রা করিবে, সেই প্ল্যাটফর্মে সহসা একটি সুবেশধারিণী পরমাসুন্দরী, দীর্ঘাঙ্গী নারীকে পাদচারণ করিতে দেখিয়া আমার চক্ষুকে বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হইল না। আমি তাহাকে চিনিতাম; সে যে আমার সেই পরিচিতা রমণী, এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশমাত্র ছিল না। আমি জানিতাম, তাহার ন্যায় ভীষণপ্রকৃতি দুর্দ্দমনীয়া নারী আমি অল্পই দেখিয়াছি!

তথাপি আমি নিঃসন্দেহ হইবার জন্ম তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম; তাহার পর দ্রুতপদে তাহার দিকে অগ্রসর হইয়া তাহাকে বলিলাম, "শোন, মিস্ ইউলেন্‌বার্গ, এখানে তুমি কেন আসিয়াছ?'

আমার প্রশ্নে সে হঠাৎ চমকিয়া উঠিল; কিন্তু তৎক্ষণাৎ সামলাইয়া লইয়া অত্যন্ত সহজস্বরে বলিল, 'তুমি আমাকে চিনিতে ভুল করিয়াছ। আমি মিসেস্ মেনওয়ারিং।'

মোটর-গাড়ীগুলি তখন ষ্টেশনে প্রবেশ করিতেছিল, তাহাদের ঘস্-ঘস্ শব্দ আমার কর্ণগোচর হইল। মুহূর্ত্ত পরে প্রথম গাড়ী ষ্টেশনে প্রবেশ করিলে তাহা ডিটেকটিভবর্গে পূর্ণ দেখিলাম। বুঝিলাম, মিঃ বেল্‌ফোর যে-কোন মুহূর্ত্তে সেখানে আসিতে পারেন, তখন আর আমার গয়ংগচ্ছ করিবার সময় ছিল না। (No time to take chances.)

আমি এক জন সহকর্মীকে আহ্বান করিয়া সেই যুবতীকে বলিলাম, 'আমি তোমাকে গ্রেপ্তার করিলাম। আমি তোমাকে চিনি, তুমি ওল্‌গা ইউলেন্‌বার্গ! জার্ম্মাণীর গুপ্তচর তুমি, যুদ্ধারম্ভের পূর্ব্বে তুমিই পোর্টসমাউথ হইতে নৌ-বিভাগের কতকগুলি নক্সা চুরি করিয়াছিলে বলিয়া সন্দেহ হইয়াছিল। মেনওয়ারিং বলিয়া নিজের পরিচয় দিলে 'এমেন্স রেষ্ট্রিক্সন্ আইন' অনুসারে তোমাকে ফৌজদারী সোপর্দ্দ করা হইবে।'

যুবতী স্পর্দ্ধাভরে বলিল, 'আমাকে গ্রেপ্তার করিলে! মুখের কথায়? ক্ষমতাপত্র সঙ্গে আছে? দেখাও ত।'

গ্রেপ্তারী পরোয়ানা তাহার সম্মুখে ধরিলাম।

সে তখন ন্যাকা সাজিয়া বলিল, 'আমি এক জন ফরাসীকে বিবাহ করিয়াছি। আমার আত্মীয়দের এখানে দেখিতে আসিয়াছি।'

'ইয়ার্ডে' গিয়া ও কথা বলিও।'

পরে তাহার পরিচ্ছদ খানাতল্লাস করিয়া একখান ফরাসী পাসপোর্ট পাইলাম। তাহার হাতব্যাগের মধ্যে একটি ক্ষুদ্র রিভলভার ছিল; তাহার প্রত্যেক ঘর টোটায় পূর্ণ! সেবার তাহাকে নির্ব্বাসিত করা হয়। কিন্তু পরে সে জার্ম্মাণীর গুপ্তচর বলিয়া ধরা পড়িয়াছিল, এবং তাহার অপরাধের অকাট্য প্রমাণ পাওয়ায়, প্যারিসের দুর্গ-প্রাকারে তাহার প্রাণদণ্ড হইয়াছিল!

যদি সে মিঃ বেল্‌ফোরের নিকটস্থ হইবার সুযোগ পাইত, তাহা হইলে সে কি কাণ্ড করিয়া বসিত, তাহা চিন্তা করিতে আমার আগ্রহ হয় নাই; কিন্তু কোন অপকর্ম্মেই তাহার কুণ্ঠা ছিল না, এবং তাহার স্নায়ু ছিল ইস্পাতের ন্যায় ঘাতসহ। যাত্রারম্ভেই যখন আমাদিগকে এইপ্রকার ভীষণ শত্রুর সম্মুখীন হইতে হইল, তখন ভবিষ্যতে কিরূপ বিপদ ঘটিবে, ইহা চিন্তা করিয়া উৎকণ্ঠিত হইয়াছিলাম।

শেষ ঘটনা

মিশনের কার্য্যের শেষ কয় দিন আমাদিগকে মার্কিণ যুক্ত সাম্রাজ্যের ওয়াসিংটন নগরে বাস করিতে হইয়াছিল। সেই সময় একাধিকবার অপ্রীতিকর অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলাম। এক দিন প্রভাতে সংবাদ পাইলাম, একটি রমণী পরিচারিকা-বেশে মিঃ বেল্‌ফোরের বাসভবনে প্রবেশের চেষ্টা করিয়াছিল। তাহার পরিচ্ছদাদি খানাতল্লাস করিয়া তাহাকে একটি গতিশীল অস্ত্রাগার বলিয়াই ধারণা হইয়াছিল!

তাহার হাত-ব্যাগের ভিতর কয়েকটি পিস্তল ছিল; তাহার পরিচ্ছদের ভিতর হইতেও একাধিক পিস্তল আবিষ্কৃত হইয়াছিল। তাহার নিকট যে সকল শাকসবজি ছিল, তাহার আড়ালে আর একটি হাতব্যাগ ছিল; তাহার ভিতর একটি ক্ষুদ্র বোমা সঞ্চিত ছিল। এতদ্ভিন্ন তাহার আস্তিনের ভিতর একখান ছোরা পাওয়া গেল।

তাহার নিকট হইতে এই সকল অস্ত্র-শস্ত্র সংগৃহীত হওয়ায় তাহাকে শত্রুপক্ষের গুপ্তচর বলিয়া সন্দেহ করিতে পারি নাই; আমার ধারণা হইয়াছিল, সে উন্মাদিনী। পরে প্রতিপন্ন হইয়াছিল, আমার এই ধারণা সত্য। সে একটি সরকারী বাতুলাশ্রমে প্রেরিত হইয়াছিল। তাহার খেয়াল হইয়াছিল—কোন গণ্য-মান্য প্রসিদ্ধ ব্যক্তির জীবন বিপন্ন করিয়া সে খ্যাতি লাভ করিবে। এরূপ বাতিকগ্রস্তা নারীকে উন্মাদিনী ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে?

অবশেষে এক দিন আমরা স্বদেশযাত্রার জন্ম ট্রেণে চাপিলাম। "প্রেসিডেণ্ট স্পেশাল" নামক বিখ্যাত ট্রেণ আমাদিগকে লইয়া কানাডার প্রান্তসীমায় উপস্থিত হইল। কানাডার সীমাপ্রান্তে অবতরণ করিয়া মিঃ বেল্‌ফোর সুবিখ্যাত 'মাটাপেডিয়া সালমন ক্লাব' কর্ত্তৃক মৎস্য শিকারের জন্ম নিমন্ত্রিত হওয়ায়, সেই নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলেন। তাঁহার এই নিমন্ত্রণগ্রহণ আমাদের সকলেরই জীবন-রক্ষার উপলক্ষ হইয়াছিল।

কানাডা সরকার সেই ট্রেণখানির ভার মিশনের হস্তে অর্পণ করিয়াছিলেন, অর্থাৎ মিশনের ইচ্ছানুযায়ী তাহা পরিচালিত করিবার ব্যবস্থা হইয়াছিল। মিশন সেই অপরাহ্নে অবসর-যাপনের অভিপ্রায় করায় ট্রেণখানি একটি সাইডিংএ 'সণ্ট' করা হইয়াছিল।

ট্রেণখানি হালিফাক্স বন্দরে লইয়া যাইবার জন্ম একটি সময় নির্দ্দিষ্ট করা হইয়াছিল। নির্দ্দিষ্ট সময়ে বেল্‌ফোরকে সংবাদ দেওয়া হইল, ট্রেণ ছাড়িবার সময় হইয়াছে। কিন্তু তখন তিনি মাছ ধরিতেছিলেন, শিকার ছাড়িয়া তাড়াতাড়ি ট্রেণে উঠিতে রাজী হইলেন না, অগত্যা ট্রেণ তাঁহার প্রতীক্ষায় দাঁড়াইয়া রহিল।

ট্রেণখানি যাহাতে 'থ্রু' চলে, 'লাইনে' তদনুযায়ী ব্যবস্থা করিয়া রাখা হইয়াছিল। 'স্পেশাল' চলিবার সময় পথিমধ্যে কোন বাধা না পায়, এজন্য লাইন ক্লিয়ার দেওয়া ছিল। মিঃ বেল্‌ফোর নির্দ্দিষ্ট সময়ে যাত্রা না করায় রেলের কর্ম্মচারীরা অসহিষ্ণু হইয়া উঠিল, এবং তিনি আরও এক ঘণ্টা মাছ ধরিতে পারেন, এই উদ্দেশ্যে সেই অবসরে একটা মালট্রেণ ছাড়িবার বন্দোবস্ত করিয়া ফেলিল।

কতকগুলা মালগাড়ী লইয়া সেই ট্রেণখানা ষ্টেশনের ডিপো হইতে বাহির হইয়া আসিল, এবং প্ল্যাটফর্ম্ম ত্যাগ করিয়া শীঘ্রই অদৃশ্য হইল।

এই ঘটনার দেড় ঘণ্টা পরে মিঃ বেল্‌ফোর সদলে ট্রেণে আশ্রয়

গ্রহণ করিলেন। মিঃ বেল্‌ফোরকে তাঁহার শয়নের কামরায় নির্ব্বিঘ্নে আশ্রয় গ্রহণ করিতে দেখিয়া নিশ্চিন্ত হইলাম। আমিও ক্লান্ত-দেহে কামরায় প্রবেশ করিয়া শয়ন করিলাম। আমি নিদ্রার ক্রোড়ে আশ্রয় গ্রহণ করিলাম, কিন্তু আমার নিদ্রা দীর্ঘস্থায়ী হয় নাই। মধ্য-রাত্রিতে সহসা ব্রেক কষিবার শব্দের সঙ্গে সঙ্গে একটা প্রকাণ্ড ঝাঁকুনী! সেই ঝাঁকুনীর চোটে আমার নিদ্রাভঙ্গ হইল! ট্রেণ হঠাৎ থামিয়া যাওয়ায় সমগ্র গাড়ী সবেগে আন্দোলিত আলোড়িত হইল।

আমার পরিচ্ছদ ঠিক করিয়া লইয়া 'করিডরে' বাহির হইয়া পড়িলাম। তাড়াতাড়ি বাহির হইতেই ট্রেণ কন্‌ডক্টারের ঘাড়ে পড়িলাম। সে সামলাইয়া লইয়া বলিল, "আসুন আমার সঙ্গে।'

আমরা রেলপথের পাশ দিয়া দৌড়াইতে দৌড়াইতে প্রায় এক-শত গজ অতিক্রম করিলাম; সেখানে এক ভীষণ দৃশ্য আমাদের দৃষ্টিগোচর হইল। আমাদের 'স্পেশাল' ছাড়িবার পূর্ব্বে যে মাল-ট্রেণ ছাড়িয়াছিল, দেখিলাম, সেই ট্রেণ লাইনচ্যুত হইয়াছে; তাহার এঞ্জিনখানা লাইনের পার্শ্বস্থিত এক গোধূম-ক্ষেত্রে উল্টাইয়া পড়িয়াছে, এবং ট্রেণের অর্দ্ধেক মালগাড়ী, ম্যাচবাক্স পদাঘাতে যেরূপ চূর্ণ হয়, সেইরূপ চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া পড়িয়া আছে। অতি ভীষণ নৈশ দৃশ্য; অগ্নির লোহিত প্রভায় চতুর্দ্দিক উদ্ভাসিত; এঞ্জিন বাষ্পরাশি উদ্‌গিরণ করিতেছিল, সঙ্গে সঙ্গে বহুকণ্ঠের কোলাহল। ট্রেণের কয়েক জন লোক নিহত হইয়াছিল। অনুসন্ধানে জানিতে পারা গেল—রেলের লাইনের সেই অংশ উৎপাটিত হইয়াছিল। 'চেয়ার'গুলি হইতে লৌহকীলক সমূহ টানিয়া তুলিয়া ফেলা হইয়াছিল। সেই সকল লৌহকীলক দ্বারা রেলগুলি কাঠের 'স্লিপারের' সঙ্গে আবদ্ধ ছিল। সেগুলি অপসারিত হওয়ায় এই দুর্ঘটনা। বৃটিশ মিশন'ট্রেণ বিধ্বস্ত করিবার জন্যই যে এই প্রকার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল, এ বিষয়ে সন্দেহের কোন কারণ ছিল না। মিঃ বেল্‌ফোর নির্দ্দিষ্ট সময়ে ট্রেণে চাপিতে সম্মত না হওয়াতেই আমাদের প্রাণরক্ষা হইল। আমি গুরু দায়িত্বভার গ্রহণ করিয়া মিঃ বেল্‌ফোরের পুলিস-রক্ষিরূপে যে বিপজ্জনক পথে যাত্রা করিয়াছিলাম, সেই যাত্রায় ইহাই শেষ দুর্ঘটনা; কিন্তু আমি কোন প্রলোভনেই জীবনে আর কখন এরূপ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিতে সম্মত নহি।'

এই যাত্রায় বৃটিশ পররাষ্ট্রসচিব মিঃ বেল্‌ফোর পরিচালিত মিশনের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছিল। বৃটিশ সরকার জার্ম্মাণ মহাযুদ্ধে জাতির সহানুভূতি ও সহায়তা লাভে সমর্থ হওয়ায় যুদ্ধের কি ফল হইয়াছিল, তাহা ইতিহাসের বিষয়, কিন্তু এই দৌত্যকার্য্যের প্রধান নায়ক মিঃ বেল্‌ফোরকে হত্যা করিবার এই শেষ চেষ্টা জর্ম্মাণ-আমেরিকানদের ষড়যন্ত্রের ফল কি না, মার্কিণ গোয়েন্দাদের আপ্রাণ চেষ্টাতেও তাহার সন্ধান হয় নাই।

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়।

সন্ধ্যাতারা

আঁধার-আকাশ-মাঝে—কোটি কোটি তারা
চেয়ে আছে সকরুণ,—যেন, বাণীহারা।
তারা নয় গৃহে জ্বালা সন্ধ্যার দীপিকা,
নহে কারো গোপনের প্রণয়-লিপিকা—
কাজল-নয়ন-নীরে। নহে মণি-হার—
উর্ব্বশীর ফেলে আসা,—পুরূরবা তার
কাননে পড়িলে মনে।
আমি তারে জানি,—
গভীর রহস্য-ভরা কাব্য একখানি
প্রকৃতির মনোরাজ্যে। কেহ নাহি জানে
কি দিয়া সাজানো আছে কোথা কোন্‌খানে?
সে-ই জানে কবে কোন্ দিবসে কি রা'তে
খুলিবে প্রথম পাতা আপনার হাতে।
আকাশের নীলাধারে ধরি বারো মাস
—করিছে মানবে শুধু গম্ভীর উদাস!

শ্রীপ্রমথনাথ কুণ্ডার
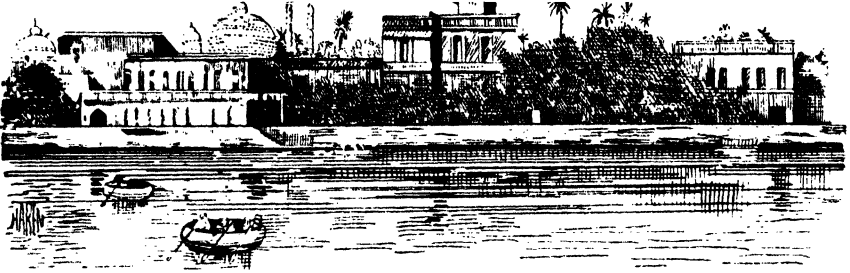
রহস্যময় মাইক্রোনেসিয়া

মাইক্রোনেসিয়া কতকগুলি ক্ষুদ্র দ্বীপের নাম। ঐ দ্বীপগুলি জাপানের অধিকারভুক্ত। দ্বীপগুলি আকারে ক্ষুদ্র হইলেও অনেকখানি স্থান লইয়া অবস্থিত। প্রশান্ত মহাসাগরের মধ্যে এই দ্বীপপুঞ্জ বিরাজিত।

এই সকল দ্বীপ দর্শন করিবার সৌভাগ্য পূর্ব্বে কাহারও হয় নাই। জাপানী সরকারী কর্ম্মচারীরা কোনও বিদেশীকে মুখে তথায় যাইতে নিষেধ করেন না বটে, কিন্তু উৎসাহ প্রদানও করেন না। কেহ তথায় যাইতে চাহিলে তাঁহারা বলেন, সেখানে কোথাও থাকিবার পান্থ-নিবাস নাই। যদি কোনও পর্য্যটক প্রশ্ন করেন, কোথায় অবস্থান করা চলিবে? সরকারী কর্ম্মচারীরা তাহার কোনও সদুত্তর দিতে পারেন না। আহারাদির সুবিধাই বা কিরূপ? সে কথারও কোন জবাব পাওয়া যায় না। যদি কেহ বলেন যে, তাঁহারা দেশীয়দিগের বাড়ীতে আহার ও শয়ন-স্থান করিয়া লইবেন, অথবা তালবৃক্ষের নীচে শিবির স্থাপন করিবেন, সরকারী কর্ম্মচারীরা সহিষ্ণুভাবে হাস্য করেন বটে, কিন্তু মাথা নাড়িয়া বলেন যে, সে সুবিধা হইবে না। যদি সত্যই কাহারও ঐ দ্বীপপুঞ্জ দেখিবার আগ্রহ থাকে, তাহা হইলে যে জাহাজ দ্বীপে দ্বীপে অত্যল্পকালের জন্য অবস্থান করিবে, তাহাতেই বসবাস করিয়া দ্বীপগুলি দর্শন করিতে পারেন।
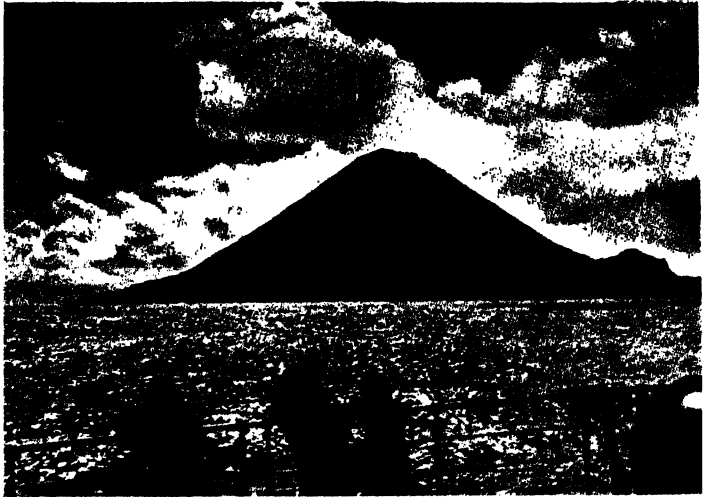
উরাকাস্ দ্বীপ—ইহা হইতে সর্ব্বক্ষণ ধূম্রজাল উত্থিত হয়

অতঃপর মিঃ উইলার্ড প্রাইস নামক জনৈক মার্কিণ পর্য্যটক অনেক কষ্টে মাইক্রোনেসিয়ায় ৪ মাস অবস্থানের অনুমোদন লাভ করেন। তিনি এই দ্বীপপুঞ্জ দর্শন করিয়া যে বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, মাসিক বসুমতীর

পাঠকবর্গের জন্য তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হইল। সমুদ্রবক্ষে প্রায় ২৫ লক্ষ বর্গ-মাইল স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপগুলি বিরাজিত। সমগ্র দ্বীপপুঞ্জের আয়তন মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের ৬ ভাগের পাঁচ ভাগ হইবে। সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ দ্বীপপুঞ্জগুলির নাম—মারিয়ানাস, ক্যারোলিসিন, এবং মার্শালস্। দ্বীপপুঞ্জের মধ্যে যেগুলির কিছু প্রসিদ্ধি আছে, তাহাদের মোট সংখ্যা ১ হাজার ৪ শত।

স্পেনের গৌরবময় যুগে এই বিপুল এবং বিচিত্র দ্বীপপুঞ্জ স্পেনের অধিকারভুক্ত ছিল। কিন্তু ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ যখন মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের কবলে পতিত হয়, সেই সময় স্পেন প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপ-সাম্রাজ্যের উপর আর লক্ষ্য রাখে নাই। স্পেন ও আমেরিকার মধ্যে যুদ্ধ বাধিবার পর স্পেন অর্থকৃচ্ছ্রতা নিবন্ধন মাইক্রোনেসিয়া দ্বীপপুঞ্জ জার্ম্মাণীর নিকট ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে ৪৫ লক্ষ ডলার মুদ্রা মূল্যে বিক্রয় করিয়া ফেলেন।

য়ুরোপীয় মহাসমরের সময় জাপানী রণতরীবহর মাইক্রোনেসিয়া দখল করিয়া লয়। ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে শান্তিসংসদে, জাতিসঙ্ঘ জাপানকে ঐ সকল দ্বীপের উপর প্রভুত্ব করিবার আদেশ দেন। তদবধি জাপানই এই দ্বীপপুঞ্জের উপর কর্তৃত্ব করিতেছে। ইয়োকোহামা হইতে জাহাজে চড়িয়া এক মাসে এই দ্বীপপুঞ্জে উপনীত হওয়া যায়। জাহাজ যে পথ দিয়া অগ্রসর হয়, তাহাও নিরাপদ নহে। সমুদ্রের মধ্যে প্রবাল-শৈল-সমূহ দণ্ডায়মান। তাহা ছাড়া অকস্মাৎ ঝড়ঝাপটার আশঙ্কাও আছে। ব্যাত্যাতাড়িত হইয়া জাহাজ প্রবাল-দ্বীপে আহত হইবার বিশেষ সম্ভাবনা। সমুদ্রমধ্যে আগ্নেয়গিরিও প্রচুর বিদ্যমান।

মাইক্রোনেসিয়া দ্বীপপুঞ্জের অধিকারসীমার মধ্যে জাহাজ পৌঁছিলেই প্রথমেই উরাকাস্ দ্বীপ দেখা যাইবে। উহা আগ্নেয়গিরি—সর্ব্বক্ষণ উহা হইতে ধূম নির্গত হইয়া থাকে। প্রায়ই এই দ্বীপ হইতে অগ্ন্যুৎপাত হইয়া থাকে। এই দ্বীপ ১ হাজার ৪৭ ফুট উচ্চ। চূড়ায় শ্বেত গন্ধক দেখিয়া মনে হইবে, যেন শুভ্র তুষারে উহা আবৃত হইয়া রহিয়াছে। পর্ব্বতগহ্বরের মুখ হইতে অবিশ্রান্ত গাঢ় পীত ধূম্রজাল উত্থিত হইয়া থাকে, এই পর্ব্বত অনুক্ষণ যেন অসন্তোষভরে গর্জ্জন করিতেছে। এই দ্বীপের কোথাও তৃণ-লতার সংস্রবমাত্র নাই।

পালায়ু অরণ্যের মধ্যে নব প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়

জাহাজের যাত্রাপথে মারিয়ানাস্ দ্বীপপুঞ্জ এক পার্শ্বে অবস্থান করে। ওয়াম্ দ্বীপ ডাহিনে রাখিয়া জাহাজ চলিতে থাকে; এখানে ৯০ দিন অন্তর একবার করিয়া জাহাজ নোঙ্গর করে। বিমান-বন্দর অধুনা এখানে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

কিছু দূর অগ্রসর হইবার পর জাপ দ্বীপ দেখিতে পাওয়া যাইবে। আধুনিকতার বাতাস এখনও এখানে পৌঁছে নাই। সময় যেন এখানে স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে।

ডোঙ্গায় চড়িয়া সমুদ্র পার হওয়া

চ্যামোরু বণিক শুক্তির মুদ্রা হইতেছে

বোধ হয়, আরও প্রাচীনতার দিকে এই দ্বীপবাসী যেন ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে, প্রাচীন যুগের ললিতকলা এই দ্বীপ হইতে যেন নির্ব্বাসিত হইয়া গিয়াছে, লোক-সংখ্যাও হ্রাস পাইয়া অর্দ্ধেকে দাঁড়াইয়াছে। বর্ত্তমান দ্বীপবাসীরা বাহিরের জগতের কোনও সন্ধান রাখে না; বরং তাহাদের রণদুর্ম্মদ পূর্ব্বপুরুষরা বহির্জগতের কিছু সন্ধান রাখিত।

'জাপ' অর্থে জমি। জাপবাসীরা মনে করে যে, ইহাই পৃথিবীর কেন্দ্রস্থান, এখানে ছাড়া মৃত্তিকা আর কোথাও নাই। সভ্যতার কথা তুলিলে জাপ-বাসীরা বিদ্রূপের হাসি হাসে। অবশ্য ইহার ব্যতিক্রম যে নাই, তাহা নহে। আধুনিক কোন কোন যুবক দ্বিচক্রযানে চড়িয়া ভ্রমণ করে, টেনিসও খেলে। এই দ্বীপে ইদানীং বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং ছাত্রগণ বস্ত্রাবৃত হইয়া বিদ্যালয়ে আসিবে, সে বিষয়ে কঠোর নিয়মও হইয়াছে। তবে ছাত্রগণ

জাপানী প্রথায় অধিবাসীরা ক্রীড়া ভূমির উদ্বোধন করিতেছে

মৃত সর্দ্দারের উদ্দেশ্যে কানাকাদের শোক-সঙ্গীত

এমনও দেখা যায় যে, ছোট ছোট বালিকা ক্লাশত্যাগের পূর্ব্বে পরিধেয় বস্ত্র গাত্র হইতে উন্মোচন করিয়া ডেস্কের মধ্যে রাখিয়া দেয় এবং সূর্য্যালোকে দৌড়াদৌড়ি করিতে থাকে। গ্রামবৃদ্ধগণ নবীনদিগকে বস্ত্র পরিধানের জন্য তীব্রভাষায় তিরস্কার করে। য়ুরোপীয় পদ্ধতি অবলম্বন করায় বৃদ্ধগণ উহা অশিষ্টতার লক্ষণ বলিয়া ঘোষণা করে এবং সম্প্রদায়ের দেবতারা উহাতে কুপিত হন, এইরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়া থাকে।

তাহাদের ধারণা, স্বদেশীয় রীতি-নীতির পরিবর্ত্তে বিদেশীয় পদ্ধতি অবলম্বন করিলে, দেবতা ক্রুদ্ধ হইয়া দেশের মধ্যে মড়ক আনয়ন করিবেন, এবং যে ব্যক্তি বিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণ ত্যাগ করিবামাত্র উলঙ্গ হইয়া পরিধেয় বস্ত্র পুঁটলি বাঁধিয়া বগলে লইয়া বাড়ীর দিকে দৌড়ায়। পরের আচরণ অনুষ্ঠান করিয়া চলিবে, তাহাকে মারিয়া ফেলিবেন। সম্ভবতঃ পূর্ব্বকালে বৈদেশিক নাবিকগণ নানাবিধ

চিত্রাঙ্কিত সোপান

দ্বিচক্রযানে নগ্নদেহ জাপ বালক

মূর্খ পিতা ও শিক্ষিত পুত্র

জাপ-কুমারী

কানাকা তরুণী

বন্দী—ঘুঘু

তালবৃক্ষ হইতে রস নিষ্কাশন

পক্ষী ধরিবার ব্যবস্থা

পীড়াগ্রস্ত হইয়া আসিত। তাহা হইতেই দ্বীপবাসীদিগের মনে ঐরূপ সংস্কার বদ্ধমূল হইয়াছে। এ কারণে জাপ-অধিবাসীরা বহির্জগতের সহিত কোনও সংস্রব রাখিতে চাহে না।

পর্য্যটক মিঃ উইলার্ড প্রাইস একখানি ডোঙ্গায় চড়িয়া রুমং দ্বীপ দেখিতে গমন করিয়াছিলেন। জাহাজ হইতে তিনি রুমং দ্বীপ-বাসী এক জন যুবককে ভাগ্যক্রমে জোগাড় করিয়া লইয়াছিলেন। এই যুবক একখানি লাল কৌপীন পরিয়া গলদেশে প্রবালের মালা ধারণ করিয়াছিল। যুবকের মুখ হাসি-খুসীতে ভরা, কিন্তু তাহার দন্তপংক্তি কালো হইয়া গিয়াছে। শুধু তাম্বূল চর্ব্বণে নহে, এক প্রকার দন্তমঞ্জন ব্যবহার করায় মেহগ্নি কাঠের মত দাঁতের রং হইয়াছিল। ছোকরা গুয়াম দ্বীপে থাকে বলিয়া কিছু কিছু ইংরেজি বলিতে ও বুঝিতে পারে। ইংরেজি বলা ছাড়া সে অন্য সর্ব্বপ্রকার বৈদেশিক সভ্যতার প্রভাবের সংস্রববর্জ্জিত ছিল। এই যুবক কানাকা জাতীয়। কানাকার অভিধানসঙ্গত অর্থ—দক্ষিণ-দ্বীপপুঞ্জবাসী। সকল জাতির বর্ণ এই "কানাকার" মধ্যে দেখা যায়—কাল, পাঁশুটে, লোহিত, পীত, এমন কি, শ্বেত পর্য্যন্ত। বর্ত্তমান যুবকের বর্ণ পাঁশুটে। কানাকারা বিদ্যালয়ে পাঠকালে পাটীগণিতকে যমের ন্যায় ভয় করে। কিন্তু মাছ কোথায় পাওয়া যাইবে, সে সম্বন্ধে ইহারা অভ্রান্ত।

জাপ দ্বীপ, ম্যাপ ও রুমং দ্বীপের সহিত ঘন-সন্নিবিষ্ট। এই দ্বীপগুলির চারিদিকে প্রবালের বেষ্টনী। দ্বীপগুলির দীর্ঘতা ১৯ মাইল এবং প্রস্থে সাড়ে সাত মাইল হইবে। রুমং দ্বীপে যাইতে হইলে অগ্রে ম্যাপ দ্বীপ পড়িবে।

পরিব্রাজকের সমভিব্যাহারী কানাকা যুবকের নাম

পালায়ুতে রন্ধন-প্রথা

পোনেপির খৃষ্টান ছাত্রী

টোল। তীরে অবতীর্ণ হইয়া সে সুপারি গাছে সুপারি ফলিতে দেখিয়া, সেই দিকে দৃষ্টিপাত করিল। ৩০ ফুট উচ্চ গাছে সুপারি ফলিয়া রহিয়াছে। টোল অনায়াসে অত্যুচ্চ

বৃক্ষে আরোহণ করিয়া সুপারি পাড়িয়া আনিল। কাঁচা সুপারি ভাঙ্গিয়া সে এক প্রকার পাতা পাড়িয়া লইল। তাহার সঙ্গে বাঁশের চোঙ্গে চূণ ছিল। পাতা,

এক জাতীয় তূলা-বৃক্ষ

টোলের স্কন্ধে জাপ পাষাণ-চাক্তি মুদ্রা

সুপারি ও চূণ লইয়া সে মুখে পূরিয়া চিবাইতে লাগিল। গাছে গাছে নারিকেল, ডাব ফলিয়াছিল। পর্য্যটক দম্পতি ডাবের জল পান করিয়া পরিতৃপ্ত হইলেন।

মূষিকের উৎপাত দ্বীপে প্রবল। উহারা দেখিতে এক একটি মার্জ্জারের মত। ইহারা ডাব নারিকেল নষ্ট করিয়া ফেলে। একবার এই দ্বীপে জাহাজ-বোঝাই মার্জ্জার আমদানী করা হয়। কিন্তু মূষিকগুলি এমন প্রতাপশালী যে, তাহারা মার্জ্জারকুল ধ্বংস করিয়া ফেলিয়াছিল।

কুমং দ্বীপে অনেকগুলি গ্রামে ক্রীতদাসগণ বাস করে। এই ক্রীতদাসদিগকে বিক্রয় বা ক্রয় করা চলে না। উহারা কোন ব্যক্তির সম্পত্তি নহে, স্বাধীন ব্যক্তিমাত্রেরই তাহারা তাঁবেদার; কিন্তু কোনও স্বাধীন মানুষ তাহাকে বলিতে পারে না, ইহা তোমাকে করিতে হইবে, বা উহা তুমি করিতে পাইবে না। রাজা ব্যতীত এরূপ আদেশ করিবার আর কাহারও অধিকার নাই।

ক্রীতদাসরা তাহাদের গ্রামে বাস করিয়া থাকে। রাজার আদেশ অনুসারে, কোনও স্বাধীন মানুষ তাহাদিগকে কায করিবার জন্য আহ্বান করিতে পারে। কোনও লোক যদি অপ্রকাশ্যভাবে ক্রীতদাসদিগের দ্বারা চাষের কায করাইয়া লইতে চাহেন, তাহা হইলে তিনি রাজার অনুমোদনলাভ করিতে পারেন। এজন্য তাঁহাকে কিছু তামাকু বা অপর কিছু লোভনীয় বস্তু রাজাকে উপহারস্বরূপ দিতে হয়।

যে সকল পরাজিত উপজাতি বন্দী হইয়া জাপএ আনীত হইয়াছিল, তাহারাই ক্রীতদাস বলিয়া পরিগণিত। যাহাতে তাহারা ডোঙ্গায় চড়িয়া পলায়ন করিতে না পারে, এজন্য

নিভৃত পল্লীতে তাহাদিগকে রাখা হইত। স্বাধীন মানুষের খাদ্যদ্রব্য ক্রীতদাসরা ভোজন নাও করিতে পারে, হাঙ্গরের মাংস, শুশুকের মাংস স্বাধীন মানুষদিগের অখাদ্য ছিল। ক্রীতদাসরা তাহাই ভোজন করিত।

ক্রীতদাসরা মাথায় চিরুণী ব্যবহার করিতে পায় না। উহা স্বাধীন মানুষের জন্য ব্যবহৃত হয়! স্বাধীন মানুষের বংশমর্য্যাদা যত বড়, তাহার মাথায় চিরুণীও তত বড় হইয়া থাকে। এই চিরুণীগুলি শাদা কাষ্ঠ হইতে নির্ম্মিত হয়। প্রত্যেক চিরুণী প্রস্থে তিন ইঞ্চি, দৈর্ঘ্যে ৬ ইঞ্চ হইতে দুই ফুট। চিরুণীর দুই দিকেই দাঁড়া থাকিবে। বেশ-ভূষার সঙ্গে চিরুণী ধারণ প্রথা। শুধু মগমগ দ্বীপের অধিবাসীরা এখানে
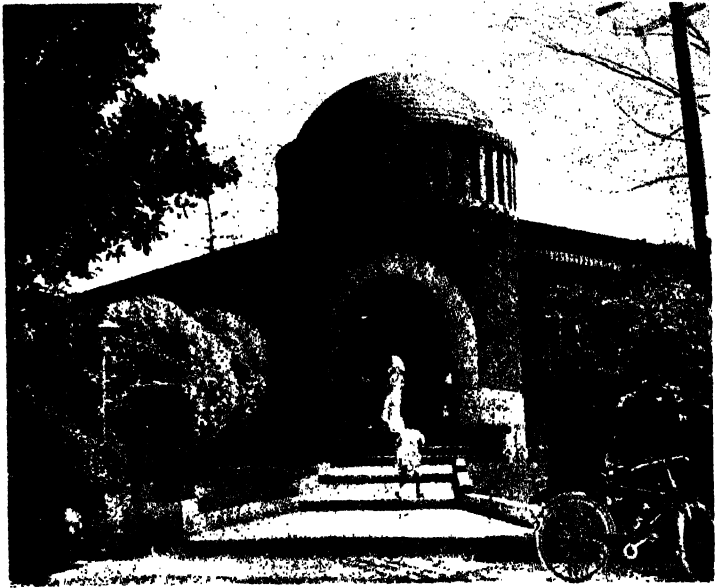
জাপানী হাসপাতাল

পরিব্রাজক দম্পতি ডাবের জল পান করিতেছেন
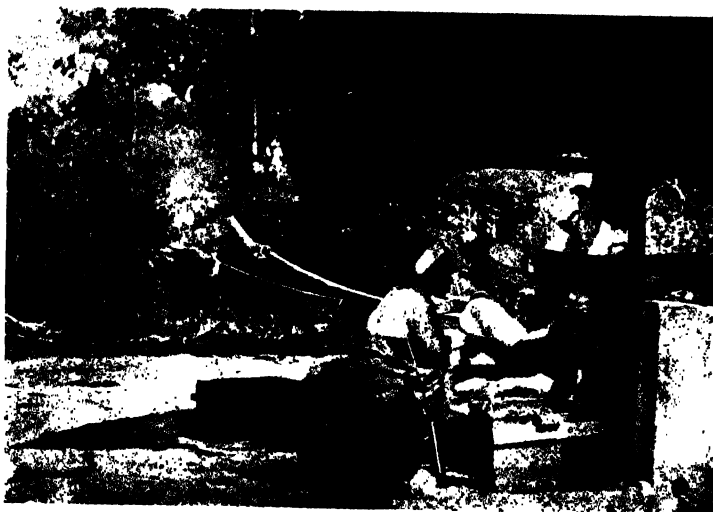
ঘানিগাছ হইতে নারিকেল তৈল নিষ্কাশিত হইতেছে

ক্লাবঘরে স্বপাক-রন্ধন

বসবাস করিতে আসিলে এই ফ্যাসন অনুসারে চলে না।

সুরাপান সম্বন্ধে বিধি-নিষেধ আছে, যাহারা সে বিধান মানিয়া চলে না, তাহারা কারাগারে প্রেরিত হইয়া থাকে। জাপানী কারাগার গৃহ অপেক্ষাও আকর্ষণের স্থান। কারাগারে প্রেরিত হইলেই অপরাধীদিগের চুল ছাঁটিয়া ছোট করিয়া দেওয়া হয়। তখন আর কেশে চিরুণী ধারণ করিবার উপায় থাকে না। ইহাই হইল প্রধান শাস্তি।

জাপানীরা জাপ-দ্বীপ শাসন করিলেও তাহারা প্রাচীন পদ্ধতি অনুসারে দেশশাসনের ব্যবস্থা করিয়াছে। জাপ-দ্বীপে দ্বাদশ জন রাজা আছেন, অবশ্য প্রত্যেক রাজারই রাজ্য-সীমা ক্ষুদ্র। তথাপি রাজারা নিজের রাজত্বে অসীম প্রতাপশালী।

পৃথিবীর কোনও স্বৈর-শাসক রাজা তাঁহাদের অপেক্ষা অধিকতর স্বৈর-শাসক নহে। প্রত্যেক রাজার অধীনে একদল আমীর-ওমরাহ আছে। তাহারা রাজার আদেশ-পালনে তৎপর।

প্রজাবর্গ রাজার শাসন মানিতে অভ্যস্ত। সেজন্য দ্বীপের জাপানী শাসক নিজের আদেশ প্রত্যেক রাজার মারফত ঘোষণা করিয়া থাকেন। স্থানীয় অধিকাংশ ব্যাপারের মীমাংসা স্থানীয় রাজার আদেশমতই সম্পন্ন হইয়া থাকে।

প্রাগৈতিহাসিকযুগের পক্ষিবিষ্ঠাজাত সার

পথি-প্রদর্শক টোল-এর মাতা ঘাসের স্কার্ট পরিয়া পর্য্যটকদিগকে অভিনন্দিত করিয়াছিল। জীবনে প্রথম মার্কিণ ভদ্রলোক দর্শন করিলেও, সে তাঁহাদের সহিত এমন ব্যবহার করিয়াছিল, যেন সর্ব্বদাই সে এমন ভদ্রলোকদিগকে অভিনন্দিত করিয়া থাকে। এক সপ্তাহ পূর্ব্বে টোলের পিতৃবিয়োগ হইয়াছিল। এজন্য তাহার মাতা শোকচিহ্ন কর্ণে ধারণ করিয়াছিল। সে আবার নূতন পতি নির্ব্বাচিত করিয়া লইয়াছে। জাপ-বিধবারা একসঙ্গেই শোকপ্রকাশ ও পত্যন্তর গ্রহণে কুণ্ঠানুভব করে না। এই নূতন ভর্ত্তা তখন বাড়ীর সম্মুখে বসিয়াছিল। সে সর্দ্দিজ্বরে কষ্ট পাইতেছিল।

টোলের ভগিনী একটি শূকরছানা ক্রোড়ে লইয়া পর্য্যটকদিগের সম্মুখে আসিল। সে যতক্ষণ মুখ বন্ধ করিয়াছিল, তাহাকে মন্দ দেখাইতেছিল না। কিন্তু তাম্বূলরাগ-রঞ্জিত কাল দন্তপাতি দেখিলে তেমন মনে হইবে না। তাহার গলদেশে কালো সূতার ফেটি ঝুলিতেছিল। উহাতে

জাপদ্বীপের বাদুড়

এই বুঝায় যে, তরুণী বিবাহের উপযুক্ত বয়স প্রাপ্ত হইয়াছে। কেহ পাণি প্রার্থনা করিলে সে তাহার প্রার্থনার

কুসেয়ি দ্বীপে জালে মাছধরা

কোনও খাদ্য এক বৎসরের মধ্যে অপর কেহ ভোজন করিবার অধিকারী হয় না। গাছের ফল মাটীতে পড়িয়া শুকাইয়া পচিয়া যাইবে, তবুও কাহারও ভাগ্যে তাহা লাভ করা ঘটিবে না। প্রবাদ, উহা যে খাইবে, তাহারই পীড়া হইবে এবং মৃত্যু অনিবার্য্য। প্রচুর ফল থাকা সত্ত্বেও টোল গ্রামের ফলবিক্রেতার কাছে জিনিষ কিনিতে গেল।

পাথরের চাকা মুদ্রা

কর্ণপাত করিতে সম্মত আছে। পর্য্যটক ও তাঁহার পত্নী দেখিলেন, টোলের বাড়ীতে ফলভারে অবনত বহু বৃক্ষ বিদ্যমান। তাঁহারা ক্ষুধার্ত্ত ও তৃষ্ণার্ত্ত হইলেও সেই সকল ফলভোগের সৌভাগ্য তাঁহাদের হইল না। কোনও কানাকা পরিবারে কাহারও মৃত্যু ঘটিলে, সেই গৃহের

জাপদিগের মধ্যে পাথরের অর্থ এখনও প্রচলিত আছে। ছয় ইঞ্চ পাথরের চাকা হইতে ১২ ফুট ব্যাসবিশিষ্ট পাথরের চাকা দেখিতে পাওয়া যাইবে। কোন কোন চাকার গর্ত্ত এত বড় যে, এক জন মানুষ তাহার মধ্যে কুণ্ডলী পাকাইয়া শুইয়া থাকিতে পারে। বাড়ীর বাহিরে এই সব চাকা গৃহস্বামীর ঐশ্বর্য্যের প্রমাণস্বরূপ সজ্জিত থাকে। কে কত ধনী, তাহা এই চাকা দেখিয়া দর্শক বুঝিতে পারে। ছোট অপেক্ষা বড় চাকাই ভাল। কারণ, উহা সহজে অপহৃত হয় না।

এই পাথরের চাকা জাল করা সহজ নহে। কারণ, যে পাথর হইতে চাকা নির্ম্মিত হয়, তাহা জাপদ্বীপে পাওয়া যায় না। পালাউ নামক দ্বীপে এই পাথর প্রচুর পাওয়া যায় বলিয়া সেখানেই টাঁকশাল প্রতিষ্ঠিত আছে। ডোঙ্গায় করিয়া উহা বহন করিয়া আনাও বিপজ্জনক। তিন শত মাইল দূর হইতে ডোঙ্গায় করিয়া আনয়ন করা অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার। কারণ, ২০ খানা ডোঙ্গার মধ্যে একখানা কোনও মতে চাকা সহ জাপদ্বীপে আসিয়া পৌঁছে।

ক্যাপ্টেন ডেভিড, ডি ওকিফ্ নামক জনৈক আইরিশ ব্যবসায়ী একখানি জাহাজে করিয়া বড় বড় চাকা-মুদ্রা

জাপদ্বীপে লইয়া যান। তিনি এই ভাবে চাকা-মুদ্রা সরবরাহ করিয়া বিনিময়ে প্রচুর নারিকেল প্রাপ্ত হন। দ্বীপের জনসংখ্যা অর্দ্ধেক হ্রাস পাওয়ায় সেই চাকামুদ্রাতেই কায চলিয়া যাইতেছে। আর নূতন মুদ্রা প্রস্তুত করিবার প্রয়োজন হয় নাই।

গ্রামের "পুরুষগৃহ"

চাকা মুদ্রা ব্যতীত আর এক জাতীয় মুদ্রা দ্বীপে প্রচলিত আছে। উহা শুক্তি মুদ্রা।
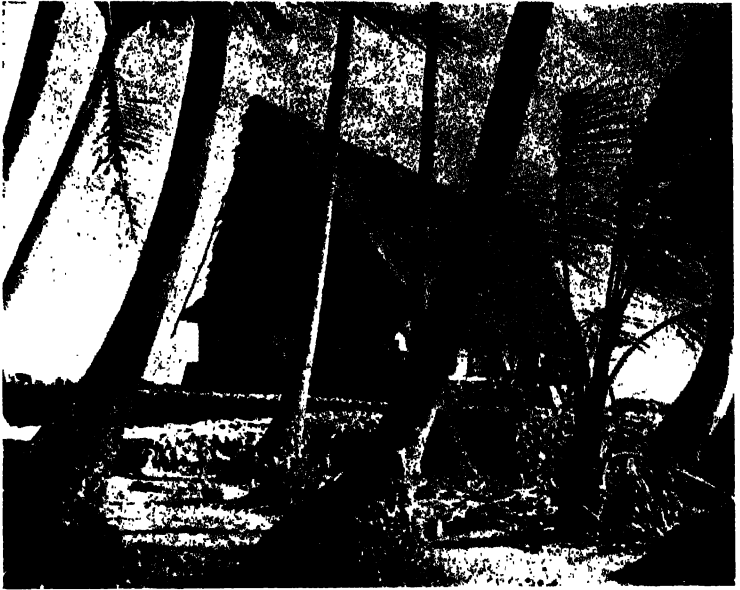
চামোরোরা সংখ্যায় খুবই অল্প। তাহারা য়ুরোপীয় পরিচ্ছদ ধারণ করিয়া থাকে। ইহাদের দেহে স্পেনিশ রক্ত প্রবহমান। এই অসভ্যদেশে চামোরোদের নামও বিচিত্র। জেমস্ উন্‌টালান, মিসাইনা, মাজিয়া, জুয়াসিটো, ম্যানোলো, ভাইসেন্‌টিকো, মার্কস, টিরেসা, টোমাসা, জোস, ফিলোমেনা, উর্শালা এই জাতীয় নাম দেখিতে পাওয়া যাইবে।

চামোরোদিগের অনুকরণপ্রবৃত্তি তীক্ষ্ণ। নূতন কিছু দেখিবামাত্র তাহারা তাহা অনুকরণ করিয়া থাকে। জাপানী মুদ্রাও তাহারা ব্যবহার করে। কিন্তু কামাকারা পাথরের চাকা বা শুক্তি ব্যতীত অন্য কোনও মুদ্রা ব্যবহার করিবে না। একটা নারিকেলের বিনিময়ে তাহারা একটা চুরটিকা ক্রয় করিবে। একটি দীপশলাকা-বাক্সের বিনিময়ে দুইটা সুপারি, দশটা সুপারির বিনিময়ে একখানা রুটী। ডিম্ব, মুরগী-শাবক, শূকর প্রভৃতিও এইরূপ দ্রব্য-বিনিময়ে ক্রয়-বিক্রয় হইয়া থাকে

টোলের গৃহে পরিব্রাজক দম্পতি নূতন ব্যবস্থা দেখিয়া

টিনিয়ানদ্বীপের প্রাচীন স্তম্ভযুগল

মাইক্রোনেসিয়ায় স্পেনীয় ধর্ম্মমন্দির

স্বতন্ত্র পাত্রে খাদ্য পরিপাক করা হয়। মেয়েরা তাহাদের মাতার পাত্রের আহার্য্য ভোজন করিতে পারে। পুরুষদের পক্ষে কোনও নারীর আধার হইতে খাদ্য পরিবেষণ করা চলিবে না! উহাতে নাকি পুরুষ নারীর ক্রীতদাস হইয়া পড়ে। এইভাবে নারীর কার্য্যতালিকা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া থাকে, টোলের গৃহে পুরুষের নিদ্রা যাইবার ব্যবস্থা ছিল না। গ্রামের ক্লাব-গৃহকে পুরুষ-গৃহ বলিয়া তাহারা অভিহিত করিয়া থাকে। এই গৃহ সুবৃহৎ, তৃণনিৰ্ম্মিত। এখানে শুধু পুরুষরাই থাকিতে পারে। শুধু বৈদেশিক মহিলার জন্য নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিয়াছিল।

পরিত্যক্ত নগরের পাষাণ-প্রাকার

বিস্মিত হন! পাঁচটি উনানে রান্না চড়ান হইয়াছিল। টোলকে প্রশ্ন করায় সে জানাইল যে, প্রত্যেক পুরুষের জন্য

জাপদ্বীপে এক মাস যাপনের পর পরিব্রাজক দম্পতি মাইক্রোনেসিয়ার অন্যান্য দ্বীপে তিন মাস অবস্থান করিয়াছিলেন। কিন্তু জাপদ্বীপে আদিম মানুষের জীবনযাত্রার পরিচয় যেমন সুস্পষ্ট দেখা যায়, অন্যত্র তাহা নহে। কিন্তু প্রত্যেক দ্বীপেই বৈচিত্র্য আছে।

পালায়ু দ্বীপপুঞ্জেই জাপান সরকারের দপ্তরখানা প্রতিষ্ঠিত। যেখানে পূর্ব্বে অরণ্য ছিল, এখন সেখানে জাপানী সহর প্রতিষ্ঠিত, তাহার লোকসংখ্যা ৫ হাজার। এইরূপ গ্রামে রেডিও যন্ত্র, হাসপাতাল, স্কুল সবই আছে। টোকিওর সহিত পালায়ুর সংযোগ-স্থাপনের জন্য এই দ্বীপে একটা বিমান-পোতাশ্রয় নির্ম্মিত হইতেছে। জাপানীরা যাহাতে এই দ্বীপে আসিয়া বসবাস করে, সে জন্য পালায়ুর অনেক উন্নতি সাধিত হইয়াছে।

এই দ্বীপপুঞ্জে ৪০ হাজার জাপানী ও হাজার দেশীয়

পোনেপের গায়িকাবৃন্দ

জাপদ্বীপের কানাকা—মাথায় চিরুণী

পঞ্চায়তে যোগ দিবার জন্ত শঙ্খনাদ

জাপানী-কৃষকের তত্ত্বাবধানে শস্যক্ষেত্র

পাষাণের চাকামুদ্রা
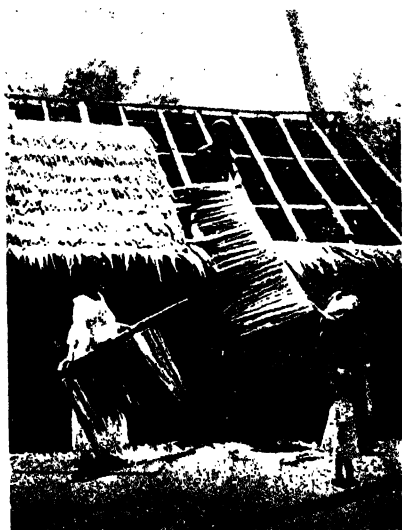
দেশীয়রা কুটীর নির্ম্মাণ করিতেছে

লোক আছে। জাপদ্বীপ ছাড়া আর কোথাও লোকসংখ্যা হ্রাস পায় নাই। চারি বৎসরে এই দ্বীপে জাপানী জনসংখ্যা দ্বিগুণ হইয়াছে। আগামী ৪ বৎসরে তাহারও দ্বিগুণ হইবার সম্ভাবনা। মাইক্রোনেসিয়া অতি দ্রুত জাপানী অধিবাসীতে পূর্ণ হইয়া চলিয়াছে।

জাপানী কৃষিবিদ্যার প্রভাবে জমি কর্ষিত হইয়া ফলশস্যে পূর্ণ হইয়া উঠিতেছে। যে সকল জমি সম্পূর্ণ উষর ছিল, এখন তাহা শস্যসম্ভারে পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে।

করিয়া তুলিয়াছে। পোনাপে দ্বীপে ২ শত ৩৮টি বিভিন্ন জাতীয় ফলের গাছ, শাকসব্জী প্রভৃতি আমদানী করা হইয়াছে।

মাইক্রোনেসিয়ার দ্বীপগুলি দুই প্রকারের ;—আগ্নেয়গিরিপূর্ণ এবং প্রবালসমন্বিত। আগ্নেয়গিরিপূর্ণ দ্বীপগুলি শৈলসমাকীর্ণ ও উর্ব্বর। এই উর্ব্বরা ভূমি হইতে প্রবালসমন্বিত দ্বীপগুলিতেও মরূদ্যান রচিত হইতেছে।

ট্রক দ্বীপে ইংরেজি ভাষাভাষী লোকের সংস্রব ঘটিয়াছিল, তাহার প্রমাণ কতকগুলি ব্যবহৃত শব্দ হইতে পাওয়া

জাপানী পুলিস কর্ম্মচারীর নূতনগৃহে প্রবেশ

সমুদ্রের যে অংশ অপেক্ষাকৃত শান্ত, সেখানে শুক্তির চাষ হইতেছে। তাহা হইতে প্রচুর মুক্তা উৎপন্ন হইতেছে।

মারিয়ানা দ্বীপপুঞ্জে প্রচুর ইক্ষু উৎপন্ন হইতেছে। আগে এখানে কোন শস্য পর্য্যন্ত জন্মিত না। সাইপান, টিনিয়াস্ এবং রোটা দ্বীপ হইতে বাৎসরিক ১ কোটি ইয়েন মুদ্রা মূল্যের চিনি উৎপাদিত হয়।

জাপানীরা নানা জাতীয় ফলের গাছ এখানে রোপণ করিতেছে। অবশ্য প্রতিকূল আবহাওয়ায় অনেক চারা মরিয়া যায়, কিন্তু যাহারা বাঁচে, বৈজ্ঞানিক উপায়ে জাপানীরা তাহাদিগকে মাইক্রোনেসিয়ার স্থায়ী সম্পদ

যায়। মার্শাল ও কুসেয়ি দ্বীপের অধিবাসীরা কিছু কিছু ইংরেজি বলিতে পারে ১৮০৪ খৃষ্টাব্দে কুসেয়ি মার্কিণরা আবিষ্কার করেন। এই দ্বীপে কোন কারাগার নাই। অধিবাসীরা অপরাধ করিতেই জানে না। কোন প্রকার ব্যাধি এই দ্বীপে ছিল না এই দ্বীপের বর্ত্তমান লোকসংখ্যা ১ হাজার ২ শত।

পোনেপি দ্বীপে পরিব্রাজকরা ডোঙ্গা করিয়া গিয়াছিলেন। এই দ্বীপের প্রধান নগর এখন পরিত্যক্ত। তটভূমি হইতে দুর্গের প্রাকার উত্থিত হইয়াছে। সমস্তই প্রস্তরনির্ম্মিত। অরণ্যের দ্বারা এই দুর্গ প্রায় আবৃত

হইতে চলিয়াছে। স্থানীয় অধিবাসীরা এই দুর্গের সন্নিহিত হইতে ভয় পায়। এমন কি, জাপানীরাও সহজে সে দিকে যাইতে চাহে না।

পরিব্রাজকরা নাস্ টাউয়াচ্ নামক স্থানে ডোঙ্গা হইতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। একটা তোরণের মধ্য দিয়া দুর্গ-প্রাঙ্গণে তাঁহারা প্রবেশ করেন। এই ধ্বংসপ্রায় দুর্গে শুক্তিনির্ম্মিত কুঠার, শুক্তির হার, কঙ্কণ এবং শুক্তির সূচ মনুষ্য-কঙ্কালের সহিত দেখিতে পাওয়া যায়।

দেখিলেই বুঝা যাইবে, এই নগর বহু পূর্ব্বে রচিত হইয়াছিল। বর্ত্তমান পাঁশুটে বর্ণের অধিবাসী হইতে স্বতন্ত্র জাতীয় কোনও সভ্য কালো জাতি এই দুর্গ নগর তৈয়ার করিয়াছিল। কিম্বদন্তী অনুসারে জানা যায় যে, চাউ-টে-লিচুর নামক কোনও রাজবংশ একদা এখানে রাজত্ব করিয়াছিল। তার পর ইদ্জিকল্কল নামক অসভ্য আততায়ী জাতি এই বংশকে বিতাড়িত করে স্বতরাং পুরাতন সভ্যতা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। সেই জাতি ঐ দ্বীপ ছাড়িয়া পলায়নও করে।

অরণ্যবাসীরা এখনও সভ্যতাকে ভীতির দৃষ্টিতে দেখিয়া থাকে, ভালও বাসে না। কিন্তু যে ভাবে স্কুলের ছাত্র-ছাত্রী বৃদ্ধি পাইতেছে, হাঁসপাতালের কায চলিতেছে, তাহাতে দক্ষিণ-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ আর অন্ধকারে থাকিবে না।

শ্রীসরোজনাথ ঘোষ।

ব্যর্থ মিলন

আপনা হারায়ে চেয়েছিনু দূরে, উন্মনা;
প্রাণ হয়েছিল অজানা সুরেতে তন্মনা।

পাইনি তোমারে খুঁজিয়া সকল দিশিতে,
স্বপনের আশে ঘুমায়েছি, হায়, নিশিতে।
প্রভাত বেলার নূতন অরুণ কিরণে,
চল চঞ্চল দীপ্ত-কমল হিরণে
খুঁজেছি নয়নে কত আকুলতা ভরিয়া,—
আস নাই তুমি মনোহর রূপ ধরিয়া।
দিন গেছে তোমা খুঁজিয়া সিক্ত নয়নে;
কত বেলা, হায়, কেটেছে পুষ্প চয়নে।—
ওগো নিষ্ঠুর! শুধুই মালিকা রচনা!
আসিবে বলিয়া হয়নি কিছুই সূচনা।
অস্ত-তোরণে বেজেছে ভানুর পূরবী,
লাজে আঁখি নত করেছে রক্ত করবী,
ওগো অকরুণ! শুনি নাই তব গীতিকা—
চরণ পরশ লভে নাই বুকে বীথিকা;

আঁধারে নিশীথ হারায়ে ফেলেছে আপনা,
তারকা-নয়নে ঝরেছে মিলন কামনা,
পবন-শ্বাসেতে উঠে নাই প্রিয় আভাসি,
জোছনার মাঝে উঠে নাই হাসি বিকাশি।
মিলন আশায় বিরহ উঠেছে ব্যথিয়া,
অভিমান মোর গিয়েছে হৃদয় মথিয়া।
ঘুমায়েছি যবে, শিয়রে আমার এসেছ—
জাগান-ছলায় কত মোরে ভাল বেসেছ!
আঁখির পাতায় চুম্বন দেছ আঁকিয়া,
'মালা কই?' মোরে সুধায়েছ কত ডাকিয়া!
জাগি নাই তবু, ছিনু মোহ-ঘোরে ঘুমিয়া,—
আঁখিজল রাখি চলে গেছ পুনঃ চুমিয়া।
চোখে চোখে যদি নাহি পাই, সখা, মিলনে—
কিবা কায তবে হেন মিলনের ছলনে?

শ্রীমতী ইলারাণী মুখোপাধ্যায়।

পাহাড়ে ঝড়

উপন্যাস

৪

সরলকুমার মনে করিয়াছিল বটে, সে তাহার মনের ভাব গোপন রাখিবে, কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই সে বুঝিল, তাহা দুঃসাধ্য—হয় ত অসম্ভব। ফুলের বুক যখন সৌরভে ভরিয়া উঠে. তখন সে যেমন সেই সৌরভ গোপন রাখিতে পারে না, কস্তুরী মৃগের নাভি যখন কস্তুরীতে পূর্ণ হয়, তখন সে যেমন তাহার গন্ধ আর গোপন রাখিতে পারে না—যুবকের হৃদয়ে প্রকৃত প্রেম সঞ্চিত হইলে সে তেমনই তাহা আর গোপন রাখিতে পারে না। বিশেষ দুই মাস পরে যখন তাহার শেষ পরীক্ষা হইয়া গেল, তখন তাহার পক্ষে আর আগ্রায় থাকিবার কোন কারণ রহিল না। পরীক্ষা শেষ হইয়া যাইলে সে এক দিন যখন একা তাঁহার গৃহে গেল, তখন "ছোট সাহেব" বলিলেন, "তুমি যে সাফল্য লাভ করবে, তা' নিশ্চয় জেনে আমি আগেই তোমাকে অভিনন্দিত করছি। জীবনের কায কি ভাবে করবে, এইবার তা ঠিক ক'রে নাও।"

সরলকুমার বলিল, "আপনার অনুমতি পেলে আমি আগ্রাতেই থাকতে পারি।"

"কেন? আগ্রা তোমার পান্থশালা। তোমার অভাব আমরা নিশ্চয়ই অনুভব করব; কিন্তু আগ্রা তোমার কর্ম্ম-ক্ষেত্র হ'তে পারে না। তা'র সর্ব্বপ্রধান কারণ—গত পঁচিশ বৎসর আমি লক্ষ্য করছি, এক প্রদেশের লোক অন্য প্রদেশের লোককে আপনাদের মধ্যে প্রাধান্য দিতে চায় না। বিহারে আর যুক্তপ্রদেশে এই প্রাদেশিক সঙ্কীর্ণতা বাঙ্গালীর প্রতি বিদ্বেষে আত্মপ্রকাশ করছে। কাযেই তোমাকে বাঙ্গালায় কায ক'রে যশ অর্জ্জন করতে হবে।"

"কর্ম্ম-জীবনে প্রবেশ ক'রে স্থির হয়ে বসবার জন্যই আমি আপনার অনুমতি চাইতে এসেছি।"

"আমি অনুমতি ত দিচ্ছিই; যদি কখন আমার দ্বারা কোন সাহায্য হয়, তা'ও আমি সানন্দে দেব—তা' তুমি অবশ্যই জান। কর্ম্ম-জীবনে প্রবেশে অকারণ বিলম্ব করলে ক্ষতিই হয়। সময়ের অপব্যয় করতে নাই।"

এবার মনের ভাব প্রকাশকালে সরলকুমারের দৃষ্টি লজ্জায় নত হইল। সে একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, "আমি যে কথা বলতে এসেছি, তা' যদি অন্যায় মনে করেন, তবে, দয়া ক'রে আমাকে ক্ষমা করবেন। আর স্নেহে বঞ্চিত করবেন না বললে, বলতে সাহস করি।"

সরলকুমারের কথায় "ছোট সাহেব" বিস্ময়ানুভব করিলেন। সে কি কথা বলিতে আসিয়াছে? তিনি বলিলেন, "তোমার ভয় করবার কোন কারণ নাই। তুমি জান, আমি তোমাকে ছেলের মত ভালবাসি।"

"সেই ভালবাসা স্থায়ী করবার—আমার জীবনে মণিকাকে সঙ্গী পা'বার আশা কি আমি করতে পারি?"

"ছোট সাহেব" সহসা কোন উত্তর দিলেন না—একটু ভাবিলেন। তাহার পর তিনি বলিলেন, "আমি তোমাকে সর্ব্বাংশে যোগ্য পাত্র ব'লে বিবেচনা করি। কিন্তু এ বিষয়ে তোমাকে যেমন একটা কথা ভেবে দেখতে বলব, তেমনই মণিকাকেও তা'র মত জিজ্ঞাসা করব।"

সরলকুমার নির্ব্বাক্ রহিল।

"ছোট সাহেব" বলিলেন, "তুমি জান, আমি ব্রাহ্ম—মণিকাকে বিয়ে করতে হ'লে তোমাকে তোমার হিন্দু—অর্থাৎ রক্ষণশীল হিন্দু আত্মীয়-স্বজনের অপ্রীতিভাজন হ'তে হবে। সুতরাং সে ত্যাগস্বীকার করা তোমার কর্ত্তব্য কি না, সেটা ভেবে দেখবে।"

"আমি সে কথা বিশেষভাবেই ভেবে দেখেছি। আপনি জানেন, আমার বাপ-মা নাই, ভাই-বোনও নাই; যে সব আত্মীয় আছেন, তাঁদের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা নাই। আমি নিজে যে রক্ষণশীল হিন্দু আচারানুষ্ঠানী নই, তা'ও আপনি জেনেছেন। সুতরাং আমার পক্ষে ভাববার আর কিছু নাই। তবে মণিকার মত—আর আপনার মত।"

"আমি পরে তোমাকে বলব। যদি কোন কারণে তোমার প্রস্তাবে সম্মতি দিতে না পারি, তবে সেজন্য আমি নিজেই দুঃখিত হ'ব।"

হৃদয়ে আশায় ও নিরাশায় দ্বন্দ্ব অনুভব করিতে করিতে সরলকুমার তাহার বাংলোয় ফিরিয়া গেল।

সে চলিয়া যাইলে "ছোট সাহেব" যে স্থানে বসিয়াছিলেন, কিছুক্ষণ সেই স্থানেই বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন। কন্যাকে সৎপাত্রে প্রদান করা তিনি পিতামাতার কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচনা করিয়া থাকেন—আজ তাঁহার সেই কর্ত্তব্য পালন করিবার সময় উপস্থিত। তিনি কিছুক্ষণ পরে কক্ষমধ্যে যাইয়া কক্ষ প্রাচীরে বিলম্বিত তাঁহার পরলোকগতা পত্নীর চিত্রের নিম্নে দাঁড়াইলেন। তিনি তাঁহার স্মৃতি সর্ব্বদা সযত্নে রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন—ক্রমে সে স্মৃতি ভালবাসার উচ্চতম স্তরে উপনীত হইয়াছে—তাহা শ্রদ্ধায় পরিণতি লাভ করিয়াছে। আজ তাঁহার মনে হইল—পত্নীর অভাব কত প্রবল! কন্যার জন্য উপযুক্ত পাত্র নির্ব্বাচনে কেবল যিনি তাঁহাকে সাহায্য করিতে পারিতেন,—যাঁহার মতের উপর তিনি অনায়াসে নির্ভর করিতে পারিতেন—তিনি নাই। তাই আজ তাঁহাকেই মণিকার পিতা ও মাতা উভয়ের কর্ত্তব্য একক পালন করিতে হইবে।

তিনি যখন পত্নীর তৈলচিত্রের নিম্নে দাঁড়াইয়া এই সব কথা ভাবিতেছিলেন, তখন মণিকা তাঁহাকে কি একটা কথা জিজ্ঞাসা করিবার জন্য সেই কক্ষে প্রবেশ করিল। সে জানিত, তাহার পিতা সময় সময় সেই চিত্রে বদ্ধদৃষ্টি হইয়া চিন্তা করেন। সে সময় সে কখনও তাঁহাকে ডাকে না।—কারণ, পূজায় বা উপাসনায় রত ব্যক্তির মনোযোগ অন্যদিকে আকর্ষণ করিতে নাই। আজ সে সেই জন্য যেমন নীরবে আসিয়াছিল, তেমনই নিঃশব্দে বাহির হইয়া যাইবার চেষ্টা করিল। কিন্তু সে যাইবার জন্য দ্বারের পর্দ্দাটি সরাইলে চিত্রের উপর অধিক আলোকপাত হইল। তাহার কারণ জানিবার জন্য ফিরিয়া "ছোট সাহেব" দেখিলেন, মণিকা চলিয়া যাইতেছে।

তিনি তাহাকে ডাকিলেন, "মা!"

মণিকা ফিরিয়া আসিল।

"আমি তোমার কাছেই যাচ্ছিলাম।"

"কেন, বাবা?"

"সরলকুমার এসেছিলেন।"

"আমি তাঁকে আসতে দেখেছিলাম; ভাবলাম, পরীক্ষা শেষ ক'রে তিনি দেখা করতে এসেছেন।"

"তা-ও বটে।"

"ছোট সাহেব" একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন, "তাঁকে এ-বার যেতে হবে।"

মণিকা বলিল, "হাঁ", কিন্তু সে যেন অন্যমনস্ক। আর তাহার মুখের স্বাভাবিক প্রফুল্লভাব যেন সহসা অন্তর্হিত হইয়া গেল।

"ছোট সাহেব" বলিলেন, "ক' বছর তিনি আগায় ছিলেন—মিষ্টস্বভাবহেতু আমাদের যেন আপনার হয়ে গিয়েছিলেন।"

মণিকা কোন কথা বলিল না,—সে ভাবিতেছিল।

"তাঁকে ছাড়তে আমাদের কষ্ট হবে।"

"তাঁর কি আর এখানে থাকা অসম্ভব?"

"তাই বটে। তুমি ত' তাঁর ইতিহাস জান—তাঁর ঠিক আপনার বলতে কেউ নাই; তাই তিনি, ইচ্ছা হওয়ায়, এত দিন এখানে ছিলেন। এখন তাঁকে ভবিষ্যৎ-জীবনের কায ঠিক ক'রে নিতে হবে—তাঁর শিক্ষা, তাঁর প্রতিভা—এ সব ব্যর্থ হওয়া ত অভিপ্রেত হ'তে পারে না।"

মণিকা আর কিছু বলিল না।

"ছোট সাহেব" বলিলেন, "সেই সম্পর্কে তিনি একটা প্রস্তাব করতে এসেছিলেন।"

মণিকা জিজ্ঞাসা করিল, "কি প্রস্তাব?"

"তিনি তোমাকে সঙ্গে নিয়ে যেতে চান।"

"আমাকে? সঙ্গে?"

একটু হাসিয়া "ছোট সাহেব" বলিলেন, "যদি আমার আর তোমার আপত্তি না থাকে, তবে তিনি তোমাকে বিবাহ করবার প্রস্তাব করবেন।"

উষার আলোকে তাজমহলের বিকাশোন্মুখ কুসুমের মত গম্বুজের উপর যেমন রক্তাভা ছড়াইয়া পড়ে, মণিকার মুখে তেমনই রক্তিমাভা ছড়াইয়া পড়িল।

"ছোট সাহেব" বলিলেন, "তোমার মা বেঁচে থাকলে তোমার মত জানবার ভার অবশ্য তিনিই নিতেন। আমি সেই কথাই ভাবছিলাম। কিন্তু তিনি নাই, কাযেই আমাকে সে কাযের ভার নিতে হয়েছে। তিনি যেমন ভাবে তোমার মত জানতে পারতেন, তেমন ভাবে জানবার নৈপুণ্য আমার নাই। তাই আমি একেবারে এই কথা তোমাকে জিজ্ঞাসা করছি।"

কোন উত্তর না দিয়া মণিকা চলিয়া যাইবার উদ্যোগ করিল। তাহা দেখিয়া "ছোট সাহেব" বলিলেন, "বিষয়ের গুরুত্ব অসাধারণ। সুতরাং বিশেষ বিবেচনা করতেই হ'বে। তুমি ভাববার সময় লও। কেবল তোমার ভাববার সুবিধা হ'বে, মত স্থির করতে সাহায্য হ'বে ব'লে আমি ক'টা কথা বলব—প্রথম, সরলকুমারকে আমরা ক' বৎসর দেখেছি—জেনেছি, তাঁর বিরুদ্ধে বলবার কিছু পাই নি; দ্বিতীয়, তিনি যে টাকা পেয়েছেন, তা'তে তাঁ'র আর্থিক অবস্থা ভালই বলা যেতে পারে—অর্থের জন্য যে তাঁ'র কষ্ট পা'বার সম্ভাবনা নাই—এ কথা, বোধ হয়, বলা যেতে পারে; তৃতীয়, তাঁ'র সংসারে তাঁ'র ও তাঁ'র স্ত্রীর কাযে হস্তক্ষেপ ক'রে অশান্তি ঘটাবার কেহ নাই; চতুর্থ, তিনি সাহিত্যরসিক; পঞ্চম, তিনি মিষ্টভাষী ও শিষ্টাচারী। এ সবই তাঁ'র পক্ষের কথা। বিপক্ষে কি বলব, তা' আমি ভেবে পাচ্ছি না; যদি পাই, পরে তোমাকে জানাব। এখন তুমি ভেবে দেখ, আমিও ভেবে দেখি।"

মণিকা নিষ্কৃতি পাইল। এ প্রস্তাব এমনই অতর্কিত যে, ইহা তাহার অপ্রস্তুত মনকে অতিমাত্র চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছিল। কিন্তু সে পিতার সম্মুখে কেবল সেই চাঞ্চল্য গোপন করিবার চেষ্টাই করিতেছিল—যাহা সংযত করা যায় না, তাহাই সংযত করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছিল। এখন সে পিতার নিকট হইতে যাইয়া আপনার বসিবার ঘরে প্রবেশ করিল।

মণিকা চলিয়া যাইলে "ছোট সাহেব" একবার তাঁহার পত্নীর চিত্রের দিকে চাহিলেন। তাঁহার মনে হইল, যদি ঐ চিত্রের ওষ্ঠাধরে বাক্যস্ফূর্ত্তি হইত! তাহা হইলে তিনি সরলকুমারের প্রস্তাব সম্বন্ধে মণিকার মাতার মত জানিতে পারিতেন। সংসারের সব কাযে তিনি দীর্ঘকাল পত্নীর মতই অভ্রান্ত মনে করিয়া—সর্ব্বতোভাবে তাঁহার উপর নির্ভর করিয়া আপনি অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা লইয়া ব্যস্ত ছিলেন। তাহার পর সংসারের ভার কতকটা মণিকার ও কতকটা ভৃত্যের হস্তগত হইয়াছে—তিনি তাহা গ্রহণ করিতে সাহস করেন নাই।

তাহার পর তিনি বারান্দায় যাইয়া বসিলেন—ভাবিতে লাগিলেন। বহুদিন তাঁহার চিন্তার এমন কোন কারণ ঘটে নাই—সব যেন যথারীতি চলিতেছিল। পুত্র বিবাহ করিয়াছে; কিন্তু বিবাহ করিতে সে পিতার মত গ্রহণ করে নাই। তিনি কেবল পুত্রবধূকে আশীর্ব্বাদ করিয়াছেন। মণিকার বিবাহের কথা তিনি যতই ভাবিতে লাগিলেন, ততই তাঁহার ভাবনা বাড়িতে লাগিল।

অপরাহ্নে যখন ছাত্ররা "ছোট সাহেবের" কাছে আসিল, তখন তিনি যেন চিন্তা হইতে অব্যাহতি লাভ করিলেন। সরলকুমারও আসিয়াছিল; কিন্তু আজ সে যেন আপনাকে অন্য সকলের পশ্চাতে রাখিতেই সচেষ্ট ছিল।

মণিকা ছাত্রদিগকে চা দিয়া "একটু কায আছে" বলিয়া চলিয়া গেল।

"ছোট সাহেব" ছাত্রদিগকে বলিলেন, "চল, আজ বাগানেই একটু বেড়ান যা'ক, তা'র পর ফিরে এসে কিছু পড়া যাবে।"

বাগান মনোরম—বাগানের মধ্যে ঋজু পথগুলি সুরক্ষিত; গাছ এমন ভাবে সজ্জিত যে, কখন বাগানের কোন অংশ ফুলশূন্য হয় না। "ছোট সাহেব" ফুল ভালবাসেন বলিয়া তাঁহার পত্নী বিশেষ যত্ন সহকারে উদ্যান খানি সাজাইয়াছিলেন। তাহার পর তাহা কখনও মণিকার সতর্ক ও স্নেহদৃষ্টিতে বঞ্চিত হয় নাই।

সকলে গৃহে ফিরিয়া আসিলে সরলকুমারই প্রস্তাব করিল, টেনিসনের 'লকস্‌লি হল' পাঠ করা হউক।

কবিতাটি পূর্ব্বেও পঠিত হইয়াছিল; তাই "ছোট সাহেব" কেবল তাহা পড়িয়া যাইতে লাগিলেন—যেন স্মৃতি হইতেই আবৃত্তি করিতে লাগিলেন; ব্যাখ্যার প্রয়োজন হইল না।

গৃহে ফিরিবার পথে এক জন যুবক ছাত্র বলিল, "কি সুন্দর আবৃত্তি!"

আর একজন বলিল, "'ছোট সাহেব' যখন কোন কবিতা আবৃত্তি করেন, তখন তাহাতেই যেন কবিতার নূতন সৌন্দর্য্য সপ্রকাশ হয়। কি বলেন, সরল বাবু?"

সরলকুমার তখন অন্যমনস্ক হইয়াছিল। সে কবিতার দুইটি চরণ স্মরণ করিতেছিল:—

"বসন্তে বিহগ-দেহে শোভা পায় নবীন বরণ,
বসন্তে প্রেমের চিন্তা পূর্ণ করে যুবকের মন।"

পিতার নিকট হইতে সরলকুমারের প্রস্তাবের বিষয় অবগত হইয়া মণিকা মনের মধ্যে অনন্যভূতপূর্ব্ব ভাব ও চাঞ্চল্য অনুভব করিতে লাগিল। গৃহকার্য্যের অবসরে স্থিরভাবে চিন্তা করিবার অবসর সে পাইল না—অথবা তাহার মনে হইল, সে পাইল না। মধ্যাহ্নের পর সে যখন একা ভাবিবার সময় পাইল, তখনও সে ভাবিবার পদ্ধতি স্থির করিতে পারিল না; বুঝিতে পারিল না, যৌবনে কেহ এরূপ বিষয়ে ভাবিবার পদ্ধতি স্থির করিতে পারে না—কেন না, সমুদ্রের চাঞ্চল্য যেমন তাহার স্বভাব, এ বিষয়ে যুবতীর মনের চাঞ্চল্য তেমনই তাহার প্রকৃতিগত। কেবল মণিকার মনে হইল, যে দিন সে তাজমহল সম্বন্ধে সরলকুমারের অভিব্যক্ত মতের সমর্থন করিয়াছিল, সে দিন সরলকুমার যে দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়াছিল এবং উভয়ের দৃষ্টি মিলিত হইলেই তাহা নত করিয়াছিল, সে দৃষ্টিতে সে বিদ্যুতের স্পর্শ অনুভব করিয়াছিল। সে দৃষ্টি সেই দিন হইতে বার বার তাহার মনে পড়িয়াছে।

রাত্রিকালে শয্যায় শয়ন করিয়া সে কেবলই ভাবিতে লাগিল। তখন যদি কেহ তাহাকে লক্ষ্য করিতে পারিত, তবে লক্ষ্যকারীর মনে হইত, যখন কোমল চিন্তা ও ত্বরিত-গতি ভাবাতিশয্য সুন্দরীর মুখে সৌন্দর্য্য-সঞ্চার করে, তখন তাহার কাছে প্রভাতের বা দিনান্তের আলোকে দৃষ্ট কুসুমের সুষমাও মলিন অনুভূত হয়।

একবার মণিকার মনে হইল, বিবাহে অনিশ্চিতের যে অংশ অনিবার্য্য, তাহা হইতে অসুখের উদ্ভব হইতে কতক্ষণ? কিন্তু তখনই আবার তাহার মনে হইল—যদি কখন পথে দস্যুর সহিত দেখা হয়—সেই ভয়ে কি কেহ জীবনের পথে তাহার সকল সঞ্চয় ফেলিয়া দিয়া রিক্ত হইয়া অগ্রসর হয়? জীবন সম্বন্ধে—সংসার সম্বন্ধে তাহার অভিজ্ঞতা অতি অল্প। কিন্তু সে যাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছে, সে কেবল তাহার কথাই মনে করিতে লাগিল—তাহার পিতামাতার সুখসমুজ্জ্বল জীবনের কথাই তাহার মনে পড়িতে লাগিল। সেরূপ জীবন যে আর কাহারও হয় না বা হইতে পারে না, এমনই বা কে মনে করিতে পারে?

যদিও তাহার যে বয়স, সে বয়সে মানুষ আপনার সুখের উপকরণ সংগ্রহ করিতে যথেষ্ট সময় পাইলেও স্বজনগণের সুখবিধানের জন্য সময় পায় না, তথাপি মণিকার মনে হইল, সে বিবাহ করিয়া স্বামীর সঙ্গে চলিয়া যাইলে, কে তাহার পিতাকে দেখিবে? সে জানিত, "ছোট সাহেব" স্ত্রীর স্বামীর নিকট হইতে দূরে থাকা ভালবাসিতেন না এবং তিনি বলিয়াছেন, সরলকুমারকে বাঙ্গালায় যাইতে হইবে।

সে মনে করিল, না—সে বিবাহ করিবে না। কিন্তু সেই সঙ্কল্প স্থির করিতে সে মনে কোন ব্যথা অনুভব করিল কি? সে তরবারের ফলক ধরিয়া তাহার ধরিবার স্থান দিয়া অপরকে আঘাত করে, সে কঠোরভাবে আঘাত করিতে পারে না—অথচ তাহার আপনার হাত কাটিয়া রক্ত পড়ে। মণিকার কি তাহাই হইল?

ভাবিতে ভাবিতে শেষ রাত্রিতে সে ঘুমাইয়া পড়িল। যখন স্নায়ুর শক্তি উত্তেজনার ফলে নিঃশেষ হয়, তখন মানুষ গাঢ় নিদ্রায় নিদ্রিত হয় এবং সে নিদ্রা যখন ভঙ্গ হয়, তখন তাহার মনে হয়, যে চিন্তার ভার দুর্ব্বহ বলিয়া মনে হইয়াছিল, সে চিন্তাভারও বহন করা যায়,—যে অবস্থা দুঃসহ বলিয়া মনে হইয়াছিল, তাহাও সহ্য করা সম্ভব। মণিকার তাহাই হইল। সে উঠিয়া অভ্যস্ত গৃহকার্য্যে আত্মনিয়োগ করিল। কিন্তু দর্পণের সম্মুখে যাইয়াই সে বুঝিতে পারিল, গত রাত্রির চিন্তা ও উদ্বেগ তাহার মুখে তাহাদিগের চিহ্ন অঙ্কিত করিয়া গিয়াছে—তাহার চক্ষু বেষ্টিত করিয়া মলিন বৃত্ত সৃষ্টি করিয়া গিয়াছে।

মালী ফুল লইয়া আসিলে মণিকা ঘরে ঘরে পুষ্পপাত্রে মলিন ফুলগুলি ফেলিয়া দিয়া নূতন ফুল সজ্জিত করিল এবং সর্ব্বশেষে বারান্দায় আসিয়া তথায় পুষ্পপাত্রটি তুলিয়া লইয়া নূতন ফুল দিল।

"ছোট সাহেব" তথায় ছিলেন।

মণিকা পিতার নিকটে বসিলে তিনি বলিলেন, "আমি ঠ'কে গেছি, মণিকা।"

মণিকা জিজ্ঞাসা করিল, "কেন, বাবা?"

"অনেক ভেবে দেখলাম, সরলকুমারের বিরুদ্ধে বলবার কিছু খুঁজে পেলাম না।"

মণিকা চুপ করিয়া রহিল।

"ছোট সাহেব" বলিলেন, "আমার মত আমি দিলাম; এখন তোমাকে তোমার মত জানাতে হ'বে।"

"বাবা, আমাকে কি বিয়ে করতেই হ'বে?"

"এ কথা তুমি জিজ্ঞাসা করছ কেন ?"

"আপনাকে কে দেখবে ?"

"ছোট সাহেব" হাসিয়া উঠিলেন ; বলিলেন, "দেখছি, তোমার নাবালক বাপটিকে নিয়ে তুমি বড়ই বিপন্ন হয়ে পড়েছ ! বিলাতে বুড়াদের জন্য আশ্রম আছে ; এ দেশে অকেজো পশুর জন্য পিঁজরাপোল হয়েছে—কিন্তু বুড়া মানুষদের জন্য কোন ব্যবস্থা হয় নি। না ?"

"না, বাবা, তাহা নয়। আমি আপনাকে ছেড়ে যা'ব না।"

"তা হ'লে আমি কখন আপনাকে ক্ষমা করতে পারব না। কারণ, আমি নিজেকে কখন এতটা স্বার্থপর ভাবতে পারি না। যখন আমার সেবার দরকার হবে, তখন সে সংবাদ তোমরা অবশ্যই পাবে। কিন্তু সে দরকার যেন না হয়, আমি তা-ই চাই।"

মণিকা ভাবিতে লাগিল, বাস্তবিক কেহ কি জলে অবতরণ না করিয়া কেবল কূলে বসিয়া জীবন-নদীর স্রোতঃ লক্ষ্য করিয়া থাকিতে পারে ?

"ছোট সাহেব" বলিলেন, "তুমি ভেবে দেখ। যদি সরলকুমারকে তোমার ভাল ব'লে মনে না হয়, তবে আমি কখনই বলব না—তুমি তাঁ'কে বিবাহ কর। সে বিষয়ে তুমি নিশ্চিন্ত থেক। তোমার মত জানতে পারলে, তবে আমি তাঁ'কে আমার কথা জানাব।"

মণিকা আর কিছু বলিল না।

মণিকা ভাবিতে লাগিল—ভাবিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিল না। সে পিতাকে দেবতার মত জ্ঞান করিত ; তিনি কোন বিষয়ে ভুল করিতে পারেন, ইহা সে বিশ্বাস করিতে পারিত না। তিনি যে বলিয়াছেন, তিনি সরলকুমারের বিরুদ্ধে বলিবার কিছুই পান নাই, তাহা মণিকার কাছে অভ্রান্ত সত্য বলিয়াই বোধ হইয়াছিল।

ফুলের পাঁপড়ীতে যখন স্বাভাবিক নিয়মে বর্ণ-সঞ্চার হয়, তখন সে বর্ণ দেখিতে দেখিতে গাঢ়তা ও প্রসার লাভ করে ; তেমনই যুবক-যুবতীর মনে যখন ভালবাসা প্রথম দেখা দেয়, তখন তাহা ক্রমেই প্রবল হয়। মণিকার তাহাই হইয়াছিল। সরলকুমারের মনীষা ও তাহার মিষ্ট ব্যবহার প্রথমে তাহাকে আকৃষ্ট করিয়াছিল—তাহার পর এই কয় বৎসরের ঘনিষ্ঠ পরিচয়ে সে আকর্ষণ দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর হইয়াছিল। কেবল তাহাই নহে—কখন্ যে তাহা একটু ভাবান্তর লাভ করিয়াছিল, তাহা সে বুঝিতেই পারে নাই। আপনার বক্ষে যে সৌরভ সঞ্চিত হয়, ফুল কি তাহা বুঝিতে পারে ? শেষে যে দিন সৌরভ অলিকে আকৃষ্ট করে, সেই দিন সে তাহার স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারে।

বয়সের ধর্ম্ম বয়সের সঙ্গে সঙ্গে দেখা দেয়।

মণিকাও সরলকুমারের বিরুদ্ধে বলিবার কিছু খুঁজিয়া পাইল না ; পরন্তু তাহার পক্ষে বলিবার অনেক নূতন বিষয়ের সন্ধান সে পাইতে লাগিল।

সে চলিয়া যাইলে পিতার অসুবিধা হইবে বলিয়া সে বিবাহে আপত্তি করিয়াছিল ; কিন্তু পিতার কথায় সে বুঝিয়াছিল, সে বিবাহ করিলে পিতা সুখী হইবেন—তাঁহার কর্ত্তব্য শেষ হইল, মনে করিবেন।

দুই দিন পরে "ছোট সাহেব" যখন কন্যাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মণিকা, তুমি কিছু স্থির করলে ?" তখন মণিকা নির্ব্বাক্ রহিল ; কেবল তাহার মুখে লজ্জার ভাব দেখা দিল।

"ছোট সাহেব" বলিলেন, "আমি সরলকুমারকে ডেকে ব'লে দেব, তাঁ'র প্রস্তাবে আমি আপত্তির কোন কারণ দেখি না।"

মণিকা কিছুই বলিল না।

৬

যে দিন পিতা পুত্রীকে পূর্ব্বোল্লিখিত কথা বলিলেন, সেই দিন সন্ধ্যায় ছাত্ররা বিদায় লইবার সময় "ছোট সাহেব" সরলকুমারকে পরদিন প্রাতে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে বলিয়া দিলেন। সে রাত্রিতে সরলকুমার ঘুমাইতে পারিল না—শরতের আকাশে যেমন পবন-তাড়িত লঘু মেঘ এক একবার চন্দ্রালোক আবৃত করে, আবার তাহার পর চন্দ্রালোকে আকাশ যেন হাসিতে থাকে, তাহার মনে তেমনই একবার আশার আলোক দেখা যাইতে লাগিল, আবার আশঙ্কার মেঘ তাহা আবৃত করিতে লাগিল। যদি সুসংবাদই হইবে, তবে "ছোট সাহেব" তাহা পরদিন বলিবার জন্য রাখিয়া দিবেন কেন ? কিন্তু যদি দুঃসংবাদই হয়, তবেই বা বিলম্বের কারণ কি হইতে পারে ? হয় ত তিনি তাহাকে সান্ত্বনা দিবার চেষ্টা করিবেন।

সান্ত্বনা! সে যৌবনের আগ্রহে যে ভালবাসা পুষ্ট করিয়াছে, সে ভালবাসা প্রত্যাখ্যাত হইলে সে কি কখন সান্ত্বনা লাভ করিতে পারে? তাহার মন বলিল—না—না।

যদি সে দুঃসংবাদই পায়, তবে সে পরদিনই আগ্রা ত্যাগ করিবে, আর কখন আগ্রায় আসিবে না; যে গুরুকে সে এত ভক্তি করে, সে গুরুর সঙ্গে তাহার আর কখন সাক্ষাৎ হইবে না। মণিকার কাছে সে বিদায় লইতে পারিবে না; মানুষের মনকে বিশ্বাস নাই; যদি হতাশার বেদনায় সে কোন অপ্রিয় কথা বলিয়া ফেলে! সে জন্য সে কখন আপনাকে ক্ষমা করিতে পারিবে না। কিন্তু কেনই বা সে অসংযত হইবে? সে মণিকার কাছেও বিদায় লইয়া যাইবে।

শয্যায় থাকা কষ্টকর মনে করিয়া সরলকুমার বারান্দায় যাইয়া একখানি চেয়ারে বসিল, মধ্যে মধ্যে উঠিয়া বেড়াইতে লাগিল। দিবালোকবিকাশসূচনা হইতে না হইতে সে ভৃত্যকে ডাকিয়া দিয়া স্বয়ং স্নান করিতে চলিয়া গেল এবং যখন সে "ছোট সাহেবের" বাংলোর পথ গ্রহণ করিল, তখন দিনের আলো কেবল আগ্রার গম্বুজে গম্বুজে যেন বর্ণরঞ্জন করিতেছে। সে আপনি আপনার হৃদয়ের স্পন্দন-শব্দ শুনিতে পাইতে লাগিল।

সরলকুমার গৃহের বেষ্টনোদ্যানে প্রবেশ করিয়া দেখিতে পাইল, মণিকা তাহার পিতার সহিত বেড়াইতেছে। তাঁহারাও তাহাকে দেখিতে পাইলেন। সে তাঁহাদিগের নিকট উপনীত হইবার পূর্ব্বেই যখন মণিকা বাংলোর মধ্যে চলিয়া গেল, তখন তাহার উৎকণ্ঠা ও আশঙ্কা যেন আর সীমায় বদ্ধ রহিল না। সে যে কিরূপে "ছোট সাহেবের" কাছে উপনীত হইল, তাহা সে আপনিই বুঝিতে পারিল না। তাহার মনে হইতেছিল, হয় ত মণিকার সহিত তাহার এই দেখাই শেষ দেখা। সে চিন্তায় কি ব্যথা!

"ছোট সাহেব" বলিলেন, "এস, সরলকুমার। এস!"

তাহার পর তিনি ডাকিলেন, "মণিকা! মা!"

বাংলোর মধ্য হইতে কেহ উত্তর দিল না। তবে "ছোট সাহেবের" মুখের প্রফুল্লভাব সরলকুমারকে সাহস দিল।

"ছোট সাহেব" বলিলেন, "মণিকা দেখছি, আসবে না। আমার ইচ্ছা ছিল, দু'জনকে একসঙ্গে আশীর্ব্বাদ ও অভিনন্দিত করব; তা' দেখছি, হ'ল না। আশীর্ব্বাদ আমি তোমাদের দু'জনকেই করছি—চিরসুখী হও। আর আমি তোমাদের দু'জনকেই অভিনন্দিত করতে পারি; কারণ, আমার বিশ্বাস—মণিকার যেমন তোমার মত স্বামী পাওয়া সৌভাগ্য বিবেচনা করা সঙ্গত, তুমিও তেমনই—তোমার রুচির অনুরূপ রুচির অনুশীলনকারিণী মণিকাকে পেয়ে সুখী হবে।"

সরলকুমারের হৃদয় আনন্দে পূর্ণ হইয়া উঠিল। সে নতমস্তক হইয়া "ছোট সাহেবের" কথা শুনিতেছিল—তাহার মনে হইতেছিল, সত্য সত্যই যেন তাঁহার আশীর্ব্বাদ তাহার মস্তকে কল্যাণ বর্ষণ করিতেছে।

উভয়ে উদ্যান হইতে বাংলোয় উপনীত হইলেন। তথায় "ছোট সাহেব" আবার কন্যাকে ডাকিলেন এবং উত্তর না পাইয়া হাসিয়া বলিলেন, "দেখ, মণিকা এর মধ্যেই আর আমার কথা শুনছেন না।"

তাহার পর তিনি সরলকুমারকে বলিলেন, "তুমি যাও, মণিকার সঙ্গে দেখা ক'রে এস।"

সরলকমার বলিল, "আমি পরে এসে দেখা করব।"

তাহার কথা শুনিয়া "ছোট সাহেব" বিস্মিতভাবে তাহার দিকে চাহিলেন।

সরলকুমার বলিল, "মণিকার আঙ্গুলের আংটীর মাপ পেতে পারি কি?"

"ছোট সাহেব" হাসিয়া বলিলেন, "আংটী নিয়ে এসে দেখা করবে? সেটা কিন্তু বিলাতের প্রথার অনুকরণ।"

ছাত্র হিসাবে পদের ব্যাখ্যা লইয়া সে যেমন অধ্যাপকের সহিত তর্ক করিত, তেমনই ভাবে সরলকুমার বলিল, "কেন? আমাদের দেশেও যে অঙ্গুরীয় অভিজ্ঞান হিসাবে ব্যবহৃত হ'ত, তা' ত কালিদাসের সাক্ষ্যে পাওয়া যায়।"

"ঠিক বলেছ।"

একটু ভাবিয়া "ছোট সাহেব" বলিলেন, "আংটী মণিকা একটাই ব্যবহার করেন; সেটা যে দেবেন, এমন মনে হয় না—কারণ, সেটা ওঁর মা'র ছিল। তবে—তাঁ'র আংটী আরও আছে; আমি দেখছি।"

"ছোট সাহেব" তাঁহার শয়নকক্ষে প্রবেশ করিলেন এবং তথায় আলমারী খুলিয়া একটি অঙ্গুরী আনিয়া সরলকুমারকে দিলেন। সরলকুমার শ্রদ্ধা সহকারে সেটি গ্রহণ করিয়া পকেটে রাখিল এবং উঠিয়া দাঁড়াইয়া বিদায়ী নমস্কার করিল।

"ছোট সাহেব" বলিলেন, "এখনই চল্লে ?"

সরলকুমার বলিল, "এখন একবার যেতে হ'বে। পরে আবার আসব।"

"এক পেয়ালা চা-ও খেলে না ?"

"চা আমি খেয়ে এসেছি"—বলিয়া সরলকুমার বিদায় লইল। আসিবার সময় সে মনে আশঙ্কা লইয়া আসিয়াছিল, যাইবার সময় আনন্দ লইয়া গেল—এ-বার তাহার গতি আর মন্থর নহে—দ্রুত।

"ছোট সাহেব" বুঝিলেন, সে অঙ্গুরীয় কিনিতে গেল। কিন্তু সে জন্য সে যে আগ্রা হইতে দিল্লী পর্য্যন্ত যাইবে, তাহা তিনি অপরাহ্ণের পূর্ব্বে জানিতে পারিলেন না। অপরাহ্ণে অন্য ছাত্ররা আসিয়া বলিল, কি একটা কায আছে বলিয়া সরলকুমার দিল্লী যাত্রা করিয়াছে ; বলিয়া গিয়াছে, সন্ধ্যায় ফিরিবে।

সন্ধ্যার পর যখন অন্য ছাত্ররা চলিয়া গেল, তখন "ছোট সাহেব" কন্যাকে বলিলেন, "সকালে সরলকুমার যখন তোমার আংটীর মাপ চেয়েছিলেন, তখন যদি বলতেন, তিনি সেটা নিয়ে দিল্লী পর্য্যন্ত যাবেন, তবে আমি বারণ করতাম। ছেলেমানুষ!"

মণিকা কোন কথা বলিল না ; কিন্তু পিতার কথায় তাহার চক্ষু যেন উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

এই সময় একখানি যান গৃহবেষ্টনোদ্যানে প্রবেশ করিল—শব্দ শুনা গেল এবং তাহার পরই সেখানি বারান্দার সম্মুখে দাঁড়াইবামাত্র সরলকুমার নামিয়া বাংলোয় প্রবেশ করিল।

সে ঘরে প্রবেশ করিলে মণিকা উঠিয়া চলিয়া যাইবার উদ্যোগ করিলে, "ছোট সাহেব" বলিলেন, "মণিকা, শুনেছ ত, সরলকুমার দিল্লী থেকে আসছেন—তুমি ওঁর জন্য কিছু খাবার আন ; চাকরকে বল, স্নানের ঘরটা দেখিয়ে দিক—হাত-মুখ ধুয়ে আসবেন।"

মণিকা চলিয়া যাইলে সরলকুমার অঙ্গুরীয়ের বাক্স বাহির করিয়া সেটি খুলিল—বিদ্যুতের আলোকে অঙ্গুরীয়ের হীরক যেন জ্বলিয়া উঠিল।

"ছোট সাহেব" বলিলেন, "তুমি এ কত টাকার জিনিষ এনেছ ?"

সরলকুমার বলিল, "বেশী নয়।"

সরলকুমার হাত মুখ ধৌত করিয়া আসিল। মণিকা তাহার জন্য খাবার লইয়া আসিল।

অঙ্গুরীয়ের বাক্সটি টেবলের উপরেই ছিল। "ছোট সাহেব" সরলকুমারকে বলিলেন, "তুমি এটি মণিকাকে দাও।" বলিয়া তিনি—যেন কি কাযে—পার্শ্বের কক্ষে গমন করিলেন।

সরলকুমার পকেট হইতে একখানি খাম বাহির করিয়া সেইখানি ও অঙ্গুরীয়টি মণিকাকে দিল। মণিকা লজ্জানত-দৃষ্টি হইয়া সেগুলি গ্রহণ করিয়া অঙ্গুরীয়টি টেবলের উপর রাখিয়া দিল এবং খামখানি বুকের কাপড়ের মধ্যে লুকাইয়া রাখিল।

আপনার ঘরে যাইয়া মণিকা খামখানি বাহির করিল। তাহার মধ্যে সরলকুমারের স্বরচিত একটি কবিতা ছিল :—

এস রজনীর শেষে সমুজ্জল বেশে দিবালোকরাশিসম ;
এস স্নিগ্ধ শীতল বরষার জল তপ্ত-হৃদয়ে মম ;
এস মরুর উষর বালুর উপর স্ফটিকস্বচ্ছ ধার ;
এস শিশির-অন্তে নব বসন্তে সুমনস সুকুমার ;
এস নীল নির্ম্মল গগনে বিমল রজতজ্যোৎস্না-হাসি ;
এস অলিসঙ্কুল সৌরভাকুল পুলকিত ফুলরাশি ;
এস শরৎ-তপনে প্রভাত-পবনে বিকশিত শতদল ;
এস খররবিকরে পিপাসাকাতরে স্নিগ্ধ শীতল জল ;
এস অমানিশাপরে নীল অম্বরে রবিকর মধুময় ;
এস হতাশের তরে জীবন-সমরে চির-ঈপ্সিত জয় ;
এস হতাশাকাতর মম অন্তর পুলকিত তোমা লাগি' ;
এস টুটি' দুখশোক আশার আলোক উঠিছে সেথায় জাগি' ;
এস দুখের আঁধার ঘুচায়ে আমার আলোক পুলকভরা ;
এস সুখ এ জীবনে শান্তি মরণে সংসার আলোকরা ;

কবিতাটি একবার পাঠ করিয়া মণিকা যখন আবার পাঠ করিতেছে, সেই সময় তাহাকে ডাকিয়া পিতা কক্ষে প্রবেশ করিলেন। তিনি অঙ্গুরীয় ও আধারটি টেবলের উপর রাখিয়া বলিলেন, "তুমি ফেলে এসেছিলে। সরলকুমার অনেকগুলি টাকা খরচ করেছেন। এটি তোমাকে পরতে হ'বে।"

তিনি চলিয়া যাইলে মণিকা একবার দ্বারের দিকে চাহিয়া দেখিল, তাহার পর অঙ্গুরীয়টি বাক্স হইতে বাহির করিল। আলোকপাতে হীরক হইতে আলোক যেন

বিচ্ছুরিত হইল। মণিকা সেটি অঙ্গুলীতে পরিধান করিল। তাহার মনে হইল, অঙ্গুরীয়টি কবিতাটিরই মত সুন্দর। সে আপনাকে জিজ্ঞাসা করিল, সরলকুমারের প্রেম কি আরও সুন্দর?

সে অঙ্গুরীয়টি ধীরে ধীরে খুলিয়া রাখিল বটে, কিন্তু রাত্রিতে শয়ন করিতে যাইবার পূর্ব্বে কবিতাটি আবার—বারবার পাঠ করিয়া অঙ্গুরীয়টি পুনরায় পরিধান করিয়া যখন শুইতে গেল,—তখন কবিতাটি তাহার স্মৃতিগত হইয়াছে! শয্যায় শয়ন করিয়া তাহার মনে হইতে লাগিল, কবিতাটি যেন তাহার মনের মধ্যে কেবল গুঞ্জরণ করিতেছে।

সে ঘুমাইয়া পড়িল। [ক্রমশঃ।

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ।

গেঁয়ো নদী

অনাদি কালের প্রাচীন তাপস হিমালয়-শির হ'তে
কোন্ অমরার পীযূষ বহিয়া পূত জাহ্নবী স্রোতে
চলিয়াছ বেয়ে চির-আনমনা স্বচ্ছ তটিনি অয়ি।
পতিত-পাবনি! শান্তি-দায়িনি! চির-কল্যাণ-ময়ি!
সৃষ্টি-প্রভাতে জন্ম হয় ত, সেই আদিযুগ হ'তে
আপনা ভুলিয়া সঁপিলে জীবন শুধু পরহিত-ব্রতে।
কুল্ কুল্ কুল্ চলিয়াছ গেয়ে কত গ্রাম, পথ ছাড়ি,
কত যে নগর কত বনভূমি প্রান্তর দিয়া পাড়ি!
বিটপী-গুল্ম-ব্রততীতে ঘেরা তোমার উভয় তীর,
প্রণাম জানায় অশ্বত্থ বট বিনয়ে নোয়ায়ে শির।

কোথাও দু-পাশে কুঞ্জ, কানন, শ্যামল বেতস-বনে
শ্যামা তরুণীর আঁচড়ানো চুল দুলে মৃদু সমীরণে।—
বন-মালতীর শুভ্র লহর দুলাইয়া কম গলে,
আলতা-রাঙানো যুগল চরণ রেখেছে কমল দলে;
শ্যামল আঁচল তট হ'তে তার বুঝি বা তোমারি জলে
দুষ্ট সমীর ছড়াইয়া দেছে পুলক-কৌতূহলে।
কেশের সুরভি পাগল করেছে ডাহুক বুঝি বা তাই
সারা দিনমান কি যেন কি খোঁজে কি যেন তাহার নাই।

শাল্মলী-শাখে রয়েছে বসিয়া মাছরাঙা একমনে,
ব্যগ্র চাহনী চৌদিকে হানে অপলক দু'নয়নে।
পানিকৌড়ী সে কখনো ডুবিছে উঠিছে কভু বা ভেসে,
ডুব দিয়া পুনঃ চ'লে যায় কোন্ গহীন্ অতল দেশে;
কনক-বরণ কোন্ মেয়ে সে যে পলাশের মাঝে ধীরে
মুখ বাড়াইয়া ছবি দেখে তার স্বচ্ছ তোমারি নীরে!
তট-ভূমে কোথা শত দ্রোণফুল ধবল মুকুতা-রাশি,
বুঝি বা তোমারি জোয়ারের সনে আসিয়াছে তারা ভাসি';

ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে গাঙ্ চিল কত সারা দিনমান ধরি',
বটগাছ শিরে কত শত পাখী রহিয়াছে বাসা করি'।
অনেক দিনের বালুচর ভরা কাশের বনের মাঝে
খরগোস আর খেঁকশিয়ালীরা ছুটে ফিরে প্রাতে সাঁঝে!
তারি পাশ দিয়া মাঠে যাইবার সরু পথখানি ধ'রে
রাখাল ছেলেরা গরু নিয়া যায় হরষে নিতুই ভোরে।
মিঠেল সুরেতে বাঁশের বাঁশীটি বাজায় সে নানা মতে,
সেই মিঠে সুর যেন ভেসে চলে তোমারি তরল স্রোতে।

গাঁয়ের মেয়েরা জল নিতে যায় শূন্য কলসী কাঁখে,
হয় ত কাহারো উদাস বাঁশরী হয় ত কারেও ডাকে।
শূন্য গাগরী ভরাইতে গিয়া দেরী হয় শুধু তার,
সঙ্গী মেয়েরা বলে—ছি ছি ওলো, এ কি তোর ব্যবহার!
সন্ধ্যা নেমেছে আঁকা-বাঁকা পথে যাইতে হইবে দূরে,
আনমনা ওলো মন ছুটে তোর কোন্ সে মায়ার পুরে,
পিছে পিছে ধীরে চলে সে তরুণী অদূরে পথের বাঁকে
কে যেন তাহারে হাতছানি দিয়া বারে বারে শুধু ডাকে।
শিথিল চরণ অবশ তাহার কোন মতে যায় বাড়ী
ভাবে বুঝি তার হৃদয়ের ধন পথ-বাঁকে এলো ছাড়ি,

জটাধারী যোগী বসিয়া থাকিত তব 'জোড়গাছ'-তলে,
সে-ই বসাইল 'যোগীর হাট' যে শুনা যায় তপোবলে।
আজো শুনা যায় ঘোর অমা-রাতে নীরব নিশীথে কেহ
হাটের প্রান্তে ধ্যানে নিমগ্ন দেখেছে বিশাল দেহ।
দু'নয়ন তার আগুনের মত ঝক্ ঝক্ জ্বলে যেন,
দৃষ্টি-প্রভাবে ভস্ম হইবে বুঝি বা সকলি হেন।
শনি মঙ্গল কিবা অমা সাঁঝে তাই 'জোড়গাছ'-তলে
'ভোগ' দিয়া কেহ 'পাঁঠা' কেটে যায় দুধ-কলা পাকা ফলে।

লক্ লক্ লক্ চিতার আগুন জ্বলিছে কোথাও ধূ ধূ,
কত হৃদয়ের বুক-ফাটা শ্বাস শ্বসিছে পবনে হু হু;
বাধ-হারা বারি দুনয়ন হ'তে ঝরিছে অনর্গল,
তিতিয়া বক্ষ, তিতিয়া বস্ত্র, তিতিয়া শ্মশান-স্থল।
স্মৃতি-মন্দির গড়িল কেহ বা, কেহ বা দহন-শেষে
ফিরে গেল শেষ স্মৃতি নিয়া শুধু অশ্রু-সলিলে ভেসে,—
অবগাহি' তব পূত ও জলে। দেখি' সব নিরবধি
চলিয়াছ বয়ে চির-আনমনা একমনে অয়ি নদি!

বর্ষা-বসন্ত ভেদ নাই তব চলেছ সদাই বেয়ে,
সেই অবিরাম কুল্ কুল্ কুল্, কুল্ কুল্ কুল্ গেয়ে।
ভরা যৌবনে জোয়ার আসিয়া ফিরে যায় পুনরায়,
প্রেমিকে তোমার তবু নাহি পাও বিরহিণী চির হায়!
শাশ্বত প্রেমে জীবন সঁপিয়া তাই কি পরের হিতে
যা কিছু সকলি বিলাইয়া দিছ পরম হৃষ্ট চিতে?
পার্থিব কিছু নহেকো কাম্য তাই লো আপন-হারা,
যুগ যুগ ধরি' বিলাইছ শুধু বুঝি বা পীযূষ-ধারা!

কে, এম, শমশের আলী।

ইতিহাসের অনুসরণ

অশোক

ভারতের ইতিহাস-প্রসিদ্ধ মৌর্য্যবংশের প্রতিষ্ঠাতা চন্দ্রগুপ্তের পৌত্র এবং রাজা বিন্দুসারের পুত্র অশোকের নাম অনেকে শুনিয়াছেন বটে, কিন্তু তিনি যে কত মহৎ কার্য্য করিয়াছেন বা ইতিহাসবেত্তা পণ্ডিতগণ তাঁহাকে কত উচ্চে আসন দিয়াছেন, তাহা সকলে জানেন না। যদিও এ কথা আমরা নিঃসন্দেহে বলিতে পারি যে, তাঁহার ন্যায় দেশ-সেবক ও প্রজারঞ্জক রাজা অতি অল্পই দেখা যায়, তবুও পণ্ডিতগণ তাঁহাকে মাত্র এই কারণেই মহৎ বলিয়া আখ্যাত করেন নাই। তিনি প্রজাদিগকে সুখে-স্বচ্ছন্দে রাখিবার দিকে প্রখর দৃষ্টি রাখিয়াছিলেন। তাঁহার রাজত্ব-সময়ের বিবরণ পাঠে আমরা জানিতে পারি যে, তাঁহার সময়ে চৌর্য্যবৃত্তি কেহই গ্রহণ করে নাই। লোক নির্ব্বিরোধে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিত, কাহারও কোন অভাব ঘটিত না। এইরূপ কার্য্য করিলে প্রত্যেক রাজাই প্রশংসা পান। কিন্তু তাঁহার কার্য্য এত উন্নত যে, প্রশংসার দ্বারা তাঁহার প্রকৃত মহত্ব উপলব্ধি করান সহজ নয়। তিনি কোন্ কোন্ মহৎ কার্য্য করিয়া তাঁহার মনের উদারতা দেখাইয়াছিলেন, আজ আমরা তাহাই বলিবার চেষ্টা করিব।

তিনি রাজা হইবার অল্পদিন পরেই যে বিপুল আয়োজন করিয়া কলিঙ্গ প্রদেশকে তাঁহার রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন, তাহাতে অনেক নরহত্যা ও প্রভূত অর্থব্যয় হইলেও তাহার দ্বারা দেশের, তথা সমস্ত জগতের যে উপকার সাধিত হইয়াছিল, তাহার তুলনা হয় না। এই যুদ্ধে হতাহতের সংখ্যা দেখিয়া এবং বিনা কারণে একদেশবাসী জনগণের অবর্ণনীয় দুর্দ্দশা দর্শনে তাঁহার মহৎ হৃদয় এত দূর বিচলিত হইয়া উঠে যে, তিনি এই পাপক্ষালনের জন্য বৌদ্ধধর্ম্মের মতে দীক্ষা গ্রহণ করেন। এই বৌদ্ধধর্ম্মের অহিংসানীতি, পরোপকার-প্রবৃত্তি ও সুনীতি অনুসরণের আদেশ ইত্যাদি দেখিয়া তিনি এতদূর মোহিত হন যে, স্বয়ং ঐ মতে দীক্ষিত হইয়া ইহার মতে কার্য্য করিয়াই ক্ষান্ত হইলেন না; পরন্তু যাহাতে এই ধর্ম্মমত সমস্ত দেশে ছড়াইয়া পড়ে, তাহার জন্য বিশেষ সচেষ্ট হইলেন। ইতিহাসের প্রত্যেক ছত্রে যে তাঁহার যশোগান করা হইয়াছে, তাঁহার এই বৌদ্ধধর্ম্মবিস্তৃতির চেষ্টাই তাহার প্রধান কারণ। তিনি কিরূপ ভাবে রাজ্য শাসন করিতেন, সে সম্বন্ধে কিছুমাত্র আলোচনা না করিয়া আমরা এক্ষণে কেবলমাত্র তাঁহার সম্বন্ধে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ কিরূপ ধারণা পোষণ করেন এবং কেনই বা সেরূপ ধারণা করেন, তাহাই বলিব।

এক জন পণ্ডিত বলিয়াছেন—ইতিহাসে আমরা যে শত-সহস্র রাজার নাম দেখিতে পাই, তাহার মধ্যে অশোকের নাম একটি তারকার ন্যায় উজ্জ্বল হইয়া রহিয়াছে। অপর এক ব্যক্তি বলিয়াছেন, রাজা অশোকের তুলনা পৃথিবীর ইতিহাসে পাওয়া যায় না। যদি তাঁহার তুলনাই করিতে হয়, তাহা হইলে কোন এক নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তির সহিত তুলনা না করিয়া, একত্রে তিন জনের সহিত তুলনা করাই ভাল। তিনি একাধারে কনষ্টানটাইন, নেপোলিয়ন ও আলেকজান্দার। যে ব্যক্তির সম্বন্ধে পণ্ডিতগণ এইরূপ মতামত পোষণ করেন, তাঁহার কৃতিত্ব সম্বন্ধে আলোচনার স্বতঃই আগ্রহ হয়।

যে ব্যক্তিই অশোকের ইতিহাস পাঠ করুন না কেন, অশোক সম্বন্ধে পণ্ডিতগণের মতামতের বিরুদ্ধে বলিবার মত কিছুই পাইবেন না। অশোককে রাজা আখ্যাত না করিয়া রাজর্ষি নামে অভিহিত করিলেই গুণগ্রাহিতার পরিচয় দেওয়া হয় এবং তিনিও যে জনহিতকর ও যশোমণ্ডিত কার্য্য করিয়াছেন, তাহারও কতক সম্মান রক্ষা করা হয়। অশোক মৃত্যুসময় পর্য্যন্ত, কেহ কেহ বলেন কিছু পূর্ব্বে, সিংহাসন ত্যাগ করিয়াছিলেন। রাজ্যশাসন করিলেও তাহা যে কেবলমাত্র প্রজাদিগের সুখ ও শ্রীবৃদ্ধিসাধনের হেতু হইয়াছিল, সে বিষয়ে, বোধ হয়, কিঞ্চিন্মাত্র সন্দেহের অবকাশ নাই। যিনি অহিংসানীতিকে জীবনের শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম জ্ঞানে গ্রহণ করিয়া, প্রজাদিগের যাহাতে ধর্ম্মে মতি হয়, তাহার জন্য অতুল ঐশ্বর্য্য ব্যয় করত চতুর্দ্দিকে

ধর্ম্ম-নীতি-সমূহ-ক্ষোদিত প্রস্তরফলক বসাইতেন, এবং স্তম্ভে ও লিপি-গাত্রেও ঐ সব অনুশাসন ক্ষোদিত করাইতেন। তিনি প্রজাদিগকে সুখে রাখিবার নিমিত্ত যে নানারূপ উপায় উদ্ভাবন করিতেন, তাহাতে বিস্ময়ের কি আছে? আমরা তাঁহার ৬নং রক এডিক্ট (শিলালিপি) প্রস্তরস্তম্ভে দেখিতে পাই, তিনি বলিতেছেন—প্রজারা যে কোন সময়েই আসুক না কেন, তিনি যেন তৎক্ষণাৎ তাহাদিগের আগমনের কারণ জানিতে পারেন। তিনি ইহাও বলিয়াছেন যে, তখন যদি আমি রাণীর কক্ষে থাকি, তাহা হইলেও আমাকে জানাইতে হইবে।

অশোক তাঁহার রাজ্য যাহাতে সম্পূর্ণ সুশৃঙ্খলে অর্থাৎ প্রজাবর্গের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে শাসিত হয়, সে বিষয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু তিনি বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারের জন্য যেরূপ আগ্রহান্বিত হইয়াছিলেন বা যেরূপ যত্ন লইয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার রাজভোগ লালসার বিকাশ প্রবল ছিল না বলিলে, বোধ হয়, সত্যের অপলাপ করা হইবে না। আমরা দেখিতে পাই, অশোক এই ধর্ম্ম প্রচারের জন্য মধ্যে মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিক্ষু (বৌদ্ধ সন্ন্যাসী) প্রেরণ করিতেন এবং তাহারই ফলে এই ধর্ম্ম বিভিন্ন জাতির মধ্যে ছড়াইয়া পড়ে। ভিনসেণ্ট স্মিথ বলিয়াছেন, সর্ব্বসমেত তিনি নয়বার এইরূপ ভিক্ষু পাঠাইয়াছিলেন, তাহার মধ্যে সাতটি দল ভারতের সীমানামধ্যে, একটি ব্রহ্মদেশে এবং অপরটি সিংহলে পাঠান হইয়াছিল। এই শেষোক্ত ভিক্ষু, তাঁহার এক ভ্রাতা ও এক ভগিনী একটি মঠের মধ্যে জীবন নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন। তিনি এই দেশের রাজাকে তাঁহার ধর্ম্ম-প্রচার-কার্য্যের সহায়করূপে প্রাপ্ত হয়েন। যদিও য়ুরোপে তাঁহার লোক পাঠান সম্বন্ধে কোন প্রমাণ এখনও পাওয়া যায় নাই, তথাপি আমরা এই পর্য্যন্ত জানি যে, খৃষ্টধর্ম্মের উপদেশাবলীর জন্য শেষোক্ত ধর্ম্ম বৌদ্ধধর্ম্মের নিকট ঋণী এবং আরও শুনিয়াছি যে, খৃষ্ট যে বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই বংশ না কি তখন অশোক-প্রচারিত ধর্ম্মেই দীক্ষিত ছিলেন। যদিও এ বিষয়ে সম্যক্ প্রমাণ পাওয়া যায় না, তথাপি পরস্পর তুলনা করিয়া যে প্রমাণ পাওয়া যায়, তাহা হইতেই এ কথা বলা চলে।

রাজা অশোক বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারের নিমিত্ত নানারূপ উপায় উদ্ভাবন বা তাহার জন্য বিশেষ ক্লেশ স্বীকার করিয়াছিলেন। তিনি ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে এই ধর্ম্ম প্রচারের জন্য সময়ে সময়ে ধর্ম্মযাজক প্রেরণ করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই; যাহাতে লোক সর্ব্বসময়ে এই ধর্ম্মের উপদেশাবলী পাঠ করিয়া এই ধর্ম্মে দীক্ষিত হয়, তাহার জন্য তিনি জন-বহুল স্থানসমূহে উপদেশের সারাংশ প্রস্তরে ক্ষোদিত করিয়া রাখিয়া দিতেন। এই সকল প্রস্তরে আমরা তাঁহার এবং দেশের সম্বন্ধে সকল বিষয় অবগত হইতে পারি। তাহারই দুই চারিটির লিপির অনুবাদ নিম্নে প্রদান করিলাম।

আমার রাজত্বের যত উচ্চ ও নিম্নপদস্থ কর্ম্মচারী আছেন, তাঁহাদিগের প্রত্যেককেই রাজকীয় কার্য্য থাকুক বা না থাকুক, ধর্ম্মসম্বন্ধে উপদেশ দিবার নিমিত্ত প্রতি পাঁচ বৎসরে নিজ নিজ এলাকার মধ্যে ভ্রমণ করিতে হইবে।—পিতা-মাতার আদেশ পালন, বন্ধু, পরিচিত ও আত্মীয়বর্গের প্রতি সদ্ব্যবহার, ব্রাহ্মণ ও বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদিগের প্রতি ভক্তি, প্রাণি-হত্যায় বিরতি, মিতব্যয়িতা, অল্প সঞ্চয় ইত্যাদি যে সৎকার্য্য, সে বিষয়ে উপদেশ দিতে হইবে। (Rock Edict III)

ধর্ম্মদান অপেক্ষা কোন দান উচ্চ নয়, ধর্ম্মকার্য্যের জন্য বন্ধুত্ব, ধর্ম্মনীতি সম্বন্ধে উদারতা, পরধর্ম্মে অসহিষ্ণু না হওয়া, সৎসংসর্গ এবং ক্রীতদাসের প্রতি ন্যায় আচরণ ধর্ম্মকার্য্য; (R E. XI.)

কোন ব্যক্তি যথেষ্টরূপ প্রমাণ না পাইয়া তাহার নিজের ধর্ম্ম সম্বন্ধে উচ্চ মত বা পরধর্ম্ম সম্বন্ধে মিথ্যা কলঙ্ক ঘোষণা করিবে না। বিশেষ কোন দোষ না পাইলে অন্য ধর্ম্ম সম্বন্ধে কুৎসাপ্রচার অনুচিত। কারণ, ভিন্নধর্ম্মাবলম্বিগণও কোন না কোন বিষয়ে প্রশংসা পাইবার যোগ্য। এই মতানু-সারে কায করিলে নিজ ধর্ম্মকে উন্নত এবং পরধর্ম্মেরও উপকার করা হয়। ইহার বিপরীত কায করিলে নিজের ধর্ম্মের উপর গ্লানি আনয়ন করা হয়। (R E. XII.)

ধর্ম্মকে বিশেষরূপে ভাল না বাসিলে, নিজেকে সম্পূর্ণরূপে পরীক্ষা করিয়া সমস্ত কালিমা ধুইয়া না ফেলিলে, বিনয়, ভয় এবং দুর্নিবার্য্য প্রয়াস না থাকিলে ইহলোক এবং পরলোকে কোথাও শান্তিলাভ হয় না। (Pillar dict)

ধর্ম্মকার্য্যের নিমিত্ত জীবনধারণ অতীব সুখের।

কিন্তু কোন্ কার্য্যমধ্যে ধর্ম্ম নিহিত আছে?—পাপিষ্ঠ না হওয়া, সৎকর্ম্ম, দয়া এবং সত্যবাদিতা এই সকল ধর্ম্মমধ্যে নিহিত আছে। (R. E. II)

পূর্ব্ব পূর্ব্ব অনেক রাজা তাঁহাদিগের প্রজাবর্গকে আশীর্ব্বাদ করিয়াছেন। আমিও এক্ষণে তাহাদিগকে এই বলিয়া আশিস্ বিতরণ করিতেছি—যেন তাহাদের ধর্ম্মে মতি হয়। (R. E)

রাজা অশোক ইহার মধ্যে নিজ নাম দেন নাই। তিনি "প্রিয়দর্শন" বলিয়া নিজেকে আখ্যাত করিয়াছেন। ইহাতে এইরূপ মনে হয় যে, তিনি যশের আকাঙ্ক্ষা করিতেন না।

বুদ্ধদেব-প্রচারিত নীতিসমূহ হিন্দুধর্ম্ম হইতে গৃহীত হইলেও অহিংসা-নীতিকে এই মত অতি উচ্চ স্থান দান করিয়াছে। হিন্দুধর্ম্মে যাগযজ্ঞ ইত্যাদি কার্য্য নির্ব্বাহ জন্য পশু-বলিদানের ব্যবস্থা আছে। কিন্তু অন্যান্য রীতি-নীতি সবই হিন্দু ও বৌদ্ধধর্ম্মে প্রায় এক। বৌদ্ধধর্ম্মে জাতিভেদ-প্রথা নাই। জৈনদিগের মধ্যেও ইহা নাই। কিন্তু রাজা অশোক যেরূপ বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারের নিমিত্ত প্রাণপণ প্রয়াস করিয়াছিলেন, সেরূপ অপর কোন রাজা জৈন-ধর্ম্মের জন্য না করায় উহা দেশগত ধর্ম্ম হইয়া গিয়াছে এবং ভারতের নিতান্ত সামান্য স্থান ব্যতীত অপর কোথাও ইহার প্রচলন হয় নাই। যদিও অশোকের রাজত্বকালে ভারতের অধিকাংশ ব্যক্তিই বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন, তথাপি তাঁহার মৃত্যুর কিছুকাল পরেই তাঁহারা পুনরায় হিন্দুধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন এবং এক্ষণে আমরা দেখিতে পাই যে, বৌদ্ধধর্ম্ম এই দেশে লুপ্তধর্ম্ম হইয়া গিয়াছে।* কেবলমাত্র চীন, জাপান ইত্যাদি দেশে এই ধর্ম্ম পরিবর্ত্তিত-রূপে এক্ষণেও চলিতেছে। পাশ্চাত্যদেশে এই ধর্ম্ম বিস্তার লাভ করিয়াছিল কি না, সে বিষয়ে মতদ্বৈধ থাকিলেও খৃষ্টান-ধর্ম্মের কিছু নীতি যে বৌদ্ধধর্ম্ম হইতে সংগৃহীত হইয়াছে, সে কথা পণ্ডিতমণ্ডলী এক্ষণে স্বীকার করেন।

অশোক এই ধর্ম্ম প্রচারের নিমিত্ত যেরূপ প্রয়াস পাইয়াছিলেন এবং তাঁহার কার্য্য-প্রণালীর যে সব নিদর্শন পাওয়া যায়, তাহার আলোচনা করিলে আমরা তাঁহার কৃতিত্ব এবং লোকহিতকর কার্য্য-সমূহ জ্ঞাত হই। তাঁহার সমস্ত কার্য্য-প্রণালী পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিবেচনা করিয়া কোন পণ্ডিত তাঁহাকে পাশ্চাত্যপ্রদেশের রাজা কনষ্টানটাইনের সহিত তুলনা করেন। আমরা জানি যে, এই শেষোক্ত রাজা খৃষ্টান-ধর্ম্মপ্রচার যাহাতে চলিতে পারে, সেই জন্য এই ধর্ম্মাবলম্বীদিগের অসুবিধাজনক যে সব আইন ছিল, সে সব প্রত্যাহার করিয়া এই ধর্ম্ম প্রচারের সাহায্য করেন। তিনি ইহার দ্বারা খৃষ্টান-ধর্ম্মের অবর্ণনীয় উপকার করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু সেই জন্য যে তাঁহাকে অশোকের সহিত তুলনীয় মনে করা যাইতে পারে, তাহা আমরা স্বীকার করি না। কারণ, আমরা জানি, তিনি এই ধর্ম্ম প্রচারের বিরুদ্ধে না থাকিলেও প্রত্যক্ষভাবে ইহার প্রচারের কিঞ্চিন্মাত্র সাহায্যও করেন নাই। আবার কেহ কেহ আকবরের সহিত অশোকের তুলনা করেন। এই দুই জনের কর্ম্ম-পদ্ধতিপাঠে বেশ বুঝা যায় যে, ইঁহাদের দুই জনের তুলনা উচ্চের সহিত অনুচ্চের তুলনার ন্যায়।

উপসংহারে আমরা অশোকের ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে আলোচনা এবং তাঁহার জন্য ইতিহাস কোন্ স্থান নির্দ্দেশ করে, তাহাই বলিব। আমরা দেখিলাম, অশোক বিস্তৃত রাজ্যের নৃপতি হইয়াও আর রাজ্য-জয়ের আকাঙ্ক্ষা করেন নাই। তিনি রাজ্য-রক্ষার নিমিত্ত বিধিমতে বন্দোবস্ত করিলেও রাজ্য-ভোগ সম্বন্ধে উদাসীন হইয়া মনঃপ্রাণ ধর্ম্মবিস্তারে নিয়োজিত করিয়াছিলেন। সেই জন্যই আমরা তাঁহাকে রাজা না বলিয়া রাজর্ষি নামে অভিহিত করিতে পারি। অশোক তাঁহার কর্ম্মজীবন ধর্ম্মার্থে অর্পিত করিয়া যাহাতে তাঁহার নাম না প্রচারিত হইতে পারে, তজ্জন্য "প্রিয়দর্শন" ছদ্মনামে কায করিতেন। এই পৃথিবীতে অনেক দেশের অনেক রাজা তাঁহাদের প্রজাবর্গের হিতের জন্য নানাবিধ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছেন, কিন্তু অশোকের ন্যায় কেহই ধর্ম্ম দান করেন নাই। কোন কাযই যে ধর্ম্ম-বিস্তার অপেক্ষা মহৎ নহে, সে কথা না বলিলেও চলে প্রত্যেকেই বোধ হয় জানেন যে, যীশুখৃষ্ট, শঙ্করাচার্য্য ইত্যাদি ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তিগণ অতি দীন-দরিদ্রের ন্যায় জীবন-যাপন করিলেও সাধারণ ব্যক্তিবর্গ তাঁহাদিগকে যেরূপ ভক্তি, প্রীতি ও জনসাধারণের হিতকারী বলিয়া পূজা করেন, কোনও রাজাকে তাঁহারা সেরূপ মনে করেন না।

* অধিকারিভেদ না থাকায় বৌদ্ধমত সর্ব্বজনগ্রাহ্য হয় নাই, ইহাই পণ্ডিতদিগের মত। আদর্শ যত উন্নত হইবে, হউক না, তাহা গ্রহণের ও অনুসরণের ক্ষমতা না থাকিলে, তাহা ব্যর্থ হয়। এই কথা বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার 'দেবী চৌধুরাণী'তে বুঝাইয়াছেন—"ঈশ্বর অনন্ত জানি। কিন্তু অনন্তকে ক্ষুদ্র হৃদয়-পিঞ্জরে পূরিতে পারি না। তাই অনন্ত জগদীশ্বর, হিন্দুর হৃৎপিঞ্জরে সান্ত শ্রীকৃষ্ণ।" —সম্পাদক

ইহার মূল কারণ, ইঁহারা জগতের লোকের সুখশান্তির জন্য যে সব উপদেশ দিয়া গিয়াছেন, সে সকল ভোগযোগ্য দ্রব্যসমূহ হইতে অনেক শ্রেষ্ঠ। ইঁহাদের উপদেশ-সমূহ না পাইলে মনুষ্য-সমাজ পঙ্কিল হইয়া যাইত বলিলেও, বোধ হয়, অত্যুক্তি করা হইবে না। অশোক নিজে কোন ধর্ম্মমত উদ্ভাবন না করিলেও তিনি বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারের নিমিত্ত যেরূপ পরিশ্রম ও যত্ন স্বীকার করিয়াছিলেন, তাহা অসাধারণ। তিনি শেষ জীবনে সম্পূর্ণরূপে ভিক্ষু হইয়াছিলেন কি না, সে বিষয়ে মতদ্বৈধ থাকিলেও তিনি যে তাঁহার জীবনের কিছুকাল দরিদ্র ভিক্ষুরূপে মঠে অতিবাহিত করিয়াছিলেন, তাহা বোধ হয় প্রামাণ্য। অশোককে আমরা নিঃসন্দেহে মহাপুরুষ বলিতে পারি।

শ্রীসচ্চিদানন্দ মুখোপাধ্যায় (বি, এ)।

কি সুরে বাজাও বীণা ?

জিজ্ঞাসি তবু,—জানি না যদিও উত্তর পাব কি না,
হে যন্ত্রী, তুমি আদিকাল হ'তে কি সুরে বাজাও বীণা ?
সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের গান
লভি' কি জন্ম পায় নির্ব্বাণ ?—
কখন কি সুর উঠিছে পড়িছে কিছুই তার বুঝি না—
হে যন্ত্রী, তুমি আদিকাল হ'তে কি সুরে বাজাও বীণা ?

টানিয়া এনেছ যে দিন ধরায় দিয়া জননীর ক্রোড়,
সৃষ্টির গান সে দিন আসিয়া কাণে শুনায়েছ মোর।
তোমার বীণায় শুনি সেই সুর
লেগেছিল কাণে বড়ই মধুর,
ভেবেছিনু মনে সেই সুর বুঝি শুনিব জীবন-ভোর।
এনেছিলে টানি' যে দিন ধরায় দিয়া জননীর ক্রোড়।

শৈশব কাটি' একদিন যবে যৌবন সমাগত,
'স্থিতি'র মন্ত্র কাণেতে আমার শুনালে মনের মত।
তব গান শুনি' মনে লভি' আশা
সংসার-ভূমে বাঁধিলাম বাসা,
মনেতে জাগিল কত না সুখের ছায়া-ছবি শত শত,
ভাবিলাম বুঝি লভিয়াছি স্থিতি চির-জীবনের মত।

তখনো জানি না আরো কত সুর শুনাতে রয়েছে বাকি,
স্থিতি সুর-রেশ শুধু কাণে বাজে, আবেশে মুদেছি আঁখি ;
শুনি নাই আমি মাতি' নানা কাজে
আরো কোনো সুর বাজে কি না বাজে,
মনে ভেবেছিনু সারাটা জীবন এই ভাবে দিবে রাখি'—
তখনো জানি না আরো কত সুর শুনাতে রয়েছে বাকি!

যৌবনকাল পাড়ি দিয়া যবে আসিনু জীবন-সাঁঝে,
তোমার বীণার প্রলয়ের সুর কর্ণে আমার বাজে।
নয়নে নাহিক মোহ-অঞ্জন,
চোখের সমুখে নাচিছে মরণ,
এ ধরার আর নাহি প্রয়োজন—লাগিবে না কোন কাজে,
তোমার বীণার প্রলয়ের সুর কর্ণে শুধুই বাজে!

জীবন-বেলার শেষ ক্ষণে আজি নিভিয়া আসিছে আলো,
ব'লে যাই আমি সব ক'টি সুর লেগেছে আমার ভালো ;
তুমি সুনিপুণ যন্ত্রী, তোমার
সে সুর কখনো কি গো ভুলিবার ?
দিয়াছে সে সুর ধুইয়া আমার জীবনের যত কালো ;
যত সুর তুমি গেয়েছ, সকলি লেগেছে আমার ভালো!

তাই জিজ্ঞাসি,—জানি না যদিও উত্তর পা'ব কি না,
হে যন্ত্রী, তুমি আদিকাল হ'তে কি সুরে বাজাও বীণা ?
তব বীণা হ'তে উঠিছে যে তান,
আমি শুনি তাতে প্রলয়ের গান,
শিশু যুবা শোনে সৃষ্টি-স্থিতি সুর—কিছুই তার বুঝি না—
হে যন্ত্রী, তুমি আদিকাল হ'তে কি সুরে বাজাও বীণা!

শ্রীগোকুলেশ্বর ভট্টাচার্য্য।

সিংহলী নারী

সিংহল বা স্বর্ণ-লঙ্কা—এখন সিলোন্—ছোট একটি দ্বীপ। এখানকার জল-বাতাস না কি স্কটলাণ্ডের অনুরূপ! তাই শ্বেতাঙ্গ-জাতি এ-দ্বীপটিকে ভালোবাসে। এ দ্বীপে পাশ্চাত্য সভ্যতা আজ তাই বেশ আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে।

স্বর্ণ-লঙ্কার মোহ ভারতবাসীর মনে আজো বড় কম নয়! পৌরাণিক যুগে রাবণ-রাজার সেই বিপুল ঐশ্বর্য্য, সেই অশোক-কানন, নিকুম্ভিলা যজ্ঞ-গৃহ, দুরন্ত চেড়ী, রক্ষ-সৈন্য;—তারপর ইতিহাসের যুগে বঙ্গ-রাজ-পুত্র বিজয়-সিংহের অভিযান, সিংহল-রাজকন্যা কুবেণী! বায়োস্কোপের ছবির মত মনের পর্দায় সে-সব দৃশ্য আজো সিংহলের নামে ঝলশিয়া ওঠে! বিজয়সিংহ লঙ্কা জয় করেন; এবং সে বিজয়ের ফলে সমগ্র ভারতে লঙ্কার নাম 'সিংহল' বলিয়া প্রখ্যাত হয়।

পৌরাণিক যুগ হইতেই স্বর্ণ-লঙ্কা বা সিংহলের সঙ্গে ভারতবর্ষের সম্পর্ক অতি-নিকট।

বেদ্দাদের ঘরে

সিংহল ফুলের দেশ, মণি-রত্নের দেশ। ফুলের শোভা এখনো আছে; মণি-রত্ন এখনো মেলে প্রচুর।

ঐতিহাসিক মতে সিংহলের আদিম অধিবাসী বেদ্দা জাতি। খৃঃ জন্মের প্রায় পাঁচশত বৎসর পূর্ব্বে তামিল-রাজ এলালা সিংহলে আসিয়া সিংহল জয় করেন। তখন বেদ্দা-রাজ সর্দার দুতুগেমুণু ছিল সিংহলের একচ্ছত্র অধিপতি। প্রথম যুদ্ধে পরাজয়ের পর এলালাকে দুতুগেমুণু দ্বন্দ্ব-যুদ্ধে আহ্বান করে। হাতীর পিঠে চড়িয়া দুজনের যুদ্ধ হয়; এ যুদ্ধে এলালা হন নিহত।

ইহার পর হইতে ভারতের তামিল হিন্দু জাতির সঙ্গে সিংহলী বেদ্দা-জাতির বিরোধের অন্ত ছিল না; এবং বহু যুদ্ধেই তামিলীদের হয় জয়। সেই সময় হইতে বহু তামিলী সিংহলে আসিয়া বসতি স্থাপনা করে। নগর ছাড়িয়া, গ্রাম ছাড়িয়া বেদ্দারা ক্রমে জঙ্গলে প্রবেশ করে, নিরাপদ নীড় রচনা করিয়া বাসের উদ্দেশ্যে।

এবং এমনিভাবে গ্রাম-নগরে বেদ্দার দর্শন সুদুর্লভ হইয়া ওঠে।

তারপর সে-দিনের কথা। ব্রিটিশ-জাতি সিংহল অধিকার করে এবং বেদ্দা-জাতি আজ পর্য্যন্ত জঙ্গলে রহিয়া গিয়াছে; সভ্যতার আলোয় আসিয়া এ পর্য্যন্ত বাসের সুবিধা করিতে পারে নাই।

ব্রিটিশ অধিকারের পূর্ব্বে পোর্ত্তুগীজ-জাতি আসিয়া সিংহলের দ্বারে হানা দেয়; তারপর আসে ডাচ্ জাতি। এমনি নানা জাতির নানা অভিযানের ফলে সিংহলে আজ বহু জাতির আস্তানা পড়িয়াছে। বিদেশী জাতির কথা ছাড়িয়া দিলেও সিংহলের আদিম অধিবাসী বা সিংহলী বলিতে আজ আমরা বুঝি—বেদ্দা, তামিলী হিন্দু ও মুসলমান।

এখানকার মুসলমান জাতি আসলে মুর। যে-সব আরব বণিক দীর্ঘকাল ধরিয়া বাণিজ্য-সূত্রে এখানে আসিয়া বাস করিয়াছে, এ সব মুসলমান তাহাদের বংশধর।

এখানে মেয়েদের মধ্যে পর্দ্দার প্রথা সম্পূর্ণ অবিদিত; শুধু সিংহলী মুসলমানেরা পর্দ্দা মানিয়া চলে।

পথে-ঘাটে মেয়েদের ভিড় প্রায় পুরুষের মত। মিল-কারখানার কাজ, তরী-তরকারীর পণ্য লইয়া হাটে-বাজারে বিক্রয় করিতে যাওয়া, রবারের ক্ষেত, চা-বাগান—সর্ব্বত্রই মেয়েরা কাজ করে। পুরুষের দল বেশীর ভাগ রিক্শ-গাড়ী টানে। এ দেশে গরুর গাড়ী ও রিক্শ-গাড়ীর প্রচলন খুব বেশী।

পর্দ্দা-প্রথা না থাকিলেও শিক্ষিত গৃহস্থ বা বনিয়াদী ঘরের সিংহলী মেয়েরা পথে-ঘাটে বড় বাহির হন না। 'প্রাপ্তে তু দ্বাদশে বর্ষে' মেয়েদের মনে জাগে মর্য্যাদা-বোধ। পথে বাহির হইতে হইলে তখন তাঁরা রিক্শ বা অন্য কোন গাড়ীতে চড়িয়া বাহির হন। হাঁটিয়া পথ চলিলে সমাজে নিন্দা রটে।

মেয়েদের বিবাহের বয়স নির্দ্দিষ্ট আছে, সাধারণতঃ বারো হইতে বিশ বৎসর। বিবাহ হইলে একা কোনো নারী পথে বাহির হয় না। সে-রীতি নাই। হাঁটিয়া বাহির হওয়া চলে না: গাড়ীতে চড়িয়া পথে বাহির হইলে বিবাহিতা রমণীর সঙ্গে সাথী চাই দাসী—কিম্বা কোনো বর্ষীয়সী আত্মীয়া।

বিবাহের পর সকল দেশের মেয়েদের মতো সংসারই হয় নারীর সর্ব্বস্ব। গৃহে নানা কাজ; সে কাজে নারীর দিনাতিপাত হয়। বাহিরে যাইবার অবসর থাকে না। কাজেই বাহিরের প্রতি কোনো আকর্ষণ সাধারণতঃ নারীর মনে সাড়া দেয় না। ঘর-সংসার লইয়া তাঁরা আরামে বাস করেন।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, সিংহলে নানা মিশ্র-জাতির বাস। কাজেই জাতি-হিসাবে গড়ন, বেশভূষা, আচার-রীতি ও

সিংহলী পল্লী রমণী

ধর্ম্মে বহু তারতম্য দেখা যায়। সিংহলী ও তামিলা, মুর এবং বার্জার (ডাচ্ বংশ-জাত ইউরেশিয়ান)—এ কয় জাতে মিলিয়া মিশিয়া দীর্ঘকাল ধরিয়া বাস করিতেছে—তবু কাহারো স্বাতন্ত্র্য লোপ পায় নাই। এ চারিটি জাতি ভিন্ন মলয়, আফগান এবং পার্শী আছে বিস্তর; তবে ইহাদের সংখ্যা এত অল্প যে, লঙ্কাদ্বীপের নারী বলিয়া এ তিন জাতের নারীর কথা আলোচনার যোগ্য বলিয়া মনে হয় না!

প্রথমে আমরা সিংহলের আদিম অধিবাসী বেদ্দা মেয়েদের কথা বলিব। বহু কাল ধরিয়া তারা বনে-জঙ্গলে

আশ্রয় লইয়া বাস করিতেছে। বেদ্দারা শিক্ষা-সভ্যতার কোনো ধার ধারে না। কোথা হইতে কোন্ রাজা আসিয়া কবে সিংহলের গদি অধিকার করিয়া বসিল, তাহারো কোনো সংবাদ রাখে না।

ইহাদের প্রাণে না আছে আশা বা আকাঙ্ক্ষা, উদ্যম বা অধ্যবসায়। শান্ত নিরীহ বলিয়া বেদ্দাদের খ্যাতি জগৎ-প্রসিদ্ধ। ইহারা হিংসা জানে না। বিদেশী কোন লোক যদি বনে গিয়া পড়ে, তাহার সহিত অভদ্র ইতর ব্যবহার করে না। এক কথায়,—রেড ইণ্ডিয়ান, পাপুয়ান প্রভৃতি বর্ব্বর জাতির হাতে পড়িলে বিদেশীর নির্য্যাতন যেমন শাণিত হইয়া ওঠে, বেদ্দাদের হাতে সে আশঙ্কা আদৌ নাই। বেদ্দারা ফল-মূল ও চাকের মধু খাইয়া জীবন ধারণ করে এবং তাদের অবসরকাল কাটে তীর-ধনু লইয়া পশু-শীকার করিয়া। তাদের ভাষা মৌলিক সনাতনী; বাস বৃক্ষ-কোটরে, গিরি-গুহায় কিম্বা তৃণপত্রে ছাওয়া কুটীরে। তরু-পল্লব ছিঁড়িয়া বন করিয়া বুনিয়া তাহাই লজ্জা-বস্ত্ররূপে ব্যবহার করে।

বেদ্দা-যুবতী

বর্ব্বর হইলেও বেদ্দা-সমাজে বহু-বিবাহ-রীতি সম্পূর্ণ অবিদিত। বেদ্দা-নারীরা খুব সাধ্বী; স্বামি-পুত্রের উপর ভালোবাসা সত্যই সীমাহীন। এ জাতি আজ মরণ-উন্মুখ। বহু বেদ্দা উদরের দায়ে বন ছাড়িয়া নর-নারী-নির্ব্বিশেষে সিংহলী ও তামিলীদের গৃহে আসিয়া দাস্যবৃত্তি করিতেছে। ফলে সিংহলী ও তামিলী আচাররীতি অবলম্বনে তাদের জাতিত্ব ক্রমে বিলুপ্ত হইতে বসিয়াছে।

সিংহলের উত্তর এবং পশ্চিমাঞ্চলে তামিলী জাতির বাস; সিংহলীদের বাস দক্ষিণে ও পূর্ব্বে। তামিলীদের মধ্যে অনেকে চা'বাগানে কুলির কাজে দিনাতিপাত করে। কয়েক ঘর বনিয়াদী তামিলী আছে। বনিয়াদী ঘরের মেয়েরা দেখিতে সুশ্রী। তাঁদের আচার-ব্যবহার মিষ্ট মধুর এবং তাঁরা শিক্ষিতা। এখন ইংরেজী শিক্ষার প্রবর্ত্তনে তামিলী ঘরের মেয়েরা বি-এ, এম-এ পাশ করিতেছেন। তামিলী মেয়েদের বেশ-ভূষা ভারত-রমণীর মতই। অলঙ্কারের তাঁরা সমাদর করেন; এবং অলঙ্কার-ভারে দেহ একেবারে ভারা-ক্রান্ত রাখেন। কর্ণে পরেন কুণ্ডল বা ইয়ারিং; কণ্ঠে স্বর্ণ বা মণি-রত্নের মালা; কেশেও মালা পরেন।

তামিলী মেয়ে-কুলি

ললাট ঘিরিয়া অলঙ্কার-ধারণের প্রথা খুব প্রচলিত। তার উপর, হাতে পরেন তাগা, বালা, চুড়ি। পদ-নখে চুটকি আছে, 'আঙ্গুঠ' আছে; নাসায় নোলক, নথ, নোজ-পিন্‌ও বাদ দেন না।

যে-সব তামিলী চা-বাগানে কুলির কাজ করে, তাদের ঘরের মেয়েরা ঘরে বসিয়া শুধু রান্না-বান্নায় সময় কাটায় না; মেয়েরাও চা-বাগানে কাজ করে। তারা চায়ের পাতা চয়ন করে, গাছগুলার সেবা-পরিচর্য্যা করে। পাহাড়ের গা ঘিরিয়া চায়ের প্রশস্ত ক্ষেত; সেই ক্ষেত ভরিয়া তামিলী নারীরা দলে দলে কাজ করিতেছে—হালকা ঝুড়ি পিঠে বাঁধা—চায়ের পাতা ছিঁড়িয়া সেই ঝুড়িতে রাখিতেছে। চায়ের ক্ষেতে তাহাদের দেখায় যেন অজস্র বিন্দু—কে যেন সবুজ পটে কালি ছিটাইয়া দিয়াছে! শিশু-কোলে নারীরা কাজ করিতে আসে; ঝোপের পাশে শিশুদের শোয়াইয়া ঘুম পাড়াইয়া কাজে নামে; শিশু কাঁদিলে তাকে চাপড়াইয়া আবার ঘুম পাড়ায়, স্তন্য-দুগ্ধে তাদের ক্ষুধা-তৃষ্ণা নিবারণ করে; অর্থাৎ শিশুদেরও দিন কাটে এই মাঠে-বাটে।

ডাগর ছেলে-মেয়েরা মা-বোনের সঙ্গে আসে চায়ের পাতা তোলা বা গাছের সেবা-পরিচর্য্যার কাজে সহায়তা করিতে। রৌদ্র-বাতাসে মা ও ছেলে-মেয়ে—সকলের দিন কাটে। তাহার ফলে সকলের দেহে যেমন স্বাস্থ্য, মনেও তেমনি সুখ!

ইহাদের দেখিয়া এক জন সুধী ইংরেজ লেখক বলিয়াছেন,—মুক্ত-বাতাসে ইহাদের কাজ। হাসি-ভরা মুখ এবং দেহ-ভরা স্বাস্থ্য দেখিয়া আমাদের দেশের বদ্ধ কারখানা-ঘরের কারিগরদের সেই রক্ত-হীন বিবর্ণ মুখ, রুগ্ন-জীর্ণ দেহ এবং অপ্রীতি-অসন্তোষে-ভরা মনের কথা মনে জাগে। কি সহজ সুখেই না তাদের আমরা বঞ্চিত রাখিয়াছি, অথচ এই সব তামিলী মেয়ে-পুরুষদের মধ্যে দেখি, গভীর প্রীতি-ভালোবাসা, চিন্তাহীন প্রসন্ন মুখ। সারা দিন তারা সন্তোষ-ভরে কাজ করিতেছে—আলো-বাতাসের এতখানি প্রাচুর্য্যে দেহ-মন ঢালিয়া দিয়া! সপ্তাহে হয় তো পাঁচ-সাত শিলিং মাত্র বেতন পায়, তাহাতেই সকল অভাব মিটাইয়া আনন্দে দিন কাটায়, কোনো দিন অনুযোগ তুলিতে দেখি না।

মাদ্রাজ-অঞ্চল হইতে এখনো নিত্য বহু নর-নারী সিংহলে আসে এখানকার চা-বাগানে কুলির কাজ করিতে। এখানে তাদের স্বাস্থ্য ভালো থাকে; এবং যাহা উপার্জ্জন করে, সুখে তাহাতে সংসার চলিয়া যায় বলিয়া তারা আর দেশে ফিরিতে চায় না। এই ভাবে তামিলী নর-নারীরা এখানে দলে বেশ পরিপুষ্ট হইয়া উঠিতেছে।

সিংহলের মুসলমান-সমাজে শুধু অবরোধ-প্রথা বিদ্যমান আছে। এখানকার মুসলমানেরা আসলে মুর। আট-দশ

সিংহলী ফলওয়ালী

বৎসর বয়স হইবামাত্র মেয়েরা গিয়া পর্দ্দার আড়ালে আশ্রয় লয়; তখন হইতে বাহিরে আসা নিষেধ! সঙ্গে সঙ্গে তার শিক্ষায় ঘটে সমাপ্তি। বাহিরে যাইতে হইলে গাড়ীতে চড়িয়া যাও—গাড়ীর চারিধারে কঠিন পর্দ্দা ঢাকিয়া কিম্বা গাড়ীর ফিরকি কষিয়া বন্ধ করিয়া। কাজেই এ সমাজে নারীর জীবনে কোনো ঘটনার ছায়াপাত দেখা যায় না। মুর-নারীর জীবনে ঘটনা ঘটে একটি-মাত্র। সে ঘটনা—বিবাহ। তখন নানাবিধ আচার সমারোহে বাধিয়া যায়। পুরুষের দল করে উপবাস—কন্যা গহনার ভারে আড়ষ্ট হইয়া বধূ সাজিয়া বসিয়া থাকে।

সেই দিনটিতে তার যা-কিছু আদর ও গৌরব! এই দিনটিই শুধু তার জীবনে স্মরণীয় ও বরণীয়! কাজেই এই ভার-বাহিনীর বেশে মূর-বধূ স্বামীর সঙ্গে স্বামীর সংসারে আসিয়া দাঁড়ায়। জীবন হয় একঘেয়ে, বৈচিত্র্যহীন। স্বামীর কথায় ওঠা-বসা—যেন তার খেলার পুতুল! ছেলেমেয়ে হইলে তাদের লালন-পালন করো, সেবা-পরিচর্য্যা করো।

মূর-ঘরের মেয়ে

ছেলে যত দিন ছোট থাকে, মায়ের সঙ্গে তত দিনই তার যা-কিছু সম্পর্ক! ডাগর হইলে অর্থাৎ খুঁটিয়া খাইতে শিখিলে মায়ের সঙ্গে ছেলের সম্পর্ক ফুরায়। মা তখন অন্দরের অন্ধকার-বাসিনী নারীমাত্র হইয়া দাঁড়ায়! ছেলে অন্দর ছাড়িয়া সদরে আসিয়া জাঁকিয়া বসে। সে তখন মানুষ হইয়াছে। তাকে মানুষের মতো কাজ-কর্ম করিতে হইবে। সে কাজ-কর্মের মাঝে মায়ের আসন নাই! আসলে ছেলে ডাগর হইবামাত্র সে যায় মায়ের নাগালের বাহিরে। সিংহলে মূর মায়ের মতো এতখানি বেদনা বোধ হয় অপর কোনো দেশের সমাজে দেখা যায় না।

নব বধূর শিক্ষা-সহবতের ভার পড়ে শাশুড়ীর হাতে। নিজের খেয়াল-ভরে কিছু করিবে, নব-বধূর সে অধিকার নাই! অন্দরে বসিয়া পুরুষের প্রীতি ও সেবার ব্যবস্থা করো। নিজের সখের খেয়ালে সেলাই-কাজ কিম্বা গান-বাজনা করা বা ছবি আঁকা, বই পড়া—এ সবে মূর নারীর অধিকার নাই!

মূর মেয়েরা বেশীর ভাগ দেখিতে সুশ্রী। তবে এ সমাজে নারীর দেহে স্থূলত্বের মোহ এত বেশী যে, নব যৌবনোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে মেয়ে-মহলে দেহ-লতাকে স্থূল মহীরুহে পরিণত করিবার জন্য সাধনা চলে অবিরাম, কঠোর রকমের। ফলে বিশ বৎসর বয়সে মূর-নারী আকারে হয় মাংস-পিণ্ডের মতো। তাদের রূপ-মাধুরীর যা-কিছু বৈচিত্র্য বা কমনীয়তা, তা ঐ বালিকা-বয়সে!

মূর সমাজে নারীর উপর পুরুষের পীড়ন-নির্য্যাতন বড় দেখা যায় না। কাজেই ব্যক্তিত্ব লোপ করিলেও মূর-জাতের মেয়েরা দীর্ঘকালের সংস্কার-বশে এ বেদনা উপলব্ধি করেন না, আজ এ যুগে পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রবর্ত্তন সত্ত্বেও!

তার পর বার্গার বা দো-আঁশলা জাতি। ডাচ ও পোর্ত্তুগীজ রক্তে এ-জাতির জন্ম। সমগ্র ইউরেশিয়ান জাতি এ-জাতির অন্তর্ভুক্ত। নর-নারী-নির্ব্বিশেষে ইহারা বুদ্ধিমান, উদ্যোগী ও শ্রমশীল। পুরুষের দল চিকিৎসা, আইন ও ব্যবসা লইয়া আছে; মেয়েরা শিক্ষা-দীক্ষায় বেশ উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে। এ জাতের মেয়েরা স্কুলে শিক্ষকতা এবং চিত্র-সঙ্গীতাদি ললিত কলার সাধনা করেন।

আদিম সিংহলী বা সিংহ-জাতি খুব পরিশ্রমী, সবল এবং স্ব-শক্তিতে নির্ভরশীল। ইহারা বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী। সিংহলী-সমাজে বহু-বিবাহ-প্রথা নাই। নারী-সমাজে বহু-পতিত্ব-প্রথা পূর্ব্বে বিদ্যমান ছিল, এখন আর নাই। তবে সে ক্ষেত্রে এক-কন্যার বিবাহ হইত দুই সহোদর ভাইয়ের সঙ্গে। কাণ্ডির সন্নিহিত কয়েকটি প্রদেশে মেয়েদের মধ্যে বহু-বিবাহ-প্রথা এখনো দেখা যায়; তবে শিক্ষা-প্রসারের সঙ্গে এ প্রথা ক্রমে বিলুপ্ত হইতেছে।

পারিবারিক স্নেহ-প্রীতি সিংহলী জাতের বৈশিষ্ট্য।

এ সমাজে দু'রকম বিবাহের প্রচলন আছে; দিগা ও বীণা।

দিগা-রীতিতে স্ত্রী আসে স্বামীর সঙ্গে স্বামীর ঘরে সংসার পাতিতে; বীণা-রীতিতে স্বামী গিয়া স্ত্রীর গৃহে

সংসার পাতে। গৃহ-জামাতারূপে স্ত্রীর গৃহেই সে প্রতি-পালিত হয়। এ সব স্বামীর জীবন নির্ভর করে স্ত্রীর কৃপার উপরে; যদি স্ত্রীর মন রাখিয়া চলিতে পারো, টি'কিয়া গেলে! নহিলে সরিয়া অন্য পথ ছাখো! অর্থাৎ মনে করিলে স্ত্রী এ-দলের স্বামীকে যে-কোনো মুহূর্তে তাড়াইয়া দিতে পারে। বীণা-দলে স্ত্রী সর্ব্বেসর্ব্বা। সম্পত্তির মালিক স্ত্রী। কোন-কিছুতে স্বামীর এক্তিয়ার বা

তামিলী কুলি-রমণী

অধিকার থাকে না। ব্যবসায়াদি-কার্য্যেও স্ত্রী অগ্রণী। এ সংসারে কন্যা কুমারী-হাসি নামে সমাজে অভিহিতা হয়।

সিংহলী-সমাজে বাল্য-বিবাহ আদৌ নাই। মেয়েরা বিবাহ করে ষোল-সতেরো বৎসর বয়সে।

পূর্ব্বে এ বিবাহে ঘটক-ঘটকীর দূতীয়ালী ছিল; বহু অনুষ্ঠান-উৎসবের সমারোহ ছিল; এখন সে সব রীতি উঠিয়া গিয়াছে। এখন এ বিবাহ নিষ্পন্ন হয় রেজিষ্ট্রী-অফিসে। তবু বিবাহের সময় বর-কন্যার বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠদ্বয় একত্র বাঁধিয়া দিবার প্রথা বিলুপ্ত হয় নাই। রেশমী সূতা দিয়া দু'জনের অঙ্গুষ্ঠ-বন্ধন ক্রিয়া সম্পন্ন হয় এবং পুরোহিত সে সময় বৌদ্ধ শাস্ত্রাদি হইতে মন্ত্র উচ্চারণ করে। পুরোহিত অবশ্য বৌদ্ধ নন। বৌদ্ধ পুরোহিতের দল চির-কুমার—সেজন্য বিবাহাদি অনুষ্ঠানের সহিত তাঁর সম্পর্ক রাখা শাস্ত্র-বিরুদ্ধ।

বিবাহের সময় বাদ্যাড়ম্বর এবং আত্মীয়-কুটুম্ব ডাকিয়া ভোজের সমারোহ চলে। গৃহসজ্জা করিতে হয়। এ সজ্জা সম্পাদিত হয় নারিকেল-পত্রে। সে সজ্জা-সুষমা সত্যই চমৎকার:

তামিলী মহিলা

নারিকেল-পত্র সিংহলী সমাজে কল্যাণের নিদর্শন। শুভকর্ম্মে নারিকেল-পত্রের সংযোগ থাকা চাই-ই। আমাদের দেশে আম্র-পল্লব যেমন সর্ব্ব-অনুষ্ঠানে শুভ সূচনার জন্য প্রয়োজন, সিংহলে নারিকেল-পত্রের ঠিক তেমনি সমাদর ও গৌরব। নারিকেল সিংহলে সম্পদ-স্বরূপ; লক্ষ্মী বলিলেও অত্যুক্তি হয় না! নারিকেলের জলে পিপাসা ঘোচে, শাঁসে ক্ষুধানাশ হয়। নারিকেলের ছোবড়ায় কার্পেট ও শয্যা রচনা; কাঠে ফার্ণিচার, কুটীর রচিবার খুঁটী-বাতা; নারিকেলের মালায় পাত্র; নারিকেল-গাছ চিরিয়া ডোঙ্গা ও শালতি, নারিকেল-তৈলে রন্ধন ও কেশ-প্রসাধন,—

এক কথায় নারিকেলে সংসারের সকল অভাব-মোচন হয়। তাই নারিকেল এদেশের লক্ষ্মী!

সিংহলী নারী সুকেশিনী; এবং সে কেশ-সম্পদের মূলে আছে এই নারিকেল-তৈল!

মেয়েরা নারিকেল লইয়া বিবিধ খাদ্য রচনা করে। আমাদের দেশের মতো চন্দ্রপুলি, নাড়ু, ছাবা-সন্দেশ প্রভৃতি তৈয়ার করিতে তারা পটু!

সিংহলী সংসারে ছেলেমেয়ের আদর খুব বেশী। মায়েরা ছেলেমেয়েদের কূয়াতলায় আনিয়া নিত্য স্নান করায়। স্বামীকে ধরিয়া স্নান করানোর প্রথা আছে। প্রকাণ্ড কূয়ার ধারে দেখিবে, স্বামীকে ধরিয়া স্ত্রী তার অঙ্গ মার্জ্জনা করিয়া ঘষিয়া রগড়াইয়া স্নান করাইয়া দিতেছে! সেই সঙ্গে দাঁত মাজিয়া দেওয়া, কাপড় কাচিয়া দেওয়া—এ সবও দেশাচারে দাঁড়াইয়াছে। এমনি-ভাবে চলে নারীর সংসার-সাধনা। এ-কাজে তিলমাত্র ঔদাস্য বা বিরাগ দেখা যায় না!

মেয়েরা একখানি মাত্র সুদীর্ঘ বসনে অঙ্গাবরণ করে। জ্যাকেট পরার রীতি খুবই সীমাবদ্ধ।

রোডিয়া জাতের মেয়েরা সুশ্রী। তাদের দেহের গঠন সুছাঁদের। তারা স্কন্ধদেশ রাখে অনাবৃত—কণ্ঠ হইতে ঘের দিয়া বসন পরে; সে বসন আমাদের দেশের মেয়েদের বসনের মতো ফেরতা দিয়া পরে। বক্ষোবাসরূপে অনেকে রেশমী-রুমাল বুকে জড়ায়। পায়ে জুতা আঁটিবার রেওয়াজ নাই। মুখে বা মাথায় ঘোমটা দিবার প্রথাও সিংহলী-সমাজে প্রচলিত নাই। তবে যে পরিবারে পাশ্চাত্য আচার-প্রথা প্রবেশ করিয়াছে, সেখানে হাই-হীল জুতাও চরণাশ্রয়-লাভে কৃতার্থ হইয়াছে।

সিংহলে রত্নপুর নগরটি সত্যই মণি-রত্নের ভাণ্ডার। এখানকার হাটে-বাজারে তরী-তরকারীর মতোই চুণী, পান্না, নীলা, cats eye, এবং আরো বহু মণি-রত্নের পশরা মাথায় পশারী-পশারিণীরা নিত্য আসিয়া বসে। মণি-রত্নের দেশ হইলেও সিংহলী ঘরের মেয়েরা এ সব মণি-রত্ন গায়ে আঁটিয়া থাকে, এমন কথা যদি কেহ ভাবিয়া থাকেন তো সে ভুল। সিংহলী মেয়েদের অলঙ্কারের দিকে ঝোঁক নাই!

রোডিয়ার ঘরে

খুব ধনী সিংহলী-ঘরের মেয়েরা তামিলী মেয়েদের মতো অলঙ্কার-ভূষণের বোঝা বহিয়া বেড়ান না। সাধারণতঃ তাঁরা কণ্ঠে দুলান মণি-হার, মাথায় আঁটেন হেয়ার-পিন, বসনে লাগান্ হীরার বোতাম: কচিৎ কেহ ইহার উপর হাতে আঁটেন ব্রেশলেট, কানে পরেন ইয়ারিং। নাসা ফুঁড়িয়া নাক-ছাবি কিম্বা নথ পরার প্রথা সিংহলী-মেয়ে-সমাজে আদৌ নাই। কাণ্ডির মেয়েরা সোনার ভারী গহনার ভারে ঝুঁকিয়া নুইয়া পথে চলেন।

আমাদের দেশের মতো তাম্বুলের আদর এখানকার মেয়ে-সমাজে খুব বেশী। ধনি-দরিদ্র-নির্ব্বিশেষে মেয়েরা

বড় বড় পাণের ডিবা পাণে ভরিয়া সঙ্গে রাখেন, সকল সময়ে। এই পাণের ডিবা-রচনায় কলা-শিল্পের চরম বিকাশ দেখা যায়।

সিংহলে পর্দা-প্রথা নাই বলিয়া মেয়েদের শিক্ষার বেশ সুব্যবস্থা আছে। এখন গ্রামে গ্রামে বহু বিদ্যালয় হইয়াছে। হাস্যমুখী মেয়েরা নিত্য বিদ্যালয়ে চলিয়াছে। কলম্বো, কাণ্ডি ও গালিতে নিরক্ষর মেয়ে নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। এখন বিশ্ববিদ্যালয়ের দৌলতে পাশ করার দিকে মেয়েদের প্রবল মোহ জাগিয়াছে এবং এক্ষেত্রে মেয়েদের পটুতা সত্যই অসাধারণ।

রোডিয়া সুন্দরী

শিল্প-কাজে সিংহলী মেয়েদের অনুরাগ প্রবল। বালিশের ওয়াড়ে এত বিচিত্র ছাঁদের নক্সা রচনা করে, দেখিলে বিস্ময়ের সীমা থাকে না! পুরুষদেরও এ-কাজে পটুতা খুব।

মেয়েদের আর একটি কাজ,—নানা ছাঁদের নানাবর্ণের ঝুড়ি তৈয়ার করা। পাশ্চাত্য শিক্ষা-সভ্যতার প্রভাবে এ শিল্পের প্রতি বিরাগ জাগে নাই। শিক্ষিতা পাশ-করা মেয়েদের আজো ঝুড়ি-বোনার কাজে এতটুকু শৈথিল্য দেখা যায় না।

শিক্ষা সত্ত্বেও সিংহলী নারী-সমাজে তুক্‌তাক্, মন্ত্র-তন্ত্র, ভূত-প্রেতে বিশ্বাস আজো অটল অবিচল রহিয়া গিয়াছে। সেজন্য সমাজে জ্যোতিষীর আদর আজো প্রাচীন যুগের মতো অটুট আছে। সিংহলীরা আজ পর্য্যন্ত কতকগুলি অতি-প্রাচীন সংস্কার ত্যাগ করেন নাই। মাটীর বা মোমের পুতুল গড়িয়া তার গায়ে আল্‌পিন ফুটাইলে শত্রু-নিপাত সুনিশ্চিত! লেবুর রস নিংড়াইয়া প্রাতে পান করিলে কুগ্রহ মোচন হয়; যদি কেহ ভয় দেখায় তো তার নাম করিয়া গাছ হইতে লেবু ছিঁড়িয়া সেই লেবু মাটী খুঁড়িয়া পুঁতিয়া দিলে শত্রু-হস্তে অনিষ্ট-আশঙ্কা থাকিবে না!

চা-বাগানের এক কুলি এক দিন প্রাতে সাহেব মনিবের কাছে আসিয়া কম্পিত স্বরে বলিল—সাহেব, আমার বড় বিপদ।

সাহেব কহিলেন,—কি হইয়াছে?

সে বলিল—আমার এক দুশমন আমার নামে কাদার পুতুল গড়িয়া সেই পুতুলের বুকে লোহার পেরেক বিঁধিয়া দিয়াছে। আজ রাত্রে আমার মরণ নিশ্চিত।

সাহেব কহিলেন—কোথায় সে পুতুল পুঁতিয়াছে, জানো?

—জানি সাহেব। আমার ঘরের পাশে। আজ রাত্রে সেখানে আসিয়া মন্ত্র পড়িবে। সঙ্গে সঙ্গে আমার মৃত্যু হইবে।

সাহেব কহিলেন—পুতুলটা মাটী হইতে তুলিয়া ফেলিয়া দাও।

সে বলিল—সর্ব্বনাশ! সে পুতুল মন্ত্র-পূত! তাকে তুলিতে গেলে পুতুল আমায় তখনি মারিয়া ফেলিবে।

হাসিয়া সাহেব তাকে সঙ্গে লইয়া চলিলেন তার গৃহের পাশে। স্বহস্তে মাটী খুঁড়িয়া পুতুল তুলিয়া ভাঙ্গিয়া চূর্ণ করিয়া ফেলিলেন; পরে সেই চূর্ণ মাটী ফেলিয়া দিলেন নদীর জলে। কুলি কম্পিত বক্ষে ভীত নয়নে এ দৃশ্য দেখিল। সাহেব বলিলেন—যাও, গিয়া কাজ করো। তোমার ভয় নাই। যে মাটীর পুতুল রাত্রে তোমায় প্রাণে মারিত, সে ঐ নদীর জলে গলিয়া জল হইয়া গিয়াছে! পেরেকটা আমার কাছে রাখিয়া দিব।

কুলির ভয় তবু ঘোচে না! কিন্তু মনিবের হুকুম—কি করে! কাজে নামিতে হইল।

রাত্রে সাহেবের বাঙলোয় সে পড়িয়া রহিল। প্রাতে উঠিয়া যখন দেখিল, বাঁচিয়া আছে, তখন সাহেবের শক্তির উপর প্রচণ্ড বিশ্বাস জাগিল। সাহেবের পায়ে নতি জানাইয়া বলিল—সাহেব, তুমি ভগবান!

সাহেব বলিলেন—ভগবান নই। তোমার মতো মানুষ! তবে মাটীর পুতুল দেখিয়া ভয় পাই না—তফাৎ শুধু এই। আর কখনো পুতুলের নামে ভয় পাইয়ো না!

মেয়েদের দেহ-চর্চ্চা

দেহের শক্তি-সামর্থ্য প্রধানতঃ নির্ভর করে আমাদের পিঠের মেরু-দণ্ড বা শির-দাঁড়ার উপর। মেরু-দণ্ড যদি জোরালো থাকে, তাহা হইলে কোনোরূপ দৌর্ব্বল্যে আমরা ভাঙ্গিয়া পড়িব না!

১নং চিত্র

২নং চিত্র

নারী ও পুরুষ—উভয়ের পক্ষে এই মেরুদণ্ডের পরিচর্য্যা একান্ত আবশ্যক। সে পরিচর্য্যার প্রধান উপায়—ব্যায়াম-সাধনা। নারীর সুগঠিত দেহ শুধু তাঁর স্বাস্থ্যের সহায় নয়; সংসারের শ্রী-সাধন করে। এ শ্রী যে-পুরুষ চাহে না, তার উচিত বনে গিয়া পশুর সঙ্গে বাস করা!

এই মেরু-দণ্ড-সাধনার ফলে নারীর মাতৃত্ব আদৌ ক্লেশকর হয় না; ইহার ফলে মাতৃত্ব সহজ ও সরল হয়।

প্রত্যেক নারীর কর্ত্তব্য, মেরুদণ্ডকে গড়িয়া তোলা।

৩নং চিত্র

মেরুদণ্ড সুদৃঢ় হইলে নারীর কল্যাণী-মূর্ত্তি স্বাস্থ্য-সুখে সমুজ্জ্বল থাকিবে—সংসার আনন্দ-নিলয় হইবে!

আধুনিক বিশেষজ্ঞদের মতে মেরু-দণ্ড-গঠনের সহায়ক কয়েকটি ব্যায়াম-চিত্র প্রকাশিত হইল। এ চিত্র দেখিয়া কল্যাণীরা যদি নিত্য ব্যায়াম সাধনা করেন তো তার সুফল তাঁরা অঙ্গে-অঙ্গে এবং মনে-প্রাণে উপলব্ধি করিবেন; রূপ-সম্পদে বিভূষিতা হইয়া আনন্দ-পুলকের অধিকারিণী হইবেন।

১।—মেরু-দণ্ডের সঙ্কোচন ও প্রসারণ—পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ স্পর্শ করা চাই।

২।—নিম্নাঙ্গ-প্রসার-কল্পে।

৪নং চিত্র

৫নং চিত্র

৬নং চিত্র

৩।—সিধা দাঁড়াইয়া বিভঙ্গ-ভাবে দুই পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ স্পর্শ করুন। বার-বার অন্ততঃ দশ বার পুনরাবৃত্তি প্রয়োজন।

৪।—ভূমে চিৎ হইয়া শুইয়া হাঁটু তুলিয়া সঙ্গে সঙ্গে জঘনদেশ ঊর্দ্ধে তুলিতে হইবে।

৫ ও ৬—এ দুটি চিত্রে একই অঙ্গের গতি-ছন্দ দেখানো হইয়াছে। একটি টুলের উপর তুলার বালিশ রাখিয়া তদুপরি তলপেটে ভর দিয়া —পা দুটিকে কোনো ভারী ফার্নি-চার বা খড়খড়ির গরাদে বাঁধিয়া সুস্থির রাখিতে হইবে; তার পর বক্রভাবে দেহার্দ্ধভাগ তুলুন,—যতখানি ঊর্দ্ধমুখী হইতে পারেন, চেষ্টা করিবেন। দুই হাতে কণ্ঠ বেষ্টন করিয়া থাকিতে হইবে—চিত্রের অনুরূপ ভঙ্গিমায়। লক্ষ-নৃত্য-ছন্দে মেরুদেশ সুগঠিত হয়—এ-কথা ভালো করিয়া মনে রাখিবেন।

সর্ব্বনিম্নে এই যে দোলার ছন্দে শুইয়া দোল খাওয়া—সর্ব্বদেহের পুষ্টি ও কান্তি-বর্দ্ধনের পক্ষে এমন উপায় আর নাই। নিত্য এ ব্যায়ামে দেহে-মনে একসঙ্গে যে স্বাস্থ্য জাগিবে, দেখিয়া সুখী হইবেন।

সানকীতে বজ্রাঘাত

পয়ঃ-প্রণালীর কপাট

রজ্জুবদ্ধ প্যারাডাইনের পদদ্বয় ও উভয় স্কন্ধ ধরিয়া, তাহাকে পরাশয্যা হইতে শূন্যে উত্তোলিত করা হইল! মূর্চ্ছিতের ভাণ করিয়া সে আততায়িদ্বয়ের কবলে আত্মসমর্পণ করিলেও, ধীরে ধীরে চক্ষু দুইটি অর্দ্ধ-উন্মীলিত করিতেই সম্মুখবর্ত্তী আততায়ীর প্রশস্ত পৃষ্ঠ তাহার দৃষ্টিগোচর হইল। প্যারাডাইনের ধারণা হইল, তাহার আততায়ীরা একটি সঙ্কীর্ণ পথ দিয়া তাহাকে বহিয়া লইয়া যাইতেছিল। কয়েক মিনিট পরে প্যারাডাইন দক্ষিণ পার্শ্বে পতনোন্মুখ একটি জীর্ণ অট্টালিকা অন্ধকারে পটাঙ্কিত চিত্রবৎ দেখিতে পাইল। মুহূর্ত্ত পরেই একটি সরোবরের নিস্তরঙ্গ স্বচ্ছ জলরাশি তাহার নেত্রযুগলে প্রতিফলিত হইল।

তাহার ভাগ্যে কি আছে, তাহা সে এবার বুঝিতে পারিল; বুঝিতে পারিল, জালের খাঁচায় আবদ্ধ ইঁদুরের মত তাহাকে জলে ডুবাইয়া হত্যা করা হইবে, মৃত্যু-কবল হইতে তাহার উদ্ধারের উপায় নাই!

প্যারাডাইনের আততায়ীরা সেই সরোবরতীরে উপস্থিত হইয়া থমকিয়া দাঁড়াইল। সেই সঙ্কটময় মুহূর্ত্তে জীবনের প্রধান প্রধান সকল ঘটনার কথাই প্যারাডাইনের স্মরণ হইল। তাহার বাল্য-জীবনের কত তুচ্ছ ঘটনার কথা, আট বৎসর বয়সের সময় তাহার স্নেহময়ী জননীর মৃত্যুর কথা, মাতার পরলোকগমনের পর যে পিতা তাহার জননীর স্থান অধিকার করিয়া পরম স্নেহে যত্নে তাহাকে প্রতিপালন করিয়াছিলেন—সেই পুত্রবৎসল পিতার কথা, শৈশবে বিদ্যালয়ে প্রবেশের পর তাহার ছাত্র-জীবনের কথা, তাহার পর মেসার্শ নিসবেট কোম্পানীর অফিসে নিম্নপদস্থ কেরাণী-গিরি লাভের কথা, কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিবার পর তাহার পিতার সাংঘাতিক রোগের কথা পটের উপর ছায়াচিত্রের ন্যায় তাহার চিত্তপটে প্রতিফলিত হইল। তাহার স্মরণ হইল, ডাক্তার তাহাকে উপদেশ দান করিয়াছিলেন—তাহার পিতার জীবন রক্ষা করিতে হইলে বায়ু-পরিবর্ত্তনের জন্য তাঁহাকে ফ্রান্সদেশের দক্ষিণাংশে কোন স্বাস্থ্যকর স্থানে প্রেরণ করিতে হইবে; কিন্তু সে দরিদ্র কেরাণী, চিকিৎসকের এই উপদেশ পালন করা তাহার অসাধ্য হওয়ায়, পিতার প্রাণরক্ষায় হতাশ হইয়া সে কিরূপ তীব্রভাবে দারিদ্র্য-যন্ত্রণা অনুভব করিয়াছিল, তাহাও তাহার স্মরণ হইল।

অতঃপর শেষ কয়েক সপ্তাহের সকল ঘটনা একযোগে তাহার মনে উদিত হওয়ায় তাহার জীবনের নিদারুণ সঙ্কট-সঙ্কুল অবস্থার কথাও সে যেন বিস্মৃত হইল। মিঃ ফার্মিনের সহিত তাহার সাক্ষাৎ, পিতার চিকিৎসার জন্য তাহার নিকট পঞ্চাশ পাউণ্ড ঋণ গ্রহণ; কিন্তু তাহাও বৃথা হইল, পিতার চিকিৎসার জন্য এই টাকা ব্যয় করিয়াও প্যারাডাইন পিতার জীবন রক্ষা করিতে পারিল না। কিন্তু ফার্মিন অবিলম্বে ঋণ পরিশোধের জন্য তাহাকে পুনঃ পুনঃ ভয় প্রদর্শন করিতে লাগিল। অগত্যা তাহাকে টেরির শরণাপন্ন হইতে হইল। ফার্মিনের ঋণ সে পরিশোধ করিল বটে, কিন্তু টেরি তাহাকে প্রলুব্ধ করিয়া যে পাশে আবদ্ধ করিল, তাহা হইতে মুক্তিলাভ করা তাহার অসাধ্য হইল; অবশেষে পাশবদ্ধ অবস্থায় তাহাকে মৃত্যুদ্বারে উপস্থিত হইতে হইয়াছে। এত দিনে তাহার সকল যন্ত্রণার অবসান হইবে।

সহসা তাহার মাথার দিক হইতে এক জন বলিল, "আর বিলম্ব কেন? উহাকে সাঁতার দিতে ছাড়িয়া দাও, যেন এক ডুবেই জীবনের এপার হইতে ওপারে পাড়ি জমাইতে পারে।"

এই কথা শুনিয়া প্যারাডাইনের চিন্তা-স্রোত অবরুদ্ধ হইল। মুহূর্ত্তমধ্যে তাহার বাহকদ্বয় তাহাকে ঊর্দ্ধে তুলিয়া, পুনঃ পুনঃ সবেগে আন্দোলিত করিতে লাগিল।

এক জন নীরস স্বরে বলিল, "যে মুহূর্ত্তে বলিব—ছাড়, সেই মুহূর্ত্তেই—বুঝিয়াছ ?"

বক্তার সহযোগী কথা বলিল না ; কিন্তু প্যারাডাইনের দেহের আন্দোলনের বেগ বর্দ্ধিত হইল। প্যারাডাইন রুদ্ধ নিশ্বাসে শেষ মুহূর্ত্তের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। সে বিস্ফারিত-নেত্রে সেইরূপ আন্দোলিত অবস্থায় ঊর্দ্ধাকাশে দৃষ্টিপাত করিল : অন্ধকারাচ্ছন্ন আকাশে শত শত নক্ষত্র শুভ্র হীরক-গুচ্ছের ন্যায় উজ্জ্বল দীপ্তি বিকাশ করিতেছিল, আরও দূরে দিগন্ত-বিস্তৃত মলিনাভ ছায়াপথ। চক্ষুর নিমেষে সমস্তই তাহার নয়নসমক্ষে মসীমলিন অন্ধকার যবনিকায় সমাচ্ছাদিত হইল।

বজ্রধ্বনিবৎ তাহার শ্রবণ-বিবরে প্রবেশ করিল,—"ছাড়।"

সঙ্গে সঙ্গে প্যারাডাইনের বাহকদ্বয় যুগপৎ তাহার হাত-পা ছাড়িয়া দিল। তাহারা যে বেগে তাহার দেহ আন্দোলিত করিতেছিল, সেই বেগে প্যারাডাইন শূন্যে নিক্ষিপ্ত হইল ; তাহার পর সে সবেগে নিক্ষিপ্ত লোষ্ট্রবৎ "ঝপাং" শব্দে সরোবরবক্ষে নিপতিত হইল।

প্যারাডাইন জলে পড়িবামাত্র সরোবরগর্ভে অদৃশ্য হইল ; ক্রমশঃ সে তলাইতে লাগিল। সে কতক্ষণ ধরিয়া ডুবিল, কত নীচে ডুবিল, চেতনা থাকিলেও তাহা সে ধারণা করিতে পারিল না ; তাহার মনে হইল, সেই সরোবর-গর্ভ প্রশান্ত মহাসাগরের ন্যায় অতলস্পর্শ, এবং সে অনন্তকাল ধরিয়া তাহার ভিতর তলাইয়া যাইতেছিল ! কিন্তু তাহাকে সেই সরসীর তলদেশ স্পর্শ করিতে হইল না। যে বেগে সে জলে পড়িয়াছিল, সেই বেগেই কিছু দূর পর্য্যন্ত তলাইবার পর পুনর্ব্বার ভাসিয়া উঠিতে লাগিল। যেন সরোবর-গর্ভস্থিত কি একটা অদৃশ্য শক্তি তাহাকে ঠেলিয়া ঊর্দ্ধে তুলিতে লাগিল। মুহূর্ত্তের জন্য তাহার মস্তক জলের ঊর্দ্ধে ভাসিয়া উঠিল। সে শ্বাসনালীতে সজোরে শ্বাস গ্রহণ করিয়া পুনর্ব্বার মাথা ডুবাইল, এবং অদৃশ্য হইল।

এতক্ষণ পরে প্যারাডাইনের মনে এই অনুভূতির সঞ্চার হইল, যেন তাহার কোমরে কি একটা ভারী জিনিষ বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছিল ; যাহা তাহাকে নীচের দিকে আকর্ষণ করিতেছিল, এবং সে জলের ভিতর হাত-পা আন্দোলিত করিয়া ঊর্দ্ধে উঠিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারিতেছিল না। সে বহু চেষ্টায় একটু ঊর্দ্ধে উঠিলেও সেই ভারী জিনিষটা তাহাকে টানিয়া নীচে নামাইতে লাগিল।

প্যারাডাইন ডুবিতে ডুবিতে দুই হাতে কোমর স্পর্শ করিয়া বুঝিতে পারিল—তাহার কোমরে কোনও একটা ভারী জিনিষ জড়াইয়া তাহার উপর কোমরবন্ধ আঁটিয়া দেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু সেই ভারী জিনিষটা কি, বা কোন্ উপাদানে নির্ম্মিত, তাহা সে বুঝিতে পারিল না। তাহা জলের ভিতর দেখিবার উপায় ছিল না ; তাহার উপর প্রাণরক্ষার আশায় মৃত্যুর সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে জিনিষটা কি, তাহা অনুমান করাও তাহার অসাধ্য হইয়াছিল। তথাপি সে কোমরবন্ধের ভিতর হইতে তাহা টানিয়া খসাইয়া ফেলিবার চেষ্টা করিল ; কিন্তু কোমরবন্ধ তাহার কোমরে এরূপ জোরে আঁটিয়া বসিয়াছিল যে, তাহা টানিয়া আলগা করিতে পারিল না ; তখন সে ডুবিতে ডুবিতে দুই হাতে কোমরবন্ধের বগলস্ ধরিয়া টানাটানি করিতে লাগিল। অবশেষে যখন তাহার শ্বাসযন্ত্র বিদীর্ণ হইবার উপক্রম, সেই সময় বগলসের ফিতা পিন হইতে খসিয়া পড়িতেই কোমরবন্ধ আলগা হইয়া গেল ; সঙ্গে সঙ্গে কোমরবন্ধ-সংলগ্ন ভারী জিনিষটা স্খলিত হইবামাত্র প্যারাডাইন জলের উপর ভাসিয়া উঠিল। এবার সে জলের উপর চিত হইয়া পদদ্বয়ের সন্তাড়নে দেহটি জলের ভিতর এভাবে ভাসাইয়া রাখিল যে, দেহের বিভিন্ন অবয়ব জলের উপর না জাগিলেও তাহার মুখমণ্ডল জলের ঊর্দ্ধে রহিল।

এই ভাবে চিত-সাঁতার দিয়া প্যারাডাইন শ্বাস-প্রশ্বাসের ক্রিয়া অব্যাহত রাখিল। জলে পড়িয়া নাকানিচুবানী খাইয়া সে অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হইয়াছিল ; কিছুকাল চিত-সাঁতার দিয়া সে শ্রান্তি দূর করিয়া যখন একটু প্রকৃতিস্থ হইল, তখন সে একবার চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া স্থানটি পরীক্ষা করিতে লাগিল। সে তীরের দিকে চাহিয়া তাহার আততায়ীদিগকে দেখিতে পাইল না ; তখন তাহারা অদৃশ্য হইয়াছিল। সে জলে পড়িয়া থাকিয়া সেই নৈশ নিস্তব্ধতার মধ্যে শব্দ শুনিবার চেষ্টা করিল ; যে শব্দ তাহার কর্ণগোচর হইল, তাহাতে তাহার ধারণা হইল, কোন মোটর-কার ঘস্-ঘস্ শব্দ করিতে করিতে দূরে চলিয়া গেল !

সরোবরে নিক্ষিপ্ত হইবার সময় সে জীবনের আশা ত্যাগ করিয়াছিল ; কিন্তু যখন সে বুঝিল, প্রথম ধাক্কা

সামলাইতে পারিয়াছে, এবং জলে ডুবিয়াও বাঁচিয়া আছে—তখন তাহার মনে আশার সঞ্চার হইল, কিন্তু সেই জলাশয়-গর্ভ হইতে উদ্ধারলাভ করা কিরূপ কঠিন, তাহা বুঝিতে পারিয়া পুনর্ব্বার সে হতাশ হইল। তাহার উভয় হস্ত এবং পদদ্বয় রজ্জুবদ্ধ ছিল; এ অবস্থায় অন্যের সাহায্য ব্যতীত মুক্তিলাভের কোন উপায় ছিল না; কিন্তু সেই সময় সেই স্থানে কে তাহাকে সাহায্য করিবে? প্যারাডাইন কোন উপায়ে সরোবরের কিনারায় যাইবার জন্য উৎসুক হইল।

প্যারাডাইন রজ্জুবদ্ধ পদদ্বয় জলের ভিতর আন্দোলিত করিতেই তাহার মস্তক জলমগ্ন হইল। তখন সে উপায়ান্তর না দেখিয়া চিত-সাঁতার দিয়া সরিয়া যাইবার চেষ্টা করিল; কিন্তু হাত-পা রজ্জুবদ্ধ,—এ জন্য তাহার চেষ্টা সফল হইল না। সে পুনর্ব্বার জলের ভিতর তলাইয়া যাইতে লাগিল। সে জলের কয়েক ফুট নীচে যাইতেই কি একটা শক্ত জিনিষে তাহার পিঠ ঠেকিল। সে ব্যগ্রভাবে তাহা স্পর্শ করিয়া বুঝিতে পারিল—তাহা কঠিন মৃত্তিকা। সেই স্থানে মাটী কোথা হইতে আসিল, তাহা সে বুঝিতে পারিল না; কারণ, সরোবরের তীর সেই স্থান হইতে অনেক দূরে ছিল।

যাহা হউক, পিঠে মাটী স্পর্শ হওয়ায় প্যারাডাইন সেই মাটীতে পৃষ্ঠ-স্থাপন করিয়া রজ্জুবদ্ধ পদদ্বয় দ্বারা মাটী ঠেলিতে লাগিল; এবং অগভীর জলের ভিতর দিয়া ক্রমশঃ তীরের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। এই ভাবে চলিতে চলিতে ইষ্টকনির্ম্মিত একটি প্রাচীরে তাহার মাথা বাধিয়া গেল। প্যারাডাইন বুঝিতে পারিল—সেই স্থানে জলের গভীরতা দুই ফুটের অধিক নহে। সে সেই স্থানে উভয় জানুর উপর ভর দিয়া বসিয়া পড়িল। তখন তাহার আর ডুবিবার আশঙ্কা না থাকায় সে জলের উপর মাথা তুলিয়া কয়েক মিনিট বিশ্রাম করিল। কিন্তু সে এরূপ পরিশ্রান্ত হইয়াছিল যে, তাহার অবসন্ন দেহ থর-থর করিয়া কাঁপিতেছিল। শ্রান্তি দূর হইলে সে সেই ইষ্টক-প্রাচীরে আরোহণ করিবার চেষ্টা করিল, এবং পুনঃ পুনঃ চেষ্টার পর সে তাহার বাহুদ্বয় সেই প্রাচীরের মাথায় স্থাপন করিতে সমর্থ হইল।

কয়েক মিনিট পরে তাহার দেহ তৃণশয্যায় প্রসারিত হইল। কিন্তু সে জীবিত ছিল কি ঘুমাইয়া স্বপ্ন দেখিতেছিল, তাহা বুঝিতে পারিল না। সে ভাবিল, "তবে কি সত্যই এ-যাত্রা বাঁচিলাম?"

সপ্তম পল্লব

ম্যানেজারের আফিস

মিঃ গ্রীড্ বুইলোঁ রেস্তরাঁয় প্যারাডাইনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন, এই জন্য তিনি নির্দ্দিষ্ট সময়ে সেখানে উপস্থিত হইবার অভিপ্রায়ে রেস্তরাঁর দিকে অগ্রসর হইয়াছেন, হঠাৎ পথিমধ্যে আহ্বানধ্বনি শুনিতে পাইলেন; কে কোথা হইতে কি উদ্দেশ্যে তাঁহার নাম ধরিয়া ডাকিল, ইহা বুঝিতে না পারিয়া তিনি পথের চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিতেই চলন্ত ট্যাক্সিতে তাঁহার দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল। তিনি ট্যাক্সির বাতায়ন-পথে প্যারাডাইনকে মুহূর্ত্তের জন্য দেখিতে পাইলেন; কিন্তু ব্যাপার কি, তাহা বুঝিতে না পারিয়া তিনি সেই ট্যাক্সির দিকে দুই এক পা অগ্রসর হইতেই শকটারোহী প্যারাডাইনের ঘাড় ধরিয়া টানিয়া ট্যাক্সির বাতায়ন বন্ধ করিল; তাহার পর ট্যাক্সিখানি দ্রুতবেগে চলিয়া গেল। মিঃ গ্রীড ট্যাক্সির দিকে চাহিয়া রহিলেন। কোন সাধারণ লোক মিঃ গ্রীডের ভাবভঙ্গী দেখিলে অস্বাভাবিক কিছু ঘটিয়াছে বলিয়া বুঝিতে পারিত না। কারণ, এরূপ কৌতূহলোদ্দীপক ব্যাপারেও মিঃ গ্রীডের মুখভাবের পরিবর্ত্তন লক্ষিত হইল না। তিনি চলিতে চলিতে মুহূর্ত্তের জন্য থমকিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন, যাহা দেখিবার, তাহা দেখিয়াছিলেন; তাহার পর ট্যাক্সি অদৃশ্য হইলে তিনি পূর্ব্ববৎ রেস্তরাঁর দ্বারের দিকে অগ্রসর হইলেন।

কিন্তু মিঃ গ্রীডের ভাবভঙ্গী দেখিয়া যদি কেহ মনে করিয়া থাকেন, পূর্ব্বোক্ত ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়া তিনি সম্পূর্ণ উদাসীন ছিলেন, প্যারাডাইনের মিনতি-ভরা আকুল আহ্বানে তিনি বিন্দুমাত্র বিচলিত না হইয়া সম্পূর্ণ নির্লিপ্তভাবে তাঁহার গন্তব্য-পথে অগ্রসর হইয়াছিলেন, তাহা হইলে স্বীকার করিতে হইবে, মিঃ গ্রীড সম্বন্ধে সেই ব্যক্তির ধারণা ভ্রমপূর্ণ। মিঃ গ্রীড যাহা দেখিয়াছিলেন, এবং শুনিয়াছিলেন, তাহা হইতে মুহূর্ত্তের মধ্যে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন, তাহা তাঁহার মনুষ্য-চরিত্রজ্ঞানের পরিচায়ক। তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন, প্যারাডাইন অত্যন্ত বিপন্ন হইয়াই তাঁহাকে আহ্বান করিয়াছিল; সম্ভব হইলে তিনি তাহার প্রার্থনা পূর্ণ

করিতেন। কিন্তু তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন, দ্রুতগামী মোটর-কারের অনুসরণ করিয়া তাহাতে আরোহণের চেষ্টা বাতুলতা মাত্র; সেরূপ চেষ্টা করিলে তাঁহার সময় ও উদ্যম নষ্ট হইত। কিন্তু তাহাতে তাঁহার কৃতকার্য্য হইবার সম্ভাবনা ছিল না। এই জন্য তিনি শকটখানির নম্বরটি স্মরণ রাখিলেন, এবং যে দৃশ্য তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইল, তাহার প্রকৃত কারণ কি হইতে পারে, তাহাই মনে মনে আলোচনা করিতে লাগিলেন। সেই সময় তিনি ইহার অধিক আর কিছুই করিতে পারিতেন না।

মিঃ প্রীডের ধারণা হইল, প্যারাডাইন বুইলোঁ রেস্তরাঁয় তাঁহার আদেশ পালন করিতে আসিয়াছিল, সেখানে সম্ভবতঃ এরূপ কোন ঘটনা সংঘটিত হইয়াছিল—যে জন্য তাহাকে অনিচ্ছার সহিত সেই স্থান ত্যাগ করিতে হইয়াছিল: হয় ত এই কার্য্যে তাহাকে বাধ্য করা হইয়াছিল, নতুবা রেস্তরাঁয় সে তাঁহার প্রতীক্ষা করিত। মিঃ প্রীড গাড়ীর ভিতর প্যারাডাইনের পার্শ্বে আর এক জন লোককে দেখিতে পাইয়াছিলেন, তাহার চেহারা তিনি লক্ষ্য করিয়াছিলেন, এবং সেই অল্পসময়ের মধ্যেই তাহা তাঁহার মানসপটে অঙ্কিত করিয়া লইয়াছিলেন। এই জন্য তিনি স্থির করিলেন, বুইলোঁ রেস্তরাঁয় উপস্থিত হইয়া এই বিষয়ের অনুসন্ধান করিবেন।

মিঃ প্রীড রেস্তরাঁয় প্রবেশ করিতেই দ্বারপ্রান্তে এক জন প্রহরীকে দেখিতে পাইলেন। তিনি তাহাকে বলিলেন, "একটি যুবক কয়েক মিনিট পূর্ব্বে অন্য এক জন লোকের সঙ্গে এই রেস্তরাঁ ত্যাগ করিয়াছে। যুবকটির সেই সঙ্গীর পরিচ্ছদ নীলবর্ণ, মাথায় গোল টুপী এবং মুখে এক জোড়া জমকাল কালো গোঁফ; তাহার টাই ডোরা কাটা। আমি যে যুবকটির কথা বলিতেছি, সে ইদানীং প্রায় প্রতি সপ্তাহেই এইখানে আহার করিত; এই জন্য আমার বিশ্বাস, সে তোমার অপরিচিত নহে। যুবকটি কি কারণে তাড়াতাড়ি রেস্তরাঁ হইতে চলিয়া গেল, তাহা জানিবার জন্য আমার আগ্রহ হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন তাহার সঙ্গীটিরও পরিচয় জানা আবশ্যক।"

আদালতের আমলা এবং হোটেলের আরদালীর হাতে যতক্ষণ কিছু গুঁজিয়া দেওয়া না যায়, ততক্ষণ তাহাদের কাছে কায পাওয়া যায় না। প্রহরী মিঃ প্রীডের মুখের দিকে চাহিয়া উপেক্ষাভরে বলিল, "রেস্তরাঁয় প্রত্যহ কত লোক আসিতেছে, যাইতেছে, যদি তাহাদের সকলের মুখ চিনিয়া রাখিতে পারিতাম, তাহা হইলে—"

মিঃ প্রীড প্রহরীর বাঁকা সুর শুনিয়া তৎক্ষণাৎ একটি রজত-মুদ্রা তাহার মুঠার ভিতর গুঁজিয়া দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে প্রহরীর মুখভাবের পরিবর্ত্তন হইল; প্রহরী সুর নরম করিয়া বলিল, "তাহা হইলে আপনার প্রশ্নের উত্তর দিতে বিলম্ব হইত না; তথাপি আমি চেষ্টা করিয়া দেখিব। সেই যুবকটি কি আপনার কোন আত্মীয় বা বন্ধু?"

মিঃ প্রীড বলিলেন, "আমার প্রশ্নের উত্তর দিতে হইলে যুবকটি আমার আত্মীয় কি বন্ধু, তাহা বোধ হয় জানিবার প্রয়োজন হয় না।"

প্রহরী বলিল, "মিঃ প্যারাডাইন যে ভদ্রলোকটির সঙ্গে রেস্তরাঁর বাহিরে গিয়াছেন, সেই ভদ্রলোকটির কথা জানিতে চাহেন?"

মিঃ প্রীড বলিলেন, "আমি যাহা জানিতে চাহি, তাহা তোমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছি।"

প্রহরী বলিল, "আমার তাহা জানা নাই, মহাশয়! আপনি রেস্তরাঁর ম্যানেজারকে ঐ সকল কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারেন। মিঃ প্যারাডাইন সাতটা বাজিয়া কুড়ি মিনিটের সময় এখানে আসিয়াছিলেন, এবং যে গাড়ীতে আপনি তাঁহাকে চলিয়া যাইতে দেখিয়াছিলেন, সেই গাড়ী তাহার ঠিক ছয় মিনিট পরে রেস্তরাঁর দরজায় উপস্থিত হইয়াছিল। যে ভদ্রলোকটি সেই গাড়ীতে ছিলেন, তাঁহাকে আমি চিনি না। তিনি গাড়ীর ড্রাইভারকে অপেক্ষা করিতে বলিয়া গাড়ী হইতে নামিয়া আসিলেন; তাহার পর রেস্তরাঁয় প্রবেশ করিয়া মিঃ প্যারাডাইনকে সঙ্গে লইয়া বাহিরে আসিলেন, ইহাই আমি দেখিয়াছি; এবং যাহা দেখিয়াছি, তাহাই আপনাকে বলিলাম।"

মিঃ প্রীড বুঝিলেন, টাকাটা মাঠে মারা গেল। কিন্তু প্রহরীর নিকট আর কোন কথা জানিবার উপায় নাই বুঝিয়া তিনি রেস্তরাঁয় প্রবেশ করিলেন। প্রহরী তাঁহাকে বলিয়াছিল, তিনি ম্যানেজারকে সকল কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারেন; কিন্তু মিঃ প্রীড তাহা সঙ্গত মনে করিলেন না। তাঁহার মনে হইল, যদি এই রেস্তরাঁয় টেরির প্রতিপত্তি থাকে এবং রেস্তরাঁর কর্ত্তৃপক্ষ তাহাকে

তাহাদের মুরুব্বি মনে করে, তাহা হইলে তিনি ম্যানেজারকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিয়া সদুত্তর পাইবেন না। এই সকল রেওরাঁর ম্যানেজাররা তাহাদের খদ্দেরের স্বার্থ-রক্ষারই চেষ্টা করে। যাহা হউক, মিঃ গ্রীড স্থির করিলেন—তিনি সেই স্থানেই আহার করিবেন এবং আহার করিতে করিতে তাঁহার কর্ত্তব্য সম্বন্ধে সকল কথা চিন্তা করিবেন।

মিঃ গ্রীড খাদ্যদ্রব্যের জন্য আদেশ করিয়া ভোজন-টেবলে বসিয়া পড়িলেন; সেই সময় একটি বিশালদেহ ভদ্রলোক আকর্ণ-বিশ্রান্ত গোঁফের নিশান উড়াইয়া তাঁহার পাশে আসিয়া দাঁড়াইল। সে মিঃ গ্রীড্‌কে বলিল, "রেস্তরাঁর দ্বাররক্ষীর নিকট শুনিলাম, আপনি মিঃ প্যারাডাইনের সন্ধান লইতেছিলেন?"

মিঃ গ্রীড্ সেই বিরাট গোঁফের দিকে দৃষ্টি প্রসারিত করিয়া বলিলেন, "হাঁ। মিঃ প্যারাডাইন আমার বন্ধুপুত্র, তাহাকে একটা লোকের সঙ্গে এই রেস্তরাঁ ত্যাগ করিতে দেখিয়া আপনাদের দ্বাররক্ষীকে তাহার কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম বটে।"

প্রশ্ন হইল, "আপনার এই বন্ধুপুত্র যে ভদ্রলোকটির সঙ্গে বাহিরে গিয়াছেন, তাঁহারও পরিচয় জানিবার জন্য আপনি আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন?"

মিঃ গ্রীড্ বলিলেন, "সে কথা সত্য। আমরা বুড়া হইতে চলিয়াছি কি না, আমাদের কৌতূহলের পরিমাণ কিছু অধিক। এ কালের ছেলেরা কাহারও সহিত মিশামিশি করিতেছে শুনিলে কিরূপ লোক তাহাদিগকে দলে টানিবার চেষ্টা করে—তাহা জানিবার জন্য স্বতঃই আমাদের আগ্রহ হইয়া থাকে।"

গুঁফো ভদ্রলোকটি সেই রেস্তরাঁর ম্যানেজার। ম্যানেজার মিঃ গ্রীডের কথা শুনিয়া সেই জনবহুল ভোজন-কক্ষের চারিদিকে কুঞ্চিত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল, তাহার পর ক্ষণকাল ইতস্ততঃ করিয়া মৃদুস্বরে বলিল, "আপনি যদি আমার অফিসে যাইতেন, তাহা হইলে আপনার সেই বন্ধুপুত্র সম্বন্ধে কোন কোন কথা আপনাকে বলিতে পারিতাম। এই কক্ষে বিস্তর লোক আহারাদি করিতেছে, এখানে আপনার সঙ্গে ঐ সকল কথার আলোচনা করিলে উহাদের কেহ না কেহ সে কথা শুনিতে পাইবে; এই জন্যই এখানে আমি সে কথার আলোচনা করিতে চাহি না।"

"সে কথা সত্য"—বলিয়া মিঃ গ্রীড্ তাঁহার টুপী ও ছাতাটি তুলিয়া লইয়া আসন ত্যাগ করিলেন।

অতঃপর মিঃ গ্রীড ম্যানেজারের অনুসরণ করিয়া সেই কক্ষের অন্য প্রান্তে উপস্থিত হইলেন। তাহার পর একটি অন্ধকারপূর্ণ পথ অতিক্রম করিয়া আর একটি দ্বারের সম্মুখে আসিলেন।

দ্বারটি রুদ্ধ থাকায় ম্যানেজার পকেট হইতে একটি চাবি বাহির করিল। সেই চাবির সাহায্যে সে রুদ্ধ দ্বার উদ্ঘাটিত করিয়া মিঃ গ্রীডকে বলিল, "আপনি এই কক্ষে প্রবেশ করুন।"

মিঃ গ্রীড সেই কক্ষের চৌকাঠ পার হইয়া ভিতরে দৃষ্টিপাত করিলেন। কক্ষটি বৃহৎ, কিন্তু বাতায়নবর্জ্জিত এবং আসবাবপত্রবিহীন: তাহার বায়ুস্তর দুর্গন্ধপূর্ণ; কক্ষটির প্রধান বৈচিত্র্য এই যে, তাহার এক-প্রান্তে রাশি রাশি খড় পড়িয়াছিল। মিঃ গ্রীড্ কক্ষের ভিতর প্রবেশ করিয়া দ্বারের অদূরবর্ত্তী দেওয়ালে ঠেস দিয়া দাঁড়াইলেন এবং কি উদ্দেশ্যে ম্যানেজার তাঁহাকে সেই কক্ষে প্রবেশ করিতে বলিল—তাহাই চিন্তা করিতে লাগিলেন। ম্যানেজার তখন সেই কক্ষের দ্বার দুই হস্তে ধরিয়া চৌকাঠের নিকট দাঁড়াইয়াছিল।

মিঃ গ্রীড ম্যানেজারকে বলিলেন, "আপনার আফিসের চারিদিকের অবস্থা দেখিয়া অবাক্ হইতে হয়। আপনার এই কামরাটি গো-পালনের যোগ্য বটে।"

ম্যানেজার গম্ভীর স্বরে বলিল, "অধিকতর প্রয়োজনীয় কার্য্যে এই কক্ষ ব্যবহৃত হয়। আপনি শীঘ্রই তাহা জানিতে পারিবেন। আপনার বোধ হয় স্মরণ আছে, আপনি আমার প্রহরীকে উৎকোচ দানে বশীভূত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, হাঁ, তাহাকে ঘুস দিয়া কোন কোন কথা তাহার নিকট জানিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, অথচ আমার নিকট আপনার সেই উদ্দেশ্য গোপন করিয়া আমাকে বুঝাইবার চেষ্টা করিলেন—ঐ সকল কথা জানিবার জন্য আপনার আগ্রহ ছিল না! আপনি বলুন, কি উদ্দেশ্যে আপনি এখানে আসিয়া জুটিয়াছেন?"

মিঃ গ্রীড ততোধিক গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "আপনার

এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া আমি নিষ্প্রয়োজন মনে করি।"

ম্যানেজার ভ্রূভঙ্গী করিয়া কঠোর স্বরে বলিল, "আলবৎ আপনি আমার প্রশ্নের উত্তর দিবেন। এখন আমার হাতে অন্য জরুরী কায আছে, এই জন্য আমার এখানে অপেক্ষা করিবার অবসর হইবে না। সুতরাং আপনি কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণের জন্য যথেষ্ট সময় পাইবেন।—পেড্রো!"

ম্যানেজার হঠাৎ পেড্রো বলিয়া হুঙ্কার দিল; মিঃ ব্লেক তাহার এই হুঙ্কারের অর্থ বুঝিতে পারিলেন না; তাঁহার অনুমান হইল, ম্যানেজার কোন কারণে তাহার কোন ভৃত্যকে আহ্বান করিল। সেই কক্ষের এক প্রান্তে সংস্থাপিত একটি ক্ষুদ্র বৈদ্যুতিক দীপ-গোলক হইতে মৃদু আলোকপ্রভা নিঃসারিত হইতেছিল, তাহাতে সেই কক্ষের সকল অংশ আলোকিত হয় নাই। মিঃ ব্লেক দেখিতে পাইলেন, ম্যানেজারের আহ্বানমাত্র অন্ধকারাচ্ছন্ন খড়ের গাদার এক প্রান্ত হইতে নেকড়ে বাঘের আকারবিশিষ্ট কি একটা চতুষ্পদ জন্তু সেই কক্ষের দ্বার লক্ষ্য করিয়া দৌড়াইয়া আসিতেছিল; জানোয়ারটা ম্যানেজারের নিকট আসিয়া দাঁড়াইলে মিঃ ব্লেক তাহাকে দেখিয়া চিনিতে পারিলেন—তাহা আল্‌সাটিয়ান নেকড়ে কুকুর। (Alsatian wolf-hound) ঐ জাতীয় ঐরূপ ভীষণ-দর্শন বলিষ্ঠ কুকুর মিঃ ব্লেক পূর্ব্বে কোন দিন দেখিয়াছেন বলিয়া তাঁহার স্মরণ হইল না। কুকুরটার সুতীক্ষ্ণ ও সুবৃহৎ দন্তশ্রেণী উদ্ঘাটিত, তাহার সুলোহিত লোল জিহ্বা হইতে লালা ক্ষরিত হইতেছিল। সে আরক্তিম নেত্র ঊর্দ্ধে তুলিয়া ম্যানেজারের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। মিঃ ব্লেক স্তম্ভিতহৃদয়ে সেই কুকুরটার ভাবভঙ্গী নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন।

ম্যানেজার মিঃ ব্লেককে লক্ষ্য করিয়া নীরস স্বরে বলিল, "মহাশয়, আপনি যেখানে দাঁড়াইয়া আছেন, ঐ স্থানে স্থির-ভাবে দাঁড়াইয়া থাকুন, ঐ স্থান ত্যাগ করা আপনার পক্ষে অত্যন্ত অবিবেচনার কায হইবে। আমার এই উপদেশ অগ্রাহ্য করিলে আপনার জীবনের আশঙ্কা আছে, এ কথা স্মরণ রাখিবেন। আর মিনিট পনের পরে আমি এখানে ফিরিয়া আসিব। আমার প্রশ্নের উত্তর দেওয়া উচিত কি না, তাহা আপনি এই সময়মধ্যে স্থির করিয়া ফেলিবেন; কিন্তু পুনর্ব্বার আপনাকে সতর্ক করিতেছি, যদি জীবন বিপন্ন করিবার জন্য আপনার আগ্রহ না হয়, তাহা হইলে ঐ স্থান হইতে আপনি নড়িবেন না। আমি এখন চলিলাম। পেড্রো; তুই উহার পাহারায় থাক।"

কথা শেষ হইলে ম্যানেজার মুহূর্ত্তের জন্য কুকুরটার মাথায় হাত বুলাইয়া সেই কক্ষের বাহিরে দাঁড়াইয়া দ্বার রুদ্ধ করিল। মিঃ ব্লেক দ্বারে তালা বন্ধ করিবার শব্দ শুনিতে পাইলেন। পরমুহূর্ত্তেই সেই কক্ষের বৈদ্যুতিক দীপ নির্ব্বাপিত হইল। মিঃ ব্লেক নিবিড় অন্ধকারাচ্ছন্ন কক্ষে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

মিঃ ব্লেক সেই অন্ধকারের মধ্যে দাঁড়াইয়া কুকুরটার উজ্জ্বল চক্ষু দুইটি দেখিতে পাইলেন, অন্ধকারে তাহা ব্যাঘ্রের চক্ষুর ন্যায় জ্বল্‌জ্বল্ করিতেছিল। মিঃ ব্লেক বুঝিতে পারিলেন, তিনি সেই কক্ষের দেওয়ালে ঠেস দিয়া দাঁড়াইয়া ভালই করিয়াছিলেন, কারণ, সেই অবস্থায় তাঁহার সরিয়া যাইবার সম্ভাবনা ছিল না, সুতরাং কুকুরটা তাঁহাকে আক্রমণ না করিয়া নিস্তব্ধভাবে তাঁহার পাহারায় নিযুক্ত থাকিবে। কিন্তু মিঃ ব্লেক সেই অন্ধকারেও কুকুরের উজ্জ্বল চক্ষু দুইটি ক্রমশঃ তাঁহার দেহের দিকে ঘেঁসিয়া আসিতেছিল দেখিয়া উৎকণ্ঠিত হইলেন। তিনি ছাতার মাথাটা সোজা-ভাবে মেঝের উপর রাখিতেই তাহার আঘাতে 'খট্' করিয়া শব্দ হইল। মৃদুশব্দ; কিন্তু সেই শব্দেই কুকুরটা গম্ভীর গর্জ্জন করিল। মিঃ ব্লেক বুঝিতে পারিলেন, রেস্তরাঁর ম্যানেজার অতি ভীষণ জানোয়ারকে তাঁহার পাহারায় রাখিয়া গিয়াছে। মেঝের উপর ছাতার অগ্রভাগ স্পর্শের মৃদু শব্দেই কুকুরটা যখন এরূপ বিচলিত হইয়া উঠিয়াছিল, তখন তিনি স্থান পরিবর্ত্তন করিবামাত্র সে তাঁহার বুকের উপর লাফাইয়া উঠিয়া তাঁহার গলা কামড়াইয়া ধরিবে, এ বিষয়ে তাঁহার সন্দেহ রহিল না। তাঁহার ধারণা হইল, ম্যানেজার তাঁহাকে যে কথা বলিয়া সতর্ক করিয়াছিল, তাহা অত্যুক্তি নহে।

মিঃ ব্লেক ছাতার দাণ্ডিতে হাত দিয়া হাতখানি ধীরে ধীরে তাহার স্প্রিংএর কাছে নামাইলেন; সেই স্প্রিংএর উপর তাঁহার অঙ্গুলীর চাপ পড়িতেই পুনর্ব্বার 'খট্' করিয়া শব্দ হইল। সেই শব্দ শুনিয়া কুকুরটা পুনর্ব্বার গোঁ-গোঁ শব্দ করিয়া মুখ তুলিয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিল। মিঃ ব্লেক অন্ধকারে তাহার উজ্জ্বল চক্ষু দুইটি ঊর্দ্ধে প্রসারিত দেখিলেন।

সেই মূহূর্ত্তে তিনি ডান পাশে ঈষৎ সরিয়া দাঁড়াইয়া ছাতার দাণ্ডি ধরিয়া আকর্ষণ করিতেই ছাতার শিকগুলি সহ কাপড়ের সাজ মেঝের উপর খসিয়া পড়িল, এবং তীক্ষ্ণধার গুপ্তিখানি তাঁহার হাতের মুঠার মধ্যে রহিয়া গেল !'

মুহূর্ত্তমধ্যে মিঃ গ্রীড তাঁহার পার্শ্বে কোন ভারী জিনিষের পতন-শব্দ শুনিতে পাইলেন, তিনি বুঝিতে পারিলেন, কুকুরটা তাঁহাকে আক্রমণের উদ্দেশ্যে, দেওয়ালের যে স্থানে তিনি প্রথমে দাঁড়াইয়াছিলেন, সেই স্থানে লাফাইয়া পড়িল। তিনি সরিয়া না দাঁড়াইলে কুকুরটা তাঁহারই দেহের উপর নিক্ষিপ্ত হইত।

কুকুরটা দেওয়ালের নীচে পড়িয়াই উঠিয়া দাঁড়াইল, এবং অগ্নিগোলকের ন্যায় উজ্জ্বল চক্ষু দুইটি উর্দ্ধে তুলিয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিল। সেই মূহূর্ত্তে মিঃ গ্রীডের দক্ষিণ হস্ত সেই সাংঘাতিক গুপ্তিসহ সম্মুখে প্রসারিত হইল।

কুকুরটা তাঁহার সম্মুখে আসিয়া আক্রমণোদ্যত হইল; কিন্তু তাহার বিশাল দেহ মিঃ গ্রীডের অঙ্গস্পর্শ করিতে পারিল না; এবার হুঙ্কারের পরিবর্ত্তে তাহার বিদীর্ণ কণ্ঠ হইতে যন্ত্রণাসূচক গভীর আর্ত্তনাদ নিঃসারিত হইল। সঙ্গে সঙ্গে একটা ঝাঁটকা টানে গুপ্তিখানা তাঁহার হস্তচ্যুত হইবার উপক্রম! কিন্তু তিনি উভয় হস্তের সাহায্যে সবেগে তাহা আকর্ষণ করিয়া, দেহের সমগ্র শক্তি প্রয়োগে এরূপ এক খোঁচা দিলেন যে, সেই খোঁচায় কুকুরটার কণ্ঠ চির-নীরব হইল, তাহার ভারী দেহ সশব্দে মেঝের উপর নিক্ষিপ্ত হইল।

মিঃ গ্রীড ক্ষণকাল নিস্তব্ধভাবে সেই স্থানে দাঁড়াইয়া রহিলেন, তাহার পর গুপ্তিখানি সবলে টানিয়া লইয়া পকেট হইতে 'পেট্রল লাইটার' বাহির করিলেন! তাহার মৃদু আলোকে সেই স্থান আলোকিত হইল। সেই আলোকে তিনি সুবৃহৎ আল্‌সাটিয়ান হাউণ্ডের মৃতদেহ তাঁহার পদপ্রান্তে নিপতিত দেখিলেন। তাঁহার গুপ্তির তীক্ষ্ণাগ্রভাগ কুকুরটার কণ্ঠনালী এবং ঘাড় এভাবে বিদীর্ণ করিয়াছিল যে, তাহা এক দিকে প্রবেশ করিয়া অন্য দিক দিয়া বাহির হইয়া গিয়াছিল। মেঝের উপর তাহার শোণিতের স্রোত বহিতেছিল।

মিঃ গ্রীড মেঝের উপর হইতে তাঁহার ছাতার শিক ও কাপড়ের সাজ কুড়াইয়া লইয়া ধীরে ধীরে গুপ্তিখান তাহার ভিতর সংস্থাপিত করিলেন, এবং মুহূর্ত্তমধ্যে তাহার স্প্রিং টিপিয়া তাহাকে ছাতায় পরিণত করিলেন। অতঃপর তিনি কুকুরটার গলার কলার ধরিয়া তাহার মৃতদেহ টানিয়া তুলিলেন, এবং কুকুরটা সেই কক্ষের যে কোণের খড়ের গাদা হইতে বাহির হইয়া আসিয়াছিল, তাহাকে সেই কোণে টানিয়া লইয়া গিয়া খড়ের সেই গাদার ভিতর ফেলিয়া রাখিলেন।

অতঃপর মিঃ গ্রীড নিঃশব্দপদসঞ্চারে সেই কক্ষের দ্বারের নিকট উপস্থিত হইলেন। কোন কৌশলে সেই কক্ষের দ্বার খুলিয়া বাহিরে যাইবার জন্য তাঁহার আগ্রহ হইল, কিন্তু তিনি রুদ্ধ দ্বার পরীক্ষা করিয়া বুঝিতে পারিলেন, তাঁহার সেই চেষ্টা সফল হইবার সম্ভাবনা নাই, ভিতর হইতে চেষ্টা করিয়া সেই সুদৃঢ় দ্বার খুলিবার উপায় ছিল না। কিন্তু দ্বার খুলিতে না পারিলেও তিনি বিন্দুমাত্র উৎকণ্ঠিত হইলেন না।

ম্যানেজার তাঁহার নিকট শীঘ্রই ফিরিয়া আসিবার অঙ্গীকার করিয়াছিল। তিনি অব্যাকুল-চিত্তে তাহার প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

মিঃ গ্রীড ভাবিলেন, ম্যানেজার আসিয়া দ্বার খুলিয়া তাঁহার সম্মুখে অগ্রসর হইবামাত্র তিনি তাহাকে ঠেলিয়া ফেলিয়া অনায়াসেই রেস্তরাঁ ত্যাগ করিতে পারিবেন এবং পুলিস ডাকিয়া তাহাদিগকে ম্যানেজারের অপকার্য্যের প্রমাণ প্রদর্শন করিলে তাহাকে ফৌজদারী সোপর্দ্দ করা কঠিন হইবে না; কিন্তু ম্যানেজারকে এইভাবে শাস্তিপ্রদানের চেষ্টা করিলে তাঁহার সঙ্কল্পসিদ্ধির ব্যাঘাত হইবে বলিয়াই তাঁহার ধারণা হইল। কারণ, তিনি একটি বিশেষ উদ্দেশ্যে বুইলোঁ রেস্তরাঁয় উপস্থিত হইয়াছিলেন। তিনি মিঃ গার্ভিনের হত্যাকারীকে আবিষ্কার করিয়া জন প্যারা-ডাইনকে তাহার শত্রুপক্ষের ষড়যন্ত্রজাল হইতে উদ্ধার করিবেন, ইহাই তাঁহার সঙ্কল্প। তিনি প্যারাডাইনের শত্রুপক্ষের ষড়যন্ত্রের কোন কোন সূত্র আবিষ্কারে সমর্থ হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু রহস্যভেদে তখনও অনেক বিলম্ব ছিল, এ অবস্থায় রেস্তরাঁর ম্যানেজারকে পুলিসে ধরাইয়া দিয়া মূল চেষ্টা ব্যর্থ করিতে তাঁহার প্রবৃত্তি হইল না।

বুইলোঁ রেস্তরাঁ নগরের সাধারণ রেস্তরাঁগুলির ন্যায় ভোজনালয় হইলেও তাহা যে অন্য গোপনীয় উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হইত, এ বিষয়ে তিনি নিঃসন্দেহ হইয়াছিলেন। এই রেস্তরাঁই বদমায়েসদের অপরাধজনক কার্য্যানুষ্ঠানের একটা

আড্ডা, ইহার সুস্পষ্ট প্রমাণ তিনি সংগ্রহ করিতে পারিয়াছিলেন। কিন্তু টেরি এখানে কোন্ ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল, টেরির প্রকৃত পরিচয় কি, এবং সে কোথায় বাস করিতেছিল, তাহা তিনি তখনও জানিতে পারেন নাই। এই জন্য মিঃ প্রীড ধৈর্য্যধারণ করিয়া সুযোগের প্রতীক্ষা করাই সঙ্গত মনে করিলেন। কিন্তু আর একটি বিষয় চিন্তা করিয়া তিনি অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইলেন। প্যারাডাইনের ভাগ্যে কি ঘটিয়াছিল, তাহাকে কি ভাবে কিরূপ ষড়যন্ত্রে জড়াইয়া পড়িয়া দুঃসহ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইতেছিল, তাহা আবিষ্কারের পূর্ব্বে তিনি ম্যানেজারের অত্যাচারের প্রতিফল দেওয়া অকর্ত্তব্য মনে করিলেন।

মিঃ প্রীড ঘড়ীর দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বুঝিতে পারিলেন, তিনি সেই কক্ষে অবরুদ্ধ হইবার পর প্রায় এক ঘণ্টা অতীত হইয়াছিল; অথচ ম্যানেজার তাঁহাকে বলিয়া গিয়াছিল—পনের মিনিটের মধ্যে সে তাঁহার নিকট ফিরিয়া আসিবে! কিন্তু এক ঘণ্টার মধ্যে তাহার সাক্ষাৎ নাই, তাহার অনুপস্থিতির কারণ অনুমান করা তাঁহার অসাধ্য হইল।

আরও কিছুকাল পরে দূরস্থ বারান্দা হইতে কাহারও পদশব্দ মিঃ প্রীডের কর্ণগোচর হইল; ক্রমশঃ সেই শব্দ স্পষ্টতর হইতে লাগিল, যেন ধীরে ধীরে তাহা সেই কক্ষের দ্বারের অভিমুখে অগ্রসর হইতেছিল। অবশেষে মিঃ প্রীড কাহারও নিশ্বাস-পতনের শব্দ শুনিতে পাইলেন। সহসা সেই কক্ষের বৈদ্যুতিক দীপ জ্বলিয়া উঠিল। ম্যানেজার মুহূর্ত্তমধ্যে সেই কক্ষে প্রবেশ করিবে মনে করিয়া মিঃ প্রীড সতর্কভাবে দ্বারের নিকট অগ্রসর হইলেন; কিন্তু সেই মুহূর্ত্তে দীপ পুনর্ব্বার নির্ব্বাপিত হইল, এবং সেই কক্ষ আবার গাঢ় অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইল। [ক্রমশঃ।

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়।

গান

কে দিলি রে কে দিলি,
ঐ যে আমার মায়ের পায়ে
রক্তজবার অঞ্জলি ?
ভক্তি-রাঙ্গা কামনা কে
ছড়িয়ে গেল প্রাণ খুলি ?
তা'রই মনের ছোঁয়াচ লেগে
উঠুক আমার চিত্ত জেগে,
নিত্য আমি দু'হাত ভ'রে
তোমার পূজার ফুল তুলি।

সেই পূজারি আনন্দেতে
পূরবে আমার মনের সাধ,
মাথায় ল'য়ে প্রসাদী ফুল
বইব তোমার আশীর্ব্বাদ ;
তাইতে ফুটে উঠবে আমার হৃদয়-কমল-দলগুলি।
বিশ্ব-জবা-ফোটা পায়ে,
স্নিগ্ধ তোমার করুণ-ছায়ে
হৃদয় আমার পাগল হয়ে
পড়বে লুটি' চঞ্চলি'।

শ্রীঅসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়।

স্যর রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

যাঁহারা বাঙ্গালীজাতির মুখোজ্জ্বল করিয়াছেন, সার রাজেন্দ্রনাথ তাঁহাদের অন্যতম। শুধু অন্যতম তিনি নহেন—কাহারও পশ্চাতে তাঁহার আসন নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে না। বিগত ১৩৪০ সালের আষাঢ় মাসে "মাসিক বসুমতী" বাঙ্গালা মায়ের এই কৃতী সন্তানের অশীতিতম জন্মতিথি উপলক্ষে তাঁহার জীবন-কাহিনীর আলোচনা করিয়া ধন্য হইয়াছিল। এত শীঘ্র সার রাজেন্দ্রনাথ বঙ্গ-জননীর ক্রোড় শূন্য করিয়া চলিয়া যাইবেন, ইহা তাঁহার গুণ-মুগ্ধ বাঙ্গালীজাতি কল্পনা করিতে পারে নাই। ১লা জ্যৈষ্ঠ তারিখে কর্ম্মবীর রাজেন্দ্রনাথ মহাপ্রয়াণ করিয়াছেন।

২৪ পরগণার বসিরহাট মহকুমার প্রায় এক মাইল দূরে অবস্থিত ভ্যাবলা গ্রামে রাজেন্দ্রনাথ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা ভগবানচন্দ্রের বহু সাধনার সন্তান তিনি। জননীর ৩৩।৩৪ বৎসর বয়সে রাজেন্দ্রনাথ মাতৃক্রোড় আলোকিত করেন। একান্নবর্ত্তী পরিবারে ভগবানচন্দ্র তাঁহার স্বোপার্জ্জিত সমুদয় অর্থ প্রদান করিতেন! তাই নিজের পুত্রের জন্য তিনি কিছুই সঞ্চয় করিতে পারেন নাই।

ছয় বৎসর বয়সে রাজেন্দ্রনাথ পিতৃহারা হন। কিন্তু জননীর অকপট স্নেহ তাঁহাকে সকলপ্রকার অভাবের তাড়না হইতে রক্ষা করিত। রাজেন্দ্রনাথ গ্রাম্য পাঠশালায় কিছুদিন বিদ্যাশিক্ষা করেন। পাঠশালার গুরুমহাশয় মানসাঙ্কে বিশেষভাবে অভিজ্ঞ ছিলেন। রাজেন্দ্রনাথ প্রথম শিক্ষাগুরুর নিকট হইতে মানসাঙ্কে বিশেষ পারদর্শী হইয়াছিলেন। উত্তরকালে এই অসাধারণ স্মৃতি-শক্তিই তাঁহার উন্নতির পথকে বিঘ্ন-শূন্য করিয়া তুলিয়াছিল।

পাঠশালার শিক্ষা সমাপ্ত হইলে রাজেন্দ্রনাথ ইংরেজি শিখিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিতে থাকেন। কালীগঞ্জে একটি ছোটখাট ইংরেজি বিদ্যালয় ছিল। সম্পর্কে ভ্রাতুষ্পুত্র মতিলালের সহিত রাজেন্দ্রনাথ কালীগঞ্জে পড়িতে গেলেন। এই মতিলাল রাজেন্দ্রনাথের অন্তরঙ্গ বন্ধুর স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। বসন্ত-রোগের মহামারী আরম্ভ হওয়ায় রাজেন্দ্রনাথকে বাধ্য হইয়া কালীগঞ্জ ত্যাগ করিতে হয়। এই ব্যাধির কবলে পড়িয়া রাজেন্দ্রনাথ বহু দিন শয্যাশায়ী ছিলেন—অতি কষ্টে তাঁহার জীবন রক্ষিত হইয়াছিল। ভ্যাবলায় ফিরিয়া আসিয়া কিছুকাল তিনি সন্তরণ ও মৎস্য-শিকারে দিন-যাপন করিতেন।

অতঃপর রাজেন্দ্রনাথ বারাসতের স্থানীয় স্কুলে দ্বিতীয় শ্রেণী পর্য্যন্ত অধ্যয়ন করেন। সেখানে যাঁহার আশ্রয়ে থাকিয়া তিনি লেখাপড়া করিতেছিলেন, অকস্মাৎ তাঁহার মৃত্যু হওয়ায় রাজেন্দ্র-নাথের পড়াশুনা বন্ধ হয়। তার পর তিনি মাতুলাশ্রয়ে থাকিয়া পড়িবার জন্য আগ্রায় গমন করেন। সেখানে তিনি মনের আনন্দে অধ্যয়ন করিতেছিলেন। কিন্তু কৌশলে তাঁহাকে অনতিবিলম্বে দেশে ফিরাইয়া আনা হইয়াছিল। তখনও তাঁহার বয়স অষ্টাদশবর্ষ হয় নাই। বাড়ীতে আসিবার পরই কৌলিক প্রথা অনুসারে তাঁহার বিবাহ হয়।

বয়সে অনেক বড় ভ্রাতুষ্পুত্র, কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটীর কলেক্টর যোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের বাসায় থাকিয়া তার পর তিনি লণ্ডন মিশন ইনষ্টিটিউশনে পাঠ আরম্ভ করেন। তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র মতিলালও সেই স্কুলে পাঠ করেন। এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া রাজেন্দ্রনাথ প্রেসিডেন্সী কলেজে এঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে প্রবেশ করেন। মতিলাল মেডিক্যাল কলেজে চিকিৎসা-বিদ্যা শিক্ষা করিতে থাকেন।

১৮৭২ খৃষ্টাব্দ হইতে তিন বৎসর তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজে পূর্ত্তবিভাগের কার্য্য শিক্ষা করিতে থাকেন। স্বাস্থ্য ক্ষুণ্ণ হওয়ার ফলে উপাধিলাভ করিবার পূর্ব্বেই বাধ্য হইয়া পাঠ বন্ধ ও কলেজ ছাড়িয়া দিতে হয়। তখন জীবিকা উপার্জ্জনের জন্য তিনি ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন।

স্বাধীন কর্ম্মজীবন গড়িয়া তুলিবার অভিপ্রায়ে রাজেন্দ্রনাথ ওয়েলিংটন স্কোয়ারের কাছাকাছি একটি মেসে থাকিবার ব্যবস্থা করিয়া লইলেন। বন্ধুবর্গের সাহায্যে একটি অনাথ বালিকা-আশ্রমে ১৫৲ টাকা বেতনে গণিত-শিক্ষকের পদ পাইলেন। প্রত্যহ দুই ঘণ্টা শিক্ষাদান করিয়া ঐ সামান্য আয়ে তিনি মেসের ব্যয় নির্ব্বাহ করিতেন।

এঞ্জিনিয়ারিং বিদ্যার প্রতি তাঁহার প্রবল অনুরাগ ছিল। এ জন্য উক্ত বিজ্ঞান সম্বন্ধে অতিরিক্ত জ্ঞানার্জ্জনের অভিপ্রায়ে তিনি কলিকাতা সহরের রাজপথ ও সাধারণ উদ্যানে প্রায়ই বেড়াইতেন। সেই সময় সহরের প্রাসাদোপম অট্টালিকাসমূহের রচনা-কৌশল দেখিয়া তিনি বিমল আনন্দও উপভোগ করিতেন। কারিকরগণের কার্য্যকলাপ অখণ্ড মনোযোগ-সহকারে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া তিনি মনে মনে ভাবিতেন, উহা আরও উত্তমরূপে করা যায় কি না।

রামব্রহ্ম সান্ন্যাল নামক মেডিক্যাল কলেজের কোনও ছাত্র রাজেন্দ্রনাথের সহিত একই মেসে থাকিতেন। তিনি শারীরিক অসুস্থতা বশতঃ শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারেন নাই। কিন্তু জীব-বিজ্ঞানের ব্যবহারিক জ্ঞান লাভ করার ফলে তিনি আলিপুর চিড়িয়াখানার সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের পদ পাইয়াছিলেন। রাজেন্দ্রনাথ বন্ধুর কাছে চিড়িয়াখানায় প্রায়ই আসিতেন।

ব্রাডফোর্ড লেশলি কলিকাতা কর্পোরেশনের তদানীন্তন চীফ এঞ্জিনিয়ার ছিলেন। এক দিন রাজেন্দ্রনাথ বন্ধুসহ পশুশালায়

[বসুমতীর জন্য বিশেষভাবে গৃহীত চিত্র।

শ্রীরাজেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়
২৭।৩।৪০

সম্রাট-সকাশে সস্ত্রীক সার রাজেন্দ্রনাথ

ভ্রমণকালে দেখিতে পান, এক জন ইংরেজ কয়েক জন কারিকরকে একটা নূতন সেতুর নির্ম্মাণ-প্রণালী বুঝাইয়া দিবার চেষ্টা করিতেছিলেন, কিন্তু মিস্ত্রীরা সাহেবের কথা আদৌ বুঝিতে পারিতেছিল না। ইনিই ব্রাডফোর্ড লেশলি। রাজেন্দ্রনাথ সাহেবকে বিব্রত দেখিয়া প্রধান মিস্ত্রীকে সহজভাষায় ব্যাপারটা বুঝাইয়া দিতেই সে বলিয়া উঠিল, এবার সে সব বুঝিয়াছে। ব্রাডফোর্ড লেশলি তখন যুবক রাজেন্দ্রনাথের পরিচয় গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে পরদিবস প্রভাতে ফল্‌তা জলকলের কারখানায় গিয়া তাঁহার সহিত দেখা করিতে বলিলেন।

নির্দ্দিষ্ট দিনে সাক্ষাৎ করার পর লেশলি সাহেব ফল্‌তা কলের কন্‌ট্রাক্ট তাঁহাকে প্রদান করিতে সম্মত হন। এই সূত্রেই রাজেন্দ্রনাথের প্রতিভা তাঁহার কর্ম্ম-জীবনের বিরাট সৌধ গঠনের সহায়তা করিয়াছিল। ফল্‌তা কলের কন্‌ট্রাক্ট লইয়া সেই কার্য্য নিষ্পন্ন করিতে তাঁহাকে মূলধনের জন্য যেরূপ বেগ পাইতে হইয়াছিল, তাহা ইতিহাসের বিষয়। নির্দ্দিষ্ট সময়ে কার্য্য সমাপ্ত হইলে প্রধান এঞ্জিনিয়ার কায দেখিয়া রাজেন্দ্রনাথের উপর অত্যন্ত প্রসন্ন হইলেন। তার পর তিনি জল-শোধণের বন্দোবস্ত ও থিতাইবার জলাধারগুলির সংরক্ষণকার্য্য তদারক করিবার ভার প্রাপ্ত হইলেন।

অতঃপর মণিরামপুরে তিনি পত্নী ও মাতাকে লইয়া আসিলেন। কিন্তু পত্নী সন্তান-সম্ভবা হওয়ায় তাঁহাকে পিত্রালয়ে পাঠান হইল। সেখানে রাজেন্দ্রনাথের পত্নী-বিয়োগ ঘটে। মনের দুঃখে কিছু দিন যাপনের পর মাতৃ-আদেশে ২৬ বৎসর বয়সে রাজেন্দ্রনাথ সোলাদানার কোনও দরিদ্র ব্রাহ্মণকন্যার পাণি-গ্রহণ করেন। ইনিই বর্ত্তমানে লেডী যাদুমতী। গৃহলক্ষ্মীর পুনরাগমনের পর রাজেন্দ্রনাথের সৌভাগ্যলক্ষ্মীও সোনার ঝাঁপি খুলিয়া কর্ম্মবীর রাজেন্দ্রনাথের মাথায় আশিসধারা ঢালিয়া দিতে লাগিলেন।

টি, সি, মুখার্জ্জি এণ্ড কোম্পানী নাম দিয়া রাজেন্দ্রনাথ যুরোপীয় কন্‌ট্রাক্টরগণের তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা সত্ত্বেও প্রথম শ্রেণীর কন্‌ট্রাক্টর বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিলেন। ফলতার জলকলের বিস্তার-সংক্রান্ত নির্ম্মাণ-কার্য্যের অধিকাংশ কন্‌ট্রাক্টসূত্রে পাইয়া রাজেন্দ্রনাথ বহু অর্থ লাভ করিলেন। তাঁহার নাম চারিদিকে প্রচারিত হইল।

তার পর আগ্রা সহরে কলের জল প্রবর্ত্তিত হইবে জানিতে পারিয়া রাজেন্দ্রনাথ আগ্রায় গমন করেন। সেখানে মিঃ হিউজ চীফ এঞ্জিনিয়ার ছিলেন। রাজেন্দ্রনাথ তাঁহার নক্সার কতিপয় ভ্রম প্রদর্শন করেন। ইহাতে মিঃ হিউজ তাঁহার গুণমুগ্ধ হইয়া পড়েন। যত কোম্পানী টেণ্ডার দিয়াছিল, রাজেন্দ্রনাথের টেণ্ডার সর্ব্বনিম্ন ছিল। মিউনিসিপ্যালিটীর সুপারিশ সত্ত্বেও তিনি ভারতীয় কন্‌ট্রাক্টর বলিয়া সরকারী ব্যবস্থায় তাঁহাকে কন্‌ট্রাক্ট দেওয়া হইল না। অন্য যুরোপীয় ব্যবসায়ী তাঁহার অপেক্ষা বেশী টাকায় টেণ্ডার দিলেও কন্‌ট্রাক্ট পাইলেন। রাজেন্দ্রনাথ এই অবিবেচনা দর্শনে মর্ম্মাহত হইয়া বাঙ্গালায় ফিরিয়া আসিলেন।

এলাহাবাদে জলকলের প্রতিষ্ঠা হইবে জানিয়া রাজেন্দ্রনাথ ব্যর্থকাম হইবেন ভাবিয়া কোনও চেষ্টা করেন নাই। কিন্তু হিউজ সাহেব পুনঃপুনঃ তাঁহাকে টেণ্ডার দিবার জন্য অনুরোধ করেন। কলিকাতার অনেকগুলি যুরোপীয় ব্যবসায়ী রাজেন্দ্রনাথকে কায এবং উচ্চ বেতন ও কমিশন দিবার প্রস্তাব করেন। রাজেন্দ্রনাথ দাসত্বের ঘোর বিরোধী ছিলেন। কাযেই কাহারও প্রস্তাবে তিনি কর্ণপাত করিলেন না! কিন্তু ওয়ালস্ লভেট নামক কোম্পানীর অ্যাকুইন মার্টিন সম্মানজনক সর্ত্তে রাজেন্দ্রনাথকে এক-তৃতীয়াংশ লভ্যাংশ দিবার প্রস্তাব করায় রাজেন্দ্রনাথ স্বীকৃত হয়েন। এলাহাবাদে গিয়া মিঃ মার্টিন ও রাজেন্দ্রনাথ গোপনে টেণ্ডার প্রস্তুত করেন; কিন্তু তাহা কৌশলে বিরুদ্ধপক্ষ চুরি করে। শেষ মুহূর্ত্তে পুনরায় অসাধারণ শ্রম সহকারে টেণ্ডার প্রস্তুত করিয়া ফেলেন। রাজেন্দ্রনাথের অসাধারণ স্মরণশক্তিই তাঁহাকে এ বিষয়ে বিশেষ সাহায্য করিয়াছিল। সৌভাগ্যক্রমে রাজেন্দ্রনাথ ও মিঃ মার্টিন জলকলের কন্‌ট্রাক্ট প্রাপ্ত হন।

১৮৯০ হইতে ১৮৯২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজেন্দ্রনাথ এলাহাবাদে প্রবাস-জীবন যাপন করেন। আগ্রার জলকলের কায বহু পূর্ব্বে আরব্ধ হইলেও তখনও সমাপ্ত হয় নাই। কিন্তু রাজেন্দ্রনাথের অপূর্ব্ব কর্ম্মনৈপুণ্যে এলাহাবাদের জলকলের প্রতিষ্ঠা অগ্রে হইয়া গেল। উদ্বোধন-কার্য্যে তদানীন্তন বড়লাট লর্ড ল্যান্সডাউন স্বয়ং আসিলেন। রাজেন্দ্রনাথকে তিনি অশেষ প্রশংসা-বচনে পুরস্কৃত করেন।

আগ্রার জলকল নির্ম্মাণে অনতিক্রমণীয় বাধা উপস্থিত হইয়াছিল। যুক্তপ্রদেশের সরকার রাজেন্দ্রনাথকে পারিশ্রমিক দিয়া আহ্বান করিলেন—গলদ কোথায়, তাহা আবিষ্কার করিতে। কিন্তু তেজস্বী কর্ম্মবীর বিনা পারিশ্রমিকে সাহায্য করিবেন বলিয়া জানাইলেন। তাঁহার কর্ম্মনৈপুণ্যে আগ্রা জলকল প্রতিষ্ঠিত হইল। সরকার মুক্তকণ্ঠে এই বাঙ্গালী কর্ম্মবীরের পঞ্চমুখে প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

১৮৯২-৯৫ খৃষ্টাব্দে কানপুর জলকলের কন্‌ট্রাক্টও রাজেন্দ্রনাথ প্রাপ্ত হইলেন। তখনও ওয়ালস্ লভেট কোম্পানীর নামে কারবার চলিতেছিল। উক্ত কোম্পানীর প্রধান অংশীদার এক জন বাঙ্গালী কন্‌ট্রাক্টরকে এক-তৃতীয়াংশ লভ্য দিতে আপত্তি করায় অ্যাকুইন মার্টিন সেই কোম্পানীর সহিত সমুদয় সংস্রব ত্যাগ করিলেন। রাজেন্দ্রনাথকে সমান অংশিদাররূপে লইয়া তিনি "মার্টিন কোম্পানী" নাম দিয়া নূতন কোম্পানী গঠন করিলেন। রাজেন্দ্রনাথও টি, সি মুখার্জ্জি কোম্পানীর সহিত তাঁহার সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিয়া লইলেন।

যুরোপীয় কোম্পানীগণের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা সত্ত্বেও নব-প্রতিষ্ঠিত মার্টিন কোম্পানী মীরাট, নাইনিতাল, বেনারস ও লক্ষ্ণৌয়ের জলকলসমূহের এবং লক্ষ্ণৌ সহরের বৃহৎ পয়ঃপ্রণালী-সমূহের নির্ম্মাণের কন্‌ট্রাক্ট পাইলেন। জয়ের রথচক্র তখন ঘর্ঘর নির্ঘোষে চলিয়াছে—বাঙ্গালী কর্ম্মবীরের জয়পতাকা আকাশে তখন পত্ পত্ শব্দ করিয়া উড়িতেছে।

প্রবাসের সর্ব্বত্র জয়লাভ করিয়া অতি বিস্ময়করভাবে মার্টিন কোম্পানী হাওড়ায় পরাজিত হইলেন। কিন্তু ইহার মূলে নিদারুণ বিশ্বাসঘাতকতা ছিল। রাজেন্দ্রনাথ যখন লক্ষ্ণৌয়ে, সেই সময় হাওড়া জলকলের জন্য টেণ্ডার আহূত হয়। বাঙ্গালাদেশে, নিজের জন্মভূমিতে রাজেন্দ্রনাথ এই কন্‌ট্রাক্ট পাইবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইলেন—মার্টিনও অনুরূপ আগ্রহ প্রকাশ করিলেন।

রাজেন্দ্রনাথের প্রধান সহকারী এঞ্জিনিয়ারের (তাঁহার নাম করিবার প্রয়োজন নাই) সহিত পরামর্শ করিয়া রাজেন্দ্রনাথ লক্ষ্ণৌ হইতে টেণ্ডার প্রস্তুত করিলেন। যথাসময়ে টেণ্ডার প্রেরিত হইল। কিন্তু মার্টিন ও রাজেন্দ্রনাথ পরে জানিতে পারিলেন যে, প্রতিযোগী বারণ কোম্পানী ৪ হাজার টাকা কম টেণ্ডার দেওয়ায়, তাঁহাদের টেণ্ডার না-মঞ্জুর হইয়াছে। উক্ত ঘটনার পর উল্লিখিত সহকারী এঞ্জিনিয়ার মার্টিন কোম্পানীর চাকরী ছাড়িয়া বারণ্ কোম্পানীতে যোগদান করেন।

অ্যাকুইন মার্টিন নাইট পদবী লাভ করায় রাজেন্দ্রনাথ নিজের অর্দ্ধাংশ হইতে আধ আনা অংশ প্রিয়বন্ধু সার অ্যাকুইনকে অভিনন্দন হিসাবে চিরকালের জন্য অর্পণ করেন। কৃতজ্ঞ সার অ্যাকুইন্ এই মহানুভবতা বিস্মৃত হন নাই। তিনি মৃত্যুকালে উইল দ্বারা রাজেন্দ্রনাথকে নিজ সম্পত্তির একমাত্র তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করিয়া গিয়াছিলেন।

প্রচুর অর্থোপার্জ্জন করিয়া রাজেন্দ্রনাথ ২০ নম্বর রডন ষ্ট্রীটে বিস্তৃত উদ্যান-সমন্বিত প্রাসাদোপম অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। সেখানে বাঙ্গালার সুসন্তানগণের সহিত মিলিত হইয়া নানাবিধ জ্ঞানের চর্চ্চা তিনি করিতেন।

রাজেন্দ্রনাথের উদ্ভাবনী প্রতিভা অতঃপর বাঙ্গালার নানা স্থানে লাইট রেলওয়ে নির্ম্মাণ করিবার পন্থা উদ্ভাবিত করিল। সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় মার্টিন কোম্পানী, হাওড়া—আমতা—সেয়াখালা, রাণাঘাট কৃষ্ণনগর, বারাসাত বসিরহাট, বক্তিয়ারপুর-বেহার, এবং আরা-সাসারাম লাইট রেলওয়ে নির্ম্মাণ করিলেন। ইহা হইতে প্রচুর অর্থাগম হইতে লাগিল—রাজেন্দ্রনাথের নাম ইতিহাসের পৃষ্ঠে অমর হইয়া রহিল। কিন্তু য়ুরোপীয় বণিকগণের ঈর্ষা দিন দিন বাড়িতেছিল। তাঁহাদের প্ররোচনায় সরকার আর পৃষ্ঠপোষকতা করিতে সম্মত হইলেন না—মার্টিন কোম্পানীর রেলপথ নির্ম্মাণ বন্ধ হইয়া গেল।

নূতন কর্ম্মপন্থা রাজেন্দ্রনাথের উর্ব্বর মস্তিষ্ক হইতে উদ্ভাবিত হইল। সার অ্যাকুইন বন্ধুবরের পরামর্শমত বিলাত হইতে থর্নটন নামক এক অপূর্ব্ব প্রতিভাশালী স্থপতি শিল্পীকে ভারতবর্ষে আনাইলেন। থর্নটনের মৌলিক ও অতুলনীয় পরিকল্পনা অনুসারে মার্টিন কোম্পানী কলিকাতা মহানগরীর প্রাসাদসদৃশ হর্ম্ম্যমালা রচনা করিলেন—অন্যান্য সহরের সুদৃশ্য ও মনোরম সৌধাবলীও রচিত হইল। আগ্রার তাজের মর্ম্মরস্বপ্ন কলিকাতা সহরেও ভিক্টোরিয়া স্মৃতিসৌধে বিকশিত হইয়া উঠিল।

১৯২৭ খৃষ্টাব্দে সার রাজেন্দ্রনাথ বারণ্ কোম্পানীর সুবৃহৎ কারবার ক্রয় করিয়া মার্টিন কোম্পানীর সহিত যোগ করিয়া দিলেন। উক্ত কোম্পানীর কোনও প্রতিনিধি রাজেন্দ্রনাথকে দেশীয় বলিয়া অবজ্ঞা করিয়াছিলেন। তেজস্বী রাজেন্দ্রনাথ তখনই প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, এক দিন বারণ্ কোম্পানীর এই দর্প চূর্ণ করিবেন। কালবশে সার রাজেন্দ্রনাথের সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছিল।

সার রাজেন্দ্রনাথের বিরাট কর্ম্মময় জীবনের ইতিহাস অল্পপরিসর স্থানে বিবৃত করা অসম্ভব। সরকারের মনোনীত সদস্যরূপে বহু উচ্চ অবৈতনিক পদে তিনি কাষ করিয়াছিলেন। জনসাধারণের বহু হিতকর কার্য্যেও তিনি আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। নিম্নে তাহাদের কতিপয় তালিকা প্রদত্ত হইল :—

১। এলাহাবাদে শ্রমশিল্প ও অর্থনৈতিক সমিতির সভাপতি-পদে তিনি ১৯১০ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হন।

২। ১৯১১ খৃষ্টাব্দে তিনি কলিকাতায় সেরিফ হইয়াছিলেন।

৩। ১৯১৬-১৮ খৃষ্টাব্দে ভারত-সম্রাট শ্রমশিল্প কমিটীর সদস্য নিযুক্ত করেন। কয়েক মাসের জন্য সার রাজেন্দ্রনাথ উহার প্রেসিডেণ্টও হইয়াছিলেন।

৪। ১৯২১ খৃষ্টাব্দে রেলওয়ে কমিটীর সদস্যপদে তিনি মনোনীত হন।

৫। ১৯২১ খৃষ্টাব্দে ভাগীরথী সেতু কমিটীর প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন।

৬। ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে বঙ্গীয় ব্যয়-সঙ্কোচ কমিটীর প্রেসিডেণ্ট-রূপে তিনি কার্য্য করেন।

৭। ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে ভারতীয় ব্যয়-সঙ্কোচ কমিটীর সদস্য পদে ভারতসম্রাট তাঁহাকে নিয়োগ করেন।

৮। ১৯২৪-২৫ খৃষ্টাব্দে ভারতীয় কয়লা কমিটীর সদস্য।

৯। ১৯২৫-২৬ খৃষ্টাব্দে ভারতসম্রাট নিযুক্ত ভারতীয় মুদ্রানীতি ও আয়ব্যয়-সংক্রান্ত কমিটীর সদস্য।

সার রাজেন্দ্রনাথ আতুরাশ্রম ও অনুন্নত শ্রেণীর উন্নতি বিধায়ক সমিতির প্রধান পৃষ্ঠপোষকও ছিলেন। নারী-শিক্ষার পৃষ্ঠপোষকরূপে তাঁহার দান সামান্য নহে। শরীরচর্চ্চায় তাঁহার উৎসাহের সীমা ছিল না। ভারতের এঞ্জিনিয়ারিং সভার সভাপতিরূপে রাজেন্দ্রনাথ অনেক কার্য্য করিয়াছেন।

রাজেন্দ্রনাথ দুইবার বিলাতে গিয়াছিলেন। কিন্তু তৎসত্ত্বেও তিনি নিজের ব্যক্তিত্ব কখনও বিসর্জ্জন দেন নাই। তিনি খাঁটি হিন্দু ছিলেন এবং পারিবারিক কার্য্যসমূহ নিষ্ঠাবান হিন্দুর নিয়মানুসারেই পরিচালিত হইত।

ভারতীয় এবং য়ুরোপীয় সমাজে সার রাজেন্দ্রনাথের সমান প্রতিপত্তি ও সম্মান ছিল। গোলটেবল বৈঠকে ভারত সমস্যা-সমাধানের পরিকল্পনা তিনিই প্রথমে করিয়াছিলেন। তাঁহাকে বাঙ্গালার মন্ত্রিত্ব করিবার জন্য অনুরোধ করা হইলেও, তিনি তাহা গ্রহণ করেন নাই। রাষ্ট্রনৈতিক আন্দোলনে যোগদান করিবার বাসনা তাঁহার মোটেই ছিল না।

সার রাজেন্দ্রনাথের মাতৃভক্তি অতুলনীয়। স্বদেশবাসিগণের প্রতি তাঁহার প্রীতি অন্যের অনুকরণযোগ্য।

বাঙ্গালার এই স্বনামধন্য কর্ম্ম-বীরের ৮২ বৎসর বয়সে তিরোধান ঘটিল। পরিণত বয়সে তিনি ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। সে জন্য শোক প্রকাশ করিবার কথা নহে। কিন্তু এমন আদর্শ কর্ম্মবীর—বাঙ্গালী জাতির বরেণ্য প্রতিভাধর ব্যবসায়ীর মৃত্যুতে বাঙ্গালা মায়ের অঙ্কের যে স্থান শূন্য হইয়া গেল, তাহা কখনও পূর্ণ হইবে কি না, তাহা ভগবানই বলিতে পারেন। বাঙ্গালী রাজেন্দ্রনাথকে হারাইয়া বাঙ্গালী জাতির গর্ব্বের মণিহারের অত্যুজ্জ্বল মণির অভাব অনুভব করিবে। ব্যবসায়-জীবনে বাঙ্গালীর নয়ন-সমক্ষে যে প্রদীপ্ত ভাস্কর দীপ্তি পাইতেছিল, তাহার অস্তগমনে ঘনান্ধকার জাগিয়া উঠিয়াছে। আজ বাঙ্গালী সার রাজেন্দ্রনাথের শোক-সন্তপ্ত পরিবারবর্গের সহিত হৃদয়ের সমবেদনা প্রকাশ করিতেছে!

পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

যাঁহার উৎসাহের সিংহনাদে বসুমতী-সাহিত্য-মন্দির প্রকম্পিত হইত—কর্ম্মিবৃন্দ সন্ত্রস্ত—উদ্দীপিত হইত, সেই কর্ম্মবীর পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়—সর্ব্বজনপ্রিয় পটল বাবু গত ১৭ই জ্যৈষ্ঠ রবিবার, মধ্যরাত্রিতে, ৬৪ বৎসর বয়সে, দীর্ঘকাল রোগযন্ত্রণা ভোগের পর শ্রীরামকৃষ্ণধামে মহাপ্রয়াণ করিয়াছেন। দেশের অতীব দুর্দ্দিনে বাঙ্গালা-সাহিত্য ও সংবাদপত্রের প্রতি শিক্ষিতসমাজ—জনসাধারণের উপেক্ষায়—অনাদরে ব্যথিত হইয়া বসুমতীর প্রতিষ্ঠাতা উপেন্দ্রনাথ যখন সৎসাহিত্য—শাস্ত্রগ্রন্থরাজি বিনামূল্যে—নামমাত্রমূল্যে উপহার বিতরণ করিয়া, প্রবলপ্রভাব প্রতাপান্বিত বাঙ্গালা সংবাদপত্র-প্রচারে আত্মনিবেদন করেন, সেই সময়ের হ্যাণ্ডপ্রেসের সাহায্যে সুলভ শাস্ত্রগ্রন্থ মুদ্রণ—প্রকাশ হইতে বৈদ্যুতিক রোটারী যন্ত্রে বসুমতীর প্রবল প্রচার পর্য্যন্ত সাফল্য-গৌরবের কর্ম্মকর্ত্তৃত্বের ভার পূর্ণচন্দ্রের উপর ন্যস্ত ছিল। পটল বাবু নামে বসুমতীর প্রিণ্টার পাবলিসার হইলেও ম্যানেজারের গুরু দায়িত্বভার সাদরে গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি পরম নিষ্ঠার সহিত চিরদিন সে কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়া গিয়াছেন। বসুমতীর স্বত্বাধিকারিদ্বয় চিরদিন তাঁহার সুপরামর্শ—কার্য্যকুশলতার উপর নির্ভরশীল ছিলেন।

পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

বসুমতীর শাস্ত্রপ্রচারে পূর্ণচন্দ্রের উৎসাহের অন্ত ছিল না। বসুমতীর বিভিন্ন সংস্করণের মুদ্রাকর—প্রকাশকরূপে—বসুমতী-প্রচারিত সৎসাহিত্য-গ্রন্থাবলী—শাস্ত্রগ্রন্থের মুদ্রাকররূপে তাঁহার নাম বঙ্গ-সাহিত্যে দেদীপ্যমান—বাঙ্গালার ঘরে ঘরে বিরাজিত। তিনি কর্ম্ম-জীবনের ৪৭ বর্ষব্যাপী সাধনায় ভদ্র পরিবারের অসংখ্য বাঙ্গালী—শিক্ষিত যুবককে কম্পোজের কার্য্যে শিক্ষা প্রদান করিয়া তাঁহাদের জীবনযাত্রার পথ সুগম করিয়া দিয়াছেন। যে সময়ে তিনি বসুমতী প্রেসের কার্য্যে যোগদান করেন, তখন মুদ্রণ যন্ত্রের কার্য্য মুসলমান প্রেস-ম্যানগণের একচেটিয়া ছিল—প্রধানতঃ তাঁহার উৎসাহে—প্রচেষ্টায় এখন এই কার্য্যে বহু বাঙ্গালী যুবক নিয়োজিত হইয়া বিশেষ অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছে। এজন্য কেবল বসুমতী প্রেসে নহে—কলিকাতা—বাঙ্গালার বহু প্রেসেই পূর্ণবাবুর বহু ছাত্র বিদ্যমান; প্রেসের শত কার্য্যের ভিতরও পটল বাবু প্রতিদিন সন্ধ্যায় কিছুক্ষণ কর্ম্মিগণকে ধর্ম্মোপদেশ দিতেন—তাহাদের চরিত্রগঠনের প্রয়াস পাইতেন—তাহাদের অভাব অভিযোগের যথাসাধ্য প্রতিকার করিতেন—শ্রীরামকৃষ্ণমহিমা প্রচার করিতেন। তাঁহার প্রভাবে বসুমতীর কয়েক জন কম্পোজিটার শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের সন্ন্যাসী হইয়াছে।

তিনি ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পরম ভক্ত—শ্রীমাতাঠাকুরাণীর মন্ত্রশিষ্য ছিলেন। বসুমতী কার্য্যালয়ে সমাগত স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী ব্রহ্মানন্দ, স্বামী শিবানন্দ, স্বামী অদ্ভুতানন্দ, স্বামী অখণ্ডানন্দ প্রভৃতি পূজ্যপাদ সন্ন্যাসিমণ্ডলী—কীর্ত্তিমান সাহিত্যিক—সাংবাদিকগণের আশীর্ব্বাদ—স্নেহপ্রীতিলাভের যথেষ্ট সুযোগ তিনি লাভ করিয়াছিলেন। স্বামী অদ্ভুতানন্দ—লাটু মহারাজের বিশেষ কৃপালাভে তাঁহার জীবন ধন্য হইয়াছিল। নাট্যকবি গিরিশচন্দ্রের প্রতিভার তিনি পরম অনুরাগী ছিলেন।

এ দেশের সংবাদপত্রে নির্ভীক অভিমত প্রকাশের পথ বিঘ্ন-বহুল—এজন্য বসুমতী-সম্পাদকের সহিত পূর্ণ বাবুকেও বহুবার আদালতে অভিযুক্ত হইতে হইয়াছিল—কিন্তু তিনি কর্ত্তব্যে বিচলিত হন নাই। তাঁহার কর্ম্মকঠোর জীবনে দয়ামমতার উৎস প্রবাহিত ছিল—দুঃস্থ ব্যক্তিকে বসুমতী তহবিল হইতে সাহায্য করিয়াও তাঁহার তৃপ্তি হইত না—নিজ বেতনের বহু অংশ তিনি নিয়মিত ভাবে দান করিতেন; এবং দানের সঙ্গে সঙ্গে একটি প্রচণ্ড ধমক দিয়া আত্মপ্রসাদের অবসান করিতেও কোন দিন বিস্মৃত হইতেন না। তাঁহার মৃত্যুতে আমরা সোদর-বিয়োগ-বেদনায় মর্ম্মাহত। তাঁহার মত একান্ত হিতৈষী বন্ধু—অকপট সুহৃদ—শিক্ষাদাতা সহকর্ম্মীর অভাব কোন যুগে পূর্ণ হইবার নহে।

হরিপদ মুখোপাধ্যায়

স্বনামপ্রসিদ্ধ উকিল হরিপদ মুখোপাধ্যায় গত ৫ই জ্যৈষ্ঠ পরলোকগমন করিয়াছেন। হরিপদ বাবু ১২৭১ সালে চন্দননগর

হরিপদ মুখোপাধ্যায়

তেলিনীপাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যেই তাঁহার পিতৃবিয়োগ হয়। এণ্ট্রান্স পরীক্ষার বৃত্তিতে ও দুই তিনটি গৃহে শিক্ষকতা-লব্ধ পারিশ্রমিকে সংসার প্রতিপালন করিয়া, তিনি এফ এ, বি এ পাশ করেন। বি এ পাশের পর ভদ্রেশ্বর স্কুলে দ্বিতীয় শিক্ষক নিযুক্ত হইয়া কলিকাতা সিটি কলেজ হইতে আইন পাশ করেন। পরে হুগলী জজ আদালতে ওকালতি করিয়া যথেষ্ট খ্যাতি অর্জ্জন করেন। অবসর গ্রহণ করিয়া তিনি জনসেবাকার্য্যে ব্রতী হন। তিনি ভদ্রেশ্বর মিউনিসিপ্যালিটীর ভাইস চেয়ারম্যান,—স্কুলের প্রেসিডেণ্ট—তেলিনীপাড়া অনাথ ভাণ্ডার প্রতিষ্ঠাতৃগণের অন্যতম ছিলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুত সুশীলকুমার মুখোপাধ্যায় কলিকাতা মেডিকেল কলেজের লব্ধপ্রতিষ্ঠ চক্ষু-চিকিৎসক।

পূরণচাঁদ নাহার

গত ১৭ই জ্যৈষ্ঠ অপরাহ্নে, ৮২ বৎসর বয়সে পূরণচাঁদ নাহার মহাশয় তাঁহার কলিকাতা ইণ্ডিয়ান মিরার ষ্ট্রীটস্থ ভবন হইতে পরলোকে গমন করিয়াছেন। পূরণচাঁদ বাবু মুর্শিদাবাদ—আজিমগঞ্জের সুপ্রসিদ্ধ নাহার-পরিবারে ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি রায় সিতাবচাঁদ নাহার বাহাদুরের পুত্র। তিনি প্রেসিডেন্সি

পূরণচাঁদ নাহার

কলেজ হইতে বি এ পাশের পর ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে জৈন সম্প্রদায়ে প্রথম আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এটর্ণী হইবার জন্য তিনি কিছুদিন ভূপেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের আপিসে শিক্ষানবীশ ছিলেন। তাঁহার জ্ঞানার্জ্জন-স্পৃহা—জৈনদর্শনচর্চ্চা—শিল্পানুরাগ—ধর্ম্মনিষ্ঠা তাঁহাকে ব্যবসায়ে বিরত করে। তিনি অনন্যকর্ম্মা হইয়া জৈনদর্শন অধ্যয়নে মনোনিবেশ করেন এবং জৈনদর্শনে বিশেষজ্ঞ হইয়া বহু গ্রন্থ প্রকাশ করেন। পূরণচাঁদ বাবু প্রাচীন ও মধ্যযুগের

শিল্পকীর্ত্তি সযত্নে বহু অর্থব্যয়ে সংগ্রহ করিতেন—এরূপ পুরাবস্তু-সংগ্রহ দুর্ল্লভ। তিনি বিভিন্ন অনুসন্ধান সমিতি ও সাহিত্য-প্রতিষ্ঠানে সদস্য ছিলেন—অশোয়াল জৈন সম্মেলনের প্রথম সভাপতি হইয়াছিলেন। তাঁহার লিখিত 'জৈন অনুশাসন' গ্রন্থ ইতিহাসের অমূল্য সম্পদ।

চিত্তরঞ্জন গোস্বামী

আনন্দ-মজলিসে সর্ব্বজনচিত্তরঞ্জন—হাস্যরসের সুপ্রসিদ্ধ অভিনেতা চিত্তরঞ্জন গোস্বামী গত ১লা জ্যৈষ্ঠ শুক্রবার অপরাহ্নে ৫৫ বৎসর বয়সে লোকান্তরিত হইয়াছেন জানিয়া আমরা ব্যথিত হইয়াছি। শান্তিপুরের সুপ্রসিদ্ধ গোস্বামি-বংশে তিনি জন্মগ্রহণ করেন, বাল্যেই তাঁহার কৌতুকাভিনয়ের প্রতিভা পরিস্ফুট হইয়াছিল। রসরাজ অমৃতলাল চিত্তরঞ্জনের হাস্যরস-উচ্ছল 'মালাবদল' চিত্রপুস্তকের পরিচয় প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন—"শান্তিপুরের কালগোপাল গোস্বামী মহাশয় কি ছয় মাসের

চিত্তরঞ্জন গোস্বামী

শিশুকে দেখিয়া বুঝিতে পারিয়াছিলেন, তাঁহার পুত্র যৌবনে সমস্ত বঙ্গদেশবাসীর চিত্ত-নিহিত আনন্দ-উৎস মাত্র চক্ষের দৃষ্টিতে খুলিয়া দিতে সমর্থ হইবে যে, তিনি তার নাম রাখিলেন চিত্তরঞ্জন ?"

চিত্তরঞ্জন কিছুদিন পাকুড় রাজষ্টেটে, পরে ই, আই রেলে চাকরী করেন। হাসির গানের অমরকবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের অনুপ্রেরণায় তিনি চাকরী ত্যাগ করিয়া, কৌতুকাভিনয়ের অনাবিল হাস্যরঙ্গ-তরঙ্গে বাঙ্গালার অসংখ্য আনন্দ-মজলিস তরঙ্গায়িত করেন। সুরসিক-চূড়ামণি দীনবন্ধু মিত্র, সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের ভবনে পূর্ণিমামিলনে যে হাস্যস্রোতের সূচনার পর, লাট সম্বর্দ্ধনার আসর হইতে নিভৃত পল্লীতে পর্য্যন্ত লীলায়িত হইয়া সর্ব্ব-সম্প্রদায়কে কৌতুকরঙ্গে বিভ্রান্ত করিয়াছে—চিত্তরঞ্জনের সেই একক অভিনয়ের সহজাত প্রতিভা—বিভিন্ন মুখভঙ্গীতে নানাভাবের বিকাশনৈপুণ্য সত্যই অতুলনীয়—অনন্যসাধারণ ছিল। মাসিক বসুমতীতে প্রকাশিত তাঁহার ৬৪ রকম হাসির চিত্র যেমন নূতন—তেমনি সম্মোহন। বায়স্কোপে প্রদর্শিত তাঁহার কয়েকখানি সবাক্ নির্ব্বাক্ চিত্রাভিনয়—হাস্যপ্রস্রবণ চিত্রপুস্তক রঙ্গামোদী সমাজে বিশেষ প্রশংসালাভ করিয়াছিল। বাঙ্গালার শ্রেষ্ঠ সম্পদ কীর্ত্তন-গান—শ্রীকৃষ্ণলীলামাধুরীর কথকতা তিনি রীতিমত শিক্ষা করিয়াছিলেন। কিন্তু শ্রোতৃগণ তাঁহাকে দেখিয়া হাস্যসম্বরণ করিতে পারিতেন না বলিয়া, তিনি সে ভক্তিরসধারা প্রবাহিত করিতে বিরত হন।

ডাক্তার প্রাণকৃষ্ণ আচার্য্য

সুপ্রসিদ্ধ চিকিৎসক—ব্রাহ্মসমাজের সুপ্রবীণ আচার্য্য ডাক্তার প্রাণকৃষ্ণ আচার্য্য মহাশয় গত ২রা জ্যৈষ্ঠ, ৭৬ বৎসর বয়সে,

ডাক্তার প্রাণকৃষ্ণ আচার্য্য

সন্ন্যাসরোগে পরলোকগমন করিয়াছেন। প্রাণকৃষ্ণ বাবু জন্মস্থান পাবনা হইতে এণ্ট্রেন্স পাশের পর কলিকাতায় আসিয়া সসম্মানে এম এ ও এম বি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। যৌবনে তিনি ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। মধুর ব্যবহার ও সুচিকিৎসা-নৈপুণ্যে তিনি যথেষ্ট খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। প্রাণকৃষ্ণ বাবু বঙ্গ-বিভাগের প্রতিবাদ আন্দোলনে যোগদান করিয়াছিলেন—তাঁহার আন্তরিকতা এই আন্দোলনে শক্তিসঞ্চার করিয়াছিল।

(উপন্যাস)

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ
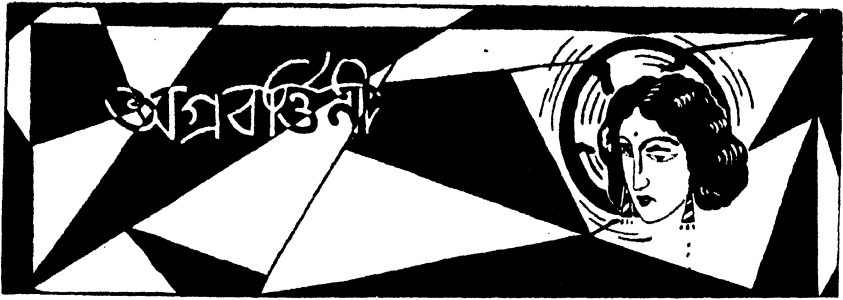
প্রান্তর-প্রান্ত

সুশীল চাটার্জী রেঙ্গুনে; ফুল্লরা নিঃসঙ্গতা বোধ করিতেছিল। স্বামীর সঙ্গে বসিয়া নিত্য হাসি-গল্প, বা সেই প্রাচীন ও সাধারণ সংসারের মতো সোহাগ-আদর, মান-অভিমান,—এ-গুলার সহিত তার কোনো সম্পর্ক ছিল না। পাঁচ জনের মুখে গল্প শুনিয়াছে,—স্বামি-স্ত্রী—দুটিতে যেন কপোত-কপোতী! সিনেমায় যাইতে, নিমন্ত্রণে যাইতে কোন্ শাড়ীখানি পরিয়া যাইবে, কোন্ গহনা গায়ে দিবে, বহু স্ত্রী এ সম্বন্ধে স্বামীর সঙ্গে বসিয়া খানিকটা পরামর্শ করে: পরামর্শে যেমন স্থির হয়…

এ-কথা শুনিয়া সে আশ্চর্য্য হইয়া থাকে! এমন ছেলেমানুষী মানুষ কি বলিয়া করে? তাছাড়া এতখানি বাঁধাবাঁধি! স্বামীর সঙ্গে কোনো দিন এ-সবের আলোচনা সে করে নাই। সে-আলোচনার সময় কোথায়? যতক্ষণ গৃহে থাকেন, স্বামী তাঁর ব্রীফ্ আর নজীরের কেতাব লইয়া আছেন! ফুল্লরা থাকে তার নিজের কাজ লইয়া! তার মধ্যে…

কলেজে পড়া কাব্য-নাটকগুলার কথা মনে জাগে! মিরান্দা, রোশালিন্দ, ডেশডেমোনা, শকুন্তলা…

নিছক কাব্য! জীবনে মিরান্দা কোনো দিন মানুষ দেখে নাই—নিজের বাপকে ছাড়া; তাই ফার্দ্দিনান্দকে দেখিবা-মাত্র অধীর, আকুল! রোশালিন্দ রাজার মেয়ে…মল্ল-যুদ্ধে অর্লান্দোকে দেখিয়া তাকে ভালোবাসিল! এ ভালোবাসা… সংসারে সম্ভব নয়! পুরুষ সাজিয়া বনে বনে ঘুরিয়া বেড়ানো—হা-হুতাশ আর দীর্ঘ-নিশ্বাস! পাগল! ফুল্লরা এর অর্থ বোঝে না! ডেশডেমোনা? শকুন্তলা…?

নায়কদের সঙ্গে সাক্ষাতের পূর্ব্বে কোনো কাজ লইয়া কাহাকেও বিব্রত থাকিতে হয় নাই! হাসিয়া খেলিয়া বেড়াইত. সখ করিয়া তাই এ ভালোবাসার খেয়াল জাগিল তাদের মনে! ব্যাধি! ফুল্লরার জীবন কি তপস্যার মধ্য দিয়া কাটিয়াছে…

হয়তো যে দিন যৌবন আসিয়া প্রথম জীবনের দ্বারে দাঁড়াইয়াছিল, মন যদি সে দিন অবসর পাইত, তাহা হইলে…! কিন্তু কাব্য-নাটকের এ ভালোবাসা…? সংসারে এই যে লক্ষ লক্ষ স্বামি-স্ত্রী দিনাতিপাত করিতেছে, তাদের জীবনে মিরান্দা, রোশালিন্দ, শকুন্তলার প্রেম কখনো উদয় হইয়াছে?

শাড়ী-গহনা পছন্দ করা…না হয় মোটর-গাড়ী কিনিবার সময় দু'জনে মিলিয়া একখানা বাছিয়া লওয়া… স্বামি-স্ত্রীর দল অনন্ত যুগ ধরিয়া এমনি করিয়াই নিজেদের ভালোবাসার পরিচয় দিয়া আসিতেছে!

পাঁচ জনের কথায় তার মনে এমনি কথা জাগে। তাও ক্ষণেকের জন্য…তার পর আবার কাজের মধ্যে পড়িয়া এ-কথা ভুলিয়া যায়।

সেদিন শেষ রাত্রি হইতে বর্ষা নামিয়াছে। সকালে চায়ের টেবিলে বসিয়া একা চা-পান করিতে করিতে বুকখানা কেমন ভারী বোধ হইল। চায়ের টেবিলে সুশীল চাটার্জী বসিতেন। দুজনে একসঙ্গে বসিয়া চা পান করিত। সে সময়ে কথাবার্ত্তা হইত—স্কুল কেমন

চলিতেছে ? প্রশ্ন করিতেন,—সেই সঙ্গে আর পাঁচটা কথা উঠিত···বাহিরের জগতের স্পর্শ খানিকটা আসিয়া তখন প্রাণে লাগিত।

আজ সুশীল চাটার্জ্জী কাছে নাই। ফুল্লরা একা বসিয়া চা-পান করিতেছে। মনে হইতেছিল, স্বামী থাকিলে ভালো হইত, পাঁচটা কথা চলিত। বাহিরে ঐ অন্ধকার! বর্ষার অজস্র বারি-পাতে মনে কেমন নিরানন্দ ভাব! প্রভাতের রৌদ্রে জীবনের অনেকখানি যেন পাওয়া যায়—মন যেন অনেকখানি প্রসারিত হইয়া ওঠে,—ফুল্লরা তাই ভাবিতেছিল।

সংসার কি সত্যই শুধু কর্ত্তব্যের স্থান? মন বলিয়া যে-সামগ্রীর রহস্য-নির্ণয়ে মানুষ যুগ-যুগান্তর ধরিয়া সাধনা করিতেছে, সে মনটা কি? কি লইয়া মানুষ তৃপ্তি পায়?

চা-পানের পর ফুল্লরা খবরের কাগজ খুলিল। হয়তো বাহিরে যাইত! কিন্তু এ বৃষ্টিতে কোথায় যাইবে, এই জল-কাদা···? খবরের কাগজে টেলিগ্রাম-কলমে দেখে, বড় বড় হরফে ছাপা—ব্রহ্মপুত্রে প্রবল বন্যা নামিয়াছে—সে জলে আসাম বুঝি যায়!

বুকখানা ধ্বক্ করিয়া উঠিল। সহস্র আর্ত্ত কণ্ঠের চীৎকার তার কাণে বাজিল! নিশ্বাস ফেলিয়া কাগজ রাখিয়া ফুল্লরা আসিল বাহিরের ঢাকা-বারান্দায়।

পাশে স্বামীর অফিস-কামরা। পা দু'খানা আপনা হইতে ফুল্লরাকে টানিয়া সেই ঘরে লইয়া গেল। চেয়ার খালি। শূন্য ঘর। টেবিলের এক ধারে ডাঁই-করা ব্রীফ···

অন্য দিন এ সময় এ ঘর গম্-গম্ করিত···একটি লোককে ধরিয়া কি বিপুল কর্ম্ম-স্রোত বহিত! কি ভিড়! কি কলরব! শুধু এক জনের জন্য!

কেন?

প্রতিভা···শক্তি! এ শক্তি, এ প্রতিভা সকলের নাই!···তার?

এমন কোনো শক্তি নাই যার কুহকে দলে দলে লোক আসিয়া তার সামনে ভিড় করিয়া দাঁড়াইবে?

পুরুষ আর নারীর সাম্য! তাও কি হয়? কত কত বৎসর, কত কত যুগ ধরিয়া পুরুষ শক্তির চর্চ্চা করিয়া আসিতেছে—নারী শুধু বসিয়া থাকিত গৃহের কোণে—সর্ব্ব কর্ম্মের অন্তরালে সকল শক্তির সান্নিধ্য ছাড়িয়া দূরে··· বহু দূরে!

আজ দু'খানা ইংরেজি বইয়ের কল্যাণে বাঁধা কতক-গুলা গৎ পড়িয়া সে চায় পুরুষের সঙ্গে পাল্লা দিতে। মিথ্যা! মরীচিকা!

বেলা ন'টা। স্কুলের টীচার বনলতা ব্যানার্জ্জী আসিয়া হাজির।

ফুল্লরা বলিল—কি খপর, মিস্ ব্যানার্জ্জী?

সরমের রক্ত-রাগে বনলতার কপোল রাঙা হইয়া উঠিল। মৃদু হাস্যে সলজ্জ ভাষে বনলতা বলিল—আমার বিয়ে।

—বিয়ে!···

এত বড় আশ্চর্য্য সংবাদ ফুল্লরা যেন জীবনে কখনো শোনে নাই! শুনিবে বলিয়া কল্পনাও করে নাই!

বনলতার পানে ক্ষণেক চাহিয়া থাকিয়া ফুল্লরা কহিল—হঠাৎ?

—হঠাৎ নয়, মিসেস্ চাটার্জ্জী। অনেক দিন থেকেই কথা ছিল। শুধু ওঁর চাকরি পাকা না হবার জন্যই···

—ও···তিনি কি করেন?

—প্রফেশরি চাকরি পেয়েচেন। পাকা চাকরি। গভর্ণমেণ্ট সার্ভিস। কাল এ্যাপয়েণ্টমেণ্ট লেটার পেয়েছেন। জয়েন করতে হবে রাজসাহী কলেজে পয়লা তারিখে।

ফুল্লরা কোনো জবাব দিল না, স্থির দৃষ্টিতে বনলতার পানে চাহিয়া রহিল।

বনলতা কহিল—আমি গিয়েছিলুম আজই মিসেস্ দত্তর কাছে। তিনি পাঠালেন আপনার এখানে।···মানে, এ মাসের শেষ তারিখে আমাকে ছেড়ে দিতে হবে। বিয়ের পরে স্বামীর সঙ্গে আমাকেও রাজসাহী যেতে হবে।

—চাকরি ছেড়ে দেবে?

অপ্রতিভ হাসি-মুখে বনলতা বলিল—সংসার আর চাকরি—দুই রাখা আমার পক্ষে সম্ভব হবে না। আমাদের বিয়ের কথা স্থির হয় প্রায় বছরখানেক আগে। তখন আমার মা বেঁচে। আমার যিনি শাশুড়ী, তিনি আর আমার মা—দুজনে ছেলেবেলা থেকে ছিল খুব ভাব। বাবা মারা গেছেন প্রায় এক বছর। সংসারে সঞ্চয় কিছু ছিল

না। আমার আর আমার একটি ভাইয়ের লেখাপড়ার জন্যে সঞ্চয় থাকবার উপায় ছিল না। আমার ভাই পড়ছে শিবপুরে। তার খরচ, সংসারের খরচ…কাজেই বি-এ পড়তে পড়তে এই স্কুলে মাষ্টারী নিতে হয়েছে। মিসেস্ দত্ত সব জানেন। স্বামী এ-কলেজে ও-কলেজে এ্যাক্‌টিং চাকরি করছিলেন। তাতে বিয়ে করে সংসারের দায়িত্ব নেওয়া সম্ভব ছিল না…

বিস্ময়ে বিহ্বল হইয়া ফুল্লরা এ কাহিনী শুনিতেছিল। এক বৎসর ধরিয়া বিবাহের কথা পাকা হইয়া আছে… বনলতা মেয়েটি ভালো—লেখাপড়াতেও বেশ! সংসারের মায়ায় সব ছাড়িয়া নিজের ভবিষ্যৎ ভাঙ্গিয়া দিয়া সেই চিরকালের দাস্য মানিয়া সংসার-কোটরে আশ্রয় লইবে! কি আছে এ সংসারে? কিসের স্বাদ সে পাইয়াছে? স্বামী? তারো আছে। ফুল্লরার বিবাহ হইয়াছে, সংসার আছে…চমৎকার সংসার! কোথাও একটুকু অভাব অনুযোগ নাই!…তবু…

বুকে একটা নিশ্বাস ঠেলিয়া উঠিল। সে নিশ্বাস রোধ করিয়া ফুল্লরা বলিল—সংসারের লোভে লেখাপড়া, নিজের career, ভবিষ্যৎ—সব ছেড়ে দেবে?

সলজ্জ মৃদু ভাষে বনলতা বলিল—সংসারে আমার বড় মায়া! স্বামী, ছেলেমেয়ে…

তার কথা শেষ হইল না।

ছেলেমেয়ে কথাটা ফুল্লরার বিঁধিল ছুঁচের মতো বুকে।

ফুল্লরা কহিল—এই এক বৎসর স্বামীর সঙ্গে দেখাশুনা হয়?

সলজ্জ দৃষ্টি ভূমে নিবদ্ধ করিয়া বনলতা বলিল—হয়।

ঠিক! ভালোবাসা…কাব্যের সেই প্রেম!

ফুল্লরা বলিল—আমাকে সত্যি বলবে, মিস্ ব্যানার্জ্জী, এই ভালোবাসাটা কি—যার জন্য এক বৎসর ধ'রে শত নিরাশা-বেদনার মধ্যেও তোমরা দু জনে দু জনকে আশ্রয় ক'রে আছ?

নিশ্বাস ফেলিয়া বনলতা বলিল—তা জানি না। শুধু জানি, দু জনে দু জনকে দিনের শেষে কিছুক্ষণের জন্য দেখতে না পেলে অস্বস্তির সীমা থাকে না। সকাল হলে কাজের সাড়া জাগে। কাজ করি। মনে হয়, এ কাজটুকু সার্থক হবে সন্ধ্যার সময় দু জনে দু জনের কাছে যখন দিনের কাজের হিসেব দেবো। কত নিরাশা, কত ব্যথা যে গেছে…

ফুল্লরা বলিল,—বুঝেছি।…তা বিয়ে কবে?

বনলতা বলিল—আঠারো তারিখে।

ফুল্লরা বলিল—নিমন্ত্রণ-পত্র পাবো তো?

—নিশ্চয়। তা হলে আমায় দেবেন তো ছুটী? মিসেস্ দত্ত বল্লেন, তুমি চিঠি লিখে মিসেস্ চাটার্জ্জীর হাতে দিয়ো। তিনি আমাদের কমিটীতে সে-চিঠি ফরোয়ার্ড করলে ছুটী পাবে!…মানে, চাকরি নেবার সময় মিসেস দত্তকে আমি এ-কথা জানিয়ে রেখেছিলুম।

ফুল্লরা কোনো জবাব দিল না—চাহিয়া রহিল বনলতার পানে। কত কথা মনে ভাসিয়া আসিতেছিল…মানস-নয়নের সামনে দেখিতেছিল, যেন দীর্ঘ প্রান্তর! সে প্রান্তরের প্রান্তে ছোট একখানি ঘর…পান্থ চলিয়াছে প্রান্তর-প্রান্তের সেই গৃহ লক্ষ্য করিয়া…চারি দিক দিয়া যেন সন্ধ্যার অন্ধকার নামিতেছে! সে অন্ধকারের বুকে গৃহ-বাতায়নে ছোট একটি দীপ-শিখা…যেন নক্ষত্র!

বনলতা বলিল—তা হলে দরখাস্ত লিখে আজই সে দরখাস্ত আপনাকে দেবো।…

ফুল্লরা যেন কোন্ নিঃশব্দ-লোকে বসিয়া আছে! চেতনা নাই!

কৃতাঞ্জলি-পুটে নমস্কার জানাইয়া বনলতা কহিল—এখন তা হলে আসি…

বনলতা উঠিল। ফুল্লরার স্বপ্ন ভাঙ্গিল। একটা নিশ্বাস ফেলিয়া সে বলিল—তোমার খুব আনন্দ হচ্ছে…না?

বনলতা কোনো জবাব দিল না; মৃদু হাস্যে মাথা নত করিল।

ফুল্লরা কহিল,—এসো।

বনলতা চলিয়া গেল।

ফুল্লরা দাঁড়াইয়া রহিল তার পানে চাহিয়া…যেন কাঠের পুতুল!…

বেলাতেও বৃষ্টি ধরিল না।

বারোটা বাজিল। ইভা আসিল; কহিল,—একটা টিকিট নিতে হবে।

ফুল্লরা বলিল,—কিসের টিকিট?

ইভা কহিল,—চ্যারিটি প্লে করচে বসন্তবাণী-বিদ্যালয়ের মেয়েরা···স্কুলটা বে-মেরামতে প'ড়ে যেতে বসেছে। চ্যারিটি প্লে করে যে টাকা পাওয়া যাবে, তাতে বাড়ীর সংস্কার হবে।

ফুল্লরাকে কিনিতে হইল একটি বক্স। পঞ্চাশ টাকা দাম।

ইভা কহিল—মিসেস্ দত্ত নিয়েচেন পাশের বক্স। তিনি বললেন, এটা দিয়ো ফুল্লরাকে।···তোমার একটা বক্সের দরকার নেই, জানি। কিন্তু এ তো প্লে দেখা নয়—দান করা।

ইভা হাসিল, হাসিয়া কহিল,—মিষ্টার চাটার্জ্জী বাইরে গেছেন। তুমি গেলে না যে সঙ্গে! একা এই বর্ষায় বিরহিণী যক্ষ-বধূ সেজে ব'সে আছো!···তোমাদের ভাই, সব আলাদা রকম! মিলনে কোনো দিন উচ্ছ্বাসের ঘনঘটা দেখলুম না—বিরহেও বেশ থাকো রাজ্যের বাইরের কাজ নিয়ে মত্ত!—এখন বসতে পারছি না···ঢের কাজ। এখনো প্রায় দুশো টাকার টিকিট বেচতে হবে। শনিবারে প্লে। আসা চাই, মোদ্দা। বুঝলে!

মাথা নাড়িয়া ফুল্লরা জানাইল, সে যাইবে প্লে দেখিতে।

তার পর ইভা বিদায় লইল। আসিয়াছিল যেমন এক ঝলক চপল বাতাসের মতো, গেল ঠিক তেমনি ভাবে।

গেল। কিন্তু ফুল্লরাকে পল্লবিনী লতার মতো দোল দিয়া গেল।···

ফুল্লরার মন আকুল হইয়া উঠিল। তাদের সবই আলাদা রকমের···মিলনে যেমন নাই উচ্ছ্বাসের ঘনঘটা—বিরহেও তেমনি নাই নিশ্বাসের সমারোহ!···নিশ্বাস আছে বলিয়া মনে হয় না!

সত্যই তাই?···হয়তো-বা!

চিরদিনের সংসার···সে-সংসার স্বামি-স্ত্রীর হাসি-গানে গল্পে গাঁথা আছে চিরদিন। শুষ্ক কর্ত্তব্যের বোঝা যদি মানুষকে বহিতে হইত, তাহা হইলে···

কাব্যে-উপন্যাসে হৃদয়-বৃত্তি লইয়া এই যে রঙ ফলানো চলিয়াছে, সে আগাগোড়া কাল্পনিক? হাতে হাত রাখিয়া, নয়নে নয়ন মিলাইয়া প্রণয়ের সেই আধ-আধ বাণী! দুটি তৃষিত অধর পরস্পরকে পাইয়া পিপাসার কি তৃপ্তি সাধন করে! আগাগোড়া বসন্তের হিল্লোল···

তার জীবনে সে বসন্ত তো আসিল না!···

নিজের মনের মধ্যে সন্ধান লইল, সুগভীর সন্ধান! অধরে পিপাসা কোনো দিন জাগিয়াছে বলিয়া মনে পড়ে না! স্বামি-স্ত্রী বাস করিতেছে, যেন···

আজ ফুল্লরার সারা প্রাণ আর-একটি প্রাণের মিলন চাহিয়া অধীর উচ্ছ্বাসে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। সংসারে সব আছে—নিজের তেজ, অহঙ্কার, অভিমান···সব, সব! কাজের উৎসাহ, খ্যাতির মোহ—তাও আছে! নাই শুধু প্রাণ চাহিয়া প্রাণের আস্বাদনের বাসনা!

যে-সব নারী সংসারে বসিয়া বাহিরের দিকে তাকাইতে ভুলিয়া যায়, তারা তাহা লইয়াই থাকে! তারা কখনো নিজেদের প্রাণে এমন নিঃসঙ্গতা বোধ করিয়াছে? কে জানে!

ফুল্লরার মনে হইল, এত ভিড়ের মধ্যেও সে যেন পড়িয়া আছে দীর্ঘ প্রান্তরের প্রান্তে একা···নিঃসঙ্গ! পাশে তার কেহ নাই!

বারান্দায় ছিল প্রকাণ্ড দাঁড়া-খাঁচার মধ্যে এক ঝাঁক পাখী—মুনিয়া, জাভা-স্প্যারো···আরো কত জাতের ছোট পাখী! তাদের কলরবে বাতাস ভরিয়া গিয়াছে!

ফুল্লরা একটা নিশ্বাস ফেলিয়া ঘরে আসিয়া বসিল।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

সমবেতা যুযুৎসবঃ

পাঁচ-সাত দিন পরের কথা।

ব্রহ্মপুত্রের বন্যায় আসামের অনেকখানি ডুবিয়া ভাসিয়া গিয়াছে। খপরের কাগজওয়ালারা হুজুগে মাতিয়া উঠিয়াছে। রাজ্যের পুরানো ছবি বাহির করিয়া তার ব্লক কাগজে ছাপিয়া সেই ছবির সঙ্গে প্রত্যক্ষদর্শীর পত্র টাইটেল আঁটিয়া রোমাঞ্চকর এমন বিবরণ ক'দিন ধরিয়া ছাপিতে সুরু করিয়াছে যে পড়িয়া পাঠক-পাঠিকাদের উত্তেজনার আর সীমা নাই! বেকার ছোকরার দল পাড়ায় পাড়ায় আখড়া খুলিয়া কোরাশ্-গানের রিহার্শাল চালাইয়া গলায় বক্স-হারমোনিয়াম ঝুলাইয়া পথে পথে সে গান গাহিয়া ছেঁড়া কাপড়, জামা, চাদর, চাল-ডাল, পয়সা সংগ্রহ করিতেছে বিষম রোখে! যে-সব বুড়া কাজের অভাবে পরচর্চ্চা

করিয়া ফিরিত, তারা ছোকরাদের নিঃস্বার্থ অধ্যবসায় দেখিয়া গুম্ হইয়া বসিয়া আছে···অর্থাৎ সহর কলিকাতার সঙ্গে আসামের নাড়ীর যোগ বাধাইয়া ব্রহ্মপুত্র আজ বন্যাস্রোতে যেন ব্যবধান ঘুচাইয়া দিয়াছে! সে যেন আজ বহিয়া চলিয়াছে এই কলিকাতা-সহরের বুক ছুঁইয়া!

ইভা আসিয়া ফুল্লরার সঙ্গে আবার দেখা করিল, বলিল—লেডিস্ এ্যাসোশিয়েন বন্যার রিলিফ কাজে নেমেছে! তারা চায় এক জন নামজাদা মহিলাকে সভানেত্রী করতে। তোমাকে সে ভার নিতে হবে, ভাই।

ফুল্লরার মনের নিঃসঙ্গতা তখনো ঘুচে নাই। সে বলিল—কিন্তু···

ইভা বলিল—এতে কিন্তু বলা চলে না। এতগুলো লোক ধনে-প্রাণে নষ্ট হতে বসেছে···

ফুল্লরাকে রাজী হইতে হইল।

কাগজে-কাগজে এ সংবাদ ছাপা হইয়া গেল। তলায় সম্পাদকের টিপ্পনী,—এই তো চাই! অন্নপূর্ণার জাত মায়েরা যদি অন্নপাত্র হাতে লন তো অন্নের দুঃখ না ঘুচিয়া থাকে কখনো? টিপ্পনী পড়িয়া ফুল্লরার মনে হইল, নিরন্ন আসাম তার হাতের অন্ন-থালিটির পানে চাহিয়া আছে তৃষিত নয়নে!

ইভা আসিয়া বলিল—রিলিফের কাজে এক দল ইয়ং ভলান্টিয়ার পাঠানো চাই গৌহাটীতে। দেখে-শুনে কাজের তদ্বির করা চাই। আমি যাবো।

ফুল্লরার কি খেয়াল হইল! সে কহিল—আমিও যাবো।

—তুমি! কিন্তু মিষ্টার চাটার্জী এখানে নেই!

ফুল্লরা কহিল—তাতে কি! আমাদের মধ্যে সর্ত্ত আছে,—to call of Duty that both of us would think proper···(যোগ্য কর্ত্তব্যের আহ্বানে আমরা কাহারো পথে বাধা হইব না)···

নিমেষে এ ব্যবস্থা পাকা হইয়া গেল। রেঙ্গুনে টেলিগ্রাম পাঠাইয়া ফুল্লরা যাত্রার উদ্যোগ করিতে লাগিল।

মিসেস্ দত্ত আসিয়া ডাকিলেন—ফুল্লরা···

ফুল্লরা কহিল—এ পুণ্য কাজ।

মিসেস্ দত্ত কহিলেন—সেখানে ভয়ঙ্কর কষ্ট পাবে। মাথা গোঁজবার জন্য হয়তো ঘর পাবে না।

ফুল্লরা কহিল—তা হোক···

মিসেস দত্ত কহিলেন,—কিন্তু···

ফুল্লরা কহিল—মন বড় ফাঁকা···নিরাশ্রয় মনে হচ্ছে। কাজ করতে চাই আমি···

ফুল্লরা কাহারো নিষেধ শুনিল না। আরো ক'জন তরুণী ভলান্টিয়ার লইয়া দু'জন তরুণ সহকর্ম্মী গৌহাটী যাত্রা করিল ট্রেণে। ইভাকে লইয়া ফুল্লরা চলিল এরোপ্লেনে চড়িয়া। শীঘ্র গিয়া পৌঁছিবে! তা ছাড়া আকাশ-পথ হইতে এ বিপ্লবের চূড়ান্ত পরিচয় পাওয়া যাইবে।

পদ্মার পারে ঢাকায় গিয়া প্লেন পৌঁছিল দেড় ঘণ্টায়। রমনার ও-পাশে এরোড্রোমে প্লেন নামিল। ক্ষণেক বিশ্রাম। পরে জলযোগ সারিয়া প্লেন আবার চলিল···

কুয়াশার অস্পষ্ট আব-ছায়ায় দেখিল, নীচে পৃথিবীর যতখানি দেখা যায়, কে যেন তার দেহে ধূসর রঙের চাদর বিছাইয়া রাখিয়াছে! সে-চাদরের গা ফুঁড়িয়া কোথাও দু'চারিটি গৃহ-শিরের একটুখানি জাগিয়া আছে! কোথাও গাছপালার সবুজ রেখা—তুলির অতি-ক্ষীণ আঁচড়ের মতো!

চারিদিকে জল আর জল···

সন্ধ্যার পূর্ব্বে খানিকটা উঁচু জমির উপরে গিয়া প্লেন নামিল। লোকে লোকারণ্য···আর্ত্ত হতভাগাদের কাতর কলরব ছুটিয়াছে! সে কলরবের বুক চিরিয়া মাঝে মাঝে সান্ত্বনা, আশা জাগিতেছে···নিকষ-কালো মেঘের বুকে বিজলীর চকিত-চমকের মতো!

কানাতের ক'টা ক্যাম্প। একটা ক্যাম্প ছাড়িয়া দেওয়া হইল ফুল্লরা ও ইভাকে। বহু লোক আসিয়া তাদের ঘিরিয়া ভিড় করিয়া দাঁড়াইল,—সকল কাজে ফরমাস খাটিবার জন্য বিপুল আগ্রহ লইয়া···

আর্ত্ত-ভূমি চকিতে যেন মায়ার স্পর্শে উৎসব-মণ্ডপে পরিণত হইল। সেবার কাজে কর্ম্মীদের উৎসাহ বাড়িল চতুর্গুণ। পরস্পরে যেন প্রতিদ্বন্দ্বিতা জাগিল···সেবায় পরিচর্য্যায় এই উৎসব-লক্ষ্মীর প্রসন্ন-দৃষ্টি কে কতখানি লাভ করিতে পারে···

খবরের কাগজে প্রত্যক্ষদর্শীর পত্র ছাপিয়া বাহির হইল। লেখা আছে,—কল্যাণী নারীর সংযোগ নহিলে কোনো অনুষ্ঠান সাফল্য-মণ্ডিত হয় না! আর্ত্ত-ত্রাণের এ ব্রতে দেবী সুভদ্রার মতো শ্রীমতী ফুল্লরা চট্টোপাধ্যায়ের অলস্ত অনুরাগ, জীবন্ত উদ্দীপনা ইত্যাদি ইত্যাদি। একখানা

কাগজে ছাপা হইয়াছে—Ministering angel-এর মতো শ্রীমতী ফুল্লরা দিকে দিকে উৎসাহ-শিখা জ্বালিয়া দিয়াছেন! তাঁর রূপের বিভায়, মনের জ্যোতিতে বিপদের ঘনান্ধকার ঘুচিতে আর বিলম্ব নাই! জয় শ্রীশ্রীমতী ফুল্লরা দেবী! কুরুক্ষেত্র-সমরাঙ্গনে তোমায় দেখিয়াছি সুভদ্রারূপে। য়ুরোপের সমরাঙ্গনে তুমি দেখা দিয়াছিলে কুমারী ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেলের মহিমময়ী মূর্ত্তিতে! আর আসামের এ বিপ্লব-শ্মশানে আজ রূপোজ্জ্বলা, চূর্ণ-কুন্তলা, মণি-কুণ্ডলা অভয়-বরাভয়া রূপে ইত্যাদি ইত্যাদি!

খবরের কাগজে ছাপার অক্ষরে এ লেখা পড়িয়া ফুল্লরা মুগ্ধ! মনে হইল, সত্যই যেন কুরুক্ষেত্র-রণাঙ্গনে সে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে সুভদ্রার বেশে···

চারিদিকে ভক্ত পূজারীদের অজস্র স্তুতি! সে স্তুতিবাণীর কি প্রচণ্ড মোহ!

ফুল্লরার নিঃসঙ্গ জীবন পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল···

এখানে দিন পনেরো কাটিবার পর কলিকাতা হইতে টেলিগ্রাম আসিল। সুশীল চাটার্জ্জী টেলিগ্রাম করিয়াছেন,—

গৃহে ফিরিয়াছি। তুমি আর কত দিন ওখানে থাকিবে? কাজের ব্যবস্থা করাইয়া ফিরিয়া এসো। ফিরতি-টেলিগ্রামে তারিখ জানাইয়ো। প্লেন পাঠাইবার ব্যবস্থা করিব। আমার সময় থাকিলে নিজে গিয়া তোমাকে লইয়া আসিতাম।

টেলিগ্রাম দেখিয়া ইভা কহিল,—বিরহী যক্ষ ডাক দিয়েছে! এবার ফেরো, সখি!

ফুল্লরা কহিল—না। কাজ ফেলে কি ক'রে এখন যাবো?

ইভা কহিল—মিষ্টার চাটার্জ্জীর অসুবিধা হচ্ছে।

ফুল্লরা কহিল—কোনো অসুবিধা হবে না যক্ষের মতো। সেখানে সংসার যেমন চলে, আমরা দুজনেও তেমনি চলি··· যন্ত্রের মতো···বাঁধা রুটীন ধ'রে···তার এতটুকু নড়চড় হবার জো নেই!

হাসিয়া ইভা কহিল,—তার মানে?

ফুল্লরা কহিল,—জীবন-ধারণ করছি সকলেই। সংসার, এবং সে-সংসারে স্বামী, আমি···

দ্বারে আসিয়া কে ডাকিল,—মা···

ফুল্লরা বলিল,—নকুল···এসো।

নকুল ভলান্টিয়ার। বখামি করিয়া জীবনটাকে রসাতলের পথে লইয়া যাইতেছিল, কর্ত্তব্যের আহ্বানে আজ এ পথে পা দিয়াছে!

নকুল আসিল, বলিল,—একটি মেয়ে এসেছে। আপনার সঙ্গে দেখা করতে চায়।

—নিয়ে এসো।

মেয়ে আসিল। এক জন আসামী তরুণী। সে বলিল, তার সব গিয়াছে: কাঁদিয়া-কাটিয়া সে-শোক ভুলিয়াছে। কিন্তু সে চায় বাঁচিতে—বাঁচিয়া নূতন করিয়া সংসার পাতিতে। এখানে দেখা পাইয়াছে এক জন পূর্ব্ব-প্রতিবেশীর। তারো সব গিয়াছে। সেও চায় নূতন করিয়া সংসার পাতিতে। সে রাজী আছে তাকে লইয়া···তবে কিছু টাকা চাই। মণিপুরের ও-দিকে গিয়া ছোট-খাট দোকান খুলিয়া দুজনে বাস করিবে।

ফুল্লরা বলিল,—কত টাকা চাই?

মেয়েটি বলিল,—শ'খানেক।

ফুল্লরা বলিল,—পাবে। আমার নিজের টাকা থেকে দেবো।

মেয়েটি বলিল—এখন যদি পাই, তাহলে এইখানেই সে আমাকে বিয়ে করে···

ফুল্লরা বলিল—তাই হবে। নকুলবাবুর হাতে টাকা আমি পাঠাবো। ও-বেলায় পাবে।

মেয়েটি চলিয়া গেল—খুশী-মনে। ইভা কহিল— কত ভাঙ্গা সংসারকে এ-ভাবে তুমি গড়ে তুলবে! এ লোভ দেখিয়ো না! জানো না তো, এর মধ্যে অনেকেই···

নকুল বলিল—বিয়ে-টিয়ে হয়তো বাজে কথা!···কোনো-মতে কিছু আদায় করে···আপনি বুঝবেন না এ-সব লোকের রুচি-প্রবৃত্তির ব্যাপার!

ফুল্লরা বলিল—খুব বড় calamity-র পর মানুষের প্রবৃত্তি একটু অসংযত হয়···এটা ঐতিহাসিক সত্য। পৃথিবীর সর্ব্বত্র তাই ঘটেছে। অত বড় জার্ম্মান্-ওয়ার··· তার পরে সভ্য জগতেও···নকুল এখন যাও। এক সময়ে এসে ওদের টাকাটা নিয়ে যেয়ো···

নকুল চলিয়া গেল। পরক্ষণে আর একটা আর্জ্জী আসিল। এক জন প্রৌঢ় পুরুষ আসিয়া নালিশ জানাইল, তার দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী—বয়স অল্প—জলের মুখে সব ফেলিয়া দিয়া এ বয়সে সেই স্ত্রীকে পিঠে বহিয়া নিরাপদ

আশ্রয়ে গিয়া কোনোমতে দুজনে প্রাণ বাঁচাইয়াছে। সে-স্ত্রী এখানে একজন ভলান্টিয়ার বাবুর সঙ্গে ভাব করিয়া তাকে ত্যাগ করিয়া সরিয়া যাইতে চায়!

ফুল্লরা বলিল—প্রসাদবাবুকে পাঠিয়ে দাও···তাঁর কাছে তোমাদের নাম-ধাম লিখে দিয়ো···ব্যবস্থা করবো'খন।

প্রসাদবাবু এখানকার দশটা ক্যাম্পের অধিনায়ক। লোকটা চলিয়া গেলে ইভা কহিল—Scandalous (কদর্য্য)!

ফুল্লরা বলিল—ভালোর গায়ে মন্দ লেগে থাকে সর্ব্বত্র। যেমন আলোর সঙ্গে ছায়া! কিন্তু এ ব্যাপারের মীমাংসা করুন প্রসাদবাবু। আমাদের দ্বারা এর মীমাংসা সম্ভব নয়।

ইভা কহিল,—ও কথা যাক,—টেলিগ্রামের তুমি কি জবাব দিচ্ছ?

ফুল্লরা কহিল,—কি ক'রে এখন যাবো?

ইভা কহিল—উচিত, যাওয়া। তুমি একজনের বিবাহিতা পত্নী···

ফুল্লরা কহিল,—ক্রীতদাসী নই। এ কাজে যদি তিনি আসতেন···কর্ত্তব্য বুঝে? আমি তাঁকে ফিরতে বলতে পারতুম? না, বললে তিনি এ-কাজ ফেলে ফিরে যেতেন?

ইভা কহিল—তোমার এ তত্ত্ব আমার মাথায় আসে না! স্বামি-স্ত্রীর মধ্যে প্রভু-ভৃত্যের সম্পর্ক নয়,—পরস্পরের কথা শোনার মধ্যে আজ্ঞা-পালনের কথাও আসতে পারে না।

ফুল্লরা কহিল—তা নয় ইভা। সারা জীবন ধরে আমি কেবল ভাবছি, সংসারে এক সঙ্গে বাস করাই কি স্বামি-স্ত্রীর একমাত্র কাজ? পৃথিবী তো তা হলে কতকগুলো ভিন্ন ভিন্ন সংসারের সমষ্টিমাত্র হবে—সবগুলোর মধ্যে যোগ থাকবে কি দিয়ে? চারি দিকে এই যে দাতব্য হাসপাতাল, স্কুল, কারখানা গ'ড়ে উঠেছে, এগুলো কি গ'ড়ে উঠতো কখনো?

অর্থ না বুঝিয়া ইভা কৌতূহলী দৃষ্টিতে ফুল্লরার পানে চাহিয়া রহিল।

ফুল্লরা বলিল—স্বামি-স্ত্রী নিজের-নিজের সংসার নিয়েই যদি মত্ত থাকে, তা হলে···এখানকার এই বন্যার কথাই ধরো—এই সব বিপন্ন নর-নারী। এ বিপদে কার হাত ধরে আবার মাথা তুলে দাঁড়াতো? কি করে কোথায় বা আশ্রয় পেতো? আমি যদি আজ স্বামীর পাশটিতে চুপ করে বসে থাকতুম···? তুমি···আর সকলে···? সকলের সংসার আছে—আলাদা সংসার—সেই সংসার নিয়েই তো আর সব ত্যাগ করে কেউ বসে নেই···তা থাকে না! থাকে না বলেই পৃথিবী চলেছে অনন্ত কালের সঙ্গে যোগ রেখে এমন শৃঙ্খলিত ধারায়! সেখানে ফিরে আমি যাবো···ফিরে আমি করবো স্কুলের কাজ···স্বামী তাঁর মক্কেলদের মকর্দ্দমা করবেন। এখানে আমি চুপ ক'রে ব'সে নেই—যে-কাজ পেয়েছি, সাধ্যমত সে কাজ করছি। কাজেই ফেরবার প্রয়োজন বুঝছি না। আমার অভাবে সংসার সেখানে অচল হয়ে দাঁড়িয়ে পড়েনি! সে চলছে। মিষ্টার চাটার্জ্জীরও ব্রীফের অভাব ঘটেনি। তবে···?

আরো দু'চারিটা কথা বলিল···কিন্তু সে কথার অর্থ না বুঝিয়া ইভা হাল ছাড়িয়া দিল।···

ফুল্লরা টেলিগ্রামের জবাব পাঠাইল—এখানে অনেক কাজ! এখন ফিরিয়া যাওয়া সম্ভব নয়। ক্ষমা করিবে।···

তিন দিন পরে কিসের ছুটী ছিল। বৈকালের দিকে ঘর্ঘর রবে একখানা এরোপ্লেন আসিয়া নামিল। সে-এরোপ্লেনে আসিলেন সুশীল চাটার্জ্জী।

নগদ পাঁচশো টাকা ফুল্লরার হাতে দিয়া সুশীল চাটার্জ্জী কহিলেন—টাকাটা দিয়ে আপাততঃ এসো আমার সঙ্গে। দু'তিন দিনের মধ্যে রোজা আসছে। রামগোপাল বাবুর টেলিগ্রাম পেয়েছি কাল। মাদ্রাজ থেকে টেলিগ্রাম করেছেন তিনি আসচেন ব'লে।···

ফুল্লরা ফিরিল; যে-মন লইয়া ব্রহ্মপুত্রের বন্যা-রিলিফে গিয়াছিল, সে মনে অনেকখানি পরিবর্ত্তন লইয়া ফিরিল।

ভক্ত পূজারীদের সেই বন্দনা-গান···কানে যেন লাগিয়া আছে! সারাক্ষণ গুঞ্জন তুলিতেছে—কল্যাণী সুভদ্রা! নাইটিঙ্গেল! Ministering angel—রূপোজ্জলা মণি-কুণ্ডলা দেবী!···জীবনের দিনগুলা কি সার্থকতাতেই না ভরিয়া উঠিয়াছিল! নিমেষের জন্য শূন্যতা উপলব্ধি করে নাই।···

রোজা ফিরিল। আবার সেই স্কুল! ঘরে বসিয়া রামগোপাল বাবুর কাছে নিত্য সেই লেশ্‌নের ঘন-ঘটা!

অবাধ মুক্ত জীবনকে আবার সেই বদ্ধ-পিঞ্জরে ঠাশিয়া ধরা!…

সুশীল চাটার্জ্জী বলিলেন,—আবার আমায় যেতে হবে রেঙ্গুন। তুমি যাবে?

ফুল্লরা স্বামীর পানে চাহিল। কোনো জবাব দিবার পূর্ব্বে সুশীল চাটার্জ্জী বলিলেন—গেলে হতো…কিন্তু রোজা একা কার কাছে এখানে থাকবে?…দেখা যাক, আর একবার হয়তো যেতে হবে। তখন বরং দুজনেই তোমরা…

সুশীল চাটার্জ্জী রেঙ্গুনে গেলেন; সেখান হইতে সিঙ্গাপুরে যাইতে পারেন। সিঙ্গাপুরে এক জন মক্কেল কাণের কাছে টাকা বাজাইতেছিল…

ইভা ফিরিয়া আসিয়াছে। চ্যারিটি-প্লের আয়োজনে সে দারুণ ব্যস্ত। এবারকার এ চ্যারিটি ব্রহ্মপুত্র-রোষ-গ্রস্ত বিপন্নদের সাহায্য-কল্পে।

ফুল্লরাকে সে ধরিল—এ আয়োজনে নেতৃত্ব করিতে। নকুলও আসিয়াছিল, বলিল—হ্যাঁ মা। মেয়ে জোগাড় হয়েছে। আমার এক বন্ধু বই লিখেছে, মদন-ভস্ম।

সমারোহে রিহার্শাল চলিল। রিহার্শাল লইয়া ফুল্লরা মত্ত। এম্পায়ারের ষ্টেজ ভাড়া লওয়া হইয়াছে। টিকিটের চাহিদা অসম্ভব রকমের।

প্লের দু দিন বাকী। ষ্টেজের উপরে রাত্রি বারোটা হইতে তিনটা পর্য্যন্ত রিহার্শাল চালাইয়া ফুল্লরা শ্রান্ত দেহে গৃহে ফিরিলে বয় তার হাতে একখানি চিঠি দিল। সাদা খামে আঁটা। খামে কিছু লেখা নাই।

খাম ছিঁড়িয়া চিঠি বাহির করিয়া ফুল্লরা দেখে,—রোজা লিখিয়াছে। ইংরেজিতে কয় ছত্র…

> মোটরে চড়িয়া রাঁচি চলিয়াছি—দু জন বন্ধুর সঙ্গে। মিস্ পাইক আর মিষ্টার পাওয়েল। চার দিন পরে ফিরিব। সন্ধ্যার সময় কথা হইয়াছে। পাওয়েল নূতন টু-সীটার কার কিনিয়াছে—হিলম্যান্ নূতন মডেল। চিন্তা করিয়ো না।

ফুল্লরার পায়ের তলায় মাটী দুলিয়া উঠিল। মনে পড়িল বহুদিন-পূর্ব্বেকার কথা…পথে সেই এ্যাড্ভেঞ্চার!

শ্রান্ত অবসন্ন দেহ…মাথা কেমন ঘুরিয়া গেল। ফুল্লরা সোফায় বসিয়া পড়িল।

[ক্রমশঃ

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

দেখ্‌বে কেমন—

ব্যথার বিষে জর্জ্জরিত
হো'ক্ না তোমার হৃদয়খান;
কিসের তা'তে দুঃখ এত,
বন্ধু, কেন মুহ্যমান?
ধরার কোলে ওই যে দূরে,
তটিনী বয় মধুর সুরে
কণ্ঠ ওতে মিশাও—যদি
থেমেই থাকে বুকের গান।

শান্তি যদি নিভেই থাকে
সাংনেতে শ্যাম বনানী,—
হৃদয়খানা ভরাও নিয়ে
সুধা তাহার সব ছানি'।
সুখের স্বপন আঁখির পাতে,
দেখ্‌বে আবার আঁধার রাতে,
—দেখবে কিবা মরুর মাঝে
বিরাজ করে মরূদ্যান॥

—রাজা শ্রীপূর্ণেন্দু রায়।

সীরিয়াতে অশান্তি

ভূমধ্য সাগরের পূর্ব্বতীরে সীরিয়া দেশ অবস্থিত। এই রাজ্যটি ভূমধ্য সাগরের বেলাভূমি হইতে পূর্ব্বদিকে য়ুফ্রেটিস্ নদী পর্য্যন্ত বিস্তৃত। এখন এই রাজ্যটির বিস্তার আনুমানিক ৬০ হাজার বর্গ-মাইল, লোকসংখ্যা ৩০ লক্ষের অধিক নহে। রাজ্যটি ছিল তুরস্কের। বিগত য়ুরোপীয় মহাযুদ্ধের অবসানকাল হইতে ফরাসী জাতি এই দেশটি আদেশাত্মকভাবে শাসন করিবার অধিকার পাইয়াছেন। এখন ফরাসী জাতিই ঐ অঞ্চলের যথেচ্ছ ক্ষমতাশালী শাসনকর্ত্তা। কিন্তু সুসভ্য ফরাসীজাতি এই রাজ্যের শাসনদণ্ড পরিচালিত করিলেও এই রাজ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইতেছে না। ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে যে বিখ্যাত ড্রুস-বিদ্রোহ উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা দমন করিবার জন্য ফরাসীরা ৪৮ ঘণ্টা ধরিয়া ডামাস্কাসনগরের উপর গোলা বর্ষণ করিয়াছিলেন, ইহা ইতিহাসপ্রসিদ্ধ ঘটনা। সেই সময় হইতে সীরিয়াবাসীদিগের মনে একটা অশান্তির অনল ধিকি ধিকি জ্বলিতেছে। সংপ্রতি আবার ঐ অশান্তির অনলশিখা দাউ দাউ জ্বলিয়া উঠিয়াছিল। ফরাসীদিগের আর্থিক নীতিজনিত অসন্তোষের ফলে তথাকার জাতীয় দল মধ্যে মধ্যে বিদ্রোহ উপস্থিত করিতেছিল। ইহার পর মিশরে বৃটিশ-বিরোধী জাতীয় দলের সাফল্যে উৎসাহিত হইয়া সীরিয়ার জাতীয় দল স্বাধীনতা লাভের জন্য আন্দোলন উপস্থিত করে। এই জাতীয় আন্দোলনের দমনকল্পে সীরিয়ার ফরাসী রাজপুরুষগণ তথাকার নবগঠিত জাতীয় দলকে ভাঙ্গিয়া দেন এবং তাহাদের ২৯ জন নেতাকে গ্রেপ্তার করেন। ইহাদের বিরুদ্ধে ফরাসীরা একমাত্র এই অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছিল যে, ইহারা আইনের নির্দ্দেশ অনুসারে ইহাদের দলকে রেজিষ্টারী করেন নাই। দ্বিতীয় অভিযোগ এই যে, এই দল যদি বজায় থাকে, তাহা হইলে সাধারণের নির্ব্বিঘ্নতায় বিঘ্ন ঘটিবে। বলা বাহুল্য যে, সাম্রাজ্যবাদীদিগের যে মামুলী অভিযোগ আছে, দ্বিতীয় অভিযোগ তাহাই। ফরাসী রাজপুরুষদিগের এই দৃঢ়তা প্রদর্শনের বিপরীত ফল ফলিল। ফরাসী কর্তৃপক্ষ ঐ অঞ্চলের সংবাদপত্রগুলি সমস্ত বন্ধ করিয়া দিলেন, (Damascus) ডামাস্কাসের বিশ্ববিদ্যালয়ের এবং স্কুলগুলির দ্বার রুদ্ধ করিলেন, জাতীয় দলের নেতাদিগকে নির্ব্বাসিত করিয়া দিলেন এবং সেনিগাল অঞ্চল হইতে আনীত সৈন্যদিগের দ্বারা রাজপথে পাহারা বসাইলেন। কিন্তু এত করিয়াও তাঁহারা জাতীয় দলের বাহ্য আন্দোলন বন্ধ করিতে পারিলেন না। লোক দোকানপাট বন্ধ করিয়া হরতাল করিল। ফরাসী রাজপুরুষরা হুকুম দিলেন যে, ২৪ ঘণ্টার মধ্যে দোকানপাট খুলিতে হইবে—না খুলিলে জরিমানা দিতে হইবে এবং আর দোকান বা কারবারের আফিস খুলিতে দেওয়া হইবে না। সে কথায় কেহই কর্ণপাত করিল না। তিন মাসকাল সেই হরতাল চলিয়াছিল।

বাহ্য দৃষ্টিতে এই হাঙ্গামা ও ফ্যাসাদের কারণ ছিল রাজনীতিক, কিন্তু অর্থনীতিক কারণ ইহার ভিতর অন্তঃসলিলা ফল্গুধারার ন্যায় বহিতেছিল। ফরাসীরা সীরিয়া দেশটাকে পাঁচ প্রদেশে বিভক্ত করিয়া ফেলিয়াছেন, সীরিয়ার জাতীয় দল বলেন যে, ফরাসীরা অন্তঃপ্রাদেশিক ভেদনীতির বীজ বপনের জন্য ঐ বিভাগ করিয়াছেন। তাঁহাদের বিশ্বাস, উহা রোমকদিগের পুরাতন ভেদনীতির পুনঃপ্রবর্ত্তন। ইহার উপর সীরিয়ার জাতীয় দল ভাঙ্গিয়া দেওয়াতে সেই অসন্তোষ আরও প্রবল হইয়া উঠে।

অধিকন্তু উপস্থিত হয় আর্থিক কারণ। সীরিয়া অঞ্চলের খ্যাতনামা লোকরা বলিয়া থাকেন যে, গত ১৬ বৎসরে ফরাসী জাতি কি কৃষির দিকে অথবা কি শ্রমশিল্পের দিকে সীরিয়ায় সম্পদ বৃদ্ধি করিবার কোনরূপ চেষ্টাই করেন নাই। বরং সীরিয়াতে ফরাসী মালের কাটতি হ্রাস পাইলে তাঁহারা সীরিয়াবাসীদিগের আর্থিক উন্নতিসাধক কার্য্যে বাধা দেন। অন্য দেশ হইতে আমদানী মালের উপর তাঁহারা কড়া হারে শুল্ক বসাইতেছেন, কিন্তু ফ্রান্স হইতে আগত মালের উপর তাঁহারা কোন প্রকার শুল্ক ধার্য্য করেন না বা নামমাত্র শুল্ক ধার্য্য করিয়া থাকেন। উদাহরণস্বরূপ দুইটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। সীরিয়ার কতকগুলি ভদ্রলোক মার্কিণে থাকিয়া ব্যবসা করিয়া প্রচুর ধন উপার্জ্জন করেন। তাঁহারা তাঁহাদের দেশে বহুলক্ষ ডলার ব্যয় করিয়া একটি চামড়ার কারখানা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। সেই কারখানার দ্বারা এক শত পরিবারের গ্রাসাচ্ছাদন নির্ব্বাহিত হইতে পারিত। ফরাসীরা প্রথম তাহাদিগকে ঐ কার্য্য করিতে উৎসাহ দিয়াছিলেন। কারণ, ফ্রান্স হইতে তাঁহারা যন্ত্রপাতি আমদানী করেন। তখন বিদেশ হইতে আমদানী পাকা চামড়ার উপর শতকরা ৪০ টাকা হারে আমদানী শুল্ক ধার্য্য ছিল। সুতরাং সীরিয়াবাসীদিগের বৈদেশিক চামড়ার উপর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা সহজ ছিল। কিন্তু যেমন ঐ কারখানায় কার্য্য আরম্ভ হইয়াছিল, অমনই ফরাসী চর্ম্মকারগণ চীৎকার করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন যে, তাঁহাদের ব্যবসায় মাটী হইতে বসিয়াছে, আর প্রায় সেই সঙ্গে সঙ্গেই ফরাসী কর্ত্তৃপক্ষ চামড়ার আমদানী শুল্ক শতকরা ৪০ টাকা হইতে ১১ টাকায় নামাইয়া দিয়া সীরিয়ায় স্বদেশী কারবারের মুণ্ডপাত করিয়া বসিলেন। আর একটা দৃষ্টান্ত এই যে, সীরিয়ায় অতি সুন্দর বিলাতী মাটী (সিমেণ্ট) প্রস্তুত হয়। কিন্তু ফরাসী সরকার তথাকার সমস্ত সরকারী ইমারতের কাযে ফ্রান্স হইতে আমদানী সিমেণ্টই ব্যবহার করেন। কিন্তু সীরিয়াবাসীদিগের প্রদত্ত টেক্স হইতেই ঐ ইমারতগুলি নির্ম্মিত হয়। সীরিয়ার ব্যবসায়ীরা আরও অভিযোগ করেন যে, তথাকার ফরাসী রাজপুরুষগণ ফরাসীদিগের প্রতিষ্ঠিত সমবায় ভাণ্ডার হইতে আলপিন হইতে মোটরগাড়ী পর্য্যন্ত সমস্ত জিনিষই খরিদ করেন, দেশীয় দোকান হইতে কিছুই খরিদ করেন না।

এইরূপ নানা কারণে সীরিয়াবাসীদিগের মন অসন্তোষে পূর্ণ ছিল। তাহার পর ডামাস্কাসের ট্রামের ভাড়া লইয়া সীরিয়াবাসীদিগের সহিত কর্ত্তৃপক্ষের বিবাদ বাধে। ঐ ট্রাম বেলজিয়াম এবং ফ্রান্সের লোক দ্বারা গঠিত কোম্পানী কর্ত্তৃক চালিত। সীরিয়ানরা

বলেন যে, উহার ভাড়ার হার বড় অধিক, অতএব উহা কমাইয়া দিতে হইবে। কোম্পানী তাহাতে সম্মত হন না। সীরিয়ানরা ট্রাম বর্জ্জন করে। ফকরী এল বারোদী এই ট্রাম বর্জ্জন আন্দোলনের নেতা ছিলেন। ফরাসী সরকার তাঁহাকে নির্ব্বাসিত করেন। তখন সীরিয়ানরা সব ছাড়িয়া দিয়া পূর্ণ স্বাধীনতা-প্রাপ্তির দাবী করিতে লাগিল। সীরিয়ান নারীরাও বড় বড় সভা করিয়া সরকারী কার্য্যের প্রতিবাদ করিতে থাকিলেন এবং দাঙ্গা-ফ্যাসাদ ঘটাইবার জন্য পুরুষদিগের সহিত যোগ দিলেন। তাঁহারা জিদ করিয়া সীরিয়ান প্রজাতন্ত্রের প্রেসিডেণ্ট আলি বে এল আবেদকে পদত্যাগ করিতে সম্মত করাইলেন। সীরিয়ায় তদানীন্তন হাইকমিশনার কাউণ্ট হেন্‌রী ডি মার্টেন বলপ্রয়োগ না করিয়া কৌশলে কার্য্যসিদ্ধি করিবার জন্য ব্যস্ত হইলেন। তিনি সরকারের সহিত জাতীয় দলের মিটমাট করিবার জন্য জাতীয় দলের বহির্ভূত সাত জন লোককে মধ্যস্থতা করিবার জন্য এক কমিটী গঠিত করেন। তাঁহার ইচ্ছা ছিল, কমিটী "সরকারের গোড়েই গোড় দেন।" কমিটী তাহাতে সম্মত হইলেন না। তখন কাউণ্ট মার্টেন কিছু নরম হইলেন। তিনি ঐ রাজ্যের প্রধান মন্ত্রী জাতীয়তার বিরোধী তাজেদসিন এবং তাঁহার মন্ত্রিমণ্ডলীকে বিদায় দিয়া তাহার স্থানে অট্টাল আয়োবী (Attal Ayoubi)কে মন্ত্রী নিয়োগ করেন। ইনি জাতীয় দলকে লইয়া মন্ত্রিমণ্ডলী গঠিত করেন এবং হাঙ্গামা-ফ্যাসাদ সমস্ত বন্ধ করিবার প্রতিশ্রুতি দেন। ইতোমধ্যে কাউণ্ট মার্টেন মরক্কোর হাই কমিশনার হইয়া তথায় গিয়াছেন, এবং মসিয়ে পন্‌সো (Ponsot) সীরিয়ায় হাই কমিশনার হইয়াছেন। হাঙ্গামা-হুজ্জুৎ কিছু কমিয়াছে। ফরাসীরা সীরিয়াকে কিঞ্চিৎ স্বাধীনতা দিতে সম্মত হইয়াছেন। এখন কাযে কি দাঁড়ায়, তাহা দেখিবার জন্য সকলে কৌতূহলী রহিয়াছেন। দাঙ্গা-ফ্যাসাদের যে শেষ হইয়া গেল, তাহা মনে হইতেছে না।

—

পাতালে পাট

পাট বাঙ্গালা এবং আসামের একচেটিয়া সম্পত্তি। মাদ্রাজে কিছু পাট উৎপাদনের চেষ্টা করা হইয়াছিল, কিন্তু তাহা বিশেষ সাফল্যলাভে সমর্থ হয় নাই। কিন্তু সম্প্রতি পাতালপুরী মেক্সিকো দেশে পাটের চাষ আরম্ভ হইয়াছে এবং সে চেষ্টা সফল হইবার সম্ভাবনা জন্মিয়াছে; মেক্সিকো এখন কৃষির দ্বারা পাটের ন্যায় অংশু উৎপাদনে মন দিয়াছে। ঐ দেশে এক প্রকার গাছের আঁশ হইতে পাটের ন্যায় আঁশ পাওয়া যায়,—সে গাছ অনেকটা পাট-গাছেরই মত। এখন মেক্সিকোতে অনেক পাটের চাষ হইতেছে। গত বৎসর তথায় প্রায় ৫ হাজার এক শত বিঘা জমিতে পাট চাষ হইয়াছিল, এবার তথায় ১৫ হাজার বিঘারও অধিক জমিতে ঐ পাট উৎপাদনের আয়োজন হইতেছে। মেক্সিকোতে কতকগুলি ছোট ছোট পাটকলও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, কিন্তু তথায় ভূরি পরিমাণে দাঁড়-দড়া, বোরা, চট, গালিচা প্রভৃতি হেনেকোয়েন অংশু হইতে প্রস্তুত হইতেছে। আর ঐ আঁশের অনেক অংশ বিদেশে চালান যায়। সেলাই করিবার সুতালী যাহারা প্রস্তুত করে, তাহারা উহা লইয়া থাকে। শুনা যাইতেছে যে, মার্কিণের এক কারবারওয়ালারা মেক্সিকোতে বড় রকমের এক পাট-কল প্রতিষ্ঠার জন্য কার্য্যারম্ভ করিয়া দিয়াছেন। গত এপ্রিল মাসে মার্কিণ হইতে ঐ অঞ্চলে যন্ত্রপাতি চালান দিবার কথা ছিল। মিষ্টার এফ জে গিলব্রেথ ঐ নূতন মার্কিণী পাট-কলের ম্যানেজার হইয়া যাইতেছেন। গত মাসে ইঁহার কালিফোর্ণিয়া হইতে মেক্সিকোতে রওনা হইবার কথা ছিল। এই সংবাদে ভারতীয় কলওয়ালাদিগের মনে আতঙ্কসঞ্চার হইয়াছে। বঙ্গবাসীর মনেও আতঙ্ক জন্মিবার কথা। কারণ, পাট বাঙ্গালীর একটা বড় আয়ের জিনিষ। কিন্তু চিরদিন কখনই সমান যায় না। বাঙ্গালায় পাটের সুদিন আসিয়াছিল, আবার চলিয়া যাইবে তবে বাঙ্গালীর সেজন্য সময় থাকিতে প্রস্তুত হওয়া উচিত। ফলে বাঙ্গালার দুর্দ্দিন ক্রমে ঘনাইয়া আসিতেছে। বাঙ্গালীকে অচিরে বলিদানের জন্য আনীত যূপবদ্ধ ব্রাহ্মণবালকের ন্যায় বলিতে হইবে :—

> পিতরৌ ধনলুব্ধৌ চ রাজা খড়্গধরস্তথা।
> দেবতা বলিমিচ্ছন্তি কো মে ত্রাতা ভবিষ্যতি॥

—

বোলিভিয়ায় রাষ্ট্র-বিপ্লব

চাকো সংগ্রাম সম্পর্কে দক্ষিণ-আমেরিকার বোলিভিয়ার কথা পাঠক বহুবার শুনিয়াছেন। সে যুদ্ধের সমস্ত বিবাদী বিষয়ের এখন মীমাংসা হয় নাই। তবে প্রায় মীমাংসা হইয়া গিয়াছে বলা যাইতে পারে। এই যুদ্ধের সময় বোলিভিয়াবাসীদিগকে প্যারাগুয়া-বাসীদিগের সহিত সংগ্রামে অনেকবার পরাজিত হইতে হইয়াছিল। সে জন্য এই রাজ্যের কতকগুলা লোক রাষ্ট্রপরিচালকদিগের উপর অসন্তুষ্ট হইয়া উঠে। তাহাদের বিশ্বাস জন্মে যে, কর্ত্তাদের ত্রুটির জন্য তাহাদের পরাজয় ঘটিয়াছিল। ইহা ভিন্ন এই দেশের আর্থিক দুর্গতির জন্য ইহারা এ দেশের ধনী সম্প্রদায়কে এবং শাসকদিগকেই মুখ্যতঃ দায়ী করে। এই রাজ্যের লোকসংখ্যা ৩০ হইতে ৩১ হাজারের মধ্যে, তন্মধ্যে আমেরিকার আদিমনিবাসী রেড ইণ্ডিয়ানের সংখ্যা হইবে উহার অর্দ্ধেকের কিছু অধিক। শিক্ষিত শ্বেত ইণ্ডিয়ানরা স্পেনিস ভাষায় কথা বলে—অশিক্ষিত রেড ইণ্ডিয়ানরা খুয়েচুয়া এবং আইমারা ভাষায় কথা কহে। সুকার (Sucre) এই রাজ্যের রাজধানী বলিয়া পরিজ্ঞাত, কিন্তু লাপাজই এখন ইহার প্রকৃত রাজধানী। কারণ, ঐ সহরেই প্রজাদিগের প্রতিনিধি সভার এবং সিনেটের অধিবেশন হয়। সম্প্রতি এই বোলিভিয়া রাজ্যের সৈন্যদল তাহাদের শাসনযন্ত্র পরিবর্ত্তন করিয়া দিয়াছে। তাহাদের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক কৃতিত্ব এই যে, তাহারা সম্প্রতি বিনা রক্তপাতে এই কার্য্য সাধন করিয়াছে। এই কার্য্যে লেফটন্যাণ্ট কর্ণেল যুসুথ নামক এক জন জার্ম্মাণ তাহাদিগকে বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন। কর্ণেল টোরো এখন চাকোতে আছেন। তাঁহাকেই সকলে একবাক্যে ঐ রাজ্যের প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচিত করিবেন স্থির করিয়াছেন। তথাকার প্রগতিশীল দুইটি বড় বড় দলই নূতন সরকারের সমর্থন করিতেছেন। এখন নূতন সরকার সমাজতন্ত্র-নীতির অনুসরণ করিয়াই শাসনযন্ত্র ও দেশের কার্য্য পরিচালন করিবেন স্থির হইয়া গিয়াছে। তাঁহারা স্থির করিয়াছেন, ঐ অঞ্চলে সমাজতন্ত্রবাদ অনুযায়ী শাসনব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হইলে তথায় ধনিক-দিগের প্রভাব হ্রাস পাইবে এবং দেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হইবে। এখন তাঁহাদের সে আশা কতখানি সফল হইবে, তাহা দেখিবার জন্য অনেকে প্রতীক্ষা করিয়া রহিয়াছেন।

ইংরাজ শান্তিপ্রিয় কেন ?

আজকাল অনেকেই প্রশ্ন করিতেছেন—ইংরাজ জাতি হঠাৎ এত শান্তিপ্রিয় হইয়া উঠিল কেন ? ইটালী এত কথা বলিল, এত রক্তচক্ষু দেখাইল, কিন্তু প্রতিদানে বৃটিশ কেশরী একটু কেশর-কম্পনও করিল না কেন ? বৃটিশ সিংহের গায়ে কি মহাত্মাজীর বাতাস লাগিল না কি ? না, তাহা লাগে নাই। সম্প্রতি প্যারিসের 'লে মাতিন্' পত্রে সেণ্ট ব্রাইস নামক জনৈক ব্যক্তি লিখিয়াছেন, ইংরেজ জাতি জার্ম্মাণীর সহিত একটা চুক্তি করিবার জন্য কি জন্য ব্যস্ত ? এই প্রশ্নের উত্তরে তিনিই বলিয়াছেন যে, ইহার কারণ, সুদূর প্রাচীতে মিশরে এবং প্যালেষ্টাইনে ইংরেজের উদ্বেগের অনেক হেতু আছে। ইংলণ্ডে তাহার সৈন্য এবং রণতরী পুনর্গঠিত করিতে হইবে। কাযেই তাহারা যুদ্ধ বাধাইয়া আর অশান্তিকে ডাকিয়া আনিতে চাহে না।

আর এক কারণে ইংরেজ শান্তিপ্রিয় হইয়াছেন ; হিটলার যে এত আড়ম্বরে সেনাবল ও নৌবল বৃদ্ধি করিতেছেন,—তাহা দেখিয়াও ইংরেজ বেশিতেছে না। সম্প্রতি বৃটেনের ঋদ্ধি ফিরিয়া আসিতেছে। গত বজেটে তাহার জমা-খরচ ভালরূপ মিলিয়া গিয়াছে। দশ লক্ষ নূতন লোক কায পাইয়াছে। কাঁচা মালের আমদানী এবং শ্রমশিল্পজ পণ্যের রপ্তানী বাড়িয়া গিয়াছে। এখন এই সুবিধা ছাড়িয়া ইংরেজ জাতি যে যুদ্ধ দ্বারা জগতে অশান্তি আনিবেন, এত নির্ব্বোধ ইংরেজ জাতি নহেন।

প্যালেষ্টাইনএ অশান্তি

প্যালেষ্টাইনের আরব মুসলমানগণ বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়া নানাবিধ অশান্তির সৃষ্টি করিতেছে। সংবাদ-পত্রে নিত্যই নূতন নূতন রোমাঞ্চকর সংবাদ প্রকাশ পাইতেছে। আরবরা শান্ত হইতে চাহিতেছে না। কর্ত্তৃপক্ষ জরুরী রেগুলেশন জারী করিলেও আরবগণ উপদ্রব করিতে পশ্চাৎপদ নহে। বৃটিশ সৈন্যের ৩টি ব্যাটালিয়ন প্যালেষ্টাইনএ আছে। কিন্তু আরব মুসলমানরা কিছুই গ্রাহ্য করিতেছে না।

গত ৩রা জুন সংবাদ আসিয়াছিল, হেব্রন রোডে দুইটি সেতু উড়াইয়া দেওয়া হইয়াছিল। এই পথের ধারে যে টেলিগ্রাফের তার ছিল, তাহাও ধ্বংস করিয়া ফেলা হইয়াছে। রাত্রিকালে বৃটিশ-পুলিস যখন টহল দিয়া ফিরিতেছিল, বিদ্রোহী আরবরা তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া গুলী নিক্ষেপ করিতে থাকে, কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে কেহ আহত হয় নাই।

প্যালেষ্টাইনএ যে জরুরী রেগুলেশান জারি করা হইয়াছে, তাহার ফলে জেলা-কমিশনাররা দোকান খোলা ও কায করিতে দিবার হুকুম করিবার ক্ষমতা পাইয়াছেন। যাহারা তাঁহাদের কথা শুনিবে না, তাহাদের প্রতি দণ্ডাদেশ দিবার ক্ষমতাও তাঁহাদের আছে। কিন্তু তথাপি প্যালেষ্টাইনএ এখনও শান্তি সংস্থাপিত হয় নাই।

এই আরব বিদ্রোহের হেতু কি ? আরব-মুসলমানরা প্যালেষ্টাইনএ মুসলমান প্রাধান্য রক্ষা করিবার জন্য বদ্ধ-পরিকর। তাই এই বিদ্রোহের উদ্ভব। ইহুদীজাতির নিজের কোনও দেশ নাই। পৃথিবীর সর্ব্বত্রই তাহারা ছড়াইয়া পড়িয়াছে, নিজের দেশ না থাকায়, যে দেশে ইহুদীজাতি যখন বাস করে, তখন তাহার স্বাভাবিক অধিবাসীরা প্রায়ই তাহাদের উপর নানাপ্রকার অত্যাচার করিয়া থাকে। সম্প্রতি জার্ম্মাণীতেও তাহাই ঘটিয়াছে। হার হিটলার ইহুদী-বিতাড়ন ব্যাপারে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন।

লর্ড ব্যালফোরের মনে ইহুদীজাতির প্রতি অনুকম্পা জাগিয়াছিল। পৃথিবীর এই বহু পুরাতন জাতি যাহাতে প্যালেষ্টাইন্এ পাকা আশ্রয়স্থান পায়, ইহাই ছিল তাঁহার মনোগত অভিপ্রায়। তিনি সুপণ্ডিত লোক। বর্ণ-বিদ্বেষ তাঁহার উদার প্রাণে প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই। মুসলমান-বিদ্বেষের কোনও পরিচয় এ পর্য্যন্ত লর্ড ব্যালফোরের আচরণে প্রকাশ পায় নাই। প্যালেষ্টাইন্এ ইহুদীরা বসবাস করিলে মুসলমানরা জব্দ হইয়া পড়িবে, এরূপ কোনও দুরভিসন্ধি লর্ড ব্যালফোরের মনে ছিল না।

ইহুদীরা তাঁহার আশ্বাসবাণীতে আশ্বস্ত হইয়া প্যালেষ্টাইন্এ আশ্রয়-স্থান রচনা করিতে থাকে। আদম সুমারীর হিসাব দেখিলে বুঝিতে পারা যাইবে, ১৯২২ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯৩১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ১০ বৎসরে প্যালেষ্টাইন্এর জন-সংখ্যা ৭ লক্ষ ৫৭ হাজার ১ শত ৮২ হইতে বাড়িয়া ১০ লক্ষ ৩৫ হাজার ৮ শত ২১ জন হইয়াছে। অর্থাৎ প্রায় শতকরা ৩৬ জন বাড়িয়াছে। লোক সংখ্যার এই বৃদ্ধি দেখিয়াই মুসলমানদিগের চমক ভাঙ্গিয়াছে - তাহারা শঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছে।

হিসাব করিলে দেখা যাইবে, ইহুদীদিগের সংখ্যা শতকরা ১০৮ জন বাড়িয়াছে। অর্থাৎ ৮৩ হাজার ৭ শত ৯৪ হইতে ১ লক্ষ ৭৪ হাজার ৬ শত ১০ জনে দাঁড়াইয়াছে। এ দিকে আরবদিগের সংখ্যা বাড়িয়াছে মাত্র শতকরা ২৮ জন। তাহাদিগের সংখ্যা ৫ লক্ষ ৯০ হাজার ৮ শত ৯০ হইতে ৭ লক্ষ ৫৯ হাজার ৭ শত ১২ জনে দাঁড়াইয়াছে।

প্যালেষ্টাইন্এ যে সকল খৃষ্টান আছে, ঐ সময়ে তাহাদের সংখ্যা শতকরা ২৫ হিসাবে বাড়িয়াছে। অর্থাৎ ৭৩ হাজার ২৪ জন হইতে ৯১ হাজার ৩ শত ৯৮ দাঁড়াইয়াছে। ১৯৩১ খৃষ্টাব্দের পর ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত সকল সম্প্রদায়ের জনসংখ্যা আরও বাড়িয়াছে, কিন্তু তাহার হিসাব এখন পাওয়া সম্ভবপর নহে।

উল্লিখিত প্রকার লোকসংখ্যার বৃদ্ধির মূলে সুশাসন বিদ্যমান রহিয়াছে, ইহা অনায়াসে অনুমান করা যাইতে পারে। মুসলমান-শাসনসময়ে এই অনুপাতে জন-সংখ্যার বৃদ্ধি ঘটে নাই, ইহা স্বতঃসিদ্ধ প্রমাণ বলিয়া কেহ গ্রহণ করিলে তাহাতে আপত্তি করিবার কিছু থাকিতে পারে না।

প্যালেষ্টাইনএর মত ধর্ম্মস্থানে সকল সম্প্রদায়ই গমন করিবার অধিকারী। ইহুদীদিগের সম্বন্ধে বরং কিছু বিধিনিষেধ দেখা যায়। তৎসত্ত্বেও দশ বৎসরে যদি ইহুদীদিগের সংখ্যা শতকরা ১০৮ হিসাবে বাড়িয়া থাকে, তাহার জন্য ইহুদীদিগের অপরাধ আছে, ইহা কোনও নিরপেক্ষ লোকই বলিতে পারেন না—আরব মুসলমানগণও এ জন্য ইহুদীদিগকে নিশ্চয়ই অপরাধী করিতে পারেন না। সুতরাং প্যালেষ্টাইন্এ মুসলমান-প্রাধান্য রক্ষাকল্পে তাঁহারা হাঙ্গামা বাধাইলে, ন্যায়ধর্ম্মের কাছে তাহা যুক্তিহীন বলিয়া পরিগণিত হইবে।

আরব মুসলমানরা বলিতেছেন যে, প্যালেষ্টাইন্এ জমির

পরিমাণ অনির্দিষ্ট নহে—তাহার একটা সীমা আছে। সুতরাং ইহুদীরা অর্থবলে যদি ইহুদীদিগের জন্ত অধিক জমি সংগ্রহ করে, তাহা হইলে মুসলমানরা কোথায় যাইবেন? ইহাকে ন্যায়সঙ্গত যুক্তি বলা চলে কি? জীবন-সংগ্রামে শক্তিমানরাই টিকিয়া থাকে। ইহুদীরা যে কারণে জমি সংগ্রহ করিতে পারিতেছে, মুসলমানরাও সেই কারণ অবলম্বন করিতে পারেন।

দেশের জমিতে জন্মগত অধিকার দাবী করিয়া আরব মুসলমানরা যদি তথায় স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহেন এবং ইহুদী ও খৃষ্টান জাতির সাহচর্য্যে প্যালেষ্টাইনএ স্বায়ত্তশাসন-প্রথা প্রবর্ত্তিত করিতে পারেন, তাহা হইলে দেশের প্রকৃত কল্যাণ ঘটিতে পারে। অবশ্য স্বায়ত্তশাসন অর্থে, সেই স্থানের অন্যান্য সম্প্রদায়কে বঞ্চিত করিয়া একচ্ছত্র অধিকার সংগ্রহ নহে। সমান অধিকারের উদার মনোবৃত্তি প্রকাশ করিয়া, ইহুদী ও খৃষ্টান জাতির স্বার্থ অক্ষুন্ন রাখিয়া যদি আরব মুসলমানরা আন্দোলন চালাইবার পরিচয় দিতেন, তাহা হইলে পৃথিবীর সভ্য মানব বুঝিত যে, তাঁহারা কল্যাণকর অনুষ্ঠানে ব্রতী হইয়াছেন। কিন্তু তাঁহারা যে অশান্তির সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহার অন্তরালে এমন মনোবৃত্তির পরিচয় পাওয়া যাইতেছে না।

এ জন্ত আরব বিদ্রোহ কল্যাণপ্রসূ বলিয়া কেহ মনে করিতে পারিতেছে না।

বৃটেন ও ইটালী

ইটালীর ভাগ্যবিধাতা সেনর মুসোলিনী মুখে যদিও ঘোষণা করিয়াছেন যে, গ্রেট বৃটেনের সহিত ইটালী বন্ধুভাবেই আচরণ করিবে, কিন্তু রাষ্ট্রনৈতিক গগনের প্রান্তদেশে যে মেঘসঞ্চার হইতেছে, তাহাতে আশাবাদীরও মনে আশার আলোক জ্বলিয়া উঠিবে, এমন মনে হয় না।

সম্প্রতি সংবাদপত্রে একটি সংবাদ বাহির হইয়াছে যে, অষ্ট্রিয়ার সিংহাসনে হাপসবার্গ বংশের কাহাকেও পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্ত ইটালী ও জার্ম্মাণীর মধ্যে একটা চুক্তি হইয়াছে। এই চুক্তি পরিণামে জার্ম্মাণী ও ইটালীর মধ্যে সন্ধিসর্ত্তে পরিণত হইবে না ত?

ইটালীর অবসরপ্রাপ্ত নৌ-রাজ কর্ম্মচারী ডিউক জেনারো পাসানোভি মেলিটো একখানি পুস্তিকা রচনা করিয়াছেন। সেই রচনায় ডিউক ঘোষণা করিয়াছেন, "বৃটেন যদি ইটালীর সহিত লড়াই করিতে চেষ্টা করে, তাহা হইলে ভূমধ্যসাগর বৃটিশ নৌ-বহরের সমাধিসিন্ধুরূপে পরিণত হইবে।"

কথাটা হয় ত আস্ফালনেই পর্য্যবসিত হইবার মত। কিন্তু উক্ত লেখক দেখাইয়াছেন যে, বৃটিশের নৌপ্রতাপ এখন পূর্ব্ববৎ নাই। ইটালীর নৌবহর বৃটেনের অপেক্ষা অধিক। পপুলার সায়ান্স নামক একখানি মার্কিণ বৈজ্ঞানিক পত্রে রুসিয়া, ইটালী, জার্ম্মাণী ও ইংলণ্ডের সৈন্যসংখ্যা ও বিমানবহর কিরূপ, তাহা দেখাইয়াছে। তাহাতে দেখা যায় যে, ইটালীর সৈন্যসংখ্যা ১০ লক্ষ, গ্রেট বৃটেনের ৪ লক্ষ। ইটালীর বিমানবহরও গ্রেট বৃটেন অপেক্ষা দুইগুণেরও অধিক। এ কথা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে ইটালীর ডিউকের নির্দ্ধারণ অনুসারে ইটালীর সাবমেরিণের সংখ্যা অনেক অধিক হইয়াছে। তাই তিনি জোর গলায় বলিয়াছেন, বৃটেন যে আজ লড়াই করিতে চাহে না, তাহার কারণ ইহাই যে, বৃটেনের লড়াই করিবার শক্তিই নাই।

শক্তি আছে কি না, তাহা প্রমাণসাপেক্ষ, তবে ইটালীর এই ডিউক দেখাইয়াছেন যে, বৃটেনকে আপন অন্নের জন্ত সম্পূর্ণরূপে সমুদ্রপথের উপর নির্ভর করিতে হয়। "যদি কোনও কারণে লণ্ডন ডকে প্রত্যহ বৃটেনের যে আহার্য্য পণ্য আসে তাহা না পৌঁছায়, তাহা হইলে তিন সপ্তাহের মধ্যে ইংরেজদিগকে মাঠের ঘাস তুলিয়া সিদ্ধ করিয়া খাইতে হইবে।" শুধু তাহাই নহে, ডিউক মনে করেন যে, বৃটেন তাহার জিব্রাল্টার ও মাল্টাস্থিত মৌলিক নৌকেন্দ্র পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইবে। কারণ, সিসিলি-স্থিত ইটালীর বিমান-ঘাঁটিগুলি হইতে মাল্টা ২০ মিনিটের পথ। লড়াই যদি বাধে, তাহা হইলে ভূমধ্য সাগরের পূর্ব্বাংশ বৃটিশ নৌ-বহরের সমাধিসিন্ধুরূপে পরিণত হইবে!

ক্যাপ্টেন ফার্দিনন্দ টুওহিও বলিয়াছেন, মুসোলিনীর একমাত্র উদ্দেশ্য ভূমধ্যসাগরের দক্ষিণপূর্ব্বাংশে ও প্রাচ্যদেশে গমন করিবার পথ আয়ত্ত করা। মুসোলিনীর একান্ত ইচ্ছা যে, ইটালী, জার্ম্মাণী ও ফ্রান্স একযোগে যুগপৎ বৃটেনকে আক্রমণ করিয়া সপ্তসিন্ধু হইতে বৃটেনের রাজ্য লুণ্ঠন করিয়া লইবেন।

ইটালীর এই মনোবৃত্তি থাকা অসম্ভব নহে। বিশেষতঃ সম্প্রতি জার্ম্মাণীর সহিত যে চুক্তির কথা অষ্ট্রিয়া সম্বন্ধে প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা যে গভীরতর ইঙ্গিতপূর্ণ, ইহা অনুমান করা কষ্ট-সাধ্য নহে। অবশ্য ফরাসী দেশ ইংলণ্ডের পার্শ্ব শীঘ্র ত্যাগ করিবে না। কারণ, সে জার্ম্মাণীকে ভয় করে; কিন্তু ইহাও সত্য যে, মুসোলিনীর ফরাসীপ্রীতি সুস্পষ্ট। আবিসিনিয়ার যুদ্ধে ফরাসী দেশ মুসোলিনীকে কম সাহায্য করে নাই! ফরাসী সরকার ইটালীর বিরুদ্ধে অঙ্গুলিমাত্র পরিচালনা করা দূরে থাকুক, ইটালী-প্রীতিই সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল!

রাষ্ট্রনৈতিক স্বার্থপ্রবাহ কখন কোন্ খাতে প্রবাহিত হইবে, তাহা অনুমান করা কঠিন। ইটালীর গ্রেটবৃটেনবিদ্বেষ অত্যন্ত সুস্পষ্ট। এ জন্ত রাষ্ট্রনৈতিক ও সাম্রাজ্যবিস্তারের লোভ উদ্ধত শক্তিশালী মানুষকে কোথায় টানিয়া লইয়া যায়, তাহা কেহই বলিতে পারে না। সুতরাং আকাশে যে মেঘ জমিয়া উঠিতেছে, তাহা হইতে বজ্র কবে নিপতিত হইবে, কে বলিতে পারে?

আবিসিনিয়ার দশা

হত্যাকাণ্ড

বিস্তীর্ণ আফ্রিকা ভূমির শেষ স্বাধীন রাজ্য আজ ইটালীর কুক্ষিগত। ইটালী এখন হাবসী জাতিকে নির্ব্বীর্য্য করিবার জন্ত বিধিমতে চেষ্টা করিতেছে। আদ্দিস আবাবা হইতে যাহারা বাহির হইয়া আসিয়াছে, তাহাদের মুখে শুনা গিয়াছে যে, ইটালীয় কর্ত্তৃপক্ষ আদ্দিস আবাবায় লুণ্ঠনকারীদিগকে অত্যন্ত নির্ম্মমভাবে শাস্তি দিতেছে। ইটালীয় সামরিক বিচারালয়ে বিচারের পর তাহা-দিগকে দলে দলে গুলী করিয়া মারা হইতেছে। এক এক দলে ৩০ হইতে ৪০ জনকে কলের কামানের মুখে দাঁড় করাইয়া তাহাদিগকে দেওয়া হইতেছে। বড় বড় রাস্তার ধারে মৃতদেহগুলি

পুড়িয়া ফেলা হইতেছে। খুব কঠোরতার সহিত হত্যাকাণ্ড চালান হইতেছে। ইটালীয় সৈন্য ৫ই মে আদ্দিস আবাবা অধিকার করে। তাহার পর তাহারা কয়েক দিনের মধ্যে ১৫ শতেরও অধিক লোককে গ্রেপ্তার করে। লুটপাট করার অভিযোগে তাহাদিগকে অভিযুক্ত করিয়া সামরিক আদালতে সরাসরিভাবে অত্যন্ত ত্বরিতগতিতে তাহাদের বিচারকার্য্য করা হয়। কোন হাবসীর নিকট অস্ত্রশস্ত্র থাকিলে তাহার অপরাধের জন্য প্রাণদণ্ড দেওয়া হইতেছে। আদ্দিস আবাবায় প্রবেশ করিবার পর ইটালীয় সৈন্যাধ্যক্ষ এই মর্ম্মে এক ইস্তাহার প্রকাশ করেন যে, এই ইস্তাহারপত্র প্রকাশের ৩ দিনের মধ্যে হাবসীদিগকে সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র ইটালীয়ানদিগের হস্তে সমর্পণ করিতে হইবে। অনেকে সে ইস্তাহারের কথা জানিতেও পারে নাই। ৯ই মে বিভিন্ন জেলায় খানাতল্লাসী আরম্ভ হয়। তখনও পর্য্যন্ত মফস্বলের কেহ ঐ আদেশের কথা অবগত ছিল না। কিন্তু তাহা হইলেও তাহাদিগকে বিচারের অভিনয় করিয়া হত্যা করা হইয়াছে।

একটি দৃষ্টান্ত

কি ভাবে এই হত্যাকাণ্ড চালান হইতেছে, তাহার একটি দৃষ্টান্ত এ স্থলে দেওয়া গেল। অষ্ট্রিয়ান ব্যাঙ্কার হার আড়েল বেলজিয়ান দূতাবাসের এলাকায় বাস করিতেন। ৯ই মে ২৬শে বৈশাখ তিনি বাসায় ফিরিয়া আসিয়া দেখেন যে, ইটালীয় সৈন্যগণ তাঁহার সমস্ত হাবসী ভৃত্যকে ধরিয়া লইয়া গিয়াছে। তিনি আর বিলম্ব না করিয়া সামরিক শাসনকর্ত্তার নিকট যাইয়া তাঁহাকে তাঁহার ভৃত্যদিগকে ছাড়িয়া দিতে বলেন। তাঁহাকে তাহার পরদিন যাইতে বলা হয়। পরদিন প্রাতে তিনি যাইয়া শুনিলেন যে, ইটালীয়ানরা তাঁহার ভৃত্যদিগকে গুলী করিয়া মারিয়া ফেলিয়াছে। ভৃত্যদিগের মধ্যে কেহ কেহ হার আড়েলের নিকট গত ২০ বৎসর ধরিয়া কায করিয়াছিল। হাঙ্গামার সময় তাহারা তাঁহার বাসগৃহ রক্ষা করিয়াছিল। ইটালীয় ইস্তাহারের কথা তাহারা কিছুই অবগত ছিল না বলিয়া মনে হয়। ইহাতে বিচার করিয়া কিরূপ ভাবে হাবসীদিগকে খুন করা হইতেছে, তাহা বুঝা যাইবে। ইটালী ঐ দেশে উপনিবেশ স্থাপন করিবে, সুতরাং তথায় হাবসী থাকে,—ইহা তাহাদের অভিপ্রেত নহে বলিয়া মনে হয়। হাবসী ব্যবহারাজীব মিষ্টার অটো আডেরা এই যুদ্ধের পূর্ব্বে বিশেষ বিচারালয়ে মামলায় কতকগুলি ইটালীয় প্রজার প্রতিকূল পক্ষে দাঁড়াইয়াছিলেন। তিনি ছিলেন এক জন দেশপ্রেমিক। গত ২৪শে বৈশাখ এক দল ইটালীয় সৈন্য তাঁহাকে হত্যা করিয়াছে বলিয়া সংবাদ আসিয়াছে।

শুনা যাইতেছে যে, হাবসীদিগের উত্তর-রণক্ষেত্রের অন্যতম সেনাপতি ডেজাসমাচ আইলডারু দুই শত সৈন্যসহ মার্শাল বোগাডিলিওর করে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন। আবিসিনিয়া হইতে ৩ শত য়ুরোপীয়কে বিতাড়িত করা হইবে প্রকাশ পাইয়াছিল। সংবাদপত্রের অনেক সংবাদদাতাকেও বহিষ্কৃত করা হইয়াছে। বিখ্যাত সাংবাদিক মিষ্টার ষ্টীয়ারকে আবিসিনিয়া হইতে বহিষ্কৃত করা হইয়াছে।

আদ্দিস আবাবাতে হাবসীদিগকে এলোপাতাড়িভাবে খুন করা হইতেছে বলিয়া যে সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল, ইটালীয় সরকার তাহা অস্বীকার করিয়াছেন। তাঁহারা বলিয়াছেন যে, যাহারা লুঠতরাজ করিয়াছিল, কেবলমাত্র তাহাদিগকেই খুন করা হইয়াছে। অবশ্য একটা বিচার বা বিচারের অভিনয় করা হইয়াছে, তাহা সত্য। কিন্তু অষ্ট্রিয়ার ব্যাঙ্কার হার আড়েলের বিশ্বস্ত ভৃত্যগণকে যে ভাবে হত্যা করা হইয়াছে, তাহাতেই আসল ব্যাপারটা সুপ্রকাশ।

সেনর মুসোলিনী

মার্শাল বাডোগ্লিও

আবিসিনিয়ায় ইটালীর উপনিবেশ

সেনর মুসোলিনী তাঁহার নববিজিত আবিসিনিয়া রাজ্যকে ইটালীর উপনিবেশে পরিণত করিবার জন্য মনে মনে সঙ্কল্প ধার্য্য করিয়া বসিয়াছেন। তিনি হুকুম দিয়াছেন যে, যে সকল ইটালীয় যুবক আবিসিনিয়া জয় করিবার জন্য ঐ অঞ্চলে প্রেরিত হইয়াছেন,—তাঁহারা আর দেশে ফিরিতে পারিবেন না। তাঁহাদিগকে ইথিওপিয়াতেই বসবাস করিতে হইবে। মুসোলিনী তাঁহাদিগকে জমি দিবেন,—বসবাসের ব্যবস্থা করিয়া দিবেন, এবং দেশ হইতে গৃহিণী পাঠাইয়া দিবেন। যাহাদিগের গৃহিণী আছে, তাহাদিগকে ত বিনা ভাড়ায় জাহাজে করিয়া তাঁহাদের নিকট পাঠাইয়া দিবেনই, অধিকন্তু যাহাদিগের পরস্পর বিবাহের কথাবার্ত্তা হইতেছিল, তাঁহাদিগকেও ইটালী হইতে আবিসিনিয়ায় পাঠাইয়া দেওয়া

হইবে। কথাবার্ত্তার শেষ পরিণাম কি দাঁড়াইত, তাহা আর বিবেচনা করিয়া দেখা হইবে না। তাহাদিগকেও এই স্বৈর শাসকদিগের নির্দ্দেশ অনুসারে বাধ্য হইয়া পরস্পর পরস্পরকে বিবাহ করিয়া ঘরসংসার করিতেই হইবে। আর যাহাদের বিবাহ হয় নাই,—বিবাহ হইবার কথাও হয় নাই,—কাহারও সহিত প্রেমালাপও হয় নাই,—তাহাদিগের জন্য দলে দলে নারী জাহাজ-বন্দী করিয়া হাবসী রাজ্যে পাঠাইয়া দেওয়া হইবে। এই সকল স্ত্রী-রেজিমেন্টের সহিত পুরুষ রেজিমেন্টের লোকরা পরস্পর প্রণয়ালাপ এবং প্রেম-প্রতিযোগিতা করিয়া পরস্পর পরস্পরের সহিত মাল্য বদল করিবেন, না সরকারী লোক যাঁহার সহিত যাঁহাকে গাঁথিয়া দিবেন, তাঁহাকে তাহা লইয়াই সন্তুষ্ট হইতে হইবে, তাহার ঠিক নাই। তবে ভঙ্গী দেখিয়া মনে হইতেছে,—সরকার পক্ষ হইতে যাহাকে যাহার সহিত গাঁইট-ছড়া বাঁধিয়া দিবেন, তাঁহাকে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার সহিত ঘরকন্না করিতে হইবে। অর্থাৎ দাম্পত্য-বন্ধনে বদ্ধ হইবার জন্য পাত্রাপাত্র বিবেচনা করিবার স্বাধীনতা দেওয়া হইবে না। দেশের কাযের দোহাই দিয়া ইটালীতে নারী সংগ্রহ করাও হইতেছে। আড়কাঠিও বোধ হয় ঘুরিতেছে। এ দিকে কিন্তু যুবক দলকে দেশে ফিরিতে দেওয়া হইবে না শুনিয়া তাহারা অতিশয় কষ্ট এবং অসন্তুষ্ট হইয়া উঠিতেছে। সংবাদ আসিয়াছে যে, ইটালীর, বিশেষতঃ উত্তর-ইটালীর শ্রমিক এবং সৈনিক পরিবারবর্গের মধ্যে অতিশয় ভয় উপস্থিত হইয়াছে। আবার শুনা যাইতেছে, যে সকল সৈনিক আবিসিনিয়া বিজয়ের জন্য প্রেরিত হইয়াছে, তাহাদিগের ফিরিয়া আসিবার ছাড়-পত্র সম্বন্ধে কড়া নিয়ম জারি হইয়াছে বলিয়া গুজব রটিয়াছে যে, ঐ সকল সৈনিককে আর দেশে ফিরিয়া আসিতে দেওয়া হইবে না। সরকারপক্ষ বলিতেছেন যে, তাঁহারা শৃঙ্খলারক্ষার জন্য কতকগুলি নূতন বিধি মাত্র জারি করিয়াছেন। এই জনরব উদ্ভবের কারণ যাহাই হউক না কেন, ইহার ফলে ইটালীর শ্রমিক মহলে যে চাঞ্চল্য এবং বিক্ষোভ জন্মিয়াছে, তাহা দমন করিবার জন্য ফাসিষ্ট কর্ত্তৃপক্ষকে যে বিশেষ বেগ পাইতে হইতেছে এবং এই উপলক্ষে কতকগুলি লোককে গ্রেপ্তার করা হইতেছে ও হইয়াছে, এই সংবাদ হইতেই তাহা জানা যায়। নারী-প্রেরণের সংবাদটাও কি মিথ্যা?

হাবসী সম্রাট

হাবসী সম্রাজ্ঞী

হাবসী যুবরাজ

রাস কাসা

ইথিওপিয়ায় ইটালী উপনিবেশ প্রতিষ্ঠার জন্য অর্থও যথেষ্ট সংগ্রহ হইতেছে। রোম হইতে প্রাপ্ত সংবাদপাঠে জানা গিয়াছে যে, সিনেটার ক্রেসপি আবিসিনিয়ার উন্নতিসাধন করিবার জন্য মুসোলিনীর হস্তে ১০ লক্ষ লীরা দিয়াছেন। মুসোলিনী বলিতেছেন যে, তিনি আবিসিনিয়ার উন্নতিসাধনের জন্য আবশ্যক ব্যবস্থা করিতেছেন। তিনি শিল্প-সংঘের সভাপতি কাউন্ট ভেলপি মিসুরাটাকে আবিসিনিয়ার সম্পদের পরিমাণ নির্দ্ধারণের জন্য

অনুসন্ধান আরম্ভ করিবার কথা বলেন। আবিসিনিয়ার কিরূপ খনিজ সম্পত্তি আছে এবং তথায় কি পরিমাণ কৃষিজ সম্পত্তি উৎপাদন করা যাইতে পারে, সে সম্বন্ধে অনুসন্ধান করা হইবে। এইবার ঐ অসভ্যের দেশকে য়ুরোপীয় সভ্যতার করালচক্রে আরোহণ করান হইতেছে।

ট্রিয়েষ্ট হইতে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, আবিসিনিয়ার মেঘলী অঞ্চল হইতে এক চালান কফি ইটালীর ট্রিয়েষ্ট বন্দরে যাইয়া পৌছিয়াছে। উহাতে তিন শত টন কফি আছে। সবে কলির সন্ধ্যা বই ত নয়। কিছু দিন পূর্ব্বে আদ্দিস আবাবার সংবাদ হইতে জানা যায় যে, রোমের শাসনকর্ত্তা মেজর বোট্টাই আদ্দিস আবাবার শাসনকর্তৃপদে নিযুক্ত হইয়াছেন। তথায় ফাসিষ্ট দল গঠনের ভার ভার্সি ও ওরসিওর উপর অর্পিত হইয়াছে।

এখনও ইটালী ইথিওপিয়ার সকল স্থান অধিকার করিতে পারে নাই। অনেক অঞ্চল এখনও অনধিকৃত রহিয়াছে। তবে ইটালীয়ানরা বাহিরে প্রকাশ করিতেছে যে, অনধিকৃত স্থানগুলি অধিকার করা কঠিন হইবে না।

পরাজিত সম্রাট

এ দিকে ইথিওপিয়ার সম্রাট হাইলাস সিলাসী প্যালেষ্টাইন হইতে দুই পুত্র, দুই কন্যা এবং সেনাপতি রাস কাসাকে সঙ্গে লইয়া গত ২০শে জ্যৈষ্ঠ ওয়াটালু ষ্টেশনে উপস্থিত হইয়াছেন। তথায় বৃটিশ জাতি তাঁহাকে সসম্মানে সম্বর্দ্ধনা করেন। বৃটিশ সরকারের পররাষ্ট্রসচিব মিষ্টার এন্থনি এডেনের খাস মুন্সি অগ্রসর হইয়া প্রথমে সম্রাট হাইলাস সিলাসীকে অভিনন্দিত করিয়াছিলেন। ইহা ভিন্ন লর্ড এলেন, সার ওয়াল্টার লেটন, সার নর্ম্মান এঞ্জেলও তথায় উপস্থিত ছিলেন। ষ্টেশনের সান্নিধ্যে বহু লোকের সমাগম হয়। রাজপুত্রদ্বয় কৃষ্ণবর্ণ পরিচ্ছদ এবং কন্যাদ্বয় য়ুরোপীয় পরিচ্ছদ পরিয়াছিলেন। রাস কাসা এবং সম্রাট তাঁহাদের দেশীয় পরিচ্ছদ পরিয়াছিলেন। জনৈক মহিলা ষ্টেশনে ইথিওপীয় পতাকা বিতরণ করেন। ঐ সকল পতাকা আন্দোলিত করিয়া জনতা সিংহাসনচ্যুত সম্রাটকে সম্বর্দ্ধনা করিয়াছিলেন। সম্রাট তথা হইতে প্রিন্সেস গেটে সার ইলাই কাডুরীর গৃহে গমন করেন।

হতাহতের সংখ্যা

হাবসী যুদ্ধে ইটালীর কিরূপ লোকক্ষয় হইয়াছে, রোমে তাহার খাঁটি খবর বাহির করা হইয়াছে। উহাতে বলা হইয়াছে যে, ঐ যুদ্ধে ১ হাজার ৫ শত ৬৮ জন ইটালীয় সৈন্য এবং ১ হাজার ৫ শত ৯৩ জন ইটালীয়দিগের দেশীয় সৈন্য নিহত হইয়াছে। এ সংবাদ অভ্রান্ত বলিয়া সকলে মানিয়া লইতে চাহিতেছেন না। ইটালী যখন রণজয়ী, তখন তাঁহার কথা সত্য বলিয়া মানিতেই হয়।

মাটির মায়া

চোখ রাঙ্গিয়ে বললেম হেঁকে,—ওরে,—
এ পৃথিবীর সবই শুধু ফাঁকা;
করিস্ যদি শান্তি-সুখের আশা—
খুঁজিস্ নে কো মায়ায় যাহা ঢাকা!

অবুঝ এ মন বুঝ মানে না মোর,
ভয়ে ভয়ে বল্‌লো অতি ধীরে,—
হোক্ না ফাঁকা, তবু যে ভাই একে
প্রাণের চেয়েও ভাল বেসেছি রে!

শ্রীগিরিজাশঙ্কর চট্টোপাধ্যায়।

আকবরের সমাধি

আগ্রার কথায় লোকের মনে স্বভাবতঃই অনিন্দ্যসুন্দর স্থাপত্যকীর্ত্তি তাজমহলের স্মৃতি উদিত হয়। কালিন্দীর কূলে সম্রাট সাহজাহানের পত্নীপ্রেম যে সৌধে মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়া কালজয়ী সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করিয়াছে, তাহার খ্যাতি আগ্রার সান্নিধ্যে অবস্থিত আর সব স্মৃতি-সৌধের খ্যাতি ম্লান করিয়া দিয়াছে। সে সব সৌধ তাজমহলের তুলনায়—পূর্ণিমার পূর্ণচন্দ্রের নিকট উজ্জ্বল তারকার মতই প্রতীয়মান হয়। কিন্তু এমন মনে করিবার কারণ আছে যে, এই সব স্মৃতি-সৌধ রচনায় যদি স্থপতিদিগের রচনাকৌশলের অনুশীলন না হইত, তবে হয় ত তাজমহল রচনা সম্ভব হইত না। দিল্লীতে হুমায়ুনের সমাধি-সৌধ, আগ্রার উপকণ্ঠে আকবরের স্মৃতি-সৌধ ও নুরজিহানের পিতার সমাধি-সৌধ এবং লাহোরে জাহাঙ্গীরের সমাধি-সৌধ—এ সবই বুঝি তাজমহল রচনা সম্ভব ও সহজ করিয়া দিয়াছিল। হুমায়ুনের সমাধিসৌধে যে পৌরুষের ভাব দেখা যায়, তাহাই কমনীয়তায় পরিণতি লাভ করিয়া তাজমহলে অবিরল সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করিয়াছে।

আকবরের স্মৃতিসৌধের গঠন-পদ্ধতি স্বতন্ত্ররূপ—ইহার সহিত মোগলদিগের স্থাপত্যের আর কোন নিদর্শনের সাদৃশ্য নাই; কেবল আকবরের পরিত্যক্ত রাজধানী ফতেপুর সিক্রীর "পাঁচ মহলের" যে কিছু সাদৃশ্যানুভব করা যায়। উভয় সৌধই সম্ভবতঃ বৌদ্ধ সৌধের আদর্শে কল্পিত হইয়াছিল। মহাবল্লীপুরের রথগুলির সহিতই ইহাদিগের সাদৃশ্য সুস্পষ্ট অনুভূত হয়।

মহাবল্লীপুরের রথ

আগ্রা হইতে পাঁচ মাইল দূরবর্ত্তী সিকন্দ্রা নামক গ্রামে আকবরের সমাধিসৌধ অবস্থিত। ভারতবর্ষের মুসলমান নৃপতিদিগের মধ্যে মোগলদিগের পূর্ব্ববর্ত্তী সিকন্দর লোদীর নামানুসারে এই গ্রামের নামকরণ হইয়াছিল।

আগ্রা হইতে যে রাজপথ সামরিক প্রয়োজনে বাবর কর্ত্তৃক কল্পিত ও তাঁহার পরবর্ত্তী মোগল সম্রাটদিগের দ্বারা সমাপ্ত হইয়াছিল, সেই পথে যাইলে পথের পার্শ্বে এখনও ক্রোশ-চিহ্নস্তম্ভ ("কোশ মিনার") দেখা যায়। এই পথে যাইতে পথেই কতকগুলি ঐতিহাসিক ধ্বংসাবশেষ লক্ষিত হয়। প্রথমেই পুরাতন নগরপ্রাচীরের দিল্লীদ্বার

উল্লেখ-যোগ্য। সমগ্র নগর কি ভাবে প্রাচীর-পরিবেষ্টিত থাকিত, তাহার পরিচয় এখনও দিল্লীতে পাওয়া যায়। হয় ত কিছু দিন পরে সে পরিচয় নিশ্চিহ্ন হইয়া মুছিয়া যাইবে—কারণ, সাহজাহানের দিল্লীর এই ঐতিহাসিক অবশেষও নষ্ট করিয়া সহরের প্রসারবৃদ্ধির প্রস্তাব হইয়াছে!

ইহার পর প্রায় এক মাইল পথ অতিক্রম করিলে একটি প্রাচীর-পরিবেষ্টিত স্থান লক্ষিত হয়। আকবরের প্রধান মন্ত্রী ও চরিতকার আবুল ফজলের ভগিনী লাডলী বেগমের নামানুসারে ইহার নামকরণ হইয়াছে। এই স্থানে পূর্ব্বে লাডলী বেগমের, তাঁহার পিতা শেখ মোবারকের ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ফৈজীর সমাধি ছিল। কিন্তু বহু বর্ষ পূর্ব্বে বৃটিশ সরকার ইহা বিক্রয় করেন। মথুরার কোন ধনী ব্যবসায়ী (লক্ষ্মীচাঁদ শেঠ) ইহা কিনিয়া সমাধিসৌধগুলি ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া লব্ধ উপকরণে একটি গৃহ নির্ম্মিত করান। প্রবেশদ্বারের সম্মুখে একটি প্রকাণ্ড "বাওলী" বা কূপগৃহ ছিল—আগ্রার এই অঞ্চলে আর এত বড় কূপগৃহ ছিল না। তাহাও বুজাইয়া দেওয়া হইয়াছে। এ দেশে হিন্দু ও বৌদ্ধদিগের অনেক মন্দির ও মূর্ত্তি প্রভৃতি মুসলমান শাসক ও সামরিক কর্ম্মচারীদিগের দ্বারা বিকৃত ও বিভগ্ন হইয়াছিল। কিন্তু ইহা যদি বর্ব্বরতার পরিচায়ক হয়, তবে এই বর্ব্বরতা হইতে এ দেশে ইংরেজরা যে অব্যাহতি লাভ করেন নাই, তাহা ইংরেজরাই স্বীকার করিয়াছেন। উড়িষ্যায় যাজপুরে মুসলমানদিগের দ্বারা হিন্দুমূর্ত্তি ও মন্দির ভাঙ্গিয়া সেই উপকরণে মসজেদ নির্ম্মাণের কথা বলিয়া ঐতিহাসিক হাণ্টার বলিয়াছেন—

"But it was reserved for the English to put the finishing stroke of ruin to the royal and sacred edifices of Jajpur."

ইংরেজ সরকারের পূর্ত্ত বিভাগ প্রাসাদের অবশেষ ভাঙ্গিয়া সেই প্রস্তরে সেতুনির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।

লর্ড কার্জ্জন বলিয়াছেন, দীর্ঘকাল ইংরেজরা এই বিষয়ে বর্ব্বরোচিত ব্যবহার করিয়াছেন ("How strongly the barbarian dominated the aesthetic in the official mind, may be shown by incidents that from time to time occurred") লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক যখন ভারতের বড়লাট, তখন মর্ম্মর-প্রস্তর বিক্রয় করিয়া অর্থলাভের জন্য তাজমহল ভাঙ্গিয়া ফেলিবার সম্ভাবনা ঘটিয়াছিল। তিনিই আগ্রায় সাহজাহানের প্রাসাদের মর্ম্মর-নির্ম্মিত স্নানের জলাধার নীলামে বিক্রয় করাইয়াছিলেন। এই জলাধার চতুর্থ জর্জ্জকে উপহার দিবার জন্য লর্ড হেষ্টিংস স্থানান্তরিত করিয়া রাখিয়াছিলেন; কিন্তু ঘটনাচক্রে বিলাতে প্রেরিত হয় নাই। সিকান্দ্রায় আকবরের সমাধি-সৌধবেষ্টন উদ্যান একজিকিউটিভ এঞ্জিনিয়ারকে চাষের জন্য ভাড়া দিবার প্রস্তাব হইয়াছিল। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে সিপাহী-বিদ্রোহের পর দিল্লীর জুম্মা মসজেদ ভাঙ্গিয়া ফেলিবার প্রস্তাব হইয়াছিল,—কেবল সার জন লরেন্সের প্রতিকূলতায় সে প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করা হয় নাই। তাঁহারই প্রতিবাদ-হেতু ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে সাঁচীর তোরণ রক্ষা পাইয়াছিল। আলিগড়ে মিউনিসিপ্যালিটীর কাযে ও কতকগুলি দোকানঘর নির্ম্মাণ জন্য ৬ শত বৎসরেরও অধিক কালের পুরাতন একটি স্তম্ভ নষ্ট করা হয়; অথচ দোকানঘরগুলি নির্ম্মাণের পর কখন ভাড়া দেওয়া হয় নাই! তৎকালীন বড়লাটের গমন-পথে তোরণ নির্ম্মাণের জন্য আজমীরে মসজেদের কয়টি ভাস্করকার্য্যসুন্দর স্তম্ভ ভাঙ্গিয়া ফেলা হইয়াছিল। এই সব ইংরেজকে লর্ড কার্জ্জন মহাপাপী বলিয়াছেন ("I must confess that I think these individuals have been, and within the more restricted scope now left to them, still are inveterate sinners.") লর্ড কার্জ্জনের বহু পূর্ব্বে স্থপতিবিদ্যাবিশারদ ফার্গুসন এ দেশে ইংরেজের এই সব কার্য্যের নিন্দা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাতে যে কোন সুফল ফলিয়াছিল, তাহা বোধ হয় না। তাহার কারণ, যে মনোভাব লইয়া এই সব ইংরেজ—বড়লাট হইতে এঞ্জিনিয়ার পর্য্যন্ত—কায করিয়াছেন, সেই মনোভাবে এ দেশের লোকের ও তাহাদিগের পুরাকীর্ত্তির প্রতি শ্রদ্ধার স্থান নাই। যে দৈপায়ন সঙ্কীর্ণতা ও দম্ভ হেতু লর্ড মেকলে বলিয়াছিলেন, প্রাচীর সমগ্র সাহিত্যও ইংরেজের পুস্তকাগারের একটি আলমারীর একটিমাত্র তাকের পুস্তকের সহিত তুলিত হইতে পারে না, সেই সঙ্কীর্ণতা ও দম্ভই এই সকল ইংরেজকে এ দেশের পুরাকীর্ত্তি-রক্ষায়—সভ্য জাতিমাত্রেরই কর্ত্তব্যে অনবহিত করিয়াছিল।

লর্ড কার্জ্জন এ দেশে পুরাকীর্ত্তি রক্ষার্থ যে আইন বিধিবদ্ধ করেন, তাহার পূর্ব্বে কত কীর্ত্তি লোপ পাইয়াছে, কে

তাহা বলিতে পারে ? ইসলামাতিরিক্ত ধর্মদ্বেষী ঔরঙ্গজেবের কুকীর্ত্তি যেমন বৃন্দাবনে গোবিন্দজীর ভগ্নশীর্ষ ও মদন-মোহনের ত্যক্ত মন্দিরে এবং বারাণসীর বক্ষে বিশ্বনাথের মন্দিরের স্থানে নির্ম্মিত মসজেদে সপ্রকাশ—তেমনই ইংরেজের পুরাবস্তু-ধ্বংসকারী কার্য্য নানা স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়। ঔরঙ্গজেব ইসলামাতিরিক্ত ধর্ম্মের প্রতি বিদ্বেষ-বশে যে কায করিয়াছিলেন, ইংরেজরা ইংরেজাতিরিক্ত জাতির প্রতি শ্রদ্ধাবুদ্ধির অভাবহেতু তাহাই করিয়াছিলেন; ফল একই হইয়াছে।

লাড়লী বেগম ফতেপুর সিক্রীর প্রসিদ্ধ পীর সেলিম চিস্তির বংশধর ইসলাম খাঁর পত্নী ছিলেন—তাঁহার স্বামী জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে বাঙ্গালার শাসক হইয়াছিলেন; ১৬০৮ খৃষ্টাব্দে অর্থাৎ তাঁহার স্বামীর মৃত্যুর পাচ বৎসর পূর্ব্বে লাড়লী বেগমের মৃত্যু হয়।

এই স্থানে আকবরের সমাধি-সৌধের নিকটে অবস্থিত আর এক জন মহিলার শেষ-শয়নস্থানের উল্লেখ করিব। ইনি—মিরিয়ম জামানী। ইনি আকবরের অন্যতমা পত্নী ছিলেন। ইনি কোন্ জাতীয়া ছিলেন, সে সম্বন্ধে মতভেদ আছে। তবে প্রচলিত মত, ইনি খৃষ্টানবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং বাদশাহের উপর এই সুন্দরীর যথেষ্ট প্রভাব থাকায় আকবর খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বীদিগকে কোনরূপে উৎপীড়িত করিতেন না। কিছু দিন পূর্ব্বে একখানি চিত্র পাওয়া যায়, এবং সেখানি আকবর ও মিরিয়ম বেগমের বলিয়া কেহ কেহ মত প্রকাশও করিয়াছিলেন। চিত্রখানি পুরাতন হইলেও চিত্রে চিত্রিতা রমণীই মিরিয়ম কি না, তাহা নিশ্চয় বলা যায় না। মোগল বাদশাহ যে তাঁহার পত্নীর চিত্র অঙ্কিত করিতে দিবেন, ইহাও মনে হয় না। তবে মোগল-শুদ্ধান্তে মহিলারা যে কেহ কেহ চিত্রাঙ্কন-কৌশলের অনুশীলন করিয়াছিলেন, তাহা যদি সত্য হয়, তবে ইহা তাঁহাদিগের কাহারও অঙ্কিতও হইতে পারে। ফতেপুর সিক্রীতেও মিরিয়মের মহল বলিয়া একটি মহল দেখান হয়। সে যাহাই হউক, যে স্থানে এই সমাধি বিদ্যমান, তাহাই সম্রাট সিকন্দর লোদীর গ্রীষ্মাবাস বা বারদ্বারী ছিল। ইহা ১৪৯৫ খৃষ্টাব্দে তাঁহার দ্বারা নির্ম্মিত হয়। এই দ্বিতল গৃহ লোহিত বালু-প্রস্তরে নির্ম্মিত এবং আগ্রার অত্যন্ত পুরাতন গৃহগুলির অন্যতম। সেকেন্দর লোদীই, বোধ হয়, প্রথম আগ্রায় মুসলমাননগর প্রতিষ্ঠা করেন।

আকবর ও তাঁহার খৃষ্টান পত্নী

এই উদ্যান হইতে অনতিদূরে কান্দাহারী বাগে সাহজাহানের প্রথমা পত্নী—কান্দাহারী বেগমের সমাধি।

ইনি পারস্যের রাজবংশীয় মুজাফ্ফর হোসেনের দুহিতা ছিলেন।

ইন্দ্রনীলমণিনীলজলবেণীরম্যা কালিন্দীর কূলে মর্ম্মরে রচিত প্রেমস্বপ্ন তাজমহল যেমন সাহজাহানের আর সব সৌধের সৌন্দর্য্য ম্লান করিয়াছে, তেমনই তাঁহার যে পত্নীর জন্য সেই সমাধিসৌধ নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাঁহার গৌরব সাহজাহানের আর সব পত্নীর গৌরব এমন মলিন করিয়াছে যে, ইতিহাসেও আজ আর তাঁহাদিগের সন্ধান পাওয়া দুষ্কর। তাঁহারা যেন ইতিহাসের উপেক্ষিতা। কান্দাহারী বেগমের সম্বন্ধে তাহাই বলা যাইতে পারে। সাহজাহানের মমতাজের প্রতি আনুরক্তি ও তাঁহার বিয়োগে শোকের কথা সমসাময়িক ঐতিহাসিকরা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন এবং তাজমহলই পতিপত্নীর সেই প্রেমকে কাব্যের বিষয় করিয়াছে। ১৬১২ খৃষ্টাব্দে সাহজাহানের সহিত মমতাজের বিবাহ হয়। তখন সাহজাহান খুরাম নামে পরিচিত। তখন তাঁহার পত্নী কান্দাহারী বেগম জীবিতা। তবে মমতাজই সাহজাহানের—"গৃহিণী সচিব সখী" ছিলেন এবং তাঁহারই গর্ভে সাহজাহানের ১৪টি সন্তান হয়—শেষ সন্তানটি প্রসব করিবার পরই তাঁহার মৃত্যু হয়। তখন সম্রাট খাঁ জাঁহান লোদীর সহিত যুদ্ধ করিতে যাইয়া বুরহানপুরে শিবির-সন্নিবেশ করিয়াছিলেন এবং মমতাজও তাঁহার সঙ্গে ছিলেন।

কান্দাহারী বেগমের মৃত্যু-কাল ও মৃত্যুর কারণ জানা যায় না এবং তাঁহার সমাধি-সৌধও প্রসিদ্ধি লাভ করিতে পারে নাই।

পথে আর একটি দ্রষ্টব্য বস্তু আছে—লালপাতরে ক্ষোদিত একটি পূর্ণাঙ্গ অশ্বমূর্ত্তি। এই বিস্ময়কর বস্তুর ইতিহাস পাওয়া যায় না এবং ঔরঙ্গজেবের মূর্ত্তিদ্বেষ যে ইহাকে নষ্ট করে নাই, তাহাও বিস্ময়ের বিষয়। জীবের প্রতিকৃতি পটে বা প্রস্তরে রচনা ইসলামের নির্দ্দেশ-বিরুদ্ধ বলিয়া ঔরঙ্গজেবের আদেশে বা তাঁহার সন্তোষবিধানের জন্য বহু শিল্পকীর্ত্তি নষ্ট করা হইয়াছিল। লকউড কিপলিং লিখিয়াছেন—

"You may hear, when going over palaces in Rajputana, of elaborate carvings in stone, which on a threatening hint from the iconoclastic court at Delhi, were hastily covered up with plaster."

এই অশ্ব সম্বন্ধে দ্বিবিধ কিম্বদন্তী আছে। একটি এইরূপ:—কোন অশ্বারোহী দিল্লী হইতে আগ্রায় আসিবার সময় পথে এই স্থানে—আগ্রার উপকণ্ঠে আসিয়া কোন বৃদ্ধাকে—আগ্রা আর কত দূর, জিজ্ঞাসা করেন। অশ্বারোহী যে আগ্রা কোথায় জানেন না, ইহা বিশ্বাস করিতে না পারিয়া বৃদ্ধা তাঁহার জিজ্ঞাসা ব্যঙ্গ মনে করিয়া বিরক্তিভরে বলেন—"যত পথ আসিয়াছ, আর তত পথ।" এই উত্তরে শ্রান্ত অশ্বারোহী আগ্রায় উপনীত হওয়া সম্বন্ধে হতাশ হইয়া পড়েন এবং তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার স্মৃতিরক্ষার্থ এই অশ্বের মূর্ত্তি এই স্থানে প্রতিষ্ঠিত হয়; নিকটস্থ সমাধিটি আরোহীর।

দ্বিতীয় কিম্বদন্তী—কোন ধনীর প্রিয় অশ্ব এই স্থানে নিহত হইলে তিনি এই অশ্বমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেন। অশ্বের চালকও নিহত হইয়াছিল—নিকটস্থ সমাধি তাহার।

কোন কিম্বদন্তী সত্য কি না বলা যায় না।

অদূরে গুরু-কা-তালাও; বৃহদায়তন জলাশয়—এখন শুকাইয়া গিয়াছে। এই জলাশয় ও তাহার নিকটস্থ ভগ্ন গৃহগুলি সিকন্দর লোদীর কীর্ত্তি বলিয়া প্রকাশ।

[ক্রমশঃ।

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ।

সাময়িক প্রসঙ্গ

কার্সিয়ঙ্গে সুভাষচন্দ্র

গত ৬ই জ্যৈষ্ঠ (২০ মে) তারিখে সুভাষচন্দ্র বসুকে কার্সিয়ঙ্গে তাঁহার ভ্রাতা শ্রীযুত শরৎচন্দ্র বসুর গৃহে আনিয়া তথায় আটক করিয়া রাখা হইয়াছে। শ্রীযুত শরৎচন্দ্র বসুকে যে যে সর্ত্তে তথায় আটক রাখা হইয়াছিল, সুভাষ বাবুকে সেই সেই সর্ত্তে তথায় আটক রাখা হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ। গত ৮ই জ্যৈষ্ঠ

শ্রীসুভাষচন্দ্র বসু

সুভাষ বাবুকে ঝাঁসী এক্সপ্রেস ট্রেণে লক্ষ্ণৌতে লইয়া যাওয়া হইয়াছিল। তথা হইতে আমগাও প্যাসেঞ্জার ট্রেণে তাঁহাকে লইয়া যাওয়া হয়। এই সংবাদ যাহাতে পূর্ব্বে প্রকাশ না পায়, তাহার জন্য সরকারপক্ষ সাবধানতা অবলম্বন করিয়াছিলেন। কিন্তু সংবাদ পাইয়া ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য মোহনলাল সাকসেনা প্রভৃতি সুভাষ বাবুকে দেখিবার জন্য চারবাগের সেণ্ট্রাল ষ্টেশনে উপস্থিত হইয়াছিলেন। তাঁহারা প্রথমে মনে করেন যে, পুলিস তাঁহাদের আকাঙ্ক্ষা ব্যর্থ করিয়া দিবার জন্য সুভাষচন্দ্রকে অন্যত্র লইয়া গিয়াছে; তাই আর এক দল কংগ্রেসকর্ম্মী লক্ষ্ণৌ সিটি ষ্টেশনে গমন করেন। তথায় তাঁহারা দেখিতে পান যে, সুভাষ বাবু আমগাও প্যাসেঞ্জার ট্রেণের প্রথম শ্রেণীর একটি কামরায় বসিয়া আছেন। বঙ্গীয় পুলিস তাঁহার পাহারায় নিযুক্ত। তাঁহাকে তথায় যাঁহারা দেখিয়াছিলেন, তাঁহারা তাঁহাকে দুর্ব্বল মনে করিয়াছিলেন। শ্রীযুত শরৎচন্দ্র বসু কার্সিয়ঙ্গে গিয়া ১৬ই জ্যৈষ্ঠ সুভাষ বসুর সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। যাহা হউক, সরকার যে তাঁহার প্রতি এটুকু অনুগ্রহ করিয়াছেন, ইহা সুখের কথা। আশা করি, এইবার সরকার তাঁহাকে মুক্তি দিয়া তাঁহার প্রতি সুবিচার করিবেন। কৃষ্ণদাসের দ্বিতীয় চিঠি প্রকাশের পর আর তাঁহাকে আটক রাখা সঙ্গত হইবে না।

বাঙ্গালা বানানের নূতন নিয়ম

হাতে কায না থাকিলে অনেক লোক খুড়োর গঙ্গাযাত্রার উদ্যোগ করে। আমাদের কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দেখিতেছি, হাতে কায নাই, তাই তাঁহারা খুড়োর গঙ্গাযাত্রারূপ বাঙ্গালা বানানের সংস্কার বা সংহারকার্য্যে মন দিয়াছেন। তাঁহারা দুই আনা মূল্যের একখানা "বাঙ্গালা বানানের নূতন নিয়ম" নামধেয় পুস্তিকা প্রকাশ করিয়াছেন। তাহা পাঠ করিয়া আমাদের ধারণা জন্মিয়াছে যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তাদের ধারণা এই যে, বাঙ্গালা ভাষাটা এবং বাঙ্গালা বানানটা এক তাল বেওয়ারিস ময়দা, সুতরাং যাহার যেরূপ ইচ্ছা সে সেইরূপ ভাবে উহা ঠাসিতে পারে। আসল কথা, আজকাল কতক লোক বাঙ্গালাভাষা শিক্ষা করিবে না, বর্ণ-তত্ত্ব বুঝিবে না,—কাজেই মাতৃভাষায় তাহাদের পক্ষে লেখাপড়া করা কঠিন হয়। বিশেষ বানানের ব্যাপারে ত' কথাই নাই। তাহাদের কলরবে বাঙ্গালা বানানের একটা হেস্তনেস্ত করিবার জন্য একটা চেষ্টা হইতেছে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক প্রকাশিত পুস্তিকাখানিতে সেই কথারই আলোচনা হইয়াছে। তরুণ ভাইস-চান্সলার শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় উহার ভূমিকায় বলিয়াছেন যে, "বাঙ্গালা ভাষায় প্রচলিত শব্দ-সমূহের মধ্যে যেগুলি সংস্কৃত ভাষা হইতে অপরিবর্ত্তিতভাবে আসিয়াছে, তাহাদের বানান প্রায় সুনির্দ্দিষ্ট" সুতরাং তাঁহার কথার ভঙ্গীতে বোধ হইল, যে সকল শব্দ সংস্কৃত নহে অর্থাৎ যেগুলি দেশজ বা অজ্ঞাতমূল, বিদেশাগত অথবা সংস্কৃত বা বিদেশী শব্দের অপভ্রংশ, তাহাদের বানানে বহুস্থলে ভিন্নতা দেখা যায়, সুতরাং সেই সকল শব্দের বানানের একটা বাঁধা-ধরা নিয়ম করিবার কথা হইয়াছে। বিদেশাগত শব্দের অপভ্রংশের সহিত সংস্কৃত শব্দের অপভ্রংশকে একপর্য্যায়ে ফেলা কোনমতেই সঙ্গত হইতে পারে না। কেন না, মানুষের যেমন পিতৃ-পরিচয়ের প্রয়োজন, শব্দেরও সেইরূপ পিতৃ-পরিচয়ের প্রয়োজন আছে। নতুবা শব্দের স্বরূপ নির্ণয় করা সম্ভব হইবে না। মনে করুন, বাঙ্গালা কাণ শব্দ। উহা সংস্কৃত কর্ণ শব্দ হইতে অপভ্রষ্ট হইয়া বাঙ্গালায় আসিয়াছে। উহার ঐ মূর্দ্ধণ্য ণটি রাখিলে উহা যে কর্ণ শব্দ হইতে আগত, তাহার একটু পরিচয় পাওয়া যায়; কিন্তু কান বলিলে সেটা আর থাকে না। কাণ লিখিতেও যে কষ্ট, কান লিখিতেও সেই কষ্ট, তবে এই অতীতের সম্বন্ধ যত দূর সম্ভব ঘুচাইবার প্রয়োজন কি? অনর্থক প্রচলিত ব্যবস্থাকে বিপর্য্যস্ত না করিলে কি বাহাদুরী প্রকাশ পায় না? ইহা নাকি মধ্যম পন্থা। উত্তম পন্থা অবলম্বন করিলে, বোধ হয়, বাঙ্গালা হরপ

পর্য্যন্ত লোপাপত্তি পাইবে। সুতরাং আমরা ঐ সকল অপভ্রষ্ট শব্দের ষত্ব-ণত্ব বদলাইয়া ফেলিবার পক্ষপাতী নহি।

বিশ্ববিদ্যালয়ের কমিটী ঠিক করিয়া দিয়াছেন যে, অহঙ্কার, ভয়ঙ্কর প্রভৃতি শব্দ অহংকার ও ভয়ংকর লিখিতে হইবে। কেন অহঙ্কার ভয়ঙ্করই থাকুক না? উহাদিগকে ভাষায় অপাংক্তেয় করিলে কি লাভ হইবে? যদি কোন ছাত্র অহঙ্কার বা ভয়ঙ্কর লেখে, তাহা হইলে তাহার নম্বর কাটা যাইবে কোন্ অপরাধে? যখন সংজ্ঞাত এবং সঙ্গাত, স্বয়ম্ভূ এবং স্বয়ংভূ উভয়কেই পাংক্তেয় রাখা হইল, তখন অহঙ্কার ও ভয়ঙ্করকে বর্জ্জন করিবার যুক্তি বিশেষ বুঝিলাম না। লাইনো টাইপের 'কী বোর্ডের' দিকে দৃষ্টি রাখিয়া বানান সংস্কার করিতে গেলে তাহাতে নানা গোলযোগ ঘটিবে। বিদেশী যন্ত্রের প্রসারবৃদ্ধির ও সুবিধার জন্য বানান-বিভ্রাট ঘটান কখনই উচিত নহে।

আবার বানানটা উচ্চারণের অনুযায়ী করিবার জন্য বিশ্ব-বিদ্যালয়ের বিদ্যাদিগ্‌গজদিগের বাতিক চাগিয়া উঠিয়াছে। এই বিষয়ে, বোধ হয়, তাঁহারা মার্কিণের পদাঙ্ক অনুসরণ করিতে চাহেন। নকলনবিশী ছাড়া মৌলিকতার পরিচয় তাঁহারা যে, কখনও বিশেষ দিতে পারিয়াছেন, তাহা মনে হয় না। কিন্তু মার্কিণীরা এমন ভাবে ভাষার পূর্ব্ববর্ত্তী ব্যবস্থার সহিত সর্ব্বসম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিয়া শব্দের পরিবর্ত্তন করেন নাই। মার্কিণরা although স্থানে altho লেখেন বটে, কিন্তু through স্থানে throo লেখেন না বা enoughএর স্থানে উচ্চারণের অনুরোধে enuf লেখেন না। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের বিদ্যাবাগীশগণ তাহা মানিবেন না। তাঁহারা পূর্ব্বজগণের সহিত সম্বন্ধ ছেদনের জন্যই ব্যস্ত। ঢাক এই কথাটি কোন কোন অঞ্চলের লোক ডাক এইরূপ উচ্চারণ করে। আমাদের এই অঞ্চলের এক জামাই ঐ অঞ্চলে শ্বশুরবাড়ীতে গিয়াছিলেন। পূজার সময় ঢাকের বাদ্য শুনিয়া জামাই তাহার শ্যালককে জিজ্ঞাসা করেন, ঢাক বাজে কোথায়? তখন উভয়ের ঢাক শব্দের উচ্চারণ লইয়া তর্ক উপস্থিত হয়। শ্বশুরকে মধ্যস্থ মানা হয়। শ্বশুর বলেন, ও ঢাক বল্‌লেও হয়, ডাক্ বল্‌লেও হয়। অনেক স্থলে লেখে শাক, বলে হাগ। এখন বানানটা কাহাদের উচ্চারণানুগ হইবে? অন্য আর এক অঞ্চলের বঙ্গবাসীরা 'স্ত্রীর' লেখেন, কিন্তু উচ্চারণ করেন স্ত্রীয়ের। তাঁহারাও বাঙ্গালী। বানানটা তাঁহাদের উচ্চারণ অনুযায়ী না হইয়া কলিকাতার নিকটবর্ত্তী স্থানের অনুযায়ী বা পিরালিদের মত কর' হইবে কেন? ইহার যুক্তি কি? আমরা লিখি 'সেকরা,' পড়ি স্যাকরা। অনেক স্থলে সেখরাও পড়ে। অনেক স্থলে লেখে বাঁশ, পড়ে বাশ। সুতরাং আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের এই বিদ্‌কুটে প্রস্তাবের সমর্থন করি না। ঙ অক্ষরকে লক্ষ্য করিয়া কিছুদিন পূর্ব্বে বাঙ্গালী কবি লিখিয়াছিলেন—

"মাথায় পাকড়ি সার, ব্রীফলেস ব্যারিষ্টার
ক বর্গের পঞ্চমবর্ণ ওরে আমার।"

বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃপায় ঙ এবার অনেক client পাইলেন। বাঙালি তাহার client হইল; সঙ্গে সঙ্গে আঙুল ও রঙ আসিয়া ঙর পসার জাঁকাইয়া তুলিল।

বিশ্ববিদ্যালয়ের পুস্তিকায় লেখা হইয়াছে—ইরা, উরা প্রত্যয়ান্ত কতকগুলি শব্দের চলিত (ও আধুনিক সাধু) রূপ এই প্রকার হইবে; এক ঘরে, জাট, কটমটে ইত্যাদি। তাহার পর লেখা হইয়াছে যে, উপান্ত্য বর্ণে ও-কার ধ্বনি বুঝাইবার জন্য বিকল্পে ঊর্দ্ধ কমা দেওয়া যাইতে পারে। যথা এক ক'রে জ'লো। যদি সেই বিকল্পের ব্যবস্থাই রাখিতে হইল, তাহা হইলে অহঙ্কার, ভয়ঙ্কর কি অপরাধ করিল?

কমিটী ধার্য্য করিয়া দিয়াছেন, "ইংরেজির st স্থানে নূতন সংযুক্তবর্ণ সৃট বিধেয় যথা স্টেশন।" কিন্তু অনভ্যস্ত চক্ষু তে সেটশন পড়িবে। কেবল লাইনো টাইপের কী বোর্ডের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া এইরূপ ব্যবস্থা করিলে যে সমস্ত বাঙ্গালী জাতির লিখিবার এবং পড়িবার ঘোর অসুবিধা ঘটিবে, তাহা নহে, তাঁহাদের চক্ষু এই প্রকার লেখা পড়িতে অভ্যস্ত হইলে আর তাঁহারা পুরাতন বানানে ছাপা পুস্তকাদি পড়িতে পারিবেন না। বিশ্বপণ্ডিতদিগের কমিটী সে কথা ভাবিয়া দেখিয়াছেন কি? এখন কি লাইনো টাইপের অনুরোধে পূর্ব্ববর্ত্তী সাহিত্যের সহিত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিতে হইবে? এ কি অনাচার!

ংএর স্থানে বিশ্ববিদ্যালয় নূতন চিহ্ন ব্যবহারের বিধান দিয়াছেন। একে উনপঞ্চাশ বর্ণ লইয়া আমরা ব্যতিব্যস্ত, তাহার উপর আবার নূতন চিহ্ন। ইহাই কি তাঁহাদের উনপঞ্চাশ বায়ুর প্রকোপ ঢাকিবার ব্যবস্থা?

বাঙ্গালার বহু ভদ্র যুবক এখন কম্পোজের কায—বাঙ্গালা অক্ষর প্রস্তুতের কায করিয়া অন্নসংস্থান করিতেছেন। যে সকল তথাকথিত জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্র বাঙ্গালার বেকারসমস্যা-সমাধানের জন্য অতিমাত্রায় ব্যাকুল, কুটীরশিল্প প্রসারের জন্য যাঁহাদের চোখে অশ্রুবন্যা বহিয়া যায়, তাঁহারা এই সকল শিক্ষিত যুবককে উপার্জ্জনে বঞ্চিত করিবার জন্য বিদেশী যন্ত্র প্রচলনে বিদেশের সম্পদবৃদ্ধির জন্য ব্যস্ত হইয়াছেন। তরুণ ভাইসচ্যান্সেলারের নেতৃত্বে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ও কম্পোজের যন্ত্র প্রতিষ্ঠার সুবিধা করিয়া দিবার জন্য নিরঙ্কুশ ক্ষমতা প্রয়োগ করিতেছেন দেখিয়া আমরা অত্যন্ত বিস্মিত হইয়াছি। লাইনো মেসিনে কম্পোজের অনুরোধে বাঙ্গালা বানানের পরিবর্ত্তনে সচেষ্ট না হইয়া তাঁহারা প্রচলিত বানান অনুসারে মেসিনের ছাঁচ করাইবার প্রচেষ্টা করিলে তাঁহাদের প্রয়াস সার্থক হইতে পারিত। যে বিশ্ব-বিদ্যালয়লব্ধ শিক্ষার ফলে অন্নসংস্থান হয় না—বেকার—উমেদারের সংখ্যা দিন দিন প্রবর্দ্ধিত হইতেছে—সেই বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের পক্ষে বানান সংস্কারের নামে সাহিত্য-সংহারের অন্তরালে বিদেশী বণিকের সম্পদবৃদ্ধির সহায়তার প্রচেষ্টা—সঙ্গে সঙ্গে বহু ভদ্রপরিবারের অন্নহানির প্রয়াস—বেকারসমস্যাবৃদ্ধির উদ্যম যে উচ্চ প্রশংসার যোগ্য, তাহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই!

বঙ্গে দুর্ভিক্ষ

আজ সারা বাঙ্গালা জুড়িয়া অন্নহীনের আর্ত্তনাদ উঠিতেছে প্রথমে বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া, বীরভূম প্রভৃতি জেলা হইতে ক্ষুধিতের আর্ত্তনাদ উত্থিত হইয়াছিল, এখন দেখা যাইতেছে, এই হাহাকার বাঙ্গালায় প্রায় সর্ব্বব্যাপী। এখন ২৪ পরগণা, নদীয়া, যশোহর, খুলনা, হুগলী প্রভৃতি জেলা হইতে দারুণ উদ্বেগজনক সংবাদ পাওয়া যাইতেছে। ভদ্রসন্তানদিগের মধ্যে অনেকেই বুক

ফাটিলেও মুখ ফুটিয়া কোন কথা বলিতে পারিতেছেন না। প্রায় ৩০ বৎসর পূর্ব্বে সুধী রমেশচন্দ্র দত্ত বলিয়াছিলেন যে, বাঙ্গালার চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত আছে বলিয়া বাঙ্গালায় দুর্ভিক্ষ অধিক হয় না। আজ বাঙ্গালীর ছেলে সেই চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের উপর কুবুদ্ধির বশে খড়্গহস্ত। এ দিকে দুর্ভিক্ষও বাঙ্গালায় যেন জাঁকিয়া বসিয়াছে। গত তিন বৎসরকাল বাঙ্গালাদেশে নিয়মিতভাবে এবং পর্য্যাপ্ত পরিমাণে বারিপাত হয় নাই,—সেজন্য অজন্মা হইয়াছে। সেজন্য শস্য অল্প জন্মিয়াছিল,—কাযেই প্রায় কাহারও ঘরে মজুদ ধান নাই। তাহার উপর গত বৎসর বর্ষা অল্প হইয়াছিল। ফলে এবার প্রায় সমস্ত বঙ্গদেশেই অন্নহীনের হাহাকার উঠিয়াছে। সম্প্রতি বাঙ্গালার কোন কোন জেলায় প্রচুর বারিপাত হইয়াছে। কিন্তু যাহার উপর বিধাতা বাম, তাহার সকল ব্যাপারের ফলই বিপরীত হইয়া থাকে। আমরা ২৪ পরগণার উত্তর এবং যশোহরের দক্ষিণস্থ কতকগুলি স্থান হইতে সংবাদ পাইলাম যে, ঐ অঞ্চলে কয় দিনের জলে জমিতে ঘাস এত অধিক জন্মিয়াছে যে, এবার আশুধান্য অধিক জন্মিবে না। চাষীরা কষ্ট করিয়াও এই ঘাস মারিতে পারিতেছে না। সুতরাং এই বারিপাত দেখিয়া যাঁহারা মনে করিতেছেন যে, বুঝি বা বাঙ্গালীর দুঃখের অবসান হইল,—তাঁহারা সিদ্ধান্তকার্য্যটা আপাততঃ স্থগিত রাখুন। অনেক কৃষক জঠরজ্বালায় দগ্ধ হইয়া বীজ-ধান খাইয়া ফেলিয়াছে। আমন ধান বুনিবার সময় তাহারা কি বুনিবে, তাহা ভাবিয়া পাইতেছে না। সরকার অবশ্য অর্থসাহায্য করিতেছেন। কিন্তু বিপদের তুলনায় সে সাহায্যের পরিমাণ এত অল্প যে, তাহাতে বিশেষ কোন ফল ফলিবে না। যে সুন্দরবনের ধান বাঙ্গালাকে এত দিন রক্ষা করিয়া আসিতেছে, আজ সেই সুন্দরবনের গোলা শূন্য। বাঙ্গালার বহু স্থানের লোক অন্নহীন, বস্ত্রহীন এবং জলহীন হইয়াছিল। যেরূপ বর্ষা নামিয়াছে, তাহাতে মনে হইতেছে যে, জলকষ্ট শীঘ্র ঘুচিতে পারে, কিন্তু অন্নবস্ত্রের কষ্ট সহজে ঘুচিবার নহে। এক কালীনগর কেন্দ্রেই শত শত দুর্ভিক্ষ-ক্লিষ্ট নরনারী এককালীন দান গ্রহণের জন্য সমবেত হইয়াছিল। সেখানে ২ শত যোড়া কাপড় বিতরিত হইলেও অনেক লোক কাপড় পায় নাই। সরকার ২৪ পরগণা জেলায় এককালীন দানের জন্য ১০ হাজার টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন, জেলাবোর্ড এক হাজার টাকা দিবেন বলিয়াছেন, আর ২৪ পরগণার ম্যাজিষ্ট্রেট সাধারণের নিকট হইতে দুঃস্থ লোকের সাহায্যের জন্য ২৭ হাজার টাকা সংগ্রহ করিয়াছেন। ইহা ভিন্ন সরকার কৃষি এবং জমির উন্নতিসাধনকল্পে প্রদত্ত ঋণের টাকা ব্যতীত নানা বাবদে সাহায্যার্থ ২৪ পরগণার জন্য ৫ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন। এখানে একটা কথা সকলেরই স্মরণ রাখিতে হইবে যে, দরিদ্র ভদ্রলোকদিগের এবং বিধবা, নাবালক ও রুগ্ন ব্যক্তিদিগের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছে।

বাঙ্গালা সরকারের রাজস্ব বিভাগের সদস্য শ্রীযুত বিজয়-কুমার বসু এ বিষয়ে বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া দেখিয়াছেন কি? বাঙ্গালার মন্ত্রী সার বিজয়প্রসাদ সিংহরায় বর্দ্ধমান অঞ্চলের লোকের আর্থিক অবস্থা দেখিয়া তথ্য সংগ্রহ করিবেন কথা ছিল। কিন্তু তিনি আগামী নির্ব্বাচনের জন্য ভোট সংগ্রহে যত ব্যস্ত ছিলেন, দুর্ভিক্ষপীড়িতদিগের অবস্থাগত তথ্য সংগ্রহের জন্য ততটা ব্যস্ত ছিলেন কি না, সে সংবাদ আমরা পাই নাই। তিনি তাঁহার জেলাবাসী বিপন্নদিগের সাহায্যার্থ কয়টি টাকা দান করিয়াছেন? ইঁহারাই প্রজার প্রতিনিধি! হায় অদৃষ্ট! এই উপলক্ষে আমরা একটা কথা সরকারকে এবং সাধারণকে বিশেষভাবে স্মরণ রাখিতে বলি। এবার বারিপাত আরম্ভ হইয়াছে দেখিয়া নিশ্চিন্ত হইবার কারণ ঘটে নাই। ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে বিহার এবং উত্তরবঙ্গে যে দুর্ভিক্ষ হইয়াছিল, তাহার পূর্ব্বেই তথায় ঠিক এই অবস্থাই ঘটিয়াছিল। সে বার প্রথমে এবারকার মত বর্ষণ হয় নাই। তাহার পর হঠাৎ বর্ষণের আধিক্যে ভাদুই শস্য বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তৎপরে শেষদিকে বর্ষণ এরূপ ভাবে বন্ধ হইয়া যায় যে, হৈমন্তিক শস্য নষ্ট হইয়া যায়। সেবার পূর্ব্ববঙ্গে এবং মধ্যবঙ্গেও বারিপাতের গোলযোগ হওয়াতে শস্য ভাল জন্মে নাই। ফলে সে বার বিহারে এবং উত্তর-বঙ্গে ঘোর দুর্ভিক্ষ ও মধ্যবঙ্গে কতকটা দুর্ভিক্ষ ঘটে। লর্ড নর্থব্রুক তখন ভারতের বড় লাট। তিনি লোকের প্রাণরক্ষা করিবার জন্য প্রথম হইতেই সুষ্ঠুনীতি অবলম্বন করেন। তাঁহার অনুসৃত নীতি সফল হইয়াছিল। সে বৎসর নয় মাসকাল ৭ লক্ষ ৩৫ হাজার লোক রিলিফ কাযে খাটিয়াছিল আর সাড়ে ৪ লক্ষ দুঃস্থ লোককে অনুগ্রহ করিয়া অর্থ দান করা হইয়াছিল। প্রায় ছয় মাস ধরিয়া ঐ অনুগ্রহ দান করা হইয়াছিল। সার জর্জ ক্যাম্পবেল স্পষ্টই লিখিয়াছিলেন যে, "বিপন্ন লোকদিগকে সাহায্য করিতে হইলে সময় থাকিতে তাহা করা উচিত।" আমরা বাঙ্গালার বর্ত্তমান গভর্ণর সার জন এণ্ডার্সনকে সেই দুর্ভিক্ষের প্রাক্কালে ২২শে অক্টোবর তারিখের প্রথম পত্রখানি পাঠ করিতে অনুরোধ করি। এবার স্থানে স্থানে অনাহারের ক্লেশে লোক আত্মহত্যা করিয়াছে এবং কদন্ন ভোজন করিয়া ওলাউঠায়—উদরাময়ে আক্রান্ত হইয়া মরিয়াছে, শুনা যাইতেছে। আমাদের মনে হয়, সাহায্যদান-ব্যবস্থা পূর্ব্বেই আরম্ভ হওয়া উচিত ছিল। চাষীদিগকে বীজধান ও হালের গরু কিনিবার জন্য বিশেষভাবে সাহায্যদান আবশ্যক।

সমাজতন্ত্রবাদে আতঙ্ক

পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু কংগ্রেসের সভাপতির পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া যে অভিভাষণ করিয়াছিলেন, তাহার সম্বন্ধে গত মাসেই আমাদের বক্তব্য সংক্ষেপেই বলিয়াছি। সংপ্রতি সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, সার নৌরজী সাকলাতওয়ালা, সার পুরুষোত্তমদাস ঠাকুরদাস, সার কওয়াসজী জাহাঙ্গীর প্রমুখ ২১ জন ধনিক তাঁহাদের নাম স্বাক্ষরিত একখানি ইস্তাহার প্রচার করিয়াছেন তাহাতে পণ্ডিত জওহরলালজী কর্তৃক সমাজতন্ত্রবাদ প্রচারে ঘোর আপত্তি করা হইয়াছে। যাহার যেখানে স্বার্থ নিহিত, সে তাহা রক্ষার জন্য স্বতঃ পরতঃ সজাগ হইয়া থাকে। ভারতের ইতিহাসে দেখা যায় যে, এ দেশের ধনীরা ধন উপার্জ্জন করিয়া সেই ধন সঞ্চিত করিয়া রাখিতেন না; তাহা ধর্ম্মকার্য্য উপলক্ষে নানা জনহিতকর ব্যাপারে ব্যয় করিতেন। তদ্ভিন্ন অতিথিসেবা, পুষ্করিণী খনন, বিদ্যালয়-স্থাপন, তুলাপুরুষদান, দুঃস্থকে সাহায্য দান প্রভৃতি কাযে ধনীরা সেই ধন ব্যয় করিতেন। কাযেই এ দেশে

ধনীর সহিত নির্দ্ধনের বিবাদ কখনই বাধে নাই। তাহা না করিলে তাঁহাদের উপর সামাজিক শাসন প্রযুক্ত হইত; লোকও ধর্ম্মবুদ্ধিবশে তাহা করিত। কিন্তু তাই বলিয়া আমরা সমাজতন্ত্রবাদের পক্ষপাতী নহি। সমাজতন্ত্রবাদ সর্ব্বপ্রকার ধর্ম্মবিশ্বাসের বিরোধী। সমাজতন্ত্রবাদীদিগের এক জন বড় চাঁই এ কথা উদাত্তস্বরে ঘোষণা করিয়াছেন যে—It is our duty as socialists to root out the faith in God with all the zeal; nor is any one worthy of the name who does not consecrate himself to the spread of atheism.

ভগবানের উপর বিশ্বাসের উচ্ছেদ করাই আমাদের সমাজতান্ত্রিকদিগের কর্ত্তব্য। যে ব্যক্তি নাস্তিক্য-প্রচারে আত্মনিয়োগ
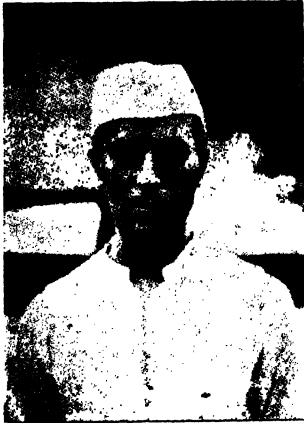
পণ্ডিত জওহরলাল

না করে, সে ব্যক্তি কখনই সমাজতন্ত্রবাদী নাম গ্রহণের যোগ্য নহে। কেবল তাহাই নহে। কয়েক বৎসরমাত্র পূর্ব্বে রুসিয়ায় কমিউনিষ্ট যুবকসঙ্ঘ লোকের মন হইতে ধর্ম্মসম্বন্ধীয় অনুভূতি ঝাড়ে-মূলে উৎপাটিত করিবার জন্য শোভাযাত্রা বাহির করিয়াছিল। উহারা পেট্রোগ্রাডে এবং মস্কো সহরে অনেকগুলি উচ্চ বধমঞ্চ নির্ম্মিত করিয়া, তাহার উপর যীশুখৃষ্ট এবং কুমারী মেরীর প্রতিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়া, সেগুলির মস্তকচ্ছেদন করিয়াছিল। সোভিয়েট শাসন এতই মনোহারী এবং শুভজনক যে, রুসিয়া হইতে ধর্ম্মভাব বিদূরিত করিবার জন্য তথাকার কমিউনিষ্ট সরকার সহস্র সহস্র ধার্ম্মিক লোককে এবং ধর্ম্মযাজককে ঘোর অত্যাচারে প্রপীড়িত করিয়া তুলিয়াছিলেন। সে কয় বৎসর পূর্ব্বের কথা? সে অত্যাচার মধ্য-যুগের ইনকুইজিসনের অত্যাচার অপেক্ষা কম নহে। স্বাধীন মত প্রকাশের জন্য গ্যালিলিও এবং ব্রুণোকে যেরূপ নির্য্যাতন সহ্য করিতে হইয়াছিল, রুসিয়ার বহু ধর্ম্মপ্রাণ লোককে তাহা অপেক্ষা বিশেষ অল্প নির্য্যাতন ভোগ করিতে হয় নাই। সাইবেরিয়ার বন্দিশালায় এখনও কত ধর্ম্মপ্রাণ রুস আবদ্ধ আছেন, জওহরলালজী তাহার সন্ধান লইয়াছেন কি? সমাজতন্ত্রবাদ প্রতিষ্ঠিত হইলে দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইবে, লোকের দুঃখ-দৈন্য থাকিবে না, এ কথা কতখানি ভুল, তাহা রুসিয়ার দিকে চাহিলেই বুঝা যায়। জারের আমলে রুসিয়ার এক লক্ষ সৈন্যও ছিল না। ১৯৩২-৩৩ খৃষ্টাব্দে উহা ৫ লক্ষ ৬২ হাজারেরও উপর দাঁড়ায়। আবার কয়েক মাস মাত্র পূর্ব্বে এক জন রুস সেনানায়ক গর্ব্ব করিয়া বলিয়াছেন যে, রুসিয়া এখন ১০ লক্ষ শিক্ষিত সৈন্য রণক্ষেত্রে হাজির করিতে পারে। ইহাতেই রুসিয়ায় শান্তি কতখানি প্রতিষ্ঠিত, তাহা সুপ্রকাশ। পণ্ডিত জওহরলাল ঐ ২১ ব্যক্তির স্বাক্ষরিত ইস্তাহার পাঠ করিয়া 'বোম্বাই ক্রনিক্যালের' বিশেষ প্রতিনিধির সহিত যে কথা বলিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার বিশেষ অজ্ঞতারই পরিচয় পাওয়া যায়। বোম্বাইয়ের ২১ জন ভদ্রলোক স্বাক্ষরিত ইস্তাহারে ধর্ম্ম বিপন্ন হইবার কথা বলা হইয়াছে বলিয়া তিনি বিদ্রূপ করিয়া বলিয়াছেন, "ঐ ২১ জন লোক যে বোম্বাই সহরে ধর্ম্মযাজক বা ধর্ম্মরক্ষক, তাহা আমি জানিতাম না।" যেন ধর্ম্মযাজক এবং ধর্ম্মরক্ষক ভিন্ন অন্য কাহারও ধর্ম্ম সম্বন্ধে কথা বলিবার অধিকার নাই। তিনি আবার বলিয়াছেন যে, "আর্থিক নীতির আলোচনাকালে ধর্ম্মসংক্রান্ত কোন কথাই উঠিতে পারে না।" কেন, ধর্ম্ম আর অর্থ এই দুইটি কি মানব-প্রকৃতির মধ্যে দুইটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এবং পরস্পর-দুষ্প্রবেশ্য প্রকোষ্ঠে রক্ষিত না কি? অর্থ সংগ্রহ করিতে হইলে সমস্ত ধর্ম্মজ্ঞান বিসর্জ্জন দিয়া ষ্টালীনের ন্যায় দুর্ব্বলের সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিতে হইবে, ইহা কমিউনিজ্‌ম্ নীতি-সঙ্গত হইতে পারে, কিন্তু মনুষ্যত্বের নীতিসঙ্গত কখনই হইতে পারে না। তাহার পর তিনি বলিয়াছেন, "যদি বিশেষ অধিকার এবং সুবিধা ভোগের কথা না উঠে, তাহা হইলে ধর্ম্ম-সম্পর্কিত ব্যাপারে সকল প্রকার স্বাধীনতা থাকা উচিত।" সে ঔচিত্যের কথা তিনি এ দেশে প্রচার না করিয়া, তাঁহার নন্দনকানন সমাজতন্ত্রবাদ ও সর্ব্বস্বহরবাদের লীলাভূমি রুসিয়ায় যাইয়া প্রচার করিলে ভাল করিতেন।

যাহা হউক, আমরা বোম্বায়ের ইস্তাহারের ঐ ২১ জন স্বাক্ষরকারীর সমর্থন করি না। তবে সমাজতন্ত্রবাদ প্রচারে যে ধর্ম্ম বিপন্ন হইবে, সে কথার আমরা সম্পূর্ণ সমর্থন করি। একটা অন্ধ ভাবের ঝোঁকে কায করিলে তাহাতে ভুল হইবেই হইবে। আমরা এ সম্বন্ধে তাঁহার সহিত অধিক কথা বলিতে চাহি না।

আবদুল্লা গান্ধী

১৬ই জ্যৈষ্ঠ বোম্বাই হইতে সংবাদ আসিয়াছে, মহাত্মা গান্ধীর জ্যেষ্ঠ পুত্র হীরালাল গান্ধী ৫০ বৎসর বয়সে মুসলমানধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া ধন্য হইয়াছেন। ধর্ম্মান্তরগ্রহণ ব্যাপারটা নাকি পূর্ব্বেই নাগপুরে সুসম্পন্ন হইয়াছিল। ১৫ই জ্যৈষ্ঠ বোম্বায়ে জুম্মা মসজেদে নামাজ পাঠ শেষ হইলে তিনি ইসলাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া ঘোষণা করেন এবং আবদুল্লা নাম গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে তীব্র ভাষায় অন্যান্য ধর্ম্মের প্রতিকূল সমালোচনা করিতেও বিস্মৃত হন নাই। তাঁহার বক্তৃতা শুনিয়া সমবেত মুসলমান জনতা উচ্চৈঃস্বরে "আল্লা হো আকবর" ধ্বনি করিতে থাকে।

গত ফেব্রুয়ারী মাসে হীরালাল ভক্তিভরে বাইবেল পড়িয়া খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণে প্রবল আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন ; কিন্তু সম্প্রতি তিনি ঘোষণা করিয়াছেন যে, খৃষ্টধর্ম্মে তাঁহার রুচি নাই।

অনেকে বলেন, মহাত্মাজীর সহিত তাঁর মতভেদের ফলেই তাঁহার শ্রাদ্ধাধিকারী জ্যেষ্ঠ পুত্র তাঁহাকে পিণ্ড হইতে বঞ্চিত করিবার জন্যই ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিয়াছেন।

মহাত্মাজী কায়মনোবাক্যে অহিংসা সাধনা করিয়া সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন—সত্যাগ্রহের তিনি একমাত্র আবিষ্কর্ত্তা ও দীক্ষাগুরু। পিতা-পুত্রের মধ্যে মতবিবাদ যতই প্রবল হউক, মহাত্মাজীর প্রাণে বিদ্বেষবুদ্ধি প্রবেশ করিবার উপায় নাই। প্রেম ও সত্যের প্রভাবে যিনি সমগ্র ভারতের—এমন কি, বিদেশী শাসনকর্ত্তাদের হৃদয় পরিবর্ত্তনের জন্য বদ্ধপরিকর, তিনি যে বিদ্বেষবুদ্ধিদুষ্ট আত্মজের মনোবৃত্তি—ধর্ম্মবুদ্ধি পরিবর্ত্তনে সমর্থ হইবেন না—এ কথা নিতান্তই অশ্রদ্ধেয়।

ধর্ম্মান্তর গ্রহণের পর মহাত্মাজীর মুসলমান বন্ধুগণকে লিখিত যে দীর্ঘপত্র ২০শে জ্যৈষ্ঠের দৈনিক বসুমতীতে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার শেষাংশে তিনি লিখিয়াছেন,—"স্বীকার করিতেছি, ইহাতে আমি আঘাত পাইয়াছি, এ ব্যাপারের পশ্চাতে কোন ধর্ম্মবুদ্ধি আমি প্রত্যক্ষ করিতেছি না। যাঁহারা হীরালালকে ইসলাম ধর্ম্ম গ্রহণ করাইয়াছেন, তাঁহারা সামান্য সাবধানতাও অবলম্বন করেন নাই। হীরালালের নবধর্ম্ম গ্রহণে হিন্দুধর্ম্মের কিছুমাত্র ক্ষতি হইবে না। আমার আশঙ্কা এই যে, পূর্ব্ববৎ উচ্ছৃঙ্খল রহিয়া গেলে, হীরালালের ইসলাম ধর্ম্ম গ্রহণে উক্ত ধর্ম্ম দুর্ব্বলই হইবে। স্রষ্টার অন্তরের কথা জানেন একমাত্র স্রষ্টা। দীক্ষা এই স্রষ্ট ও স্রষ্টার সম্পর্ক হইতে উদ্ভূত। অন্তর নির্ম্মল না থাকিলে ধর্ম্ম গ্রহণ করার অর্থ ধর্ম্ম ও ভগবানকে অস্বীকার করা। অন্তর শোধন করিয়া না লইয়া ধর্ম্মে দীক্ষাদান সাধু ব্যক্তির নিকট আনন্দের বিষয় নহে—দুঃখের বিষয়।"

মহাত্মাজী জানেন, যে ধর্ম্ম হীরালালকে অধিক মূল্য প্রদান করিবে, তিনি সেই ধর্ম্মই সাদরে গ্রহণ করিতে প্রস্তুত ছিলেন। তথাপি তিনি মুসলমান বন্ধুগণকে হীরালালকে বর্জ্জন করিবার জন্য বৃথা অনুরোধ করিয়াছেন। মুসলমান-সমাজ হইতে হীরালালকে বর্জ্জন করা দূরের কথা, আগ্রায় নবাব মহম্মদ ফৈয়জ খাঁ হীরালাল—আবদুল্লাকে টেলিগ্রামে জানাইয়াছেন, হীরালাল প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভার সদস্যপদপ্রার্থী হইলে তিনি স্বয়ং সরিয়া দাঁড়াইয়া তাঁহার নির্ব্বাচনের পথ মুক্ত করিবেন। মুসলমান সাহায্যে কাউন্সিলে প্রবেশ করিতে পারিলে ভবিষ্যতে হীরালাল যুক্তপ্রদেশের শিক্ষামন্ত্রীর পদ লাভ করিতেও পারেন। মিউনিসিপ্যালিটীর কেরাণীর পদ বড় না এই দাঁও বড় ? সুতরাং মহাত্মাজী অরণ্যে রোদন করিয়াছেন।

অসবর্ণ বিবাহ আইন

কাশীস্থ শ্রীযুত ভগবান দাস হিন্দু-সমাজে অসবর্ণ বিবাহ চালাইবার জন্য আইনের একখানি পাণ্ডুলিপি ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থা-পরিষদে পেশ করিয়াছেন। হিন্দু-সমাজে অসবর্ণ বিবাহ আইনসিদ্ধ করিবার জন্যই তাঁহার এই প্রচেষ্টা। হিন্দু-সমাজের জাতিভেদ-প্রথা উচ্ছিন্ন করিবার জন্য যাঁহারা উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া আছেন, তাঁহাদের পক্ষে এই চেষ্টা নূতন নহে। যাহা হউক, এই প্রকার বিবাহ হিন্দুর ধর্ম্মশাস্ত্র অনুসারে বর্ত্তমান সময়ে সিদ্ধ হইতে পারে না। সত্য বটে, এক কালে হিন্দু-সমাজে অনুলোম অসবর্ণ বিবাহ চলিত ছিল, কিন্তু কলিযুগে তাহা নিষিদ্ধ হইয়াছে। যাহা নিষিদ্ধ হইয়াছে, তাহার পুনঃ প্রবর্ত্তন করা কোনমতেই কর্ত্তব্য নহে। এ কথা সত্য যে, যাঁহারা সম্মুখ দিয়া আক্রমণ করিয়া জাতি-ভেদ উচ্ছিন্ন করিতে সমর্থ হইতেছেন না,—তাঁহারা পার্শ্বদেশ দিয়া আক্রমণ পূর্ব্বক জয়লাভ করিবার প্রয়াস পাইতেছেন। যদি অসবর্ণ বিবাহ হিন্দু-সমাজে সিদ্ধ বিবাহ বলিয়া গণ্য হয়, তাহা হইলে জাতিভেদ টিকিবে না। শাস্ত্র বলিতেছেন যে, যদি কোন দ্বিজাতি শূদ্রাণীকে বিবাহ করে, তাহা হইলে সে ব্যক্তি কখনই শূদ্রাণীর পক্কান্ন গ্রহণ করিবে না। অসবর্ণ বিবাহের পদ্ধতিরও ভেদ আছে। সমাজসংস্কারকরা সেই পদ্ধতিভেদ রাখিবেন না! কারণ, তাঁহারা ঐ সমস্ত কিছুই মানেন না। আমাদের বিশ্বাস, হিন্দু-সমাজ যদি শাস্ত্র-নির্দ্দিষ্ট পথ ত্যাগ করিয়া চলেন, তাহা হইলে তাঁহারা আত্মহত্যা করিবেন। সাম্যবাদের ভাঁওতায় বা ধাপ্পায় পড়িয়া যাঁহারা দিশাহারা, তাঁহারা জাতিভেদের সুফল কি, তাহা ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছেন না। কিন্তু অধ্যাপক ব্লণ্টশ্লির (Bluntochli) ন্যায় এক জন চিন্তাশীল ব্যক্তি বলিয়াছেন যে, "Indian civilization is the blosoom and fruit of the caste system অর্থাৎ ভারতীয় সভ্যতা জাতিভেদেরই পুষ্প এবং ফলস্বরূপ।" এ কথা কেবল ব্লুণ্টশ্লিই বলেন নাই,—অনেক নিরপেক্ষ য়ুরোপীয়ও এ কথা বলিয়াছেন। বিখ্যাত য়ুরোপীয় পর্য্যটক আবেডুবয় ভারতে আসিয়া হিন্দু-সমাজের জাতিভেদ দেখিয়া লিখিয়া গিয়াছেন, "আমার বিশ্বাস এই যে—জাতিভেদ অনেক বিষয়ে সিদ্ধ হস্তের কার্য্য এবং মনুষ্যকৃত-ব্যবস্থার সর্ব্বাপেক্ষা মঙ্গলকর ব্যবস্থা। সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া আমার বিশ্বাস হইয়াছে যে, ভারতের লোক জাতিভেদ অনুসারে বিভক্ত বলিয়া ভারতবর্ষের লোক বর্ব্বরতায় ফিরিয়া যায় নাই এবং যে সময় অন্যান্য অধিকাংশ রাজ্য বর্ব্বর বা বন্য অবস্থায় ছিল, সেই সময়ে ভারতের লোক শিল্প বা বিজ্ঞানের উৎকর্ষসাধন এবং উন্নত অবস্থা রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিল।" এ কথাগুলি মিথ্যা নহে। জাতিভেদ কৌলিক শক্তি-সংক্রমণ দ্বারা পূর্ব্ব-পুরুষের সাধনালব্ধ গুণাবলি রক্ষা করে বলিয়া অতীত সাধনার ফলকে বিলুপ্ত হইতে দেয় না। কিন্তু আমাদের দেশের লোক এখন সাম্যবাদের ভণ্ডামিতে ভুলিয়া মনে করিতেছে যে, ভারতে সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠিত হইলেই হাতে হাতে স্বর্গ মিলিবে। কিন্তু তাহা হইবার নহে। সাম্য-প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে সাম্যের ভণ্ডামিও আমদানী হইবে। বিখ্যাত জার্ম্মাণ দার্শনিক ফ্রেডরিক উইলহেম নিট্‌শে যথার্থই বলিয়াছেন যে, The wrong never lies in unequal rights. It lies in the pretension to equal rights. "বৈষম্যপূর্ণ অধিকারের মধ্যে অন্যায় নিহিত নাই,—সমান অধিকারের ভণ্ডামির মধ্যেই অন্যায় নিহিত।" জীব-জগতের কুত্রাপি অধিকার-সাম্য নাই। সর্ব্বত্রই অধিকারের বৈষম্য বিরাজমান। এ সকল কথা এই মন্তব্যে বিস্তৃতভাবে আলোচনা

করিবার স্থান হইবে না। তবে আমরা উপসংহারে এইমাত্র বলিতে পারি যে, ভারতের এক একটি জাতির পূর্ব্ব-পুরুষগণ সহস্র সহস্র বৎসর ধরিয়া তাহাদের প্রকৃতিতে কতকগুলি বিশিষ্টভাব ও গুণ সাধনা দ্বারা বিকশিত করিয়া তুলিয়াছিলেন। সেই গুণভেদেই জাতিভেদ-ব্যবস্থা হইয়াছে। বহু পুরুষ ধরিয়া সেই ভাব এবং গুণ বিকশিত করাতে উহা সেই সেই জাতির চরিত্রে এরূপ ভাবে নিখাত হইয়া গিয়াছে যে, ঐ সকল ভাবের ও গুণের বীজগুলি কৌলিক ধারা অনুসারে বিসর্পিত হয়। উহা সহজে নষ্ট হয় না। প্রকৃতি কোন কিছুই সহজে নষ্ট হইতে দেন না। অবশ্য পূর্ব্বজগণের সাধনালব্ধ ঐ সকল ভাব ও গুণ অনুশীলন ব্যতীত বিকাশ লাভ করে না। কিন্তু অনুশীলন না করিলেও উহা বহু পুরুষ পর্য্যন্ত সুপ্ত থাকে, সহসা লুপ্ত হইতে চাহে না। ইহা ঋষিদিগের সিদ্ধান্ত। বীজের অন্তর্নিহিত শক্তি অমোঘ। নতুবা ৬ হাজার বৎসরের পুরাতন বীজ (মহেঞ্জোদাড়োতে প্রাপ্ত) হইতে গমের চারা বাহির হইত না। তাই বলি, পরস্পর বিভিন্ন ভাবের বীজ-সংমিশ্রণ দ্বারা পূর্ব্বপুরুষের সাধনালব্ধ গুণাবলি বিনষ্ট করিবার চেষ্টা করিও না। উহা একবার হারাইলে আর পাইবে না। সমাজসংস্কারকরা ধ্বংস করিতেই মজবুৎ, গঠন করিবার কেহ নহেন। ইঁহারা গুণ দেখিয়া গাছের জোড় কলম বাঁধেন,—ঘোড়া কুকুর প্রভৃতি কিনিবার বা উৎপাদন করিবার সময় তাহাদের জনক-জননী কুলজি (Pedigree) দেখেন। কেবল মানুষের বেলা সাম্যবাদের পাণ্ডা সাজিয়া দাঁড়ান। শাস্ত্রের কথা শুনিলে ইঁহারা কাণে আঙ্গুল দেন, এমনই ইঁহাদের দেশানুরাগ ও স্বদেশপ্রীতি। কিন্তু তাঁহারা যাঁহাদের কথা নির্ব্বিচারে গ্রহণ করেন, সেই পাশ্চাত্য দেশে এখন blue blood এর গরিমা লুপ্ত হয় নাই। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, এই জাতিভেদ আছে বলিয়া আজি হিন্দু জাতি আত্মসত্তা অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিয়াছে; নতুবা তাহারা কালের স্রোতে কোথায় ভাসিয়া যাইত, তাহার ঠিকানা নাই। উদার-নৈতিকগণ যখন রাজনীতিক্ষেত্রে প্রবল ছিলেন, তখন তাঁহারা দল হিসাবে তাঁহাদের প্রতিষ্ঠানে ধর্ম্মের ও সমাজের কথা আমল দিতেন না। এই জন্যই কি তাঁহারা ১৭৮০ খৃষ্টাব্দের ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আইনে ১৮ ধারা এবং ১৭৯৭ খৃষ্টাব্দের ইষ্ট ইণ্ডিয়া আইনের ১২ ধারা পুরাতন বলিয়া উঠাইয়া দিবার ব্যবস্থা করিয়া আসিয়াছেন? ব্যাপারটা বড় রহস্য-জালে আবৃত।

—

সহিদগঞ্জ মসজেদের মামলা

গত ১১ই জ্যৈষ্ঠ লাহোরের দায়রা জজ মিষ্টার সেলস সহিদগঞ্জ মসজেদ মামলার রায় প্রকাশ করিয়াছেন। ডাক্তার আলম এবং মিষ্টার নুরুদ্দীন সহিদগঞ্জ মসজেদের দখল পাইবার জন্য এই মোকদ্দমা উপস্থিত করিয়াছিলেন। দায়রা জজ তাঁহার রায়ে বলিয়াছেন যে, ঐ মসজেদটি ১৭৬২ খৃষ্টাব্দ হইতে শিখ-দিগের দখলে আসিয়াছে। সুতরাং এই মামলা তামাদি হইয়া গিয়াছে। এখন উভয় পক্ষই নিজ নিজ খরচা বহন করিবেন। মিষ্টার নুরুদ্দীন ঐ মসজেদটি দখলে পাইবার জন্য এক মামলা উপস্থিত করিয়াছিলেন। সে মামলাও মায় খরচা ডিসমিস্ হইয়াছে। এই রায় উপলক্ষে একটা চাঞ্চল্য উপস্থিত হইবে, সরকার তাহা ভাবিয়াছিলেন। ঐ দিনই লাহোর হইতে সংবাদ পাওয়া যায় যে, স্থানীয় মুসলমানগণ সম্পূর্ণ হরতাল করিয়াছিলেন। এই মামলার রায় প্রকাশিত হইবার পর স্থানীয় উর্দ্দু দৈনিক পত্রিকায় সেই রায় প্রকাশিত হয় এবং মুসলমানগণ ঢেঁটরা পিটাইয়া ঘোষণা করেন যে, স্থানীয় বাদশাহী মসজেদে মুসলমান-দিগের এক সভা হইবে। সহরে পুলিস প্রহরীর সংখ্যা বৃদ্ধি করা হইয়াছিল, কিন্তু কুত্রাপি কোনরূপ গোলযোগ ঘটে নাই। আজ প্রায় ত্রিপাদ শতাব্দীকাল যে মসজেদ অন্যের হস্তগত হইয়াছে এবং যে মসজেদে এত কাল নমাজ প্রভৃতি পড়া হয় নাই, সে মসজেদে দখল পাইবার জন্য এই মামলা উপস্থিত করা কোন-মতেই সঙ্গত হয় নাই।

শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত

কলিকাতা, ১৬৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, বসুমতী রোটারী মেসিনে শ্রীশশিভূষণ দত্ত মুদ্রিত ও প্রকাশিত

১৫শ বর্ষ] আষাঢ়, ১৩৪৩ [৩য় সংখ্যা

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-দেব

দশম পরিচ্ছেদ

শ্রীঠাকুর ও মথুর—বৈষ্ণব-তীর্থ ভ্রমণ—মথুরের দেহত্যাগ

মথুর প্রথমে রাসমণির তৃতীয়া কন্যাকে বিবাহ করেন, এ জন্য তাঁহাকে সকলে সেজোবাবু বলিয়া ডাকিত—এ কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। ঠাকুরও তাঁহাকে মাঝে মাঝে সেজো-বাবু বলিতেন এবং সেই জন্য যদিও জগদম্বা দাসী, রাসমণির ছোট কন্যা মথুরের দ্বিতীয়া স্ত্রী ছিলেন, তথাপি তিনিও সেজো গিন্নী নামে অভিহিত হইতেন।

যে দিন মথুর ঠাকুরের শরীরে মা-কালীর রূপ দর্শন করিলেন, সেই দিন হইতে তিনি ঠাকুরের পদে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন;—ঠাকুরও সাধনাবস্থায় মথুরকে তাঁহার প্রথম রসদ্দাররূপে দেখিয়াছিলেন, এ কথাও পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। তীর্থভ্রমণকালে মথুরের সেবার কিছু কিছু পরিচয় আমরা পাইয়াছি। বিষয় বিষয়ীর প্রাণ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তীর্থভ্রমণসময়ে ঠাকুরের আজ্ঞায় ও সেবায় মথুর জলের ন্যায় অর্থ ব্যয় করিয়াছেন। এ বিষয়ে মথুরের আজ্ঞানুবর্ত্তিতার পরিচয় আমরা ক্রমে ক্রমে আরও দিতেছি।

কালীবাড়ীতে এক্ষণে হৃদয় বেশ এক জন বিশিষ্ট ব্যক্তি হইয়া উঠিয়াছেন। মথুর তাঁহাকে ঠাকুরের সেবায় নিযুক্ত রাখিয়াছেন, সুতরাং এ জন্যও তিনি মথুরের এক জন প্রীতিভাজন ব্যক্তি। কিন্তু হৃদয়ের সেবা যখনই মথুরের মনঃপূত না হইত, তখনই তিনি শ্রীঠাকুরকে নিজ বাড়ীতে—জানবাজারে লইয়া যাইতেন। এখানে মথুর, তাঁহার স্ত্রী ও ছেলেমেয়েরা সকলেই তাঁহাকে আপনার জন বলিয়া ভাবিতেন এবং কিসে তিনি সুখে থাকেন, কিসে তাঁহার ভাবের ব্যতিক্রম না হয়, তদ্বিষয়ে এই ভক্ত পরি-বারের বিশেষ লক্ষ্য থাকিত। মথুর তাঁহাকে লইয়া নিজে জুড়ী হাঁকাইয়া বেড়াইতে লইয়া যাইতেন;—কখনও কেল্লায় লইয়া যাইতেন,—কখনও এসিয়াটিক সোসাইটীর মিউ-জিয়ামে, কখনও বা চিড়িয়াখানায়। কখনও বা কোথাও কোন তামাসা থাকিলে মথুর তথায় বাবাকে লইয়া যাইতে ভুলিতেন না। ঠাকুরের উত্তরকালের কথোপকথনমধ্যে আমরা সোসাইটীর কথা শুনিতে পাই। তাঁহার শরীর অসুখের দুর্ব্বলতা বশতঃ যখন হাড়সার হইয়া গেল, তখন মা'র কাছে ঠাকুর বলিয়াছিলেন—"মা, সোসাইটীতে যেমন তার দিয়া জোড়া খণ্ড খণ্ড হাড়ে তৈয়ার করা নরকঙ্কাল দেখিয়াছি, আমার শরীরটা তেমনি জুড়ে জুড়ে শক্ত একটু ক'রে দাও—তোমার নাম-গুণ কীর্ত্তন ও তোমার ভক্তসঙ্গ করি।" কেল্লা দেখার কথায় বলিয়াছেন, "প্রথমে যখন কেল্লায় যাচ্ছি, তখন যে নীচের দিকে নেমে যাচ্ছি, তা বুঝতে পারিনি।

শেষে ভিতরে পৌঁছে দেখি, তেতলা সমান নেমে গেছি। কলম বাড়া বা ক্রমনিম্ন রাস্তায় গেলে প্রথমে নামাটা ধীরে হয় ব'লে বোঝা যায় না। কিন্তু শেষে দেখা যায়, কোথায় আমরা নেমে এসেছি। মহামায়ার সংসারে মেয়েমানুষ এই কলমবাড়া রাস্তা। এই পথে যাহারা চলে, তাহারা প্রথমে বুঝতে পারে না যে নামছে—শেষে দেখতে পায় কত নেমে গেছে!" চিড়িয়াখানায় ঠাকুর সিংহ দেখিয়াই ভগবতীর বাহন চিন্তা করিয়া, ভগবতীর উদ্দীপনে ভাবে মত্ত হইয়া গেলেন। তিনি আর কিছুই দেখিতে পান নাই—সেই ভাবাবস্থায় মথুর বাবু তাঁহাকে ফিরাইয়া আনেন। একবার গড়ের মাঠে বেলুন উঠা দেখিতে গিয়া একটি গাছের তলায় এক সাহেবের ছেলে ত্রিভঙ্গ ঠামে দাঁড়াইয়া আছে দেখিয়া, ঠাকুর ললিতত্রিভঙ্গ শ্যামসুন্দর ভাবে বিভোর হইয়া যান। তাঁহার চক্ষু, মন, ভাব কিছুই ত' ঐহিক মানুষের তুল্য ছিল না, সেই জন্য যাহাই দেখিতেন, তাহাতেই সেই পরমানন্দ ময় বা পরমানন্দময়ীর ছাপ দেখিতে পাইতেন। যে মন বিষয়রসশূন্য, ঠাকুর বলিতেন তাহা শুষ্ক দীপশলাকার মত একটু সামান্য ঘর্ষণেই জ্বলিয়া উঠে। ঠাকুরের মন সেইরূপ সামান্য উদ্দীপনে চিদানন্দসাগরে ডুবিয়া যাইত।

মথুরের বাড়ীতে ঠাকুরের প্রতি চন্দ্র হালদারের কুব্যবহারের কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। আর একবার জানবাজারে কোন এক ভৃত্যের অসাবধানতায় ঠাকুরের বড় কষ্ট হইয়াছিল। একদা তিনি যখন অর্দ্ধবাহ্য দশায় একটি ঘরে বসিয়াছিলেন, তখন একটি চাকর বড় কলিকাতে তামাক সাজিয়া গুলের আগুনে তাহা ধরাইয়া, বাবুদের জন্য লইয়া যাইতেছিল। চলন পথের ধারে উপবিষ্ট, ভাবনিমগ্ন ঠাকুরের গায়ে সেই কলিকা হইতে একটি জ্বলন্ত গুল পড়িয়া যায়, তাহাতে শ্রীঠাকুরের ত্বক্‌, পরে মাংস পুড়িতে থাকে। সেই জ্বলন্ত গুল মাংসের মধ্যে প্রবেশ করিলেও ঠাকুরের বাহ্য চেতনা না আসায় ব্যাপারটি কেহ জানিতে পারে নাই। যখন মাংস পোড়া গন্ধ বাহির হইতে লাগিল, তখন মথুর প্রথমে চারিদিকে গন্ধের কারণ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া, শেষে ঠাকুরের গায়ে জ্বলন্ত গুল দেখিতে পাইলেন। মর্ম্মাহত মথুর ইহা দেখিয়া নিজেকে অতিমাত্র অপরাধী মনে করিলেন এবং বিশেষ যত্নে ও শুশ্রূষায় সেই ক্ষত আরাম করাইলেন। এই দাগটি কিন্তু ঠাকুরের তলপেটের কিঞ্চিৎ উপরে বরাবর থাকিয়া গিয়াছিল।

ঠাকুরের যখন যাহা আবশ্যক হইত, তাহা মথুরকে জানাইবার জন্য হৃদয়ের উপর ভার ছিল; ইহা ব্যতীত ঠাকুর যদি কখনো কোন ইচ্ছা মথুরের নিকট প্রকাশ

মথুর বাবু

করিতেন, মথুর তৎক্ষণাৎ তাহা পূর্ণ করিতেন। নাথের বাগানে একটি ছেলের কোমরে সোণার গোট দেখিয়া ঠাকুরের সোণার গোট পরিতে সাধ হইয়াছিল। মথুর সোণার গোট পরাইয়া ঠাকুরের সে সাধ পূর্ণ করিয়াছিলেন। বড়বাজারের রঙ্গীন সন্দেশ, ধনেখালির খইচুর, কৃষ্ণনগরের সরভাজা ইত্যাদি যখন যাহা তাঁহার খাইতে ইচ্ছা হইত, মথুর তৎক্ষণাৎ তাহা আনাইয়া বাবাকে খাওয়াইতেন। তৎকালে রাজা জমিদার বা বড় লোকরা যেমন জরীর

সাজ পরিতেন, ঠাকুরের একবার সেই মত সাজ পরিতে সখ হইয়াছিল। সেই সাজ পরিয়া রূপার গুড়্গুড়িতে তামাক খাইবেন—হাতে হীরার আংটী থাকিবে ইত্যাদি প্রকারের ইচ্ছার কথা যেমন মথুর জানিলেন, অমনই সে সব জোগাড় করিয়া দিলেন এবং নিজে দাঁড়াইয়া ঠাকুরের রাজবেশ করিয়া দিলেন। ঠাকুরের সাজগোজ করিয়া তামাক খাওয়া হইল। সাধ মিটিবার পর কিন্তু আর এক মিনিটও সে সব গায়ে রাখিবার উপায় ছিল না। রাজবেশ যেমন শেষ হওয়া, অমনই, সঙ্গে সঙ্গে সে বাসনাও চিরতরে মিটিয়া গেল।
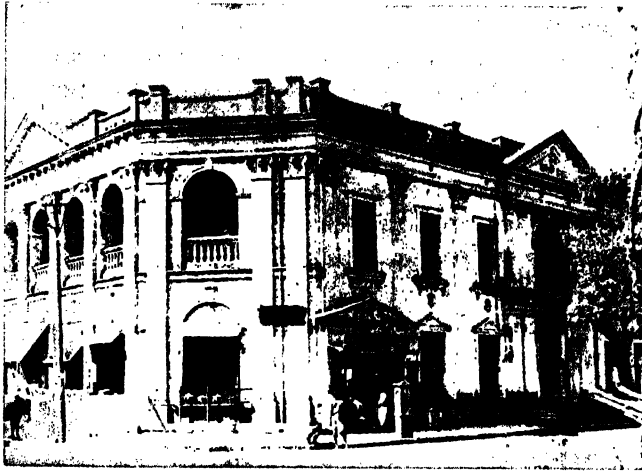
রাণী রাসমণির ভবন—জানবাজার

ঠাকুরের একবার ভাল জরীর শাল গায় দিতে সাধ হইয়াছিল। তাহা জানিতে পারিয়া এক হাজার টাকা দামের জরীর কায করা শাল মথুর কিনিয়া দিলেন; শাল গায়ে দেওয়া হইল। অল্পক্ষণ পরে দেখা গেল যে, সেই দামী শালকে মাটীতে ফেলিয়া দিয়া তাহার উপর ঠাকুর থুথু দিতেছেন। ঠাকুর বিচার করিয়া মনকে বলিলেন—"এই শাল জিনিষটার ভিতর লোম ছাড়া আর কিছুই নাই অথচ তাহা গায় দিয়ে লোকের অহঙ্কারের অন্ত থাকে না। অতএব এই অসার জিনিষ যাহা অহঙ্কার বাড়ায়, তাতে থুথু দেওয়াই তাহার উপযুক্ত ব্যবহার।" মথুর এই কার্য্য দেখিয়া হাসিলেন; বুঝিলেন, যিনি মা-ধনে ধনী, তাঁহার কাছে সামান্য শাল ও ছেঁড়া ন্যাকড়ার প্রভেদ হওয়াই আশ্চর্য্য।

দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের সাধন-ভজনকালে অনেক সাধু আসিতেন এবং ঠাকুরের তাঁহাদের সেবা করিতে ইচ্ছা হইত। তাই মা'র কাছে ঠাকুর প্রার্থনা করিয়াছিলেন, "মা, আমার ভার কে নেবে—তোমার ভক্ত-সঙ্গ করিব, তাহাদের সেবা ক'রবো ইচ্ছা—কিন্তু মা কেমন ক'রে হয়। এক জন বড় মানুষ পেছনে না থাকলে কেমন ক'রে হবে, মা।" ঠাকুর বলিতেন, 'মা তাই মথুরবাবুকে আনিয়ে দিলেন, তিনি চৌদ্দ বৎসর (১৮৫৭—১৮৭১) সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া আমার সর্ব্ববিধ ভার গ্রহণ ও বহন করলেন।' ঠাকুরের সাধু-সেবার জন্য আলাদা এক ভাঁড়ার মথুর বাবুর হুকুমে খোলা হইল। সেই ভাঁড়ার হইতে চাল, ডাল, সিধে, মায় কম্বল, কমণ্ডলু পর্য্যন্ত ঠাকুরের ইচ্ছামত দেওয়া হইতে লাগিল। এমন কি, শুনা গিয়াছে, ঠাকুরের আদেশে গাড়ী, পাল্কী পর্য্যন্ত মথুর বাবু কোন কোন সাধুকে দানের ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণী তাই মথুর বাবুর দান ও ঠাকুরের প্রতি তাঁহার ভক্তি ও সেবা দেখিয়া বলিতেন, 'চৈতন্য অবতারের প্রতাপ রুদ্র এ অবতারে মথুর হয়ে এসেছেন দেখছি।'

মথুর, ঠাকুরকে এমনই আপন ভাবিতেন—এমনই ভালবাসিতেন যে, তাঁহাকে এমন সব কাযের জন্য অনুরোধ করিতেন, যাহা অন্যের কাছে অন্যায় বোধ হইবে, কিন্তু মথুর বাবু নিজে তাহা দোষ বলিয়া মনে করিতেন না। একবার মথুর একটা বড় মকদ্দমায় পড়েন, তাহাতে

অনেক হাজার টাকা ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু তিনি জানিতেন, তাঁহার বাবা সাক্ষাৎ অভয়া, তাঁহার আবার ভয় কি? এক দিন তিনি বাবাকে বলিলেন, "বাবা, এই অর্ঘ্যটি মাকে দিন ত'।" বাবা মাকে অর্ঘ্য দিলে তাহাতে ভক্তের অভীষ্টসিদ্ধি নিশ্চিত, ইহাই মথুরের ধ্রুব বিশ্বাস। ঠাকুর অর্ঘ্যটি মাকে দিলেন; অন্তর্য্যামী ঠাকুর এই জন্য দিলেন যে, ' মথুরের কি বিশ্বাস!

আর একবার সেজো-গিন্নী (জগদম্বা) বাবাকে বলেন, "বাবা, আমার সন্দেহ হয়, সেজোবাবু বোধ হয় খারাপ জায়গায় যান। বাবা, আমি যেদিন ব'লবো, আপনি কি সেদিন সেজোবাবুর সঙ্গে যাবেন?" ঠাকুর বলিলেন, "বেশ, তা যাবো।" শেষে সেজো-গিন্নীর ইঙ্গিতে এক দিন তিনি সেজো বাবুর সঙ্গে গাড়ীতে করিয়া বাহির হইলেন। ফিরিয়া আসিলে সেজো-গিন্নী তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাবা, আপনারা কোথায় গেলেন, কি হোলো বলুন ত।" ঠাকুর বলিলেন, "দেখ গো—আমরা এক জায়গায় গেলুম। সেখানে সেজো-বাবু আমাকে নীচে বসিয়ে রেখে উপরে কোথায় চ'লে গেল। প্রায় আধ ঘণ্টা পরে এসে আমায় বল্লে, চল বাবা।" সেজো-গিন্নী ঠিক অবস্থাটা বুঝিয়া লইলেন। মথুর কিন্তু এত সাহসী যে, শ্রীঠাকুরকে সঙ্গে লইয়া এমন স্থানে যাইতেও দ্বিধা-বোধ করেন নাই। ধন্য ভক্তি-বিশ্বাসের জোর ও সাহস! যাঁহার কাছে লজ্জা-সরম ধর্ম্ম-অধর্ম্ম সকলই সমর্পিত হইয়াছে, সেখানে ভয় কুণ্ঠা আর আসিবে কেমন করিয়া? 'যশ, অপযশ, সুরস, কুরস সকল রস তোমারি।'

আর একবার জমিদারীর বিষয় লইয়া প্রতিপক্ষের সহিত দাঙ্গা লাঠালাঠি হয় এবং তাহার ফলে এক জন লোক খুন হয়। মথুর জমিদার, বিপদে পড়িয়া ঠাকুরের শরণাপন্ন হন। ঠাকুর প্রথমে মথুরকে খুব তিরস্কার করিলেন, বলিলেন, "তুমি রোজ রোজ ফ্যাসাদ বাধাবে, আর আমি রোজ রোজ মা'র কাছে গিয়ে তোমার জন্য কাঁদাকাটা করবো—এই বুঝি তুমি মনে করেছো? এখন যাও, নিজ কর্ম্মের ফলভোগ কর।" কিন্তু মথুর কি ছাড়িবার পাত্র? শেষে মথুরের কাতরতায় ও পীড়াপীড়িতে আর বিমুখ থাকিতে না পারিয়া "মা'র যা ইচ্ছে তাই হবে," বলিয়া ঠাকুর মথুরকে অভয় দিলেন এবং মথুর সে বিপদেও সহজে মুক্তিলাভ করিলেন।

ঠাকুরের ভাব আর সমাধি লাগিয়াই ছিল; এ সব দেখিতে দেখিতে মথুরের নিজের ভাব হইবার জন্য সাধ হইল। ঠাকুরের কাছে মথুর প্রার্থনা জানাইলেন। ঠাকুর বলিলেন,—'এ সবে কায নাই—ভাবটাব থাক—সব ধাতে এ সব সহে না।' কিন্তু মথুর তাহা শুনিতে ইচ্ছুক নন। ভক্তবাঞ্ছা পূর্ণ না করিলেও চলে না,—কাযেই মথুর বাবুর শেষে সত্য সত্যই ভাব হইল। সর্ব্বদাই আনন্দে মাতোয়ারা অবস্থা এবং বিষয়-কর্ম্মে উদাসীন। জমিদারীর লোকজন অবাক্। এ কি অবস্থা! মথুর এমন বিষয়-কর্ম্মে উদাসীন হইলে বড় বড় জমিদারী—বিষয় থাকিবে কেমন করিয়া? ছোট ভট্টাচার্য্য এমন কি গুণ—তুক্-তাক্ করিল, যাহাতে বাবুর এমন দশা! সেই ঘোর বিষয়ী মথুর এখন যেন আর এক ব্যক্তি! শেষে মথুর নিজেই এক দিন বাবাকে ডাকাইলেন। ঠাকুর আসিলে মথুর ঠাকুরের পদতলে পতিত হইয়া বলিলেন, "বাবা, আমি যাহা চাহিয়াছিলাম, তাহা আপনি দিয়াছেন। কিন্তু তখন বুঝিতে পারি নাই যে, এতে মন একেবারে বিষয়-বিমুখী হইয়া যাইবে। মনে করিয়াছিলাম, এও হ'বে—ও'ও হ'বে। এখন বাবা, আমায় আবার ভাল ক'রে দিন।" ঠাকুর মথুরের বুকে হাত দিয়া তাঁহার ভাব সম্বরণ করিলেন এবং বলিলেন যে, তিনি প্রথমেই এ-বিষয়ে বারণ করিয়াছিলেন। মথুরের ধাতে এ সব সহ্য হইবে কেন? ভোগবাসনা তাঁহার তখনও যথেষ্টই ছিল। ভোগীর এত সহজে যোগী হওয়া সম্ভব হয় না। ঠাকুর কৃপা করিয়া শুধু আনন্দরস একটু আস্বাদ করাইয়া দিলেন।

মথুরের ইচ্ছা ছিল, ঠাকুরকে বহুমূল্য একখানি তালুক লিখিয়া দেওয়া, মথুরের অবর্ত্তমানে যাহাতে ঠাকুর ও শ্রীমার সেবার কোন কষ্ট না হয়। হৃদয়ের সঙ্গে মথুর বাবু এ বিষয়ে পরামর্শ করিয়াছিলেন। হৃদয় মথুরের পরামর্শ উত্তম বলিয়া মনে করিলেও ঠাকুরের কাছে কথাটা হঠাৎ মথুর উত্থাপন করিতে ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। ঠাকুরের মনে কাঞ্চন, জমি বা টাকার প্রতি একটুও টান নাই, তাহার নিদর্শন ইতিপূর্ব্বে মথুর বহুবারই দেখিয়াছেন কিন্তু শেষে কথাটা ঠাকুরের কাছে বলিবামাত্র, ঠাকুর বলিলেন, "দেখ মথুর, অমন কার্য্য করবার চিন্তা

পর্য্যন্ত ছেড়ে দাও। ওতে আমার এবং সেই সঙ্গে তোমারও ভারি অনিষ্ট হবে।" শুনিয়া মথুর আর এই ভাবের কথা দ্বিতীয়বার উত্থাপন করিতে সাহস করেন নাই। ঠাকুরের মাতাঠাকুরাণী চন্দ্রমণি দেবী তখন নহবতে বাস করিতেছিলেন। মথুর একবার শেষ চেষ্টা করিলেন, যদি তিনি কিছু গ্রহণ করেন। কিন্তু চন্দ্রাদেবী ত্যাগের মূর্ত্তি। তিনি মথুরের অভিলাষের কথা শুনিয়া প্রথমে বলিলেন, "মথুর, তুমি গদাইকে দেখছো, আমাদের দেখছো, আবার আমাদের কি দরকার থাক্‌তে পারে।" কিন্তু মথুর বিশেষ জেদ করিতে থাকায় বলিলেন, "আচ্ছা, যখন কিছু দিতে তোমার এতই ইচ্ছা, তখন আমাকে এক আনার দোক্তাপাতা এনে দিও, পুড়িয়ে গুল করবো এখন।" মথুর শুনিয়া সজলনয়নে ভাবিতে লাগিলেন, এমন ত্যাগের আকর না হ'লে কি এমন অভূতপূর্ব্ব ত্যাগিচূড়ামণি পুত্ররত্ন জন্মে! সব শুক্তিতেই কি মহামূল্য মুক্তা হয়, না সকল গজেই গজমুক্তা জন্মে!

ঠাকুরের অসামান্য তপস্যা ও ত্যাগের কথা ইত্যবসরে কিছু কিছু লোকের মুখে মুখে কলিকাতায় পৌঁছিতে আরম্ভ করিয়াছে। বড় বড় লোক গাড়ীজুড়ী চড়িয়া ঠাকুরের কাছে মাঝে মাঝে আসিতে আরম্ভ করিল, রোগ সারাইবার জন্য, শান্তি-স্বস্ত্যয়ন জন্য বা মকদ্দমা জিতিবার জন্য। তাহাদের সঙ্গে দেখা করিতে বা কথা কহিতে ঠাকুর বড়ই কষ্ট বোধ করিতেন—বিশেষতঃ তাহাদের স্বার্থবুদ্ধির জন্য। এ দিকে বলিতেছে পরমহংস, আর এ দিকে চাহিতেছে মকদ্দমায় জয় বা গ্রহদোষশান্তি! যেন কল্পতরুর কাছে গিয়ে লাউ কুমড়ো ফল প্রার্থনা করা! শেষে ঠাকুরের এমন অবস্থা হইল যে, তিনি এই সব লোক আসিতেছে দেখিলে বা জানিতে পারিলে গৃহের দ্বার বন্ধ করিয়া দিতেন। তাহাদের সঙ্গে দেখা করিতেন না। বরং সর্ব্বদা খুঁজিতেন কোথায় ভক্ত আছে—যাহারা ঈশ্বর-চিন্তা করিতেছে বা ঈশ্বরলাভের জন্য ব্যাকুল। কারণ, এরূপ লোকের সঙ্গ পাইলে তিনি কথঞ্চিৎ সুস্থ বোধ করিতেন। শিখদের হাবিলদার কোয়ার সিং এ সময় খুব আসিতেন, ঠাকুরও তাঁহার সঙ্গে কথা কহিয়া সুখবোধ করিতেন। কোয়ার সিং সাধু-সেবা করিতে ভালবাসিতেন ও তদুপলক্ষে ঠাকুরকে নিমন্ত্রণ করিয়া, অন্য সাধুদের সঙ্গে খাওয়াইতেন। এক দিন ঠাকুর শুনিলেন, বাগবাজারের পোলের কাছে দীননাথ মুখোপাধ্যায় নামে একটি ভাল লোক আছেন। তাঁহাকে দেখিবার জন্য ঠাকুর সেজো বাবুকে বলিলেন, 'আমায় নিয়ে চল।' তিনিও গাড়ী করিয়া ঠাকুরকে সেই স্থানে লইয়া গেলেন। সেখানে গিয়া কিন্তু তাঁহাদের বড় অসুবিধা ঘটিল। বাড়ী ছোট, আর গাড়ী করিয়া ধনী লোক আসিয়াছেন দেখিয়াই তাঁহারা বিব্রত ;—আবার সেদিন তাঁহাদের বাড়ীতে ছেলের উপনয়ন। কোথায় ঠাকুরকে বসান হয়; কোথায় মথুরকে বসান হয়; উভয়পক্ষই অপ্রস্তুত!

তাহার পর ঠাকুরের দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে দেখিবার ইচ্ছা হইয়াছিল। তাহা শুনিয়া মথুর বাবু বলিলেন যে, তিনি ঠাকুরকে সেখানে লইয়া যাইতে পারিবেন। দেবেন্দ্র ঠাকুর ও মথুর বাবু হিন্দু স্কুলে একসঙ্গে পড়িয়াছিলেন। ঠাকুর ও মথুর একসঙ্গে গিয়া দেবেন্দ্রের সহিত দেখা করিলেন। মথুর ঠাকুরের পরিচয় দিলেন এবং বলিলেন, ইনি ঈশ্বরের নামে পাগল। ঠাকুরের সঙ্গে দেবেন্দ্রনাথের অনেক কথাবার্ত্তা হইবার পর ঠাকুরের সমাধি হইল। সমাধিস্থ হইয়া তিনি দেখিলেন, দেবেন্দ্রের যোগ ভোগ দুই-ই আছে। তার পর দেবেন্দ্র বেদ হইতে কিছু কিছু উদ্ধৃত করিয়া ঠাকুরকে শুনাইলেন এবং সেই অংশের এই অর্থ করিলেন যে, জগৎ যেন একটি বৃহৎ ঝাড়ের মত, আর জীবগুলি তার এক একটি দীপ। ঠাকুরও ধ্যানে ইতিপূর্ব্বে ঠিক এইটি দর্শন করিয়াছিলেন, কাযেই দেবেন্দ্রের ব্যাখ্যা শুনিয়া খুব আশ্চর্য্য বোধ করিলেন। শেষে কিন্তু দেখিলেন, এই মন্ত্রের মর্ম্মার্থ ঠাকুর যাহা ধারণা করিয়াছেন, দেবেন্দ্র তাহা ব্যাখ্যা করেন নাই। আলাপান্তে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে তাঁহাদের বার্ষিক উৎসবে আসিতে বলিলেন। ঠাকুর বলিলেন যে, সে সবই মায়ের ইচ্ছা। দেবেন্দ্র বলিলেন যে, ঠাকুরকে কিন্তু চাদর গায়ে দিয়া আসিতে হইবে, এলোমেলো বা খালি গায়ে আসিলে চলিবে না। যদি কেউ কিছু বলে, দেবেন্দ্রের মনে তাহাতে কষ্ট হইবে। কিন্তু ঠাকুর বলিলেন, তিনি বাবু হইতে পারিবেন না। পরদিনই সেজো-বাবুর কাছে দেবেন্দ্রের চিঠি উপস্থিত—ঠাকুরকে উৎসবে যাইতে বারণ করা হইয়াছে। ঠাকুরের গায়ে চাদর না থাকিলে, অসভ্যতা দোষ হইবে, সেই জন্য!

দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ীতে হৃদয় যে এখন এক জন গণ্যমান্য ব্যক্তি হইয়া উঠিয়াছেন, তাহার আভাস পূর্ব্বেই দেওয়া হইয়াছে। হৃদয়ের এখন অর্থ উপার্জ্জনের দিকে লক্ষ্য খুব। মামার সেবা করা যেমন তাঁহার কার্য্য, তেমনই মথুর-প্রদত্ত ও মামা কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত বেনারসী কাপড়, টাকা, অলঙ্কারাদি কুড়াইয়া এবং দর্শনী প্রণামী হস্তগত করাও ছিল তাঁহার কার্য্য। ধর্ম্ম-কর্ম্মে বিশেষ মন দেওয়ার ইচ্ছা বা অবকাশ এখনও তাঁহার হয় নাই। হৃদয় ভাবিতেন, মামা যখন এত বড় এক জন সাধু, তখন মামাকেই ধ'রে শেষে কিছু ক'রে নেওয়া যাবে, উপস্থিত বিষয়-আশয় একটু ঠিক করিয়া লওয়া যাক। বড় মানুষ কেহ ঠাকুরের সঙ্গে দেখা করিতে আসিলে, হৃদয় দর্শনী না পাইলে দেখা হইতে দিতেন না। পূর্ব্ব হইতে হৃদয়ের সহিত টাকার বিনিময়ে বন্দোবস্ত না থাকিলে হৃদয়ের সম্মুখে কেহ ঠাকুরের পদধূলি গ্রহণ করিতে পারিত না। এই সময়ে হঠাৎ হৃদয়ের স্ত্রী-বিয়োগ ঘটিল। স্ত্রী-বিরহে হৃদয়ের মনে কিঞ্চিৎ বৈরাগ্য উদয় হইল এবং একটু সাধন-ভজন করিতে ইচ্ছা হইল। হৃদয় মা'র পূজায় বিশেষ অনুরাগী হইলেন এবং মধ্যে মধ্যে পঞ্চবটীতে গিয়া ধ্যান-ভজন করিতেও আরম্ভ করিলেন। ঠাকুর তাঁহার অবস্থান্তর লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "হৃদু, তুমি এখানকার কায— সেবা করছিলে, তাই কর না, মা তোমাকে শেষে সব দেবেন—যা তুমি চাচ্ছ।" কিন্তু হৃদয় তাহা শুনিলেন না। কিছুদিন সাধন করিবার পর হৃদয়েরও ভাবাবেশ হইতে লাগিল এবং ঈশ্বরীয় রূপদর্শন হইতে লাগিল। মথুর হৃদয়ের এই অবস্থান্তর দেখিয়া ঠাকুরকে কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন ঠাকুর বলিলেন, "হৃদয় মা'র কাছে আজকাল এই সব চায়, তাই মা কিছু কিছু তাকে দিচ্ছেন।" মথুর বল্লেন, "বাবা, হৃদয় ও আমি আপনার সেবা করি। এই যথেষ্ট ধর্ম্ম করা হচ্ছে। ভাব-টাব ও-সব আমাদের ধাতে সহে না।" ঠাকুর বলিলেন—"তাই হবে মথুর, মা সব ঠিক ক'রে দেবেন।" ইহার কয় দিন পরে হৃদয় এক দিন পঞ্চবটীর ঘরে ধ্যান করিতেছিলেন। এমন সময় তাঁহার মনে হইল, কে যেন তাঁহার পিঠের উপর জ্বলন্ত অগ্নিশিখার স্রোত বহাইয়া দিল। হৃদয় যন্ত্রণায় 'গেলুম মলুম' বলিয়া চীৎকার করিতে আরম্ভ করিলেন, পরে ঠাকুর তাঁহার পৃষ্ঠে হাত বুলাইয়া সে জ্বালা নিবারণ করিয়া দিলেন। আরও কিছু দিন এই ভাবে যাইতে যাইতে হৃদয় এক দিন যখন পঞ্চবটীর দিকে ঠাকুরের পশ্চাদনুসরণ করিতেছিলেন, তখন হঠাৎ দেখিতে পাইলেন যে, ঠাকুরের দেহ জ্যোতির্ম্ময় হইয়া গিয়াছে এবং
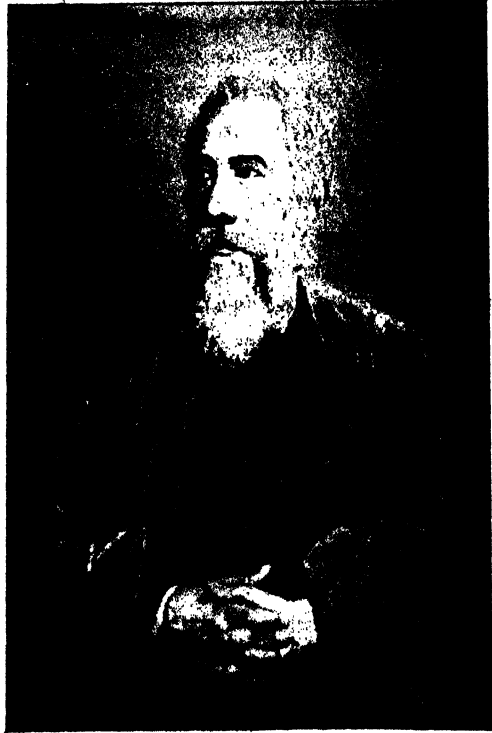
দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর

তিনি মৃত্তিকা স্পর্শ না করিয়াই শূন্যে চলিয়া যাইতেছেন। নিজের দিকে চাহিয়া হৃদয় দেখিল, নিজেও জ্যোতির্ম্ময়, যেন বড় জ্যোতির ক্ষুদ্র অংশ। এই দেখিয়া হৃদয় ভাবোন্মত্ত হইয়া চীৎকার আরম্ভ করিল "ও রামকৃষ্ণ, তুমিও যে আমিও সে। চল জগতের হিতের জন্য দুজনেই এই স্থান হইতে চলিয়া যাই।" ঠাকুর হৃদুর চীৎকারে অসন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, "এমন ক'রে কেন চেঁচাচ্ছিস? লোকে শুন্‌লে মনে করবে কি?" কিন্তু সে কথায় হৃদয়ের চীৎকার থামা দূরে থাক্, আরও বাড়িয়া যাইতে লাগিল। তখন ঠাকুর হৃদয়ের বুকে হাত দিয়া বলিলেন, "একটুখানি শক্তিও ধারণ করতে পারিস্ না—আবার ভাব সমাধি, এই সবের ফরমাস করিস্! থাক্ শালা জড় হ'য়ে!" বলিবামাত্র হৃদয়ের ভাব ও দর্শন চলিয়া গেল, তিনি সাধারণ অবস্থা প্রাপ্ত হইলেন এবং তখন ঠাকুরের পদতলে পড়িয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন—"মামা, আমাকে সত্যি সত্যিই জড় ক'রে দিলে?" ঠাকুর বলিলেন, "তুই রাখতে পাল্লি না, তা আমি কি করবো। আচ্ছা, এখন এম্নি থাক্, সময়ে সব ঠিক হয়ে যাবে।" হৃদয় সেই অবধি আর সাধন-ভজনের দিকে মনোযোগ করিতেন না।

এই সময়ে দেশের বাড়ীতে হৃদয়ের দুর্গোৎসব করিবার ইচ্ছা হইল। ঠাকুর ইহাতে সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন, মথুরও অর্থ-সাহায্য করিলেন। হৃদয় ঠাকুরকে লইয়া যাইতে ইচ্ছুক ছিলেন, কিন্তু মথুর ছাড়িলেন না, বলিলেন, "বাবা আমার বাড়ীতে না থাকলে আমার পূজা হ'বে কেমন ক'রে?" কাযেই হৃদয় একাকী দেশে চলিয়া গেলেন। তবে ঠাকুর বলিলেন, "হৃদয়, দুঃখ করিস্ নি, আমি সূক্ষ্মদেহে তোর পূজায় তিন দিনই হাজির থাক্‌বো—তুই রোজ আমাকে তোর বাড়ীতে মা'র আরতির সময় দেখ্‌তে পাবি।" হৃদয় তিন বৎসর দুর্গাপূজা করিয়াছিলেন। প্রথম বৎসর দুর্গোৎসবের পর হৃদয় কিন্তু দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করিলেন।

১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে ঠাকুরের ভ্রাতুষ্পুত্র অক্ষয় অল্পবয়সে দেহত্যাগ করিলেন, অক্ষয়ের দেহত্যাগের পর—ঠাকুরের মধ্যম ভ্রাতা রামেশ্বর বিষ্ণুঘরের পূজারী নিযুক্ত হইলেন—রাম চট্টোপাধ্যায় সহকারী রহিলেন। এই সময়ে, (১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে) ঠাকুর জয়নারায়ণ পণ্ডিতকে দর্শন করেন। জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন বিখ্যাত আলঙ্কারিক ও নৈয়ায়িক ছিলেন। ইঁহার পিতাও পণ্ডিত ছিলেন। ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে ইনি সংস্কৃত কলেজের ন্যায়ের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে ঠাকুরের সহিত সাক্ষাতের পর তিনি কাশীতে গমন করেন। কাশীতে তাঁহার মৃত্যু হয় ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে। ঠাকুর ইঁহার সঙ্গে কথা কহিয়া খুসী হইয়াছিলেন। ইনি অতিশয় সরল ও বিদ্যার্থিগণের প্রতি সর্ব্বদা সদয় ছিলেন। ঠাকুর যখন ইঁহাকে দর্শন করেন, তখন ইঁহার ছেলেদের বুটপরা

জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন

দেখিয়াছিলেন। এই ছেলেদের এক জন হরমোহন, পরে Dy Inspector of Schools হইয়াছিলেন।

অক্ষয়ের মৃত্যুতে ঠাকুরকে কিঞ্চিৎ শোকাবেগ সহ্য করিতে হয়। সেই জন্য মথুর তাঁহাকে লইয়া আবার কলিকাতার বাহিরে তাঁহার জমিদারীতে লইয়া যান। হৃদয়ও সঙ্গে ছিলেন। শুনা যায়, এই যাত্রায় মকিমপুর নীলকুঠী দর্শন ও পরে তথা হইতে মথুরের জন্মস্থান খুলনা জেলার বাড়ীতেও গমন করেন। এতদুপলক্ষে নিজগ্রামে মথুরকে আর একবার ঠাকুরের আদেশে ভাণ্ডারা দিতে

হয়। তিনি দেশের যাবতীয় কাঙ্গালী গরীবকে অন্ন, বস্ত্র, একটি করিয়া সিকি দানে তুষ্ট করিয়াছিলেন।

বৈষ্ণবচরণ ঠাকুরের কাছে সর্ব্বদাই যাতায়াত করিতেন। তিনি ঠাকুরকে যতই দেখিতে লাগিলেন, ততই তাঁহার প্রতি তাঁহার ভক্তি-বিশ্বাস বাড়িয়া যাইতে লাগিল। তিনি ঠাকুরকে সাক্ষাৎ দেহধারী শ্রীচৈতন্য বোধ করিতে লাগিলেন। কলিকাতার কলুটোলায় কালীনাথ দত্তর বাড়ীতে একটি হরিসভা ছিল। এখানে পাঠ-কীর্ত্তনাদি নিয়মিতভাবে হইত,

শ্রীচৈতন্যদেব

এবং সেই অধিবেশনের সময়ে সভামঞ্চের উপরে একটি স্বতন্ত্র আসন শ্রীচৈতন্যদেবের উদ্দেশ্যে পৃথক্‌ভাবে ফুল-মালা প্রভৃতিতে সাজাইয়া রাখা হইত। এক সময়ে বৈষ্ণবচরণ এখানে ভাগবত পাঠে ব্রতী ছিলেন, ঠাকুর হৃদয়ের সঙ্গে এই সভায় আসিয়া এক পার্শ্বে বসিয়াছিলেন। ক্রমে কীর্ত্তন মহোৎসব আরম্ভ হইলে ঠাকুর নৃত্য করিতে করিতে মুহুর্মুহুঃ সমাধিস্থ হইতে থাকেন এবং ভাবাবেশে শ্রীচৈতন্যের আসনে গিয়া দণ্ডায়মান হন। তাঁহার সেই দিব্য ভাবোদ্ভাসিত মূর্ত্তি ও ঈশ্বরপ্রেমোজ্জ্বল সহাস্য মুখ দেখিয়া তখন কেহ তাঁহাকে বাধা দিতে ইচ্ছা করিলেন না বা তাঁহাদের মনে কোন বিদ্বেষভাবও তৎকালে আসিল না। কিন্তু ক্রমে যখন অন্যান্য বৈষ্ণবগণ এই কথা শুনিতে পাইলেন, তখন তাঁহারা ঠাকুরের উপর বড়ই অসন্তুষ্ট হইলেন এবং শ্রীচৈতন্য আসন গ্রহণ করার স্পর্দ্ধাকে ভণ্ডামীর চূড়ান্ত বলিয়া ঠাকুরের অজস্র নিন্দাবাদও করিতে ছাড়িলেন না। ক্রমে এই সংবাদ তৎকালীন বৈষ্ণবদিগের মধ্যে বয়সে ও সাধনে বরিষ্ঠ কালনার ভগবান দাস বাবাজীর কর্ণে গেল। তিনিও এ কথা শুনিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবকে এক জন মহাভণ্ড মনে করিলেন এবং তাঁহার দুঃসাহসের জন্য যথেষ্ট নিন্দা করিতে ত্রুটি করিলেন না।

ঠাকুর প্রায় প্রতি বৎসর পানিহাটীর মহোৎসবে যোগদান করিতে যাইতেন। পানিহাটী গ্রাম কলিকাতা হইতে ৭।৮ মাইল উত্তরে গঙ্গাতীরে অবস্থিত শ্রীগৌরাঙ্গদেব যখন অবতীর্ণ, তখন তাঁহার পার্ষদ শ্রীনিত্যানন্দ নাম প্রচার কার্য্যে ব্রতী থাকিয়া এক দিন পানিহাটী গ্রামে আসিয়া গঙ্গাতীরস্থ এক বটবৃক্ষতলে বসিয়াছিলেন। তিনি অবধূত, কাহারও বাড়ী যাইতেন না, কাযেই বৃক্ষতলে অবস্থান করেন। পরে তাঁহার শিষ্যরা তাঁহাকে সেইখানে দেখিতে পান। এই শিষ্যগণমধ্যে দাস রঘুনাথ ছিলেন। ইনি সপ্তগ্রামনিবাসী এক জন ধনীর পুত্র, বৈরাগ্যবশতঃ সংসার ত্যাগ করিয়াছিলেন। নিত্যানন্দ তখন রঘুনাথ দাসকে বলিলেন—"তুমি কেবল বাড়ী থেকে পালাও এবং ভগবানের প্রেম ও ভক্তিরস গোপনে আস্বাদন করিয়া থাক। তাহার দণ্ডস্বরূপ আজ তুমি আমাদিগকে চিঁড়ার মহোৎসব করিয়া খাওয়াও।" এইজন্য এই উৎসবের নাম দণ্ড মহোৎসব। জ্যৈষ্ঠ শুক্লা ত্রয়োদশী তিথিতে এই মহোৎসব প্রথমে হইয়াছিল। রঘুনাথ দাসের পর এই মহোৎসব প্রতি বৎসর ঐ গ্রামস্থ শ্রীচৈতন্যভক্ত রাঘব পণ্ডিত করিতেন। এখনও এই মহোৎসব চলিয়া আসিতেছে। ঠাকুর যখনই পানিহাটী যাইতেন, তখনই তিনি ভাবে মাতোয়ারা হইয়া নৃত্য করিতেন এবং তাঁহার ঘন ঘন সমাধি ও ভাবোজ্জ্বল মূর্ত্তি দেখিলে মনে হইত, শ্রীগৌরাঙ্গ বুঝি আবার অবতীর্ণ হইয়া প্রেমের হিল্লোলে দেশ ভাসাইতে আসিয়াছেন। কলুটোলার শ্রীচৈতন্য-আসন গ্রহণের পর মথুরের ভয় হইল, পাছে দুষ্ট

বৈষ্ণবগণ পেনেটীতে ঠাকুরের প্রতি কোন অত্যাচার করে, সেইজন্য প্রথমে ঠাকুরকে সে বৎসর পেনেটী যাইতে নিষেধ করিলেন। কিন্তু ঠাকুর যখন ভীত হইলেন না, নিষেধও শুনিলেন না, তখন অগত্যা মথুর তাঁহাকে যাইতে দিয়া নিজের মনের দুশ্চিন্তা বশতঃ চার জন দরোয়ান লইয়া প্রচ্ছন্নভাবে দূর হইতে উৎসবক্ষেত্রের উপর দৃষ্টি রাখিলেন। তিনি দরোয়ান চারি জনকে আদেশ দিলেন, তাহারা যেন একটু দূর হইতে বাবাকে চোখে চোখে রাখে এবং সামান্য বিপদের চিহ্ন দেখিলেই যেন তাঁহাকে লইয়া নিরাপদ স্থানে চলিয়া আসে। সুখের বিষয়, এ উৎসবে ঠাকুরের অদ্ভুত ভাব ও সমাধি দর্শনে সমবেত সমস্ত বৈষ্ণবই আনন্দ লাভ করিলেন, কেহই তাঁহার প্রতি বিদ্বেষের লেশমাত্র পোষণ করিয়াছেন, তাহার কোন চিহ্ন দেখা গেল না। সমবেত ভক্তমণ্ডলীকে পরমানন্দ দান করিয়া দিবাশেষে পরমানন্দময় ঠাকুর সুস্থদেহে ও প্রফুল্লমনে আবার দক্ষিণেশ্বরে ফিরিয়া আসিলেন।

১৮৭০ খৃষ্টাব্দে ঠাকুরের আবার পেটের পীড়া অতিশয় বৃদ্ধি পাইল। লোকে পরামর্শ দিল যে, গঙ্গায় কিছুদিন ভ্রমণ করিলে গঙ্গার নির্ম্মলবায়ু সেবনে তাঁহার পীড়ার উপশম হইতে পারে। মথুর বাবু তাহা শুনিয়া বজরা ভাড়া করিয়া কিছু দিনের জন্য ঠাকুরের গঙ্গাভ্রমণ ব্যবস্থা করিলেন। বজরায় রহিলেন ঠাকুর, মথুর, হৃদয় এবং পরিচারকগণ। মাঝিরা যখন রাঁধিত, তখন যদি ঠাকুর সেখানে গিয়া দাঁড়াইতেন, মথুর নিজে আসিয়া তাঁহাকে ফিরাইয়া লইয়া যাইতেন। মথুর হয় ত ভাবিতেন, ঠাকুরের যে সর্ব্বধর্ম্মে অনুরাগের অবস্থা, তাহাতে তিনি অনায়াসে মুসলমান মাঝিদের নিকট হইতে কিছু চাহিয়া খাইতে পারেন। ইসলামধর্ম্মে সাধন কথা মথুর বেশ স্মরণ রাখিয়াছেন এবং সেও খুব বেশী দিনের কথা নহে। এইভাবে ভ্রমণ করিতে করিতে বজরা যখন কালনায় উপস্থিত হইল, তখন ঠাকুর কাহাকেও কিছু না বলিয়া বজরা হইতে নামিয়া আসিলেন এবং পরিচিত স্থানের ন্যায় চলিতে চলিতে সোজা ভগবানদাস বাবাজীর আখড়ায় উপস্থিত হইলেন। হৃদয় সঙ্গে ছিলেন, তিনি প্রথম আখড়ায় প্রবেশ করিতেই কি জানি কেমন করিয়া ভগবানদাস বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, কোন এক মহাপুরুষ তাঁহার আখড়ায় আসিতেছেন। হৃদয়ের পশ্চাতে ঠাকুর যখন চাদর মুড়ি দিয়া প্রবেশ করিয়াছিলেন, তখন অন্য লোকরা তৎপ্রতি বিশেষ মনোযোগ দেন নাই। ভগবান দাস মালা জপ করিতেছিলেন। হৃদয় বলিলেন যে, তাঁহারা বাবাজীকে দেখিতে আসিয়াছেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি সিদ্ধ পুরুষ, তবে মালা জপ করছেন কেন?" বাবাজী জবাব দিলেন, "নিজের জন্য জপ নয়, জপ লোকশিক্ষার জন্য।" এই কথা ঠাকুর যেমন শুনিলেন, অমনই তাঁহার ভাবাবেশ হইল; তিনি হুঙ্কার দিয়া বলিলেন—"আরে ভগবান, তোমার এখনও এত অভিমান! বৈষ্ণবের অভিমানশূন্যতা একটি বিশেষ লক্ষণ, আর তুমি এতদূর দর্পিত যে, সামান্য জীব হইয়া লোকশিক্ষা দিবে, তাই দুর্বুদ্ধি ও বিষম অভিমান পোষণ কর! লোকশিক্ষা দেবেন মা—যাঁর জগৎ তিনি। তুমি লোকশিক্ষা দেবার কি শক্তি রাখ?" কথাগুলি তীক্ষ্ণ তীরের ন্যায় সাধক ভগবানদাসের হৃদয়ে প্রবেশ করিল। তিনি কথাগুলির যথার্থতা অনুভব করিয়া নীরবে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন এবং ঠাকুরের কথায় তাঁহার চৈতন্য উদয় হইল। কর্ত্তা একমাত্র ভগবান, মানুষের স্বাধীনতা নাই, মানুষ ভগবানের নির্দ্দেশের যন্ত্রমাত্র, এই জ্ঞান যেন তাঁহার চক্ষুর সম্মুখে ভাসিয়া উঠিল। নবাগতের এই রূঢ় কথার জন্য তাঁহার প্রতি ক্রোধ হওয়া দূরে থাকুক, তিনি বিস্ময়-দৃষ্টিতে ঠাকুরের ভাবাবস্থা ও তেজ দেখিয়া বুঝিলেন, ইনি সামান্য ব্যক্তি নহেন। তাহার পর বাবাজীর সঙ্গে ঠাকুরের ধর্ম্মকথাপ্রসঙ্গ চলিতে লাগিল, ভাবনিধি ঠাকুরের বারংবার ভাব-সমাধি হইতে লাগিল। তাহা দেখিয়া ভগবানের মন ঠাকুরের প্রতি ভক্তি ও প্রীতিতে ভরিয়া উঠিল। কথা-প্রসঙ্গে যখন ভগবানদাস জানিলেন যে, ইনিই তিনি—যিনি ভাবাবেশে কলুটোলায় শ্রীচৈতন্যের আসন অধিকার করিয়াছিলেন, তখন নিজ মুখেই ভগবানদাস স্বীকার করিলেন যে, ঠাকুরের ন্যায় ব্যক্তিই ভাব-ভক্তি-প্রেমে মাতোয়ারা শ্রীচৈতন্যের আসনে বসিবার উপযুক্ত। তিনি যেন শ্রীচৈতন্যের নব আবির্ভাব বলিয়া ভগবানদাসের মনে হইতে লাগিল। হৃদয়গ্রন্থি ভেদ হইয়া সাধন-ভজনের পূর্ণতা ভগবানদাস লাভ করিলেন।

কালনা হইয়া ঠাকুর নবদ্বীপ দর্শনে গমন করেন। নবদ্বীপ সহরে চারিদিকে মন্দিরাদি দর্শন করিয়া বেড়াইতে

বেড়াইতে ঠাকুরের মন কোথায়ও কোন উচ্চ ভাবভূমিতে উঠিল না। ইহাতে তিনি খুব বিস্ময়বোধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু নৌকা করিয়া ভ্রমণ করিতে করিতে গঙ্গামধ্যবর্ত্তী কোন এক চড়ার নিকটে যখন বজরা আসিল, তখনি ঠাকুর 'ঐ এলো রে' বলিয়া চীৎকার করিয়া সমাধিস্থ হইলেন। পরে বলিয়াছিলেন, দুইটি তেজঃপুঞ্জদেহী যুবক হাসিতে হাসিতে আসিয়া ঠাকুরের দেহে প্রবেশ করিয়াছিলেন। ইহাতে অনুমান হয়, বর্ত্তমানে যে স্থান নবদ্বীপ বলিয়া কথিত আছে, তাহা চৈতন্যদেবের লীলাভূমি নবদ্বীপ নহে। আসল নবদ্বীপ এখন গঙ্গাগর্ভে চলিয়া গিয়াছে এবং সেই স্থানেই শ্রীঠাকুরের গৌর-নিতাই-দর্শন ঘটিয়াছিল।

মথুর বাবু চৌদ্দ বৎসর ধরিয়া ঠাকুরের শিষ্যের ন্যায়, দাসের ন্যায়, প্রভুভক্ত সেবকের ন্যায় সেবা করিয়াছেন। এইবার তাঁহার জীবন-লীলায় ছুটীর সময় উপস্থিত। ঠাকুর বলিতেন, "সেজোবাবু বয়সকালে দেহের উপর অনেক অত্যাচার করেছিলেন—প্রথমে তা টের পাওয়া যায় নাই, শেষবয়সে সেই সবের ফল হ'তে আরম্ভ করিল।" প্রথমে তাঁহার দুষ্টব্রণ হইল, তাহা হইতে আরোগ্য হইয়া কিছুদিন পরে হইল জ্বর-বিকার। এবার আর মথুর রক্ষা পাইলেন না। ১৮৭১ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসের মধ্যভাগে বৈকাল ৫টার সময় মথুর দেহত্যাগ করিলেন। যত দিন রোগশয্যায় মথুর পড়িয়াছিলেন—হৃদয় প্রত্যহই তাঁহার সংবাদ আনিয়া ঠাকুরকে দিতেন। ঠাকুর পূর্ব্বেই জানিতে পারিয়াছিলেন যে, মা এবার মথুরকে লইবেন। যখন মথুর কালীঘাটে শরীর ত্যাগ করিলেন, তখন দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে ঠাকুরও সমাধিস্থ হইয়া পড়িলেন। জ্ঞান হইলে বলিলেন, মথুর দেবীলোকে গমন করিল। সংবাদ আসিলে জানা গেল, ঠাকুরের সমাধির সময়েই মথুরের দেহত্যাগ হইয়াছিল। মথুরের দেহত্যাগের পর এক জন ভক্ত ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, মথুরের মুক্তি হইয়াছে কি না? উত্তরে ঠাকুর বলিয়াছিলেন যে, মথুরের ভোগবাসনা এখনও মিটে নাই। মথুর পুনরায় কোথাও কোন রাজপুত্র হইয়া জন্মগ্রহণ করিবেন।

বাসনা থাকিতে জীবের মুক্তি হয় না। বিবেক-বৈরাগ্য জন্মিলে তবে বাসনার বীজ নষ্ট হয়। প্রশ্ন উঠিতে পারে, এত সঙ্গ, সেবা, দর্শন করিয়াও কি মথুরের মনের বাসনার বীজ ধ্বংস প্রাপ্ত হয় নাই? ইহার উত্তরে বলা যায়, ঠাকুরের কথায়, যে কল্পতরুর কাছে লোকে যাহা চায়, তাহাই লাভ করে। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ চার ফলের মধ্যে মথুর প্রথম তিন ফল কামনা করিয়াছিলেন, চতুর্থ ফল বোধ হয় কামনা করেন নাই। তাই তাঁহাকে আবার জন্মগ্রহণ করিতে হইয়াছিল। সম্পূর্ণ ভোগান্ত না হইলে ঈশ্বরের জন্য ঠিক ঠিক ব্যাকুলতা আসে না এবং ব্যাকুলতা জন্মিলেই তবে মানুষ বিবেক-বৈরাগ্যের অধিকারী হইয়া অমৃতত্বলাভ করিয়া থাকে।

মথুরের দেহত্যাগের কিছু পূর্ব্বে মা ঠাকুরকে জানাইয়া দিয়াছিলেন যে, তাঁহার অনেক শুদ্ধসত্ত্ব ভক্ত আছেন, যাহারা এইবার আসিতে আরম্ভ করিবেন। ঠাকুর আরতির সময় তাই কুঠীর ছাদে উঠিয়া মধ্যে মধ্যে উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতেন, "ওরে তোরা কে কোথায় আছিস্ চ'লে আয়—তোদের দেখার জন্য আমি বড়ই কাতর হয়ে পড়েছি!" এই সব কথা শুনিয়া মথুর কখনো কখনো বলিতেন, "কেন বাবা, আমার সেবায় কি আপনি তুষ্ট হন না? বেশ ত' আপনার আরও ছেলে আসুক। সকলে মিলেই সেবা করবো।" কিন্তু মথুর থাকিতে ইহারা কেহ আসেন নাই। মা যখন মথুরকে লইলেন, তখন হইতে নানা ভক্ত-সমাগম যে হইবে, তাহার লক্ষণ প্রকাশ পাইতে লাগিল। ঠাকুরের অন্তরঙ্গ ভক্তগণকে ঠাকুর বলিতেন যে, তাঁহারা তাঁহার সহিত একস্বত্বা—যেন একটি বড় অগ্নির স্ফুলিঙ্গগুলি। এই সকল ভক্তের মধ্যে সর্ব্বপ্রধানা শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী,—যিনি ঠাকুরের শক্তি ও তাঁহার সহিত অভেদাত্মস্বরূপিণী সাক্ষাৎ ব্রহ্মময়ীস্বরূপা। এইবার তাঁহার আগমনকাল হইয়াছে। সুধী পাঠক এইবার আপনাকে সেই সব কথা জানাইব।

[ক্রমশঃ।

শ্রীদুর্গাপদ মিত্র।

জলধর-স্মৃতি-সম্বর্দ্ধনা

নিজের বিস্মৃত স্মৃতির তর্পণ করিতে গিয়া, রায় জলধর সেন বাহাদুর কেবল যে 'বসুমতীতে' আমার নিয়োগ সম্বন্ধেই সত্যের অপলাপ করিয়াছেন, তাহা বলিলে ভুল হইবে। আত্মপ্রসাদ লাভের আশায় তিনি স্মৃতি-পূজার অন্তরালে আত্মপ্রশংসার প্রয়াসে যে অশোভন স্পর্দ্ধা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা কোন কারণেই উপেক্ষণীয় নহে। বিশেষতঃ তিনি প্রবন্ধ-সূচনায় পূজনীয় পণ্ডিত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি মহাশয়ের অনুরোধের নামে বিনয়ের আবরণে যখন উদ্দেশ্য বিবৃত করিয়াছেন—"বাংলা সাহিত্যিকদিগের ইতিহাসের কিছু মাল-মসলা জমা হবে" (ভারতবর্ষ ১৩৪২ কার্ত্তিক ৭১০ পৃষ্ঠা) তখন সে ইতিহাস যাহাতে অসত্য-বিহীন—অসঙ্গতি-দোষ-বর্জ্জিত হয়, সাহিত্যিকগণের সে চেষ্টা করা বাঞ্ছনীয়—একান্ত কর্ত্তব্য বলিয়াই মনে করি। আমার 'সেকালের স্মৃতি' কথায় বরোদা হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পর 'বসুমতীর' সেবা-ভার গ্রহণের কথা এবার স্থানাভাবে বলিতে পারিলাম না; এবং সেই জন্যই জলধর বাবুর জীবন-স্মৃতির অষ্টাদশ পর্ব্ব মহাভারতের—এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত নয় পর্ব্ব মধ্যে আদি—সভা—বন পর্ব্বের মহিমা-কীর্ত্তন করিয়াই ক্ষান্ত হইতে হইল।

বিশ্ববরেণ্য স্বামী বিবেকানন্দের জীবনদানপ্রসঙ্গে রায় বাহাদুর স্মৃতিতর্পণে লিখিয়াছেন :—

"প্রায় শনিবারেই অপরাহ্ণ দু'টার সময় স্কুল থেকে ফিরে এসে···একখানি কম্বল ও লাঠি নিয়ে·মহানন্দে বেরিয়ে পড়তাম।···

"এই সময় এক শনিবারে বেলা একটা কি দুটোর সময় লাঠি আর কম্বল নিয়ে নগ্নপদে বেরিয়ে পড়ি। সেদিন আমার লক্ষ্যস্থান ছিল—হৃষীকেশ।···

"পথে নামলে আমার পা দুখানিতে কে যেন পাখা বেঁধে দিত! আমি সেদিন এমন হেঁটেছিলাম যে, সন্ধ্যার পূর্ব্বেই হৃষীকেশে পৌঁছাই। অবশ্য তখন গ্রীষ্মকালের দিন।—কাযেই খুব বড়।"

(ভারতবর্ষ' ১৩৪২, ফাল্গুন, ৩৪৫ পৃষ্ঠা)

গ্রীষ্মের "সন্ধ্যার প্রাক্কাল" বোধ হয় ৭টা পর্য্যন্ত ধরা যাইতে পারে। তাহা হইলে পূর্ণ পাঁচ ঘণ্টায় জলধর বাবু ডেরাডুনের করণপুর হইতে হৃষীকেশে পৌঁছিয়াছিলেন।

করণপুর হইতে ডেরাডুনের দূরত্ব বাদ দিলেও রেলপথে ডেরাডুন হইতে হৃষীকেশ ৫০ মাইল; পাহাড়ের পাকদণ্ডীর জঙ্গল পথে ৩৬ মাইল। এই সংক্ষেপ পার্ব্বত্য রাস্তা দিয়া জলধর বাবু তাঁহার "পাখা বাঁধা" চরণযুগল পরিচালনা করিয়া থাকিলেও কত সময় লাগিবার কথা, তাহা তাঁহার বর্ণিত 'হিমালয়' ভ্রমণ-কাহিনী হইতে দেখিবার প্রয়াস পাইতেছি।

(১৮৯০ খৃষ্টাব্দের) "৬ই মে বুধবার রাত্রি সাড়ে চারটার সময় দেশত্যাগের বন্দোবস্ত। তৎপূর্ব্বেই বন্ধুবর্গ বিদায়ের জন্য সমবেত হলেন।···সূর্য্যোদয় হ'ল। আমরা হৃষীকেশের পথে আসতে লাগলুম।···পাহাড় জঙ্গল অতিক্রম করে বেলা ১১টার সময় 'খালু' নামে একটা ছোট গ্রামে উপস্থিত হ'লুম।···অপরাহ্ণ ৫টার সময় আবার যাত্রা আরম্ভ কল্লুম।···সন্ধ্যার সময় আমরা 'ভোগপুরে' উপস্থিত হলুম।···ভোগপুরের ধর্ম্মশালায় রাত্রিবাস করা গেল।···"

"৭ই মে বৃহস্পতিবার প্রত্যূষে উঠে আবার যাত্রা।···বেলা একটার সময় হৃষীকেশে পৌঁছলুম।···অপরাহ্ণে রৌদ্রের তেজ কমলে যাত্রা করে লছমন ঝোলায় উপস্থিত হতে সন্ধ্যা হ'য়ে গেল।"

('হিমালয়' ১০ম সংস্করণ ৪—৭ পৃষ্ঠা)

হৃষীকেশ ও লছমনঝোলার মধ্যবর্ত্তী স্বর্গাশ্রমেই সদাব্রত ও সাধুদের ঝুপড়ী—এই স্থানেই স্বামীজী ছিলেন।

পরিব্রাজকরূপে মাষ্টার মহাশয় যে পথ দুই দিনে অন্ততঃ ১৮ ঘণ্টায় অতিক্রম করিয়াছিলেন—এক শনিবারের বারবেলায় তাহাই পাঁচ ঘণ্টায় মারিয়া দিলেন। এ যেন সেই, "কাঞ্চীপুর বৰ্দ্ধমান ছ'মাসের পথ, ছয় দিনে উত্তরিল অশ্ব-মনোরথ"। আশা করি, সে-দিনও তাঁহাকে যে পদ-যুগলের উপর নির্ভর করিতে হইয়াছিল—এ দিনেও সেই পাখাবাঁধা পা দু'খানিই চালিত করিয়াছিলেন। ইহাতে তিনি অবশ্যই বলিতে পারেন "আমি গর্ব্ব ক'রে বলতে পারি যে, সব প্রতিযোগিতায় ফাষ্ট ক্লাশ ফাষ্ট হতাম।" (ভারতবর্ষ ১৩৪২, ফাল্গুন, ৩৪৫ পৃষ্ঠা) এইবার হৃষীকেশে মুমূর্ষু স্বামীজীর জীবনদানের জন্য জলধর বাবুর মৃত-সঞ্জীবনী-সুধা প্রদান কাহিনীটি উদ্ধৃত করিতেছি :—

"সন্ধ্যার প্রাক্কালে হৃষীকেশে পৌঁছে আমি সন্ন্যাসীদের কুটীর-গুলি দেখতে গেলাম। সেইখানে ঘুরতে ঘুরতে একটি কুটীরের

সম্মুখে দেখি, জন তিন চার বাঙ্গালী সন্ন্যাসী সেখানে দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁদের মুখে প্রবল উৎকণ্ঠা দেখে আমি হিন্দীতেই জিজ্ঞাসা করলাম—কি হয়েছে? তাঁরা বল্লেন—স্বামী বিবেকানন্দ নামে একজন সন্ন্যাসী মৃত্যুশয্যায়।

"স্বামী বিবেকানন্দ! হৃষীকেশের গঙ্গাতীরে এই ক্ষুদ্র কুটীরে পরমহংসদেবের পরম স্নেহপাত্র স্বামী বিবেকানন্দ! আমি সন্ন্যাসীদের অনুমতি নিয়ে সেই কুটীরের মধ্যে প্রবেশ করলাম। কুটীরমধ্যস্থ ধুনীর অস্পষ্ট আলোকে স্বামী বিবেকানন্দকে দেখলাম। তিনি তখন সংজ্ঞাশূন্য।

"হিমালয়ের বনজঙ্গলের মধ্যে অনেক অসাধু সন্ন্যাসীও দেখেছি, আবার অনেক সাধু সন্ন্যাসীরও দর্শনলাভ হয়েছে। তাঁদের কারো কারো বিশেষ ক্ষমতাও দেখেছি! এমনও দেখেছি, কোন সন্ন্যাসী কোন একটা গাছের পাতা দিয়ে মুমূর্ষু রোগীর জীবন ফিরিয়ে এনেছেন। তাঁর কাছে সে পাতার সন্ধানও নিয়েছি! সে দিন স্বামী বিবেকানন্দকে মুমূর্ষু অবস্থায় দেখে এবং তাঁর চিকিৎসার কোন সুবিধাই নাই দেখে আমার সে গাছের কথা মনে হ'য়েছিল। আমি তখন তাড়াতাড়ি কুটীর থেকে বেরিয়ে এসে সেই প্রায়ান্ধকারে গঙ্গার বালুকাময় চড়ায় সেই গাছের অনুসন্ধান করে সৌভাগ্যক্রমে অনতিদূরেই সেই গাছ পাই। তারি ২।৩টি পাতা এনে হাতে রগড়ে রস বের করে স্বামীজীর মুখে দিলাম। দেখিই না কেন,—সন্ন্যাসীর এ গাছ ফলপ্রদ হয় কি না। তার পর ঔষধের ফলাফল দেখবার জন্ম কুটীরের বাইরে বালুকার আসনে বসে রইলাম। প্রায় আধঘণ্টা পরে স্বামীজী চৈতন্য লাভ করলেন।"

('ভারতবর্ষ' ১৩৪২, ফাল্গুন, ৩৪৬ পৃষ্ঠা)।

তাঁহার স্মৃতিতর্পণে এই অলৌকিক কাহিনী পাঠ করিয়া, কোন কোন কৌতূহলী পাঠক বিস্ময়াগ্রহে অধীর হইয়া, রায় বাহাদুরকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—দাদা, এমন মৃত-সঞ্জীবনী ঔষধ যখন জানেন, তবে এই সুদীর্ঘ-কাল এ কর্ম্মভোগ করিতেছেন কেন? সন্ন্যাসি-মুখ-শ্রুত এই এক জীবন-প্রদায়িনী ঔষধের কৃপায় অনায়াসে ত' এখনও ধনকুবের হইতে পারেন;—সঙ্গে সঙ্গে অসংখ্য মুমূর্ষু রোগীর জীবন দান করিয়া জগতের প্রভূত কল্যাণ-সাধন করিতে পারেন!

আমরা শুনিয়া অতিমাত্রায় বিস্মিত হইলাম, কোন সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিকের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে অবশেষে আমাদের এই সার্ব্বজনীন দাদাকে মৃতসঞ্জীবনী ঔষধের নামটি বেফাঁস করিতে হইয়াছে! এই ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দুর দেশে অবশ্যই নামটি শুনিয়া কেহই চমকিত হইবেন না—মুমূর্ষু-দেহে জীবনীশক্তি-সঞ্চারিণী তুলসী—তুলসীগাছের পাতা। আকার ও প্রকার-ভেদে তুলসী-গাছের নানা জাত—বিভিন্ন নাম আছে। কোন্ জাতের তুলসীপত্র প্রাণশক্তি-প্রদায়ী, তাহা অবশ্য 'দাদা' এখনও খুলিয়া বলেন নাই—মনের নিভৃত গুহায় সংগুপ্ত রাখিয়াছেন। কিন্তু জলধর বাবুর পূর্ব্বে এবং পরবর্ত্তী ৪৩ বৎসরের ভিতর অসংখ্য বাঙ্গালী কেদারবদ্রিনাথ-দর্শনে হিমালয়ে গিয়াছেন—যাত্রা-সূচনায় হৃষীকেশের গঙ্গার বালুকাময় চড়ায় (?) পরিভ্রমণ করিয়াছেন। কিন্তু নিতান্ত দুর্ভাগ্য-ক্রমেই তাঁহারা এই পার্ব্বত্য-প্রদেশে ও গঙ্গার বালুকাময় চড়ায় (?) তুলসী-গাছ দেখিবার সৌভাগ্যে বঞ্চিত হইয়াছেন। তুলসীপত্র দুষ্প্রাপ্য বলিয়াই বদ্রিনারায়ণের পূজার জন্য যাত্রিগণ শুষ্ক তুলসীপত্র লইয়া যান।

এ মৃতসঞ্জীবনী ঔষধ কিন্তু যাহাই হউক—মাষ্টার মহাশয়—জলধর বাবুর অপার পরম কৃপায় মুমূর্ষু স্বামী বিবেকানন্দ পুনর্জ্জীবন লাভ করিয়াছিলেন। সেজন্য আজ সমগ্র বিশ্ব—ধর্ম্মজগৎ—বিশেষতঃ শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের সন্ন্যাসিমণ্ডলী—সংখ্যাতীত ভক্তসম্প্রদায় যে রায় বাহাদুরের নিকট অপরিশোধনীয় ঋণে চিরঋণী, এ কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। অলৌকিক শক্তিবলে জলধর বাবু পায়ে পাখা বাঁধিয়া পাঁচ ঘণ্টার ভিতর হৃষীকেশে উপস্থিত হইয়া—সেই প্রায়ান্ধকার গঙ্গার বালুকাময় চড়ায় (?) ঔষধ সন্ধান করিয়া, যদি স্বামীজীর মুমূর্ষু দেহে জীবনীশক্তি সঞ্চার না করিতেন—তবে বেলুড় মঠ প্রতিষ্ঠিত হইত কি?—শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের সেবাব্রতের প্রবর্ত্তন হইত কি?—ভবিষ্যৎ জীবনে স্বামীজী চিকাগোর ধর্ম্ম-মহাসভায় বক্তৃতা করিয়া সনাতন ধর্ম্মের বিজয়-বৈজয়ন্তী জগতে উড্ডীন করিতে পারিতেন কি?—বহু মুমুক্ষুকে তিনি শান্তি ও মুক্তির সন্ধান দিতে পারিতেন কি? রায় বাহাদুরের সে অসীম মহিমার সুযোগ্য ধন্যবাদ প্রদানের উপযুক্ত প্রশংসা কীর্ত্তন করিবার মত ভাষা আমি ত' 'অনুবাদ সাহিত্যিক' জানিই না—সাহিত্য-রত্নাকর নিঃশেষ করিলেও, বোধ হয়, যথাযোগ্য গুণগান সম্ভব হইবে না।

পরিব্রাজক-জীবনে হৃষীকেশে সাধনাকালে স্বামীজী এক দিন সহসা প্রবল জ্বর ও ডিফথিরিয়ার আক্রান্ত হইয়া অচৈতন্য হইলে এক জন বৃদ্ধ সাধুর প্রদত্ত ঔষধে তাঁহার চৈতন্য-সঞ্চার হইয়াছিল। ইহা ইতিহাস-প্রসিদ্ধ ঘটনা—স্বামীজীর অন্ততঃ দশখানি জীবনচরিতে এই ঘটনাটি বিবৃত হইয়াছে। স্বামীজীর গুরুভ্রাতৃবৃন্দের এবং প্রাচ্য ও

প্রতীচ্যের বিশিষ্ট ভক্তগণের নিকট হইতে তথ্য সংগ্রহ করিয়া, বহু বৎসরের ঐকান্তিক সাধনায় আলমোড়া মায়াবতীর অদ্বৈত আশ্রম হইতে স্বামীজীর যে সুপ্রকাণ্ড জীবনী প্রকাশিত -তাহা যে প্রামাণ্য গ্রন্থ, সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই। আমরা সেই প্রামাণ্য জীবনী হইতে ঘটনাটি উদ্ধৃত করিতেছি।

"In Hrishikesh the Swami and his 'gurubhais' passed a considerable time, dwelling in a hut raised by their own hands, near the temple of Chandeswar Mahadev, and living on 'madhukari bhiksha' Again the resolve of performing severe Sadhanas came upon the Swami; but as ill-luck would have it, hardly had he proceeded with them for a time than a severe illness frustrated all his intentions. One day the 'gurubhais' went into the jungle to cut bamboos for the purpose of extending their huts, and returning the Swami was suddenly attacked with high fever and diphoetheria. He grew worse and worse until his brethren were in terror. One day his pulse sank lower and lower, and the life-blood turned, as it were, into perspiration. His body became cold, his pulse seemed to have stopped. Indeed, it appeared as though the Leader's last moments had come. He lay unconscious on his rude bed composed of a couple of coarse blankets on the ground His Brothers overwhelmed with grief and anxiety, were at a loss to know what to do. In those days no help could be found within a great distance. While they were thus in the utmost agony of mind, praying that his life be spared and theirs taken in its stead, they heard a faint rustling sound caused by a movement in the grasses outside. And before the entrance of the hut stood a Sadhu. They invited him in, and when he heard the case he brought out from his wallet some honey and powdered Pichul, and mixing them together, forced the medicine into the Swami's mouth. This seemed to be the one remedy, a god-send as it were.

"After a while the Swami opened his eyes and attempted to speak One of the 'gurubhais' put his ear near his mouth and heard him utter in a feeble, almost inaudible voice, the words, 'Cheer up, my boys! I shall not die!' Gradually he recovered and later he told his companions that during that unconscious state of his body, he had seen that he had a particular mission in the world which he must fulfil, and that until he had accomplished that mission, he would have no rest"—The Life of the Swami Vivekananda, Vol. II, pp 120-121.

তপস্তা-সঙ্গী গুরুভ্রাতৃগণ-প্রদত্ত বিবরণ হইতে সঙ্কলিত স্বামীজীর এই প্রামাণ্য জীবনীগ্রন্থ নির্ভরযোগ্য হইলে স্বীকার করিতে হয়, সন্ন্যাসী ঝুলি হইতে যে ঔষধ দিয়া স্বামীজীর চৈতন্যসঞ্চার করিয়াছিলেন, তাহা পিপুল-চূর্ণ ও মধু—জলধর বাবু-বর্ণিত গঙ্গার বালুকাময় চড়ায় (?) সংগৃহীত গাছের পাতা বা তুলসী-পাতা নহে, এবং সময়টাও দিনমান—'সন্ধ্যার প্রাক্কাল' নহে।

বেলুড় মঠ-পরিচালিত উদ্বোধন কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত 'স্বামী বিবেকানন্দ' নামে সংক্ষিপ্ত জীবনীর দ্বিতীয় সংস্করণের ৩১ পৃষ্ঠা হইতে সম্ভবতঃ জলধর বাবু এই কাহিনীটি আত্মসাৎ করিয়াছেন। কিন্তু তাহাতেও দেখা যায়,—

"এমন সময়ে সহসা একজন '**প্রাচীন**' সাধু তথায় উপস্থিত হইলেন। ঘটনাক্রমে তাঁহার নিকট ঔষধ ছিল। সেই ঔষধ প্রয়োগ করায় স্বামীজীর দেহে চৈতন্যোদয় হইল।"

ডেরাডুন হইতে যাত্রাকালে জলধর বাবু 'লাঠি আর কম্বল' লইয়াছিলেন বটে, কিন্তু গেরুয়া পরিতে ভুলিয়া গিয়াছিলেন। আমরা পরে দেখিতে পাইব, জলধর বাবুর বয়স তখন ৩০ বর্ষের বেশী নহে। সুতরাং স্বামীজীর গুরুভ্রাতারা তাঁহাকে 'প্রাচীন সাধু' বলিয়া ভুল করিবেন কেন?

অক্ষম ভাষার সাহায্যে ত' রায় বাহাদুরের এই অমর কীর্ত্তির যথাযোগ্য সম্বর্দ্ধনা করিতে পারিলাম না। অঙ্কপাত করিয়া, তাঁহার জীবন-ইতিহাসের তারিখনির্ণয়ে যদি সে গরিমা সমুজ্জ্বল করিতে পারি, সেজন্য প্রয়াস পাইতেছি। কিন্তু মাষ্টার মহাশয় অঙ্কশাস্ত্রে পরম পণ্ডিত—

'মাসিক বসুমতী' ১৩৪০ আশ্বিন, ১০২৪ পৃষ্ঠায় তিনি লিখিয়াছেন,—"এই বৃদ্ধবয়স পর্য্যন্ত উচ্চ গণিতের চর্চ্চা ক'রে আনন্দ পাই।"

আর কাকার কথায় আমি স্বীকার করিয়াছি যে, "আঁকে আমি গো-মূখ্খু" ('মাসিক বসুমতী' ১৩৪০ শ্রাবণ, ৫৭৮ পৃষ্ঠা)।

বিশ্ববিশ্রুত-নাম সাহিত্যিক রায় জলধর সেন বাহাদুরকে "কোন কোন বন্ধু ধারাবাহিক ভাবে লিখতে অনুরোধ

করেছেন। কিন্তু তা হলে যে জীবন-চরিত হয়, তা আমি এখন পারছিনে।" তাই তাঁহার জীবনী-সঙ্কলনের সুবিধার জন্য বিশেষ ঘটনাগুলির সন তারিখ তাঁহার স্মৃতিতর্পণ হইতে সঙ্কলন করিয়া দিতেছি।

আদিপর্ব্ব—ছাত্রজীবনে

"আমি (জলধর সেন) জন্মগ্রহণ করি ১৮৬০ অব্দের ১লা চৈত্র, শিবচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন ঐ ১৮৬০ অব্দের—২রা জ্যৈষ্ঠ, সোমবার। আর তৃতীয় জন বাংলা দেশের সুপ্রসিদ্ধ প্রথিতযশা ঐতিহাসিক ও সাহিত্যিক অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়—জন্মগ্রহণ করেন ঐ ১৮৬০ অব্দেই—আমার অন্নপ্রাশনের দিন।"

('ভারতবর্ষ' ১৩৪২ চৈত্র, ৫৩৯ পৃষ্ঠা)

"আমি তখন আমাদের গ্রামের (নদীয়া জেলার কুমারখালী) বাঙ্গালা স্কুলে পড়ি। সাল, তারিখ আমি ঠিক বলতে পারবো না; মনে হচ্ছে, সে হয় ত' ইংরাজী ১৮৭০ কি ১৮৭১ অব্দ। তখন আমার বয়স এই এগার বারো বৎসর।…

"আমি যখন বঙ্গবিদ্যালয়ের প্রথম শ্রেণীতে পড়ি, সেই সময় একদিন শুনতে পেলাম যে, বিদ্যালয়সমূহের ইনস্পেক্টর ভূদেববাবু দু-একদিনের মধ্যে আমাদের স্কুল পরিদর্শনে আসছেন।…ভূদেব বাবু কুষ্টিয়া থেকে নৌকাযোগে আসছেন, যদিও তখন আমাদের গ্রামের উপর দিয়ে রেলপথ গোয়ালন্দ পর্য্যন্ত গিয়েছিল।…ভূদেব বাবু ইংরাজী স্কুলই পরিদর্শন করছেন, আর আমরা বাঙ্গালা স্কুলের ছাত্রেরা দুয়ারের দিকে চেয়ে বসে আছি।…কাঙ্গাল হরিনাথের আদেশ পেয়ে আমি দাঁড়িয়ে হাত যোড় করে আবৃত্তি করলাম।…আমাদের সময়ে ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার পাঠ্য ছিল পরলোকগত রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় প্রণীত 'মিত্রবিলাপ কাব্য'।…আমার ঐ আবৃত্তি শুনে মহাত্মা ভূদেবের চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হলো।…ভূদেব বাবু আমাকে আশীর্ব্বাদ করে যে বইখানি দিয়ে গিয়েছিলেন, সেখানি ইংরাজি বই! তার নাম Spectator।"

('ভারতবর্ষ' ১৩৪২ পৌষ, ৪৩—৪৫ পৃষ্ঠা)

ভারতবর্ষের পরবর্ত্তী সংখ্যায় (১৩৪২ মাঘ ১৭৮ পৃষ্ঠা) রায় বাহাদুর লিখিয়াছেন,—

"গোয়ালন্দের উকিল, মোক্তার, বড় বড় কর্ম্মচারী সকলেই আমাকে ভালবাসতেন ও আদর করতেন, কারণ আমি বাল্যকাল থেকেই গোয়ালন্দে ছিলাম। গোয়ালন্দের মাইনর স্কুল থেকেই পরীক্ষা দিয়ে পাঁচ টাকা বৃত্তি পাই, তারপর অবস্থা-বিপর্য্যয়ে (?) সেই মাইনর স্কুল এনট্রান্স স্কুলে পরিণত হলে আমি শিক্ষক হয়ে আসি।"

জলধর বাবুর গ্রাম কুমারখালি নদীয়া জেলায়—গোয়ালন্দ ফরিদপুর জেলায়—রেলপথে আসিতে এখন সওয়া এক ঘণ্টা লাগে—তখনও তাহাই লাগিবার কথা; তিনি স্বগ্রাম কুমারখালির স্কুলে ছাত্রবৃত্তি ক্লাসে প্রাইজ পাইলেন, অথচ গোয়ালন্দে বাল্যকাল হইতে আছেন—গোয়ালন্দের মাইনর স্কুল হইতে তিনি পরীক্ষা দিয়া ৫৲ বৃত্তি পাইলেন কিরূপে? ইহার কোন্‌টি সত্য, বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না। মাইনর ও ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষা একই বৎসরে—একই সময়ে গৃহীত হইত বলিয়াই ত' জানি। রায় বাহাদুর জীবনী-লেখককেও এখানে ধাঁধায় ফেলিলেন! তাহার পর—

"সে হচ্ছে ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দের কথা…এ সালটা মনে আছে, কারণ এইবার আমি প্রবেশিকা পরীক্ষা দিই,…আমি পরীক্ষা দিতে গিয়েছিলাম আমাদের গ্রামের স্কুল থেকে, আর দ্বিজেন্দ্রলাল পরীক্ষা দিয়েছিলেন কৃষ্ণনগর থেকে…আমি ও দ্বিজেন্দ্রলাল (অমর কবি ডি, এল, রায়) একই ব্রাকেটে স্কলারশিপ পেয়েছি।

(ভারতবর্ষ ১৩৪২ কার্ত্তিক, ৭১১ পৃষ্ঠা)

"১৮৭৮ অব্দে প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাশ হলাম। অভাবনীয় সৌভাগ্যের বশে দ্বিতীয় বিভাগে পাশ হয়েও মাসিক ১০৲ টাকা বৃত্তি পেলাম, কারণ সেবার প্রথম বিভাগে বেশী ছাত্র উত্তীর্ণ হতে পারেনি,—বিশেষতঃ প্রেসিডেন্সী বিভাগের বৃত্তিসংখ্যা নির্দ্দিষ্ট থাকাতেই আমার সৌভাগ্যলাভ হয়েছিল।"

(ভারতবর্ষ ১৩৪২ অগ্রহায়ণ, ৯৩১ পৃষ্ঠা)

উপসংহারে অশ্রু-বিসর্জ্জন-প্রসঙ্গে দ্বিজেন্দ্রলালের কথায় ব্রাকেট-মাহাত্ম্যের দৃঢ় ভিত্তি প্রতিষ্ঠা-প্রয়াসে কৌশল প্রয়োগ করিতেও রায় বাহাদুর বিস্মৃত হন নাই। তিনি বলিতেছেন,—

"তারপর কলকাতায় কতবার দ্বিজেন্দ্রলালের সঙ্গে দেখা হয়েছে। প্রতিবারেই সকলকে শুনিয়ে তিনি বলেছেন—জলধর বাবু আর আমি এক ব্রাকেটে। এ ব্রাকেট ভাঙ্গবে না।

"হায়, সেই ব্রাকেটই ভেঙ্গে গেল তেইশ বৎসর আগে। একদিন অকস্মাৎ আমার শৈশবের (?) বন্ধু দ্বিজেন্দ্রলাল ব্রাকেট ভেঙ্গে চলে গেলেন।"

('ভারতবর্ষ' ১৩৪২ কার্ত্তিক ৭১৬ পৃষ্ঠা)

কিন্তু ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে ২০শে জানুয়ারীর 'কলিকাতা গেজেট' এই ব্রাকেটটি দিতে ভুল করিয়াছেন। তাহাতে দেখা যায়, কৃষ্ণনগর কলেজিয়েট স্কুল হইতে দ্বিজেন্দ্রলাল রায় প্রেসিডেন্সী বিভাগের সেকেণ্ড গ্রেড এবং কুমারখালি এইচ, ই, স্কুল হইতে জলধর সেন থার্ড গ্রেড জুনিয়ার স্কলারসিপ পাইয়াছেন। মধ্যে অনেকগুলি ছাত্রের নামের ব্যবধান ছিল বলিয়াই বোধ হয় এ ব্রাকেট দেওয়া সম্ভব হয় নাই। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাদের ১৮৮০-৮১ খৃষ্টাব্দের ক্যালেণ্ডারেও এই ব্রাকেটটি বর্জ্জন করিয়া, একইরূপ মারাত্মক ভুল করিয়াছেন। বিশেষতঃ তাঁহারা উপাধির বর্ণানুক্রমে নাম সাজাইতে গিয়া Rএর কোটায় দ্বিজেন্দ্রলালের এবং Sএর কোটায় জলধর বাবুর নাম ছাপিয়া বিষম ত্রুটি করিয়াছেন। সেই জন্যই আজ তাঁহার ব্রাকেট ভাঙ্গার আক্ষেপ ভিত্তিহীন।

"১৮৮০ খৃষ্টাব্দে এল-এ ফেল করে তার পর-বৎসরই আমাকে চাকরীতে প্রবিষ্ট হ'তে হয়েছিল।...১৮৮১ অব্দে পঁচিশ টাকা বেতনে গোয়ালন্দ স্কুলে থার্ড মাষ্টার হয়েছিলাম।...খাই দাই, ছেলে পড়াই, পূর্ব্ব-সংস্কারবশে স্বদেশীও করি, ছেলেদের নিয়ে সভাসমিতি করি, বড়দের সঙ্গে মিশে দেশোদ্ধারেরও পাণ্ডাগিরি করি।...সেই যে ৮১ অব্দে ২৫৲ বেতনে মাষ্টারী আরম্ভ করেছিলাম, ৮৫ অব্দের মধ্যভাগ পর্য্যন্ত আমার সে মাইনে আর বাড়েনি। ঐ সালের শেষভাগে স্কুল কর্ত্তৃপক্ষের শুভদৃষ্টি আমার উপর পড়ল। তাঁরা আমার বেতন ৫৲ টাকা বাড়িয়ে দিলেন। এ যে আমার যোগ্যতার পুরস্কার, সে কথা মনে করবেন না...কারণ...সেই বৎসরের প্রথম ভাগে আমি বিবাহ করি।"

('ভারতবর্ষ' মাঘ ১৩৪২, ১৭৭-১৭৮ পৃষ্ঠা)

সভাপর্ব্ব—কংগ্রেসে

"...১৮৮৬ অব্দের শেষভাগে ডিসেম্বর মাসে কলিকাতা নগরীতে জাতীয়মহাসমিতি (কংগ্রেসের) দ্বিতীয় অধিবেশন হয়। সেই অধিবেশনে আমি গোয়ালন্দের জনসাধারণ কর্ত্তৃক প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হয়ে যাই।" ('ভারতবর্ষ' ১৩৪২ মাঘ, ১৭৮ পৃষ্ঠা)

রায় বাহাদুরের এই নির্ব্বাচনে বাঙ্গালীর মানবৃদ্ধি—মুখরক্ষা হইল। বোম্বাইয়ে কংগ্রেসের সুবর্ণ-জয়ন্তীর অনুষ্ঠানের নেতৃত্ব করিবার সুযোগে তদানীন্তন কংগ্রেস সভাপতি বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ এবং মাদ্রাজী ডাক্তার পট্টভী সীতারামিয়া তাঁহার রচিত কংগ্রেস ইতিহাসে যে বলিয়াছেন, প্রাথমিক যুগের কংগ্রেসে বিভিন্ন প্রদেশ হইতে প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হইতেন না, রায় বাহাদুরের এই উক্তি তাহার মূর্ত্তিমান প্রতিবাদ! সহানুভূতি—করুণা উদ্রেক-প্রয়াসে জলধর বাবুর ছাত্র-জীবনে দুঃখের অবধি নাই—কিন্তু ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দের কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশনের মুদ্রিত রিপোর্টের ১৩৭ পৃষ্ঠায় তাঁহার পরিচয়—ভূস্বামী—ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের গোয়ালন্দ শাখার প্রতিনিধি। তিনি নিশ্চয়ই এ মিথ্যা পরিচয় দেন নাই। 'কংগ্রেস ও বাঙ্গলা' নামে সম্প্রতি যে শতবর্ষের রাজনৈতিক ইতিহাস প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার ১১৬—১১৭ পৃষ্ঠার প্রদত্ত তালিকায় ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসনের গোয়ালন্দ শাখার নাম নিশ্চয়ই ভ্রমক্রমে প্রদত্ত হয় নাই। তাহা হইলেও গোয়ালন্দের স্বয়ংসিদ্ধ প্রতিনিধি—ভূস্বামিরূপেই জলধর বাবু যে কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশনে হাজির হইয়াছিলেন, তাহাতে ত' সন্দেহের কারণ নাই! বঙ্গভঙ্গের পর স্বদেশী আন্দোলনের সূচনা হইবার বহু পূর্ব্বেই যে জলধর বাবু 'দেশোদ্ধারেরও পাণ্ডাগিরি' করিয়া বিভিন্ন সভায় বক্তৃতার প্রলয় ঝঞ্ঝায় পদ্মার প্রবল প্রবাহের মতই যে গোয়ালন্দে দেশাত্মবোধ উচ্ছ্বসিত করিয়াছিলেন—তাহাতেই বা সন্দেহের অবকাশ কোথায়?

বনপর্ব্ব—হিমালয়ে

"ডিসেম্বর মাসের শেষে কংগ্রেস হয়ে গেল। জানুয়ারীর প্রথম ভাগে (অর্থাৎ ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে)...শনিবারের প্রত্যুষে মেল গাড়ীতে অশ্বিনীবাবু গোয়ালন্দ ষ্টেশনে পৌঁছিলেন।...এই দুই দিনে অশ্বিনীকুমার আমার ক্ষুদ্র কুটীরকে একেবারে আনন্দের স্রোতে ভাসিয়ে দিয়েছিলেন।...পূর্ব্ববর্ত্তী ঘটনার নয়মাস পরে এক দিন অপরাহ্নে গোলদীঘির ধারের ফুটপাথের উপর অশ্বিনীকুমারের সঙ্গে আমার দেখা—আমি তখন হিমালয়ের যাত্রী।...সব খবর শেষ হয়ে গিয়েছে।..." ('ভারতবর্ষ' ১৩৪২ মাঘ, ১৮০-১৮৫ পৃষ্ঠা)।

তাহা হইলে অবশ্যই স্বীকার করিতে হয়, ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর অক্টোবর মাসের পূর্ব্বে তিনি হিমালয় যাত্রা করেন নাই। এই প্রসঙ্গ-সূচনায় তিনিও তাহাই লিখিয়াছেন—

"সে ইংরাজী ১৮৮৭ অব্দের কথা—প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বের কথা। আমি তখন এল-এ ফেল করে ফরিদপুর জেলার গোয়ালন্দে মাষ্টারী করি।" ('ভারতবর্ষ' মাঘ, ১৩৪২ সাল, ১৭৮ পৃষ্ঠা)

তাঁহার জীবন-স্মৃতির আলোচনা এবারের মত স্থগিত রাখিয়া এইবার মূল প্রসঙ্গের অনুসরণ করি,—কোন্ সময়ে জলধর বাবু স্বামীজীর জীবন দান করিয়াছেন? স্মৃতি-তর্পণে তিনি লিখিয়াছেন :—

"তারপর এক অভাবনীয় ঘটনায় আমি স্বামী বিবেকানন্দের (নরেন্দ্রনাথ দত্তের নহে) দর্শনলাভ করি। দর্শনলাভ মাত্র; পরিচয় হয় নি, তখন পরিচয় হবার অবস্থাও তাঁর ছিল না।"

"এ কিন্তু প্রায় ১২ বৎসর পরের কথা। আমি তখন হিমালয়ের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছি। তখনো আমি বদরিকাশ্রমের দিকে যাইনি। যাবার কল্পনাও মনে হয় নি।...আমি ঘুরতে ঘুরতে হিমালয়ের মধ্যে গিয়ে সর্ব্বপ্রথম ডেরাডুনে...মাষ্টারজীর আশ্রয় লাভ করি।...ওরে বাবা! সেই মাষ্টারী! এই যে দেশ ত্যাগ করে এলাম—তুমি কিনা বিনা টিকিটে আমার সঙ্গে সঙ্গে এসে এই হিমালয়ের সানুদেশে ডেরাডুনেও উপস্থিত।"

('ভারতবর্ষ' ১৩৪২ ফাল্গুন, ৩৪৯ পৃষ্ঠা)।

কিন্তু রায় বাহাদুরের স্মৃতিতর্পণের অষ্টাদশ পর্ব্ব মহাভারতের এই দ্বাদশবর্ষব্যাপী বনপর্ব্ব কোন্ বর্ষ হইতে গণনা করিব? জলধর বাবুর ১৮৮০-৮১ খৃষ্টাব্দের 'কলেজের পাঠসমাপ্তি পর্য্যন্ত'—'সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের রবিবাসরীয় উপাসনায় যোগদান' সময় হইতে দ্বাদশ বর্ষ গণনা করিলে ১৮৯২-৯৩ খৃষ্টাব্দ হয়; কিন্তু সে সময় ত' তিনি মহিষাদল রাজস্কুলের মাষ্টার এবং স্বামীজীও দাক্ষিণাত্য—

বোম্বাই—খেতরি পরিভ্রমণ করিয়া আমেরিকাযাত্রী। জলধর বাবুর গোলদীঘির বিদায় পর্ব্ব ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দ হইতে গণনা করিলে ১২ বৎসর পরে ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দ হয়। কিন্তু তিনি তখন ত' সশরীরে 'বসুমতী' কার্য্যালয়ে বিরাজিত!

"আমি ১৩০৪ সালের শেষে অথবা ১৩০৫ সালের প্রথমে বসুমতী আফিসে প্রবেশ করি (ভারতবর্ষ ১৩৪৩ আষাঢ়, ১২৩ পৃষ্ঠা)

জলধর বাবু সাহিত্যিক ভায়ামহলে চিরদিন সুপ্রচার করিয়া আসিতেছেন, তাঁহার হিমালয়ে বনবাসপর্ব্ব দ্বাদশবর্ষব্যাপী। সেইজন্যই বোধ হয় উচ্ছ্বাসের লম্ফ-কৌশলে এক যুগ—দ্বাদশ বর্ষ অতিক্রম করিলেন। কিন্তু সময় নির্ণয়ের সুবিধার জন্য এই প্রসঙ্গে তিনি আর এক হদিস দিয়াছেন,—

"তখনো আমি বদরিকাশ্রমের দিকে যাই নি।"

তাঁহার বদরিকাশ্রম-ভ্রমণকাহিনী 'হিমালয়' পুস্তকে বর্ণিত হইয়াছে। তাহাতে দেখি, তিনি ১৮৯০ খৃষ্টাব্দের ৩ই মে বুধবার রাত্রি সাড়ে চারটার সময় যাত্রা করিয়া—২৩ দিনে ২৯শে মে শুক্রবার বদরিকাশ্রমে উপস্থিত হইয়াছেন।

('হিমালয়' ৪ ও ২২৬ পৃষ্ঠা)

সুতরাং জলধর বাবু যে ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর হইতে ১৮৯০ খৃষ্টাব্দের মে মাসের পূর্ব্বেই সহসা হৃষীকেশে উপস্থিত হইয়া স্বামীজীর জীবন দান করিয়াছিলেন, সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই।

জলধর বাবুকে তাঁহার জীবনের এই শ্রেষ্ঠ গৌরব হইতে বঞ্চিত করিবার জন্যই স্বামীজীর জীবনী-লেখকগণ বোধ হয় ষড়যন্ত্র করিয়া, হৃষীকেশে তপস্যাকালে স্বামীজীর জ্বরঘোরে অচৈতন্য হইবার তারিখটির উল্লেখ করেন নাই। কিন্তু মায়াবতী অদ্বৈত আশ্রম প্রকাশিত স্বামীজীর প্রামাণ্য জীবনী অনুসরণে তিনি কোন্ সময়ে গুরুভ্রাতৃগণ সঙ্গে হৃষীকেশে সাধনাকালে সাধুর প্রদত্ত ঔষধে চৈতন্যলাভ করিয়াছিলেন, তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য নহে। এজন্য স্বামীজীর পরিব্রাজক-জীবনের আনুপূর্ব্বিক বিবরণ সঙ্কলন করিয়া দিতেছি।

১৮৮৬ খৃষ্টাব্দের ১৬ই আগষ্ট রবিবার, ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব লীলা সম্বরণ করেন।

"Sunday, August the sixteenth, eighteen hundred and sightysix,—the Master, breathing the most sacred word of the Vedas, entered Brahma-Nirvanam, passing into the uttermost peace" (Vol. I page 430)

১৮৮৬ হইতে ১৮৯২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ বরাহনগরে ছিল। "The Monastery was at Baranagore from the year 1886 to 1892" (vol II page 15)

মঠ প্রতিষ্ঠিত হইল বটে, কিন্তু নির্জ্জনে সাধনা করিবার জন্য প্রথমে স্বামী যোগানন্দ—অদ্ভুতানন্দ—ত্রিগুণাতীত (সারদা)—অখণ্ডানন্দ—পরে স্বামী সারদানন্দ—ব্রহ্মানন্দ—অভেদানন্দ—শিবানন্দ—কৃপানন্দ প্রভৃতি সন্ন্যাসিবৃন্দ তীর্থপর্য্যটনে বাহির হইলেন। স্বামীজী, শশী মহারাজ (রামকৃষ্ণানন্দ) ও অন্যান্য গুরুভ্রাতৃগণ তখনও বরাহনগর মঠে থাকিয়া সাধন ভজন করিতে লাগিলেন। ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দের প্রথমার্দ্ধ পর্য্যন্ত সিমুলতলা—বৈদ্যনাথ—আঁটপুর প্রভৃতি নিকটবর্ত্তী স্থানে কয়েক দিনের জন্য গমন ব্যতীত স্বামীজী বরাহনগর মঠেই অবস্থান করিতেন।

"With the exception of several unimportant journeys, more in the nature of 'excursions' from the monastery, the Leader did not leave Baranagore until the year 1888 was well on the way. He had paid flying visits to Vaidyanath, Shimultola and for the second time to Antpur,"

[Vol. II page 59]

১৮৮৮ খৃষ্টাব্দের মধ্যভাগে তিনি সর্ব্বপ্রথম কাশী—অযোধ্যা—আগ্রা হইয়া পদব্রজে শ্রীবৃন্দাবনে পৌঁছিলেন। বেলুড় মঠে সংরক্ষিত এবং পত্রাবলী তৃতীয় ভাগের ১ ও ২ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত—তাঁহার ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দের ১২ই আগষ্টের পত্রে তিনি বৃন্দাবন হইতে লিখিতেছেন—"শীঘ্রই হরিদ্বার যাইব, বাসনা আছে।" ১৮৮৮, ২০শে আগষ্টের পত্রে স্বামীজী লিখিতেছেন—"গ—(স্বামী অখণ্ডানন্দ) দুইবার তিব্বত ও ভুটান পর্য্যন্ত গিয়াছিল। এই মাসেই বৃন্দাবন আসিবে। আমি তাহাকে দেখিবার প্রত্যাশায় হরিদ্বারে গমন কিছুদিন স্থগিত রাখিলাম।" গিরিগোবর্দ্ধন, রাধাকুণ্ড পরিক্রম করিয়া, তিনি হাতরাসে কিছুদিন থাকিয়া, এসিষ্টাণ্ট ষ্টেশন-মাষ্টার শরৎচন্দ্র গুপ্তকে (সদানন্দ স্বামীকে) প্রথম শিষ্যরূপে সঙ্গে লইয়া, হৃষীকেশ যাত্রা করিলেন। কিন্তু সদানন্দ স্বামী অত্যন্ত অসুস্থ হওয়ায় স্বামীজী সত্বর

হাতরাসে ফিরিতে বাধ্য হইলেন। "But with his disciple ill, he was bound to give up the Kedar-Badri trip and even his life of 'tapasya' in Hrishikesh". (Vol 11 page 79)

এই সময় হৃষীকেশে কয়েক দিন অবস্থান-কালে স্বামীজী যে প্রবল জ্বরে অচৈতন্য হন নাই—সম্পূর্ণ সুস্থ ছিলেন—সদানন্দ স্বামি-প্রদত্ত বিবরণই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। "I was ill and fainted with hunger and thirst The Swami carried me on his shoulders for several miles, and thus undoubtedly saved me from certain death. On another occasion, like a syce he led the horse, which some one kindly lent us for the journey, across a mountain river which was very dangerous to ford, being extremely swift, and slippery at the bottom. ...he carried my personal belongings, including my shoes, upon his head." (vol II page 78)

যিনি কয়েক দিন পূর্ব্বে প্রবল জ্বরে অচৈতন্য ছিলেন, তাঁহার পক্ষে এক জন যুবক-রোগীকে কয়েক মাইল বন্ধুর রাস্তা কাঁধে করিয়া আনা, অশ্ববল্গা ধরিয়া পার্ব্বত্যনদী ও অত্যন্ত ঢালু—বিপজ্জনক পিচ্ছিল পথ অতিক্রম করা—শিষ্যের জুতাসহ দ্রব্যাদি মস্তকে বহন সম্ভবপর কি ?

গুরুভ্রাতৃগণের পত্র পাইয়া স্বামীজী হাতরাস হইতে বরাহনগর মঠে ফিরিয়া আসেন। কয়েক মাস পরে সদানন্দ স্বামীও বরাহনগর মঠে আসেন। ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর, ১৮৮৯ ফেব্রুয়ারী—মার্চ্চ—জুন—জুলাই—আগষ্ট—সেপ্টেম্বর হইতে ডিসেম্বর ১৩ই পর্য্যন্ত স্বামীজী যে বরাহনগর মঠে ছিলেন, তাহা বেলুড় মঠে সুরক্ষিত এবং পত্রাবলী তৃতীয়-ভাগে ৩ হইতে ২৩ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত তাঁহার স্বহস্তে লিখিত পত্ররাজিতেই সুপ্রকাশ।

১৮৮৯ ডিসেম্বর মাসে স্বামীজী বৈদ্যনাথে গিয়া কাশী যাইবেন স্থির করিয়াছেন, এমন সময় যোগানন্দ স্বামীর কঠিন পীড়ার সংবাদ পাইয়া, তিনি এলাহাবাদে গমন করেন। পত্রাবলী তৃতীয় ভাগের ২৬—২৭ পৃষ্ঠায় এবং ৫ম ভাগের ৩ হইতে ১০ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দের ২৬শে ও ২৫শে ডিসেম্বর বৈদ্যনাথের এবং ৩০শে ডিসেম্বর ও ১৮৯০ খৃষ্টাব্দের ৫ই জানুয়ারীর প্রয়াগধামের পত্র ইহার প্রমাণ।

যোগানন্দ স্বামী আরোগ্য লাভ করিলে স্বামীজী কিছুদিন কাশীধামে থাকিয়া, ১৮৯০ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসের শেষ ভাগে পাওহারী বাবার সঙ্গলাভের জন্য গাজীপুরে গমন করেন। ১৮৯০ খৃষ্টাব্দের ২৪শে, ৩১শে জানুয়ারী ৪ঠা, ৭ই, ১৩ই, ১৪ই, ১৯শে, ২৫শে ফেব্রুয়ারী—৩রা, ৮ই, ১২ই, ১৫ই, ৩১শে মার্চ্চ—২রা, প্রথম সপ্তাহ এপ্রিলে গাজীপুর হইতে স্বামীজীর লিখিত পত্রসমূহ পত্রাবলী ৩য় ভাগে ২৯ হইতে ৫৮ পৃষ্ঠায় এবং ৫ম ভাগে ১১ হইতে ২২ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত। স্বামীজী যে এই সময়ে গাজীপুরে অবস্থান করিয়া, পাওহারী বাবার উপদেশ গ্রহণ করিতেছিলেন, তাঁহার স্বহস্তলিখিত এই পত্রগুলিই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। গাজীপুরে অবস্থানকালে স্বামীজী অভেদানন্দ স্বামী হৃষীকেশে পীড়িত সংবাদ পাইয়া, তাঁহাকে কাশীতে আনিবার ব্যবস্থা করিয়া, স্বয়ং কাশীতে আসিয়া সংস্কৃতে সুপণ্ডিত প্রমদাদাস মিত্রের অতিথি হইলেন। এই সময় কাশীতে ঠাকুরের প্রিয়তম গৃহী শিষ্য বলরাম বাবুর পরলোকগমন-সংবাদ পাইয়া, তিনি বরাহনগরে ফিরিয়া, দুই মাস মঠে ও বলরাম বাবুর বাড়ীতে অবস্থান করেন। পত্রাবলী ৩য় ভাগে ৫৯ হইতে ৭১ পৃষ্ঠায় তাঁহার বরাহনগর ও বলরাম বাবুর বাড়ী হইতে লিখিত—১৮৯০ খৃষ্টাব্দের ১০ই, ২৬শে মে—৪ঠা জুন—৬ই জুলাই তারিখের পত্র প্রকাশিত হইয়াছে। স্বামীজীর স্বহস্তাক্ষরের পত্রগুলি আজও বেলুড়মঠে সংরক্ষিত।

স্বামী অখণ্ডানন্দ তিব্বত পরিভ্রমণ করিয়া, এই সময়ে মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। তাঁহার মুখে তিব্বত—কাশ্মীর—কেদার-বদ্রিনাথের মহান্ সৌন্দর্য্যের উচ্ছ্বাসময় বর্ণনা শ্রবণে আকৃষ্ট হইয়া, স্বামীজী ১৮৯০ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে স্বামী অখণ্ডানন্দের সহিত হিমালয় পরিভ্রমণে যাত্রা করেন। ১৮৯০—৬ই জুলাই হিমালয় যাত্রা সূচনায় তিনি যে পত্রখানি লিখিয়াছিলেন, তাহা এইরূপ ;—

"I had no intention to leave Ghazipur this time and certainly did not want to come to Calcutta but Kali's (অভেদানন্দ স্বামীর) illness made me go to Benares and Balaram's sudden death

brought me to Calcutta. So Suresh Babu and Balaram Babu have both gone !······

"I intend shortly, as soon as I can get a portion of my fare, to go up to Almora and thence to some place in Gharwal on the Ganges where I can settle down for a long meditation. Gangadhar is accompanying me. Indeed, it was with this desire and intention that I brought him down from Kashmir···I am in fine health now···"

(Vol 11. pp 101-102)

বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সন্ন্যাসী গুরুভ্রাতা স্বামীজীর ভ্রমণ-সঙ্গী হইয়াছেন, কিন্তু বেলুড়মঠের বর্ত্তমান প্রেসিডেন্ট—ধর্ম্মগুরু অখণ্ডানন্দ স্বামীই এই সময়ে স্বামীজীর সঙ্গী হইয়াছিলেন।

"At different times these different monks were the companions of the Leader in his travels in these days, but of all of them, the Swami Akhandananda remained with him for the longest period at a time, being with him from the end of July, 1890, till the latter part of the autumn of the same year."

(Vol. 11 page 61)

শালকিয়া ঘুসুড়ীতে শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর পদধূলি লইয়া যাত্রা করিয়া, স্বামীজী ও অখণ্ডানন্দ স্বামী ১৮৯০ আগষ্ট মাসে ভাগলপুরে পৌছিয়া কয়দিন বিশ্রাম করেন। পরে বৈদ্যনাথে আসিয়া, তাঁহারা এক দিন শ্রদ্ধেয় রাজনারায়ণ বসুর আতিথ্য গ্রহণ করিয়া, কাশী ও অযোধ্যা হইয়া পদব্রজে হিমালয়ের পাদদেশ নৈনিতালে উপস্থিত হন। নৈনিতালে স্বামীজী রমাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্যের ভবনে ৬ দিন আতিথ্য গ্রহণ করেন। নৈনিতাল হইতে আলমোড়ার পথে স্বামীজী ক্ষুধায় তৃষ্ণায় মূর্চ্ছিতপ্রায় হইয়াছিলেন, এক জন ফকিরের প্রদত্ত একটি শশা খাইয়া তিনি তৃপ্ত হন। আলমোড়ায় পৌছিয়া তাঁহারা হিমালয়-পরিভ্রমণকারী অপর দুই গুরুভ্রাতা—স্বামী সারদানন্দ ও কৃপানন্দের সহিত মিলিত হইয়া বদ্রীসার বাগানে কয়েক দিন অবস্থান করেন।

ব্রহ্মচারী শ্রীপ্রকাশচন্দ্র সঙ্কলিত 'স্বামী সারদানন্দ' জীবনী-গ্রন্থের ৭৪ পৃষ্ঠায় বদ্রীসার বাগানে গুরুভ্রাতৃগণের মিলনসময়ের নিম্ন পত্রখানি আলমোড়া ডাকঘরের শীলে ৫ই সেপ্টেম্বর ১৮৯০ তারিখের প্রতিলিপিসহ প্রকাশিত হইয়াছে, কাশীর প্রমদাদাস মিত্রকে স্বামীজীর আলমোড়া আগমন সংবাদ দিবার জন্য শরৎ মহারাজ লিখিতেছেন :—

আলমোড়া, ৫ই সেপ্টেম্বর ১৮৯০

"মহাশয়—নরেন্দ্র ও গঙ্গাধর প্রায় ৫।৭ দিন হইল এখানে আসিয়াছে। অদ্য পুনরায় গাড়োয়ালের দিকে রওনা হইবে। নরেন্দ্র বার বার নিষেধ করাতে আপনাকে এত দিন উত্তর দিতে পারি নাই। তজ্জন্য ক্ষমা করিবেন। আমরাও নরেন্দ্রের সঙ্গে চলিতেছি। পত্রাদি কিছুকাল আর লিখিতে পারিব না। কারণ, তাহা হইলে আমাদিগকে সঙ্গে রাখিবে না।"···

গাড়োয়াল রাজ্যাভিমুখে অগ্রসর হইয়া, কর্ণপ্রয়াগ অতিক্রম করিয়া, এক চটীতে বিশ্রামকালে স্বামীজী জ্বরে আক্রান্ত হন। সেই চটীতে তিন দিন বিশ্রাম করিয়া, রুদ্রপ্রয়াগের পরবর্ত্তী চটীতে তাঁহার আবার প্রবল জ্বর হয়। কাছারীর আমিন-প্রদত্ত কবিরাজী ঔষধে স্বামীজী কিঞ্চিৎ সুস্থ হইলে তিনি তাঁহাকে দাণ্ডী ভাড়া করিয়া, শ্রীনগরে (গাড়োয়াল) পাঠাইয়া দেন। আলমোড়া হইতে তাঁহারা এ পর্য্যন্ত ১২০ মাইল পদব্রজে অতিক্রম করিয়াছেন—এই স্থান হইতেই বদরিকাশ্রমের রাস্তা। শ্রীনগর (গাড়োয়াল) হইতে কাঠগোদামের দূরত্ব ১৬০ মাইল। ধর্ম্মপ্রসঙ্গ আলোচনা—ধ্যান-ধারণা—ভিক্ষা সংগ্রহ করিয়া, আলমোড়া হইতে শ্রীনগরের বন্ধুর পার্ব্বত্য পথ অতিক্রম করিতে তাঁহাদের দুই সপ্তাহেরও উপর সময় লাগিয়াছিল।

"It had taken them more than two weeks to accomplish the distance from Almora, and the time had been spent in wandering slowly up the mountain paths, begging their food, meditating, and holding religious conversation."

(Vol. 11 page 115)

তাহা হইলে স্বামীজী ও তাঁহার গুরু-ভ্রাতৃগণ ১৮৯০ খৃষ্টাব্দের ২০শে বা ২১শে সেপ্টেম্বরের পূর্ব্বে কোনমতেই গাড়োয়ালের শ্রীনগরে উপনীত হইতে পারেন নাই।

জলধর বাবু বদরিকাশ্রমের পথে দুইবার গাড়োয়ালের শ্রীনগর অতিক্রম করিয়াছেন। যাত্রাকালে—

(১৮৯০) "১৪ই মে বৃহস্পতিবার বেলা প্রায় এগারটার সময় গাড়োয়ালের প্রধান নগর শ্রীনগরে উপস্থিত হওয়া গেল।"

('হিমালয়' ৪৪ পৃষ্ঠা)।

(১৮৯০) "৮ই জুন—আজ আমার দীর্ঘ প্রবাসের সঙ্গী অচ্যুতানন্দ ব্রহ্মচারীকে হারিয়েছি।···এই দিন থেকে আমি আর ডাইরি রাখিনি।···প্রত্যাবর্ত্তনের পথে শ্রীনগর অবধি এসে আর

আমার লেখবার তেমন ইচ্ছা হ'ল না।...বিশেষ যে পথে গিয়েছিলুম, সেই পথেই প্রত্যাবর্ত্তন ; নূতন ব্যাপার, নূতন দৃশ্য কিছুই আমার সম্মুখে পড়েনি ; ডাইরি না লিখবার ইহাও একটি কারণ !"

"শ্রীনগর হিমালয়ের মধ্যে হ'লেও সেটা লোকালয়। আমরা লোকালয়ে পৌঁছিয়াছি, শ্রীনগরে আমার অনেক বন্ধু অনেক ছাত্র আছেন, তাঁদের সঙ্গে কয়েক দিন কাটিয়ে আমি ফিরে আসি !"

('হিমালয়' ২৮৭—২৮৯ পৃষ্ঠা)

জলধর বাবুর বন্ধু ও ছাত্রগণের সহিত শ্রীনগরে কয়েক দিন অবস্থান এক সপ্তাহ বলিয়া ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। তাহা হইলেও স্বামীজীর শ্রীনগরে ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে ২০শে সেপ্টেম্বর তারিখে পৌঁছিবার অন্ততঃ ৯৭ দিন পূর্ব্বেই ১৮৯০ খৃষ্টাব্দের ৮ই জুন হইতে এক সপ্তাহ পরে ১৫ই জুন তারিখে যে জলধর বাবু শ্রীনগর ত্যাগ করিয়াছেন, তাহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই। অথচ তিনি লিখিয়াছেন—"তখনো আমি বদরিকাশ্রমের দিকে যাই নি। যাবার কল্পনাও মনে হয় নি।" ('ভারতবর্ষ' ১৩৪২ ফাল্গুন, ৩৪৪ পৃষ্ঠা)

কিন্তু আমাদের প্রতিপাদ্য প্রসঙ্গ এখনও সমাপ্ত হয় নাই। শ্রীনগরে আসিয়া স্বামীজী ও তাঁহার গুরুভ্রাতৃগণ অলকনন্দাতীরে একটি নির্জ্জন কুটীরে কিছুদিন সাধনা করিলেন। এই কুটীরেই পূর্ব্বে স্বামী তুরীয়ানন্দ তপস্যা করিতেন। শ্রীনগর হইতে তাঁহারা টিহিরী যাত্রা করিলেন। পথে ভিক্ষা মিলিল না। টিহিরীতে গঙ্গাতীরে একটি পোড়ো-বাগানের দুটি নির্জ্জন কুটীরে থাকিয়া, তাঁহারা সাধনা করিতে লাগিলেন। কয়দিন পরে পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের ভ্রাতা—টিহিরী-রাজের দাওয়ান রঘুনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের সহিত পরিচয় হইলে, তিনি গণেশপ্রয়াগে—গঙ্গা ও ভিলাঙ্গন নদীর সঙ্গমস্থানে তাঁহাদের সাধনা করিবার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। এই স্থানে সাধনাকালে স্বামী অখণ্ডানন্দ ব্রঙ্কাইটিস রোগে আক্রান্ত হন। পার্ব্বত্য বায়ু তাঁহার সহ্য হইবে না এবং শীত আসিতেছে বলিয়া স্থানীয় ডাক্তারের পরামর্শমত স্বামী অখণ্ডানন্দের চিকিৎসার জন্য তাঁহারা টিহিরী হইতে মুশুরীর মধ্য দিয়া রাজপুর (ডেরাডুন) গেলেন।

"The physician at Tehori ordered him to go down at once to the plains, as the mountain air was proving too rarified for his lungs, and as the winter was approaching."

(vol II page 117)

রাজপুর উপত্যকায়—নব-রাত্রির এক দিন পূর্ব্বে ১৩ই অক্টোবর ১৮৯০—বহুকাল পরে স্বামী তুরীয়ানন্দের সহিত তাঁহাদের মিলন হইল। ডেরাডুনে উপনীত হইয়া তাঁহারা সকলে স্বামী অখণ্ডানন্দকে ডেরাডুনের সিভিল সার্জ্জেনের নিকট লইয়া গেলেন। টিহিরীর দাওয়ানের অনুরোধ-পত্রানুসারে স্বামী অখণ্ডানন্দকে বিশেষভাবে পরীক্ষা করিয়া সিভিল সার্জ্জেন মত দিলেন যে, ইঁহার আর পর্ব্বতে উঠা উচিত নহে—সমতল-ভূমিতে কিছুকাল থাকিয়া, ভাল করিয়া চিকিৎসা করা দরকার। স্বামীজী তাঁহার অসুস্থ গুরু-ভ্রাতার চিকিৎসার জন্য আশ্রয়প্রার্থী হইয়া ডেরাডুনের প্রত্যেক বাড়ীতে ঘুরিয়াও আশ্রয়স্থান পাইলেন না।

"After careful examination the Doctor advised Akhandananda not to return to the hills but to live carefully in the plains and have good medical treatment. But first of all some shelter had to be found for the sick monk. So the Swami himself went about the town of Dehra Dun, in search of a suitable place, entering many houses, and saying, 'My 'gurubhai' is ill ! Can you give him a little place in your house and arrange for suitable diet for him ?' But the Swami only received cold-hearted replies and excuses. Nothing undaunted he went abegging from house to house and at last the Pandit Ananda Narayan, a Kashmiri Brahman and a vakil of the place, took charge of the sick monk. He rented a small house for him and provided him with suitable diet and warm clothing. The others stayed elsewhere, and begged their meals as fortune favoured them."

(vol. II. pp. 118-119.)

ইহা ১৮৯০—২০শে সেপ্টেম্বরের স্বামীজীর শ্রীনগরে পৌঁছিবার তিন সপ্তাহ পরে ১৩ই অক্টোবর মহালয়ার দিনের ঘটনা। জলধর বাবু নিশ্চয়ই এ সময়ে ডেরাডুনে ছিলেন না। কিন্তু ইহার পরও কি জলধর বাবু বলিবেন ?—

"স্বামী বিবেকানন্দের দর্শনলাভের বোধ হয় ১০।১৫ দিন পরে সংবাদ পেলাম, সাদ্রচর বিবেকানন্দ স্বামী ডেরাডুনে এসে সেখানকার কালীবাড়ীতে আতিথ্য-গ্রহণ করেছেন। সেই কথা শুনে আমি শ্রীযুক্ত বিমলাচরণ এবং তার খুল্লতাত সার্ভে অফিসের এক জন প্রধান কর্ম্মচারী বন্ধুবর শশিভূষণ সোম—এই তিন জন কালীবাড়ীতে গিয়ে উপস্থিত হলাম। সেই রাত্রিতেই তাঁদের করণপুরে নিয়ে আসতে চেয়েছিলাম, তাঁরা পরদিন প্রাতঃকালে আসতে স্বীকার করলেন।

"শশিভূষণ সোম মহাশয়ের বাড়ী খুব বড় ও সুন্দর। সেইখানেই তাঁদের থাকবার ব্যবস্থা করলাম। শশীবাবুদের সকলেরই

অফিস ছিল। কাযেই সন্ন্যাসীদের পরিচর্য্যার ভার—বাহিরে আমি এবং ভিতরে শশীবাবুর বাড়ীর মেয়েরা গ্রহণ করলেন।

"স্বামীজী এবং তাঁর সহচরবর্গকে আমরা কয়েকদিন আটকে রাখতে চেয়েছিলাম, কিন্তু স্বামীজী অস্বীকার করলেন। তিনি বল্লেন, দ্বিতীয় তিথি পর্য্যন্ত অপেক্ষা করতে নেই—সেইজন্যই নাম 'অতিথি'। তার পরদিন প্রত্যূষে তাঁরা চলে গেলেন। স্বামীজী বলে গেলেন, তিনি উত্তরাপথ ত্যাগ করে এইবার দক্ষিণাপথে যাবেন।"...

('ভারতবর্ষ' ১৩৪২ ফাল্গুন, ৩৪৬ পৃষ্ঠা)

ধন্য জলধর বাবু! বিনয়ের অন্তরালে আত্মপ্রশংসা করিতে গিয়া, জলধর বাবু সত্যের প্রতীক স্বামী বিবেকানন্দের মুখ দিয়াও মিথ্যা কথা বাহির করিয়া লইয়াছেন! যিনি পীড়িত গুরুভ্রাতার জন্য সেই সময়ে বা তাহার কিছুদিন পরে ডেরাডুনেই দ্বারে দ্বারে আশ্রয়প্রার্থী—পরিব্রাজক-জীবনে যিনি বহুস্থানে বহুদিনব্যাপী আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছেন—সাধকজীবনে ভিক্ষান্নই যাঁহার সম্বল—সেই স্বামী বিবেকানন্দই কি না 'অতিথি' শব্দের অর্থ বিশ্লেষণে মিথ্যার আরোপ করিয়া, জলধর বাবুকে সৌজন্যে বঞ্চিত করিলেন! 'অতিথি' শব্দের প্রকৃত অর্থ রায় বাহাদুরের জানা থাকিলে এরূপ অপূর্ব্ব পাণ্ডিত্য প্রকট করিয়া, সুধীজনসমাজে মৃত-সঞ্জীবনীসুধার সঙ্গে হাস্যরস পরিবেশন করিতে পারিতেন কি? অ+তিথি=যাঁহার তিথি বিচার নাই—যে কোন তিথিতে সহসা গৃহস্থের গৃহে আগমন করিয়া যিনি আতিথ্য গ্রহণ করেন, তিনিই অতিথি। রায় বাহাদুরের এই উক্তি কেবল অমার্জ্জনীয় অপরাধ নহে, ধৃষ্টতারও পরিচায়ক নহে কি?

কিন্তু ডেরাডুনে স্বামীজীর আশ্রয় মিলিল। পণ্ডিত আনন্দনারায়ণ নামে এক জন কাশ্মীরী ব্রাহ্মণ উকিল অসুস্থ অখণ্ডানন্দ স্বামীর জন্য একটি ছোট বাংলো ভাড়া করিয়া আশ্রয়—পথ্য—গরম কাপড় দিলেন। স্বামীজী ও অন্যান্য সন্ন্যাসিগণ ভিক্ষা করিয়া খাইতেন। ডেরাডুনে প্রায় তিন সপ্তাহ অতিবাহিত করিয়া, অখণ্ডানন্দ স্বামী একটু সুস্থ হইলে তাঁহাকে কৃপানন্দের সঙ্গে চিকিৎসার জন্য এলাহাবাদে পাঠাইয়া, স্বামীজী তুরীয়ানন্দ সারদানন্দ প্রভৃতি গুরুভ্রাতৃসহ হৃষীকেশে আসিলেন।

"The Swami remained at Dorah Dun for about three weeks and then advising Akhandananda to go to a friend's house in Allahabad.

(vol II. page. 120)

অখণ্ডানন্দ স্বামী সাহারাণপুর হইতে বন্ধু বাবুর পরামর্শে এলাহাবাদে না গিয়া, মীরাটে ডাক্তার ত্রৈলোক্যনাথ ঘোষের বাড়ী গেলেন—সেখানে দেড় মাস চিকিৎসার পর সুস্থ হইলেন।

ডেরাডুন হইতে হৃষীকেশে আসিয়া তপস্যাকালেই স্বামীজী এক দিন জ্বরঘোরে অচৈতন্য হইয়া, সাধুর প্রদত্ত ঔষধে সংজ্ঞালাভ করিয়াছিলেন। মায়াবতী অদ্বৈত আশ্রম প্রকাশিত স্বামীজীর জীবনী হইতে সে বিবরণ পূর্ব্বেই উদ্ধৃত করিয়াছি।

হৃষীকেশে প্রবল জ্বরে স্বামীজী অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়াছিলেন, তিনি একটু সুস্থ হইলেই তাঁহার গুরু-ভ্রাতারা তাঁহাকে হরিদ্বারে আনিলেন। রাখাল মহারাজ—স্বামী ব্রহ্মানন্দ সে সময়ে হরিদ্বার কনখলে সাধনা করিতেছিলেন। তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া সকলে সাহারাণপুরে আসিয়া বন্ধু বাবুর নিকট শুনিলেন, অখণ্ডানন্দ স্বামী মীরাটে আছেন। তাঁহারা মীরাটে আসিয়া অখণ্ডানন্দ স্বামীর সহিত শরৎকালের শেষভাগে কালীপূজার পর মিলিত হইলেন। "It was now past the time of the year when mother Kali is worshipped, that is, late in the autumn." (vol II page 122). যথাযোগ্য চিকিৎসায় স্বামীজী ও অখণ্ডানন্দ স্বামী সুস্থ হইলেন। মীরাটে গুরু-ভ্রাতৃগণ সকলে সম্মিলিত হইয়া, বরাহনগর মঠের আনন্দের মত পরমানন্দে প্রায় তিন মাস ধর্ম্মালোচনা—সাহিত্য-দর্শন-চর্চ্চা—ধ্যান-ধারণা করিতে লাগিলেন। স্বামীজী ১৮৯১ জানুয়ারীর শেষে গুরুভ্রাতৃগণকে ৭ বৎসরের জন্য ত্যাগ করিয়া, মীরাট হইতে দিল্লী-যাত্রা করেন।

"And from the year 1891 for nearly seven years the Leader himself was absent. When he became the 'Parivrajaka', he was buried in forgottenness; none of his brothers knew his whereabouts, though often they made efforts to find him out. But since the passing of Sri Ram Krishna for about four years he was on and off, with his guruthais,' either at Baranagore or in the company af one or more of them on various pilgrimages, and only for short periods by himself. Then in the beginning of the year 1891 he broke free from his brother monks, leaving them finally at Delhi."

(Vol. II page 52-53).

দিল্লী হইতে ১৮৯১ ফেব্রুয়ারী মাসে স্বামীজী আলোয়ারে উপনীত হন—পরে জয়পুর—আজমীর—আবু পাহাড়—খেতরি—গুজরাট—বোম্বাই হইয়া, দাক্ষিণাত্যের বিভিন্ন প্রদেশ—রামেশ্বর—কন্যাকুমারী পরিভ্রমণ করিলেন। পণ্ডিচেরী ঘুরিয়া স্বামীজী ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে—হায়দ্রাবাদ—মাদ্রাজ হইয়া আবার খেতরি গিয়া, ১৮৯৩—৩১শে মে স্বামীজী আমেরিকায় যাত্রা করেন এবং ১১ই সেপ্টেম্বর চিকাগোর ধর্ম্মমহা-সম্মেলনে যোগদান করেন। উহার বহু দিন পরে তিনি আবার হিমালয়ের বিভিন্ন প্রদেশ—কাশ্মীর প্রভৃতি পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন; কিন্তু তাহা আমাদের আলোচ্য নহে।

স্বামীজী ১৮৯০ খৃষ্টাব্দের ১৩ই অক্টোবর ডেরাডুনে পৌঁছিয়া, প্রায় তিন সপ্তাহ—৪ঠা নভেম্বর পর্য্যন্ত, ডেরাডুনে ছিলেন। কালীপূজার পর ১৫ই নভেম্বর নাগাৎ তাঁহারা মীরাটে সমবেত হন। ইহার মধ্যে কনখল ও সাহারাণপুরে অন্ততঃ ২ দিন ছিলেন। তাহা হইলে ৪ঠা হইতে ১২ই নভেম্বর মধ্যেই স্বামীজী হৃষীকেশে অচৈতন্য হইয়াছিলেন।

জলধর বাবু ১৮৯০ খৃষ্টাব্দের ৮ই জুন শ্রীনগরে ফিরিয়া কয়েক দিন—এক সপ্তাহ-পরেই ১৫ই জুন তাঁহার যাত্রাপথ দিয়াই ডেরাডুনে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। তিনি ১৮৯০—৩ই মে তারিখে ডেরাডুন যাত্রা করিয়া ১৪ই মে—৯ দিনে শ্রীনগরে পৌঁছিয়াছিলেন। সুতরাং ১৮৯০ খৃষ্টাব্দের ২৪শে জুন তাঁহার ডেরাডুনে ফিরিবার কথা। ইহার কিছু দিন পরেই তিনি স্বগ্রাম কুমারখালিতে ফিরিয়া—সাধকপ্রবর কাঙ্গাল হরিনাথের 'গ্রাম্যবার্ত্তা-প্রকাশিকা'র পরিচালনে সহায়তা করিতেছিলেন; এবং তাহার কিছুদিন পরেই মহিষাদল রাজস্কুলে তৃতীয় শিক্ষকের কার্য্যে ব্রতী হইয়াছিলেন। 'ভারতবর্ষের' ১৩৪২ সালের ফাল্গুন সংখ্যায় জলধর বাবু স্বামীজীর 'স্মৃতিতর্পণ' করিবার ৩০ মাস পূর্ব্বেই 'মাসিক বসুমতীর' ১৩৩০ সালের ভাদ্র সংখ্যায় ৭৪৬ পৃষ্ঠায় আমার 'সেকালের স্মৃতি' কথায় এই প্রসঙ্গের বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছি। সুতরাং জ্বরঘোরে হৃষীকেশে স্বামীজী অচৈতন্য হইবার পূর্ব্বেই জলধর বাবু কুমারখালি ফিরিয়াছিলেন। বদরিকাশ্রম হইতে ফিরিয়া জলধর বাবু আবার ডেরাডুন স্কুলে মাষ্টারী করিতেছিলেন, এ কথা বলিবারও উপায় নাই। কারণ, তিনি প্রসঙ্গ-সূচনায় স্পষ্টই লিখিয়াছেন:—

"আমি তখন হিমালয়ের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছি। তখনো আমি বদরিকাশ্রমের দিকে যাইনি। যাবার কল্পনাও মনে হয় নি।…আমি ঘুরতে ঘুরতে হিমালয়ের মধ্যে গিয়ে সর্ব্বপ্রথম ডেরাডুনে এই মাষ্টারজীর আশ্রয় লাভ করি।"

('ভারতবর্ষ' ১৩৪২ ফাল্গুন, ৩৪৪ পৃষ্ঠা)

হৃষীকেশ হিমালয়ের পাদদেশে অবস্থিত। টিহিরী হইতে যাত্রা-সময়েই শীতের আগমন-সম্ভাবনায় স্বামীজীরা ডাক্তারের পরামর্শে অক্টোবর মাসে ডেরাডুনে ফিরিয়াছিলেন। নভেম্বর মাসে বাঙ্গালাদেশেই শীতের প্রাদুর্ভাব, হিমালয় প্রদেশে নিশ্চয়ই তখন গ্রীষ্মকাল। নচেৎ জলধর বাবু "গ্রীষ্মকালের…সন্ধ্যার প্রাক্কালে" হৃষীকেশে সহসা হাজির হইয়া—"সেই প্রায়ান্ধকারে গঙ্গার বালুকাময় চড়ায় (?) সেই গাছের অনুসন্ধান ক'রে সৌভাগ্যক্রমে অনতিদূরেই সেই গাছ" পাইবেন কিরূপে?—"তারি ২।৩টি পাতা এনে হাতে রগড়ে রস বের করে স্বামীজীর মুখে" দিলেন কিরূপে?—"প্রায় আধঘণ্টা পরে স্বামীজী চৈতন্যলাভ করলেন" কিরূপে?

বৃদ্ধ সন্ন্যাসী নিশ্চয়ই এতকাল বাঁচিয়া নাই—দৈবাৎ বাঁচিয়া থাকিলেও ৪৬ বৎসর পূর্ব্বে এক দিন হৃষীকেশে তিনি ঔষধ প্রয়োগ করিয়া জ্বরঘোরে অচৈতন্য স্বামীজীর চৈতন্য-সঞ্চার করিয়াছিলেন বলিয়া, নিশ্চয়ই এই সুদীর্ঘকাল পরে সে গৌরবের দাবী করিতে আসিবেন না। অতএব সন্ন্যাসীর প্রাপ্য গৌরব সুকৌশলে আত্মসাৎ করিতে দোষ কি? জলধর বাবু নিজেই স্বীকার করিয়াছেন—সাইমাল্‌টেনিয়াস্ ইকোয়েসনে তিনি ছাত্রদের গাধা বানান। ইহাও কি সেই সাইমাল্‌টেনিয়াস্ ইকোয়েসনের মোহিনী ধাঁধা? কিন্তু সুধীজনসমাজ—পাঠকগণের সকলেই ত' আমার মত তাঁহার ছাত্র নহেন—তাঁহাদের নিকট তিনি এ ছাইমালের সামাল দিতে পারিয়াছেন ত'?

জলধর বাবুর পক্ষে পরবর্ত্তী কালে স্বামীজীর জীবনী পাঠে ব্রাহ্মসমাজে তাঁহার গানের প্রশংসা ঘনিষ্ঠতার কথা অবগত হইয়া অনায়াসে স্মৃতিতর্পণে তাহার উল্লেখ সম্ভবপর হইতে পারে;—দক্ষিণেশ্বরে সে সময় বিশিষ্ট ভক্তগণ ব্যতীত বিরাট জনতা না থাকিলেও—ঠাকুরের ক্ষুদ্র কক্ষের "দুয়োরের কাছ থেকে প্রণাম করেই বিদায়" লওয়া—"কোনো দিন তাঁর দৃষ্টি না পড়াও" বিশ্বাসযোগ্য হইলেও হইতে পারে;—কিন্তু "সংসার ত্যাগ ক'রে স্বামী বিবেকানন্দ

নাম ধারণ করেছেন, এ সংবাদও বন্ধু-বান্ধবগণের মুখে অথবা সংবাদপত্রের মারফতে পেয়েছিলাম"—এবং হৃষীকেশে সেইজন্যই তিনি চমকিত—উৎকণ্ঠিত হইয়াছিলেন—"স্বামী বিবেকানন্দ! হৃষীকেশে গঙ্গাতীরে এই ক্ষুদ্র কুটীরে পরমহংসদেবের পরম স্নেহপাত্র স্বামী বিবেকানন্দ!" ('ভারতবর্ষ' ১৩৪২ ফাল্গুন—৩৪৪-৩৪৫ পৃষ্ঠা) কিন্তু সে সময়ে অর্থাৎ ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে অথবা তাহার ১২ বৎসর পূর্ব্বে ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে জলধর বাবু কোন্ কোন্ সংবাদপত্র পাঠে বা কোন্ কোন্ বন্ধুর নিকট স্বামী বিবেকানন্দের নাম জানিতে পারিয়াছিলেন—পরবর্ত্তী স্মৃতিতর্পণে তাহা প্রকাশ করিবেন কি? কিন্তু তাঁহার মত সপ্রতিভ রায় বাহাদুরও শুনিয়া বিস্মিত হইবেন—সংবাদপত্রে প্রশংসার ঢাক বাজান দূরের কথা, সাধনসময়ে—হিমালয়ে পরিভ্রমণকালে স্বামীজী এতটা আত্মগোপন করিয়া থাকিতেন যে, কাহাকেও পত্রাদি পর্য্যন্ত লিখিতেন না এবং আত্মসংগোপনের জন্য তিনি 'বিবিদিষানন্দ' ও 'সচ্চিদানন্দ' নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন।

আমেরিকা যাত্রার অব্যবহিত পূর্ব্বে ১৮৯৩—মে মাসে —খেতরির রাজার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে তিনি গৈরিক রেশমী পরিচ্ছদ—পাগড়ী এবং গুরুদত্ত নাম সর্ব্বপ্রথম ব্যবহার করিতে সম্মত হন।

"Now he was known as 'Vividishananda', now as 'Sachchidananda' and so on. It is said that he finally assumed the name Vivekananda at the earnest entreaty of the Rajah of Khetri.

(Vol II, page 258).

ডেরাডুনে স্বামীজীর জলধর বাবুর আতিথ্যগ্রহণপ্রসঙ্গে জলধর বাবু লিখিতেছেন—

"এই যে আমাদের সেদিনকার এত আনন্দ—এর মধ্যে কিন্তু ঘুণাক্ষরেও হৃষীকেশে আমার সেই অভাবনীয় বা অপ্রত্যাশিতভাবে স্বামীজীর দর্শনলাভের কথার উল্লেখ করিনি। স্বামীজী ত' ন'নই, তাঁর সঙ্গীরাও ডেরাডুনে আমাকে চিনতে পারেন নি—পারবার কথাও নয়; তখন আমি নগ্নপদ কম্বল-সম্বল সন্ন্যাসী, আর ডেরাডুনে আমি ভদ্রবেশী, প্রকাণ্ড পাগড়ীধারী মাষ্টারজী। তা ছাড়া হৃষীকেশে গঙ্গাতীরে প্রায়ান্ধকারে মানুষ চেনাও শক্ত।"

('ভারতবর্ষ' ১৩৪২ ফাল্গুন, ৩৪৬ পৃষ্ঠা)

ছাপার অক্ষরে—স্বাক্ষরযুক্ত প্রবন্ধে এরূপ নির্লজ্জ মিথ্যার বিরাট বাহার আর কখনও দেখিবার সৌভাগ্য হইয়াছে বলিয়া ত' স্মরণ হয় না।

উপসংহারে এই অলীক কাহিনীকে সত্যের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য রায় বাহাদুর লিখিতেছেন—

"সম্পূর্ণ আত্মবিস্মৃত হয়ে স্বামীজীর পরলোকগমন উপলক্ষে একদিন মাত্র টাউনহলের শোকসভায় হৃদয়ের আবেগ সম্বরণ করতে না পেরে হৃষীকেশের ঘটনার সামান্য উল্লেখমাত্র করেছিলাম।"

জলধর বাবু বিস্মৃত হইয়াছেন—টাউনহলের সেই শোক-সভা হৃষীকেশের অতীত যুগের কাহিনী নহে—স্বামী বিবেকানন্দের দেহাবসানের পর সেদিনের শোক-সভায় উপস্থিত স্বামীজীর বহু ভক্ত আজও সশরীরে বর্ত্তমান। স্বামী বিবেকানন্দ 'বসুমতী'-প্রতিষ্ঠাতৃগণের অন্যতম ছিলেন—'বসুমতী' নাম ও সম্পাদকীয় স্তম্ভশীর্ষে 'নমো নারায়ণায়'—সন্ন্যাসিগণের প্রণাম-মন্ত্র তাঁহারই প্রদত্ত। ১৯০২ খৃষ্টাব্দে জলধর বাবু 'বসুমতীর' সম্পাদক নামে অভিহিত হইতেন বলিয়াই তাঁহাকে স্বামীজীর স্মৃতিপূজা-সভায় বক্তৃতা করিতে আহ্বান করা হইয়াছিল—৫ মিনিট মাত্র তাঁহার বক্তৃতার সময় নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। কিন্তু বোধ হয়, তৎপূর্ব্বে অন্য কোন বিরাট সভায় তিনি বক্তৃতা করেন নাই। সেই বিপুল জনতার সম্মুখে বক্তৃতা করিতে উঠিয়া, তিনি ত্রাসজড়িত অস্পষ্ট কণ্ঠস্বরে একটি মাত্র ছত্র—"হিমালয়ে এক দিন স্বামী বিবেকানন্দ আমার উরুর উপর মাথা রেখে আট দশ ঘণ্টা বড় আরামে ঘুমিয়েছিলেন"—বলিয়াই যে কম্পান্বিত-কলেবরে বসিয়া পড়িতে বাধ্য হইয়াছিলেন—তাহা আজও অনেকের স্মরণ আছে। সেই স্মৃতিসভায় উপস্থিত স্বামী সারদানন্দ বেলুড় মঠে জলধর বাবুর বক্তৃতা সম্বন্ধে আলোচনাকালে এই কথা জানাইলে, স্বামী অখণ্ডানন্দ গ্রে ষ্ট্রীটে 'বসুমতী-কার্য্যালয়ে' পদধূলি প্রদান করিয়াছিলেন। আমার সম্মুখেই তিনি জলধর বাবুকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—"জলধর বাবু, আমরা মরিবার পর এইরূপ কথা প্রচার করিলেই ঠিক হইত না কি?" সে কথা আমার আজও বেশ স্মরণ আছে। জলধর বাবু শুনিয়া আশ্বস্ত হইবেন, স্বামীজীর হিমালয়ের সাধন-সঙ্গী পরম পূজনীয় স্বামী অখণ্ডানন্দ আজও সশরীরে বিদ্যমান;—তিনিই এখন বেলুড় মঠের প্রেসিডেণ্ট—ধর্ম্মগুরু। স্বামীজীর অন্যতম লীলাসহচর—গুরুভ্রাতা স্বামী অভেদানন্দ বর্ত্তমান সময়ে দার্জ্জিলিংএ রহিয়াছেন, তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা ও প্রেসিডেণ্ট।

রায় বাহাদুরের স্মৃতি-তর্পণের অষ্টাদশ পর্ব্ব মহাভারতের বনপর্ব্ব পর্য্যন্ত আলোচনা করিয়াই পাঠকগণের ধৈর্য্যচ্যুতির আশঙ্কায় এবারের মত ক্ষান্ত হইলাম। আগামী সংখ্যায় 'বসুমতী'পর্ব্ব পর্য্যন্ত আলোচনা করিবার বাসনা রহিল। জলধর বাবুর ভাষায় ব্যক্ত করিতে গেলে বলিতে হয়, অন্যের সাফল্য-গৌরব আত্মসাৎ করিবার প্রবল আকাঙ্ক্ষা তখনও তাঁহার যেরূপ ছিল—এখনও তেমনি আছে।

কিছুদিন পূর্ব্বে মহাত্মা গান্ধী বলিয়াছিলেন—Himalayan blunder,—ভাগ্যে এত দিন বাঁচিয়া আছি—তাই জলধর বাবুর 'হিমালয়' প্রসঙ্গে দুইবার সেই Himalayan blunder প্রত্যক্ষ করিয়া, হিমালয় সদৃশ মিথ্যার প্রকট পরিচয়ের সৌভাগ্যলাভে আমরাও তাঁহারই মত ধন্য—কৃতার্থ হইলাম।

বনপর্ব্বে সুধারস জলধর দান।
অতুল মহিমা ভবে, কর জয়গান॥

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়।

স্বাক্ষরযুক্ত হইলেও সম্পাদক-লিখিত প্রবন্ধের প্রতিবাদ সেই সংবাদপত্র—মাসিকপত্রেই প্রকাশ করা সম্ভব হয় না। এজন্য এই প্রতিবাদ প্রবন্ধ প্রকাশ করিতে বাধ্য হইলাম। রায় জলধর সেন বাহাদুর বা তাঁহার পক্ষ হইতে কোন সুপরিচিত সাহিত্যিক অনুগ্রহ করিয়া যদি কোন প্রতিবাদ করেন, তাহাও সাদরে প্রকাশ করিব।

—'মাসিক বসুমতী'-সম্পাদক।

অশ্রু-অর্ঘ্য

ম্যাক্সিম গর্কি

৬৮ বৎসর বয়সে বিশ্ববরেণ্য রুশীয় সাহিত্যিক ম্যাক্সিম গর্কি ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার প্রকৃত নাম পেশকফ। কিন্তু ম্যাক্সিম গর্কি এই ছদ্ম নামেই তিনি বিশ্ববিখ্যাত হইয়াছিলেন। আশৈশব তিনি জীবনে তিক্ত অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছিলেন, তাই রুস ভাষায় তিক্ত শব্দের প্রতিশব্দ গর্কি নামই তিনি ব্যবহার করিতেন। শৈশবে পিতৃ-মাতৃহীন হওয়ার ফলে তিনি মাত্র ৫ মাস বিদ্যালয়ে শিক্ষার্জ্জন করিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন।

ম্যাক্সিম গর্কি

দশ বৎসর বয়সে জীবন-সংগ্রামে অতিষ্ঠ হইয়া তিনি এক মুচির দোকানে কার্য্যারম্ভ করেন, কিন্তু সে কায ভাল না লাগায় তিনি উহা ত্যাগ করেন। তার পর কখনও ষ্টীমারের খালাসীদিগের পাচকবৃত্তি,—কখনও পাউরুটীর দোকানে রুটী সেঁকিয়া, কখনও চৌকীদারী, কখনও বা কেরাণীগিরি করিয়া তিনি জীবিকার্জ্জন করিতে থাকেন। টিফলিসে গর্কি রেলে চাকরী করিতেন। সেই সময় আত্মজীবনকাহিনী লিপিবদ্ধ করিবার সংকল্প তাঁহার মানসপটে উদিত হয়। ইহার ফলে "কাভকাজ" পত্রে তাঁহার প্রথম রচনা প্রকাশিত হয়, ইহার পর স্বগ্রামে ফিরিয়া গিয়া তিনি ছোট গল্প রচনায় মনোনিবেশ করেন। এই সময় প্রসিদ্ধ কথাসাহিত্যিক ভ্লাডিমির করলেঙ্কোর সহিত তাঁহার পরিচয় হয়। ভ্লাডিমির এই নবীন সাহিত্য-সেবীর অপূর্ব্ব প্রতিভার পরিচয় পাইয়া মুগ্ধ হন। তাঁহারই চেষ্টায় রুসিয়ার একটি প্রসিদ্ধ সাময়িক পত্রে গর্কির "চেলকাশ" নামক সুপ্রসিদ্ধ গল্প প্রকাশিত হয়।
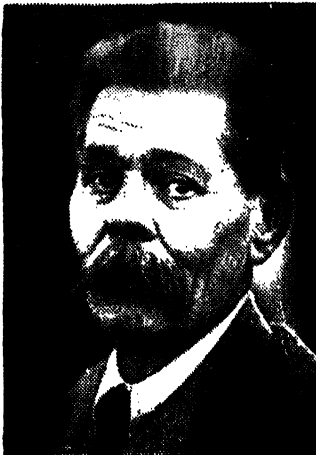
যাহারা দারিদ্র্য, কুশিক্ষা, নিরক্ষরতা ও পাপকলুষিত জীবন যাপন করিত, গর্কি তাহাদের মধ্য হইতেই রচনার উপাদান সংগ্রহ করিতেন। তাঁহার কোনও গল্প বা উপন্যাসের নায়ক ধনীর দুলাল নহে। ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে গর্কির কতিপয় গল্প দুইখানি গ্রন্থে প্রকাশ পায়। নাটক রচনা করিয়াও তিনি প্রচুর খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন! তাঁহার রচিত "In the Depths" নামক নাটক বার্লিনে ৫ শত রাত্রি ধরিয়া অভিনীত হইয়াছিল। "My Childhood" বা আমার শৈশব কথা নামক আত্মজীবন-কাহিনী ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে গর্কি প্রকাশ করেন।

বিপ্লববাদীদিগের সহিত গর্কির সহানুভূতি ছিল বলিয়া ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে রুস সরকার তাঁহাকে গ্রেপ্তার করেন। পরবৎসরে তিনি আমেরিকায় গিয়া জারের বিরুদ্ধে প্রচারকার্য্য আরম্ভ করেন। তিনি যে রমণীকে আমেরিকায় লইয়া গিয়াছিলেন, তিনি গর্কির বিবাহিতা পত্নী নহেন বলিয়া সেখানে প্রবল আন্দোলন চলিতে থাকে। তখন বাধ্য হইয়া তিনি য়ুরোপে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। য়ুরোপীয় মহাযুদ্ধে যোগ দিয়া গ্যালিসিয়া রণক্ষেত্রে তিনি আহত হন। বলশেভিক বিদ্রোহেও তিনি অসুস্থ দেহে যোগ দিয়াছিলেন। লেনিনকে গণতন্ত্রের পূজারী মনে করিয়াই তিনি তাঁহার সাহায্যে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। কিন্তু কাছে আসিয়া সত্যের পূজারী গর্কি যখন দেখিলেন, লেনিন একাই সর্ব্বশক্তি গ্রাস করিতে চাহেন, তখন তিনি লেনিনের বিরুদ্ধাচরণ করেন। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত সংবাদপত্র ইহাতে বন্ধ হইয়া যায়।

কিন্তু রুসিয়ার বিরাট নর-নারীর হৃদয়ে তাঁহার জন্ত শ্রদ্ধার আসন এমন সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল যে, লেনিনের বিরুদ্ধাচরণ জন্ত কোন শাস্তি তাঁহাকে পাইতে হয় নাই। বলশেভিক নীতির সমর্থক হইলেও গর্কি তাহাদের অত্যাচারণ সহ্য করিতে পারিতেন না। কর্তৃপক্ষের আদেশে যখন বহু মনীষীকে গুলী করিয়া হত্যা করা হয়, গর্কি তখন আবেগপূর্ণ ভাষায় লেনিনের নিকট প্রতিবাদ করিয়াছিলেন।

গর্কির চল্লিশ বৎসরব্যাপী সাহিত্য-সাধনা স্মরণীয় রাখিবার জন্ত তাঁহার নামানুসারে রুসিয়ার কতিপয় সহরের নূতন নামকরণ হইয়াছে। ১৯২১ খৃষ্টাব্দে অভাবপীড়িত স্বদেশবাসিগণের সাহায্যের জন্ত গর্কি দেশভ্রমণে বাহির হইয়াছিলেন। ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে তিনি যখন মস্কো সহরে প্রত্যাবর্ত্তন করেন, রাজোচিত সমারোহের সহিত তাঁহার সম্বর্দ্ধনা হয়। ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে ইটালীতে অবস্থানকালে স্থানীয় সরকার জানিতে পারেন, ম্যাক্সিম গর্কিকে হত্যা করিবার ষড়যন্ত্র হইতেছে।

১৯৩২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রুসিয়ায় সাহিত্য অপেক্ষা সমাজতন্ত্রের আদর অধিক ছিল। এ জন্ত রুসীয় সাহিত্য অবনতির পথে চলিয়াছিল। ম্যাক্সিম গর্কি—ইহা দেখিয়া তদানীন্তন প্রচলিত ব্যবস্থার বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছিলেন। ষ্টালিন তাঁহারই পরামর্শে নূতন পদ্ধতির প্রবর্ত্তন করেন। তাহার পরে রুস সাহিত্যে নূতন জীবনালোক প্রতিবিম্বিত হইয়াছে।

আধুনিক সাহিত্যের প্রথম ও প্রধান পুরোহিত হইলেও গর্কি পূর্ব্ববর্ত্তী সাহিত্যিকদিগকে বিশেষ শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখিতেন। তিনি প্রায়ই বলিতেন, আধুনিক সাহিত্যিকগণ যেন উনবিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ গ্রন্থগুলি সযত্নে পাঠ করেন। প্রতীচ্যের আধুনিক সাহিত্য সম্বন্ধে গর্কির আস্থা কিরূপ ছিল, তাহা বলা কঠিন। তবে রোমা রোঁলার সাহিত্যিক প্রতিভা স্বীকার করিতে তিনি কুণ্ঠিত হন নাই।

সাহিত্যের মধ্য দিয়া ম্যাক্সিম গর্কি সমগ্র রুসিয়ার হৃদয় জয় করিয়াছিলেন, তিনি ঘরের বাহির হইলেই মস্কোএর পথে ছেলেদের ভিড় জমিয়া যাইত। তাঁহার দর্শনের আশায় নর-নারী পরম সহিষ্ণুভাবে ঘণ্টার পর ঘণ্টা প্রতীক্ষা করিত।

গর্কির প্রসিদ্ধ উপন্যাস "থ্রি অব দেম," "মাদার" (মা) জগতে অমর হইয়া থাকিবে। "দি ব্রোকন হার্ট" (ভগ্ন হৃদয়) নামক গল্প-পুস্তকের গল্পগুলি চির-নূতন। শৈশব হইতে সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থা সম্বন্ধে গর্কি যে অসম্ভব স্বপ্ন দেখিতেন, তাঁহার জীবদ্দশায় তাহাই সার্থক হইয়াছে। ম্যাক্সিম গর্কির কর্ম্মবহুল জীবনের অবসান হইল, কিন্তু সাহিত্যে তিনি অমর আসন অধিকার করিয়াই থাকিবেন।

পরলোকে রায় বাহাদুর কৈলাসচন্দ্র বসু

৫ই আষাঢ় আলিপুরের ভূতপূর্ব্ব সরকারী উকিল রায় বাহাদুর কৈলাসচন্দ্র বসু ৭৬ বৎসর বয়সে ইহধাম ত্যাগ করিয়াছেন। সম্ভ্রান্ত কিন্তু দরিদ্র পরিবারে তাঁহার জন্ম হইয়াছিল; কিন্তু স্বাবলম্বনের বলে তিনি প্রতিভার পরিচয় দিয়া জীবন-সংগ্রামে জয়লাভ করিয়া প্রভূত যশঃ ও সম্পদ অর্জ্জন করিয়াছিলেন।

প্রবেশিকা পরীক্ষায় সাফল্য ও বৃত্তিলাভের পর কৈলাস বাবু দয়ার সাগর ঈশ্বরচন্দ্রের মেট্রপলিটান ইনষ্টিটিউশনে বিনা বেতনে অধ্যয়ন করিতে থাকেন। বহু বাধা-বিঘ্ন জয় করিয়া, শিক্ষকতার সাহায্যে বি, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি আইন পরীক্ষায় সাফল্য-লাভ করেন। সে সময়ে আর্থিক অবস্থা শোচনীয় হইলেও তিনি নিষ্ঠা সহকারে ব্যবহারাজীবের ব্যবসায় অবলম্বন করেন।

কৈলাসচন্দ্র বসু
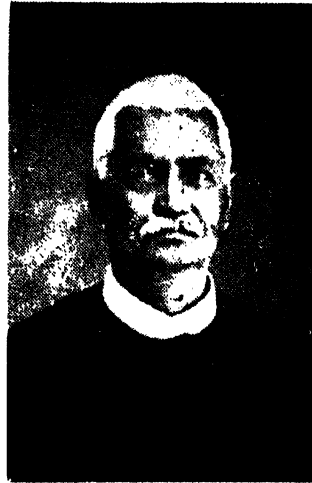
উপযুক্তা গৃহ-লক্ষ্মীর সুব্যবস্থায় কৈলাসবাবু আইন ব্যবসায়ে মন-প্রাণ দিয়া কার্য্যারম্ভ করেন। প্রতিভা ও কর্ম্মতৎপরতার সাহায্যে তিনি অল্পদিনের মধ্যেই প্রতিষ্ঠার পথে অগ্রসর হইতে থাকেন। তাঁহার আইন-জ্ঞান দেখিয়া আলিপুরের বিচারকমণ্ডলী তাঁহার প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধাশীল হইয়া উঠেন। সরকারও তাঁহাকে সরকারী উকীলের পদে নিয়োগ করিয়া এই প্রতিভাবান্ ব্যবহারাজীবের সম্বর্দ্ধনা করেন। দীর্ঘ অর্দ্ধশতাব্দীকাল আলিপুরের শ্রেষ্ঠ ব্যবহারাজীবগণের মধ্যে তিনি সগৌরবে আপনার আসন সুপ্রতিষ্ঠিত রাখেন।

কৈলাস বাবু যেমন স্থিরবুদ্ধি, তেমনই দৃঢ়চেতা ছিলেন। তাঁহার মত অমায়িক, চরিত্রবান লোক সাধারণতঃ দেখা যায় না। অর্দ্ধশতাব্দীকাল ব্যবহারাজীবের ব্যবসা করার পর আলিপুরের উকীলগণ তাঁহার জয়ন্তী উৎসব সম্পন্ন করিয়াছিলেন। পরিণত বার্দ্ধক্যেও তিনি পরিশ্রমবিমুখ ছিলেন না। মৃত্যুর দুই মাস পূর্ব্বে তিনি উকীল-সরকারের পদত্যাগ করেন। নূতন নিয়মে ৬০ বৎসর বয়সের পর সে পদে থাকিবার ব্যবস্থা নাই।

জীবনে তিনি দুইটি প্রবল শোক পাইয়াছিলেন—কনিষ্ঠ জামাতার বিয়োগ এবং টাইফয়েড জ্বরে তাঁহার মধ্যম পুত্রের অকাল-বিয়োগ। কৈলাস বাবু কার্ম্মাইকেল মেডিক্যাল কলেজে টাইফয়েড চিকিৎসাগারের জন্ত ৫০ হাজার টাকা দান করিয়া যান। পুত্রের স্মৃতিরক্ষাকল্পেই এই দান। স্বগ্রামে পিতার নামে তিনি একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাকল্পেও অর্থদান করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার বিয়োগে এ বিষয়ে যে ক্ষতি হইল, তাহা সহজে পূর্ণ হইবার নহে। আমরা কৈলাস বাবুর আত্মীয়-পরিজনকে এই শোকে সান্ত্বনা দিবার ভাষা খুঁজিয়া পাইতেছি না। তাঁহার আত্মা শান্তিঃ লাভ করুক, ভগবানের নিকট ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

স্বয়ংসিদ্ধা

(উপন্যাস)

পঞ্চম উল্লাস

১

গাঙ্গুলী-বংশের প্রথা, কুশণ্ডিকার পর গৃহিনী ও পুরবাসিনীগণ শঙ্খধ্বনি ও পূত গঙ্গাবারির ধারার সহিত সুসজ্জিতা বধূকে শুদ্ধান্তের কোষাগারে লইয়া যান। সেই কক্ষে এক অতিকায় লৌহময় সিন্দুকের মধ্যে দুর্লভ রত্নরাজি ও স্বর্ণময় মাঙ্গলিক দুষ্প্রাপ্য বহুবিধ সামগ্রী সুরক্ষিত। শুভক্ষণে কুলবধূর সম্মুখে সেই বিরাট সিন্দুকটির বিশাল ডালা উদ্‌ঘাটিত হইলে বধূকে শ্রদ্ধাসহকারে ভিতরের রত্নরাজি ও স্বর্ণময় দ্রব্যাদি স্পর্শ করিতে হয়।

কুশণ্ডিকা-অন্তে শুভ লগ্নে মাধুরীদেবী ও পুরমহিলাগণ রীতিমত শোভাযাত্রা করিয়াই নববধূ চণ্ডীকে লইয়া কোষাগারে বিশালকায় রুদ্ধ সিন্দুকটির সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। পাশাপাশি কতিপয় সুদৃঢ় কীলকাবদ্ধ সুবৃহৎ তালায় এই মহাকায় সিন্দুকের ডালা রুদ্ধ ছিল।

কর্ত্তার আদেশমত বালক ভৃত্য দুর্গাদাস শৃঙ্খলবদ্ধ চাবি-গুচ্ছ আনিয়া তালাগুলি খুলিয়া দিল। অন্য সময় এই মহাসিন্দুক খুলিবার প্রয়োজন হইলে কর্ত্তার খাস ভৃত্য পালোয়ান পঞ্চানন চাবির তাড়া লইয়া আসে এবং সেই ই তালাগুলি খুলিয়া গুরুভার ডালা তুলিয়া ধরে।

দুর্গাদাস তালাগুলির চাবি খুলিয়া দিয়া, ডালার কীলক মুক্ত করিয়া সরিয়া দাঁড়াইতেই মাধুরীদেবী বিরক্তির স্বরে প্রশ্ন করিলেন,—পঞ্চা যে এল না, ডালা তুলবে কে?

দুর্গাদাস সবিনয়ে জানাইল,—রাজাবাবু ব'লে দিলেন, পালোয়ান দিয়ে সিন্দুকের ডালা তোলবার আর দরকার হবে না।

ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া রাণী কহিলেন,—তা হ'লে তুই এই ডালা তোলবার মত লায়েক হয়েছিস বুঝি?

ভীতিপূর্ণ স্বরে বালক কহিল,—আমি! আমার ক্ষ্যামতা কি, রাণী-মা—যে ঐ পেল্লয় ডালা তুলব! দু-হাতে চাড়া দিয়ে চারটি আঙুলও উঁচু করতে পারব না ত, রাণী-মা!

কণ্ঠস্বর তীক্ষ্ণ করিয়া রাণী কহিলেন,—তা হ'লে তোর রাজাবাবুকে গিয়ে বল্ যে, পালোয়ান দিয়ে ডালা তোলাবার দরকার যদি না থাকে, তিনি নিজে এসেই ডালাখানা তুলে দিয়ে যান।

চণ্ডী স্থির হইয়া দুই পক্ষের কথাই শুনিতেছিল, ডালা তোলা সম্বন্ধে রাজাবাবুর প্রচ্ছন্ন মনোভাবটি বুঝিয়া সে মনে মনে হাসিল। কিন্তু নিজের মনোভাব গোপন করিয়া শাশুড়ীর মুখের দিকে চাহিয়া সে কহিল,—বাবা ত ভালো কথাই বলেছেন মা, সিন্দুকের ডালা তুলতে মেয়ে-মহলে পালোয়ানের কি দরকার? আমরা তুলতে পারব না?

স্বামীর কথায় মাধুরীদেবীর মনটি অভিমানে ভরিয়া উঠিয়াছিল, বধূর যুক্তি শুনিয়া সর্ব্বাঙ্গ তাঁহার জ্বলিয়া উঠিল, দীর্ঘায়ত দুইটি চক্ষুর দৃষ্টি প্রখর করিয়া তিনি বধূর দিকে চাহিলেন মাত্র। বাক্য স্ফুরিত না হইলেও সে তীক্ষ্ণ দৃষ্টির অর্থ দুর্ব্বোধ্য ছিল না।

সেই জলন্ত দৃষ্টির অর্থ কথায় ব্যক্ত করিল তাঁহার ভ্রাতৃকন্যা মৃণালিনী। বিদ্রূপের সুরে সে বধূকে লক্ষ্য করিয়া কহিল,—কথা কইতে হয় বউদি, দশ জনের সামনে হিসেব ক'রে—আগা-পাছা ভেবে! এ তোমার বাপের বাড়ীর আমকাঠের সিন্দুক নয় যে, গায়ের জোরে ডালা চাগিয়ে তুলবে!—এর 'হুর্যোশি' ডালাখানা আমাদের তুলতে হ'লে দুটি বছর আদা-ছোলা খেয়ে ডন-বৈঠক করতে হবে।

আরক্ত মুখখানিতে অপূর্ব্ব হাসির লহর তুলিয়া চণ্ডী উত্তর দিল,—তোমার কথাগুলি সবই সত্য, ঠাকুরঝি, কিন্তু আসল কথাটাই তুমি বলতে ভুলে গিয়েছ; সে কথাটি হচ্ছে এই,—এ বংশের বধূর মর্য্যাদা নিয়ে এ ঘরে আসতে হ'লে এই কুলবস্তুটির ডালাখানি নিজের হাতে তোলবার যোগ্যতাটুকুও তাকে আনতে হবে। বাবার নির্দ্দেশটুকু মাথায় নিয়ে তাঁরই আশীর্ব্বাদে—বাপের বাড়ীর এমো-সিন্দুক-খোলা-হাতেই শ্বশুরবাড়ীর এই লোহার সিন্দুকটার ডালাখানা আমিই তুলে দিচ্ছি,—পালোয়ান ডাকাবার সত্যই কোনও দরকার হবে না।

দিব্য সহজ স্বাভাবিক ভঙ্গীতে অগ্রসর হইয়া চণ্ডী সেই মহাসিন্দুকটির কীলকমুক্ত অতিকায় ডালাটি দুই হাতে তুলিয়া স্বচ্ছন্দে কক্ষের দেওয়ালের আশ্রয়ে হেলাইয়া রাখিল।

দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ জমিদারের গৃহিণী—শুদ্ধান্তের রাণী হইতে আরম্ভ করিয়া প্রৌঢ়া-তরুণী-কিশোরী-নির্ব্বিশেষে প্রায় অর্দ্ধশত পুরমহিলা ও তাহাদের পশ্চাতে দণ্ডায়মানা পাচিকা ও পরিচারিকাগণ নববধূর কাণ্ড দেখিয়া অবাক বিস্ময়ে তাহার দিকে চাহিয়া রহিল;—সত্যই কি বধূ স্বহস্তে এই বিশাল সিন্দুকটির গুরুভার ডালাটি তুলিল, কিম্বা এই বংশের কুলদেবী বধূর কোমল হাত দু'খানি আশ্রয় করিয়া তাঁহার মুখ রক্ষা করিলেন! মৃণালিনীর মুখখানি ছায়ের মত বিবর্ণ, রাণীর দৃপ্ত মুখে অতৃপ্তির কালিমা। বালক ভৃত্য দুর্গাদাস বধূর উদ্দেশে হেঁট হইয়া কক্ষতলে মাথা ঠুকিয়া কহিল,—আপনাকে গড় করছি বউরাণী-মা, এমনটি কুথাও দেখি নাই।

চণ্ডী কাহারও স্তুতিবাদে কর্ণপাত না করিয়া গৃহিণী মাধুরীদেবীকে উদ্দেশ করিয়া কহিল,—এখন কি করতে হবে, মা?

গৃহিণী এ পর্য্যন্ত নববধূকে যতদূর সম্ভব এড়াইয়া আসিয়াছেন। উভয়ের মধ্যে কথাবার্ত্তা অল্পই হইয়াছে, একান্ত প্রয়োজনসূত্রে যে দুই চারিটি কথা তিনি কহিয়াছেন ও বধূ সেই কথার পিঠে যে উত্তর দিয়াছে, তাহা তাঁহার ভাল লাগে নাই। এ কক্ষে চাবিসহ ভৃত্য দুর্গাদাসের আগমন, তাহার উক্তি, সেই প্রসঙ্গে বধূর আচরণ, প্রত্যেকটিই যেন তাঁহাকে আঘাত দিবার জন্য ঘটিয়া গেল। সমস্ত রোষটুকু তাঁহার কর্ত্তার উপর গিয়া পড়িল। এই সময় বধূর প্রশ্ন যেন তাঁহাকে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরাইয়া আনিল। সঙ্গে সঙ্গে মুখের ভাবটুকু বদলাইবার জন্য হাসির ভান করিয়া কহিলেন,—সেই কথাই ত ভাবছি অবাক্ হয়ে মা, আগে জানা থাকলে পাড়ার মেয়েদের নেমন্তন্ন ক'রে এ ঘরে এনে ঐ হাত দু'খানার শক্তিটুকু দেখাতুম।

চণ্ডী অল্প একটু হাসিয়া বেশ সপ্রতিভভাবেই উত্তর দিল,—এর জন্য ভাবনাই বা কেন মা, শুনেছি, আজ রাতে হাজার মেয়ে আসবেন নেমন্তন্ন খেতে, আমাকে সে সময় ছেড়ে দেবেন তাঁদের পরিবেষণ করতে, তাতেই তাঁরা এই হাত দু'খানার শক্তি দেখতে পাবেন; এর চেয়ে সেটা আরও ভালো দেখাবে, আর তাতে আপনাদের কাযেরও সাশ্রয় বড় কম হবে না, মা।

মাধুরীদেবীর মুখের হাসিটুকু ধীরে ধীরে অন্তর্হিত হইয়া গেল। গম্ভীর হইয়াই এবার তিনি কহিলেন,—ভাল, এই ব্যবস্থাই না হয় তখন হবে। এখন ত এ ঘরের কাযটুকু সারা হোক।

অতঃপর তিনি সিন্দুকের অভ্যন্তরে রক্ষিত দুর্লভ রত্নরাজির উপর বধূর করস্পর্শে মঙ্গলাচরণে প্রবৃত্ত হইলেন। যুগপৎ শঙ্খ ও হুলুধ্বনিতে গাঙ্গুলী-সংসারের লক্ষ্মীর ভাণ্ডার মুখরিত হইয়া উঠিল।

২

বিবাহ-বাসরে প্রথম আলাপনের পর এই বিচিত্র দম্পতি কথোপকথনের আর অবসর পায় নাই, সে অবসর আসিল ফুলশয্যার মধুময় নিশায়।

শুদ্ধান্তের যে অংশে গোবিন্দের মা থাকিতেন, সেই সুবৃহৎ মহলটি নববধূর জন্য সংস্কার করাইয়া কর্ত্তার নির্দ্দেশমত সাজানো হইয়াছিল। মাধুরীদেবী এ বাড়ীতে বধূরূপে

পদার্পণ করিয়া অল্পকালই এই মহলে অবস্থিতি করিয়াছিলেন, স্বামীর চিত্ত হইতে লোকান্তরিতা পত্নীর স্মৃতিটুকু নিশ্চিহ্ন করিবার জন্য নিজেই জেদ করিয়া শুদ্ধান্তের অপরাংশে আধুনিক পরিকল্পনায় তাঁহার বাসোপযোগী স্বতন্ত্র একটি মহল নির্ম্মাণ করাইয়া লইয়াছিলেন।

অব্যবহৃত পরিত্যক্ত মহলটি দীর্ঘকাল পরে নূতন শ্রী, মনোরম সজ্জা ও প্রচুর দীপালোকে উদ্ভাসিত হইয়া নবদম্পতির সম্বর্দ্ধনা করিতেছিল। নিজের মহলটির ব্যবস্থা দেখিয়া চণ্ডীর মন তৃপ্তিতে ভরিয়া গেল। শয়নঘরে বিচিত্র পালঙ্কের উপর অপূর্ব্ব শয্যা, তাহার আস্তরণ ও উপধানগুলি পুষ্পময়। কক্ষতলে পারস্যদেশীয় মূল্যবান্ গালিচা আস্তৃত, কক্ষের দেওয়ালে বিভিন্ন স্থানে নানাবিধ মনোজ্ঞ আলেখ্য, দরজার সম্মুখেই দেওয়াল জুড়িয়া এক বিশাল তৈলচিত্র,—অপূর্ব্বরূপলাবণ্যবতী এক হাস্যাননা নারীর পরিপূর্ণ অবয়ব সেই চিত্রে প্রতিফলিত; কক্ষদ্বারে দাঁড়াইলেই মনে হয়, চিত্রাঙ্কিতা নারীমূর্ত্তি মধুর হাস্যে অভ্যাগতদের সাদর আহ্বান করিতেছেন! নানাজাতীয় দুর্লভ ও দুষ্প্রাপ্য পুষ্পসম্ভারে এই বৃহৎ শয়নমন্দিরটির অভ্যন্তর ও বাহিরের সুপ্রশস্ত দরদালান পরিপাটীরূপে সুসজ্জিত; কক্ষতলে আস্তৃত গালিচার উপর ছোট ছোট ধাতুময় কারুকার্য্যখচিত আধারগুলি পুষ্পসম্ভারে পূর্ণ।

শয়নঘরের এক পার্শ্বে পুস্তকাগার, বড় বড় সুদৃশ্য আলমারিভরা বিবিধ পুস্তক, মধ্যস্থলে টেবল, চারিপার্শ্বে কেদারা; ইহার পরেই বসিবার ঘর, সুন্দর সুন্দর কৌচ ও সোফায় সে ঘর সজ্জিত। অপর পার্শ্বে মনোহর প্রসাধন-কক্ষ, বিবিধ বিলাসসম্ভার কক্ষের বায়ুকে সুরভিত করিয়া তুলিয়াছিল। ইহার পার্শ্বেই দম্পতির ভোজন-ঘর, অদূরে প্রশস্ত উন্মুক্ত ছাদ, চারিপার্শ্বে ফুলের টব, নিম্নে সুরম্য উদ্যান।

উপন্যাসের রাজান্তঃপুরিকাদের স্বতন্ত্র প্রাসাদ-কক্ষের যে কাহিনী এক সময় চণ্ডীর মনে কল্প-লোকের সৃষ্টি করিত, নিজের মহলে আসিয়া এই প্রথম সে অনুভব করিল যে, কল্পিত কাহিনীও সত্য হয়।

সুসজ্জিতা দম্পতির সহিত অনেকগুলি তরুণীরও ফুলশয্যার কক্ষে সমাগম হইয়াছিল। আচার অনুষ্ঠানগুলি শেষ হইলেও ইহাদের স্থান-ত্যাগের কোন লক্ষণ দেখা গেল না। বধূর মুখখানি বিরক্তিতে বিকৃত হইয়া উঠিলেও ইহাদের ভ্রূক্ষেপ নাই; বধূর অনেক কথাই ইহারা অবাক্ হইয়া শুনিয়াছে, কিন্তু বরের সহিত বধূ কি ভাবে কথা কহে, এ পর্য্যন্ত ইহাদের কেহই তাহা শুনে নাই, সুতরাং শুনিবার এই স্পৃহাটুকু মিটাইতে ইহারা যেন জোর করিয়া জাঁকিয়া বসিয়াছিল। মৃণালিনীই এখন এ বাড়ীর সকল ক্ষেত্রেই অগ্রবর্ত্তিনী, সে নিজেই কথাটা খপ্ করিয়া পাড়িয়া ফেলিল, কহিল,—এখন তোমরা দুটিতে গোটাকতক কথা কইলেই আমরা ছুটী পাই, আর উৎসবটারও মধুরেণ সমাপয়েৎ হয়, বৌদিদি!

বধূ কোনও উত্তর দিল না, কিন্তু এ বাড়ীতে যে মানুষটিকে কাহারও কথার পিঠে কোনও দিন একটি কথা কহিতে কেহ দেখে নাই, সেই নিরীহ মানুষটিই সহর্ষে বলিয়া উঠিল,—তোমরা তা হ'লে কিছু জান না,—বিয়ের রাতেই আমাদের কত কথা হয়ে গেছে, সে বুঝি গোটাকতক? ওরে বাবা! সে কত—সারারাত ধ'রে কত ভালো-ভালো গপ্প—

গোবিন্দের কথার সঙ্গে সঙ্গে তরুণীদের মুখে মুখে কৌতুকের হাসি যেন বিদ্যুতের মত খেলিয়া গেল। মৃণালিনী মুখ টিপিয়া হাসিয়া কহিল,—বল কি গবা-দা, এত কথা হয়ে গেছে তোমার বাসরে, গপ্পো পর্য্যন্ত! ও—বাবা!

গোবিন্দের মুখ-চক্ষু তখন উৎসাহে দৃপ্ত হইয়া উঠিয়াছে, গভীর উল্লাসের স্বরে সে কহিল,—সে গপ্পো যদি শোনো, একবারে তাক্ লেগে যাবে। সব চেয়ে ভালো, সেই যে রাজকন্যে বিদ্যাবতীর গপ্পোটা,—কি মজার গপ্পো সেটা—ওঃ!

মৃণালিনী সকৌতুকে জিজ্ঞাসা করিল,—কে গপ্পো বললে গবা-দা, বউ না তুমি?

গোবিন্দ সগর্ব্বে উত্তর দিল,—বউ! ঐ যে—

এতক্ষণে চণ্ডীর সহিত গোবিন্দের চোখোচোখি হইল। চণ্ডী অসহিষ্ণুভাবেই গোবিন্দের দিকে পুনঃপুনঃ অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিতেছিল, কিন্তু কথা কহিবার উৎসাহে গোবিন্দের বধূর মুখের দিকে চাহিবার অবসর ছিল না, কথা-প্রসঙ্গে চোখোচোখি হইতেই বধূর তীক্ষ্ণ-দৃষ্টির সংঘাতে গোবিন্দের উৎসাহ মুহূর্ত্তে নিবিয়া গেল, পরক্ষণেই স্বর নিম্ন ও আর্ত্ত করিয়া সে কহিল,—ও বাবা, তুমিও আবার চোখ দিয়ে ধমকাচ্ছো!

গোবিন্দের কথায় তরুণীরা সকলেই কৌতুক অনুভব করিল, মৃণালিনী বধূর দিকে চাহিয়া কহিল, বৌদি বুঝি তা হ'লে বের রাতেই আমাদের গবাকান্ত ভাইটির বুদ্ধির প্যাঁচে পাক-কতক দম খাইয়ে দিয়েছিলে?

চণ্ডী প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপের সুরে কহিল,—কি সূত্রে এত বড় আবিষ্কারটি ঠাকুরঝির বুদ্ধি-ভরা মাথায় গজিয়ে উঠল শুনি!

কথাটায় মনে মনে আঘাত পাইলেও সে ভাব গোপন করিয়া সহজ সুরেই মৃণালিনী উত্তর দিল,—কথা বলবার ধরণ দেখেই গো! যে লোক সাত চড়েও কথা কইত না, আজ সে ওপরপড়া হয়ে কথা কইতে আসে! এতে মনে হয় না কি, তোমার হাতের গুণে কিম্বা স্পর্শের প্রভাবে এমনটি হয়েছে।

চণ্ডী একটু হাসিয়া কহিল,—তোমাদের ভাইটিকে তোমরাই যদি সাধ ক'রে মায়াকাঠি ছুঁইয়ে ঘুম পাড়িয়ে রেখে থাকো, তার পর একটা শুভলগ্নে হঠাৎ সোণার কাঠীর পরশ পেয়ে ঘুম তাঁর ভেঙ্গে যায়, সে দোষ ত আমার নয়, ঠাকুরঝি!

বধূর কথা এক মুহূর্ত্তেই সকলকেই নির্ব্বাক্ করিয়া দিল; মৃণালিনী আসিয়াছিল তাহাকে খোঁটা দিয়া খাটো করিতে, কিন্তু নিজেই আঘাতের পর আঘাত পাইয়া ক্রমেই কঠিন হইয়া উঠিতেছিল। এতগুলি মেয়ের সম্মুখে সে অপ্রতিভ হইয়া যাইবে! সুতরাং মুখের কথায় বিশেষ জোর দিয়াই সে এবার কহিল,—দোষের কথা হবে কেন বৌদি, এ ত খুব গৌরবেরই কথা গো! হবুকান্ত রাজার ছিল গবুকান্ত মন্ত্রী, এবার আমরাও পেলুম—গবাকান্ত ভাইটির পরশ-পাথর বউটি!

চণ্ডী হাসিমুখে কহিল,—কিন্তু এর পরে সত্যি সত্যিই যদি পুকুর চুরি হয়, তা হ'লে যেন দোষ দিয়ো না, ঠাকুরঝি।

ঠাকুরঝির মুখে এবার উত্তর যোগাইল না, উত্তর আসিল বাহির হইতে তাহারই উদ্দেশে,—চুপ ক'রে রইলি কেন মিনা, বল্ না তুই—ও ভয় এখানে মোটেই নেই, কবরেজের মেয়েরা বড় জোর ওষুধ চুরি করতে পারে।

বাহিরের দিকে চাহিতেই সবিস্ময়ে সকলে দেখিল, দ্বারদেশে দাঁড়াইয়া নিবারণ! তরুণীদের অনেকেই শশব্যস্ত হইয়া অবগুণ্ঠন টানিল, মৃণালিনীর মলিন মুখখানি উৎসাহে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। নিবারণের কথায় সায় দিয়া সে এবার দৃঢ়কণ্ঠে কহিল,—দাদা ঠিক কথাই বলেছে, বউদি। জমিদারের মেয়ে যদি হ'তে, তা হ'লে তোমার মুখে পুকুর চুরির কথা সাজতো।

সকলকে চমকিত করিয়া উদ্দীপ্ত কণ্ঠে চণ্ডী কহিল,—কথা হচ্ছিল ঠাকুরঝি আমাদের মধ্যে, এখানে বাপ-পিতামহকে টেনে আনবার কোনও দরকার ত ছিল না!

আরক্তমুখে মৃণালিনী নিবারণের মুখের দিকে চাহিতেই চকিতের মধ্যে তাহাদের চোখে চোখে কি কথা হইয়া গেল, পরক্ষণেই মৃণালিনী তাচ্ছীল্যের ভঙ্গীতে কহিল,—ছোট মুখে উঁচু কথা বললেই বংশের খোঁটা সকলেই দিয়ে থাকে। যার বাপ নাড়ী টিপে বড়ী বেচে খায়, তার মুখে বড় বড় কথা মানায় না।

ভ্রাতা-ভগিনীর অশিষ্ট ব্যবহার ও রূঢ় কথায় দৃষ্টি প্রখর হইয়া উঠিল, মৃণালিনীর মুখের উপর দুই চক্ষু তুলিয়া, মুখের কথায় বিশেষ জোর দিয়াই সে কহিল,—আমার বাবা বৃত্তি হিসেবে ওষুধের বড়ী বেচে খান, এ কথা খুব সত্য, কিন্তু দেনার দায়ে মেয়ে বেচে বংশকে তিনি খাটো করেন নি কোন দিন। এ দিক দিয়ে শস্য খড়ার চেয়ে পূর্ণ খটীর মর্য্যাদা অনেক বেশী

নিজের কথাগুলি রূঢ় হইলেও বধূ যে তাহার উত্তরে এমন নিষ্ঠুর আঘাত করিবে, তাহার মহামান্য স্বর্গীয় পিতামহকেও আক্রমণ করিয়া সকলের সমক্ষে তাহার মুখখানি নীচু করিয়া দিবে, মৃণালিনী এতটা ভাবে নাই। এ বাড়ীতে আসিয়া কয়েক দিনের মধ্যেই যে বধূ এ বংশের সকল তথ্যই জানিয়াছে, ইহাও সে জানিত না। বিবর্ণ মুখখানি তুলিয়া একান্ত অসহায়ের মত সে নিবারণের দিকে চাহিল।

নিবারণও আজ প্রস্তুত হইয়াই বধূর সহিত বোঝাপড়া করিতে আসিয়াছিল। তাহার পিতৃবংশ ও পিতার বৃত্তির প্রসঙ্গ তুলিয়া অপ্রতিভ করিয়া দিবে এবং এই সূত্রে রূঢ় কথা শুনাইয়া সে দিনের অপমানের প্রতিশোধ লইবে, ইহাই ছিল নিবারণের তরুণ চিত্তের উদ্দাম বাসনা। কিন্তু কথার সূত্রে বধূর পিতার প্রসঙ্গ উঠিতেই বধূ তাহার উত্তরে যে সুতীক্ষ্ণ শর নিক্ষেপ করিয়া বসিল, তাহার লক্ষ্যস্থলকে—মৃণালিনীর ন্যায় নিবারণেরও তাহা বুঝিতে বিলম্ব হয় নাই। তবে মৃণালিনী নিরুপায়ের মত নিবারণের দিকে

নির্ব্বাক্ দৃষ্টিতে চাহিয়াছিল, কিন্তু নিবারণ বধূর এই স্পর্দ্ধায় ধৈর্য্যচ্যুত হইয়া চীৎকার তুলিয়া নির্ব্বোধের মত কহিল,—কাকে ঠেস্ দিয়ে ছোটমুখে এত বড় কথা তুমি বললে, তা জান ?

চণ্ডী অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া অবিচলিত কণ্ঠে কহিল,—আমি কাউকে ঠেস্ দিয়ে বা কারুর নাম নিয়ে এ কথা বলিনি ; কথায় কথায় যারা উঁচু বংশ নিয়ে গলাবাজি করে, আমি তাদের জানাতে চেয়েছি—প্রদীপের নীচেই অন্ধকার বেশী, উঁচু বংশও অনেক সময় নীচু কায ক'রে লোক হাসায়, কাযেই বংশ নিয়ে বড়াই করা মস্ত ভুল।

চণ্ডীর কথাগুলি নিবারণকে আরও বিচলিত করিয়া তুলিল, সে এবার দুই চক্ষু পাকাইয়া তর্জ্জন করিয়া কহিল,—তুমি এখন শাক দিয়ে মাছ ঢাকবার চেষ্টা করছ, কিন্তু এ চালাকী খাটবে না তোমার ! আমি বলছি, তুমি আমার মাতামহকে ঠেস্ দিয়েই এ কথা বলেছ। বল নি তুমি—বল নি ?

নিবারণের তর্জ্জনে ত্রস্ত হইয়া মেয়েরা চণ্ডীর মুখের দিকে চাহিল, কিন্তু ভয়ের কোন চিহ্নই তাহার মুখে দেখা গেল না। পূর্ব্ববৎ অবিচলিত কণ্ঠে স্বর অপেক্ষাকৃত কঠিন করিয়া সে কহিল,—আপনার মাতামহের নাম ধ'রে আমি কোনও কথাই বলিনি, আপনিই তাঁর কথা তুললেন। এখন আমি বলছি, সত্যিই যদি তিনি এমন কায ক'রে থাকেন, তাঁর নাতি-নাতনীর সে জন্য লজ্জিত হওয়াই উচিত।

কি ! তুমি আমার দাদামশায়ের কাযের বিচার করতে চাও ?

আমার বাবার বৃত্তি নিয়ে খোঁটা দেবার অধিকার কে আপনাদের দিয়েছে—আমি যদি এ কথা জিজ্ঞাসা করি ?

তোমার বাবার সঙ্গে আমাদের রাজাপ্রজা সম্বন্ধ, তার সম্বন্ধে চর্চ্চা করবার অধিকার আমার নিশ্চয়ই আছে।

তা হ'লে আমারও উত্তর শুনে রাখুন, মানুষের মতই আমি রাজার মুখোসপরা লোকদের অন্যায়ের প্রতিবাদ করব চিরদিন !

মৃণালিনী এই সময় সবেগে নিবারণের একখানি হাত ধরিয়া মিনতির সুরে কহিল,—চুপ কর দাদা, আর কেলেঙ্কারী বাড়িয়ে কায নেই, এ মেয়ের সঙ্গে কথায় তুমি পারবে না।

নিবারণ তখন রাগে ফুলিতেছিল, এ দিকে উত্তর দিবার মত কথার পুঁজিও তাহার নিঃশেষ হইয়া গিয়াছিল। আলোচ্য বিষয়ের মোড় ফিরাইয়া রুক্ষস্বরে সে এবার ঝঙ্কার তুলিল,—এ রকম আস্পর্দ্ধা সহ্য করা যায় না, সে দিনও তুমি আমাকে সকলের সামনে গাধা বলেছিলে !

চণ্ডী চুপ করিয়া রহিল, এ কথার কোনও উত্তর দিল না। কিন্তু সেই কক্ষের সকলকে চমকিত করিয়া নিবারণের কথার উত্তর দিল গোবিন্দ ; ঘৃণায় মুখখানি বিকৃত করিয়া সে কহিল,—কেন বলবে না গাধা ? দাদাকে পাগল বললি, বউএর ঘোমটা খুলে দিতে গেলি, চেঁচিয়ে সবার কাণে তালা ধরিয়ে দিলি—তুই গাধা নস্ ত কি ?

দৃষ্টি উজ্জ্বল করিয়া চণ্ডী স্বামীর মুখের দিকে চাহিল। নিবারণের সহিত মৃণালিনীর আবার দৃষ্টি-বিনিময় হইল, সঙ্গে সঙ্গে নিবারণ শ্লেষের সুরে কহিল,—গবা পাগলাও কপচাতে শিখেছে দেখছি,—ম'রে যাই, ম'রে যাই ! মুখের ভারী দৌড় যে,—বে'র জল প'ড়ে অবধি পিঠে বেত পড়ে নি—তাই বুঝি এত ঝাঁঝ ?

গোবিন্দর মুখ আজ খুলিয়া গিয়াছে। নিবারণের কথার পিঠে আজ সে অকুতোভয়েই উত্তর দিল,—সাধে কি বউ তোকে গাধা বলেছে ! এক ঘর মেয়েমানুষের ভেতরে দাঁড়িয়ে তুই সকলকে শুনিয়ে বলছিস্ কি না—বড় ভাইকে মারিস্ ! তুই গাধা—গাধা ; আমার ইচ্ছে করছে, কাগজের একটা গাধার টুপী বানিয়ে তোর মাথায় পরিয়ে দিই,—বেশ মানায় তা হ'লে, আর আমরা সকলে পেছনে পেছনে হাত-তালি দিয়ে বলি—তুই গাধা, তুই গাধা—

চণ্ডী তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে গোবিন্দের মুখের দিকে চাহিয়াছিল, এই সময় আবার চোখোচোখি হইতেই তাহার উৎসাহে সহসা বাধা পাইল, সে বুঝিল,—নিজেও সে গাধার মত চেঁচাইয়া দোষ করিয়া ফেলিয়াছে : মনের উচ্ছ্বাস তৎক্ষণাৎ বন্ধ করিয়া চুপ করিয়া সে বসিয়া রহিল।

কিন্তু নিবারণের উৎসাহ তখন উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। এ পর্য্যন্ত সে জ্যেষ্ঠকে শাসন করিয়াই আসিয়াছে, আজ সে বধূর অঞ্চল ধরিয়া তাহাকে সকলের সমক্ষে হেয় করিয়া দিবে ! তাহার দুই চক্ষু দৃপ্ত হইয়া উঠিল, বধূর উপর সঞ্চিত রোষটুকু গোবিন্দের উপর প্রয়োগ করিয়া সে তীক্ষ্ণ

স্বরে কহিল,—আজ তোর কাণ দুটো ধ'রে এই ঘরে ঘোড়-দৌড় করাব, রাস্কেল !

নিবারণের কথায় চণ্ডীর অন্তর যেন জ্বলিয়া উঠিল, কিন্তু বাহিরে তাহার কোন লক্ষণ প্রকাশ না করিয়া, প্রকাশ্যে একটুখানি হাসিয়া সে কহিল,—ঘোড়দৌড়ের মাঠই আপনার যোগ্য স্থান ; কিন্তু মনে রাখবেন, এটা ময়দান নয়, ভদ্র-ঘরের মেয়েরা এখানে আপনার আচরণে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছেন। রীতিমত সভ্যতা ও ভদ্রতা শিক্ষা ক'রে তবে মেয়েদের সঙ্গে কথাবার্ত্তা কইতে হয়, এ বিবেচনাটুকুও আপনার নেই !

নিবারণ এবার মারমুখী হইয়া হুঙ্কার দিয়া কহিল,—কি বলব, তুমি কনে বউ, মেয়েমানুষ, নইলে—

কণ্ঠের স্বরটুকু তরল করিয়া পরিহাসের সুরে চণ্ডী কহিল,—কি করতেন তা হ'লে? কাণ ধ'রে ঘোড়দৌড় করাতেন বোধ হয়? সে দিন আপনাকে উদ্দেশে গাধা বলেছিলুম, কিন্তু আজ আপনার আচরণ দেখে মনে হচ্ছে, গাধাকেই ছোট করা হয়েছে।

মৃণালিনী এই সময় ক্রন্দনের সুরে চীৎকার তুলিয়া কহিল,—দাদা, তুমি কি এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এমনি ক'রে আঘাত সহ্য করবে? আমি তোমাকে এক মুহূর্ত্তও এখানে থাকতে দেব না, কিছুতেই না, তুমি চল—

নিবারণ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে বধূর দিকে চাহিয়া কহিল,—আমি বুঝতে পেরেছি, কার জোরে এত বড় আস্পর্দ্ধা হয়েছে ওর ! কিন্তু আমি ব'লে যাচ্ছি, এ দর্প আমি ভাঙ্গবই —যে ওকে মাথায় তুলেছে, সেই-ই দু পায়ে থ্যাঁতলাবে কালই। হাঁ, এখানে যাঁরা যাঁরা আছেন, মিনা, তুই তাঁদের নাম দিবি, সবাইকে সাক্ষী দিতে হবে বাবার কাছে।

কথাগুলি শেষ করিয়াই খরদৃষ্টিতে একবার বধূর দিকে চাহিয়া নিবারণ টলিতে টলিতে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

চণ্ডী হাসি-মুখে দ্বারের দিকে চাহিয়া কহিল,—মোল্লার দৌড় মসজিদ পর্য্যন্ত। কিন্তু ভাইটিকে আগেই কেন এই উপদেশটুকু দাওনি, ঠাকুরঝি !

মৃণালিনী মুখখানি ভার করিয়া কহিল,—মোল্লাকেও দেখনি আর মসজিদের পায়রাটাও দেখনি, দেখবে শীগ্‌গীর ; তখন চোখের জলে পায়ের আলতা পর্য্যন্ত ধুয়ে যাবে।

চণ্ডী সবেগে ছুটিয়া গিয়া মৃণালিনীর কাঁধটি এক হাতে ধরিয়া অপর হাতে তাহার মুখখানি চাপা দিয়া পরিহাস-ভঙ্গীতে কহিল,—মুখ সামলে ঠাকুরঝি, মুখ সামলে! আজ আমাদের ফুলশয্যার রাত, হাসি ছাড়া অন্য কথা মুখে আনাও পাপ, অতএব সাবধান !

মৃণালিনীর সর্ব্বাঙ্গ তখন আড়ষ্ট হইয়া গিয়াছে,—না পারে ঘাড়টি নাড়িতে, মুখ দিয়া কথা বলিবারও সামর্থ্য নাই, বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত নির্ব্বাক্‌দৃষ্টিতে সে বধূর দিকে চাহিয়া রহিল। ক্ষণকাল পরেই কাঁধ হইতে হাতখানি সরাইয়া বধূ তাহাকে মুক্তি দিল। তাহার পর সে তরুণীদের দিকে চাহিয়া কহিল,—আপনারা ঠাকুরঝির সঙ্গে গিয়ে নামগুলো লিখিয়ে দিন, সাক্ষীর সমন যাবে আপনাদের কাছে।

তরুণীদের ভিতর হইতে এক জন কহিল,—আমরা ত এখন আপনারই কোর্টে, এই সময় দস্তুরমত দিয়ে হাত ক'রে ফেলুন, বৌদি।

চণ্ডী কহিল,—ঠাকুরপো আগেই আপনাদের সাক্ষী মেনে গেলেন শুনলেন না? আপনারা তাঁর তরফেই সাক্ষী দেবেন, আমার সাফাই সাক্ষী আছে।

এই সময় মৃণালিনী প্রকৃতিস্থ হইয়া কহিল,—বউ আমার গায়ে হাত দিয়েছে, মুখ চেপে ধরেছে, তোমরা তা দেখেছ, রাজাবাবুর কাছে এ কথা বলতে হবে তোমাদের।

তরুণী-সমাজে তখন চাঞ্চল্য দেখা গেল, কেহ কেহ বিরক্তির সুরে কহিল,—কি ঝকমারিই করেছি বাবা, ফুলশয্যের ঘরে এসে !

নানা কণ্ঠে গুঞ্জন তুলিয়া তরুণীদল মৃণালিনীর সহিত চলিয়া গেল। চণ্ডী এতক্ষণে নিষ্কৃতি পাইল।

* * *

সকলে চলিয়া গেলে ক্ষণকাল পরে চণ্ডীও বাহিরের দিকে গেল। এই মহলের প্রবেশদ্বারে দুই জন পরিচারিকা বসিয়া বসিয়া ঝিমাইতেছিল। চণ্ডীকে দেখিয়াই তাহারা উঠিয়া দাঁড়াইল, জিজ্ঞাসা করিল,—কি চাই, বউরাণী-মা?

চণ্ডী কহিল,—কিছু চাই না, তোমরা এখন ঘুমাতে যাও।

তাহারা বিস্ময়ে কাহিকে চাহিল,—রাতে যদি দরকার

পড়ে,—আমাদের সারা রাত পালা ক'রে এখানে জেগে থাকবার কথা। এক জন ঘুমোবে, এক জন জাগবে।

চণ্ডী জানাইল,—কোনও প্রয়োজন নেই এ ভাবে তোমাদের রাত কাটাবার। দরকার পড়ে, আমি নিজেই তা সেরে নেব, আমি ত ঠুঁটো নই,—তোমরা যাও।

বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হইয়া তাহারা চলিয়া গেল। চণ্ডী স্বহস্তে দরজা বন্ধ করিয়া দিয়া নিজের ঘরে ফিরিয়া আসিল। গোবিন্দ তখন পালঙ্কের উপর গম্ভীর হইয়া বসিয়াছিল। চণ্ডী আস্তে আস্তে তাহার সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল, পরিপূর্ণ শান্ত দৃষ্টিতে স্বামীর মুখের দিকে চাহিল।

গোবিন্দ এতক্ষণ মনে মনে বিচার করিতেছিল, সে যে আজ এত কথা কহিয়া ফেলিল, তাহা কি ভাল হইয়াছে, কিম্বা সে অন্যায় করিয়া ফেলিয়াছে! চণ্ডীর স্থির মূর্ত্তি ও শান্ত দৃষ্টি দেখিয়া সাহস পাইয়া সে নিজেই সংশয় ভঞ্জন করিতে ব্যগ্র হইল, আগ্রহের সুরে চণ্ডীর দিকে চাহিয়া প্রশ্ন করিল,—তুমিই বল না, কথা ব'লে আমি ভাল করেছি, না মন্দ করেছি?

চণ্ডী গম্ভীর হইয়া উত্তর দিল,—তুমি নিজে বুঝতে পারছ না, ভাল করেছ কি মন্দ করেছ?

গোবিন্দ নিরুত্তরে চণ্ডীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, তাহার ম্লান দৃষ্টি যেন প্রকাশ করিতেছিল,—আমি যদি বুঝতে পারব, তা হ'লে তোমাকে জিজ্ঞাসা করব কেন?

চণ্ডী স্বামীর মুখভঙ্গীটির দিকে বক্রদৃষ্টিতে চাহিয়া কহিল,—বাসরের কথা কে তোমাকে বলতে বলেছিল? মেয়েগুলোর মুখে ঠাট্টা শুনেও তোমার হুঁস হয় নি!

ওহো! তাই তুমি তক্ষুনি আমাকে চোখ দিয়ে ধমকে দিয়েছিলে! কিন্তু তুমি ত আমাকে বারণ ক'রে দাও নি—বাসরের কথা কাউকে বলতে নেই। তা হ'লে আমি কক্‌খনো বলতুম না। আর ত বলব না।

মনের কথা মুখে সব বলতে নেই, স্বামি-স্ত্রীর মধ্যে যে সব কথা হয়, অপর কাউকে শোনাতে নেই। আজ থেকে আমার সম্বন্ধে কোনও কথা তুমি কাউকে বলতে পারবে না, আমি তোমাকে যা যা বলব, সে সব মনের ভেতর ছিপি এঁটে রাখতে হবে, বুঝেছ?

বুঝিছি—বুঝিছি,—বউএর কথা কাউকে বলতে নেই, তা হ'লে লজ্জা হয়; আমি আর কখ্‌খনও বলব না।

বেশী কথা না বলাই ভাল; যা বলবে, ভেবে চিন্তে বলবে। তোমার একটি কথায় আমি আজ ভারি খুসী হয়েছি।

খুসী হয়েছ—সত্যি? বাঃ—বাঃ! কি মজা!

কিন্তু জিজ্ঞাসা ত করলে না—কোন্ কথাটা?

বল না, বল না,—লক্ষ্মীটি! বল না—

ঠাকুরপো গাধার কথা তুলতে, তুমি প্রথম যে জবাবটি দিয়েছিলে। বেশ বলেছিলে।

বলব না! আমার তখন যা রাগ হয়েছিল!

তোমার মনে তা হ'লে রাগও হয়?

আগে হ'ত না, কিন্তু এখন হয়, কেউ যদি তোমাকে কিছু বলে, অমনি রাগ আসে। রাগের মাথায় আমি কি করতুম আজ জানি না, কিন্তু তুমি যে আবার ধমকে দিলে চোখ দুটো পাকিয়ে—

তুমি অভদ্রের মত ভারী বাড়াবাড়ি ক'রে ফেললে। মেয়েদের সামনে হাততালি দিয়ে অমন ক'রে চেঁচালে যে নিন্দে হয়।

আচ্ছা, আমি আর কখনও মেয়েদের সামনে চেঁচিয়ে কথা বলব না।

আজ আমাদের ফুলশয্যা, তা জান ত?

তা আর জানি না,—অত ঘটা, ঘরে এত ফুল—

আচ্ছা, ঐ বড় ছবিখানা বোধ হয় তোমার মায়ের?

হাঁ, ঐ ত আমার মা।

তোমার ওঁকে মনে পড়ে?

কি ক'রে পড়বে মনে? আমি যে তখন ছোট্টটি ছিলুম, মা যখন স্বর্গে যান—

এ ঘরের আর সব ছবির গলাতেই আজ মালা চড়ানো হয়েছে, শুধু আমাদের মায়ের ছবিখানিই খালি দেখছি; বলতে পার—কেন?

কি জানি! হয় ত ভুলে গেছে।

কিন্তু আমাদের ত এই ভুলটুকু শুধরে নিতে হবে। ঘরে ত মালার অভাব দেখছি না, তুমি ওঠ এখনি, নিজের হাতে মায়ের গলায় মালা পরিয়ে দাও।

অভিভূতের মত গোবিন্দ পালঙ্ক হইতে উঠিল। কক্ষের বিভিন্ন আধারে প্রচুর মালা ছিল, চণ্ডী নিজে বাছিয়া কয়েক ছড়া গোড়ে স্বামীর হাতে দিল, পার্শ্বের ঘর হইতে

নিজেই একখানা কেদারা আনিয়া ছবির সম্মুখে রাখিল, গোবিন্দ তাহার উপর দাঁড়াইয়া মায়ের আলেখ্যটির উপর মালাগুলি চড়াইয়া দিল।

কেদারাখানি সরাইয়া চণ্ডী স্বামীর হাত ধরিয়া সেই আলেখ্য-সম্মুখে নতজানু হইয়া বসিয়া কহিল,—এসো, আমরা দু'জনে এই শুভরাতটিতে আগে আমাদের মায়ের আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করি;—ভক্তির সঙ্গে বলি, মা! আমাদের মনে বল দাও, তোমার আশীর্ব্বাদে আমরা যেন সত্যকার মানুষ হ'তে পারি।

পুরোহিতের মন্ত্র শুনিয়া শিষ্য যে ভাবে তাহা আবৃত্তি করে, চণ্ডীর মুখের কথাগুলি সেই ভাবেই গোবিন্দ ভাবগদ-গদস্বরে উচ্চারণ করিল। চণ্ডী কহিল,—রোজই সকাল সন্ধ্যায় এই ভাবে আমরা এই মন্ত্র পড়ব, তার পর আমরা মানুষের মত মানুষ হবার জন্য কঠোর সাধনা করব।

গোবিন্দ জিজ্ঞাসুনয়নে চণ্ডীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, শেষের কথাগুলি তাহার ঠিক বোধগম্য হয় নাই। চণ্ডী তাহা লক্ষ্য করিয়া কহিল,—আমার কথা বোধ হয় বুঝতে পারনি, কিন্তু মুখে বললে বুঝতে হয় ত পারবেও না; কাযের সঙ্গে সঙ্গে সব কথাই তুমি ক্রমে ক্রমে নিজেই বুঝতে পারবে। তখন হয় ত আমাকেও অনেক কথা তুমি বুঝিয়ে দেবে। কিন্তু সেই বোঝাপড়ার গোড়াপত্তন হবে আজ এই শুভ রাতটিতে। আজ থেকেই আমাদের সাধনার পথে হাতে খড়ি। চল, আমরা পড়বার ঘরে যাই।

যেন তাহার মাথার উপর আর কেহ নাই, সেই-ই এই গৃহের সর্ব্বময়ী কর্ত্রী, এমনই সহজ স্বচ্ছন্দ গতিতে অসঙ্কোচে চণ্ডী মন্ত্রমুগ্ধ স্বামীর হাতখানি ধরিয়া পড়িবার ঘরটির দিকে অগ্রসর হইল।

[ক্রমশঃ।

শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়।

চির-সাথী

তোমারেই যেন ভালবাসি
জীবনের শত পথ দিয়া,
সুখে দুঃখে হরষে বিষাদে
তুমি হও চির-সাথী, প্রিয়া।

এ বিশ্ব-নিশীথে যবে আমি
আঁধারেতে থাকি গো মগন,
নিজ হাতে জ্বেলে নব বাতি
থেকো কাছে চাঁদের মতন।

সে আলোকে যখন চাহিব
আঁধারের মুছি আঁখি-জল,
ওই মুখ কেবলি হেরিব
বক্ষে যাহা বাঞ্ছিত কমল।

তুমি ফুল মোর প্রাণ-বনে,
গন্ধে তার হয়েছি মধুর,
সদা ভয় যদি পড় খ'সি,
চ'লে যাও অজানা সুদূর।

তবুও জেনেছি ওগো আমি
তোমা ছাড়া কোন ঠাঁই নাই,
তব দেহ-ঝরা পরিমল
সবখানে আছে তার ঠাঁই।

জলে স্থলে বনে উপবনে
সদাই রয়েছ এক সাথী,
আলোকে আঁধারে সুখে দুঃখে
সমতুল সব সাথে মাতি।

খরতর এই কাল-স্রোতে
তুমিই রয়েছ স্রোতহীন,
পুরাণে মলিনে জীর্ণে শীর্ণে
জাগিতেছ তুমিই নবীন।

শ্রীঅশ্বিনীকুমার পাল (এম-এ)।

উপন্যাস পাঠ

২। চরিত্র (Characters)

উপন্যাসমাত্রই প্রায় উপাখ্যান-প্রধান—উপন্যাসের ঘটনার উপর সকলে বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়া থাকে, কিন্তু প্রকৃত কথা বলিতে কি, ঘটনা-প্রধান উপন্যাস শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিতে পারে না। চরিত্রচিত্রণেই উপন্যাসের উৎকর্ষ বর্দ্ধিত হইয়া থাকে; অল্পশিক্ষিত বা বালকেই ঘটনার বিবরণ লইয়া বিশেষ ব্যস্ত থাকে—চরিত্রের বিশ্লেষণের দিকে তাহার লক্ষ্য আদৌ থাকে না। উপন্যাসের ঘটনার বিবৃতি ও চরিত্র-গৌরব উভয়ই থাকার প্রয়োজন, কিন্তু লেখকবিশেষের হস্তে উপন্যাস হয় ঘটনাপ্রধান বা চরিত্রপ্রধান হইয়া পড়ে। কথাবস্তুর শ্রেষ্ঠত্ব ও চরিত্রগৌরবের মাধুর্য্যের সুন্দর সম্মিলন যেরূপ বঙ্কিমচন্দ্রের মধ্যে হইয়াছে, এরূপ অপর কোন উপন্যাসে দেখা যায় না। রবীন্দ্রনাথের 'গোরা', 'ঘরে বাইরে', 'শেষের কবিতা' প্রভৃতি উপন্যাস ঘটনাবহুল না হইয়া মনস্তত্ত্বের বিশ্লেষণে চরিত্রচিত্রণনিপুণতার পরিচায়ক হইয়া পড়িয়াছে। এতদ্ভিন্ন কতকগুলি রোমাঞ্চকর উপন্যাস আছে, তাহাতে চরিত্রচিত্রণের কোন আপদ্‌-বালাই নাই—সে-গুলিতে হত্যাকাণ্ডের বর্ণনা, নানাপ্রকার চুরি, জুয়াচুরি প্রভৃতি অপরাধ ও গোয়েন্দাদের কীর্ত্তিকলাপ বর্ণনা থাকে। কিন্তু এ সকল উপন্যাস সাহিত্যে উচ্চ স্থান অধিকার করিয়া থাকিতে পারে না। চরিত্রমাধুর্য্যহীন উপন্যাস, কাহিনী বা উপাখ্যানে পরিণত হয়, সে সকল পুস্তক-পাঠ অরসজ্ঞ বালকের ভাল লাগিতে পারে, শিক্ষিত পাঠকের তাহা কখনই তৃপ্তিকর হইতে পারে না। উপন্যাসের মধ্যে চরিত্রের প্রাধান্য কি উপাখ্যানের প্রাধান্য, তাহা সমাধান করা বিশেষ কঠিন বলিয়া বোধ হয় না। শ্রেষ্ঠ উপন্যাসে চরিত্রচিত্রণই প্রধান স্থান অধিকার করিয়া আছে। উপন্যাসের চিত্রিত চরিত্র সজীব হওয়া একান্ত আবশ্যক। বঙ্কিমচন্দ্রের আখ্যায়িকার বহু চরিত্র ঐতিহাসিক সত্য চরিত্র অপেক্ষাও আমাদের নিকট অধিকতর সত্য এবং আত্মীয়-স্বজন অপেক্ষা আমাদের প্রিয় আপনার জন হইয়া গিয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্রের সূর্য্যমুখী, ভ্রমর, কমলমণি যেন বাঙ্গালার মেয়ে—বাঙ্গালার তেলে জলে পুষ্ট—বাঙ্গালার ঘরে ঘরে দৃষ্ট মধুর ছবি। ইহারা যেন কল্পরাজ্যের নয়—ইহারা যেন আমাদের নিত্য-দৃষ্ট গৃহে গৃহে বিরাজিত গৃহলক্ষ্মীস্বরূপা। যে চরিত্র যত সজীব, স্বাভাবিক হইবে, তাহা ততই সুন্দর ও হৃদয়গ্রাহী হইবে। যে স্থলে চরিত্র ভাব বা আদর্শের প্রতীক হইয়া দাঁড়ায়, তাহা অস্বাভাবিক হইয়া উঠে এবং সাহিত্যে যে সত্যের আদর্শের সমাদর দৃষ্ট হয়, তাহা হইতে বিচ্যুত হইয়া পড়িয়া থাকে। সাহিত্যক্ষেত্রে সত্য (Principle of truth), সুন্দর (Principle of beauty) ও শিব (Principle of morality) এই ত্রিসত্যের মর্য্যাদা রক্ষা না করিলে তাহা হইতে উচ্চাঙ্গের সাহিত্য গঠিত হইতে পারে না। যাহা কেবল সুন্দর—কিন্তু সত্য বা শিবময় নহে, তাহা কখন শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিতে পারে না, অপর দিকে সত্য—সুন্দর ও শিবময়রূপে অভিব্যক্ত না হইলে তাহাও সাহিত্যে সমাদৃত হয় না। এ কারণে সাহিত্যে যে সৃষ্ট চরিত্র, তাহা সত্য জগতের অনুরূপ বা সম্ভাব্য সত্যে (possible truth) পরিণত হওয়া একান্ত আবশ্যক। উপন্যাসের পাত্রবর্গ গ্রন্থকারের অভিজ্ঞতাসম্ভূত হইলে বিশেষভাবে পরিস্ফুট ও ও সজীব হইয়া উঠে। যে বিষয়ে গ্রন্থকারের অভিজ্ঞতা নাই, তাহার বর্ণনায় বহুসময়ে অস্বাভাবিকতা ঘটিয়া থাকে; সত্য বস্তুর পরিবর্ত্তে বহুস্থলে মিথ্যা বর্ণনা আসিয়া পড়ে। এ স্থলে জেন অষ্টেন বা ডিকেন্সের আদর্শ স্মরণীয়—জেন

অষ্টেন তাঁহার সীমাবদ্ধ আবেষ্টনীর মধ্যে যে সকল চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন, সেগুলির প্রত্যেকটিই রত্নস্বরূপ। ডিকেন্স তাঁহার উপন্যাসসমূহে সমাজের নিম্নস্তরের লোকের সুন্দর চিত্র দিয়াছেন, কিন্তু উচ্চপদবীস্থ লোকের চরিত্রচিত্রণে তিনি আদৌ সাফল্য লাভ করেন নাই। তিনি যে শ্রেণীর লোকের কথা অবগত ছিলেন এবং যাহাদের সহিত ব্যবহারিক জীবনে মিশিতেন, সেই সকল চরিত্র অঙ্কনেই তিনি সফল-প্রযত্ন হ'ন—অপরত্র তাঁহার চেষ্টা আদৌ ফলবতী হয় নাই। এই চরিত্র-চিত্রণেই লেখকের প্রয়োগনৈপুণ্যের বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। যিনি যত সহানুভূতিসম্পন্ন, তিনি ততই সুন্দর চরিত্র আঁকিতে পারেন; এ বিষয়ে সেক্সপীয়ারের তুলনা নাই। তিনি যেরূপ চরিত্র—সেইরূপ চরিত্রই আঁকিতেন; তাঁহার অনুপম সহানুভূতিবলে প্রত্যেক চরিত্রই সুন্দর ও স্বাভাবিক হইয়া উঠিত; সৃষ্ট চরিত্রমধ্যে স্রষ্টার ব্যক্তিত্ব কোন দিনই উঁকি মারে নাই। এই জন্য সেক্সপীয়ারের ব্যক্তিত্ব চিরদিনই রহস্যময় রহিয়া গিয়াছে। পরবর্ত্তী সমালোচকবর্গ তাঁহাকে ধরিবার কত না চেষ্টাই করিয়াছেন—কেহ তাঁহাকে Protestant, কেহ বা Roman Catholic, কেহ বা তাঁহাকে রক্ষণশীল, কেহ বা তাঁহাকে উদারনৈতিক, কেহ বা তাঁহাকে দার্শনিক, কেহ বা তাঁহাকে স্ফূর্ত্তিবাজ Bohemian, কেহ বা তাঁহাকে গণতান্ত্রিক, কেহ বা তাঁহাকে গণবিদ্বেষী বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন; কিন্তু সেক্সপীয়ার চিরকালই এই সকল মুগ্ধ (বা মূঢ়) সমালোচককে ধাঁধায় ফেলিয়া নিজের মহিমায় মহীয়ান্ হইয়া আছেন। যে স্থলে উপন্যাসে চিত্রের মধ্যে লেখকের ব্যক্তিত্ব ধরা পড়ে, সেই স্থলে সাহিত্যরসের অপচয় ঘটিয়া থাকে। এই সকল স্থলে Sugar coated Quinineএর ন্যায় সাহিত্যের আবরণে দেখা দেয় প্রচার বা Propoganda. এই ভাবে বঙ্কিমচন্দ্রের দেবী চৌধুরাণী, সীতারাম ও আনন্দমঠে তিনি সাহিত্যিক বঙ্কিমচন্দ্র হইতে প্রচারক বঙ্কিমচন্দ্রের পর্য্যায়ে অবনত হইয়াছেন। শরৎচন্দ্র 'শেষ প্রশ্ন' গ্রন্থে আর সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র নহেন, তিনি Propagandist বা প্রচারক শরৎচন্দ্র—কমলের মুখ দিয়া তিনি অগ্নিগর্ভ বক্তৃতা করিতেছেন। সাহিত্য হিসাবে এই সকল গ্রন্থ সম্পূর্ণ সার্থক হয় নাই। মানবের আশা, আকাঙ্ক্ষা, বাসনা, বৃত্তি ও ভাবের অভিব্যক্তিই সাহিত্যের কাম্য, তাহা স্থান-কালের মধ্যে থাকিয়াও সার্ব্বজনীন ও সার্ব্বকালীন হইয়া পড়ে। এই সকল চরিত্র প্রেম ও ত্যাগের মহত্ত্বে, ভাবের ঐশ্বর্য্যে, মনের শুচিতা ও ঔদার্য্যে জাগতিক সাহিত্যে চিরবরণীয় হইয়া থাকে! এই কারণেই দেখা যায় যে, জগতের ইতিহাসে রামায়ণ, মহাভারত, Iliad, Devine comedy or Paradise Lost প্রভৃতি মহাকাব্যগুলি সাহিত্যে অতি উচ্চ স্থান অধিকার করিয়া আছে। গ্রন্থ-নিহিত চরিত্রের মহত্ত্বে গ্রন্থ-গৌরব অবশ্য অবশ্য বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়—প্রতিপাদ্য-মহিম্না চ প্রবন্ধো হি মহত্তরঃ।

উপন্যাস-সাহিত্যে চরিত্রচিত্রণেই প্রতিভার প্রকৃত পরিচয় পাওয়া যায়। কেহ কেহ শিব গড়িতে বানর গড়িয়া ফেলেন; কিন্তু প্রতিভাশালী ব্যক্তির হস্তে সকল চিত্রই অনবদ্য ও সুন্দর হইয়া উঠে; তাঁহাদের হস্তের ধূলিমুষ্টি সুবর্ণমুষ্টিতে পরিণত হয়। প্রতিভার কোন আইন-কানুন্ নাই—প্রতিভা আপনা-আপনি গড়িয়া উঠে এবং স্বীয় সৃষ্টি-শক্তি দ্বারা সকলই সুন্দর ও শোভন করিয়া গড়িয়া তুলেন। বিখ্যাত ঔপন্যাসিক থ্যাকারে বলিতেন যে, উপন্যাসের চরিত্র সম্বন্ধে পূর্ব্ব হইতে তাঁহার কোন বিশেষ ধারণা থাকে না; লিখিতে লিখিতে তাঁহার হস্তে চরিত্র যে ভাবে দাঁড়াইয়া যায়, তাহাই তিনি তাঁহার পাঠকবর্গের সমীপে উপস্থিত করেন। এই সমূহ চরিত্র তাঁহার সৃষ্টিশীল প্রতিভার দিব্যদান—ইহা কোন সাহিত্য-দর্পণের বিধি-নিষেধের ফল নহে। প্রতিভার সৃষ্টি-শক্তিবলেই সৎ-সাহিত্যের সৃষ্টি—যাহার হস্তে প্রতিভার যাদুদণ্ড থাকে, তিনিই সাহিত্যে সৃষ্টির অধিকারী হইয়া থাকেন। উপন্যাসে যে সকল সুন্দর স্বাভাবিক সজীব চিত্র দেখিতে পাওয়া যায়, তৎসমুদায় প্রতিভার সৃষ্টি, ইহাই অবশ্য স্বীকার্য্য।

চরিত্রের বর্ণনা প্রায় দুই প্রকারে হইয়া থাকে। যে স্থলে গ্রন্থকার স্বয়ং উপন্যাসোক্ত পাত্রের চরিত্র বর্ণনা করেন, তাহাকে মুখ্য প্রকার (direct method) বলা হয়; যে স্থলে পাত্র-পাত্রীর কার্য্যের ধারায়, কথাবার্ত্তায় তাহাদের চরিত্র প্রকটিত হয়, তাহাকে গৌণ প্রকার (indirect method) বলা হইয়া থাকে। মুখ্যপ্রকার সাধারণ পাঠকের নিকট বুঝিবার পক্ষে সুবিধাজনক হইলেও তাহা প্রয়োগ-[illegible] পরিচায়ক নহে। অপর দিকে গৌণভাবে বর্ণিত

চরিত্র বিশেষভাবে হৃদয়গ্রাহী হয় ও লেখকের কলা-কৌশলের পরিচয় প্রদান করিয়া থাকে। কোন কোন লেখকের হস্তে উপন্যাস নাটকের আকার ধারণ করিয়া থাকে—তথায় গ্রন্থকার ধরা দেন না; ঘটনার পর ঘটনা চলিয়াছে, ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে পাত্র-পাত্রীও চলিতেছেন—ইহার মধ্যে চরিত্র উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতরভাবে ফুটিয়া উঠিতেছে। আবার কোন কোন লেখক প্রতিপদে টীকা-টিপ্পনী করিয়া ঘটনার ক্রমপারম্পর্য্য বর্ণনার সহিত চরিত্রের মনের বিশ্লেষণ করিতেছেন, তাহার নৈতিকবলের হিসাব-নিকাশ দিতেছেন, তাহার সহিত স্বীয় মতামত প্রকট করিয়া পাঠককে শিক্ষা দিয়া চলিতেছেন। উপন্যাসে ইহা চলে, এজন্য লেখককে দোষ দেওয়া যায় না; কিন্তু লেখক যখন প্রস্তুত বিষয় 'ছাপাইয়া' কোমর বাঁধিয়া প্রচার-কার্য্যে নামিয়া যান, তখন তাহা 'সাহিত্য' না হইয়া প্রচার-সাহিত্যে পরিণত হয়।

উপন্যাসে যে সকল চরিত্র চিত্রিত হয়, সে সকল চরিত্রে একটা সামঞ্জস্য থাকা আবশ্যক। লেখকের খেয়ালমত এক জন দুষ্টচরিত্র এক মুহূর্ত্তে সাধু হয় না বা একটি সাধু চিত্রকে এক মুহূর্ত্তেই অতি কুৎসিত করা যায় না। চরিত্রের মধ্যে সামঞ্জস্য থাকা নিতান্ত প্রয়োজন—প্রতি চরিত্রে ক্রম-বিকাশের একটি ধারা থাকার প্রয়োজন। খরস্রোতা উপন্যাসে সুন্দর শোভন চরিত্র এক নিশ্বাসে পাপের অতল জলে ডুবাইয়া দেওয়া হইয়াছে—ইহাতে উপন্যাসের চরিত্র-ঘটিত সামঞ্জস্যহানি ঘটিয়াছে, অপর দিকে নরেশচন্দ্রের সুপ্তশিখা গ্রন্থে একটি নারী-চরিত্রে অধঃপতনের ক্রম-বিবর্ত্তন স্থির রাখিয়া চরিত্রের মধ্যে সঙ্গতি রাখা হইয়াছে। বিষবৃক্ষে কত না ঘাত-প্রতিঘাতের পর কুন্দনন্দিনীর প্রতি নগেন্দ্রনাথের আসক্তির চিত্র দেওয়া হইয়াছে। শৈবলিনী-চরিত্রে পরিবর্ত্তন আনিতে যোগশক্তির পর্য্যন্ত অবতারণা করিতে হইয়াছে, কিন্তু বাল্যপ্রীতির সে বীজ ধ্বংস হয় না—এই যে চরিত্রে সংরক্ষণরীতি (Law of conservation), ইহা একান্তভাবে উপন্যাসে পালনীয়।

৪

৩। কথোপকথন (Dialogue)

দিন দিন নাটক ও উপন্যাসের পার্থক্য যেন কমিয়া আসিতেছে। Ibsen ও Bernard Shawএর নাটকে দৃশ্যের প্রথমেই যেরূপ ঘটা করিয়া স্থান, কাল ও পাত্রের বর্ণনা থাকে, তাহাতে এরূপ মনে হওয়া বিচিত্র নহে; অপর দিকে বহু উপন্যাসের বর্ণনার জাঁকজমক কমিয়া গিয়া পত্রের পর পত্র কথাবার্ত্তাই চলিতেছে; একটু কাটছাঁট করিলে এ সকল উপন্যাসে কথাবার্ত্তা ভিন্ন আর কিছুই নাই। এখন নাটকে ভাল করিয়া নভেলের Setting বা ভূমিকা দেওয়া হয়, অপর দিকে নভেলে কথাবার্ত্তাই সমস্ত স্থানটি জুড়িয়া থাকে। এতৎসত্ত্বেও নভেল ও নাটক সাহিত্যের বিভিন্ন বিভাগরূপে বর্ত্তমান থাকিবে। কারণ, নাটকের ও উপন্যাসের উপাদান সম্পূর্ণ বিভিন্ন, তাহাদের রসও সম্পূর্ণ পৃথক্, তাহাদের আকারেও (form) যথেষ্ট প্রভেদ। আধুনিক উপন্যাসে আর আখ্যানবস্তুর যেন তত প্রাধান্য দেখা যায় না—এ সকল প্রায় মনস্তত্ত্বের বিশ্লেষণমূলক বা চরিত্রপ্রধান; এতদ্ব্যতীত আরও কতকগুলি উপন্যাস সমস্যামূলক হওয়ায় তাহার মধ্যে কথাবার্ত্তাই গ্রন্থের প্রায় সমগ্র স্থান জুড়িয়া আছে। রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে কথাবার্ত্তার বৈশিষ্ট্য বিশেষভাবে দেখা যায়। শরৎচন্দ্রের 'শেষ প্রশ্ন' আগাগোড়া কথোপকথন ও তর্ক-বিতর্কে পূর্ণ। এই গ্রন্থে শরৎচন্দ্র পুরাতন আদর্শ ভাঙ্গিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছেন—কথোপকথনের মধ্য দিয়া, নানা দৃশ্য (situation) সৃষ্টি করিয়া, একই কথা বারবার ফেনাইয়া ফাঁপাইয়া বলিতেছেন। কিন্তু তাহার বলিবার ভঙ্গী এত সুন্দর যে, একবার বসিয়া দুই শত পাতা পড়ার পূর্ব্বে আর উঠিতে ইচ্ছা করে না। রবীন্দ্রনাথের 'গোরা' বা 'চোখের বালির' মধ্যে এইরূপ কথাবার্ত্তার বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। কথাবার্ত্তায় ঘটনাবিন্যাস বা চরিত্রচিত্রণ বিশেষ কলানৈপুণ্যের লক্ষণ; ইহা সমানভাবে নাটক ও উপন্যাসে আবশ্যক। উপন্যাস বা নাটকে কথাবার্ত্তার সুষ্ঠু সমাবেশ করিতে যথেষ্ট নিপুণতার প্রয়োজন। উপন্যাসের উৎকর্ষ প্রধানতঃ চরিত্রচিত্রণ ও কথাবার্ত্তার উপর নির্ভর করিয়া থাকে। কবি স্বয়ং সমালোচনা না করিয়া কথাবার্ত্তা দ্বারা যে কেবল ঘটনা-বিন্যাস ও চরিত্রচিত্রণ করিয়া থাকেন, এমন নহে, পরন্তু কথাবার্ত্তার মধ্য দিয়া নাটকীয় পাত্রবর্গ পরস্পরের চরিত্র বিশ্লেষণ, ঘটনার সংস্থান ও নানা অবান্তর বিষয় দ্বারা প্রস্তুত বিষয় মনোহর করিয়া তুলেন। একটি কথা উপন্যাসের অঙ্গীভূত (organic) হওয়ার একান্ত প্রয়োজন। বহু অবান্তর কথার আলোচনায় সাহিত্যের বিশুদ্ধ রস দোষযুক্ত

হইয়া পড়ে, সুকুমার সাহিত্য প্রচারসাহিত্যে পরিণত হয়। বহু গ্রন্থকার সমাজনীতি, রাজনীতি, ধর্ম্মনীতি, এমন কি, গীতার ব্যাখ্যা পর্য্যন্ত নভেলের মধ্যে জুড়িয়া দেন—এ সকল অবান্তর বিষয় সাহিত্যকে অনর্থক ভারাক্রান্ত করিয়া তুলে, গলার হার তখন গলার ফাঁসি হইয়া উঠে। বাঙ্গালা সাহিত্যে একটি উপন্যাসের নাম করা যায়—যাহাতে আখ্যান-বস্তু (plot) বা চরিত্রচিত্রণ নাই, তথাপি কেবল কথাবার্ত্তার জন্য এই গ্রন্থ অমর হইয়া থাকিবে। ইহা বাঙ্গালা সাহিত্যে অদ্বিতীয় পরিহাসরস-সুপটু কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের 'কোষ্ঠীর ফলাফল'। এই গ্রন্থের motto হওয়া উচিত Live and laugh বা Laugh & Live; শুনিয়াছি, হাস্যে নাকি মানুষের জীবনীশক্তি বৃদ্ধি পায়, এই ক্ষীণায়ুঃ বাঙ্গালীর দেশে এই গ্রন্থ সমানভাবে দেহ ও মনের পরম রসায়ন। প্রতি পত্রে (প্রতি ছত্রে বলিলেও চলে) হাস্যের এমন বিমল স্রোত আর কোন গ্রন্থে দেখি নাই। শুনিয়াছি, এক বাটীতে হাসির উচ্চরোল শুনিয়া কোন ব্যক্তি যথার্থ অনুমান করিয়াছিলেন যে, উপরে Cervantes প্রণীত Don Quixote পড়া হইতেছে, কোন দিন কেদার বাবুরও এই পুস্তক সম্বন্ধে ঐরূপ কোন উক্তি শুনিতে পাইব। কেবল কথাবার্ত্তার কলাকৌশলে কেদার বাবুর এই গ্রন্থ বঙ্গ সাহিত্যে অমরত্ব লাভ করিল।

উপন্যাসে লিখিত কথাবার্ত্তা স্বাভাবিক ও স্থানকাল-পাত্রোপযোগী হওয়া আবশ্যক। পাত্রপাত্রী যে স্তরের ও যে ভাবের লোক, ভাষাও সেই গ্রামের হইবে! কথাগুলি চরিত্রের উপযোগী হইবে এবং ভাষার ভঙ্গী সহজ, সরল ও চিত্তাকর্ষক হইবে। অনেক সময় কথাবার্ত্তার মধ্যে লেখকের ব্যক্তিত্ব ফুটিয়া উঠে—'শেষ প্রশ্নে' কমলের কথা পড়িয়া বাইবেলের ভাষায় বলিতে হয়—The hand is the hand of Esau but the voice is the voice of Jacob এ যে স্ত্রীলোক কমলের মুখে পুরুষ শরৎচন্দ্র কথা কহিতেছেন। কথাবার্ত্তার স্বাভাবিকতার মধ্যে অশ্লীলতা বা অশোভনতা না থাকাই বাঞ্ছনীয়।

সাহিত্যে কলহের অবতারণা করিতে হইলে বস্তুতন্ত্রের দোহাই দিয়া ইতরভাষার অবতারণা করায় আপনার শিক্ষা, রুচি ও চরিত্রের কদর্য্যতার পরিচয়ই ফুটিয়া উঠে—সাহিত্য জীবনের দর্পণ হইলেও তাহা সাহিত্য, তাহার রসবস্তুর বৈশিষ্ট্য আছে। অবশ্য, অশ্লীল, ঘৃণাকারজনক ভাব ও ভাষা রসানুভূতির বিশেষ অন্তরায়। তবে যাহারা সাহিত্য না লিখিয়া অশ্লীল রচনা লিখিতে চাহে, তাহাদের কথা স্বতন্ত্র, সাহিত্যের আসরে সে ছাগতন্ত্রীদের স্থান নাই।

[ক্রমশঃ

শ্রীবীরেন্দ্রকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় (এম, এ, অধ্যাপক)।

দেশবন্ধু-স্মরণে

এসেছিলে এক দিন, বেসেছিলে ভালো,
স্বদেশের ধূলি-কণা, অন্ধকার-আলো,
আকাশ বাতাস এর; প্রতিদিনগুলি,
কুসুমের মত শুধু ফুটাইয়া তুলি'

হও নাই ক্ষান্ত দেব। আপনার প্রাণ
সৌরভের মত সাথে করেছিলে দান!
জাতি-ধর্ম্ম না মানিয়া টেনে নিলে হাসি'
ভাই ব'লে বক্ষ-মাঝে,—সাম্যের সে বাঁশী
বাজাইলে, তার পর, হে পার্থ গাণ্ডীবী,
অকস্মাৎ—এক দিন গেলে হায় নিভি—
আর উঠিলে না তাতি, শুধু গেলে রাখি',
তোমার অমর-গীতি—মিলনের রাখী

নিঃশব্দে নীরবে। প্রতি হৃদয়ের তারে
আঘাতে আঘাতে বাজে আজো বারেবারে
সে-সঙ্গীত, সেই ছন্দে, সে বিচিত্র সুরে,
মর্ম্মভাঙ্গা ভারতের আঁখি-জল ঝুরে।
মহা-শ্মশানের শেষ চিহ্ন 'পরে তাই
তোমার উদাত্ত-বাণী এঁকে যেতে চাই,
নয়নের অশ্রুধারে। এ কি সবি বৃথা?
কথা কও হে পাষাণ—ভারাক্রান্ত গীতা!

উদ্দেশ

[গল্প]

নিস্তব্ধ রাত্রি।
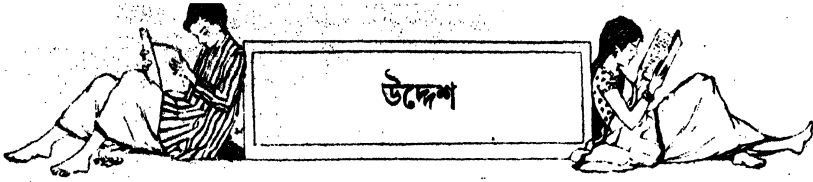
দেবী বাবু বাড়ী ঢুকিয়া উপরের ঘরে আসিতেই যোগমায়া দ্রুতপদে কাছে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি হলো, হ্যাঁগা?"

দেবী বাবু স্ত্রীর দিকে একটিবার তাকাইলেন, তার পর মুখখানা নীচু করিয়া অন্যমনস্কভাবে খাটের উপর গিয়া বসিয়া পড়িলেন।

দেবী বাবুর গৃহ-জামাতা নিরুদ্দেশ হইয়াছে, সে আজ এই পূর্ণ বারো বৎসর। কেন হইয়াছে, বাহিরের লোক জানে না। কেহ বলে, মস্তিষ্ক-বিকৃতি হইয়াছিল বলিয়া, কেহ বলে—পরমহংসদেবের 'কথামৃত' পড়িয়া, পাড়ার নিন্দুক-মহলে প্রচার—'পরিবারের' হতশ্রদ্ধায়। কিন্তু, শেষের কথাটা বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না। কারণ, তখন রাণুর বয়স উনিশ কি কুড়ি—এ বয়সে—কিন্তু, সে-কথা এখন যাক্।

জবাব না পাইয়া যোগমায়াও সরিয়া গিয়া স্বামীর সম্মুখে বসিল এবং অধীর হইয়া পুনশ্চ প্রশ্ন করিল, "বল না?"

দেবী বাবু এইবার মুখ তুলিলেন—তাঁহার দৃষ্টি উদাস, অথচ স্থির, অচঞ্চল। কহিলেন, "রাণু ঘুমিয়েছে?"

"হ্যাঁ!"

দেবী বাবু পুনরায় মুখ নামাইয়া লইলেন, যেন মুখ খুলিয়া কহিবার কোনও কথা নাই।

স্বামীর অন্তরের বিকৃতি বুঝি বা যোগমায়ার কাছে গোপন রহিল না। বিবর্ণ মুখে স্বামীর দিকে চোখ তুলিয়া, চোখ নামাইয়া যেন মোরিয়া হইয়া বলিয়া উঠিল, "উপায় নেই?"

"আছে।" বলিয়াই দেবী বাবু বাহিরের দিকে একবার সতর্ক দৃষ্টিপাত করিলেন।

সে [illegible] অর্থ [illegible], [illegible] যোগমায়া তৎক্ষণাৎ উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "আচ্ছা, দেখে আসছি"—বলিয়াই বাহির হইয়া গিয়া রাণুর রুদ্ধকক্ষের কপাটে খানিকক্ষণ কাণ পাতিয়া থাকিয়া গলা চাপিয়া সাড়া লইল—"রাণু, অ—রাণু—"

ভিতর হইতে সাড়া আসিল না। সুতরাং যোগমায়াও নিশ্চিন্ত হইয়া ফিরিয়া গিয়া স্বামীকে কহিল, "জেগে নেই!"

দেবী বাবুর বুকের ভিতর হইতে যেন এক গোপন অনুভূতি নির্গত হইল—'হুঁ!' অতঃপর চকিত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "একখানা চিঠি দেখাতে হবে—বেঁচে আছে! তা' হলেই আরো বারো বৎসর—"

"চিঠি?"

"প্রমাণের প্রয়োজন হবে না! আমি হাতে ক'রে দেখাতে পারলেই—ব্যস্!"

যোগমায়ার মুখখানা চকচক্ করিয়া উঠিল। অধীর আগ্রহে বলিয়া উঠিল, "তবে, তাই কর না? কাউকে দিয়ে লিখিয়ে—"

দেবী বাবু হাত তুলিয়া বাধা দিলেন। জোর করিয়া একটু হাসিয়া কহিলেন, "জানি!"

"তবে?"

"হিন্দু, ব্রাহ্মণ!"

কুরুক্ষেত্রে পাণ্ডব-সখা যেমন তাঁহার এক পরমাত্মীয়কে উপদেশ দিয়া তাজা করিয়াছিলেন, ঠিক তেমনই করিয়া যোগমায়া বলিয়া উঠিল, "এতে পাপ নেই! কু-খবর বাতাসে উড়ে আসে! যদি কিছু হতো—"

"তা ত জানি! কিন্তু, সমাজ, বিধি, শাসন!"

"আর মেয়েমানুষ—খাওয়া-পরা, অকারণ দণ্ড?"

ইহার উপর আর কথা চলে না। একটু নীরব থাকিয়া দেবী বাবু একনিষ্ঠ পুরোহিতের ন্যায় স্ত্রীর মুখের দিকে তাকাইয়া কহিলেন, "তাই ভাব্‌ছি, মানুষের অন্যায় নিয়েই বুঝি শাস্ত্র তৈরী হয়েছিল!"

কথাটায় বুঝি খোঁচা ছিল। যোগমায়া মুখখানা হাঁড়ি করিয়া শ্লেষকণ্ঠে কহিল, "কিসে কি হয়েছিল, জানিনে। মেয়েমানুষের ওপর অযথা শাস্তিই যদি তোমাদের শাস্ত্রের অহঙ্কার হয়, তবে তাই হোক্।" বলিয়াই উঠিয়া বাহিরের দিকে পা বাড়াইল।

দেবী বাবু বাধা দিলেন। বলিয়া উঠিলেন, "শোন। রাজি আমি হয়েই এসেছি। কাল সকালে সমাজ বসবে, এইখানে—চিঠিও আমি দিয়ে দেব।"

কথাটা এই। তিথি, নক্ষত্র ও দিনের হিসাব দেবী বাবুর বা যোগমায়ার জানা থাক বা না থাক—পাড়ার মেয়েমহলে ইহার সঠিক হিসাব বহুদিন পাকাপাকি হইয়া গিয়াছে যে, আজ ঐ নিরুদ্দিষ্টের নিরুদ্দেশ বারোটা বৎসর পরিপূর্ণ হইবে। সুতরাং, শাস্ত্রীয় ও সামাজিক বিধানে রাণুকে কাল হইতে সধবার সাজ ও আচার পরিহার করিতে হইবেই হইবে। রাণুর জনক জননীও এ সিদ্ধান্ত নির্বিবাদে মানিয়া লইয়াছেন কিন্তু এটা মানিয়া লইতে পারেন নাই যে, বাস্তবিকই ঐ সর্ব্বনেশে অকারণ প্রভাত কোনও দিবস তাঁহাদের চোখে পড়িয়া দিতে পারে! ইহার একটু ইতিহাস আছে। স্বামী নিরুদ্দেশ হইবার পরদিন হইতেই রাণু 'গৃহ-বিগ্রহ' গোবিন্দের পায়ে একান্তভাবে আত্মসমর্পণ করিয়া আছে। সংসারের কামকর্ম্মে সে নির্লিপ্ত।—অন্তর এবং অনুভূতির ভাগাভাগি হয় নাই, কায়মনোবাক্যে এই দীর্ঘ বারোটা বৎসর ধরিয়াই সে ডাকিয়া আসিতেছে গোবিন্দকে—"তুমিই আমার মুখ রেখো!" এ সত্য রাণুর জনক-জননীর অবিদিত নাই। সুতরাং তাঁহারা নিশ্চিন্ত হইয়াই ছিলেন যে, 'গোবিন্দ' যদি সত্য হন, তা হইলে রাণুর এক যুগের সাধনাও সত্য হইবে। কিন্তু 'কলিকালের' ঠাকুর-দেবতা —দুর্নাম আছে! প্রার্থিতার প্রার্থনা পূরণ করিলেন না। তাই দিনের পর দিন কাটিয়া যখন একে-একে সমস্ত দিনই ফুরাইয়া গেল, তখন দেবী বাবু ও যোগমায়া উভয়েই হাহাকার করিয়া উঠিলেন। আজ শেষদিন, তাই দেবী বাবু সমাজপতির কাছে ছুটিয়া গিয়াছিলেন, দুর্দ্দৈবকে রোধ করিতে যদিই বা কোন অস্ত্র থাকে; এবং সমাজপতি যাহা নির্দ্দেশ দিয়াছেন, তাহা আগেই

যোগমায়া ফিরিয়া দাঁড়াইল। হর্ষে আত্মহারা হইয়া বলিয়া উঠিল, "দেবে?"

"নিশ্চয়ই! পাপ নইলে পাপ ঢাকা পড়ে না! বাপ-মায়ের পাপ না থাক্‌লে, ছেলে-মেয়ের শাস্তি হয় না! দণ্ড, রাণুর, অকারণ—আমাদেরই পাপে।"

যোগমায়া যেন বুঝিতে পারে নাই, এমনইভাবে স্বামীর দিকে তাকাইতেই তিনি বলিয়া উঠিলেন, "বুঝতে পারছ না? মেয়ের লোভ দেখিয়ে পরের ছেলেকে ঘরে এনে পশু ক'রে রাখ্‌তে চেয়েছিলাম—সে পাপ নয়? মানুষ!—মানুষ হয়ে আর এক মানুষকে করতে চেয়েছিলাম, অ-মানুষ, পরাশ্রিত।

একটু থামিয়াই আবার সুরু করিলেন, "মানুষের একমাত্র ধর্ম্ম, তার স্বাধীন-বৃত্তি—এক জনের সেই রত্নটিকে অপহরণ করতে গিয়েছিলাম আমি। চোর, তস্কর—পাপী নই?"

অস্বীকার করিবার যুক্তি নাই। এক প্রচণ্ড সত্যের প্রতিমূর্ত্তি যেন বারবার করিয়া যোগমায়ার বুকের ভিতর উঁকি মারিয়া চলিয়া গেল। নতমুখী হইয়া কিয়ৎক্ষণ স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া অস্ফুটকণ্ঠে কহিল, "ও সব ক'রে আর কাজ নেই—থাক।"

কেহ হাসিতে বলে নাই, তথাপি দেবী বাবু আপন মনে খামকা হাসিয়া বলিয়া উঠিলেন, "থাকলে চলে না! পাপের প্রায়শ্চিত্ত প্রয়োজন। শপথ করেছি—নিজেকে ত্যাগ করবোই কর্‌বো।" বলিয়াই একখানা চাদর মুড়ি দিয়া শুইয়া পড়িলেন।

যোগমায়ার মুখে আর কথা নাই, তেমনই নতনেত্র হইয়া নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া রহিল! এমনইভাবে কতক্ষণ অতিবাহিত হইল, তাহা সে জানে না, এক সময় টের পাইল, যেন কে ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিতেছে!

চৌকাঠ পার হইয়াই যেমন বাহিরের বারান্দায় পা দিবে, দেখিল, সম্মুখেই—রাণু। যেন একমুঠি অন্ধকার, এক ঝলক জ্যোৎস্না! যোগমায়া থমকিয়া একটু পিছাইয়া আসিল, যেন চোখের উপর—এক প্রেতমূর্ত্তি, একটি দেবকন্যা!

অপর পক্ষের এক মুহূর্ত্তও বিলম্ব হইল না! রাণু প্রশ্ন করিল, "আমাকে ডাক্‌ছিলে, মা?" যেন সে প্রয়োজনের

মায়ের মুখ দিয়া কিন্তু কোন কথাই নির্গত হইল না!

রাণু জবাব না পাইয়া আপন-মনে বলিয়া উঠিল, "তা হ'লে—স্বপ্ন!" বলিয়া আর অপেক্ষা করিল না।

মায়ের কিন্তু পা উঠিল না, শবের ন্যায় কিয়ৎক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল। অতঃপর নিজেকে যেন টানিয়া হিঁচড়াইয়া কক্ষান্তরে লইয়া গেল।

দেবী বাবুর বহির্বাটীতে প্রভাতেই 'সমাজ' বসিয়াছে!

দেবী বাবু একনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ, ধার্ম্মিক! শোনা যায়, কোনও মামলায়, তিনি সাক্ষী থাকিলে, মহকুমার হাকিম তাঁহারই সাক্ষ্যে রায় দেন! সুতরাং, তিনি দশের মাথা, সমাজের মুখ! এ হেন লোকের বাড়ীতে 'সমাজ' পদার্পণ করিতে কেহই বিমুখ হয় নাই!

যথাসময়ে দেবী বাবু আসিয়া দেখা দিলেন। সভায় একটু আলোড়ন উঠিল, উঠিয়াই থামিয়া গেল। সমাজপতি কে টিপ নস্য লইয়া বলিলেন, "বসো ভায়া।" বলিয়াই সজোরে নাক টানিয়া নাক মুছিয়া পুনশ্চ কহিলেন, "বিধির বিধান! তোমার বাড়ীতেও সমাজ বসলো—'গৌরহরি'!"

পাশেই একটি সতের-আঠারো বৎসরের ছেলে বসিয়াছিল। সে নস্যের গন্ধ পাইয়া উসখুস্ করিতেছিল। এইবার যেন এক সুযোগ পাইয়া বলিয়া উঠিল, "পিসেমশাই—"

"বলো, কি বলছ—তোমাকে নিয়ে ত তিন-পুরুষ হলো—"

ও ধারের কোণ হইতে কে চাপাকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "খুব পিণ্ডি পাবে—"

"কে রে! কোন্ নচ্ছার—"

সম্মুখে এ-পাড়ার চাটুয্যে মশাই বসিয়াছিলেন, অর্থ ও সম্পত্তিতে তিনি সকলের সেরা—তাঁহার বাড়ীতে বন্দুক আছে। অকারণ কলহের নিষ্পত্তি তিনিই করিয়া দিলেন, কহিলেন, "আপনি চট্‌ছেন কেন? সম্পর্কে ওরা নাতি—ঠাট্টা ত করবেই!"

সমাজপতি একটু নরম হইলেন। কহিলেন, "তা করুক্ না, করবেই ত! তবে পিসেমশাই বলে কি না!"

"বল্‌বেই—ওদের বাপ্-ঠাকুরদা ব'লে এসেছে, ওরা বল্‌বে না?" চাটুয্যেমশাই হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন।

ইহার একটু ইতিহাস আছে। কোন্ অজ্ঞাত দিনে এই সমাজপতি ও-পাড়ার ভট্টাচার্য্য-বাড়ীর গৃহজামাতা হইয়া আসিয়া এই গ্রামে বসবাস সুরু করেন। ইঁহার বয়সের খবর গ্রামের বর্ত্তমান লোকজন কেহ রাখে না। রাখে মাত্র এইটুকুই,—ওঁর বয়সের আদিও নাই, অন্তও নাই। সে যাহাই হউক, তদবধিই পুরুষানুক্রমে আবালবৃদ্ধ-বনিতা সবাই ইঁহাকে 'পিসেমশাই' বলিয়াই ডাকিয়া আসিতেছে—কিবা হিন্দু, কিবা মুসলমান! বেশী বয়সের একটু দুর্নাম আছে—মানুষে অল্পে চটিয়া উঠে! ইনিও যদি মাঝে মাঝে চটিয়া উঠেন, কিন্তু তাহা মারাত্মক নহে। সবাই ইঁহাকে মানিয়া চলে, বয়সের মূল্য ও সম্পর্কের মান সাগ্রহে দিয়া থাকে। তাই ইনি সমাজপতি।

ছেলেটির নেশা কিন্তু মাঠে মারা পড়িতে বসিয়াছিল। 'পিসেমশাই'কে একটু প্রকৃতিস্থ দেখিয়া আবার বলিয়া উঠিল "বল্‌বো, পিসেমশাই—"

"ভাল আপদ! আরে বল না কি বলবি?"

"এই বাবারা বল্‌তো—"

"বাবা-রা কি রে? বাবা কারা?"

"এই আমাদের সবাইকার—"

সমাজপতি গম্ভীর হইয়া বলিলেন, "কি বল্‌তো, শুনি?"

"বল্‌তো, 'পিসেমশাই' আস্‌বার আগে রোজ-রোজ 'সমাজ' বসতো—এর বাড়ী, ওর বাড়ী, তার বাড়ী! পিসেমশাই এসে সব বন্ধ হয়ে গেছে—কি শাসন!"

'পিসেমশাই' একগাল হাসিয়া ফেলিলেন! বলিলেন, "কথাটা ঠিক! কিন্তু, আমি এ-গাঁয়ে আস্‌বার আগেকার খবর তোর বাবারা জান্‌লে কি ক'রে? আমি যখন এসেছি, তখন ওরা মায়ের পেটে!"

ছেলেটি একটু অপ্রতিভ হইবার ভাণ করিয়া বলিল, "তা বটে!—পিসেমশাই, একটু নস্যি দেবে?"

"হুম্ ল্য! আচ্ছা, এই একটুখানি—" বলিয়া 'পিসেমশাই' ছেলেটিকে এক টিপ নস্য দিলেন। তার পর তাঁহার নজর ফিরিল দেবী বাবুর উপর। বলিলেন, "দাঁড়িয়ে কেন ভায়া, বোসো—বোসো না?"

দেবী বাবু এতক্ষণ নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন, এইবার তাঁহার চমক ভাঙ্গিল। একটু দূরেই সমাজপতির আসন—দেবী বাবু সরিয়া আসিলেন। অতঃপর কলের পুতুল যেমন করিয়া হাত তোলে, তেমনই করিয়া একখানা পত্র বাহির করিয়া হাত তুলিয়া দেখাইলেন, দেখাইয়াই

সেইখানে বসিয়া পড়িলেন—আঙুলের চাপ খুলিয়া পত্রখানা তখন মাটীতে পড়িয়া গিয়াছে।

সমাজপতি পত্রখানা উঠাইয়া লইয়া যেন কুণ্ঠিতভাবেই বলিয়া উঠিলেন, "আমরা দেখ্‌বো আর কি?" বলিয়াই চশমা খুলিয়া পত্রখানার আগাগোড়া নিরীক্ষণ করিলেন, করিয়া কহিলেন, "ঠিকানা নেই, পাছে গিয়ে গ্রেপ্তার কর!" তিনি একমুখ হাসিয়া উঠিলেন।

চাটুয্যে-মশাইও সেই হাসিতে যোগ দিলেন, কহিলেন, "তা হোক্‌, বাবাজীর ধর্ম্মজ্ঞান কিন্তু খুব—পরিবারকে খুব বাঁচিয়েছে!"

সমাজপতি গম্ভীর হইয়া মন্তব্য প্রকাশ করিলেন—"আহা-হা! জামাই ত আর মূর্খ্য নয়—একটা পাশ দিয়ে তবে বেরিয়েছে! আমাদের 'নদের নিমাই' যে বাড়ী বয়ে এসে জানিয়ে যেতেন—'ওগো, আমি বেঁচে আছি'!"

কে এক জন ও-দিকের কোণ হইতে বলিয়া উঠিল, "বাবাঠাকুরদের কি দয়া!"

চাটুয্যে-মশাই প্রসঙ্গটাকে চাপা দিবার উদ্দেশে তাড়াতাড়ি সমাজপতিকে বলিয়া উঠিলেন, "আপনি আর এ-দিকে কাণ দেবেন না—কায আরম্ভ ক'রে দিন!"

সমাজপতি পত্রখানার দিকে আর একবার চোখ ফেলিয়া সভাস্থ সকলকে উদ্দেশ করিয়া কহিলেন, "তোমরা কেউ দেখ্‌তে চাও?"

একবাক্যে সকলেই কহিল—"না"।

"বলবার কিছু—"

"নয়।"

সমাজপতি রায় দিলেন, "আরও বারো বৎসর—"

"আর এক দিনও নয়—" বলিতে-বলিতে রাণু প্রবেশ করিল। তাহার পরনে থান-কাপড়, হাত শুধু, মাথায় সিন্দুর নাই। সকলের বিস্মিত-দৃষ্টি তাহার উপর পড়িতেই, তাহার মুখে ম্লান হাসি দেখা দিল। ধীর ও সংযতকণ্ঠে কহিল, "হিঁদুর মেয়ের আর ও-সব মানায় না!"

সমাজপতি শামুকের খোল হইতে নস্য বাহির করিয়া সবেমাত্র নাকে গুঁজিতেছিলেন, তাড়াতাড়ি এক জোর টান দিয়া বলিয়া উঠিলেন, "অকারণ বৈধব্য—অশাস্ত্রীয়!"

রাণুর মুখে আবার তেমনই হাসি। বলিল, "হ'তে পিত্রালয়ে থাকিলেও, কোনোও দিন এই মেয়েটির মূর্ত্তি পর্য্যন্ত কেহই দেখিতে পায় নাই, মুখের কথা শোনা ত দূরের কথা। সুতরাং রাণুর আকস্মিক এই আবির্ভাব, তদুপরি নির্ভীক এই কথাবার্ত্তা সকলকেই বিহ্বল করিয়া তুলিয়াছিল। কিন্তু, শাস্ত্রে প্রতিবাদ—বিশেষ করিয়া অধিকারহীনা নারীর মুখে—ইহা সমাজপতির অন্ততঃ সহ্য হইল না। ঈষৎ রুক্ষকণ্ঠে তিনি বলিয়া উঠিলেন, "কি বল্‌ছিস্‌?—মূর্খ্যর মতন!"

"মেয়েমানুষ, মূর্খ্য—তাই-ই হয়! পণ্ডিত হ'লে আমাদের জাত যায়!"

রাণুর কথাটায় ঝাঁঝ ছিল না। না থাকিলেও, সকলেই ইহা স্পষ্ট করিয়া বুঝিল যে, এক প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপ বাক্যটির ভিতর নিহিত আছে, কিন্তু উহা এমনই নিরীহ, এমনই সহজ যে প্রতিবাদ করা চলে না। সকলেই চুপ করিয়া রহিল।

একমুখ হাসিয়া সমাজপতি বলিয়া উঠিলেন, "দেখ্‌ছি, খুব কথা জানিস! আচ্ছা, তারপর—"

"তারপর? তোমাদের শাস্ত্র আজ থেকে আমাকেই মেনে চলুক, আমি ওকে মান্‌বো না।"

"মান্‌বিনে?"

"না।"

"ধর্ম্ম, সমাজ, কল্যাণ -"

রাণু মাটীর দিকে মুখ নামাইয়া নখে মাটী খুঁড়িতে খুঁড়িতে জবাব দিল, "জানি।"

"তবে?"

রাণু মুখ তুলিল, তাহার দৃষ্টির এক পার্শ্বে সমাজপতি, অন্য পার্শ্বে পিতা, আর চারিদিক্‌ ঘিরিয়া এক পরিপূর্ণ 'ইহলোক!' সকলেরই মুখে দাবী—'উত্তর দাও!' রাণুর মুখটি আবার ঝুলিয়া পড়িল। নীরবে সে দাঁড়াইয়া রহিল।

সমাজপতি তাহার মুখের দিকে চাহিয়া ঈষৎ হাসিলেন—জয়ের হাসি। অতঃপর পরমাত্মীয়ের ন্যায় স্নেহার্দ্রকণ্ঠে কহিলেন, "বুঝে দেখ্‌—বাপের মুখে কালি পড়বে!"

রাণু শিহরিয়া উঠিল। মুখ তুলিতেই সমাজপতি পুনশ্চ কহিলেন, "লোকে ভাব্‌ছে, এ-চিঠি মিথ্যে—তুই

তথাপি রাণু নির্ব্বাক্, নিস্তব্ধ। তখন তাহার চোখদুটি বড় হইয়া জ্যোতিঃ ফেলিয়া সম্মুখের এক জানালা দিয়া বাহিরে গিয়া পড়িয়াছে, যেন সেই আলোকেই বসিয়া পৃথিবীর কোন্ একান্তে ইহলোকের এক আদি-পুরুষ মানুষের শাস্ত্র, সমাজের আইন, ধর্ম্মের নির্দ্দেশ, ধরিত্রীর কল্যাণ-রচনায় তন্ময় হইয়া আছেন, আজিও তাহার শেষ হয় নাই!

সমাজপতি অধীর হইয়া উঠিতেছিলেন। একটু তাড়া দিয়া বলিলেন, "মেয়েমানুষ, সধবা!—ও-সব ছাড়তে নেই!"

রাণুর এইবার চমক ভাঙ্গিল। যেন কিছুই শুনিতে পায় নাই, এমনই ভাব দেখাইয়া বলিল, "আমাকে কিছু বল্‌ছ, পিসেমশাই?"

"গৌরহরি! এতক্ষণে কথা হ'লো—'কি বল্‌ছ?'—বল্‌ছি, এয়োতির চিহ্ন—ও-সব ত্যাগ করো না!"

"রুচি, মন, প্রবৃত্তি—আর ও-সবে নেই!" বলিয়াই রাণু ঈষৎ হাসিয়া মুখ ফিরাইয়া তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া গেল।

সঙ্গে-সঙ্গে সমাজপতির মুখে যেন কালি পড়িয়া গেল। যুগ-যুগের পুঁথি, যুগ-যুগের আচার, হিঁদুয়ানী, শাসন, নিয়ম, আইন—সমস্তই এক নিমেষে ধ্বংস করিয়া গেল—ওই মেয়েটা! মিনিটখানেক গুম্ হইয়া থাকিয়া দেবী বাবুর দিকে চাহিয়া বিকৃত কণ্ঠে তিনি বলিয়া উঠিলেন, "মেয়েকে এইবার থিয়েটারে পাঠাও—" বলিয়াই ঠক্-ঠক্ করিয়া কাঁপিতে-কাঁপিতে উঠিয়া পড়িলেন।

পশ্চাৎ হইতে এক বিদ্রূপকণ্ঠ বলিয়া উঠিল, "আর পিসে-মশাইকে যুবরাজের 'পাট' দিলেই হবে!"

"হতভাগা, বানর—" বলিয়া 'পিসেমশাই' লাঠি ঠুকিয়া গর্জ্জিয়া উঠিলেন।

তখন সকলেই উঠিয়া পড়িয়াছে। চাটুয্যেমশাই তাড়াতাড়ি 'পিসেমশাইয়ের' কাছে সরিয়া আসিয়া একমুখ হাসিয়া বলিয়া উঠিলেন, "আঃ, করেন কি! আপনি যান দিকিনি বেরিয়ে!" বলিয়াই পশ্চাদ্দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "বুড়ো মানুষ—বয়সেরও একটু মান রাখ্‌তে তোমরা জান না—ছিঃ!"

'পিসেমশাই' আশ্রয় পাইয়া বলিলেন, "দেখ দিকিনি, ভায়া—"

"আপনি যান, আমি ভালো ক'রেই দেখ্‌ছি—" বলিয়াই চাটুয্যেমশাই সহাস্যে 'পিসেমশায়ের' হাত ধরিয়া ঘর হইতে বাহির করিয়া রাস্তায় দিয়া আসিলেন। অতঃপর ফিরিয়া আসিয়া জনতার দিকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "আমার অনুরোধ—ওঁকে আর তোমরা রাগিয়ো না, এতে হয়—তোমাদেরই অকল্যাণ!" তার পর দেবী বাবুর কাছে সরিয়া গিয়া আস্তে-আস্তে কহিলেন, "আজ জয় হয়েছে রাণুর! সত্যিই ত, যে-মেয়ে বারো-বারোটা বৎসর দর্শন পেলে না, তার কাছে স্বামীর এক উড়ো-খবরের আর আদর কি? আমার মেয়ের বয়সী রাণু, কিন্তু সে আমার পূজনীয়া!" বলিয়াই সকলকে ডাক দিয়া বাহির হইয়া গেলেন।

সবাই গেল। কেবল বসিয়া রহিলেন দেবী বাবু—এক মাটীর মূর্ত্তি! বসিয়া-বসিয়া বুঝি বা এই কথাটাই বেশী করিয়া ভাবিতে লাগিলেন যে, পৃথিবীতে যে-উৎসব অহরহঃ মানুষের ঝুলি ভরিয়া রাখিবে বলিয়া আশ্বাস দেয়, উহাই আবার এক নিমেষে বুক খালি করিয়া দিয়া, রিক্ত করিয়া তাহাকে নিষ্পিষ্ট করিয়া চলিয়া যাইতে পারে, অথবা আনন্দে আত্মহারা যে-মানুষ বেদীর উপর প্রতিমা বসায়, তাহাকেই আবার মুহূর্ত্তে জলসই করিতে চায় কেন? হৃৎপিণ্ড বলিয়া ইহলোকের যে উপহার, মানুষের কাছে কি ছাই এর কোনও কদর নাই?

এমনই ভাবে কতক্ষণ ইনি বেহুঁস হইয়া ছিলেন, তাহার ঠিক নাই, সহসা রাণুর কণ্ঠস্বরে চমকিয়া উঠিলেন। রাণু ডাকিল, "বাবা—"

দেবী বাবু চাহিয়া দেখিলেন—সেই সে! পুরাতন যুগের এক 'উমা!' সত্যই কি এত দিন পরে রাণু নিরুদ্দিষ্ট স্বামীর যথার্থ উদ্দেশ পাইয়াছে? অক্ষম দৃষ্টি, অবশ চোখ—জলে ভারি হইয়া উঠিল।

রাণু তাড়াতাড়ি কাছে সরিয়া গিয়া ধমক দিয়া বলিয়া উঠিল, "ছাই-ভস্ম!—ব'সে-ব'সে ওই-সব ভাব্‌ছ বুঝি? উঠে এসো—" বলিয়া হাতে একটা টান দিল।

দেবী বাবু কোঁচার খুঁটে চোখ মুছিলেন। মুছিয়া বলিলেন, "না মা, তা ভাবিনি! ভাব্‌ছি—স্বামীর নামে মেয়েদের আর একটা বুক আছে, যা বাপ-মাকে দেবার বুকের সঙ্গে মেলে না!"

শ্রীচরণদাস ঘোষ।

নারী—পাশ্চাত্য-সমাজে ও হিন্দু-সমাজে

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

জাতিভেদ প্রথা

জীব-জগৎ পর্য্যালোচনায় পাওয়া যায় যে, অনেক সময়ে পিতা-মাতার দোষ, গুণ বা শক্তি যদিও সময়ে সময়ে তাহাদিগের শাবকদিগের ভিতর পাওয়া যায় না, কিন্তু সেই গুণ, দোষ বা শক্তি সেই বংশে—দুই তিন পুরুষ পরেও পাওয়া যায়—তাহাকে Atavism বলে। যেখানে জাতিভেদ-প্রথা নাই, সেখানে পিতা বা মাতার যে গুণ নাই, তাহাদিগের অপত্যদিগের ভিতর কেহ কেহ সেই গুণসম্পন্ন হইয়া থাকে। কিন্তু এ দেশে বংশানুক্রমিক বৃত্তি থাকায় ও একই জাতিভুক্তদিগের ভিতর বিবাহ নিবদ্ধ থাকায় একজাতিভুক্ত লোকের সন্তানের ভিতর প্রায় কখনই অন্যজাতির বৃত্তিতে আবশ্যক গুণ অধিক পরিমাণে থাকে না। ইংলণ্ডাদি দেশে যেমন ভারবাহী ঘোড়ার শাবক প্রায় কখনই ঘোড়দৌড়ের ঘোড়া হয় না—সে কেবল ঘোড়দৌড়ের ঘোড়ার শাবকরাই হয়—এ দেশেও তেমনই একজাতিভুক্ত লোকের সন্তানের অন্য জাতির বৃত্তির উপযোগী শ্রেষ্ঠ গুণসম্পন্ন হইবার সম্ভাবনা অতীব অল্প—নাই বলিলেই হয়। সুতরাং এখানে জাতিগত বৃত্তি নির্দ্দেশে অতীব অল্পসংখ্যক লোককে হয় ত তাহার কোন কর্ম্মের উপযোগী শ্রেষ্ঠ গুণ থাকা সত্ত্বেও সেই কর্ম্ম করিতে দেওয়া হয় না। যদি কদাচ কখনও পৃথিবীর আশ্চর্য্য ঘটনার ন্যায় বা গুপ্ত প্রণয়ের ফলে ঐরূপ হয়, তাহার জন্য সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম কোন সমাজই করিতে পারে না। মনে রাখিতে হইবে যে, কোন এক বৃত্তির উপযোগী শ্রেষ্ঠ গুণসম্পন্ন লোককে যদি সেই বৃত্তি অবলম্বন করিতে দেওয়া না হয়, তাহা হইলেই উহা সমাজের ও দেশের পক্ষে অমঙ্গলজনক—মোটামুটিভাবে অন্য এক বৃত্তির কার্য্য করিতে পারায় কিছু আসে যায় না। ধোপার ছেলে কেরাণীগিরি করিতে পারাতে বা করাতে দেশের কোন মঙ্গল হয় না—তাহা অনেকেই করিতে পারে।

এই জাতিগত বৃত্তি-নির্দ্দেশের একটি বিশেষ শুভ ফল হইয়াছিল এই যে, বংশানুক্রমিতার ফলে ও অনুকূল আবেষ্টনীতে বর্দ্ধিত হওয়ার জন্য যাহারা যে কর্ম্ম করিবার বিশেষ উপযোগী গুণসম্পন্ন, তাহারা সেই কর্ম্ম করিবার সুবিধা হইতে বঞ্চিত হয় নাই। এই মৌখিক সমান সুযোগ ও ইচ্ছানুযায়ী কর্ম্ম করিবার স্বাধীনতার দিনে, প্রায় কোন গরীব লোক তাহার কোন উচ্চ কর্ম্ম করিবার শ্রেষ্ঠ গুণ থাকা সত্ত্বেও সে কর্ম্ম করিতে পায় না। কারণ, অধিকাংশ উচ্চ কর্ম্মের উপযোগিতা অর্জ্জন করিতেও বহুকাল অধ্যয়ন করিতে হয়, তাহাতে বহু অর্থের আবশ্যক—অবস্থাপন্ন না হইলে তাহা কোন লোকই তাহাদিগের স্বাস্থ্যের জন্য যাহার যাহা আবশ্যক তাহা পায়—তাহারা যে কার্য্য করিতে বা বিদ্যা শিখিতে চায়—যে কার্য্য করিবার বা যে বিদ্যা শিখিবার বিশেষ উপযোগিতা আছে—তাহাতে পারদর্শিতা লাভ করিবার সকল সুবিধা বিনা ব্যয়ে করিয়া দেয়—পুস্তক যন্ত্রাদি কিনিয়া দেয় বা ব্যবহার করিবার সুবিধা দেয়, তাহা হইলে বুঝিতাম যে, যথার্থ সকলকে সমান সুযোগ দেওয়া হইল—অন্যথা এই সমান সুযোগবাদ গরীব-ভুলানো ছলনা মাত্র। এই সমান সুযোগবাদ প্রচার করিয়া সকলকে প্রাথমিক শিক্ষা বিনা বেতনে করিতে দিয়া (তাহাতে ধনী, বণিক বা পদস্থ প্রভুদিগের বেতনভোগী দাসরা তাঁহাদিগের আজ্ঞা প্রতিপালনে সম্যক্ সমর্থ হয় সুতরাং তাঁহাদিগেরই বিশেষ সুবিধা হয়) পাশ্চাত্যের রাষ্ট্রপরিচালকরা এই মিথ্যা স্তোকবাক্য দিয়া নিজেদের ন্যায়পরতা জাহির করিতেছেন—মুখে বলিতেছেন, সকলের সকল কর্ম্ম করিবার সমান অধিকার—সকল কর্ম্মেই অবারিত দ্বার—গরীবরা বড় হইতে পায় না নিজের দোষে—ফলতঃ গরীবদিগের পক্ষে সকল দ্বারই প্রায় সম্পূর্ণ রুদ্ধ। মাত্র দশ বিশ জন বিশেষ অনুকূল ঘটনা সাহায্যে বা কোন ধনী বা পদস্থ লোকের সাহায্যে (যাহা পাওয়া যায়, তাহাদিগের কোন প্রকাশ্য বা গুপ্ত উদ্দেশ্য সাধন করিয়া) ধনী বা পদস্থ হয়—তাহা দেখিয়া আমরা মুগ্ধ হই। দশ বিশ জন গরীব ঐরূপে ধনী বা বড় হওয়ায় সমাজের কোন লাভ নাই বিশেষতঃ যখন দেখা যায়, তাহারা এমন কোন কার্য্য করে নাই, যাহা অন্য লোক করিতে পারিত না। অতি অল্পসংখ্যক লোকের আর্থিক অবস্থা অন্য লোকের পরিবর্ত্তে উন্নত হইল বটে তাহাতে বহু সহস্রের জীবনের সন্তোষ ও শান্তি নষ্ট হয়। আরও দেখা যায় যে, তাহারা ধনীদিগের সহিত মিশিয়া যায়—আত্মীয় গরীবদিগের সহিত বিচ্ছিন্ন হয়—সমাজে ধনের প্রভাবের অতিবৃদ্ধি হয়—বিলাসিতারও বৃদ্ধি হয়, তজ্জন্য সাধারণ লোকের জীবনের সন্তোষ, শান্তি ও স্বচ্ছন্দতা নষ্ট করা হয়। যে ঐরূপে বড় হয়, তাহারও জীবন বিশেষ সুখশান্তিদায়ী হয় না। অবস্থা পরিবর্ত্তনের সহিত আবেষ্টনেরও পরিবর্ত্তন হয়—উহার সামঞ্জস্য-সাধন কষ্টকর—আবার তিনি যেরূপ সামঞ্জস্য করিতে চাহেন তাঁহার স্ত্রী-পুত্র-কন্যারা সেরূপ করিতে পারে না বা চাহে না—তজ্জন্য পারিবারিক জীবনে বিশেষ অশান্তি হয়। তজ্জন্য যাহারা ঐরূপে অধিক ধন বা মান পায়, তাহাদিগের নিজের পক্ষে তাহা বিশেষ শুভজনক হইল, তাহাও বলা যায় না—দিল্লীর লাড্ডু পাওয়ার মতই হয়।

পূর্ব্ব-প্রবন্ধে বলা হইয়াছে যে, সকল কর্ম্মে সকলের সমান সুযোগ দেওয়ায় পাশ্চাত্যে ধনী ও বণিকরা প্রায় সকল ব্যবসা-

করেন। রাষ্ট্রশক্তিও তাহারা গ্রাস করিতেছে। সুতরাং মধ্যবিত্ত ও গরীবরা কেবল ধনীদিগের ও রাষ্ট্রশক্তির চাকরী করিতে পায়। এই সকল চাকরীর উচ্চ কর্ম ওকালতী, ডাক্তারী, ইঞ্জিনিয়ারী আদি কর্ম্মে উপযোগিতা অর্জ্জন করা বহু ব্যয় ও সময়-সাপেক্ষ, সুতরাং মধ্যবিত্তরাই তাহা করিতে পায়—দরিদ্ররা তাহা করিতে পায় না। দরিদ্ররা তজ্জন্য বংশগত ভাবেই দরিদ্র কায়শ্রমিক থাকিয়া যায়—নির্ব্বংশ হইয়া যায়—আর ধনী ও মধ্যবিত্তদিগের ভিতর যাহারা একবার দরিদ্র হইয়া যায়, তাহারাও বংশগতভাবে চিরকালের জন্য দরিদ্র কায়শ্রমিকভুক্ত হইয়া যায়—আর যখন চাকরী পাওয়া দুর্ঘট হয়, তখন রাজসরকারের সাহায্য ব্যতীত তাহারা বাঁচিতেই পারে না। এই কোটি কোটি দরিদ্রের ভিতর—যাহারা বংশানুক্রমিক গুণ ও শক্তিতে মধ্যবিত্ত ও ধনীদিগের সমকক্ষ কত সহস্র সহস্র লোক কত উচ্চ করিবার উপযুক্ত শ্রেষ্ঠ গুণ লইয়া জন্মায়, অর্থ ও সুযোগ অভাবে সেই সকল গুণের বিকাশ হইতে পায় না— তাহাদিগকে দরিদ্র কায়শ্রমিকই থাকিয়া যাইতে হয়—তাহাতে তাহাদিগের কিরূপ অন্তর্দাহ হয়—কত মূর্খ নির্গুণ লোক কত উচ্চ কর্ম্ম করে—ধনের বলে রাজনৈতিক সভার সভ্যও হয়, ইহা সমাজের পক্ষে কত অনিষ্টকর, তাহা সকলকে দেখিতে বলি। সকলের সকল কর্ম্ম করিবার সমান সুযোগ থাকার ফলে কত অল্পসংখ্যক গরীব ধনী হইতে পায়—তাহার তুলনায় কত অধিকসংখ্যক লোকের জীবিকার লাভ ধনীরা গ্রাস করিয়া বসে ও তাহাদিগকে বংশগত ভাবে কায়শ্রমিক দাসত্বে পরিণত করে, তাহাদিগকে জীবন ভীষণ কষ্টকর করে, কত অধিকসংখ্যক দরিদ্রের সন্তান, তাহাদের অনেক উচ্চ কর্ম্ম করিবার গুণ ও শক্তি থাকা সত্ত্বেও সে সকল কর্ম্ম করিতে পায় না, তাহা দেখিলে জাতিগত বৃত্তি নির্দ্দেশের মন্দ ফল নগণ্য মাত্র প্রতিপন্ন হয়। ইহার সুফল কত অধিক, পরে দেখান হইবে।

পাশ্চাত্য দেশসকল আমাদিগের তুলনায় বহু ধনী, তাহাদিগের অনেকের বিস্তৃত রাজত্ব, বৃহৎ বৃহৎ শিল্প কারখানা ব্যবসা-বাণিজ্য আছে। সেখানকার দরিদ্ররা বুদ্ধি ও শক্তিতে ধনী ও মধ্যবিত্তদিগের সমকক্ষ; সুতরাং সেখানকার কোটি কোটি দরিদ্রের ভিতর স্বল্পসংখ্যক লোক সময়ে সময়ে, দেশে ও বিদেশে অধিক ধনী বা মধ্যবিত্ত হইবার সুবিধা পায় বটে; কিন্তু আমরা পরাধীন, আমাদিগের বাণিজ্য পরহস্তগত, দেশও প্রায় লুপ্তশিল্প—যে সকল বৃহৎ শিল্প আছে, তাহাও আমাদিগের কর্ত্তৃত্বাধীনে নয়। নিম্নজাতির অনেকেই সভ্যতার বিভিন্ন স্তরের—তাহাদিগের বংশানুক্রমিক শক্তি ও বুদ্ধি বিভিন্ন প্রকারের—সুতরাং এ দেশে সকল কর্ম্মে সকলের সমানাধিকার থাকিলে দরিদ্র ও নিম্নজাতিদিগের কোন উন্নতির আশা নাই—লাভের ভিতর তাহাদিগের একচেটিয়া বৃত্তির লাভ ও তাহাদিগের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ধনী ও মধ্যবিত্তরা গ্রাস করিয়া তাহাদিগকে কায়শ্রমিক দাসমাত্রে পরিণত করিবে এবং যখন দাসত্ব জোটাও ভার হইবে, তখন তাহাদিগের দুর্গতির একশেষ হইবে—অন্নাভাবে মরিবে—দেশে সংক্রামক ব্যাধির বহু বিস্তার হইবে। পাশ্চাত্য দেশে যে সকল উপায়ে দরিদ্রদিগকে সাহায্যদানের জন্য যাহা—[illegible] যে ব্যবস্থা আছে সে উপায় এ দেশে অসম্ভব পরে দেখান হইবে—সম্পূর্ণ স্বাধীন হইলেও অসম্ভব।

দরিদ্র ও নিম্নজাতিদিগের উন্নতিকল্পে যে সকল উপায় অবলম্বিত হইতেছে, তাহার ভিতর রাজসরকারের চাকরীতে ও রাজনৈতিক সভার সভ্যের ভিতর একটা নির্দ্দিষ্ট অংশ দেওয়া স্থির হইয়াছে। প্রথমতঃ দেখা যায়, রাজসরকারের চাকরীতে মাত্র শতকরা ২টি প্রতিপালিত—তাহাও সৈনিক ও পুলিস ও আবগারী ও তাহাদিগের দ্বারা প্রতিপালিত স্ত্রী-পুত্র-কন্যা লইয়া—সুতরাং তাহা ৪ কোটি ৭০ লক্ষ লোকের ভিতর বিতরিত হইলে অতি অল্পসংখ্যক নিম্নজাতীয়দিগের সুবিধা হইতে পারে। কতক ইংরেজি শিক্ষিত না হইলে রাজসরকারের চাকরীর সুবিধা হয় না—তাহাদিগের শতকরা ৯৮ অশিক্ষিত—নিরক্ষর। বক্রী ২টি চাকরীর উমেদার হইবার যোগ্য। এই রাজসরকারের চাকরী ও রাজনৈতিক সভার সভ্য লইয়াই ইতিমধ্যে হিন্দু-মুসলমান বিদ্বেষ ও বিরোধ (শিখ ও মুসলমান বিরোধ—প্রাদেশিক বিদ্বেষ) শিক্ষিত সম্প্রদায়ের ভিতর উত্থিত হইয়াছে ও তাহাদিগেরই গুপ্ত প্ররোচনায় অশিক্ষিত ও অল্পশিক্ষিত সম্প্রদায়ের ভিতর উত্তরোত্তর প্রজ্বলিত হইতেছে। এই চাকরী পাওয়ার রেশারিশিতে ক্রমে হিন্দুদিগের শুধু উচ্চ ও নিম্নজাতিদিগের ভিতর নয়—বিভিন্ন সম্প্রদায়ের নিম্ন জাতিদিগের ভিতরও প্রজ্বলিত হইয়া উঠিবে—তাহার সূত্রপাতও হইয়াছে।

এই চাকরী ও ওকালতী, ডাক্তারী, এঞ্জিনিয়ারী ইত্যাদি (যাহাতে মাত্র শতকরা ২টি লোক—তাহাদিগের প্রতিপাল্য লইয়া আছে) এখন অনেক অবস্থাপন্ন বৈশ্য, শূদ্র জাতীয়তা অবলম্বন করিতেছেন—মুসলমানরাও করিতেছেন, তজ্জন্য উচ্চশ্রেণীভুক্ত হিন্দুরা ইতিমধ্যেই নিম্নজাতিভুক্তদিগের বৃত্তি অবলম্বন করিয়া তাহার লাভ ভোগ করিতেছেন—কামার, পোটো, গয়লা, ধোপা, কুম্ভকার, মুচির কার্য্য করিতেছেন—শীঘ্রই বাধ্য হইয়া পূর্ণভাবে গ্রাস করিবে—সুতরাং দশ বিশ জন আম্বেদকরের মতন লোক ব্যতীত সকল নিম্নজাতিদিগের ভীষণ দুর্গতি অবশ্যম্ভাবী। এই দুই দশ জনের অবস্থা উন্নত দেখিয়া আরও অধিক-সংখ্যক লোক জাতীয় ব্যবসা পরিত্যাগ করিয়া—সাধ্যাতিরিক্ত বিলাসিতায় অভ্যস্ত হইয়া—ঐ সকল কর্ম্ম করিবার উপযোগিতা অর্জ্জন করিতে যাইবে ও উমেদার-সংখ্যা বাড়াইয়া জীবনের সন্তোষ বা শান্তি হারাইবে মাত্র। ঐ সকল জাতিভুক্ত যাহাদিগের পিতা, পিতামহ ভদ্রজাতিভোগ্য গোলামীগিরি ও ওকালতী, ডাক্তারী ইত্যাদি কার্য্য করিয়াছিলেন, তাঁহারা প্রায় সকলেই তাঁহাদিগের আত্মীয়-কুটুম্বদিগের সহিত বিভিন্ন মনোভাবগ্রস্ত হইয়া বিচ্ছিন্ন হইয়াছেন—জাতিগত ব্যবসা করিতে অপারগ হইয়াছেন—তাঁহাদিগের এখন ঐরূপ চাকরী আদি কর্ম্ম করিতে না পাওয়ায় জীবন বিশেষ কষ্টকর হইয়াছে! আর সেই সকল জাতীয় বৃত্তিতে বুদ্ধিমান বিদ্বান লোকাভাবে তাহার কোন উন্নতি হইতে পাইতেছে না—অন্য প্রদেশবাসীরাও গ্রাস করিয়া প্রভূত ধনোপার্জ্জনও করিতেছে।

ইচ্ছানুযায়ী কর্ম্ম করিতে দেওয়া হয় বলিয়া—এই মৌখিক সমান সুযোগবাদের জন্য কত কোটি কোটি লোকের জীবন কিরূপ সন্তোষ, স্বচ্ছন্দতা ও শান্তিহীন করা হইতেছে

তাহা আমরা দেখি না। কৈশোর ও যৌবনে সকলেরই অনেক উচ্চ আশা থাকে—সকলেই নিজেকে যথেষ্ট বুদ্ধিমান মনে করে—তৎকালে ধন, মান, রূপ ইত্যাদি ভোগ্যবস্তুর মোহ প্রবল থাকে—সাংসারিক অভিজ্ঞতা অল্প থাকে—নিজের নিজের শক্তির সীমা ও আবেষ্টনের প্রভাব সম্বন্ধে জ্ঞান অল্পই থাকে—তজ্জন্য অধিকাংশ তরুণ যে সকল কার্য্যে তৎকালে অধিক ধন ও মান্য লোকেরা পায় দেখে, তাহাই করিতে যায়। সে কর্ম্ম করিতে যে মানসিক বা শারীরিক শক্তির আবশ্যক, তাহা পূর্ব্ব হইতে জানা প্রায় অসম্ভব। তজ্জন্য অধিকাংশ তরুণদিগের উচ্চ আশা অনুসরণ মরীচিকা অনুসরণের ন্যায়ই হয়—সেই আশা অনুসরণ করিতে গিয়া সহজলভ্য, অর্থোপায়, সন্তোষ ও শান্তি উপেক্ষা করে—অধিকাংশকেই পরে বিফলতার দুঃখ, কষ্ট ভোগ করিতে হয়—কতক পরিমাণ সাফল্য ও জীবনে সন্তোষ ও শান্তি থাকে না—অনেকেরই জীবন বিষাক্ত হয়। বহু কোটির ভিতর এক জন র‍্যামজে ম্যাকডোনাল্ড হইয়াছে—কত লক্ষ লোক ঐরূপ হইবার আশা হৃদয়ে পোষণ করিয়া প্রাণপণ চেষ্টা করে, কত রাত্রি জাগিয়া বক্তৃতা মুখস্থ করে—হৃদয়ের কোমল বৃত্তি কিরূপ বলি দিতে হয়—তজ্জন্য কত লোকের হৃদয়ে শেল বিদ্ধ করা হয়, পরে বিফলতার দুঃখ হৃদয়ের অন্তস্তলে গোপন করিয়া জীবনই অশান্তিগ্রস্ত করে, তাহা কে দেখে? দুই দশ জন ঐরূপ সাফল্যলাভ করার ফলে লক্ষ লক্ষ লোকের জীবন অশান্তিগ্রস্ত ও সন্তোষহীন করা হয়, তাহা আমরা দেখি না, তাহা ত সমাজের পক্ষে বাঞ্ছনীয় নয়। তাহার উপর যখন দেখা যায় যে, র‍্যামজে ম্যাকডোনাল্ডও এমন কোন কার্য্য করেন নাই—যাহা অন্য লোকে করিতে পারিত না; সুতরাং তাঁহার উচ্চপদ লাভে দেশের কোন উপকারই হইল না। আর দেখা যায় যে, ঐরূপ উচ্চপদ পাইবার নিমিত্ত বা তাহাতে প্রতিষ্ঠিত থাকিবার জন্য তাঁহার আজীবনের মত পরিবর্ত্তন করিতে হইল—তাহাতে কি তিনি সুখী হইতে পারিয়াছেন? যে অবস্থায় যাহার জন্ম, তদপেক্ষা বহু ধনী বা বহু উচ্চপদ পাইতে হইলে এইরূপ মতপরিবর্ত্তনও অধিকাংশ স্থলেই করিতে লোকে বাধ্য হয় ও অনেক অন্যায় কার্য্যও করিতে হয়।

আর দেখা যায়, যে সকল কার্য্যে অধিক ধন বা মান্য লোকে পায়, তাহাতেই অত্যধিক লোক নিযুক্ত হয়—অপর কার্য্যে লোকাভাব হয়! যে সকল কার্য্যে অত্যধিক লোক যায়—সেখানেই তৎকার্য্যে নিযুক্ত লোকদিগের জীবন কষ্টকর হয় এবং যাহারা সেই সেই কর্ম্মের উপযুক্ত, তাহারাও অর্থাভাবে বা অন্য সুবিধার অভাবে সে কর্ম্ম করিতে পায় না। সকলেই শুনিয়াছেন, বিখ্যাত লর্ড সিংহ কয়েক বৎসর ব্যারিষ্টারী করার পর মুন্সেফীর প্রার্থী হইয়াছিলেন। তাঁহার ভাগ্যবলে তাহা তৎকালে পান নাই। আরও কিছুদিন ব্যারিষ্টারী করিবার অর্থ তাঁহার ছিল ও এইরূপ কি ব্যারিষ্টারীতে, কি ওকালতীতে, কি ডাক্তারীতে, কি এঞ্জিনীয়ারীতে, কি কেরাণীগিরিতে অত্যধিক-সংখ্যক লোক হইয়াছে, তাহারা ঐ সকল কর্ম্ম করিবার জন্য কত সময়, শক্তি ও অর্থব্যয় করে—কত বিশেষ উপযুক্ত লোক ঐ অবাধ প্রতিযোগিতার ঠেলায় সেই সকল কর্ম্ম করিবার সুযোগ [illegible]

কত অধিক, কত অনুপযুক্ত লোকও খোসামুদি বা অন্য অন্যায় উপায় অবলম্বনে বড় হয়। উপযুক্ত লোকরা তাহাতে কিরূপ মর্ম্মাহত হয়, অবশেষে বিফলতার দুঃখ ও কষ্ট অনুভব করে—লোকের কাছে অকিঞ্চিৎকর বলিয়া গণ্য হয়, সামান্য সাফল্যেও জীবনের শান্তি ও সন্তোষ নষ্ট হয়, তাহা আমরা দেখি না। লোকের ইচ্ছানুযায়ী কর্ম্ম করিতে দিলে,—সকল কর্ম্মে অবাধ প্রতিযোগিতা থাকায় ইহা অবশ্যম্ভাবী ফল,—আমরা তাহা বুঝি না, কেবল দুই দশ জনের আর্থিক সাফল্য দেখিয়াই মুগ্ধ হই।

বাঙ্গালা দেশ হইতে ইংরেজ রাজত্বের উদ্ভব হইয়াছে ও ক্রমে সর্ব্বত্র বিস্তৃত হইয়াছে। বাঙ্গালীরাই প্রথমে ইংরেজি শিখিয়া তাহাদিগের চাকরীতে ঢুকিয়াছে, তাহাদিগের সহিত অন্যান্য প্রদেশে গিয়া ইংরেজের চাকরী করিয়া তাঁহাদিগের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। আমরা যদি ইংরেজি না শিখিতাম ও চাকরী না করিতাম, ইংরেজ রাজত্ব হওয়াই অসম্ভব হইত, কখনই সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে পারিত না। যাহারা ইংরেজি শিখিয়া চাকরী করিত, তাহাতে তাহারা বাঙ্গালায় ও অন্যান্য প্রদেশে ন্যায্য ও অন্যায্য উপায়ে প্রভূত অর্থোপার্জ্জন করিত, মান্যও পাইত। কায়স্থদিগের স্বজাতীয়বৃত্তি ঐ রাজসরকারের চাকরী করা। যে সকল ক্ষত্রিয় পূর্ব্বে রাজ্য পরিচালন জন্য অ-সামরিক কার্য্য করিত, তাহারাই কালক্রমে কায়স্থ বলিয়া পরিচিত হইয়াছে এবং তাহারাই প্রথমে অধিকাংশ চাকরী করিত। অনেক ব্রহ্মোত্তর জমি বাজেয়াপ্ত হওয়ায় ব্রাহ্মণদিগের অতিশয় দুর্দ্দশা হয়, তজ্জন্য তাহারাও বাধ্য হইয়া ইংরেজদিগের চাকরীতে ঢুকিতে লাগিল ও তদ্দ্বারা অর্থোপার্জ্জন ও মান্য পাইতে লাগিল—যদিও এরূপে অর্থোপার্জ্জন হেয় বলিয়া গণ্য ছিল। তৎকালে রোগাধিক্য না থাকায় বৈদ্যদিগের অবস্থা অতিশয় মন্দ ছিল, তাহারাও ইংরেজি শিখিয়া চাকরীতে ঢুকিতে লাগিল। ও দিকে আমরা পরাধীন বলিয়া ও যন্ত্র-সাহায্যে নির্ম্মিত শিল্পের সহিত অবাধপ্রতিযোগিতায় আমাদিগের স্বজাতীয় শিল্প ধ্বংস হইতে লাগিল। ঐ সকল শিল্পে নিযুক্ত লোকদিগের দুর্দ্দশা হইতে লাগিল। উচ্চ জাতিদিগের অবস্থা ইংরেজি শিক্ষার নিমিত্ত চাকরী আদি পাওয়ায় কতক উন্নত দেখিয়া বৈশ্য-শূদ্ররাও ইংরেজি শিখিতে লাগিল, চাকরী আদি বৃত্তি অবলম্বন করিতে লাগিল। তৎসঙ্গে ইংরেজি শিক্ষিত সকলেই অল্পাধিক পরিমাণে পাশ্চাত্য প্রভাবগ্রস্ত হইতে লাগিল, তাহাদিগের মত ভোগবিলাসপ্রবণও হইতে লাগিল, ব্যক্তিতান্ত্রিকতার প্রভাবও বাড়িল—যৌথ-পরিবার প্রথাও ভাঙ্গিল—জাতিগত সমাজ-শাসন, সামাজিক বিধি-নিষেধের প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করিয়া স্বাধীন মনোবৃত্তির পরিচয় দিয়া স্ফীতবক্ষঃও হইল দেশের দুর্দ্দশাবৃদ্ধির সহায়তাও করিল। যাহাদিগের জাতীয় ব্যবসা ঐরূপে নষ্ট হইল, যাহারা ভদ্রোচিত গোলামীগিরি করিয়া মান্যগণ্য হইল, তাহারা তখন বলিতে আরম্ভ করিল, কতকটা পাশ্চাত্যদিগের কথার প্রতিধ্বনিতে, যে জাতিভেদ প্রথায় নিম্নজাতিদিগকে উচ্চ কর্ম্ম করিতে না দেওয়ার নিমিত্ত—তাহাদিগকে লেখা-পড়া না শিখিতে দেওয়ার নিমিত্তই উহাদিগের দুর্দ্দশা হইয়াছে, উহা ব্রাহ্মণদিগের অত্যাচার। কেহ তৎকালে দেখিল না যে, আমাদিগের দেশের তাহাদিগের দুর্দ্দশার মূল কারণই অবাধপ্রতিযোগিতায় আমাদিগের শিল্প ধ্বংস হওয়া ও তৎসঙ্গে যৌথপরিবার ভাঙ্গা ও পাশ্চাত্য অনুকরণে [illegible] ঐ সকল শিল্পের উপাদান পাশ্চাত্য শিল্প-প্রসূত [illegible]

বলিয়া তাহা আমাদিগের ধন দোহন করিতেছে ও দুর্দ্দশা হইতেছে। শিক্ষিত সম্প্রদায় সাম্যবাদের মোহে জাতিভেদ প্রথার বিরোধী হইয়াছেন। ইহার উদ্দেশ্য কি—ইহার সুফল কত অধিক, ইহা বিশেষতঃ এ দেশে কত একান্ত আবশ্যক, কেহ দেখিল না—বুঝিবার চেষ্টাও করিল না। অন্য কোন দেশে এ প্রথা নাই, সুতরাং ইহা অন্যায় ও নিম্নজাতিদিগের প্রতি অত্যাচার, ইহা স্বতঃসিদ্ধ সত্যের মত স্বীকৃত হইতেছে এবং শুধু তাহাই নহে, এ দেশেই জাতিভেদ-প্রথা আছে, এ দেশ প্রায় সহস্র বৎসর পরাধীন, সুতরাং ইহাই আমাদিগের পরাধীনতার কারণ, সুতরাং অনেকে ইহাই ভাঙ্গিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন।

অল্পলোকই দেখিতেছেন যে, জাতিভেদপ্রথা যদি আমাদিগের জাতীয় পরাধীনতার কারণ হয়, তাহা হইলে এই প্রথা থাকা সত্ত্বেও আমরা বহু সহস্র বৎসর ধরিয়া কখনই সভ্যতার শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া থাকিতে পারিতাম না। জাতিভেদ-প্রথার সর্ব্বোচ্চ জাতি ব্রাহ্মণদিগের জীবিকার নির্দ্দিষ্ট বৃত্তি পরের দান ও ভিক্ষামাত্র। পূর্ব্বে দেখান হইয়াছে যে, এখনও রাজ-সরকারের চাকরীতে সবে শতকরা ২½টিরও (অল্পলোক সৈনিক ও পুলিস ও তাহাদিগের প্রতিপাল্য লইয়া, প্রতিপালিত হয়—পুরাকালে ঐ বৃত্তিতে তাহার দশম বা চতুর্থ অংশ মাত্র প্রতিপালিত হইতে পারিত। আরও ধনোপার্জ্জনের সকল শ্রেষ্ঠ উপায়গুলি—ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প ও কৃষি নিম্নজাতিদিগের জন্য নির্দ্দিষ্ট—সুতরাং এই প্রথা নিম্নজাতিদিগের প্রতি ব্রাহ্মণদিগের বা উচ্চ জাতিদিগের নিম্নজাতিদিগের প্রতি অত্যাচার, এ কথা উঠিতেই পারে না,—পাশ্চাত্যের সখের গোলামরাই কেবল এ কথা বলিতে পারেন। সভ্যতার বহু ভিন্নস্তরের বহুজাতি সমাবিষ্ট ভারতে জাতিভেদ-প্রথা ও জাতিগত বৃত্তিনির্দ্দেশই নানা নিম্নজাতিদিগকে স্বচ্ছন্দে বাঁচাইয়া রাখিবার সর্ব্বত্র সমদর্শী সেকালের শ্রেষ্ঠ মনীষী-গণের দ্বারায় উদ্ভাবিত শ্রেষ্ঠ উপায়, এবং শুধু তাহাই নহে, যাহাতে কোনকালে অধিক দরিদ্র ও বেকার না হয়, তাহারও পূর্ব্ব হইতে স্থায়ী বন্দোবস্ত (Economic planning) ইহার ও যৌথ পরিবারপ্রথার দ্বারা করা হইয়াছিল। এইরূপ সামাজিক গঠনের আশ্রয়ে বহু সহস্র বৎসর ধরিয়া পরাধীনতা ও অরাজকতা সত্ত্বেও আমরা স্বচ্ছন্দে বাঁচিয়াছিলাম। কোন কালে বেকার, দারিদ্র্য ও নারী-সমস্যা পাশ্চাত্য দেশের ন্যায় ভীষণ হয় নাই—ভারতীয় সভ্যতার অতুলনীয় সঞ্জীবনী শক্তি এই সমাজগঠনেই নিহিত আছে—ইহা উপনিষদ ও গীতারই মত, ভারতের প্রাচীন মনীষিগণের অতুলকীর্ত্তি ও ঐ দর্শনশাস্ত্রে উক্ত মতবাদেরই অভিব্যক্তি। আমরা তাহাদিগের কৃতঘ্ন দুঃসন্তান বলিয়া পাশ্চাত্যের মৌখিক সাম্যবাদে বিভ্রান্ত হইয়া তাহার নিন্দা করি ও তাহা ভাঙ্গিতেছি।

প্রায় সকল পাশ্চাত্যদেশেই এক ধাঁচের (homogenous) লোকের বাস। সেখানেও ধনোপার্জ্জন ও ধনরক্ষণে অকুশল ব্যক্তিদিগের কত দুর্দ্দশা হইয়াছে—বেকার-সমস্যা-পূরণ কত অধিক ব্যয়-সাপেক্ষ হইয়াছে—অধিকাংশ লোকই ধনীদিগের দাসত্বে নীত হইয়াছে—নারী-সমস্যা-পূরণ প্রায় অসাধ্য হইয়াছে। ধনী ও শ্রমিক, বিরোধ ও বিদ্বেষ কিরূপ বাড়িতেছে, তাহা সকলকে দেখিতে বলি। সুতরাং সভ্যতার বহু বিভিন্ন স্তরের বহু জাতি সমাবিষ্ট ভারতে, জাতিগত নির্দ্দিষ্ট বৃত্তি না থাকিলে, সকল লোককে তাহাদিগের ইচ্ছামত সকল কর্ম্ম করিতে দিলে এই সকল নিম্নজাতি-দিগের, অল্পবুদ্ধি লোকদিগের—গরীবদিগের অতি ভীষণ দুর্গতি অবশ্যম্ভাবী, তাহা আমাদিগের সাম্যবাদমোহগ্রস্ত সংস্কারকরা দেখেন না। এই জন্যই পাশ্চাত্যে যেখানে কেবল ধনের প্রভেদ সমাজের শ্রেণীনির্দ্দেশক, সেখানে বণিক ও শ্রমিকবিদ্বেষ ক্রমাগতই বাড়িতেছে। সাম্যবাদভিত্তিতে এ দেশে সমাজগঠন হইলে শুধু যে দারিদ্র্য-সমস্যা ও নারী-সমস্যা পূরণ এ গরীব পরাধীন দেশে অসাধ্য হইবে, তাহা নহে, নানা বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ভিতর ভীষণ অন্তর্দ্রোহ ভারতের অভীপ্সিত একতা সুদূর-পরাহত করিবে, তেমনি নিম্নশ্রেণীর জাতিদিগের ও সকল দরিদ্রের এ দেশে এখন শতকরা ৯৯ জন দরিদ্র দুর্গতির একশেষ হইবে, অন্নাভাবে মরিবে—সংক্রামক ব্যাধির ভীষণ বৃদ্ধি হইবে।

রাজসরকারের চাকরী আদি এখন দুষ্প্রাপ্য হওয়ায় ও তাহাতে অল্প লোক অধিক উপার্জ্জন করিতে পায় দেখিয়া এখন এই সকল উচ্চ জাতি তথাকথিত 'অত্যাচারিত' নিম্ন-জাতিদিগের একচেটিয়া বৃত্তি অবলম্বন করিতেছেন, তাহাতে অধিক অর্থোপার্জ্জনও করিতেছেন। আমরা ইংরেজি শিখিয়া পাশ্চাত্য ভাবগ্রস্ত হওয়ার ফলে অধিক ভোগপ্রবণ, শারীরিক কষ্ট অসহিষ্ণু ও শ্রমবিমুখ হইয়াছি বলিয়া, ব্যবসায়ী ও শিল্পিজাতি-দিগের যাহারা বুদ্ধিমান্, বিদ্বান্ ও ধনবান্, তাহারা চাকরী আদি কার্য্য করিতে যাওয়ায়, ঐ সকল কার্য্যে বুদ্ধিমান্ লোকাভাবে কোন উন্নতি হইতে পাইতেছে না ও যাহা আছে, তাহাও অন্য প্রদেশবাসীদিগের, হস্তে চলিয়া যাইতেছে; সুতরাং বুদ্ধি ও পাণ্ডিত্যাভিমানী অধিকতর পাশ্চাত্যভাবগ্রস্ত বাঙ্গালীরা বেকারসংখ্যা বাড়াইতেছেন, অনেকেই ইতিমধ্যেই সভ্যসমাজোচিত গর্ভনিরোধপ্রথা, ভ্রূণহত্যা, জারজসন্তান ত্যাগ, আত্মহত্যাও করিতেছেন। দেশের ব্যবসা শিল্প (কৃষিও) ঐরূপে কতক উচ্চজাতিদিগের, অধিকাংশই অন্য প্রদেশবাসীদিগের, হস্তে চলিয়া যাইবে—তখন নিম্নজাতিভুক্ত প্রায় সকলেই পাশ্চাত্য দেশের ন্যায় কায়শ্রমিক দাস মাত্র হইবে। যখন দাসত্ব জোটাও ভার হইবে, তখনই অধিকাংশের ভীষণ দুর্দ্দশা হইবে—বেকার-সমস্যা পূরণ করা আমাদিগের অসাধ্য হইবে—অন্নাভাবে মরিবে—দেশ নানা ব্যাধিতে প্লাবিত হইবে—ইতিমধ্যেই অনেক নূতন ব্যাধি এ দেশে বদ্ধমূল হইয়াছে। অল্পসংখ্যক শিক্ষিত সম্প্রদায়ের বেকার-সমস্যা এখনই এত গুরু হইয়াছে যে, তাহাই পূরণ করা দুঃসাধ্য হইয়াছে—শিক্ষার আমূল পরিবর্ত্তন করা বিধেয় অনেকেই বলিতেছেন—এখনও কোন সুনিশ্চিত পন্থা কেহই দেখাইতে পারেন নাই। তাহার উপর অল্পদিনেই নিম্নজাতিদিগের নির্দ্দিষ্ট বৃত্তির লাভ ধনী ও বণিক ও উচ্চজাতিরা যখন গ্রাস করিবে—অবাধ প্রতিযোগিতায় করিবেই—তখন যে বেকার-সমস্যা পূরণ, দরিদ্রদিগকে বাঁচাইয়া রাখাই যে অসম্ভব, তাহা অল্পলোকেই দেখিতেছেন।

সকল কর্ম্মে সকলের সমান সুযোগ থাকার ফলে সাম্যবাদ মোহ-গ্রস্ততায় বহু ধনী পাশ্চাত্য দেশসমূহের বেকার-সমস্যা কিরূপ হইয়াছে, তাহা সকলকে দেখিতে বলি। পৃথিবীর সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ধনী দেশ আমেরিকার যুক্তপ্রদেশে ১১ কোটি লোকের ভিতর

এখন প্রায় ৯০ লক্ষ লোক বেকার। তাহাদিগের সাহায্য দানে কত অযুত কোটি টাকা ব্যয় হইতেছে। ইংলণ্ড যাহা ধনাধিক্যে পৃথিবীতে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে ও যাহার রাজত্ব পৃথিবীব্যাপ্ত —যাহাতে সূর্য্য কখনও অস্ত যায় না, সেখানেও কিছুদিন পূর্ব্বে তাহার ৪ কোটি ৫০ লক্ষ লোকের ভিতর ৩৫ লক্ষ লোক বেকার ছিল। অটোয়া পেক্ট ও অন্য নানা উপায় অবলম্বন করিয়া এখনও প্রায় ২২ লক্ষ লোক বেকার—তাহাদিগের সাহায্য দানে প্রায় ২৬ হইতে ৩০ কোটি টাকা ব্যয় করিতেছেন। সুতরাং বাঙ্গালাতে যাহাতে ৪ কোটি ৬০ লক্ষ লোকের বাস—যেখানে পাশ্চাত্যের তুলনায় শিল্প, বাণিজ্য নাই বলিলেই হয়, সেখানে অন্ততঃ ২০ লক্ষ লোককেও সাহায্য দান আবশ্যক। জেলের প্রত্যেক কয়েদীদিগের জন্য মাসিক ৭ টাকা ব্যয় হয়—এই বেকার-দিগের শুধু গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য মাসিক ৩ টাকাও ব্যয় করিলে বাৎসরিক ৭ কোটি ২০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়—তাহার উপর তাহাদিগের বসবাস, চিকিৎসা, শিক্ষার জন্যও ব্যয় আবশ্যক, এই টাকা কোথা হইতে আসিবে? বাঙ্গালার মোট রাজস্ব ১১ কোটি টাকা মাত্র (পাটের টেক্সের কতক অংশ বাঙ্গালা পাওয়ায় ঠিক এখন কত হইয়াছে, জানি না)। বাঙ্গালার দশশালার বন্দোবস্ত তুলিয়া দিলে মাত্র এক কোটি টাকা রাজস্ব বৃদ্ধি হইতে পারে—ইহা রাজস্বসচিব সার প্রভাসচন্দ্র মিত্রের সাইমন কমিশনের সম্মুখে সাক্ষ্যদানে প্রকাশ আছে—জমিদারদিগের উপর ঘোর অত্যাচারও আছে এবং এই টাকা রাজসরকারের হস্তে চলিয়া যাইবে—তজ্জন্য অর্থাভাবে দেশের কোন শিল্পোন্নতি হওয়াও অসম্ভব হইবে। ভারতের বর্ত্তমান রাজস্বসচিব গ্রিগ্ সাহেব কিছুদিন পূর্ব্বে রাজনৈতিক সভায় স্বীকার করিয়াছেন যে, ভারতের টেক্সভার অত্যধিক। বাঙ্গালায় ত শতকরা একটি বা সওয়া একটিমাত্র লোকের মাসিক আয় এক শত টাকা আছে; সুতরাং নূতন টেক্স স্থাপন করিয়া অধিক অর্থাগমের সম্ভাবনা নাই; সুতরাং এই সকল লোক অন্নাভাবে মরিবে—নানা ব্যাধির বৃদ্ধিও হইবে—চুরি-ডাকাতিও বাড়িবে, কতক টেক্স বৃদ্ধিও অনিবার্য্য। একে ত যে টেক্স আছে, তাহাতেই লোকের প্রাণান্ত ও তাহার উপর নূতন টেক্সের ঠেলায় অস্থির হইতে হইবে।

অগাধ ধনী পাশ্চাত্য দেশসমূহ তাহাদিগের এত শিল্প-বাণিজ্য থাকা সত্ত্বেও সেখানে এত টাকা ব্যয় করিয়াও ত এত লোকের বেকার থাকা বন্ধ করিতে পারিতেছেন না। আমেরিকার যুক্তপ্রদেশে এত প্রচুর আহার্য্য ও অনেক আবশ্যক দ্রব্যাদি হয় যে, অনেক সময়ে তাহা পোড়াইয়া দেওয়াও হয়, তাহা না হইলে ঐ সকল দ্রব্যের দর এত কম হয় যে, তাহাতে লোকসান হয়—অথচ এত বেকার হইয়াছে যে, সাহায্য দান ব্যতিরেকে তাহারা অন্নাভাবে মরে। তাহা হইতে প্রমাণ হয় যে, প্রথম দ্রব্য উৎপাদনকার্য্যে অবাধপ্রতিযোগিতা থাকায় কতক কার্য্যে অধিক লোক গিয়াছে ও দ্রব্য প্রস্তুত করণের আবশ্যক ভূমি ও জিনিষ সকল অল্পসংখ্যক লোক গ্রাস করিয়া বসিয়াছে—ঠিক যেমন কাঙ্গালী বিদায়কালীন প্রভূত আহার্য্য সংগ্রহ করিয়া তাহা বাটওয়ারা না করিয়া কাঙ্গালীগণকে যদি তাহা লইতে ছাড়িয়া দেওয়া হয়,—যাহারা শক্তিশালী, তাহারা অধিকাংশ দ্রব্য লয়, কাড়াকাড়ির মুখে অনেকে চাপা পড়ে, অনেকে কিছুই পায় না, প্রকৃত ধনী পাশ্চাত্যে তাহাই হইতেছে। প্রজেদের ভিতর যে যেখানে শারীরিক শক্তিশালী যাহারা, তাহারাই অধিক আহার্য্যাদি কাড়িয়া লয়, এ ক্ষেত্রে যাহারা ধনোপার্জ্জন ও ধনরক্ষণ-কুশল, তাহা ন্যায্য উপায়ে হউক বা অন্যায্য উপায়েই হউক, তাহারাই দেশের ধন অধিকার করিয়া বসে। এই ধনোপার্জ্জন ও ধনরক্ষণ কুশলতা কোন উচ্চ অঙ্গের গুণের উপর নির্ভর করে না। অনেক অল্পবুদ্ধি ও নীচাশয় ব্যক্তিরও সেই গুণ থাকে। অনেক শ্রেষ্ঠ বিদ্বান্, বুদ্ধিমান লোকও ধনোপার্জ্জন করিতে পারে না দেখা যায়; সুতরাং এইরূপ লোকের ধনাধিক্য সমাজের পক্ষে বিশেষ অমঙ্গলজনক। ভারতে জাতিভেদ প্রথা ও জাতিগত বৃত্তি নির্দ্দেশে এই সকল দোষ নিবারিত হইতেছিল, ইহাই আমাদিগের Economic planning. পাশ্চাত্যরা বহু অর্থ ব্যয় করিয়া, যাহা করিবার আমাদিগের শক্তি নাই, কেবল দুঃস্থ বেকারদিগকে গ্রাসাচ্ছাদন দিতেছেন, কিন্তু ঐ ভুল সাম্যবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত সকল কর্ম্মে সকলের সমান সুযোগ ও অবাধপ্রতিযোগিতা থাকার নিমিত্ত পাশ্চাত্যের প্রভূত ধন ও আহার্য্যাদি থাকা সত্ত্বেও অত্যধিক বেকার ও দুঃস্থ জন্মাইতেছে, পূর্ব্ব হইতে বন্দোবস্ত ব্যতিরেকে চিরকালই জন্মাইবে। রুসিয়া ব্যতীত কোথাও কোন সুচিন্তিত বন্দোবস্তই নাই। শিল্প-শিক্ষাদি দিয়া তাহা করিবার চেষ্টা করা হইতেছে, রুজভেল্ট ও হিটলার অনেক নূতন নূতন উপায় অবলম্বন করিতেছেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হইবার কোন চিহ্নও দেখা যাইতেছে না—যদিও তাঁহাদের জয়ডঙ্কা বাজাইবার লোকের অভাব নাই। রুসিয়ায় লোকদিগকে রাষ্ট্রশক্তি-পরিচালকদিগের হুকুম অনুযায়ী কার্য্য করিতে হয় অর্থাৎ অবাধপ্রতিযোগিতা বন্ধ ও ইচ্ছানুযায়ী কর্ম্ম করিবার স্বাধীনতা লোপ করা হইয়াছে। এখন রাষ্ট্রপরিচালক-দিগের তাৎকালিক ইচ্ছা অনুযায়ী কার্য্য হইতেছে—তাঁহাদিগের ভুলের, পক্ষপাতিত্বের ও অন্যায়ের দুঃখকষ্ট সকলকে ভোগ করিতে হইতেছে, ব্যক্তিগত স্বাধীনতার লোপ হইয়াছে, রাষ্ট্রপরিচালক ও তাহাদিগের মত পরিবর্ত্তনের সহিত লোকের জীবিকা ও জীবনের কার্য্যেরও পরিবর্ত্তন হইতেছে। এরূপ অবস্থায় বেকার লোকদিগের উপযোগিতা ও ব্যক্তিগত সামর্থ্যের ও অন্তরস্থ ইচ্ছার অনুযায়ী কার্য্যে নিযুক্ত হওয়া অসম্ভব, সুতরাং লোক-দিগের স্বচ্ছন্দতাও অসম্ভব, এ পর্য্যন্ত কোন স্থায়ী বন্দোবস্তও হয় নাই। তাহার উপর আমাদিগের মনে রাখিতে হইবে যে, আমরা স্বাধীন নই—ইংরেজরা পুরাকালের হিন্দু রাজাদিগের মত তাঁহাদিগের পালনপুত্র ইংরেজিশিক্ষিত সম্প্রদায়ের হস্তে রাজ্য-শাসনভার দিয়া চলিয়া যাইবার কোন বন্দোবস্ত ত করেন নাই—সুতরাং অন্য পাশ্চাত্য দেশে যাহা হইতেছে, তাহা করিবার আশা বা চেষ্টা করাই বৃথা সময় ও শক্তিক্ষয় মাত্র।

আজকাল মহাত্মা গান্ধী সমাজের নিম্নতম শ্রেণীর উন্নতিবিধানে বিশেষ চেষ্টিত হইয়াছেন,—হিন্দু সমাজ তাহাদিগের প্রতি ঘোর অত্যাচার করিয়া আসিয়াছে, তাহা প্রচারিত হইয়াছে। তাহা-দিগকে প্রাথমিক শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা হইতেছে, তাহাদিগকে একই বিদ্যালয়ে অন্য জাতিদিগের সহিত শিক্ষাদান দেওয়া বাঞ্ছনীয় অনেকে বলেন—সকল মন্দিরে প্রবেশাধিকার দিতে চাহেন। কিন্তু আমাদিগকে মনে রাখিতে হইবে যে, তাহারা সচরাচর অতিশয় অপরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন থাকার শক্তি ও সুবিধাও নাই—ইচ্ছাও নাই

এবং তাহাদিগের বুদ্ধি অতীব অল্প। সুতরাং অন্য জাতীয় বালক-বালিকারা তাহাদিগের অপরিচ্ছন্নতা ও অল্পবুদ্ধির জন্য তাহাদিগের প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করিবে—অন্য জাতিভুক্তদিগের দেখাদেখি সাধ্যাতিরিক্ত বস্ত্রাদি পরিবার ও অন্য ভোগ ইচ্ছা উদ্দীপিত করা হইবে, জাতীয় ব্যবসা করিতে লজ্জা বোধ করিবে—অথচ যে বিদ্যা তাহারা অর্জ্জন করিবে, তাহাতে অন্য উপায়ে অধিক অর্থোপার্জ্জনের কোন সুবিধাই হয় না—হইবেও না। ইহাতে তাহাদিগের দুর্গতি বৃদ্ধি করা হইবে, জীবনের শান্তি ও সন্তোষ নষ্ট করা হইবে—অন্য জাতীয় বালকদিগের অবজ্ঞা পাওয়ায় উচ্চশ্রেণী-মাত্রেরই প্রতি বিদ্বেষ ও বিরোধ উদ্দীপিত করা হইবে মাত্র। এখনই জাতিভেদ-প্রথা নিম্ন জাতিদিগের প্রতি অত্যাচার এই কথা শিক্ষিত নব্যতন্ত্রী সম্প্রদায় প্রকাশ করায়, উচ্চ জাতিদিগের, বিশেষতঃ ব্রাহ্মণদিগের প্রতি বিদ্বেষ প্রধূমিত হইতেছে—নিম্ন জাতিদিগের স্বার্থ ও উচ্চ জাতিদিগের স্বার্থ বিভিন্ন, ইহা আমরা নিজেরাই শক্তি ও অর্থক্ষয় করিয়া প্রকাশ করিতেছি—এইরূপ করিয়াই হিন্দু সমাজের সর্ব্বত্র অন্তর্দ্রোহ সৃষ্টি করিয়া সর্ব্বনাশসাধন করিতেছি। পাশ্চাত্যের অনেক দেশে তাহাকেই প্রাথমিক শিক্ষা দিয়া অনেক উন্নতি করিয়াছে বলিয়া প্রকাশ আছে—আমরা সকল বিষয়েই পাশ্চাত্যের অনুকরণপ্রয়াসী, সেই জন্য ঐরূপ প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্ত্তনের প্রয়াসী। কিন্তু প্রাথমিক শিক্ষা দিবার অর্থ নাই, পুনরায় উচ্চ হারে টেক্স দিতে হইবে। অথচ ম্যালেরিয়াদি অনেক দেশধ্বংস-কারী ব্যাধিনিবারণের জন্য অর্থ ব্যয় করিবারও অর্থ নাই—মরা নদী কাটিয়া চতুর্দ্দিকের জমির উর্ব্বরতা বৃদ্ধি ও লোকের স্বাস্থ্যোন্নতি করিবার অর্থও নাই। সকল পাশ্চাত্যদেশে প্রায় একই ধাঁচের লোক আছে, তাহারা সভ্যতার একই স্তরের। সেখানে প্রাথমিক শিক্ষা পাইয়া মাতৃভাষার সকল জ্ঞাতব্য বিষয়ের পুস্তকাদি পড়িতে পারে—পাঠাগারের সুবিধা আছে। সুতরাং তাহাতে লোকদিগের উন্নতি করিবার কিছু সুবিধা পায়। শুধু প্রাথমিক শিক্ষাতে কোন আর্থিক বা মানসিক উন্নতির সুবিধা হয় না। আমাদিগের দেশে এই নিম্নজাতিভুক্তরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে সভ্যতার নিম্নস্তরের, তাহাদিগের বুদ্ধি অতি অল্প—তাহাদিগের মাতৃভাষায় যে শিক্ষায় জাগতিক উন্নতি হইতে পারে, তাহার কোন পুস্তক নাই—বাঙ্গালা হিন্দী ভাষাতেও নাই বলিলেই হয়—সাধারণ পুস্তকাগারও নাই; সুতরাং এইরূপ বহুব্যয়সাপেক্ষ শিক্ষা প্রবর্ত্তন আপাততঃ স্থগিত রাখাই কর্ত্তব্য। তৎপরিবর্ত্তে তাহাদিগের জাতীয় ব্যবসার কিরূপ উন্নতি করা সহজে হইতে পারে, তাহা হাতে কলমে করিয়া দেখাইয়া দিলে, তাহাদিগের উৎপাদিত পণ্য বিক্রয়ের ও আবশ্যক দ্রব্য ক্রয় সমবায় প্রথা দ্বারা, সুবিধা করিয়া দিলে, তাহাদিগের যথেষ্ট উন্নতি অতি সহজে ও বিনা অধিক অর্থব্যয়ে হইতে পারে। এরূপ করা দেশের অবস্থা ও পূর্ব্বপ্রচলিত প্রথা অনুযায়ী হয়, তাহাতে অন্তর্দ্রোহ সৃষ্টি না করিয়া পরস্পরের সহানুভূতি বৃদ্ধি করাও হয়। উদাহরণস্বরূপ বলিতেছি—ডোমদিগকে চীনা ও বর্ম্মীদিগের মত নানা প্রকারের উত্তম উত্তম বাঁশের কার্য্য যদি শিখান হয়, দুলিয়াদিগকে মৎস্য সংরক্ষণ ও মৎস্যের তৈল নিষ্কাশন করিবার ও মৎস্যাদি দ্রব্য সকল বিক্রয়ের সুবিধা করিয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে তাহাদিগের যথেষ্ট উন্নতি হইতে পারে। এই সকল সভ্যতার নিম্নস্তরের জাতিদিগের উন্নতিতে সাফল্যলাভ করা ছেলেখেলা নয়। তাহাদিগের সহিত মিশিতে হইবে, তাহাদিগের বুদ্ধি, শক্তি ও অভাব বুঝিতে হইবে, তবে কিঞ্চিৎ সাফল্যলাভ হইতে পারে। মিশনারীরা বহুকাল ধরিয়া বহু কোটি টাকা ব্যয় করিয়া তাহাদিগকে ফর্শা কাপড় পরাইতে শিখাইয়াছেন বটে, তাহাদিগের সাহায্যে চাকরীতে জনকতকের কিছু সুবিধা করিয়া দিয়াছেন বটে, কিন্তু স্বাধীনভাবে অর্থোপার্জ্জনের কোন সুবিধাই করেন নাই। মিশনারী ও ইংরেজদিগের সাহায্য ব্যতিরেকে তাহাদিগের ফিরিঙ্গিদিগের ন্যায় অত্যন্ত দুর্দ্দশা হয়, আর দেখা যায়, অধিকাংশের জীবন আপেক্ষিক অর্থ স্বচ্ছলতা সত্ত্বেও স্বচ্ছন্দতা ও আনন্দবিহীন হয়। মিশনারীরা যাহা করিতেছে, তাহার শতাংশের এক অংশও করিবার শক্তি আমাদিগের নাই। সুতরাং এইরূপ করিবার চেষ্টায় কেবল বৃথা শক্তি ও সময় ও অর্থক্ষয় করা হইবে, তাহাদিগের জীবনের স্বচ্ছন্দতা নষ্ট করা হইবে, তাহাদিগের দুর্গতি বৃদ্ধি করা হইবে—দেশে কেবল অন্তর্দ্রোহ সৃষ্টি করা হইবে। শুধু নিম্নতম শ্রেণীর জাতিদিগের জন্য এই পূর্ব্বোক্ত প্রকার শিক্ষা-প্রবর্ত্তন বিধেয় নয়, প্রত্যেক জাতির জাতীয় ব্যবসা বা বৃত্তির অনুকূল শিক্ষাই প্রধান লক্ষ্য রাখিয়া শিক্ষা অল্প বয়স হইতে দিলেই দেশের উন্নতি সহজে হইতে পারে, দেশের শ্রী ফিরিতে পারে।

ব্যবসায়ী শিল্পী জাতিভুক্ত যাঁহারা উচ্চ শিক্ষা পাইয়াছেন, তাঁহারা যদি প্রত্যেকের জাতিগত বৃত্তির উন্নতি করিতে চেষ্টা করেন—পাশ্চাত্যে ঐ সকল ব্যবসার বা শিল্পের উন্নতি-বিধায়ক যে সকল তথ্য অর্জ্জিত হইয়াছে ও কার্য্যে পরিণত হইয়াছে, তাহা স্বজাতির ভিতর প্রচার করেন, তাহা হইলে সহজেই দেশের বহু উন্নতি হইতে পারে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তাহা হইতেছে না; তাঁহারা সকলেই কায়স্থ ও ব্রাহ্মণদিগের বৃত্তি অবলম্বন করেন; স্বজাতিভুক্তদিগের সহিত বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়েন, আর বুদ্ধিমান লোকাভাবে সেই সকল বৃত্তি অধিকাংশ স্থলেই অ-বাঙ্গালীর হস্তে চলিয়া যাইতেছে ও তজ্জন্য আমাদিগের দুর্দ্দশা বাড়িতেছে।

এখন শিক্ষার আমূল পরিবর্ত্তন করা বিধেয় অনেকেই বলিতেছেন ও তাঁহারা শিল্প শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করিতে উদ্যত হইয়াছেন। যদি শিল্প শিক্ষার ব্যবস্থা পুরাতন প্রথামত হয়, প্রত্যেক জাতির জন্য তাহার জাতিগত ব্যবসা বা শিল্পের উপযোগী শিক্ষা দেওয়া হয়, তাহা হইলে তাহা অল্পব্যয়সাপেক্ষও হয় এবং আশু ফলপ্রদ হয়। ইহা করিতে হইলে প্রত্যেক জাতির জাতিগত স্থানীয় সভাগুলি সংগঠন করিয়া এক বৃহৎ সভার অন্তর্গত করিতে হইবে, ও তাহাদিগের সকলকেই তদ্বিষয়ে বিশেষ উদ্যোগী হইতে হইবে। ঐ কার্য্য করা ও জাতিস্থ লোকদিগের দারিদ্র্য নিবারণের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করা তাহাদিগের প্রধান কার্য্য হওয়াই বিধেয়।

সকল জাতিভুক্ত লোকদিগের জন্য একই প্রকার শিক্ষা প্রবর্ত্তনে অধিকাংশ স্থলেই বৃথা শক্তি, সময় ও অর্থক্ষয় হয়। ভট্টাচার্য্য ব্রাহ্মণ সন্তানকে মুচির কর্ম্ম শিখাইয়া প্রায় কোন লাভ হয় না, তাহার পক্ষে ঐ কর্ম্ম করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করা প্রায় অসাধ্য। ঐ কর্ম্মে অধিক অর্থোপার্জ্জন করিতে হইলে যে মূলধন আবশ্যক, তাহা সংগ্রহ করা প্রায় দুঃসাধ্য হয়, তাহা জুটিলেও ঐ কর্ম্মোপযুক্ত শ্রমিক জোটানও ভার হয় ও তাহাদিগকে পূরামাত্রায় আবশ্যকমত খাটাইয়া লওয়াইতেও অপারগ হয় ও ঐ কর্ম্ম চালাইবার উপযোগী

অভিজ্ঞতা অভাবে প্রায়ই লোকসান হয়। মুর্শিদাবাদ জেলার রেশমশিল্প শিক্ষালয়ে রেশমব্যবসায়ীদিগের সন্তান ব্যতীত অন্ত কাহাকেও শিক্ষা দেওয়ায় কোন ফললাভ হয় না বলিয়া গভর্ণমেণ্ট রিপোর্টেও প্রকাশ আছে শুনিয়াছি। সূতার বস্ত্রবয়ন কার্য্য ত বহু লক্ষ লোক শিখিয়াছিল—তাঁতি ভিন্ন কয় জন লোকই বা ঐ কর্ম্ম করিতেছে—কত লক্ষ লক্ষ চরকা ও তাঁত জালানী কাষ্ঠে পরিণত হইয়াছে, তাহাও সকলকে দেখিতে বলি। লেখক বহু বৎসর ধরিয়া জাতীয় শিল্পশিক্ষালয়—যাহা এখন যাদবপুরে প্রতিষ্ঠিত, তাহার কার্য্যকরী সমিতির সভ্য। সেখানে ৬৫০ হইতে ৭০০ ছাত্রের জন্ত বাৎসরিক দেড় লক্ষ টাকা ব্যয় হয়। তাহার উপর বাটীনির্ম্মাণ যন্ত্রাদি কিনিবার জন্ত বহু লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছে ও তজ্জন্ত আরও বহু লক্ষ টাকা আবশ্যক—সে টাকা জুটিতেছে না। আমাদিগের অনেক ছাত্র উপযুক্ত শিক্ষা পাইয়াও ইতিমধ্যেই বেকারসংখ্যা বাড়াইতেছে। উপরে উক্ত নানা কারণে অতি অল্পসংখ্যক ছাত্র স্বাধীনভাবে যে কার্য্য শিখিয়াছে, তাহা করিতে সমর্থ হইয়াছে। বেকারসমস্যা পূরণের জন্ত অনেকেই technical education দিবার জন্ত ব্যগ্র হইয়াছেন—পাশ্চাত্য ধরণের সেইরূপ নানা শিক্ষাগার স্থাপন করা বিধেয় বলিতেছেন। একে ত জার্ম্মাণী, আমেরিকা, ইংলণ্ডাদি দেশের মত ঐরূপ নানা শিক্ষালয় করাই আমাদিগের অসাধ্য—তাহার শতাংশের একাংশ করাও অসাধ্য, তাহার উপর তাহা করিয়াও ঐ সকল দেশে বেকার-সমস্যা, দারিদ্র্য ও নারীসমস্যা পূরণ হয় নাই—সুতরাং ঐরূপ পন্থার অনুবর্ত্তন করিয়া আমরা কখনও সাফল্যলাভ করিতে পারিব না—করিতে পারিলেও ধনিকরাই পাশ্চাত্য দেশের স্তায় বৃহৎ যন্ত্রচালিত বড় বড় কারখানা স্থাপন করিবে—বেকার-সমস্যা অধিকতর ভীষণ হইবে। এই বুঝিয়াই বোধ হয় ত্রিকালদর্শী মনু তাঁহার ধর্ম্মশাস্ত্রে মহাযন্ত্র ব্যবহার মহাপাপের অন্তর্গত করিয়াছিলেন—উহার ব্যবহারফলেই কোটি কোটি লোকের জীবন দুঃসহ হইয়াছে। পাশ্চাত্য প্রথা অনুবর্ত্তনের চেষ্টায় আমাদিগের দুর্গতির লাঘব হওয়া অসম্ভব—বৃদ্ধি হইবারই অধিক সম্ভাবনা, তাহা দেখিয়া সকলেরই বোঝা উচিত যে, আমাদিগের প্রাচীন প্রথা অনুবর্ত্তন করা ভিন্ন আমাদিগের গত্যন্তর নাই ও তাহা সহজসাধ্য ও আশু ফলপ্রদ ও বহু সহস্র বৎসর ধরিয়া পরীক্ষিত।

[ক্রমশঃ।

শ্রীচারুচন্দ্র মিত্র (এটর্ণী)

কবিতার দুর্দ্দশা

দুপুর বেলাতে ঘরের মেঝেতে মাদুরখানিরে পাতি,
লয়ে কবিতার খাতাখানি আর পারকারে করি সাথী
ভাবি মনে মনে অবসর-ক্ষণে দিব না বিফলে যেতে—
কত কল্পনা লয়ে জল্পনা উঠি উৎসাহে মেতে।
বাহিরে বাদল বাজায় মাদল সঘন বহিছে বায়,
কালো মেঘটিরে ক্ষণে ক্ষণে চিরে বিজলী বহিয়া যায়।
এমন সুদিনে কবিতা এ বিনে কিছুই লাগে না ভালো,
চারিদিকে চুপ শুধু ঝুপ ঝুপ, আঁধার আকাশ কালো।
খাতাটিরে লয়ে আধশোয়া হয়ে চাহি জানালার পানে
ভিজে ভিজে হাওয়া করে আসা-যাওয়া কথা কয় কাণে কাণে,
কত এলোমেলো কথা এলো গেলো! ভাবিলাম মনে মনে—
বরষা-রাণীকে সাজাব আজিকে কবিতা-কুসুম বনে।
সাজাই যতনে আপনার মনে কথাগুলি মালা করি
এমন সময় কেঁদে ওঠে মেয়ে ধূলার উপরে পড়ি,
খাতা ফেলে দিয়ে তারে কোলে নিয়ে ভুলাই কত না ক'রে—
কাসছে আবার খাবে না খাবার পড়বে বুঝি বা জ্বরে!
দিয়ে বেলেভোনা গান গেয়ে নানা আবল-তাবল বকে,
ঘুমটি পাড়িয়ে গায়ে চাপা দিয়ে বসি কবিতার সখে,
ঝি আসিয়ে বলে জল নেই কলে বাসন রহিল পড়ে—
সেদিকেতে যাই নীচেতে তাকাই কড়া নাড়ে কেও জোরে?
এই যে এদিকে নিয়ে গেল কাকে খুকীর ঝিনুকখানা!
বেলা পড়ে গেল, খোকা নাহি এলো, ভাবনা নানান খানা।
ঘাড়ে বোঝা লয়ে এল ধোপা-মেয়ে হিসাব মিলাতে যাই,
খাতাও না পাই কি যে করি ভাই হাতও দুটি বই নাই।
ঢের কায পড়ে করি সে কি করে কুটনো কুটিতে বাকি,
দুধ এল ওই, কড়াখানা কই? জ্বাল দিয়ে তুলে রাখি।
এবে কবিতার দেখা পাওয়া ভার লুকায় সে কোন্‌খানে
খাতাখানি হায় ধূলায় লুটায় নিদারুণ অভিমানে।
সব কায সেরে লয়ে খাতাটিরে সাঁঝের বেলায় পুন
বসি যেই এসে শশী বলে কেসে ফুরায়ে গিয়েছে নুনো!
তাহারে বিদায় ক'রে যেই হায় বসি জোড়-জোড় লয়ে,
ডাকিল তারিণী,—ঠাকুর আসেনি—উনুন যেতেছে বয়ে।
রন্ধন-গৃহে নুণ-তেল লয়ে সময় কাটিল ঢের—
সবারে খাবায়ে ঘুমটি পাড়ায়ে বসি খাতা লয়ে ফের।
শোবার ঘরেতে ইজিচেয়ারেতে কর্ত্তার ডাকে নাক,
ঘুম ভেঙ্গে গিয়ে বলেন হাসিয়ে, "কবিতা এখন থাক্।
কয়দিন ধরে নানা কায ফেরে হয়নি হিসাব দেখা
এই নিরিবিলি দুজনায় মিলি হিসাবটা যাক লেখা।"
হিসাবের চোটে মাথা তেতে ওঠে প্রাণ ছাড়ে ত্রাহি ডাক্,
বাঁচি শুতে পেলে আর সব ফেলে কবিতা চুলোয় যাক।

শ্রীমতী পুষ্প দেবী।

[উপন্যাস]

চামেলীকে দেখিলে এখন আর কেহ পূর্ব্বের সেই বিষাদ-প্রতিমা বলিয়া চিনিতে পারিবে না। তাহার সর্ব্বদা সশঙ্ক সন্দিগ্ধ দৃষ্টি যেন যাদুকরের মায়াদণ্ডস্পর্শে কোথায় অন্তর্হিত হইয়াছে। আর তাহার সদালাপে পরিতুষ্ট হইয়া অপরিচিত লোক যে তাহাকে শিক্ষিতা মার্জ্জিতরুচি গৃহস্থ-কন্যা বলিয়া স্থির করিয়া লইবে, ইহাতে কোন সংশয়ই ছিল না। শাস্ত্রকাররা এই জন্য সৎসঙ্গের অশেষ গুণব্যাখ্যা করিয়াছেন বোধ হয়।

চামেলী এখন ষ্টুডিওরই একাংশে বাস করে এবং কোথাও বাহির হইলে অসীমের নিযুক্ত রক্ষকের আশ্রয় লইয়াই বাহির হয়, অন্যথা তাহার অন্যত্র যাওয়ায় নিষেধ আছে। এ সতর্কতার বন্দোবস্ত তাহার নিজের প্রার্থনা-মতই করা হইয়াছিল। কেন না, তাহার আপনার লোকের কাছেই ছিল তাহার ভয়; তাই বাহিরের লোকের কাছেই আশ্রয় প্রার্থনা।

এখন আর হিরণীকে আদর্শ রাখিয়া চামেলীকে পোজ লইতে হয় না, সে প্রথম শিক্ষার ফলে সেই বিদ্যায় এতই পারদর্শিনী হইয়াছিল যে, পর পর দুইখানি ফিল্মে সে প্রধানা নায়িকার ভূমিকা গ্রহণ করিয়া জনসাধারণের ভূয়সী প্রশংসা অর্জ্জন করিয়াছে এবং উহাতেই সে অসীম ফিল্মস লিমিটেডের ষ্টার একট্রেস বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। আর একখানি নূতন ফিল্ম নাট্য তৈয়ার হইতেছে, এখানির গল্পলেখক, প্রযোজক ও আর্টিষ্ট স্বয়ং শুভেন্দু। সুতরাং এইখানির প্রধানা নায়িকার ভূমিকায় চামেলীকে প্রস্তুত করিয়া তুলিবার জন্য তিনি প্রাণ-মন ঢালিয়া শিক্ষা দিতেছেন। এজন্য প্রায় দিবসের অধিকাংশ সময় তাঁহাদের উভয়কে একত্র থাকিতে হয়। এ মিলামিশায় ঘনিষ্ঠতা অবশ্যম্ভাবী। এ ঘনিষ্ঠতা যে সকলের দৃষ্টি অতিক্রম করিয়াছিল, তাহা নহে। এই সবাক্ চলচ্চিত্রের অন্যান্য নায়কনায়িকাদেরও ষ্টুডিওতে রিহার্শাল দিতে হইত; তাহারা আর্টিষ্ট, সুতরাং তাহাদের আর্টিষ্টের দৃষ্টিতে হয় ত এ ঘনিষ্ঠতা নির্দ্দোষ বলিয়া পরিগণিত হইত, কিন্তু দূর হইতে যাহারা কচিৎ কখনও ইহার সংস্রবে আসিত, তাহাদের মধ্যে কাহারও কাহারও এ ঘনিষ্ঠতায় যেন কিছু অভিনবত্ব ছিল বলিয়াই অনুমিত হইত। ইহাদের মধ্যে ঊষারাণী এক জন।

অপদার্থ ভ্রাতা বিভাসচন্দ্রের জন্য ঊষাকে মাঝে মাঝে শুভেন্দুর শরণাপন্ন হইতে হইত। একবার সে যখন স্বামীর অজ্ঞাতসারে গোপনে এ বিষয়ে শুভেন্দুর সাহায্য গ্রহণ করিয়াছে এবং সেই সাহায্য গ্রহণের কথা এ যাবৎ স্বামীর নিকট গোপন রাখিয়াছে, তখন তাহার আর গত্যন্তর ছিল না। এ বিষয়ে হিরণী তাহাকে অনেক বুঝাইয়াছে। সে বলিয়াছে, স্বামি-স্ত্রীর মধ্যে গোপন কথা কিছুই থাকিতে পারে না, থাকা উচিত নয়। এক খণ্ড কালো মেঘের মত যদি সন্দেহ ও অবিশ্বাস একবার তাহাদের মধুর শান্ত পবিত্র পারিবারিক জীবনাকাশে দেখা দেয়, তবে তাহার পরিণাম কোন্ ভীষণ ঝটিকাবর্ত্তে পরিণত হইবে, তাহা কে বলিতে পারে? স্বামি-স্ত্রীর ভালবাসার সম্বন্ধের মধ্যে তৃতীয় ব্যক্তির অনধিকার-প্রবেশ কখনই দাম্পত্য জীবনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের পক্ষে মঙ্গলের বিষয় হইতে পারে না। এই ভাবের কথা শুভেন্দুও প্রথমে বলিয়াছিল।

কিন্তু হিরণীর সকল যুক্তি-তর্কই ঊষারাণীর অন্যায় ভ্রাতৃস্নেহের এবং আত্মাভিমানের প্রবল স্রোতে ভাসিয়া গিয়াছে। সেও হিরণীকে বুঝাইয়াছে, তাহার ভ্রাতার সাংসারিক

ব্যবস্থা সে নিজেই করিবে, এ জন্ম যদি তাহাকে তাহার অলঙ্কারপত্র অথবা নিজস্ব সম্পত্তি বাঁধা দিতে অথবা বিক্রয় করিতে হয়, তাহাও স্বীকার, তথাপি সে গর্ব্বিত স্বামীর নিকট হাত পাতিবে না! যে তাহার সহোদরকে পথের কুকুরের মত দূর-ছাই করিয়া গৃহ হইতে বিতাড়িত করিয়া তাহার অনাবিল দাম্পত্য-প্রণয়ের মস্তকে পদাঘাত করিতে সঙ্কুচিত হয় না, তাহার নিকটে সে ভ্রাতার জন্য প্রার্থিরূপে মস্তক অবনত করিবে? তাহার আগে যেন তাহার মরণ হয়!

এ অবুঝকে হিরণী বুঝাইবে কিরূপে? বয়সের অনুপাতে সে কত ছোট, কিন্তু তাহাকেই আজ এ সংসারের শান্তি পুনরানয়নের জন্য বর্ষীয়সী গৃহিণীর মতই ব্যবহার করিতে হইতেছে। এ কি মহা পাপ!—আজ তাহাকে ভ্রাতৃজায়ার জন্য জগতে আরাধ্য দেবতা দাদার বিরুদ্ধে অজ্ঞাতে চক্রান্তে জড়িত হইতে হইতেছে!

হিরণীর সহ্যগুণ নিতান্ত অল্প ছিল না; সে কাহারও অন্যায় কথা সহিতে পারিত না, এ কথা সত্য, কিন্তু যেখানে তাহাদের পারিবারিক সুখশান্তির সমস্যা বিজড়িত, সেখানে সুসমস্যার সমাধানে সে তাহার সারা অন্তরের শোণিত দিয়াও মুখটি বুজিয়া অসহ্য যন্ত্রণা সহ্য করিতে পারে,—এমনই ধাতুতে সে গঠিত! এক দিকে তাহার প্রাণাধিক প্রিয়তম শিক্ষাগুরু জ্যেষ্ঠভ্রাতা, অন্য দিকে তাহার প্রাণসমা ভ্রাতৃজায়া! এ কি ভীষণ পরীক্ষা!

বুঝাইলেও উষা বুঝিত না, সময়ে অসময়ে শুভেন্দুর ষ্টুডিওতে গিয়া তাহার সহিত ভ্রাতার সম্বন্ধে গোপনে পরামর্শ করিত, কখনও শুভেন্দুর নিজস্ব বসবাসের অংশে, আবার কখনও বা সাধারণ ষ্টুডিওতে; তবে অধিকাংশ সময়ে সে সুধাংশুর নিজস্ব বিশ্রামকক্ষেই হাজির দিত; আবার ষ্টুডিওতে রিহার্শাল রুমে বহু অভিনেতা-অভিনেত্রীর সমাগম হইলে অথবা পূর্ণমাত্রায় রিহার্শাল চলিলে সে ক্ষুণ্ণ-মনে স্বস্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করিত। বিভাসচন্দ্র হোটেলে গিয়া উঠিবার পর হইতে উষারাণীর এই যাওয়া আসাটা একটু বেশী রকমেই হইয়া পড়িয়াছিল। যাহার জন্য সে তাহার সোণার সংসারে স্বহস্তে আগুন জালিয়া দিবার বন্দোবস্ত করিতেছিল, সেই গুণধর ভাইটি কিন্তু তাহার বারম্বার নিষেধ ও ভর্ৎসনা সত্ত্বেও এক এক দিন গোপনে অতর্কিতে তাহার অন্দরমহলে আসিয়া উপস্থিত হইত এবং তাহার নিকট নিত্য নূতন আবদার বায়না করিতে বিন্দুমাত্র সঙ্কোচ বা লজ্জা অনুভব করিত না। হিরণী এই গোপনে দেখা-সাক্ষাতের বিপক্ষে বিদ্রোহী হইয়া ভ্রাতৃজায়াকে বেশ দুই কথা শুনাইয়া দিয়াছিল এবং উহার পুনরাবৃত্তি হইলে সে অনর্থপাত করিবে বলিয়া ভয়ও দেখাইয়াছিল। শুভেন্দুও যখন বিভাসচন্দ্রের সহিত অন্দরে উপস্থিত হইয়াছিল, তখন হিরণী শুভেন্দুকেও এজন্য কম অনুযোগ করে নাই। একটা পাপকে অথবা একটা মিথ্যাকে ঢাকিবার জন্য যেমন সাতটা পাপ বা সাতটা মিথ্যার আশ্রয় লইতে হয়, তেমনই এই গুপ্ত দেখা-সাক্ষাতের কথা আরও গুপ্ত রাখিবার জন্য তখন হইতে হিরণীকেও যথাসম্ভব এড়াইয়া দেখা-সাক্ষাৎ চলিতে লাগিল। এ সব ব্যাপার গুপ্ত রাখিতে গেলে বেতনভুক্ অধীন ভৃত্য-পরিজনের কাছে অনেক সময় হীনতা ও দৈন্য স্বীকার করিতে হয়, গুপ্ত পুরস্কারের প্রলোভনে বাধ্য করিয়া উচ্চ মাথা হেঁট করিতে হয়,—গৃহ-স্বামিনী হইয়াও উষাকে এজন্য কত নিম্নে—পুলিস্তরের উপরেই না নামিতে হইয়াছিল! কিন্তু তাহাতেও ত তাহার মোহ ঘুচিল না। অপদার্থ কাপুরুষ ভ্রাতাই হইল সব, আর কেহ কিছু নহে? সংসার, পরিবার, সমাজ, ননন্দা, স্বামী?

গোপনে দেখা-সাক্ষাতের ফল কিন্তু এক দিন বিষম হইল। বিস্তীর্ণ বাগানবাড়ীর একাংশে গৃহস্বামীর প্রাসাদোপম আবাসভবন, মধ্যে সুবিস্তীর্ণ মাঠ, ফল ও ফুলের বাগান, তাহার পর অপরাংশে ষ্টুডিওর দিকে বাগানের অংশে কৃত্রিম পাহাড়, প্রস্রবণ, খাল, প্রান্তর ও জঙ্গল—যেন প্রকৃতির ক্ষুদ্র লীলা-নিকেতন। সেখানে বাঘ লুকাইয়া থাকিলেও কাহারও ধরিবার সাধ্য নাই। এক দিন চামেলী রক্ষীর সহিত বাগানের খিড়কীর ছোট ফটক দিয়া বাহিরে যাইবার সময় সন্ধ্যার অন্ধকারে প্রাসাদের দিক হইতে বিভাসচন্দ্রকে লুকাইয়া আসিতে দেখিয়া বিস্মিত হইল। সে জানিত, বিভাসচন্দ্রের পক্ষে এ বাড়ীর দ্বার রুদ্ধ। তবে? আর এক দিন এমনই সময়ে সেই ফটকের কাছে একটা লোক বিভাসচন্দ্রকে আক্রমণ করিয়াছিল; ভাগ্যে সেই সময়ে শুভেন্দু তথায় উপস্থিত হইয়াছিল, নতুবা সে দিন একটা অঘটন নিশ্চয়ই ঘটিয়া যাইত। শুভেন্দু সে লোকটাকে দেখিয়াই চিনিয়াছিল—সে সেই মধুপুরের খুনী মহুয়া।

এ সকল কথা অসীমের কাণে উঠিতে বিলম্ব হয় নাই। ইহা লইয়া পতি-পত্নীতে এক দিন তুমুল বাদানুবাদও হইয়া গিয়াছিল। সে দিন অসীমের মুখে যে সব কটুবাক্য বাহির হইয়াছিল, কেহ তাহা কখনও শোনে নাই এবং সেজন্য হিরণী তাহাকে খুবই অনুযোগ করিয়াছিল। আর সে দিন উষারাণীর চোখে যে ক্রোধ ও অভিমান মিশ্রিত অশ্রুধারা নামিয়াছিল, তেমনটি আর কখনও নামিয়াছিল বলিয়া হিরণীর জানা ছিল না। হিরণী এবার ভ্রাতৃজায়াকে কঠিন স্বরে জানাইয়া দিল যে, এখন হইতে বিভাসচন্দ্রকে এ বাড়ীতে আর যেন প্রকাশ্যে বা গোপনে আনয়ন করা না হয়, তাহার হোটেলে থাকাই ভাল; আর আসিলে যখন সংসারে এই অশান্তি দেখা দেয় এবং গৃহিণী হইয়াও তাহাকে অপমান লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হয়, তখন তাহার নিজেরই মঙ্গল ও আত্মসম্মান রক্ষার জন্য তাহাকে এ বিষয়ে একটু দৃঢ়চিত্ত হইতে হইবে।

উষা অনেক কাঁদিল, অনেক কিছু বলিল; কিন্তু মনে বুঝিল যে, ননন্দা হিত-কথাই বলিতেছে। সে তাহাকে প্রতিশ্রুতি দিল যে, অতঃপর সে আর কখনও তাহাদের না জানাইয়া তাহার ভ্রাতাকে গৃহে প্রবেশ করিতে দিবে না! কিন্তু তরলমতি উষারাণীর প্রতিশ্রুতি দেওয়ার পরিণাম ইহাই হইল যে, সে অতঃপর ভ্রাতার সম্পর্কের সমস্ত কথা সুখে-দুঃখে সমব্যথী স্নেহময়ী ননদীর কাছেও গোপন করিতে লাগিল। তখন তাহার একমাত্র বিশ্বাসের ও নির্ভরের পাত্র হইল শুভেন্দু বাবু! বিবাহিতা নারীর পক্ষে স্বামীর বন্ধুর উপর স্বামী ও ননন্দার অজ্ঞাতে এই নির্ভর সমর্থন-যোগ্য কি না, তাহা অন্ধ ভ্রাতৃস্নেহের মোহবশে একবারও সে চিন্তা করিয়া দেখিল না। কত সংসারের সর্ব্বনাশের বীজ এই মনোবৃত্তিতে খুঁজিয়া পাওয়া যায়!

আরও এক দিকে সে এক জনকে আপনার পরম শত্রু করিয়া রাখিল। যে চামেলীকে এক দিন সে-ই সকলের চেয়ে সুনজরে দেখিয়াছিল এবং তাহার সহিত অতিরিক্ত মিলামিশার জন্য হিরণীর কাছে তীব্র অনুযোগ শুনিয়াছিল, সেই চামেলীই হইল এখন তাহার চক্ষুশূল। সে-ই তাহার ভ্রাতাকে এ বাড়ীর বিষ-নজরে ফেলিবার মূল কারণ। সে তাহার ভ্রাতার গোপন যাতায়াতের কথা তাহার স্বামীর কর্ণগোচর করিল কেন? শুভেন্দু বাবু এই গণিকা-কন্যার মধ্যে কি দেখিয়াছেন যে, তাহাকে মাথায় করিয়া রাখিয়াছেন? শুভেন্দু বাবুর আর সব ভাল, কিন্তু এ কি অন্যায়ের তিনি প্রশ্রয় দিতেছেন? তাহার স্বামী না হয় অন্ধ—চামেলী তাঁহাকে কি এক যাদুমন্ত্রে বশ করিয়া ফেলিয়াছে। কিন্তু শুভেন্দু বাবু এই প্রকৃতির মানুষ নহেন—তবে?

মানসিক অবস্থার কোন্ নিম্নস্তরে নামিলে সম্ভ্রান্তঘরের শিক্ষিতা হিন্দু কুলবধূর মনে এ সব চিন্তার উদয় হয়, তাহা বোধ হয়, সহজে অনুমান করিয়া লওয়া যায়। সুতরাং উষা-রাণীর মানসিক অবস্থা যে তখন অতি শোচনীয় এবং সে অবস্থায় যে কোন কিছু ভাল করিয়া ভাবিয়া চিন্তিয়া বিচার করিয়া লওয়া যায় না, তাহা বোধ হয় কাহাকেও বুঝাইবার প্রয়োজন নাই!

উষারাণীর যখন এইরূপ মনের অবস্থা, তখন এক দিন সে ষ্টুডিওর যে অংশে শুভেন্দুর বসবাসের স্থান নির্দ্দিষ্ট ছিল, তাহারই মধ্যস্থ বসিবার কক্ষে হঠাৎ প্রয়োজনীয় গুপ্ত পরামর্শের জন্য উপস্থিত হইয়া দ্বারপ্রান্ত হইতে যে দৃশ্য দেখিল, তাহাতে তাহার বিস্ময়ের সীমা রহিল না, সে তাড়াতাড়ি সেখান হইতে ফিরিয়া আসিতে পথ পাইল না।

অপরাহ্নের স্বর্ণালোকে কক্ষ উদ্ভাসিত, কক্ষের সমস্ত দ্বার ও বাতায়ন উন্মুক্ত, সুতরাং সে দৃশ্যের কোথাও বিন্দুমাত্র লুকাচুরি ছিল না। তথাপি উষা তথায় শুভেন্দু ও চামেলীকে সোফায় ঘনিষ্ঠভাবে পাশাপাশি বসিতে দেখিয়া যে অতিমাত্র বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইবে, ইহাতে সত্যই বিস্ময়ের বিষয় কিছুই ছিল না। শুভেন্দু সুদর্শন যুবক, চামেলী কুলটা-গর্ভজা সুন্দরী যুবতী, অগ্নি ও ঘৃতের একত্র সমাবেশে যাহা হইবার, তাহাই হইয়াছে, এই ধারণা লইয়াই উষা তথা হইতে দ্রুত প্রস্থান করিয়াছিল।

কিন্তু সে যদি তখন ঘৃণা ও বিরক্তিভরে চলিয়া না আসিয়া এই অবস্থার কারণ অবগত হইবার চেষ্টা করিত, তাহা হইলে বোধ হয়, চামেলী হইতে তাহার অনর্থপাতের বীজোদ্ভব হইত না। সত্যই শুভেন্দু তখন চামেলীকে নির্জ্জনে তাহারই নূতন ফিল্মের একটি কঠিন পোজে অভ্যস্ত করাইতেছিল। এই ফিল্মটি আদ্যোপান্ত শুভেন্দুর নিজেরই সৃষ্টি, সুতরাং সে এইটিকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর

করিবার চেষ্টা করিতেছিল। হয় ত নায়ক-নায়িকার এই মিলনের 'পোজে' চামেলীর ভাবের অভিব্যক্তিতে লালসার তীব্র নিদর্শন ফুটিয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু শুভেন্দুর মুখচক্ষুতে আর্টিষ্টের নিষ্পাপ-অনাবিল ভাবের অভিব্যক্তি ছাড়া অন্য কিছুই ছিল কি না, তাহা উষারাণীর ভাল করিয়া বুঝা উচিত ছিল। এটুকু উষার অব্যবস্থিত চঞ্চল মনের দৃষ্টি এড়াইয়া গিয়াছিল।

মনে যাহার পাপ নাই, সে বিন্দুমাত্র বিচলিত হয় না। শুভেন্দু উষাকে দেখিয়া বিচলিত হয় নাই। কিন্তু সে যখন দেখিল, উষা কক্ষে প্রবেশ না করিয়াই বিরক্তিভরে চলিয়া যাইতেছে, তখন সে বিস্মিত হইয়া একরূপ রূঢ়ভাবেই চামেলীকে এক পার্শ্বে সরাইয়া দিয়া দাড়াইয়া উঠিতে গেল; কিন্তু চামেলী তাহার উপর অতৃপ্ত লালসার দৃষ্টি স্থাপন করিয়া দুই হস্তে তাহাকে ধরিয়া বসাইবার চেষ্টা করিল।

বিস্মিত ও স্তম্ভিত শুভেন্দু মুহূর্ত্তমাত্র কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া রহিল। কিন্তু তৎপরেই অবস্থাটি যখন পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করিল, তখন সবলে চামেলীর বাহুপাশ হইতে আপনাকে মুক্ত করিয়া দুই হস্ত দূরে সরিয়া গিয়া অজগর সর্পের ন্যায় দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিতে লাগিল—সে এই চামেলীর মধ্যে আর্টে তন্ময় পূর্ব্বের ভাবপ্রবণ চামেলীকে খুঁজিয়া পাইল না, এ যে তীব্র লালসাময়ী জীবন্ত রক্তমাংসমেদের ক্রিমিকীটপূতিগন্ধময় রূপজীবিনীর গর্ভজা কন্যা চামেলী! সে চীৎকার করিয়া বলিল, "চামেলী, আমার ভুল ভেঙ্গে দাও। বল, তুমি সত্যই অভিনয় করছো?"

উত্তরে চামেলী তাহার পদতলে লুটাইয়া পড়িল। জানুদ্বয় আলিঙ্গন করিয়া অশ্রুপূর্ণলোচনে তাহার মুখের দিকে দৃষ্টি উন্নীত করিয়া সে জড়িত অস্পষ্টস্বরে যাহা বলিল, তাহাতে শুভেন্দুর মস্তকে বজ্রাঘাত হইল, সে এই নারীর অযাচিত প্রেমভিক্ষায় ক্ষুব্ধ ব্যথিত হইয়া দুই হস্তে কর্ণ আচ্ছাদন করিয়া কঠোর-স্বরে বলিল, "কি প্রলাপ বকছো, চামেলী? মাথা ঠিক কর। আমি যে তোমায় মার পেটের বোনের মত দেখে আসছি, আর তাই যাতে তুমি তোমার সাধের আর্টের জগতে কালজয়ী নাম কিনতে পারো, তারই জন্যে যা আজ পর্য্যন্ত কাউকে শেখাবার চেষ্টা করিনি, তাই তোমায় শেখাচ্ছি। ছিঃ ছিঃ, ভুলে যাও এ সব কথা! তুমি আমার ভগ্নী, আমি তোমার ভাই।"

চামেলী তথাপি বাষ্পগদ্গদকণ্ঠে বলিল, "নিষ্ঠুর! আমি যে নারী হয়ে"—

বাধা দিয়া আপনাকে মুক্ত করিয়া লইয়া শুভেন্দু বলিল, "আবার প্রলাপ বকছো? দেখ, যা হয়ে গিয়েছে গিয়েছে, এ কথা কেউ জানতে পারবে না। কিন্তু এখন হ'তে জেনো, তুমি আমার ভগ্নী, আমি তোমার ভাই—এ সম্বন্ধ যদি বজায় রাখতে পারো, তা হ'লে আবার এসো নির্জ্জনে এমনি ক'রে পার্ট রিহার্শাল দিতে, নইলে আর এসো না।"

শুভেন্দু আর দাড়াইল না, দ্রুতপদে কক্ষ ত্যাগ করিয়া গেল। আর চামেলী? তাহার নয়নে ক্রূর কুটিল নরকের আগুন জ্বলিয়া উঠিল। সে হস্ত দৃঢ় মুষ্টিবদ্ধ করিয়া, অধর দংশন করিয়া আপন মনে বলিল, "আচ্ছা! আমার ভালবাসায় পাপ? আর যে পরস্ত্রীর লোভে আমার এই অপমান, তার ভালবাসায় পাপ নেই? আচ্ছা!"

দলিতা ফণিনীর দংশনের তীব্রতা কত অধিক এবং তাহার জ্বালা কি ভীষণ, তাহা পরে জানা যাইবে।

১০

ফোঁটা ফোঁটা জল বর্ষণে পাষাণও ক্ষয় হইয়া যায়। পুরুষ যতই দৃঢ়চিত্ত ও কর্ত্তব্যপরায়ণ হউক, অহরহঃ যদি তাহার কর্ণে নারী মন্ত্রণা দান করে, তাহা হইলে কালে সে সঙ্কল্পচ্যুত হইতে পারে। অসীমবিকাশের তাহাই হইয়াছিল। একেই নানা কারণে তাহার নিকটে তাহার বিবাহিত জীবন বিষময় হইয়া উঠিতেছিল, তাহার উপর সুগৃহিণীর সুপরামর্শের অভাবে তাহাদের স্বামিস্ত্রীর মনোমালিন্যের পাষাণ-প্রাচীর ক্রমশঃ অভ্রভেদ করিবার নিমিত্ত মস্তক উত্তোলন করিতেছিল। হিরণী উহাতে যতটুকু সম্ভব বাধাপ্রদান করিতেছিল বটে, কিন্তু সে সংসারানভিজ্ঞা বালিকা, তপঃসিদ্ধ অগস্ত্যের মত ক্রমবর্দ্ধমান বিন্ধ্যকে 'তিষ্ঠ' বলিবার ক্ষমতা তাহার ছিল না। ইহার উপর মনসাকে ধুনার গন্ধ দিবার লোকের অভাব হইল না। একই পুরুষের প্রেম-ভিখারিণী নারী যদি অপরাকে তাহার সফলকাম প্রতিদ্বন্দ্বী বলিয়া মনে করে, তবে তাহার প্রতিদ্বন্দ্বীকে, অভাবে প্রণয়ীকে হেয়, অপদস্থ অথবা ক্ষতিগ্রস্ত করিতে জগতে অসাধ্য কায তাহার কিছুই থাকে না। ভ্রান্ত ধারণার বশে চামেলী উষারাণীকে তাহার প্রণয়ী

শুভেন্দুর প্রেমাকাঙ্ক্ষিনী বলিয়া স্থির করিয়াছিল এবং প্রণয়ী শুভেন্দুও যে উষারাণীর প্রণয়ার্থী ও সেই জন্য তাহার অন্তরের প্রেমনির্মাল্য ঘৃণায় দূরে নিক্ষেপ করিয়াছে, ইহাই হইল তাহার সমস্ত ক্রোধ, ঘৃণা ও আক্রোশের মূল। চামেলী এ যাবৎ লেখাপড়া ও কলাবিদ্যার চর্চ্চায় অতি জঘন্য অসৎসংসর্গের মধ্যেও আপনার মনটিকে খাঁটি রাখিতে সমর্থ হইয়াছিল, তাহার দেহও সে রাখিয়াছিল পবিত্র এবং অকলুষিত। এ যাবৎ ভালবাসা তাহার হৃদয়ে কোন ছাপ দিতে পারে নাই। কিন্তু একবার যখন তাহার অপাপবিদ্ধ অনাবিল পবিত্র হৃদয়পটে ভালবাসা শুভেন্দুর উদার স্নেহ দয়ামায়া-প্রবণ অনিন্দ্যসুন্দর মূর্ত্তি অঙ্কিত করিয়া দিয়া গেল, তখন সেই দাগ আর সহজে মুছিয়া যাইবার নহে। প্রতীচ্যের কবিরা কাব্যে কামদেবকে অন্ধ করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন, আর প্রাচ্য ও প্রতীচ্য উভয় দেশের কবিরাই তাঁহাকে ফুলধনুরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। প্রণয়ী বা প্রণয়িনী একবার ফুলধনুর শরে বিদ্ধ হইলে তাঁহারই মত অন্ধ হইয়া যায়,—তাহার ভালমন্দ, ন্যায়-অন্যায়, পাপ-পুণ্য কিছুই বিচার করিবার শক্তি থাকে না। চামেলীর অবস্থা ঠিক তাহাই হইয়াছিল।

তাই সে নানা উপায়ে নানারূপে অসীমের কাণে বিষ ঢালিয়া দিতে লাগিল। প্রথম প্রথম অসীম বিস্মিত ও বিরক্ত হইয়া তাহার স্পর্দ্ধাকে, অবজ্ঞা ও তাচ্ছীল্যের গুরুভারে অবনত ও ধূলিসাৎ করিয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছিল। সে গৃহস্বামী, এই সাধারণ গণিকাশ্রেণীর অভিনেত্রীর প্রভু, অন্নদাতা, প্রতিপালক,—স্পর্দ্ধা ত তাহার কম নহে যে, সে তাহার সহধর্ম্মিণীর—এই প্রাসাদের সর্ব্বেসর্ব্বময়ী কর্ত্রীর বিপক্ষে ঘুণাক্ষরেও অপবাদের কথা উচ্চারণ করিতে সাহস করে! আবার সেই অপবাদের সহিত তাহার বাল্যবন্ধু সতীর্থ সোদরপ্রতিম শুভেন্দুর নাম বিজড়িত! তখনই এই নষ্টচরিত্রা নটীকে পদাঘাতে দূর করিয়া দিবার উৎকট বাসনা অসীমের মনে জাগিয়াছিল।

কিন্তু দুর্ব্বল তাহার মন—তাহার মন কেন এই কুলটার মিথ্যাভাষণে সায় দিতে চায়? বন্ধুকে স্বগৃহে অধিষ্ঠিত করিবার পর হইতে এ যাবৎ একটি একটি করিয়া ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র ঘটনা তাহার দুর্ব্বল সঙ্কীর্ণ ক্ষুদ্র মনের চিত্রপটে এই দুর্ব্বল মুহূর্ত্তে ফুটিয়া উঠে কেন? সে রজ্জুকে সর্পভ্রম করিতেছে না ত?

কিন্তু—কিন্তু—সত্যকে ত মিথ্যা করা যায় না, দিনকে ত রাত্রি বলিয়া মানিয়া লওয়া চলে না। অলঙ্ঘ্য অকাট্য প্রমাণ,—কেন শুভেন্দু তাহাকে গোপন করিয়া মধুপুরে বিভাসচন্দ্রের সাহায্যে যায়—বিভাস তাহার কে? কি সম্পর্ক তাহার বিভাসের সহিত? বিভাসই হউক অথবা বিভাসের ভগিনীই হউক, তাহাদের কাহারও সাংসারিক ব্যাপারে তাহার মাথাব্যথা কেন? সে ত আর্টিষ্ট—আর্টই তাহার ধ্যান জ্ঞান—সে ত আর্ট লইয়াই মসগুল হইয়া থাকিবে। তবে? বিভাসচন্দ্র গৃহ হইতে বিতাড়িত হইবার পরে গোপনে তাহাকে তাহার ভগিনীর সহিত দেখা-সাক্ষাতের যোগাযোগের মূলে ছিল কে? সেও না শুভেন্দু? তাহার পর কেবল এক দিন এক মুহূর্ত্ত নয়,—একাধিক দিন সে অতর্কিতভাবে অসময়ে ষ্টুডিওতে গিয়া শুভেন্দু ও উষারাণীকে যে ভাবে তন্ময় হইয়া গোপনে নিম্নস্বরে পরামর্শ করিতে দেখিয়াছে এবং সে আত্মপ্রকাশ করিলে তাহারা যেরূপ অপ্রতিভ হইয়াছে, তাহাতে চামেলীর কথায় ত তাহাদের সম্বন্ধে সেই ধারণা দৃঢ়মূলই হয়!

অসীম ভাল করিয়া খায় না, ঘুমায় না, তাহার অযত্ন-বিন্যস্ত রুক্ষ কেশ ও আরক্ত নয়ন তাহার মনের অস্থিরতা ও অশান্তিরই পরিচয় দিতেছিল। হিরণী সবই দেখে, সবই বুঝে, কিন্তু কোন প্রতীকারের উপায় খুঁজিয়া পায় না। তাহার অনুক্ষণ ডাক ছাড়িয়া কাঁদিতে ইচ্ছা করে। এক এক সময়ে তীব্র যাতনা উপস্থিত হইলে সে কাতরস্বরে প্রার্থনা করে,—ভগবান, কি করিলে আবার এ বাড়ীতে যে শান্তি বিরাজ করিত, তাহা ফিরিয়া আসে!

বাল্য ও কৈশোরের সুখস্বপ্নঘেরা মধুর স্মৃতি—সে ত ভুলিবার নয়! সে স্মৃতি এই দুর্দ্দিনে শত বৃশ্চিক-জ্বালার মত অন্তরের অন্তস্তলে ধীকি ধীকি জ্বলিয়া উঠে! অজ্ঞান শিশুরূপে যখন সে মাতৃক্রোড়ে, তখনই তাহার জননীর স্মৃতি ধুইয়া মুছিয়া গিয়াছে। পিতা স্বয়ং পিতা ও মাতারূপে তাহাকে অঙ্কে ধারণ করিয়াছিলেন। সেই স্নেহময় পিতাও তাহার বাল্য ও কৈশোরের সন্ধিস্থলে অকস্মাৎ এক দিন দারুণ সন্ন্যাস রোগে শয্যাশায়ী হইলেন। তাঁহার বাঁচিবার আশা ছিল না। বিধির কৃপায় যদিও বা তিনি সেই প্রথম আক্রমণ সহ্য করিয়া বাঁচিয়া উঠিলেন, তথাপি চিরজন্মের মত পক্ষাঘাতে পঙ্গু হইয়া রহিলেন। অতুল ঐশ্বর্য্যের প্রাপ্য

সমস্ত সুখস্বাচ্ছন্দ্য বিদ্যমান, অথচ মানুষের বুভুক্ষু হৃদয় যে স্নেহমমতার সুখসংস্পর্শের জন্য কাঙ্গাল, জীবনের প্রথম প্রভাতে যখন সে তাহা হইতে বঞ্চিত হইল, তখন কে তাহাকে তাহার অফুরন্ত অপরিমেয় ভ্রাতৃস্নেহের পক্ষপুটে আশ্রয় দিয়া সঞ্জীবিত করিয়া রাখিয়াছিল? সে তাহার সহোদর নহে, সে তাহার অপেক্ষা বয়সে অধিক বড় নহে,—অথচ প্রশান্ত সাগরের মত ছিল তাহার উদার উন্মুক্ত হৃদয়, হিমাচলের মত উন্নত ছিল তাহার বুদ্ধিবৃত্তি আর ধরিত্রীর মত ছিল তাহার অচল সহিষ্ণুতা,—সে-ও ছিল তাহারই মত অল্পবয়সেই পিতৃমাতৃহীন। আত্মীয়স্বজনের জীবনদায়িনী স্নেহসুধায় বঞ্চিত এই কিশোর হৃদয়ের অতৃপ্ত স্নেহক্ষুধা মিটাইয়াছিল তাহার জ্যেষ্ঠতাতপুত্র অসীমবিকাশ। তাহার মুখের একটি কথা খসাইতে হয় নাই, মনে বাসনার উদয় হইতে না হইতেই তাহার দাদা অবিলম্বেই সেই বাসনা পূর্ণ করিয়াছে। দাসদাসী ভৃত্য-পরিজন দাদার ইঙ্গিতে তাহার সকল আদেশ—সকল আবদার বাহানা নিমেষে পালন করিয়াছে। নিজে না খাইয়া দাদা তাহাকে খাওয়াইয়াছে, নিজে না পরিয়া তাহাকে পরাইয়াছে, নিজে আমোদ-আহ্লাদ বন্ধ করিয়া তাহার রোগশয্যার পার্শ্বে স্থান গ্রহণ করিয়াছে। সেই দাদার ঘর-আলো-করা বৌ আসিল, আর সেই বিবাহের প্রধান উদ্যোক্তাই ছিল সে স্বয়ং। তাহাদেরই কলেজের স্কুলে সে যখন তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্রী, তখন ঊষা পড়িত প্রথম বার্ষিক শ্রেণীতে। ঊষা ছিল তাহাদের কলেজের ছাত্রী-সমিতির সেক্রেটারী, সেই সূত্রেই ঊষার সহিত তাহার ঘনিষ্ঠতা হইয়াছিল। ঊষাও এই নির্ভীক ও তেজস্বী ফুটফুটে মেয়েটিকে দেখিয়া অবধি তাহার একান্ত পক্ষপাতিনী হইয়া পড়িয়াছিল। হিরণীই ঊষাকে প্রায়ই তাহাদের ঘরে ধরিয়া লইয়া আসিত। সেইখানেই তাহার ভ্রাতার সহিত ঊষার সাক্ষাৎ ও পরিচয়। প্রথম প্রথম ধরিয়া আনিতে হইয়াছিল বটে, কিন্তু পরে ঘন ঘন যাতায়াতের আগ্রহটা ছিল ঊষা ও অসীমেরই সমধিক; কারণ, অসীমও ইহার পর ঊষার আত্মীয় অভিভাবকদের সহিত আলাপ-পরিচয় করিয়া লইয়াছিল। পরস্পরের প্রতি পরস্পরের আকর্ষণ,—যেন উপন্যাসের নায়ক-নায়িকারই মত। সে সব কি সুখের দিনই গিয়াছিল!

হিরণীর চোখের পাতা ভিজিয়া আসিল।

তাহার সেই সদানন্দ উদার দাদা ও অনন্ত প্রেমময়ী ভ্রাতৃজায়ার মধ্যে এই কালো মেঘের আড়াল কে গড়িয়া তুলিল? কে তাহাদের সুখের সংসারে অশান্তির আগুন ধরাইয়া দিল? সত্য বটে, তাহার বৌদি একটু তরলমতি, গভীর চিন্তাশক্তির স্থান তাহার মধ্যে নাই, তাই সে নিজের ভালমন্দ কিসে হয়, বুঝিতে পারে না, বুঝিবার চেষ্টাও করে না। কিন্তু অন্যথা সে ত নিষ্পাপ কোমলহৃদয়া পরম স্নেহপ্রেমপ্রবণা। সে জানে, তাহার ভ্রাতৃজায়া পূর্ব্বেরই মত তাহার ভ্রাতাকে প্রাণ দিয়া ভালবাসে, তাহার ভ্রাতার পায়ে একটি কাঁটা ফুটিলে বুক দিয়া তাহা তুলিয়া দিতে পারে। তবে কেন সে আজ মিথ্যা অভিমানভরে আপনার সর্ব্বনাশ আপনি ডাকিয়া আনিতেছে? পতিপ্রেমের কাছে ভ্রাতৃস্নেহ? তাও সেই ভ্রাতা যখন অপদার্থ কাপুরুষ? হিরণীদের ক্লাসে তখন রোমিও-জুলিয়েট পড়া হইতেছিল। জুলিয়েটের মুখে রোমিও ও টাইব্যাল্টের তুলনার কথা মনে পড়িয়া গেল। তুচ্ছ টাইব্যাল্ট! হিরণীর অতৃপ্ত বাসনা অন্তরের অন্তস্তলটাকে যেন কুরিয়া কুরিয়া খাইতে লাগিল; সে টেবিলের উপরে মাথা গুঁজিয়া নিঃশব্দে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিল।

"একলাটি ব'সে অন্ধকারে কি করছিস্ রে, হিরো? ওঃ, অনেক দিন তোকে দেখিনি—আয়, ভাই-বোনে আজ দুটো কথা কই।" অসীমবিকাশ ধীরে ধীরে আসিয়া তাহার পার্শ্বের আসনে উপবেশন করিল। হিরণী তাহার কণ্ঠস্বরে চমকিত হইয়া পূর্ব্বেই আপনাকে সামলাইয়া লইয়াছিল। তাড়াতাড়ি অঞ্চলে চোখ মুছিয়া গাঢ়স্বরে বলিল, "দাদা! তুমি?"

"হাঁ হিরো, আমি। তা আশ্চর্য্য হবার কথা বটে—তোর সঙ্গে দশ দিনের উপর দেখা হয়নি—এটা—এ কি, কাঁদছিলি? দেখি, দেখি!"

অসীম তাড়াতাড়ি উঠিয়া লাইটের সুইচ টিপিয়া দিল, তখনও গোধূলির আলো ঘরখানিকে একেবারে অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইতে দেয় নাই।

হিরণী জোর করিয়া মুখে-চোখে হাসি আনিয়া বলিল, "হাঁ কাঁদছি না বয়ে গেছে! তুমি কোত্থেকে এলে বলো দিকি, আকাশ থেকে?"

অসীম বলিল, "তাই বটে। তা, তোর গলা ভারী, চোখের পাতা এখনও ভিজে—মানে কি?"

সস্নেহে হিরণীর মেঘের মত কালো কেশরাশির উপর হস্তাবমর্ষণ করিতে করিতে অসীম বলিল, "সত্যই হিরো, স্বার্থপর আমি নিজের সুখ-দুঃখ নিয়েই মসগুল, তোর খবরটা পর্য্যন্তও নিতে পারিনি। আর দিকি একটু পড়াই মেঘদূত-খানা, অনেক দিন বই ছোঁয়া হয়নি।"

হিরণী বলিল, "সে হবে'খন পরে। বলছিলুম কি, তুমি এমন হয়ে যাচ্ছ কেন বল দিকি? অমন যদি কর, তবে একেবারে দেশে চ'লে যাব, আর আসবো না ব'লে দিচ্ছি। আমার কিছু ভাল লাগে না, দাদা।"

"তুই চ'লে যাবি? তা হ'লে আমিও এক দিকে গিয়ে বেরুবো। তুই আমার এই শ্মশানপুরীতে সোণার প্রদীপ—হিরো, এ সংসারে মানুষ কি সুখে থাকে বলতে পারিস?"

"ছিঃ দাদা! তুমি না পুরুষমানুষ ব'লে বড়াই করো? কিন্তু আমি যে বলি পুরুষমানুষ হলেই তার একটা লেজ বেরোয় না—যে বিধাতা পুরুষকে সৃষ্টি করেছেন, তিনিই মেয়েমানুষকে সৃষ্টি করেছেন—সে কথা সত্যি ব'লে মান? তুমিই না বল, মেয়েমানুষ বড় প্যান্‌সে, একটুতেই ঝাঁঝরা চোখে তার জল ঝরে?"

অসীম একটা সিগারেট ধরাইয়া ধূম উদ্গিরণ করিয়া কিছুক্ষণ সেই আকাশগামী ধূমরাশির দিকে স্থিরনেত্রে চাহিয়া রহিল। তাহার পর ধীরে ধীরে বলিল, "হঁা, তা বলি বটে—আর সেটা মিথ্যেও নয়। দুই এক জনকে বাদ দিলে যা থাকে, তাদের সবারই দেখতে পাই হৃদয় ব'লে একটা জিনিষই নেই—তারা পুরুষের মনটাকে নিয়ে নকড়া-ছকড়া করে।"

হিরণী ক্ষুব্ধ হইয়া বলিল, "ছি দাদা—এমন ছোট মন ত তোমার আগে ছিল না।"

"না, ছিল না। কিন্তু ঠেকে শিখছি অনেক নতুন জিনিষ। যাদেরই বিশ্বাস করা যায় অগাধ—তারাই আগে বিশ্বাস ভেঙ্গে দেয়—"

হিরণী বাধা দিয়া বলিল, "এ তোমার অন্যায়, দাদা। তুমি কেবল নিজের দিকটাই দেখছো, তাদের দিক থেকেও কি বলবার আছে, তা কখনও খোঁজ ক'রে দেখেছো?"

অসীম বলিল, "না, দেখিনি—দেখবার দরকারও হয় নি—নিজের চোখ-কাণকে ত অবিশ্বাস করতে পারিনি।"

হিরণী একটু উত্তেজিতস্বরে বলিল, "কখ্‌খোনো না। তুমি নিজের চোখে কাণে কিছুই দেখ নি শোন নি, পরের চোখে কাণে দেখেছ শুনেছো। আজ যখন কথা উঠলো, তখন এর একটা মীমাংসা করতে চাই, আমি ব'সে ব'সে সর্ব্বনাশ দেখতে চাই নি। দাদা, আমার কথায় বিশ্বাস কর, যা ছিল, তাই আছে, কিছুই বদলায় নি, কেবল তোমাদের মধ্যে একটা খোলা কথাবার্ত্তা"—

অসীম ম্লান হাসি হাসিয়া বাধা দিয়া বলিল, "তা হয় না, হিরো, কাচ একবার ভাঙ্গলে আর জোড়া লাগে না।"

হিরণী বলিল, "তা হ'তে পারে, কিন্তু স্বামি-স্ত্রীর সম্বন্ধ কাচের মত ঠুন্‌কো নয় যে, ভেঙ্গে গেলে জোড়া লাগবে না। তুমি ব'স দাদা, আমি—"

অসীম বাধা দিয়া বলিল, "সর্ব্বনাশ! ও কাযটি করতে যেও না, মিছে অপমান হবে।"

হিরণী দৃঢ়স্বরে বলিল, "তা হই হবো, তোমাদের কাছে আমার আবার মান অপমান কি? আচ্ছা, আমি বলি কি, ষ্টুডিওটা এখান থেকে তুলে দাও না কেন? অন্ততঃ চামেলীকে অন্য যায়গায় থাকবার বন্দোবস্ত ক'রে দাও না।"

অসীম বলিল, "খুব সোজা কথা নয়, হিরো। ষ্টুডিও সরিয়ে দেওয়া মানে আমার হাতে গড়া এই বিরাট ফিল্ম কোম্পানীটিকে গলা টিপে মেরে ফেলা। আর তার মানে আমার ভাত-ভিত্তিতে টান দেওয়া। জান ত, আমার যথাসর্ব্বস্ব এতেই দিয়েছি।"

হিরণী বলিল, "কেন দাদা, আমাদের জমিদারী রয়েছে ত, উঠে গেলেই বা ফিল্ম কোম্পানী! সংসারের শান্তির কাছে ত আর ফিল্ম কোম্পানী নয়।"

অসীম বলিল, "তা হ'তে পারে, কিন্তু যে হাতে ক'রে গড়েছে, তার কাছে নয়। আর তা ছাড়া জমিদারী আমার বলতে ত এক ছটাকও নেই, যা আছে কাকাবাবুর, তার মানে তোমার নিজের।"

হিরণী ছলছলনেত্রে বলিল, "ছি দাদা, তুমি এত পর হয়ে গেছ? তোমার আর আমার কি? তোমার যা, তা আমার নয় কি? তবে? আমার থাকলেই ত তোমার।"

অসীমের চোখের পাতা ভিজিয়া আসিল। সস্নেহে ভগিনীর মাথার উপর হাত রাখিয়া বলিল, "এমনি মিষ্টি মনটি যদি সকলের হ'ত জগতে!"

"তবে চামেলীকে আর কোথাও বিদায় ক'রে দাও।"

"তুইই না বলেছিলি, অসহায় নিরাশ্রয়, ওকে আশ্রয় দাও, মানুষ ক'রে গ'ড়ে তোল ?"

"হাঁ, তাও বটে। ওকেও তাড়ানো যায় না। তবে বিভাসদাকে কোন দূরদেশে চাকরী-বাকরীতে পাঠিয়ে দাও না। বোম্বাই সহরে অনেক বড়মানুষ ত তোমার বন্ধু।"

"তা পারি। কিন্তু দুদিন গিয়েই সেখানে, আবার পালিয়ে আসবে বোনের আঁচলে।"

"কেন, এখন ত হোটেলেই রয়েছে।"

"তা হলেও দেখাসাক্ষাতে বাধা আছে ব'লে মনে হয় না—বিশেষ তোমাদের শুভেন্দু বাবুটি মাঝখানে থাকতে।"

কথাটা বলিবার সময় অসীমের নয়নে অস্বাভাবিক এক উষ্মার লক্ষণ প্রকাশ পাইল।

হিরণী অনুযোগের স্বরে বলিল, "বলেইছি ত, তুমি কেবল নিজের দিকটাই বড় ক'রে দেখছো। আজ তুমি যাঁকে আমাদের ব'লে মস্ত বড় অভিমান ক'রে অভিযোগ জানাচ্ছ, মনে ক'রে দেখ, তিনি তোমার কে ছিলেন এত দিন, আর তাঁকেই বা এখানে এনেছিল কে? মানুষ রাগে অন্ধ হ'লে তার যে বিচার-বিবেচনার ক্ষমতা লোপ পেয়ে যায়, তা ত সত্যিই দেখছি চোখের সামনে।"

অসীম বিস্মিত হইল, সে এমনভাবে কখনও হিরণীকে শুভেন্দুর পক্ষ গ্রহণ করিতে দেখে নাই। একটু যে ক্রোধও হইল না, তাহা নহে। এই লোকটা কি মোহিনী জানে যে, তাহার নিজের সংসারে যাহাদের আপনার বলিবার, তাহারাও তাহার বিপক্ষে বিদ্রোহী হইয়া শুভেন্দুরই পক্ষপাতিনী হইয়া পড়িয়াছে? কথায় একটু ঝাঁঝ দিয়া বলিল, "সে দুধকলা দিয়ে পোষে; সে যাকে পোষে, তাকে ভাল জেনেই পুষতে নিয়ে আসে, কিন্তু সে যে পরে সাপ হয়ে দংশন করবে, তা ত আগে থেকে জানা থাকে না।"

হিরণী বিস্ময়ে কিছুক্ষণ স্তম্ভিত হইয়া রহিল। তাহার পর বলিল, "কি বলছ তুমি দাদা? তোমার কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে? ছিঃ ছিঃ!"

অসীম বলিল, "হাঁ, তোমরা আমায় ছি ছি করবে বটে, কিন্তু তুমি যদি সব কথা জানতে, তা হ'লে এমন কথা বলতে না।"

হিরণী বলিল, "আমি সব কথা জানি। জানি বলেই বলছি, তুমি মনে মনে যে মাকড়সার জাল বুনছো, তা এক দিন তোমারই চোখের সামনে ফেঁসে যাবে। মিছে তুমি কেবল তোমার মনকে কষ্ট দিচ্ছ, দাদা।"

অসীম বিরক্তিভরে বলিল, "আমার চেয়ে তুমি যে শুভেন্দুকে ভাল ক'রে জানো, এটা খুবই নতুন কথা বটে। এক বছরে যে তুমি মানুষটাকে এতটা চিনে ফেলেছো, এটুকু তোমার বাহাদুরীও বটে। তাই বুঝি ওর হয়ে আমার সঙ্গে লড়াই করতে এসেছ?"

হিরণী গম্ভীরস্বরে বলিল, "বলেইছি ত, রাগে তুমি অন্ধ হয়েছ। নইলে যেটাকে তুমি লড়াই করা বলছো, সেটাকে লড়াই বলে না। বুঝে, বুঝতে যে, আমি তোমার সংসারে সুখ-শান্তি আনবার জন্যেই বোঝাবার চেষ্টা করছিলুম। যাক্, তুমি যখন বুঝবে না ব'লে আগে থাকতেই ঠিক ক'রে রেখেছ, তখন আর ও-কথা নিয়ে তর্কো করবার দরকার নেই, ও-কথা আর তুলবোও না কখনও, হয় ত এখানে থেকে চোখে এ সব দেখার চেয়ে আমার দেশে চ'লে যাওয়াই ভাল। যাবার আগে কিন্তু একটা কথা ব'লে যাবো। তুমি যাকে কুৎসিত ব'লে মনে ক'রে শত্রুর দলে ফেলেছো, তাঁর চেয়ে তোমার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী কেউ নেই, এটা জেনে রেখো, আর তাঁর মনে কোন পাপ নেই, এটাও জেনে রেখো।"

হিরণী ধীরগম্ভীরপাদবিক্ষেপ করিয়া চলিয়া গেল, অসীম একবার হিরণী বলিয়া ডাকিয়া ফিরাইবার চেষ্টা করিল বটে, কিন্তু হিরণী ফিরিয়াও চাহিল না।

কিছুক্ষণ স্তম্ভিত হইয়া অসীমবিকাশ নীরবে বসিয়া রহিল। সে তখন মনের মধ্যে আকাশ-পাতাল তোলাপাড়া করিতেছিল। এই নারীজাতির অন্তরের অন্তস্তল কি গভীর দুর্ভেদ্য রহস্যজালে আবৃত! সে অন্তরের বাহিরে শুষ্ক নীরস সাহারার ধূ ধূ বালুকারাশি, কিন্তু ভিতরে অন্তঃস্রোতা ফল্গুর মত শীতল শান্ত প্রস্রবণ! হিরণীর এই অযাচিত উচ্ছ্বসিত প্রশংসাবাদে গুণগ্রহণের পরিচয় পরিস্ফুট, না আর কিছু? বহুক্ষণ চিন্তা করিয়াও অসীম-বিকাশ এ সমস্যার সমাধান করিতে পারিল না।

[ক্রমশঃ

শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার বসু (সাহিত্যরত্ন)।

হুগলী জেলার ইতিহাস

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

হুগলীর বিবিধ সংবাদ

মোগলদের সময়ে হুগলী জেলা তিন ভাগে বিভক্ত ছিল—প্রত্যেকটিকে 'সরকার' বলিত। সপ্তগ্রাম, শালিমানাবাদ ও মন্দারণ এই তিনটি 'সরকার' ছিল।

হুগলীতে আকের চাষ খুব বেশী ছিল। সূতার কাপড় ও তসর কাপড়ের ব্যবসাও খুব বেশী ছিল।

হুগলীর কেল্লা (মোগলদের) মহম্মদউল্লা নির্ম্মাণ করেন। তিনি এক জন হুগলীর ফৌজদার ছিলেন।

মুরশিদকুলী খাঁ বাঙ্গালার সুবেদার হন। তৎপরে তাঁহার জামাতা সুজাউদ্দীন হন। তিনি সুজা খাঁকে হুগলীর ফৌজদার নিযুক্ত করেন।

মীরকাশিমের সময় বর্গী সেনাপতি শীভট্ট একবার হুগলী আক্রমণ ও লুণ্ঠন করেন।

মেজর ক্লিপ্যাট্রিক ও কাপ্তেন্ কুট পলাশী-যুদ্ধের পূর্ব্বে একবার হুগলী লুণ্ঠন করেন; সেই জন্য নবাব সিরাজউদ্দৌল্লা নিজে কলিকাতা আক্রমণে গিয়াছিলেন। "হুগলী ও হাবড়ার ইতিহাস ২য় খণ্ড পৃ ১৯৪।"

সোমড়ানিবাসী রামকান্ত রায় (জাতিতে বৈদ্য) চিৎপুরে নবাব-বাড়ীর প্রধান মুন্সি ছিলেন, পরে নিজ ভ্রাতুষ্পুত্র কালীনাথকে ঐ চাকরী দিয়া, হুগলীতে নবাব খানজা খাঁর দেওয়ানী পদে নিযুক্ত হন।

কাঁচড়াপাড়ায় (কাঞ্চনপল্লী) বৈদ্যক-বিশারদ রামচন্দ্রের নিবাস ছিল। তিনি নবাব খানজা খাঁর গৃহচিকিৎসক ছিলেন। কোন সময়ে নদীয়ার রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় দুরারোগ্য রোগে আক্রান্ত হইলে বর্দ্ধমানের রাজার অনুরোধে রামচন্দ্র নদীয়ার রাজাকে আরোগ্য করেন। "চাঁদরাণী" হইতে গৃহীত।

ভট্টরাজবংশে (মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের পূর্ব্বপুরুষ) কালীনাথ নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র দুর্গাদাস গঙ্গাস্নান উপলক্ষে বল্লভপুরে আসিয়াছিলেন। সেই সময় নবাব-সৈন্য নৌকাযোগে যাইবার সময় ঐখানে অবতরণ করেন। সৈন্য আগমনের জন্য দুর্গাদাসের সঙ্গী ও রক্ষিগণ ভয়ে পলায়ন করে, কিন্তু বালক দুর্গাদাস স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। বালকের সাহস দেখিয়া মুসলমান শাসনকর্ত্তা বিস্মিত হইলেন এবং উহাকে হুগলী যাইবার পথ জিজ্ঞাসা করিলেন। দুর্গাদাস হুগলীর দূরত্ব, প্রত্যেক গ্রামের নাম, এমন কি, গঙ্গানদীর গভীরতা পর্য্যন্ত বলিয়া দিলেন। মুসলমান শাসনকর্ত্তা অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া উহাকে, দুর্গাদাসের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাদের অনুমতি লইয়া হুগলীতে লইয়া যান। এই হুগলীতেই তাঁহার শিক্ষালাভ হয়। এই দুর্গাদাসই কৃষ্ণনগর রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা ভবানন্দ মজুমদার।

ঐ বংশে রুদ্ররায় নামে এক রাজা ছিলেন। হুগলীর শাসনকর্ত্তা তাঁহাকে বার বার ডাকিয়া পাঠান, কিন্তু রুদ্ররায় খাজনার প্রাপ্য টাকা পাঠাইতেন—নিজে কখনও যাইতেন না। ইহাতে নবাব ছলক্রমে রুদ্ররায়কে ধরিয়া হুগলীতে আনেন।

ঐ রুদ্ররায় মৃত্যুর পূর্ব্বে বলিয়াছিলেন যে, তাঁহার শব যেন চন্দনকাষ্ঠে দাহ করা হয়। সেই জন্য হুগলীতে লোক পাঠান হয় এবং চন্দনকাষ্ঠও লইয়া যাওয়া হয়। ঐ চন্দনকাষ্ঠ খুব সম্ভব চন্দননগর হইতে সংগৃহীত হইয়াছিল। "দাহোপযুক্তচন্দনকাষ্ঠমানেতুং হুগলীপ্রদেশে তরণীং প্রস্থাপয়িত্বা ইদানীমপি নাগতা।" এখানে হুগলী প্রদেশ বলিয়াছে, কিন্তু ঠিক হুগলী নহে। "ক্ষিতীশবংশাবলীচরিত" Edited by W Pertch published from Berlin 1852.

রুদ্ররায়ের মৃত্যু হইলে তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র রামজীবনকে রাজ্য দিয়া যান এবং জ্যেষ্ঠপুত্র রামচন্দ্রের ভার রামজীবনের উপর দিয়া যান। কিন্তু শ্রাদ্ধদিবসে যখন সমস্ত ব্রাহ্মণ ও অপরাপর সকলে সভাস্থ হইলেন, তখন রামচন্দ্র রামজীবনকে পিতার আদেশ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করেন যে, তাঁহাকে কি দেওয়া হইবে। রামজীবন কিছুই দিতে স্বীকার না হওয়ায়, রামচন্দ্র অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া হুগলীর ফৌজদার-সমীপে আইসেন ও ভ্রাতার সম্বন্ধে অভিযোগ করেন। এই রামচন্দ্র অতিভোজী ছিলেন, এমন কি, ১৫।২০ জনের আহার্য্য একা খাইতে পারিতেন। শারীরিক বলও অসাধারণ ছিল। তাঁহার শরীরের ওজন এত অধিক ছিল যে, আরবদেশীয় অশ্ব ব্যতিরেকে অন্য অশ্ব তাঁহার ভার বহন করিতে পারিত না।

বঙ্গের শেষবীর প্রতাপাদিত্যের বিরুদ্ধে হুগলীর শাসনকর্ত্তাই আকবর বাদশাহের নিকট প্রথম 'অভিযোগ প্রেরণ করেন। At this time the Governors of Jamhagir and Hooghly informed the Sultan of Delhi of the many fold baseness."

মুরশিদকুলি খাঁর সহিত ইংরেজের অমিল হয়। সেজন্য ইংরেজ, বাদশাহ শাহ আলমের কাছে দূত প্রেরণ করেন। এই

সময় উইলিয়ম হ্যামিলটন ডাক্তার সাহেব বাদশাহের কঠিন পীড়া আরোগ্য করেন। ইহারই পুরস্কারস্বরূপে ১৭১৪-১৫ খৃষ্টাব্দে কলিকাতার নিকট ৩৮ খানি গ্রাম ক্রয় করিবার প্রার্থনা করেন। প্রার্থনা মঞ্জুরও হইয়াছিল! কিন্তু মুরশিদ জমিদারদিগকে হুকুম দিলেন, যে জমি বিক্রয় করিবে, তাহারই তিনি সর্ব্বনাশ করিবেন। সেজন্য কেহই জমি বিক্রয় করিতে সাহসী হন নাই। এই সময়ে হুগলীর ফৌজদার ছিলেন জৈনউদ্দীন, তৎপরে ওয়ালিবেগ, তৎপরে আসান আলি খাঁ ফৌজদার হন। ঐ ৩৮ খানি গ্রামমধ্যে শিবপুর ও বেতড় ছিল।

ডাঃ টমাস ওয়াইজ সাহেব হুগলীতে প্রথম হাঁসপাতাল করেন এবং 'হরটিকলচারল' সোসাইটী স্থাপন করেন। জীবনচন্দ্র পাল ঐ সোসাইটীর অগ্রণী ছিলেন। হুগলীতে তাঁহার বিস্তৃত উদ্যান এখনও বর্ত্তমান আছে।

কলিকাতাস্থাপয়িতা জব চারণক প্রথমে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর এজেণ্ট হইয়া হুগলীতে ছিলেন। তৎপরে উলুবেড়িয়ায় উপনিবেশ স্থাপন করেন। কিন্তু দুই যায়গাতেই অকৃতকার্য্য হন। পরে সুতানুটীতে পাট্টা গ্রহণ করিয়া কলিকাতার ভিত্তি স্থাপন করেন। বর্ত্তমান টাকশাল সুতানুটী গ্রাম ছিল। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করিতেছি, জব চারণক চাণকের সৃষ্টিকর্ত্তা নহেন, উহা জনরব মাত্র। চার্ণকের বহুপূর্ব্বে বিপ্রদাসের কবিতায় (১৪৯৫ খৃঃ) চাণকের উল্লেখ আছে। ঐ সাহেব সহমরণ হইতে পলায়িতা এক হিন্দু রমণীর পাণিগ্রহণ করেন। চার্ণকের মৃত্যুর পূর্ব্বেই তাঁহার সহধর্ম্মিণীর মৃত্যু হয়। তাঁহার কবর চাণকে ছিল। চারণক সাহেব পত্নীর কবর দেখিতে প্রায়ই চাণকে যাইতেন। "Travels of a Hindu" পুস্তক হইতে গৃহীত।

পূর্ব্বে বৈদ্যুতিক পাখা ত ছিলই না, টানাপাখাও ছিল না। এক জন ডচ্ গভর্ণর উহার উদ্ভাবন করেন।

নিউটনের উদ্ভাবিত দূরবীক্ষণ যন্ত্র এস, কে, ধর ব্রাদার্স প্রথমে হুগলীতে তৈয়ারি করে। District Gazetteer p 186 by O' Malloy.

পূর্ব্বে ১'৩ বর্গমাইলে ৮৬০ জন লোকের বাস ছিল। ইহার উপর ১ জন মাত্র পুলিস-কর্ম্মচারী ছিল অর্থাৎ প্রায় ১২২০ জন লোকের উপর ১ জন মাত্র পুলিস-কর্ম্মচারী ছিল।

সন্দীপের রাজা কেদাররায় মানসিংহের সহিত যুদ্ধে নিহত হন। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার নৌ-সেনাপতি কার্ভালো সৈন্য সংগ্রহের জন্য হুগলী আসিয়াছিল। মোগল-দুর্গ হইতে তাঁহার জাহাজে তোপ নিক্ষেপ করে। কার্ভালো ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার সৈন্য লইয়া সন্তরণ দিয়া তীরে উঠিয়া দুর্গের প্রহরীকে নিহত করিয়া দুর্গে প্রবেশ করে এবং ৪০০ শত সৈন্য নিহত করে। এক জন মাত্র কাজী পলাইয়াছিল। "হাবড়া ও হুগলীর ইতিহাস ২য় খণ্ড পৃঃ ১১৯।"

মীর হবিব বর্গীদের সঙ্গে যোগ দেয়। বর্গীরা মন্দারণে আড্ডা লয়। শেষ হুগলী লুণ্ঠন করে। "ঐ পৃঃ৬৫"

খোজা ওয়াজিদ নামে হুগলীর এক জন ধনী মুসলমান বণিক ফরাসী জেনেরল (ল) সাহেবকে নবাব সিরাজদ্দৌলার সঙ্গে পরিচিত করিয়া দেয়—"Caja Wajid who had introduced me (Law) to the Nawab and who, it would be natural to suppose, was our patron was a great merchant of Hoogly."—Three Frenchmen in Bengal p 88 By S. C. Hill B.A. B.T.

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বাণিজ্যের ভিতর উপরিতন অফিসার পর্য্যন্ত ভাগে কায করিতেন—প্রকারান্তরে বাণিজ্য-শুল্ক দিতেন না। "The first was the private monopoly in partnership which commenced in the begining of June 1765 between Lord Clive, Messieurs Summers, Sykes and Verelst each one quarter part for purchasing large quantities of salt that inthe hands of private merchants and in August 1765 the monopoly of inland-trade in salt beetelnut and tobacco was established.—Consideration on Indian Affairs part II p 58 By William Balts.

মতিরাম নামে এক জন হুগলীর ফৌজদার ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী দ্বারা কারারুদ্ধ হয়। "Matiram a Hindoo and man of family who had been lately appointed fouzder of Hooghly through the interest of Mr. John Johnstone one of the council together with Busuntroy his dewan were suddenly imprisoned." —Ditto p. 59.

হুগলীর বাণিজ্য লইয়াই নবাব সিরাজউদ্দৌলার বিরুদ্ধে তাঁহার মাতা আমিনা বেগম দাঁড়াইয়াছিলেন এবং ঐ বেগম ইংরেজের সাহায্য করিতেন। আমিনা সিরাজকে ইংরেজের সহিত যুদ্ধ করিতে বারণ করেন—ইহার মূলে একটু স্বার্থ ছিল বলিয়া মনে হয়। ঘসিটি (সিরাজের মাসী) ও আমিনা কারবার বাণিজ্য দ্বারা অর্থোপার্জ্জন করিতেন। বাণিজ্যের পথ উন্মুক্ত রাখিতে হইলে ইংরেজ বণিকের সহিত সদ্ভাব রাখা একান্ত প্রয়োজন। কারণ, ইংরেজের ন্যায় অধিক মূল্যে দ্রব্যাদি খরিদ করিবার সামর্থ্য আর কাহারও ছিল না। উমিচাঁদ নবাবের প্রিয়পাত্র ছিলেন। তাঁহার মারফৎ আফিম ও সোরা জলাঙ্গী দিয়া হুগলীতে ব্যবসা চলিত। "বাঙ্গালার বেগম"—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

মুরশিদকুলি খাঁ হুগলীতে ওয়ালিবেগকে ফৌজদার নিযুক্ত করেন এবং জৈনউদ্দীনকে পদচ্যুত করেন। ওয়ালিবেগ বিক্রমসেনকে সঙ্গে লইবার প্রস্তাব করিলে জৈনউদ্দীন আপত্তি করিলেন। পরে উভয়েই অস্ত্রধারণ করিলেন। ওয়ালি নবাবের সাহায্য চাহিলেন এবং তিনি দীলপৎ সিং নামে এক জন হিন্দু সেনাপতিকে পাঠাইলেন। নবাব ইতিপূর্ব্বেই য়ুরোপীয়ানদিগকে সাবধান করিয়া দেন, যেন তাঁহারা কোন পক্ষই অবলম্বন না করেন। কিন্তু ফরাসী ও দিনেমার জৈনউদ্দীনকে কামান দিয়া সাহায্য করিল। চন্দননগরের সমীপে এই ঘটনা হয়। কিছুদিন এই ভাবেই কাটে। পরে দীলপৎসিংকে মধ্যস্থতার জন্য নবাব হুকুম দিলেন। তিনি নবাবদত্ত শাল কাঁধে করিয়া চন্দননগরের দিকে গেলেন। অপর পক্ষের প্রতিনিধি ও দীলপৎসিং দাঁড়াইয়া কথাবার্ত্তা কহিতেছেন, এমন সময়ে ফরাসীর কামানে দীলপতের মাথা উড়িয়া গেল।—Historical Sketches of Bengal p. 45.

সায়েস্তা খাঁর সময়ে টাকায় ৮ মণ চাউল পাওয়া যাইত। সেজন্য তিনি ঢাকার পশ্চিম গেট ইটের গাঁথনি করিয়া বন্ধ করিয়া দেন এবং বলেন, যদি কেহ এইরূপ সস্তা করিতে পারেন, তবে যেন ঐ গেট খোলা হয়। যশোবন্ত রায়ের সময়ে ঐরূপ খাদ্যদ্রব্য সস্তা হইয়াছিল। তিনি ঐ গেট ভাঙ্গিয়া দেন। যশোবন্তরায় মুরশিদকুলী খাঁর দ্বারা শিক্ষিত হন। খাজনা আদায়ের তিনি কর্ত্তা ছিলেন।

আইন আকবরীতে উল্লেখ আছে যে, সাতগাঁ ও হুগলীর মধ্যে ব্যবধান ১ মাইল, কিন্তু জেমস্ রেনেলের লিখিত Memoir of a map of Hindustanএ ৫ম পৃষ্ঠায় লেখা আছে ৪ মাইল।

রৌপ্যমুদ্রা সের খাঁর সময়েই প্রথম প্রচলিত হয়। উহার ওজন ১১২ মাষা। ১৲ টাকার তামার পয়সা বা দাম ৪০টা ছিল। আকবরশাহ চতুষ্কোণ টাকা উঠাইয়া দিয়া গোল টাকা প্রচলন করেন। "আইন আকবরী"

পূর্ব্বকালে সামুদ্রিক জাহাজ বাঙ্গালা দেশেই তৈয়ার হইত। বলাগড়ের নিকট জাহাজ তৈয়ার হইত। ১৯ শতাব্দীর প্রথম ভাগে কোন্নগরের ডকে ছোট ছোট জাহাজ তৈয়ার হইত। "Early in 19th century there was a dock at Konnagar where ships were built." Dr.—Crawdford's Medical Gazetteer P 24. ঐ স্থানে "হাঁড়িকুল অয়েল মিল" হইয়াছিল। বর্ত্তমান সময়ে "বাটা" কোম্পানির জুতার কারখানা হইয়াছে।

মীর হবিব, মীর আবুল হাসান ও আবুল কাশিম দুই জন বণিকের সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া, উহাদের সাহায্যে হুগলী অধিকার করিলেন। এক দিন রাত্রিতে দুর্গদ্বার রুদ্ধ হইলে ঐ বণিকদ্বয় সংবাদ পাঠায় যে, শাসনকর্ত্তার সহিত তাহাদের বিশেষ আবশ্যক আছে। দুর্গদ্বার খোলা হইল। মীর হবিব ১৫ জন অনুচর লইয়া ভিতরে প্রবেশ করিয়া শাসনকর্ত্তাকে বন্দী করিল। সহরের বাহিরে বর্গী-সেনাপতি শিবরাও অপেক্ষা করিতেছিলেন। মীর হবিব তাঁহাকে নিজের সাফল্যের সংবাদ অবিলম্বে পাঠাইলে শিবরাও হুগলীতে সসৈন্যে প্রবেশ করিলেন—শাসনকর্ত্তাকে বন্দী করিলেন—হুগলী লুণ্ঠন করিলেন।

জনশ্রুতি যে, ফুরফুরায় এক জন বাগ্দী রাজা ছিলেন। তিনি হজরৎশা কবির হাবিবী এবং হজরৎ কায়ামুদ্দীন কর্ত্তৃক পরাজিত হন, কিন্তু উভয়েই পরে নিহত হন।

৯২২ শকাব্দায় সপ্তগ্রামে (হুগলী ইহার ভিতর) রূপো নামে বাগ্দী রাজা ছিলেন। বাগ্দী ও ডোম জাতীয় তাঁহার বিশেষ পরাক্রান্ত সৈন্যও ছিল। তাঁহার বাগ্দী সেনাপতির নাম ছিল 'মেঘা'। রাজা রণশূর ও উড়িষ্যার রাজা হরিবর্দ্ধন দেব একত্র মিলিত হইয়া অবিরাম যুদ্ধের পর মেঘাকে পরাজিত করেন। রূপো রাজাও মারা যান। ডোম সৈন্যরা অশ্বারোহী ও পথপরিষ্কার কার্য্যে (স্যাপারমাইনর) নিযুক্ত থাকিত এবং তাহারাই অগ্রে অগ্রে যাইত। ইহা হইতেই আমাদের ছেলে-ভুলান ছড়া হইয়াছে—"আগে ডোম বাগা ডোম ঘোড়াডোম সাজে

ঢাল মৃগল খাগর বাজে

বাজতে বাজতে পড়্‌লো সাড়া

সাড়া গেল সে বামন পাড়া।" ইত্যাদি,

—"বেণের মেয়ে" হইতে উদ্ধৃত।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ১। এজেন্টের মাহিনা বাৎসরিক ১০০ পাউণ্ড, পরে ২০০ পাউণ্ড হয় ও বকসিস ছিল। ২। হিসাবপরীক্ষক, ৩। গুদামরক্ষক, ৪। খাজাঞ্চী, ৫। পাদরী মাহিনা বাৎসরিক ১০০ পাউণ্ড, ৬। ডাক্তার মাহিনা বাৎসরিক ৩৬ পাউণ্ড, ৭। ফ্যাক্টরের মাহিনা বাৎসরিক ২০ হইতে ৪০ পাউণ্ড, ৮। কেরাণীর মাহিনা বাৎসরিক ১০ পাউণ্ড ছিল।

বার্ণিয়ার সাহেব (যিনি ১৫০৲ টাকা মাহিনায় বাদশাহ আরঙ্গজেবের ডাক্তার ছিলেন) পিপলাই হইতে হুগলীতে নৌকাযোগে ভ্রমণ করেন। তিনি লিখিয়াছেন,—"I remember a nine days voyage that I move from Piplay to Hooghly among these islands sandcamels…my seven oared boat had conveyed us out of the river Piplay and we had advanced 3 or 4 leagues at sea along the coasts saw sea covered with fishes, carles and dolphines."

র‍্যাল্‌ফ ফিচ্‌ নামে এক জন ইংরেজ প্রথম হুগলী আসেন, তিনি লেখেন, "In the year of our Lord 1583, I Ralph Fitch of London merchant being desirous to see the countries of the East India in the company of Mr. John Newberie…" হুগলী সম্বন্ধে তিনি লেখেন যে, From thence I returned Hugely which is the place where the Portugals keep in the country of Bangalas,which standeth in 23 degrees of Northerly latitude standeteh a league from Satagar, they cal it Porto Piqueno. We went through the wilderness because the right way was full of thieves where we passed countreys of Gouren (গৌড়)"—Ralph Fitch P. 48 & 113 by I. Horton Rylsy.

উইলিয়ম ক্রটন বলেন, ১৬৩২ খৃষ্টাব্দে হুগলী গঙ্গা নদীর একটি দ্বীপ ছিল। বার্ণিয়ার ট্রাভেলে একখানি মানচিত্রেও দ্বীপ দেখান আছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে দ্বীপ ছিল না। পর্ত্তুগীজরা গঙ্গার দিক ব্যতীত অপর তিন দিকে গড়খাত কাটিয়া তাহা জলে পূর্ণ করিয়া রাখিত। 'ষ্টুয়ার্টের ডেসক্রেপটিক ক্যাটালগ' এই কথার সমর্থন করে এবং ক্যাম্পস সাহেবও ঐ খাতের কথা বলেন। হুগলী গঙ্গা নদীর দ্বীপ ছিল না।

৩০ সালের বন্যার কয়েক দিন পরে ব্যারাকপুরে সিপাহী-বিদ্রোহ হয়। এই সংবাদ প্রাপ্তিতে হুগলীর ম্যাজিষ্ট্রেট স্মিথ সাহেব কতকগুলি বরকন্দাজ পাঠাইয়া ৪৫ জন বিদ্রোহীকে ধরিয়া আনেন। তাহাদের মধ্যে ১২ জনের ফাঁসি হয়।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর Commercial Residencies হুগলী জেলায় হরিপালে, খিরপাই এবং রাধানগরে ছিল। ১৮০৭-১৮২০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রবার্ট রিচার্ডসন এবং জর্জ রিচার্ডসন, ১৮২৪ খৃঃ চার্লস কেরি, ১৮২৫-১৮২৮ খৃঃ পর্য্যন্ত রবার্ট ব্রুক, ১৮২৯-১৮৩৩ পর্য্যন্ত হেনরি এস,স্পেন রেসিডেণ্ট ছিলেন। ইহার পূর্ব্বে ১৭৬৫ খৃঃ টমাস হিউয়েট হরিপালে, ১৭৯৫ খৃঃ মে মাসে রজার গেল ওরিকার্ড গেলোগরে এবং আগষ্ট ১৭৯৬ খৃঃ পিটস্ মিডলটন রেসিডেণ্ট ছিলেন।
—Dr. Crawford's Medical Gazetteer.

গ্রীষ্মকালে হুগলী কাছারী সকালে বসিত :—"হুগলী… আজকাল রৌদ্রের তেজ প্রখর হওয়াতে ফৌজদারী, রেজেষ্টারী, কালেকটারী প্রভৃতি আদালত-সমূহের কার্য্য প্রাতঃকালে হইতে আরম্ভ করিয়া বেলা দশটা এগারটা পর্য্যন্ত হইয়া থাকে।… শ্রীযুত কেদারনাথ বিশ্বাস ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট হুকুম দিয়াছেন, তিনি বেলা ৯ টা হইতে দুই ঘটিকা পর্য্যন্ত স্বীয় আদালত ও ট্রেজারি খোলা রাখিবেন। ২৩ ভাগ ২য় সংখ্যা ১২৮৭।১৫ই বৈশাখ ইং ১৮৮০।২৬ এপ্রেল "সোম প্রকাশ"।

১৬৫৮-৬৪ খৃষ্টাব্দে ওলন্দাজ শাসনকর্ত্তা ভনডার ব্রুক হুগলী নদী জরিপ করেন এবং প্রথম পাইলট চার্ট প্রস্তুত করেন। ব্রেকের সময় ইংরেজ ১৬৬৮ খৃঃ ঐ নদী জরিপ করেন এবং ইহা হইতেই পাইলট সার্ব্বিসের সূত্রপাত হয়।

১৬৭৬ খৃষ্টাব্দে ইংরেজ বণিক সভা হুগলী "Key of Bengal" বলিয়া বর্ণনা করেন। সেই জন্ম তাঁহারা এইখানে প্রধান কুঠী স্থাপন করেন। ১৬৭৯ খৃঃ বাঙ্গালার কুঠীগুলি সংযত করা হয়। হুগলীতে কাউনসিল রচিত হয় এবং সমস্ত বাঙ্গালার ইংরেজ-চালিত বাণিজ্য তাহার অধীন হয়।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আয়-ব্যয়-তালিকা :—"পার্লিয়ামেণ্টে দাখিল করা হিসাবে প্রকাশ হয়, ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দের ১ মে তারিখ অবধি ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দের ৩০ এপ্রিল পর্য্যন্ত এক বৎসরে বিলাতের ধনাগারে ভারতবর্ষ হইতে ৫ কোটি ৬১ লক্ষ ৮৯ হাজার ২৭১ টাকা জমা হইয়া ৪ কোটি ২৭ লক্ষ ৪৪ হাজার ৯৫১ ব্যয় হয়, এতদতিরিক্ত ১ কোটি ৩৪ লক্ষ ৪৪ হাজার ৩২০ টাকা সঞ্চয় থাকে। ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দের ১ মে অবধি ১৮৫০।৩০ এপ্রিল পর্য্যন্ত দ্বাদশ মাসে ৫ কোটি ২০ লক্ষ ১৯ হাজার ৩১১ টাকা জমা হইয়া ৪ কোটি ২৩ লক্ষ ৩৮ হাজার ৮৫১ টাকা ব্যয় বাদে ৯৬ লক্ষ ৮০ হাজার ৪৬০ টাকা উদ্বৃত্ত থাকে…ইষ্ট ইণ্ডিয়া গভর্ণমেণ্টের বিলাত রাজ্যস্থ কর্ম্মচারী-দিগের এক তালিকা গত মে মাসে প্রস্তুত হয়, তদ্দ্বারাবগতি হইল তথায় সর্ব্বশুদ্ধ ৫১৪ জন লোক নিযুক্ত আছেন ইহারদিগের বার্ষিক বেতনে ১২ লক্ষ ৬১ হাজার ২১১ টাকা পর্য্যন্ত ব্যয় হয়।" ৬০ সংখ্যা ১৮৭৯।৪ সেপ্টেম্বর। ১২৫৬।২০ ভাদ্র মঙ্গলবার "সম্বাদ-ভাস্কর।"

১৮৭০ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯০০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত হুগলী জেলায় বৃষ্টিপাতের তালিকা

খৃষ্টাব্দ	ইঞ্চি হিসাবে	খৃষ্টাব্দ	ইঞ্চি হিসাবে	খৃষ্টাব্দ	ইঞ্চি হিসাবে
৮৭০	৫৮·০২		৫৪ ৮৭		৫৫·০৭
৭১	৭৬·৭৯		৬২·৭৭		৪৫ ৮৫
৭২	৫১·০০	৮২	৭৬·৯০		৪১·৩১
৭৩	৩৯·৬৩	৮৩	৫৬ ২৬	৯৩	৬৯·৪৭
৭৪	৩৯·৩৭	৮৪	৪৬ ৫১	৯৪	৪৩·৮২
৭৫	৫২·৯৯	৮৫	৭২·৭৯	৯৫	৪৩·১৮
৭৬	৪০·৭২	৮৬	৫৯ ৮৯	৯৬	৪৩·৬১
৭৭	৫৬ ৩৭	৮৭	৪৮·৬০	৯৭	৬৮ ৮২
				৯৮	৫২·৮৭
৭৮	৮৯·৩০	৮৮	৭২·৪৭	৯৯	৭২·৩১
৭৯	৪২·৫৩	৮৯	৪০·২৭	১৯০০	৭১·৮৭

১৯০০ খৃষ্টাব্দে সেপ্টেম্বর মাসের ২১শে ৯·৭০″ ইঞ্চি, ২০শে ৫·৮৫″ ২২শে ২·৮৫ ইঞ্চি অর্থাৎ তিন দিনে ১৮·৪০″ ইঞ্চি বৃষ্টিপাত হয়। এই বৎসর কলিকাতা সহরের অনেক রাস্তায় নৌকা চলিয়াছিল, কিন্তু মোটের উপর অধিক বৃষ্টিপাত হয় নাই। ১৮৬৩ খৃঃ ৭৬·৮০; ১৮৬৪ খৃঃ ৭১·১০; ১৮৬৫ খৃঃ ৬৩·০০; এবং ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে ৬৪ ৭০ ইঞ্চি বৃষ্টিপাত হয়। ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে ২০·৫০″ এবং ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দের ঐ জুলাই মাসে ২০·২০″ ইঞ্চি এক দিনে বৃষ্টিপাত হয়। এক দিনের বারিপাত হিসাবে ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক।

হুগলীজেলায় রম্ মদের কারখানা ছিল, তাহার তালিকা

স্থান		মালিকের নাম
বদ্রভপুর	…	W. Woolen late C. S.
ঐ	…	W. Graves
পদমডাঙ্গা	…	Elber'ing late Donish secretary
ধানগোরি	…	Carr, Tagore & Co,
রিষড়া	…	G. Macnair
কোন্নগর	…	Do.
বাঁকীপুর	…	Jerdon
চন্দননগর		Tressanges "Toynbee"

হুগলী জেলার গড়পড়তায় দৈনিক পারিশ্রমিক :—

সাল	ঘরামি	ছুতর	কৃষাণ	অন্যান্য মজুর
১৮৪৭	৶০	৵০	৴১০	⁄৫
১৮৫৯	৶১০	৵১০	৴১১।	⁄১০
১৮৫৯	৶০	।০	৴১০।	⁄১৭।
১৮৬৯	৶৫	।১০	⁄০	৵০
১৮৬৯	।⁄৫	।⁄৫	⁄৭।	৵০
১৮৭১	।৵১০	।৵১০	⁄৭।	৵১০

ওমেলির ডিষ্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার হইতে গৃহীত।

চাউল প্রভৃতি ১৲ এক টাকায় কত পাওয়া যাইত

গড় বৎসর	চাউল (সের)	গম	ছোলা	লবণ
১৭৯৩ হইতে ১৮১৩	৪০	৫০·৫০	৫০·৫০	…
১৮৬১ হইতে ১৮৬৫	২১	২১·৪০	২২·৭১	১০·৬০
১৮৬৬ — ১৮৭০	২০·৮৪	২১·৮৬	১৭·১৪	৯·৩২
১৮৭১ — ১৮৭৫	১৬·৯৪	১৪·৬৪	১৮·৭৪	৮·৭৩
১৮৭৬ — ১৮৮০	১৪·৪০	১৩·৮৯	১৫·৪৩	৯·০০
১৮৮১ — ১৮৮৫	১৬·৫৯	১৫·৫৭	১৮·৩৭	১২·৪৩
১৮৮৬ — ১৮৯০	১৪·৮৬	১৩·৯৫	১৭·১৬	১০·৭৬
১৮৯১ — ১৮৯৫	১১·৮৬	১২·৯৫	১৫·০৩	১০·৫৯
১৮৯৬ — ১৯০০	১০·৯৫	১০·৯৭	১২·৫৯	৯·৯৭
১৯০১ — ১৯০৫	৯·৯৮	১০·৬৪	১২·৬৪	১২·১৬
১৯০৫ — ১৯০৭	৭·৪০	৮·৫০	৯·৪৬	১৬·১৭

হুগলী জেলার হাঁসপাতাল

স্থান	স্থাপিত সাল	স্থান	স্থাপিত সাল
শ্রীরামপুর	১৮৩৬	ভদ্রেশ্বর	১৭৮৫
(হুগলী) ইমামবাড়ী	১৮৩৬	খানাকুল	১৮৯৩
উত্তরপাড়া	১৮৫১	মাণ্ডালে	১৮৯৩
দ্বারবাসিনী	১৮৫৬	হুগলী জানানা	১৮৯৪
বৈদ্যবাটী	১৮৫৭	বলাগড়	১৮৯৪
আরামবাগ	১৮৭১	ইটাচোনা	১৯০১
ত্রিবড়া	১৮৭৩	ভাণ্ডারহাটী	১৯০৫
বৈঁচি	১৮৭৮	হরিপাল	১৯০৮

শ্রীউপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (জ্যোতীরত্ন)।

পুষ্পাঞ্জলি—শ্রীনবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য প্রণীত কবিতার বই। প্রকাশক নারায়ণ লাইব্রেরী, ২৭ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ১২৮ পৃষ্ঠা, কাগজে বাঁধানো শক্ত মলাট চিত্রিত, উত্তম এন্টিক কাগজে ছাপা। মূল্য পাঁচ সিকা।

নবকৃষ্ণ বাবু প্রবীণ কবি, এক কালে তাঁহার কবি-খ্যাতি বঙ্গদেশে সুবিস্তৃত ছিল। তাঁহার সহজ সরল ভাষা, উত্তম ভাব, সূক্ষ্ম পর্য্যবেক্ষণ-শক্তি তাঁহার কবিতাগুলিকে এক কালে বিশেষ সমাদৃত করিয়াছিল। বিশেষ করিয়া তাঁহার শিশু-পাঠ্য উপদেশ-মূলক কবিতাগুলি সেকালের স্বল্প শিশু-পাঠ্য সাহিত্যের মধ্যে একটি উচ্চ আসন অধিকার করিয়াছিল। এখনও এমন পাঠ্য পুস্তক খুব অল্পই লিখিত বা সঙ্কলিত হয়—যাহাতে নবকৃষ্ণ বাবুর শিশু-পাঠ্য কোনো না কোনো কবিতা না গৃহীত হয়। তাঁহার "শিশুরঞ্জন-রামায়ণ" প্রভৃতিও শিশু-সাহিত্যে একটি নূতন দিক নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছিল, এবং তিনিই এই বিষয়ে অগ্রণী বলিয়া বঙ্গবাসীর কৃতজ্ঞতার পাত্র। কিন্তু নবকৃষ্ণ বাবু কেবলমাত্র শিশুতোষণ কবিতাই লেখেন নাই, তিনি বহুকাল হইতে নানা বিখ্যাত সাময়িক পত্রে স্বকীয় ভাবোচ্ছ্বাস সরল সুমধুর কবিতায় পরিব্যক্ত করিয়া সাহিত্য-সমাজে সুপরিচিত হইয়াছিলেন। এই বর্ত্তমান পুস্তকখানি সেই সব পূর্ব্ব-প্রকাশিত কবিতাগুলির সমাহার। ইহাতে ১২৯১ সাল হইতে আরম্ভ করিয়া ১৩৪১ সাল পর্য্যন্ত সময়ের—পূর্ণ ৫০ বৎসরের সাহিত্য-সাধনার নমুনা সংগৃহীত হইয়াছে। কবি নবকৃষ্ণ বাবু তাঁহার সাহিত্য-সাধনার ইতিহাস এইরূপ দিয়াছেন—"সোমপ্রকাশ, নববিভাকর, এডুকেশন গেজেট প্রভৃতি সাপ্তাহিক পত্রেই আমি সর্ব্বপ্রথম কবিতা লিখিতে আরম্ভ করি।…মাসিক পত্রের মধ্যে সুবিখ্যাত 'ভারতী' পত্রিকাতেই আমার কবিতা প্রথম প্রকাশিত হয়। তখন আমি কলিকাতা সংস্কৃত কলেজিয়েট স্কুলে প্রথম শ্রেণীতে পড়িতাম—নিজের লেখার উপর নিজের বিশ্বাস ছিল না। এজন্ত প্রথম কয়েকটি লেখা কবিবর (অধুনা বিশ্বকবি) শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথের নিকট পাঠাই। তিনি দেখিয়া বিশেষ সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং উহাতে সংশোধনের কিছুই নাই, এইরূপ মত প্রকাশ করিয়া 'ভারতী'র সম্পাদিকা মহাশয়ার নিকট পাঠাইয়া দেন। সম্পাদিকা মহাশয়াও ঐগুলি আনন্দের সহিত প্রকাশ করেন।…১২৯১ সালে সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের তত্ত্বাবধানে তদীয় জ্যেষ্ঠ জামাতা (অধুনা স্বর্গীয়) রাখালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সম্পাদকতায় মাসিকপত্র 'প্রচার' বাহির হইলে দ্বিতীয় বর্ষ হইতে আমি তাহাতেও কবিতা লিখিতে থাকি। রাখাল বাবু আমার কবিতার বড়ই আদর করিতেন, ইহাতে আমি যথেষ্ট উৎসাহিত হই। এই উপলক্ষে পূজ্যপাদ সাহিত্য-সম্রাটের নিকট অনেক উপদেশ লাভ করিয়াও আমি কৃতার্থ হইয়াছিলাম।"

এই পুস্তকে ৫০ বৎসর সময়ের মধ্যে লেখা ৪৯টি বিভিন্ন বিষয়ের কবিতা আছে। ৫০টি কবিতা থাকিলেই বৎসর-সংখ্যার সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষিত হইত। ইহাদের মধ্যে কতকগুলি প্রাচীন কালে লেখা, এবং কতকগুলি আধুনিক কালে আধুনিক বিষয় লইয়া বা ঘটনা লইয়া লেখা।

এক বৎসর হইল, আমি বঙ্গসাহিত্যের প্রাচীন কাল হইতে আধুনিক কাল পর্য্যন্ত লিখিত উত্তম গীতিকবিতার একটি চয়নিকা 'বঙ্গবীণা' নামে সঙ্কলন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। তখন আমি নবকৃষ্ণ বাবুকে কেবল শিশুপাঠ্য কবিতা-রচয়িতা বলিয়াই জানিতাম। এই জন্ত তাঁহার কোনো কবিতা আমার সেই সংগ্রহে স্থান পায় নাই। আমার এই ত্রুটি প্রদর্শন করিয়া সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক বন্ধুবর শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয় আমাকে এক পত্র লেখেন এবং প্রাচীন 'প্রচার' হইতে 'শেষ' নামক একটি কবিতা আমাকে নকল করিয়া পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। সেই কবিতাটি পড়িয়া আমি বিস্মিত ও মুগ্ধ হই। কিন্তু তখন আমার বই সমস্ত ছাপা হইয়া গিয়াছিল, আমি সেই সুন্দর সরস সুমিষ্ট কবিতাটি আমার পুস্তকে সন্নিবেশিত করিতে না পারিয়া আমার পুস্তকের অঙ্গহানি হওয়ার জন্ত অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছিলাম। নবকৃষ্ণ বাবুর কবিতা-সংগ্রহ পুষ্পাঞ্জলি হাতে পাইয়াই আমি প্রথমে দেখিলাম যে, যোগেন্দ্র বাবুর নির্দ্দিষ্ট কবিতাটি এই সংগ্রহের মধ্যে আছে কি না, এবং উহা আছে দেখিয়া আনন্দিত হইয়াছিলাম।

এ-সব তো গেল আমার ব্যক্তিগত মতামত। পাঠক-পাঠিকারা যাহাতে পরের মুখে ঝাল না খাইয়া আস্বাদ ও নিজেরা বিচার করিয়া কবি-প্রতিভার নিবিখ নির্ণয় করিতে পারেন, তাহার সুবিধার জন্ত আমি কয়েকটি কবিতা হইতে কিয়দংশ উদ্ধার করিয়া নমুনা দেখাইতেছি। কোন্‌টির কতটুকু উদ্ধার করিব তাহা স্থির করা আমার পক্ষে দুঃসাধ্য বোধ হইতেছে, কয়েকটি কবিতা সম্পূর্ণই উদ্ধার করিবার প্রবল লোভ হইতেছে। কিন্তু সে লোভ সম্বরণ করিয়া আমি পাঠকপাঠিকাদিগকে কবিত্বের উৎস-সন্ধানে যাইবার জন্ত প্রলুব্ধ করিয়া বিদায় লইব।

প্রথমেই 'শেষ' কবিতাটির উল্লেখ করিয়াছি, অতএব 'শেষ' দিয়াই আরম্ভ করি। ইহাতে কোনো অসঙ্গতি হইবে না, কারণ, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন যে, 'শেষের মধ্যে অশেষ আছে', এবং "শেষ নাহি যে শেষ কথা কে বল্‌বে!" শেষ কবিতাটি ১২৯৫ সালে 'প্রচার' পত্রে প্রকাশিত হয়, চৈত্র মাসে লেখা, বসন্ত ঋতুর

বিদায় ও সঙ্গে সঙ্গে "প্রচারের" তিরোধানে মর্ম্মব্যথা অনুভব করিয়াই কবি বোধ হয় লিখিয়াছিলেন—

গোকুলে মধু ফুরায়ে গেল, আঁধার আজি কুঞ্জবন,
আর গাহে না পাখী, ফুটে না কলি, নাহিক অলি-গুঞ্জরণ।
তুলাতে মৃদু লতিকা বনে, খেলিতে নব-কলিকা সনে,
মধুরতর নাহি সে আর সমীর-ধীর সকরুণ।
কাননে ঢালি' জোছনারাশি ভাসে না চাঁদ গোকুলে আসি',
নাহি সে হাসি প্রমোদ-রাশি, নাহি সে সুখ-সম্মিলন।
জলদে শশি-মাধুরী ঢাকা, বিষাদ যেন সকলে মাখা,
শ্রীহীন তরু, শ্রীহীন লতা, শ্রীহীন চারু-পুষ্পবন।

এই সুললিত কবিতাটির সমস্তটা যিনি না পড়িবেন, তিনি বঙ্গসাহিত্যের একটি উত্তম নমুনার আস্বাদ হইতে বঞ্চিত থাকিবেন। এই সব কবিতা পাঠ করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, অনেক আধুনিক কবির কবিতায় নবকৃষ্ণ বাবুর কবিতার প্রতিধ্বনি বা সুর বাজিয়াছে।

'চিঠি আসায়' এবং 'চিঠি না আসায়' কবিতা দুটিতে নারী-চিত্তের একটি মধুর রহস্য প্রকাশিত হইয়াছে—প্রিয়তমের চিঠি যখন আসে ঘন ঘন, তখন তাহার যেন কতই বিরাগ, কিন্তু যে দিন চিঠি আসা বন্ধ হয়, সে দিন হইতে দিন গণনা আরম্ভ হয়—

রাত পোহালে বৃহস্পতিবার
ন' দিন হবে—
বুধে বুধে আট দিন আজ যায়,
কোনও খবর এলো না কই তার,
কাল্‌কে তবে
বিপিন, কি তুই যাবি কলকাতায়?

'বর্ষ-বিবর্ত্তন' কবিতায় নববর্ষ বলিতেছে—

আমি এসেছি আবার—
তরুরে ছেয়েছি ফল-মুকুলে,
ধরণী ঢেকেছি শ্যাম-দুকূলে,
পরায়েছি লতিকায়
অঙ্গ বেড়ি' ফুল-অলঙ্কার,—
এসেছি আবার।
রূপ রস-গন্ধে ধরাতল
করিয়াছি আনন্দে চঞ্চল—
ভুলিতে মঞ্জুল ফুলে গুঞ্জন-রত অলিকুলে
কুঞ্জে এনেছি ডেকে,
ওই শোন মধুর ঝঙ্কার—
এসেছি আবার।
আমি নীলিমা দিয়েছি ঢেলে আকাশে,
সুরভি দিয়েছি ঢেলে বাতাসে;
নন্দন বনের পাখী যতনে এনেছি ডাকি',
থেকে থেকে কুহুতানে
মোহ আনে হৃদয়ে সবার—
এসেছি আবার!

এই কবিতাটির সহিত 'নববর্ষ' কবিতাটি তুলনা করিয়া পাঠ করিতে অনুরোধ করি। কবি ধরা-সুন্দরীকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন—

বল্, ধরাসুন্দরী, শুনি,
কার প্রেমে তোর এত হাসি,
কার তরে সাজালি অঙ্গ
দিয়ে গুচ্ছ ফুলের রাশি।

এই কবিতাটি পড়িলে শ্রীমদ্‌ভাগবতের মধ্যে রাসপূর্ণিমায় গোপীরা ধরাসুন্দরীর রূপ-ঐশ্বর্য্য দেখিয়া যে প্রশ্ন করিয়াছিলেন, সেই বর্ণনা মনে পড়িয়া যায়—তাহার মূল সংস্কৃত ও অকবি আমার অনুবাদ দিয়া ভাবসাম্য বুঝাইতে চেষ্টা করিতেছি। কৃষ্ণ গোপীদের কাছে লুক্কায়িত হইয়াছেন, গোপীরা তাঁহাকে খুঁজিয়া খুঁজিয়া ফিরিতেছেন, এবং সেই সময়ে গোপীরা—

দৃষ্টং বনং কুসুমিতং রাকেশ-কর-রঞ্জিতম্।
যমুনানিল-লীলৈজৎ-তরুপল্লব-শোভিতম্।
দেখিল কানন কুসুম-ভূষণ
পূর্ণ চাঁদেরি জ্যোৎস্না-মাতা।
যমুনা-বিহারী শীতল-বায়ুতে
লীলা-চঞ্চল বৃক্ষ-পাতা।

তখন তাঁহারা তাহাদের জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন—

দৃষ্টো বঃ কচ্চিদ্ অশ্বত্থ-প্লক্ষ-ন্যগ্রোধ…
কচ্চিৎ কুরুবকাশোক-নাগ-পুন্নাগ-চম্পকাঃ?
মালত্যদর্শি বঃ কচ্চিন্ মল্লিকে জাতি-যথিকে?
প্রীতিং বো জনয়ন্ যাতঃ করস্পর্শেন মাধবঃ।
কিং তে কৃতং ক্ষিতি তপো বত কেশবাঙ্ঘ্রি-
স্পর্শোৎসবোৎপুলকিতাঙ্গরুহৈর্বিভাসি?
দেখেছ তোমরা অশথ পাকুড়, বট তুমি কি গো দেখেছ তায়?
কুরুবক নাগকেশর অশোক চম্পা চামেলি দেখেছ হায়?
মল্লী মালতী জাতি ও যথিকা, মধুময় তারে দেখেছ মানি,—
তাই তোমাদের এত আনন্দ, শোভা দেছে তার পরশখানি।
ওগো ধরিত্রী, বলো বলো বলো কোন্ সে গোপন পুণ্যতপ
তার চরণের পরশে জাগালো অঙ্গে পুলক-মহোৎসব।
এবং কৃষ্ণং পৃচ্ছমানা বৃন্দাবন-লতান্ তরূন্
ব্যচক্ষত বনোদ্দেশে পদানি পরমাত্মনঃ।
এইরূপে তারা কৃষ্ণে ঢুঁড়িয়া পুছিল ব্রজের লতা ও গাছে—
বনের বুকেতে পরমাত্মার পায়ের চিহ্ন দেখিল আছে।

কবি একটি বালিকার অকাল-মৃত্যু স্মরণ করিয়া কবিতা লিখিয়াছিলেন 'নিরুদ্দেশের পথে'—

বালিকা গেল কোথা চলিয়া,
খেলিতে এসে খেলা ফেলিয়া।
খেলার ঘর-বাটী সাজানো পরিপাটী,
ভবেছে কুটি-মাটি পড়িয়া।
খেলানা ভাঁড় পড়ি' রয়েছে গড়াগড়ি,
ধূলার চিনি যায় উড়িয়া।
সেদিকে কেহ আর চাহে না একবার,
চাহিলে আঁখি যায় ধাঁধিয়া,
পিপিড়া সারি দিয়ে সেখানে শুধু গিয়ে
ফিরিয়া আসে বুঝি কাঁদিয়া।

এই কবিতাটির আগাগোড়াই একটি স্নিগ্ধ করুণ রস টলটল করিতেছে।

প্রণয়ি-প্রণয়িনী পরস্পরকে ভালবাসে, কিন্তু তাহাদের সেই গোপন প্রাণের প্রণয় তাহারা প্রকাশ করিতে চায় না, বা সাহস পায় না, তাই তাহাদের দৃষ্টিতে 'লুকোচুরি' খেলা চলে। সেই লুকোচুরি' ধরিয়া ফেলিয়া এক জন আর এক জনকে বলিতেছে—

তুমি বটে ভাবো মনে মনে—
মনোভাব রেখেছ গোপনে,—
হৃদয় সে নিরজন,　　সেথা রম্য কুঞ্জবন,
সন্ধান করিবে সাধ্য কার ?
কিন্তু সে তোমার ভুল,　　সেথা যে ফুটেছে ফুল
প্রতি শ্বাসে আসে গন্ধ তার,
সেথা সে গাহিছে পিক　　কানে বাজিতেছে ঠিক
দূরাগত সঙ্গীত সুধার !

'ফুলের খেলা' নামক কবিতাটি ভাষার লালিত্যে ও কবিত্বে মনোহর। তাহা উদ্ধার করিয়া দেখাইবার প্রলোভন সংবরণ করিলাম, কৌতূহলী পাঠক-পাঠিকারা তাহা মূল পুষ্পোদ্যানে প্রবেশ ও বিচরণ করিয়া সম্ভোগ করিবেন এই আশায়।

প্রণয়িনী প্রণয়ীর সহিত মিলনে হতাশ হইয়া 'গাথা মালা' হাতে লইয়া নিষ্ফল প্রয়াসের জন্য বিলাপ করিতেছে—

সই রে, জলিনু মিছে,
বাসনা হইল সার !
সারা বন বুলে বুলে
বন-ফুল তুলে তুলে
গাঁথিনু চিকণ মালা,—
দিব কারে উপহার ?

এই কবিতাটির আগাগোড়া একটি করুণ মিষ্টতা পরম উপভোগ্য হইয়াছে।

'মহাভিক্ষা' কবিতায় কবি মানব-মনের চির-অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা জিজ্ঞাসা ও অজ্ঞাতের সন্ধানে সাধনার কথা চমৎকার করিয়া পরিব্যক্ত করিয়াছেন। জগতের সমস্ত কিছুর সঙ্গে যে মানবের চিরন্তন যোগ রহিয়াছে, এবং সেই যোগের জন্য মানব যে ব্যাকুল হইয়া ইহার পরম রহস্য জানিতে আগ্রহান্বিত হইয়াও রহস্য উদ্‌ভেদ করিতে পারিতেছে না, তাহাই কবি সুন্দর করিয়া এই কবিতায় বলিয়াছেন—

পুঞ্জ-পরমাণুময়　　বিশাল বিশ্বের এই
প্রতি-অণু-পরমাণু-কাছে
প্রতিদিন— প্রতিক্ষণ　　স্বপ্নময়—মোহময়
কি ভিক্ষা আমার যেন আছে।

এই কবিতাটি সমস্ত উদ্ধৃত করিতে পারিলে ইহার সর্ব্বাঙ্গীন সৌন্দর্য্য বুঝাইতে পারিতাম, কিন্তু তাহার স্থান নাই, অতএব পাঠক-পাঠিকারা ইহার মূল উৎসে গিয়া ইহার সৌন্দর্য্য ও ভাবের গভীরতা উপলব্ধি করিবেন আশা করি। এই কবিতাটি সমস্ত কবিতার মধ্যে ভাব-সমৃদ্ধ বলিয়া শ্রেষ্ঠ মনে হয়।

এই পুস্তকের আর একটি উত্তম কবিতা 'শারদীয় আবাহন।' ইহার বাক্য—চিত্র সুন্দর কবিত্বময় এবং ভাবও সু উচ্চ। সমস্ত কবিতাটি উদ্ধৃত করিয়া আমার পরিচয় দেওয়া সমাপ্ত করি—

সুপ্রসন্ন ছায়াপথ　　বাহি' শরতের রথ
নামিয়া আসিল ধরাতলে,
দীর্ঘ বরষার পর　　স্বর্ণবর্ণ রবি-কর
ধরণীর বুকে ঝলমলে।
পাখী গায় কলভাষ,　　চামর ঢুলায় কাশ,
জলে ফোটে কুমুদ কমল,
চরণ-পূজার তরে　　শেফালী নীরবে ঝরে,
স্থলপদ্মে শোভিল ভূতল।
রক্তজবা ওঠে ফুটি',　　নীলের মাধুরী লুটি'
ফুটিল অপরাজিতা রঙ্গে,
এস মা অপরাজিতা বঙ্গে।
হরিৎ শস্যের ক্ষেত্র　　দেখিলে জুড়ায় নেত্র,
বিছাইয়া দিয়াছে আসন,
এ আসনে যাঁরে চাই, ভাবিয়া তো নাহি পাই
কি নামে করিব আবাহন।
ব্যাপ্ত যিনি বিশ্বময়,　　সৃষ্টি স্থিতি আর লয়
যাঁহার ইচ্ছার পরিণাম,
ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র জ্ঞান　　ল'য়ে তুচ্ছ চিন্তা ধ্যান,
মানব কি দিবে তার নাম !
তাই নাম দূরে রাখি'　　শুধু 'মা' বলিয়া ডাকি,
মা গো পূর্ণ করো অভিলাষ।
দেখায়ে পুণ্যের পথ　　চালাও এ মনোরথ,
পাপের প্রগতি করো নাশ।

কবির সহিত আমরাও এই প্রার্থনায় যোগ দিয়া বলি, তথাস্তু, আমেন।

চারু বন্দ্যোপাধ্যায় (এম এ)।

'কুরুক্ষেত্র'

গত চৈত্র মাসের মৌনী অমাবস্যার দিন দিল্লী হইতে কুরুক্ষেত্র গিয়াছিলাম। সঙ্গে ছিলেন কাশী টীকমাণি সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত তারাচরণ সাহিত্যাচার্য্য ও দিল্লী ভিক্টিরিয়া কলেজের অধ্যাপক মদীয় ছাত্র শ্রীমান্ উপেন্দ্রনাথ সাংখ্যতীর্থ; আমরা তিন জনে সেই পবিত্র তীর্থক্ষেত্রে উপনীত হইয়া দ্বৈপায়ন হ্রদে অবগাহনাদি শ্রাদ্ধান্ত তীর্থকার্য্য সম্পাদন করিয়া ঐ স্থানের দ্রষ্টব্য সকল দেখিয়াছিলাম। যে সকল ভূমি তীর্থক্ষেত্র বলিয়া পরিচিত, ভারত-যুদ্ধকালে সেই কয়েক ক্রোশ ভূমি যুদ্ধকার্য্যে ব্যবহৃত হয় নাই, ইহা মহাভারত পাঠে অবগত হওয়া যায়। এবারে আষাঢ় মাসে সূর্য্যগ্রহণ হইবে এবং তৎকালে বহু লক্ষ যাত্রীর সমাগম হইবে বলিয়া এখন হইতেই পথঘাট পানীয় জলের ব্যবস্থাদি কার্য্য অতি দ্রুতবেগে সম্পন্ন হইতেছে। চিকিৎসালয়, সেবকগণের বাসস্থানাদিও নির্ম্মিত হইতেছে। সর্ব্বত্রই একটা কার্য্যের গুরুত্ব উপলব্ধি করা যায়। ষ্টেশন হইতে হ্রদ পর্য্যন্ত মোটর, বাস বা টাঙ্গা যায়, পথও দুই মাইলের কম, রাস্তা উৎকৃষ্ট। হ্রদ হইতে আমরা সর্ব্বপ্রথমে বাণগঙ্গায় গিয়াছিলাম। দ্বৈপায়ন

হ্রদের একাংশ পুষ্করিণীর আকারে চতুষ্পার্শ-সমন্বিত ও সুসম্বদ্ধ সোপানাবলী মণ্ডিত। উহার অপর নাম 'সন্নিহিত্যা', এই নাম অন্যান্য বহু পুরাণেও দৃষ্ট হয়। কাশীখণ্ডে গ্রহণকালে ঐ পুষ্করিণীতে স্নানদানের বহু প্রশংসার কথা আছে। সুপ্রসিদ্ধ প্রভাসযজ্ঞ কুরুক্ষেত্রেই হইয়াছিল। সেই সময়ে ভারতের রাজন্য-মণ্ডলী কুরুক্ষেত্রে গ্রহণ-স্নান ও দানোপলক্ষে মিলিত হইয়াছিলেন, এ কথা বিষ্ণুপুরাণ ও ভাগবতে বর্ণিত হইয়াছে। ইহার অপর একটি নাম স্যমন্তপঞ্চক তীর্থ। পরশুরাম কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন কর্ত্তৃক অন্যায়ভাবে পিতৃহত্যায় একুশবার পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয় করেন ও তাহাদের রুধির দ্বারা পাঁচটি রুধির-হ্রদ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, উহাই স্যমন্তপঞ্চক নামে অভিহিত হয়। বর্ত্তমানে ঐ সব হ্রদই প্রায় ভরিয়া গিয়াছে, প্রায় দুই মাইল পর্য্যন্ত একটি নদীর মত—অল্প-জলা নদীর ন্যায় উহার শেষ অস্তিত্ব পরিলক্ষিত হয়। এই কুরুক্ষেত্রে বর্ষাকালে আটটি নদীর অস্তিত্ব সূচিত হয়। আমরা যখন গিয়াছিলাম, তখন মাত্র সরস্বতীর চিহ্ন দেখিয়াছি। অন্য কোন নদীর চিহ্ন দেখি নাই। ঐ স্থানের পাণ্ডার মুখে শুনিয়াছি,—এই পাণ্ডাটির কিছু জ্ঞান আছে, বিশুদ্ধ মন্ত্রোচ্চারণে সমর্থ ও প্রাচীন ঘটনাও অনেকটা জানে এবং ভদ্র ব্যবহার করে,—যে স্থানে কুরু-বৃদ্ধপিতামহ—আদর্শ ক্ষত্রিয় ভীষ্ম পিতামহ অর্জ্জুন-শরে জর্জ্জরিত হইয়া শরশয্যা গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই স্থান হ্রদের নিকট হইতে তিন মাইল দূরে অবস্থিত। উহার একটি নাম 'বিনশন' বলে। মহাভারতে শান্তিপর্ব্বে উক্ত হইয়াছে—"ততো বিনশনং প্রাগাদ্ যত্র দেবব্রতোঽপতৎ।" এই বিনশন নাম হইবার কারণ, সরস্বতী ঐ স্থানে আসিয়া বিনষ্ট হইয়াছেন বলিয়া ইহা কেহ কেহ বলেন। সম্ভবতঃ যে স্থানকে বাণগঙ্গা বলা হয়, সেই জলাশয়ই সরস্বতীর খাত এবং উহার পর আর তাহার অস্তিত্ব দেখা যায় না। ঐ স্থানে দুইটি সুবৃহৎ প্রাচীন আম্রবৃক্ষ দেখিয়াছি। চতুর্দ্দিকে দিগন্তবিস্তৃত মাঠ, উহাতে কোন শস্যই হয় না; কেবল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পলাশবৃক্ষ বা ঐরূপ বৃক্ষ-গুল্মাদি রহিয়াছে। মনে হইল, এই সেই পবিত্রতম স্থান—যেখানে শায়িত থাকিয়া দেবব্রত রাজধর্ম্ম, আপদ্ধর্ম্ম ও মোক্ষধর্ম্ম যুধিষ্ঠিরকে বলিয়াছিলেন। সেই আদর্শ ক্ষত্রিয় সংগ্রামে পতিত হইলে সমস্ত ঋষি তাঁহাকে দেখিতে সেই স্থানে আসিয়াছিলেন, অসূর্য্যম্পশ্যা ক্ষত্রিয় রমণীগণ পুষ্পমাল্য লাজ-চন্দনে তাঁহার পূজা করিতে আসিতেন এবং কর্ণও পিতামহের নিকটে আসিয়া তাঁহার স্নেহলাভে বিগলিত হইয়াছিলেন। ১০ দিন যুদ্ধের পর ঐ স্থানও নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল।

আমরা সেই স্থান হইতে প্রত্যাবর্ত্তনকালে দ্বৈপায়ন হ্রদের কিয়দ্দূরে পথিপার্শ্বে একটি প্রকাণ্ড বটবৃক্ষ ও জঙ্গলাকীর্ণ স্থান দেখিলাম। ঐ বটবৃক্ষ সুবৃহৎ ও প্রাচীন। তদ্দৃষ্টে মনে হইল, এইরূপেই একটি বটবৃক্ষতলে সায়াহ্নে কৌরব পক্ষের অবশিষ্ট বীরত্রয় আশ্রয় লইয়াছিলেন এবং তথা হইতে রাত্রে পাণ্ডব-শিবিরে গমন করিয়া চোরের ন্যায় তাহাতে অগ্নিসংযোগ ও নিষ্ঠুরভাবে দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র পাঞ্চালরাজবংশ ধ্বংস করিয়াছিলেন। তথা হইতে হ্রদ পার হইয়া স্থাণ্বীশ্বররাজ ভারত-সম্রাট ইতিহাস-প্রসিদ্ধ হর্ষবর্দ্ধনের রাজধানীর ভগ্নাবশিষ্ট ও রাজবাটীর উপর প্রকাণ্ড মসজিদ স্থাণ্বীশ্বর শিব দেখিলাম। কুরুক্ষেত্রের দর্শনীয় সকলের মধ্যে ইহারই স্থানটি সুন্দর, সুরক্ষিত আছে। অবশ্য এই মন্দিরটিও মুসলমানগণ ভাঙ্গিয়াছিল, পরে নূতন নির্ম্মিত হইয়াছে। ঐ স্থান দেখিয়া 'ভদ্রকালী' (যাহা একান্ন মহাপীঠের অন্যতম) দেখিলাম, ঐ স্থানটিও বেশ মনোরম, কিন্তু দেবীর যে বিশেষ পূজা হয়, তাহা বোধ হইল না! আমরা যে দিন গিয়াছিলাম, সেই দিন মৌনী অমাবস্যা বলিয়া তথায় লক্ষাধিক যাত্রী উপস্থিত হইলেও এই মহাপীঠে আমরা একটি লোকও দেখি নাই।

ভদ্রকালী ও স্থাণ্বীশ্বর শিব ইহার মধ্য দিয়া সরস্বতী প্রবাহিত ছিল। এখনও সেই নদীর খাতে জল আছে এবং নদীর উপরে ইষ্টকনির্ম্মিত হর্ষবর্দ্ধনের সময়ের একটি সেতুর ভগ্নাবশেষ আছে। উহার তিনটি খিলান এখনও সুদৃঢ় আছে। তথা হইতে হর্ষবর্দ্ধনের বাড়ী ও সহরায়মান স্থান দেখিয়া আমরা ষ্টেশনে প্রত্যাবর্ত্তন করি। এই কুরুক্ষেত্র ষ্টেশনে বাঙ্গালীর একটা ধর্ম্মশালা আছে। তথা হইতে পুনর্ব্বার দিল্লীতে প্রত্যাবর্ত্তন করি। কুরুক্ষেত্র কর্ণাল জেলার অন্তর্গত। কর্ণালও খুব ইতিহাস-প্রসিদ্ধ, ঐ স্থানে আর্য্য ও অনার্য্যের বিপুল সংগ্রাম হইয়াছিল। কুরুক্ষেত্র ষ্টেশন দিল্লী হইতে ৮০ মাইল এবং তাহার পরও দিগন্তবিস্তৃত মাঠ। মধ্যবর্ত্তী কয়েক ক্রোশ স্থান বাদ দিয়া সর্ব্বত্রই যুদ্ধ হইয়াছিল। পূর্ব্বাংশে কৌরবগণ, পশ্চিমাংশে পাণ্ডবগণ ছিলেন, ওঘবতী নদীর তীরে শিবির সন্নিবিষ্ট ছিল। ভীষ্মের পতনস্থান হইতে ২৪ মাইল দূরে বর্ত্তমানে পাণিপত ষ্টেশন, ঐ নাম দৃষ্টে তাহার কারণ অনুসন্ধান করিয়াছিলাম; কিন্তু কেহই ইহার কোন সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারেন নাই। আমার মনে হয়, ইহা ভূরিশ্রবার পাণিপতনের স্থান। মহাভারতে উক্ত হইয়াছে, যুদ্ধক্ষেত্র হইতে ২৪ মাইল ব্যাপী শকটব্যূহের অন্তর্বর্ত্তী স্থানে জয়দ্রথকে রক্ষা করা হইয়াছিল এবং ঐ স্থানে ভূরিশ্রবার হস্ত অর্জ্জুন কাটিয়া ফেলেন, সেই বিখ্যাত ঘটনাবলম্বনে স্থানের নাম পাণিপত হইয়া থাকিবে।

শ্রীশ্যামাকান্ত তর্কপঞ্চানন (কাশ্মীররাজ-সভাপণ্ডিত)

'শুদ্ধি'

আগুন-শিখায় যত দগ্ধ্ধায়
উজ্জ্বল তত হেম,
বেদনা-দহনে দহিয়া মধুর
মানবের বুকে প্রেম।

শ্রীঅদ্বৈতকুমার সরকার।

চিরন্তনী

(গল্প

এক

লক্ষ্ণৌ বাদশাবাগের দিকে, ফিকে নীল রং-এর ছোটো-খাটো বাংলোখানি, পরিষ্কার, ঝরঝরে, রাস্তা হইতে ছবির মত দেখা যায়।

বাংলোর অধিকারিণী অমিয়া চাটার্জ্জী, এক জন লেডী ডাক্তার। মেডিকেল কলেজ হইতে অল্পদিন বাহির হইলেও সে ইহারই মধ্যে বেশ পসার করিয়া ফেলিয়াছে। সহরের অনেক সম্ভ্রান্ত বড়লোকের বাড়ীতে তাহার ডাক আসে। অমিয়ার হাতযশ খুব,—মিশুক অমায়িক স্বভাব, অধ্যবসায়গুণেই হয় ত এত পসার, কিন্তু তাহার সমব্যবসায়ীদের মুখে অন্যরকম কথা শোনা যায়, তাঁহারা আড়ালে বলিয়া থাকেন, "এ শুধু ডাক্তার মুখার্জ্জীর অনুগ্রহ।"

কথাটা কতদূর সত্য, তা ঠিক বলা যায় না, তবে এই নূতন পাশ করা লেডী ডাক্তারটির দ্রুত উন্নতি তাঁহাদের অনেকেরই মনে যে কিঞ্চিৎ ঈর্ষার উদ্রেক করিয়াছিল, ইহা মিথ্যা নহে।

অমিয়ার প্র্যাক্‌টিস, অমিয়ার চরিত্র ও আত্মীয়-স্বজনহীনতা তাঁহাদের ছিল প্রধান একটা আলোচনার বিষয়। এমন কি, অমিয়ার বয়স লইয়াও মাঝে মাঝে বেশ একচোট বাদানুবাদও হইত।

বাস্তবিক অমিয়াকে দেখিয়া তাহার বয়স অনুমান করা কঠিন। তাহার আকৃতি-প্রকৃতিতে প্রৌঢ়ের গাম্ভীর্য্য ও বুদ্ধিমত্তা, যৌবনের লীলায়িত লাবণ্য-সুষমা এবং কিশোরীর তারুণ্য ও সরলতার ছাপ সুস্পষ্ট। তাহা ছাড়া সে মিস্ কি মিসেস্, তাহার প্রমাণও এ পর্য্যন্ত কেহ পায় নাই। অনেকে শুধু অনুমানে নির্ভর করিয়া বলিত, ইনি বিধবা কিম্বা—কিন্তু সে কথা থাকুক।

বেলা তখন প্রায় দশটা। একখানা ভাড়াটে সেকেণ্ড ক্লাস টাঙ্গা সেই বাংলোর গেটের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। টাঙ্গা হইতে নামিলেন এক জন বাঙ্গালী ভদ্রলোক আর একটি সাত-আট বছরের ছেলে। গেটে লাগানো সাইনবোর্ডটা একবার দেখিয়া লইয়া, টাঙ্গার জিনিষপত্র টাঙ্গাতেই রাখিয়া, ছেলেকে সম্মুখে দাঁড়াইতে বলিয়া ভদ্রলোকটি সুরকি-পেটা লাল টুক্‌টুকে রাস্তা দিয়া সবুজ আইভি-লতায় ছাওয়া গাড়ী-বারান্দার দিকে অগ্রসর হইলেন। তকমাধারী এক হিন্দুস্থানী বেয়ারাকে দেখিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—"এই—তোমারা মাইজী কাহা?"

বেয়ারা সে প্রশ্নের উত্তর না দিয়া প্রশ্নকারীর মুখের পানে চাহিয়া রহিল।

"আরে বাবা! তোম্ বোলতা কাহে নেই? তোমারা মাইজী—"

বড় অদ্ভুত সে প্রশ্ন। বেয়ারা ভাবিল, লোকটার বাড়ীতে হয় ত বাড়াবাড়ি অসুখ, কিন্তু অমন অসভ্যের মত মাইজী বলিয়া ডাকে কেন?

যাহাই হউক, বেয়ারা তাঁহাকে কায়দা-দুরস্তভাবে একটা সেলাম ঠুকিয়া চট্‌পট্ জিজ্ঞাসা করিল, "আপ কিস্‌কো পুঁছতে হাঁয়, সাব? মেম সাবকো?"

"মেম সাব্! ও! হাঁ হাঁ—মেম সাব ঘরমে হ্যায়?"

উত্তরে বেয়ারা জানাইল, মেমসাহেব খুব সকালেই বাহির হইয়াছেন একটা ডেলিভারি কেশে, কখন্ ফিরিবেন, তাহার কিছু স্থিরতা নেই।

"এঃ! তবেই ত গোল দেখছি।"

ভদ্রলোক উদ্বিগ্নভাবে রুমালে কপালের ঘাম মুছিতে লাগিলেন। বেয়ারা বলিল, তিনি যদি অপেক্ষা করিতে চাহেন, তাহা হইলে বাবাকে লইয়া কামরায় আসিয়া বসুন।

"আরে বাপু! অপেক্ষা যে করতেই হবে! তা হ'লে চলো, এই টাঙ্গাওয়ালা, আসবাব উতারো! দীপু, আয় বাবা!"

আসবাব কেন?—বেয়ারার বিস্ময় আরও বৃদ্ধি পাইল। এমনভাবে আসবাব-পত্র লইয়া সে কাহাকেও ত আসিতে দেখে নাই!

গাড়ী-বারান্দার সম্মুখেই সিঁড়ি-দেওয়া একটা প্রশস্ত উঁচু দালান, দালানের ডানহাতি একটা কামরায় সপুত্র স-লগেজ বাবুটিকে বসাইয়া আবার এক সেলাম দিয়া বেয়ারা নিজের কাযে গেল।

লগেজগুলি একবার দেখিয়া লইয়া, গাড়োয়ানকে বিদায় দিয়া বাবুটি একখানা ইজি-চেয়ারে বসিয়া পড়িলেন—অর্দ্ধশায়িতভাবে।

ঘরখানা তেমন বড় নহে। আসবাবপত্রের বাহুল্যও ছিল না; ম্যাটিং করা মেঝের উপর কেবল খান-কতক ছোট-বড় চেয়ার পাতা, একখানা টেবলও আছে, দেয়ালে দু'চারখানা ছবি। কিন্তু বেশ মানান-সই ও পরিচ্ছন্ন।

ছেলেটি কৌতূহলী হইয়া ঘরের এ-দিক্ ও-দিক্ ঘুরিয়া দেখিতে দেখিতে সানন্দে বলিয়া উঠিল, "বাঃ রে! বেশ সুন্দর ঘর ত, বাবা! আমাদের বাড়ীতে কিন্তু এরকম—"

—"আঃ! মিছে বকো না, দীপু! চুপ ক'রে বসো, ক্ষিধে পেয়ে থাকে যদি, তা হ'লে ঐ টিফিন-ক্যারিয়ারে খাবার রয়েছে।"

"বাবা! এরি মধ্যে ক্ষিদে পাবে কি! এই ত ইষ্টিসনে এতো খাবার খেলুম—"

"তবে বসো না একটু স্থির হয়ে।"

দীপু বসিল, কিন্তু বেশীক্ষণ নহে। একবার এ চেয়ারে, একবার ও চেয়ারে বসিয়া বাপের চিন্তামগ্ন গম্ভীর মুখপানে চাহিয়া সে ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করিল, "আমি একটু বাইরে যাই, বাবা? ঐ যেখানে ফুলের গাছ সব—প্রজাপতি উড়ছে কত—"

"যাও, কিন্তু ছুটোছুটি করো না, গেটের বাইরেও যেও না।"

দীপু খুসী-মনে বাহিরে গেল। তাহার বাবা একটা গভীর নিশ্বাস ফেলিয়া গালে হাত দিয়া আবার ভাবিতে লাগিলেন। সে ভাবনার যেন অন্ত নাই।

কতক্ষণ পরে মোটরের তীব্র হর্ণের শব্দে তাঁহার চিন্তাসূত্র ছিন্ন হইয়া গেল।

সচকিত শশব্যস্ত হইয়া তিনি জানালার সম্মুখে আসিয়া পর্দ্দার ফাঁকে দেখিলেন—একখানা টু সীটের বেবী-অষ্টিন 'কার'—একেবারে নূতন ঝক্‌ঝকে—দ্রুত ছুটিয়া আসিল গাড়ী-বারান্দায়, তাহাতে পাশাপাশি বসিয়া দু'জন;—লেডী ডাক্তার অমিয়া চ্যাটার্জ্জী এবং ডাক্তার মুখার্জ্জী।

বাবুটির রেখাঙ্কিত ললাট আরও কুঞ্চিত হইল, চক্ষু-যুগল জ্বলিয়া উঠিল।

লেডী ডাক্তারের বেশ-ভূষা অনাড়ম্বর অথচ সুশোভন, জরীর পাড় দেওয়া কালাপাড় দেশী শাড়ী পরিয়া, গায়ের শুভ্র লেডীস্ শালখানাও দেশী: বিলাতীর মধ্যে শুধু হাতে ঝোলানো হাণ্ড-ব্যাগটা। সুগঠিত দেহ, সুশ্রী মুখখানিতে চারু শান্ত কমনীয়তা। কৃষ্ণতার আয়ত চক্ষুটি প্রতিভার দীপ্তিতে সমুজ্জ্বল।

ডাক্তার মুখার্জ্জী হাট-কোট-চশমাধারী, পুরা-দস্তুর সাহেব। ফর্সা রং, গোঁফ কামানো, চেহারাটা গম্ভীর হইলেও মুখের ভাব বেশ হাসি-হাসি।

মোটর থামিতেই অমিয়া নীচে নামিয়া ডাক্তার মুখার্জ্জীর দিকে চাহিয়া বলিল, "আপনি নামবেন্ না কি?"

"নামব?—বড্ড বেলা হয়ে গেছে না?"

ডাক্তার সাহেব হাত তুলিয়া ঘড়ী দেখিলেন, তার পর অমিয়ার মুখপানে চাহিয়া বলিলেন, "আচ্ছা, চল।"

তিনিও নামিয়া পড়িলেন।

বাবুটি এবার সন্ত্রস্তভাবে জানালা হইতে সরিয়া দাঁড়াইতেছিলেন, সাহেব যদি এই ঘরেই আসেন; কিন্তু তাহা হইল না। সোফারকে অপেক্ষা করিতে বলিয়া তিনি অমিয়ার সঙ্গে সোজা বাড়ীর ভিতর চলিয়া গেলেন।

ডাক্তার সাহেবের এ বাড়ীতে অবারিত দ্বার। সঙ্কোচ-সম্ভ্রমের বালাই নাই, লেডী ডাক্তারের সঙ্গে তাঁহার অতটা ঘনিষ্ঠতা ব্যবসাসূত্রে হইলেও একটুকু স্নেহ-প্রীতির সংস্পর্শও ছিল যেন। অন্ততঃ চাকর-বাকররা এইরূপ ঘনিষ্ঠতা

দেখিয়া ভাবিয়া লইয়াছিল, এই ডাক্তার মুখার্জ্জীই এক দিন এ-বাড়ীর মালিক হইবেন।

সত্য মিথ্যা ভগবান্ জানেন।

উভয়ে দৃষ্টির অন্তরালে চলিয়া গেলেও ভদ্রলোকটি সেইখানে নিশ্চল স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

লাল সুরকি দেওয়া রাস্তাটির দুই ধারে লাল, নীল, গোলাপী, হলদে কত রং-বেরংএর বিচিত্র মরসুমী ফুলের সমারোহ। নানা বর্ণের প্রজাপতি রঙ্গীন পাখনা মেলিয়া দলে দলে ফুলে ফুলে ফিরিতেছে।

বিভ্রান্তভাবে সে দিকে চাহিয়া বাবুটি বুঝি কোন বিস্মৃত স্মরণের চেষ্টা করিতেছিলেন। শেষ মাঘের দীপ্ত সোনালী রৌদ্রচ্ছটা তাঁহার পলকহারা চোখের দৃষ্টিতে যেন ঝাপসা হইয়া উঠিয়াছে!

"হ্যা বাবা, ঐ যে মোটরে ক'রে সায়েব মেম এলো, ওরা গেল কোথায়?"

সে প্রশ্নে চকিত হইয়া বাবুটি চাপা-গলায় ধমক দিয়া বলিয়া উঠিলেন, "আঃ! বললুম চুপ ক'রে থাকতে, তা নয়—বকর্ বকর্ করবে খালি!"

বালক থতমত ভাবে কোণের দিকে রাখা ছোট চেয়ারখানায় গিয়া বসিল।

'বাস্তবিক—কি অভাবনীয় আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন!—আঁ্যা?'

আত্মগতভাবে কথাটা বলিয়া ভদ্রলোক আবার একটা সুদীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন।

দুই

স্নান-আহারের সময় উত্তীর্ণপ্রায়, তখনও মুখার্জ্জী সাহেব উঠি উঠি করিয়াও উঠিতে পারিতেছিলেন না।

লোকে ডাক্তার মুখার্জ্জীকে খুব গম্ভীরপ্রকৃতি ও স্বল্পভাষী বলে, কিন্তু অমিয়ার সঙ্গে কথা বলিবার সময় তিনি যেন পঞ্চমুখ হইয়া উঠেন।

প্রথমে আজকের রোগীর বিষয়, তার পর অন্য পাঁচটা অবান্তর কথা তুলিয়া ডাক্তার গল্পটা দস্তুরমত জমাইবার চেষ্টা করিতেছিলেন। বেয়ারা বেগতিক দেখিয়া মেম সাহেবকে জানাইল, এক জন বাঙ্গালী-বাবু ঘণ্টাখানেক হইল অপেক্ষা করিতেছেন; সঙ্গে আসবাব-পত্র এবং একটি ছেলেও আছে। বাবুটি বোধ হয় অনেক দূর হইতে আসিয়াছেন।

আঃ! এমন অসময়ে কে আবার—

ডাক্তার সাহেব আকস্মিক রসভঙ্গে বিরক্ত হইয়া অমিয়াকে কিছু বলিবার অবকাশ না দিয়াই হুকুম করিলেন, "উন্‌কো নাম-কা কার্ড লে আও না?"

মিনিট পাঁচ পরে বেয়ারা এক টুকরা কাগজ আনিয়া অমিয়ার হাতে দিল। পেন্সিলে লেখা:—প্রভাসচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বর্দ্ধমান।

সেই লেখায় চোখ পড়িতেই অমিয়া এমন চমকিয়া উঠিল যে, তাহার হাত হইতে কাগজটুকু খসিয়া টেবলের নীচে পড়িয়া গেল।

ডাঃ মুখার্জ্জী বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হ'ল, অমিয়া?"

অমিয়া বাঁ হাতে কপালটা টিপিয়া ধরিয়া বিবর্ণ মুখে বলিল, "কি জানি কেন, মাথাটা কেমন ঘুরে উঠল হঠাৎ, আজ বড্ড বেশী ক্লান্ত হয়ে পড়েছি যেন।"

"তা হ'লে স্নানাহারটা সেরে নাও এখন, ও বাবুটি একটু বসুন না। আচ্ছা, আমি এখন উঠি, গুড বাই!"

ডাক্তার সাহেব বিদায় হইলে অমিয়া উর্দ্ধদৃষ্টিতে খানিক চুপ করিয়া থাকিয়া বেয়ারাকে বলিল, "উন্‌কো এহিঁ পর লে আও।"

"এহিঁ পর!"—এই ড্রয়িংরুমে যাহাদের পায়ের ধূলা পড়িয়া থাকে, তাঁহারা সকলেই মেমসাহেবের বিশেষ পরিচিত, তবে এ লোকটা—

বেশ একটু আশ্চর্য্যভাবেই বেয়ারা মনিবের হুকুম পালন করিতে গেল।

আয়া আসিয়া বলিল, "মেম সাব! গোসলখানামে গরম পানি—"

"অভি ঠ্যায় রো।"

টেবলে শ্লথ বাহু দুটি ছড়াইয়া দিয়া বাহুর মধ্যে মুখ গুঁজিয়া অমিয়া বসিয়াছিল। অবশপ্রায় দেহখানা দুলিয়া দুলিয়া উঠিতেছিল চাপা নিশ্বাসের বেগে। বারান্দায় পদশব্দ হইতেই সে তাড়াতাড়ি সোজা হইয়া উঠিয়া রুমালে মুখ মুছিতে লাগিল।

বেয়ারার সঙ্গে সেই ভদ্রলোক ও ছেলেটি।

অমিয়া সে দিকে একবার চাহিয়াই চকিতে চোখ

নামাইয়া লইল। তাহার আননে তখন রক্তলেশমাত্র যেন ছিল না।

আগন্তুকের মুখ-চক্ষুতেও একটা আশ্চর্য্য ভাবান্তর দেখা গেল।

এক মুহূর্ত্ত পাপোষের উপর থমকিয়া দাঁড়াইয়া তিনি আস্তে আস্তে মুলতানী গালিচার উপর দিয়া অমিয়ার পাশের চেয়ারখানা একটু তফাৎ করিয়া বসিয়া পড়িলেন। তার পর অমিয়ার মুখের পানে অপাঙ্গে দৃষ্টিপাত করিয়া বাধ-বাধ কণ্ঠে তিনি বলিলেন, "কত কষ্টে, কত চেষ্টায় তোমার সন্ধান করতে পেরেছি যে—ওঃ!"

অমিয়া আত্মস্থ হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কেন?"

অকুণ্ঠিত সে প্রশ্ন। প্রশ্নকারিণীর কণ্ঠস্বরেও সঙ্কোচ বা জড়তার লেশমাত্র নাই।

প্রভাস বাবু একটু থামিয়া স্খলিত-কণ্ঠে বলিলেন, "এ দিকে আসতে হ'ল কাযের চেষ্টায়, তাই ভাবলুম—এত দূরে এসেছি, তখন একবার দেখেই যাই—"

অমিয়ার ওষ্ঠপ্রান্তে কুটিল হাসির বক্ররেখা দেখা দিল। সে হাসি তীক্ষ্ণধার ছুরীর ফলার মত শাণিত। দীপুর দিকে চাহিয়া সে জিজ্ঞাসা করিল, "এ ছেলেটি?"

"এটি আমার ছেলে :—ওঁকে নমস্কার কর, দীপু!"

দীপু এতক্ষণ বাপের চেয়ার ধরিয়া জড়সড়ভাবে দাঁড়াইয়াছিল। সে হাত দুইটি যুক্ত করিয়া নমস্কার করিল। অমিয়ার পা দু'খানা টেবলের তলায় অন্তর্হিত, কাযেই পদধূলি লওয়া সম্ভব হইল না।

"থাক, থাক, হয়েছে, তুমি বসো, খোকা!"

দীপুকে পাশে বসাইয়া অমিয়া তাহার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। ছেলেটি মন্দ না ত! রংটাও বেশ ফরসা আছে, কিন্তু ভারী রোগা। শীর্ণ মুখখানিতে টিকটিকে নাকটি আর ডাগর চোখ দুটি একটু বেমানান লাগে যেন। সে চোখের দৃষ্টি বড় নম্র, বড় স্নেহাতুর, দেখিলেই মায়া হয় মনে।

দীপুর একখানি হাত হাতের মুঠায় ধরিয়া অমিয়া কোমল-কণ্ঠে বলিল, "তুমি এত রোগা কেন, দীপু?"

ছেলের দিকে চাহিয়া দীপুর বাবা সহানুভূতির সুরে বলিলেন, "এত বেশী রোগা ও ছিল না, কিন্তু এবার ম্যালেরিয়ায় ভুগে ভুগে—তারপর যত্নও ত পায় না বেচারা—"

"কেন?"

"কে করবে যত্ন? যার মা নেই—নীহার মারা গেছে কি না—এই কার্ত্তিক মাসে। অসুখ-বিসুখ কিছুই নয়—প্রসব হ'তে গিয়ে—"

"ও!"

সেই ক্ষুদ্র শব্দটুকুর মধ্যে কেবল সহানুভূতিই নহে, আরো এমন কিছু ছিল, যাহা সহজে ধরা যায় না।

"তুমি স্নান করবে, খোকা? না, থাক—বড্ড বেলা হয়ে গেছে। অম্‌নি হাত-মুখ ধুয়ে দুটি খেয়ে নেবে চলো।"

দীপুর হাত ধরিয়া অমিয়া ভিতরে চলিয়া গেল।

দীপুর বাবা এতক্ষণে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিলেন। চেয়ারের পিঠে মাথা হেলাইয়া প্রশংসমান দৃষ্টিতে তিনি দেখিতে লাগিলেন ড্রয়িংরুমের সুরুচিসঙ্গত সুন্দর সাজসজ্জা। শুধু এই ঘরখানাই কি? সমস্ত বাড়ীটাই কি নিপুণভাবে সুশৃঙ্খলতার সহিত সাজানো। আর এ গৃহের অধিকারিণী? অপূর্ব্ব! কে বলিবে এ সেই অমিয়া? এ যে কল্পনার অতীত, স্বপ্নের চেয়েও আশ্চর্য্য!

বাস্তবিক জগতে অসম্ভব কিছুই নাই বুঝি?

তিন

"তুমি একটু ঘুমোলে না, খোকা?"

অমিয়ার শয়নঘরের পশ্চাতে—এক যায়গায় সারি সারি সূর্য্যমুখী গাছ, তাহাদের শাখায় কুঁড়ি ধরিয়াছে, দু'চারটি ফুলও ফুটিয়াছে। পীতোজ্জ্বলচ্ছটায় গাছগুলি আলোকিত।

দীপু সেখানে চুপি চুপি প্রজাপতির সন্ধানে ঘুরিতেছিল। তাহার বাবা আহারাদির পর ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন অঘোরে, সেই ফাঁকে দীপু পলাইয়া আসিয়াছে। অমিয়ার সহসা আগমনে সে একটু থতমত খাইয়া বলিল, "না, আমি ত রেলে সমানে ঘুমিয়েছিলুম, বাবাই জেগে বসেছিলেন সমস্ত রাত্তির।"

দীপুর কাছে আসিয়া তাহার মুখের পানে নীরবে খানিক চাহিয়া থাকিয়া অমিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার এখানে কেমন লাগছে, ভাল?"

"ওঃ! খুব! আমাদের বর্দ্ধমানের বাড়ী ছোট্ট, এমন সুন্দর বাগানও নেই সেখানে।"

"আচ্ছা, দীপু!—তোমার নাম দীপু না?"
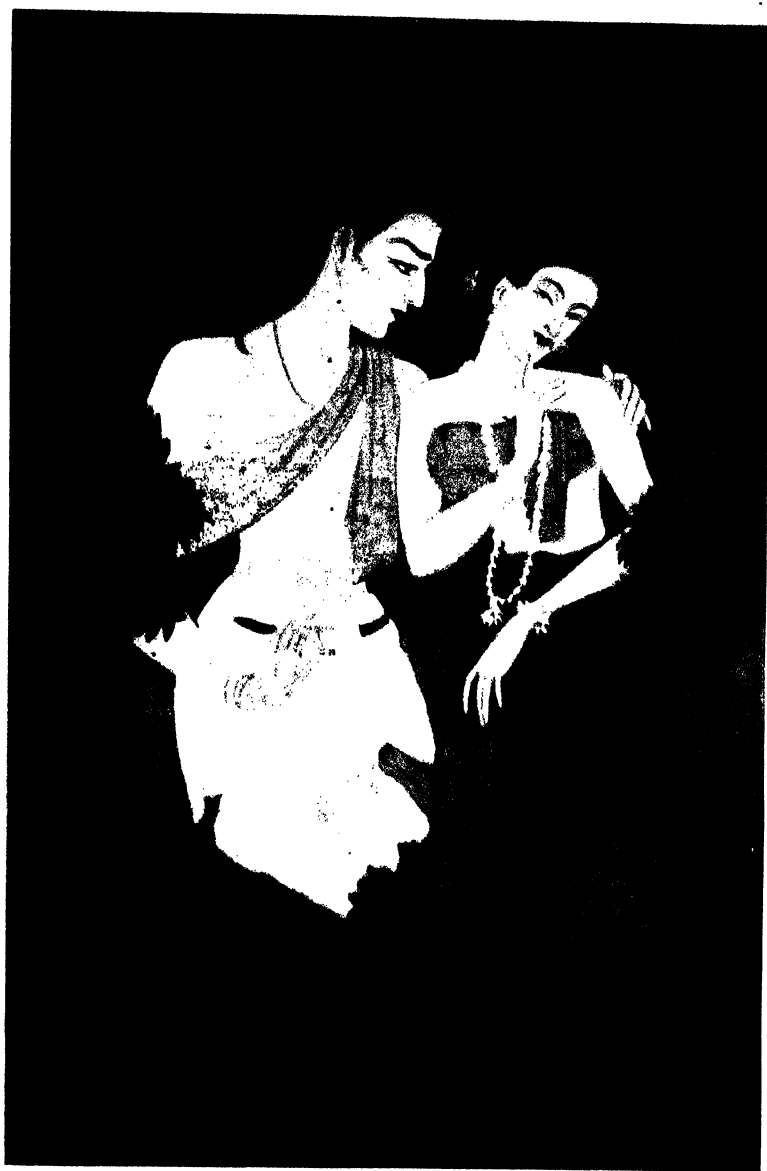
অভিজ্ঞান

আষাঢ়, ১৩৪৩] [শ্রীঅরুণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

"হ্যাঁ, আমাকে দীপু বলেই ডাকে সকলে, কিন্তু আসল নাম হচ্ছে আমার দীপক।"

"বাঃ! সুন্দর নাম ত!"

"এ নাম আমার মায়ের রাখা!"

বালকের উৎসাহদীপ্ত চোখ দুটিতে পলকে বেদনার ম্লান ছায়া ঘনাইয়া আসিল।

"বেশ নাম তোমার।"

অমিয়া তাহার পিঠের উপর হাত রাখিয়া স্নিগ্ধ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা দীপু! তোমাদের বর্দ্ধমানের বাড়ীতে এখন কে কে আছেন?"

"কে আর থাকবে? আমরা ত চলেই এলুম, খুকীকে বাবা পিসীমার কাছে রেখে এলো, সে এখনো ছোট্ট কি না!"

"তোমার আর ভাই বোন নেই বুঝি?"

"না, ঐ খুকীই—"

"আর তোমার ঠাকুমা?"

"ঠাকুমা?—ঠাকুমা ত নেই, আমার ত মনেই পড়ে না তাঁকে—"

"ও!"

আয়া খবর দিল, উকীল মাতাপ্রসাদ গাড়ী পাঠাইয়াছেন, তাঁহার স্ত্রীর তবিয়ৎ বড় খারাপ। একবার মেহেরবাণি করিয়া যদি—

"তাঁকে অপেক্ষা করতে বলো।"

অমিয়া দীপুকে বলিল, "আচ্ছা, তুমি এখন খেলা করো, দীপু, আমি যাই, আমার ফিরতে যদি দেরী হয়, তা হ'লে—"

"কোথায় যাবেন?"

"রুগী দেখতে।"

"ও! তুমি—আপনি বুঝি ডাক্তার? লেডী ডাক্তার না?"

"হ্যাঁ, তুমিও ডাক্তার হবে, কেমন?"

আদর করিয়া দীপুর থুঁৎনীটা নাড়িয়া দিয়া অমিয়া চলিয়া গেল।

দীপুর বড় বড় চোখদুটি বিস্ফারিত হইয়া উঠিল গভীর বিস্ময়ে। আর এক জন লেডী ডাক্তার তাহার মায়ের অসুখের সময় আসিয়াছিলেন; তাঁহাকে দেখিয়া দীপুর কি রকম ভয় হইয়াছিল! খুকীটা ত কেঁদেই অস্থির। কিন্তু ইনি ত বেশ! ডাক্তার বলেই মনে হয় না। কেমন মিষ্ট কথা, কত আদর-যত্ন করিতেছেন তাহাকে।

"বাবা! ও বাবা! ওঠো, চা খেতে ডাকছেন যে—"

ছেলের ডাকে প্রভাস বাবু বিছানার উপরে উঠিয়া বসিলেন। চোখ মুছিতে মুছিতে এদিক ওদিক দেখিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "কই? কে ডাকছে?"

"ওই যে উনি—লেডী ডাক্তার।"

"ওঁকে তুমি মা বোলো, বুঝলে?"

"আচ্ছা, কিন্তু উনি যদি রাগ করেন?"

দীপুর বাবা একটু ভাবিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, "না, রাগ করবেন কেন?"

দীপু খুসী হইয়া বলিল, "বেশ, তাই বলব'খন। তুমি চলো বাবা, চা ঠাণ্ডা হয়ে যাবে যে!"

কুঁজোর জল লইয়া চোখে মুখে দিয়া দীপুর বাবা বলিলেন, "চলো, কোথায় যেতে হবে?"

"খাবার ঘরে, ওই যে, যেখানে আমরা ভাত খেয়েছিলুম।"

প্রভাস বাবু ছেলের হাত ধরিয়া খাবার ঘরে গিয়া দেখিলেন, টেবলের উপর চায়ের সরঞ্জাম সাজাইয়া অমিয়া বসিয়া আছে দরজার পানে চাহিয়া। তাহার এ প্রতীক্ষা প্রভাস বাবুর সংশয়-ক্ষুব্ধ মনকে পুলকিত করিয়া তুলিল। আসন গ্রহণ করিয়া তিনি হর্ষোৎফুল্ল স্বরে বলিলেন, "বড্ড ঘুমিয়ে পড়েছিলুম, এমন নিশ্চিন্তে কত দিন যে ঘুম হয় নি!"

অমিয়া হেঁট হইয়া চা ঢালিতেছিল। যেটাতে দুধের ভাগ বেশী, সে কাপটা দিল দীপুকে, অন্যটা প্রভাস বাবুকে, একখানা ফুলকাটা কাচের ডিসে খানকতক 'সিঙ্গাড়া' আর 'দালমুট' রাখা ছিল, সেখানাও আগাইয়া দিল।

"এ আবার কি? দুপুরবেলা যে খাওয়া খাইয়েছ, তাই এখনো হজম করতে পারিনি, তার ওপর আবার জলখাবার,—দীপু—"

"দীপুকে এ ঘিয়ের খাবার না দিলেই ভাল হয়, ওর লিভার বেড়েছে।"

"বটে! তাই এত ভুগছে বেচারা! তা হ'লে ত ওর

খাওয়া-দাওয়ার ধরকাট করা দরকার, কিন্তু কি ক'রে তা হয়? আমার যে কিছুরই ঠিক নেই—"

প্রভাস বাবু একটা নিশ্বাস ফেলিলেন ছেলের পানে তাকাইয়া। দীপু খাবারের প্লেটের দিকে লুব্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া আছে দেখিয়া অমিয়া বলিল, "ওগুলো বড় ঝাল, তুমি খেতে পারবে না, তার চেয়ে এই খাও এখন, ওবেলা তোমার জন্যে ভাল বিস্কুট চকোলেট সব আনিয়ে দেব।"

মাখন-মাখান পাঁউরুটীতে আধ-সিদ্ধ একটা ডিমের কুসুম মাখাইয়া আনিয়া দীপুকে খাইতে দিল। বলিল, "দেখ দেখি, কেমন লাগে?"

দীপু এক কামড় মুখে দিয়া খুসী হইয়া বলিল, "খুব ভাল!"

দীপুর বাবা চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিতে দিতে ছেলের খাওয়া দেখিতে লাগিলেন পরম পরিতৃপ্তির সঙ্গে। এক বেলাতেই তাহার চেহারার শ্রী ফিরিয়া গিয়াছে যেন! আহা! এমনই একটু যত্ন-আত্তি সে পায় যদি! প্রকাশ্যে তিনি বলিলেন, "এ রকম যত্ন পেলে ও এত দিন ভুগতো না, কিন্তু কে করবে? ওর মা—"

"মা না থাকলে বাপকেই করতে হয় যে, এটা ত কর্ত্তব্য।"

গম্ভীরভাবে কথাটা বলিয়া অমিয়া অতিথিকে আর এক কাপ চা পরিবেষণ করিল।

দীপুর বাবা বিমর্ষভাবে বলিলেন, "ঠিক কথা, কিন্তু আমার ত শুধু ছেলে-পিলে আগলে ঘরে ব'সে থাকা চলবে না। এদ্দিনকার চাকরী, তা-ও গেল, এখন পেটের জ্বালায় যে কোথায় কোথায় ঘুরতে হয়, মেয়েটাকে তাই বীণার কাছে রেখে এলুম, সে-ও আবার পরবশ—কি আর করা যায়?—ওদের ভাগ্য! পাঁচটির মধ্যে এই দুটি, তার এই দুর্গতি। আমিও আর পারি না, দেহমন ভেঙ্গে পড়েছে যেন, দুটো দিন জিরোতে পারলে বাঁচতুম।"

ক্লান্ত কণ্ঠস্বর ব্যথায় আর্দ্র। অমিয়া এতক্ষণ পরে চোখ দুটি তাহার মুখের পানে তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "এখন কোথায় যেতে হবে?"

"তা কেমন ক'রে বলা যায়? ঠিক তো কিছু নেই, তবে কানপুরে—সুধীরের কাছে গেলে একটা সুবিধে হ'তে পারে, তাই মনে করেছি প্রথমে সেখানে—"

"তাড়াতাড়ি না থাকে যদি, তবে দিন কতক বিশ্রাম ক'রে—তোমার খাওয়া হয়ে গেছে দীপু, আচ্ছা বসো।"

অমিয়া ন্যাপকিন্ দিয়া দীপুর মুখ-হাত পরিষ্কার করিয়া দিল।

দীপু বলিল, "এইবার আমি বাগানে যাই?"

"যাও।"

দীপুর বাবা বলিলেন, "গাছ-পালা কিছু নষ্ট করো না যেন!"

দীপু চলিয়া গেলে প্রভাস বাবু দ্বিতীয় পেয়ালা এক চুমুকে নিঃশেষিত করিয়া খানিক নিঃশব্দে বসিয়া রহিলেন। তার পর কুণ্ঠিতস্বরে ডাকিলেন, "অমিয়া!"

অমিয়া চমকিয়া উঠিল। বিস্মৃতির তলে চাপা পড়িয়া যাওয়া সে ডাক যে তাহার অনেক—অনেক কাল আগের শোনা—এক যুগেরও বেশী হইয়া গেল!

"ভুল-ভ্রান্তি মানুষমাত্রেরই হয়ে থাকে, কিন্তু—আমার অপরাধ ক্ষমার অতীত, তবু তুমি যদি দয়া ক'রে আমাকে ক্ষমা চাইবার অধিকার দাও, অমিয়া—"

"থাক, যা হয়ে গেছে, তা হয়ে গেছে, তার জন্যে আমার মনে আর একটুকু গ্লানি কি আপশোস নেই ত।"

অমিয়া চায়ের খালি পেয়ালাগুলি একপাশে সরাইয়া রাখিয়া ফুলদানি হইতে ঝরিয়া-পড়া গোলাপের পাপড়ি ক'টি তুলিয়া নখ দিয়া খুঁটিতে লাগিল। কথাগুলি বেশ সহজ ভাবেই বলা হইলেও তাহার মধ্যে যে একটা নির্লিপ্ত ঔদাস্যের ভাব ছিল, তাহা প্রভাস বাবুকে এমন অভিভূত করিয়া তুলিল যে, কতক্ষণ তাঁহার মুখে আর বাক্‌স্ফূর্ত্তি হইল না।—একটুও আপশোষ নেই আর?—কেনই বা থাকবে? আপশোষের কোনো হেতুই যদি না থাকে—

বেহারা আসিয়া জানাইল, ডাক্তার সাহেব আসিয়াছেন। তাঁহাকে কি এখানেই—

"—না।"

অমিয়া শশব্যস্তে উঠিয়া পড়িল। ঘর হইতে বাহির হইবার সময় সে একবার প্রভাস বাবুর দিকে ফিরিয়া বলিয়া গেল, "আমাকে এখন বেরোতে হবে, ফিরতে রাত হয় যদি, তোমরা খাওয়া-দাওয়া ক'রে নিয়ো—আমার অপেক্ষা না ক'রে।"

চার

রাত্রি অনেক।

দীপু আহারাদির পর ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। প্রভাস বাবু খবরের কাগজ দেখিতেছিলেন, পড়ায় তাঁহার মন ছিল না একটুও, কেবল সময় কাটাইবার জন্যই হয় ত।

রাস্তায় গাড়ী-ঘোড়া-চলাচলের শব্দ কাণে গেলেই তিনি উৎকর্ণ হইয়া উঠেন, তাঁহার উৎসুক দৃষ্টি পর্দার ফাঁকে বাহিরে উধাও হইয়া যায় থাকিয়া থাকিয়া।

অমিয়া কখন্ ফিরিবে কে জানে? রোগী দেখা কি এতক্ষণেও—সে যে রোগী দেখিতেই গিয়াছে, তাহারই বা কি নিশ্চয়তা! কি জ্বালা, অমিয়া কোথায় যায়, না যায়, কি করে, না করে, সে খোঁজে তাঁহার কায কি? অধিকারই বা কি খোঁজ লইবার?—তিনি কেবল অতিথিই নহেন, প্রত্যাশী হইয়া অনাহূতভাবে ইহার দুয়ারে আসিয়াছেন!

একটা বিচ্ছুরিত উজ্জ্বল আলোকচ্ছটা সম্মুখের রাস্তায় আসিয়া পড়িল। সঙ্গে সঙ্গে মোটর ব্রেক করার সর্ সর্ শব্দ পরক্ষণেই অমিয়াকে গেটের কাছে নামাইয়া দিয়া 'কার'খানা ফিরিয়া চলিয়া গেল।

প্রভাস বাবু একবারটি বাহিরে পা দিয়াই তাড়াতাড়ি বিছানায় আসিয়া বসিলেন। বারান্দায় লেডিস 'সু'র শব্দ হইল। সে শব্দের তালে তালে প্রভাস বাবুর বুকের স্পন্দন দ্রুত হইয়া উঠিল যেন। অমিয়া দরজার পর্দা সরাইয়া মৃদু কণ্ঠে ডাকিল, "দীপু!"

"দীপু ঘুমিয়েছে।"

"ঘুমিয়েছে?"

ঘরের ভিতর মুখ বাড়াইয়া ঘুমন্ত দীপুর দিকে খানিক চাহিয়া অমিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তোমাদের খাওয়া হয়েছে ত?"

"অনেকক্ষণ। তুমি এখনি এলে বুঝি?"

"হ্যাঁ, ডাক্তার মুখার্জ্জী আমায় নামিয়ে দিয়ে গেলেন।"

প্রভাস বাবুর মুখে চোখে ক্ষণিকের যে আনন্দ-দীপ্তিটুকু উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল, তাহা মিলাইয়া গেল। শরীরের সমস্ত শিরা-উপশিরা যেন ঝন্ ঝন্ করিয়া উঠিল একটা অসম্বরণীয় উত্তেজনার বেগে।

"আচ্ছা, আমি এখন যাই। রাত হয়েছে খুব। কোনো অসুবিধে হ'লে জানিও, সর্ব্বদা দেখা-শোনা করার সময় যদি হয়ে না ওঠে, তাই ব'লে রাখলুম।"

অমিয়া তখনই চলিয়া গেল।

প্রভাস বাবু বিমূঢ়ের মত বসিয়া রহিলেন। খানিক বাদে অমিয়ার আয়া পাণ লইয়া আসিল। পাণের সঙ্গে জর্দ্দা—আশ্চর্য্য!

প্রভাস বাবু তাহাকে ব্যগ্রতার সঙ্গে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মেম সায়েব কি করছেন?"

আয়া উত্তর দিল, "তিনি এই মাত্র শুতে গেলেন।"

"এরি মধ্যে? খাওয়া হয়ে গেছে তাঁর?"

"না, মেম সায়েব খেয়ে এসেছেন।"

একটুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া আয়া বলিল, "বাবুজীর যদি আর কিছু দরকার থাকে—"

প্রভাস বাবু মাথা নাড়িলেন,—"উঁহু।"

আয়া চলিয়া গেল। প্রভাস বাবু গালে হাত দিয়া ভাবিতে লাগিলেন—'আশ্চর্য্য! পাণে জর্দ্দা খাওয়া—সেটুকুও মনে আছে, এত দিন—এত কাল পরেও! কিছুই ভুল হয় নি আতিথ্যের দিক থেকে, কর্ত্তব্যের দিক থেকে, কোনো খানটায় এতটুকু ফাঁক পড়ছে না ত?—কেবল আসলেই ফাঁকি! কিন্তু এই ফাঁকি পড়ার জন্য দায়ী কে? অন্তরের জিনিষকে দূরে ঠেলে দিয়ে যে হতভাগা স্বেচ্ছায় এই দুর্লঙ্ঘ্য ব্যবধান রচনা করেছে, সে-ই না?'

এই যে সযত্ন অতিথি-সৎকার—ইহাতে আন্তরিকতার স্পর্শও আছে কিছু। ইহাও যদি ভাগ্যে না ঘটিত, অমিয়া যদি বেয়ারাকে দিয়া ঘাড় ধরিয়া তাঁহাকে আজ গেটের বাহির করিয়া দিত, তাহাতে এ পক্ষ হইতে অনুযোগ অভিযোগ করিবার কি ছিল? কিছুই না—তবে?—

এক দিন যাহা অযাচিতভাবে পাইয়া হেলায় হারাইয়াছেন, তাহা পাইবার জন্য এমন নির্লজ্জ কাঙ্গালপনা কেন?

কে জানে? বড় অদ্ভুত, বড় বিচিত্র মানুষের মন!

সুসজ্জিত কক্ষে, দুগ্ধ-শুভ্র কোমল শয্যায় শয়ন করিয়া বিনিদ্র প্রভাস বাবু ছট্‌ফট্ করিতে লাগিলেন যন্ত্রণাগ্রস্ত রোগীর মত।

অন্য ঘরে অমিয়াও জাগিয়া ছিল।

নিশ্চেষ্টভাবে চক্ষু মুদিয়া সে ভাবিতেছিল—কত রাজ্যের এলোমেলো ভাবনা।

বাল্য ও কৈশোরের কত স্মরণীয় ঘটনা—সুদূর অতীতে হারাইয়া গেলেও এখনও তাহা মনে পড়ে। আজ অতীত যেন সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল একটা অস্বস্তিকর অভিনব অনুভূতির প্রেরণায়।

অমিয়ার পিতা মা-হারা মেয়েটিকে কত যত্নে—কত আদরে পালন করিয়াছিলেন। কন্যাকে বয়স্থা ও সুশিক্ষিতা করিয়া যোগ্যপাত্রে অর্পণ করিবেন, ইহাই ছিল তাঁহার মনোগত অভিলাষ। কিন্তু অসময়ে কালের আহ্বানে তাঁহাকে অকস্মাৎ চলিয়া যাইতে হইল।

পিতার নিরাপদ আশ্রয় হারাইয়া অমিয়া এলাহাবাদে তাহার জ্যাঠামশায়ের কাছে আসিল—পিতৃদত্ত হাজার তিনেক টাকা লইয়া। সেই টাকার কিয়দংশ ব্যয় করিয়া জ্যাঠামশায় কিশোরী অমিয়ার একটা সম্বন্ধ করিয়া দিলেন। কাযটা তিনি বুদ্ধিমানের মতই করিয়াছিলেন, তাহাতে কোনও ভুল নাই, কিন্তু বিবাহের সময় কন্যাকে অলঙ্কার ও যৌতুকাদিতে কিঞ্চিৎ হেরফের করিয়া জ্যাঠামশায় যে অতিবুদ্ধির পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহার ফলভোগ করিতে হইল অমিয়াকে।

শাশুড়ীর নিরুকণ বিমুখ মন আর প্রসন্ন হইল না। অমিয়া অনেক চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু শাশুড়ী প্রসন্ন হইলেন না। প্রভাস অত্যন্ত অনুগত ও বাধ্য পুত্র ছিল। অমিয়ার প্রতি স্বামীর কর্ত্তব্য-পালনে সে আগ্রহ সত্ত্বেও দুর্ব্বলতা প্রকাশ করিয়াছিল। কিশোরী পত্নীর প্রতি সহজাত প্রেম প্রকাশেও সে সাহস করিত না। কাযেই স্বামিগৃহে পাওয়ার মধ্যে সে পাইয়াছিল শুধু অনাদর আর উৎপীড়ন—তাহাও সহ্য করিয়াছিল নীরবে, নির্ব্বিবাদে একটি বৎসর। তাহার কষ্টের কথা শুনিতে পাইয়া জ্যাঠামশায় একবার অমিয়াকে লইতে আসিয়া ফিরিয়া গিয়াছিলেন—অপমানিত হইয়া। কিন্তু তাহার কিছু দিন পরেই প্রভাসের মাতাঠাকুরাণী বধূর স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সহসা সচেতন হইয়া এক দিন তাহাকে আপনা হইতেই বাপের বাড়ী পাঠাইয়া দিলেন, তখন অমিয়া যেন হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল। কিন্তু তাহার জ্যাঠাইমার মনে একটা খটকা লাগিয়া গেল। বেহানের এই অযাচিত করুণার মূলে কোনও গোপন অভিসন্ধি নাই ত?

অমিয়াকে নীরোগ, কিন্তু নিরাভরণা দেখিয়াই তাঁহার এ রকম সন্দেহ হইয়াছিল বোধ হয়, কিন্তু সন্দেহটা মিথ্যা নহে। বহু দিন যাবৎ জামাতার কোনো সংবাদ না পাইয়া তাহার রাগের আশঙ্কায় অমিয়ার জ্যাঠামশাই যখন মেয়েকে লইয়া নিজেই রাখিতে গেলেন শ্বশুরবাড়ী, তখন সে বাড়ীর দুয়ার অমিয়ার জন্য বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। তাহার স্থান অধিকার করিয়াছিল আর একটি অপরিচিতা তরুণী!

তবুও হিন্দু মেয়ের পতি ছাড়া আর গতি নাই, স্বামি-গৃহের আস্তাকুড় ঝাঁট দিয়া খাওয়াও নাকি তাহাদের পক্ষে পরম গৌরবের বিষয়—তাই বেচারী অমিয়া শাশুড়ী ও স্বামীর পায়ে ধরিয়া কত কাকুতি-মিনতি—কত কান্নাকাটি করিয়াছিল—সে বাড়ীর একটি কোণে একটুকু আশ্রয় পাইবার জন্য; কিন্তু তাহাও তাহার ভাগ্যে ঘটে নাই। নিরাশ হইয়া তাহাকে ফিরিতে হইল—অমিয়ার বধূ-জীবনের এইখানেই পরিসমাপ্তি।

জ্যাঠামশায়ের আশ্রয়ে আসিয়াও সে এবার শান্তি পাইল না আর। জ্যাঠামশায়ের বিরক্তি, জ্যাঠাইমার স্নেহহীন অকরুণ আচরণ অমিয়াকে অতিষ্ঠ করিয়া তুলিল।

স্বামি-গৃহের কষ্ট-নির্য্যাতন সে সহ্য করিয়াছিল নীরবে, সে জন্য কোনও অনুযোগ অভিযোগও কাহাকেও সে জানায় নাই কখনও; কিন্তু এবার আর তাহা সম্ভব হইল না। বারবার আঘাতের পর আঘাত পাইয়া কিশোরীর কোমল চিত্ত ক্রমশঃ কঠিন ও বিদ্রোহী হইয়া উঠিয়াছিল; তাই অসহিষ্ণু, উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া অমিয়া এক দুঃসাহসের কায করিয়া বসিল।

হাতের সোণাবাঁধানো শাঁখা দু'গাছি আর পনেরোটি টাকা সম্বল করিয়া অমিয়া এক দিন হঠাৎ রাতারাতি কাণপুরে চলিয়া গেল। সে দেশে তাহার এক দূর-সম্পর্কের মাসী থাকিতেন, তাঁহার ঠিকানাও সঠিক জানা ছিল না। তবু সেখানে পৌঁছিয়া খোঁজ করিয়া লইতে পারিবে, এই ভরসা তাহার ছিল; কিন্তু কাণপুর ছোটখাটো সহর নহে। খোঁজ করিবে কোথায়? খোঁজ না পাইলে সে

যাইবেই বা কোথায়? ফিরিবার পথও যে এখন বন্ধ! অমিয়া ফাঁপরে পড়িয়া গেল।

বহু লাঞ্ছনা—বহু বিড়ম্বনার পর বিপন্না নিরাশ্রয়া বালিকা শেষে অকূলে কূল পাইল। আর্য্য সমাজের জনৈক প্রধান আচার্য্য তাহাকে আশ্রয় দিলেন। সে আশ্রয় না পাইলে অমিয়া প্রতিকূল ঘটনার স্রোতে পড়িয়া এত দিন কি জানি কোন্ অতলে তলাইয়া যাইত।

কত কষ্টে, কত চেষ্টায় অমিয়া তাহার বিড়ম্বিত তুচ্ছ জীবনটাকে আবার নূতন করিয়া গড়িয়া তুলিয়াছে। অতীতের ব্যথা-গ্লানি সব নিঃশেষে মুছিয়া ফেলিয়া উজ্জ্বল ভবিষ্যৎকে উজ্জ্বলতর করিবে বলিয়া সে বদ্ধপরিকর! এমন সময় হঠাৎ এ কি বিপত্তি?

স্বামী—স্ত্রীর ইহ-পরকালের দেবতা, দোষ-গুণ বিচার না করিয়া কায়মনে তাঁহার সেবা করাই পতিব্রতার ধর্ম্ম, এ বিশ্বাস এক দিন অমিয়ার মজ্জাগত ছিল; কিন্তু সে দিন আর আছে কি? এখন যুগধর্ম্মে তাহার মতি-গতি ও রুচি পরিবর্ত্তিত হয় নাই কি? সে জীবনে যাহা পায় নাই, পরক্ষণে তাহা পাইবার জন্য তাহার আগ্রহও নাই। ইহা কি সত্য নহে?

তবে কর্ত্তব্য,—হ্যাঁ, কর্ত্তব্যই সে করিবে। শুধু যতটা করা দরকার, তাহার বেশী কিছু নহে।

পাঁচ

পরদিন দুপুরবেলা—

দীপুর সাড়াশব্দ অনেকক্ষণ না পাইয়া প্রভাস বাবু বাহিরে আসিয়া ডাকিলেন, "দীপু!"

"কি বাবা?"

শব্দটা বাগানের দিক্ হইতে আসিল। প্রভাস বাবু সেই দিকে অগ্রসর হইয়া বলিলেন, "কৈ—কোথায়?"

"এই যে এখানে,—তুমিও এসো না, বাবা! দেখ কি সুন্দর—"

আঙ্গুরের জাফরীর ছায়ায় পাতা একটা বেঞ্চির উপর বসিয়া অমিয়া দীপুকে ছবির বই দেখাইতেছিল। প্রভাস বাবু সেইখানে আসিতেই বেঞ্চির এক প্রান্তে সরিয়া গিয়া সে দীপুকে বলিল, "তুমি এ দিকে স'রে এসো, দীপু। ওঁকে বসতে যায়গা দাও।"

"থাক্,—দীপুর সাড়াশব্দ পাইনি অনেকক্ষণ, তাই—"

"বসো না, বাবা! বসো, কেমন সুন্দর ছবি দেখছ? এ বই এখন আমার—জানলে বাবা? এই দেখ না, আমার নাম লেখা রয়েছে—"

"হুঁ!"

প্রভাস বাবু দীপুর হাতের বইখানার দিকে একবার চাহিয়া তাহার পাশে বসিলেন গম্ভীর মুখে। অমিয়া আনত-নয়নের বক্র দৃষ্টি দিয়া দেখিল, তাঁহার চেহারা যেন বিদ্যুৎ-গর্ভ মেঘের মত থমথম করিতেছে। দেখিয়া অমিয়ার মনে বোধ হয় দুঃখ হইল না, বরং আনন্দই হইল;—এ আনন্দ কি জয়ের?

এক দিন পায়ে ধরিয়া ভিক্ষা করিয়াও যাহার কাছে করুণার কণামাত্রও পায় নাই, অমিয়া আজ মাথা তুলিয়া বিজয়িনীর গৌরবে তাহার সম্মুখে দাঁড়াইতে পারিয়াছে।

লোকটা এখন বুঝুক, যাহাকে সে এক দিন লাঞ্ছিত, অপমানিত করিয়া চোখের জলে বিদায় দিয়াছিল, নারী হইলেও সে এক জন মানুষ! পশু নহে! তাহার জীবনেরও একটা মূল্য আছে, নারীত্বেরও মর্য্যাদা আছে।

দীপু বই হইতে একটা সিংহের ছবি বাহির করিয়া বলিল, "ও বাবা! কি প্রকাণ্ড সিংহ দেখ। ঠিক যেন সত্যিকার—"

"সত্যিকার সিংহ তুমি দেখবে, দীপু?"

অমিয়ার কথা শুনিয়া দীপু সাগ্রহে বলিয়া উঠিল, "হ্যাঁ দেখ্‌ব, কোথায় আছে সিংহ?"

"এখানেই আছে,—বিকালবেলা দীপুকে একটু বেড়িয়ে আনো না, মোটর ত রয়েছে।"

কথাটা প্রভাস বাবুর দিকে চাহিয়া অমিয়া কহিল।

"কি দরকার মোটরের? গরীবের ছেলে, বেড়াতে হয় অমনিই যাবে।"

প্রভাস বাবুর কথার মধ্যে ঝাঁঝ ত ছিলই, তাহা ছাড়া খোঁচাও ছিল একটু। অমিয়া মনে মনে হাসিয়া মুখটা ফিরাইয়া লইয়া দীপুর কপালে ঝুলিয়া পড়া এলো-মেলো চুলগুলি সরাইতে সরাইতে সস্নেহকণ্ঠে বলিল, "আমি তোমাকে সিংহ দেখিয়ে আন্‌ব, দীপু! আজ ত হয়ে উঠ্‌বে না, দেখি কাল কোনও এক সময়ে—"

দীপু পুলকিত হইয়া কহিল, "আচ্ছা।"

দীপুর বাবা খানিক গুম হইয়া থাকিয়া বলিলেন, "কাণপুরে আজ রাত্তিরেই ষ্টার্ট করবো ভাবছি।"

—"আজ-ই ?"

—"হ্যাঁ, আজ নেহাৎ না পারি, তা হ'লে সকালের ট্রেণে নিশ্চয় বেরোতে হবে।"

—"কেন ? এত তাড়া কিসের ? দিন-কতক বিশ্রাম নিয়ে—"

"বিশ্রাম করে না আর—ঢের হয়েছে, একলা ত নয়, ছেলে-মেয়ে দুটো রয়েছে, ওদের জন্যে একটু কিছু না করলে—"

কথাটা শেষ না করিয়া প্রভাস বাবু দীপুর দিকে চাহিয়া রহিলেন উদাসভাবে। দীপু তখন বইখানা বেঞ্চির উপর রাখিয়া সম্মুখের বড় একটা কাঠের টবে রাখা গোলাপের চারা গাছে কটি গোলাপ, তাহা গুণিতেছিল। অমিয়াও নীরব।

ক্ষণ পরে সে বলিল,—"তোমার এখানে কষ্ট হচ্ছে কি ?"

অমিয়ার এ আকস্মিক প্রশ্নে প্রভাস বাবু চকিতে দৃষ্টি ফিরাইয়া দেখিলেন, অমিয়া তাঁহার খুব কাছে সরিয়া আসিয়া তাঁহার দিকে চাহিয়া আছে, তাহার প্রদীপ্ত নয়ন-যুগলে করুণার স্নিগ্ধতা, মুখের ভাব বড় কোমল।—সাদাসিদা ধরণে পরা লাল-পাড় শাড়ীর আঁচলখানি এলানো কোঁকড়ানো চুলের উপর ন্যস্ত—এ যেন মমতাময়ী গৃহলক্ষ্মীর কল্যাণী রূপ !

সে রূপ এক মুহূর্ত্ত মুগ্ধ-নয়নে দেখিয়া প্রভাস বাবু বলিলেন, "কষ্ট ?—না, অমিয়া ! এ রকম আদরে থেকেও যদি বলি কষ্ট হচ্ছে, তা হ'লে যে নেহাৎ অকৃতজ্ঞের মত—না, তা নয়, তবে এ সব আমার সইবে না, কুলী-মজুর লোক আমরা—"

ছাড়া ছাড়া ভাবে কথাগুলি বলিয়া তিনি ঈষৎ হাসিলেন। সে হাসি ও কথায় শ্লেষের তুলনায় বোধ হয় ব্যথাই ছিল বেশী।

অমিয়ার প্রফুল্ল মুখ-কান্তি নিমেষে ম্লান হইয়া গেল।

"উঁহু, ও গাছ নষ্ট করো না, দীপু ! ও দোপাটী, ওটা তুলে ঐখানে লাগাতে হবে, রসো—"

বলিতে বলিতে সে উঠিয়া দীপুর কাছে গেল। আশে-পাশের ঘাসগুলি তুলিতে তুলিতে অমিয়া এক সময় পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিল, প্রভাস বেঞ্চির উপর নাই !

আস্তে একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া সে দীপুকে বলিল, "তোমার বাবা ত এখানে থাক্‌তে চান না, দীপু !"

দীপু মুখখানা মলিন করিয়া বলিল, "আমি বল্‌ব থাক্‌তে। আমার ত এখান থেকে যেতেই ইচ্ছে কর্‌ছে না, মা !—সত্যি—"

'মা', ছোট্ট একটি শব্দ, কিন্তু কি প্রাণ-গলানো মাধুর্য্য ইহাতে ! সে ডাকে অমিয়ার অন্তরের কোন্ গোপন গহন-তল হইতে সাড়া দিয়া উঠিল তাহার অপরিতৃপ্ত মাতৃত্ব ! এ কি অপূর্ব্ব অনুভূতি !

"দীপু !"

দীপুকে কাছে টানিয়া আনিয়া অমিয়া মমতাসিক্ত-কণ্ঠে বলিল,—"তুমি আমার কাছে থাক্‌বে, দীপু ?"

"থাক্‌ব, মা !"

দীপুর বিরস-মুখে হাসি দেখা গেল, সরলতা-মাখানো চোখদুটিতে কি কুণ্ঠাহীন নির্ভরতা !

"তুমি বাবার জন্যে কাঁদবে না ?"

"বা রে ! তা কেন ? আমি কি কচি খোকা যে কাঁদব ? বাবা ত আমাকে পিসীমার কাছে রেখে আস্‌ছিল—আমার সেখানে ভাল লাগে না, তাই—"

"এখানে ভাল লাগবে ত ?"

"ওঃ ! খুব—খুব ভাল লাগবে !—"

পরিপূর্ণ তৃপ্তিতে দীপুর মুখে হাসি উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

রাত্রিতে দীপু ঘুমাইয়া পড়িয়াছে।

দীপুর বাবা বিছানায় চিৎ হইয়া শুইয়া ছাদের কড়ি কাঠ গণিতেছিলেন বোধ হয়। কিসের একটু শব্দ কাণে যাইতেই তিনি ঘাড় উঁচু করিয়া দেখিলেন, ঘরের মধ্যে পাণের ডিবা হাতে করিয়া 'আয়া' নহে, অমিয়া নিজে !

প্রভাস বাবুর পলকে মনে পড়িয়া গেল কত দিন, কত বৎসর আগের দেখা একটি সরম-কুণ্ঠিতা কিশোরীর কথা। কি দীনতা, কি সঙ্কোচভরে সে জড়সড় ভাবে তাঁহার কাছ ঘেঁষিয়া দাঁড়াইত—তাঁহার অন্তরের এতটুকু স্পর্শ পাইবার আশায়, একান্ত নির্ভরশীলা আশ্রিতা লতার মত—এ ত সেই অমিয়া !

আলোড়িত চিত্তের ফেনিল উচ্ছ্বাস কষ্টে রোধ করিয়া প্রভাস বাবু ত্বরিতে উঠিয়া বসিয়া বলিলেন, "বসো,অমিয়া !"

টীপয়ের উপর পাণের ডিবা রাখিয়া অমিয়া দীপুর খাটের এক পাশে বসিল, তার পর প্রভাস বাবুর আগ্রহভরা চোখের দিকে একবার তাকাইয়া তখনই চক্ষু নত করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তা হ'লে তোমার যাওয়াই কি ঠিক হ'ল ?"

উত্তরে প্রভাস বাবুর মুখে আসিতেছিল, 'তুমি যদি বল, তবে'—কিন্তু কথাটা তাড়াতাড়ি চাপিয়া লইয়া তিনি শুধু বলিলেন, "তা বৈ কি ?"

মনে হয় ত ক্ষীণ আশা ছিল, অপর পক্ষ হইতে আরও দুই দিন থাকিয়া যাইবার জন্য উপরোধ আসিতে পারে : কিন্তু তাহা হইল না। অমিয়া সুপ্ত দীপুর গায়ে হাত রাখিয়া ধীরে ধীরে বলিল, "দীপু আমার কাছে থাক্‌তে চায়, যদি কোন রকম বাধা না থাকে, তা হ'লে ওকে এখানে রেখে যাও, ও আমার কাছে বেশ থাক্‌বে।"

"রাখবে ওকে ? আঃ! তুমি আমাকে বাঁচালে, অমিয়া !—"

আশাতীত আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া প্রভাস বাবু উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলিলেন, "কথাটা বলি বলি করেও তোমাকে বল্‌তে পার্‌ছিলুম না, ভরসা হচ্ছিল না বল্‌তে। কিন্তু দীপুর জন্যে আমার যা ভাবনা হয়েছিল! নিজের ত কিছু ঠিক-ঠিকানা নেই, ছেলেটা তোমার আশ্রয়ে থাক্‌লে আমি নিশ্চিন্ত হয়ে কায কর্‌তে পারি।"

তার পর একটু থামিয়া একটা কম্পিত রুদ্ধ নিশ্বাস নিঃশব্দে ফেলিয়া প্রভাস বাবু আবার আবেগভরে বলিতে লাগিলেন, "আমি বুঝতে পারছি, তোমার ওপরে এ ভার দেওয়া আমার উচিত হচ্ছে না, কিন্তু তুমি ত সত্যি সত্যি আমার পর নও ? এ জীবনে বিচ্ছিন্ন হবার নয়! আমি অতি হতভাগা যে, এ কথা এক দিন বুঝেও বুঝিনি, পূজার কুসুম পায়ে দলে—"

"থাক্‌, আবার কেন ? বলেছি ত আমার মনে সেজন্য আর দুঃখ অনুতাপ কিছুই নেই।"

—"বেশ !"

অমিয়া উঠিতে উঠিতে বলিল, "তা হ'লে ঐ ঠিক রইলো, দীপু আমার কাছে থাকবে।"

প্রভাস বাবু তাহার গমনে বাধা দিয়া আহতকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, "আমার একটা কথার জবাব দিয়ে যাও, অমিয়া, —আমি জান্‌তে চাই, তুমি কি সেই অমিয়া ? তেরো বছর আগে আমি যাকে—"

—"না, না, সে অমিয়া অনেক দিন মরেছে, তুমিই ত তাকে গলা টিপে মেরে ফেলেছো ! আজ যদি তুমি তারই সন্ধানে এসে থাকো, তা হ'লে সেটা তোমার মস্ত বড় ভুল ! সে অমিয়া আর নেই !"

গমনোন্মুখী অমিয়া যাইতে যাইতে আবার ফিরিয়া দাঁড়াইয়া দৃপ্ত ভঙ্গীতে বলিল, "দীপুকে আমি মনের মত ক'রে মানুষ করতে চাই, এ আমার কর্ত্তব্য ব'লে নয়, আমার অন্তরের ইচ্ছে। ছেলেটিকে আমার ভাল লেগেছে, তাই। তুমিও যত দিন খুসী এখানে থাকতে পার স্বচ্ছন্দে, আমি তোমায় আদর ক'রে রাখব হিতৈষী বন্ধুর মত, কিন্তু—"

অমিয়া আর দাঁড়াইল না।

ছয়

বিদায়প্রার্থী প্রভাস বাবু প্রণত ছেলের মাথায় হাত রাখিয়া মনে মনে আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন, "বেশ ভাল ক'রে লক্ষ্মীটি হয়ে থেকো, বাবা। উনি যা বলেন, তাই করো, বুঝেছ ?"

অমিয়া খাবার-ভর্ত্তি-করা টিফিন-ক্যারিয়রটা গাড়ীতে রাখিতে দিয়া, সেখানে আসিয়া দীপুকে কোলের কাছে টানিয়া লইয়া বলিল, "সেজন্য ভাবতে হবে না, দীপু ভারি লক্ষ্মী ছেলে, ও আমার কাছে বেশ থাকবে—দেখো। আর তুমি যেখানেই যাও, নিজের ঠিকানাটা জানিয়ো, তা হলেই দীপুর খবর নিয়মিত পাবে।"

প্রভাস বাবু ঘাড় নাড়িয়া শুধু সায় দিলেন। হৃদয় যখন পরিপূর্ণ, মুখে তখন কথা আসে না। কিন্তু অমিয়া ? দীপুর হাত ধরিয়া তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে সে গাড়ীর কাছে আগাইয়া গিয়া বেশ সহজ ভাবেই বলিল, "কাণপুর থেকে লক্ষ্ণৌ ত এ-পাড়া ও-পাড়া। সেখানেই যদি থাকা হয়, তা হ'লে মাঝে মাঝে সুবিধা ক'রে ওকে স্বচ্ছন্দে দেখে যেতে পারো, সেজন্য অনুরোধ উপরোধ না করতে হয় যেন। হাজার হলেও বাচ্ছা ত ?"

"তাই হবে।"

গাড়ীর পা-দানীতে পা দিয়া অমিয়ার দিকে ফিরিয়া প্রভাস বাবু বিক্ষুব্ধচিত্তের সুগভীর উচ্ছ্বাস অব্যক্ত রাখিয়া শুধু ধরা-গলায় মৃদুস্বরে বলিলেন, "আচ্ছা, তবে চললুম! যদি পার, আমাকে ক্ষমা করো।"

অমিয়া নীরবে হাত দু'খানা ঈষৎ তুলিয়া নমস্কার জানাইল—একটি নমস্কার শুধু! নিতান্ত অপরিচিতের মত!

প্রভাস বাবুর বুক চিরিয়া একটা গভীর গাঢ় নিশ্বাস বাহির হইল।

গাড়ীখানা অদৃশ্য হইলেও অমিয়া কতক্ষণ সেই দিকে চাহিয়া রহিল—স্বপ্নাচ্ছন্নের মত। তার পর আকস্মিক দুর্ব্বলতাটুকু সবলে ঝাড়িয়া ফেলিয়া উদ্যত দীর্ঘশ্বাসটা বুকের মধ্যে চাপিয়া ফেলিয়া সে বলিল, "চল দীপু! আমরা ঘরে যাই।"

বৈকালে দীপু নতুন-কেনা ব্যাটবল লইয়া খেলা করিতেছিল; অমিয়া ডাকিল, "দীপু, এইবার এসো, বাবা! তোমার মুখ-হাত ধুয়ে কাপড় ছাড়িয়ে দি।"

দীপু খেলা ছাড়িয়া তখনই ছুটিয়া আসিল পোষমানা কুরঙ্গ-শিশুর মত। আয়া তাহাকে বাথরুমে লইয়া যাইতেছিল, অমিয়া বাধা দিয়া নিজেই তাহাকে লইয়া গেল

সে নিজের হাতে দীপুকে পরিষ্কার করিয়া কাপড় ছাড়াইয়া দিল। দীপুর তখন তাহার মায়ের কথা মনে পড়িতেছিল—অমিয়ার হাতের স্পর্শে, চোখের চাহনিতে, কথার সুরে যেন তেমনই দরদ মাখানো।

দীপুর মাথাভরা ঘন চুলে ব্রস্ দিতে দিতে অমিয়া সাদরে জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার বাবার জন্যে মন কেমন করছে দীপু—না?"

দীপু সলজ্জভাবে একটু হাসিয়া উত্তর দিল, "না, মা।"

"সত্যি?"

দীপুর অবনমিত কচি মুখখানি বুকের উপর টানিয়া আনিয়া উচ্ছ্বসিত মমতায় অমিয়া বলিয়া উঠিল, "আমার দীপুমণি ত ভারী লক্ষী ছেলে! চল, তোমাকে আজ সত্যিকার সিংহ দেখিয়ে আনি।"

দীপু সোল্লাসে কহিল, "কখন্ যাবেন, মা?"

"এই যে এখুনি, বেলাবেলি না গেলে ভাল ক'রে দেখা হবে না।"

বাহিরে ভারী বুট-জুতার মস্ মস্ শব্দ শোনা গেল। শব্দটা অমিয়ার পরিচিত।

"আমি আস্‌তে পারি?"

ডাক্তার মুখার্জ্জী ঘরে ঢুকিয়াই সাহেবী কায়দায় একবার হ্যাট্‌টা তুলিয়া বসিয়া বলিলেন, "কাল কিছুতেই সময় করতে পারলুম না—এমন ঝঞ্ঝাট—"

বলিতে বলিতে দীপুর দিকে দৃষ্টি পড়িতেই থমকিয়া বলিয়া উঠিলেন, "এ ছেলেটি আবার কে?"

"সেই যে যিনি এসেছিলেন—তাঁর—!"

"ও! তিনি এখনও আছেন না কি?"

"না, আজ চ'লে গেলেন।"

"তবে এ ছেলেটি যে—"

মনোযোগের সহিত দীপুর চুলে সীঁথি কাটিতে কাটিতে অমিয়া বলিল, "এ আমার কাছেই থাক্‌বে।"

"সে কি? কেন?"

ডাক্তার মুখার্জ্জীর মুখপানে একবার উজ্জ্বল দৃষ্টিপাত করিয়া অমিয়া বলিল, "এম্‌নি, ইচ্ছে হলো! মা-হারা ছেলেটি দেখে—"

"বাঃ এ আবার কি বাতিক তোমার? পরের ছেলে মানুষ করার দায়িত্ব কত—তা জানো?"

মুখার্জ্জীর মুখের ভাব অপ্রসন্ন। তাহা লক্ষ্য করিয়া অমিয়া হাসিতে হাসিতেই বলিল, "জানি, কিন্তু এ ছেলে ত আমার পর নয়।"

"তবে?—ওর ফাদার তোমার আত্মীয় হন বুঝি?"

"হ্যাঁ, উনি আমার—স্বামী।"

"স্বামী!"

পথ চলিতে চলিতে সহসা সম্মুখে বজ্রপাত হইলে পথিকের যে অবস্থা ঘটে, ডাক্তার মুখার্জ্জীর এখন সেই অবস্থা।

"মাই গড!"

দুই হাতে মাথা টিপিয়া তিনি বসিয়া পড়িলেন।

খানিক নীরবতার পর মুখার্জ্জী শুষ্ক কণ্ঠে বলিলেন, "কিন্তু—তোমার যে স্বামী আছেন, তা ত কোনও দিন বলোনি, অমিয়া!"

"না, বলার দরকার বুঝি নি, কাযেই—তুমি কোটটাও গায়ে দিয়ে নাও, দীপু। দোরসা সময়, ঠাণ্ডা লাগানো উচিত নয়।"

ডাক্তার সাহেব একবারে স্তম্ভিত! এ যাবৎ অমিয়ার তরফ হইতে স্পষ্ট কোন ইঙ্গিত না পাইলেও তিনি মনে মনে যে অনেকখানি আশা পুষিয়া রাখিয়াছিলেন, সমস্তই ধূলিসাৎ হইয়া গেল এক নিমেষে!

"কিন্তু, অমিয়া! এটা তোমার—"

অমিয়া বাধা দিয়া ত্রস্তে বলিয়া উঠিল, "আমার কথা হয় ত এক দিন জান্‌তে পারবেন, ডাক্তার! কিন্তু এখন নয়। আজ আমাকে যেতে হচ্ছে একটু—"

"কোথায়?"

"দীপুকে সিংহ দেখাতে—আপনি যাবেন?"

"নাঃ! আমার কাষ রয়েছে।"

দীপুর দিকে বক্রনয়নের অগ্নিময় দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া ডাক্তার মুখার্জ্জী মেঘাচ্ছন্নমুখে তাড়াতাড়ি চলিয়া গেলেন।

অমিয়া মোটর আনিতে বলিয়া অবসন্নভাবে কৌচের ওপর এলাইয়া পড়িল।

বাহিরে চাঞ্চল্য প্রকাশ না পাইলেও অন্তরে অন্তরে সে কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করিতেছিল। তাহার বুকের ভিতর কিসের একটা অদম্য উচ্ছ্বাস ঠেলিয়া উঠিতেছিল।

"ও মা, মোটর এসে গেছে।"

দীপু কাছে আসিতেই অমিয়া তাহাকে কোলের মধ্যে ব্যাকুল আগ্রহে টানিয়া লইয়া বলিল, "দীপু আমার—মাণিক আমার,—সোণা ছেলে হবে, আমায় কত ভালবাসবে—না?"

অমিয়ার কণ্ঠস্বর বিকম্পিত গাঢ়!

চোখের পাতাও বোধ হয় ভিজিয়া উঠিয়াছিল!

শ্রীচিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়।

ছিন্নকলি

ধূলি-প্রসরিত মলিন গোধূলি ঢাকিয়াছে ধরণীরে,
গন্ধ বহিয়া দখিণা বাতাস ব'য়ে যায় ধীরে ধীরে।
ওরে ও মালতি আয়!
আয় বোন্ এই আকাশের তলে মিলি মোরা গুঞ্জনায়—
ডুকরি কেঁদে লো উঠি',
বল্ তো মোদের অনন্ত ব্যথা বলি আর কারে ফুটি'!
মোরা তো ভগিনী থাকি একা একা প্রকৃতি মায়ের মেয়ে
আপনার মনে নাচি হাসি খেলি কাননের বুক ছেয়ে।
মানুষ স্বার্থপর,
পলকের সুখে ছুড়ে ফেলে দেয় মোদেরে মাটীর 'পর।

লাজুক নূতন বধূটির মত ঊষালোকে অবগাহি'
ফুটেছিলি একা সঙ্গিবিহীনা আকাশের পানে চাহি'।
ছোট তোর তনুটিরে,
নীরব প্রেমিক বাতাস শুধুই ছুঁয়ে' চলে গেল ধীরে।
মাতাল ভ্রমর এলো সে ছুটিয়া, মৌন অস্ফুট বাণী।
তপ্ত-চুমায় শুধু ভ'রে দিলো তোর ও কপোলখানি।
কিন্তু বহিন্ তোদের মিলন, ও মহান্ উৎসব
সহিতে পারে না, ভেঙ্গে ফেলে দেয় নিঠুর মানব সব।

নিটোল মোহন লীলায়িত তোর সুন্দর তনুখানি
আপন খেয়ালে কঠিন পরশে ছিঁড়ে ফেলে দেয় টানি।

কিন্তু ভগিনি, আমি তো পারিনে ফুটিতে তোমার মত
আমার বুকেতে কেঁদেছে গন্ধ ঝরেছে মধু সে কত!
ছিল মনে কত আশা,
বিশ্বেরে আমি করিব পাগল দিয়া এই ভালবাসা।
আমার আলোর দেবতা সে যে লো আমারে বুকেতে নিবে
লজ্জা-লালিম এই মুখে মোর সোহাগের চুমা দিবে।
মিথ্যা হ'লো সে আশা,
মিথ্যা হ'লো সে প্রণয়-আবেগ, বুক-ভরা ভালবাসা।

তারি বিনিময়ে আজিকে ভগিনি, লুটে প'ড়ে আছি ভুঁয়ে,
নীহার সে তার তুহিন ধারায় দেয় মোর তনু ধুয়ে।
ভেঙ্গে ফেলে দেছে মানুষ আমার যৌবন-ভরা বুক,
ভেঙ্গেছে রে তারা আমার প্রেমের রঙিন্ স্বপ্নটুক্।
আমরা অবলা ফুল,
নিতে পারি নাকো প্রতিশোধ এর মানুষের সমতুল!
নিয়ে ভাঙা বুক, যৌবন, প্রাণ পড়ে থাকি ভূমিতলে—
মৌন ব্যথায় মাটীরে শুধুই ভিজাই চোখের জলে।

শ্রীযতীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত।

বাঘের শিকার

(শিকার-কাহিনী)
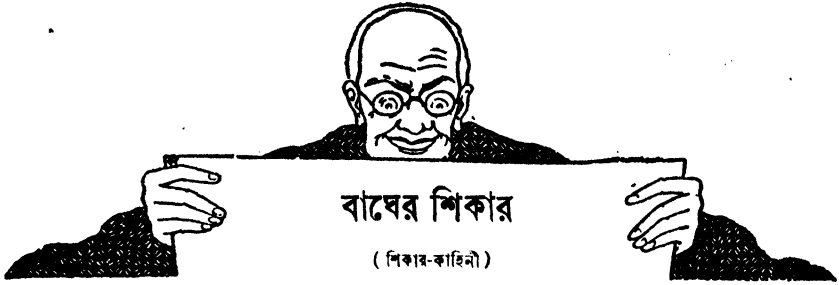
আসামের কোন ইংরেজ চা-কর ডি, এইচ, এম, এই সজ্ক্ষিপ্ত নামে মে মাসের এক বিলাতী মাসিকে ব্যাঘ্র-শিকারের একটি গল্প লিখিয়াছেন। এই গল্পটির বঙ্গানুবাদে শিকারীকে 'বাঘের শিকার' বলিয়া অভিহিত করিলে অত্যুক্তি হইবে না। আশা করি, পাঠকগণ আমাদের এই উক্তির সমর্থন করিবেন। গল্পটি কৌতুকাবহ।

লেখক লিখিয়াছেন—আলোচ্য ঘটনাটি যখন ঘটিয়াছিল, সেই সময় (এই গল্পের উপনায়ক) রড ডগলাসের বয়স বাইশ বৎসর। এই আখ্যায়িকারম্ভের প্রায় এক বৎসর পূর্ব্বে এক চা-বাগিচার সহকারী পদে নিযুক্ত হইয়া সে আসামে আসিয়াছিল! যুবকটি এরূপ খর্ব্বকায় ও কৃশ ছিল যে, তাহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ও মুখ দেখিলে মনে হইত, তাহার বয়স আরও অল্প। এত দিন পরেও এখন তাহাকে ওজন করিলে, তাহার দেহের ভার এক শত কুড়ি পাউণ্ডের (প্রায় দেড় মণের) অধিক হইবে না।

ডগ্‌লাস চাকরী লইয়া লণ্ডন হইতে আসামের চা-বাগানে উপস্থিত হইলে, তাহাকে দেখিয়া বাগানের ম্যানেজার মন্‌রোর কি রাগ! তিনি লণ্ডনস্থিত ডাইরেক্টরগণকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন, তাঁহাদের বিন্দুমাত্র বুদ্ধি-বিবেচনা নাই। তাঁহারা বাছিয়া বাছিয়া এ রকম একটা রোগা ছোকরাকে চাকরীতে নিযুক্ত করিয়া পাঠাইয়াছেন যে, এ দেশের জলবাতাসে সে ছয়মাসও টিকিয়া থাকিতে পারিবে না! এই গল্পারম্ভের সময় যদিও মন্‌রো বুঝিতে পারিয়াছিলেন—ডগলাস কাযের লোক এবং নির্ভরযোগ্য সহকারী, সে তাঁহার স্নেহভাজনও হইয়াছিল, তথাপি তাহার ক্ষীণ দেহের দিকে চাহিয়া অবজ্ঞায় তাঁহার নাসিকা কুঞ্চিত হইত।

এক দিন অপরাহ্নে বাগানের ম্যানেজার ও তাঁহার এই সহকারী বাগানের এক প্রান্তে কুলী খাটাইতেছিলেন; শত শত কুলী চা-গাছ হইতে কচি কচি পাতা সংগ্রহ করিতেছিল। তখন বর্ষা আরম্ভ হইয়াছিল, কিন্তু বায়ুর উষ্ণতা তখনও অত্যন্ত অধিক; তাহার উপর তাহা এরূপ আর্দ্র যে, য়ুরোপীয়দের পক্ষে অত্যন্ত কষ্টদায়ক বলিয়া মনে হইত।

মন্‌রো এবং ডগ্‌লাস উভয়েই কার্পাস-সূত্র-নির্ম্মিত সাদা সার্ট এবং খাকীর হাফ্‌প্যাণ্ট পরিধান করিয়া কাযে বাহির হইয়াছিলেন, তথাপি ঘর্ম্মধারায় তাঁহাদের সর্ব্বাঙ্গ প্লাবিত হইতেছিল। তাঁহাদের রৌদ্রদগ্ধ আরক্তিম মুখমণ্ডল হইতে ঘর্ম্মপ্রবাহ ধারাকারে ঝরিয়া পড়িতেছিল। তাঁহাদের অনাবৃত হস্ত ঘর্ম্মাপ্লুত এবং পরিচ্ছদও ঘর্ম্মসিক্ত।

তাঁহারা সেই অবস্থায় কুলী খাটাইতে খাটাইতে সাধারণ কৃষক-শ্রেণীর দুই জন অসমিয়াকে পথ দিয়া তাঁহাদের দিকে দৌড়াইয়া আসিতে দেখিলেন।

তাহারা উভয়ে তাঁহাদের সম্মুখে উপস্থিত হইলে মন্‌রো জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা কি চাও?"

আগন্তুকদ্বয়ের এক জন বলিল, "সাহেব, আমাদের বড় বিপদ! আমাদের ছোট ভাইটিকে বাঘে মারিয়াছে। আপনি আমাদিগকে রক্ষা না করিলে আমরা নিরুপায়।"

ম্যানেজার সাহেব বলিলেন, "কিরূপে আমি তোমাদিগকে রক্ষা করিব?" লোকটি বলিল, "হুজুর বাঘটাকে গুলী করিয়া মারিলে আমাদের প্রাণরক্ষা হইতে পারে।"

অতঃপর তাহাদিগকে প্রশ্ন করিয়া জানিতে পারা গেল—সেই চা-বাগিচার প্রান্তবাহিনী নদীর অপর তীরবর্ত্তী কোন গ্রামে তাহাদের বাস; সেই গ্রামখানি বাগান হইতে প্রায় তিন মাইল দূরে অবস্থিত। তাহারা যে বাঘটির কথা বলিল—তাহার আকার অত্যন্ত বৃহৎ। তাহাদের ভাই যে গরুটাকে চরাইতে লইয়া গিয়াছিল, বাঘ প্রথমে সেই গরুটাকে হত্যা করে; তাহার পর তাহাদের বাড়ীর সম্মুখে আসিয়া তাহাদের ভাইকে আক্রমণ করে। ইহা পূর্ব্বদিন সায়ংকালের ঘটনা।

এই সকল কথা শুনিয়া মন্‌রো জিজ্ঞাসা করিলেন, "এত দেরী করিয়া খবর দিতে আসিয়াছ কেন?"

আগন্তুক বলিল, "সাহেব, প্রথমে আমাদিগকে থানায় গিয়া খবর দিতে হইয়াছিল; তাহার পর ঘরে ফিরিয়া ভাইকে মাটী দিলাম। এ সকল কায শেষ করিয়াই আপনার কাছে আসিতেছি।"

মন্‌রো কয়েক মিনিট কি চিন্তা করিলেন, তাহার পর তাঁহার সহকারীকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "এ কাযের ভার লইতে আমার ইচ্ছা হইতেছে না। উহাদের গ্রামে যাইবার ভাল রাস্তা নাই, পথ কাদায় ভরা; তাহার উপর মশার ঝাঁক। শেষে গিয়া বাঘের হয় ত সন্ধানই পাওয়া যাইবে না! তখন আবার অন্ধকারে কাদা ভাঙ্গিয়া ফিরিয়া আসিতে হইবে। কায কি এত ঝঞ্ঝাটে?"

অনন্তর তিনি অসমিয়াদ্বয়কে বলিলেন, "অত্যন্ত দুঃখের বিষয় বটে, কিন্তু আমি যাইতে পারিব না।"

মন্‌রোর মন্তব্য শুনিয়া চাষীটা ব্যাকুল স্বরে বলিল, "হুজুর আমাদের মা-বাপ। আমরা আমাদের জানানাদের ঘরের ভিতর পুরিয়া রাখিয়া, ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া আসিয়াছি। আমরা

বাড়ীতে নাই, বাঘটা তাহাদিগকেও খাইয়া ফেলিবে বলিয়া ভয় হইতেছিল। আপনি দয়া করিয়া চলুন, সাহেব !"

তাহারা উভয়েই মন্‌রোর পদপ্রান্তে ঝুঁকিয়া পড়িয়া তাঁহার জুতা স্পর্শ করিল।

মন্‌রো বলিলেন, "বাঘ যদি জঙ্গলে ঢুকিয়া সেখানে লুকাইয়া থাকে, তাহা হইলে তোমাদের সঙ্গে আমার যাওয়ার ফয়দা কি ?"

কৃষক বলিল, "বাঘটা যে গরু মারিয়াছে, সাহেব ! তাহার গোস্তর লোভে জরুর সেখানে আসিয়া জুটিবে।"

ডগলাস এতক্ষণ কোন কথা বলে নাই, মুখ বুজিয়া উভয় পক্ষের তকরার শুনিতেছিল ; এবার সে তাহার 'বড়া সাহেবে'র মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "আপনি না যান, আমার ইচ্ছা, একবার চেষ্টা করিয়া দেখি।"

মন্‌রো দুই এক মিনিট তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "আমি তোমাকে একাকী যাইতে দিতে পারি না। ভয়ঙ্কর জানোয়ার ! সেটা এখনও যদি ঠিক 'মানুষ-খেকো' না হইয়া থাকে ত শীঘ্রই 'মানুষ-খেকো' হইয়া উঠিবে। বিশেষতঃ, ব্যাঘ্র শিকারে তুমি অনভিজ্ঞ, ডগলাস।"

ডগলাস বলিল, "আমি খুব হুঁসিয়ার থাকিব মহাশয়, বাঘের উপর একবার গুলী চালাইতে আমার ভারী সখ হইয়াছে।"

মন্‌রো কয়েক মিনিট নীরব থাকিলেন ; বস্তুতঃ তিনি কর্ত্তব্য স্থির করিতে পারিলেন না। অবশেষে তিনি গমনোন্মুখ হইয়া ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, "এদিকের পাতা সংগ্রহ করা শেষ হইলে জমাদারকে পাতাগুলা ওজন করিয়া লইতে বলিয়া তুমি আমার কাছে যাইবে, এক পেয়ালা চা খাইবে !"

ডগলাস ম্যানেজারের আদেশ পালন করিয়া মন্‌রোর অনুসরণ করিল। মন্‌রো বাগান হইতে বাংলোয় ফিরিলে, কৃষকদ্বয়ও তাঁহার সঙ্গে গিয়াছিল। ডগলাস মন্‌রোর বারান্দায় উঠিয়াই এক পেয়ালা চা পাইল। মন্‌রো স্তব্ধভাবে বসিয়াছিলেন ; চাষীদ্বয় বারান্দার সম্মুখে বসিয়া শূন্য-দৃষ্টিতে চাহিয়াছিল।

ডগলাসের চা-পান শেষ হইলে মন্‌রো তাহাকে বলিলেন, "জানি তোমার রাইফেল নাই ; তোমার ১২ বোরের কার্ত্তুজ আছে ত ?"

ডগলাস আশ্বস্ত হৃদয়ে বলিল, "হাঁ, আছে বৈ কি ! গত সপ্তাহেই ত কয়েকটা চালাইয়া পরীক্ষা করিয়াছিলাম।"

মন্‌রো তাহাকে তাহার বন্দুক ও কার্ত্তুজগুলিসহ শিকারের পোষাকে শীঘ্র সজ্জিত হইয়া আসিতে আদেশ করিলেন।

ইত্যবসরে মন্‌রো একটা ঝোলায় কতকগুলি প্রয়োজনীয় জিনিষ ভরিয়া লইয়া, শিকারের পরিচ্ছদ পরিধান করিলেন। ডগলাস যোদ্ধৃবেশে তাঁহার বাংলোয় ফিরিয়া আসিলে তিনি বলিলেন, "কৃষক দু'জনকে নদীতীরে পাঠাইয়াছি ; চল, আমরা সেখানে গাড়ীতে যাই।" তিনি তাঁহার রাইফেলটি এক জন আর্দ্দালীর হাতে দিয়া কার্ত্তুজের হালাটি পরিয়া লইলেন।

তাঁহারা উভয়ে শকটারোহণে নদীতীরে উপস্থিত হইলেন। কৃষকদ্বয় নদীকূলে শালতি জাতীয় একখানি নৌকার নিকট দাঁড়াইয়াছিল ; বর্ষার নদী কূলে কূলে ভরিয়া উঠিয়াছিল ; তাহার স্রোত অত্যন্ত প্রখর।

নৌকা আধ ঘণ্টা পরে নদীর অপর পারে উপস্থিত হইলে মাঝিকে তাঁহাদের প্রত্যাগমনের প্রতীক্ষায় নৌকাসহ সেখানে হাজির থাকিতে বলিয়া, মন্‌রো ও তাঁহার সহকারী ভৃত্যসহ কৃষকদ্বয়ের অনুসরণ করিলেন। সঙ্কীর্ণ পথ আইলের উপর দিয়া প্রসারিত ; দুই পাশে ধান্যক্ষেত্র। অল্পকাল পরে দক্ষিণ-পশ্চিম আকাশে কৃষ্ণবর্ণ মেঘের সঞ্চার হইল, এবং মেঘগর্জ্জন তাঁহাদের কর্ণগোচর হইল।

মন্‌রো বলিলেন, "আমরা বাঘ শিকার করিতে পারি না পারি, বৃষ্টিতে ভিজিয়া লণ্ডভণ্ড হইতে হইবে ! তবে বৃষ্টি নামিলে শরীর ঠাণ্ডা হইবে বটে।"

ডগলাস কোন কথা বলিল না ; সে ভাবিল, বন্দুক ব্যবহারের সুযোগ পাইলে বৃষ্টিতে ভিজিতে তাহার কোন আপত্তি নাই।

পথ দিয়া চলিতে চলিতে তাঁহারা অরণ্যে প্রবেশ করিলেন। সেই অরণ্যের ভিতর তাঁহারা যে পথ পাইলেন, তাহা অত্যন্ত দুর্গম ! পথের অবস্থা দেখিয়া তাঁহাদের মনে হইল—সেই পথে লোকের তেমন অধিক গতিবিধি ছিল না। পথের দুই ধারে বাঁশবন, গুচ্ছ গুচ্ছ কঞ্চিতে তাঁহাদের গতিরোধ হইতে লাগিল ; এজন্য কৃষকদ্বয় দা দিয়া কঞ্চিগুলি কাটিয়া পথ পরিষ্কার করিতে লাগিল। কয়েকটি কাদাজলপূর্ণ নালাও তাঁহাদিগকে লাফাইয়া পার হইতে হইল। কোন কোন স্থানে তাঁহাদিগকে পাঁকের ভিতর দিয়া হাঁটিতে হইল। আরও কিছুকাল পরে বৃষ্টি আরম্ভ হইল। অরণ্যের ভিতর গাঢ় অন্ধকার। সঘন বিদ্যুৎ-স্ফুরণে অরণ্য আলোকিত হইতে লাগিল।

মন্‌রো বিজলী-বাতির সাহায্যে পথ দেখিয়া চলিতে লাগিলেন ; কিন্তু বৃষ্টির বেগ ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইয়া মুষলধারায় বর্ষণ আরম্ভ হইল। ঘন ঘন মেঘ-গর্জ্জনে কর্ণ বধির হইবার উপক্রম !

অবশেষে বৃষ্টির বিরাম হইল ; শিকারী দল অরণ্য হইতে মাঠে প্রবেশ করিলেন ; তখনও দিবালোকের অভাব হয় নাই। কৃষকদ্বয় বেড়ায় ঘেরা দুইখানি ক্ষুদ্র কুটীরের দিকে অগ্রসর হইল। এই স্থানটি অরণ্যপ্রান্ত হইতে প্রায় এক শত গজ দূরে অবস্থিত।

কৃষকদ্বয়ের এক জন একটি তৃণপূর্ণ ক্ষেত্র দেখাইয়া বলিল, "ঐ স্থানে আমাদের ভাইকে বাঘে মারিয়াছে।" তাহার পর আর একটি স্থান দেখাইয়া বলিল, "এই স্থানে গরুটা মারা গিয়াছে।"

তাঁহারা বেড়ার ভিতর প্রবেশ করিলেন ; নিহত গাভীর চর্ম্ম উৎপাটনের উদ্দেশ্যে তাহার মৃত দেহটি সেই বেড়ার ভিতর আনীত হইয়াছিল। শকুনি প্রভৃতি পক্ষীর আক্রমণ হইতে মৃত দেহটি রক্ষা করিবার জন্য ডাল-পাতা দ্বারা তাহা ঢাকিয়া রাখা হইয়াছিল ; সেগুলি অপসারিত করা হইল।

কুটীরগুলির কিছু দূরে একটি ক্ষুদ্র জীর্ণ গোশালা অবস্থিত ; মৃত গাভীর বাছুরটি সেই গোশালায় আবদ্ধ ছিল। মন্‌রো ডগলাসকে বলিলেন, "বাঘটা মড়ির কাছে আসিলে এই 'চালা' হইতে তাহাকে লক্ষ্য করিবার সুযোগ হইবে।"

অতঃপর তাঁহারা সেই গোশালার বাঁশের আগড়ের মাথার কিয়দংশ ভাঙ্গিয়া, দৃষ্টি-পরিচালনের জন্য একটা ফুকর করিলেন। বাড়ীর পুরুষরা তখন কুটীরের দ্বার খুলিয়া স্ত্রীলোকদের মুক্তিদান করিতে গিয়াছিল। মন্‌রো তাহাদিগকে ডাকিয়া গোশালার আগড়ের পশ্চাতে শিকারীর বসিবার জন্য একটা মাচান বাঁধিয়া দিতে আদেশ করিলেন।

তখন সন্ধ্যা সমাগতপ্রায়। মনরো গৃহস্থদের সকলকে কুটীরে আশ্রয় গ্রহণ করিতে আদেশ করিলেন; ইহাও বলিয়া দিলেন, না ডাকিলে তাহারা যেন ঘরের বাহিরে না আসে।

মনরো তাঁহার সহকারী ডগলাস ও আর্দ্দালী সহ সেই গোশালায় প্রবেশ করিলেন; গো-বৎসটিও এক পাশে রহিল। ঘরখানি যেরূপ নোংরা, সেইরূপ দুর্গন্ধপূর্ণ! মেঝে ভিজা, তাহার চারিদিকে গোবর, কুটীরের পচা খড়ের ছাউনি ভেদ করিয়া বৃষ্টিধারা সেই গোময়রাশির উপর ঝরিয়া পড়ায়, তাহা কর্দ্দমের সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছিল; এবং কোন স্থান শুষ্ক ছিল না। গো-মূত্র, গো-ময় এবং কর্দ্দমের সংমিশ্রণে যে সৌরভ উত্থিত হইতেছিল, তাহা শ্বেতাঙ্গদ্বয়ের নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করিয়া তাঁহাদিগকে পুলকিত করিয়া তুলিল। আগড়ের ঊর্দ্ধাংশ ভাঙ্গিয়া যে ফুকরের সৃষ্টি হইয়াছিল, ডগলাস তাহার ভিতর দিয়া অদূর-স্থিত মড়িটা (kill) দেখিতে পাইতেছিল।

মনরো ডগলাসকে মৃদুস্বরে বলিলেন, "মড়িটার যে পাশ তোমার নজরে পড়িতেছে, বাঘ যদি ঐ পাশে আসে, তাহা হইলে তুমিই প্রথমে গুলী করিবে। কিন্তু চলন্ত অবস্থায় তাহাকে লক্ষ্য করিয়া গুলীবর্ষণ করিও না। যখন আমি বলিব, ঠিক সেই সময় গুলী করিবে। যদি তাহাকে মাথা তুলিতে দেখ, তাহা হইলে তাহার দুই চক্ষুর ব্যবধানে গুলী করিবে। যদি তাহার পাশের দিক নজরে পড়ে, তাহা হইলে কাঁধের পশ্চাদ্ভাগে নিশানা করিবে। (aim behind the shoulder) যাহাই ঘটুক, অচঞ্চল থাকিবে! শীঘ্রই অন্ধকার হইবে বটে, কিন্তু তাহা দীর্ঘস্থায়ী হইবে না; কারণ, কিছুকাল পরেই চন্দ্রোদয় হইবে।"

অল্পকাল পরে মশার ঝাঁক গুঞ্জনধ্বনি আরম্ভ করিল। ডগলাস হাতে ও মুখে তাহাদের হুলের সুতীক্ষ্ণ খোঁচায় অস্থির হইয়া উঠিল। গো-শালার ছ্যাঁচার দেওয়ালের অপর পার্শ্বে গৃহবাসীরা ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল, ডগলাস তাহাদের পদশব্দ শুনিতে পাইল। অতঃপর নারীরা রন্ধন আরম্ভ করিলে সে তাহারও গন্ধ পাইল। সন্ধ্যার অন্ধকার গাঢ় হইলে শিকারীদ্বয় গাভীর মৃতদেহটি দেখিতে পাইলেন না; তথাপি তাঁহারা সতর্কভাবে সেই দিকে চাহিয়া রহিলেন।

আরও কিছুকাল অতিবাহিত হইল; কুটীরবাসীদের চাপা কণ্ঠস্বর ক্রমশঃ নীরব হইল; কিন্তু ভেকের অশ্রান্ত মকধ্বনি, অসংখ্য পতঙ্গের মিশ্র গুঞ্জন এবং গোবৎসটির হাম্বারব নৈশ প্রকৃতির নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিতে লাগিল।

অবশেষে পূর্ব্বাকাশে চন্দ্রোদয় হইল; চন্দ্রালোকে প্রকৃতি দেবীর তিমিরাবগুণ্ঠন ধীরে ধীরে অপসারিত হইল। তখন চতুর্দ্দিক্ সুস্পষ্টরূপে দৃষ্টিগোচর হইল। চন্দ্র ক্রমশঃ আকাশের ঊর্দ্ধদেশে আরোহণ করিলে ডগলাস গোশালার বাহিরে কাহারও নড়িয়া চড়িয়া বেড়াইবার শব্দ অনুভব করিল; কিন্তু সুস্পষ্টরূপে কিছুই দেখিতে পাইল না।

অবশেষে মনরো ডগলাসের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়া মৃদুস্বরে বলিলেন, "এ কষ্ট আমার অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে। আমি জ্বর-ভাব বোধ করিতেছি। খানিক আগেই বোধ হয় তাঁহার শুভাগমন হইয়াছে।"

তাঁহাদের উভয়েরই পরিচ্ছদ বৃষ্টিতে ভিজিয়া গিয়াছিল; তাহার উপর ঝড়বৃষ্টি আরম্ভ হওয়ায় হঠাৎ অত্যন্ত ঠাণ্ডা পড়িয়াছিল। শীতে মনরো কাঁপিতেছিলেন। ডগলাস যে মাচানে বসিয়াছিল, তাহাও নড়-বড় করিতেছিল।

আতঙ্কে তাহাদের বিস্ফারিত চক্ষু কপালে উঠিয়াছে

মনরো চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া পুনর্ব্বার বলিলেন, "আমি উহাদের ঘরের ভিতর যাইতেছি। সেখানে এখনও বোধ হয় আগুন আছে, শরীরটা একটু গরম করিয়া লইব।"

মনরো সেই গোশালার ভিতর হইতে গৃহস্বামীকে ডাকিয়া তাহার বাসগৃহের দ্বার খুলিয়া দিতে আদেশ করিলেন। মনরো প্রস্থান করিলে গোশালায় ডগলাস মাচানের উপর একাকী বসিয়া রহিল। মনরোর আর্দ্দালী একপ্রান্তে মশক-দংশনে জর্জ্জরিত হইতেছিল। ডগলাস তাহার দায়িত্ব উপলব্ধি করিয়া অধিকতর সতর্কতা অবলম্বন করিল। প্রতি মুহূর্ত্তেই সে বাঘের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। নিহত গাভীর দেহ হইতে সে মুহূর্ত্তের জন্য দৃষ্টি ফিরাইল না।

সহসা সে ঝাঁপের দেওয়ালের অন্য পাশে বাসগৃহ ও

ও গোশালার ব্যবধান-পথে কাহারও সঞ্চরণ-শব্দ শুনিতে পাইল; পরমুহূর্ত্তেই গম্ভীর হুঙ্কার, সঙ্গে সঙ্গে গৃহবাসিনী রমণী-কণ্ঠের আর্ত্তনাদ তাহার কর্ণগোচর হইল। মনরো সরোষে গালি দিয়া উঠিলেন।

কুটীরপ্রান্ত হইতে আর্দ্দালীটা উত্তেজিত স্বরে বলিল, "ঐ বাঘ!"

ডগলাস সেই মুহূর্ত্তে দরমার আবরণ আঙ্গুলের সাহায্যে একটু ফাঁক করিয়া অদূরবর্ত্তী কুটীরস্থিত মৃৎপ্রদীপের মৃদু আলোকে দেখিল, একটি প্রকাণ্ড ব্যাঘ্র সেই কুটীরের মধ্যস্থলে বসিয়া জিহ্বা দ্বারা তাহার থাবা লেহন করিতেছিল। (licking his paws) মনরো বাঘটার কিছু দূরে নিস্তব্ধভাবে পড়িয়াছিলেন। কুটীরের একপ্রান্তে বংশনির্ম্মিত মাচানের উপর কুটীরবাসিনী নারীরা দেওয়াল-ঘেঁসিয়া বসিয়া ভয়ে কাঁপিতেছিল, এবং তাহাদের পুরুষরা তাহাদিগকে আড়ালে রাখিয়া ব্যাঘের আক্রমণের প্রতীক্ষা করিতেছিল! আতঙ্কে তাহাদের বিস্ফারিত চক্ষু কপালে উঠিয়াছিল।

ডগলাস তৎক্ষণাৎ বন্দুক তুলিল, কিন্তু সে বুঝিতে পারিল, সে গুলী করিলে গৃহবাসীরা আহত হইতে পারে; যে দিকে গুলী চলিবে, তাহারা সেই দিকেই বসিয়াছিল! এই জন্য সে মুক্তদ্বার কুটীরের দ্বারে উপস্থিত হইয়া গুলীবর্ষণের সঙ্কল্প করিল। কিন্তু মুহূর্ত্তমধ্যে আর একটা সম্ভাবনার কথা তাহার মনে পড়িল। সে ভাবিল, কুটীরদ্বারে উপস্থিত হইয়া বাঘকে গুলী করিলে যদি সেই গুলীতে বাঘ না মরে, তাহা হইলে ক্রুদ্ধ বাঘ গৃহবাসিগণকে আক্রমণ করিয়া তাহাদের সকলকেই হত্যা করিতে পারে।

শিকারী কে

এ অবস্থায় কর্ত্তব্য কি? ডগলাস ফুকরের ভিতর দিয়া চাহিয়া কুটীরের জীর্ণ ও বিবর্ণ খোড়ো চালের এক অংশ দেখিতে পাইল; সেই স্থানের খড়গুলি পচিয়া যাওয়ায় যেটুকু ফাঁক হইয়াছিল, তাহার ভিতর দিয়া চাঁদের আলো কুটীরের ভিতর প্রতিফলিত হইতেছিল। তাহা দেখিয়া তাহার মাথায় একটা ফন্দি গজাইল এবং তৎক্ষণাৎ তাহা কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য তাহার আগ্রহ হইল।

ডগলাস আর্দ্দালীর কাঁধে উঠিয়া, গোশালার চালের কতকগুলি খড় দুই হাতে সরাইয়া ফেলিয়া, সেই স্থান দিয়া চালের উপর উঠিবার জন্য একটা পথ করিয়া লইল। সেই ফাঁক দিয়া সে চালে উঠিয়া আর্দ্দালীকেও চালের উপর তুলিয়া লইল। তাহার পর উভয়ে চাল হইতে নামিয়া গৃহবাসীদের কুটীরের চালে উঠিল, এবং কুটীরস্থিত নরনারীরা কুটীরের যে প্রান্তে শয়নের মাচানের উপর বসিয়া ছিল, নিঃশব্দে কুটীরের চালের সেই প্রান্তে উপস্থিত হইয়া চালের খড় সরাইতে লাগিল। কিন্তু প্রতি মুহূর্ত্তে তাহার আশঙ্কা হইতেছিল, পাছে বাঘটা সেই শব্দ শুনিয়া বিচলিত হইয়া একটা অনর্থ ঘটায়! কারণ, বাঘটা তখনও মনরোর অদূরে বসিয়া নিশ্চিন্ত-ভাবে থাবা চাটিতেছিল।

চালের খড়-(প্রকৃতপক্ষে সেগুলি শুষ্ক ঘাস) গুলি সরাইয়া চালের বাতার ভিতর দিয়া যে ফুকর করা হইল, সেই ফুকর দিয়া ডগলাস আর্দ্দালীর সাহায্যে কুটীরের মাচা হইতে স্ত্রী-পুরুষ সকলকে চালের উপর তুলিয়া বাহিরে নামাইয়া দিল। বিস্ময়ের বিষয় এই যে, কুটীরের একপ্রান্তে যখন এই কার্য্য চলিতেছিল, বাঘটা তখনও মনরোর অদূরে থাবা পাতিয়া বসিয়াছিল।

মনরোর বাম উরু ব্যাঘের নখাঘাতে বিদীর্ণ হইয়াছিল; তিনি কুটীরের মেঝেতে মাথা গুঁজিয়া পড়িয়া, আহত উরু উভয় হস্তে চাপিয়া ধরিয়াছিলেন। ডগলাস বুঝিতে পারিল, বাঘটা জীবিত থাকিতে মনরোকে সেই স্থান হইতে অপসারিত করিবার উপায় ছিল না। কিন্তু বাঘ যদি গুলী খাইয়া না মরে, তাহা হইলে মনরোর জীবন রক্ষা করা অসাধ্য হইবে; ইহা বুঝিতে পারিয়া ডগলাস কুটীরের চালের উপর হইতে তখনও গুলী চালাইতে সাহস করিল না।

কুটীরবাসীদের শয়নের জন্য কুটীরের এক প্রান্তে যে বাঁশের মাচান ছিল, মনরো তাহার অদূরে পড়িয়াছিলেন, ইহা লক্ষ্য করিয়া ডগলাস বুঝিতে পারিল—মনরো যদি বাঘটার অজ্ঞাতসারে (without attracting the beast's attention) গড়াইতে গড়াইতে সেই মাচানের তলায় গিয়া আশ্রয় লইতে পারেন, তাহা হইলে সে বাঘটাকে গুলী করিতে পারে; বাঘ এক গুলীতে না মরিলেও আহত হইয়া মাচানের তলায় গিয়া মনরোকে আক্রমণ করিবার পূর্ব্বে সে দ্বিতীয় গুলী মারিবার সুযোগ পাইবে। কিন্তু মনরোকে সে তাহার মনের কথা কি উপায়ে বুঝাইয়া দিবে?

ডগ্‌লাস চালের উপর হইতে মন্‌রোকে পুনঃ পুনঃ ইঙ্গিত করিয়া তাহার মনের ভাব বুঝাইবার চেষ্টা করিল। অবশেষে মন্‌রোর দৃষ্টি সে আকৃষ্ট করিতে সমর্থ হইল। মন্‌রো ডগ্‌লাসকে বাঘের বক্ষঃস্থল লক্ষ্য করিয়া বন্দুক প্রসারিত করিতে দেখিয়া নিঃশব্দে গড়াইতে গড়াইতে মাচানের তলায় চলিলেন। বাঘ তাহা যেন দেখিতে পাইল না, বাঘের যেন তখন ঢুলুনী আসিয়াছিল! (it looked almost sleepy.)

মন্‌রো গড়াইতে গড়াইতে সেই মাচানের নীচে প্রবেশ করিতে এরূপ অধিক সময় লইলেন যে, ডগ্‌লাস অধীর হইয়া উঠিল; বন্দুকের ভারে তাহার হাত টাটাইতে লাগিল।

যাহা হউক, অবশেষে মন্‌রো কুম্ভাণ্ডবৎ গড়াইতে গড়াইতে মাচানের নীচে প্রবেশ করিতেই টুং করিয়া একটা শব্দ হইল; বাঘ সেই শব্দের অনুসরণে মাচানের নীচে দৃষ্টিপাত করিয়া চক্ষুর নিমেষে বিশাল দেহ আলোড়িত করিয়া মন্‌রোর দিকে ঘুরিয়া বসিল, তাহার চক্ষু হইতে আগুনের হল্কা বাহির হইল। সে মেঝের উপর সবেগে লাঙ্গুল আস্ফালন করিতে করিতে মন্‌রোকে আক্রমণ করিবার জন্য মাচানের তলায় প্রবেশ করে আর কি!

ডগ্‌লাস বাঘের দীর্ঘ দেহ তাহার বন্দুকের নলের মাথায় প্রসারিত দেখিয়া তৎক্ষণাৎ গুলী করিল। গুলী বাঘের মর্ম্মভেদ করায় বাঘ ভীষণ গর্জ্জন করিয়া শূন্যে লাফ দিল, কিন্তু সেই মুহূর্ত্তেই তাহার দেহ সশব্দে মেঝের উপর নিক্ষিপ্ত হইল।

ডগ্‌লাস বন্দুকের দ্বিতীয় 'ব্যারেল'ও খালি করিতে উদ্যত হইল, তাহা দেখিয়া মন্‌রো বলিলেন, 'বাঘ মরিয়াছে।'

ডগ্‌লাস আড়ষ্ট হাত জুড়াইবার জন্য বন্দুকটা আর্দ্দালীর হাতে দিয়া চালের খড় সরাইয়া ফুকরটা আরও বড় করিল এবং মহা উৎসাহে চালের উপর হইতে কুটীরে প্রবেশ করিল। মন্‌রো আড়ষ্ট দেহে পড়িয়া থাকিয়া পিপাসায় মুখব্যাদান করিলে, ডগ্‌লাস তাহার 'ফ্লাস্ক' বাহির করিয়া মন্‌রোর পিপাসা নিবৃত্তি করিল। মন্‌রো তৃপ্তিলাভ করিয়া বলিলেন, "ঈশ্বরকে ধন্যবাদ! ডগ্‌লাস, তুমিও খানিক পান করিয়া সুস্থ হও। আমি সম্পূর্ণ নিরুপায়। আমি এই কুটীরে প্রবেশ করিয়া আমার রাইফেলটা দুর্ব্বুদ্ধি ক্রমে দেওয়ালের গায়ে কাত করিয়া রাখিয়াছিলাম। বাঘটা হঠাৎ কুটীরে প্রবেশ করিলে, তাহা আমি তুলিয়া লইবার পূর্ব্বেই সে আমাকে আক্রমণ করিয়া আমার উরু ক্ষতবিক্ষত করিয়াছিল।"

ডগ্‌লাস কুটীরবাসী কৃষকদের ডাকিয়া তাহাদের সাহায্যে মন্‌রোকে মাচানের তলা হইতে বাহির করিল, এবং ক্ষতস্থল গরমজলে ধুইয়া ফেলিয়া ব্যাণ্ডেজ বাঁধিয়া দিল।

বাঘের শিকার

ডগ্‌লাস বলিল, "বাঘটাকে আমি মড়ির দিকে যাইতে দেখি নাই, কুটীরদ্বারেও তাহাকে দেখিতে পাই নাই। সে কিরূপে কুটীরে প্রবেশ করিয়াছিল, তাহা বুঝিতে পারি নাই।"

মন্‌রো বলিলেন, "বাঘ কুটীরের পশ্চাৎ দিয়া ঘুরিয়া আসিয়াছিল। আমি কুটীরদ্বার খুলিয়া আগড় বাঁধিয়া না রাখায় উহা বোধ হয় আলগা হইয়াছিল। আমি কুটীরে প্রবেশ করিয়া কম্পিত দেহে আগুন পোহাইতেছিলাম, সেই সময় পশ্চাতে একটা শব্দ শুনিয়া ফিরিয়া চাহিলাম। বাঘটাকে কুটীরে প্রবেশ করিতে দেখিয়া আমার রাইফেলটা হাতে লইবার চেষ্টা করিলাম,

কিন্তু তাহার আর সুযোগ হইল না; বাঘ এক থাবায় আমাকে কাত করিয়া ফেলিয়া আমার উরু ক্ষত-বিক্ষত করিয়া ফেলিল। তখন আমি নিস্তব্ধভাবে পড়িয়া থাকা ভিন্ন আত্মরক্ষার অন্য উপায় দেখিলাম না।

"তোমার ইঙ্গিতে আমি উহাদের শয়নের মাচানের নীচে প্রবেশের চেষ্টা করিলাম, কিন্তু সৌভাগ্য বশতঃ বাঘ সে সময় আমাকে লক্ষ্য করিল না; কিন্তু আমার আঙ্গুলের অঙ্গুরী মাচানের নিম্নস্থিত পিতলের গামলাটায় ঠেকিতেই 'ঠুং' করিয়া শব্দ হইল; সেই শব্দ শুনিয়া বাঘ আমাকে আক্রমণের চেষ্টা করিল।"

ক্ষতস্থানে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা হইলে একজন কৃষক মনরোকে তাহার বাংলোয় লইয়া যাইবার জন্য বাহক সংগ্রহ করিতে গেল। ইত্যবসরে তাঁহাকে বহন করিবার জন্য বাঁশের খাটুলী নির্ম্মিত হইল।

কিছুকাল পরে বাহকেরা আসিলে, তাহারা আহত মনরোকে সেই খাটুলীতে শয়ন করাইয়া বহন করিতে লাগিল। কিন্তু তাঁহাদের বাংলোয় প্রত্যাগমন করিতে অনেক অধিক সময় লাগিল। পরদিন প্রভাতে মনরোর চিকিৎসা আরম্ভ হইল। ডাক্তার সেই চা-বাগিচা হইতে পনের মাইল দূরে বাস করিতেন। ডগলাস মুহূর্ত্তমাত্র বিশ্রাম না করিয়া শ্রান্তদেহে তাঁহাকে আনিতে গিয়াছিল। ক্ষতস্থানের রক্ত দূষিত না হওয়ায় মনরো অল্পদিন ভুগিয়াই সুস্থ হইলেন; তাঁহাকে সে যাত্রা খোঁড়া হইতে হইল না।

মনরো কৃতজ্ঞতার নিদর্শনস্বরূপ ডগলাসকে একটি উৎকৃষ্ট রাইফেল উপহার দিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার জীবনদাতাকে খর্ব্বকায়, রুগ্ন ও অকর্ম্মণ্য বলিয়া আর কোন দিন উপহাস করেন নাই এবং বিলাতের ডাইরেক্টরদের বুদ্ধিহীনতারও নিন্দা করেন নাই। ডগলাস সেই দিন হইতে মনরোর গভীর স্নেহ ও আন্তরিক শ্রদ্ধার অধিকারী হইয়াছিল।

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়।

অপরিচিতা

তখনো হয় নি আঁধারের অবসান,
তরুশাখে শুধু জেগেছে পাখীর গান।
আবছায়া মাখা সিক্ত বীথির ঘাসে
পদরেখা আঁকি থমকি' দাঁড়ালো পাশে,
নীরব তাহার অরুণ-নয়নাভাসে
মিশেছিল যেন প্রভাত-কাকলী-তান।

হাতে তার ফুল-ডালা,
কণ্ঠে শেফালী মালা;—
দাঁড়ায়ে একাকী অচেনা ষোড়শী বালা!
সরমের রাঙা আবরণখানি খুলি'
একটি কুসুম দিল মোর হাতে তুলি',—
মুগ্ধ-নয়নে আমি শুধু চাহিলাম,—
কহিল সে শুধু,—শুধা'য়ো না মোর নাম!

তখনো জাগে নি দুপুরের স্তব্ধতা,
বকুলের শাখে জাগে দু'টি কল-কথা।
তরুছায়া-ঢাকা জনহীন পথে ধীরে
দেবালয় হতে একাকী আসিছে ফিরে,
শুভ্রবসন এলো-কুন্তল ঘিরে
উদ্ভাসি' ওঠে শুচিতার স্নিগ্ধতা

হাতে উপচার-থালা,
কণ্ঠে শেফালীমালা,—
আমারে দেখিয়া থমকি' দাঁড়ালো বালা!
মোর মুখপানে বারেক রাখিয়া আঁখি
ললাটে আমার দিল চন্দন আঁকি;
মুগ্ধ-নয়নে আমি শুধু চাহিলাম,—
সে কহিল শুধু,—শুধায়ো না মোর নাম!

তখনো ভুবন ঢাকিয়া নামেনি নিশি,—
আলোকে আঁধারে ঘিরে আছে দশ দিশি:
সন্ধ্যাসুরের নীরব রাগিণী সাথে
একা চলেছিল সাঁঝের প্রদীপ হাতে,—
কম্পিত তার করুণ নয়ন-পাতে
সন্ধ্যা-দীপের কিরণ সে ছিল মিশি!'

হাতে তার দীপ জ্বালা,
কণ্ঠে শেফালী-মালা,
বিজনে একাকী অচেনা ষোড়শী বালা!
মোর পানে চেয়ে কি ভাবিয়া নাহি জানি,—
মোর বেদী-মূলে রাখিল প্রদীপখানি;
মুগ্ধ-নয়নে আমি শুধু চাহিলাম,—
ব'লে গেল শুধু,—শুধায়ো না মোর নাম!

শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্ত (এম-এ)।

মৃত্তিকা-রচিত অত্যুচ্চ অট্টালিকা

দক্ষিণ-আরব দেশে প্রাচীন শিবাম নগরে শত শত বৎসরের পুরাতন, মৃত্তিকানির্ম্মিত আকাশচুম্বী অট্টালিকা এখনও বিদ্যমান। আধুনিক আকাশচুম্বী ইস্পাতের অট্টালিকাগুলি ৫০ বৎসর পূর্ব্বের নির্ম্মিত। রাণী সেবার রাজত্বকালে এই প্রাচীন নগর শিবাম অত্যন্ত প্রগতিশীল রাজধানী ছিল—বহু আকাশচুম্বী

মৃত্তিকা-নির্ম্মিত গগনচুম্বী অট্টালিকা

অট্টালিকা নগরের শোভা বর্দ্ধন করিত। এখনও মরুভূমির মধ্যে এই নগর জনবহুল। মাটীর সহিত খড় মিশাইয়া এই সকল গগনস্পর্শী অট্টালিকা নির্ম্মিত হইয়াছিল। দুর্দ্ধর্ষ উপজাতীয় আরবগণ এই সকল গৃহে যাহাতে সহজে প্রবেশাধিকার না পায়, এ জন্য ভূমি হইতে বহু উর্দ্ধে বাতায়ন নির্ম্মিত হইত। খড়মিশ্রিত মাটী সূর্য্যতাপে এমন শক্ত ও সুদৃঢ় হইত যে, সহসা কেহ মৃত্তিকাভবন চূর্ণ করিতে পারিত না। মৃত্তিকাভবনগুলি কালের প্রভাব অতিক্রম করিয়া এখনও অটুট অবস্থায় দাঁড়াইয়া রহিয়াছে।

জিরাফের গলদেশ পরিষ্কারের ব্যবস্থা

জিরাফ অতি দীর্ঘকায় পশু। ইহার গলদেশ ভূমি হইতে বহু উর্দ্ধে অবস্থিত। সার্কাস কোম্পানী পশু-প্রদর্শনীর জন্য শীতের প্রারম্ভে অন্যত্র যাইবার পূর্ব্বে সার্কাসের পশুগুলিকে স্নান করাইয়া, মাজিয়া ঘসিয়া সুন্দর করিয়া তুলে। কিন্তু জিরাফের গলদেশের ময়লা পরিষ্কার করা দুরূহ ব্যাপার। সার্কাস কোম্পানীর এক জন কর্ম্মচারী বুদ্ধি-কৌশলে একটা প্রকাণ্ড ব্রুস একটা সুদীর্ঘ দণ্ডে

জিরাফের কণ্ঠদেশ-মার্জ্জনের ব্যবস্থা

বাঁধিয়া তাহারই সাহায্যে জিরাফের কণ্ঠদেশ মার্জ্জিত করিবার ব্যবস্থা করিয়াছে।

বোমা-নিক্ষেপকারী অতিকায় বিমান

ফরাসী বিমানবহরে একখানি নূতন বোমানিক্ষেপকারী বিমান সংগৃহীত হইয়াছে। এই বিমানের ওজন প্রায় ৪ শত ৯৫ মণ। ইহার গতিবেগ ঘণ্টায় ২ শত মাইল। ইহাতে প্রায় ৬৯ মণ ওজনের বোমা থাকে। ফ্রান্স যে অন্যান্য জাতির ন্যায় মারণ অস্ত্র প্রয়োগের জন্য উপযুক্ত বিমান রাখায় অবহিত হইয়াছে, ইহা তাহার একটা নিদর্শন মাত্র। রুসিয়া, ইটালী, জার্ম্মাণী ও ফরাসী সকলেই

রণবিমান নির্ম্মাণে সবিশেষ মনঃসংযোগ করিয়াছে। জার্ম্মাণীর রণবিমানের সংখ্যা গুপ্ত রাখা হইয়াছে। এ পর্য্যন্ত যত দূর জানা গিয়াছে, তাহাতে রুসিয়ার বিমানপোতের সংখ্যা ৩ হাজার,

বোমা-নিক্ষেপকারী অতিকায় বিমান
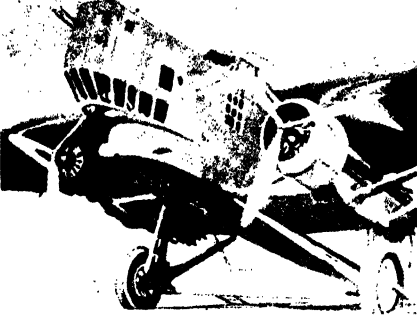
ফ্রান্সের ২ হাজার ৫ শত, ইটালীর ১৫ শত এবং ইংলণ্ডের ১১ শত। প্রত্যেক শক্তিই বিমানপোতের সংখ্যা বৃদ্ধি করিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছে।

বেলুনের সাহায্যে ফুসফুসের উন্নতি

জনৈক ক্যানাডীয় চিকিৎসক শ্বাস-সংক্রান্ত একটি বেলুন উদ্ভাবিত করিয়াছেন। ইহার সাহায্যে ফুসফুস শক্তিশালী হয় এবং বক্ষঃস্থল

বেলুনের সাহায্যে ফুসফুসের উন্নতি

প্রশস্ত হইয়া থাকে। বাস্কেটবলের আকারবিশিষ্ট একটি রবার-ব্যাগের মুখে একটি মুখোস লাগাইয়া ব্যাগের অভ্যন্তরস্থ কারবন্-ডা-অক্সাইড গ্যাস মুখোসের ছিদ্রপথে সেবন করিলে ফুসফুসের ক্রিয়া ভাল হয়।

টর্পেডো ট্রেণ

পোল্যাণ্ডে "টর্পেডো ট্রেণ" চলিতেছে। এই ট্রেণ ঘণ্টায় ৯৩ মাইল চলে। য়ুরোপের দ্রুতগামী ট্রেণের মধ্যে ইহা অন্যতম।
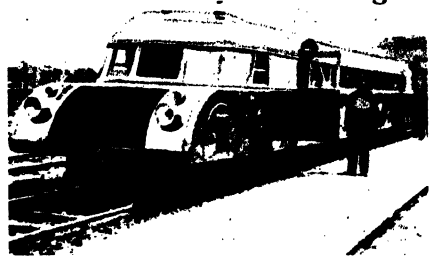
টর্পেডো ট্রেণ

এই ট্রেণের এঞ্জিন ডিজেল মোটরের দ্বারা পরিচালিত হয়। এই গাড়ীতে ৮৬ জন যাত্রীর স্থান আছে।

রবার-নির্ম্মিত প্রকাণ্ড হস্তী

বিজ্ঞাপনের সুবিধার জন্য আমেরিকার পশ্চিম উপকূল অঞ্চলে রবারের প্রকাণ্ড হস্তিমূর্তি নির্ম্মিত করা হইয়াছে। রবার
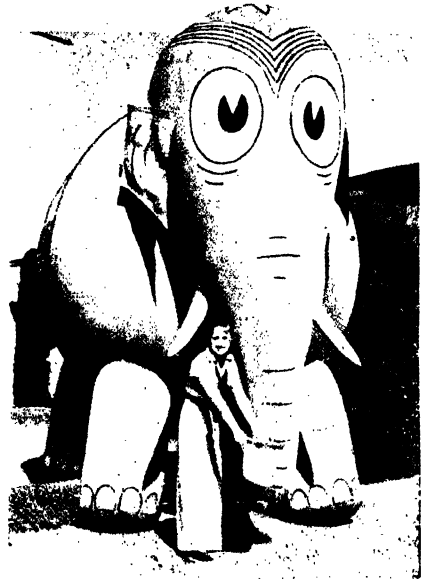
রবার-নির্ম্মিত প্রকাণ্ড হস্তী

নির্ম্মিত পশু-পরিপূর্ণ পশুশালায় এইরূপ মূর্ত্তি রচনা করিয়া রক্ষিত হইতেছে। উদ্যানে এইরূপ পশু রাখিবার সখ অনেকের আছে। মূর্ত্তিনির্ম্মাতা নিজের কারখানার বিজ্ঞাপন প্রচারের উদ্দেশ্যে এই ভাবের পশুমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিতেছেন।

নূতন ধরণের ভেলা

হনলুলুতে একপ্রকার অভিনব ভেলা নির্ম্মিত হইয়াছে। ছবি দেখিলেই ভেলার আকৃতি বোধগম্য হইবে। দুইখানি বড় তক্তার

নূতন ধরণের ভেলা

উপর ছই নির্ম্মিত। ছইএর নীচে পেডাল আছে। উহা পদ দ্বারা চালিত হইলেই ভেলা চলিতে আরম্ভ করে। জলক্রীড়া এবং অন্যান্য কাযেও এই ভেলা ব্যবহৃত হইতে পারে।

অভিনব ছত্র

জোরে বৃষ্টি পড়িতেছে, এমন সময় ব্রুকলিনের কোন পথচারিণী নারী সম্মুখে ছাতার আড়াল করিয়া পথ পার হইবার সময়, দ্রুতগামী একখানি মোটর ট্রকের আঘাতে সাংঘাতিকভাবে আহত হন। তিনি উক্ত ট্রক ছাতার আড়াল বশতঃ দেখিতে পান নাই। উক্ত নারী অতঃপর ছাতার সহিত একটি স্বচ্ছ যবনিকা সংযুক্ত করিয়া দেন। ছবি দেখিলেই উক্ত ছত্র ও যবনিকা সম্বন্ধে জ্ঞান জন্মিবে। ছাতা মুড়িবার সময় উক্ত স্বচ্ছ যবনিকার শিকগুলিও স্বচ্ছন্দে মুড়িয়া রাখা যায়।

অভিনব ছত্র

সীমাহীন মই

অরিগনএর জনৈক উদ্ভাবয়িতা এই বিচিত্র আরোহণী বা মই নির্ম্মাণ করিয়াছেন। ইহার সাহায্যে ব্যায়াম শিক্ষা হয়। ধাক্কা দেওয়া, টানিয়া তোলা, উপরে উঠা প্রভৃতি যাবতীয় শ্রমসাধ্য ব্যাপার
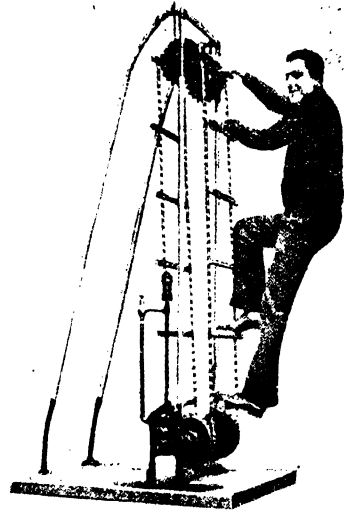
সীমাহীন মই

এই মইয়ে সম্পাদিত হয়। দুইটি সীমাহীন শৃঙ্খল দাঁতওয়াল চাকার উপর দিয়া উঠা-নামা করে। ধাপগুলিতে পা দিবামাত্র উহা আবর্ত্তিত হইতে থাকে। মইয়ে যে 'ব্রেক' আছে, তাহার সাহায্যে গতিবেগ নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে।

অতিকায় বিমান

ইংলণ্ডে এক শ্রেণীর অতিকায় বিমান নির্ম্মিত হইতেছে। এই বিমান দ্বিতল। উপর তলে বিমান-চালক ও তাহার সঙ্গীরা থাকিবে; নিম্নতল যাত্রীদিগের জন্য। ১৬ জন যাত্রী যাহাতে রাত্রিকালে নিদ্রা যাইতে পারেন, এমন কক্ষের বন্দোবস্তও হইতেছে। এই অতিকায় বিমানের ওজন ৪ শত ৩৭ মণেরও

অতিকায় বিমান

উপর। সমস্ত দিন ও রাত্রি যাহাতে বিমান পরিচালিত হয়, তাহার ব্যবস্থা এবং তদুপযোগী তৈল ইহাতে সংগৃহীত থাকিবে।

যুক্তরাষ্ট্রের নূতন কামান

যুক্তরাষ্ট্রের সেনা-বিভাগের জন্য নূতন কামান নির্ম্মিত হইয়াছে। এই কামানের গোলা ১৩ হাজার ৫ শত গজ পর্য্যন্ত লক্ষ্যভেদ করিতে সমর্থ। এই জাতীয় কামান ইহার অপেক্ষা ৩ মাইল কম দূর পর্য্যন্ত গোলা নিক্ষেপ করিতে পারিত। এই কামানের ওজন ২ হাজার ৮ শত পাউণ্ড। ঘোড়া বা ট্রাক্টর উভয়ের দ্বারাই ইহা পরিচালিত হইতে পারে। পুরাতন কামান নির্ম্মাণ করিতে যে অর্থব্যয় হইত, তদপেক্ষা ৫ হাজার ডলার বেশী ইহার জন্য ব্যয় পড়িয়াছে। ফোর্ট ব্র্যাগএ এই কামানের শক্তি পরীক্ষিত হইয়াছে।

যুক্তরাষ্ট্রের নূতন কামান

অঙ্গুরীয়-সংলগ্ন পেন্সিল

ওকলাহোমা সহরের এক জন ডাকবিভাগীয় কর্ম্মচারী পেন্সিল
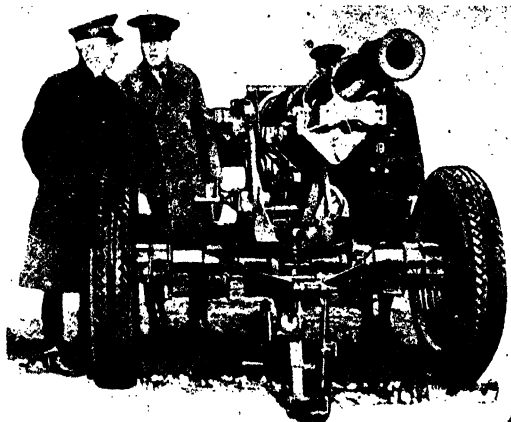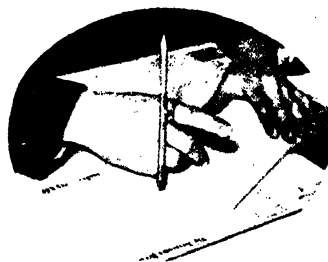
অঙ্গুরীয়ক-সংলগ্ন পেন্সিল

রাখিবার এক চমৎকার কৌশল উদ্ভাবন করিয়াছেন। তর্জ্জনী-সংলগ্ন অঙ্গুরীয়কে স্প্রিংয়ের সাহায্যে একটি পেন্সিল রাখিবার ব্যবস্থা তিনি করিয়াছেন। মণিবন্ধ একটু ঘুরাইবামাত্র পেন্সিলটি লিখিবার উপযুক্ত আশ্রয়ে আসিয়া পড়ে বা

হস্তের উপরে গিয়া থামিয়া পড়ে। ইহাতে পেন্সিল খুঁজিয়া হয়রাণ হইতে হয় না।

প্রজ্বলিত গ্যাসোলিন ট্রাক্

পতঙ্গখাদক হংস-পুষ্প

ফ্লোরিডয়ে এই বিচিত্র হংস-পুষ্পের জন্মস্থান। ইহা কীট-পতঙ্গ ভক্ষণ করিয়া জীবিত থাকে। এই হংসপুষ্পের মধুর গন্ধে আকৃষ্ট হইয়া কীট-পতঙ্গ উহার ছিদ্রপথে উদরে প্রবেশ করে। বামে চিত্র, তাহাতে হংসপুষ্পের সুন্দর অভ্যন্তরভাগ

পতঙ্গখাদক হংসপুষ্প

আলোকদীপ্ত ফাতনা

আলোকদীপ্ত ফাতনা

কিরূপ, তাহা বুঝা যাইবে। এই ছিদ্রপথেই সুগন্ধ নির্গত হয় এবং সেই গন্ধে কীট-পতঙ্গ আকৃষ্ট হইয়া গহ্বরে প্রবেশ করে। দক্ষিণের চিত্র হইতে পুষ্পের হংসাকৃতি বুঝা যাইবে।

প্রজ্বলিত গ্যাসোলিন ট্রাক

কালিফোর্ণিয়ার রাজপথে সম্প্রতি একটি গ্যাসোলিন ট্রাক জ্বলিয়া উঠিয়াছিল। ভীষণ বিস্ফোরণের আশঙ্কায় পথ হইতে যাত্রিগণ সরিয়া দাঁড়াইয়াছিল। যাহাতে শীঘ্র আগুন নিভিয়া যায়, এজন্য পেট্রল-কোম্পানীর এক জন কর্ম্মচারী প্রজ্বলিত ট্রাক পিস্তলের গুলীতে ছিদ্র করিয়া ফেলেন। ইহাতে গ্যাসোলিন বহু ছিদ্রপথে বাহির হইয়া যায়। ছিদ্রবহুল হওয়াতে ট্রাকের মধ্যে বাষ্পও জমিতে পায় নাই। ঐ ট্রাকে ৫ হাজার গ্যালন গ্যাসোলিন ছিল।

ছিপ ফেলিয়া মাছ ধরিবার সময়, বঁড়শীতে মাছ লাগিবামাত্র ফাতনায় একটা আলো জ্বলিয়া উঠিবে। ইহা বৈজ্ঞানিকের অভিনব ব্যবস্থায় সম্ভবপর হইয়াছে। ফাতনার সঙ্গে বিদ্যুতালোকের ব্যবস্থা আছে। মৎস্য টোপ গিলিবামাত্র ঐ আলো আপনা হইতে জ্বলিয়া উঠে। ফাতনা-সংলগ্ন ব্যাটারীতে ৫ শত বার আলোক জ্বলিয়া উঠিবে, এমন ব্যবস্থা আছে।

বিচিত্রদর্শন মোটরগাড়ী

মোটরদৌড়ে সুবিখ্যাত ইংরেজ ক্যাপ্টেন জর্জ্জ এইষ্টোনের জন্য একখানি নূতন ধরণের গাড়ী নির্ম্মিত হইয়াছে। ১২ সিলিণ্ডারের একটা এঞ্জিন এই গাড়ীতে সংলগ্ন করা হইয়াছে। উহার নক্সা সাধারণে প্রকাশ পায় নাই। সমুদ্র-উপকূলে বালুকারাশির উপর দিয়া গাড়ী ছুটিয়া চলিবার সময়, যাহাতে চালকের চোখে-মুখে
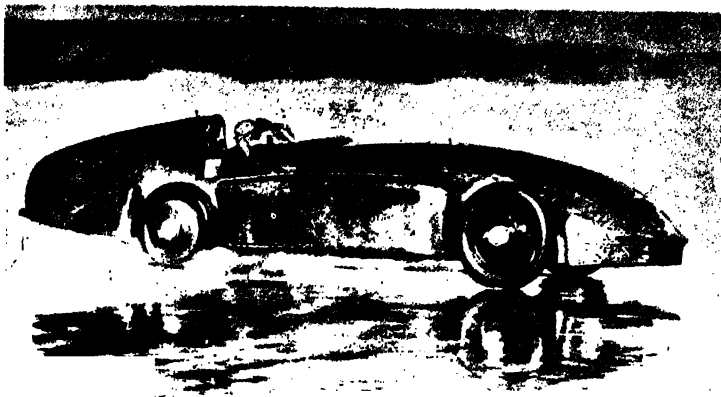
বিচিত্রদর্শন মোটরগাড়ী

বালুকণা বা শীকরকণা না লাগিতে পারে, সে ব্যবস্থাও এই গাড়ীতে আছে। দীর্ঘ দৌড়ে এই গাড়ী অপরাজেয় বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে।

ফোনএ মূর্ত্তি দর্শন

বার্লিন হইতে লিপজিক সহরে কেহ কাহাকেও ফোনের সাহায্যে আহ্বান করিলে, আহ্বানকারীর ছবি শ্রোতার কাছে ফুটিয়া উঠিবে, আহ্বানকারীও শ্রোতার ছবি দেখিতে পাইবে। বিজ্ঞান-সাহায্যে ইহাও সম্ভবপর হইয়াছে। এখন হইতে শুধু কাণে কণ্ঠস্বর শুনা নহে, মানুষকেও দেখা যাইবে। তিন মিনিটকাল মূর্ত্তি টেলিফোনের সম্মুখস্থিত পরদায় সুস্পষ্ট থাকিবে। এ জন্য ব্যয় পড়িবে ১·৪০ ডলার মুদ্রা।

ফোনএ মূর্ত্তি দর্শন

রবারনির্ম্মিত বৈদ্যুতিক পাখা

রবারনির্ম্মিত ব্লেড বৈদ্যুতিক পাখায় সংযুক্ত করায় সকলপ্রকার বিপদের আশঙ্কা দূরীভূত হইয়াছে। এ জন্য পাখার চারিদিকে তারের বেড়া দিবার প্রয়োজন নাই। ব্লেডগুলি এমনই নমনীয় যে, কোন শিশু ইহাতে হাত দিলে চলন্ত পাখায় তাহার কোনও অনিষ্ট হইবে না, অথচ পাখা দ্রুতবেগে চলিতে থাকিবে। এই পাখার আর একটা সুবিধা, উহা যখন আবর্ত্তিত হয়, তখন কোনও শব্দ

রবার-নির্ম্মিত বৈদ্যুতিক পাখা

হয় না। নূতন ধরণের মোটর সংযুক্ত হওয়ায় পাখার আবর্তনবেগে অধিক উত্তাপ জন্মিতে পারে না। সেজন্য এই পাখা দীর্ঘ-স্থায়ী হইবে। ছবি দেখিলেই এই টেবল-পাখার পরিচয় পাওয়া যাইবে।

মুখোসধারী দ্বিচক্রযান আরোহী

বিষবাষ্প দ্বারা দেশ আক্রান্ত হইলে, সে সংবাদ নগরবাসীকে জানাইবার জন্য, বিষবাষ্প-নিবারক মুখোস পরিয়া পুলিস দ্বিচক্রযানে করিয়া নগরের পথে পথে লাউডস্পীকারের সাহায্যে

মুখোসধারী দ্বিচক্রযান আরোহী

ছুটিয়া বেড়াইবে। সম্প্রতি ইংলণ্ডে ইহার পরীক্ষা হইয়াছে। পথচারী নেতৃগণও অনুরূপভাবে পরীক্ষা দিয়াছে। মোটর গাড়ী চড়া মুখোসধারীরাও এই ভাবে নগরবাসীকে সংবাদ দিবার জন্য শিক্ষালাভ করিতেছে।

ব্যাঙ্কের বিচিত্র ব্যবস্থা

বৃটিশ ব্যাঙ্কগুলির কর্তৃপক্ষ বিচিত্র ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া টাকা ও অন্যান্য জিনিস গচ্ছিত রাখিবার বন্দোবস্ত করিয়াছেন। পাশে ছবি দেখিলেই এই যান্ত্রিক ক্যাসিয়ারের স্বরূপ উপলব্ধি হইবে। ছিদ্রপথে নোট, টাকা, দলিল-পত্র প্রভৃতি নিক্ষিপ্ত হইবামাত্র যন্ত্রের অভ্যন্তরস্থ ক্যামেরা-বাতায়ন শব্দ করিয়া উঠে। কয়েক সেকেণ্ড পরে অন্য ছিদ্র-পথে একখানি রসিদ বাহির হইয়া আসে। সেই রসিদে জমা দেওয়া বস্তুর আলোক চিত্র মুদ্রিত থাকে। সেই সঙ্গেই কোন্ সময়ে এই দ্রব্য গচ্ছিত হইল, তাহাও সেই রসিদে ছাপা হইয়া যায়। কে জমা

ব্যাঙ্কের বিচিত্র ব্যবস্থা

সে সম্বন্ধেও কোনও প্রকার গোলমাল হয় না। ব্যাঙ্ক যখ থাকে, সেই সময়ে এই যন্ত্রের উপকারিতা অত্যন্ত অধিক।

বিমানের ক্রমোন্নতি

মিনিটে পাঁচ মাইলগামী বিমান

টমাস্ ই, সেলটন "ক্রুসেডার" নামক এক বিমান নির্ম্মাণ করিয়া মিয়ামিতে তাহার গতিবেগের পরীক্ষা দিয়াছেন। এই বিমান ১২ ঘণ্টায় নিউইয়র্ক হইতে প্যারী নগরে পৌছিতে পারে। ২৬ হাজার ফুট উর্দ্ধে উত্থিত হইয়া এই বিমান প্রতি মিনিটে ৫ মাইল পথ অতিক্রম করিতে পারে। ইহাতেও দুইটি এঞ্জিন সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

নূতন "রকেট কার"

নূতন "রকেট কার"

আরোহীদিগকে শিহরণে আমোদিত করিবার জন্য বিদ্যুৎচালিত এই দোলা-গাড়ীর উদ্ভাবন হইয়াছে। ইহার ওজন ১ শত সাড়ে সাঁইত্রিশ মণ। ১৮ জন আরোহী একসঙ্গে ইহাতে বসিয়া আমোদ উপভোগ করিতে পারে। ইহার গতিবেগ ঘণ্টায় ২৫ মাইল। জনৈক ইংরেজ ইহার উদ্ভাবয়িতা। টেকসাসের প্রদর্শনীতে উহা আমেরিকায় লইয়া যাওয়া হইবে।
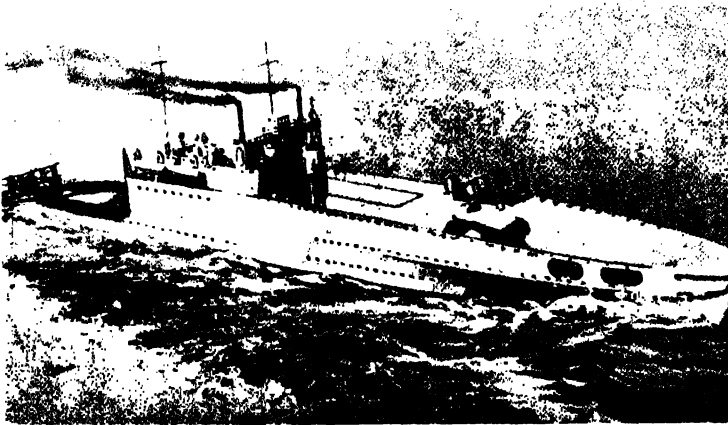
বিমানবাহী জাহাজ

জনৈক বৃটিশ বিমান-নির্ম্মাতা বিমানবাহী একখানি রণপোত নির্ম্মাণ করিতেছেন। জাহাজের উপর ছোট ছোট বিমানগুলি অবস্থান করিবে। শুধু বিমানবহন ব্যতীত এই জাহাজ অন্য কোন কার্য্য করিবে না। এই জাহাজ দৈর্ঘ্যে ৩৫ শত ৬১ ফুট, উহার প্রসার ১ ফুট। ৫ হাজার মাইল পর্য্যন্ত উহা গতায়াত করিবে।

বিমানবাহী জাহাজ

প্রেম

আঁখি মেলি' চারিদিকে চেয়ে কহে কবি,
কি সুন্দর মরি মরি এ নিখিল ছবি!
প্রেম কহে, আমা ছাড়া সুন্দরের হাট
মিলিত না, হতো ধরা শুধু মাটী কাঠ।

শ্রীঅবনীমোহন চক্রবর্ত্তী।
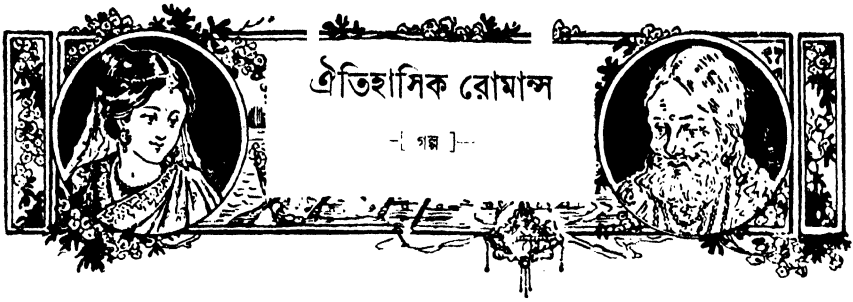
ক্ষিতিপতি হিষ্ট্রীর এম-এ। ছেলেবেলায় কবিতা লিখিত; এখন ইউনিভার্সিটির পাঠ্য-ইতিহাস পড়িয়া সেই ইতিহাসের কঙ্কালের উপর কল্পনার রঙীন ফিতা জড়ায়—জড়াইয়া নিজে মুগ্ধ হয়। ভাবে, হায়রে, যদি এমন না হইয়া অমন হইত! অর্থাৎ মামুদ গজনীর ভারত-অভিযানের অন্তরালে যদি একটু রোমান্সের টিঙ্গ…! বেগম-রাজিয়ার যদি প্রণয় হইত কোনো হিন্দু-রাজার সহিত! রাণী চন্দ্রাবতী যদি চিঠি পাঠাইতেন মহারাণা প্রতাপসিংহকে, সে চিঠির হরফ যদি লিখিতেন বুকের রক্ত দিয়া এবং সে রক্তে ঢালিয়া দিতেন প্রাণের প্রেম, প্রীতি…

ইতিহাসের পাতা খুলিয়া এমন অনেক কথা সে ভাবিতে বসে! কল্পনায় সে দেখে, আরাবলী গিরির কোলে খর্জ্জুর কুঞ্জ—সেখানে বসিয়া শাহজাদী সাশ্রু চোখে আহত রাজপুত বীরের সেবা করিতেছে…সিন্ধু-নদের তীরে বসিয়া মামুদ গজনীর স্বপ্ন দেখিতেছে…হিমালয় ভেদ করিয়া তিব্বতে ছুটিয়াছে বঙ্গাধিপ লক্ষ্মণসেনের বাহিনী…

কিন্তু এ স্বপ্ন! এক-একবার মনে হইত, ঐতিহাসিক নাটক ছাপ মারিয়া রাজ্যের অনৈতিহাসিক ব্যাপার লইয়া কত নাটক বাঙলার রঙ্গমঞ্চে তাণ্ডব নৃত্য করিয়া বেড়াইতেছে—সে-গুলার আদর্শে ইতিহাসকে ভিত্তি করিয়া সে রোমান্স রচনা করিবে! কিন্তু ইতিহাসে এম-এ ডিগ্রী লইয়া এমন কাল্পনিক কথায় ইতিহাসের 'মার্কা' দিতে…

না! লজ্জা করে! এ কাজ আর যে করে করুক, সে করিতে পারিবে না!

পাঁচ রকমের গল্প শুনিয়া সেবারে সে টুরে বাহির হইল—পঞ্জাবের দিকে ঐতিহাসিক তত্ত্ব খুঁজিবার বাসনায়।

দিল্লী-আগ্রা ঘুরিয়া সে আসিল রাজপুতানায়। উদয়পুর, যোধপুর দেখিয়া অবশেষে জয়পুরে!

সহর ছাড়িয়া এধারে ওধারে ঘুরিতে একদিন চকের ও-দিকে দেখে, ছোট একটি দোকান। দোকানের সামনে রঙ-চটা কাঠের ফলক—তাহাতে দেবনাগরী ও বাঙলা হরফে লেখা আছে,—(আমরা শুধু বাঙলা হরফগুলার পরিচয় দিতেছি)—

শ্রীচন্দ্রকান্ত ভট্টাচার্য্য
প্রাচীন-কালের সর্ব্ব রকম দ্রব্য
সরবরাহ-কারক পরীক্ষা প্রার্থনীয়

রৌদ্র-জল খাইয়া অক্ষরগুলা স্থানে স্থানে অস্পষ্ট, অদৃশ্য হইয়াছে!

দোকানের জানলায় সার্শি বসানো, হাল-ফ্যাশনে। সার্শির মধ্য দিয়া দেখা যায়, ভিতরে জানলার সেল্‌ফে টুকিটাকি অনেক জিনিস সাজানো রহিয়াছে,—আংটি, হার, লকেট, কচ,—তাছাড়া জয়পুরী পাথরের খেলনা।

ক্ষিতিপতি গিয়া দোকানে ঢুকিল। মালিক চন্দ্রকান্ত ভট্টাচার্য্য, মাথায় প্রকাণ্ড পাগড়ী; আসিয়া বলিল—আপনি বাঙালী!

অত-বড় পাগড়ী-ধারীর মুখে বিশুদ্ধ বঙ্গভাষা নিখুঁত ভাবে উচ্চারিত হইতে শুনিয়া ক্ষিতিপতি যেন চমকিয়া উঠিল! সে ভাব কাটিলে ক্ষিতিপতি প্রশ্ন করিল—আপনাকেও বাঙালী দেখছি!

চন্দ্রকান্ত কহিল—তাই। প্রথম জীবনে ভেবেছিলুম, নাটক লিখে নাম আর পয়সা রোজগার করবো। তা হলো না। এ মুল্লুকে কাজ করতো এক সম্বন্ধী। এসে তার আশ্রয় নিলুম। তার পর এই সব টুকিটাকি সংগ্রহ করে বিক্রী করছি।…সাহেব-সুবোরা কেনে—বাঙালীও কেনে—এদিকে অবশ্য যাদের সখ আছে!

ক্ষিতিপতি বলিল,—এ-সবে আমারো একটু সখ

আছে···ঘুরে-ঘারে তেমন কোনো-কিছু পেলে সংগ্রহ করি।···তা, আমাকে কোনো জিনিষ দেখাতে পারেন—মানে, যার বেশ historical interest আছে?

—আছে বৈ কি···নিশ্চয় আছে।

কথাটা বলিয়া চন্দ্রকান্ত বাহির করিল একটা তাবিজ। তাবিজের গায়ে রকমারি নক্সা।

নক্সা বুঝাইতে চন্দ্রকান্ত রাজপুত-আর্ট, মোগল-আর্ট প্রভৃতি লইয়া অনেক বড় বড় কথা সুরু করিয়া দিল। ক্ষিতিপতির রোখ চাপিল। সে যেন দোকানখানা কিনিয়া ফেলিবে, এমন ভাব দেখাইল; এবং তার ফলে ছ'টা ছোট আলমারি ঘাঁটিয়া চন্দ্রকান্ত রাজ্যের জিনিষ বাহির করিল। নাক-ছাবি—এ নাক-ছাবি এই জয়পুরেরই এক মহারাণী নাকে আঁটিতেন!—বাজুবন্ধ—মোগল-আমলের: বহু খোসামোদে দিল্লীর জোহানি বক্সের কাছ হইতে চড়া দামে কিনিয়া সংগ্রহ করিয়াছে—এ বাজুবন্ধ দিল্লীর শেষ বাদশা মহম্মদ সাহের কে নাৎনী পেটের দায়ে বেচিয়া দিয়াছিল। উর্দ্দু-হরফে লেখা ক'খানা জীর্ণ মলিন কাগজের টুকরা চন্দ্রকান্ত মেলিয়া ধরিল ক্ষিতিপতির সামনে।

কথায়-কথায় ছ'পক্ষের উৎসাহ বাড়িয়া উঠিয়াছিল এবং ছুটাছুটি করিতে গিয়া ছোট একটা টুলে হুঁচট খাইতে চন্দ্রকান্তর ফতুয়ার জেবে-ঝুলানো সোনার চেনছড়া লকেট-সমেত ছিটকাইয়া কাচের শো-কেশে আসিয়া লাগিল।

সে-শব্দে ছ'জনেই চাহিল কাচের পানে। কাচখানা ভাঙ্গিল না কি?

ক্ষিতিপতি বলিল—লকেট! বাঃ! দেখি···

চেন-সমেত লকেটটি চন্দ্রকান্ত ক্ষিতিপতির হাতে দিল। ক্ষিতিপতি দেখিল, দেখিয়া লকেটটি খুলিল। লকেটের মধ্যে···নারীর মাথার একগাছি কেশ—সুদীর্ঘ; রঙ স্নিগ্ধ কালো; আর নরম যেন রেশমী সূতা!

নিশ্চয় কোনো গূঢ় রহস্য আছে···ঐতিহাসিকের দৃষ্টিতে নিমেষে সে বুঝিল।

ক্ষিতিপতি বলিল,—একগাছি মাথার চুল···

চন্দ্রকান্ত বলিল,—হ্যাঁ। ঐটুকু ওর ইতিহাস।

ক্ষিতিপতি বলিল,—ইতিহাস!···লকেটটি বেচবেন···যদি আমি কিনি?

কুণ্ঠিত স্বরে চন্দ্রকান্ত বলিল,—এ লকেট বেচতে পারবো না। এ এক-রকম আমার luck! যাকে বলে, charm! তাছাড়া আমার নিজের জীবনের সঙ্গে এর যোগ আছে।

—আপনার জীবনের সঙ্গে যোগ!

ক্ষিতিপতির স্বরে একরাশ বিস্ময়!

মৃদু হাস্যে চন্দ্রকান্ত বলিল,—তাই!···তবে লকেট যদি চান, ঢের ভালো লকেট আছে আমার কাছে। জয়পুরী মীনার কাজ···

ক্ষিতিপতি বলিল,—আপনি যে বললেন, এ চুলের ইতিহাস আছে! তার মানে, আপনার জীবনের ইতিহাস? না···না?

বাধা দিয়া চন্দ্রকান্ত বলিল,—পুরোনো ইতিহাস। সে ইতিহাসের সঙ্গে শেষে আমার জীবনের যোগ হয়। অর্থাৎ ঐ চুলগাছি···আপনারা বোধ হয় সে কথা বিশ্বাস করবেন না!

আশ্চর্য্য কথা! ক্ষিতিপতি বলিল,—আমি বিশ্বাস করবো না, এ ধারণা আপনার কিসে হলো? আমি বেশী কিছু বলতে চাই না···শুধু এইটুকু জেনে রাখুন, আমি ইতিহাসে এম-এ; তত্ত্ব-সন্ধান করি। আমার বাস কলকাতায়।

—বটে!

চন্দ্রকান্তর দুই চোখ প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। চন্দ্রকান্ত বলিল,—বাঙালীর মুখে এ-কথা এই প্রথম শুনলুম।··· কাউলি সাহেবের নাম শুনেচেন? খুব বড় হিষ্টরিয়ান··· থাকেন অক্সফোর্ডে···রিশার্চ করেন। তিনি এসে একটি নাচের ঘুঙুর নিয়ে যান্ এখান থেকে···সে ঘুঙুরটি ছিল বাদশা ফরুক্ শিয়ারের এক বাঁদীর। ঘুঙুরের গায়ে নানা চিত্তির-বিচিত্তির কাটা ছিল···তাই দেখে সাহেব সেটা নেন··· তার পর দেশে গিয়ে সেই নক্সা নিয়ে মস্ত essay লেখেন··· হুলস্থূল পড়ে যায় সে essay-তে! আমায় একখানা ছাপা কাগজ পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। দু'চার বছর অন্তর সাহেব একবার ক'রে ইণ্ডিয়ায় আসেন।···এলে আমার সঙ্গে দেখা না ক'রে যান্ না!

লোকটি শুধু দোকান খুলিয়া বসে নাই—গুণী! ক্ষিতিপতির শ্রদ্ধা হইল। ক্ষিতিপতি বলিল,—আপনার কোনো আপত্তি আছে এ চুলগাছির ইতিহাস আমায় বলতে? কোনো কেশবতী রাজকন্যার মাথার চুল, বুঝি?

ছোট একটা নিশ্বাস ফেলিয়া চন্দ্রকান্ত বলিল,—রাজ কন্যা নয়···তবে···আচ্ছা, আমি বলচি আপনারা এ সব নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন···হয়তো মস্ত রহস্য আবিষ্কার করতে পারবেন···

ক্ষিতিপতি বলিল,—বলুন···

চন্দ্রকান্ত কহিল,—সিগারেট-বিড়ি ইচ্ছা করেন?

—না।

—বটে! তা হলে বসুন···আমি বলচি ···

ক্ষিতিপতি বসিল। চন্দ্রকান্ত বলিতে লাগিল,—ইন্দোরে তখন সম্বন্ধীর বাসায় এসে উঠেছি···খাই-দাই বেড়াই। কোনো মতে যদি কাজকর্ম জুটে যায়···চেষ্টা! কিন্তু চেষ্টা থাকলেও কাজে তা ঘটছিল না। দারুণ অস্বস্তি ··· বৈরাগ্যের কথা মনে জাগছিল স্ত্রী মিষ্টভাষিণী হলেও বেকার-স্বামীকে সে মিষ্ট ভাষা কত আর জোগাবেন! শেষে তাঁর ভাষা হলো তিক্ত, বাণী রূঢ়; সম্বন্ধী হলো উদাস, শাশুড়ী গম্ভীর—তখন হঠাৎ এক রাত্রে সকলে ঘুমোলে আমি বেরিয়ে পড়লুম পাষাণ-পথে। মনে হতো, কোনো পাহাড়ের গুহায় দেখা পাবো জটাজুটধারী কোনো সাধু-সন্ন্যাসীর—ভক্তিতে তাঁকে তুষ্ট ক'রে স্পর্শমণি, না হয় কোনো স্বপ্নাদ্য ওষধি নিয়ে ফিরে আসবো তখন···

আশার এমনি রঙীন্ ছোপ মনে লেগে থাকতো বলে চলার পথ হয়েছিল সহজ, স্বচ্ছন্দ!

ইন্দোর পার হয়ে উজ্জয়িনীতে এলুম···পয়সা-কড়ির জোর তেমন ছিল না—তবু আশ্রয় মিলেছে বরাবর। জানি, যিনি জীব দিয়েছেন, উপায় তিনিই ক'রে রেখেচেন!

উজ্জয়িনীতে ছিলুম এক ধরমশালায়। সেখানে যাত্রীদের মুখে শুনলুম, পাঁচ ক্রোশ উত্তরে এক পাহাড় আছে; পাহাড়ের নাম মহেশ্বর। সেখানে আছেন এক যোগী—তাঁর বয়স প্রায় তিনশো বছর! তিনি সাক্ষাৎ কামনানাথ মহাদেব—সদা-প্রসন্ন মূর্ত্তি!

আমার মন নেচে উঠলো···পরের দিন মহেশ্বরকে স্মরণ করে বেরুলুম মহেশ্বর পাহাড়ে যোগী-মহেশ্বরের উদ্দেশে!

তিন হপ্তা পরে পাহাড়ের ধারে এক চটীতে এসে পৌঁছলুম। সন্ধ্যা হয়-হয়। শীতে হাত-পা ঝন্‌ঝন করছিল। চটীটি ছোট—যাত্রীতে ভরে গেছে। চটীওয়ালা জানালো, সেখানে তিল-ধারণের ঠাঁই নেই।

উপায়?

চটীওয়ালা বললে,—খানিকটা এগিয়ে গেলে পাবো গড়। অর্থাৎ সেখানে আছে বহুকালের পুরানো কেল্লা। কেল্লায় ক'খানা ঘর এখনো টিঁকে আছে। মহারাজিয়া রাক্ষণী সে ঘর দখল ক'রে আছে। তার ওখানে যাত্রী থাকে সেখানে গেলে আস্তানা মিলবে।

দায়ে পড়ে শ্রান্ত দেহটাকে টেনে-হিঁচড়ে কোনো মতে এসে পেলুম সেই গড়। পাহাড়ের পাঁচিল, পাহাড়ের পাঁচিল—কতদূর পর্য্যন্ত চলে গেছে—ওঃ!···পরিখা আছে, চূড়া আছে···মাঝে মাঝে ভেঙ্গে গেছে! খুব জীর্ণ দশা। দেখলে মনে হয়, হাঁ, ছিল বটে এক কালে কেল্লার মতো কেল্লা···নাম বীরগড় সে-কেল্লার যোগ্য নাম বটে!

ডাকাডাকি করে মহারাজিয়াকে পাওয়া গেল।

আস্তানার কথা বললুম। মহারাজিয়া বললে,—কামরা মিলবে এসো।

তার সঙ্গে গড়ে ঢুকলুম ···

প্রচুর খোলা জায়গা···এখন মাঠ হয়ে আছে! মাঝে মাঝে পাথরের স্তূপ। গড়ের পাঁচিলের গায়ে অসংখ্য ঘর দোতলা তিন-তলা। পাথরের সিঁড়ি। দোতলার একটা ঘরে এনে মহারাজিয়া জ্বাললো প্রদীপ। ঘরটি প্রকাণ্ড! ও পাশে জানালা। মহারাজিয়া জানলা খুলে দিল···

বললে—খাওয়া-দাওয়া হবে তো?

বললুম,—কিছু খেতে পেলে বাঁচি। ক্ষেত থেকে কাঁচা ছোলা তুলে খেয়েছি!

—বসো···খাবার আনছি। আটার রুটী আছে—ছোলার ডাল আছে।

মহারাজিয়া গেল চলে'···আমি এসে জানলার ধারে দাঁড়ালুম। বাহিরে অজস্র জ্যোৎস্নার আলো! যেন মায়া-ছড়ি বুলিয়ে কে এই পাহাড়-তলীর রন্ধ্রে-রন্ধ্রে যে-কালো অন্ধকার ছিল লেপে, সে কালি মুছে রূপা গলিয়ে ঢেলে দেছে! মন বলে উঠলো, চমৎকার!

মহারাজিয়া ফিরলো খানিকক্ষণ পরে; তার হাতে পিতলের থালিতে রুটী আর বাটীতে ডাল।

থালি রেখে সে বললে,—জল দিয়ে যাচ্ছি। খেয়ে-দেয়ে ঐ খাটিয়ায় শুয়ে ঘুমিয়ো—কাল সকালে এসে আমি পাত্র নিয়ে যাবো।..

যথাসময়ে আহারাদি সেরে খাটিয়ার উপর শ্রান্ত দেহকে দিলুম বিছিয়ে। জানলা খোলা ছিল। আকাশ যেন দুধ-সাগর! ঘরে জ্যোৎস্নার আলো উথলে এসে পড়েছে··· প্রদীপটা নিবিয়ে দিলুম···দারুণ পরিশ্রম গেছে···চোখে তন্দ্রা-ভার···আমি চক্ষু মুদলুম।

স্নিগ্ধ বাতাস! দিব্য প্রশান্তি!

কতক্ষণ ঘুমিয়ে ছিলুম, জানি না। হঠাৎ যেন একটা শব্দ পেলুম! যেন শাড়ীর খশখশ শব্দ · স্পষ্ট! চোখ মেলে চাইলুম।

চাইতে দেখি, ঘরে দাঁড়িয়ে অপূর্ব্ব-রূপসী এক তরুণী! পরণে রূপার কুচি-আঁটা সাদা ঘাগরা···বুকে পেঁয়াজী-রঙের কাঁচুলি···মাথায় দীর্ঘ কালো কেশ · মুক্তধারে ঝরে পড়েছে পিঠ বয়ে জানু ছুঁয়ে···যেন মেঘের ঝালর! তরুণীর সর্ব্বাঙ্গে জ্যোৎস্না-ধারা! মনে হলো, যেন রাণী পদ্মিনী এসে সামনে দাঁড়িয়েছেন!

কল্পনার ছবি? না, সত্য? বিস্ফারিত নেত্রে তার পানে চেয়ে আমি বিছানার উপর উঠে বসলুম। প্রশ্ন করলুম—কে?

জবাব পেলুম না···তবে স্পষ্ট দেখলুম, তরুণীর অধরে ফুটলো মৃদু হাস্য-রেখা! যেন ছটি রজনী-গন্ধা ফুল! তেমনি সাদা, তেমনি নরম!

আমি উঠে দাঁড়ালুম। না, এ তো বিভ্রম নয়! সত্য। কিন্তু কে?

তরুণী দ্রুত পায়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। আমি ছুটলুম পিছনে...

পাশের ঘর। অন্ধকার। কেউ নেই। মনে হলো, সে অন্ধকারের গা বয়ে একটা রূপালি-আলোর আভা সরে-সরে চলেছে···

সিঁড়ির ধারে এলুম। নীচে নামলুম না। মনে কেমন আতঙ্ক! বিস্ময়ে হতভম্ব দাঁড়িয়ে রইলুম সেই অন্ধকারে পাথরের সিঁড়ির সামনে উৎকর্ণ!

কিন্তু কোথায় কে? এতটুকু সাড়া নেই, শব্দ নেই কোনো দিকে! দারুণ নিঃশব্দতা যেন জমাট স্তূপের মতো পৃথিবীর বুকে চেপে বসে আছে!

নিরুপায় বিমূঢ়ের মতো ফিরে এলুম ঘরে···বিছানায় শুয়ে পড়লুম।···

পরের দিন সকালে মহারাজিয়ার কাছে কথাটা প্রকাশ ক'রে বললুম। সে অবাক হয়ে চেয়ে রইলো আমার মুখের পানে।

আমি বললুম,—স্পষ্ট দেখেছি।

মহারাজিয়া বললে,—যাত্রী এখানে আরো দু'চার জন আছেন। কিন্তু এমন বড়-ঘরানা···কৈ এমন মেয়ে তো আমার এখানে নেই এখন।··· ভালো কথা, আপনি কি এখানে থাকবেন দু'চার দিন?

মনের ভাব মুখে ফুটে উঠলো। বললুম,—হ্যাঁ, কিছু দিন এখানে আমি থাকবো।

সারা দিন মন প্রতীক্ষা ক'রে রইলো,—বুঝি সে আসবে!

এলো না! বিকেলের দিকে অস্বস্তি-ভরে বেরিয়ে পড়লুম পথে। গেলুম সেই গুহার সন্ধানে। মন প'ড়ে রইলো কিন্তু এই জীর্ণ কেল্লায়। হয়তো রূপসী এসেছেন! কেল্লার কোনো ঘরের বাতায়নে হয়তো আছেন দাঁড়িয়ে—ডাগর চোখে চেয়ে পাহাড়ের কোলে বনের পানে! হয়তো ঘুরে বেড়াচ্ছেন সেই পাথরের স্তূপগুলোর ফাঁকে ফাঁকে যে-পথ, সেই পথে···বাতাসে উড়ছে তাঁর ঘাগরা, ওড়নী···গতির ছন্দ-রাগে বাজছে হাতের কিঙ্কিণী!···রূপ-কথার উদাসিনী রাজকন্যার মতো হয়তো আমারি সন্ধান করছেন!

গুহায় থাকতে পারলুম না। ফিরে এলুম সেই কেল্লায়। ফটক খোলা ছিল···এলুম ভিতরে।

এ ঘর, ও ঘর—খালি ঘরগুলোয় ঘুরে-ঘুরে দেখলুম। কেশের সুরভি কণা···হাসির বিদ্যুৎ-ঝিলিক···কিঙ্কিণী-রাগিণীর রেশ···রূপের সে রূপালি আভা···কোথাও কোনো চিহ্ন নাই!

একটা ঘর···দিন-শেষের রাঙা রবির আলোয় ঘর ভরে আছে। সে আলোয় দেখি, পাথরের দেওয়ালে রঙের রেখায় ছবির একটা আদরা! একখানি তরুণীর মুখ··· মাথায় কেশের রাশি···

সে-মুখ—রাত্রে-দেখা সেই তরুণীর মুখ! হুবহু! কোনো নিপুণ শিল্পী পাথরের বুকে তরুণীকে যেন বন্দিনী ক'রে রাখবার প্রয়াস পেয়েছিলেন!

আমার সর্ব্বাঙ্গে রোমাঞ্চ-রেখা! মুগ্ধ নয়নে আমি সেই পাষাণ-রেখার পানে চেয়ে রইলুম…অনেকক্ষণ…মন বিহ্বল, বিবশ হয়ে এলো!

সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছিল!…অন্ধকারে পাথরের বুকে সে রেখা অদৃশ্য হয়ে গেল।

আমি চ'লে এলুম আমার ঘরে।

মহারাজিয়া এলো। তার হাতে ভোজ্য

আমি বললুম,—ওই পাশের ঘরে দেয়ালের গায়ে তুলির রঙে কে ও-ছবি এঁকেছে?

—ছবি!

মহারাজিয়া যেন আকাশ থেকে পড়লো! আমি বললুম,—হ্যাঁ, ছবি। কে ও মেয়েটি…আর ও ছবিই বা কে আঁকলো? কবে আঁকলো?

মহারাজিয়া বললে,—কে আবার ছবি আঁকবে, বাবু-সাব? কার ছবি আঁকবে? আপনার চোখের ভুল!

ভুল! ভাবলুম, মনের মধ্যে যে-মানসী বসে আছে, সেই মানসীই এ বিজন পাহাড়-তলীতে আমার চোখে কুহক-মায়া রচনা করছে!

মহারাজিয়া চ'লে গেল। আমার মন উতল হয়ে রইলো।

কিন্তু না, ভুল নয়! মোহ নয়! চাই! যেমন ক'রে পারি, এই রূপসীকে খুঁজে বার করা চাই! এই পাষাণের বুক চিরে রূপসীকে আমি উদ্ধার করবো! করবোই! স্পষ্ট তাকে দেখেছি…

দুর্জ্জয় লোলুপতায় মন ভরে উঠলো। ভুলে গেলুম, আমি নিরন্ন বেকার! মনে হচ্ছিল, আমি যেন রূপ-কথার সেই রাজপুত্র…এসেছি এই পাষাণ-দুর্গে বন্দিনী রাজকন্যাকে তাঁর পাষাণ-কারা থেকে উদ্ধার করতে!…

আবার সেই রাত্রি! জানলার পানে চেয়ে বসে আছি…নিস্পন্দ! চোখের সামনে ভরে এলো গাঢ়-কালো অন্ধকার…সে অন্ধকার ধুয়ে মুছে বয়ে এলো আবার সেই জ্যোৎস্নার বন্যা-ধারা!…

মনের উপর দিয়ে ভেসে চলেছিল পাৎলা মেঘের মতো অতীত যুগের ইতিহাসের বহু ঘটনা!

রাণা ভীমসিংহ…রাণী পদ্মিনী…আলাউদ্দিন খিলিজি…জওহর ব্রত…চাঁদ সুলতানা…রাণী সংযুক্তা…জয়চাঁদ…স্বয়ংবর সভা…ছবির মতো!

হঠাৎ মনে হলো, আমি একা নই…নিঃসঙ্গ নই! কে যেন এসে কাছে দাঁড়িয়েছে! যেন তার নিশ্বাস…

সারা দেহে আবার রোমাঞ্চ!

আপনা-হতে কণ্ঠে জাগলো অস্ফুট ধ্বনি—কে?

উত্তর নেই…শব্দ নেই! আমার সে স্বর যেন কঠিন জমাট নৈঃশব্দের গায়ে পড়ে ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে ছড়িয়ে গেল!

মনে হলো, যেন রূপের আভা জাগছে…অন্ধকারের রন্ধ্রে রন্ধ্রে! সে আভা স্পষ্ট হলো, উজ্জ্বল হলো…আর সেই স্পষ্ট আলোয় দেখি…

চোখের সামনে রূপসী তরুণী…সে!

বললুম,—কে?

সত্য? হাত বাড়ালুম স্পর্শ নেবার জন্য।

কোথায় কে? শূন্যতা! কেউ নেই! রূপসী সে মিলিয়ে গেল! যেন আলোর শিখা নিবে গেছে!

সিঁড়ির কাছে এসে জোর-গলায় ডাকলুম, মহারাজিয়া…

নীচে কে গান গাইছিল…ভজন-গান। মহারাজিয়ার সাড়া পেলুম না।

আবার ডাকলুম…আবার…আবার…

মহারাজিয়া এলো! আমি তাকে বললুম…যা দেখেছি!

মহারাজিয়া বললে—কি জানি বাবু-সাব! কেউ কেউ এমন কথা বলেছে বটে আগে! আমি তো কিছু দেখিনি কখনো!…আশ্চর্য্য নয়…কত রাজা-রাজড়া এখানে একদিন বাস করেছে। কোন্ শাহজাদী ছিল বন্দিনী…রাজকন্যা, সখী-সহচরী…বাঁদী! কেউ বলে, দেখেছে রূপসী রাজকন্যা! কেউ শুনেছে বাঁশী-গান…এমনি নানা কথা বলেছে নানা লোক!…ভুল, বাবু-সাব! স্বপ্ন!…

মহারাজিয়ার কাছে কোনো সন্ধান পাবো না—বুঝলুম। কিন্তু এ স্বপ্ন নয়…

ফিরে এলুম নিজের ঘরে। আলেয়ার পিছনে কোথায় ঘুরবো?

বিছানায় শুয়ে শুয়ে নানা কথা ভাবছিলুম…তার মধ্যে চোখে বয়ে এলো ঘুমের পাথার।

সে ঘুম ভাঙলো অতর্কিতে! চাঁদ তখন আকাশে এক রাশ মেঘের আড়ালে গেছে সরে'···আলোর আব্ছায়া··· সেই ছায়া-মেশা অস্পষ্ট আলোয় দেখলুম···ঘরের দ্বারে সেই রূপসী! মাথায় দীর্ঘ কেশের রাশি···আলুলায়িত! সারা ঘর তার রূপের আলোয় আলো হয়ে উঠলো!

উঠে বসলুম···তরুণী চ'লে গেল না···এগিয়ে এলো আমার দিকে। মুখে মৃদু হাসি! সে যে কি···

বললুম,—বসবে?

তরুণী এসে বসলেন আমার পালঙ্কে···আমার শিরায় শিরায় বাসনা হলো উগ্র···অধীর উন্মাদ স্রোতে বুকের রক্ত উচ্ছল হয়ে উঠলো···মনে হলো, এ তরুণী আমার! আমার পথ চেয়ে বসে আছে জন্ম-জন্ম যুগ-যুগ ধরে'···! আর আমি সব ভুলে তুচ্ছ চাকরি-নোকরির মোহে কোথায় বেড়াচ্ছি ঘুরে···রাজ্যের ইট-কাঠের চাপে দেহ-মন ক্ষত-বিক্ষত করে···

মত্ত নেশায় আমি যেন বিহ্বল হয়ে উঠলুম।

তরুণীকে বুকে টেনে নিলুম। তার কেশের সুরভি··· কপোলের লালিমা···রূপের মাধুরী···

অধরে অধর মিশে আমাকে যেন মূর্চ্ছাতুর করে তুললো!

স্বর্গ! আমার বুকে তরুণীর দেহ-লতা···আমি তার কেশরাশি নিয়ে আঙুলে জড়িয়ে লীলা-ভরে খেলায় মত্ত···

বললুম,—আমাকে ছেড়ে তুমি চলে যেয়ো না···

তরুণী তার ডাগর দুটি চোখ মেলে আমার পানে তাকালো। তার চোখে ফুটলো যেন আতঙ্ক! বর্ণের আভায় নীলিমার আভাস!

চকিতে আমার বাহুর বাঁধন কেটে তরুণী উঠে দাঁড়ালো··· এবং চকিতে চলে গেল সে-ঘর ছেড়ে চঞ্চলা-চপলার চমকের মতো!

আমি ছুটলুম তার পিছনে।

কিন্তু মিথ্যা ছোটা! রূপসীর চিহ্ন যেন পৃথিবীর বুক থেকে নিমেষে উবে মুছে গেল!···

আমার সমস্ত প্রাণ হায়-হায় ক'রে উঠলো! চেতনা-পাতে দেখি, আমার আঙুলে জড়িয়ে আছে তার মাথার সেই সুরভি কালো কেশ···একগাছি! যেন রেশমী সুতো···আর সেই কেশের প্রান্তে বাঁধা ছোট একটি পদক··· সে এই লকেট!···

ক্ষিতিপতি মুগ্ধ চিত্তে কাহিনী শুনিতেছিল। প্রশ্ন করিল,—কে সে রূপসী? কোনো পরিচয় পেলেন?

চন্দ্রকান্ত বলিল,—পেয়েছিলুম।···তবে তাকে আর কোনো দিন দেখিনি। ছিলুম সেখানে এ ঘটনার পর আরো প্রায় দু'হপ্তা। নিত্য প্রতীক্ষায় থাকতুম, মনে অনন্ত আশা নিয়ে···কিন্তু দেখা পাইনি!···

সকালে উঠে মহারাজিয়াকে ধরলুম··মিনতি জানালুম। আমার আঙুলে ছিল চুনীর আংটি। সেই আংটি তার হাতে তুলে দিয়ে মিনতি জানিয়ে বললুম—বলো আমায় এর কথা, মহারাজিয়া···করুণা করো···

জবাবে তার সেই এক কথা—আপনার চোখের ভুল বাবু-সাব···স্বপ্ন! এমন রূপসী কেল্লায় নেই···এ তল্লাটে নেই!

আমি বললুম,—হতে পারে না। সে আছে···নিশ্চয় আছে। আমার ভুল নয়!

আমি তার চোখের সামনে ধরলুম সেই পদক আর কেশ! দেখে মহারাজিয়া শিউরে উঠলো। বললে,—জানি বাবু-সাব, এ জেবর! এ জেবর ছিল আমাদের বংশের এক জেনানীর।···

তার পর মহারাজিয়া বললে,—অনেক বছর আগেকার কথা! আমার প্রপিতামহীর বহিন···নাম ছিল লছমী···সে ছিল রাজকন্যা চম্পাবতীর সহচরী। চম্পাবতী আর জামাই-রাজা। সুখে দুজনের দিন কাটছিল। তার পর এই লছমী-দেবীকে ভালো বাসলো জামাই-রাজা! লছমী দেবীর রূপ ছিল লছমী ঠাকুরাইনের মতো! দুজনে জাগ্‌লো গভীর ভালোবাসা! জামাই-রাজা ছিল গুণী···ছবি আঁকতে পারতো পাথরের বুকে। লছমী দেবীর যে-ছবি দেখেছো বাবু-সাব ঐ ঘরে পাথরের দেওয়ালে, সে রেখা জামাই-রাজার হাতের। শেষে এ ভালোবাসার কথা শুনলেন রাজকন্যা চম্পাবতী। লছমী দেবীকে তিনি করলেন বন্দিনী।···লছমী দেবী সে-অপমান সইতে না পেরে কেল্লার ছাদ থেকে লাফিয়ে পড়েন পাহাড়ের বুকে। তাঁর সব শেষ হয়ে যায়!···

কাহিনী শুনিয়া ক্ষিতিপতি বলিল—ভৌতিক ব্যাপার!··· ছায়া-ভূত কিন্তু সত্যকার লকেট চুলে বেঁধে পৃথিবীতে ঘোরে না!

চন্দ্রকান্ত হাসিল, হাসিয়া বলিল—এ কথা কেউ বিশ্বাস করতে চায় না···কিন্তু আমি তো জানি···চোখে যা দেখেছি, হাতে যে লকেট পেয়েছি···তাছাড়া দেখছেন, এ লকেটের চেহারা? গড়ন এ-কালের নয়। একে সুর্ম্মাদানি বললে চলে, মশলাদানি বলা চলে, কবচ বলাও চলে! এ লকেট কে এখন গড়ে? গড়তে পারে? বলুন তো!

কথাটা সত্য।

ক্ষিতিপতি দেখিল ভালো করিয়া···লকেট না বলিলে কে চিনিবে?···Curios বটে! অপরূপ গড়ন!

চন্দ্রকান্ত বলিল,—আজ আমায় এমন দেখচেন—সেদিন কিন্তু সুপুরুষ বলে আমার খ্যাতি ছিল।···এ ঘটনার পর উদভ্রান্তের মতো পথে পথে ঘুরে বেড়িয়েছি। শেষে এক সন্ন্যাসীর কৃপায় আমার সে পাগলের ভাব কাটে। আবার সংসারে ফিরে আসি। তবে সে বেকার-দশা ঘোচে আসবামাত্র!···

চন্দ্রকান্ত ক্ষণেক স্তব্ধ রহিল, পরে একটা নিশ্বাস ফেলিয়া আবার বলিল,—সে স্বপ্ন নয়, ভুল নয়···সারা জীবনে··· এতখানি বয়স হলো, তবু আমি ভুলতে পারিনি সে-রাত্রের কথা! যেন সে কালকের ঘটনা···! বুঝলেন মশায়, লছমী দেবী বাস করচেন আমার এই বুকে। এটি বুকে বয়ে বেড়াচ্ছি···সেই দিন থেকে আজ পর্য্যন্ত বরাবর।··· লকেটটিকে কোনো ক্ষণে সঙ্গ-ছাড়া করিনি।

ক্ষিতিপতি স্তম্ভিতের মতো বসিয়া রহিল।···

চন্দ্রকান্তর মূর্ত্তি গম্ভীর-উদাস!

ক্ষিতিপতি কহিল,—শুনচেন?

—কি?

ক্ষিতিপতি বলিল,—এ লকেটটি বেচবেন? আমি একশো টাকা দিতে পারি···দাম!

—মাপ করবেন। এর আসল দাম কতই বা! বড় জোর চার-পাঁচ টাকা···কিন্তু এ তো ব্যবসার জিনিষ নয় ···ঐ যা বললুম···

—আচ্ছা, আমি দুশো টাকা দেবো।

—মাপ করবেন। আপনি বাঙালী···এ-সবে আপনার সখ আছে, বুঝি। কিন্তু···

—বেশ···আড়াই'শো নিন্। দিন্···এ নিয়ে আমি রিশার্চ্চ করবো···রাণী চম্পাবতী···লছমী দেবী! জামাই-রাজার কি নাম ছিল?

চন্দ্রকান্ত কহিল,—জানি না। মানে, জানতে পারিনি।

—তা হ'লে এই কথা···এখনি আমি দিচ্ছি আড়াইশো টাকা···নিন্, রাখুন।

পকেট হইতে পার্শ বাহির করিয়া একতাড়া নোট···

গণিয়া চন্দ্রকান্তর সামনে রাখিয়া ক্ষিতিপতি কহিল,—গুণে নিন। কোনো আপত্তি নয়···

ক্ষিতিপতি দুই পাণি অঞ্জলি-বদ্ধ করিল।

নোটের তাড়ার পানে চাহিয়া চন্দ্রকান্ত কহিল,—আপনি বড় লোক···গুণী···যে-জিনিষের যা দাম, তা বোঝেন···আমি আর কদ্দিন বা বাঁচবো? তার পরে··· বুঝি সব। কিন্তু···

—না, না, কিন্তু করবেন না। দিন লকেট···নোটগুলো গুণে নিন্। এদিকে রাত হয়ে এলো···

—তাই তো! আপনি বিপদে ফেললেন!···

চন্দ্রকান্ত নোট গণিল বহু-অনিচ্ছায়। ক্ষিতিপতি কহিল,—ঠিক আছে? আড়াই'শো?

—তা আছে!···কিন্তু···

—না, কোনো কথা শুনবো না, শুনতে চাই না।··· আপনি বরং আমার নাম-ঠিকানা লিখে রাখুন···এমনি historical interestএর কোনো-কিছু জিনিষ পেলে আমাকে লিখে জানাবেন। আমি···

নোটের তাড়া চন্দ্রকান্তর হাতে···চন্দ্রকান্তর চোখের দৃষ্টিতে দ্বিধা···

ক্ষিতিপতি সাইকলজি পড়িয়াছে। টাকা হাতে থাকিলে···কঠিন পরীক্ষা! টাকার মোহে মানুষ স্মৃতি, প্রীতি সব ভুলিয়া যায়! চন্দ্রকান্তর মনে চলিয়াছে দ্বন্দ্ব! এই সুযোগে একটু মস্তিষ্ক-কৌশল···! লকেটটি পকেটে ফেলিয়া ক্ষিতিপতি দুই হাত পুটবদ্ধ করিয়া নতি জানাইল।

চন্দ্রকান্তর দুই চোখের দৃষ্টিতে করুণ কাকুতি··· ক্ষিতিপতি উঠিয়া পড়িল, বলিল,—এখন আসি। আর এক

সময় আসবো'খন !...ভালো কিছু পেলে...বললুম তো...এই আমার কার্ড রইলো, খপর দিতে ভুলবেন না !...

বিনয়-নম্র মৃদু বচনে চন্দ্রকান্ত কহিল—তা ভুলবো না ! কিন্তু ও লকেট...দয়া করুন ! আমায়...

—না, না। এ লকেট আমাকে দিতেই হবে। এ আমি ছাড়বো না। বলেন কি, এত-বড় historical romance...

ক্ষিতিপতি ভাবিল, এ কাহিনী লিখিয়া পাঠাইলে বিলাতী যে কোনো মাসিক-পত্রে...

ক্ষিতিপতি বিদায় লইল।

ক্ষিতিপতি চলিয়া গেলে নোটের তাড়া গেঁজিয়ায় ভরিয়া হাসি-মুখে চন্দ্রকান্ত দোকানের ভিতর-দিককার দ্বার ঠেলিয়া অন্দরে আসিল, ডাকিল, ওগো...

গৃহিণী ছিলেন রান্নাঘরে; মেয়ে চারুবালা আসিয়া বাপের সামনে দাঁড়াইল।

চন্দ্রকান্ত বলিল—আজ একটা লকেট বেচলুম রে, নগদ আড়াই'শো টাকায়।

মেয়ে চারুবালা ভ্রূ কুঞ্চিত করিল, করিয়া কহিল,—সত্যি...এ তুমি কি করচো বাবা ! এ সব মিথ্যা-গল্পে লোক ভুলিয়ে পয়সা নেওয়া—এতে পাপ হয়, জানো !

চন্দ্রকান্ত কহিল কি করি, বল্ মা ? দেশ ছেড়ে এ মুল্লুকে এসেছি ব্যবসা করতে ! এই সব নুড়ি-পাথর কেউ কিনবে না—অথচ মূল-ধন এমন কিছু নেই ! কথায় বলে, ব্যবসা-বুদ্ধি যার আছে, তারই উচিত ব্যবসা করা। ব্যবসা তো অনেকে করছে—বড় হয় সে, যার বুদ্ধি আছে। এতে কোনো পাপ নেই, মা।

চারুবালা বলিল—অনেক পয়সা তো করেছ, আর কেন এ ব্যবসা ?

চন্দ্রকান্ত বলিল—তোর বিয়ে দিতে হবে ভালো পাত্রে—তারা অনেক টাকা যৌতুক চাইবে। আট-দশ হাজার টাকার কমে তো মেয়ের বিয়ে হবে না এ কালে। সে টাকার জোগাড় চাই।...

মেয়ে বলিল—কিন্তু তোমার ঐ সব পচা বাজে আংটি-লকেটের জন্যে এক-গাছি এক-গাছি করে মাথার চুল জোগাতে জোগাতে আমার মাথা যে ন্যাড়া হয়ে গেল !

চন্দ্রকান্ত কহিল—আজ বানিয়ে যে-গল্প বলেছি, কোথায় লাগে তার কাছে আরব্য-উপন্যাস ! ভাবছি, তোর বিয়ে হোক্, তার পর এ সব গল্প ছেপে বই বার করবো। ভাগ্যে প্রথম বয়সে গল্প-লেখা অভ্যাস করেছিলুম। সহজ-ভাবে গল্প লিখে পয়সা হলো না ! তাই সে-গল্প মূলধন করে practical ব্যবসা ধরেছি বলেই মা-লক্ষ্মী আজ মুখ তুলে চেয়েছেন ! জয় মা লছমী দেবী !

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

ভালোবাসা

ভালো আমায় বাসো কি না
 সুধাবো না তোমায় প্রিয়া,
ভালো তোমায় বাসবো শুধু—
 আমার সকল হৃদয় দিয়া।

চাইবে চেয়ো আমার পানে
 নয় তো থেকো নয়ন মুদি,
আমি তবু তোমার পানে
 চাইবো সখি নিরবধি।

ওই অধরের মধুর-মধু—
 নিতুই আমি লবো লুটে,
নাই বা তুমি ফিরিয়ে দিলে
 একটি চুমা অধর-পুটে।

নিতুই বাহুর মালা গেঁথে
 পরিয়ে দেবো তোমার গলে,
দেবে দিও ছিন্ন ক'রে—
 আমার বাঁধন অবহেলে।

তোমার সুখে হাসবো আমি
 দুখের দিনে রাখবো বুকে,
নাই বা তুমি একটি কথা
 কইলে প্রিয়া, আমার দুখে।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী।

অষ্টম পল্লব

হিতে বিপরীত

মিঃ ব্লীড্ সেই অন্ধকারাচ্ছন্ন কক্ষের চতুর্দ্দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি প্রসারিত করিলেন। সহসা তাঁহার মনে হইল, ম্যানেজার পুনর্ব্বার তাঁহার সহিত দেখা করিতে আসিয়া যদি তাঁহাকে সেই স্থানে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখে, তাহা হইলে তিনি পলায়ন করিতে পারেন—এই সন্দেহে তাড়াতাড়ি সেই কক্ষের দ্বার রুদ্ধ করিয়া তাহার চাবি বন্ধ করিতে পারে। এই জন্য তিনি সঙ্কল্প করিলেন, কোন কৌশলে তাহাকে কক্ষের ভিতর লইয়া যাইবেন, এবং তাহাকে কায়দায় পাইয়া যাহা কর্ত্তব্য মনে হইবে, তাহার প্রতি সেইরূপ ব্যবহার করিবেন।

এই সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করিবার উদ্দেশ্যে মিঃ ব্লীড্ চক্ষুর নিমেষে সেই কক্ষের সুদূর প্রান্তে উপস্থিত হইলেন এবং সেখানে যে শুষ্ক তৃণরাশি প্রসারিত ছিল, তাহার উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া মেঝেতে মুখ গুঁজিলেন; সেই সময় তিনি ছাতার ভিতর হইতে গুপ্তিখানা টানিয়া বাহির করিয়া তৃণরাশির ভিতর লুকাইয়া রাখিলেন।

সেই কক্ষের দ্বার ধীরে ধীরে উদ্ঘাটিত হইতে লাগিল। মিঃ ব্লীড্ পূর্ব্বে যে ভারী পদবিক্ষেপের শব্দ এবং নিশ্বাস-পতনের শব্দ শুনিতে পাইয়াছিলেন, তাহা পূর্ব্বাপেক্ষা পরিস্ফুটরূপে তাঁহার কর্ণগোচর হইল। তাহার অল্পকাল পরে ধপাস্ করিয়া একটা শব্দ হইল, যেন কোন ব্যক্তি সবেগে মেঝের উপর বসিয়া পড়িল। সঙ্গে সঙ্গে অস্ফুট হাস্যধ্বনি।

প্রশ্ন হইল, "আমার আদেশ অগ্রাহ্য করিয়া স্থানান্তরে গিয়াছ কেন? অত্যন্ত অন্যায় কায করিয়াছ।"

মিঃ ব্লীড্ দেখিতে না পাইলেও পদশব্দে বুঝিতে পারিলেন, ম্যানেজার তাঁহার দিকে অগ্রসর হইতেছিল।

ম্যানেজার গম্ভীর স্বরে ডাকিল, "পেড্রো!"—কক্ষ আলোকিত হইল।

ম্যানেজার তাহার কুকুরের আগমনের জন্য প্রতীক্ষা না করিয়াই মিঃ ব্লীডের অদূরে আসিয়া দাঁড়াইল। মিঃ ব্লীড্ সেই মুহূর্ত্তেই ধরা-শয্যা ত্যাগ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং তাঁহার হাতের গুপ্তিখানা ম্যানেজারের দেহের দিকে প্রসারিত করিয়া তাহার তীক্ষ্ণাগ্র দ্বারা ম্যানেজারের স্থূল কণ্ঠনালীর মধ্যস্থল স্পর্শ করিলেন। তাহার পর অচঞ্চল স্বরে বলিলেন, "যদি তোমার কুকুরের মত অক্কা লাভের জন্য আগ্রহ না থাকে, তাহা হইলে ঐ স্থান হইতে এক ইঞ্চি নড়িও না বন্ধু! যে স্থানে দাঁড়াইয়া আছ, ঠিক ঐ স্থানেই কাঠের পুতুলের মত দাঁড়াইয়া থাক। একটু নড়িলেই গলা এ-ফোঁড় ও-ফোঁড় হইবে।"

মুহূর্ত্তমধ্যে ম্যানেজারের সুগোল হাঁড়ির মত মুখখানা বিবর্ণ হইল।

ম্যানেজারের আরক্তিম ক্ষুদ্র চক্ষু দুইটির দৃষ্টি মিঃ ব্লীডের মুখের উপর সংস্থাপিত হইল; তাহার বিস্ফারিত নেত্রে আতঙ্ক পরিস্ফুট। মিঃ ব্লীড্ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ম্যানেজারের মুখের দিকে চাহিয়া থাকিলেও নিমেষের জন্য একবার সেই কক্ষের অন্য প্রান্তে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। সেখানে এক অদ্ভুত দৃশ্য তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইল। সেই কক্ষের দেওয়ালে পৃষ্ঠ সংলগ্ন করিয়া একটি লোক মেঝের উপর উপবিষ্ট ছিল। লোকটি দীর্ঘকায়, তাহার রৌদ্রদগ্ধ কপোলদ্বয় আরক্তিম। তাহার মস্তক সম্মুখে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছিল, এবং উন্মুক্ত বদনগহ্বর হইতে নিশ্বাসপতনের ন্যায় ফোঁস্ ফোঁস্ শব্দ নিঃসারিত হইতেছিল। মিঃ ব্লীড্ সেই শব্দই পূর্ব্বে শুনিতে পাইয়াছিলেন; কিন্তু তাহা কোথা হইতে আসিতেছিল, অন্ধকারাচ্ছন্ন কক্ষে দাঁড়াইয়া ইহা তিনি তখন বুঝিতে পারেন নাই।

মিঃ ব্লীড্ ম্যানেজারকে লক্ষ্য করিয়া অস্ফুট স্বরে বলিলেন, "তোমার আর একটা শিকার! উহার সম্বন্ধে তোমার বোধ হয় অনেক কথাই বলিবার আছে, কিন্তু সর্ব্বাগ্রে উহার নামটি শুনিতে চাই, কি নাম উহার—অর্থাৎ ঐ পাশের ঐ কয়েদীটির?"

ম্যানেজার মিঃ ব্লীডের প্রশ্নের উত্তরদানে অনিচ্ছুক বলিয়াই মনে হইল, সে নির্ব্বাক্‌ভাবে দাঁড়াইয়া রহিল!

মিঃ ব্লীড বলিলেন, "উহার নাম প্রকাশ করিবার ইচ্ছা নাই? আমার প্রশ্নের উত্তর দিবে না? কিন্তু কথা কহাইবার কৌশল আমার অজ্ঞাত নহে, পরীক্ষা করিতে চাও?"—তিনি তাঁহার হাতের গুপ্তির ডাণ্টিতে একটু চাপ দিলেন, সঙ্গে সঙ্গে তাহার তীক্ষ্ণ অগ্র কণ্ঠনালীর ত্বকে একটু জোরে বসিল।

ম্যানেজার বুঝিল, নিরুত্তর থাকিলে কায়েমীভাবে তাহার কণ্ঠরোধের আশঙ্কা আছে। এ জন্য সে অনিচ্ছার সহিত বলিল, "উহার নাম ডসন,—হেনরী ডসন, কিন্তু এই ব্যাপারের সহিত আমার কোন সম্বন্ধ নাই। আমি হলপ করিয়া বলিতেছি—ইহাতে আমার কোন হাত ছিল না।"

মিঃ ব্লীড গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "খাসা! এই সকল অপকর্ম্মে তোমার কোন হাত নাই, তুমি যে পরম সাধু, শান্ত, শিষ্ট, অপাপবিদ্ধ পুরুষ, মহামূর্খেরও ইহা বুঝিতে বিলম্ব হয় না! দেশের আইন এবং শান্তি-শৃঙ্খলার প্রতি তোমার অনুরাগ অসাধারণ, কাহার সাধ্য ইহা অস্বীকার করে? তথাপি আমি জানিতে চাই, এই ভদ্রলোকটিকে অর্থাৎ মিঃ ডসনকে কি কারণে মাদকাভিভূত করিয়া ঐ ভাবে ওখানে বসাইয়া রাখা হইয়াছে, এবং আমাকেই বা উহার সহিত যোগদানের ব্যবস্থা কেন করা হইয়াছে?"

ম্যানেজার নিরুত্তর; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সে গুপ্তির খোঁচা খাইয়া যন্ত্রণায় অস্ফুট আর্ত্তনাদ করিয়া বলিল, "আমি তাহা জানি না; আমি শপথ করিয়া বলিতেছি, এ তথ্য আমার অজ্ঞাত। আমি বেতনভোগী কর্ম্মচারী মাত্র, পয়সা খাই—চাকরী করি। আমাকে আদেশ করা হইয়াছে যে, কেহ এখানে মিঃ প্যারাডাইন সম্বন্ধে কোন খোঁজ-খবর লইতে আসিবে, তাহাকেই যেন নজরবন্দী করি।"

মিঃ ব্লীড্ তাঁহার গুপ্তি ঠিক সেই ভাবেই উদ্যত রাখিয়া ম্যানেজারকে বলিলেন, "একসঙ্গে এক রাশি কথা না বলিয়া পর পর প্রত্যেক প্রশ্নের উত্তর দাও। আমরা মিঃ ডসনের প্রসঙ্গের আলোচনা করিতেছি। উহাকে মাদকাভিভূত করিয়া এই কক্ষে আটক রাখিবার জন্য কাহার নিকট টাকা খাইয়াছ?"

ম্যানেজার বলিল, "আমি তাহার নাম জানি না। তাহা জানিবার জন্যও আমি আগ্রহ প্রকাশ করি নাই। টাকায় আমার প্রয়োজন, তাহা পাইয়াছি: তাহার নাম জানিবার প্রয়োজন কি? আমি তাহা জানিতে পারি নাই।"

মিঃ ব্লীড্ বলিলেন, "এই ব্যাপারের সংস্রবে টেরীর নামটা কখন কি তোমার কর্ণ-গোচর হয় নাই।"

মিঃ ব্লীডের কথা শুনিয়া ম্যানেজারের মুখ কাল হইয়া গেল। কিন্তু উত্তর না দিলে গলা ফুটা হইতে পারে বুঝিয়া সে মুহূর্ত্তকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া বলিল, "হাঁ—ইয়ে—তা ও নামটা শুনিয়াছি বটে, কিন্তু উহা যে আসল নাম নয়, ছদ্মনাম মাত্র, ইহা সহজেই বুঝিতে পারা উচিত।"

মিঃ ব্লীড্ বলিলেন, "সম্ভব বটে, কিন্তু ছদ্মনাম হইলেও লোকটা ত কাল্পনিক নহে। তাহার প্রকৃত নাম যাহাই হউক, সেই ব্যক্তিই কি মিঃ ডসনকে এখানে আটক রাখিবার জন্য তোমাকে আদেশ করিয়াছিল? শীঘ্র আমার এই প্রশ্নের উত্তর দাও, উত্তর দিতে বিলম্ব করিলে আমার ধৈর্য্য ধারণ করা কঠিন হইবে, এবং আমি ধৈর্য্যচ্যুত হইলে আমার হাত সুড়-সুড় করিবে, তাহাতে তোমার জীবনের আশঙ্কা আছে।"

সঙ্গে সঙ্গে তাহার গলায় গুপ্তির আর এক খোঁচা! সেই খোঁচা খাইয়া ম্যানেজার উভয় জানুর উপর ভর-দিয়া সেই স্থানে বসিয়া পড়িল। আতঙ্কে তখন তাহার সর্ব্বাঙ্গ থর থর করিয়া কাঁপিতেছিল; তাহার পদদ্বয় এরূপ অসাড় হইয়া পড়িয়াছিল যে, তাহা তাহার দেহের ভার বহনে অশক্ত হইয়াছিল।

ম্যানেজার কম্পিতকণ্ঠে বলিল, "আমি তাহা জানি না। আমি শপথ করিয়া বলিতেছি, উহা আমি জানি না। সাত নম্বর টেবলখানা টেলিফোনে রিজার্ভ করা হইয়াছিল। যাহারা আমাকে টাকা দিয়াছিল, তাহারা কোন্ কোন্ কথা বলিয়া আমাকে কি করিতে হইবে, তাহা জানাইয়া দিয়াছিল। মিঃ ডসন রেস্তোরাঁয় আসিলে

আমি সেই আদেশানুসারে তাহাকে সাত নম্বর টেবলে লইয়া যাই। যে ভদ্রলোকের সঙ্গে সেখানে তাহার ভোজন করিবার কথা, সেই ভদ্রলোকের জন্য তাহাকে অপেক্ষা করিতে হইয়াছিল। ইত্যবসরে আমি আদেশানুসারে তাহাকে পানীয় দিয়াছিলাম।"

মিঃ ব্লীড্ বলিলেন, "এবং সেই পানীয়ে মাদকদ্রব্য মিশ্রিত ছিল। মিঃ ডসনকে মাদকাভিভূত দেখিয়া, আদেশানুযায়ী তাহাকে এই কক্ষে লইয়া আসিয়াছিলে।"

মিঃ ব্লীড ম্যানেজারের মুখের দিকে চাহিয়া বুঝিতে পারিলেন, তাঁহার কথাগুলি সত্য, ইহা অস্বীকার করিতে তাহার সাহস নাই।

মিঃ ব্লীড্ বলিলেন, "বুঝিলাম ; তাহার পর কি হইল বলি শোন : অতঃপর মিঃ প্যারাডাইন আসিলেন : সাড়ে সাতটার সময় এখানে তাঁহার ভোজন করিবার কথা ছিল। সময়টা আমিই নির্দ্ধারিত করিয়াছিলাম। আমি জানিতাম, কোন কারণেই তিনি ইহার ব্যতিক্রম করিবেন না। কিন্তু তথাপি সেই সময়ের পূর্ব্বেই আমি তাঁহাকে অন্য এক জন লোকের সঙ্গে একখান গাড়ীতে পথ দিয়া যাইতে দেখি। সেই গাড়ী আবরণ দ্বারা আচ্ছাদিত ছিল। তখন সাড়ে সাতটা বাজিবার দুই মিনিট বিলম্ব ছিল। কিন্তু তৎপূর্ব্বে এখানে কি কাণ্ড ঘটিয়াছিল, তাহা শীঘ্র আমাকে বল।"

ম্যানেজার জানুতে ভর দিয়া বসিয়া দুই একটা ঢোক গিলিয়া বলিল, "আমার সর্ব্বনাশ হইল, আর আমার নিষ্কৃতি নাই। উহারা আমাকে হত্যা করিবে।"

মিঃ ব্লীড বলিলেন, "তাহারা যাহারাই হউক, ঐরূপ করিবার সুযোগ পাইবে না। যদি তুমি সকল কথা প্রকাশ কর, তাহা হইলে তোমার অনিষ্টের আশঙ্কা নাই। তুমি ত জান, যতক্ষণ জীবন, ততক্ষণ আশা।"

ম্যানেজার বলিল, "মিঃ ডসনের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ না হওয়াই প্রার্থনীয় ছিল। সাক্ষাতে বিপদের আশঙ্কা ছিল। মিঃ প্যারাডাইন এখানে আসিলে আমি টেলিফোনে সে সংবাদ জ্ঞাপন করায় আমার কর্ত্তব্য সম্বন্ধে উপদেশ পাইয়াছিলাম। এক জন লোক আসিয়া মিঃ প্যারাডাইনের সঙ্গে আলাপ আরম্ভ করিল। কিন্তু তাহাদের সেই আলাপের মর্ম্ম আমি জানিতে পারি নাই। তবে মিঃ প্যারাডাইন তাহার সঙ্গে রেস্তোরাঁ ত্যাগ করেন। আমি সেই লোকটিকে চিনি না।"

মিঃ ব্লীড্ আইন-জীবী। তিনি ম্যানেজারকে কিছুকাল জেরার পর বুঝিতে পারিলেন, তাহার উক্তি মিথ্যা নহে। অনন্তর তিনি বলিলেন, "এখন আমার আর একটি প্রশ্নের উত্তর দাও। তুমি বলিয়াছ, প্যারাডাইনের আগমন-সংবাদ টেলিফোনে জানাইয়া তুমি তোমার কর্ত্তব্য সম্বন্ধে উপদেশ গ্রহণ করিয়াছিলে। টেলিফোন-যোগে কাহার নিকট হইতে উপদেশ গ্রহণ করিয়াছিলে? তাহার নাম ও নম্বর শীঘ্র বল।"

ম্যানেজার বলিল, "সেই ব্যক্তির নাম আমার জানা নাই, তবে নম্বর পাঁচ-নয়-চার-সাত মে ফেয়ার।"

মিঃ ব্লীড্ বামহস্ত প্রসারিত করিয়া বলিলেন, "এই কক্ষের চাবি কোথায়? আমাকে দাও।"

ম্যানেজার তাঁহার আদেশপালনে বিলম্ব করিল না।

মিঃ ব্লীড্ চাবিটি হস্তগত করিয়া ম্যানেজারের পরিচ্ছদ খানাতল্লাস করিলেন, কিন্তু তাহার পকেটে কয়েকটি ধাতু-মুদ্রা ভিন্ন আর কিছুই পাইলেন না ; তাহা তিনি সেই কক্ষের মেঝের উপর ফেলিয়া রাখিয়া ম্যানেজারকে বলিলেন, "এখন যাহা বলি, মন দিয়া শোন। তোমাদের এই রেস্তোরাঁ হইতে বাহিরে যাইবার জন্য সম্ভবতঃ কোন গুপ্তপথ আছে। তুমি মিঃ ডসনকে তুলিয়া লইয়া সেই পথে আমার সঙ্গে বাহিরে চল।"

ছাতার শিক-সংলগ্ন বস্ত্রাবরণ বগলে পুরিয়া মিঃ ব্লীড্ ম্যানেজারকে উঠিতে ইঙ্গিত করিলে ম্যানেজার মিঃ ডসনের নিকট উপস্থিত হইল এবং তাহাকে টানিয়া তুলিয়া অতি কষ্টে কাঁধে ফেলিল। মিঃ ডসন তখনও বাহ্যজ্ঞানরহিত।

মিঃ ব্লীড্ বলিলেন, "চল, সেই গুপ্ত পথ আমাকে দেখাইয়া দিবে।"

ম্যানেজার গুপ্তির খোঁচা খাইবার ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া, তাহার কাঁধের বোঝা সহ টলিতে টলিতে সেই কক্ষের বাহিরে আসিয়া অন্ধকারাচ্ছন্ন দালান দিয়া চলিতে লাগিল। মিঃ ব্লীড্ গুপ্তি-হস্তে তাহার অনুসরণ করিলেন। কয়েক মিনিট পরে উভয়ে সোপান-শ্রেণী অতিক্রম করিয়া অট্টালিকার বাহিরে আসিলেন এবং একটি আঙ্গিনা পার

হইয়া পশ্চাতের দ্বার দিয়া রেস্তোরাঁর পশ্চাৎস্থিত পথে উপস্থিত হইলেন। পথটি সংকীর্ণ। মিঃ ব্লীড্‌ ম্যানেজার সহ সেই পথে প্রবেশ করিতেই তিন জন লোককে পথের এক পাশে দণ্ডায়মান দেখিলেন। তাহাদিগকে দেখিবামাত্র মিঃ ব্লীড্‌ গুপ্তি হাতে লইয়া তাহাদের দিকে ঘুরিয়া দাঁড়াইলেন। সেই লোক তিন জনকে সে স্থানে দেখিয়া ম্যানেজারের সর্ব্বাঙ্গ ভয়ে আড়ষ্ট হইল, ডসনের দেহ তাহার কাঁধ হইতে পথে পড়িয়া গেল। মিঃ ব্লীড্‌ সেই সময় দেখিলেন, পূর্ব্বোক্ত তিন জন পথিক ঠিক একই সময়ে পকেটে হাত পূরিল।

মিঃ ব্লীড্‌ তাঁহার বিপদের গুরুত্ব বুঝিতে পারিলেন। আগন্তুকত্রয় রিভলভারধারী, তাঁহার সম্বল গুপ্তি মাত্র; তাহারা পথের অন্য প্রান্ত হইতে তাঁহাকে গুলী করিলে গুপ্তি দ্বারা তিনি কিরূপে আত্মরক্ষা করিবেন? এ যেন ইটালিয়ানদের বোমারু বিমান হইতে নিক্ষিপ্ত বিষ-বাষ্পের বোমার বিরুদ্ধে হাবসী-বীরদের হাতের সেকেলে গেঁটে বন্দুক! আত্মরক্ষার কোন উপায় নাই, সম্মুখে মৃত্যু অপরিহার্য্য! মিঃ ব্লীড্‌ তাহাদের আক্রমণে বাধাদানের কোন উপায় স্থির করিতে পারিলেন না।

মিঃ ব্লীড্‌ মুহূর্ত্তমধ্যে কর্ত্তব্য স্থির করিলেন। তিনি গুপ্তি দ্বারা রেস্তোরাঁর ম্যানেজারের পাঞ্জরে খোঁচা দিয়া বলিলেন, "পথের প্রায় পনের গজ দূরে তিন জন পুলিসম্যান দেখিতেছি, তুমি ঐ তিন জন লোককে চীৎকার করিয়া বল, 'ঐ দেখ পুলিস আসিতেছে'—আমার কথা বুঝিতে পারিয়াছ?"

ম্যানেজার তৎক্ষণাৎ উচ্চৈঃস্বরে বলিল, "ঐ পুলিস!"

ম্যানেজারের কণ্ঠস্বর সেই রিভলভারধারীদের কর্ণে প্রবেশ করিল। তাহারা সম্মুখের পথ বিঘ্ন-সঙ্কুল মনে করিয়া পশ্চাতে দৃষ্টিপাত করিল এবং সেই দিকে জন-সমাগম না দেখিয়া সেই পথে উর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল।

অতঃপর মিঃ ব্লীড্‌ ধরাশায়ী ডসনকে পুনর্ব্বার কাঁধে তুলিয়া লইবার জন্য ম্যানেজারকে আদেশ করিতে উদ্যত হইয়া দেখিলেন, ডসনের চেতনা-সঞ্চার হওয়ায় সে উঠিয়া বসিবার চেষ্টা করিতেছিল।

মিঃ ব্লীড্‌ রেস্তোরাঁর ম্যানেজারকে বলিলেন, "মিঃ ডসনের মোহ কাটিয়া গিয়াছে, সে উঠিয়া বসিয়াছে, উহাকে ধরিয়া তোল, এবং দাঁড় করাইয়া দেওয়ালে ঠেস্‌ দিতে দাও।"

ডসন ম্যানেজারের সাহায্যে উঠিয়া দেওয়ালে ঠেস দিয়া দাঁড়াইল এবং বিহ্বল-দৃষ্টিতে মিঃ ব্লীডের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

মিঃ ব্লীড্‌ বলিলেন, "মিঃ ডসন, আজ রাত্রে আপনার জীবন কিরূপ বিপন্ন হইয়াছিল, তাহা আপনার বুঝিবার শক্তি ছিল না। আপনি সেই ধাক্কা সাম্‌লাইতে পারিয়াছেন বটে, কিন্তু এখনও সম্পূর্ণ প্রকৃতিস্থ হইতে পারেন নাই; এ অবস্থায় আমি আপনাকে সঙ্গে লইয়া আমার বাসায় যাইব, আশা করি, ইহাতে আপনার আপত্তি হইবে না। আমার বাসা অদূরেই অবস্থিত। সম্ভবতঃ এখনও আপনি স্বাভাবিকভাবে চলিবার শক্তি লাভ করিতে পারেন নাই; কিন্তু এই ভদ্রলোকটি আপনার হাত ধরিয়া আপনাকে পথের ঐ মোড়ায় লইয়া যাইলে আপনি বোধ হয় এই পথটুকু হাঁটিয়া পার হইতে পারিবেন। সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া আমি ট্যাক্সি সংগ্রহ করিতে পারিব। সেই ট্যাক্সিতে আপনি আমার বাসায় যাইবেন।"

মিঃ ব্লীডের আদেশানুসারে ম্যানেজার মিঃ ডসনের হাত ধরিয়া ধীরে ধীরে পথের মোড়ায় উপস্থিত হইলে, মিঃ ব্লীড্‌ এক জন ট্যাক্সি-চালকের ট্যাক্সি থামাইয়া সঙ্গিদ্বয় সহ সেই গাড়ীতে উঠিয়া বসিলেন। ট্যাক্সি তাঁহাদিগকে লইয়া কয়েক মিনিট পরে গ্রেট্‌ল্যাণ্ডস্‌ ম্যানসনসের সম্মুখে উপস্থিত হইল। মিঃ ব্লীড্‌ সঙ্গিদ্বয় সহ ট্যাক্সি হইতে নামিয়া তাঁহার বাস-ভবনে প্রবেশ করিলেন। মিঃ ডসন তখন সম্পূর্ণ প্রকৃতিস্থ হইয়াছিলেন। মিঃ ব্লীড্‌ তাঁহাকে একখান চেয়ার দেখাইয়া তাহাতে বসিবার জন্য ইঙ্গিত করিলে, মিঃ ডসন তাঁহার অনুরোধ রক্ষা না করিয়া ঘুরিয়া দাঁড়াইলেন, এবং ভ্রূ-ভঙ্গী করিয়া মিঃ ব্লীড্‌কে বলিলেন, "আপনার শিষ্টাচারে বাধিত হইলাম; কিন্তু এ সকল কি ব্যাপার? কে আমাকে লইয়া খেলা আরম্ভ করিয়াছিল?"

মিঃ ব্লীড্‌ বলিলেন, "তাহাই আবিষ্কারের জন্য আমার আগ্রহ হইয়াছে।"

অনন্তর তিনি সেই কক্ষের এক প্রান্তে সংরক্ষিত

ডেস্কের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া তাহার ভিতর হইতে দুই জোড়া হাতকড়ি বাহির করিলেন, সেই হাতকড়ি সহ তিনি রেস্তোরাঁর ম্যানেজারের সম্মুখে আসিলেন, এবং তাহাকে বলিলেন, "তুমি ঐ চেয়ারখানা টানিয়া লইয়া তাহাতে বসিয়া কিছুকাল শ্রান্তি দূর কর। আশা করি, এখানে বিশ্রাম করিতে তোমার কষ্ট হইবে না। কিন্তু বসিবার পূর্ব্বে তোমার হাত দু'খানি আমার সম্মুখে প্রসারিত কর, তাহা হইলে তোমার সম্বন্ধে আমি কতকটা নিশ্চিন্ত হইতে পারিব।"

কিন্তু ম্যানেজার তাঁহার এই অনুরোধ গ্রাহ্য করিল না; তাহার মন ভয় ও দুশ্চিন্তায় পূর্ণ হইয়াছিল। মিঃ গ্রীড্ ম্যানেজারের অনিচ্ছা বুঝিতে পারিয়া তাহার উভয় হস্ত সম্মুখে আকর্ষণ করিলেন, এবং চক্ষুর নিমিষে তাহার উভয় প্রকোষ্ঠে হাতকড়ি-জোড়াটা আঁটিয়া দিলেন। দ্বিতীয় লৌহবলয়-জোড়াটা অতঃপর তাহার পদদ্বয়ে আবদ্ধ করিয়া তিনি মিঃ ডসনকে বলিলেন, "মিঃ ডসন, এখন আমরা কিছুকাল নির্ব্বিঘ্নে আলাপ করিতে পারিব।"

নবম পল্লব

ডসনের আত্মকথা

মিঃ ডসন মিঃ গ্রীডের অনুরোধে কর্ণপাত না করিয়া গম্ভীরভাবে বসিয়া রহিলেন; মিঃ গ্রীডকে তিনি বিশ্বাস করিতে পারেন নাই, তাঁহার মন তখন নানা দুশ্চিন্তায় পূর্ণ। রেস্তোরাঁর ম্যানেজারের প্রতি মিঃ গ্রীডের ব্যবহার লক্ষ্য করিয়া তিনি অস্বস্তি বোধ করিতেছিলেন। মিঃ গ্রীড তাঁহার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া, তিনি রেস্তোরাঁয় উপস্থিত হইবার পর যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, তাহা সমস্তই ডসনের গোচর করিলেন এবং তিনি রেস্তোরাঁর কারাকক্ষে ডসনকে মাদকাভিভূত দেখিয়া কিরূপে ম্যানেজারের কবল হইতে তাঁহাকে উদ্ধার করিয়াছিলেন, তাহাও তাঁহাকে বলিলেন। সেই সকল কাহিনী শ্রবণ করিয়া মিঃ ডসনের উৎকণ্ঠা দূর হইল, মিঃ গ্রীডের প্রতি তাঁহার সকল সন্দেহ অপনীত হইল।

মিঃ ডসন বলিলেন, "আমি অজ্ঞানাভিভূত ছিলাম, এ জন্য আমি প্রথমে বুঝিতে পারি নাই—আপনি আমার কিরূপ উপকার করিয়াছিলেন। আপনি আমার প্রাণরক্ষা করিয়াছেন, এ জন্য আমি আপনার নিকট আন্তরিক কৃতজ্ঞ; কোন্ ভাষায় আপনার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিব, তাহা আমার অজ্ঞাত। কিন্তু হল ও হালিফাক্স এই মাতব্বর মুরুব্বীদ্বয় কি উদ্দেশ্যে আমাকে ও-ভাবে মাদকাভিভূত করিবার ব্যবস্থা করিয়াছিল, তাহা ধারণা করা আমার অসাধ্য।"

মিঃ গ্রীড বলিলেন, "আপনি কি জন্য রেস্তোরাঁয় গমন করিয়াছিলেন?"

মিঃ ডসন বলিলেন, "এক জন বন্ধুর সহিত সেখানে আমার সাক্ষাতের কথা ছিল। তিনিই আমাকে ওখানে ভোজনের নিমন্ত্রণ করিয়া বলিয়াছিলেন—ভোজন উপলক্ষে সেখানে তাঁহার সহিত আমার সাক্ষাৎ হইবে।"

মিঃ গ্রীড বলিলেন, "আপনার সেই বন্ধুটির পরিচয় জানিতে পারি কি?"

মিঃ ডসন বলিলেন, "তাদের দস্তুর অনুসারে আপনাকে বলিলাম বটে তিনি আমার বন্ধু; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আজ সন্ধ্যার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তাঁহার সঙ্গে আমার আলাপ-পরিচয় থাকা দূরের কথা, তাঁহার চেহারাও পূর্ব্বে কোন দিন দেখি নাই! আমি যে 'ফার্ম্মে' কায করি, সেই ফার্ম্মের যিনি 'ম্যানেজিং ডাইরেক্টার', তাঁহারই বাড়ীতে এই 'বন্ধু'টির সহিত আমার প্রথম সাক্ষাৎ। মিঃ নিস্‌বেট স্থানান্তরে আবদ্ধ থাকায় তিনি আমার অভ্যর্থনার ব্যবস্থা করিতে পারেন নাই, কিন্তু অতিথিসৎকারে ত্রুটি প্রদর্শন অকর্ত্তব্য বোধে তিনি তাঁহার খাস মুন্সীর হস্তে আমার অভ্যর্থনার ভার অর্পণ করিয়াছিলেন।"

মিঃ গ্রীড গভীর মনোযোগ সহকারে মিঃ ডসনের আত্মকাহিনী শুনিতে লাগিলেন, কিন্তু তাঁহার কৌতূহল প্রবল হইলেও তাঁহার মুখভাবের বিন্দুমাত্র পরিবর্ত্তন লক্ষিত হইল না, তাঁহার ললাটের একটি শিরাও কুঞ্চিত হইল না, যেন তিনি মুখোসে মুখমণ্ডল আবৃত করিয়া মিঃ ডসনের কথাগুলি শুনিতেছিলেন। মিঃ ডসন প্রসঙ্গক্রমে যে নাম উচ্চারণ করিলেন, সেই নাম শুনিয়াও তাঁহার চক্ষুর পাতা মুহূর্ত্তের জন্য কম্পিত হইল না। মিঃ গ্রীডের সংযম এবং কৌতূহলদমনের শক্তি অসাধারণ।

মিঃ ডসন একবার তীক্ষ্ণ-দৃষ্টিতে মিঃ গ্রীডের মুখের দিকে চাহিয়া, তাঁহার মনোভাব বুঝিবার জন্য চেষ্টা করিয়া

পুনর্ব্বার বলিতে লাগিলেন, "আপনাকে প্রথমেই জানাইয়া রাখা ভাল যে, আমি অষ্ট্রেলিয়াবাসী। এখানে আমার নিজের লোক বলিতে কেহই নাই। মহাযুদ্ধের পর আমি লণ্ডনে এই প্রথম আসিয়াছি। ইতিপূর্ব্বে আমি পশ্চিম-আফ্রিকায় গমন করিয়াছিলাম, অল্পদিন পূর্ব্বে সে দেশ হইতে এ দেশে প্রত্যাগমন করিয়াছি। গত শনিবার প্রভাতে আমি জাহাজ হইতে সাউদামটন বন্দরে অবতরণ করিয়াছিলাম; কিন্তু জাহাজ-ত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে আমি ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হইয়া সাউদামটনেই শয্যাগত ছিলাম, আজ সকালে লণ্ডনে আসিয়াছি।"

মিঃ ব্লেক মিঃ ডসনের বাক্যস্রোতে বাধা দিয়া বলিলেন, "পশ্চিম-আফ্রিকায় আপনি কোন্ কার্য্যে লিপ্ত ছিলেন, তাহা জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি?"

মিঃ ডসন বলিলেন, "আমি খনি-এঞ্জিনিয়ার। গত ছয় মাস হইতে আমি একটি বৃহৎ খনির কার্য্যে রত ছিলাম, অত্যন্ত দায়িত্বপূর্ণ কঠিন কার্য্য। আপনি কখনও আরানা স্বর্ণখনির নাম শুনিয়াছেন?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "হাঁ, শুনিয়াছি।"

মিঃ ডসন বলিলেন, "গত ছয় মাস সেই স্বর্ণখনিতেই আমি এঞ্জিনিয়ারিং কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া খনির কার্য্য পরিচালিত করিয়াছি। ব্যবসায়-সংক্রান্ত আর্থিক লাভালাভের সকল ব্যাপার আমার হস্তেই সংরক্ষিত ছিল। আমার পরিদর্শন-কার্য্য শেষ হইলে, খনির কার্য্য-সংক্রান্ত রিপোর্ট প্রস্তুতের ভার আমার হস্তেই অর্পিত হয়; তদনুসারে আমি সেই রিপোর্ট প্রস্তুত করি এবং যে জাহাজে সেই রিপোর্ট প্রেরিত হয়, সেই জাহাজেই আমি ইংলণ্ডে যাত্রা করি।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আপনি লণ্ডনে উপস্থিত হইয়া বোধ হয় মনে করিলেন, এই খনির ম্যানেজিং ডাইরেক্টর মিঃ নিস্‌বেটের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, আপনি খনি-সংক্রান্ত যে রিপোর্ট তাঁহার নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন, সেই রিপোর্টের আলোচ্য বিষয় সম্বন্ধে তাঁহার সহিত মৌখিক আলোচনা করিবেন?"

মিঃ ডসন বলিলেন, "হাঁ মহাশয়, আপনার এই অনুমান সত্য। ঐ উদ্দেশ্যেই আমি লণ্ডনে আসিয়াই মিঃ নিস্‌বেটের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য উৎসুক হইয়াছিলাম। বিশেষতঃ সেই খনির কার্য্য পরিচালনের জন্য অর্থাভাবও অনুভূত হইয়াছিল। সুতরাং মিঃ নিস্‌বেটকে আর্থিক অবস্থা সম্বন্ধে সকল সংবাদ জ্ঞাপন করাও অবশ্য-কর্ত্তব্য বলিয়া আমার ধারণা হইয়াছিল। আমার নিকট সকল বিবরণ শ্রবণ করিলে তিনি প্রকৃত অবস্থা বুঝিতে পারিতেন।"

মিঃ ডসন এই পর্য্যন্ত বলিয়াই হঠাৎ যেন সন্দিগ্ধ হইয়া উঠিলেন; তিনি ভ্রূযুগল ঊর্দ্ধে তুলিয়া মিঃ ব্লেককে বলিলেন, "দেখুন মিঃ ব্লেক, আজ রাত্রিকালে আমাকে যে বিপজ্জালে জড়িত হইতে হইয়াছিল, তাহার সহিত মিঃ নিস্‌বেটের কোন সংস্রব ছিল বলিয়া কি আপনার সন্দেহ হয়?"

মিঃ ব্লেক গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "মিঃ নিস্‌বেটকে আমি চিনি না, জানি না, এ অবস্থায় আপনার ঐ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া আমার অসাধ্য; আর যদি তাঁহার সঙ্গে আমার পরিচয় থাকিত, তাহা হইলেও এই সকল বৈষয়িক ব্যাপার সম্বন্ধে তাঁহার মনোভাব বিশ্লেষণ করাও সম্ভবপর হইত না। কিন্তু সত্য কথা বলিতে কি, এই ব্যাপার লইয়া যে রহস্যের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহার আলোচনা করিয়া আমার ধাঁধাঁ লাগিয়া গিয়াছে, নানা জটিল ব্যাপার, এমন কি, নরহত্যা পর্য্যন্ত এই রহস্যের অন্তর্ভূত!"

অনন্তর মিঃ ব্লেক চেয়ারে উপবিষ্ট ম্যানেজারের শৃঙ্খলিত দেহের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া তাহাকে বলিলেন, "মিঃ ডসনের সকল কথাই তুমি শুনিলে, এ বিষয়ে আরও কোন কোন সংবাদ তোমার নিকট জানিতে চাই। মিঃ ডসন পানীয়ের সহিত মাদক দ্রব্য পানে অভিভূত হইলে তুমিই তাঁহাকে সেই কক্ষে স্থানান্তরিত করিয়াছিলে—যে কক্ষটিকে তুমি তোমার আফিস বলিয়া অভিহিত করিয়াছিলে। তুমি উঁহাকে সেই কক্ষের এক প্রান্তে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলে; দৈবক্রমে তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া সেই কারাকক্ষ হইতে উদ্ধার করি। তোমার সাধ্য হইলে তুমি আমার চেষ্টা বিফল করিতে—ইহা আমি দৃঢ়তার সহিত বলিতে পারি; কিন্তু যদি উঁহাকে ঐ ভাবে মুক্তিদান করিতে না পারিতাম, তাহা হইলে পরে তুমি উঁহার সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা করিতে, তাহা জানিতে চাই। দেখ, তুমি আমার নিকট কোন কথা গোপন না করিয়া সরলভাবে সকল কথা প্রকাশ কর। যদি তুমি আমার অবাধ্য হও, এবং মিথ্যা

কথায় আমাকে প্রতারিত করিবার চেষ্টা কর, তাহা হইলে তাহার ফল তোমার পক্ষে অত্যন্ত বিপজ্জনক হইবে। মনে করিও না, আমি তোমাকে মিথ্যা ভয় প্রদর্শন করিতেছি।"

ম্যানেজার বলিল, "কি করিতাম, তাহা বলিতে পারিব না, কারণ, তখন পর্য্যন্ত আমি কর্ত্তব্য সম্বন্ধে কোন আদেশ পাই নাই। আমি উঁহাকে আটক করিয়া আদেশের প্রতীক্ষা করিতেছিলাম। সেই সময় রোজার ঘাড়ে ভূত চাপিয়াছিল।"

মিঃ ব্লীড তৎক্ষণাৎ উঠিয়া গিয়া সেই কক্ষের অন্য প্রান্ত হইতে টেলিফোনের কলটি ম্যানেজারের চেয়ারের নিকট আনিয়া, রিসিভারটি তাহার কানের কাছে ধরিলেন, তাহার পর বলিলেন, "তোমার নিকট শুনিয়াছিলাম—সেই বাড়ীর টেলিফোনের নম্বর পাঁচ-নয়-চার-সাত মে ফেয়ার। তুমি এই টেলিফোনে মিঃ ডসনের প্রতি তোমার কর্ত্তব্য সম্বন্ধে উপদেশ বা আদেশ জিজ্ঞাসা কর; বল, এখন পর্য্যন্ত কোন আদেশ না পাওয়ায় তাহা জানিবার জন্য উৎসুক হইয়াছ; বিশেষতঃ, মিঃ ডসনের চেতনা-সঞ্চার হওয়ায় শীঘ্র তাহা জানিবার প্রয়োজন হইয়াছে। তুমি তোমার রেস্তোরাঁ হইতে টেলিফোন করিতেছ—ইহাই যেন তোমার সেই মুরুব্বী বুঝিতে পারে।"

ম্যানেজার অত্যন্ত অনিচ্ছার সহিত মিঃ ব্লীডের আদেশ পালন করিল। নম্বর দেওয়া হইলে অল্পকাল পরে মাইক্রো-ফোনে গম্ভীর স্বরতরঙ্গ প্রতিধ্বনিত হইল।

ম্যানেজার বলিতে লাগিল, "আমি ফারিনি কথা বলিতেছি। যে ভদ্রলোকটিকে আপনি আমাদের রেস্তোরাঁয় পাঠাইয়াছিলেন, তাঁহার প্রতি কর্ত্তব্য সম্বন্ধে আমি উপদেশের প্রতীক্ষায় ছিলাম। কিন্তু তাহারা উপস্থিত না হওয়ায় আমি উৎকণ্ঠিত হইয়াছি।"

মিঃ ব্লীড অতঃপর রিসিভারের অন্য প্রান্ত এ ভাবে ধরিলেন যে, উত্তরটা তাঁহাদের উভয়েরই কর্ণগোচর হইবার অসুবিধা হইল না।

উত্তর আসিল, "ল্যাঙহাম এবং হ্যান্‌স-এ উভয়েরই বহু পূর্ব্বে প্রত্যাগমন করা উচিত ছিল। আমি পিটার্শকে আদেশ করিয়াছিলাম, তাহাদের সাহায্যের প্রয়োজন হইলে সে যেন তাহাদের সহিত যোগদান করে।"

মিঃ ব্লীড ম্যানেজারের পিঠে গুঁতা দিয়া, অতঃপর তাহার যাহা বলিবার ছিল, তাহা বলিবার জন্য ইঙ্গিত করিলেন। তদনুসারে ম্যানেজার টেলিফোনের সাহায্যে বলিল, "কিন্তু তাহাদের উভয়ের কেহই এখন পর্য্যন্ত এখানে উপস্থিত হয় নাই। এখন আমি কি করিব?—লোকটা যে কোন মুহূর্ত্তে চেতনালাভ করিতে পারে।"

উত্তর আসিল, "ল্যাঙহাম মুহূর্ত্তমধ্যে যাইবে। সে এখন পর্য্যন্ত ওখানে যায় নাই কেন, তাহা বুঝিতে পারিতেছি না। রেস্তোরাঁয় এখন অন্য কোন লোক আছে কি?"

ম্যানেজার বলিল, "সন্ধান লইয়া বলিতেছি, অপেক্ষা করুন।"

মিঃ ব্লীড টেলিফোনের রিসিভারের মুখে হাত চাপা দিয়া তাহা আবৃত করিলেন। ম্যানেজার তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া সভয়ে বলিল, "আমি এখন কি বলিব? যদি সে প্রকৃত ব্যাপার জানিতে পারে, তাহা হইলে আমাকে হত্যা করিতে কুণ্ঠিত হইবে না, দোহাই আপনার, আপনি আমার প্রাণরক্ষা করুন।"—ভয়ে ম্যানেজারের মুখ সাদা হইয়া গেল, সে চেয়ারে বসিয়া ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল।

মিঃ ব্লীড বলিলেন, "তোমার কোন ভয় নাই। এই লোকটার আদেশ পালনের জন্য বিস্তর এজেণ্ট আছে, তাহা বুঝিতে পারিয়াছি। এখন কথা এই, তুমি যখন রেস্তোরাঁ ত্যাগ করিয়া আসিয়াছিলে, সেই সময় উহার কোন কারপরদাজ কি রেস্তোরাঁয় উপস্থিত ছিল? তুমি উহার এজেণ্টদের অনেকেরই নাম জান; তোমার ইচ্ছামত তাহাদের কাহারও কাহারও নাম উহাকে বলিতে পার।"

মিঃ ব্লীড রিসিভারের মুখ হইতে তাঁহার হাতখানি অপসারিত করিলে ম্যানেজার অত্যন্ত অনিচ্ছার সহিত টেলিফোনে বলিল, "হার্ট এবং জেম্‌স এখন এখানে উপস্থিত আছে সার!"

উত্তর হইল, "উত্তম, তাহাদের দ্বারা কায চলিবে। তাহাদিগকে জানাও, তুমি যে ব্যক্তিকে ধরিয়া রাখিয়াছ, তাহারা তাহাকে 'স্যুইনের' কাছে লইয়া যাক। তাহারা ফিরিলে তাহাদের নিকট যে সংবাদ পাইবে, তাহা আমাকে জানাইবে। ল্যাঙহাম তোমার সঙ্গে দেখা করিলে তাহাকে বলিবে, তাহার সঙ্গে আমার কথা আছে।"

মিঃ ব্লীড রিসিভারে কর্ণ সংযোগ করিয়া মনোযোগ সহকারে এই সকল কথা শুনিতেছিলেন। তিনি চমকিয়া

উঠিয়া বিস্ময়সূচক অস্ফুট শব্দ করিলেন। তিনি মুখ ফিরাইয়া দেখিলেন, মিঃ ডসন তাঁহার চেয়ারে কাত হইয়া পড়িয়া সকল কথা শুনিতেছিলেন।

মিঃ প্রীড ম্যানেজারকে ইঙ্গিতে জানাইলেন, শীঘ্র তাহাকে উত্তর দিতে হইবে।

ম্যানেজার তৎক্ষণাৎ বলিল, "আপনার আদেশানুযায়ী কায হইবে।"

অতঃপর মিঃ প্রীড রিসিভার সরাইয়া রাখিয়া মিঃ ডসনকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "আপনি কৌতূহলের বশবর্ত্তী হইয়া আমার সকল সঙ্কল্প ব্যর্থ করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, তাহা বুঝিতে পারিয়াছেন কি? যে ব্যক্তির সহিত কথা চলিতেছিল, সে যদি কোনক্রমে জানিতে পারিত, ঐ সকল কথা অন্য কেহ শুনিতেছিল, তাহা হইলে তাহার মনে সন্দেহের উদয় হইত।"

মিঃ ডসন বলিলেন, "আমার কৌতূহলের জন্য আমি দুঃখিত; কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার জানিবার জন্য আমার কৌতূহল অসংবরণীয় হইয়াছিল। প্রকৃত ব্যাপার কি, তাহার কিছুই আমি বুঝিতে পারি নাই। তবে যে ব্যক্তির সহিত ম্যানেজারের কথা হইতেছিল, সেই ব্যক্তির কণ্ঠস্বর শুনিয়া আমি বুঝিতে পারিয়াছি, তিনি কে।"

মিঃ প্রীড গভীর বিস্ময়ে মিঃ ডসনের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "তাহাকে চিনিতে পারিয়াছেন? বলুন ত বক্তাটা কে?"

মিঃ ডসন বলিলেন, "উনি আরানা স্বর্ণখনি কোম্পানীর ম্যানেজিং ডাইরেক্টার মিঃ নিস্‌বেট!"

মিঃ প্রীড এ কথা শুনিয়া স্তম্ভিতভাবে তাঁহার চেয়ারে বসিয়া রহিলেন। সেই কক্ষ তখন সম্পূর্ণ নিস্তব্ধ। কয়েক মিনিট পরে তিনি স্বপ্নাবিষ্টের ন্যায় উঠিয়া তাঁহার ছাতা ও টুপী লইবার জন্য হাত বাড়াইলেন। তাহার পর মিঃ ডসনকে বলিলেন, "আপনি এই ব্যক্তির সঙ্গে এখানে অপেক্ষা করুন, আমি যতক্ষণ ফিরিয়া না আসি, ততক্ষণ এই কক্ষ ত্যাগ করিবেন না। কোন কোন জরুরী বিষয়ের সন্ধান লইবার জন্য আমাকে এই মুহূর্ত্তেই বাহিরে যাইতে হইতেছে।"

তিনি দ্বারপ্রান্তে অগ্রসর হইয়া শৃঙ্খলাবদ্ধ ম্যানেজারকে বলিলেন, "যে তিন জন লোককে আমরা পথের ধারে অপেক্ষা করিতে দেখিয়াছিলাম, এবং যাহারা পুলিসের নাম শুনিয়া পলায়ন করিয়াছিল, তাহাদেরই এক জনকে আমি প্যারাডাইনের সঙ্গে গাড়ীতে যাইতে দেখিয়াছিলাম। সেই ব্যক্তির নামই কি ল্যাংহ্যাম নহে?"

ম্যানেজার তাঁহার প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিল না, তাহার বাক্‌শক্তি যেন রহিত হইয়াছিল, কিন্তু মিঃ প্রীড তাহার আতঙ্ক-বিস্ফারিত চক্ষুর দিকে চাহিয়া বুঝিতে পারিলেন, তাঁহার অনুমান সত্য। তাহার চক্ষু তাঁহাকে প্রতারিত করিতে পারিল না।

মিঃ প্রীড মিঃ ডসনকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মিঃ নিস্‌বেটের ঠিকানা কি?"

মিঃ ডসন বলিলেন, "বাইশ নম্বর লংফোর্ড গার্ডেন্‌স।"

মিঃ প্রীড বলিলেন, "বটে? তবে ত আমরা পরস্পরের প্রতিবেশী।"

মিঃ প্রীড মুহূর্ত্তমধ্যে অদৃশ্য হইলেন।

[ক্রমশঃ।

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়।

মুক্তি

বঁধু! তব প্রেম-জাহ্নবী-নীরে অবগাহিয়াছে চিত্ত,
দেশে দেশে ঘুরি বৃথা খুঁজি মরি মন্দির, মঠ, তীর্থ।

শ্রীঅদ্বৈতকুমার সরকার।

২০

জ্ঞঃ অতএব (২।৩।১৮)

(শঙ্কর) জ্ঞঃ (জীবাত্মা নিত্য চৈতন্যস্বরূপ); অতএব (এই কারণেই)

বৈশেষিক মতে জীবাত্মার কখনও চৈতন্য থাকে, আবার কখনও চৈতন্য থাকে না। সাংখ্যমতে জীবাত্মার (পুরুষের) সর্ব্বদাই চৈতন্য থাকে। কোন্ মত যথার্থ? সাংখ্যের মতই যথার্থ। জীবাত্মার সর্ব্বদাই চৈতন্য থাকে,—ইহা চৈতন্যস্বরূপ। কারণ, ব্রহ্মই দেহের মধ্যে জীবভাবে প্রবেশ করেন এবং চৈতন্য ব্রহ্মের স্বরূপ। চৈতন্য যে ব্রহ্মের স্বরূপ, তাহা নিম্নলিখিত শ্রুতিবাক্যে উক্ত হইয়াছে :—

'বিজ্ঞানম্ আনন্দং ব্রহ্ম (বৃহদারণ্যক ৩।৯।২৮) অর্থাৎ ব্রহ্ম চৈতন্যস্বরূপ এবং আনন্দস্বরূপ।

সত্যং জ্ঞানম্ অনন্তং ব্রহ্ম (তৈঃ ২।১।১)

অর্থাৎ ব্রহ্ম সত্য, জ্ঞান এবং অনন্ত।

অনন্তরঃ অবাহ্যঃ কৃৎস্নঃ প্রজ্ঞানঘন এব (বৃ ৪।৫।১৩) অর্থাৎ ব্রহ্মের অন্তর বাহির ভেদ নাই, তিনি কেবল চৈতন্যস্বরূপ।

জীবাত্মা সম্বন্ধে শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে, "অয়ং পুরুষঃ স্বয়ংজ্যোতিঃ ভবতি" (বৃহদারণ্যক ৪।৩।৯) অর্থাৎ জীব নিজ জ্যোতিতেই (চৈতন্যেই) প্রকাশ পায়। "নহি বিজ্ঞাতুর্বিজ্ঞাতের্বিপরিলোপো বিদ্যতে" (৪।৩।৩০) অর্থাৎ জ্ঞাতা জীবের জ্ঞানের কখনও বিলোপ হয় না।

আপত্তি হইতে পারে যে, জীবের জ্ঞানই স্বরূপ, ইহা কিরূপে বলা যায়? কারণ, কোনও ব্যক্তির নিকটে পুষ্প আনিবার পর তাহার সুগন্ধের জ্ঞান হয়, পূর্ব্বে সে জ্ঞান থাকে না। ইহার উত্তর এই যে, সাধারণভাবে জ্ঞান পূর্ব্বেও ছিল। একটা বিশেষ আকারের জ্ঞান পুষ্পটি নিকটে আনিলে পরে উৎপন্ন হয় বটে। সুষুপ্তির সময় বিষয়ের অভাব হেতু জাগ্রৎ অবস্থার ন্যায় বিশেষ জ্ঞান হয় না, কিন্তু সাধারণ রকমের জ্ঞান তখনও থাকে। এ বিষয়ে শ্রুতি বলিয়াছেন—"যৎ বৈ তৎ ন পশ্যতি পশ্যন্ বৈ ন পশ্যতি; ন হি দ্রষ্টুঃ দৃষ্টেঃ বিপরিলোপঃ বিদ্যতে, অবিনাশিত্বাৎ; ন তু তৎ দ্বিতীয়ম্ অস্তি ততঃ অন্যৎ বিভক্তং যৎ পশ্যেৎ" (বৃহঃ ৪।৩।২৩) অর্থাৎ সুষুপ্তির সময় জীব যে দেখিতে পায় না, তখন দেখিয়াও দেখে না। কারণ, দ্রষ্টার দৃষ্টির বিলোপ হয় না। দৃষ্টি (জ্ঞান) অবিনাশী। তখন তাহা হইতে ভিন্ন দ্বিতীয় বস্তু থাকে না—যাহা দেখিতে পাইবে। সুতরাং যখন মনে হয় চৈতন্য নাই, তখন বিষয়ের অভাব হেতু সেইরূপ বোধ হয়, চৈতন্যের অভাব হেতু সেরূপ বোধ হয় না।

(রামানুজ) বৈশেষিক বলেন যে, জীবাত্মার চৈতন্য কখনও থাকে, কখনও থাকে না। সাংখ্য বলেন যে, চৈতন্য বা কেবলমাত্র জ্ঞানই জীবের স্বরূপ। সংশয় হইতেছে, ইহাদের মত কি সত্য? না। ইহাদের কাহারও মত সত্য নহে। জীবের স্বরূপ "জ্ঞঃ" অর্থাৎ জ্ঞাতা। জীব আগন্তুক চৈতন্যযুক্ত বস্তু নহে; প্রত্যুত নির্ব্বিশেষ জ্ঞান বা চৈতন্যই জীবের স্বরূপ নহে। জ্ঞাতৃত্বই জীবের স্বরূপ। "অতএব" অর্থাৎ শ্রুতি হইতেই ইহা জানা যায়। ছান্দোগ্য উপনিষদে আছে—"অথ যো বেদ ইদং জিঘ্রাণি ইতি স আত্মা" অর্থাৎ "যিনি জানেন, ইহা আঘ্রাণ করিতেছি, তিনিই আত্মা।"

সত্যকামঃ সত্যসংকল্পঃ (ছান্দোগ্য উপনিষদ্ ৮।৭।১) মুক্ত জীব যাহা ইচ্ছা করেন, যাহা কল্পনা করেন, তাহাই সত্য। "বিজ্ঞাতারম্ অরে কেন বিজানীয়াৎ" (বৃহঃ ৩।৫।১৫) অর্থাৎ যে জীব বিজ্ঞাতা, তাহাকে কাহার সাহায্যে জানিতে পারিবে? "এষ হি দ্রষ্টা শ্রোতা ঘ্রাতা রসয়িতা মন্তা বোদ্ধা কর্ত্তা বিজ্ঞানাত্মা পুরুষঃ" (প্রশ্নোপনিষদ্ ৪।৯) অর্থাৎ এই জীবই দ্রষ্টা, শ্রোতা, ঘ্রাতা, রসয়িতা, মন্তা, বোদ্ধা, কর্ত্তা ও বিজ্ঞানাত্মা। যে সকল স্থানে জ্ঞানকে

জীবাত্মার স্বরূপ বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে, সেই সকল স্থানের উদ্দেশ্য এই যে, জ্ঞান জীবাত্মার অসাধারণ গুণ।

উৎক্রান্তিগত্যাগতীনাম্ (২।৩।১৯)

জীবাত্মার পরিমাণ কিরূপ? উহা অনন্ত, (infinite), অপরিচ্ছিন্ন, (finite), অথবা অণু (infinifeaimal)? বেদে জীবের 'উৎক্রান্তি' 'গতি' এবং 'আগতি' শোনা যায়। "উৎক্রান্তি" যথা—"স যদা অস্মাৎ শরীরাৎ উৎক্রামতি সহ এব এতৈঃ সর্বৈঃ উৎক্রামতি" (কৌষিতকী ৩।৩) অর্থাৎ, সে (জীব) যখন দেহত্যাগ করিয়া গমন করে, তখন বুদ্ধি ইন্দ্রিয় প্রভৃতির সহিতই গমন করে। "গতি" যথা, "যে বৈ কে চ অস্মাৎ লোকাৎ প্রযন্তি চন্দ্রমসম্ এব তে সর্বে গচ্ছন্তি" (কৌষিতকী ১।২) অর্থাৎ, যাহারা এই পৃথিবী হইতে গমন করে, তাহারা সকলে চন্দ্রলোকেই গমন করে। "আগতি" অর্থাৎ আগমন যথা,—"তস্মাৎ লোকাৎ পুনঃ এতি অস্মৈ লোকায় কর্ম্মণে" (বৃহদারণ্যক ৪।৪।৬) অর্থাৎ পরলোক হইতে পুনরায় এই পৃথিবীতে কর্ম্ম করিবার জন্য আসে। জীবের যখন উৎক্রান্তি, গতি ও আগতির কথা বলা হইয়াছে, তখন বুঝিতে হইবে যে, জীব অনন্ত নহে। কারণ, যাহা অনন্ত, তাহার উৎক্রামণ, গতি ও আগতি হইতে পারে না। সুতরাং জীব হয় পরিচ্ছিন্ন (finite) অথবা অণুপরিমাণ। জীব পরিচ্ছিন্ন হইলে দেহের পরিমাণ হইত, কিন্তু জৈনমত আলোচনা করিবার সময় দেখান হইয়াছে যে, জীবের পরিমাণ দেহের সমান এরূপ কল্পনা করা যায় না। অতএব জীব অণুপরিমাণ, ইহাই সিদ্ধান্ত।

স্বাত্মনা চ উত্তরয়োঃ (২।৩।২০)

জীবের উৎক্রান্তি, গতি এবং আগতির কথা বেদে পাওয়া যায়। উৎক্রান্তিবাচক শ্রুতি মুখ্যভাবে গ্রহণ না করিয়া গৌণভাবে গ্রহণ করা সম্ভব। কোনও গ্রামের স্বামীর যদি স্বামিত্ব চলিয়া যায়, তাহা হইলে সে ব্যক্তি কোথাও না যাইলেও কবির ভাষায় বলা যাইতে পারে "গ্রামস্বামী চলিয়া গেলেন।" কিন্তু "উত্তরয়োঃ" অর্থাৎ পরবর্ত্তী দুইটি ব্যাপার অর্থাৎ গতি এবং আগতিবাচক শ্রুতিবাক্য গৌণভাবে গ্রহণ করা সম্ভব নহে; "স্বাত্মনা" অর্থাৎ জীবাত্মা সত্য সত্যই গমনাগমন না করিলে এই শ্রুতিবাক্যগুলি সার্থক হয় না। সুতরাং জীবের অবশ্যই গমনাগমন হয়। অতএব জীব নিশ্চয়ই অণুপরিমাণ হইবে।

ন অণুঃ অতচ্ছ্রুতেঃ ইতি চেৎ ন ইতরাধিকারাৎ (২।৩।২১)

ন অণুঃ (আত্মা অণুপরিমাণ হইতে পারে না), অতৎশ্রুতেঃ (আত্মা অণু নহে, বৃহৎ, এইরূপ শ্রুতিবাক্য দেখিতে পাওয়া যায়) ইতি চেৎ (কেহ যদি ইহা বলেন), ন (না), ইতরাধিকারাৎ (যেখানে আত্মাকে বৃহৎ বলা হইয়াছে, সেখানে অন্য আত্মা অর্থাৎ পরমাত্মা বা ব্রহ্মকে লক্ষ্য করা হইয়াছে, জীবাত্মাকে নহে)। বৃহদারণ্যক উপনিষদে আছে, "স বা এষ মহান্ অজঃ আত্মা যঃ অয়ম্ বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেষু" (৪।৪।২২) অর্থাৎ "প্রাণের মধ্যে যে বিজ্ঞানময় আত্মা আছেন, তিনি মহান্ এবং জন্মরহিত"। "আকাশবৎ সর্ব্বগতঃ চ নিত্যঃ" অর্থাৎ আত্মা আকাশের ন্যায় সর্ব্বগত এবং নিত্য। "সত্যং জ্ঞানম্ অনন্তং ব্রহ্ম" অর্থাৎ আত্মা সত্য, জ্ঞান এবং অনন্ত। এই সকল স্থানে পরমাত্মা বা ব্রহ্মকে লক্ষ্য করা হইয়াছে। "প্রাণের মধ্যে যিনি বিজ্ঞানময়" এখানে জীবাত্মাকে লক্ষ্য করা হইতেছে সত্য, কিন্তু বামদেবের যেরূপ ব্রহ্মদর্শন হইয়াছিল, সেইরূপ জীবাত্মাকে ব্রহ্ম বলিয়া অনুভব হইয়াছিল।

রামানুজের মতে "প্রাণের মধ্যে যে বিজ্ঞানময় আত্মা" এই মর্ম্মের যে শ্রুতিবাক্য উপরে উদ্ধৃত হইয়াছে, এই শ্রুতিবাক্যে পরমাত্মাকে লক্ষ্য করা হইয়াছে। "যোঽয়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেষু" (বৃঃ ৬।৩।৭) এই বলিয়া এখানে জীবাত্মার প্রস্তাব আরম্ভ করা হইয়াছে সত্য; কিন্তু মধ্যস্থলে "যস্য অনুবিত্তঃ প্রতিবুদ্ধঃ আত্মা" (বৃঃ ৬।৪।১৩) অর্থাৎ প্রতিবুদ্ধ আত্মা অর্থাৎ নিত্যবোধসম্পন্ন আত্মা (পরমাত্মা) যাহার অনুবিত্ত (অর্থাৎ জ্ঞাত) হইয়াছে, এই বলিয়া মধ্যস্থলে পরমাত্মার প্রসঙ্গ উত্থাপন করা হইয়াছে, তাহার পর বলা হইয়াছে, "স বা এষ মহান্ অজ আত্মা" (বৃঃ ৬।৪।২৫) অর্থাৎ সেই আত্মা মহান্ এবং জন্মরহিত। সুতরাং যেখানে মহান্ আত্মা বলা হইয়াছে, সেখানে পরমাত্মাকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। জীবাত্মাকে লক্ষ্য করা হয় নাই।

স্বশব্দোন্মানাভ্যাং চ (২।৩।২২)

যে অণু, তাহা "স্বশব্দে" অর্থাৎ বেদে উক্ত

হইয়াছে, "এষ অণুঃ আত্মা চেতসা বেদিতব্যঃ যস্মিন্ প্রাণঃ পঞ্চধা সংবিবেশ" (মুণ্ডক ৩।১।৯)

অর্থাৎ এই অণুপরিমাণ আত্মাকে চিত্ত দ্বারা জানিতে হইবে, যে আত্মাতে প্রাণবায়ু পাঁচ ভাগে বিভক্ত হইয়া সংবিষ্ট হইয়াছে। "উন্মান" অর্থাৎ জীবাত্মার যে মাপ দেওয়া হইয়াছে, তাহাতেও জীব যে অণুপরিমাণ, তাহা বুঝিতে পারা যায়, যথা—

বালাগ্রশতভাগস্য শতধা কল্পিতস্য চ।
ভাগো জীবঃ স বিজ্ঞেয়ঃ (শ্বেতাশ্বতর ৫।৯)

কেশাগ্র শতভাগে ভাগ করিয়া, তাহার প্রত্যেক ভাগ আবার শতভাগে বিভাগ করিলে যাহা পাওয়া যায়, তাহাই জীবের পরিমাণ বলিয়া জানিবে।

অবিরোধঃ চন্দনবৎ (২।৩।২৩)

আপত্তি হইতে পারে যে, আত্মা যদি অণুপরিমাণ হয়, তাহা হইলে সকল দেহ ব্যাপ্ত করিয়া কিরূপে অনুভূতি হয়? "অবিরোধঃ" আত্মার অণুপরিমাণ এবং সকলদেহগত অনুভব উভয়ের মধ্যে বিরোধ নাই। "চন্দনবৎ" যেমন এক বিন্দু হরিচন্দন দেহের এক স্থানে লগ্ন হইলে সকল দেহে তৃপ্তির অনুভব হয়। আত্মার সহিত ত্বক্‌এর সম্বন্ধ আছে এবং ত্বক্ সকল দেহ ব্যাপ্ত করে, এ জন্য সকল দেহে অনুভব হয়।

অবস্থিতিবৈশেষ্যাৎ ইতি চেৎ ন অভ্যুপগম্যাৎ হৃদি হি (২।৩।২৪)

আপত্তি হইতে পারে, "অবস্থিতিবৈশেষ্যাৎ",—হরিচন্দন-বিন্দু দেহের এক স্থানে অবস্থিত থাকে, আত্মা সেরূপ দেহের এক স্থলে অবস্থিত নহে। "ইতি চেৎ ন"—এইরূপ আপত্তি করিলে বলা যায়,—না, "অভ্যুপগম্যাৎ হৃদি হি" আত্মা হৃদয়ে অবস্থান করে, ইহা স্বীকার করা হইয়াছে। প্রশ্নোপনিষদে আছে—"হৃদি হি এষ আত্মা" (৩।৭) অর্থাৎ এই আত্মা হৃদয়ে অবস্থান করে। ছান্দোগ্য উপনিষদে আছে—"স বা এষ আত্মা হৃদি" (৮।৩।৩) অর্থাৎ এই আত্মা হৃদয়ে অবস্থান করে।

গুণাৎ বালোকবৎ (২।৩।২৫)

পুনরায় আপত্তি হইতে পারে যে, হরিচন্দনের সূক্ষ্ম অংশ-গুলি সকল দেহে পরিব্যাপ্ত হইয়া আহ্লাদ জন্মাইতে পারে, কিন্তু আত্মার ত কোনও সূক্ষ্ম অংশ নাই। ইহার উত্তর এই যে, "গুণাৎ বা" আত্মার গুণ চৈতন্য সকল দেহে ব্যাপ্ত হইয়া সকল দেহে সুখ-দুঃখ অনুভব করে। "আলোকবৎ" যেমন প্রদীপের আলোক গৃহের সকল স্থানে প্রসারিত হইয়া সকল স্থান আলোকিত করে, সেইরূপ।

(রামানুজ) আত্মা জ্ঞাতা; তাহার গুণ জ্ঞান। এই গুণ সকল দেহ ব্যাপ্ত করে। আত্মার সহিত প্রদীপের তুলনা হইয়াছে। জ্ঞানের সহিত আলোকের তুলনা হইয়াছে।

ব্যতিরেকো গন্ধবৎ (২।৩।২৬)

আপত্তি হইতে পারে যে, গুণীকে আশ্রয় না করিয়া গুণ থাকিতে পারে না। যথা বস্ত্রের গুণ শ্বেতবর্ণ, বস্ত্রকে আশ্রয় করিয়া থাকে, যে স্থানে বস্ত্র নাই, সে স্থলে শ্বেত-বর্ণের অনুভব হইতে পারে না। অতএব যে স্থলে আত্মা নাই, সে স্থলে আত্মার গুণ—চৈতন্য বা জ্ঞানের অনুভব হইতে পারে না। আত্মা যখন সকল দেহ ব্যাপ্ত করিয়া অবস্থিত নহে, তখন সকল দেহে জ্ঞানের উপলব্ধি হওয়া যুক্তিযুক্ত নহে। ইহার উত্তর এই যে, "ব্যতিরেকঃ"—যে স্থলে গুণী থাকে না, সে স্থলেও গুণ থাকিতে পারে। "গন্ধবৎ"—যে স্থলে পুষ্প নাই, সে স্থলেও গন্ধের অনুভব হইয়া থাকে।

তথা চ দর্শয়তি (২।৩।২৭)

শ্রুতিতেও ইহা দেখান হইয়াছে। শ্রুতি বলিয়াছেন যে, আত্মা অণু পরিমাণ এবং হৃদয়ই তাহার আশ্রয়। তাহার পর বলিয়াছেন যে, আত্মার গুণ—চৈতন্য—সমস্ত শরীর ব্যাপ্ত করিয়া থাকেন,

—"আলোমভ্য আনখাগ্রেভ্যঃ" (ছান্দোগ্য ৮।৮।১)—লোম এবং নখ পর্য্যন্ত।

রামানুজ পূর্ব্বের দুইটি সূত্র একত্র করিয়া একটিমাত্র সূত্র করিয়া লইয়াছেন, "ব্যতিরেকো গন্ধবৎ তথা চ দর্শয়তি" এবং ইহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন, "যেরূপ পৃথিবীর গুণ গন্ধ পৃথিবী ব্যতিরিক্ত অন্যত্রও অনুভব হয়, সেইরূপ জ্ঞাতৃস্বরূপ আত্মার গুণ—জ্ঞান—আত্মাব্যতিরিক্ত অন্যত্রও (সকল দেহে) উপলব্ধি হয়। "তথা চ দর্শয়তি" অর্থাৎ শ্রুতি ইহা দেখাইয়াছেন। কারণ, শ্রুতি বলিয়াছেন, "জানাতি এব অয়ং পুরুষঃ" অর্থাৎ এই পুরুষ জানে। সুতরাং পুরুষ এবং জ্ঞান এক বস্তু নহে। জ্ঞান পুরুষের গুণ।

পৃথক্ উপদেশাৎ (২।৩।২৮)

আত্মা এবং জ্ঞানের পৃথক্ উপদেশ আছে, অতএব বুঝিতে হইবে আত্মার গুণ—চৈতন্য—দ্বারা শরীর ব্যাপ্ত হয়। কৌষিতকী উপনিষদে আছে, "প্রজ্ঞয়া শরীরং সমারুহ্য" (৩।৬) অর্থাৎ জীবাত্মা প্রজ্ঞা বা জ্ঞানের দ্বারা শরীরে সম্যক্ আরোহণ করে, অথবা অধিষ্ঠিত হয়। এখানে জীবাত্মা কর্ত্তা, জ্ঞান করণ, সুতরাং উভয়ে বিভিন্ন।

তদ্গুণসারত্বাৎ তু তদ্ব্যপদেশঃ প্রাজ্ঞবৎ (২।৩।২৯)

(শঙ্কর) পূর্ব্বে যে বলা হইয়াছে, জীব অণুপরিমাণ, তাহা যথার্থ নহে জীব ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন। ব্রহ্মের যাহা পরিমাণ, জীবেরও তাহা পরিমাণ ব্রহ্ম অনন্ত; অতএব জীবও অনন্ত। ব্রহ্ম বুদ্ধিরূপ উপাধি দ্বারা পরিচ্ছিন্ন হইয়া জীব বলিয়া বোধ হয়। "তদ্গুণসারত্বাৎ তু তদ্ব্যপদেশঃ"—"তদ্গুণ" অর্থাৎ সেই বুদ্ধির যে সকল গুণ (যথা ইচ্ছা, দ্বেষ, সুখ, দুঃখ ইত্যাদি), ব্রহ্ম বা আত্মা সংসারী হইলে বুদ্ধির এই গুণগুলি সার বলিয়া বোধ হয়, এই জন্য "তদ্ব্যপদেশঃ"—তৎ অর্থাৎ সেই বুদ্ধির পরিমাণ অনুসারে, আত্মার পরিমাণ "ব্যপদেশ" অর্থাৎ উল্লেখ করা হইয়াছে। শ্রুতি বলিয়াছেন, "বালাগ্রশতভাগস্য শতধা-কল্পিতস্য চ, ভাগো জীবঃ স বিজ্ঞেয়ঃ স চানন্ত্যায় কল্পতে" (শ্বেতাশ্বতর ৫।৯) "কেশের অগ্রভাগ যদি শতভাগে ভাগ করা হয়, আবার সেই এক একটি ভাগ যদি শতভাগে ভাগ করা হয়, তাহা হইলে যে পরিমাণ হয়, তাহাই জীবের পরিমাণ, কিন্তু মোক্ষলাভ করিলে তাহাই অনন্ত হইয়া যায়।" যাহা প্রকৃতই অণুপরিমাণ, তাহা কখনও অনন্ত হইতে পারে না। জীবের প্রকৃত পরিমাণ অনন্ত। বুদ্ধিরূপ উপাধির পরিমাণ অনুসারে তাহাকে অণুপরিমাণ বলা হইতেছে। সেইরূপ মুণ্ডক উপনিষদে যে আছে "এষ অণুঃ আত্মা চেতসা বেদিতব্যঃ।" (৩।১।৯) অণুপরিমাণ এই জীবাত্মাকে চিত্ত দ্বারা জানিতে হইবে—ইহা হইতে এরূপ সিদ্ধান্ত করা উচিত নয় যে, জীবের পরিমাণ অণু। জীবাত্মাকে উপলব্ধি করা দুরূহ বলিয়া অণু বলা হইয়াছে, অথবা বুদ্ধিরূপ উপাধিকে লক্ষ্য করিয়া অণু বলা হইয়াছে। পূর্ব্বসূত্রে যে শ্রুতিবাক্য উদ্ধৃত হইয়াছে "প্রজ্ঞয়া শরীরং সমারুহ্য," তাহাও বুদ্ধিরূপ উপাধির দ্বারা বুদ্ধি উপাধিযুক্ত আত্মা (অর্থাৎ জীব) শরীরে অধিষ্ঠিত হয়, ইহাই বলা হইয়াছে। জ্ঞানকে আত্মার গুণ বলা যুক্তি-যুক্ত হয় না। যেখানে জীবের গতি উক্ত হইয়াছে, সেখানেও বুদ্ধিরূপ উপাধিকে অবলম্বন করিয়া বলা হইয়াছে। "প্রাজ্ঞবৎ" যেমন প্রাজ্ঞ অর্থাৎ পরমাত্মাকে কোনও কোনও স্থলে অণু বলা হইয়াছে। যথা "অণীয়ান্ ব্রীহের্বা যবাদ্ বা" (ছান্দোগ্য ৩।১৪।৩) (ব্রহ্ম) ব্রীহি এবং যব অপেক্ষাও অণু। উপাসনার জন্য উপাধির গুণ অনুসারে পরমাত্মাকে এইভাবে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। সেইরূপ পরমাত্মাকে উপাধির গুণ অনুসারে বলা হইয়াছে "মনোময়ঃ প্রাণশরীরঃ," তিনি মনোময়, প্রাণই তাঁহার শরীর

(রামানুজ) "তদ্গুণসারত্বাৎ" এখানে 'তৎ' শব্দের অর্থ জীব। জীবের সার (শ্রেষ্ঠ) গুণ হইতেছে জ্ঞান। এ জন্য কোনও কোনও স্থলে জীবকে জ্ঞান বা বিজ্ঞান শব্দের দ্বারা অভিহিত করা হইয়াছে। যথা 'বিজ্ঞানং যজ্ঞং তনুতে' অর্থাৎ জীব যজ্ঞ করে। "প্রাজ্ঞবৎ" প্রাজ্ঞ অর্থাৎ পরমাত্মার শ্রেষ্ঠ গুণ আনন্দ, এ জন্য কোনও কোনও স্থলে পরমাত্মাকে আনন্দ শব্দের দ্বারা নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। যথা "আনন্দো ব্রহ্ম ইতি ব্যজানাৎ" অর্থাৎ ব্রহ্মকে আনন্দ বলিয়া জানিল। আবার কোনও কোনও স্থলে পরমাত্মাকে জ্ঞান শব্দের দ্বারাও নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, যথা "সত্যং জ্ঞানম্ অনন্তং ব্রহ্ম" অর্থাৎ ব্রহ্ম সত্য-স্বরূপ, জ্ঞান স্বরূপ এবং আনন্দ-স্বরূপ। এই সকল শ্রুতি-বাক্য হইতে জানা যায় যে, জ্ঞানও ব্রহ্মের সারভূত গুণ।

যাবদাত্মভাবিত্বাৎ ন দোষঃ তদ্দর্শনাৎ (২।৩।৩০)

(শঙ্কর) যদি ব্রহ্ম এবং বুদ্ধির সংযোগেই জীবের উৎপত্তি হইয়াছে, তাহা হইলে উহাদের বিয়োগ হইলে জীব কিরূপে থাকিতে পারিবে? ইহার উত্তরে এই সূত্রে বলা হইয়াছে, "ন দোষঃ", এই দোষ নাই; যাবদাত্ম-ভাবিত্বাৎ,—যতক্ষণ জীব থাকে, ততক্ষণ (ব্রহ্ম ও বুদ্ধির) সংযোগ থাকে। যখন ব্রহ্মজ্ঞান হইয়া যায়, জীব নিজকে ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন বলিয়া উপলব্ধি করে, তখন জীবই ব্রহ্ম হইয়া যায়, জীব আর থাকে না। "তদ্দর্শনাৎ"—বেদাদি শাস্ত্র তাহা দেখাইয়াছে। "যোঽয়ং বিজ্ঞানময়ঃ

প্রাণেষু হৃদ্যন্তঃ জ্যোতিঃ পুরুষঃ স সমানঃ সন্ উভৌ লোকৌ অনুসঞ্চরতি ধ্যায়তি ইব লেলায়তি ইব” প্রাণ এবং হৃদয়ের মধ্যে যে জ্যোতির্ম্ময় পুরুষ দেখা যায়, সে সমানভাবে ইহলোক এবং পরলোকে সঞ্চরণ করে, মনে হয় যেন ধ্যান করিতেছে, চলিতেছে। বুদ্ধি যখন ধ্যান করে, তখন মনে হয় যে জীব ধ্যান করিতেছে। বুদ্ধি যখন চলে, তখন মনে হয় যে জীব চলিতেছে।

(রামানুজ) “যাবদাত্মভাবিত্বাৎ” যতক্ষণ আত্মা (জীব) থাকে, ততক্ষণ জ্ঞানও থাকে। “ন দোষঃ” জ্ঞানশব্দ দ্বারা আত্মাকে নির্দ্দেশ করা দোষ হয় নাই। “তদ্দর্শনাৎ” দেখা যায় যে, অনেক সময় যণ্ডকেও গো শব্দ দ্বারা নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, কারণ, যণ্ড যতক্ষণ থাকে, গোত্বও ততক্ষণ থাকে।

পুংস্ত্বাদিবত্ত্বস্য সতোঽভিব্যক্তিযোগাৎ (২।৩।৩১)

(শঙ্কর) পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, যতক্ষণ জীব থাকে, ততক্ষণ বুদ্ধির সহিত সম্বন্ধ থাকে, এ বিষয়ে সন্দেহ হইতে পারে যে, সুষুপ্তির সময় বুদ্ধির অস্তিত্ব থাকে না, সকলই প্রাণে বিলীন হইয়া যায়? তাহার উত্তরে এই সূত্রে বলা হইতেছে—“পুংস্ত্বাদিবৎ”—বালকের পুংস্ত্ব থাকিলেও যেমন অভিব্যক্তি হয় না, যৌবনে অভিব্যক্তি হয়, সেইরূপ সুষুপ্তির সময় বুদ্ধির অস্তিত্ব থাকিলেও অভিব্যক্তি হয় না, পুনরায় জাগ্রত হইলে তাহার অভিব্যক্তি হয়।

(রামানুজ) পূর্ব্বের সূত্রে বলা হইয়াছে যে, যতক্ষণ জীব থাকে, ততক্ষণ জ্ঞানও থাকে, এ বিষয়ে সন্দেহ হইতে পারে যে, সুষুপ্তির সময় জ্ঞান থাকে কি না। এই সূত্রে সেই সন্দেহ নিরস্ত হইতেছে,—বাল্যকালে যেরূপ পুংস্ত্বের (শুক্র) অস্তিত্ব থাকিলেও উপলব্ধি হয় না, যৌবনে উপলব্ধি হয়, সেইরূপ সুষুপ্তির সময় জ্ঞানের উপলব্ধি হয় না (কিন্তু জ্ঞান থাকে), জাগ্রত হইলে উপলব্ধি হয়। মুক্ত অবস্থাতেও জ্ঞান থাকে, কেবল স্থূলদেহের অনুগামী জন্মমরণাদি থাকে না।

নিত্যোপলব্ধ্যনুপলব্ধিপ্রসঙ্গোঽন্যতরনিয়মো বা অন্যথা (২।৩।৩২)

(শঙ্কর) অন্যথা (বুদ্ধির অস্তিত্ব স্বীকার না করিলে) নিত্যোপলব্ধি-অনুপলব্ধিপ্রসঙ্গঃ (সর্ব্বদাই উপলব্ধি হইবে, অথবা সর্ব্বদাই অনুপলব্ধি হইবে,—এইরূপ স্বীকার করিতে হইবে) অন্যতরনিয়মঃ (অথবা অন্যতর বস্তুর শক্তিপ্রতিবন্ধ হয়, ইহা স্বীকার করিতে হইবে। আমরা কখনও একটি বস্তু উপলব্ধি করি, কখনও বা বস্তুটি সম্মুখে থাকিলেও উপলব্ধি করি না। আত্মা, ইন্দ্রিয় এবং বিষয় (বাহ্য বস্তু) ব্যতীত অপর একটি বস্তু (বুদ্ধি বা মন) না স্বীকার করিলে ইহার কারণ নির্দ্দেশ করিতে পারা যায় না, কেন আমরা সম্মুখের বস্তু কখনও উপলব্ধি করি, কখনও উপলব্ধি করি না? আত্মা, ইন্দ্রিয় এবং বিষয় সর্ব্বদাই বিদ্যমান থাকে, তাহারা যদি উপলব্ধির পক্ষে যথেষ্ট হইত, তাহা হইলে সর্ব্বদাই বিষয় উপলব্ধি হইত, যদি যথেষ্ট না হইত, তাহা হইলে কখনও বিষয় উপলব্ধি হইত না। আত্মা, ইন্দ্রিয় ও বিষয় ভিন্ন নিশ্চয় অপর একটি বস্তু আছে,—ইহার নাম অন্তঃকরণ,—ইহাকেই বৃত্তিভেদ অনুসারে মন ও বুদ্ধি নাম দেওয়া হয়,—যখন সংশয়াত্মক বৃত্তি হয়, তখন ইহার নাম হয় মন, যখন নিশ্চয়াত্মক বৃত্তি থাকে, তখন ইহার নাম হয় বুদ্ধি। যখন অন্তঃকরণ বিষয়ের সহিত সংযুক্ত হয়, তখন আমরা বিষয় উপলব্ধি করি, যখন বিষয়ের সহিত সংযোগ থাকে না, তখন আমরা বিষয় উপলব্ধি করি না। এ বিষয়ে শ্রুতি বলিয়াছেন—“অন্যত্রমনা অভূবং ন অদর্শং অন্যত্রমনা অভূবং ন অশ্রৌষম্, মনসা হি এব পশ্যতি মনসা হি এব শৃণোতি” (বৃহদারণ্যক ১।৫।৩)—অর্থাৎ আমার মন অন্যত্র ছিল, এ জন্য দেখি নাই, আমার মন অন্যত্র ছিল, এ জন্য শুনি নাই, মনের দ্বারাই দর্শন করে, মনের দ্বারাই শ্রবণ করে।

(রামানুজ) যদি আত্মা জ্ঞানস্বরূপ এবং বিভু (স্বগত) হয়, তাহা হইলে এক ব্যক্তির যাহা উপলব্ধি হইবে, সকল ব্যক্তিরই তাহা উপলব্ধি হইবে, কারণ, প্রত্যেক ব্যক্তির আত্মা সকল ব্যক্তির ইন্দ্রিয়ের সহিত সমানভাবে সংযুক্ত থাকিত। বিভিন্ন ব্যক্তির অদৃষ্ট বিভিন্ন বলিয়া, উপলব্ধিও বিভিন্ন হয়,—এ প্রকারেও সমস্যার সমাধান হয় না, কারণ, প্রত্যেক আত্মা যদি সর্ব্বব্যাপক হয়, তাহা হইলে একটি বিশেষ অদৃষ্টের সহিত একটি বিশেষ আত্মার সম্বন্ধ স্থাপন করিবার কোনও হেতু থাকে না।

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় (এম-এ)।

তুর্কী হুর

তুর্ক-মুলুকে তেরো-জাতের বাস। মুসলমান ছাড়া এখানে আছে আলবানিয়ান, কুর্দ, সার্কেশিয়ান, তাতার, তুর্কোমান এবং য়ুরাক জাতি।

এক জন মুসলমান পুরুষ একসঙ্গে চারটি পত্নী গ্রহণ করিতে পারে; ইশ্‌লামের তাহাতে নিষেধ নাই। তার উপর বাঁদী পালন করো অসংখ্য, তাহাতে মানা নাই! তবু কার্য্যক্ষেত্রে খুব ধনী মুসলমান ছাড়া সাধারণ গৃহস্থ পুরুষ একটি পত্নী লইয়াই ঘর-সংসার করে। একাধিক পত্নী পুষিতে ব্যয় অনেক—সে ব্যয় ক'জন বহিতে পারে?

একটির উপর আর একটি স্ত্রী ঘরে আনিলে তার জন্য চাই আর-একখানি ঘর; তার পর সামাজিক পদবী বুঝিয়া স্বতন্ত্র দাসী-বাঁদী রাখিতে হইবে। তার উপর আছে দেন-মোহরের উৎপাত!

মুসলিম কুমারীর উত্তরাধিকার-বিধি ভালো। পিতার মৃত্যু ঘটিলে ভাই থাকিলে ভাইয়ের সঙ্গে পৈতৃক সম্পত্তি সে পায় তুল্যাংশে। বিবাহের পরে স্বামীর সম্পত্তিতে তার অধিকার আছে; পিতার সম্পত্তিতেও অধিকার বিলুপ্ত হয় না। আইনের চোখে, তার দায়িত্ব ঠিক পুরুষের মতো। সামাজিক পদ-মর্য্যাদানুসারে স্ত্রীর খোরপোষ দিতে স্বামী বাধ্য। তুর্কি-সমাজে ডিভোর্শ-প্রথা আছে; তবে বিবাহের পূর্ব্বে স্বামীর সঙ্গে স্ত্রীর দেন-মোহর বা যৌতুকের চুক্তি-নামা থাকে। বিবাহ-বন্ধন ছিন্ন হইলে স্বামীকে কড়ায়-গণ্ডায় সে দেন-মোহর চুকাইয়া দিতে হয়; নচেৎ ডিভোর্শ বা তাল্লাক মঞ্জুর হয় না।

মুসলিম সংসারে শাশুড়ী হন্ কর্ত্রী; তাই ছেলেমেয়েরা মাকে সাধারণতঃ খুব ভক্তি করে—মায়ের আদেশবর্ত্তী হয়।

তার উপর মুসলিম সমাজে পর্দার খুব কড়াক্কড় বিধি থাকার জন্য অনাত্মীয় গৃহের মেয়েদের সঙ্গে কেহ মিশিতে পারে না; এ জন্য পুরুষ-জাতের বন্ধু ও সহায় বলিতে আছে শুধু মা, বোন ও নিকট-আত্মীয়ারা। সমাজে এই বিধির কল্যাণে মুসলিম সংসারে মায়ে-ছেলের, ভাইয়ে-বোনে বেশ সম্প্রীতি দেখা যায়।

তুর্কি গৃহে আছে দুটা ভাগ। এক ভাগের নাম হারেম্-লিক বা অন্দর; অপর ভাগের নাম সেলামলিক বা সদর। সেলামলিকের অর্থ, নীচের তলায় দু'খানা ঘর—বৈঠকখানা ও অফিস-কামরা। এ দুই কামরায় বসিয়া কর্ত্তা বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে খোশ-গল্প করে; কাজ-কর্ম্ম করে।

কালের ঘোমটা

হারেমলিক বা অন্দর-মহলের দ্বারে ঝোলে পর্দা; পর্দার ও দিকে উঠান, বাগান। এ অংশটিতে মেয়েদের আস্তানা; এ অংশে বাহিরের লোকের প্রবেশ-অধিকার নাই। অন্দরে মেয়েদের বান্ধবী বা সখী আসিলে বাড়ীর যুবা-প্রৌঢ়-বৃদ্ধগণের হুট করিয়া অন্দরে আসিবার জো থাকে না!

'হারেম' আরবী কথা। এ কথার আসল অর্থ—

অন্তরাল; seclusion বা privacy. এই অর্থ ধরিয়া অন্দর-মহল বুঝাইতে হারেম কথার প্রচলন হইয়াছে।

মুসলিম গৃহে বাঁদী-প্রথা প্রচলিত থাকিলেও বাঁদীদের স্বত্ব অস্বীকার করিবার উপায় নাই। বাঁদীদেরও বহু স্বত্ব আছে, অধিকার আছে। কাজেই বাঁদীর জীবন মুসলিম-গৃহে দুর্ব্বহ নয়; বাঁদী এক দিন ঘরের ঘরণী হইতে পারে—তাহাতে ধর্ম্ম বা সমাজগত কোনোরূপ নিষেধ নাই। মুসলিম-

অন্দরে—স্বামী ও স্ত্রী-ত্রয়

কুল-কামিনী

সমাজে ধর্ম্মানুশাসন এমন যে, কাহারো পক্ষে অবিবাহিত থাকা চলে না। অবিবাহিত থাকার অর্থ, জাতির বিলোপ-সাধন। এ জন্য পয়গম্বরের আদেশ,—যৌবনোদয়ে পুরুষ-মাত্রেই বিবাহ করিবে। বিবাহের ফলে পাপাচরণে প্রবৃত্তি ঘটিবে না। এ বিধি মেয়ে-পুরুষ দু'জনের সম্বন্ধে খাটিয়া আসিতেছে সমানভাবে যুগ-যুগান্তকাল ব্যাপিয়া।

বধূ-নির্ব্বাচনেও ধর্ম্মানুশাসন মানিতে হয়। অর্থাৎ বধূ যেন নারী-কুলে বরেণ্যা হয়। পয়গম্বরের মতে—বুদ্ধিমতী, সম্ভ্রম-মর্য্যাদাশীলা, সতী, লজ্জাবতী, পতি-অনুরাগিণী, গম্ভীর ও শান্তপ্রকৃতির নারীই বধূ-কুলে শ্রেষ্ঠ। এমন বধূ বিবাহ করিবে—যে-বধূ পতিগত-চিন্তা এবং প্রচুর সন্তানবতী হইবে।

কেমন মেয়েকে বিবাহ করিবে না—তাহারো বিধি নির্দ্দিষ্ট আছে। যে-মেয়ে অশ্রুমুখী, কুৎসা-রতা, নিন্দায় সহস্রমুখী, শোক-দুঃখার্ত্তা বা মুখরা ও কলহপ্রিয়া, এমন মেয়েকে কদাচ বিবাহ করিবে না। যে বিধবার পূর্ব্ব-স্বামীর ঔরস-জাত সন্তান আছে, কিম্বা যে উড়নচণ্ডী, এমন কন্যাকে কদাচ বিবাহ করিবে না। পূর্ব্ব-স্বামীর গুণ যে নিত্য গাহিয়া বেড়ায়, স্বামীর কাছে দিবানিশি যে দুঃখ জানায়, স্বামীকে দেখিলে যার মুখের হাসি উবিয়া যায়,—এমন নারীকে কদাচ বিবাহ করিবে না! তার উপর

সম্পর্ক-বিচারেও আছে বিবাহে নিষেধ। অর্থাৎ বিমাতা, মাতা, কন্যা, সহোদরা, খুড়ী, জেঠী, পিসী, মাসী, ভাগিনেয়ী, ভাইঝী এবং শাশুড়ীকে কোনো পুরুষ কদাচ বিবাহ করিবে না।

এমনি বহু নিষেধ-শাসনের চাপে মুসলিম যুবা বিবাহের পাত্রী-নির্ব্বাচন সম্বন্ধে উদাস ও নির্লিপ্ত থাকে। বধূ নির্ব্বাচন করে

তুর্কি নর্ত্তকী

সব-চেয়ে বড় জিনিষ। এই দেন-মোহরই তুর্কি-নারীর আত্ম-রক্ষার অমোঘ বা দুর্জ্জয় বর্ম। স্বামীকে চুক্তি করিতে হয়, স্বামী মারা গেলে কিম্বা স্বামী ডিভোর্শ করিলে স্ত্রীকে

অন্দরের অন্তরে

মা-বাপ—ঘটক-ঘটকীর সহায়তায়। পাত্রী স্থির হইলে সে পাত্রী মনোনীত করিবার ভার শুধু মায়ের। দেখিয়া শুনিয়া মা আসিয়া পাত্রীর সম্বন্ধে সার্টিফিকেট দিলে তখন বিবাহের কথা পাকা হয়। মায়ের রিপোর্ট ভালো না হইলে বিবাহ ঘটা দায়।

পাত্রী পছন্দ হইলে নিয়ম-রক্ষার জন্য এ বিবাহে পাত্রের সম্মতি লইতে হয়। বিবাহের যৌতুকাদি স্থির হইলে বিবাহ ঘটে। এই যৌতুক বা দেন-মোহর—বিবাহে নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ দিবে। এ অর্থের পরিমাণ থাকে খুব বেশী। সে অর্থ দেওয়া অনেক সময় স্বামীর সামর্থ্যে কুলায় না; কাজেই পাণ হইতে চূণ খশিলে বা সামান্য মান-অভিমান ঘটিলেই স্বামী স্ত্রীকে বলিবে—"তোমায় তালাক দিলাম! তুমি সরিয়া পড়ো" সে উপায় নাই!

মুসলিম-বিবাহে পাত্র-পাত্রী উভয়ের সম্মতি থাকা চাই। মেয়েদের বিবাহ হয় বালিকা-বয়সে—তখন তারা নাবালিকা থাকে; তাই পাত্রীর হইয়া তার মা-বাপ কিম্বা মা-বাপের

অবর্তমানে নিকটতম আত্মীয়-আত্মীয়ারা সম্মতি-দানের পালা সারিয়া বিবাহ-অনুষ্ঠান সম্পাদিত করেন। বালিকা-বয়সী মেয়ে লজ্জার মাথা খাইয়া বলিতে পারে না—এ পাত্র বিবাহ করিব না; কিম্বা ও-পাত্রটি আমার ভারী পছন্দ—উহাকে আমি বিবাহ করিব। তাই কন্যাকে প্রগল্‌ভতা হইতে রক্ষা করিতে এবং আইনে নাবালিকার চুক্তি বা সম্মতির মূল্য নাই বলিয়া আইনের মর্যাদা বাঁচাইতে সম্মতিদানের এই ব্যবস্থা; বিবাহে মা-বাপ সম্মতি দিলেও,—বিবাহের পরে মেয়ে সাবালিকা হইলে মুখের কথায় তাকে একবার স্বামী-পাত্রে 'হাঁ, পছন্দ' বলিয়া সায় দিতে হয়।

বিবাহের কথা পাকা হইবার পর বিবাহ ঘটে অনতিবিলম্বে। তিন দিন ধরিয়া উৎসব চলে। বরের গৃহে নানা অনুষ্ঠান; বধূ বসিয়া থাকে পিতার গৃহে লোক-লোচনের অন্তরালে। তৃতীয় দিনে জমকালো বেশভূষায় সাজিয়া আত্মীয়-বন্ধুর ফৌজসহ বর আসে কন্যার গৃহে। সদরে আদর। পুরুষের দল আসরে বসে; মেয়েরা থাকে অন্দরে সদরে-অন্দরে উৎসবের বন্যা বহিয়া যায়। তার পর বিবাহ-অনুষ্ঠান।

বর ও বধূ—এ যাবৎ কেহ কাহাকেও দেখে নাই—দেখিবে না। বধূর তরফে থাকে প্রতিনিধি proxy। সাক্ষীদের সামনে বর আসে—প্রতিনিধির হাত ধরিয়া। সকলের সামনে বরকে কাজী প্রশ্ন করেন—যে বধূর ইনি প্রতিনিধি, তাঁহাকে গ্রহণ করিতে রাজী আছো? চুক্তিনামা বরাবর তাহাকে দেনমোহর দিতে স্বীকৃত আছো?

অন্দরের আরাম

এ প্রশ্নের উত্তরে বর বলে,—কায়মনোবাক্যে আমি এ নারীর সকল ভার গ্রহণ করিলাম। তাহাকে নির্দ্ধারিত দেন-মোহর দিব। আমি রাজী—আমি রাজী—আমি রাজী। তখন কাজী প্রার্থনা নিবেদন করেন—হে মহান্ ঈশ্বর, এই দাম্পত্য-মিলনকে অটুট সুখময় করো—আদম ও ঈভের মতো, আব্রাহাম ও শারার মতো, শ্রীল শ্রীযুত মহম্মদ পয়গম্বর এবং আয়েসার মতো এ মিলন হোক সুখ-শান্তিময়, পুণ্যময়!

এই প্রার্থনার সঙ্গে সঙ্গে বিবাহ মঞ্জুর হইয়া যায়। এখন বর অনুমতি পায় বধূকে দেখিতে। বরকে অন্দরে আনা হয়। বধূ অন্দরে বসিয়া আছে দীর্ঘ-অবগুণ্ঠনবতী—তাকে কেন্দ্র করিয়া আত্মীয়ার দল দাঁড়াইয়া থাকে। বধূর সামনে বর আসিয়া উপস্থিত হইলে আত্মীয়ারা অন্তরালে সরিয়া যায় এবং বর তখন অবগুণ্ঠন মোচন করিয়া বধূর চন্দ্র-মুখ দেখে।

বাহিরে ওদিকে বর-ও-কন্যাযাত্রীর দল অধীর ঔৎসুক্যে

দাবার ধারে

দাঁড়াইয়া আছে। বর বধূর মুখ দেখিবামাত্র সে সংবাদ সদরে পাঠানো হয়; অমনি সেখানে পুরুষের দলে আনন্দ-উল্লাসের ধ্বনি জাগিয়া ওঠে। সকলে নব-দম্পতীর কল্যাণ-কামনা করে। পরক্ষণে হুড়াহুড়ি ঠেলাঠেলির ধুম বাধিয়া যায়. বর এবার বধূকে লইয়া নিজের গৃহে ফিরিবে! হাসি-তামাসা, নাচ-গানের নির্ঝর বহিতে থাকে।

বরের গৃহে বধূর জন্য অন্দরে বিশিষ্ট আসন পাতা থাকে। বধূ আসিলে তাকে সেই আসনে বসানো হয়; তখন বরের গৃহের মেয়েদের সঙ্গে, বরের আত্মীয়া কুটুম্বিনী-দের সঙ্গে বধূর চেনা-পরিচয় করাইয়া দেওয়া হয়।

মুসলিম সমাজ ও ধর্ম-বিধিমতে পুরুষের মূল্য নারীর চেয়ে বেশী। পুরুষ শ্রেষ্ঠ—নারী হীন; নারী শয়তানের সহচরী, তার হাতের কল! এমন বহু বচন বহু মুসলিম-গ্রন্থে দেখা যায়।

পুরুষের অধিকার এতখানি অপ্রতিহত যে, খেয়ালমাত্রে বিবাহিতা পত্নীকে সে ত্যাগ করিতে পারে; তাহাতে কোনো নিষেধ নাই। তবে দেন-মোহর দিতে হইবে। এই ডিভোর্শের বিধিও খুব সহজ। স্বামী শুধু স্ত্রীকে তিনবার মাত্র বলে—তোমায় তালাক! তালাক! তালাক! তাহা হইলেই সর্ব্বনাশ—বিবাহের গন্থি অমনি খুলিয়া গেল!

মেয়েরা ডিভোর্শ চাহিতে পারে শুধু স্বামীর তরফে নিষ্ঠুর আচরণে। স্বামী যদি অবিশ্বাসী হয়, রোগগ্রস্ত হয়, কিম্বা শক্তিহীন হয়, তাহা হইলে স্বামীর সম্মতি বা অনুমতি না পাইলেও ডিভোর্শে স্ত্রীর অধিকার আছে। তা ছাড়া স্বামি-স্ত্রী পরস্পরের সম্মতি-ক্রমেও বিবাহ-বন্ধন ছেদন করিতে পারে।

বনিয়াদী মহিলার বিলাস

ডিভোর্শের ব্যবস্থা এত সহজ হইলেও কোনো সুধী মুসলিম এ প্রথার তারিফ করে না। পয়গম্বর স্বয়ং ডিভোর্শের বিরোধী ছিলেন। তিনি বলিয়া গিয়াছেন—আইন ডিভোর্শের অনুমোদন করিলেও এ ব্যবস্থায়

ভগবানের বিরাগ! যে-নারী স্বেচ্ছায় ডিভোর্শ চায়, বেহেস্তে তার প্রবেশ-দ্বার চির-রুদ্ধ!

মুস্‌লিম সংসারে বাঁদী অপরিহার্য্য অঙ্গ বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। কোনো নারী ঘোমটা খুলিয়া নিকট-আত্মীয় ছাড়া অপর পুরুষ মানুষের সামনে বাহির হইবে না, ইহাই শাস্ত্র-বিধি। এমন যদি বিধি, তাহা হইলে বাঁদী প্রথার সৃষ্টি এ সমাজে কি করিয়া ঘটিল?

বহু প্রাচীন যুগে যে সব বিধর্ম্মী বিদেশী জাতি তুর্কির হাতে পরাভূত ও বন্দী হয়, তাদের ঘরের মেয়েদের আনিয়া বিজয়ী তুর্কি জাতি দাস্যে নিযুক্ত করে। তার পর বনিয়াদী বিলাসী ঘরে বাঁদীর প্রয়োজন বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বহু লোক রীতিমত বাঁদীর ব্যবসা সুরু করিয়া দেয়। সার্কেশিয়া হইতেই বেশী বাঁদী সংগৃহীত হইত।

এই বাঁদীর দল কিন্তু তুর্কি সংসারে একান্ত দুর্ভাগিনী নয়। সংসারে তাদের নানা কাজ সত্য; কিন্তু সে কাজে যে খুব দুঃসহ পরিশ্রম করিতে হয়, তাহা নয়। কাপড় কাচা, দাসী-বৃত্তি, সখী-সহচরীর কাজ করিলেও তাদের অবসর থাকে প্রচুর। সে অবসরে বসিয়া অনেকে দিবা-স্বপ্ন দেখে। কাহারো ভাগ্যে সে স্বপ্ন সত্য হয়; কাহারো বা হয় না। তবে রূপ-যৌবনের জোর থাকিলে বাঁদীর প্রোমোশন-লাভে কোনো দিন বাধা-বিঘ্ন ঘটে না।

বাঁদীদের নাম স্বাধীন জেনানা (free maiden)। বাঁদী বা স্বাধীন জেনানাকে বিবাহ করিতে হইলে বাজারে বেশ চড়া দাম দিয়া তাকে কিনিতে হয়। গৃহের বাঁদীর যদি কন্যা হয়, তবে সে কন্যাকে বিক্রয়ের অধিকার মালিকের নাই—বাঁদীর গর্ভে জন্মিলেও সে কন্যা স্বাধীন জেনানা।

বাঁদী যদি মুখরা বা অবাধ্য হয়, তথাপি তাকে বাড়ীর বাহির করিয়া দিবে, সে উপায় নাই। সাত বৎসর কোনো পরিবারে একাদিক্রমে দাস্য করিলে মুক্তি-লাভে বাঁদীর অধিকার জন্মায়; তখন তার পক্ষে বিবাহ করা মোটেই দুঃসাধ্য হয় না।

কর্ত্তা-গৃহিণী-ত্রয়ের ভোজন-বিলাস

তুর্কিতে আজ সে বাঁদী-বাজার নাই সত্য; তবু ধনী সৌখীন মুস্‌লিম পুরুষের বাঁদীর নেশা আজো উবিয়া যায় নাই! তাদের খেয়াল-তৃপ্তির জন্য এখন বাঁদী আসে জর্জ্জিয়া, সার্কেশিয়া এবং অন্যান্য বহু প্রদেশ হইতে। শ্বেতাঙ্গিনী যুবতী বাঁদী! এ ব্যবসা অবৈধ বলিয়া ধিকৃত হয় না। বাঁদী-ব্যবসায়ীর দল শ্যেন-দৃষ্টি লইয়া বাঁদীর সন্ধানে ফাঁদ হাতে

তুর্কির বেদিয়া-বালিকা

কন্‌স্তান্তিনোপলের ধনী-সদাগর-বনিতা

আজো য়ুরোপে-আমেরিকায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছে—তাদের কুহকে পড়িলে রক্ষা পাইবার আশা থাকে না।

কনস্তান্তিনোপলে এক বাঁদী-সদাগরের প্রাসাদ-তুল্য অট্টালিকা এবং ঐশ্বর্য্য যা আছে, দেখিলে বিস্ময় বোধ হয়। সমাজে এই বাঁদী-বেচা সদাগরের সম্ভ্রম-মর্য্যাদারও সীমা নাই।

এই বাঁদীর দল—তারা জানে না, ভালোবাসা কি বস্তু—মুক্তিই বা কি! বিলাসী পুরুষের কামানলে নিজেদের আহুতি দিয়া পড়িয়া আছে। এমন অবস্থায়,—যারা বুদ্ধিমতী, তারা লক্ষ্য রাখে, রূপযৌবনের ফাঁদে ধনী বিলাসীকে করগত করিতে। 'ভালোবাসিতে মানা'—তারা তাহা বোঝে। কাজেই তারা রূপ-যৌবনকে মূলধন করিয়া ব্যবসায়ে নামে। এ সব বাঁদীর মধ্যে অনেকের জন্ম জর্জ্জিয়ায় ও সার্কেশিয়ায়।

তুর্কি রমণীর স্থান ছিল অন্দরে; অবশ্য এ যুগে অন্দরে সে পর্দ্দা খসিয়া গিয়াছে,—আমরা বলিতেছিলাম পূর্ব্ব-যুগের কথা! সেকালে সদর ছিল তুর্কি রমণীর পক্ষে নিষিদ্ধ জগৎ (forbidden land)। তখন তুর্কি রমণীর কাজ ছিল—বিবাহে নিমন্ত্রণ-রক্ষা, জন্ম বা পারিবারিক উৎসব-অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়া, হামামে স্নান। পথে-ঘাটে বাহির হইতেন; তবে সর্ব্বাঙ্গ বোর্খায় ঢাকিয়া বাহির হইতে হইত। বিলাসিনী মহিলার অভাব ছিল না—রোমান্সের রঙে রঙীন মন লইয়া তাঁরা নিঃশব্দে পথে বাহির হইতেন, সঙ্গে থাকিত বিশ্বস্তা বাঁদী! এবং…

কিন্তু সে-সব রোমান্সের কেচ্ছা

সাবস্তারে লেখা আছে আরব-রজনীর কাহিনী গ্রন্থে! সুতরাং সে কথার আলোচনায় নিবৃত্ত রহিলাম।

তুর্কি নারী সাধারণতঃ গৃহ-কর্ম্মে নিপুণ। তাঁরা বিদুষী। ভাষা-শিক্ষা, শিল্প-শিক্ষা, ললিত-কলার অনুশীলন—এ সবে তুর্কি নারীর অখণ্ড অনুরাগের কথা কে না জানে!

তুর্কিতে আজ পাশ্চাত্য-শিক্ষা প্রবেশ করিয়াছে এবং তার ফলে পর্দা সরানোর সঙ্গে সঙ্গে তুর্কি-হারেমে আজ আলো-বাতাসের মুক্ত-লহর বহিয়াছে। বালিকা এবং কিশোরীদের মতো বর্ষীয়সী বহু নারী স্কুল-কলেজে গিয়া লেখাপড়া শিখিতেছেন—বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ডিগ্রী-লাভের জন্য উৎসাহী হইয়াছেন। তা ছাড়া তুর্কি-নারী আজ পলিটিক্সের ক্ষেত্রে অবতীর্ণা হইয়াছেন! কামাল-পাশার জয়-মন্ত্রে তুর্কি-নারী নব-চেতনা-লাভে পাশ্চাত্য নারীর সমতুল্য হইয়া উঠিয়াছেন। য়ুরোপীয় আদর্শে শিক্ষা-দীক্ষা চলিয়াছে; আচার-রীতিতেও পাশ্চাত্য প্রভাব আসিয়া মিশিয়াছে! তুর্কি-বালিকারা আজ গার্ল-গাইড সাজিয়া, স্কাউট সাজিয়া পথে-ঘাটে দৃপ্ত-ভঙ্গিমায় বিচরণ করিতেছে।

বৃদ্ধ-জাতের মেয়ে

বাগিচায় তুর্কি-মহিলা

তবে নারীরা য়ুরোপীয় বেশ-ভূষাকেই কাল্চারের চরম উৎকর্ষ বলিয়া জানিয়াছে, এ-জন্য বহু য়ুরোপীয় সুধী আক্ষেপ করিয়া বলিতেছেন—তুর্কির সে প্রাচীন আদর্শ আজ চূর্ণ হইয়া ধূলায় মিশিয়াছে! তুর্কি আজ ফ্যাশনে প্যারিস, শিক্ষায় ইংরেজ, দীক্ষায় জার্ম্মাণী! ইহা লইয়া মার্কিণের বহু পত্রিকা তুর্কি-নারীকে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করে!

ব্যবসা-বাণিজ্যে, ডাক্তারী, ওকালতি পেশায়—তুর্কিনারী দলে দলে আসিয়া যোগ দিয়াছে। খনিতে, ফ্যাক্টরিতে তুর্কি-মেয়েরা কুলী-মজুর ও কারিগরের কাজ করিতেছে। ব্যাঙ্কিংয়ের কাজে তুর্কি মহিলা হাতিজা হান্নমের নাম আজ বিশ্ব-প্রসিদ্ধ।

এ সব ব্যবসায়াদি-কাজে নামলেও

তুর্কির পল্লী-মহিলা

সার্কেশিয়ান, কুর্দ্দ, য়ুরাক, তাতার, তুর্কোমান প্রভৃতি। এ সব জাত ধর্ম্মে মুসলমান। তবে এ ধর্ম্ম তারা বড় বেশী দিন গ্রহণ করে নাই!

য়ুরাক জাতি বহু-বিবাহ করে। যে ঘরে গিয়া সন্ধান লও, দেখিবে, গৃহে য়ুরাক পুরুষের চারটি স্ত্রী ত আছেই; কাহারো বা পত্নীর সংখ্যা আরো বেশী। পত্নী-পালনে য়ুরাক জাতির পয়সা বড় বেশী ব্যয় হয় না। স্ত্রীর সংখ্যা বাড়িলে চাষ-বাসের কাযে, পশু-পালনের কাযে সাহায্য পাওয়া যায়। এ জাতি প্রধানতঃ উষ্ট্রবাহী। পয়সা দিয়া লোক খাটাইবে, সেই পয়সার অভাব। তাই যে রমণীর উট আছে, খুঁজিয়া বাছিয়া তাদের এরা বিবাহ করে। এরা বাস করে কানাতের ছাউনিতে; মেষ-ছাগ ও উষ্ট্রাদি পালন করে। কোনো স্ত্রী মেষাদি দেখে; কেহ উষ্ট্র-পরিচর্য্যা করে; কেহ জ্বালানি কাঠ কুড়ায়; কেহ ইঁদারা বা ঝর্ণা হইতে জল আনে; কেহ তাঁতে কাপড় বোনে, তাঁবুর কাপড় তৈয়ার করে। প্রতি পরিবার বেশ বৃহৎ। এক একটি স্ত্রীর গর্ভে পাঁচ

তুর্কি-নারীর সংসারপ্রীতি কমে নাই। সন্তান-পালন, স্বামিসেবা—এগুলা এখনো ঠিক আছে। হাতিজা হানুমের ছ'টি পুত্র-কন্যা—ব্যাঙ্কার হইলেও তিনি ছেলেমেয়েগুলির পরিচর্য্যা করেন। স্বামীর আছে চাষ-বাসের কায, তাহাতেও তিনি স্বামীর প্রধান সহায়। তিনি বলেন,—মেয়েদের পক্ষে ব্যাঙ্কিংয়ের কায খুব ভালো। হিসাব-নিকাশে নারী-জাতির পটুতা যুগান্তর-ব্যাপী। কারণ, তাঁরা পুরুষের চেয়ে ঢের বেশী হিসাবী ও হুঁশিয়ার। ইস্তাম্বুলের American College for Girls হইতে হাতিজা হানুম গ্রাজুয়েটের ডিগ্রী লাভ করিয়াছেন।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, মুসলিম ছাড়া তুর্ক-মুলুকে আরো নানা জাতির বাস।

ইস্তাম্বুলের বিদ্যাপীঠে প্রৌঢ়া ছাত্রীর দল

পর্দ্দার বাহিরে এ যুগের তুর্কি-মহিলা

নব্য তুর্কির গার্ল-গাইড

ছয়টি করিয়া সন্তান হয়। তাহা হইলে আটটি স্ত্রীর গর্ভে রীতিমত অক্ষৌহিণী সেনার সৃষ্টি! যে-পরিবারে যত লোক, সে পরিবারে ব্যবসাও তত সমৃদ্ধ হয়।

কুর্দ্দ জাতের মেয়েদের বাগানের সখ খুব বেশী। তারা বাস করে অন্দরে। পথে-ঘাটে ঘুরিয়া বেড়ানোয় কুর্দ্দ জাতের মেয়েদের অপমান, লজ্জা ও কলঙ্ক! হাটে-বাজারে যাইতে হয় দায়ে পড়িয়া; তবে সে সময় বোর্খায় সর্ব্বাঙ্গ ঢাকিয়া যায়। কুর্দ্দ জাতের মেয়েরা সূচী-কাযে বেশ নিপুণ। তারা লেশ বোনে,—তা ছাড়া বিবিধ সূচী-শিল্পে তাদের দক্ষতা অসাধারণ।

এ বিদ্যা তারা শিখিয়াছে তুর্কি হারেমে। আজ পাশ্চাত্য শিক্ষা-দীক্ষা তুর্ক মুলুকে আসন পাতিয়া বসিলেও তুর্কি নারী তাঁর চিরযুগাভ্যস্ত সংসার-প্রীতি, সূচী-শিল্প ও ললিত-কলা-সাধন, গীত-বাদ্য ত্যাগ করেন নাই।

প্রতি তুর্কি গৃহে বাগান আছে। যত কাম, যত পরিশ্রম করো, বাগানে বসিয়া একটু আরাম-সুখ-উপভোগ—এ বনিয়াদী চালে কোনো দিন ত্রুটি নাই।

প্রত্যেক পুষ্প-পত্র-পল্লবের ভাষা আছে,—প্রাণ আছে; প্রতি পুষ্প-পল্লবের অর্থ আছে। সে অর্থ, ফুলের তোড়ার মত কবিত্বময়, উপভোগ্য। এক জন ইংরেজ কবি তুর্কির বাগিচা, তুর্কির পুষ্প-পল্লব সম্বন্ধে ছন্দ লিখিয়া গিয়াছেন: সেই ছন্দে তুর্কি-হুরের বন্দনা শেষ করি,—

> ফুলের দেশ এ—
> ফুলের ভাষায় সবার মনের কথা!
> ফুলের মালায়
> জানায় এরা মনের প্রীতি-ব্যথা!
> বাতাস-দোলায়
> কানন-কোণে যে কুঁড়িটি জাগে—
> তার পাতায় পাতায়
> জানায় লোকে প্রাণের অনুরাগে!

দেহের ছন্দ

এ দেশের প্রাচীন কবি বলিয়াছেন,—ইয়ং গেহে লক্ষ্মীরিয়মমৃতবর্ত্তির্নয়নয়োঃ!

গৃহলক্ষ্মীর কল্যাণী-মূর্ত্তি যদি নয়নে-মনে আনন্দ না দিল ত সংসারে আনন্দ আর কিসে মিলিবে!

নারীর রূপশ্রী তার সুগঠিত দেহ-ছন্দে। শুধু কাব্যের দিক দিয়া এ রূপশ্রী বা সুঠাম দেহের আদর নয়; নারী বংশ-জননী, সন্তান-প্রসবিনী; কাযেই নারীর দেহ স্বাস্থ্য-সম্পদে ভূষিত থাকা চাই। এই রূপ ও স্বাস্থ্য-সম্পদ বহু সাধনায় লাভ করিতে হয় এবং বহু যত্নে তাহা রক্ষা করিতে হয়!

অনাদরে-হেলায় নারীর রূপ, নারীর লাবণ্য, দেহ-ছন্দ সকলই বিনষ্ট হয়; তাহার সহিত যদি নারীর সৌভাগ্য-শ্রী রাহুগ্রস্ত হয় ত দুঃখ বা আক্ষেপ অপরিসীম হইবে।

পায়ে ভর—উর্দ্ধবাহু

মোহ-মুদ্গরে আমাদের মনকে পিউরিটান্-দল যতই পিটিয়া পাত্ করিয়া দিন, এ কথা তবু স্বীকার করিতে হইবে যে,—নারীর দেহ-ছন্দ যদি সুচারু না হয়, রূপশ্রী পরিম্লান হয়, তাহা হইলে সংসার হইবে সুখহীন, শান্তিহীন—অরণ্যতুল্য; নারী হইবে দুর্ভাগিনী!

স্বাস্থ্য, লাবণ্য প্রভৃতি রক্ষা-কল্পে ব্যায়াম-সাধনার

প্রয়োজন। আমরা জানি, লজ্জাবতী নারীর পক্ষে পুরুষের মত ব্যায়াম-সাধনা সুকঠিন, অনেক স্থলে অসম্ভব! তাই আমরা সহজ ও অনায়াস কয়েকটি সাধনার কথা প্রকাশ করিতেছি।

বিশেষজ্ঞরা বলেন,—দৈহিক শক্তির অভাবে সুন্দরীর সৌন্দর্য্য ম্লান হয়। এজন্য শক্তি-লাভ ও শক্তি-সঞ্চয়ের জন্য

ঝিনিকি-ঝিনিকি ঝিনি-ঝিনি

নারীর সাধনা চাই। সে-কালে কুম্ভ ভরিয়া জল আনা, বাটনা বাটা, ধান-কোটা প্রভৃতি বহু কাজে নারীর শক্তি-সাধনা চলিত; এখন নানা কারণে সে উপায় তিরোহিত হইয়াছে। কালের পরিবর্ত্তনের সহিত সাধনার ভঙ্গী বদলাইয়াছে।

এই নিবন্ধের সহিত নৃত্য-ভঙ্গিমার ক'খানি চিত্র ছাপা হইল। এ নৃত্য পায়ে ঘুঙুর আঁটিয়া প্রকাশ্যভাবে মজলিসী-আসরের নাচ নয়; বিজন-ঘরে, সকলের দৃষ্টির

বাহু দোলে চরণ তোলে

রণ-তাণ্ডব

আবেশে বিভোর!

অন্তরালে ব্যায়াম-সাধনার ছলে এ নৃত্য-ভঙ্গী অভ্যাস করিলে দেহে শক্তি সঞ্চারিত হইবে,—দেহ সুঠাম সুছন্দে গঠিত হইবে। দেহে মেদ-সঞ্চার হইবে না; নারী তাঁর প্রিয়জনের চিত্তরঞ্জিকা-বেশে চির-যৌবনা আনন্দ-দায়িনীরূপে বিরাজ করিবেন—ভাগ্য-সম্পদে ঐশ্বর্য্যময়ী হইবেন!

এই নৃত্য-ভঙ্গীর সাধনা চলিবে মৃদুভাবে। ষ্টেজে বা মজলিসে নাচিতে হইবে, এমন কথা বলি না,—শুধু অঙ্গের ছন্দ-দোলা,—বিজন ঘরের কোণে অভ্যাস করুন! তাহাতে দেহ হইবে রমণীয়, কমনীয়, নমনীয়—সুছাঁদে গঠিত। ইংরেজিতে যাকে grace বলে,—এ ভঙ্গী-সাধনায় নারী সেই graceএর অধিকারিণী হইবেন।

প্রত্যহ সকালে ও সন্ধ্যায়—পনেরো মিনিট ধরিয়া এই ভাবে ব্যায়াম সাধনা করিলে নারীর দেহ কোনো কালে মেদ-পিণ্ড হইবে না; এ সাধনায় দেহে শক্তি মিলিবে, স্বাস্থ্যলাভ হইবে এবং নারী হইবে ললামভূতা সুন্দরী!

নাচের ভঙ্গীগুলিতে পায়ের আঙুলের উপর ভর দিয়া দাঁড়ানো এবং দোলন-ছন্দের প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে। এ ভাবে দেহ-দোলায় অঙ্গপ্রত্যঙ্গ হইবে নিটোল ও পরিপুষ্ট: মেদ-বর্জ্জিত। অর্থাৎ মনোহর!

প্রতীক্ষায়

[গান]

আসবে ব'লে ওগো তুমি দয়া ক'রে আমার ঘরে,
মনের সাধে আসনখানি সাজিয়েছি আজ এমন ক'রে।
বেলা যে বেড়ে ওঠে কাজে কাজে,
গান যে থেমে আসে সুরের মাঝে;
শূন্য তোমার আসনখানি থাকবে কি গো এমনি প'ড়ে?

ক্ষীণ হয়ে এল ধূপেরি ধোঁয়া,
ফুল-চন্দন শুকা'ল।
স'রে গেল ওই পথের ছায়া,
অগুরু গন্ধ মিলা'ল।

এত আয়োজন, এত ডাকা-ডাকি,
এত চেয়ে থাকা, বৃথাই হ'বে কি?
এস প্রাণাধিক, চিত্ত আমার কানায় কানায় উঠুক ভ'রে।

শ্রীঅসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়।

পাহাড়ে ঝড়

(উপন্যাস)

প্রত্যুষে যখন মণিকার নিদ্রাভঙ্গ হইল, তখন তাহার দৃষ্টি প্রথমেই সরলকুমারের উপহার অঙ্গুরীয়ের উপর পড়িল। তাহার পর সে দেখিল, টেবলের উপর কবিতার কাগজখানি রহিয়াছে—শুইতে যাইবার সময় সে জয়পুরী শিল্পীর রচনা একটি কাগজচাপা সেটির উপর রাখিয়াছিল, পাছে কাগজ উড়িয়া যায়—কাগজচাপাটিতে একটি ময়ূর তাহার গাঢ় নীল কণ্ঠ উন্নত করিয়া যেন দূরস্থ ময়ূরীর আহ্বানকেকা শুনিতেছে। সে কবিতার কাগজখানি ও অঙ্গুরীটি টেবলের টানায় রাখিয়া দিল; রাখিবার পূর্ব্বে অঙ্গুরীটি তুলিয়া লইয়া এক বার ভাল করিয়া দেখিল—সেটি ওষ্ঠাধরস্পৃষ্ট করিল।

সে যখন পিতার ও আপনার জন্য চা লইয়া বারান্দায় আসিল, তখন সরলকুমার তথায় উপস্থিত!

সরলকুমার গত সন্ধ্যায় মাপের জন্য গৃহীত অঙ্গুরীটি ফিরাইয়া দিতে ভুলিয়া গিয়াছিল; আজ সেইটি দিবার জন্য প্রত্যুষেই আসিয়াছে।

পিতার নির্দ্দেশে সে সরলকুমারের জন্য এক পেয়ালা চা ঢালিল। তাহার মনে হইল, সরলকুমারের দৃষ্টি তাহার আঙ্গুলে কিসের সন্ধান করিতেছে। সে বুঝিল, সে অঙ্গুরীটি পরিয়াছে কি না, সে তাহাই দেখিতেছে। শেষে সরলকুমার "ছোট সাহেবকে" জিজ্ঞাসা করিল, "আংটী মাপে ঠিক হয়েছে কি?"

মণিকাকে তাহার পিতা যখন সেই কথা জিজ্ঞাসা করিলেন, তখন সে লজ্জা-সঙ্কুচিতভাবে মাথা নাড়িয়া জানাইল—হাঁ।

"ছোট সাহেব" বলিলেন, "ওটি তুমি সর্ব্বদা পরবে। যাও—প'রে এস।"

মণিকা যাইয়া সেটি পরিয়া আসিল।

"ছোট সাহেবের" ও মণিকার সঙ্গে বাগানে একটু বেড়াইয়া সরলকুমার যখন যাইবার জন্য বিদায় লইল, তখন "ছোট সাহেব" তাহাকে বলিলেন, "আজি রাত্রিতে তুমি আমাদের সঙ্গে খা'বে!"

সে দিন অপরাহ্ণে সরলকুমার অন্যান্য ছাত্রের সঙ্গে অধ্যাপকের গৃহে আসিল।

সে দিন ওমর খৈয়মের কবিতার আলোচনা করিতে করিতে ছাত্রদিগের মধ্যে এক জন বলিল, "ইংরেজীতে ওমরের কবিতার অনেক অনুবাদ হয়েছে বটে, কিন্তু মনে হয়, ফিটজিরাল্ডের অনুবাদ সবচেয়ে ভাল।"

"ছোট সাহেব" বলিলেন, "তা'র কারণ, এ ক্ষেত্রে অনুবাদকও এক জন বড় কবি; আর তিনি অনুবাদ অপেক্ষা অনুসরণে অধিক অবহিত হয়েছিলেন।"

"কিন্তু অনুবাদ ঠিক অনুবাদ না হ'লে কবির রচনার স্বরূপ বুঝা যায় না।"

"তা' বটে; কিন্তু সেটা অনেক সময় অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়,—বিশেষ কবিতায় কবিতার অনুবাদে।"

"আবার কোন কোন কবিতা ধাতুগত প্রভেদের জন্য অন্য ভাষায় অনুসরণ করা যায় না।"

সরলকুমার বলিল, "ও কথা আমি স্বীকার করি না। ভাব সব দেশেই এক; কাযেই ভাবের অনুসরণ করা যায়।"

টেবলের উপর কবি টেনিসনের গ্রন্থাবলী ছিল। সেখানি লইয়া পাতা উল্টাইতে উল্টাইতে এক স্থানে আসিয়া সেই যুবক বলিল, "এই ধর 'মিলারসডটারের' গান—এর ভাবানুসরণে বাঙ্গালায় কি কবিতা রচনা করা যায়?"

সরলকুমার বলিল, "নিশ্চয়ই যায়। আমি গত মাসখানেকের মধ্যেই সে চেষ্টা করেছি। আমার মনে হয়, একটু চেষ্টা করলে আমি আমার কবিতাটা মনে করতে পারব।"

সে মণিকার নিকট কাগজ চাহিল। মণিকা তাহার একখানি খাতা আনিয়া দিল। সরলকুমার খাতাখানি লইয়া ঘর হইতে বারান্দায় যাইয়া আলোকের কাছে বসিল।

ঘরের মধ্যে সকলে পূর্ব্ববৎ ওমরের কবিতার আলোচনা করিতে লাগিলেন; কেবল মণিকা পুনঃ পুনঃ বারান্দা হইতে ঘরে আসিবার দ্বারের দিকে চাহিতে লাগিল।

প্রায় পনের মিনিট পরে সরলকুমার খাতাখানি লইয়া ঘরে প্রবেশ করিল। যে যুবকের সহিত তাহার তর্ক হইয়াছিল, সে একটি ইংরেজী গানের একটি চরণ আবৃত্তি করিয়া বলিল—"বিজয়ী বীরেন্দ্র, হের, আসিছেন ওই।"

"ছোট সাহেব" বলিলেন, "সরলকুমার, তোমার কবিতাটি পড়।"

সরলকুমার পড়িল;—

আমি যদি শুধু হ'তাম তাহার
কবরীর ফুল-হার,—
নিবিড় আঁধার কেশের পরশে
উঠিতাম ফুটি' আকুল হরষে
চিক্কণ চিকুরে তা'র;
এ হৃদয় করি' খালি অলকে দিতাম ঢালি'
আমার সৌরভভার।
হয় ত দেখিত চাহি, ক্ষণেকের তরে,
কোন্ ফুলমালা হ'তে এ সৌরভ ঝরে?

আমি যদি তা'র কমল-চরণে
হ'তাম নূপুরখানি
গুঞ্জরি' উঠি' গৌরব-মদে
করিতাম তা'র প্রতি পদে পদে
কৌতুক কাণাকাণি;
গুঞ্জরি' চরণ-তলে কহিতাম কত ছলে
হৃদয়ের আশা-বাণী।
হয় ত অধীরা লাজে চাহিত চরণে—
মুখর নূপুর যেন বাজে ক্ষণে ক্ষণে?

আমি যদি শুধু হ'তাম কাঁকন—
কোমল করের সাথী,
রভস লালস পরশে আমার
কম করখানি বেড়ি' ধরি' তা'র
রহিতাম দিবারাতি;
কোমল-প্রকোষ্ঠলীন, রহিতাম নিশিদিন,
পরশ-হরষে মাতি';
হয় ত আমারে তুলি ভাবিত, কি চাহি'
অধীর কাঁকন মরে নিশিদিন গাহি'?

আমি যদি শুধু হ'তাম হীরক
হারলতামাঝে বুকে—
নিশ্বাসসাথে কাঁপি' চঞ্চল
লভিয়া দীপ্তি অমিত—উজ্জ্বল
রহিতাম শত সুখে।
হরষে উরসে মিশি', রহিতাম দিবানিশি,
চাহি' শুধু তার মুখে।
হয় ত হেরিয়া মোরে ভাবিত কেবল
তা'র বুকে মণি কেন এত সমুজ্জ্বল?

কবিতাটি পাঠ করিবার সময় সরলকুমার বার বার—বুঝি আপনারও অজ্ঞাতে—মণিকার দিকে চাহিয়াছিল এবং প্রতি বারই সে দেখিয়াছিল, মণিকা তাহার দিকে চাহিয়া আছে।

কবিতাপাঠ শেষ হইলে, যে যুবকের সহিত সরলকুমারের তর্ক হইয়াছিল, সে বলিল, "পৃথিবীর ইতিহাসে দেখা যায়, অনেক পরাজয়ের গৌরব জয়ের গৌরব অপেক্ষা উজ্জ্বল; আমি পরাজয়ের গৌরবই গ্রহণ করলাম। কেবল আমার বক্তব্য, কবরী এখন আর মেয়েরা বাঁধেন না, আর নূপুর বাতিল হয়ে গেছে।"

সকলে হাসিল।

"ছোট সাহেব" বলিলেন, "সরলকুমার, তুমি এমন কবিতা লিখতে পার, এ ত আমরা এত দিন জানতে পারিনি?"

এক জন যুবক বলিল, "আমরা জানি, উনি কবিতা লেখেন; কিন্তু কিছুতেই ছাপাতে চান না।"

আর এক জন বলিল, "সেইটাই অসাধারণ সংযমের পরিচায়ক।"

"ছোট সাহেব" বলিলেন, "অনুসরণ চমৎকার হয়েছে —এমন কি, মূল কবিতায় যেমন বাসনা-বিকাশের কারণ কি, তা' স্পষ্ট ব্যক্ত হয়নি অর্থাৎ বাসনা কি থেকে উদ্ভূত, তা' ব্যক্ত হয় নি, এতেও তেমনই। ভালবাসা অনেক ক্ষেত্রেই অনন্যভাববিকাশ নয়; আত্মম্ভরিতা, উচ্চাকাঙ্ক্ষা, অর্থলালসা, লালসা—এ সব হ'তেও তা'র উদ্ভব হ'তে পারে—ভালবাসা বৈচিত্র্য লাভ করতে পারে। প্রকৃত ভালবাসার সঙ্গে এ সকলের প্রভেদ স্থির করাও দুষ্কর;

কারণ, এ সবও সন্দেহ, বেদনা, লক্ষ্য করবার ক্ষমতার তীক্ষ্ণতা উৎপন্ন করে। কেবল নিঃস্বার্থতায় আর স্থায়িত্বে প্রকৃত ভালবাসা বুঝা যায়—সে-ই তার কষ্টি-পাতর।"

ছাত্রগণ বিদায় লইবার সময় সরলকুমার মণিকার খাতাখানি তাহাকে ফিরাইয়া দিল—দিবার সময় তাহার হস্ত মণিকার হস্ত স্পর্শ করিল। তাহার মনে হইল, মণিকার হাত একটু কাঁপিল।

এক জন ছাত্র বলিল, "সরল বাবু, এ কবিতাটা কোন মাসিক পত্রে ছাপবার অনুমতি দিতে হ'বে।"

সরলকুমার মণিকার দিকে চাহিয়া বলিল, "আমি ত কবিতাটি স্বত্বত্যাগ করেই দিয়াছি।"

"আমি কাল এসে কুমারী পালিতের অনুমতি নিয়ে যা'ব, আর কবিতাটিও নকল ক'রে নেব!"

অন্য ছাত্রদিগের সহিত সরলকুমার বারান্দায় আসিলে "ছোট সাহেব" বলিলেন, "সরলকুমার, কবিতায় বিভোর হয়ে ভুলে যেও না যে, তুমি আজ এখানে খাবে।"

সরলকুমার উত্তর দিল, "আমি যাচ্ছি না।"

"ছোট সাহেবের" বাড়ীতে মধ্যে মধ্যে ছাত্রদিগের (অবশ্য যাহারা খাইতে আপত্তি করিত না) আহারের জন্য নিমন্ত্রণ হইত এবং তাহার বৈশিষ্ট্য—তিনি কখনও সকলকে এক দিনে খাইতে বলিতেন না; তাহার প্রধান কারণ, আহারের জন্য নির্দ্দিষ্ট ঘরে স্থানের স্বল্পতা। সুতরাং আজ সরলকুমারের নিমন্ত্রণে কাহারও বিস্ময়ের কোন কারণ ছিল না। তবুও ফিরিয়া যাইবার পথে ছাত্ররা তাহার বিষয়ই আলোচনা করিতে করিতে গেল।

কবিতাটি পড়িবার সময় সরলকুমার যে বার বার মণিকার দিকেই চাহিয়াছিল, তাহা অনেকে লক্ষ্য করিয়াছিল। সে যে পূর্ব্বদিন ও সে দিন সকালেও অধ্যাপক-গৃহে আসিয়াছিল, তাহাও তাহারা জানিত। আবার কোন অজ্ঞাত কারণে তাহার সহসা—কয় ঘণ্টার জন্য—দিল্লী-গমন তাহাদিগের কৌতূহল উদ্দীপ্ত করিয়াছিল।

এক জন বলিল, "সরল যেন কিছু বেশী ঘনিষ্ঠতা ক'রে ফেলছে।"

আর এক জন বলিল, "আমি ত আগেই এক দিন বলেছিলাম, সরল বাবু প্রশংসার পিচ্ছিল পথে একটু দ্রুত অগ্রসর হচ্ছেন।"

তৃতীয় ছাত্রটি বলিল, "তা'তে তোমারই বা কি, আর আমারই বা কি?"

"কিছুই নয়; কেবল ক' বছর একসঙ্গে থাকা গেল—হিন্দুর ছেলে।"

"ওঁর ত সমাজের সঙ্গে ভারি সম্পর্ক!"

"আর আমরাও ত যাকে বলে—

'নানা পক্ষী এক বৃক্ষে নিশিতে বঞ্চয়ে সুখে
প্রভাত হইলে দশ দিকেতে গমন।'

এই ত সরলকুমারের পড়া শেষ হ'ল; আর আগ্রায় থেকে কি করবেন?"

"আজও যে কেন আছেন, তাই বুঝা যায় না।"

"সে কেবল ওঁর বাপ মা ভাই বোন কেউ নাই ব'লে—ওঁর পক্ষে—ভোজনং যত্র তত্র আর শয়নং হট্টমন্দিরে।"

"সে কথাটি ওঁর সম্বন্ধে বলা চলে না—সে সব বিষয়ে খুব পারিপাট্য আছে। বাংলোখানি এমন ভাবে সাজিয়েছেন যে, কোন দিন ছেড়ে যাবার কথা যেন মনেও হয়নি।"

"টাকারও অভাব নাই, সখও আছে। ভাবনার কারণ কি?"

"এটাও দেখতে হবে যে, লোকটা একেবারে বন্ধন-বিহীন।"

"সেই জন্যই ত ভয় হয়, কোথায় কোন্ বন্ধনে কবে বদ্ধ হয়ে পড়ে।"

ছাত্ররা তাহাদিগের আবাসে উপনীত হইল।

৮

আহারান্তে সরলকুমার "ছোট সাহেবকে" বলিল, তাহাকে এক বার কলিকাতায় যাইতে হইবে। কারণ জিজ্ঞাসায় সে বলিল, "মা'র গহনা সব ব্যাঙ্কে আছে। বাবা সেই ব্যবস্থা করেছিলেন; আর, বোধ হয়, সেই জন্যই ট্রেণ-দুর্ঘটনায় সেগুলি নষ্ট হয় নি। সেগুলি আনতে হ'বে। আর আমার বাড়ীতে যিনি ভাড়াটে আছেন, তাঁর চুক্তির মেয়াদ এখনও তিন বৎসর—যদি ব'লে তাঁ'কে বাড়ী ছাড়াতে পারি।"

"ছোট সাহেব" বলিলেন, "তুমি বলেছ, বাড়ীটা সহরের কেন্দ্রস্থান থেকে দূরে, আর বড়। ছোট বাড়ীতে স্বামি-স্ত্রী

পরস্পরের যত কাছে থাকতে পায়, বড় বাড়ীতে তত নয়। বড় বাড়ীর তোমার দরকারই বা কি? তুমি বরং সহরের মধ্যে একখানি ছোট বাড়ী ভাড়া কর; তা'তে কাযেরও সুবিধা হ'বে।"

"তাই করব। কিন্তু আমি আমার বাড়ীর সংলগ্ন জমিতে—বাগানের মধ্যে একখানি ছোট বাংলো করব—তাতে আগ্রার কথা আমাদের মনে পড়বে; আর ছুটীর দিন আমরা সেখানে থাকব।"

"ছোট সাহেব" হাসিলেন। যুবকের কল্পনা কোন্ পথে ধাবিত হয়, তাহা তাঁহার অবিদিত ছিল না।

মণিকা এই কথোপকথন শুনিতেছিল। তাহার মনে হইতেছিল, সে যে নূতন জীবনে প্রবেশ করিবে, তাহার সেই জীবনের সঙ্গী তাহার জীবন সুখময় করিবার উপায় উদ্ভাবনেই ব্যস্ত।

"ছোট সাহেব" জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার ফিরতে ক' দিন হ'বে?"

"আমার বোধ হয়, এক সপ্তাহের মধ্যেই ফিরতে পারব।"

"সেই অনুসারে বিবাহের দিন স্থির করতে হবে। মণিকার ভাইকে খবর দিতে হ'বে। যদিও তিনি কা'রও দোঁস সইতে ভালবাসেন না, তবুও তাঁ'কে আসতে বলতে হ'বে। যদি আসেন, খুবই ভাল।"

"বাড়ী কি আমি ঠিক ক'রে আসব? না—মণিকা গিয়ে দেখে ঠিক করবেন?"

"তুমিই ঠিক ক'রে এস। তোমার পছন্দের উপর অনেক বিষয়ে মণিকাকে নির্ভর করতেই হবে। অবশ্য সেটা পরস্পরের কথা।"

"তাই হ'বে।"

"তোমার আত্মীয়স্বজনদের কাউকে সংবাদ দিতে হ'বে না?"

"আমার পিতৃকুলে যাঁ'রা আছেন, তাঁ'রা বাবার সম্বন্ধে হিংসা ছাড়া প্রীতি কখনও হৃদয়ে পোষণ করেন নি; মাতুল কেউ নাই—আছেন এক মাসীমা: তিনি মনে করেন, একালের যা' কিছু সবই মন্দ। তিনি আমার এ বিবাহে আনন্দিত হবেন না। সেই জন্য তাঁকে সংবাদ দিতে চাই না।"

"কলিকাতায় যাচ্ছ, আমার একটু কায আছে।"

সরলকুমার সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিল, "কি?"

"আমি মণিকাকে তা'র মা'র একখানি ছবি উপহার দিতে চাই। আমার বসবার ঘরে তাঁ'র যে ছবিখানি আছে, সেখানি এক জন ভাল চিত্রকর তাঁ'কে দেখে এঁকেছিলেন। সেইখানি দেখে একখানি ছবি আঁকতে হ'বে।"

"আমি চিত্রকর নিয়ে আসব।"—তাহার সঙ্কল্প হইল, সেই চিত্রকরের দ্বারা সে "ছোট সাহেবের" একখানি প্রতিকৃতি অঙ্কিত করাইয়া লইবে।

"কিন্তু আনতে কি খরচ খুব বেশী পড়বে না?"

"ছবি যে খুব বেশী লোক আঁকান তা নয়; সুতরাং এখানে আসবার জন্য বেশী টাকা নেবার কোন কারণ থাকতে পারে না। বরং এখানে এলে চিত্রকর নিজেও কতকগুলি ছবি এঁকে নেবার সুযোগ পা'বেন।"

সাংসারিক ব্যাপারে নির্লিপ্ততা হেতু অনভিজ্ঞ "ছোট সাহেব" তাহাই বুঝিলেন এবং সর্ব্বতোভাবে সরলকুমারের উপর নির্ভর করিলেন।

সরলকুমার কলিকাতায় যাইবার আয়োজন করিল। তখন মণিকার সহিত তাহার বিবাহ-সম্বন্ধীয় সংবাদ তাহার বন্ধুদিগের মধ্যে প্রচারিত হইল। তাহাদিগের কাছে তাহা বিশেষ আলোচনার বিষয় হইল। কেহ বলিল, মণিকা জিতিল: কেহ বা বলিল, সরলকুমার যে জিতিল না, এমন বলা যায় না। কেহ বলিল, প্রণয়ে প্রথম পথটা দ্রুত অতিক্রম করিতে হয়, সরলকুমার তাহাই করিয়াছে। আর এক জন বলিল, "যখন প্রণয়ের ফলে বিয়ে, তখন তা'তে পাশ্চাত্য ব্যাপারের সব লক্ষণ থাকাই সঙ্গত।" এক জন তাহাকে বিদ্রূপ করিয়া বলিল, "তোমার কি সে জন্য দুঃখ হচ্ছে? প্রণয়ের ফলে বিয়ে, আর বিয়ের ফলে প্রণয়—দুইয়ের মধ্যে প্রভেদ যে খুব বেশী, তা' মনে হয় না। কেবল প্রথমটিতে রং প্রথমে বেশী ঘোরালো থাকে, পরে ফিকে হয়; আর দ্বিতীয়টিতে ফিকে রং ক্রমে ঘোরাল হয়—শেষে কিন্তু দুই-ই সমান দাঁড়ায়।"

যে দিন সরলকুমার মণিকাকে অঙ্গুরী ও কবিতাটি দিয়াছিল, সেই দিন হইতে সে তাহাকে এক বারও একা পায় নাই—পাইবার চেষ্টা করিতে লজ্জানুভব করিয়াছিল।

যে দিন সে কলিকাতায় যাইবে, সেই দিন "ছোট সাহেবের" কাছে বিদায় লইয়া উঠিয়া সে বলিল, "মণিকাকে ব'লে যা'ব মনে করছি—"

"ছোট সাহেব" বলিলেন, "হাঁ, ব'লে যাও।" তিনি মণিকাকে ডাকিলেন—ভৃত্য আসিয়া বলিল, মণিকা বাগানে।

সরলকুমার বারান্দার সোপানের উপর হইতে চাহিয়া দেখিল, একটু দূরে যে স্থানে একটা ব্রাউনিয়া অশোকের গাছ বড় বড় গুচ্ছ গুচ্ছ ফুলের ভারে নত-শাখ হইয়াছে এবং তাহার নবোদ্গত পত্রগুলির মধ্যে ঘোর লাল ফুলগুলি মধুর বৈচিত্র্যের সঞ্চার করিতেছে—তথায়, গাছের ছায়ায় বেঞ্চের উপর মণিকা বসিয়া আছে। তাহার পরিধানে অশোকের ঐ নবোদ্গত পত্রেরই বর্ণের একখানি শাড়ী—আর তাহার পাড় ঐ অশোকফুলেরই বর্ণের। অদূরে ফুলের কেয়ারীতে ছোট ও বড় সূর্য্যমুখী ফুটিয়া আছে—বড় ফুলগুলি যেন প্রেমগৌরবে গর্ব্বিতা যুবতীর মত। অশোকফুলের কয়টি গুচ্ছ মণিকার পার্শ্বে আসনে রক্ষিত। একটি ময়ূর অত্যন্ত নিঃসঙ্কোচে তাহার নিকটে আসিয়া ভূমির উপর শস্যের সন্ধান করিতেছে। কাছে যে বকুল গাছ, তাহার শাখা হইতে এক ঝাঁক টিয়া পাখী উড়িয়া গেল। মণিকা তাহাই লক্ষ্য করিতেছিল।

সরলকুমার দেখিল,—তাহার অন্তরের প্রেম যেন মণিকাকে অপার্থিব সৌন্দর্য্যে ভূষিত করিল। ইংরেজ কবির কবিতা তাহার মনে পড়িল :—

"মূরতি তাহার নয়নে আমার
প্রথম যে দিন উঠিল ভাসি',
আনন্দ-প্রতিমা কি তা'র গরিমা
যেন সীমাহীন মাধুরীরাশি।"

দেখিতে দেখিতে সে অগ্রসর হইল।

সে যখন সেই তরুতলে উপনীত হইল, তখন মণিকা—পিতার ছাত্ররা আসিলে যেমন উঠিয়া দাঁড়াইয়া নমস্কার করে—অভ্যাসবশে তেমনই উঠিয়া দাঁড়াইল—কিন্তু নমস্কার করিবার জন্য হাত তুলিতে যাইয়া উভয়ের বর্ত্তমান সম্বন্ধ মনে করিয়া নিরস্ত হইল। তাহার দৃষ্টি নত ও মুখমণ্ডল লজ্জায় রক্তিমাভ হইল।

সরলকুমার মৃদু হাসিয়া বলিল, "নমস্কারের দিন আর নাই।"

সে দেখিল, মণিকার আঙ্গুলে তাহার প্রদত্ত উপহার অঙ্গুরী শোভা পাইতেছে।

তাহার কথা শুনিয়া মণিকা মৃদু হাস্য করিল—তাহার গণ্ডে টোল পড়িল।

সে গণ্ডে চুম্বন অঙ্কিত করিবার কি প্রবল প্রলোভন! স্বভাবসংযত সরলকুমার সে প্রলোভন সম্বরণ করিল। সে বলিল, "আমি আজ এক বার কলিকাতায় যা'ব।"

মণিকা তাহার নত দৃষ্টি সরলকুমারের মুখে স্থাপিত করিয়া বলিল, "বাবার কাছে শুনেছি, যাচ্ছেন।"

সরলকুমার হাসিয়া উঠিল। তাহার হাসির শব্দে ময়ূরটি একবার গ্রীবা উন্নত করিয়া তাহাদিগের দিকে চাহিল, তাহার পর লম্বিত পুচ্ছ যেন টানিয়া লইয়া একটু সরিয়া গেল। সরলকুমার বলিল, "নমস্কারের সঙ্গে সঙ্গে কি 'আপনি'ও যাবার সময় হয় নি?"

মণিকা হাসিয়া বলিল, "অভ্যাস।"—প্রথম প্রণয় যুবককে যেমন নারীর মত লজ্জাতুর করে, যুবতীকে তেমনই পুরুষোচিত লজ্জাজয়ী করে,—সেই জন্যই প্রথম প্রণয়ে যুবকযুবতী পরস্পরের সমস্বভাব হয়।

"এই ক' দিনে অভ্যাস জয় ক'রে রেখ। ফিরে আসবার পরও যদি এই অভ্যাসের পরিচয় পাই, তবে রাগ করব—তখন আমার অভিমান করবার অধিকার হ'বে।"

মণিকা একটা অশোক ফুল তুলিয়া লইয়া সেটা নাড়িতে নাড়িতে বলিল, "আচ্ছা"। সে মনে মনে বলিল, "সে অধিকার তুমি লাভ করেছ।"

"তা' হ'লে এখন চললাম। তোমার জন্য বাড়ী সাজিয়ে রেখে আসব।"—বলিয়া সরলকুমার মণিকার করধৃত অশোক ফুলটি টানিয়া লইল এবং সেটিকে তাহার কোটে ফুল বসাইবার স্থানে বসাইতে যাইয়া দেখিল—কোটে সে ব্যবস্থা নাই। সে পকেট হইতে চাবির রিংএ বদ্ধ ছুরিকা লইয়া কোটের সেই স্থানে ছিদ্র করিয়া ফেলিল এবং ফুলটি তাহাতে গুঁজিয়া দিয়া বিদায় লইল।

সরলকুমার চলিয়া গেল—মণিকা তাহাকে দেখিতে লাগিল। যখন সে ফটক পার হইয়া গেল, তখন

মণিকা আসনে বসিয়া পড়িল—তাহার পর অবশিষ্ট ফুল কয়টি তুলিয়া লইল।

৯

মনের মধ্যে যেন মত্ততা লইয়া—ভবিষ্যতের স্বপ্ন রচনা করিতে করিতে সরলকুমার বাংলোয় ফিরিল। সে দেখিল, তাহার পুরাতন ভৃত্য বেণী তাহার ও আপনার দ্রব্যাদি গুছাইয়া রাখিয়াছে; বসিয়া কি ভাবিতেছে। বেণীর পরিচয়—বেণী। আদি-পশ্চিমা, আদি-কুল মা-হারা অনাথ বালককে সিমলায় পাইয়া সরলকুমারের পিতা তাহাকে আশ্রয় দিয়াছিলেন এবং তাঁহার স্ত্রী সেই অনাথকে স্নেহে নূতন করিয়া গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। যে দিন সে তাঁহাদিগের গৃহে আশ্রয় পাইয়াছিল, সেই দিন হইতে আজ পর্যন্ত এক দিনের জন্যও সে সেই আশ্রয় ছাড়ে নাই। সে যে কেবল ভৃত্য, তাহা নহে—সে সেই পরিবারের এক জন হইয়া উঠিয়াছে। আজ পর্য্যন্ত সে কোন দিন বেতন বলিয়া কিছু লয় নাই; তাহার যখন যাহা প্রয়োজন, চাহিলেই পাইয়াছে। বেতন দিবার কথা বলিলে সে রাগ করিত—রাগ না বলিয়া তাহা অভিমান বলাই সঙ্গত। সে কথায় ও বেশে বাঙ্গালীই হইয়া গিয়াছে। যে ট্রেণ-দুর্ঘটনা সরলকুমারকে পিতৃমাতৃহীন করিয়াছিল, তাহাতে সে-ও আহত হইয়াছিল—তবে তাহার আঘাত গুরু হয় নাই। সরলকুমারের পিতার শেষ শয্যায় সে যেমন করিয়া তাঁহার সেবা করিয়াছিল, বুঝি সরলকুমারও তেমন করিয়া সেবা করিতে পারে নাই। আশ্রয়দাতৃদ্বয়ের অতর্কিত ও অপ্রত্যাশিত মৃত্যু তাহার দেহে সহসা জরার সঞ্চার করিয়াছে। সে এখন সরলকুমারের ভৃত্য ও মন্ত্রী। তাহার অনেক গুণ। তাহার নিকট যথাসর্ব্বস্ব দিয়া সরলকুমার নিশ্চিন্ত। আবার তাহার সব জিনিষ যথাকালে ঝাড়িয়া গুছাইয়া রাখিতে তাহাকে কখন বলিতে হয় না। সে নানারূপ রন্ধনে দক্ষ; রোগীর সেবায় তৎপর; কাহার সহিত কিরূপ ব্যবহার করিতে হইবে, তাহা সে যেন সহজাত সংস্কারবশে বুঝিতে পারে। পূর্ব্বে সে সরলকুমারকে "তুমিই" বলিত; এখন তাহাকে "দাদাবাবু" বলা বহাল রাখিলেও "আপনি" বলিতে আরম্ভ করিয়াছে—নহিলে প্রভুর সম্ভ্রম থাকে না। সে জন্য সে বহুবার সরলকুমারের দ্বারা তিরস্কৃতও হইয়াছে; কিন্তু তিরস্কারে কেবল হাসিয়াছে। সরলকুমারের বন্ধুরা বলিয়া থাকে, বেণী একটি রত্ন—সরলকুমারের সকল ভার তাহার। সরলকুমার তাহাকে বলিয়াছিল, বাসা ঠিক করিয়া তাহাকে তথায় রাখিয়া আসিবে; সে পরে মণিকাকে লইয়া যাইবে। শুনিয়া অবধি বেণী ভাবিতেছিল, সে না থাকিলে সরলকুমারের অসুবিধা হইবে, অথচ সে আসিলে কলিকাতার নূতন বাসায় কে সব গুছাইয়া রাখিবে? এ যেন এক সমস্যা! শেষে সে অনেক চিন্তার পর সরলকুমারকে বলিয়াছিল, "এসে 'ছোটসাহেবের' কুঠীতে উঠলেই ভাল হ'বে; এখানে কে দেখবে?"

আজ কলিকাতায় যাইবার পূর্ব্বে তাহার আর এক ভাবনা হইয়াছিল—মণিকাকে সে কি বলিয়া ডাকিবে? মণিকা বাড়ীর গৃহিণী হইবে—গৃহিণী ভৃত্যের মাতৃস্থানীয়া; কেহ কেহ "মা" বলিয়া না ডাকিলে মনে করেন, তাঁহার সম্ভ্রম রক্ষা করা হইল না। অথচ—যাঁহার কাছে সে মা'র স্নেহ পাইয়াছে, তাঁহার কথা মনে করিয়া সে চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল।

সে সরলকুমারকে জিজ্ঞাসা করিল, "আমাকে ত কলিকাতায় থাক্‌তে হ'বে?"

সরলকুমার বলিল, "তাই ত বলেছি।"

"আমি 'ছোট সাহেবের' মেয়েকে কি ব'লে ডাকব?"

তাহার প্রশ্নে সরলকুমারের হাসি পাইল। সে জিজ্ঞাসা করিল, "কেন?"

"কি জানি, 'বৌদি' বল্‌লে যদি রাগ করেন?"

সরলকুমার হাসিয়া উঠিল, বলিল, "সেটা তাঁকে জিজ্ঞাসা ক'রে নিয়ো।"

"সে-ই ভাল"—বলিয়া বেণী যখন গমনোদ্যত হইল, তখন সরলকুমার জিজ্ঞাসা করিল, "এখনই যাচ্ছ না কি?"

"হাঁ।"

কৌতূহলাতিশয্যহেতু সরলকুমার তাহাকে নিবারণ করিল না; বলিল, "দেরী না হয়।"

"তা হ'বে না"—বলিয়া বেণী জুতা পায় দিয়া বাহির হইয়া গেল।

সরলকুমার বারান্দায় একখানা লম্বা বেতের চেয়ারে শুইয়া আপনার মনে হাসিতে লাগিল—বেণী কি করিয়া আইসে, জানিবার জন্য তাহার কৌতূহল বাড়িতে লাগিল।

বেণী "ছোট সাহেবের" গৃহে অপরিচিত ছিল না— পুস্তক দিতে ও পুস্তক আনিতে তাহাকে প্রায়ই তথায় যাইতে হইত। সহসা তাহাকে দেখিয়া মণিকা মনে করিল, সে সেইরূপ কোন কার্য্যেই আসিয়াছে। সে জিজ্ঞাসা করিল, "বেণী, বাবাকে চাই?"

বেণী বলিল, "না। আপনার কাছে একটা দরকারে এসেছি।"

মণিকা ভাবিল, গৃহে ফিরিয়াই আবার কি মনে পড়ায় সরলকুমার তাহাকেই পাঠাইয়াছে। সে জিজ্ঞাসা করিল, "পত্র আছে?"

"না। আমি একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে এলাম।"

মণিকার কৌতূহল বৰ্দ্ধিত হইতে লাগিল। সে জিজ্ঞাসা করিল, "কি কথা?"

"দাদাবাবুকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম; তিনি আপনাকে জিজ্ঞাসা করতে বলেছেন।"

বিবৰ্দ্ধিত কৌতূহলে মণিকা বলিল, "কি কথা? বল।"

"আপনাকে কি ব'লে ডাকতে হ'বে?"

এ বার তাহার প্রশ্নের সরলতায় মণিকা মৃদু হাসিল; বলিল, "কেন?"

"'মা' ব'লে না ডাকলে কি আপনি রাগ করবেন?"

মণিকা হাসিয়া বলিল, "এই কথার উত্তর তোমার দাদাবাবু দিতে পারেন নি?"

"না।"

"তুমি আমাকে 'বৌদিদি' বলবে; যদি 'মা' বল, তবেই আমি রাগ করব।"

আনন্দে বেণীর নয়নদ্বয় উজ্জ্বল হইয়া উঠিল এবং তাহার পরেই অশ্রুসজল হইল।

মণিকা তাহা লক্ষ্য করিয়া বলিল, "তবে আর একটা কথা আছে।"

"কি?"

"তোমার কথা আমি ক্রমে ক্রমে সব শুনেছি। তুমি আমাকে আজ অবধি যে 'আপনি' বলেছ,—সেই 'আপনি' বলার শেষ। এখন থেকে তুমি আমাকে আর 'আপনি' বলতে পা'বে না—'তুমি' বলবে।"

বেণীর আনন্দের আর সীমা রহিল না। সে বুঝিল, যে গৃহ সে আপনার ব্যতীত আর কিছুই মনে করিতে পারে নাই, সে গৃহে তাহার স্থান পূৰ্ব্ববৎই রহিল। আজ পরলোকগত প্রভুর ও প্রভুপত্নীর—তাহার দ্বিতীয় পিতা-মাতার কথা স্মরণ করিয়া তাহার হৃদয়ে শোক উথলিয়া উঠিল।

আপনাকে সামলাইয়া লইয়া, চক্ষু মুছিয়া বেণী বলিল, "বাবা আর মা যে আপনাকে বৌ দেখে যেতে পেলেন না, আমার এ দুঃখ রাখবার ঠাঁই নাই।"

চিন্তিতভাবে মণিকা জিজ্ঞাসা করিল, "বেণী, তোমার কি মনে হয়, আমাকে পেলে তাঁ'রা আনন্দিত হ'তেন?"

"হ'তেন না? অমন মানুষ কি আর হবে? আপনি যেমন বাপের মেয়ে, তেমনই শ্বশুর-শাশুড়ীর বৌ। মা'র গহনা এলে আমি দেখিয়ে দেব, কত গহনা তিনি এক দিনও অঙ্গে দেন নি—ভাল নক্সা দেখলে বাবা যখন গহনা গড়তে দিবেন, তখন মা যদি বলতেন, 'আবার গহনা কেন?'—তবে বাবা বলতেন, 'সরলের বৌ এলে পরবে।' মা আর কোন কথা বলতেন না। মনে কত আশা! যেখানে যে ভাল কাপড়, ভাল জিনিষ দেখেছেন, বৌমার জন্য কিনেছেন। এই ক'বছর আমি কেবল বাক্স বাক্স ভরা সে সব জিনিষ ঝেড়ে পাট ক'রে রেখেছি। কত জিনিষ সময়ে মলিন হয়ে গেছে।"

"তা' হ'ক, তাঁ'দের স্নেহ সেগুলি উজ্জ্বল ক'রে রেখেছে।"

"এ বার আপনাকে সে সব দিয়ে আমার ছুটী।"

"কেন, বেণী, তুমি ছুটী নেবে কেন?"

"ছুটী নেব না—নিতে পারব না। কোথায় যা'ব? রাস্তা থেকে কুড়িয়ে এনে মা আর বাবা আমাকে মানুষ করেছিলেন। এক বার সিমলায় যখন আমার জ্বর-বিকার হ'ল, ডাক্তার আমাকে হাসপাতালে পাঠাতে বললেন। মা বললেন, 'না। যদি আমার ছেলের অসুখ হ'ত, আমি কি করতাম? আমাদের যা'রা সেবা করে, তাদের অসুখ হ'লে হাসপাতালে পাঠা'তে আমি পারব না।' বাবা কোন আপত্তি করলেন না। মা নিজের খাট থেকে গদী এনে আমার বিছানা ক'রে দিলেন—ওষুধ পথ্য নিজে খাইয়ে আমাকে বাঁচালেন। আমার আর কেউ নেই, বৌদিদি, কেউ নেই; কেবল তোমরা আছ। তোমাদের দুয়ার ছেড়ে আমি স্বর্গেও যেতে চাই না।"

"বর্ণ-পরিচয়"

শিল্পী—শ্রীসমরেন্দ্রনাথ ঘোষ

বেণী ব্যথাকাতর বালকের মত কাঁদিতে লাগিল।

মণিকাও অশ্রু সম্বরণ করিতে পারিল না।

অল্পক্ষণ পরে মণিকা বলিল, "বেণী, আমি কলিকাতায় গেলে তুমি আমাকে তাঁ'দের কথা শুনাবে ?"

"শুনা'ব, বৌদিদি, বল্‌লে আমার পুণ্য হ'বে।"

তাহার পর বেণী বলিল, "এখন যাই, বৌদিদি—দাদাবাবু দেরী করতে বারণ করেছেন।"

মণিকা বলিল, "এস।"

যাইবার সময় বেণীর সহিত "ছোট সাহেবের" দেখা হইল। তিনি বলিলেন, "কি, বেণী ?"

বেণী প্রণাম করিয়া বলিল, "আজ কলিকাতায় যাচ্ছি : বৌদিদির সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলাম।"

"সরলকুমার ব'লে গেছেন, এক সপ্তাহের মধ্যেই ফিরে আসবেন।"

"আমার এখন আসা হ'বে না।"

"কেন ?"

"দাদাবাবু কলিকাতায় বাড়ী ঠিক করে' আসবেন—আমাকে সেখানে থাকতে হবে ; সব গুছিয়ে রাখতে হ'বে।"

"তুমি পুরাণ লোক ; সেখান থেকে ওঁদের হু'জনকে আশীর্ব্বাদ করবে।"

"আশীর্ব্বাদ আপনি করবেন। বৌদিদি যাঁ'দের কত আদরের বৌ, তাঁ'রা যে কাছে থেকে আশীর্ব্বাদ করতে পারলেন না, তাই মনে ক'রে আমি কান্না রাখতে পারছি না।"

বেণীর নয়ন আবার অশ্রুতে পূর্ণ হইয়া গেল।

"ছোট সাহেব" বলিলেন, "তাঁ'রা যেখানেই কেন থাকুন না, ছেলেবৌকে আশীর্ব্বাদ করবেন।"

বলিতে বলিতে "ছোট সাহেব" একটু অভিভূত হইয়া পড়িলেন। আর এক জনের কথা তাঁহার মনে পড়িল। মণিকার মা তাঁহার স্নেহের কন্যাকে এমন পাত্রে সমর্পিতা দেখিয়া দুই জনকে আশীর্ব্বাদ করিতে পারিলেন না !

বেণী "ছোট সাহেবকে" প্রণাম করিয়া চলিয়া গেল। "ছোট সাহেব" ভাবিতে লাগিলেন।

বেণীর কথা ও বেণীর অশ্রু আরও এক জনের মনে কত কথা ও কত ব্যথা জাগাইয়া দিয়াছিল ! বিবাহের প্রস্তাব শুনিয়া অবধি মা'র কথা কেবলই মণিকার মনে পড়িতেছিল। বিদ্যুতের সান্নিধ্যে যেমন বিদ্যুৎ প্রবল হয়, বেণীর কথায় ও ভাবে তাহার তেমনই হইয়াছিল।

প্রেম মানুষকে প্রেমাস্পদের সম্বন্ধে যেমন স্বার্থত্যাগী করে, আর সকলের সম্বন্ধে তেমনই স্বার্থপর করে—তাই যুবতী যেমন স্বামীর জন্য পিত্রালয়কে পরের ঘর মনে করে, যুবক তেমনই স্ত্রীর জন্য আর সকলের সহিত সম্বন্ধ তুচ্ছ মনে করে—তাহারা কেবল পরস্পরের জন্যই ত্যাগ-স্বীকারে আনন্দানুভব করে। তবুও মণিকার কেবলই মনে হইতেছিল, সে চলিয়া যাইলে তাহার পিতার অনেক অসুবিধা হইবে ; আর সঙ্গে সঙ্গে সে তাহার মাতার অভাব অনুভব করিয়াছে। আজ সে সেই অভাব অতি তীব্রভাবেই অনুভব করিতে লাগিল। আজ মা'র কথা মনে করিয়া তাহার বুক বেদনায় ও চক্ষু অশ্রুতে পূর্ণ হইয়া উঠিতে লাগিল।

বেণীকে তাহার পিতা যাহা বলিয়াছিলেন, সে তাহা শুনিয়াছিল : শুনিয়া বুঝিয়াছিল, তিনিও সেই এক জনের অভাব অনুভব করিতেছেন। তিনি যে তাহাকে তাহার মাতার চিত্র উপহার দিবেন, তাহাও সে জানিয়াছিল।

মা'র চিত্রখানি দেখিবে বলিয়া যে ঘরে সেই চিত্রখানি ছিল, সে সেই ঘরে প্রবেশ করিতে গেল—দ্বারের পর্দ্দা সরাইয়া দেখিতে পাইল, "ছোট সাহেব" সেই চিত্রের সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছেন। পর্দ্দাটি ফেলিয়া সে নিঃশব্দে সরিয়া গেল।

সরলকুমার তাহাকে যে অশোক তরুমূলে দেখিয়া গিয়াছিল, মণিকা তথায় যাইয়া বেঞ্চে উপবেশন করিল। মা'র কথা ভাবিতে ভাবিতে তাহার দুই চক্ষু হইতে অশ্রু ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। কখন্ যে অপরাহ্ণ সন্ধ্যার স্বচ্ছান্ধকারে তাহার বিচিত্র বর্ণ বিসর্জ্জন দিতেছিল, তাহা সে জানিতেও পারে নাই। ভৃত্যের আহ্বানে সে চমকিয়া উঠিল। ভৃত্য বলিল, ছাত্ররা আসিয়াছেন—"সাহেব" তাহাকে ডাকিতেছেন সে চক্ষু মুছিয়া আপনাকে স্থির করিয়া বাংলোয় গেল।

[ক্রমশঃ]

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ।

নর্ম্যাণ্ডি
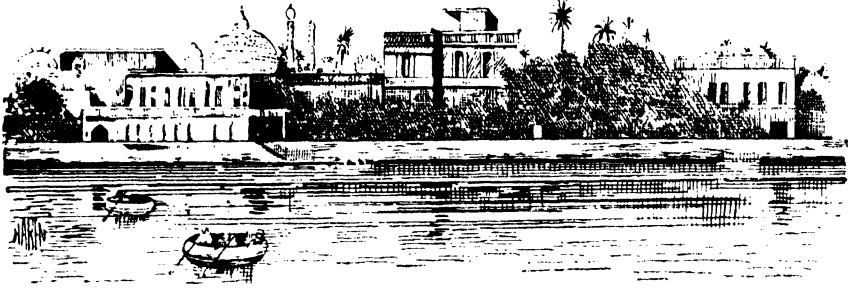
নর্ম্যাণ্ডি ফ্রান্সের একটি প্রদেশ। বিজেতা উইলিয়মের নামের সহিত নর্ম্যাণ্ডি বিজড়িত। ইতিহাসপাঠকগণ নর্ম্যাণ্ডির নামের সহিত সুপরিচিত হইলেও এই প্রদেশের ভৌগোলিক বিবরণ এবং অন্যান্য জ্ঞাতব্য তথ্য সম্বন্ধে জানিবার আগ্রহ রাখেন। নর্ম্যাণ্ডির প্রধান বন্দরের নাম সারবরো। এখানে মৎস্য ধরিবার শ্রেষ্ঠ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত। অনেকেই মৎস্য ধরিয়া শুধু জীবিকা নির্ব্বাহ করে না, প্রচুর অর্থও উপার্জ্জন করিয়া থাকে।

সারবরোতে নারীরা সাধারণের ব্যবহৃত উৎস-জলে বস্ত্রাদি ধৌত করিয়া থাকে। তুষারশীতল জলে বস্ত্র ধৌত করা সহজ ব্যাপার নহে; কিন্তু নারীরা পরম উৎসাহভরে সেই তুষারশীতল জলেই বস্ত্র ধৌত করিয়া থাকে।

বন্দর হইতে বাহির হইয়া কয়েক মাইল অগ্রসর হইলেই দর্শকের নয়ন-পথে আপেল-ভারাবনত বৃক্ষরাজির সুন্দর দৃশ্য পতিত হইবে। সর্ব্বত্রই আপেল গাছের ছড়াছড়ি।

সমগ্র অঞ্চলটি পাহাড়ে সমাকীর্ণ। প্রত্যেক কৃষিক্ষেত্রই পাহাড়ের উপর অবস্থিত। নির্ঝরিণীর সংখ্যা গণনা করা যায় না। নির্ঝরিণী-তীরে পুষ্পিত 'সিডার' গাছ। উহা নর্ম্যাণ্ডির অন্যতম বৈশিষ্ট্য।
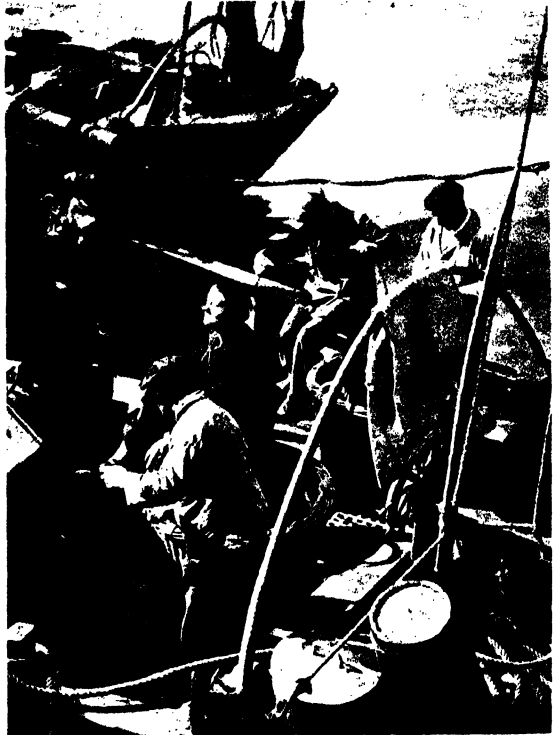
নর্ম্যাণ্ডির ধীবর-সম্প্রদায়

প্রত্যেক কৃষিক্ষেত্র এবং গোলাবাড়ী যেন পুরাতন দুর্গের জ্ঞাতিভ্রাতা। কোন কোন গোলাবাড়ীর আকার অসম্ভব বৃহৎ। এক একটি অট্টালিকার মধ্যে গোলাকার টাওয়ার মাথা উন্নত করিয়া দণ্ডায়মান। গল্প আছে,

সারবরো বন্দরের বৃদ্ধ দম্পতি

গোয়ালিনী ও দুগ্ধবতী গাভীর দল

প্রণয়িনীর জন্য প্রেমিক বাতায়নের নিম্নে প্রতীক্ষা করিয়া ছিল। এইরূপে উক্ত সুন্দরী সতর্ক প্রহরীদিগের সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া দিয়াছিল।

মাউণ্ট সেণ্ট মাইকেল এখানকার প্রধান দর্শনীয় স্থান। যাত্রিদল সারবরো বন্দর হইতে বাহির হইয়া এই তীর্থস্থান অভিমুখে গমন করিয়া থাকে। এভরান্‌চেস নামক ক্ষুদ্র সহরে পৌছিয়া সেখান হইতে সেণ্ট মাইকেল অভিমুখে যাইতে হয়। পথ ক্রমশঃ উপরের দিকে উঠিয়াছে।

সন্ন্যাসী আবেলার্ড-এর কথা কেহ ভুলিবে না। হেলয়সীর প্রেমে তিনি আকণ্ঠ নিমজ্জিত হইয়াছিলেন। তাঁহার রচিত ধর্ম্মগ্রন্থ "সিক্-এট-নন"এর কথা হয় ত অনেকে জানেন না; কিন্তু তাঁহার প্রণয়কাহিনী কেহই বিস্মৃত হইবেন না।

একটি এইরূপ দুর্গে কোন কালে একটি সুন্দরী তরুণীকে সতর্কভাবে বন্দী করিয়া রাখা হইয়াছিল। কিন্তু সেই দীর্ঘকেশা সুন্দরী তাহার কেশরাজি বাতায়নপথে নামাইয়া দিয়া তাহার প্রেমিককে চুলের সাহায্যে ঘরে তুলিয়া লইয়াছিল। মানুষ রোমান্স এমনই ভালবাসে। পাহাড়ের উপরেই "প্লেট ফরমে"। এই নাম প্রথমতঃ মানুষের মনে কোন কৌতূহলেরই উদ্রেক করিবে না। কিন্তু উহা পর্য্যবেক্ষণ করিলেই এই সাধারণ পাষাণখণ্ড যে ইতিহাস বক্ষে ধারণ

করিয়া রহিয়াছে, তাহার সমস্তই মানস-পটে ভাসিয়া উঠিবে।

পূর্ব্বে এই পাষাণ-খণ্ডের সম্মুখে একটি ধর্ম্ম-মন্দির ছিল। এখন তাহা নাই। পাষাণখণ্ড মন্দির-দ্বারের সম্মুখেই সংস্থাপিত ছিল। ১১৭২ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডের রাজা দ্বিতীয় হেনরী পোপের প্রতিনিধি-বর্গের সম্মুখে এই পাথরের উপর নতজানু হইয়া উপবেশন করিয়াছিলেন। ক্যাণ্টারবরি গির্জ্জার ধর্ম্মযাজক টমাস বেকেটকে হত্যা করার পর অনুতাপ হওয়ায় রাজা দ্বিতীয় হেনরী ক্ষমাপ্রার্থনার জন্য এখানে জানু পাতিয়া প্রতীক্ষা করিতে থাকেন। ধর্ম্মযাজক-হত্যাপরাধে রাজা সমাজচ্যুত হইয়া-ছিলেন। মন্দিরের ভিতর পোপের প্রতি-নিধিগণ অপেক্ষা করিতেছিলেন। তাঁহারা যতক্ষণ না রাজাকে ক্ষমা করিয়াছিলেন, নতজানু অবস্থায় ইংলণ্ডের রাজা ততক্ষণ প্রস্তরখণ্ডের উপর অবস্থান করিয়াছিলেন। ইহাতে তাঁহার জানুযুগল ব্যথায় ভারী হইয়া উঠিয়াছিল।
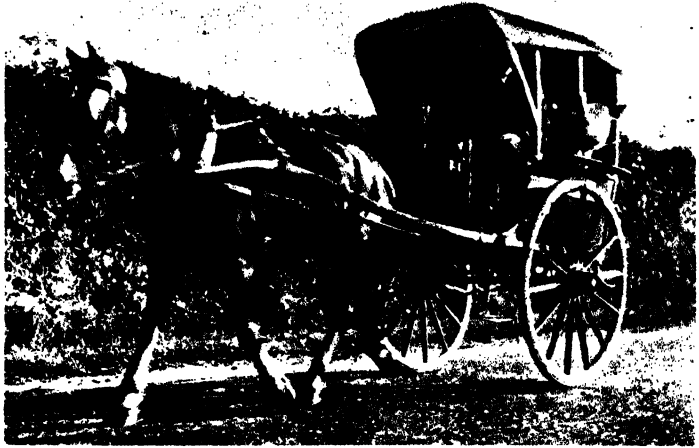
বগীগাড়ীর পশ্চাতে গোবৎস

সন্তানসহ সারবরোর দম্পতির বায়ুসেবন

এই বিচিত্রদর্শন মাউণ্ট মাইকেল সমুদ্রগর্ভে অবস্থিত। তীর হইতে অবশ্য উহার দূরত্ব অধিক নহে। পাহাড়ের উপর মঠ—যেন মঠের শীর্ষগুলি আকাশচুম্বন করিতেছে। সেণ্ট মাইকেলের তরবারিধৃত বাহু সহ দীর্ঘ মূর্ত্তি যেন

লেস-বয়নরতা তরুণীর দল

সারবরোর ভেড়া-বিক্রেত্রী

সর্ব্বাপেক্ষা প্রকৃষ্ট সময়, রাত্রিকালে যখন সমুদ্রে জোয়ার লাগে এবং আকাশে চন্দ্রালোকের বিমলদীপ্তি উদ্ভাসিত হয়, সেই সময়ে পাহাড়ে গিয়া দেখিলেই পূর্ণানন্দলাভ হয়।

কোয়েস্‌সন্ নামক ক্ষুদ্র নদীর তীরে পন্টরসন্ নামক একটি স্থান আছে। এই স্থান হইতেই মাউণ্টএ যাইতে হয়। তটভূমি বালুকাপূর্ণ এবং সিক্ত। উক্ত আর্দ্র তটভূমির উপর দিয়া পাহাড়ের দিকে অগ্রসর হইতে হইবে। রাজা ও বিশপরাও ঐ পথে যাইবেনই। জোয়ার এবং চোরা বালিতে পড়িয়া বিপন্ন হইবার আশঙ্কা থাকে। রাজা একাদশ লুই পর্য্যন্ত পরিধেয় বসন গুটাইয়া এই পথে অগ্রসর হইয়াছিলেন। পূর্ব্বে এই ভাবেই দর্শক মাউণ্ট সেণ্ট মাইকেল দেখিতে আসিত। এখনও বস্ত্রাদি ভিজিয়া যাইবার দুর্ভাবনা যে সকল দর্শক করেন না, তাঁহারা পদব্রজে বালুকারাশির উপর দিয়া যাইতে পারেন। তবে পনটরসন হইতে পথ উচ্চ করিয়া তাহার উপর দিয়া ছোট রেলগাড়ী চলিতে আরম্ভ করিয়াছে। শত শত

সূর্য্যালোকে ঝলসিত হইয়া নীল আকাশ স্পর্শ করিতে চাহিতেছে।

মাউণ্ট সেণ্ট মাইকেল যখন ইচ্ছা দেখা যাইতে পারে। এমন কি, শীতের নিশীথ রাত্রিতেও দ্রষ্টব্য। কিন্তু

মোটরগাড়ীও এখন সেখানে যাত্রী বহন করিয়া লইয়া যায়, বিমানযোগেও গমন করা চলে। প্রজাপতির মত পক্ষ বিস্তার করিয়া বিমান বিশাল বিস্তীর্ণ সৈকতভূমির উপর অবতরণ করিয়া থাকে।

অতি প্রাচীনকাল হইতে এই স্থানটি তীর্থ হিসাবে পরিগণিত। সে সময়ে ভক্তগণ নগ্নপদে সৈতকভূমির উপর দিয়া সেণ্ট মাইকেল দর্শনে গমন করিত। ড্রুইড পুরোহিত-দিগের নারীরা সেই যুগে এই তীর্থ-স্থানে নানাপ্রকার দুর্বোধ্য আচার পালন করিত। তাহারা সুগন্ধি পুষ্প-মাল্য দ্বারা মস্তক সুশোভিত করিয়া স্বর্ণনির্ম্মিত বাণপূর্ণ তূণীর বহন করিত। যাহারা বজ্রধ্বনি শুনিয়া ঝটিকার সময় শিহরিয়া উঠিত, তাহারা এই বাণের গুণে সে আশঙ্কাশিহরণ হইতে মুক্তি-লাভ করিত। এইরূপ প্রবাদ।

মন্মথশরে অনাহত কোনও বালক এই তীর মেঘ লক্ষ্য করিয়া নিক্ষেপ করিলে, ভীষণ ঝটিকা পর্য্যন্ত শান্ত হইয়া যাইত, এইরূপ লোকের বিশ্বাস ছিল। জাহাজের নাবিকরা এই বাণ সংগ্রহ করিবার জন্য সেণ্ট মাইকেল পাহাড়ে প্রায়ই আসিত, ধনুর্ব্বিদ নাবিক তীর নিক্ষেপ করিয়া ঝটিকাকে শান্ত করিতে পারিলে ড্রুইড নারীদিগের কাছে ফিরিয়া আসিয়া পুরস্কারস্বরূপ কোনও কুমারীকে প্রার্থনা করিত।

মাউণ্ট সেণ্ট মাইকেলের প্রবেশ-তোরণ

ড্রুইডদিগের পর সন্ন্যাসীরা এখানে আসিতে আরম্ভ করেন। সেই সময় এই স্থানের নাম ছিল মণ্টা টুম্বা বা মণ্ট টম্বে। ইহাদের পর সেণ্ট অউবার্টের শুভাগমন হয়। অষ্টম শতাব্দীতে তিনি আভরাসচেস্ পাহাড়ে বসবাস করিতে থাকেন। তিনি ঐ স্থানের বিশপ ছিলেন। তিনি এখানে কাষ করিতেন এবং পাহাড় সম্বন্ধে দিবাস্বপ্ন দেখিতেন। সেই সময় সেণ্ট মাইকেল হইতে তিনি আকাশবাণী প্রাপ্ত হন। এইখানে একটি খৃষ্টান গির্জ্জা নির্ম্মাণ করিবার দৈবাদেশ তিনি পাইয়াছিলেন। সে যুগে ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তিরা প্রায়ই এই প্রকার দৈবাদেশ প্রাপ্ত হইতেন। সে আদেশ প্রতিপালনে বিলম্বও ঘটিত না।

বিশপ অউবার্ট কতিপয় ধর্ম্মপ্রাণ সন্ন্যাসীকে পাহাড়ের উপরে সামুদ্রিক পাখীর ন্যায় অবস্থান করিতে দেখেন। তিনি এইখানে একটি গির্জ্জা নির্ম্মাণ করার পর বহুলোক সেখানে তীর্থযাত্রা করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। অবশেষে এখানে একটা মঠের প্রতিষ্ঠা হয়। মণ্ট টম্বে নামের পরিবর্ত্তে মণ্ট সেণ্ট মাইকেল নামই প্রসিদ্ধ হইয়া উঠে। স্বপ্নে বিশপ অউবার্টের কাছে এই ঋষিই আবির্ভূত হইয়াছিলেন।

অউবার্টের দুই শত বৎসর পরে নর্ম্ম্যানরা এখানে আগমন করে। তাহারা এই মঠ ও মঠস্থ সন্ন্যাসীদিগকে বিদ্বেষের দৃষ্টিতে দেখিত না। সেজন্য অট্টালিকাগুলি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় নাই। নর্ম্ম্যানদিগের দলপতি রোলো এবং তস্য বংশধর উইলিয়ম (বিজেতা) তখন অন্য ভাবের ভাবুক ছিলেন।

মন্দিরের সোপানশ্রেণী

সমুদ্রের ধারে একটি পাহাড়ের উপর অউবার্ট-নির্ম্মিত ছোট গির্জ্জা-ঘর বিদ্যমান। রোভার্ট জলিভেট নামক জনৈক ভাস্কর চতুর্দ্দশ শতাব্দীর প্রারম্ভে সেণ্ট মাইকেল দুর্গের প্রাকার নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।

যে সোপানাবলী দিয়া সেণ্ট মাইকেল মন্দিরে উপনীত হইতে হয়, তাহার সোপানসংখ্যা ৩ শত ৭২।

সমগ্র পাহাড়টি অট্টালিকাপূর্ণ, উপরে মঠবাড়ী অবস্থিত। উহার অভ্যন্তরভাগ বিচিত্র কারুকার্য্য-সমন্বিত, সুদৃশ্য ও সুন্দর।

সেণ্ট মাইকেলের মূর্ত্তি অতি বিচিত্রদর্শন। শয়তানকে পরাজিত করিয়া বিজয়-গর্ব্বে যেন তিনি দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। পদতলে শয়তান পরাজিত হইয়া অবস্থিত। মূর্ত্তির ঊর্দ্ধোৎক্ষিপ্ত বাহু যেন বলিতেছে—আরও বহু বিষয়ে তিনি জয়ী হইবেন।

নর্ম্ম্যান গথিক যখন প্রচলিত ছিল, সেই সময় এই মঠ নির্ম্মিত হয়। বিরাট সৌধের সর্ব্বত্র গথিক ভাস্কর্য্যচিহ্ন প্রকটিত।

মণ্ট সেণ্ট মাইকেল যখন মনস্ টুম্বা নামে অভিহিত হইত, তখন ক্ষুদ্র দ্বীপটির নাম ছিল টম্বেলিন্। প্রাচীন অধিবাসীরা তখন এই স্থানে সমাহিত হইত। এখানে একটি বাড়ী আছে। টিফেন্ রগেসেলের বাড়ী নামে উহা অভিহিত। বারট্রাণ্ড ডু গুয়েস্‌লিনের সহিত ঐ সুন্দরী এখানে বাস করিতেন, বারট্রাণ্ড চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে বীর যোদ্ধা বলিয়া পরিগণিত ছিলেন। তিনি বিবাহের পর যুদ্ধবৃত্তি ত্যাগ করিয়া কিছুদিন শান্তিতে এখানে বসবাস করিয়াছিলেন।

১৪৩৪ খৃষ্টাব্দে ইংরেজসেনা মাউণ্ট আক্রমণ করিয়া পরাজিত হইয়াছিল। প্রাকার দুর্ভেদ্য এবং অত্যন্ত দৃঢ়। গেব্রিয়েল দুর্গচূড়া আকাশ চুম্বন করিয়া দণ্ডায়মান। শত্রুকে উপহাস করিয়া এই দুর্গচূড়া যেন গর্ব্বোন্নতমস্তকে দণ্ডায়মান।

উত্তরদিকে এখনও অরণ্য বিরাজিত। পাহাড় হইতে অরণ্য যেন সমুদ্রের দিকে নামিয়া আসিয়াছে। এ অঞ্চলে কোনও অট্টালিকা নাই—শুধু প্রকৃতির মধুর দৃশ্য বিরাজিত।

নর্ম্ম্যাণ্ডি কেমন করিয়া নর্ম্ম্যানদিগের অধিকারে আসিয়াছিল এবং কেমন করিয়া ফরাসীরা উহার মালিক

ডনকুর্ক বন্দরের দৃশ্য

লি হ্যাভার বন্দরের দৃশ্য

সেণ্ট মাইকেল ধর্ম্মমন্দিরের স্বর্ণখচিত চূড়া

সেণ্ট মাইকেল ধর্ম্মমন্দির-সংলগ্ন সবজিবাগ

সমুদ্র-জোয়ারে ৭ মাইল বিস্তৃত সৈকতভূমি জলময়

মন্দিরের অভ্যন্তরস্থ খিলান

দুর্গ প্রাকারের একাংশ

বিমান হইতে মণ্ট সেণ্ট মাইকেলের দৃশ্য
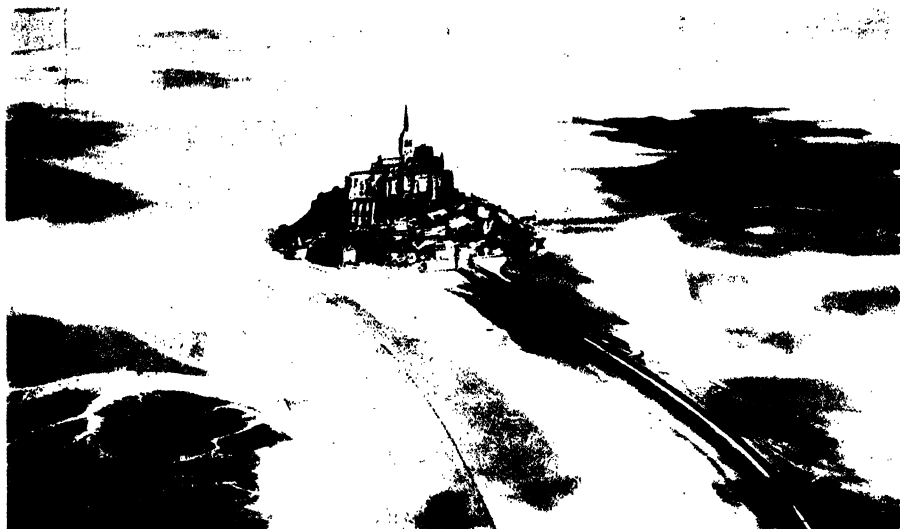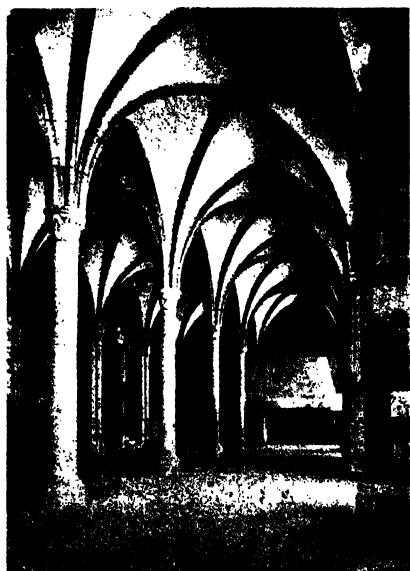
দুই শত অতিথির ভোজনাগার

মন্দিরের অপর।

হইয়াছিল; তাহা ঐতিহাসিক ব্যাপার। এইখান হইতে দুঃসাহসী সামুদ্রিক সঙ্ঘার জাহাজে করিয়া উভয় সমুদ্র অভিমুখে বিজয় যাত্রা করিত এবং সমগ্র উত্তর-সমুদ্রের উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল। এক শত বৎসরের অধিককাল নর্ম্ম্যানদিগের করতলগত না হইতেই বিজয়ী উইলিয়ম ডিউক বলিয়া আপনাকে বিঘোষিত করেন এবং ইংলণ্ডের প্রতি লোলুপদৃষ্টি নিক্ষেপ করেন।

মন্দিরের প্রাকার

সমগ্র নর্ম্ম্যাণ্ডি করতলগত করিয়া ডিউক নানা স্থানে দুর্গ নির্ম্মাণ করেন। ফালাইস নামক স্থানে দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া উইলিয়মের পিতা ডিউক রোবার্ট বাস করিতেন। তাঁহার বয়স যখন অষ্টাদশ, সেই সময় দুর্গের বাতায়নপথে তিনি একটি দৃশ্য দেখিতে পান বৃক্ষবীথির অন্তরালে একটি প্রকাণ্ড স্থানে বহু নারী সমবেত হইয়া বস্ত্র ধৌত করিতেছিল। সেই নারীদলের মধ্যে এক অপূর্ব্ব সুন্দরী তরুণী ছিলেন। তাঁহার নাম আর্লেট। যুবক ডিউক সেই সুন্দরী যুবতীকে দেখিয়া প্রেমমুগ্ধ হন এবং তাঁহাকে দুর্গে আহ্বান করেন। উভয়ের মধ্যে প্রণয় ঘটে, মিলনও হয়; কিন্তু বিবাহ হয় নাই। আর্লেটের

মন্দিরের বহির্দৃশ্য

শস্যবোঝাই ঘোড়ার গাড়ী
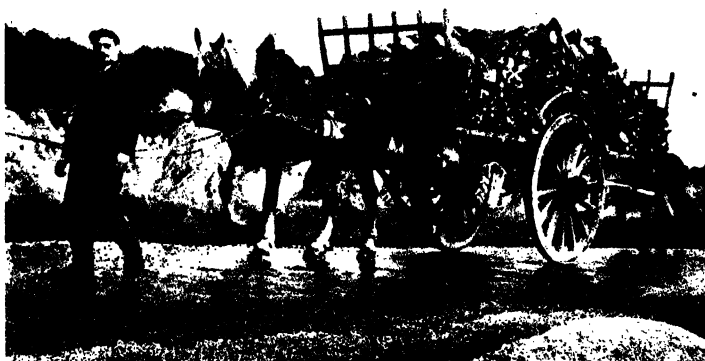
অপর দুই পুত্র ছিল। তাহারা উইলিয়মের সহোদর ভ্রাতা হইলেও এক পিতার ঔরস-জাত নহে। রোবার্টের উইলিয়ম ছাড়া অন্য পুত্র ছিল না। আর্লেট ও রোবার্ট বিবাহ করিয়াছিলেন, কিন্তু পরস্পরকে নহে। এই দুই ভ্রাতা উইলিয়মের সৌভাগ্যের অংশীদার হইয়াছিল। এখনও ফেলাইসের সেই উৎস-সন্নিধানে নারীরা বস্ত্র ধৌত করে এবং আর্লেটের ভাগ্যবান সন্তান উইলিয়মের সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া থাকে। কিন্তু কোনও ইংরেজ উপস্থিত থাকিলে সে আলোচনা বন্ধ হইয়া যায়। কারণ, পাছে তাঁহাদের মনে উইলিয়মের জন্মকথায় আঘাত লাগে।

মণ্ট সেণ্ট মাইকেলের তীর্থযাত্রীর দল

যে বাতায়নপথে রবার্ট প্রথম আর্লেটকে দেখেন, এখনও সে বাতায়ন বিদ্যমান। সেই পুরাতন দুর্গ এখনও দাঁড়াইয়া আছে। আর্লেট যে কক্ষে বসবাস করিতেন, দর্শককে তাহা দেখাইয়া দেওয়া হইয়া থাকে।

ডাইভস্-সর্-মের নামক বন্দরে উইলিয়ম ৭ শত জাহাজ সমবেত করিয়া তাহাতে যোদ্ধ-সমাবেশ করিয়াছিলেন, সে যুগে এই বৃহৎ পোতবহর ও যোদ্ধ-বৃন্দকে সমুদ্রপথে লইয়া যাওয়া সহজসাধ্য ব্যাপার ছিল না। উক্ত বন্দরের সহর এখনও বিদ্যমান। এখনও সেখানে বিজেতার নামে একটি সরাইখানা দৃষ্ট হয়। সেই পান্থনিবাসে অসংখ্য
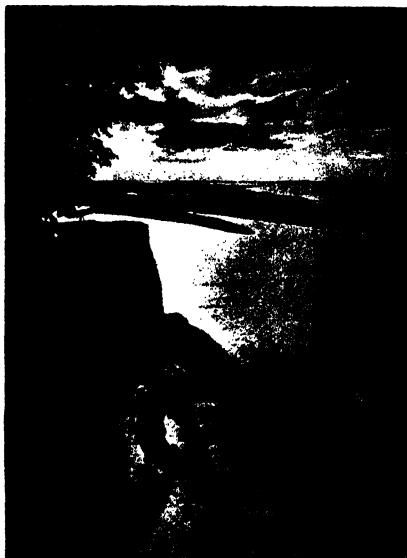
সেণ্ট অউবার্ট গির্জ্জা

এইখানে মঠের সন্ন্যাসীরা জল সঞ্চয় করিয়া রাখিত

পাহাড়ের উত্তরাংশ হইতে সমুদ্র-দৃশ্য

দ্বাদশ শতাব্দী পূর্ব্বে নির্ম্মিত মন্দিরচূড়া

নর্ম্ম্যান বাহক

জলের কল হইতে জল তোলা

পন্টরসনের নর্ম্ম্যান নারী

চারিতল রেস্তোরা

সমুদ্রস্নানার্থী বালকের দল

আভরাস্চেন সহরের কশাইখানা
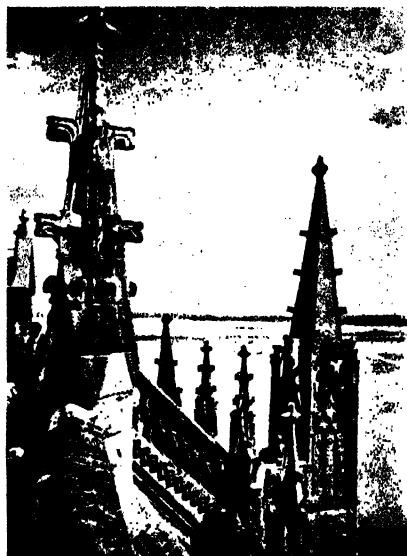
এই দুর্গে বিজেতা উইলিয়মের জন্ম হয়

বিজেতা উইলিয়ম পান্থনিবাস

প্রাচীরগাত্রে উৎকীর্ণ ঋষিমূর্ত্তিচতুষ্টয়

রণপণ্ডিত নায়ক সমবেত হইয়াছিলেন।

ষোড়শ খৃষ্টাব্দে ম্যাডাম দে সেভেকী নামক এক জন লেখিকা উক্ত পান্থনিবাসে আশ্রয় লইয়াছিলেন। পান্থনিবাসটি এখন জীর্ণ অবস্থায় বিরাজিত। দর্শকগণকে এই পান্থনিবাস দেখান হইয়া থাকে, সমুদ্র এই নগর হইতে এখন এক মাইল দূরে সরিয়া গিয়াছে।

কেইন সহরে বিজেতা উইলিয়ম বিবাহিত জীবন যাপন করিয়াছিলেন। এইখানে জ্ঞাতি-ভগিনী ম্যাটিলডার সহিত তাঁহার পরিচয় হয়। পরিচয় ক্রমে প্রেমে পরিণত হয়। তাহার পরই বিবাহ। উইলিয়ম একটি কন্যাসন্তান লাভ করেন। তাহার নাম সিসিলিয়া। এই সিসিলিয়া অত্যন্ত রূপসী ছিলেন।

সেণ্ট মাইকেল হইতে নিম্নস্থ ট্রামলাইনের দৃশ্য

গর্দ্দভবাহিত গাড়ী
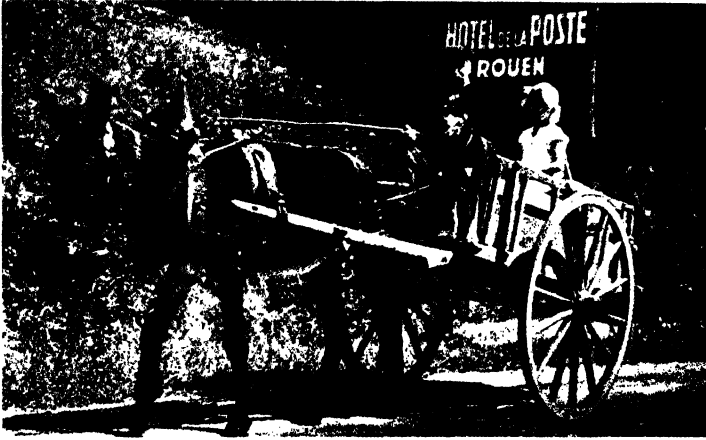
কেইনের পথগুলি জনসমাগমপূর্ণ। নর্ম্ম্যান অধিবাসী এই নগরের শোভাবর্দ্ধন করিতেছে। উইলিয়ম্ এইখানে একটি ধর্ম্মমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। সেণ্ট এটিনী ধর্ম্মমন্দিরের চূড়া যেন গগন স্পর্শ করিতেছে। সহরের বিপরীত দিকে ম্যাটিলডা লা ট্রিনিটি নামক আর একটি ধর্ম্মমন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। এই দুইটি ধর্ম্মমন্দির কেইনের বৈশিষ্ট্য।

উইলিয়ম ও ম্যাটিলডার কন্যা সিসিলিয়া লা ট্রিনিটির ধর্ম্মাধ্যক্ষা নিযুক্ত হইয়াছিলেন। উইলিয়ম ও ম্যাটিলডা স্ব স্ব ধর্ম্মমন্দিরে সমাহিত হন। কিন্তু পরবর্ত্তী শতাব্দীতে তাঁহাদের সমাধিক্ষেত্র ভাঙ্গিয়া ফেলা
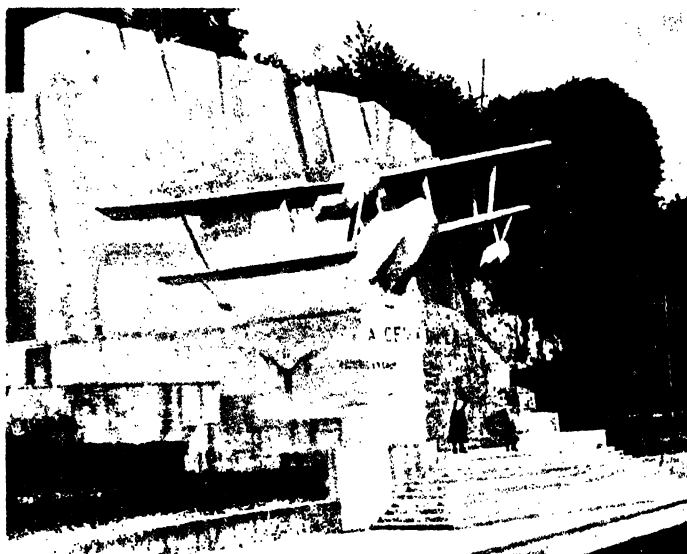
সেণ্ট মাইকেলের রেস্তোরাঁ।

স্মৃতিসৌধ—বিখ্যাত বিমান এনগুসেনের উদ্দেশে

লি হ্যাভারের প্রসিদ্ধ রণস্মৃতি-সৌধ

ট্রাউভিলির প্রসিদ্ধ সৈকতভূমি

নর্ম্ম্যান গোলাবাড়ী

হইয়াছিল। কেইন শুধু অতীত যুগের কীর্ত্তি বক্ষে ধারণ করিয়া ধন্য হয় নাই হ্যাভারের সহিত তাহার বাণিজ্যগত সম্বন্ধ আছে। খালের পথে ব্যবসা-বাণিজ্য চলে।

উইষ্ট্রিহাম্ নামক স্থানকে চতুর্দ্দশ ও পঞ্চদশ শতাব্দীতে ইংরেজরা বন্দররূপে ব্যবহার করিত। কেইন সহর লুণ্ঠন করিয়া যে সকল জিনিষ তাহারা সংগ্রহ করিত, তাহা তাহারা জাহাজে করিয়া ইংলণ্ডে লইয়া যাইত।

বেইউএর নক্সাসমন্বিত চাদর প্রভৃতির সমাদর অত্যন্ত অধিক। এক একখানা ২ শত ৩০ ফুট লম্বা চাদরে সূচি শিল্পের সাহায্যে নর্ম্ম্যান বিজয়ের নানা চিত্র অঙ্কিত থাকে। কথিত আছে, একখানা চাদরে রাণী ম্যাটিলডা নিজের হাতে নর্ম্ম্যান বিজয়ের নানা চিত্র সূচের সাহায্যে অঙ্কিত করিয়াছিলেন।

রাউয়েনের প্রসিদ্ধ ঘড়ী-ঘর

সে নক্সাসমন্বিত বস্ত্রখানি বেইউর লাইব্রেরী-ঘরে কাচের আধারে রক্ষিত আছে। এই লাইব্রেরী পূর্ব্বে বিশপের বাসস্থান ছিল। চোরাবালির গ্রাসভুক্ত একদল সশস্ত্র নর্ম্ম্যানকে টানিয়া তুলা হইতেছে, এমন চিত্রও এই বস্ত্রের একাংশে সূচিশিল্পের সহায়তায় ফুটিয়া উঠিয়াছে।

আমেরিকার হেলেন চর্চ্চিল ক্যাণ্ডি নাম্নী জনৈক মহিলা লেখিকা একবার নর্ম্ম্যাণ্ডি-পরিভ্রমণে গিয়া এইরূপ একখানি সূচিশিল্প-সমন্বিত নক্সাকরা চাদর ক্রয় করিয়া আমেরিকায় লইয়া যান। তিনি লিখিয়াছেন যে,
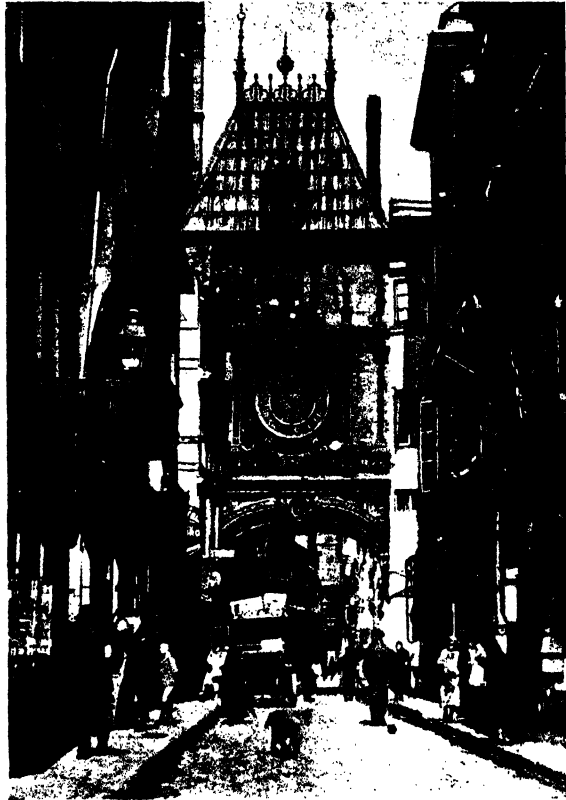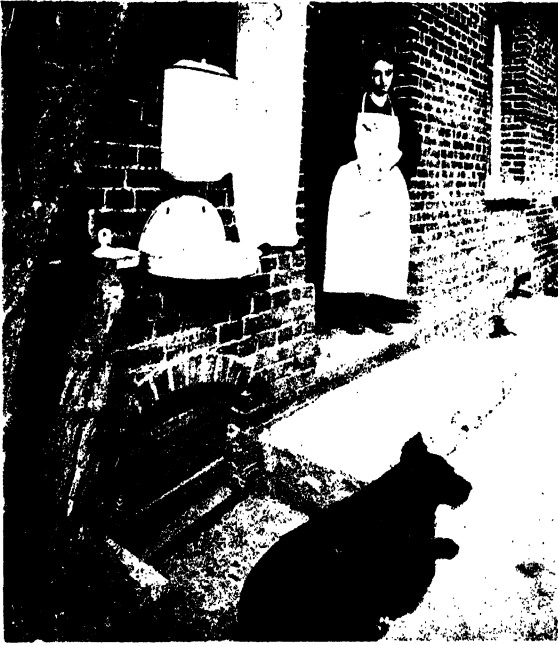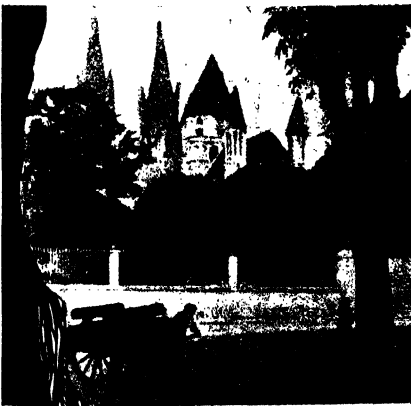
নর্ম্ম্যান নারী কাপড় কাচিতেছে

সেণ্ট সেইনসের পান্থশালা

এরূপ সুন্দর নক্সার কায সর্ব্বত্র সুলভ নহে। লিসিউ নর্ম্ম্যাণ্ডির অন্তর্ভুক্ত। এই সহরটিতে থেরেসা বাস করিতেন। থেরেসা মার্টিন তরুণ যৌবনে ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে এখানকার মঠে সন্ন্যাসিনীরূপে প্রবেশ করেন। নয় বৎসর পরে ২০ বৎসর বয়সে তিনি দেহরক্ষা করেন। তাঁহার মৃত্যুর ২৮ বৎসর পরে ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে এই তরুণী সন্ন্যাসিনীর উদ্দেশে মানুষ শ্রদ্ধার অর্ঘ্য নিবেদন করিতে আরম্ভ করে।

রাউয়েন শুধু ফ্রান্সের নহে, সমগ্র জগতের তীর্থস্থানস্বরূপ। জোয়ান আর্কের আত্মোৎসর্গে এই নগর পবিত্র তীর্থস্বরূপ বিবেচিত হইয়াছে। নানাদেশ হইতে দর্শকদল এই সহর দেখিতে আসে। সহরটি ভাস্কর্য্য সম্পদে পূর্ণ। কিন্তু সে জন্য এত জনসমাগম হয় না। শুধু বীর্য্যবতী মহিলার আত্মনিবেদন যে স্থানকে পবিত্র করিয়াছে, তীর্থযাত্রী হিসাবে দেশ-বিদেশের লোক সেখানে আগমন করিয়া থাকে। উচ্চ চূড়া-সমন্বিত গির্জ্জা ও অট্টালিকা-সমূহ দেখিতে দেখিতে দর্শকের চরণযুগল পুরাতন বাজারের কাছে গিয়া থামিয়া পড়ে। এইখানেই তরুণী সুন্দরী তাঁহার জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। এই বাজারটি অবশ্য সুদৃশ্য স্থান নহে—ইহার অপেক্ষা বহু রমণীয় স্থান রাউয়েনএ দেখিতে পাওয়া যাইবে। কিন্তু যে তরুণীর আত্মত্যাগ, তাঁহার পবিত্র ধর্ম্ম-বিশ্বাস সমগ্র জাতিকে ধন্য করিয়াছে, তাঁহার পরলোকগত আত্মা হয় ত এখনও এই স্থানে ঘুরিয়া বেড়ায়, সেই জন্যই দর্শকদল মন্ত্রমুগ্ধবৎ এখানে সমবেত হইয়া থাকে।

বিজেতা উইলিয়ম-প্রতিষ্ঠিত গির্জ্জা

নর্ম্ম্যাণ্ডির হৃদয়-স্পন্দন এই সহরেই অনুভূত হইবে। কারণ, এইখানেই নর্ম্ম্যাণ্ডির প্রাচীন রাজধানী ছিল। কিন্তু দর্শক মণ্ট সেণ্ট মাইকেল পাহাড়কে কোনও দিন বিস্মৃত হইতে পারিবে না। সমগ্র নর্ম্ম্যাণ্ডির মধ্যে উহার মত চমৎকার স্থান আর নাই।

শ্রীসরোজনাথ ঘোষ।

জাতিসঙ্ঘের বলাধান

কয়েক দিন পূর্ব্বে বৃটিশ সাম্রাজ্যের পররাষ্ট্রসচিব মিষ্টার এন্থনি ইডেন বলিয়াছেন, লীগ অব নেসন্স বা জাতিসঙ্ঘের বলাধান করিতে হইবে। জাতিসঙ্ঘ যে ইদানীং কতকগুলি ব্যাপারে অত্যন্ত অকর্ম্মণ্যতা প্রকটিত করিয়াছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। তাহার উপর আবিসিনিয়ার ব্যাপারে উহার ক্লীবতা বা সামর্থ্যহীনতা পূর্ণমাত্রায় প্রকটিত হইয়াছে, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। নানা কারণে বৃটিশ জাতি জাতিসঙ্ঘের পক্ষপাতী। আন্তর্জ্জাতিক শক্তি রক্ষা করিবার পক্ষে জাতিসঙ্ঘ যে একটা প্রকৃষ্ট উপায়, এই ধারণা এখনও বৃটিশ জাতির মন হইতে তিরোহিত হয় নাই। কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে লীগ যে এ পর্য্যন্ত বিশেষ কিছুই করিতে পারিয়াছেন, তাহা মনে হয় না। সার এন্থনি ইডেন কি প্রকারে লীগ বা সঙ্ঘকে বলবান্ করিয়া তুলিবেন, তাহা স্পষ্ট করিয়া বলেন নাই। সে কথা স্পষ্ট না বলিয়া অব্যক্ত রাখিলেই সাধারণে তাহা বুঝিতেই পারিবে না। মার্কিণের ভূতপূর্ব্ব প্রেসিডেণ্ট উড্রো উইলসন যে ভাবে জাতিসঙ্ঘ গঠন করিতে বলিয়াছিলেন, উহা ঠিক সেই ভাবে গঠিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। তিনি বলিয়াছিলেন যে,—"এই জাতিসঙ্ঘটি একটি সত্যকার সালিসী সভা হইবে," যে প্রতিষ্ঠান সকলের শ্রদ্ধাভাজন হইবে, সে প্রতিষ্ঠানকে সবল দুর্ব্বলকে সমান দৃষ্টিতে দেখিতে হইবে,—তাহার কেবল সবলের পক্ষাশ্রয়ী বা মুখাপেক্ষী হইলে চলিবে না। প্রবলের অযথা আক্রমণ হইতে দুর্ব্বলকে রক্ষা করা সালিসী সভামাত্রেরই কর্ত্তব্য। কিন্তু এ পর্য্যন্ত জাতিসঙ্ঘ তাহা করিতে পারিয়াছেন কি? আমরা ত তাহার দৃষ্টান্ত কিছুই দেখিতে পাইতেছি না। পৃথিবী হইতে যুদ্ধ নির্ব্বাসন করা জাতিসঙ্ঘের অন্যতম উদ্দেশ্য, কিন্তু জাতিসঙ্ঘ প্রতিষ্ঠিত হইবার পর কি পৃথিবী হইতে যুদ্ধ নির্ব্বাসিত হইয়াছে? দক্ষিণ-আমেরিকার বাকো সংগ্রাম—পূর্ব্ব-এসিয়ায় জাপান ও চীনের হাঙ্গামা এবং সর্ব্বোপরি আবিসিনিয়ার সহিত ইটালীর সংগ্রাম কি কার্য্যক্ষেত্রে জাতিসঙ্ঘের সাফল্য সূচিত করে? গ্রেট বৃটেনের প্রধান মন্ত্রী মিষ্টার বলড্উইন স্পষ্টাক্ষরেই বলিয়াছেন যে, আবিসিনিয়ার যুদ্ধ-ব্যাপারে গ্রেট বৃটেনকে হতমান হইতে হইয়াছে এবং জাতিসঙ্ঘকেও হতমান হইতে হইয়াছে। কথা খুবই সত্য। কারণ, কেলগ প্যাক্ট স্বাক্ষরিত হইবার পর সকলেই মনে করিয়াছিলেন যে, অতঃপর আর কোন প্রবল জাতি জোর করিয়া কোন দুর্ব্বল জাতির রাজ্য অধিকৃত করিতে পারিবে না, জগতে আন্তর্জ্জাতিক বিবাদ মীমাংসা করিবার জন্য পশু-বলের স্থানে নৈতিক বল প্রতিষ্ঠিত হইবে। কিন্তু সে আশা ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে। ইহার ফল এই দাঁড়াইয়াছে যে, লীগের বা জাতিসঙ্ঘের উপর লোকের একটা অশ্রদ্ধা আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। মিষ্টার এন্থনি ইডেনও সে কথা মুক্ত-কণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন; এবং বলিয়াছেন, উহা দেখিয়া কাহারও নিরাশ হওয়া কর্ত্তব্য নহে। তাঁহার প্রধান কথা এই যে, লীগের কর্তৃত্বশক্তি ক্ষীণ হইয়াছে, ইহাতে উহার সদস্যদিগের উপর এইরূপ একটা দায়িত্ব অর্পিত হইয়াছে যে, তাঁহারা যেন বর্ত্তমান ঘটনাবলি বিশেষভাবে পরিদর্শন করিয়া উহার ফলে যে সকল ত্রুটি প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা বাস্তব দিক হইতে বিচার করিয়া অকপটভাবে তাহার সংশোধন করিবার চেষ্টা করিবেন। মিষ্টার ইডেন যে কথা বলিয়াছেন, তাহা সত্য।

মিষ্টার বলড্উইন

এন্থনি ইডেন

কিন্তু উদ্ধত এবং ক্ষমতাস্পর্দ্ধী ব্যক্তি যদি অন্যায় কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হয়, তাহা হইলে বিনা যুদ্ধে তাহাকে নিবৃত্ত করা সম্ভব হয় না। সেনর মুসোলিনী যেরূপ স্পর্দ্ধার সহিত সুয়েজ খালের ভিতর দিয়া রণতরী চালাইয়াছিলেন, তাহাতে বুঝা গিয়াছিল যে, বিনা যুদ্ধে তাঁহাকে নিবৃত্ত করা সম্ভব হইত না। কাযেই যুদ্ধ রোধ করিবার জন্য যুদ্ধই করিতে হইত। তাঁহার প্রযুক্ত "অকপট বাস্তবিক সত্তার ভাবে ভাবিত হইয়া" (in a spirit of candid realism) কথা প্রয়োগে বুঝা যায়, তিনি যে শব্দ প্রয়োগ করিতে চাহেন, তাহার অতিরিক্ত ভাব ব্যঞ্জনার দ্বারা প্রকাশ করিতে চাহেন। আসল কথা, লীগের ভিতরে ভিতরে অনেক ত্রুটি রহিয়াছে। সকল সদস্যের পক্ষে একযোগে কার্য্য করাই কঠিন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কাযেই বস্তুগত ব্যাপার দেখিয়া সহসা যুদ্ধে নামা সঙ্গত হইত

না,—ইহা বলাই বাহুল্য। ইটালী এখন ইথিওপিয়াকে গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছে। সে আর কিছুতেই উগ্‌ উগ্‌রাইয়া দিবে না। জগতে যার লাঠি তার মাটী, এই নীতি চিরকালই স্বীকৃত হইয়া আসিতেছে। কিন্তু তাহা হইলেও যুদ্ধে কতকগুলি বিধি-নিষেধ মানিয়া চলিতে হয়। নিরস্ত্র গ্রাম্য লোকের উপর, রোগিনিবাসে, চিকিৎসাগারে, ধর্ম্মস্থানে বা বিদ্যালয়ে বোমা প্রভৃতি নিক্ষেপ করা যুদ্ধনীতিতে নিষিদ্ধ। ইটালী কালা আদমীর দেশ জয় করিতে গিয়াছেন বলিয়া সে সমস্ত বিধি-নিষেধ কিছুই মানেন নাই। এ কথা কেবল কালা আদমীরা বলিতেছে না, রক্তক্রশচিহ্নিত আহত এবং রুগ্ন ব্যক্তিদিগের চিকিৎসাকার্য্যে যাঁহারা নিযুক্ত ছিলেন, এইরূপ বহু চিকিৎসকই সেই কথা বলিয়াছেন। এখন সে কথা আর অস্বীকার করিবার উপায় নাই। অথচ ঐ কার্য্যের সমর্থনও করা যায় না। অগত্যা কালা আদমী হাবসীদিগের উপর কতকটা দোষ চাপাইয়া ইটালীয়ানরা আত্মপক্ষ-সমর্থনের প্রয়াস পাইবেন, ইহা সহজে বুঝা যায়। ইহার মধ্যেই

মুসোলিনী

এক জন তথাকথিত সংবাদদাতা লিখিয়াছেন যে, হাবসীরা রেডক্রশ চিহ্নের ঘোর অপব্যবহার করিয়াছে। তাহারা যখন দেখিল যে, রেডক্রশ চিহ্নযুক্ত গাড়ীতে, লরীতে হাসপাতালে বোমা বর্ষিত হয় না, তখন তাহারা অস্ত্রশস্ত্রপূর্ণ গাড়ীতে, রোগিহীন বাড়ীতে, গণিকালয়ে, অস্ত্ররক্ষার গুদামের উপর রক্ত-পতাকা উড়াইয়া দিতে থাকিল। তখন ইটালীয়ান বেচারীরা কি করেন, তাই দায়ে পড়িয়া তাঁহারা রেডক্রশ চিহ্নিত বাড়ীতে বোমা নিক্ষিপ্ত করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। এ কথার মূল্য কতখানি,তাহা বুঝা কঠিন নহে। এত দিন এ কথা কাহারও মুখে শুনা যায় নাই। যে সকল ভিন্নদেশীয় শ্বেতাঙ্গ আহতদিগের শুশ্রূষার জন্য ঐ দেশে গিয়াছিল, তাহারাও এত দিন ঘুণাক্ষরেও এই কথা প্রকাশ করে নাই। এখন এই নূতন কথা শুনিলে কে তাহা বিশ্বাস করিবে? ইটালীর ডিপ্লোমেসীর স্বরূপ কি, তাহা জানিতে কাহারও বাকী নাই। এখন জাতিসঙ্ঘ ইটালীর এই গর্হিত আচরণের সমর্থন করিবেন কি না, তাহা তাঁহারাই জানেন। জাতিসঙ্ঘের যদি প্রকৃত বল থাকে, তাহা হইলে তাঁহারা ইটালীর ঐ অনিষ্টাচরণের কৈফিয়ৎ চাহিবেন। কিন্তু ইটালী জাতিসঙ্ঘের কেরামতি বুঝিয়াছে। তাহারা কোন কথাই শুনিবে না। এখন সার এন্থনি ইডেন এবং বৃটিশ রাজনীতিকগণ কি ভাবে জাতিসঙ্ঘের বলাধান করিবেন, তাহা দেখিবার জন্য সকলেই উৎসুক রহিয়াছেন।

স্পেনে বিক্ষোভ

আজকাল য়ুরোপের নানা দেশেই রাজনীতিক ব্যবস্থা সম্বন্ধে একটা যেন কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়তার ভাব দেখা দিয়াছে। য়ুরোপ কিছুদিন গণতন্ত্রের সেবক ছিলেন। বিখ্যাত ফরাসী বিদ্রোহের ভস্মস্তূপ হইতে যে স্বাধীনতা, সাম্য এবং মৈত্রীর ধ্বনি উঠিয়াছিল, তাহার ফলে য়ুরোপের কোন কোন দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। কার্‌লাইলের ভাষায় সেই ফরাসী বিপ্লব "কলুষিত এবং ক্ষয়দশা-প্রাপ্ত স্বৈরশাসনের উপর কারামুক্ত অরাজকতার প্রকাশ্য বিদ্রোহ এবং জয়লাভ।" ঐ ফরাসী বিপ্লবের পর হইতে প্রত্যেক রাজ্যের রাজনীতিকগণ দেশে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করা উচিত কি রাজতন্ত্রকে নিয়মনিয়ন্ত্রিত করিয়া বজায় রাখা উচিত, সেই বিষয়ে চিন্তা করিতে মন দিয়াছিলেন। তাহার ফলে ফ্রান্সে শাসনপদ্ধতির দ্রুত গুরু পরিবর্ত্তন ঘটে, শেষে তথায় প্রজাতন্ত্রই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কতকগুলি রাজ্যের রাজশাসনকে নিয়মের নিগড়ে বদ্ধ করা হইয়াছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে স্পেনের শাসনব্যবস্থা লইয়া বিশেষ গোলযোগ ঘটে। যে স্পেন ষোড়শ শতাব্দীতে য়ুরোপের সর্ব্বপ্রধান রাজ্য বলিয়া গণ্য ছিল, ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে সেই স্পেন একেবারে হীনবীর্য্য এবং রাজনীতিক্ষেত্রে বিশেষ পশ্চাৎপদ হইয়া পড়ে। মধ্যে ৫ বৎসরের জন্য স্পেনে সাধারণ-তন্ত্রের অনুরাগী ব্যক্তিদিগের কর্তৃত্বকালে চারিবার বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছিল। ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে বিনা রক্তপাতে তথাকার শ্রমিক এবং উদারনীতিকদল রাজতন্ত্রকে ঐ দেশ হইতে নির্ব্বাসিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

এ স্থলে বলা আবশ্যক যে, বর্ত্তমান সময়ে স্পেনে মোটামুটি দুইটি রাজনীতিক দল দেখা দিয়াছে। উদারনীতিক এবং শ্রমিক এই দুই উপদল লইয়া তথায় "প্রগতিশীল দল" গঠিত; ইহারা তথায় সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিতে চাহে। আর একটি দলে আছেন রাজতন্ত্রের পক্ষপাতী দল, ধর্ম্মযাজকদল এবং ধনী ভূস্বামিবর্গ। এই শেষোক্ত দলকে কতকটা রাজতন্ত্রী দল বলা যাইতে পারে। বহু-কাল ধরিয়া এই দুই দলে ক্ষমতা লইয়া কাড়াকাড়ি চলিতেছে। ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে প্রগতিশীল দলই নির্ব্বাচনে জয়ী হইয়া স্পেনে রাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করে। কিন্তু ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে রাজতন্ত্রী দল আবার জয়লাভ করিয়া সমাজতন্ত্রী দলের সমস্ত ব্যবস্থা বিপর্য্যস্ত করিয়া দিয়াছিল। কিন্তু তাহারা অনেক কার্য্যে জনসাধারণের অসুবিধা করাতে এক সম্প্রদায়ের লোক বড়ই অসন্তুষ্ট হইয়া উঠে। ফলে ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে আবার প্রজাতন্ত্রী দলের জয়লাভ হয়। এই জয়-লাভে প্রজাতন্ত্রীদের সংখ্যা রাজতন্ত্রীদিগের সংখ্যা অপেক্ষা বেশী অধিক হয় নাই, কিছু অধিক হইয়াছে। স্পেনে ভোটদাতার সংখ্যা ১ কোটি ৩৫ লক্ষ ২৮ হাজার ৬ শত ৯ জন। তন্মধ্যে সরকারী

হিসাবে ৯৪ লক্ষ ৮ হাজার ৫ শত ১৪ জন ভোটার এই নির্ব্বাচনে ভোট দিয়াছিল। ইহাদের মধ্যে ৫০ লক্ষ ৫১ হাজার ৯ শত ৫৫ জন রাজতন্ত্রের পক্ষপাতী দলের অনুকূলে এবং ৪৩ লক্ষ ৫৬ হাজার ৮ শত ৫৯ জন ভোটদাতা প্রজাতন্ত্রীদিগের পক্ষে ভোট দিয়াছিল। কিন্তু স্পেনের নির্ব্বাচন-নিয়মের এইরূপ ব্যবস্থা যে রাজতন্ত্রীদিগের পক্ষে ভোটের সংখ্যা অধিক হইলেও প্রজাতান্ত্রিকদিগের পক্ষে অধিক সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। প্রজাতান্ত্রিক সদস্য হইয়াছেন ২ শত ৬৬ জন—রাজতান্ত্রিক সদস্য হইয়াছেন ২ শত ১৭ জন। সুতরাং স্পেনীয় পার্লামেণ্ট কর্টেসে প্রজাতান্ত্রিক দল ৪৯ জন সদস্য অধিক পাইল। এইবার রাজতন্ত্রীদিগের তাহাদের ভূতপূর্ব্ব রাজা ত্রয়োদশ আলফান্সোকে সিংহাসনে বসাইবার সমস্ত আশাই নৈরাশ্যের পারাবারে নিমজ্জিত হইয়া গেল। এবার হাতে ক্ষমতা পাইয়া প্রজাতন্ত্রী পক্ষ আপনাদের স্বার্থ কায়েম করিয়া লইবার চেষ্টা করিতেছেন। তাঁহারা সরকারের সমস্ত বিভাগেই প্রজাতন্ত্রের পক্ষপাতী লোকদিগকে বসাইতেছেন। বৈতনিক কোন রাজ-পুরুষের পদে তাঁহারা রাজতন্ত্রের পক্ষপাতী লোকদিগকে বসাইবেন না। তবে তাহা যদি একান্ত সম্ভব না হয়, তাহা হইলে রাজভক্ত-দিগকে বড় বড় পদ প্রদানে সম্মত হইবেন না; কিন্তু তাঁহারা বুঝিয়াছেন যে, দেশে অধিকাংশ ভোটারই রাজতন্ত্রীদিগের পক্ষে ভোট দিয়াছেন। সুতরাং তাঁহারা স্পেনের বিচক্ষণ জননায়ক সেনর আজানাকে তাঁহাদের রাজনীতিক তরণীর কাণ্ডারীপদে প্রতিষ্ঠিত করেন। সেনর আজানা বলেন যে, তিনি সম্পূর্ণ নিরপেক্ষভাবে রাজকার্য্য পরিচালিত করিবেন। তাঁহার ঐ উক্তির এবং তদনুযায়ী কার্য্যের ফলে রাজতন্ত্রী দল অনেকটা আশ্বস্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু সমাজতন্ত্রী দল, বিশেষতঃ তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা উগ্রপন্থী, তাঁহারা উদ্বিগ্ন হইয়া উঠেন। তাঁহারা তখন মুখের মুখস খুলিয়া ফেলিয়া আপনাদের প্রকৃত মূর্ত্তি বাহিরে প্রকাশ করিতে থাকিলেন। তাঁহারা বুলি ধরিলেন যে, সেনর আজানা জনসাধারণের স্বার্থ-হানি করিতেছেন। তাঁহারা বলেন, সমর বিভাগকে মলিনতাশূন্য এবং শাসনযন্ত্রকে বিশুদ্ধ করিতে হইবে, অর্থাৎ উগ্রপন্থীরা প্রজাতন্ত্রীদিগের অনুকূলভাবে সমর এবং শাসন বিভাগ গঠন করিতে চাহেন। এই ব্যাপার লইয়া বিবাদ বাধিয়া উঠে।

কেন্দ্রী পক্ষ হইতেই প্রথম হাঙ্গামা উপস্থিত করা হয়। মাদ্রিড (Madrid) এবং গ্রাণাডার গীর্জ্জাগুলিতে অগ্নিপ্রদান এবং লোগ্রোনো অঞ্চলের (উত্তর-স্পেনের) বিস্তীর্ণ অঞ্চল ভস্মীভূত করা হইল। পল্লী অঞ্চলে কৃষীবল তাহাদের ভূস্বামীর সম্পত্তি আপনাদের মধ্যে বিভক্ত করিয়া লইতে বসিয়া গেল। তাহাদিগকে এই কার্য্যে প্রেরণা দিবার জন্য বেতনভোগী লোকরা যাইয়া উৎসাহ দিতে থাকিল। বিপ্লব-সংঘটনের অনুকূল মনোবৃত্তি উত্তেজিত করিবার জন্য চেষ্টা হইতে লাগিল এবং যাহারা বিশৃঙ্খলতা এবং অরাজকতার সৃষ্টি করিয়া আনন্দ পায়, তাহারা জনসাধারণকে সর্ব্বপ্রকার কড়াকড়ি এবং অনাচার করিতে প্রেরণা দিতে থাকিল। আজানা কর্তৃক পরিচালিত সরকার এই অশান্তির দমন করিবার জন্য বিশেষভাবে চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু তিনি শেষ পর্য্যন্ত দেশের শান্তিরক্ষায় সমর্থ হইবেন কি না, সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। অনেকে আশঙ্কা করিতেছেন যে, শেষে হয় ত তাঁহাকে পরাজিত হইয়া কার্য্য ত্যাগ করিতে হইবে। চরমপন্থীদিগের মধ্যে যাঁহারা আজানার পক্ষ সমর্থন করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন, তাঁহারা কাণাকাণে সরিয়া দাঁড়াইলেন। সেই জন্য অনেকে শঙ্কা করিতেছেন যে, বর্ত্তমান সরকার হাঙ্গাম-হুজ্জৎ দমন করিতে সমর্থ হইবেন না। অগত্যা তাঁহাদিগকে হয় ত কর্ম্মত্যাগ করিতে হইবে।

স্পেনের প্রগতিশীল দল বা সমাজতান্ত্রিক দল প্রায় সকলেই সর্ব্বস্বত্ববাদী। তাহারা এখন সুবিধা পাইলেই স্পেনে রুসিয়ার অনুকরণে সর্ব্বস্বত্ববাদী সরকারের বা সোভিয়েট সরকারের প্রতিষ্ঠা করিবে, এই ভাবের আশঙ্কা অনেকের মনে জাগিতেছে। সেনর আজানা সমাজতন্ত্রবাদী দলের নায়ক বলিয়া পরিজ্ঞাত ছিলেন। কিন্তু তিনি নিরপেক্ষভাবে শাসনযন্ত্র পরিচালিত করিতে যাইয়া উগ্রপন্থী সর্ব্বস্বত্ববাদীদিগের বিরাগভাজন হইয়াছেন। এখন প্রশ্ন হইতেছে, আজানা সমাজতন্ত্রবাদীদিগকে এবং সর্ব্বস্বত্ববাদীদিগকে দমনে রাখিতে পারিবেন কি না? প্রশ্নটি সঙ্গীন। স্পেনের ভূতপূর্ব্ব প্রধান সচিব, কেন্দ্রী দলের নায়ক ম্যানুয়েল পোর্টেলা বলিয়াছেন যে—আজানার সহিত সমাজতন্ত্রবাদীদিগের অচিরেই বিচ্ছেদ হইবার আশঙ্কা আছে। যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে আজানা কেন্দ্রী দলভুক্ত সদস্যগণের সহায়তায় এবং রাজতন্ত্রীদিগের আনুকূল্যে স্পেনের প্রতিনিধি সভা নিয়ন্ত্রিত করিতে সমর্থ হইবেন। কলভো মোটেলো 'লণ্ডন টেলিগ্রাফের' নিকট বলিয়াছেন যে, বর্ত্তমান সময়ে রাজতন্ত্রীদলের প্রত্যেকেই আশা করিতেছেন যে, প্রধান সচিব আজানা সোভিয়েটদিগকে দমন করিতে সমর্থ হইবেন! কিন্তু যখন তাঁহার উগ্রপন্থীদিগের সহিত প্রেমে ভাটা পড়িবে, তখনই অবস্থা সঙ্গীন হইয়া উঠিবে। ১৯৩১ খৃষ্টাব্দ হইতেই রাজপক্ষ সমাজ-তান্ত্রিক পক্ষকে গীর্জ্জায় অগ্নিপ্রদান, ধর্ম্মায়তনকে অপবিত্রীকরণ এবং মঠগুলি ধ্বংস করিবার জন্য দায়ী করিয়া আসিতেছেন। স্পেনের প্রতিনিধি সভায় আজানা একবার এক বক্তৃতাপ্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন যে—স্পেনের লোক আর রোম্যান ক্যাথলিক ধর্ম্মাবলম্বী নাই। তাঁহার সে কথায় রাজতন্ত্রী দল বিশেষ বিক্ষুব্ধ এবং সমাজতন্ত্রী দল অত্যন্ত প্রীত হইয়া উঠিয়াছিল। ১৯৩১ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত সেনর আজানা যে শাসনযন্ত্র পরিচালিত করিয়াছিলেন, তাহাতে পোপের সহিত তখনকার স্পেনীয় সরকারের বিশেষ সম্প্রীতি ছিল না। সে সময়েও মঠগুলি জ্বালাইয়া দেওয়া হয়, কার্ডিনাল সেগুরাকে (Segura) রাজনীতিক ব্যাপারে হস্তক্ষেপের অভিযোগে দেশ হইতে বিতাড়িত করা হয় এবং ধর্ম্মবিষয়ের সহিত রাষ্ট্রীয় বিষয়ের একেবারে পৃথক করা হয়। ধর্ম্মের সহিত রাষ্ট্রের সম্বন্ধ সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। সেই সময় জেসুইট সম্প্রদায়কে ছত্রভঙ্গ করিয়া দেওয়া এবং পোপের সহিত স্পেনের সম্বন্ধ রহিত করিয়া দেওয়া হয়। ফলে সে সময়ে স্পেনকে সর্ব্বস্বত্ববাদের দিকে কতকটা অগ্রসর করিয়া দিবার চেষ্টা করা যে না হইয়াছিল, তাহা নহে। তাহার পর ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে আবার যখন রাজতন্ত্রীরা শাসনকার্য্য পরিচালনের ভার পাইয়াছিলেন, তখন প্রেসিডেণ্ট নিমেটো আলকালা জামোরা পোপের সহিত আবার ঘনিষ্ঠতা করিতে আরম্ভ করেন। আজানা এখন বলিতেছেন—তাঁহারা কাহাকেও উৎপীড়িত করিতে চাহেন না। আমরা উদারভাবে লোকের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য শাসনযন্ত্র পরিচালিত করিতেছি। রোম্যান ক্যাথলিকই হউন আর প্রোটেষ্টাণ্টই হউন অথবা মুসলমানই হউন, কেহই আমাদের দ্বারা

হইবেন না। কিন্তু তাহা হইলেও স্পেনে শান্তি নাই। ধর্ম্মস্থানগুলির উপর উপদ্রব চলিতেছে। দাঙ্গা-হাঙ্গামাও হইতেছে। মধ্যে মধ্যে গুলীও চলিতেছে, খুন-জখমও হইতেছে। ইহার শেষ পরিণতি কোথায়, তাহা বুঝা কঠিন।

য়ুরোপে রণরঙ্গ

য়ুরোপে আবার রণরঙ্গ উপস্থিত। ইটালী আচম্বিতে যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইয়েছে। তথায় চারিদিকে সাজ সাজ রব পড়িয়া গিয়াছে। উত্তর-ইটালীতে অনেক স্কুল-গৃহ আছে। সমস্ত স্কুল বা বিদ্যালয়ের ছুটী দেওয়া হইয়াছে। ঐ সকল বিদ্যালয়ে সামরিক প্রয়োজনে সৈনিক সমাবিষ্ট করা হইবে শুনা যাইতেছে। নৌ-বিভাগের যে সকল সৈনিককে বিশেষ প্রয়োজনের জন্ম রাখা

ডাঃ সুচানগ

হইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে কতকগুলিকে যুদ্ধার্থ হাজির করা হইতেছে আর দুই শ্রেণীর বিশেষ সৌনকদলকে যুদ্ধের জন্ম প্রস্তুত হইতে বলা হইয়াছে। জেনিভাস্থিত ইটালীয়ানদিগকে শীঘ্রই সংগ্রামের জন্ম দলবদ্ধ হইতে বলা হইয়াছে। ফরাসী এবং যুগোপ্লাভ সীমান্তে সামরিক আয়োজন চলিতেছে। কেন এই ব্যাপার, তাহা কেহ ঠিক করিতে পারিতেছে না। কেহ কেহ অনুমান করিতেছেন যে, মার্শাল বাড্‌গ্লিওকে আবিসিনিয়া হইতে ডাকিয়া আনা হইয়াছে, তাহার কারণ যদি ইটালীতে শাস্তিদানমূলক ব্যবস্থাগুলি জোরে চালান হয়, তাহা হইলে ইটালীও কাহাকেও ছাড়িয়া কথা কহিবে না। অথবা ইহার উদ্দেশ্য ইহা হইতে পারে যে, অষ্ট্রিয়ায় হাপ্‌সবর্গবংশীয় রাজাকে সিংহাসন দিবার জন্ম ইটালী এবং জার্ম্মাণীতে একটা চুক্তি হইয়া গিয়াছে। সম্প্রতি অষ্ট্রিয়ার ডাক্তার সুচনিগ, ইটালীর টাঙ্কনাস্থিত 'ভাইয়া বেগিও' নামক স্থানে আসিয়াছেন। সম্ভবতঃ সেই স্থানেই তিনি মুসোলিনীর সহিত সাক্ষাৎ করিবেন। এখন এই ব্যাপার লইয়া ফ্রান্সে কোনরূপ চাঞ্চল্য উপস্থিত হইবে কি না, কে বলিতে পারে? সংবাদ যেরূপ সংক্ষিপ্ত, তাহাতে কোন কিছুই ঠিক বুঝা যাইতেছে না। জাতি-সঙ্ঘও এই ব্যাপারে আতঙ্কিত। ফলে য়ুরোপের রাজনীতিক আকাশের ভাব ভাল নহে।

বৃটেনের কর্ত্তব্য

গ্রেট বৃটেনের পররাষ্ট্রনীতি লইয়া এখন সর্ব্বত্রই আন্দোলন এবং আলোচনা চলিতেছে। ইটালী জাতিসঙ্ঘের অন্যতম সদস্য আবিসিনিয়াকে অকারণে এবং অন্যায় ভাবে আক্রমণ করিল, জাতি-সঙ্ঘের ৫০টি জাতি একবাক্যে বলিল যে, ইটালীর কার্য্যটি অত্যন্ত গর্হিত হইয়াছে, সুতরাং ইটালীর এই কার্য্যে বাধা দেওয়া আবশ্যক। গ্রেট বৃটেন লীগের কথা সমর্থন করেন। জাতিসঙ্ঘের কথা অমান্য করিয়া ইটালী গায়ের জোরে ইথিওপিয়া রাজ্যটি গ্রাস করিতে লাগিল বলিয়া জাতিসঙ্ঘ ইটালীকে (যুদ্ধ না করিয়া) শাস্তি দিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, তাহা পাঠক জানেন। ইটালী তাহা গ্রাহ্য না করিয়া ঐ দুর্ব্বল রাজ্যটিকে গ্রাস করিয়া ফেলিল। ইটালীকে শাস্তি দিবার যে ব্যবস্থা করা হইয়াছিল, তাহা তেমন জোর করিয়া করা হয় নাই,—অধিকন্তু সকলে তাহা মানেন নাই, তাই ইটালী তাহাতে কিছু অসুবিধায় পড়িলেও নিজ উদ্দেশ্যসাধনে পশ্চাৎপদ হয় নাই। সে যুদ্ধে ক্ষান্ত হয় নাই, পরন্তু বিস্তীর্ণ আবিসিনিয়া রাজ্যটি গ্রাস করিয়া বসিয়াছে। জাতিসঙ্ঘ বলিতেছেন যে—এত শীঘ্র যে যুদ্ধ শেষ হইবে, তাহা তাঁহারা ভাবেন নাই। এটা যে একটা বাজে অজুহাত, তাহা বলাই বাহুল্য। রণ-বিমান হইতে বিষময় বাষ্পপূর্ণ বোমা নিক্ষিপ্ত করিয়া দুর্ব্বল জাতির লোকক্ষয় করিলে তাহারা কতক্ষণ তাহা সহিতে পারে? তাহার উপর পয়সা দিয়া সামন্ত রাজাদিগকে ভাঙ্গাইলে আর উপায় কি? সুতরাং এ যুদ্ধ যে দীর্ঘকালস্থায়ী হইবে না, তাহা বুঝা উচিত ছিল। যাহা হউক, গ্রেট বৃটেন জাতিসঙ্ঘের শাস্তিদানের সিদ্ধান্তের বিশেষ সমর্থন করিয়া আসিয়াছেন। তাঁহারা বলিয়াছিলেন, শাস্তি-দানের ব্যবস্থাটা বেশ ভালভাবে চালাইতে হইবে। আবিসিনিয়া বিনীত হইলেও তাহা রহিত করা হইবে না,—এরূপ ভাবও গ্রেট বৃটেন আকারে ইঙ্গিতে ব্যক্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু এখন দেখিতেছি, বৃটিশ রাজনীতিকরা ঠিক উহার বিপরীত কথা বলিতেছেন! গত ১৮ই জুন ৪ঠা আষাঢ় কমন্স সভায় সার এন্থনি ইডেন বলিয়াছেন যে, ইটালীকে শাস্তি দিবার ব্যবস্থা সমস্তই ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে, সুতরাং আর ঐ ব্যবস্থা বহাল রাখা সঙ্গত হইবে না। এই ব্যাপারের দুইটি দিক আছে, একটি স্বার্থের দিক, আর একটি ন্যায়ের দিক। স্বার্থের দিক হইতে বিবেচনা করিলে দেখা যায়, এই শাস্তি-দানের ব্যবস্থাটি দ্বারা আর্থিক দিক দিয়া ইটালীর কতকটা অসুবিধা ঘটিয়াছে সত্য, কিন্তু উহার ফলে জাতিসঙ্ঘ ইটালীকে দস্যুতা এবং পরধন-লুণ্ঠনের ব্যাপার হইতে নিবৃত্ত করিতে পারে নাই। সেই জন্ম মিষ্টার বল্ডুইন কর্তৃক পরিচালিত বৃটিশ সরকার স্থির করিয়াছেন যে, এই শাস্তিদানের ব্যবস্থা তিরোহিত করিয়া দেওয়া এবং ইটালীর সহিত কিরূপ সম্বন্ধ করিতে হইবে, সে বিষয়ে নূতন করিয়া বিবেচনা করিতে হইবে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, ইটালী যখন তাহার জিদ সদম্ভে বজায় রাখিল, তখন বৃটিশ সরকার তাঁহাদের

মতটা একেবারে পাণ্টাইয়া ফেলিলেন। সুবিধাবাদের দিক হইতে ইহা মন্দ হয় নাই। য়ুরোপে এখন মুসোলিনীর সহায়তার প্রয়োজন আছে। কারণ, ইটালী যদি জার্ম্মাণীর সহিত যোগ দেয়, তাহা হইলে চিন্তার কারণ ঘটিবে। কাযেই মুসোলিনীকে আর অসন্তুষ্ট করা সঙ্গত নহে। ইহা অবশ্য সুবিধাবাদের কথা। জাতিসঙ্ঘ এখনও এ বিষয়ে কোন কথা বলেন নাই। জুন মাসের শেষ ভাগে জাতিসঙ্ঘ এই বিষয়ে কি করিবেন, তাহা স্থির করিবেন। তবে বৃটিশ পররাষ্ট্রসচিব সার এন্থনি ইডেন বলিয়াছেন যে, বৃটিশ জাতি বরাবরই সকলে একযোগে কার্য্য করিবার অনুকূলে মত দিয়াছেন। এখনও তাঁহারা লীগের কার্য্যেরই সমর্থন করিবেন। সার এন্থনি ইডেন স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, বৃটিশ জাতি মূলনীতি পরিহার করিতে ইচ্ছা করেন না। পক্ষান্তরে তাঁহারা একই মূলনীতির অনুসরণ করিয়াই চলিবেন এবং সম্মিলিতভাবে কার্য্য করাই তাঁহাদের লক্ষ্য থাকিবে। অতএব জাতিসঙ্ঘ যাহা করিবে, তাঁহারা তাহারই পূর্ণমাত্রায় সমর্থন করিবেন। সার এন্থনি বলিয়াছেন যে, "আমরাই জাতিসঙ্ঘ নহি। আমরা জাতিসঙ্ঘের সদস্য মাত্র। জাতিসঙ্ঘ ৫০টি জাতির সভা।" এই সঙ্ঘ যাহা নির্দ্দেশ করিবেন, ইংরেজ জাতি তাহাই মানিয়া লইবেন এবং তদনুসারে কার্য্য করিবেন। উপসংহারেও তিনি বলিয়াছেন যে, পররাষ্ট্রসচিব হিসাবে তিনি সরকারকে যে পরামর্শ দিয়াছেন, তাহা বিশেষ বিবেচনা করিয়া বৃটিশ সরকার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, আর ইটালীকে চাপ দিবার জন্য শাস্তিদানমূলক ব্যবস্থাগুলি বহাল রাখা উচিত নহে। পররাষ্ট্রসচিব বৃটিশ সরকারের এই নীতির কথা বলিয়া বসিলে কমন্স সভাস্থিত সরকারের প্রতিপক্ষ দলের সদস্যগণ 'শেম শেম' এবং "ইস্তফা দাও ইস্তফা দাও" রবে সভাগৃহ মুখরিত করিয়াছিলেন।

বৃটিশ সরকারের এই নীতি কোনমতেই ন্যায়সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। অবশ্য বৃটিশ সরকার লীগের মতানুসারে চালিত হইবেন বলিয়াছেন। কিন্তু লীগের মত যে বৃটিশ এবং ফরাসী মত দ্বারা বিশেষভাবে চালিত হয়, এ ধারণা অনেকের মনেই দৃঢ়বদ্ধ হইয়া গিয়াছে। সে ধারণা ভুল কি সত্য, আমরা এ স্থলে তাহার আলোচনা করিব না। যদি ইহাই সত্য হয় যে, লীগের ৫০টি দেশের সদস্য পরামর্শ করিয়া এই সিদ্ধান্ত করেন যে, ইটালীকে শাস্তিদানমূলক ব্যবস্থা প্রত্যাহার করিয়া লইতে হইবে,—তাহা হইলে কি লীগেরও মর্য্যাদা অধিকতর ক্ষুণ্ণ হইবে না? লীগ যদি দুর্ব্বলের সহায়রূপে বিরাজ না করেন, তাহা হইলে তাঁহাদের থাকিবার প্রয়োজন কি আছে, তাহা আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারি না। যে সভা তেজীয়ানদিগের সহিত একরূপ ব্যবহার করে,—আর নিস্তেজ জাতির সহিত অন্যরূপ ব্যবহার করে, সে সভার থাকা অপেক্ষা না থাকাই অনেক ভাল। সে সভার সিদ্ধান্ত কেহ ন্যায়সঙ্গত বলিয়া মনে করিতে পারে না। বিচারক যদি পাত্র বিবেচনায় তাঁহার ন্যায়ের নিক্তিটি ঘুরাইয়া দেন, তাহা হইলে সেই বিচারক, তিনি ব্যক্তিই হউন আর প্রতিষ্ঠানই হউন, বিচারকপদে অধিষ্ঠিত থাকিবার যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইতে পারেন না। আজ ইটালী অতি ভীষণ অপরাধ করিলেও যদি জাতিসঙ্ঘ তাহাকে রেহাই দেন, তাহা হইলে কাল ঐ প্রতিষ্ঠান কোন্ মুখে অন্য অপরাধী বলিয়া বিবেচিত জাতিকে শাস্তি দিবেন? জাতিসঙ্ঘের এই আচরণ কেবল উহার নিজ ক্ষীণ মর্য্যাদাটুকু বিলুপ্ত করিয়া দিল না,—পরন্তু সমস্ত শ্বেতাঙ্গ জাতিরও তাহারা সম্মানহানি করিল। সার এন্থনির এই বক্তৃতা শুনিয়া বিলাতের বহু লোক অসন্তুষ্ট হইয়া উঠিয়াছেন বলিয়া বোধ হইল। য়ুরোপীয় মহাযুদ্ধের পর হইতে এ পর্য্যন্ত বৃটিশ জাতি কথনই এমন দুরূহ সমস্যার সম্মুখীন হন নাই। ইটালীর শুভ ইচ্ছা ক্রয় করিবার জন্য বৃটিশ জাতিকে যে মূল্য দিতে হইল, তাহা কোনমতেই উপেক্ষণীয় বলিয়া মনে হইল না। উহা যেন কাচের বদলে কাঞ্চন দেওয়া হইল। এ কথা সত্য যে, রাজনীতিক ক্ষেত্রে এত দিন যে অবস্থা ছিল, এখন সে অবস্থা আর নাই। এখন উহার অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। বিগত মহাযুদ্ধে সকলকেই বিশেষ ক্ষতি এবং কষ্ট স্বীকার করিতে হইয়াছে। বিজ্ঞানের প্রগতিফলে দেশের দূরত্ব হ্রাস পাইয়াছে। ইচ্ছায় হউক আর অনিচ্ছাতেই হউক, এখন সকল জাতিকে পরস্পর ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা করিতে হইতেছে। অগত্যা দ্বৈপায়ন বৃটিশ জাতিকে সেই জন্য য়ুরোপীয় মহাদেশস্থ জাতিদিগের সহিত ঘনিষ্ঠতা করিতে হইতেছে। কাযেই বৃটিশ জাতির পররাষ্ট্রচিন্তায় ক্রমশঃ জটিলতা বৃদ্ধি পাইতেছে। নানা বিভিন্ন জাতির সম্মিলনফলে বিভিন্ন স্বার্থের সংঘট্ট উপস্থিত হইতেছে। শান্তি রক্ষা করা কঠিন হইয়া উঠিতেছে। ইটালীর ব্যাপার দেখিয়াই মনে হইতেছে যে, এখন শান্তিরক্ষাকার্য্য বিঘ্নবহুল হইয়া পড়িতেছে। শান্তিরক্ষা করিতে হইলে পূর্ব্বাপেক্ষা এখন অধিক স্বার্থত্যাগ করিতে হইবে। এখন গ্রেট বৃটেন শান্তির পক্ষপাতী। তাঁহারা ইটালীর সহিত মিত্রতা করিতে চাহেন। হায় য়ুরোপীয় রাজনীতি!

চীন ও জাপান

প্রাচীতে এবার আবার নিয়তি রণরঙ্গিণী-মূর্ত্তিতে দেখা দিতেছেন। ইতোমধ্যেই তাঁহার অট্টহাস্য শুনা যাইতেছে। এবার মনে হইতেছে, জাপানের সহিত চীনের সংগ্রাম আসন্ন হইয়া পড়িয়াছে। উত্তর-চীনে এবার চীন-জাপানে সংগ্রাম বাধিবে বলিয়া মনে হইতেছে। ঐ অঞ্চলে জাপানের গতিবিধিতে চীন রুষ্ট হইয়াছে,—এ সংবাদ পাঠক জানেন। আমরা সে কথা পাঠকদিগকে যথাসময়ে জানাইয়াছি। জাপান চাহে চীনকে বশীভূত করিতে। তাহারা চীনের মাঞ্চুরিয়া অঞ্চলকে মাঞ্চুকুয়ো নামে এক স্বতন্ত্র রাজ্যে পরিণত করিয়াছে। ঐ রাজ্যটি নামতঃ স্বাধীন হইলেও কার্য্যতঃ জাপানেরই একান্ত বশীভূত। তাহার পর জাপান উত্তর-চীনের পাঁচ ছয়টি পরগণাকে নিজ আয়ত্তমধ্যে রাখিবার চেষ্টা পাইতেছেন। চীন অবশ্য তাহা সহ্য করিতে পারে না। কাযেই চীনাদের মন এই ব্যাপারে অতিশয় বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিয়াছে। উত্তর-চীনের কর্তৃপক্ষ এই ব্যাপারে কি কর্ত্তব্য, তাহা স্থির করিতে অসমর্থ হইয়াছেন। তাঁহারা যেন কতকটা ইতস্ততঃ করিতেছেন। কিন্তু দক্ষিণ-চীনের সরকার অর্থাৎ ক্যাণ্টন সরকার ইহা যেন সহ্য করিতে পারিতেছেন না। তাঁহারা চীনের নাঙ্কিনস্থ কেন্দ্রী-সরকারকে জাপানের সহিত যুদ্ধ-ঘোষণা করিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছেন। কিন্তু কেন্দ্রী-সরকারের যুদ্ধ-ঘোষণা করিতে ইতস্ততঃ করিতে দেখিয়া ক্যাণ্টন সরকার অসন্তুষ্ট হইয়া উঠিয়াছেন। উভয় সরকারে

মধ্যে যেন একটা বিরোধ বাধিবার সম্ভাবনা ঘটিয়াছে। অবশ্য বিবাদ যে বাধিবে, এমন কথা আমরা বলিতেছি না। চীনার তরুণ-সম্প্রদায় এতদূর বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিয়াছে যে, তাহারা দলে দলে মিছিল বাহির করিয়া সাংহাইয়ের রাজপথে জাপানের বিরোধী নানারূপ বাক্য ও শব্দ উচ্চারণ এবং জাপানের বিরুদ্ধে সাধারণের মনোভাব উত্তেজিত করিবার জন্য জলন্ত ভাষায় লিখিত বিজ্ঞপ্তি-পত্র বিলি করিতে করিতে গিয়াছিল। উহারা দিবসত্রয়ব্যাপী হরতাল এবং দেশের চাষী এবং সৈনিকদিগকে জাপানীদিগের দ্বারা যে ক্ষতি সাধিত হইতেছে, তাহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইবার জন্য উত্তেজিত করিয়াছিল।

এই উপলক্ষে চীনের পুনরভ্যুদয়সাধনের নেতা হুসি যে কথাগুলি বলিয়াছেন, জাপানের তাহা বিশেষভাবে প্রণিধান করিয়া দেখা কর্ত্তব্য। জাপান কথায় কথায় চীনকে তাঁহার বন্ধু বলেন, কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে তাঁহারা চীনের সর্ব্বনাশসাধনে কশুর করেন না। জাপানের কর্ত্তৃপক্ষ জোর করিয়া চীনা-সরকারকে এই মর্ম্মে এক আদেশ জারি করাইতে বাধ্য করিয়াছেন যে, কোন চীনাই আর জাপানীদিগের বিরুদ্ধে কোনরূপ বাক্য উচ্চারণ বা মন্তব্য প্রকাশ করিতে পারিবেন না। মন্তব্য প্রকাশই না হয় বন্ধ হইল, মনের যাহা ভাব, তাহা ত বন্ধ করা সম্ভবে না। জাপানীরা এই সোজা কথা বুঝিতেছে না কেন? জাপান মুখে বলিতেছে যে, সে চীনকে সাহায্য করিতেছে, কিন্তু কাযে চীনের সার শোষণ করিতেছে। সরকারী ঘোষণা বা আইন মানুষের মনোভাব বা চিন্তার ধারা বদলাইয়া দিতে পারে না। চীনের অধিবাসীরা জানে যে, জাপানের সামরিক শক্তি চীনাদিগের সামরিক শক্তি অপেক্ষা অনেক অধিক। তাই তাহারা বিশেষ কিছু করিয়া উঠিতে পারিতেছে না। জাপান চীনের মাঞ্চুরিয়া অঞ্চলটি লইয়াই ক্ষান্ত হইল না, তাহারা তাহার উপর জেহোল অঞ্চলটি ফাউ হিসাবে গ্রহণ করিল। চাহার অঞ্চলটি না লইলে জেহোল অঞ্চলটি গ্রহণ করা সার্থক হয় না, অতএব লও চাহার। এই প্রকারে জাপান উত্তর-চীনের একে একে পাঁচ পাচটি প্রদেশ দখল করিয়া বসিয়াছে। জাপানীদিগের লোভ অসীম হইতে পারে, কিন্তু চীনাদিগের ধৈর্য্যেরও ত একটা সীমা আছে। জাপানের কোনমতেই ৪০ কোটি চীনার বিরাগভাজন হওয়া উচিত নহে। হুসির এই কথাগুলি জাপানের বিশেষভাবে পর্য্যালোচনা করিয়া দেখা উচিত। জগতে জাপানের কোন বন্ধু নাই। বরং শ্বেতকায় জাতিরা জাপানের বিরুদ্ধে পীতাতঙ্কের উদ্দীপনা করিয়া একজোটা হইবার চেষ্টা করিতেছে। সে বিষয়টি জাপানের উপেক্ষা করা সঙ্গত হইবে না। জাপান বিগত ৬০ বৎসরে যে উন্নতি করিয়াছে, তাহা ধরাবাসীর বিস্ময় জন্মাইয়া দিয়াছে। জাপান যদি বুঝিয়া চলে, তাহা হইলে তাহার ভবিষ্যৎ সমুজ্জ্বল এবং তাহার সাম্রাজ্য ক্রমশঃ প্রগতির পথে ধাবিত হইবে। জাপানের পক্ষে এখন হীনভাবে নিজ সঙ্কীর্ণ স্বার্থ না দেখিয়া উদারভাবে বিশ্বমানবের বিরাট স্বার্থ দেখিয়া চলা উচিত।

জাপানের বিষয় চিন্তা করিলেই হৃদয়ে নৈরাশ্যের সঞ্চার হয়। জাপানে এখন গণতন্ত্রতা ঘুচিয়া যাইয়া সামরিক স্বৈরিতা প্রতিষ্ঠিত হইতে বসিয়াছে। জাপান চিরদিনই বিধি-নিষেধ মানিয়া চলিয়াছে, আইনের সম্মান রাখিয়াছে, এখন কিন্তু তথায় সামরিকদিগের খোসখেয়াল প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। জাপান স্বীয় সামরিকতার জন্য যে অবস্থার উদ্ভব করিয়াছে, তাহার মধ্যে আত্মরক্ষা করিতে হইলে সামরিক বল যেরূপ তাহার পক্ষে প্রয়োজন, তাহা তাহার নাই। এ দিকে সামরিক বলবৃদ্ধি করিতে হইলে অস্ত্রের সন্দেহভাজনও হইতে হয়, সেটাও বড় নিরাপদ নহে। এখন জাপানের পক্ষে বুদ্ধি স্থির করিয়া কর্ত্তব্যপথ নির্দ্ধারণ করা কর্ত্তব্য।

ইহার পর আরও যে সংবাদ আসিয়াছে, তাহা অত্যন্ত ভীষণ। চীন যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতেছে। চীনের দক্ষিণ-পশ্চিমস্থিত রাজনীতিক কাউন্সিল কোয়াণ্টাংএর সেনাপতি চেন-চিটানকে এবং কোয়াংসির সেনানায়ক লিচ উঙ্গেনকে যথাক্রমে জাপান-বিরোধী জাতীয় মুক্তিবাহিনীর প্রথম এবং চতুর্থ দলের সেনাপতি পদে নিযুক্ত করিয়াছেন। ইহাদিগের উভয়কেই চীনের উত্তর অঞ্চলে অভিযান করিবার জন্য সৈন্যদিগকে প্রস্তুত রাখিবার আদেশ দেওয়া হইয়াছে। এ দিকে সাংহাই হইতে সংবাদ আসিয়াছে যে, ক্যাণ্টনস্থ জাপানী কর্ত্তৃপক্ষ এই মর্ম্মে এক বিজ্ঞপ্তি প্রচার করিয়াছেন যে, উক্ত সহরের অধিবাসী জাপানীরা যেন এমনভাবে প্রস্তুত থাকেন যে,তাঁহারা নোটিশ পাইবার সঙ্গে সঙ্গেই যেন ক্যাণ্টন পরিত্যাগ করিতে পারেন। কোয়াণ্টাং এবং কোয়াংসির ৬০ জন সেনাপতি এই মর্ম্মে এক ইস্তাহার প্রচার করিয়াছেন যে, আবশ্যক হইলে যুদ্ধ করিয়াও জাপানের কার্য্যের প্রতিরোধ করিতে হইবে। ঐ সকল সেনাপতি এতই অধীর হইয়া উঠিয়াছেন যে, তাঁহারা বলিতেছেন যে, তাঁহাদিগকে অবিলম্বে জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিবার হুকুম দেওয়া হউক। তাঁহারা অন্য সকল সেনাপতিকেও এই অনুরোধ জানাইয়াছেন যে, তাঁহাদের সকলকে একযোগে তাঁহাদের দেশের শত্রু জাপানীদিগকে দেশ হইতে বিদূরিত করিবার জন্য সংগ্রাম করিতে হইবে। ফলে অবস্থা ক্রমশঃ সঙ্কটাপন্ন হইয়া উঠিল। শীঘ্রই হয় ত যুদ্ধ বাধিতে পারে। তবে এখনও যুদ্ধ বিঘোষিত হয় নাই। কেন্দ্রী সরকার অর্থাৎ নাঙ্কিন সরকার যুদ্ধ ঘোষণা না করিলে যুদ্ধ হইবে না।

চীনের শেষ কথা

ইহার পর সংবাদ আসিয়াছে যে, চীনে গৃহযুদ্ধ বাধিয়া যাইবার প্রবল সম্ভাবনা জন্মিয়াছে। মধ্যে সংবাদ পাওয়া যায় যে, চীনে গৃহযুদ্ধ বাধিয়াই গিয়াছে। ২৯শে জ্যৈষ্ঠ তারিখে হাংকাউ হইতে যে সংবাদ প্রেরিত হয়, তাহাতে প্রকাশ পায় যে, চীনের কেন্দ্রী সরকারের সৈন্যদল হাংকাউয়ের দক্ষিণে ত্রিশ মাইল দূরবর্ত্তী লিয়াং সহর দখল করিয়া লইয়াছে। দক্ষিণ-চীনের সৈন্যদল লিয়াং এবং বেন চাউয়ের মধ্যবর্ত্তী স্থানে হটিয়া আসিয়াছে। কিন্তু গৃহযুদ্ধ বাধিবার সংবাদটা অতিরঞ্জিত বলিয়াই বোধ হয়। আসল কথা, চীনের কেন্দ্রী সরকার জাপানের সহিত বিবাদ করিতে সম্মত নহেন। তাঁহারা বুঝেন যে, জাপানের সহিত যুদ্ধ বাধিলেই চীনের পরাজয় অবশ্যম্ভাবী। সেই জন্য মার্শাল চিয়াং কাইসেক যুদ্ধ করিতে অসম্মত। এ দিকে সাংহাই এবং ক্যাণ্টনে মুদ্রা-বিনিময়ের ব্যবস্থার ফলে চীনের বহু ধনী ব্যক্তি দেউলিয়া হইয়া পড়িতেছে। সেই জন্য সাংহাই এবং ক্যাণ্টনের অধিকাংশ লোকই যুদ্ধের বিরোধী হইয়া দাঁড়াইয়াছেন। যাঁহারা এই মুদ্রা-বিনিময়ের ব্যাপার বিশেষভাবে ভাবিয়া দেখিতেছেন, তাঁহারা সিদ্ধান্ত

করিতেছেন যে, নাঙ্কিন সরকারের মুদ্রানীতির ফলেই দক্ষিণ-চীনে অর্থ-সঙ্কট উপস্থিত হইয়াছে। কেহ কেহ বলিতেছেন যে, নাঙ্কিন সরকার নগদ টাকা দিয়া এই অর্থ-সঙ্কটের প্রতিকার করিবেন।

এ দিকে বিলাতের সহকারী পররাষ্ট্রসচিব লর্ড ক্র্যানবোর্ণ কমন্স সভায় বলিয়াছিলেন যে, চীনের কেন্দ্রী সরকারের সহিত দক্ষিণ-পশ্চিম প্রদেশগুলির মনোমালিন্স উপস্থিত হইয়াছে সত্য, কিন্তু তাই বলিয়া এই ব্যাপার লইয়া শঙ্কিত হইবার মত কোন কারণ ঘটে নাই। উত্তর-চীনে বে-আইনীভাবে পণ্য আমদানী করা হইতেছে বলিয়া জাপানের সহিত চীনের যে মনোমালিন্স উপস্থিত হইয়াছে, তাহার মীমাংসা করিবার জন্ম বৃটিশ-প্রতিনিধি-গণের সহিত জাপান ও চীনের প্রতিনিধিদিগের কথাবার্ত্তা চলিতেছে। জাপানী সরকার অকুস্থলে উপস্থিত হইয়া প্রকৃত ব্যাপার পর্য্যবেক্ষণ করিবার জন্ম পররাষ্ট্র বিভাগের এক জন কর্ম্মচারীকে পাঠাইয়াছেন। উত্তর-চীনে জাপানী সৈন্সসংখ্যা বৃদ্ধি করা হইয়াছে সত্য, কিন্তু সেই বর্দ্ধিত সৈন্স-সংখ্যা কত, তাহা তিনি বলিতে পারেন না। কিছুদিন পূর্ব্বে সাংহাই হইতে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, চীনে গৃহ-যুদ্ধ নিকটবর্ত্তী হইয়াছে। নাঙ্কিন সরকারের সৈন্সদল নানাদলে বিভক্ত হইয়া দক্ষিণ-পুনানে প্রবেশ করিতেছে। কোয়াংসি সৈন্সের সহিত তাহাদের শীঘ্র সংঘর্ষ ঘটিবে বলিয়াই আশঙ্কা হইতেছে। মার্কিণী কামানবাহী জাহাজ বোনোকেক হুবানের রাজধানী চাংসায় 'ককসেপার' এবং 'স্যায়াম' নামক দুইখানি মার্কিণী কামানবাহী জাহাজের সহিত আসিয়া যোগ দিয়াছে। আময়ে পাঁচখানি জাপানী রণতরী রহিয়াছে। যদি সঙ্গীন অবস্থা উপস্থিত হয়, তাহা হইলে জাপানী রণতরীগুলি ক্যান্টনে যাইবার জন্ম প্রস্তুত হইয়াছিল বলিয়া শুনা গিয়াছিল। আময় বন্দরে অনেকগুলি চীনারণতরীও আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। ইহার পর টিয়েনসিন হইতে গত ৭ই আষাঢ় সংবাদ পাওয়া যায় যে, চীনের পোরমিট বিভাগের একখানা ক্রুজার হোপে প্রদেশের চিকাউয়ের সান্নিধ্যে একখানা জাপানী ক্রুজারের উপর গোলাবর্ষণ করে। ২ জন জাপানী খালাসী তাহাতে আহত হয়। এই ঘটনায় জাপানের সহিত চীনের মনোমালিন্স বৃদ্ধি পাইবে বলিয়াই অনেকে মনে করিতেছেন। ইহার পর ক্যান্টন হইতে সংবাদ পাওয়া যায় যে, নাঙ্কিন সরকারের সৈন্সদিগের সহিত কোয়েরেণী সৈন্সদিগের এক সংঘর্ষ বাধিয়াছিল। উভয়পক্ষেই গুলী চলিয়াছিল। কিন্তু ব্যাপার গুরুতর হয় নাই। নাঙ্কিন সরকার কোয়াংসি অঞ্চল আক্রমণ করিবে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছিল। কোয়াংসি কিন্তু ভিতরে ভিতরে উত্তর অঞ্চলে সৈন্স পাঠাইতেছে। ফলে এ বিষয়ে ধারাবাহিক কোন সংবাদ পাওয়া যাইতেছে না। এখন চীনের অবস্থা ঠিক জানা যাইতেছে না। বিস্তৃত সংবাদ না আসিলে কোন কথাই বুঝা সম্ভব নহে।

প্যালেষ্টাইনে বিক্ষোভ

আজ প্রায় দুই মাস বা তাহার অধিক কাল প্যালেষ্টাইনের আরব-বিক্ষোভ অত্যন্ত তীব্রভাব ধারণ করিয়াছে। প্রথমে এই অশান্তি ধর্ম্মঘটের আকার ধারণ করে, ক্রমে উহা অনেক গুরু আকার ধারণ করিতেছে। এখন আর উহাকে ঠিক ধর্ম্মঘট বলা যায় না, ক্রমশঃ উহা ঠিক বিদ্রোহের আকারই ধারণ করিতেছে। প্রতিদিন ইহার গুরুত্ব যেরূপ বৃদ্ধি পাইতেছে, তাহাতে ইহা যে শেষে বিদ্রোহে পরিণত হইবে না, এমন কথাও কেহ সাহস করিয়া বলিতে পারেন না। মধ্যে মধ্যে ইহুদীদিগের উপর এবং ইহুদীদিগের আবাস অঞ্চল প্রায়ই আরবদিগের দ্বারা আক্রান্ত হইতেছে। ইহার ফলে সমস্ত দেশটা অরাজকতায় বিপ্লুত হইবে বলিয়া আশঙ্কা ঘটিতেছে। প্রতিদিন ঐ দেশের সহর এবং মফস্বল হইতে গৃহদাহের, নরহত্যার, লুণ্ঠনের এবং সম্পত্তিনাশের সংবাদ আসিতেছে। ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে কেবল ইহুদীদিগকে যে ভাবে হত্যা করা হইয়াছিল, এবার ঠিক সেই ভাবে কেবল ইহুদীদিগের উপরই অত্যাচার অনুষ্ঠিত হইতেছে না। বৃটিশ গোরা সৈন্স এবং পুলিসদিগকে প্রস্তরাঘাতে বা গুলী করিয়া ধরাশায়ী করা হইতেছে, এরূপ সংবাদও পাওয়া যাইতেছে। ঐ দেশে যত বিদেশী আছেন, তাঁহারাও আপনাদিগকে বিপন্ন মনে করিতেছেন। কিন্তু অবস্থা এখন এমন দাঁড়ায় নাই যে, উহা অসাধ্য হইয়াছে মনে করা যাইতে পারে।

বালফুর যে সময়ে বলিয়াছিলেন যে, তিনি ইহুদীদিগের পিতৃভূমি প্যালেষ্টাইনে ইহুদীদিগকে বসবাস করাইবেন, সেই সময়েই আরব-দিগের মনে কেমন একটা খটকা লাগিয়াছিল যে, তাহারা বুঝি ঐ অঞ্চল হইতে বিতাড়িত হইবে। এই খট্‌কা যে নিরর্থক, তাহা বলাই বাহুল্য। এই অঞ্চলের আরবরা এখন জাতীয়ভাবে উদ্‌বুদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে। আফগান রাজ্য হইতে সুদূর মরক্কো পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ দেশে তাহারা ইস্‌লামের আধিপত্য এবং আরবদিগের প্রাধান্স প্রতিষ্ঠার জন্ম ব্যস্ত হইয়াছে। অন্ততঃ এসিয়া মাইনর হইতে মরক্কো পর্য্যন্ত যে সকল দেশে আরবজাতি এবং আরবজাতির শোণিতসম্ভূত জাতির বাস আছে, সেই সকল দেশকে একত্র করিয়া তাহারা উহার অধিবাসীদিগকে এক মহাজাতিতে পরিণত করিবার সঙ্কল্প করিতেছে। ইহা ভিন্ন ইটালীয়ানরা দক্ষিণ-ইটালীর বারি হইতেও প্যালেষ্টাইনে যে প্রচারকার্য্য চালাইতেছেন, তাহার ফলেও আরবদিগের বিক্ষুব্ধ মন আরও চঞ্চল হইয়া উঠিতেছে। ফলে স্বার্থ লইয়া ইহুদী এবং আরবদিগের মধ্যে বিষম বিদ্বেষ এবং রেষারেষি জাগিয়া উঠিয়াছে। তাহারই ফলে এই অশান্তি প্যালেষ্টাইনের অধিবাসীদিগকে অতিশয় বিক্ষুব্ধ করিয়া তুলিয়াছে। দাঙ্গা ক্রমশঃ লড়াইয়ের আকার ধরিতেছে।

ইদানীং প্যালেষ্টাইনে যে সমৃদ্ধি দেখা দিয়াছে, তাহা প্রায় সমস্তই ইহুদীদিগের চেষ্টার ফল। তাহাদের উৎসাহ, তাহাদের অবলম্বিত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি এবং তাহাদের মূলধনই এদেশের মরু-কান্তারে কমলা-কুঞ্জের সুষমা ফুটাইয়া তুলিয়াছে। ইদানীং এই দেশে বহু ইহুদীর আমদানী হইতেছে। ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে এই দেশে ৫০ হাজার মাত্র ইহুদী ছিল, এখন তথায় ইহুদীর সংখ্যা দাঁড়াইয়াছে ৪ কোটি। আরবদিগের সংখ্যাও তথায় অল্প নাই। তাহাদের সংখ্যা ছিল ৪ লক্ষ ৫৭ হাজার, এখন তাহাদের সংখ্যা দাঁড়াইয়াছে সাড়ে আট কোটি। যদি এই ভাবে উভয় পক্ষের লোক-সংখ্যা বৃদ্ধি পায়, তাহা হইলে অচির-ভবিষ্যতে ঐ অঞ্চলে ইহুদী-দিগের সংখ্যাধিক্য হইবার সম্ভাবনা। তবে ইহুদীরা গত ১৬ বৎসরে যে হারে বাড়িয়াছে, সেই হারেই যে আগামী ১৬ বৎসরে বাড়িবে, তাহা মনে করা যাইতে পারে না। আরবরা মনে করিতেছে যে, ইহুদীরা তাহাদের দেশেই উড়িয়া আসিয়া জুড়িয়া

বসিতেছে; সেই জন্যই এই অশান্তি। এখন এদেশে ক্রমাগতই হাঙ্গামা হুজ্জুৎ লাগিয়া আছে। এখন তথায় কি করিয়া শান্তি সংস্থাপিত হইতে পারে, তাহাই চিন্তার বিষয়। সম্প্রতি এক বিষম হাঙ্গামা হইয়া গিয়াছে।

ইহার পর সংবাদ আসিয়াছে যে, প্যালেষ্টাইনে আরবরা অনেকটা বিদ্রোহী হইয়া উঠিয়াছে। তাহারা বৃটিশ সৈন্যদিগকে গুলী করিতেছে, ট্রেণ ধ্বংস করিতেছে এবং রেলপথ ধ্বংস করিবার চেষ্টা করিতেছে। তাহারা ইহুদীদিগের সহিত সমস্ত সম্বন্ধ বর্জ্জন করিতেছে। ফলে সমস্ত দেশময় ঘোর অশান্তি উপস্থিত হইয়াছে। বৃটিশ সৈন্য রেলওয়ে লাইনে পাহারা দিতেছে। গত ১২ই আষাঢ় শুক্রবার বিলাতের ডোমিনিয়ন সেক্রেটারী মিষ্টার ম্যালকম্ ম্যাক্‌ডোনাল্ড কমন্স সভায় বলিয়াছেন যে, প্যালেষ্টাইনে এখনও অশান্তি বিরাজ করিতেছে এবং আরবরা বিক্ষিপ্তভাবে বৃটিশ সৈনিক এবং কনেষ্টবলদিগকে খুন-জখমও করিতেছে। ইনি আরও বলেন, সাজা নগরীতে বড় ভীষণ হাঙ্গামা উপস্থিত হইয়াছিল; কিন্তু বড়ই সুখের বিষয়, তথায় শৃঙ্খলা এবং সাধারণের শান্তি অনেকটা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ঐ অঞ্চলে গোরা সৈন্য এবং ইংরেজ কনেষ্টবল অনেক বৃদ্ধি করা হইয়াছে। এ দিকে রয়টার সংবাদ দিতেছেন যে, ঐ দেশে, বিশেষতঃ উত্তর-প্যালেষ্টাইনে আরবরা অধিকতর দুঃসাহসী হইয়া উঠিতেছে। তাহারা লুকাইয়া থাকিয়া বৃটিশ সৈন্যদিগের উপর এবং সহগামী মোটরগুলির উপর গুলী চালাইতেছে। উহাদের রক্ষার্থ সশস্ত্র প্রহরী থাকিলেও তাহারা তাহা গ্রাহ্য করিতেছে না। উহারা ইহুদীদিগের শস্যক্ষেত্রে অগ্নি দিয়া ফসল নষ্ট করিয়া ফেলিতেছে; টেলিগ্রাফের তার কাটিয়া দিতেছে। এরূপ অবস্থাকে বিদ্রোহ ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে? আরবরা বে-আইনী-ভাবে আগ্নেয় অস্ত্র লুকাইয়া রাখিতেছে। বৃটিশ কনেষ্টবলরা গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া উহার খানাতল্লাস করিতেছে এবং এই কার্য্য করিতে যাইয়া স্থানে স্থানে দুই একটি করিয়া গোরা সৈনিক এবং কনেষ্টবল নিহত হইতেছে। তাহার পর সংবাদ আসিয়াছে যে, নবলুস্ রমলের পথের পার্শ্বে এক দল বৃটিশ সৈন্যের সহিত আরবদিগের ভীষণ সংঘর্ষ হইয়া গিয়াছে। সেই যুদ্ধে সীফোর্থ হাইল্যাণ্ডার দলের এক জন লান্স কর্পোর্যাল নিহত হইয়াছেন এবং আরবদিগের ৬ জন নিহত এবং ৪ জন আহত হইয়াছে। তদ্ভিন্ন নব্লুসের দক্ষিণ-পূর্ব্বদিকে অবস্থিত কুবালান গ্রামে সীফোর্থ হাইল্যাণ্ডারদিগের সহিত আরবদিগের আর একটি যুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। ঐ যুদ্ধে ৪ জন আরব নিহত হইয়াছে। একটি পাহাড়ের উপর প্রায় ৫০ জন আরব লুণ্ঠন করিবার উদ্দেশ্যে লুকাইয়াছিল। সীফোর্থ হাইল্যাণ্ডার সৈন্যগণ তাহাদিগকে তথা হইতে মেসিন কামান হইতে গোলা বর্ষণ করিয়া খেদাইয়া দেয়। এইরূপ অনেক অশান্তি তথায় লাগিয়াই আছে। ব্যাপার নিতান্ত সামান্য মনে হইতেছে না। এ দিকে আরব দেশের এই অশান্তি ট্রান্স জর্ডান অঞ্চলের অর্থাৎ জর্ডান নদীর পরপারস্থ বেদুইন জাতির মধ্যে বিসর্পিত হইবার সম্ভাবনা জন্মিয়াছে। প্যালেষ্টাইনের হাই কমিশনার মিষ্টার ওয়াকোপের উপর ট্রান্স জর্ডান অঞ্চলের শান্তিরক্ষার ভার ন্যস্ত রহিয়াছে। বেদুইনরা প্যালেষ্টাইনে ইহুদীদিগের বসবাসের বিরোধী। বৃটিশ কর্ত্তৃপক্ষ বলিতেছেন যে, যদি তাহাই হয়, অর্থাৎ জর্ডান পারের বেদুইনরা যদি সত্য সত্যই ক্ষেপিয়া উঠে, তাহা হইলে বৃটিশ জাতি তাহাতে শঙ্কিত হইবেন না। অথচ এ বিষয়ে ট্রান্স জর্ডানের আমীর আবদুল্লা কি করেন, তাহাও দেখিতে হইবে। বৃটিশ জাতি আমীরের শাসনকার্য্য নির্ব্বাহের জন্য বার্ষিক ৬০ হাজার পাউণ্ড করিয়া সাহায্য করিয়া থাকেন। এখন প্রশ্ন হইতেছে, আমীর আবদুল্লা বেদুইনদিগকে দমনে রাখিতে পারিবেন কি না? এই ব্যাপারের পরিণাম কি দাঁড়াইবে, তাহা বলা কঠিন। যুদ্ধের সময় আরবদিগকে বলা হইয়াছিল যে, যদি তাহারা তুরস্কের সহিত সংগ্রাম করে, তাহা হইলে তাহাদিগকে স্বাধীনতা দেওয়া হইবে। আবার ইহুদীদিগকেও বলা হয় যে, ঐ দেশ তাহাদের পিতৃভূমি, অতএব উহা তাহাদিগকেই দেওয়া হইবে। কাজেই আরবরা অতিশয় বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিয়াছে। তবে তাহাদিগকে শান্ত হইতেই হইবে। আর অনর্থক রক্তপাত করা বৃথা।

হাবসী রাজ্যের কথা

হাবসী রাজ্য এখন ইটালীর পদানত বলিয়াই পরিজ্ঞাত। ইটালীর রাজা ইমান্নুয়েল এখন আবিসিনিয়া-সম্রাট বলিয়া বিঘোষিত। হাবসী রাজ্যের সম্রাট হাইলাস সিলাসী এখন পরাজিত হইয়া জেনিভায় উপস্থিত। তথায় তাঁহাকে মৌখিক সম্মান বেশ করা হইয়াছে। কিন্তু এখন শুনা যাইতেছে যে, ইটালী এখনও সমস্ত আবিসিনিয়া রাজ্যটি অধিকৃত করিতে পারে নাই। উহার অত্যন্ত অধিক অংশই এখন অপরাজিত রহিয়া গিয়াছে। ইটালী কেবল কতকগুলি সহর দখল করিয়া লইয়াছেন। ইহা কত দূর সত্য, তাহা বলা যায় না। যদি এ কথা সত্য হয় যে, আবিসিনিয়ার এক-তৃতীয়াংশ এখন ইটালী দখলে আনিতে পারে নাই, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, ইটালীর রাজা ইমান্নুয়েলকে আবিসিনিয়ার সম্রাট বলিয়া ঘোষণা করা ঠিক হয় নাই। কিন্তু রাজনীতিক্ষেত্রে কয়টা কায ঠিক হয়? তবে এই চা'ল চালিবার একটা উদ্দেশ্য আছে। অতঃপর যে সকল হাবসী সর্দ্দার এখনও ইটালীর অধীনতা স্বীকার করে নাই, তাহাদিগকে বিদ্রোহী বলিয়া অসঙ্কোচভাবে শাস্তি দেওয়ার সুবিধা হইবে। ইটালী বীরত্ব দ্বারা আবিসিনিয়া জয় করিতে পারে নাই; পারিয়াছে ছলে আর কৌশলে। ও-দুইটিও রাজনীতিক পন্থা বটে। বলা বাহুল্য, রাজনীতির সহিত ধর্ম্মনীতির সম্বন্ধ নাই। প্রতারণাই কূট-রাজনীতির যথাসর্ব্বস্ব। অবশ্য এ কথা এখন শুনা যাইতেছে যে, ইটালী অন্তরীক্ষ হইতে বোমাবর্ষণ করিয়া এবং বিষবাষ্প ছড়াইয়াও হাবসীদিগকে পরাজিত করিতে সমর্থ হয় নাই। ইটালী ঘুষ দিয়া অনেক সর্দ্দারকে ভাঙ্গাইয়া আপনার কার্য্যোদ্ধার করিয়া লইয়াছে। ইহাও একটা রাজনীতিক কৌশল। ঘুষ খাইয়া অনেক সোমালী এবং আবিসিনীয় বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছে, দেশের পক্ষ ছাড়িয়া বিদেশীর পদলেহন করিয়াছে। যে দেশে জয়চাঁদ, মিরজাফর বা রাসগুগ্সার মত বিশ্বাসঘাতক জন্মে, সে দেশ বিশ্বেশ্বরের অভিসম্পাতগ্রস্ত হয়-ই হয়। কাজেই আজ আবিসিনিয়ার ভাগ্যে এই দুর্গতি ঘটিয়াছে। ঘুষ দিয়া প্রতিপক্ষের উপর জয়লাভ কেবল ইটালীই করে নাই, আরও বহুজাতি তাহা করিয়াছে। দেশাত্মবোধের একান্ত অভাব হইলেই কতক-গুলি নরপাংশুল বিপক্ষের নিকট হইতে ঘুষ লইয়া থাকে। কেবল

যে যুদ্ধের ব্যাপারেই ঘুষ চলে, তাহা নহে, রাজনীতিক্ষেত্রেও বেশ ঘুষ চলে। উহা "মনে মনে সবাই জানে বল্লে দোষী হয়।" টাকা লইয়া বা পুরস্কার লইয়া অথবা পুরস্কারের লোভে অথবা মিষ্ট কথায় ভুলিয়া অযোগ্য ব্যক্তিকে ভোট যাঁহারা দেন, তাঁহারাও ঘুষখোর। যাহা হউক, ইটালী কৌশলে কার্য্যোদ্ধার করিয়াছে। মাছি অরি পারি যে কৌশলে, ইহাই মুসোলিনীর নীতি। এ নীতি বীরত্বসূচক নহে, ইহা শৌর্য্যের সম্মান পাইতে পারে না। ইহা কাপুরুষতার কার্য্য, তাহাতে সন্দেহ নাই। যাহারা বিনা কারণে দুর্ব্বলের যথাসর্ব্বস্ব হরণ করে, তাহারা যে কাপুরুষের পন্থা অবলম্বন করিয়া কার্য্যোদ্ধার করিবে, তাহাতে বিস্ময়ের বিষয় কিছুই থাকিতে পারে না। এখন বিলাতের শ্রমিকদল যাহাই বলুক না কেন, তাহাতে কিছুই আইসে যায় না। আবিসিনিয়ার ভাগ্যে যে অমানিশার অন্ধকার নামিয়া আসিয়াছে, কত দিনে তাহার অবসান হইবে, তাহা বিশ্বপাতাই বলিতে পারেন।

পল্লী-বর্ষা

রিম্ ঝিম্ রিম্ ঝিম্
মেঘ-মল্লারে বীণ
বাজে আজি সহসা
এল ঐ বরষা;

তুল্ তুই বুল্ বুল্
ভুল্ তুল্ ফুল তুল্
বন্ জুঁই কেয়া ফুল
ভরা নদী বিলকুল্
হৃদে জাগে ভরসা
এল ঐ-বরষা।

কাজরী গানের সাথ
সজল "মিগে"র বাং
বয় সখি ঝির্ ঝির্
যেন সেতারের মীড়
টুং টাং টুং টুং
বাজে সারা মরসুম্
ধরণী যে সরসা
এল ঐ বরষা।

তর্ তর্ সর্ সর্
তটিনীর নীরপর
চলে তরী চঞ্চল
বহে নদী কল্ কল্
এদিকেতে সুকোমল
সবুজেরি অঞ্চল
গাছে গাছে ঝল্ মল্
মখমল্ পরশা
এল ঐ বরষা।

জলে দীঘি টুবটাব
সারা মাঠ সয়লাব
ভরপুর খাল বিল
"টোরা" বক্ গাঙ্ চিল
মাছ ধরে অবিরাম
রাতদিন ঝিম্ ঝাম্
ঝম্ ঝম্ শুনি ওই
বর্ষা যে এল সই!

করম্‌চা সজিনার,
পাতা ঝলে অনিবার-
ঝিল্ মিল্ চিক্ চিক্
হাসে হাওয়া ফিক্ ফিক্
এদিকেতে নদীজল
ঝল্ মল্ টল্ টল্
ছল ছল চোখে চায়
আজি এই বরিষায়।

ঝরে গুটি পাকুড়ের
পাকাফল ডুমুরের;
তটিনীর তটপাশ
জামরুল বাশে বাশ
বিছাইয়া পড়ি রয়
তরুতল জলময়
শুনি শুধু রাত দিন
রিম্ ঝিম্ রিম্ ঝিম্।

এ-পারেতে বেনাকুল
"জল-মরীচে"র ফুল
কদম ও যূথিকায়
হেরি যেন ঈর্ষায়
বিছুটীর পানে চায়
নিঝ্ ঝুম নিরালায়
কাটে দিন রজনী
সজনী লো সজনী।

ও-পারেতে ঘাটজাল
ফেলি সারা সকাল
জেলেনী ও জেলে ওই
ধরে "সিঙী" "বাটা" "কই"
ছেলেমেয়ে ছাঁকনির—
জাল্ লয়ে তটিনীর
জল করে তোলপাড়্
গান গাহে বর্ষার।

গাঙে বেই "পলুয়ে"ই
দেয় খড়া মৎস্যেই
হাত দিয়ে লোকজন
মাছ ধরে অনুখন্

তার পরে চাবিজাল
ফেলি সারা বৈকাল
ধরে "রুই" "কাৎলায়"
"পাংসী" ও "পাবদা"য়।

কৈবং একপাল
"খেবলা" ও গাঁতিজাল—
ফেলি ঘাঁটে কর্দ্দম
মাছ ধরে হর্দ্দম্
কভু বুকে নদীটির
দেয় বেড়া কঞ্চির
ভাবি কত সাত পাঁচ
"বাচ" করি ধরে মাছ।

কৃষাণেরা "ঘুনি" আর—
"ফাটা" জালে বারেবার
"চাং" "পুঁটি" খয়রায়
"চিংড়ি ও "ট্যাংরা"য়
খালুইটা ভরি লয়
কভু তোড়ে চেয়ে রয়
কেউ ছুটি পাছে পাছ,
"টঁ্যাটা" দিয়ে বিঁধে মাছ।

বিজুরীও লপ্‌লপায়
আঁখি মোর ঝলসায়
হিয়া করে ছম্ ছম্
হর্দ্দম্ থম্ থম্
গম্ গম্ শুনি তায়
এদিকে এ বাদলায়
মাদল্ যে বাজে সই—
দিং-তা-না থই থই।

কোথায় পীতম্ কই
"পিউ কাঁহা" শুনি ওই—
ডাকে পাখী নিরালায়
হিয়া মোর মুরছায়
কাঁপে তনু থর্ থর্
ঝরে আঁখি দর্ দর্—
বৃথাই জনম্ যায়
সে বিনে এ বরিষায়।

কাদের নওয়াজ।

(উপন্যাস)

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

প্রেম ও Love

বহুক্ষণ ফুল্লরার যেন কোনো চেতনা ছিল না! পৃথিবী, সমাজ, ঘর-বাড়ী, লোক-জন···সব কেমন অনুভূতির অন্তরালে অদৃশ্য হইয়া গিয়াছিল!

ধীরে ধীরে চেতনা ফিরিল। শুধু ঘড়ির পেণ্ডুলাম দুলিতেছে···আর কোনো শব্দ নাই। বয় দাঁড়াইয়া আছে দ্বারের প্রান্তে···নিঃশব্দে যেন কাঠের পুতুল!

একটা নিশ্বাস! নিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে দেহে-মনে প্রাণের সঞ্চার হইল। ভয়ঙ্কর মাথা ধরিয়াছে। বয়ের পানে চাহিয়া ফুল্লরা বলিল—তুমি শুতে যাও বয়, খানা আমি খাবো না।

বয় চলিয়া গেল।

বাড়ীতে দাস-দাসী আছে, অনুগত আশ্রিতও দু'চারি জন আছে। সকলে ঘুমাইতেছে।

ফুল্লরার মনে হইল, সে বড় নিঃসঙ্গ···একা! রোজা চলিয়া গিয়াছে···

এই চলিয়া যাওয়াটা তার ভালো লাগিল না! এ-ভাবে মানুষ যায় না! বিশেষ, রোজার মতো ডাগর মেয়ে···! এ-ভাবে কখনো কেহ গিয়াছে? যারা যায়···

ফুল্লরা শিহরিয়া উঠিল।

রোজা গিয়াছে বলিয়া করিবার কিছু নাই!···সন্ধান? কি প্রয়োজন? স্পষ্ট সে লিখিয়া গিয়াছে—রাঁচি চলিয়াছে; বন্ধুদের সঙ্গে বেড়াইতে।

মনে হইল, স্বামী থাকিলে ভালো হইত! কিন্তু স্বামী কি করিতেন? রোজাকে ফিরাইয়া আনিতেন? ফিরাইয়া আনিলেও যাওয়ার যে অপরাধ রোজা করিয়াছে, তা ফিরিত না!

পরক্ষণে মনে হইল, কি অপরাধ? অপরাধই বা কেন? সখ হইয়াছে, বেড়াইতে গিয়াছে! পুরুষমানুষ তো এমন যায়। রোজা মেয়ে বলিয়া···

কোথা হইতে বিদ্রোহের ক্ষীণ শিখা মনের মধ্যে ঝলশিয়া উঠিল। এত লেখাপড়া শিখিয়া ফুল্লরা এ-কথা কেন ভাবে? হয়তো রোজা নিজের মনের পরিচয় জানে! হয়তো তার মনের উপর জোর আছে!

সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়িল ছবির কথা। আবার সে শিহরিয়া উঠিল। ছবি সহজ মেয়ে নয়! কিন্তু সেই শয়তান বিশ্বাসটা···

পুরুষের উপর নারী কোনো দিন নির্ভর রাখিতে পারিবে না? একা অসহায় নারী···পুরুষের কাছে সে শুধু মৃগয়ার জীব?···

এ কথাগুলা রোজা জানে? জানিলে ভয় নাই! যদি না জানে···?

কথাগুলা সহজ নয়! সহজ ভাবে এ কথার আলোচনা সকলের সঙ্গে করা চলে না! কিন্তু আজ যখন পুরুষের সঙ্গে সাম্য চাহিয়া নারী দিগ্‌দিগন্তে বাহির হইতেছে, তখন এ কথাগুলা জানিয়া রাখা প্রয়োজন!

এমনি পাঁচ-সাত রকম ভাবিতে ভাবিতে ফুল্লরার দুই চোখ ঘুমে মুদিয়া আসিল। সারাদিন অল্প পরিশ্রম হয় নাই। সেজন্য অবসাদ···

ফুল্লরা উঠিল, উঠিয়া মুখ-হাত ধুইয়া বেশ-পরিবর্ত্তন

করিয়া শয্যায় আশ্রয় লইল। খোলা খড়খড়ি দিয়া আকাশের খানিকটা দেখা যাইতেছে···ছোট ছোট হাল্‌কা মেঘ··· যেন বরফের কুচি···কখনো সেগুলার উপর দিয়া, কখনো বা নীচে দিয়া পিছলাইয়া চাঁদ সরিয়া সরিয়া ভাসিয়া ভাসিয়া চলিয়াছে···নিরাময় নিরুদ্বেগে!

ফুল্লরা চক্ষু মুদিল।······

পরের দিন সকালে ইভা আসিয়া দেখা দিল, সঙ্গে নকুল।

চায়ের টেবলে বসিয়া কাজ-কর্ম্মের কথা চলিতেছিল। ইভা বলিল,—টিকিট যা বেচেছি, তার টাকা তোমায় দিয়ে যাই···তোমার খাতা এনে সেগুলো জমা ক'রে নাও, ভাই। তার পর নকুলের পানে চাহিয়া বলিল,—তুমি এখন যাও সান্ন্যাল সাহেবের কাছে। তিনি নিজে তো ক'খানা দশ টাকার টিকিট নেবেন—তাছাড়া ক'খানা টিকিট চেয়েছেন, বেচে দেবেন। Higher seatsএর টিকিট···তুমি একটা ফর্দ্দ ক'রে এনো···সেই ফর্দ্দ দেখে টিকিট নিয়ে যেয়ো মিসেস চাটার্জ্জীর কাছ থেকে।···

নকুল চলিয়া গেল।

কথায় কথায় ইভা বলিল,—তোমার ভাইঝী কোথায়? তাকে সঙ্গে নিতে চাই। এ সব কাজে ওরা যদি না ভলাণ্টিয়ারী করে···

ফুল্লরা কহিল,—সে রাঁচি গেছে।

—রাঁচি! কবে গেল? কাল তাকে দেখে গেছি, সকালের দিকে যখন এসেছিলুম···

ফুল্লরা বলিল,—হ্যাঁ।···রাত্রে ফিরে এসে চিঠি পেলুম। লিখেছে—রাঁচি চললুম···দিন চারেকের জন্য!

ইভা কহিল,—হঠাৎ!···কার সঙ্গে গেল?

ফুল্লরা কোনো কথা গোপন করিল না, বলিল,—তার বন্ধুদের সঙ্গে···কে এক মিস্ আর কে এক জন মিষ্টার। তারা বাঙালী নয়।

বাঙালী নয়!

ইভার বিস্ময় একেবারে সীমা ছাপাইয়া উঠিল। ফুল্লরা কোনো কথা কহিল না, খাতায় জমার ঘরে টাকার অঙ্ক লিখিতেছিল···

ইভা কহিল,—ডাগর মেয়ে···একা গেল রাঁচি এমনি করে···তোকে কিছু না জানিয়ে!···এ তো ভালো কথা নয়, ফুল্লু!

ফুল্লরা বলিল,—কি করবো? স্কুলে যায়···স্বাধীন··· এ নিয়ে আগে দু'চার কথা বলেছিলুম···তাতে রাগ করে। সেই অবধি বলা ছেড়ে দিয়েছি···

ইভা কহিল,—পর নয়! রাগ করে বলে' এমন উদাসীন্ থাকবি!···এ-বয়সে ওদের কি জ্ঞান আছে বাইরের সম্বন্ধে···বল্?···তার ভালোর জন্যেই বলা···

ফুল্লরা বলিল,—সে বলে, নিজের ভালো সে নিজে বোঝে।···

ইভা কহিল,—মিষ্টার চাটার্জ্জী এ-কথা শুনলে রাগ করবেন হয়তো!···

ফুল্লরা কি ভাবিল, পরে খাতার লেখা শেষ করিয়া বলিল,—যা হয়ে গেছে, তা নিয়ে ভেবে তো কোনো ফল নেই!···এই যে আমরা একদিন ও-বয়সে লেখাপড়া শিখেছি···রাঁচি যাবার অবসর হয় নি বা বাড়ীর লোক যা চায় না, এমন কাজ কোনোদিন করি নি!···আর ছবি? কি না করলে, বল্? মানুষের প্রবৃত্তি কি রুচি কেউ কোনো দিন নিষেধ-শাসনে ফেরাতে পেরেচে?

ইভার মনের আতঙ্ক তবু ঘুচিল না। সে চুপ করিয়া রহিল।···

সারাদিন ফুল্লরার অস্বস্তি আর কাটিতে চায় না। নিজেকে কখনো ইহার পূর্ব্বে এতখানি নিঃসঙ্গ বা নিঃসহায় সে বোধ করে নাই!

দুপুরবেলায় কোথা হইতে আকাশে একরাশ মেঘ জমিয়া মুষলধারে বৃষ্টি নামিল। সে বর্ষায় ধৈর্য্য হারাইয়া মন তার অসহ্য বেদনায় আর্ত্ত হইয়া উঠিল। বসিয়া বসিয়া কেবলি মনে হইতেছিল, মনকে শিখাইয়া পড়াইয়া কি পাইলাম? ছেলেবেলার কথা মনে পড়িল। নিজের মায়ের কথা···

তার মতো পড়িয়া মা কতকগুলা একজামিন পাশ করেন নাই! নিজেকে সংসারে সঁপিয়া দিয়াছিলেন কি ভাবে, নিজেকে কতখানি দাবিয়া রাখিয়া! ছেলেরা তর্জ্জন তুলিয়াছে···তারাও কোনোদিন মা বলিয়া পাশে গিয়া বসে নাই, নিজেদের বিদ্যা-চর্চ্চা লইয়া মাতিয়া থাকিত। বাপ খেয়ালী···বই আর খাতাপত্র লইয়া দিনাতিপাত

করিতেন···মা কোনো দিন এতটুকু অনুযোগ তোলেন নাই! কাহারো বিরুদ্ধে নয়! হাসি-মুখে···নিমেষের জন্য মাকে ম্লান বা মলিন দেখে নাই। সেই সংসারে মানুষ হইয়া মেয়েদের উপর পুরুষের যেটুকু অবিচার দেখিয়াছে, পীড়ন দেখিয়াছে, সেই দেখার ফলেই না সে মনকে সুদৃঢ় পণে বদ্ধ করিয়াছিল, নিজের জীবনে সে দেখাইবে, পুরুষের উপর নির্ভর না রাখিয়াও নারীর দিন অনায়াসে কাটিয়া যায়।···

বিবাহ!···

···ভুল নয়। মোহ নয়। বন্ধু বলিয়া সুশীল চাটার্জীকে গ্রহণ করিতে মন উদগ্র উন্মুখ হইয়াছিল। সুশীল চাটার্জী বলিয়াছিল, ফুল্লরার স্বাধীন চিন্তায়, স্বাধীন মতে কোনোদিন হস্তক্ষেপ করিবে না!

এ কথা টলে নাই।···

কিন্তু থাকিয়া থাকিয়া জীবন এমন নিঃশেষ শূন্য মনে হয় কেন? সকলের কি এমন হয়?

সংসার!···সংসার এমনি? তার কোথায় কি আকর্ষণ!

কাব্যে নাটকে পড়ে, ভালোবাসা। সে ভালোবাসায় দেহ লইয়া কত না নিবেদন কত ভাবে! বাহুর বাঁধন··· অধর-সুধা···

এ সবে ফুল্লরার মন বিরূপতায় ভরিয়া ওঠে। পশুরার মতো নিজেকে ধরিয়া দেওয়া···

ঘৃণায়-লজ্জায় মাথা নত হইয়া আসে।···অথচ এই ভালোবাসার কথা লইয়া যুগে যুগে যত কবি, নাট্যকার ও শিল্পীর চলিয়াছে শিল্প-রচনা···

লজ্জা আর ঘৃণার বস্তু হইলে এ ভালোবাসা··· যৌবনের এই প্রমত্ত আবেগ···?

লেখাপড়া আর দুর্জ্জয় মনের পণ···তাহারি জন্য তার মনে হয়তো যৌবন কোনোদিন জাগিয়া আসন পাতিয়া বসিতে পারে নাই! হয়তো···

কড়্-কড়্ শব্দে আকাশ চিরিয়া তীব্র বজ্রনাদ। ঘর-দ্বার···সেই সঙ্গে ফুল্লরার মনের মধ্যটা সে শব্দে ঝন্-ঝন্ করিয়া কাঁপিয়া উঠিল।···চিন্তার সূত্র গেল ছিঁড়িয়া।

ফুল্লরা স্থির নেত্রে চাহিয়া রহিল বাহিরের পানে···অজস্র বিপুল ধারায় আকাশ যেন তার বক্ষ-সঞ্চিত সমস্ত জল পৃথিবীর বুকে ঢালিয়া দিতেছে···

কেন? কেন?

ফুল্লরার নিঃসঙ্গ মনে এ প্রশ্ন বিপর্য্যয় আকারে চাপিয়া বসিল।

সন্ধ্যার দিকে বৃষ্টি থামিল।

টেলিফোনে ডাক আসিল,—হ্যালো···হ্যালো···

রিহার্শালে যাইতে হইবে। এ বৃষ্টিতেও কেহ সেখানে গর-হাজির নাই। সকলে বসিয়া আছে ফুল্লরার পথ চাহিয়া···

শূন্য-স্তব্ধ বাড়ী ছাড়িয়া সে কোলাহল-কলরবের মধ্যে যাইতে পারিলে প্রাণটা বুঝি বাঁচিয়া যাইবে।···

গড়িয়াহাট রোডে বাণী-মঞ্জরীর গৃহে রিহার্শাল বসে। ফুল্লরা রিহার্শালে গেল।···

মেয়েরা সাজিয়াছে···পুরুষের দল নেপথ্যে বসিয়া আয়োজন করিতেছে। গান শেখানো, নাচ শেখানো, অভিনয়···পোজ, এক্সপ্রেশন···এগুলা শিখাইতেছে গুণীন্ পুরুষ। ফুল্লরা এ-সবের তত্ত্বাবধান করিতেছে।

শঙ্কর বসিয়াছেন যোগাসনে···ধ্যান-মগ্ন চিত্ত হইতে ত্রিভুবন সরিয়া গিয়াছে···উমা আসিয়াছেন পূজার অর্ঘ্য বহিয়া···এমনি সময়ে দেবতাদের ইঙ্গিতে মদনকে আসিয়া শঙ্করের ধ্যান ভাঙ্গিতে হইবে পুষ্পশরের আঘাতে···নয়ন মেলিয়া শঙ্কর দেখিবেন পেলবযৌবনা উমাকে···সঙ্গে সঙ্গে দিকে দিকে জাগিবে মধুমাস কোকিল-ভ্রমরের গুঞ্জন··· নব পত্র-পল্লবে আবেগ-আবেশ-মত্ততা!

মদনের প্রবেশ লইয়া তর্ক উঠিল। উমার আসিবার পূর্ব্বে মদন আসিয়া বসিয়া থাকিবে গিরি-শিলার অন্তরালে··· পাশে রতি···শঙ্কর ধ্যান-স্তব্ধ···কথা উঠিল, মদন-রতি এখানে একটা গান গাহিলে atmosphere খাশা জমিয়া উঠিবে নিমেষে!··

নাট্যকার বলিল,—গান দিলে পেশাদারী থিয়েটারের মতো হবে। আমি চাই, আগে থেকে কোনো আভাস দেবো না! উমা এসে যখন ষ্টেজে দাঁড়াবে, তখন মদন তার ধনুতে জুড়বে পুষ্পশর!···উমার সেদিকে লক্ষ্য নেই ···আসচেন ধীর পায়ে দ্বিধা-কুণ্ঠাভরে শঙ্করের কাছে এগিয়ে···দুটি চোখের দৃষ্টি শঙ্করের মুখে···শঙ্কর চেতনা-হারা, নিস্পন্দ···এই শর শঙ্করের বুকে লাগবে ঠিক যখন উমা এসে দাঁড়াবেন শঙ্করের সামনে! তীরের বেদনায় শঙ্কর

চোখ মেলে চাইবেন···সঙ্গে সঙ্গে বসন্ত জাগ্রত হয়ে উঠবে···শঙ্করের চিত্তে চাঞ্চল্য জাগবে উমার যৌবনশ্রী দেখে··· এর মধ্যে গান দিলে আর্ট মাটী হয়ে যাবে!···

নানা জনে নানা মত দিল···অবশেষে ফুল্লরাকে করিতে হইবে এ সব মতের বিচার!

ফুল্লরা বলিল—রিহার্শাল হোক। কি রকম impression হয়, দেখি···দেখে আমার মতামত বলবো।

রিহার্শাল চলিল। দৃশ্য-শেষে ফুল্লরা বলিল—মদনের গানের দরকার নেই!

ইভা বলিল—যে মেয়েটি মদন সাজবে, সে ভারী চমৎকার গান গায়। ওর মুখে যত গান দেবে, play তত successful হবে···commercially ··Box-office-এর দিকে চেয়ে সেই ভাবে ব্যবস্থা করতে হবে তো!···

আবার তর্ক চলিল···

আর্ট মাটী হইয়া যাইবে, এই ভয়ে নাট্যকার বলিল—আপনি বিচার করুন মিসেস সেন, প্রেমের প্রথম-জাগরণ ··তা ঘটে অতি-নিঃশব্দে···অতি মৃদু ইঙ্গিতে-ভঙ্গীতে!

হাসিয়া ফুল্লরা বলিল—ও সব কবিতার কথা চলবে না। কথা হচ্ছে, ইভা যা বললে, business-এর দিক দিয়ে···

ক্ষুব্ধ নাট্যকার বলিল—আপনিও দেখবেন ঐ business-এর দিক! Dramar আর্ট···তবে গিয়ে love's psychology···এগুলো উড়িয়ে দেবেন?

হাসিয়া ইভা কহিল,—শুনুন, এ তো ঘর-সংসারের কথা হচ্ছে না···এ হচ্ছে box office-এর ব্যাপার। মদন মেয়েটি খুব ভালো···ওর রেকর্ড আছে গ্রামোফোনে··· রেডিওতে গায়।

নাট্যকার আবার ফুল্লরার পানে চাহিল, মিনতি-ভরা কণ্ঠে কহিল—কিন্তু আপনি বলুন···love···তার প্রথম স্পন্দন জাগলে স্ত্রী-পুরুষে চায় বিজন ঠাঁই···নির্জ্জনতা!

ফুল্লরা বলিল,—ও-সব love-টাভ চলবে না···এ হলো business। এঁরা যা বলচেন, experience থেকেই বলচেন। এঁরা stage-play করিয়েচেন আরো···তাছাড়া জানেন, এই সব love-display...well, to me, they are simply ridiculous...

—Ridiculous!

কথাটা বলিয়া যে-দৃষ্টিতে নাট্যকার ফুল্লরার পানে চাহিল, দেখিয়া মনে হইল, তার চোখ দুটা যেন ঠিকরিয়া খশিয়া পড়িবে!

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

ঝঞ্ঝা

প্লে'র দিন···রাজসূয় ব্যাপার। পোষাক-পরিচ্ছদ আসিয়া জমা হইতেছে ফুল্লরার গৃহে···দর্জীর দল বসিয়া গিয়াছে। যে-মেয়েরা সাজিবে, সকলে আজ এ-বাড়ীতে আসিয়া আশ্রয় লইয়াছে। পোষাক পরাইয়া তার কাট-ছাঁট চলিয়াছে···অবিরাম। আর্ট-ডিরেক্টর একেবারে দশ হাত বাহির করিয়াছে। সকলের স্নানাহার আজ এ-বাড়ীতে।

বেলা দুটায় একখানা টেলিগ্রাম আসিয়া হাজির। রোজা টেলিগ্রাম করিয়াছে,—

> হাজারিবাগের পথে ব্রেক-ডাউন। গাড়ীর এঞ্জিন অচল। ফিরিতে বিলম্ব হইবে। চিন্তা করিয়ো না।
>
> রোজা

টেলিগ্রাম পড়িয়া ফুল্লরা চুপ! ইভা আসিয়া বলিল,— রোজার টেলিগ্রাম?

—হঁ্যা।

টেলিগ্রামখানা ফুল্লরা দিল ইভার হাতে।···টেলিগ্রাম পড়িয়া ইভা শুধু ফুল্লরার পানে চাহিয়া রহিল। ফুল্লরা বলিল—বসে আছ কি! তোমার এখন অনেক কাজ···এই সব জিনিষ ষ্টেজে পৌঁছে দেওয়া···

ইভা কহিল—কিন্তু এই accident...

ফুল্লরা কহিল,—মানুষ নিজের কর্ম্মফল ভোগ করে। তা নিয়ে ভাবনা-চিন্তা কিম্বা সাধ্য-সাধনা যদি অপরে করে, তাতে লাভ?

ইভা কহিল—এ হলো ফিলজফির কথা···

ফুল্লরা কহিল—কিন্তু ফিলজফি কখনো যা কল্পনা করে না, তার চেয়েও বড় বড় ঘটনা জগতে ঘটে! মোদ্দা এ-কথা থাক···আমার মনের শিক্ষা যা হচ্ছে, একটার পর আর একটা ঘটনায়, তাতে দেখছি, ক্রমে fatalist হয়ে দাঁড়াবো!···এখন তুই যা।

ইভা কহিল—যাই।···তুই কখন আসচিস?

—তিনটে-সাড়ে তিনটে নাগাদ আমি যাবো। ক'টা জিনিষ আসবার কথা আছে, সেগুলো এলে বেয়ারাদের কাউকে নিয়ে আমি যাবো। তুই যা। ওদিকে চা, খাবার-দাবার···এ-সবের ভারও তোর হাতে।···

থিয়েটারে অভিনয় যা হইল, চারিদিকে জয়-জয়কার পড়িয়া গেল। ফুল্লরা বসিয়া অভিনয় দেখিল। এ যেন স্বপ্নলোক!

যে-মেয়েটি উমা সাজিয়াছে, তার নাম নবনলিনী; জ্যোতিরেখা সাজিয়াছে মদন। নবনলিনীর অভিনয় দেখিয়া ফুল্লরার মনে হইল, এমন যার শক্তি···বাস্তব ভুলাইয়া দর্শকের মনে অতীত যুগের এ প্রেম-সাধনাকে সে এমন জীবন্ত করিয়া তুলিতে পারে···সে শক্তি জাগ্রত করিয়া কেন সে সারা বিশ্বে আনন্দময়ীর বেশে দাঁড়াইবে না? আর জ্যোতির ঐ কণ্ঠ···নাচে এমন করিয়া ভাবাবেগ ফুটাইয়া তোলা···রতির ঐ বেদনা-ভরা সুর···

ইহার নাম প্রতিভা! এই প্রতিভার জোরে পাশ্চাত্য জগতে সারা বার্ণহার্ড, আনা পাবলোভা, মেলবা···ইন্দ্রজাল রচনা করিয়া গিয়াছেন! এ-দিক দিয়া নিজেদের জীবনকে কি সার্থকতায় না ভরিয়া তুলিয়াছেন! পুরুষকে অবলম্বন করিয়া নারীর বাঁচা—ভুল! ভুল! নিজের নিজের সত্তা যদি না জাগাইয়া তুলিলাম···তাহা হইলে জীবন যে বৃথা হইয়া গেল!

সংসার দেখা, রান্না-বান্না···এ সব কাজ দাস-দাসীতেও করে! খাওয়া-দাওয়ার জন্যই মানুষ সংসার করে না! সেক্সপীয়র খাওয়া-দাওয়া লইয়া বসিয়া থাকেন নাই! গ্যেটে, বায়রন, টলষ্টয়···আর পাঁচ জনের মতো খাওয়া-দাওয়া করিয়াছেন, সত্য! কিন্তু জীবনকে এই খাওয়া-দাওয়া আর পয়সা-রোজগারের মধ্যে সঁপিয়া দেন নাই! এ সব ছাড়িয়া মন ছুটিয়াছিল···তাই পৃথিবীর বুকে অক্ষয় কীর্ত্তি রাখিয়া অমর হইয়া আছেন! আমার মধ্যে যে শক্তি আছে, সে শক্তিকে বিকশিত করিয়া তোলা চাই···

ষ্টেজের উপর শিব তখন উমার সামনে ভিখারীর বেশে দাঁড়াইয়াছেন—দুই হাত অঞ্জলিবদ্ধ···শিব বলিলেন,—আমায় ভিক্ষা দাও সুন্দরি···তোমার ঐ হৃদয়-মন! আমি ভিখারী···তোমার দানে আমি ধন্য হই!

এগুলা শুধু কথা···এ কথার সঙ্গে আমাদের জীবনের কোন যোগ নাই! এমনি কথা নাটকের নায়ক চিরদিন বলিয়া আসিয়াছে,—এ সব কথা না বলিলে নায়ক হয় না। তাই! এ সব কথা ভেদ করিয়া ফুল্লরার মন চলিয়া ছিল,—শাশ্বত-সত্যের সন্ধানে! শক্তি! প্রতিভা!···

এই শক্তি···কাহার কি শক্তি আছে, সে শক্তি বিকশিত করিয়া তোলো! তবেই জীবনে মিলিবে সার্থকতা! মানুষ করিবে selfকে realise!

কাব্য-নাটক, ফিলজফি আর জীবন—একসঙ্গে সবগুলা মিশিয়া ফুল্লরার মনে তরঙ্গ তুলিয়াছিল···উচ্ছ্বাসে বিপুল তরঙ্গমালা!···

এমনি চিন্তার তরঙ্গে ফুল্লরার মন ভাসিয়া চলিয়াছে, সহসা যেন ভীষণ ঝঙ্কারে বাজ ডাকিল। চমকিয়া ফুল্লরা দেখে, এক-বাড়ী লোক মত্ত নেশার ঘোরে অবিরাম করতালি বর্ষণ করিতেছে এবং ষ্টেজের মোটা পর্দ্দাখানা বার-বার সরিয়া, বার-বার ফিরিয়া ষ্টেজকে আবার ঢাকিয়া দিতেছে! ষ্টেজের উপর দাঁড়াইয়া আছে হাসি-মুখে খুশী-মনে সাজা-পোষাকে শিব, উমা, মদন, রতি, ইন্দ্র চন্দ্র, বরুণ···

দর্শকের দল নড়িতে চায় না! থিয়েটার ছাড়িয়া যাইবে না। কি তাদের উল্লাসের উচ্ছ্বাস!

ফুল্লরা বলিল, এ আয়োজন এতখানি সফল হবে, ভাবিনি!

ও দিকে দর্শকদের মধ্য হইতে উপহার বর্ষণ চলিয়াছে··· প্রচণ্ড উৎসাহে···বিমুগ্ধ চিত্তের প্রীতি নিবেদন!

ইভা আসিয়া বলিল—সামনের হপ্তায় আর একবার রীপীট করো এ প্লে। সকলে বলছে, আবার দেখবে···

আবার!···ফুল্লরা কোনো জবাব দিল না···সে যেন কোন্ স্বপ্নলোকে বসিয়া আছে···চোখের সামনে যা দেখিতেছে···স্বপ্ন! স্বপ্ন!···

জীবন তার ব্যর্থ হইতে বসিয়াছে! সোনার শিকলে বন্দী সে বসিয়া আছে মণিরত্ন-রচিত খাঁচায়। মন হাঁফাইয়া ওঠে প্রতি-নিমেষ!

কোন কাজে সুখ নাই! স্কুলের কাজ···সে যেন প্রাণহীন!

রোজা ফিরিল, ফিরিয়া ফুল্লরার কাছে আসিয়া বলিল—মাপ করো পিশিমা...I couldn't help this joy drive. It was lovely.

গৃহে ক্রমে সে দুর্লভ হইয়া উঠিল। ফুল্লরা একদিন বলিল—তোমার পিশেমশায় এখানে থাকলে বিরক্ত হতেন! তাঁর বাড়ীতে তাঁর কতকগুলো নিয়ম-কানুন আছে, এ বয়সে তোমার তা মেনে চলা উচিত, রোজা।

রোজা বলিল—কি সে নিয়ম-কানুন? লেখা কোনো নিয়ম-কানুন আমি কখনো দেখিনি!

ফুল্লরা বলিল—আমি এ কথা বলচি না, যে প্রতি ব্যাপারে দাস্ত করো! তা নয়...তবে কতকগুলো সহজ বিধি...আমরাও এক দিন লেখাপড়া করেছি রোজা... বাড়ীর সঙ্গে সম্পর্ক নেই, এমন বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে ট্রিপ দেওয়া...আমি জানি, দু'চার জন এ venture করতে গিয়ে বিপদে পড়েছে...বড় রকমের বিপদ!

এ কথা শুনিয়া রোজা ক্ষণেক গম্ভীর হইয়া রহিল, পরে বলিল—But these my friends...they are all honourable people...

কথাটা বলিয়া রোজা সে স্থান ত্যাগ করিল।...

ফুল্লরা ভাবিল, রোজা কি ভাবে? ভালো কথা বলিতে গেলে তার এমন জটিল অর্থ করে কেন?...তার কল্যাণের জন্য...তাকে শুধু একটু সচেতন করিয়া দিতে এ কথা তুলিতে হয়! নহিলে রোজার সঙ্গে তার সম্পর্ক এমন নয় যে অনর্থক তাকে ব্যথা দিবে, তার সহজ আরামে নিষেধ তুলিবে!

'নিষেধ' কথাটা মনে জাগিতে ছেলেবেলার কথা মনে পড়িল।

এই নিষেধ আর শাসন—এ দুটার বিরুদ্ধে ফুল্লরা চিরদিন রুখিয়া মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছে!

তবু এ নিষেধ...আর সে-নিষেধ—দুটা সমান নয়! দুয়ে কত ভেদ!...

মিসেস দত্ত আসিয়া একদিন অনুযোগ তুলিলেন—স্কুলের সঙ্গে তুমি সংস্রব কেটে দিলে, মিসেস সেন!

ফুল্লরা বলিল—কাটিনি। মনের অবস্থা খুব ভাল নয় বলে একটু বিশ্রাম নিচ্ছি।

মিসেস দত্ত মৃদু হাসিলেন, বলিলেন,—মন যে-কারণে ভালো নয়, সে কারণ তো ঘরে বসে থাকলে ঘুচবে না! এখন আরো উচিত, পাঁচ জনের সঙ্গে মেলামেশা করা! চ্যারিটি প্লে নিয়ে ব্যস্ত ছিলে...ভাবলুম, ভালো হয়েছে। সত্যি, দুজনে এ বয়সে বেশী দিন ছাড়াছাড়ি থাকা যায় না। আমি জানি মিসেস সেন...আমারো একদিন এ-বয়স ছিল। মনে পড়ে, মেদিনীপুরে উনি একবার যান মকদ্দমা করতে। সাত দিন একটানা সেখানে ছিলেন! আমার যা হয়েছিল...উনি এসে বললেন,—তোমার খুব অসুখ-বিসুখ করেছিল, মুক্তি?...এ কি চেহারা!...চলো দার্জ্জিলিং, নয় পুরী!...আমি বললুম, তুমি আর মেদিনীপুরে যেয়ো না—দেখো, আমারো কোনোখানে যাবার দরকার হবে না—ঘরে থেকে সেরে উঠবো...ষোল কলায়।

ফুল্লরা মনে মনে হাসিল। ভাবিল, কি যে এঁরা ভাবিয়া রাখিয়াছেন! স্থির নেত্রে সে মিসেস দত্তর পানে চাহিয়া রহিল।

মিসেস দত্ত কহিলেন—একটি ছেলে বা মেয়ে হতো... তাহলে মন এতখানি হু হু করতো না...! হওয়া উচিত। এখনো হলো না! সত্যি, বলো যদি তাহলে এমন মাদুলি আমি আনিয়ে দিতে পারি...ও-সবে আমার বিশ্বাস আছে খুব। দেখেচি তো চোখে!

ফুল্লরা আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না, বলিল—আপনি চুপ করুন মিসেস দত্ত...মিষ্টার চাটার্জী বাইরে গেছেন বলে' আমার মনে এ ভাবান্তর হয়েছে, তা নয়। আপনারা যা ভাবেন...মানে, ও-সবে আমার প্রবৃত্তি বা রুচি নেই। ছেলেবেলা থেকে একটা কথা শুধু আমার মনে জাগতো...নানা ঘটনা থেকে মনে মনে আমি পণ করেছিলুম, সাধারণভাবে সংসার পেয়ে লোকে তুষ্ট থাকে, তাদের জীবনটুকু তারা ঢেলে দেয় সংসারের পায়ে! তাতে আমার মন ওঠে না। আমার মনে হয়, নিজেদের জীবনকে কোনো একদিক দিয়ে ফুটিয়ে তোলাতেই জীবনে সত্যকার সার্থকতা! স্বামীকে দুটো ভালো খাবার করে' খাওয়ালুম, তাঁর কাছে বসে দুটো ভালোবাসার কথা শুনলুম—তার পর ছেলেমেয়ে...তাদের সাজানো খাওয়ানো ঘুম পাড়ানো... এগুলো যেন কলের কাজ! এ কাজ করবার জন্যে কি

দরকার, বলুন, মনকে শিক্ষায় দীক্ষায় জাগিয়ে তোলার? কি-বা দরকার পৃথিবীর, এত সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান নিয়ে মাথা ঘামাবার? আমাদের দেশে পুরুষমানুষ বলুন আর মেয়ে-জাতই বলুন—জগতে এসে করলো কি, তার কোনো হিসাব আমায় দিতে পারেন?

হাসিয়া মিসেস দত্ত বলিলেন,—এ নিয়ে তুমি বক্তৃতা দাও ফুল্লরা···মেয়েরা কবিতা লিখচে, উপন্যাস লিখচে, স্কুল, মহামণ্ডল খুলচে, পলিটিক্স করচে···কিন্তু তোমার মতো ফিলজফির চর্চ্চায় কেউ এখনো মাথা ঘামায়নি! কি যে তুমি বলো!···আমি বুঝেচি তোমার এ অভিমান··তা এসো আমার সঙ্গে···স্কুলে। যে ভার নিয়েছিলে, সে ভার নিয়ে আমাকে ভাবনার দায় থেকে বাঁচাও, ভাই. সত্যি!···

ফুল্লরা কহিল,—আমাকে ক্ষমা করবেন, মিসেস দত্ত, আমার মন সুস্থ না হওয়া ইস্তক আমি স্কুলের কাজ দেখতে পারবো না।···এ-মন নিয়ে কাজ করা চলে না।··· ক'দিন ধরে ভাবচি···লেখাপড়া কেন শিখলুম! কি কাজে লাগবে? দাসী-চাকরদের উপর কর্তৃত্ব করে কিম্বা স্বামীর বিলাস-সহচরী হয়ে জীবনে সব পেলুম বলে তৃপ্তি বোধ করা—আর যে করে করুক, আমি তা করতে পারচি না।···তার চেয়ে···ঐ যে আমাদের থিয়েটারে সেদিন জ্যোতি বলে মেয়েটি মদন সেজেছিল···ভাবচি, কেন মিছে ও এ বিদ্যা শিখচে! দুদিন পরে সংসারে হাঁড়িকুড়ি, হাতা-বেড়ির মধ্যে সব বিদ্যা ঢেলে নিশ্চিন্ত হবে তো! ঐ নাচ নিয়ে ওর উচিত সাধনা করা···আনা পাবলোভা ঐ নাচের কৌশল দেখিয়ে দুনিয়া জয় করে ফেললেন···এ কি কম গৌরব!

মিসেস দত্ত বলিলেন,—বেশতো, তুমি লেখাপড়া শিখেচো—স্কুলের ভার নিয়ে তুমি শিক্ষা দাও, বাঙলার মেয়ে-জাতকে যতখানি পারো, শিখিয়ে-পড়িয়ে মানুষ করে তোলো।

ফুল্লরা বলিল—এ শিক্ষা দেওয়া···যেন প্রাণহীন ঠেকচে! মামুলি কতকগুলো গৎ গিলিয়ে দেওয়া···একে শিক্ষা বলতে আমার বাধচে, মিসেস দত্ত।

মিসেস দত্ত চট্ করিয়া কোনো উত্তর দিতে পারিলেন না। বেয়ারা আসিয়া সংবাদ দিল,—নকুলবাবু!

ফুল্লরা বলিল—ও! তাঁকে ও-ঘরে বসাও।

[ক্রমশঃ

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

বরষা এল অই

বরসা এল অই বাজায়ে রিনি ঝিনি,
চপলা সখী সাথে এলায়ে মেঘ-বেণী।
ঈশানে উড়ে মেঘ অশনি গরজন,
চমকি' নরনারী শ্রীরামে ডাকে ঘন।
বাদল বাজাইছে মাদল নীলাকাশে,
মেঘের বুক চিরি চপলা ঘন হাসে।
দাদুরী সারি সারি কাজরী গাহি চলে,
জনম হ'তে শুনি মরম তবু গলে।
নীরব বন-বীথি নবীনা বধূ সম.
সবুজ গুণ্ঠনে আহা কি মনোরম!
সরল সীঁথিসম বনের পথ তা'র,
আজিএ ধারা জলে ধোয়া যে ধূলিভার।
বরষি' অবিরল চলিছে মেঘদল,
বারতা দিতে দূরে—কামনা থাকে বল।

সুদূর অলকায় তরুণী প্রিয়া কার,
জমাট মেঘসম হৃদয়ে গুরুভার।
দয়িত 'পরে তা'র কুবের দিল শাপ,
দু'জনে ছাড়া ছাড়ি বিরহে বাড়ে তাপ।
কোথা সে রামগিরি—দূর সে কতখানি!
কাঁদিছে বিরহিণী কপালে কর হানি।
বসন আলুথালু নয়ন ভাসে জলে,
সচল মেঘদল তাহারে ডাকি বলে।
প্রাণেশ জানাইল বিরহী-বালা শুন,
আসিবে ধীরে ধীরে মিলন ফিরে পুনঃ।
বিকাশি সুখ দুখ বরষ-মাস-পলে,
নিয়তি লীলায়িত এমনি নাচি চলে।
তাহাতে দুখ কেন, বিরহ-বিষাদিনি,
সবলে বাঁধ হিয়া, দরদী কহে বাণী।

শ্রীমতী চারুশীলা দেবী।

আকবরের সমাধি

২

লাহোরের পথে আর একটু অগ্রসর হইলেই আকবরের সমাধিসৌধ দৃষ্টিগোচর হয়।

মোগলদিগের অন্যান্য সমাধিসৌধেরই মত ইহা বৃহৎ উদ্যানমধ্যে অবস্থিত। এককালে উদ্যানটি কিরূপ সুসজ্জিত ও শোভাময় ছিল, আজ আর তাহা বুঝিবার উপায় নাই। কালের নির্মম করস্পর্শে সেই পুরাতন সৌন্দর্য্যসুন্দর উদ্যান আজ তাহার পূর্ব্বশ্রীবর্জ্জিত।

সৌধটির বৈশিষ্ট্য—ইহা মোগল সম্রাটদিগের আর কোন সৌধের মত নহে; দেখিলে মনে হয়, ইহাতে হিন্দুস্থাপত্যের প্রভাবই পরিস্ফুট। হিন্দু—বিশেষ বৌদ্ধ সৌধ যেরূপ বহুতল—ইহাও তাহাই এবং ইহা দেখিলে মনে হয়, বিরাটত্বে ও অসম্পূর্ণতায় ইহা আকবরের কার্য্যের প্রতীক বলা যাইতে পারে।

হিন্দু স্থাপত্যের এই দৃষ্টান্ত আকবর ফতেপুর সিক্রীতে অনুকরণ করিয়াছিলেন। যাহারা তাঁহার পরিত্যক্ত পুরী দেখিয়াছেন, তাহারাই লক্ষ্য করিয়াছেন, তথায় দাওয়ান-ই-আমের বিপরীত দিকে অবস্থিত "পাঁচ মহল" সেই মোগল-পুরীতে হিন্দু প্রভাবের পরিচয় প্রদান করে। মহল-ই খাস হইতে সোপানপথে "পাঁচ মহলে" যাইতে হয়। এই পঞ্চতল বৃহৎ গৃহের প্রত্যেক তল পূর্ব্বে ছিদ্রযুক্ত প্রস্তরবৃতি পরিবেষ্টিত ছিল। এই বৃতির আবরণ যেমন ইহার উপর হইতে যে দৃশ্য দেখা যায়, তাহাতেও তেমনই—মনে হয়,
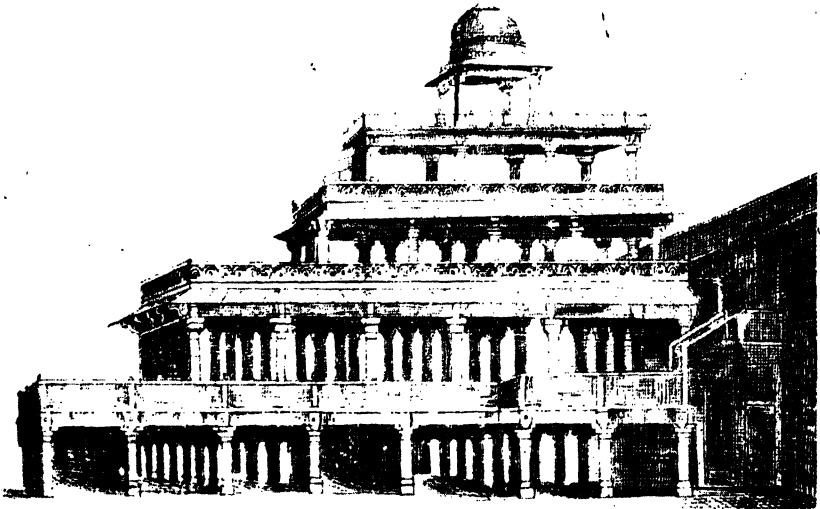
পাঁচ মহল

ইহা সম্রাট ও শুদ্ধান্তের মহিলাদিগের ভ্রমণের স্থানরূপে ব্যবহৃত হইত। সর্ব্বনিম্নতলে স্তম্ভগুলির মধ্যে যে বৃতি দিয়া বিভাগ করা ছিল, তাহাতে কেহ কেহ মনে করেন, ইহা বাদশাহের পরিবারের বালক-বালিকা ও তাহাদিগের অনুচরদিগের দ্বারা ব্যবহৃত হইত। ঐতিহাসিক কীন এই মতের সমর্থন করেন। এই বিরাট গৃহের স্তম্ভগুলিতে যে সকল নক্সা আছে, সেগুলির বৈচিত্র্য ও রুচি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ও চিত্তাকর্ষক। ইহাতে উত্তর-ভারতের হিন্দু ও সারাসিনিক শিল্পরীতি মিশ্রিত হইয়াছে। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, দেখিলে মহবল্লীপুরের "রথ" মনে পড়ে।

এই "রথ"গুলির কালনির্ণয়ে বহু বিলম্ব হইয়াছে। তাহার সর্ব্বপ্রধান কারণ, এগুলি বিরাট গ্রানাইট প্রস্তর
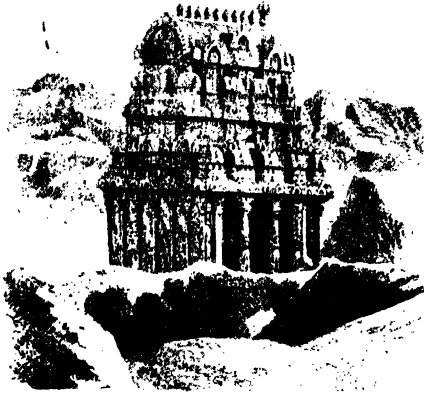
মহাবল্লীপুরের রথ

হইতে কাটিয়া বাহির করা বলিয়া ইহাদিগের অঙ্গে কালের করচিহ্ন সহজে লক্ষিত হয় না। বিশেষ সবগুলিই যেন অসমাপ্ত; দেখিলে মনে হয়, কায করিতে করিতে শিল্পীরা চলিয়া গিয়াছিল। এই সকল "রথ"ই যে দক্ষিণ-ভারতের মন্দির-স্থাপত্যের পূর্ব্ববর্ত্তী ও আদর্শ, তাহাতে সন্দেহ নাই। এইগুলি যে খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর পরবর্ত্তী নহে, তাহা এখন বিশেষজ্ঞরা সকলেই স্বীকার করেন। মদ্রদেশের সিন্ধুকূলে এই সব স্থপতিকীর্ত্তি অবস্থিত। "রথগুলিতে" উৎকীর্ণ লিপিতে সময়ের উল্লেখ নাই। কিন্তু এই সব লিপিতে যে পল্লভদিগের উল্লেখ আছে, তাহাতে মনে করা যায়, এগুলি খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর পরবর্ত্তী হইতে পারে না। সহজে বলা যায়, বৌদ্ধ যুগের বিহারগুলির আদর্শ এইরূপ ছিল—কারণ, গুহামন্দিরে তাহাই লক্ষিত হয়। ফার্গুশন বলেন—এই দৃষ্টান্ত বৌদ্ধ স্থাপত্যের শেষ ও দ্রাবিড়ীয় স্থাপত্যের আরম্ভ—উভয়ের মধ্যবর্ত্তী ("It seems hardly to admit of doubt that we have here petrifactions of the last forms of Buddhist architecure and of the first forms of that of the Dravidians")

আকবরের সময় হইতে মুসলমানরা হিন্দু স্থপতিদিগকে স্বাধীনভাবে কায করিবার যে সুযোগ দিয়াছিলেন, তাহার ফলে এ দেশে এক নূতন স্থাপত্যের উদ্ভব হয় এবং তাহা "ইণ্ডো-সারাসিনিক" নামে পরিচিত। মোগল সম্রাটদিগের মধ্যে আকবরই এ বিষয়ে অগ্রণী। তিনি বুঝিতে পারেন, বিদেশে বিজিত জাতির মধ্যে সর্ব্বতোভাবে বিজেতার আদর্শ অক্ষুণ্ণ রাখায় রাজনৈতিক বিপদ থাকে; এবং তিনি হিন্দুর শিল্পে যাহা সুন্দর, তাহা গ্রহণ করেন। "He authorised a liberal use of life portrature in both animal and vegetable form In other words Hindu treatment of Muhammadan subjects became the rule, not the exception" এই আদর্শে আগ্রা দুর্গের এ প্রাসাদের কতকাংশ নির্ম্মিত হয়, ফতেপুর সিক্রীর রাজপুরী কল্পিত ও রচিত হয় এবং সিকান্দ্রায় আকবরের সমাধিতে ও নুরজিহানের পিতার সমাধি (ইতিমদ্দৌলা) এতদুভয়ে এই নূতন আদর্শের পরিচয় পাওয়া যায়

দেখা যায়, সমৃদ্ধ মুসলমানরা জীবদ্দশায় আপনাদিগের সমাধি রচনার ব্যবস্থা করিয়া যাইতেন—কেহ কেহ তাহা রচনা করিয়াও যাইতেন। এই প্রথা আজও যে কেহ কেহ পালন করেন না, তাহা নহে।

আকবর স্বয়ং তাঁহার সমাধি-সৌধের গঠন আরম্ভ করিয়া গিয়াছিলেন এবং সেই জন্যই তাহা ভারতে মোগল সম্রাটদিগের অন্যান্য সমাধিসৌধ হইতে গঠনের আদর্শে

ভিন্নরূপ। আকবর যেমন নানা ধর্ম্মে সমন্বয়সাধনের কল্পনা করিয়াছিলেন—এই সমাধিসৌধেও তেমনই হিন্দু বা বৌদ্ধ স্থাপত্যাদর্শ অনুসৃত হওয়ায় ইহা ভারতীয় সারাসিনিক আদর্শের অনুরূপ হয় নাই।

আকবরের মূল কল্পনা কিরূপ ছিল, তাহা জানিবার উপায় নাই। হয় ত সে আদর্শ পরে—তাঁহার পুত্র জাহাঙ্গীর কর্তৃক পরিচালিত হওয়ায় ইহার সামঞ্জস্যহানি হইয়াছিল। সেই জন্য ফার্গুশন বলিয়াছেন—প্রথম দৃষ্টিতে মনে হয়, এই অসাধারণ সৌধের কল্পনা আকবরের "খেয়াল" বা কোন ভিন্নরূপ সৌধের অনুকরণ। ইহা যে বৌদ্ধ "রথের" অনুকরণ, তাহাতে সন্দেহ নাই। কারণ, প্রস্তরে ক্ষোদিত বৌদ্ধমন্দিরে যে সব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কক্ষ থাকে, এই সমাধি-সৌধের সর্ব্বোচ্চ তলে তাহার অনুকরণে রচিত "প্যাভিলিয়ন" লক্ষিত হয়। মহাবল্লীপুরের রথের সহিত ইহার তুলনা করিলেই ইহা বুঝিতে পারা যায়। যে স্থানে সমাধি রচিত হইয়াছে—কবরের উপর প্রস্তরখণ্ড স্থাপিত হইয়াছে—তাহার উপর যদি ৩০ বা ৫০ ফুট উচ্চ গম্বুজ থাকিত, তবে "রথের" সহিত ইহার সাদৃশ্য অনায়াসে বুঝা যাইত। ভারতবর্ষে বহু সমাধি বিদ্যমান—কোনটিতে কবর অনাচ্ছাদিত নাই। সুতরাং মনে করা অসঙ্গত হইবে না যে, গম্বুজ রচনা করাই আকবরের অভিপ্রেত ছিল। যদি ঐ গম্বুজটি রচিত হইত, তবে যে এই সমাধিসৌধ সৌন্দর্য্যে তাজমহলের অব্যবহিত পরবর্ত্তী বলিয়া বিবেচিত হইত, তাহাতে সন্দেহ নাই। ("Had it been so completed, it certainly would have ranked next the Taje among Indian mausolea")

সৌধটি যে আকবরের কল্পনানুসারে সম্পূর্ণ করা হয় নাই, তাহার প্রমাণ জাহাঙ্গীর তাঁহার আত্মচরিতে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার রাজত্বকালের তৃতীয় বৎসরের বিবরণ বিবৃত করিবার সময় জাহাঙ্গীর লিখিয়াছেন :—

"জামাদী-উল-সানীর" ১৭ই তারিখে—সোমবারে আমি নবমস্বর্গবাসী আমার পিতার সমুজ্জ্বল সমাধিস্থানে আমার শ্রদ্ধা জ্ঞাপনজন্য পদব্রজে (আগ্রা) হইতে যাত্রা করি। যদি সম্ভব হইত, তবে আমি চক্ষু ও মস্তক দিয়া হাঁটিয়া এই পথ অতিক্রম করিতাম। আমার জন্মের জন্য তিনি যে "মানত" করিয়াছিলেন, তদনুসারে আমার পূজ্য পিতা ফতেপুর হইতে ১ শত ২০ ক্রোশ দূরবর্ত্তী আজমীরে শ্রদ্ধেয় খাজা মইন উদ্দীন চিস্তির সমাধিস্থানে শ্রদ্ধা নিবেদনকল্পে ঐ পথ পদব্রজে অতিক্রম করিয়াছিলেন। যদি আমি চক্ষু ও মস্তক দিয়া হাঁটিয়া এই পথ অতিক্রম করিতাম, তাহা হইলে আমি আর কি বিস্ময়কর কায করিতাম? সেই সমুজ্জ্বল সমাধিস্থানে উপনীত হইয়া আমি তাহার উপর নির্ম্মিত সৌধটি যত্নসহকারে পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম। আমার মনে হইল, সৌধটি আমার কল্পনানুযায়ী হয় নাই; কারণ, আমার বাসনা এই যে, যাহাতে পৃথিবীর সকল স্থান হইতে ভ্রমণকারীরা আসিয়া সৌধটি দর্শন করিয়া বলিবেন—আমরা পৃথিবীর আর কোথাও এমন গৃহ দর্শন করি নাই—এমন ভাবে সৌধটি নিৰ্ম্মিত হইবে। সৌধটি যখন নির্ম্মিত হইতেছিল, তখনই হতভাগ্য খশরু বিদ্রোহী হওয়ায় আমাকে বাধ্য হইয়া লাহোর যাত্রা করিতে হয়। (আমার অনুপস্থিতিতে) স্থপতিরা যাহা ভাল মনে করিয়াছিল, তদনুসারে নির্ম্মাণকার্য্য করিতে থাকে। তাহারা কতকগুলি নূতন কায করে এবং তিন বা চারি বৎসরের মধ্যে সৌধের জন্য নির্দ্দিষ্ট সব অর্থ ব্যয়িত হইয়া যায়। আমার আদেশে দক্ষ স্থপতিদিগের নির্দ্দেশানুসারে অন্য কারিগররা আমার অভিপ্রেত নক্সা অনুসারে কতকগুলি অংশের পুনর্নির্ম্মাণ করে। ক্রমে বিরাট সৌধ নির্ম্মিত হয়। এই সৌধের চারিদিকে উদ্যান রচনা করা হয় এবং শ্বেত মর্ম্মর প্রস্তরে রচিত উচ্চ এক বিরাট তোরণ রচিত হয়।"

জাহাঙ্গীরের এই লিপি পাঠ করিলে একটি কথা প্রথমেই মনে হয়। পিতার জীবদ্দশায় পুত্রের বিদ্রোহ-ঘোষণ ভারতে মোগল সম্রাটদিগের অভিসম্পাত ছিল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কিন্তু পিতার মৃত্যুর পর পিতৃ-রাজ্যাধিকারী পুত্রের পিতার সম্বন্ধে উক্তি প্রায় সর্ব্বত্র অতিরঞ্জনপূর্ণ। এ দেশে একটি চলিত কথা আছে :—

"জ্যান্তে দিল না ভাতকাপড়;
ম'রে গেলে দান-সাগর।"—

অর্থাৎ জীবদ্দশায় পিতা বা মাতাকে অযত্ন করিয়া তাঁহার শ্রাদ্ধে বিরাট আয়োজন করা হয়!

জাহাঙ্গীর যখন যুবরাজ, তখন তিনি অনেক সময় পিতার প্রতি অনুরাগের ও শ্রদ্ধার পরিচয় দেন নাই এ

তিনিই আকবরের শ্রদ্ধেয় বন্ধু আবুল ফজলের মৃত্যুর জন্য দায়ী। কিন্তু এই পুত্রের প্রতি আকবরের স্নেহ অপরিসীম ছিল। তিনি পুত্রলাভের আশায় যখন ধর্ম্মকর্ম্ম করিতেছিলেন, তখনই জাহাঙ্গীরের জন্ম হয়। তাঁহার জন্ম অলৌকিক ঘটনা বলিয়া আকবরের বিশ্বাস ছিল এবং বহু আরাধনায় যে পুত্র লাভ করা যায়, তাহার প্রতি পিতামাতার স্নেহাধিক্যও স্বাভাবিক। তাই জাহাঙ্গীরের কুব্যবহার জানিয়াও আকবর মৃত্যুর তিন বৎসর পূর্ব্বে তাঁহাকেই উত্তরাধিকারী নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন।

এই সৌধনির্ম্মাণে ১৫ লক্ষ টাকা ও ৪৫ লক্ষ তুরাণীয় মুদ্রা ব্যয় হইয়াছিল বলিয়া জানা যায়।

টমাস হার্ব্বার্ট নামক যে ভ্রমণকারী জাহাঙ্গীরের শাসনকালে আগ্রায় গমন করিয়াছিলেন, তিনি তাঁহার ভ্রমণ-বিবরণে লিখিয়াছিলেন :—

"আগ্রা হইতে—লাহোরে যাইবার পথে—৫ মাইল দূরে মোগল সম্রাটের (আকবরের) সমাধিস্থান। আকবরই সমাধিসৌধের নির্ম্মাণ আরম্ভ করাইয়াছিলেন এবং তাঁহার পুত্র জাহাঙ্গীর কর্তৃক নির্ম্মাণকার্য্য শেষ করা হইতেছে। এখনও সৌধনির্ম্মাণ শেষ হয় নাই এবং এই বিস্ময়কর সৌধনির্ম্মাণে ইতোমধ্যেই ১ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা ব্যয়িত হইয়াছে। * * * এমন সৌধ আর দেখা না—

"Such a monument
The sun through all the world sees none
more great."

বলা বাহুল্য, হার্ব্বার্ট যখন এই সৌধ অসম্পূর্ণ অবস্থায় দেখিয়া এইরূপ বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছিলেন, তখনও তাজমহল নির্ম্মাণের অনেক বিলম্ব ছিল।

১৬৪০ খৃষ্টাব্দে পাদ্রি মানরিকও ইহার যেরূপ উল্লেখ করিয়াছিলেন, তাহাতে স্পষ্টই প্রতীত হয়, তৎকালে এই সৌধ জাহাঙ্গীরের অভিলাষ পূর্ণ করিয়াছিল—বিদেশ হইতে আগত ভ্রমণকারীরা ইহার অশেষ প্রশংসা করিয়াছিলেন।

বার্ণিয়ার লিখিয়াছিলেন, দুইটি সৌধে দিল্লী অপেক্ষা আগ্রার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত—আকবরের সমাধি-সৌধ ও তাজমহল। এই কথা বলিয়া তাজমহলের বর্ণনায় প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে বার্ণিয়ার বলিয়াছিলেন :—"আমি আকবরের স্মৃতি-সৌধ সম্বন্ধে আর কিছু বলিব না; কারণ, ইহার সর্ব্ববিধ সৌন্দর্য্য তাজমহলে আরও সুস্পষ্টরূপে বিকশিত হইয়াছে।"

কাউণ্ট অব নোয়ার সম্রাট আকবরের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধাসম্পন্ন ছিলেন এবং আকবর সম্বন্ধে প্রামাণ্য পুস্তক রচনা করিয়া গিয়াছেন। তিনি মনে করেন—তাঁহার সমসাময়িক ব্যক্তিদিগের মধ্যে আকবর যেমন তুলনাহীন ছিলেন, তাঁহার সমাধি-সৌধও তেমনই ভারতবর্ষে—এমন কি এসিয়ায়—অতুলনীয় বলা যাইতে পারে। ডিউক লিখিয়াছেন :—ইহা সেকালের কিম্বদন্তীকথিত পরীর সৌধের মত মনে হয়। এই সমাধিসৌধ দেখিয়া প্রত্যাবর্ত্তনকালে ইহার প্রভাব তাঁহাকে কিরূপ প্রভাবিত করিয়াছিল—তাঁহার পুস্তকের (দ্বিতীয় ভাগে) উপসংহারে তাহা দেখিতে পাওয়া যায়—"I formed the resolution to hold in remembrance Akbar and the age of Akbar"—আমি আকবরের ও আকবরের সময়ের কথা স্মরণ রাখিতে কৃতসঙ্কল্প হইলাম।

[ক্রমশঃ।

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ।

"নিভাইয়া দাও দীপ"

নিভাইয়া দাও দীপ। মৃত্যুসম ঘন অন্ধকার
সমুদ্র তরঙ্গ মত প্লাবিত করিয়া চারিধার
নামিয়া আসুক ত্বরা; কৃষ্ণ-পক্ষ করিয়া বিস্তার
আবরিয়া দিক্ মোরে, যেন স্নিগ্ধ অঞ্চল মাতার!
চিহ্ন মোর, নাম মোর মুছে যাক্ এ সংসার হতে
আঁধারে মেলিয়া আঁখি দেখি নব আলোকের রথে
জীবন-দেবতা মোর। কায নাই আলোকের মেলা
ধরণীর প্রয়োজনে আপনারে লয়ে তুচ্ছ খেলা;
বাহিরে খুঁজিয়া ফিরে যে অশান্ত ব্যাকুল হৃদয়
তাহারে ফিরায়ে আনো অন্ধকারে কর তারে লয়!
যে আলোকে দেখি নাই হে সুন্দর তব রূপখানি
মৃত্যুসম অন্ধকারে তাহারে লইব আজ চিনি।

শ্রীনলিনী সেন।

সাময়িক প্রসঙ্গ

কংগ্রেস ও কৃষক

আজকাল দেখিতেছি যে দেশের শ্রমিক এবং কৃষক প্রভৃতিকে স্বদলে টানিবার জন্য একটা বিষম হুড়াহুড়ি পড়িয়া গিয়াছে। সরকার পক্ষ আচম্বিতে নিম্নস্তরের লোকদিগের বন্ধু হইয়া দাঁড়াইয়াছেন। আবার কংগ্রেসে জওহরলালজীও সমাজতন্ত্রবাদ প্রচার করিয়া দেশের নিম্নতম শ্রেণীকে স্বদলে টানিবার চেষ্টা করিতেছেন। মহাত্মাজী যেমন গ্রাম্য উন্নতিসাধনে অবহিত হইলেন, অমনই সরকার পল্লীগ্রামের উন্নতিসাধনে অবহিত হইলেন। সরকারের যে কথা, সেই কায। সঙ্গে সঙ্গে ভারত-সরকার কোটি টাকা ত মঞ্জুর করিয়াছেন এবং প্রতি বৎসর ঐরূপ করিতে থাকিবেন বলিয়া আশ্বাস দিয়াছেন। আর কংগ্রেসওয়ালা-দিগের "মন ত সখের বটে, হাতে কিন্তু পয়সা নাই। আমি রাজা মারি উজির মারি কুকুর মেরে ফাঁসী যাই।" সরকার পল্লীগ্রামে টাকা খরচ করিয়া কৃষক এবং শ্রমিক সমাজের কিছু কিছু উপকার করিবেন,—আর রেডিও বাজাইয়া কিছু আনন্দ এবং সদুপদেশ-সুধা বিতরণ করিবেন। কংগ্রেস লোক পাঠাইয়া তাহাদিগকে রাজনীতিকভাবে ভাবিত করিবেন। কৃষক ও শ্রমিকদিগের কষ্ট কতখানি, তাহাদের অধিকার কতখানি, তাহাদের দাবী কতখানি হওয়া উচিত, তাহারা যে সকলের সমান, এ সকল অমিয় বচন তাহাদিগকে শুনাইবেন! অন্য দেশের কৃষীবলের এবং শ্রমিক-দিগের অবস্থার সহিত তাহাদের অবস্থার তুলনা করিবেন,—কিন্তু কাযে কিছু করিতে পারিবেন না। কারণ, তাঁহাদের ক্ষমতা এবং অর্থ এই দুইটি কার্য্য-সাধক উপকরণেরই অত্যন্ত অভাব। এ দেশের সাধারণ লোকদিগের মধ্যে শতকরা ৯০ জনের অধিক চাষী, তাহারা সকলেই প্রায় নিরক্ষর। তাহারা অত্যন্ত দরিদ্র, তাহার উপর অমিতব্যয়ী। অন্য আনুষঙ্গিক কর্ম্মের অভাবে তাহারা বৎসরের মধ্যে কয়েক মাস প্রায়ই বসিয়া থাকে। তাহার উপর তাহাদের ক্ষেতের জমি ক্রমশঃ নানা ভাগে বিভক্ত হইয়া যাইতেছে। এরূপ অবস্থায় কৃষকদিগের উপকার করিতে হইলে কৃষির উন্নতি এবং গবাদি গৃহপালিত পশুর উন্নতি অবশ্যই করিতে হইবে। নতুবা তাহাদের উন্নতির অন্য কোন উপায় নাই। ইহা ভিন্ন বাঙ্গালায় কৃষক জ্বরে জীর্ণ, দারিদ্র্যে দীর্ণ। আনুষঙ্গিক বৃত্তি হিসাবে কুটীরশিল্পের ব্যবস্থা করিতে হইলে অর্থের প্রয়োজন। সরকারের অর্থ আছে, সরকার মন করিলে তাহা করিতে পারেন। কংগ্রেসের অর্থ নাই,—তাঁহারা বাক্‌সর্ব্বস্ব, সুতরাং এখন নাস্তিক্যবাদমূলক সমাজতন্ত্রবাদ প্রচার পূর্ব্বক সাধারণ লোকের মনে উচ্চাকাঙ্ক্ষা জাগাইয়া তোলা ভিন্ন তাঁহাদের অন্য কায নাই। কিন্তু এই সমাজতন্ত্রবাদ প্রচার দ্বারা দেশে একটা ধর্ম্মবিরোধী দারুণ বিপ্লব উপস্থিত করা ভিন্ন অন্য কোন লাভ হইবে না। লর্ড লিনলিথগো এ দিকে গৃহপালিত পশুর এবং কৃষির উন্নতিসাধনে অবহিত হইয়াছেন। কিন্তু কংগ্রেস কি করিতেছেন? তাঁহাদের মধ্যে এখন সমাজতন্ত্রবাদ প্রচার হইয়া ঘোর মতভেদ দেখা দিয়াছে বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ এবং মিষ্টার রাজাগোপালাচারী (মহাত্মাজীর বৈবাহিক) এই ভাবের কথা বলিয়াছেন। তাঁহারা এবং তাঁহাদের সহিত আরও অনেকে বলিতেছেন যে, এ দেশের চাষীরা অশিক্ষিত, তাহারা কংগ্রেসের উদ্দেশ্য বুঝিতে অক্ষম, অধিকন্তু চারি আনা চাঁদা দিতেও অসমর্থ। যাহারা সমর্থ, তাহারা চাঁদা দিতে অসম্মত। অতএব তাহাদিগকে কংগ্রেসের মধ্যে না আনিয়া তাহাদিগকে সঙ্ঘবদ্ধ করা উচিত। তাহাদের অভাব অভিযোগের প্রতীকার করাও বিধেয়। কিন্তু প্রতীকার করিবার সাধ্য কি কংগ্রেসের আছে? বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ সম্প্রতি বিহারের নানা স্থানে বক্তৃতা করিয়া, কি উপায়ে কংগ্রেসের সহিত কৃষীবলের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ সংস্থাপন করা সম্ভব, তাহার আলোচনা করিয়াছেন। কৃষকরা বাবু রাজেন্দ্র-প্রসাদকে জমিদার এবং জমিদারদিগের নায়েব-গোমস্তার অত্যাচার-উৎপীড়নের অনেক কথাই বলিয়াছিল। ইহা অযথা মামুলী এবং একতরফা কথা। ইহার মধ্যে যদি সত্য কিছু থাকে, তাহা হইলে তাহার অনুসন্ধান করিয়া চাষীদিগকে তাহার প্রতীকার করিবার উপায় বলা উচিত। বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ চাষীদিগকে বলিয়াছেন যে, দেশে স্বরাজ প্রতিষ্ঠিত না হইলে তাহাদের সেই অভিযোগের প্রতীকার হইবে না। ইহা যেন প্রকারান্তরে বলা হইতেছে যে, "থাক্ রে মন সয়ে, আষাঢ় মাসে ভাত দেব তোকে ঝিঙ্গের ঝোল দিয়ে।" এইরূপ কথা। জমিদারদিগের দেয় ন্যায্য খাজনা জমিদারদিগকে দিতে বলা অবশ্য কর্ত্তব্য। কিন্তু তাই বলিয়া জমিদাররা যদি অতিরিক্ত কিছু চাহিয়া বসেন, তাহা হইলে তাহা সহ্য করাও কোনমতে সঙ্গত নহে। বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ বিহারের অবস্থা খুব ভাল রকমই জানেন। সুতরাং যাহাতে কোন জমিদার বা জমিদারের আমলা-গোমস্তারা প্রজাপীড়ন না করিতে পারে, তাহারও ব্যবস্থা করা আবশ্যক। অবশ্য ন্যায্য খাজনা দিতে বলিলে তাহা কোনমতেই দোষাবহ হইবে না। অথচ স্বরাজ কবে আসিবে, কস্মিন্‌কালেও তাহা আসিবে কি না, তাহা ভারতে

বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ

ভাগ্যবিধাতাই বলিতে পারেন। কিন্তু তাহার মধ্যে জমিদার এবং প্রজার মধ্যে যাহাতে সদ্ভাব স্থাপিত হয়, তাহা করা প্রত্যেক জননায়কের অবশ্য কর্ত্তব্য।

বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ কৃষকদিগের অনেক দুঃখের কাহিনী শুনিয়া আসিয়াছেন। তন্মধ্যে একটি তথ্য এই যে,—"অনেক স্থলে কৃষকদিগের বিঘা প্রতি কুড়ি হইতে পঁয়ত্রিশ টাকা পর্য্যন্ত খাজনা দিতে হয়।" ('দৈনিক বসুমতী' ২রা আষাঢ় ৪ পৃষ্ঠা ৪র্থ কলম)। ইহা কি সত্য হইতে পারে? এই বিঘা আমাদের দেশের বিঘা নহে। আমাদের দেশে ১ হাজার ৬ শত বর্গ-গজে এক বিঘা জমি হয়। স্থানে স্থানে ইহার পরিমাণ আরও অধিক; কিন্তু যুক্তপ্রদেশে ৩ হাজার ২৫ বর্গ-গজে এক বিঘা হয়। সুতরাং উহা আমাদের দুই বিঘারও কম। যদি বিহারের বিঘা যুক্তপ্রদেশের বিঘার অনুরূপ হয় আর তাহার খাজনা যদি ২০ হইতে ৩৫ টাকা পর্য্যন্ত হয়, তাহা হইলে ঐ খাজনার পরিমাণ অত্যন্ত অধিক, ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। বাঙ্গালায় কিন্তু এরূপ উচ্চ হারে খাজনা কোন জমিদারের জমিতে নাই। এখানে অনেক স্থানে বিঘা প্রতি আট আনা খাজনা ধার্য্য আছে। অধিকাংশ স্থলে এক টাকা হইতে ২ টাকা পর্য্যন্ত ধার্য্য আছে। সে হিসাবে বিহারের এক বিঘা জমির খাজনা ৩ টাকার অধিক হওয়া উচিত নহে। বিহারের জমি অধিক উর্ব্বর, ইহা ধরিলেও তথায় এক বিঘা জমির খাজনা না হয় ৪ টাকা সাড়ে ৪ টাকা হারেই হউক। ইহার অধিক ধার্য্য হওয়া উচিত নহে। অবিলম্বে ইহার প্রতীকার হওয়া আবশ্যক। স্বর্গীয় রমেশচন্দ্র দত্ত ৩৬ বৎসর পূর্ব্বে গয়া জিলায় খাজনার যে হিসাব দিয়াছিলেন, তাহাতে ত এত অধিক হারে খাজনা দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহাতে মনে হয়, কৃষকরা তাহাদের অভাব এবং অভিযোগের কথা অত্যন্ত অতিরঞ্জিত করিয়া বলিয়াছে। ইহা স্বাভাবিক। যাহা হউক, চাষী লইয়া এই কাড়াকাড়ি ব্যাপারে চাষীদের আত্মানন্দ পরম। বড়লাট প্রতি প্রদেশের শাসকদিগকে, শাসকরা প্রতি জিলার ম্যাজিষ্ট্রেটকে এবং জমিদারদিগকে গবাদি পশুর উন্নতিবিধানের ব্যবস্থা করিবার জন্য পত্র দিতেছেন। সরকারের হুকুমমতে সকলে না হয় বলবান্ বলীবর্দ্দ দ্বারা গো-মহিষাদি জাতির আকৃতির উন্নতিসাধন করিতে থাকিবেন, কিন্তু অর্দ্ধাশনে শীর্ণ কৃষীবল আপনারাই উদর পূরিয়া খাইতে পায় না, বলীবর্দ্দকে খাইতে দিবে কি? তাহারা বাড়ীর সংলগ্ন সঙ্কীর্ণ ভূমিতে নেপিয়ার ঘাস প্রভৃতির চাষ করিবে,—কিন্তু তাহাদের মুখে অন্নগ্রাস তুলিবার জন্য তরকারীর চাষ করিবে কোথায়? নেপিয়ার বা সাবু ঘাসের বনে যে সাপ ও মশার আড়ত হইবে না, এমন কথা কি শাসনকর্ত্তারা জোর করিয়া বলিতে পারেন? যাহা হউক, বড়লাটের ও প্রাদেশিক লাটদিগের চাষীদিগের উন্নতিসাধনের দিকে অবহিত দেখিয়া বিলাতে চার্চ্চিল সাহেব বলিয়াছেন যে, কৃষকদিগের জন্য বড়লাটের মনে এত করুণা দেখিয়া আর ভারতের কৃষকরা রাজভক্ত না হইয়া যায় না। এদিকে রাজেন্দ্রপ্রসাদ বলিতেছেন, "মা ভৈঃ ভারতের কৃষীবল, স্বরাজ আসিলেই আমরা তোমাদিগকে হাতে হাতে স্বর্গ দিব। স্বরাজ আগত ঐ।" এখন এই দোটানায় পড়িয়া ভারতীয় কৃষীবলের প্রাণে কতটা আশার সঞ্চার হইবে, আমরা কেবল তাহাই ভাবিতেছি। এখন ভূস্বামী, জমিদার ও সাধারণ ভদ্রলোকরা কোথায় যাইয়া দাঁড়াইবেন?

নিরঙ্কুশ বিদ্রোহ

ভাগাড়ে মরা গরু পড়িলে যেমন অনেক শিয়াল শকুনি আসিয়া তাহার উপর পড়ে, এবং অতি অল্পক্ষণের মধ্যে যেমন উহা একবারে নিঃশেষ করিয়া দেয়, সেইরূপ হিন্দুর ধর্ম্মানুষ্ঠানের উপর তুণ্ডাঘাত করিবার জন্য অনেক শৃগাল শকুনি গৃধিনী আসিয়া উপস্থিত হইতেছে। সম্প্রতি চৌরঙ্গীর 'ষ্টেটস্‌ম্যান' ডাক্তার ভগবান দাসের অসবর্ণ বিবাহ আইনের পাণ্ডুলিপিখানির সমর্থনকল্পে ফতোয়া দিয়াছেন যে, হিন্দুর বিবাহ একটা সামাজিক আচার মাত্র। ইহা ধর্ম্মের অঙ্গ নহে। কিন্তু হিন্দু ধর্ম্মশাস্ত্রের বিশেষজ্ঞগণ উহাকে ধর্ম্মকার্য্য বলিয়াই জানেন। বিবাহ হিন্দুর সর্ব্বপ্রধান সংস্কার, সুতরাং উহা ধর্ম্মকার্য্য। শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা হইতে ত' উহার ব্যতিক্রম করিলে হিন্দুর হিন্দুত্ব থাকে না—থাকিতে পারে না। হিন্দুর ধর্ম্মকার্য্যের লক্ষ্য হইতেছে মায়াভিভূত আত্মার উন্নতিসাধন। সংস্কার-কার্য্যগুলি সেই উন্নতিসাধন করিয়া দেয়। যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন যে,—

এবমেনঃ শমং যাতি বীজগর্ভসমুদ্ভবম্।

অর্থাৎ "সংস্কার বীজগর্ভজাত পাপ সকলকে প্রশমিত করে।" যাহা পাপের প্রকোপ প্রশমিত করে, তাহা কখনই সামাজিক কার্য্য হইতেই পারে না। উহাকে সামাজিক কার্য্য বলিলে ভুল করা হয়। ধর্ম্মের সংস্কারসাধন করিবার অধিকার ব্যবস্থাপরিষদের থাকা কখনই উচিত নহে। ১৭৮০ খৃষ্টাব্দে যে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আইন প্রণীত হয়, তাহার ১৮ ধারায় এই মর্ম্মে ব্যবস্থা করা ছিল যে, হিন্দু, মুসলমান প্রভৃতি ভারতবাসীদিগের নাগরিক এবং ধর্ম্মসম্পর্কিত ব্যবস্থার কোনরূপ পরিবর্ত্তন সাধন করা যাইবে না। পরিবারের কর্ত্তা যে ধর্ম্মাচরণ করিয়া আসিতেছেন, তাহাই চূড়ান্ত হইবে। তাহার পর ১৭৯৭ খৃষ্টাব্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়া আইন নামে যে আইন প্রণীত হয়, তাহার ১২ ধারাতেও ব্যবস্থা করা হয় যে, ভারতীয় গৃহস্থের কর্ত্তা নাগরিক (civil) এবং ধর্ম্মবিষয়ক যে আচার প্রতিপালন করিয়া আসিতেছেন, তাহার কোন ক্রমেই ব্যতিক্রম করা যাইবে না। এই ব্যবস্থা বরাবরই চলিয়া আসিতেছে। এতবার শাসন-সংস্কার সাধিত হইল, কিন্তু এই দুইটি আইনের ঐ দুইটি ধারা বরাবরই অক্ষুণ্ণ ছিল। সাইমন কমিশনের রিপোর্টে ও হোয়াইট পেপারে উহা উঠাইয়া দিবার কথা ঘুণাক্ষরেও বলা হয় নাই। কিন্তু বিলাতের লর্ড সভায় গত ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দের ১৮ই জুলাই যখন শাসন-সংস্কার আইন রচিবার বিষয় আলোচিত হইতেছিল, তখন লর্ড মেষ্টনের প্রস্তাবে এবং মার্কুইস্ অব জেটল্যাণ্ডের সমর্থনে নূতন শাসন সংস্কার আইনের ৩০১ ধারা সংযোজিত হয়। উহাতে ঐ দুইটি ধারাকে পুরাতন (archaic and obsolete) বলিয়া বাদ দিবার প্রস্তাব করা হয়। সেই প্রস্তাবই গ্রাহ্য হয়। বলা বাহুল্য যে, গোলটেবিল বৈঠকেও ঐ দুইটি প্রয়োজনীয় ধারা (স্থানাভাবে আমরা এখানে ঐ দুইটি ধারা উদ্ধৃত করিয়া দিতে পারিলাম না) সম্বন্ধে কোন আলোচনাই হয় নাই। চুপি চুপি কিরূপ গুপ্তমন্ত্রণাবলে এই কার্য্য সাধিত হইল, তাহা আমরা বুঝিলাম না। কিন্তু এখনও যখন শাসন-সংস্কার আইন বহাল হয় নাই, তখন ঐ দুইটি ধারা বজায় আছে স্বীকার করিতে হইবে।

কারণ, প্রাদেশিক অটোনমি নামক কাঁঠালের আমসত্ব এখনও প্রবর্ত্তিত হয় নাই। অবশ্য ইহার পূর্ব্বে সর্দ্দা আইন এবং গৌরের অসবর্ণ বিবাহ আইন এই ধারা অমান্য করিয়াই বিধিবদ্ধ করা হইয়া গিয়াছে। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, আইন একবার লঙ্ঘন করিয়া কায করিলে কি বারবার তাহা করা যায়? হিন্দু সমাজ শববৎ পতিত, তাই আজ তাহার উপর হিন্দুর ধর্ম্মনাশা শকুনি গৃধিনী আসিয়া তুণ্ডাঘাত করিতে পারিতেছে।

সম্প্রতি অধ্যাপক শ্রীযুত রাধাকমল মুখোপাধ্যায় হিন্দুর এই ধর্ম্মকে বলি দিয়া হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ-সমস্যার সমাধান করিতে চাহিতেছেন। তিনি রাজসাহীর আষাঢ়ে সমিতি নামক এক সাহিত্যিক সম্মেলনে এই আষাঢ়ে প্রস্তাব করিয়াছেন। তিনি বলেন যে, ধর্ম্ম লইয়া এই স্বতন্ত্র নির্ব্বাচক-মণ্ডলী গঠিত করাতে দেশ নানা ভাগে বিভক্ত হইয়া পড়িতেছে। অতএব উচ্চ বর্ণের লোকদিগের সাম্প্রদায়িক ভাব বর্জ্জন করিয়া বা উহা এক পাশে ফেলিয়া রাখিয়া আর্থিক ব্যাপার লইয়া দুইটি বিবদমান সম্প্রদায়কে মিলিত হইতে হইবে। তিনি বলেন, যদি আর্থিক সমস্যা ও রাজনীতিক সমস্যা লইয়া ঠিক ভাবে আলোচনা করা যায়, তাহা হইলে এই সমস্যার সমাধান হইতে পারে। যদি ভালভাবে আর্থিক মতলব আঁটা যায়, তাহা হইলে মধ্যবর্ত্তী শ্রেণীভুক্ত হিন্দুমুসলমানের এই বিবাদ মিটিয়া যাইবে। কত 'হাতী-ঘোড়া গেল তল, গাধা বলে কত জল।' কত বড় বড় রথী মহারথ এই সমস্যাসমাধানের চেষ্টা করিতে যাইয়া বিফলমনোরথ হইয়া ফিরিয়া গেলেন। এখন উপযুক্ত আর্থিক ব্যবস্থা করিলেই সব বিবাদ মিটিয়া যাইবে, ইহা যিনি মনে করেন, এই সমস্যার গূঢ় তত্ত্ব সম্বন্ধে তিনি একবারেই অজ্ঞ। ইহাতে মনে হয়, অধ্যাপক মহাশয় কল্পলোকে বাস করিতেছেন, বাস্তব রাজনীতিক জগতের কোন ধারই তিনি ধারেন না। এই বিবাদটা একবারেই আর্থিক নহে, ইহা সম্পূর্ণ রাজনীতিক।

তাহার পর তিনি যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার বাস্তব জগৎ সম্বন্ধে জ্ঞানের অল্পতাই নগ্নমূর্ত্তিতে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। একজন বিদ্যাবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি যে কি করিয়া এইরূপ প্রস্তাব করিতে পারেন, তাহা ভাবিয়াই আমরা বিস্মিত। তিনি বলেন যে, হিন্দু এবং মুসলমান এই দুই সম্প্রদায়ের নিম্নস্তরের লোকরা যদি পরস্পর বৈবাহিক সম্বন্ধে আবদ্ধ হন, তাহা হইলে সাম্প্রদায়িক বিবাদের দাবানল দপ করিয়া নিবিয়া যাইবে। অবশ্য যাহারা পরস্পর বিবাহবন্ধনে বদ্ধ হইবে, তাহাদিগের কাহাকেও ধর্ম্মত্যাগ করিতে হইবে না। উভয়েই নিজ নিজ ধর্ম্মে ঠিক থাকিবেন। একটা প্রবচন আছে, "পাগলে কি না বলে ছাগলে কি না খায়?" এরূপ আজগুবি প্রস্তাব কেহ শুনিয়াছেন কি? হিন্দুর বিবাহ যে একটা ধর্ম্মকার্য্য, মুখোপাধ্যায় মহাশয় তাহা জানেন না। কিন্তু হিন্দু সমাজের নিম্নস্তরের লোকরা তাহা জানে। উভয়ের খাদ্যা-খাদ্য-বিচার স্বতন্ত্র। আচার-ব্যবহার স্বতন্ত্র হইবেই। এরূপ অবস্থায় হেঁসেল ঘরে উভয়ে ঠেঙ্গাঠেঙ্গি আরম্ভ করিবে না ত? দ্বিতীয়তঃ হিন্দুমুসলমানের সাঙ্কর্য্যফলে যে সন্তান জন্মিবে, তাহার ধর্ম্ম কি হইবে? সে মুসলমান হইবে না হিন্দু হইবে? রাধাকমল বাবুর ন্যায় এক জন শিক্ষিত ব্যক্তির জানা উচিত ছিল যে, মানুষের ধর্ম্মবুদ্ধি কৌলিক শক্তি হইতে গজাইয়া উঠে সত্য, কিন্তু পারিবারিক প্রভাবই যেন তাহাকে জলসেকের দ্বারা বর্দ্ধিত করে। জাতীয় ভাবরক্ষাকার্য্যে বীজশক্তি যেমন বিশেষ সহায়তা করে, সেইরূপ পারিবারিক প্রভাব, পারিপার্শ্বিকতা এবং শিক্ষা সেই বীজসম্ভূত ভাবকে বর্দ্ধিত করে। তাহা তার হইবে না। রাধাকমল বাবুর ব্যবস্থা অনুসারে হিন্দু জাতির ধ্বংসের পথ খুব পরিষ্কৃত হইবে সন্দেহ নাই।

বিনয় বাবুর ব্যবস্থা

অর্থনীতি শাস্ত্রের অধ্যাপক শ্রীযুত বিনয়কুমার সরকার আবার শ্রীযুত রাধাকমল বাবুর উপরে যান। তিনি ব্যবস্থা দিয়াছেন যে, হিন্দু-মুসলমানে বিবাহ ব্যবস্থা ত প্রবর্ত্তিত করিতেই হইবে, অধিকন্তু মুসলমানগণ যখন হিন্দুর বিগ্রহাদি ভাঙ্গিতে আসিবে, তখন তাঁহারা সে বিষয়ে দৃক্‌পাত করিবেন না। তাঁহারা সম্পূর্ণ উদাসীন এবং উদ্বেগহীন ভাবে এই ব্যাপার দেখিবেন। এক কথায় হিন্দুরা ধর্ম্মসম্বন্ধে এবং বিগ্রহাদি সম্বন্ধে কোনরূপ মমতাবুদ্ধি হৃদয়ে পোষণ করিবেন না। ঐ মন্দিরাদিভঙ্গ ব্যাপারটা যেন কিছুই নহে, এইভাবে ব্যাপারটা দেখিবেন অর্থাৎ সকলকে বীতরাগভয়ক্রোধ স্থিরধী মুনি হইয়া বসিতে হইবে। যদি কেহ তাহা না পারেন, তাহা হইলে তিনি অকুস্থল হইতে ভোঁ দৌড় দিবেন। তাহার নিকটেও থাকিবেন না। ফলে তাঁহারা অবাধে তাহাদের মুসলমান ভ্রাতাদিগকে তাহাদের অভীপ্সিত কার্য্য সম্পাদন করিতে দিবেন। তাহা হইলে বোধ হয়, ছয় মাসের মধ্যেই এই বিস্তীর্ণ ভারতবর্ষ দেবালয়শূন্য হইবে। সুতরাং মন্দির ও বিগ্রহ লইয়া আর বিবাদ করিবার কোন সম্ভাবনাই থাকিবে না। কিন্তু তাহা হইলেও ত বিবাদের সকল বিষয় অপসারিত হইবে না। মুসলমানরা যখন নারী-হরণ করিতে আসিবে, তখন কি করিতে হইবে, অর্থশাস্ত্রজ্ঞ বিনয় বাবু ত তাহা বলিয়া দেন নাই। তখন কি হিন্দুদিগের পক্ষে নারীদিগকে মুসলমানদিগের হস্তে সঁপিয়া দিয়া ঘর ছাড়িয়া নিশ্চিন্তভাবে মাঠে যাইয়া বসিতে হইবে? সঙ্গীতে আপত্তি করিলে হিন্দুদিগকে কি ঐ সকল ব্যাপার বর্জ্জন করিতে হইবে? এক কথায় সমস্ত হিন্দু মুসলমানধর্ম্মে দীক্ষিত না হইলে এই বিবাদের অবসান হইবে না। তবে কি তাহাই করিতে হইবে? বিনয় বাবু সেই কথাগুলি স্পষ্ট করিয়া বলিলেই ভাল হয়। হিন্দু-সন্তানগণ তাঁহাদের পৈতৃক ধর্ম্ম সম্বন্ধে কত দূর অনভিজ্ঞ হইয়াছেন, এই ব্যাপারে তাহাই বেশ বুঝা যায়। হিন্দুধর্ম্ম সম্বন্ধে এইরূপ অনভিজ্ঞ লোক দ্বারা যে অসবর্ণ বিবাহ আইন বিধিবদ্ধ হইবে, তাহাতে বিস্ময়ের বিষয় কি আছে? প্রকৃত হিন্দুদিগের ইহাই বিষম বিপদের কারণ হইয়াছে।

স্কলারশিপের নূতন নিয়ম

চিরকালই জানা আছে যে, সরকার দেশের লোককে শিক্ষা বিষয়ে উৎসাহ দিবার জন্য প্রতিভাশালী ছাত্রদিগকে বৃত্তি দিয়া থাকেন। সেই জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাগুলিতে যাহারা উচ্চ স্থান অধিকার করিয়া থাকে, তাহারাই স্কলারশিপ বা ছাত্রবৃত্তি পাইয়া থাকে। কিন্তু সম্প্রতি শুনা যাইতেছে যে, বঙ্গীয় সরকারের শি[illegible]

বিভাগ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর এবং বাঙ্গালার সমস্ত বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের উপর এক সার্কুলার জারি করিয়াছেন, সেই সার্কুলারে ছাত্রবৃত্তি প্রদান সম্বন্ধে বিস্ময়কর পরিবর্তন ঘটাইবার চেষ্টা হইতেছে। তন্মধ্যে একটি প্রস্তাব এই যে, এ পর্য্যন্ত ছাত্রদিগকে তাহাদের কৃতিত্ব হিসাবেই যে বৃত্তি দেওয়া হইয়া আসিতেছে, তাহা আর দেওয়া হইবে না। এখন ছাত্রদিগের আর্থিক অবস্থা এবং পিতা-মাতার আর্থিক অবস্থা বিবেচনা করিয়া ছাত্রদিগকে বৃত্তি দেওয়া হইবে। স্কলারশিপের জন্য আবেদনপত্রে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক এবং অধ্যক্ষ ছাত্রদিগের পিতামাতার এবং অভিভাবকের আয় কত, তাহা লিখিয়া দিবেন, এবং বলিবেন যে, বাহিরের সাহায্য ব্যতীত তাহার পক্ষে পড়াশুনা করা সম্ভব হইবে না। বাহ্যদৃষ্টিতে ইহা মনে হইতে পারে যে, যে সকল ছাত্র মেধাবী, তাহারা বৃত্তি পাইবে না,—পাইবে যাহারা যোগাড় করিতে এবং লম্বা সেলাম করিতে সমর্থ হইবে। ভদ্রলোকদিগের মধ্যে কাহার কিরূপ আর্থিক অবস্থা, তাহা বুঝা অত্যন্ত কঠিন। বিদ্যালয়ের হেড মাষ্টারের এবং অধ্যক্ষের পক্ষে তাহা জানা অসম্ভব বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। কেবল আয় দেখিয়াই অবস্থার অনুমান করা যায় না। আয় এবং ব্যয় বা পোষ্যবর্গের সংখ্যা দেখিয়া অবস্থার পরিমাপ করিতে হয়। পূর্ব্বকৃত ঋণাদির বিষয়ও ভাবিতে হয়। এত ভাবিয়া কাহারও প্রকৃত অবস্থা নির্ণয় করা সহজ নহে। ফলে অবস্থা বিবেচনায় স্কলারশিপ দিবার কল্পনা এক দিক দিয়া যতই ভাল শুনাক না কেন,—কার্য্যতঃ কিছুই হইবে না, অযোগ্য ব্যক্তিরাই স্কলারশিপ পাইবার অধিকারী হইবে। তাহার পর বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ প্রভৃতি কেবল সুপারিশ করিয়াই খালাশ হইবেন। প্রকৃত স্কলারশিপ দিবার পাত্র নির্ব্বাচন করিবেন শিক্ষা বিভাগের রাজপুরুষরা। শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টার বাহাদুরই সম্ভবতঃ কার্য্য করিবার ভার পাইবেন। সুতরাং ব্যাপারটা কিরূপ দাঁড়াইবে, তাহা বুঝিতে কাহারও বিলম্ব হওয়া উচিত নহে। আমরা শুনিতেছি, প্রতিভাশালী ছাত্রদিগকে সরকার দুই একটা অনারারী বৃত্তি দিবেন। এই অনারারী বা সম্মানজ্ঞাপক বৃত্তি কিরূপ হইবে, তাহা আমরা জানি না। উহার ফলে ছাত্র অবস্থা হইতেই লোকের মনে অসন্তোষের সঞ্চার করিয়া দেওয়াও হইবে, সে বিষয়ে সন্দেহমাত্র নাই। যদি অবস্থা ভাল ছাত্রদিগের মন নামমাত্র সম্মানখ্যাপক বৃত্তি পাইলেই খুশী হয়, তাহা হইলে এই দরিদ্র ভারতবর্ষে অবস্থাপন্ন লাট বেলাটকে সম্মান-খ্যাপক নামমাত্র বেতন দিয়া কার্য্য করিতে আমন্ত্রণ করিলে কি দোষ হয়? আমাদের প্রধান কথা এই যে, যে ব্যবস্থা পৃথিবীর কোন দেশে আছে বলিয়া জানা নাই,—যাহা আমাদের শাসক জাতির স্বদেশেও প্রবর্ত্তিত নাই, এমন যে সোভিয়েট শাসিত রুসিয়া, তাহাতেও এই প্রকার বিদকুটে ব্যবস্থা বহাল হইয়াছে বলিয়া শুনা যায় নাই,—আমাদের দেশে হঠাৎ এইরূপ ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত করিবার জন্য সরকারের প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল কেন, তাহা বুঝিতে পারিতেছি না। শুনিতেছি, সরকার আজ তিন বৎসর পূর্ব্বে এই পরিকল্পনা করিয়া রাখিয়াছেন। এইবার হইতে তাঁহারা ইহা চালাইবার সঙ্কল্প করিয়াছেন। কিন্তু যে ব্যবস্থা কুত্রাপি প্রচলিত নাই, এ দেশে সেই ব্যবস্থা প্রচলিত করিবার পূর্ব্বে এ বিষয়ে তাঁহারা সাধারণের মতামত জানিবার চেষ্টা না করিলেন কেন, তাহা আমরা বুঝিতে পারিলাম না। এ বিষয়ে লোকমত জানিবার জন্য সরকারের যেন অরুচি লক্ষিত হইতেছে। ইহা শুভ লক্ষণ বলিয়া মনে হইতেছে না। বঙ্গীয় সরকারের ভূতপূর্ব্ব শিক্ষা-সচিব খাজা সার নাজিমুদ্দীনই কয় বৎসর পূর্ব্বেই এ ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছিলেন, এ জন্য তিনিই দায়ী। বর্ত্তমান শিক্ষামন্ত্রী এ বৎসরও তাহা কার্য্যে পরিণত করিলেন না। ইহা মন্দের ভাল বলিতে হইবে। কিন্তু এরূপ অসঙ্গত ব্যবস্থা যাহাতে রহিত হয়, সরকারের তাহা করা অবশ্যকর্ত্তব্য।

সহযোগিতার আহ্বান

সম্প্রতি বিলাতের "ম্যাঞ্চেষ্টার গার্জ্জেন" The Indian scene নামক একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। সেই প্রবন্ধে সম্পাদক লর্ড লিনলিথগো সম্বন্ধে অনেক প্রশংসাসূচক কথা বলিয়াছেন। এ পর্য্যন্ত এ দেশে লর্ড লিনলিথগোর কার্য্য দেখিয়া মনে হইতেছে যে, তিনি প্রশংসার যোগ্যপাত্র। তবে তিনি এত অল্পদিন এ দেশে আসিয়াছেন যে, তাঁহার সম্বন্ধে এখনও কোন চূড়ান্ত মত ব্যক্ত করা সম্ভব নহে। তিনি এ দেশে পল্লীগ্রামের উন্নতি-সাধনে অবহিত হইয়াছেন। ভারতবর্ষ পল্লীগ্রামেরই দেশ। ইহার ৬ লক্ষ ৮৭ হাজার পল্লীগ্রামে ভারতবাসীর প্রাণের স্পন্দনই অনুভূত হয়। এ দেশে যে সামান্য কয়েকটি সহর আছে,—তন্মধ্যে লক্ষাধিক অধিবাসীর সংখ্যা-যুক্ত সহর ৩৪টির অধিক নাই। বৃটিশ ভারতে উহার সংখ্যা ২৯টি। এত বড় বিস্তীর্ণ দেশে ৩৪টি বা ২৯টি সহর ধর্ত্তব্যের মধ্যেই নহে। সুতরাং এই পল্লীগ্রামের উন্নতিসাধন করিলেই ভারতের উন্নতিসাধন করা হইবে। বৃটিশ শাসিত ভারতে পল্লীগ্রামের সংখ্যা ৫লক্ষ। কি কংগ্রেস কি সরকার কাহারও মুখে এত দিন পল্লীগ্রামের উন্নতির কথা প্রায় শুনা যায় নাই। কেবল যে সময় মহাত্মা গান্ধী রাজনীতিক্ষেত্র হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই সময় তিনি পল্লীগ্রামের উন্নতি-সাধন করিবার জন্য আত্মনিয়োগ করিবেন বলিয়া মত প্রকাশ করেন। মহাত্মাজী ঐ কার্য্য আরম্ভ করিতে না করিতেই সরকার হ্যালেট সার্কুলার জারি করিয়াছিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে দেখা যায়, যেন কেমন একটা যাদুমন্ত্রবলে সরকারের পল্লীগ্রামের জন্য দরদের দরিয়া উথলিয়া উঠে। বৃটিশ শাসিত ভারতের ৫ লক্ষ পল্লীগ্রামের উন্নতি-সাধনের জন্য সরকার প্রথমেই ১ কোটি টাকা বরাদ্দ করিয়াছিলেন। তখন লর্ড উইলিংডন ভারতের শাসন-তরণীর কাণ্ডারী। ইহাতে বুঝা যাইতেছে যে, পল্লীর উন্নতিসাধন করিবার কল্পনা লর্ড লিনলিথগো ভারতে আসিবার পূর্ব্বেই বৃটিশ সরকার করিয়া রাখেন। কাযেই লোকের ধারণা জন্মে যে, মহাত্মাজী পল্লীর উন্নয়নকার্য্য করিবেন বলিবার পরে সরকার পল্লীর উন্নতিবিধান-কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। যাহা হউক, লর্ড লিনলিথগো যখন পল্লীসংস্কার কার্য্যে মনোনিবেশ করিয়াছেন, তখন বুঝিতে হইবে, বড়লাট বাহাদুরের এবং মহাত্মাজীর উদ্দেশ্য বাহ্যতঃ এক। ম্যাঞ্চেষ্টার গার্জ্জেন বলিয়াছেন যে, Lord Linlithgow's enthusiasm are in many points akin to those of Mr Gandh

himself. The heart of both men is in the countryside. Both chiefly want to see the condition of the peasant improved and new life poured into Indias 500,000 villages ইহার অর্থ এই যে, "লর্ড লিন্‌লিথগোর আগ্রহ অনেক বিষয়ে মহাত্মা গান্ধীরই আগ্রহের অনুরূপ। উভয়ের চিত্ত পল্লীর দিকে। উভয়েই প্রধানতঃ কৃষীবলের উন্নতিসাধনের এবং ৫ লক্ষ পল্লীতে নবজীবনসঞ্চারের পক্ষপাতী।" কথা সত্য। ইহার পর ম্যাঞ্চেষ্টার গার্জ্জেন জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, "তবে ইঁহারা উভয়ে বারম্বার সহযোগিতা করিতে না পারিবেন কেন? এই কার্য্য করিলে চরমপন্থীদিগের অসুবিধা করিয়া সরকারের সুবিধা করা যাইতে পারিবে।" সহযোগিতা করিতে পারিলে অনেক বিষয়ে সুবিধা হয়। কিন্তু তাহা করা হয় না কেন? কোন্ কার্য্যে এদেশের রাজপুরুষরা দেশীয় জননায়কদিগের কার্য্যে প্রাণ খুলিয়া সহযোগিতা করিয়া আসিতেছেন? মহাত্মা গান্ধীই হউন, আর যিনিই হউন, ভারতীয় জননায়কমাত্রই সর্ব্বান্তঃকরণে ভারতবাসীর কল্যাণ কামনা করিয়া তাঁহাদের কর্ম্মপদ্ধতির পরিকল্পনা করিয়া থাকেন। কিন্তু রাজপুরুষরা তাহা করিতে পারেন কি? তাঁহারা একটা চক্ষু তাঁহাদের দেশের স্বার্থের দিকে, আর একটা চক্ষু ভারতের দিকে রাখিয়া কায করেন। সুতরাং উভয়ের কার্য্য ঠিক একরূপ হইতে পারে না, উভয় সম্প্রদায়ের পরস্পরের মধ্যে সহযোগিতা হইতে পারে না। ব্যুরোক্রেশীর কতকগুলি বিশেষ দোষ আছে। ব্যুরোক্রেশীর একটা বড় দোষ এই যে, তাহারা অত্যন্ত জ্ঞানদর্পী হইয়া থাকে। তাহারা লোককে দেখাইতে চাহে যে, তাহাদের ন্যায় বুদ্ধিমান্ সম্প্রদায় আর জগতে নাই। সেই জন্য জন ষ্টুয়ার্ট মিল বলিয়াছেন যে, A bureaucracy always tends to become a pedantocracy. অর্থাৎ আমলাতান্ত্রিক শাসন সর্ব্বদাই জ্ঞানগর্ব্বিতদিগের শাসনে পরিণত হইতে চাহে। সেই জন্য কোন আত্মসম্মানজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিই অপমানিত হইবার ভয়ে আমলাতন্ত্রের আমলাদিগের সহিত সহযোগিতা করিয়া কার্য্য করিতে চাহেন না। ম্যাঞ্চেষ্টার গার্জ্জেনের লেখক মহাশয়ের তাহা বুঝা উচিত। এই প্রবন্ধ-লেখক বলিয়াছেন যে, ভারতের জননায়কদিগকে আমাদের (অর্থাৎ শাসকদিগের) দলে ভিড়াইয়া আনিতে হইবে।

এখন জিজ্ঞাস্য, দেশের সাধারণ জননায়ক কাহারা? পূর্ব্বে দেশের জমিদার বা ভূস্বামিবর্গ দেশের সাধারণ জননায়ক ছিলেন। এখন আর তাহা নাই। সরকারই তাঁহাদের সে দেমাক ফাঁক করিয়া দিয়াছেন। ব্রাহ্মণগণ (অবশ্য বিদ্যাবিনয়সম্পন্ন) এককালে জননায়ক ছিলেন। সরকারী ও মিশনরী শিক্ষা তাঁহাদের সে সম্মান গুঁড়া করিয়া দিয়াছে। উকীল বাবুরা জননায়কত্ব গ্রহণ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন বচনের এবং টাকার জোরে। কিন্তু তাঁহাদের সে চেষ্টা খাটে নাই। এখন বিদ্যাশূন্য হুজুগে বাক্যবাগীশদিগেরই রাজত্ব। সরকারী নীতির ফলেই দেশ নেতৃশূন্য হইয়াছে,—সুতরাং তজ্জনিত অসুবিধা সরকারকেও ভোগ করিতে হইবে। তাহার পর লর্ড লিন্‌লিথগো যতই ভারতহিতে আত্মনিয়োগ করুন না কেন, তিনি কি নিজ বিবেচনাবুদ্ধি অনুসারে কায করিতে পারিবেন? অতীতের ইতিহাস দেখিয়া আমরা সে আশা করিতে পারি না। ৯ম ল্যান্সার সৈন্যদলের প্রতি শাস্তিবিধানের জন্য জবরদস্ত লর্ড কর্জ্জনকে দিল্লীর দরবার-প্রাঙ্গণে যে ভাবে অপমানিত হইতে হইয়াছিল, তাহা দেশের লোকের মন হইতে কখনই মুছিয়া যাইবে না। ম্যাঞ্চেষ্টার গার্জ্জেন যদি হ্যালেট সার্কুলারখানি বিশেষ মনোযোগ সহকারে পড়িতেন, তাহা হইলেই তিনি আসল ব্যাপারটা ভাল করিয়া বুঝিতে পারিতেন। সহযোগিতা করিতে হইলে উভয় পক্ষের আগ্রহ এবং ত্যাগ-স্বীকার চাই।

বর্ণাশ্রমী সম্মেলন

কলিকাতা আলবার্ট হলে সনাতনীদিগের সম্মেলন হইয়াছে। বর্ণাশ্রমী হিন্দুরা শাস্ত্র-নির্দ্দিষ্ট পথে চলিতে চাহেন। সে জন্য কেহ কেহ তাঁহাদের উপর অসন্তুষ্ট হইয়াছেন। বর্ণাশ্রমীরা বলেন, হিন্দু-ধর্ম্ম কালের আঘাত প্রতিহত করিয়া এত দীর্ঘকাল আত্মসত্তা অক্ষুন্ন রাখিতে সমর্থ হইয়াছে, ইহা দেখিয়াই বুঝা উচিত যে, এই ধর্ম্ম-ব্যবস্থায় এমন কিছু আছে, যাহা হিন্দু-সমাজকে কালজয়ী করিয়া রাখিয়াছে। এই হিন্দুধর্ম্ম যে কত প্রাচীন, এ পর্য্যন্ত তাহা নির্ণীত হয় নাই। সেই জন্য বর্ণাশ্রমী হিন্দুরা পাশ্চাত্য সিদ্ধান্তের মোহে পড়িয়া তাঁহাদের পৈতৃক ব্যবস্থা ও বিধানগুলি পরিহার করিতে চাহেন না। গ্রেট বৃটেনে পূর্ব্বকালে বৃটন জাতির বাস ছিল। ইহারা কিছুকাল রোমকদিগের শাসনাধীনে থাকিয়া রোমকদিগের শিক্ষাপ্রভাবে আপনাদের বৈশিষ্ট্য হারাইয়া একবারে রোমক ভাবাপন্ন হইয়াছিল। তাহার পরিণাম কি হইয়াছিল, তাহা বিদিত ভুবনে। বৃটন বা ব্রাইথন জাতিকে বাধ্য হইয়া স্বরাজ দিয়া যখন রোমকরা ইংলণ্ড হইতে চলিয়া গিয়াছিল, তখন সেই জাতিহারা, বৈশিষ্ট্যহারা, পরানুকারী বৃটনগণ মেরুদণ্ডহীন হইয়া পড়িয়াছিল, তাহারা পড়িয়া পাওয়া স্বরাজও রক্ষা করিতে পারে নাই। উহার দেড় শত বৎসরের মধ্যে তাহাদের দেশে জুট, স্যাক্সন ও অ্যাঙ্গেল জাতি আসিয়া বাস করে, এবং তাহাদিগকে ওয়েল্‌সের দিকে খেদাইয়া দেয়। আজ সেই বৃটনদিগের মাতৃভূমি এঙ্গেল ল্যাণ্ড (Anglo land) বা ইংলণ্ড নামে খ্যাত,—বৃটনদিগের বংশধরগণ এখন ওয়েলস অঞ্চলে অন্যান্য কেল্ট (Celt) জাতির সহিত শোণিত মিশ্রিত করিয়া কয়লার খনিতে কুলীর কায বা লোহার খনিতে মজুরের কায করিতেছে। হিন্দু জাতি তাহাদের পৈতৃক ধারা ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে, সেই জন্য তাহারা আত্মসত্তা হারায় নাই। আধুনিক ইংরেজি-শিক্ষিত ব্যক্তিরা পৈতৃক আচারকে বর্জ্জন করিতে চাহেন। কিন্তু তাহা হঠকারিতার সহিত বর্জ্জন করা কোনমতেই সঙ্গত নহে। বিখ্যাত দার্শনিক এবং চিন্তাশীল ইংরেজ লেখক হার্ব্বার্ট স্পেন্সার বলিয়াছেন যে, যদি এক দল জীব বহু পুরুষ ধরিয়া কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট আচার পালন করিয়া চলে, তাহা হইলে সেই আচারগুলির সহিত তাহাদের দেহের একটা উপযোগিতা প্রতিষ্ঠিত হয়। সেইরূপ আর কতকগুলি জীব যদি বহু পুরুষ ধরিয়া অন্য কতকগুলি বিভিন্ন আচার পালন করে, তাহা হইলে সেই আচারগুলির সহিত সেযোগ

জীবগুলির দেহের একটা উপযোগিতা ঘটিয়া যায়। এইরূপ যদি দুইটি সম্পূর্ণ বিভিন্ন বা বিপরীত আচারের মিশ্রণ করা যায়, তাহা হইলে তাহার ফল কখনই ভাল হয় না। আবার আর কতকগুলি বিকাশবাদী বলেন যে, পুরুষপরম্পরাক্রমে অনুবর্ত্তিত বিভিন্ন ভাবের আচার জীবদেহের গঠনের উপরও কিছু প্রভাব বিস্তৃত করে। এখন যদি সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রকার আচারের একটা জগা-খিচুড়ি বানান যায়, তাহা হইলে তাহা জীবকে ধ্বংসের পথে লইয়া যায়। হবসন বলিয়াছেন যে, উচ্চস্তরের মানবের সহিত যেখানে নিম্নস্তরের মানবের ঘনিষ্ঠতা ঘটে, সেখানে যুদ্ধ এবং অন্য প্রকার হত্যাকাণ্ডের ফলে অসভ্য জাতির যত লোকক্ষয় হয়, নিম্নস্তরের লোকদিগকে উচ্চস্তরের লোকের আচার গ্রহণ করাইবার ফলে তাহাদের তদপেক্ষা অধিক লোক ক্ষয় পায়। মিষ্টার ব্রাইস তাঁহার এক বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন যে, হাউই দ্বীপে কাপ্তেন কুকের আমলে ৩ লক্ষ আদিম অধিবাসী ছিল। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে তাহাদের সংখ্যা ৩০ হাজারে দাঁড়ায়। ইহার প্রধান কারণ, তাহাদিগকে তাহাদের পুরুষানুক্রমিক কুটীরের পরিবর্ত্তে কাষ্ঠনির্ম্মিত গৃহে বাস করান এবং বস্ত্র ব্যবহার করিতে অভ্যস্ত করা। অতএব না বুঝিয়া পুরুষপরম্পরাগত আচার বর্জ্জনীয় নহে। সেই জন্য হিন্দুরা আচারকে পরম ধর্ম্ম বলিয়াছেন। তবে কালের গতি অনুসারে আচারাদির পরিবর্ত্তন ঘটে। সে পরিবর্ত্তন পূর্ব্বজগণের আচারের বিকাশসাধন দ্বারা করা উচিত—এক আচার বর্জ্জন পূর্ব্বক অন্য আচার গ্রহণ করিয়া পরিবর্ত্তনসাধন কর্ত্তব্য নহে!

পণ্ডিত-সম্মেলন

গত ৩০শে জ্যৈষ্ঠ শনিবার কলিকাতায় এক পণ্ডিত-সম্মেলন হইয়া গিয়াছে। এই সম্মেলনের সভাপতি হইয়াছিলেন সাধু সম্প্রদায়ের আচার্য্য শ্রীযুত দামোদরলাল শাস্ত্রী আর অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি হইয়াছিলেন মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুত হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ।

মূল সভার সভাপতি মহাশয় তাঁহার অভিভাষণে বলিয়াছিলেন যে, সংস্কৃত ভাষাই নিখিল ভারতবর্ষে সার্ব্বজনীন ভাষা বলিয়া গ্রহণ করা হউক। যে সময় ভারতবাসীর পূর্ব্ব-পুরুষদিগের মার্জ্জিত ভাষাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের দরজা হইতে গলা ধাক্কা দিয়া প্রায় বাহির করিয়া দেওয়া হইয়াছে, সে সময় ঐ পৈতৃক ভাষার সমর্থন করা যে দুরন্ত দুঃসাহসের কার্য্য, শাস্ত্রী মহাশয় যে তাহা বুঝিলেন না, ইহাই বড় বিস্ময়ের ব্যাপার। মানুষ যখন পরমুখো হয়, তখন তাহাকে ঘরমুখো করা বড় কঠিন; সুতরাং শাস্ত্রীজীর প্রস্তাব সুধী-সমাজে গৃহীত হইবে না। এখন ভারতে সার্ব্বজনীন ভাষা হইবার জন্য অনেক ভাষাকে উমেদাররূপে উপস্থিত করা হইয়াছে। মহাত্মাজী ত হিন্দী ভাষাকেই ভারতের সার্ব্বজনীন ভাষারূপে প্রতিষ্ঠিত দেখিতে চাহেন। মুসলমান ভ্রাতৃগণ ত উর্দ্দুকে সার্ব্বজনীন ভাষা না করিয়া ছাড়িবেন না। আবার একদল ইংরেজিকেই ভারতের সার্ব্বজনীন ভাষা বলিয়া গ্রহণ করিতে চাহেন। এখন সকলের পক্ষেই বড় বড় উকিল দাঁড়াইবেন;—কিন্তু পৈতৃক ভাষা সংস্কৃতের পক্ষে কোন উকিলই দাঁড়াইবে না। দুর্দ্দশা এতই হইয়াছে। পিতৃপরিচয় নাকি সভ্যতার বিরোধী!

দেহের পোষণ

লর্ড লিন্‌লিথগো ভারতে অতি অল্পদিনই বড়লাট হইয়া আসিয়াছেন। এই অল্পকালের মধ্যে তিনি অনেকগুলি বিশেষ কার্য্যসাধনে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। ভারতের কাঁচামালের উৎপাদক কৃষী-বলের যাহাতে উন্নতি সাধিত হয়, সে বিষয়ে তিনি বিশেষভাবে দৃষ্টি দিতেছেন। এ জন্য তিনি সাধারণের কৃতজ্ঞতা ভাজন হইয়াছেন। ভারতের কৃষকরা অত্যন্ত দরিদ্র। তাহাদের মধ্যে অনেকেই দুই বেলা উদর পূর্ণ করিয়া খাইতে পায় না। সেই জন্য তাহাদের দেহের আবশ্যক পুষ্টিসাধন হয় না।

লর্ড লিন্‌লিথগো

পূর্ব্বে কৃষিমাত্রসম্বল জাঠজাতি যেরূপ সবল ছিল, এখন আর তাহারা সেরূপ বলবান্ নাই শুনিতে পাই। বাঙ্গালায় কৃষকদিগের মধ্যে পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে যেরূপ সবল লোক দেখা যাইত, এখন আর সেরূপ দেখা যায় না। বাঙ্গালায় ইহার প্রধান কারণ ম্যালেরিয়ার প্রকোপ এবং দারিদ্র্যবৃদ্ধি। দেশের লোকের শিল্পবাণিজ্যের সুবিধা না থাকাতে প্রায় সকলেই কৃষিবৃত্তি অবলম্বন করিতেছে, সেই জন্য কৃষকদিগের জমি অত্যন্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত হইয়া পড়িতেছে, সে জমির আয়ে তাহাদের সাংসারিক ব্যয় সঙ্কুলান হইতেছে না। কাযেই তাহারা অল্লাহারে দিনযাপন করিতে বাধ্য হইতেছে। এরূপ অবস্থায় ইহাদের দেহের পুষ্টিসাধন কোন-ক্রমেই আশা করিতে পারা যায় না। লর্ড উইলিংডন গো-জাতির উন্নতিসাধনে এবং ভারতবাসীর খাদ্যসম্বন্ধে অনুসন্ধানে ও গবেষণায় মন দিয়াছেন, ইহা সুখের বিষয়। তিনি নিজ ব্যয়ে দরিদ্রদিগকে খাইতে দিয়াছেন। শিমলা বিদ্যালয়ের শীর্ণকায় ছাত্রদিগকে বিনামূল্যে এক এক গ্লাস দুগ্ধ দিবার জন্য স্থানীয় মিউনিসিপ্যালিটীকে আদেশ দিয়াছেন। তিনি গৃহপালিত পশু (গো-মহিষাদির) উন্নতিসাধনের জন্য প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তা-দিগকে অনুরোধপত্র পাঠাইয়াছেন এবং খাদ্যসার সম্বন্ধে গবেষণা করিবার জন্য শিমলায় নিউট্রিশন এডভাইসারী বোর্ড গঠন করিয়াছেন। এই দিকে এত কায ইহার পূর্ব্বে কোন লাটই করেন নাই। এ কার্য্যগুলি যে দরিদ্রদিগের জন্যই করা হইতেছে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

কিন্তু আমাদের বিশ্বাস, মার্কুইস অব লিনলিথগো এ ক্ষেত্রে সোণা ফেলিয়া আঁচলে গিরো বাঁধিতেছেন। জনসাধারণের আর্থিক অবস্থার উন্নতি না করিয়া কেবল যদি তাহাদের কোন্

খাদ্যে কিরূপ ভিটামিন বা খাদ্যসার বিদ্যমান, তাহার সন্ধান করা হয়, তাহা হইলে তাহার ফল কিছুই হইবে না। মনে করুন, মসুর দাইলে বা বাঁধা কপিতে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন ও অন্যান্য পুষ্টিকর খাদ্যদ্রব্য আছে, তাহা এক জন জানে, কিন্তু তাহার যদি উহা কিনিবার পয়সা না থাকে, তাহা হইলে তাহার সেই জ্ঞান কোন্ কাযে লাগিবে? আসল কথা, দেশের লোকের আর্থিক অবস্থার উন্নতি না করিতে পারিলে সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হইয়া যাইবে। তাহা করিতে হইলে কেবল এ দেশের কৃষির উন্নতি করিলে চলিবে না, সঙ্গে সঙ্গে শিল্পের উন্নতি করিতে হইবে। কারণ, শিল্পাভাবে সমস্ত দেশের লোক যদি কেবল কৃষিমাত্রসম্বল হয়, তাহা হইলে তাহারা আত্মরক্ষার্থ জমির উপর যাইয়া পড়িবেই। তাহাদের আর দারিদ্র্য কাটিবে না। দ্বিতীয়তঃ বাঁধের জন্য বাঙ্গালার মাঠ আর বন্যার গৈরিক জলে প্লাবিত হইতে পারিতেছে না বলিয়া শস্যের পোষণকারী শক্তি ক্ষয় পাইতেছে। ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে ২১শে ফেব্রুয়ারী তারিখে যখন সার উইলিয়ম উইলকক্স ডাক্তার বেণ্টলীর সহিত লালগোলাঘাট হইতে কলিকাতায় আসিতেছিলেন, তখন তিনি ডাক্তার বেণ্টলীকে বাঁধের পারে কতকগুলি মসুর-ক্ষেত দেখাইয়া বলিয়াছিলেন—It looks as if locusts had eaten down these poor fields. অর্থাৎ, এই সকল মাঠের শস্যগুলি যেন পঙ্গপালে চুষিয়া খাইয়াছে বলিয়া মনে হইতেছে। উহার ফলেও যে শস্যের পুষ্টিকরত্ব নষ্ট হইতেছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। ইহার প্রতীকার করা আবশ্যক। তাই বলিতেছি যে, বড় লাট লর্ড লিনলিথগোর উদ্দেশ্য অত্যন্ত মহৎ, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই; কিন্তু কেবল দুগ্ধপানের ব্যবস্থা এবং খাদ্য-বীর্য্য (vitamin) অনুসন্ধানে ফল হইবে না। ভারতবাসীর আর্থিক উন্নতিরও ব্যবস্থা করিতে হইবে।

—

বিলাতী বস্ত্রের উপর ধার্য্য শুল্ক

ইদানীং বিলাত হইতে ভারতে আমদানী বস্ত্রের পরিমাণ কিছু হ্রাস পাইয়াছে। তাই ম্যাঞ্চেষ্টারের তন্তুবায়দিগের মাথার টনক নড়িয়াছে। এই ম্যাঞ্চেষ্টারের স্বার্থের জন্য ভারতীয় বস্ত্র প্রস্তুতকারকদিগের স্বার্থ বিশেষভাবে বলি দেওয়া হইয়া আসিতেছিল। অনেক সময় যে হারে বিলাতী বস্ত্রের উপর আমদানী শুল্ক ধার্য্য করা হইয়াছিল, ঠিক সেই হারেই ভারতীয় কলজাত বস্ত্রের উপর স্বদেশী শুল্ক (Excise duty) ধার্য্য হইয়াছিল। সে সব কাহিনী আমরা এ স্থলে বিবৃত করিব না। আজ কয়েক বৎসর হইল, ভারতে স্বদেশী কর উঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু বিলাতী আমদানী বস্ত্রের উপর শুল্ক ধার্য্য রহিয়াছে। এ দিকে সম্প্রতি ভারতে বিদেশ হইতে আমদানী বস্ত্রের পরিমাণ হ্রাস পাইতেছে। ইদানীং বিলাত হইতে আমদানী বস্ত্রের এবং সূত্রের পরিমাণ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক হ্রাস পাইতেছে।

১৯০৫-৬ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষে বিদেশ হইতে ২ শত ৯ কোটি গজ কাপড় আমদানী হইয়াছিল। উহার অধিকাংশই বিলাত হইতে আমদানী হইয়াছিল। সে-বৎসর ভারতে জনপ্রতি প্রায় ৮ গজ করিয়া কাপড় বিদেশ হইতে আসিয়াছিল। ১৯৩০-৩১ খৃষ্টাব্দ হইতে ভারতে বিদেশ হইতে আমদানী বস্ত্রের পরিমাণ বিশেষ কমিয়া আসে। ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে উহার পরিমাণ ৭৭ কোটি গজে দাঁড়ায়। অর্থাৎ ঐ বৎসর প্রতি জন ভারতবাসী গড়ে ২॥০ গজ করিয়া কাপড় বিদেশ হইতে আমদানী করে। কিন্তু ঐ বৎসর ভারতের কলগুলিতে প্রস্তুত ২ শত ৮৯ কোটি গজ মজুত ছিল। অর্থাৎ জন প্রতি প্রায় ৮ গজেরও কিছু অধিক ভারতীয় কল-জাত বস্ত্র বাজারে বিক্রয়ার্থ উপস্থিত হয়। ইহা ভিন্ন হস্তচালিত তাঁতে বোনা ১ শত ৪৪ কোটি গজ কাপড় বাজারে বিক্রয়ার্থ উপস্থিত করা হয়। অর্থাৎ জন পিছু প্রায় ৪ গজ করিয়া তাঁতের কাপড় ভারতের হাটে বিকায়। এ হিসাব আন্দাজী, ইহাতে ম্যাঞ্চেষ্টারের তন্তুবায়রা যে বিচলিত হইবেন, তাহাতে বিস্ময়ের বিষয় কিছুই নাই। যাহা হউক, ভারত সরকার সেই জন্য বিলাত হইতে আমদানী বস্ত্রের উপর ধার্য্য শুল্ক সম্বন্ধে বিচার করিবার জন্য টেরিফ বোর্ডকে অনুরোধ করেন। এই বোর্ড সম্প্রতি সিদ্ধান্ত করিয়া দিয়াছেন, যে সকল ক্ষেত্রে বিলাত হইতে আমদানী পণ্যের উপর শতকরা ২৫ টাকা হারে আমদানী শুল্ক ধার্য্য আছে, সেই সকল ক্ষেত্রে ঐ শুল্কের হার কমাইয়া মূল্য শতকরা ২০ টাকা হারে ধার্য্য করাই সঙ্গত। অর্থাৎ শতকরা ৫ টাকা হারে আমদানী শুল্ক কমাইয়া বিলাতী বস্ত্রের প্রসারবৃদ্ধির চেষ্টা করা হইল। ইহার ফলে দেশীয় কার্পাস-কলগুলির যে বিশেষ ক্ষতি হইবে, টেরিফ বোর্ড তাহা স্বীকার করিয়াছেন। তবে তাঁহারা ঐরূপ ব্যবস্থা করিলেন কেন? দেশের শিল্প যাহাতে আহত না হয়, দেশের লোকের স্বার্থ যাহাতে অক্ষুণ্ণ থাকে, তাহার ব্যবস্থাই ত সর্ব্বাগ্রে করা উচিত। একবার এক জন ভারত-সচিব ম্যাঞ্চেষ্টারের কলওয়ালাদিগকে বলিয়াছিলেন যে, ভারতবর্ষকে যখন আর্থিক বিষয়ে অটোনমি দেওয়া হইয়াছে, তখন আর তাঁহারা শুল্ক বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে পারেন না। এরূপ অবস্থায় টেরিফ বোর্ড কেন এইরূপ ব্যবস্থা করিলেন, তাহা বুঝিলাম না। এই শুল্কের হার কেবল বিলাতী আমদানী বস্ত্রের উপর কমিয়াছে। ইটালী, নেদারল্যাণ্ড, মার্কিণ, সুইজারল্যাণ্ড, চীন, জাপান প্রভৃতি দেশ হইতে আমদানী কার্পাস-পণ্যের উপর ধার্য্য শুল্ক হ্রাস পায় নাই। এ সময় বাঙ্গালায় কয়েকটি কার্পাস কল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে ও হইতেছে। এ সময়ে এই ব্যবস্থা করা নিতান্তই অসঙ্গত হইয়াছে। আমরা বঙ্গবাসীদিগকে বলি, তাঁহারা যেন যথাসাধ্য বাঙ্গালার কলের কাপড় এবং সূতা ব্যবহার করেন।

মন্ত্রিত্ব গ্রহণে সত্যমূর্ত্তি

মাদ্রাজের কংগ্রেসী নেতার উদ্ভাবনী শক্তি অতুলনীয়। তিনি গবেষণা-সাহায্যে স্থির করিয়া ফেলিয়াছেন যে, সরকারী মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করিতে পারিলেই স্বরাজ অনায়াসে করায়ত্ত হইবে। এমন সহজ উপায়ে যখন স্বরাজলাভ সম্ভবপর, তখন কংগ্রেসের পক্ষ হইতে সদলবলে ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশ করিতে পারিলেই বিনা আয়াসে মন্ত্রীর পদ অধিকার করা চলিবে। মন্ত্রী হইতে পারিলে, স্বরাজ কোনও দিক দিয়া পলাইতে পারিবে না—বিনা কষ্টে তাহাকে আয়ত্ত করা চলিবে। সে স্বরাজের অর্থ—কংগ্রেসের ত্রিবর্ণ-রঞ্জিত পতাকা সরকারী আপিসগুলির উপর উড্ডীন করা। সত্যমূর্ত্তি স্বরাজলাভের এই বিচিত্র পন্থা আবিষ্কার করিয়া এত কাল

পরমোৎসাহে মন্ত্রিত্বলাভের কথা কহিয়া আসিতেছিলেন। অবশ্য নিখিল ভারতীয় কংগ্রেস কমিটী মন্ত্রিত্ব-গ্রহণ সম্বন্ধে স্পষ্টভাবে কোন কথা ব্যক্ত করেন নাই। তবে অনেক কংগ্রেসী নেতার যে মন্ত্রিত্ব গ্রহণের প্রতি লোলুপদৃষ্টি আছে, তাহা তাঁহাদের বক্তৃতা ও মন্তব্যের অন্তরাল হইতে উঁকি মারিয়া থাকে।

সত্যমূর্ত্তি এত দিন ধরিয়া মন্ত্রিত্ব গ্রহণের পক্ষে যে ওকালতী করিতেছিলেন, তাহা শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু সহ্য করিতে পারিলেন না। তিনি স্পষ্ট ভাষায় সত্যমূর্ত্তিকে জেরা করিয়া বলিলেন যে, ব্যবস্থা পরিষদে বক্তৃতা করিবার সময় তিনি ও শ্রীযুত দেশাই সদম্ভে বলিয়াছিলেন—নূতন শাসনপদ্ধতি গ্রহণের সম্পূর্ণ অযোগ্য। এখন তাঁহারা কোন্ মুখে বলিতেছেন, সেই শাসনপদ্ধতি প্রবর্ত্তিত হইবার পর, সরকারী মন্ত্রিত্ব-গ্রহণ বিধেয়? মতের এই প্রকার ডিগবাজি বিস্ময়কর। সুতরাং শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র প্রশ্ন করিলেন, শ্রীযুক্ত সত্যমূর্ত্তি দেশের লোককে বুঝাইয়া বলুন, এরূপ মতপরিবর্ত্তনের হেতু কি?

শ্রীযুত সত্যমূর্ত্তি

সত্যমূর্ত্তি বোধ হয় দেশের লোককে বুঝাইয়া বলিবার সুবিধা নাই দেখিয়া, শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসুকে পত্র লিখিয়া জানাইয়া দিলেন, মন্ত্রিত্ব-গ্রহণ বিষয় লইয়া তাঁহার সহিত বাদানুবাদ না করিয়া শরৎ বাবুর কর্ত্তব্য নেতা হইয়া বাহির হইয়া পড়া। কারণ, ভারতের রাষ্ট্র-সভায় বাঙ্গালার দুর্দ্দশার সীমা নাই। স্বরাজ-সমরক্ষেত্রে শরৎ বাবু যদি অবতীর্ণ হন, সত্যমূর্ত্তিও তাঁহার সহিত যোগ দিবেন। মন্ত্রিত্ব-গ্রহণ সম্বন্ধে কংগ্রেসের যে নিষেধবাক্য আছে, শ্রীযুত সত্যমূর্ত্তি শুধু সেইটুকু বাদ দিবার জন্য চেষ্টা করিতেছেন। তার পর মন্ত্রিত্ব গ্রহণ সঙ্গত কি না, সে প্রশ্নের বিচার প্রত্যেক প্রদেশ স্বয়ং করিয়া দেখিতে পাবে।

নিখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানে বাঙ্গালার কোন স্থান নাই, এই কথাটার উল্লেখ শ্রীযুত সত্যমূর্ত্তি করিবামাত্র শ্রীযুত শরৎচন্দ্র বসু পত্রযোগে তাহার বিশদ ব্যাখ্যা পাঠাইয়া দিলেন। তাঁহার পত্রের সার মর্ম্ম এইরূপঃ—বিগত পাঁচ ছয় বৎসর ধরিয়া নিখিল ভারতীয় রাষ্ট্রনীতি এমন কদর্য্য ব্যাপারে পরিণত হইয়াছে যে, ভাষায় তাহার ব্যাখ্যা করা চলে না। কংগ্রেসের বড় বড় কর্ত্তা যাঁহারা, তাঁহারা বাঙ্গালাকে কোণঠাসা করিয়া রাখিবার জন্য কিরূপ ষড়যন্ত্র করিয়াছেন। সুতরাং কংগ্রেসের তোমরা তোমরা ঐ সকল নেতার সহিত বাঙ্গালার সংস্রব রাখিবার কোনও প্রয়োজন নাই। বাঙ্গালা নিজের পায় ভর দিয়া যাহাতে দাঁড়াইতে পারে, তাহারই চেষ্টা সে করিবে।

শ্রীযুত সত্যমূর্ত্তি এই সরল স্পষ্ট উক্তি শুনিয়া কিছু দমিয়া গেলেন। তাই তিনি পরবর্ত্তী পত্রে শরৎ বাবুকে পত্র লিখিলেন যে, শরৎ বাবুর ন্যায় তিনিও বিশ্বাস করেন—নূতন শাসন-পদ্ধতিকে প্রত্যাখ্যান করাই কর্ত্তব্য। কিন্তু অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া তিনি স্থির করিয়াছেন যে, অন্যান্য প্রদেশে যাহাই হউক না কেন, মাদ্রাজে যদি নূতন শাসনপদ্ধতি প্রত্যাখ্যান করিতে হয়, তাহা হইলে সেই শাসনপদ্ধতি প্রবর্ত্তনের ফলে যাহা কিছু সুবিধা পাওয়া যাইবে, তাহার সহায়তায় শাসনযন্ত্র অচল করিয়া দেওয়াই তাঁহার লক্ষ্য। সেই জন্যই সত্যমূর্ত্তি মন্ত্রিত্ব গ্রহণের পক্ষপাতী। তবে শরৎ বাবুকে তিনি এমন অনুরোধও জানাইলেন যে, তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইবার পূর্ব্বে তিনি যেন মন্ত্রিত্ব গ্রহণের বিরুদ্ধে প্রচারকার্য্য না করেন।

শ্রীযুত শরৎচন্দ্র বসু

কিন্তু শরৎ বাবু এই সহজ, সরল কথাটা বুঝিতে পারেন নাই। মন্ত্রিত্ব গ্রহণে কোনও সুফললাভের আশা নাই জানিয়া তিনি স্পষ্টাক্ষরে তাহার প্রতিবাদ করিয়াছেন। স্বরাজলাভ কামনার অপেক্ষা শ্রীযুক্ত সত্যমূর্ত্তি বার্ষিক ৬৪ হাজার লাভকে বস্তুতান্ত্রিক সফলতালাভ বলিয়া বিশ্বাস করেন, ইহা কি অস্বীকার করা চলে? শাসনযন্ত্রকে অচল করিবার ক্ষমতা মন্ত্রীদিগের কতটুকু আছে, তাহা নব শাসন-পদ্ধতির মধ্য হইতে আবিষ্কার করা বিন্দুমাত্র কষ্ট-সাধ্য নহে।

এভারেষ্ট অভিযান

এভারেষ্ট হিমালয়ের সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ শৃঙ্গ। ইহার উচ্চতা সাগর-বক্ষ হইতে ১৯ হাজার ৩ ফুট। শুনা গিয়াছে, বিহারে যেবার প্রবল ভূমিকম্প হয়, সেইবার ইহার উচ্চতা কয়েক ফুট বাড়িয়া গিয়াছে! এ কথা সত্য কি না, তাহা বিধাতাই বলিতে পারেন। এখন উহার উচ্চতা ১৯ হাজার ২ ফুট। এই গিরিশৃঙ্গকে কেহ কেহ গৌরীশঙ্কর গিরিশৃঙ্গ বলেন। কেহ কেহ বলেন, সে কথা সত্য নহে। উহার সন্নিহিত দুইটি গিরিশৃঙ্গই প্রকৃত গৌরীশঙ্কর! যাহা হউক, এই এভারেষ্ট গিরিশীর্ষে আরোহণ করিবার জন্য কয়েক দল য়ুরোপীয় কয়েক বৎসর ধরিয়া চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন; কিন্তু কোন দল এই কার্য্যে সাফল্যলাভ করিতে পারিতেছেন না। এবার মিষ্টার রাটলেজ প্রমুখ কয়েক জন শ্বেতাঙ্গ দৃঢ়সঙ্কল্প করিয়া বাহির হইয়াছিলেন যে, তাঁহারা এই গিরিশৃঙ্গ আরোহণ না করিয়া কিছুতেই প্রতিনিবৃত্ত হইবেন না। সেই জন্য তাঁহারা এবার অনেক তোড় জোড় করিয়া এবং সাজ-সরঞ্জাম লইয়া এই শৃঙ্গে আরোহণ করিবার জন্য যাত্রা করিয়াছিলেন। তাঁহারা প্রথম বেশ উৎসাহের সহিত এই শৃঙ্গে আরোহণ করিতেছিলেন। তাঁহারা শৃঙ্গের পাদদেশ হইতে আরম্ভ করিয়া শৃঙ্গগাত্রে একের পর একটি করিয়া কয়েকটি স্থানে শিবির সন্নিবিষ্ট করিয়াছিলেন। অনেকে আশা করিয়াছিলেন যে, এইবার বোধ হয় এই অসমসাহসিক আরোহীর দল জটাধারীর জটাজাল ধরিয়া টানাটানি করিবে। তাহার পর সংবাদ আসিতে লাগিল, তাঁহাদের গতি নানা প্রাকৃতিক বাধায় বিঘ্নপ্রাপ্ত হইতেছে; কিন্তু তাহা হইলেও তাঁহারা চেষ্টা ছাড়িতেছেন না। সম্প্রতি আচম্বিতে গত আষাঢ়ের প্রথমদিবসে সংবাদ পাওয়া গেল যে, তাঁহারা বার বার বাধাপ্রাপ্ত হইয়া এবারকার মত ঐ শৃঙ্গের মস্তকে আরোহণ করিবার সঙ্কল্প বর্জ্জন করিলেন। তাঁহারা যথাক্রমে চতুর্থ শিবির পর্য্যন্ত যেন আরোহণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাহার পর আরম্ভ হইল ঝড় আর তুফান। তখন অগ্রসর হওয়া ত দূরের কথা, চতুর্থ শিবিরে তিষ্ঠিয়া থাকাও তাঁহাদের পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠিল। অগত্যা তাঁহারা দায়ে পড়িয়া ৩নং শিবিরে নামিয়া আসিতে বাধ্য হইলেন। কিন্তু সেখানেও অধিকক্ষণ তিষ্ঠিয়া থাকিতে পারিলেন না। ঝড়-ঝঞ্ঝা ও তুহিন ক্রমশঃ বাড়িতে থাকিল। তাঁহারা তখন ৩নং শিবিরে থাকাও নিরাপদ মনে করিলেন না। অগত্যা তাঁহারা ২নং শিবিরে ফিরিয়া আসিলেন। কিন্তু ঝড় ঝঞ্ঝার বিরাম হইল না, বরং ধীরে ধীরে বাড়িতে থাকিল। অবশেষে তাঁহারা অনেকটা নিরাশ হইয়া ২নং শিবির হইতে ১নং শিবিরে ছুটিয়া আসিলেন। কিন্তু শেষকালে গত ১৫ই জুন সংবাদ পাওয়া যায় যে, তাঁহারা এ বৎসরের মত এভারেষ্ট বিজয়ের আশা ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইয়াছেন। তাঁহারা বাঁচিয়া থাকেন ত আগামী বৎসর আর এক দফা চেষ্টা করিয়া দেখিতে পারেন। তাঁহারা আবার এরূপ কথাও বলিয়াছেন যে, এই পর্ব্বতশৃঙ্গের উচ্চতার জন্য তাঁহারা বিশেষ ভীত নহেন। উহার উচ্চতা কখনই উহার আরোহণে বিশেষ বাধা জন্মাইতে পারিবে না। কিন্তু ইহার প্রাকৃতিক অবস্থা যেরূপ, তাহাতে কেহ যে কস্মিন্‌কালেও ইহার উপর উঠিতে পারিবেন, এরূপ আশা তাঁহারা করেন না। এবার এই শিখরগাত্রে যেরূপ তুষারস্তূপ জমিয়াছে, তাহাতে উহার উপর আরোহণ করাও অতিশয় কঠিন হইয়া উঠিয়াছে। তাহার উপর ঝড়-ঝঞ্ঝা ত লাগিয়াই আছে।

পরলোকে আনন্দময় ধর

প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক ও সাংবাদিক আনন্দময় ধর ৩রা আষাঢ় অকালে লোকান্তরগমন করিয়াছেন। তাঁহার এই আকস্মিক মৃত্যুসংবাদ বন্ধুজনের হৃদয়ে দারুণ বেদনা দিয়াছে। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স মাত্র ৪৮ বৎসর হইয়াছিল। ১৩ বৎসর বয়সে আনন্দময় প্রবেশিকা পরীক্ষায় সাফল্যের সহিত উত্তীর্ণ হন। ডাফটন কলেজ হইতে বি, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া, স্কটিশচার্চ্চ কলেজ হইতে ইংরেজি সাহিত্যে তিনি এম, এ পরীক্ষায় সাফল্য লাভ করেন। ১৯১১ খৃষ্টাব্দে বি, এল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেও, ব্যবহারাজীবের কার্য্যে তাঁহার মন আকৃষ্ট হয় নাই। নেপালের মহারাজার পুত্র-দিগের শিক্ষার ভার গ্রহণ করিয়া কিছুদিন তিনি সেই কার্য্য করিয়াছিলেন।

আনন্দময় ধর

আনন্দময়ের পৈতৃক বাসভূমি ফরাসী চন্দননগর। পৈতৃক ব্যবসায় অবলম্বন না করিয়া তিনি সংবাদ-পত্র-সেবায় আত্মনিবেদন করেন। "সার্ভাণ্ট" নামক দৈনিক পত্র পরিচালনে তিনি শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তীর দক্ষিণ হস্তস্বরূপ ছিলেন। ইংরেজি দৈনিক বসুমতীতেও আনন্দ বাবু কিছুদিন কার্য্য করিয়াছিলেন। আনন্দময় ভাষাবিদ বলিয়া শিক্ষিত সমাজে বিশেষ যশঃ অর্জ্জন করিয়াছিলেন। ইংরেজি, বাঙ্গালা, সংস্কৃত ব্যতীত তিনি ল্যাটিন, ফ্রেঞ্চ, গ্রীক, জার্ম্মাণ, ইটালীয়ান, রুসিয়ান, উড়িয়া, তেলেগু, তামিল প্রভৃতি আরও ১৪টি ভাষায় ব্যুৎপত্তি অর্জ্জন করিয়া যশস্বী হইয়াছিলেন।

কিছুকাল হইতে এই ভাষাবিদ পণ্ডিত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেকগুলি পাঠ্যপুস্তকের অর্থপুস্তক রচনা করিয়া জীবিকার্জ্জন করিতেন। তাঁহার জ্ঞানভাণ্ডারের দ্বার বাঙ্গালী জাতির কল্যাণকল্পে উন্মুক্ত করিবার সুযোগ তিনি পান নাই, ইহা বাঙ্গালীর দুর্ভাগ্য বলিতে হইবে। আনন্দময় প্রকৃতই আনন্দময় ছিলেন। তাঁহার চরিত্রে ও ব্যবহারে অহঙ্কারের সংস্পর্শ পর্য্যন্ত ছিল না। তিনি সদালাপী, অমায়িক, বন্ধুবৎসল ভদ্রলোক বলিয়া সকলের প্রশংসা অর্জ্জন করিয়াছিলেন। আনন্দ বাবু চির-কুমার এবং নিরামিষভোজী ছিলেন। এই অজাতশত্রু সুপণ্ডিত কিছুদিন হইতে অজীর্ণ রোগে কষ্ট পাইতেছিলেন। পরে পাকস্থলীর ক্ষতরোগ তাঁহাকে শয্যাশায়ী করিয়া ফেলিয়াছিল। তাঁহার অকালমৃত্যুতে আমরা প্রিয়জন-বিয়োগ-বেদনা অনুভব করিতেছি। তাঁহার শোকার্ত্ত আত্মীয়-স্বজনগণকে সমবেদনা জ্ঞাপন ছাড়া আর কিছুই করিবার নাই। ভগবান্ তাঁহার আত্মার কল্যাণ করুন।

শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত

কলিকাতা, ১৬৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, বসুমতী রোটারী মেসিনে শ্রীশশিভূষণ দত্ত মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

"ভালে তোমার আছে লেখা
পুণ্য নামের রশ্মিরেখা,
স্বর্গীয় হৃদয়খানি
হাসে চোখের পরে।"

শ্রাবণ, ১৩৪৩ ।

শিল্পী—মিষ্টার টমাস

১৫শ বর্ষ] শ্রাবণ, ১৩৪৩ [৪র্থ সংখ্যা

শ্রীরামকৃষ্ণ-দেব

একাদশ পরিচ্ছেদ

শ্রীমায়ের দক্ষিণেশ্বর আগমন—ভক্তগণ-সমাগম

শ্রীমাকে আমরা ইতিপূর্ব্বে কামারপুকুরে ঠাকুর ও ব্রাহ্মণীর সঙ্গে দেখিয়াছি। তাহার পর আর তাঁহার সংবাদ রাখা হয় নাই। জননীর বয়স এখন অষ্টাদশ বৎসর। ইতিমধ্যে ঠাকুরের নানা সংবাদই তাঁহার নিকট পৌঁছিয়াছে। প্রতিবেশিনীরা ঠাকুরকে পাগল বলিয়া মা'র কাছে বর্ণনা করিতেন। তিনি শুনিতেন, ভাবিতেন; কাহাকেও কিছু বলিতেন না। কামারপুকুরে ঠাকুরের সঙ্গে কয়েক মাস বাস করিয়া, তিনি কিন্তু ঠাকুরের বিশেষ কোন উন্মাদলক্ষণই দেখেন নাই। তবে কি ঠাকুর ইতিমধ্যে উন্মত্ত হইয়া গিয়াছেন?—তিনি কি তবে সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছেন? এইরূপ নানা ভাবের চিন্তা তাঁহার তরুণ মনে জাগিত। শেষে তিনি সঙ্কল্প করিলেন যে, স্বয়ং কলিকাতায় গিয়া, একবার ঠাকুরকে দেখিয়া এ বিষয়ে সত্যাসত্য নিরূপণ করিবেন।

১২৭৮ সালের—ইংরেজি ১৮৭২ খৃষ্টাব্দের দোল-পূর্ণিমার সময়, শ্রীমায়ের কয়েক জন দূরসম্পর্কীয় আত্মীয়, আত্মীয়া এবং প্রতিবেশী গঙ্গাস্নান করিবার মানস করিলেন। হাঁটাপথে জয়রামবাটী হইতে বৈদ্যবাটীতে আসিলে তবে গঙ্গাস্নান সম্ভব। শ্রীমা তাঁহাদের সঙ্গে বৈদ্যবাটী হইয়া, কলিকাতায় আসিতে মনস্থ করিলেন। শ্রীমার পিতা রামচন্দ্র কিন্তু কন্যার প্রকৃত মনের ভাব বুঝিলেন এবং তাঁহার গমনে বাধা দিলেন না, বরং স্বয়ং তাঁহাদের সঙ্গে আসিবেন স্থির করিলেন। দীর্ঘ পথ, প্রায় ২৫।২৬ ক্রোশ—পদব্রজে চলা। পাল্কীর ব্যবস্থা ধনীরাই করিতে পারেন, তাঁহাদের করিবার সাধ্য হইল না। দুই দিন পথ চলার পর পথশ্রমে শ্রীমা জ্বরে পড়িলেন। জ্বরে বাহ্যসংজ্ঞা যখন প্রায় লুপ্ত, তখন তিনি দেখিলেন, যেন একটি অতি সুদর্শনা শ্যামা বালিকা তাঁহার পার্শ্বে বসিয়া তাঁহার গায়ে হাত বুলাইতেছেন। শ্রীমা তাঁর পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে সেই বালিকা বলিলেন, তিনি দক্ষিণেশ্বর হইতে আসিতেছেন—সেইখানেই তিনি থাকেন। শ্রীমা তাঁহাকে বলিলেন যে, তিনিও দক্ষিণেশ্বরে শ্রীঠাকুরকে দেখিতে ও তাঁহার সেবা করিবার জন্য যাইতেছেন। শুনিয়া বালিকা বলিলেন, "তা বেশ' ত', খুব ভাল হ'বে তা হ'লে—তাই চল না।" জ্বরের ঘোরে শ্রীভবতারিণী মাতার সহিত এইরূপ কথাবার্ত্তার পর হইতে তিনি নিজেকে যেন জ্বরমুক্ত ও সুস্থ বোধ করিতে লাগিলেন, ক্রমে ঘুমাইয়া পড়িলেন। প্রাতে শ্রীমার শরীর সত্য সত্যই অনেকটা সুস্থ বোধ হওয়ায় ধীরে ধীরে আবার

পথ চলা আরম্ভ হইল। তিনি যথাসময়ে পিতৃসহ দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া পৌঁছিলেন।

ঠাকুর শ্রীমাকে শ্বশুরসহ সমাগতা দেখিয়া, প্রথমে কুশলাদি প্রশ্ন করিলেন এবং পরে দুঃখ করিয়া বলিতে লাগিলেন যে, শ্রীমা সেই যখন দক্ষিণেশ্বরে আসিলেন, যদি আর কিছুদিন আগে আসিতেন, মথুর বিশেষ-ভাবে তাঁহার সেবার বন্দোবস্ত করিতে পারিতেন। কিন্তু এখন মথুর আর নাই, তাঁহার সেবাযত্ন কেমন করিয়া হইবে? আর কেই বা করিবে! যাহা হউক, তাঁহাদিগের যথাসম্ভব ব্যবস্থা হইবার পর শ্রীমা ঠাকুরের সঙ্গে কথাবার্তা কহিয়া অল্প সময়মধ্যেই বুঝিলেন যে, ঠাকুরকে কামারপুকুরে তিনি যেমন দেখিয়াছিলেন, ঠাকুর সেই মানুষই আছেন, বিশেষ কোন পরিবর্তন হয় নাই। শ্রীমার মনের উদ্বেগ দূর হইল। তিনি দক্ষিণেশ্বরে রহিয়া গেলেন—চন্দ্রাদেবীর সহিত তিনি নহবতেই বাস করিতে লাগিলেন। তাঁহার পিতা কয়েক দিবস পরে জয়রামবাটীতে নিজ গৃহে একাকী ফিরিয়া গেলেন।

এখন হইতে শ্রীমা ঠাকুরের সেবায় আত্মনিয়োগ করিলেন এবং ঠাকুরও তাঁহাকে দিবারাত্র শিক্ষা-দীক্ষা দিতে লাগিলেন। সর্ব্বোপরি শ্রীমাকে তিনি জানাইলেন যে, ঈশ্বর লাভ করিতে সকলেরই চেষ্টা করা উচিত এবং একান্ত-মনে কাতর হইয়া, তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিলে তিনি ভক্তকে দেখা না দিয়া থাকিতে পারেন না। যে জীবনে ঈশ্বরলাভ হইল না, তাহা বৃথাই নষ্ট হইয়া গেল। সেই জন্য দুর্লভ মনুষ্যদেহ লাভ করিলে জীবের ঈশ্বরলাভ জন্য সতত এবং সর্ব্বতোমুখী চেষ্টা হওয়া উচিত।

এত দিন ঠাকুর একাকী দক্ষিণেশ্বরে বাস করিতেছিলেন —মা-জননী আসায় তাঁহার মনে তখন যুগপৎ কয়েকটি চিন্তার উদয় হইল। তিনি ভাবিতে লাগিলেন, মা পল্লীগ্রামে পালিতা ও প্রায় অশিক্ষিতা; ঠাকুরের ন্যায় উচ্চ অবস্থার সাধক ও সিদ্ধের সহধর্ম্মিণী তিনি! কিন্তু তাঁহার আচরণ অবস্থানুরূপ মানানসই হইবে কি না, তাহা বলা যায় না। তাহা না হইলে লোকে 'হংসের হংসী' বলিয়া তাঁহাকে যদি বিদ্রূপ করে, তবে তাহাও ঠাকুরের ব্যথার কারণ হইতে পারে। আবার শ্রীমা যদি ঠাকুরের অবস্থা না বুঝিয়া সাধারণ স্ত্রীর ন্যায় তাঁহার স্বামীর নিকট হইতে লৌকিক ব্যবহারের দাবী করেন, তবে ঠাকুরকে নূতন মুস্কিলে পড়িতে হইতে পারে। বিশেষতঃ ঠাকুর জানিতেন, মা ভবতারিণী তাঁহার কাম-প্রবৃত্তি লোপ করিয়া দিয়াছেন। নানা সাধনের দ্বারা যেমন তান্ত্রিক আনন্দ আসনের সাধনে—সখী ও দাসীভাবে সাধনে সিদ্ধিলাভ করায়, ঠাকুরের ত' আর কামোদ্রেক হওয়ার কথা নয়। তবুও কি জানি শ্রীভবতারিণী মা'র মনে কি আছে? বিকারগ্রস্ত রোগীর পক্ষে তেঁতুল ভোজন বা বহু পরিমাণে জলপানের মতই সাধু-সন্ন্যাসীর পক্ষে স্ত্রীলোক অত্যন্ত অনিষ্টকর। এ সব ভাবিয়া ঠাকুর মা'র নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিলেন, যেন জগজ্জননী শ্রীমার মন উন্নত ও উপযুক্তভাবে প্রস্তুত করিয়া

শ্রীশ্রীমা

দেন—যেন তাঁহার মোড় ঘুরাইয়া দেন। কথার আভাসে শ্রীমা ক্রমশঃ ঠাকুরের উদ্বেগের কারণ কিছু কিছু জানিতে পারিলেন। যিনি এই অবতার-বরিষ্ঠের সহধর্ম্মিণীরূপে আসিয়াছেন—যাঁহাকে ঠাকুর তাঁহার নিজের শক্তি বলিয়া পরে ভক্তদের নিকট পরিচিত করিয়া দিয়াছিলেন, তাঁহার ভিতরের সেই লোকোত্তর শক্তির উন্মেষ এইবার আরম্ভ হইল। শ্রীমা প্রথমে প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, ঠাকুর না ডাকিলে কখনও ঠাকুরের কাছে আসিবেন না। দ্বিতীয়তঃ

তিনি এমন প্রচ্ছন্নভাবে মন্দিরে আত্মগোপন করিয়া জীবন-যাপন করিবেন যে, লোকে তাঁহার অস্তিত্ব যেন সহজে জানিতে না পারে। তৃতীয়তঃ তিনি ঠাকুরের উপদেশ বর্ণে বর্ণে পালন করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিবেন।

উত্তর দিকের নহবতের ঠিক উত্তর গায়ে দুইটি সুবৃহৎ বকুলগাছ ছিল। ঐ গাছ দু'টির সম্মুখের বাঁধাঘাট বকুলতলার ঘাট নামে অভিহিত হইত। এই ঘাটটি মুখ্যতঃ বাগানের বাবুদের স্ত্রীলোকদিগের জন্য প্রস্তুত করান হইয়াছিল। তাঁহারা বাগানে আসিলে ঐ ঘাট

দক্ষিণেশ্বরের নহবৎখানা

ব্যবহার করিতেন। তদ্ভিন্ন ঐ ঘাটে দক্ষিণেশ্বর গ্রামের গৃহস্থ বধূরাও স্নান করিতেন, বকুলতলার ঘাটে পুরুষদিগের স্নান নিষেধ ছিল—এখনও আছে। গাত্রমার্জ্জন ও কাপড় বদলান প্রভৃতির জন্য এই ঘাটে স্ত্রীলোকদিগের অনেক সুবিধা হয়। এই বকুলতলার ঘাটে শ্রীমা স্নান করিতেন। রাত্রি ৩০টা—৪ টার সময় উঠিয়া, প্রাতঃকৃত্যাদি শেষ করিয়া, স্নান করিয়া, তিনি নহবতের নীচে নিজের ঘরে প্রবেশ করিতেন। ঘরখানি দেখিলে বেশ বুঝা যাইবে যে, তাহার মধ্যে আবদ্ধ থাকা আর সাধু-সন্ন্যাসীর ক্ষুদ্র কুটীরে থাকা একই কথা। প্রকোষ্ঠটি এত ক্ষুদ্রায়তন যে, তন্মধ্যে কোনরকমে হাত পা গুটাইয়া বসা বা শোয়া চলে। দ্বারটি এমন ছোট যে, শ্রীমার মাথায় দরজার ধাক্কা প্রতিনিয়তই লাগিত; তাঁহার এরূপ ধাক্কা সহ্য করা একপ্রকার অভ্যাসগত হইয়া গিয়াছিল। শেষ রাত্রে উঠিয়া স্নানাদি সারিয়া তিনি সিক্ত কেশ লইয়া এই ঘরে প্রবেশ করিতেন এবং জপ, ধ্যান প্রভৃতি ঠাকুর যেমন যেমন দেখাইয়া শিখাইয়া দিতেন, সেইরূপ করিতেন। অন্ধকারময়ী শেষ রাত্রিতে সর্ব্বঋতুতে উঠার দুর্ভোগও তাঁহাকে সহ্য করিতে হইত। শুনা যায়, এক দিন এক কুম্ভীর নাকি রাত্রে জল হইতে উঠিয়া স্থলে নিদ্রা যাইতেছিল। শ্রীমা অন্ধকারে দেখিতে না পাইয়া তাহারই ঘাড়ে পা দিয়াছিলেন। সৌভাগ্য-বশতঃ কুম্ভীর ভয় পাইয়া হুড়মুড় করিয়া জলে গিয়া পড়িল, নচেৎ বিপদ ঘটিতেও পারিত। যাহা হউক, এইরূপ নিভৃত বাসের এই ফল হইল যে, শ্রীমা যে এইভাবে দক্ষিণেশ্বরে বাস করিতেছেন, হৃদয়াদি দুই এক জন ব্যতীত মন্দিরের কেহই আর তাহা জানিতে পাইতেন না। শ্রীমার মুখে শুনা গিয়াছে, এইভাবে থাকিতে থাকিতে তাঁহার গায়ে পায়ে বাত ধরিয়া গিয়াছিল; সে কষ্ট তাঁহাকে সারাজীবন ভোগ করিতে হয়। তাঁহার এই গোপন-বাস কথাপ্রসঙ্গে ঠাকুরের পরম ভক্ত মাষ্টার মশায় বলিতেন যে, তিনি দুই বৎসর ঠাকুরের সঙ্গ করার সময় পর্য্যন্ত নহবতে যে শ্রীমা থাকেন, তাহা জানিতে বা বুঝিতে পারেন নাই।

রাত্রে শ্রীমাকে ঠাকুর সময়ে সময়ে নিজের ঘরে ডাকিতেন ও গায়ে পায়ে হস্ত বুলাইতে বলিতেন এবং সেই সময় যথোচিত উপদেশ ও শিক্ষা দিতেন। শ্রীমা একবার জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "আমি তোমার কে?" তাহার উত্তরে ঠাকুর বলিলেন, যিনি মন্দিরে রহিয়াছেন, যিনি নহবতের উপরে আছেন,—চতুর্দ্দিকে মাতা, স্ত্রী, ভগ্নী, কন্যারূপে যিনি লোকদের সহিত বাস করিতেছেন এবং যিনি তখন ঠাকুরের পায়ে হাত বুলাইতেছেন, সকলেই এক—তাঁহার আনন্দময়ী মা! কখনো কখনো ঠাকুর বলিতেন, ঠাকুরও যেমন মায়ের দাস, শ্রীমাও তেমনি মায়ের দাসী, দুই জনেই মায়ের সখী। ঠাকুর

পরে আরও বলিতেন যে, তিনি নিজেকে পুরুষ বলিয়া ভাবিতে ভুলিয়াই গিয়াছিলেন। জগজ্জননীর কাছে ঠাকুর সর্ব্বদা প্রার্থনা করিতেন, যেমন তাঁহার নিজের মনে কামগন্ধও নাই, তেমনি যেন শ্রীমার মনও অতি শুদ্ধ—কামগন্ধশূন্য থাকিয়া যায়। যে মনে কামগন্ধ নাই, সে মনে ঈশ্বর সতত বাস করেন। বলা বাহুল্য, এ বিষয়ে শ্রীমা ঠাকুরের উপযুক্তা সহধর্ম্মিণীই ছিলেন। তাঁহার মন চিরকাল বালিকার মনের মত শুদ্ধ ও অপাপবিদ্ধ ছিল।

তোতাপুরী বলিয়াছিলেন যে, শ্রীরামকৃষ্ণ নিজেকে কামজিৎ পুরুষ মনে করিলে কি হইবে, এই বিষয়ে বহুবিধ পরীক্ষা না হইলে নিজে এত নিশ্চয় হওয়া উচিত নয়। যোগিরাজ শিবেরও একদা কামোন্মাদ হইয়াছিল শুনা যায়। ঠাকুর সে সব কথা মনে রাখিয়াছিলেন। এক্ষণে নিজেকে পরীক্ষা করিবার সুযোগ আসিল। তিনি শ্রীমাকে নিজের কাছে রাত্রে শুইতে দিতেন এবং এইভাবে ক্রমাগত ৮ মাস কাল এক শয্যায় উভয়ে শয়ন করিয়াছিলেন। কিন্তু রাত্রে এই অদ্ভুত দম্পতির মধ্যে যে বিচিত্র ব্যাপার ঘটিত, তাহা শ্রীমায়ের এই সময়ের অনুভূতির কথায় কতক কতক আভাস পাওয়া যায়। তিনি বলিয়াছিলেন যে, প্রায় সমস্ত রাত্রি ধরিয়া ঠাকুরের নানা ভাব হইত এবং সেইরূপ ভাবান্তর শ্রীমায়ের পূর্ব্বে দেখা না থাকায়, তিনি ঠাকুরের এইরূপ নানা ভাবান্তর দর্শন করিয়া, প্রথম প্রথম ভয়ে—উদ্বেগে রাত্রে ঘুমাইতে পারিতেন না, সমস্ত রাত্রি প্রায় জাগিয়াই কাটাইতেন। ঠাকুর যখন জানিতে পারিলেন যে, রাত্রে ভয়ে ও উৎকণ্ঠায় শ্রীমার ঘুম হয় না, তখন তাঁহাকে নিজের ভিন্ন ভিন্ন ভাবের ভিন্ন ভিন্ন লক্ষণ ও তাহা উপশমের জন্য মন্ত্রাদি উচ্চারণবিধি শিখাইতে লাগিলেন। এইরূপ শিক্ষা পাওয়া সত্ত্বেও এক এক দিন ঠাকুরের এমন ভাব হইত যে, তাহা শ্রীমার ভাবোপশমন মন্ত্রে তখন কুলাইত না, মাকে হৃদয় মুখোপাধ্যায়কে সেই সময়ে সাহায্যার্থ ডাকাইয়া পাঠাইতে হইত। এই ভাবে ৮ মাস কাটিবার পর নিজেকে ও শ্রীমাকে পরীক্ষোত্তীর্ণ জানিয়া ঠাকুর শ্রীমাকে বলিলেন, "তুমি এখন নহবতে থাকো গে। দরকার হ'লে ডাকবো।" এখন হইতে শ্রীমা এক একবার ঠাকুরকে দর্শন করিতে আসিতেন, দিনের বেলা প্রায়ই দর্শন হইত না। যখন ভক্ত-সমাগম বৃদ্ধি পাইতে লাগিল তখন এমনও হইত যে, ঠাকুর না ডাকিলে মাসাধিককালও ঠাকুরের কাছে শ্রীমার আসা ঘটিয়া উঠিত না। নহবৎ হইতে শ্রীমা উদ্দেশেই ঠাকুরকে প্রত্যহ প্রণাম করিতেন এবং ভক্তমুখে তাঁহার কুশলসংবাদ লইতেন। এইভাবে এই আধুনিক ভোগযুগের মধ্যে এই আদর্শ দম্পতি, এই ঋষি ও ঋষিপত্নী সাধারণের অগোচরে, কামগন্ধশূন্য এক অপূর্ব্ব জীবন যাপন করিয়া গিয়াছেন। ইহার চাক্ষুষ তুলনা আর কোথায় মিলিবে?

মথুরের দেহত্যাগের পর ঠাকুরের সঙ্গে তাঁহার ভাবে দৃষ্ট দ্বিতীয় রসদ্দার শম্ভুচন্দ্র মল্লিকের আলাপ হইল। শম্ভু

শম্ভুচন্দ্র মল্লিক

বাবু ছিলেন এক জন ইংরেজিনবীশ ধনী, কলিকাতাবাসী ভদ্রলোক, জাতিতে সুবর্ণবণিক। ইনি কোন এক সওদাগরি আপিসের মুৎসুদ্দি ছিলেন। ইঁহার ধরণও কতকটা সাহেবীভাবের ছিল। শম্ভু বাইবেল খুব পড়িতেন এবং মধ্যে মধ্যে তাহা হইতে প্রবচনাদি উদ্ধৃত করিয়া বলিতেন। দক্ষিণেশ্বরে কালীবাটী হইতে কিছু পূর্ব্বে ইঁহার একটি সুরম্য বাগান ছিল—এখনও সে বাগান আছে। বাগানের উত্তরপশ্চিমের কিয়দংশ নূতন রেল-লাইনের জন্য কোম্পানী এখন গ্রহণ করিয়াছে। বাগানের মধ্যের বাটীটি

সুন্দর—সুবৃহৎ। দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া শম্ভুচন্দ্র ঠাকুরকে নিজের বাগানে লইয়া যাইতেন ও তাঁহার সঙ্গে ধর্ম্ম আলাপ করিতেন। ঠাকুর সাধু বলিয়া শম্ভুর জানা ছিল এবং সেই জন্য তাঁহার ব্যবহারার্থ আলাদা এক সেট বাসন বাগানে রাখিয়া দিয়াছিলেন। ঠাকুরকে তিনি ফল-মিষ্টান্নাদি খাওয়াইয়া বড়ই সুখ অনুভব করিতেন—মধ্যে মধ্যে নানাবিধ ফল-মূল তাঁহার সেবার্থ দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে পাঠাইতেন। শম্ভু ঠাকুরকে 'গুরুজী' বলিতেন এবং নিজেও কখনো কখনো রাসমণির বাগানে ঠাকুরকে দেখিতে আসিতেন।

শ্রীমা ১৮৭২ খৃষ্টাব্দের ফাল্গুন মাসে দক্ষিণেশ্বর আসিয়াছেন। (১৮৭৩ খৃঃ) ১২৮০ জ্যৈষ্ঠ মাসে ঠাকুরের ষোড়শী পূজার সাধ হইল ষোড়শী দশমহাবিদ্যার তৃতীয়া বিদ্যা; অন্যনাম ত্রিপুরাসুন্দরী। ঠাকুর শ্রীমাকে ষোড়শীরূপে পূজা করিতে ইচ্ছা করিলেন। পূজার দিন নির্দ্দিষ্ট হইল—ফলহারিণী অমাবস্যার দিন, সন্ধ্যা ৯টার সময়। পূজার আয়োজনাদি সমস্ত করিতে হৃদয়ের উপর ভার দেওয়া হইল। বেশী লোক যাহাতে ঠাকুরের সঙ্কল্পের কথা না জানেন, ঠাকুর তজ্জন্য হৃদয়কে সাবধান করিয়া দিলেন। এখন ঠাকুরের ঘরে যে স্থানে জলের জালাটি দেখা যায়, সেই স্থানে পূজার স্থান নির্দ্দিষ্ট হইল। আলপনা দেওয়া পিঁড়িতে শ্রীমাকে বসাইয়া ঠাকুর তাঁহাকে ভগবতী জ্ঞানে পূজা করিলেন। পূজা করিতে করিতে ঠাকুরও ভাবস্থ, শ্রীমা-ও ভাবস্থ হইয়া যান। বস্ত্র, সিন্দুর-চুপড়ী, বাসন, শাঁখা, শাড়ী প্রভৃতি উপহার প্রদানান্তে ঠাকুর শ্রীমায়ের চরণে ফুল, চন্দন, বিল্বদল, এমন কি, নিজের জপের মালা পর্য্যন্ত রাখিয়া প্রণাম করিলেন। শাস্ত্রীয় সাধন-ভজন তাঁহার এইখানে সমাপ্ত হইল। পূজা শেষ হইলে শ্রীমা জিজ্ঞাসা করিলেন, পূজায় প্রাপ্ত উপহারবস্তুগুলি তিনি কি করিবেন? ঠাকুর তাহাতে শ্রীমাকে উপদেশ দিলেন যে, ঐ সমস্ত উপহৃত দ্রব্য শ্রীমা যেন তাঁহার নিজের গর্ভধারিণীকে ভগবতী বা জগদম্বাবোধে দান করেন। তখন শ্রীমার জননী শ্যামাসুন্দরী সধবা ছিলেন। কিছু দিন পরে শ্রীমা দেশে ফিরিয়াছিলেন, সেই সময়ে তিনি ঠাকুরের আদেশমত কার্য্য করিয়াছিলেন।

শ্রীমা দক্ষিণেশ্বরে অবস্থানকালে ঠাকুরের জন্য ঝোল-ভাত রাঁধিয়া খাওয়াইতেন। ঠাকুরের মাতাঠাকুরাণী যত দিন জীবিতা ছিলেন, ঠাকুর তত দিন নহবতে আসিয়া মা'র কাছে বসিয়া আহার করিতেন। মাতার দেহত্যাগ ঘটিলে ঠাকুরের আহার তাঁহার ঘরে যাইত, সেইখানেই আহার করিতেন। শ্রীমা ঠাকুরের পদসেবা করিতেন ও আবশ্যক হইলে তাঁহার গায়ে তৈল মাখাইয়াও দিতেন। ঠাকুর শ্রীমাকে ধর্ম্ম উপদেশ ছাড়া সাংসারিক ব্যাপারেরও উপদেশ দিতেন। স্থানান্তরে কোথাও যাইতে হইলে গাড়ীতে বা নৌকাতে গিয়া প্রথমে বসিতে বলিতেন ও সর্ব্বশেষ নামিতে বলিতেন। কারণ, তাহা হইলে কোন জিনিষ গাড়ী বা নৌকাতে পড়িয়া রহিল কি না দেখিয়া লইয়া আসিতে পারিবেন। ঠাকুর নিজে এ দিকে এত এলোমেলো যে, পরণের কাপড় কোথায়, তাহার হুঁস নাই; কিন্তু কার্য্যকালে সিংহতুল্য ছিলেন। নিজের গামছাখানি, চটীজোড়াটি, এমন কি, তাঁহার ব্যবহার্য্য দ্রব্যাদির সামান্য স্থানচ্যুতির জন্য অসন্তুষ্ট হইতেন। শ্রীমাকে ঠিক এইভাবে জীবন গঠন করিতে শিক্ষা দিয়াছিলেন। ঠাকুরের বেশ একটি উপদেশ আছে—তাহা শ্রীমাকেও বলিতেন—শিখাইতেন:—"যেখানে যেমন, যখন যেমন, যাকে যেমন"—তেমনিই করিতে শিক্ষা ও চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। কথা কয়টি কর্ম্মযোগের একটি সংক্ষিপ্ত মন্ত্র বলিয়াও গ্রাহ্য হইবার যোগ্য।

ঠাকুরের মধ্যম ভ্রাতা রামেশ্বর দক্ষিণেশ্বরে বিষ্ণুঘরে পূজা করিতেছিলেন। তাঁহার শরীর কিন্তু ক্রমশঃ খারাপ হইতেছিল। ঠাকুর তাঁহাকে দেশে ফিরিতে বারণ করিলেন, কিন্তু তিনি তাঁহার কথা না শুনিয়া আরোগ্যলাভের আশায় দেশে ফিরিলেন। সেখানে বেশী দিন আর বাঁচিলেন না—জ্বরাতিসারে তাঁহার দেহত্যাগ ঘটিল। রামেশ্বর সরল উদার দানশীল ছিলেন। কেহ তাঁহার কাছে কিছু প্রার্থনা করিলে তিনি 'না' বলিতে পারিতেন না। রামেশ্বর জ্যোতিষ-শাস্ত্রও কিছু কিছু জানিতেন। মৃত্যুকালে 'রাম' নাম করিতে করিতে তাঁহার প্রাণ দেহ ছাড়িয়া গেল। তাঁহার ইচ্ছামত তাঁহার দেহ শ্মশানে না লইয়া গিয়া পথিপার্শ্বেই দাহ করা হয়—কারণ, তাহা হইলে তাঁহার দেহাবশেষ সাধুভক্ত পথিকের চরণ-ধূলায় পবিত্রীকৃত হইবে—এইটি তাঁহার শেষ ইচ্ছা ছিল।

রামেশ্বরের দেহত্যাগের পর বিষ্ণুঘরে ঠাকুরের এক জ্ঞাতি-ভ্রাতুষ্পুত্র দীনু কিছুদিন পূজাদি দেবসেবা-কার্য্য

করিলেন। তিনি কিন্তু বেশী দিন জীবিত রহিলেন না, ওলাউঠা রোগে তাঁহার মৃত্যু ঘটিল। তাহার পর রামেশ্বরের পুত্র রামলাল বিষ্ণুঘরের পূজারী হইয়া আসিলেন। রামলাল পূজা ছাড়াও ঠাকুরের মাতা ও তাঁহার পিতামহী চন্দ্রাদেবীর সেবা-শুশ্রূষা করিতেন।

শম্ভুচন্দ্র মল্লিকের কেমন করিয়া ঠাকুরের প্রতি এত ভক্তি-বিশ্বাস হইয়াছিল, প্রসঙ্গক্রমে সে সম্বন্ধে এইবার কিছু বলিতেছি ইংরেজি-নবীশ—শম্ভুর সাধু-সন্ন্যাসী সম্বন্ধে মোটামুটি একটা ঝাপসা-গোছের ধারণা ছিল সাধুরা ঈশ্বরচিন্তাও করেন, আবার বড়মানুষের কাছে টাকাকড়িও চাহিয়া লয়েন, এইরূপই ত' দেখা যায়। কিন্তু পরমহংস-দেব ঈশ্বরচিন্তাই করেন, কখনো কাহারও কাছে কিছু চাহেন না—মা যাহা দেন, তাহাতেই সন্তুষ্ট। তিনি বিবাহও করিয়াছেন অথচ স্ত্রীর সঙ্গে দৈহিক সম্পর্কশূন্য। এ এক মজার সাধু বটে, ইঁহাকে গৃহীও বলা যায়, সাধুও বলা যায়। অথচ গেরুয়া-বসন নাই, তিলক-ত্রিপুণ্ড্রও নাই, ভস্ম-চিমটাও নাই। যাহা হউক, এক দিন শম্ভু খবর পাঠান সত্ত্বেও ঠাকুর অসুস্থতা বশতঃ শম্ভুর বাগানে যাইতে পারিলেন না। শম্ভু নিজেই ঠাকুরের কাছে আসিয়া আলাপ করিতে লাগিলেন। আলাপান্তে ঠাকুর শম্ভুর সঙ্গে আস্তে আস্তে তাঁর বাগানে গেলেন। এখানে ঠাকুরের জন্য শম্ভু অনেক বেদানা আনিয়া রাখিয়াছিলেন, তাহা হইতে কিছু ঠাকুরকে খাওয়াইলেন, অধিকাংশই পড়িয়া রহিল। শম্ভু বলিলেন যে, ঐ সব ঠাকুরের জন্যই আনা, অতএব ঠাকুর ঐগুলি লইয়া গেলে ভাল হয়। ঠাকুর বলিলেন, তিনি অসুস্থ, কিছুই লইয়া যাইতে চাহেন না। অবশেষে বিশেষ পীড়াপীড়িতে তিনি দু'টি বেদানা পকেটে লইলেন এবং দক্ষিণেশ্বরের বাগানে আসিবার জন্য যাত্রা করিলেন। শম্ভুও একটু অগ্রসর হইয়া আসিলেন। ইহার পর এক আশ্চর্য্য ব্যাপার ঘটিল, এই বাগানের পথ বহুবার আগমন ও ভ্রমণের জন্য ঠাকুরের বিশেষভাবে চেনা-শুনা থাকিলেও সে সময়ে তিনি সেই বাগানের ফটক কোনমতে খুঁজিয়া পাইলেন না। অর্দ্ধ-নিদ্রিত, অর্দ্ধ-জাগরিত লোক যেমন দিশেহারা হইয়া ভ্রমণ করে, ঠাকুর সেইমত বাগানের চারিদিকে পথভ্রান্ত হইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। শম্ভু দাঁড়াইয়া সবই দেখিতেছিলেন। তিনি আসিয়া ঠাকুরের হাত ধরিলেন। বাগানবাটীতে আসিয়া ঠাকুর বেদানা দু'টি রাখিয়া দিবামাত্র তিনি আবার সমস্ত বেশ দেখিতে পাইলেন। শম্ভু এইরূপ পথভ্রান্তির কারণ জিজ্ঞাসা করিলে ঠাকুর বলিলেন, তিনি এতক্ষণে কারণ বুঝিয়াছেন। পক্ষী ও দরবেশ সঞ্চয় করিবে না, শাস্ত্র এই বিধান দেয়। তিনি দরবেশ হইয়াও শম্ভুর বেদানা সঞ্চয় করিয়াছিলেন, সেই জন্যই মা তাঁহার এইরূপ ভাবান্তর ঘটাইয়াছিলেন। শম্ভুর বেদানা রাখিয়া ঠাকুর চলিয়া আসিলেন। শম্ভু বিস্মিত হইলেন বটে, কিন্তু নিঃসন্দেহ হইলেন না। গোপনে আর একবার পরীক্ষা করিতে ইচ্ছা করিলেন। এই ত্যাগের অবস্থা ঠাকুরের পক্ষে সহজ না লোক দেখান—তাহা শম্ভু নিঃসন্দেহভাবে দেখিতে ইচ্ছা করিলেন।

কিছু দিন পরে ঠাকুর যখন পেটের অসুখে খুব কষ্ট পাইতেছিলেন, তখন শম্ভু আর এক দিন ঠাকুরকে বাগানে লইয়া আসিলেন এবং তাঁহাকে সামান্য একটু অহিফেন সেবন করিতে দিলেন। ফলে অসুখের যেন কতকটা উপশমও হইল। এই অবধি ঠাকুর, পেটের অসুখ বাড়িলে শম্ভুর বাগানে গিয়া কখনো কখনো একটু অহিফেন সেবন করিয়া আসিতেন। এক দিন শম্ভু বলিলেন, ঠাকুর রোজ রোজ কেন কষ্ট করিয়া আসেন, একটু অহিফেন নিজের কাছে রাখিয়া দিলে এতটা কষ্ট স্বীকার করিতে হয় না। যখনই অসুখ বাড়িবে, একটু সেবন করিতে পারিবেন, কিন্তু সঞ্চয় করিতে অনিচ্ছুক থাকায় ঠাকুর তাহা গ্রহণে সম্মত হইলেন না। শম্ভু এমন ত্যাগের কথা কখনো শুনেন নাই, দেখা ত' দূরে থাকুক। ঔষধার্থ একটু অহিফেন গ্রহণ ও সঞ্চয় সাধুর পক্ষে অবৈধ কার্য্য, এমন কথা কখনও তাঁহাকে কোন সাধু ত' বলেন নাই। শম্ভু এই সর্ব্বত্যাগের কথাটা যাচাই করিতে চান। সেই জন্য যখন ঠাকুর উঠিয়া আসিতেছেন, তখন শম্ভু ঠাকুরের অগোচরে একটু অহিফেন পাতায় মুড়িয়া তাঁহার পকেটে ফেলিয়া দিলেন, এবং ঠাকুরের অলক্ষ্যে দেখিতে লাগিলেন, তাঁর কিছু ভাবান্তর ঘটে কি না। ঠাকুর শম্ভুর ঘর হইতে বাহির হইয়া আর পথ খুঁজিয়া পান না—ফটক যে দিকে, কেবলি তদ্বিপরীত দিকে যান। বারংবার চেষ্টায় নিষ্ফল হইয়া, ঠাকুর যখন ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন, তখন শম্ভু আস্তে

আস্তে নিকটে গিয়া তেমনি ভাবে ঠাকুরের অজ্ঞাতসারে অহিফেনটুকু বাহির করিয়া লইলেন। তৎক্ষণাৎ তাঁহার দৃষ্টি সহজ হইল, তিনি এবারে সোজা ফটকে আসিয়া বাগান হইতে বাহির হইয়া আসিলেন। শম্ভু মল্লিক এই ব্যাপার দেখিয়া বিস্ময়ে ও পুলকে নির্ব্বাক্! ভাবিতে লাগিলেন, এমন ত্যাগী নররূপধারী এই রামকৃষ্ণ পরমহংস তবে কে? এ নরোত্তম নিশ্চয়ই দেহধারী ভগবান্—জীব-শিক্ষার জন্য এই দীন আচরণে আপনাকে লুকাইয়া রাখিয়াছেন! সেই দিন হইতে শম্ভু ঠাকুরের পায়ে আপনাকে সমর্পণ করিলেন এবং সেই অবধি যখন যাহা তাঁহার আবশ্যক, তাহা দিতে লাগিলেন। ঠাকুর বলিয়াছিলেন, তাঁর দ্বিতীয় রসদ্দার শম্ভুচন্দ্র মল্লিক। শম্ভু দক্ষিণেশ্বর তীর্থে শ্রীমার থাকিবার জন্য কিছু জমি কিনিয়া বাংলা চালা ঘরও করিয়া দিয়াছিলেন। শ্রীমা অতঃপর কিছুদিন হৃদয়ের দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীর সঙ্গে সেই ঘরে থাকিতেন।

শম্ভুর মুখে ঠাকুরের অলৌকিক ত্যাগ ও অসাধারণ চরিতকথা শুনিয়া, এই সময় কলিকাতার কতিপয় ধনী লোক ঠাকুরকে দেখিতে আসেন। শম্ভু মল্লিকের নাকটি একটু টেপা ছিল, সেই জন্য বাহ্যিক লক্ষণে ঠাকুর বলিতেন, তিনি খুব সরল ছিলেন না। শম্ভুচন্দ্রের একান্ত সাধ ছিল যে, তিনি তাঁহার টাকা দিয়া কতকগুলি হাঁসপাতাল ও ডিস্পেনসারী করিয়া দেন, লোকের কল্যাণের জন্য কতকগুলি পুকুর খনন করাইয়া দেন। কিন্তু ঠাকুর তাঁহার এই উদ্দেশ্য খুব উচ্চ বলিয়া অনুমোদন করেন নাই। ঠাকুর বলিয়াছিলেন, ঈশ্বরলাভই জীবনের উদ্দেশ্য, হাঁসপাতাল—ডিসপেন্সারী করা নহে। শম্ভু আবার ঠাকুরকে রহস্য করিয়া কখনও কখনও বলিতেন,"ঢাল নাই তলোয়ার নাই নিধিরাম সিং"। শেষে কিন্তু শম্ভুর মন হইতে ঐশ্বর্য্যের মোহ একেবারে চলিয়া গিয়াছিল—মৃত্যুর কিছু পূর্ব্বে হৃদয় তাঁহার সহিত দেখা করিতে গিয়াছিলেন, তখন শম্ভু বলিলেন, "হৃদু, পোঁটলা বেঁধে ব'সে আছি।" ঠাকুরের কাছে তিনি প্রার্থনা করিয়াছিলেন, যেন সব ছাড়িয়া ভগবানের কাছে যাইতে পারেন। অহেতুক কৃপাসিন্ধু ঠাকুরের আশীর্ব্বাদে হয় ত' তাঁহার শেষ প্রার্থনা মা পূর্ণ করিয়া দিয়াছেন—অন্তে তাঁহার পরমা গতি লাভ হইয়াছে। শম্ভু বহুমূত্র রোগে মারা যান। তাঁহার দেহান্তে তাঁহার সাধ্বী স্ত্রীও ঠাকুরের ও শ্রীমার সেবা করিতে ত্রুটি করিতেন না। শম্ভুর স্ত্রী মধ্যে মধ্যে নহবতে শ্রীমায়ের নিকট কিছু কিছু উপহার লইয়া আসিতেন, বসিতেন, সকল সংবাদ লইতেন এবং তাহার পর ঠাকুরকে দর্শন করিয়া আবার কলিকাতায় ফিরিতেন।

যদুলাল মল্লিক আর এক জন কলিকাতার ধনী ভদ্রলোক। ইনিও ঠাকুরকে দর্শন করিয়া তাঁহার প্রতি

যদুলাল মল্লিক

ভক্তিমান হইয়াছিলেন। রাসমণির বাগানের ঠিক পূর্ব্ব গায়ে ইঁহার বাগান ছিল। এই বাগান এখন বালীপুলের কর্ত্তৃপক্ষরা কিনিয়া লইয়া, পুলের আপিস করিয়াছেন। এ বাগানেও তিনি ঠাকুরকে প্রায়ই লইয়া যাইতেন, তাঁর কলিকাতার বাড়ীতেও ঠাকুর যাতায়াত করিতেন। যদু মল্লিকের এক মাসী ছিলেন, তিনি বড়ই ভক্তিমতী রমণী। তিনি ঠাকুরকে অতিশয় ভক্তিশ্রদ্ধা করিতেন। যদু মল্লিকের সিংহবাহিনীর সেবা ছিল। এই সিংহবাহিনীকে ঠাকুর বলিয়াছেন জাগ্রতা দেবী, দশভুজা মূর্ত্তি। এই সিংহবাহিনী দর্শন করিয়া ঠাকুর সমাধিস্থ হইয়া পড়িতেন। জোড়াসাঁকো পল্লীতে যদু মল্লিকের বাড়ী

যদু মল্লিকের বাগানেই মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের সহিত ঠাকুরের আলাপ হয়। ঠাকুর যতীন্দ্রমোহনকে জিজ্ঞাসা করেন যে, "ঈশ্বরচিন্তা আমাদের উচিত কি না?"

সিংহবাহিনী

মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর

যতীন্দ্রমোহন বলেন যে,"সংসারীদের ঈশ্বরচিন্তা হ'লেই বা কি হবে, মুক্তি ত' হবে না। রাজা যুধিষ্ঠির সংসারী ছিলেন, তাই মিথ্যাকথা বলতে হয়েছিল, যার ফলে তাঁকেও নরক দেখতে হইয়াছিল।" এ কথা শুনিয়া ঠাকুর যতীন্দ্রমোহনকে বলিয়াছিলেন, "এ ত তোমার অতি হীনবুদ্ধির কথা। হাঁগা, তুমি যুধিষ্ঠিরের সত্যনিষ্ঠা, দয়া, ক্ষমা এসব ছেড়ে দিয়েছ, কেবল নরক-দর্শনটিই মনে ক'রে রেখেছ?" এই কথার একটু পরেই মহারাজা অপ্রস্তত হইয়া চলিয়া গিয়াছিলেন এবং ঠাকুরের সঙ্গে আর দেখা করেন নাই।

১৮৭২ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে কবি মধুসূদন ঠাকুরকে দর্শন করিয়াছিলেন, এ কথা ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি। তিনি ঠাকুরকে এই প্রথম ও শেষ দর্শন করেন। ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দের জুন মাসের শেষে তাঁহার দেহত্যাগ ঘটিয়াছিল। ঠাকুর মধুসূদনের সহিত কোন শাস্ত্রীয় কথা কহেন নাই, মধুসূদন ঠাকুরের নিকট কিছু তত্ত্বকথা শুনিবার ইচ্ছাপ্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু মা শ্রীঠাকুরের মুখ চাপিয়া ধরিয়াছিলেন, কথা কহিতে দেন নাই।

[ক্রমশঃ।

শ্রীদুর্গাপদ মিত্র

ব্যাঙ্গ বিরহ

(দ্বৈত ছড়া)

১। দুরন্ত বসন্ত এল কান্ত এল কই।
২। নিতান্ত প্রাণান্ত বুঝি হ'ল এবার সই॥
১। পাপিয়া পিউ ডাকে কোকিলে দিচ্ছে সাড়া।
২। বিরহে বিষম তাতে শুকিয়ে ফাটে সজনেখাড়া॥
১। চলতে গেলে দখিণ-বাতাস আঁচল ধ'রে পিছে টানে।
২। কে জানে কি কথাটি কয় যেন কার কাণে কাণে॥
১। কে যেন ভাঙ্গা-সুরে বাজালে ভাঙ্গা বাঁশী।
২। কে যেন আধেক মুখে হেসে গেল আধেক হাসি॥
১। স্বপনে গোপন মনে সুধা খাই হাতা হাতা।
২। ভোরে সৈ খুঁজতে বেরুই কোথা পাই গাঁদালপাতা॥
১। কে ডাকে হাতছানি দেয় হ'ল ভার ঘরে টেকা।
২। মিতালি কোরব এবার পেলে পর যমের দেখা॥

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বসু।

জলধর-স্মৃতি-সম্বর্দ্ধনা

দ্বিতীয় প্রস্তাব

মাসিক বসুমতীর' আষাঢ় সংখ্যায় রায় জলধর সেন বাহাদুরের স্মৃতিতর্পণ-মহাভারতের আদি, সভা, বনপর্ব্ব পর্য্যন্ত অনুশীলন করিয়া, আশা করিয়াছিলাম যে, এ বার বিরাট ও উদ্যোগপর্ব্ব সারিয়া যুদ্ধপর্ব্বে অবতীর্ণ হইতে পারিব। কিন্তু 'মাসিক বসুমতীর' কোন কোন সুধী পাঠক পত্র লিখিয়া অনুযোগ করিয়াছেন যে, মাষ্টার মহাশয়ের স্মৃতিতর্পণ করিতে গিয়া, স্বামী বিবেকানন্দের পরিব্রাজক জীবনের আনুপূর্ব্বিক বিবরণ সঙ্কলন করিয়া দিলাম, কিন্তু মনীষী ভূদেব বাবুর পুণ্যজীবনী আলোচনার অবকাশ পাইলাম না। তাঁহাদের অনুযোগে এ শ্রম-লাঘব প্রয়াসে কর্ত্তব্যে অবহেলার জন্য লজ্জিত হইলাম। কিন্তু সত্য কথা বলিতে কি, রায় বাহাদুর এ সুপ্রবীণ বয়সেও যে চিরাচরিত মিথ্যার বেসাতি সমভাবে চালাইতেছেন, তাহা মনে করিতে পারি নাই। জলধর বাবুর মত অসত্যসন্ধ কীর্ত্তিধ্বজ পুরুষের জীবন-স্মৃতির মহিমা-সিন্ধুতে পাছে বিন্দুমাত্র সত্যের আলোক পরিস্ফুট হইয়া উঠে—সত্যের আভাসমাত্র দেখিয়াই শিক্ষিত সমাজ বিভ্রান্ত হন—সেই জন্য আবার আদিপর্ব্বে অনুবর্ত্তন করিতে হইল। বিশেষতঃ মাষ্টার মহাশয় নিজেই স্বীকার করিয়া ফেলিয়াছেন—"দু-একজন কনিষ্ঠের অনুরোধে আমি মুখে মুখে আমার বাল্যজীবন ও ছাত্রজীবনের কথা বলেছি। আমার সোদরোপম শ্রীমান্ নরেন্দ্রনাথ বসু সে কথাগুলি লিখে রেখেছেন। কিন্তু ঐ পর্য্যন্তই। আমার ছাত্রজীবনের কথাও বলা শেষ হয়নি। আর, হবে ব'লে আশাও নেই।" ('ভারতবর্ষ', ১৩৪২, কার্ত্তিক, ৭১১ পৃষ্ঠা) রায় বাহাদুরের প্রখ্যাতনামা উকিল, পরম বন্ধু শ্রীযুত নরেন্দ্র দেব অনুগ্রহ করিয়া লিখিয়াছিলেন,—আমি—"সাহিত্য-ক্ষেত্রে অর্দ্ধশতাব্দী ধরিয়া লেখনী সঞ্চালন করিয়াও স্থায়ী কিছুই সংস্থান করিতে পারি নাই" ('মাসিক বসুমতী', ১৩৪০, মাঘ, ৬৫২ পৃষ্ঠা)। জীবন-সায়াহ্নে "গুরুদক্ষিণা দিবার ছলে"—মাষ্টার মহাশয়ের কীর্ত্তি-প্রহেলিকার রহস্য-যবনিকা যদি অপসারিত করিতে পারি—তাহা আমাকে "চিরদিন···বঙ্গসাহিত্যে অমর করিয়া রাখিবে।"

শ্রীমান্ নরেন্দ্রনাথ বসুর সাহিত্য-প্রতিভার পরিচয় এখনও পাই নাই—তিনি কোন্ শ্রীমান্ নরেন্দ্রনাথ, তাহা জানিবার সৌভাগ্য আজও হয় নাই। তবে তিনি যে কীর্ত্তিমান সাহিত্যিক, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই—নচেৎ বিশ্ববিজয়ী সাহিত্য-দিগ্‌গজ জলধর বাবুর 'বাল্যজীবন ও ছাত্রজীবন' লিখিবার ভার পাইতেন না। তাঁহার প্রতিভা-রঞ্জিত জলধর বাবুর 'বাল্যজীবন ও ছাত্রজীবন' প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বে যদি সাহিত্যক্ষেত্রে অর্দ্ধশতাব্দী সঞ্চালনে ক্ষয়িত—ব্যর্থ—অক্ষম "লেখনী সঞ্চালন করিয়া স্থায়ী কিছু সংস্থান করিতে পারি"—জীবন-সায়াহ্নে এই দুরাশার ভেলা ভরসা করিয়া, জলধর বাবুর বাল্যজীবন ও ছাত্রজীবনের উর্ম্মিমুখর দুস্তর সাগর উত্তীর্ণ হইবার প্রয়াস পাইতেছি। খোসামোদে সিদ্ধবাক্ নহি,—স্থবিরতার দোহাই দিয়া, সরলতার ভাণে, দীনতাভিনয়ে প্যাচকসার কেরামতিও অভ্যাস করি নাই,—পরের লেখা নিজের নামে পাচার করিয়া প্রতিপত্তি অর্জ্জন করিতে পারি নাই—সস্তায় কিস্তিমাতের এ-সকল সুকৌশল সুপ্রয়োগ করিতে জানি না বলিয়া গত অর্দ্ধ-শতাব্দীর পণ্ড সাধনার মতই যে এ দুরাকাঙ্ক্ষাও নিশ্চয়ই ব্যর্থ হইবে, তাহাও বেশ বুঝিতেছি। তবু মন্দঃ কবিযশঃপ্রার্থী লুব্ধ আশার অনুসরণ করিতেছি।

আদিপর্ব্ব—ছাত্রজীবনে—ভূদেব-আশিস্-পর্ব্বাধ্যায়

"আমি তখন আমাদের গ্রামের (নদীয়া জেলার কুমারখালী) বাঙ্গালা স্কুলে পড়ি। সাল, তারিখ আমি ঠিক বলতে পারবো না; মনে হচ্ছে, সে হয় ত' ইংরাজী ১৮৭০ কি ১৮৭১ অব্দ। তখন আমার বয়স এই এগার বারো বৎসর।···

"আমি যখন বঙ্গবিদ্যালয়ের প্রথম শ্রেণীতে পড়ি, সেই সময় এক দিন শুনতে পেলাম যে, বিদ্যালয়সমূহের ইন্স্পেক্টর

ভূদেব বাবু দু-একদিনের মধ্যে আমাদের স্কুল পরিদর্শনে আসছেন।...ভূদেব বাবু কুষ্টিয়া থেকে নৌকাযোগে আসচেন, যদিও তখন আমাদের গ্রামের উপর দিয়ে রেলপথ গোয়ালন্দ পর্য্যন্ত গিয়েছিল।...আমি এই সমারোহ ব্যাপারের জন্ম কত দেবদারুপাতা যে টেনে আনলাম, কত বাঁশ যে কাঁধে করে বইলাম, বড় ছেলেদের হুকুম তামিল করবার জন্ম কত যে দৌড়াদৌড়ি করলাম, তা আর বলতে পারিনি। আমাদের উৎসাহ দেখে কে? এই বৃদ্ধবয়সেও সেই সুদূর অতীতের দৃশ্য আমি চোখের সম্মুখে দেখতে পাচ্ছি।...

"বারোটা বেজে গেল, একটাও বেজে গেল—ভূদেব বাবু ইংরাজী স্কুলই পরিদর্শন করছেন, আর আমরা বাঙ্গালা স্কুলের ছাত্রেরা দুয়ারের দিকে চেয়ে বসে আছি।...কাঙ্গাল হরিনাথের আদেশ পেয়ে আমি দাঁড়িয়ে হাত যোড় করে আবৃত্তি করলাম। আমাদের সময়ে ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার পাঠ্য ছিল পরলোকগত রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় প্রণীত 'মিত্রবিলাপ কাব্য'।...কিসে কি হোলো বুঝতে পারলাম না। আমার ঐ আবৃত্তি শুনে মহাত্মা ভূদেবের চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হ'লো।. ভূদেব বাবু আমাকে আশীর্ব্বাদ করে যে বইখানি দিয়ে গিয়েছিলেন, সেখানি ইংরাজি বই। তার নাম Sp ct.tor!" ..."বই আর নেই—পোকায় কেটে তাকে একেবারে শেষ করেছে। বইখানি থাকলে আজ আমি পরম গর্ব্বভরে আমার জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুরস্কার সকলকে দেখাতাম।..."

('ভারতবর্ষ' ১৩৪২ পৌষ, ৪৩—৪৫ পৃষ্ঠা)

জলধর বাবু ১৮৬০ অব্দে ১লা চৈত্র জন্মগ্রহণ করেন ('ভারতবর্ষ' ১৩৪২, চৈত্র, ৫৭৯ পৃষ্ঠা)। তাহা হইলে তাঁহার এগার কি বারো বৎসর বয়সে—১৮৭১-৭২ খৃষ্টাব্দে তিনি নদীয়া—কুমারখালির বঙ্গবিদ্যালয়ে ছাত্রবৃত্তি প্রথম শ্রেণীর ছাত্ররূপে 'মিত্রবিলাপ কাব্য' হইতে আবৃত্তি করিয়া বিদ্যালয়সমূহের ইনস্পেক্টর মহাত্মা ভূদেব বাবুর চক্ষে অশ্রু উচ্ছ্বসিত করিয়া Spectator ইংরেজি পুস্তক আশীর্ব্বাদ পাইয়াছিলেন।

ঋষিকল্প ভূদেব বাবুর সুযোগ্য পুত্র—সদাচারপরায়ণ—সত্যনিষ্ঠ মুকুন্দদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয় বিচারকার্য্যের অবসরগ্রহণ-সময় হইতে—জীবনের শেষদিন পর্য্যন্ত প্রাণপাত সাধনায় তিন খণ্ডে সম্পূর্ণ 'ভূদেব-চরিত' প্রণয়ন করিয়াছেন, তাহা যে প্রামাণ্য গ্রন্থ, অস্বীকার করিবার উপায় নাই। ভূদেব বাবুর সুরক্ষিত পত্ররাশি—স্বহস্তলিখিত ডায়েরী—সরকারী রিপোর্টের স্তূপ আলোড়ন করিয়া, তিনি যে 'ভূদেব-চরিত' সঙ্কলন করিয়াছেন—তাহার প্রথম ভাগের ৩৫৪ পৃষ্ঠায় প্রকাশ—"ভূদেব বাবু উত্তরমধ্য বিভাগের * সাধারণ ইনস্পেক্টর নিযুক্ত হইলেন—(১৩৫।১৮৬৯)।...চুঁচুড়াতেই তাঁহার সদর আফিস থাকিতে পাইল।"

পাদটীকায় উত্তরমধ্য বিভাগের সীমা-নির্দ্দেশ এইরূপ :—

"* এই 'নর্থসেন্‌ট্রাল ডিভিসানে' মালদহ, রাজসাহী, পাবনা (সিরাজগঞ্জ মহকুমা বাদ), যশোহর, মুরশিদাবাদ, বীরভূম (সাঁওতাল পরগণা বাদ) জেলাগুলি ছিল।"

১৮৬৯ খৃষ্টাব্দের ১৩ই এপ্রেলের 'এডুকেশন গেজেটের' ৯ পৃষ্ঠায়ও এই সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে।

তাহা হইলে নিয়ম-তন্ত্র-নিষ্ঠ ভূদেব বাবু নিশ্চয়ই যে তাঁহার পরিদর্শন-কেন্দ্রসীমা অতিক্রম করিয়া, নৌকাযোগে নদীয়া জেলার কুমারখালির বঙ্গবিদ্যালয়ে বা ফরিদপুর জেলার গোয়ালন্দের মাইনর স্কুলে—জলধর বাবুর ছাত্র-গৌরবের যশঃসৌরভে আকৃষ্ট হইয়া সহসা উপস্থিত হইয়াছিলেন, এবং জলধর বাবুর আবৃত্তি শুনিয়া অশ্রুভারাক্রান্ত চক্ষে—"মলিন-বস্ত্র-পরিহিত, নগ্নগাত্র, নগ্নপদ কায়স্থ কিশোরকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন"—"প্রকৃতিস্থ হয়ে... আশীর্ব্বাদ করে...ইংরাজি বই দিয়ে গিয়েছিলেন"—ইহা সম্ভবপর বলিয়া বিশ্বাস করিবেন কি?

তথাপি এই ১৮৭১—৭২ খৃষ্টাব্দমধ্যে ভূদেব বাবুর নদীয়া কুমারখালি বা ফরিদপুর গোয়ালন্দে সহসা উপস্থিতি সম্ভবপর ছিল কি না, 'ভূদেব-চরিত' হইতে তাহা নির্দ্ধারণের প্রয়াস পাইতেছি।

১৮৬৯ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে কাশী হইতে ফিরিয়া "মুর্শিদাবাদ, রাজসাহী, পাবনা প্রভৃতির স্কুল পরিদর্শন কালে ভূদেব বাবু কিছুদিন বজরা ব্যবহার করেন।" ১৮৭০—২৮শে ফেব্রুয়ারী জলপাইগুড়িতে "৪৫ বৎসর বয়সে প্রথম ঘোড়া চড়িতে আরম্ভ করেন।" (১ম ভাগ, ৩৯৩ পৃষ্ঠা) "একদিন...আরবী ঘোড়া হইতে...তাঁহার (চুঁচুড়ার) বাড়ীর সম্মুখেই পড়িয়া গিয়া...তজ্জন্য পাঁচ মাসকাল...শয্যাগত থাকিতে হয়।...কর্ত্তৃপক্ষীয়গণ তাঁহার উপর এতাদৃশ অনুকূল ছিলেন যে, এরূপ অবস্থাতেও তাঁহাকে ছুটী লইতে হয় নাই। 'সুবিধামত অফিসের কাজকর্ম্ম চালাইলেই হইবে এবং পরিদর্শনকার্য্য যখন করিতে সমর্থ হইবেন, তখন করিবেন;' স্বয়ং ছোটলাট গ্রে সাহেব এই কথা ডিরেক্টার সাহেবকে বলিয়াছিলেন।

"এই অসুখের সময় তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র...কয়েক মাস দিনরাত্রি সেবা করিতে করিতে (১৮৭১) বি-এ পরীক্ষার সময় উপস্থিত হইলে ভূদেব বাবু...আশীর্ব্বাদ" করিয়াছিলেন। (১ম ভাগ, ৩৯৪ পৃষ্ঠা) ১৮৭০—১০ই জুন কবিবর হেমচন্দ্রের 'ভারত বিলাপ' ও ২২শে জুলাই 'ভারত সঙ্গীত' এডুকেশন গেজেটে প্রকাশিত হয়। (১৮৭১) "বহরমপুরে থাকার সময় প্রত্যহ সন্ধ্যার পর পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয়, সুপ্রসিদ্ধ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

মহাশয় এবং অন্যান্য কয়েক জন ভদ্রলোক ভূদেব বাবুর বাসায় একত্র হইয়া নানা বিষয়ে, বিশেষতঃ সংস্কৃত-সাহিত্যবিষয়ে আলোচনা করিতেন।" (১ম ভাগ, ৩৯৮ পৃষ্ঠা)

১৮৭২ অব্দে প্রকাশিত 'হেকটর বধে'…উৎসর্গপত্র দেখিয়া ভূদেব বাবু মাইকেলকে ঐ বৎসর ২৮শে মার্চ্চ…পত্র চুঁচুড়া হইতে লিখিয়াছিলেন।" (১ম ভাগ, ৪০৩ পৃষ্ঠা) "১৮৭২ অব্দের প্রথম হইতেই ভূদেব বাবু …ফরাসিডাঙ্গায় একটি বাড়ী ভাড়া করিয়া…সপরিবারে বাস করেন। ৫।৭। ১৮৭২ দুই প্রহরে দৌহিত্রটির এবং প্রথম রাত্রিতে ভূদেব বাবুর সহধর্ম্মিণীর দেহান্ত হইয়াছিল।" (২য় ভাগ, ১-২ পৃষ্ঠা) "শোকাচ্ছন্ন চুঁচুড়ার বাড়ী…হইতে সকল পরিজনকে সরাইয়া দিয়া ভূদেব বাবু নিজে মুর্শিদাবাদ জেলার স্কুল পরিদর্শন-কার্য্যে ব্যাপৃত হইতে গেলেন।" (২য় ভাগ, ৩ পৃষ্ঠা)

"তিনি মফঃস্বল স্কুল পরিদর্শন করিতে গিয়া জিয়াগঞ্জ হইতে (৩০।৮।১৮৭২) তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যাকে জঙ্গিপুরে পত্র লিখিয়াছিলেন।" (২য় ভাগ, ১৬ পৃষ্ঠা) ১৮৭২ "কার্ত্তিক মাসে তথায় তাঁহাদের গুছাইয়া রাখিয়া দিয়া ভূদেব বাবু দ্বিতীয় পুত্রসহ লক্ষ্ণৌ গিয়াছিলেন।" (২য় ভাগ, ১৭ পৃষ্ঠা)

"সদাশয় গ্রে সাহেবের পরেই কতকটা কঠোরতার সহিত শাসিত উত্তরপশ্চিম প্রদেশের সিভিলিয়ান সার জর্জ্জ ক্যাম্বেলের ছোটলাট হইয়া আসা বাঙ্গালীর মনঃপুত হয় নাই।" (২য় ভাগ, ২১ পৃষ্ঠা) "দেশীয় কর্ম্মচারী যতই ভাল হউক না, ইনস্পেক্টরের কার্য্য—যাহাতে অধিক ঘুরিতে ফিরিতে হয়—ইংরাজ ভিন্ন অপর কেহ ভাল পারে না,—ক্যাম্বেল সাহেবের এই বিশ্বাস স্থির থাকায়,…রামপুর বোয়ালিয়া ও মালদহে পরিদর্শন কালে তাঁহাকে (ভূদেব বাবুকে) তথায় উপস্থিত থাকিতে না দেখিয়া…ক্যাম্বেল সাহেব…আগষ্ট ও অক্টোবর মাসের (১৮৭২) পত্রে ভূদেব বাবুর কৈফিয়ৎ তলব করেন।" (২য় ভাগ, ২৪ পৃষ্ঠা) ভূদেব বাবু নির্ভীক ভাবায় যথাযথ উত্তর প্রদান করিয়া লিখিয়াছিলেন, "যে বৎসর ঘোড়া হইতে পড়িয়া গিয়া পাঁচ মাস চলিতে পারেন নাই, সেবারও ৯৫ দিন মফঃস্বলে ছিলেন।" (২য় ভাগ, ২৫ পৃষ্ঠা)

যিনি ঘোড়া হইতে পড়িয়া গিয়া ৫ মাস শয্যাগত, তাঁহার পক্ষে এই ৯৫ দিনের ভিতর স্বকীয় পরিদর্শন-কেন্দ্রসীমা অতিক্রম করিয়া, নদীয়া জেলার কুমারখালি বা ফরিদপুর জেলার গোয়ালন্দে সহসা উপস্থিত হওয়া সম্ভবপর বলিয়া বোধ হয় কি?

"তিনি ৩০শে জুলাই ১৮৭২ বহরমপুরে পৌছিয়া শুনিলেন যে, ছোটলাট সাহেব পরবর্ত্তী মাসের ১৯শে বহরমপুরে এবং ২৯শে রামপুর বোয়ালিয়া পৌছিবেন।…তিনি স্থির করিয়াছিলেন যে, মুর্শিদাবাদ ও মালদহের স্কুলগুলি এক মাসে পরিদর্শন করিয়া ফেলিয়া বোয়ালিয়াতে একবার হাজির হইবেন। (২য় ভাগ, ২৭ পৃষ্ঠা)

"এ দিকে ক্যাম্বেল সাহেব হুকুম দিলেন যে, ভূদেব বাবুর সদর আফিস বহরমপুরে উঠিয়া যাইবে এবং তাঁহার এলাকা ঠিক রাজসাহী ডিভিসনের সহিত এক হইবে। ইহাতে বীরভূম এবং যশোহর তাঁহার এলাকার বাহির হইয়া যায় এবং রংপুর, বগুড়া ও দিনাজপুর উহার ভিতরে আইসে। যে সময়ে আফিসের কাগজপত্র চুঁচুড়া হইতে বহরমপুরে যাইতেছে—তাহা সাজান হইয়া উঠে নাই, সেই সময়েই এইরূপ অকারণ পুনঃ পুনঃ কৈফিয়তের তলবে অসুবিধা এবং বিরক্তিবোধ ঘনীভূত হইতে থাকে। শরীর সাত আট মাস পূর্ব্ব হইতেই বিশেষ খারাপ বোধ হইতেছিল; তাহার পর এত দৈব-দুর্ঘটনা! শেষ কৈফিয়ৎ (১০।১১।১৮৭২) পাঠাইয়া দিবার পূর্ব্বেই রাত্রে হঠাৎ…ভূদেব বাবু তাঁহার মৃত প্রিয়তম পৌত্রটিকে সাক্ষাৎ দেখিতে পাইয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়েন। ডাক্তারের বিশেষ সার্টিফিকেট সহ দরখাস্ত পাঠান হইলে সেক্রেটারী বার্ণার্ড সাহেব ডিরেকটর সাহেবকে (১১।১১।৭২) লেখেন যে, ছোটলাট বলিতেছেন, পরিদর্শন সম্বন্ধে পূর্ণ কৈফিয়ৎ না পাইলে তিনি ছুটী দিতে চাহেন না। ওরূপ অসুস্থ অবস্থায় ছুটী না দিলে এরূপ কাজ ছাড়িতেই বলা যায়। বার্ণার্ড সাহেব মুখেও বলিয়াছিলেন যে, এখন ভূদেব বাবুর পক্ষে কর্ম্মত্যাগ করাই ভাল। যাহা হউক, শেষ কৈফিয়ৎ যথাকালে পৌছিলে ছুটী মঞ্জুর হইল।…ছুটী (২৭।১০।১৮৭২ হইতে ২৬।৫।১৮৭৩) পাইয়া ভূদেব বাবু আসাম প্রদেশে ভ্রমণ করিতে গিয়াছিলেন।…আসাম হইতে ফিরিয়া আসিয়া ভূদেব বাবু আবিসিনিয়া জাহাজে (১।৪।১৮৭৩) ব্রহ্মদেশে যাত্রা করিয়াছিলেন। (২য় ভাগ, ২৯-৩০ পৃষ্ঠা)

জলধর বাবু সাধক-প্রবর "কাঙ্গাল হরিনাথের আদেশ পেয়ে…দাঁড়িয়ে হাত যোড় করে আবৃত্তি" করিবার সময় নিশ্চয়ই চক্ষু দুটিও মুদিত করিয়াছিলেন—সেই জন্য দিনমানেই স্বপ্ন দেখিবার সুযোগও লাভ করিয়াছিলেন। মহাত্মা ভূদেবও, বোধ হয়, সেই সময় অচৈতন্য ছিলেন, সুতরাং জলধর বাবুকে দর্শন দান করিতে তাঁহারও অসুবিধা হয় নাই। জলধর বাবু স্বপ্নাবেশে যে কবিতাটি আবৃত্তি করিয়াছেন তাহাও সময়োপযোগী—তাহাতে সে স্বপ্নের কথা বেশ পরিস্ফুট হইয়াই উঠিয়াছে—

"কেন স্মৃতি দেখাইছ সে স্বপন আর।"

সেইজন্য জলধর বাবু অতি সত্য কথাই লিখিতে পারিয়াছেন—

"মনে যে ছবি এঁকে ফেলেছিলাম, তার থেকেও জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তি! এমন সৌম্যমূর্ত্তি দর্শন আমাদের পল্লীগ্রামে অতি কমই ঘটে। দীর্ঘকায়, গৌরবর্ণ, যীশুখৃষ্টের ছবির মত চেহারা কাঙ্গাল হরিনাথের পার্শ্বে অপূর্ব্ব-দর্শন মূর্ত্তি! এখনও সে দৃশ্য মনে আছে।" ('ভারতবর্ষ' ১৩৪২ পৌষ, ৪৪ পৃষ্ঠা)

মনে থাকিবারই ত' কথা—স্বপ্নের কথা বহু দিন পরেও বেশ মনে থাকে—বরং প্রয়োজনকালে আরও সুস্পষ্ট হইয়া উঠে। জাগ্রত স্বপ্ন না হইলে—ভূদেব বাবু যেখানে যান নাই—যাইবার সম্ভাবনাও ছিল না—যাহা তাঁহার

পরিদর্শনসীমার বহির্ভূত—কুমারখালির সেই বঙ্গ-বিদ্যালয়ে জলধর বাবুর কল্পনাবলে সহসা হাজির হইয়া, তিনি অশ্রু-উপহার দিয়া আসিবেন কেন?

১৮৭১—৭২ খৃষ্টাব্দে ভূদেব বাবু যে নর্থ সেন্ট্রাল ডিভিসনের ইন্‌স্পেক্টর ছিলেন, ঐ সময়ের 'এডুকেশন গেজেটের ফাইলে' তাহার রাশি রাশি প্রমাণ সুসঞ্চিত আছে। স্থানাভাবে তাহার চারটি মাত্র অব্যর্থ নিদর্শন উদ্ধৃত করিয়া সপ্রমাণ করিতেছি।

বিজ্ঞাপন

উত্তর মধ্যবিভাগ অর্থাৎ মালদহ, রাজসাহী, যশোহর, পাবনা, মুরশিদাবাদ ও বীরভূম এই কয়েকটি জেলার স্কুলের সম্পাদকগণ অনেকেই তাঁহাদের স্কুলের শিক্ষক মনোনীত করিয়া দিবার ভার আমাকে অর্পণ করেন।…

শ্রীভূদেব মুখোপাধ্যায়
"উ, ম, স্কুল ইন্‌স্পেকটর"

('এডুকেশন গেজেটের' ১৮৭১ খৃষ্টাব্দের ২১শে এপ্রেল হইতে ২৯শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত উপরোক্ত বিজ্ঞাপনটি প্রতি সপ্তাহে প্রকাশিত হইয়াছে)

সরকারী ঘোষণায় কোন্ ইন্‌স্পেক্টর তখন কোন্ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত ছিলেন দেখুন :—

শিক্ষা-বিভাগের নূতন ব্যবস্থা

এখন ছয় জন স্কুল-ইন্‌স্পেকটর আছেন, ভবিষ্যতেও থাকিবেন, তবে অধিকারের কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন হইবে। যথা—

"উড্রো সাহেব—রাজধানী বিভাগ (মধ্যবিভাগ) রাজধানী ও ছোটনাগপুরের কমিশনারের এলাকা অর্থাৎ ২৪ পরগণা, নদীয়া, যশোহর, হাজারিবাগ, লোহারডগা, সিংহভূম ও মানভূম জেলা।" আপীস—কলিকাতায়।"

"বাবু ভূদেব মুখোপাধ্যায়—রাজসাহী বিভাগ—রাজসাহী কমিশনারের এলাকা, অর্থাৎ মুরশিদাবাদ, দিনাজপুর, মালদহ, রাজসাহী, রঙ্গপুর, বগুড়া ও পাবনা জেলা। আপীস—বহরমপুরে।"

('এডুকেশন গেজেট' ৪ঠা অক্টোবর ১৮৭২ খৃষ্টাব্দ ৪০৪ ৪০৫ পৃষ্ঠা)

কুমারখালি যে নদীয়া জেলায়, তাহা জলধর বাবুও স্বীকার করিয়াছেন। এইচ, উড্রো সাহেব যে ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে মধ্যবিভাগের ইন্‌স্পেক্টর ছিলেন, তাহা 'এডুকেশন গেজেটের' ১লা সেপ্টেম্বর ১৮৭১ খৃষ্টাব্দের ২৫২ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত তাঁহার ১৫ই আগষ্ট ১৮৭১ তারিখে স্বাক্ষরযুক্ত বিজ্ঞাপনটি দেখিলেই বেশ বুঝা যায়। মধ্যবিভাগের সীমা-নির্দ্দেশ এইরূপ :—

"মধ্যবিভাগ—কলিকাতা—২৪ পরগণা, নদীয়া, যশোহর জেলা। স্কুলের সংখ্যা অনুমান ১১৪০।"

('এডুকেশন গেজেট' ৮ই মার্চ্চ, ১৮৭২—৬২৩ পৃষ্ঠা)

তাহার পর **ভূদেব-প্রণাম পর্ব্বাধ্যায়ে** রায় বাহাদুর লিখিতেছেন—

"আমি যখন জেনারল এসেম্ব্লি কলেজের দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে পড়ি। সেই সময় হুগলীর একটি ছেলে আমাদের সহপাঠী ছিলেন। তাঁর নাম ভুলে গিয়েছি;…তিনি প্রতিদিন বাড়ী থেকে এসে কলেজ করতেন। এক দিন…বললেন, হুগলীতে তাঁদের বাড়ীর অনতিদূরেই ভূদেব বাবুর বাড়ী; তাঁর সঙ্গে ভূদেব বাবুর বাড়ীর সকলেরই বিশেষ ঘনিষ্ঠতা আছে।…পরবর্ত্তী শনিবারে কলেজের ছুটীর পর তাঁর সঙ্গে হুগলী গেলাম। নৈহাটীতে গাড়ী থেকে নেমে ঘাটে গিয়ে গঙ্গা পার হয়ে হুগলী উপস্থিত হলাম। বন্ধু বললেন, 'চল, আগে ভূদেব বাবুর বাড়ীতেই যাই; তার পর আমাদের বাড়ীতে কিছু খেয়ে তোমাকে নৈহাটীতে রেখে আসব।' আমি হুগলী যাবার সময় আমার সেই 'অমূল্য রত্ন', ভূদেব বাবুর দেওয়া 'Spectator' খানি একটা কাগজে মুড়ে সঙ্গে নিয়েছিলাম, সেখানিই যে আমার পরিচয়-পত্র।…

"আমি তখন মোড়ক খুলে সেই বইখানির প্রথম পৃষ্ঠা মুক্ত করে তাঁর হাতে দিলাম। তিনি সেই লেখাটার দিকে চেয়েই তাড়াতাড়ি চেয়ার থেকে উঠে এসে আমার হাত চেপে ধরে বললেন, 'তুমি সেই জলধর এত বড় হয়েছ। আমি তোমায় চিনতে পারিনি, মনে কিছু কোরো না বাবা! কলেজে পড়ছ, বেশ বেশ।'

"আমার বন্ধু বললেন, 'জলধর স্কলারশিপ পেয়েছে।'…তখন তিনি চাকরদের ডেকে জলখাবার আনতে বললেন।…তার পর প্রচুর জলযোগ করে, সেই মহাত্মার পদধূলি ও আশীর্ব্বাদ মাথায় নিয়ে সেই দেবনিকেতন থেকে বেরিয়ে এলাম। বেলা শেষ হয়েছিল, বন্ধুগৃহে আর যাওয়া হোলো না। তিনি গঙ্গা পার হয়ে নৈহাটীতে আমাকে রেলে তুলে দিয়ে গেলেন।

"তার পর আর ভূদেব বাবুর সঙ্গে আমার দেখা হয়নি, দেখা করতে যাইনি—পরীক্ষায় ফেল করে কোন্ মুখ নিয়ে তাঁর সম্মুখে গিয়ে দাঁড়াব।" ('ভারতবর্ষ' ১৩৪২, পৌষ, ৪৫-৪৬ পৃষ্ঠা)

ভূদেব বাবুর বাড়ী চুঁচুড়ায় গঙ্গার উপর বলিয়াই জানি—তাহা হুগলীজেলায় বা হুগলীর সন্নিকটবর্ত্তী হইলেও—ভাটপাড়ার পরপারে চুঁচুড়ায়। জলধর বাবু নৈহাটী হইতে হুগলীতে গিয়াই তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন—চুঁচুড়ার 'দেবনিকেতনের' সন্ধান তিনি তখনও যেমন পান নাই, এখনও কি তেমনই জানেন না?

জলধর বাবু ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে এন্‌ট্রান্স পাশ করিয়াছিলেন তিনি লিখিয়াছেন—

"এ সালটা মনে আছে, কারণ এইবার আমি প্রবেশিকা পরীক্ষা দিই। ('ভারতবর্ষ', ১৩৪২ কার্ত্তিক, ৭১১ পৃষ্ঠা)

জলধর বাবু ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে এল-এ প্রথম বার্ষিক শ্রেণীর—১৮৮০ খৃষ্টাব্দে এল-এ দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র ছিলেন। তিনি নিজেও তাহাই লিখিতেছেন—

"১৮৮০ খৃষ্টাব্দে এল-এ ফেল করে তার পর বৎসরই আমাকে চাকুরীতে প্রবিষ্ট হ'তে হয়েছিল।" ('ভারতবর্ষ', ১৩৪২ মাঘ, ১৭৭ পৃষ্ঠা)

তাহা হইলে ১৮৮০ খৃষ্টাব্দেই যে জলধর বাবু পূজনীয় ভূদেব বাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু 'ভূদেব-চরিত' অনুসরণে দেখা যায়—

"ছুটী শেষ হইলে ভূদেব বাবু (২৭।৫।১৮৭৩) নর্থ সেণ্ট্রাল ডিভিসনের কার্য্যভার গ্রহণ করেন। (২য় ভাগ, ৩৮ পৃষ্ঠা)

"১৮৭৫ অব্দের ২৮শে এপ্রেল ভূদেব বাবু রাজসাহী সার্কেলের ইনস্পেক্টর নিযুক্ত হন...১৮৭৬ অব্দের ২রা মে তিনি পশ্চিম সার্কেল হুগলীতে বদলী হন।" (২য় ভাগ, ৫৪ পৃষ্ঠা)

"১৮৭৬ খৃঃ অব্দের ১৫ই নভেম্বর ভূদেব বাবু বিহার সার্কেলের ভার প্রাপ্ত হন এবং বাঁকীপুরে নকটি বিবির কুঠি নামক বাড়ী ভাড়া লইয়া তথায় বাস করেন।...পাটনা, ত্রিহুত, ভাগলপুর, বর্দ্ধমান ও উড়িষ্যা স্কুলসমূহ তাঁহার পরিদর্শনাধীন হয়।" (২য় ভাগ, ১২২ পৃষ্ঠা)

জলধর বাবু শুনিয়া পরম প্রীতিলাভ করিবেন যে, ১৮৭৬ অব্দের ২৪ শে ডিসেম্বর হইতে ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দের ১০ই অক্টোবর পর্য্যন্ত ভূদেব বাবুর স্বহস্তলিখিত ডায়েরীর অনুবাদ—ভূদেব-চরিত ২য় ভাগের ১৩৬ হইতে ৩৮৬ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হইয়াছে। ভূদেব বাবুর সহিত যাঁহারা সাক্ষাৎ করিয়াছেন—তিনি যে সকল বিষয়ের আলাপ-আলোচনা করিয়াছেন—চিন্তা করিয়াছেন—যে সকল স্থান পরিভ্রমণ করিয়াছেন—বিশেষ বিশেষ পত্র লিখিয়াছেন, তাহা এই ডায়েরীতে তিনি ধারাবাহিকভাবে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ভূদেব বাবু এই সময়ের ২৫০ পৃষ্ঠা ডায়েরীতে জলধর বাবুর নাম—প্রণাম ও জলযোগ-পর্ব্বসংক্রান্ত কোনও কথার উল্লেখ করেন নাই।

ইহাতে জলধর বাবু নিশ্চয়ই বলিবেন—তিনি তখনও ত' রায় বাহাদুর হন নাই—তাঁহার খ্যাতিও বিশ্বে প্রসারিত হয় নাই—তাঁহার মত অখ্যাতনামা ব্যক্তি চুঁচুড়া বা হুগলীতে আশীর্ব্বাদের নিদর্শন দেখাইয়া প্রণাম করিতে গিয়াছেন, তাহা ভূদেব বাবু ডায়েরীতে লিখিয়া রাখিবেন কেন? কিন্তু কার্য্য-কারণের সংযোগ করিলে উত্তরে অবশ্যই বলা যায়—ডায়েরী লেখার অভ্যাস থাকিলে ইহা উল্লেখযোগ্য ঘটনা বৈ কি? যে ছেলেটির ১১।১২ বৎসর বয়সের আবৃত্তি শুনিয়া ভাবাভিভূত ভূদেব বাবু কুমারখালিতে ইংরেজি স্কুলের উচ্চশ্রেণীর ছাত্রগণেরও দুষ্পাচ্য, সুকঠিন 'স্পেক্টেটর' নামক পুস্তকখানি নিতান্ত নিরুপায় হইয়াই তাহাকে প্রাইজ দিয়াছিলেন—সে বড় হইয়া স্কলারশিপ পাইয়াছে, কলেজে পড়িতেছে—তাঁহার সাশ্রুনেত্রে স্নেহালিঙ্গন দানের কথা স্মরণ করিয়া কত বৎসর পরে প্রণাম করিতে চুঁচুড়ায় আসিয়াছে, ইহা ডায়েরীতে উল্লেখযোগ্য ঘটনা নহে কি? জলধর বাবু পূজনীয় ভূদেব বাবুর এই সগুরু ভ্রমসংশোধন করিয়া যে সাহিত্য-জগতের অসংখ্য ধন্যবাদ অর্জ্জন করিয়াছেন, তাহাতে বিন্দুমাত্র সংশয় নাই।

শিক্ষাপ্রসারে আত্মনিবেদিত ভূদেব বাবুর স্কুল পরিদর্শননীতির সহিত রায় বাহাদুরের কোনরূপ পরিচয় থাকিলে, তিনি জানিতে পারিতেন, ভূদেব বাবু ছাত্রবৃত্তি ক্লাসের ছাত্রের কবিতা আবৃত্তি শুনিয়া, কোন দিন অশ্রুভারাক্রান্ত নেত্রে অপ্রকৃতিস্থ হইয়া 'অভিজ্ঞানস্বরূপ' ইংরেজি পুস্তক দিয়া আসিতেন না। বিদ্যালয় পরিদর্শনকালে শিক্ষকদের তিনি কিরূপ সারগর্ভ উপদেশ—শিক্ষা-প্রণালীর নির্দ্দেশ দিতেন,—ছাত্রগণের প্রতিভা কেবল পাঠ্যপুস্তকে সীমাবদ্ধ কি না, বিশেষভাবে পরীক্ষা লইতেন—তাহার পরিচয় দিতে হইলে সুপ্রকাণ্ড 'ভূদেব-চরিতের' বহু অংশ উদ্ধৃত করিতে হয়। কিন্তু স্থানাভাবে তাহা সম্ভবপর নহে। শিক্ষাবিস্তারসম্বন্ধে সরকারী রিপোর্টে—'শিক্ষাবিধায়ক প্রস্তাব' প্রভৃতি প্রবন্ধ-পুস্তকে ভূদেব বাবু যে সকল সুচিন্তিত অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন, জাতির মঙ্গলের জন্য তাহা তাঁহার মহান্ দান।

জলধর বাবু-বর্ণিত স্বপ্ন-কাহিনীর সুদীর্ঘ দশ বৎসর পূর্ব্বে হুগলী নর্ম্যাল স্কুলের প্রধান শিক্ষকরূপে কার্য্যকালে ভূদেব বাবু ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে—ছয় মাসের জন্য অস্থায়িভাবে মধ্য-বিভাগের সহকারী ইনস্পেক্টর হইয়াছিলেন। সেই সময়ে তিনি কৃষ্ণনগর জেলার স্কুল পরিদর্শনে গিয়াছিলেন।

"মধ্য বিভাগের অস্থায়ী সহকারী ইনস্পেক্টর পদে এইরূপে নিযুক্ত হইয়া (১৫।৭।১৮৬২) ভূদেব বাবু যথেষ্ট উৎসাহের সহিত কর্ম্ম করিতে লাগিলেন।

(১ম ভাগ ২৩৫ পৃষ্ঠা)

"মধ্য-বিভাগের প্রতিনিধি স্কুল ইনস্পেক্টর মেডলিকট সাহেব ডিরেক্টর বাহাদুরের নিকট যে রিপোর্ট (৯।৮।১৮৬২) প্রেরণ করেন, তাহার উপসংহারে লিখিয়াছিলেন, 'মধ্যবিভাগের প্রতিনিধি সহকারী ইনস্পেক্টরের পদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া বাবু ভূদেব মুখোপাধ্যায় কৃষ্ণনগর জেলার স্কুল পাঠশালাদি পরিদর্শন করিয়া রিপোর্ট পাঠাইয়াছেন'।" (১ম ভাগ, ২৪১ পৃষ্ঠা)

কিন্তু এ সময়েও যে ভূদেব বাবু কুমারখালির বঙ্গ-বিদ্যালয় পরিদর্শন করিতে যান নাই, তাহা পরে দেখাইতেছি। আর জলধর বাবুর বয়স তখন ২ বৎসর ৪ মাস মাত্র। এই বয়সে অলৌকিক প্রতিভাবলে তিনি যদি বঙ্গ-বিদ্যালয়ের ছাত্রবৃত্তি শ্রেণীতে কবিতা আবৃত্তি করিয়া প্রাইজ পাইয়া থাকেন, তাহাতে কাহারও আপত্তি হইবার কথা নহে। তিনি কিন্তু বিশেষ সাবধান হইয়াছেন। 'ভারতবর্ষের' ১৩৪২ পৌষ সংখ্যায় ভূদেব বাবুর স্মৃতি-তর্পণ সারিয়াছেন—আর ১৩৪২ চৈত্র সংখ্যায় অনুগ্রহ করিয়া তাঁহার ভূমিষ্ঠ হইবার তারিখটি ফাঁস করিয়াছেন। তাঁহার জন্মগ্রহণের তারিখটি যে প্রয়োজনমত পিছাইয়া লইব, তিনি তাহারও উপায় রাখেন নাই। জলধর বাবু লিখিতেছেন—

"আমি জন্মগ্রহণ করি ১৮৬০ অব্দের ১লা চৈত্র (অর্থাৎ ১৩ই মার্চ্চ) শিবচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন ঐ ১৮৬০ অব্দের ২রা জ্যৈষ্ঠ, সোমবার। আর তৃতীয় জন বাঙ্গালা দেশের সুপ্রসিদ্ধ প্রথিতযশা ঐতিহাসিক ও সাহিত্যিক অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়—জন্মগ্রহণ করেন ঐ ১৮৬০ অব্দেই—আমার অন্নপ্রাশনের দিন।" ('ভারতবর্ষ' ১৩৪২, চৈত্র, ৫৩৯ পৃষ্ঠা)

এখন প্রশ্ন হইতে পারে—স্বামী বিবেকানন্দের জীবন-দানে না হয় জলধর বাবুর অতুল কীর্ত্তি জগতে প্রসারিত হইতে পারে—কিন্তু ভূদেব বাবুকে প্রণাম—নিদর্শন দেখাইয়া আশীর্ব্বাদ গ্রহণের আগ্রহে তাঁহার লাভ কি?—তাঁহার যশোভাতি তাহাতে কতটা বিস্তারিত হইবে?

সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র—বর্দ্ধমানের মহাতাপচাঁদ—কৃষ্ণদাস পাল প্রভৃতি ভূদেব বাবুর বিশেষ বন্ধু,—মাইকেল মধুসূদন দত্ত তাঁহার সহপাঠী,—অমরকবি হেমচন্দ্র—রঙ্গলাল—দীনবন্ধু—নবীনচন্দ্র—রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি তাঁহার পত্রিকার লেখক,—প্যারীচরণ সরকার—ব্রহ্মমোহন মল্লিক—রামগতি ন্যায়রত্ন—লোহারাম শিরোমণি প্রভৃতি তাঁহার সহকারী,—ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর—কেশবচন্দ্র সেন—মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন তাঁহার সুহৃদ—এ অবস্থায় জলধর বাবুর মত প্রথম শ্রেণীর সুপ্রবীণ সাহিত্যিকের সহিত যদি মনীবী ভূদেব বাবুর পরিচয় না থাকে, তবে রায় বাহাদুরের জীবন-স্মৃতির মহাভারত তাহাতে অশুদ্ধ হয় না কি? বিশেষতঃ হিমালয় লেখাইবার বহু পূর্ব্বেই—১৫ বৎসর বয়সেই ত' মাষ্টার মহাশয় একখানি উপন্যাস লিখিয়াছিলেন।

"আমার বয়স যখন ১৫ বৎসর, তখন আমি চুপে চুপে ঘরে বসে একখানি ছোট-খাটো উপন্যাসই লিখে ফেলেছিলাম। ('ভারতবর্ষ', ১৩৪৩ জ্যৈষ্ঠ, ৯০৫ পৃষ্ঠা)

সুতরাং ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে ১৮ বৎসর বয়সে এনট্রান্স পাশ করিবার তিন বৎসর পূর্ব্বেই যিনি ১৫ বৎসর বয়সে ঔপন্যাসিকরূপে সাহিত্যরাজ্যে অভিযান করিয়াছিলেন—তিনি ভূদেব বাবুর সহিত সুপরিচিত ছিলেন না, ইহাও কি একটা বিশ্বাসযোগ্য কথা?

আর সওয়া দুই বৎসর বয়সে ছাত্রবৃত্তি শ্রেণীতে সাধক-প্রবর কাঙ্গাল হরিনাথের আদেশে জলধর বাবু যদি কবিতা আবৃত্তি করিয়া ভূদেব বাবুর অশ্রু-উপহার লাভ করিয়া থাকেন, তাহাতেই বা বিস্ময়ের কারণ কি থাকিতে পারে? শুকদেব পারেন—বুদ্ধদেব পারেন—শঙ্করাচার্য্য পারেন—আর আমাদের জলধর বাবু পারেন না? ইহাই বা কোন্ দুঃসাহসে অবিশ্বাস করিব? এই অলীক কাহিনীটি সত্যের ভিত্তিতে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার প্রয়াসে তিনি ত চেষ্টার ত্রুটি করেন নাই;—'ভারতবর্ষের' ১৩৪২ পৌষ সংখ্যায় ভূদেব আশিস্ পত্র প্রকাশের ১৯ মাস পূর্ব্বেই ১৩৪১ সালের ১১ই জ্যৈষ্ঠের 'এডুকেশন গেজেটের' 'ভূদেব স্মৃতি-সংখ্যায়' ইহা প্রকাশ করিয়া রাখিয়াছেন—অবিশ্বাস করিতে পারিবেন কি?

কাঙ্গাল হরিনাথ-আদেশ-পর্ব্বাধ্যায়

এই প্রসঙ্গে স্মৃতি-তর্পণে রায় বাহাদুর লিখিতেছেন:—

…"কাঙ্গাল হরিনাথকে অগ্রবর্ত্তী করে ভূদেব বাবু আমাদের প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করলেন।"

…"কাঙ্গাল হরিনাথের আদেশ পেয়ে আমি দাঁড়িয়ে হাত যোড় করে আবৃত্তি করলাম।"…('ভারতবর্ষ' ১৩৪২, পৌষ, ৪৪-৪৫ পৃষ্ঠা)

তাহা হইলে কাঙ্গাল হরিনাথ নিশ্চয়ই এ সময়ে কুমার-খালি বঙ্গ-বিদ্যালয়ের প্রধান পণ্ডিত ছিলেন। কারণ, ইনস্পেক্টর বা সহকারী ইনস্পেক্টরের স্কুল পরিদর্শনকালে—তিনি স্বয়ং অথবা সেই বিদ্যালয়ের হেড মাষ্টার বা হেড

পণ্ডিতের পক্ষেই এরূপ আদেশ দেওয়া সম্ভব। বিশেষতঃ ভূদেব বাবুর পরিদর্শন-নীতির অনুশীলনে দেখা যায়—

"পরিদর্শনে গেলে আসল কাজ বাকী রাখিয়া তিনি (ভূদেব বাবু) সমাগত কাহারও সহিত কথাবার্ত্তা বা আলাপ-পরিচয় করিতেন না। ('ভূদেব চরিত', ১ম ভাগ, ৩৭৮ পৃষ্ঠা)

• জলধর-গ্রন্থাবলী দ্বিতীয় খণ্ডের অন্তর্ভুক্ত—রায় শ্রীজলধর সেন বাহাদুর প্রণীত—'কাঙ্গাল হরিনাথের' 'জীবন-কথায়' প্রকাশ—

"তিনি (কাঙ্গাল হরিনাথ) নিজে জ্ঞানোপার্জ্জন করিতে পারেন নাই, তজ্জন্য তাঁহার মনে ক্ষোভ ও আক্ষেপ ছিল। তাই দেশের বালকদিগের শিক্ষার জন্য ১৮৫৪ খ্রীঃ ১৩ই জানুয়ারী একটি বাঙ্গালা পাঠশালা স্থাপন করিয়া বালকদিগের বিদ্যাশিক্ষার পথ সুগম করিয়া দেন।...স্থানীয় কতিপয় সদাশয় ব্যক্তি স্কুল পরিচালনের ভার গ্রহণ করিয়া...মাসিক চাঁদা সংগ্রহ করিয়া কমিটী কাঙ্গাল হরিনাথকে জল-পানি ৬৲ ছয় টাকা স্থির করিয়া দেন।...ছাত্রসংখ্যা ক্রমে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে বিদ্যালয়ের আয় বৃদ্ধি-প্রাপ্ত হইতে লাগিল। স্কুল কমিটী তাঁহার 'ভাতা' বৃদ্ধি করিয়া ১২৲ টাকা করিয়া দিলেন।

"এই সময়ে ইংরাজী ও বাঙ্গালা বিদ্যালয়ের সাহায্য করিবার ব্যবস্থা করিয়া * গভর্ণমেণ্ট পাঠশালার ইনস্পেক্টর ও সহকারী ইনস্পেক্টর নিযুক্ত করেন। সরকারী তত্ত্বাবধায়ক বা ইনস্পেক্টর **নীলমণি সেন** মহাশয় কুমারখালি আসিয়া বাংলা পাঠ-শালায় ছাত্রদিগের পরীক্ষা গ্রহণ পূর্ব্বক সাহায্যপ্রাপ্তির অনুকূলে অভিমত প্রকাশ করিলেন ...কমিটী কাঙ্গাল হরিনাথের বেতন ২০৲ টাকা স্থির করিলেন।... হরিনাথ নিজে ১৫ টাকা বেতন গ্রহণ করিয়া অবশিষ্ট টাকা নিম্নতম শিক্ষকগণের মধ্যে বিভাগ করিয়া দিয়া সুখী হইলেন।" (জলধর-গ্রন্থাবলী ২য় খণ্ড, ৬-৭ পৃষ্ঠা)

"...কাঙ্গাল হরিনাথ ১২৭০ সালে গিরিশ বিদ্যারত্ন যন্ত্রে মাসিক চারি ফর্ম্মা করিয়া গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা প্রকাশ আরম্ভ করিলেন। ...গ্রামবার্ত্তার প্রবন্ধাদি ও প্রেরিত পত্রের সংবাদ প্রভৃতি বিচার ও সংশোধন করিয়া চারি ফর্ম্মার উপযুক্ত আদর্শলিপি অর্থাৎ কাপি নিজ হাতে লিখিয়া যথাসময়ে মুদ্রাযন্ত্রালয়ে প্রেরণ করা বহু সময়ের আবশ্যক।...কাজেই তিনি বাধ্য হইয়া বিদ্যালয়ের শিক্ষকতা পরিত্যাগ করিলেন।" ('জলধর-গ্রন্থাবলী', ২য় খণ্ড, ১০ পৃষ্ঠা)।

১৩০৮ সালে 'বসুমতী কার্য্যালয়' হইতে শ্রীজলধর সেন যে 'হরিনাথ-গ্রন্থাবলী' প্রকাশ করিয়াছিলেন—যাহার ভূমি-কায় তিনি নিজেই স্বীকার করিয়া ফেলিয়াছেন—

"বসুমতীর সুযোগ্য স্বত্বাধিকারী উদারহৃদয় শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রাণগত যত্ন ও সাহায্যে কাঙ্গাল হরিনাথের বিস্তৃত গ্রন্থাবলীর প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইল।"

সেই 'হরিনাথ-গ্রন্থাবলীতে' প্রকাশিত শ্রীসতীশচন্দ্র মজুমদারের স্বাক্ষরযুক্ত জীবনীতেও দেখা যায়:—

"কাঙ্গাল হরিনাথ ১২৭০ সালের ১লা বৈশাখ হইতে 'গ্রামবার্ত্তা-প্রকাশিকা' নামে একখানি সংবাদপত্র প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন।" (হরিনাথ গ্রন্থাবলী ১ম ভাগ ৫ পৃষ্ঠা)

তাহা হইলে ১২৭০ সালের ১লা বৈশাখ—অর্থাৎ ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দের ১৩ই এপ্রেলের পূর্ব্বেই কাঙ্গাল হরিনাথ কুমারখালির বঙ্গ-বিদ্যালয়ের শিক্ষকতা পরিত্যাগ করিয়া-ছিলেন। কাঙ্গাল হরিনাথের বঙ্গবিদ্যালয় ত্যাগকালেও যখন জলধর বাবুর বয়স ৩ বৎসরের অধিক নহে—তখন নীলমণি মিত্র মহাশয়ের পরিদর্শনকালে তাঁহার বয়স দুই বৎসর বলিয়া অনুমান করিলে বোধ হয় ভুল হয় না। নদীয়া জেলার কুমারখালির বঙ্গ-বিদ্যালয়ে এবং ফরিদপুর জেলার গোয়ালন্দের মাইনর স্কুলে জলধর বাবু যখন একই সময়ে—বাল্যকালে পড়িয়াছেন, তখন নীলমণি মিত্র মহাশয় যে সহসা ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের সৌম্যমূর্ত্তিতে রূপান্তরিত হইবেন—তাহাতেই বা বিস্ময়ের অবকাশ কোথায়?

পরবর্ত্তী কালে জলধর বাবু কাঙ্গাল হরিনাথের ফিকির-চাঁদ ফকিরের দলে উত্তর বঙ্গের বিভিন্ন স্থানে গান করিয়া প্রচুর বাহবালাভের সঙ্গে খ্যাতির অর্জ্জন করিয়াছিলেন। 'কাঙ্গাল হরিনাথে' তিনি যখন তাঁহার সেই মহিমা প্রচার করিতে বিস্মৃত হন নাই—তখন এই সময়ে বা কাঙ্গাল হরিনাথ কুমারখালি স্কুলের সংস্রব ত্যাগ করিবার পরেও যদি তিনি যথার্থ ই ভূদেব বাবুর অশ্রু-উপহার লাভ করিতেন, এই জীবন-গ্রন্থে জলধর বাবু নিজের সে কীর্ত্তিগাথা গাহিতে বিস্মরণ হইতেন কি?

প্রসঙ্গক্রমে আর একটি কথার উল্লেখও, বোধ হয়, অসঙ্গত হইবে না। কাঙ্গাল হরিনাথ-বিরচিত ফিকিরচাঁদ ফকিরের গান ও অন্যান্য গীতাবলী ১৩০৮ সালে বসুমতী প্রেসে মুদ্রিত 'হরিনাথ-গ্রন্থাবলীতে' সন্নিবেশিত হইয়াছিল এবং তৎপূর্ব্বে 'কুমারখালি মথুরানাথ যন্ত্র' হইতে এ গীতাবলী খণ্ডাকারে প্রকাশিত হইয়া, জলধর বাবুর হিমালয়ের সাথী হইয়াছিল। ইহার সহিত বাঁধান সাদা কাগজে মাষ্টার মহাশয় হিমালয়ের ডায়েরীর কঙ্কালমাত্র লিখিয়া রাখিয়াছিলেন। এ সকল কথা 'মাসিক বসুমতীর' ১৩৪০, ভাদ্র সংখ্যার ৭৪৭ পৃষ্ঠায় আমার 'সে-কালের স্মৃতি' কথায় বিস্তৃতভাবে

---

* "গবর্ণমেণ্ট প্রাথমিক শিক্ষার জন্য (১৮৬২-৬৩ অব্দে বজেটে) ৩০ হাজার টাকা মঞ্জুর করিয়াছিলেন।" ('ভূদেব-চরিত' ১ম ভাগ, ২৪০ পৃষ্ঠা)

আলোচনা করিয়াছি। পরম সৌভাগ্যক্রমে সেই সঙ্গীতগুলি এক্ষণে সুনির্ব্বাচিত হইয়া, হরিনাথের 'ব্রহ্মাণ্ড-বেদের' সহিত সংযোগের পর সমালোচনার কৌশলে 'জলধর-গ্রন্থাবলীর' ২য় খণ্ডের প্রায় অর্দ্ধাংশ অধিকার করিয়াছে। জলধর বাবু অবশ্য 'কাঙ্গাল হরিনাথের' প্রথম খণ্ড প্রাচীন সঙ্গীতের পরম অনুরাগী "বর্দ্ধমানাধিপতি মহারাজাধিরাজ শ্রীবিজয়চাঁদ মহতাব বাহাদুরের শ্রীকরকমলে" নিবেদন করিয়াছেন। এবং দ্বিতীয় খণ্ড—কাঙ্গাল হরিনাথের অন্যতম সাহিত্য-শিষ্য বলিয়া আখ্যাত "সোদরোপম শ্রীমান্ অক্ষয়কুমার মৈত্রের করকমলে অর্পণ" করিতেও বিস্মৃত হন নাই। শ্রীভগবানের কৃপায় যদি আরও কিছুদিন বাঁচিয়া থাকিতে পারি—তবে আশা করি, কাঙ্গাল হরিনাথের 'বিজয়বসন্ত' উপন্যাস-খানিও 'জলধর-গ্রন্থাবলী'র অন্তর্ভুক্ত দেখিয়া যাইতে পারিব।

উচ্ছ্বাসের আবেগে বিবশ হইয়া রায় বাহাদুর নিজেই স্বীকার করিয়া ফেলিয়াছেন,—

"আমি হলফ করে বলতে পারি, এই সুদীর্ঘ জীবনে আমি কোন দিন ছুই লাইন কবিতাও লিখতে পারিনি।" (ভারতবর্ষ ১৩৪২, পৌষ, ৪৪ পৃষ্ঠা)

সেই জন্যই জলধর বাবু না হয় তাঁহার সাহিত্য-গুরুর গীতাবলী 'জলধর-গ্রন্থাবলী'তে সন্নিবেশিত করিয়া কবিতার অভাব পূরণ করিয়াছেন। কিন্তু ১৩০৮ সালে বসুমতী প্রেসে মুদ্রিত 'হরিনাথ গ্রন্থাবলীতে' শ্রীসতীশচন্দ্র মজুমদারের স্বাক্ষরযুক্ত কাঙ্গাল হরিনাথের যে সংক্ষিপ্ত জীবনীটি প্রকাশিত হইয়াছিল—সতীশ বাবুর পরলোকগমনের পর তাহাও ত' নিঃশেষে ১৩৩২ সালে প্রকাশিত 'জলধর-গ্রন্থাবলীর' দ্বিতীয় খণ্ডের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। গুরু-দক্ষিণা-ছলে জলধর বাবু সতীশচন্দ্র মজুমদার স্বাক্ষরযুক্ত জীবনীর উপকরণ—কাহিনীমাত্র গ্রহণ করিয়াই তৃপ্ত হন নাই। উভয় জীবনীর ভাষার সামঞ্জস্য দেখিয়া হয়ত অনেকেই বিস্মিত হইবেন। বহু স্থান উদ্ধৃত করিবার স্থানাভাব —সামান্য উদ্ধৃত করিয়া পরিচয় দিতেছি।

"একদিকে তিনি যেমন নিরাশ্রয় প্রপীড়িত দীন-দরিদ্রের রক্ষার জন্য প্রাণপণে অত্যাচারের বিরুদ্ধে মহাসংগ্রাম ঘোষণা করিতেন, অপর দিকে তাঁহার সুকণ্ঠনিঃসৃত স্বরচিত পবিত্র গীতিস্রোতে দুঃখ-দৈন্য, সমস্তই ভাসিয়া যাইত। সহস্র সহস্র শ্রোতা পুত্তলিকার মত স্থিরভাবে অতৃপ্ত হৃদয়ে তাঁহার কণ্ঠনিঃসৃত সঙ্গীতসুধা পান করিত এবং নীরবে অশ্রু-বিসর্জ্জন করিত।"

"বার্দ্ধক্যকালে হরিনাথ সর্ব্বদা ধর্ম্মচিন্তায় নিমগ্ন থাকিতেন। সংসার-চিন্তা অন্নকষ্ট কিছুই তাঁহার হৃদয় স্পর্শ করিতে পারিত না। পরের উপকার করা তাঁহার জীবনের কার্য্য ছিল, অন্তিম-মুহূর্ত্তেও তিনি সেই পরম পবিত্র ব্রত পালনে উদাসীন ছিলেন না। দুঃখী, তাপী, অনাথ, অসহায়, রোগী, শোককাতর ব্যক্তি সকলেই 'কাঙ্গালের' স্নেহ পাইত। তিনি মাতৃহীনের মাতা, বিপন্নের বন্ধু, সম্পন্ন ব্যক্তির সুপরামর্শদাতা এবং কুপথগামী জনগণের সুপথপ্রদর্শক ছিলেন। দাসের ন্যায় তিনি অনাথের সেবা করিতেন। বিপন্ন ব্যক্তি তাঁহার উপর নির্ভর করিয়া নিরুদ্বেগ হইত।...বার্দ্ধক্যে তিনি রোগী ও তাপীর সান্ত্বনার স্থল ছিলেন।... হরিনাথ ধীরে ধীরে রোগীর মস্তকপ্রান্তে আসন গ্রহণ করিয়া তাহার শির স্পর্শ করিতেন, কুশল জিজ্ঞাসা করিতেন, কত আশার কথা বলিতেন, শুনিতে শুনিতে সেই মৃতপ্রায় দেহে যেন নবজীবনের সঞ্চার হইত। রোগীর শয্যাপার্শ্বে—তাঁহার সেই তেজঃপূর্ণ উন্নত সুগৌর দেহ, শ্বেত শ্মশ্রু, গৈরিক বস্ত্র, নগ্ন পদ এবং পৃষ্ঠবিলম্বিত শ্বেতবর্ণ রুক্ষ কেশভার দেখিলে মনে হইত—স্বর্গ হইতে বিধাতা বুঝি কোন দেবদূতকে এই রোগীর সেবার জন্য পৃথিবীতে পাঠাইয়াছেন।" [সতীশচন্দ্র মজুমদারের স্বাক্ষরযুক্ত 'হরিনাথের জীবনী'—১২—১৩ পৃষ্ঠা।

রায় শ্রীজলধর সেন বাহাদুরের লিখিত 'কাঙ্গাল হরি-নাথে" উপরি-উক্ত অংশের বর্ণনা এইরূপ :—

"একদিকে তিনি যেমন নিরাশ্রয় প্রপীড়িত দীন-দরিদ্রের জন্য প্রাণপণে অত্যাচারের বিরুদ্ধে মহাসংগ্রাম করিতেন, অপর দিকে তাঁহার কণ্ঠনিঃসৃত স্বরচিত পবিত্র গীতিস্রোতে দুঃখ-দৈন্য-শোক-তাপ সমস্তই ভাসিয়া যাইত। সহস্র সহস্র শ্রোতা পুত্তলিকার মত অতৃপ্ত-হৃদয়ে তাঁহার কণ্ঠনিঃসৃত সঙ্গীত-সুধা পান করিত এবং নীরবে অশ্রু-বিসর্জ্জন করিত।"

"বার্দ্ধক্যে হরিনাথ অধিকাংশ সময়ই ধর্ম্মচিন্তায় নিযুক্ত থাকিতেন। সংসার-চিন্তা, অন্নকষ্ট কিছুই তাঁহার হৃদয় স্পর্শ করিতে পারিত না। পরের উপকার করা তাঁহার জীবনের কার্য্য ছিল, অন্তিম মুহূর্ত্তেও সেই পরম পবিত্র ব্রত পালনে তিনি উদাসীন ছিলেন না। দুঃখী, তাপী, অনাথ, অসহায়, রোগী সকলেই তাঁহার স্নেহ পাইত। তিনি মাতৃহীনের মাতা, বিপন্নের বন্ধু, সম্পন্ন ব্যক্তির সুপরামর্শদাতা এবং কুপথগামী জনগণের সুপথপ্রদর্শক ছিলেন। দাসের ন্যায় তিনি অনাথের সেবা করিতেন। বিপন্ন ব্যক্তি তাঁহার উপর নির্ভর করিয়া নিরুদ্বেগ হইত। তিনি রোগী ও তাপীর সান্ত্বনা-স্থল ছিলেন। হরিনাথ যখন ধীরে ধীরে রোগীর মস্তক স্পর্শ করিতেন, কুশল জিজ্ঞাসা করিতেন এবং কত আশার কথা বলিতেন, তখন তাহা শুনিতে শুনিতে রোগীর সেই মৃতপ্রায় দেহে নবজীবনের সঞ্চার হইত। রোগীর শয্যাপার্শ্বে তাঁহার সেই তেজঃপূর্ণ, উন্নত, সুগৌর দেহ, শ্বেতশ্মশ্রুমণ্ডিত মুখমণ্ডল, গৈরিক-বস্ত্র, নগ্ন পদ এবং পৃষ্ঠবিলম্বিত শ্বেতবর্ণ রুক্ষ কেশভার দেখিলে মনে হইত, স্বর্গ হইতে বিধাতা বুঝি কোন দেবদূতকে রোগীর সেবার জন্য পৃথিবীতে পাঠাইয়াছেন।"

('জলধর-গ্রন্থাবলী', ২য় ভাগ ১৬ পৃষ্ঠা।

অত্যন্ত সঙ্কোচের সহিত স্বীকার করিতেছি যে, ১৩০৮ সালে হরিনাথ গ্রন্থাবলীর পুরোভাগে প্রকাশিত—স্বর্গীয় সতীশচন্দ্র মজুমদারের স্বাক্ষরযুক্ত কাঙ্গালের সংক্ষিপ্ত জীবনীটি আমারই অক্ষম লেখনী-প্রসূত। সতীশ বাবু 'হরিনাথ গ্রন্থাবলী' প্রকাশ সময়ে তাঁহার পিতৃদেবের জীবনীর উপাদান সংগ্রহ করিয়া দিয়া, একটি সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিয়া দিবার জন্য আমাকে অনুরোধ করিয়াছিলেন। "বসুমতী' কার্য্যালয়ে জলধর বাবুও আমাকে ইহা লিখিবার জন্য সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিলে, আমিই ইহা লিখিয়া দিয়াছিলাম। আশা করি, সাহিত্য-সুরসিকগণ ভাষাগত বৈশিষ্ট্য দেখিয়া সত্য নির্দ্ধারণ করিতে পারিবেন।

আদিপর্ব্ব—ছাত্রবৃত্তি-পর্ব্বাধ্যায়

এই প্রসঙ্গে রায় জলধর সেন বাহাদুর মহিমা-বিস্তার করিয়া লিখিয়াছেন :—

"আমি তখন আমাদের গ্রামের (নদীয়া কুমারখালী) বাঙ্গালা স্কুলের প্রথম শ্রেণীতে পড়ি। সাল, তারিখ আমি ঠিক বলতে পারব না। সে হয় ত ইংরাজী ১৮৭০ কি ১৮৭১ অব্দ। তখন আমার বয়স এই এগারো কি বারো বৎসর।...আমাদের সময়ে ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার পাঠ্য ছিল পরলোকগত রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় প্রণীত 'মিত্রবিলাপ কাব্য'।

('ভারতবর্ষ', ১৩৪২, পৌষ, ৪৩-৪৫ পৃষ্ঠা)

পরবর্ত্তী সংখ্যায় রায় বাহাদুর লিখিয়াছেন :—

"আমি বাল্যকাল থেকেই গোয়ালন্দে ছিলাম। গোয়ালন্দের মাইনর স্কুল থেকেই পরীক্ষা দিয়ে পাঁচ টাকা বৃত্তি পাই।"

('ভারতবর্ষ', ১৩৪২, মাঘ, ১৭৮ পৃষ্ঠা)

অন্যের পক্ষে অসম্ভব হইলেও "ব্রিলিয়াণ্ট জলধর সেন" ('ভারতবর্ষ', ১৩৪২, কার্ত্তিক, ৭১৪ পৃষ্ঠা) যে অনায়াসে একই সময়ে নদীয়া জেলার কুমারখালির বঙ্গ-বিদ্যালয়ে ছাত্রবৃত্তি প্রথম শ্রেণীতে এবং ফরিদপুর জেলার গোয়ালন্দের মাইনর ফার্ষ্ট ক্লাসে পড়িতে পারেন, তাহা পূর্ব্ব-প্রবন্ধেই দেখাইয়াছি। ছাত্রবৃত্তি ও মাইনর পরীক্ষা একই সময়ে —একই বৎসরে গৃহীত হইত। মাইনর পরীক্ষায় অতিরিক্তভাবে কেবল ইংরেজির পরীক্ষা দিতে হইত। বিভিন্ন কেন্দ্রে একই সময়ে মাইনর ও ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষা গ্রহণের তারিখগুলি প্রতি বর্ষেই 'এডুকেশন গেজেটে' বিঘোষিত হইয়াছে। জলধর বাবু যে বৎসর পরীক্ষা দিয়াছিলেন—সেই ১৮৭১ খৃষ্টাব্দের ঘোষণা এইরূপ :—

"মধ্যবিভাগের মাইনর ও বাঙ্গালা ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষা আগামী ৪ঠা, ৫ই, ৬ই, ৭ই, ৮ই, ৯ই ডিসেম্বর তারিখে নিম্নলিখিত কয়েকটি স্থানে হইবে—

কলিকাতা নর্ম্মাল স্কুল, হাওড়া গবর্ণমেণ্ট স্কুল, উত্তরপাড়া গবর্ণমেণ্ট স্কুল, হুগলী নর্ম্মাল স্কুল, বারাকপুর গবর্ণমেণ্ট স্কুল, বারাসাত গবর্ণমেণ্ট স্কুল, কৃষ্ণনগর কলেজ, বারুইপুর, টাকি, পুরুলিয়া।...

২০শে সেপ্টেম্বর ১৮৭১

এইচ, উড্রো

মধ্যবিভাগের স্কুল সমূহের ইনস্পেকটর"।

('এডুকেশন গেজেট'—২২শে সেপ্টেম্বর হইতে প্রতি সপ্তাহে প্রকাশিত)

তিনি ১৮৭০ কি ৭১ খৃষ্টাব্দে ছাত্রবৃত্তি কি মাইনর পরীক্ষা দিয়াছিলেন, তাহা জলধর বাবুর স্মরণ নাই বটে, কিন্তু ছাত্রবৃত্তি প্রথম শ্রেণীতে যে 'মিত্র-বিলাপকাব্য' পাঠ্য ছিল, তাহার কতকাংশ এখনও তাঁহার বেশ স্মরণ আছে। সেই জন্যই তিনি লিখিয়াছেন :—

"এখন তার সবটা বলতে পারবো না, কয়েক লাইন মনে আছে। তাহা এই—'কেন স্মৃতি দেখাইছ সে স্বপন আর।' ইত্যাদি" ('ভারতবর্ষ', ১৩৪২, পৌষ, ৪৫ পৃষ্ঠা)

'মিত্র-বিলাপ কাব্য'খানি যে কেবল ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে মাইনর ও ছাত্রবৃত্তির পাঠ্য ছিল—'এডুকেশন গেজেটে' প্রতি বর্ষে প্রকাশিত পাঠ্য-তালিকা হইতে সঙ্কলন করিয়া তাহা দেখাইতেছি।

১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে—(১) সীতার বনবাস, (২) কুসুমাবলী (৬০-৯৫, ১০৯-১৪৪ পৃষ্ঠা) (৩) তুলসীদাসের রামায়ণ (১১-১৫ সর্গ)।

১৮৬৯ খৃষ্টাব্দের ১৭ই ডিসেম্বরের 'এডুকেশন গেজেটে' প্রকাশ —"এতদিনের পর বঙ্গদেশীয় বঙ্গ বিদ্যালয়ে ছাত্রবৃত্তির পাঠ্য পুস্তক এক হইল—ইনস্পেক্টর ভেদে আর পুস্তক ভেদ রহিল না।"

১৮৭০ খৃষ্টাব্দে—(১) সীতার বনবাস, (২) চারুপাঠ ৩য় ভাগ, (৩) পদ্যপাঠ ৩য় ভাগ।

১৮৭১ খৃষ্টাব্দে—(১) সীতার বনবাস, (২) মিত্রবিলাপ কাব্য, (৩) পদ্যপাঠ ৩য় ভাগ।

১৮৭২ খৃষ্টাব্দে—(১) চারুপাঠ ৩য় ভাগ, (২) রাজের রাজ্যাভিষেক, (৩) কুসুমাবলী ১ম ভাগ।

১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে—বাঙ্গালার পাঠ্য পুস্তক পূর্ব্ব-বৎসরের অনুরূপ, কিন্তু টেক্সটবুক হইতে কোন প্রশ্ন হইবে না।

কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, কেবল ১৮৭০—৭১ খৃষ্টাব্দে নহে— ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দের এপ্রেল পর্য্যন্ত 'এডুকেশন গেজেটে' প্রকাশিত মাইনর ও ছাত্রবৃত্তি

পরীক্ষোত্তীর্ণ ও বৃত্তিপ্রাপ্ত ছাত্রগণের নামের তালিকা তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিয়াও, আমরা "ব্রিলিয়াণ্ট জলধর সেনের" নামটি কোনমতে আবিষ্কার করিতে পারি নাই। তিনি "ব্রিলিয়াণ্ট" ষ্টুডেণ্ট, তাঁহার পক্ষে অন্য কোন ছদ্ম নামে পরীক্ষা দেওয়া অসম্ভব নহে। জলধর বাবুর "গোয়ালন্দ মাইনর স্কুল থেকেই পরীক্ষা দিয়ে পাঁচ টাকা বৃত্তি" পাইবার সংবাদটি সাফল্য-গৌরবের আদর্শস্বরূপ বাঙ্গালা, বিহার, উড়িষ্যা, আসাম, ছোট নাগপুর ব্যতীত যদি অন্য কোন বিভাগের প্রাদেশিক গেজেট সমুজ্জ্বল করিয়া থাকে, তাহা জানিবার উপায় নাই। কল্পনার সে দিব্য-দৃষ্টিতে আমি বঞ্চিত।

আর জলধর বাবুর "মত ব্রিলিয়াণ্ট ছেলে⋯কখন দেখেন নি" ('ভারতবর্ষ', ১৩৪২, কার্ত্তিক, ৭১৪ পৃষ্ঠা) সেই জন্যই শিক্ষা বিভাগ বা স্বয়ং ছোট লাট তাঁহার জন্য স্বতন্ত্র ভাবে পাঁচ টাকা বৃত্তি দিবার ব্যবস্থা করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। নচেৎ 'এডুকেশন গেজেটে' প্রকাশ—

"১৮৭১ ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার ফল। নিম্নলিখিত ছাত্রগণ মাসিক ৪৲ টাকার হিসাবে চারি বৎসরের জন্য বৃত্তিপ্রাপ্ত হইয়াছে।⋯নিম্নলিখিত ছাত্রগণ চারি টাকার হিসাবে এক বৎসরের জন্য বৃত্তি প্রাপ্ত হইয়াছে।

(৮ই মার্চ্চ ১৮৭২, ৬৩৫ পৃষ্ঠা)

"এই ছাত্রবৃত্তির পরিমাণ মাসিক ৫৲ টাকা। ইহা দুই বৎসর কোন মধ্য ইংরাজী স্কুলে⋯অধ্যয়নের নিমিত্ত পাঠশালার ছাত্রদিগকে দেওয়া হইবে।"

(২৫ শে অক্টোবর ১৮৭২, ৫২২ পৃষ্ঠা।)

'এডুকেশন গেজেটে' সে মহিমা বিঘোষিত না হইলেও জলধর বাবু ত ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে কুমারখালি হইতে ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষা দিয়া, অনায়াসে গোয়ালন্দের মাইনর স্কুল হইতে পাঁচ টাকা বৃত্তি লাভ করিলেন। কিন্তু ঠিক সেই বৎসরেই তাঁহার স্বগ্রাম কুমারখালি হইতেই ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার তিনটি বিষয়ে সর্ব্বোচ্চ নম্বর পাইবার জন্য তিনটি রৌপ্য-পদক পুরস্কার দিবার তিনটি বিজ্ঞাপন 'এডুকেশন গেজেটে' পর পর কয়েক সপ্তাহ প্রকাশিত হইয়াছে।

"আমার অধীনস্থ বিদ্যালয় সকলের মধ্যে যে ছাত্রটি ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে মাইনর ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় ইংরাজী ভাষাতে সর্ব্বোচ্চ নম্বর রাখিতে পারিবে, তাহাকে পদমদীর বদান্য জমিদার শ্রীযুক্ত মীর মহম্মদ আলি খাঁ ২৫ পঁচিশ টাকা মূল্যের একটি রৌপ্য মেডেল পুরস্কার দিবেন।

শ্রীকৃষ্ণনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
২২ জুলাই ১৮৭১ স্কুল-সমূহের ডেপুটী ইন্‌স্পেক্টর
কুমারখালি"।

(২৮শে জুলাই ১৮৭১ খৃষ্টাব্দ, ১৯২ পৃষ্ঠা)

"খোকসা ইংরাজী বিদ্যালয়ের সেক্রেটারি বিদ্যোৎসাহী শ্রীযুক্ত বাবু কালীকান্ত মজুমদার মহাশয় আমার অধীনস্থ বঙ্গবিদ্যালয় সকলের ছাত্রগণের উৎসাহ বর্দ্ধনার্থ দশ টাকা মূল্যের একটি রৌপ্য-মেডেল প্রদান করিবেন। ১৮৭১ অব্দের বাঙ্গালা ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় আমার অধীনস্থ বিদ্যালয়ের ছাত্রগণের মধ্যে যিনি পাটীগণিত ও ক্ষেত্রতত্ত্ব এই দুই বিষয়ের নম্বর একত্রিত করিয়া সর্ব্বোচ্চ নম্বর রাখিতে পারিবেন, উক্ত পুরস্কার তাঁহারই প্রাপ্য।

শ্রীকৃষ্ণনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
২৬ জুলাই ১৮৭১ স্কুল-সমূহের ডেপুটী ইন্‌স্পেক্টর,
কুমারখালি"।

(২৫শে আগষ্ট—১৮৭১ খৃষ্টাব্দ ২৩০ পৃষ্ঠা)

"প্রসিদ্ধ দানশীলা শ্রীমতী মহারাণী স্বর্ণময়ী আমার অধীনস্থ বিদ্যালয় সকলের ছাত্রগণের উৎসাহ বর্দ্ধনার্থ ৩০ টাকা মূল্যের একটি রৌপ্য-মেডেল পুরস্কার প্রদান করিবেন। আগামী মাইনর ছাত্রবৃত্তির পরীক্ষায় যে ছাত্রটি সংস্কৃতে সর্ব্বোচ্চ নম্বর রাখিতে পারিবে, উক্ত পুরস্কার তাহারই প্রাপ্য।

শ্রীকৃষ্ণনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
২৬ সেপ্টেম্বর ১৮৭১ স্কুল-সমূহের ডেপুটী ইন্‌স্পেক্টর
কুমারখালি"।

(৪ঠা নভেম্বর ১৮৭১ খৃষ্টাব্দ, ৩৪৭ পৃষ্ঠা)

১৮৭১ খৃষ্টাব্দে ছাত্রবৃত্তি বা মাইনর পরীক্ষায় পাঁচ টাকা বৃত্তি লাভের সঙ্গে সঙ্গে এই তিনখানি রৌপ্য মেডেলের অন্ততঃ দুইখানি ত' জলধর বাবু নিশ্চয়ই লাভ করিয়াছেন। তাঁহার মত "ব্রিলিয়াণ্ট জলধর সেন" সেই খৃষ্টাব্দেই যখন খাস কুমারখালি হইতে ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় বৃত্তি লাভ করিয়াছেন, তখন এই তিনখানি মেডেল ত' অন্য কোন ছাত্র পাইতেই পারেন না। কিন্তু সেই মেডেলগুলির সম্বন্ধেও অবশ্যই তিনি বলিতে পারিবেন, তাঁহার "জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুরস্কার" ভূদেব বাবু-প্রদত্ত, অশ্রু-চিহ্নিত Spectator বহিখানির সহিত—

"যখন আমি হিমালয়ে চ'লে যাই, তখন একখানি নেকড়ায় বেঁধে আমার জ্যেঠাইমার পুরাতন কাঠের সিন্দুকে ⋯রেখে যাই। অনেক দিন পরে ফিরে এসে⋯দেখি⋯ আর নেই—পোকায় কেটে তাকে একেবারে শেষ করেছে।"

('ভারতবর্ষ', ১৩৪২, পৌষ, ৮৫ পৃষ্ঠা)

জলধর বাবুর কল্পনার রঙে সুরঞ্জিত "নিশান শোভিত পান্সী"—"নানা বর্ণের পতাকা ও পত্রপুষ্পে শোভিত তোরণ"—দেবদারু পাতা টানা—বাঁশ বহিবার কাঁধের কড়া—"লাল কাপড় মণ্ডিত পথের পার্শ্বে" "নগ্নপদে—নগ্ন গাত্রে—মলিন বস্ত্র-পরিহিত" শ্যামল অঙ্গ-শোভা বিকাশ—ভূদেববাবুর সম্বর্দ্ধনার জন্য মিথ্যার কুহকজাল বিস্তারে তাঁহার সকল আয়োজন আশা করি সার্থক হইয়াছে। স্বামীজীর জীবনদানের প্রবল আগ্রহে জলধর বাবু "পায়ে পাখা বেঁধে" পাঁচ ঘণ্টায় ৩৬ মাইল পার্ব্বত্য পথ অতিক্রম ক'রে "গ্রীষ্মের সন্ধ্যার প্রাক্কালে" সহসা হৃষীকেশে উপস্থিত হয়ে—"প্রায়ান্ধকার গঙ্গার চড়ায় সেই গাছের অনুসন্ধান করে—সৌভাগ্যক্রমে অনতিদূরেই সেই গাছ" পেয়ে—"তারি ২।৩টি পাতা এনে হাতে রগড়ে রস করে স্বামীজীর মুখে" দিয়াছিলেন—"প্রায় আধ ঘণ্টা পরে স্বামীজী চৈতন্য লাভ" করিয়াছিলেন। ভূদেববাবুর গুরু-নিদর্শন লাভের জন্য জলধর বাবু যে স্বপ্ন-কাহিনীটি বর্ণনা করিয়াছেন—আশা করি, তাহা হিমালয়ে স্বামীজীর জীবনদান-বিবরণী হইতে কোন অংশে নিকৃষ্ট হয় নাই। বরং—তিনি যে অধিকতর মিথ্যার রামধনু-প্রভায় ইঁহাকে আরও সমুজ্জ্বল করিতে পারিয়াছেন, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

বিরাট পর্ব্ব—মহিষাদল রাজ্যে অজ্ঞাতবাসে

মাষ্টার মহাশয় মহিষাদল রাজ্যে অজ্ঞাতবাস-লীলার আত্মসংগোপন-কাহিনী বিশেষ কিছু ভাঙ্গিয়া বলেন নাই। স্মৃতি-তর্পণে রহস্য-লীলার আভাসমাত্র দিয়াই তিনি বিরত হইয়াছেন ; কিন্তু তাহাতে রহস্য-পিয়াসু পাঠক-সমাজের তৃষা তৃপ্ত করিতে পারিয়াছেন বলিয়া ত' বোধ হয় না। এই প্রসঙ্গে তিনি লিখিয়াছেন :—

"আমি তখন মহিষাদলে মাষ্টারি করি। হিমালয়-ফেরত মুসাফির তখন আবার ঘর বেঁধেছে। মহিষাদলে কয়েক বৎসর আমার বেশ কেটেছিল। তার পর নানা কারণে সেখানে মাষ্টারি করা এবং নাবালক রাজকুমারদের অভিভাবকত্ব আমার আর পুষিয়ে উঠল না। তখন আমার এমন অবস্থা হয়েছিল যে, সে স্থান ত্যাগ করতে পারলেই বাঁচি।...সুরেশের চিঠি পেয়ে আমি মহিষাদলের মাষ্টারি ত্যাগ করে কলিকাতায় এসে সুরেশের স্কন্ধে ভর করলাম।" ('ভারতবর্ষ', ১৩৪৩, জ্যৈষ্ঠ, ৯০৫-৯০৬ পৃষ্ঠা)

জলধর বাবু ব্রাহ্মমতে স্মৃতি-উপাসনা না করিয়া, যখন হিন্দুমতে স্মৃতি-তর্পণ অর্থে স্মৃতির শ্রাদ্ধ করিতেছেন, তখন বাঙ্গালা দেশের সুপ্রচলিত বিধি অনুসারে শ্রাদ্ধবাসরে বিরাট পর্ব্ব পাঠের বিশেষ ব্যবস্থা করিলেই সমীচীন হইত। কিন্তু জলধর বাবু নিজে ব্রাহ্মধর্ম্মের উপাসক, স্মৃতি-তর্পণেই তিনি সে কথা বিবৃত করিয়াছেন :—

"বাল্যকাল থেকেই আমি ব্রাহ্মসমাজে যাতায়াত করতাম। আমাদের গ্রামে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় একটি ব্রাহ্ম-সমাজ প্রতিষ্ঠিত করেন। আচার্য্য কেশবচন্দ্র সেনের আমলে আমাদের গ্রামের ব্রাহ্মসমাজ ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মমন্দিরের অন্তর্ভুক্ত হয় ; তার পর যখন সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন আমাদের ব্রাহ্মসমাজও 'সাধারণ' দল-ভুক্ত হয়। স্কুলে পাঠের সময় থেকে কলেজের পাঠসমাপ্তি পর্য্যন্ত আমি যথানিয়মে ব্রাহ্ম-সমাজের উপাসনায় যোগ দিতাম।" ('ভারতবর্ষ', ১৩৪২, ফাল্গুন, ৩৪৩ পৃষ্ঠা)।

ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের পরম অনুরাগী বলিয়াই, বোধ হয়, জলধর বাবু মহিষাদলে অজ্ঞাতবাস পর্ব্বের মাহাত্ম্য বর্ণনায় বিরত হইয়া, তাঁহার লীলামাধুর্য্যের রসাস্বাদে পাঠকসমাজকে নিতান্তই বঞ্চিত করিয়াছেন।

কিন্তু, অন্ততঃ লালবাগের সেই দরোয়ানজীর কথাটা বলাও কি মাষ্টার মহাশয়ের একান্ত উচিত ছিল না ? মহিষা-দলে জলধর বাবু যে দরোয়ানজীকে আপ্যায়িত করিবার জন্য অবসরকালে অতিমাত্রায় ব্যস্ত থাকিতেন—পরম সমাদরে সম্মান প্রদান করিতেন, তাঁহার স্মৃতি-তর্পণে সেই নিগূঢ় শ্রদ্ধাস্পদ দরোয়ানজীর নামোল্লেখ পর্য্যন্ত না করা কি শোভন হইয়াছে ? দরোয়ানজীকে সম্মান প্রদর্শন করিবার তোয়াজ-কসরতিতে সেই সময়েই অভ্যস্ত হইতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই ত' তিনি আজ রায় বাহাদুর হইবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন,—দক্ষিণাপথ ভ্রমণকালে জলধর বাবু বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজের ভৃত্য—পরিচারকবৃন্দকে খাতির করিয়া, মান বজায় রাখিতে পারিয়াছেন। ইহা কি তাঁহার অনন্যসাধারণ গুণ-গরিমার দিব্য প্রকাশ নহে ?

রাজভ্রাতুষ্পুত্রদ্বয়ের দুই জন গৃহশিক্ষক—ত্রিভুবনচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও উকিল রাধানাথ মাইতি অজ্ঞাতকারণে পর পর আত্মহত্যা করিলে—তাঁহাদের জন্য অন্য সুযোগ্য শিক্ষক না আসা পর্য্যন্ত সে ভার জলধর বাবু বিশাল স্কন্ধে অস্থায়িভাবে বহন করিয়াছিলেন বলিয়াই ত' জানি। কিন্তু তিনি নাবালক রাজকুমারদের "অভিভাবকত্বের" সুযোগ

কোন সময়ে লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া ত' স্মরণ হয় না। তবে হ্যাঁ—জলধর বাবু যে, মহিষাদলের বাহির-অন্দরের কুমারযুগল ও পরমাত্মীয়দ্বয়ের গুরুদায়িত্ব সাদরে গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা সকলেরই বেশ স্মরণ আছে। কিন্তু মাষ্টার মহাশয় তাঁহার অননুকরণীয় বিনয়রসে অভিষিক্ত করিয়া সে যশঃসৌরভে বঙ্গ-সাহিত্যকে উদ্‌ভ্রান্ত করিতে বিস্মৃত হইলেন কেন ?

আর ষ্টার থিয়েটারের সেই উজ্জ্বল তারকা দু'টির জ্যোতিপ্রভাও কি স্মৃতি-তর্পণের সময়ে জলধর বাবুর স্মৃতি-পথ হইতে মুছিয়া গেল ? যাঁহারা সেই সময়ে মহিষাদলের বাহির-অন্দরে বিরাজিতা ছিলেন—'সেন্ট্রাল এভিনিউ' প্রসারে অধুনা লুপ্ত 'ফুলবাগান' প্রাসাদবাসিনী ভগিনী-যুগলের পুত্রদ্বয়ের শিক্ষার গুরুভার জলধর বাবু স-সম্মানে গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া ত' সুপ্রচারিত। মাষ্টার মহাশয়ের সেই পরম স্নেহাস্পদ ছাত্রদ্বয়ের বড়টি গ্রে ষ্ট্রীটের 'বসুমতী কার্য্যালয়ে' গাড়ী-ঘোড়া বিক্রয় করিতে আসিলে, আমার সম্মুখেই তিনি তাহাকে কত যত্ন—কত আদর করিয়াছিলেন, তাহা ত' এত সত্বর ভুলিবার কথা নহে। এই পরম স্নেহের প্রতিদানের সহিত জলধর বাবু স্বভাবসিদ্ধ কৌশলে আধ ছটাক চোখের জল—দেড় ছটাক সরলতার ভাণ—আধ সের খাঁটী মিথ্যা কথার ভেজী মিশাইয়া, ফাউন্টেন পেনে পূরিয়া কি স্মৃতি-তর্পণের আট পৃষ্ঠা অপূর্ব্ব মহিমারঞ্জিত করিতে পারিতেন না ? সে বিচিত্র বর্ণচ্ছটা হৃষীকেশে জলধর বাবুর স্বামী বিবেকানন্দের জীবনদানের গৌরব-গর্ব্বকে কি আরও প্রদীপ্ত করিয়া তুলিত না ?

মহিষাদল হইতে প্রত্যাবর্ত্তন-প্রসঙ্গে রায় বাহাদুর স্মৃতি-তর্পণে লিখিয়াছেন—

…"গুরুদাস বাবুর সঙ্গে এই আমার প্রথম পরিচয়। ইহার তিন চার মাস পরে মহিষাদলের মাষ্টারী ছেড়ে দিয়ে কলিকাতায় চ'লে আসি।…পরদিন বঙ্গবাসী আফিসে যাবার সময় গুরুদাস বাবুর দোকানে গিয়ে তাঁর পদধূলি নিয়ে বললাম, 'আজই কাজে যাচ্ছি। যোগেন্দ্র বাবু আপাততঃ মাসে ত্রিশটাকা দেবেন, কাজকর্ম্ম শিখলে বাড়িয়ে দেবেন'।"

('ভারতবর্ষ', ১৩৪৩, বৈশাখ, ৭৫৫ পৃষ্ঠা)

পূজনীয় গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের মত সত্যনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ—আদর্শ সংব্যবসায়ীর পদধূলি সত্যই গ্রহণ করিয়া জলধর বাবু যদি সংবাদপত্র-সেবায় ব্রতী হইতে পারিতেন, তাহা হইলে অন্যের সাফল্য-গৌরব আত্মসাৎ করিবার তীব্র আকাঙ্ক্ষা প্রকট করিতে নিশ্চয়ই তিনি লজ্জিত হইতেন। আর জলধর বাবুর সারা জীবনের এই উৎকট সাধনার পরিচয় দিবার জন্য আমাদেরও আজ এ বিড়ম্বনা ভোগ করিতে হইত না। রায় বাহাদুর সুপ্রবীণ বয়সে স্মৃতিতর্পণে "বাঙ্গালা সাহিত্যিকদিগের ইতিহাসের কিছু মালমসলা জমা" করিতেছেন। যে সকল সাহিত্যিকের সাধনা তিনি পরম অনুকম্পায় আত্মসাৎ করিয়াছেন—নিজ নামে চালাইবার কৃপা করিয়াছেন—তাঁহার বিনয়াতিশয্যে বিমুগ্ধ হইয়া যে সকল "নগণ্য" লেখক তাঁহার মত সৌভাগ্যবানকে যথাসাধ্য সাহায্য করিয়া ধন্য হইতে পারিয়াছেন—তাঁহারা আশা করিয়াছিলেন, জলধর বাবু এই শুভ সুযোগে তাঁহাদের সাহায্যের কথা স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হইবেন না। কিন্তু স্পর্দ্ধার সমুচ্চ-শিখরে অধিষ্ঠিত রায় বাহাদুরের নিকট সে কর্ত্তব্যপালনের আশা করা—দুরাশার বাতুলতামাত্র।

অমর নাট্যকবি সেক্সপীয়ারের কয়েকখানি নাটক বর্ত্তমান যুগে লর্ড বেকনের লিখিত বলিয়া প্রচারিত হইলেও ত' সেক্সপীয়ারের যশোগৌরব কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয় নাই। আর সাহিত্য-জগতে সেক্সপীয়ারের কীর্ত্তিজ্যোতি—বিশাল প্রতিষ্ঠার তুলনায় জলধর বাবুর যশোভাতি হিমালয়ের সহিত বল্মীকস্তূপের উপমার মতই নিরর্থক নহে কি ?

রায় বাহাদুর যে সকল সাহিত্যিকের প্রাণপাত সাধনার ফলে সুদীর্ঘ জীবন ব্যাপিয়া অজস্রভাবে যশ ও অর্থ আহরণ করিয়াছেন—মহাপ্রস্থানপর্ব্বের পূর্ব্বে সেই দুঃস্থ সাহিত্যিকগণের সাহায্যের কথা স্বীকার করিলে তাঁহার মহিমাই সমুজ্জ্বল হইবে না কি ? সঙ্গে সঙ্গে তিনি কৃতজ্ঞতার ঋণ পরিশোধ করিয়া বয়সোচিত প্রায়শ্চিত্ত করিবার সুযোগ পাইতে পারিবেন না কি ? অবশ্য শেষবয়সে প্রায়শ্চিত্তবিধান হিন্দুধর্ম্মেরই সমীচীন ব্যবস্থা। জলধর বাবু এই কলিযুগে একমাত্র সত্য—তন্ত্রশাস্ত্রে—শিববাক্যেও অবিশ্বাসী। স্মৃতিতর্পণেই তিনি লিখিয়াছেন :—

"…আমি তন্ত্র-শাস্ত্র পড়িনি, এখনও তার কিছুই জানিনে; কিন্তু তা হলেও আমি বলতে দ্বিধাবোধ করছিনে যে আমি তন্ত্র-শাস্ত্রের বিরোধী ছিলাম এবং এখনও আছি। আমি

তন্ত্রোক্ত পঞ্চ-মকারের সাধন কি, তা জানিনে। কিন্তু ঐ পাঁচটি ম-আদি নাম শুনে তখনও শিউরে উঠতাম—এখনও উঠি।"

('ভারতবর্ষ', ১৩৪২, চৈত্র, ৫৪১ পৃষ্ঠা)

রায় বাহাদুর এই সুপ্রবীণ বয়সেও যে শাস্ত্র পড়েন নাই—জানেন না, এখনও তিনি সেই নিত্য-সত্য তন্ত্রশাস্ত্রের বিরোধী,—ঘৃণা—অশ্রদ্ধার ভাব প্রচার করিতেছেন। তিনি যে হিন্দুধর্ম্মে দীক্ষিত নহেন, তাঁহার হিন্দুধর্ম্ম-বিদ্বেষী এই সমস্ত উক্তি তাহাই প্রমাণ করে না কি? কারণ, দীক্ষার বীজমন্ত্ররাজি—যাবতীয় সাধন-পদ্ধতি তন্ত্রশাস্ত্রে সমাহিত। বৈষ্ণব ভাবের সাধনাও তন্ত্রেরই প্রকারভেদ মাত্র।

কিন্তু তন্ত্রোক্ত পশুভাবের পঞ্চ মকার সাধনার অনুষ্ঠানে কি জলধর বাবু চিরনিমগ্ন নহেন? পঞ্চ ম-কারের মধ্যে মদ্য না হয় তিনি পান করেন না; কিন্তু আর একটি বিষয় ভদ্রসমাজে আলোচ্য না হইলেও মৎস্য, মাংস ও মুদ্রা (নব্য মতে)—এ তিনের আদরই কি তিনি চিরজীবন করেন নাই ও করিতেছেন না? তন্ত্রশাস্ত্র-নির্দ্দেশিত দিব্যভাবের পঞ্চ মকার-সাধনা—যাহার প্রভাবে ব্রহ্মজ্ঞানলাভ—ব্রহ্মানন্দের অনুভূতি হয়, তাহা অবশ্য জলধর বাবুর মত মিথ্যাশ্রয়ীর পক্ষে এ জীবনে উপলব্ধি করা সম্ভবপর নহে।

কিন্তু তিনি ত' ব্রাহ্মধর্ম্মের অনুরাগী—ব্রাহ্মধর্ম্মের অনুরাগিগণ ত' সত্যনিষ্ঠ বলিয়া প্রসিদ্ধ—তাঁহারা ত' সত্য-প্রকাশে কোন দিন কুণ্ঠিত নহেন। খৃষ্টানগণও শেষ সময়ের পূর্ব্বে, জীবনের যত কিছু অসদাচরণের গুপ্তকাহিনী পাদরীর নিকট প্রকাশ করিয়া শান্তি লাভ করেন। সকল ধর্ম্মমতই এক—কোন ধর্ম্মমতই ত' তাঁহাকে সত্যকথা প্রকাশে বাধা দিবে না। তাঁহার ভাষাতেই তাঁহাকে নিবেদন করি—এত কাল পরে মহাত্মাগণের স্মৃতিতর্পণ ক'রে যদি সত্যই তাঁর অন্তর কৃতার্থ—ধন্য—পবিত্র হয়ে থাকে, তবে সাহিত্যিকগণের নিকট তাঁহার ঋণের পরিমাণ—তাঁহার স্বনামে প্রচারিত কোন্ পুস্তক কাহার প্রণীত, তাহা অনুগ্রহ করিয়া অসঙ্কোচে স্বীকার করুন। এতকাল পরে গ্রন্থকারগণের কেহই কাপিরাইটের দাবী করিতে আসিবেন না। তিনি যথার্থই স্মৃতিতর্পণ করিয়া ধন্য হইবার সুযোগ পাইবেন।

তবে তিনি সুদীর্ঘ-জীবনে যখন অসত্যের সাধনায় সিদ্ধি-লাভ করিয়াছেন, তখন তাঁহার ভাগ্যে কবির সে কথা কখনই সার্থক হইবে না—

"To see the spectre of Despair
Come to our lonely tent,
Like Brutus midst his slumbering host
Summon'd to die by Cæsar's ghost."

স্মৃতিতর্পণ-সূচনায় রায় বাহাদুর ক্রমওয়েলের যে উক্তি—"Paint me as I am" উদ্ধৃত করিয়া নির্দ্দেশ দিয়াছেন—মাষ্টার মহাশয়ের সেই নির্দ্দেশ সসম্মানে শিরোধার্য্য করিয়া, তাঁহার স্বরূপ প্রকাশে যথাসাধ্য প্রয়াস পাইতেছি। আশা করি, শিষ্ট-সমাজের বিরক্তি-ভাজন হইব না এবং অন্যান্য পর্ব্বের কথাও অতঃপর সকলে ধৈর্য্য সহকারে পাঠ করিবেন।

বিরাট পর্ব্বের কথা চাঁদ-ধরা ফাঁদ।
খুলিয়া বলিলে পরে ঘুচিত প্রমাদ॥

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়।

এই প্রবন্ধের প্রথম অংশ প্রকাশের পর কয়েকখানি পত্র আসিয়াছে, কিন্তু তাহাদের কোনখানিই প্রতিবাদ-পত্র নহে। 'মাসিক বসুমতীর' কোন প্রবন্ধের মত-সমর্থনে পত্রাকারে ছোট প্রবন্ধ প্রকাশের স্থানাভাব। আশা করি, পত্র-লেখকগণ এজন্য ক্ষুণ্ণ হইবেন না।

'মাসিক বসুমতী'-সম্পাদক।

বাদল-রাতে

স্বপনে কার পায়ের ধ্বনি যেন শুনি!
বৃষ্টিধারা ঝরছে বেগে দেখি জেগে!
বাদল ঝরে বনে-বনে, বাতায়নে,
আঙিনাতে বর্ষা-রাতে!

দুর্য্যোগে আজ মিথ্যা রাতি—
জ্বালি বাতি
ব'সে আছি হতাশ্বাসে—
আসবে না সে!

শ্রীপৃথ্বীরাজ মুখোপাধ্যায়।

কর্ত্তা শাস্ত্রার্থবত্ত্বাৎ (২।৩।৩৩)

(শঙ্কর) "কর্ত্তা," জীবের কর্তৃত্ব আছে, "শাস্ত্রার্থবত্ত্বাৎ" যেহেতু শাস্ত্রবাক্য অর্থবান্ হওয়া প্রয়োজন। শাস্ত্র বলিয়াছেন—"যজেত" অর্থাৎ যজ্ঞ করিবে, "জুহুয়াৎ" অর্থাৎ আহুতি দিবে। যদি জীব কর্ত্তা না হন, তাহা হইলে এই সকল শাস্ত্রবাক্য সার্থক হইবে না।

প্রকৃতপক্ষে বুদ্ধিই কর্ত্তা। বুদ্ধি আত্মার শ্রেষ্ঠ গুণ। এজন্য আত্মাকে কর্ত্তা বলা হয়।

(রামানুজ) কর্ত্তৃত্ব আত্মারই গুণ। ইহা যথার্থ নহে যে, কর্তৃত্ব বুদ্ধিরই গুণ, ইহাকে আত্মার গুণ বলিয়া ভ্রম হয়। গীতায় ইহা বলা হইয়াছে বটে যে, প্রকৃতিই কর্ত্তা, ভ্রমহেতু আত্মাকে কর্ত্তা বলিয়া মনে হয়, * কিন্তু তাহার উদ্দেশ্য এই যে, সাংসারিক কর্ম্ম করিবার সময় আত্মা সত্ত্ব, রজঃ বা তমঃ গুণের নিকট হইতে প্রেরণা লাভ করে। "শাস্ত্র" শব্দের অর্থ "যাহা শাসন করে"। যদি জীব কর্ত্তা না হইত, তাহা হইলে কিরূপে শাসন করা হইত?

বিহারোপদেশাৎ (২।৩।৩৪)

জীব যে কর্ত্তা, তাহার আর একটি কারণ এই যে, নিদ্রার সময় জীব দেহের মধ্যে "বিহার" বা ভ্রমণ করে, ইহা শাস্ত্রে "উপদেশ" দেওয়া হইয়াছে। বৃহদারণ্যক উপনিষদে আছে, "স্বে শরীরে যথাকামং পরিবর্ত্ততে" (২।১।১৮) অর্থাৎ নিজের শরীরে যথেচ্ছভাবে পরিবর্ত্তন করে।

উপাদানাৎ (২।৩।৩৫)

জীব যে কর্ত্তা, তাহার আর একটি কারণ এই যে, উপনিষদে উক্ত হইয়াছে যে, জীব ইন্দ্রিয়গুলি "উপাদান" বা গ্রহণ করে। যথা "প্রাণান্ গৃহীত্বা" (বৃহদারণ্যক ২।১।১৮) অর্থাৎ ইন্দ্রিয় সকল গ্রহণ করিয়া।

ব্যপদেশাৎ চ ক্রিয়ায়াং ন চেৎ নির্দ্দেশবিপর্য্যয়ঃ (২।৩।৩৬)

"ক্রিয়ায়াং" অর্থাৎ কর্ম্মে, "ব্যপদেশাৎ" কর্ত্তৃরূপে উল্লেখ আছে (অতএব জীবই কর্ত্তা)। যথা "বিজ্ঞানং যজ্ঞং তনুতে" (তৈত্তিরীয় উপনিষদ্ ২।৫।১) অর্থাৎ জীব যজ্ঞ করে। আপত্তি হইতে পারে যে, এখানে "বিজ্ঞান" শব্দে জীবকে বুঝায় না, বুদ্ধিকে বুঝায়। না, এখানে বিজ্ঞান-শব্দে জীবকেই বুঝায়? "নচেৎ" যদি জীবকে না বুঝাইত, "নির্দ্দেশবিপর্য্যয়ঃ" তাহা হইলে নির্দ্দেশের বিপর্য্যয় হইত, অর্থাৎ বিজ্ঞান শব্দে যদি বুদ্ধিকে বুঝাইত, তাহা হইলে "বিজ্ঞানেন যজ্ঞং তনুতে" এইরূপ বলা হইত। ("বুদ্ধি দ্বারা যজ্ঞ করে" ইহা বলাই সমীচীন, "বুদ্ধি যজ্ঞ করে" ইহা বলা সমীচীন নহে)

উপলব্ধিবৎ অনিয়মঃ (২।৩।৩৭)

(শঙ্কর) আপত্তি হইতে পারে যে, জীব যদি কর্ত্তা হইত, তাহা হইলে সর্ব্বদা নিজের হিতকর কার্য্য করিত, কিন্তু দেখা যায় যে, জীব কখনও কখনও নিজের অহিতকর কার্য্যও করিয়া থাকে। ইহার উত্তর এই যে,—"উপলব্ধিবৎ অনিয়মঃ"। জীব উপলব্ধি বা জ্ঞানের কর্ত্তা। তথাপি সর্ব্বদা যে সুখকর জ্ঞান হয়, তাহা নহে, কখনও সুখকর, কখনও অসুখকর জ্ঞান হয়; এরূপ কোনও নিয়ম নাই যে, সর্ব্বদাই সুখকর জ্ঞানই হইবে, ("অনিয়মঃ") সেরূপ এরূপ কোনও নিয়ম নাই যে, জীব সর্ব্বদা হিতকর কার্য্যই করিবে। প্রতিকূল বস্তু নিকটে থাকিলে অসুখকর জ্ঞান হয়। সেইরূপ প্রতিকূল অবস্থায় পড়িলে (যথা, কুসঙ্গ) জীব অহিতকর কার্য্য করে। তথাপি জীবকে যেমন জ্ঞাতা বলা হয়, সেইরূপ জীবকে কর্ত্তাও বলিতে হইবে।

(রামানুজ) যদি জীব কর্ত্তা না হইয়া প্রকৃতিই কর্ত্তা হইত, তাহা হইলে সকল কর্ম্মের ফল সকল জীবকে ভোগ করিতে হইত, কিন্তু দেখা যায় যে, জীব নিজের কর্ম্মের ফলই ভোগ করে, অন্যের কর্ম্মের ফল ভোগ করে না। প্রকৃতি এক। সকল জীবের সহিত প্রকৃতির সম্বন্ধ সমান।

---

* প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ।
অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহম্ ইতি মন্যতে।

"প্রকৃতির গুণ দ্বারা কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয়। অহঙ্কারহেতু যাহার জ্ঞান আবৃত হইয়াছে, সে মনে করে 'আমিই কর্ত্তা'।"

প্রকৃতিই যদি সকল কর্ম্মের কর্ত্তা হয়, তাহা হইলে সকল কর্ম্মের সহিত সকল জীবের সম্বন্ধ সমান হইত।

শক্তিবিপর্য্যয়াৎ (২।৩।৩৮)

(শঙ্কর) যদি বুদ্ধি কর্ত্তা হইত, জীব যদি কর্ত্তা না হইত, তাহা হইলে শক্তিবিপর্য্যয় হইত, বুদ্ধির করণশক্তি থাকিত না, কর্ত্তৃত্বশক্তি থাকিত। কিন্তু বুদ্ধির করণশক্তি আছে, ইহা সুবিদিত।

(রামানুজ) যে কর্ত্তা, সেই ভোক্তা হইবে, ইহা যুক্তি-সঙ্গত। বুদ্ধি যদি কর্ত্তা হইত, তাহা হইলে বুদ্ধি ভোক্তা হইত, অর্থাৎ বুদ্ধির ভোক্তৃত্বশক্তি থাকিত। ইহা শক্তি-বিপর্য্যয়। কারণ, ভোক্তৃত্বশক্তি জীবেরই আছে। বস্তুতঃ ইহাই জীবের অস্তিত্বের প্রমাণ। "পুরুষঃ অস্তি ভোক্তৃ-ভাবাৎ" (সাংখ্যকারিকা ১৭) অর্থাৎ জীব আছে, কারণ, ভোক্তৃভাব আছে।

সমাধ্যভাবাৎ চ (২।৩।৩৯)

(শঙ্কর) যদি জীব কর্ত্তা না হইত, তাহা হইলে "সমাধি" হইতে পারিত না। কিন্তু উপনিষদে সমাধির উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। "আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যঃ নিদিধ্যাসি-তব্যঃ" (বৃহদারণ্যক ২।৪।৫) অর্থাৎ আত্মাকে দর্শন করিতে হইবে, শ্রবণ করিতে হইবে, আত্মাতে সমাধি অবলম্বন করিতে হইবে।

(রামানুজ) "আমি প্রকৃতি হইতে ভিন্ন" এইরূপ প্রত্যয়ই সমাধির অবলম্বন। বুদ্ধি প্রকৃতির অন্তর্গত, সুতরাং বুদ্ধির এরূপ প্রত্যয় হইতে পারে না যে, সে প্রকৃতি হইতে ভিন্ন। সুতরাং বুদ্ধি সমাধিক্রিয়ার কর্ত্তা হইতে পারে না। বুদ্ধি যদি সকল কর্ম্মের কর্ত্তা হয়, তাহা হইলে সমাধি কাহারও হইতে পারে না। সুতরাং বুদ্ধিকে সকল ক্রিয়ার কর্ত্তা বলা যায় না।

যথা চ তক্ষা উভয়থা (২।৩।৪০)

তক্ষার (সূত্রধরের) ন্যায়, উভয় প্রকারেই (জীব অবস্থান করে)।

(শঙ্কর) জীবের কর্ত্তৃত্ব স্বাভাবিক নহে, বুদ্ধি প্রভৃতি উপাধির সংসর্গে জীবের কর্ত্তৃত্ব হয়। জীবের কর্ত্তৃত্ব যদি স্বাভাবিক হইত, তাহা হইলে জীবের কর্ত্তৃত্ব কখনও অপগত হইত না,—যেমন অগ্নির স্বাভাবিক উষ্ণতা কখনও অগ্নিকে ত্যাগ করে না। জীবের কর্ত্তৃত্ব অপগত না হইলে জীবের মোক্ষ হইতে পারে না। সূত্রধরের হস্তে যখন যন্ত্র থাকে, সে তখন কর্ত্তা ও দুঃখী হয়; সে যখন গৃহে ফিরিয়া যন্ত্র ত্যাগ করিয়া অবস্থান করে, তখন সুখী হয়। সেইরূপ ইন্দ্রিয় সকলের সংসর্গে আত্মা কর্ত্তা ও দুঃখী হয়, আবার ইন্দ্রিয়ের সহিত সম্পর্ক ত্যাগ করিয়া ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইয়া আত্মা অ-কর্ত্তা ও সুখী হয়।

(রামানুজ) সূত্রধর যখন ইচ্ছা হয়, তখন কায করে, যখন ইচ্ছা হয় না, তখন কায করে না। সেই প্রকার জীব যখন ইচ্ছা হয়, তখন কায করে, যখন ইচ্ছা হয় না, তখন করে না। যদি অচেতন বুদ্ধি কর্ত্তা হইত, তাহা হইলে সর্ব্বদাই কায করিত। কারণ, বুদ্ধি অচেতন, তাহার ইচ্ছা বা অনিচ্ছা হইতে পারে না।

পরাৎ তু তচ্ছ্রুতেঃ (২।৩।৪১)

পরাৎ (পরমেশ্বর হইতে জীবের কর্ত্তৃত্ব হয়), তৎশ্রুতেঃ (কারণ, পরমেশ্বরের ইচ্ছায় জীব কার্য্য করে, এইরূপ শ্রুতি আছে)।

বেদ বলিয়াছেন—"এষ হি এব সাধু কর্ম্ম কারয়তি তং যম্ এভ্যঃ লোকেভ্যঃ উন্নিনীষতে, এষ হি এব অসাধু কর্ম্ম কারয়তি তং যম্ এভ্যঃ লোকেভ্যঃ অধো নিনীষতে" (কৌষীতকি ৩।৮) অর্থাৎ ইনিই (ঈশ্বর) যাহাকে উপরে তুলিতে ইচ্ছা করেন, তাহার দ্বারা সাধু কর্ম্ম করান, এবং যাহাকে নীচে নামাইতে ইচ্ছা করেন, তাহার দ্বারা অসাধু কর্ম্ম করান। পুনশ্চ, "য আত্মানম্ অন্তরো যময়তি স তে আত্মা অন্তর্য্যামী অমৃতঃ" অর্থাৎ যিনি আত্মার মধ্যে অবস্থান করিয়া আত্মাকে সংযত করেন, তিনি তোমার আত্মা, তিনি অন্তর্য্যামী ও অমৃত। গীতাতেও ভগবান্ এই কথা বলিয়াছেন,—

ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়াণি মায়য়া॥

"ঈশ্বর সকল জীবের হৃদয়ে অবস্থান করেন, এবং যন্ত্রারূঢ় জীবসকলকে মায়া দ্বারা ভ্রমণ করান।"

কৃৎস্নপ্রযত্নাপেক্ষস্তু বিহিতপ্রতিষিদ্ধ-অবৈয়র্থ্যাদিভ্যঃ (২।৩।৪২)

"কৃৎস্নপ্রযত্নাপেক্ষঃ"—ঈশ্বর জীবের "কৃৎস্ন" (সমুদয়) "প্রযত্ন" (চেষ্টা) "অপেক্ষা" করিয়া (চেষ্টার অনুরূপ) জীবকে কর্ম্ম করান। "বিহিতপ্রতিষিদ্ধ-অবৈয়র্থ্যাদিভ্যঃ" শাস্ত্রে যে সকল কার্য্য "বিহিত" আছে, এবং যাহা "প্রতিষিদ্ধ" আছে, তাহারা যাহাতে ব্যর্থ না হয় ("অবৈয়র্থ্য") তজ্জন্য

এরূপ সিদ্ধান্ত করা প্রয়োজন। শাস্ত্রে আছে—"স্বর্গকামো যজেত" যিনি স্বর্গ-কামনা করেন, তিনি যজ্ঞ করিবেন। যিনি স্বর্গ-কামনা করিয়া যজ্ঞ করিবার চেষ্টা করিবেন, ঈশ্বর তাঁহার দ্বারা যজ্ঞ সম্পাদন করান, এবং যজ্ঞ করিবার ফলে তিনি স্বর্গলাভ করেন, এই ভাবে শাস্ত্রবাক্য সার্থক হয়। জীবের চেষ্টা অনুসারে যদি ঈশ্বর তাহার দ্বারা কার্য্য না করান, তাহা হইলে জীবের পুরুষকার ব্যর্থ হইয়া যাইবে, তাহা হইতে পারে না।

ঈশ্বরের অন্তর্য্যামিত্ব এবং সর্ব্বশক্তিমত্তার সহিত এই-ভাবে পুরুষকারের সামঞ্জস্য স্থাপন করা হইয়াছে।

(রামানুজ) যাহার যেরূপ বিষয়ে প্রযত্ন, ঈশ্বর তাহাকে সেইরূপ বিষয়ে প্রবৃত্তির অনুমতি প্রদান করেন, ঈশ্বরের অনুমতি হইলে জীবের প্রবৃত্তি হয়। গীতায় ভগবান্ বলিয়াছেন, "মত্তঃ সর্ব্বং প্রবর্ত্ততে" (১০।৮) অর্থাৎ আমিই সকলকে প্রবৃত্তি প্রদান করি : "দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মাম্ উপযান্তি তে" (১০।১১) অর্থাৎ যে বুদ্ধির দ্বারা আমাকে প্রাপ্ত হওয়া যায়, সেই বুদ্ধির সহিত আমি তাহাদিগকে যুক্ত করিয়া দিই (যাহারা সর্ব্বদা প্রীতিপূর্ব্বক আমাকে ভজনা করে।)

অংশো নানাব্যপদেশাৎ অন্যথা চ অপি দাশকিতবাদিত্বম্ অধীয়ত একে (২।৩।৪৩)

অংশঃ (জীব ঈশ্বরের অংশ), নানাব্যপদেশাৎ (কারণ, জীব ও ঈশ্বরের মধ্যে "নানা" অর্থাৎ প্রভেদের "ব্যপদেশ" অর্থাৎ উল্লেখ আছে), অন্যথা চ অপি "অন্যথা চ" অর্থাৎ প্রভেদ ভিন্ন অন্যরূপ, অর্থাৎ জীব ঈশ্বর হইতে অভিন্ন, ইহারও উল্লেখ আছে, দাশকিতবাদিত্বম্ (দাশ অর্থাৎ কৈবর্ত্ত, কিতব অর্থাৎ দ্যূতকারী, ব্রহ্মকেই দাশ ও কিতব বলা হইয়াছে) "একে অধীয়তে" (এক শাখায় এইরূপ কথা আছে)।

বেদে কোনও স্থানে জীব ও ব্রহ্মের মধ্যে ভেদের উল্লেখ আছে, আবার কোনও স্থানে অভেদের উল্লেখ আছে। ভেদের উল্লেখ,—"সঃ অন্বেষ্টব্যঃ সঃ বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ" অর্থাৎ তাঁহাকে (ঈশ্বরকে) অন্বেষণ করা উচিত, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা উচিত। যিনি জিজ্ঞাসা করিবেন (জীব) এবং যাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিবেন (ব্রহ্ম), উভয়ে অবশ্য বিভিন্ন। সুতরাং এখানে জীব ও ব্রহ্মের মধ্যে প্রভেদ আছে, ইহাই বলা হইল। আবার অথর্ব্ববেদে ব্রহ্মসূক্তে আছে—"ব্রহ্ম দাশা ব্রহ্ম দাসা ব্রহ্ম এব ইমে কিতবাঃ" ব্রহ্মই দাশ (কৈবর্ত্ত), ব্রহ্মই দাস (ভৃত্য), ব্রহ্মই এই সকল কিতব (ধূর্ত্ত বা দ্যূতক্রীড়াকারী)। সকল মানবই ব্রহ্ম। ব্রহ্ম ও জীবের মধ্যে যখন ভেদও আছে, অভেদও আছে, তখন বুঝিতে হইবে যে, জীব ব্রহ্মের অংশ। কারণ, অংশ ও অংশীর মধ্যে ভেদও আছে, অভেদও আছে।

(রামানুজ) জীব যে ব্রহ্মের অংশ, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে (ব্রহ্মসূত্র ২।১।২২, "অধিকং তু ভেদনির্দ্দেশাৎ")। সেই সিদ্ধান্তই এখানে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হইয়াছে। জীব ও ব্রহ্মের সম্বন্ধ কিরূপ, এ বিষয়ে দ্বৈত-বাদ, অদ্বৈতবাদ, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ প্রভৃতি বিভিন্ন মত আছে। একটি মত এই যে, জীব ও ব্রহ্ম একান্ত ভিন্ন, ব্রহ্ম সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান, জীব অল্পজ্ঞ, অল্পশক্তিমান (দ্বৈতবাদ)। আর এক মত এই যে, জীবও ব্রহ্ম অভিন্ন, অবিদ্যা বা অজ্ঞান বশতঃ ব্রহ্ম নিজকে জীব বলিয়া ভ্রম করেন (অদ্বৈতবাদ)। আর একটি মত এই যে, জীব ব্রহ্মের অংশ (বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ)। শেষের এই মতটিই যথার্থ। অন্য মত-গুলি যথার্থ নহে। কারণ, শ্রুতিতে কোনও স্থানে ব্রহ্মকে জীব হইতে ভিন্ন বলা হইয়াছে, আবার কোনও স্থানে জীবকে ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন বলা হইয়াছে। জীব ব্রহ্মের অংশ হইলে এই দুই প্রকার শ্রুতিবাক্যই যথার্থ হয়। ইহাই বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের মত। যাঁহারা বলেন, জীব ও ব্রহ্ম একান্ত ভিন্ন, তাঁহারা বলেন যে, যে শ্রুতিবাক্যে উভয়কে এক বলা হইয়াছে, তাহার মুখ্য অর্থ গ্রহণ না করিয়া গৌণ অর্থ গ্রহণ করিতে হইবে (অর্থাৎ ঐরূপ শ্রুতিবাক্যের অর্থ এই যে, জীব ব্রহ্মের ন্যায় আনন্দময়)। যাঁহারা বলেন যে, ব্রহ্ম অবিদ্যা হেতু নিজকে জীব মনে করেন, তাঁহারা বলেন যে, ব্রহ্ম ও জীবের মধ্যে ভেদবাচক শ্রুতিবাক্যে অবিদ্যা-কল্পিত এবং লোকপ্রসিদ্ধ ভেদকে লক্ষ্য করা হইয়াছে। এ-সকল মত সন্তোষজনক নহে,—কারণ, সকল শ্রুতিবাক্যের মর্য্যাদা রক্ষা করা হয় নাই। কেবল বিশিষ্টাদ্বৈতবাদে সকল শ্রুতিবাক্যের মর্য্যাদা রক্ষা করা হইয়াছে। উপাধি-সংযোগে ব্রহ্মই জীব হন, এ মতও ঠিক নহে। জ্ঞানী এবং শক্তিমান কোনও ব্যক্তি গৃহ প্রভৃতি উপাধির সংযোগে জ্ঞানহীন ও শক্তিহীন হইতে পারে না। সুতরাং ব্রহ্মও উপাধিসংযোগে জীব হইতে পারেন না।

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় (এম-এ)।

১
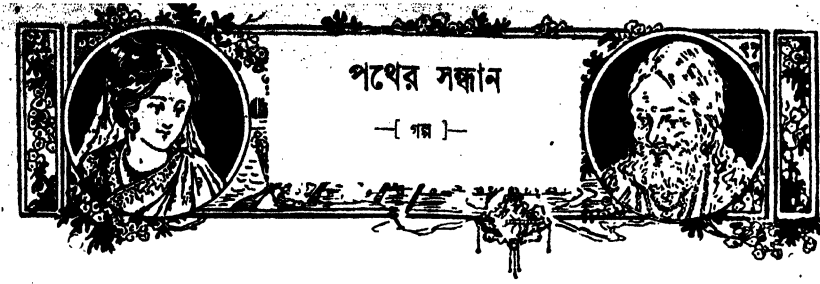
বাসায় ঝি-বামুন ছাড়া কেহ নাই। বহুক্ষণ অপেক্ষার পর অনাথবন্ধু তক্তপোষে আস্তৃত জীর্ণ মসলন্দের উপর দেহ এলাইয়া দিলেন। গলির মধ্যে পথচারী ও যানবাহনের চলাচলের বিরাম নাই। অনাথবন্ধু গবাক্ষের বাহিরে সন্নিবদ্ধদৃষ্টি হইয়া কত কি ভাবিতেছিলেন। উগাণ্ডার কালা জঙ্গলে রেলের ঠিকাদারী, বারো বৎসর পরে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন, পরম আত্মীয়-গৃহে আতিথ্য-স্বীকার,—এই বারো বৎসরের মধ্যে সহরের কি অভাবনীয় পরিবর্ত্তন!

ভগিনীপতি প্রসাদদাস কমার্সিয়াল আর্টিষ্ট, তাঁহারই গৃহে তিনি অতিথি। কমার্সিয়াল আর্টিষ্ট—যেন সোনার পাথর-বাটি! কেশতৈলের বিজ্ঞাপন, গন্ধদ্রব্যের বিজ্ঞাপন, ঔষধ-পথ্যের বিজ্ঞাপন, বীমার বিজ্ঞাপন, ব্যাঙ্ক ও হৌস-সমূহের বিজ্ঞাপন, ব্যবসায়ের যেমন ছড়াছড়ি, বিজ্ঞাপনেরও ততোধিক, বারো বৎসর পূর্ব্বে ইহার নামগন্ধও ছিল না। অক্ষরে ও চিত্রে ঐ সকল বিজ্ঞাপনের পরিকল্পনাকে মূর্ত্তি দেওয়াই ছিল প্রসাদদাসের পেশা, দিনগুজরাণের প্রধান উপায়। এই অর্ডারের পর অর্ডার, আবার দুই মাস কিছুই নাই—নিছক নিষ্কর্ম্মা বসিয়া থাকা, অনিশ্চিত আতঙ্কময় দুর্ভাবনার জীবন-যাত্রা! এই বিড়ম্বনাময় জীবন-যাত্রার সংসারে আতিথ্য স্বীকার,—নিতান্ত আপনার না হইলে—

তক্তপোষের একটা কোণে টিনের কৌটার ডালার উপর অর্দ্ধভুক্ত চুরুটটা আপনিই অযত্নে পুড়িয়া যাইতেছিল, অনাথবন্ধু উহা মুখে তুলিয়া দুই-চারিবার টান দিলেন।

বারো বৎসর! এক যুগ!—কি ভীষণ যুগান্তর! সহর ত চেনাই যায় না, সহরের সহুরে পুরুষ ও নারীও তথৈব চ—বিশেষতঃ বাঙ্গালী নারী! আশ্চর্য্য তাহার পরিবর্ত্তন! আর্টিষ্ট প্রসাদদাস প্রায় সারাদিনই ঘরের বাহিরে—হয় ষ্টুডিওতে, না হয় পথে পথে অর্ডারের সন্ধানে। তাঁহার গৃহিণী কল্পনা দেবী প্রায় তথৈব চ—হাফ-আর্টিষ্ট, বিদুষী কথাশিল্পী, কবি, নারী-সমিতির সেক্রেটারী, কত কি,—তাঁহারও ঘরের গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ হইয়া থাকা সকল সময়ে সম্ভব হইয়া উঠিত না। এই ত আজ সন্ধ্যা অতীত, অথচ গৃহে অতিথি সত্ত্বেও কর্ত্তা গৃহিণী যথাসময়ে গৃহে অনুপস্থিত। কন্যা মঞ্জুও বা এত রাত্রি অবধি কোথায়? ভগিনী ও ভাগিনেয়ীর সনির্ব্বন্ধ অনুরোধেই তিনি না চিত্ত-বিশ্রাম হোটেল হইতে ডেরাডাণ্ডা উঠাইয়া এখানে আসিয়া উঠিয়াছেন? কিন্তু যাঁহাদের আগ্রহ, তাঁহারা কোথায়?

ক্ষুণ্ণমনে তিনি এই কথাই চিন্তা করিতেছিলেন। ভাগিনেয়ী মঞ্জুর পরিবর্ত্তনই তাঁহার দৃষ্টিতে বিরাট বলিয়াই মনে হইতেছিল। মঞ্জু সুন্দরী, শিক্ষিতা, বাক্‌পটু,—ইহাতে সন্দেহ নাই। দেখিয়া গিয়াছিলেন তিনি তাহাকে ছয় বৎসরের ফুটফুটে মেয়েটি,—আর আজ সে কলেজের ছাত্রী, পৃষ্ঠে দীর্ঘ বেণী দোলাইয়া নিঃসঙ্কোচে হেথা-সেথা যাতায়াত করে, নির্ভীক নয়নে পরিচিত অপরিচিত পুরুষের সহিত আলাপ-পরিচয় করে। উগাণ্ডার দীর্ঘ নির্ব্বাসিত নিঃসঙ্গ জীবন অতিবাহনকালে প্রতীচ্যের সাহিত্যের মারফতে বহু আধুনিকার চরিত্র-চিত্রাঙ্কনের সহিত পরিচিত হইয়াছিলেন। মঞ্জু ঠিক সে ভাবের না হইলেও কতকটা যে সেই ভাবের, তাহা তিনি নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারেন। মাথায় তাহার কর্ত্তিতালক বব্‌ড্‌-হেয়ার অথবা অধরোষ্ঠে সিগারেট নাই বটে, সে তাহার পুরুষ বন্ধুদের মত যৌবন-মদোদ্ধত গর্ব্বিত চরণবিক্ষেপে চলে না বটে, উপানৎশোভিত চরণ চেয়ারের উপর উত্তোলিত করিয়া মাথা হেলাইয়া

চোখের চাহনি হইতে লজ্জা ভয় সঙ্কোচ বিদায় দিয়া বয়োজ্যেষ্ঠ আগন্তুকের সহিত সমান ওজনে আলাপ-পরিচয় করে না বটে, কিন্তু—কিন্তু—তবুও—

কাল অপরাহ্ণে খিদিরপুরের কায সারিয়া ফিরিবার পথে ইডেন উদ্যানে বায়ু-সেবনের উদ্দেশ্যে গাড়ী হইতে নামিয়া যাহা দেখিয়াছেন, তাহা কি তিনি জীবনে ভুলিতে পারিবেন? পর পর তিনখানি বাসগাড়ী উদ্যানের ফটকে দাঁড়াইয়া—তিনখানি বাঙ্গালী ছাত্রী বোঝাই—তিনখানিরই অঙ্গে ভবানীপুরের কোন এক নারী-শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের নামাঙ্কিত। গাড়ীগুলি কয়খেপ যাতায়াত করিবে এবং প্রতি খেপে কত যাত্রী বহন করিবে, সে সম্বন্ধে সোফারের সহিত অভিভাবিকা প্রধান শিক্ষয়িত্রীর কথোপকথন হইতে তিনি বুঝিয়া লইয়াছিলেন যে, অন্ততঃ ছাত্রীর সংখ্যা দেড় শতেরও কম হইবে না। কথার ভাবে বুঝিয়াছিলেন, তাঁহারা শিবপুর বাগানের ফেরত যাত্রী, সেখানে তাঁহাদের একস্কার্সান ছিল।

বালিকা, কিশোরী, যুবতী, প্রৌঢ়া—তা ছাড়া সহযাত্রী পুরুষও দুই তিন জন। বোধ হয়, প্রৌঢ়া ও পুরুষরা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষক ও শিক্ষয়িত্রী।

ছাত্রীদের মধ্যে একার্দ্ধেরও অধিক বাসগাড়ীতে স্থান পাইল না, সুতরাং তাহারা বাগানের মধ্যে বনকুরঙ্গীর মত ছুটাছুটি হুড়াহুড়ি আরম্ভ করিয়া দিল,—তাহাদের প্রত্যেক গতিতে উদ্দাম অসহনীয় কৈশোর যৌবনের প্রাণ-স্পন্দনের স্ফূর্ত্তি বিকসিত হইতে লাগিল! উগাণ্ডার জঙ্গলের জঙ্গলী মানুষ—তাঁহার চোখে এ এক অভিনব ব্যাপার বলিয়া অনুমিত হইবে, ইহাতে বিস্ময়ের বিষয় কি আছে? পাছে যূথ-ভ্রষ্ট হইয়া কেহ বিপথে ধাবিত হয়, এ জন্য অভিভাবক ও অভিভাবিকারা অনুযোগ অথবা তাড়না করিলে দুই একটি তরুণী যে জবাব দিয়াছিল, তাহা এখনও তাঁহার কাণে বাজিতেছে! কয়টি ভিন্‌দেশী বিধর্ম্মী তরুণ, তরুণীদের প্রতি কটাক্ষপাত করিয়া আপনাদের মধ্যে মৃদুস্বরে যে আলোচনা করিয়াছিল, তাহা এখনও তাঁহার মনে কাঁটার মত বিঁধিতেছে। জঙ্গলের মানুষ— সংসার ও সমাজের মঙ্গলস্পর্শ হইতে দূরে জঙ্গলে হিংস্র শ্বাপদসমূহের মধ্যে নির্ব্বাসিত এই জঙ্গলী মানুষটির কাছে এ সব পরিবর্ত্তন পৃথিবীর অষ্টম আশ্চর্য্য বলিয়া বোধ হইবে না?

"একলা ব'সে আছেন, মামাবাবু? বাঃ! বাঃ, কী?"

মঞ্জু কখন কক্ষে প্রবেশ করিয়াছিল, গম্ভীর চিন্তামগ্ন অনাথবন্ধু তাহা জানিতে পারেন নাই। অতর্কিত প্রশ্নে চমকিত হইয়া বলিলেন, "হাঁ মা, একলাই রয়েছি বটে। কটা বাজলো? ওঃ, প্রায় দশটা? তুমি কোথা ছিলে, মা —ক্লাবে? কি রিহার্শাল হ'ল তোমাদের?"

পার্শ্বের কক্ষে মঞ্জু বেশ পরিবর্ত্তন করিতেছিল, বলিল, "না, আজ আমাদের ক্লাবের দিন ছিল না। শিশির-দাদের ওখানে গিয়েছিলুম ইকনমিকস্‌টা বুঝে নিতে—শিশির-দা এম, এ-তে ইকনমিকস্ নিয়েছে কি না—"

"তুমিও বুঝি ঐ সাবজেক্ট নিয়েছ? তা বেশ। শিশির-দা?"

"শিশির-দাকে জানেন না? রেবার বড়দা—ঐ যে আমাদের গলির মোড় পেরিয়ে বড় রাস্তার উপর মস্ত ফটকওলা বাড়ী—"

"হুঁ"—অন্যমনস্কভাবে জবাব দিয়া অনাথবন্ধু মাথার মধ্যে অতীতের কোন একটা ঘটনা স্মৃতিপথে আনিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। গলির মোড় পারে বড় রাস্তার উপর—মস্ত ফটকওলা বাড়ী—ভোরের অন্ধকার—বাসগাড়ী—

মঞ্জু ঘরে আসিয়া বলিল, "খেতে রাত হয়ে যাচ্ছে বোধ হয় আপনার, মামাবাবু? আমরা একটু রাত ক'রে খেয়ে থাকি।"

"তা বেশ কর। বলছিলুম কি, এমনি রোজ রাত ক'রে একলা ঘরে ফেরো?"

ক্ষণকাল বিস্মিতভাবে মুখের দিকে তাকাইয়া মঞ্জু স্মিতমুখে বলিল, "ওতে খুব বদনাম হয় বুঝি আমার?"

মঞ্জুর অবজ্ঞামিশ্রিত হাসি অনাথবন্ধুকে বিন্দুমাত্র বিচলিত করিল না, এমন কথা বলা যায় না। তবে তাঁহার মুখের হাসি বিলুপ্ত হইল না। তিনি সহজস্বরে কথাটার জবাব দিতে যাইতেছিলেন; কিন্তু তৎপূর্ব্বেই মঞ্জু ভিতরে চলিয়া গেল।

অনাথবন্ধুর অনুশোচনা হইল, কেন তিনি এমন অযাচিত অপ্রিয় প্রশ্ন করিতে গেলেন? মঞ্জুদের সহিত তাঁহার কিসের সম্বন্ধ—কয় দিনেরই বা সম্বন্ধ? না, কালই তিনি তাঁহার বীরভূমের শান্ত পল্লীবাসে চলিয়া যাইবেন। সেখানে

বাঙ্গালা পল্লীজননীর চেলাঞ্চলে লুক্কায়িত স্নিগ্ধ শ্যাম-শোভা-মণ্ডিত গ্রাম্য কুটীরে কিরণদের সহবাসে তাঁহার স্নেহমায়া-বুভুক্ষু নিঃসঙ্গ জীবন দিন কয়েক বেশ আনন্দেই কাটিবে। সহরের মোটর বিজলীর কৃত্রিম জীবনের অবিরাম অবিশ্রান্ত দ্রুত জীবন-স্পন্দন!—প্রাণ যেন হাঁপাইয়া উঠিতেছে!

যাইতে ত হইবেই—কিন্তু—কিন্তু, মঞ্জু? এই কয় দিনেই সেই কুহকিনী মায়াবিনী যে তাঁহাকে আপনার করিয়া লইয়াছে—তাহাকে ছাড়িয়া তিনি ত এক দিনও থাকিতে পারেন না। এ কি বিড়ম্বনা! চিরদিনই লোকালয় হইতে, সমাজ হইতে, দূরে নিঃসঙ্গ নিরবলম্ব জীবন অতি-বাহিত করিয়া আসিয়াছেন,—এ কি পায়ের নূতন শিকল স্বহস্তে গড়িয়া তুলিতেছেন!

দূর জ্ঞাতিপুত্র কিরণচন্দ্র তাঁহারই কল্যাণে লেখাপড়া শিখিয়া মানুষ হইয়াছে। তিনিই তাহার বিবাহ দিয়া সিউড়ী সহরে স্থিতভিত করিয়া দিয়াছেন, সে এখন সদরের জুনিয়র উকিল। সুখেই হউক বা দুঃখেই হউক, সে আপনিই আপনার সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া তৃপ্তি অনুভব করে, জ্ঞাতি খুল্লতাতের মুখাপেক্ষী হইতে চাহে না। সে তাঁহারই আদর্শে আত্মনির্ভরশীল হই-য়াছে। আজ তাহারই গৃহে—যদিও সে ঘরবাড়ী-বাগান-পুকুর তাঁহারই দেওয়া—তিনি কিছুদিনের জন্য বিশ্রামসুখ উপভোগ করিতে যাইবেন মাত্র, নতুবা তাহার সহিত তাঁহার সম্পর্ক কি?

কিন্তু মঞ্জু? মঞ্জু ছাড়া তাঁহার ত কেহ নাই। সেই মঞ্জুকে কি মনের মত করিয়া গড়িয়া তোলা যায় না? অন্যথা তাঁহার বিপুল সম্পত্তি কি কিরণচন্দ্রের—থাক!

"কি গো বাবুসাহেব, খানাটানা তৈরী? না? উঃ! দশটা কুড়ি? ওঁরা আসেন নি বুঝি? মঞ্জু?"

আটিষ্ট ভগিনীপতির রকম-সকম দেখিয়া অনাথবন্ধু হাস্যসম্বরণ করিতে পারিলেন না। মাথায় এক ঝাঁকা চুল, তাহাও অযত্ন-বিন্যস্ত, বেশভূষাও প্রায় তদ্রূপ—যেন কিম্ভূত-কিমাকার! বয়স্থা অনূঢ়া কন্যার দরিদ্র পিতার মত তাঁহাকে আদৌ অনুমিত হইতেছিল না। বেশ পরিবর্ত্তন করিতেও ভুলিয়া গিয়া তিনি শ্যালকের পার্শ্বে মোটঘাট সমেত বসিয়া পড়িলেন এবং নির্ব্বাণোন্মুখ সিগার হইতে ধূম উদ্গিরণের প্রয়াস পাইতে লাগিলেন।

হাসিতে হাসিতে অনাথবন্ধু বলিলেন, "দশটা কুড়ি না কি? তবু ভাল, হুঁস হয়েছে বাবু সাহেবের। মঞ্জু এত রাত্তে এলো না এলো, সে খোঁজেরও দরকার হয় না বুঝি? ভাল!"

প্রসাদদাস চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া তাঁহার দিকে ক্ষণ-কাল তাকাইয়া রহিলেন। তাহার পর ধীরে ধীরে বলিলেন, "উপযুক্ত ছেলে রাত দশটার পর ঘরে এলে বলা হয় না ত কিছু।"

বিরক্তিভরা সুরে অনাথবন্ধু বলিলেন, "ছেলে আর মেয়ে?"

প্রসাদদাস বলিলেন, "কেন, তফাৎ কি? জ্ঞান হয়েছে, লেখাপড়া শিখছে, ভাল-মন্দ বিচারের শক্তি হয়েছে—ওহোহো, তাও বটে, কাকে কি বলছি! দেখো, ও-সব ঠাকুরমা-ঠানদিদের চশমা খুলে ফেলে দেখতে হবে এ যুগের মানুষকে, বুঝলে?"

কিছুক্ষণ নিরুত্তর থাকিয়া অনাথবন্ধু দীর্ঘশ্বাস নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন, "হুঁ, তা বটে, তফাৎ কিছুই নেই।"

"ঢোক গিলে বললে যে? বলতে চাও কি—ঘোমটা টেনে ঘরের কোণে ব'সে থাকবে ওরা? ছেলেবয়সেই থুবড়ী হয়ে থাকবে? হাসবে না, খেলবে না, আলো-বাতাসে বেরুবে না? এই ধর না গিয়ে তোমার ভগ্নীটি—"

"কেন, ভগ্নীটি আবার কি করলে? দাদা কতক্ষণ এলে? বোসো, এখনই আসছি,"—এক তাড়া খাতাপত্র বগলে করিয়া ভগিনী কল্পনাদেবী কক্ষে প্রবেশ করিলেন। কিন্তু ভিতরে যাওয়া দূরে থাকুক, পরিশ্রান্ত অবসন্ন দেহে তিনিও একখানা আসনে বসিয়া পড়িলেন।

প্রসাদদাস বলিলেন, "তোমার দাদা বলছিলেন"—

অনাথবন্ধু বলিলেন, "কি মন্দ বলছিলেন? তোমরা কর্ত্তা-গিন্নীতে হিল্লী-ডিল্লী টহল দিয়ে ফিরলে বাড়ী রাত দশটায়, আর অত বড় বিয়ের যুগ্যি মেয়ে রইল বাইরে কি ঘরে, তা দেখবার দরকারও হ'ল না তোমাদের, বাঃ! চমৎকার ব্যবস্থা!"

কল্পনাদেবী বিন্দুমাত্র অপ্রতিভ না হইয়া বলিলেন, "কেন, বিশ্বাস হয় না একলা ছেড়ে দিয়ে মেয়েকে? পাহারা বসিয়ে দিতে হবে?"

"না, তা বলছি না,—ওদের খাঁচায় পুরে রাখতে কেউ বলে না,—তবে একলা রাত-বিরেতে যার তার সঙ্গে—"

কথায় মধ্যপথে বাধা পড়িল, মঞ্জু আসিয়া বলিল, "খাবার তৈরী, মা। পাশের বাড়ীতে রেবা ফোন করছিল, কাল ওরা কোলাঘাটে পিকনিকে যাবে। কি বন্দোবস্ত হবে, ঠিক করবার জন্তে আমায় ডাকছে শিশিরদা। তোমরা খেতে বোসো, আমি এলুম ব'লে।"

উত্তরের প্রতীক্ষা না রাখিয়াই এক ঝলক বিদ্যুতের মত দেখা দিয়া মঞ্জু ঘর আঁধার করিয়া বেণী দোলাইয়া চলিয়া গেল। সে প্রায় নিরাভরণা, কিন্তু তাহার রূপের জ্যোতির কাছে আভরণ ম্লান হইয়া যায়। অনাথবন্ধুর নয়নদ্বয় স্নেহরসে আর্দ্র হইয়া আসিল, সন্তানহীনের সন্তানের বুভুক্ষা শতমুখে তাঁহার হৃদয়মধ্যে জ্বলিয়া উঠিল। আজ তাঁহার যদি এমনই একটি সঞ্চারিণী পল্লবিনী লতার মত মেয়ে থাকিত!

কল্পনাদেবীর আহ্বানে তাঁহার মোহ ভঙ্গ হইল। আহার্য্যাদি পরিবেষণের বন্দোবস্ত করিতে যাইবার পূর্ব্বে কল্পনাদেবী তাঁহাদিগকে প্রস্তুত হইতে বলিয়া গেলেন। অনাথবন্ধুর সে দিকে কাণই ছিল কি না সন্দেহ, তখন তিনি এই আধুনিক বাঙ্গালী সংসারের অভিনবত্বের কথাই ভাবিতেছিলেন। হঠাৎ শুনিলেন, প্রসাদদাস তাঁহার মোটঘাট গুছাইয়া রাখিবার সঙ্গে সঙ্গে বলিতেছেন,—"গরীবের ঘরের ডালভাত রুচবে কি হোটেলের খানাপিনার পরে?"

অন্যমনস্কভাবে অনাথবন্ধু জবাব দিলেন, "ডালভাত? তাই দিও পেট ভ'রে,—জঙ্গলে তাও যে কত দিন জোটে নি, ভাই!"

২

"দেখো না মামাবাবু, কি সুন্দর!" মঞ্জু এখন অনাথবন্ধুকে খুবই আপনার করিয়া লইয়াছে, তাই 'আপনি' এখন 'তুমি'তে দাঁড়াইয়াছে।

মস্ত বড় গোলাপের তোড়া। অনাথবন্ধু বলিলেন, "বাঃ, চমৎকার! কোথায় পেলে মা, পাওয়াপুরীতে?"

মঞ্জু এক গাল হাসিয়া বলিল, "হাঁ মামাবাবু। ওটা আমায় কমলারা বিউটি প্রাইজ দিয়েছে সেখানে।"

"বিউটি প্রাইজ? তার মানে?"

"মামাবাবু যেন কি! তাও জানো না? পাওয়াপুরীর জৈন মন্দিরে বিস্তর জৈন মেয়েছেলে এসেছিল পুজো দিতে। তা কমলারা—ঐ যে গো কাল সন্ধ্যার পর ধরমশালার দক্ষিণদিকে যাদের ঘরে নাচগান হয়েছিলো—ঐ কমলাদের বাবা ইন্দ্রনারাণ বাবু—তাঁর মেয়েরা বাছাই ক'রে—"

অনাথবন্ধু হাসিয়া বলিলেন, "ওঃ! বুঝেছি, বাছাই ক'রে তোমায় সবচেয়ে সুন্দর দেখে প্রাইজ—"

বাধা দিয়া মঞ্জু বলিল, "বল ত গোলাপের তোড়াটা কিসের? গন্ধ পাচ্ছো গোলাপের? হাঃ হাঃ! মামাবাবু কিছু ধরতে পার নি তুমি—বাবা! ও বাবা! এই দেখো ত তোড়াটা, কিসের বল ত?"

মঞ্জুর বালিকাসুলভ আলাপে কক্ষটি যেন জীবন্ত হইয়া উঠিল। নতুবা এতক্ষণ অনাথবন্ধু এই ধর্ম্মশালার কক্ষমধ্যে একাকী অবস্থান করিয়া অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছিলেন। তাঁহার ভগিনী স্বামীর সহিত অন্য এক ধর্ম্মশালায় প্রবাসের বন্ধুদের সহিত আলাপ করিতে গিয়াছিলেন, এইমাত্র স্বামীর সহিত ফিরিয়া আসিয়াছেন।

পিতামাতা এক সঙ্গে বলিয়া উঠিলেন, "বাঃ, চমৎকার!"

মঞ্জু হাসিতে হাসিতে বলিল, "দুয়ো! সত্যিই তোমরা মামাবাবুর মত ভেবেছো এটা সত্যিকারের তোড়া, না? হাঃ হাঃ! এটা যে মাছের আঁশের তৈরী। কি চমৎকার সিল্কের উপর বুনেছে কমলারা, না?"

প্রসাদদাস বলিলেন, "বাঃ, তাই ত রে! এটিকে মডেল ক'রে খাসা একখানা পেন্টিং করা যায়।"

অনাথবন্ধু হাসিয়া বলিলেন, "ব্যাক্ গ্রাউণ্ড হবে কি তার তা হ'লে এই রাজগীরের পাঁচ পাহাড়ের পাঁচ চূড়ো? বাঃ বাঃ!"

কল্পনা বলিলেন, "তা হ'লে তোমরা গল্প-সল্প কর, আমি গিয়ে দেখি, মহারাজজী পুরী-তরকারীর কি শ্রাদ্ধ করছেন।" কল্পনা পার্শ্বের পাকশালার দিকে চলিয়া গেলেন।

আজ দশ দিন হইল মঞ্জুরা রাজগীরের এই ধর্ম্মশালায় আসিয়া উঠিয়াছে। রাজগীরের পাহাড় জঙ্গলের সঙ্গে সপ্তধারার একখানি তৈল-চিত্র অঙ্কনের অর্ডার আসিয়াছিল তাহার পিতার। অনাথবন্ধুর টালীগঞ্জের নূতন বাড়ী হইতেছে, তিনি তাই প্রথমে আসিতে চাহেন নাই, কিন্তু শেষ মুহূর্ত্তে মঞ্জুর আবদার এড়াইতে পারেন নাই, তাই তিনিও তাহাদের সঙ্গী হইয়াছেন। তবে এই সর্ত্তে যে,

কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তনের পর মঞ্জু কিছু দিনের জন্য তাঁহার শিউড়ীর পৈতৃক আবাস-ভবনে বেড়াইয়া আসিতে কোন ওজর আপত্তি করিবে না।

পাঁচচূড়ার কথা উঠিতেই মঞ্জু বলিল, "সত্যি মামাবাবু, তোমরা বড় কুণো, এক দিনও পাঁচচূড়োর এক চূড়োতেও উঠলে না। এত ক'রে পাওয়াপুরী যেতে বললুম, কেমন পিকনিক হোলো—"

অনাথবন্ধু বাধা দিয়া বলিলেন, "হাঁ, হাঁ, কেমন পিকনিক হ'ল বল ত মা—খুব আমোদে দিন কাটলো, না? কেমন দেখলে মন্দির? ট্যাক্সি একবারে পুকুরপাড়ের মন্দির অবধি গেল তোমাদের নিয়ে?"

মঞ্জু হঠাৎ গম্ভীর হইয়া তাড়াতাড়ি বলিল, "ভাল কথা, ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে রয়েছে যে ফটকে—মা, ও মা,—ট্যাক্সি-ভাড়াটা—বা রে, মা কোথায় গেল?"

মঞ্জু দ্রুতপদে পাকশালার অভিমুখে চলিয়া গেল। প্রসাদদাসের মুখ পানে তাকাইয়া অনাথবন্ধু দেখিলেন, আপন-ভোলা আর্টিষ্টটি কন্যার কথা যেন শুনিয়াও শুনেন নাই, এমনই ভাবে অন্যমনস্ক হইয়া বসিয়া আছেন। ঈষৎ হাসিয়া অনাথবন্ধু ফটকে গিয়া ট্যাক্সি-চালককে বিদায় করিয়া দিলেন। তাহারই মুখে শুনিলেন, তিনখানি ট্যাক্সি বিহার সরিফ হইতে ভাড়া করিয়া আনা হইয়াছিল, দুইখানি অন্য দুইটি ধর্ম্মশালা হইতে বিদায় হইয়াছে, এখানির এই ধর্ম্মশালা হইতে বিদায় হইবার কথা। এমনভাবে ভগিনী-পতির অস্বচ্ছল সংসারে অভাব-অনাটন মিটাইয়া পাওনাদারকে বিদায় করা অনাথবন্ধুর পক্ষে এই প্রথম নহে, অথচ এ সব সাহায্যদান গোপনে অপরের অজ্ঞাত-সারেই সম্পন্ন হইত। যদি কখনও ইহাতে আপত্তি উত্থাপিত হইত, তাহা হইলে হোটেলে পুনঃ স্থানান্তরিত হইবার ভয় দেখাইয়া নিরস্ত করা হইত। বস্তুতঃ কিছু দিন হইতে মঞ্জুর আবদার-বাহানা-জাত সমস্ত অতিরিক্ত ব্যয়ভারই তিনি বহন করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। ভগিনী বা ভগিনীপতি কিছু বলিলে বলিতেন যে, তাঁহার অবর্ত্তমানে যখন তাঁহার সমস্ত সম্পত্তিই মঞ্জুর হইবে, তখন এই ব্যয়ে কোন আপত্তিই উঠিতে পারে না। টালিগঞ্জে যে সৌধ নির্ম্মিত হইতেছিল, মাঝে মাঝে তিনি মঞ্জুকে তাহার নির্ম্মাণকার্য্য দেখাইয়া আনিতেন। কোথায় কিরূপ ঘর, দালান বা বারান্দা হইবে, কি প্রকারের বাথ-রুম বা ষ্টোর রুম হইবে, কোন্ জলে কি ভাবে কি পরিমাণে জল সরবরাহের বন্দোবস্ত হইবে,—এ সব বিষয়ে মঞ্জুর পরামর্শই প্রায়ই হইত 'ফাইনাল'। সত্যই মঞ্জু তাঁহার পরম প্রিয় পুত্রের স্থানই অধিকার করিয়াছিল। কাযেই তাহার ট্যাক্সি-ভাড়া চুকাইয়া দেওয়ায় বিস্ময়ের বিষয় কিছুই ছিল না। প্রসাদদাস এ যাবৎ এইরূপ সাহায্যদানে বিশেষ আপত্তি করেন নাই—যদিও তাঁহার পত্নী এ বিষয়ে ভিন্ন মত পোষণ করিতেন। কিন্তু এ ক্ষেত্রে হঠাৎ প্রসাদদাস গদ-গদকণ্ঠে বলিয়া ফেলিলেন,—"ভাই অনাথ, তোমার ঋণ—"

অনাথবন্ধু বিস্মিত হইয়া বাধা দিয়া বিদ্রূপের ভঙ্গীতে বলিলেন, "বাঃ, বক্তৃতাও তা হ'লে আসে দেখছি আর্টিষ্টের! বাহবাঃ!"

"না ভাই, ঠাট্টা না—"

পুনরায় বাধা দিয়া অনাথবন্ধু বলিলেন, "কে বলেছে ঠাট্টা? দেখো ভাই, সোজা কথা বলি, জান ত আমি সোজা কথার মানুষ। মঞ্জুর বিয়ে-থা দেবে, না এমনই দিন কেটে যাবে? এমন মেয়ে যার ঘরে যাবে, তার ঘর আলো ক'রে থাকবে, এ কথা জান ত?"

প্রসাদদাস দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, "আলো ত করবে—কিন্তু—"

"কিন্তু কি?"

"অর্থাৎ আলো করা ছাড়া এখনকার কালে আরও কিছু করা চাই যে বিয়ের কনের।"

"কি, টাকা-কড়ি?"

"তা ত আছেই, তা ছাড়া—"

"আবার কি?"

"লেখাপড়া—"

"তাতেও ত মঞ্জু কম যায় না।"

"না। কিন্তু তাতেও কুলোয় না—ওর উপরে আরও কিছু চাই।"

অনাথবন্ধু বিস্মিত ও বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "কি, কথাটা ভেঙ্গেই বল না হে, হেঁয়ালীর দরকার কি? বলি, রূপ-গুণ ছাড়া আর কি? রান্নাবান্না বুঝি?"

"আরে না না,—ও সব সেকেলে দাবী—ও সব বামুন-ঠাকুরদের ডিউটি! এখনকার দাবী অন্য রকমের। দেখো,

তুমি আসবার আগে মঞ্জুকে ক' যায়গা থেকে দেখতে এসেছিল। পাওনার হাঁক-ডাকে ত পেটের পিলে চমকে গিয়েছিল। এক পাত্তোর দেখতে এসে—"

উত্তরোত্তর বিস্মিত হইয়া অনাথবন্ধু বলিলেন, "পাত্তোর দেখতে এসেছিল, তার মানে ?"

প্রসাদদাস হাসিয়া বলিলেন, "তাও বটে! উগাণ্ডার খাস জঙ্গলী—একেবারে বন থেকে বেরুলো টিয়ে—জানবে কি ক'রে এ সব। এখনকার কালে যে পাত্তোর নিজে কনে পছন্দ করবার আগে বাজিয়ে নেয় হে।"

"বাজিয়ে নেয় ? যেমন ক'রে দোকানে হাঁড়ি সরা বাজিয়ে নেয় ?"

"হাঁ, তাই। এ পাত্তোরটি এম-এ,—কলেজে প্রফেসারি করে, খেংরা-কাঠিটি দেখতে, চোখে পাঁশনে, একবারে আবলুস কাঠ! তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, পিয়ানো বাজিয়ে গাইতে জান ?"

অনাথবন্ধু বিদ্রূপের হাসি হাসিয়া বলিলেন, "নাচতে জানে জিজ্ঞাসা করেনি ?"

"তা ত করেছিলই, এ-সব নাকি এখনকার কালে বিয়ের কনেদের গুণের অঙ্গ! কি বলবো, পয়সা নেই, নইলে মুখের মত জবাব দিতুম। তবে মঞ্জু পুষিয়ে নিয়েছে ঐ অভাবটা। সে কি জবাব দিয়েছিল জানো ?"

"না, কেমন ক'রে জানবো ?"

"বলেছিল,—আমারও কিছু জানবার আছে। আপনি ছেলে পড়িয়ে কত পান ? সে মাইনেয় লোকজন রেখে সংসার চালিয়ে নাচিয়ে গাইয়ে পিয়ানো বাজিয়ে পরিবার পুষতে পারবেন ? আমার রকম-বেরকমের সাড়ী-ব্লাউজের দাম জোগাতে পারবেন ? হাঃ হাঃ! জান ত মঞ্জুর জিবখানি ? যেন ক্ষুরের ধার।"

অনাথবন্ধু মহা তৃপ্তি ও স্বস্তি অনুভব করিতেছিলেন। হঠাৎ উচ্চ হাস্যরোলে কক্ষ প্রকম্পিত করিয়া বলিলেন, "খাসা মেয়ে আমার মা-লক্ষ্মী। ওকে ঠিকমত গ'ড়ে তুলতে পারলে কি চমৎকার হয়! ওঃ! পাত্তোর এম-এ পাশ—তবে ত মাথা কিনেছে! যা ওঁদের কদর এ কালে। জানো, উগাণ্ডায় একটা দিশী ডাক্তার দরকার হয়েছিল, আউট ডোরের জন্যে। তা, কলকাতায় এম-বি পাশ ছেলের দশ বারোটা দরখাস্ত পড়েছিল সেই কালাজঙ্গলে চাকরীর জন্যে,—তা এম-এ পাশ!"

"তাই না কি ?"

"টাকার শ্রাদ্ধ ক'রে ছ বছর ডাক্তারী পড়িয়ে তবে ফল কি ? তার চেয়ে একটা হোমিওপ্যাথির বাক্স নিয়ে ব'সে হেতুড়েরা কত বেশী উপার্জ্জন করে!"

"কিন্তু গরীবের ঘরে ঐ রকমই ত সব সম্বন্ধ আসছে, আবার তার গাঁই কত! আবদার বায়না দাবী কত!"

"দেখো, একটা কথা শোন। টাকার জন্যে ভেবো না। কিন্তু সত্যিই একটা ভাল পাত্র দেখদিকি। আঃ থাম,—ও সব সাহেবী কেতায় শুকনো ধন্যবাদ চাইছি না। বিয়ের খরচ সবই দেবো, তোমায় কিছু ভাবতে হবে না,—তবে আমার একটা সর্ত্ত আছে।"

প্রসাদদাসের বক্ষ স্পন্দিত হইল, কম্পিত-কণ্ঠে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "সর্ত্ত ? সে আবার কি ?"

গম্ভীরভাবে প্রসাদদাস বলিলেন, "বলছি। এদ্দিন তোমাদের সঙ্গে বসবাস ক'রে বুঝেছি, কোন কোন বিষয়ে আমাদের মধ্যে মতের মিল হলেও অন্য কয়টি বিষয়ে আমাদের ধারণা আর মতের মধ্যে আকাশ-পাতাল তফাৎ। তফাৎটাকে কিন্তু আমাদের মানিয়ে জুনিয়ে একটু কাছে ক'রে আনতে হবে। যদি তা না হয়, তা হ'লে আবার তল্পীতল্পা বেঁধে উগাণ্ডার জঙ্গলে জঙ্গলী মানুষ ফিরে যাবে।"

উৎকণ্ঠা-ব্যাকুল স্বরে প্রসাদদাস বলিলেন, "ধারণার তফাৎটা কি হ'ল ?"

ডাক্তার দুষ্ট ব্রণে অস্ত্রোপচার করিবার পূর্ব্বে রোগীকে যেমন আশ্বস্ত ও শঙ্কাশূন্য করিবার চেষ্টা করিয়া থাকেন, অনাথবন্ধুও তেমনই করিয়া প্রসাদদাসকে বলিলেন, "কথাটা খোলসা ক'রে বলতে হ'লে একটু কঠোর হবে, ভাই। কিন্তু তুমি আমি ত অভেদ নই, মঞ্জু তোমাদেরও যেমন, আমারও তেমনই আপনার।" কথাটা বলিবার সময় তাঁহার কণ্ঠ ঈষৎ বাষ্পরুদ্ধ হইয়া আসিল।

প্রসাদদাস উত্তেজিত-কণ্ঠে বলিলেন, "পাঁচশো বার! তুমি মঞ্জুর জন্যে যা করছো—"

কথা শেষ করিতে না দিয়া অনাথবন্ধু বলিলেন, "ভাই বলছি, মঞ্জুকে একটু আলাদা রকম ক'রে গ'ড়ে তোলবার

দরকার হয়েছে ব'লে মনে করছি। আশ্চর্য্য বোধ করছ? না, না, এতে আশ্চর্য্য হবার কিছু নেই। তোমরা স্ত্রী-পুরুষে সত্যই ভিন্ন জগতের—আমাদের থোড়বড়ি-খাড়ার সংসারের নও"—

"এ হেঁয়ালী"—

"হেঁয়ালী না। তুমি আর্টিষ্ট, সংসারের ধার ধারো না, বাইরেই কাটাও। কল্পনাও প্রায় তাই—সমিতি আর পত্রিকা নিয়েই মসগুল—তোমরা এক একটা জিনিয়াস—"

"হাঁ, হাঁ, তামাসা করতে পারো বটে—"

"ঠাট্টা না, সত্যি, সে জন্যে তোমাদের শ্রদ্ধা করি। তা হলেও আমি হলুম কিন্তু মাটীর পৃথিবীর মানুষ—তোমাদের আকাশ-বাতাসের কল্পনারাজ্যের সঙ্গে আমার সম্পর্কই নেই। আমার আছে টাকা আনা পাই আর আহার নিদ্রা, ব্যস্!"

"আরও জুতো আছে?"

"উল্টো বুঝো না ভাই। জিনিয়াস হওয়া ভাল, কিন্তু সংসারধর্ম্মো করতে হলে, ছেলে-মেয়ে পালন করতে হলে, আমার মত মাটীর পৃথিবীতে নেমে আসতে হবে, কেবল আকাশের দিকে চোখ মেলে থাকলে চলবে না, বুঝলে?"

"না, এখনও বুঝলাম না।"

"অর্থাৎ সংসারী হ'তে হলে,—সামনের দুটো চোখ ছাড়া পিছনে ও উপরে নীচে আরও তিন জোড়া চোখ রাখতে হবে। ফেলফেল ক'রে চেয়ে রয়েছো যে? বুঝলে না তবুও? আচ্ছা, মঞ্জুর লেখাপড়ার কথাটাই ধর না। কি ভাবে ও লেখাপড়া শিখছে, কোথায় যায়, কাদের সঙ্গে বেড়ায়, কখন্ বাড়ী আসে না আসে,—তোমাদের এই একটা মেয়ে—তাও দেখবার সময় পাও না? না, দরকার ব'লে মনে কর না? এক দিন কলকাতায় ঐ কথা পাড়তেই ক্ষেপ্পা হয়ে উঠেছিলে না?"

কিঞ্চিৎ পরুষকণ্ঠে প্রসাদদাস বলিলেন, "এ তোমার ভাই খুব অন্যায়! মঞ্জু বড় হয়েছে, লেখাপড়া শিখেছে, নিজের দায়িত্বজ্ঞান হয়েছে, সে নিজের ভার নিজে নিতে পারে না? ওদের অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে দেখতে হবে? তার মানে কি? ওদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে যাওয়ার দরকারই বা কি?"

অনাথবন্ধু ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "বা রে, তা কেন? আমি কি বেত নিয়ে মঞ্জুকে শাসন করতে বলছি, না তাকে ব্রতকথার ছড়া শেখাতে বলছি? কেবল বাপ-মার স্নেহদৃষ্টির শাসন, তার সঙ্গে বন্ধুর মত ব্যবহার করা। যতই ওদের স্নেহের মুখ থেকে লাগাম খুলে নাও না কেন, তবুও সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গটা ওদের কি রকমের হচ্ছে, তার খবরও রাখতে হবে বিশেষ ক'রে—"

প্রসাদদাস বিচলিত হইয়া বলিলেন, "এ কথা বলবার মানে? কি করেছে মঞ্জু—কি দেখছো তুমি? সে ত আমার তেমন মেয়ে নয়।"

"ঠিক কথা। সেই জন্যই ওর উপর নজর রাখার দরকার—অমন মেয়ে—"

"দেখো, কথা চাপা দিও না, কি দেখেছো বা শুনেছো, বল।"

"তা নাই বা বল্লুম—"

"না, বলতেই হবে। কথা যখন পেড়েছো, তখন শেষ অবধি সবটা খোলাখুলি বলতেই হবে তোমায়। আর আমি ওর বাবা—"

"আঃ, ভাল বিপদ! কে বলছে মঞ্জু একবারে টোলের পণ্ডিত শুকদেব গোস্বামী। ওদের বয়সে মানুষের পদে পদেই দোষ-ত্রুটি হয়ে থাকে, তা ব'লে কি মানুষকে মানুষ ফেলে দেয়?"

গম্ভীরকণ্ঠে প্রসাদদাস বলিলেন, "ওতে ত কথার জবাব দেওয়া হ'ল না। খুবই বেশী রকমের কথা বাড়াচ্ছো। তোমায় বলতেই হবে, কি শুনেছো, কি দেখেছো।"

অনাথবন্ধুও গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "তবে শোন। ভেবেছিলুম, ও সব কথা আর তুলবো না, কিন্তু—যাক, কলকাতায় প্রথমে নেমে যখন হোটেলে উঠি, তখন এক দিন ভোরবেলা এজেন্টের সঙ্গে ষ্টপের কাছে ট্যাক্সির জন্যে অপেক্ষা করছিলুম হোটেলের সামনে। একখানা বাস যাচ্ছিল কলকাতার দিকে সেই সময়ে। জরুরী কায, বাসেই উঠে পড়লুম দুজনে। দোতলায় উঠতে কেমন একটা ইচ্ছে হ'ল। উঠে কি দেখলুম জানো?"

"না, কি ক'রে জানবো?"

"কেউ নেই সেখানে, কেবল একটা কোণে এক জোড়া তরুণ-তরুণী। কে তারা জানো?"

"ব'লে যাও।"

"রাগ ক'রে চেঁচামেচি কোরো না,—তারা আমাদের মঞ্জু আর তোমাদের গলির মোড়ের ঐ বড় বাড়ীর শিশির বাবু—"

প্রসাদদাস নিষেধ সত্ত্বেও চীৎকার করিয়া উঠিলেন, "কখখোনো না, এ হতেই পারে না,—মঞ্জু? ভোরের বেলা? বাসে?"

"হাঁ, বাসে। ভোরের অস্পষ্ট আলো, তবু বেশ দেখলুম, তারা ঘেঁসাঘেঁসি ক'রে ব'সে চুপি চুপি কথা কইছে, হাসি-তামাসাও বোধ হয় করছে—"

প্রসাদদাস আবার বাধা দিয়া সক্রোধে বলিলেন, "কখখোনো না—এ হতেই পারে না। মঞ্জুকে আমি বাসের টিকিট ত দিই নি কিনে—কলেজ যাবার জন্যে তার ত ট্রামের টিকিট আছে; সে বাসে যাবে কেন? মঞ্জু, মঞ্জু!"

অনাথবন্ধু তাঁহার মুখ চাপা দিয়া ভর্ৎসনা করিয়া বলিলেন, "ছিঃ ছিঃ, ফের ষাঁড়ের মত চেঁচামেচি করছো? ঐ জন্যই ত বলতে চাইনি কিছু! এ নিয়ে সোরগোল করতে আছে? চুপ, চুপ!"

শ্যালককে একরূপ ঠেলিয়া ফেলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া প্রসাদদাস বলিলেন, "না, না, এ একটা মস্ত বড় সিরিয়াস কথা—এর একটা হেস্তনেস্ত হয়ে যাওয়া দরকার। মঞ্জু! মঞ্জু!"

একরূপ জোর করিয়া ধরিয়া বসাইয়া প্রসাদদাস বাবুকে অনাথবন্ধু বলিলেন, "দেখো, অমন ক'রে হাঁকডাক ক'রে লোক জড় ক'রে কেলেঙ্কারী কোরো না বলছি। মেয়ে আমাদের—আমরা যা করবার ঘরেই কোরবো, বাইরের লোক জড় করবার দরকার? কে বলেছে, মঞ্জু শিশিরের সঙ্গে গিয়েছিল ব'লে মহাভারত অশুদ্ধ হয়েছে বা ওদের ভিতর কোন মন্দ মতলব ছিল? জানো ত, ও লেখাপড়া নিয়ে পাগল—ইকনমি, সোসালিজম, হয় ত ঐ নিয়ে ওদের মধ্যে তর্কাতর্কি চলছিল। দেখো না, এই রাজগীরে এসেই বা ও কি করছে। ঐ যে বাঁকীপুর কলেজের প্রফেসরের ফ্যামিলি রয়েছে ধর্ম্মশালার পূবধারের ঘরে, ওদের একটা ছেলে—ঐ যে রমাপতি না কি—ও ত এম, এতে ইকনমি নিয়েছে, তাই প্রায়ই ত দেখি মঞ্জু ওর সঙ্গে হেসে খেলে বেড়ায়, আবার রাগারাগি ক'রে তর্কাতর্কি করে। সে দিন ভোরের আঁধার থাকতে থাকতে বেড়াতে বেরিয়ে দেখেছি, ও ব্রহ্মধারা থেকে নেয়ে এলোচুলে রমাপতির সঙ্গে ধর্ম্মশালায় ফিরে আসছে।"

প্রসাদদাস বলিলেন, "হাঁ, তা ওরা ও-রকম এসে থাকে বটে, বেড়াতেও যায় দুজনে বিকেলে, চাঁদের আলোতেও।"

অনাথবন্ধু বলিলেন, "সে দিন রমাপতিদের ঘরে টাইম-টেবলখানা আনতে গিয়েও দেখেছি, রমাপতি মাদুরে শুয়ে কেতাব পড়ছে, মঞ্জু শিয়রে ব'সে নোটবুকে কি সব টুকে নিচ্ছে। ও ত ঐ প্রকৃতির—মনে কুভাব থাকলে অমন ক'রে সকলকে জানিয়ে তর্কাতর্কি করতো না। ওরা লেখাপড়ার চর্চ্চা নিয়েই থাকে—পুরুষ আর মেয়ে পড়ুয়ার মধ্যে কোন তফাৎ আছে, তা ওরা মনেই করতে পারে না। তবে কি জান, আমাদের চোখে—"

প্রসাদদাস অধীরভাবে বলিলেন, "তা হ'লে কি করতে বল?"

অনাথবন্ধু বলিলেন, "দেখো, মঞ্জু বড় সরল, বড় কোমল, বড় স্নেহ-মমতা ওর। ও চায় একটা কোন বড় আশ্রয় ওকে আগলে নিয়ে সংসারের ঝড়ঝাপটা থেকে দূরে রেখে দেয়—জীবনের শান্ত শীতল প্রস্রবণের জলে ও ডুব দিয়ে শান্তি তৃপ্তি পায়। তোমরা কিন্তু ওকে মস্ত বড় হয়েছে মনে ক'রে তোমাদের স্নেহ-মমতা থেকে দূরে রেখে হিংস্র সংসারের ভয়ের মধ্যে ছেড়ে দিয়েছ, ভেবেছ, ওর নিজের ইচ্ছামত কাষ করবার ওর বয়েস হয়েছে। এইখানেই তোমাদের মস্ত ভুল। এমন ভাবে কি আমাদের ঘরের মেয়েদের গ'ড়ে তুলতে আছে?"

প্রসাদদাস কেবলমাত্র ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, "হুঁ। তার পর?"

"হুঁ না, এর একটা বিহিত করতে হবে। ওকে নিঃসঙ্গ থাকতে দেওয়া হবে না, কোলের মধ্যে টেনে নিতে হবে। দূর ক'রে দাও তোমাদের বাইরে ঘোরার রোগ,—ক্লাব কমিটী। রাম, রাম! ও সব কি আমাদের ধাতে সয়?"

"কি করতে বল, বলুলে না ত।"

"বলছি। ব্যবস্থা আমাদেরই করতে হবে। বেত নিয়ে শাসন করলে—চোখ রাঙ্গালে কিছু হবে না, বরং হিতে বিপরীত হবে। ওর চোখের সামনে আমাদের গেরোস্তোর ঘরের দৃষ্টান্ত দেখাতে হবে—ঐ ভাবে ছেলে-মেয়ে

মানুষ করাই এই ওলট-পালোটের যুগে একমাত্র উপায়, ওর চেয়ে বড় পথ আর নেই। ওকে আপনাতেই কেন্দ্র ক'রে গ'ড়ে উঠতে না দিয়ে, আর পাঁচটা গেরোস্তোর ঘরের ঝি-বউদের সঙ্গে মেলামেশা করবার সুযোগ দিতে হবে। এটা জেনে রেখো, হাজার ওলট-পালোট হোক, আমাদের ঘরের মা-লক্ষ্মীরা চিরকালই মা-লক্ষ্মী থাকবেন। হাজার বাহিরের ঢেউ এসে তাঁদের ঘরসংসারের দোরে আছাড়ি-পিছাড়ি করলেও কিছু করতে পারবে না।"

"হুঁ।"

"তাই বলছিলুম কি, রাজগীর থেকে ফিরে ওকে নিয়ে দিন কতক বীরভূমে কিরণদের ওখানে গিয়ে থাকি। কি বল?"

"বেশ, তাই হবে।"

অনাথবন্ধুদের আহারের জন্য ডাক পড়িয়াছে, তিনি প্রস্তুত হইতে কূপের দিকে গিয়াছেন, কিন্তু তখনও প্রসাদদাস উঠেন নাই, তিনি গভীর চিন্তায় মগ্ন! তাঁহার মনের মধ্যে শ্যালকের শেষ কথাটা বার বার জাগিয়া উঠিতেছিল,—আমাদের ঘরের মা-লক্ষ্মীরা চিরদিন মা-লক্ষ্মীই থাকবেন!

৩

কি ভীষণ পত্র! কন্যা পিতাকে এমন পত্র লিখিতে পারে? প্রসাদদাসের মনে হইল, পৃথিবীটা তাঁহার চরণতল হইতে সরিয়া যাইতেছে।

এমন কি অন্যায় কথা তিনি তাহাকে বলিয়াছেন? কলিকাতায় ফিরিবার পর তাহাদের কলেজের ছিল প্রতিষ্ঠা-দিবসের উৎসব,—অভিনয়, নৃত্য, সঙ্গীত, যন্ত্র-সঙ্গীত,—কত কি! কন্যার বাহানামত সাজ-সজ্জার উপকরণ যোগাইতে পারেন নাই, ইহাই হইল তাঁহার প্রধান অপরাধ। কিন্তু চির-অভাবগ্রস্ত দরিদ্র পিতার সংসারে অসম্ভব আব্দার-বাহানা কেন? কল্পনালোকের অধিবাসী আকাশে সৌধ রচনা করে—মাটীর পৃথিবীর তুচ্ছ ঘৃত-লবণ-তৈল-তণ্ডুলের চিন্তার প্রতি দৃষ্টিপাতে তাহাদের অবসর কোথায়? তাঁহার আয়াস-অভ্যস্ত সহজ সরল জীবন-যাত্রার পথে এ সব অবাঞ্ছনীয় সংসারসমস্যার উদ্ভব হয় কেন? আর গৃহিণী?—সমিতির বার্ষিক রিপোর্টেই তিনি মশগুল,—তাঁহার এ সব তুচ্ছ ব্যাপারে দৃষ্টি দিবার অবসরই নাই।

অভাব—অভাবই যত অনিষ্টের মূল। এ অভাবের বিষ-দংশনের কথা কন্যা ত বুঝিতে চাহে না। অতীত যুগে গৃহস্থ-সন্তান দুই বৎসর বয়স পর্য্যন্ত দিগম্বর থাকিত। বর্ত্তমানে শিশুর সাজ-সজ্জার জন্য যে অর্থ ব্যয়িত হয়, তাহাতে ছোট-খাটো একটি সংসার প্রতিপালিত হইতে পারে। কিন্তু পেটের অন্ন মারিয়াও ফ্যাসানের মর্য্যাদা রক্ষা করা চাই! অতীতে মাত্র দুইটি মুদ্রাব্যয়ে একখানি সাটীতেই ফ্যাসান রক্ষিত হইত। এখন হরেক রকমের রঙ্গবেরঙ্গের একখানি সাটীর দাম পাঁচ টাকাতেও কুলায় না। ছেলেদের চুল ছাঁটিতে আগে লাগিত বড় জোর দুই পয়সা, এখন হেয়ার কাটিং সেলুনের সেই খরচা চারি আনা! অতীতে পাড়ার বারোয়ারী পূজায় কালেভদ্রে যাত্রা কথকতা হইত, এখন নিত্য সিনেমা-টকিতে পয়সার শ্রাদ্ধ! কন্যার জিহ্বায় দুষ্টা সরস্বতী অধিষ্ঠান করিয়া বলিয়াছিল,—অতীতে ভদ্রলোক চটি পায়ে গামছা কাঁধে গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে যাইত, এখন যায় না কেন?

তর্ক-বিতর্ক,—ফল ধৈর্য্যচ্যুতি,—প্রসাদদাসকে তাহারই বিষ আকণ্ঠ পান করিতে হইতেছে!

"কি ভাবছো ব'সে? ও কি চিঠি? কার চিঠি?"

পত্রখানি আগাইয়া দিয়া প্রায় বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে প্রসাদদাস অনাথবন্ধুকে বলিলেন, "প'ড়ে দেখো।"

পত্র ছোট—মাত্র দুই চারি ছত্র,—"আমার কি করা ভাল, তা বোঝবার আমার যথেষ্ট বয়েস হয়েছে, জ্ঞানবুদ্ধিও হয়েছে বোধ হয়। এমন ক'রে স্বাধীন মতে বাধা দিলে তোমাদের সংস্রবে থাকা উচিত কি না, ভেবে দেখতে হবে।"

অনাথবন্ধু পাঠান্তে ক্ষণকাল স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন, তাহার পর জিজ্ঞাসা করিলেন, "ঝগড়া হয়েছিল কিছু?"

প্রসাদদাস বলিলেন, "না, এমন কিছু না, কেবল তোমার সেদিনকার বাসের ঘটনার কথা পেড়েছিলুম—"

অনাথবন্ধু বিরক্তিভরে বলিলেন, "খুব করেছিলে! বুদ্ধির ঢেঁকি! যা বারণ ক'রে দিলুম—যাক্, চিঠির জবাব দিও না, যা করবার, আমিই করছি।"

"তুমি?"

"হাঁ। দেখ, ওকে নিয়ে আজই দেশে চ'লে যাব।

পিসীমা কাল সন্ধ্যার সময় গঙ্গা-চানে এসেছেন—সবাই একসঙ্গে যাওয়া যাবে।"

"ও যেতে চাইবে ?"

"সে ভার আমার—এই যে মঞ্জু! চল, আজই তা হ'লে দেশে রওনা হওয়া যাক ? কি বল মা-লক্ষ্মি ?" পূর্ব্বেই পত্রখানি তিনি লুকাইয়া ফেলিয়াছিলেন।

মঞ্জুর নয়নকমল অরুণাভ, সে যে এই ক্ষণপূর্ব্বে কাঁদিতেছিল, তাহা বুঝিতে অনাথবন্ধুর বিলম্ব হইল না। তিনি সস্নেহে তাহার কালো মেঘের মত চুলের রাশির উপর হস্তাবমর্ষণ করিতে করিতে আবার বলিলেন, "যাওয়াই তা হ'লে ঠিক ? গোছ-গাছ ক'রে নাও মা, তোমার বাবাকে নিয়ে একবার বাজার হয়ে আসি।"

মঞ্জু হাসিয়া ফেলিল, বলিল, "মামাবাবু যেন কি! আজই—এখনই ?"

"না রে পাগ্‌লী, রাত্তিরের গাড়ীতে, কাল পৌঁচুনো যাবে।"

৪

"কি কুটছো বৌদি, কি হবে ওতে ?"

মঞ্জুর বালিকাসুলভ প্রশ্নে কুমুদিনী হাসিয়া বলিল, "কি আবার, তরকারী।"

"তরকারী ? ও মা, ও ত জঙ্গল। তোমরা জঙ্গল খাও ?"

"খাই বই কি, ভাই। আমরা যে জঙ্গলী পাড়াগেঁয়ে ভূত, তোমাদের মত সউরে কি ?"

"সত্যি বল না বৌদি, তোমার ৬টি পায়ে পড়ি,—ওটা কি হবে ?"

কুমুদিনী বলিল, "বলছি ভাই, ততক্ষণ তুমি খুকুকে দুধটো খাওয়াও দিকি—তোমায় যে ও কি চোখে দেখেছে, কেমন শান্ত হয়ে দুধ খায় তোমার কাছে। তুমি ভাই কি মন্তরই জানো! হাঁ, ওটা কি জানো ? কচু শাক।"

"কচু শাক ? ও মা, ও আবার খায় না কি ?"

"খায় না ত কি শোঁকে ? মটর-ডালের বড়া দিয়ে ও যা হয়—"

"দূর, দূর, মুখ কুট-কুট করে না ?"

"আচ্ছা, আজ খেয়েই দেখো না কেমন লাগে। এই যে অড়োর ডালে উচ্ছে দিয়ে রেঁধেছিলুম কালকে,—মন্দ লাগলো ?"

উৎসাহ ও আনন্দভরে মঞ্জু বলিল, "মন্দ ? অমন সুন্দর ডাল কখনও খাইনি, বউদি। কি চমৎকারই রাঁধো তুমি!"

খোকা অরুণ এই সময়ে ঘরে আসিয়া বলিল, "পিসীমা, ও পিসীমা, সেই রাজপুত্তুর মন্ত্রিপুত্তুরের গল্পটা এইবার বলুন না।"

মা বলিল, "চ'লে এলি যে এর মধ্যে ? পড়া হয়ে গেল ? মাষ্টার মশাই ছুটী দিয়েছেন ?"

অরুণ বলিল, "ওঃ, পড়া ত এক নিশ্বেসে দিয়েছি মাষ্টার মশাইকে—পিসীমা যে কাল সন্ধ্যের সময় সব পড়া মুখস্থ নিয়েছিলেন। না পিসী-মা ?"

মঞ্জু খোকাকে বুকের মধ্যে টানিয়া লইয়া মুখ-চুম্বন করিয়া বলিল, "হাঁ মাণিক! অমনি ক'রে লক্ষ্মী হয়ে পড়া তৈরী করলে কত গল্প বলবো। আর—আর—সেই শতদল নভদলের গল্প ? মনে আছে ত ?"

খোকা সহর্ষে বলিয়া উঠিল, "ওঃ খুব মনে আছে। পিসীমা—শুনবেন ? এই এক ছিল"—

কুমুদিনী বাধা দিয়া বলিল, "থাক, এখন আর গল্পে বলতে হবে না। যাও, পিসীমার সঙ্গে চান ক'রে এসো দিকি, ভাত হয়ে এলো।"

মঞ্জু বলিল, "বেশ, মামাবাবুরা আসুন আগে।"

কুমুদিনী বলিল, "আজ যে রবিবার, পাড়ায় গেছেন তাঁরা, বেলা হবে তাঁদের।"

এই কয় দিনেই মঞ্জুর নূতন বন্ধু—তাহার কিরণদাদার পত্নী কুমুদিনী তাহাকে অতি আপনার করিয়া লইয়াছে। এ বাড়ীর সকলেই যেন তাহার অতি আপনার জন, কেহ তাহাকে একাকী থাকিতে দেয় না এক দণ্ড। কিরণদা উকিল হইলেও সাদাসিধা মানুষ, লেখাপড়ার চর্চ্চাই ভালবাসে। কাছারীর কায সারিয়াই বাড়ী আসে। বিশ্রাম ও জলযোগের পর তাহাদের লইয়া নদীর ধারে ঝাউগাছের শ্রেণীর মধ্যে সিন্দুরে রাস্তায় বেড়াইতে যায়। তখন তাহাদের মধ্যে কত কথা কাটাকাটি হয়—কত তর্কাতর্কি হয়—কিন্তু সবই হয় হাসিমুখে। তাহাতে মঞ্জু যে শান্তি—যে তৃপ্তি পায়, তাহা জীবনে পাইয়াছে কি না সন্দেহ।

গৃহিণী কুমুদিনী তরুণী—বোধ হয়, তাহার অপেক্ষা ছয় সাত বৎসরের বেশী বড় হইবে না। তাহার মুখে হাসি লাগিয়াই আছে। গৃহস্থালী ও সন্তানপালনের অক্লান্ত পরিশ্রমের মধ্যেও সে তাহার সহিত হাস্য-পরিহাস ও আলাপ-আলোচনার অবসর করিয়া লইত; পরন্তু তাহার আদর-যত্নের ত্রুটি যাহাতে না হয়, সে দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখিত। তাহার ও তাহার স্বামীর ত কথাই নাই, তাহাদের দুইটি শিশু-সন্তানও যেন উত্তরাধিকারসূত্রে তাহাদের স্বভাব প্রাপ্ত হইয়াছিল। বড়টি ছেলে—বছর পাঁচেকের হইবে—সে ত 'পিসীমাকে' একবারে পাইয়াই বসিয়াছিল। তাহার পিসীমা তাহাকে কত 'ব্যাঙ্গমা ব্যাঙ্গমীর' গল্প বলিত, সোণার কাঠির রাজপুত্র কেমন করিয়া ঘুমন্ত রাজকন্যাকে জাগাইয়াছিল, তাহার কাহিনী শুনাইত,—বালক শুনিতে শুনিতে মুগ্ধচিত্তে তাহার কোলে ঘুমাইয়া পড়িত। তাহার সরল নিষ্পাপ ঘুমন্ত ফুলের মত কচি মুখখানি মঞ্জুর স্নেহ-প্রবণ মনের কাছে কি মিষ্টই লাগিত; বাতাসে তাহার চূর্ণকুন্তলগুলি উড়িত, একটি আসিয়া তাহার মুখের উপর পড়িত, মঞ্জু স্নেহাশ্রু-সিক্ত-নেত্রে সেই ঘুমন্ত শিশুর মুখ পানে একদৃষ্টে তাকাইয়া থাকিত—চাহিয়া চাহিয়া তাহার যেন আশা মিটিত না—শিশুর নব-কিশলয় তুল্য অধরোষ্ঠ সে চুম্বনে চুম্বনে ভরাইয়া দিত!

নারীহৃদয় যতই কঠোর ও নীরস হউক—যতই অহঙ্কারদৃপ্ত হউক—তাহার একটি কোণে মাতৃত্বের স্নেহ-কোমল শীতল প্রস্রবণ ধীরে ধীরে—হয় ত অজ্ঞাতসারে বহিয়া থাকে। বিধাতার এ এক আশ্চর্য্য ব্যবস্থা! মঞ্জুদের ছিল মস্ত বড় মনীষীর সংসার—সকলেই মস্তিষ্ক-বান্। পিতামহ ছিলেন মস্ত বড় লেখক ও সাংবাদিক—রাজদ্বারে ও সাধারণে ছিল তাঁহার তুল্যমূল্যের সম্মান প্রতিপত্তি। মঞ্জুর মাতামহও ছিলেন সদরআলা হাকিম। উত্তরাধিকারসূত্রে তাহার পিতামাতাও পাইয়াছিলেন মস্ত মস্তিষ্ক। সংসারের ছোট-খাটো ব্যাপারের বহু উর্দ্ধে ছিল তাঁহাদের দৃষ্টি। স্নিগ্ধগম্ভীর হিমগিরির তুষার-শুভ্র উত্তুঙ্গ শৃঙ্গ সহস্রাংশুর সুবর্ণ-কিরণে ঝকমক করে, আবক্ষ-উত্থিত কুহেলিকার বিষাক্ত বাষ্প কি তাহাকে মলিন করিতে পারে? যশোমানের তুঙ্গ-শৃঙ্গে আরূঢ় আটিষ্ট পতি-পত্নীর সামান্য মুখের কথার প্রত্যাশী সমাজ তাঁহাদের সকাশে যে স্তুতি পরিবেশণ করিত, তাহার কাছে ক্ষুদ্র সংসারের তুচ্ছ খুঁটিনাটির কুজ্ঝটিকা কি তুলনীয় হইতে পারে?

কিন্তু এ সকল সত্ত্বেও তাঁহাদের সংসারের আবহাওয়া ছিল নীরস—হৃদয়হীন। মস্তিষ্কের সহিত হৃদয়ের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হইবে, এমন কোন আইন নাই। প্রকাণ্ড মস্তিষ্কের পাশাপাশি প্রকাণ্ড হৃদয়ের অস্তিত্ব প্রায়ই দেখা যায় না। উচ্চাঙ্গের সাহিত্য বা শিল্পচর্চ্চা বিরাট মস্তিষ্কের বাহ্য প্রকাশ হইতে পারে, কিন্তু উহা প্রায়ই হইয়া থাকে হিমানীর তুল্য শীতল, সংসারপ্রবেশোন্মুখ তরুণ হৃদয়ের তপ্ত রক্তস্রোতের অনুকূল ইন্ধন যোগান দেওয়া উহার সাধ্যাতীত—বরং উহার প্রাণহীন শীতল স্পর্শে রক্তস্রোতের উত্তাপ ম্লান হইয়া যায়। আর্টিষ্ট পিতামাতার নীরস সংসারের স্নেহ-সহানুভূতির মঙ্গল-স্পর্শের অভাবে মঞ্জুর নবীন মুকুলিত যৌবনের সহস্র আশা-আকাঙ্ক্ষা কামনা-বাসনা শুষ্ক হইয়া উঠিতেছিল—আর সেই কারণেই তাহার অন্তরে তীব্র বুভুক্ষা-তৃষ্ণা মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতেছিল।

তাহার পর মাতুলের কল্যাণে হঠাৎ অভাবনীয় পরিবর্ত্তন। চিতোরগড় হইতে রাজপুতনার বিশ ত্রিশ মাইল ধূ-ধূ মরু-প্রান্তর রেলপথে অতিক্রম করিবার পর যখন আরাবলী পর্ব্বতমালার বক্ষঃপঞ্জরস্থ দেবারী গিরি-সঙ্কটের টানেল পার হইয়া রেলগাড়ী নন্দন-পারিজাতের শোভায় অতুলনা সুন্দরী উদয়পুরনগরীর পেশোলা হ্রদ-তটে উপনীত হয়, তখন যাত্রীর হৃদয় যে অনির্ব্বচনীয় সুধারসে সিক্ত হয়, এই নূতন সংসারে শিশুর সরল হাসিকান্না ও দরদী তরুণ-তরুণীর অপরিমেয় স্নেহ-মমতার সংস্পর্শে দরিদ্র পিতামাতার প্রাণহীন কঠোর সংসারের অশান্তি অসন্তোষের পর মঞ্জুর হৃদয় সেই মধুর আনন্দরসেই অভিষিক্ত হইতেছিল। এ তৃপ্তি—এ শান্তি ত সে তাহার কলেজ-জীবনের শত শিহরণের মধ্যেও পায় নাই! দরদীর অন্তরে অন্তরে ব্যথা-বেদনার অনুভব ও আকর্ষণ মানুষকে এমন অমৃতের সন্ধান দিতে পারে? এ কি আনন্দ! কি তৃপ্তি!

সকল সময়ে, সকল দেশে, সকল সমাজে ঘরের আকর্ষণ মানুষকে সত্য-পথের সন্ধান দেয়, এই আকর্ষণই মানুষকে সমাজ-শাসনের গণ্ডীবদ্ধ জীবরূপে অবস্থান করিতে প্রেরণা

দিয়া থাকে। এ সত্যের সন্ধান পাইলে মানুষের জীবন সুখময়ই হইয়া থাকে। গৃহস্থালীর শত খুঁটিনাটির কাযে মন নিবিষ্ট হইলে বাহিরের আকর্ষণ অতি তুচ্ছ বলিয়াই অনুমিত হয়,—ইহা শাশ্বত সনাতন সত্য!

অরুণকে লইয়া মঞ্জু যখন স্নান করিতে গেল, তখন সত্যই তাহার মন কি এক অনাস্বাদিতপূর্ব্ব আনন্দরসে ভরিয়া উঠিয়াছে। তাহার মনে হইল, এ জীবনই যেন তাহার নিজস্ব—আনন্দ যেন তাহার সেই জীবন-নদের দুই কূল ছাপাইয়া উঠিতেছে। মঞ্জু বালকের সহিত বালিকার মত ছুটাছুটি করিয়া অন্তঃপুরের পুষ্করিণীর দিকে যাইতে লাগিল। বালকও যত হাসির লহরে আকাশ-বাতাস ভরাইয়া দেয়, মঞ্জুও তত উচ্চরবে হাসিতে হাসিতে তাহার পশ্চাদ্ধাবন করে।

এ এক নূতন জীবন! এ জীবন শত দুঃখ-কষ্ট এবং অভাব-অনাটনের মধ্যেও হাসি ও আনন্দ বিলাইয়া দেয়। মঞ্জুর পিতামাতার সংসারে উচ্চাঙ্গের বিদ্যাচর্চ্চার মধ্যেও সে যেন অনুক্ষণ কিসের একটা অভাব অনুভব করিত—সে অভাব তাহার কেহ ত পূর্ণ করিবার চেষ্টা করে নাই! হউক তাহার কিরণদার এটি ক্ষুদ্র সংসার—কলাসাহিত্য-চর্চ্চাহীন সাধারণ মানুষের সাধারণ সংসার—তবুও তাহার যে মাতৃ-হৃদয় অতৃপ্ত স্নেহ-মমতার ক্ষুধায় অনুক্ষণ বুভুক্ষু থাকিত, এখানে সেই মাতৃ-হৃদয় ত তেমন আর ব্যথায় বেদনায় টনটন করে না।

সাধারণ গৃহস্থের ছোট-খাটো সাধারণ সংসার—রান্না-বান্না পোড় বড়ি খাড়া,—না আছে দৌড়ঝাঁপ, না আছে শিহরণ! কিন্তু তবুও কোথা হইতে বহিয়া যায় তাহাতে আনন্দ-তৃপ্তির প্রস্রবণ! ছোট বাড়ী, ছোট-খাটো সংসার, সাজসজ্জা আসবাবপত্র সামান্য। তবুও ঘরের লক্ষ্মী কুমুদিনী যখন রান্নাবান্নার অবসরে সন্তান দুটিকে লইয়া নিজেও শিশু সন্তান সাজিয়া খেলা করে, তখন শোভাসম্পদ-হীন সেই ছোট সংসারে কি অপূর্ব্ব লক্ষ্মীশ্রী ফুটিয়া উঠে!

এক দিন মঞ্জু অতর্কিতে বৌদিদির শয়নকক্ষে প্রবেশ করিতে গিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল। সম্মুখে যাহা দেখিল, তাহাতে তাহার নয়ন হাস্যোজ্জ্বল হইয়া উঠিল, নয়ন-কোণে আনন্দাশ্রু গড়াইয়া পড়িল! মায়ের কোলে কনিষ্ঠ শিশু—মায়ের নয়নতারা উজ্জ্বল, মুখে মৃদুমন্দ হাসি—সে হাসি যেন এ জগতের নয়! সকল দেশের—সকল সময়ের—সকল সমাজের অজর অমর এই চিত্র—যশোদাক্রোড়ে নন্দদুলাল! মাতৃ-হৃদয়ের আনন্দতৃপ্তির এই কলাশিল্প অপেক্ষা জগতে নারীর পক্ষে আর কি সুন্দর চর্চ্চার জিনিষ থাকিতে পারে,—ভাবপ্রবণা স্নেহকোমলা মঞ্জু তাহা ঠিক করিতে পারিল না,—কেবল নিষ্পলক নেত্রে সেই চিত্রের প্রতি তন্ময় হইয়া রহিল।

"কি মা, দোরে দাঁড়িয়ে রয়েছো কেন অমন ক'রে? কি দেখছো?"

অনাথবন্ধুর অতর্কিত প্রশ্নে মঞ্জু চমকিয়া উঠিল। মঞ্জুকে অপ্রতিভ দেখিয়া অনাথবন্ধু কথাটার মোড় ফিরাইয়া বলিলেন, "বাড়ী যেতে ইচ্ছে করছে? এখানে বুঝি মন টিকছে না?"

মঞ্জু তাহার বৌদিদির কোল হইতে শিশুকে বুকে তুলিয়া লইয়া শিশুরই বুকে মুখ লুকাইয়া বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে বলিল, "না মামাবাবু, আরও দুচার দিন থাকি—বৌদিকে আমার বড্ডো ভাল লাগে!"

শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার বসু (সাহিত্য-রত্ন)

মিলনের মূল

কঠোর শাসন কিবা অগণিত ধনে,
পারে কি বাঁধিতে নরে মধুর-মিলনে?

সম্পদ, ঐশ্বর্য্য আর আসুরিক বল
পারে কি সাধিতে কভু মিলন-মঙ্গল?

হয় কি মিলন কভু বিনিময়ে হেম?—
মিলন সাধিতে পারে শুধু এক প্রেম।

জে, বি, সরকার।

ইতিহাসের অনুসরণ

সুয়েজ ক্যানালের ইতিকথা

দক্ষিণ-পূর্ব্ব এসিয়ার মৌসুমী-বায়ু-পুষ্ট দেশগুলি ইতিহাসের প্রথম হইতেই শস্যশ্যামলা ও ধনজনসমৃদ্ধ বলিয়া পৃথিবীতে পরিচিত এবং গরম দেশের সামগ্রী উৎকৃষ্ট ও সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রকারের বলিয়া পাশ্চাত্য দেশে ইহাদের যথেষ্ট আদর ছিল। ভারতবর্ষ ও ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের মসলা, গাছ-গাছড়া, ঔষধপত্র, রং, চীনদেশের রেশম, মহামূল্য এবং দুষ্প্রাপ্য মণি-মুক্তা প্রভৃতি রোমক সভ্যতার সময় হইতেই য়ুরোপীয় বণিক্-সমাজ কর্তৃক সমাদৃত হইত। এমন কি, কোনও কোনও দ্রব্যাদি বাইবেলের প্রথম যুগেও ভূমধ্যসাগরতীরবর্ত্তী দেশসমূহে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল।

সাধারণতঃ যে সকল পথ দিয়া তখনকার দিনে এই দ্রব্যাদির ব্যবসা চলিত, তাহা ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন ছিল। রোম্যানদিগের সময়ে ভারত, তথা অন্যান্য প্রাচ্যদেশের সহিত য়ুরোপের বাণিজ্যের পথ মিশর দেশের ভিতর দিয়াই ছিল এবং ইহারই ফলে আলেকজান্দ্রিয়া অতি প্রাচীনকাল হইতেই ব্যবসার কেন্দ্র বলিয়া গণ্য হইয়া আসিতেছে। প্রাচ্যদেশীয় জিনিসপত্র লোহিত সাগরের পশ্চিম উপকূলে নামান হইত এবং সেখান হইতে মিশরের ভিতর দিয়া কায়রো অথবা আলেকজান্দ্রিয়া লইয়া যাওয়া হইত; কখনও কখনও সুয়েজ সংযোজকের ভিতর দিয়াও যাইত।

য়ুরোপ এবং দক্ষিণ-পূর্ব্ব এসিয়ার মধ্যে যাতায়াতের আরও কয়েকটি পথ ছিল। যথা—(১) দামাস্কাস্ হইয়া পারস্য উপসাগরের ভিতর দিয়া; (২) এজিভ্ সমুদ্র, তথা কৃষ্ণসাগরের মধ্য দিয়া; (৩) কাস্পিয়ান সাগর এবং কাবুলের দিকে। কিন্তু এই সকল বাণিজ্য-পথের মধ্যে একটিও সুবিধাজনক ছিল না। আমরা দেখিতে পাই যে, অতি পুরাকাল হইতেই য়ুরোপ ও দক্ষিণ-পূর্ব্ব এসিয়া খণ্ডের মধ্যে ব্যবসায়-প্রসারের নিমিত্ত অধিকতর সুগম পথ আবিষ্কারের জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করা হইয়াছে।

যখন ওলন্দাজ, পর্ত্তুগীজ, ফরাসী ও ইংরেজগণ ভারত এবং তাহার নিকটবর্ত্তী দেশসমূহের সহিত বাণিজ্যে প্রবৃত্ত হইলেন, তাঁহারা ভাস্কোডাগামা আবিষ্কৃত পথে, আফ্রিকার দক্ষিণে উত্তমাশা অন্তরীপ ঘুরিয়া আসা-যাওয়া করিতেন, কিন্তু এই পথে প্রায় ছয় মাস সময় লাগিত, সুতরাং এই পথও ব্যবসার পক্ষে তেমন সুবিধাজনক হইল না।

য়ুরোপ হইতে এসিয়া যাতায়াতের পক্ষে ভূমধ্যসাগর হইতে সুয়েজের ভিতর দিয়া—তথা লোহিত সাগরের মধ্য দিয়া পূর্ব্বাভিমুখী পথটিই সর্ব্ববাদিসম্মত সুগম। এই পথে সর্ব্বাপেক্ষা কম সময়ে আসা যায় এবং ইহার দুই পার্শ্বে এত সমৃদ্ধ দেশ আছে যে, অন্য কোনও পথে অত নাই। ব্যবসা-বাণিজ্যের পক্ষে ইহা যথেষ্ট অনুকূল। কিন্তু সুয়েজের সংযোজকটি বহুকাল পর্য্যন্ত এই পথের প্রধান অন্তরায় ছিল এবং তিন সহস্র বৎসরেরও অধিক কাল ধরিয়া এই সংযোজকটির ভিতর দিয়া জলপথ নির্ম্মাণের চেষ্টার পরে মাত্র ৬৫ বৎসর হইল, এই পথ সম্পূর্ণরূপে সুগম হইয়াছে।

এখনকার সুয়েজ খালের ভিতর লবণাক্ত জলবিশিষ্ট হ্রদ আছে। এই দেখিয়া মনে হয় যে, কোন সময়ে সুয়েজের সংযোজকটি খুব সম্ভবতঃ সমুদ্রতলদেশে ছিল, অর্থাৎ ঐ স্থানে বহু পূর্ব্বে সমুদ্র ছিল এবং পরে ভূমিকম্প অথবা প্রকৃতির অন্য কোনও খেয়াল বশতঃ সমুদ্রের স্থানে স্থল দেখা দিয়াছে। বাইবেলে কথিত আছে যে, মোজেস্ এবং ইস্রেলের বংশধরগণ মিশর হইতে জলপথে লোহিতসাগর দিয়া পলায়ন করেন। ইহা দ্বারাও প্রমাণ হয় যে, বহুপূর্ব্বে বর্ত্তমান সুয়েজ খালের পথে জলপথ ছিল। সে যাহাই হউক, সুয়েজ-সংযোজক কাটিয়া তাহার ভিতর দিয়া জলপথ নির্ম্মাণের চেষ্টা ৩ হাজার বৎসরেরও অধিক সময় ধরিয়া হইয়াছে এবং মিশরের দ্বিতীয় রামেসিস, পারস্যের প্রথম দরায়ুস, গ্রীসের দ্বিতীয় টলেমী, রোম-সম্রাট ট্রাজান, খলিফা হারুণ-অল-রসিদ ও নেপোলিয়ান বোনাপার্টি প্রমুখ বহু গণমান্য ক্ষমতাশালী ব্যক্তিই বিভিন্ন সময়ে এই অজেয়কে জয় করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছেন।

ফ্যারোয়া দ্বিতীয় রামেসিস্‌এর নাম বিখ্যাত; তিনি প্রসিদ্ধ থীবস্ নগর নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার ইহুদী-নিপীড়ন উল্লেখযোগ্য। তিনি খৃষ্টপূর্ব্ব চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে নাইল নদ হইতে লোহিতসাগর পর্য্যন্ত একটি খালের কিয়দংশ নির্ম্মাণ করেন। এই খাল দীর্ঘকালস্থায়ী হইতে পারে নাই, অল্পদিন পরেই বালুকাপূর্ণ হইয়া একেবারে অব্যবহার্য্য হইয়া যায়। বর্ত্তমান সুয়েজ খাল কাটিবার সময় এই খালের ধ্বংসাবশেষ বালুকার তলদেশ হইতে পাওয়া যায়।

ইহার প্রায় ৭ শত বৎসর পরে, অর্থাৎ খৃষ্টপূর্ব্ব সপ্তম শতাব্দীতে ফ্যারোয়া নেকো, রামেসিসের আরব্ধ খাল শেষ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। তিনি ১ লক্ষ ক্রীতদাস লইয়া এই কার্য্যে মন দেন, কিন্তু বেশী দূর অগ্রসর হইতে পারেন নাই।

নেকোর মৃত্যুর প্রায় ১ শত বৎসর পরেও তাঁহার খালের অস্তিত্ব সম্বন্ধে হেরোডোটাস্ লিখিয়া গিয়াছেন। এই সময়ে পারসিকরা মিশর অধিকার করেন এবং খুব সম্ভবতঃ প্রথম দরায়ুস্ নেকোর খালটির কার্য্য শেষ করেন। কিন্তু মানব-কীর্ত্তির নশ্বরতা এবং ক্ষণস্থায়িত্ব প্রমাণ করিবার জন্যই বোধ হয়, এইবারেও এই খালটি বালুকাপূর্ণ হইয়া ক্রমে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। দরায়ুসের প্রাণপণ চেষ্টা ও অজস্র অর্থব্যয়ের ফল একেবারে নিশ্চিহ্ন হইয়া গেল।

খৃষ্টপূর্ব্ব ২৬০ বৎসরে দ্বিতীয় টলেমী দরায়ুসের খালটির যথেষ্ট সংস্কারসাধন করেন এবং ইহাকে পুনর্জীবিত করেন। কিন্তু খালটি বোধ হয় সম্পূর্ণ ব্যবহারোপযোগী হয় নাই। কারণ, এই

সময়েও প্রাচ্যদেশের সহিত ব্যবসা সাধারণতঃ য়ুরোপ হইতে আলেকজান্দ্রিয়া, তথা হইতে রসেটা, তথা হইতে নাইল নদ উজান বাহিয়া ৩।৪ শত মাইল নীচে কাস্ অথবা কপ্‌টপ্ এবং শেষে স্থলপথে গাধা অথবা উটের পিঠে লোহিত সাগরের তীরস্থ আইধাব বেরেনিস্ প্রভৃতি বন্দরের পথে চলিত। এই বন্দরগুলি বর্ত্তমান সুয়েজ বন্দরের কয়েক শত মাইল দক্ষিণে ছিল।

খৃষ্ট জন্মিবার পরে, রোম সাম্রাজ্যের গৌরবময় দিনে, সম্রাট ট্রাজান কর্ত্তৃক এই জলপথটি আর একবার খোলা হইল। তিনি দরায়ুসের খালটির বালুকারাশি অপসারণ করাইয়া তাহাকে পুনরায় গভীর করিয়া কাটিয়া, কার্য্যোপযোগী করিলেন। ট্রাজান এই খালের নাম রাখিলেন "অগষ্টাস্ এমনিস্" অথবা বিশাল স্রোত। ইহা ক্লিওপ্যাট্রিস্ (বর্ত্তমান সুয়েজ বন্দর) হইতে তুইটি লবণ হ্রদের ভিতর দিয়া পশ্চিমে বুবাষ্টিস্ হইয়া একেবারে উত্তরদিকে মানসুরে অর্থাৎ নাইল নদের পর্ব্ব মোহানা পর্য্যন্ত ছিল। ইহার পূর্ব্বেকার সকল খাল অপেক্ষা এই খালটি বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হইত এবং বর্ত্তমান সুয়েজ খাল কাটিবার সময় শ্রমিকদিগের পানীয় জল সরবরাহ করিবার নিমিত্ত ফার্দ্দিনাণ্ড দি লেসেপ্‌স্ তাঁহার পানীয় জলের খাল এই পথেই আনিয়াছিলেন।

এইরূপে একে একে মিশরীয়, পারসিক্, গ্রীক্ ও রোমানগণ ব্যবসা চালাইবার নিমিত্ত একটি অত্যাবশ্যক জলপথ নির্ম্মাণের জন্য বহু সময় এবং অর্থ ব্যয় করিলেন, কিন্তু কালের করাল গ্রাস, নিয়তির নিষ্ঠুর পরিহাস কাহাকেও তাঁহাদিগের কীর্ত্তি উপেক্ষা করিতে পারিল না।

এইবার আরবদেশের খলিফাদিগের পালা। তাঁহারা মিশরে দীর্ঘকালাবধি রাজত্ব করেন। প্রায় ষষ্ঠ শতাব্দীতে আরব খলিফা অমরু ট্রাজানের নষ্ট কীর্ত্তির সংস্কার ও উদ্ধারসাধন করেন এবং এই খাল শত বৎসরেরও অধিক যান-বাহন চলিবার পক্ষে উপযুক্ত ছিল। খালটির অন্ত সীমানা ক্লিওপ্যাট্রিসের পরিবর্ত্তে কুলসম্ নামে অভিহিত হইতে লাগিল এবং লোহিত সাগরের নাম হইল কুলসম্ সাগর।

আরব্যোপন্যাস-বিখ্যাত ন্যায়পরায়ণ খলিফা হারুণ-অল-রসিদ, বর্ত্তমান সুয়েজ খালের পথেই সুয়েজ সংযোজক কাটিয়া একটি খাল নির্ম্মাণের কল্পনা করেন। কিন্তু পাছে মিশর আলাদা হইয়া যায় এবং তাঁহার সাম্রাজ্যের পূর্ব্বভাগ জলপথে গ্রীক্ আক্রমণে বিপর্য্যস্ত হয়, এই ভয়ে তিনি তাঁহার কল্পনা কার্য্যে পরিণত করিতে পারেন নাই।

নবম খৃষ্টাব্দে নাইল নদ হইতে লবণ হ্রদের ভিতর দিয়া কুলসম পর্য্যন্ত বিস্তৃত জলপথ পুনরায় বন্ধ হইয়া যায় এবং এই পথে চলাচল বেশী হইত না, মেরামত কার্য্যও বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে দেখা যায় যে, কুলসম্ বন্দর ধ্বংসস্তূপে পরিণত হইয়াছিল এবং নিকটস্থ সুয়েজ সহরেরও প্রায় সমান অবস্থা ছিল। ইহার পরে কিছুকাল প্রাচ্য এবং প্রতীচ্যের ব্যবসা-বাণিজ্য প্রধানতঃ নাইল নদ দিয়া কাস্ পর্য্যন্ত ও তাহার পরে স্থলপথে আইবার পর্য্যন্ত যাতায়াত করিত।

টার্কিশ অটোম্যান সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে সুয়েজ একটি বড় বন্দর এবং ব্যবসার কেন্দ্র হইয়া উঠিয়াছিল। ইহা ব্যতীত সুয়েজ বন্দর লোহিত সাগর সহ টার্কিশ নৌ-বাহিনীর প্রধান আড্ডা হইয়া উঠিল, এবং এখানে নৌ-গঠন শিল্পও বাড়িয়া উঠিল। ভারতের সহিত ব্যবসা পুনরায় স্থাপিত হইল এবং প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের ব্যবসার পক্ষে সুয়েজ বন্দর একটি বিশেষ স্থল হইয়া উঠিল। প্রতি বৎসরই মুসলমানদিগের বাণিজ্য-জাহাজ জেড্ডা, মক্কা প্রভৃতি বন্দরে ভারতের সহিত ব্যবসায় নিমিত্ত বিবিধ দ্রব্যসম্ভার লইয়া যাতায়াত করিত। কিন্তু তখনও সুয়েজ বন্দর হইতে ভূমধ্যসাগরাভিমুখী সমস্ত ব্যবসাবাণিজ্যই স্থলপথে চলিত। সুয়েজ হইতে ভূমধ্যসাগর পর্য্যন্ত জলপথ অথবা সুবিধাজনক কোনও স্থলপথ না থাকাতে ব্যবসার যে কি প্রকার ক্ষতি হইতেছিল, তাহা অষ্টাদশ শতাব্দীতে য়ুরোপীয়গণ প্রাচ্য ও প্রতীচ্যে ব্যবসা চালাইবার সময় উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে সুয়েজ সংযোজকের ভিতর দিয়া একটি জলপথের কল্পনা পুনরায় য়ুরোপের মহারথগণকে বিব্রত করিয়া তুলিয়াছিল।

এইরূপে বৎসরের পর বৎসর—যুগের পর যুগ চলিয়া গেল, কিন্তু মানুষের স্বপ্ন অথবা কল্পনা বাস্তবে পরিণত হইবার কোনই লক্ষণ দেখা গেল না। প্রকৃতিরই শেষ পর্য্যন্ত জয় হইল। কিন্তু সুয়েজের ভিতর দিয়া জলপথ নির্ম্মাণের স্বপ্ন তখনও পর্য্যন্ত বহু লোকেরই মস্তিষ্কে খেলা করিতেছিল, যদিও প্রথম যাঁহারা এই স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই বহুদিন পর্ব্বেই পৃথিবী হইতে চিরতরে অবসর গ্রহণ করিয়াছিলেন।

ইহার কিছুদিন পরে ঊনবিংশ শতাব্দীর রণদেবতা, সমর-পণ্ডিত নেপোলিয়ান বোনাপার্টির উর্ব্বর মস্তিষ্কে পুনরায় এই কল্পনা বাসা বাঁধিল এবং এই উদ্দেশ্যে তিনি স্বয়ং সমুদ্র হইতে সমুদ্রে জলপথে ভ্রমণ করিয়া সুয়েজের ভিতর দিয়া ভূমধ্যসাগর ও লোহিতসাগর দুইটিকে সংযুক্ত করিবার উপায় খুঁজিতে লাগিলেন। তিনি যে সকল সংবাদ ও তথ্য সংগ্রহ করিলেন, তাহার সাহায্যে অঙ্ক কসিয়া হিসাব করিয়া দেখিলেন যে, ভূমধ্যসাগর ও লোহিত সাগর এই দুই সমুদ্রের levelএ অনেক তফাৎ—প্রায় দশ মিটার অর্থাৎ এগার গজ। সুতরাং সুয়েজের ভিতর দিয়া সোজাসুজি খাল কাটিয়া এই দুই সমুদ্রকে সংযুক্ত করা একেবারে অসম্ভব বলিয়া ঠিক হইল। অবশ্য এ বিষয়ে নেপোলিয়নের হিসাবে ভুল হইয়াছিল, তাহা পরে বুঝা যাইবে।

ভারতে ব্রিটিশের ক্ষমতার বিরুদ্ধে অভিযান করিবার মানসে নেপোলিয়ন মিশর দখল করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, যাহাতে তিনি সুয়েজের ভিতর দিয়া একটি জলপথ নির্ম্মাণ করিয়া প্রাচ্যের দিকে একটি নূতন সমুদ্রপথ সম্পূর্ণ ফরাসীদিগের দখলে রাখিতে পারিবেন। তাঁহার আয়োজন সম্পূর্ণ হইবার পূর্ব্বেই নাইল নদে নেলসন কর্ত্তৃক ফরাসী নৌবাহিনী ধ্বংসপ্রাপ্ত হইল এবং ব্রিটিশগণ সুয়েজ দখল করিলেন। ব্রিটিশগণ এখন য়ুরোপ হইতে এসিয়া-খণ্ডের সহিত ব্যবসা-বাণিজ্যের নিমিত্ত মিশরের প্রয়োজনীয়তা কতদূর, তাহা উপলব্ধি করিতে পারিলেন। সুয়েজের ভিতর দিয়া একটি জলপথের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা সম্যক্ বুঝিতে পারিয়া ব্রিটিশগণ খাল কাটাইতে মনস্থ করিলেন এবং এই উদ্দেশ্যে ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে এডেন দখল করিয়া তাহাকে সুরক্ষিত করিলেন। তখন তুর্কীর পাশা মহম্মদ আলি শা মিশরে নিজের ক্ষমতা বিস্তার করিতেছিলেন এবং তিনি মিশরে ব্রিটিশদিগকে তাঁহাদিগের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিতে দেন নাই। ইহার পরে ৬ বৎসরকাল কিছুই উল্লেখযোগ্য ঘটে নাই।

সুয়েজ-বন্দরে লেফটেনাণ্ট ওয়াগহর্ণের আবক্ষ মর্ম্মর-মূর্ত্তি
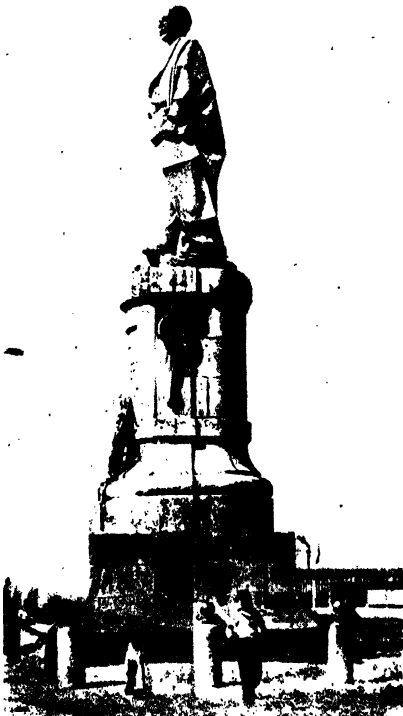
১৮৪৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত লেফটেনাণ্ট ওয়াগহর্ণ নামে এক জন ব্রিটিশ নাবিক এঞ্জিনিয়র নাইল নদ হইতে লোহিতসাগর পর্য্যন্ত উন্নত প্রকারের স্থলপথ প্রতিষ্ঠিত করিলেন। এই পথে প্রথমে গাড়ী, উষ্ট্র এবং ঘোড়ার সাহায্যে মালপত্র যাওয়া-আসা করিত। পরে রেলগাড়ী চলিতে লাগিল। সুয়েজে রেলপথ এই প্রথম। ওয়াগহর্ণের এই প্রকার সুব্যবস্থার জন্যই আফ্রিকার দক্ষিণে উত্তমাশা অন্তরীপ ঘুরিয়া প্রাচ্যদেশে যাইবার যে সমুদ্রপথ ছিল, তাহার ব্যবহার কমিয়া গিয়া ভূমধ্যসাগর, সুয়েজ ও লোহিত-সাগরের মধ্য দিয়া ভারতে আসিবার পথই প্রধান হইয়া উঠিল। বহুদিন ধরিয়া তিনি সুয়েজ সংযোজকটি কাটিয়া তাহার ভিতর দিয়া খাল লইয়া যাইবার জন্য ইংলণ্ডে আন্দোলন চালাইলেন, কিন্তু ব্রিটিশগণ তাঁহার প্রস্তাবে বিশেষ আশ্বস্ত না হইয়া এ বিষয়ে সম্পূর্ণ নিশ্চেষ্ট রহিলেন। ওয়াগহর্ণ বিত্তশালী ছিলেন না, তাঁহার ক্ষমতাও যথেষ্ট ছিল না। সুতরাং দেশবাসীর নিকট হইতে কোনও সহানুভূতি বা সাহায্য না পাইয়া তিনি তাঁহার প্রচেষ্টা হইতে বিরত হন এবং ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে নিতান্ত দরিদ্রদশায় মারা যান। বর্ত্তমান সুয়েজ খালের সহিত লেফটেনাণ্ট ওয়াগহর্ণের নাম কি ভাবে এবং কতদূর জড়িত, তাহা ফার্দ্দিনান্দ দি লেসেপস্ বলিয়া গিয়াছেন। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দের ৩০শে নভেম্বর তারিখে সুয়েজ ক্যানাল কোম্পানীর একটি মিটিংএ লেসেপস্ বলিয়াছিলেন, "কেবলমাত্র ওয়াগহর্ণের নিকটই সুয়েজ খাল নির্ম্মাণের কল্পনার জন্য আমি ঋণী।" ওয়াগহর্ণের স্মৃতিচিহ্ন-স্বরূপ লেসেপস্ টিউফিক্ বন্দরে তাঁহার একটি মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করাইয়া স্থাপিত করেন।

সৈয়দ বন্দরে ফার্দ্দিনান্দ দি লেসেপসের মূর্ত্তি

এইবার সুয়েজের ভিতর দিয়া জলপথ নির্ম্মাণের কল্পনা এক জন সাহসী এবং দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ফরাসী লোকের মাথায় উদিত হইল এবং শেষ পর্য্যন্ত তাঁহারই জয় হইল। তিন সহস্রের অধিক কালের নানা মহাজ্ঞানী, বিচক্ষণ, দূরদর্শী, কূটরাজনীতি-বিশারদ, দেশপ্রেমিক ব্যক্তির সম্মিলিত ঐকান্তিক চেষ্টা—অবশেষে মসিয়ে ফার্দ্দিনান্দ দি লেসেপস্‌এর আন্তরিক চেষ্টার সহিত মিলিত হইয়া তাঁহার মস্তকে বিজয়-মুকুট পরাইয়া দিল। এই জন্যই বলা হয়, "The many fail, the one succeeds".

১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে, সম্রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়া রাণী হইবার সময়ে, ৩১ বৎসর বয়স্ক একটি যুবকের ন্যায় ম'সিয়ে ফার্দিনান্দ দি লেসেপ্স্ রাজদূতের কার্য্যোপলক্ষে আলেকজান্দ্রিয়াতে প্রথম আসেন। তিনি দেখিতে পাইলেন যে, তাঁহার জাহাজকে ক্যারেণ্টাইনে থাকিতে হইবে। এই সময়ে তাঁহাকে কিছুকাল বাধ্য হইয়া নিষ্কর্ম্মার ন্যায় বসিয়া থাকিতে হইয়াছিল এবং সেই অবসরে তিনি ভূমধ্যসাগর ও লোহিতসাগরের levelএর difference সম্বন্ধীয় নেপোলিয়নের এঞ্জিনীয়র লেপায়ারের রিপোর্ট পাঠ করিয়াছিলেন। লেসেপ্স্ এই রিপোর্টের সত্যতা নির্ণয় করিতে মনস্থ করিলেন। তাঁহার মাথায় নূতন খেয়াল আসিয়া উপস্থিত হইল এবং তিনি তখনকার সর্ব্বাপেক্ষা বিশারদ এঞ্জিনীয়রগণের সহিত পরামর্শ করিলেন। এঞ্জিনীয়রগণ অনেক খোঁজ-খবর ও গবেষণার পরে লেসেপ্স্‌কে বুঝাইয়া দিলেন যে, ঐ দুই সমুদ্রের levelএ কোনও difference নাই—উহারা একই levelএ আছে। লেসেপ্স্ স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিলেন।

দূরদর্শী লেসেপ্স্ এইবার মিশরের তুর্কী রাজপ্রতিনিধি মেহেমেত আলি এবং তাঁহার পুত্র মহম্মদ সৈয়দের অন্তঃকরণ জয় করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কারণ, মিশর তখন তুর্কীর অধীনে ছিল। সুয়েজ খালের কল্পনার প্রায় ২০ বৎসর পরে ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে সুয়েজ সংযোজক কাটিবার অনুমতি পাওয়া গেল। তুর্কীর রাজপ্রতিনিধির এই অনুমতি বা সুবিধা সুয়েজ খাল প্রতিষ্ঠা দিবস হইতে ৯৯ বৎসরের জন্য থাকিল এবং আরও একটি সর্ত্ত ছিল যে, এই খাল ব্যবহার করা সম্বন্ধে সকল জাতিরই সমান অধিকার থাকিবে। তখন লেসেপ্স্ জমি ও মৃত্তিকা পরীক্ষা করিয়া মিশরের সুলতানের নিকট যাইয়া তাঁহার সম্মতি লইলেন। তাহার পরে তিনি যথেষ্ট অর্থ সংগ্রহের নিমিত্ত প্যারিসে গেলেন। লেসেপ্স্‌এর ইচ্ছা ছিল যে, সুয়েজ খাল একটি আন্তর্জাতিক বাণিজ্য জলপথ হইবে এবং সেই উদ্দেশ্যে সকল দেশের প্রধান প্রধান এঞ্জিনীয়রগণের পরামর্শ এবং মত লইবার জন্য প্যারিসে একটি আন্তর্জাতিক এঞ্জিনীয়রদিগের সভা আহ্বান করিলেন। এই সভায় সকল এঞ্জিনীয়ারই লেসেপ্স্‌এর কল্পনার ভূয়সী প্রশংসা করিলেন এবং তাঁহার নক্সামত সুয়েজ খাল কাটিবার প্রস্তাব সমর্থন করিলেন। একদল এঞ্জিনীয়র মিশর দেশে যাইলে, মিশরের রাজপ্রতিনিধি নাইল নদের মোহানা ও সুয়েজ সংযোজককে তাঁহাদিগের অপ্রতিহত গতির ব্যবস্থা করিয়া দিলেন এবং মহম্মদ সৈয়দ পরিষ্কারভাবে ঘোষণা করিয়া দিলেন যে, কল্পিত জলপথ ব্যবসা-বাণিজ্য সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ থাকিবে এবং জাতিধর্ম্ম বা বর্ণনির্ব্বিশেষে সকলেরই এই জলপথে সমান অধিকার থাকিবে, কেহ কোন বিশেষ সুবিধা পাইবে না।

সৈয়দ বন্দরে লেসেপস্ ষ্ট্রীটের একটি দৃশ্য

অতঃপর "মিশরের খাল" লইয়া য়ুরোপের সকল দেশের নেতৃগণ ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। লেসেপ্স্ স্বয়ং ইংলণ্ডে প্রস্তাবিত সুয়েজ খালের প্রয়োজনীয়তা ও উপকারিতা সম্বন্ধে বক্তৃতা দিয়াছিলেন এবং ইংলণ্ডের বণিক সম্প্রদায়ও তাঁহাকে সাদরে অভিনন্দিত করিয়াছিলেন। কিন্তু তখনকার ইংরেজ গভর্ণমেণ্টের অদূরদর্শিতা চরমে উঠিয়াছিল। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট কিছুকাল পর্য্যন্ত সুয়েজ খাল নির্ম্মাণের বিরুদ্ধে ছিলেন। কিন্তু কূটরাজনীতি-বিশারদ পামারষ্টোন এবং ডিস্‌রেলী দুই জনেই সম্যক্ বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, কেবলমাত্র ফরাসী ও মিশরীয়গণ কর্ত্তৃক

অধিকৃত ও নিয়ন্ত্রিত জলপথ প্রাচ্যদেশীয় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রতিকূল হইবে। কিছুদিন পর্য্যন্ত একদল ব্রিটিশ ধনকুবের প্যালেষ্টাইনস্থ হাইফা হইতে লোহিত সাগরের অপর এবং উত্তর-পূর্ব্ব সীমান্ত আকাবা উপসাগর পর্য্যন্ত বর্ত্তমান সুয়েজ খালের প্রতিদ্বন্দ্বী আর একটি জলপথ নির্ম্মাণের চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু তাহা কার্য্যে পরিণত হয় নাই। এইরূপে বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট প্রথমে সুয়েজ খাল সম্বন্ধে কোনও ঔৎসুক্য বা আগ্রহ দেখাইলেন না এবং তাঁহারা এই ব্যাপারে নির্লিপ্ত থাকিলেন। প্রধানতঃ ফরাসী মূলধন, ফরাসী বুদ্ধি এবং ফরাসী কোম্পানীর অধিনায়কত্ব ও তত্ত্বাবধানেই সুয়েজ খালের কায আরম্ভ হইল। অবশ্য কিছু ওলন্দাজ মূলধনও ছিল।

ইতিমধ্যে লেসেপস্ বর্ত্তমান সৈয়দ বন্দরের স্থানটি তাঁহার কার্য্যোপযোগী হইবে মনে করিয়া ঐ স্থান হইতেই বালুকারাশি কাটিয়া খাল নির্ম্মাণের কার্য্য আরম্ভ করিবেন স্থির করিলেন এবং রাজপ্রতিনিধি মহম্মদ সৈয়দের নামানুসারে তাহার নাম সৈয়দ রাখা হইল। নানাপ্রকার শ্রমিক আন্দোলন, কুচক্রান্ত এবং অসুবিধা সত্ত্বেও মেসার্স হার্ডন এণ্ড সাই নামক প্যারিসের এক দল কণ্ট্রাক্টরের তত্ত্বাবধানে খালের কার্য্য ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে লাগিল।

মরুভূমির অসহ্য উত্তাপ, বালুকাপূর্ণ-ঝটিকার তাণ্ডবলীলা, বিষাক্ত কীট-পতঙ্গ এবং সম্পূর্ণ জলকষ্টের মধ্যে প্রত্যহ ২৫ হাজার শ্রমিক কায করিতেছে ইহা একেবারে কল্পনার অতীত। প্রথমে লেসেপস্ কায়রো হইতে ১৫০ মাইল দূরে সমুদ্রতীর পর্য্যন্ত ২ হাজার জলবাহী উষ্ট্রের দ্বারা পানীয় জলের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। পরে সৈয়দ বন্দর পর্য্যন্ত একটি জলের পাইপ বসান হইয়াছিল। কিন্তু তাহাতে কেবলমাত্র সৈয়দ বন্দরেরই জলাভাব দূর হইত। অবশেষে কায়রোর নিকটে নাইল নদ হইতে প্রস্তাবিত সুয়েজ খালের ঠিক মাঝখানে টিম্‌সা হ্রদ পর্য্যন্ত একটি পানীয় জলের খাল প্রস্তুত করা হইল। এইরূপে পানীয় জল সরবরাহের ব্যবস্থা সম্পূর্ণ হইলে সুয়েজখালের কার্য্য যতদূর সম্ভব দ্রুত চলিতে লাগিল। সৈয়দ বন্দর হইতে নীচের দিকে এবং সুয়েজ বন্দর হইতে উপর দিকে, দুই দিক হইতেই কার্য্য অগ্রসর হইতে লাগিল—যাহাতে ভূমধ্যসাগর এবং লোহিতসাগর এই দুইটি সমুদ্রকে মাঝামাঝি কোনও একটি স্থানে সংযুক্ত করাইয়া দেওয়া যাইতে পারে। ভূমধ্য সাগরের নীল জল এবং লোহিতসাগরের রক্তাভ জল দুই দিক হইতে পরস্পরের সহিত সম্মিলিত হইবার উদ্দেশ্যে ক্রমশঃ পরস্পরের নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল।
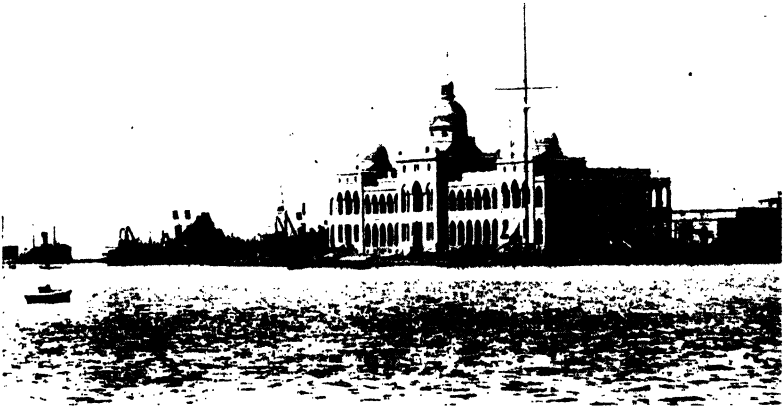
সৈয়দ-বন্দরে সুয়েজ ক্যানাল কোম্পানীর আপিস

১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে ভূমধ্যসাগরের জল উপর হইতে নীচের দিকে প্রস্তাবিত খালের মধ্যস্থানে অবস্থিত লবণ-হ্রদে আসিয়া পৌঁছিল। সেই বৎসরই শরৎকালে লোহিতসাগরের জলও নীচে হইতে উপরদিকে ক্রমশঃ অগ্রসর হইয়া তাহার চির-বাঞ্ছিত প্রিয়তমের সহিত মিলিত হইয়া দীর্ঘকালের বিরহজ্বালা নিবারণ করিল। এইরূপে দুইটি সাগরের প্রথম মিলন এবং সংযোগ ঘটিল। সুয়েজ সংযোজক সত্য সত্যই শেষ পর্য্যন্ত কাটা হইল এবং ৩ হাজার বৎসরেরও অধিককালব্যাপী অসুবিধা দূর করিয়া লেসেপস্ মানব-সমাজের যথেষ্ট কল্যাণসাধন করিলেন। লেসেপস্‌এর আকর্ষণী শক্তি দ্বারা অনুপ্রাণিত মিশরের মুক্তহস্ত

খেদিব ইস্মাইল যে এই উপলক্ষে এক বিরাট উৎসবের আয়োজন করিয়া ফেলিলেন। যথেষ্ট আড়ম্বর এবং ঘটার মধ্যে নব নির্ম্মিত জলপথের ভিতর দিয়া ফরাসী রাণী ইউজিনী এবং রাজপরিবারবর্গকে লইয়া "লা এইগল্" নামক ফরাসী রাজকীয় নৌকাটি সর্ব্বপ্রথম গিয়াছিল। তাহার পিছনে অষ্ট্রিয়ার সম্রাট ফ্রান্জ জোসেফ, জার্ম্মাণীর ভূতপূর্ব্ব কাইসার (তখন তিনি ক্রাউন প্রিন্স ছিলেন), হল্যাণ্ডের রাজপরিবারবর্গ, তুর্কীর সুলতান, মিশরের খেদিব এবং সমগ্র য়ুরোপের অর্দ্ধেক রাজ-নীতিবিশারদ ব্যক্তিগণ পর পর গিয়াছিলেন। ইহা হইতে মনে হয়, কেবলমাত্র বৃটেনের পক্ষ হইতে কেহই যান নাই।

এইরূপে ১২ মিলিয়ন পাউণ্ড অর্থাৎ প্রায় ১৬ কোটি ৮০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে উনবিংশ শতাব্দীর সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় ও বিরাট একটি কীর্ত্তি স্থাপিত হইল, যাহার তুলনায় মিশরের পিরামিডও নগণ্য বলা যাইতে পারে।

১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে কন্সট্যান্টিনোপলে একটি নৌসভার বৈঠক বসিয়াছিল। এই সভাতে সুয়েজ খাল নির্ম্মাণের ব্যয় উঠাইতে সুয়েজ খালের ভিতর দিয়া যে সকল জাহাজ যাতায়াত করিবে, তাহাদিগের উপরে অত্যন্ত বেশী হারে ট্যাক্স বা "টোল" বসান হইয়াছিল। ইহার ফল খুবই সন্তোষজনক হইয়াছিল। এখন সুয়েজ খালের নিমিত্ত বিশেষ কোন খরচা নাই বলিলেই হয়। কিন্তু তথাপি "টোলের" হার প্রায় সমানই আছে। বর্ত্তমানে সুয়েজ খালের ভিতর দিয়া যাতায়াতের নিমিত্ত জাহাজ পিছু এত বেশী টোল দিতে হয় যে, তাহা ব্যবসার দিক দিয়া মোটেই সুবিধাজনক নহে। সুয়েজ খাল এখন একটি বিশেষ মূল্যবান এবং লাভজনক সম্পত্তি হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইহা দ্বারা মনে হয়, লেসেপস্ তথা মিশরের রাজপ্রতিনিধির ইচ্ছা এবং উদ্দেশ্য সফল হয় নাই। কারণ, তাঁহারা চাহিয়াছিলেন যে, সুয়েজ খাল ব্যবসা-বাণিজ্যের পূর্ণ সহায়তা ও বিস্তার করিবে, সুয়েজ খালে পৃথিবীর সকল জাতিরই ধর্ম্ম বা বর্ণনির্ব্বিশেষে সমান অধিকার থাকিবে এবং পৃথিবীর সকল যুদ্ধ-বিগ্রহেই সুয়েজ খাল সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ থাকিবে।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, প্রথমে সুয়েজ খালে ইংরেজগণের কোনও অধিকার ছিল না এবং সুয়েজ খাল কেবলমাত্র ফরাসী মূলধনেই নির্ম্মিত হইয়াছিল—ওলন্দাজদিগের কিছু অংশ ছিল। আর কোনও জাতিরই কোন প্রকার অর্থ বা অন্য কোনও সাহায্য লওয়া হয় নাই। সুয়েজ ক্যানাল কোম্পানীর কিয়দংশ শেয়ার মিশরের খেদিবকে দেওয়া হইয়াছিল; এই শেয়ারগুলির মূল্য আড়াই মিলিয়ন পাউণ্ড অর্থাৎ প্রায় ৩ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা। বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট প্রথমে সুয়েজ খালের আবশ্যকতা বা প্রয়োজনীয়-তার গুরুত্ব উপলব্ধি করিতে পারেন নাই, সুতরাং প্রথমে তাঁহারা সুয়েজখালে এক কপর্দ্দকও মূলধন দেন নাই! কিন্তু সুয়েজ খাল খোলা হইলে এবং ব্যবসায় দ্রুত উন্নতি অবশ্যম্ভাবী বুঝিতে পারিয়া তাঁহারা নিজেদের ভুলের জন্য আপ্‌শোষ করিতে লাগিলেন। যাহা হউক, কিছুদিন পরে ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট দৈবক্রমে সুয়েজ খালে কিছু প্রাধান্য পাইয়াছিলেন।

পূর্ব্বোক্ত মিশরের খেদিব ইসমাইল্ যে দেউলিয়া হইয়া যান। ফলে তাঁহার সুয়েজ ক্যানাল কোম্পানীর শেয়ারগুলি অপ্রত্যাশিত ভাবে বাজারে বিক্রয়ার্থ আসে। তখন ইংলণ্ডের বিখ্যাত দেশ-প্রেমিক নেতা বেঞ্জামিন ডিস্‌রেলি এই শেয়ারগুলি ইংরেজ গবর্ণ-মেণ্টের পক্ষ হইতে ক্রয় করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। ইহাতে ইংলণ্ডের জনসাধারণ তথা ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট প্রচণ্ড আপত্তি জানাইয়া বলিয়াছিলেন, "এ কি, টাকা লইয়া ছিনিমিনি খেলা? মিশরের একটি সামান্য খালের পিছনে দেশের এত অর্থ অপব্যয় হইবে?" যাহা হউক, এই তুমুল আপত্তি সত্ত্বেও ডিস্‌রেলির কথাই শেষ পর্য্যন্ত থাকিল এবং ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে মিশরের খেদিবের আড়াই মিলিয়ন পাউণ্ডের শেয়ারগুলি ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে ৪ মিলিয়ন ৮০ হাজার পাউণ্ড অর্থাৎ প্রায় ১২ কোটি টাকা মূল্যে ক্রয় করা হইল। অত আপত্তির বিপক্ষে সম্পূর্ণ একাকী হইয়াও কি করিয়া ডিসরেলি এই শেয়ারগুলি বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের জন্য কিনিয়াছিলেন, তাহা এখন নাটকাভিনয় বলিয়া মনে হয় এবং বর্ত্তমানে ইহা একটি ঐতিহাসিক ঘটনা হইয়া দাঁড়াইয়াছে মাত্র। কিন্তু এই বিচক্ষণ, দূরদর্শী, রাজনীতি-বিশারদের নিঃস্বার্থপরতার কথা অনেকে হয় ত জানেন না। ডিসরেলি জাতিতে ইহুদী ছিলেন এবং তাঁহার টাকার অভাব ছিল না। সুয়েজ ক্যানাল কোম্পানীর শেয়ারের প্রয়োজনীয়তা এবং তাহার সম্বন্ধে সমস্ত খবরই তিনি ভাল করিয়া জানিতেন। ইচ্ছা করিলে তিনি নিজেই সমস্ত না হউক, অন্ততঃ অধিকাংশ শেয়ার কিনিতে পারিতেন। কিন্তু ডিসরেলি ইংলণ্ডকে প্রাণাপেক্ষা ভালবাসিতেন এবং সেই জন্য যে দেশ তাঁহাকে সমাদরপূর্ব্বক সম্মান দেখাইয়া গৌরবান্বিত করিয়াছিল, সেই ইংলণ্ডের জন্যই সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থভাবে এই শেয়ারগুলি কিনিয়া দিলেন। এইরূপে কেবলমাত্র ডিসরেলির দূরদর্শিতা তথা অপূর্ব্ব স্বার্থত্যাগের ফলেই ব্রিটিশ সুয়েজ খালে কিছু প্রাধান্য পাইলেন, যাহার জোরে আজ তাঁহারা ইটালীকে হুমকি দিতেছেন।

তখনকার দিনে সুয়েজ খাল সম্বন্ধে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের সম্পূর্ণ নির্লিপ্ততা এবং একগুঁয়েমী ভাব পরবর্ত্তী কালের ব্রিটেনের পক্ষে বিশেষ হানিকর হইয়াছে এবং তখনকার কতিপয় রাজ-নীতিজ্ঞের অদূরদর্শিতার ফল বর্ত্তমান ব্রিটিশজাতি ভোগ করিতে-ছেন। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, প্রাচ্যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের দিক দিয়া দেখিলে এই সুয়েজ খাল ব্রিটিশেরই সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় ও অপরিহার্য্য এবং সুয়েজ খাল সম্পূর্ণ ব্রিটিশ দখলেই থাকা উচিত ছিল।

সুয়েজ খাল দৈর্ঘ্যে ৯৯ মাইল। প্রথমে ইহা মাত্র ২১ ফুট গভীর ও ৭২ ফুট চওড়া ছিল। ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে ইহাকে পুনরায় কাটিয়া কিছু বড় করা হয় এবং তখন ইহা ৩৩ হইতে ৪২ ফুট গভীর এবং ১৯৮ ফুট চওড়া ছিল। প্রথমে কেবলমাত্র ৫ হাজার টনের কম ওজনের জাহাজ ইহার ভিতর দিয়া যাতায়াত করিতে পারিত এবং সমস্ত খালটি পার হইতে ৪৮ ঘণ্টা সময় লাগিত। এখন ২৭ হাজার টনের একটি জাহাজ মাত্র ১৫ ঘণ্টায় চলিয়া যায়। সুয়েজ খালের দৌলতে এখন লণ্ডন হইতে বোম্বাই মাত্র ১৭ দিনেই পৌছান যায়,—যে স্থলে পূর্ব্বে উত্তমাশা অন্তরীপ হইয়া আসিতে প্রায় ৬ মাস সময় লাগিত।

শ্রীরাধাভূষণ বসু।
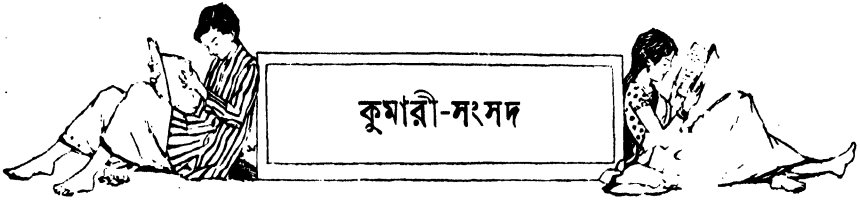
(গল্প)

মিশন কলেজের প্রিন্সিপ্যাল সাহেব হইলে কি হয়, ছাত্র ও ছাত্রীদের আচরণের দিকে তাঁহার লক্ষ্য এমনই তীক্ষ্ণ যে, কোন পক্ষেরই সামান্য একটু বেচাল হইবার যো নাই। ইহার পূর্ব্বে যিনি প্রিন্সিপ্যাল ছিলেন, তাঁহার আমোলে কলেজের ডিবেটিং ক্লাবে একদা বচসাসূত্রে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে তুমুল কলহ বাধিয়া যায় এবং তাহার পরিণাম এমনই শোচনীয় হইয়া উঠে যে, ছাত্রীদের মর্য্যাদা রক্ষার জন্য কলেজের কর্তৃপক্ষকে পুলিসের সহায়তা গ্রহণ করিতে হয়। এই ঘটনায় প্রিন্সিপ্যালের অযোগ্যতা ও সহ-শিক্ষার অবৈধতা সম্বন্ধে সংবাদপত্রের তীব্র আলোচনা সহরবাসীকে বিক্ষুব্ধ করিয়া তুলে। তাহার ফলে এই বহুদর্শী প্রবীণ প্রিন্সিপ্যালের আগমন এবং কার্য্যভারগ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে ছাত্রছাত্রীদের আচরণ সম্বন্ধে তাঁহার এইরূপ কঠোরতা অবলম্বন।

সেই ঘটনার পর হইতেই ছাত্রীরা ডিবেটিং ক্লাবের সহিত সংস্রব ছিন্ন করিয়াছিল, ছেলেদের সহিতও তাহারা কথাবার্ত্তা বন্ধ করিয়া দিয়াছিল। ছেলের দল উস্‌খুস্‌ করিত তাহাদের সহিত মিশিতে, তাহাদিগকে আবার ডিবেটিং ক্লাবের বৈঠকে টানিতে। কিন্তু মেয়েদের দৃঢ়তা এ সম্বন্ধে অসাধারণ, কিছুতেই তাহাদিগকে সংখ্যাগরিষ্ঠদের দলে ভিড়িতে দেখা গেল না।

ছাত্রীদলের যিনি চাঁই, তাঁহার নাম অনীতা সেন। ফিফ্‌থ ইয়ারে পড়েন, বড় ঘরের মেয়ে, কলেজের সকল মেয়ের উপর তাঁহার অসামান্য প্রভাব। ইহার পরেই থার্ড ইয়ারের ছাত্রী শক্তি বোসের নাম করা চলে। যদিও এই ছাত্রীটি খুব সম্পন্ন ঘরের মেয়ে নন, কিন্তু প্রতিভায় অসাধারণ। লেখাপড়ায় মেধা যেমন তীক্ষ্ণ, বাক্‌পটুতা ও উপস্থিতবুদ্ধি তেমনই অতুলনীয়। এই দুই তরুণী কলেজের মেয়েদিগকে সংঘবদ্ধ করিয়া এক সংস্থা খাড়া করিয়া বসিল। তাহার নাম হইল, কুমারী-সংসদ। নূতন প্রিন্সিপ্যাল সাহেব তাহাদের উদ্দেশ্য শুনিয়া কলেজের নিম্ন-তলে একখানি ঘর ছাড়িয়া দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে আদেশ জারি করিয়া দিলেন,—সেই ঘরে ছাত্রীরা তাহাদের ডিবেটিং ক্লাব বসাইবে, তাহাদের সংসদে কোনও ছাত্র প্রবেশ করিতে পারিবে না। মিশন কলেজে ছাত্রীদের স্বতন্ত্র সংসদ প্রতিষ্ঠার ইহাই সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।

ডিবেটিং ক্লাবে যে আলোচনা-প্রসঙ্গে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে বিবাদের সৃষ্টি হয়, তাহার বিষয়বস্তু ছিল—বিবাহে পণ-প্রথা ও তাহার বিষময় ফল। গড়পাড়ের কোনও বিশিষ্ট ঘরের অবিবাহিতা কতিপয় তরুণীর একসঙ্গে বিষপানে আত্মহত্যার শোচনীয় কাহিনী তখন সহরের প্রধান আলোচ্য বিষয়, তরুণী-সমাজে উত্তেজনার অন্ত নাই। সুতরাং ডিবেটিং সভায় এই মর্ম্মস্পর্শী বিষয়ের আলোচনা-প্রসঙ্গে এক তরুণী ছাত্রী এই নিষ্ঠুর প্রথাটিকে আক্রমণ করিয়া দেশের ছেলেদিগকে তজ্জন্য দায়ী করিয়া বসিল। এক সদ্যোবিবাহিত ছাত্র এই সভায় যোগ দিয়াছিল। তাহার পিতা এই বিবাহ উপলক্ষে পাত্রীপক্ষের উপর রীতিমত মোচড় দিয়া হাজার কয়েক টাকা আদায় করিয়াছিলেন, সুতরাং সহপাঠিনীর খোঁচাটি তাহার গায়েই সর্ব্বপ্রথম বিঁধিল। যে সুরে মেয়েটি মন্তব্য তুলিয়াছিল, তাহার পর্দ্দা তিনগুণ অধিক চড়াইয়া ছেলেটি পাল্টা জবাব দিল। তাহার পরেই সভার আইন-কানুন ভাঙ্গিয়া কদর্য্য আবহাওয়ার আত্মপ্রকাশ।

মেয়েরা এখনও সে কথা ভুলে নাই, সুতরাং সংসদের প্রথম বৈঠকেই সতেজে ইহারা ঘোষণা করিয়াছে,—ছেলের বিবাহের নামে ছেলের বাপরা এত কাল ধরিয়া মেয়ের বাপদের উপর যে অত্যাচার করিয়া আসিয়াছে—কসাই

সুলভ নৃশংস মনোবৃত্তির পরিচয় দিয়া মেয়েদের মুখ নীচু করিয়া রাখিয়াছে, ইহারা মুখ তুলিয়া তাহার প্রতীকার করিবে, সমস্ত অত্যাচারের প্রতিশোধ লইয়া ছেলের অভিভাবকদের ধারালো মুখ ভোঁতা করিয়া দিবে ; এজন্য যে কোনও প্রোপ্যাগ্যাণ্ডা, ছল বা কৌশল বা চাতুরী চালাইবার প্রয়োজন হইবে, কিছুতেই পেছপাও হইবে না।

ইহাকে ভিত্তি করিয়া উত্তেজনাপূর্ণ গান, নূতন নূতন প্রস্তাব ও নানাপ্রকার পরিকল্পনা সংসদের প্রতি বৈঠকেই বিপুল চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে, বাহিরেও তাহার রেস্ বায়ুপ্রবাহে ছুটিয়া থাকে ; ছেলেরা উৎকর্ণ হইয়া সভার উচ্ছ্বাস শুনে এবং পরস্পর নানারূপ আলোচনাও করে। কিন্তু আলোচ্য বিষয়ের গুরুত্ব বুঝিয়া, নিজেদের বৈঠকে তাহারা প্রতিবাদ তুলিতে সাহস পায় না। পূর্ব্বে যাহারা গোলযোগ পাকাইয়া তুলিয়াছিল এবং পণপ্রথার যাহারা সমর্থক, তাহারা বেপরোয়া হইয়া ডিবেটিং ক্লাবে মেয়েদের মতবাদের বিরুদ্ধে প্রস্তাব তুলিতে প্রয়াস পাইয়াছিল, কিন্তু ভোটে টেঁকে নাই। অধিকাংশ ছাত্রই দৃঢ়তার সহিত মত প্রকাশ করে যে, ওঁরা যে বিষয় লইয়া আলোচনা করিতেছেন, আমাদেরই উচিত ছিল ওঁদের আগেই তাহা গ্রহণ করা। সমাজের যে কুপ্রথার উচ্ছেদ করিতে উঁহারা বদ্ধপরিকর, আমরা তাহার বিরুদ্ধে সভা করিব ? অসম্ভব। বরং এ ক্ষেত্রে কোনও আলোচনাই আমরা করিব না।—সুতরাং মেয়েদের সংসদ বৈঠকের পর বৈঠকের সফলতায় অপ্রতিহতভাবেই পরিপুষ্ট হইতেছিল।

সে দিন নামমাত্র ক্লাস বসিয়াছিল, নাম লিখাইয়াই সকলে নিশ্চিন্ত ; পরস্পর বিদায়াভিবাদনের পালা, যেহেতু পরদিন হইতেই গ্রীষ্মাবকাশে কলেজ বন্ধ হইবার কথা। ক্লাস ভাঙ্গিতেই ছাত্রীরা পরিপূর্ণ উৎসাহে তাহাদের সংসদের শেষ বৈঠকের কাযগুলি সারিতে ছুটিল। বিশেষ জরুরী কোনও তাগিদ না থাকিলে ছুটীর মধ্যে আর কোনও অধিবেশন হইবে না, এরূপ স্থির ছিল।

ছেলেদের ডিবেটিং আজ বসে নাই, তাহারা কমন রুমে বিদায়াভিবাদনের পালা শেষ করিয়া ইটালী-আবিসিনিয়ার প্রসঙ্গ লইয়া মাতিয়া উঠিয়াছিল। এমন সময় অদূরবর্ত্তী ছাত্রীদের সংসদ-গৃহে মধুর সুর ঝঙ্কার দিয়া উঠিল।

তৎক্ষণাৎ ইটালী-আবিসিনিয়াপ্রসঙ্গের তুমুল তর্ক থামিয়া গেল। অনেকগুলি কর্ণ যুগপৎ কণ্টকিত হইয়া উঠিল। সুধীর চাটার্জ্জী কৌতূহলের সুরে কহিল,—ব্র্যাভো, হাঁসনিয়ম সাড়া দিয়েছে।

অনুপম হালদার হতাশের সুরে জানাইল,—বেল পাকলে কাকের কি লাভ? আমাদের যখন ওখানে—নো আডমিট্যান্স।

নিবারণ বিশ্বাস আশ্বাসের ভঙ্গীতে কহিল,—তবুও আনাচে-কানাচে ঘুরলে লাভ কিছু আছে বৈ কি, কোরাস্ গানখানা ত আর মুখ বুজিয়ে গাইবে না, তা ছাড়া ফায়ারী স্পীচ ও—

বিশ্বাসের কথায় বাধা দিয়া বংশীধারী বক্সী হাসিমুখে কহিল—আর যাই হোক, ওদের গানগুলো কিন্তু রিয়েলী পাউয়ারফুল, ওর এফেক্ট কিছু আছেই ; প্রত্যেক কথাটি যেন হুলের মত ফোটে!

অখিল মিত্র নিবিষ্টমনেই সহপাঠীদের কথাগুলি শুনিতেছিল, কিন্তু নিজের কথাটা নিক্ষেপ করিবার অবসর পাইতেছিল না। সে কালের যাত্রার দলের গায়কের মুখের গান অপেক্ষাকৃত সুদক্ষ গায়ক যেমন সহসা কাড়িয়া লইয়া বিচিত্রভঙ্গীতে তান তুলিয়া দর্শকবৃন্দের বাহাবা লইত, ঠিক সেই ভাবেই সে বক্সীর কথাটি যেন লুফিয়া লইয়াই কহিল,—সুটবেই ত! ফিফ্‌থ্ ইয়ারের অনীতা সেন নাম করা ভীমরুল্, উনি হচ্ছেন প্রেসিডেণ্ট, আর থার্ড ইয়ারের সার্প বোল্‌তা শক্তি বোস সেক্রেটারী, বাকি যে পনেরোটি হচ্ছেন সভ্যা, তাঁরা প্রত্যেকেই এক একটি মৌমাছি। এঁদের উচিত ছিল, সভার নাম দেওয়া—হুল ফোটানো সংসদ।

ছেলের দল সমস্বরে উল্লাসের সুরে কহিয়া উঠিল,—হিয়ার—হিয়ার!

সত্যব্রত সেন মুখ মচকাইয়া হাসিয়া কহিল,—মিষ্টার মিত্তির দেখছি ও-দলের অনেক খবরই রাখেন!

মিত্তির বিন্দুমাত্র অপ্রতিভ না হইয়া উত্তর দিল,—রাখতে হয় ঐ মিস্ শক্তি বোসের জন্য।

সেন ব্যঙ্গের সুরে কহিল,—এনগেজমেণ্ট চলেছে বুঝি! ও পক্ষ বোস, এ পক্ষ মিত্তির, তার ওপর সহপাঠিনী এবং রীতিমত বিউটি।

মিত্তির কহিল,—তুমি যেমন পাগল! ওকে ত চেন না, এমন শক্ত মেয়ে খুব কম দেখেছি। দৃক্‌পাত করে না কাউকে, কত ছুতো ধ'রে আলাপ জমাবার চেষ্টা করেছি, সবই হয়েছে বৃথা। সি ব্রেক নট, বেণ্ড নট এণ্ড কেয়ার নট্‌—

সেন হাসিমুখে কহিল,—থ্যাঙ্ক য়ু! আশা ছেড় না, ভাই; আজ না হইতে পারে, হতে পারে কাল!—Much rain wears the marble অতএব go on.

মিত্তির এবার উৎসাহের সহিত কহিল,—এই যে খাতাখানা দেখছ, এটা মিস্ বোসের। ক্লাসে ফেলে এসেছেন, আমি বয়ে বেড়াচ্ছি আর ফুরসদ খুঁজছি, কি ক'রে তাঁর হাতে পৌছে দিই!

অনুপম হালদার ব্যবস্থা দিল,—তার জন্য ভাবনা কি, চ'লে যাও সোজা ঐ পর্দাখানা ঠেলে ওদের সভায়; খাতাখানার শোকে মিস্ বোসের প্রাণখানা হাঁপিয়ে উঠেছে নিশ্চয়ই, হাতে ক'রে ঐটি পৌছে দিলেই চিয়ার্শের সঙ্গে তাঁর পাশের চেয়ারখানাও হয় ত এই সূত্রে অধিকার ক'রে বসবেন।

সুধীর চ্যাটার্জ্জী হতাশের সুরে জানাইয়া দিল—সে গুড়ে বালি! ও-ঘরে মুখখানি বাড়ালেই অমনি—গেট্ আউট প্লীজ্!

সেন সহাস্যে প্রশ্ন করিল,—চ্যাটার্জ্জী বুঝি এ অভিজ্ঞতা-টুকু আগেই সঞ্চয় ক'রে ফেলেছেন?

সুধীর উত্তর দিল,—নিশ্চয়ই; মিত্তিরের ও সঙ্কল্প পুরানো হয়ে গেছে, সুতরাং ওঁর এ অ্যাডভেঞ্চারের কোনো সার্থকতাই নেই। আমার ক্লাসে পড়েন মহামায়া মুখার্জ্জী, তিনিও ফেলে এসেছিলেন ক্লাসে তাঁর পেনসিলটা। সে দিনও ছিল ওঁদের সভা। আমি পেনসিলটি কুড়িয়ে মিত্তিরের মতই সেটি যথাস্থানে দাখিল করবার জন্য একেবারে অস্থির! তার পর যেমন ওঁদের গান শেষ হওয়া, অমনই পেনসিল হস্তে সভায় সুধীর চ্যাটার্জ্জীর বেগে প্রবেশ—

সুধীর চ্যাটার্জ্জী মুখখানি বিকৃত করিয়া উত্তর দিল—তখনই এমনই একটা হৈ-চৈ প'ড়ে গেল, সুধীর চ্যাটার্জ্জী যেন গুণ্ডারাজা মীনা পেশোয়ারীর মূর্ত্তি ধ'রে সেখানে উপস্থিত! কেউ বলে—ট্রেস্‌পাস্, কেউ বলে—সেম্‌লেস্ ক্রীচার, প্রেসিডেণ্ট অনীতা সেন টেবল চাপড়ে চেঁচিয়ে জিজ্ঞাসা করলে—হোয়াট-ইফ্? আমি হাতের পেনসিলটি দেখিয়ে অনধিকারপ্রবেশের কারণটি বলতেই প্রেসিডেণ্ট ঠোক্কর দিয়ে প্রশ্ন করলেন—পেনসিলটায় মিস্ মুখার্জ্জীর নামটা বুঝি লেখা আছে?

সেন হাসিয়া কহিল,—শক্ত জেরা ত! তুমি কি বললে, চ্যাটার্জ্জী?

চ্যাটার্জ্জী স্বর আর্দ্র করিয়া উত্তর দিল,—আমাকে কথা বলবার ফুরসদ না দিয়েই মিস্ মুখার্জ্জী ব'লে উঠলেন—এতে আশ্চর্য্য হবার কিছু নেই, অনীতা দি। আমার নিজের বই খাতা পেনসিল সম্বন্ধে অনেক সময় আমি নিজেই যা জানি না, এঁরা তাও জানেন!

বিশ্বাস বিচিত্র মুখভঙ্গী করিয়া কহিল,—যাকে বলে মিষ্টি জুতো!

সুধীর কহিল,—এর পরের চ্যাপ্টারটা আগে শোনো, তার পর ক'র তোমার রিমার্ক।

উপসংহারটি শুনিবার আগ্রহ সমবেত ছাত্রদল সকলেই সমস্বরে ব্যক্ত করিল। সুধীর কহিল,—আমি তখন বললুম, আপনার পেনসিলটা একটু স্পেশাল রকমের কি না,—

সেন প্রশ্ন করিল,—পেনসিলটার স্পেশ্যালিটি ছিল বুঝি?

সুধীর উত্তর দিল,—হাঁ, তার মাথার দিকে ছিল একটা সাদা টাস্পী; কিন্তু আমার কথার ওপরে মুখঝাপটা দিয়ে মিস্ মুখার্জ্জী ব'লে উঠলেন—ক্লাসে কিছু ফেলে এলে তার খবরদারী করতে আছে মাইনে-করা 'বেয়ারা', আপনার এ ফেভারটুকু করবার কোনো দরকার ছিল না, আর এই ছুতোয় যে একটা ধন্যবাদ আদায় করবেন ভেবেছেন, সেটাও আপনার দুরাশা।

সেন কহিল,—তখনও তুমি সেখানে দাঁড়িয়ে ভাগ্য পরীক্ষা করছিলে?

সুধীর উত্তর দিল,—আমার অবস্থা তখন ত্রিশঙ্কুর মত; তবুও হাল একেবারে ছেড়ে না দিয়ে সাহস ক'রে জানিয়ে দিলুম তাঁকে—হাতের জিনিষটা ফেলে এসেছিলেন, আমি সেটা পৌছে দিলুম—অ্যাজ এ ফ্রেণ্ড, হাণ্ড অ্যাণ্ড ইন্ গ্লোভ উইথ্—

সেনের পুনরায় প্রশ্ন,—এ কথা শুনেই বুঝি মিস্ মুখার্জ্জী হাসিমুখে তোমার হাত থেকে পেনসিলটি নিয়ে কৃতার্থ ক'রে দিলেন?

সুধীরের মুখে বেদনার ছায়া পড়িল, স্বরেও ব্যথার আভাস পাওয়া গেল, কহিল,—আমার কথাটা যেমন শেষ হওয়া, অমনি খপ ক'রে আমার হাত থেকে পেনসিলটা টেনে নিয়ে সেইটে দিয়েই রগের ওপর ঠকাস্ ক'রে একটি ঘা বসিয়ে দিয়ে ঝাঁঝিয়ে বললে—সাট আপ—গেট আউট প্লীজ! রগটা টিপে আমি তখন দে ছুট।

সবার মুখেই চাপা হাসি, অস্ফুট গুঞ্জন। সেন মন্তব্য প্রকাশ করিল,—সর্ব্বনাশ! যাকে বলে—ইন্ দি ভেরী অ্যাক্ট! তা হ'লে মিত্তিরের অবস্থাও হোপলেস্, মিস্ বোসের খাতাখানা বহন করাই সার হ'ল!

সুধীর চ্যাটার্জী কহিল,—বন্ধুর কর্ত্তব্য বন্ধুকে সতর্ক ক'রে দেওয়া।

এই সময় সংসদকক্ষ হইতে সমবেত কণ্ঠের চমকপ্রদ কোরাস্ গানখানির ঝঙ্কার ছাত্রদের কাণের ভিতর দিয়া মরমে প্রবেশ করিয়া সকল আলোচনা বন্ধ করিয়া দিল।

সকলের উপস্থিতিতে সংসদের এ দিনের বৈঠকটি গোড়া হইতেই জমজমাট হইয়াছে। প্রতি বৈঠকের সূচনায় নূতন গান রচিত ও গীত হইয়া থাকে। এদিনের বৈঠকের গানখানি শক্তি বোস নিজে রচনা করিয়াছে, সুর দিয়াছে সভানেত্রী অনীতা; সংসদের সকলেই সমবেত কণ্ঠে গানখানি গাহিতে সভায় একটা উত্তেজনার ভাব যেন মূর্ত্ত হইয়া উঠিল। গানখানির মর্ম্ম এইরূপ—

কি দেখিস্ বল না চেয়ে কাঁদে আজ আকুল হয়ে
ব'সে ঐ বাঙ্গালার মেয়ের বাপ রে।
ভেবে মেয়ের বিয়ের কথা ভেঙ্গে পড়ে বাপের মাথা
কি দারুণ পণপ্রথার ঝাঁঝ রে।
ব'সে আছে বরের বাবা বাগিয়ে মস্ত থাবা
বসাতে মেয়ের বাপের বুকে;
রেখেছে মনে পুষে খাবে সে রক্ত চুষে
তবে গো তৃপ্ত হবে সুখে;
তাই বলি জাগ রে তোরা আগুনে আজকে পোড়া
যত ঐ সমাজ-বিধির পাপরে।
আচার্য্যের 'চিঁড়েগুড়ে' রহিল হৃদয় জুড়ে
চায়ের কাপ ফেলতে দূরে কহিলেন ডাকি;
চাবাগানের কুলীর দুখে ব্যথা তাঁর বাজল বুকে
দেশের এই পাপের দিকে ফিরে না আঁখি;
মেয়েদের এই মৃত্যু বরণ, চিত্তে কারো দেয় না দোলন
হুজুগ নিয়ে সবাই মগন, এমনি পরিতাপ রে।

গানের পর সংসদের কায আরম্ভ হইল। সেক্রেটারী শক্তি বোস জানাইল,—বিভিন্ন পত্রিকায় সংসদের বিজ্ঞাপন ছাপা হইয়াছে। প্রকাশিত বিজ্ঞাপনটি সভায় তৎক্ষণাৎ পঠিত হইল। অবিবাহিতা বিপন্না কুমারীদের আশ্বাস দিয়া এই মর্ম্মে ঘোষণা করা হইয়াছে যে,—

আমাদের সমাজের বুকের উপর পণপ্রথার যে জাঁতা চলিতেছে, কুমারী-সংসদ তাহা বন্ধ করিতে কোমর বাঁধিয়াছেন। সুতরাং আর্ত্ত কুমারীদিগকে আমরা অনুরোধ করিতেছি, কেরোসিন ও অহিফেনের আশ্রয় না লইয়া তাঁহারা সংসদের সভানেত্রীকে সবিশেষ লিখন, প্রতীকার হইবে। শুভবিবাহের নামে যে সকল পণগ্রাহী কন্যাপক্ষের উপর করাত চালাইতে এখনও কুণ্ঠিত নয়, তাহাদের নাম ধাম সংসদে লিখিয়া পাঠান, সংসদ হইতে তাহার প্রতিবিধান হইবে।

সভ্যাগণ একযোগে করতালি দিয়া প্রকাশিত বিজ্ঞাপনটির সমর্থন করিল। সভানেত্রী অনীতা সেন কহিলেন,—সংসদের গান সমাজের কাণে বেজেছে। সহরের সকল সংবাদপত্র সংসদের সৎসাহসের প্রশংসা ক'রে 'প্যারা' লিখেছেন।

সভানেত্রীর আদেশে সম্পাদিকা বিভিন্ন কাগজের সম্পাদকীয় মন্তব্যগুলি পাঠ করিলেন। তাহাদের মোটামুটি মর্ম্ম এইরূপ,—বস্তুতঃ দেশের সর্ব্বাপেক্ষা সমস্যাময় বিষয়টির সমাধানে দেশের নেতা ও সমাজপতিগণ যখন উদাসীন, তখন শিক্ষিতা কুমারী ছাত্রীগণ নিদারুণ অবমাননা হইতে নারীত্বের শুভ্রতাকে রক্ষা করিতে এই আদর্শ সংস্থাটির প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। এ ক্ষেত্রে কবির সেই বিখ্যাত গানটিই আমাদের মনে জাগিতেছে,—'না জাগিলে এই ভারত-ললনা, এ ভারত আর জাগে না জাগে না!' কুমারী-সংসদের বীর কুমারীদের এ জাগরণ সার্থক হউক।

বিপুল উল্লাসে সভ্যাগণ পুনরায় করতালি দিল। অতঃপর কতকগুলি প্রস্তাব উঠিল। প্রথম প্রস্তাব তুলিলেন সভানেত্রী স্বয়ং, কহিলেন,—নানা সূত্রে জানা গিয়েছে, পণপ্রথার সুযোগে আর এক অনাচার কুমারীদের সর্ব্বনাশ আরম্ভ করেছে। এক শ্রেণীর বিবাহ-বাতিকগ্রস্ত বৃদ্ধ

নিরুপায় অভিভাবকদের কন্যাদায়মুক্তির ছলে বয়স্থা কন্যাদের বিবাহ ক'রে সমাজে হাহাকার তুলেছে। এখন থেকে এই কদর্য্য ব্যাপারের প্রতীকারে সংসদকে বিশেষভাবে অবহিত হ'তে হবে।

প্রস্তাবটি অনুমোদিত ও সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল। আরও কতকগুলি প্রস্তাব একে একে উত্থাপিত হইলে, সেগুলিও অনুমোদিত ও গৃহীত হইল। শেষ প্রস্তাব তুলিল সেক্রেটারী শক্তি বোস, কহিল,—আমাদের দেশের যাঁরা নেতা ব'লে পরিচিত এবং যে সকল শিক্ষিতা মহিলার দেশনিষ্ঠায় ভারতের নারী-সমাজ গৌরবান্বিত, তাঁদের প্রত্যেকের নিকট আজকের কাগজগুলির মন্তব্য ও সংসদের প্রস্তাবগুলির অনুলিপি পাঠান হোক।

সমস্বরে সকলেই এই প্রস্তাবের সমর্থন করিল। এই সময় দরোয়ান অতি সন্তর্পণে পর্দ্দা ঠেলিয়া কক্ষে ঢুকিল ও সংসদের নামীয় দুইখানি চিঠি সভানেত্রীর টেবলের উপর রাখিয়া সেলাম বাজাইয়া চলিয়া গেল। বাহির হইতে সংসদের নামে ডাকের এই প্রথম চিঠি! লেফাফা দুইখানি দেখিয়া সকলেরই মুখখানি হর্ষোৎফুল্ল। সভানেত্রী নিজেই চিঠি দুইখানি হাতে করিয়া উচ্ছ্বাসের সহিত কহিলেন,—দি ফ্রুটস্ ফার্ষ্ট গেদার্ড ইন্ এ সিজন্ অফ আওয়ার য়্যাডভারটাইজমেণ্টস্!

শক্তি কহিল,—আমরা ঐ দুই অগ্রদূতের বাণী শুনতে উৎকর্ণ, অনীতাদি, আপনিই পড়ুন।

অনীতাদেবী চিঠি দুইখানি খুলিয়া তাহাদের বয়ানটুকু মনে মনে পড়িয়া লইয়া কহিলেন,—দুখানা চিঠির বিষয়ই খব গুরুতর, কাযেই নাম ঠিকানা নানা কারণে উপস্থিত চেপে রেখে, চিঠির আর সব অংশই আমি পড়ছি. তোমরা শোনো।

প্রথম চিঠির লেখিকা বারো বৎসরের এক বালিকা। সে লিখিয়াছে,—আমার দাত্ত্বর নাম আপনারা নিশ্চয়ই জানেন। তিনি ছিলেন দায়রার হাকিম। অনেককে জেলে দিয়াছেন, কত লোককে ফাঁসী দিয়াছেন। কিন্তু আপনারা শুনে হয় ত অবাক্ হবেন, পেনশান নিয়েও দাত্ত্বর ফাঁসী দেবার হাত-শুড়শুড়ুনি এখনও থামেনি। তিনি সম্প্রতি যোলো বছরের একটি কুমারীর গলায় ফাঁসী লাগাবার মতলব করেছেন, অর্থাৎ দাত্ত্ব এই ৭২ বছর বয়সে সেই মেয়েটিকে নিয়ে শীঘ্রই ছাঁদনাতলায় দাঁড়িয়ে আবার কেঁচে গণ্ডুষ করবেন। এ দিকে সংসারে তাঁর বাড়বাড়ন্ত খুবই; উপযুক্ত সাতটি ছেলে, এগারোটি মেয়ে, নাতিনাতনীদের সংখ্যা একুশ. তাদের কেউ কেউ ছেলের মা হয়েছে। দুপক্ষের ঠিকানা দিলাম, বিয়ের কথাবার্ত্তা পাকা, এখন যা কিছু করবার, আপনারা করুন।

চিঠিখানি পড়া হইতেই এক সভ্যা কহিয়া উঠিল,—ওরে বাবা! বাহাত্ত্বরে বুড়োর সখ ত সামান্য নয়!

সঙ্গে সঙ্গে বহুকণ্ঠের ধ্বনি উঠিল,—ছুইপ—ছুইপ!

সভানেত্রী সকলকে শান্ত হইতে বলিয়া দ্বিতীয় পত্রখানি পড়িতে আরম্ভ করিলেন। তাহার লেখক লিখিয়াছেন,—আমি এক ধনী জমিদারের ছেলে। আমরা পাঁচ ভাই; বোন নাই। আমার বাবা চারিটি ছেলে, তিনটি ভাইপো এবং পাঁচটি ভাগনের বিয়ে দিয়ে বারোটি সংসার ভেঙ্গে দিয়েছেন। অর্থাৎ ধনী জমিদারের ঘরে কন্যাদানের মোহে ঐ বারোটি সংসারের মেয়ের বাপরা সর্ব্বস্বান্ত হয়েছেন। আমার বাবার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে আমি চিরকুমার-ব্রত নিয়েছি। বাবা আমাকে যদিও ত্যাজ্যপুত্র করেছেন, কিন্তু আমি সরকারী চাকরী আশ্রয় ক'রে পণপ্রথার উচ্ছেদে আত্মোৎসর্গ করেছি। অর্থে, সামর্থ্যে, পরামর্শে আমি সর্ব্বতোভাবে কুমারী-সংসদের সহায়তায় প্রস্তুত।

এ পত্রখানি সভায় সংশয় তুলিল। কেহ কহিল, মন্দ কি! কেহ কেহ সন্দেহের সুরে কহিল, বিশ্বাস কি?

সভানেত্রী প্রশ্ন তুলিলেন,—আশা করি, বিয়ের ব্যাপারে হাত দেওয়া সংসদের সকলেরই মত?

সমস্বরে সকলেই উত্তর দিল,—নিশ্চয়ই।

সভানেত্রী জানাইলেন,—তা হ'লে এ সম্বন্ধে তদন্তের জন্য উপস্থিত সংসদের ছয় জনকে আমি মনোনীত করছি—শক্তি বোস, সত্যভামা সোম, গোদাবরী গুপ্তা, মহামায়া মুখার্জ্জী, চাঁপা চাটার্জ্জী এবং তিলোত্তমা তালুকদার। আর এক কথা, বিষয়টি খুবই গুরুতর; সুতরাং এর একটা হেস্তনেস্ত না হওয়া পর্য্যন্ত কাল থেকে আমার বাড়ীতে বৈকাল তিনটের সময় প্রত্যহ সংসদের বৈঠক বসবে।

সভ্যাগণ সকলেই সভানেত্রীর প্রস্তাবে সানন্দে সায় দিল। অবশেষে শক্তি বোস সভানেত্রীকে ধন্যবাদ জানাইয়া সভার কার্য্য শেষ করিল।

অবনী রায় ছাঁপোষা গৃহস্থ। মার্চেন্ট আফিসে চাকুরী করেন, মাহিনা পান আশী টাকা। বাস করেন বাগবাজার অঞ্চলের শেষপ্রান্তে নিয়োগী-পাড়ায়; ছোটখাটো একখানি বাড়ী, তাহার ভাড়া দেন মাসে বত্রিশ টাকা, বাকি আটচল্লিশ টাকায় তাঁহাকে সংসার চালাইতে হয়। বড় মেয়ে সাবিত্রী ষোলো পার হইয়া সতেরোয় পড়িয়াছে, বাড়ন্ত গড়ন, আর রাখা যায় না; গৃহিণী যশোদাদেবী দুই বেলা তাগিদ দেন, কিন্তু ঘরে যাহার একটি পয়সার স্থিতি বলিতে নাই, সে কি করিয়া মেয়ে পার করিবে? সাবিত্রীর রূপের খ্যাতি থাকিলেও, পাত্রপক্ষ দাবীর অঙ্ক খাটো করিতে কিছুতেই রাজী নহে। রায় মহাশয় করযোড়ে নিজের অক্ষমতার কথা জানাইলে ব্যঙ্গের সুরে উত্তর আসে,—দুহাজারের কমে এ যুগে মেয়ে পার করা চলে না।

আফিসের এক আর্টিষ্ট বন্ধুর সৌজন্যে অবনী রায় কন্যা সাবিত্রীর কয়েকখানি ফটো তুলাইয়া ঘটকদিগকে দিয়াছিলেন। উদ্দেশ্য, সুন্দরী কন্যার আলেখ্য যদি রূপগ্রাহী পাত্রপক্ষের চিত্তে সহজেই প্রভাব বিস্তার করে। ঘটকদিগকে তিনি স্পষ্ট করিয়াই বলিয়া দিয়াছিলেন যে, মেয়ের ফটো দেখিয়া খুসী হইয়া কোনও মহাত্মা যদি বিনাপণে তাহাকে গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক হন, তাহা হইলে যেন কথা পাড়া হয়, কেন না, টাকা দিয়া মেয়ে পার করিবার মত অবস্থা তাঁহার নয়।

ঘটকদের মধ্যস্থতায় যে মহাত্মা অবশেষে একান্ত অনুকম্পার সহিত অবনী রায়ের দায় উদ্ধার করিতে সম্মত হইলেন, তিনি অবসরপ্রাপ্ত দায়রার হাকিম রায় বাহাদুর শশিনাথ চৌধুরী। টালায় প্রাসাদতুল্য প্রকাণ্ড বাড়ী। প্রচণ্ড দপদপা, উত্তর অঞ্চল ব্যাপিয়া বিপুল নামডাক, প্রতিষ্ঠা; মোটা টাকা পেনশান পান; পেনশানের অর্দ্ধেক টাকার বিনিময়ে ব্যাঙ্কে প্রায় অর্দ্ধলক্ষ টাকা সঞ্চিত হইয়াছে। মা-লক্ষ্মী ও মা-ষষ্ঠীর প্রচুর কৃপা তাঁহার বিশাল সংসারের পরিস্থিতি জমজমাট করিয়া তুলিলে কি হয়, গৃহলক্ষ্মীর অভাবে মধ্যে মধ্যে তাঁহার মনটি ক্লিষ্ট হইয়া উঠিত। কিন্তু মকরকেতনের চক্রান্তে এমন এক সন্ধিক্ষণে সাবিত্রীর ফটোখানি রায় বাহাদুরের চক্ষু দুইটিকে চমৎকৃত করিয়া দিল যে, তাহার প্রভাবে তাঁহার ক্লিষ্ট মনটির উপরও নবীন যৌবনের পুলকপ্রবাহ দুর্ব্বারগতিতে উচ্ছ্বসিয়া উঠিল।

রায় বাহাদুরের সাদর আহ্বানে অবনী রায় তাঁহার টালার বাড়ীতে দেখা করিতে আসিলেন; ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই কথাবার্ত্তা পাকা হইয়া গেল। বয়সের দিক দিয়া যে খোঁচাটুকু রায় মহাশয়ের মনে বিঁধিতেছিল, রায় বাহাদুরের মুখের কথায় তাহা নিশ্চিহ্ন হইয়া গেল। রায় বাহাদুর দৃঢ়স্বরে আশ্বাস দিলেন,—এ বিবাহে একটি পয়সাও তাঁকে ব্যয় করতে হবে না, উপরন্তু মার্চেন্ট আফিসে আশী টাকা মাইনের চাকরীও তাঁকে আর বেশী দিন করতে হবে না, ছোট আদালতের সেরেস্তায় এমন কোনও দুর্লভ আসনে তিনি তাঁকে বসিয়ে দেবেন—যার গ্রেড্ তিন শোর কম নয়। ছেলেদেরও তিনি ভাল যায়গায় ঢুকিয়ে দেবেন, অপর মেয়েগুলোর বিয়ের জন্যও রায় মহাশয়কে আর ভাবতে হবে না।

দায়রার এজলাসে বসিয়া যে লোক ফাঁসীর আসামীর বিচার করিয়া আসিয়াছেন, আজ সেই লোক স্বেচ্ছায় অবনী রায়ের মুরুব্বী হইতে ইচ্ছুক! আশা অনাগত ভবিষ্যতের উজ্জ্বল ছবি তাহার চক্ষুর উপর তুলিয়া মাথা ঘুরাইয়া দিল। মন দ্বিধা তুলিলে পরক্ষণেই উত্তর আসিল,—বহু সুন্দরী তরুণীই ত গুণশালী বর্ষীয়ান্ পুরুষকে স্বেচ্ছায় বরণ করেছে, পুরাণে, ইতিহাসে, সমাজে ত নজীরের অভাব নাই; তবে?

সুতরাং অবনী রায় বিবাহের কথা পাকা করিয়াই বাড়ী ফিরিলেন। গৃহিণী যশোদা দেবী কথাটা শুনিয়া আকাশ হইতে পড়িলেন; তাঁহার স্নেহের দুলালী সোণার কমল সাবিত্রীকে শেষে এক বাহাত্তুরে বুড়োর গলায় ঝুলাইয়া দিবার ব্যবস্থা করিয়া আসিলেন স্বামী! দুনিয়ায় কি আর পাত্র ছিল না? কিন্তু স্বামী আর্ত্তস্বরে জানাইলেন, দুনিয়ায় পাত্রের অভাব নেই, কিন্তু গরীবের মেয়েকে বিনি পয়সায় গ্রহণ করতে কোনও পাত্রই নেই। অত বড় মানী লোক শুধু সাবির ছবি দেখেই যখন উপযাচক হয়ে নিতে চেয়েছে, তখন এ যে ভগবানের ইচ্ছা, তাতে সংশয় করবার কি আছে? উমা শিবের গলায় মালা দিয়েছিল, তার গুণ দেখে, বয়স মেপে নয়। বঙ্কিম বাবুর রাজসিংহ পড়েছ ত? মনে নেই, রূপনগরের রাজকন্যা বুড়ো রাজা রাজসিংহকে সেধে বরণ করেছিলেন? সবই ভবিতব্যের খেলা, এতে দুঃখ করবার কিছু নেই।

যশোদা দেবী স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া মনের ব্যথা বুকের মধ্যে চাপিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু পরক্ষণে সাবিত্রীর সুন্দর মুখখানির উপর দুই চক্ষু পড়িতেই সকল ধৈর্য্য হারাইয়া ফেলিলেন, দুই হাতে বুকখানি চাপিয়া ধরিয়া পূজার ঘরে ছুটিয়া গেলেন, ইষ্টদেবীর সিন্দুর-চন্দন-চর্চ্চিত আলেখ্যখানির সম্মুখে লুটাইয়া পড়িয়া আর্ত্তস্বরে মিনতি জানাইলেন,—তোমার দোর ধরেই যে সাবিকে পেটে ধরেছিলুম, মা! এই যদি তোমার মনে ছিল, কেন তাকে সেখানেই শেষ ক'রে দাও নি? পয়সার অভাবে আজ ঘাটের এক মড়ার হাতে তাকে তুলে দিতে হবে! এই কি তোমার ইচ্ছা, মা! তার চেয়ে তোমার দেওয়া সাবিকে তুমি নিজের কাছে ডেকে নাও, মা, ডেকে নাও!

শ্যামবাজার অঞ্চলে দেশবন্ধু পার্কের সান্নিধ্যে ছোট একখানি বাড়ীর বাহিরের ঘরে চেয়ারে বসিয়া ক্যালকাটা পুলিসের ইন্‌সপেক্টর নির্ম্মলকান্তি ব্যানার্জ্জী আফিসের ফাইল ঘাঁটিতেছিলেন। সম্মুখেই একখানি সেক্রেটেরিয়েট টেবল, তাহার উপর লাল ফিতায় বাঁধা নানাবিধ নথী-পত্র, কেতাব ও কয়েকখানি সাময়িক পত্র। বাহিরের দিকে দরজার উপর জাপানী ছিটের একটা পর্দ্দা ঝুলিতেছিল। সেই পর্দ্দা ঠেলিয়া কক্ষে প্রবেশ করিল এক সুন্দরী তরুণী; তাহার আকৃতি, আসিবার ভঙ্গী ও সাদাসিধা একখানি দেশী শাড়ী পরিবার কায়দাটি তরুণীর বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দিল।

নির্ম্মলকান্তি বিস্ফারিত দৃষ্টিতে তরুণীর দিকে চাহিতেই সে অসঙ্কোচেই প্রথমে প্রশ্ন করিল,—আপনার নাম নির্ম্মলকান্তি ব্যানার্জ্জী?

শ্রদ্ধার সহিত নির্ম্মলকান্তি উত্তর দিলেন,—আজ্ঞে হাঁ। বসুন আপনি।

তরুণী বেশ সপ্রতিভভাবেই টেবলের অপর পার্শ্বে রক্ষিত চেয়ারখানি একটু টানিয়াই তাহাতে বসিয়া পড়িল।

নির্ম্মলকান্তি বদ্ধদৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া প্রশ্ন করিলেন,—কোথা থেকে আসছেন বলুন ত,—কি আপনার বিজনেস?

তরুণী সহজস্বরেই উত্তর দিল,—আমার নাম কুমারী শক্তি বোস; কুমারী-সংসদের আমি সেক্রেটারী।

সহর্ষে নির্ম্মলকান্তি বলিয়া উঠিলেন,—আপনি! নমস্কার! আমি আপনাকে খুবই জানি, অবশ্য থ্‌-ইয়োর ডিস্‌টিংগুইষ্ট্‌ নেম্‌,—আপনার সংসদে সম্প্রতি আমি একখানা পত্র—

শক্তি।—সে পত্র আমরা পেয়েছি, আর সেই সূত্রেই আমার এখানে আসা। আপনি লিখেছেন—সকল রকমেই সংসদকে সাহায্য করবেন। সেটা ভেরিফাই করতেই—

নির্ম্মল।—চিঠিতে আমি যা লিখেছি, আপনার সামনেও তাই বলছি;—যে আদর্শ নিয়ে আপনাদের সংসদ, সে সম্বন্ধে যে কোন ভার নিতে আমি সানন্দে প্রস্তুত।

শ।—একটা ভার আমি নিয়েই এসেছিলুম। কিন্তু—

নি।—দ্বিধা কেন, অসঙ্কোচেই বলুন।

শ। সে ভারটা এখন চাপাতে ভরসা হচ্ছে না।

নি।—কেন বলুন ত?

শক্তি নির্ম্মলকান্তির মুখের দিকে চাহিয়া একটু হাসিয়া কহিল,—আপনার চাপরাশ দেখে। এই ঘরে ঢোকবার আগে দরজার ধারে আঁটা ট্যাবলেটখানা পড়েছি, আর সেই সূত্রে ভরসাটুকুও হারিয়ে ফেলেছি।

নির্ম্মলকান্তি মুখখানি গম্ভীর করিয়া কহিলেন,—বুঝেছি। যেই জানলেন, আমি ক্যালকাটা পুলিসের ইন্‌সপেক্টর, অমনি সামনে একটা ব্যবধান খাড়া ক'রে ফেললেন! কিন্তু চিঠিখানাতেই ত জানিয়েছিলুম, আমি সরকারী কর্ম্মচারী।

শক্তি কহিল,—তা জানিয়েছিলেন। কিন্তু তখন বুঝতে পারিনি, আপনার কার্য্য দারোগাগিরি! রাগ করবেন না, পরিচয় পেয়ে যদি কিঞ্চিৎ ভীত হই, সেটা কি অস্বাভাবিক?

নির্ম্মলকান্তি নিজের কথার উপর এবার জোর দিয়াই কহিলেন,—আমি যদি এ কথার উত্তরে বলি—সত্যের দরজায় আগড় থাকে না; যেখানে পাপ নেই, ভয়ও সেখানে ঘেঁসতে পারে না। আপনারা ত মেয়েগুলোর দুঃখমোচনের ছলে তাদের আউটসাইড অফ্‌ বেঙ্গলে চালান দেবার ব্যবসায় ফাঁদেন নি, তবে ভীত হবেন কেন শুনি?

ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া শক্তি সহসা উত্তর দিল,—তা হ'লে আমার কথা আমি প্রত্যাহার করছি, নির্ম্মল বাবু!

নির্ম্মলকান্তি আবেগের সুরে কহিলেন,—দেখুন, য়ুনিভারসিটীর শেষ ডিগ্রী নিয়ে কম্পিটিটিভ একজামিনেশান-গুলোর গণ্ডী পার হয়ে কেন আমি বেছে বেছে পুলিস ডিপার্টমেণ্টে ঢুকেছি শুনবেন? আমাদের দেশের মেয়ে-গুলোকে বাঁচাতে আর পণপ্রথাটা ভেঙ্গে দিতে যে ব্রত আমি নিয়েছি, আমার এই পোষ্ট তাতে লোহার পোষ্টের মত কায করবে। পলিটিক্যাল য়্যাফেয়ারে যে য়্যাটিটি-উডই পুলিসের থাকুক, কিন্তু এমন একটা সোস্যাল ডিষ্টারব্যান্সে পুলিস আর কিছু না পারুক, সিচুয়েশানটাকে পজ্‌ল্ করতেও ত পারে!

কণ্ঠস্বর গাঢ় করিয়া শক্তি কহিল,—আমাকে মাপ করুন, নির্ম্মল বাবু। মনে যে সংশয়টুকু উঠেছিল, আপনার কথায় তা মুছে গেল একেবারে। এখন বুঝছি, ঈশ্বরের নির্দ্দেশেই আমরা আপনাকে পেয়েছি। যে ভারটি আমি সংসদের পক্ষ থেকে এনেছি, সেটি বহন করবার উপযুক্ত পাত্রই এখন আপনি।

নির্ম্মলকান্তি কৌতূহলী হইয়া কহিলেন,—কি ব্যাপার বলুন ত?

শক্তি তৎক্ষণাৎ একখানি চিঠি বাহির করিয়া নির্ম্মল-কান্তির হাতে দিয়া কহিল,—এইখানা পড়ুন, তা হলেই সব বুঝতে পারবেন।

হাতের ফাইলটি পার্শ্বে সরাইয়া রাখিয়া নির্ম্মলকান্তি চিঠিখানির দিকে অখণ্ড মনোযোগ দিলেন। শক্তি কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল,—বিধাতার কি সৃষ্টিবৈষম্য দেখুন! কোনও বাপ মেয়ে পার করতে সর্ব্বস্ব ঘুচোয়, আবার কোনও কোনও বাপ সর্ব্বস্ব রাখতে মেয়ের গলায় ফাঁসী পরায়!—পড়া হ'ল আপনার?

চিঠি হইতে চোখ দুইটি তুলিয়া নির্ম্মলকান্তি কহিলেন,—হাঁ! কিন্তু আমি এদের দুপক্ষকেই চিনি। বুড়ো জজ, আর—

বিস্ময়োল্লাসে শক্তি কহিল,—চেনেন আপনি! তা হ'লে ত ভালই হ'ল। আমরাও দুপক্ষের সঙ্গে দেখা করেছি। মেয়ের বাপ কপাল দেখিয়ে বলে—নিরুপায়, আর জজ সাহেবের কাছে কথাটা পাড়তেই তিনি রেগে উঠে হাণ্টার হাঁকরাতে চান—

নির্ম্মলকান্তি কহিলেন,—জজ সাহেবের মেজাজ আজকাল ঐ রকমই হয়েছে, তাঁর সম্বন্ধে আমাদের ধারণা—শেষ-বয়সে গৃহিণীর শোকে মাথার গোটাকতক স্ক্রু ঢিলে ক'রে ফেলেছেন! ওখানে যাওয়াই আপনাদের মস্ত ভুল হয়েছে!

শক্তি কহিল,—কিন্তু মেয়েটির মুখখানি দেখে আর তার কান্না শুনে আমরা পণ করেছি, নির্ম্মল বাবু, উদ্ধার তাকে করবই। সেই জন্যেই এসেছি আপনার কাছে।

নির্ম্মলকান্তি হাসিমুখে কহিলেন,—আমাদের শাস্ত্র-কাররা শক্তিমান বেকুবদের দাবাতে যে নীতি গ্রহণ করতে বলেছেন, সেটির নাম—শঠে শাঠ্যং। এই নীতি আজ আমাদেরও অবলম্বন।

শক্তি নির্ম্মলকান্তির কথায় সায় দিয়া জানাইল,—আমাদেরও সেই ইচ্ছা। জজ বুড়োকে এমন ভাবে নাস্তা-নাবুদ করতে হবে, যা দেখে দেশের এই জাতীয় বিয়ে-পাগলা বুড়োদের রীতিমত আক্কেল হয়।

নির্ম্মলকান্তি কহিলেন,—সঙ্গে সঙ্গে এটাও আমাদের ভাবতে হবে, বিয়ের রাতেই মেয়েটিও যাতে সৎপাত্রের হাতে পড়ে।

শক্তি সহসা বিচলিত হইয়া কহিল,—কিন্তু এ কথাটা ত আমরা মোটেই ভাবি নি, নির্ম্মল বাবু! তা হ'লে উপায়?

নির্ম্মলকান্তি তাঁহার মুখের কথায় বিশেষ জোর দিয়াই কহিলেন,—মায়ের জাত আপনারা—এ পাপ থেকে সমাজকে রক্ষা করতে যখন নেমেছেন, তখন কিছুই আটকাবে না, উপায় হবেই। আপনাদের সংসদের পক্ষ থেকে এ ভার আমিই নিলুম। মেয়েটির উপযুক্ত পাত্রের সন্ধান আমি আজই ক'রে ফেলব। কাল আবার এই সময় আমাদের কথা হবে।

শ্রদ্ধার সহিত নির্ম্মলকান্তিকে ধন্যবাদ দিয়া শক্তি বিদায় লইল।

৬

রায় বাহাদুরের মনে সংশয় জাগিয়াছিল, তাঁহার পরিজনবর্গ সম্ভবতঃ বিবাহের কথাটি জানিয়া ফেলিয়াছে এবং তাহাদেরই যোগ-সাজসে বিবাহটি বন্ধ করিবার চক্রান্ত চলিয়াছে। নতুবা তাঁহার বাড়ীচড়াও হইয়া অপরিচিতা এক তরুণী খোঁটা দিতে আসে কোন্ সাহসে?

সেই দিনই তিনি ভাবী শ্বশুরকে ডাকাইয়া অতি সন্তর্পণে

বলিয়া দিলেন, এই বিবাহের কথা যেন কাক-চিলেও জানবার কোনো সুযোগ না পায় ; যে ভাবে নিত্য বৈকালে আমি বেড়াতে বেরুই, সেই ভাবেই আমি সাদাসিধা কাপড়-জামা পরেই একলাটি ওখানে যাব, আর আজকাল ত সভ্য সমাজে চেলীর যোড় প'রে বর সাজানোর পাঠ উঠেই গেছে, আমিও না হয় সেই দলেই ভিড়লুম, তাতে আর কি এমন আটকাবে ?

অবনী রায় বিস্ময়ের সুরে জিজ্ঞাসা করিলেন,—তা যেন হ'ল, কিন্তু পুরুত-নাপিতও কি সঙ্গে নেবেন না ?

রায় বাহাদুর হাসিয়া কহিলেন,—কি দরকার ? এমন কোনও কথা নেই, যে বরপক্ষের পুরুত-নাপিত না হ'লে বিয়ে সিদ্ধ হবে না। আপনার পুরুত-নাপিত ত আছে, তারাই করবে কায ; নাই বা হ'ল দু পক্ষের পুরুত-নাপিতের গুল্‌তোন। সংক্ষেপেই সব সারবার ব্যবস্থা করুন।

সুতরাং বিবাহরাত্রিতে সেই ব্যবস্থাই হইয়াছিল। ঘটনা-চক্রে এ দিন বিবাহের লগ্ন ছিল রাত্রি পৌনে দুইটায়। রায় বাহাদুর এই অপ্রত্যাশিত লগ্ন নির্ণয়ের জন্য মনে মনে বোধ হয় পঞ্জিকাকারদের উদ্দেশে ধন্যবাদ দিয়াছিলেন। কাক-চিলের অজ্ঞাতে সন্তর্পণে বিবাহের পক্ষে এই লগ্নই ত সুপ্রশস্ত।

রাত্রি দশটার সময় অবনী রায়ের বাড়ীর সম্মুখে একখানি ট্যাক্সি আসিয়া দাঁড়াইল, ভিতর হইতে অতি সন্তর্পণে রায় বাহাদুর নামিয়া আসিলেন। পরিচ্ছন্ন সাদা-সিধা পরিচ্ছদ, নরুণপাড় ধুতি, সাদা গরদের পিরাণ, হাতে ও গলায় যুঁইফুলের গোড়ে মালা। অবনী বাবুর জ্যেষ্ঠপুত্র বরাবর বাহিরে রায় বাহাদুরের প্রতীক্ষা করিতেছিল, সসম্ভ্রমে তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া ভিতরে লইয়া চলিল। বাহিরে কোনওরূপ আড়ম্বরের পরিচয় না পাইয়া, রায় বাহাদুর মনে মনে খুসী হইলেন। কিন্তু তিনি যদি বিশেষভাবে লক্ষ্য করিতেন, তাহা হইলে অবিলম্বেই জানিতে পারিতেন যে, এই বাড়ীর অপরাংশটুকু যাহা খালি পড়িয়াছিল, তাহা এই রাত্রির জন্য এই বাড়ীর সহিত মিলিত হইয়াছে ও সেই অংশে বিপুল উদ্যমে শুভবিবাহের উদ্যোগ আয়োজন চলিয়াছে।

অবনী বাবুর পুত্র যে ঘরখানির ভিতরে রায় বাহাদুরকে অভ্যর্থনা করিয়া বসাইল, সেখানি অপেক্ষাকৃত বড় ও সুন্দর-ভাবে সাজানো। ঘরযোড়া সতরঞ্চির উপর সাদা ধবধবে জাজিম পাতা, কয়েকটা বড় বড় তাকিয়া, এক পার্শ্বে একটা হারমনিয়ম ; বরের বসিবার যোগ্য স্বতন্ত্র আসন, দুই পার্শ্বে পিতলের দুইটি ফুলদানির উপর ফুলের তোড়া ; অনুষ্ঠানের কোনও ত্রুটিই নাই।

রায় বাহাদুর বরাসনে বসিতেই শাঁক বাজিয়া উঠিল, উলুধ্বনিও শোনা গেল। সঙ্গে সঙ্গে সুসজ্জিতা তরুণীর দল কলহাস্যের ঝঙ্কার তুলিয়া কক্ষমধ্যে রঙ্গভূমির সখীর ঝাঁকের মত নৃত্যভঙ্গীতে প্রবেশ করিল। রায় বাহাদুর অবাক্, আগন্তুকাদের রূপের প্রখর উত্তাপে তাঁহার দুই চক্ষু যেন আড়ষ্ট হইয়া উঠিল।

তরুণীদলের এক জন কহিল,—লগ্ন ভোরে কি না, তাই বিয়ের আগেই বাসরের ব্যবস্থা হয়েছে।

আর এক তরুণী স্মিতহাস্যে কহিল,—যদিও ব্যবস্থা ঘোড়া ডিঙ্গিয়ে ঘাস খাবার মত, কিন্তু বিয়ের ইতিহাসে এ সম্বন্ধে নজীর যথেষ্ট আছে। এখন হাকিম হুজুর যদি কোনো কসুর না নিয়ে হুকুম দেন।

রায় বাহাদুর তরুণীদের রসালাপে প্রচুর আনন্দের আস্বাদ পাইয়া প্রসন্নভাবে কহিলেন,—ভালই ত, এই ত চাই ; যেমন দেখছি তোমাদের রূপ, বুদ্ধি-বিবেচনারও তেমনি পরিচয় পাচ্ছি। তবে, তবে একটা কথা—

কথাটা শেষ হইবার পূর্ব্বেই আমাদের পূর্ব্ব-পরিচিতা শক্তি বোস সুসজ্জিতা অবগুণ্ঠনবতী কন্যার হাতখানি ধরিয়া কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিল, সঙ্গে সঙ্গে পরিহাসের সুরে কহিল, হবু বধূটিকেও ধ'রে এনেছি হুজুরের এজলাসে—

রায় বাহাদুর এই কথাটিই বলিবার জন্য উন্মুখ হইয়া-ছিলেন। অবগুণ্ঠনবতী ভাবী বধূটিকে দেখিয়াই মুখখানি তাঁহার হাস্যোজ্জ্বল হইয়া উঠিল। তরুণীরা সমস্বরে কহিল,—হুজুরের পাশে বসা, পাশে বসা—

শক্তি অবগুণ্ঠনবতীর হাতখানির উপর একটু ঝাঁকুনি দিয়া কহিল,—ব'স্ লো, ছুঁড়ী, ব'স্,—অত লজ্জা কিসের ? কত বড় ভাগ্যধরী তুই, জজ সাহেবের মেমসাহেব হ'তে চলেছিস্—ব'স্ এখানে।

অতিমাত্রায় লজ্জিতা দীর্ঘাবগুণ্ঠনবতীকে এক প্রকার জোর করিয়াই শক্তি রায় বাহাদুরের বামপার্শ্বে বসাইয়া দিল, তাহার পর অপাঙ্গে রায় বাহাদুরের দিকে চাহিয়া কহিল,—হুজুর কিন্তু অনুগ্রহ ক'রে ক'নের ঘোমটাখানি

এখন খুলবেন না যেন! শুভদৃষ্টির আগে বিয়ের রাতে মুখ দেখতে মানা কি না, তাই!

রায় বাহাদুর একটু গম্ভীর হইয়াই কহিলেন,—সে ভয় তোমাদের নেই গো নেই। বিয়ের আগেই যখন বাসর বসিয়েছ, আর ওঁকেও যে এখানকার আমোদে যোগ দিতে এনেছ, এতেই আমি খুসী হয়েছি।

শক্তি অবগুণ্ঠনবতীর গণ্ডে একটি ঠোনা দিয়া কহিল,—ওলো ক'নে, শুনছিস্ তোর বরের সোহাগের কথা?

তরুণীরা হাসিয়া উঠিল। হাসির উচ্ছ্বাস থামিতেই এক তরুণী কহিল,—তা হ'লে উৎসব আরম্ভ হোক!

শক্তি উত্তর দিল,—নিশ্চয়ই; বর এইবার তাঁর চির-তরুণ কণ্ঠের মিষ্টি ঝঙ্কার তুলে এখানে স্বর্গ রচনা করুন।

রায় বাহাদুর কহিলেন,—স্বর্গ রচনার ভারটুকু তোমাদের ওপরেই দিচ্ছি।

একাধিক কণ্ঠে আপত্তি উঠিল,—তা কি হয়, হুজুর?

অবশেষে এক তরুণী মীমাংসা করিয়া দিল,—কোর্টের হুজুর যদিও আজ আমাদের কোর্টে, তথাপি তাঁর হুকুম মানা চাই; ওলো ভাই শক্তি, তুই-ই তা হ'লে এ বাসরে বোধন বসা, তোরই কণ্ঠের সুধাধারায়—

শক্তি তখন হার্ম্মনিয়মটি টানিয়া সুরের ঝঙ্কার তুলিল—

চির-তরুণ, রূপে অরুণ, এসেছ গো আজ শুভ মিলনে,
বয়েস তাঁহার হয়েছে গো পার,
যাঠের কোঠা গত ফাগুনে।
মাথায়ে কলপ সাদা অলকে
কেটেছে সীঁথি কত পুলকে
বাঁধানো দশন শোভিছে কিবা অপরূপ লো লোল-আননে।
গৃহেতে তাঁহার আছে কত পরিজন
ছেলে মেয়ে বধূ আদি নাতি অগণন
তাদেরি ত্যজি, ষোড়শী আজি করিতে গ্রহণ,
কত সাধ মনে।

গানের শেষ চরণটি সুরের তালে ঝঙ্কার দিতেই রায় বাহাদুর সক্রোধে সহসা গর্জ্জিয়া উঠিলেন,—বটে, ডেঁপমী! ঠাট্টা করা হ'ল আমাকে! আমি বুঝিনি কিছু বটে, জ্যাঠা মেয়ে কোথাকার—

রায় বাহাদুরের ঝঙ্কারের সঙ্গে সঙ্গে তরুণীগণ আর্ত্তস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল,—পুলিস, পুলিস, পুলিস!

রায় বাহাদুর অপ্রতিভের ভঙ্গীতে কহিলেন,—আমি কি তোমাদের গায়ে হাত তুলেছি যে পুলিস ডাকছ?

তরুণী-সঙ্ঘের এক জন কহিল,—আমরা ডাকছি, না তাদের এখানে আসতে দেখে ভয়ে চেঁচাচ্ছি! ঐ দেখুন না, কোট-প্যাণ্ট পরা, মাথায় হ্যাট, ওরে বাবা—

ভয়ে তরুণীরা জড়াজড়ি অবস্থায় কক্ষের এক প্রান্তে আশ্রয় লইল। পরক্ষণে পুলিস-ইনসপেক্টরের পরিচ্ছদে বাসরকক্ষে নির্ম্মলকান্তির প্রবেশ।

কক্ষের চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি বুলাইয়া তিনি কহিলেন,—মাপ করবেন, এক ফেরারী পলিটিক্যাল আসামীর তল্লাসে আমাকে এখানে আসতে হয়েছে; আমি সার্চ্চ করব আপনাদের—এ কি! রায় বাহাদুর! আপনি এখানে! কি আশ্চর্য্য!

রায় বাহাদুর এতক্ষণ বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হইয়া পড়িয়াছিলেন, নির্ম্মলকান্তির কণ্ঠস্বর ও পরিচিত মুখখানি যেন তাঁহাকে প্রকৃতিস্থ করিয়া দিল, সঙ্গে সঙ্গে তিনি বিস্ময়োৎফুল্ল কণ্ঠে কহিলেন,—আরে কে ও, নির্ম্মল বাবু, তুমি? ব্যাপার কি?

আর বলেন কেন, চিটাগঙ্গ কনস্পিরাসি কেসের ফেরারী আসামী হাবুল হাজরা হায়রাণ ক'রে মারলে আমাদের। আজ সন্ধ্যের সময় কমিশনার সাহেব কি রকম ক'রে খবর পেয়েছেন, হাবুল হাজরা এই বাড়ীতে মেয়ে সেজে লুকিয়ে আছে। তাই না তার সন্ধানে এখানে এসেছি। কিন্তু আপনাকে এ ভাবে দেখে আমি যে একবারে আকাশ থেকে পড়ছি, রায় বাহাদুর? কৈ, কিছু শুনিনি ত!

শুনবে কি ক'রে? ধ'রে বেঁধে ভগবানকে ভূত সাজিয়েছে দেখ না! অবনী বাবু আর কোনও উপায় না দেখে, তাঁর মেয়েটিকে চাপিয়েছেন আমারই ঘাড়ে। কি করি, ভদ্রলোকের কুলরক্ষা নিয়ে কথা, ঠেলতে পারলুম না।

সে যাই হোক, আপনাকে কিন্তু এ সময় এখানে পেয়ে আমি হাঁফ ছেড়ে বাঁচলুম। আপনি এক জন রিটায়ার্ড অফিসার, সরকারী কাযে আপনার সহায়তা আমি নিশ্চয়ই পাব, এ আশা করতে পারি। এখন আমাদের প্রধান

কায হচ্ছে, এদের মধ্যে মেয়ে সেজে সেই ছোকরা আছে কি না!

নির্ম্মলকান্তির কথায় রায় বাহাদুরের দুই চক্ষু সহসা উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, তিনি সংশয়ের সুরে কহিলেন,—রোসো ইনসপেক্টর, রোসো, এখন আমার মনে হচ্ছে, কমিশনার সাহেবের সন্দেহ হয় ত সত্যই হবে; এদের মধ্যে এই মেয়েটাকে আমার সন্দেহ হয়—

তরুণীদের পুরোভাগেই শক্তি বোস দাঁড়াইয়াছিল, রায় বাহাদুর দুই চক্ষুর জ্বলন্ত দৃষ্টির সহিত হাতের তর্জ্জনী যুগপৎ তাহার দিকেই নির্দ্দেশ করিলেন।

কিন্তু শক্তি বোস কিছুমাত্র দমিল না, রাজহংসীর মত গ্রীবা তুলিয়া সদর্প ভঙ্গীতে রায় বাহাদুরের ঠিক সম্মুখে আসিয়া দৃপ্তস্বরে প্রশ্ন করিল,—আপনি আমাকে সন্দেহ করছেন? কি ভেবেছেন আমাকে, স্যর?

রায় বাহাদুরের সর্ব্বাঙ্গ এবার ক্রোধে কণ্টকিত হইয়া উঠিল, কয়েক দিন পূর্ব্বের স্মৃতি মনে সহসা ভাসিয়া আসিল, তীক্ষ্ণ কণ্ঠে কহিলেন,—তুমিই সে দিন আমার বাড়ীতে গিয়েছিলে আমাকে শাসাতে! যাওনি তুমি?

অকুতোভয়ে শক্তি উত্তর দিল,—গিয়েছিলুম ত। জানতে চেয়েছিলুম, বুড়ো বয়সে নাতনীর বয়সী একটা মেয়ের গলায় ফাঁসীর দড়ি পরাতে হাত দুখানা সুড়-সুড় করছে, কেন?

তর্জ্জন করিয়া রায় বাহাদুর কহিলেন,—শুনছ, ইনসপেক্টর, এর কথা? এ কখনো মেয়ে নয়, কথাগুলো যেন বন্দুকের বুলেট; একে তুমি গ্রেপ্তার কর, এ নিশ্চয়ই তোমার চিটাগঙ্গের ফেরারী আসামী হাবুল হাজরা।

শক্তি দৃঢ়স্বরে কহিল,—নেভার, আমার নাম শক্তি বোস; মিশন কলেজের থার্ড ইয়ারের নাম রেজেষ্টারী খাতায় আমার নাম জ্বল্-জ্বল্ করছে—লাইক দি ড্যাজলিং সাইন অফ দি সান্।

রায় বাহাদুর পুনরায় গর্জ্জিয়া উঠিলেন,—অ্যারেষ্ট কর ওকে ইনসপেক্টর, অ্যারেষ্ট কর; আমি বলছি, কখনই ও শক্তি বোস নয়, নিশ্চয়ই ফেরারী হাবুল হাজরা।

নির্ম্মলকান্তি কহিলেন,—আপনি যদি বলেন, রায় বাহাদুর—

শক্তি তাঁহার কথায় বাধা দিয়া কহিল,—ওঁর বলবার আগে আমিই হাটের মাঝে হাঁড়ী ভেঙ্গে দিচ্ছি, স্যর! পুলিসের চোখে ধূলো দেবেন ব'লে রায় বাহাদুর নিজেই হাবুল হাজরাকে ডানা দিয়ে ঢেকে রেখেছেন—

রোষে রুদ্ধকণ্ঠে রায় বাহাদুর কহিলেন, কি? কি?

কিন্তু তাঁহার রোষবিক্ষুব্ধ চিত্তের উপর সেই মুহূর্ত্তেই শক্তি বোস বিস্ময়ের শিহরণ তুলিল রায় বাহাদুরের পার্শ্ববর্ত্তিনী অবগুণ্ঠনবতীর অবগুণ্ঠনটি খুলিয়া দিয়া। যে মুখ বাহির হইল, তাহা যে কোনও কন্যার নহে, সে সম্বন্ধে রায় বাহাদুরের মনেও সন্দেহের অবকাশ রহিল না। অবগুণ্ঠন-মোচনের সঙ্গে সঙ্গে তাহার মাথার দীর্ঘ পরচুল খসিয়া পড়িয়াছিল।

নির্ম্মলকান্তি উল্লাসে চীৎকার তুলিয়া কহিলেন,—হুর রে, এই ত আমার আসামী হাবুল হাজরা।

তাহাকে হাতকড়ি পরাইতে বিলম্ব হইল না।—বিদ্রূপের সুরে বিজয়োল্লাসে নির্ম্মলকান্তি বন্দীর দিকে চাহিয়া কহিলেন,—বিয়ের কনে সেজে দিব্যিটি ব'সে ছিলে ত!

রায় বাহাদুর এতক্ষণ স্তব্ধ বিস্ময়ে আসামীর দিকে চাহিয়াছিলেন। কি সর্ব্বনাশ! এই রাজদ্রোহের আসামী এতক্ষণ তাঁহার বধূ সাজিয়া পার্শ্বে বসিয়াছিল! এতক্ষণে হাকিমী মেজাজে তাহাকে প্রশ্ন করিলেন,—তুমি রাস্কেল কি ক'রে এখানে এলে,—কে তোমাকে এ রকম ক'রে সাজালে?

আসামী উত্তর দিল—সেটা এখনো বুঝতে পারেন নি, স্যার? বলির হাড়কাঠ থেকে কনেকে সরিয়ে দিয়ে আমি নিজেই মাথাটি বাড়িয়েছিলুম! এখন আমার অবস্থা—বিটুইন দি ডেভিল এণ্ড দি ডীপ্ সী!

রায় বাহাদুর দুই চক্ষু পাকাইয়া কহিলেন,—আমি তোমাকে জেলে পূরবো, পাজী বদমাস্—

আসামী নির্ভয়ে উত্তর দিল,—জেলে ত আমি পা বাড়িয়েছি, স্যার: কিন্তু এই নিয়ে যদি আপনি কেলেঙ্কারী করেন, আমি আপনাকে এমন জড়ান জড়াব, আপনার রায় বাহাদুরী খেতাব আর মোটা পেনশান দুটোই খ'সে পড়বে।

মুহূর্ত্তে রায় বাহাদুরের মুখখানি বিবর্ণ হইয়া গেল, অসহায়ের মত নির্ম্মলকান্তির দিকে চাহিয়া তিনি কহিলেন,—শুনছ নির্ম্মল বাবু, রাস্কেল ইতরটার কথা? এরা সব পারে।

নির্ম্মলকান্তি গম্ভীরভাবেই কহিলেন—তাই ত, রায় বাহাদুর! আমি এখন কি করি বলুন ত?

রায় বাহাদুর নিষ্ফল ক্রোধে পুনরায় তর্জ্জন করিয়া

কহিলেন, এ সব চক্রান্ত, রীতিমত চক্রান্ত ! আমি ডাকছি অবনী বাবুকে এখুনি ;—অবনী বাবু—অবনী বাবু—

নির্ম্মলকান্তি কহিলেন,—তিনিও কি রেহাই পাবেন, সবাইকে নিয়ে এখনই কমিশনার সাহেবের ডেরায় ছুটতে হবে ! মুস্কিল আর কাকে বলে—

মনে মনে অবস্থাটা উপলব্ধি করিলেও মুখে সে ভাব প্রকাশ না করিয়া ঈষৎ বিরক্তির ভঙ্গীতে রায় বাহাদুর কহিলেন,—চুলোয় যাক সব, আমি এ সব নোংরা ব্যাপারে থাকতে চাই না, নির্ম্মল বাবু, আমি স'রে পড়ি।

নির্ম্মলকান্তি মুখখানি গম্ভীর করিয়া কহিলেন,—কিন্তু অবস্থা যা দাঁড়িয়েছে, তাতে আপনাকেও যে অনুগ্রহ ক'রে কমিশনার সাহেবের কাছে যেতে হয়, রায় বাহাদুর !

রায় বাহাদুর কহিলেন,—তুমি বুঝছ না, নির্ম্মল বাবু। যেতে আমার বাধা কি? কিন্তু ব্যাপারটা এমনি নোংরা হয়ে দাঁড়িয়েছে, এর সঙ্গে আমার নামটা যদি ওঠে, অমনি চারদিকে হৈ-চৈ প'ড়ে যাবে, আর কাগজওয়ালারা এই নিয়ে যাচ্ছে-তাই সুরু ক'রে দেবে।

নির্ম্মলকান্তি হাসিয়া কহিলেন,—তা মিছে নয় ; বাড়ীর কাছেই 'পত্রিকা', হয় ত একটা কারটুনই এই নিয়ে ছেপে দেবে। কিন্তু কি ক'রে আপনাকে বাদ দিই বলুন ত !

রায় বাহাদুর কতকটা আশ্বস্ত হইয়া কহিলেন,—তুমি ইচ্ছা করলেই পার ; আসল ব্যাপারটা আমি তোমাকে খুলে বলছি—

নির্ম্মলকান্তির মুখে হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিল ; কহিলেন, —আমি সব বুঝেছি· আপনাকে আর কষ্ট দেব না। আচ্ছা, এ রিস্ক্ আমি নিজের ওপরেই নিচ্ছি ; তা হ'লে আপনি এক কায করুন, এখনি সোজা বাড়ী চ'লে যান্, একটি মুহূর্ত্ত এখানে আর থাকবেন না।

রায় বাহাদুরের ইহাই একান্ত কামনা ; গলার মালা-ছড়াটি ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া তিনি দরজার দিকে পা বাড়াইলেন। কিন্তু পিছন হইতে শক্তি বোস পরিহাসের সুরে শুনাইয়া দিল,—বাড়ীতে গিয়েই সেই হাণ্টারটা নিয়ে নিজের ভাঙ্গা বরাতটার ওপর ঘা-কতক কসিয়ে দিতে যেন ভুলবেন না, দাদামশাই !

দুই চক্ষু পাকাইয়া রায় বাহাদুর ফিরিয়া তাকাইলেন, সঙ্গে সঙ্গে তীক্ষ্ণকণ্ঠের স্বরটিও শোনা গেল,—ডেঁপো মেয়ে এক দম বয়ে গেছে !

শক্তিও ছাড়িবার মেয়ে নয়, দরজার উপর দাঁড়াইয়া মুখটি বাড়াইয়া শুনাইয়া দিল—কাল ভোরে আমরা দল বেঁধে হাজির হচ্ছি, জলখাবার সাজিয়ে রাখতে ভুলবেন না।

রায় বাহাদুর তখন রোষে ক্ষোভে কম্পিতপদে সোপান-শ্রেণী অতিক্রম করিতেছিলেন, কোনও উত্তর তাঁহার মুখ হইতে আর বাহির হইল না।

*　　*　　*

শক্তি সহাস্যে কহিল, চমৎকার অভিনয় করলেন আপনি, নির্ম্মল বাবু !

নির্ম্মল বাবু তখন বন্দীর হাতকড়ি খুলিতে ব্যস্ত,—আসামীকে মুক্তি দিয়া কহিলেন,—আমার চেয়ে ভাল অভিনয় করেছেন আপনার ভাই ! রায় বাহাদুরের মাথা পর্য্যন্ত ঘুরিয়ে দিয়েছে।

তরুণীদের মধ্য হইতে এক জন কহিল,—কেমন বোনের ভাই !

শক্তি বোস কহিল,—এখন আমি লজ্জা অনুভব করছি, নির্ম্মল বাবু, আপনাকে অকারণ সন্দেহ করেছিলুম।

নির্ম্মলকান্তি কহিলেন,—এখন বুঝলেন ত, পুলিসের কায করলেও আমরা দেশের সত্যকার কাযে অবহেলা করি না।

এই সময় সংসদের সভানেত্রী অনীতা দেবী সেই কক্ষে দেখা দিলেন, দুই হাত যুক্ত করিয়া নির্ম্মল বাবুকে নমস্কার জানাইয়া কহিলেন,- এই ত ঠিক কাযের মত কায, নির্ম্মল বাবু। কুমারী-সংসদের পক্ষ থেকে আমি আপনাকে ধন্যবাদ দিচ্ছি।

শক্তি সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিল,—ওদিককার খবর কি, অনীতাদি ?

অনীতা দেবী গাঢ় স্বরে কহিলেন,—নির্ম্মল বাবুর সৌজন্যে ওদিককার কাযও সুশৃঙ্খলে শেষ হয়েছে। বিয়ে হয়ে গিয়েছে, বর-ক'নে বাসরে আসছে। যেমন সুন্দর কনে, তেমনই সভা-উজ্জ্বল বিদ্বান্ বর। নির্ম্মল বাবুর জয়জয়কার হোক।

তরুণীদল সমস্বরে নির্ম্মলকান্তির জয়ধ্বনি তুলিতেই, তিনি অপ্রস্তুতের ভঙ্গীতে কহিলেন,—থামুন, থামুন, আমি কি আপনাদের সংসদ ছাড়া যে, একতরফা আমারই জয়ধ্বনি করছেন ? আসুন সকলে মিলে বলি—কুমারী-সংসদের জয়।

সেই গভীর নিশীথে সুপ্ত পল্লী মুখরিত করিয়া জয়ধ্বনি উঠিল—কুমারী-সংসদের জয় !

শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়।
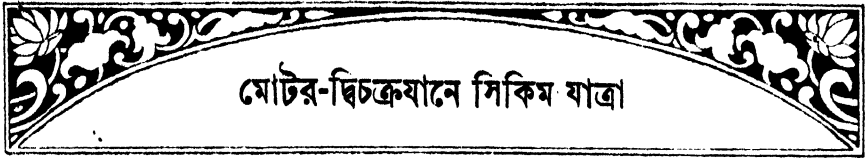
মোটর-দ্বিচক্রযানে সিকিম যাত্রা

আমরা ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে কয় জন বন্ধুতে মোটর সাইকেলে যখন প্রথম দার্জ্জিলিং যাই, তখনই ইচ্ছা ছিল, সিকিমটাও সারিয়া আসিব; কিন্তু ঐ অঞ্চলের খামখেয়ালী বারিপাতের ভুমকিটুকু একটু মানিয়া চলিতে হয়। সুতরাং সে সময়ের এবং পরবর্ত্তী আর একটি উদ্যমও আমাদের নিষ্ফল হইয়াছিল।

এবার শারদীয়ার মাঙ্গলিক শঙ্খ বাজিবার কিছু পূর্ব্বেই সিকিম যাইবার উদ্দেশ্যে বাহির হইয়া পড়িলাম। পূজাটা দার্জ্জিলিঙ্গেই দেখিব—সেজন্য ১৬ই অক্টোবর যাত্রা সুরু করিলাম। ইচ্ছা ছিল, শিলিগুড়ি পর্য্যন্ত রেলগাড়ীতেই যাইব, কারণ, পূর্ব্বে দার্জ্জিলিং যাইবার সময় সমস্ত পথটির পরিচয় বিশেষভাবে জ্ঞাত ছিলাম। উপরন্তু আমরা গিয়াছিলাম মার্চ্চ মাসের শেষভাগে, নদীগুলি তখন ছিল তেজোগর্ব্বহীনা শীর্ণকায়া; কিন্তু এখন হইয়াছে তাহারা ভরা যৌবনের চঞ্চলমতি গর্ব্বিতা স্ফীতোদরা বেগময়ী নদী!

ডাকগাড়ী ছাড়িবার পূর্ব্বে গিয়া দেখিলাম, তিল রাখিবারও স্থান নাই। অগত্যা পথে চালাইয়া যাইবার জন্য আমার দু'চাকার রথ Ariel মোটর সাইকেল সজ্জিত করিলাম। রাত্রি প্রায় তিনটার সময় নিদ্রিত প্রতিবেশীদের শেষ রাত্রির সুখালসভরা তন্দ্রাটুকুর বিঘ্ন ঘটাইয়া একাকী যাত্রা সুরু করিলাম।

মেমারীর কিছু পূর্ব্বে পূর্ব্বাকাশের রং দিগ্বিদিকে প্রক্ষিপ্ত হইল। পাখীর কাকলি আগমনীর সুরে সূর্য্যের বন্দনা-গান সুরু করিয়া দিল। সূর্য্যোদয়ের পবিত্র মুহূর্ত্তের অপেক্ষায় সারা হৃদয় আনন্দে আন্দোলিত হইয়া উঠিল।

বর্দ্ধমানে ৬।২০ মিনিটে আসিয়া পৌছিলাম। প্রায় ২০ মিনিট তথায় বিশ্রামের পর পুনরায় যাত্রা আরম্ভ করিয়া দু'ঘণ্টার মধ্যেই অণ্ডালের (১২১ মাইল) নিকট পৌছিলাম। এ স্থান হইতে একটি রাস্তা পূর্ব্বদিকে অজয় নদ পার হইয়া সিউড়ির অভিমুখে গিয়াছে, সেই রাস্তায় দার্জ্জিলিং যাইতে হয়। কিন্তু অজয়, সাল, বক্রেশ্বর, মৌরাক্ষি প্রভৃতি নদীতে যথেষ্ট 'বান' থাকাতে ঐ সকল পথ ত্যাগ করিয়া আসানসোলে (১৩৭ মাইল) আসিলাম।

আসানসোল ষ্টেশনের 'বিশ্রাম কামরায়' স্নান এবং আহার সমাপ্ত করিয়া বেলা বারোটায় বাহির হইয়া পড়িলাম। প্রায় ৮ মাইল আসার পর সীতারামপুর ষ্টেশন (৩ মাইল) যাইবার জন্য পূর্ব্বাভিমুখে ফিরিলাম এবং সেই রাস্তায় আরও প্রায় ৩৪ মাইল আসিয়া কার্ম্মাটার ষ্টেশনে পৌছিলাম। এই রাস্তা যদিও একটু অপ্রশস্ত এবং আঁকা-বাঁকা, কিন্তু গাড়ী চালাইয়া যাওয়ার অসুবিধা হইবে বলিয়া মনে হইল না।

কার্ম্মাটারে প্রায় দু'ঘণ্টা অপেক্ষার পর কলিকাতা হইতে দিল্লী এক্সপ্রেস আসিয়া পৌছিল। তাহাতে গাড়ী সমেত চড়িয়া সন্ধ্যার পূর্ব্বে জসিডি ষ্টেশনে নামিয়া এবং কালক্ষেপ না করিয়াই চার মাইল চালাইয়া বৈদ্যনাথধামে (দেওঘর) আমাদের বাটীতে সকলকে চমকিত করিয়া আসিয়া পৌছান গেল। এই স্থানে বলিয়া রাখা উচিত যে, কার্ম্মাটার হইতে একটি কাঁচা রাস্তা দিয়া গাড়ী চালাইয়া বরাবর দেওঘর পর্য্যন্ত আসা যায়; কিন্তু এই রাস্তায় বর্ষার পর জয়ন্তী, অজয়, মৌরাক্ষি, পাথরু প্রভৃতি ছোট-বড় কয়েকটি নদী পার হওয়া বিশেষ কষ্টকর, কারণ, 'ফেরী'র কোনওরূপ ব্যবস্থা নাই। জামতাড়া কিম্বা মধুপুর হইতেও একবারে দুমকা পর্য্যন্ত যাইতে পারা যায়, কিন্তু উল্লিখিত কারণে এই সময়ে রেল-গাড়ীর সাহায্য লওয়াই উচিত।

পরদিন (১৭ই অক্টোবর) প্রাতে প্রায় সাড়ে সাতটার সময় বাহির হইয়া এবং ৩৮ মাইল আসিয়া দুমকা ভাগলপুরের রাস্তায় পৌছিলাম। এই স্থান হইতে দুমকা সহর দক্ষিণদিকে প্রায় ৩ মাইল দূরে। আমার গাড়ীতে পেট্রল প্রভৃতি যথেষ্ট থাকাতে দুমকা যাওয়া প্রয়োজন বোধ করিলাম না এবং সে স্থানে অপেক্ষা না করিয়াই আরও ৩৮ মাইল চালাইয়া বৌসিতে (মন্দার হিল ষ্টেশন) প্রায় নটার সময় আসিয়া পৌছিলাম। এই জনবিরল রাস্তাটি অতি সুন্দর এবং পারিপার্শ্বিক দৃশ্যও অতি মনোরম। পথের দুই পার্শ্বে সারি সারি গাছ। প্রায় চার মাইল ব্যাপিয়া ছোট বড় পাহাড়ের সানুদেশ ঘেঁসিয়া রাস্তাটি সোজা চলিয়া গিয়াছে। পাহাড়ের পশ্চাতেই একটি নদী এবং তাহার বহুদূর-প্রসারিত ঘন বন চতুর্দ্দিকের শোভা আরও বর্দ্ধিত করিতেছে।

বৌসিতে প্রায় ১৫ মিনিট অপেক্ষা করিয়া ভাগলপুরের (৩৩ মাইল) উদ্দেশ্যে বাহির হইলাম। বেশ প্রশস্ত রাস্তা দিয়া চালাইয়া তথায় প্রায় ১১টার সময় আসিয়া পৌছিলাম। আমার পিসতুতো অগ্রজ স্বর্গীয় ডাক্তার মোহিনীমোহন ঘোষের বাটীতে শীঘ্র আহারাদি সম্পন্ন করিয়া প্রায় বেলা দেড়টার সময় ভাগলপুর-কাছারী ষ্টেশনে বি-এন্-ডব্লিউ-রেলের ছোট গাড়ীতে চড়িয়া বসিলাম। খানিক পরে এই রেলগাড়ী গঙ্গার ধারে মহা-দেবপুরঘাট-ষ্টেশনে আসিয়া থামিলে, তথায় ধীরে ধীরে আমার মোটর-সাইকেলটা নামাইয়া ষ্টীমারে উঠিলাম। ষ্টীমার প্রায় ৪০ মিনিট পরে অপরপারে বরারি ঘাটে আসিয়া থামিল। এখানে পুনরায় রেলগাড়ীতে চড়িতে হইল এবং আসিয়া বিহপুর ষ্টেশনে গাড়ী বদল করিলাম। এই গাড়ী প্রায় ৭টার সময় কারাগোলাঘাট রোড ষ্টেশনে আসিয়া পৌছিলে তথায় নামিয়া তত্রস্থ ষ্টেশন-মাষ্টারের শরণাপন্ন হইলাম। তিনি বেহারী এবং পূর্ব্বে যখন আমরা দার্জ্জিলিং যাই, তখনও তিনি এ স্থানে ছিলেন। তাঁহার নির্দ্দেশ-মত ষ্টেশনের আরাম-কামরায় কম্বল জড়াইয়া রাত্রিটা কোনওমতে কাটাইয়া দিলাম; তবে সারাদিনের ক্লান্তি এবং অবসাদের পর নিদ্রার সুখটুকু উপভোগ করিবার তেমন সুযোগ ঘটে নাই। কারণ, ঘরের বাহিরে দুর্গন্ধ এবং ঘরের ভিতরে মশার বেয়াদবি উপদ্রব যত কিছু বিঘ্ন ঘটাইয়াছিল। খাবারের মধ্যে ষ্টেশন-সংলগ্ন হালুইকরের দোকানের পুরি ও পেঁড়াই ক্ষুধা-নিবৃত্তি করিয়াছিল।

১৮ই অক্টোবর। অতি প্রত্যূষেই যাত্রা সুরু করিলাম। এখান হইতে পূর্ণিয়া পর্য্যন্ত ২২ মাইল পথ অতিক্রম করিতে দেড় ঘণ্টা লাগিল। মোটর 'বাসে'র যাতায়াতের জন্য রাস্তার পাঁজরা বাহির

হইয়া পড়িয়াছে এবং নিজ দুঃখদৈন্য বশতঃ আজ সে তাহাই পাথরের খোয়া দিয়া নিজেই নিজের শিরে আঘাত করিয়া মরিতেছে!

পূর্ণিয়া হইতে কিষণগঞ্জের রাস্তা (৪৫ মাইল) দেখিলাম, আরও খারাপ। কিষণগঞ্জ পৌঁছিবার ২২ মাইল পূর্ব্বে মহানদী পার হইতে হইল। এ স্থানে 'ফেরী'র বেশ ভাল ব্যবস্থা আছে। বর্ষা ব্যতীত অন্য সময়ে খানিকটা বালির চড়ার উপর দিয়া যাইতে হয়। অপর পারের নাম ডিরো ঘাট এবং তথায় 'ফেরী'র মাশুল এক টাকা দিতে হইল।

কিষণগঞ্জে প্রায় আধঘণ্টা বিশ্রামের পর শিলিগুড়ির উদ্দেশ্যে বাহির হইলাম। কিষণগঞ্জ হইতে রাস্তার পাশাপাশি ডি-এইচ রেলের লাইন ইস্‌লামপুর (৮ মাইল) পর্য্যন্ত গিয়াছে। ইহার পর অতি নিকৃষ্ট রাস্তা আরম্ভ হইল। শুধু গোযানের যাতায়াতের ফলে রাস্তার মধ্যে পাশাপাশি দুই তিনটি নালার মত গর্ত্ত হইয়া গিয়াছে। এই রাস্তায় মোটরগাড়ী-চালকরা অতি সাবধানে যাতায়াত করে। সুতরাং দ্বিচক্র মোটরসাইকেলে চড়িয়া আমার কিরূপ অবস্থা হইয়াছিল, তাহা সহজেই অনুমেয়। দেড় বৎসর পূর্ব্বেও রাস্তার এইরূপ অবস্থা দেখিয়াছিলাম। ইহা ইতিহাসপ্রসিদ্ধ অতি প্রাচীন রাস্তা। যখন পদ্মার অপর পারে রেল হয় নাই, তখন ইংরেজদিগের সৈন্যসামন্ত এবং বাণিজ্যের রসদাদি এই রাস্তা দিয়াই ভাগলপুর হইতে দার্জ্জিলিং, তিব্বত প্রভৃতি স্থানে যাতায়াত করিত; রেল হওয়াতে এখন ইহার কদর নাই। এত বড় রাস্তার উপর জেলাবোর্ডের কর্ত্তৃপক্ষদের কেন দয়া-কটাক্ষ হয় না, তাহা আজ পর্য্যন্ত বুঝিতে পারিলাম না।

কিষণগঞ্জ হইতে ৩৮ মাইল আসিয়া তিতলিয়া গ্রামে পৌঁছিলাম। পূর্ব্বে এখানে এক সেনাবাস ছিল, এখন পরিত্যক্ত। এখানে একটি ডাকবাংলো আছে, তবে সে স্থানে না থাকাই ভাল। এ স্থান হইতে একটি ভাল রাস্তা জলপাইগুড়ি (৩০ মাইল) গিয়াছে। তিতলিয়া হইতে বাঙ্গালা দেশ আবার আরম্ভ হইল, এবং এ স্থান হইতে শিলিগুড়ি পর্য্যন্ত ১৫ মাইল রাস্তা মন্দের ভাল। সেই রাস্তায় চালাইয়া পরিশেষে হাসিকান্না-মিশ্রিত অন্তরে বেলা একটার কিছু পরে শিলিগুড়ির বাজারে আসিয়া পৌঁছিলাম।

শিলিগুড়ির ষ্টেশন-সংলগ্ন দুইটি ভোজনালয় আছে; একটি মুসলমানদিগের জন্য, অপরটি হিন্দুদের। ষ্টেশনের বিশ্রামকামরায় শীঘ্র স্নানাদি শেষ করিয়া হিন্দুদের হোটেলে পাকান্ন খাইলাম। উঃ, সে কি তীব্র ঝাল! আজও তাহা মনে পড়িলে চোখে জল আসে।

আধ ঘণ্টা বিশ্রাম করিয়া এইবার দার্জ্জিলিঙের উদ্দেশ্যে শেষ পাড়ি দিলাম। শিলিগুড়ি হইতে শুকনা (৭ মাইল) ছাড়াইয়া কিছু দূর পর্য্যন্ত রাস্তায় কলিকাতার রাস্তার মত 'পিচ' দেওয়া আছে। প্রকৃতপক্ষে রাস্তার চড়াই এই স্থান হইতে আরম্ভ। তার পর রাস্তা রংটং ছাড়াইয়া চুণাভটি পর্য্যন্ত এবং পুনরায় তিনধড়িয়া (২০ মাইল উচ্চতা ২৭০০ ফুট) ছাড়াইয়া গয়াবাড়ী পর্য্যন্ত খুব ঘন ঘন বেঁক খাইয়া রেলের লাইন পার হইয়াছে। সেই জন্য এই রাস্তাটুকুতে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত।

কার্সিয়ঙে (৩৪ মাইল, উচ্চতা ৪৮৪০ ফুট) পৌঁছিয়া দেখি, অনেক স্বাস্থ্যান্বেষী বাঙ্গালী ভদ্রলোক সান্ধ্যভ্রমণে বাহির হইয়াছেন। উদ্বিগ্ন এবং ভীতিকাতর চিত্তে যথেষ্ট বেগে আসিতে আসিতে সায়াহ্নের রক্তচ্ছটা আকাশের গায়ে কখন্ মিলাইয়া গিয়াছে, পাহাড়ের আঁকা-বাঁকা রাস্তায় তাহা একবারে দৃষ্টিগোচর হয় নাই। দার্জ্জিলিঙে (৫০ মাইল, উচ্চতা ৬৭০০ ফুট) যখন পৌঁছিলাম, তখন সাড়ে ছয়টা বাজে। এখানে আমার ভগিনীপতি শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয়ের বাটীতে হঠাৎ সকলকে সচকিত করিয়া আমার মোটর-সাইকেলের হৃদয়বিদারক চীৎকার থামাইলাম। তাঁহার বাটীর পার্শ্বেই হিন্দুহলে দার্জ্জিলিঙের বাঙ্গালীদের একমাত্র দুর্গোৎসব হয়। আমি যখন পৌঁছিলাম, তখন সকলে মন্দিরের সম্মুখে সমবেত হইয়া আরতির জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। নির্ব্বিঘ্নে একাকী দার্জ্জিলিঙ পর্য্যন্ত আসিয়াছি চিন্তা করিয়া অন্তরে অন্তরে তাঁহাকে আমার প্রণতি জানাইলাম।

এই স্থানে বলিয়া রাখা প্রয়োজন যে, মোটরগাড়ী কিম্বা সাইড-কার সমেত মোটর সাইকেলে এই রাস্তায় যাতায়াত করিলে শুকনা হইতে দার্জ্জিলিঙ পর্য্যন্ত সমস্ত ছোটবড় ষ্টেশনে থামিয়া রেলগাড়ীর মত রাস্তাখালির অনুমতিপত্র (line clearpass) না লইয়া যাইলে বিপদের বিশেষ সম্ভাবনা আছে।

দার্জ্জিলিঙে প্রায় ১২ দিন ছিলাম; সুতরাং পূজার ছুটীর বেশীর ভাগটা মনের আনন্দেই কাটিয়াছিল। দার্জ্জিলিঙে পূর্ব্বে বহুবার আসিয়াছি, কিন্তু সে স্থানের দ্রষ্টব্য অনেক জিনিষ আমার আদৌ দেখা ছিল না। তাই এবারে এখানে অবস্থিতির সময় সেগুলি এক একটি করিয়া সারিয়া লইলাম। উপরন্তু বাঙ্গালার লাট-সাহেবের শাসনকাল শেষ হইয়া আসাতে তাঁহার শৈলবাস এই-বারের মত শেষ হইল বলিয়া অনেক প্রকারের সামাজিক অনুষ্ঠান এবং আমোদ-প্রমোদের বন্দোবস্ত হইয়াছিল; তাহার মধ্যে ঘুমের বৌদ্ধমন্দিরের প্রাঙ্গণে লামাদিগের নাচ (devil dance) উল্লেখ-যোগ্য। ইহা বেশ উপভোগ্য।

দার্জ্জিলিঙে আসিলে লোক প্রথমে ঠিক করিয়া ফেলেন, কবে তাঁহারা 'টাইগার' পাহাড় হইতে সূর্য্যোদয় দেখিতে যাইবেন। পূর্ব্বে আমার কখনও দেখা হয় নাই। তাই এবার তত্রস্থ স্কুলের কতিপয় ছাত্রের সমভিব্যাহারে রাত্রি দু'টার সময় উঠিয়া এবং প্রায় ছয় মাইল রাস্তা মৃদু বায়ুসঞ্চারিত হিমরাত্রিতে পদব্রজে গিয়া শুধু মেঘের ভিতর লুক্কায়িত বালসূর্য্যের আলোকরশ্মির উঁকি দেখিয়া সর্ব্বহারা পথিকের ন্যায় মনঃক্ষুণ্ণ হইয়া ধীরে ধীরে বাটী ফিরিয়া আসিলাম। শুনিতে পাই, এরূপ অবস্থা প্রায় অনেকেরই হয়। সুতরাং উদ্যম কমিল না মোটেই। ঘুমের 'জোড়বাংলো' পর্য্যন্ত মোটর সাইকেলে আসিয়া এবং সে স্থানে আরও কয়েক জনের সহিত মিলিত হইয়া 'টাইগার' পাহাড়ের উপরে উঠিলাম। লাট সাহেবের গলফ খেলার মাঠের পর হইতে আধ মাইল খাড়াই অতিশয় নির্ম্মম। কষ্ট করিয়া উপরে উঠিয়া শীতের তীক্ষ্ণ বায়ু-সঞ্চালনে শ্বাস রুদ্ধ হইতেছিল। এই স্থানের উচ্চতা দশ হাজার ফুটের কিছু কম।

রাত্রি সাড়ে চারটা হইতে পূর্ব্বদিকের আকাশ পরিষ্কার হইতে থাকে। সেই সময় নবনির্ম্মিত পাকা ঘরের ভিতর হইতে বাহির হইয়া কাঁপিতে কাঁপিতে উপরে উঠিয়া সুবিধামত একটি স্থান অধিকার করিয়া বসিলাম। পাঁচটার পর হইতে নির্মেঘ আকাশে নানা রংএর খেলা সুরু হইল এবং তাহারই আলোকরশ্মি পশ্চাতের

আকাশচুম্বী শুভ্র-কিরীটশোভিত পর্ব্বতশৃঙ্গের গাত্রে বিলীন হইতে লাগিল; আধ ঘণ্টা আলোকের এইরূপ খেলার পর সহসা বিশাল জ্যোতির্ম্মণ্ডলের খানিকটা দৃষ্টিগোচর হইল এবং সেই সদ্যোত্থিত নবসূর্য্যের বিচ্ছুরিত রক্তরশ্মিতে তাঁহার আশীর্ব্বাদ নিষ্পলক এবং নিস্পন্দচিত্তে গ্রহণ করিলাম। পর-মুহূর্ত্তে দৃষ্টি ফিরাইয়া তুষারমণ্ডিত পর্ব্বতশৃঙ্গগুলির প্রতি দেখিলাম, ঘোমটার আড়ে আরক্তিম মুখশ্রীর ঈষৎ হাসিচ্ছটা এবং শুভদৃষ্টির নিষ্পলক চাহনি। প্রকৃতির নয়নাভিরাম রূপের প্রতি আমাদের দেহের সমস্ত তন্ত্রী একসঙ্গে পরম তৃপ্তিতে সাড়া দিয়া উঠিল। মন্ত্রমুগ্ধ প্রাণীর অন্তরস্থিত যন্ত্রগুলি নিয়ন্ত্রিত করিবার শক্তি কিয়ৎক্ষণের জন্য স্তব্ধ হইল। পরমপুরুষের উদ্দেশে সকলের মস্তক আপনা হইতেই যেন কিছু নত হইয়া পড়িল; আধুনিক সভ্যতার নাস্তিক নব্য-যুবাদিগের অন্তরে ভগবানের সত্তা প্রথম অনুভূত হইল।

কথা বলিয়াছিলেন, আমি ভুলক্রমে সে রাস্তা ত্যাগ করিয়া সটান্ সোজা চলিয়া আসিলাম। এই ঘনবৃক্ষসমাকুল অবিদিত জনবিরল এবং অপ্রশস্ত রাস্তায় ৯ মাইল আসার পর দেখি, ভীষণভাবে রাস্তা আঁকিয়া-বাঁকিয়া নীচের দিকে নামিয়াছে। তাহার উপর আবার পাথরের বড় বড় খোয়া এবং ধূলায় রাস্তা পরিপূর্ণ। সম্মুখে ও পশ্চাতের চাকার 'ব্রেক' আঁটিয়া এবং যৎপরোনাস্তি সাবধানতা অবলম্বন করিয়া পেসক নামে এক পার্ব্বত্য গ্রাম বা চটীতে আসিলাম। ঘুম হইতে ইহার দূরত্ব ১৪ মাইল। শুনিলাম, এ স্থানে একটি সাধারণের থাকিবার জন্য বাংলো আছে। পেসকে কতকগুলি চা বাগানের কারখানা আছে; এবং একটি বাগান হইতে দেখিলাম শূন্যে অবস্থিত রজ্জুপথ (Arial ropeway) নীচের দিকে নামিয়া গিয়াছে। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম যে, এই রজ্জুপথ তিস্তা পর্য্যন্ত বিদ্যমান। ইহা দ্বারা উক্ত বাগানের

এক শত কুড়ি ফুট উচ্চ রাস্তা হইতে তিস্তা নদীর দৃশ্য

মাল সরবরাহ করা হয়। পেসকের উচ্চতা ২৭০০ ফুট। পেসক হইতে প্রায় আধ মাইল উক্তরূপ ঢালু রাস্তায় নামিয়া আসিলে বামপার্শ্বে একটি কাষ্ঠনির্ম্মিত হাওয়া-ঘর বা বিশ্রামস্থান দেখিলাম। এ স্থানে দাঁড়াইলে দূরে তিস্তা এবং রঙ্গিৎ নদীর সঙ্গমস্থান দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার পারিপার্শ্বিক দৃশ্যও অতি তৃপ্তিকর। এই রাস্তায় মাঝে মাঝে দু' একটি হরিণের দলও দৃষ্টিপথে পতিত হইয়াছিল। ইহার পর আরও দুই মাইল ঢালু রাস্তায় নামিয়া হঠাৎ একটি ছোট পাথরের পুলের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। এ স্থানে রাস্তা সমতল হইয়াছে। বামপার্শ্বে একটি কাষ্ঠফলকে লিখিত বিজ্ঞাপনের প্রতি দৃষ্টি পড়াতে দেখিলাম যে, পেসকের রাস্তায় কোনও প্রকার মোটর-গাড়ীর যাতায়াত নিষিদ্ধ। সুতরাং ধরা পড়ার ভয়ে তথায় কালক্ষেপ না করিয়াই খানিক দূর চলিয়া আসিয়া জানিলাম যে, আমি তিস্তা গ্রামে পৌছিয়াছি। তথা হইতে আরও প্রায় আধ মাইল আসিয়া বামপার্শ্বস্থিত

শুনিয়াছি, পৃথিবীতে ইহার সমতুল্য মনোবিমোহন দৃশ্য আর কোথাও দৃষ্টিগোচর হয় না। তবে মনে হয়, শীতকালে পুরীধামে সমুদ্রবক্ষ হইতে সূর্য্যোদয়ের দৃশ্যও অতি সুন্দর এবং কমনীয়।

৩১শে অক্টোবর লাটসাহেবের দার্জ্জিলিং-পরিত্যাগের পরেই সকলে কলিকাতা প্রত্যাবর্ত্তনের জন্য উৎসুক হইয়া পড়িলেন। সুতরাং নীচে নামিবার জন্য ভিড়ের আধিক্য হইবার পূর্ব্বেই আমি ১লা নভেম্বর সিকিমযাত্রা স্থির করিলাম।

এ স্থান হইতে সিকিম যাইবার পথ আমার একবারে অজ্ঞাত থাকায় দার্জ্জিলিঙ্গের সর্দ্দার বাহাদুর লাডেনলা সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া পূর্ব্ব হইতেই সবিশেষ জানিয়া লইয়াছিলাম।

১লা নভেম্বর এগারটার মধ্যে আহারাদি শেষ করিয়া সিকিমের উদ্দেশ্যে বাহির হইয়া পড়িলাম। ঘুমের 'জোড়-বাংলো' অতিক্রম করিয়া ৬ মাইল-ষ্টোনের নিকট বামদিকে ঘুরিতে হইল। এই স্থানে আসিয়া লাডেনলা সাহেব তাগ্দার ভিতর দিয়া যে রাস্তার

তিস্তা নদীর পুলের নিকট পৌঁছিলাম। তিস্তা নদীর উপর পুরাতন তারের পুলের (Suspension bridge) পার্শ্বে পাথরের (ferro concrete) একটি নূতন সেতু তৈয়ারী হইতেছে; তাহার জন্য বহু কুলী তথায় কায করে। রবিবার ব্যতিরেকে অন্য দিন নির্দ্দিষ্ট সময় ব্যতীত অন্য কোনও সময়ে উক্ত তারের পুলের উপর দিয়া কোনও প্রকার যানের যাতায়াত বন্ধ থাকে। ভাগ্যক্রমে আমি রবিবারে তথায় পৌঁছিয়াছিলাম বলিয়া অপর পারে যাওয়ার জন্য কোনও কষ্ট বা কালক্ষেপ হয় নাই।

তিস্তা গ্রামের উচ্চতা ৫ শত ফুটের কিছু বেশী। এ অঞ্চলে ইহা একটি বাণিজ্যের কেন্দ্র। এ স্থানে একটি ডাক-বাংলো আছে এবং পূর্ত্ত বিভাগের এক জন ওভারসিয়ার থাকেন। মোটর গাড়ীর পেট্রল প্রভৃতি যাবতীয় জিনিষ এখানে পাওয়া যায়।

তিস্তা গ্রামে বিলম্বের কোনও প্রয়োজনীয়তা না বোধ করায় করিবার বন্দোবস্ত হওয়ায় একটু বিঘ্ন ঘটে। ইহার নিকটে একটি রজ্জুপথ দিয়া তিস্তা পার হইয়া এক পায়ে হাঁটা রাস্তায় বাদামটম্ভ এবং লেবঙ হইয়া দার্জ্জিলিঙ যাওয়া যায়।

মল্লির কিছু পরেই একটি বড় রকমের ধ্বস্ দেখিলাম। ইহা সেপ্টেম্বর মাসে হইয়াছিল, তবে এখন মোটামুটি তাহার সংস্কার হইয়াছে। রাস্তাটি বেশ প্রশস্ত না হইলেও বন্ধুর নহে। তবে একটি জিনিসের জন্য বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত। পাহাড়ের গাত্র ঘেঁসিয়া ঝরণার জল রাস্তার উপর দিয়াই বহিয়া চলিয়াছে। রাস্তার ক্ষতি যাহাতে না হয়, তাহার জন্য সেই সমস্ত স্থানে উপলখণ্ড ছড়াইয়া রাখিয়াছে। মোটর-গাড়ীর পক্ষে ইহা বিশেষ অসুবিধার কারণ না হইতে পারে, তবে মোটর-সাইকেল-চালকের পক্ষে ইহাতে সমূহ বিপদের সম্ভাবনা থাকে।

তিস্তা হইতে ১৪ মাইল আসার পর রংপুতে পৌঁছিলাম।
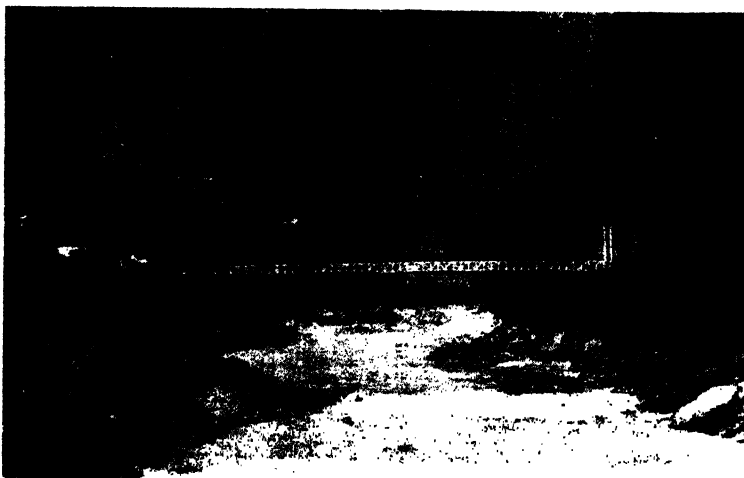
তিস্তা সেতু

অপর পারে গিয়া পুনরায় যাত্রা সুরু করিলাম। প্রায় আধ মাইল আসার পর দেখিলাম, রাস্তাটি দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া গিয়াছে। একটি রাস্তা সোজা খাড়াই উঠিয়া কালিংপঙের দিকে গিয়াছে; অপরটি তিস্তা নদীকে বামপার্শ্বে রাখিয়া রংপু হইয়া সিকিমের দিকে গিয়াছে। অতএব আমি শেষোক্ত রাস্তাই ধরিলাম।

এই রাস্তার বামপার্শ্বে বরাবর গর্ব্বোন্নতা নীলবসনা তিস্তার উদ্দাম ধারা প্রবাহিত হইতেছে, অপর দিকে ঝিল্লীমুখরিত ঘন বৃক্ষ-সমাকুল অরণ্যানী সুউচ্চ পাহাড়ের গাত্রে বিভিন্ন রংএর চেলী পরাইয়া সজ্জিত করিয়া রাখিয়াছে। ৩ মাইল আসিয়া মল্লি নামক এক পাহাড়ী চটীর ভিতর দিয়া যাইতে হইল। এখানে একটি ডাক-বাংলো আছে। দার্জ্জিলিঙ জেলার এলাকার মধ্যে যত ডাক-বাংলো আছে, সেগুলি ব্যবহার করিতে হইলে পূর্ত্তবিভাগের কাহারও অনুমতিপত্রের প্রয়োজন। উহা না থাকিলে বাংলোতে বাস

ইহা ব্রিটিশ ভারত এবং সিকিম রাজ্যের সীমানা। রংপু এবং তিস্তা নদীর সঙ্গমস্থানে মাছ ধরিবার জন্য অনেক শ্বেতাঙ্গের আগমন হয়। ভারত সরকার কিম্বা সিকিম দরবারের forest officer-এর নিকটে দশ টাকা দিয়া মাছ ধরিবার অনুমতিপত্র লইতে হয়। ভারত সরকারের এখানে একটি পুলিস-ঘাঁটি আছে, তাহাতে শুনিলাম, ৫ জন সিপাই এবং এক জন হাবিলদার বাস করে। সিকিম রাজ্যে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে এই স্থানে তাহারা যাত্রীদিগকে তাহাদের নাম-ধাম জিজ্ঞাসা করিয়া লয়। ভারতবাসী ব্যতীত অন্য কোনও দেশীয় লোকের সিকিম প্রবেশ করিতে হইলে দার্জ্জিলিঙের ডেপুটী কমিশনারের স্বাক্ষরিত ছাড়পত্র চাই। শুনিয়াছি, পূর্ব্বে ভারতবাসীর মধ্যে বাঙ্গালীদেরও সিকিম প্রবেশ করিতে হইলে উক্তরূপ ছাড়পত্রের প্রয়োজন হইত। তাহার কারণ বিশ্লেষণের বোধ হয় এ স্থানে প্রয়োজন হইবে না।

রংপু নদীর উপর দিয়াও একটি রজ্জুপথ আছে, তাহার উপর দিয়াই যান-বাহনাদি গমনাগমন করে। পাকা-সেতু অপেক্ষা এইরূপ রজ্জুপথেরই বন্দোবস্ত এতদঞ্চলে বেশী। রংপুগ্রাম বলিতে গেলে সিকিম-রাজ্যের ভিতরকার গ্রামটিকে বুঝায়। এই স্থানে ডাকঘর, ডাকবাংলো এবং একটি হাসপাতাল আছে। ইহা সমস্তই ভারত সরকারের ব্যয়ে পরিচালিত। পুল পার হইয়াই রাস্তা রংপু বাজারের মধ্য দিয়া চলিয়া গিয়াছে। গ্রামের পরেই একটি

Bridle pathএর অন্য একটি নমুনা—পার্শ্বে ধ্বস্

বড় রকমের জলস্রোত রাস্তার উপরে পার হইতে হইল। ইহাকে ছোটখাট একটি নদী বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। প্রকৃতপক্ষে রংপু হইতে রাস্তা ক্রমে ক্রমে উপরে উঠিতে আরম্ভ করিয়াছে। তবে তাহা বুঝিতে পারা যায় না। মাঝে মাঝে খানিকটা ঢালু রাস্তাও পাওয়া যায়। রাস্তায় বড় ধূলা, কিন্তু গর্ত্ত এবং পাথরের খোয়া হইতে ইহা সংরক্ষিত। বামে অতলস্পর্শ খদ নামিয়া গিয়াছে এবং তাহারই নীচে পার্ব্বত্য জলস্রোত নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া উন্মাদ হুঙ্কারে ছুটিয়া চলিয়াছে। নদীর অপর পার্শ্বে কখনও বৃক্ষগুল্মহীন পাহাড়ের নৈরাশ্যময় কুৎসিত নগ্নতা এ পারের পত্রপুষ্পশোভিত বৃক্ষ সমাকুল পাহাড়ের সম্পদকে বিদ্রূপ-কটাক্ষ করিতেছে; আবার কোথাও দুই পার্শ্বের পরিপূর্ণ শোভা কমনীয় মমতার আকর্ষণে পরস্পরকে আলিঙ্গন করিতে চাহিতেছে।

রংপু হইতে প্রায় ৬ মাইল দূরে সিংটম। একটি লোহার সেতুর উপর দিয়া আসিতে হয়। সেতুর পরে খানিক দূর আসিয়া তত্রস্থ বাজারের মধ্য দিয়া যাইতে হয়। Lower Sikkimএর মধ্যে সিংটম সহরটি সকলের অপেক্ষা বড়। ইহাতে বাজারে প্রায় সমস্ত জিনিষ পাওয়া যায়। দোকানদার বেশীর ভাগ মাড়োয়ারী এবং বড় বড় সমস্ত ব্যবসা তাহাদেরই আয়ত্তাধীন।

এই স্থান হইতে বামদিকে একটি রাস্তা বাদামটং হইয়া দার্জ্জিলিং, অপরটি গ্যাংটক অভিমুখে গিয়াছে। সিংটমের পর হইতে রাস্তার চড়াই ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইল। প্রায় ৩ মাইল আসিয়া দেখি, এক মাইল ধরিয়া কুলীরা রাস্তা মেরামত কার্য্যে ব্যাপৃত। পূর্ব্বে এই রাস্তা অত্যন্ত অপ্রশস্ত এবং আঁকা-বাঁকা ছিল। তাহা মোটর-গাড়ীর যাতায়াতের পক্ষে বিশেষ বিপজ্জনক বলিয়া এই স্থানে রাস্তা বামপার্শ্বস্থিত পাহাড় কাটিয়া প্রশস্ত করা হইতেছে। এক স্থানে দেখিলাম, ৫০ ফুট লম্বা একটি সুড়ঙ্গ পথ তৈয়ারী হইতেছে। রাস্তার দক্ষিণ পার্শ্বে সিংটম নদীর জল খরবেগে বহিয়া চলিয়াছে। যৎপরোনাস্তি সাবধানতার সহিত আমাকে এই রাস্তার উপর দিয়া সাইকেল চালাইয়া যাইতে হইয়াছিল।

রংপু হইতে আসিতে স্থানে স্থানে প্রায়ই কমলা লেবুর বাগান দেখিতে পাওয়া যায়। এই বাগানগুলি বেশীর ভাগ সরকারের অধীনে। সিংটম হইতে প্রায় ৩ মাইল আসার পর ঐরূপ একটি বাগান দেখিলাম। রাস্তার ধারেই ছোট ছোট গাছে কমলালেবু ফলিয়া আছে। কোনও রক্ষকের দর্শন না পাইয়া কয়েকটি চুরি করার ইচ্ছা হইল। সুতরাং গাড়ীটি ধীরে ধীরে একটি গাছে ঠেশ দিয়া রাখিয়া টপ টপ করিয়া গোটা চারেক লেবু পকেটস্থ করিলাম। ব্যস্, অমনি কোথা হইতে এক সরকারী রক্ষক আসিয়া হাজির। তাহাকে বুঝাইয়া বলিলাম যে, আমি বিদেশী মুসাফির। তাহাদের দেখা না পাওয়াতেই দু'টি ফল লইয়াছি। আমি ভাবিয়াছিলাম, এগুলি বুঝি গরীব মুসাফিরদের জন্য। কিন্তু দোষ যখন করিয়াছি, প্রায়শ্চিত্তের মূল্যস্বরূপ তাহাকে আট আনা পয়সা দিতে চাহিলাম। প্রথমতঃ সে কোনও মতেই পয়সা লইবে না। অবশেষে কি ভাবিয়া পয়সাগুলি লইয়া চলিয়া গেল; আমিও স্বেদসিক্ত রক্তাভ মুখে শীঘ্র সে স্থান ত্যাগ করিলাম।

৮ মাইল ষ্টেশনের পর হইতে রাস্তার অসম্ভবরূপে চড়াই আরম্ভ হইয়াছে। তবে রাস্তা বেশী আঁকা-বাঁকা নয় এবং যথেষ্ট প্রশস্ত। চতুষ্পার্শের পাহাড়গুলি বেশীর ভাগ ফাঁকা, শুধু শিখর-দেশ জঙ্গলসমাকীর্ণ বলিয়া মনে হয়। দার্জ্জিলিঙ্গের নিকটবর্ত্তী হইলেও এই সমস্ত পাহাড়ে কোথাও চায়ের বাগান বা তাহার চাষ দেখিতে পাইলাম না। তাহার পরিবর্ত্তে ধান কিম্বা অন্যান্য ফসলের আবাদ হয়। সিকিম দরবারে চায়ের চাষ করিতে হুকুম দেওয়া হয় না। কারণ, দেশের প্রজারা অত্যন্ত গরীব। তাহাদের উৎপাদিত ধান পর্য্যাপ্ত পরিমাণে হয় না বলিয়া বাহির হইতে ধান আমদানী করিতে হয়। ইহার উপর যদি চায়ের চাষ হয়, তাহা হইলে প্রজারা হয় ত অর্দ্ধেক অভুক্ত থাকিবে এবং লভ্যাংশের টাকা বেশীর ভাগ বাহিরে চলিয়া যাইবে।

এই রাস্তায় প্রায়ই গো-যানের যাতায়াত হয় দেখিলাম। সূর্য্যের আলো ক্রমে মন্দীভূত হইয়া আসিতে লাগিল। সন্ধ্যার প্রাকালে মনে হইতেছিল, দূরের পাহাড়গুলি যেন জীবন্ত মহাকালের মত দাঁড়াইয়া আছে। যৎপরোনাস্তি সাবধানতা অবলম্বন করিয়া খানিকক্ষণ বেগে চালাইয়া গংটকের রাস্তার বৈদ্যুতিক আলো জ্বালিবার পূর্ব্বেই আসিয়া তথায় পৌঁছিলাম। তত্রস্থ State Engineer শ্রীযুক্ত ফকিরচাঁদ জালির বাসা জানিয়া লইয়া খানিক পরে তথায় গিয়া হাজির হইলাম।

জালি সাহেব এক জন পঞ্জাবদেশবাসী। আমার সহিত তাঁহার পূর্ব্বে কোনও প্রকার আলাপ ছিল না; শুধুমাত্র দার্জ্জিলিঙে তাঁহার নামের পরিচয় পাইয়াই অযাচিতভাবে তাঁহার অতিথি হইলাম। অতিথি অযাচিতভাবেই হয়—কিন্তু সে রীতি ছিল বহুপূর্ব্বে; এখন খ্যাতনামা লোকের পরিচয়পত্র ব্যতিরেকে

শুভ্র কিরীটশোভিত বিশাল কাঞ্চনজঙ্ঘা যেন হঠাৎ পৃথিবীর বুক বিদীর্ণ করিয়া ঊর্দ্ধে উঠিয়া স্বয়ং পৃথিবীর জীবনযাত্রা পরিদর্শন এবং তাহার তত্ত্বাবধান করিতেছে। চতুষ্পার্শ্বে নাটমন্দিরের আঙ্গিনার মত বিখ্যাত সিকিম উপত্যকার কমনীয় দৃশ্য! মধ্যে মধ্যে বাঙ্গালা দেশের পল্লীর মত বাঁশগাছের ঝাড় দেখিয়া কিয়ৎক্ষণের জন্য চক্ষু দু'টি উন্মীলন করিয়া সুদূর বাঙ্গালার পল্লীশ্রীর কথা অন্তরে অনুভব করিলাম।

গংটক সিকিমের রাজধানী। ইহার উচ্চতা ৫৭৮০ ফুট। সিকিমের অন্যান্য সহর অপেক্ষা ইহা বড় এবং লোকালয়পূর্ণ। তবে এই রাজ্যে সহর বলিতে এই গংটক সহরকেই বুঝায়—অন্য সমস্ত ছোট-বড় পল্লীবিশেষ। আবার পল্লী বলিতে যাহা বুঝায়, তাহার সংখ্যা এখানে খুব কম। কৃষক-প্রজারা নিজ নিজ জমির এক পার্শ্বে এক একটি কুটীর তৈয়ারী করিয়া তাহাতেই বাস করে,

গংটক যাইবার পথের এক স্থানের অবস্থা

কাহারও গৃহে আশ্রয় ভিক্ষা চাহিলে ভদ্রভাবে বিতাড়িত হইবার সম্ভাবনা থাকে বেশী। আমার কিন্তু তাহা হয় নাই। জালি সাহেবের মত অমায়িক এবং সরলপ্রকৃতির লোক সুদূর বিদেশে হঠাৎ পাওয়া বাস্তবিক ভাগ্যের কথা বলিতে হইবে। আমি তাঁহার বাংলোয় পৌঁছিলে, শুনিলাম, তিনি অসুস্থ। তত্রাচ তিনি সংবাদপ্রাপ্তিমাত্র বাহিরে আসিয়া আমার সহিত আলাপ পরিচয় করিলেন এবং আমার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থার জন্য তৎপর হইলেন।

২রা নভেম্বর। এ স্থানের প্রাকৃতিক শোভা দেখিবার জন্য অতি প্রত্যূষে শয্যাত্যাগ করিলাম। তুষারমণ্ডিত হিমাচলের অভ্রভেদী সেই চিরপরিচিত কাঞ্চনজঙ্ঘা, কবরু প্রভৃতি পর্ব্বতশৃঙ্গগুলি দেখিলাম। দার্জ্জিলিঙের দৃশ্য হইতে ইহার এইটুকু পার্থক্য মনে হইল যে, ইহার সম্মুখে সারি সারি পর্ব্বতশ্রেণীর সংখ্যা খুব অল্প।

এক একটি স্থানে ঐরূপ কুটীরের সমষ্টি ১০ হইতে ১৫ পর্য্যন্ত। দোকান-হাটের জন্য স্ত্রী-পুরুষে নিকটবর্ত্তী কোনও বড় স্থানে সপ্তাহে একবার কি দুইবার 'হাট' করিতে যায়।

সহরবাসীদের জীবনযাত্রা ও গৃহস্থালী অতিরিক্ত অপরিষ্কার। ইহারা মোটা পদ্দর-জাতীয় একপ্রকার কাপড়ের ঘাগরা এবং জামা পরিয়া থাকে। পায়ের জুতাও তাহারা ঐ প্রকারের কাপড়ের দ্বারা প্রস্তুত করে। স্নান ইহারা আদৌ করে না বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

সিকিমরাজ্যের পরিমাণ ২,৮১৪ বর্গ-মাইল; অর্থাৎ উত্তর দক্ষিণে ৭৩ মাইল এবং পূর্ব্ব-পশ্চিমে ৫৫ মাইল। ইহার বেশীর ভাগ অরণ্য-সমাকুল পর্ব্বতে পরিপূর্ণ!

[আগামীবারে সমাপ্য।

শ্রীপ্রণবেশচন্দ্র সিংহ।

উপন্যাস

১১

এক দিন মন্নুয়া কুলী অসীমের কাছে অনেক কাঁদা-কাটা করিল। সে বলিল, সে জানকীর সন্ধান পাইয়াছে। জানকীকে সাহেব বাবু সহরের এক বস্তিতে রাখিয়াছে, তবে কোন্ বস্তি, সে খবর সে এখনও পায় নাই। বাবুজী দয়া করিয়া সাহেব বাবুকে বলিয়া কহিয়া তাহার জানকীকে ফিরাইয়া দিবার ব্যবস্থা করিয়া দিন। অসীম বুঝাইল যে, সাহেব বাবুকে সে তাড়াইয়া দিয়াছে, সে এখন আর এই বাড়ীতে থাকে না, হোটেলে বাস করে। মন্নুয়া কিছুতেই সে কথা বিশ্বাস করিতে চাহিল না। সে বলিল, সে সাহেব বাবুকে এই বাড়ীর মধ্যে যাতায়াত করিতে দেখিয়াছে। অসীম বলিল, সে ভুল দেখিয়াছে, অন্য কেহ গোপনে এই বাড়ীতে যাতায়াত করে, ইহা হইতে পারে। কিন্তু মন্নুয়া নাছোড়বান্দা, সে কিছুতেই তাহার গোঁ ছাড়িতে চাহে না। শেষে সে বলিয়া গেল যে, সে হাওড়ার রেল-ষ্টেশনে কুলীর কাযে ঢুকিয়াছে, যত দিন না জানকীর সন্ধান পায়, তত দিন মধুপুরে ফিরিবে না; আর সাহেব বাবুর রক্ত দর্শন না করিয়াও দেশে ঘরে ফিরিবে না।

মন্নুয়া এইরূপে শাসাইয়া যাইবার পর অসীম গভীর চিন্তাসাগরে মগ্ন হইল। মন্নুয়া যাহাকে এই বাড়ীতে যাতায়াত করিতে দেখিয়াছে, সে কে? সে কি—সে কি শুভেন্দু? দারুণ ক্রোধ বা হিংসানলে অসীমের সারা অন্তরটা জ্বলিয়া উঠিল। মানুষ একবার গভীর খাদে নামিতে আরম্ভ করিলে তাহার গতি রুদ্ধ হওয়া দুষ্কর। অতি উচ্চ আদর্শ লইয়াই অসীম অনুপ্রাণিত হইয়াছিল; কিন্তু যখন একবার সে সন্দেহ ও অবিশ্বাসের ঘৃণিত চক্রান্ত দ্বারা প্রভাবিত হইল, তখন তাহার সেই আদর্শও সাময়িকভাবে অন্তর্হিত হইল। রক্ত-মাংসের শরীর, মানুষ তাহার স্বাভাবিক পশুবৃত্তি এড়াইতে পারে না।

অসীমের মনের অবস্থা যখন এইরূপ, যখন তাহার মনের মধ্যে নরকের আগুন প্রজ্বলিত হইয়া উঠিয়াছে, তখন সে অতি নীচ গুপ্তচরের কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিতে যে পশ্চাৎপদ হইবে না, ইহা বলা বাহুল্য। সে ফিল্মের উন্নতির দিকে দৃষ্টি না রাখিয়া শুভেন্দুর গতি-বিধির উপর লক্ষ্য রাখিবার জন্য সময় নিয়োজিত করিতে লাগিল। এ বিষয়ে তাহার যোগ্য অনুচরও জুটিয়াছিল ভাল—সে চামেলী। আবাল্য যে দূষিত আবহাওয়ায় লালিত-পালিত ও পুষ্ট হইয়াছে, ক্ষণিকের সৎসঙ্গের ফলে তাহার মনের সাময়িক পরিবর্তন সম্ভবপর হইতে পারে বটে, কিন্তু অনুকূল অবস্থা দেখা দিলে তাহার সহজাত মনোবৃত্তি যে সতেজ ও জীবন্ত হইয়া উঠিবে, ইহা ত স্বাভাবিক।

সুদর্শন শুভেন্দুর প্রতি চামেলীর আকর্ষণে যথার্থ প্রেমের কোন গন্ধ ছিল না, ইহার মূলে ছিল চোখের নেশা। প্রেমের গতি প্রতিহত হইলে তাহা বিষাক্ত হইয়া উঠে না, কিন্তু চোখের নেশার পক্ষে স্বতন্ত্র কথা। শুভেন্দুর কাছে প্রেম প্রত্যাখ্যানের ফলে সে তাহার পক্ষে শোণিতপিপাসু ব্যাঘ্রীর মত হইয়া উঠিয়াছিল। আবার সে যখন দেখিল, তাহার কুমন্ত্রণা গৃহ-স্বামীর উপর প্রভাব-বিস্তারে সমর্থ হইয়াছে, তখন একবার রক্তের আস্বাদ পাইয়া ব্যাঘ্রী যেমন দ্বিগুণ উৎসাহে প্রাণি হত্যায় অভ্যস্ত হয়, তেমনই সে প্রতি পদে শুভেন্দুর ছিদ্র অন্বেষণে অতিমাত্র তৎপরতা প্রদর্শন করিতে লাগিল।

আশ্চর্য্য এই, যাহাকে কেন্দ্র করিয়া এত বড় একটা জীবন-নাটকের বিয়োগান্ত অভিনয় হইতেছিল, সেই আপন-ভোলা শুভেন্দু আপনার সমূহ অনিষ্টের কথা বিন্দুবিসর্গও

জানিতে না পারিয়া সম্পূর্ণ নিশ্চিন্তমনে আপনার আরাধ্যা কলাদেবীর উপাসনা লইয়াই তন্ময় হইয়াছিল। যতই সে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিতেছিল, ততই সে নিত্য নূতন পরিকল্পনার পত্র-পুষ্প-তোয়-ফলে আরাধ্যা-দেবীকে পূজার্চ্চনা করিতেছিল, নিত্য নূতন সাজে তাঁহাকে সাজাইতেছিল। ষ্টুডিও লাইব্রেরীতে সিনেমা আর্ট চর্চ্চার আধুনিক যত কিছু প্রামাণ্য গ্রন্থ সংগৃহীত হইয়াছিল—আর সে বিষয়ে অসীমবিকাশ কখনও কার্পণ্য প্রদর্শন করে নাই—শুভেন্দু সে সকল গ্রন্থ অবসর পাইলেই পাঠ করিত। 'আর্ট-অফ-মেক আপ' অর্থাৎ মানুষকে নানা সাজে সাজাইবার বিদ্যা সম্বন্ধে ন্যূনাধিক কুড়িখানি গ্রন্থ ছিল, প্রত্যেকখানিই আধুনিক ও মূল্যবান্। বৃদ্ধকে যুবক করিবার, তরুণীকে বৃদ্ধা করিবার এবং বৃদ্ধাকে ষোড়শীতে পরিণত করিবার, সুস্থ সবল ব্যক্তিকে বিকলাঙ্গ অন্ধ খঞ্জ করিবার, এ যুগের লোককে প্রাচীন যুগের উপযোগী সাজে সজ্জিত করিবার অসংখ্য সঙ্কেত ও নির্দ্দেশ এই সকল গ্রন্থে ছিল। কেশ ও বেশ-প্রসাধনের অনন্ত কলা-কৌশল অন্যান্য গ্রন্থে বিশ্লেষিত হইয়াছিল। আবার অভিনয়ের বাক্য-বিন্যাস (আর্ট-অফ এলোকিউশন) এবং বসিবার দাঁড়াইবার চলিবার ফিরিবার অনন্ত ভঙ্গী (পোজ্ ও গেশ্চার পশ্চার) সম্বন্ধেও অনেক কেতাব ছিল, ভাবের অভিব্যক্তির (হাসি, কান্না, ঘৃণা, ভালবাসা, হিংসা, ক্রোধ প্রভৃতির) সম্পর্কিত গ্রন্থেরও অভাব ছিল না। চিত্রাঙ্কন ও অভিনয় শিক্ষাদানের কর্ত্তব্যপালন ছাড়া অবসর পাইলেই শুভেন্দু স্বেচ্ছায় প্রফুল্লমনে তাহাতে নিমগ্ন থাকিয়া নিত্য নূতন জ্ঞানাহরণ করিত। ঘটনাচক্র সম্প্রতি তাহাকে একটি বিষয়ে বড়ই অশান্তি প্রদান করিতেছিল—তাহার সম্পূর্ণ অনিচ্ছাসত্ত্বেও এবং বিবেকবুদ্ধির বিরুদ্ধে বন্ধুপত্নী গৃহস্বামিনী তাহার উপরে যে গুরু দায়িত্বের ভার চাপাইয়া দিয়াছিল, তাহা পালন করিতে গিয়া তাহাকে অনুক্ষণ অন্তর্দাহে দগ্ধ হইতে হইতেছিল। জগতে সকলের চেয়ে যে তাহার শুভাকাঙ্ক্ষী বন্ধু, যে তাহাকে সহোদরাধিক ভালবাসার ডোরে বাঁধিয়া রাখিয়াছে, তাহাকে প্রবঞ্চনা করিয়া সে তাহারই পত্নীর অনুরোধ পালন করিতেছে, বিবেকের এ দংশন হইতে ত তাহার অব্যাহতি নাই! একটা হৃদয়হীন স্বার্থপর মদ্যপ লম্পট ভ্রাতার জন্য গৃহস্বামিনী তাহার দেবতুল্য স্বামীকে প্রবঞ্চনা করিতেছে, আর ঘটনাচক্র আশ্চর্য্যরূপে তাহাকে এই ঘৃণিত ব্যাপারের সহিত অচ্ছেদ্যরূপে বিজড়িত করিয়া রাখিয়াছে—এ মোহপাশ হইতে ছিন্ন হইবার তাহার সাধ্য নাই, বিধাতার এ কি অভিশাপ!

আরও আশ্চর্য্যের কথা, বন্ধুপত্নীর সকাতর অনুরোধ রক্ষার জন্য সে বন্ধুর অজ্ঞাতসারে যে পাপকে প্রশ্রয় দিয়াছে, তাহাতে বন্ধুগৃহের অন্যতমা কর্ত্রী বন্ধুভগিনীরও পূর্ণ সম্মতি ছিল। নারীর মান-মর্য্যাদা রক্ষার্থে সে বন্ধুর অজ্ঞাতসারে বন্ধুপত্নীর ভ্রাতাকে সাহায্য করিয়া বন্ধুর অপ্রীতিকর কার্য্য করিয়াছে। যে বন্ধু তাহার আশ্রয়দাতা ভ্রাতার অপেক্ষাও মহৎ, তাহার অজ্ঞাতে এই চক্রান্তে লিপ্ত হওয়া তাহার পক্ষে পাপ। কিন্তু তবুও তাহাতে এই সান্ত্বনা ছিল যে, বন্ধুর ভগিনীও তাহাকে এই কার্য্যে বাধা প্রদান করেন নাই, নিরুৎসাহ করেন নাই। তিনি শিক্ষিতা, বুদ্ধিমতী, ন্যায় ও সত্যের উপাসিকা, নির্ভীক স্পষ্টভাষিণী। কিন্তু কিছুদিন হইতে তিনিও ত আর ভ্রাতৃজায়ার এই গুপ্ত ব্যাপারে যোগদান করিতেছেন না। তবে কি তিনিও এই লুকাচুরি ব্যাপারটাকে হীন ও তাঁহার পক্ষে অযোগ্য মনে করিয়া ইহা হইতে দূরে সরিয়া গিয়াছেন? পূর্ব্বে পোজ দিবার সময় তিনি ষ্টুডিওতে অনুক্ষণ আসিতেন যাইতেন, কিছুদিন হইতে তিনি এখানে একবারেই পদার্পণ করেন না। কেবল তাহাই নহে, এখন তাঁহাদের আবাসভবনে গেলে তিনি সম্ভবমত তাহাকে এড়াইয়া চলেন, নিতান্ত প্রয়োজন না হইলে দেখা দেন না বা কথা কহেন না। এ কি ঘৃণার পরিচয়? মানুষ মানুষের ব্যবহারে বিরক্ত বা অসন্তুষ্ট হইলেই ত এমনই ব্যবহার করিয়া থাকে।

শুভেন্দুর এ চিন্তা অসহ্য হইয়া উঠিল। এই এক বৎসরে সে এই অপরিণতবয়স্কা বন্ধু-ভগিনীর ভাল-মন্দ মতামতের যতটা মুখাপেক্ষী হইয়া পড়িয়াছিল, বোধ হয়, তত আর কখনও কাহারও হয় নাই। তরুণ হৃদয়ের অফুরন্ত আশার যে বীজটিকে সে সযত্নে সঙ্গোপনে প্রীতি প্রেমের স্নেহরসে সিক্ত করিয়া আসিতেছিল, তাহা কি অঙ্কুরেই উন্মূলিত হইবে? কেহ ত জানে না, সে এই এক বৎসর কি যত্নে মানস-সিংহাসনে এই দেবী-প্রতিমাকে বসাইয়া হৃদয়ের সমস্ত শ্রদ্ধাপ্রীতির অঞ্জলি দিয়া আসিয়াছে!

আশা কুহকিনী! সে ত দেখিয়াছে, প্রথম প্রথম সেই দেবীপ্রতিমা তাহার প্রতি ঔদাসীন্য প্রদর্শন করিলেও এবং কোন কোন ক্ষেত্রে তাহার অজ্ঞাত অপরাধে বিরক্তি প্রকাশ করিলেও পরে কিন্তু অপরের সহিত তাহার কথা হইলেও মনোযোগ দিয়া তাহা শুনিয়াছে, হঠাৎ চোখে চোখে দেখা হইলে তাহার প্রতি নিবদ্ধ-দৃষ্টি চকিতে অবনমিত করিয়া লইয়াছে। এ সব কিসের লক্ষণ? ঔদাসীন্য কিছুতেই হইতে পারে না, অবজ্ঞা ত নহেই। তবে কি—তবে কি—না, এ তাহার ধৃষ্টতা, স্পর্দ্ধা! পথের ভিখারী বামনের আকাশের চাঁদ ধরিবার সাধ?

জমিদারকন্যা, ধনী জমিদারের ভগিনী, শিক্ষিতা মার্জ্জিতা অকলঙ্কসুন্দরী সে। আর সে নিজে? দরিদ্র বেতনভুক্ কর্ম্মচারী, প্রভুর অনুগ্রহ-নিগ্রহের মুখাপেক্ষী, তাহারই উপর তাহার দিনযাপনের ভরসা। দূর হউক এ দুরাশা, তাহার পক্ষে এই সহরের আকর্ষণ বা প্রলোভনের আর কোন কারণ ত নাই। তবে অকারণে কেন সে এখানে অবস্থান করে? তাহার বোম্বাইএর চিন্তা-লেশহীন আনন্দময় জীবনই ত ছিল ভাল। কেন সে বন্ধুর আবাহনে এখানে আসিল? আসিল যদি, তবে পতঙ্গের মত জ্বলন্ত বহ্নির দিকে আকৃষ্ট হইল কেন? না, তাহার এখনই বোম্বাই ফিরিয়া যাওয়াই ভাল—দূরে, যত দূরে এই উন্মাদকর প্রলোভন হইতে সরিয়া থাকা যায়, ততই ভাল। ন পিতা, ন মাতা, ন ভ্রাতা, ন ভগিনী,—জগতে তাহার আপনার বলিতে কেহ নাই, সে সকল মধুর আকর্ষণের সম্বন্ধ তাহার একে একে ঘুচিয়াছে। তবে আবার এ নূতন আকর্ষণের মোহ কেন? যাহাতে লাভের কোন আশা নাই, তাহার প্রতি আকর্ষণ, এ ত মরণের লক্ষণ!

"এই যে শুভেন্দু বাবু, দুটো প্রাইভেট কথা কবার অবসর হবে কি?" অসীম আসিয়া পার্শ্ববর্ত্তী আসনে উপবেশন করিল।

শুভেন্দুর বিস্ময়ের সীমা নাই, সে বলিল, "এ ডাক আবার কবে থেকে আরম্ভ হ'ল?"

"যবে থেকে আমি তোমার বন্ধুত্ব হারিয়েছি, বন্ধুত্বের বদলে অন্য কিছু পেয়েছি।"

"কি রকম? এটা ত বরং উল্টোই গাইছ, ভাই। আমি তোমার এ হেঁয়ালির কথা বুঝতে পারছি না। কিছুদিন থেকে তুমিই আমায় তফাতে রাখছ। বুঝছি, প্রভু-ভৃত্যের সম্বন্ধটা বোধ হয় আমায় মনে করিয়ে দিচ্ছ"—

প্রবল বেগে মাথা নাড়িয়া অসীম বলিল, "না, না, আমি যেমন ছিলুম, তাই আছি, তুমিই আমাদের বন্ধুত্বের মূল খুঁড়ে ফেলছো।"

শুভেন্দু সবিস্ময়ে বলিল, "আমি?"

অসীম দৃঢ়কণ্ঠে দৃপ্তস্বরে বলিল, "হাঁ, তুমি। যাক, যেই করুক আর যে কারণেই এটা ঘটে থাকুক, এ নিয়ে কথা-কাটাকাটির দরকার নেই। বলছিলুম কি, আমার একটা প্রস্তাব আছে, শুনবে কি?"

শুভেন্দু ব্যথিত-কণ্ঠে অনুযোগের সুরে বলিল, "কবে শুনি নি? বোম্বাইয়ে গিয়ে তুমি আমায় এখানে আসতে বল্লে, কোন দিকে না চেয়ে তোমার সঙ্গে চ'লে এলুম। আমি ত বেশ ছিলুম, আমার না আসাই ত ভাল ছিল।"

"বোম্বাইয়ে ফিরে যেতে চাও? আমি সেই প্রস্তাবই করতে এসেছিলুম। দেখ, আমি ভাবছি, এখানকার ষ্টুডিও ভেঙ্গে দেব, আর বোম্বাই সহরেই বড় ক'রে ষ্টুডিও প্রতিষ্ঠা কোরবো, সেখানে তোমাকেই কর্ত্তা হয়ে সমস্ত জিনিষটা গ'ড়ে তুলতে হবে, পারবে?"

শুভেন্দুর মুখখানা ম্লান হইয়া গেল, সে বলিল, "তা হ'লে বল, প্রকারান্তরে আমায় তাড়িয়েই দিচ্ছ? তা ভালই হয়েছে, আমি নিজেই বোম্বাই যাব ব'লে ঠিক করেছিলুম। দেখ, সেখান থেকে আমার অফার এসেছে আজ এক মাস আগে—এখনও সে অফার ওপন্ আছে আমার পূর্ব্ব-মনিবদের কাছে। যাবই আমি যে কোন কোম্পানীর ম্যানেজারী নিয়ে সেখানে, এটা নিশ্চয়। কিন্তু যাবার আগে আমার একটা কথা খোলাখুলি জিজ্ঞাসা করবার আছে। কিছুদিন থেকে দেখছি, তুমি আর আমার সঙ্গে ছেলেবেলার পড়ার সাথী অন্তরঙ্গ বন্ধুর মত ব্যবহার করছো না, কিসে যেন আমি তোমার স্নেহ-ভালবাসা হ'তে বঞ্চিত হয়েছি, যেন কোনও অবিশ্বাসের কায করেছি। এটা কি আমার কাযে গাফিলির জন্যে, না পারিবারিক কোন কারণে? আমি খোলাখুলি জবাব চাই, নয় ত ইংরেজিতে কুকুরকে বদনাম দিয়ে পরে ফাঁসী দেওয়ার মত বদ্‌নাম নিয়ে আমি যেতে চাই নি। আমি তোমার কাছে কি অপরাধ করেছি, বল।"

অসীম কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ হইয়া রহিল, তাহার পর ধীরে ধীরে বলিল, "অপরাধ? হাঁ, না,—অপরাধ কিছু নয়। তবে হিরণীর ইচ্ছা নয় যে, বাড়ীর মধ্যে আর ষ্টুডিও রাখা হয়।"

শুভেন্দুর মুখখানা একবারে পাংশুবর্ণ ধারণ করিল। ক্ষণপরে ব্যথিত-কণ্ঠে বলিল, "তিনি বলেছেন আমায় বিদায় নিতে?"

অসীমের মনে হইল, এ যেন যথার্থ ভীত পশুর কণ্ঠনিঃসৃত আর্ত্তনাদ! সে বলিল, "না, ঠিক তা নয়, তবে প্রকারান্তরে বটে। সে বলেছে, ষ্টুডিও ভেঙ্গে দিতে। তার মতে ষ্টুডিওর দূষিত বাতাসে আমাদের সংসারের সুখশান্তি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। আমি ত তার কথা ফেলতে পারি নি।"

শুভেন্দু আবার কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া বলিল, "হুঁ, তা ঠিক। সিনেমা আর্টিষ্টরা নিজেদের আর্টটাকে যত বড় বলেই মনে করুক, আমাদের বড় ঘরের মেয়েছেলেদের কাছে তারা অনেক নীচু স্তরে প'ড়ে আছে, তাদের হাওয়া দূষিত হওয়াই সম্ভব। তা হ'লে, তাঁর ইচ্ছা কি, আমি আজই বোম্বাই রওনা হই?"

অসীমের মুখে হঠাৎ হাসি দেখা দিল, সে পূর্ব্বের মত ঘনিষ্ঠতার সুরেই বলিল, "সবটাই খারাপ ব'লে নিচ্ছিস কেন, শুভো? আজই যেতে হবে, তার মানে কি? আর হিরোও ত কাউকে কোথাও যেতে বলে নি, সে কেবল বলেছে ষ্টুডিওটা তুলে দিতে এখান থেকে।"

শুভেন্দু বলিল, "যাক, দুদিন আগে পিছে কিছু আসে যায় না। আজ থেকেই আমি তৈরী হব, সে জন্যে ভেবো না কিছু। যাবার আগে আমার কিছু করবার আছে, সে কর্ত্তব্যটা যত শীগ্‌গির পারি শেষ ক'রে ফেলবো। আর কিছু বলবার আছে?"

অসীম তাহার কণ্ঠস্বর ও কথার ভঙ্গীতে যার-পর-নাই বিস্মিত হইল। সে এত দিন তাহাকে আপন-ভোলা আর্ট-পাগলা যোগী বলিয়াই জানিত। তাহার কাছে এমন ভাবের কঠোর স্পষ্ট জবাবের সে প্রত্যাশা করে নাই। সে বলিল, "রাগ করলি, শুভো? আমি ত ভালই বলছি। প্রলোভনকে জয় করা মস্ত বীরের কাম বটে; কিন্তু প্রলোভনকে জয় করবো ব'লে প্রলোভনের কাছে না থেকে, তার কাছ থেকে দূরে স'রে যাওয়াই ভাল না?"

শুভেন্দুর অন্তর গুরু গুরু করিয়া উঠিল। তবে কি অসীমবিকাশ তাহার মনের গোপন কথাটির সন্ধান পাইয়াছে? ক্ষীণকণ্ঠে সে বলিল, "প্রলোভন? এখানে আমার কি প্রলোভন থাকতে পারে?"

অসীমের সমস্ত অন্তরটা আবার বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। মানুষ এত মিথ্যাশ্রয়ী হইতে পারে? এখনও কপটতার আবরণ? না, উহার মুখের মুখোস খুলিয়া দেওয়াই ভাল। উত্তেজিত স্বরে বলিল, "কর্ত্তব্যপালনের কথা এইমাত্র বলছিলে না তুমি? সে কর্ত্তব্যপালনের সঙ্গে প্রলোভনের কি কোন সম্বন্ধ খুঁজে পাচ্ছ না? একটু ভেবে দেখলেই পাবে।"

অসীম আর দাঁড়াইল না। যাইবার সময় দ্বারপ্রান্ত হইতে বলিয়া গেল, "তা হ'লে বোম্বের ষ্টুডিওর ভার নেওয়াই তোমার ঠিক রইলো?"

শুভেন্দুর মনের ভিতরটা তখন সত্যই গুলাইয়া গিয়াছিল। সে তখনও বুঝিতে পারে নাই, অসীমবিকাশ কি ভাবিয়া কর্ত্তব্যপালনের সঙ্গে প্রলোভন কথাটাকে জড়িত করিয়া গেল। অন্ধকারে অস্পষ্ট আলোকের মত তাহার মনের মধ্যে একটা সন্দেহের রেখাপাত হইল, সে ক্ষিপ্তের মত চীৎকার করিয়া বলিল, "যেখানেই যাই আর যার কাছেই কাম করি, ভবিষ্যতে তোমার ষ্টুডিওর সঙ্গে যে আমার কোন সম্বন্ধ থাকবে না, এটা নিশ্চয়।"

অসীম তখন চলিয়া গিয়াছে, তাহার শেষ কথাটা তাহার কর্ণে পশিয়াছে কি না সন্দেহ। শুভেন্দু অস্থির হইয়া মাথার একরাশ কেশের মধ্যে অঙ্গুলি চালনা করিতে লাগিল। কে তাহাকে এই হেঁয়ালির অর্থ সমাধান করিয়া দিবে? এখানে তাহার একমাত্র প্রলোভন যাহা, তাহার সঙ্গে তাহার কর্ত্তব্যপালনের সম্পর্ক ত কিছুই নাই। বরং ইদানীং এই কর্ত্তব্য পালনের সংস্রব হইতে তাহার প্রলোভনের প্রতিমা ত আপনাকে দূরে অপসৃত করিয়াছে। তবে?

মাথার ভিতরে অসহ্য যন্ত্রণা হইতেছিল। শুভেন্দু আর আকাশ-বাতাসহীন সীমাবদ্ধ কক্ষের অভ্যন্তরে আবদ্ধ হইয়া থাকিতে পারিল না, একরূপ ছুটিয়া বাগানের দিকে চলিল। সেখানে ঝিলের ধারে ছায়াশীতল বৃক্ষমূলে সৌহাসনে কিছুক্ষণ বসিয়া থাকিবার পর শীকরসিক্ত স্নিগ্ধ সমীরণে তাহা।

উত্তপ্ত মস্তিষ্ক শান্ত শীতল হইল। ঝিরঝিরে ঠাণ্ডা হাওয়া বহিতেছিল, সে ক্ষণকালমধ্যেই তন্দ্রাচ্ছন্ন হইয়া পড়িল। স্বপ্নে সে যেন দেখিল, চারিদিক আলো করিয়া তাহার মানসী প্রতিমা অদূরে দাঁড়াইয়া আছে, তাহার মুখে মৃদুমন্দ হাস্য; তর্জ্জনী হেলাইয়া সে যেন অনুযোগের সুরে বলিতেছে,— ভালবাসা যদি সত্য হয়, তবে উহা সন্দেহ বা আশঙ্কার অপেক্ষা রাখে না, চিন্তার অবসর দেয় না; ভালবাসা ভীরুকেও সাহসী করে, মূকের মুখেও কথা যোগাইয়া দেয়!

অস্ফুট স্বরে হিরণীর নাম উচ্চারণ করিয়া, বাহু প্রসারণ করিয়া শুভেন্দু ছায়ামূর্ত্তিকে ধরিতে গেল। কোথায় সেই হাস্যপ্রফুল্লাননা মূর্ত্তি? শুভেন্দুর দিবা-স্বপ্ন বুদ্‌বুদের মত উঠিয়াই মিলাইয়া গেল।

১২

হিরণী যে সংসারে এত দিন সুখশান্তির গঠন দেখিতেই অভ্যস্ত ছিল, এখন কিছুতেই আর তাহার ভাঙ্গনের সূত্রপাত সহ্য করিতে পারিতেছিল না, তাহার প্রাণ যেন দিন দিন অতিষ্ঠ হইয়া উঠিতেছিল। ভ্রাতা ও ভ্রাতৃজায়াকে বুঝাইবার চেষ্টার ত্রুটি সে করে নাই, অন্ততঃ তাহার পক্ষে যতটুকু অনধিকারচর্চ্চা বলিয়া গৃহীত না হয়, ততটুকু চেষ্টা সে প্রাণপণে করিয়াছিল। কিন্তু তাহার প্রাণপণ চেষ্টা ব্যর্থ হইল। তাহার শত চেষ্টা সত্ত্বেও তাহার ভ্রাতা ও ভ্রাতৃজায়ার মধ্যে ব্যবধান ক্ষুদ্র হইতে ক্রমশঃ বিরাট আকার ধারণ করিতে লাগিল, উভয়ের কেহই অপরের দিকের কথা শুনিবার বা বুঝিবার সহিষ্ণুতা প্রদর্শন করিতে পারিল না। এক এক সময়ে হিরণীর ডাক ছাড়িয়া কান্না পাইত; লেখাপড়া, খেলা-ধূলা, হাসি-তামাসা কিছুই তাহার ভাল লাগিত না। শেষে এমন অবস্থা হইল যে, সে আপনার মধ্যে গুমরিয়া হাঁপাইয়া উঠিতে লাগিল। তখন সে সত্য সত্যই লেখাপড়া ছাড়িয়া দেশে ফিরিয়া যাইবে বলিয়াই স্থির করিল।

সে তাহার ভ্রাতৃজায়ার স্নেহ-প্রেম-প্রবণ কোমল অন্তরের কথা বিলক্ষণ জানিত। দোষের মধ্যে সেই ভ্রাতৃজায়া ছিল তরলমতি ও অতিমাত্র অভিমানিনী। যদি তাহাকে আর একবার বুঝাইয়া বলিলে সকল গোল মিটিয়া যায়, সেই আশায় প্রত্যাখ্যাত হইবার আশঙ্কা থাকিলেও হিরণী একবার তাহাকে শেষ বুঝাইতে গেল।

অভিমান যেখানে প্রবল, সেখানে প্রত্যেক হিতকথাটিই গুরুমহাশয়ের বেতের শাসনের মত বলিয়াই মনে হয়। উষা মনে মনে নিজের দুর্ব্বলতা কোন্‌খানে, তাহা হয় ত বুঝিত, কিন্তু হিরণী যখন তাহা দেখাইয়া দিয়া তাহাকে নরম হইতে অনুরোধ করিল, যখন সে বলিল, "জানি বৌদি, তুমি অন্যায় কিছু করনি, কিন্তু তবুও যখন দাদার মনে একটা মিথ্যা সন্দেহ দেখা দিয়েছে, তখন গোড়া থেকে সব কথাটা তাঁকে খুলে বলাই উচিত। দেখো, কেবল পাপকে এড়িয়ে যাওয়াই যে উচিত, তা নয়, পাপ করা হচ্ছে ব'লে যাতে লোকের মনে সন্দেহ না হয়, তা-ও করা উচিত।"

উষা বলিল, "আমি মনে যখন জানি আমি নিষ্পাপ, তখন লোকে কি ভাবলে না ভাবলে, তা দেখবার কিছু দরকার আছে ব'লে মনে করিনি।"

"এটা তোমার ভুল, বৌদি। সংসারে থাকতে গেলে, সমাজের মুখ চাইতে হ'লে ওটা দরকার ব'লে নিশ্চয়ই মনে হবে।"

"না, তা হবে না। কেন বল দিকি, সবতাতেই আমরা নরম হয়ে যাব? তুমিই ত যখন তখন ব'লে থাক, যে বিধাতা পুরুষদের সৃষ্টি করেছেন, সেই বিধাতা আমাদেরও সৃষ্টি করেছেন। তবে কিসে মেনে নেবো যে, জগৎটা ওদের জন্যেই সৃষ্টি হয়েছে, আর আমরা তাতে অনধিকারপ্রবেশ করেছি? ওদের গড়া আইন-কানুন ওরা না মানলে দোষ নেই, আর আমরা না মানলেই দোষ? না, কখ্‌খোনো নরম হব না। কেন ওঁরা যা ইচ্ছে তাই বলবেন? ওঁরা যা ইচ্ছে তাই ইতরের মত সন্দেহ করবেন, আর আমরা পায়ে লুটিয়ে প'ড়ে বোলবো,—ওগো, আমি তোমাদের চরণের কেনা বাঁদী, আমার কোন দোষ হয়নি?"

"এটা বলতে পার বটে; কিন্তু তোমায় এটাও দেখতে হবে যে, পুরুষরা যতই সাবালক হোক, ওদের ভিতর একটুখানি ছেলেমানুষে রআবছায়া থেকে যায়, ওরা আমাদের কাছে একটুখানি মায়ের স্নেহ পেতে চায়— ওদের উপর রাগ না হয়ে ওদের দয়ার পাত্র বলেই মনে করতে ইচ্ছে হয়। কেমন, না?"

ঊষা বিস্ময়ে একবারে অভিভূত হইয়া পড়িল। হিরণীর মুখে ত কখনও সে এমন কথা শুনে নাই, বরং ঠিক ইহার বিপরীত কথাই শুনিয়াছে। কোন্ যাদুকরের মায়াদণ্ডের স্পর্শে তাহার এই অভাবনীয় পরিবর্ত্তন? নারীর মাতৃহৃদয়ের কথা সে জানিল কিরূপে? নারীর পতিপ্রেমের মধ্যেও যে প্রচ্ছন্ন অপত্যস্নেহ লুক্কায়িত থাকে, এ সত্য ত নারী বিবাহিত না হইলে আবিষ্কার করিতে পারে না। আর এক কারণে নারী এ সত্য উপলব্ধি করিয়া থাকে। নারী যখন প্রাণ দিয়া ভালবাসে, তখন প্রণয়ীর দুঃখে বিপদে জননার ন্যায় পক্ষপুটে আশ্রয় দিবার প্রবল বাসনা তাহার অন্তরে জাগিয়া উঠে; প্রণয়ীর সকল প্রকার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য-বিধানে জননীরই মত তাহার অন্তর আকুল হইয়া উঠে। তবে কি হিরণীর অন্তরে গুপ্ত প্রেমের বীজ উপ্ত হইয়াছে? কে সেই ভাগ্যবান্—

হিরণী বলিল, "কথাটা কাণে গেল বৌদি? দেখো, একটা কথা বলি। এ পর্য্যন্ত কেবল হাসি আর আনন্দের জীবন ভোগ ক'রে এসেছ, আদর-যত্ন ছাড়া কখনও কিছু পাওনি। কিন্তু মানুষের জীবনটা তা নয়।"

ঊষা বলিল, "তবে কি?"

হিরণী বলিল, "জীবনটাই হাসি-কান্নার, সুখ-দুঃখের। আমাদের সুখের কপাল যে চিরদিনই থাকবে, তা মনে কোরো না।"

ঊষা হাসিয়া বলিল, "এত কথা শিখ্‌লি কোত্থেকে বল্ দিকি? কলেজের ডিবেটিং ক্লাবে?"

হিরণী গম্ভীরভাবে বলিল, "ঠাট্টা না, সত্যিই সকল অবস্থার জন্যেই তৈরী হয়ে থাকা আমাদের উচিত।"

ঊষা বলিল, "আমি ত বলি, জীবনটা ক্ষণভঙ্গুর, কাযেই যতটুকু সুখ বিধাতা দিচ্ছেন, তাই দু'হাত পেতে নাও আর তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ থাকো। শোন্ হিরণী, তুই যত লেক্‌চারই দে, কিছুতেই আমায় বোঝাতে পারবি নি যে, তোর দাদা আমায় কখনও সত্যি ভালবেসেছিল। যে ভালবাসা দেখাতো, ওটা চোখের নেশা। যথার্থ ভালবাসায় কখনও অবিশ্বাস আসে?" ঊষার চোখ ছল-ছল করিতে লাগিল।

হিরণী ব্যথিত-হৃদয়ে বলিল, "ছি বৌদি, কাঁদছো? যথার্থ ভালবাসা না হ'লে কি কখনও চোখে জল আসে, না অভিমান হয়? বোঝো ত সবই, তবে তুচ্ছ মান বজায় রাখতে গিয়ে ইহকালের সুখ-শান্তি নষ্ট করছো কেন? যে ধাতুতে গড়া হ'লে মানের জন্য সর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন দিতেও বাধা ঠেকে না, সে ধাতুতে তুমি ত গড়া নও।"

ঊষা বলিল, "কেন?"

হিরণী বলিল, "কেন? এই জন্যে যে, এর পর যখন তোমার রাগ অভিমান কেটে যাবে, তখন অনুশোচনার ধাক্কা তুমি সামলাতে পারবে না। যে ভালবাসা গভীর নয়, ভাসা ভাসা, তার অনুশোচনা আসে না, তোমার ত তা নয়, বৌদি। তবে মিথ্যে কেন নিজে কষ্ট ডেকে আনছো?"

ঊষা ক্ষণকাল নিস্পন্দ নীরব হইয়া রহিল। তাহার পর ধীরে ধীরে বলিল, "আচ্ছা হিরো, গভীর ভালবাসার ধারণাটা তোর কি শুনি?"

হিরণী লজ্জিত হইয়া বলিল, "আমার ধারণা? আমার ধারণা নিয়ে কি আসে যায়? তোমার মন দিয়েই ত তুমি বুঝতে পারছো। আমি ত বুঝি, পুরুষ যতই ভালবাসুক, আমাদের মত সর্ব্বস্ব দিয়ে ভালবাসতে পারে না। সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী, শকুন্তলা বা জুলিয়েট ডেসডিমোনার মত কে ভালবাসতে পারে, ভালবাসার অত্যাচারই বা সহ্য করতে পারে?"

ঊষা বিস্ময়ে স্তব্ধ হইয়া রহিল। এ না সংসারজ্ঞানানভিজ্ঞা বালিকা?

হিরণী বলিয়া যাইতে লাগিল, "তাই বলছিলুম বৌদি, দাদা যাই করুক, সে পুরুষমানুষ। তোমার সহ্যগুণ তার চেয়ে ঢের বেশী হওয়া উচিত নয় কি? তোমার দুটি পায়ে পড়ি, বৌদি, আমার কথা শোন। আমি দাদাকে ডেকে এনে আগাগোড়া সব খুলে বলি, আবার তোমাদের যেমনি ছিল, তেমনি হোক্।"

হিরণীর এই কাকুতিতে কতখানি আগ্রহ উৎকণ্ঠা ছিল, ঊষার তাহা বুঝিতে বাকী রহিল না। তাহার মন বলিতেছে, হিরণীর কথাই ঠিক, কিন্তু দুর্জ্জয় অভিমান ও নারীত্বমর্য্যাদার গর্ব্ব আসিয়া প্রবল অন্তরায় হইয়া দাঁড়ায় যে! গর্ব্বিত কণ্ঠে সে বলিল, "না হিরো, তা আর হয় না। কাচ একবার ভাঙ্গলে আর যোড়া লাগে না। সত্য পথে থেকে, ন্যায় পথে থেকেই বা ফল কি? আজ

হয় ত সাধ্যসাধনা করলে তোমার দাদার মন ফিরতে পারে, হয় ত তিনি দয়া ক'রে দাসী-বাঁদীকে পায়ে স্থান দিতে পারেন। যে ভালবাসার অত্যাচারের কথা বলছিলে, না হয় তা সহ্যই করলুম, কিন্তু তার পর? আবার ত এমন ঘটতে পারে। না, না, আমাকে স্বার্থপরই বল, কঠিনই বল আর যা-ই বল, খোসামোদ আমি করতে পারবো না, এতে যা আছে ভাগ্যে, তাই হবে।"

হিরণী ব্যথিত ক্ষুব্ধ মনে আপনার চেষ্টার ব্যর্থতার কথা ভাবিতে লাগিল। সত্যই কি ভাঙ্গা কাচ জোড়া লাগে না? এ অকূলে কে তাহাকে কূল দেখাইয়া দিবে? অবোধ জ্ঞানহীনা সে! যাতনাদিগ্ধ স্বরে সে বলিল, "তোমার আকাশের মত উঁচু আদর্শ কোথায় গেল, বৌদি? তুমিই না আমায়—"

উষা বলিল, "হাঁ, শিখিয়েছি। কিন্তু উঁচু আদর্শ আঁকড়ে ধ'রে থেকে লাভ কি?"

হিরণী বলিল, "লাভ নেই? খুব আছে। সংসার বল্‌তে শুধু ত স্বামি-স্ত্রীকেই বোঝায় না। বাপ-মা, ভাই-বোন, আত্মীয়-স্বজন, এদেরও নিয়ে ত সংসার। ধর, আজ যদি তোমাদের একটি সন্তান থাকতো! তা হ'লে কি করতে?"

উষা বলিল, "থাকলে কি করতুম, বলতে পারিনি। নেই যখন, তখন ও ভাবনায় দরকার নেই। তোমরা যাই বল, আমি আমার ভাইকে ভাসিয়ে দিতে পারবো না।"

হিরণী দুঃখিত হইল। যে অপদার্থ বিভাসচন্দ্রের জন্য তাহার দাদা এখনও এত করিতেছে, সেই ভাই-ই হইল সব? আর কেহ কিছু নহে? এত করিয়াও ভ্রাতৃজায়ার মন পাইবার যো নাই? সেও অনুযোগের সুরে বলিল, "কে বলছে তোমার ভাইকে ভাসিয়ে দিতে? দাদা কি তাকে ভাসিয়ে দিয়েছেন?"

উষা শ্লেষের সুরে বলিল, "না, তা দেবে কেন? বলে, খেদাই নি তোর উঠোন চষি।"

হিরণী এবার ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল, "এ তোমার বাপু অন্যায়, বৌদি—তুমি কেবলই দাদাকে ঠেস দিয়ে কথা বোলছো। কিন্তু বল দিকি সত্যি ক'রে, দাদা বিভাসদার জন্যে কি না করেছে, কত না সহ্য করেছে? দাদার মত সহ্যগুণ কার আছে?"

উষা আহতা ব্যাঘ্রীর মত গর্জ্জন করিয়া বলিল, "আমি ত বলছি, আমি মন্দ মানুষ, আমায় তোমাদের সংস্রবে না রাখাই ভাল।"

ক্রোধে অভিমানে দিগ্‌বিদিক্‌জ্ঞানশূন্য হইয়া উষা ঝড়ের মত কক্ষ ত্যাগ করিয়া গেল। হিরণী সত্যই বড় আঘাত পাইল, তাহার নয়নকমল অশ্রুসিক্ত হইয়া উঠিল। মানুষ যাহাকে ভালবাসে, সে যদি অন্যায় অন্ধ বিশ্বাসের বশে তাহাকে ভুল বুঝিয়া রূঢ় ভাষা প্রয়োগ করে, তখন সে অন্তরে যে আঘাত পায়, শাণিত অস্ত্রের আঘাতও তাহার তুলনায় অনেক অল্প ব্যথা-বেদনাদায়ক। হিরণীর মন এই বাড়ীর বিষাক্ত হাওয়ায় থাকিয়া সত্যই হাঁপাইয়া উঠিয়াছিল; তাহার উপর এই আঘাত তাহাকে অতিষ্ঠ করিয়া তুলিল। সে তদ্দণ্ডেই দেশে চলিয়া যাইবার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইল। কাষ কি অনর্থক এই পারিবারিক কলহের মধ্যে থাকিয়া অহরহ মন খারাপ করিয়া? তাহার পরীক্ষার আর অধিক বিলম্ব নাই, পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতে তাহাদিগকে শীঘ্রই কলেজ হইতে ছুটী দেওয়া হইবে। এ সময়ে দেশে গিয়া নির্জ্জনে নিঝ্ঞ্ঝাটে পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হওয়াই ত ভাল।

কিন্তু—কিন্তু—দেশে থাকিতে ভাল লাগিবে কি? এই কলকোলাহলময় হাসিকান্নার সংসার ছাড়িয়া শয্যাশায়ী পিতার নির্জ্জন উৎসাহ-উদ্যমহীন চমকলেশহীন সংসারে গতানুগতিক দিনযাপন করিয়া তাহার মন তৃপ্ত হইবে কি?

"দিদিমণি, ষ্টুডিও থেকে চিঠি এসেছে আপনার নামে"—দাসী পত্র দিয়া চলিয়া গেল। চিন্তাস্রোতে বাধা পড়িতে হিরণী প্রথমে চমকিত হইয়াছিল। কক্ষ আবার নির্জ্জন হইলে সে পত্রখানি পাঠ করিল। পত্রে নাম স্বাক্ষর ছিল না, কিন্তু হস্তাক্ষর দেখিয়া তাহার অনুমান হইল, পত্র আসিতেছে চামেলীর নিকট হইতে। কিন্তু সে সেই বিষয়ে স্থিরনিশ্চয় হইতে পারিল না। পত্রে লেখা ছিল মাত্র দুই চারি ছত্র—গভীর নিশীথে সমস্ত সংসার নিদ্রিত হইলে পর প্রাসাদের অন্তঃপুরের দ্বিতলে আজ দুই তিন দিন হইতে নিয়মিত একটি আলোক জ্বলিয়া উঠে এবং ক্ষণপরেই নিভিয়া যায়, ইহা কি আপনি লক্ষ্য করিয়াছেন?

বেনামা পত্র দেখিয়াই সে সেখানি প্রথমে ছিঁড়িয়া ফেলিতে যাইতেছিল, কিন্তু কি ভাবিয়া শেষে পাঠ করিল। দুই তিনবার পাঠ করিয়াও সে পত্রের মর্ম্ম গ্রহণ করিতে

পারিল না। কিন্তু যখন পত্রের বিষয়টি অনুধাবন করিল, তখন তাহার ভ্রূ কুঞ্চিত হইল, ললাট চিন্তারেখাগ্রস্ত হইল। প্রাসাদের অন্তঃপুরে নিশীথে আলো জ্বলিয়া নিভিয়া যায়, ইহাতে আশ্চর্য্যের বিষয় কি আছে? সে-ও ত স্বয়ং গভীর নিশীথে আলোক প্রজ্বালিত করিয়া পাঠ্যপুস্তক পাঠ করিয়া থাকে। তবে সে আলোক একবার জ্বলিয়াই নিভিয়া যায় না বটে, সন্ধ্যার আলোক জ্বলিবার পর হইতেই জ্বলিতে থাকে। তবে কি তাহার ভ্রাতৃজায়ার মহলে আলোক জ্বলে? অধুনা তাহার ভ্রাতা ও ভ্রাতৃজায়া একত্র রাত্রিবাস করে না, ভ্রাতা বহির্বাটীতেই নিশাযাপন করিয়া থাকেন। তবে গভীর নিশীথে আলোক জ্বলিবার কারণ কি? নিয়মিত সময়ে আলোক নিভিয়া যায়,—তবে কি উহা সঙ্কেত? কেন?

হিরণী অস্থির হইয়া উঠিল। এই পুণ্যের সংসারে এ কি পাপ প্রবেশ করিল! সুখ-শান্তি যেখানে অনুক্ষণ বিরাজ করিত, আজ কাহার অভিশাপে সেখানে সন্দেহ অবিশ্বাস প্রবেশ করিল? প্লেগদুষ্ট স্থানের মত এই স্থান যত শীঘ্র ত্যাগ করা যায়, ততই মঙ্গল।

১৩

দত্ত সাহেব কিছুদিন হইতে প্রতি ঝোপে বাঘ দেখিতে আরম্ভ করিয়াছেন। হোটেল সিলেশচিয়ালের দ্বিতলের ৫ নং রুমের গবাক্ষে দাঁড়াইয়া পর্দ্দার আড়াল হইতে আজ কয়দিন তিনি দেখিতেছেন, ঠিক মনুষ্যরই মত একটা মুস্কো জোয়ান সন্ধ্যার পর রাজপথের অপর পার্শ্বস্থ ফুটপাতে পাদচারণা করিয়া বেড়ায়, না হয় পাণ-বিড়ির দোকানে বসিয়া খইনি টেপে, হিন্দুস্থানী পাণওয়ালার সঙ্গে খোসগল্প করে; রাস্তার গ্যাসের আলোকে তাহার তেলকুচকুচে কালো বলিষ্ঠ দেহখানা শত শত পথ-চারীর মধ্য হইতে বাছিয়া লওয়া মোটেই কষ্টকর নহে।

তবে ত এই আপদ তাহার হোটেলের সন্ধানও পাইয়াছে। সর্ব্বনাশ! এত করিয়া আত্মগোপন করিয়াও ত ছোটলোক কুলীটার শ্যেনদৃষ্টি এড়াইবার উপায় নাই!

আতঙ্কে বিভাসচন্দ্রের প্রাণ শুকাইয়া গেল। না, আর এখানে থাকা চলিবে না। ঊষারাণীর বাড়ীর দরজাও তাহার পক্ষে একরূপ রুদ্ধ—চোরের মত গভীর নিশীথে যাওয়া আসা ত আর বাস করার সামিল বলিয়া ধরা যায় না। না, আজই বোকা শুভেন্দুটাকে দিয়া অনুরোধ করাইয়া ঊষার সহিত একটা বন্দোবস্ত করিতে হইবে। এমন করিয়া বনের পশুর মত তাড়া খাইয়া আর বাস করা যায় না। জীবনটা—বিশেষতঃ যৌবনকালটা—কত দিনের? ভোগের সময় বহিয়া গেলে ভোগের প্রয়োজন? ভয়ে ভয়ে চোরের মত প্রাণটি হাতে লইয়া বাস করাকে ত আর জীবন যৌবন ভোগ কর বলা চলে না।

সন্ধ্যার পর রাজপথের সমস্ত দীপাবলী প্রজ্বালিত হইয়াছে—পথটি যেন উজ্জ্বল আলোকের মালা পরিধান করিয়াছে। রাজধানীর রাজপথ, অনন্ত জনস্রোত, অনন্ত অবিশ্রান্ত যানবাহন, ট্রামের ঘড়ঘড়ানি, বাসের ছুটাছুটি, পাল্লাপাল্লি, ট্যাক্সির ভোঁ ভোঁ, হরণের আওয়াজ, রিক্সা-ওয়ালার টুন টুন শব্দ, ফিরিওয়ালার চীৎকার,—রাজপথ যেন গমগম করিতেছে। সবাই জীবন্ত, প্রাণের সাড়া যেন অচেতন প্রাসাদ-হর্ম্ম্যগুলার ইষ্টক-পঞ্জরের মধ্য হইতেও পাওয়া যাইতেছে। কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে, এই সচেতন প্রাণবন্ত সহর-জীবনের সংস্পর্শে থাকিয়াও বিভাস-চন্দ্র আতঙ্কে বিবর্ণমুখ হইয়া রহিয়াছে, কেশ-প্রসাধনে রত তাহার হস্তের ব্রাসখানা কাঁপিতেছে,—সে এইমাত্র চুলের উপর ব্রাস চালাইতে চালাইতে জানালার ধারে গিয়া পর্দ্দা সরাইয়া দেখিয়াছে, অপর পারে সেই কুলীটা পাণ-বিড়ির দোকানে বসিয়া তাহার জানালার দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া আছে!

ভয়ে বিভাসচন্দ্রের বক্ষ গুরুগুরু কাঁপিয়া উঠিল। এই লক্ষ্মীছাড়া ছোটলোক কুলীটা চায় কি? জানকী? আঃ, স্পর্দ্ধা ত কম নহে! দেবতার ভোগ্যে কুক্কুরের সাধ? তাহার মত কুলীর জন্য জানকীর সৃষ্টি হয় নাই। জানকীর সন্ধান পাইবে সে? যদি হাজার বৎসর খুঁজিয়া মরে, তবুও তাহার কেশাগ্রও দেখিতে পাইবে না।

এই ছোটলোকগুলার সৃষ্টি হইয়াছে কিসের জন্য—কাহাদের জন্য? আমাদেরই আরাম ভোগ-বিলাস চরিতার্থ করিবার উপাদান যোগাইবার জন্য ত! কেহ বা দেহের পরিশ্রমের দ্বারা আর কেহ বা মস্তিষ্কের ব্যবহার দ্বারা। যখন আমাদের উদ্দেশ্যসাধন হইয়া যাইবে, তখন আর তাহাদের প্রয়োজন থাকিবে না।

"এক বাবু সেলাম দিয়া সাব",—হোটেলের হিন্দুস্থানী 'বয়' অভিবাদনান্তে কথাটা জানাইয়া উত্তরের প্রতীক্ষায় দাঁড়াইয়া রহিল। বিভাসচন্দ্র ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বলিল, "বাবু? কোন্ বাবু? আচ্ছা, আনে বোলো।"

কে আসিল সন্ধ্যার পর তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে এই হোটেলে? তাহার এই আবাসস্থলের কথা ত বাহিরের কেহ জানে না। হঠাৎ দ্বারপ্রান্তে আগন্তুককে দেখিয়া সে ব্রাসটা ফেলিয়া দিয়া দক্ষিণ কর প্রসারণ করিয়া দ্রুতপদে দ্বারের দিকে অগ্রসর হইতে হইতে সোল্লাসে চীৎকার করিয়া উঠিল, "হ্যালো! ইউ হিয়ার? তার পর? ওঃ, তোমায়ই চাইছিলুম, মিঃ মিটার। হ্যাপি কোয়েন্সিডেন্স!"

শুভেন্দু আসন গ্রহণ করিয়া বলিল, "আমায় চাইছিলে, দত্ত সাহেব? আমার সৌভাগ্য। তোমায় যে এ সময়ে এখানে পাবো, আশা করিনি মোটেই।"

সহসা বিভাসচন্দ্রের মুখের হাসি মিলাইয়া গেল, সে তাড়াতাড়ি শুভেন্দুর হাতখানা ধরিয়া জানালার দিকে টানিয়া লইয়া গেল এবং পর্দ্দার আড়াল হইতে পথের দিকে অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়া ভয়ার্ত্ত স্বরে বলিল,—"লুক হিয়ার—ঐ, ঐ, বিড়ির দোকানে পা ঝুলিয়ে ব'সে—ঐ—"

শুভেন্দু প্রথমে খুবই বিস্মিত হইয়াছিল। হইবারই কথা। সে আসিয়াছিল তাহার সহিত নিভৃতে পরামর্শ করিতে, এরূপ অপ্রত্যাশিতভাবে গবাক্ষের দিকে আকৃষ্ট হইবার সম্ভাবনা তাহার মনে একবারও উদয় হয় নাই। তবে বিভাসচন্দ্রের কাছে কখন্ কিরূপ অপ্রত্যাশিত ব্যবহার পাওয়া যায়, তাহার কোন নিশ্চয়তা ছিল না—এমনি প্রকৃতির মানুষ সে! এখন বিভাসচন্দ্রের লক্ষ্যের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া গম্ভীর-স্বরে বলিল, "হুঁ, দেখলুম ত, ও ত সেই মধুপুরের মনুয়া। তা ও ঐখানে ব'সে রয়েছে কেন?"

দুই হাত উল্‌টাইয়া দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া বিভাসচন্দ্র বলিল, "গড্ নোজ! ঐ-ই জানে। আমি কি বলতে পারি?"

শুভেন্দু পুনরায় আসন গ্রহণ না করিয়া দ্বারের দিকে অগ্রসর হইল, বলিল, "তুমি বোসো, আমি ওর সঙ্গে গোটা দুই কথা কয়ে আসি।"

এক লম্ফে দ্বারপ্রান্তে অগ্রসর হইয়া শুভেন্দুর হাতে সজোরে টান দিয়া বিভাসচন্দ্র বলিল, "হেভ্‌ন্ ফরবিড! ঐ কেভ্‌ম্যানটাকে কি বোঝাতে যাচ্ছ তুমি? ড্যাম ইট! একটা কমন্ কুলী—"

শুভেন্দু বলিল, "তা হোক, মানুষ ত।"

বিভাসচন্দ্র নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া বলিল, "মানুষ? বাই জোভ! ওদের তুমি মানুষ ব'লে মনে কর? হাউ ফানি! এস বসি গিয়ে—অনেক কথা আছে। টি? কেক বিস্কিট? না, না বোলো না, শুভেন্দু বাবু। তোমার ওখানে গেলে"—বিভাসচন্দ্র কলিংবেল টিপিয়া 'বয়কে' যথোচিত আদেশ করিল।

শুভেন্দু মুখ টিপিয়া হাসিতেছিল, বলিল, "দেখ, দত্ত সাহেব! ঐ লোকটাকে তুমি মানুষ ব'লে মনে করতেই চাও না, কিন্তু ওর বৌটিকে নিয়ে মধুপুরে কি কেলেঙ্কারী ক'রে এসেছিলে, বল ত?"

বিভাসচন্দ্র বিন্দুমাত্র অপ্রতিভ না হইয়া হঃ হঃ হাসিয়া বলিল, "ওঃ দ্যাটস্ অল্ টুগেদার এ ডিফারেন্ট অ্যাফেয়ার। আমাদের শাস্ত্রেই না স্ত্রীরত্নং দুষ্কুলাদপি বলে?"

শুভেন্দু বলিল, "এই যে সাহেবের সংস্কৃত জ্ঞানও টন্‌টনে দেখছি"—

বিভাস বলিল, "হোয়াট ডু ইউ টেক মি ফর? তোমাদের মত এম, এ, পাশ না করলেও আমার পড়াশুনো কম আছে ব'লে মনে কোরো না, মিঃ মিটার।"

শুভেন্দু ক্রমেই ধৈর্য্যচ্যুত হইতেছিল, বিরক্ত হইয়া বলিল, "আচ্ছা, বেশ করেছো পড়াশুনো করেছ, এখন দুটো কাযের কথা কও দিকি। ভালই হয়েছে, কাযের কথার আপনিই অবসর হয়েছে। একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। লেখাপড়া শিখেছো বলছ, তা তোমার লজ্জা করে না ও-সব কথা ব'লে বাহাদুরী নিতে? মনে ভেবে দেখো দিকি, তোমার এ সব বদমায়েসির জন্যে তোমার নির্দ্দোষ ভগ্নীকে কি বিষম অবস্থায় ফেলেছ, তার সংসারে আগুন ধরিয়ে দিয়েছ?"

বিভাসচন্দ্রের যেটুকু আতঙ্ক ছিল, শুভেন্দুর উপস্থিতিতে তাহা অপসারিত হইয়াছিল। এখন সে বেশ স্বচ্ছন্দ ও প্রফুল্লমনে যেন আকাশ হইতে পড়ার ভাণ করিয়া বলিল, "আমি? র‍্যাসক্যালাটি? ও হোয়াট এ ওয়ার্লড্! আমাকে কেউ চিন্‌লে না!"

শুভেন্দুর গাম্ভীর্য্য রক্ষা করা অসম্ভব হইয়া পড়িল। সে হো হো হাসিয়া বলিল, "না, তোমায় চিনেও কায নেই—ও কি করছ? রেখে দাও বলছি গেলাস, নইলে আমি এখনই চ'লে যাব—ছি ছি, এততেও তোমার চৈতন্য হয় না? তোমায় না ডাক্তারে বারণ করেছে ও ছাই না খেতে? তোমার না হার্ট ট্রাবল্‌স্ আছে?"

বিভাসচন্দ্র ততক্ষণ এক নিশ্বাসে গেলাসটি গলাধঃকরণ করিয়া ফেলিয়াছিল। পর পর দুইটি পেগ উদরস্থ করিয়া তৃপ্তির উদ্গার তুলিয়া ক্ষিপ্রহস্তে সে টানার মধ্যে গেলাস ও বোতল লুকাইয়া ফেলিল; তৎপূর্ব্বেই সে তাহার রুমের দ্বার রুদ্ধ করিয়াছিল। রুমালে মুখ মুছিয়া বলিল, "রেখে দাও তোমার হার্ট ট্রাবল্‌স্। পন ফেথ, শুভেন্দু বাবু, এই একটি-বার, ওন্‌লি ওয়ান্‌স্, স্যার! আর কোন্ শালা খায়! গলাটা একবারে শুকিয়ে কাঠ হয়ে এসেছিল। রাগ করলে, দাদা? সরি—অফুলি সরি—"

শুভেন্দু অতিকষ্টে হাসি চাপিয়া ধমক দিয়া বলিল, "থামো বলছি তুমি, ঢের ন্যাকামি করেছ। আমি ভেবে পাইনে, মানুষ তোমার মত কেমন ক'রে এ রকম দায়িত্ব-জ্ঞানহীন হতে পারে। দেখ, প্রথম যখন তোমায় দেখেছিলুম, যখন অসীম তোমায় যা ইচ্ছে তাই ব'লে অপমান করেছিল, তখন সত্যিই তোমার জন্যে আমার বড় দুঃখ, বড় লজ্জা হয়েছিল। মনে হয়েছিল, যেন সেই অপমানের চাবুক আমারই পিঠে পড়ছে। তাই তোমার হয়ে তখন থেকে অনেক লড়েছিলুম ওর সঙ্গে, তোমার জন্যে আমার মন ব্যথায় ভ'রে উঠেছিল। তাই তোমার স্নেহময়ী ভগিনী—হাজারের মধ্যে অমন একটি সুন্দর মন খুঁজে পাওয়া যায় না—"

বিভাসচন্দ্র টেবলের উপর মুষ্ট্যাঘাত করিয়া বলিল, "পাচশোবার—এ প্যারাগন, ওয়ান্ ইন্ এ থাউজ্যাণ্ড—"

শুভেন্দু বাধা দিয়া বলিল, "দেখ, ও রকম ক'রে থিয়েটারী অভিনয় ক'রে বাধা দিও না। অমন ভগিনী—যিনি তোমার জন্যে কি না সহ্য করেছেন ও করছেন! তাঁকে সুখে রাখবার জন্যে, তাঁর সংসারের শান্তি বজায় রাখবার জন্যে, তুমি কি করেছ এ পর্য্যন্ত? কেবল স্বার্থ খুঁজেছ—কেবল নিজের সুখ, নিজের জঘন্য ভোগ-বিলাস—না, না, বাধা দিও না, তোমায় আজ সত্যি কথা শুনতে হবে আমার কাছে। আমি সেই স্বর্গের দেবীর অনুরোধে তোমার মঙ্গল চেষ্টা করেছি, তোমায় সৎপথে আনবার চেষ্টা করেছি, কিন্তু তুমি তার কি প্রতিদান দিয়েছ?"

বিভাস বালকের মত ক্রন্দনের সুরে বলিল, "এক্‌স্-কিউজ মি, স্যার! এবার থেকে আমি গুড বয় হবার চেষ্টা করবো।"

শুভেন্দু বলিল, "বলেইছি ত, নেকামি আমি মোটেই পছন্দ করি না। প্রথম প্রথম অসীম তোমায় অপমান করলে আমার রাগ হোতো, আমি তাকে বাধা দিতুম। কিন্তু এই এক বৎসর তোমার সঙ্গে ব্যবহার ক'রে, তোমায় নিয়ে চ'লে বুঝতে পারছি, অসীম কিছু অন্যায় করেনি। যার রক্তমাংসের শরীর আছে, সে তোমার ব্যবহারে স্থির থাকতে পারে না, ধৈর্য্য ধারণ ক'রে থাকতে পারে না। তুমি জান, তোমার ব্যবহারের জন্য অসীমের সংসার কি ভাবে ছারখার যাচ্ছে? জান কি, সে তার ষ্টুডিও তুলে দিচ্ছে? শুধু ওদের স্বামি-স্ত্রীর মধ্যে নয়, ভাই-বোনের মধ্যেও আর মনের সুখ নেই। জান কি, যে ভাই-বোনে এত ভালবাসা ছিল, সেই ভাইবোনেও ছাড়াছাড়ি হয়ে যাচ্ছে? ছিঃ ছিঃ, তুমি এত বড় নীচ স্বার্থপর লম্পট যে, এখনও তুমি যাকে ছোটলোক কুলী ব'লে ঘেন্নায় নাক সিঁটকে থাকো, তার বিবাহিত ধর্ম্মপত্নীকে এনে কোথায় লুকিয়ে রেখেছো, তাকে জানতে দিচ্ছো না। সে তোমাকে মারবার জন্যে তোমার পায় পায় ঘুরছে। সে দিন আমি মাঝে না পড়লে একটা কাণ্ড ঘটে যেতো। তোমার লজ্জা করে না এমনি ক'রে ঢলাঢলি করতে? এত বড় মদ্দো মিনষে, নিজে খেটে খেতে পার না, ভগ্নীর আঁচল ধ'রে বেড়াচ্ছো, তবুও বজ্জাতি বুদ্ধি ছাড় না"—

যেন কেহ মারিতে উদ্যত হইয়াছে বলিয়া আত্মরক্ষার্থ দুই হস্তে চক্ষু আচ্ছাদন করিতেছে, এইরূপ ভাণ করিয়া বিভাসচন্দ্র বলিল, "হোল্‌ড! হোল্‌ড! এনাফ! উঃ, এরকম বোম্বার্ডমেণ্ট সহ্য করা আমার মোটেই অভ্যাস নেই। তার আগে এলাউ মি স্যার এনাদর ওয়ান!"

কথাটা বলিয়া বিভাসচন্দ্র অম্লানবদনে টানা খুলিয়া বোতল ও গেলাস বাহির করিতে গেল। অতিমাত্র বিরক্ত

হইয়া শুভেন্দু তাহাকে জোর করিয়া টান দিয়া চেয়ারে বসাইয়া দিল, ক্রোধ-কম্পিত কণ্ঠে বলিল, "শোন বিভাস, তোমায় আমি এই শেষ সুপরামর্শ দিচ্ছি, এর পর হয় ত সময় পাব না। আমি দুই চার দিনের মধ্যেই বোম্বাই চ'লে যাচ্ছি। যদি বাঁচতে চাও আর তোমার ভগ্নীকে আর ভগ্নীর সংসারকে বাঁচাতে চাও, তবে তুমিও আমার সঙ্গে চল, আমি তোমাকে সেখানে একটা না একটা কাযে লাগিয়ে দেব, তুমিও মানুষের মত মানুষ হ'তে পারবে"—

বিভাসচন্দ্র গুম্ভিত হইয়া বলিল, "দু'চারদিনের মধ্যে? ইম্‌পসিব্‌ল্! এখানকার একটা সেট্‌ল্‌মেণ্ট না ক'রে"—

শুভেন্দু বাধা দিয়া বলিল, "সেট্‌ল্‌মেণ্ট? তার মানে? ওঃ, বুঝেছি, ইন্‌করিজিব্‌ল্! তবে তুমি যাবে না? নিজে মরবে, আর পাঁচ জনকেও মারবে? বেশ, তাই হোক! আমি চললুম, জেনে রেখো, এই আমার শেষ কথা।"

বিভাসচন্দ্র তখন আর এক পেগ চড়াইয়াছিল। মৃদু হাসিয়া বলিল, "সো লং, মিঃ মিটার! কিন্তু মিস বোস,—হিরণী"—

শুভেন্দু দ্বারপ্রান্তে উপনীত হইয়াছিল, হঠাৎ পশ্চাৎ ফিরিয়া দ্রুতপদে অগ্রসর হইয়া বিভাসচন্দ্রকে একটা ঝাঁকুনি দিয়া পরুষ-কণ্ঠে বলিল, "খবরদার, ও নাম মুখে এনো না ব'লে দিচ্ছি"—

বিভাসচন্দ্র শুভেন্দুর আরক্তনয়ন, উদ্যত মুষ্টি দেখিয়া ও সিংহগর্জ্জন শুনিয়া ভীত হইল, তাড়াতাড়ি বলিল, "না, না, আমি ত ভালই বলছিলুম। গ্যার্ল, ফাইন গ্যার্ল! আপনি কি জন্মের মত চলে যাচ্ছেন তার আশা ছেড়ে দিয়ে? দ্যাট্‌স্ নট ম্যানলি!"

শুভেন্দুর বিস্ময়ের সীমা রহিল না। এই অপদার্থ কাপুরুষ তাহার অন্তরের অন্তস্তলের অতি গোপন কথা জানিল কিরূপে? বাহিরে কোনরূপ চাঞ্চল্য প্রদর্শন না করিয়া শুভেন্দু গম্ভীরস্বরে বলিল, "ও সব কথা নিয়ে চর্চ্চা করা আমি মোটেই পছন্দ করি না। তিনি আমাদের এ সব তুচ্ছ তর্কাতর্কির অনেক উপরে। চল্‌লুম, পার যদি এখনও আমার কথা শুনে কায কোরো, সব বজায় থাকবে।"

শুভেন্দু আর দাঁড়াইল না, দ্রুতপদে কক্ষ ত্যাগ করিয়া গেল। বিভাসচন্দ্র আর এক পেগ চড়াইয়া গুন্ গুন্ স্বরে গান ধরিল। স্বভাবতঃ স্বল্পভাষী শুভেন্দুর আজ এমন মুখ খুলিল কিরূপে, ইহাই সে ভাবিতেছিল। তাহার পর একবার বাতায়নের পর্দ্দা সরাইয়া বাহিরে দৃষ্টিপাত করিল। তাহার মুখখানা হঠাৎ হর্ষোৎফুল্ল হইয়া উঠিল, সেখানে তাহার ভয়ের কারণ নাই। সে আপন মনে বলিল, "ব্রাইও! ব্রাইও ইডিয়ট! গুড্ গ্যার্ল, ফাইন গ্যার্ল! ট্যা রা রা ল্যা ল্লা!" [ক্রমশঃ।

শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার বসু (সাহিত্যরত্ন)

জেলে

ধনি গৃহ হতে বহু দূরে ওরা, সমাজের চোখে হীন।
সাগর, নদীর কূলে ছোট কুঁড়ে বাঙ্গালার বেদুইন।
শীতে-বর্ষায় দারুণ-গ্রীষ্মে সমতপা মহাযোগী,
শান্ত-সরল প্রকৃতির ছেলে সংসারসুখত্যাগী।
সুগোল-সুঠাম দৃঢ় বাহুযুগ শ্রান্তি জানে না কভু,
কর্ম্মজীবনে কর্ম্মিপ্রবর কর্ম্ম তাহার প্রভু।
পদ্মাবক্ষে প্রবল তুফান প্রলয়ের নাচ নাচে,
বিজ্ঞান দান, তুচ্ছ সকলি সে রুদ্র নাচন-কাছে।
ছোট একখানি জেলে ডিঙি নিয়ে পাড়ি দেয় অবহেলে,
বিভীষিকাময় মৃত্যু-করাল হেলায় চরণে দলে।

চৈতি হাওয়ায় সাগর উতলা, রক্ত-অরুণ আঁখি,
হাসিমুখ ভ'রে তাহার উপরে ডিঙ্গি চালাতে দেখি।
হাড়ভাঙ্গা-শীতে অসাড়-নিশীথে জমে যায় বুঝি জল,
নিয়তির মত প্রকৃত শাসিতে দাঁড়ায়েছে অবিকল।
সিউনী লইয়া এক হাঁটু জলে সঙ্গীরে লয়ে বিলে,
জল সেচে যায় ঝুপ ঝুপ ঝুপ, সঙ্গীত তালে তালে।
কি দিয়ে ওদের গড়েছিল বিধি, যখনি মনেতে ভাবি,
নুয়ে পড়ে শির, সাধনার কাছে সিদ্ধি লইতে মাগি'
ধন্য তোমরা, কর্ম্মী তোমরা, ও-ভাই তোমরা জেলে!
কে বলে তোমরা সমাজে পতিত?—মায়ের শ্রেষ্ঠ ছেলে!

উপন্যাস পাঠ

৫

৪। হাস্য ও করুণরস

কথাবার্ত্তায় যেমন লেখকবিশেষ স্বীয় নৈপুণ্য দেখাইতে পারেন, কোন কোন গ্রন্থকার সেইরূপ হাস্য বা করুণ-রসের উদ্দীপনে বিশেষ দক্ষতা প্রকাশ করেন। পরিহাস-রসপটুত্ব উপন্যাস-লেখকের বিশেষ গুণ। যে সকল লেখকের এই গুণ বিশেষভাবে বর্ত্তমান, তাঁহাদের লেখাই বিশেষভাবে সমাদৃত হইয়া থাকে। কোন কোন লেখক যেমন পরিহাস-রসের উদ্দীপনায় সুপটু, কেহ কেহ বা পরিহাসরসের অবতারণায় একান্ত অসমর্থ; কিন্তু করুণরসের উদ্দীপনায় হয় ত বিশেষ দক্ষ। ইংরেজ কবি মিলটনে এই পরিহাস-রসের একান্ত অভাব দৃষ্ট হইয়া থাকে। অপর দিকে দেখা যায় যে, কোন কোন লেখক পরিহাসরস ও করুণরস দুইএর অবতারণায় সমানভাবে সুপটু। অমর লেখক সেক্সপীয়ারের দুই রসোদ্ভাবনায় সমান ক্ষমতা ছিল।

বহু উপন্যাসেই পরিহাসরসের অবতারণা দেখা যায়। পরিহাসের মূল—অসামঞ্জস্য বা বৈসাদৃশ্য। পরিহাসরসের বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায়, ইহার মূলে incongruity বা বৈসাদৃশ্যের বিদ্যমানতা। স্থূলকায় স্ফীতোদর মানব বৈসাদৃশ্যের উদাহরণ। এই কারণে স্থূল ব্যক্তিবর্গ চিরকালই হাস্যোদ্রেকের কারণ হইয়া রহিয়াছে। ফলষ্টাফ হইতে পিকউইক পর্য্যন্ত সর্ব্বত্রই স্থূলকায় ব্যক্তিবর্গ জগতে বহু পরিহাসের অবসর প্রদান করিয়াছে। পিকউইক, পেপারসএ স্থূলকায়ের হাট বসিয়া গিয়াছে, স্নডগ্রাস্ ওয়ারডল, পিকউইক হইতে আরম্ভ করিয়া ইয়ং ন্যাম্বার্ট-রূপী চাকরটি পর্য্যন্ত সকলেই স্থূলকায়। বাক্যে ও কার্য্যে বৈসাদৃশ্য—ইহাও হাস্যরসের কারণ. এই জন্য ক্যাপ্টেন বোবাডিল হইতে আরম্ভ করিয়া উইঙ্কল পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র পরিহাসরসের নিদর্শন পাওয়া যাইতেছে। বুড়াপাগলা বুড়ার বৃদ্ধবয়সে বিবাহ চেষ্টা বিসদৃশ—তাহাও পরিহাস-রসের নিদর্শন। অপর দিকে ভক্ত-বিটেলের বাহিরে মালাকুড়াজালি থাকিলেও মুসলমানী ফতেমার উপর নজর—ইহা হাস্যরসের কারণ। ইলেকট্রিসিটি লইয়া হিন্দুস্থানীর হৈ চৈ কাণ্ড অসামঞ্জস্য বা বৈসাদৃশ্যের ব্যাপার—ইহাতে পরিহাসরসই ফুটিয়াছে। জামাইবারিকে জামাইদের ব্যাপার একান্ত বিসদৃশ—সুতরাং তত্র পরিহাসরসের সমাবেশ।

ইংরেজিতে wit ও humour বলিয়া দুইটি কথা আছে। বাঙ্গালায় ইহার প্রতিশব্দ পাওয়া একটু কঠিন। witকে রসিকতা বলা যায়, humourকে পরিহাসরস বা হাস্যরস বলা যায়। রসিকতা শব্দের প্রয়োগ কৌশলের উপর নির্ভর করে, বহুস্থলে শব্দের দ্ব্যর্থ করিয়া বা pun প্রয়োগে রসিকতার অবতারণা করা হয়। কেদার বাবুর কোষ্ঠীর ফলাফলে wit ও humour দুই এবং সমান প্রয়োগ দেখা যায়। বর্ণনানৈপুণ্য, বাগ্বৈদগ্ধ্য বা বাঙ্নিপুণতাই রসিকতার প্রাণ। রসিকতা বিদ্যুতের ন্যায় ক্ষণপ্রকাশে মনকে চমৎকৃত করে, (flash of wit) humourক্স্রুর ন্যায় প্যাঁচ কাটিয়া কাটিয়া অন্তরের মধ্যে প্রবেশ করে। wit বা রসিকতা ক্ষণের মধ্যে আবির্ভূত হইয়া চিত্তকে অভিভূত করে; ইহার ব্যাপকতা নাই, extensity নাই, কিন্তু গভীরতা (intensity) আছে। কিন্তু পরিহাসরস বড় ব্যাপক—ইহার দহন তুষকাঠের ন্যায় জ্বলিতে থাকে।

দুই জন রসিক পুরুষ যখন রসিকতার ফোয়ারা ছুটাইতে থাকেন, তখন সে স্থল রঙ্গরসের রণক্ষেত্র হইয়া উঠে। আমাদের বাঙ্গালা দেশে ৺ইন্দ্রনারায়ণ, ৺দ্বিজেন্দ্রলাল, ৺পাঁচকড়ি

বন্দ্যো, ৺অমৃতলাল, ৺ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতির এ ক্ষমতা ছিল। ৺দীনবন্ধুর সরস কথোপকথন বহুবিখ্যাত—তিনি ঘণ্টার পর ঘণ্টা আসর জমাইয়া রাখিতে পারিতেন। জীবনসংগ্রামের তীব্রতায় বাঙ্গালীর রঙ্গরস ফুরাইয়া আসিতেছে! তথাপি বাঙ্গালা সাহিত্যে যেরূপ রঙ্গরসের নিদর্শন দেখা যায়, এরূপ আর কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। রসিকতা করিতে জানিলে, এমন কি, বেদান্তের মধ্যে সরস রচনা দৃষ্ট হয়। প্রমাণ ৺ক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভয়ের কথা। অপরোক্ষ ও পরোক্ষজ্ঞান বুঝাইতে রসিক ক্ষেত্রনাথ বলিতেছেন—অনেক সময়ে স্ত্রীলোকে কুপিতা হইয়া শালা বলিয়া গালি দেয়। শালা শব্দার্থ স্ত্রীলোকের পরোক্ষভাবে জানা থাকিতে পারে; অপরোক্ষভাবে জানা থাকে না। কাহারও কাহারও রসিকতা একটু স্থূল, অমার্জ্জিত হইয়া পড়ে—সেকালে রসিকতা প্রায়ই অশ্লীল হইত; ইহাতে তৎকালের সমাজের ছায়া পড়িয়াছে। এ কালের রসিকতা মার্জ্জিত হইয়াছে বটে, তবে সর্ব্বজনের হৃদয়গ্রাহিণী হয় নাই—সেকালের রসিকতা স্থূল ছিল বলিয়া হয় ত সকলেই বুঝিত। দাশু রায়ের রসিকতা সর্ব্বসাধারণেই বুঝিবে, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের বিশুদ্ধ রসিকতা বহুল পরিমাণে শিক্ষাদীক্ষার উপর নির্ভর করে।

মূল কথা, আনন্দপ্রদানের সহিত বস্তুবিন্যাস বিশেষ নিপুণতার লক্ষণ। এই পরিহাস কাহারও কাহারও লেখনীর গুণ জীবনের মধ্যে অদৃষ্টে ক্রূর পরিহাস প্রদর্শনে এরূপ নিরত যে, সেই হাস্যের মধ্যে নিরুদ্ধ অশ্রু থাকিয়া যায়—ইহাই সাহিত্যে ক্রূর শ্লেষের নিদর্শন। অপর দিকে কাহার কাহার হাস্যরস সমবেদনায় সরস হইয়া উঠে—এই বস্তু এডিসন্, গোল্ডস্মিথ, ডিকেন্সএর মধ্যে বিশেষভাবে দেখিতে পাই। কাহারও কাহারও হাস্যরস এরূপ মার্জ্জিত যে, বিশেষভাবে শিক্ষিত না হইলে সে রস আস্বাদন সার্থক হয় না। ইংরেজি সাহিত্যে ল্যাম্ব ও বাঙ্গালা সাহিত্যে ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মধ্যে এইভাবে রসিকতা বিশেষভাবে দেখা যায়। বঙ্কিমচন্দ্রের কমলাকান্তে সরসরচনায় প্রবন্ধ আরম্ভ হইয়া তাহা গভীর চিন্তাপূর্ণ হইয়া শেষ হইত। কাহারও কাহারও হাস্যরস অদ্ভুতরসে পরিণত হইয়াছে—বাঙ্গালা সাহিত্যে ত্রৈলোক্যনাথের প্রবন্ধগুলি পড়িলে হাস্যরস ও অদ্ভুতরস কি ভাবে মিশাইয়া যাইতে পারে, তাহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ পাওয়া যায়—ইহা The odd, the grotesque, the Queer in Bengali literature. কাহারও কাহারও পরিহাসরস অতি তীব্র হইয়া কশাঘাতের ন্যায় দুর্জ্জনের পৃষ্ঠে পড়িতে থাকে—ইহা অমৃতলাল ও দ্বিজেন্দ্রলালের গ্রন্থে দৃষ্ট হয়। কাহারও কাহারও পরিহাসরস এত তীব্র বা কঠোর হইয়া পড়ে যে, তাহা ব্যঙ্গচিত্রে satire or caricatureএ পরিণত হয়। ডিন সুইফটএর গালিভারস ট্রাভেলস তাহার নিদর্শন।

যাহা আমাদের পূজ্য ও নমস্য, তাহাতে পরিহাসরসের প্রয়োগ—ইহা পরিহাসরসের অপপ্রয়োগ মাত্র। ধর্ম্মবিষয়ে পরিহাস জাতির অধঃপতনের পূর্ব্বলক্ষণ—রোমের অধঃপতনের পূর্ব্বে এ রোগ দেখা দিয়াছিল। আমাদের দেশেও তাহার লক্ষণ দেখা দিয়াছে। সামাজিক কুরীতি, পাপ ও অনাচারের প্রতি পরিহাসই সাহিত্যের কর্ত্তব্য। ব্যক্তিগত শ্লেষ অশিষ্ট, অভদ্র ও ইতরজনোচিত।

উপন্যাসে হাস্যরস প্রয়োগের ন্যায় বহুল করুণরসেরও প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। মানব করুণরসে বিশেষ আনন্দ পাইয়া থাকে; দুঃখ হৃদয়কে পরিশুদ্ধ ও মার্জ্জিত করিয়া তুলে। এই কারণে বিষাদান্ত নাটক সাহিত্য-রসিকবর্গের বিশেষ প্রিয় হইয়া থাকে। চন্দ্রশেখরে প্রতাপ মরিয়া অমর হইয়াছেন এবং তিনি জীবিত থাকিয়া সুখে ঘর-কন্না করিতে থাকিলে আমাদের হৃদয়ে তিনি যে স্থান পাইয়াছেন, তাহা হইত না। সীতার বসুন্ধরা-প্রবেশ তাঁহার অসহনীয় জীবনের যে মহনীয় পরিণাম, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। আমাদের দেশের দুইটি সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ মহাকাব্য রামায়ণ ও মহাভারত—তাহা বিষাদান্ত। সেক্সপীয়ারের চারিটি বিষাদান্ত নাটক যেরূপ বিখ্যাত, মিলনান্ত নাটকগুলি সেরূপ নহে—কি জানি কেন শেলীর ভাষায় দুঃখের গানই আমাদের নিকট সর্ব্বাপেক্ষা মধুর। জীবনের মধ্যে হাস্য ও আনন্দ ক্ষণিক, দুঃখই কি আমাদের জীবনের চিরন্তন অবস্থা? এইজন্য কি আমরা দুঃখ ভালবাসি? দার্শনিকগণ এ বিষয়ে বিচার করিবেন, আমরা ইহা লইয়া গণ্ডগোল করিতে চাহি না। তবে বলিতে পারি, করুণরস সাহিত্যের সেরা রস—দুঃখ কষ্টপ্রদ হইলেও লোকে ভালবাসে। কাঁদিতে লোকে ভালবাসে—কেন তাহা কে জানে!

করুণরস সাহিত্য-রসিকগণের প্রিয় হইলেও দুঃখপ্রবণতা (sentimentalism) একান্ত দোষের। দুঃখের

কথা বিনাইয়া বিনাইয়া বলা—নিজেকে জন্মদুঃখী প্রমাণ করিয়া কেবলই পরের সহানুভূতি আকর্ষণ করা একটা ব্যাধি বলিলেই হয়। এই রোগ লর্ড বায়রণকে পাইয়া বসিয়াছিল—লিখিতে বসিলে তিনি এই দুঃখের কথা ফেনাইয়া ফেনাইয়া বলিতে ছাড়িতেন না। ফল কথা, এ সকল অস্বাভাবিক। যাহা অস্বাভাবিক, তাহাই পরিবর্জ্জনীয়; যাহা সহজ, সরল ও স্বাভাবিক, তাহাই শোভন, সুন্দর ও শিষ্ট-সম্মত।

৫। দেশ ও কালের অবস্থান

উপন্যাস যখন জীবনের চিত্র, তখন তাহার মধ্যে দেশ, কাল, আচার, ব্যবহার, পারিপার্শ্বিক অবস্থা প্রভৃতির (milien) সুন্দর চিত্র পাওয়া যাইবে। ভারতবর্ষের ঘটনায় বিলাতী সমাজ-সংস্থানের চিত্র দেওয়া যেরূপ অদ্ভুত হইবে, আবার বিলাতের কথা বলিতে চীনদেশের সমাজ-সংস্থান বর্ণনা করা তদ্রূপ অদ্ভুত হইবে। সাহিত্য যতই বিশ্বজনীন হউক, তাহার মধ্যে কোন স্থানের বা সমাজের আবেষ্টনীর প্রভাব থাকিবে। হ্যামলেটএর সাহিত্যরস বিশ্বপ্রিয় হইতে পারে, কিন্তু হ্যামলেটএর লীলাভূমি যে ডেনমার্ক, তাহা ভুলিলে চলিবে না। জুলিয়াস সীজারের ব্রুটাসের মধ্যে যে বিয়োগান্ত নাটকের বীজ (tragic element) রহিয়াছে, তাহা বিশ্ব-মনোহর হইলেও সেক্সপীয়ারকে রোমের আবহাওয়ার সৃষ্টি করিতে হইয়াছে। বৈচিত্র্যবহুল জীবনের অখণ্ড স্বরূপ কেহ দেখাইতে পারে না—অসীম বা অনন্তের ধারণা সহজ নহে। মানব-মনের চিরন্তন ভাবগুলি সাহিত্যকে পরিচ্ছিন্ন কাল বা স্থানের মধ্য দিয়া প্রকাশ করিয়া থাকেন। দেশদিমোনার প্রেম বা ওথেলোর সন্দেহ বা ইয়াগোর ঈর্ষ্যা সার্ব্বকালিক ও সার্ব্বভৌমিক হইতে পারে, কিন্তু ইহার বিকাশ একটি পরিচ্ছিন্ন স্থান বা কালের মধ্যে ঘটিয়াছিল। উপন্যাসের মধ্যে এই সকল ঘটনার স্থান ও কালের বর্ণনার মধ্যে একটা সম্ভাব্য সত্য থাকার প্রয়োজন। কৃষ্ণকান্তের উইল বা বিষবৃক্ষের ঘটনাগুল যতই কাল্পনিক হউক না কেন, তাহা যে বঙ্গদেশের অন্তর্গত, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই; তাহা অলীক হইলেও সত্য হওয়া সম্পূর্ণতঃ সম্ভবপর। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার উপন্যাসে বাঙ্গালী নারী-হৃদয়ের অপূর্ব্ব কোমলত্ব ও মাধুর্য্য দেখাইয়াছেন, কিন্তু যে স্থলে তিনি বাঙ্গালী জীবনে সম্পূর্ণ অসম্ভব চরিত্র গড়িয়াছেন, সে স্থলে তাঁহাকে এক দীর্ঘ পরিচ্ছেদ লিখিয়া সাফাই দিতে হইয়াছে। আমি আনন্দমঠে শান্তি-চরিত্রের কথা বলিতেছি। অপর দিকে দেবী চৌধুরাণীর প্রফুল্ল-চরিত্রের অপূর্ব্ব রূপান্তরে এই সম্ভাব্য সত্যের অপলাপ ঘটিয়াছে—ইহা তাঁহার অনুশীলনতত্ত্বের উদাহরণস্বরূপ হইয়াছে, কিন্তু সাহিত্যের দিক্ দিয়া যথেষ্ট ক্ষতি হইয়াছে। কৃষ্ণকান্তের উইল বা বিষবৃক্ষ দেশ-কাল-পাত্রভেদের যথেষ্ট সঙ্গতি রক্ষা করায় ও স্বাভাবিকতায় সুন্দর হওয়ায় এই দুই গ্রন্থ উপন্যাস (Novel) হিসাবে শ্রেষ্ঠ হইয়াছে। Romance বা রম্য উপন্যাসে এ বিষয়ে একটু স্বাধীনতা থাকায় দুর্গেশনন্দিনী, কপালকুণ্ডলা, মৃণালিনী প্রভৃতি গ্রন্থ সাহিত্যিকগণের প্রিয় হইয়া আছে। যে বিষয়ে গ্রন্থ রচনা হইতেছে, তাহার স্থান ও কাল সম্বন্ধে যথাযথ সংস্থান প্রত্যেক ঔপন্যাসিকের কর্ত্তব্য। যিনি যতটুকু জানেন, যে বিষয়ে যাঁহার অধিকার, ততটুকুই বলা উচিত। তাহার অধিক বলিতে গেলে বিপর্য্যয় ঘটিয়া পড়ে। ডিকেন্স বিলাতের নিম্নস্তরের লোকের সুন্দর বর্ণনা দিয়াছেন, কিন্তু তিনি যখনই উচ্চস্তরের লোকের কথা বলিতে গিয়াছেন, তখনই গোলে পড়িয়াছেন। ইংলণ্ডের নিম্নস্তরের ব্যক্তি সম্বন্ধে ডিকেন্সের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ছিল—তিনি এককালে এই সমাজের মধ্যে মিশিয়াছিলেন। কাযেই তাঁহার বর্ণনা স্বাভাবিক, সহানুভূতিসম্পন্ন ও সুন্দর হইয়াছে, উপরন্তু পরিহাসরসের মিঠাপাকে ফেলিয়া তিনি তাঁহার সৃষ্টি অতি উপাদেয় করিয়া তুলিয়াছেন। ইংরেজ ঔপন্যাসিক থ্যাকারে কিন্তু নিম্নশ্রেণীর চিত্র সুন্দর করিতে পারিতেন না; মধ্যশ্রেণীর বা অভিজাত সম্প্রদায়ের চিত্র তাঁহার হাতে অতি সুন্দরভাবে ফুটিত। আমাদের দেশের এক জন খ্যাতনামা ঔপন্যাসিকের হাতে সমাজবহির্ভূতা নারীর চিত্র অতি সুন্দরভাবে ফুটিয়া থাকে, শুনিয়াছি, ইহা নাকি তাঁহার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার নিদর্শন।

এই ভাবে আমরা উপন্যাসের মধ্য দিয়া রাজারাজড়ার জীবন, অভিজাত শ্রেণীর কথা, মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ঘরের কথা, দরিদ্র কৃষক, মুটে, মজুর প্রভৃতির জীবন দেখিতে পাই। এই ভাবে আবার বিভিন্ন জাতির চিত্রও উপন্যাসে দেখিতে

পাই। বিলাতের উপন্যাসের মধ্যে একটা ভৌগোলিক ভাগও দেখা যায়; স্কচ নভেল, আইরিস নভেল, ওয়েলেস্ নভেল; আমাদের দেশে কোন দিন রাঢ়ীয়, বারেন্দ্রের ন্যায় ঢাকাই নভেল, কলকেত্তাই নভেল, চাটগেয়ে উপন্যাস বা রঙ্গপুরী উপন্যাস না দেখা দেয়! তবে আমাদের দেশে বিলাতফেরতা বা বালিগঞ্জী নভেলের অভাব নাই—এক কালে পটোলডাঙ্গা রোমান্সের লীলালেখা ছিল, এখন তাহা অচল, এখন লেক অঞ্চলই উপন্যাসের একমাত্র লীলা-ক্ষেত্র। আসল কথা, উপন্যাসের রঙ্গভূমি সম্বন্ধে বা উপ-ন্যাসের চরিত্রগুলি সম্বন্ধে বা তাহার পারিপার্শ্বিক অবস্থার বর্ণনায় লেখকের অভিজ্ঞতা, যথার্থ দৃষ্টির বিদ্যমানতা থাকার একান্ত প্রয়োজন, এজন্য যদি স্থানের বর্ণনায় একটু বস্তু-তন্ত্রের আমেজ আসে, তাহা ভাল বৈ মন্দ নহে। ডিকেন্স বিলাতের নানাস্থান বর্ণনায় যদি অতিমাত্রায় বস্তুতান্ত্রিক হ'ন, তাহাতে দুঃখের কিছুই নাই, বরং উপন্যাসের গৌরব বৃদ্ধি পাইয়াছে।

ঐতিহাসিক ঘটনার বর্ণনায় কিন্তু এ বিষয়ে সম্পূর্ণতঃ সাবধান হওয়া আবশ্যক। উপন্যাসে দুই একটি ঐতিহাসিক নামের চরিত্র থাকিলে তাহা ঐতিহাসিক উপন্যাস হয় না। প্রমাণ—মৃণালিনী, দুর্গেশনন্দিনী, কপালকুণ্ডলা ও চন্দ্রশেখর। অপর দিকে ঐতিহাসিক চরিত্রাদি না থাকিলেও ঐতিহাসিক উপন্যাস হইতে পারে, যথা—বেণের মেয়ে। ঐতিহাসিক উপন্যাস লেখা বড় কঠিন; বহু সময়ে ইতিহাসের খাতির রাখিতে উপন্যাসের প্রাণান্ত, আবার বহুস্থলে উপন্যাস বাঁচাইতে গিয়া ইতিহাসের গলা টিপিয়া মারা হয়। পূজ্য-পাদ শাস্ত্রী মহাশয় বেণের মেয়ে লিখিতে গিয়া ইতিহাসের বহু ঘটনা তন্ন তন্ন করিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। সেকালে ব্রাহ্মণ ও সহজিয়া বৌদ্ধদের আচার-ব্যবহারের প্রত্যেক খুঁটিনাটি এরূপ করিয়া বলিয়াছেন, যেন তাঁহার পর এ সকল কথা চিরকালের জন্য লুপ্ত হইয়া যাইবে। এ কথা শুনাইবার জন্য আর কেহ থাকিবে না। তিনি প্রাণ দিয়া—হৃদয় দিয়া স্বাধীন বাঙ্গালার শেষ সমাচার শুনাইয়া গিয়াছেন—আমরা প্রতি পত্রের প্রতি ছত্রে তাঁহার লেখায় বিস্ময়-বিমূঢ় হইয়া পড়ি। তাঁহার ভাষার সহজ সরলতায়, তাঁহার বর্ণনা-ভঙ্গীতে, তাঁহার ঐতিহাসিক গবেষণায় বহুল জ্ঞান লাভ করি। এ সকলের ঐতিহাসিক মূল্য কতদূর, তাহা ঐতিহাসিক পণ্ডিত বলিতে পারেন; কিন্তু তাঁহার বলিবার ভঙ্গী যে অসাধারণ, তাহা স্বীকার করিতে হইবে। পাথুরে প্রমাণ তিনি দেন নাই, ইহা সত্য; কিন্তু ইতিহাসকে তিনি যে সজীব করিয়া তুলিয়াছেন, তাহাও সত্য। ঐতিহাসিকতা রাখিতে গিয়া উপন্যাস সাহিত্যের যে প্রাণ, তাহার কিন্তু অপচয় করিয়াছেন। বেণের মেয়ে উপন্যাসে হয় ত' একটা অপূর্ব্ব সংঘাত বা Conflict দেখা যাইত, সেই Conflict গুরু-পুত্রের দিক দিয়া বা বেণের মেয়ের দিক দিয়া থাকা উপন্যাসের পক্ষে একান্ত আবশ্যক ছিল। প্রাচীনপন্থীর হিন্দু বলিয়া বিধবা বণিক্-দুহিতার মধ্যে তিনি সে সংঘাত দেখাইতে পারেন নাই; কিন্তু গুরুপুত্রের মধ্যেও তাহার ক্ষীণ রেখা দৃষ্ট হইলেও ফুটিয়া উঠে নাই। ঐতিহাসিক উপন্যাসে বহুসময়ে হয় ত' ইতিহাস থাকে, কিন্তু উপন্যাসে গণ্ডগোল ঘটে, আবার হয় ত' উপন্যাস ঠিক হয়, ইতিহাস উপিয়া যায়। বঙ্কিমচন্দ্রের রাজসিংহ ঐতিহাসিক উপন্যাস বা রোমান্স, তাহা সন্দেহ। উপন্যাস হিসাবে নানা সংঘাতের ভিতর দিয়া 'রাজসিংহ' হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে, কিন্তু ঐতিহাসিকতায় ইহার বহু অপচয় বা অপহ্নব ঘটিয়াছে। যে ঐতিহাসিক উপন্যাসে দুই কূল বাঁচাইতে পারা যায়, তাহাই শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক উপন্যাস। ফরাসী ঔপন্যাসিকগণ, বিশেষতঃ আনাটোল ফ্রান্স বা ডোডে ঐতিহাসিক আব-হাওয়া ঠিক রাখিবার চেষ্টা করেন। আনাটোল ফ্রান্সএর অদ্ভুত পাণ্ডিত্য বোধ হয় তাঁহাকে এ বিষয়ে সিদ্ধিদানে সমর্থ হইয়াছে। সালাম্বো গ্রন্থে বা ফক্‌স্ নামক অপর একটি গ্রন্থে বর্জ্জিয়া ক্যালসানএর আলেখ্য প্রণয়নে গ্রন্থকারগণ সফলকাম হইয়াছেন। আলেকজাণ্ডার ডুমারএর গ্রন্থগুলি Romance হইলেও ইতিহাসের মূল তথ্য প্রায় বজায় আছে। সার ওয়ালটার ঐতিহাসিক উপন্যাসের জন্য বিশেষ বিখ্যাত; ঘটনাবিশেষের কালানুক্রমিক বর্ণনায় তাঁহার ভুল থাকিলেও, তিনি ঐতিহাসিক আবহাওয়ার সৃষ্টি বিশেষভাবে করিতে পারেন। ঐতিহাসিকগণ তাঁহার রাজভক্তি (Royalist leaning) ও Jacobiteএর দিকে পক্ষপাতিত্বের জন্য যথেষ্ট নিন্দা করিয়াছেন। ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখিতে হইলে নিজের ব্যক্তিগত মত চাপিয়া রাখিয়া, যেটি যেরূপ, সেইরূপই বর্ণনা করিতে হইবে। এ

বিষয়ে সেক্সপীয়ারএর শ্রেষ্ঠত্ব অবশ্য স্বীকার্য্য ; এ জন্য কেহ তাঁহাকে ধরিতে ছুঁইতে পারে নাই ; অন্ধের হস্তিদর্শন-ন্যায়ে কেহ তাঁহাকে রয়ালিষ্ট, কেহ তাঁহাকে পিউরিটান, কেহ তাঁহাকে রোমান্‌ক্যাথলিক, কেহ তাঁহাকে বোহেমিয়ান, কেহ তাঁহাকে Optimist, কেহ তাঁহাকে দুঃখবাদী বলিয়াছেন, কিন্তু সেক্সপীয়ার যে রহস্যময়, সেই রহস্যময় রহিয়াছেন। তাঁহার Chronicle plays দেখিয়া কেহ তাঁহার স্বরূপ ধরিতে পারিবেন না। আমরা বাজে বই না পড়িয়া যদি সেক্সপীয়ার পড়ি, সাহিত্যিক আদর্শ সম্বন্ধে বহু বিষয় শিখিতে পারিব। সেক্সপীয়ার ও বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে বিদ্যাপতির সেই চরণ মনে পড়ে—সোহি রূপ বাখানিতে তিল তিল নৌতুন হোয়।

ফল কথা, ঐতিহাসিক যুগের বর্ণনা করিতে হইলে ঐ যুগের যে ভাব, তাহা অটুট রাখিতে হইবে। জর্জ্জ এলিয়ট রমোলা গ্রন্থে রেনার্সাঁ যুগের অতি সুন্দর বর্ণনা দিয়া গিয়াছেন। যে যুগের কথা বর্ণিত হইতেছে, তদানীন্তন কাল ও ভাবের অনুকূলে উপন্যাস চলিবে, নচেৎ অনৈতিহাসিক ভ্রমপ্রমাদদুষ্ট হইয়া গ্রন্থ বিবুধগণের বর্জ্জনীয় হইয়া থাকিবে। সামান্য ঘটনার ভ্রমপ্রমাদ মার্জ্জনীয়, কিন্তু অতীত যুগের আশ্রয়ে একবারে আধুনিক ভাব বা ঘটনার বর্ণনা অত্যন্ত অন্যায়। ইতিহাসকে মারিয়া নভেল লেখা অপেক্ষা কেবল উপন্যাস লেখাই ভাল। অনিপুণ হস্তে ঐতিহাসিক উপন্যাস 'না ঘাটকা না ঘরকা' হইয়া তাহার 'তিসরা হাল' হইয়া তাহা এক সঙ্করজাতীয় কিম্ভূতকিমাকার বস্তুতে দাঁড়াইয়া যায়।

স্থান-কাল-পাত্রের বর্ণনায় উপন্যাসের মাধুর্য্য বাড়িয়া যায়। জেন অষ্টিন এ বিষয়ে সেরূপ অবহিত ছিলেন না, কিন্তু ডিকেন্স বা বালজাক্ এ বিষয়ে মনোযোগী ছিলেন। লণ্ডন বা প্যারিসএর প্রত্যেক অলিগলির বর্ণনায় ডিকেন্স ও বালজাক সিদ্ধ-হস্ত ছিলেন। বহু গ্রন্থকার ঘটনাবিন্যাসের ও প্রাকৃতিক শোভার মনোহর বর্ণনা দান করিয়াছেন ; ডিকেন্সএর ন্যায় বস্তুতন্ত্রের লেখকও এ বিষয়ে অসাবধান নহেন। প্রকৃতির বর্ণনা বহুস্থলে ঘটনার পাত্রপাত্রীর মনোভাবের অনুকূল। আমাদের সংস্কৃত কবিগণ এ বিষয়ে অপরাজেয়—রামের বনবাসে বনকে পর্য্যন্ত তাঁহারা কাঁদাইয়া ছাড়িয়াছেন। বাল্মীকি হইতে কালিদাস, ভবভূতি পর্য্যন্ত এবং classic যুগের কবিগণ হইতে অর্ব্বাচীন ভারবি, মাঘ, ভট্টি পর্য্যন্ত এবং অধুনাতন জয়দেব পর্য্যন্ত সকলেই সিদ্ধহস্ত। এ দেশে প্রকৃতির দান যেরূপ সুপ্রচুর, স্বভাবকবিগণ স্বভাবের বর্ণনায়ও সেইরূপ মুক্তকণ্ঠ। বঙ্কিমচন্দ্রের নভেল এই স্বভাবের বর্ণনায় বড়ই সুমধুর হইয়া আছে—কোথাও তাহা জলদগম্ভীর হইয়া মনে বিস্ময় ও পুলকের সঞ্চার করিতেছে, কোথাও বা শরতের মেঘচ্ছায়ার ন্যায় সুবিমল স্মিত-হাস্যের সঞ্চার করিতেছে। বিধবার উপর যখন কোকিল ডাকে, আমরা তখন পুলকিত হই। আবার গগন-পবন মুখরিত করিয়া মরণোন্মুখী কল্যাণীর উপর সমগ্র প্রকৃতি সমস্বরে যখন হরে মুরারে গান গাহিতে থাকে, তখন বিস্ময়বিমুগ্ধ হইয়া যাই। হোমার অশ্বের হ্রেষার, অস্ত্রের ঝন-ঝন-ঝনৎ-কারের মধ্যে wine deep illimitable seaএর বর্ণনা করেন, অথবা উপমামুখে আকাশে সারসপংক্তির বর্ণনা দেন অথবা শরতে শস্যসম্ভারকর্ত্তনের সংবাদ বহন করিয়া আনেন, তখন প্রাণ একটু হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচে—যেন কলকোলাহল হইতে শান্তস্নিগ্ধ প্রকৃতি-জননীর কোলে ঘুমাইয়া পড়ি। ঘটনাপুঞ্জের বর্ণনার মধ্যে স্বভাবের শোভায় বাস্তবিকই মনের অবসাদ ঘুচিয়া গিয়া একটু বিমল আনন্দের আস্বাদ পাওয়া যায়। কোথায় বা দেখা যায় যে, ঘটনার পাত্রপাত্রীর মুখের দিকে না তাকাইয়া প্রকৃতি আপনার লীলায় আপনি মুগ্ধ হইয়া চলিয়া যাইতেছে——মানুষ নদীতীরে শিশুর ন্যায় খেলা করিতেছে, নদী তাহার ঊর্ম্মিমালা তুলিয়া ছল্-ছল্ রব করিয়া উপলখণ্ডের মধ্যে ক্রীড়াশীল গতিতে চলিয়া যাইতেছে। সোরাব রোস্তমএর উপসংহারে প্রকৃতির এই লীলাই দেখা যায়। আধুনিক লেখকগণ মানসিকতত্ত্বের বিশ্লেষণে এমনই বিভ্রান্ত হইয়াছেন বা যৌনসমস্যার মদিরায় এমনই উন্মত্ত যে, প্রকৃতির এই রুদ্রমধুর লীলার দিকে দৃষ্টিপাত করিতে পারেন না। জড়বাদী সভ্যতার ইহা একটি বিষময় ফল। প্রকৃতির মাধুর্য্যে বাঙ্গালা-সাহিত্যে একখানি গ্রন্থ বড় সুমধুর হইয়াছে, তাহার উল্লেখ না করিলে এ প্রবন্ধ সম্পূর্ণ হইতে পারে না। ইহা শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পথের পাঁচালী, পল্লীগ্রামের সোঁদা মাটীর গন্ধ, ইহার পংক্তিতে পংক্তিতে বিরাজমান।

ইহার বর্ণনাভঙ্গী সুন্দর—অত বড় বিরাট্ গ্রন্থের বর্ণনা-নৈপুণ্য পড়িতে অবসাদ আসে না।

৬। শেষ কথা—জীবনের আলোচনা

নাটকের ন্যায় নভেলও মানব-জীবন লইয়া ব্যস্ত। নর-নারীর নানা সম্পর্ক, তাহাদের চিন্তার ধারা, সুখ-দুঃখ, কল্পনা, অভাব, অভিযোগ, আশা-আকাঙ্ক্ষা, প্রবৃত্তি, কামনা, প্রেম-নৈরাশ্য লইয়া নভেল। উপন্যাসও নাটকের ন্যায় জীবনের দর্পণবিশেষ—যাহা কিছু জীবনে দৃষ্ট হয়, তাহার সকলই উপন্যাসে চিত্রিত হইতে পারে; পুনশ্চ, সংসারে যাহা দেখা যায় না, কেবলই কল্পনায় যাহার অস্তিত্ব, তাহাও সাহিত্যে উপন্যস্ত হইতে পারে। সাহিত্যের বৈচিত্র্যই সাহিত্যের প্রধান আকর্ষণ। কিন্তু নানা ঘটনা-বৈচিত্র্যের মধ্যে এবং নানা চরিত্রের বিকাশ-সত্ত্বেও লেখকের ব্যক্তিত্ব সময় সময় প্রকাশিত না হইয়া পারে না। যে স্থলে লেখক ইহা চাপিয়া রাখিতে পারেন, তথায় লেখক অসামান্য ও অসাধারণ। যেমন সেক্সপীয়ার—অপর দিকে লেখক সর্ব্বত্র প্রায় নিজের ঝোঁক, প্রবৃত্তি, মতামত প্রকাশ করিয়া ফেলেন। যে সকল উপন্যাস কোন বিশিষ্ট মতবাদ প্রকাশের জন্য লিখিত হয়—সে সকল গ্রন্থের কথা ধরিতেছি না, তাহা প্রচার-সাহিত্যমাত্র। তবে এ কথা বলা যায় না যে, প্রচার-সাহিত্য হইলে তাহা সৎসাহিত্য হইবে না। ল্যাটিন কবিতা শিক্ষার জন্য লিখিত হইলেও তাহা সাহিত্যে উচ্চ স্থান অধিকার করিয়া আছে। আঙ্কল টমস কেবিন (টমকাকার কুটীর) ক্রীতদাস ব্যবসায়ের বিরুদ্ধে প্রচারগ্রন্থ হিসাবে লিখিত হইলেও তাহা সকলের চিত্তাকর্ষক। পিলগ্রিমস্ প্রগ্রেসএ ধর্ম্মতত্ত্বের গুহ্যকথা লিপিবদ্ধ হইলেও তাহা রূপকের রাজা বলিয়া বিশ্বের মন হরণ করিয়াছে। বলিদান পণপ্রথার বিরুদ্ধে লিখিত হইলেও নাটকীয় গুণে হীন নহে। প্রচার-গ্রন্থ ভিন্ন যে সকল উপন্যাস বা নাটক লিখিত হয়, তাহার মধ্যে লেখার নিজস্ব জীবন-সমস্যা সমাধানের একটা চেষ্টা দেখিতে পাওয়া যায়। এই যে জীবন-সমস্যার আলোচনা—criticism of life, ইহাই উপন্যাসের একটি চরম গুণ। চিত্তবিনোদন বা অবসর-রঞ্জনের জন্য যে গ্রন্থ লিখিত হয়, তাহার সাহিত্যিক মূল্য অতি অল্প বা কোন মূল্যই নাই বলা যায়। কিন্তু প্রত্যেক উপন্যাসেই মানব-জীবনের আলোচনা থাকিয়া যাইবেই। আধুনিক নভেল প্রায়ই Problem বা সমস্যা ভিন্ন চলে না; যৌন-সমস্যা প্রায় বারো আনা নভেলের প্রতিপাদ্য, সমাজ-সমস্যা আধুনিক বাঙ্গালা নভেলের প্রতিপাদ্য। এই সকল নভেলে সহজভাবে যে সমস্যার আলোচনা, তাহা সরল রীতি বা direct method, কিন্তু direct method বা সরল রীতি ভিন্নও জীবনের নানা সমস্যা লেখকের লেখার মধ্যে ফুটিয়া উঠে, ইহা indirect বা গৌণ প্রথা; সেক্সপীয়ার তাঁহার নাটকগুলির মধ্যে নানা ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে ও নানা চরিত্রের বিচিত্রতার মধ্যে যাহা বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা হইতে সমালোচকবর্গ নানা সমস্যার উদ্ভব দেখিয়াছেন ও তাহার সমাধানে ব্যস্ত হইয়াছেন। লেখক যে পূর্ব্ব হইতে একটা সংস্কার লইয়া সকল সময়ে লিখিয়া যান, তাহা নহে; কিন্তু লেখার মধ্যে লেখকের সংস্কার ধরা পড়িয়া যায়! লেখক পল্লীসমাজের ঝোঁক বা bias লইয়া লিখিতে আরম্ভ করিয়াছেন, কিন্তু ইহার মধ্যে রমা ও রমেশের সামাজিক সমস্যা আপনি উদ্ভূত হইয়া পড়িয়াছে। সেক্সপীয়ারএর bias ধরা বড় কঠিন—তিনি এ বিষয়ে আমাদের দৃষ্টি সম্পূর্ণ এড়াইয়া গিয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের সীতারাম, দেবী চৌধুরাণী, আনন্দমঠে তাঁহার উদ্দেশ্য সাফাই বলিয়া গিয়াছেন—গীতার শ্লোকগুলি motto করিয়া তাহারই উদাহরণ দিয়াছেন। কিন্তু কপালকুণ্ডলার দার্শনিক তত্ত্বের উদ্ঘাটনে নিপুণ সমালোচক বিশেষ পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়াছেন; এ স্থলে বঙ্কিমচন্দ্রের যে কি অভিমত, তাহা জানা অতি দুরূহ। সেক্সপীয়ারএ জীবনের আলোচনা নাটকীয় রীতিতে লিখিত; সমালোচকবর্গ সেজন্য গোলে পড়িয়া নানা মত ও নানা পথ অবলম্বন করিয়াছেন। সেক্সপীয়ারএ নৈতিক সমস্যার কথা ছাড়িয়া দিই—সামান্য অতিপ্রাকৃত ভৌতিক ব্যাপার লইয়া বস্তুতান্ত্রিক মত মনস্তাত্ত্বিক মত গড়িয়া উঠিয়াছে। এ সকল খণ্ডন করিয়া সে যুগের লোকের সংস্কারের উপর সাহিত্যের প্রতিষ্ঠা বলিয়া ঐগুলি সাহিত্য হিসাবে সত্য বলিয়া তাঁহার মত গড়িয়া তুলিয়াছেন।

সত্য ও নীতি এই দুই বস্তু অবলম্বন পূর্ব্বক সাহিত্যের সকল সমস্যার সমাধান হইয়া থাকে। আমরা সাহিত্যে যে সত্যের আশা করিয়া থাকি, তাহা বিজ্ঞানের সত্য না হইতে পারে। সাহিত্যিক সত্য ও বৈজ্ঞানিক সত্যে পার্থক্য

আছে, ইহা প্লেটো পর্য্যন্ত ভুলিয়া গিয়াছিলেন। এ জন্ম তিনি হোমারের রচনাকে সত্যশূন্য অসার বলিয়া মনে করিয়া গিয়াছেন। বাস্তব জীবনে দেখা যায় না, অতএব ইহা মিথ্যা, কাব্যবিচারে এ সিদ্ধান্ত গ্রাহ্য নহে। সাহিত্যিক সত্য বাস্তব হইতে আরও গভীর ও ব্যাপক। সম্ভাবন সত্যই সাহিত্যিকের গ্রাহ্য—তাহা বাস্তব সত্য না হইতে পারে। বিষবৃক্ষ বা কৃষ্ণকান্তের উইলের ঘটনা বাস্তব জীবনে না ঘটিতে পারে, কিন্তু ঐরূপ ঘটনা অসম্ভব নহে। সুতরাং তাহা সাহিত্যবিচারে মিথ্যা বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া যায় না। সম্ভাব্য ঘটনায় সত্যের পূর্ণাভাস রহিয়াছে। জ্ঞানসাহিত্যে এই বৈজ্ঞানিক সত্য বা বাস্তব সত্যের নিতান্ত আবশ্যক, কিন্তু অভিভূতি সাহিত্য সম্ভাব্য সত্যে অনায়াসে কার্য্য চলিয়া যাইবে।

সাহিত্যে সত্যের প্রসার অর্থ এই নয় যে, জীবনে যাহা কিছু দৃষ্ট হইবে, তাহাই সাহিত্যে দেখাইতে হইবে। সাহিত্য জীবনের দর্পণ হইলেও দর্পণে সুমার্জ্জিত সুন্দর মুখখানিই দেখিতে সুন্দর ; কিন্তু পূয়স্রাবী কদর্য্য ব্রণাদি দর্পণ সাহায্যে দেখিতে পাওয়া গেলেও তাহা দেখান সুরুচির কার্য্য নহে। সুরুচি ও সুনীতি একই বস্তুর দুই দিক্ মাত্র। সাহিত্যের মধ্যে জীবনের কদর্য্য ও আবর্জ্জনাসংগ্রহই সত্যসন্ধা নহে। জীবনের নানা দুঃখ ও দৈন্যের মধ্যে সাহিত্যের আলোচনায় যদি সত্য শিব সুন্দরের সাক্ষাৎ না পাওয়া যায় তবে তাহার অস্তিত্বের কি প্রয়োজন? আদর্শবাদীর উপর বস্তুতান্ত্রিকের যে অভিযোগ, তাহার উত্তরে সাহিত্যিক সত্য বনাম বৈজ্ঞানিক সত্যের কথা আসিয়া পড়ে। বাস্তব সত্য সাহিত্যের সর্ব্বত্র গ্রাহ্য নহে। সম্ভাব্য সত্যই সাহিত্যের সত্য। নিরবচ্ছিন্ন বস্তুতান্ত্রিকতা সাহিত্যকে তিক্ত করিয়া তুলে। 'কলরবে' অব্যক্ত মধুর ধ্বনি নাই, তাহা কচকচি মাত্র। সাহিত্যের রসাল উদ্যানে ঢেঁকির কচকচি—ভাই ভাইএ কলহ, জাএ জাএ কোলাহল, কুলীদের মাতলামি, বা কল লইয়া ঝিএদের কলহ, ডাক্তার আসিলে ভিজিট জুটে না, ভিজিট জুটে ত ঔষধের খরচ নাই, ছেলেটা বখাটে হইয়া যাইতেছে, মেয়েটার বিবাহের টাকা নাই, শাশুড়ী বধূ-নির্য্যাতন করিতেছেন, কদর্য্য ভাষায় বধূর বাপান্ত করিতেছেন,—এ সকল দৃশ্য অসহ্য। কিন্তু সকল কদর্য্য দৃশ্যের মধ্যে—এই পাঁকের মধ্যে যে স্থলে পদ্ম ফুটিয়া উঠে, সে স্থলে সাহিত্যের সার্থকতা ঘটে। নিরবচ্ছিন্ন বস্তুতান্ত্রিকতাও ঠিক নহে, আবার বস্তু ছাড়িয়া কোন বিষয়ই গড়িয়া উঠিতে পারে না। ভিত্তিহীন প্রাসাদ হইতে পারে না। বাস্তবতা ছাড়িলে তাহা আজগুবি হইয়া দাঁড়ায়—তাহার প্রাণ থাকে না। কল্পনার উজ্জ্বল আলোকে তাহা মুহূর্ত্তের জন্য জ্বলিয়া উঠিলেও চিরস্থায়ী হয় না। কঙ্কাবতীর কথা বা আরব্য উপন্যাস শৈশব-কৈশোরে মন মাতাইয়া তুলিলেও তাহা শিক্ষিত মনের ক্ষুধা মিটাইতে পারে না। কল্পনাসাহিত্য বা আদর্শবাদীর সাহিত্য বস্তুতন্ত্রকে সম্পূর্ণভাবে বিদায় দিতে পারে না। সম্ভাব্য-সত্যের উপর সাহিত্যের প্রতিষ্ঠা করিয়া বস্তুতান্ত্রিকের প্রয়োগ-কৌশল ও আদর্শবাদীর মহান্ আদর্শের সম্মিলন ঘটাইতে পারিলে তবেই উচ্চাঙ্গের সাহিত্য পাওয়া যায়। সাহিত্য জীবনের ছায়াচিত্র নহে, সাহিত্যে জীবনের মধ্যে যাহা সুন্দর ও শোভন, তাহারই প্রতিবিম্ব দর্পণের ন্যায় প্রতিফলিত করিয়া থাকে।

জীবন লইয়া সাহিত্য, জীবন লইয়া কাব্য ও নাটক এবং জীবনের আলোচনাই উপন্যাস। জীবন নীতিশূন্য হইয়া চলিতে পারে না। নীতিশূন্য জীবন নিষ্ফল ও অসার, নীতিশূন্য সাহিত্যও মূল্যহীন অসার। সাহিত্য নীতি-প্রচারের উদ্দেশ্যে রচিত না হইতে পারে, কিন্তু তাহাতে দুর্নীতির প্রশ্রয় থাকিবে কেন? সাহিত্যের কার্য্য প্রচার নয় বটে, কিন্তু সাহিত্যে প্রচার থাকা সত্ত্বেও সৎসাহিত্যের অভাব নাই। অকুশল হস্তে প্রচার ধরা পড়ে, কুশল হস্তে সৎসাহিত্যের সকল দাবী বজায় রাখিয়া জীবনের নানা সমস্যা আলোচিত হয়। সাহিত্যিক স্কুলমাষ্টার না হইলেও তাহার প্রভাব স্কুলমাষ্টার অপেক্ষা বহু অধিক। সাহিত্য নীতির মূলোচ্ছেদ করিয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে না। সাহিত্যের সহিত জীবন ও নীতির সম্পর্ক অতি নিবিড় ; এ কথা অস্বীকার করিলে সত্যের অপলাপ করা হয়।*

শ্রীধীরেন্দ্রকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়। (এম এ, অধ্যাপক)

---

* এই প্রবন্ধ হডসন্ ওয়ারস্‌ফোল্ড, ডাউডেন প্রভৃতি বহু ইংরেজ লেখকের গ্রন্থ হইতে সঙ্কলিত হইয়াছে; হডসনএর Introduction to the Study of Literatureএর বহুস্থলে অনুসরণ করা হইয়াছে।

অশ্রুময়ী

(গল্প)

আর্টের কৌশল দেখাইবার জন্য এ-কাহিনী বলিতে বসি নাই। আমি মা···মায়ের মনে যে রাবণের চিতা জ্বলিতেছে অহর্নিশি······

বড় ছেলে অমল। তার যখন জন্ম হয়, সংসারে নানা অভাব, নানা অভিযোগ! এক-একটা দিন যায়, মনে হয়, বাঁচিয়া গেলাম। স্বামীর মনে দুশ্চিন্তার ছায়া! আমার মনে সদাই উদ্বেগ···প্রথম অঙ্কেই যদি জীবন-নাট্যের উপর যবনিকা পড়িয়া যায়! অর্থাৎ সামনে যতদূর দেখা যায়, শুধু অন্ধকার!

এমন দিনে অমল আসিয়া যেন সে-আঁধারে জ্যোৎস্না ঢালিয়া দিল! স্বামী আর আমি—দু'জনের সে হইল মাথার মণি! সে যা চায়, যে বায়না তোলে—তাহাই দি। না দিলে স্বস্তি পাই না! আদরের ঘটায় তার আব্‌দার বাড়িয়া চলিল সীমাহীন প্রসারে!

দুর্দ্দিনের মেঘও কাটিতেছিল···অল্প অল্প আলোর আভাস! অমলের বয়স তখন বারো বৎসর। অফিসের কাজে স্বামীকে যাইতে হইল দিল্লী, লাহোর, করাচি, বোম্বাই। মাহিনা বাড়িল। স্বামীর উপর অফিসের বিশ্বাস বাড়িল এবং দিল্লী-ব্রাঞ্চে স্বামী হইলেন কর্ত্তা।

বাড়ী, গাড়ী, টাকা সব হইল। অর্থাৎ ঐশ্বর্য্যের দীপ্তিতে—অতীত-দিনের সব কালি, সব অন্ধকার মুছিয়া গেল।

অমলের বয়স একুশ বৎসর। তার কোলে শিশির। শিশিরের বয়স ষোল। আমরা দিল্লীতে থাকি।

অমল বায়না ধরিল—জীবনে ঘৃণা ধরে গেল! ইট-কাঠের এ খাঁচা আর সহ্য হয় না! আমি মানুষ···জানোয়ার নই। কলকাতায় যাবো···এখানে এমন বেঁচে মরে আমি থাকতে পারবো না।

আমি চমকিয়া উঠিলাম, বলিলাম—উনি বলছিলেন, ওঁর সঙ্গে অফিসে বেরুতে। সাহেবরা রাজী তোমায় অফিসে নিতে।

অমল বলিল,—অফিসের দাস্য আমার পোষাবে না। আমি ব্যবসা করবো। চারুকে জানো? আমার সঙ্গে পড়তো কলকাতার স্কুলে···প্রায় আসতো আমাদের বাড়ী। সে ব্যবসা করছে···কেঁপে লাল হয়ে উঠেছে দু'বছরে। আমায় ক্রমাগত চিঠি লিখচে, এসো। আমায় পার্টনার নিতে রাজী!···আমি কল্‌কাতায় যাবো···এখানে থাকবো না।

দুটি ছেলে আমাদের চোখের তারা! তাদের ছাড়িয়া কোন্ প্রাণে বাঁচিব?

অনেক বুঝাইলাম। বলিলাম,—ব্যবসা করতে চাস, এইখানে কর্। ওঁকে বল্···এখানেও মোটরের ব্যবসা ভালো চল্‌বে।

অমল বলিল,—কল্‌কাতা ছেড়ে দিল্লী!···হুঃ! বাঙলা দেশ আমার প্রাণ। সোনার বাঙলা!

নিশ্বাস চাপিয়া বলিলাম—ওঁকে বলি।

অমল বলিল,—তোমাদের বারণ আমি শুনবো না। প্রাপ্তে তু ষোড়শে বর্ষে···ষোল পেরিয়ে আমার বয়স হলো একুশ! এখনো এমন শাসন-নিষেধ! দেহ-মন পঙ্গু, জীবন অপদার্থ হয়ে গেল! এভাবে কেউ মানুষ হতে পারে না!

বলিলাম,—ওঁর সঙ্গে কথা ক'। টাকা দেবার মালিক উনি···আমি নই। উনি যদি বলেন···

অমল ঝাঁজিয়া উঠিল, বলিল,—বলাবলি কি! আমি যাবো কল্‌কাতায় চারুর ওখানে।···প্রাণ এখানে হাঁফিয়ে

উঠেচে। তোমাদের ঐশ্বর্য্য ভোগ করে' নন্দদুলাল হয়ে গেলুম। নিজের পা দু'খানায় জোর আছে কি না, সে পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াতে পারি কি না, দেখতে চাই। ভয় নেই। টাকা এখন দিতে হবে না। আগে কাজ-কর্ম্ম শিখি, তার পর টাকা…আমায় তো ষ্টার্ট দেবে জীবনে!…আসল কথা, বাবাকে বলো, চাকরি-বাকরি আমি করবো না। কি দুঃখে করবো?

অমলকে ধরিয়া রাখা গেল না। সে কলিকাতায় চলিয়া গেল। স্বামী খরচ-পত্রের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন।

আমার মন আতঙ্কে ছমছম করিত সারাক্ষণ। আমার ছেলে অমল…আমার পেটে জন্মিয়াছে! তাকে আমি যেমন জানি,—সে নিজে তেমন জানে না! আমি জানি, দুর্ব্বল তার মন…দুর্জ্জয় তার গোঁ! যেদিকে ঝোঁকে, কার সাধ্য, ফিরায়! কলিকাতা সহর…আমি কাছে নাই…কে তাকে দেখিবে?

নিশ্বাসে-নিশ্বাসে আমার বুকখানা ভরিয়া এমন করিত! মনে হইত……

চারু ছেলেটি ভালো। যখন কলিকাতায় ছিলাম, আমাদের বাড়ী আসিত। থাকিবার মধ্যে ছিল বিধবা মা…সে মা আজ নাই!

দু'মাস পরে সুরেশ আমায় চিঠি লিখিল—অমল এখানে একটি মেয়ে দেখিয়াছে। মেয়েটি দেখিতে ভালো…ডাগর বয়স। তাকে অমলের খুব পছন্দ। সে চায় তাকে বিবাহ করিতে। তার সঙ্গে প্রায় দেখাশুনা হয়। সে আপনার অনুমতি চায়। অনুমতি পাইলে মেয়েটিকে লইয়া দিল্লীতে আসিবে। সে-মেয়ে আপনার পছন্দ হইবে নিশ্চয়।

চমকিয়া উঠিলাম। আজ তিন বৎসর ধরিয়া কত মেয়ে দেখিলাম। চমৎকার সব মেয়ে! সুন্দরী, লেখাপড়া জানে, বনিয়াদী ঘর। অমলকে কত সাধিয়াছি…এই দিল্লীরই গুণময় বাবুর মেয়ে প্রীতিকণা…কাশীর বরদা বাবুর মেয়ে সাধনা…এলাহাবাদের জয়কালী বাবুর ভাইঝী লাবণ্য-লেখা…কলিকাতার এটর্ণি শ্যামশঙ্কর বাবুর পৌত্রী দুর্গাবালা… আমার কি পছন্দই হইয়াছিল! অমলের ধনুর্ভঙ্গ পণ—না, আমি বিবাহ করিব না।…আর আজ?

মায়ের পাশ ছাড়িয়া দূরে গিয়াছে। যেমন গিয়াছে, অমনি বিবাহে সাধ! নিজে দেখিয়া পছন্দ হইয়াছে, তাই, তাই…

অভিমান? অভিমান হইল খুব—সে কথা গোপন করিব না।

এক সপ্তাহ পরে অমল আসিল দিল্লীতে; সঙ্গে সেই পাত্রী। ডাগর মেয়ে। রূপে পদ্মিনী না হোক্, দেখিতে খাশা! মুখ যেন প্রতিমার মুখ!

মেয়েটির নাম অশ্রুময়ী। নামটা ভালো লাগিল না। সাধ করিয়া মেয়ের এ নাম রাখিতে আছে?

তার পর বিবাহের কথা! মেয়ে সুশ্রী হইলেই তাকে ছেলের বৌ করা চলে? তার মা-বাপের পরিচয়…বংশের পরিচয়…কেমন লোক…কি বৃত্তান্ত…সে-সবের সন্ধান লইব না?

অমলকে বলিলাম,—মেয়ের মা-বাপ আছেন? বাপের নাম? কি করেন তিনি? তোর সঙ্গে এত-বড় মেয়েকে ছেড়ে দিলেন? এ-সম্বন্ধে তাঁরা আমাদের কোনো চিঠি লিখলেন না কেন?

অমল বলিল—অত খপর আমি নিইনি। তাদের আমি চিনি না। আমি জানি শুধু এই অশ্রুকে। ওর সঙ্গে প্রথম দেখা ট্রামে…আমি সিনেমা দেখে ফিরছি… সেই ট্রামে ছিল অশ্রু। কণ্ডাক্টার টিকিট দিতে এলো; টিকিটের দাম দিতে গিয়ে দেখে, পার্শ নেই! দারুণ-অপ্রতিভ…মুখ-চোখ রাঙা হয়ে উঠেছে! ব্যাপার বুঝে আমি করি ওকে সে-দায়ে উদ্ধার। সেই থেকে জানাশোনা। অশ্রু থাকে "পান্থ-নিবাসে"। অশ্রুর মামার হোটেল…আর মেয়ে পড়ায় পাড়ার একটি গার্ল-স্কুলে…ব্যস্!

আমি বলিলাম—মা-বাপ?

অমল বলিল—আছে, শুনেছি। কিন্তু কে তাদের খপর রাখে!…শুধু একটা খপর নিয়েছি, জানি তো তোমাদের কাণ্ড…ওরা হলো গাঙ্গুলি…আমরা ব্যানার্জ্জী। তোমাদের শাস্ত্রে বাধবে না—ব্যস্!

আমার মনের দ্বিধা তবু ঘুচিতে চায় না। ছেলের বিবাহ দিতে বসিয়া পাত্রীর মা-বাপের পরিচয় লইব না?

বলিলাম,—তবু মা-বাপের খপর একটা চাই তো…

কাঁদিয়া অমল বলিল,—কেন? আমি তো মা-বাপকে বিয়ে করচি না···বিয়ে করচি অশ্রুকে। অশ্রুকে আমি চিনি, জানি···ব্যস্!

ছেলের যে-ভাব দেখিলাম,···কিন্তু অসঙ্গত আব্দার! স্বামী বলিলেন,—ছেলেবেলা থেকে যেমন গড়েচো···

•

অশ্রু মেয়েটি ভালো। তাকে আমি সত্যই ভালো-বাসিয়াছি। কিন্তু বিবাহ তো শুধু খেলা আর ভালোবাসার বস্তু নয়! এর পিছনে আছে পাঁচ জন···পিছনে আছে সমাজ!

অমল বলিল,—কবে বিয়ে দিচ্ছ, বলো···

বলিলাম,—দাঁড়া! পাঁজি দেখাই। তাছাড়া ওঁর একটা ইজ্জৎ আছে···লোকজন নিমন্ত্রণ আছে···পাঁচটা আয়োজন আছে।

অমল বলিল—আয়োজন আবার কি! বিয়ে···এ তো মিউনিসিপাল ইলেক্‌শন্ নয় যে ভোটারদের বাড়ী-বাড়ী গিয়ে গলবস্ত্র হয়ে খোসামোদ করার দরকার। তোমাদের সব বিশ্রী!··· এই জন্যেই তো···

ছেলের সঙ্গে আলোচনা নিষ্ফল! অশ্রুর কাছে কথাটা পাড়িলাম। বুঝাইয়া তাকে বলিলাম—তোমার মা-বাবা আছেন, অশ্রু···তোমরা যতই বড় হও, স্বাধীন হও, নিজেদের মতে যতই চলো, বাঙালীর ঘরে বিয়ের ব্যাপারে মা-বাপকে ছেঁটে কাজ করা উচিত হবে না। তোমার মামার কাছে তুমি থাকো···তাঁর মত আছে, বলচো··· মানি। কিন্তু মা-বাপ···তাঁদের একবার খপরটা দেওয়া উচিত তো!

বিনয়-নম্র ধীর বচনে অশ্রু বলিল,—বাবা থাকেন রাণাঘাটে। সামান্য চাকরি করেন। ভাই-বোন আমার আটটি। দিদিমার অসুখ হতে আমি আসি কলকাতায় দিদিমার সেবা করতে। তখন আমার বয়স আট বৎসর। তারপর দিদিমা মারা গেল···আমি আর মা-বাপের কাছে ফিরিনি···মা-বাপও আমায় ফিরে যেতে বলেনি! সেই অবধি আছি মামার বাড়ী। মামার একটি হোটেল আছে—পান্থ-নিবাস। তার উপর আমি জগদম্বা বালিকা-বিদ্যালয়ে মেয়ে পড়িয়ে কুড়ি টাকা মাহিনা পাই। হোটেলের উপরি-কাজ দুচারটে করতে হয়···পয়সার জন্যে। অবস্থা খারাপ। পয়সা চাই!···

বড় করুণ ইতিহাস! এ ইতিহাস বলিতে অশ্রুর চোখ ছলছলিয়া উঠিল। আমারো বুকে অশ্রুর তরঙ্গ-দোলা!

নিশ্বাস চাপিতে পারিলাম না। বলিলাম—অমলের সঙ্গে বিয়ে হচ্ছে শুনলে তোমার মা-বাপ খুশী হবেন, মা।··· তুমি তোমার বাবার নাম ঠিকানা দাও··· উনি তাঁকে চিঠি লিখবেন।···তোমার বাপের মত নিতে হবে—নেওয়া দরকার। সামাজিক দিক থেকে দরকার—নিজেদের দিক থেকেও দরকার।···তাঁরা যদি এত দুঃখ-কষ্টে আনন্দ পান··· তুমি মেয়ে, তোমার তা করা উচিত। না করলে পাপ হবে।

অশ্রু বসিয়া রহিল বহুক্ষণ নিস্পন্দ, স্থির! তার পর নিশ্বাস ফেলিয়া তার বাপের নাম ঠিকানা লিখিয়া দিল—শ্রীযুক্ত বাবু জহরলাল গাঙ্গুলি···শিবতলা, রাণাঘাট।

স্বামী চিঠি লিখিলেন—যথারীতি অনুমতি চাহিয়া, নিমন্ত্রণ করিয়া। ছেলেমেয়েদের লইয়া কবে এখানে আসিবেন জানাইলে মর্য্যাদা-স্বরূপ স্বামী টাকা পাঠাইয়া দিবেন, এ কথাও চিঠিতে লিখিয়া দিলেন।

অবস্থা ভালো নয়। এতদূরে আসিতে ট্রেণ-ভাড়া তো অল্প লাগিবে না!···নিজেরা, আটটি ছেলে-মেয়ে···

চিঠি গেল।···এক সপ্তাহ, দু'সপ্তাহ কাটিল··কোনো জবাব আসিল না। স্বামীর লেখা চিঠি ফেরতও আসিল না।

অমলের অধীরতা দেখে কে? সে বলিল,—অশ্রুকে কত দিন এমন অনুগ্রহ-প্রত্যাশী বসিয়ে রাখবে তোমাদের বাড়ী? ধনী না হলেও ওর মান-ইজ্জৎ আছে। ভিখিরী নয়! আসল কথা, অশ্রু ছাড়া আর কোনো মেয়েকে আমি বিয়ে করবো না···তা সে ইরাণের বাদশাজাদী হোক কি রাশিয়ার রাজকন্যা হোক!

উপায় নাই! অশ্রুর সেই অশ্রুময় করুণ কাহিনী··· মা-বাপ যদি মেয়েকে ছাঁটিয়া আরাম পায়—মেয়ের দোষ? মেয়ে ভাসিয়া যাইবে? বিশেষ, এমন মেয়ে···

ছেলের বিবাহ দিয়া আমি তো মেয়ের বাপের কা[illegible] মলিয়া পয়সা রোজগার করিতে চাহি না! ভগবা[illegible] যা দিয়াছেন,···এমন মেয়েকে যদি আমি না ঘরে লই·· পয়সার অভাবে এ মেয়ের যোগ্য বর হয়তো মিলিবে না·· তার জীবনটা ব্যর্থ হইয়া যাইবে? তার উপর ছে[illegible]

তাকে চায়। এ-মেয়েকে না পাইলে ছেলে যে কি করিয়া বসিবে—কি যে না করিবে ··ভাবিলে শিহরিয়া উঠি।

অশ্রুকে যদি আমি না পাই,—অমল তাকে বিবাহ করিবেই···পড়ি তো গল্পে-উপন্যাসে। তাছাড়া এ বয়সে মামার হোটেলে দাস্ত করিয়া অশ্রু দিন কাটাইবে!

ব্যথায়-বেদনায় বুক ভরিয়া উঠিল।···অনুকম্পা, মায়া, স্নেহ, মমতা···বুক জুড়িয়া মস্ত কলরব তুলিল।

স্বামীকে প্রশ্ন করিলাম,—হ্যাঁ গা, তুমি কি বলো?

স্বামী বলিলেন,—মেয়েটিকে ছাড়তে মন চায় না। বড় ভালো মেয়ে···এ্যাদ্দিন তো নিয়ে ঘর করলে। কোনো দোষ দেখেচো?

কহিলাম—না।···

তবু মনের এক কোণে কেমন যে সংশয়ের একটু রেখা···এত দিন এ-মেয়ে···ডাগর মেয়ে···তার উপর চাকরি করে!

এমন মেয়ের কল্পনা তো কখনো করি নাই।

কিন্তু নিরুপায়! ছেলে অমলের তৃপ্তি···বেচারী অশ্রু!

শুভদিন দেখিয়া ছেলের বিবাহ দিলাম অশ্রুর সঙ্গে। অশ্রু হইল আমাদের বুকের মণি!···

অমল বলিল—এইখানেই মোটরের কারখানা খুলি, মা। তুমি তো ছেড়ে দেবে না, জানি।···তাছাড়া বিদেশে অশ্রুই বা কার কাছে থাকবে···একলা! ও চায় এখানে থাকতে; কলকাতায় যেতে চায় না।

অশ্রু এখানে থাকিতে চায়, তাই!···মা আজ কেহ নয়!

তাই হোক্! ছেলেমেয়ে যত দিন ছোট থাকে, তত দিনই মায়ের খোঁজ করে। হায়রে, তার পর মায়ের কাজ যায় ফুরাইয়া···মাকে আর প্রয়োজন হয় না!

নির্মল আকাশ···আলোর দীপ্তিতে ভরিয়া আছে। কোথাও তার মেঘের ছায়া নাই!

অমল কাজে নামিয়াছে। চকের কাছে মোটরের মস্ত কারখানা। আর অশ্রু···

স্বামী বলেন,—পরের মেয়ে···এত তার মায়া! এত যত্ন!···আমার নিজের মাকে যেন আবার ফিরে পেয়েছি!

শুনি। আমার মুখে কথা ফোটে না। ঠাকুরকে উদ্দেশে প্রণাম করি, প্রণাম করিয়া বলি—তোমার করুণার সীমা নাই, ঠাকুর···

তবু যেন ছায়া! ছায়ার মতো অশ্রু নিজেকে রাখিয়াছে সারাক্ষণ আমার পাশে। হাসি-খুশীর মাঝেও তার মুখখানি দেখি, মলিন হইয়া আছে!···যখন একলা থাকে, দেখি, কখনো বসিয়া আছে জানালার পাশে উদাস নয়নে চাহিয়া আছে আকাশের পানে! কখনো দেখি, ছাদে গিয়া আলিশায় হাত রাখিয়া চাহিয়া আছে সুদূর দিগন্তের পানে···

ডাকি,—অশ্রু···মা···

চমকিয়া অশ্রু আমার পানে ফিরিয়া চায়। যেন ঘুমের ঘোরে স্বপ্ন দেখিতেছিল—আমার আহ্বানে ঘুম ভাঙ্গিয়া গিয়াছে···সেই সঙ্গে স্বপ্ন! এমনি ভাব!

বলি,—কি তুমি এত ভাবো, মা?

অচপল নেত্রে অশ্রু আমার পানে চাহিয়া থাকে···দুটি চোখের তারায় রাজ্যের দুশ্চিন্তা যেন মাখানো!

তাকে বুকে টানিয়া আদর করিয়া বলি,—বলো। মা-বাপের জন্যে মন কেমন করচে?

নিশ্বাস ফেলিয়া অশ্রু জবাব দেয়,—না।

আতঙ্কে তার সোনার বর্ণ নীল হইয়া ওঠে!···আমার বুকে সে মুখ লুকায়, ফুঁপাইয়া কাঁদে।···

আমি বলি,—কি হয়েছে মা?···অমল বকেছে? তার সঙ্গে···

মুখ তুলিয়া মাথা নাড়িয়া অশ্রু জবাব দেয়,—না, না···

তার স্বর গাঢ়···দু'চোখে জল-ধারা!

আমার বুক ব্যথায় টনটনিয়া ওঠে। অশ্রুর চোখে জল কেন?

কেন?···মনে তার কি এমন বেদনা?···

চুপ করিয়া থাকি বহুক্ষণ। নিত্য এমন ঘটে।

সেদিনও। অশ্রুকে বলিলাম,—গাড়ী বার করতে বলি··· চলো, দুজনে বেড়িয়ে আসি সেই যমুনার ধার পর্য্যন্ত।

শিশির এখানে নাই। সে লাহোরে পড়িতেছে মেডিকেল কলেজে।

অশ্রুকে লইয়া বেড়াইতে বাহির হইলাম। নয়া দিল্লী, পুরানো দিল্লী, কোর্ট···সব ঘুরিয়া শেষে আসিলাম কুতবের কাছে।

আকাশ-ভরা জ্যোৎস্নার বন্যা · সবুজ ঘাসে-ছাওয়া প্রশস্ত অঙ্গন···

অশ্রুকে বলিলাম,—এসো, এখানে একটু বসি।

অশ্রু নামিল। আমি নামিলাম। দুজনে বসিলাম তৃণ-শয্যায়।

অশ্রুর মুখ···জ্যোৎস্নার আলোয় দেখি, বিবর্ণ, মলিন!

বুকখানা ছ্যাঁৎ করিয়া উঠিল। কি কথা বলিয়া তার মুখে ভাষা ফুটাইব, ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিলাম না।

বহুক্ষণ কাটিল···নীরবে।

শেষে বলিলাম,—তোমার কোনো অসুখ করচে?

সংক্ষেপে অশ্রু বলিল,—না।

বলিলাম,—শোনো অশ্রু, তুমি জানো, আমার মেয়ে নেই। তোমাকে পেটের মেয়ে বলে জানি। ক'দিন ধরে দেখচি, তোমার মুখ শুকনো···কি এত ভাবো, বলো তো?···যেন কত ব্যথা! বলো মা, আমার ভাবনা বুঝচো না? আমি মা···

অশ্রু মাথা নামাইল···তার পর অতি কষ্টে নিশ্বাস চাপিয়া বলিল,—কোনো অসুখ নয়, মা···

—তাহলে···?

ভাবিলাম, হয়তো সন্তান-সম্ভাবনার প্রথম বেদনা-ভার!

ইঙ্গিতে সে-কথা তুলিলাম। সলজ্জ-সঙ্কোচে মৃদু-ভাষে অশ্রু বলিল,—না।

তবে···কি?

চোখে সেই জল-ধারা! অশ্রুকে বুকে চাপিয়া ধরিলাম। দূরে কে গান গাহিতেছিল···

সহসা অশ্রু বলিল,—বাড়ী চলুন মা···আমার ভালো লাগচে না।

বলিলাম,—তাই চলো। বাড়ী গিয়ে ডাক্তারকে ডাকিয়ে পাঠাই।

অশ্রু বলিল,—না, না···ডাক্তারে কি করবে, মা?

তার স্বর কাঁপিয়া ভাঙ্গিয়া চূর্ণ হইয়া গেল।

ভাবিলাম, গৃহে ফিরিয়া অমলের সঙ্গে একবার···

গৃহে ফিরিলাম। অমল তখনো আসে নাই।···

সে ফিরিল অনেক রাত্রে। আমি বসিয়াছিলাম দোতলার খোলা বারান্দায়। অমল আসিল, ডাকিল—মা···

বলিলাম,—অমল!···আয় বাবা, বোস্ এখানে আমার কাছে।

অমল বসিল।

বুঝিলাম, সে আসিয়াছে অশ্রুর কথা বলিতে। জানি,—অশ্রু-অন্ত প্রাণ! অশ্রুকে সে কতখানি ভালোবাসে··· দুটিতে কি গভীর প্রীতি ভালোবাসা···আমি জানি।

অমল বলিল,—অশ্রুর কি হয়েচে, বলো তো মা···চোখে জল···কি ও ভাবে!···জিজ্ঞাসা করি। কিছু বলে না—শুধু মুখের পানে চেয়ে থাকে।···কাল রাত্রে হঠাৎ আমার ঘুম ভেঙ্গে যায়···দেখি, অশ্রু বিছানায় নেই···মেঝেয় উপুড় হয়ে পড়ে আছে। ডাকলুম···ধরে তুললুম। চোখ জলে ভরা, মুখে-চোখে কালির রেখা! জিজ্ঞাসা করলুম—কি হয়েচে? কোনো জবাব দিলে না। আমার কথায় ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলো।···আজ এখন ঘরে ঢুকে দেখি, জানলায় বসে কাঁদচে অঝোর-ধারে!···যত জিজ্ঞাসা করি, কি হয়েছে? ···কোনো জবাব দেয় না।

আমি বলিলাম,—এই কথাই তোকে জিজ্ঞাসা করবো বলে বসে আছি, অমল।···এ চোখের জল আমিও দেখেছি···জিজ্ঞাসা করে' কোনো জবাব পাইনি।···তুই বকেচিস-টকেচিস? কিম্বা···

—বকেচি!

অমলের স্বরে একরাশ বিস্ময়!

চোখের জল কেন—জানা গেল না। স্বামীকে বলিলাম—তিনিও আদর করিয়া অশ্রুকে বহু প্রশ্ন করিলেন। কিন্তু কোনো জবাব নাই! শুধু অশ্রু আর অশ্রু! ভাবিলাম, এইজন্যই মা-বাপ তোমার নাম রাখিয়াছে অশ্রুময়ী!

পরের দিন সকালে পুঁটি দাসী আসিয়া বলিল—পাঁচদিন আগে ডাকে একখানা চিঠি আসে বৌদির নামে।···সে চিঠি আমি নিয়ে গিয়ে বৌদিকে দিই। সেই চিঠি পড়ে বৌদির মুখ হয়ে গেল পাঁশের মতো! দেখে আমি শিউরে উঠলুম। জিজ্ঞাসা করলুম,—কোনো মন্দ খপর, বৌদি? যে-চোখে বৌদি আমার পানে তাকালো·· তা আমি কখনো ভুলবো না, মা। বৌদি যেন ভূত দেখেচে···না, কি!

চিঠি!···পুঁটিকে বলিলাম,—এ কথা আমায় বলিস্ নে কেন?

পুঁটি বলিল—বৌদি যখন বললে না কার চিঠি, কি চিঠি…ভাবলুম, তেমন কিছু খপর নয়, বুঝি! তাছাড়া সেদিন আমি নিজের কাণে শুনেছি মা, দাদাবাবু কত মিনতি করে বৌদিকে বলচেন,—কি হয়েছে, বলো আমায়! তা বৌদি কোনো জবাব দিলে না।

পুঁটিকে বলিলাম—তুই যা পুঁটি…

পুঁটি চলিয়া গেল।

ভাবিলাম, কি চিঠি? কার চিঠি?

অশ্রুকে প্রশ্ন করিলাম,—ক'দিন আগে ডাকে কি চিঠি পেয়েচো, মা?

অশ্রু যেন কাঁপিয়া উঠিল! তার মুখ হইতে রক্ত সরিয়া গেল…যে-মুখে অমন রক্ত-কমলের আভা…নিমেষে সে মুখ দেখি, কাগজের মতো সাদা!…

অশ্রু চক্ষু মুদিল। ভাবিলাম, এখনি বুঝি মাথা ঘুরিয়া পড়িয়া যাইবে! তাড়াতাড়ি ধরিয়া তাকে বুকে লইলাম। কহিলাম,—কার চিঠি?

অশ্রু কাঁদিয়া একেবারে আমার পায়ে লুটাইয়া পড়িল… ডাকিল,—মা…মা…তুমি আমার মা…আমার সত্যি-কারের মা!

আমি বলিলাম,—তাই…আমি তোমার মা। বলো আমায়, কি হয়েছে। ভয় নেই। যদি কোনো খারাপ খপর পেয়ে থাকো… মনে পুষে রেখে কষ্ট পেয়ো না! আমি মা…আমায় বলো সব কথা খুলে।

অশ্রু কোনো কথা বলিল না…দুটি ঠোঁট কাঁপিতে লাগিল, বাতাসের দোলায় কিশলয়ের মতো! মুখে কথা নাই! দু'চোখের দৃষ্টি আমার পানে…চোখে জলের ধারা নির্ঝরের মতো ঝরিতেছে!

কত আদর…কত সাধনা!

অশ্রু বলিল—এ-কথা কেউ বুঝবে না, মা…আমার বড় ভয় করে!

কি কথা? কিসের ভয়?

আমার পায়ে অশ্রু লুটাইয়া পড়িল।

বলিলাম,—আর কেউ জানবে না। আমায় বলো। মা আর মেয়ে ছাড়া এ কথার বাষ্পও কেউ জানবে না!

অশ্রু বলিল না। তার চোখে শুধু অশ্রুর পাথার! কত সাধনা, কত আশ্বাস, কত প্রবোধ! কহিলাম,—বলো মা, বলো কোনো ভয় নেই। আমি তোমায় বুক দিয়ে রক্ষা করবো।

অশ্রু বলিল—তোমায় বলবো মা সব কথা।…কোনো কিছু গোপন করবো না!

অশ্রুর চোখের জল মুছাইয়া দিলাম। অশ্রু বলিল,—অনেক দিন আগে…

কথা আর অগ্রসর হইল না; বন্ধ হইল অমলের অতর্কিত আগমনে।

এখন ভাবি, যদি সে না আসিত! যদি সে অশ্রুকে সঙ্গে লইয়া বেড়াইতে না বাহির হইত! হয়তো এমন ঘটিত না!…

রাত্রি প্রায় আটটা। স্বামীর কাছে বসিয়া আছি… বাড়ী মেরামতের জন্য কাল মিস্ত্রী আসিবে, কোন্ দিকে তারা কি কাজ সুরু করিবে, তাহারি আলোচনা হইতেছিল।

পুঁটি আসিয়া হাজির। বস্ত ভাব। অধীর আগ্রহে সে প্রশ্ন করিল,—বৌদি…?

চমকিয়া উঠিলাম। কহিলাম,—ঘরে নেই? একটু আগে দেখে এলুম, বিছানায় শুয়ে আছে। ভাবলুম, ঘুমোচ্ছে তাই ডাকিনি।

পুঁটি বলিল—ঠাকুর খাবার দেছে। তাই ডাকতে এসেছিলুম।…কোথাও দেখতে পাচ্ছি না, মা…

পুঁটি বলে কি?

স্বামী স্ত্রী…দুজনে আমরা তখনি আসিলাম অশ্রুর ঘরে। অমল তখনো আসে নাই। কারখানায় ক'দিন কাজ খুব বেশী…তার ফিরিতে রাত হয় প্রত্যহ।

আলো জ্বালিলাম। না, অশ্রু নাই! বিছানার উপর পড়িয়া আছে একখানা চিঠি…খামে মোড়া। খামে কাহারো নাম নাই।

খাম ছিঁড়িয়া চিঠি বাহির করিলাম। অশ্রুর লেখা। লিখিয়াছে,—

> আমাকে কি না দিয়াছিলে! কিন্তু জানিতে না, আমি কত বড় শয়তানী। তবু ওগো, তবু একটু সদয়-হৃদয়ে আমার বিচার করিয়ো।
>
> এখানে থাকিবার যোগ্যতা আমার নাই। আমার কোনো সন্ধান করিয়ো না।

সকলের পায়ে আমার কৃতজ্ঞ প্রাণের অজস্র প্রণাম রাখিয়া গেলাম।

অশ্রু

নভেলের মতো এ কি চিঠি! এ চিঠির মানে? এখানে থাকিবে, সে যোগ্যতা তার নাই! আমাদের এত আদরের অশ্রু!

চোখের সামনে হইতে ছুনিয়া মুছিয়া বিলুপ্ত হইয়া গেল! অশ্রু! অশ্রু! অশ্রু!

চারি দিকে লোক ছুটিল অশ্রুর সন্ধানে। অমল যেন পৃথিবী চষিয়া ফেলিল! কোথাও অশ্রুর দেখা মিলিল না। ক'দিন পরে যে-খপর মিলিল...

মর্ম্মান্তিক ট্রাজেডি...সেই সঙ্গে কতখানি লজ্জা!

ডাকে চিঠি আসিল অশ্রুর নামে।

সে চিঠি খুলিলাম। তাহাতে লেখা—

> চমৎকার খেল খেলিয়াছ শ্রীমতী হৈমবতী! নাম বদলাইয়া এখন হইয়াছ শ্রীমতী অশ্রুময়ী! খুব বড় ঘরে গিয়া বৌ সাজিয়াছ! বেশ! বেশ! তোমার মামার কাছে সন্ধান পাইয়াছি। আগে তোমাকে লিখিয়াছি,—এবারও লিখিতেছি,—আমাদের কি ব্যবস্থা করিবে?

চিঠিতে লেখা সে-সব লক্ষ্মীছাড়া কথা তুলিতে চাই না। চিঠি পড়িয়া এবং অশ্রুর মা-বাপ ও মামার কাছ হইতে যে-সংবাদ মিলিল...

অর্থাৎ মামার বাড়ীতে থাকিয়া অশ্রু করিত সংসারের দাস্য...গার্ল স্কুলে মাষ্টারী। লেখাপড়া শিখিয়াছিল—এদিকে তার ঝোঁক ছিল অনেক খানি। অশ্রু তার আসল নাম নয়। এ নাম সে নিজে লইয়াছে: মা-বাপের দেওয়া নাম—হৈম।

মামার বাড়ীতে হৈম ডাগর হইয়া উঠিল। মামার সঙ্গতি নাই, তার বিবাহ দেয়। নিজের মেয়ে নয়... ভাগিনেয়ী! এ যুগে কোন্ মামা গাঁটের পয়সা খরচ করিয়া ভাগিনেয়ীর বিবাহ দেয়!

এমন সময় জুটিয়া গেল পাড়ায় এক লক্ষ্মীছাড়া পাত্র। তার নাম নারাণ। বখার শিরোমণি! নারাণের বাপের ছিল হোটেল। অশ্রুর রূপে নারাণ ক্ষেপিয়া উঠিল। মামার দ্বারে ধর্ণা দিত নিত্য। মামা যা হুকুম করিত, তাহাই পালন করিত। যেন মামার পোষা কুকুর!

মামা দাঁও বুঝিল। নারাণ বলিল, অশ্রুকে সে বিবাহ করিবে! মামা সে-কথা কাণে তোলে না। নারাণ লোভ দেখাইল। শেষে মামা বলিল,—এমন সুন্দরী মেয়ে... আমায় কি দাম দিবে?

হোটেলটা নারাণ লিখিয়া দিল দলিল রেজেষ্ট্রী করিয়া মামার নামে—বিক্রয়-কোবালা। মামা একটি পয়সা দিল না। হোটেলের বদলে দিল হৈমকে তুলিয়া নারাণের হাতে। বিবাহ হইয়া গেল।

কিন্তু হতভাগা বখা পাত্র—হৈমর তাকে মনে ধরিবে কেন? মামার বাড়ী মানুষ হইলেও তার তেজ ছিল প্রচণ্ড। স্বামীর হাতে নিজেকে সে ধরা দেয় নাই—তার শয্যা সে স্পর্শ করে নাই কোনো দিন! এ জন্য বিরোধ-কলহের সীমা ছিল না। নারাণ সে-জন্য মামাকে প্রহার করিতে ছাড়ে নাই। অশ্রুও প্রহার খাইয়াছে অসহ্য রকম! হাতে ছিল কাটা দাগ—লক্ষ্য করিয়াছি। প্রশ্ন করিয়াছিলাম অশ্রুকে; সনিশ্বাসে সে জবাব দিয়াছিল,—একবার চোর আসিয়াছিল...

এইটুকু মাত্র!

ছ'মাস পরে প্রহারে-প্রহারে পীড়নে নির্য্যাতনে এক গণিকাকে হত্যা করিবার অপরাধে নারাণের হয় পাঁচ বৎসরের জেল। মামা নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচে। হোটেলটি দান করিলেও নারাণের খেয়াল-আবদার মিটাইতে মামাকে বেগ বড় অল্প সহিতে হইত না!

আপদ কাটিলে হৈমকে মামা দেয় পাড়ার বালিকা-বিদ্যালয়ে মাষ্টারী করিতে...

দিন কাটিয়া যাইতেছিল। তার পর দৈবক্রমে ট্রামে একদিন অমলের সঙ্গে অশ্রুর দেখা।

রূপে-গুণে লক্ষ্মী মেয়ে...অমল বিমুগ্ধ হইবে, তাহাতে বিস্ময়ের কিছু ছিল না! অমল বিবাহের প্রস্তাব করিল। অশ্রু সে প্রস্তাবে কাঁপিয়া উঠিল।...

কি তার সঙ্কোচ...কুণ্ঠা! অথচ তার সদ্য-ফোটা তরুণ জীবন...

খবর আসিয়াছিল, নারাণ নাকি জেলে মারা গিয়াছে।

মামা-মামী অশ্রুকে বুঝাইয়াছিল—সে কি তোর স্বামী? তাছাড়া সে আজ বাঁচিয়া নাই! এমন সুযোগ

…বিধবা-বিবাহ তো সমাজে চলিতেছে! তবে?…তোর সারা জীবন মিথ্যা হইবে কি অপরাধে?

মামা-মামী না কি অমলকে এ-কথা বলিতে চাহিয়াছিল…কিন্তু অমল তখন বিহ্বল, উন্মাদ…কোনো কথা কাণে তুলিতে চায় না!

কাজেই…

মামার হোটেলে অমল বসিয়া থাকিত নিত্য-দিন। অশ্রু তার সর্ব্বস্ব! বেচারা অশ্রু জীবনে কোনো দিন আদর ভালোবাসা পায় নাই।

মামা বলিল—তার কি অপরাধ বলুন? অপরাধ আমার। শুধু মেয়েটা সুখী হইবে ভাবিয়াই…তাছাড়া কোথায় দিল্লী…কোথায় কলিকাতা। কে বা জানিবে? লোকের ঘর পুড়িয়া ছাই হইয়া গেলে সে যে আবার নূতন ঘর বাঁধিয়া জীবন-যাত্রা নূতন ভাবে সুরু করে! স্ত্রী মন্দ হইলে পুরুষ-মানুষ সে আবার বিবাহ করিয়া নূতন স্ত্রী ঘরে আনে! অশ্রু যদি…

মামা বলিল,—জীবনে অশ্রু কি পাইয়াছে? কেন সে পাইবে না, যা পাইবার যোগ্যতা তার আছে?

কিন্তু নারাণ না কি মরে নাই। যে-খপর পাওয়া গিয়াছিল, মিথ্যা গুজব! জেল হইতে সম্প্রতি সে ফিরিয়াছে। ফিরিয়া কি তার জুলুম-জবরদস্তি! তবু দিল্লীর কথা, অশ্রুর কথা মামা প্রকাশ করে নাই। দিল্লীর কথা বলিয়াছে নারাণের এক বখা ইয়ার দুলো…নারাণ জেলে যাওয়া ইস্তক সে ফিরিত এই অশ্রুর লোভে! কি জ্বালাতন করিত! হতভাগা শয়তান…

অশ্রুর জীবনের ইতিহাস আমার বুকে রক্তের অক্ষরে লেখা আছে। সে লেখা মুছিবার নয়!

অমল?

তার মুখের পানে মা আমি চাহিতে পারি না! অমল বলিতেছিল—তাকে যদি আমি পাই মা,…না হয় সমাজে থাকবো না! না হয় তোমাদের সঙ্গে এক বাড়ীতে থাকবো না!…তোমরা আমাদের ত্যাগ করবে না তো…ভালোবাসো!

এমনি কত কথাই বলে!

আমি চুপ করিয়া বসিয়া সে-সব কথা শুনি। কি বলিয়া তাকে কি-বা বুঝাইব? অশ্রু কি বাঁচিয়া আছে?

তবু অমল অশ্রুর আশা ত্যাগ করে নাই…আজো তার সন্ধান করে। রাত্রে হঠাৎ ধড়মড়িয়া উঠিয়া কোথায় চলিয়া যায়…সকালে ফিরিয়া আসে মলিন মুখে। আমার কোলে মাথা রাখিয়া বলে,—রাত্রে যেন পষ্ট শুনলুম মা, আমায় সে ডাকচে!…গিয়েছিলুম। সত্য নয়, স্বপ্ন!

ছেলের মুখের পানে চাহিয়া আমি শিহরিয়া উঠি! কোথায় গেল তার সে স্বাস্থ্য…সে শ্রী……

পাগল হইয়া আছে সে অশ্রুর জন্য! কিন্তু তাকে পাইব কি? যদি পাই…

মিথ্যা আশা! নিত্য ভাবি, কাল সকালে উঠিয়া হয়তো দেখিব, অশ্রু আসিয়াছে!…ছলনা! অশ্রু আসিবে না…আসিতে সে পারে না! সে যে বড় ভালো মেয়ে ……মান-ইজ্জতের দাম কতখানি, অমল না বুঝুক, অশ্রু বোঝে!

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

সুভদ্রার প্রতি উত্তরা

সোনার কাঁকন খুলে দাও মা গো, কপাল পুড়েছে মোর।
সীঁথির সিঁদুর দাও গো মুছিয়া অভাগিনী বধূ তোর॥

রাজবধূ আমি নহি মা গো, আজি হয়েছি ভিখারী দীনা।
কি কায আমার মণিময় হারে, আমি যে মা স্বামিহীনা॥
কাঁদিছ মা, কাঁদ, পুত্রহারা তুমি, কাঁদ মা আমার সাথে।
রোদনের রবে ভুবন ভরুক, আজি এ আঁধার রাতে॥

কাঁদিছে আকাশ, কাঁদিছে বাতাস, কাঁদে গো চন্দ্র-তারা।
গভীর রাত্রি কহিছে মা, কাঁদি' উত্তরা স্বামী-হারা॥
যে দিকে তাকাই মনে হয় মা গো কোনো খানে নাই আলো।
আঁধার সকলি, হেরি চারি দিকে সব যেন আজি কালো॥

শ্রীমতী শেফালী দেবী।

হুগলী জেলার ইতিহাস

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

চুঁচুড়া

ভারতের সঙ্গে বিদেশীয় বাণিজ্য অতি প্রাচীন কাল হইতেই চলিয়াছিল। পাশ্চাত্য জাতির মধ্যে পর্ত্তুগীজই সর্ব্বপ্রথম জলপথে ভারতের পথ আবিষ্কার করেন। ভাসকো-ডি-গামাই ১৪৯৮ খৃষ্টাব্দে প্রথম কালিকটে আসেন। ইহার পর দিনেমারগণ ১৬১২ খৃষ্টাব্দে এবং সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজও ভারতে আসেন। ১৬১৬ খৃষ্টাব্দে ডচ্ বা ওলন্দাজ কোম্পানী ভারতে আসে।

ওলন্দাজদিগের হুগলী বা চুঁচুড়ায় আসিবার সম্বন্ধে অনেকগুলি মত আছে। হুগলী ডিষ্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার প্রণেতা ওমেলি সাহেব বলেন, "The earliest record of the arrival of watch ships in the North of the Bay in 1615" কিন্তু ডচ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ১৬১৫ খৃষ্টাব্দে গঠিত হয়, সুতরাং ১৬১৬ খৃষ্টাব্দে এখানে আসাই সম্ভব। Calcutta Review of the 1845 লিখিয়াছেন যে, ডচগণ ১৬৯৮ খৃষ্টাব্দে হুগলীর নিকট গোঁদলপাড়ায় আসিয়া বাস করে। কিন্তু ইহা সমীচীন বলিয়া মনে হয় না। কারণ, চুঁচুড়ার ওলন্দাজগির্জ্জাভ্যন্তরে একখানি চর্ম্মফলকে এক জন ডচ শাসনকর্ত্তার ১৬৬৫ খৃষ্টাব্দে মৃত্যুর কথা লেখা আছে। ওলন্দাজগণ দিল্লীর বাদশাহের নিকট হইতে ৪ খানি 'ফরমান' বিভিন্ন সময়ে পাইয়াছিলেন। প্রথম ফরমান ১৬৩৮ খৃঃ, ২য় ফরমান ১৬৫০ খৃঃ, ৩য় ফরমান ১৬৬২ খৃঃ এবং ৪র্থ বা শেষ ফরমান ১৭১১ খৃষ্টাব্দে পাইয়াছিলেন। অরমি সাহেব বলেন, ডচরা ১৬২৫ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালায় আসিয়া বাস করে। চুঁচুড়া ইংরেজের দখলে আসিলে ঐ ফরমানগুলি "Presidency Committee of Records"এর নিকট পাঠাইয়া দেন।

আরঙ্গেবের রাজত্বকালে ১৬৯৫-৯৬ খৃষ্টাব্দে শোভাসিং বর্দ্ধমান আক্রমণ করেন। পাঠান রহিম খাঁ উড়িষ্যা হইতে আসিয়া তাঁহাকে সাহায্য করে। বর্দ্ধমানের রাজা কৃষ্ণরাম * ঐ যুদ্ধে নিহত হন। এই সময়ে বাঙ্গালার নবাব ইব্রাহিম খাঁ। ওলন্দাজ, ফরাসী ও ইংরেজ আত্মরক্ষার্থ ও বাণিজ্যরক্ষার্থ কেল্লা নির্ম্মাণ করিবার জন্ত নবাবের নিকট হুকুম চাহিলেন। নবাব কেল্লা-নির্ম্মাণে হুকুম দিলেন। এই সুযোগে ওলন্দাজ চুঁচুড়ায় Fort Gustavas, ফরাসী চন্দননগরে Fort Orleans এবং ইংরেজ কলিকাতায় Fort William কেল্লা নির্ম্মাণ করিলেন। এই ঘটনা ১৬৯৭ খৃষ্টাব্দে হইয়াছিল। ইংরেজের ঐ পুরাতন কেল্লা এখন আর নাই। কিন্তু ওলন্দাজ কেল্লার উত্তরদিকের দরজায় লেখা ছিল ১৬৮৭ খৃষ্টাব্দ এবং দক্ষিণদিকের দরজায় ১৬৯২ খৃষ্টাব্দ লেখা ছিল। ইহা হইতে বুঝা যায়, ওলন্দাজরা নবাবের হুকুম পাইবার পূর্ব্বেই প্রাচীর নির্ম্মাণ করিয়া চুঁচুড়া সুরক্ষিত করিয়াছিল, পরে কেল্লা নির্ম্মাণ করে। ১৬৯৭ খৃষ্টাব্দের পরেই ওলন্দাজ গোঁদলপাড়ায় বাস করেন। ঐ কেল্লা ঘণ্টাঘাট হইতে বাজারের বারিক পর্য্যন্ত ছিল। ইংরেজের দখলে চুঁচুড়া আসিলে ঐ কেল্লা ভূমিসাৎ করা হয়। উহার চিহ্নমাত্র এখন নাই।

ইংরেজের বাণিজ্য-বিস্তারের বহু পূর্ব্বে ওলন্দাজরা বিশেষরূপে তাহাদের বাণিজ্য-বিস্তার করিয়াছিল; অটল অধ্যবসায়ে বাণিজ্য করিয়া বহু অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিল। যে সময় ওলন্দাজ চুঁচুড়ায় আসিল, সে সময় ফরাসী চন্দননগরে ছিল। উভয়ের নগর পাশাপাশি, সেজন্ত উভয়ে বন্দোবস্ত করিয়া একটি বিস্তৃত খাদ কাটাইয়া সীমা নির্দ্দেশ করিয়া লইল। এই সীমানা এখনও বর্ত্তমান আছে—উহাকে "ফরাসিগড়" বলে। চুঁচুড়ার পশ্চিমে একটি দ্বারহীন ফটক এখনও বর্ত্তমান আছে। ঐ ফটক দিয়া যে সমস্ত মালপত্র আসিত, তাহার উপর ঐ স্থানে শুল্ক আদায় করা হইত, সে জন্ত উহার নাম "তোলা ফটক।"

চুঁচুড়ায় 'মিঞার বেড়' ও 'ধর্ম্মপুর' পল্লীর মধ্যে একটি প্রাচীরবেষ্টিত সমাধিক্ষেত্র আছে। ঐ স্থানে আন্দাজ ৩০ ফুট উচ্চ একটি সমাধি আছে। উহার নাম 'বিবির গোর'। ঐ সমাধিটি সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন।

ইংরেজ ও ওলন্দাজে প্রথমে বিশেষ প্রীতি ছিল। ১৭৭০ খৃষ্টাব্দে ওলন্দাজ বণিক-সমিতির ডাইরেক্টর বা গভর্ণর কলিকাতার ইংরেজ বণিক-সমিতির প্রেসিডেণ্টের সহিত সাক্ষাৎ করিতে কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। এই সময় কাটিয়ার সাহেব কলিকাতার গভর্ণর। ওলন্দাজ ডাইরেক্টর অপরাহ্ণ ৪টার সময় ৮ জন সঙ্গী লইয়া কলিকাতায় রওনা হইলেন। সহর হইতে নদীতীর পর্য্যন্ত দুই সারি সৈন্ত দাঁড়াইল, কেল্লা হইতে ২১টি তোপ পড়িল।

* কৃষ্ণসায়ার অতি বৃহৎ পুষ্করিণী তাঁহারই নামানুসারে হয়।

ডাইরেক্টর সাহেব নিজের বৃহৎ বজরায় উঠিলেন। ঐ বজরা এত বড় যে, ৩৬ জন লোক টেবলে বসিয়া আহার করিতে পারে! এই বজরায় ডচ-রমণীও ছিলেন। দুইখানি বজরা রন্ধনের জন্য, দুইখানি আহরীয় দ্রব্যপূর্ণ এবং অন্যান্য কর্ম্মচারীদের জন্য একখানি বজরা ছিল; মোটের উপর ৩২।৩৩ খানি বজরায় সুসজ্জিত হইয়া কলিকাতা যাত্রা করিলেন। পরদিন প্রভাতে ৭টার সময় কলিকাতায় চিৎপুরে বজরার বহর আসিয়া নোঙ্গর ফেলিল। রসেল সাহেব ও অন্যান্য কয়েক জন উচ্চপদস্থ ব্যক্তি ডচ ডাইরেক্টরকে অভিবাদন করিতে আসিলেন। ডাইরেক্টর সাহেব ও তাঁহার সঙ্গী ও দেহরক্ষিগণ তীরে অবতরণ করিলেন। রসেল সাহেব তাঁহাদিগকে আপ্যায়িত করিয়া তাঁহার উদ্যানবাটীতে প্রাতরাশ সমাপন করাইলেন। পরে ৫ খানি অশ্বযান আসিয়া তাঁহাদিগকে বেলভেডিয়ার প্রাসাদে* লইয়া যাওয়া হইল। সেখানে তাঁহাদের বিভিন্ন কক্ষ নিরূপিত ছিল। একটি তামাক খাইবার ঘরও ছিল। সেখানে টেবলের উপর গুড়গুড়ি, তাওয়াভরা তামাকু প্রস্তুত ছিল। তাঁহারা তামাকু সেবন করিয়া অন্য কক্ষে গেলেন। গভর্ণর কাটিয়ার সাহেব তাঁহাদের যথোচিত আদর-আপ্যায়ন করিলেন। পরদিন বল্‌নাচের আয়োজন হইল। সমস্ত রাত্রি নাচ চলিল। পরে কাটিয়ার সাহেবের নিকট বিদায় লইয়া তিনি বজরায় ফিরিলেন। কলিকাতার কেল্লা হইতে ২৯টি তোপধ্বনি হইল। এই ব্যাপারে ডচ্ গভর্ণরের, নিম্নপদস্থ ইংরেজ কর্ম্মচারী ও ইংরেজ ভৃত্যদিগকে বকসিস দিবার জন্য ১ হাজার টাকা ব্যয় হয়। তিনি ফিরিবার সময় প্রথম গৌরহাটী (গরুটি) আসিলেন। সেখানে ফরাসীকর্ত্তা (Administrator) Mr. Chavalier তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া একটি বৃহৎ ভোজ দেন। সন্ধ্যার সময় ডচ্ গভর্ণর চুঁচুড়ায় ফিরিলেন। এই সমস্ত ঘটনা হইতে বেশ বুঝা যায় যে, ডচ্‌গণ খুব মিশুক ছিলেন—সকলের সঙ্গেই বন্ধুত্ব করিতে কুণ্ঠিত ছিলেন না।

ওলন্দাজদিগের চাল-চলন

ওলন্দাজদিগের ঘরের মেঝেগুলি জমির সমতল করা হইত। চীনদেশে এখনও এই প্রথা প্রচলিত আছে। জমির সমতল হওয়ায় মেঝেগুলি অল্পবিস্তর আর্দ্র থাকিত। তাহারা ঐ ঘরে ধূমগমনের গবাক্ষ রাখিত না। কাচের সারসি লাগাইত না—বলিত, ইহাতে বায়ু আবদ্ধ হইয়া ঘর গ্রীষ্মকালে আরও গরম করে, সেজন্য তাহারা বেতের জাফ্রি লাগাইত। বাঙ্গালায় পূর্ব্বে টানা-পাখার প্রচলন ছিল না। কোন ডচ্ গভর্ণর এই টানা-পাখার প্রথম আবিষ্কার করেন। কোন সভা বা উৎসবে তখন বড় বড় তালপাতার পাখা ব্যবহৃত হইত। এখন বৈদ্যুতিক পাখার জন্য ঐ সকল তালপাতার পাখা উঠিয়া গিয়াছে। তবে পল্লীগ্রামের জমিদার-বাড়ীতে এখনও ঐ পাখা দেখা যায়। ডচ্‌গণ অত্যন্ত বিলাসী ছিল।

ওলন্দাজদিগের বিচার বিভাগ

চুঁচুড়ার উপনিবেশ বটেভিয়ার অধীনে ছিল। চুঁচুড়ার কোন সরকারীপদ শূন্য হইলে, বটেভিয়া হইতে কর্ম্মচারী নিযুক্ত হইত। চুঁচুড়া উপনিবেশের ভার এক জন ডাইরেক্টর বা গভর্ণর ও সাত জন কৌন্সিলের উপর ন্যস্ত থাকিত। ঐ সাত জনের মধ্যে ৫ জনের সভার প্রত্যেক কার্য্যে ভোট দিবার অধিকার ছিল এবং গভর্ণরকে মন্ত্রণাও দিবার ক্ষমতা ছিল। বাকী দুই জন শুধু মন্ত্রণা দিতে পারিতেন। কিন্তু আর্থিক বিষয়ে ঐ সভ্যগণ গভর্ণরের অধীন ছিলেন। প্রধান ডাইরেক্টরের মাহিনা অল্প হইলেও, তাঁহার 'উপরি পাওনা' যথেষ্ট ছিল। ভার্নেট নামে এক জন গভর্ণরের বাৎসরিক সংসারখরচ ছত্রিশ হাজার টাকা ছিল, তবু তিনি অত্যন্ত মিতব্যয়ী ছিলেন। তাঁহার পূর্ব্বতন গভর্ণরের বাৎসরিক খরচ এক লক্ষ টাকা ছিল। ঐ গভর্ণরের "তাঞ্জাম" নামে একরূপ পাল্কী ছিল। উহাতে চেয়ারে বসিবার বন্দোবস্ত ছিল। এইরূপ তাঞ্জাম গভর্ণর ব্যতীত আর কাহারও ব্যবহার করিবার হুকুম ছিল না। যখন তিনি নগর-ভ্রমণে বাহির হইতেন, তখন দেশীয় বাদ্যকরেরা বাজনা বাজাইত। তিনি তাঞ্জামে আরোহণ করিতেন, দুই পার্শ্বে ছয় জন চোপদার (ঠিক Body-Guard নহে, কারণ, তাহাদের হস্তে কোন অস্ত্র থাকিত না) রূপার আসাসোঁটা লইয়া সঙ্গে সঙ্গে গমন করিত। রাস্তায় যদি কোন অশ্বারোহী আসিত, তবে তাহাকে অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া, যতক্ষণ না গভর্ণর সাহেব চলিয়া যান, ততক্ষণ অপেক্ষা করিতে হইত। যে সময়ের কথা লেখা হইতেছে, সেই সময় কলিকাতায় উচ্চপদস্থ ইংরেজ কর্ম্মচারীদিগেরও চোপদার থাকিত। ওলন্দাজ গভর্ণর ব্যক্তিগত সম্মান অত্যন্ত ভালবাসিতেন। ওলন্দাজ কাউনসিলের সভ্যগণ জ্যেষ্ঠ বণিক (Senior) নামে অভিহিত হইতেন। তাঁহাদের প্রত্যেকের উপর এক একটি বিশিষ্ট কার্য্যের ভার দেওয়া হইত। যিনি কোষাধ্যক্ষ থাকিতেন, তিনিই নগরাধ্যক্ষের ক্ষমতা পাইতেন। তাঁহার বেতন কিন্তু অতি অল্প ছিল। এক জনের উপর বিচার ও শাসনের ভার ছিল (Judicial Executive)। ইঁহার আয় যথেষ্ট ছিল। এই জজ-ম্যাজিষ্ট্রেটকে সকলে যেরূপ ভয় করিত, গভর্ণরকে তাহারা সেরূপ ভয় করিত না। তাঁহার ক্ষমতার সীমা ছিল না। কোন সামান্য অপরাধীকে থামে বাঁধিয়া বেত্রাঘাত পর্য্যন্ত করা হইত। বড়লোক অপরাধী হইলেও তাহার নিষ্কৃতি ছিল না। বড়লোকের সাজা ঐরূপই হইত, অধিকন্তু অত্যধিক জরিমানা দিতে হইত। এমন কি, বিশ হাজার টাকা পর্য্যন্ত জরিমানা হইত। ঐ বিচারপতি মাহিনাকে গ্রাহ্যমধ্যেই আনিতেন না। যখন ডচ্ গভর্ণর কলিকাতার কাটিয়ার সাহেবের সহিত কথা-বার্ত্তা কহিয়াছিলেন, তখন তিনি বলিয়াছিলেন—"আশা করি, আপনি এরূপ প্রণালীতে কার্য্য করিবেন যে, যাহাতে আপনি ত্বরায় যুরোপ প্রত্যাগমন করিতে সমর্থ হন।" অর্থাৎ যাহাতে কাটিয়ার সাহেব যথেষ্ট অর্থ সংগ্রহ করিয়া দেশে ফিরিতে পারেন। তখনকার দিনে ঐরূপই ছিল।

ব্যবসা

এখান হইতে ওলন্দাজরা অনেক জিনিষ যুরোপে রপ্তানী করিত; কিন্তু জাভাদ্বীপে অহিফেন চালানি কার্য্যে বিশেষ

---

*এই প্রাসাদ আরঙ্গেবের পৌত্র আজিম ওসমান কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল। কলিকাতায় যখন তিনি মৃগয়া করিতে আসিতেন, তখন এই প্রাসাদে অবস্থান করিতেন।

লাভ হইত। উহারা পাটনা হইতে আফিং লইত। প্রত্যেক বাক্সের ওজন ৬৪ মণ, উহার মূল্য সাত আট শত টাকা মাত্র। ঐরূপ বাক্স বৎসরে ৭-৮টা জাভায় চালান দিয়া প্রত্যেক বাক্স ১২৫০৲ টাকায় বিক্রয় হইত। অল্প পরিশ্রমে বহু অর্থ উপার্জন হইলে লোকে প্রায়ই অলস ও লোভী হইয়া যায়। ওলন্দাজরা তাহাই হইয়াছিল। তাহারা 'ছিপে' (লম্বা নৌকায় ২০।২৫ দাঁড় থাকিত) চড়িয়া গঙ্গায় হাওয়া খাইতে যাইত। স্ত্রীলোকরা এত অলস হইয়াছিল যে, তাহারা কখনও সোফায় শুইয়া থাকিত, সোফা হইতে উঠিয়া চেয়ারে বসিত, কখনও বা এলোমেলো পোষাক পরিয়া মাটিতে পা ছড়াইয়া চাকরদের সঙ্গে বসিয়া গল্প করিত—দিন যেন আর কাটে না। এই ত গেল স্ত্রীলোকদের কথা। পুরুষরাও ক্রমে জুয়াচুরি আরম্ভ করিয়াছিল। উহাদের সম্বন্ধে একখানি পত্রে পাওয়া যায়—"তাহাদের সাধুতার উপর নির্ভর করিয়া কোম্পানীর যে সকল দ্রব্য রাখা হইত, সে সকল দ্রব্য যেন তাহাদের লুণ্ঠনের জন্যই থাকিত। তাহারা যথেচ্ছাক্রমে বাণিজ্যের দ্রব্যাদির চালানের দর মিথ্যা করিয়া লিখিয়া দিত।" এই সকল অসাধুতার জন্যই ওলন্দাজ গভর্ণমেণ্ট পরে ইংরেজকে চুঁচুড়া ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। কারণ, লাভ হইত না—লোকসান কত দিন দিবে? ওলন্দাজদিগের বাগানের খুব সখ ছিল। তাহারা চাষ করিয়া শাকসব্জী পর্য্যন্ত য়ুরোপে ও বিভিন্ন দেশে চালান দিত। ওলন্দাজরা কলাইশুঁটির চাষ এ দেশে প্রথম করে; সে জন্য অদ্যাবধি "ওলন্দাশুঁটী" নামে বিখ্যাত। ওলন্দাজ হইতেই ইংরেজ বাগানের সখ পাইয়াছে। কিয়ার নেণ্ডার সাহেব বাঙ্গালীকে প্রথম ইংরেজি ভাষা শিক্ষা দেন।

ইংরেজ ও ওলন্দাজে যে বিশেষ সৌহার্দ্দ ছিল, তাহার নিদর্শন ডচ্ গভর্ণরের কলিকাতাগমন—পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে। আর একটা প্রমাণের উল্লেখ করিতেছি। যখন উইলিয়ম হেজ প্রথম ইংরেজ-গভর্ণর হুগলীতে আসেন, তখন তিনি প্রথমেই চুঁচুড়ায় আসিয়া ওলন্দাজ-গভর্ণরের আতিথ্য গ্রহণ করেন।

July 24 (1682) "Early in ye * Morning I was met by Mr. Littleton and most of ye factory near Hugly and about 9 or 10 o'clock by Mr. Vincent near ye Dutch Garden who come attended by severall Boats and Budgerows guarded by 35 Firelock and about 50 Rashpoots and peons were armed. He invited me to go ashore with him to the Dutch Garden where he had provided an entertainment for me and made preparation for my reception. I went along with him and stayed till evening expecting Mr. Beard's arrival in ye other sloop who not coming in time and we went in ye factory and there parted Company."—Hedges Diary part I by Colonel Yule.

ইহার পর যখন প্রেসিডেণ্ট গাইফোর্ডের সহিত হেজ সাহেবের মনোবিবাদ হয়, তখন তিনি ওলন্দাজদের চুঁচুড়াতেই কিছুদিন আশ্রয় লয়েন। "September 23 (1684) President Gyford and most of ye councellors specially Mr. Beard carrying themselves very unkindly and disrespectfully towards me. I was no longer able to endure their insolent behavior and being resolved to leave ye factory. I removed this afternoon to ye house of ye Duch quarters."

"September 26th—I went to visit Duch Director and give him thanks for his kindness in so readily in his quarters."—Hedges Diary part I

ইংরেজ ও ওলন্দাজে বিবাদ

১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে ক্লাইব পলাশীর যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া মীরজাফরকে নবাব করেন। মীরজাফর কিন্তু ইংরেজের প্রভুত্ব ও ক্ষমতায় অসন্তুষ্ট হইতে লাগিল—অপর একটি য়ুরোপীয় জাতিকে ইংরেজের প্রতিদ্বন্দ্বী করিতে প্রয়াস পাইল। ডচরা এত দিন শুধু বাণিজ্য লইয়াই ব্যস্ত ছিল। এখন মীরজাফরের প্ররোচনায় তাহারা রাজ্যস্থাপনের জন্য উদ্যোগী হইল। মীরজাফর তাহাদের সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুতি দিল। ইহা ইংরেজ ঐতিহাসিকের কথা। ওলন্দাজরা বটেভিয়া হইতে ৭ খানি যুদ্ধের জাহাজ আনাইল। বাহিরে প্রকাশ করিল, ঐ রণতরীগুলি করমণ্ডল উপকূলে যাইবে। কোন কারণ বশতঃ একবার চুঁচুড়ায় আসিবে। ঐ সাতখানি জাহাজের মধ্যে ৩ খানিতে ৩৬টি করিয়া কামান, অপর তিনখানিতে ২৬টি করিয়া কামান এবং অবশিষ্ট ১ খানিতে ১৬টি কামান লইয়া আসিতেছিল। সকল জাহাজের সেনাসমষ্টি প্রায় দেড় হাজার হইবে। এই সময়ে ইংরেজ ও ওলন্দাজে পূর্ণ বন্ধুত্ব ও শান্তি বিরাজিত ছিল। ক্লাইব ভাবিলেন, ইহা ইংরেজের প্রতিপত্তি নষ্ট করিবার জন্যই আসিতেছে—করমণ্ডল উপকূলে যাওয়া মিথ্যা রটনা। তিনি তৎক্ষণাৎ ফোর্ড (Ford) সাহেবকে হুকুম দিলেন, ঐ নৌবহর ধ্বংস কর। ফোর্ড ঐ পূর্ণশান্তির সময় ওলন্দাজ নৌবহর ধ্বংস করিতে ইতস্ততঃ করিয়া ক্লাইবকে জানাইলেন, বোর্ডের হুকুম তিনি চাহেন। ক্লাইব তখন তাস খেলিতেছিলেন—বড় ব্যস্ত। তিনি সেই অবস্থায় একটি পেনসিলে লিখিয়া দিলেন—"Dear Forde, Light them immediately I will send you the order of Council to-morrow." ফোর্ড ঐ হুকুম পাইয়া ওলন্দাজ নৌবহর আক্রমণ করিয়া ধ্বংস করিলেন। ঐ নৌবহর তখন কলিকাতা অতিক্রম করে নাই। ওলন্দাজের রাজ্যলিপ্সা এইখানেই শেষ হইল।

১৭৯৫ খৃষ্টাব্দের ২৮শে জুলাই ইংরেজ একবার চুঁচুড়া অধিকার করেন, কিন্তু ১৮১৭।২০শে সেপ্টেম্বর উহা প্রত্যর্পণ করেন। এই বারো বৎসরকাল Mr. R. Birch সাহেব বিশিষ্ট কমিশনররূপে কার্য্য করেন এবং ইংরেজকে ৮৪৭৲ টাকা রাজস্ব আদায় করিয়া দিতেন। ওলন্দাজ গভর্ণরদিগের নাম পাওয়া যায় না, শুধু ভিনসেণ্ট ও ওভারবিকের নাম পাওয়া যায়। য়ুরোপে ওলন্দাজ-রাজা দেখিলেন যে, ব্যবসায়ে আর তাদৃশ লাভ নাই, শুধু খরচ চলিতেছে;

* তখনকার দিনে the কথাটা লেখার উপরদিকে ye এইভাবে লিখিত হইত। অক্ষর বানানের প্রভেদ থাকিত যথা Severall.

ইংরেজও দেখিলেন, সুমাত্রায় তাঁহাদের লোকসান হইতেছে, এই জন্ত উভয়ের একটা সন্ধি হইল। ১৮২৪ খৃষ্টাব্দের ১৭ই মার্চ্চ এই নিষ্পত্তি হইল যে, চুঁচুড়া এবং সহর মাল্‌কাপুর, পলতা ও বালেশ্বরের কুঠী ইংরেজের হইল এবং তৎসঙ্গে মালাক্কা দ্বীপ পাইলেন। ওলন্দাজ পাইলেন সুমাত্রা দ্বীপ ও Fort Marlbough, যদিও ঐ তারিখে সন্ধি স্বাক্ষরিত হইল, কিন্তু ওলন্দাজ চুঁচুড়া অর্পণ করিলেন ১৮২৫ খৃষ্টাব্দের ১লা মার্চ্চ তারিখে। গভর্ণর ওভারবিক ও আট জন নিম্নপদস্থ অফিসার ওলন্দাজ-রাজা দ্বারা মাহিনার এক-তৃতীয়াংশ পেনসন পাইলেন। ঐ পেনসনের টাকা পামার কোম্পানী দিতেন, পরে হুগলীর কলেক্টর সাহেব দিতেন। এই ওভারবিক সাহেবই বর্দ্ধমানের তথাকথিত রাজা প্রতাপচাঁদের মোকদ্দমায় সনাক্ত করিয়াছিলেন। G. Herklots সাহেবও ঐ পেনসনভোগীদের এক জন ছিলেন। পরে তিনি ঐ পেনশন ত্যাগ করিয়া ইংরেজের অধীনে চাকরী গ্রহণ করেন এবং পরে সদর আমীনের পদ পাইয়াছিলেন—মাহিনা ৫০০৲ টাকা। ইঁহার কাছারী ছিল আর্ম্মানিগির্জ্জার নিকট।

ওলন্দাজের স্মৃতি

১৬৯৫ খৃষ্টাব্দে আরমিনিয়ানরা প্রথম খৃষ্টান গির্জ্জা নির্ম্মিত করে। ইহাই ওলন্দাজদিগের প্রথম গির্জ্জা। ওলন্দাজ গভর্ণমেণ্ট ওভারবিক, হফ, হারকণ্ট, ফেথ ও মিচেল সাহেবকে চুঁচুড়ায় থাকিবার এবং বার্গঅ্যানডেসকে তালদায় থাকিবার হুকুম দেন। চুঁচুড়ায় ২টি হোটেল, ১টি নীলামঘর এবং Mr. N D. Rozirio কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত ছাপাখানা ছিল। ইংরেজ W. Bland (নীলামদার), Stephen Mathers (দস্তানা-নির্ম্মাতা), এবং H. Robertকে চুঁচুড়া থাকিবার আদেশ দেন। ঐ রবার্ট সাহেব Vanzan Dyke কোম্পানীর চুরুটের কারখানার তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন। চুঁচুড়া ইংরেজের হাতে আসিলে ওলন্দাজ গির্জ্জা ও ২টি সমাধিক্ষেত্র কলিকাতার লর্ড বিশপের হাতে অর্পণ করা হয়। Rev. J. Morton প্রথম পাদ্রী এখানে আসেন। ১৮২৫ খৃষ্টাব্দেই চুঁচুড়ায় ওলন্দাজ কেল্লা ভাঙ্গিয়া ফেলা হয়। ঐ স্থানেই ব্যারাক নির্ম্মিত হয়। ঐ ব্যারাকই বর্ত্তমান সময়ে আদালতরূপে পরিণত হইয়াছে। ঐ কেল্লায় যে সকল সেগুন কাঠের কড়ি ব্যবহৃত হইয়াছিল, তাহা জাভা দ্বীপ হইতে আনীত হইয়াছিল। ১৬৯৭ খৃষ্টাব্দে ঐ কেল্লা নির্ম্মিত হইয়াছিল এবং ১৮২৫ খৃষ্টাব্দে উহা ভূমিসাৎ করা হয়; কিন্তু ঐ ১২৮ বৎসরেও কড়িকাঠের কণামাত্র নষ্ট হয় নাই; এবং ঐ কড়িকাঠই বর্ত্তমান ব্যারাকে আজ পর্য্যন্ত আছে। এখন উহার কতকগুলি নষ্ট হওয়ায় লোহার কড়ি তাহার স্থানে দেওয়া হইয়াছে। কেল্লার ইষ্টকাদি রাস্তা প্রস্তুতে লাগান হইয়াছিল। ওলন্দাজের অতীতের স্মৃতি কিছুই নাই, শুধু ২।১টি পুরাতন ফটক বিনষ্ট গৌরবের সাক্ষীস্বরূপ নীরবে অশ্রুপাত করিতেছে। আর একটি আধুনিক স্মৃতি আছে, তাহা Van Hoorus Dyke নামে রাস্তার কিছু অংশ চন্দননগর ও চুঁচুড়ার মধ্যে আছে। ওলন্দাজ প্রায় ১৮০ বৎসর চুঁচুড়ায় ছিল।

ওলন্দাজদের সময় দুই জন বিখ্যাত লোক চুঁচুড়ায় ছিলেন। ১ম—কিয়ার নেণ্ডার সাহেব—ইনিই বাঙ্গালীকে প্রথম ইংরেজি-ভাষা শিক্ষা দেন। ২য়—ওয়েটন। ইনি ব্যবসায়ে বিশেষ উন্নতি করিয়া যথেষ্ট অর্থ সংগ্রহ করেন। ব্যবসায়ে অনেকে অর্থ সংগ্রহ করিতে পারেন, কিন্তু দানের জন্ত তিনি স্মরণীয় হইয়া আছেন। তিনি প্রতি মাসে ষোল শত টাকা দরিদ্রদিগকে দান করিতেন।

ইংরেজের সময় চুঁচুড়া

Jan Dinks নামে এক জন ওলন্দাজের হাতের মাপে জমির মাপ হইত। ইহা ওলন্দাজের সময়ে। উহার এক হাত ২১ ইঞ্চি ছিল। ইংরেজ চুঁচুড়া অধিকার করিয়া ওলন্দাজদত্ত পাট্টার পরিবর্ত্তন করিয়া জমির মাপ ১৮ ইঞ্চিতে আরম্ভ করিলেন। আড়সা পরগণা সর্ব্বপ্রথম ঐ ১৮ ইঞ্চি হিসাবে মাপ করা হয়। ১৮৩৩ খৃঃ হইতে ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ২১০০ পাট্টার মধ্যে ১১০০ পাট্টা পরিবর্ত্তন করা হয়। ঐ পাট্টা পরিবর্ত্তনের খরচা আদায় হইয়াছিল ১১ হাজার ৪০০ টাকা। এই সময় উত্তরপাড়ার জমিদার জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাফেজখানার (Record) কর্ত্তা হইয়া চাকরী গ্রহণ করেন। ঐ পাট্টা-পরিবর্ত্তনের কাযকর্ম্মের ভার তাঁহার উপর ছিল। চুঁচুড়ার শীলরা ঐ পাট্টা-পরিবর্ত্তনে আপত্তি করেন। জয়কৃষ্ণ বাবু W. H. Balli সাহেব দ্বারা নিযুক্ত হন। জয়কৃষ্ণ বাবুর বিরুদ্ধে প্রায় ৭০ জন লোকের স্বাক্ষরিত একখানি দরখাস্ত, যাহাতে লেখা ছিল যে জয়কৃষ্ণ বাবু ঘুস লইয়া পাট্টা পরিবর্ত্তন করেন। ইহা লইয়া একটা দাঙ্গাও হইয়াছিল। কমিশনর Evylyn Gordon সাহেব হুগলীতে আসিলেন। তিনি কলেক্টর সাহেবের কাছে তদন্তের ভার দিলেন। বেলি সাহেব তখন কলেক্টর। তিনি লিখিলেন, কোন বিশেষ অপরাধের অভিযোগের কথা ইহাতে উল্লেখ নাই, সুতরাং তিনি ইহার কি আর তদন্ত করিবেন? কিন্তু 'বোর্ড' ঐ দরখাস্ত কমিশনর সাহেবকে নিজে তদন্ত করিতে বলিলেন। গর্ডন সাহেব ১লা জানুয়ারী ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দ হইতে ৫ই মার্চ্চ পর্য্যন্ত তদন্ত করিয়া জয়কৃষ্ণ বাবুকে অস্থায়িভাবে কর্ম্মচ্যুত করিলেন এবং ২০ হাজার টাকার জামিন চাহিলেন। জামিনের টাকা তৎক্ষণাৎ না দেওয়ায় তাঁহাকে থানায় থাকিতে হইল। ঐ তদন্তের ফল এই যে, জয়কৃষ্ণ বাবু ও নাজীর সাফদর আলিকে কমিশনর সাহেব পদচ্যুত করিলেন। বেলী সাহেবকে, কমিশনর সাহেব ভৎর্সনা করিয়া লিখিলেন যে, তিনি নিজে কাযকর্ম্ম না দেখিয়া কর্ম্মচারীর উপর বিশ্বাস করিয়া থাকেন, ইহাতেই প্রজাবর্গের উপর অত্যাচার হইতেছে। বেলী সাহেব ক্রুদ্ধ হইয়া কমিশনর সাহেবকে যে পত্র দেন, তাহার কিছু উল্লেখ করিতেছি:—"I can take my oath I am right···something like the wolf and the lamb···The usual self-trumpeting···I am not a jot inferior to Mr. Officiating Commissioner···Flippant as usual. I know the matter as well as, but zid in your food, whilst the essential ends of justice are wholly neglected."—Toynbee.

ওলন্দাজের রাজস্বের হার কিছু ঠিক ছিল না। Special Commissioner দ্বারা তাঁহাদের ইচ্ছামত রাজস্বের হার স্থির হইত। ৩৮৴০ হইতে ২২।০ পর্য্যন্ত বিঘা প্রতি রাজস্ব নির্দ্ধারিত হইত। মোগল বাদশাহের নিকট হইতে ওলন্দাজেরা চুঁচুড়া পাইয়া রাজস্বের হার বৃদ্ধি করে নাই, তবে নূতন পাট্টা দেওয়া, পাট্টা

পরিবর্ত্তন কিম্বা হস্তান্তর বা পতিত জমি বিলি বা লুকান জমি ধরা পড়ার উপর তাহারা ইচ্ছামত রাজস্ব লইত। জমি হস্তান্তর জন্ম উহাদের দুইটি আদালত ছিল। ১ম দেশীয় বা জমিদারী আদালত, ২য় য়ুরোপীয় আদালত। ১ম আদালতে পাট্টা দেওয়া হইত, বিক্রয় হস্তান্তর বা দানপত্র দেওয়া কায হইত। কিন্তু উহা রেজেষ্টারি করা হইত না যতক্ষণ পর্য্যন্ত উহা সাধারণে বিজ্ঞাপিত হইত। যদি কোন আপত্তি না হইত, তবে নূতন পাট্টা দেওয়া হইত। বিষয় হস্তান্তর জন্ম শতকরা ৫ টাকা ফি ধার্য্য ছিল।

চুঁচড়া বারিক

চুঁচুড়ায় সর্ব্বশুদ্ধ চারিটি বারিক নির্ম্মিত হইয়াছিল। ১ম ওলন্দাজদিগের নির্ম্মিত বারিক হুগলীনদীর সমান্তরালে, উত্তর দক্ষিণে লম্বাভাবে অবস্থিত। ইহাই সর্ব্বপুরাতন বারিক। বর্ত্তমান সময়ে এইখানে জজসাহেবের আদালত হইয়াছে। এইখানেই হুগলী কলেজের হিন্দু হোষ্টেল ছিল এবং চুঁচুড়া পোষ্টাফিস ছিল। ২য়—এই বারিকটি সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। ১৮২৪ খৃঃ ওলন্দাজ ও ইংরেজে সন্ধি হয়, তাহাতে ইংরেজ চুঁচুড়ায় আসিয়াছিল। ১৮২৫ খৃঃ ১লা মার্চ্চ তাহারা চুঁচুড়া দখল করে। ঐ সময়েই ওলন্দাজ কেল্লা ভূমিসাৎ করা হয়। ১৮২৯ খৃঃ ইংরেজ এই বারিক নির্ম্মাণ করে। ঐ বারিকে সৈন্তদিগের থাকিবার স্থাননির্দ্দেশ হয়। ইহা এক হাজার ফুট লম্বা, দ্বিতলগৃহ। এত বড় লম্বা বাড়ী বোধ হয় হুগলী জেলায় নাই। এই বারিকের উত্তরদিকের দ্বিতলে দেওয়ালে পাথরের উপর ক্ষোদিত অক্ষরে লিখিত আছে:—"শ্রীযুক্ত কা বেন সাহেবের দ্বারায় সুমতসিদ্ধি শ্রীরামহরি সরকার সাং চক্রবেড় এবং শ্রী সেখ তনু দফাদার সাং চক্রবেড় ইং সন ১৮২৯ বাঃ সন ১২৩৬" ঐ বারিকের দক্ষিণ দিকের দেওয়ালে (দ্বিতলে) কৃষ্ণপ্রস্তরে ক্ষোদিত অক্ষরে লিখিত আছে:—

"This Barracks were commenced December 1829. The foundation and plinth of the whole and superstructure of the lower story west wing by Lt. J. A. Crommelin, Executive Engineer the remainder of the structure and entire finishing by Captain Wm. Boll of Artillary Ex. Officer."

বড়লাট উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক সাহেব ব্যয়-সঙ্কোচের জন্ত চুঁচুড়া বারিক উঠাইয়া দিবার প্রস্তাব করেন; কিন্তু তৎকালীন জঙ্গী লাট তাহাতে আপত্তি করেন। বিলাতে উহার মীমাংসা হয়। বেণ্টিঙ্কের কথাই রহিল। সমুদায় সৈন্ত কলিকাতার কেল্লায় চলিয়া আসিল। ব্যারাক খালি পড়িয়া রহিল। ইহা ১৮৩০ খৃষ্টাব্দের ঘটনা।

১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের মিউটিনির পর জেনারল হ্যাবলক এই চুঁচুড়া বারিকে আসিয়া বাস করেন। তিনি যে এক জন বিখ্যাত যোদ্ধা ও সৈন্তাধ্যক্ষ ছিলেন, তাহা নয়, তিনি এক জন সুপণ্ডিত ছিলেন। সমগ্র সেক্সপিয়র তাঁহার কণ্ঠস্থ ছিল। উত্তরপাড়ার জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় জমিদার তাঁহারই নিকট ইংরেজি শিক্ষা করেন। তিনি জয়কৃষ্ণ বাবুকে ছাত্রের ন্যায় পাঠ দিতেন এবং পরদিন পাঠ লইতেন। হ্যাবলক সাহেব এক জন দাতা ছিলেন। তিনি ৮০০৲ টাকা বেতন পাইতেন। ইহার মধ্যে মাসিক ২০০৲ দুই শত টাকা দরিদ্রদিগকে দান করিতেন। তিনি বলিতেন—"ইহসংসারে আমার পর্য্যাপ্ত হইয়া যাহা থাকিবে, তাহা আমার নহে; যাহাদের অভাব আছে, তাহাদের।" সৈনিক জীবনে এত উদারতা অতি বিরল দেখা যায়।

৩য়—ঐ বারিকের পশ্চিমদিকে একটি দ্বিতল বারিক আছে। দক্ষিণদিকে ও উত্তরদিকে খোলা বারান্দা। এটি খুব উচ্চ ও খুব হাওয়াদার। প্রথমে ইহা সৈন্তদিগের হাঁসপাতালরূপে ব্যবহৃত হইত। বর্ত্তমান সময়ে পুলিসের থাকিবার স্থান হইয়াছে।

৪র্থ—এই বারিকের কিছু দক্ষিণে আর একটি বারিক আছে। বর্ত্তমান সময়ে উহা Circuit House, সিবিল অফিসার কোয়ার্টার, সিবিল সার্জ্জনের বাড়ী, জেলা পুলিস সুপারিনটেণ্ডেণ্ট সাহেবের বাড়ীস্বরূপ ব্যবহৃত হয়।

[ক্রমশঃ

শ্রীউপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (জ্যোতীরত্ন)।

বনে ও মনে

কোন্ বনে জাগিতেছে মধু নিশিগন্ধা
মালতী হেনায় ভরা সে অলকানন্দা!
বকুল ঝরিয়া নীচে
ফুল-শেয বিরচিছে
আকুল কোকিল গাহে গীতি মধুছন্দা!

জ্যো'স্নায় ধুয়ে যায় নিতি সে নিকুঞ্জ
প্রকৃতির ফুলদানে সাজে ফুলপুঞ্জ
মনের মধুপ কবি
ভুঞ্জে সে মধু-ছবি
চিত্তের নিরালায় জাগে অলিগুঞ্জ!

কোন্ বনে ফুটিতেছে মধু নিশিগন্ধা!
সোনার স্বপন ভরা সে অলকানন্দা!
মধুহাসি মুখে ভরা
নন্দন হ'ল ধরা
কণ্ঠের কলতানে গীতি মধুছন্দা!

ধোয়া তার জ্যো'স্নায় চাঁদ পারা মুখটি,
মুকুতা ঢাকেনি আজো ঘোমটার শুক্তি!
টানা টানা আঁখি দু'টি—
কমল উঠেছে ফুটি!
বিমল মাধুরী ভরা অকলুষ বুকটি!

শ্রীরামেন্দু দত্ত।

মাটীর প্রদীপ

[গল্প]
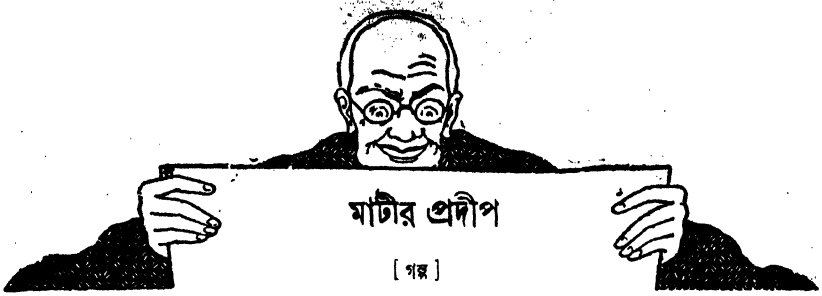
এক

দীর্ঘ প্রবাসের অবসানে, আই সি এস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ইংলণ্ড হইতে প্রত্যাগত মণীশ, বাঙ্গালার মাটীতে পা দিতেই তাহার ভাবী শ্বশুর মহাশয় তাহাকে এক রকম গ্রেপ্তার করিয়াই তাঁহার নিজের গৃহে লইয়া গেলেন। এ গৃহের ভবিষ্যৎ জামাতার যেমন আদর-যত্ন হওয়া উচিত, তাহার অবশ্য ব্যতিক্রম ঘটে নাই। তবু বহু দিন প্রবাসী মণীশের অন্তর কেমন যেন অতৃপ্তি অনুভব করিতে লাগিল। সংসারে মা ভিন্ন তাহার আপন বলিতে কেহ নাই। পুত্রকে বিদেশে পাঠাইয়া এ কয় বৎসর তিনি কাশীবাস করিতেছেন। মণীশ ফিরিলে তিনিও দেশে আসিবেন। দীর্ঘ দিন অদেখা জননীর সঙ্গে তাহার জন্মস্থান শিবনিবাসের শ্যামল শীতল বুক অদম্য আকর্ষণে নিয়ত টানিলেও এ-দিককার কঠিনবাঁধন এড়ান বড় সহজ হইল না। দুই দিন পর মণীশ সিপ্রাকে ডাকিয়া বলিল, "আজ আমায় ছেড়ে দিতে হবেই, সিপ্রা। আমি বাড়ী যাব।"

পিয়ানোর সম্মুখে বসিয়া সিপ্রা কি একটা বিদেশী গৎ বাজাইতেছিল। অত্যন্ত চমকিয়া ফিরিয়া চাহিয়া সে কহিল, "এই ত সবে এসেছ, এর মধ্যেই যাবার জন্যে এত ব্যস্ত?"

পরক্ষণেই অল্প হাসিয়া রবীন্দ্রনাথের রাজা ও রাণী হইতে আবৃত্তি করিয়া বলিল, "আমারে লাগে না ভাল দু দণ্ডের বেশী! এসেই যাই যাই কেন বল ত?"

মণীশও একটু হাসিয়া কহিল, "তোমায় ভাল লাগে না, এ কথা বলতে পারি না। কিন্তু আমার মা? তিনি যে এই তিন বছর আমায় দেখেন নি। আমার দেশ, আমার বাড়ী—সব আমার পথ চেয়ে আছে জান, সিপ্রা?"

অভিমান-স্ফুরিত অধরে সিপ্রা কহিল,—"জানি। কিন্তু আমি যে আগ্রহ নিয়ে এই ক'বছর তোমার পথ চেয়ে থেকেছি, তেমন ভাবে কেউ তোমায় চাইছে বলতে পার? অসম্ভব!"

এ কথার প্রতিবাদ চলে না। হয় ত সিপ্রার মত উদ্দাম আগ্রহ লইয়া সত্যই কেহ তাহার পথ চাহিয়া নাই। একমাত্র সন্তানের জননী তাহার মা-ও হয় ত নহে। তবুও সেই আগ্রহহীন লোকগুলির সঙ্গে, সভ্যতার সংস্রব-পরিশূন্য তাহার বাল্যের জন্মভূমি সেই ক্ষুদ্র গ্রামখানিকে দেখিবার আকাঙ্ক্ষা, সিপ্রার কাছে থাকিয়াও মনের মধ্যে প্রবল হইয়া উঠিয়াছে, এ সত্য নিজের কাছে অস্বীকার করিতে না পারিয়া তাহার কুণ্ঠার সীমা রহিল না। আজও বুঝি সিপ্রাকে সে এমন ভাবে ভালবাসিতে পারে নাই, যাহাতে জগৎ-সংসার সবই তুচ্ছ হইয়া যায়।

সঙ্কোচ-বিজড়িত স্বরে মণীশ বলিল,—"আমায় ক্ষমা কর, সিপ্রা। অনেক দিন বাইরে থেকে একবার সেই চিরপরিচিত চিরপ্রিয় বাড়ী, মার মুখ, আমার বাড়ীর পুরোণ লোকজন, বুড়ো ম্যানেজার দাদা সবাইকে দেখবার ইচ্ছে মনে এত বেশী হচ্ছে যে, ইচ্ছে করছে, এখনই ছুটে যাই। সেই জন্যই মিঃ চৌধুরীকে বলেছিলুম, দেশ থেকে ফিরে এসে তার পর এখানে আসব, তা তিনি—"

"বাবা যে জানতেন, তাঁর মেয়ে কি ভাবে এত দিন কাটিয়েছে। তাই তুমি ফিরে আসতেই আমার কাছে না এনে দিয়ে পারেন নি। যদি বুঝতেন, অন্য সব কিছুর তুলনায় তোমার মনে আমার স্থান অতি তুচ্ছ, তা হ'লে তোমায় তোমার বাড়ীতে তোমার আপন জনদের কাছেই যেতে দিতেন।"

কথার শেষে সুগন্ধি পুষ্পসারসিক্ত রুমালখানা তুলিয়া সে চোখের উপর ধরিল।

মণীশ সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল। আত্মরক্ষার্থে অল্পস্বল্প মিথ্যার আশ্রয় না কি লওয়া যায়। ব্যগ্রভাবে সিপ্রার মুখের উপর হইতে রুমালখানা টানিয়া লইয়া সে বলিল, "তুমি একবারে একটি পাগল, সিপ্রা! তোমার চেয়ে আর কেউ আমার কাছে বড়, এ কি সম্ভব? তুমি যে আমার কি, এ কি তুমি এত দিনেও বোঝনি?"

"তোমার ব্যবহারে সেটা বিলক্ষণ বোঝা যায়!"

"তবে আমি উপায়হীন। তুমি যদি এ ভাবে রাগ কর, তা হ'লে কি বল্‌ব আর!"

সিক্ত-কমলের মত জলে ভিজা চোখ দু'টা তাহার দিকে তুলিয়া সিপ্রা কহিল, "কিছু বল্‌তে হবে না! শুধু কথা দাও, এখন তিন সপ্তাহের মধ্যে তুমি আমাকে ছেড়ে আর কোথাও যাবার নাম করবে না!"

মণীশ বিপন্ন হইয়া পড়িল এ প্রস্তাবে। মাসখানেকের মধ্যেই তাহাকে কার্য্যে নিযুক্ত হইতে হইবে। ইহার মধ্যে তিন সপ্তাহ এখানে কাটাইলে জননীর স্নেহচ্ছায়াতলে আশ্রয় পাইবে ক'টি দিন? সিপ্রার সাহচর্য্য তাহার কাছে আনন্দময় হইলেও মার মমতাসিক্ত স্নিগ্ধ বুক আরও তৃপ্তিপ্রদ, আরও পুলকময়, ইহা ত সে ভুলিতে পারে না! প্রবাসের দিনগুলি উজ্জ্বল মধুর করিয়া রাখিয়াছিল শুধু সিপ্রার স্মৃতিই নয়; জননীর স্থান ছিল তাহাতেই অনেকখানি বেশীই।

মণীশকে নীরব দেখিয়া খোঁচা দিয়াই সিপ্রা কহিল, "থাক্ থাক্, তোমায় কিছু আর বল্‌তে হবে না। জোর ক'রে তোমার কাছ থেকে কথা আদায় ক'রে নিতে আমি চাই না। তুমি আজই যাও—"

"রাগ ক'রে বল্‌ছ, সিপ্রা?"

ব্যথিত-উদাস-কণ্ঠে সিপ্রা কহিল, "রাগ করব কেন? রাগ কর্‌লেই বা শুন্‌ছে কে?"

কথাটাকে হাল্‌কা করিয়া লইবার চেষ্টায় মৃদু হাসির সঙ্গে মণীশ কহিল, "তুমি রাগ করলে শুনব না, এত বড় দুঃসাহস আজও আমার হয় নি।"

"সে বোঝাই গেছে। যাও! ধ'রে বেঁধে তোমায় রাখব, এত নির্লজ্জ আমি নই। তুমি যাও!" সিপ্রা আবার চোখে রুমাল দিল।

"আঃ! সিপ্রা, কি ছেলেমানুষী করছ বল ত! আচ্ছা, আচ্ছা, আমি কথা দিচ্ছি, যত দিন না তোমার আদেশ পাব, তত দিন এখান থেকে এক পাও নড়ব না। তুমি এখন শান্ত হও, লক্ষীটি। তবু কাঁদে, না সিপ্রা, তুমি ভারী ছেলেমানুষ।"

সিপ্রা ঘন ঘন চোখ মুছিতে লাগিল। তাহার সিক্ত শতদলের মত অশ্রুমাখা সুশ্রী সুগৌর মুখখানা ক্ষণেকের জন্য মণীশকে বিশ্বসংসার ভুলাইয়া দিল। অন্য কোন কথাই মনে রহিল না। সুন্দর মুখের মাদকতা অতি তীব্র! তরুণ মনে নেশার ঘোরও বড় সহজেই লাগিয়া যায়। অপলক-নয়নে মণীশ সিপ্রার দিকে চাহিয়া রহিল।

দ্বারবিলম্বিত রেশমী পর্দ্দা সরাইয়া চৌধুরী সাহেব বা মিঃ চৌধুরী ঘরে ঢুকিলেন। বছর দশ বারো আগে যখন তিনি উকিল ছিলেন, সে সময় লোকে তাঁহাকে তারিণীপ্রসন্ন চৌধুরী বলিয়া জানিত; ডাকিতও তারিণী বাবু বলিয়া। কিন্তু তার পর বৎসরখানেক বিলাতে থাকিয়া ব্যারিষ্টাররূপে যে দিন তিনি দেশে ফিরিলেন, সে দিন দেশী পরিচ্ছদ দেশী আচার-ব্যবহারের সঙ্গেই পৈতৃক নামটাও সম্পূর্ণভাবে বর্জ্জিত হইয়াছিল। আজ কেহ তাঁহাকে নাম জিজ্ঞাসা করিলে হয় ত চট করিয়া মনে পড়িতেও না পারে।

মণীশের দিকে চাহিয়া চৌধুরী সাহেব বিনা ভূমিকায় প্রশ্ন করিলেন, "তার পর মণীশ, তুমি আমাদের সঙ্গে যাচ্ছ ত?"

"আপনাদের সঙ্গে? কোথায়? কোথায় যাচ্ছেন আপনারা?"

"কি রকম, সিপ্রা তোমায় বলেনি? সিপ্রা, 'ইউ নটি গার্ল' তুমি মণীশকে বলনি?"

"বলবার সময় পেলুম কখন্? উনি ত কেবলই বলছেন, ওঁকে ছেড়ে দিতে হবে। উনি ওঁর বাড়ী ওঁর মাকে না দেখে একবারে অস্থির হয়ে পড়েছেন।"

"সত্যি না কি? দেশে যাবার জন্যে এত ব্যস্ত? আছে কি সেখানে? তোমার মা বেনারস থেকে ফিরেছেন? বোধ হয় না!"

"না, মা ফিরেছেন! আমি আসছি খবর পেয়েই তিনি ফিরে এসে আমার জন্যে ব্যাকুল হয়ে পথ চেয়ে আছেন, এ আমি দূরে থেকেও বুঝতে পারছি।"

মণীশের কণ্ঠস্বর গাঢ় হইয়া আসিল। ক্ষণিক আলোড়নে আন্দোলিত সরসীনীরে বিক্ষেপ জাগিলেও তাহার স্বভাবগত শান্ত স্থৈর্য্য ফিরিয়া আসিতে বিলম্ব হয় না। ক্ষণপূর্ব্বে অনুভূত ভাবটা তখন মণীশের মন হইতে অনেকটা দূরে সরিয়া গিয়াছে। চৌধুরী সাহেব বলিতে লাগিলেন, "তোমার কাযে 'জয়েন' কর্ত্তে ত মাসখানেক দেরী আছে। এ কটা দিন আমাদের কাছেই থেকে যাও! আর মণীশ, তুমি শোননি বোধ হয়, আমি একটা নতুন মহল কিনেছি—নীলামে, নারায়ণপুর, কলকাতা থেকে কাছেই, বেশ যায়গা! মনে করছি, এ-বারের গ্রীষ্মটা আর কোথাও না গিয়ে ওখানেই কাটিয়ে আসব। মানে খাজনাপত্র মোটে 'আদায়' হচ্ছে না, তা না হলে, প্রজা-গুলো অতি পাজি, বেশীর ভাগ খাজনা আজও সেই পুরোণ জমিদারটাকেই দিয়ে আসে। তাই ভাবছি, নিজে গিয়ে এবার ব্যাটাদের সায়েস্তা ক'রে আসব। সিপ্রাও যাবে বলছে, কাযেই তোমায় এর মধ্যে থেকে ছেড়ে দেওয়া অসম্ভব।"

নিষ্ফল জানিয়াও মণীশ ক্ষীণ প্রতিবাদ তুলিল, "আমার সময় বড় কম যে। মার কাছে তা হ'লে—"

তাহাকে কথা শেষ করিবার অবসর না দিয়াই অধীর-ভাবে সিপ্রা কহিল, "আঃ, কেবল মা আর মা। লিট্‌ল বেবী। মা ছাড়া জানে না! মা তোমার দুদিনের মধ্যে কর্পূরের মত উবে যাবেন না ত! বাবা বলছেন, আমি বলছি, তবু তুমি যাবে না? আমাদের চেয়েও কি মা তোমার কাছে বেশী হলেন?"

সত্য কথাটা হয় ত তাই! তবু সত্যকে স্বীকার করিয়া লইবার মত সাহস মানুষের সব সময় থাকে না! অন্ততঃ মণীশের এখন ছিল না। সে তাই স্তব্ধ, নিরুত্তর রহিল।

সিপ্রা বলিল, "জোর ক'রে তোমায় নিয়ে যেতে চাই না। ইচ্ছে না হয়, যেও না।"

তাহার রুষ্ট মুখের দিকে চাহিয়া চৌধুরী ব্যস্তভাবে বলিলেন, "মিথ্যে অনুযোগ ক'রে বেচারীকে কষ্ট দিও না, সিপ্রা! ও ত যাবে না বলেনি, না মণীশ, তুমি ও দুষ্টু মেয়ের কথায় কাণ দিও না। ওর কেবল কথায় কথায় অভিমান আর রাগ। যাবে বৈ কি মণীশ, নিশ্চয় যাবে। মার সঙ্গে দেখা করা? বেশ ত, তুমি কাযে যাবার আগে দিন দুই তাঁর কাছে থেকে যেও।"

সমস্ত ব্যবস্থা করিয়া দিয়া পরম নিশ্চিন্তভাবে তিনি চুরুটে অগ্নিসংযোগ করিলেন। মণীশ টেবলের উপর হইতে সংবাদপত্রখানা তুলিয়া লইল। চুরুটে গোটা দুই টান দিয়া মিষ্টার চৌধুরী কহিলেন,—"আচ্ছা মণীশ, তোমাদের ষ্টেটের 'ইনকাম' এখন কত?"

এ প্রশ্ন তিনি আরও অনেকবার অনেক সময় করিয়া-ছেন; মণীশ উত্তর দিয়াছে। কাগজ হইতে চোখ না তুলিয়াই সে বলিল,—"খুব বেশী নয়, হাজার চল্লিশ টাকা হ'তে পারে।"

"হ'তে পারে? তুমি তা হ'লে ঠিক জান না? আচ্ছা, লোক ত? বরাবরই আয় এই রকম, না এখন—"

শেষ পর্য্যন্ত তাঁহার কথা না শুনিয়াই মণীশ জবাব দিল, "শুনেছি, বাবা থাকতে আরও বেশী কিছু পাওয়া যেত। তার পর ক'বছর হ'তে অনেক প্রজার অবস্থা খারাপ হওয়ায় মা তাদের খাজনা কমিয়ে দিয়েছেন।"

চৌধুরী সাহেবের চোখে-মুখে এমন ভাব ফুটিল যেন এমন অভাবনীয় কথা তিনি অতি অল্পই শুনিয়াছেন। গভীর বিস্ময়ভরা স্বরে কহিলেন,—"তোমার মা তাদের খাজনা কম ক'রে দিয়ে নিজের ষ্টেটের আয় কমিয়ে ফেলেছেন? এর মানে কি?"

এবার পূর্ণ-নয়নে তাঁহার দিকে চাহিয়া মণীশ কহিল, "মানে আর কি, গরীব বেচারীরা দিতে পারে না, তাই।"

"তাই নিজেদের ক্ষতি ক'রে তাদের সুবিধা ক'রে দিতে হবে? বেশ বুদ্ধি ত?"

সিপ্রা এতক্ষণ নীরব ছিল। শ্লেষ-ভরা স্বরে এবার সে কহিল, "'ড্যাডি' যে কি বল। নিরক্ষরা গ্রাম্য স্ত্রী-লোকের কাছ হ'তে এর চেয়ে বেশী কি আর আশা করা যায়? নিজের ক্ষতি হয় হোক্, অসভ্য চাষা কতকগুলো—তাদের কিসে সুবিধা হয় না হয়, তার জন্য চেষ্টা আগে! বাস্তবিক মণী, আমি অবশ্য তোমার মাকে লক্ষ্য করেই বলছি না; কিন্তু এটা ঠিক, এই সব শিক্ষালেশপরিশূন্যা বিচার-বুদ্ধিহীনা মেয়েরাই এ দেশের উন্নতির প্রধান অন্তরায়।"

কন্যার কথার সমর্থন করিয়া পিতা বলিলেন, "এক্-জ্যাক্টলি সো! ঠিক বলেছিস। অতি সত্য কথা।"

মণীশ স্তব্ধ নিরুত্তরে কাগজের দিকে চাহিয়া রহিল। হাতের চুরুটটায় আর একটা লম্বা টান দিয়া চৌধুরী মহাশয়

কহিলেন, "যাই হোক, এ টাকাটা সব ঘরে ঠিক আসে কি না, এ খবরটা জান ত ?"

এ সব আলোচনা কিন্তু মণীশের ভাল লাগিতেছিল না। বিরসভাবে সে উত্তর দিল, "যত দিন এ দেশে ছিলুম, তত দিন জানতুম, উপস্থিত ক'বছর ত আমি দেশ-ছাড়া।"

"ওয়াণ্ডারফুল! তোমার 'ষ্টেট' কি রকম আছে, তার খবর রাখনি ?"

"রাখা দরকার মনে করিনি। মা আছেন, ম্যানেজার দাদা—"

শেষ পর্য্যন্ত না শুনিয়াই অপ্রসন্নমুখে চৌধুরী কহিলেন, "হাঁ, তোমার ঐ ম্যানেজারদা, ওর সম্বন্ধে আমি কিছু বলব তোমায়। ও লোকটিকে আমার ভাল ব'লে বোধ হয় না। তোমার মার কথা যা শুনলুম, তাতে তাঁকে বুদ্ধিমতী ব'লে ত মনে করাই যায় না! আমার ধারণা, তাঁর নির্ব্বুদ্ধিতা আর তোমার সরল বিশ্বাসের সুযোগ নিয়ে ও লোকটা তার নিজের দিকটা বেশ ভারী ক'রে তুলেছে। তুমি বরং দেশে গিয়ে খোঁজ নিয়ে দেখ—"

প্রশান্ত আকাশের বুকে ক্ষণিক মেঘচ্ছায়ার মত মুহূর্ত্তের জন্য মণীশের মুখে বিরক্তির ছায়া দেখা দিয়াই আবার সহজ হইয়া আসিল। শান্তভাবে সে বলিল, "ম্যানেজার দাদাকে আমি বড় ভাই বলেই জানি। তিনি আমার ক্ষতি করবেন, এ কথা ভাবতেও কষ্ট হয়। আমার ভাল ভিন্ন মন্দ তাঁর দ্বারা হবে না।"

বিজ্ঞভাবে হাসিয়া চৌধুরী সাহেব কহিলেন, "তুমি এখনও ছেলেমানুষ, সংসারকে চিনতে অনেক দেরী। আচ্ছা, ও ব্যবস্থা আমি পরে কর্ব। এখন আসল যেটা, তার কথাই হোক। তুমি ত এক মাস পরেই কায নিয়ে চ'লে যাচ্ছ। অনেক দূরে! তোমাদের বিয়েটা তা হ'লে—"

"আমি ত বলেছি, এ সম্বন্ধে মা যে দিন স্থির ক'রে দেবেন—"

"আঃ, সব বিষয়েই মার উপর নির্ভর ক'রে থাকবার মত বয়স তোমার বহু দিন উৎরে গেছে। তোমার নিজের কি একটা সত্তা নেই ?"

ধীরকণ্ঠে মণীশ কহিল, "আছে। তা হলেও আমি ভুলতে পারি না—আমার মা আছেন। আর আমি তাঁর এক সন্তান। আমার জীবনের সব চেয়ে শ্রেষ্ঠ যে ব্যাপার, এতে তাঁকে না জানিয়ে মত দিতে আমি কিছুতে পারি না! এর জন্যে আমায় ক্ষমা করবেন—"

"আশ্চর্য্য! এত শিক্ষিত হয়ে—য়ুরোপ ঘুরে এসেও তোমার মন তেমনই জড় আছে দেখে আশ্চর্য্য হয়ে যাচ্ছি। যাক, জোর ত নেই, যা ভাল হয় কর। মোটের উপর তোমাদের বিয়েটা যত শীগ্‌গীর চুকে যায়, সেইটা আমি চাই। তোমার মাকে জানিও, তাড়াতাড়ি এর ব্যবস্থা করতে বলছি আমি। তিনি যেন এ মাসে হ'তে নেই, ও-মাস অকাল, ব'লে দেরী না করেন। অশিক্ষিত মেয়েদের অনেক রকম কুসংস্কার আছে কি না! অনেক ঝঞ্চাট, 'পাঁজি পুঁথি', দিন-ক্ষণ, কত কি ?"

তিক্ত হাসিয়া সিপ্রা বলিল, "পাড়া-গেঁয়ে মেয়েগুলো মানুষের বা'র। তাই ত এক এক সময় মনে হয়, ওঁর মা'র সঙ্গে মানিয়ে চলা হয় ত আমার পক্ষে সম্ভব হবে না।"

ঈষৎ চিন্তা-বিচলিতকণ্ঠে চৌধুরী সাহেব কহিলেন, "এও একটা কথা সত্যি! আমিও তোমায় জিজ্ঞাসা করব ভাবছিলুম। তোমার মা সিপ্রাকে বেশ প্রসন্ন-মনে গ্রহণ করতে পারবেন ত ? ও ত সে অভিমানী মেয়ে, এতটুকু অনাদর সইতে পারবে না।"

কাগজখানা টেবলের উপর রাখিয়া দিয়া মণীশ কহিল, "আমার মাকে যদি আপনারা একবার দেখতেন, তা হ'লে বুঝতে পারতেন, এ আশঙ্কা আপনাদের কত বড় ভুল। আমার যাকে ভাল লেগেছে, মা তাকে পছন্দ করবেন না বা অনাদর করবেন, এ কল্পনাও করবেন না। চার বছর আগে যখন প্রথম আপনাদের সঙ্গে পরিচয় হয়, তখনই আমি মাকে সিপ্রার কথা বলি। তিনি এতে খুসী হয়ে সম্মতি দিয়েছিলেন বলেই আমি ওকে প্রার্থনা করি।"

"ওঃ! কিন্তু তুমি তা হ'লে সর্ব্বতোভাবে তোমার মা'র ইঙ্গিতেই চলা-ফেরা কর ? এ ত ঠিক নয়! আজ যদি তিনি সিপ্রার বদলে আর কাকেও ছেলের বউ ক'রে ঘরে আনতে চান, তুমি বোধ হয় সুবোধ শিশুর মত অম্নি তাতেই রাজি হবে ?"

সপ্রশ্ন দৃষ্টি মণীশের মুখে রাখিয়া মিষ্টার চৌধুরী অপ্রসন্ন-মুখে চুরুটের ছাই ঝাড়িতে লাগিলেন। মুহূর্ত্তের জন্য মণীশ চাহিল সিপ্রার দিকে। উজ্জ্বল মোহন দৃষ্টিতে সেও চাহিয়াছিল। ক্ষণেকের জন্য উভয়ের দৃষ্টি মিলিল

স্নিগ্ধ হাসির সঙ্গে মণীশ কহিল, "তাই কি আর সম্ভব? আমার সারা জীবন তোমায় নিয়ে কাটবে ভাল। আর এমন কথা আমার মা বলবেনও না।"

"বলা যায় কি! অশিক্ষিতা মেয়েদের ত কোন দায়িত্ব-বোধ নেই। কিছু করতেই তাদের আটকায় না! যাক্, যত শীগ্‌গীর হয়, এ কাযটা মিটিয়ে ফেলতে চেষ্টা কর, আমিও নিশ্চিন্ত হ'তে পারি! আচ্ছা, তোমরা ব'স, আমি একটু ঘুরে আসি।"

দুই

পশ্চিম আকাশের গায়ে সারা দিনের শ্রমক্লান্ত দেহখানি এলাইয়া অস্তরবি অনেকখানি আত্মগোপন করিয়াছেন। লাল আলোর খানিকটা আসিয়া পড়িয়াছিল সরসী-তীরে ছিপ হাতে উপবিষ্ট মণীশ ও সিপ্রার চোখে-মুখে, সারা দেহে ক্ষুদ্র নারায়ণপুরে প্রবল আলোড়ন তুলিয়া কয় দিন হইতে সপরিবারে চৌধুরী সাহেব আসিয়া রহিয়াছেন। গ্রামবাসীর চোখে নব ভূস্বামীর জাঁক-জমক ঐশ্বর্য্যের আড়ম্বর যেমন বিস্ময়কর বোধ হইয়াছিল, ভীত-সন্ত্রস্ত করিয়াছিলও ততখানি। বিদুষী জমিদারদুহিতার বেশভূষা—ভাবী স্বামীর সঙ্গে অবাধে পথে-ঘাটে ঘুরিয়া বেড়ান দেখিয়া তাহারা ভয়ে ভয়ে নিজেদের মধ্যে তাহার সম্বন্ধে যে আলোচনা চালাইতে ও মত প্রকাশ করিতে লাগিল, তাহার কণামাত্রও তাঁহাদের কাণে উঠিলে এ বেচারীদের দুর্গতির সীমা থাকিত না। ইহাদের সৌভাগ্য যে, মানুষের শ্রবণশক্তির সীমা খুব বেশী দূর অবধি প্রসারিত নয়। অবাধ্য প্রজার দল শাসিত হইয়া যাইতে দেরী হয় নাই। ভক্তি অপেক্ষা ভয়ে মানুষ সহজে পরাজয় স্বীকার করে। ইহা ত বহু পরীক্ষিত সত্য।

এখানে আসিয়া অবধি মাছ ধরা ও পাখী শিকারের নেশা মণীশ ও সিপ্রাকে পাইয়া বসিয়াছিল। এই দুই বিষয়েই সিপ্রা মণীশ হইতেও নিপুণ। লক্ষ্যও তাহার যেমন অব্যর্থ, ছিপে মাছ গাঁথিতেও তেমনই তাহার পারদর্শিতা। কতকটা সহকারী হিসাবে মণীশ থাকে তাহার সঙ্গে আজও ছোট বড় অনেকগুলা মাছ উঠিয়াছে, অধিকাংশই সিপ্রার ছিপে। মণীশ ধরিয়াছিল একটা কি দুইটা। বঁড়শীর মুখে ময়দার টোপ দিয়া ছিপ জলে ফেলিয়া সিপ্রা কহিল, "সব কাযেই তুমি দেখছি সিদ্ধহস্ত! একবারে অপদার্থ!"

তাহার মুখের দিকে চাহিয়া স্মিত-মুখে মণীশ কহিল, "এ কথা তুমি আজ জানলে, সিপ্রা? আমি ত অনেক আগেই এ কথা জানি। জানি বলেই তোমার মত কর্ম্মঠ লোকের হাতে নিজেকে সঁপে দিয়েছি।"

"কথায় তোমায় হারান দায়! সাবধান, টোপ গিলেছে, সেবারের মত সুতো ছিঁড়ে নিয়ে পালায় না যেন!"

মণীশ জলের উপর দৃষ্টি রাখিয়া বলিল, "আচ্ছা সিপ্রা, তুমি এ কাযে এত নিপুণ হ'লে কি ক'রে বল ত? তোমার এম এ ক্লাশের পড়ার মধ্যে এ সম্বন্ধে কিছু শেখান হয় ব'লে ত শুনি নি।"

সিপ্রা হাসিয়া উঠিল, বলিল, "ওঃ, সে জান না, বি এ একজামিন দিয়ে হঠাৎ খেয়াল হ'ল মাছ ধরার। বরানগরের বাগানে আমাদের কত বড় পুকুর আছে, জান ত? এক দিন সেখানে একটা পনের সের—এই এই, মণীশ, খ্যাখ খ্যাখ—সুতো ছিঁড়ে পালালো! না, তুমি একবারেই অপদার্থ, এ বারেও পারলে না মাছটা তুলতে।"

ছিপটা তুলিয়া লইয়া মণীশ হাসিতে লাগিল। সিপ্রা ভৃত্যের হাতে নিজের ছিপ দিয়া ফ্লাস্ক হইতে চা ঢালিতে লাগিল। তরুশীর্ষ হইতে দিনান্তের শেষ আলোটুকু মিলাইয়া আসিতেছিল। তীর-সন্নিহিত তরু-রাজির ছায়া কাল জলের উপর গাঢ় হইয়া উঠিতেছে। কলসী লইয়া পল্লী-নারীরা জল লইতে আসিয়া অন্য দিনের মতই দূর হইতে ইহাদিগকে দেখিয়া নীরবে ফিরিয়া ক্রোশ দুই দূরে অবস্থিত নদীর উদ্দেশে চলিল। ক্ষুদ্র গ্রামে জলাশয় মাত্র এই একটিই।

দুই কাপ চা ঢালিয়া একটা মণীশের দিকে সরাইয়া দিয়া সিপ্রা কহিল, "নাও! মাছ ত অনেক ধরলে। চা-টা এবার খেয়ে নাও। আচ্ছা লোককে সঙ্গে এনেছি!"

তাহার চটুল দৃষ্টি মণীশের দেহ-মনে পুলকের বন্যা বহাইয়া দিল!

"দেখুন, আপনারা যদি প্রত্যহ এ সময় এখানে ব'সে থাকেন, তা হ'লে আমাদের ত অসুবিধার সীমা থাকে না!"

সচকিতে মণীশ ও সিপ্রা ফিরিয়া চাহিল। তাহাদের কাছেই দাঁড়াইয়া সতের আঠার বছরের শ্যামলা একটি তরুণী। সাধারণ আর পাঁচটি গ্রাম্য মেয়ের মতই বেশভূষা। চেহারায় বিশেষত্ব কিছু নাই। দুই জনেরই বিস্ময়ের সীমা রহিল না—এই তরুণীটির দুঃসাহসে। প্রবলপ্রতাপ ভূস্বামীর পরিচয় গ্রামবাসী ত এ কয় দিনেই যথেষ্ট পাইয়াছে, তথাপিও এ আসিয়াছে নিজেদের অসুবিধার কথা জানাইয়া অভিযোগ করিতে! তাহাদিগকে চাহিতে দেখিয়া নির্ভীক অকুণ্ঠভাবে তরুণী বলিতে লাগিল, "আজ চার পাঁচ দিন হ'তে এইখানে ব'সে আপনারা মাছ ধরছেন। গ্রামের মেয়েদের তাতে অসুবিধার শেষ নাই। নদী কত দূরে, তাও আপনারা জানেন। সেখানে যেতে হয় আমাদের জল আন্‌তে। গ্রামে অন্য পুকুর নেই ত।"

বিস্ময়ের প্রথম সংঘাতটা কাটিয়া যাইতেই সিপ্রা রাগে জ্বলিয়া উঠিল। মেয়েটির দিক হইতে দৃষ্টি ফিরাইয়া লইয়া ক্রুদ্ধস্বরে কহিল,—"কার কি অসুবিধা হচ্ছে, সে দেখে কায করবার দরকার ত আমার নেই।"

"এ কথা যদি বলেন, তা হ'লে অবশ্য আমরা নিরুপায়। কিন্তু গ্রামের জমিদার আপনারা, আপনারা যদি আমাদের সুখ-দুঃখে সুবিধা-অসুবিধায় এ ভাবে ঔদাসীন্য দেখান, তা হ'লে আমরা যাই কোথা? আমাদের যাতে অসুবিধা না হয়, তার ব্যবস্থা করা আপনাদেরই কর্ত্তব্য নয় কি?

তিক্ত সত্য মানুষকে প্রীতি অপেক্ষা বিরক্তিই বেশী আনিয়া দেয়। সিপ্রা আরও জ্বলিয়া গেল। কিন্তু মণীশের বিস্ময়ের আর সীমা ছিল না—এই গ্রাম্য মেয়েটির কথার ধরণে, তাহার নির্ভীকতায়! তাহার দিকে লক্ষ্য না করিয়া শুধু সিপ্রার দিকে চাহিয়া সেই মেয়েটি বলিতে লাগিল,—"গ্রামের মধ্যে এমন অনেক লোক আছে, যাদের চার পাঁচ মাইল হেঁটে নদীতে যাবার সামর্থ্য নেই। এ ক'দিন তারা যা কষ্ট পাচ্ছে, তার তুলনা হয় না। এ জেনেও যদি এখনও আপনারা এখানে ব'সে থাকেন, তা হ'লে—"

"তা হ'লে কি করবে তুমি, তাই শুনি?"

অত্যন্ত রূঢ়ভাবে কথাটা বলিয়া সিপ্রা মেয়েটির দিকে চাহিল। নম্র কণ্ঠেই তরুণী বলিল, "করব কিছু, এমন কথা ত আমি বলিনি। আমাদের অসুবিধার কথা জানিয়ে এর প্রতীকার প্রার্থনা করেছি,—আপনার মনুষ্যত্বের কাছে।"

তার এ কথা সিপ্রাকে ক্ষণতরে স্তব্ধ করিয়া দিল। তার পর ঠোঁট বাঁকাইয়া সে বলিল,—"জল নিয়ে যেতে ত কেউ বারণ করেনি। যাক না নিয়ে—"

এবার অত্যন্ত বিস্ময়ভরে মেয়েটি বলিল,—"এ আপনি কি বলছেন, দিদিমণি? আপনারা রয়েছেন এখানে, আপনার লোকজন ঘাটের উপর ঘুরছে। এর মধ্যে এসে তারা জল নেবে, গা ধুয়ে যাবে কি ক'রে? হ'তে পারে তারা অসভ্য পাড়াগেঁয়ে, কিন্তু মেয়েদের সহজাত সংকোচ যা, তার হাত এড়াবে কি ক'রে, তাই বলুন?"

সিপ্রার ধৈর্য্যের বাঁধন ক্রমশঃ শিথিল হইয়া পড়িতেছিল। রুক্ষকণ্ঠে কহিল,—"তবে কি করতে হবে, তাই শুনি? তোমাদের পুকুর ছেড়ে দিয়ে উঠে যাব আমরা? কিন্তু একটা কথা ভুল না, এটা আমাদের!"

মাথা নাড়িয়া মেয়েটি বলিল, "সে কথা অস্বীকার করছে কে? কিন্তু পুকুর আপনার বলেই যদি সকলের অসুবিধা আপনারা তুচ্ছ করেন, তা হ'লে তাকে উৎপীড়ন ভিন্ন আর কি বলব?"

"উৎপীড়ন? নিজের জিনিষে দাবী জানানর নাম উৎপীড়ন?" সিপ্রা প্রায় লাফাইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। তাহার চোখ-মুখের উন্মাদ ভাব বিচলিত করিল মণীশকে। ব্যস্তভাবে তাহার দিকে চাহিয়া ইংরেজিতে বলিল, "সামান্য একটা মেয়ের কথায় রাগ ক'রে কি ছেলেমানুষী করছ? যেতে দাও!"

উত্তেজিতভাবে সিপ্রা বলিল,—"যেতে দেব? কি বল তুমি? বাবাকে বলব, কাল থেকে এই পুকুর আমরা ভিন্ন অন্য সকলের অব্যবহার্য্য হবে—এই হুকুম দিতে।"

শান্ত কোমল কণ্ঠে মণীশ বলিল, "তা হয় না, সিপ্রা, গ্রামের মধ্যে একটি পুকুর, ন্যায়তঃ এতে সকলেরই অধিকার।"

তার পর মেয়েটির দিকে চাহিয়া বলিল,—"আমার জন্যেই এখানে আসতে আপনাদের অসুবিধা হয়। কাল থেকে আর আমি এখানে আসব না। না জেনে যে দোষ করেছি, তার জন্যে ক্ষমা করবেন। এস, সিপ্রা, বাড়ী যাওয়া যাক, বেলাও গেছে।"

কথার সঙ্গে সিপ্রার হাতে মৃদু একটা টান দিয়া সে

অগ্রসর হইল। নিষ্ফল ক্রোধের অসহ দহন বুকে চাপিয়া সিপ্রা উঠিল। মর্য্যাদাবোধ যাহাদের মনে অতি প্রখর, প্রতি পদক্ষেপে মর্য্যাদা হারাইবার আশঙ্কাও তাহাদের বড় বেশী। নিঃশব্দে খানিকটা পথ আসিয়া কঠিনভাবে সিপ্রা বলিল, "তোমার সম্মান বাঁচাতে গিয়ে আজ নিজেকে কতটা আমায় অপমান হ'তে হ'ল জান? এই ভাবে চ'লে আসায় ঐ সব ছোট লোকরা কত দূর আস্কারা পেলে? এর পর ওরা আমাদের মানবে, না গ্রাহ্য করবে?"

স্বভাবতঃই মণীশ শান্ত সংযত, রুষ্ট হইলেও সে আত্ম দমন করিতে জানে। সিপ্রার কথার ভঙ্গীতে তাহার স্নিগ্ধ দৃষ্টি মুহূর্ত্তের জন্য দীপ্ত হইয়া উঠিলেও সহজভাবে বলিল, "ছোট লোক হলেও ওরাও মানুষ, সিপ্রা! সুবিধা অসুবিধা নিয়ে অভিযোগ জানাবার অধিকার ওদের যেমন আছে, ওদের ভাল-মন্দর দিকে লক্ষ্য রাখাও তেমনই আমাদের কর্ত্তব্য, এটা ভুলে যেও না।"

গভীর বিতৃষ্ণায় সিপ্রার ওষ্ঠাধর আকুঞ্চিত হইল। ইহার প্রতিবাদ করিয়া কিছু বলিতেও যেন তাহার প্রবৃত্তি হইল না। মণীশ অন্যমনে বলিল, "সে যাই হোক, মেয়েটিকে দেখে আমি আশ্চর্য্য হয়ে গেছি। আমার ধারণা ছিল, পল্লীগ্রামের মেয়েরা জড় পদার্থের মতই, নিজের একটা সত্তা পর্য্যন্ত তাদের নেই। কিন্তু আশ্চর্য্য এই মেয়েটি। কেমন সহজ অকুণ্ঠ ভঙ্গী! জড়তার লেশমাত্র কোথাও নেই। এখানে এ রকমটি দেখব, এ ধারণা আমার ছিল না।"

পরিপূর্ণ আধারে অন্য কিছুর স্থান হয় না। ক্ষণপূর্ব্বে দৃষ্টা কিশোরীর ছবি মণীশের সারা অন্তর ভরিয়াছিল বলিয়াই তাহার এ প্রশংসার বাণী সিপ্রার মুখে মেঘের ছায়া কতখানি ঘনাইয়া তুলিল, ইহা তাহার চোখে পড়িল না। এক জন রমণীর সুখ্যাতি অন্য রমণী কখনই খুব ক্ষুদ্র চিত্ত লইয়া গ্রহণ করিতে পারে না, এ চিরন্তন সত্যও সে ভুলিয়া গেল। বজ্রাগ্নি-নিহিত নীরদ-খণ্ডের মতই গভীর জ্বালা মূর্ত্তি লইয়া সিপ্রা বাড়ী ফিরিল।

তিন

"এই শূয়াররা, হাসছিস কেন? বল্, কেন হাসছিস?"

অত্যন্ত রুষ্ট স্বরেই সিপ্রা সম্মুখস্থ ছেলে দুটিকে লক্ষ্য করিয়া প্রশ্ন করিল। ছেলে দুইটি বোধ হয় সহোদর ভাই। গ্রামে নূতন আসিয়াছে। সিপ্রার পরিচয় জ্ঞাত নয়। তাই সকৌতুকে তাহার দিকে চাহিয়া এক জন অপরকে কহিল, "মেম সাহেব, না দাদা? পায়ে যে জুতো—"

দাদা গম্ভীরভাবে কহিল, "না রে, 'পুরুষ,' তাই হাতে বন্দুক, সেই বৰ্দ্ধমানে গিয়ে দেখে এলাম, পুরুষদের হাতে বন্দুক। এও তাই মেয়ে পুরুষ!"

ছেলে দুইটির সরল কথার ভঙ্গীতে মণীশ হাসিয়া উঠিয়াই সিপ্রার আগুনের মত চোখ দুইটির দিকে চাহিয়া সভয়ে থামিল। এক জনের হাসির উপাদান যাহা, অন্যের পক্ষে তাহা হাস্যকর না-ও হইতে পারে। সিপ্রা ফিরিয়া চাহিল। তাহারই 'রাইফেলের' গুলীতে সদ্যোহত গোটা-কত বটের ও তিতিরের রক্তাক্ত দেহ বহিয়া যে লোকটি সঙ্গে আসিতেছিল, তাহাকে লক্ষ্য করিয়া সে কহিল, "রামলাল, এই বেয়াদব ছোঁড়া দুটোর কাণ ধ'রে কাছারী-বাড়ীতে নিয়ে যা! দু'জনকে পঁচিশ ঘা ক'রে বেত দিয়ে ছেড়ে দিবি।"

ছেলে দুইটি এতক্ষণ পর্য্যন্ত নির্ভয়ে সিপ্রার সম্মুখে দাঁড়াইয়া গভীর মনোযোগের সঙ্গে চাহিয়া চাহিয়া তাহার আপাদমস্তক দেখিতেছিল। সহসা এই আদেশের সঙ্গে রামলালকে তাহাদের দিকে আসিতে দেখিয়া, 'ওরে বাবা রে' বলিয়া একটা আর্ত্তরব তুলিয়াই প্রাণপণে দৌড় দিল। সিপ্রা নিজেই আগাইয়া ধরিয়া ফেলিল ছোটটিকে। বড়টি তখন অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে। তারস্বরে ছেলেটা চেঁচাইতে লাগিল। রামলালের দিকে তাহাকে ঠেলিয়া দিয়া সিপ্রা কহিল, "উজবুক! ওটাকে ধরতে পারলি না? একে নিয়ে যা, গুণে পঁচিশ ঘা বেত—"

"আহা! এ ছেলেমানুষের উপর এ শাস্তির হুকুম কেন? ও কি জানে বলুন ত? এ রকম দেখেনি কখনও, তাই ও কথা বলেছে। দিন—ছেড়ে দিন ওকে।" অদূরস্থ ছোট কুটীরখানির দ্বারে দাঁড়াইয়া যে মেয়েটি এতক্ষণ এই ব্যাপার দেখিতেছিল, আগাইয়া আসিয়া সে সিপ্রার হাত হইতে যূপবদ্ধ বলির পশুর মত ছেলেটির কম্পিত দেহটা টানিয়া লইল।

মণীশ দূর হইতেই চিনিয়াছিল এ সেই, যে তাহাদের গত দিনে নিজেদের অসুবিধার কথা জানাইয়া পুষ্করিণীর তীর হইতে তাহাদিগকে উঠিয়া যাইতে বাধ্য করিয়াছিল। পূর্ব্বদিনে

তাহার কুণ্ঠাহীন নির্ভীকতায় সে যেমন বিস্ময় বোধ করিয়াছিল, আজও তেমনই তাহাকে তৃপ্ত মুগ্ধ করিল—তাহার পরের জন্য এই ব্যাকুলতায়। ছেলেটি যে উহার কেহ নয়, তাহা দুই জনের দিকে একবার চাহিলেই বুঝা যায়।

সিপ্রা অবজ্ঞাভরে তাহার দিকে চাহিয়া দেখিল মাত্র, কথার উত্তর দিল না। রামলালের দিকে চাহিয়া বলিল, "এই উল্লুক, তুই শুনতে পাচ্ছিস না? ওকে নিয়ে যা!"

মিনতিভরা স্বরে মেয়েটি কহিল, "অবোধ শিশু জানোয়ারের সামিল। ওর উপর রাগ না ক'রে ক্ষমা করাই আপনার পক্ষে শোভন হবে। এবারকার মত ওর দোষটা মাপ করুন।"

সিপ্রা এবারও তাহার দিকে ভ্রূক্ষেপ করিল না। তাহার এ অশিষ্ট অবজ্ঞা মুহূর্ত্তের জন্য মেয়েটির আকর্ণ রক্তিম করিয়া তুলিল। তার পর সহজভাবেই বলিল, "ওর হয়ে আমি আপনার কাছে ক্ষমা চাইছি।"

সিপ্রা তাহার দিকে চাহিলও না; রামলালকে লক্ষ্য করিয়াই গর্জ্জিয়া উঠিল, "আমার হুকুম শুনতে পেয়েছিস্?"

বিপন্নভাবে রামলাল বলিল, "আমি কি করব, উনি যে ওকে ধ'রে রেখেছেন।"

বিহঙ্গজননী যেমন ভাবে ডানার আড়ালে শাবককে লুকাইয়া রাখে, তেমনই ভাবে ছেলেটিকে নিজের অন্তরালে সে যেন এই রোষাগ্নি হইতে সন্তর্পণে ঢাকিয়া রাখিয়াছিল। তাহার দিকে চাহিয়া কড়া আদেশের সুরে সিপ্রা কহিল, "এই, ওকে ছেড়ে দে। শুনতে পাচ্ছিস না?"

মেয়েটির সারা মুখ আবার লাল হইয়া উঠিল। আর তাহারই স্পর্শ লাগিল যেন মণীশের মুখে! মেয়েটি দৃঢ়কণ্ঠে বলিল, "না, আপনার হুকুমে বেত মারবার জন্য ওকে ছাড়তে আমি পারব না। নির্দ্দোষ অসহায় শিশু এ, একে এ শাস্তি দিয়ে কোন লাভ নেই ত আপনার।"

ক্ষমতার গর্ব্ব মানুষকে অন্ধ করে যেমন, বিবেচনাশূন্য করেও তেমনই। অসহ ক্রোধে আত্মহারা হইয়া সিপ্রা চেঁচাইয়া উঠিল, "আলবৎ ছাড়তে হবে। রামলাল, ওর কাছ থেকে ছিনিয়ে নে ছেলেটাকে।"

মণীশ এতক্ষণ নীরব দর্শকের মত দাঁড়াইয়া ছিল। ইহাদের ব্যাপারে আর কখনও সে কথা কহিবে না স্থির করিয়া রাখিলেও আর সে ভাব বজায় রাখা গেল না। সিপ্রার কাছে আসিয়া মৃদুকণ্ঠে কহিল, "চায়ের পেয়ালায় তুফান তুলছ তুমি, সিপ্রা! যেতে দাও ওদের।"

"থাম, তুমি সব কথায় কথা বলতে এস না।"

রূঢ়কণ্ঠে সিপ্রা ধমক দিয়া উঠিল। মণীশের দিকে লক্ষ্য না করিয়াই বলিল, "ও যদি না ছাড়ে রামলাল, তুই কেড়ে নে ছেলেটাকে, আমার হুকুম।"

মেয়েটার দীর্ঘায়ত কাল চোখের দৃষ্টি বিদ্যুৎশিখার মত জ্বলিয়া উঠিল। তীক্ষ্ণকণ্ঠে সে বলিল, "ধন্য আপনি যে, স্ত্রীলোক হয়ে আর এক জন রমণীর অসম্মান করবার আদেশ দিতে পারছেন! কিন্তু যাই বলুন, একে আমি আপনার হাতে দিতে পারব না। এইটুকু ছেলে পঁচিশ ঘা বেতের পর আর বেঁচে থাকবে না। এখনই ত ভয়েই প্রায় ম'রে রয়েছে, আহা!"

কথার সঙ্গে করুণা ও বেদনার একত্র সংমিশ্রণ তাহার মুখে চোখে যে ছায়া ফুটাইল, তাহা যেমন সুন্দর, তেমনই পবিত্র। মেয়েটির কথা সিপ্রাকে এতটুকু বিচলিত করিল না। সে কহিল, "ওকে শুদ্ধ, চুলের ঝুঁটি ধ'রে নিয়ে যা, রামলাল। ওরা জানুক, জমিদারের কথার বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর পরিণাম কি?"

অবিচলিত স্বরে মেয়েটি বলিল, "পরিণাম আমাদের অজানা নয়। জমিদারের আদেশের বিরুদ্ধে দাঁড়ান অন্যায়, এও জানি। কিন্তু আদেশ যখন ন্যায়ের গণ্ডীর বাইরে গিয়ে দাঁড়ায়, তখন তাকে অবহেলা করবার অধিকার সকলেরই আছে। একটু ভেবে দেখলে আপনি নিজেও বুঝতে পারবেন এ কথা। কিন্তু নিজের ব্যবহারের জন্য আমি ক্ষমা চাইছি। দয়া ক'রে আমাদের ক্ষমা করুন।"

প্রভুত্বপ্রিয়তা, ক্ষমতাগর্ব্ব সিপ্রার হিতাহিতজ্ঞানকে অতিক্রম করিয়া গেল। সে রামলালের দিকে চাহিয়া কহিল,—"তোদের সকলেরই স্পর্দ্ধা বড় বেশী হয়েছে, নয়? এখনও চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে আছিস্!"

রামলাল এই গ্রামেরই লোক। তাই স্বগ্রামের এই মেয়েটিকে নির্য্যাতন করিতে তাহার পা উঠিতেছিল না। হতাশভাবে সে চাহিল মণীশের দিকে। মণীশ একবার চাহিল সিপ্রার দিকে, একবার চাহিল মেয়েটির প্রতি। তার পর বলিল,—"আমি বলছি, আপনারা যেতে পারেন।"

মেয়েটি চমকিয়া তাহার দিকে দৃষ্টি তুলিয়া উচ্ছ্বসিত

কণ্ঠে কহিল, "আপনার এ দয়ার কথা আমার চিরদিন মনে থাকবে। নমস্কার!" যুক্ত কর ললাটে ঠেকাইয়া সে অগ্রসর হইতেছিল, সহসা কি ভাবিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইয়া সিপ্রাকে উদ্দেশ করিয়া বলিল, "আমার উপর আপনি রাগ ক'রে থাকবেন না। আর একটা কথা মনে রাখবেন, নারীর বৈশিষ্ট্য যা, তা শুধু তার কোমল হৃদয়ে, তার নারীত্বের বিকাশ সেইখানে। আপনি উচ্চশিক্ষিতা, এ সহজ কথাটা নিশ্চয়ই বুঝবেন।"

আর একবার হাত দুটা কপালে তুলিয়া ছেলেটিকে লইয়া চকিতে সে ঘনবিন্যস্ত তরুশ্রেণীর অন্তরালে অদৃশ্য হইয়া গেল। প্রতীকারশক্তিহীন নিষ্ফল ক্রোধের দহন মানুষকে ক্ষেপাইয়া তুলে। ক্ষণেকের জন্য কথা বলিবার মত অবস্থাও সিপ্রার রহিল না। তার পর মণীশের দিকে চাহিয়া অত্যন্ত কঠোরকণ্ঠেই বলিল, "কেন তুমি সব বিষয়ে আমার উপর কথা বল্‌তে এস?—কোন্ অধিকারে?"

আসন্ন শিকার হাতছাড়া হইলে শিকারীর যেমন মনস্তাপের সীমা থাকে না, তেমনই একটা ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছিল সিপ্রার চোখে-মুখে! রূঢ়কণ্ঠে আবার সে বলিল, "লোকের চোখে তোমায় হেয় করা আমার ইচ্ছে নয়, তাই আমি বাধ্য হয়ে চুপ ক'রে থাকি, কিন্তু আর এ চলে না। কালও তুমি এইভাবে আমায় তোমার কথামত চল্‌তে বাধ্য করেছ। তোমার এ প্রভুত্ব আমার অসহ্য।"

অসহ্য! ক্ষণেকের জন্য মণীশ চঞ্চল হইয়া উঠিল! সে দিকে লক্ষ্য না করিয়া 'রাইফেল'টা মাটীতে ঠুকিয়া সিপ্রা কহিল, "হ্যাঁ, অসহ্য! তুমি জান, কারও প্রভুত্ব আমি সহ্য করতে পারি না। আমাদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কের দাবী নিয়ে তুমি যদি আমার উপর জোর চালাতে যাও, তা হ'লে ভুল করবে। কারও ইচ্ছেমত চলতে বাধ্য হব, সে প্রকৃতি আমার নয়।"

শান্তকণ্ঠে মণীশ কহিল, "ভুল করছ, সিপ্রা! আজই হোক বা দুদিন পরেই হোক, আমার কথামত চলতে তোমায় বাধ্য করাব, এত বড় অভদ্রতা আমার মধ্যে নেই।"

বিদ্রূপভরা স্বরে সিপ্রা কহিল, "মুখে ও কথা বল্লেও আদেশ জাহির করতে ত্রুটি ত দেখি না। তোমায় কি বলব, ও পুরুষের স্বভাব! মেয়েদের পদানত ক'রে রাখতেই তারা চায়। আর কিছু না—" বলিয়াই মনের বিরক্তি গতিভঙ্গীতে ফুটাইয়া সে অগ্রসর হইল; মণীশের দিকে চাহিলও না। হত পাখীগুলা তুলিয়া লইতে লইতে রামলাল মণীশকে উদ্দেশ করিয়া কহিল, "বেলা গেল, বাড়ী চলুন, হুজুর!"

মণীশ কি ভাবিতেছিল। তাহার কথায় ফিরিয়া চাহিয়া কহিল, "চল যাই। উনি ত অনেকটা এগিয়ে গেছেন দেখছি।"

শুষ্ক তরুপত্রে মর্ম্মরধ্বনি তুলিয়া, ছায়াশীতল কাননের মধ্যবর্ত্তী পায়ে চলার পথ বহিয়া অগ্রসর হইতে হইতে মণীশ কহিল, "ও মেয়েটি কে, রামলাল? চেন তুমি?"

"চিনি বৈ কি, বাবু, ওনার নাম ঊষা। এই গাঁয়ে যে স্কুল আছে, ওঁর বাবা ছিলেন তার মাষ্টার। বড় ভাল লোক ছেলেন। বছর দুই তাঁর 'কাল' হয়েছে! কিছু রেখে যেতে পারেন নি। দুঃখু-কষ্ট ক'রে ঊষা দিদি নিজের আর বুড়ো মার খরচ চালায়। এমন কেউ নেই যে, ওনাদের ভার নেয়। বিয়েও হল'না তাই আজ পর্য্যন্ত।"

কেন কে জানে, এই মেয়েটির সম্বন্ধে মণীশের কৌতূহলের অন্ত রহিল না। উৎসুকভাবে সে কহিল, "কি দুঃখ-কষ্ট করেন উনি? লোকের বাড়ী কায করেন?"

সসঙ্কোচে রামলাল মাথা নাড়িল, বলিল, "না হুজুর! বড় ঘরের মেয়ে উনি. ও-সব কায কি করতে পারেন? বাপের সেই স্কুলটিই উনি চালাচ্ছেন।"

মণীশের কৌতূহল বিস্ময়ে রূপান্তরিত হইল। বলিল, "স্কুল চালাচ্ছেন, উনি লেখাপড়া জানেন?"

"জানেন বৈ কি, বাবু! কিছু জানেন নিশ্চয়; নইলে পড়ান কি ক'রে? আর ছোট ছেলে-মেয়ে সব, তাদের পড়াতে বেশী বিদ্যের ত দরকার নেই।"

"তা সত্যি, তবু মেয়েটির ক্ষমতা আছে যে, এই রকম অসহায় অবস্থাতেও সব দিকে সামঞ্জস্য রেখে নিজের খরচ নিজে চালাতে পাচ্ছে, কারুর উপর নির্ভর করেনি, কারুর গলগ্রহ হয়নি।"

রামলাল সব কথা না বুঝিয়াও বিজ্ঞভাবে কহিল, "ঠিক কথা, হুজুর, ঠিক কথা। গাঁয়ে এমন অবস্থা কারও নাই যে, কেউ কাকেও দেখবে, কিন্তু নিন্দে করবার বেলা সবাই

আছে। ওঁর ঐ স্কুল করার জন্তে, বে না হওয়ার জন্তে মাষ্টার মশায়ের বিধবাকে কম কথা শুনিয়ে যায় সব ? আ মর্! ভাল কর্‌তে নেই, মন্দ কর্‌তে আছে!"

সিপ্রা অনেকটা আগাইয়া গিয়াছে। রামলালের কথাগুলা মণীশের বেশ ভাল লাগিতেছিল। মন্থর-পদে চলিতে চলিতে সে বলিল, "ওঁর মা চেষ্টা করেন না মেয়ের বে'র জন্তে?"

"করলেই বা হচ্ছে কৈ, হুজুর? গরীবের ঘরের কালো মেয়ে নেবে কে?"

মণীশ আর প্রশ্ন করিল না।

চার

মণীশের জন্ত নির্দ্দিষ্ট ঘরের দ্বারে দাঁড়াইয়া সিপ্রা বলিল, "চমৎকার, এখনও বেশ নিশ্চিন্ত হয়ে শুয়ে আছ? যাবে না?"

সিপ্রার বেশ লক্ষ্য করিয়াও মণীশ অনাবশ্যক প্রশ্ন করিল, "যাব? কোথায় যাব?"

জানিয়া শুনিয়া অজ্ঞতার ভাণ সকলকেই বিরক্ত করে। রুক্ষভাবে সিপ্রা কহিল, "রোজ যাই কোথায়, জান না?"

"ওঃ! পাখী-শিকারে? না, সিপ্রা, আজ আমার ভাল লাগছে না।"

"কেন তাই শুনি? কি হয়েছে তোমার?"

মণীশ কথা কহিল না। আরও জলিয়া সিপ্রা বলিতে লাগিল, "কদিন হ'তেই দেখছি, তোমার যেন কি রকম ভাব। আমি জানতে চাই, এর কারণ কি? কি হয়েছে তোমার?"

এবারও মণীশ কথা কহিল না। রাগের মাথায় উত্তর না পাইলে বিরক্তি আরও বাড়িয়া যায়। ক্রূর হাসির সঙ্গে সিপ্রা কহিল, "এইখানেই তোমার সঙ্গে আমার মেলে না। তোমরা অতিরিক্ত ভাবপ্রবণ, স্বপ্ন-জগতের মানুষ। আমি তা নই। এই সেন্টিমেন্টালিটী জিনিষটা আমার দু'চোখের বিষ! কি হয়েছে তোমার? কিছু কি এখানে অসুবিধা হচ্ছে? কিম্বা এখানে ভাল লাগছে না, এ কথা স্পষ্ট বল্লে তার প্রতীকার হ'তে পারে। কিন্তু এভাবে—"

কিছু অধীরভাবেই মণীশ বলিল, "কিন্তু আমি ত কোন অভিযোগ জানাইনি, সিপ্রা।"

"কেন জানাচ্ছ না? আমরা কি তোমার কেউ নই?"

মণীশ কথা বলিল না। অসহিষ্ণুভাবে সিপ্রা কহিল, "কি? তা হ'লে সত্যিই যাবে না?"

"না সিপ্রা, আমার শরীর মন ভাল নেই!"

আর কথা না কহিয়া, পদশব্দে কক্ষ মুখর করিয়া সিপ্রা চলিয়া গেল। তাহাকে বিশেষ দোষীও করা যায় না। সত্যই কয় দিন হইতে মণীশের যে কি হইয়াছে, নিজেই সে ভাবিয়া পায় না। এক দুর্বোধ্য ব্যাকুলতা তাহাকে কেমন যেন অধীর উন্মনা করিয়া তুলিয়াছে।

মানুষের মন এক দুর্জ্জেয় পদার্থ! সিপ্রা চলিয়া গেল। মুক্ত-বাতায়নপথে ক্লান্ত অলস দৃষ্টি মেলিয়া মণীশ চাহিয়া রহিল। দিগন্তপ্রসারিত সবুজ মাঠের দিকে—এ বাড়ীর সীমা যেখানে শেষ হইয়াছে, সেখান হইতেই ইহার আরম্ভ হইয়া দৃষ্টির শেষ সীমায় গিয়া আকাশে মিশিয়াছে। তাহার ওপারে কি আছে, কে জানে? ও-দিকটায় তাহারা যায় নাই কোন দিন। মাঠের আর এক দিকে গ্রাম্য পথের সঙ্কীর্ণ রেখা। তাহার উপর সিপ্রার বিলীয়মান মূর্ত্তির কতকটা তখনও দেখা যাইতেছে। 'টিফিন বাস্কেট', চায়ের 'ফ্লাস্ক' ও অন্যান্য আর কয়টা জিনিষ বহিয়া ভৃত্যটা চলিয়াছে তাহার সঙ্গে। মণীশ সে দিক হইতে দৃষ্টি ফিরাইয়া লইল। মিনিট দুই নিশ্চলভাবে বসিয়া থাকিয়া সে-ও উঠিয়া ত্রস্তপদে বাড়ীর বাহিরে আসিল। গ্রীষ্মের খর দৃষ্টির আঘাতে ধরণীর সরস শ্যামলতা লুপ্ত হইয়া চারিদিক কেমন একটা দুঃসহ কাঠিন্যে ভরিয়া উঠিয়াছে। রবিকর সহ্য যায় না। মণীশ লক্ষ্যহীনভাবে পথের পাশের আম-কাঁটালের বাগানের মধ্য দিয়া চলিতে আরম্ভ করিল;—সিপ্রাকে যে দিকে যাইতে দেখিয়াছিল, তাহার বিপরীত দিকে। খানিকটা গিয়া শিশুকণ্ঠের সমবেত কলরোলে মণীশ চকিত হইয়া উঠিল। সম্মুখেই খড়ে ছাওয়া মাটীর বাড়ী। বাহিরের দিকে একটা ঘরে প্রায় ত্রিশ বত্রিশটি ছোট ছেলে-মেয়ে জড় হইয়াছে। তাহাদের মাঝখানে বসিয়া সে দিনের সেই মেয়েটি। মণীশের মনে পড়িয়া গেল—সে দিন রামলাল বলিয়াছিল এই কথাই। কৌতূহল উদগ্র হইয়া উঠিলেও ক্ষণেক সে ইতস্ততঃ করিল।

চলিয়া যাইবে বলিয়া ফিরিলও। তার পর কি ভাবিয়া আগাইয়া সেই ঘরখানির সম্মুখে আসিয়া বলিল, "একটু খাবার জল দেবেন ?"

উষা অন্য দিকে চাহিয়া একটি ছেলেকে অঙ্ক বুঝাইয়া দিতেছিল। মণীশের কণ্ঠস্বরে চমকিয়া চাহিল, শিশুদল সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল।

ব্যস্তভাবে উঠিয়া দাঁড়াইয়া, ছোট একটি নমস্কার করিয়া উষা বলিল, "আসুন, ঘরে এসে বসুন, জল এনে দিচ্ছি।"

মণীশ উঠিয়া ঘরের মধ্যে আসিল। সুপ্রশস্ত ঘরখানি জুড়িয়া মাদুর বিছান। এক ধারে গোটা দুই বেতের মোড়া। বোধ হয়, সম্মানিত অতিথি কেহ আসিলে তাঁহাদের জন্য উহা ব্যবহৃত হয়। তাহারই একটা দেখাইয়া দিয়া উষা কহিল, "বসুন।"

ভিতরে যাইবার বদ্ধ দরজাটা খুলিয়া উষা ভিতরে গেল। তাহার মধ্য দিয়া যত দূর দেখা যায়, মণীশ একবার চোখ বুলাইয়া লইল। ছোট উঠানখানির এক পাশে তুলসী-বেদী, তাহারই এক ধারে কয়েকটা বেল-ফুলের গাছ। রাত্রির ফোটা ফুলগুলি রৌদ্রতাপে পরিম্লান হইয়া রহিয়াছে। অন্য ধারে বোধ হয় রান্না-ঘর। বদ্ধ দ্বারের শিকল তুলিয়া দেওয়া। সমস্তই নির্ম্মল পরিচ্ছন্নতায় সুমার্জ্জিত! আবিলতার লেশমাত্র যেন কোনখানে নাই! ছেলে-মেয়েগুলি ঘরের এক ধারে একত্র হইয়া অপলক-নয়নে মণীশের দিকে চাহিয়া ছিল। তাহার সুশ্রী সুগৌর চেহারা কিম্বা তার হাতের ঘড়ী, চশমা, মহার্ঘ্য পরিচ্ছদ, কোন্‌টা তাহাদের এত মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছিল, বলা দুরূহ।

গোটা দুই ডাব ও ছোট একটি কাটারী লইয়া উষা অল্পক্ষণের মধ্যেই আসিল। শিশু-দলের মধ্য হইতে এক জনকে উদ্দেশ করিয়া কহিল, "গৌরী, বাড়ীর মধ্যে থেকে পাথরের একটা গ্লাস আন ত, ভাই।"

গৌরী চলিয়া গেল। উষাকে লক্ষ্য করিয়া মণীশ বলিল, "জল চেয়ে আপনাকে খুব বিব্রত করলুম। এক গ্লাস জল দিলেই যথেষ্ট হ'ত। এত ব্যাপার—"

দীর্ঘায়ত দুই চোখের শান্ত কোমল দৃষ্টি তুলিয়া তাহার দিকে চাহিয়া উষা কহিল, "এ আমাদের গাছের ডাব। আপনি কুণ্ঠিত হবেন না।"

কাটারী ও ডাব সে তুলিয়া লইতেছিল, ব্যস্ত হইয়া মণীশ বলিল, আপনি কেন কষ্ট করছেন? দিন, আমি কেটে নিচ্ছি।"

"আপনি পারবেন না, এ ত কখনও—"

কথা সে শেষ করিল না। মণীশ হাসিয়া বলিল, "আপনি ভুলে যাচ্ছেন, আমি এই বাঙ্গালা দেশেরই ছেলে।"

উষাও হাসিল; বলিল, "কিন্তু এখন?"

"এখন কি? সাহেব হয়ে গেছি? তাই একটা ডাব কাটতেও পারব না? আচ্ছা দিন, দেখিয়ে দিই আপনাকে, এ ধারণা আপনার কত বড় ভুল।"

সে হাত বাড়াইলেও উষা কাটারী তাহার হাতে দিল না। স্মিতমুখে কহিল, "কিন্তু আপনি যে আমার অতিথি, সেটাও ভুলবেন না।"

ক্ষিপ্রহাতে ডাব কাটিয়া গ্লাসে জল ঢালিয়া সে মণীশের কাছে রাখিল। গ্লাসটা তুলিয়া লইয়া মণীশ কহিল, "আপনার আতিথেয়তাকে শত ধন্যবাদ। রৌদ্রে ঘুরে যা তেষ্টা পেয়েছিল।"

শূন্য গ্লাসটা নামাইয়া রাখিয়া অপর ডাবটির জল তাহাতে ঢালিয়া দিয়া উষা বলিল, "রৌদ্রে ঘুরছেন কেন? অসুখ হ'তে পারে।"

"অসুখের ভয় আমার নেই! কিন্তু বেরিয়েছিলুম বলেই ত আপনার অতিথি-সৎকারের নমুনা দেখতে পেলুম। আরও পেলুম, এ দেশের মেয়েরাও যে স্বাবলম্বী হ'তে পারে, তার একটা চাক্ষুষ পরিচয়। বাস্তবিক আমার একটা ভ্রান্ত ধারণা আজ গেল। আমি জানতুম, আমাদের দেশের সাড়ে পনর আনা মেয়ের সব বিষয়ে পরের মুখোপেক্ষী হয়ে থাকা ভিন্ন অন্য উপায় নাই।"

গভীর কুণ্ঠায় উষার মুখখানা লাল হইয়া উঠিল। মণীশ সে দিকে না চাহিয়াই বলিয়া যাইতে লাগিল, "আপনার পরিচয় যত পাচ্ছি, ততই আমি আশ্চর্য্য হয়ে যাচ্ছি এই ভেবে—"

কি ভাবিয়া সে আশ্চর্য্য হইতেছে, তাহা শুনিবার অপেক্ষা না করিয়াই উষা কহিল, "কি সব বলছেন আপনি। বেশী কিছু দেখেন নি বলেই যা দেখছেন, তাতেই আশ্চর্য্য হয়েছেন। এর মধ্যে অসাধারণত্ব কিছু নেই!"

পরক্ষণেই ছাত্রদলের দিকে ফিরিয়া বলিল, "তোমরা সব চুপ ক'রে কেন, পড়তে আরম্ভ কর।"

ছেলেমেয়েগুলি খাতা-বই তুলিয়া লইল। ইহাতে

তাহাকেই চলিয়া যাইবার ইঙ্গিত, মণীশ তাহা বুঝিল। নিঃসম্পর্কীয় এক জন যুবকের সান্নিধ্য সে চাহে না। মণীশ ক্ষুণ্নমনে উঠিয়া দাঁড়াইল। আরও খানিকটা বসিয়া যাইবার ইচ্ছা কেন যে তাহার মনে এত প্রবল হইয়া উঠিয়াছে, সে নিজেই বুঝিল না। উষার দিকে চাহিয়া কহিল, "চল্লুম তা হ'লে। অনাহূত এসে খুব উপদ্রব ক'রে গেলুম।"

"পাড়াগাঁয়ের লোক কেউ বাড়ীতে অতিথি এলে উপদ্রব মনে করে না।"

"তার প্রমাণ আমিও পেয়েছি। আচ্ছা, একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে পারি?"

"নিশ্চয়, কি কথা বলুন?"—সপ্রশ্ন-নয়নে উষা তাহার দিকে চাহিল।

সভ্যতা-বিরোধী হইলেও অসীম কৌতূহল মণীশকে দিয়া অনধিকার প্রশ্ন করাইল। "আপনি কি চিরজীবন এই ভাবে কাটাবেন ঠিক করেছেন?"

সহজভাবেই উষা উত্তর দিল, "তাই ত মনে করেছি।"

"কিন্তু এ ভাবে চিরকাল—আচ্ছা, এদের পড়ান কি প্রণালীতে হয়?"

"সাধারণ স্কুলে যেমন পড়ান হয়, তেমনই ভাবে পড়াতে চেষ্টা করি।"

মণীশ ক্রমশই অধিকতর বিস্ময় বোধ করিতেছিল। বলিল, "আপনার কাছে এদের পড়া কত দূর পর্য্যন্ত হ'তে পারবে?"

এ প্রশ্নের উত্তর দিতে উষার মুখে আর একবার রক্তিমাভা জাগিল। নতমুখে মৃদুকণ্ঠে কহিল, "আমি ত বেশী লেখাপড়া জানি না। ম্যাট্রিক ক্লাশ পর্য্যন্ত ওদের পড়াতে পারব। তার বেশী ক্ষমতা আমার নেই।"

পাঁচ

সকালবেলা চায়ের টেবলে মণীশকে অনুপস্থিত দেখিয়া চৌধুরী সাহেব ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। কন্যার দিকে চাহিয়া কহিলেন, "তার কি এখনও ঘুম ভাঙ্গেনি? ব্যাপার কি?"

অর্দ্ধসিদ্ধ ডিমের পাত্রটা টানিয়া লইয়া বিরক্তভাবে সিপ্রা কহিল, "কে জানে? তার আজ ক'দিন যেন কি হয়েছে! ঘর ছেড়ে ত বার হ'তেই চায় না। তুমি নিতান্ত আটকে রেখেছ, তাই রয়েছে, না' হ'লে চ'লে যেত।"

"তাই না কি? কেন বল্ ত, তোর সঙ্গে ঝগড়া হয়েছে?"

"কিছু না, বেবী! মার জন্যে বুঝি মন কেমন করছে। কে জানে কি হয়েছে। বলে না ত কিছু, জানব কি ক'রে? বিলেত ঘুরে এলেও ওর মধ্যে গ্রাম্য ভাব যা—সে যায় নি! ও-ধরণের লোক আমার একটুও ভাল লাগে না।"

পিতা সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিলেন। বলিলেন, "চুপ চুপ, 'সিলি গার্ল'! কি বলে, ঠিক নেই।"

উষ্ণকণ্ঠে সিপ্রা কহিল, "আমি অমন মনের ভাব গোপন ক'রে রাখতে পারি না। ও সভ্য-সমাজের অযোগ্য।"

আর কথা না বাড়াইয়া চৌধুরী সাহেব ঘণ্টা বাজাইয়া, পরিচারককে ডাকিয়া মণীশের সংবাদ আনিতে পাঠাইলেন। সিপ্রা নিঃশব্দে চা ঢালিতে লাগিল। ভৃত্য ফিরিয়া আসিল। চৌধুরী সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন, "উঠেছে সে, আসছে না কি?"

"তাঁর ভারী জ্বর। উঠতে পারছেন না। মাথায় যন্ত্রণা—"

জ্বর? আর কিছু না শুনিয়াই পিতা ও কন্যা প্রায় লাফাইয়া উঠিলেন।

অন্ধকার-ভরা মুখে সিপ্রা কহিল, "আমি শুনেছি, এ দিকে ভারী 'পক্স' হচ্ছে, তাই নয় ত?"

উদ্বেগবিহ্বল স্বরে চৌধুরী কহিলেন, "সেইটাই সম্ভব। না হ'লে হঠাৎ জ্বর হবে কেন? কি করি, বল দেখি?"

অন্ধ ব্যক্তি অন্য এক অন্ধকে পথ কোথায় জিজ্ঞাসা করিতেছে, এমনই বিপন্নভাবে সিপ্রা চাহিয়া রহিল। দ্রুতকণ্ঠে চৌধুরী বলিতে লাগিলেন, "অসুখ-বিসুখের ঝঞ্ঝাট আমি মোটেই সইতে পারি না। তার পর যদি সত্যিই 'পক্স' হয়, তা হ'লে ত কথাই নেই! এখন দেখছি, ওকে আটকে রাখাই আমার অন্যায় হয়েছে। এমন বিপদে পড়ব যে, তা কে জানে?"

হতাশভাবে চেয়ারের উপর এলাইয়া পড়িয়া সিপ্রা কহিল, "যা হয় ব্যবস্থা কর, বাবা। ভয়ে আমি 'হার্টফেল'

করবার মত হয়েছি ! এত 'প্যালপিটেশন' হচ্ছে। ওর 'পক্স' না হয়ে যায় না। তা যদি হয়, তা হ'লে আমাদেরও হবে, যা 'কনটেজিয়াস্' ডিজিজ ও। কি হবে ?"

সিপ্রার চোখে-মুখে অবর্ণনীয় আশঙ্কার যে ছবি ফুটিয়া উঠিল, তাহার তুলনা খুঁজিয়া পাওয়া দুরূহ। স্নেহভরে তাহার মাথায় হাত দিয়া পিতা বলিলেন, "ভয় কি, অত 'নার্ভস্' হচ্ছ কেন ? আমি এখনই সব ব্যবস্থা করছি। তুমি না হয় একটু শুয়ে পড় গিয়ে। আমি ওকে দেখে আসি।"

"খুব কাছে যেও না। তফাৎ হতে খোঁজ-খবর নিও। আমার কথা বলো, অসুখের খবর পেয়েই আমার যা অবস্থা হয়েছে, চোখে দেখতে পারব না।"

"না না, তোমার আর ওর কাছে গিয়ে কায নেই ! আমিই যাচ্ছি, কি করি ওর ব্যবস্থা, তাই হচ্ছে চিন্তা ! দাও, চা দাও, খেয়েই যাই।"

চৌধুরী সাহেব আবার চেয়ার টানিয়া লইয়া বসিলেন। সিপ্রা চা ঢালিতে ঢালিতে অস্ফুট কণ্ঠে কহিল, "যত ঝঞ্ঝাট। কে জানে আবার অসুখ বাধিয়ে বসবে। এমন জানলে—"

পিতাই কন্যার কথার উপসংহার করিলেন। "তা হ'লে কি ওকে সঙ্গে আনি ? এমন বিপদে মানুষ পড়ে ?"

কাপ তিন চার চা-পানের পর কতকটা সুস্থ হইয়া চৌধুরী সাহেব ঘরের বাহির হইলেন। সিপ্রা সদ্য আগত সংবাদপত্রখানা লইয়া সেইখানেই বসিয়া রহিল।

খানিকক্ষণ পরে মিঃ চৌধুরী আবার দেখা দিলেন। মুখের ভাব পূর্ব্বাপেক্ষাও শোচনীয়। কহিলেন, ডাক্তার এসেছিল। যা ভয় করা যাচ্ছে, সেইটাই হওয়া সম্ভব ব'লে গেলেন। হাই টেম্পারেচার। কোমরে গায়েও ব্যথা আছে বল্লে।"

কাগজখানা ফেলিয়া দিয়া গভীর ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া সিপ্রা কহিল, "কি হবে তা হ'লে ? আমি ত আগেই বলেছি, ঐ অসুখ ভিন্ন আর কিছু নয়।"

চৌধুরী সাহেব অত্যন্ত চিন্তিতভাবে বাহিরের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

সিপ্রা অস্থির পায়ে ঘরময় ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। যাহা কৃত্রিম, সত্য নয়, তাহার আড়ালে মানুষ নিজেকে বেশীক্ষণ ঢাকিয়া রাখিতে পারে না। অল্প হাওয়া লাগিলেই আবরণ সরিয়া স্বরূপ প্রকাশ হইয়া যায়। সিপ্রা কহিল, "এই সব 'কনটেজিয়াস্ ডিজিজে'র কাছ থেকে নিজেদের তফাৎ ক'রে না ফেললে বিপদ অনিবার্য্য, এটা বোঝ ত ? আমার মনে হয়—"

কথাটা সে সম্পূর্ণ না করিলেও চৌধুরী ঠিক বুঝিলেন। বলিলেন, "আমিও তাই ভাবছি। কিন্তু ও যদি এতে কিছু মনে করে ?"

"করে যদি, তাতে ওর নির্ব্বুদ্ধিতাই প্রকাশ পাবে, ও ত ছেলেমানুষ নয়। এটা ওর বোঝা উচিত, নিজেকে সাবধান ক'রে নেবার অধিকার সকলেরই আছে। না না 'ড্যাডি' কোন কথা নয়, ঐ ভয়ঙ্কর অসুখ যা মনে করেও আমি শিউরে উঠছি, ওর কাছে থাকা অসম্ভব।"

"আচ্ছা, তা হ'লে সেই ব্যবস্থাই করা যাক।"

"নিশ্চয়, তুমি আর দেরী ক'রো না। ওর গায়ে সেগুলো দেখা দিয়েছে ?"

মাথা নাড়িয়া চৌধুরী কহিলেন, "ঠিক বোঝা গেল না যদিও, তবে ঐ নিশ্চয় !"

ছয়

বেলা প্রায় চারিটা বাজে। বাহিরের তাপ হইতে আত্মরক্ষায় অসমর্থ ঘরখানা যেন আগুন হইয়া উঠিয়াছে ! জ্বরতপ্ত চোখদুটা মেলিয়া মণীশ ডাকিল, "সিপ্রা !"

কেহ সাড়া দিল না। কোনমতে শয্যার উপর উঠিয়া বসিয়া সে আহ্বান-ঘণ্টা স্পর্শ করিল। মিনিট কয়েক কাটিতে দ্বারের পর্দা সরাইয়া কে এক জন ভিতরে আসিল। মণীশ শুইয়া পড়িয়া ছিল। তাহার দিকে না চাহিয়াই কহিল, "আমাকে একটু জল দিয়ে, সিপ্রাকে ডেকে দাও ত।"

"তাঁরা ত কেউ নেই। চ'লে গেছেন।"

মণীশের ব্যাধিক্লিষ্ট মাথায় কথাটা ঠিক প্রবেশ করিল না। বলিল, "নেই ? কোথায় গেছেন ? শিকার করতে ?"

"না, হুজুর, কলকাতায় সাহেবের একটা জরুরী কায আছে, আর দিদি মেম সাহেবেরও শরীর ভারী খারাপ লাগছিল, তিনিও তাই সঙ্গে গেলেন, বল্লেন, এক বাড়ীতে দু'জন অসুখে পড়লে দেখবে কে ? আপনার চিকিচ্ছে-পত্তরের সব ব্যবস্থাই তাঁরা ক'রে দিয়ে গেছেন, কোন কষ্ট হবে না !"

অসম্ভব কোন কিছুকে মানুষ সহসা বিশ্বাস করিতে পারে না! আর একবার শয্যার উপর উঠিয়া বসিয়া বিহ্বলভাবে কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া মণীশ বলিল, "তুই বলছিস কি রে'? তাঁরা চ'লে গেছেন ?"

"হাঁ! হুজুর, জরুরী কাম কি না—"

"হুঁ! সকালেই বলছিলেন বটে, আমার 'পক্স' হবার সম্ভাবনা আছে। সেই ভয়েই তা হ'লে পালিয়েছেন! ভাল।"

মণীশ ক্লান্তভাবে আবার শুইয়া পড়িল। চাকরটা কি করিবে ভাবিয়া না পাইয়া নিশ্চলভাবে দাঁড়াইয়াই রহিল। ক্ষণেক নিঃশব্দে পড়িয়া থাকিয়া মণীশ তাহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, "তোমাদের ম্যানেজার বাবু আছেন, না তিনিও পালিয়েছেন ?"

"না, তিনি কোথাও যাননি। এখানেই আছেন।"

"তাঁর অসীম অনুগ্রহ। একবার তাঁকে ডেকে দিতে পার ?"

"দিচ্ছি, হুজুর, এখনই দিচ্ছি।"

লোকটা চলিয়া গেল। ঘরের জানালাগুলা খোলা রহিয়াছে। আগুনের শিখার মত তপ্ত হাওয়া ঘরের মধ্যে থাকিয়া থাকিয়া লুটাইয়া পড়িতেছে। যে চাকরটি প্রতিদিন দশটা বাজিলেই ঘরের দ্বার-বাতায়ন বন্ধ করিয়া দিয়া যায়, সম্ভবতঃ সেও আজ কলিকাতায় ফিরিয়া গিয়াছে। মণীশ আঙ্গুল দিয়া কপালের দুইটা পাশ চাপিয়া ধরিল। ম্যানেজার বাবু আসিয়া দাঁড়াইলেন। প্রভুর রুগ্ন অতিথিকে ফেলিয়া এ ভাবে সরিয়া পড়ায় অসীম সঙ্কোচে এ লোকটির কুণ্ঠার সীমা ছিল না। নত দৃষ্টিতে নমস্কার জানাইয়া তিনি বলিলেন, "দেহটা একটু ভাল বোধ কচ্ছেন কি ?"

"হ্যাঁ, যথেষ্ট ভাল বোধ হচ্ছে। সে কথা যাক্। আপনাকে যে একটু কায করতে হবে। কলকাতার শেষ ট্রেণ ছাড়বে বোধ হয় আটটায়। এর আগে আমি যাতে ষ্টেশনে যেতে পারি, এর ব্যবস্থা দয়া ক'রে আপনি ক'রে দিন!"

সবিস্ময়ে কয় মুহূর্ত্ত চাহিয়া থাকিয়া ম্যানেজার বলিলেন, "এই শরীর নিয়ে আপনি যাবেন ?"

"হ্যাঁ, আপনি আর দেরী করবেন না। যান্—"

ম্যানেজার বাবু ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন, কিছু বলিবার মত সাহসও তাঁহার হইল না। মণীশ আর একবার তাগিদ দিল:—"যান আপনি! হেঁটে যাবার সামর্থ্য থাকলে অবশ্য আপনাকে কষ্ট দিতুম না।"

"আজ না গেলেই কি চলে না? এই অসুস্থ শরীরে—"

"শরীর আমার বেশ ভালই আছে। আপনি যাওয়ার ব্যবস্থা করুন।"

ম্যানেজার বাবুকে বাধ্য হইয়া সেই ব্যবস্থা করিবার জন্যই ফিরিতে হইল। বিকম্পিত-দেহ মণীশ শয্যা ছাড়িয়া তাহার ইতস্ততঃ ছড়ান প্রয়োজনীয় জিনিষগুলাকে গুছাইয়া একত্র করিতে লাগিল।

ঘণ্টাখানেক পর অবশ ক্লিষ্ট দেহটাকে কোনও মতে টানিয়া লইয়া মণীশ যখন এখানকার একমাত্র সম্বল গরুর গাড়ীতে উঠিয়া বসিল, তখনও দিনের আলো বেশ প্রখর হইয়াই রহিয়াছে। সঙ্কীর্ণ কাঁচা রাস্তা বাহিয়া গো-যান চলিল। দুই চোখে গভীর ব্যগ্রতা লইয়া মণীশ চাহিয়াছিল—পথের দিকে, কি যেন প্রত্যাশা করিতেছিল সে। না পাইয়া হতাশাভরে দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া দৃষ্টি ফিরাইল! হঠাৎ কি ভাবিয়া গাড়ীর চালককে সে লক্ষ্য করিয়া বলিল, "হ্যাঁ রে, এখানকার স্কুল-বাড়ী তুই চিনিস? ছোট ছেলেরা সেখানে পড়ে?"

মুখ ফিরাইয়া সে উত্তর দিল, "চিনি বৈ কি, বাবু! সেখানে দরকার আছে কিছু?"

মণীশ ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। প্রয়োজন তাহার কিছু নাই সত্য, তথাপি—ক্ষণেক স্তব্ধ থাকিয়া দ্বিধার ভাবটা কাটাইয়া বলিল, "ওখান দিয়ে একটু গাড়ীটা ঘুরিয়ে নিয়ে যাস ত।"

কথাটা বলিয়াই সঙ্কোচভরে সে সরিয়া ভিতরের দিকে বসিল। একটু পরেই গাড়োয়ানটা ডাকিয়া বলিল, "বাবু, এই ত স্কুলবাড়ী। নামেন।"

নামিবার প্রয়োজন নাই, অথচ কেন যে সে এখানে আসিল, নিজেই ভাবিয়া স্থির করিতে পারিল না। উৎসুকভাবে একবার চারিদিক দেখিয়া সে বলিল "না। নামব না। নে, তুই চল্।"

চালকটা বিস্মিতভাবে একবার আরোহীর দিকে চাহিয়া দেখিয়া গরু দুটাকে তাড়া দিল। হঠাৎ সম্মুখের দিকে চাহিয়া মণীশ বলিয়া উঠিল, "ওরে, রাখ রাখ। আর একটু থাক্!"

উষাদের বাড়ীর বাহির দিকের ঘরের মধ্য হইতে ছোট দুটি মেয়েকে লইয়া উষা এ দিকেই আসিতেছিল। পথের উপর গাড়ীটা দেখিয়া বিস্মিতভাবে চাহিতেই মণীশের উৎসুক দুই চোখের উপর গিয়া পড়িল তাহার দৃষ্টি! ত্রস্তপদে কাছে আসিয়া মণীশের দিকে চাহিয়াই ব্যাকুলভাবে বলিল, "কি হয়েছে আপনার? এমন দেখাচ্ছে কেন?"

সে কথার উত্তর না দিয়া মণীশ বলিল, "ভাগ্য ভাল, তাই আপনার সঙ্গে এখন দেখা হ'ল। আমি চ'লে যাচ্ছি।"

"চ'লে যাচ্ছেন? কিন্তু আপনাকে যে ভারী অসুস্থ দেখাচ্ছে!"

"অসুস্থই হয়ে পড়েছি। জ্বরটা বেশীই, ডাক্তার বলেছেন, এর উপর 'পক্স' হবারও সম্ভাবনা আছে!"

উষার মুখখানা নিষ্প্রভ হইয়া আসিল। সে বলিল, "কিন্তু এ অবস্থায় চ'লে যাচ্ছেন কেন? ওঁরা আপনাকে যেতে দিলেন?"

বিশুষ্ক ওষ্ঠে জোর করিয়া একটু হাসি টানিয়া মণীশ বলিল, "কি জানি, ওঁরা বাড়ী থাকলে আমায় যেতে দিতেন কি না। কিন্তু আমার দুর্ভাগ্য যে, আমার অসুখের কথা শোনবার পরই ওঁদের হঠাৎ একটা দরকারী কাযের কথা মনে প'ড়ে যাওয়ায় কলকাতায় ফিরে যেতে হয়েছে"

নিস্তব্ধভাবে উষা কি যেন ভাবিল, বলিল, "কিন্তু এ অবস্থায় যেতে কি আপনার খুবই কষ্ট হবে না?"

"হওয়াই সম্ভব, কিন্তু উপায় কি? সামর্থ্য থাকতে যাওয়াই ভাল।"

"তার চেয়ে দুটো দিন আমাদের এই কুঁড়েয় কাটিয়ে গেলে কি আপনার খুব অসুবিধা হবে?"

শান্ত চোখের স্নিগ্ধ দৃষ্টি উষা মণীশের মুখের উপর তুলিয়া ধরিল।

বিমুগ্ধ-নয়নে তাহার দিকে চাহিয়া মণীশ বলিল, "আমার অসুবিধা হবে না, এ খুব সত্যি; কিন্তু আপনারা বিব্রত হবেন। তা' ছাড়া আমার বসন্ত হবার সম্ভাবনা আছে, এটা মনে রাখবেন।"

কোমল হাসির সঙ্গে উষা কহিল, "আপনারা সহরের লোক, জানেন না তাই, সহর আর পাড়াগাঁয়ের রীতিনীতি ঠিক এক নিয়মে বদ্ধ নয়। এই অসুস্থ অবস্থায় আপনাকে ছেড়ে দিলে আমাদের অপরাধের সীমা থাকবে না। আপনার অবশ্য এখানে খুবই কষ্ট হবে। তবু এ অবস্থায় একা পথে বেরোনোর চেয়ে এ অনেক ভাল। আসুন, কোন দ্বিধা করবেন না, বাড়ীতে আমার মা আছেন। আর কিছু না হোক আপনার মা'র মত তাঁর স্নেহ-যত্ন এখানে আপনাকে তৃপ্তি দিতে পারবে।"

মণীশ নীরবে নামিয়া গাড়োয়ানকে একটি টাকা দিয়া তাহার সঙ্গে অগ্রসর হইল।

সাত

তিন চার দিনের পরই মণীশের জ্বর ছাড়িয়া গেলেও আর দুইটা দিন তাহাকে এখানে কাটাইতে হইল। সে দিন বিকালের দিকে কি কাযে উষা তাহার ঘরের সম্মুখ দিয়া যাইতেছিল। দেখিতে পাইয়া মণীশ ডাকিল। প্রয়োজন ভিন্ন এ ঘরে সে আসে না। তাহার নিপুণ হাতের পরিচর্য্যা এ কয় দিন মণীশের রোগশয্যা নিবিড় তৃপ্তি ও আনন্দে ভরিয়া দিলেও এই পল্লী-তরুণীর সহিত ঘনিষ্ঠতার এতটুকু অবকাশ সে পায় নাই। অটুট গাম্ভীর্য্য দুর্ভেদ্য বর্ম্মের মত নিয়ত তাহাকে ঘেরিয়া অনেক দূরে সরাইয়া রাখিয়াছে। সেখানে প্রবেশের সাধ্য কাহারও নাই। মণীশের ডাকে উষা আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার স্বভাবনম্র কোমল কণ্ঠে কহিল, "কি চাই বলুন ত, কি দেব?"

"কিছু দিতে হবে না। বিনা দরকারে কি ডাকতে নাই?"

উষা হাসিল মাত্র; কথার উত্তর দিল না। অকারণ কথা সে বলে না, ইহাও মণীশের অজানা নাই। অপলকনয়নে ক্ষণেক চাহিয়া থাকিয়া সে বলিল, "এবার আর আমায় যেতে দিতে আপত্তি হবে না বোধ হয়? আমি কাল যেতে চাই। মাকে বলেছি, তিনি রাজি হচ্ছেন না। বলছেন আর দুদিন থাকতে।"

মণীশ ভাবিয়াছিল, উষাও হয় ত সেই কথাই বলিবে। উৎসুক দৃষ্টিতে সে চাহিয়া রহিল।

সহজকণ্ঠে উষা বলিল, "বেশ তাই যাবেন। সকালেই ট্রেণ বোধ হয়?"

উষা চলিয়া যাইতেছিল। মণীশ ডাকিল, "আমার কথা শেষ হয়নি। উষা, আর একটু দাঁড়াও।"

বিস্ময়-উজ্জ্বল চোখের দৃষ্টি মণীশের মুখে ফেলিয়া উষা ফিরিল। আজ প্রথম সে তাহাকে নাম ধরিয়া ডাকিল! ধীরস্বরে বলিল, "বলুন, আর কি বলবেন?"

মুহূর্ত্ত স্তব্ধ থাকিয়া মণীশ কহিল, "আমি কাল যাচ্ছি; কিন্তু শীগ্‌গীর আবার আসব কেন জান?"

জিজ্ঞাসু-নেত্রে উষা তাহার দিকে চাহিল।

"তোমায় নিয়ে যেতে আমার ঘরে আমার কাছে।"

উষার শান্ত মুখখানা নিমেষে কঠিন হইয়া উঠিল। বলিল, "আপনি কি মনে করেছেন, এই রকম কিছু একটা আশা করেই আমি সে দিন অসুস্থ আপনাকে ঘরে এনেছিলুম? তা নয়। আপনার কৃতজ্ঞ অন্তরের এ পরিচয় খুবই প্রশংসনীয়, কিন্তু এটাও ভুলবেন না, আমি কারও অনুগ্রহের প্রত্যাশী নই।"

তাহার দিকে সরিয়া আসিয়া গাঢ়স্বরে মণীশ বলিল, "তুমিও ভুল বুঝো না, উষা। এ কৃতজ্ঞতা নয়! প্রথম যে দিন দেখি তোমায়, তখনই আমার বড় ভাল লেগেছিল। কিন্তু চোখের সামনে ছিল বিজলী আলোর উজ্জ্বল দীপ্তি, তাই বিভ্রান্ত দৃষ্টি আমার চিনেও চেনে নি। আজ কিন্তু ভ্রান্তি নেই। আজ জেনেছি, ও আলো শুধু চোখকে ধাঁধিয়ে রাখে, তৃপ্তি দেয় না। তার চেয়ে অনেক ভাল এই মাটীর প্রদীপের স্নিগ্ধ শিখাটুকু! এখনও কি বুঝতে পার নি উষা, যাব বলেও কেন সে দিন যেতে পারি নি, ফিরে এসেছিলুম তোমারই কাছে?"

শ্রীমতী জ্যোৎস্না ঘোষ।

শেষ মিনতি

একটি কথা গোপনে আজি বলিব সাধ তোমাকে
মিনতি শেষ এই গো তব চরণে।
সকল ব্যথা সকল সাধ জান তো বঁধু ফুরাবে—
একটি কথা রাখিয়ো প্রিয় স্মরণে!

অভিমানের কোনই কথা কবো না আমি কবো না,
অভিমানের দিন সে গেছে চলিয়া,
হাসিতে আর মাণিক নাই, নয়নে জলে ঝরে না
মুকুতা-ধারে কপোল-তল ঝলিয়া!

দরশে আর হরষ নাহি, শিহরি নাহি উঠে গো
বিবশ তব পরাণ মোরে পরশি',
কত না বার কত না ছলে আঁখির কোণে হেরিয়া
চিত্ত তব উঠে না আর সরসি'!

বিশ্ব-মাঝে কোথাও মোর ছিল না কোন তুলনা,—
কত না কথা উঠিছে মনে দুলিয়া;
অভিমানের সে সব কথা কবো না বঁধু কবো না,
সে সব কথা গিয়াছি হায়, ভুলিয়া।

জ্যোছনা-মাঝে মুখের মম লাবণী তুমি হেরিতে—
একদা সারা জ্যোছনা-নিশি জাগিয়া,—
কখনো যদি বলেছি ভুলে, "এমন মিছে ব'লো না"—
ফিরায়ে মুখ উঠিতে তুমি রাগিয়া!

অধরে মম মাধবী-বন-মধু যে ছিল ভরিয়া,
দেহেতে ছিল পদ্মকুসুম সুরভি!
প্রণয় ঢালি, পরাণ ঢালি, হৃদয় ঢালি পূজিয়া
কেশেতে মোর পরায়ে দিতে করবী!

সে সব কথা বলিতে নাই, সে সব দিন নাহি আর—
আছে গো তাহা আছে সে শুধু স্মরণে,—
থাক্ সে মিছে গোপন-কথা পরাণে থাক্ গোপনে,
সকল সাধ মিটিবে প্রিয়, মরণে॥

শ্রীজ্যোতিস্ময় চৌধুরী (বি, এ)।

কলম্বসের যুগের ঘটিকাযন্ত্র

পাঁচ শত বৎসরাধিক বয়ঃক্রম হইলেও এই ঘটিকাযন্ত্র এখনও চলিতেছে। ১৪১০ খৃষ্টাব্দে এই ঘটিকাযন্ত্র নির্ম্মিত হয়। নিউইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়ে যে সকল পুরাতন জিনিষ সংগৃহীত হইয়াছে, এই

কলম্বসের যুগের ঘটিকাযন্ত্র

ঘটিকাযন্ত্র তাহার অন্যতম। অধ্যাপক ড্যানিয়েল ওয়েবেষ্টার হেরিং উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের কিউরেটার। কোনও বিক্রেতার দোকান হইতে তিনি উহা সংগ্রহ করেন। অধ্যাপক হেরিংএর বয়স ৮৬ বৎসর। কলম্বস যখন আমেরিকা আবিষ্কার করেন, তাহার কয়েক বৎসর পূর্ব্বে উক্ত ঘটিকাযন্ত্র নির্ম্মিত হয়। ঘটিকাটি এখনও চলিতেছে।

কাচ-নির্ম্মিত পার্ব্বত্য ট্রেণগাড়ী

আল্‌পস্‌ পর্ব্বতে যাঁহারা ট্রেণযোগে গমন করেন, তাঁহারা পাহাড়ের দৃশ্য যাহাতে ভাল করিয়া দর্শন করিতে পান, সে জন্য কাচনির্ম্মিত গাড়ী অধুনা নির্ম্মিত হইয়াছে। গাড়ীর উপরের অর্দ্ধাংশ সমস্তই কাচ-নির্ম্মিত। গাড়ীর ভিতরের দেওয়াল এমন ভাবে নির্ম্মিত, যাহাতে শব্দ প্রবেশ করিতে না পারে। সুদৃঢ়
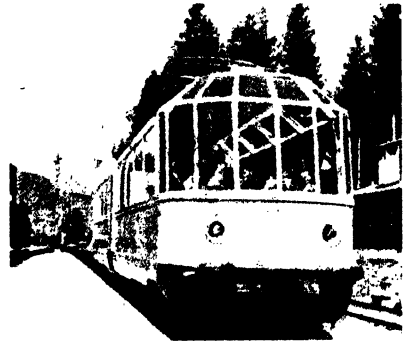
উপরের ছবিতে যাত্রীরা কাচ-বাতায়নের সাহায্যে দৃশ্য দেখিতেছে, নীচের ছবিতে ট্রেণের বহির্দৃশ্য

কাচনির্ম্মিত ছাদ কৃত্রিম চর্ম্ম দ্বারা এমনভাবে আবৃত যে, জল প্রবেশ করিবার কোনও উপায় নাই।

বিমানধ্বংসী কামান

আমেরিকায় বিমানধ্বংসী এক প্রকার কলের কামান বাহির হইয়াছে। এই কামান অত্যন্ত দ্রুত গুলী নিক্ষেপ করিতে পারে। মিনিটে বার গুলী ইহা হইতে নির্গত হইয়া থাকে। ৬০ হাজার ফুট দূরে উহা নিক্ষিপ্ত হয়। এই কামান গুলী নিক্ষেপ কালে একটুও আন্দোলিত হয় না। পরীক্ষা করিয়া দেখা হইয়াছে যে, বন্দুকের নলের উপর এক গ্লাস জল রাখিলে এক ফোঁটা জলও উছলিয়া মাটিতে পড়িবে না।

বিমানধ্বংসী কামান

দেশপর্য্যটকের চলমান গৃহ
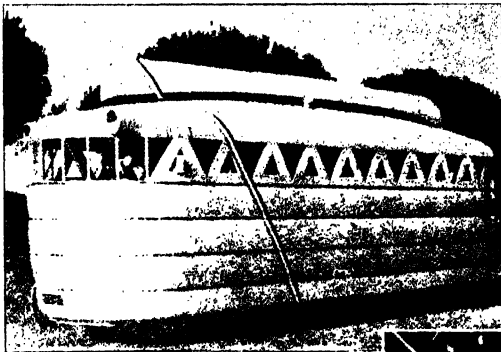
ছোট ছোট তক্তা শিরীষ দিয়া জুড়িয়া, পেরেক মারিয়া জনৈক ফরাসী উদ্ভাবক এই চলমান বাড়ী তৈয়ার করিয়াছেন। চারি জন পরিব্রাজক এই গৃহে আরামে দেশপর্য্যটন করিতে পারেন। বিমান-নির্ম্মাণে যে প্রণালী অবলম্বিত হইয়া থাকে, এই চলমান গৃহনির্ম্মাণেও সেই প্রণালীর অনুসরণ করা হইয়াছে। সমগ্র গৃহটি লঘুভার। বায়ুবেগ প্রতিহত করিবার ব্যবস্থা অনুসারে উহা নির্ম্মিত। ইহার দৈর্ঘ্য ২৪ ফুট। ঘরে দুইখানি সোফা আছে, রাত্রিকালে উহা শয্যায় পরিণত হয়। ইহা ছাড়া দুই জনের শয়ন উপযোগী স্বতন্ত্র শয্যাও আছে। একটা ছোট কামরায় বস্ত্রাদি রাখিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। রান্নাঘর এবং সুখে উপবেশন করা যায়, এমন চেয়ারও ইহাতে রহিয়াছে। নানাপ্রকার ব্যায়াম ও ক্রীড়ার দ্রব্যাদিও এই চলমান গৃহে সংরক্ষিত। নদী-ভ্রমণ করিবার প্রয়োজন হইলে ক্যান্ভাসের নৌকাও আছে। উহাতে ৪ জন বসিতে পারে, নৌকা ঘরের ছাদের উপর রক্ষিত; ছাদের উপর খানিকটা স্থান খুলিয়া দিয়া বাতাস আসিবার ব্যবস্থাও করা হইয়াছে।

বামে গৃহের বহিশ্চিত্র, নিম্নের ছবিতে ভিতরের দৃশ্য প্রদর্শিত হইতেছে

দাঙ্গা-নিবারণে গ্যাস

পুলিস বিভাগের জন্য কলের বন্দুক ও পিস্তলের সাহায্যে গ্যাস ছড়াইয়া দাঙ্গা-নিবারণের ব্যবস্থা হইয়াছে। বাম দিকের ছবিতে যে কলের বন্দুক দেখা যাইতেছে, তাহা হইতে এককালীন প্রচুর গ্যাস নির্গত হইয়া ছড়াইয়া পড়ে। এই গ্যাস এমন দুর্গন্ধযুক্ত

দাঙ্গানিবারণে গ্যাস
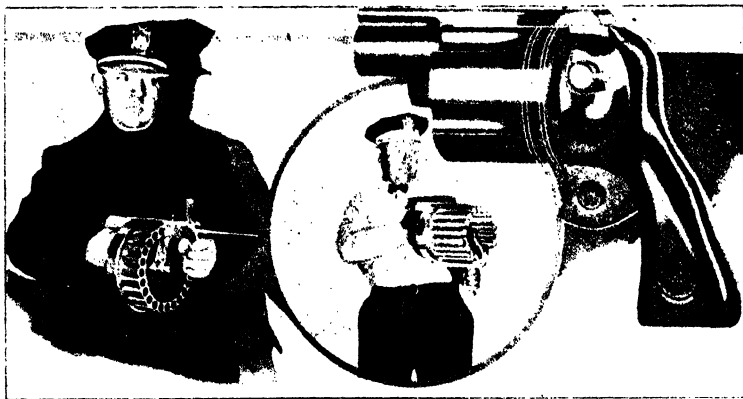
ও বমনোদ্রেককারী যে, সমবেত জনতা তাহার দুর্গন্ধে ছত্রভঙ্গ হইয়া পলায়ন করিতে বাধ্য হয়। মধ্যস্থলে যে ছবি দেখা যাইতেছে, তাহাও কলের বন্দুক। ঘোড়া টিপিবামাত্র উহা হইতে রাশি রাশি গ্যাসবাষ্প নির্গত হইয়া ছড়াইয়া পড়ে। উহাতে জনতা মুহূর্ত্তমধ্যে পলায়নতৎপর হয়। দক্ষিণে যে পিস্তল দেখা যাইতেছে, উহারও অনুরূপ দক্ষতা। এই গ্যাস কয়েক ফুট দূরে গিয়া ফলপ্রদ হয়; অথচ স্থায়ী অনিষ্ট এই গ্যাসে হয় না। খুব কাছাকাছি থাকিলে কিছু বিপদের আশঙ্কা আছে।

ধূলি নিবারক মুখোস

ধূলির সাহায্যে নানাবিধ ব্যাধির বীজাণু শ্রমিকদিগের নাসারন্ধ্র দিয়া শরীরে প্রবেশ করিয়া থাকে। সে জন্য ধূলি-নিবারক মুখোস নির্ম্মিত হইয়াছে। যাহারা খনির মধ্যে কায করে অথবা পাথর

ধূলি-নিবারক মুখোস

ভাঙ্গে, কিংবা যাহারা শাণ দেয়, তাহাদের নাসারন্ধ্র দিয়া ঐ সকল পদার্থের সূক্ষ্ম অণু পরমাণু শরীরে প্রবেশ করিয়া নানাবিধ মারাত্মক ব্যাধির সৃষ্টি করিয়া থাকে। এই মুখোস ধারণ করিলে সে সম্ভাবনা থাকিবে না, অথচ শ্বাসপ্রশ্বাসের কোনও অসুবিধা ঘটিবে না। লণ্ডন প্রদর্শনীতে [illegible] পরীক্ষিত [illegible] য়াছে।

চারিদিক ঘেরা তিন চাকার গাড়ী

প্যারী সহরে তিন চাকার এক শ্রেণীর সস্তা দামের গাড়ী নির্ম্মিত হইয়াছে। এই গাড়ীর চারিদিকে লোহার রেলিং ঘেরা। অন্য কোনও গাড়ীর সহিত সংঘর্ষ হইলে এই গাড়ীর আরোহীর কোনও

চারিদিক ঘেরা তিন চাকার গাড়ী

ক্ষতি হইবে না, সেই জন্য লোহার রেলিং দিয়া ইহা ঘেরা। এক গ্যালন তৈলে এই গাড়ী ১ শত ২৫ মাইল পর্য্যন্ত পথ চলিবে। ইহার গতিবেগ ঘণ্টায় ৩০ মাইল। ইহার এঞ্জিন তেমন বড় নহে।

শর্করা-নির্ম্মিত হোটেল-বাড়ী

এক শত পঁয়ত্রিশ পাউণ্ড চিনি ও সাড়ে তিন পাউণ্ড গঁদের সাহায্যে চিকাগো হোটেলের নমুনায় এই শর্করা-হর্ম্ম্য নির্ম্মিত হইয়াছে। চিকাগো হোটেলে ৩ হাজার ঘর আছে। শর্করানির্ম্মিত মডেল গৃহে তাহা দেখাইবার প্রচেষ্টা হইয়াছে। সকল বিষয়েই চিকাগো হোটেলের সহিত যাহাতে এই চিনির হোটেলের সাদৃশ্য থাকে, কুশলী শিল্পী তাহার কোনও ত্রুটি করেন নাই।

শর্করা-নির্ম্মিত হোটেল-বাড়ী

ছত্রসংলগ্ন ক্যামেরা ও দূরবীক্ষণ যন্ত্র

জনৈক বৃটিশ উদ্ভাবনকারী ছাতার বাঁট-সংলগ্ন দূরবীক্ষণ যন্ত্র নির্ম্মাণ করিয়াছেন। যাঁহারা ঘোড়দৌড় প্রভৃতির ভক্ত, তাঁহারা এই প্রকার ছত্র-সাহায্যে রৌদ্রবৃষ্টি হইতে রক্ষা পান এবং দূরের বস্তু
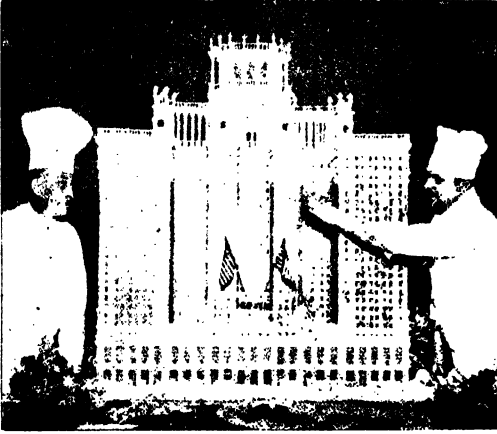
ছত্রসংলগ্ন ক্যামেরা ও দূরবীক্ষণ যন্ত্র

দেখিয়া কৌতুক অনুভব করেন। আর এক জন বৃটিশ বৈজ্ঞানিক ছত্রসংলগ্ন ক্যামেরাও উদ্ভাবন করিয়াছেন। ছবি দেখিলেই ব্যাপার বুঝিতে পারা যাইবে।

রিপোর্টারের বিচিত্র বর্ষাতি

জার্ম্মাণীর কোনও সংবাদপত্রের সংবাদদাতা তাঁহার বর্ষাতিতে স্বচ্ছ বাতায়ন সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। কাগজ-পেনসিল লইয়া তিনি

রিপোর্টারের বিচিত্র বর্ষাতি

উক্ত বাতায়নের সাহায্যে কি লিখিতেছেন, তাহা দেখিতে পান। মুষলধারে ঝড়বৃষ্টি হইলেও তাঁহার কোনও অসুবিধা হয় না। কারণ, সেই স্বচ্ছ পদার্থ ভেদ করিয়া জল প্রবেশ করিতে পায় না।

নূতন ধরণের বিমান

যাহাতে বিমান-পরিচালনা বিদ্যায় স্বল্প পারদর্শী লোকও সহজে বিমান পরিচালনা করিতে পারে, এই সংকল্প লইয়া আমেরিকার সরকারী বিমান বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষ নূতন ধরণের বিমান নির্ম্মাণ করিবার কল্পনা করিতে থাকেন। কেবিনের পশ্চাতের উপরিভাগে এঞ্জিন রাখিলে পরিচালক সব দিক ভাল করিয়া দেখিতে পাইবে, ইহা ভাবিয়া নবনির্ম্মিত বিমানে তাহার ব্যবস্থা হইয়াছে। বর্ত্তমান বিমানের তিনটি চাকা—একটি বিমানের ঠিক নাসিকার নিম্নভাগেই অবস্থিত। এই বিমানে দুই জন আরোহীর জন্য স্থান আছে। নূতন বিমান ঘণ্টায় ৯০ মাইল গতিতে চলিবে। উহার মোটর চারি সিলিণ্ডারবিশিষ্ট। এঞ্জিনের শক্তি ১ শত ২৫টি অশ্বের

শিক্ষানবীশের পরিচালন-উপযোগী নূতন বিমান

সমতুল্য। ঘণ্টায় এই বিমান এঞ্জিনে ৮ গ্যালন তৈল লাগিবে। যে কেহ এই বিমান পরিচালনা করিতে পারিবে, এই উদ্দেশ্যে উহা নির্ম্মিত হইয়াছে।

স্যুটকেসে ফটো বড় করিবার সরঞ্জাম

বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক যুগে আলোকচিত্রকর স্যুটকেসের মধ্যে অন্ধকার কক্ষ এবং আলোকচিত্র বড় করিবার যাবতীয় সরঞ্জাম রাখিবার
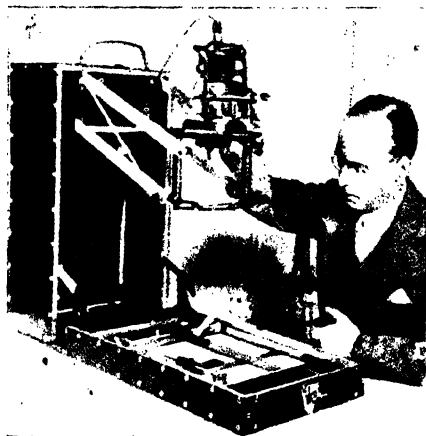
স্যুটকেসে ফটো বড় করিবার সরঞ্জাম

সুযোগ পাইয়াছেন। যাবতীয় উপাদান-সমন্বিত আলোকচিত্রের স্যুটকেস এখন বাজারে বাহির হইয়াছে। কাগজকে সোজা ভাবে রাখিবার জন্ম যন্ত্রও ইহাতে আছে। অন্ধকার কক্ষে আলোকচিত্র পরিস্ফুট করিবার ব্যবস্থা ইহাতে আছে। দুই মিনিটের মধ্যেই কক্ষটিকে কার্য্যোপযোগী করিয়া লওয়া যায়, স্যুটকেসটি জলে, এসিডে নষ্ট হইবার নহে। ধূলিকণা প্রবেশের কোনও পথ ইহাতে নাই।

বৃহৎ মৎস্য শিকারে তীরনিক্ষেপকারী বন্দুক

হাঙ্গর, খড়্গমৎস্য এবং ছোট ছোট তিমি মৎস্য শিকার করিবার উদ্দেশ্যে এক প্রকার বন্দুক নির্ম্মিত হইয়াছে। এই বন্দুক হইতে
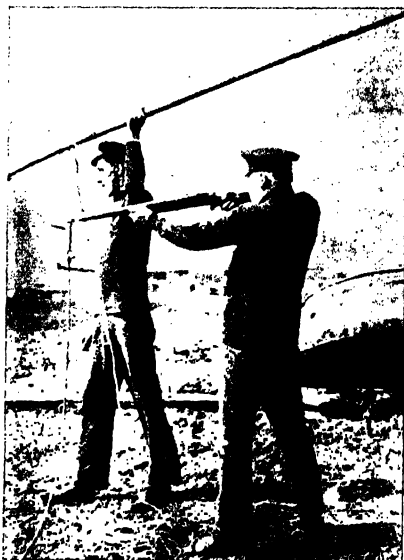
মৎস্য শিকারে তীরনিক্ষেপকারী বন্দুক

তীর নিক্ষিপ্ত হইয়া ৫০ গজ দূরবর্ত্তী বৃহৎ মৎস্যকে বিদ্ধ করে। এই বন্দুকের ওজন ১০ পাউণ্ড বা পাঁচ সেরেরও কম। তীরের ওজন দুই পাউণ্ড। উহা বন্দুকের নলের মধ্যে থাকে এই বন্দুকের সাহায্যে অভ্রান্তভাবে লক্ষ্যভেদ করা যায়।

তাঁবুর অন্তরালে বাংলো নিৰ্ম্মাণ

লস্‌এঞ্জেলেসে এক স্থানে বৃহৎ বস্ত্রাবাস সংস্থাপিত হয়। সেই বস্ত্রাবাসের ভিতর মিস্ত্রীরা যে এক বৃহৎ বাংলো নির্ম্মাণ করিতেছিল, এ সংবাদ ঘুণাক্ষরেও প্রকাশ পায় নাই। রাত্রিদিন কায করিয়া নয়টি কক্ষসমন্বিত বাংলোর নির্ম্মাণকার্য্য যখন সমাপ্ত হইল, তখন বস্ত্রাবাস সরাইয়া ফেলা হইল। দর্শকগণ তখন সবিস্ময়ে নির্ম্মাতৃগণের এই অদ্ভুত কৌশল প্রত্যক্ষ করিল। উপরের ছবিতে দেখা যাইবে, বস্ত্রাবাস রহিয়াছে, নিম্নের ছবিতে নবনির্ম্মিত বাংলোর দৃশ্য।
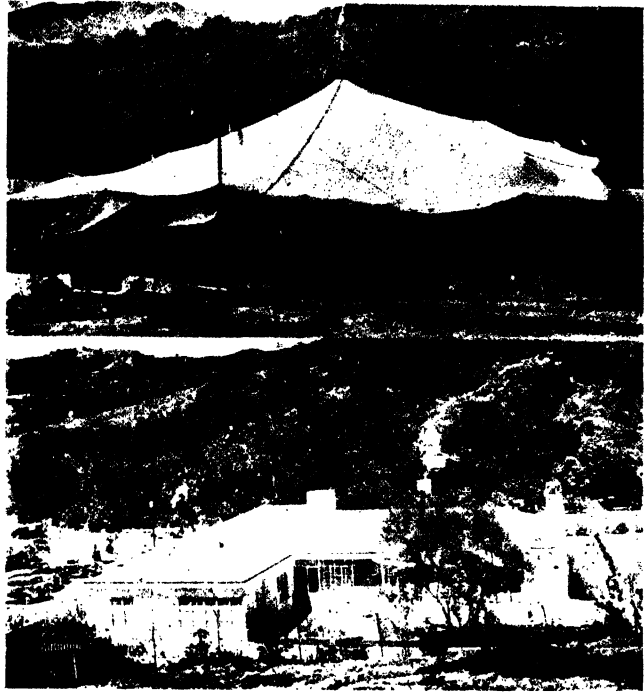
নূতন ধরণের দ্বিচক্রযান

প্যারী সহরে চেয়ারের ন্যায় আসনবিশিষ্ট দ্বিচক্রযান বাহির হইয়াছে। চালক তাহাতে সোজাভাবে বসিয়া ষ্টীয়ারিং চাকার সাহায্যে গাড়ীকে নিয়ন্ত্রিত করে: ছবি দেখিলেই ব্যাপারটা বুঝা যাইবে।

তাঁবুর অন্তরালে বাংলো নিৰ্ম্মাণ

খালি দেশলাইয়ের বাক্সনির্ম্মিত দ্বিতল-গৃহ

ক্যান্‌সাস্ সহরের এক ব্যক্তি এক মাসকাল অবসরসময়ে কায করিয়া খালি দীপশলাকার বাক্সের সাহায্যে চিত্রে বর্ণিত দ্বিতল

চেয়ারবিশিষ্ট নূতন দ্বিচক্রযান

খালি দেশলাই বাক্সনির্ম্মিত দ্বিতল-ঘর

ঘর নির্ম্মাণ করিয়াছেন। এই ঘরটি ১৯ ইঞ্চি লম্বা এবং ১৬ ইঞ্চি প্রশস্ত। ইহার উচ্চতাও ১৬ ইঞ্চি।

বিচিত্র বন্দুক

আর এক জাতীয় বিমান-ধ্বংসকারী বন্দুক বাহির হইয়াছে। উহা হইতে এক পাউণ্ড ওজনের গোলা বাহির হইয়া সাজোয়া গাড়ী এবং বোমানিক্ষেপকারী বিমানপোত চূর্ণ করিতে সমর্থ। এই প্রকার মারণাস্ত্রসমূহ প্রতীচ্য সভাদেশে ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে।

সাজোয়া-গাড়ী ধ্বংস-কারী কলের কামান

অপ্রতিদ্বন্দ্বী দ্রুতগামী ফরাসী ডেষ্ট্রয়ার

ফরাসী নৌবিভাগ ৬ খানি অত্যন্ত দ্রুতগামী ডেষ্ট্রয়ার নির্ম্মাণ করিয়াছেন। পরীক্ষায় স্থির হইয়াছে, ইহারা ঘণ্টায় ৫২ মাইল গতিবেগবিশিষ্ট। প্রত্যেক পোতে ৫টি করিয়া ৫'৫ ইঞ্চি কামান আছে। তাহা ছাড়া ২১ ৭ ইঞ্চি টর্পেডো নল এবং ৩৭ মিলিমিটারের ৪টি কামানও আছে। প্রত্যেক জাহাজে ২২০ জন করিয়া নাবিক আছে। ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে শেষ পোতখানি কারখানা হইতে বাহির হইয়া জলে নামিয়াছে। উহারা ফরাসী উপকূলভাগ রক্ষার জন্ম সমুদ্রবক্ষে ভাসিয়াছে।

অপ্রতিদ্বন্দ্বী ফরাসী ডেষ্ট্রয়ার

দশম পল্লব

অনুসরণ

লণ্ডনের পশ্চিমাংশে (west end) সম্ভ্রান্ত অধিবাসিগণের যে সকল বাসপল্লী বিরাজিত, তন্মধ্যে ল্যাংফোর্ড গার্ডেন্স্ কেবল আধুনিক নহে, এই সুনির্ব্বাচিত পল্লী সর্ব্ববিষয়েই আদর্শ-পল্লীরূপে বিলাসী সমাজের মনোরঞ্জন করিত। সুদৃশ্য উদ্যানের চতুর্দ্দিকে যে সুপ্রশস্ত পথটি নির্ম্মিত হইয়াছিল, শব্দনিবারণের জন্য তাহা রবারের দ্বারা আবৃত; সেই পথে কাষ্ঠাবরণ ব্যবহৃত হয় নাই। দুই চারিখান ট্যাক্সি ভিন্ন এই পথে সাধারণ শকট-সমূহের প্রবেশাধিকার ছিল না। লণ্ডন নগরের বিচিত্র কোলাহল ও অশ্রান্ত শব্দ-কল্লোল এখানে অস্ফুট মন্দ্রধ্বনিবৎ প্রতীয়মান হইত। মিঃ প্রীড গ্রেটল্যাণ্ডস ম্যান্সনস্ হইতে এই পল্লীতে প্রবেশ করিয়া চতুর্দ্দিকের নিস্তব্ধতায় বিস্মিত হইলেন। তিনি বাগানের রেলিংএর নিকট উপস্থিত হইয়া, রেলিংএ ভর দিয়া ২২নং ভবনের সম্মুখে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

মিঃ প্রীড সেই স্থানে দাঁড়াইয়া ধূসর-বর্ণের একখান মোটর-গাড়ী দেখিতে পাইলেন। গাড়ীখানি সেই অট্টালিকার সম্মুখে দাঁড়াইয়া ছিল। তিনি সেই গাড়ীর সম্মুখস্থ আসনে দুই জন আরোহীকে উপবিষ্ট দেখিলেন। তৃতীয় ব্যক্তি গাড়ী হইতে নামিয়া অট্টালিকার সম্মুখের দ্বারের দিকে যাইবার জন্য সিঁড়ি দিয়া বারান্দায় উঠিতেছিল। মিঃ প্রীড দেখিলেন, লোকটির স্কন্ধদেশ সুপ্রশস্ত, নীলবর্ণ পরিচ্ছদে তাহার দেহ আবৃত, এবং মস্তকে গোল টুপী। লোকটি সিঁড়ি দিয়া উঠিতে উঠিতে একবার মাথা ঘুরাইয়া পথের দিকে দৃষ্টিপাত করিতেই তাহার মুখ মিঃ প্রীডের দৃষ্টিগোচর হইল।

মিঃ প্রীড বুঝিতে পারিলেন, সেই স্থানে উপস্থিত হইবার জন্য তিনি অত্যন্ত তাড়াতাড়ি করিলেও তাঁহার পৌঁছিতে বিলম্ব হইয়া গিয়াছিল। তিনি টেলিফোনে যে কথাবার্ত্তা শুনিতে পাইয়াছিলেন, এবং বুইলোঁ রেস্তরাঁর ম্যানেজারের নিকট যে তারিখটি সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহা হইতে তিনি এই সুনিশ্চিত সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন যে, প্যারাডাইন যে লোকটির সঙ্গে গমন করিয়াছিল, সেই ব্যক্তি ল্যাংহ্যাম ভিন্ন অন্য কেহ নহে। ল্যাংহ্যামই ডসন সম্বন্ধে সুব্যবস্থা করিবার জন্য দুই জন সঙ্গীর সহিত বুইলোঁ রেস্তরাঁয় প্রত্যাগমনের উপদেশ পাইয়াছিল। রেস্তরাঁর পশ্চাৎস্থিত আঙ্গিনা হইতে যে তিন জন লোককে বাহিরে যাইতে দেখা গিয়াছিল, তাহাদের এক জন যে ল্যাংহ্যাম, এ বিষয়েও মিঃ প্রীডের সন্দেহ ছিল না।

মনে মনে এই সকল বিষয়ের আলোচনা করিয়া মিঃ প্রীড একটি সিদ্ধান্ত করিলেন। পুলিস ল্যাংহ্যামের অনুসরণ করিতেছিল, এইরূপ কল্পনা করিয়া ল্যাংহ্যাম আতঙ্কাভিভূত হইয়াছিল; তাহার পর সেই আতঙ্ক দূর হইলে যখন তাহার মন স্থির হইল, তখন সে ২২ নং ল্যাংফোর্ড গার্ডেনস-স্থিত সেই রহস্যাবৃত লোকটির নিকট উপস্থিত হইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিল। বুইলোঁ রেস্তরাঁর ম্যানেজার ডসনকে বহন করিয়া এক জন সুবেশধারী অপরিচিত ব্যক্তির সঙ্গে যাইতে যাইতে তাহারা কোথায় তাহার সম্মুখে পড়িয়াছিল, তাহা সে সেই রহস্যাবৃত লোকটিকে তাড়াতাড়ি জানাইবার জন্য অধীর হইয়াছিল। ২২নং ল্যাংফোর্ড গার্ডেন্সের সেই অধিবাসীর নিকট এই সংবাদ পৌঁছিবামাত্র সেই ব্যক্তি আশঙ্কার কারণ বুঝিতে পারিবে, এবং রহস্যের গুপ্ত তথ্যটিও সে আয়ত্ত করিতে পারিবে। তাহা হইলে মিঃ প্রীড যে রহস্যভেদে উদ্যত হইয়াছিলেন, তাহা জটিলতর করিয়া তাঁহার সঙ্কল্প ব্যর্থ করা কঠিন হইবে না, এইরূপই মিঃ প্রীডের ধারণা হইয়াছিল।

মিঃ প্রীড ল্যাংহ্যামকে দ্বারের সম্মুখে দাঁড়াইয়া ঘণ্টাধ্বনি করিতে উদ্যত দেখিলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ কর্ত্তব্য স্থির

করিলেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন, আগন্তুক-দ্বয়ের সকলেই সশস্ত্র। তাঁহাকেও তাহারা জানিত। যদিও তিনি তাহাদিগকে দেখা দিতেন, তাহা হইলে তাহারা বুঝিতে পারিত, তাহারা ফাঁদে পড়িয়াছে; তখন তাহারা 'মোরিয়া' হইয়া অস্ত্র-ব্যবহার করিতে কুণ্ঠিত হইত না। মিঃ গ্রীড্ ভাবিলেন, প্রধান সমস্যা এই যে, সেই বাড়ীর অধিবাসী সেই রহস্যাবৃত অজ্ঞাত ব্যক্তির সহিত তাহাদের আলাপের পথ কি কৌশলে বন্ধ করিবেন? অথচ কাযটি এ ভাবে শেষ করিতে হইবে—যেন তাহার ফল সাংঘাতিক না হয়!

সেই সঙ্কটময় মুহূর্তে ভাগ্যদেবী তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হইলেন। সেই বাগানের রেলিং-এর ধারে ধারে চলিয়া একটি লোক তাঁহার অদূরে উপস্থিত হইল। তাহার পরিচ্ছদ দেখিয়া মিঃ গ্রীড বুঝিতে পারিলেন, সে পুলিসম্যান। অদূরবর্ত্তী একটি ল্যাম্পের আলোক মুহূর্তের জন্য পুলিস-প্রহরীর দীর্ঘ দেহে প্রতিফলিত হইল। যে ব্যক্তি ২২নং অট্টালিকার দ্বারদেশে দাড়াইয়া দ্বারের বৈদ্যুতিক ঘণ্টার বোতামে খোঁচা দিতে উদ্যত হইয়াছিল, সে ঠিক সেই মুহূর্তে বাগানের রেলিং-এর দিকে চাহিয়া কনষ্টেবলের দীর্ঘ দেহ দেখিতে পাইল; সে তৎক্ষণাৎ বাগানের দিকে সরিয়া দাঁড়াইয়া, হাত নাড়িয়া ঈষৎ ইঙ্গিত করিতেই পূর্ব্ববৎ শকটখানি নিঃশব্দে ২২নং অট্টালিকার সম্মুখ হইতে সরিয়া গেল এবং সেই বাগানের এক কোণে উপস্থিত হইয়া সেই স্থানে দাড়াইয়া রহিল। মিঃ গ্রীড্ সেই সুযোগে ছায়ার ভিতর দিয়া চলিয়া নবাগত পুলিস-ম্যানের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন।

মিঃ গ্রীড্ পুলিস-ম্যানটিকে নিম্নস্বরে বলিলেন, "শোন কনেষ্টবল, আমি তোমাকে একটি জরুরি খবর দিতে পারি; আমার বিশ্বাস, তাহা তোমার কাযে লাগিবে। ঐ গাড়ীখানি ঐ বাড়ীর দরজার সম্মুখ হইতে ধীরে ধীরে সরিয়া গিয়া বাগানের ঐ কোণটিতে দাঁড়াইয়াছে দেখিতেছ, ঐ গাড়ীখান চোরা গাড়ী। ঐ গাড়ীর ড্রাইভারের নিকট এবং যে লোকটি উহার সঙ্গে আসিয়াছে, তাহারও নিকট রিভলভার আছে বলিয়াই আমার বিশ্বাস। যদি তুমি উহাদের নিকট উপস্থিত হইয়া উহাদিগকে জেরা কর, তাহা হইলে তুমি এরূপ কতকগুলি সংবাদ সংগ্রহ করিতে পারিবে, যাহা আইনের সম্মান এবং এই নগরের শান্তিরক্ষার পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বলিয়াই তোমার সুদৃঢ় ধারণা হইবে।"

কনষ্টেবল তাঁহার কথা শুনিয়া প্রশ্নসূচক দৃষ্টিতে তাঁহার মুখের দিকে চাহিতেই তিনি তাঁহার নামের একখানি কার্ড পকেট হইতে বাহির করিয়া তাহার হাতে গুঁজিয়া দিলেন। তাহার পর তাহাকে পূর্ব্ববৎ মৃদুস্বরে বলিলেন, "ঐ কার্ডে তুমি আমার নাম ও ঠিকানা দেখিতে পাইবে। আমার সাধ্যানুসারে আমি পুলিসকে সাহায্য করিতে সম্মত আছি। যদি আমার উপদেশানুসারে কায করিতে তোমার আপত্তি না থাকে, তাহা হইলে তুমি এই মুহূর্তেই উহাদের নিকটে গিয়া উহাদিগকে জেরা কর, নতুবা উহারা তাড়াতাড়ি সরিয়া পড়িবে, এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ।"

মি, গ্রীড কনষ্টেবলকে এই সকল কথা বলিবার সময় মুহূর্তের জন্যও সেই ২২নং বাড়ীর দরজার সম্মুখস্থিত লোকটির উপর হইতে দৃষ্টি অপসারিত করেন নাই। ল্যাংহামের সম্মুখে তখন দুইটি পথ উন্মুক্ত ছিল; একটি পথ—তাহার সাড়া পাইয়া কেহ ভিতর হইতে সেই অট্টালিকার কক্ষদ্বার খুলিয়া দিলে সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া আশ্রয়-গ্রহণ; দ্বিতীয় পন্থা—পূর্ব্বোক্ত পুলিসম্যানের সান্নিধ্য ত্যাগ করিয়া দূরে পলায়ন। সে দ্বারের সম্মুখে দণ্ডায়মান থাকিলেও অদূরবর্ত্তী পুলিস-কনষ্টেবলটির প্রতি তাহার দৃষ্টি ছিল। সে কোন্ পথ অবলম্বন করিবে, তাহাই ভাবিতে লাগিল।

কনষ্টেবলটি মিঃ গ্রীডের উপদেশ শুনিয়া, তৎক্ষণাৎ তাহা পালন করিতে উদ্যত হইল দেখিয়া মিঃ গ্রীড আশ্বস্ত হইলেন, তাঁহার যথেষ্ট আনন্দও হইল। কনষ্টেবল শকটচালক ও তাহার সঙ্গীকে সতর্ক হইবার অবসর না দিয়া পথ-প্রান্তস্থ বৃক্ষশ্রেণীর ছায়ায় ছায়ায় বাগানের কোণে অবস্থিত শকটের নিকট উপস্থিত হইল।

মিঃ গ্রীডও কনষ্টেবলের কার্য্যে উৎসাহিত হইয়া অত্যন্ত সতর্কভাবে সেই অট্টালিকার সোপান-প্রান্তে আসিয়া দাঁড়াইলেন। তিনি অত্যন্ত সতর্কতার সহিত সেই স্থানে উপস্থিত হইলেও, সেই অট্টালিকার দ্বারপ্রান্তবর্ত্তী লোকটি হয় তাঁহাকে অগ্রসর হইতে দেখিয়াছিল, অথবা তাঁহার পদশব্দ শুনিতে পাইয়াছিল। সে সহসা ফিরিয়া দাঁড়াইয়া দেখিল—তাহার পলায়নের পথ রুদ্ধ হইয়াছে। সিঁড়ির

নীচেই মিঃ ব্লেক তাহার পথরোধ করিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। সুতরাং সে পলায়নের চেষ্টা না করিয়া তৎক্ষণাৎ বুকের পকেটে হাত দিল। কিন্তু সে সেই হস্ত দ্বারা তাহার পকেটের পিস্তল স্পর্শ করিবার পূর্ব্বেই সুদীর্ঘ গুপ্তির সুতীক্ষ্ণ অগ্রভাগ তাহার হাতের কব্জীতে বিদ্ধ হইল। সঙ্গে সঙ্গে মিঃ ব্লেক দৃঢ়স্বরে বলিলেন, "যদি প্রাণের মমতা থাকে, তাহা হইলে হাত সরাইবার চেষ্টা করিও না, মিঃ ল্যাংহাম!"

মিঃ ব্লেক পথের আলোকে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিতে পাইলেন, তাহার মুখ ভয়ে সাদা হইয়া গিয়াছে। সে হাতের দিকে চাহিয়া দেখিল, অস্ত্রাঘাতে তাহার হাত ফুটা হইয়া ক্ষত-মুখ হইতে রক্ত ঝরিতেছিল; সে যন্ত্রণায় মুখ বিকৃত করিয়া হাত বুকের পকেট হইতে সরাইয়া লইতেই তাহা তাহার দেহের পাশে ঝুলিয়া পড়িল।

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "ঘুরিয়া দাঁড়াও! এক জন পুলিস ম্যান ওদিকে তোমার বন্ধুদের মুঠায় ধরিয়াছে: তুমিও যে তাহার নজরে পড়িবার জন্য বিশেষ ব্যস্ত হইয়াছ, এরূপ অনুমান করিতে পারিতেছি না।"

ল্যাংহাম তাঁহার কথায় না হউক, তাঁহার গুপ্তির খোঁচায় কাতর হইয়া ঘুরিয়া দাঁড়াইল। তখন মিঃ ব্লেক তাঁহার হাতের গুপ্তি না সরাইয়া, বাঁ-হাতে তাহার বুকের পকেট হইতে রিভলভারটি বাহির করিয়া লইলেন। তাহার পর গুপ্তি ছাতার ডাণ্ডির ভিতর ধরিয়া ল্যাংহামের পশ্চাতে দাঁড়াইলেন।

সেই সময় পুলিসের 'হুইশ্‌ল' শুনিয়া মিঃ ব্লেক পূর্ব্বোক্ত মোটর-গাড়ীর দিকে চাহিয়া দেখিলেন; তাহার পর ল্যাংহামকে বলিলেন, "তোমার বন্ধুরা পুলিসের হাতে গ্রেপ্তারের ভয়ে গাড়ী হইতে লাফাইয়া পড়িয়া পলায়ন করিয়াছে; কনষ্টেবলটা তাহার সঙ্গীদের সাহায্যলাভের আশায় 'হুইশ্‌ল' দিয়া তোমার বন্ধুদ্বয়ের অনুসরণ করিয়াছে। তোমাদের ঐ গাড়ীখানিতে আপাততঃ আমার প্রয়োজন হইয়াছে। আমার ইচ্ছা, তুমি ঐ গাড়ীতে চাপিয়া আমার সঙ্গে কিছুকাল বায়ুসেবন কর।"

মিঃ ব্লেক ল্যাংহামের পাঁজরে তাহার রিভলভারের নলটি চাপিয়া-ধরিয়া বলিলেন, "এখানে নিষ্কর্ম্মা হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিলে চলিবে না, শীঘ্র চল: পুলিস-কনষ্টেবলটা গাড়ীর কাছে ফিরিয়া আসিয়া আমাদিগকে জেরা করিতে আরম্ভ করিবার পূর্ব্বেই আমি গাড়ীখান ওখান হইতে অন্যদিকে লইয়া যাইতে চাই।"

ল্যাংহাম তথাপি নড়ে না। তখন মিঃ ব্লেক পিস্তলটা তাহার পাঁজরে চাপিয়া ধরিয়া, হাত ধরিয়া তাহাকে টানিয়া লইয়া চলিলেন।

মোটর-গাড়ী বাগানের কোণে খালি পড়িয়াছিল। মিঃ ব্লেক ল্যাংহামকে সেই গাড়ীর ভিতর ঠেলিয়া তুলিয়া দিয়া, স্বয়ং তাহার পাশে বসিয়া পড়িলেন এবং তাহার পাঁজরে রিভলভারের খোঁচা দিয়া বলিলেন, "জলাশয়ের— 'স্লুইসের' কাছে চালাও।"

গাড়ী বাগানের পথ ঘুরিয়া বাহারে বাহির হইয়া পড়িল। তাঁহারা উত্তরদিকে চলিতে আরম্ভ করিয়া বেকার ষ্ট্রীট ও সুইস্‌-কটেজ অতিক্রম করিলেন। মিঃ ব্লেক নীরব ছিলেন, এইবার কথা কহিলেন; তিনি বলিলেন, "আমি তোমাকে যাহা বলিয়াছি, তাহা করিতে যদি আপত্তি কর, কিম্বা আমাকে প্রতারিত করিবার জন্য কোন প্রকার চালাকি খাটাইবার চেষ্টা কর, তোমার ব্যবহারে যদি আমি সন্দেহ করিবার কোন কারণ পাই, তাহা হইলে এই রিভলভার ব্যবহার করিতে মুহূর্ত্তের জন্য কুণ্ঠিত হইব না। মিঃ ল্যাংহাম, তুমি স্মরণ রাখিও—আমি এক কথার মানুষ।"

মিঃ ব্লেক তাঁহার হাতের রিভলভার ঠিক একই ভাবে তাহার পাঁজরে ধরিয়া রাখিলেন; যতক্ষণ গাড়ী চলিল, সেই সময়ের মধ্যে তিনি তাহা মুহূর্ত্তের জন্য অপসারিত করিলেন না। গাড়ী বিভিন্ন দিক দিয়া, বহু সঙ্কীর্ণ পথ অতিক্রম করিয়া তাহার গন্তব্যপথে অগ্রসর হইল; নির্জ্জন পথে নৈশ অন্ধকার ক্রমশঃ ঘনীভূত হইয়া উঠিল। অবশেষে সেই অন্ধকারে পল্লীসমূহের শেষ চিহ্ন অন্তর্হিত হইল! পথের উভয় পার্শ্বে কোথাও দূরব্যাপী শস্যক্ষেত্র, কোথাও সুবিস্তীর্ণ জলা। পথের সেই অংশ বিক্ষিপ্ত লোকালয়ের সম্বন্ধবর্জ্জিত।

অবশেষে গাড়ী একটি সঙ্কীর্ণ গলির ভিতর থামিল; সেই গলির উভয় পার্শ্বে উচ্চ পাড়। সেইখানে গাড়ী থামাইয়া শকট-চালক শঙ্কা-বিজড়িত স্বরে বলিল, "আমরা স্লুইসের কাছে আসিয়াছি।"

তাহার কথা শুনিয়া মিঃ ব্লেক শকটের পুরোভাগে দৃষ্টিপাত করিলেন, এবং অদূরবর্ত্তী জলাশয়ের ধারে একখানি

জীর্ণ অট্টালিকা দেখিতে পাইলেন। তাঁহার ধারণা হইল, সেই অট্টালিকা এক সময় পুরাতন 'ওয়াটার মিলে'র কার্য্যে ব্যবহৃত হইত, এবং জলাশয়টি সেই মিলের পরিচালন-কার্য্যে শক্তিসঞ্চার করিলেও আলোচ্য ঘটনার বহু পূর্ব্ব হইতেই অব্যবহার্য্যভাবে পড়িয়া ছিল। (long since fallen into disuse.)

মিঃ ব্লেড্ অট্টালিকার দ্বারপ্রান্তে গাড়ী রাখিয়া, তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চতুর্দ্দিকের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিতে করিতে শকট-চালককে বলিলেন, "এ কথা বিশ্বাস করিবার কারণ আছে যে, তুমি মিঃ প্যারাডাইনকে এই স্থানে লইয়া আসিয়াছিলে। তুমি তাহাকে যেখানে লুকাইয়া রাখিয়াছ, সেই স্থানে আমাকে লইয়া যাইবে, এই উদ্দেশ্যেই আমি তোমাকে এখানে লইয়া আসিলাম। তাহাকে কোথায় রাখিয়াছ ?"

মিঃ ব্লেডের কথা শুনিয়া শকটচালক ল্যাংহ্যামের সুদীর্ঘ ও পরিপুষ্ট গোফ-জোড়াটা ঝুলিয়া পড়িল, এবং তাহার চক্ষুতে উদ্বেগের চিহ্ন ঘনাইয়া উঠিল; সে কুণ্ঠিতভাবে বলিল, "হাঁ—তা—কি বলি, এখানে আসিলেন বটে, আসিতে কিন্তু বড় বিলম্ব হইয়া গিয়াছে যে !"

মিঃ ব্লেড তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া কঠোর স্বরে বলিলেন, "বিলম্ব হইয়া গিয়াছে ? তোমার এ কথার অর্থ কি ? সকল কথা স্পষ্ট করিয়া বল।"

ল্যাংহ্যাম নিরুপায়ভাবে মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে স্খলিত স্বরে বলিল, "আ—আমার কথার অর্থ ? অর্থটা জটিল নয়; আমি বলিতেছি, এখানে তা—তাহার—কি বলি—একটা দুর্ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে।"

মিঃ ব্লেড তাহার কথা শুনিয়া স্তম্ভিতভাবে তাঁহার আসনে বসিয়া রহিলেন; প্রায় দুই মিনিট তাঁহার মুখ হইতে কোনও কথা নিঃসারিত হইল না। অবশেষে তিনি অস্বাভাবিক গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "তোমার কথা কতকটা বুঝিতে পারিয়াছি। দেখ ল্যাংহ্যাম, মিঃ প্যারা-ডাইন আমার কোন পুরাতন বন্ধুর পুত্র। সুতরাং যে কার্য্য তোমরা করিয়াছ, তাহার উপযুক্ত প্রতিফল দানের জন্য আইনের ভার স্বহস্তে গ্রহণের জন্য তুমি আমাকে প্রলুব্ধ করিও না। তথাপি তোমাকে সতর্ক করিবার জন্য বলিতেছি, দুর্ঘটনাটা কিরূপে ঘটিল, কোথায় ঘটিল, তাহা আমি জানিতে চাই; সেই স্থানটা আমাকে দেখাইয়া দাও। শীঘ্র গাড়ী হইতে নামো।"

ল্যাংহ্যাম কম্পিত হস্তে গাড়ীর দরজা খুলিয়া তাহার আসন হইতে নিঃশব্দে নামিয়া পড়িল। সে চলিতে আরম্ভ করিলে মিঃ ব্লেড রিভলভারটা বাগাইয়া ধরিয়া নিঃশব্দে তাহার অনুসরণ করিলেন। জলাশয়ের তীরে সেঁতা মাটী, তাহার কিয়দ্দূর পর্য্যন্ত শৈবালদামে সমাচ্ছন্ন ছিল; তাঁহারা উভয়ে তাহার উপর দিয়া চলিতে লাগিলেন। এই ভাবে চলিতে চলিতে ল্যাং-হ্যাম সেই জলাশয়ের কিনারায় জলের ধারে উপস্থিত হইল।

ল্যাংহ্যাম সেই স্থানে দাড়াইয়া কয়েক মিনিট জলের দিকে চাহিয়া থাকিয়া জলাশয়ের এক স্থানে অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করিল। সেই দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া মিঃ ব্লেডের দীর্ঘ দেহ যেন কাঠ হইয়া গেল। তাঁহার হাতের রিভলভারের ঘোড়ায় (trigger) তাঁহার যে অঙ্গুলী ছিল, তদ্দ্বারা ঘোড়া টিপিবার জন্য প্রবল আগ্রহ দমন করা যেন সেই মুহূর্ত্তে তাঁহার অসাধ্য হইয়া উঠিল। কিন্তু তিনি অতি কষ্টে সেই ইচ্ছা দমন করি-লেন। তিনি স্তব্ধভাবে স্বপ্নাবিষ্টের ন্যায় সেই স্থানে দাড়াইয়া রহিলেন, যেন স্থান-কাল সমস্তই বিস্মৃত হইলেন। অসহায়, বিপন্ন, রজ্জুবদ্ধ,মৃত্যোন্মুখ প্যারাডাইনের কাতর মুখচ্ছবি যেন তাঁহার কল্পনানেত্রের সম্মুখে ভাসিয়া উঠিল; তাহার কাতর কণ্ঠের নিরাশাজড়িত আর্ত্তনাদ যেন সেই নৈশ নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া পুনঃ পুনঃ তাঁহার কর্ণমূলে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল; যেন সেই সলিল-সমাধির অন্তস্তল ভেদ করিয়া তিনি সেই হতভাগ্য, হতাশ যুবকের বিলাপধ্বনি শুনিতে লাগিলেন। তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া ল্যাংহ্যামের বক্ষের স্পন্দন স্তম্ভিত হইবার উপক্রম হইল। তাহার সর্ব্বাঙ্গ ঘর্ম্মাপ্লুত হইল, এবং তাহার পদদ্বয় বায়ুতাড়িত বেতসপত্রের ন্যায় ঠক্‌ঠক্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল। তাহার পর সে অস্ফুট আর্ত্তনাদ করিয়া মিঃ ব্লেডের পদপ্রান্তে পড়িয়া গেল। জলাশয়ের জলের ধারে তাহার দীর্ঘদেহ প্রসারিত হইল। তাহা নিস্তব্ধ, অসাড় !

মিঃ ব্লেড নতনেত্রে তাহার দেহের দিকে চাহিলেন। তাঁহার গম্ভীর মুখভাবের কোনও পরিবর্ত্তন লক্ষিত না হইলেও দারুণ মানসিক উত্তেজনায় তাঁহার চক্ষু দুটি যেন জ্বলিয়া উঠিল। তিনি ল্যাংহ্যামের বক্ষঃস্থল লক্ষ্য করিয়া তাঁহার হাতের রিভলভারের নলের ডগা অবনত করিলেন। কিন্তু মুহূর্ত্তমধ্যে সেই নিরবচ্ছিন্ন নৈশ নিস্তব্ধতা

ভেদ করিয়া যেন কোন শব্দ তাঁহার কর্ণগোচর হইল। তিনি রুদ্ধনিশ্বাসে কাণ পাতিয়া শুনিয়া বুঝিতে পারিলেন, তাহা কোন আগন্তুকের পদশব্দ। মুহূর্ত্ত পরে কতকগুলি পাথরের নুড়ি ঝর ঝর শব্দে ঝরিয়া পড়িবার শব্দও তাঁহার কর্ণগোচর হইল। মিঃ ব্লীড সেই শব্দ শুনিয়া, মুখ তুলিয়া শব্দের কারণ অনুসন্ধানের জন্য পূর্ব্বোক্ত জীর্ণ অট্টালিকার দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। তিনি অন্ধকারে সেই ঘরের দিক হইতে এক জন লোককে, তিনি যেখানে দাঁড়াইয়াছিলেন, সেই স্থানে আসিতে দেখিলেন। একটি ছায়া-মূর্ত্তি নৈশ অন্ধকার ভেদ করিয়া ব্যগ্রভাবে তাঁহার দিকে অগ্রসর হইতেছিল, কিন্তু তাহা মনুষ্যমূর্ত্তি অথবা কোন বন্যজন্তু, দূর হইতে দেখিয়া তাহা তিনি বুঝিতে পারিলেন না।

একাদশ পল্লব

অদ্ভুত উপদেশ

মিঃ ব্লীড্ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আগন্তুকের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন, বুঝিলেন, সে মানুষ বটে; কিন্তু সে তখনও কিছু দূরে ছিল। তাহার পদশব্দ শুনিয়া ল্যাংহ্যাম মিঃ ব্লীডের পদপ্রান্তে উঠিয়া বসিয়াছিল। সে নিজের বিপদের কথা বিস্মৃত হইয়া আগন্তুকের মুখের দিকে চাহিল; তাহার পর আতঙ্ক-বিহ্বল স্বরে আর্ত্তনাদ করিল। তাহার হৃদয়ভেদী আর্ত্তনাদে নিস্তব্ধ প্রান্তর প্রতিধ্বনিত হইল। অবশেষে আগন্তুক যখন মিঃ ব্লীডের অদূরে আসিল, তখন ল্যাংহ্যাম প্রাণভয়ে মিঃ ব্লীডের পদদ্বয় জড়াইয়া ধরিল এবং কম্পিত-দেহে, ব্যাকুল স্বরে বলিল, "ভূত, ভূত, সমাধি ভেদ করিয়া উঠিয়া ভূতটা আমাকে শাস্তি দিতে আসিতেছে! আমাকে রক্ষা করুন, ভূত আমার গলা টিপিয়া মারিয়া ফেলিবে। আমাকে বাঁচান।"

ল্যাংহ্যাম পুনর্ব্বার আর্ত্তনাদ করিল। আগন্তুক তখনও মিঃ ব্লীডের তিন চারি গজ দূরে ছিল।

মিঃ ব্লীড ল্যাংহ্যামের আর্ত্তনাদে কর্ণপাত না করিয়া, আগন্তুককে সম্বোধন করিয়া অচঞ্চল স্বরে বলিলেন, "প্যারাডাইন, তুমি!"

আগন্তুক তাঁহার আরও নিকটে সরিয়া আসিলে, তিনি তাহার মূর্ত্তি সুস্পষ্টরূপে দেখিতে পাইলেন। তাহার পরিচ্ছদ সিক্ত, মস্তকের কেশরাশি হইতে তখনও বিন্দু বিন্দু জল ঝরিতেছিল; তাহার মুখ শুষ্ক ও বিবর্ণ, তাহার সর্ব্বাঙ্গ যেন অবসাদ-শিথিল; কিন্তু মিঃ ব্লীড যে মূর্ত্তি দেখিতে পাইলেন, তাহা যে ছায়া-মূর্ত্তি নহে, রক্তমাংসের দেহ, এ বিষয়ে তাঁহার বিন্দুমাত্র সন্দেহের কারণ ছিল না।

আগন্তুক বিচলিত স্বরে বলিল, "মিঃ ব্লীড, আপনি! আপনি এখানে?"

প্যারাডাইনের কণ্ঠস্বর মিঃ ব্লীডের সুপরিচিত। প্যারাডাইন জীবিত আছে এবং তাঁহার সাড়া পাইয়া সেই জলাশয়তীরে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছে, সে বিষয়ে আর সন্দেহের কোন কারণ না থাকিলেও ল্যাংহ্যাম সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে প্যারাডাইনের মুখের দিকে চাহিয়া পুনর্ব্বার আর্ত্তনাদ করিল। সে যাহাকে জলে ডুবাইয়া মারিয়াছে, সে দীর্ঘকাল পরে জীবিত অবস্থায় তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া স্বাভাবিক স্বরে কথা বলিতেছে, ইহা সে বিশ্বাস করিতে পারিল না।

মিঃ ব্লীড বলিলেন, "তুমি নিহত হইয়াছিলে ভাবিয়া আমি এখানে দাঁড়াইয়া তোমার শোচনীয় মৃত্যুর কথাই চিন্তা করিতেছিলাম। যাহাকে তোমার অপমৃত্যুর জন্য দায়ী মনে করিয়াছিলাম, তাহার অপরাধের বিচার-ভার স্বহস্তে গ্রহণ করিবার জন্য আমার আগ্রহ হইয়াছিল।"

মিঃ ব্লীডকে সেখানে দেখিয়া, তাঁহার কথা শুনিয়া প্যারাডাইন তাহার বিপদের কথা, মৃত্যুর সহিত তাহার দ্বন্দ্বের কথা বিস্মৃত হইল; তাহার ন্যায় দুর্নামগ্রস্ত ক্ষুদ্র কেরাণীর জন্য মিঃ ব্লীডের ন্যায় বহুদর্শী ব্যবহারাজীব—যিনি ঘণ্টায় ঘণ্টায় রাশি রাশি অর্থ উপার্জ্জন করেন, যাঁহার সময় অত্যন্ত মূল্যবান্, তিনি এত কষ্ট স্বীকার করিয়াছেন, তাহার সন্ধানে রাত্রিকালে সেই দুর্গম স্থানে উপস্থিত হইয়াছেন, তাঁহার দয়া ও মহত্ত্ব উপলব্ধি করিয়া প্যারাডাইনের হৃদয় কৃতজ্ঞতায় পূর্ণ হইল। সে পূর্ব্বে তাঁহাকে চিনিতে না পারিয়া তাঁহার সম্বন্ধে কি ভুল ধারণাই করিয়াছিল! তাহার প্রতি অত্যাচারের প্রতিফল দানের জন্য তিনি নরহত্যা করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন!

প্যারাডাইনকে নীরব দেখিয়া মিঃ ব্লীড বলিলেন, "যে ব্যক্তি তোমাকে সশরীরে আমার সম্মুখে আসিতে দেখিয়া ভূত মনে করিয়া ভয়ে আর্ত্তনাদ করিতেছিল, তাহাকে

বোধ হয় চিনিতে পারিয়াছ। এই ব্যক্তি কিরূপে তোমাকে এখানে লইয়া আসিয়াছিল? আমি রাত্রি সাড়ে সাতটার সময় রেস্তরাঁয় তোমার সঙ্গে দেখা করিব বলিয়াছিলাম; তদনুসারে তুমি নিশ্চিতই সেখানে উপস্থিত ছিলে, তথাপি এই ব্যক্তি কি কৌশলে নির্দ্দিষ্ট সময়ের পূর্ব্বেই তোমাকে রেস্তরাঁ হইতে বাহির করিয়া উহার সঙ্গে আসিতে বাধ্য করিয়াছিল?"

প্যারাডাইন বলিল, "উহার চাতুরী আমিও তখন বুঝিতে পারি নাই, মিঃ প্রীড! ঐ লোকটি রেস্তরাঁয় আমার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া ডিটেক্‌টিভ বলিয়া নিজের পরিচয় দিয়াছিল। আমাকে বলিয়াছিল—উহার সঙ্গে আমাকে থানায় যাইতে হইবে। মিঃ গার্ভিন যে রাত্রে নিহত হইয়াছিলেন, সেই রাত্রিটা আমি কোথায় কি ভাবে কাটাইয়াছিলাম, থানায় উপস্থিত হইয়া তাহা আমাকে জানাইতে হইবে, এই কথা বলিয়া ঐ ব্যক্তি আমাকে উহার সঙ্গে রেস্তরাঁ ত্যাগ করিতে বাধ্য করিয়াছিল। এই জন্যই আপনার সহিত আমার সাক্ষাতের সুযোগ নষ্ট হইয়াছিল।"

মিঃ প্রীড রুদ্ধশ্বাসে বলিলেন, "তাহার পর কি হইয়াছিল, তাহাই শুনিতে চাই।"

প্যারাডাইন তাহার বিপদের আমূল বৃত্তান্ত মিঃ প্রীডের নিকট সংক্ষেপে প্রকাশ করিল; তাহার পর বলিতে লাগিল, "আমি অতি কষ্টে জলাশয়ের কিনারায় উঠিয়া কিছুকাল পরিশ্রান্তভাবে পড়িয়া রহিলাম, তাহার পর অতি কষ্টে ঐ অট্টালিকার ভিতর প্রবেশ করিলাম। উহার পশ্চাতের একটি কামরায় ভাঙ্গা জানালা দেখিতে পাইয়া সেই স্থানে উপস্থিত হইলাম। সৌভাগ্যক্রমে জানালার নীচে কতকগুলি ভাঙ্গা কাচ ছিল; তাহা আমার পায়ে ঠেকিল। আমি তৎক্ষণাৎ দুই একখান কাচ হাতে তুলিয়া লইয়া, পরীক্ষা করিয়া বুঝিতে পারিলাম—ভাঙ্গা কাচের ডগায় বেশ ধার ছিল। হঠাৎ আমার মাথায় এক খেয়াল চাপিল; ভাবিলাম, এই ধারাল কাচ দিয়া হাতের বাঁধন কাটিবার চেষ্টা করিয়া দেখিই না। হাতের কব্জিতে যে দড়ির বাঁধন ছিল, তাহার উপর কাচের ধার দিয়া ঘর্ষণ আরম্ভ করিলাম। ঘষিতে ঘষিতে আমার হাত আড়ষ্ট হইয়া উঠিল; কাচের ডগায় আমার হাতের তিন চারিটি যায়গা কাটিয়া রক্ত ঝরিতে লাগিল, আমি যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া উঠিলাম।"

প্যারাডাইন মিঃ প্রীডকে তাহার হাতের ক্ষত-চিহ্ন দেখাইল; তখনও তাহার হাত হইতে রক্ত ঝরিতেছিল।

সে বলিতে লাগিল, "আমি চেষ্টা ত্যাগ করিলাম না; কতক্ষণ পরে ঠিক বলিতে পারিব না, বোধ হয়, ঘষিতে ঘষিতে ঘণ্টা দুই পরে আমার হাতের বাঁধন কাটিয়া গেল। দুই তিনটি বাঁধন কাটিবার পর বাঁধন খুলিয়া ফেলা কঠিন হইল না। আমি মুক্তি লাভ করিলাম, কিন্তু আমি নিশ্চিন্ত হইতে পারিলাম না। আমার আশঙ্কা হইল, আমার শত্রুরা হয় ত অদূরে কোথাও লুকাইয়া আছে, আমি এই অট্টালিকা ত্যাগ করিলেই আমাকে দেখিতে পাইবে, এবং পুনর্ব্বার ধরিতে পারিলে তাহাদের চক্ষুর উপর আমাকে হত্যা করিবে। আমি আমার পায়ের বাঁধনও কাটিয়া ফেলিয়া, কি করি, কোথায় যাই, কি ভাবে আত্মরক্ষা করি, এই সকল কথা চিন্তা করিতেছি—সেই সময় একটি কক্ষের আড়ালে দাঁড়াইয়া আপনার মোটর-গাড়ীর এঞ্জিনের শব্দ শুনিতে পাইলাম। উহারা আবার আসিয়াছে মনে করিয়া ভয়ে আমার সর্ব্বাঙ্গ আড়ষ্ট হইয়া উঠিল; আমি নিস্তব্ধভাবে, রুদ্ধ-নিশ্বাসে দাঁড়াইয়া রহিলাম। কয়েক মিনিট পরে ঘরের পাশে আপনাদের কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইলাম। আপনি উত্তেজিতভাবে ঐ লোকটাকে যে সকল কথা বলিতেছিলেন, তাহা শুনিয়া মনে হইল, এ স্বর ত আমার পরিচিত। আমি আপনার আরও দুই একটি কথা শুনিয়া বুঝিলাম, আপনিই আসিয়াছেন। কেন আসিয়াছেন, এই অপরিচিত দুর্গম স্থানে কিরূপে আসিলেন, তাহা বুঝিতে পারিলাম না; কিন্তু আপনি আসিয়াছেন বুঝিয়া আমার মনে আশার সঞ্চার হইল। আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার জন্য আমার আগ্রহ হইল; এই জন্যই আমি এখানে উপস্থিত হইয়াছি। আমার সন্ধানে আপনি এখানে কিরূপে আসিলেন?"

মিঃ প্রীড বলিলেন, "তোমার প্রশ্নের উত্তর দিতে হইলে অনেক কথাই বলিতে হইবে; এখন তাহার অবসর নাই। বিশেষতঃ, এই রাত্রেই আমাদিগকে অনেক কায করিতে হইবে, বিলম্ব করিলে চলিবে না।"

মিঃ প্রীড সম্মুখে ঝুঁকিয়া পড়িয়া, তাঁহার পদপ্রান্তবর্ত্তী ল্যাংহামের হাত ধরিয়া তাহাকে টানিয়া তুলিলেন। সে তখনও ভয়ে ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতেছিল।

ল্যাংহ্যাম তাঁহার সম্মুখে সোজা হইয়া দাঁড়াইলে, মিঃ ব্লেক তাহার গলার কলার ধরিয়া তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিলেন। আতঙ্কে তাহার উভয় চক্ষু কপালে উঠিয়াছিল। তাহার অবস্থা দেখিয়া মিঃ ব্লেক প্যারাডাইনকে বলিলেন, "এখন ইহাকে প্রশ্ন করিয়া সদুত্তর পাইব, তাহার আশা নাই; আতঙ্কে উহার মাথা খারাপ হইয়া গিয়াছে। প্রকৃতিস্থ থাকিলে এই হতভাগার মুখ হইতে অনেক কাযের কথা বাহির করিয়া লইতে পারিতাম; সেই সকল সংবাদে আমাদের যথেষ্ট উপকার হইত; কিন্তু উহাকে প্রশ্ন করিয়া কোন ফল হইবে না। আমার সময় মূল্যবান্, ওভাবে তাহা নষ্ট করিবার ইচ্ছা নাই; অথচ উহাকে সঙ্গে লওয়াও সঙ্গত হইবে না। এ অবস্থায় আমার কর্ত্তব্য কি, তাহা দুই এক মিনিট চিন্তা করিয়াই স্থির করিয়াছি। যে দড়ি দিয়া উহারা তোমার হাত পা বাঁধিয়াছিল, সেই দড়ি তুমি কাটিয়া-ফেলিয়া মুক্তি লাভ করিয়াছ বলিলে; সেই দড়ির কোনও অংশ ব্যবহারযোগ্য আছে কি?"

প্যারাডাইন মিঃ ব্লেকের মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া বলিল, "হাঁ মিঃ ব্লেক, আমি তাহা কাচ দিয়া কাটিলেও, তাহার সকল অংশ খণ্ড খণ্ড হয় নাই; দুই তিন টুকরা বোধ হয় লম্বা আছে। আমি দেখিতেছি।"

প্যারাডাইন তৎক্ষণাৎ সেই জীর্ণ অট্টালিকায় ফিরিয়া চলিল। সে যে কক্ষে বসিয়া দড়িগুলি খণ্ড খণ্ড করিয়াছিল, সেই কক্ষে প্রত্যাগমন করিয়া সেগুলি সংগ্রহ করিল; তাহার পর জলাশয়তীরে মিঃ ব্লেকের নিকট উপস্থিত হইয়া তাহা তাঁহার হস্তে প্রদান করিল। মিঃ ব্লেক পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন, কয়েক খণ্ড রজ্জু কার্য্যোপযোগী দীর্ঘ ছিল। সেই রজ্জু দ্বারা তিনি ল্যাংহ্যামের হাত-পা দৃঢ়রূপে বাঁধিয়া, তাহাকে সেই বাপীতটে ফেলিয়া রাখিলেন। তাহার পর তিনি বন্ধনের দৃঢ়তা পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, "হতভাগাটা এখানেই এখন পড়িয়া থাকুক। ভবিষ্যতে প্রয়োজন হইলে আবার উহাকে হাতে পাইব। এখন চল, আমরা এই স্থান ত্যাগ করি।"

মিঃ ব্লেক তাঁহার ছাতাটি মুড়িয়া বগলে পুরিয়া সেই জলাশয়ের তীর হইতে অদূরবর্ত্তী মোটর-গাড়ীর নিকট উপস্থিত হইলেন। তিনি প্যারাডাইনকে গাড়ীতে তুলিয়া লইয়া স্বয়ং তাহার পাশে বসিলেন, এবং বিভিন্ন সঙ্কীর্ণ প্রান্তরপথ দিয়া তাঁহারা গন্তব্য পথে অগ্রসর হইলেন।

ওয়াটফোর্ড প্রান্তরের সঙ্কীর্ণ পথ অতিক্রম করিয়া তিনি প্রথমে প্যারাডাইনকে কথা বলিলেন।

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তোমাদের আফিসের কর্য্যে সম্বন্ধে তোমার যে অভিজ্ঞতা আছে, তাহাতে নির্ভর করিয়া তুমি সম্ভবতঃ বলিতে পারিবে, তোমাদের ফার্ম্মের সহিত কোন্ কোন্ স্থানের কোন্ কোন্ ব্যবসায়ের সম্বন্ধ আছে। তুমি আমাকে বলিয়াছিলে, পশ্চিম-আফ্রিকার 'আরানা গোল্ড মাইন' কোম্পানীর সহিত তোমাদের ফার্ম্মের সম্বন্ধ আছে, এবং তাহারই একটি রিপোর্ট-সংক্রান্ত ব্যাপারে লিপ্ত হইয়াই তোমাকে বিপন্ন হইতে হইয়াছে। সেই কোম্পানীর সেয়ার সম্বন্ধে কোন সংবাদ আমাকে বলিতে পারিবে?"

প্যারাডাইন বলিল, "আরানা স্বর্ণক্ষেত্রের 'সেয়ার' সম্বন্ধে অনেক কথাই আমি সংবাদপত্রে পাঠ করিয়াছি; এই ব্যাপার লইয়া যথেষ্ট আন্দোলন-আলোচনাও চলিতেছে। 'সেয়ারের' বাজারে না কি ইহা ভিন্ন কোন কথা নাই! সংবাদপত্রের প্রতিনিধিরা সকল কথা জানিবার জন্য মিঃ নিস্‌বেটের সঙ্গে দেখা করিতে গিয়াছিল। মিঃ নিস্‌বেটই এই কোম্পানীর ম্যানেজিং ডাইরেক্টর—পরিচালক-সমিতির অধ্যক্ষ।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "মিঃ নিস্‌বেট তাহাদিগকে কি বলিয়াছিলেন?"

প্যারাডাইন বলিল, "তাঁহার উত্তর শুনিয়া মনে হয়, প্রকৃতই যাহা ঘটিয়াছিল, তাহাই তিনি অনুমান করিতে পারিয়াছেন। আমি জানি, টেরি উইনগেট্‌সও উপস্থিত হইয়াছিল; রিপোর্টখানা সে হস্তগত করিবার আশায় ভিক্টোরিয়া হইতে আমার অনুসরণ করিয়াছিল। আমি যখন মিঃ গার্ভিনের ঘরে দাঁড়াইয়া রিপোর্টখানি তাঁহার হাতে দিই, সেই সময় টেরি পথের দিকের জানালার কাছে দাঁড়াইয়া তাহা দেখিতে পাইয়াছিল, এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ হইয়াছিলাম।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তাহার পর সে গার্ভিনের বাড়ী ফিরিয়া আসিয়া তাঁহাকে হত্যা করিয়াছিল, এবং রিপোর্টখানি চুরি করিয়াছিল। মিঃ নিস্‌বেট কি এইরূপই সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন?"

প্যারাডাইন বলিল, "কিন্তু টেরি সম্বন্ধে তিনি কোন কথা জানিতে পারেন নাই ; বস্তুতঃ আমি ভিন্ন অন্য কেহই এ কথা জানে না। প্রকৃত ব্যাপার সম্বন্ধে তিনি যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, তাহা তাঁহার অনুমানমাত্র। সংবাদপত্রের প্রতিনিধিগণ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলে তিনি তাহাদিগকে বলিয়াছিলেন, তিনি তাঁহার সন্দেহের কথা স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের গোচর করিবেন ; তিনি তাহাদিগকে জানাইবেন—যে ব্যক্তি মিঃ গার্ভিনকে হত্যা করিয়াছিল, আরানার রিপোর্টচুরিও তাহারই কায। সেই রিপোর্টের সংবাদ সে ব্যবহার করিয়াছিল। সেই সংবাদ তাহার স্বার্থের অনুকূল ছিল, এবং যে সকল সেয়ারের মূল্য তখন পর্য্যন্ত নিতান্তই অল্প ছিল, তাহাই সে তাড়াতাড়ি কিনিয়া লইয়াছিল। প্রকৃতপ্রস্তাবে কেহ সেই সকল 'সেয়ার' কিনিয়া ফেলিয়াছিল, কারণ, যে সকল সেয়ারের মূল্য এক শিলিং বা সেইরূপ অল্প ছিল, তখন তাহাদের মূল্যবৃদ্ধি হইয়া দুই তিন পাউণ্ডে দাঁড়াইয়াছিল।"

মিঃ প্রীড বলিলেন, "ঠিক কথা ; কিন্তু এখানে একটি বিষয় আলোচনাযোগ্য এবং কৌতুকাবহ : সে সম্বন্ধে তুমি আমাকে কিঞ্চিৎ সন্ধান দিতে পারিবে কি ?"

এই সময় তাঁহার পরিচালিত শকট ঘণ্টায় প্রায় ৭০ মাইল বেগে ধাবিত হইতেছিল। মিঃ প্রীডকে সেই প্রকার বেগে মোটর চালাইতে দেখিলে সকলেরই ধারণা হইত, তিনি কেবল সুদক্ষ মোটর-চালক নহেন, তিনি ব্রুকল্যাণ্ডসএ মোটরকারের বাজি মারিতেও অভ্যস্ত ছিলেন।

মিঃ প্রীড সেই সময় পথের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া গাড়ী চালাইতে চালাইতে বলিতে লাগিলেন, "গত শনিবার অপরাহ্ণে পশ্চিম-আফ্রিকার ডাক সংগ্রহের প্রতীক্ষায় ছুটীর পরও তোমাকে আফিসে অপেক্ষা করিতে হইয়াছিল ; সেই ডাকেই আরানা স্বর্ণক্ষেত্রের রিপোর্ট আসিবার কথা ছিল। তোমার প্রতি আদেশ ছিল, তাহা ডাক-পিয়ন বিলি করিতে আসিলে, তুমি তাহা লইয়া সিন্দুকে তুলিয়া রাখিবে। তুমি এই উপদেশ পালন করিবে, মিঃ নিসবেট নিঃসন্দেহে এইরূপই প্রত্যাশা করিয়াছিলেন। তুমি জান, তুমি সেই রিপোর্ট সিন্দুকে না রাখিয়া তাহা উইনগেটসে লইয়া গিয়াছিলে, এবং তোমাদের আফিসের হেড ক্লার্ক মিঃ গার্ভিনের বাসগৃহে উপস্থিত হইয়া, তাঁহার হস্তে অর্পণ করিয়াছিলে। এই পর্য্যন্ত সকল কথা বেশ পরিষ্কার বুঝিতে পারিয়াছি ; কিন্তু মিঃ গার্ভিনের মৃত্যুকালে সেই রিপোর্ট তাঁহারই জিম্বায় ছিল, তাহা আফিসের সিন্দুকে সংরক্ষিত হয় নাই, মিঃ নিসবেট কিরূপে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন, তাহাই জানিবার জন্য আমার কৌতূহল হইয়াছে ; ইহা তুমি বলিতে পারিবে কি ?"

প্যারাডাইন ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া বলিল, "এই বিষয়টি লইয়া আমিও ধাঁধায় পড়িয়াছি, মহাশয় ! আপনার এ বড় শক্ত জেরা। ইহার অনুকূলে একটিমাত্র যুক্তি গ্রহণযোগ্য বলিয়া আমার মনে হইতেছে ; তাহা এই যে, মিঃ নিসবেট সম্ভবতঃ আফিসের 'রুটিন' মিঃ গার্ভিনের নিকট রাখিয়া গিয়াছিলেন। যখন তিনি মিঃ গার্ভিনের আকস্মিক হত্যা-কাণ্ডের সংবাদ জানিতে পারিলেন, এবং এ সংবাদও অবগত হইলেন যে, কোনও ব্যক্তি আরানা স্বর্ণখনির 'সেয়ার' যত পাইতেছে, সমস্তই কিনিয়া ফেলিতেছে—তখন তিনি উভয় ব্যাপার মিলাইয়া নির্দ্দিষ্ট সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন। তিনি অবশ্যই মনে মনে তর্ক করিয়া এইরূপ স্থির করিয়াছিলেন যে, আরানা স্বর্ণখনির ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল, এই সংবাদ না পাইলে কেহই অধিক মূল্যে উহার 'সেয়ার' ক্রয়ের জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিত না। কিন্তু উক্ত রিপোর্টের সহায়তা ব্যতীত ঐ সংবাদ জানিবার সম্ভাবনা ছিল না ; কেহই তাহা অনুমান করিতে পারিত না। সুতরাং সেই রিপোর্ট যে কোন উপায়ে সেই ব্যক্তির হস্তগত হইয়াছিল, এই সিদ্ধান্তে তিনি উপনীত হইয়াছিলেন। মিঃ গার্ভিন নিহত হওয়ায়, সেই রিপোর্ট অন্যের হস্তগত হইয়াছিল, এইরূপই তিনি সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন। এই অবস্থায় সেই রিপোর্ট আমাদের আফিসে পৌঁছিবার সময় পর্য্যন্ত মিঃ গার্ভিন যে আফিসেই ছিলেন, এবং উহা ডাকে আসিলে তিনিই তাহা গ্রহণ করিয়াছিলেন, মিঃ নিসবেটের ইহাই ধারণা হইয়াছিল।"

মিঃ প্রীড তাহার কথা শুনিয়া বলিলেন, "প্যারাডাইন, তোমার এই যুক্তি যে বিলক্ষণ কৌশলপূর্ণ, ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। কিন্তু তোমার মুখ বুজিয়া বসিয়া থাকিবার সময় উত্তীর্ণ হইয়াছে। মিঃ নিসবেটকে আর অন্ধকারে ফেলিয়া না রাখিয়া প্রকৃত কথা তাঁহার গোচর করাই সঙ্গত বলিয়া আমার মনে হইতেছে। এ জন্য

আমার প্রস্তাব এই যে, তুমি মিঃ নিস্‌বেটের বাড়ীতে উপস্থিত হইয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ কর। তুমি তাঁহার সঙ্গে দেখা করিয়া, যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, সমস্তই তাঁহার নিকট প্রকাশ কর; কোনও কথা গোপন করিবার প্রয়োজন নাই।"

প্যারাডাইন তাঁহার কথা শুনিয়া বিস্ময়-বিহ্বল-নেত্রে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল; তাঁহার কথার ঠিক মর্ম্ম বুঝিতে পারিল না। সে ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া তাঁহাকে বলিল, "আপনার কি ইচ্ছা, আমি মিঃ নিস্‌বেটের সঙ্গে দেখা করিয়া তাঁহাকে বলিব—আমি আরানা স্বর্ণক্ষেত্রের এঞ্জিনিয়ার-প্রেরিত রিপোর্টখানি হাতে পাইয়া, ইচ্ছা করিয়াই তাহা আফিসের সিন্দুকে আবদ্ধ করি নাই: আমি তাহা দুই শত পাউণ্ড মূল্যে বিক্রয় করিবার দুরভিসন্ধিতে পকেটে করিয়া আফিসের বাহিরে লইয়া গিয়াছিলাম; তাহার পর—"

মিঃ গ্রীড বলিলেন, "হাঁ, প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত সকল কথা আগাগোড়া খুলিয়া বলিবে: যাহা সত্য, তাহা সমস্তই প্রকাশ করিবে, কোন কথা গোপন করিবে না।"

তাঁহার কথা শুনিয়া প্যারাডাইন মাথায় হাত দিয়া অবসন্নভাবে গাড়ীর এক কোণে কাত হইয়া পড়িল। তাহার মুখ হইতে আর কোন কথা বাহির হইল না। ঘণ্টায় সত্তর মাইল বেগে মোটর-কার অন্ধকারাচ্ছন্ন নির্জ্জন পথে উল্কার ন্যায় ছুটিয়া চলিল।

ক্রমশঃ

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়।

মহামানব

—শত বর্ষ আগেকার কথা,
ধর্ম্মের প্রয়াগ তীর্থে, মুক্তিমন্ত্রে যে মহাবারতা
সেদিন শুনালে দেব, কম্বুকণ্ঠে উদাত্ত গম্ভীর—
আজো তা বাজিছে কাণে: লীলোচ্ছলা পূত জাহ্নবীর
ছায়াতট-তপোবনে আজো সেই পঞ্চবটীমূলে
বাজে তার প্রতিধ্বনি: তরঙ্গিয়া ওঠে দুলে দুলে
লীলায়িত ভাবমুগ্ধ এ বিপুল বিশ্বের আকাশ,
অমৃতের বার্ত্তা বহে বাধাহারা উদার বাতাস।

মুক্তির আনন্দ-যজ্ঞে বজ্রকণ্ঠে সে বীর সন্ন্যাসী
যেই মহা অগ্নিমন্ত্রে জাগাইলা সর্ব্ব-দেশবাসী,—
কোথা ছিল অগ্নিময়ী সেই দিব্যপ্রতিভা তাঁহার—
তোমারি মাঝারে দেব! হে নমস্য যুগ-অবতার!
তুমিই সে বেদান্তের তত্ত্ব-কথা অমিয়-নিষেকে,
আনন্দের রসধারে মত্ত করি জাগালে বিবেকে!

শত বর্ষ হ'লো গত, প্রতীচী সে চাহে প্রাচী পানে,
জগতের ভিক্ষাপাত্র ভরি দাও তব মহাদানে।
আবার প্লাবন আনো, ধর্ম্ম-রাজ্যে আনো যুগান্তর
ক্ষুদ্রতা ও সংকীর্ণতা চিরতরে ল'ক্‌ অবসর।
কামনা সমাধি পাক,—মৃত্যু হোক্‌ স্বার্থ-পরতার,—
হে মহামানব, তব শ্রীচরণে কোটি নমস্কার।

শ্রীবিজয়মাধব মণ্ডল।
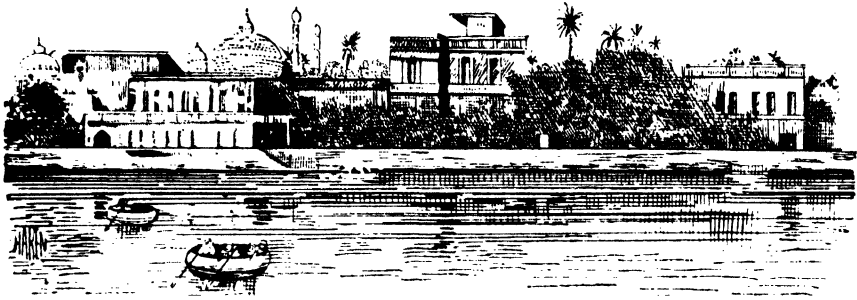
নিউজিল্যাণ্ড

প্রশান্ত মহাসাগরের দক্ষিণাংশে ক্যাপ্টেন জেম্‌স্ কুক সর্ব্ব-প্রথম যে দ্বীপ আবিষ্কার করেন, তাহারই নাম নিউজিল্যাণ্ড। বৃটিশ পতাকা এই দ্বীপে উড্ডীন হয়। পাছে ফরাসীরা এই দ্বীপে বসবাস করিতে আসে, এ জন্য উহাকে বৃটিশ উপনিবেশ বলিয়া ঘোষণা করা হয়। দ্বীপের রাজধানীর নাম ওয়েলিংটন।

বহু নিউজিল্যাণ্ড-বাসী দ্বীপের উপকূল-সীমার বাহিরে না গেলেও, ইংলণ্ডকে মাতৃভূমি বলিয়া এখনও অভিহিত করিয়া থাকে। দ্বীপের একটা বিস্তৃত অংশে সুইজারল্যাণ্ডের তুষারকিরীটী গিরি-মালার ন্যায় গিরি-শ্রেণী বিদ্যমান। জাভা ও জাপানের ন্যায় আগ্নেয়গিরিও এখানে আছে। ইটালীর ন্যায় হ্রদের অভাবও এখানে নাই। তুষারনদীর অস্তিত্ব এই দ্বীপে প্রচুর।

গঁদের আশায় গাছে চড়িতেছে

পাইন গাছ এই দ্বীপের শোভা বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। কোন কোন গাছের ২২ ফুট ব্যাস পর্য্যন্ত দেখিতে পাওয়া যাইবে।

দক্ষিণের এই দ্বীপগুলিতে মাওরিরাই প্রথম ঔপনি-বেশিক। আকাশের নক্ষত্র, বায়ুর গতি এবং সমুদ্র-স্রোতের সম্বন্ধে তাহাদের অভিজ্ঞতার সাহায্যে মাওরিরা তাহাদের ডোঙ্গার সাহায্যে জন্মভূমি হাওয়াইকি (সম্ভবতঃ টাহিটি এবং কুক দ্বীপ) হইতে নিউজিল্যাণ্ডে আসিয়াছিল।

রুখা নদীর পঙ্ক ঘাঁটিয়া স্বর্ণের সন্ধান

উহা চতুর্দ্দশ শতাব্দীর ঘটনা। খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীতে প্রসিদ্ধ পলিনেসীয় নাবিক কুপ্ নিউজিল্যাণ্ডে গমন করিয়া-ছিলেন। সেই কিম্বদন্তী অনুসারে মাওরিরা তাঁহার অবলম্বিত পথ ধরিয়া নিউজিল্যাণ্ডে গমন করে।

এই দ্বীপে আসিবার পর মাওরিদিগের বংশবৃদ্ধি হইতে থাকে—তাহারা পরস্পর পরস্পরের বিরুদ্ধে সংগ্রামও করিত। সঙ্গে সঙ্গে মিঠা আলুর চাষও (মাওরি ভাষায় ইহাকে 'কুমারা' বলে) তাহারা করিত। ঐ আলুর বীজ

তাহারা স্বদেশ হইতে আনিয়াছিল। ক্রমে তিমি মৎস্য-ব্যবসায়ী, ধর্ম্মযাজক-সম্প্রদায় এবং ব্যবসায়ীরা এই দ্বীপে সমাগত হইতে আরম্ভ করিল। নানা স্থান হইতে স্ব স্ব সামাজিক পতাকা উড্ডীন করিয়া বারুদ ও বন্দুকসহ উপনিবেশবাসী হইবার আশায় আরও অনেকে সমবেত হইল।

নানা গোলযোগ অনেক দিন ধরিয়া চলিল। তার পর ধীরে ধীরে চারিদিকে সুব্যবস্থা হইয়া নিউজিল্যাণ্ডের আর্থিক পরিস্থিতি ভারসাম্য লাভ করিল।

গত শতাব্দীতে ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে অক্ল্যাণ্ডে যত লোক ছিল, এখন তাহার দ্বিগুণ বাড়িয়াছে—অক্ল্যাণ্ডের জনসংখ্যা

বোমার সাহায্যে তিমি শিকার

বিচিত্রদর্শন কিউই পক্ষী

কারাপিটির বাষ্পোচ্ছ্বাসে কানেস্তারা শূন্যে উঠিয়াছে

মাওরি নারীরা উষ্ণজলে আহার্য্য সিদ্ধ করিতেছে

মাওরিদিগের সহিত সংগ্রাম বাধিল। দীর্ঘকাল ধরিয়া সে সংগ্রাম চলিল। জমি লইয়া বিবাদ আরম্ভ হইল। স্বর্ণখনি দেখা দিল, জমির দর বাড়িতে লাগিল। এইরূপে

২ লক্ষ ২১ হাজার ৩ শত হইবে। যুক্তরাষ্ট্রের উপকূল-ভাগ হইতে নিউজিল্যাণ্ড ৬ হাজার মাইল দূরে অবস্থিত। অষ্ট্রেলিয়ার দূরত্ব ১২ শত মাইল হইবে। ঐ সকল স্থান হইতে অর্ণবপোত-সমূহ দ্বীপ ঘুরিয়া হাওয়াকি উপসাগরের মধ্য দিয়া ওয়েটিমাটা বন্দরে প্রবেশ করিয়া থাকে। পরে নগরের পাদদেশে উপনীত হয়।

বহুকাল পূর্ব্বে এই স্থানে প্রকৃতির শক্তিরই প্রাধান্য
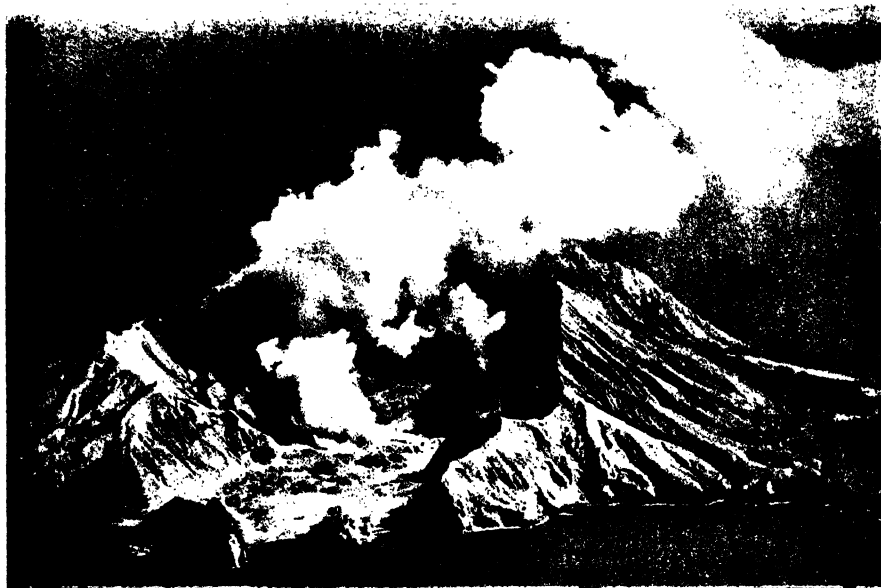
সমুদ্রগর্ভস্থ আগ্নেয় গিরির অগ্ন্যুৎপাত

মাওরিগণের নিউজিল্যাণ্ড আগমন—যাদুঘরের চিত্র

ডিউক অব, গ্লষ্টারের অভিনন্দনে মাওরিগণের নৃত্য

নিউজিল্যাণ্ডের শৈলমালায় মেষ-বিচরণভূমি

ছিল—মানুষের শ্রমশিল্প তখন অজ্ঞাত ছিল। দশ মাইলের মধ্যে প্রায় ৬০টি নির্ব্বাপিত আগ্নেয়গিরির মুখ দেখিতে পাওয়া যাইবে। মাউন্ট এডেনের শীর্ষদেশে দাঁড়াইলে—এই নির্ব্বাপিত আগ্নেয়গিরির মুখবিবর সুরক্ষিত এবং উহা সহরের ঠিক মাঝখানে অবস্থিত—বুঝিতে পারা যাইবে এক সময়ে কিরূপ ভাবে লাভাপ্রবাহ উহা হইতে নির্গত হইয়াছিল।

ঐ স্থানে দাঁড়াইয়া আরও একটি বিষয় লক্ষ্য করা যায়—উত্তর দ্বীপ কি করিয়া দুই ভাগে বিভক্ত হইতে রক্ষা পাইয়াছিল। যে যোজকের উপর অকল্যাণ্ড সহর বিরাজিত, তাহার পশ্চিমে টাসমান্ সমুদ্র। উহার বিস্তার মাত্র ৮ মাইল।

সহরের মধ্যে কুইন ষ্ট্রীটেই ব্যবসা-বাণিজ্যের কেন্দ্র জন-সাধারণ বড় বড় রাস্তা-নির্ম্মাণে ঔদাসীন্য প্রকাশ করিলেও, পার্কের বাহুল্য আছে। অসংখ্য পার্ক সহরের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যাইবে। প্রত্যেক পার্কই পুষ্পসমাকীর্ণ। সারা বৎসর ধরিয়া গাছে গাছে অজস্র ফুল ফুটিয়া থাকে। নানাবর্ণের ফুল দেখিলে নয়ন ও মন বিমোহিত হয়। এমন কি, ঘোড়দৌড়ের মাঠের চারিদিকে তালীবন—অজস্র পুষ্প-সমাকীর্ণ বৃক্ষলতা।

অকল্যাণ্ড সহরের প্রধান দ্রষ্টব্য স্থান "রণস্মৃতি-যাদুঘর।" গ্রীসীয় আদর্শে এই অট্টালিকা নির্ম্মিত। বহু দ্বীপ হইতে সংগৃহীত মূল্যবান্ পদার্থে এই যাদুঘর সুশোভিত। মাওরিদিগের বাড়ীর নমুনা, তাহারা যে ডোঙ্গায় চড়িয়া যুদ্ধ করিত তাহা, মাওরিদিগের যুদ্ধাস্ত্র এবং তাহাদের প্রস্তুত নানাবিধ দ্রব্যসম্ভার এখানে সংগৃহীত হইয়াছে।

অকল্যাণ্ড সহর হইতে বাহির হইয়া দক্ষিণদিকে গমন করিলে উন্মুক্ত প্রান্তর নয়নপথে পতিত হইবে। মাঠে গৃহপালিত পশুর দল চরিয়া বেড়াইতেছে। শত শত মেষ উপত্যকাভূমিতে বিচরণ করিতেছে।

নিউজিল্যাণ্ডের ঔপনিবেশিকগণ প্রথমতঃ চাষ-বাসেই মন দিয়াছিল। পরিশেষে তাহারা গৃহপালিত পশুর দিকেই মনঃসংযোগ করে। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে জমান মাংস ইংলণ্ডে বিক্রয়ার্থ প্রেরিত হয়। উহা হইতে নিউজিল্যাণ্ডবাসীরা

মাউরুহো আগ্নেয় গিরি

মোটা টাকা উপার্জ্জন করিয়াছিল। এই উপায়ে তাহাদের অর্থ-কৃচ্ছ্রতা দূরীভূতও হইয়াছিল।

অধুনা নিউজিল্যাণ্ড-জাত মাখম এবং ডেরিজাত দ্রব্য সমগ্র পৃথিবীতে বিক্রয়ার্থ প্রেরিত হইতেছে। ৪৩ লক্ষ মেষাদি পশুর অর্দ্ধেক ডেরিতে প্রতিপালিত হয়। উত্তর ও দক্ষিণ দ্বীপের মেষের সংখ্যা ২ কোটি ৮৬ লক্ষ। পৃথিবীতে যত দেশে ভেড়ার চাষ হয়, তন্মধ্যে নিউজিল্যাণ্ড সপ্তম স্থান

অধিকার করিয়া রহিয়াছে। মেষলোম-জাত দ্রব্য হিসাবে নিউজিল্যাণ্ডের স্থান পঞ্চম।

মার্সার নামক ক্ষুদ্র সহরটি পূর্ব্বে মাওরি ও ঔপনিবেশিকদিগের সীমান্তপ্রদেশ বলিয়া পরিচিত ছিল।

নিউজিল্যাণ্ডের মেষপাল

সমগ্র অঞ্চলটি ইতিহাস-প্রসিদ্ধ। এইখানে ১৮৬৩-৬৪ খৃষ্টাব্দে মাওরি যোদ্ধগণ বৃটিশ শক্তির পরিচয় লাভ করে। অধুনা এই স্থান ইংরেজ-অধ্যুষিত—যুদ্ধ-বিগ্রহের কোনও লক্ষণই এখানে নাই। একটি শৈলের উপর সেণ্টষ্টিফেন মাওরি কলেজ প্রতিষ্ঠিত। মাওরি যুবকগণ এখানে প্রয়োজনীয় বিষয়ে শিক্ষালাভ করিয়া থাকে।

প্রধান রাজপথের কয়েক মাইল পশ্চিমে—এই পথ ধরিয়া টিকুইটিতে গমন করা যায়—ওয়েটোমো গুহা বিরাজিত। ভূগর্ভস্থিত এই গুহা দেখিবামাত্র বিস্ময়ে মন ভরিয়া উঠে। একপ্রকার ক্ষুদ্র জোনাকী পোকা এখানে আছে। ভূগর্ভস্থ জলরাশির উপর নৌকা চড়িয়া এই গুহা দেখিতে হয়। সেই সময় লক্ষ লক্ষ জোনাকী গুহার মধ্যে জ্বলিতেছে দেখা যায়। মনে হইবে যেন একটা ছায়াপথ রচিত হইয়া দূরে মিলাইয়া গিয়াছে। এ দৃশ্য মানুষকে মুগ্ধ অভিভূত করিয়া ফেলে।

কথিত আছে, দর্শকরা কোনও শব্দ করিবামাত্র এই কীটগণ তাহাদের আলোক-উৎস নিভাইয়া দেয়; কিন্তু শব্দ করিবার প্রয়োজন হয় না। সে দৃশ্য দেখিবামাত্র মানুষ নির্ব্বাক্, নিশ্চল হইয়া পড়ে।

ওয়েটোমো গুহা হইতে বাহির হইয়া, দর্শক উচ্চাবচ স্থান ধরিয়া, আওয়াকিনো উপত্যকাভূমি পার হইয়া সমুদ্রতীরে পৌঁছিতে পারে। উহার বহুদূরে মাউণ্ট এগমণ্ট মাথা উন্নত করিয়া সমুদ্র-বক্ষে দণ্ডায়মান। মাওরিরা ইহাকে টারানাকি বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকে।

১৮৬০ খৃষ্টাব্দে টারানাকিযুদ্ধ সংঘটিত হয়। মাওরি রণ-পতাকায় ঐ পর্ব্বতের চিত্র অঙ্কিত থাকিত। উক্ত পর্ব্বতের উপত্যকা-ভূমি ও ঢালু অঞ্চলে তাহারা আশ্রয় গ্রহণও করিত। এই পর্ব্বত তুষারাবৃত। উহার সম্বন্ধে অসংখ্য উপকথা রচিত হইয়াছে। জাপানের পবিত্র ফুজি দ্বীপের ন্যায় মাউণ্ট এগমণ্টের প্রসিদ্ধি আছে।

প্রবাদ আছে যে, ঐ পর্ব্বতের চূড়া দৃষ্টিগোচর হইলেই বুঝা যাইবে যে, বৃষ্টি সমাগত। যদি উহার চূড়া দেখা না যায়, তখন বুঝিতে হইবে, বৃষ্টি হইতেছে। এ জন্য এখানে অনেক লোকের ভাল ভাল কৃষিক্ষেত্র আছে।

ওয়েলিংটন এই উপনিবেশের রাজধানী। নিকলনস

বন্দরকে যে শৈলমালা ঘিরিয়া আছে, সেই শৈলমালার উপর এই রাজধানী অবস্থিত। নিকলনস বন্দর দেখিতে অনেকটা হ্রদের ন্যায়। শৈলমালার অনেকগুলি এত খাড়া যে, অধিকাংশ অট্টালিকা উদ্যান পর্য্যন্ত নাই।

রোটোরুয়ার বল খেলা

ওয়েলিংটন সহর শুধু গিরিসহর নহে। এখানে সর্ব্বদাই ঝড় বহিয়া থাকে। এখানকার শ্বেত মর্ম্মরপ্রস্তরনির্ম্মিত পার্লামেণ্ট-ভবন ব্যতীত দারু-নির্ম্মিত প্রকাণ্ড ভবনগুলিতে সরকারী কার্য্যালয়সমূহ প্রতিষ্ঠিত রাজধানীটি সমগ্র দ্বীপের ঠিক মধ্যস্থানে

গো-পাল সাহায্যে চকোর কাঠ টানিয়া আনা হইতেছে

প্রতিনিধি ছিলেন। তিনি ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে মাওরিদিগের নিকট হইতে এক খণ্ড জমি ক্রয় করেন, সেই সহরের নাম হয় ওয়েকফিল্ড। কর্ণেল ওয়েকফিল্ড এই সহরেই সমাহিত হন। ওয়েকফিল্ড সহরের প্রসিদ্ধি কম নহে। রাজধানী ওয়েলিংটনের পরেই ইহা সুপ্রসিদ্ধ। এডওয়ার্ড গিবন ওয়েকফিল্ডের সমাধিও এখানে আছে। সমগ্র দ্বীপটিকে উপনিবেশে পরিবর্ত্তিত করিবার পরিকল্পনা তাহারই মস্তিষ্ক-প্রসূত। তিনিই স্থির করিয়া দেন যে, নির্দ্দিষ্ট অর্থ দিলে নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ জমি গৃহ-নির্ম্মাণের জন্য প্রদত্ত হইবে। এই ভাবে জমি বিক্রয়
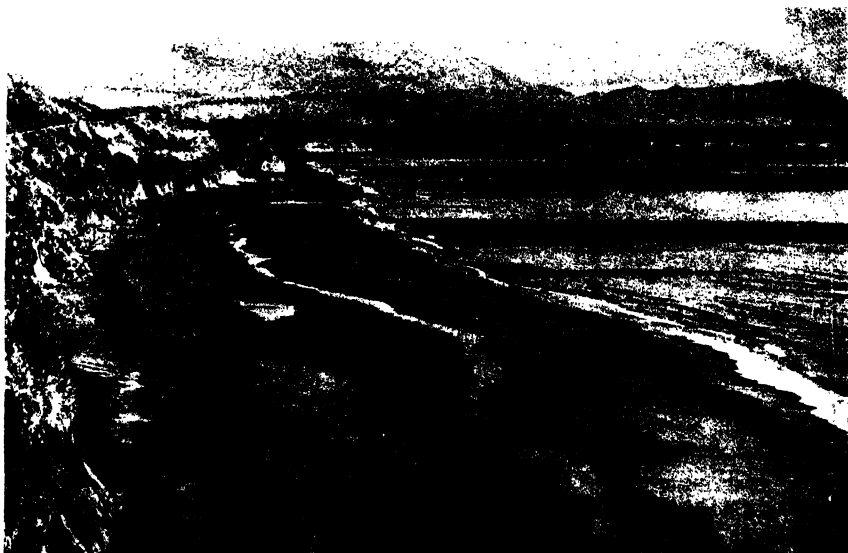
নিউজিল্যাণ্ডে খড়-সংগ্রহের প্রণালী

অবস্থিত কুক প্রণালীর মধ্য দিয়া সহজে বৈদেশিক জাহাজগুলিতে যাওয়া যায়।

কর্ণেল উইলিয়ম্ ওয়েকফিল্ড নিউজিল্যাণ্ড কোম্পানীর

টারানাকি উপকূলভাগে মাউণ্ট এগমণ্ট

স্কিপার্স খনের স্বর্ণ ধৌত করিবার ব্যবস্থা

খড়্গ-মৎস্য শিকার

অর্থ ব্যয়িত হইয়াছিল। ওয়েলিংটন সহরের নামকরণ ব্যাপারেও তাঁহার যোগাযোগ ছিল।

ক্যাথারিন ম্যানসফিল্ড ছোট গল্প লিখিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। তাঁহার জন্মভূমি এই ওয়েলিংটন সহর।

নেলসন্ অঞ্চলটি ফলের জন্য প্রসিদ্ধ। সূর্য্যালোকও এখানে বৎসরে ২ হাজার ৫ শত ৪ ঘণ্টা থাকে।

করিয়া যে অর্থ সংগৃহীত হইয়াছিল, নূতন নূতন লোককে উপনিবেশে আনিবার জন্য প্রলুব্ধ করিবার উদ্দেশে সেই

অর্থাৎ প্রতিদিন ৭ ঘণ্টা করিয়া এখানে সূর্য্যালোক পাওয়া যায়। এমনও দেখা গিয়াছে, বৎসরে কোন কোন দিন

রুয়াপেহু পাহাড়ের তুষার-নদ

২ শত ৫০ পাউণ্ড ওজনের খড়্গ-মৎস্য শিকার

আপেল প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে উৎপাদিত হইয়া থাকে। নেলসনের দক্ষিণাংশে সুদর্শন উপত্যকাভূমি ও রমণীয় পাহাড় দেখিতে পাওয়া যাইবে।

সমুদ্র-উপকূলবর্ত্তী ওয়েষ্টল্যাণ্ড অঞ্চল পাহাড়-পূর্ণ। এই অঞ্চলে প্রচুর পাথুরে কয়লা আছে। নিউজিল্যাণ্ড খনিসমূহ হইতে প্রতি বৎসর ২০ লক্ষ টন অর্থাৎ প্রায় ৫ কোটি ৫০ লক্ষ মণ কয়লা উত্থিত হয়। তন্মধ্যে শতকরা ৪৬ মণ কয়লা ওয়েষ্টল্যাণ্ড অঞ্চল সরবরাহ করিয়া থাকে।

৮ ঘণ্টাব্যাপী সূর্য্যালোক রহিয়াছে। নিউজিল্যাণ্ডে এরূপ সূর্য্যালোকিত স্থান আর নাই। এই অঞ্চলে দ্রাক্ষা,

এক সময়ে ওয়েষ্টল্যাণ্ড স্বর্ণ-খনির কেন্দ্রস্থান ছিল। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে ঐ স্থানে স্বর্ণ-খনির লোভে বহু জনসমাগম হইয়াছিল। অনেক পরিত্যক্ত গ্রাম বা সহরগুলি সে যুগের সাক্ষ্য দান করিতেছে। সে সকল সহর এখন জনসমাগম-বর্জ্জিত ভৌতিক স্থান বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। তবে এখনও স্বর্ণের সন্ধানে কায চলিয়া থাকে।

হকিটিকা এই অঞ্চলের একটি সহর। উহার দক্ষিণে রিমু নামক একটি জনপদ আছে। কোনও মার্কিণ কোম্পানী এখানকার জমি খনন করিয়া স্বর্ণের সন্ধানে ব্যাপৃত আছে।

মাওরিরাও এই ওয়েষ্টল্যাণ্ড অঞ্চলে খনির কার্য্যব্যপদেশে আগমন করিয়াছিল। তাহারা পীতবর্ণের প্রস্তর সংগ্রহের জন্যই এখানে সমাগত হয়। তাহারা সে সময় যাহাকে পীত প্রস্তর বলিত, শ্বেতকায় মানুষরা পরবর্ত্তী যুগে তাহাকেই স্বর্ণ বলিয়া অভিহিত করে।

গ্রেমাউথ ও হকিটিকার মাঝে আরাহুরা নদী বিদ্যমান। এই পীত প্রস্তর এই নদীতে পাওয়া যাইত বলিয়া কথিত আছে। উত্তর ও দক্ষিণ দ্বীপ হইতে মাওরিরা দলে দলে উহা সংগ্রহের জন্য আসিয়াছিল।

উক্ত প্রস্তর হইতে তাহারা "টিকি" বা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিত। সেই মূর্ত্তি তাহারা গলদেশে পদক বা মাদুলীর মত ধারণ করিত। এই সকল অলঙ্কারকে তাহারা এত মূল্যবান্ মনে করিত যে, আরাহুরা নদীকে তাহারা তীর্থস্থানের ন্যায় পবিত্র জ্ঞান করিত।

ওয়েষ্টল্যাণ্ডের প্রধান আকর্ষণ তাহার প্রাকৃতিক দৃশ্য। বহুদূর হইতে দর্শকগণ এই মধুর নিসর্গ-দৃশ্য দেখিবার জন্য আগমন করিয়া থাকে। এই অঞ্চলে পাহাড়, হ্রদ, তুষার-নদী এবং বন-জঙ্গল দেখিতে পাওয়া যাইবে। এই অঞ্চলে বৃষ্টিপাত প্রচুর হইয়া থাকে—বৎসরে ‹ শত ইঞ্চি বারিপাত হয়। এ জন্য প্রচুর শস্য উৎপাদিত হইয়া থাকে। গাছ গালাও অসম্ভব পুষ্টিলাভ করে।

ফ্রান্‌জ জোসেফ তুষারনদ এই অঞ্চলের দর্শনীয় বস্তু। এমন চমৎকার তুষারনদ পৃথিবীতে অল্পই দেখিতে পাওয়া যাইবে। ৮ হাজার ফুট উচ্চ তুষার-ক্ষেত্র হইতে ইহা নামিয়া আসিয়াছে। উপরের দিকে এই তুষার-নদীর গতি-বেগ অত্যন্ত প্রবল—প্রতিদিন ১৫ ফুট। বিমান সাহায্যে এই তুষারনদ দেখিলে সমস্ত দৃশ্য সুস্পষ্ট নয়নগোচর হয়
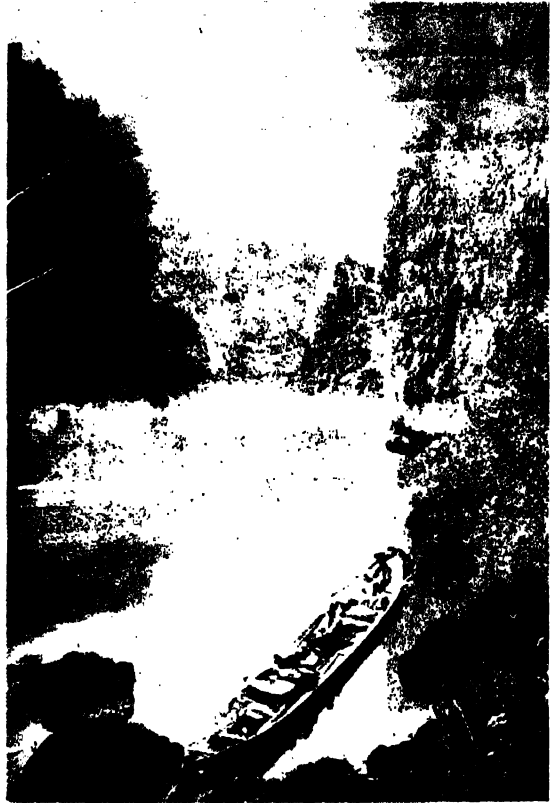
ওয়ানসানুই নদীর দৃশ্য

ওয়াহিহো হইতে ১৭ মাইল দূরে আর একটি তুষারনদী

আছে, উহার নাম ফক্স তুষার-নদ। ফ্রানজ জোসেফ নদ হইতে উহা আরও দীর্ঘ।

ডনডিন সহরে প্রচুর গম উৎপাদিত হইয়া থাকে। ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে ১ কোটি বুসেল গম এই স্থান হইতে উৎপন্ন হইয়াছিল। সমগ্র নিউজিল্যাণ্ডে যত গম জন্মে, তাহার ৫ ভাগের ৪ ভাগ এই অঞ্চলেই উৎপন্ন হয়।

ফক্স তুষার-নদ

ক্রাইষ্টচর্চ নামক সহরটি যে কোনও ইংরেজ সহরের ন্যায় দেখিতে। এখানে একটি ইংরেজের গির্জ্জা আছে। এভন নদ শান্তগতিতে এই সহরের পার্শ্ব দিয়া আঁকিয়া-বাঁকিয়া চলিয়া গিয়াছে। এই নদের উপর ২৬টি সেতু আছে।

ডনভিন সহর, রাজধানী ওয়েলিংটনের ন্যায় পাহাড়-বেষ্টিত স্থানে অবস্থিত। স্কটল্যাণ্ড হইতে প্রবাসীরা এখানে আসিয়া বসবাস করিতে থাকেন। ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে স্কটরা এখানে প্রথম আগমন করেন। এখানকার বিদ্যালয়, আইন-আদালত, বিশ্ববিদ্যালয় সবই প্রস্তর-নির্ম্মিত।

১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে ওটাগো বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। নিউজিল্যাণ্ডে ইহাই উচ্চ শিক্ষাদানের প্রথম কেন্দ্র। এখন উহা নিউজিল্যাণ্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত সংশ্লিষ্ট হইয়াছে। ওটাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে ঔষধ ও দন্তবিদ্যা শিখিবার প্রতিষ্ঠান আছে। ক্যান্টার-বেরিতে এঞ্জিনিয়ারিং বিদ্যা শিক্ষা দেওয়া হয়। অক্‌ল্যাণ্ডে স্থপতিশিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্য এবং এঞ্জিনিয়ারিং বিদ্যাশিক্ষা দিবার সুব্যবস্থা আছে। ভিক্টোরিয়া কলেজ আইন ও বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য প্রসিদ্ধ।

অন্যান্য সহরের মত দ্রুত উন্নতি হইয়াছিল ডনভিনের তাহা হয় নাই। কিন্তু অধুনা ইহার অধিবাসীর সংখ্যা ৭৮ হাজার ৫ শত। ডনভিনের ব্যবসা-বাণিজ্য ভালই চলিতেছে। ওটাগো পশম-মিলের নাম সর্ব্বত্র পরিচিত। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে ওটাগোতে স্বর্ণ পাওয়া গিয়াছিল। অষ্ট্রেলিয়া হইতে বহু লোক স্বর্ণের সন্ধানে এখানে আসিয়াছিল। কিন্তু বেশী দিন সে অবস্থা স্থায়ী হয় নাই।

টি আনাউ নামক হ্রদটি আকারে বড় এবং দেখিতে মনোরম। ইহা ২২ মাইল স্থান জুড়িয়া আছে। হ্রদটি কোন কোন স্থানে দুই মাইল প্রশস্ত। ওয়াকাটিপু নামক হ্রদটি রাকাইহাইটু না কি খনন করাইয়াছিলেন। মাওরিগণ এইরূপ কথাই বলিয়া থাকে।

নিউজিল্যাণ্ডের প্রসিদ্ধ জলপ্রপাত সাজারল্যাণ্ড। উহার জলধারা ১৯৭৪ ফুট উচ্চ হইতে ভীষণ বেগে পতিত

টাস্‌ম্যান তুষার-নদীতে তুষার-গুহা

পাহাড়ের পথে স্কুলের ছাত্র-ছাত্রী
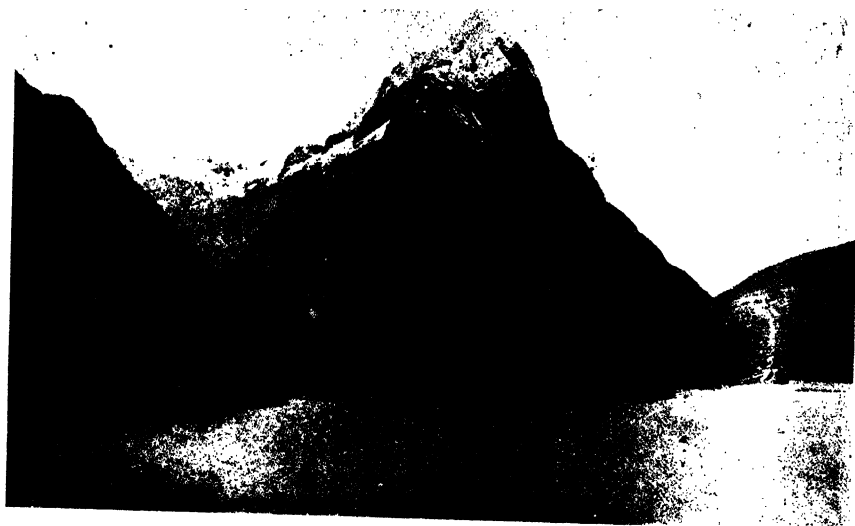
উত্তুঙ্গ সার্প মিটারি শৃঙ্গ

পাহাড়-বেষ্টিত ডনিডিন সহর

হইতেছে। উহাকে নায়াগ্রা জলপ্রপাতের সহিত কতকটা তুলনা করা যায়।

টাসমান্ তুষার-নদের শুভ্রতায় চক্ষু ধাঁধিয়া যায়। এই তুষার-নদ ১৮ মাইল দীর্ঘ এবং সওয়া মাইল চওড়া। উহার গভীরতা ২ শত ফুট হইতে হাজার ফুট হইবে।

উত্তর দ্বীপে নাগায়ুরুহো নামক আগ্নেয়গিরি সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। গত ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দেও উহা হইতে অগ্ন্যুৎপাত হইয়াছিল। রুয়াপেহু নামক পর্ব্বত উত্তর দ্বীপের মধ্যে

তুষারাচ্ছন্ন ডগলাস্ শৃঙ্গ

সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ। উহার উচ্চতা ৯ হাজার ১ শত ৭৫ ফুট হইবে।

উল্লিখিত আগ্নেয় গিরির কয়েক মাইল উত্তরে টাউপো হ্রদ অবস্থিত। ইহাতে প্রচুর মৎস্য আছে। ধীবররা এ জন্য ঐ হ্রদকে তীর্থস্থান হিসাবে গণ্য করিয়া থাকে। এত বৃহৎ হ্রদ সমগ্র উপনিবেশে আর নাই।

উপত্যকাভূমি হইতে তিন মাইল দূরে কারাপিটি গিরিমুখ হইতে নিরন্তর বাষ্পরাশি সমুত্থিত হইতে দেখা যাইবে। উক্ত পাহাড়ের মুখবিবর এক ফুট প্রশস্ত। এই মুখবিবর হইতে প্রচণ্ডবেগে বাষ্পরাশি সমুত্থিত হইয়া থাকে। বাস্তবিক এই ভাবে যদি নিরন্তর ভূগর্ভস্থ বাষ্পরাশি নির্গত না হইত, তাহা হইলে উত্তর দ্বীপের অবস্থা কি হইত, তাহা কল্পনাও করা যায় না।

উত্তর এবং দক্ষিণ দ্বীপে স্টেটের অধিকারভুক্ত কর্ষিত ভূমির পরিমাণ ৫ লক্ষ একর হইবে। ইহা ব্যতীত বে-সরকারী কোম্পানীরা ১৯২৩ খৃষ্টাব্দ হইতে প্রায় আড়াই লক্ষ একর ভূমিতে চাস-আবাদ করিয়াছে।

টারাওয়েরা পাহাড়ের উপরিস্থিত যে সুবৃহৎ অরণ্যানী

লেণ্ডেন ফেল্ড পাহাড়ের ভৌতিক ছায়া

ছিল, তাহা ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে অগ্ন্যুৎপাতের ফলে নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে।

মাওরি জাতি অন্যান্য প্রাচীন জাতির ন্যায় ক্রমে ধ্বংস মুখে যাইতেছে না। তাহাদের সংখ্যা ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে। তাহাদের অধিকাংশই কৃষিকার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়া থাকে—গোমেষাদি প্রতিপালন করিয়াও অনেকে জীবিকার্জ্জন করে।

মাওরিদিগকে বাদ দিলে, নিউজিল্যাণ্ডের বাকি সব বৃটিশ। অধিবাসীদিগের শতকরা ৯৪ জন বৃটিশ-রক্তজাত

সমগ্র দ্বীপটি অত্যন্ত রক্ষণশীল। নিউজিল্যাণ্ডে

সরকার বর্ত্তমান শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতে সামাজিক সমস্যা-সমাধানে নানা প্রকার বিধিনিষেধ প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন।

এভন নদের উপরিস্থিত সেতু (যুদ্ধস্মৃতি রক্ষার্থ নির্ম্মিত)

পার্লামেণ্টের নেতৃগণ আইন করিয়াছেন যে, প্রত্যেক মানুষকে বাঁচিয়া থাকিবার মত বেতন দিতে হইবে। বেকারদিগের জন্যও ব্যবস্থা হইয়াছে। ৬৫ বৎসর বয়স হইলেই যে কোন কর্ম্মীকে বৃত্তি দিবার ব্যবস্থাও আছে।

এ জন্য এই উপনিবেশে নিঃস্ব কেহ নাই। আবার অসাধারণ ধনী বলিয়াও কোন লোক নাই।

উপনিবেশে রেলপথ নির্ম্মিত হইয়াছে। তাহার বিস্তার ৩ হাজার ১ শত ১৫ মাইল। ১৭০ মাইল রেলপথ বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের দ্বারা পরিচালিত হইয়া থাকে।

রসেল, ওয়াইটাঙ্গি, কেরিকেরি, পাইহিয়া প্রভৃতি স্থানে (উপসাগরের সন্নিহিত অঞ্চল) নিউজিল্যাণ্ডের প্রাথমিক ইতিহাস রচিত হইয়াছিল। ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে স্যামুয়েল মারসডেনই প্রথম খৃষ্টান ধর্ম্মযাজক প্রথম ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করেন। উপনিবেশের প্রাচীনতম অট্টালিকাসমূহ

নিউজিল্যাণ্ডের শুকপক্ষী

এই সকল স্থানেই দেখিতে পাওয়া যাইবে। এই অঞ্চলেই প্রথম হলকর্ষণ দ্বারা চাষ আবাদ হয়। ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে ক্যাপ্টেন হবসন্ প্রথম শাসক হিসাবে এইখানে বৃটিশ প্রাধান্য ঘোষণা করেন।

স্পিরিটস্ বে নামক উপসাগর মাওরিদিগের নিকট পরম পবিত্র স্থান। তাহারা বিশ্বাস করে যে, এইখানে তাহাদের আত্মা (মৃত্যুর পর) আসিয়া পুনরায় তাহাদের পূর্ব্ব-পিতৃভূমি হাওয়াইকি অভিমুখে প্রয়াণ করিয়া থাকে।

শ্রীসরোজনাথ ঘোষ।

উপহার

সে সব জানিতে কিছু চাহি না আমি,
নেবে কি না আমার এ দীন উপহার;
দিতে আসিয়াছি শুধু; হে জীবন-স্বামী,
দিব আরো যাহা আছে চরণে তোমার।
পাষাণের বক্ষ ভেদি উঠি স্রোতস্বতী,
অবিরাম ছুটে চলে সাগরের তরে;

সে কি পুছে তার দান বারি-অধিপতি,
নেবে কি ফিরায়ে দেবে তীর হতাদরে?
কানন-হৃদয়তলে ফুটে ওঠে ফুল,
দেবোদ্দেশে গন্ধ তার বিতরে পবনে;
সে কি খোঁজে তার বাস করিবে আকুল
ঘৃণায় কি প্রীতিভরে তার প্রিয় জনে?

আমার যা আছে আমি দিব পদতলে,
তুমি ফেলে দিও দূরে ঘৃণা হেলা ছলে!

৺সুকুমার সান্যাল (আই, এম্, এস্)

স্বয়ংসিদ্ধা

উপন্যাস

ষষ্ঠ উল্লাস

১

সেরেস্তার কায-কর্ম চুকিয়া গেলেও খাস-কামরায় দেওয়ানজীর সহিত হুজুরের কথাবার্ত্তা তখনও শেষ হয় নাই। প্রকাণ্ড একটা তাকিয়ার উপর দেহভার রক্ষা করিয়া হরিনারায়ণ বাবু সুদীর্ঘ সটকায় সুগন্ধি তাম্রকূট সেবনের ফাঁকে ফাঁকে হাসিমুখে পুত্রবধূর সম্বন্ধে যে মুখরোচক কথাগুলি উদ্গিরণ করিতেছিলেন, ফরাসের প্রান্তভাগে বসিয়া দেওয়ান রাধানাথ বাপুলী সেগুলি উপভোগ করিতে অখণ্ড মনোযোগ দিয়াছিলেন। এমন সময় মুখখানি বিষম গম্ভীর করিয়া নিবারণ সেই কক্ষে প্রবেশ করিল।

মুখের কথা তৎক্ষণাৎ বন্ধ করিয়া কর্ত্তা বিস্ময়ের দৃষ্টিতে নিবারণের মুখের দিকে চাহিলেন। নিবারণ নিত্যই নিয়মিতরূপে সেরেস্তায় হাজিরা দেয়, তাহার স্বতন্ত্র কামরায় বসিয়া আংশিক কার্য্যও সম্পন্ন করে। প্রত্যহ বিভিন্ন মহাল হইতে যে সকল অভিযোগ ও আবেদনপত্র সদরের সেরেস্তায় আসিয়া থাকে, নিবারণ সেগুলি পড়িয়া তাহাতে নিজের মন্তব্য লিখিয়া দেয়; অতঃপর খোদ হুজুর দেওয়ানজীর সহযোগিতায় তাহাদের সম্বন্ধে চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করেন। এ দিন নিবারণ সেরেস্তায় তাহার কামরায় আসিয়া বসে নাই; তাহার অনুপস্থিতির সংবাদ হরিনারায়ণ বাবুর অজ্ঞাত ছিল না। সুতরাং অসময়ে তাহার কামরায় নিবারণের উপস্থিতি ও তাহার গুরুগম্ভীর মুখভঙ্গী এই বিচক্ষণ ভূস্বামীর মুখে সংশয়ের রেখা ফুটাইয়া তুলিল। ক্ষণকাল নিবারণের দিকে বঙ্কদৃষ্টিতে চাহিয়াই তিনি প্রশ্ন করিলেন,—এমন অসময়ে যে নেমে এলে, নিবারণ? শুনলুম, সেরেস্তায়ও আজ বসনি, শরীর ভাল আছে ত?

নিবারণ তাহার স্বভাবসিদ্ধ রুক্ষস্বরেই উত্তর দিল,—আজ্ঞে হাঁ, শরীর আমার ভালই আছে, তবে মনটা মোটেই ভাল নেই; সেই জন্যই সকালের দিকে নীচে আর নামতে পারিনি, ওপরেই আপনার জন্য এতক্ষণ অপেক্ষা করছিলুম, দেরী দেখে অগত্যা এখানেই এলুম।

এমনভাবে এক নিশ্বাসে নিবারণ কথাগুলি বলিয়া গেল, যেন এই কয়টি কথাই তাহার বক্তব্য বিষয়ের মুখবন্ধমাত্র, আসল কথাগুলি প্রচ্ছন্ন হইয়াই আছে এবং সেগুলি ব্যক্ত করিবার জন্যই এমন অসময়ে পিতার খাস-কামরায় তাহার আগমন।

বিড়ালের গোঁফ দেখিলেই শিকারী তাহার প্রকৃতি নির্ণয় করিতে পারে। পুত্রের মুখভঙ্গী ও কথায় প্রচ্ছন্ন অভিমানের নির্দ্দেশ পাইয়াই তীক্ষ্ণদর্শী বর্ষীয়ান্ পিতার বুঝিতে বিলম্ব হয় নাই যে, এমন অসময়ে কোনও প্রীতিকর প্রসঙ্গ লইয়া সে নীচে নামিয়া আসে নাই। পুত্রের প্রকৃতি পিতার অবিদিত ছিল না, সুতরাং মুখে কৌতূহলের কৃত্রিম ভাবটুকু প্রকাশ করিয়া কোমল স্বরে প্রশ্ন করিলেন,—কোনও বিশেষ কথা তা হ'লে আছে বোধ হয়?

নিবারণ উত্তর দিল,—আজ্ঞে হাঁ।

কর্ত্তা কহিলেন,—দাঁড়িয়ে কেন তা হ'লে, ব'স,—আর কথাগুলোও শীগ্‌গীর শেষ ক'রে ফেলো; বেলাও অনেক হয়েছে, অথচ ও-গুলো শোনবারও কৌতূহল হচ্ছে।

বক্রদৃষ্টিতে দেওয়ানজীর দিকে তাকাইয়া নিবারণ অপ্রসন্নভাবে কহিল,—আমার কথা উপস্থিত আপনার সঙ্গে, আপনাকেই বলতে চাই।

নিবারণের কথার সঙ্গে সঙ্গে দেওয়ান রাধানাথ বাপুলী তাঁহার বপুখানি নাড়া দিয়া কুণ্ঠার সহিত কহিলেন,—আমি তা হ'লে এখন উঠি, আপনাদের কথাবার্ত্তা চলুক।

হাত তুলিয়া বাধা দিয়া দৃঢ়স্বরে হরিনারায়ণ বাবু কহিলেন,—বিলক্ষণ! আমাদের আগেকার কথাই যে এখনও শেষ হয়নি বাপুলী, তুমি উঠবে কি রকম?

পরক্ষণে পুত্রের দিকে মর্ম্মস্পর্শী দৃষ্টিতে চাহিয়া কহিলেন,—তুমি ত জান নিবারণ, আমার এষ্টেট বা ঘরের এমন কোনও কথা নেই, যা তোমার কাকাবাবুর সামনে বলা চলে না। বেলা আর বাড়িয়ো না, নিবারণ, কি বলবে, বল।

নিবারণের মুখখানি মুহূর্ত্তে বিবর্ণ হইয়া উঠিল; প্রবীণ দেওয়ান রাধানাথ বাপুলীর সম্বন্ধে কোনও দিন সে শ্রদ্ধা-সম্পন্ন ছিল না। পিতা তাঁহাকে অন্তরঙ্গ বন্ধুর দৃষ্টিতে দেখিলেও, পুত্রের বিদ্বিষ্ট মনে দ্বিধা উঠিত, প্রভু-ভৃত্য সম্বন্ধ যেখানে, এই কৃত্রিম বাধ্যবাধকতা বালির প্রাচীর বা তাসের বাড়ীর মত সেখানে অসার! সুতরাং কোনও দিনই দেওয়ান-কাকার উদ্দেশে নিবারণকে সশ্রদ্ধ ব্যবহার করিতে দেখা যায় নাই এবং সেরেস্তার 'য়্যাডমিনষ্ট্রেসন' সম্বন্ধে দেওয়ানজীর সহিত তাহার নিজের অভিমত কখনও ঐক্যবদ্ধ হয় নাই সেই দেওয়ানজীর সম্মুখে পিতার এইরূপ দৃঢ় নির্দ্দেশ পুত্রের চিত্তে যে বিষম আঘাত দিবে, ইহা স্বতঃসিদ্ধ।

কিন্তু নিবারণ আজ প্রস্তুত হইয়াই আসিয়াছিল প্রগল্‌ভা বধূটি অল্প কয়েক দিন মাত্র তাহাদের সংসারে আসিয়া অপ্রত্যাশিতভাবে বিষম বিপ্লব বাধাইয়া দিয়াছে, তাহার নিজের ও তাহার মায়ের অপ্রতিহত শাসন-শকটের গতিবিধির প্রচণ্ড প্রতিবন্ধক হইয়া দাঁড়াইয়াছে,—তাহার সম্বন্ধে খেয়ালী পিতার প্রকৃত মনোবৃত্তি কিরূপ, তাহার পরিচয়টুকু বর্ষীয়ান্ পিতার বিশাল মনোরাজ্য আলোড়িত করিয়া আজ সে উদ্ঘাটিত করিবেই। সুতরাং দেওয়ানজীর উপস্থিতি অগত্যা উপেক্ষা করিয়াই নিবারণ তাহার গুরুতর সমস্যাটুকুর নিষ্পত্তির দিকেই অগত্যা মনোনিবেশ করিল।

অতঃপর আর কোন ভূমিকা না করিয়াই সে কহিল,—আমি একটা গুরুতর নালিশ নিয়ে আপনার কাছে এসেছি।

নিবারণ যদি তর্জ্জনী তুলিয়া, শাণিত অস্ত্র দেখাইয়া বলিত,—আপনাকে আমি খুন করতে এসেছি,—তাহা হইলেও বোধ হয় কক্ষমধ্যে ফরাসে আসীন দুই বর্ষীয়ান্ পুরুষ এ ভাবে চমৎকৃত হইতেন না!—নিবারণের মুখে নালিশের কথা শুনিয়া উভয়ের মুখেই সুগভীর বিস্ময়ের রেখা স্পষ্ট হইয়া ফুটিয়া উঠিল। সত্যই, বিস্মিত হইবার কথাই বটে। এ পর্য্যন্ত কর্ত্তা বা দেওয়ানজী কেহ কোনও দিন কোনও কারণে এই বেপরোয়া দাম্ভিক ছেলেটিকে অন্যের বিরুদ্ধে নালিশ করিতে দেখেন নাই! নিবারণের বিরুদ্ধে নানা সূত্রে নানা লোকের নিকট হইতে কর্ত্তার দরবারে অসংখ্য নালিশ উপস্থিত হইয়াছে, কিন্তু সে নিজে কোনও দিন নালিশ লইয়া আসে নাই; যে তাহার কোপে পড়িয়া বিরুদ্ধভাজন হইয়াছে, কর্ত্তার দিকে না তাকাইয়া নিজেই বিচার করিয়াছে, নিজের ইচ্ছামত দণ্ড দম্ভের সহিত দিয়াছে বরাবর। এমন কি, তাহার সম্বন্ধে দেওয়ানজীর আচরণ যদি কোনও দিন অপ্রীতিকর হইত, সে তাহার প্রতিবিধানে পিতার দ্বারস্থ না হইয়া নিজেই অবজ্ঞার সুরে কহিত,—মনে রাখবেন আপনি, সিংহের শাবক আমি; আমার মর্য্যাদা হিসেব ক'রে সমঝে কথা কইবেন! খেয়ালী কর্ত্তার কাণে পুত্রের ঔদ্ধত্যের বিবরণ যথাযথভাবেই উঠিত, কিন্তু শাসনে তাঁহার ঔদাসীন্যই দেখা যাইত। শ্লেষের সুরে তিনি মন্তব্য প্রকাশ করিতেন,—'ওর নামই যে নিবারণ, তাই কারুর বারণ মানতে চায় না।' পুত্রের সম্বন্ধে ন্যায়নিষ্ঠ নৃপপ্রতিম ভূস্বামীর এই দুর্ব্বলতাটুকু উপলক্ষ করিয়া কত গল্পকথাই প্রচারিত হইয়া আসিতেছে, কত বেনামা-পত্র পিতার করতলগত হইয়াছে, কিন্তু অনুচিত পুত্রবাৎসল্যের ত্রুটিটুকু মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করিয়াও তিনি উদ্দাম পুত্র নিবারণকে কোনও দিন বারণ বা শাসন করিতে কিছুমাত্র প্রয়াস পান নাই। এ সম্বন্ধে কোন্ গূঢ় উদ্দেশ্যটুকু তাঁহার অন্তরের অন্তস্তলে প্রচ্ছন্নভাবে নিহিত, তাহার তত্ত্ব শুধু তিনিই অবগত।

এমন যে দুর্জ্জয় নিবারণ, সেই-ই আজ এই সর্ব্বপ্রথম তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া নালিশের কথা নিবেদন করিতেছে।

কিছুক্ষণ তিনি স্তব্ধবিস্ময়ে নিবারণের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন, মুখে কোনও কথা নাই ; মনের ভিতর শুধু স্মৃতি-সাগর আলোড়ন করিয়া কে যেন জানাইতেছিল—এমন অঘটন তাঁহার সুদীর্ঘ জীবনে বুঝি আর কোনও দিন ঘটে নাই ; পূর্ব্বের সূর্য্য যেন আজ পশ্চিমদিক ধরিয়া প্রকাশ পাইয়াছে,—নিবারণ করিতেছে নালিশ ! অথচ তিনি স্বকর্ণে শুনিতেছেন, চক্ষুর উপর তাহার পাণ্ডুর মুখখানি দেখিতেছেন, অবিশ্বাসের কিছু নাই।

ক্ষণকাল পরে আত্মসংবরণ করিয়া কর্ত্তা কহিলেন,—তুমি এসেছ নালিশ নিয়ে আমার কাছে ! তা হ'লে দুনিয়ার দরিয়ায় এই প্রথম তুমি হালে পানি পাওনি,—তা' হ'লে আমাকে বুঝতে হবে,—এ মামলাও সাধারণ নয়। ভাল, আসামী কে শুনি ? কার বিরুদ্ধে তোমার এই নালিশ ?

তীক্ষ্নদৃষ্টিতে পিতার মুখের দিকে চাহিয়া ততোধিক তীক্ষ্নস্বরে নিবারণ কহিল,—আপনি কি এখনও তা জান্‌তে পারেন নি, বুঝতে পারেন নি কিছু ?

নিবারণের এই কয়টি কথা অগ্নিগর্ভ ভয়াবহ বোমার রন্ধ্রে যেন অগ্নিসংযোগ করিয়া দিল ; সমস্ত ঘরখানিকে ত্রস্ত-কম্পিত করিয়া স্থবির সিংহ গর্জ্জিয়া উঠিলেন,—চোপরাও বেয়াদব্‌ ! মনে রেখো, নালিশ করতে এসেছ তুমি, চোখ রাঙ্গাচ্ছ কাকে ? নীচু হয়ে হিসেব ক'রে এখন থেকে কথা বল্‌তে শেখ।

জীবনের পথে এত দূর অগ্রসর হইয়া এ পর্য্যন্ত পিতার নিকট এমন নির্ঘাত আঘাত নিবারণ কোনও দিন পায় নাই। কঠোরপ্রকৃতি পিতার মুখের উপর অসঙ্কোচে কথা কহিবার একমাত্র অধিকার সেই পাইয়াছিল, কথার পিঠে এমন কঠিন কথা কতবারই সে পিতাকে শুনাইয়াছে, যাহারা সে সময় সেখানে উপস্থিত ছিলেন, নিবারণের কথা শুনিয়া চমকিয়া উঠিয়াছেন, কিন্তু যাহার উদ্দেশে সেই অশোভন কথা, তাঁহার ভ্রূযুগল কুঞ্চিত হইয়া উঠে নাই, বরং হাসির আবর্ত্তে বিশাল গুম্ফ-জোড়াটি বিস্ফুরিত হইবার শোভাটুকুই তাঁহারা সবিস্ময়ে দেখিয়াছেন। যাহাদের কথা উল্লেখ করা যাইতেছে, দেওয়ান রাধানাথ বাগুলী তাঁহাদের অন্যতম। আজ তিনিও স্নেহধন্য পুত্রের প্রতি পিতার এই অপ্রত্যাশিত তীব্র আচরণে নির্ব্বাক্‌ বিস্ময়ে স্তব্ধ !

কয়েক মুহূর্ত্ত চুপ করিয়া থাকিয়া নিবারণ মনে মনে তাহার সঙ্কল্প স্থির করিয়া কহিল,—তা হ'লে আমার যা নালিশ, কাগজে কলমে লিখেই দরখাস্ত করব।

দৃঢ়স্বরে কর্ত্তা জানাইলেন,—না, তার কোনো দরকার নেই, তুমি যা বলতে এসেছ এখানে, ব'লে যাও।

নিবারণ কহিল,—বেশ, তাই বলছি, কিন্তু আমি বুঝতে পারছি, আমার কথা আপনার মনে আজ ধরবে না—

বাজে কথা বলবার কোনও আবশ্যক দেখছি না, নিবারণ, তোমার যে নালিশ, সেইটিই আগে ব'লে ফেলো।

কারুর সঙ্গে পরামর্শ না ক'রে, ছোট ঘরের একটা মেয়েকে কুলবধূর সম্মান দিয়ে—ছুঁচোর বিষ্ঠা আপনি পাহাড়ে তুলেছেন, তা জানেন ?

এ তোমার নালিশ নয়, নিবারণ, আমার নিজের কার্য্যের অনধিকারচর্চ্চা—

কিন্তু আপনার কাযের চর্চ্চা বরাবরই আমি এমনই তেজের সঙ্গেই করেছি !

সে তেজ তুমি হারিয়ে ফেলেছ, তাই অধিকারটুকুও স'রে দাঁড়াচ্ছে। তোমার যেটুকু নালিশ, তাই আমি শুনতে চাই। তোমার কাছে আমার কাযের কৈফিয়ৎ দেবার সময় এখনও আসেনি।

গোবিন্দর বৌয়ের বিরুদ্ধেই আমার নালিশ—

ব'লে যাও, আমি শুনছি।

সে সকলের সামনে আমার অপমান করেছে।

কি সূত্রে ?

আপনি তাকে যখন আশীর্ব্বাদ করেন, তখন না কি একগাছা সোণার চাবুক তার হাতে দিয়ে বলেছিলেন—আমার বাড়ীতে একটা গাধা আছে, এই চাবুক দিয়ে তাকে সায়েস্তা করতে হবে—

তাতে তোমার গাত্রদাহের কারণ ?

আমাকেই সেই গাধা সাব্যস্ত ক'রে নতুন বৌ আপনার দেওয়া সোণার চাবুকটি আমারই পিঠে হাঁকরাবে বলেছে—তাই।

বৌমা বলেছে এ কথা ?

এক ঘর মেয়ের সামনে, সাক্ষীর অভাব নেই।

কথাটা কি সূত্রে উঠেছিল, শুনি ?

নতুন বৌ আমাকে দেখেই ঘোমটা দেয়, আমি তার

মুখখানি দেখতে চাই, মীনাকে ঘোমটা খুলে দিতে বলেছিলুম—

তোমার এইটুকু ত্রুটিতেই তিনি অত বড় রূঢ় কথা তোমাকে বললেন ?

বলেছে কি না, তাকেই আগে জিজ্ঞাসা করবেন ; আপনি যে তাকে সোণার চাবুক দিয়েছেন, গাঙ্গুলী-বাড়ীর গাধাকে সায়েস্তা করতে বলেছেন, এ সব কথা আগে ত শুনিনি ; বোধ হয়, এ বাড়ীর কেউ শোনেনি—বৌ-এর মুখ থেকে প্রকাশ হবার আগে।

হুঁ ?—তার পর ? আর কিছু বলবার আছে ?

আমার দাদামশাইকেও নতুন বৌ অপমান করেছে।

কি বললে ?

আমার স্বর্গীয় মাতামহের কথা বলছি ; ফুলশয্যার রাতে এক ঘর মেয়ের সামনে বৌ তাঁর নামে এমন খোঁটা দিয়েছে, শুনলে আপনিও শিউরে উঠবেন।

কি বলেছেন ?

দেনার দায়ে তিনি না কি তাঁর মেয়েকে—আমার মাকে—বেচেছিলেন।

বৌমা এ কথা বলেছেন ? বৌমা ! চণ্ডী মা !

পকেট হইতে একখানি কাগজ বাহির করিয়া পিতার হাতে দিয়া নিবারণ কহিল,—যারা সেখানে ছিলেন, এ কথা বৌকে বল্‌তে শুনেছেন, তাঁদের নাম এতে আছে। আমার কথাটা আপনি যাচিয়ে নিতে পারেন।

সাদা কাগজখানির উপর কালো কালিতে লেখা কতকগুলি নারীর নাম হরিনারায়ণ বাবুর দৃষ্টিতে তখন যেন কুণ্ডলী-পাকানো একপাল সাপের মত প্রতীয়মান হইতেছিল ! তাঁহার মস্তিষ্কের তখন জ্বালা ধরিয়া গিয়াছে, চক্ষুর দৃষ্টি নিষ্প্রভ হইয়া উঠিয়াছে ; যে আদরিণী বধূর প্রতি তাঁহার অতি উচ্চ ধারণা, তাহার সম্বন্ধেই এমন গুরুতর অভিযোগ ; তাঁহারই শ্বশুরকে এমন ভাবে আক্রমণ করিতে সে সাহস পাইয়াছে ! এ কি স্পর্দ্ধা তাহার !

কিছুক্ষণ নীরবে কি ভাবিয়া হরিনারায়ণ বাবু কহিলেন,—আচ্ছা, তুমি এখন যেতে পার, নিবারণ, তোমার নালিশ আমি নিয়েছি ; বিচারের ত্রুটি হবে না।

নিরুত্তরে পিতার মুখের দিকে একবার তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চাহিয়া নিবারণ ধীরে ধীরে সে কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল।

একটি সুদীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কর্ত্তা কহিলেন,—বাপুলী, শুনলে ত সব !

বাপুলী কর্ত্তার মুখের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া কহিলেন,—আপনার কি মনে হয় ?

কণ্ঠস্বর গাঢ় করিয়া কর্ত্তা উত্তর দিলেন,—নিবারণ মিথ্যা বলেনি, সোণার চাবুকের কথা এ বাড়ীতে আমরা দুজন ভিন্ন আর কেউ জানে না। এমন কি, রাণী পর্য্যন্ত না।

বিচলিত কণ্ঠে বাপুলী কহিলেন,—তা হ'লে কি আপনার ধারণা, বউমা নিবারণকে—

উত্তেজিত কণ্ঠের দৃপ্ত স্বরে বাপুলীর কথায় বাধা দিয়া কর্ত্তা কহিলেন,—হাঁ, তাকেই সোণার গাধা সাব্যস্ত ক'রে নিয়েছে। আমার কথা সে ধরতে পারেনি, এইখানেই সে হেরেছে ; সব মেয়েই যেখানে ধরা দেয়, এই অভাগীও ঠিক সেইখানেই হোঁচট খেয়েছে।

একটা কথা আমার জানতে ইচ্ছে হচ্ছে।

বল।

রাণী কিছু আপনাকে বলেছেন এ সম্বন্ধে ?

কিছু না ; কিন্তু না বল্‌লেও, নতুন বউ আসার পর থেকেই তিনি আশ্চর্য্যরকম গম্ভীর হয়েছেন ; এখন আমার মনে হচ্ছে বাপুলী, তিনি সবই শুনেছেন ; বধূর ব্যবহার তাঁর মনেও কঠিন আঘাত দিয়েছে।

কিন্তু আপনাকে ত বলেন নি কিছু !

তুমি কি পাগল হয়েছ বাপুলী, বলছ কি ? রাণী এই এক ফোঁটা মেয়ের বিরুদ্ধে আমাকে লাগাবেন, নালিশ কর্‌বেন ?

তাও ত বটে, আমি এটা ভাবিনি।

ভাববার সময় এখন এসেছে, বাপুলী ! এখন মনে হচ্ছে আমার, বড় ঘরোয়ানা অবহেলা করবার নয় ; যারা করে, তারা ঠকে। আমিও বোধ হয় ঠকেছি, বাপুলী।

আমার কিন্তু দৃঢ়বিশ্বাস, আপনি যে-ঘরে সওদা করেছেন, সে ঘর পয়সা ছাড়া আর সব দিক দিয়েই বড়, আপনি ঠকেন নি।

আমিও তাই ভেবেছিলুম, কিন্তু এখন বুঝছি, ভুল করেছি। এই মেয়েটার একটা দিকই আমরা দেখেছিলুম, সেই উজ্জ্বল দিকটাতেই সে জয়পতাকা উড়িয়ে আমাদের

মাত ক'রে দেয়,—কিন্তু আর একটা দিক যে মেয়েদের আছে, আমরা সে দিকে মোটেই নজর দিই নি, আজ সেইটিই কদর্য হয়ে উঠেছে।

আপনার এ কথার অর্থ আমি ঠিক ধরতে পারছি না।

তুমি কি সত্যই এত বোকা? কিম্বা বুঝতে পেরেও না বোঝার ভাণ করছ? আমার কথা কি জান,—আমি এই মেয়েটাকে একটু অসাধারণই ভেবেছিলুম,—এর মনের আর দেহের শক্তিটুকুর সন্ধান পেয়ে। সেই সঙ্গে এটুকুও আমি ভেবেছিলুম, শ্বশুরবাড়ীতে এসে সাধারণ মেয়ের পথে ও মেয়েটি পা বাড়াবে না, বাড়ীশুদ্ধ সকলকেই আপনার ক'রে নেবে। কিন্তু এসেই ও দিয়েছে নিবারণকে এক আঘাত, তার কথাতেই তা বোঝা গেল। নিবারণের মাতামহের গলদটুকু ধরেই সেখানেও নির্ঘাত আঘাত দিয়েছে, রাণীর কথা অবশ্য জানি না, কিন্তু তিনিও যে রেহাই পেয়েছেন, তা মনে হয় না। ও এ-বাড়ীতে এসেই আপনার-পর ঠিক ক'রে নিয়েছে; একটা অপদার্থ গাধা যে ওর স্বামী হয়েছে, সে সম্বন্ধে কোনও দুঃখই ওর মনের কোণেও দেখেনি, ঐশ্বর্য্য দেখে সব ভুলে গিয়েছে।

তা হ'লে আপনি এখন কি করবেন স্থির করেছেন?

এখনও বুঝতে পার নি,—নিবারণের ওপর হুমকি দেখেও? এঁচোড়ে পাকা একটা মেয়ে যে এমন ক'রে আমাকে ঠকিয়ে দেবে, আমার সংসারে একটা বিপ্লব বাধাবে, আমি কিছুতেই তা বরদাস্ত করতে পারব না; শাস্তি তাকে নিতেই হবে, অপরাধ করলে আমার কাছে কারুর রেহাই নেই।

আর্দ্রকণ্ঠে বাপুলী কহিলেন,—কিন্তু আমার একটি অনুরোধ, যদি দেখেন, সত্যই তিনি অপরাধিনী, তা হ'লে শাস্তির ব্যবস্থাটুকু করবার আগেই—

হাসিমুখে কর্ত্তা কহিলেন,—সেন তোমাকে খবর দিই! ভাল, তাই হবে, তোমার সামনেই না হয় তাঁর শাস্তির ব্যবস্থা হবে। সে দিন শ্যামাপুরে তাঁকে পুরস্কার দিই, সে দিনও তুমি যখন উপস্থিত ছিলে, শাস্তি যখন দেওয়া হবে—তোমার সেখানে থাকাটাও উচিত!

কথাটা নিঃশেষ করিয়াই কর্ত্তা উঠিয়া পড়িলেন। ভৃত্যগণ বাহিরে প্রতীক্ষায় ছিল, শশব্যস্ত হইয়া ছুটিয়া আসিল।

ফুলশয্যার শুভ রাত্রিটিকে সাক্ষ্য করিয়া পড়িবার নিভৃত ঘরখানির মধ্যে নবদম্পতির যে সাধনার সূত্রপাত হয়, উভয়ের অদম্য উৎসাহে তাহা ক্রমশঃ গভীর হইয়া উঠিতেছিল। অপূর্ব্ব এই দম্পতির সাধনা; লক্ষ্য ইহাদের মোক্ষলাভ নয়,—সত্যকার মানুষ হওয়া। আর এই সিদ্ধিটুকু আয়ত্ত করিবার মন্ত্র—একাগ্রচিত্তে বিদ্যাদেবীর আরাধনা। আমোদ-প্রমোদ, খেলা-ধূলা, বিলাস-লাস্য, রঙ্গরস প্রভৃতি তরুণ বয়সের এই অপরিহার্য্য উদ্দাম স্পৃহাগুলি সত্যকার মানুষ হইবার সাধনায় কঠোর সংযমী সাধক-সাধিকার গভীর নিষ্ঠায় রূপান্তরিত হইয়া এই অপূর্ব্ব তরুণ-তরুণীর দুইটি হৃদয় যুগপৎ চিত্তশুদ্ধি ও বিবেকবুদ্ধির ঔজ্জ্বল্যে উদ্ভাসিত করিয়া রাখিয়াছে।

এই অপূর্ব্ব সাধনার পথে ইষ্টলাভের অর্চ্চনায় বধূকেই স্বামীর পৌরোহিত্য করিতে হইয়াছে: পূজার পদ্ধতি, মন্ত্রের নির্দ্দেশ, প্রয়োগ-প্রণালী—সকল ব্যবস্থাই বধূর উদ্ভাবিত;—কিন্তু বধূর প্রখর বুদ্ধি ও তৎপরতা প্রতি পদেই স্বামীর মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া চলে, কোনও বিষয়েই তাহাকে খাটো হইতে দেয় না।

লাহোরে বিদ্যা-সাধনায় চণ্ডী তাহার বহুদর্শী অধ্যাপক দাদামহাশয়ের নিকট যে ভাবে দীক্ষা পাইয়াছিল, সেই মন্ত্রেই গোবিন্দও দীক্ষিত হইয়াছে। সে এখন বুঝিয়াছে,—দেবী সরস্বতীকে তুষ্ট করিয়া বিদ্বান্ হইতে হইলে বিদ্যা অর্জ্জন করিতে হইবে, একমনে লেখাপড়া শিখিয়া বিশ্ব সংসারের সকল সন্ধান জানিতে হইবে। মা-সরস্বতীর পূজার শ্রেষ্ঠ উপচার এই লেখা আর পড়া; এবং অতি শীঘ্র তাঁহাকে প্রসন্ন করিবার মন্ত্র—একাগ্র মন। তিনি ফুল-চন্দন অপেক্ষা এইগুলিই অধিক পছন্দ করেন। মূর্খ কালিদাস বনে বসিয়া একমনে লেখাপড়া শিখিয়াই তাঁহার বরপুত্র হইয়াছিলেন। সুতরাং গোবিন্দের মন আশায় ভরিয়া গিয়াছিল, উৎসাহে নাচিয়া উঠিয়াছিল। মা সরস্বতীকে তুষ্ট করিয়া তাঁহার প্রসাদে বিদ্বান্ হইবার এমন সহজ উপায় আর কেহ ত তাহাকে কোনও দিন বলিয়া দেয় নাই! দুই চক্ষু মুদিত করিয়া, আহার-নিদ্রা বিসর্জ্জন দিয়া মনে মনে কোনও মন্ত্র জপ করিতে হইবে না, কিম্বা হাত তুলিয়া দীর্ঘবাহু হইয়া দাঁড়াইয়া তাঁহাকে

ডাকিতে হইবে না,—বই লইয়া বসিয়া একমনে সদা-সর্ব্বদা পড়াশুনা ও খাতায় কালি-কলম দিয়া বইয়ের কথা লেখা; সব বই পড়িতে শিখিলে, ভালো করিয়া ছাপার মত লিখিতে পারিলে—মা সরস্বতী সদয় হইবেন, সম্মুখে আসিয়া দেখা দিবেন, বর দিয়া আমাকেও কালিদাসের মত পণ্ডিত করিয়া দিবেন! কি মজা!

তেজোময় মন্ত্রের অপূর্ব্ব প্রভাবে গোবিন্দের মস্তিষ্কের জড়তা কোথায় সরিয়া গিয়াছে, সিদ্ধিলাভের উল্লাসে নিবিড় একাগ্রতায় দুর্লভ প্রতিভা ধীরে ধীরে সেই স্থানটুকুর উপর প্রভাব বিস্তার করিতেছে।

বাসরে স্বামীর সহিত পরিচয়সূত্রে তাহার বিদ্যাবুদ্ধি ও প্রকৃতির পরিচয়টুকু পাইয়াই বুদ্ধিমতী বধূ নিজের উপস্থিত-বুদ্ধির প্রভাবে প্রতীকারের উপায় স্থির করিয়া লইয়াছিল। অল্পবয়সেই বয়সের অনুপাতে সুপ্রচুর বিদ্যা সে অর্জ্জন করিতে পারিয়াছিল—নিজের সহজাত অসাধারণ প্রতিভা ও তৎসহ তাহার আদর্শ-শিক্ষক দাদা মহাশয়ের উদ্ভাবিত অভিনব শিক্ষাব্যবস্থার সহায়তায়। শিক্ষা-সংক্রান্ত সেই অপূর্ব্ব ব্যবস্থাপত্রগুলি ইষ্টকবচের মতই সে লাহোর হইতে সঙ্গে করিয়া শ্যামাপুরে আনিয়াছিল। এখানেও সেই অমূল্য পুঁথিগুলি তাহার সঙ্গে আসিয়াছে এবং যাহাদের প্রসাদে এই বয়সেই সে বিশ্ব-সাহিত্য-ভাণ্ডারের জ্ঞাতব্য বহু তথ্যরাজির সন্ধান পাইয়াছে, তাহার অজ্ঞ স্বামীকে বিজ্ঞ করিয়া তাহার সম্মুখেও সেই রহস্যময় ভাণ্ডারের দ্বার উদ্ঘাটিত করিবার সুযোগ প্রতীক্ষা করিতেছে।

চণ্ডীর প্রতিক্ষণেই মনে পড়ে, লাহোরে তাহার সম্মুখে যখন এই দ্বার উদ্ঘাটিত হয়, তখন তাহার নিয়ামক ছিলেন তাহার শিক্ষা-গুরু দাদা মহাশয় স্বয়ং। আর এখানে? তরুণী বধূ প্রকারান্তরে রহস্যান্বেষী স্বামীর বিদ্যাসাধনায় শিক্ষয়িত্রী হইলেও, সে সেই গৌরবের দিকে ভ্রূক্ষেপমাত্র না করিয়া সহপাঠিনীরূপে স্বামীর সহিত আবার নূতন করিয়া সাধনায় বসিয়াছে। সহসা দেখিলেই মনে হয়, দুই তরুণ-তরুণী পরমোৎসাহে একাগ্র সাধনায় বিদ্যা অর্জ্জন-প্রয়াসী, একই পর্য্যায়ের ছাত্র-ছাত্রী উভয়েই:—তবে অপেক্ষাকৃত পারদর্শিনী বলিয়া ছাত্রীটিই সর্ব্বতোভাবে তাহার সহ-পাঠীকে সহায়তা করিয়া চলিয়াছে।

নিভৃত কক্ষে ইহাদের এই অপূর্ব্ব বিদ্যাসাধনার বারতা কক্ষের বাহিরে গাঙ্গুলী পরিবারের জন-প্রাণীও জ্ঞাত নহে। পরিচারিকাদের বিদায় দিয়া নিজ মহল্লার দ্বার রুদ্ধ করিয়া বধূ স্বামীর সহিত অহোরাত্রির অধিকাংশ সময়টুকু এই সাধনায় অতিবাহিত করে। স্বামি-স্ত্রীর রুদ্ধ কক্ষে এই ভাবে অবস্থিতি সম্বন্ধে বাহিরে কত কল্পিত উপাখ্যানই পল্লবিত হইয়া উঠে; কিন্তু স্বামিসর্ব্বস্ব বধূর বাহ্য-জগতের আর কোনও দিকেই যেন কিছুমাত্র লক্ষ্যই নাই; তাহার ধ্যান-ধারণা চিন্তা-কল্পনা সমস্তই স্বামীকে কেন্দ্র করিয়া তাহার চারিপার্শ্বে সর্ব্বক্ষণই ঘুরিতেছে; স্বামীর মুক্তির জন্য এই তেজস্বিনী তরুণীর সর্ব্বস্ব পণ,—স্বামীর জড়ত্ব দূর করিয়া তাহাকে সে দেবত্বের পর্য্যায়ে তুলিবেই! অদৃশ্য মনোজগতে ও পরিদৃশ্যমান বাস্তব জগতের সর্ব্বত্রই সে দেখিতে পায়, যেন তাহার স্বামীই একমাত্র সকল স্থান অধিকার করিয়া মানবদেবতার প্রতীকরূপে উজ্জ্বল হইয়া বিরাজ করিতেছেন!

* * * *

সহসা বাহিরের রুদ্ধ কক্ষদ্বারে উপর্য্যুপরি আঘাত,—তাহার রূঢ় নির্ঘাত পাঠাগারের নীরব গাম্ভীর্য্য ক্ষুণ্ণ করিয়া দিল। লিখিবার ছোট টেবলখানির দুই পার্শ্বে মুখোমুখী বসিয়া উভয়েই তখন নিজ নিজ খাতায় লিখিত একই নির্দ্দিষ্ট অঙ্কের সমাধানে ব্যস্ত। দ্বারে পুনঃপুনঃ আঘাতের শব্দে বিরক্ত হইয়া চণ্ডী হাতের খাতা ছাড়িয়া উঠিল, কিন্তু গোবিন্দের গভীর অভিনিবেশের কিছুমাত্র ব্যতিক্রম দেখা গেল না। দ্বারে অবিরাম আঘাত এবং তাহাতে আকৃষ্ট হইয়া সম্মুখবর্ত্তিনী সহপাঠিনীর প্রস্থান, কোনটিই তাহার কর্ণ ও চক্ষুকে চমকিত করিল না; টেবলের উপর ন্যস্ত খাতাখানির উপর সকল ইন্দ্রিয়ের সহিত তাহার চিত্তটি এমনভাবে নিবদ্ধ, যেন আর কিছুই তাহার লক্ষ্য করিবার নাই; যে সাধনায় সে লিপ্ত হইয়াছে, তাহা সমাপ্ত না হওয়া পর্য্যন্ত বাহিরের অস্তিত্ব সম্বন্ধেই যেন সে সম্পূর্ণ অচেতন!

এই মহল্লায় যে দুই জন পরিচারিকার পর্য্যায়ক্রমে বরাবর উপস্থিত থাকিবার কথা, খাওয়া-দাওয়ার পাট চুকিয়া গেলেই চণ্ডী তাহাদের বিদায় দিয়া বাহিরের দরজা বন্ধ করিয়া দেয়; বেলা পড়িলে বৈকালিক পাট-ঝাট আরম্ভ হইবার পূর্ব্বেই চণ্ডী পুনরায় দ্বার মুক্ত করিয়া

রাখে। মধ্যের এই সুদীর্ঘ সময়টুকু নিরুপদ্রবেই তাহাদের লেখাপড়ায় অতিবাহিত হয়। আজ মধ্যাহ্নের অব্যবহিত পরেই বহির্দ্বারের আঘাতে মনে মনে অতিমাত্রায় বিরক্ত হইয়াই চণ্ডী নিতান্ত অপ্রসন্নভাবেই দরজা খুলিয়া দিল।

কিন্তু মুক্ত দ্বারের সম্মুখে এমন অসময়ে এক অপ্রত্যাশিতের আকস্মিক উপস্থিতি চণ্ডীর মুখের বিরক্তির রেখাগুলি বিস্ময়ে পরিণত করিয়া দিল। সে দুই চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া দেখিল, পরিচারিকাদের কেহ নহে, মৃণালিনী বা পুরবাসিনী কোনও তরুণী দ্বারে আঘাত দিয়া তাহার মনে বিরক্তির সঞ্চার করে নাই, গৃহস্বামী স্বয়ং তাহার সম্মুখে দণ্ডায়মান!

চণ্ডীর কণ্ঠ হইতে স্বাভাবিক গতিতেই অনুচ্চ স্বর নির্গত হইল,—বাবা!

কিন্তু বাবার মুখ হইতে স্বাভাবিক ভাবেই ইহার ঠিক প্রতি-উত্তর আসিল না, এবং চক্ষুর অপ্রসন্ন ভঙ্গীটুকুও চণ্ডীর দৃষ্টি এড়াইল না। নিজের বিস্ফারিত দৃষ্টিকে সহসা তীক্ষ্ণ করিয়া সে দেবতুল্য শ্বশুরের সঙ্কুচিত মুখের উপর স্থাপন করিল।

বধূর এই সঙ্কোচশূন্য তীক্ষ্ণ দৃষ্টি আজ কর্ত্তার বুকে সূচের মতই বিঁধিল, কিন্তু এ সম্বন্ধে মনের ভাবটুকু প্রচ্ছন্ন রাখিয়া অন্য দিক দিয়া তিনি মনের অপ্রসন্নতা প্রকাশ করিলেন; রুক্ষস্বরে প্রশ্ন করিলেন,—দিন-দুপুরে এ দরজা বন্ধ ক'রে দিয়েছ কেন, বৌমা! দাসীগুলো গেল কোথায়?

সহজ স্বরে বধূ উত্তর দিল,—আমি তাদের ছুটী দিয়েছি, বাবা!

বধূর এই সোজা কথায় কর্ত্তার চক্ষু দুইটি অস্বাভাবিক উজ্জ্বল হইয়া উঠিল; সঙ্গে সঙ্গে তীব্র স্বরে প্রশ্ন হইল,—ছুটী দিয়েছ! কেন?

অতি সাধারণ বিষয়ে অসাধারণ শ্বশুরের এই ভাবে কৈফিয়ৎ চাহিবার ভঙ্গী বধূকে ব্যথা দিল, সঙ্গে সঙ্গে তাহার সহজাত আত্মসম্মানজ্ঞানটুকুও সচেতন হইয়া উঠিল; কিন্তু আজ সে ধৈর্য্য হারাইল না, তৎক্ষণাৎ বেশ গুছাইয়া কণ্ঠস্বরকে যতটা সম্ভব কোমল করিয়া উত্তর দিল,—সব সময় ত ওদের এখানে কাম থাকে না, শুধুই প'ড়ে প'ড়ে ঘুমোয়; আর এ দরজাটা খোলা থাকলে সবাই এখানে এসে যোটে, জ্বালাতন করে; সেই জন্যই দুপুরবেলায় ওদের ছুটী দিয়ে দরজা বন্ধ ক'রে রাখি।

তুচ্ছ কথার এই উত্তরই যথেষ্ট এবং এইখানেই প্রশ্নকর্ত্তার তুষ্ট হওয়াই উচিত ছিল, কিন্তু তিনি আজ এই প্রগল্‌ভা বধূটির উপর চিত্তের অসন্তুষ্টির সমস্ত অস্ত্রগুলিই প্রয়োগ করিয়া প্রত্যেক আঘাতেই তাহাকে আহত করিবার সঙ্কল্প লইয়া আসিয়াছেন। বিচারের সূচনা হইতেই যে বিচারকের মনে আসামীকে শাস্তি দিবার অমোঘ ইচ্ছা প্রচ্ছন্ন থাকে, সেখানে আসামীর সকল যুক্তিই ভাসিয়া যায়। সুতরাং প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দিবার পরও বধূকে সবিস্ময়ে শ্বশুরের রূঢ় মন্তব্য শুনিতে হইল,—আমি এর কোনও প্রয়োজন দেখি না; তুমি বোধ হয় ভুলে গিয়েছ বৌমা, গেরস্তর সংসারে তুমি ঘর-বসত করতে আসনি, আর পাড়ার দশ জনের মাঝে এমন একখানা ঘর পাওনি—নিজের আব্রু বাঁচাবার জন্য যেখানে দিন দুপুরেও দরজা বন্ধ না ক'রে উপায় নেই! যেখানে এসেছ, সব বিষয়েই সেখানকার আদব-কায়দা, রীতি-নীতি, বিধি ব্যবস্থা মেনে চলতে হবে, বুঝেছ?

আভিজাত্যের এই খোঁচাটুকুও বধূ নীরবে সহ্য করিল; সে দরিদ্রের কন্যা, ধনাঢ্যের গৃহে বধূ হইয়া আসিয়াছে; কিন্তু এই প্রসঙ্গে দরিদ্রের গৃহস্থাশ্রমের প্রতি কটাক্ষ করিবার কি সার্থকতা, তাহা সে বুঝিতে পারিল না। এ সম্বন্ধে প্রশ্ন করিবার প্রলোভনটুকু অতি কষ্টেই সে দমন করিয়া লইল বটে, কিন্তু একটা উত্তেজনার শিহরণ তাহার সর্ব্বাঙ্গের শিরায় শিরায় রক্তের প্রবাহের সহিত তখন ক্ষিপ্রবেগেই বহিতেছিল।

বক্র কটাক্ষে বধূর নত মুখখানির দিকে চাহিয়া কর্ত্তা পুনরায় মন্তব্য প্রকাশ করিলেন,—তা ছাড়া, নতুন বউ তুমি; মেয়ে-মহলের সবাই আসবেই ত এখানে; এই সূত্রে আলাপ-পরিচয় হবে, ঘনিষ্ঠতা জন্মাবে, তুমিও অনেক কিছু জানতে শিখতে পারবে। কিন্তু তোমার সবতাতেই বিপরীত কাণ্ড! কারুর সঙ্গে মিশতে চাও না, সর্ব্বক্ষণ নিজের মহল্লার দরজা বন্ধ ক'রে ব'সে থাক চটিতে! তোমার মুখের সামনে কেউ এগুতে সাহস পায় না, শেষে আমাকেই আসতে হয়েছে এখানে। আর এসেই ত দেখতে পাচ্ছি, যা শুনেছি, সবই সত্যি।

শ্বশুরের এই তীব্রোক্তিও বধূ মুখখানি নীচু করিয়া নিরুত্তরে শুনিল।

কর্ত্তার উৎসাহ আরও প্রখর হইয়া উঠিল, বধূর দিকে বক্রদৃষ্টিতে চাহিয়া উচ্ছ্বাসের সুরে এবার কহিলেন,—জানো, কত বড় উচ্চ ধারণাই আমি তোমার সম্বন্ধে মনে পোষণ করেছিলুম, বৌমা!

বৌমা অবশ্য কথা কয়টি কাণে শুনিলেন, কিন্তু চোখ তুলিয়া চাহিলেন না; শ্বশুরের মনের ধারণাটুকু জানিতে কোনও আগ্রহই তাহার দেখা গেল না। চক্ষুর দৃষ্টি অপেক্ষাকৃত তীব্র ও কণ্ঠের স্বর তীক্ষ্ণ করিয়া কর্ত্তাই তাহা ব্যক্ত করিলেন,—সেখানে তোমাকে দেখে, তোমার কথা-বার্ত্তা শুনে, তোমার ব্যবহারে যে পরিচয় তোমার বাহিরের দিক দিয়ে পেয়ে আমি মুগ্ধ হয়েছিলুম, এখানে তোমার ভেতরটারও সন্ধান আমরা পাব, আর তাই দেখে এ বাড়ীর সবাই আমার মতই মুগ্ধ হয়ে যাবে, এই ছিল আমার ধারণা। কিন্তু এখানে এসেই তোমার প্রকৃতির এ দিকটা যে ভাবে দেখিয়েছ, তাতে বাড়ীশুদ্ধ সকলেই অবাক্! আর তাতে আমার মুখখানাও একেবারে নীচু হয়ে গিয়েছে।

আয়ত দুইটি চক্ষুর স্থির দৃষ্টি শ্বশুরের মুখের উপর তুলিয়া বধূ ধীরভাবে কহিল,—আপনাকে দেখেই আমি বুঝতে পেরেছি, বাবা, এখানকার অনেক কথাই আপনি আমাকে বলবেন, আর বোধ হয়, আমার কাছ থেকে তার উত্তরও শুনতে চাইবেন। কিন্তু এ ভাবে এখানে আপনার দাঁড়িয়ে থাকা ত ভাল দেখাচ্ছে না, আপনি ঘরে চলুন বাবা, সেখানে ব'সে—

অধৈর্য্যভাবে বধূর কথায় বাধা দিয়া বৃদ্ধ বলিলেন, —না, তার কোনও দরকার নেই, এইখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই আমি—

তা হয় না বাবা, আপনাকে বসতেই হবে!—কথার সঙ্গে সঙ্গে বধূ অপূর্ব্ব ক্ষিপ্রতার সহিত দালানের অপর প্রান্তে রক্ষিত সুবৃহৎ আরাম-কেদারখানি অবলীলাক্রমে দুই হাতে তুলিয়া আনিয়া শ্বশুরের পদপ্রান্তে রাখিয়া দিল; তাহার পর মিনতির সুরে কহিল,—ঘরে না যেতে চান, এইখানেই আপনি বসুন। যখন আমার বিচার করতেই এসেছেন, তখন দাঁড়িয়ে থেকে ও কায ত হ'তে পারে না বাবা, আর তা ভালও দেখায় না।

আসন-গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে মনের বিস্ময়টুকু গোপন করিয়া মুখে গাম্ভীর্য্য আনিয়া কর্ত্তা কহিলেন,—তুমি তা হ'লে নিজেই বুঝতে পেরেছ বউমা, যে, আমি আজ এখানে এসেছি তোমার বিচার করতেই!

মৃদুকণ্ঠে অথচ বেশ সপ্রতিভভাবেই বধূ কহিল,— আপনার আসবার আগেই আমি বুঝতে পেরেছিলুম, আপনার দরবারে ডাক আমার পড়বেই। তবে আপনি যে নিজেই এমন অসময়ে আসবেন, সেটুকু অবশ্য ভাবতে পারিনি, বাবা!

খোদ কর্ত্তার সম্মুখে বিচারের কথা উঠিলেই বিচার-প্রার্থী অতি বড় সাহসীর বুকখানিও ভয়ে কাঁপিয়া উঠে, কিন্তু সেই জবরদস্ত বিচারক বক্রনয়নে লক্ষ্য করিলেন, বধূর মুখে কোনওরূপ আশঙ্কা বা দুশ্চিন্তার একটি রেখাও পড়ে নাই! বিচারকের কণ্ঠের দৃঢ়স্বর ইচ্ছা সত্ত্বেও বিচ্ছিন্ন বিদ্রূপের সুরে নির্গত হইল,—তুমি তা হ'লে আগে থেকেই সব জেনে তৈরী হয়েই আছ বল! যে জেগে ঘুমোয়, তাকে সহজে কেউ জাগাতে পারে না; তেমনি বিচার হবে জেনেও যে দোষ করে, আর তার জন্য আগে থাকতেই আট-ঘাট বেঁধে রাখে, তাকে বড় বড় কৌঁসুলীরাও জেরায় হারাতে পারে না।

কথোপকথনের সময় কথার পিঠে যে ভাবে অন্যে কথা বলে, সেই ভাবেই বধূ বেশ সহজ কণ্ঠেই কহিল,— তাদের যে ঐ পেষা বাবা, কি ক'রে ওদের হারাবে বলুন; ওরা ভাঙ্গবে, তবুও মচকাবে না!—আবার এমন অনেকেরও আজকাল ডাক পড়ে শোনা যায়, কি দোষ তাদের, তাই তারা জানে না; কিন্তু তাতেও বিচার তাদের আটকায় না, শাস্তি হয় নির্ঘাত!

কোন্ সূত্রে নিজের দুর্ব্বলতাটুকুর সুযোগ লইয়া বধূ তাঁহার মুখের উপর এমন বেপরোয়াভাবে প্রত্যুত্তর দিতে সাহস পাইল, মনে মনে ক্ষণকাল সে সম্বন্ধে চিন্তা করিয়াই বিচারক বুঝিলেন, এখানে উপস্থিত হইয়াই কণ্ঠের পর্দ্দা যে ভাবে তিনি চড়াইয়া দিয়াছিলেন, তাহা চরমে উঠিয়া পুনরায় নামিয়া গিয়াছে; বুদ্ধিমতী বধূ এই সুযোগটুকু গ্রহণ করিতে অবহেলা করে নাই।—মুহূর্ত্তে মুখের ভঙ্গী, মনের ভাব ও কণ্ঠের স্বর উগ্র করিয়া কর্ত্তা কহিলেন,—

তোমার বিরুদ্ধে একটার পর একটা ক'রে কতগুলো নালিশ এসেছে, তা তুমি জান ?

বধূ হাসিমুখে উত্তর দিল,—আমি ত বাইরের কোনো খবরই রাখি না, আপনি ত এখানে এসেই তা জেনেছেন, বাবা !

দুই চক্ষু পাকাইয়া কর্ত্তা কহিলেন,—এটাও তোমার বিপক্ষে অন্যতম অভিযোগ !

বধূর মুখের হাসিটুকু মিলাইয়া গেল, শ্বশুরের মুখ হইতে স্নিগ্ধ দৃষ্টি সঙ্গে সঙ্গে নামাইয়া লইল, কিন্তু কথার কোনও উত্তর সে দিল না।

কঠিন স্বরে কর্ত্তা পুনরায় কহিলেন,—আমি তোমাকে বিশ্বাস ক'রে তোমার হাতে সোণার চাবুকটি আমার দিয়েছিলুম—

আনত দুইটি চক্ষুর স্নিগ্ধ দৃষ্টিটুকু সহসা তীক্ষ্ণ করিয়া বধূ শ্বশুরের মুখের উপর নিক্ষেপ করিল, সে দৃষ্টিতে প্রশ্ন যেন প্রকটিত !

কর্ত্তা কহিলেন,—বাইরের দিক দিয়ে তোমাকে যতটুকু চিনেছিলুম, তাতে খুবই ভরসা ছিল আমার, আমি যে গাধাটার কথা বলেছিলুম তোমাকে, তুমি তাকে চিনতে পারবে, হয় ত তাকে টিট করেও নেবে। কিন্তু তুমি আমার ইসারার দিক দিয়েও যাওনি !

নিরুত্তরে বধূর পুনরায় সেই মর্ম্মভেদী দৃষ্টি ! অপ্রসন্ন মুখখানি বিকৃত করিয়া কর্ত্তা কহিলেন,—এখানে এসেই তুমি তোমার দেওর নিবারণকেই সেই গাধা সাব্যস্ত ক'রে বসেছ। শুধু তাই নয়, সকলের সামনেই তুমি এ কথা দম্ভ ক'রে প্রকাশ করেছ। করনি তুমি ? প্রতিবাদ করবার সাহস তোমার আছে ?

বধূর সুন্দর মুখখানি সেই মুহূর্ত্তে আরক্ত হইয়া উঠিল ; কিন্তু শ্বশুরের কথায় কিছুমাত্র অপ্রতিভ না হইয়া সজোরে দৃঢ়কণ্ঠে কহিল,—মুখে যে কথা আমি বলেছি, তা গোপন করবার অভ্যাস আমার কোনও কালেই নেই, বাবা !

তা হ'লে তোমার দেওর নিবারণকে তুমি সকলের সামনে গাধা বলেছ, এ কথা আমার কাছেও স্বীকার করছ ?

হাঁ, বাবা ! আমি এক দিন তাঁকে গাধা বলেছি, আর এক দিন এ কথাও তাঁকে জানিয়েছি যে, তাঁর যে আচরণ, তাতে তাঁকে গাধা ব'লে গাধাকেই ছোট করা হয়েছে। বটে ! কিন্তু শেষের এ কথাটা নিবারণ বলে নি।

বোধ হয়, বলা আবশ্যক মনে করেন নি, কিম্বা ভুলে গিয়েছেন ; কিন্তু আমি বলেছি।

কিন্তু আমি তোমাকে স্পর্দ্ধা দেখাবার এতটা অধিকার এখানে দিইনি, বউমা ! এ পর্য্যন্ত এ বাড়ীর কেউ নিবারণের মুখের দিকে চোখ পাকিয়ে চাইতে সাহস করেনি,—আমার সেরেস্তার সবাই, এমন কি, দেওয়ানজী পর্য্যন্ত নিবারণকে ভয় করে।

আপনিও বোধ হয় জানেন না বাবা, ছেলেবেলা থেকে আমিও কাউকে ভয় করতে শিখিনি।

এ কথা জোর গলায় বলতে পারে কারা জান ? যারা জীবনে কারুর তোয়াক্কা রাখে না—

শুধু তাই নয় বাবা,—যারা জীবনে কোন দিন অন্যায়ের ধার দিয়ে যায় না আর সত্যময় ভগবানের ওপর বিশ্বাস হারায় না !

তুমি এ কথা আজ বলতে পারছ বৌমা, আমার সামনে দাঁড়িয়ে জোর গলায় ? অথচ তুমি নিজে জান, আমি জানি, একটা আধটা নয়, এক ডজনের কাছাকাছি অন্যায় তুমি করেছ।

আমি অন্যায় করেছি ?

নিশ্চয়,—একটু আগে তুমিই স্বীকার করেছ।

আমি যা করেছি, সেটা স্বীকার করাকেই কি আপনি অন্যায় ব'লে সাব্যস্ত করছেন ?

তুমি আমাকে আজ ন্যায়-অন্যায় শিক্ষা দিতে চাও,—এ চমৎকার !

তা হ'লে, এ কথার ওপর আমার আর কোনও কথা নেই, বাবা ! কিন্তু আপনি ভুলে যাচ্ছেন, আপনি এসেছেন বিচারক হয়ে ন্যায় অন্যায় স্থির করতে।

ঠিক কথাই বলেছ তুমি,—বিচার আমি করব, তোমার প্রত্যেক অপরাধের—প্রত্যেক অন্যায় আস্পর্দ্ধার—

তাই করুন, কিন্তু আমার বিরুদ্ধে যে সব অভিযোগ, সে-গুলোর ভিত্তি কোথায়, তাও আপনার দেখা কর্ত্তব্য।

ভাল, তোমার কাছেই নূতন ক'রে আজ কর্ত্তব্য না হয় শিক্ষাই করব।—কিন্তু এই ভাবে কথার জোরে তুমি যে আমাকে ঠকিয়ে জিতে যাবে, তা মনে ক'র না—

কথার জোরে কোন দিন আমি আপনাকে ঠকাইনি, বাবা !

দাঙ্গা

শ্রাবণ, ১৩৫৩

শিল্পী—রামগোপাল বিজয়বর্গীয়

ঠকাও নি? আলবৎ ঠকিয়েছ তুমি; শুধু কথায়, মুখের কথায় আর লোক-দেখানো দৈহিক কায়দায়!

বাবা!

অমন ক'রে ঝঙ্কার দিয়ে উঠলে যে? অস্বীকার করতে চাও আমার কথা?—কাল হয়েছিল, সেই দুরন্ত গোরুর শিং ধ'রে তাকে দাবানো, আমি চমকে উঠে তখনি সোণার চোখে দেখেছিলুম তোমাকে; তার পর, স্কুল-বাড়ী তৈরী ক'রে দেবার প্রার্থনা,—শুনে আমি মুগ্ধ হয়ে গেলুম,—উজোড় ক'রে দিলুম সব! তখন ভুলেও ভাবিনি, গায়ের জোর আর মুখের তোড়ই মেয়েদের সম্বল নয়, তাদের ভেতরটাও দেখবার,—সেইটুকু দেখি নি বলেই আজ এই বিভ্রাট বেধেছে, আমাকে এমন ক'রে ঠকতে হয়েছে!

ঠকতে হয়েছে,—আপনাকে? কে তা হ'লে আপনাকে ঠকিয়েছে, বাবা?

কে আমাকে ঠকিয়েছে?—তুমি, বৌমা, তুমি! এ পর্য্যন্ত বাঙ্গলার হরিনারায়ণ গাঙ্গুলীকে কেউ এমন ক'রে ঠকাতে পারেনি!

আমি আপনাকে ঠকিয়েছি, এই আপনার তা হ'লে দৃঢ়বিশ্বাস, বাবা?

হাঁ, হাঁ;—এই আমার দৃঢ়বিশ্বাস!—তোমার প্রকৃতির একটা দিক দেখিয়ে তুমি আমাকে মাতিয়ে দিয়েছিলে, আর এখানে এসে আর একটা দিক দিয়ে বিষ ছড়িয়ে তুমি আমাকে তাতিয়ে তুলেছ! নতুন বৌ তুমি, তোমার ব্যবহারে লোক হাসছে, কাউকে তুমি গ্রাহ্য কর না, কোনও দিকে তোমার ভ্রূক্ষেপ নেই,—নিবারণকে তুমি অপমান করেছ, মৃণালিনীর গায়ে পর্য্যন্ত হাত তুলেছ, আমার শ্বশুরের নামে পর্য্যন্ত তুমি আঘাত করেছ—এতই তোমার সাহস,—এগুলো অন্যায় নয়? এখনও তুমি বলতে সাহস করবে, তুমি অপরাধিনী নও?

কথাগুলি নিঃশেষ করিয়া কর্ত্তা জ্বলন্ত দৃষ্টিতে বধূর দিকে চাহিয়া রহিলেন। শ্বশুরের প্রতি কথাটি তীরের মত বধূর অঙ্গে বিঁধিলেও, তাহার জ্বালা অসীম সহিষ্ণুতায় সহ্য করিয়া ধীর-স্বরে বধূ কহিল,—তা হ'লে আমার বিরুদ্ধে নালিশ শুধু অন্যের নয়, আপনার মনেও নালিশ উঠেছে, আর সেইটিই আরও গুরুতর। কিন্তু এখন আমি যদি বলি, আমারও একটা নালিশ আছে, আর সেটা অগ্রাহ্য করবার মতও নয়,—আর এক সঙ্গেই দুটো মামলারই নিষ্পত্তি হওয়া উচিত।

তোমারও নালিশ আছে না কি?—কিসের নালিশ শুনি!

আমিও ঠকেছি যে বাবা, আর সেই সূত্রেই আমার এই নালিশ।

তুমি ঠকেছ? কেন তা হ'লে নালিশ করনি আগেই?

তখন প্রয়োজন বুঝিনি। ঠকেছি মনে হলেই ক্ষতিটুকু আদায় করতে সবাই নালিশ করতে ছোটে, কিন্তু আমি সকলের চেয়ে বেশী ঠকলেও নিজেই চেষ্টা ক'রে সে ক্ষতিটুকু পূরণ ক'রে নিতে পারব ভেবেই এত দিন নালিশ করিনি।

তবে এখন নালিশ করতে চাইছ কি অভিপ্রায়ে?

যিনি আমাকে ঠকিয়েছেন, তিনিই আমার নামে আজ নালিশ তুলেছেন, সেই জন্যই আমার নিজের নালিশের কথা তোলা; নতুবা আমি এ পর্য্যন্ত নালিশ কারুর কাছে করিনি।

কি বলছ তুমি বৌমা, হেঁয়ালী তোমার রাখ; আমি শুনতে চাই, কে তোমাকে ঠকিয়েছে, কি সূত্রে কার বিরুদ্ধে নালিশ তোমার?

বিক্ষুব্ধ চিত্তের সমস্ত জ্বালা কণ্ঠের উচ্ছ্বসিত স্বরে যেন ঢালিয়া দিয়াই বধূ এক নিশ্বাসে উত্তর দিল,—আপনার বিরুদ্ধে আপনার কাছেই এই নালিশ আমার; আপনি নিজেই আমাকে ঠকিয়েছেন।

দুই চক্ষু দীপ্ত করিয়া চীৎকার তুলিয়া কর্ত্তা কহিলেন,—কি বললে তুমি বৌমা, আমি—আমি তোমাকে ঠকিয়েছি?

ক্রোধের বিপুল আবেগে কণ্ঠ তাঁহার রুদ্ধ হইয়া গেল, কিন্তু দুই চক্ষুর জ্বলন্ত দৃষ্টির ধারা বধূর দিকে যেন বিচ্ছুরিত হইতে লাগিল।

বধূ কিন্তু কিছুমাত্র কুণ্ঠিত না হইয়া দৃপ্ত কণ্ঠে উত্তর দিল,—হাঁ, আমি প্রমাণ করব আমার কথা,—আপনি ঠকিয়েছেন, শুধু একা আমাকে নয়, তিন জনকে;—আপনার স্বর্গীয়া স্ত্রীকে ঠকিয়েছেন, তাঁর ছেলেকে ঠকিয়েছেন, শেষে আমাকেও ঠকিয়েছেন!—সমস্ত প্রমাণ আমি আপনার চোখের উপর তুলে ধরব,—আপনাকেই বিচার ক'রে রায় দিতে হবে—সত্যই কে ঠকেছে, অন্যায় কোথায়!

। ক্রমশঃ

শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়।

তুর্কিস্তানের মেয়ে

কাস্পিয়ান সাগরের পূর্বপ্রান্ত হইতে মোঙ্গোলিয়ার পশ্চিম-সীমা—তার মধ্যবর্ত্তী প্রদেশের নাম তুর্কিস্তান। এই বিস্তীর্ণ অঞ্চলে দু'জাত লোকের বাস-ভূমি। একটি জাতি—গৃহ-হীন
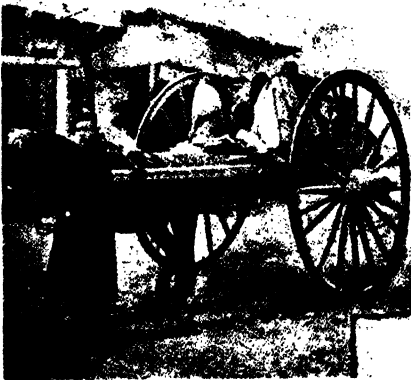
রুশী গাড়ীর সওয়ারী

যাযাবর; অপর-জাতির নাম সার্ত্ত। যাযাবর-জাতি সর্ব্বদা ঘুরিয়া বেড়াইতেছে—তারা বিশ্রাম জানে না; সার্ত্ত জাতি তেমনি অলস। কাজ নাই, কর্ম্ম নাই, বসিয়া আছে! সার্ত্তের বাস প্রধানতঃ তাশখন্দ, সমরখন্দ, কোকন্দ, মার্গেলান, আন্দিজান, নামাঙ্গান, পিয়ান্দ এবং বোখারা সহরে।

এই সার্ত্ত জাতির আদি-পুরুষ ছিল ইন্দো-জার্ম্মাণ। তুর্কিস্তানে তারাই ছিল প্রাচীন যুগে আদিম-অধিবাসী। পরে নানা জাতির সংস্রব ও মিলনের ফলে বর্ত্তমান সার্ত্ত-জাতির সৃষ্টি হইয়াছে।

কোকন্দের ধনী পরিবার

ইন্দো-জার্ম্মাণ জাতির বাস ছিল তুর্কিস্তানে প্রায় দু'হাজার বৎসর পূর্ব্বে। পারস্য হইতে রূপসী বাঁদীর আমদানি হইত তুর্কিস্তানে; এবং মোঙ্গল ও চীনা-তুর্কিস্তানে নারীর দেহে আজো যে রূপের প্রভা ঝলসিত দেখা যায়, তা শুধু সেই রূপসী বাঁদীদের দৌলতে। চীনা

ও উজ্‌বেগ-রক্তের মহিমায় সার্ত্ত-নারীর গালের হাড় আজো ঝিঁক তুলিয়া আছে, নাসা বর্ত্তুলাকার, নয়ন ঈষৎ ট্যারচা-গড়নের; কিন্তু পারস্য বাঁদীর রূপের লাবণ্য বহু শত বর্ষ পরেও ইহাদের দেহে বর্ণের ঝর্ণায় টল-টল করিতেছে।

উজবেগ-পূর্ব্বপুরুষের ভাষা ছিল তুর্কি; সার্ত্ত-জাতির ভাষাও তুর্কি। খিভা এবং বোখারার আমীরদের জন্ম এই উজবেগ-বংশে। বোখারার বহু অধিবাসী পারস্য-বংশ-সম্ভূত। নিজেদের ইহারা তাজ্জিক-জাতি বলিয়া অভিহিত করে।

সার্ত্ত-জাতি ধর্ম্মে মুসলমান; এবং তারা গোঁড়া মুসলমান। মেয়েদের পর্দ্দা-বিধি সম্বন্ধে এ-জাতি খুব বেশী-রকম হুঁশিয়ার।

পথে-ঘাটে বনিয়াদী সার্ত্ত-ঘরের মেয়েদের মুখ কেহ দেখিতে পাইবে না। পথে বাহির হইবার সময় তারা সর্ব্বাঙ্গ বস্ত্রাবরণে আবৃত রাখে। তবে স্ত্রী-পুরুষ উভয়েই এত বিচিত্র-রঙের পোষাক পরে যে মনে হয়, পথে যেন প্রজাপতির মেলা বসিয়াছে!

সার্ত্ত-গৃহের অন্দর-মহল যেন জেলখানা! বাহিরের দিকে জানালার চিহ্ন নাই। সদর হইতে অন্দরের প্রবেশ-মুখে থাকে ছোট দ্বার। বাড়ীগুলি সবই প্রায় একতলা! ভূমিকম্প নিত্য লাগিয়া আছে; তাই দোতলা, তিন-তলা বাড়ী গড়িবার কল্পনা সার্ত্ত-জাতির মনে কখনো জাগে না।

অন্দরে একখানি করিয়া থাকে বসিবার ঘর। এ ঘর গৃহস্থের আর্থিক অবস্থানুযায়ী সজ্জিত হয়। এই ঘরেই মেয়েদের গহনার সিন্দুক সংরক্ষিত থাকে; এক ধারে বালিশ-বিছানা জড়ো করা থাকে। রাত্রে এই বালিশ বিছানা লইয়া বিছানা পাতা হয়।

প্রতি গৃহের অন্দরে ছোট-বড় আঙিনা আছে। আঙিনার বুক ফুঁড়িয়া ঘোলা-জলের স্রোত বহিয়া চলিয়াছে। সেই জলে চলে স্নান: রন্ধনাদি-কাজেও এই জল ব্যবহৃত হয়। এই নোঙরা জলের জন্য ব্যাধিও তাই ঘরে-ঘরে নিত্য লাগিয়া আছে।

সার্ত্ত-সমাজে বয়স্কা নারীরা পাৎলা মশলিন কাপড় দিয়া মাথার দীর্ঘ কেশ জড়াইয়া কেশের প্রান্তভাগ কাঁধে ঝুলাইয়া রাখে—শালের মত ভঙ্গিমায়। কুমারী-মেয়েরা মাথায় কোন আবরণ দেয় না; মাথার মাঝখানে চেরা সিঁথি কাটিয়া দু'দিকে বিনুনী বাঁধিয়া পিঠে ঝুলাইয়া দেয়। কালো রেশমী ফিতা দিয়া তারা চুল বাঁধে। চুলের রং মিস্ কালো। কাজেই কালোয় কালো বেশ ভালো রকম মিশ খায়। কুমারীরা চুলের ডগায় রঙীন কাচের ও তবলকীর মালা বাঁধে। কেহ কেহ দু'চারি গাছি কেশে এক-একটি করিয়া

সার্ত্ত-গৃহস্থ—বাড়ীর উঠানে

বিনুনি রচনা করে: কাহারো কাহারো পিঠে অমন পঞ্চাশ গাছি বিনুনি দুলিতে দেখা যায়।

সার্ত্ত-মেয়েদের কেশ হয় বেশ স্থূল, ঘন এবং প্রচুর। তারা কখনো চুল কাটে না। সপ্তাহে একদিন মাত্র মাথায় ব্রাশ চালায়। তবে প্রত্যহ প্রাতে কেশ-প্রসাধন সারিয়া লয় কেশরাশির মধ্য দিয়া অঙ্গুলি চালনা করিয়া। প্রতি বৃহস্পতিবারে মাথা ধুইবার বিধি! টক দই বা ঘোল মাথায় ঢালিয়া মাথা ধোয় এবং চুল ভিজা থাকিতে থাকিতে আঁচড়াইয়া লয়। ধনীর ঘরে টক-দই দিয়া মাথা ধুইবার পর গরম জলে মাথার সে দইটুকু ধুইয়া ফেলিবার ব্যবস্থা আছে। গরীবের ঘরে গরম-জলের ব্যবস্থা নাই।

সার্ত মেয়েদের দাঁত বড় পরিষ্কার। দাঁতগুলি সমান আকারের: এবং দুগ্ধশুভ্র। অর্থাৎ আমরা যাহাকে কুন্দ-দন্ত বলি, সে দন্তের অধিকারিণী একমাত্র এই সার্ত্ত-জাতের মেয়েরা। তারা মাংস খায় কচিৎ—এবং যখনই কিছু আহার করে, তার অব্যবহিত পরক্ষণে আঙুল দিয়া দাঁত রগড়াইয়া মাজিয়া ধুইয়া আচমন করে। এটি তাদের নিত্যকার অভ্যাস। তবে দাঁত বড় বেশী দিন থাকে না। পঁচিশ-ত্রিশ বৎসর বয়সেই দাঁত পড়ে। তখন লোকে পাছে সে দাঁতের গহ্বর দেখে,

সমরখন্দের আমীর-পরিবার

এজন্য দাঁতে ও মাড়িতে তারা কালো রং মাখায়। এক রকম লতার রসে ভ্রূটিকে মেয়েরা কালো করিয়া আঁকে; কালির রেখায় দুটি ভ্রূকে সংযুক্ত করিয়া দেয়। নখ ও হাতের তালু—মেহদি পাতায় বা হেনার রঙে সুরঞ্জিত করে। শুধু বিবাহের সময় দুই গালে রাঙা রঙ মাখে; নহিলে গালে রঙ দেওয়ার রেওয়াজ নাই। অন্য সময় গালে রঙ দিলে সমাজে নিন্দা হয়।

সার্ত্ত-রমণীরা পায়জামা পরেন; গায়ে দেন রঙীন ঢিলা জ্যাকেট; পায়ে আঁটেন দীর্ঘ বুট-জুতা। মোজার রেওয়াজ এ দেশে নাই। জুতার শুকতলা খুব নরম চামড়ায় তৈয়ারী হয় এবং জুতার হীল থাকে না। পথে বাহির হইবার সময় জুতার উপরে 'গোলোশ' পরেন। এ দেশের মেয়েরা ঘোড়ায় চড়েন। ঘোড়ায় চড়িবার জন্য আলাদা জুতা আছে।

বোখারায় বনিয়াদী ঘরের মেয়েরা কপালের উপর রঙীন শিল্কের 'ব্যাণ্ড' কিম্বা সিল্কের রুমাল বাঁধেন; তার নীচে থাকে মাথার খুলি-ঢাকা 'ক্যাপ'।

কোকন্দের সার্ত্ত-পরিবার

অলঙ্কারের মধ্যে গলায় পরেন কোরালের মালা, কাণে রূপার ইয়ারিং; হাতে নীলার আংটি ও অজস্র মাদুলি। ইয়ারিং বেশ ভারী। মাথার পিনের সঙ্গে হুক দিয়া (আমাদের দেশের নথের মত) ইয়ারিং আঁটা থাকে। নাকছাবির রেওয়াজ আছে। তবে নাক বা কাণ সছিদ্র করার বিধি নাই। ইয়ারিং কাণে দোলে—মাথার পিনের সঙ্গে সে ইয়ারিং আঁটা থাকে।

সার্ত্ত-বিবাহে কোনোরূপ ধর্ম্মানুষ্ঠান নাই। শুধু এক

চুক্তিনামা লেখাপড়া হয়। কন্যাকে মূল্য দিয়া কিনিতে হয়। এই মূল্য সংগ্রহ করিতে বহু পুরুষ ফতুর হইয়া যায়। এ জন্য বিধি আছে, বিবাহের কথা পাকা হইলে বর যদি মূল্য সংগ্রহ করিতে না পারে, তাহা হইলে কন্যার পিতা-মাতা বা আত্মীয়-স্বজনের অলক্ষ্যে সে আসিয়া কন্যার সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ, আলাপ-পরিচয় এবং প্রেম-চর্চ্চা করিতে পারে। তবে সাবধান, কন্যার আত্মীয়দের সামনে পড়িয়ো

পল্লী নারী

না! যতদিন না পুত্র-কন্যার জন্ম হয়, ততদিন শ্বশুরের সঙ্গে জামাতা দেখা করিবে না। দেখা করা নিষেধ। ইহাই দেশাচার।

ইশলাম-বিধি-বশে পুরুষের একসঙ্গে চারটি মাত্র পত্নী-গ্রহণে অধিকার থাকিলেও তুর্কিস্তানের মোল্লারা পঞ্চ-পত্নী গ্রহণ করিতে পারেন; তাহাতে কোনো নিষেধ বা বাধা নাই। প্রথমা পত্নী হয় গৃহিণী; তার কাজ ঘর-সংসার দেখা। অপর পত্নীরা প্রথমার আজ্ঞানুবর্ত্তিনী থাকে। ইহাই বিধি। প্রথমা পত্নীর মৃত্যু ঘটিলে অপর পত্নীদের মধ্যে স্বামীর যিনি সমধিক প্রিয়া, প্রথমার আসন বা গদি পান তিনি।

যদি কোন পুরুষের সম্পত্তি নানা দেশে বিক্ষিপ্ত থাকে; তাহা হইলে প্রতি দেশে (অর্থাৎ যে-সব দেশে সম্পত্তি আছে) সে ব্যক্তি একটি করিয়া বিবাহ করিতে পারে। এবং সে সব দেশে দেশওয়ালী স্ত্রী সেই সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণ করে। বৎসরে দু'চারিবার সেখানে গিয়া স্বামীকে দাম্পত্য-ধর্ম্ম পালন করিয়া আসিতে হয়।

স্বামীর ধন-সম্পদ—সার্ত্ত স্ত্রীর চিত্তে অনেক সময় রীতিমত বিভীষিকার সঞ্চার করে। সম্পদ বাড়িলে স্বামীর দল বহু-বিবাহে প্রবৃত্ত হয়। এ জন্য বিদ্বেষ-বশে বহু নারী বিষ খাওয়াইয়া স্বামীকে হত্যা করিয়াছে, এমন ঘটনার অসদ্ভাব নাই।

সার্ত্ত রমণীরা অত্যন্ত লজ্জাশীলা। বাহিরের কোনো বন্ধু বা আত্মীয় যদি বৌ দেখিতে আসে তো বৌ কখনো মুখ তুলিয়া তার পানে চাহিবে না! চাহিলে লজ্জাহীনা বলিয়া বৌয়ের নিন্দা হইবে!

বিবাহের রাতে কন্যাকে রেশমী বসনে ও নানা ভূষণে সাজাইয়া দীপহীন অন্ধকার কক্ষে বসাইয়া রাখা হয়। তার পর অঙ্গনে বিবাহের উৎসব চলে। নাচ-গানের আসর বসে। বধূকে তখন অঙ্গনে আনিয়া মাদুরে বসানো হয়। নর্ত্তকী বা গায়িকাদের 'পালা' দিতে হয় নববধূকে।

তুর্কিস্তানে সাধারণ স্নানাগার আছে—সে যেন নরক! অন্ধকার কুঠরী—ছাদের দিকে ছোট একটা ঘুলঘুলি আছে—সেখান দিয়া যেটুকু আলো আসে! এ কুঠরীতে প্রবেশ করিবামাত্র চোখে কিছু দেখিবার উপায় থাকে না। কুঠরীটি বড়। এই কুঠরীতে আছে প্রকাণ্ড 'হৌজ' বা চৌবাচ্ছা; জলে পরিপূর্ণ। সিঁড়ি দিয়া চৌবাচ্ছায় নামিতে হয়। উলঙ্গ নর-নারী ও বালক-বালিকারা ভিড় করিয়া স্নানাগারে স্নান করিতে আসে। গরম জল। চৌবাচ্ছার নীচে মার্ব্বেল পাথর—তার নীচে অগ্নি জ্বালিবার ব্যবস্থা আছে। কোনো কোনো স্নানাগারে স্নান করাইয়া দিবার জন্য পরিচারিকা আছে—বয়সে তারা প্রৌঢ়া! তোয়ালে পরিয়া কোনো মতে লজ্জা রক্ষা করিয়া স্নানার্থীদের মাথায় ও গায়ে তারা গরম জল ঢালিয়া দেয়। স্নানের পর যে সব নারী অঙ্গ-সজ্জা করিতে চায়, তাদের সজ্জা করাইবার জন্য দ্বিতীয় কুঠরীতে অপর পরিচারিকা থাকে।

তার কাছে থাকে নানা পাবে লাল, সাদা ও কালো রঙের পাউডার; সেই পাউডার মুখে-গায়ে মাখাইয়া তারা প্রসাধন-কার্য্য সম্পন্ন করে। সাধারণ স্নানাগারে স্নান করিতে হইলে বসন ফেলিয়া নগ্ন দেহে আসিতে হয়। স্নানাগারের দ্বারে পয়সা দিলে পরিচারিকা মেলে—কাপড়-চোপড় চৌকি দিবার জন্য। এখানে সাঁতার কাটে, জলে মাতন তোলে—কোনো কিছুতে নিষেধ নাই! নিষেধ শুধু সবস্ত্র-স্নানে।

সংসারে যে-রমণী সকলের চেয়ে বয়সে বড়, রান্না-বান্না তাকেই করিতে হয়। প্রধান খাদ্য পোলাও। রান্নার জন্য স্বতন্ত্র পাকশালা নাই। উঠানে থাকে প্রকাণ্ড "তোলা উনুন"—মাটী-লেপা; তার উপরে তৈজস-প্যান বা কড়া চাপানো আছে। সেই কড়ায় ভেড়ার চর্ব্বি আছে গলানো—বিশুদ্ধ (purified) চর্ব্বি। কুচি কুচি করিয়া মাংস কাটিয়া এই কড়ায় ফেলিয়া দেয়—সঙ্গে সঙ্গে দেয় গাজরের কুচি। বাজারে গাজরের কুচি বা ফালি কিনিতে পাওয়া যায়—আমাদের দেশে কুমড়ার ফালির মত।—কড়ার নীচে চলে আগুনের জ্বাল। চর্ব্বি ফুটিলে তাহাতে চাউল দেওয়া হয়—এবং কড়ার উপরে আবরণ টানিয়া দেয়। চাউল বাষ্পে সিদ্ধ হইতে থাকে। মাঝে মাঝে কাঠি দিয়া নাড়িতে হয়। ভাত ফুটিলে তাহাতে কিসমিস, ফোড়ন প্রভৃতি মশলা ছাড়িয়া দেয়—সুগন্ধি করিবার জন্য।

পথে সার্ত-রমণী

রান্না হইলে বাড়ীর পুরুষের দল আগে খায়; তাদের আহারের সময় মেয়েরা সামনে বসিয়া খাতির-তদারক করে; পুরুষদের আহার চুকিলে তবে মেয়েরা খাইতে বসে।

সার্ত্ত-নারীর উপর মা-ষষ্ঠীর কৃপা খুব বেশী রকমের। ষোলটি সন্তানের মাতা হওয়া তুর্কিস্থানে বিচিত্র ব্যাপার নয়; তবে যতগুলি জন্মায়, ততগুলি বাঁচে না—অযত্নে-অনাদরে গৃহস্থ-ঘরে শতকরা পঞ্চাশটি শিশু মারা যায়; পঞ্চাশটি থাকে। মেয়েদের বিবাহ হয় দশ-এগারো বৎসর বয়সে—ত্রয়োদশ বৎসর বয়সে তারা হয় গর্ভধারিণী; কাজেই নিজেদের যত্ন করিতে হয় কিরূপে, তাহা শিখিবার পূর্ব্বেই কোলে শিশু আসিয়া দেখা দেয়! সে-শিশুর যত্ন কি করিয়া তারা করিবে? কাজেই নিরীহ জীবগুলি মাতৃক্রোড়ে আসিয়া বিদায় লয়। শিশুদের মৃত্যু-হার তুর্কিস্থানে অত্যন্ত অধিক।

তুর্কিস্থানে বেসাতির প্রধান বস্তু রেশম। রেশমী কাপড় বুনিবার জন্য ঘরে ঘরে তাঁত আছে। গুটি পোকার ডিম মেয়েরা নিজেদের ওড়না-চাপা দিয়া সেই তাপে ফুটাইয়া তোলে। মুর্গীর সাহায্যেও ডিম ফুটানো হয়।

ছোট বয়সে ছেলেদের লেখাপড়া সুরু হয় শিক্ষয়িত্রীর কাছে। গরীবের ঘরের মেয়েরা শিক্ষয়িত্রীর কাজ করে।

তুর্কিস্থানের যাযাবার জাতির মধ্যে কির্গিজ জাতি প্রধান। শীতকালে ছাউনি ফেলিয়া সেই ছাউনিতে তারা বাস করে। শীত ছাড়া অপর ঋতুতে বনে-পর্ব্বতে ঘুরিয়া দিনাতিপাত করে। ইহারাও ধর্ম্মে মুসলমান—তবে গোঁড়ামি নাই।

কির্গিজ-জাতের মেয়ে

বিধি এ-সমাজে প্রচলিত নাই। সংসারের যা-কিছু কঠিন কাজ, মেয়েরা করে। ছাউনি ফেলিতে, কুলি-মজুরের কাজ করিতে মেয়েরা পটু। মাঠে-ঘাটে যা কিছু কাজ—পশু-পালন, কাঠ কাটা, জ্বালানি-সংগ্রহ, সে সমস্ত কাজ করে মেয়েরা, তাই মেয়েদের দেহ বেশ জোয়ান। পোষাক-সম্বন্ধে মেয়ে-পুরুষে প্রভেদ খুব অল্প, এজন্য বাজারের ভিড়ের মধ্যে কে পুরুষ, কে মেয়ে—চট করিয়া চেনা যায় না।

বোখারা ও কাশপীয়ান সাগরের মধ্যে যে বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড—তার নাম ট্রান্স-কাস্পিয়া। এ-অঞ্চলে তেজে তুর্কোমান-জাতির বাস। এ জাতির নর-নারী মাঠে-ঘাটে ছাউনি ফেলিয়া তাহাতে বাস করে। ধনীর ছাউনি থাকে অনেক-গুলা—স্বতন্ত্র কামরা সমেত। পরিবারের বিভিন্ন নর-নারী এক একটি ছাউনি অধিকার করে; গরীবদের থাকে একটি-মাত্র ছাউনি, তাহাতে সকলে বাস করে; পর্দ্দা টাঙাইয়া ছাউনির মধ্যে স্বতন্ত্র কামরা রচিত হয়। তুর্কোমান-জাতির মেয়েরা কার্পেট-গালিচা তৈয়ার করে। এ-সব কার্পেট বাজারে বেশ চড়া দামে বিক্রয় হয়।

তুর্কোমান-পরিবার

কির্গিজ-জাতের মেয়েরা পর্দ্দা মানে না। মুখে ঘোমটা দিয়া মুখখানিকে লোকলোচনের অন্তরালে গোপন রাখিবার

তুর্কোমান-মেয়েদের স্বাধীনতা অপরিসীম—ঘোমটা বা পর্দ্দার তারা ধার ধারে না। ছোট বয়স হইতে মেয়ে-পুরুষে অবাধ মেলামেশা চলে। তাদের মধ্যে রূপসীর অভাব। তবে রূপসী নাই, এমন নয়; রূপসীরা পারস্য-বাসীদের বংশ-সম্ভূতা।

তুর্কোমান-মেয়েরা রূপার ভারী ভারী অলঙ্কারে অঙ্গশোভা বর্দ্ধন করে। বুকে আঁটে রূপার প্লেট—মাথার

টুপিতে অসংখ্য রূপার বোতাম সেলাই করিয়া আঁটিয়া রাখে। পায়ে জুতা পরে না। বরফে পথ-ঘাট আচ্ছন্ন থাকিলেও শুধু-পায়ে সে পথে অনায়াসে চলিতে পারে!

রূপার গহনাগুলির ওজন অসামান্য, হাতে পরে তাগা-বালা; গলায় রূপার চিক (না, কলার?) পরে,—তার ওজন আট-দশ সের!

এ যুগের মেয়ে-স্কুল

সম্পত্তি,—সব বেচিয়া স্ত্রীর জন্য সে রূপার গহনা তৈয়ার করায়! অর্থাৎ স্ত্রীর দেহখানি যেন পুরুষের ব্যাঙ্ক—তার যথাসর্ব্বস্ব থাকে স্ত্রীর অঙ্গে!

এক জন পাশ্চাত্য লেখিকা তুর্কোমান-বিবাহের যে বর্ণনা লিখিয়াছেন, তাহার মর্ম্ম সঙ্কলিত করিয়া দিলাম,—

ছাউনিতে-ছাউনিতে উৎসবের ধূম পড়িয়া গেল। আমি

খবরের কাগজ পড়া

বসিলাম আসনে। ভারে-ভারে সকলে গরম পোলাওয়ের পাত্র বহিয়া আনিতেছে। বহু নিমন্ত্রিত সমাগত।…বধূ এবং তার তরুণী বান্ধবীরা বসিয়াছে আলাদা একটি ছাউনিতে।…ছাউনির সামনে ছ'খানি গাড়ী। গাড়ীগুলি রাশিয়া হইতে আমদানি। পূর্ব্বে উষ্ট্র ছিল এ-অঞ্চলে একমাত্র বাহন; এখন রাশিয়া হইতে গাড়ী আসিয়াছে।…

আহারাদি চুকিলে বধূ তার বান্ধবীদের সঙ্গে গিয়া গাড়ীতে চড়িয়া বসিল। হাস্যে-ভাস্যে যেন আনন্দের প্রতিমা! বধূ-গৃহের নর-নারীরা অন্য গাড়ীতে বসিল। বধূর গাড়ীর সঙ্গে এ সব গাড়ী চলিল মিছিল করিয়া। পথে এক জায়গায় গিয়া গাড়ী থামিল। সেখানে বর ও বর-পক্ষীয় বহু লোক আগে হইতে আসিয়া জমায়েত থাকে। বরপক্ষ যদি কন্যার মূল্য পুরাপুরি চুকাইয়া দেয়, তাহা হইলে কন্যা গিয়া বরের সঙ্গে দেখা করে এবং বর তার হাত ধরিয়া নিজের ছাউনিতে লইয়া যায়। পুরা-মূল্য সে সময় দিতে না পারিলে একটি রৌপ্যমুদ্রা দিতে হয় কন্যার মাতার হাতে। মাতা তখন অনুমতি দেয়,—যাও কন্যা তোমার স্বামীর সঙ্গে। বায়নার টাকা পাইয়াছি—বাকী মূল্য বর অচিরে দিবে, চুক্তি হইয়াছে। মাতার অনুমতি মিলিলে কন্যা গিয়া বরের পাশে দাঁড়ায় এবং কন্যাকে লইয়া বর চলিয়া যায় নিজের ছাউনিতে। এমনি ভাবে বিবাহ-ক্রিয়া সুসম্পন্ন হয়।

সোভিয়েট রাশিয়ার কল্যাণে তুর্কিস্তানে এখন শিক্ষা-সভ্যতার প্রবর্ত্তন হইয়াছে। পুরানো পাঠশালার জায়গায় স্কুল বসিয়াছে। মেয়ে-পুরুষ সকলকেই লেখাপড়া শিখিতে হয়। সংবাদ-পত্রের আদর হইয়াছে। দুনিয়ার খবর পাইবার জন্য সর্ব্বশ্রেণীর নর-নারীর আজ আগ্রহের সীমা নাই। কাজ-কর্ম্ম চুকিলে সন্ধ্যার সময় সরাইয়ে বা আখড়ায় বসিয়া পুরুষের দল খবরের কাগজ পড়ে, চারিদিকে ছেলেমেয়ে ও তরুণ-তরুণীরা ভিড় করিয়া বসিয়া রাজ্যের খবর শোনে।

দেশের লোক এখন স্বাস্থ্য-তত্ত্ব শিখিতেছে; রাজনীতির সংবাদ রাখিতেছে। দশ বৎসরের মধ্যে তুর্কিস্তানে বহু উন্নতি সাধিত হইয়াছে। তবে এ উন্নতি শুধু রাশিয়া-সন্নিহিত অঞ্চলে; দূরাঞ্চলে এখনো—'চরণতলে বিশাল মরু দিগন্তে বিলীন'—যাযাবর জাতি সেই বনে-পর্ব্বতে ঘুরিয়া বেড়ায়; ভূমি মাপিয়া সেখানে আস্তানা পাতিয়া বাস—সে-রীতি আজো তাদের অবিদিত রহিয়াছে।

রাজেন্দ্র-তর্পণ

আশুতোষ কলেজ ইমারতে স্যার রাজেন্দ্রনাথের স্মৃতিসভায় গীত

দীর্ঘ কর্ম্ম-জীবনের শেষে বিরাম লভিলে কর্ম্মবীর,
দীর্ঘ পথের ক্লান্তি ঘুচাক মন্দাকিনীর শীত সমীর।
হে দিগ্‌বিজয়ী, জীবনের রণে
পরম কাম্য লভিলে ভুবনে,
উৎসবে আজ নন্দিত হোক ইন্দ্রলোকের তব শিবির।

পতিত অধম জাতির মাঝারে পুরুষ-সিংহ জাগিলে তুমি
চির-কলঙ্ক ঘুচালে দেশের ধন্য করিলে জন্ম-ভূমি।
তুমি চলে গেলে তব আদর্শ
শীর্ষে বহিবে ভারতবর্ষ,
স্মৃতির তীর্থে চির-উন্নত র'বে চিরদিন তোমার শির।

তোমার সাধনা নবীন প্রেরণা দিয়াছে কর্ম্ম-বিমুখ দেশে
তুমি চ'লে গেছ শক্তি সাহস কে দেবে মোদেরে মধুর হেসে?
তব করুণার ছায়ায় যাহারা
পালিত লালিত আজিকে তাহারা
হয়ে হায় ধ্রুব আশ্রয়-হারা ফেলে অবিরল অশ্রু-নীর।

শ্রীকালিদাস রায়।

উপন্যাস।

১০

সাত দিন কলিকাতায় থাকিয়া, বাড়ী ভাড়া করিয়া, তাহা সাজাইয়া—বেণীকে তথায় কায়েমমোকাম করিয়া সরলকুমার আগ্রায় ফিরিয়া আসিল। সে সাত দিন সে কলিকাতায় ছিল, প্রতিদিনই মণিকাকে পত্র লিখিত, আর সেই পত্রের সঙ্গে অন্ততঃ একটি করিয়া স্বরচিত কবিতা পাঠাইয়া দিত। প্রথম দিনের কবিতা—

প্রেমালোক

বিষাদে-বিরাগে খুঁজেছি প্রণয়,
খুঁজেছি প্রণয় নয়ন-জলে;
খুঁজেছি তরস-মথিত-হৃদয়
কোথা প্রণয়ের আলোক জ্বলে।

প্রভাত সমীরে, সাঁঝের গগনে,
তারার হাসিতে, রবির করে,
হৃদয়ে, বাহিরে—নিখিল ভুবনে
পাই নাই তা'রে ক্ষণেক তরে।

খুঁজে খুঁজে সারা—শ্রান্ত যখন,
হেরিনু সহসা মাধবী রাতে,
উজল করিয়া বিশ্ব-ভবন
সে আলো তোমারি নয়নে ভাতে।

দ্বিতীয় দিনের পত্রের সহিত প্রেরিত কবিতা—

উপমা

তুমি স্নিগ্ধ যেমন শব্দবিহীন স্তব্ধ বরিষা-রাতি;
তুমি উজ্জ্বল যেমন কুসুমবহুল পুষ্পসময়ভাতি;
তুমি কোমল যেমন শারদ আকাশে জ্যোৎস্নামধুর নিশি;
তুমি মধুর যেমন অরুণ উদয়ে পুলক-আকুল দিশি;
তুমি সুখদ যেমন বেদনাতপ্তে অশ্রু—বেদনহারী;
তুমি উদার যেমন গগন-বিলীন সুনীল সাগরবারি;
তুমি অসীম যেমন নিঃস্ব-হৃদয়ে ব্যাকুল বাসনারাশি;
তুমি পূত যেমন শিশুর অধরে সরল মধুর হাসি;
তুমি হাস্যে যেমন নববিকশিত কুসুম লোচনলোভা;
তুমি ক্রন্দনে যেন শিশিরসিক্ত বিকশিতফুলশোভা;
তুমি প্রণয়ে যেমন সুনীল আকাশে রজতজ্যোৎস্নাধারা।
তুমি বিরাগে যেমন প্রভাত-গগনে মলিনদীপ্তি তারা;
তুমি হৃদয়-সরসে ফুটিয়া উঠেছ প্রভাত-নলিনী সম;
আমার হৃদয় মম!

শেষ দিনের কবিতাটি সে অনেক দ্বিধার পর পাঠাইয়াছিল। আসিবার দিন অশোক-তরুতলে সে যে প্রলোভন সংবরণ করিয়া আসিয়াছিল, এ কি তাহারই স্মৃতি হইতে উদ্ভূত?—

তিন রূপ

প্রেমসুখস্বপ্নরঞ্জিত মিলন শয়ন
দীর্ঘ জাগরণশেষে নিদ্রা আঁখি ছায়;—
লাজ সঙ্কুচিত তৃষা অধরে চুম্বন—
ফুলবনে মৃদুমন্দ মলয়ের প্রায়।
সে চুম্বনে হৃদয়ের প্রেমরক্তোৎপল
শিহরি' বিকশি' উঠে মেলি' শত দল।

দীর্ঘ অভিমান অন্তে তৃষিত অধরে
তীব্র প্রেমতৃষাকুল সরস চুম্বন;—
নিদাঘের তীব্র তাপে তপ্ত ধরা প'রে
গাঢ়-কৃষ্ণ মেঘমুক্ত সুস্নিগ্ধ বর্ষণ।
সে চুম্বনে কি আকুল প্রণয়ের তৃষা,
কি চাঞ্চল্য, কি আনন্দ, কি অতৃপ্ত আশা!

অপগতচপলতা বহে যে সময়
গভীর গম্ভীর প্রেম মধু কলস্বনে,—
স্নিগ্ধ স্নেহরসসিক্ত কোমল হৃদয়
আপন সর্ব্বস্ব দেয় প্রেমের চুম্বনে।
সে চুম্বনে কি নির্ভর! মরণের পার
সে প্রেম বিতরে দিব্য জ্যোতিঃ আপনার।

কবিতা লিখিয়া সে না পাঠাইয়া থাকিতে পারিত না; আবার পাঠাইয়া স্বস্তি বোধ করিতে পারিত না—মণিকা কি মনে করিতেছে, কবিতাগুলি তাহার ভাল লাগিতেছে কি না—এইরূপ নানা চিন্তা তাহার মনে সমুদিত হইত।

সে তাহার পত্রের উত্তরে মণিকার একখানি পত্রও পায় নাই।

মণিকা কবিতাগুলি বার বার পাঠ করিত—পত্র একাধিক বার পাঠ করিত; মনে করিত, উত্তর না দিলে অশিষ্টতা হইবে না ত? সরলকুমার কি মনে করিবে? কিন্তু তবুও সে পত্র লিখিতে পারিত না। প্রথম চিন্তা হইত, কিরূপ সম্বোধন করিবে? দ্বিতীয় সমস্যা—সরলকুমারের পত্রের উচ্ছ্বাসের নিকট তাহার পত্র একান্ত সঙ্কুচিত বোধ হইবে—ইত্যাদি। সরলকুমারও, বোধ হয়, পত্রের উত্তর পাইবার আশা করে নাই—সেই জন্যই তাহার মনে অভিমান দেখা দেয় নাই।

আগ্রায় ফিরিয়া গাড়ীতেই জিনিষ রাখিয়া আপনার বাঙ্গলো হইতে স্নান ও বেশ-পরিবর্ত্তন করিয়া সরলকুমার "ছোট সাহেবের" গৃহে গেল। গৃহবেষ্টনোদ্যানপথে গাড়ীর শব্দ পাইয়া মণিকা তাহার ঘরের জানালার পর্দ্দা সরাইয়া মুখ বাড়াইতেই উভয়ের দৃষ্টি মিলিত হইল—দুই জনেরই মুখ হাসিতে দীপ্ত হইয়া উঠিল।

তাহার আনীত জিনিষ দেখিবার জন্য "ছোট সাহেব" যখন মণিকাকে ডাকিলেন, তখন মণিকা পিতার নিকটে আসিল। কাপড়ের পর কাপড় প্রভৃতি দেখিয়া "ছোট সাহেব" সরলকুমারকে বলিলেন, "এ যে দোকান সাজিয়েছ!"

একখানি গাঢ় লোহিত বর্ণের বেনারসী শাড়ী ও তাহারই জামা দেখাইয়া সরলকুমার বলিল, "এই বেণীর উপহার।"

"ছোট সাহেব" বলিলেন, "এ যে অনেক দামের!"

সরলকুমার বলিল, "বেণী কখন মাহিনা লয় না—এ বার পসন্দ ক'রে এই কাপড় কিনলে।"

তাহার পর সরলকুমার তাহার জননীর অলঙ্কারের বাক্সটি খুলিয়া টেবলের উপর রাখিল।

"ছোট সাহেব" বলিলেন, "আমি ভাবছিলাম—আমি কি কি দেব; কেমন ক'রে তৈয়ারী করাব। তা' এ যা' দেখছি, তা'তে তা'র আর কোন দরকারই নাই। তুমি জান না, মণিকার মা বড় হিসাবী গৃহিণী ছিলেন—কাযেই আমার কোন বই যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য হ'ত, তা'র আয় সবটাই জমত। আমার তিনখানা বই পাঠ্য নির্দ্দিষ্ট হয়েছিল—একখানার টাকা মণিকার মা'র জন্য, আর দু'খানার টাকা এদের ভাইবোনের জন্য জমা রেখেছিলাম। মণিকার মা'র জন্য যে টাকা জমা ছিল, তা' আমি বিশ্ববিদ্যালয়ে দিয়েছি; বি, এ, পরীক্ষায় সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার ক'রে তুমি তা' থেকেই বৃত্তি পেয়েছ। মণিকার টাকাটা ব্যাঙ্কে স্থায়ী জমা আছে—রসিদ ওর নামে ক'রে দেব, আর টাকাটা কলিকাতায় ব্যাঙ্কের হেড অফিসে পাঠাতে লিখে দেব। ওর মা'র গহনা যা' আছে, সে-ও ওর।"

সরলকুমার কোন কথা বলিল না।

জিনিষগুলি রাখিয়া সরলকুমার যখন যাইতে চাহিল, তখন "ছোট সাহেব" বলিলেন, "বেণী আমায় ব'লে গেছে, এ বার তুমি এখানেই থাকবে; বাসায় তোমার অসুবিধা হ'বে।"

"না—কোন অসুবিধা হ'বে না। বেণী ছাড়া আর সকলেই আছে।"

"ছোট সাহেব" হাসিয়া বলিলেন, "কিন্তু বেণী যদি আমার উপর রাগ করে?" তিনি মণিকাকে বলিলেন, "তখন তোমাকে সাক্ষ্য দিতে হ'বে, আমি সরলকুমারকে এখানে থাকতে বলেছিলাম।"

মণিকা হাসিল।

সরলকুমার বলিল, "সে যে উৎসাহে কলিকাতায় বাড়ী সাজাতে আরম্ভ করেছে, তা'তে সে কথা আর তা'র মনে থাকবে না।"

সরলকুমার তাহার বাঙ্গলোয় ফিরিয়া যাইলেই ছাত্রদল তাহার কাছে আসিয়া জুটিল। তাহাদিগের

সহিত কথা বলিতে বলিতে সে পশ্চাদ্দিকের বারান্দায় গেল। তথায় তাহার প্রেরিত চিত্রকর মণিকার মাতার ছবি নকল করিতেছিলেন। তিনি তাহার জিজ্ঞাসায় বলিলেন, "ছবিখানি আর দু'তিন দিনের মধ্যে শেষ করতে পারব।"

সরলকুমার বলিল, "তার পর 'ছোট সাহেবের' ছবি আঁকতে হবে। সুবিধার মধ্যে তাঁকে যখন বলবেন, তখনই বসাতে পারবেন। আর যে ক'খানা আঁকতে হবে, সে কলিকাতায় ফিরে গিয়ে আঁকলেই চলবে।"

চিত্রকর অবসরকালে আগ্রার তাজমহল প্রভৃতির যে সব চিত্র খসড়া করিয়াছেন, সেগুলি সরলকুমারকে দেখাইতে লাগিলেন।

১১

সরলকুমারের সহিত মণিকার বিবাহ ও তাহাদিগের উভয়ের কলিকাতায় গমন এতদুভয়ের মধ্যে প্রায় তিন সপ্তাহকাল অতিবাহিত হইল। এই সময়ের মধ্যে চিত্রকর "ছোট সাহেবের" নির্দ্দেশে তাঁহার পত্নীর ও সরলকুমারের জন্য তাঁহার প্রতিকৃতি অঙ্কিত করিলেন। সরলকুমার ও মণিকা এই সময়ের মধ্যে আগ্রায় বহুবার দৃষ্ট কিন্তু চিরনূতন বহু স্থান একসঙ্গে দেখিয়া পরম আনন্দ লাভ করিল। আর সেই সময়ের মধ্যে মণিকা ধীরে ধীরে পিতার সেবাভার ভৃত্যদিগের উপর ন্যস্ত করিতে লাগিল। তাহাতে সে যে বেদনা অনুভব করিতে লাগিল, স্বামীর প্রতি যুবতীর প্রবল অনুরাগ ব্যতীত আর কিছুই তাহাকে তাহা সহ্য করিবার শক্তি প্রদান করিতে পারিত না।

কিন্তু যাইবার দিন সে যেন একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িল—আর কিছুতেই আপনাকে সংযত করিতে পারিল না। সে মাতৃহীনা কন্যা, যে পিতা পিতার ও মাতার স্নেহ দিয়া তাহাকে বর্দ্ধিত করিয়াছেন, যিনি তাহার উপর সংসারের সব ভার দিয়া আপনি অধ্যয়নে ও অধ্যাপনায় আত্মহারা হইয়া ছিলেন—আজ তাহাকে তাঁহাকে ছাড়িয়া যাইতে হইবে,—কত দিনে তাঁহার সহিত তাহার দেখা হইবে, তাহাও বলা যায় না। যদিও সরলকুমার তাঁহাকে অসাধারণ শ্রদ্ধা করে এবং বার বার বলিয়াছে, তাহারা মধ্যে মধ্যে তাঁহাকে দেখিতে আসিবে, তবুও সে কিছুতেই আপনাকে শান্ত করিতে পারিতেছিল না।

"ছোট সাহেব" স্বভাবতঃ স্থির, গম্ভীর—তিনিও হৃদয়ে বিশেষ চাঞ্চল্য অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু তাহার বাহ্যিক বিকাশ ছিল না বলিলেই হয়। বিশেষ কন্যার অধীরতা তাঁহাকে আরও স্থির করিয়াছিল। তিনি কন্যাকে শান্ত হইতে উপদেশ দিতেছিলেন; বলিতেছিলেন, তাহাকে সৎপাত্রে বিবাহিতা দেখিয়া তিনি যে আনন্দ লাভ করিয়াছেন, তাহা অতুলনীয়—তাঁহার মনে হইতেছে, এই কর্ত্তব্য শেষ না করিয়া মরিলে তিনি কখন শান্তিতে মরিতে পারিতেন না।

ছাত্রগণ মণিকাকে দেখিয়া বলিতে লাগিল, আজকাল হিন্দুর ঘরের কিশোরী বধূকেও প্রথম স্বামিগৃহে যাইবার সময় এমন ভাবে কাঁদিতে দেখা যায় না।

"ছোট সাহেব" কন্যাজামাতাকে আশীর্ব্বাদ করিবার জন্য তাহাদিগের সহিত রেল ষ্টেশন পর্য্যন্ত আসিলেন। কেবল তিনি নহেন—তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধাশীল বহু লোকও তাঁহার সহিত আসিলেন। ট্রেণ ষ্টেশনে আসিয়া স্থির হইতে না হইতে ছাত্রগণ সরলকুমারের নির্দ্দিষ্ট কামরাটি ফুলে যেন ভরিয়া দিল। যাত্রাকালে সরলকুমার ও মণিকা তাঁহাকে প্রণাম করিলে "ছোট সাহেব" ভাবাবেগে কোন কথা বলিতে পারিলেন না—তাহাদিগের মস্তকে করতল স্থাপিত করিয়া মনে মনে তাহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিলেন।

ট্রেণ চলিয়া গেল।

ছাত্রগণ "ছোট সাহেবের" সঙ্গে তাঁহার বাঙ্গলোয় গেল। তিনি অল্প সময়ের মধ্যেই উচ্ছ্বসিত চাঞ্চল্য সংযত করিয়া অত্যন্ত গম্ভীরভাবে তাহাদিগের সহিত নানা বিষয়ের আলোচনা করিতে লাগিলেন। তাহারা চলিয়া যাইলে তিনি শূন্য গৃহ যেন আরও শূন্য অনুভব করিতে লাগিলেন।

এ দিকে ট্রেণ ছাড়িলে মণিকা ব্যাকুলভাবে কাঁদিতে লাগিল। সরলকুমার বুঝিল, এ সময় কোন কথা বলিয়া তাহাকে সান্ত্বনা দিবার চেষ্টা ব্যর্থ হইবেই, পরন্তু মণিকার পক্ষে বিরক্তিকরও হইবে। সে কিছু না বলিয়া কেবল মণিকার মুখ আপনার বক্ষে টানিয়া লইল এবং তাহার কেশের উপর হাত বুলাইতে লাগিল।

বহুক্ষণ কাঁদিয়া মণিকা শান্ত হইল। সে বলিল, "বাবাকে বলতে ভুলে এসেছি, তিনি যেন আজ থেকেই পত্র লিখে তাঁর সংবাদ জানান।"

সরলকুমার বলিল, "আমি সে কথা তাঁকে ব'লে এসেছি। আমি জানি, তিনি অধীর হ'বেন না ; তবুও তিনি অধীর হ'ন কি না, তা' লক্ষ্য করবার জন্য বন্ধুদের ব'লে এসেছি। যদি তিনি অধীর হ'ন, তবে আমরা দু'চার দিনের মধ্যেই এক বার তাঁ'র কাছে যা'ব।"

মণিকা জানিত, সরলকুমার তাহার পিতাকে পিতৃবৎ জ্ঞান করে। তাঁহার প্রতি ভক্তি উভয়ের মধ্যে একটি বন্ধন। তাহার কথায় মণিকার প্রেম-সমুজ্জ্বল চক্ষুতে প্রশংসার ভাব যেন ফুটিয়া উঠিল। তখন উভয়ে "ছোট সাহেবের" কথাই আলোচনা করিতে লাগিল।

রাত্রিতে নিদ্রার পর প্রভাতে জাগিয়া মণিকা আপনার স্থৈর্য্য ফিরিয়া পাইল। তখন কেবল দিবালোকবিকাশ হইতেছে। সরলকুমার তাহার পূর্ব্বেই উঠিয়াছিল এবং মণিকাকে ঘোর নিদ্রায় অভিভূতা দেখিয়া তাহাকে না জাগাইয়া আপনি স্নানকক্ষে প্রবেশ করিয়াছিল।

মণিকা কামরার বাতায়নপথে চাহিয়া দেখিল—প্রকৃতির রূপের পরিবর্ত্তন হইয়াছে। সে পূর্ব্বে কখন বাঙ্গালায় যায় নাই। আগ্রায় তাহার জন্ম এবং যত দিন তাহার জননী জীবিতা ছিলেন, তত দিন তাহার পিতা তাহাদিগকে লইয়া প্রতি বৎসর গ্রীষ্মাবকাশকালে সিমলায় যাইতেন। তদ্ভিন্ন তিনি কখন কখন বোম্বাইয়ে গিয়াছেন—রাজপুতানার কতকগুলি স্থান ও দিল্লী মণিকাকেও দেখাইয়াছেন। কিন্তু তিনি বাঙ্গালী হইলেও তাঁহার পক্ষে শেষবয়সে কখন বাঙ্গালায় যাওয়া ঘটে নাই। আর, বোধ হয় সেই জন্যই, তিনি বাঙ্গালার যে চিত্র অঙ্কিত করিতেন, তাহাতে মণিকার মনে বাঙ্গালার সম্বন্ধে অসাধারণ সৌন্দর্য্যের ধারণা বদ্ধমূল হইয়াছিল। "ছোট সাহেব" বলিতেন, ভারতবর্ষের আর কোন প্রদেশের কোন প্রতিভাবান লেখক "বন্দে মাতরম্" রচনা করিতে পারিতেন না ; কেন না, বাঙ্গালী বঙ্কিমচন্দ্র চিন্ময়ী মা'র যে মৃন্ময়ী রূপ দেখিয়াছিলেন, তাহা বাঙ্গালা ব্যতীত আর কোথাও প্রত্যক্ষ করা যায় না। "বন্দে মাতরম্" যে অতর্কিত প্রেরণাপ্রসূত, তাহা তিনি স্বীকার করিতেন না। তিনি বলিতেন, মার্কিণের বৈজ্ঞানিক সত্যই বলিয়াছেন—প্রতিভার শতকরা নব্বই ভাগ পরিশ্রম অর্থাৎ অনুশীলন, আর দশ ভাগ প্রেরণা। বাঙ্গালী বহুদিনের সাধনার ফলে যে অবস্থায় উপনীত হইয়াছে, তাহাতেই "বন্দে মাতরম্" রচনা সম্ভব। বাঙ্গালায় প্রকৃতি জীবন-ধারণোপায় সব উপকরণ উৎপাদন সহজসাধ্য করিয়া দিয়া বাঙ্গালীকে তাহার প্রতিভার অনুশীলন করিবার সুযোগ প্রদান করিয়াছিলেন। বাঙ্গালী সে সুযোগের সদ্ব্যবহার করিয়াছে, তাই নব-ভারতে বাঙ্গালী উন্নতির পথি-প্রদর্শক। পিতার কথায় মণিকা যে বাঙ্গালার কল্পনা করিয়াছিল, সে বাঙ্গালা প্রকৃত বাঙ্গালা কি না, তাহা সে জানিত না। কিন্তু সে সেই বাঙ্গালায় যাইতেছে,—সেই বাঙ্গালাই তাহার গৃহ।

সে যখন বাহিরে প্রকৃতির আলোক-সম্পাতমধুর শোভা দেখিতেছিল, তখন স্নানাগারের দ্বার খুলিয়া সরলকুমার বাহির হইল। "জাগাইনি ব'লে রাগ কর নি ?"—বলিয়া সে মণিকার ওষ্ঠাধর চুম্বন করিয়া বলিল, "যাও, মুখ ধুয়ে এস। এর পরের ষ্টেশনে চা।"

মণিকা তাহার একটি ছোট ব্যাগ লইয়া স্নানাগারে প্রবেশ করিল।

পরের ষ্টেশনে ট্রেণ আসিয়া স্থির হইবার পূর্ব্বেই মণিকা স্নান শেষ করিয়া বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া বাহির হইয়া আসিল।

সরলকুমার বলিল, "সংক্ষেপে সারলে ?"

"না। বরং অন্য দিনের চাইতে বেশীক্ষণ ধ'রে চুল মুছেছি—শুকা'বার অসুবিধা হ'বে।"

"অসুবিধা কি ? মাথায় কাপড় না রাখলে দেখবে, হাওয়ায় অল্পক্ষণের মধ্যেই শুকিয়ে যা'বে। একখানা শুকনা তোয়ালে বা'র ক'রে পিঠে কাপড়ের উপর দাও—চুল তার উপর পড়লে কাপড়ও ভিজবে না।"

সরলকুমার আপনিই ব্যাগ হইতে একখানা ছোট তোয়ালে বাহির করিয়া সেখানিকে নিজনির্দ্দেশমত স্থাপিত করিল এবং মণিকা চুল এলাইয়া দিল।

গাড়ী ষ্টেশনে থামিলে সরলকুমার চা আনাইল এবং তাহার ভৃত্য আসিলে তাহাকে বলিল, "কাপড় আর তোয়ালে কেচে দাও,—শুকিয়ে যা'বে।"

ভৃত্যকে আদেশ করিয়া সে মণিকাকে বলিল, "আজও—এখন পর্য্যন্ত আমি এ সব দেখ্‌ছি ; কলিকাতায় পৌঁছে এ সব তোমার ভার, তুমি নেবে।"

মণিকা হাসিয়া বলিল, "বেণীর মত সহকর্ম্মী থাকলে তা'তে ভয় করবার কোন কারণ থাকবে না।"

"ঠিক বলেছ"—বলিয়া সরলকুমার হাসিতে লাগিল; বলিল, "আমি বল্‌তে পারি, সে ভোর থেকে ঘড়ী দেখছে—কখন্ ট্রেণ পৌঁছবার সময় হ'বে।"

ট্রেণ যখন বাঙ্গালায় আসিয়া পড়িল, তখন মণিকা বলিল, "কি সবুজ!"

সরলকুমার বলিল, "বাঙ্গালা 'সুজলা'—তাই এমন শ্যাম শোভা। মধুসূদন যখন বিলাতে যা'ন, তখন তিনি বাঙ্গালাকে 'শ্যামা জন্মদে' বলেই সম্বোধন করেছিলেন—জন্মভূমির কাছে প্রার্থনা জানিয়েছিলেন—

'ফুটি যেন স্মৃতিজলে,
মানসে, মা, যথা ফলে—
মধুময় তামরস কি বসন্তে কি শারদে।'

মা তাঁর প্রার্থনা পূর্ণ করেছিলেন।"

ট্রেণ বর্দ্ধমানে পৌঁছিলে সরলকুমার ভৃত্যকে ডাকিয়া জিনিষ গুছাইবার ব্যবস্থা করিল। মণিকা বড় ব্যাগ খুলিতে যাইলে সরলকুমার জিজ্ঞাসা করিল, "কি চাই?"

সে বলিল, "বেণীর উপহার কাপড় আর জামা প'রে আমি কলিকাতায় নামব। দেখলে সে নিশ্চয়ই খুসী হ'বে।"

"নিশ্চয়।"

বেণী ষ্টেশনেই ছিল। ট্রেণ স্থির হইতে না হইতে সে কুলী ডাকিয়া জিনিষ নামাইবার ব্যবস্থা করিল এবং লগেজ-কামরায় যে সব জিনিষ ছিল, সে সব তাহাকে দেখাইয়া দিবার জন্য সরলকুমারকে বলিল। সে বলিল, "আমি একখানা মোটর বাস ঠিক ক'রে রেখেছি, তা'তে জিনিষ যা'বে।"

বেণীর সেনাপতিত্বে কুলি-সৈনিকরা যখন তাহাদিগের কায সুসম্পন্ন করিল, তখন সকলে যাত্রা করিল।

যাত্রার পূর্ব্বে সরলকুমার বেণীকে বলিল, "বেণী, তোমার বৌদিদি বল্‌লেন, তোমার দেওয়া কাপড় প'রে নামবেন।"

বেণীর মুখ হর্ষোৎফুল্ল হইয়া উঠিল। সে মণিকার দিকে চাহিল। মণিকার মনে হইল, সে যেন কি সন্ধান করিতেছিল। সে কি স্নেহ?

গৃহে উপনীত হইয়া মণিকা দেখিল, গৃহ স্বল্পায়তন নহে; আর তাহার সজ্জা সর্ব্বতোভাবে সুন্দর।

বেণী বলিল, "স্নানের ঘরে জল আছে—তোমরা যাও—পথের কষ্ট! জিনিষ সব আমি নামিয়ে নিচ্ছি।"

স্নানের ঘর দুইটি হইতে বাহির হইয়া সরলকুমার ও মণিকা দেখিল, জিনিষ গুছাইয়া রাখিয়া বেণী চা'র পাত্রে জল ঢালিয়া তাহাদিগের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছে। টেবলের উপর নানারূপ মিষ্টান্ন, পাউরুটি, টোষ্ট প্রভৃতি। দেখিয়া মণিকা বলিল, "এ যে বিষম আয়োজন, বেণী!"

বেণী বলিল, "কলিকাতার খাবার—দেশের জিনিষ কেমন, দেখবে না?"

মণিকা হাসিয়া বলিল, "এক দিনেই সব দেখতে হ'বে?"

বেণী সে কথার উত্তর না দিয়া বলিল, "চা কড়া হয়ে যা'বে—ঢাল, বৌদিদি।"

মণিকা বলিল, "আজ আমরা তোমার অতিথি—তুমি চা ঢাল।"

বেণীই চা ঢালিল।

তাহার পর উভয়ে বাড়ীটা সব দেখিতে গেল। সরলকুমার বলিল, "আমি জিনিষ কতক কিনে, কতক ফরমাস দিয়ে বেণীকে সব বুঝিয়ে দিয়ে আগ্রায় গিয়েছিলাম—বেণী সব কেমন সাজিয়েছে, দেখ।"

মণিকা বলিল, "ওকে আর কিছু দেখিয়ে দিতে হয় না।"

"না। মা'র ছাত্র হয়ে ও এমন শিখেছে যে, ওকে শিখাবার আর কিছু নাই।"

"তোমাকে বড় ভালবাসে।"

"বরাবরই বাসত; মা'র আর বাবার মৃত্যুর পর থেকে যেন আরও বেশী ভালবাসে। যা'কে বলে প্রাণ দিতে পারে—ও তাই; ও বোধ হয়, দরকার হ'লে আমার জন্য প্রাণ দিতে পারে।"

১২

কলিকাতার বিরাটত্ব মণিকাকে বিস্মিত করিয়াছিল। হাওড়া ষ্টেশন হইতে সেতুর উপর আসিয়া মণিকা দেখিয়াছিল, জনস্রোত বহিয়া যাইতেছে—নদীর পরপারে বিরাট গুদাম ও গৃহ। তাহার পর বড়বাজারের মধ্য দিয়া আসিবার সময় জনতা কি অসাধারণ! সে সরলকুমারকে সেই কথা বলিয়াছিল। সেই জন্য বাড়ী দেখিয়া সরলকুমার বলিল, "চল, তোমাকে সহর ঘুরিয়ে আনি।" কিন্তু গাড়ী

আনিবার জন্য বলিতে যাইয়া ফিরিয়া আসিয়া সে বলিল, "আজ তোমাকে অপেক্ষা করতে হবে। অভিভাবকের আপত্তি আছে।"

মণিকা হাসিয়া বলিল, "বেণী কি বল্‌লে?"

"বল্‌লে, কলিকাতা সহর আজই পালিয়ে যাবে না। এত পথ অতিক্রম ক'রে এসে, আজ বিশ্রাম করা তোমার পক্ষে বিশেষ দরকার।"

তাহার পর সরলকুমার বলিল, "আমি ত মোটামুটি বাড়ী সাজাবার ব্যবস্থা করেছি। এখন তুমি দেখে বল, আর কি কি আন্‌তে হ'বে।"

"এর পর আরও আন্‌তে হ'বে! তুমি একেবারে প্রাসাদ সাজিয়েছ!"

"আমার নিজের জন্য কত অল্প দরকার, তা' তুমি আগ্রায় দেখেছ। কিন্তু যখন সাম্রাজ্ঞীর জন্য বাড়ী সাজাতে হয়, তখন সজ্জা তা'র উপযুক্ত হওয়া চাই।"

"আমার দরকার কতটুকু, তা'ও তুমি দেখেছ—আমি কি এতই বদলে গেছি?"

"চল, ছবি দু'খানা বা'র ক'রে টাঙ্গাবার ব্যবস্থা করা যা'ক।"

উভয়ে উঠিল এবং যাইয়া প্যাকিং কেস হইতে "ছোট সাহেবের" ও মণিকার জননীর ছবি বাহির করাইয়া টাঙ্গাইবার ব্যবস্থা করিল।

সরলকুমার চিত্রকরকে বলিয়া দিয়াছিল, কলিকাতায় ফিরিয়া তাঁহাকে তাহার পিতামাতার ও মণিকার ছবি আঁকিতে হইবে।

সে দিন বেণী আপনি তাহাদিগের জন্য সব আহার্য্য প্রস্তুত করিয়াছিল।

পরদিন প্রভাতে বেণী মণিকাকে বলিল, "বৌদিদি, চল—তোমার সংসার তুমি বুঝে নেবে।"

মণিকা হাসিতে হাসিতে বেণীর সঙ্গে গেল।

জিনিষ সব মণিকাকে বুঝাইয়া দিতে দিতে বেণী বলিল, "বৌদিদি, যদি রাগ না কর, তবে একটা কথা বলি।"

মণিকা বলিল, "কি কথা, বেণী?"

"মা বল্‌তেন, স্ত্রীলোকের সব চেয়ে বড় আর আদরের অলঙ্কার সিন্দূর। সিন্দূর পরতে কি তোমার কোন আপত্তি আছে?"

মণিকা একটু ভাবিল, তাহার পর বলিল, "আপত্তি! কিন্তু আমার ত সিন্দুর নাই।"

"তুমি বল্‌লেই আমি এনে দেব; আর দাদাবাবুকে কৌটা বার ক'রে দিতে বলব।"

মণিকা ভাবিতে লাগিল, ইহাতে আপত্তির কি কারণ থাকিতে পারে? সংস্কার ও প্রথা ত্যাগ করিতেই হইবে, এমন কোন কথা নাই।

বেণী কখন্ যাইয়া সিন্দূর কিনিয়াছিল, মণিকা জানিতে পারে নাই। সে যখন সিন্দুর লইয়া আসিয়া দাঁড়াইল, তখন সরলকুমার ও মণিকা কতকগুলি পুস্তক সাজাইতেছিল। বেণীর হাত হইতে কাগজে মোড়া সিন্দুর লইয়া মণিকা হাসিতে হাসিতে সরলকুমারকে বলিল, "বেণী বল্‌ছে, আমি যদি সিন্দূর পরি, তবে ও আনন্দিত হ'বে।"

সরলকুমার ভাবিল, মণিকা হয় ত ইহা পসন্দ করিতেছে না। সে বলিল, "কি দরকার?"

বেণীর মুখে বিমর্ষভাব দেখা গেল। সে বলিল, "কাল বৌদিদি আসা থেকে আমার মা'র কথা মনে পড়ছে—তিনি বলতেন, সিন্দুর আর নোয়া স্ত্রীলোকের সব চেয়ে বড় আদরের অলঙ্কার। তিনি সতী—লক্ষ্মী—দুই অলঙ্কার পরেই গেছেন।"

বলিতে বলিতে বেণীর দুই চক্ষু হইতে অশ্রু ঝরিয়া পড়িল।

মণিকা বলিল, "বেণী, তুমি যে বলেছিলে, কৌটা বা'র ক'রে দিতে বলবে।"

বেণী বলিল, "সিন্দূরকৌটা মা'র গহনার বাক্সে নিশ্চয়ই আছে।"

সরলকুমার বলিল, "গহনার বাক্সে?"

"হাঁ। প্রত্যেক বার দিল্লী থেকে আসবার সময় আমাকে দরিবা থেকে কতকগুলা হাতীর দাঁতের সিন্দুর-কৌটা কিনে আন্‌তে হ'ত। মা লোককে দিতেন। তিনি সিন্দুরের আর লোহার বড় আদর করতেন। তাঁ'র গহনার বাক্সে নিশ্চয়ই কৌটা আছে।"

সরলকুমার হাসিয়া বলিল, "লোহার কথা যে এখনও বল নি, বেণী?"

বেণী বলিল. "সত্য কথা বলতে কি—পাছে বৌদিদি

বিরক্ত হ'ন, তাই ভেবে বলি নি। বাবার আফিসে যে 'সেন সাহেব' চাকরী করতেন, তিনি খৃষ্টান ছিলেন; তাঁ'র স্ত্রীকেও সিন্দূর পরতে দেখেছিলাম ব'লে সিন্দূরের কথাটা সাহস ক'রে বলেছি।"

মণিকা জিজ্ঞাসা কবিল, "লোহা কি ?"

সরলকুমার বলিল, "পশ্চিমে যেমন মেয়েদের হাতে যত গহনাই কেন থাকুক না—কাচের চুড়ীই সাধব্যের চিহ্ন, এ দিকে 'লোহা'—চুড়ীর মত লোহার একগাছা গহনা—তা'ই।"

"সেটা সাধব্যের চিহ্ন ?"

"হাঁ।"

"গহনার বাক্স কোথায় ?"

"বাক্সটার থাকগুলা বা'র ক'রে লোহার আলমারীতে রাখা হয়েছে। আমি আন্‌ছি।"

সরলকুমার যাইয়া একে একে থাকগুলি আনিয়া টেবলের উপর রাখিল। সত্যই তাহাতে একাধিক সিন্দূর-কৌটা ছিল। সবগুলিতেই সিন্দূর। একটি অপেক্ষাকৃত বড় হাতীর দাঁতের কৌটার অঙ্গে ব্যবহারচিহ্ন ছিল। বেণী বলিয়া উঠিল, "বৌদিদি, এইটি মা'র সিন্দূর-কৌটা—এইটি তুমি নাও।" মণিকা সেইটি তুলিয়া লইল। তাহার পর সে অলঙ্কারগুলির সম্বন্ধে বলিল, "যেন নূতন!"

বেণী বলিল, "মা কোথাও যাবার সময় যে গহনা পরতেন, এসে তা' মুছে, পরিষ্কার ক'রে তবে তুলতেন। আর অনেক গহনা তিনি পরেন নি—তোমার জন্যই রেখেছিলেন।"

সেই গহনাগুলি দেখাইতে দেখাইতে একগাছি "লোহা" তুলিয়া লইয়া বেণী বলিল, "সে-বার মা সাবিত্রী থেকে যে সব 'লোহা' এনেছিলেন, এ তা'রই একটি; সেকরাকে ডাকিয়ে তোমার জন্য সোণার তার জড়িয়ে বাঁধাতে দিয়েছিলেন।"

মণিকা বেণীর নিকট হইতে সেটি লইল—দেখিতে সুন্দর, লোহার উপর সোণার তার জড়ান—মকরের মুখ। মকরের মুখ দেখাইয়া মণিকা সরলকুমারকে জিজ্ঞাসা করিল, "এটি কি ?"

সরলকুমার বলিল, "প্রাণিতত্ত্বের কোন পুস্তকে ওর সন্ধান পা'বে না।"

"তবে এর বসতি কবিতার রাজ্যে ?"

"হাঁ। তবে সে-ও একালে নয়। মকর গঙ্গার বাহনরূপে কল্পিত।"

"দেখি, আমার হাতে হয় কি না"—বলিয়া মণিকা দক্ষিণ-হস্তে "লৌহ" পরিবার চেষ্টা করিলে সরলকুমার বলিল, "কিছু জান না।"

মণিকা বলিল, "কেন ?"

হাসিতে হাসিতে সরলকুমার "লৌহ" লইয়া বলিল, "বাঁ হাতে পরতে হয়"—তাহার পর আপনার বাম করে মণিকার বাম করতল সঙ্কুচিত করিয়া ধরিয়া দক্ষিণ হস্তে "লৌহ" পরাইয়া দিল।

মণিকা হাতখানি ঘুরাইয়া দেখিল।

বেণী হর্ষোৎফুল্লভাবে বলিল, "দেখ দেখি, কেমন মানাল!"

এই সময় আর এক জন ভৃত্য কি বিষয়ে উপদেশ লইবার জন্য বেণীকে ডাকিল। বেণী চলিয়া গেল।

সরলকুমার বলিল, "তবে সিন্দূর পরা আর বাকি থাকে কেন ?"

মণিকা হাসিতে হাসিতে বেশ-পরিবর্ত্তনের কক্ষে যাইবার উদ্যোগ করিলে সরলকুমার বলিল, "এ-ও তুমি কিছু জান না। প্রথম দিন স্বামীকেই সিন্দূর পরিয়ে দিতে হয়।"

"তুমি ত পরিয়ে দাও নি।"

"বিয়ের দিন ত বেণী ছিল না, থাকলে হয় ত বলত, কিন্তু সে দিন হয় ত ওর কথা থাকত না।"

"তুমি মনে করছ, বাবা আপত্তি করতেন ? তিনি কখন আপত্তি করতেন না। তিনি বলেন, যে সব প্রথার সঙ্গে বহুকালের স্মৃতি জড়ান আছে, সেগুলি মন্দ না হ'লে নষ্ট করা অনাবশ্যক। বরং সে সব গেলে অনেক বৈশিষ্ট্য, বৈচিত্র্য ও সৌন্দর্য্য নষ্ট হয়ে যায়। আমারও তাই মনে হয়। এই ধর না—সিন্দূর পরার বিষয়। সিন্দূর পরলে ত, ভাল ছাড়া, মন্দ দেখায় না।"

"তা' হ'লে সিন্দূর পরিয়ে দিচ্ছি। একখানা চিরুণী আনি।"

"আমি আন্‌ছি"—বলিয়া মণিকা বেশ-পরিবর্ত্তনকক্ষে যাইয়া চিরুণী আনিল। সরলকুমার সেখানি লইয়া তাহা সিন্দূরলিপ্ত করিয়া মণিকার সীমন্তে রেখা টানিয়া

দিয়া বলিল, "স্ত্রীলোকের সিন্দুর পরা এ দেশে এত চলিত যে, ধর্ম্ম-সঙ্গীতেরও বিষয় হয়েছে—

'অয়ি সুখময়ী উষে, কে তোমারে নিরমিল ;

বালার্ক-সিন্দুর-ফোঁটা কে তোমার ভালে দিল ?'

তবে সে সিন্দূরের টিপের কথা।"

সে মণিকার মুখখানি একটু উর্দ্ধোৎক্ষিপ্ত করিয়া তাহার ভ্রূ-যুগলের মধ্যবর্ত্তী স্থানে সিন্দূরের একটি বিন্দু অঙ্কিত করিবার চেষ্টা করিল এবং সেটি ঠিক মধ্যস্থলে অঙ্কিত হইল না দেখিয়া দুই বার রুমালে মুছিয়া তৃতীয় বার তাহা অঙ্কিত করিয়া বলিল, "এই বার আয়নায় দেখ, কেমন হয়েছে।"

মণিকা হাসিতে হাসিতে একখানি দর্পণের সম্মুখে গেল। দর্পণে তাহার হাস্যোৎফুল্ল মুখের প্রতিবিম্ব পড়িল—হাসিতে তাহার গালে সেই টোল পড়িল। সরলকুমার দেখিল, দেখিয়া মুগ্ধ ও আকৃষ্ট হইল—মণিকার দিকে অগ্রসর হইল। মণিকা দর্পণে তাহার গতি লক্ষ্য করিয়া—ফিরিয়া দাঁড়াইল। সরলকুমারের মনে হইল, কি মোহিনী মূর্ত্তি! সে আপনাকে ভাগ্যবান বলিয়া মনে করিল। সে তরুণীর হর্ষ-প্রফুল্ল মুখ চুম্বন করিবার প্রলোভন সংবরণ করিতে পারিল না। টেনিসনের "দিবা-স্বপ্নের" একটি চরণ তাহার মনে পড়িল—"পরশ—চুম্বন—মায়া হ'ল অবসান।"

প্রীতি-নিদর্শন বিনিময়ের পর সরলকুমার বলিল, "কেহ কেহ বলেন, সধবা নারীকে চিনাইবার জন্য যে সিন্দুর আর 'লোহা' ব্যবহারের ব্যবস্থা হয়েছিল—সে বর্ব্বরযুগের—তাহাতে বুঝায়, যে নারীর সীমন্তে সিন্দুর আর মণিবন্ধে 'লোহা' আছে, তাহার জন্য যুদ্ধ—রক্তপাত হয়ে গেছে, আর সে বন্দিনী।"

মণিকা বলিল, "এ ব্যাখ্যা কখনই কবিজনগ্রাহ্য হ'তে পারে না।"

"না। কবির ব্যাখ্যা—প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যপ্রিয় মানব দিনের আরম্ভে রাত্রির অন্ধকার বিদীর্ণ ক'রে অরুণ-রাগ-বিকাশের সৌন্দর্য্য দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন, আর যে নারীকে তাঁ'রা গৃহের লক্ষ্মী আর সৌন্দর্য্যের সার মনে করতেন তাঁ'র ঘনান্ধকার কেশের মধ্যে সিন্দুররেখার ব্যবস্থায় সেই সৌন্দর্য্যের অনুকরণ করেছিলেন।"

"চমৎকার! আর লোহা?"

"সংসারধর্ম্ম যথাযথভাবে পালন করতে হ'লে কুসুম-কোমলা নারীকেও যে সময় সময় কঠোরতা অবলম্বন করতে হয়, 'লোহা' তা'রই প্রতীক।"

মণিকা হাসিয়া বলিল, "এই ব্যাখ্যাটা স্বামীদের সর্ব্বদা মনে রাখা কর্ত্তব্য।"

"কেন?"

"তাঁ'রা যেন কখন পাতরের মত শুষ্ক ও কঠোর না হ'ন। কারণ, পাতরে আর লোহায় সংঘর্ষ উপস্থিত হ'লে আগুনের উৎপত্তি অনিবার্য্য।"

"আর সেই আগুনে সংসারের আর জীবনের সব সুখ-শান্তির আশা পুড়ে ছাই হয়ে যেতে পারে।"

বেণীর সহিত আলোচনা করিয়া সরলকুমার কলিকাতায় পিতার বন্ধুদিগের একটা তালিকা প্রস্তুত করিল ;—স্থির করিল, তাঁহাদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আসিবে ; কলিকাতার সমাজে যখন থাকিতে হইবে, তখন সেই সমাজে তাহার স্থানটি নির্দ্দিষ্ট করিয়া লইতে হইবে। তবে তাহাতে কিছু বিলম্ব হইবে ; কারণ, তাহার পূর্ব্বে মণিকাকে কলিকাতার দ্রষ্টব্য স্থানাদি দেখাইতে হইবে।

মণিকাকে কলিকাতার দ্রষ্টব্য স্থানগুলি দেখান সেই দিন হইতে আরম্ভ হইল। যিনি কলিকাতাকে "দূরত্বের সহর" নামে অভিহিত করিয়াছিলেন, তিনি ভুল করেন নাই, অতিরঞ্জনের আশ্রয়ও গ্রহণ করেন নাই। কারণ, কলিকাতা জলার জন্য পূর্ব্বদিকে আর নদীর জন্য পশ্চিম দিকে বিস্তৃতি লাভ করিতে না পারিয়া গঙ্গার কূলে দীর্ঘ হইয়াছে।

কলিকাতায় যাহারা বাস করে, তাহারা ইহাঁর দ্রষ্টব্য স্থানের বাহুল্য যেন অনুভব করিতেই পারে না কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কলিকাতা বহু দ্রষ্টব্য স্থানের গর্ব্ব করিতে পারে। এ দেশে রাজা হইয়া ইংরেজ ইহাকেই রাজধানী করিয়া সাজাইয়াছিল এবং কলিকাতা ইংরেজ রাজত্বে দিনে দিনে বিস্তৃতি ও সমৃদ্ধি লাভ করিয়াছিল।

প্রথম দিনেই সরলকুমার কয়টি স্থান ও দ্রব্য দেখাইয়া তাহার আপনার গৃহ দেখাইতে লইয়া গেল। সেই গৃহের বেষ্টনোদ্যানমধ্যে এক পার্শ্বে তখন তাহার নির্দ্দেশানুযায়ী বাঙ্গলো গঠনের কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। সে গৃহ যে আগ্রায় "ছোট সাহেবের" বাঙ্গলোর অনুকরণে নির্ম্মিত

হইবে, তাহা সে মণিকার নিকট গোপন রাখিয়া রচনাশেষে মণিকাকে বিস্মিত করিবে মনে করিয়াছিল বটে, কিন্তু সে সঙ্কল্প আর অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিল না। শুনিয়া মণিকা বলিল, "ঠিক তেমন করা কেন ?"

সরলকুমার বলিল, "আগ্রার বাঙ্গলোতে তুমি জন্মাবধি অভ্যস্ত—নিশ্চয়ই সেটা তোমার ভাল লাগে।"

"তুমি যদি কেবলই আমার জন্য ভাব, তবে যে আর কোন কথা ভাবতেই সময় পাবে না !"

সেক্সপীয়রের পরিচিত উক্তি উদ্ধৃত করিয়া সরলকুমার বলিল :—

"নিমজ্জিত হ'ক রোম টাইবার জলে,
ধ্বংস হ'ক সাম্রাজ্যের বিস্তৃত খিলান—
তোমাতেই স্থান মোর।"

প্রগাঢ় প্রেমের পরিচয়ে মণিকা যে অসাধারণ তৃপ্তি ও আনন্দ লাভ করিল, তাহা কি ভাষায় ব্যক্ত করা যায় ? ব্যক্ত করিবার ব্যর্থ চেষ্টাও সে করিল না।

উভয়ের দিন যেন সুখের স্বপ্ন-রাজ্যে অতিবাহিত হইতে লাগিল। [ক্রমশঃ।

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ।

এসো পুনঃ

মোর পানে চেয়ে হেসেছিলে যবে,
হে মোর পরাণ-বঁধু,
সে হাসি তোমার এ মোর অঙ্গে
ঢেলেছিল শুধু মধু।

নিরজন গেহে প্রেমভরে চাহি,
কয়েছিলে 'ভালবাসি' ;—
হৃদয়-গগনে স্নিগ্ধ আভায়
চাঁদ উঠেছিল হাসি।

শ্যামল চরণে মণি-মঞ্জীর
বাজাইয়া রিনি-ঝিনি,
তারার মালিকা কণ্ঠে দুলায়ে
নিশীথের সোহাগিনী,

নীল অম্বর নিচোল বক্ষে
জোনাকি প্রদীপ জ্বালি,
দুয়ারে আমার আসিয়া গোপনে
দেছে কত গীতি ডালি।

নদীপারে ওই পশ্চিম কূলে
জ্বলেছে দিনের চিতা ;
রজনীগন্ধা প্রিয়তম-আশে
মনসুখে আমোদিতা।

দিকবালা কত তরুর শ্রবণে
কয়েছে প্রেমের কথা ;
আঁধারের সনে চক্রবাকীর
বেড়েছে হৃদয়-ব্যথা।

জয়টীকা দেছে ললাটে আমার
সাঁঝের তরুণ ইন্দু ;
যশোগান কত শুনায়েছে কাণে
পরাণের সুখ-সিন্ধু।

সে-গানে মোহিয়া ভুলেছি তোমারে,—
তাই রহ দূরে সরি !
বুঝি নাই, প্রিয় ! উৎসব গানে
আছিল হৃদয় ভরি।

ক্ষম, হে আমার, ক্ষম অপরাধ,
এস পুনঃ হৃদিমাঝে,
নিরজন গেহে প্রেমভরে চাহি—
এস অপরূপ সাজে।

শ্রীমতী ইলারাণী মুখোপাধ্যায়।

য়ুরোপের অবস্থা

যেরূপ সংবাদ পাওয়া যাইতেছে, তাহাতে মনে হইতেছে যে, য়ুরোপের অবস্থা অত্যন্ত শঙ্কাজনক হইয়া উঠিয়াছে। ফ্রান্স, জার্ম্মাণী, অষ্ট্রিয়া, ইটালী, পোলাণ্ড, বেলজিয়াম, স্পেন প্রভৃতি নানা দেশেই অশান্তি নানারূপে আত্মপ্রকাশ করিতেছে। সমস্ত য়ুরোপ যেন একটা বিস্তীর্ণ বারুদের স্তূপের মত বিরাজ করিতেছে। অগ্নিও স্থানে স্থানে জ্বলিয়া উঠিতেছে। সুতরাং কোথা হইতে কখন্ কি উপলক্ষে একটা অগ্নিকণা অশুভ মুহূর্ত্তে কোথায় যাইয়া পড়িবে, তাহা বুঝিয়া উঠা কঠিন। সেই জন্য য়ুরোপের ভিতরকার অবস্থা খুব শঙ্কাজনক বলিয়া মনে হইতেছে।

এ দিকে যুদ্ধ না বাধিবার অনেকগুলি কারণও য়ুরোপে উপস্থিত হইয়াছে। গত মহাযুদ্ধের পর হইতে কোন রাজ্যের ভিতরকার অবস্থা বিশেষ ভাল নহে। সর্ব্বত্রই বাণিজ্যের অবস্থা সঙ্কুচিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে ব্যয়ের বাহুল্য ঘটিতেছে। সর্ব্বত্রই বেকার-সংখ্যা বাড়িয়া গিয়াছে। গ্রেট বৃটেন ত য়ুরোপের মধ্যে শক্তিশালী দেশ। ধনবলে বৃটেনের সমকক্ষ লোক য়ুরোপের মহাদেশে আছে বলিয়া মনে হয় না। সেই গ্রেট বৃটেনে এখন প্রায় ২২ লক্ষ লোক বেকার। সরকার হইতে তথায় বেকার লোকদিগকে প্রতিপালন করিতে হয়। সে জন্য বৃটেনের বর্ত্তমান বৎসরে ব্যয় পড়িবে ৩ কোটি ৮৮ লক্ষ পাউণ্ড। এইরূপ বেকার প্রায় সকল দেশেই অল্প-বিস্তর আছে। ফ্রান্সেও আছে, জার্ম্মাণীতেও আছে। মার্কিণ এখন না কি সর্ব্বাপেক্ষা ধনী দেশ। সে দেশে বর্ত্তমান সময়ে ১০ লক্ষ লোক বেকার, ইহা প্রেসিডেণ্ট রুজ-ভেল্টের কথা। সুতরাং যাঁহারা মনে করিয়াছিলেন যে, যুদ্ধের পর "মধুর বহিবে বায়ু ভেসে যাব রঙ্গে," তাঁহাদের আশা পূর্ণ হয় নাই। বরং সকল দেশের রাজনীতিকরা প্রতিকূল ঝড়-ঝঞ্ঝার ভয়ে সদাই শঙ্কিত। তাঁহাদের শঙ্কা এতই বাড়িয়াছে যে, তাঁহারা যেন একটি পত্র-পতনেও চমকিত হইয়া উঠিতেছেন। যুদ্ধের ভীষণতা এখন সকলেই মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিতেছেন। তাহার উপর কাহারও আর্থিক অবস্থা ভাল নহে। প্রায় সকল রাজ্যের বাজেটে জমায় কম, খরচ বেশী দেখিতে পাওয়া যায়। সকল দেশের লোকই করভারে পীড়িত। রাজনীতিকদিগের চিন্তার পার নাই। এরূপ অবস্থায় কেহ যে ইচ্ছা করিয়া শান্তিভঙ্গ করিতে প্রবৃত্ত হইবেন, ইহা মনে হয় না।

পক্ষান্তরে, শান্তিরক্ষার জন্য যে সকল উপায় পাশ্চাত্য রাজনীতিকরা অবলম্বন করিতে যাইতেছেন,—তাহা যেন কাহার অভিসম্পাতে ব্যর্থ হইয়া যাইতেছে। গ্রেট বৃটেনের পার্থিব অধিকার সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বিস্তৃত। পৃথিবীর বহু দেশে তাহার টাকা খাটে। সেই জন্য বৃটেনের রাজনীতিকদিগের বিশ্বাস, য়ুরোপের শান্তিভঙ্গ হইলে তাঁহারাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ক্ষতিগ্রস্ত হইবেন। তাঁহারা সমরাস্ত্রের সঙ্কোচসাধনের জন্য যথাসম্ভব চেষ্টা করিয়া আসিতেছিলেন। কয়েক স্থানে ঐ বিষয়ের বৈঠকও বসান হইয়াছিল। কিন্তু পরস্পরের উপর পরস্পরের বিশ্বাসের অভাব হেতু তাহা সফল হয় নাই। এবার য়ুরোপের রাজনীতিক আকাশকে মেঘমেদুর দেখিয়া গ্রেট বৃটেনই স্বয়ং সমর-সরঞ্জাম বাড়াইবার জন্য বিস্তর টাকা বরাদ্দ করিয়াছেন। আয়োজন খুব জোরে চলিয়াছে। জাহাজ, বিমান, কামান প্রভৃতি নির্ম্মাণে অনেক বেকার মজুর কায পাইতেছে। পূর্ব্বে বৃটিশ রাজনীতিক-বর্গ প্রায় বলিতেন,—যুদ্ধের সাজসজ্জা বাড়াইয়া রাখিলে আচম্বিতে যুদ্ধ বাধিতেই পারে। এখন আবার তাঁহারা মতটা পাল্টাইয়া ফেলিয়া বলিতেছেন যে, গ্রেট বৃটেন যদি পূর্ণ রণ-সাজে সজ্জিত হন, তাহা হইলে কেহ আর যুদ্ধ করিতে সাহস পাইবে না। মানুষের বিচার-বুদ্ধি অনেক সময়ই স্বার্থবুদ্ধির দ্বারা প্রভাবিত হইয়া থাকে। কিন্তু শেষে বিধাতার মতলবই হাসিল হয়। ফলে এখন য়ুরোপের চারিদিকেই সাজ সাজ রব পড়িয়া গিয়াছে। ইহাতে শান্তি রক্ষিত হইবে কি না, তাহা লইয়া তর্ক করা বৃথা।

ইহার পর আর একটি ব্যাপার বর্ত্তমান রাজনীতিক অবস্থাকে বিশেষভাবে বিড়ম্বিত করিয়াছে। সেটি হইতেছে, ইটালী কর্ত্তৃক আবিসিনিয়া-বিজয়। এই ব্যাপারে লীগ অব নেসন্সের বা জাতি-সঙ্ঘের ব্যর্থতা পূর্ণ মাত্রায় দেখা দিয়াছে। এই লীগের বা জাতিসঙ্ঘের উপর বিশ্বাস করিয়াই ইথিওপিয়ার সম্রাট হাইলাস সিলাসী আজ এতটা দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। এ কথা এখন সত্য বলিয়াই জানা গিয়াছে যে, ইটালী কিছুদিন হইতে আবি-সিনিয়ার সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিল, কিন্তু যখনই আবিসিনিয়া একটু যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইবার লক্ষণ প্রকটিত করিয়াছিল, তখনই ইটালী চীৎকার করিয়া বলিয়াছে যে, আবি-সিনিয়া নিরপেক্ষতা ভঙ্গ করিয়া যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইতেছে; লীগের তোয়াক্কা তাহারা কিছুই রাখিতেছে না। লীগ আবিসিনিয়া-রাজকে বরাবরই এই ব্যাপার মিটাইয়া দিবার আশ্বাস দিয়া আসিয়াছিল, সে জন্যও আবিসিনিয়ারাজ বিশেষ কিছুই করেন নাই। তিনি লীগের কথাতেই আশ্বস্ত হইয়াছিলেন। নতুবা ইটালী যখন সম্পূর্ণ প্রস্তুত হইতে পারে নাই, তখন যদি হাইলাস সিলাসী ইটালীর অধিকৃত ইরিট্রিয়া আক্রমণ করিতেন, তাহা হইলে ইটালীকে যে বিষম বিব্রত হইয়া পড়িতে হইত, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। এ কথা এখন বেশ জানিতে পারা গিয়াছে যে, ইটালী প্রথম হইতেই এই আফ্রিকাবাসী অশ্বেত জাতির উপর বিষবাষ্প-পূর্ণ বোমা নিক্ষিপ্ত করিয়া আসিতেছে। মেজর গ্রাহাম পোল লিখিয়াছেন যে, গত জানুয়ারী মাসে ২ শত ২৪ টন বিষবাষ্প আবিসিনিয়ার ভিতর লইয়া যাওয়া হইয়াছে। ফলে শৌর্য্যে বা বীরত্বে ইটালীয়ানরা ইথিওপিয়াকে পরাজিত করিতে পারে নাই। তাহারা অন্তরীক্ষ হইতে বিষময় বাষ্প-পূর্ণ বোমা নিক্ষিপ্ত করিয়াই হাবসীবীরদিগকে কাপুরুষের ন্যায় পরাজিত করিয়াছে। অথচ এই ইটালীই এক সময়ে যুদ্ধে বিষময় বাষ্প ব্যবহারের ঘোর

নিন্দা করিয়াছিলেন। যুদ্ধ না করিয়া মধ্যস্থের সাহায্যে সকল বিবাদ মিটাইয়া দিবার জন্ম যে জাতিসঙ্ঘের প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে, সেই জাতিসঙ্ঘের মুখাপেক্ষী থাকিয়াই আজ আবিসিনিয়া-রাজকে ঘোর দুর্দ্দশা ভোগ করিতে হইল। ইহা ভিন্ন ইটালী যে রেড ক্রস চিকিৎসাগারের উপর বেপরোয়া হইয়া বোমা নিক্ষেপ করিয়াছিল, তাহার উদ্দেশ্য কেবল আহত এবং পীড়িত সৈনিকদিগকে বধ করা ছিল না—পরন্তু তাহারা আবিসিনিয়ায় যে নিষ্ঠুর ও পৈশাচিক ব্যবহার করিয়াছে, তাহার যেন কোন য়ুরোপীয় সাক্ষী না থাকে, তাহার উপায় করা। ফলে এই দেশ বিজয় করিতে যাইয়া ইটালী কেবল সর্ব্বপ্রকারে অন্যায় আচরণ করে নাই,—শান্তিরক্ষার প্রতিষ্ঠান লীগকে একবারে খেলো করিয়া দিয়াছে।

ইটালীর অদ্ভুতকর্ম্মা পুরুষ মুসোলিনী এই উপলক্ষে আর একটা ব্যাপার প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি হাতে-কলমে দেখাইয়াছেন যে, স্বৈরশাসকরা যদি বিশেষ দৃঢ়তার এবং ক্ষিপ্রতার সহিত কায করিতে পারেন, তাহা হইলে তাঁহারা সকল কার্য্যই সাধন করিতে পারেন। ইহাতে একটা মন্দ নজীরের সৃষ্টি হইয়াছে। ইহাতে তিনি যে পথ দেখাইয়াছেন, সেই পথে চলিলে হার হিটলার বোধ হয় অতিশয় ক্ষিপ্রতার সহিত তাঁহার প্রণষ্ট উপনিবেশগুলি পুনরধিকার করিতে পারিবেন। কুকার্য্যের পরিণাম এইরূপই হইয়া থাকে। তাই গত ২৯শে এপ্রিল আবিসিনিয়ার সম্রাট হইলাস সিলাসী বলিয়াছিলেন,—I must still hold on until my tardy allies appear. And if they never come, then I say prophetically and without bitterness, "The west will perish"…আমার বিলম্বকামী মিত্রবর্গ যত দিন না আসিতেছেন, এখনও আমি তত দিন আপ্রাণ ধরিয়া থাকিব। যদি তাঁহারা আমার সাহায্যার্থে না আসেন, তাহা হইলে আমি শান্তভাবে এই ভবিষ্যদ্বাণী করিতেছি যে, "প্রতীচীর পতন হইবে।" ইটালী যে নজীরের সৃষ্টি করিয়াছে, তাহা যে হাবসী সম্রাটের ঐ ভবিষ্যদ্বাণী সফল হইবার পথ প্রশস্ত করিয়া দিবে, তাহাতে বিন্দুমাত্রও সংশয় নাই।

এ দিকে অষ্ট্রিয়ার সহিত জার্ম্মাণীর ত একটা মৈত্রী-বন্ধন হইয়াই গিয়াছে। শুনিতেছি, ইটালীর সহিতও অষ্ট্রিয়া ও জার্ম্মাণীর একটা মৈত্রী-বন্ধন হইয়া গিয়াছে। তাহা যদি হইয়া গিয়া থাকে, তাহা হইলে বিগত য়ুরোপীয় মহাযুদ্ধের পূর্ব্বে মধ্য-য়ুরোপে যে ত্রিশক্তির সম্মেলন ছিল, তাহারই আবার প্রবর্ত্তনা করা হইল। মুসোলিনী এই ব্যাপারে অষ্ট্রিয়ার শুম্‌নিগকে অভিবাদনও করিয়াছেন। ব্রুসেলস সহরে লোকার্ণো চুক্তির স্বাক্ষরকারীদিগের যে সম্মেলন হইবার কথা, তাহাতে যোগদান করিবার জন্ম বেলজিয়ামের প্রধান সচিব ইটালীকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। সেই নিমন্ত্রণ পত্রের জবাবে ইটালী জানাইয়াছেন যে, ইটালী চিরকালই শান্তিরক্ষার কার্য্য করিবার জন্ম উৎসুক। তবে উহার প্রথম বৈঠকে জার্ম্মাণীকেও যোগ দিবার জন্ম আহ্বান করা উচিত। তিনি ঐ বৈঠকে উপস্থিত না থাকিলে এই বিষয়ের অবস্থা অধিকতর জটিল হইবে। ঐ গো! "যার ভয় কর তুমি, সেই ভদ্রকালী আমি।" পাছে ইটালী জার্ম্মাণীর দিকে ভিড়িয়া পড়ে,—এই ভয়ে গ্রেট বৃটেন এবং ফ্রান্স ইটালীর অনেক ধমক সহিয়াছেন। কিন্তু তথাপি যে তাহাই ঘটিল!

মুসোলিনী

হার হিটলার

হাবসীদিগের কথা

য়ুরোপীয় শক্তিবর্গ এবং জাতিসঙ্ঘ ইটালীর বিরুদ্ধে শ্যাংসন বা শাস্তিদানমূলক ব্যবস্থা তুলিয়া লইয়াছেন। বলা বাহুল্য, এখনও হাবসী সংগ্রামের অবসান হয় নাই। ইটালীয়ানরা এখন ঐ দেশের অনেক স্থান জয় করিতে পারে নাই বলিয়া মধ্যে সংবাদ পাওয়া গিয়াছিল। হাবসীরা এখনও কেবল স্বদেশপ্রেমের বশবর্ত্তী হইয়া ইটালীর বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাইতেছে। ঐ সকল সংগ্রামের সংবাদ এখন আর এদেশে আসিয়া পৌঁছিতেছে না। অনাথ তাহারা এখন কেবল অনাথশরণের শরণ লইয়া সংগ্রাম চালাইতেছে। মধ্যে সংবাদ পাওয়া যায় যে, ইটালীর কতকগুলি সৈনিককে হাবসীরা বিনষ্ট করিয়াছে। যুদ্ধ শেষ হইবার পূর্ব্বে এরূপ শ্যাংসন তুলিয়া লওয়া কোনমতেই সমর্থন করা যাইতে পারে না। যদি যুদ্ধ শেষ হইয়া গিয়া থাকে,—যদি হাবসীরা ইটালীয়ানদিগের বশ্যতা স্বীকার করিয়া থাকে,—তাহা হইলে হাবসী সম্রাট সে কথা বলিতেছেন না কেন? আদ্দিস আবাবা হইতে আগত ইটালীর তিনখানি রণ-বিমানপোতের আরোহীদিগকে হাবসীরা আক্রমণ করিয়া সংহার করিয়াছে। কেবলমাত্র কাদার বেরেলো পলায়ন করিয়া প্রাণ

রক্ষা করিতে পারিয়াছেন। রুশবিমানখানি দেকেওিতে নামিয়াছিল। সেইখানেই হাবসীরা ইটালীয়দিগকে আক্রমণ করিয়াছে। এই স্থানে সর্ব্বসমেত ৩০ জন ইটালীয় নিহত হইয়াছিল। আরও প্রকাশ যে, আদ্দিস আবাবা এবং জিবুতি রেলপথের অকাকি এবং নজ্জ নামক স্থানে হাবসীরা কিয়দংশ ভাঙ্গিয়া দেয়। স্থানটি মেরামত করা হইয়াছে। বিষাক্ত গ্যাস দ্বারা আক্রান্ত হইবার ভয়ে দেশভক্ত হাবসীরা এইভাবে যুদ্ধ করিতেছে।

হাবসী জাতির কথা

হাবসী সম্রাট জেনেভায় জাতিসঙ্ঘে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাই হাবসী জাতির মর্ম্মকথা। তিনি হাবসীজাতির এই দুর্দশার জন্য জাতি-সঙ্ঘকেই দায়ী করিয়াছিলেন। তিনি আবেগ-কম্পিত স্বরে বিষবাষ্প নিক্ষেপের কথা বলিতে বলিতে বলেন, ৯ খানি হইতে ১৮খানি বিমানপোত শ্রেণীবদ্ধ এবং দলে দলে বিভক্ত হইয়া ইথিওপিয়ার উপর বিষময় বাষ্প ছড়াইয়া দিয়াছে। উহার ফলে কেবল সৈনিকেরা মরে নাই,—যাহারা সমরে লিপ্ত হয় নাই, এরূপ সাধারণ অধিবাসীরাও মরিয়াছে। গোমেষাদি গৃহপালিত পশুর দলও মরিয়া নির্ম্মূল হইয়া গিয়াছে। গোচর-ভূমি ও পানীয় জল পর্য্যন্ত বিষবর্ষী বোমার দ্বারা বিষাক্ত করা হইয়াছে। তিনি আরও বলেন যে, এই ভাবের অতিশয় সাংঘাতিক দুষ্কার্য্যের প্রকৃত বিবরণ প্রদানের এবং ইহার প্রতিবাদ করিবার জন্য তাঁহারই তথায় আসিবার প্রয়োজন হইয়াছে। অন্য কেহ জেনিভায় আসিয়া সে কথা যথাযথভাবে বলিতে পারিতেন না। সেই জন্যই তিনি তাঁহার সহকর্ম্মী যোদ্ধৃগণকে লইয়া জেনিভায় আসিয়াছেন। তাঁহারা এবং আমি এই ভীষণ ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়াছি। তাঁহার প্রজাদিগের উপর ইটালী যে কাণ্ড করিয়াছে, তাহার যথোচিত প্রমাণ উপস্থিত করিবার জন্য তিনি তথায় উপস্থিত। তাহার পর হাইলাস সিলাসী জাতিসঙ্ঘের সদস্যগণকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন,—সমস্ত ইথিওপিয়াকে একতাবদ্ধ করিবার জন্য চেষ্টা করা হইয়াছিল; কিন্তু ইটালীর চক্রান্তে সে চেষ্টা ব্যর্থ হইয়া যায়। ইটালী ১৪ বৎসর ধরিয়া যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইয়া আসিতেছে, কিন্তু তাহা হইলেও যদি য়ুরোপের কয়েকটি রাজ্য ইটালীর সহিত বন্ধুত্ব রক্ষা করা প্রয়োজন মনে না করিতেন, তাহা হইলে আজ

সম্রাট হাইলাস সিলাসী

আবিসিনিয়ার এরূপ দুর্গতি হইত না। গোপনে গোপনে যে সন্ধি হইয়াছিল, তাহাতে বাস্তবিক হিসাবে ইটালী ইথিওপীয় যুদ্ধের এই প্রকার পরিণতি হইবে স্বীকার করিয়া লওয়া হয়। কিন্তু তাহা হইলেও ৫২টি রাজ্য এই জেনিভায় উপস্থিত হইয়া আমাকে ভরসা দিয়াছিলেন যে, পররাজ্য আক্রমণকারীকে শেষে জয়যুক্ত হইতে দেওয়া হইবে না। তখন আমি জাতিসঙ্ঘের কথায় বিশ্বাস করিয়াছিলাম। আমি মনে করিয়াছিলাম, জাতিসঙ্ঘেরই শেষে জয় ঘটিবে।

এ দিকে দুর্ব্বল আবিসিনিয়াকে যুদ্ধের জন্য আবশ্যক দ্রব্যাদি পাঠান নিষিদ্ধ হইল, অন্যদিকে ইটালীর হাতে ছিল সুপ্রচুর অস্ত্র-শস্ত্র। উভয় পক্ষের অবস্থার তুলনা করিয়া হাবসী রাজা বলেন,—"আমি জিজ্ঞাসা করি যে, প্রকৃতপক্ষে এই ৫২টি রাজ্যের জাতিসঙ্ঘ দুর্ব্বল পক্ষকে কিরূপ সাহায্য করিয়াছেন? রাষ্ট্রসঙ্ঘের চুক্তি অনুসারে তাঁহারা কত দূর কর্ত্তব্য পালন করিয়াছেন? ইটালীর পক্ষ হইতে আমাকে অনেক সুবিধা করিয়া দিবার প্রস্তাব আসিয়াছিল,—কিন্তু সমস্ত হাবসী জাতির উপর বিশ্বাসঘাতকতা করিতে হইবে বলিয়া আমি সে প্রস্তাবে সম্মত হই নাই। আমি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলির স্বার্থরক্ষার ব্যবস্থা করিতে চাহি। য়ুরোপের তিনটি রাজ্য শাস্তিমূলক বিধান বিনিয়োগ করেন নাই। অন্য রাষ্ট্রগুলি রাষ্ট্রসঙ্ঘের নীতি পালনের কথা মুখে স্বীকার করিলেও কার্য্যে কিছুই করেন নাই; বরং সেই নীতির প্রতিকূল কার্য্য করিয়াছেন। আর্থিক সাহায্যের জন্য আমাদের আবেদন উপেক্ষিত হইয়াছে। এখন জিজ্ঞাসা করি, রাষ্ট্রসঙ্ঘের চুক্তির ১৬ ধারা কিরূপ ভাবে প্রতিপালিত হইয়াছে? আমাদিগকে অর্থাৎ হাবসীদিগকে জিবুতি রেলপথের সুবিধা হইতে বঞ্চিত করা হইয়াছিল, কিন্তু এখন ইটালীয় সৈন্যদিগকে এই রেলপথে সর্ব্ব-প্রকার সুবিধা প্রদান করা হইতেছে। ইহাই কি নিরপেক্ষতার নমুনা? আজ সমস্ত আন্তর্জ্জাতিক নীতি বিপন্ন। তাই আজ আমি আপনাদিগের নিকট আমার দেশকে,—আমার বিপন্ন প্রজা-বৃন্দকে রক্ষা করিবার জন্য আবেদন করিতেছি।" উপসংহারে তিনি বলেন "আমার প্রজাবৃন্দের নিকট আমি কি উত্তর লইয়া যাইব?" হাবসী সম্রাট আমহারিক ভাষায় বক্তৃতা করিয়াছিলেন। এরূপ আবেগপূর্ণ বক্তৃতা ইহার পূর্ব্বে আর কেহ জাতিসঙ্ঘে করেন নাই। কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে বিশেষ কোন ফল ফলে নাই। অনেকে বলেন যে, স্পেন বা ইটালীকে শাস্তিদানমূলক ব্যবস্থা বলবৎ রাখিতেই হইবে। কিন্তু সে কথাও শেষ পর্য্যন্ত রক্ষিত হয় নাই। হাবসী-দিগের প্রতিনিধি বলেন, তাঁহারা জাতিসঙ্ঘকে একটা বাক্যসর্ব্বস্ব প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইতে দেখিতে চাহেন না। আবার শুনা যাইতেছে, ইহুদীদিগকে প্যালেষ্টাইনে স্থান না দিয়া ইথিওপিয়ায় স্থান দেওয়া হইবে। এ সম্বন্ধে জার্ম্মাণীর সহিত ইটালীর একটা আলোচনা চলিতেছে। ফলে অশ্বেত হাবসীদিগকে উচ্ছিন্ন করিয়া এখন তথায় ইহুদী বসান হইবার সম্ভাবনা জন্মিয়াছে। নেগাস কিছু অর্থ ঋণস্বরূপ চাহিয়াছিলেন,—কিন্তু তাহা তিনি পান নাই। যাহা হউক, জাতিসঙ্ঘে আবিসিনিয়ার পালা শেষ হইয়াছে। হাবসী জাতির করুণ কাহিনী নেগাসের বক্তৃতাতে প্রতিবিম্বিত হইয়াছে। উহার উপর আর কিছু বলিবার নাই।

হাবসীরা যে ইটালীয় সৈন্যগণের নিকট সম্পূর্ণ পরাজয় স্বীকার

করিয়াছে, তাহা মনে হইতেছে না। সম্প্রতি হাবসীরা নৈশ অন্ধকারে যাইয়া আদ্দিস আবাবার সন্নিহিত বনভূমিতে আশ্রয় লয়। পরদিন প্রাতে তাহারা রাস কাসার পুত্রের নেতৃত্বে নগর আক্রমণ করিয়াছিল। কিন্তু শেষে তাহারা রাস হাইলুর সৈন্যগণ কর্তৃক পরাজিত হইয়া পলায়ন করিয়াছে। ইটালী তাহার চিরাচরিত ব্যবহারানুযায়ী এই কৃষ্ণাঙ্গ জাতির উপর বোমাবর্ষণ করিয়াছিল। সংবাদটি ইটালীয়দিগের নিকট হইতে আসিয়াছে, সুতরাং বোমায় বিষবাষ্প ছিল কি না, তাহা কিছু প্রকাশ নাই। যাহা হউক, তাহাতে ব্যাপার কি, তাহা বুঝিয়া লইতে বোধ হয়, কাহারও বিলম্ব হইবে না। কয়েক জন ইথিওপীয় সৈনিক ইটালীয় সৈনিকদিগের হস্তে বন্দী হইয়াছেন। তন্মধ্যে আছেন গোজ্জামের এক জন খ্যাতনামা ধর্ম্মযাজক আর এক জন খৃষ্ট ধর্ম্মযাজক। এই ব্যাপারে এখন স্বতঃই সন্দেহ জন্মিতেছে, ইথিওপীয় সংগ্রামের এখনও নিবৃত্তি হয় নাই। উহা বরাবরই চলিতেছে।

সম্রাটকে আক্রমণ

গত ৩২ শে আষাঢ় (ইং ১৬ জুলাই) বৃহস্পতিবার প্রাতে লণ্ডনের হাইড পার্কে একটি বড়ই আতঙ্কজনক ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে। ইংলণ্ডের রাজা—ভারতের সম্রাট অষ্টম এডোয়ার্ড ৬টি রক্ষী সৈন্যদলকে নূতন পতাকা দিয়া সংবর্দ্ধিত করিতে গিয়াছিলেন। সংবর্দ্ধনা উপলক্ষে সম্রাট একটি স্বল্প বক্তৃতা করেন। তিনি বলেন, "পৃথিবীর সমস্ত মানুষ আজ শান্তি পাইতে চাহিতেছে। যাহাতে পৃথিবীতে শান্তি অক্ষুণ্ণ থাকে, সকলেই আজ তাহার জন্য কামনা করিতেছে। শান্তি বিরাজিত থাকিলে যে সেবা এবং কর্ত্তব্যপালনের সুযোগ পাওয়া যায়, তাহার মহত্ব যুদ্ধক্ষেত্রের কর্ত্তব্যপালন ও সেবাব্রতেরই সমান। আপনারা য়ুরোপের বিগত মহাযুদ্ধের কথা ভুলিয়া যান নাই। আমাদের জীবনে এবং আমাদের ভবিষ্যদ্বংশধরদিগের জীবনে সেরূপ দুর্দ্দিন যেন আর না আসে, ইহাই আমার আন্তরিক কামনা।" ভানুকিরণোজ্জ্বল প্রভাতে এই অনুষ্ঠানটি হইয়াছিল। বাকিংহাম প্রাসাদ হইতে হাইড পার্ক পর্য্যন্ত সম্রাটকে দর্শন করিবার জন্য লোক সমবেত হইয়াছিল। সম্রাট এই জনতার মধ্য দিয়া অশ্বারোহণে গমন করেন, তাঁহার পার্শ্বে যাইতেছিলেন তাঁহার ভ্রাতা ডিউক অব ইয়র্ক। রাজমাতা ও রাজমহিলাগণ উৎসব দর্শন করিতে গিয়াছিলেন।

ঐ চাঞ্চল্যকর ঘটনা সংঘটিত হয় ফিরিবার সময় পথে। সম্রাট যখন কনষ্টিটিউশন হিলের উপরিস্থিত একটি তোরণ দিয়া আসিতেছিলেন, সেই সময়ে জনতার মধ্য হইতে একটা লোক তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া একটি অস্ত্র নিক্ষেপ করে। পরে দেখা যায় যে, ঐ নিক্ষিপ্ত অস্ত্রটি একটি রিভলভার। রিভলভারটি সম্রাটের অশ্বের পার্শ্বদেশে আঘাত করে। রাজ-অশ্ব উহাকে পদাঘাতে দূরে ফেলিয়া দেয়। সম্রাট সেই সময়ে চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া প্রশান্তচিত্তে ধীরে ধীরে অশ্বপৃষ্ঠে অগ্রসর হইতে থাকেন। এ দিকে এক জন পুলিসের লোক তাহার অশ্ব হইতে সেই আততায়ীর উপর লাফাইয়া পড়িয়াছিল এবং জনতার সাহায্যে তাহাকে ধরিয়া ফেলে। পুলিসের অন্যান্য লোকও তথায় উপস্থিত হয় এবং লোকটাকে গ্রেপ্তার করে। লোকটিকে ধরিয়া লইয়া যাইবার সময় আর একটা লোক পুলিসের নিকট উপস্থিত হয় এবং তখন উভয় পক্ষে ধ্বস্তাধ্বস্তি আরম্ভ হয়। সে লোকটাকেও পুলিস গ্রেপ্তার করিয়া লইয়া যায়। পথে দুই জন মহিলা প্রত্যক্ষদর্শী পুলিসের মোটর-যোগে ঐ স্থান হইতে চলিয়া যান।

যে ব্যক্তি রাজাকে লক্ষ্য করিয়া এই পিস্তলটি নিক্ষেপ করিয়াছিল, সে ব্যক্তির চরণ বিকৃত। তাহার নাম জর্জ্জ এণ্ডরুজ মেহন। আপাততঃ শুনা যাইতেছে যে, সে সংবাদপত্রে কায করে। সে লোকের জীবন বিপন্ন করিবার অভিপ্রায়ে রিভলবার রাখিয়াছিল, এই অভিযোগে অভিযুক্ত হইয়া বোষ্ট্রীট থানায় হাজতে রক্ষিত হয়। এক জন গোয়েন্দা বলিয়াছেন যে, মেহন তাহাকে
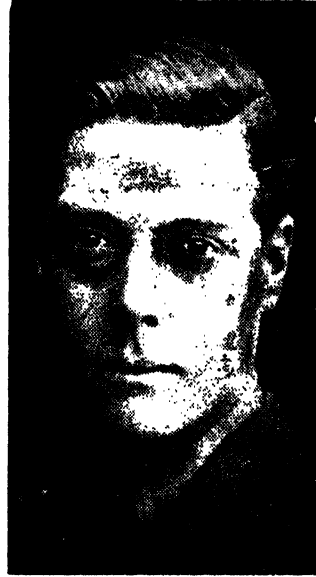
ভারতের সম্রাট অষ্টম এডওয়ার্ড

বলিয়াছে যে,সমস্ত দোষটাই সার জন সাইমনের। রাজাকে আঘাত করিবার কোন অভিসন্ধি মেহনের ছিল না। সে প্রতিবাদস্বরূপ ঐরূপ কার্য্য করিয়াছে। মেহনের সলিসিটার যে বিবৃতি দিয়াছেন, তাহাতে তিনি বলিয়াছেন যে, আসামী এই কথাই বলিতে চাহে যে, তাহার মনে সম্রাটকে হত্যা করিবার অভিপ্রায় ছিল না কিম্বা সে ঐরূপ চেষ্টাও করে নাই। স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড প্রকাশ করিয়াছেন যে, ঐ নিক্ষিপ্ত রিভলভারটির পাঁচটি ঘরে চারিটি গুলী ভর্ত্তি ছিল, একটি ঘর খালি ছিল। লোকটি বিদেশী নহে। এক জন প্রত্যক্ষদর্শী বলিয়াছেন যে, এই ব্যাপারে সম্রাট কিছুমাত্র বিচলিত হন নাই। তিনি যেমন ভাবে যাইতেছিলেন, ঠিক সেই ভাবেই অগ্রসর হইতে থাকেন। এক জন পুলিস ও একটি স্ত্রীলোক ঐ লোকটার হস্তে আঘাত করাতে সে রিভলভারটি ফেলিয়া দিতে বাধ্য হইয়াছিল।

এ সময় একটা ধ্বস্তাধ্বস্তিও হইয়াছিল। আর এক জন বলিয়াছেন যে, এক জন সওয়ার এবং একটি পুলিসের ঘোড়া আততায়ীর সম্মুখে আসিয়া পড়িয়াছিল বলিয়া তাহার দৃষ্টিপথ রুদ্ধ হয়, সে তখন একটু ইতস্ততঃ করে। তাহার পর সম্রাটের দিকে রিভলভারটি নিক্ষিপ্ত হয়। এই ব্যাপারে সম্রাটের মুখ গম্ভীরভাব ধারণ করে। তিনি স্বীয় অশ্বাধ্যক্ষ সার জন এডোয়ার্ডকে কিছু বলেন। অশ্বাধ্যক্ষ মেজর জেনারাল সার জন ব্রুকের সহিত আসিতেছিলেন। তখন সম্রাটের এক জন এডিকং ঘটনাস্থলে যাইয়া পুলিসকে কিছু বলিয়া আসেন। জনৈক স্ত্রীলোক বলেন যে, "আক্রমণকারী লোকটা আমাদের পিছনের চতুর্থ সারি হইতে আসিয়াছিল বলিয়া মনে হইতেছে। সে জনতাকে ঠেলিয়া ফুটপাথের ধারে যায়। ঐ সময় এক ব্যক্তি 'উহাকে ধর, উহাকে ধর' বলিয়া চীৎকার করে। সে পুলিসের সারি ঠেলিয়া যাইবার চেষ্টা করিবামাত্র এক জন স্ত্রীলোক তাহার পিছু পিছু যান। ঐ সময় এক জন পুলিস এবং স্ত্রীলোকটি তাহার হাত হইতে রিভলভারটি ধাক্কা দিয়া ফেলিয়া দেয়। উহা রাস্তার উপর যাইয়া পড়ে।' এইরূপ নানা জনের মুখে ভিন্ন ভিন্ন কথা শুনা যায়। এই ঘটনায় সম্রাট তাঁহার কার্য্য-তালিকা অনুসারেই কায করিয়া গিয়াছেন। উহার কিছুমাত্র পরিবর্ত্তন করেন নাই।

এণ্ড্রুজ মেহন

সার জন সাইমন

কমন্স সভায় সার জন সাইমন গম্ভীরভাবে বলেন যে, "প্রকৃত ব্যাপার কি ঘটিয়াছিল, তাহা এখনও যথাযথভাবে জানিতে পারা যায় নাই। তবে একটা রিভলভার সম্রাটের এবং তাঁহার অনুগমনকারী সৈনিকদিগের মধ্যে রাস্তার উপর আসিয়া পড়িয়াছিল। আক্রমণকারীকে ধরিয়া হাইড পার্কে থানায় লইয়া যাওয়া হইয়াছে। রিভলভার হইতে গুলী ছোড়া হয় নাই। তবে রিভলভারটির ৫টি ঘরের মধ্যে ৪টি ঘরে গুলী পোরা ছিল।"

যাহা হউক, ভগবান যে সম্রাটকে রক্ষা করিয়াছেন, তাঁহার যে কোন বিঘ্ন ঘটে নাই, সে জন্ম আমরা ভগবানকে আন্তরিক ধন্যবাদ করিতেছি। ভারত হইতে এবং পৃথিবীর অন্যান্য বহু স্থান হইতে সম্রাটের নির্ব্বিঘ্নতার জন্য আনন্দ প্রকাশ করিয়া টেলিগ্রাম প্রেরিত হইয়াছে। সম্রাট দীর্ঘজীবী হউন, ইহাই আমাদের একান্ত কামনা।

বর্ত্তমান যুগে যুদ্ধের স্বরূপ

য়ুরোপে এবং পৃথিবীর অন্যান্য স্থানের শ্বেতকায় জাতির মধ্যে সমরাতঙ্ক উপস্থিত হইয়াছে। এখন কেহ সংগ্রাম করিতে ইচ্ছা করেন না, কিন্তু নিয়তির এমনই একটা গতি আসিয়া পড়িয়াছে যে, সকলেই মনে করিতেছেন যে, লোকের ইচ্ছা থাকুক আর নাই থাকুক, অচিরভবিষ্যতে য়ুরোপে একটা অতিভীষণ যুদ্ধ উপস্থিত হইবে। কোথায় কাহাদের মধ্যে ঐ যুদ্ধ ঘটিবে, তাহা কেহ ঠিকমত বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছেন না সত্য, কিন্তু একটা ভীষণ সংগ্রাম যে আসন্ন, ইহা য়ুরোপের প্রত্যেক রাজনীতিক যেন নরাঙ্কিতন্যায় মনে করিতেছেন। কাযেই এখন সমস্ত য়ুরোপে ও মার্কিণে যুদ্ধের কথা লইয়া বিশেষভাবে আলোচনা চলিতেছে। এখানে বলা আবশ্যক যে, বর্ত্তমান সময়ে বিজ্ঞানের উন্নতির সহিত সংগ্রামের স্বরূপ অনেক পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। পূর্ব্বে সংগ্রাম যেরূপ ছিল, এখন আর তাহা নাই। বিষয়টি প্রয়োজনীয় বোধে এ স্থলে আমরা সে কথার আলোচনা করিব।

বর্ত্তমান সময়ে যুদ্ধের প্রণালী বদলাইয়া গিয়াছে। য়ুরোপেই এই প্রণালীর পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। পিটার দি গ্রেটের অথবা নেপোলিয়ান বোনাপার্টের আমলে লোক যুদ্ধ বলিতে যাহা বুঝিত এবং যুদ্ধের পদ্ধতি যেরূপ ছিল, এখন আর তাহা নাই। সবই ওলট-পালট হইয়া গিয়াছে। যাঁহারা মনে করেন যে, বর্ত্তমান সময়ে বৈজ্ঞানিক জ্ঞানবলে কতকগুলি পরসংহারক অস্ত্র-শস্ত্র নির্ম্মিত হইতেছে এবং তাহার প্রয়োগ হেতু যুদ্ধের পদ্ধতি এবং মারাত্মকতা বৃদ্ধি পাইয়াছে, তাঁহারা ব্যাপারটা ঠিকমত বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছেন না। নেপোলিয়ানের সময় পর্য্যন্ত যুদ্ধব্যাপারটা এত ভীষণ ছিল না। তখন যে সকল লোক সৈনিকের বৃত্তি গ্রহণ করিত, তাহাদের মধ্যেই সংগ্রাম সীমাবদ্ধ ছিল। ইহা ছিল কতকটা ব্যাপক মল্লক্রীড়ার মত। তখন প্রত্যেক দেশ বা দেশাধিপতি কতকগুলি অস্ত্রচালনাকৌশলী লোককে বেতন দিয়া রাখিতেন। তাঁহারাই ছিলেন সৈনিক। যুদ্ধ এই সৈনিকদিগের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। সাধারণ লোকের গায়ে ঐ যুদ্ধের আঁচ বড় অধিক লাগিত না। যে দেশের বা রাষ্ট্রপতির সৈনিকরা প্রতিপক্ষের ঐরূপ সেনাদলকে পরাজিত করিতে সমর্থ হইতেন, সেই দেশের বা রাষ্ট্রপতির যুদ্ধে জয় হইত, তিনি প্রতিপক্ষের রাজ্যকে গ্রাস করিতে পারিতেন। এইরূপে

প্রতিপক্ষের রাজ্য বিজেতৃ-পক্ষের অধীন হইত। ইহার ফলে তিনি ঐ রাজ্য হয় নিজ অধিকারভুক্ত করিতেন অথবা ঐ বিজিত রাজ্যকে করদানে বাধ্য করিতেন। ইহা যেন কতকটা দাবাখেলার মত ব্যাপার ছিল।

কিন্তু এখন এই অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। নেপোলিয়ানের আমলেই এই পরিবর্ত্তনের সূত্রপাত হয়। নেপোলিয়ান জার্ম্মাণী জয় করিয়া উহাকে চিরপদানত করিয়া রাখিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। তিনি জার্ম্মাণীকে এত অল্প সৈন্য রাখিতে বাধ্য করিয়াছিলেন যে, তদ্দ্বারা জার্ম্মাণীর পক্ষে কোন প্রকারেই আত্মরক্ষা করা সম্ভব হইত না। কিন্তু মানুষ যাহা ভাবে, বিধাতা তাহা ভাবেন না। স্বার্ণ হষ্ট এবং গ্নীন নামক দুই জন প্রতিভাশালী সৈনিক পুরুষ ইহার মধ্য হইতে একটি ফাঁকি বাহির করেন। ইঁহারা দেশের সকল সমর্থ ব্যক্তিকে সেনা-বিভাগে লইয়া তাহাদিগকে উপযুক্ত সামরিক শিক্ষা দিয়া ছাড়িয়া দিতেন। যাইবার সময় তাহাদিগকে অস্ত্র শস্ত্র প্রদান করিতেন এবং সাধারণ নাগরিকদিগের ন্যায় জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে বলিতেন। এই প্রকারে দেশের প্রায় সমস্ত সমর্থ লোকই সামরিক শিক্ষা লাভ করিতে থাকে। ইহাদের নাম-ধাম সরকারের নিকট লেখা থাকিত, এবং যুদ্ধ বাধিলে তাহাদের প্রয়োজনমত ডাক পড়িত। এই প্রকারে জার্ম্মাণীতে সমস্ত সমর্থ ব্যক্তিকে লইয়া জাতীয় সৈন্য গঠিত হইয়া উঠিল। ফলে জার্ম্মাণীতে বিশালবাহিনী যেরূপভাবে গঠিত হইয়াছিল, তাহারই ফলে নেপোলিয়ানকে লিপজিকে বিড়ম্বিত এবং ওয়াটার্লুতে বিধ্বস্ত হইতে হইয়াছিল।

যাহা হউক, এই ব্যাপার হইতে সমর-সম্পর্কিত ব্যাপারের নূতন অধ্যায় আরম্ভ হইয়াছে। লোক এই ব্যাপার হইতেই উপলব্ধি করিতে আরম্ভ করে যে, কতকগুলি বেতনভুক্ সৈনিকের হস্তে কোন জাতির বা দেশের ভাগ্য ন্যস্ত করা সঙ্গত নহে। যখন যুদ্ধ দ্বারা জাতির সর্ব্বনাশ ঘটে, তখন দেশের প্রত্যেক লোকেরই যথাসর্ব্বস্ব দিয়া জাতীয় স্বাধীনতা রক্ষা করা কর্ত্তব্য। কিন্তু তাহা হইলেও এই বিষয়টির পূর্ণ পরিণতি লাভ হইতে শতাধিক বর্ষ অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে। বিগত য়ুরোপীয় মহাযুদ্ধের পর হইতে য়ুরোপীয় জাতিরা ঠেকিয়া শিখিয়াছে যে, যদি কোন জাতি সামরিক আয়োজনে সম্পূর্ণ সজ্জিত না হইতে পারেন, তাহা হইলে সেই জাতির আর নিস্তারের উপায় নাই। অবশ্য জাতির সমস্ত ধন-জন দিয়া সমরায়োজন করার মত দুর্ভোগ আর কিছুই হইতে পারে না। কিন্তু এখন পৃথিবীর সকল জাতিরই ইহা বেশ ধারণা হইয়াছে যে, হয় ঐ প্রকার দুর্ভোগকে, না হয় জাতীয় ধ্বংসকে বরণ করিতে হইবে। য়ুরোপের এবং অন্যান্য স্থানের শ্বেতকায় জাতির মধ্যে এই রাক্ষসী সমস্যা অত্যন্ত নগ্নমূর্ত্তিতে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। তাই এখন সমস্ত জাতিই যুদ্ধার্থ সম্পূর্ণ প্রস্তুত হইতেছে। যুদ্ধকালে আর কোন জাতিই বিচ্ছিন্ন ও ব্যষ্টিভাবে কায করিতে পারিবেন না, দেশের সকলকে সমষ্টিগতভাবে, অর্থাৎ ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য বিসর্জ্জন দিয়া একমনে এবং একপ্রাণে সামরিক কার্য্যে আত্ম-নিয়োগ করিতে হইবে। আজ যদি গ্রেট ব্রিটেন কোন বড় যুদ্ধে লিপ্ত হয়েন, তাহা হইলে গ্রেট বৃটেনের ৫ কোটি লোককেই সমরে বিজয়লাভ করিবার জন্য একমনে একপ্রাণে রণচণ্ডীর চরণে তাহাদের যথাসর্ব্বস্ব সমর্পণ করিয়া কায করিতে হইবে। উহাতে অন্যথা করিলে চলিবে না। তাহাদের সমস্ত কল-কারখানাই রণসম্ভার প্রস্তুত করিবার জন্য নিযুক্ত করিবে, সমস্ত মজুর ঐ কার্য্য করিতেই রত হইবে। সে কার্য্যসাধনে তাঁহারা শেষ পেনিটি এবং শেষ প্রাণীটি পর্য্যন্ত নিয়োগ করিতে কুণ্ঠিত হইবেন না। অর্থাৎ বর্ত্তমান যুগে সংগ্রামে বিজয়লাভ করিবার জন্য সর্ব্বস্ব পণ করিতে হইবে। বিজ্ঞানের যত দূর উন্নতি হইয়াছে, তাহার ফলও রণচণ্ডীর চরণে নিবেদন করিয়া স্বজাতি-সংহারে উহা নিয়োগ করা চাই। সুতরাং বর্ত্তমান সময়ে য়ুরোপীয় সভ্যতা কোথায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহা একটু চিন্তা করিলেই বুঝা যাইবে।

বিজ্ঞানের উন্নতিফলে এক স্থান হইতে অন্য স্থানে সৈন্য লইয়া যাওয়া এবং মাল স্কন্ধাবারে রসদাদি অতি অল্পসময়ের মধ্যে বহন করিয়া আনা অতি সহজ হইয়া আসিয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে কোন দেশের পক্ষেই তাহার সমস্ত সীমান্তপ্রদেশ মনুষ্যের বৃতির দ্বারা সুরক্ষিত করা কঠিন নহে। সে বৃতি বা বেড়া ভাঙ্গাও বড় সহজ নহে। বিগত য়ুরোপীয় মহাযুদ্ধে ইহা সকলেই বুঝিয়াছেন, উত্তর সাগর হইতে ভূমধ্য সাগরের বেলাভূমি পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ ভূভাগ এই প্রকার ব্যূহ দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়াছিল। তিন বৎসর ধরিয়া চেষ্টাতেও উহা ভাঙ্গিতে পারা যায় নাই। যদি জর্ম্মাণীতে অবরোধ জন্য খাদ্যাভাব না ঘটিত, তাহা হইলে সম্ভবতঃ উহা ভাঙ্গিতে আরও অধিক সময় লাগিত। সুতরাং বর্ত্তমান যুগে যুদ্ধটা যে ভীষণ ব্যাপারে পরিণত হইয়াছে, তাহা ইহা হইতে বুঝা যাইতে পারে।

পৃথিবীর সর্ব্বত্রই, বিশেষতঃ য়ুরোপের সকল জাতিই আজ যুদ্ধার্থ এইরূপ ভাবে প্রস্তুত হইতেছে। কিন্তু কোন জাতিই অগ্রসর হইয়া আজ সংগ্রামে লিপ্ত হইতে সম্মত নহেন। কারণ, বিজয়লাভের মূল্য হইতেছে সর্ব্বস্ব পণ। যে জাতির সাম্রাজ্যের বিস্তার এবং ধনের পরিমাণ যত অধিক, সে জাতিকে তত অধিক পণ করিতে হইবে। সেই জন্য বড় বড় সাম্রাজ্যবাদী জাতিরা ইচ্ছা করিয়া সমরানলে ঝাঁপ দিতে প্রস্তুত নহেন। কারণ, তাহাতে তাঁহাদের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পণ ধরিতে হইবে। সাম্রাজ্য এবং ধনে গ্রেট বৃটেনই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। সেই জন্য গ্রেট বৃটেন একটা তুচ্ছ কথা লইয়া রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে চাহেন না, ইহা গ্রেট বৃটেনের সমীক্ষা-কারিতারই প্রমাণ। যুদ্ধ বাধিলে বাণিজ্যের বিশেষ ক্ষতি হইয়া থাকে। বিগত য়ুরোপীয় মহাযুদ্ধের ফলে বহু বাণিজ্য-প্রধান জাতির তাহাই হইয়াছিল। গ্রেট বৃটেনের বাণিজ্যও বিশেষ ক্ষুণ্ণ হইয়াছিল। বাণিজ্যনাশ হইলে গ্রেট বৃটেনের অতিশয় ক্ষতি হইবে। তাই বৃটেন সমরাঙ্গনে অবতীর্ণ হইতে অসম্মত। কিন্তু তাহা হইলেও যখন সকল জাতিই যুদ্ধের সমস্ত উপকরণ বৃদ্ধি করিতেছেন, তখন গ্রেট বৃটেন নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন না। তাঁহাকেও সমরায়োজন বৃদ্ধি করিতে হইতেছে। ধনাঢ্যদেরই সম্পত্তি রক্ষার জন্য অধিক প্রস্তুত থাকিতে হয়। কিন্তু এইরূপ সসজ্জ অবস্থা শান্তিরক্ষার কতদূর অনুকূল হইবে, তাহাই বিচার্য্য। ইহা বিগ্রহের অনুকূল অবস্থা সৃষ্টি করিতে পারে। সমস্যা ত এইখানেই।

—

স্পেনে বিদ্রোহ

স্পেনে বিদ্রোহ উপস্থিত। এই বিদ্রোহ নিতান্ত সামান্য বলিয়া উপেক্ষণীয় নহে। ব্যাপারটা বুঝিতে হইলে গত আষাঢ় মাসের সাময়িকে আমরা যে সকল কথা বলিয়াছি, তাহা বিশেষ মনোযোগের সহিত পাঠ করা উচিত। গ্রীক সভ্যতার আমল হইতে য়ুরোপে ধনীর সহিত শ্রমীর যে বিবাদ বাধিয়া আসিতেছে, তাহা নিতান্তই নিষ্ঠুর এবং অস্বাভাবিক। সে বিবরণ পাঠ করিয়া নিশ্চয় য়ুরোপের হৃদয়হীনতায় স্তম্ভিত হইতে হয়। এখন দেখা যাইতেছে যে, স্পেনে সেই বিবাদ একটু রকমফের হইয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। স্পেনে এখন সোস্যালিষ্টরা বা সমাজতন্ত্রীরাই শাসন-তরণীর হাল ধরিয়া রহিয়াছেন। কিন্তু ভোটদাতাদিগের মধ্যে রাজতন্ত্রীদিগের সংখ্যা অধিক ছিল। কি প্রকারে সমাজতান্ত্রিকদল শাসনতরণীর কাণ্ডারী হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহার বিবরণ গত মাসে দেওয়া হইয়াছে। এখন স্পেনের সমাজতন্ত্রবাদীরা তাঁহাদের রাজ্যে রুসিয়ার ন্যায় সর্ব্বস্বত্ববাদ প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহেন। পরলোকগত মিষ্টার ব্র্যাডল বলিতেন, যার নাম ভাজা চাল, তারই নাম মুড়ি। যারে বলে সমাজতন্ত্রবাদ, তারেই বলে সর্ব্বস্বত্ববাদ (Communism), উভয়ের মধ্যে ভেদ নাই। এখন শ্রমিক প্রভৃতিরা সমাজতন্ত্রবাদ প্রতিষ্ঠার শঙ্কায় শঙ্কিত এবং চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। উহারা এবং সৈনিকরা সর্ব্বস্বত্ববাদীদিগের কঠোর শাসন পছন্দ করে না। সেই জন্য তাহারা তথাকথিত গণতন্ত্রের অর্থাৎ সর্ব্বস্বত্ববাদীদিগের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান করিয়াছে। প্রজাতন্ত্রীরা যে ভাবে উদ্যোগ-আয়োজন করিতেছিল, তাহা দেখিয়া সাধারণ লোক মনে করিয়াছিল যে, স্পেনে বুঝি দ্বিতীয় সোভিয়েট সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। আমরা গতবারেই বলিয়াছি যে, সমাজতন্ত্রী দলের অন্যতম নেতা অধুনা স্পেনের রাজনীতিক তরণীর কর্ণধার সেনর আজানা বলিয়াছিলেন যে, তিনি নিরপেক্ষভাবে রাজকার্য্য পরিচালিত করিবেন। ইহাতে সমাজতন্ত্রী দল অধীর হইয়া তথায় হাঙ্গামা উপস্থিত করে। তিনি বলিয়াছেন যে, তাঁহারা কোন ধর্ম্মাবলম্বী-দিগকেই উৎপীড়িত করিতে চাহেন না; কিন্তু তাহা সত্ত্বেও বিদ্রোহ নিবারিত হয় নাই। এবার বিদ্রোহের উদ্ভব হইয়াছে মাদ্রিদ নগর হইতে প্রায় ৯০ মাইল দূরস্থিত কুয়েঙকা নামক স্থানে। এখানে প্রকৃত দাঙ্গা হইয়াছিল এবং কয়েক জন হতাহত হইয়াছিল। তবে ঐখানে শেষে স্পেনের রাজতন্ত্রী দলের (ফ্যাসিষ্ট) ১৮৫ জনকে (নেতা, কর্ম্মচারী এবং জাহাজের লোককে) গ্রেপ্তার করা হয় বলিয়া সংবাদ পাওয়া যায়। স্পেনের সরকারী পুলিস পক্ষের কথা এই যে, এই সকল লোক শীঘ্রই স্পেনে একটা গণ্ডগোল বাধাইবার চেষ্টা করিতে-ছিলেন, তাই তাঁহাদিগকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। স্পেনের পার্লামেণ্ট সভা কর্ত্তৃক নিযুক্ত স্থায়ী কমিশনের যদি আবশ্যক মনে হয়, তাহা হইলে সঙ্কটপূর্ণ অবস্থাজ্ঞাপক ঘোষণা অনির্দ্দিষ্টকালের জন্য বলবৎ থাকিবে। এই সময়েই বুঝা যায় যে, ব্যাপারটি নিতান্ত সহজ হইবে না। ঠিক ঐ সময়েই সংবাদ পাওয়া যায় যে, মরক্কোর অন্তর্গত মেলিল্লা নামক স্থানে সেনাবারিকের সৈন্যরা বিদ্রোহী হইয়া উঠিয়াছে। তথায় সামরিক আইন জারি করা হইয়াছে এবং স্পেনের বৈদেশিক সৈন্যদল সহর দখল করিয়া হইয়াছে। মেলিল্লা সেনাদলের কর্ণেল সিটেল্লা, ও তাঁহার অধীনস্থ সমস্ত সৈন্যই বিদ্রোহী হইয়া দাঁড়াইয়াছেন। তথাকার প্রধান সেনা-নায়ক বিদ্রোহীদিগের হস্তে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন। স্পেনের প্রধান সেনাপতি জেনারাল গোমেজ মোটাটো কিউটা হইতে মোনল্লায় রওনা হইয়াছেন। সরকার পক্ষ হইতে তখন প্রচারিত হয় যে, ঐ বিদ্রোহ বহুদূর পর্য্যন্ত বিস্তারলাভ করে নাই। সুতরাং সেনাপতি মোটাটো অল্প-সময়ের মধ্যে এই অশান্তির উপশান্তি করিতে সমর্থ হইবেন। আবার ঐ তারিখেই সংবাদ পাওয়া যায় যে, স্পেনের শাসনাধীন মরক্কো রাজ্যের সর্ব্বত্রই বিদ্রোহ উপস্থিত হইয়াছে। আরজিলা বারাসি এবং এলকামা নামক স্থানে সৈনিকরা বিদ্রোহী হইয়া উঠিয়াছে। ঐ বিদ্রোহ প্রবলভাবে প্রসারলাভ করিতেছে। ইহার পরই সংবাদ পাওয়া যায় যে, টেপিনীস্থিত স্পেনিস সৈন্য-দিগকে কিউটা হইয়া আলজিরাসে যাইবার জন্য আদেশ দেওয়া হইয়াছে এবং মরক্কোতে সেনাদল বর্দ্ধিত করিবার জন্য সমস্ত পদাতিক সৈন্যকে ঐ সঙ্গে লইয়া যাইতে বলা হইয়াছে। মরক্কোতে বিদ্রোহ অতি শীঘ্র বিস্তারলাভ করিতেছে। স্পেনের সরকারী সংবাদে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, তাহাদের সরকারী সৈন্যগণ কিউটাস্থিত বিদ্রোহীদিগের উপর বোমাবৃষ্টি করিতেছে। ইহাতে মনে হইতেছে যে, ঐ সময় কিউটার বিদ্রোহীরা প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল।

এই ব্যাপারের প্রকৃত সংবাদ পাওয়া কঠিন হইয়া উঠিয়াছে; সকল পক্ষই আপনাদিগের স্বার্থের অনুকূলভাবেই সংবাদ পাঠাইতেছেন। এই হাঙ্গামাটা বাধিয়াছে প্রগতিশীল দলে এবং রাজতন্ত্রী দলে। এখন প্রগতিশীল দলকে সমাজতন্ত্রী দল এবং রাজতন্ত্রী দলকে ফাসিষ্ট দল বলিয়া অভিহিত করা হইতেছে। এই ফাসিষ্টদলই বিদ্রোহী আর সমাজতন্ত্রী দলই তথাকার সরকার। বিদ্রোহটি মরক্কো হইতে দ্রুতগতিতে দক্ষিণ স্পেনে এবং তথা হইতে প্রায় সমস্ত স্পেনে ছড়াইয়া পড়িতেছে। সরকার পক্ষ তখন বলেন, "মা ভৈঃ"! অবস্থা আয়ত্তের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছে। আবার বিদ্রোহীরা সংবাদ দেন, বিদ্রোহ ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতেছে। প্রকাশ—ফাসিষ্ট দল কতকগুলি সমাজতন্ত্রবাদীকে গুলী করিয়া মারে, কমিউনিষ্ট দল অর্থাৎ সরকার পক্ষ কতকগুলি ফাসিষ্টকে গ্রেপ্তার করে। সরকার পক্ষের কথা এই যে, রাজতন্ত্রী বা ফাসিষ্টরা গণ-তন্ত্রের উচ্ছেদসাধনের জন্য বিশেষভাবে চেষ্টা করিতে আরম্ভ করে। কিন্তু তাহাদের সে চেষ্টা ব্যর্থ হইয়া যায়। মরক্কোর সৈন্যদল গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছে। কিন্তু এই বিদ্রোহ কয়েকটিমাত্র নগরীতে সীমাবদ্ধ রহিয়াছে। তাঁহারা বলিয়াছিলেন যে, স্পেনে কেহই এই বিদ্রোহে যোগদান করিতেছে না। কিন্তু এ সংবাদটা বিশ্বাসযোগ্য মনে হইতেছে না। কারণ, তাহা হইলে এই বিদ্রোহ কখনই এত দিন পর্য্যন্ত স্থায়ী হইতে পারিত না। ইহার পরে আবার সরকার পক্ষ বলেন, অবস্থা ক্রমশঃ আয়ত্তের মধ্যে আসিয়া পড়িতেছে। ইহার পরই সংবাদ আসে যে, স্পেনে ফাসিষ্ট এবং সোস্যালিষ্ট দলে বিরোধ উগ্রভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। ফাসিষ্টদিগের গুলীর আঘাতে অনেক সমাজতন্ত্রবাদী নিহত হইয়াছে। ফলে সোস্যালিষ্ট সরকার সহস্রাধিক ফাসিষ্টকে গ্রেপ্তার করেন। শ্রমিকরাও ধর্ম্মঘট করিয়া কায বন্ধ করিয়া দেয়। ফাসিষ্টরা বা রাজতন্ত্রীরা পার্লামেণ্ট বর্জ্জন করে। সরকার পক্ষ উত্তেজনার উপশমের জন্য পার্লামেণ্ট (কর্টেজ) বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন।

পরস্পর যেরূপ বিরোধী সংবাদ আসিয়াছে, তাহাতে প্রকৃত ব্যাপার বুঝা অতিশয় কঠিন হইয়া দাঁড়ায়। মধ্যে সংবাদ পাওয়া যায় যে, স্পেনের রাজধানী মাদ্রিদ সহরের পতন হইয়াছে অর্থাৎ বাষ্ট্রতন্ত্রী বা ফাসিষ্ট দল রাজধানী দখল করিয়া লইয়াছিল। কিন্তু পরে যেরূপ সংবাদ আসিয়াছে, তাহাতে এই সংবাদ সত্য বলিয়া মনে হয় নাই। মাদ্রিদ হইতে বেতার বার্ত্তাবহ যোগে এই সংবাদ প্রচার করা হইয়াছিল যে, অবস্থা অনেকটা সুবিধাজনক হইয়াছে, কিন্তু তাহার পরই মাদ্রিদ সহরের পতন সংবাদ সকলকে চমকিত করিয়া তুলিয়াছিল। ৪ঠা শ্রাবণ জিব্রাল্টার হইতে সংবাদ আসে যে, রাত্রিযোগে বিদ্রোহী সৈন্যরা দক্ষিণ অঞ্চলের অনেকগুলি নগর এবং কয়েকটি বিমানঘাটি অধিকার করিয়া লইয়াছে এবং বলিয়াছে যে, সরকার পক্ষ যদি বিনা সর্ত্তে বিদ্রোহীদিগের নিকট আত্মসমর্পণ না করেন, তাহা হইলে তাহারা মাদ্রিদ সহরের উপর বোমা বর্ষণ করিবে। এইরূপ অনিশ্চিত অবস্থার জন্য জিব্রাল্টারে দুইখানি বৃটিশ ডেষ্ট্রয়ার বৃটিশ স্বার্থরক্ষার জন্য মোতায়েন রাখা হইয়াছিল। ইংলণ্ডের প্লিমাউথ (Plymouth) বন্দরেও দুইখানি যুদ্ধ-জাহাজ আবশ্যক হইলে জিব্রাল্টারে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিল। লালিনে বিদ্রোহীদিগের সহিত সরকার পক্ষের প্রবল সংগ্রাম হইয়া গিয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া যায়। ১৯শে জুলাইয়ের সংবাদ হইতে জানা যায় যে, স্পেনে ১৫ ঘণ্টার মধ্যে তিনবার মন্ত্রিসভার পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল। তিন জন প্রধান মন্ত্রিপদে নির্ব্বাচিত ব্যক্তিই ব্যাপার দেখিয়া পদত্যাগ করিয়াছিলেন। ইহাতে বুঝা যায় যে, অবস্থা বড়ই সঙ্গীন হইয়া দাঁড়ায়। তারের সংবাদে আরও প্রকাশ পায় যে, বিদ্রোহীদিগকে বাধা দিবার জন্য সরকার পক্ষ গ্রামবাসীদিগকে অস্ত্রশস্ত্র প্রদান করিয়াছিলেন। ইহাতে বেশ বুঝা যায় যে সরকার পক্ষ যেন কতকটা দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিলেন। সরকার পক্ষ আরও ঘোষণা করেন যে, সামরিক কর্ম্মচারীদিগের সহিত যে সকল সৈনিকের মনের এবং মতের মিল নাই, তাহারা সৈন্যদল ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে পারে। অনেক সৈন্য সে জন্য দল ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে। আবার বহু লোক আসিয়া সরকারী সৈন্যদলে যোগ দিতেছে বলিয়া প্রকাশ। সরকার পক্ষের তিনখানি রণতরী বিদ্রোহীদিগের দলে ভিড়িয়া গিয়াছে বলিয়া সংবাদ আসে। বিস্তৃত স্থানে ঘরোয়া যুদ্ধ হইয়াছে। ফেসিস্তের বিদ্রোহী দলের নেতা সেনাপতি ফ্রাঙ্কো বলিয়াছেন যে, আফ্রিকার সৈন্যরা ধীরে ধীরে বিদ্রোহিদলে যোগ দিতেছে। নৌ-বাহিনীর সৈন্যরাও বিদ্রোহীদিগের দলে যাইয়া মিশিতেছে। বিদ্রোহীরা প্রচার করিতেছে যে, তাহাদের জয়যাত্রায় বাধা দিতে পারে, এমন কোন শক্তি পৃথিবীতে নাই। আবার সরকার পক্ষ বলিতেছে যে, বিদ্রোহীরা পরাজিত হইতেছে। আসল কথা, প্রকৃত সংবাদ অতি অল্পই পাওয়া যাইতেছে। মিসেস পি, ই ভাওয়ার, নামক জনৈক ইংরাজ মহিলা বিদ্রোহীদিগের গুলীতে আহত হইয়া জিব্রাল্টারে গিয়াছেন। মিষ্টার এডোয়ার্ড মার্শাল নামক জনৈক ইংরেজও আহত হইয়া জিব্রাল্টারের হাসপাতালে ভর্ত্তি হইয়াছেন।

ইহার পর সংবাদ পাওয়া যায় যে, বিদ্রোহীরা সান সিবাষ্টিয়ান সহর অবরুদ্ধ করিয়াছে। তাহারা তার পর মাদ্রিদ সহরের বাহিরে সরকারী সৈন্যদিগের সহিত ভীষণ সংগ্রাম করিয়াছে। তথায় ভীষণ অবস্থা উপস্থিত হইয়াছে। এক দল গুণ্ডা তথায় লুণ্ঠন করিবার উদ্দেশ্যে হোটেল ও ভজনালয়ে অগ্নি সংযোগ করিয়া দিয়াছিল। এ দিকে বিদ্রোহীরা বার্গাসে অস্থায়ী ফাসিষ্ট শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। সেনাপতি ক্যাবানেল্লাস সেই বিদ্রোহীদিগের নেতৃপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। বৃটিশ প্রজাদিগের উপর যাহাতে অত্যাচার না হইতে পারে, তাহার জন্য স্পেনের প্রায় প্রতি বন্দরেই বৃটিশ রণতরী রক্ষিত হইয়াছে। এই অনাচারে কতকগুলি বিদেশী নরনারী আহত হইয়াছেন বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। তন্মধ্যে সানসিবাষ্টিয়ানে নরওয়ে দূতের পত্নীর মৃত্যু হইয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। তিনি জানালা খুলিতে যাইয়া সাজ্যাতিকভাবে আহত হইয়াছিলেন। এক জন ইংরেজ-ছাত্রও গুলী লাগিয়া আহত হইয়াছে। ইহার পর সংবাদ পাওয়া যায় যে, মাদ্রিদের নিকট উভয় পক্ষে যে যুদ্ধ হইতেছিল, সেই যুদ্ধে সরকার পক্ষের জয় হইয়াছে। অনেক স্থলে জিনিসপত্র দুর্ম্মূল্য হইয়াছে। বার্সিলোনায় কতকগুলি লোক গোলযোগ ঘটিতেছে দেখিয়া হোটেল এবং ক্লাবগুলি দখল করিয়া লইয়াছে। তাহাদিগকে শাসন করিবার জন্য সরকার পক্ষ বিশেষভাবে চেষ্টা করিতেছেন। মাদ্রিদ হইতে সংবাদ পাওয়া যায় যে, তথায় বহু নরনারীই দূতাবাসে যাইয়া আশ্রয় লইয়াছে। সরকার পক্ষ ফরাসীদিগের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করেন, ফরাসীরাও প্রথমে সাহায্য দানে সম্মত হইয়াছিলেন; কিন্তু পরে তাঁহারা আবার ইতস্ততঃ করিতেছেন। কারণ, তাঁহারা যদি সরকার পক্ষকে সাহায্য করেন, তাহা হইলে ইটালী ও জার্ম্মাণী হয় ত বিদ্রোহীদিগকে সাহায্য করিতে পারেন। সুতরাং এখনও তাহারা সাহায্য করিতে পারে নাই।

এ দিকে সংবাদ আসিয়াছে যে স্পেনের রাজধানী মাদ্রিদ সহর অধিকৃত করিবার জন্য কাষ্টাইল পরগণার অন্তর্ভূক্ত গুয়াডারামা নামক স্থানে যে যুদ্ধ হইতেছিল, সেই যুদ্ধে বিদ্রোহী সেনাপতি মোলার সৈনিকগণের মধ্যে দুই হাজার সৈন্য নিহত হইয়াছে, কিন্তু তাহা হইলেও বিদ্রোহীরা সংগ্রামে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিতেছে না। এই সংবাদটি প্যারিস সহর হইতে আসিয়াছে। সুতরাং ইহা সরকার পক্ষের সংবাদ বলিয়াই মনে হইতেছে। সরকার পক্ষের কত সৈন্য হতাহত হইয়াছে, এ সংবাদ ইহাতে নাই। বার্সিলোনা হইতে সংবাদ পাওয়া যায় যে, গত সপ্তাহব্যাপী যুদ্ধে তথায় তিন শতের অধিক লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। সারাগোসা দখল করিবার জন্য বিদ্রোহীরা বিশেষভাবে চেষ্টা করিতেছে। সরকার পক্ষ ঐ রণক্ষেত্র হইতে ৮০ মাইল দূরবর্ত্তী স্থানে একটি বিমানের আড্ডা স্থাপন করিয়াছেন। ঐখান হইতে বিমান আসিয়া বিদ্রোহীদিগের উপর বোমাবৃষ্টি করিবে। আবার মাদ্রিদ হইতে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, মেজরকা দ্বীপস্থ পামার উপর বার্সিলোনা হইতে প্রেরিত সামুদ্রিক বিমান বোমাবৃষ্টি করিয়াছে। বিদ্রোহীদিগের অনেক নায়ক নৌকাযোগে পলায়ন করিতে যাইয়া ধরা পড়িয়াছে। ইংরেজ প্রভৃতির জাহাজে করিয়া ইংরেজ এবং অন্যান্য জাতীয় লোককে নিরাপদ স্থানে লইয়া যাওয়া হইতেছে।

৫ই আগষ্টের সংবাদে জানা যায় যে, স্পেন সরকারের ডেষ্ট্রয়ার "লেপাণ্টো" ক্ষতিগ্রস্ত অবস্থায় জিব্রাল্টারে আশ্রয় লয়। উহার এক জন নৌ-সৈনিক মারা গিয়াছে এবং বিমানধ্বংসকারী কামান অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িয়াছে। কার্ত্তা জেনাভ নৌ বিভাগের কেন্দ্রস্থান। বর্ত্তমান স্পেন সরকারের রণতরীগুলি তথা হইতে

অস্ত্রশস্ত্র ও পেট্রল লইতেছিল। সেখানে ভীষণ বিস্ফোরণ ও অগ্নিকাণ্ড হইয়া গিয়াছে। সরকারী সেনাদল সারাগোসা অভিমুখে অগ্রসর হইতেছে বলিয়া সংবাদ আসে। তাহারা বলিতেছে যে, ২ হাজার বিদ্রোহী সৈন্যকে তাহারা বন্দী করিয়াছে।

২ খানা ষ্টীমারে ২ হাজার বিদ্রোহী সৈন্য মরক্কো হইতে প্রণালী পার হইতেছিল। সেই সময় সরকার পক্ষের ডেষ্ট্রয়ার মালাগা হইতে ছুটিয়া আসে। বিদ্রোহীদিগের কয়েকখানা বিমান ষ্টীমার রক্ষার্থ নিযুক্ত ছিল। তথা হইতে বোমা নিক্ষিপ্ত হয়। ফলে ডেষ্ট্রয়ারখানা পলায়ন করে বলিয়া সংবাদ আসিয়াছে।

৬ই আগষ্টের সংবাদে প্রকাশ যে, চরমপন্থী সরকারী সেনাদল হাইপার অধিকার করিয়া একটি গ্রাম্য গীর্জ্জায় অগ্নি সংযোগ করিয়া দেয়। সান্টাগোয় বিদ্রোহী দল পরাজিত হওয়ায়, সরকারী সৈন্যদলের পক্ষে সারাগোসায় গমনের পথ উন্মুক্ত হইয়াছে বলিয়া সংবাদ আসিয়াছে। উহা অধিকৃত হইলে এই গৃহযুদ্ধের গতি পরিবর্ত্তিত হইতে পারে।

যাহাতে স্পেনের সমাজতন্ত্রবাদীদিগের জয়লাভ হয়, তাহার জন্য ফ্রান্সের সর্ব্বতোভাবে চেষ্টা স্বাভাবিক। কারণ, গণতন্ত্রশাসিত ফ্রান্সের একদিকে স্বৈরতন্ত্রশাসিত ইটালী এবং অন্য দিকে স্বৈরতান্ত্রিক জার্ম্মাণী রহিয়াছে। তাহার উপর যদি স্পেনে স্বৈরতন্ত্রবাদীরা প্রাধান্য লাভ করিতে পারে, তাহা হইলে ফ্রান্স ত স্বৈরতান্ত্রিক রাজ্য কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত হইবে। সেই জন্য ফ্রান্স স্পেনের সরকার পক্ষকে গোপনে অস্ত্র বেচিতেছেন বলিয়া প্রকাশ। ফ্রান্স অস্ত্র যোগাইবার অভিযোগ অস্বীকার করিতেছে। এ দিকে গুজব রটিয়াছে যে, গ্রেট বৃটেন স্পেনীয় সরকারকে অস্ত্র যোগাইবেন। কিন্তু এই ব্যাপার লইয়া একটা আন্তর্জ্জাতিক হাঙ্গামা বাধিতে পারে। কারণ, বিদ্রোহী ফাসিষ্টদিগের সহিত ইটালীর ও জার্ম্মাণীর বিশেষ সহানুভূতি থাকা স্বাভাবিক। তারের সংবাদে প্রকাশ, ইটালী হইতে ৬ খানি বিমান মরোক্কাতে যাইতেছিল, তাহার মধ্যে ৩ খানি বিমান ফরাসীদিগের অধিকারমধ্যে নামিতে বাধ্য হয়। তন্মধ্যে আলজিরিয়ায় যেখানি নামিয়াছে, তাহাতে পাঁচটি কলের কামান ছিল। উহারা নাকি মরক্কোর অন্তর্গত মেন্দিলার নিকট নাদর নামক স্থানে যাইতেছিল। তথায় স্পেনিস বিদ্রোহীরা প্রবল হইয়া আছে। সেই জন্য সন্দেহ করা হইতেছে যে, ইটালী স্পেনের ফাসিষ্টদিগকে অস্ত্র যোগাইয়া সাহায্য করিতেছে।

সম্প্রতি সরকারী বেতারবার্ত্তায় প্রকাশ পাইয়াছে যে, স্পেনের এই গৃহযুদ্ধে অন্যান্য রাষ্ট্র যাহাতে হস্তক্ষেপ না করে, তদুদ্দেশ্যে ফ্রান্স প্রস্তাব করিয়াছেন। সেই প্রস্তাবে ইংলণ্ড ও বেলজিয়ম সম্পূর্ণ সম্মতি দিয়াছেন। রুসিয়া যদি অনুমোদন করেন, তাহা হইলে জার্ম্মাণীও নিরপেক্ষ থাকিবেন জানাইয়াছেন। রুসিয়াও ঐ প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন। তবে জানাইয়াছেন যে, পোর্তুগালকেও এই নীতি গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা উচিত। কর্ত্তৃপক্ষ আশা করেন যে, পোর্তুগাল এবং ইটালীর নিকট হইতে অনুকূল উত্তর পাওয়া যাইবে।

এ দিকে গৃহযুদ্ধ চলিতেছে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে জয়-পরাজয় কোন্ পক্ষে হইতেছে, তাহা বুঝা যাইতেছে না। কোথাও সরকার পক্ষ জয়লাভ করিতেছে, কোথাও ফাসিষ্ট বিদ্রোহীরা জয়যুক্ত হইতেছে। উভয় পক্ষই বলিতেছে যে, তাহারাই জিতিতেছে। স্পেনের বিদ্রোহী সেনাপতি ফ্রাঙ্কো খুব দক্ষতার সহিত সংগ্রাম করিতেছেন। তবে সরকার পক্ষের অর্থবল ও জনবল অধিক। ব্যাপারটা ক্রমশঃ অতিশয় জটিল হইয়া উঠিতেছে। নিরপেক্ষ থাকিবার প্রস্তাব সত্ত্বেও এই উপলক্ষে সমস্ত য়ুরোপে আগুন জ্বলিয়া উঠিবে কি না কে বলিতে পারে?

হার হিটলারের দৈবরক্ষা

সম্প্রতি হার হিটলারের জীবননাশের জন্য তাঁহার কয়েক জন আততায়ী বিশেষভাবে চেষ্টা করিয়াছিল। গত ১৫ই মে তারিখে হার হিটলার যখন বেনার্ড যাইতেছিলেন, সেই সময় হিংসাশ্রয়ী সন্ত্রাসবাদীরা তাঁহাকে হত্যা করিবার চেষ্টা করে। কিন্তু তাহাদের সে চেষ্টা ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে। হার হিটলারের মোটর-চালক জুলিয়াস শ্রেকের আকৃতির সহিত তাঁহার আকৃতিগত বিশেষ সাদৃশ্য আছে। জুলিয়াস শ্রেককে দেখিয়া জার্ম্মাণগণ বহুবার তাঁহাকে হার হিটলার মনে করিয়া বিশেষরূপ সম্বর্দ্ধনা করিয়াছে। কিছু কাল ধরিয়া জার্ম্মাণ সরকারের বড় বড় কর্ম্মচারীরা তাঁহাদের চিঠিপত্রে আর, আর অর্থাৎ রোয়েম রিভেঞ্জার (রোয়েম হত্যাকাণ্ডের প্রতিহিংসাসাধকগণ) এই সাঙ্কেতিক অক্ষর দেখিতে পায়। সরকারী খানাপিনাতেও রাজপুরুষগণ খাইতে বসিয়াছেন, এমন সময় দেখা যায় যে, তাঁহাদের তোয়ালেতে, ঝাড়নে আর আর লিখিত রহিয়াছে। জার্ম্মাণ পুলিস এই ভীতিপ্রদর্শকদিগকে ধরিবার জন্য বিশেষভাবে চেষ্টা করিয়াও তাহাদিগকে কোনমতেই ধরিতে পারে নাই। হার হিটলার যখন বেনার্ড যাইতেছিলেন,সেই সময় তাঁহার আততায়ীরা তাঁহাকে হত্যা করিবার চেষ্টা করে। পথে একটি স্থানে রেল-লাইন পার হইতে হয়। সে সময় মোটরখানি একটু ধীরভাবে চালাইতে হইয়াছিল। সেই সুযোগে হিটলারের শত্রুরা মোটরের উপর গুলী বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। মোটর-চালক খুব জোরে মোটর হাঁকাইয়া শত্রু-হস্ত হইতে নিস্তার পাইয়াছিলেন। ঘটনাক্রমে সে দিন হিটলারই স্বয়ং মোটর চালাইতেছিলেন, আততায়ীরা তাঁহাকে জুলিয়াস শ্রেক মনে করিয়া তাঁহার পার্শ্বে উপবিষ্ট জুলিয়াস শ্রেককেই লক্ষ্য করিয়া গুলী চালাইয়াছিল। ফলে জুলিয়াস শ্রেকই নিহত হন। এই ঘটনার কথা এত দিন প্রকাশ হইতে দেওয়া হয় নাই। কিন্তু অল্পদিন পূর্ব্বে ইহা কোন প্রকারে লণ্ডনে প্রকাশ পায়। তথা হইতে এই সংবাদ সর্ব্বত্র প্রচারিত হইয়াছে। জার্ম্মাণীতে শ্রেকের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া রাজকীয় অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার ন্যায় আড়ম্বরে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। তাহার জন্য যে শোভাযাত্রা হইয়াছিল, তাহা রাজারাজড়ার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার শোভাযাত্রার ন্যায় হইয়াছিল। সেনাপতি গোরিং স্বয়ং সেই শোভাযাত্রার অগ্রে অগ্রে গিয়াছিলেন। ইহাকেই বলে রাখে কৃষ্ণ মারে কে? সে দিন হিটলার যদি স্বয়ং মোটর না চালাইতেন, তাহা হইলে হয় ত তাঁহাকে সেই দিনই আততায়ীদিগের গুলীতে দেহ ত্যাগ করিতে হইত। ইহা নিতান্তই দৈবরক্ষা।

আমার 'স্মৃতিতর্পণ' সম্বন্ধে দু'একটি কথা

শ্রদ্ধেয় সম্পাদক মহাশয়—

আষাঢ় সংখ্যা মাসিক 'বসুমতি'তে বন্ধুবর শ্রীযুক্ত দীনেন্দ্রকুমার রায় মহাশয় আমার 'স্মৃতিতর্পণ' প্রবন্ধগুলিকে লক্ষ্য করে যে সুদীর্ঘ আলোচনা করেছেন সে সম্বন্ধে দু'একটা কথা বলতে চাই।

বয়স আমার আশীর কোঠায় গড়িয়ে আসছে। জীবন প্রদীপ স্তিমিতপ্রায়। এ সময় এরূপ অকারণ বাদ-প্রতিবাদে লিপ্ত হবার মত উৎসাহ বা প্রবৃত্তি কোনটাই আমার নেই। কিন্তু কর্মের দায়িত্ব থেকে আজও মুক্ত হতে পারিনি বলেই এ বিষয়ে কিছু বলতে হচ্ছে।

প্রথমেই আমি এই মূল কথাটা স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে আমার স্মৃতি তর্পণের বহু স্থলে বার বার আমি একথা বলেছি যে অর্দ্ধশতাব্দীর ও অধিক কাল পরে 'স্মৃতিতর্পণ' লিখতে বসে আমি কোন ঘটনারই সন তারিখ সঠিক বলতে পারবো না। কারণ এত কাল পরে সন তারিখ মনে রাখা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। মাঝে মাঝে দু'একটা বিষয়ে পারিপার্শ্বিক ঘটনার আলোচনা করে কোন কোন প্রসঙ্গের একটা সময় নির্ণয়ের চেষ্টা করেছি বটে, কিন্তু সেটা যখন নিতান্তই আন্দাজি তখন ভ্রম প্রমাদপূর্ণ হওয়া কিছুমাত্র বিচিত্র নয়। এমন কি অনেক স্থলে আমি ঘটনার পারম্পার্য্য পর্য্যন্ত যথাযথভাবে রক্ষা করতে পারিনি। কিন্তু এসব কথা স্পষ্ট করুল থাকা সত্ত্বেও দীনেন্দ্র বাবু দেখছি এই অশীতিপর বৃদ্ধের ক্ষীণস্মৃতি প্রসূত দুর্বল সন তারিখ গুলোকেই আঁকড়ে ধরে অকারণ অনেকখানি উৎসাহ ও সময় নষ্ট করেছেন। তারিখের নিরিখ কসে আমার জীবনের কতকগুলি প্রধান ঘটনাকে 'মেকী' সাব্যস্ত করবার জন্য দীনেন্দ্র বাবুর এই বিপুল পরিশ্রম ও প্রাণপণ প্রয়াস দেখে আমি যথার্থই বন্ধুবরের জন্য একান্ত অনুকম্পা বোধ করছি।

পিতার স্বর্গারোহন আগে হয়েছিল না মাতার গঙ্গা-লাভের পর হয়েছিল এ যদি কেউ ভুল করে বসে তাহলে দেখছি দীনেন্দ্র বাবু তাকে 'অনাথ' বলে কিছুতেই স্বীকার করবেন না। সন্তানের জন্মতারিখ যদি কোন পিতার স্মরণ না থাকে তাহলে পিতৃপরিচয় থেকে তাঁকে কি বঞ্চিত হতে হবে? কোন্‌টা আগে ঘটেছিল আর পরে ঘটেছিল কোনটা—এ যদি আমি গুছিয়ে বলতে না পেরে থাকি সেজন্য কি ঘটনাগুলিও মিথ্যা হয়ে যাবে?

দীনেন্দ্র বাবুর অসংখ্য বাক্‌বিস্তারের উত্তরে আমি শুধু দৃঢ়তার সঙ্গে এই একটি কথাই বলতে চাই যে আমার বর্ণিত ঘটনাগুলি, বিশেষতঃ পূজ্যপাদ স্বামী বিবেকানন্দ সম্বন্ধে বর্ণিত ব্যাপার দিবালোকের ন্যায় সম্পূর্ণ সত্য। উহার মধ্যে কোথাও বিন্দুমাত্র অতিরঞ্জন নাই। তবে খুঁটিনাটির ভুল থাকতে পারে বটে, কারণ অনেক দিনের কথা। আমি যে সময়ের কথা বলেছি, তখন দেরাদুন থেকে হরিদ্বার পর্য্যন্ত কোন রেলপথ ছিল না। হৃষিকেশ যাবার একটি প্রসস্ত পথ ছিল, যে পথে গাড়ী-ঘোড়া, লোকজন ও মালপত্র যাতায়াত করত। এ ছাড়া জঙ্গলের ভিতর দিয়ে আর একটা "একপেয়ে" সোজাপথ ছিল, কাঠুরিয়ারা জঙ্গলে কাঠ কাটবার জন্য এই সঙ্কীর্ণ পথ ধরেই বনের মধ্যে যেত। সাহসী গ্রামবাসীরাও অনেকে প্রয়োজন হলে এ পথ ব্যবহার করত। আমি একাধিকবার এই পথ বেয়ে বেলা একটা দেড়টায় বেরিয়ে দেরাদুন থেকে হৃষিকেশ পৌঁছেচি সন্ধ্যার প্রাক্কালেই। এ পথ সুরু হয়েছে দেরাদুনের 'দড়িয়ালা' বা ঐরূপ একটা কি নামের গণ্ডগ্রাম থেকে। এ পথের দৈর্ঘ্য হবে অনুমান ১৫।১৬ মাইল মাত্র। আমি সে বয়েসে ঘণ্টায় পাঁচ ছয় মাইল পথ অবলীলায় চলে যেতে পারতেম। এটা কিছুমাত্র বাহাদুরীও নয়, কারণ, আমারই জানিত একাধিক সাধু প্রতি ঘণ্টায় গড়ে এর চেয়েও দীর্ঘতর বন্ধুর পথ অনায়াসে অতিক্রম করে যেতেন। দীনেন্দ্র বাবুও এরূপ কাহিনী জানেন বলেই আমার বিশ্বাস।

মায়াবতী হতে প্রকাশিত স্বামীজীর জীবনীতে তাঁর দেরাদুনে অবস্থান সম্বন্ধে যে বিবরণ লিপিবদ্ধ হয়েছে, তা আমার কাছে একান্ত অসঙ্গত বলেই মনে হয়। একজন পীড়িত সন্ন্যাসীকে নিয়ে স্বামীজীকে আশ্রয়ের জন্য সে যুগে দেরাদুনের দ্বারে দ্বারে ঘুরে হতাশ হ'তে হয়েছিল, এ কথা মেনে নেওয়া কঠিন। কারণ নিজ জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে আমি জোর করেই বলতে পারি যে গৈরিকধারীকে অবজ্ঞা বা অশ্রদ্ধা করবার মত নাস্তিক্য বুদ্ধি সে যুগের ভারতবাসী হিন্দুদের মধ্যে তখনও দেখা দেয়নি—অবশ্য বিশেষ কোন গ্রাম বা পরিবার ছাড়া। কিন্তু সে যাই হোক আমি জিজ্ঞাসা করি, পণ্ডিত আনন্দনারায়ণ দেরাদুনে স্বামী অখণ্ডানন্দকে একখানি পৃথক বাড়ী ভাড়া করে রাখলেন, উপযুক্ত পথ্য ও গরম কাপড় সরবরাহ করলেন, আর তাঁর গুরুভাইরা তাঁকে সেই বাড়ীতে একলা রেখে—"the other stayed else where and begged their meals as fortune favoured them." এ কেমন করে সম্ভব হতে পারে? দেরাদুনের করণপুরে তখন অনেক বাঙ্গালীর বাস ছিল। আমরা যেই শুনলেম যে স্বামীজী কয়েকজন সন্ন্যাসীদের নিয়ে দেরাদুনের

কালীবাড়ীতে অবস্থান করছেন, আমরা তৎক্ষণাৎ ছুটে গেছলেম তাঁদের নিয়ে আসতে। সুতরাং তিনি দেরাদুনের দ্বারে দ্বারে আশ্রয়ের জন্য ঘুরে ব্যর্থকাম হোয়েছিলেন এ কথা কিরূপে স্বীকার করা যেতে পারে? সম্ভবতঃ মায়াবতীর জীবনী লেখক স্বামীজীর সমভিব্যাহারী সে দিনের কোন সন্ন্যাসীর নিকট দেরাদুনের কাহিনী সংগ্রহ করবার চেষ্টা করেন নি। করলে এত বড় ভুল কখনই হতে পারত না। আমার সে দিনের সঙ্গী ও দেরাদুনের বন্ধু বিমলাচরণ বাবু, যাঁদের গৃহে স্বামীজী গুরুভ্রাতৃগণ সহ অবস্থান করেছিলেন তিনি আজও জীবিত আছেন এবং ঐ ঘটনার সাক্ষ্য দিতে পারেন। মায়াবতীর প্রকাশিত স্বামীজীর জীবনী যে আদ্যোপান্ত নির্ভুল বলে মেনে নেওয়া চলে না, তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ আমি একাধিক পাচ্ছি, তা ছাড়া "ভারত" নামক সাপ্তাহিক পত্রে প্রকাশিত বিবেকানন্দ মিশনের সন্ন্যাসী স্বামী অমৃতানন্দের লেখা 'শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘের ইতিহাস' শীর্ষক ধারাবাহিক প্রবন্ধগুলির মধ্যে সে দিন চোখ বুলতে গিয়ে দেখছিলেম, তিনিও মায়াবতীর প্রকাশিত এই বইটির কয়েকটি অসঙ্গতির দিকে সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। ("ভারত" ২য় বর্ষ, ২২ সংখ্যা, ১২ অগ্রহায়ণ ১৩৪২, পৃঃ ৪২৮, ঐ ৩১ সংখ্যা ৩০শে মাঘ, পৃঃ ৫৪৫ দ্রষ্টব্য)

যে সন্ন্যাসী হৃষীকেশ মুমূর্ষ স্বামীজীকে ঔষধ সেবন করিয়েছিল সে আজ বৃদ্ধ হয়েছে এবং সন্ন্যাসীর গর্ব্ব ও গৌরব আজ আর তার নেই, কিন্তু সে দিন ছিল সে এক পরিণত-যৌবন বলিষ্ঠ পরিব্রাজক। 'প্রাচীন' সাধু নয়, "বৃদ্ধ"ও নয়। দীনেন্দ্রকুমারের উদ্ধৃত দুখানি পুস্তকের বর্ণনা পরস্পর সামঞ্জস্যহীন। ইংরাজিতে আছে,—And before the entrance of the hut, Stood a Sadhu বাংলায় আছে—"এমন সময় সহসা একজন "প্রাচীন" সাধু তথায় উপস্থিত হইলেন। ঘটনাক্রমে তাঁহার নিকট ঔষধ ছিল।" বাংলায় 'পিপুল মধুর' উল্লেখ নাই কিন্তু ইংরাজিতে আছে এখন কোনখানিকে তিনি প্রামাণ্য বলে মানতে চান?

আমার "স্মৃতিতর্পণের" মধ্যে কোথাও 'তুলসী পত্রের' উল্লেখমাত্র নাই। তা'সত্বেও দেখছি দীনেন্দ্র বাবু একজন সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিকের কাছ থেকে এ তথ্য সংগ্রহ করে অতিমাত্রায় উৎসাহিত হয়েছেন। কিন্তু তিনি বোধ হয় জানেন যে সেই সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক আমার একজন বহুদিনের পরিচিত বন্ধু। পাতার নামটা জানবার জন্য তাঁর একান্ত আগ্রহ দেখে আমি তাঁর কাছে তদঞ্চলে দুষ্প্রাপ্য 'তুলসী পাতার' নামটা যে রহস্যচ্ছলেই বলেছিলাম, আশা করি এটুকু বোঝবার মত বয়স দীনেন্দ্র বাবুর হয়েছে।

স্বামীজীর জীবন সঙ্কটকালে, তাঁর কাছে যে আমি দৈবাৎ উপস্থিত হয়েছিলেম এবং সামান্য কিছু তাঁর সেবা করবার সৌভাগ্য লাভ করেছিলেম, এ কাহিনী আমি এই 'স্মৃতিতর্পণে' উল্লেখ করবার ৩৫ বৎসর পূর্ব্বেও টাউন হলে তাঁর স্মৃতিসভায় উল্লেখ করেছিলেম, এ কথা দীনেন্দ্র বাবুও তাঁর স্বকীয় ভঙ্গীতে কতকটা স্বীকার কর্ত্তে বাধ্য হয়েছেন দেখলুম! সুখের বিষয় যে সে দিনের সভায় দীনেন্দ্র বাবুই একমাত্র শ্রোতা ছিলেন না। সেখানে স্বামীজীর ভক্ত আরও এমন অনেকেই উপস্থিত ছিলেন, যাঁরা আমার সেই বক্তৃতা শুনে আমার সঙ্গে অযাচিত সাক্ষাৎ ও আলাপ পরিচয় করেছিলেন। তাঁরা কেউ কেউ আজও জীবিত আছেন। এঁদের মধ্যে শ্রীমান গণেন্দ্র মহারাজের নাম করা যেতে পারে—'টাউন হ'ল মিটিং' সম্বন্ধে দীনেন্দ্র বাবুর বর্ণনা ঠিক কি না, সে বিষয়ে সম্ভবতঃ তিনি সাক্ষ্য দিতে পারবেন। পুরাতন 'বসুমতীর' ফাইল খুঁজলেও হয় ত আমার সেই বক্তৃতার সারাংশ পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু আমার সে সব সংগ্রহ করিয়া উদ্ধৃত করবার সামর্থ্য ও অবকাশের একান্ত অভাব। আর একটা বিষয়ে দীনেন্দ্র বাবুর দৃষ্টি আকর্ষণ করা দরকার বিবেচনা করি। স্বামী অখণ্ডানন্দ বসুমতী আফিসে এসে দীনেন্দ্র বাবুর কল্পিত ওরূপ কোন অশিষ্ট উক্তি আমার প্রতি প্রয়োগ করতেই পারে না; কেন না, হৃষিকেশের ঘটনার সময় স্বামী অখণ্ডানন্দ সেখানে উপস্থিত ছিলেন না। তিনি যে সে সময়ে শাহারানপুর হয়ে মীরাট যাত্রা করেছিলেন এ কথা দীনেন্দ্র বাবুর আলোচনার মধ্যেই রয়েছে। সুতরাং বেলুড় মঠের বর্ত্তমান ধর্ম্মগুরু স্বামী অখণ্ডানন্দ মহারাজকে এর মধ্যে টেনে আনার চেষ্টা করাটা বা স্বামী অভেদানন্দের নাম উল্লেখ করে তাঁর উক্তিতে একটা গুরুত্ব আরোপের চেষ্টা করাটা নিতান্ত অবান্তর হয়ে পড়েছে। আমার যতদূর স্মরণ আছে, দেরাদুনে স্বামীজীর সঙ্গে কালীমহারাজ (স্বামী অভেদানন্দ) ছিলেন না। সুতরাং তিনি এ সম্বন্ধে কিছু বলতেই পারেন না। যাঁরা ছিলেন তাঁদের মধ্যে একজনের কথা আমার অস্পষ্ট মনে পড়ে। ইনি স্বামীজীর অসুস্থতাকে তাঁর 'সমাধি-অবস্থা' বলে গুরু ভাইদের প্রবোধ দেবার জন্য বিসেষ চেষ্টা করছিলেন। আমার নাম ধাম জানবার জন্যও তিনি একান্ত আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু পাছে আমায় তাঁরা চিনতে পারেণ এই আশঙ্কায়—আমার যতদূর মনে পড়ে, আমি তাঁকে আমার নামের পরিবর্ত্তে আমারই তদানীন্তন এক পরিচিত সাধুর নাম বলেছিলেম। তিনি যুক্ত প্রদেশের প্রসিদ্ধ অবধূতাচার্য্য—'শ্রীভগবান পুরী'।

স্বামীজীর সেই সঙ্গীটী আজও জীবিত আছেন কি না জানি না। বহুকাল পূর্ব্বে একবার ওঁদের খবর নিতে গিয়ে শুনেছিলাম তিনি নাকি সন্ন্যাস আশ্রম পরিত্যাগ কোরে গৃহস্থাশ্রমে ফিরে গেছেন। তিনি জীবিত থাকলে হয়ত এ ঘটনা সম্বন্ধে সাক্ষ্য দিতে পারতেন। কিন্তু সে যাই হোক, একটা বিষয়ে আমার স্মৃতি বিভ্রম সংশোধন

করে দেওয়ার জন্য আমি যথার্থই দীনেন্দ্র বাবুর নিকট কৃতজ্ঞ। আমি বদরিকা ঘুরে দেরাদুনে ফিরে আসবার পর স্বামীজী দেরাদুনে এসেছিলেন এবং দেরাদুন থেকেই পরে তিনি হৃষিকেশে গেছলেন। আমি আমার বার্দ্ধক্য-জনিত দুর্ব্বল স্মৃতির দোষে এই ঘটনাটাকে উল্টে ফেলে আগে পরে করে বসেছিলাম—এজন্য আমি লজ্জিত।

এইবার দীনেন্দ্রকুমারের অন্যান্য দু'একটি অপবাদের উত্তর দিয়ে আমি নিরস্ত হতে চাই। আমার এই "স্মৃতি তর্পণের" মধ্যে কোথাও এ কথা বলিনি যে আমি "ছাত্রবৃত্তি" পাশ করেছিলেম। গ্রামের স্কুলে ছাত্রবৃত্তি পড়েছিলেম মাত্র। পরে গোয়ালন্দ চলে যাই। আমার আবৃত্তি শুনে ভূদেব বাবু আমাকে যে পারিতোষিক দিয়েছিলেন তাঁর সেই ব্যক্তিগত উপহারকে, "ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার প্রাইজ" বলে চালাবার দুশ্চেষ্টা দীনেন্দ্র বাবু তাঁর প্রয়োজনের অনুরোধে করতে পারেন, কিন্তু আমার রচনার মধ্যে কোথাও আমি (তাঁর ভাষায়) এ 'ধৃষ্টতা' করিনি। 'ছাত্রবৃত্তি' পরীক্ষা না দিয়েও যে 'মাইনর' পরীক্ষা পাস করা যায়, আশা করি দীনেন্দ্র বাবু এটা এখনও বিস্মৃত হ'ন নি। দ্বিজেন্দ্রলাল ও আমি প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে "এক ব্রাকেটে স্কলারশিপ" পেয়েছিলেম আমার এ ভ্রান্ত ধারণার জন্য স্বর্গগত শ্রদ্ধেয় বন্ধু দ্বিজেন্দ্রলালই দায়ী। কারণ তাঁরই মুখে একাধিকবার একাধিক ব্যক্তির কাছে এ কথা তাঁকে বলতে শুনে আমার মনে এই ধারণাই বদ্ধমূল হয়ে পড়েছিল যে তিনিও তবে আমারই ন্যায় 'দশ টাকা' মাত্র স্কলারসিপ পেয়েছিলেন। আমি তাঁর কথায় কোনো দিন সন্দিহান হয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যালেণ্ডার হাতড়ে দেখিনি বা 'কলিকাতা গেজেটের' ফাইল খুঁজিনি তাঁর কোনো প্রয়োজনও বোধ করি নি, যে হেতু তাঁর প্রতি বা অপর কোন সতীর্থ সাহিত্যিকের প্রতি আমার মনে কোন দিন আমি কিছুমাত্র বিদ্বেষভাব পোষণ করিনি। আজ বন্ধুবর দীনেন্দ্রকুমার সে পরিশ্রম স্বীকার করে আমার ভ্রান্ত ধারণা অপনোদন করায় আমি তাঁর নিকট আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। আমার অপেক্ষা সর্ব্ববিষয়ে শ্রেষ্ঠতর আমার স্বর্গগত বন্ধু দ্বিজেন্দ্রলাল ১৫৲ টাকা স্কলারশিপ পেয়েছিলেন জেনে আমি আজ অধিকতর গর্ব্ব অনুভব করছি।

উপসংহারে, কংগ্রেস ব্যাপারটার উল্লেখ না করলে সুহৃদ্বর দীনেন্দ্রকুমার হয়ত তাঁর ভুল বিশ্বাস নিয়েই বসে থাকবেন। ১৮৮৬ খৃঃ অব্দে কলিকাতায় কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশনে যোগ দিতে এসে আমার পরিচয়পত্রে মাত্র দুটি কথার উল্লেখ করেছিলেন 'Teacher Goalundo' দীন দরিদ্র জলধর চিরদিনই ভিখারী, ভূস্বামী বলে বা ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের ন্যায় এক অভিজাত প্রতিষ্ঠানের সভ্য বলে পরিচয় দেবার স্পর্দ্ধা ও দুঃসাহস সে কোনো দিনই করেনি। তবে কংগ্রেস কর্তৃপক্ষ গভর্মেণ্টকে তাঁদের এই অধিবেশনের গুরুত্ব সম্বন্ধে সচেতন করবার উদ্দেশ্যে যদি কোনো রিপোর্টে সমবেত প্রতিনিধিবর্গের জমকালো ও ভড়কালো পরিচয় দিয়ে সভার মর্য্যাদা বৃদ্ধি করে থাকেন তবে সে জন্য এই অধীনকে দায়ী করা অনুচিত।

এ সমস্ত জেনেও তথাপি যখন বহুদিনের অন্তরঙ্গ বন্ধু দীনেন্দ্রকুমার তাঁর সুদীর্ঘ প্রবন্ধে আমাকে অজস্র ব্যঙ্গ, বিদ্রূপ, তীব্র পরিহাস, ও আক্রমণ করেছেন, জানি না এতে তাঁর কি উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে এবং এরূপ ব্যবহারে তাঁর গৌরব কতদূর বৃদ্ধি পাবে তবে আমি এ সমস্ত অপমান তাঁর বৃদ্ধ বয়সের শ্রদ্ধাপ্রদত্ত "গুরুদক্ষিণা" বলেই প্রশান্ত অন্তরে গ্রহণ করলেম।

ইতি তাং ২০শে শ্রাবণ ১৩৪৩

বিনীত

শ্রীজলধর সেন

জলধর বাবু কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বানান সংস্কারের পক্ষপাতী। এজন্য রায় বাহাদুরের প্রতিবাদটি যথাযথভাবেই প্রকাশিত হইল। তাঁহার মত সুপ্রবীণ সাহিত্যিকের বর্ণাশুদ্ধিগুলি সংশোধন করিতে সাহস করিলাম না। শ্রীযুক্ত দীনেন্দ্রকুমার রায়ের এই প্রবন্ধের প্রতিবাদটি এ মাসে স্থানাভাবে প্রকাশ করিতে পারিলাম না।

মাসিক বসুমতী-সম্পাদক।

সাময়িক প্রসঙ্গ

বাঙ্গালী হিন্দুদিগের আবেদন

বাঙ্গালার বহু বিশিষ্ট হিন্দুর স্বাক্ষরিত একখানি আবেদনপত্র ভারত-সচিব লর্ড জেটল্যাণ্ডের নিকট প্রেরিত হইয়াছিল। বাঙ্গালার হিন্দুরা মাথা-গুণতিতে সংখ্যায় মুসলমান অপেক্ষা অল্প; সুতরাং ভারতের অন্যান্য প্রদেশে সংখ্যাল্প সম্প্রদায়কে সদস্য নির্ব্বাচনে যে বিশেষ আনুকূল্য করা হয়, বাঙ্গালার হিন্দুরা ন্যায়তঃ সেইরূপ আনুকূল্যজনক ব্যবস্থার দাবী করিতে পারে। কিন্তু তাহাদিগের পক্ষে সে ব্যবস্থা করা হয় নাই। বাঙ্গালার ব্যবস্থাপক সভায় আড়াই শত সদস্যের আসন রাখা হইয়াছে। সুতরাং বাঙ্গালী হিন্দুদিগের জন্য অনুকূল ব্যবস্থা না করিলেও কেবল লোকসংখ্যা হিসাবে বাঙ্গালী হিন্দুদিগের ১ শত ১২ জন সদস্য নির্ব্বাচিত করিবার অধিকার পাওয়া উচিত! কিন্তু তাহাদিগকে তাহা না দিয়া কেবলমাত্র ৮০ জন সদস্য নির্ব্বাচন করিবার অধিকার দেওয়া হইয়াছে। অর্থাৎ যত সংখ্যা বাঙ্গালী হিন্দুদিগের জন্য ন্যায্য প্রাপ্য, তাহা অপেক্ষা তাহাদিগকে ৩২ জন কম সদস্য নির্ব্বাচনের অধিকার দেওয়া হইয়াছে। ন্যায়ের দৃষ্টিতে উহা অত্যন্ত অবিচার হইয়াছে, তাহা যে কেবল আমরাই বুঝিতেছি, তাহা নহে,—শাসকগণও তাহা বিলক্ষণ বুঝেন। এই লর্ড জেটল্যাণ্ডই শাসনসংস্কার সভায় এই বিষয়ে সব কথাই বিশদভাবে বিবৃত করিয়াছিলেন। উহা কেবল-মাত্র দুই বৎসরের কথা। তিনি বাঙ্গালায় শাসনকর্ত্তার আসনে বসিয়া পাঁচ বৎসর কায করিয়া গিয়াছেন। অতএব কেবলমাত্র সংখ্যা ব্যতীত বাঙ্গালার অন্য সকল বিষয়ে কোন্ সম্প্রদায়ের গুরুত্ব অধিক, তাহা তিনি পূর্ণমাত্রায় অবগত আছেন। সুতরাং দরখাস্ত পাঠ করিয়া তাঁহার কোন কথা বুঝিতে হইবে না। তিনিই বলিয়াছিলেন যে, ৮০টি বিশেষ সদস্য পদের মধ্যে যদি হিন্দুরা ১৩টি লাভ করিতে পারে, তাহা হইলেও মুসলমানরা ১ শত ২৫টি এবং হিন্দুরা কেবলমাত্র ৯৩টি সদস্যের আসন পাইবেন! তিনি বলিয়াছিলেন যে, বাঙ্গালার অবনত বা অস্পৃশ্য জাতির জন্য স্বতন্ত্র ব্যবস্থার প্রয়োজন নাই;—কারণ, বিশেষ ব্যবস্থা না থাকিলেও বাঙ্গালার শক্তিশালী নমঃশূদ্র ও রাজবংশীয়দিগের পক্ষে ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশ করিতে কোন বাধা জন্মিতেছে না; কিন্তু তিনি তাহা বুঝিলেও এই ব্যাপারে হিন্দুদিগের দৃঢ়তার সহিত আপত্তি জ্ঞাপন করা অবশ্য কর্ত্তব্য। নিজ ন্যায়সঙ্গত অধিকার যাহারা সহজে ছাড়িয়া দিতে চাহে,—তাহারা কখনই তাহার অধিকার রক্ষা করিতে সমর্থ হয় না। পুণা প্যাক্টে বাঙ্গালার হিন্দুদিগের উপর যে ঘোর অবিচার করা হইয়াছে, সে কথাও লর্ড জেটল্যাণ্ড স্বীকার করিয়াছেন। সুতরাং ইহাতে বুঝাইবার কিছুই নাই। যাহা হউক, গত ৩১ শে আষাঢ় বুধবার কলিকাতা টাউনহলে কবীন্দ্র ডক্টর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সভাপতিত্বে যে জনসভা হইয়াছিল, আমরা তাহার সম্পূর্ণ সমর্থন করি। রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতা ভালই হইয়াছিল। কিন্তু এই সাম্প্রদায়িক নির্ব্বাচন-ব্যবস্থা যে দোষাবহ, ইহা কি শাসকবর্গ বুঝেন না? যে মিষ্টার র‍্যাম্জে ম্যাক্‌ডোনাল্ড এই সাম্প্রদায়িক নির্ব্বাচনের পরিসর বৃদ্ধি করিয়া দিয়াছেন, সেই সমাজতন্ত্রবাদী র‍্যামজে ম্যাকডোনাল্ড কেমন স্পষ্ট এবং সরলভাবে সাম্প্রদায়িক নির্ব্বাচনের এবং সাম্প্রদায়িকভাব পোষণের দোষগুলি বলিয়া দিয়াছিলেন,—তাহা শুনিয়া কেহ কি মনে করিতে পারিয়াছিলেন যে, সেই দরিদ্রদুঃখে ব্যথিত র‍্যামজে ম্যাকডোনাল্ডই এই প্রকার সাম্প্রদায়িক ভাববর্দ্ধক সাম্প্রদায়িক নির্ব্বাচকমণ্ডলী কেবল রক্ষা করিবেন না, পরন্তু উহার প্রসার বৃদ্ধি করিয়া দিবেন? সুতরাং শাসকদিগকে কোন কথাই বুঝাইয়া বলিবার কোন প্রয়োজন নাই। তাঁহারা বুঝেন সব কথা। তবে যে তাঁহারা কেন এইরূপ অবিচার করেন, তাহাই সকলের বিশেষভাবে ভাবিয়া দেখা আবশ্যক। ডক্টর রবীন্দ্রনাথ তাঁহার অভিভাষণে অন্যান্য কথার মধ্যে এ কথাও বলিয়াছেন যে, "শাসকদিগকে আমি বিনয় পূর্ব্বক স্মরণ করাইয়া দিতে চাই যে, অর্থগত এবং বাণিজ্যগত শোষণ-নীতির ফলে অথবা বিনা বিচারে বা সন্দেহক্রমে প্রজাদিগকে শাস্তি প্রদানফলে কিম্বা বিচার না করিয়া প্রজাদিগকে অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য আটক রাখার ফলে আমাদের যে অনিষ্ট হইয়াছে—আমাদের জাতীয় শোণিতকে বিষাক্ত করা তাহা অপেক্ষা অধিকতর অনিষ্টজনক। কারণ, ইহারা দ্বারা, প্রকৃত অপেক্ষা কাল্পনিক, প্রমাণিত অপেক্ষা প্রমাণাভাবযুক্ত কারণে সুদূর-ভবিষ্যতে পর্য্যন্ত সমগ্র জাতিকে দণ্ডদান করা হইতেছে।" কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ যাহা বলিয়াছেন, তাহা বুঝিতে হইলে বিশেষ সূক্ষ্মবুদ্ধি ধারণের প্রয়োজন হয় না।

কিন্তু লর্ড জেটল্যাণ্ড হিন্দুর এই সঙ্গত আবেদনে কর্ণপাত করেন নাই। ভারতের রাজ-প্রতিনিধির মারফত তিনি হিন্দুর আবেদন প্রত্যাখ্যাত হইল, ইহাই জানাইয়াছেন। তাঁহার উক্তি, "সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সম্মতি ব্যতীত বৃটিশ সরকার ৩০৮ (৪) ধারা অনুযায়ী সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদের কোনরূপ পরিবর্ত্তন সাধন করিবেন না। পরন্তু পারলামেন্টের সুস্পষ্ট সম্মতি ব্যতীত এই ধারা অনুযায়ী কোনরূপ পরিবর্ত্তনসাধন সম্ভব হইবে না।"

বঙ্গ-ভঙ্গের সময়েও লর্ড কার্জ্জন বলিয়াছিলেন যে, যাহা একবার স্থির হইয়া গিয়াছে, তাহার আর পরিবর্ত্তন হইবে না। কিন্তু ভাঙ্গা বাঙ্গালা আবার জোড়া লাগিয়াছিল। এবার বাঙ্গালার হিন্দুরা কি করিবেন?

সর্দ্দা আইনের সংশোধন

পাঠকের স্মরণ থাকিতে পারে, ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে বাল্যবিবাহ বন্ধ করিবার জন্য সমাজসংস্কারকরা সরকারের সাহায্যে সর্দ্দা আইন পাশ করাইয়া লইয়াছিলেন। সে সময়ে ঐ আইন বিধিবদ্ধ করিবার বিরুদ্ধে জনমত আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। কিন্তু তাহা চাপা দিয়া সমাজসংস্কারকরা ঐ আইন বিধিবদ্ধ করিয়া লইয়াছিলেন। সেই আইন বিধিবদ্ধ হইবার পর এবং জারি হইবার পূর্ব্ববর্ত্তী সময় পর্য্যন্ত কয়েক মাসের মধ্যে নিখিল ভারতে বাল্য-বিবাহের এবং শিশু বিবাহের যেরূপ ধূম পড়িয়া গিয়াছিল, তাহাতে

জনমত-যে কতদূর ইহার বিরোধী ছিল, তাহা বেশ বুঝা গিয়াছিল। অথচ রাজনীতিক বিষয়ে যাঁহারা জনমতের দোহাই দিতে পঞ্চমুখ, এই ধর্ম্ম এবং সমাজ-সম্পর্কিত ব্যাপারে তাঁহারা নানা কৌশলে জনমতকে চাপা দিয়া এই ধর্ম্ম ও সমাজের পক্ষে অকল্যাণকর আইনটি পাশ করাইয়া লইতে কুণ্ঠাবোধ করেন নাই। সে আজ ছয় বৎসরের কথা। এই ছয় বৎসরের অভিজ্ঞতায় সংস্কারক মহাশয়রা বুঝিয়াছেন যে, ঐ আইন দ্বারা তাঁহাদের অভিপ্রায় সম্বন্ধে আরও একটু জোর করিতে চাহেন। সেই জন্ত তাঁহারা উৎকলদেশবাসী মিষ্টার বি দাস নামধেয় জনৈক সদস্তের মারফতে সর্দ্দা আইনের কতকগুলি পরিবর্ত্তনসাধন করিবার জন্ত আইনের এক পাণ্ডুলিপি ব্যবস্থা পরিষদে পেশ করিয়াছেন। বিলখানিতে প্রধানতঃ তিনটি প্রস্তাব করা হইয়াছে। যথা—

(১) সর্দ্দা আইন অনুসারে কোন বিবাহ অবৈধ বলিয়া নালিস করিতে হইলে, ফরিয়াদীকে এক শত টাকা জমা দিতে হইবে বলিয়া যে ব্যবস্থা আছে, তাহা উঠাইয়া দিতে হইবে।

(২) সর্দ্দা আইনে ব্যবস্থা আছে যে, বিবাহের পূর্ব্বে, আইনমতে অপরাধ অনুষ্ঠিত হইবার পূর্ব্বে, ম্যাজিষ্ট্রেট ঐ ব্যাপারে কোনরূপ হস্তক্ষেপ করিতে পারিবেন না। মিষ্টার দাসের অভিনব বিলে প্রস্তাব করা হইয়াছে, বিবাহের পূর্ব্বে অর্থাৎ অপরাধ অনুষ্ঠিত হইবার পূর্ব্বে ম্যাজিষ্ট্রেট বিবাহ নিষিদ্ধ করিয়া দিতে পারিবেন। তিনি যে নিষেধাজ্ঞা জারি করিবেন, তাহা অমান্ত করিলে ৩ মাস সশ্রম বা অশ্রম কারাদণ্ড এবং দুই হাজার টাকা অর্থদণ্ড হইবে।

(৩) আইন ভঙ্গ করিয়া যদি কোন বিবাহ হয়, তাহা হইলে উভয় পক্ষকে এই মর্ম্মে মুচলেকা দিতে হইবে যে, কন্তার বয়স ১৪ বৎসর পূর্ণ হইবার পূর্ব্বে অথবা ম্যাজিষ্ট্রেটের যত দিনের ইচ্ছা তত দিনের জন্ত বর ও বধূ পরস্পর দেখা-শুনা করিতে পারিবেন না।

এই পাণ্ডুলিপিতে লিখিত প্রস্তাবের বিরুদ্ধে এদেশের নানা স্থানে নানা সভাসমিতি হইতেছে, কিন্তু রাজনীতিক সংবাদপত্রগুলি সনাতনীদিগের উপর অবজ্ঞা হেতু সে সকল সংবাদ প্রকাশ করিতেছেন না। তবে সরকার সে সম্বন্ধে কতকগুলি সংবাদ পাইতেছেন বলিয়া মনে হয়।

(১) এই পাণ্ডুলিপির প্রত্যেক দফাতেই আপত্তি করিবার যুক্তিযুক্ত কারণ বিদ্যমান। কারণ, সর্দ্দা আইনে ফরিয়াদীকে এক শত টাকা আমানত করিতে হইবে বলিয়া যে ব্যবস্থা আছে, তাহা যদি রহিত করা যায়, তাহা হইলে অনেক মিথ্যা মামলা উপস্থিত হইবেই হইবে। ঐরূপ ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও যখন অনেক মিথ্যা মামলা রুজু হইয়াছে, তখন উহা উঠাইয়া দিলে মিথ্যা মামলার সংখ্যা যে অনেক বাড়িয়া যাইবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। মিথ্যা মামলা আনিয়া প্রতিপক্ষকে বিপন্ন করিবার চেষ্টা এ দেশের অনেক নীচপ্রবৃত্তি লোকের আছে, তাহা অস্বীকার করা যায় না। ছয় বৎসর পূর্ব্বে যে ধারাটি আইনে রাখা যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে হইয়াছিল, আজ ছয় বৎসর পরে তাহা উঠাইয়া দিতে হইবে, এমন কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ ঘটে নাই। ছয় বৎসরে এদেশের লোকচরিত্রের বিশেষ পরিবর্ত্তন ঘটে নাই; ঘটিতে পারে না। সেই জন্ত এই ধারাটি উঠাইয়া দিতে বিশেষ আপত্তি আছে।

(২) দ্বিতীয় দফা সম্বন্ধে আপত্তি এই যে, মিষ্টার দাসের বিল আইনে পরিণত হইলে লোকের শত্রুতা করিয়া বিবাহ পণ্ড এবং কন্তাপক্ষকে অকারণ বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত করিবার বিশেষ সুবিধা করিয়া দেওয়া হইবে। কন্তার বিবাহ হইয়া গেলে আর সে বিবাহ পণ্ড করা যায় না। কিন্তু দাসের বিল আইনে পরিণত হইলে তাহা অনায়াসে করা যাইবে। অপরাধ অনুষ্ঠিত হইবার পূর্ব্বে উহা ম্যাজিষ্ট্রেটের আমলে আসিবে, এ ব্যবস্থা অত্যন্ত অন্তায়। ডাকাতি বা রাজবিদ্রোহে অথবা দাঙ্গার উপক্রমে এরূপ ব্যবস্থা হইতে পারে, কিন্তু বিবাহরূপ মাঙ্গলিক এবং শুভকার্য্যে পূর্ব্বে নিষেধাজ্ঞা (Injunction) জারি করা ঘোর অন্তায়। প্রথমতঃ বর-কন্তার আকৃতি দেখিয়াই বয়স নির্ণয় করা অত্যন্ত কঠিন, একরূপ অসম্ভব বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এমন কি, কোন শারীরবিজ্ঞানবিশারদ চিকিৎসকও অভ্রান্তভাবে বয়স নির্ণয় করিতে পারেন না। শিশুদিগের বয়স অনুমানেও দুই এক বৎসরের পার্থক্য ঘটে। কেহ অসম্ভব বাড়ন্ত হয়, কেহ খর্ব্বাকৃতি হয়। এরূপ অবস্থায় কন্তার বয়স ১৩ বৎসর কি ১৪ বৎসর, তাহা অভ্রান্তভাবে নির্ণীত হইবে কি করিয়া? মনে করুন, ম্যাজিষ্ট্রেট সংবাদ পাইলেন কোন বিবাহ হইতেছে, এমন সময় নিষেধাজ্ঞা জারি করিলেন যে, বিবাহ বন্ধ কর। তখন কন্তাকর্ত্তার পাত্র খুঁজিবার জন্ত সমস্ত চেষ্টা ও ব্যয়, বিবাহের আয়োজনের ব্যয় প্রভৃতি সমস্তই পণ্ড হইয়া যাইবে। ইহা ভিন্ন মনঃকষ্ট ও সামাজিক অপমান ত আছেই। অনেক স্থলে কন্তাটির বিবাহ হওয়াই দায় হইবে। শেষে যদি সাব্যস্ত হয় যে, কন্তার ও বরের বয়স আইনের সীমা পার হইয়া গিয়াছে,—তখন কি কেবল ক্ষতিপূরণ দ্বারা তাহার প্রতীকার হইতে পারিবে? আর সেই ক্ষতিপূরণের মাত্রা ন্যায়ত কতদূর হইবে? এরূপ অবস্থায় পিতামাতার উক্তিই সন্তানের বয়সের প্রমাণ বলিয়াই মানিয়া লইতে হয়। জীবন বীমা প্রভৃতিতেও ত ঠিকুজী কোষ্ঠী প্রভৃতি প্রমাণ বলিয়া গণ্য হয়। সুতরাং বিবাহ-সভায় ম্যাজিষ্ট্রেট নিষেধাজ্ঞা জারি করিলে বরপক্ষ এবং কন্তাপক্ষকে অকারণ হয়রাণ করা যাইতে পারে, শত্রুতাসাধনও ভালরূপ হয়, অতএব এরূপ ব্যবস্থা কোনমতেই হইতে দেওয়া উচিত নহে। কারণ, অনেক সময় কথাবার্ত্তা ঠিকঠাক করিয়া বিবাহ হইতেই এক বৎসরেরও আরও অধিক সময় অতিবাহিত হইয়া যায়। অনেক সময় বিবাহ হইবার বহু পূর্ব্বেই বিবাহের কথাবার্ত্তা ঠিকঠাক করা হয়। ইহা সকল দেশেই হয়। হিন্দুর পক্ষেই বা তাহা অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবে কেন? সুতরাং এ ব্যবস্থায় কোন নিরপেক্ষ ব্যক্তিই সম্মত হইতে পারেন না।

(৩) ম্যাজিষ্ট্রেট যত দিন ইচ্ছা তত দিনের জন্ত বর-বধূর মিলন নিষিদ্ধ করিয়া দিতে পারিবেন, এরূপ ব্যবস্থা নিতান্তই স্বৈরিতাসূচক। তিনি কন্তার বয়স চৌদ্দ বৎসর পূর্ণ হইবার পর পর্য্যন্ত আর নিষেধাজ্ঞা জারি করিতে পারিবেন না। অতএব বিবাহের বিষয়ে এ ব্যবস্থা কোন মতেই সমর্থন করা যায় না। ফল কথা, মিষ্টার দাসের বিলখানি যেন হিন্দুদিগের উপর প্রতিহিংসাসাধনের জন্তই পরিকল্পিত হইয়াছে বলিয়াই মনে হয়। ইহার তীব্র প্রতিবাদ হওয়া আবশ্যক।

পল্লীগ্রামে দরিদ্র গৃহস্থের পক্ষে কন্তাকে অধিক বয়স পর্য্যন্ত অনূঢ়া রাখা যে কি কঠিন ও বিপজ্জনক ব্যাপার, তাহা যদি সংস্কারকরা না বুঝেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে কিছুতেই ঐ সকল কথা বুঝান যাইবে না। অনেক অপ্রাপ্তবয়স্কা বালিকাকে

ফুসলাইয়া ব্যভিচারে লিপ্ত করা হয়, আদালতে তাহা প্রমাণ হইয়া গিয়াছে। য়ুরোপে এবং মার্কিণেও তাহার দৃষ্টান্ত অনেক পাওয়া গিয়াছে। এ স্থানে আর তাহার উল্লেখ করা গেল না। ছেলে কোলে করিয়া বিবাহ য়ুরোপে চলিতে পারে, কিন্তু হিন্দু সমাজ ত তাহার সমর্থন করিবে না। এরূপ অবস্থায় তাহাদিগকে কারাদণ্ডের এবং সর্ব্বস্ব দণ্ডের ভয় দেখাইয়া বাল্যবিবাহ উচ্ছেদ করিবার কি প্রয়োজন হইয়াছে? য়ুরোপে এক সময়ে বাল্যবিবাহ চলিত ছিল। জীবন-সংগ্রামের তীব্রতা এবং জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের মানদণ্ড বৃদ্ধি হেতু তথায় বাল্যবিবাহ ক্রমশঃ রহিত হইয়া যৌবন-বিবাহ প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। উহার ফলে বিবাহ যে একটা ধর্ম্মনির্দ্দিষ্ট অনুষ্ঠান (Sacrament), ইহা লোক ভুলিয়াছে, উহা আইনসঙ্গত বেশ্যাবৃত্তি বলিয়া লোকের ধারণা জন্মিয়াছে, ফলে বিবাহানুষ্ঠান তথায় নিষ্ফল হইয়া গিয়াছে। গৃহস্থাশ্রম ক্ষণভঙ্গুর হইয়া পড়িয়াছে। কাযেই এখন য়ুরোপ আবার বাল্যবিবাহ প্রবর্ত্তনের পক্ষপাতী হইতেছে। আর আমাদের সমাজসংস্কারকরা সর্ব্বস্বহানি করিয়া এই বাল্যবিবাহ জনমতের বিরুদ্ধে উঠাইয়া দিতে প্রস্তুত হইয়াছেন।

এক জন মুসলমান সদস্য ব্যবস্থা-পরিষদে এই মর্ম্মে এক পাণ্ডুলিপি উপস্থিত করিয়াছেন যে, সর্দ্দা আইন মুসলমানদিগের বেলায় আমলে আসিবে না। ইহাতে বুঝা যায় যে, মুসলমান সম্প্রদায় আমাদের ন্যায় হাটে মাথা হারায় নাই। যে সময় সর্দ্দা আইন বিধিবদ্ধ হইয়াছিল, সে সময় মুসলমানগণ এইরূপ দাবী করিয়াছিলেন। তখন পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু জীবিত ছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন যে, মুসলমানরা যদি আইনের দায় হইতে রেহাই পান, তাহা হইলে তিনি ঐ আইন রহিত করিয়া দিবেন। এখন কিন্তু সংস্কারকরা সে কথা মুখে আনিতেছেন না। আইনেও দেখিতেছি, সাম্প্রদায়িকতা প্রতিষ্ঠিত হইতে চলিল, এবং তাহা করিতেছেন,—সংস্কারকদল।

মন্ত্রিত্ব-গ্রহণ

কংগ্রেসের দলভুক্ত ব্যক্তিরা সরকারের মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করিবেন কি না, তাহা লইয়া বেশ বাদানুবাদ উপস্থিত হইয়াছে। মাদ্রাজের মিষ্টার সত্যমূর্ত্তি মন্ত্রিত্ব গ্রহণের পক্ষে স্পষ্ট মত দিয়াছেন। যাঁহারা সংস্কৃত শাসনপদ্ধতিকে অগ্রাহ্য করিয়াছেন বলিতেছেন, তাঁহারা যে কি প্রকারে সরকারের মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করিতে পারেন, তাহা আমরা বুঝিলাম না। মন্ত্রীদিগের হাত দিয়াই সরকারের সকল কার্য্য নির্ব্বাহ হইবে। অন্ততঃ দৃশ্যতঃ এই ব্যবস্থাই আছে। মন্ত্রী যদি ছায়াবাজীর পুতুলের মত অন্য লোক দ্বারা চালিত হইতে বাধ্য হন, তাহা হইলে কংগ্রেসওয়ালারা কি তাহাই করিতে সম্মত হইবেন? মিষ্টার সত্যমূর্ত্তি বলিতেছেন যে, শাসনসংস্কার বর্জ্জনের সহিত মন্ত্রিত্বগ্রহণ এই উভয় কার্য্য পরস্পর বেশ খাপ খায়। চমৎকার যুক্তি! শ্রীযুত শরচ্চন্দ্র বসু দেখাইয়াছেন, তাহা খাপ খাইবে না। কিন্তু সে কথা সত্যমূর্ত্তি এবং মিষ্টার রাজাগোপাল আচারিয়া মানিতে চাহেন না। গরজ কি নাহি লাজ। আমাদের বিশ্বাস, কাউন্সিলে প্রবেশ করিবার মত গ্রহণ করিয়াই কংগ্রেস স্বীয় মতের বৈশিষ্ট্য হারাইয়া বসিয়াছেন, তাহার উপর যদি তাঁহারা সরকারী উর্দ্দী পরিয়া মন্ত্রী সাজিতে সম্মত হন, তাহা হইলে সোণায় সোহাগা হইবে। মতের স্বাধীনতা দেখাইতে গেলে মন্ত্রীদিগের কি দশা ঘটে, তাহা বিদিত ভুবনে। পণ্ডিত শ্রীযুত জগৎনারায়ণ, শ্রীযুত চিরভূরি যজ্ঞেশ্বর চিন্তামণি, কুমার শ্রীযুত শিবশেখরেশ্বর রায় প্রভৃতির দৃষ্টান্তই তাহার জাজ্বল্যমান প্রমাণ। যে দেশে এক জন দক্ষ মন্ত্রীকে পদত্যাগ করিবার উৎসাহ দিয়া ভাগাড়ের শকুনির ন্যায় সেই শূন্য পদ গ্রহণ করিবার জন্য দলে দলে স্বার্থান্ধ এবং আত্মসর্ব্বস্ব লোকের অভাব হয় না, আর তাহারা লোকলজ্জা পরিত্যাগ করিয়া সেই পরিত্যক্ত উর্দ্দী পরিয়া লোকসমাজে বুক ফুলাইয়া বেড়াইতে পারে, সে দেশে মন্ত্রিত্ব পাইয়া যে কেহ স্বাধীনভাবে কায করিতে পারিবেন, ইহা যাঁহারা মনে করিতে পারেন, তাঁহাদিগকে বাতুল ভিন্ন আর কিছুই মনে করা যাইতে পারে না। অতিবৃদ্ধি শ্রীযুত রাজাগোপাল আচারিয়া আবার বলিয়াছেন, "ওগো! মন্ত্রীর আসন কুসুমশয়ন নহে,—উহা কণ্টকশয্যা।" বৎসর বৎসর চৌষট্টি হাজার কণ্টক যখন যাইয়া গায়ে বিঁধিবে, তখন তাহা চৌষট্টি হাজার গোলাপের পাপড়িতে পরিণত হইবে! তিনি বলিয়াছেন, মন্ত্রিত্বগ্রহণ একটা সামরিক কসরৎ (strategy), যে ফন্দীতে বৎসরে চৌষট্টি হাজার রুই-কাতলা থাবায় আসিয়া জমে,সে কায়দাকে যাহারা নিন্দা করে, তাহাদের কণ্ঠী ছিঁড়িয়া দাও।

সর্দ্দার শার্দ্দূল সিংহ মধ্যে বাঙ্গালায় আসিয়া বাঙ্গালার হালচাল দেখিয়া গিয়াছেন। তিনি বাঙ্গালা হইতে ফিরিয়া যাইয়া হাটে হাঁড়ি ভাঙ্গিয়া দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, "বাঙ্গালার একটা বড় কংগ্রেসী দল মন্ত্রিত্ব গ্রহণের পক্ষপাতী। কংগ্রেসের যে নির্ব্বাচন বোর্ড গঠিত হইয়াছে, সে দলে ইহাদের যথেষ্ট প্রভাব বিদ্যমান। তবে মাদ্রাজে যেমন বুজরুকী আছে যে, তাঁহারা মন্ত্রিত্ব লইয়া শাসনযন্ত্র অচল করিয়া দিবেন, বাঙ্গালায় এই দলের সেই বুজরুকী নাই। তাঁহারা সোজা কথায়ই বলেন, "শাসনপদ্ধতি যেমনই হউক না কেন, তাঁহারা তাহা চালাইতে সাহায্য করিবেন।" এই দল যে ঢেঁকির আটশলির মত সকল দিকে চলেন, তাহা জানে সর্ব্বজনে। এখন ইহারা আর আপনাদিগকে মডারেটদল হইতে পৃথক্ রাখিতে চাহেন না,—তবে কিছু প্রতিপত্তি লাভের খাতিরে কংগ্রেসের নাম লইয়া থাকিতে চাহেন। কোন্ বনের কোন্ বাঘ, তাহা চিনিয়া রাখা ভাল। সর্দ্দারজী বলিয়াছেন যে, বাঙ্গালায় সকলেরই এই মত যে, নূতন শাসনপদ্ধতির দ্বারা কোন উপকার হইবে না। যখন শাসনসংস্কার দ্বারা কোন কাযই হইবে না, তখন চৌষট্টি হাজারী মন্ত্রিপদই বা ছাড়ি কেন,—ইহাই বোধ হয় এই দলের মত। এখন দেখা যাউক, শ্রাদ্ধ কতদূর গড়ায়।

মহাত্মাজী ও জহরলাল

কিছুদিন পূর্ব্বে একখানি বিদেশী কাগজে প্রকাশ পায় যে, মহাত্মা গান্ধী বলিয়াছেন, "জহরলালজীর কার্য্যতালিকা আমার জীবনের সমস্ত কাযকে এমনভাবে পণ্ড করিয়া দিয়াছে যে, বৃটিশ সরকারের দৃঢ়তা এবং দমননীতি ততটা ক্ষতি করিতে পারে নাই। পণ্ডিত নেহেরু যে নীতির বিবৃতি করিয়াছেন, তাহাতে আমার কার্য্যের অধিক ক্ষতি হইয়াছে।" মহাত্মাজী যে এরূপ

কথা এক জন বিদেশী সাংবাদিকের কাছে বলিতে পারেন, ইহা কেহই বিশ্বাস করিতে পারেন না। মহাত্মাজীর প্রকৃতিই সেরূপ নহে। যাহা হউক, সম্প্রতি মহাত্মাজী তাঁহার "হরিজন" পত্রে ঐ উক্তির প্রতিবাদ করিয়া বলিয়াছেন যে, তিনি ঐরূপ কথা কাহারও সহিত বলেন নাই। তাঁহার মনে ঐরূপ কোন ভাবও নাই। পণ্ডিত জহরলাল বরং এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, হিংসার পথ অবলম্বন করিলে ভারত কখনই স্বাধীনতা লাভ করিতে পারিবে না,—বরং অহিংসার পথে চলিলে স্বরাজলাভ ঘটিবে। উভয়ের মধ্যে যে পত্র-ব্যবহার হইয়াছিল, তাহাতে তাহা বিশদভাবে বিবৃত আছে। তাহার জন্ম তাঁহাদের উভয়ের মধ্যে ব্যক্তিগত সম্বন্ধ ক্ষুণ্ণ হইবার কোন সম্ভাবনা নাই। তাঁহারা উভয়েই কংগ্রেসের গন্তব্য পথে লক্ষ্য স্থির রাখিয়াছেন। তিনি আরও বলিয়াছেন যে, জহরলালজীর কার্য্যতালিকার দ্বারা তাঁহার জীবনের কার্য্য পণ্ড হইবার নহে,—তাঁহার আরও বিশ্বাস এই যে, বৃটিশ সরকারের দৃঢ়তা এবং দমন-নীতির ফলে তাঁহার কার্য্য-তালিকা পণ্ড হইবার নহে। তিনি আরও বলিয়াছেন যে, তাঁহার যদি কোন দার্শনিকতা থাকে, তাহা হইলে তাহা বাহিরের লোক দ্বারা ক্ষুণ্ণ হইতে পারে না। যদি কাহারও যুক্তি বা মত মন্দ হয়, অথবা যদি উহা অভ্রান্ত হয়, তাহা হইলেও উহার সমর্থকগণ যদি কপট, দুর্ব্বলচিত্ত অথবা অশুচি হন, তাহা হইলে তাঁহার ক্ষতি হইতে পারে। তিনি আরও বলিয়াছেন যে, তাঁহার জীবনে কখনও কোন গুপ্ত অভিসন্ধি ছিল না এবং জহরলালজীর সহিত তাঁহার কোনপ্রকার প্রতিদ্বন্দ্বিতা নাই। মহাত্মাজীর সম্বন্ধে এইরূপ মিথ্যা কথা কেন রটে, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। তবে একটা কথা আছে যে, বড় গাছে বড় ঝড়ই বাধিয়া থাকে। তাঁহাদের উভয়ের লক্ষ্য যখন এক, তখন অবলম্বিত পথ ভিন্ন হইলেও ক্ষতি নাই।

হাবড়ায় নূতন সেতু

আজ কয়েক বৎসর ধরিয়া হাবড়ার সেতুটি নূতন করিয়া গড়িবার প্রস্তাব চলিতেছে। ইহা লইয়া যে কত বাক্যব্যয় হইয়া গেল, তাহার সংখ্যা করা যায় না। এই পুলটি নির্ম্মাণ করিতে তিন কোটি টাকার উপর ব্যয় পড়িবে; সুতরাং উহার ঠিকা পাইবার জন্ম অনেকেই বিশেষ ব্যাকুল ছিলেন। বলা বাহুল্য, এই সেতুবন্ধের ব্যয় যাহা পড়িবে, তাহা দিবে ভারতবাসীরা। কিন্তু সাব্যস্ত হইয়াছে যে, পুল-নির্ম্মাণ কার্য্যের ঠিকা পাইবেন বিলাতের মেসার্স ক্লিভল্যাণ্ড ব্রিজ এণ্ড ইঞ্জিনিয়ারীং কোম্পানী। উহারা যে টেণ্ডার দিয়াছিলেন, শুনিতেছি, তাহা সর্ব্বনিম্ন ছিল না। তথাপি ইহাদিগকেই ঠিকা দেওয়া হইয়াছে। এইরূপ ব্যাপার আমাদের দেশে যেরূপ গা-সহা হইয়া গিয়াছে, তাহাতে বোধ হয়, কেহই বিশেষরূপ বিস্মিত হন নাই। তবে এই ক্লিভল্যাণ্ড ব্রিজ কোম্পানী নাকি ভারতবাসীদিগকে অনন্যসাধারণ অনুকম্পা প্রদর্শন করিয়া বলিয়াছেন যে, যদি তাঁহারা কোন ভারতীয় কারখানার সহিত ন্যায্য দরে এবং অন্যান্য অনুকূল সর্ত্তে চুক্তি করিতে পারেন, তাহা হইলে তাঁহারা ভারতীয় কারখানা হইতেই ইস্পাত লইবেন। সেতু-কমিশনাররা সেই জন্ম মনে করিয়াছেন যে, যখন ইহাদিগকে ঠিকা দিলে ভারতীয় লৌহ কারখানাওয়ালাদের ক্ষতি হইবে না, তখন ইহাদিগকেই ঠিকা দেওয়া উচিত। এখন টাটা কোম্পানী এই ইস্পাত সরবরাহের কত অংশ পান, তাহা দেখিবার জন্ম সকলে উৎসুক রহিয়াছেন। কিন্তু এই সেতু নির্ম্মাণ করিতে অনেক পরিমাণ সিমেণ্ট বা বিলাতী মাটী লাগিবে। সে মাটীও তাঁহারা এদেশের বিলাতী মাটী প্রস্তুতকারকদিগের নিকট হইতে লইবেন। আরও গুজব শুনা যাইতেছে, ক্লিভল্যাণ্ড কোম্পানী শোণ ভ্যালি কোম্পানীর নিকট হইতে সিমেণ্ট গ্রহণ করিবেন সাব্যস্ত করিয়াছেন। শোণ ভ্যালি কোম্পানী মাজ্জার কোম্পানীর সহিত এই মর্ম্মে একটা চুক্তি করিয়াছেন যে, এই সেতু নির্ম্মাণের জন্ম যত সিমেণ্টের প্রয়োজন হইবে, তাহার শতকরা ৬০ ভাগ দিবেন মাজ্জার কোম্পানী আর ৪০ ভাগ দিবেন শোণ ভ্যালি কোম্পানী।

সন্ত্রাসবাদে গবর্ণর

গত ১১ই শ্রাবণ সোমবার বাঙ্গালার গবর্ণর সার জন এণ্ডারসন ঢাকার দরবারে এক বক্তৃতা করিয়াছিলেন। সেই বক্তৃতায় তিনি সন্ত্রাসবাদী বলিয়া বিবেচিত ব্যক্তিদিগকে অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্ম আটক রাখা সম্বন্ধে এক বিবৃতি দিয়াছেন। 'ষ্টেটসম্যান' কাগজে এই সম্বন্ধে আলোচনা হয়। তাহাই সার জন এণ্ডারসনের এ বিষয় লইয়া কতকগুলি কথা বলিবার কারণ। তাঁহার উক্তির লক্ষ্য এই যে, লোক অনেক সময় বলিয়া থাকে যে, সরকার অনেক নিরপরাধ ব্যক্তিকে সন্দেহমাত্র করিয়া বা পুলিসের কথার উপর নির্ভর করিয়া অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্ম আটক রাখিয়াছেন। এ দেশের অনেকের এরূপ বিশ্বাসও আছে। সার জন বলিতে চাহেন যে, যাঁহারা এরূপ বলেন বা বিশ্বাস করেন, তাঁহারা ভ্রান্ত। কারণ, তিনি স্বয়ং ইচ্ছামত বাছিয়া লইয়া অনেকগুলি আটক আসামীর কাগজপত্র দেখিয়া ভাল রকম বুঝিয়াছেন, এ ক্ষেত্রে ভুল হইবার সম্ভাবনা একরূপ নাই বলিলেও চলে। দুর্ভাগ্যক্রমে আমরা সার জনের এই উক্তি শুনিয়া আশ্বস্ত হইতে পারিলাম না। সার জন এণ্ডারসন একজন তীক্ষ্ণবুদ্ধি ব্যক্তি। তিনি বহু কাগজপত্র নিরপেক্ষভাবে তন্ন তন্ন করিয়া দেখিয়াছেন, এ কথা আমরা সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি। তিনি দেখিয়া বিশেষভাবে বিচার করিয়া বুঝিয়াছেন, ঐ সম্বন্ধে ভুল হইবার সম্ভাবনা অতি অল্প—নাই বলিলেই চলে—এ কথা ঠিক। কিন্তু সার জন কেবল কাগজপত্র ভিন্ন আর ত কিছুই দেখেন নাই। আমরা সার জন এণ্ডারসনকে সসম্ভ্রমে জিজ্ঞাসা করি, কেবল নিৰ্জ্জীব নথিপত্র দেখিয়া কি সকল সময়ে অভ্রান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব? তিনি বিশেষভাবে বিচার করিয়া দেখুন, যদি কেহ কাহারও বিরুদ্ধে কোন মিথ্যা মামলা সাজায়, তাহা হইলে সে কি সাধ্যপক্ষে তাহার ভিতর এমন কোন ফাঁক রাখে—যাহা সহজে ধরা পড়ে? যদি তাহা ধরা পড়িত, তাহা হইলে বিচারকার্য্য অতি সহজ হইয়া দাঁড়াইত। অনেক সময় আদালতে দেখা গিয়াছে যে, সাজান সাক্ষী এমনভাবে জবানবন্দী দিয়া গিয়াছে যে, তাহা শুনিয়া বিজ্ঞ বিচারকেরও দৃঢ় ধারণা জন্মিয়াছে যে, বাস্তবিকই সত্য

কথা বলিয়া যাইতেছে। বিশেষ সুদক্ষ উকিলের জেরা না পড়িলে সে যে মিথ্যা কথা বলিতেছে, তাহা ধরা পড়ে নাই। যদি কেবল কাগজপত্র দেখিয়াই মামলার বিচার করা যাইত, তাহা হইলে আদালতে সাক্ষীদিগকে জেরা করিবার ব্যবস্থা থাকিত না।

সার জন এণ্ডারসন বলিয়াছেন, অনেক ভূতপূর্ব্ব আটক আসামী স্বেচ্ছায় যে সংবাদ দিয়াছে, তাহার দ্বারাও উহা সমর্থিত হইয়াছে। ভূতপূর্ব্ব আটক আসামীরা "স্বেচ্ছায়" কাহার নিকট সংবাদ দিয়াছে? কোন পুলিস-কর্ম্মচারীর নিকট কি? যদি তাহারা "স্বেচ্ছায়" কোন পুলিস কর্ম্মচারীর নিকট সংবাদ দিয়া থাকে, তাহা হইলে তাহা বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া মনে করা যাইতে পারে কি? সার জন এণ্ডারসন অবশ্য জানেন যে, কোন আসামী যদি কোন পুলিস-কর্ম্মচারীর নিকট স্বীকারোক্তি করে, তাহা হইলে তাহা প্রমাণ বলিয়া উপস্থিত করা যায় না। এই ব্যবস্থা করিবার হেতু কি, তাহা অবশ্য সার জন বুঝিয়াছেন। সুতরাং ঐরূপ সমর্থক সংবাদ সত্য বলিয়া গ্রাহ্য করা নিরাপদ নহে। যদি তাহারা ঐরূপ সমর্থক সংবাদ স্বেচ্ছায় কোন বিচারপতির নিকট দিয়া থাকে,—তাহা হইলে সহজেই এই কথা জানিতে কৌতূহল হয় যে, তাহাদিগকে 'স্বেচ্ছায়' ঐ প্রকার সমর্থক প্রমাণ দিবার জন্য যোগাড় করিয়া আনিয়াছিল কে? এ কথা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে, আপীল আদালতে অনেক সময় কাগজপত্র দেখিয়াই বিচার করা হয়। কিন্তু নিম্ন আদালতে সাক্ষীদিগকে যদি জেরা প্রভৃতি না করা হইত, তাহা হইলে উচ্চ আদালত আপীল বিচার ঠিকমত করিতে পারিতেন না। নিম্ন আদালত যদি কেবল সাক্ষীদিগের জবানবন্দীমাত্র গ্রহণ করিয়া নথিপত্র উচ্চ আদালতে পাঠাইয়া দেন, তাহা হইলে কি উচ্চ আদালত আপীল বিচারে ঐ মামলা সম্বন্ধে চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করিতে সমর্থ হন?

এ কথা অবশ্য কেহই মনে করেন না যে, সরকার যতগুলি লোককে গ্রেপ্তার এবং আটক রাখিয়াছেন, তাহারা সকলেই নির্দ্দোষ। উহাদের মধ্যেই অনেকে সম্ভবতঃ প্রকৃত দোষী। কিন্তু সকলেই যে সমান দোষী, তাহাও মনে করা যাইতে পারে না। সকল ক্ষেত্রেই অপরাধের তারতম্য থাকে। অনেক চপলমতি বালক হয় ত সঙ্গদোষে পড়িয়া কুকর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়। তাহারা ক্ষণিক বুদ্ধির দোষে হয় ত ঐরূপ করিতে চেষ্টা করে। উহাদের চরিত্রের সংশোধন হইতে পারে। এরূপ ক্ষেত্রে সকলকে অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য আটক রাখা কোনমতেই বিচারসিদ্ধ হইতে পারে না। উহাদিগকে একটা নির্দ্দিষ্ট কালের জন্য আটক রাখিয়া শেষে সাবধান করিয়া এবং সদুপদেশ দিয়া ছাড়িয়া দেওয়া উচিত। যাহারা দোষী, তাহাদের মধ্যে অনেকে কুশিক্ষায় এবং কুবুদ্ধির বশে ঘোর কাপুরুষতাসূচক কুকর্ম্মে রত হইয়াছে। কিন্তু তাই বলিয়া তাহাদের যে সংশোধনের উপায় নাই, তাহাও মনে করা উচিত নহে। বাঙ্গালার গবর্ণর যে কষ্ট করিয়া আটক আসামীদিগের কাগজপত্র দেখিয়াছেন, এ জন্য তিনি ধন্যবাদার্হ। তিনি যে বিশেষ তীক্ষ্ণবুদ্ধি লোক, তাহা কেহই অস্বীকার করে না। তবে তাঁহার বুঝা উচিত যে, মানুষমাত্রেরই ভুল হয়। সার আইজাক নিউটনও বাক্স হইতে ইন্দুরের বাহির হইবার দ্বার প্রস্তুত করিতে যাইয়া বিষম ভুল করিতে বসিয়াছিলেন।

নারী-ধর্ষণ ও বঙ্গীয় লাট

বাঙ্গালার লাট সে দিন ঢাকা সহরে পুলিস-বাহিনীকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন, ১৩৩৪ খৃষ্টাব্দ অপেক্ষা ১৩৩৫ খৃষ্টাব্দে এই শ্রেণীর গুরুতর অভিযোগের মামলা শতকরা ৩০টি হারে কমিয়াছে, কিন্তু অপেক্ষাকৃত লঘু অপরাধের মামলা শতকরা ৭টি হিসাবে বাড়িয়াছে। লাট বাহাদুরের এই উক্তি বুঝিতে আমাদের ঘোর অসুবিধা ঘটিতেছে। কারণ, নারীর মর্য্যাদা বা সতীত্বঘটিত মামলার অপরাধের গুরুত্ব এবং লঘুত্ব সার জন এণ্ডারসন কি ভাবে বিচার করেন, তাহা আমরা ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না। আমাদের মনে হয়, নারীর মর্য্যাদাহানিকর অপরাধ অপরাধীর পক্ষে ঘোর পশুত্বসূচক, সুতরাং সে অপরাধের গৌরব বা লাঘব থাকিতে পারে না। যে অপরাধে মানুষের প্রকৃতি পশুত্বের পর্য্যায়ে পড়ে, সে অপরাধ সম্বন্ধে গৌরব-লাঘবের আরোপ করা ভুল। তাহার পর সার জন এণ্ডারসন বলিয়াছেন যে, গত বৎসর নারীর মর্য্যাদা-নাশের মামলা হইয়াছিল ৭ শত ৩৭টি। তন্মধ্যে হিন্দুনারীর বিরুদ্ধে ৩ শত ৩৩টি আর মুসলমান নারীর বিরুদ্ধে ৪ শত ৪টি। এখন আমাদের জানিতে ইচ্ছা হয় যে, তাঁহার ধারণা অনুযায়ী এই শ্রেণীর অপরাধের গুরুত্ব এবং লঘুত্ব হিসাবে হিন্দু নারীর উপর কতগুলি গুরু এবং কতগুলি লঘু অপরাধ অনুষ্ঠিত হইয়াছিল এবং মুসলমান নারীদিগের উপরই বা ঐরূপ অপরাধ কতগুলি অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহা তিনি আর একটি বক্তৃতায় প্রকাশ করিয়া দিবেন কি? দ্বিতীয়তঃ এই অপরাধ অনুষ্ঠাতাদিগের মধ্যে কত ভাগই বা হিন্দু আর কত ভাগই বা মুসলমান, তাহারও একটা তালিকা দেওয়াও উচিত। কারণ, তাহা হইলে কোন্ সমাজ কতটা অধঃপাতে গিয়াছে, তাহা বুঝা যায়। আমাদের মনে পড়ে, বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় যখন এই অতীব ঘৃণ্য এবং পশুত্বসূচক অপরাধে বেত্রদণ্ড দিবার ব্যবস্থা হয়, তখন সুরাবর্দ্দী বলিয়াছিলেন যে, এই অপরাধের আসামীদিগের মধ্যে মুসলমানের সংখ্যা অধিক বলিয়া হিন্দুরা ইহার জন্য কঠোর দণ্ড দিতে চাহিতেছেন। সার জন এণ্ডারসন অবশ্য বলিয়াছেন যে, যে সব ক্ষেত্রবিশেষে ব্যবস্থা-পূর্ব্বক এবং শৃঙ্খলার সহিত, অথবা পাপের দ্বারা অর্থলাভ করিবার লোভে এই শ্রেণীর অপরাধ অনুষ্ঠিত হয়, তাহার আসামীদিগকে কঠোর দণ্ড দিতে কোন্ সম্প্রদায়ই আপত্তি করে না। ইহাতে লাট সাহেব কোন্ শ্রেণীর অপরাধকে গুরুতর মনে করেন, তাহার আভাস পাওয়া যায়। আমরা অবশ্য ঐ প্রকার পশ্বাচারের ঐরূপ তারতম্য বুঝি না। নরকের মধ্যে ভাল মন্দ স্থানের বিচার করা যায় না। তবে কেহ ঐ প্রকার অপরাধের কঠোর দণ্ডের আপত্তি করে কি না, তাহা বেত্রদণ্ড দানের আইন প্রণয়নকালে ভোটের তালিকা দেখিলেই বুঝা যায়। নারীধর্ষণরূপ মহাপাপের অবসানকল্পে কঠোর বেত্রদণ্ড যে মহৌষধ, ইহা ভদ্র-মানুষ-মাত্রেই স্বীকার করিবেন।

প্লাবন-পীড়ন

গোমতী নদীর জলবৃদ্ধির ফলে যুক্তপ্রদেশের বহু স্থান জলে ভাসিয়া গিয়াছে। বিস্তীর্ণ স্থানে লোকের ঘরবাড়ী পড়িয়া গিয়াছে।

অনেক লোক জলে ভাসিয়া গিয়াছে। যাহারা ভাসিয়া গিয়াছে, তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ অবশ্য ভবনদীর অপর তীরে যাইয়া পৌঁছিবে, কেহ কেহ হয় ত কোন রূপে আপনার জীবনরক্ষা করিতে পারিবে। গোমতীতীরবর্ত্তী ৫০টি গ্রাম মনুষ্যশূন্য হইয়া গিয়াছে। বাটলার রোডের কয়েকটি স্থান ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, কতকগুলি রাজ-পথে লোকের যাতায়াত বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। কেবল লক্ষ্ণৌ সহর বিপন্ন হয় নাই, গোমতীর বামতীরস্থ সমস্ত গ্রাম ও পল্লীর অবস্থা শঙ্কাজনক হইয়া উঠে। ঐ সকল স্থানের অধিবাসীদিগের সাহায্যের জন্য সরকার কমিশনারের হাতে ১০ হাজার টাকা দিয়াছেন। ইহার পর সংবাদ আসে যে, প্রায় ৬ শত গৃহ পড়িয়া গিয়াছে, গৃহপতনে কয়েক জন লোকের মৃত্যুও হইয়াছে।

ইহা ভিন্ন বেরিলী, পিলভিট, সাজাহানপুরও বন্যার প্রকোপে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। রামগঙ্গার জলও বিশেষ বাড়িয়া যায়। লক্ষ্ণৌ সহরের বাঁধটি ভাঙ্গিয়া যাইবার আশঙ্কা হইয়াছিল। বালি-পূর্ণ বস্তা দিয়া বাঁধটি রক্ষা করা হইয়াছে। গোমতীর পশ্চিম-তীরস্থ অধিবাসীদিগেরই ক্ষতি অধিক হইয়াছে। লক্ষ্ণৌ হইতে যে রাস্তা কাণপুরে গিয়াছে, সেই রাস্তার ক্ষতিই অত্যন্ত অধিক হইয়াছে। নালাগুলির ভিতর দিয়া বন্যার জল প্রবেশ করিয়া পল্লী অঞ্চলের গ্রামগুলিকেও বড় বিপন্ন করিয়া তুলিয়াছে। গ্রাম-বাসীরা ঘরদ্বার ফেলিয়া পলায়ন করিয়াছে। বেরিলীর অবস্থাও বিপজ্জনক শুনা গিয়াছিল। তথা হইতে সংবাদ পাওয়া গিয়াছিল যে, বহু লোক গাছের উপর উঠিয়া কোনমতে জীবনরক্ষা করিয়াছে। সহরে প্রায়ই গৃহপতনের শব্দ কয়েক দিন ধরিয়া শুনা গিয়াছিল। এই অঞ্চলের অনেক গৃহপালিত পশু জলে ভাসিয়া গিয়াছে। যুক্তপ্রদেশে এবং বিহারের নানা স্থান হইতে এইরূপ বন্যাসম্পর্কিত বিপদের সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। রাপ্তি নদীর জলবৃদ্ধি হেতু বিস্তৃত স্থানে বহুলোক বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছে। রাপ্তির শাখানদী রোহিণীতে বন্যা হইয়াছে। মতিহারী হইতেও শোচনীয় সংবাদ আসিয়াছে। গণ্ডক নদীতে বান আসাতে এবং গাজনা এবং ধিমরা নদীর জল অতিশয় বৃদ্ধি পাওয়াতে বিহার অঞ্চলে বিস্তীর্ণ ভূভাগ জলমগ্ন হইয়াছে। বাঙ্গালা দেশে দামোদর নদে এবং বাঁকুড়া প্রভৃতি জিলায় কতকগুলি নদীর জল বৃদ্ধি পাওয়াতে লোকের মনে আতঙ্কের সঞ্চার হইয়াছে। জলবৃদ্ধিতে স্থানে স্থানে কৃষিক্ষেত্রেরও বিশেষ ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা ঘটিয়াছে। ব্রহ্মদেশ এবং মাদ্রাজ হইতে বর্ষাজনিত বন্যার সংবাদ আসিয়াছে। ফলে দেখা যাইতেছে, এবার মোটের উপর অধিক বারিপাত হওয়াতে ভারতের বহু স্থানে লোকের দুর্গতি ঘটিয়াছে ও ঘটিতেছে। বাঙ্গালায় এ বৎসর ত বিষম দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইয়াছে। স্থানে স্থানে লোক না খাইতে পাইয়া মরিতেছে বা আত্মহত্যা করিতেছে এরূপ সংবাদও পাওয়া যাইতেছে। ফলে ভারতবর্ষের উপর যেন দেবতারও অভিসম্পাত আসিয়া পড়িয়াছে বলিয়া মনে হইতেছে। এই বন্যার প্রভাবে বহু স্থানে শস্যনাশ হইয়াছে।

বঙ্গে দুর্ভিক্ষ

গত বৎসর পর্য্যাপ্ত পরিমাণে বারিপাত না হওয়াতে এবার মধ্যবঙ্গে এবং পশ্চিমবঙ্গে লোকের দারুণ অন্নকষ্ট উপস্থিত হইয়াছে। স্থানে স্থানে ঘোর দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়াছে। সরকারও কয়েক স্থানে দুর্ভিক্ষ হইয়াছে বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। এবার বৃষ্টি হইয়াছে বলিয়া সরকার ইহার মধ্যে অনেক স্থানে সাহায্য-দান বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। কিন্তু যত দিন ফসল না হইতেছে, তত দিন সাহায্যদান না করিলে যে লোকের ঘোর কষ্ট হইবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। হুগলী, বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া প্রভৃতি জিলায় দেশের লোকের বিশেষ কষ্ট হইতেছে। বাঁকুড়া প্রভৃতি কয়েকটি জিলায় যাহারা মধ্যবিত্ত ভদ্রশ্রেণীর মধ্যে নিঃস্ব, তাহাদেরই কষ্টের একশেষ হইয়াছে, শুনা যাইতেছে। বাঁকুড়া জিলার সোণামুখী অঞ্চল হইতে ভীষণ সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। এই অঞ্চলে ভদ্র গৃহস্থের অবস্থা অতিশয় শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছে। মধ্যবিত্ত গৃহস্থের অবস্থা একবারে চরমে উঠিয়াছে। যে সকল ভদ্রঘরে পুরুষ অভিভাবক নাই, তাহাদের ঘোর বিপদ উপস্থিত। তাহারা ভিক্ষা করিয়া জীবিত আছে, কিন্তু সকলের অবস্থা মন্দ হওয়াতে ভিক্ষা করিয়া আর দিন চালান সম্ভব হইতেছে না। এই অঞ্চলে ১৩ শত ঘর তাঁতির বাস। বিদেশ হইতে রেশম আমদানীর ফলে তাহাদের রেশমজাত বস্ত্রশিল্প নষ্ট হইয়া গিয়াছে। উহা পুনরুদ্ধারের আর সম্ভাবনা অতি অল্প। এখন তাহারা অনেকেই বেকার অবস্থায় পতিত। অনেকে উদরের জ্বালা সহিতে না পারিয়া পুত্র-পরিবার ত্যাগ করিয়া বিদেশে চলিয়া যাইতেছে। ফলে অবস্থা বিষম শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। হাট আসুরিয়া, বেলে তোড়, বড় জোড়া প্রভৃতি স্থানে লোকের বিশেষ কষ্ট হইয়াছে। কিন্তু তাহারা কোনরূপ সাহায্য পাইতেছে না।

এই ঘোর অন্নকষ্ট অল্পস্থানের মধ্যে সীমাবদ্ধ নাই। ২৪ পরগণা, হুগলী, যশোহর, দিনাজপুর—সর্ব্বত্রই লোকের অন্নকষ্ট উপস্থিত হইয়াছে। প্রত্যেক গৃহস্থই ইহার প্রভাব অনুভব করিতেছে। ফলে এখন বাঙ্গালা হইতে দেশব্যাপী হাহাকার উঠিয়াছে। কেন এমন হয়, ইহাই বিশেষভাবে চিন্তনীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আমাদের বিশ্বাস, লোকেরও কৃষি ভিন্ন অন্য বৃত্তি না থাকাতেই এই অবস্থা ঘটিয়াছে। যদি দেশের লোকের কৃষি ভিন্ন অন্য বৃত্তি না থাকে,—আর সেই কৃষি যদি কেবল পর্জ্জন্যদেবের কৃপাভিখারী হইয়া থাকে,—তাহা হইলে এরূপ ব্যাপার হইবেই হইবে। সুতরাং অনাবৃষ্টির সময়ের জন্য সেচের সুব্যবস্থা করা এবং শিল্প সংরক্ষণ করা ভিন্ন ইহার প্রতীকারের অন্য উপায় নাই। অতএব নূতন বড়লাট বাহাদুর যশুদানে কৃষীবলদিগকে যে বাধিত করিতেছেন, তাহাতে বিশেষ কিছুই হইবে না। কৃষীবলের এবং ভারতবাসীর উপকার করিতে হইলে সেচের সুব্যবস্থা এবং শিল্প প্রতিষ্ঠা করা আবশ্যক। নতুবা এরূপ দুর্দ্দৈব প্রায়ই ঘটিবে। কিছুতেই তাহা রক্ষা করা যাইবে না।

শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত
কলিকাতা, ১৬৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, বসুমতী রোটারী মেসিনে শ্রীশশিভূষণ দত্ত মুদ্রিত ও প্রকাশিত

"গভীর অরণ্য-ছায়ে উদাসিনা হ'য়ে
বসে থাক ; ঝিকিমিকি আলোছায়া গায়ে।"

শিল্পী - মিষ্টার টমাস

১৫শ বর্ষ] ভাদ্র, ১৩৪৩ [৫ম সংখ্যা

ডিনার-লহরী

["যমুনা-লহরীর" অনুকরণ নয়]

কবিবর স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের অপ্রকাশিত কবিতা

মিশ্র কানেড়া

ডিনার, ফলার, ভোজ খেয়েছি বহুৎ,
কিন্তু খেয়ে কভু হেন হয়নিক "যুত"।

কেন না,—

ধ'রে বেঁধে' ভূমে পেড়ে', বুকের উপর হাঁটু গেড়ে',
(এই রকম) খানা আদায় করা বেড়ে!
যদিও সে লোকটা একটু হয় অপ্রস্তুত;
তথাপি এ রকম খানা খেতে বড় 'যুত'।

এ খানার অনেকগুলি বেশ সুন্দর moral আছে।
এর প্রথম moral হচ্ছে এই; —

কষ্টে-পাওয়া রত্নলাভে যে সুখটি পাবে,
পাবে না তা' অনায়াসলব্ধ ধনলাভে;—
এই যেমন রাজারাজড়া মৃগয়া যে করে,
কিম্বা নিষ্কর্ম্মারা ছিপ দিয়ে মাছ ধরে,

কেন করে এত কষ্ট?—ওই সমুদয়,
চাকর দিয়ে ধরিয়ে ত কেটে খেলেই হয়!
আরও দেখুন, লোকের কেন
ঘোড়ায় চড়ে' পড়া,
যখন তার চেয়ে সোজা গাধার পীঠে চড়া?
মনুষ্য-চরিত্রেও দেখুন—নবীনা মুখরা,
অভিমানপরায়ণা নারী বশ করা
ভারি আমোদের। সবাই জানেন নব বধূর
অধরেতে কষ্টে-পাওয়া চুম্বন অতি মধুর;
কোন কবি বলেন—ভুলে গিইছি ইংরেজিটে—
গোপনে অবৈধ চুম্বন ভয়ঙ্কর মিঠে!
যদিও নীতিবিরুদ্ধ কথাটি নিশ্চয়;
কিন্তু তার জন্য দায়ী এ বেচারী নয়।
আরও উদাহরণ—তৈরি ভাত ছেড়ে যাওয়া
এবং বনে গিয়ে লোকের নিজে রেঁধে খাওয়া।

কিন্তু অন্য উদাহরণ করা কেন খোঁজ,
তার বেশই ত উদাহরণ আজকার এ ভোজ !
নিজে-থেকে-দেওয়া খানা,
নানাবিধ স্থানে নানা,
খেয়েছি ত লক্ষ লক্ষ অযুত অযুত,
কিন্তু কোনটাই হেন হয়নিক "যুত"।

এর দ্বিতীয় moral এই যে,—

থাকিলে উদ্যম এবং অধ্যবসায়,
পৃথিবীতে অনেক কার্য্যই সিদ্ধ করা যায় ;
প্রমাণ, একা চড়া, ধ্রুপদ গাওয়া, পদ্য লেখা,
জর্ম্মাণ ভাষার উচ্চারণ ও cheese খেতে শেখা ;
প্রমাণ, গ্রীষ্মে দুপর বেলা আপিস করা রোজ ;
অধিক আর কি প্রমাণ দেব—প্রমাণ এই ভোজ !
—এঁর কাছ থেকে খানা আদায় করা আজ
বুঝি সোজা অধ্যবসায় ও উদ্যমের কাজ !
অতুল অধ্যবসায়ে আদায় করা খানাটা এ
খায় বন্ধুভাবে আজি যত আর্য্যসুত –
সেই জন্য এ ভোজ রে ভাই খেতে বড় "যুত"।

এ খানার তৃতীয় moral এই যে,—

একতা।—থাকিত তাহা এ ভারতে যদি
পারিত কি ম্লেচ্ছ পার হতে সিন্ধু নদী—
অর্থাৎ নদ। চটবেন নাক,—নিরঙ্কুশাঃ কবয়ঃ—
একতা থাকিলে—বলি দেন যদি অভয়—
লোপ পেত বিয়ের হাটে ছেলের দাম হাঁকা ;
সাহেবদের সব বাবুর্চিরা পেত টানা-পাখা ;
বানরদের একতায় রাবণ বাজিমাৎ ;
রাজাদের একতায় নেপোলিয়ন কাৎ ;
একতায়—মৌমাছিরা মধুচক্র গড়ে,
এবং ছেলেরা তা ভেঙ্গে মধু পান করে।
দশ জনের একতায় club হয় নানা ;
দশ জনের একতায় আজিকার খানা।
দশ জনের একতায় দশ জনে খানা খায় ;
এরেই বলে দশচক্রে ভগবান্ ভূত—
মরিরে ! —তাই এ খানা খেতে বড় "যুত"।

এ খানাটির চতুর্থ moral,—

বুদ্ধি। —ছেলের কেনা সন্দেশ চিলে নিয়ে যায় ;
বাপে কষ্টে টাকা জমায়, পুত্রে বসে' খায় ;
কোকিল উড়ে বেড়ায়, ও তার ডিমে তা দেয় কাকে ;
জমীদারে বাড়ি করে, সাহেবেরা থাকে ;
বোকায় গায়ে আতর মাখে, বুদ্ধিমানে শোঁকে ;
মূর্খে করে বিয়ে, ভোগ করে জ্ঞানী লোকে ;
—আর্য্যগণ এই কথা শুনে মৎ চটো,
কারণ, এই শেষোক্তটা ইংরাজদের "মটো" ! —
মূর্খে কেনে বহি আর জ্ঞানী পড়ে তায় ;
বোকা লোকে খানা দেয় ও বুদ্ধিমানে খায়।
নিজের বুদ্ধির পরিচয় নিয়ে বন্ধু সমুদয়
খেয়ে বাড়ি চলে যাও—ধরো নাক খুঁত ;
—মনে রেখো, এই রকম খেতে বড় "যুত"।

[পণ্ডিত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি মহাশয়ের নিমন্ত্রণ উপলক্ষে রচিত]

[শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ মহাশয়ের সৌজন্যে প্রকাশিত]
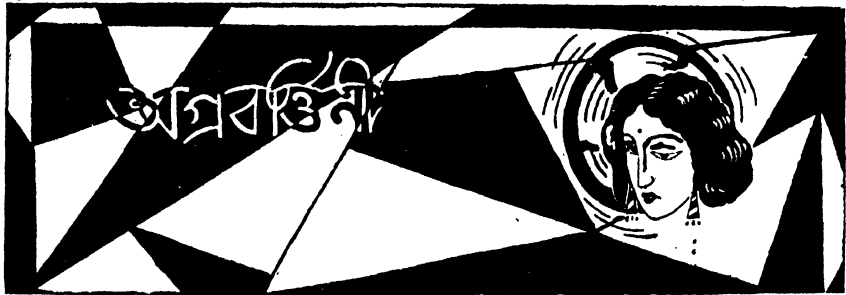
[উপন্যাস]

উনবিংশ পরিচ্ছেদ

নূতন হাওয়া

মিসেস দত্ত চলিয়া গেলে ফুল্লরা পাশের ঘরে আসিল। নকুল বসিয়া একখানা খবরের কাগজের পাতা উল্টাইতেছিল, ফুল্লরাকে দেখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, বলিল—কি খপর?

নিশ্বাস ফেলিয়া নকুল বলিল,—ভালো খপর নয়।

ভালো খপর নয়? কিসের খপর?...

প্রশ্নের সঙ্গে সঙ্গে ফুল্লরার মনে হইল—তার কাছে ডুনিয়ার কোন্ খপর এমন মূল্যবান্?

সমস্ত পৃথিবী যেন চোখের সামনে সবেগে তুলিয়া উঠিল। স্বামী...?

কিন্তু তিনি বিদেশে! মক্কেলের গ্রীফ পিষিয়া চূর্ণ করিয়া তাহা হইতে পয়সা বাহির করিতেছেন! খবর নকুল পাইবে কোথা হইতে?

কুতূহলী দৃষ্টিতে ফুল্লরা নকুলের পানে চাহিয়া রহিল।

নকুল বলিল—আপনার ভাইঝী...

রোজা? রোজার সম্বন্ধে কোনো কথা ভাবিবে না, স্থির করিয়া রাখিলেও মন চমকিয়া উঠিল। ফুল্লরা কহিল—রোজা কি করেছে?

কুণ্ঠা-জড়িত স্বরে নকুল কহিল—কথাটা বলতে লজ্জা হচ্ছে, অথচ না বললে নয়!

অধীর আগ্রহে ফুল্লরা কহিল—বলো...

নকুল বলিল—একখানা টু-শীটার মোটরে তিনি আর একটি ফিরিঙ্গি ছোকরা চলেছিল গড়িয়া হাটের দিকে। টালিগঞ্জের ট্রাম-ডিপোর কাছে একখানা ট্রামের সঙ্গে গাড়ীর ধাক্কা লাগে। ফিরিঙ্গি-ছোকরার মাথা ফেটে গেছে। আপনার ভাইঝীরও বেশ চোট লেগেছে—তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়েন। আমরা ঐ পথে আসছিলুম। এখানে তাঁকে দেখেছি বলেই চিনতে পারলুম। খুব ভিড় জমে গেল। আম্বুলেন্স ডাকিয়ে তাঁদের দুজনকে শম্ভুনাথ হাসপাতালে পাঠানো হলো। শুনলুম, দুজনেই না কি মানে, drink করেছিলেন...

ফুল্লরা বলিল—রোজা বেঁচে আছে?

—আছে...

ফুল্লরা বলিল—বাড়ীতে আনা যাবে না?

নকুল বলিল,—বোধ হয়, তারা এখন আসতে দেবে না। চোট যা পেয়েচেন, সামান্য নয়! ফিরিঙ্গি ছোকরাটির এখনো জ্ঞান হয়নি, -তবে মরে নি। আপনার ভাইঝীর জ্ঞান হয়েছে দেখে তাড়াতাড়ি আমি এখানে আসচি আপনাকে খপর দিতে।

ফুল্লরা কি ভাবিল; তার পর একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—তাকে আমি দেখতে যেতে পারি?

নকুল বলিল—কেন পারবেন না?

ফুল্লরা বলিল—তাহলে আমাকে তুমি নিয়ে চলো, নকুল। আমি তো জানি না, কোথায় কার সঙ্গে সেখানে গিয়ে দেখা করতে হবে।

নকুল বলিল—আপনি তাহলে তৈরী হয়ে নিন। আমি আপনার ড্রাইভারকে বলি, গাড়ী আনবে।

—বেশ!

হাসপাতালে আসিয়া রোজাকে দেখিয়া ফুল্লরা শিহরিয়া

উঠিল। মাথায়-মুখে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা; ছুটি চোখ শুধু আর্ত্ত করুণ দৃষ্টি মেলিয়া চাহিয়া আছে। অশ্রুর বাষ্পে সে দৃষ্টি যেন ধুইয়া নির্ম্মল হইয়া রহিয়াছে!

ফুল্লরা কহিল—খুব কষ্ট হচ্ছে?

রোজা কোনো কথা বলিতে পারিল না। আর্ত্ত-চোখে ছ'ফোঁটা জল ঝকঝক্ করিয়া উঠিল।

নার্শ বলিল,—কথা বলতে পারচেন না।

ফুল্লরা বলিল,—কোনো ভয় নেই?

নার্শ বলিল,—না।

কথায় কথায় প্রকাশ পাইল, রোজা সুরা পান করিয়াছিল। লজ্জায় ফুল্লরার মাথা যেন কাটা গেল!

ফুল্লরা কহিল—বাড়ী যেতে পারবে না?

নার্শ বলিল,—এখন নাড়াচাড়া করা উচিত হবে না, ছ'দিন।

ফুল্লরা কাঠ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।...

গৃহে ফিরিল অনেক রাত্রে। মনে যেন চিতা জ্বলিতেছে! জীবনে এত অস্বস্তি মানুষকে ভোগ করিতে হয়! কৈ, এমন অস্বস্তি তো অপরে ভোগ করে না! সংসার লইয়া কাজ-কর্ম্মে তাদের দিনের পর দিন কাটিয়া চলিয়াছে...লঘু মন, মুখে হাসি-কথা...

হয়তো তাদের লক্ষ্য নির্দ্দিষ্ট সীমানার মধ্যে আবদ্ধ। মনের যেমন প্রসার নাই, বাসনারও তেমনি সীমা আছে! সে...

কি চায়, আজো তাহা নির্ণয় করিতে পারিল না! সংসার...লোকে বলে, আরাম-নীড়! কিন্তু কোথায় আরাম? কিসে আরাম?

রোজার কথা মনে পড়িল। বেচারী রোজা! রোজা কিসের সন্ধানে এমন করিয়া ঘুরিয়া বেড়ায়? গৃহে তার সুখ নাই, আরাম নাই! আজ কোন্ অপরিচিতের সঙ্গে বাহির হইয়া সে কি করিয়া বসিল? সুরা-পান!

সর্ব্বাঙ্গ রী-রী করিয়া উঠিল। সুরা-পান দোষের... সকলের মুখে শুনিয়া আসিতেছে আশৈশব। দাদা কি বলিবে? মেয়ের ভার তার হাতে দিয়া কোথায় পড়িয়া আছে কত দূরে! আর এমনি করিয়া ফুল্লরা রোজার ভার বহন করিতেছে!

সমস্ত পৃথিবী তপ্ত গোলার মতো চোখের সামনে বিপর্য্যয় বেগে ঘুরিতে লাগিল। তার বাঁচে প্রাণ বুঝি জ্বলিয়া ছাই হইয়া যায়!

দারুণ অস্বস্তির মধ্য দিয়া বিনিদ্র রাত্রি কাটিয়া গেল। সকালে স্বামী আসিয়া উপস্থিত।

রোজার কথা ফুল্লরা বলিতে পারিল না। না বলিলেও সুশীল চাটার্জ্জী জানিলেন খবরের কাগজ পড়িয়া।

তিনি আসিয়া ফুল্লরাকে বলিলেন,—রোজার এত বড় accident হয়েছে? আমায় বলোনি!

অপরাধীর কুণ্ঠিত দৃষ্টিতে ফুল্লরা স্বামীর পানে চাহিল। সুশীল চাটার্জ্জী বলিলেন,—কে এই হার্বার্ট?

ফুল্লরা কহিল—ওর কোন্ ক্লাশফ্রেণ্ডের ভাই, বোধ হয়।

—তার সঙ্গে রোজা বেরিয়েছিল! তুমি অনুমতি দিয়েছিলে?

—না।

—তবে?

ফুল্লরা বলিল রোজার কাহিনী; কবে সে চিঠি লিখিয়া হাজারিবাগ যায়, তার সঙ্গে এ ব্যাপার লইয়া আলোচনা—তাহাতে রোজা কি জবাব দেয়...সব কথা। কোনো কথাই গোপন করিল না।

শুনিয়া সুশীল চাটার্জ্জী একটা নিশ্বাস ফেলিলেন, নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন,—সংসারী হবার কোনো যোগ্যতা নেই,—তোমার নেই, আমারো নেই।...কিন্তু এ ব্যাপারে আমার চেয়ে তোমার দায়িত্ব অনেক বেশী, ফুল্ল!...কিছু মনে করো না। বিদেশে বসে আমাদের ঘর-সংসার, আমাদের জীবন—এ নিয়ে আমি অনেক চিন্তা করেছি ...ভেবেছিলুম, এখানে এসে তোমার সঙ্গে এ-সব কথার আলোচনা করবো। ছদিন বাদে আলোচনা করতুম,—কিন্তু এখানে আসবামাত্র রোজার এ ব্যাপার...তা কি বলো,...শুনবে আমার কথা?

একটা উদ্গত নিশ্বাস চাপিয়া ফুল্লরা বলিল,—বলো।

সুশীল চাটার্জ্জী বলিলেন—সংসার রচনা করে পুরুষ আর নারী ছজনে মিলে,—সে সংসারে বন্ধুভাবে ছজনে পরস্পরের উপর নির্ভর রেখে—ছজনে মিলে-মিশে আরামে বাস করবে বলে'।...পুরুষ হয়তো একা কোনোমতে দিন চালিয়ে যেতে পারে; কিন্তু সংসার না হলে মেয়েদের চলে না। নয় কি?

ফুল্লরা কহিল—তা নয়। পুরুষই সংসার চায়—দিনের শ্রান্তি ঘুচোবে সংসারে এসে। সংসার ছাড়া তার অন্য আশ্রয় নেই। মেয়েদের আবার সংসার কি? সংসারে সে আসবাব মাত্র। আর পাঁচটা জিনিষ—দাসদাসী, খাট-বিছানা—এ সব জিনিষ না হলে যেমন পুরুষ সংসারে আরাম পায় না, তেমনি মেয়েদের না পেলে পুরুষের সংসার অচল থাকে, তাই দয়া করে মেয়েদের এনে পুরুষ সে-সংসারে ঠাঁই দেয়। সংসার হলো পুরুষের পক্ষে অস্বাচ্ছন্দ্য-অস্বস্তি ঘুচোবার মুক্তি-নীড়—মেয়েদের পক্ষে সংসার কারাগার…বন্ধন! পুরুষের ঘর আছে, বাইরে আছে; মেয়ে-মানুষের বাইরে নেই—শুধু ঘর আছে। আলোর আরাম বোঝবার জন্য অন্ধকারের দরকার…নিছক-আলো মানুষের ভালো লাগে না। তেমনি নিছক-বাইরে পুরুষের ভালো লাগে না বলেই পুরুষ ঘর বাঁধে—ঘরে-বাইরে দু'জায়গায় পূর্ণ আরাম উপভোগ করবে বলে'!

সুশীল চাটার্জ্জী মনোযোগ দিয়া এ কথা শুনিলেন; শুনিয়া মৃদু হাস্য করিয়া বলিলেন,—এ কথা তুমি বলতে পারো…বলবার সুযোগ তোমায় আমি দিয়েছি…এই অবধি বলিয়া সুশীল চাটার্জ্জী চুপ করিলেন; কুতূহলী দৃষ্টিতে ফুল্লরার পানে চাহিয়া রহিলেন।

ফুল্লরা কোনো জবাব দিল না।

সুশীল চাটার্জ্জী বলিলেন—তোমায় এনে তোমার পানে কোনো দিন আমি তাকাইনি। পয়সা রোজগার নিয়ে মত্ত আছি অহর্নিশি। এর ফলে তোমার মন নিবে যেতে বসেছে…সব ব্যাপারে তোমার গভীর ঔদাস্য…কোনো কিছুতে আগ্রহ নেই—এগুলো আমি লক্ষ্য করেছি। তাছাড়া এই যে বিদেশে গিয়েছিলুম…সেখানে যার বাড়ীতে অতিথি হয়েছিলুম, সেখানে দেখলুম…তাঁরা স্বামি-স্ত্রী…দুজনে কি অন্তরঙ্গতা! সকল কাজে দুজনে দুজনের উপর নির্ভর করচেন! একদিন বেড়াতে যাবার কথা হলো…পঁচিশ মাইল দূরে একটা লেক আছে, সেইখানে। ভদ্র-লোক বললেন, স্ত্রীকে না জানিয়ে মতামত দিতে পারবেন না! আমি ভাবলুম, বেশ তো! অথচ আমি এই মক্কেলের ব্রীফ নিয়ে চলে এলুম, এতদিনের জন্য…এ ব্রীফ নেবার আগে আমার স্ত্রীর মতামত গ্রহণ করিনি!…স্ত্রীর প্রতি স্বামীর কর্ত্তব্যে এতখানি ত্রুটি ভালো নয়!…তাই আমি ভাবতে ভাবতে আসচি, এখন থেকে আর ব্যবসাদারীর পার্টনার-শিপ নয় তোমার সঙ্গে…একেবারে পুরো-দস্তুর দাম্পত্য জীবন যাপন করবো…I, a loving husband, and you a smiling wife…partners in minds.

স্বামীর এ অত্যুগ্র উচ্ছ্বাস ফুল্লরাকে স্পর্শ করিতে পারিল না! সে যেন কোন্ কল্পলোকে বসিয়া আছে—বাস্তব জগতের আলো-বাতাস যেন সে কল্পলোককে স্পর্শ করিতে পারে না!

মনের মধ্যে নিরবলম্বন শূন্যতা…ফুল্লরা বুঝিতে পারিল না, স্বামীর এ কথার কি জবাব দিবে!

সুশীল চাটার্জ্জী বলিলেন,—এ গেল আমাদের ঘরোয়া কথা! তার পর রোজা…কাগজে যা লিখেচে…তা যদি সত্য হয়…বড় দুঃখের কথা, বড় লজ্জার কথা! She was smelling of liquor…ভদ্র-ঘরের মেয়ের পক্ষে এর চেয়ে দুর্ভাগ্য আর হতে পারে না!…তুমি হাসপাতালে গিয়েছিলে তাকে দেখতে?

ফুল্লরা কহিল—গিয়েছিলুম।

—তাকে বাড়ীতে নিয়ে এলে না কেন?

ফুল্লরা কহিল—ডাক্তাররা বললেন, নিয়ে আসা চলবে না অন্ততঃ দু'দিন।

সুশীল চাটার্জ্জী কহিলেন—আমি ফোন্ করে দিই তার জন্য আলাদা কামরার ব্যবস্থা করতে…

ফুল্লরা বলিল,—নার্শকে বলে সে ব্যবস্থা কাল রাত্রেই আমি করে এসেছি। আজ তাকে দেখতে যাবো।

—যেয়ো। এখানে আসবার ক্ষমতা হলেই তাকে নিয়ে এসো। তাকে সুবুদ্ধি দাও…সুশিক্ষা দাও, ফুল। নিজেদের ছেলেমেয়ে নেই…ঐ রোজাকে মানুষ করে এসো, আমরা সংসার-ধর্ম্ম পালন করি। স্নেহ-মায়া—এই সবেই মানুষ আনন্দ পায়, আরাম পায়। কথায় বলে, ছেলেমেয়ে মানুষের জীবনে আনন্দ আর কল্যাণ…সে কথা খুব ঠিক। এই রোজাকে অবলম্বন করে আমরা সংসার রচনা করবো…পয়সা বলো, খ্যাতি বলো,—মানুষ এ-সব চায় সংসারের জন্য!

ফুল্লরা চুপ করিয়া বসিয়া স্বামীর কথা শুনিতেছিল, কোনো জবাব দিল না।

সুশীল চাটার্জী বলিলেন,—তোমার সঙ্গে সর্ত্ত ছিল—বিবাহের আগে···সে সর্ত্ত পাগলের প্রলাপ!···সংসার মানেই স্বামি-স্ত্রীর মিলন-তীর্থ!···দুজনে পথে পথে ঘুরে সন্ধ্যার পর মাথা গুঁজে সেখানে আশ্রয় নেবে। সংসার গাছতলা নয়।···তার উপর জানো, নারীর জীবন সার্থক হয় তার গৃহিণীপনায়···এবং সে গৃহিণীপনা এই সংসারে।

কথাটা বলিয়া সুশীল চাটার্জী হাসিলেন; ফুল্লরা নিঃশব্দে বসিয়া রহিল···যেন পাথরে-গড়া পুতুল!

* * * *

রোজা ধীরে ধীরে সারিয়া উঠিল। সারিয়া ওঠার সঙ্গে বাহিরে উপসর্গ দেখা দিল। পুলিশ একটা কেশ করিয়াছে হার্বার্টের নামে। সে কেশের তদন্ত করিতে গিয়া এমন ক'টা বিশ্রী কথা বাহির হইল যে সুশীল চাটার্জীর দুশ্চিন্তার সীমা রহিল না।

তিনি আসিয়া রোজাকে বলিলেন,—এই সব লোককে বন্ধু ভেবে তাদের সঙ্গে যত্র-তত্র ঘুরে বেড়াও! আমাদের কথা না ভাবো, তোমার বাবার কথা ভাবো না, রোজা! এখানে তোমায় রেখে তিনি নিশ্চিন্ত আছেন···এ খবরে মনে তিনি কতখানি ব্যথা পাবেন, বলো তো!

রোজা গুম্ হইয়া রহিল, কোনো কথা বলিল না। সুশীল চাটার্জীর সঙ্গে কোনো বিষয় লইয়া সে কখনো তর্ক করে না, আজো করিল না।

সুশীল চাটার্জী বলিলেন—পুরুষের সঙ্গে একই ভাবে তোমাদের শিক্ষা চলেছে বলে' তাদের সঙ্গে তোমরা সমান চালে চলতে যাও, কিন্তু তা চলা যায় না! ভগবান তোমাদের তৈরী করেছেন ভিন্ন উপাদানে! পুরুষের সঙ্গে সমান-চালে চলতে গেলে তোমাদের পক্ষে সেটা হবে nature-এর বিরুদ্ধে সংগ্রাম! Nature-এর সঙ্গে যুদ্ধে তোমরা ক্ষতবিক্ষত হবে—এ কথা নিশ্চয় বলে জেনো।···এ সব সঙ্গ ত্যাগ করো। চাও যদি তোমার পিশিমার সঙ্গে বাইরে বরং একটু ঘুরে এসো···দার্জ্জিলিং কিম্বা কাশ্মীর!···মন যা চাইবে, তা করা মানুষের চলে না। ইচ্ছাকে দমন করতে শেখো···মানুষ হও! কি বলো?

এ কথার উত্তরেও রোজা কোনো কথা বলিল না। সুশীল চাটার্জী আসিয়া ফুল্লরাকে বলিলেন—বিপদ ঘটেছে! নিজের মেয়ে হলে শাসন করতে পারতুম—এ-ক্ষেত্রে শাসন সম্ভব নয়। পারো যদি, তুমি ওকে বুঝিয়ে সুপথ দেখাও।

ফুল্লরা বলিল—আমার কথা শুনবে না। ওর মন এক ভাবে গড়ে উঠেছে···

সুশীল চাটার্জী নিঃশব্দে কি ভাবিলেন বহুক্ষণ···তার পর বলিলেন,—তোমার দাদাকে চিঠি লিখবে?

ফুল্লরা বলিল,—দাদা তো ভবঘুরে মানুষ···

সুশীল চাটার্জী বলিলেন—এ ব্যাপার নিয়ে একটু কুৎসার সৃষ্টি হয়েছে। আমাদের অন্যায়···ছেলেমেয়েকে এভাবে বেপরোয়া ছেড়ে দেওয়া উচিত নয়! পৃথিবীর কতটুকু তারা জানে? এই জন্যই আমাদের দেশের শাস্ত্র বলেছে,—দশ বর্ষাণি তাড়য়েৎ! পনেরো বছর বয়স পর্য্যন্ত শাসন-নিষেধের দরকার।

ফুল্লরা কহিল—শাস্ত্রের কথা উচ্চারণ করলেই কাজ হয় না। রোজা আমাদের এখানে এসেছে পনেরো বৎসর বয়স পার হয়ে। তখন শাসন-নিষেধে কাজ হয় না।

—তাহলে উপায়?

একটা নিশ্বাস ফেলিয়া ফুল্লরা বলিল—কোনো উপায় দেখছি না।

সুশীল চাটার্জী কহিলেন,—তাহলে আমি বলি, এই স্কুল আর সঙ্গ ছাড়িয়ে দেওয়া যাক্। বাড়ীতেই ও থাকবে। বেড়াতে যাবে তোমার সঙ্গে, কিম্বা আমার সঙ্গে।·· ছ'মাস segregation···। এ-সব বন্ধুর দল যদি এখানে দেখা করতে আসে তো তারা রোজার দেখা পাবে না। দরোয়ানকে আমি বলে রাখচি।···কেশটার সম্বন্ধেও ব্যবস্থা আমি করচি।

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

বিদ্যুৎ-বহ্নি

রোজা এখন স্কুলে যায় না। সুশীল চাটার্জী বলিলেন,—আগে তোমার শরীর সারুক—তার পরে যেয়ো।

স্কুল-যাওয়া বন্ধ হইলেও রোজা খেঁষ দিল না। সুশীল চাটার্জী বলিলেন—রোজাকে তোমার কাছে দেখি না যে!

ফুল্লরা বলিল—আসে না।

—সারা দিন কি করে ?

—নিজের মনে থাকে। পড়ে, লেখে, গান গায়।

সুনীল চাটার্জ্জী ক্ষণেক কি ভাবিলেন, পরে বলিলেন—বাইরে কোথাও যাবে ওকে সঙ্গে নিয়ে? মানে, change of scene ?

ফুল্লরা বলিল—আমার পক্ষে সম্ভব হবে না। ছেলে-মেয়েদের মানুষ করতে হয় কি ভাবে, জানি না।

হাসিয়া সুনীল চাটার্জ্জী কহিলেন—নিজে মানুষ হয়েছ তো···সেই experience···

ফুল্লরা নিশ্বাস ফেলিল, ফেলিয়া বলিল—মানুষ হয়েছি! আমার মনে হয়, হই নি। নাহলে আর পাঁচ জনের মতো সংসারকে অবলম্বন করে থাকতে পারছি না কেন?

সুনীল চাটার্জ্জী বলিলেন—তার কারণ আমরা দুজনেই সংসার গড়বার দিকে মনোযোগ দিই নি। আমি হয়ে উঠেছি পয়সা রোজগার করবার যন্ত্র! গৃহলক্ষ্মীকে জাগাবার কোনো চেষ্টা করি নি।

সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে ফুল্লরা চাহিয়া রহিল স্বামীর পানে—স্বামীর মুখে এমন কথা আজ পর্য্যন্ত সে শোনে নাই।

সুনীল চাটার্জ্জী বলিলেন—উপায় যখন নেই, এমনি ভাবে চলুক। আমার কোর্ট বন্ধ হলে আমিই বেরুবো তোমাদের নিয়ে···

মাসখানেক পরের কথা। সন্ধ্যার সময় রোজা আসিয়া ডাকিল,—পিশিমা···

ফুল্লরা সদ্য-প্রকাশিত একখানা ইংরাজী বই পড়িতে-ছিল, রোজার আহ্বানে তার পানে চাহিল।

ভ্রূকুটি-ভঙ্গী করিয়া রোজা বলিল,—It is so dull just sticking here. (এ ভাবে পড়িয়া থাকা সহ্য হয় না—ভারী একঘেয়ে লাগিতেছে)

ফুল্লরা কহিল—কি চাও?

—আমি একটু বেরুতে চাই।

ফুল্লরা বলিল,—চলো···আমিও তাহলে ঘুরে আসি।

রোজা বলিল,—আমি একলা যাবো।

ফুল্লরা কহিল—তোমার পিসেমশায়ের মানা আছে, জানো তো···

—মানা!

রোজার চোখের দৃষ্টিতে বিরক্তি!

ফুল্লরা বলিল—তোমার শরীর এখনো সারে নি।

রোজা বলিল—আমি বেশ সেরেছি।

ফুল্লরা বলিল,—কোথায় যাবে?

স্বরে একটু ঝঙ্কার দিয়া রোজা বলিল,—ভয় নেই। কোনো বন্ধু-বান্ধবের কাছে যাবো না। মাঠের দিকে ঘুরে আসবো।

ফুল্লরা বলিল—কতক্ষণ পরে ফিরবে?

রোজা বলিল,—কতক্ষণ! এক ঘণ্টা···দু' ঘণ্টা··· তিন ঘণ্টা···তার বেশী নয়।

ফুল্লরা বলিল,—বেশ, যাও।

রোজা বাহির হইল; ফুল্লরা ড্রাইভারকে বলিয়া দিল,—দিদিমণির শরীর খারাপ—কোথাও যেন না নামেন, দেখো···

কথাটা বলিয়া দিল রোজার অসাক্ষাতে! বলিবার সময় বুকখানা একবার কাঁপিল। এ কথার অন্তরালে···

কিন্তু উপায় কি!

ঘণ্টাখানেক পরে সুনীল চাটার্জ্জী ফিরিলেন; ফিরিয়া বলিলেন,—রোজা আর তুমি···চলো, দুজনকে নিয়ে একটু ঘুরে আসি।

ফুল্লরা বলিল,—হঠাৎ?

সুনীল চাটার্জ্জী বলিলেন—আজ সন্ধ্যাবেলায় ফ্রী আছি।

কথাটা সুনীল চাটার্জ্জীর নিজের কাণেই কেমন-ধারা লাগিল! অবসর যদি দৈবাৎ কখনো মেলে, তখন মনে পড়ে স্ত্রী বলিয়া ঘরে এক জন জীবন্ত প্রাণী আছে···তার পানে মাঝে মাঝে ফিরিয়া চাওয়া প্রয়োজন!

ফুল্লরা বলিল—রোজা বাড়ী নেই।

—নেই?

—না। বললে, ভালো লাগছে না, একটু বেড়িয়ে আসবো।

—একা গেছে?

—তাই।

সুনীল চাটার্জ্জী বলিলেন,—তোমার দাসীকে সঙ্গে দিলে না কেন?

ফুল্লরা বলিল,—মানুষ যেমন হোক, তাকে প্রকাশ্য-ভাবে সন্দেহ করতে আমার বাধে।

সুশীল চাটার্জ্জী বলিলেন—Still a child!

ভর্ৎসনা? না, গঞ্জনা?…

ফুল্লরা কিছু বলিল না, সুশীল চাটার্জ্জী কহিলেন—কোথায় গেল?

—জানি না। গগনকে বলে দিয়েছি,—দিদিমণির শরীর খারাপ, কোথাও যেন না নামেন, দেখো।

গগন ড্রাইভার। রোজা বেড়াইতে গিয়াছে গগনের গাড়ীতে।…

সুশীল চাটার্জ্জী গিয়া নিজের ঘরে বসিলেন! ফুল্লরা বারান্দায় বসিয়া রহিল। একখানা বিলাতী নভেল পড়িতেছিল,—বইয়ে মন লাগিল না।

পাশের বাড়ীতে রেডিও-শেটে গান চলিয়াছিল…

কি চেয়ে হায়, কিসের লোভে
বেরিয়েছিলেম পথের পরে…

সুশীল চাটার্জ্জী উৎকর্ণ রহিলেন। কোন্ হতভাগ্যের গান এ…

আকাশে-বাতাসে যেন তরঙ্গ ছুটিল! বহু বৎসর আগেকার স্মৃতি সে তরঙ্গে ভাসিয়া আসিল। সেই প্রথম যৌবন…যখন ঐশ্বর্য্যের স্বপ্ন সব-চেয়ে বড় হইয়া মনে জাগিত! সে সম্পদকে ঘিরিয়া কি প্রকাণ্ড জনতা…সে জনতা ঠেলিয়া কল্যাণীর বেশে রূপসী জীবন-সঙ্গিনী…

কিন্তু পয়সার প্রমত্ত নেশায় জীবন-সঙ্গিনীকে ঠেলিয়া গৃহ-কোণে কোথায় ফেলিয়া রাখিয়াছেন…

গান চলিয়াছিল,—

চেয়েছি যা, পেলেম না তার!
ছিল যা, তা গেল কোথায়?
আজ নাই রে পুঁজি, বিরাম খুঁজি—
দু'নয়ন জলে ভরে!

সুশীল চাটার্জ্জী চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন—মন ভারী হইয়া উঠিল। গানের কথায়-সুরে মন এমন হইয়া ওঠে! মানুষের লেখা গান…সে গান মানুষ গাহিতেছে…

তাঁর মনের অতি গোপন কথা যেন কে জানিয়া ফেলিয়াছে! গানের ছত্রে ছত্রে সে কথা জাগিয়া আজ সারা আকাশ-বাতাস ভরিয়া দিয়াছে!…

মন অস্বস্তিতে ভরিয়া উঠিল।

ফুল্লরা বারান্দায় বসিয়াছিল কৌচে। বারান্দায় আলো নাই। এ গান তার মনকেও তরঙ্গ-দোলায় উচ্ছ্বসিত উদ্বেল করিয়া তুলিল মনে যেন ঝড় বহিতেছে! সে ভাবিতেছিল, কি? কি? জীবনে কি আমি চাহিয়াছি? কি আমি পাই নাই? কি ছিল…যাহা হারাইয়া নিঃস্ব রিক্ত পড়িয়া আছি! তার চোখের পাতা সজল—নয়নের দৃষ্টি উদাস…

সুশীল চাটার্জ্জী আসিয়া ডাকিলেন,—ফুল!

মস্ত একটা নিশ্বাস। নিশ্বাস ফেলিয়া ফুল্লরা চাহিল স্বামীর পানে। মনে হইতেছিল, স্বামীর হাত ধরিয়া বলে, ওগো, নিজেকে বড় একা, বড় নিঃস্ব মনে হইতেছে, বড় অসহায়…! পারো তুমি মনের এ-নিঃসঙ্গতা ঘুচাইয়া এ-মনকে ভরিয়া তুলিতে?

সুশীল চাটার্জ্জী কৌচে বসিলেন ফুল্লরার পাশে…তার হাত নিজের হাতে তুলিয়া লইলেন, বলিলেন—মন আজ তোমাকে চাইছে। আমার সঙ্গে কথা কও। এমন কথা কও, যাতে আনন্দ পাই…

ফুল্লরা কহিল—কি কথা কইবো?

সুশীল চাটার্জ্জী বলিলেন—জানি না।…তবে এমন কথা শুনতে চাইছি…যে-কথা শুনে পুরোনো দিনগুলোকে ফিরে পাবো…যেদিন এত পয়সা ছিল না, এত অস্বস্তিও ছিল না! ছিল শুধু সুখ, স্বস্তি, আশা!

ফুল্লরা চুপ করিয়া বসিয়া রহিল, জবাব দিল না।

সুশীল চাটার্জ্জী বলিলেন,—কি কথা…বুঝতে পারচি না। তবে সে কথা বাস্তব জগতের নয়…সে কথা মানুষ মনে মনে রচনা করে প্রথম যৌবনে…জীবনে যখন বসন্ত জাগে…

ফুল্লরা একটা নিশ্বাস ফেলিল।…তার মনও চাহিতেছিল এমন কথা…যে-কথার সুরে সুরে চাওয়ার সন্ধান পাওয়া যায়!

কিন্তু জানা নাই! সে কথা সে জানে না…কি চায়, তাও জানে না! কখনো এ চাওয়ার হিসাব করিয়া দেখে নাই। জীবনের পথে এতদূর আসিয়াছে শুধু উদ্‌ভ্রান্তের মতো ছুটিয়া, অন্ধের মতো দু'নয়ন বন্ধ করিয়া!…

সুশীল চাটার্জ্জী বলিলেন—বেশ, কথা না কও, চুপ করে দুজনে বসে থাকি, এসো…এমনি হাতে হাত রেখে। আমার বড্ড ভাল লাগছে…তোমার পাশে এমনি ভাবে চুপ করে বসে থাকতে!…

তুজনে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল···পাশের বাড়ীর রেডিও যন্ত্রটাকে সজীব করিয়া সুরের পর সুরের ধারা বহিয়া চলিয়াছে···

কিন্তু সে সুর প্রাণে পৌঁছিল না। প্রাণ তখনো সেই আগেকার গানের কথা ধরিয়া হাহাকার করিতেছে···

স্বপ্নের আবছায়া! মাটীর পৃথিবী পায়ের নীচে হইতে সরিয়া গিয়াছে!···

নীচে গাড়ী আসিয়া দাঁড়াইল···গাড়ীর দরজা বন্ধ হইল। বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইল রোজা···

ডাকিল—পিশিমা···

সঙ্গে সঙ্গে বেয়ারা আসিয়া জানাইল, এটর্ণিবাবু আসিয়াছেন কাগজ-পত্র লইয়া।

স্বপ্ন-পুরী ফাঁশিয়া গেল! সুনীল চাটার্জীর চমক ভাঙ্গিল···ভাবিলেন, জল-জ্যান্ত মানুষ···বইয়ের নায়ক সাজিয়া এভাবে মেলোড্রামার স্বপ্ন দেখিতেছিলেন! জীবন স্বপ্ন নয়···সত্য! বড় কঠিন কঠোর নির্ম্মম সত্য!··· গানের সুরে কথায় সত্যকার এ জীবনকে গড়িয়া তোলা যায় না।

দু'তিন দিন পরের কথা।

ফুল্লরার খেয়াল হইল, ঘর-দ্বার গুছাইবে। চুপচাপ এভাবে বাস করা চলে না। আর পাঁচ ঘরের গৃহিণীর মতো সে ঘর-দ্বারের পরিচর্য্যা করিবে! চির-পরিচিত ধারায় নারী-জন্মের সার্থকতা···

রোজার ঘরে আসিয়া দেখে, রোজা নাই। ঘর বিশৃঙ্খল! ড্রেসিং-টেব্‌লের ড্রয়ার খোলা···আলমারি খোলা···বিছানার উপর কখানা সিল্কের শাড়ী পড়িয়া আছে···আয়নার উপর পাউডার···

ঘরে যেন ঝড় বহিয়া গিয়াছে'!

ফুল্লরা গুছাইতে বসিল। ড্রয়ারের মধ্যে এক-তাড়া কাগজ···চিঠি-পত্র···সেগুলা গুছাইয়া রাখিতে গিয়া দৃষ্টি পড়িল ক'খানা ফটোগ্রাফে। পুরুষের ছবি। তরুণ মূর্ত্তি। অপরিচিত মুখ···সাত-আটখানা ফটোগ্রাফ।

ফটোর নীচে কোনোটায় লেখা—Wishing you always by my side...কোনোটায় লেখা—Till we meet···কোনোটায়—With kisses···

ফুল্লরার মাথায় রক্ত ছলাৎ করিয়া উঠিল। চোখের সামনে রাশি রাশি অন্ধকার! একখানা চিঠি···চিঠিতে লেখা ক'টি ছত্র—My wonderful Bob···

রোজার হস্তাক্ষর। ফুল্লরা চিনিল।

পৃথিবী তার সমস্ত কলরব-কোলাহল লইয়া দূরে সরিয়া চলিয়াছে···ফুল্লরা যেন কোন্ নিরন্ধ্র-অন্ধকার পাতালের গর্ভে নামিয়া চলিয়াছে···তার চেতনা যেন বিলুপ্ত হইয়া যাইতেছে···

রোজার স্বরে চেতনা ফিরিল। চেতনা ফিরিতে ফুল্লরা শুনিল, রোজা বলিতেছে—I hate this spying (এ ভাবে গোয়েন্দাগিরি···আমি ঘৃণা করি)···আমার confidential চিঠিপত্র তুমি কি বলে' ঘাঁটো!···আশ্রয় দেছ বলে' এতখানি জুলুম। No···No I won't tolerate this...No···Never! (না! না! এ আমি সহ্য করবো না···কখনো না।)

বলিতে বলিতে ফুল্লরার হাত হইতে ফটো ও চিঠিপত্রগুলা রোজা সবলে ছিনাইয়া লইল।

ফুল্লরার সারা দেহ কাঁপিতেছিল···ফুল্লরা ডাকিল,—রোজা···

তীব্র ঝঙ্কারে রোজা বলিল,—না। এ সম্বন্ধে কোনো কথা আমি শুনবো না···I call it a shame...it is wicked···I call it an outrage! (এ তোমার অন্যায় অত্যাচার!)···আমার বয়স হয়েছে···আমার ভালো-মন্দ আমি নিজে বুঝি। কারো হিতোপদেশ আমি মানবো না।

[ক্রমশঃ

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

ইতিহাসের অনুসরণ

মেবারে মারাঠা

মোগল ও রাজপুত ভারতের এই দুই বীর জাতিই দুর্ব্বার মারাঠা শক্তির প্রভাবে অবসন্ন হইয়া পড়ে, ইহা ঐতিহাসিক সত্য। মারাঠার প্রচণ্ড প্রহার সহ্য করিতে না পারিয়া মোগলের সাম্রাজ্য ভাঙ্গিয়া তছনছ হইয়া যায় এবং রাজপুত রাজারা রাজকোষ উন্মুক্ত করিয়া দিয়া সে যাত্রা মহারাষ্ট্র-প্লাবন হইতে রাজপুতানাকে বাঁচাইয়া রাখেন।

নানা সূত্রেই আমরা চিরদিনই রাজপুতজাতির প্রতি গভীর সহানুভূতিসম্পন্ন; সুতরাং রাজোয়ারার উপর মারাঠার এই নির্য্যাতনের সমর্থন করিতে পারি নাই। মোগলদের অত্যাচারেই যখন মারাঠা শক্তির অভ্যুদয়, তখন মোগলের সহিত লড়াই করিয়া ইহারা যদি প্রতিশোধ লইতে চায় কিম্বা তাহাদের রাজপাট ভাঙ্গিয়া চুরিয়া দেয়, সে ত Tit for Tat যেমন বুনো ওল মোগল, তেমনই বাঘাড়ে তেঁতুল এই মারাঠা; ইহাতে নাক সিঁটকাইবার কি আছে! কিন্তু মহাসতী পদ্মিনী দেবীর পুণ্যপীঠ যেখানে, মোগল-বিজেতা মারাঠারা কোন্ মুখে সেখানে হানা দিতে গেল এবং ভারতবর্ষের এমন বনেদী বীরজাতি শিষ্ট সভ্য নিরীহ রাজপুতদের ঘাড়ের উপর লাফাইয়া পড়িয়া রক্ত চুষিতে চাহিল? রাজপুতরা ত তাহাদের উপর কোনও অত্যাচার করে নাই, 'মাতৃবৎ পরদারেষু, পরদ্রব্যেষু লোষ্ট্রবৎ'—চাণক্য পণ্ডিতের এই নীতি অবলম্বন করিয়াই ত তাহারা স্বরাজ্য আগুলাইয়া পড়িয়াছিল;—তবে?

ইতিহাসের অনুসরণ করিয়া আমরা এই প্রবন্ধে আলোচনা করিতে প্রয়াস পাইব, কি সূত্রে মারাঠা জাতি সর্ব্বপ্রথম কি উদ্দেশ্যে মেবারে আসিয়া উপস্থিত হয়, এই দুই শিবভক্ত জাতির প্রথম সাক্ষাৎ বা সংঘাতে রাজস্থানে কিরূপ বিপ্লব বাধিয়াছিল, পরস্পর কিরূপ ব্যবহার পাইয়াছিল এবং অবশেষে কেনই বা মারাঠা জাতি রাজপুতানার বিভীষিকাস্বরূপ হইয়াছিল।

ছত্রপতি শাহুর রাজসভায় পেশোয়ার পদে অধিষ্ঠিত হইয়াই প্রথম বাজীরাও সগর্ব্বে ঘোষণা করিলেন,—ঐ যে বিশালকায় বিশীর্ণ মোগল-তরু অসংখ্য শাখা-প্রশাখায় সমস্ত হিন্দুস্থান আচ্ছন্ন করিয়া দাঁড়াইয়া আছে, উহার মূলচ্ছেদ আমাদের প্রথম কার্য্য। মূলহীন হইবামাত্রই উহার শাখা-প্রশাখা-সমূহ শুকাইয়া পড়িবে।

আজ মুসোলিনীর এক একটি বক্তৃতায় বিশ্বে যেমন শিহরণ উপস্থিত হইতেছে, হিটলারের বজ্রবাণী রাষ্ট্রনায়কদিগকে শঙ্কায় আকুল করিয়া তুলিতেছে, সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে পেশোয়া বাজীরাওএর এই বক্তৃতা ভারতবর্ষে এমনই চাঞ্চল্য উপস্থিত করিয়াছিল। বাদশাহ মহম্মদ শাহের দরবারে সাজ সাজ রব পড়িয়া গেল; শীর্ণ মোগল-তরুর মূলদেশটি রক্ষা করিবার জন্য তাহার দিগন্তবিসারী শাখা-প্রশাখাগুলিও উত্তেজনায় দুলিয়া উঠিল।

বাদশাহের উজীর ছিলেন ভারি বিচক্ষণ, ঝুনো রাজনৈতিক। বাদশাহী-তরু রক্ষা করিতে যাবতীয় সামন্ত ও মিত্র-রাজাদের আহ্বান করিলেন; ফতোয়া দিলেন যে, বিপদ শুধু বাদশাহের নহে, ভারতের সকল রাজারই এই অবস্থা; বাদশাহ যদি টিকিয়া থাকেন, তাঁহারাও টিকিবেন। কথাটার গুরুত্ব সকলেই বুঝিলেন। ইতিমধ্যে মালব প্রদেশ মারাঠাদের হস্তগত হওয়ায়, রাজস্থানের রাজারা শঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছিলেন। বাদশাহের আহ্বানে তাঁহারাও সাড়া দিলেন। ভূপালের বিশাল প্রাঙ্গণে মারাঠাদের বাধা দিবার জন্য বাদশাহ ও নিজামের সমবেত চেষ্টায় যে বিপুল আয়োজন চলিয়াছিল, রাজপুতানার রাজারাও তাহাতে যোগদানে ইতস্ততঃ করিলেন না। কিন্তু এত উদ্যোগ-আয়োজন সমস্তই ব্যর্থ হইয়া গেল; বিজয়ী পেশোয়া দিল্লীর দ্বারে আসিয়া হুঙ্কার দিলেন, জীর্ণ মোগল-তরুর সত্যই বুঝি মূলচ্ছেদ হয়!

কিন্তু তরুবর বিজয়ী বীরের দিকে সভয়ে নত হইয়া নির্দ্দেশ দিলেন,—যে বিশাল ভূভাগটি জুড়িয়া আমি দাঁড়াইয়া আছি, তাহার মুনফার সিকি অংশ তোমাকে ছাড়িয়া দিতেছি, আমার গোড়ায় আর কুঠারের ঘা দিও না বাপু, আরও কিছুদিন আমাকে বাঁচিতে দাও।

হাজার হৌক ব্রাহ্মণ, আবার যেমন-তেমন ব্রাহ্মণ নন,

সমগ্র মারাঠাচক্রের পরিচালক ও তৎকালের শ্রেষ্ঠ সেনানায়ক এই ব্রাহ্মণ বাজীরাও! দেহে তাঁহার ব্রাহ্মণকুলতিলক জামদগ্নির অমিত শক্তি এবং মস্তিষ্কে চাণক্যের প্রখর বুদ্ধি; সুতরাং কুঠার নামাইয়া তিনি বৃদ্ধ তরুর আর্জ্জী মানিয়া লইলেন। মিটমাটের জন্য তৎক্ষণাৎ সালিসি সভা বসিয়া গেল। বিজেতা বীরকে রীতিমত একটা সেলামী দিয়া তরুরাজ তাঁহার অধ্যুষিত এবং অধিকৃত ও অধিকারচ্যুত সকল ভূভাগের এক লম্বা ফিরিস্তি দিয়া নির্ব্বিকারে সিকি মুনফা ও চৌথ আদায়ের ব্যবস্থা দিলেন।

এইখানেই হইল সেয়ানায় সেয়ানায় কোলাকুলি। মোগল সাম্রাজ্যের বিচক্ষণ মন্ত্রিগণ ভাবিলেন, পেশোয়াকে খুব ঠকাইয়া দিলেন; কেন না, ফিরিস্তির মধ্যে এমন অনেক রাজ্যের নাম ছিল, যাহারা বাদশাহের শাসন-পাশ ছিন্ন করিয়া স্বাধীনভাবেই পরিচালিত হইতেছিল, এমন কতকগুলি রাজ্য ছিল, যাহারা বাদশাহের ছত্রছায়াতলে থাকিয়াও রাজস্ব-প্রদানে অবহেলা করিত। সুতরাং পেশোয়াকে এই সকল রাজ্যের রাজস্বের অংশ আদায় করিবার অধিকার দেওয়া আর 'উড়োখৈ গোবিন্দায় নমঃ' বলিয়া নিবেদন করা সমান কথা,—ইহাই বাদশাহের মন্ত্রণাপরিষদ সাব্যস্ত করিয়াছিলেন।

পক্ষান্তরে, পেশোয়া বাজীরাও সাব্যস্ত করিয়া লইলেন, বিশাল মোগল সাম্রাজ্যের অন্তর্গত সকল প্রদেশের রাজস্বের চতুর্থাংশ চৌথস্বরূপ আদায় করিয়া লইবার অধিকার প্রদান করিয়া বাদশাহ প্রকারান্তরে মারাঠা-শক্তির সার্ব্বভৌম প্রাধান্য মানিয়া লইলেন। ইচ্ছা করিলেই এই সময় পেশোয়া বাজীরাও বাদশাহের অস্তিত্ব লোপ করিয়া দিল্লীর সিংহাসনে মহারাষ্ট্র রাজশক্তির প্রতিষ্ঠা করিতে পারিতেন। রণজী সিন্ধিয়া, মলহররাও হোলকার প্রমুখ তাঁহার অদ্ভুতকর্ম্মা সেনানীদের এই অভিপ্রায়ই ছিল। কিন্তু এ সম্বন্ধে বাজীরাওএর সিদ্ধান্ত ছিল যে, বাদশাহের উচ্ছেদ না করিয়া তাঁহাকে সাক্ষিগোপালস্বরূপ দিল্লীর সিংহাসনে বসাইয়া রাখিয়া তাঁহারই স্বীকৃত চৌথ আদায় সূত্রে ভারতের সকল প্রদেশের উপর মারাঠা শক্তির প্রভাব ও আধিপত্য প্রতিষ্ঠা। ১৭৩৫ খৃষ্টাব্দের এই ঘটনাটি ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসের একটি স্মরণীয় বিষয়।

অতঃপর সন্ধিসর্ত্ত অনুসারে লব্ধ অধিকার প্রতিষ্ঠা বা রাজ্যে রাজ্যে রণবাহিনী পাঠাইয়া চৌথ আদায়ের পর্ব্ব আরম্ভ হইল। যে সকল রাজ্য সহজেই সম্মত হইল, ভালই; অন্যথায় অস্ত্রবলে চৌথ আদায়ের কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বিত হইল। দিকে দিকে দুর্দ্ধর্ষ রণবাহিনী লইয়া পেশোয়া বাজীরাওএর সেনানীগণ ধাবিত হইলেন।

বাদশাহী ফিরিস্তির মধ্যে রাজপুতানার নামও লিপিবদ্ধ হইয়াছিল। ভূপালের যুদ্ধের পর রাজপুতরাজগণ পরিণাম চিন্তা করিয়া দীর্ঘকাল পরে সহসা পরস্পর একতাবদ্ধ হইয়া পড়িলেন। অধিকাংশ স্থলেই এই ঐক্যবন্ধন বিবাহসূত্রে আরও দৃঢ়তর করিবার আয়োজন চলিল। যে মারবার মেবারের চক্ষুতে পতিত বলিয়া সাব্যস্ত ছিলেন, মহারাষ্ট্র আক্রমণের আতঙ্ক এই সময় মেবার ও মারবারের এই অনৈক্য দূর করিয়া দিল; শুধু ইহাই নহে, মেবারের মহামানী রাণা জগৎসিংহ মারবারের যুবরাজ বিজয়সিংহের হস্তে নিজের কন্যা পর্য্যন্ত সম্প্রদান করিয়া বসিলেন। ইহার পর রাজন্য-সমাজ সমবেত হইয়া প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন যে, রাজপুতানায় মারাঠার আক্রমণ হইলে সকলেই একযোগে তাহাদের বাধা দিবেন।

কিন্তু ১৭৩৫ খৃষ্টাব্দের শেষাংশে পেশোয়া বাজীরাও স্বয়ং যখন তাঁহার অজেয় সেনাদলসহ মেবারের উপকণ্ঠে আসিয়া শিবির ফেলিলেন, তখন সমস্ত রাজপুতানা কাঁপিয়া উঠিল। পেশোয়া স্বয়ং যে রাজস্থানে দর্শন দিবেন, এ প্রত্যাশা কেহই করেন নাই। দিগ্বিজয়ী যোদ্ধার এই অতর্কিত আবির্ভাব, শান্তভাবে শিবির স্থাপন ও তাঁহার দুর্দ্ধর্ষ সেনাদলের নিরুপদ্রব আচরণ রাজস্থানে আলোচ্য বিষয় হইয়া উঠিল। বাহিরের কোনও শত্রুকে এ পর্য্যন্ত এমন শিষ্টভাবে তাহারা রাজ্য-সীমান্তে আস্তানা পাতিতে দেখে নাই। মেবারের রাণা সর্ব্বসম্মতিক্রমে যুদ্ধবাসনা পরিত্যাগ করিয়া সন্ধিবন্ধনে আগ্রহান্বিত হইলেন। রাণার প্রতিনিধিস্বরূপ শালুম্ব্রা সর্দার ও প্রধান মন্ত্রী বিহারীদাস পেশোয়ার শিবিরে গিয়া সাক্ষাৎ করিয়া সসম্ভ্রমে রাণার দরবারে আমন্ত্রণ করিলেন।

রাণার সিংহাসনের পুরোভাগেই পেশোয়া বাজীরাওএর আসন নির্দ্ধারিত হইয়াছিল। বিপুল সম্মানে পেশোয়া রাণার সভায় অভ্যর্থিত হইলেন। সভায় পেশোয়া মারাঠা রাজশক্তির দাবী উত্থাপন করিলেন, সে সম্বন্ধে রাণা ও

তাঁহার অষ্ট মন্ত্রীর সহিত আলোচনা চলিল। কিছুক্ষণ আলোচনার পর সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্থির হইল যে, রাণা মারাঠারাজশক্তিকে বার্ষিক এক লক্ষ ষাট হাজার টাকা নিয়মিতরূপে কর প্রদান করিবেন।—পেশোয়া বাজীরাও যত দিন জীবিত ছিলেন, এই সন্ধিসর্ত্তের অবমাননা কোনও দিন করেন নাই; দীর্ঘকাল রাণা নিয়মিত কর দিয়াছেন এবং মারাঠা সরকার তাহা আদায় লইয়া তুষ্ট হইয়াছেন।

মারাঠার আক্রমণ ভয়ে রাজস্থানের রাজারা একতাবদ্ধ হইয়াছিলেন, মেবারের মহামান্য রাণা মারবার ও অম্বর-রাজবংশের সহিত এই সূত্রে পুত্রকন্যার আদান-প্রদানে কুটুম্বিতা স্থাপন করিয়াছিলেন, এ কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। কিন্তু কিছুকাল পরে এই কুটুম্বিতা-সূত্রেই একতার বন্ধন ছিঁড়িয়া গেল। অম্বররাজ শোবে জয়সিংহ লোকান্তরিত হইলে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র ঈশ্বরসিংহ অম্বরের রাজতক্তে বসিলেন। কিন্তু ইঁহার বৈমাত্রেয় অনুজ মধুসিংহ সিংহাসনপ্রার্থী হইয়া যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। মেবারের রাণা জগৎসিংহ আবার এই মধুসিংহের মাতুল। রাণা জগৎসিংহ ভাগিনেয়কে এতদূর ভালবাসিতেন যে, মেবারের অন্তর্গত জনবহুল সমৃদ্ধ জনপদদ্বয় রাজপুর ও ভালপুর তাঁহাকে জায়গীরস্বরূপ দান করিয়াছিলেন। মৃত্যুকালে রাজা শোবে জয়সিংহও কনিষ্ঠ পুত্রকে টঙ্ক, রামপুর, কাগি ও মালপুর নামক চারিটি বিশিষ্ট পরগণা অর্পণ করিয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু মধুসিংহ তথাপি সিংহাসনের লোভ ত্যাগ করিলেন না। রাণাও এই সময় ভাগিনেয়ের পক্ষ সমর্থন করিলেন এবং মেবারের সামন্তদের অনুরোধ উপেক্ষা করিয়া ভাগিনেয়কে সাহায্য করিতে সেনাদলসহ বাহির হইলেন। কিন্তু এ যুদ্ধে মেবারের সরদারগণ ও মেবারের সেনাদল আন্তরিকতার সহিত যোগদান করিতে পারে নাই, সুতরাং রাণাকে পরাজয় স্বীকার করিয়া ফিরিতে হইল। পরাজয়জনিত যত কিছু বিক্ষোভ পড়িল মেবারের সরদারদের উপর। হিতাহিতজ্ঞান হারাইয়া রাণা এক অনর্থ বাধাইয়া বসিলেন; তিনি মেবারের স্বনামধন্য গিহ্লোটবংশীয় সরদারের কৌলিক তরবারি এক নগরগণিকার হাতে তুলিয়া দিয়া শ্লেষের সহিত বলিলেন,—মেবারের সরদারদের যখন এতই অধঃপতন হইয়াছে, তখন এই তরবারি বারাঙ্গনার ব্যবহার্য্য হওয়াই উচিত।—এই অবমাননা সরদারগণ সহ্য করিতে পারিলেন না, সকলেই রাণার উপর বিরূপ হইয়া উঠিলেন; অনেকেই রাণার সংস্রব ত্যাগ করিলেন।

রাণার তথাপি চৈতন্য হইল না, অম্বররাজ ঈশ্বরীসিংহের হাতে পরাজয়-লাঞ্ছনা তাঁহাকে এতই অধৈর্য্য করিয়া তুলিল যে, তিনিই সর্ব্বপ্রথম প্রচণ্ড শার্দ্দূলের মুখে রক্তের আস্বাদ দিয়া স্বরাজ্যে নিমন্ত্রণ করিয়া ডাকিয়া আনিলেন।

তলে তলে রাণা ভাগিনেয় মধুসিংহের স্বার্থরক্ষায় ও নিজের অবমাননার প্রতিশোধ-লালসায় মারাঠা-সরদার মলহররাও হোলকারের সহিত ষড়যন্ত্রে প্রবৃত্ত হইলেন। রাণা স্বয়ং হোলকারকে নগদ আট লক্ষ টাকা সেলামী দিলেন এবং তাঁহার ভাগিনেয় মাতুলদত্ত সমৃদ্ধ দুইটি জনপদ ও পিতৃদত্ত চারিটি বিশাল পরগণা হোলকারের হস্তে তুলিয়া দিলেন এই সর্ত্তে যে, হোলকার সসৈন্য অম্বরে উপস্থিত হইয়া ঈশ্বরীসিংহকে সিংহাসনচ্যুত করিবেন ও মধুসিংহকে সেই আসনে বসাইয়া দিবেন।

মারাঠা-সরদার এ প্রলোভন ত্যাগ করিতে পারিলেন না, কেনই বা করিবেন? অবিলম্বে অম্বর-সীমান্তে হোলকারের আবির্ভাব হইল। দুর্ভাগ্য, ঈশ্বরীসিংহ বুঝিলেন, তাঁহার কোনও আশাই নাই; মারাঠার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ আর মৃত্যুকে বরণ একই কথা। তিনি অম্বরের শক্তিহানি না করিয়া, নিজেই অনুজের অনুকূলে সিংহাসন ত্যাগ করিয়া চিরদিনের মত সংসার হইতে সরিয়া পড়িলেন। প্রকাশ, চরম লাঞ্ছনার হাত হইতে নিষ্কৃতিলাভের জন্য তিনি বিষপানে আত্মহত্যা করেন। হোলকার অম্বরে প্রবেশ করিয়া মধুসিংহের মাথায় রাজমুকুট পরাইয়া দিলেন এবং নিজের প্রাপ্য গণ্ডা বুঝিয়া লইয়া এবারের মত ফিরিয়া গেলেন। এই সূত্রে মেবারের রাণার সত্যকার পরিচয়ও তিনি পাইয়াছিলেন এবং যিনি প্রথম তাঁহার রসনায় রক্তের স্বাদটুকুর প্রথম সন্ধান দিয়াছিলেন, তাহার পরিপূর্ণ স্বাদ লইতে তাঁহাকে অধিক দিন বিলম্ব করিতে হয় নাই। যে পাপ রাণা স্বয়ং করিয়াছিলেন, সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত বংশ-পরম্পরায় বহুদিন তাঁহাকে করিতে হইয়াছে। ইহাই প্রকৃতির প্রতিশোধ।

শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়।

পরিত্যক্তা

[গল্প]

সমস্ত পৃথিবীটা মনোরমার দৃষ্টির সম্মুখে মুহূর্ত্তে যেন অন্ধকার হইয়া গেল; সে আর ভাবিতে পারে না; তাহার চিন্তা-শক্তি লোপ পাইয়াছে।

অতিরিক্ত সচ্ছলতা না থাকুক, এত দিন সংসারে তাহাদের শান্তির কিছু অপ্রতুল ছিল না, আর বরাবর সে কামনাও করিয়া আসিয়াছে সেইটাই। হিন্দু-নারীর যাহা একান্ত কাম্য, সে তাহা পাইয়াছিল;—স্বামী তাহার ছিলেন দেবতুল্য। তাহারা স্বামি-স্ত্রীতে মিলিয়া এই ধূলির ধরাতে স্বর্গ রচনা করিয়াছে।

কিন্তু সে স্বর্গ আজ সহসা ভস্মীভূত হইল কোন্ ক্রোধান্ধ দেবতার অকারণ অভিশাপে! কাহারও এমন কিছু অনিষ্ট ত' সে জ্ঞানতঃ করে নাই। বরং সেই পাণ্ডব-বর্জ্জিত দেশে অল্প যে কয় ঘর বাঙ্গালী পরিবার ছিলেন, তাঁহারা সকলেই তাহাকে বিশেষ স্নেহের দৃষ্টিতে দেখিতেন। অল্পবয়স্ক ছেলেমেয়েরা ত' মনোমাসী বলিতে অজ্ঞান। তবে সে কি এমন অপরাধ করিল, যাহার জন্য নিষ্ঠুর নিয়তি তাহার স্বামীকে এমনভাবে কাড়িয়া লইল? কিন্তু তর্ক করিয়া, দুঃখ করিয়া আর লাভ নাই। যাঁহার বিচারে তাহার আজ এই শাস্তি, কাহারও আবেদন-নিবেদনে কর্ণপাত করা সে দেবতার স্বভাব নহে। শাস্তি যত ভীষণই হউক, মাথা পাতিয়া লইতেই হইবে।

প্রতিবেশিনীরা এই বিপদের দিনে সত্যই করিয়াছে যথেষ্ট। আজকালকার দিনে মায়ের পেটের বোনও অসময়ে এমন করিয়া বুক দিয়া পড়ে না। রামতারণ বাবু প্রমুখ ভদ্রলোকরাই কি করিয়াছেন কম? রোগীর সেবা পরিচর্য্যা হইতে আরম্ভ করিয়া মৃত্যুর পর সৎকার পর্য্যন্ত সমস্ত কার্য্যের ভারই ত' লইয়াছিলেন তাঁহারা। এ কয়টা দিন সে তাহার কি করিয়া কোথা দিয়া কাটিয়াছে, তাহা নিজেই সে ভাল জানে না। তবু মেয়েরা সকলে তাহাকে অহরহ নানা রকমে সাহস দিয়া ভুলাইয়া রাখিতে চেষ্টা করিয়াছে।

অবশ্য সকলে যে তাহার জন্য এত টানিয়া করিয়াছে, তাহার কারণও যে একটা নাই, তাহা নহে। সেই ক্ষুদ্র বাঙ্গালী পল্লীর সকল পরিবারেরই সঙ্গে তাহার ও তাহার স্বামীর সম্বন্ধ ছিল অতি নিবিড়। সনৎ বাবু বলিতে পুরুষরাও যেমন, মনোদি বলিতে মেয়েরাও তেমনই পাগল। স্বামীর একটি অতি দুর্লভ গুণ ছিল,—পরকে আপন করার অসাধারণ ক্ষমতা। যত বড় পরশ্রীকাতর বিশ্বনিন্দুক লোকই হউক না কেন, একবার কিছুক্ষণ যদি তাঁহার সহিত আলাপ করিয়াছে ত' ব্যস্, সখ্যতাসূত্রে বাঁধা পড়িয়াছে নিশ্চয়। অর্থাৎ তিনি ছিলেন এক কথায় যাহাকে বলে অজাতশত্রু।

যত ভাবে, মনোরমার ভাবনা ততই বাড়িয়া যায়। সে চিন্তার না আছে আদি, না আছে অন্ত।—তাহার বিবাহ হইয়াছিল বছর পাঁচেক;—সে ত' এই সে দিনকার কথা। এই পাঁচটি বৎসরের প্রতিটি তুচ্ছ ঘটনা পর্য্যন্ত মনোরমার মানসচক্ষুর সম্মুখে জ্বলজ্বল্ করিতেছে। একটা ঘটনার কথা তাহার আজিও স্পষ্ট মনে পড়ে। বিবাহের পরদিন পিতৃগৃহ ত্যাগ করার পূর্ব্বক্ষণে সে সাশ্রুনেত্রে জ্যেঠাইমার চরণ স্পর্শ করিয়া নমস্কার করিয়াছিল। যদি আসন্ন প্রিয়জন-বিচ্ছেদে সে মনে অতিরিক্ত ব্যথা পায়, সে জন্য তিনি অবিরাম অশ্রুবর্ষণের মধ্যেই সে দিন যে কি মধুর হাসিয়াছিলেন, সে হাসি ভুলিবার নয়। আর শুধুই কি হাসি? কি স্নেহমাখা মিষ্ট কথাই ছিল জ্যেঠাইমার।

চিবুক স্পর্শ করিয়া সস্নেহে সে দিন তিনি বলিয়াছিলেন,—"মেজবৌ তোকে আমার হাতে তুলে দিয়ে গিছল, মা। আমি সেই জিনিষ নিজের হাতে এত বড়টি ক'রে আজ এত দিন পরে সনতের হাতে দিয়ে নিশ্চিন্দি হ'লাম। আশীর্ব্বাদ করি, সাবিত্রী সমান হ', হাতের নোয়া বজ্জর হোক্; হিঁদুর ঘরে মেয়েমানুষের এর বড় আশীর্ব্বাদ কি আছে আমি মা জানি না।" হায়! আজ যদি সেই মাতৃকল্পা জ্যেঠাইমা জীবিতা থাকিতেন, আর কিছু না হউক, তাঁহার স্নেহচ্ছায়ায় আজ সে একটু নিরাপদ আশ্রয় পাইত নিশ্চয়।

আশ্রয়ের কথা মনে হইতেই স্বামীর শেষ কথাগুলি তাহার মনে পড়িল। সে দিন তাঁহার মৃত্যু হয়, তাহার পূর্ব্বরাত্রিতে একটু জ্ঞান হইতেই মনোরমার হাত দুইটি ধরিয়া তিনি বলিয়াছিলেন,—"রমু, মনে কর যদি আমি আর নাই উঠি, তোমার যে কি হবে,—না, না, মুখ চাপা দিলে কি হবে, মনু. ভাবনার হাত ত' এড়ান যাবে না, এত হঠাৎ যে এমন হবে, তা' ভাবিনি, সঞ্চয়ও কিছু করা হয় নি," বলিতে বলিতে দরদরধারে অশ্রু-বর্ষণ নামিয়াছিল।

স্বামীর দুঃখ সে দিন যে সে না বুঝিয়াছিল, তাহা নহে, তবু জোর করিয়া মুখে যতটা সম্ভব প্রফুল্লতার ভাব আনিয়া বলিয়াছিল,—"আমার মাথা খাও, ও সব বাজে কথা ভেবে এখন মিছিমিছি মন খারাপ করো না, লক্ষ্মীটি, কিছুই ত হয় নি তোমার—"

কিন্তু তাহার অনুরোধে ও মিথ্যা আশ্বাসে সে দিন কোনই ফল হয় নাই। স্বামী তাহার মাথাটি সাদরে বুকের উপর চাপিয়া অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে ধীরে ধীরে বলিয়াছিলেন,—"জান মনু, তোমার কথা ভেবে ভেবে আমি পাগল হয়ে যাবার দাখিল হ'লাম। আত্মীয়-স্বজনের ব্যবহারে বিরক্ত হয়েই, সংসারের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক কাটিয়ে স্বেচ্ছায় এই জঙ্গলের মধ্যে চাকরী নিয়েছিলাম; কিন্তু শেষটা যে এমন হবে, ভাবি নি। আজ দেখছি, কোথাও দাঁড়াবার তোমার স্থান নেই; না আছে পিতৃকুলের তেমন কেউ, না আছে শ্বশুরকুলের; তার ওপর পেটে এখন তোমার সন্তান রয়েছে। তুমি বরং একটা কায কোরো, দাদার কাছে গিয়ে গোবরডাঙ্গাতেই উঠো; নাই বা হ'লেন মা'র পেটের ভাই, একই বাপের ঔরসে জন্ম ত বটে; আর কি জান, অন্যের কুপরামর্শে অন্যায় তিনি অনেক করেছেন বটে, কিন্তু দাদা মোটের উপর লোক খুব খারাপ নন, গিয়ে উঠলে তিনি ফেলতে পারবেন না। আমি রামতারণ বাবুকেও সেই কথা ব'লে দেব'খন, যাতে তাঁরা পরে সেই ব্যবস্থাই করেন।" এই পর্য্যন্ত বলিয়াই তিনি আবার আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন।

স্বামীর মৃত্যুর অব্যবহিত পরে তাঁহার অভাবটাই মনোরমা বোধ করিয়াছিল অতি প্রখররূপে। কি কুক্ষণে যে তিনি জ্বর লইয়া ঘরে ফিরিলেন, আর উঠিতে হইল না। যে ব্যক্তিটি এত দিন অজস্র আদরে, সোহাগে, যত্নে তাহার জীবনকে মধুময় করিয়া রাখিয়াছিল, সে আর নাই; হাজার মাথা কুটিলেও সে আর ফিরিবে না, আর তাহাকে স্নেহস্নিগ্ধ কণ্ঠে মনু, রমু বলিয়া ডাকিবে না, এই চিন্তাটাই তাহার সমস্ত চৈতন্যকে যেন আচ্ছন্ন করিয়া রাখিল। যাহাকে নিশিদিন কাছে পাইলে সে সুখী হইত, জীবনে তাহাকে সে আর একটিবারও চোখের দেখা দেখিতে পাইবে না। সম্মুখে তাহার শূন্যতার কূলহীন পাথার,—দ্বীপের চিহ্নমাত্র নাই। এ সব কথা সে যত চিন্তা করিয়াছে, ততই চক্ষু ছাপাইয়া অশ্রুর প্লাবন বহিয়াছে।

অবশেষে শোকানুভূতির প্রাখর্য্য যখন একটু হ্রাস পাইল, মনোরমার দৃষ্টি তখন নিজের প্রতি কেন্দ্রীভূত হইল। যাহা হইবার, তাহা ত হইয়াই গিয়াছে, যত বুকভাঙ্গা আর্ত্তনাদই কর আর অশ্রুর নদী বহাইয়া দাও, যে একবার মায়া কাটাইয়াছে, তাহাকে আর ফিরাইয়া আনিবার উপায় নাই। যে জীবনপথে এত দিন দুই জনে হাত-ধরাধরি করিয়া চলিতেছিল, সেই সুদীর্ঘ পথ এখন তাহাকে সম্পূর্ণ একাকীই অতিক্রম করিতে হইবে। যত বেদনাই পাও, আর যত ক্লান্তিই বোধ কর, না জানাইবে কেহ একটু সমবেদনা, না শুনাইবে দুইটা উৎসাহের বাণী। সম্মুখে তাহার নিরালোক ভবিষ্যৎ; আর সেই নীরন্ধ্র অন্ধকারের অন্তরালে—

সহস্র বিভীষিকার কল্পনায় মনোরমা শিহরিয়া উঠিতে লাগিল।

বেশী নয়, মাত্র আট দশটি বাঙ্গালী ভদ্রলোক বন-বিভাগের চাকরী লইয়া সপরিবারে বঙ্গের বাহিরে সেই

পার্ব্বত্য অঞ্চলে জঙ্গলের মধ্যে বাস করিতেছিলেন। ফলে সেখানে একটি ক্ষুদ্র বাঙ্গালী উপনিবেশ গড়িয়া উঠিয়াছিল বলিলেও চলে। বহির্জ্জগতের সঙ্গে প্রায় কোন সম্পর্ক না থাকায়, এই কয়টি পরিবার সুখে, দুঃখে, উৎসবে অথবা বিপদে পরস্পর পরস্পরের অবলম্বন ছিলেন। কাহাকেও না হইলে কাহারও চলিত না, এমন ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছিল তাঁহাদের মধ্যে। বিশেষ করিয়া সনৎ ছিল সকলের অতি প্রিয়। বলিতে কি, সেই ছিল সকলের মধ্যে যোগসূত্র। এই কয়টি পরিবারকে ঐক্যসূত্রে বাঁধিয়াছিল সে-ই। ঈর্ষা ও কলহের বিষ যত অলক্ষ্যেই ধীরে ধীরে সঞ্চিত হউক, তাহার দৃষ্টি অতিক্রম করা সহজ নহে। প্রতিবেশীর বাদবিসম্বাদ মিটাইয়া শান্তিস্থাপন করিতে সনৎ, দুঃখের দিনেই বল আর সুখের দিনেই বল, সনৎকে সকলের চাই-ই। সনৎ না থাকিলে রোগীর পরিচর্য্যায় ত্রুটি থাকিয়া যায়, উৎসব অসম্পূর্ণ থাকে।

এহেন সনৎ যখন সহসা পীড়িত হইয়া পড়িল, সেই বিদেশেও তাহার সেবার অভাব হইল না। তাহার গুণমুগ্ধ প্রতিবেশীর অভাব নাই। বৃদ্ধ রামতারণ বাবু হইতে অজাতগুম্ফ কিশোররা পর্য্যন্ত অহোরাত্র তাহাকে লইয়া ব্যস্ত,—সনৎকে তাহারা ঐকান্তিক সেবার দ্বারা জীয়াইয়া তুলিবেই। নারীরাও পিছাইয়া রহিলেন না,—তাঁহাদের কল্যাণহস্ত প্রসারিত করিয়া ছুটিয়া আসিলেন। কিন্তু হইলে কি হইবে, বিধাতাপুরুষ যাহার ললাটে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা মানুষের শত চেষ্টাতেও যে রদ্ হইবার নহে। সনৎ সকলের সেবাশুশ্রূষা ব্যর্থ করিয়া মাত্র তিন দিনের জ্বরে সংসারের মায়া কাটাইল।

পরপারের ডাক যখন আসে, ইচ্ছা থাকিলেও পশ্চাতে ফিরিয়া চাহিবার তখন আর অবসর থাকে না; যে যেমন অবস্থায় আছে, তাহাকে সেই অবস্থায়ই সে আহ্বানে সাড়া দিতে হয়। কিন্তু এপারে যাহারা পড়িয়া রহিল, দুর্ভোগ তাহাদেরই। মনোরমারও হইল তাহাই। সে প্রথমে কাঁদিয়া কাটিয়া একসা করিল, কাহারও কোন আশ্বাসবাক্যেই সে সান্ত্বনার কিছু খুঁজিয়া পাইল না। তার পর যখন সে নিজের অবস্থা বুঝিল, কি অথই জলে সে এখন পড়িয়াছে, তখন তাহার আর্ত্তনাদও থামিয়া গেল। কেবল গভীর দুঃখ ও দুশ্চিন্তার অন্তর্বহ্নিতে সে নীরবে দগ্ধ হইতে লাগিল। এত দিন সে কুসুমাস্তীর্ণ পথেই চলিয়া আসিয়াছে, কিন্তু আর নহে, এইবার তাহার সম্মুখে কণ্টকাকীর্ণ বন্ধুর পথ প্রসারিত; কিন্তু এখন তাহার চিন্তা শুধু ত' নিজেকে লইয়াই নহে, তাহার দেহ আশ্রয় করিয়া যে ভ্রূণ সকলের অলক্ষ্যে ধীরে ধীরে পুষ্ট হইতেছে, তাহার কি হইবে? তাহাকে সযত্নে রক্ষা করার সম্পূর্ণ দায়িত্ব যে তাহারই। হা ভগবান্! এত দুঃখও কপালে লিখিয়াছিলে? কিন্তু না, সাড়ম্বরে শোক করার এখন সময় নহে। নিজের জন্য না হউক, পেটেরটার জন্য তাহাকে আবার বুকে বল বাঁধিতে হইবে। তবু ত' রক্ষা, সে এতটাও আশা করে নাই। রামতারণ বাবুর টেলিগ্রামের উত্তরে তাহার ভাসুর নিরঞ্জন টেলিগ্রাম করিয়াছেন, তিনি ভ্রাতার আকস্মিক মৃত্যু-সংবাদে মর্ম্মাহত; যেন এখান হইতে কেহ দয়া করিয়া মনোরমাকে তাঁহার নিকট পৌঁছাইয়া দেয়।

ইহাই যথেষ্ট, ইহা তাহার কল্পনাতীত। কারণ, এ কথা সে সনতের নিকট ইতিপূর্ব্বে একাধিকবার শুনিয়াছে যে, পৈতৃক বাটীতে তাহার কোন অধিকার নাই। সনতের জননী ছিলেন শ্বশুরের প্রথমা স্ত্রী, তাঁহার সন্তান হইবার কোন আশা নাই দেখিয়া শ্বশুর আবার বিবাহ করেন ও সেই তরুণী স্ত্রীর গর্ভে নিরঞ্জনের জন্ম হয়। ইহার চার পাঁচ বৎসর পরে হয় সনৎ। শ্বশুর মৃত্যুকালে তরুণী স্ত্রীর মন্ত্রণায় উইল করিয়া স্বোপার্জ্জিত অর্থে প্রস্তুত বসৎবাটীখানি নিরঞ্জনকে লিখিয়া দেন। সেই নিরঞ্জন যে আবার তাহাকে আশ্রয় দিবেন, এ কথা মনোরমা স্বপ্নেও ভাবে নাই।

স্থির হইয়াছে, আগামী কল্য বৃদ্ধ রামতারণ বাবু নিজে সঙ্গে করিয়া তাহাকে গোবরডাঙ্গায় রাখিয়া আসিবেন। এত দিন এখানে থাকিয়া দেশটার উপর মায়া পড়িয়াছে কম নহে। তাহার জীবনের মধুরতম দিনগুলির স্মৃতি এখানকার সহিতই জড়িত। কিন্তু যে পোড়া রাক্ষসে দেশ শেষে তাহার স্বামীকে এমন করিয়া গ্রাস করিল, সেখানে আর একদণ্ডও থাকিতে সে রাজী নহে। এখন যে দিকেই চাহে, তাহার প্রাণ হাহাকার করিয়া উঠে। এই কয় বৎসর নিরাত্মীয়া যতগুলি রমণীর সহিত হৃদয়ের নিবিড় যোগস্থাপন হইয়াছিল, এখন আর কাহারও প্রতি চাহিলে চলিবে

না; এ দেশের সহিত সকল সম্বন্ধ তাহাকে ছিন্ন করিতেই হইবে।

আহারাদির পর দ্বিতলের বারান্দায় বসিয়া নিস্তারিণী তখন রৌদ্রে চুল শুকাইতেছিল। ব্রজসুন্দরী পাশে বসিয়া কন্যার সহিত কথোপকথনে ব্যস্ত ছিলেন। আজ রবিবার, মনোরমার আসিবার কথা। মা ও মেয়েতে সেই বিষয়েই আলোচনা হইতেছিল।

ব্রজসুন্দরীর কথার সূত্র ধরিয়া, নিস্তারিণী একটা ঝাঁকানি দিয়া ঘাড়টিকে বামে হেলাইয়া এক বিকৃত মুখভঙ্গী করিয়া বলিল,—"তোমার জামায়ের গুণের কথা আর ব'ল না মা, শুনলে আমার গা জ্বালা করে; জিগ্যেস নেই, পড়া নেই, আত্তি দেখিয়ে নিজের খেয়ালে সাত তাড়াতাড়ি এক তার ক'রে দেওয়া হ'ল,—"

কন্যার বাক্যপ্রবাহে বাধা দিয়া মাতা বলিলেন,—"তা' নয় ত' কি বাপু, একটা শলাপরামর্শ কর, মতামত নে, তা না,—হুঁ—সাধ ক'রে কেউ আবার এই আপদ ঘরে আয়? একেই বলে—সুখে থাকতে ভূতে কিলোয়।"

বলিতে বলিতেই সদর-দরজায় একটা গরুর গাড়ী আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, বুঝিতে পারা গেল। ব্রজসুন্দরী তাড়াতাড়ি উঠিয়া ঘরের জানালা হইতে একবার উঁকি মারিয়া দেখিয়া কন্যাকে ইঙ্গিত করিলেন, আসিয়াছে সে। ইহার পর দুই জনে বস্ত্র সুসংবৃত করিয়া নীচে নামিয়া গেলেন।

নিরঞ্জন বৈঠকখানায় শুইয়া তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায়, অর্দ্ধ-নিমীলিত-নেত্রে আলবোলায় সুখটান দিতেছিলেন। গাড়ীর শব্দে সচকিত হইয়া উঠিয়া হাঁকডাক আরম্ভ করিয়া দিলেন, —"ওরে মেধো, কোথায় গেলি, আয় না ছুটে ব্যাটা, বৌমা এসেছেন,—"

মনোরমার অভ্যর্থনা যথারীতি আর্ত্তনাদসহকারে মহা সমারোহেই হইল। শোকধ্বনি শুনিয়া পল্লীর প্রবীণারা প্রথমে ছুটিয়া আসিলেন ও অবিলম্বেই নবীনারা তাঁহাদের পদানুসরণ করিলেন।

নিস্তারিণী ও ব্রজসুন্দরীকে দেখিয়া বোধ হইল, মনোরমার বৈধব্যের দুঃখটা তাঁহাদেরই লাগিয়াছে যেন বেশী; —ঘন ঘন দীর্ঘশ্বাসের ঝড় বহিতে লাগিল; বিরামহীন চক্ষুমার্জ্জনার ফলে বোধ হইল, সমস্ত বস্ত্রাঞ্চলটাই সম্ভবতঃ ভিজিয়া উঠিয়াছে।

কিন্তু এই অভিনয়ের মধ্যেও মাতা ও পুত্রীর মধ্যে নীরবে চোখে চোখে যে কথা হইয়া গেল, তাহা কাহারও নজরে পড়িল না। ভাবটা এই যে,—'সর্ব্বনাশ, এ যে দেখি গরু-বাছুর একসঙ্গে; আপদটা শুধু একলাই আসে নি, আবার পেটেও একটা নিয়ে এসেছে যে'।

মনোরমাকে তাহার ঘর দেখাইয়া দেওয়া হইল। নীচের তলায় ছাঁচতলার পাশে ছোট অপ্রশস্ত অন্ধকার ঘরখানি; বহুদিনের অযত্নে জীর্ণ দেওয়ালের স্থানে স্থানে বালি খসিয়া পড়ায় ভিতরের ইট বাহির হইয়া পড়িয়াছে; দেখিলে সহসা মনে হয়, যেন একটা কদাকার বৃদ্ধের কঙ্কালের সহিত কোথায় ইহার সামঞ্জস্য আছে। কিন্তু তাই বলিয়া ঘরটি যে অব্যবহৃত অবস্থায় এত দিন পড়িয়াছিল, সে কথাটা বলা ঠিক হইবে না। কয়লা, কাঠ, ঘুঁটে, গুল হইতে আরম্ভ করিয়া আরও কত কি যে ছিল এই ঘরটুকুর মধ্যে, ভাবিলে অবাক্ হইতে হয়।

মনোরমা ঘরে প্রবেশ করিতেই বোধ করি তাহার এই অনধিকারপ্রবেশে বিরক্ত হইয়াই কতকগুলো আরশুলা ইতস্ততঃ উড়িতে আরম্ভ করিল। এই অন্ধকূপের মধ্যে তাহাকে দিনের পর দিন অতিবাহিত করিতে হইবে মনে হইতেই তাহার অন্তরাত্মা মুহূর্ত্তের জন্য শিহরিয়া

কিন্তু বিচলিত হইবার বিশেষ কোন কারণ নাই; শুভাকাঙ্ক্ষিণী, আশ্রিতবৎসলা, আশ্রয়দাত্রীরা অযাচিত সান্ত্বনার বাণী শুনাইতে লাগিলেন।

নিস্তারিণী বলিল,—"ও কিছু না, ছোটবৌ, ভয় পেও না; দু'দিন থাকতে থাকতেই আবার ঠিক হয়ে যাবে।" একটু থামিয়া আবার বলিল,—"কি করি বল ভাই, কথায় বলে, আপনি শুতে ঠাঁই পায় না, শঙ্করাকে ডাকে; আমাদেরও হয়েছে তাই; দেখছ ত' বাড়ীতে—"

কন্যার কথায় বাধা দিয়াই মাতা বলিলেন,—"তুমি আসবে শুনে মা, তারি আমার ভেবেই অস্থির, কত কষ্ট হবে তোমার তাই ভেবে; আমি বলি, তা' কি করবি বল মা; ললাটের লেখন যাবে কোথায়? কপালে সুখ যদি থাকবে ত' এই বয়সে এমন দশা হবে কেন বল্?"

মনোরমা গোপনে চক্ষু মার্জ্জনা করিয়া বলিল,—"না মা, এ আমার বেশ হবে'খন, কোন কষ্ট—"

মুখের কথা কাড়িয়া লইয়া ব্রজসুন্দরী বলিলেন,—"তা' বলবে বৈ কি বাছা; তুমি হ'লে আজকালকার সেয়ানা মেয়ে; আর তা' ছাড়া অন্য উপায় যখন নেই, তখন হ'তেই হবে। জান ত' মা, বলে, বেঁধে মারে সয় ভাল। তবে তোমার পেটে একটা রয়েছে, আর এমন ভরা হয়ে এসেছে, এ কথা ত' আমরা আগে জানতাম না, বাছা! তা' হোক্, ওর জন্যে ভাবনা কিছু নেই; আমি যখন আছি,একখানকার জিনিষ সুভালাভালি দু'খানে যা'তে হয়, সে ভার আমার। তুমি আর আমার তারি ত' ভিন্ন নয় মা; আমার কাছে দুই সমান,—সেও মেয়ে, তুমিও মেয়ে। গুমোর করছিনে, শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে, তারির এতগুলি সব এই আমারই হাতে মানুষ।" বলিয়া এমন সগৌরবে এক পাল শিশুর দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিলেন যে, মনে হইল, কোন শিশু-প্রদর্শনীতে তিনি যেন "ছেলে মানুষ" করার কৃতিত্ব দেখাইয়া স্বর্ণপদক পুরস্কারের আশা করিতেছেন।

মনোরমা এতক্ষণ লক্ষ্য করে নাই, বিভিন্ন বয়সের অনেকগুলি উলঙ্গ এবং অর্দ্ধ-উলঙ্গ কৌতূহলী মেয়ে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল,—এক একটি যেন নোঙরার প্রতিমূর্ত্তি। ধূলা, কাদা, ছাই, গোময় প্রভৃতি বিবিধ প্রকার মহার্ঘ্য উপকরণ কত স্থান হইতে আহরণ করিয়া তাহারা যে কি বিপুল যত্নে দৈহিক প্রসাধন করিয়াছে, দেখিয়া মনোরমার বিস্ময়ের অবধি রহিল না।

ব্রজসুন্দরী মনোরমাকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন,—"তা' বাছা, এইবার গা'-হাত ধুয়ে একটু ঠাণ্ডা হয়ে মুখে চারটি দিয়ে নাও; পথে আসতে ছেরোম ত' আর কম হয় নি। ওলো, ও টেঁপি, হাবলি, বুঁচি, আর সব ছুঁড়ীরা, ওখান থেকে চ'লে আয়,—ওকে একটু ঠাণ্ডা হ'তে দে।"

এতক্ষণে একটু নিরিবিলি হইতেই মনোরমা সেই স্যাঁৎসেঁতে অপরিচ্ছন্ন ঘরে ভূমিশয্যাতেই তাহার শ্রান্ত দেহ এলাইয়া দিল; তাহার বক্ষের মধ্য হইতে একটি দীর্ঘশ্বাস বাহির হইয়া আসিল,—"মা গো"!—

কালস্রোত কাহারও সুখ-দুঃখের প্রতি দৃক্‌পাত না করিয়া অবিরাম বহিয়া চলে; দিন ঠিক্ কাটিয়া যায়। দেখিতে দেখিতে নিরঞ্জনের গৃহেও মনোরমার পাঁচ ছয় মাস কাটিয়া গেল।

এই কয় মাসের ব্যবধানে সে যথেষ্ট সাংসারিক অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছে; লোকচরিত্র অধ্যয়ন করিবার সুযোগ লাভ করিয়াছে প্রচুর। এ সংসারে তাহার স্থান যে কোথায়, হাবে ভাবে, সরস বাক্যে ও নীরব ইঙ্গিতে তাহাকে সকলে প্রত্যহ সহস্র রকমে বুঝাইয়া দিয়াছে; এবং সেটুকু বুঝিয়া সে আনন্দে উল্লসিত হইয়া উঠিতে পারে নাই। অথচ সে সকল হীন অর্থপূর্ণ ইঙ্গিত যত অপমানকরই হউক অথবা বাক্যবাণ যত তীক্ষ্ণ হৃদয়-ভেদীই হউক, মুখ ভার করিবার উপায় নাই; হাসিমুখে সব সহ্য করিতেই হইবে, গায়ে মাখিলে চলিবে না। শ্রদ্ধায়ই হউক, আর অশ্রদ্ধায়ই হউক, তোমার বিপদের দিনে ক্ষুধার অন্ন যে যোগাইতেছে, এমন কি, মাথা গুঁজিবার জন্য ছাদওয়ালা যা' হোক্ একখানি কুটীর পর্য্যন্ত যাহারা তোমাকে নিজেদের শত অপরাধ সত্ত্বেও ছাড়িয়া দিল, তাহারা কখনও যদি কোন রূঢ় কথা বলিয়াই থাকে, বুঝিতে হইবে, সে শুধু তোমারই মঙ্গলের জন্য।

মনোরমার বড় ভরসা ছিল, আর যে যাহাই বলুক, নিরঞ্জন নিজে লোক নিতান্ত মন্দ নহে; অন্ততঃ স্বামীর নিকট হইতে সে তাহাই শুনিয়াছিল। কিন্তু তাহার সে বিশ্বাস এমন করিয়া এত শীঘ্রই যে ভাঙ্গিবে, ইহা সে কল্পনাও করে নাই। তরঙ্গ-বিক্ষুব্ধ জলরাশি-পরিবেষ্টিত যে ভূখণ্ডটুকুর উপর দাঁড়াইয়া সে নিজেকে নিরাপদ মনে করিয়াছিল, তাহা যে চোরা বালিমাত্র, সে কথা বুঝিতে তাহার বিলম্ব হইল না।

নিরঞ্জন নিজে সত্যই লোক যে বিশেষ মন্দ, তাহা নহে; কিন্তু তাহার চরিত্রের একটা দিক ছিল বিশেষ দুর্ব্বল,—তাহার স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি বলিতে কিছুই ছিল না। সে নিস্তারিণীর চোখেই দেখিত এবং তাহারই কর্ণে শুনিত। নিস্তারিণী ছিল প্রকৃতই তাহার সচিব; কল্পিত ও সত্য সকল বিপদ আপদে সেই তাহাকে যুক্তি-পরামর্শ দিত, সংসার অরণ্যে সেই তাহার পথ-নির্দ্দেশ করিত।

এক কথায় নিরঞ্জন ছিল এক মেরুদণ্ডহীন মনুষ্য ;—কোন কিছুর অবলম্বন না পাইলে সে দাঁড়াইতে পারে না।

মনোরমা যখন ইহাদের সংসারে আসিল, তাহার প্রতি নিরঞ্জনের আচরণে অভাবিত মাধুর্য্য লক্ষ্য করিয়া হৃদয়ে কত যে বল পাইল, বলিবার নহে। কিন্তু কয় দিনের জন্যই বা! নিরঞ্জনের দুই কর্ণকুহরে মাতা পুত্রীর বিরামহীন মন্ত্রণাধারা বর্ষণের অব্যর্থ ফল ফলিতে বিলম্ব হইল না; মনোরমা স্ত্রী-পুরুষ সকলেরই চক্ষুশূল হইল। কিন্তু তাহার প্রতি সকলের বিরাগ চরমে পৌঁছিল সেই দিন, যে দিন শত অযত্ন ও অবহেলার মধ্যেও সে অবলীলাক্রমে এক পুত্র-সন্তান প্রসব করিয়া সকলের ঈর্ষাগ্নিতে ঘৃতাহুতি দিল। বিবাহ হওয়া অবধি নিস্তারিণী একটি পুত্র-সন্তান লাভার্থে কি না করিয়াছে? কত মন্ত্র-তন্ত্র, যাগ-যজ্ঞ, কত প্রকার মাদুলী ধারণ, পাঁচু ঠাকুরের দোর ধরা, খ্যাত ও অখ্যাত কত দেবস্থানে ধরণা দেওয়া, পূজা মানত করা, কিছুতেই কিছু হইল না, আর তাহাদেরই কৃপাশ্রিতা স্বামিহারা এই মেয়েটা কি না কোন কৃচ্ছ্রসাধন না করিয়াও দেবশিশুর মত দিব্য মোটাসোটা গোলগাল নধরকান্তি এক পুত্রের জননী হইয়া বসিল! 'একচোখো' ভগবানের উপর রাগে নিস্তারিণী গুম্ হইয়া রহিল।

সন্তান কোলে পাইয়া মনোরমা কিন্তু সকল দুঃখ ভুলিল। তাহার স্বামীর এই অমূল্য দানটুকু তাহাকে যেমন করিয়াই হউক রক্ষা করিতে হইবে। হায়! আজ যদি তিনি বাঁচিয়া থাকিতেন। ভাবিতে ভাবিতে মনোরমার মন বর্ত্তমান ভুলিয়া অতীতের সুখস্মৃতির মধ্যে ডুবিয়া যায়। কোলের উপর খোকা কাঁদিয়া উঠিলেই সে সচকিতে তাহাকে বুকে চাপিয়া ধরিয়া মুখে মাথায় চুমা খায়; তাহার দুই চক্ষু দিয়া দরবিগলিতধারে অশ্রু গড়াইয়া পড়ে। এই ভাবে হাসি ও অশ্রুর আলোছায়ার মধ্য দিয়া মনোরমার দিনগুলি কাটিতে লাগিল।

এখানে আসা অবধি ব্রজসুন্দরীর নিরামিষ রন্ধনের ভার মনোরমা স্বেচ্ছায় গ্রহণ করিয়াছে। ইহাদের সংসারে যখন থাকিতেই হইবে, তখন যতটা টানিয়া করা যায়, ততই মঙ্গল। ব্রজসুন্দরী ইহাতে প্রথমে একটু মৌখিক আপত্তি করিয়াছিলেন,—কিন্তু সে নেহাৎ করিতে হয় তাই। মনোরমার নিজেরও যখন নিরামিষ রন্ধন করিতেই হইবে, সে এ কাযটুকু হাসিমুখেই বরণ করিয়া লইল।

কিন্তু মনোরমা আঁতুড়ঘর হইতে বাহির হইবার পর হইতেই নিস্তারিণীর অম্বলের ব্যথা সহসা এরূপ বৃদ্ধি পাইল যে, তাহার পক্ষে পাকশালার ত্রিসীমায় যাওয়া নিষিদ্ধ হইল, এবং ব্রজসুন্দরীও এত শারীরিক অসুস্থতা বোধ করিতে লাগিলেন যে, সকল কার্য্যে মনোরমার উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখা ও কারণে অকারণে দরাজগলায় নিজের গৃহিণীপনা জাহির করা ভিন্ন সংসারের আর কোন কার্য্যে তিনি সম্পূর্ণ অপারগ হইয়া পড়িলেন। সুতরাং আমিষ রন্ধনের ভারও আসিয়া পড়িল মনোরমার হাতে। এইরূপে দেখিতে দেখিতে সেই নাতিক্ষুদ্র সংসার-রথটিকে সচল রাখিবার গুরুভার প্রায় সমস্তটাই পড়িল মনোরমার উপর।

নিশান্তের অন্ধকার থাকিতে তাহাকে শয্যাত্যাগ করিতে হয়। সেই সময় হইতে সমস্ত দিন অবিরাম সংসারের জন্য হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করিয়া সকলের শেষে প্রায় মধ্যরাত্রিতে তাহার ছুটী। কেবল মধ্যাহ্নে আহারাদির পর ঘণ্টাখানেক বিশ্রাম করিবার অবসর সে পায়। কিন্তু ইহাতেও সে কখনও মুখভার করে না। করিবেই বা কেন? সে জানে, খোকাকে তাহার যেন তেন প্রকারে মানুষ করিতে হইবে। এখন আর সে নিঃসঙ্গ একাকী নহে। খোকা তাহার জীবনকে গৌরবান্বিত করিয়াছে! সাংসারিক নিত্যকর্ম্মের বিরল অবসরে সকলের অগোচরে ক্ষণেকের জন্য যখন সে খোকার নিকট আসে, সেই অবোলা শিশুর মুখখানি দেখিলে, একবারটি তাহাকে বুকে চাপিয়া স্তন্য দিলেই তাহার সকল শ্রম সার্থক বলিয়া মনে হয়; মনে হয়, খোকার মুখ চাহিয়া সে জন্ম জন্ম সকল দুঃখ-কষ্ট হাসিমুখে বরণ করিয়া লইতে রাজী আছে। সহস্র ব্যস্ততার মধ্যেও মনোরমার তনুমন অনুক্ষণ অধীর উন্মুখ হইয়া থাকে—কখন্ সে তাহার দুই তৃষিত চক্ষু ভরিয়া শিশুর লীলা চাপল্য উপভোগ করিবে।

পরিশ্রম করিতে মনোরমা কাতর নহে; কিন্তু নিস্তারিণী ও ব্রজসুন্দরী যখন তাঁহাদের তূণ হইতে চোখা চোখা বাক্য-বাণ প্রয়োগ করিতে থাকেন, তখন তাহার অন্তরটা সত্যই ব্যথায় টন্‌টন্ করিয়া উঠে; মুহূর্ত্তের দুর্ব্বলতায় আঁখির কোণে অশ্রুবিন্দুও বুঝি টল্‌টল্ করে।

কিন্তু তা হউক, ভগবানের কাছে এ তাহার নিত্য প্রার্থনা, যেন তিনি তাহার শরীর সুস্থ রাখেন। গৃহকর্ম্মে যে দিন সে অক্ষম হইবে, সেই দিনই তাহাকে নিঃসন্দেহ আশ্রয়চ্যুত হইতে হইবে। মনোরমার ঘরের দেওয়ালে এক খানি কালীঠাকুরের পট লম্বিত ছিল। সে সময় নাই অসময় নাই, তাঁহার উদ্দেশে প্রণাম নিবেদন করিয়া বলিত—"হে মা কালী, তুমি অন্তর্য্যামী, সকলের মনের কথাই ত জান, আমায় নীরোগ কোরো মা, যেন খোকাকে নিয়ে আমাকে পথে না দাঁড়াতে হয়।"

কিন্তু কালীঠাকুরকে যদি মনোরমার মত অসংখ্য হিন্দু-বিধবার দুঃখের কাহিনী শুনিয়া প্রতীকার করিতে হইত, বোধ করি, তাহা হইলে তিনি আর কাহারও নালিশ শুনিবার মুহূর্ত্তমাত্রও অবকাশ পাইতেন না।

মনোরমার প্রার্থনা যে ব্যর্থ হইয়াছে, সে কথা বুঝিতে পারা গেল সেই দিন—যে দিন মনোরমা পীড়িতা হইয়া শয্যা আশ্রয় করিল। ইদানীং সে অতি দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে, অল্প পরিশ্রমেই শ্রান্ত হইয়া হাঁপাইতে থাকে, মনে হয়, চক্ষুর সম্মুখে বিশ্ব-চরাচর যেন ঘূর্ণির মত ঘুরিতেছে।

মাঝে মাঝে ব্রজসুন্দরীর বাক্যসুধা শ্রবণে অমিয় বর্ষণ করে, অবশ্য এ কথা বুঝিতে পারা কঠিন নহে যে, কথাগুলা যাহাতে তাহার শ্রুতিগোচর হয়, সেই উদ্দেশ্যেই বলা।—"পারিনে বাবা বুড়ো বয়সে,—মায়ে ঝিয়ে মরছি নিজেদের শরীর নিয়ে, আর রাজরাণী ঢং ক'রে বিছানা কামড়ে প'ড়ে আছেন। পরের হাঁতোলায় যাকে থাকতে হবে, তার অত সুখের শরীর হ'লে চলে কখনও?"

কথাটা যতই কটু ও অপ্রিয় হউক, উহার মধ্যে সত্য যে আছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। ঠিক কথা, এটা সত্য যুগ নহে অথবা সেই অন্ধকারাচ্ছন্ন যুগও নহে, যে সময়ে একান্নবর্ত্তী পরিবারের অন্তর্ভুক্ত থাকিয়া পরান্নে প্রতিপালিত এক-পাল নিষ্কর্ম্মা ব্যক্তি দিব্য আরামে দিনাতিপাত করিত। এটা হইল দ্রুত অগ্রগতিশীল আলোকোজ্জ্বল বিংশ শতাব্দী। এ কালে টাকা আনা পাইএর হিসাবই সকল হিসাবের ঊর্দ্ধে; পার্থিব লাভ-লোকসান না খতাইয়া কেহ দিবসের তুচ্ছতম কার্য্যটিও করে না।

এ কয় দিন ধরিয়া মনোরমা এ সকল কথাই ক্রমাগত চিন্তা করিয়াছে। আজ যদি তাহাকে অকর্ম্মণ্য জানে ইহারা আশ্রয়দানে পরাঙ্মুখ হয়, কোথায় দাঁড়াইবে সে? ত্রিভুবনে কে তাহার আপন জন আছে—যাহার নিকট সে আশ্রয় ভিক্ষা করিবে? বাপের বাড়ী বলিতে যাহা আছে, সে শুধু নামেই। কোন্ বাল্যকালে সে তাহার পিতামাতাকে হারাইয়াছে, তদবধি যে জ্যেঠাইমা নিঃসন্তানা বন্ধ্যা নারীর অন্তরনিহিত সমস্ত স্নেহের ভাণ্ডার উজাড় করিয়া দিয়া তাহাকে কন্যানির্ব্বিশেষে পালন করিলেন, তিনি লোকান্তরে প্রস্থান করিয়াছিলেন তাহাকে একাকী ফেলিয়া। রহিল শুধু কাকার গোষ্ঠী। কিন্তু তাঁহাদের সহিত কোন কালে জ্যেঠাইমার মুখ দেখাদেখি ছিল না বলিলেও চলে; ফলে, সেও হইয়াছিল তাঁহাদের বিরাগের পাত্র। তবে ইদানীং তাহার দুরবস্থার কথা শুনিয়া যদি তাঁহাদের মন একটু নরম হয়, এই আশায় মনোরমা নিজের দুঃখের কাহিনী বর্ণনা করিয়া কিছুদিন হইল কাকাকে একখানি চিঠি দিয়াছে। আর একখানি চিঠি দিয়াছিল তাহার বড় ভগিনীপতি শৈলেশকে। এই ভগিনীপতিটি কিছুদিন যাবৎ বিপত্নীক। দিদি তাঁহার দুই তিনটি নাবালক শিশু রাখিয়া মারা যান; সেই অবধি বেচারা সেই 'মাওড়া' শিশুকটিকে লইয়া বড় বিপদে পড়িয়াছে। সংসারে তাহার এক বৃদ্ধা মাতা ভিন্ন অপর কোন স্ত্রীলোকও নাই যে, তাহাদের তত্ত্বাবধান করিবে। মনোরমার দিদি ছিলেন তাহার অপেক্ষা বয়সে অনেক বড়। তিনি ও জামাই-বাবু উভয়েই বাল্যাবধি তাহাকে বিশেষ স্নেহ করিতেন। মনোরমার মনে গোপনলালিত একটু ক্ষীণ আশা ছিল, এই অসময়ে তাহাকে হয় ত' জামাইবাবুর প্রয়োজন হইতেও পারে।

তাহার ধারণা নিতান্ত মিথ্যা হয় নাই। দুইখানি চিঠিরই জবাব আসিয়াছে। কাকীমা যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়া অতি প্রাঞ্জল ভাষায় একখানি চিঠি দিয়াছেন—অশেষ সহানুভূতি জানাইয়া ও নানা অমূল্য উপদেশ দিয়া। তাহার দুঃখের কাহিনী শুনিয়া তিনি না কি স্বয়ং বিশেষ ব্যথিতা হইয়াছেন; কিন্তু সে যেন ভগবানের উপর বিশ্বাস রাখিয়া নীরবে সব সহ্য করে; যাঁহাদের আশ্রয়ে আছে, তাঁহাদের মন রাখিয়া যেন চলে, ইত্যাদি। মনোরমা চিঠিখানা বার বার আদ্যোপান্ত পড়িয়া দেখিল, কাকীমা কোথাও ঘুণাক্ষরেও এমন ইঙ্গিত করেন নাই যে, নিতান্ত বাধ্য হইলেও শেষে সে তাঁহার নিকট যেন যায়।

জামাইবাবু যে চিঠিখানি লিখিয়াছেন, সেটি খুব দীর্ঘ নহে, কিন্তু লেখকের আন্তরিকতা ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহার প্রতিটি ছত্রে। তাহাতে উপকারকের মামুলি দাম্ভিক উক্তিও নাই, উপদেশের বাহুল্যও নাই।—সাদা কথা সোজা ভাষায় লেখা। মনোরমা যদি নিজবাটী জ্ঞানে তাঁহার নিকট থাকিয়া তাঁহার মাতৃহীন অপোগণ্ড বোন্‌ঝি-গুলিকে কোলে তুলিয়া লয় ত' তিনি ও তাঁহার মাতা মনোরমার নিকট চিরঋণী থাকিবেন।

কিন্তু যে যাহাই লিখুক, মনোরমা এত কাঁচা মেয়ে নহে যে, সহসা অধৈর্য্য হইয়া নির্ব্বোধের মত নূতন আশ্রয়ের লোভে বর্ত্তমান আশ্রয় ত্যাগ করিবে। শেষে কি কথা-মালার সারমেয়ের মত অধ্রুবের লোভে ধ্রুব ত্যাগ করিয়া নিজের হঠকারিতায় নিজেই ভুগিবে সে? যতক্ষণ পর্য্যন্ত সে বাধ্য না হইবে, নূতন নীড়ের সন্ধানে যাত্রা করিবে না।

কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত তাহাকে সেই যাইতেই হইল। সে দিন তাহার বিস্ময়ের অবধি রহিল না, যখন দেখিল, মাতা ও পুত্রী সহসা তাহার ঘরে আসিয়া প্রবেশ করিলেন ও তাহাকে নানা কুশল-প্রশ্নে অস্থির করিয়া তুলিলেন। ঘটনাটি এতই অভাবনীয় যে, মনোরমা শঙ্কিত হইয়া উঠিল ও অবিলম্বেই বুঝিল, শঙ্কা তাহার মিথ্যা নহে; নিস্তারিণী নিছক আশ্রিতবাৎসল্য দেখাইবার জন্য তাহার স্থূল দেহে এত পরিশ্রম করিয়া সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া উপর হইতে নীচে নামিয়া আসে নাই। কুশল-প্রশ্নের দীর্ঘ ভূমিকা শেষ হইলে, নিস্তারিণী কণ্ঠে মধু ঢালিয়া দিয়া বলিল,—"তাই ভাবলাম যাই, আজ যেন একটু শরীরটে ভাল বোধ হ'ল, দেখে আসি, ছোট বৌ এদ্দিন ধ'রে ভুগছে,—মা'র মুখে ত ত' নিত্যই খবর নেই,—তা' এমন পোড়া শরীর, বারো মাসই একখানা লেগে আছে; তোমার কথা বলছিনে ছোট বৌ, কিন্তু লোকে শুনলে ভাববে, মাগীর সুখের শরীর, আদিখ্যেতা ক'রে রাতদিন শুয়ে থাকে,—"

কন্যার বাক্যস্রোতে বাধা দিয়া মাতা বলিলেন,—"নাও কথা;—লোকে অমনি ভাবলেই হ'ল? কি শরীল কি হয়েছে—"

ইহার পর নিস্তারিণী সহসা মূল বক্তব্যে আসিয়া পড়িল,—"তা তুমিও ত' ভুগলে কম দিন নয়, ছোট বৌ। তোমার ভাসুর ত তোমার জন্মে ভেবেই অস্থির, সে দিন তাই বলছিলেন, ছোট বৌমার যে রকম শরীর, ওঁর ঠাঁইনাড়া হওয়ার বিশেষ দরকার, উনি না হয় দিনকতক ওঁর বাবার কাছে—"

ব্রজসুন্দরী কথার সূত্র ধরিয়া বলিলেন,—"তাই বরং যাও বাছা দিনকতক; আর কি জান, জামাই আমার বড় নাজুক কি না, মুখ ফুটে ত বল্‌তে পারে না, আসল কথা হ'চ্ছে দিন আনে দিন খায় বই ত' নয়,—তোমার কাছে বলতে লজ্জা নেই বাছা, তুমি কিছু পর নও,—ও খরচ আর চালাতে পাচ্ছে না; আর তা' ছাড়া কি জান, শত্তুর মুখে ছাই দিয়ে, পাঁচটি নিয়ে থাকতে হয়,—কি ব্যামো তা'রও ত' কিছু ঠিক নেই—"

মনোরমাকে ইহার অধিক আর বুঝাইয়া বলিবার আবশ্যক ছিল না: যেটুকু বুঝিয়াছিল, তাহাতেই তাহার কণ্ঠ বাষ্পরুদ্ধ হইয়া আসিতেছিল; কত কষ্টে যে সে অশ্রু-রোধ করিয়াছে, সে শুধু সেই জানে। আর নহে, যথেষ্ট হইয়াছে, ইহার পর হয় ত' আরও অপমানিত হইতে হইবে। সে মৃদুকণ্ঠে বলিল,—"বেশ মা, আপনাদের অসুবিধে ক'রে থেকে লাভ নেই, তাই হবে। বনগাঁয়ে আমার ভগ্নীপতির কাছেই আপাততঃ যাব, আমি আজই সেখানে চিঠি লিখে দিচ্ছি, আমাকে নিয়ে যাবার জন্যে।"

ব্রজসুন্দরী একটু খোঁচা দিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলেন না; শ্লেষ করিয়া বলিলেন,—"তা' বই কি বাছা, তোমার থাকবার যায়গার অভাব কি? খালি মা' এক-খানা চিঠি লেখার অপিক্ষে"; বলিয়া মনোরমার অলক্ষ্যে কন্যার দিকে চাহিয়া এক অপরূপ মুখভঙ্গী করিলেন। ইঙ্গিতের অর্থ সুস্পষ্ট;—"ওঃ, অংখারে যেন ছুঁড়ী মট্‌মট্ করছে; বলে ভাঙ্গি ত মচ্‌কাই না। যা না, কোন্ চুলোয় তোর কোন্ কুটুম আছে, তোকে মাথায় ক'রে রাখে একবার দেখি।—তবু যদি গতরে আগুন না লাগত—"

বড় আশা করিয়াই মনোরমা শৈলেশের আশ্রয়ে আসিয়াছিল। শৈলেশের মাতা তাহাকে কন্যার আদরে গ্রহণও করিয়াছিলেন। মনোরমা মনে করিয়াছিল, মাতৃহীন বোনপো-বোনঝিগুলিকে সে সন্তাননির্ব্বিশেষে পালন করিবে,—মাতার অভাব তাহাদের মুহূর্ত্তের জন্যও বোধ করিতে দিবে না। তাহার খোকাও তাহাদের সহিত একত্র হাসিয়া খেলিয়া মানুষ হইবে। শৈলেশের মাতাও

চাহিয়াছিলেন ঠিক্ তাহাই। তিনি মনোরমার সপ্রতিভ ব্যবহারে একবারে মুগ্ধ হইয়া গেলেন। অজস্র আদরে, যত্নে ও পরিচর্য্যায় মনোরমাকে তিনি অল্পদিনেই সুস্থ করিয়া তুলিলেন। শিশুদের প্রতি লক্ষ্য রাখা ভিন্ন সংসারের আর কোন শ্রমসাধ্য কার্য্য তিনি মনোরমাকে করিতে দিবেন না। ভয়,—অতিরিক্ত পরিশ্রম তাহার সহ্য হইবে না। মনোরমা এরূপ অপ্রত্যাশিত আদরে অপ্রস্তুত হয়; সে কথা বুঝিয়া এক দিন তিনি বলিয়াছিলেন,—"আমার কাছে লজ্জা কি, মা? তুমি আমার বৌমার আপন বোন, আপন পেটের মেয়ের মতন।" মনোরমা বেশী কথা কহে নাই। শুধু ধীরে ধীরে বলিয়াছিল,—"জানেন ত' মা আপনি সবই; মায়ের আদর কেমন, তা ত' জানি না; ছোটবেলায় জ্যেঠাইমার আদরে মানুষ, আর বুড়ো বয়সে আবার যে ভগবান্ আপনার—" বলিতে বলিতে সে আর অশ্রুরোধ করিতে পারে নাই।

একটি মাস পূর্ণ হইয়াছে কি না হইয়াছে, ইহারই মধ্যে ছেলে-মেয়েরা মনোরমাকে পাইয়া বসিয়াছে যেন। মাসীমার নিকট না হইলে তাহারা খাইতে চাহে না; মাসীমার কোলের কাছে না শুইলে তাহাদের ঘুম আসে না। তাহাদের খেলার কথা, আনন্দের কথা, তাহাদের সহস্র আব্দার, নালিশ, সমস্তই মাসীমার কাছে। শৈলেশের মা দেখিয়া মুখ টিপিয়া টিপিয়া হাসেন; মনোরমাকে উদ্দেশ করিয়া ও শৈলেশকে উপলক্ষ করিয়া সস্নেহে স্মিতহাস্যে বলেন,—"এই ক' দিনে কি ন্যাওটাই হয়েছে এরা মাসীর; নতুন মাসী পেয়ে কি ও নেমকহারামরা আমাদের ভুলে গেল না কি?" শুনিয়া মনোরমা পুলক ও লজ্জার এক অনমুভূতপূর্ব্ব অনুভূতিতে মৃদু মৃদু হাসিতে থাকে।

মনোরমা বিরলে বসিয়া যখন গোবরডাঙ্গার সেই কদর্য্য প্রতিবেশের সহিত তাহার বর্ত্তমান শান্তিপূর্ণ সুপবিত্র পারিপার্শ্বিকের তুলনা করে, তখন সে অপরিমেয় বিস্ময়ে স্তব্ধ হইয়া শুধু এই কথা কয়টি মনের মধ্যে বার বার আবৃত্তি করে;—"এ শুধু দুঃখিনীর উপর মঙ্গলময় ভগবানের আশীর্ব্বাদ।" কে জানিত, পূর্ব্বের সেই নিদারুণ দুঃসহ দিনগুলির পরে ছিল এই মধুর নিরুদ্বেগ সাংসারিকতা; এ যেন নীরস গদ্যের পর ছন্দোবদ্ধ সাবলীল কবিতা।

জপ, তপ, পূজা, অর্চ্চনায় আজকাল মনোরমার দীর্ঘক্ষণ অতিবাহিত হয়। প্রাত্যহিক আহ্নিকে বসিয়া সে প্রার্থনা করে,—"হে ভগবান্, আমার আর কোন কামনা নেই; শুধু এদের আশ্রয়ে থেকে খোকা যেন আমার মানুষ হয়; তা'কে রেখে যেন আমি যেতে পারি।"

খোকাকে যতই আদর করে, কিছুতেই যেন তাহার পূর্ণ পরিতৃপ্তি হয় না। ব্রজসুন্দরীর সতর্ক প্রহরায় বহুদিন খোকাকে তেমন যত্ন করা হয় নাই; সে শোধ সে এখানে লইবে। খোকাকে সে মুহূর্ত্তের জন্যও চক্ষুর অন্তরাল করিবে না, খোকার চোখে সে অশ্রুর আবির্ভাব হইতে দিবে না। খোকা সহসা যদি কাঁদিয়া উঠে, মনোরমা তাহার আহ্নিক ফেলিয়া ছুটিয়া আসিয়া খোকাকে কোলে তুলিয়া লয়; তাহার সুকোমল গণ্ডে অজস্র গভীর চুম্বন আঁকিয়া দেয়। পরে উদ্দেশে নমস্কার করিয়া বলে,—"ঠাকুর, আমার এ দুর্ব্বলতা, এ অপরাধটুকু ক্ষমা কোরো,—খোকার যেন আমার কোন অমঙ্গল না হয়, ঠাকুর।"

কিন্তু অপত্যস্নেহ ভগবৎপ্রীতিকে অতিক্রম করিলে সে অপরাধ অমার্জ্জনীয়। সে অপরাধের শাস্তি হইতে নিস্তার নাই। মনোরমাকে সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইল তাহার হৃদয়ের নিধি, নয়নের মণি, তাহার স্বামিদেবতার শেষ চিহ্নটুকুকে হারাইয়া। কোথা হইতে কেমন করিয়া যে কি হইয়া গেল, ভাবিলে বিস্ময়ের সীমা থাকে না। দিব্য নির্ম্মল নির্মেঘ আকাশ, সহসা যেন বজ্রপাত হইয়া মনোরমাকে জীবন্ত দগ্ধ করিয়া গেল। বজ্রাহত-বৃক্ষের মত তাহার বাহ্যরূপে বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন নাই, কিন্তু অন্তরে সে হইল সর্ব্বহারা রিক্ত। খোকাকে দুই দিন যদি সে প্রাণ ভরিয়া সেবাও করিতে পাইত! উন্মনা হইয়া মনোরমা চিন্তা-সাগরে ডুবিয়া গেল। হায়! কি লইয়া আর সে বাঁচিয়া থাকিবে?

মনোরমা আর সে মনোরমা নাই। শৈলেশের আশ্রয়ে আসিয়া তাহার মাতার যত্নে ও পর্য্যাপ্ত বিশ্রামলাভে অতি অল্পদিনে মনোরমার নীরোগ শরীরে যে স্বাস্থ্যের লাবণ্য ফুটিয়া উঠিয়াছিল, তাহা অরুণ-কিরণ-স্পৃষ্ট কুয়াসার মতই মিলাইয়া গিয়াছে। যে শোকাগ্নি তাহার অন্তরে অহরহ ধিকিধিকি জ্বলিতেছিল, তাহার তাপে দেখিতে দেখিতে মনোরমার দেহ শীর্ণ কঙ্কালসার হইয়া উঠিল। সে

যেন কেমন একরকম হইয়া গিয়াছে। না আছে তাহার কোন কার্য্যে উৎসাহ, 'না আছে নিজের শরীরের উপর বিন্দুমাত্র মায়া। একটু নিরিবিলি পাইলেই সে মরণাহত খোকার সেই শেষ চাহনিটুকুর কথা স্মরণ করিয়া কাঁদিতে বসে। শৈলেশের মা কখনও জানিতে পারিয়া সান্ত্বনা দান করিতে আসেন, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত তিনি নিজেই অশ্রুসংবরণ করিতে না পারিয়া অন্তরালে অন্তর্দ্ধান করেন।

বিপদের উপর বিপদ; মনোরমা বুঝিতে পারে, যে কারণেই হউক, শৈলেশ ও তাহার মাতা উভয়েরই মুখে কিছুদিন হইতে গভীর দুশ্চিন্তার ছায়া পড়িয়াছে। তবে কি তাহাকেই কেন্দ্র করিয়া মাতা ও পুত্রের মধ্যে মনোমালিন্য হইল? এই ছন্দঃপতনের মূল কি তবে সে-ই? স্বীয় অপরাধের গুরুত্বের উপলব্ধিতে ও সঙ্কোচে মনোরমার সমস্ত অন্তর অস্বস্তিতে ভরিয়া গেল। কিন্তু তাহার কৌতূহলের নিবৃত্তি হইতে বেশী দিন লাগিল না। 'খাকোর মা' গোয়ালিনী বাটীতে দুধ যোগান দিত। মনোরমাকে নিভৃতে পাইয়া সেই এক দিন হাত-মুখ নাড়িয়া সালঙ্কারে ও বেশ একটু পল্লবিত করিয়াই সমস্ত ঘটনাটির আদ্যন্ত বর্ণনা করিল। শুনিয়া মনোরমার মনে হইল, সত্যই যদি এই কলিযুগে তাহার প্রার্থনায় ধরণী দ্বিধা হইতেন, ভিতরে প্রবেশ করিয়া সকল লজ্জার হাত এড়াইত সে। পাড়ার নিষ্কর্ম্মা হৃদয়হীন লোকগুলা পরনিন্দা, পরচর্চ্চা করা ভিন্ন আর কোন কাম কি খুঁজিয়া পায় না? স্বামিপুত্রহীনা নিরাশ্রয়া বিধবা সে, না হয়, স্রোতের মুখে তৃণের মত ভাসিতে ভাসিতে আসিয়াই পড়িয়াছে বিপত্নীক ভগিনীপতির আশ্রয়ে; কিন্তু তাহাই বলিয়া এই জঘন্য মিথ্যা অপবাদ রটাইতে হইবে তাহাদের নামে? এই নীচ লোকগুলা নরনারীর সেই এক আদিম সম্পর্ক ভিন্ন আর কোন পবিত্রতর সম্পর্ক কি কল্পনাও করিতে পারে না?

অপরিসীম দুঃখে, লজ্জায় ও ক্রোধে অভিভূত হইয়া মনোরমা ঘরে গিয়া ভূমিশয্যা আশ্রয় করিল ও স্বামীকে স্মরণ করিয়া উচ্ছ্বসিত আবেগে আকুল অন্তরে রোদন করিয়া অশ্রুর বন্যা বহাইয়া দিল!

ইহার পর আর এখানে থাকা তাহার চলে না; আবার তাহাকে নূতন আশ্রয়ের সন্ধান করিতেই হইবে। কথাটা এক দিন নিজেই পাড়িল;—সে তাহার কাকার নিকটই যাইবে, তা' সে বরাতে তাহার যত দুঃখই থাকুক।

ইচ্ছা সত্বেও শৈলেশের মাতা তাহার এই প্রস্তাবে বাধা দিতে পারিলেন না; শুধু সজল-নয়নে সস্নেহে তাহার মাথায়, গাত্রে হাত বুলাইয়া দিতে লাগিলেন। তাঁহারা উভয়েই উভয়ের ব্যবহারে মুগ্ধ; পরস্পরের সাহচর্য্য তাঁহাদের একান্ত কাম্য। সহজ নিবিড় পরিচয়ের মধ্য দিয়া দুইটি হৃদয়ের মধ্যে যে এই অল্পদিনের মধ্যে কি দুশ্ছেদ্য স্নেহের সম্বন্ধই স্থাপিত হইয়াছিল, সে তাঁহারা আজ এই বিচ্ছেদের পূর্ব্বক্ষণে অন্তর দিয়া উপলব্ধি করিতেছেন। কিন্তু সমাজের রক্ত আঁখিও উপেক্ষণীয় নহে। কুৎসা প্রচারের লোভনীয় সম্ভাব্যতায় সমাজের রসনা উদ্যত হইয়া রহিয়াছে; এমন সুবর্ণ-সুযোগ তাহারা সহজে নষ্ট হইতে দিবে না। দুঃখীর দুঃখানল প্রশমিত করার বিষয়ে সমাজের চেতনা না থাকুক, কিন্তু ইন্ধন যোগাইতে ইহার উৎসাহের সীমা নাই।

শেষ পর্য্যন্ত শৈলেশ মনোরমাকে চুয়াডাঙ্গায় তাহার কাকার নিকট রাখিয়া আসিয়া সমাজকে শান্ত করিল।

মনোরমার কাকীমার 'দয়াবতী' নামকরণ যে করিয়াছিল, তাহার দূরদৃষ্টির প্রশংসা করা সত্যই চলে না। মা'য়ের জাতি যে এত নির্ম্মম নিষ্করুণ হইতে পারে, রমণীর রসনা যে এমন করিয়া হলাহল বর্ষণ করিতে পারে, দয়াবতীর সহিত যাহার না পরিচয়লাভের সৌভাগ্য হইয়াছে, তাহার পক্ষে সে কথা কল্পনা করাও কঠিন। শৈলেশের জননীর কথা ইঁহার সহিত তুলনীয় নহে, কিন্তু ব্রজসুন্দরীরও কটু ভাষণে ইঁহার সহিত সমকক্ষতা করিবার স্পর্দ্ধা হইবে না।

পূর্ব্বে সংবাদ না দিয়া তাঁহার গৃহে পদার্পণ করার জন্য মনোরমার সম্বর্দ্ধনা যথোচিতভাবেই হইয়াছে; শুধু তিনি কৃপাপরবশ হইয়া এই অনুগ্রহটুকু করিয়াছেন, তাহাকে গৃহবহিষ্কৃত করিয়া দেন নাই। কেবল মুখেই বলিয়াছিলেন, —"সাত আবাটা ঘুরে শেষে বুঝি এখানেই মরতে এলি? কোনোখানে বুঝি আর ঠাঁই হ'ল না, তাই?" তাহার পর বিস্মিত দৃষ্টিতে তাহার প্রতি চাহিয়া মুখ বিকৃত করিয়া বলিয়াছিলেন,—"ও মা, কি রূপের ধুচুনিই হয়েছিস্ ‍না? যেন তাওড়াগাছের পেত্নী আর কি?"

মনোরমা বিপন্নভাবে আমতা আমতা করিয়া লজ্জা-জড়িত কণ্ঠে বলিয়াছিল,—"সংসারে আপনার ঝিয়ের দরকার ত' হ'য়ই, কাকীমা,—"

—"আচ্ছা বাছা, সে কথা হবে অখন পরে, এসেই পড়েছিস যখন—"

কাকীমার বাক্যের শেষাংশটুকু আর শ্রুতিগোচর হইল না। মোটের উপর বুঝিতে পারা গেল, মনোরমার কথা তাঁহার মনঃপুত হইয়াছে।

দয়াবতীর স্বামী উমাচরণও মনোরমার আবির্ভাবে বিরক্ত হইলেন, কিন্তু তিনি চাপা প্রকৃতির লোক, মুখে কিছু প্রকাশ করিলেন না। উমাচরণ সংসারের খরচ দিয়াই খালাস; তিনি সারাদিন বাড়ী থাকেন না, পাড়ায় পাড়ায় তাস, দাবা খেলিয়া বেড়ান। বৃহৎ বিস্তৃত জমিদারী নাই, চাকরীও নাই, অথচ সংসার তাঁহার দিব্য নিরুদ্বিগ্ন স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্য দিয়াই চলে। এককালে তিনি কলিকাতার কোন আফিসে মুচ্ছুদ্দির কার্য্য করিতেন, গুজব,—বেশ কিছু মোটা রকম ক্যাশ ভাঙ্গিয়া চাকরীতে ইস্তফা দিয়া বসিয়া আছেন।

মনোরমা সাত-পাঁচ ভাবিয়া স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তাঁহাদের ঝি ছাড়াইয়া দিল। সংসারের কিছু সাশ্রয় না হইলে ইহারা শুধু শুধু এক জনের অন্ন-বস্ত্র যোগাইবে কেন?

দয়াবতীর একটা বিষয়ে খুব নাম-ডাক ছিল,—তাঁহার ন্যায় শুদ্ধাচারিণী গৃহিণী না কি সারা চুয়াডাঙ্গা খুঁজিলেও খুব বেশী দেখিতে পাওয়া যায় না। এই সুনামটুকু তিনি অর্জ্জন করিয়াছিলেন বহু কঠোর সাধনার দ্বারা। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে অন্ততঃ দশ ঘণ্টা পরিধানে তাঁহার মাত্র একখানি গামোছা; সত্য এবং কাল্পনিক অপবিত্রতার সংস্পর্শ হইতে নিজেকে রক্ষা করিবার উৎকট চেষ্টায় তিনি বকের মত ডিঙ্গি মারিয়া চলেন ও দৈনিক অন্ততঃ চারিবার স্নান করেন। সংসারে তুচ্ছতম অনাচারও তিনি সহ্য করিতে পারেন না। মনোরমার উপরও এ বিষয়ে তাঁহার দৃষ্টি অতি তীক্ষ্ণ। মধ্যে মধ্যে কোন অলক্ষ্য স্থান হইতে 'হাঁ, হাঁ' করিয়া ডিঙ্গি মারিয়া ছুটিয়া আসেন; ঘৃণায় মুখ সিঁটকাইয়া বলেন,—"মা গো মা, জাতধম্ম আর রাখলে না দেখছি এরা,—সাতকাল গিয়ে এককালে ঠেকে, শেষে কি—"

মনোরমার মুখের উপর হাত নাড়িয়া বলেন,—"ওলো থাম্ লো, থাম্ ছুঁড়ী, তুই আর আমায় শাস্তোর ব্যাখ্যানা করতে আসিস্ নি।—সক্ড়ির জল্ লাগে নি ছিটে—বললেই অমনি আমি শুনব? কেন, চোখের মাথা কি আমি খেয়েছি—" বলিতে বলিতে তাঁহার কাংস্যকণ্ঠ সপ্তমে উঠিতে থাকে। মনোরমা নীরবে সকল তিরস্কার সহ্য করে, কখন ক্ষীণতম প্রতিবাদও করে না।

এ সকল দুঃখও হয় ত' অসহ নহে, কিন্তু এখানে আর এক নূতন উপদ্রবের উপক্রমে মনোরমা শঙ্কিত হইয়া উঠিল। দয়াবতীর এক নিষ্কর্ম্মা ভ্রাতা দিদির আশ্রয়ে থাকিয়া ফাইফরমাস খাটিত, বাজার করিত ও অবশিষ্ট সময় পাড়ায় পাড়ায় শিষ দিয়া গান গাহিয়া ও আরও অনেক কিছু করিয়া বেড়াইত। আশঙ্কার কথা এই যে, ইদানীং সে মনোরমাকে একটু বিশেষ নজরে দেখিতে আরম্ভ করিয়াছে। একটু নিভৃতে পাইলেই গজেন মনোরমাকে শুনাইয়া রসিকতা করিয়া যাত্রার গান ধরে। কিছুদিন হইতে বিশেষ পরিচিত জনের মত তাহার নাম ধরিয়া ডাকিতেও সুরু করিয়াছে; নানা অছিলা করিয়া সময়ে অসময়ে কেবল তাহাকে ডাকাডাকি করে; না আসিলে লাল লাল দাঁত বাহির করিয়া হাসিতে হাসিতে বলে,—"আচ্ছা দিদি, তোমার ওই মনোরমা না কি, ও ডাকাডাকি করলে আসে না কেন বল ত'? তখন থেকে তেষ্টার জল চাইছি—মানে,আমি কি বাঘ না ভাল্লুক যে গপ ক'রে গিলে ফেলব?" বলিয়া নিজের রসিকতাতে নিজেই হি হি করিয়া হাসিতে থাকে। রন্ধনরতা মনোরমা শুনিতে পায়, দয়াবতী বলিতেছেন,—"জানিনি বাপু, নষ্টচরিত্তের মেয়েদের রীতই অমনি ছিনেলী করা; তবু রূপ ত' ওই পোড়া কাঠ।" বলিয়া তাঁহার বাঁখারির মত ঋজু, কৃশ ও লম্বা দেহযষ্টি বহু কষ্টে আনত করিয়া নিজেই তাহাকে কলসী হইতে জল গড়াইয়া দেন। মনোরমা রাঁধিতে রাঁধিতে অন্যমনে ডালে দুইবার লবণ দিয়া ফেলে ও তজ্জন্য পরে তাহাকে অশ্রাব্য কুকথা শুনিতে হয়।

সে দিন বাবাঠাকুরের তলায় নফর হাজরার যাত্রা হইবে;—বারোয়ারী, যাত্রা বেহুলার পালা। পল্লীর স্ত্রী, পুরুষ, ছেলে, বুড়া কাহারও আনন্দের সীমা নাই। গজু ওরফে গজেন সকাল হইতে দয়াবতীকে যে কতবার

কণ্ঠরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছে,—"জানলে কি না দিদি, যে লোকটা বেহুলা সাজে, মানে তার নাম হ'চ্ছে বিশে মুচি,—মানে মস্ত নামডাক তার,—লখিন্দরের জন্তে হাপুস্ চোখে কি কাঁদাটাই কাঁদে,—মানে বিশ্বাস না হয়, যে কোন লোককে—"

যাত্রা আরম্ভ বেলা বারোটায়, সন্ধ্যার পূর্ব্বেই ভাঙ্গিয়া যাইবে।

মনোরমা প্রত্যুষ হইতেই বাসন-কোসন মাজিয়া শেষ করিয়া হেঁসেলে ঢুকিয়াছে ; রন্ধনে বিলম্ব হইলে, আজ আর তাহার অপরাধের ক্ষমা নাই।

আহারাদির পর পরিপাটীরূপে সাজসজ্জা করিয়া পাণ চিবাইতে চিবাইতে দয়াবতী মনোরমাকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন,—"আমরা তা'লে চল্লাম, বাছা ; গজু বলছে, সন্ধ্যের আগে আর যাত্রা ভাঙ্গবে না ; তা' তুই ততক্ষণ সংসারের কাযকর্ম্ম সেরে যেটুকু ফুরসুৎ পাবি, বরং একটু গড়িয়ে নিস :" বলিয়া তিনি গজেনের সহিত চলিয়া যাইতেছিলেন, আর একবার দ্বারপ্রান্ত হইতেই হাঁক দিয়া বলিলেন,—"ওলো মনো, দেখিস্, তাই ব'লে ঘুমিয়ে যেন আবার ম'রে থাকিস্ নি, তোর যা কুম্ভকর্ণের ঘুম বাবা! দরজাটা বন্ধ ক'রে দিয়ে যা,—আর হাঁা, ওবেলার রান্নাবান্না সব একটু বেলাবেলি সেরে রাখিস—আমরা যা ক্লান্ত হয়ে আসব, এসে আর দাঁড়াতে পারব না কিন্তু, তুই আবার যা কুঁড়ের বাদশা, তাই জন্তেই বলা,—"

হেঁসেল তুলিয়া, অন্যান্য সকল কায সারিয়া মনোরমা যখন দালানের এক কোণে তাহার শতছিন্ন মলিন শয্যাখানি পাতিয়া তাহার পরিশ্রান্ত শরীরটাকে এলাইয়া দিল, তখন বেলা দ্বিপ্রহর। এত ক্লান্তিতেও কিন্তু তাহার চোখে আজ ঘুম নাই। অতীতের বিস্মৃতপ্রায় যত কথা আজ তাহার অবচেতনার তল হইতে ভাসিয়া উঠিয়া মনে ভিড় জমাইয়া তুলিতেছিল। তাহার জীবন ইতিহাসের প্রতিটি পৃষ্ঠা কেবল নিরবচ্ছিন্ন দুঃখ ও বেদনার কাহিনীতেই পূর্ণ হইয়া চলিয়াছে—আশৈশব মাতৃপিতৃহীন সে, দেবতার মত স্বামী যদি বা লাভ করিল, কয় দিনের জন্যই বা? দেবশিশুর মত অমন যে তাহার খোকা, অমন যে দুর্লভ ঐশ্বর্য্য, তাহাকেও সে দুর্ব্বলহস্তে ধরিয়া রাখিতে পারিল না।—রহিল শুধু তাহাদের স্মৃতি, আর রহিল সে—কোন্ অজ্ঞাত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে কে জানে?……সংসারের আবর্ত্তে সে আবর্ত্তিত হইয়াই চলিয়াছে, নিরুপায় নিঃসহায়। কত গঞ্জনা, কত কুবাক্য, কত অপমানই সে লাভ করিল এই নিষ্করুণ পৃথিবীর নিকট হইতে।

চিন্তাচ্ছন্ন অবস্থায় মনোরমা অবশেষে কখন্ নিদ্রার ক্রোড়ে ঢলিয়া পড়িয়াছিল, স্মরণ নাই। ঘুম ভাঙ্গিল সদর-দরজায় কড়া নাড়ার শব্দে। কে কতক্ষণ ধরিয়া শব্দ করিতেছে, কে জানে? মনোরমা চক্ষু মেলিয়া দেখিল, সূর্য্য অস্তগত,—মধ্যাহ্ন গড়াইয়া অপরাহ্নে পড়িয়াছে। ক্ষিপ্রহস্তে বস্ত্র সুসংবৃত করিয়া সে উঠিয়া দাঁড়াইল ও দরজা খোলা উচিত হইবে কি না ভাবিতে লাগিল। কিন্তু গজেন ততক্ষণে তাহার নাম ধরিয়া ডাকিতে সুরু করিয়াছে। ইহারই মধ্যে সব ফিরিয়া আসিল না কি? সংসারের কায এখনও সবই ত তাহার বাকী? কি জবাবদিহী করিবে সে কাকীমার কাছে?

কিন্তু না, দরজা খুলিয়া দেখিল, সকলে নহে, কেবল গজেন একা। এ সময়ে এ অবস্থায় তাহাকে একাকী দেখিয়া ত্রাসে মনোরমার বুক কাঁপিয়া উঠিল। মাথার উপর অবগুণ্ঠন একটু টানিয়া দিয়া সে দরজার পার্শ্বে সরিয়া গেল। গজেন ভিতরে প্রবেশ করিয়া দরজাটি বন্ধ করিল ও একগাল হাসিয়া বলিল,—"শরীরটা বড় খারাপ মনে হ'স, মনোরমা। তাই চ'লে এলাম তোমার কাছে—যাত্রা ভাঙ্গলে জামাইবাবু নিয়ে আসবেখন দিদিকে।"

মনোরমা কোন কথা কহিল না ; পাথরের মত নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। শুধু একবার অপাঙ্গে চাহিয়া দেখিল, তাহার মুখে অসুস্থতার গ্লানির চিহ্নমাত্র নাই, বরং হিংস্র লোলুপতার কদর্য্যতায় তাহার মুখখানা বিশ্রী হইয়া উঠিয়াছে।

গজেন আদরে সোহাগে যেন বিগলিত হইয়া, বোধ করি, যাত্রায় সদ্য দেখা নায়কের কণ্ঠস্বরের অনুকরণ করিয়া বলিল,—"মনোরমা, এস না আমার ঘরে, আমার মাথাটা একটু টিপে দেবে,—ওদের আসতে এখনও অনেক দেরী আছে।"

মনোরমা প্রস্তরমূর্ত্তির মত নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল।

উমাচরণদের পুষ্করিণীর চারিধার জঙ্গল-সমাচ্ছন্ন। বড় বড় আমগাছ, কাঁটালগাছ, জামগাছ প্রভৃতি ত'

আছেই, তাহার উপর বাবলা, জীওল, শিশু, নাটাকাঁটা, আলকুশী, আশশ্যাওড়া প্রভৃতি ছোট বড় বন্য বৃক্ষেরও অভাব নাই। বাটী হইতে পুষ্করিণীর ঘাট অবধি একটি সরু পায়ে চলা পথ,—যেন বিধবা নারীর সীমন্ত-রেখা।

পুষ্করিণীতে একবুক জলে দাঁড়াইয়া মনোরমা,—চিন্তা ও উৎকণ্ঠায় মুখখানি তাহার পাংশু, বিবর্ণ। এতক্ষণ অবিচ্ছিন্ন মনোযোগ সহকারে সে প্রতিটি মুহূর্ত্ত গণনা করিয়াছে। আর কত কাল সে এইভাবে আবক্ষ জলে দাঁড়াইয়া থাকিবে? গজেনকে সে অনেক কষ্টে মিথ্যা প্রবোধ দিয়া বুঝাইয়া আসিয়াছে,—গা ধুইয়া কাপড় কাচিয়া সে এখনই আসিবে, গজেন যেন অধীর না হয়। মনোরমার মনে একটু ক্ষীণ আশা ছিল, ইতিমধ্যেই কাকীমারা হয় ত' আসিয়া পড়িবেন। কিন্তু আর এই অন্ধকারের মধ্যে থাকাও নিরাপদ নহে। গৃহে ফিরিয়া অপর কোন কৌশল উদ্ভাবন করিতে হইবে।

মনোরমা বিমনা হইয়া পা টিপিয়া টিপিয়া ক্ষীণ পথ-রেখা ধরিয়া চলিল। কিন্তু বেশী দূর তাহাকে যাইতে হইল না। মাত্র কয়েক পদ অগ্রসর হইয়াছে, এমন সময়ে সহসা পলকে এক অচিন্তিতপূর্ব্ব ব্যাপার ঘটিয়া গেল,—পশ্চাৎ হইতে লুঙ্গিপরিহিত কে একটা দুবমণ আকৃতির লোক বজ্রমুষ্টিতে তাহার মুখ চাপিয়া ধরিল ও চার-পাঁচ জোড়া সবল হস্ত তাহাকে তুলিয়া লইয়া বনের মধ্যে অদৃশ্য হইয়া গেল। মনোরমা একবার শুধু প্রাণপণে আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল, কিন্তু সে কাতরধ্বনি গজেনের কর্ণগোচর হইল না। সে তখন সাগ্রহ প্রতীক্ষায় মনোরমার পথ চাহিয়া আছে।

গজেন এ সকল ব্যাপারে জড়িত হইতে নারাজ; কে জানে, শেষে যদি কোন হাঙ্গামা বাধে? সে অনেক বুদ্ধি করিয়া বলিয়াছে, বাড়ী ফিরিয়া সে মনোরমাকে দেখিতে পায় নাই, সদর দরজা খোলাই পড়িয়াছিল, ইত্যাদি। নিতান্ত নিয়ম-রক্ষার জন্য উমাচরণ হ্যারিকেন হস্তে গজেনকে লইয়া একবার পুকুরপাড়টা দেখিয়া আসিয়া কর্ত্তব্য সমাধা করিলেন।

সুতরাং ইহার পর এ সিদ্ধান্তটুকু খুব সহজেই হইয়া গেল যে, মনোরমা গৃহত্যাগ করিয়া পাপের পথে পা বাড়াইয়াছে। সে রাত্রিটা আর বিশেষ কোন গোলমাল করা হইল না। মনোরমার উদ্দেশে কটূক্তি ও অভিশাপ বর্ষণ করিতে করিতে অনাহারেই সকলে শয্যা গ্রহণ করিলেন।

পরদিন এমন চাঞ্চল্যকর ঘটনার কথা দেখিতে দেখিতে গ্রামে গ্রামে প্রচার হইয়া গেল। নবীন ভট্চায, নকুড় সান্ন্যাল, ভৈরব চকোত্তি প্রমুখ গ্রাম্য-মাতব্বররা চণ্ডী-মণ্ডপে সমবেত হইয়া সিদ্ধান্ত করিলেন, সে কুলত্যাগিনী কুলটা নারী সমাজচ্যুতা ত' হইয়াছেই; যদি অবিলম্বে সে নিজের ভ্রম বুঝিয়া ফিরিয়াও আসে, তা' সে যত অনুতপ্তই হউক, তাহাকে উত্তমরূপে বুঝাইয়া দিতে হইবে যে, সনাতন হিন্দুধর্ম্মে আর যত অনাচারই অনুষ্ঠিত হউক, অসতী নারীকে হিন্দু আবহমানকাল হইতে প্রত্যাখ্যান করিয়া আসিয়াছে। মনোরমা যদি কখনও উমাচরণের "চৌকাঠ মাড়ায়", তাহা হইলে উমাচরণকে পর্য্যন্ত ধোপা-নাপিত বন্ধ করিয়া একঘরে করা হইবে।

দয়াবতী সমস্ত শুনিয়া বলিলেন,—"জানি আমি গোড়া হ'তেই, ও কখনও ঘরে থাকে? এই সমথ বয়স, কিন্তু বাপ রে, কি ঠাট্ঠমক্, যেন বাজারের বেউশ্যে,—ছি, ছি, ছি, কি ঘেন্না, আমাদের মুখ শুদ্ধু ডোবালে গা? মুখে আগুন অমন মেয়ের…"

উমাচরণ বলিলেন,—"বনগাঁয়ে শৈলেশের সঙ্গে ওর কীর্ত্তির কথা ত' আর সব শোনো নি? বলি বলি ক'রে তোমায় বলাও হয়নি। আমি শুনলাম এই সে দিন—দেশে টি টি প'ড়ে গেছে, কলঙ্কে কাণ পাতার জো নেই; শেষে সকলে মিলে দূর ক'রে দিয়েছে।"

তিন দিন পরের কথা।—

ব্রাহ্মমুহূর্ত্ত। পূর্ব্বাকাশে নবারুণজ্যোতি তখনও অপ্রকাশ। পক্ষিকুল কুলায় ত্যাগ করে নাই। গভীর অন্ধকারমাত্র ঈষৎ তারল্য লাভ করিতে সুরু করিয়াছে। উমাচরণ ও দয়াবতী তখনও গভীর নিদ্রায় অভিভূত।

খিড়কির দরজায় দ্রুত করাঘাতের শব্দে দয়াবতীর নিদ্রায় ব্যাঘাত ঘটিল।—এরূপ অসময়ে কে?—দয়াবতী ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিলেন।

—"ওগো, শুনছ, ওঠ না একবার, দেখ না কে দরজা ঠেলাঠেলি করছে।"

ঘুম ভাঙ্গিলে উমাচরণও কাণ পাতিয়া শুনিলেন ;—হাঁ, সত্যই বটে ; কে যেন আকুল আগ্রহে চঞ্চল হস্তে অতি দ্রুত শব্দ করিতেছে।—চোর ?—না, তাহা হইলে, সে শব্দে এত আকুলতা, এত শঙ্কা প্রকাশ পাইবে কেন ?—তবু সাবধানের মার নাই ;—

উমাচরণ পার্শ্বের ঘর হইতে গজেনকে ঠেলিয়া তুলিলেন ; দুই জনে দু'গাছি মোটা লাঠি লইলেন হাতে, দয়াবতী ভয়ে ভয়ে সঙ্গে চলিলেন—লণ্ঠন হস্তে আলো দেখাইয়া।

কে ?—

সর্ব্বনাশ ! মনোরমা ?

দয়াবতী লণ্ঠন আগাইয়া ধরিলেন।—হাঁ, মনোরমাই বটে। কিন্তু এ কি চেহারা তাহার ?

সকলে সহসা ভয়ে পিছাইয়া আসিলেন। দীর্ঘ, রুক্ষ, আলুলায়িত কেশরাশি অবিন্যস্ত ও বিপর্য্যস্তভাবে মুখের উপর আসিয়া পড়িয়াছে। ক্লান্তি ও গভীর অবসাদে সে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। দাঁড়াইবার তাহার ক্ষমতা নাই ; তাই অতি কাতরভাবে দেওয়ালে হেলান দিয়া সে কোন প্রকারে শরীরটাকে সোজা রাখিয়াছে। স্ফীত চক্ষু দুইটা জবাফুলের মত রাঙ্গা, ও সেই চক্ষুনিঃসৃত অজস্র অশ্রুর ধারাচিহ্নে মুখখানি তাহার নিষ্প্রভ, ম্লান। সর্ব্বাঙ্গ তাহার ক্ষত-বিক্ষত ; শোণিতরঞ্জিত কাপড়খানা এমন ছিঁড়িয়া গিয়াছে যে, তাহাতে লজ্জা রক্ষা হওয়া কঠিন।

ভীতির প্রথম ভাবটা কাটিলে, মনোরমার প্রতি একটা কঠোর ঘৃণাব্যঞ্জক দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া তীব্র কণ্ঠে দয়াবতী বলিলেন,—"কে লা, আবার ঢলানি করতে এলি ? ও কালামুখ দেখাতে লজ্জা হোলো না ?—সকালবেলা তোর মুখ দেখলাম, জানি না বরাতে—"

অশ্রুমুখী মনোরমা সভয়ে পুষ্করিণীর পশ্চিমদিকে লক্ষ্য করিতেছিল ; দৃষ্টি তাহার ব্যথিত, শঙ্কা-চঞ্চল ; যেন কোন দুর্ব্বৃত্ত তাহার পশ্চাদ্ধাবন করিতেছে, এখনই কেশাকর্ষণ পূর্ব্বক লইয়া যাইবে। সে নিরুপায় হইয়া উমাচরণের দিকে তাহার করুণ ও কুণ্ঠিত আঁখি দুইটি তুলিয়া অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে কি যেন বলিতে যাইতেছিল, দয়াবতী বাধা দিয়া উচ্চকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন,—"স'রে যা, স'রে যা ; আ মর্ ছুঁড়ী, ছুঁবি নাকি সকালবেলা ; যে নাগরের সঙ্গে—"

মনোরমার মুখখানা ছাইএর মত সাদা হইয়া গেল। তথাপি সে সাহস সহকারে পশ্চাতে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া কম্পিত কণ্ঠে বলিল,—"ওরা ধ'রে নিয়ে—"বলিতে বলিতেই তাহার দুই চক্ষু দিয়া ঝর-ঝর করিয়া অশ্রু গড়াইয়া পড়িল।

দয়াবতী তীব্র ভ্রূভঙ্গী করিয়া শ্লেষপূর্ণ কণ্ঠে বলিলেন,—"তবে আর কি ? কেতাথ হ'লাম ; তাদেরই কাছে রইলে না কেন ? বেশ আদর-যত্নে—"

গজেন এ পর্য্যন্ত দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া সানন্দ কৌতূহলে নীরবে কৌতুক দেখিতেছিল। দয়াবতীর কথা বলার সরস ভঙ্গী দেখিয়া সে তাহার আকর্ণবিস্তৃত লাল লাল দাঁত বাহির করিয়া হি হি করিয়া হাসিতে লাগিল।

নিঃসহায় বিষণ্ণ দৃষ্টিতে উমাচরণের প্রতি মুখ তুলিয়া চাহিতেই উমাচরণ গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন,—"সাত যায়গায় লোক হাসিয়ে শেষে এসেছ আমার সর্ব্বনাশ করতে, মুখে চুণ-কালি দিতে ? বটে ?—আমার লোকলজ্জা নেই ? ভদ্দর সমাজের মধ্যে আমার বাস করতে হয় না ?—বেরো, বেরো হারামজাদী, দিনের আলো ফোটবার আগে—"

মনোরমা নিরাশ-কাতর কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল,—"কোথায় যাব ব'লে দিন, কাকা। আমার নড়বার ক্ষমতা নেই যে—"

উমাচরণ স্থিরগম্ভীর স্বরে শুধু বলিলেন,—"যে চুলোয় এ ক'দিন ছিলে"—বলিয়াই তাঁহারা আর সেখানে বৃথা না দাঁড়াইয়া ভিতরে প্রবেশ করিলেন। গজেন সশব্দে দরজা বন্ধ করিয়া দিল।

মনোরমার দৃষ্টিতে গভীর অন্ধকার নামিয়া আসিল। কে যেন সবলে তাহার কণ্ঠ চাপিয়া ধরিয়াছে। সমস্ত শরীর ঝিম্ ঝিম্ করিতেছে।

অবসন্ন দেহে বিমূঢ়ের মত মনোরমা সেখানেই বসিয়া পড়িল। অন্তহীন নৈরাশ্যে বিহ্বল ও আত্মবিস্মৃত হইয়া, স্থানকাল ভুলিয়া সে প্রাণ ভরিয়া কাঁদিতে লাগিল ; তাহার হৃদয়ের সকল জ্বালা, যন্ত্রণা, বেদনা ও অভিযোগ অশ্রুতে রূপান্তরিত হইয়া স্থানটিকে সিক্ত করিল। তাহার পর ধীরে ধীরে অতি কষ্টে উঠিয়া মাতালের মত টলিতে টলিতে বনান্তরালে কোথায় অদৃশ্য হইয়া গেল।

পূর্ব্বাকাশে শুকতারা তখনও জাগিয়া আছে।

শ্রীশরদিন্দু চট্টোপাধ্যায়।

বৈষ্ণব-মতবিবেক

১১
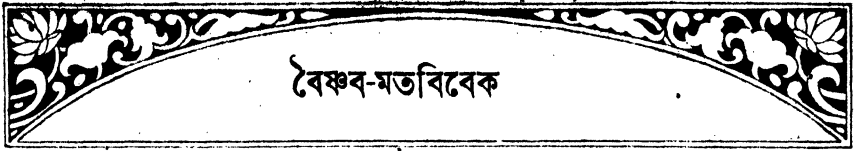
শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়—শ্রীমদীশ্বরপুরী

প্রেমাবতার শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব যাঁহার নিকট ইষ্টমন্ত্র দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহার নাম শ্রীমদীশ্বরপুরী। ইনি শ্রীমাধবেন্দ্র-পুরীর শিষ্য। ইঁহার পূর্ব্বনাম কি ছিল, তাহা জানিতে পারা যায় না। তবে প্রেমবিলাস নামক একখানি বৈষ্ণব গ্রন্থে দেখা যায় যে, রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণকুলে কুমারহট্টে শ্যামসুন্দর আচার্য্যের পুত্ররূপে ঈশ্বরপুরী আবির্ভূত হইয়াছিলেন।* শ্রীচৈতন্যভাগবতে দেখা যায় যে, মহাপ্রভু নিজেই কুমারহট্ট যে শ্রীমদীশ্বরপুরীর জন্মস্থান, তাহা স্বীকার করিয়া কুমারহট্টে আগমন করিয়া তাঁহার গুরুদেবের অপ্রকটকালে তাঁহার জন্মস্থানের মৃত্তিকা নিজ বহির্ব্বাসে বান্ধিয়া লন। যথা—

> প্রভু বোলে কুমারহট্টেরে নমস্কার।
> শ্রীঈশ্বরপুরীর যে গ্রামে অবতার॥
> কাঁদিলেন বিস্তর চৈতন্য সেই স্থানে।
> আর শব্দ কিছু নাই ঈশ্বরপুরী বিনে॥
> সে স্থানের মৃত্তিকা আপনি প্রভু তুলি।
> লইলেন বহির্ব্বাসে বান্ধি এক ঝুলি॥
> প্রভু বোলে ঈশ্বরপুরীর জন্মস্থান।
> এ মৃত্তিকা আমার জীবন ধন প্রাণ॥
>
> —শ্রীচৈতন্যভাগবত আদিখণ্ড। ১৫শ অধ্যায়।

অতএব কুমারহট্ট যে শ্রীমদীশ্বরপুরীর জন্মস্থান, সে সম্বন্ধে সন্দেহ নাই। কিছুদিন পূর্ব্বে এই কুমারহট্টে, শ্রীমদীশ্বরপুরীর জন্মভিটারও সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। তখন কুমারহট্টে বহু ভদ্র ব্রাহ্মণ কায়স্থ বৈদ্যের বসতি ছিল।

শ্রীমদীশ্বরপুরী রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ ছিলেন কি না, তৎসম্বন্ধে একমাত্র প্রেমবিলাসের সাক্ষ্য বর্ত্তমান। কিন্তু তিনি যে ব্রাহ্মণ ছিলেন, সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই। কারণ, দশনামী সন্ন্যাসীদিগের মধ্যে তৎকালে ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য কাহারও সন্ন্যাস দীক্ষা গ্রহণের অধিকার ছিল না, এবং উহাই শ্রীমদাচার্য্য শঙ্করের প্রবর্ত্তিত বিধি। এখনও নিষ্ঠাবান্ দশনামী সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ে ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্য শিষ্যকে সন্ন্যাসদীক্ষা দেওয়ার রীতি নাই। প্রেমবিলাস বলিতেছেন যে, ঈশ্বর-পুরী পূর্ব্বাশ্রমে রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ ছিলেন এবং তিনি বেদবেদান্তাদি শাস্ত্রে কৃতিত্ব লাভ করিয়া সন্ন্যাস আশ্রম অবলম্বন করেন। তিনি যে এক জন বিশিষ্ট পণ্ডিত ছিলেন, সে সম্বন্ধেও সন্দেহের কোনও অবকাশ নাই। কারণ, শ্রীমদীশ্বরপুরী শ্রীচৈতন্যদেবের সন্ন্যাস গ্রহণের পূর্ব্বে একবার নবদ্বীপে আগমন করেন। তিনি প্রথমে নবদ্বীপে আগমন করিয়া শ্রীমদদ্বৈতাচার্য্যের ভবনে গমন করেন। ঐ সময়ে তিনি "কৃষ্ণ-লীলামৃত" নামক একখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, তিনি শ্রীল গদাধর পণ্ডিতকে ঐ গ্রন্থ পাঠ করান। অবশেষে শ্রীচৈতন্যদেবের সহিত পরিচয় হইলেও তিনি তাঁহাকে ঐ গ্রন্থখানি দেখিতে দেন। ঐ গ্রন্থখানি বোধ হয় এখন আর পাওয়া যায় না, তবে কেহ কেহ বলেন, ঐ গ্রন্থের পুঁথি উড়িষ্যার কোনও কোনও স্থানে আছে। কিন্তু উহা এ পর্য্যন্ত মুদ্রিত হয় নাই। আমরা শ্রীল রূপগোস্বামীর সঙ্কলিত শ্রীপদ্যাবলী নামক গ্রন্থে শ্রীমদীশ্বরপুরীর তিনটি শ্লোক পাইয়াছি। ঐ শ্লোক কয়েকটি উক্ত কৃষ্ণলীলামৃত গ্রন্থের শ্লোকও হইতে পারে, বা স্বতন্ত্রভাবে রচিত শ্লোক হইতে পারে। কিন্তু ঐ শ্লোক কয়েক-টিতে শ্রীবৃন্দাবনলীলার পবিত্রতম রসমাধুর্য্য ও শ্রীশ্রীযুগল ভজন-নিষ্ঠা অতি সুন্দররূপে প্রকাশিত হইয়াছে। শ্লোক কয়টি পাঠ করিলে শ্রীল ঈশ্বরপুরী যে বেদবেদান্ত, সাংখ্য ও যোগশাস্ত্রেও অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন, সে সম্বন্ধে আর সন্দেহ থাকে না। প্রথম শ্লোকটি এই :—

> যোগশ্রুত্যুপপত্তি-নির্জ্জন-বন-ধ্যানাধ্বসংভাবিতাঃ
> স্বারাজ্যং প্রতিপদ্য নির্ভয়মমী মুক্তা ভবন্তু দ্বিজাঃ।
> অস্মাকন্তু কদম্ব-কুঞ্জ-কুহর-প্রোন্মীলদিন্দীবর-
> শ্রেণী-শ্যামলধাম নাম যুষতাং জন্মাস্তু লক্ষাবধি॥

অর্থাৎ "যে সকল দ্বিজ অষ্টাঙ্গযোগ, বেদ ও বেদান্ত আলোচনা, নির্জ্জনবনে ধ্যান অথবা তীর্থপর্য্যটনাদিতে সম্যক্‌রূপে নিশ্চিন্ত হইয়া স্বরাজ্য লাভ করিয়া অর্থাৎ ব্রহ্মসাক্ষাৎকার করিয়া যদি নির্ভয়ে মুক্ত হইতে পারেন, তবে হউন, তাহাতে আমাদের আপত্তি নাই; কিন্তু আমরা কদম্বকুঞ্জসমীপে প্রকৃষ্টরূপে প্রস্ফুটিত ইন্দীবর-শ্রেণীতুল্য শ্যামসুন্দরের নামের সেবক—ঐরূপ অবস্থায় আমাদের যদি অসংখ্য জন্মও হয়, হউক, তাহাতে আমাদের আপত্তি নাই।" এই নিষ্ঠা বিদ্যাপতির একটি আত্মনিবেদনের পদে, রাজা কুলশেখরের মুকুন্দ-মালার একটি শ্লোকে ও শ্রীভাগবতে প্রহ্লাদের উক্তিতে ব্যক্ত হইয়াছে; কিন্তু তাহাতে বেদান্ত-যোগাদির অপেক্ষাও যে ভক্তি আদরণীয়া, এই ভাবটি ব্যক্ত হয় নাই। এই ভাবটি শ্রীল ঈশ্বর-পুরীর আর একটি শ্লোকেও প্রকাশিত হইয়াছে—

> ধন্যানাং হৃদি ভাসতাং গিরিবরপ্রত্যগ্রকুঞ্জৌকসাং
> সত্যানন্দরসং বিকারবিভবব্যাবর্ত্তমন্তর্ম্মহঃ।
> অস্মাকং কিল বল্লবীরতিরসো বৃন্দাটবীলালসো
> গোপঃ কোঽপি মহেন্দ্রনীলরুচিরশ্চিত্তে মুহুঃ ক্রীড়তু॥

* প্রেমবিলাস গ্রন্থ খুব প্রামাণিক বলিয়া অনেকে মনে করেন না; বিশেষতঃ প্রেমবিলাসকার কিঞ্চিৎ পরেই লিখিয়াছেন যে, কেশব ভারতী ও ঈশ্বরপুরী উভয়েই মাধবেন্দ্রপুরীর নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। পুরীর নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করিলে তাঁহার উপাধি বা যোগপট্ট "ভারতী" হইতে পারে না—ইহা দশনামী সন্ন্যাসীদিগের প্রাচীন রীতি।

অর্থাৎ শ্রীশৈলাদির বিশুদ্ধ কুঞ্জেও যাহারা ধ্যানপরায়ণ হইয়া নির্জ্জনে বাস করিতেছে, সেই সৌভাগ্যবান্ পুরুষগণের হৃদয়ে বিকার-বিভবরহিত অন্তরের মহচ্চৎসবস্বরূপে নিত্য সুখরূপে ব্রহ্মানন্দ হউক, কিন্তু আমরা তাহা চাহি না, শ্রীবৃন্দাবনবিলাসী গোপীগণের একমাত্র প্রেমাস্পদ ইন্দ্রনীলকান্তিশালী কোনও গোপ নিরন্তর ক্রীড়া করিতে থাকুন।

শ্রীমদীশ্বরপুরীর আর একটি শ্লোক এই—

নৃত্যন্ বায়ুবিঘূর্ণিতৈঃ স্ববিটপৈর্গায়ন্নলীনাং রুতৈ-
র্মুঞ্চন্নশ্রুমরন্দবিন্দুভিরলং রোমাঞ্চবানঙ্কুরৈঃ।
মাকন্দোঽপি মুকুন্দ মূর্চ্ছতি তব স্মৃত্যাদ্য বৃন্দাবনে
ব্রূহি প্রাণসমান চেতসি কথং নামাপি নায়াতি তে॥

অর্থাৎ হে মুকুন্দ! এই শ্রীবৃন্দাবনে কে না তোমাকে ভালবাসে? তোমাকে স্মরণ করিয়া বায়ুবিঘূর্ণিত নিজ শাখার দ্বারা নাচিতে নাচিতে, ভ্রমরগুঞ্জনরূপ সুকরুণ ধ্বনির দ্বারা তোমার গুণ গাহিতে গাহিতে, মকরন্দবিন্দুরূপ অশ্রু মোচন করিতে করিতে এবং অঙ্কুর উদ্গমের ছলে রোমাঞ্চিত হইতে হইতে প্রেম-মূর্চ্ছা প্রাপ্ত হইতেছে, কিন্তু হে আমার প্রাণসমান প্রিয়তম! বল দেখি, আমার চিত্তে তোমার নামটিও কেন উদিত হইতেছে না?

শ্রীমদীশ্বরপুরী মাধবেন্দ্রপুরী গোস্বামীর নিকট সন্ন্যাস দীক্ষা গ্রহণ করিয়া ভারতবর্ষের সমস্ত তীর্থ ভ্রমণ করেন। মাধবেন্দ্রের তিরোভাবের কিছু পূর্ব্বে তিনি রেমুণায় আগমন করিয়া গুরুদেবের সেবায় নিযুক্ত হন। তিনি পরম প্রেমিক শ্রীমাধবেন্দ্রের হৃদয়ের ভাবের অনুসরণ করিয়া সর্ব্বদা অনুকূল সেবার দ্বারা গুরুদেবকে এমন পরিতুষ্ট করিয়াছিলেন যে, মাধবেন্দ্র এই মর্ম্মী শিষ্যকে তাঁহার অনুপম প্রেম-সম্পদের উত্তরাধিকারী করিয়া স্বাভীষ্ট ধামে গমন করেন। যথা—শ্রীচৈতন্যভাগবতে :—

যত প্রেম মাধবেন্দ্রপুরীর শরীরে।
সন্তোষে দিলেন সব ঈশ্বরপুরীরে॥
পাইয়া গুরুর প্রেম কৃষ্ণের প্রসাদে।
ভ্রমেন ঈশ্বরপুরী—অতি নির্ব্বিরোধে॥ আদি। ৯ম অধ্যায়

শ্রীচৈতন্যদেব যখন অধ্যাপক সাজিয়া নবদ্বীপে বিদ্যাবিলাসে মত্ত ছিলেন, তখন শ্রীমদীশ্বরপুরী—শ্রীনবদ্বীপে আগমন করিয়া শ্রীঅদ্বৈতের সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং গদাধর-শ্রীবাসাদি ভক্ত সহ কয়েক মাস নবদ্বীপে অবস্থান করেন। তিনি ঐ সময়ে শ্রীগোপীনাথ আচার্য্যের গৃহে অবস্থান করিয়াছিলেন। ঐ সময়ে তিনি গদাধর পণ্ডিতকে তাঁহার স্বকৃত গ্রন্থ 'শ্রীকৃষ্ণলীলামৃত' অধ্যয়ন করান। একদা নবদ্বীপের পণ্ডিতশ্রেষ্ঠ শ্রীচৈতন্যদেবের সহিত পথিমধ্যে তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। শ্রীচৈতন্যদেবের অপূর্ব্ব রূপ দেখিয়া স্বভাবতঃই শ্রীচৈতন্যদেবের প্রতি তাঁহার স্নেহসঞ্চার হইয়াছিল। শ্রীচৈতন্যদেবের অলৌকিক ভগবত্তা-সুলভ শক্তির জন্য ভক্তমাত্রেই তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইতেন। শ্রীমদীশ্বরপুরী ভক্তপ্রধান এবং ভগবান্‌কে তাঁহার প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়তম জানিয়া উপাসনা করিতেন। সুতরাং শ্রীচৈতন্যদেবে ভগবদ্ভাব তখন আচ্ছাদিত থাকিলেও—চুম্বক যেরূপ লৌহকে আকর্ষণ করে, তিনি সেইরূপভাবেই পুরী গোস্বামীকে আকর্ষণ করিয়াছিলেন। তিনি ঈশ্বরপুরীকে পরম সমাদরে নিজ গৃহে লইয়া গিয়া নারায়ণের প্রসাদের দ্বারা পরিতোষ সহকারে তাঁহাকে ভিক্ষা প্রদান করিলেন। ঐ সময়ে শ্রীচৈতন্যদেবকে তাঁহার স্বকৃত গ্রন্থ শ্রীকৃষ্ণলীলামৃত অধ্যয়ন করিতে দিয়া, উহাতে কোন দোষ থাকিলে তাহা দেখাইয়া দিতে বলেন। পাণ্ডিত্যাভিমানী ব্যক্তির নিকট মহাপ্রভু উদ্ধতের চূড়ামণি ছিলেন; কিন্তু অকপট ভক্তপ্রবর ঈশ্বরপুরীকে তিনি যথোচিত শ্রদ্ধা সহকারে বলিলেন—

"—ভক্তবাক্য কৃষ্ণের বর্ণন।
ইহাতে যে দোষ দেখে সেই পাপিজন॥
ভক্তের কবিত্ব যে তে মতে কেনে নয়।
সর্ব্বথা কৃষ্ণের প্রীত তাহাতে নিশ্চয়॥
মূর্খ বোলে 'বিষ্ণায়', 'বিষ্ণবে' বোলে ধীর।
দুই বাক্য পরিগ্রহ করে কৃষ্ণবীর॥
উহাতে যে দোষ দেখে তাহার সে দোষ।
ভক্তের বর্ণন মাত্র কৃষ্ণের সন্তোষ॥
অতএব তোমার সে প্রেমের বর্ণন।
ইহাতে দূষিবে কোন্ সাহসিক জন?"
শুনিয়া ঈশ্বরপুরী প্রভুর উত্তর।
অমৃত সিঞ্চিত হইল সর্ব্ব-কলেবর॥
পুনঃ হাসি বোলেন—"তোমার দোষ নাঞি।
অবশ্য বলিবা দোষ থাকে যেই ঠাঞি।" আদি। ১ম অধ্যায়

শ্রীল ঈশ্বরপুরী এইরূপ নির্ব্বন্ধাতিশয় প্রকাশ করিলে শ্রীচৈতন্যদেব এক দিন পুরীগোস্বামীর গ্রন্থে একটি ব্যাকরণের ভুল প্রদর্শন করেন। তিনি একটি পদ দেখাইয়া দিয়া বলেন যে, "এই ধাতুটি পরস্মৈপদী, সুতরাং উহাকে আত্মনেপদী করা ভুল হইয়াছে।" কিন্তু চৈতন্যদেব চলিয়া গেলে ঈশ্বরপুরী ঐ ধাতুটি লইয়া বিচার করিয়া উহার যে আত্মনেপদেও প্রয়োগ হয়, তাহা স্থির করেন। কয়েক দিন পরে অধ্যাপক নিমাই পণ্ডিতের সহিত সাক্ষাৎ হইলে তিনি তাঁহাকে উহা জ্ঞাপন করেন। মহাপ্রভু এইরূপে আত্মবিস্মৃত ভক্তের মধ্যেও পাণ্ডিত্যের উৎকর্ষ দেখিতে পাইয়া পরম সন্তোষ লাভ করেন। এই সময় শ্রীমদীশ্বরপুরী প্রায়ই শ্রীচৈতন্যদেবের সহিত শাস্ত্রালোচনা করিতেন। কয়েক মাস নবদ্বীপে অবস্থান করিয়া ভক্তিরসবিহ্বল ঈশ্বরপুরী নবদ্বীপ ত্যাগ করিয়া তীর্থপর্য্যটনে বহির্গত হন।

ইহার কয়েক বৎসর পরে শ্রীচৈতন্যদেব পিতৃকার্য্য সম্পাদনের জন্য শ্রীগয়াধামে গমন করেন। শ্রীল ঈশ্বরপুরীও ঐ সময়ে বহু তীর্থ পর্য্যটন করিয়া গয়াধামে সমাগত হন। শ্রীচৈতন্যদেব গয়াধামে উপস্থিত হইয়া শ্রীল গদাধরের পাদপদ্মচিহ্ন দর্শন করিয়া ভক্তিরসে বিহ্বল হইয়া পড়েন। প্রেমাবেশে যখন তিনি শ্রীবিষ্ণুপাদমন্দিরে অধীর হইয়া পড়েন, সেই সময়ে তথায় তিনি শ্রীমদীশ্বরপুরীকে দেখিতে পাইলেন; পুরীগোস্বামীকে দেখিয়া মহাপ্রভু তখনই তাঁহাকে প্রণাম করিলেন এবং পুরীও তখন তাঁহাকে দৃঢ়রূপে আলিঙ্গন করিলেন। শ্রীচৈতন্যদেব ও ঈশ্বরপুরী উভয়েই তখন প্রেমাশ্রুধারায় উভয়ের শরীর সিক্ত করিলেন। প্রভুর হৃদয়ে তখন যে প্রেমের প্রবাহ বহিতেছে, তাহা প্রবাহিত হইবার জন্য আর একটি পথ মিলিল। প্রভু তখন এই ভক্তপ্রবরের শরণ লইয়া তাঁহাকে কৃপা করিতে অনুরোধ করিলেন। পুরীগোস্বামীও তখন

প্রভুর প্রতি পুত্রাধিক স্নেহ প্রদর্শন করিয়া তাঁহাকে সুস্থ হইয়া তীর্থ-কর্ত্তব্য সমাপ্ত করিবার আজ্ঞা করিলেন। প্রভু যথাবিধি পিণ্ডদান পুরঃসর অপরাহ্নকালে বাসস্থানে আগমন করিয়া রন্ধনে প্রবৃত্ত হইলেন। যখন তাঁহার রন্ধন শেষ হইয়াছে, তখন ঈশ্বরপুরী তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি কৃষ্ণপ্রেমে বিহ্বল অবস্থায় মহাপ্রভুর নিকট উপস্থিত হইলে মহাপ্রভু পিতৃকৃত্যের পরে এইরূপ অনুপম ভক্ত অতিথি লাভ করিয়া স্বহস্তে পক অন্নাদির দ্বারা পরম সমাদরে তাঁহাকে ভোজন করাইয়া নিজেও পুনরায় অন্নাদি প্রস্তুত করিয়া ভোজন করিলেন এবং পুষ্পচন্দনাদির দ্বারা সর্ব্বলোকনমস্য এই মহাভক্তের পূজা করিলেন। অন্য এক দিন তিনি শ্রীমদীশ্বরপুরীর নিকট মন্ত্রদীক্ষা গ্রহণ করিবার অভিপ্রায় জানাইলেন। শ্রীমদীশ্বরপুরী বলিলেন—

"—মন্ত্র বা বলিয়া কোন্ কথা।
প্রাণ আমি দিতে পারি তোমারে সর্ব্বথা॥"
তবে তান স্থানে শিক্ষাগুরু নারায়ণ।
করিলেন দশাক্ষর মন্ত্রের গ্রহণ॥

শ্রীচৈতন্যভাগবত আদি। ১৫শ

এই দশাক্ষর মন্ত্রে শ্রীবৃন্দাবনের শুদ্ধ মাধুর্য্যনিষ্ঠ ভজনের উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। এই প্রেমগর্ভ উপাসনা আত্মজ্ঞাননিষ্ঠ সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের মধ্যে কি করিয়া আসিল, তাহাই বিস্ময়ের বিষয়! কিন্তু শ্রীচৈতন্যদেব স্বয়ং ভগবান্। তিনি ভক্তি ও প্রেমরসের পরাকাষ্ঠা জগদ্বাসীকে জানাইয়া ধন্য করিবার জন্য জগতে অবতীর্ণ হইয়াছেন। এই জন্য নিখিল জগতের অনধিগম্য—এমন কি, শুদ্ধ ভজননিষ্ঠ ভারতবর্ষের চারি সম্প্রদায়ের বৈষ্ণব সাধনার নিকটও যাহা চিরদিন গোপনীয় ছিল—যাহা শ্রীভগবানের রত্ন-মঞ্জুষার মধ্যে অতি সযত্নে ন্যস্ত ছিল—সেই অজ্ঞাতপূর্ব্ব অতি মধুর প্রাণারাম পঞ্চম পুরুষার্থরূপ প্রেমরসের মন্দাকিনী-প্রবাহ তিনি মাধবেন্দ্র পুরীর মধ্যে সঞ্চারিত করিয়াছিলেন। মাধুর্য্যনদীর এই অমৃতস্রোত মহামৃতসিন্ধু শ্রীচৈতন্যদেবে আসিয়া মিলিত হইলেন। পরব্রহ্মের পরম রহস্যময় শ্রীবৃন্দাবনলীলা এত দিনে অনাবৃত হইয়া জগতের মহাসৌভাগ্যের উৎকর্ষসাধন করিয়া প্রকাশিত হইবার উপক্রম হইল।

শ্রীচৈতন্যদেব দীক্ষা গ্রহণ করিয়া গয়াধাম হইতে প্রত্যাগমন করিবার পর শ্রীমদীশ্বরপুরী যে কোথায় গমন করিয়াছিলেন, তাহার বৃত্তান্ত জানা যায় না। তবে তিনি যখন অনিকেত প্রেমিক সন্ন্যাসী, তখন শ্রীভগবানের লীলাস্থলগুলির প্রতি তাঁহার আকর্ষণ স্বাভাবিক। সম্ভবতঃ তিনি এই সকল স্থানে ভ্রমণ ও অবস্থান করিয়া তাঁহার প্রেমবিহ্বল জীবনের শেষ মুহূর্ত্তগুলি যাপন করিয়াছিলেন। ইঁহার শেষ জীবনে শ্রীমান্ কাশীশ্বর ও শ্রীমান্ গোবিন্দ নামক দুই জন মর্ম্মী সেবক ইঁহার সেবায় নিরত ছিলেন। শ্রীচৈতন্যদেব যখন দাক্ষিণাত্যের তীর্থভ্রমণ শেষ করিয়া পুরীধামে প্রত্যাবর্ত্তন করেন, তখন শ্রীমদীশ্বরপুরীর সেবানিরত মর্ম্মী ভক্ত শ্রীগোবিন্দ তাঁহার গুরুদেবের শেষ আদেশ গ্রহণ করিয়া শ্রীমদীশ্বর-পুরী গোস্বামীর তিরোভাবের অন্তে শ্রীচৈতন্যদেবের সমীপে আগমন করেন। ইঁহার সম্বন্ধে কবিকুলশ্রেষ্ঠ শ্রীমৎ কবিকর্ণপুর বলিতেছেন—

"ঈশ্বরপুরীনিষেবণরতঃ স্বতঃ কৃষ্ণভক্তশ্চ।
অয়মেতি বিশদহৃদয়ো বিরক্তিমান্ সকলবিষয়েষু॥"

অর্থাৎ শ্রীমদীশ্বরপুরীর সর্ব্বপ্রকার সেবারত স্বভাবতঃ কৃষ্ণভক্ত উদারহৃদয় সকলবিষয়ে বিরক্ত শ্রীমদ্ গোবিন্দ আগমন করিতেছেন।

গোবিন্দ আসিয়া যখন বলিলেন যে, শ্রীমদীশ্বরপুরী তিরোভাব-কালে তাঁহাকে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের নিকট প্রেরণ করিবার সময় বলিয়া গিয়াছেন যে, "হে গোবিন্দ! আমি তাঁহাকে গৃহীর বেশেই দর্শন করিয়া পরমানন্দে বিভোর হইয়াছিলাম, আমি তাঁহার অন্য বেশ অর্থাৎ সন্ন্যাসবেশ দর্শন করি নাই; কিন্তু তুমি সৌভাগ্যবান্, যেহেতু তুমি সে বেশও দেখিতে পাইবে; অতএব তুমি তাঁহার নিকট গমন কর।"

শ্রীমদীশ্বরপুরী মহাপ্রভুর সন্ন্যাস গ্রহণের অব্যবহিত পরেই লৌকিক লীলা সম্বরণ করিয়াছিলেন এবং তৎকালে তাঁহার প্রিয় সেবক শ্রীমৎ কাশীশ্বর ও গোবিন্দকে শ্রীচৈতন্যদেবের সেবায় নিরত হইবার আদেশ করিয়া যান। শ্রীমৎ চৈতন্যদেবও গুরুর অনুচরের দ্বারা নিজ পরিচর্য্যা করান সঙ্গত নহে—ইহা বুঝিলেও গুরুর সাক্ষাৎ আজ্ঞা সর্ব্বাপেক্ষা বলবতী, ইহা মনে করিয়া শ্রীগোবিন্দকে ও কাশীশ্বরকে নিজ সেবায় রত রাখিয়াছিলেন। ইঁহারা পরম মর্ম্মী ভক্তের ন্যায় শ্রীচৈতন্যদেবের সেবা করিয়া ধন্য হইয়াছিলেন।

শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার প্রধান পার্ষদগণ

শ্রীচৈতন্যদেব ১৪০৭ শকাব্দের (১৪৮৬ খৃষ্টাব্দে) ফাল্গুনী পূর্ণিমা তিথিতে শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের পুত্ররূপে শ্রীশ্রীনবদ্বীপধামে আবির্ভূত হন। তাঁহার পিতা জগন্নাথ মিশ্র শ্রীহট্টে বৈদিক বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া শৈশব হইতেই বিদ্যাচর্চ্চার ও ব্রাহ্মণ-সমাজের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠাস্থান নদীয়া নগরে আসিয়া বাস করেন। বর্ত্তমান নবদ্বীপের উত্তরভাগে তৎকালিক নবদ্বীপের প্রধান পল্লীগুলি গঙ্গাতীরে অবস্থিত ছিল। ইহার ব্রাহ্মণপল্লীতে শ্রীল জগন্নাথ মিশ্র বাস করিতেন। নানাবিধ শাস্ত্রে পাণ্ডিত্য লাভ করিয়া তিনি "পুরন্দর" উপাধি প্রাপ্ত হন এবং বেলপুকুরের নীলাম্বর চক্রবর্ত্তীর কন্যা সর্ব্বসগুণ-সম্পন্না শচীদেবীকে বিবাহ করিয়া নবদ্বীপে বাস করিতে থাকেন। কালক্রমে শচীদেবীর গর্ভে তাঁহার পর পর আটটি কন্যা জন্মগ্রহণ করিয়া পরলোকগমন করে। পরবর্ত্তী কালে বিশ্বরূপ নামে তাঁহার এক পরমসুন্দর পুত্র জন্মগ্রহণ করে।

শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবের প্রায় দশ বৎসর পূর্ব্বে—সম্ভবতঃ ১৩৯৭ শকাব্দে (১৪৭৫ খৃঃ অব্দে) বিশ্বরূপের জন্ম হয়। বিশ্বরূপের জন্মের বহুবৎসর পূর্ব্বে শ্রীহট্ট দেশে ভক্তপ্রবর শ্রীল অদ্বৈতাচার্য্যের আবির্ভাব হয়। শ্রীহট্ট শব্দের অর্থ শ্রীর বা শ্রীনারায়ণের মুখ্যা শক্তি লক্ষ্মীর হট্ট বা আবাসস্থল। বস্তুতঃ শ্রীচৈতন্যদেবের অসংখ্য শক্তিশালী মুখ্য পার্ষদের আবির্ভাবে শ্রীহট্টের এই নাম সার্থক হইয়াছিল। শ্রীল অদ্বৈত আচার্য্য, শ্রীবাস পণ্ডিত ও তাঁহার ভ্রাতৃগণ, শ্রীল মুরারি গুপ্ত, শ্রীকৃষ্ণমঙ্গলের গ্রন্থকার কবিবল্লভ মাধবাচার্য্য, আচার্য্যরত্ন শ্রীল চন্দ্রশেখর প্রমুখ বহু বিখ্যাত শ্রীচৈতন্যপরিকর শ্রীহট্টে জন্মগ্রহণ করিয়া শ্রীহট্টকে ধন্য করিয়া গিয়াছেন। এই ভক্তগণের মধ্যে শ্রীল অদ্বৈত আচার্য্যদেব প্রায় সকলেরই গুরুতুল্য।

অদ্বৈত আচার্য্য

অদ্বৈত আচার্য্য আনুমানিক ১০৫৫ শকাব্দে শ্রীহট্ট জেলার লাউড় পরগণার অন্তর্বর্ত্তী নবগ্রামে ভরদ্বাজগোত্রীয় বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ কুবের আচার্য্যের ঔরসে ও নাভা দেবীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। শুক্লপক্ষের মাঘী সপ্তমী অদ্বৈত আচার্য্যের জন্মতিথি। এইরূপ শুনা যায় * যে, কুবের পণ্ডিতের পর পর ছয়টি পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়া তীর্থদর্শনচ্ছলে গৃহস্থাশ্রম ত্যাগ করিলে, কুবের পণ্ডিতের বৃদ্ধবয়সে অদ্বৈতাচার্য্য জন্মগ্রহণ করেন। অদ্বৈত আচার্য্য বাল্যকালে কমলাকান্ত বা কমলাক্ষ নামে অভিহিত হইতেন। বাল্যকাল হইতেই তাঁহার বিদ্যাশিক্ষার প্রতি বিশেষ অনুরাগ ছিল; এবং অধ্যয়নের সুবিধার জন্যই তিনি বাল্যকাল হইতে শান্তিপুরে আগমন করেন এবং স্বাভাবিক প্রতিভার বলে অল্পবয়সেই তিনি সর্ব্বশাস্ত্রে পারদর্শী হন। অন্যান্য শাস্ত্র অপেক্ষা ভক্তিশাস্ত্রের প্রতিই তাঁহার প্রবল অনুরাগ ছিল। ভক্তিশাস্ত্রপাঠ শেষ করিয়া শ্রীমৎ মাধবেন্দ্রপুরীর নিকট দীক্ষালাভ করিয়া তিনি শ্রীকৃষ্ণপ্রেমে বিহ্বল হন। বঙ্গদেশে ঐ সময় অন্যকামনাহীন বিশুদ্ধ ভগবদ্ভক্তির অভাবদর্শন করিয়া তিনি ব্যথিত হন; এবং শাস্ত্রালোচনার দ্বারা কলিযুগেও যুগাবতাররূপে শ্রীভগবদাবির্ভাব কামনা করিয়া গঙ্গাজল ও তুলসীদলের দ্বারা জীবের দুঃখ দূর করিবার জন্য ঐকান্তিক ব্যাকুলতা সহকারে শ্রীকৃষ্ণপূজায় রত হন। তীর্থভ্রমণ শেষ করিয়া আচার্য্যদেব সপ্তগ্রামের সন্নিকটবর্ত্তী নারায়ণপুরের নৃসিংহ ভাদুড়ীর সীতা নাম্নী জ্যেষ্ঠা কন্যা ও শ্রীনাম্নী কনিষ্ঠা কন্যা—এই দুই কন্যাকেই একসঙ্গে বিবাহ করেন। শুনা যায়, এই বিবাহে সপ্তগ্রামের জমিদার হিরণ্য ও গোবর্দ্ধন মজুমদার এই দুই ভাই বহু অর্থব্যয় করেন। আচার্য্যদেব বিবাহের পূর্ব্বেই নবদ্বীপে একটি চতুষ্পাঠী স্থাপন করেন, বিবাহের পরে তিনি শান্তিপুরেও একটি চতুষ্পাঠী স্থাপন করিয়া এই স্থানে বাস করিতে আরম্ভ করেন। এইরূপে আচার্য্য দুই স্থানেই চতুষ্পাঠী স্থাপন করিয়া কখনও নবদ্বীপে, আবার কখনও শান্তিপুরে অবস্থান করিতে থাকেন। নবদ্বীপবাসী শ্রীবাসাদি ভক্তগণ এবং শ্রীচৈতন্যদেবের অগ্রজ বিশ্বরূপ ঐ সময়ে অদ্বৈতাচার্য্যকে পাইয়া তাঁহার নিকট ভক্তিশাস্ত্রের ব্যাখ্যা এবং শ্রীকৃষ্ণের লীলাকথা শ্রবণ করিয়া পরম তৃপ্তি লাভ করিতেন। ঐ সময়ে হরিদাস ঠাকুর নামক এক জন মহাভক্ত অদ্বৈতের নিকট আগমন করেন। অদ্বৈত আচার্য্যও এই ভক্তপ্রবরকে প্রাপ্ত হইয়া তৎসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণভজন ও শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্ত্তনে আনন্দের পরাকাষ্ঠা লাভ করেন।

হরিদাস ঠাকুর

বর্ত্তমান খুলনা জেলার সাতক্ষীরা মহকুমার অন্তর্গত তাৎকালিক বুড়ন পরগণার সোণাই বা স্বর্ণনদীর তীরস্থিত ভাটকলা গাছি বা কেলাগাছি গ্রামে আনুমানিক শকাব্দা চতুর্দ্দশ শতাব্দীর শেষভাগে (সম্ভবতঃ ১৩৭২ শকে) শ্রীল হরিদাস ঠাকুর জন্মগ্রহণ করেন। শ্রীচৈতন্যভাগবতকারের মতে তিনি মুসলমান-বংশে প্রাদুর্ভূত হন। কিন্তু অন্য মতে তিনি ব্রাহ্মণগৃহে প্রাদুর্ভূত হইলেও অতি শৈশবে পিতৃমাতৃহীন হওয়ায় মলয়া কাজি নামক এক জন মুসলমান তাঁহাকে লালনপালন করেন। * অন্য কোনও মতে তাঁহার মাতার নাম উজ্জ্বলা ও পিতার নাম মনোহর। † এই মতে মনোহর চক্রবর্ত্তীর পরলোকান্তে হরিদাসের মাতা উজ্জ্বলাদেবী স্বামীর চিতারোহণে সহমৃতা হইলে নিকটবর্ত্তী গ্রামের সন্তানহীন হবিবুল্লা নামক এক জন পিরালী মুসলমান হরিদাসকে একপ্রকার বলপূর্ব্বক লালনপালন করিতে আরম্ভ করে। যাহা হউক, জন্মদোষেই হউক বা অন্নদোষেই হউক, হরিদাস ঠাকুরের যবনত্ব প্রাপ্তি সম্বন্ধে মতভেদ নাই। প্রামাণিক বৈষ্ণব গ্রন্থে তিনি ব্রহ্ম হরিদাস বা যবন হরিদাস নামে বিখ্যাত। শৈশব হইতেই ইনি কোনও অলৌকিক কারণে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ভক্তিমান ছিলেন এবং শ্রীভগবন্নামকেই শ্রীভগবদ্জ্ঞানে কখনও উচ্চৈঃস্বরে কখনও বা মৃদুস্বরে ঐকান্তিক আগ্রহ ও নিষ্ঠা সহকারে প্রতিদিন তিন লক্ষ জপ ও কীর্ত্তন করিতেন। এই মহাপুরুষের জীবনবৃত্তান্ত সত্যই অলৌকিক। ইনি মুসলমান হইয়া শ্রীহরিনামে এই প্রকার দৃঢ়-বিশ্বাসী ও ভক্তিমান দেখিয়া মুসলমান কাজী ও মোল্লাগণের ইঁহার প্রতি প্রবল বিদ্বেষের সঞ্চার হয়।

ঐ সময়ে তাঁহার পালক পিতা তাঁহার বিবাহের উদ্যোগ করিতে থাকিলে হরিদাস গৃহ ছাড়িয়া পলায়ন করেন এবং যশোহর জেলার বেণাপোল নামক স্থানে আসিয়া তথায় লোকালয় ত্যাগ করিয়া প্রান্তরের মধ্যে একখানি কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া সমস্ত দিবারাত্রি ধরিয়া তিন লক্ষ অথবা মাসে এক কোটি নাম কীর্ত্তন করিতে থাকেন। বেণাপোলের আবালবৃদ্ধ সকলেই হরিদাস ঠাকুরের ন্যায় সাধুকে এইভাবে ভজন করিতে দেখিয়া তাঁহার প্রতি অনুরক্ত হইয়া পড়িল, কিন্তু জগতে যেমন মহাপুরুষেরও অভাব নাই, সেইরূপ বিনা কারণে সাধুদ্বেষী পাপাত্মারও অভাব নাই। বেণাপোলের নিকটবর্ত্তী ভূম্যধিকারী রামচন্দ্র খাঁ হরিদাসের এই নিষ্কিঞ্চন ভাবকে 'ভণ্ডামি' মনে করিয়া তাঁহার সাধুত্ব নষ্ট করিবার জন্য কৃতসংকল্প হইল এবং নিজের রক্ষিতা পরমা সুন্দরী এক যুবতী বেশ্যাকে তাঁহার নিকট প্রেরণ করিল; হরিদাসের নিকট উপস্থিত হইয়া বেশ্যা হাবভাব প্রকাশ-পূর্ব্বক স্বীয় অভিলাষ ব্যক্ত করিলে, হরিদাস প্রথম রাত্রিতে বেশ্যাকে বলিলেন, "আমি সংখ্যানামকীর্ত্তনে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ আছি, যতক্ষণ পর্য্যন্ত আমার নাম-জপ সমাপ্ত না হয়, তুমি ততক্ষণ পর্য্যন্ত অপেক্ষা কর, জপ শেষ হইলেই আমি তোমার অভিলাষ পূর্ণ করিব।" কিন্তু সমস্ত রাত্রির মধ্যে সংখ্যানাম শেষ হইল না। পরদিনও বেশ্যা ঐরূপে রাত্রির প্রারম্ভে সুসজ্জিত হইয়া হরিদাসের সর্ব্বনাশসাধনের জন্য তাঁহার আশ্রমে উপনীত হইল। হরিদাসও বেশ্যাকে মধুর বচনে আশ্বস্ত করিয়া পূর্ব্বরজনীর ন্যায় তাহাকে নামকীর্ত্তন না হওয়া পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। বেশ্যাও হরিদাসের

* "প্রেমবিলাস" গ্রন্থের যশোদালাল তালুকদারের প্রকাশিত সংস্করণের চতুর্ব্বিংশ বিলাসে এই উপাখ্যান দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু ঐ গ্রন্থ সর্ব্ববাদিসম্মত প্রামাণিক বৈষ্ণব গ্রন্থ নহে।

* "প্রেমবিলাস" ২৪ বিলাস।

† "উজ্জ্বলা মায়ের নাম, বাপ মনোহর।
স্বর্ণনদীতীরে ভাটকলাগাছি গ্রাম॥"
জয়ানন্দের "চৈতন্যমঙ্গল"।

আশ্রমে বসিয়া সেই মহাপুরুষের নামকীর্ত্তন শুনিতে লাগিল; নামের শক্তিতে তাহার চিত্তবৃত্তি কোমল হইতে কোমলতর হইল। আজন্মকৃত-পাপকার্য্যাবলীর স্মরণে তাহার হৃদয়ে নানাভাবের তরঙ্গ উঠিতে লাগিল। এ দিকে হরিদাসের সংখ্যা নামকীর্ত্তনে রজনী প্রভাত হইল। হরিদাস ঐ বারাঙ্গনার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া রজনীতে আবার আসিতে বলিলেন। রাত্রিতে বেশ্যা আবার আশ্রমে সমাগত হইল—আজ তাহার হৃদয়ের সমস্ত পাপ, তাপ, গ্লানি অনুতাপের বিগলিত অশ্রুধারায় ধৌত হইয়া গিয়াছে। তাহার স্থায় পাপীয়সী কি প্রকারে হরিদাস ঠাকুরকে পাপপথে টানিয়া লইতে চাহিয়াছিল, তাহা ভাবিয়া সে শিহরিয়া উঠিল,—সে হরিদাসের চরণপ্রান্তে পতিত হইয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিল এবং কাঁদিতে কাঁদিতে নিজের উদ্ধারের জন্য প্রার্থনা করিতে লাগিল। হরিদাস প্রশান্তমনে তাহাকে ক্ষমা করিয়া বলিলেন, "যে দিন তুমি প্রথম আসিয়াছিলে, সেই দিনই আমি এ স্থান ত্যাগ করিয়া যাইতাম, কিন্তু তোমার উদ্ধারের জন্য আমি এই তিন দিন অপেক্ষা করিয়াছি। তুমি তোমার সমস্ত ঐশ্বর্য্য ব্রাহ্মণ ও ভিখারীগণকে দান করিয়া এই আশ্রমে আসিয়া অবস্থান কর, এবং নিষ্ঠা সহকারে তুলসীর সেবা করিয়া প্রত্যহ তিন লক্ষ করিয়া হরিনাম জপ কর—এইরূপে তুমি শ্রীকৃষ্ণের কৃপা প্রাপ্ত হইবে।" এই বলিয়া হরিদাস আশ্রম ত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিলেন, অনুতপ্তা বেশ্যা গুরুর আদেশে সর্ব্বস্ব ব্রাহ্মণদিগকে দান করিয়া শ্রীকৃষ্ণভজনে প্রবৃত্ত হইয়া অচিরে শান্তিলাভ করিল। হরিদাস বেণাপোল ত্যাগ করিয়া গেলেন। গোরাই কাজি নামক এক জন মুসলমান কাজী হরিদাস মুসলমান হইয়াও হিন্দুর ধর্ম্ম আচরণ করিতেছেন বলিয়া গৌড়েশ্বর হুসেন শাহার দরবারে অভিযোগ করে। সেখানে কাজীগণ মুসলমানশাস্ত্র অনুসারে বিচার করিয়া হরিদাসের গৌড়ের বাইশ বাজারে বেত্রাঘাতের দ্বারা জীবনান্তের ব্যবস্থা প্রদান করেন। কিন্তু হরিদাসের কায়মনবাক্য—সর্ব্বস্বই শ্রীকৃষ্ণে অর্পিত—তিনি শ্রীকৃষ্ণ স্মরণ করিয়া অনায়াসে এই বেত্রদণ্ড সহ্য করিলেন। পরন্তু যাহারা না বুঝিয়া অজ্ঞানতাবশে এই পাপে রত হইয়াছে, ভগবানের নিকট তাহাদের জন্য কাতর প্রাণে ক্ষমা ভিক্ষা করিতে লাগিলেন। শত্রুর এইরূপ মঙ্গলকামনা রামানুজাচার্য্যের প্রিয় শিষ্য কুরেশও করিয়াছিলেন। যাহারা তাঁহার চক্ষু উৎপাটন করিয়া তাঁহাকে অন্ধ করিয়াছিল, বরদরাজের নিকট তিনি তাঁহাদের মুক্তি প্রার্থনা করিয়াছিলেন। শ্রীভগবানের যাঁহারা নিষ্কিঞ্চন ভক্ত, তাঁহারা জগতের সকল প্রাণীরই মঙ্গলপ্রার্থী। সুতরাং ভক্তোত্তম মহাত্মা হরিদাসের এই ব্যবহার তাঁহার পক্ষে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক হইলেও জগতের বহির্ম্মুখ জীবের পক্ষে তাহা সত্যই বিস্ময়াবহ। হরিদাসের এইরূপ অপূর্ব্ব ধৈর্য্য, তিতিক্ষা ও জগতের সর্ব্বপ্রাণীর মঙ্গলেচ্ছা দেখিয়া অত্যাচারী মুসলমানগণ তাঁহাকে অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন মহাপুরুষ বলিয়া বুঝিতে পারিল এবং বঙ্গাধিপ হুসেন শাহা তাঁহাকে স্বচ্ছন্দে সর্ব্বত্র গমনের অনুমতি দান করিলেন। হরিদাস তথা হইতে চাঁদপুরে বলরাম আচার্য্যের গৃহে এবং পরে অদ্বৈত আচার্য্যের সকাশে উপনীত হন। সমস্ত নদ যেমন মহাসমুদ্রে সম্মিলিত হয়, শ্রীচৈতন্যদেব অবতীর্ণ হইলেও অদ্বৈতাচার্য্য, হরিদাস, নিত্যানন্দ প্রমুখ যাবতীয় ভক্ত আসিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইলেন।

শ্রীল নিত্যানন্দ

হরিদাসের জীবন যেমন আদর্শ বৈরাগ্য ও ভক্তির বিকাশক্ষেত্র, শ্রীল নিত্যানন্দ প্রভুর জীবনে তেমনই অলৌকিক প্রেমের অপূর্ব্ব প্রকাশ। শাস্ত্রে যে ভাগবত পরমহংসের কথা দেখিতে পাওয়া যায়, শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু তাহারই জীবন্ত আদর্শ। জীবনের সর্ব্বভাবে তাঁহাদের শ্রীভগবানের লীলাই প্রকাশিত হইয়া থাকে—তাঁহাদের জীবনে তাঁহাদের ব্যক্তিগত কোনও কামনা-বাসনা নাই—তাঁহাদের আমিত্ব সম্পূর্ণভাবে ভগবৎসত্তায় সমর্পিত। শ্রীভগবানের সমস্ত কার্য্য ইঁহাদিগের দ্বারাই নির্ব্বাহিত হইয়া থাকে। এইরূপে অবতারের প্রেমপ্রদানের যে কার্য্য—সে কার্য্য তিনি নিত্যানন্দ প্রভুর দ্বারাই সম্পন্ন করিলেন। এই জন্যই বিধিনিষেধের অতীত শ্রীনিত্যানন্দের তত্ত্ব একান্ত দুর্জ্ঞেয়। যাঁহারা ভক্তিভরে এই অলৌকিকচরিত্র মহাপুরুষের শরণাগত হইয়াছেন, তাঁহারাই তাঁহার চরিত্র-মাহাত্ম্যে বিস্মিত ও মুগ্ধ হইয়াছেন। এহেন অলৌকিক চরিত্র মহাপুরুষ বীরভূম জেলার একচক্রা গ্রামে হাড়াই ওঝা বা মুকুন্দ পণ্ডিতের পুত্ররূপে আনুমানিক ১৩৯৫ শকাব্দায় মাঘী শুক্লা ত্রয়োদশী তিথিতে আবির্ভূত হন। বাল্যকাল হইতেই নিত্যানন্দ শ্রীকৃষ্ণলীলার অনুকরণে নানা প্রকার খেলায় বিভোর হইয়া থাকিতেন। কৈশোরের শেষভাগে এক সন্ন্যাসী তাঁহাকে পিতামাতার নিকট হইতে ভিক্ষা করিয়া লইয়া নিজের সহিত তীর্থভ্রমণে বহির্গত করেন। এই ভক্ত সন্ন্যাসীর সহিত নানা তীর্থ ভ্রমণের পর প্রায় কুড়ি বৎসর পরে তিনি বৃন্দাবনাদি তীর্থ-দর্শন শেষ করিয়া নবদ্বীপের প্রেমময় মহাপুরুষের নিকট সমাগত হন। নবদ্বীপের প্রেম-মহাসমুদ্রে মিলিত হইয়া তিনি সেই সমুদ্রের তরঙ্গলীলা জগতে বিস্তার করাই তাঁহার জীবনের মহাব্রতরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। অবিচারিতচিত্তে তিনি এই প্রেমস্রোতে আত্মসমর্পণ করিয়া সমস্ত বিধিনিষেধের অতীত হইয়া কখনও সন্ন্যাসী—কখনও ব্রহ্মচারী—কখনও অবধূত—কখনও গৃহীরূপে বর্ণাশ্রমধর্ম্মের সমস্ত বাহ্যাচারকে মাত্র সামাজিকভাবে অঙ্গীকার করিয়া অন্তরে ভগবৎপদে আত্মসমর্পণ করিয়া তাঁহার জীবনব্রতের পরিসমাপ্তি করিয়া গিয়াছেন। সাক্ষাৎ ভগবদনুভূতির মত্ততায় তিনি চিরকাল উন্মত্ত—তাঁহার কার্য্যধারার মধ্যে সংকল্পের বিকল্পের অবকাশ নাই—যখনই ভাগবতী বুদ্ধির যে প্রেরণা আসিতেছে, তখনই তাহার নিকট তিনি আত্মসমর্পণ করিয়া সেই প্রেরণাকেই তাঁহার জীবনক্ষেত্রে সার্থক ও সফল করিয়া তুলিতেছেন। ইহার মধ্যে এক দিকে যেমন বিচার-বিতর্কের সন্দেহের কোনও অবকাশ নাই, তেমনই অপর দিকে কৃত কর্ম্মের জন্য দুঃখের, অনুশোচনার বা অনুতাপের কোনও কারণ নাই। শ্রীচৈতন্যভাগবতে এই জন্য শ্রীনিত্যানন্দকে ও ব্রজলীলায় শ্রীবলরামকে একই তত্ত্ব বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। বস্তুতঃ দার্শনিক তত্ত্ববিচারে সঙ্কর্ষণতত্ত্ব যেমন বাসুদেবেরই ব্যূহরূপে বিকাশের এবং লীলার ক্ষেত্রে শ্রীনিত্যানন্দেও সেই প্রকার শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরে একান্ত তন্ময়তা বা আত্মসমর্পণের ফলে শ্রীগৌরাঙ্গলীলাই প্রকাশিত হইয়াছে। ঐকান্তিক আত্মদানমূলক সেবার দ্বারাই এই প্রকার ঘটিয়া থাকে, এই জন্যই ইঁহাকে অনন্তদেবের বা শেষের অবতাররূপে অনেকে বিশ্বাস করিয়া থাকেন। যিনি সর্ব্বভাবে

ভগবৎ-সেবায় আত্মাকে নিযুক্ত করিয়া নিজে নিঃশেষিত হইয়াছেন, তিনিই শেষ। শ্রীরামানুজ সম্প্রদায়ের আদিগুরু শ্রীল যামুনাচার্য্য এই শেষ সম্বন্ধে তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ "স্তোত্ররত্নে" বলিয়াছেন—

নিবাস-শয্যাসন-পাদুকাংশুকো-
পধান-বর্ষাতপবারণাদিভিঃ।
শরীরভেদৈস্তব শেষতাং গতৈ-
র্যথোচিতং শেষ ইতীর্য্যতে জনৈঃ।

(স্তোত্ররত্ন ৪০ শ্লোক)

অর্থাৎ—"আমি ভিন্ন আমার সেই প্রিয়তমকে কে আর সেবা করিতে পারে?" এই জন্যই তিনি তাঁহার আবাসগৃহ, শয্যা, আসন, পাদুকা, বস্ত্র, উপধান, ছত্রচামরাদিতে পরিণত হইয়া নিজের অলৌকিক শক্তির দ্বারা যখন যেরূপ প্রয়োজন সেইরূপে পৃথক পৃথক শরীরের দ্বারা ভগবানের সেবা করিয়া নিজেকে নিঃশেষিত করেন, এই জন্যই লোকে তাঁহাকে শেষ নামে অভিহিত করিয়া থাকে।

এই ভাবেই ব্রজলীলায় বলরামের শ্রীকৃষ্ণসেবা, এই ভাবেই রামাবতারে লক্ষ্মণের শ্রীরামচন্দ্রের সেবা এবং এই ভাবেই নিত্যানন্দের গৌরাঙ্গের সেবা। শ্রীগৌরাঙ্গের মনে যখনই যে ভাব উঠিয়াছে, শ্রীগৌরাঙ্গে সমাহিতচিত্ত নিতাইয়ের চিত্তে তখনই সেই ভাবের স্ফুরণ হইয়াছে এবং তখনই সেই ভাবে উদ্বুদ্ধ হইয়া নিত্যানন্দ কার্য্য করিয়াছেন। এই জন্য নিত্যানন্দের কোনও কোনও ভক্ত শ্রীগৌরাঙ্গের সহিত শ্রীনিত্যানন্দকে অভিন্ন বলিয়া মনে করিয়াছেন। এই জন্যই গৌড়ীয় বৈষ্ণবরা শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীঅদ্বৈতকে শ্রীগৌরাঙ্গেরই স্বীয় অঙ্গরূপে নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। * শ্রীনিত্যানন্দের কৃপাপ্রাপ্ত দার্শনিক-চূড়ামণি শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী যেরূপ সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিচার সহকারে নিত্যানন্দতত্ত্ব বিচার করিয়াছেন, তাহা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের আদি খণ্ডে পঞ্চম অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য। বস্তুতঃ অভিজ্ঞের্ নিত্যানন্দতত্ত্ব যেরূপ ভাবে তিনি প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা সত্যই অপূর্ব্ব। ভক্তগণ তাহার আলোচনা করিলে নিত্যানন্দতত্ত্ব ও নিত্যানন্দমহিমা নিশ্চয়ই হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইবেন। এই নিত্যানন্দ ও অদ্বৈত আচার্য্যই শ্রীচৈতন্যদেবের মুখ্য সহায়। ইঁহাদের সহায়তাতেই তাঁহার লীলা পরিপূর্ণ হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে নিত্যানন্দ শ্রীচৈতন্যদেবের সহিত মিলিত হইলেই নবদ্বীপলীলায় ভক্তি ও প্রেমদানের কার্য্য আরম্ভ হয়।

শ্রীবাস পণ্ডিত

শ্রীহট্টে জলধর পণ্ডিত নামক এক জন সদাচারী বৈদিক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। ঐ সময়ে গঙ্গাবাসের জন্য অনেক ধর্ম্মশীল, সম্পন্ন ব্যক্তির নবদ্বীপেও বাড়ী থাকিত। পণ্ডিত জলধরের নবদ্বীপের বৈদিক পাড়ায়ও একটি আবাসগৃহ ছিল। জলধর পণ্ডিতের পাঁচ পুত্র;—নলিন, শ্রীবাস, শ্রীরাম, শ্রীপতি ও শ্রীকান্ত বা শ্রীনিধি।

* "অদ্বৈত আচার্য্য নিত্যানন্দ—দুই অঙ্গ।
দুই জন লঞা প্রভুর যত কিছু রঙ্গ।"
চরিতামৃত। আদি। ৫ম।

জলধরের পরলোকান্তে তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র নলিন পণ্ডিতের নারায়ণী নাম্নী একটি কন্যা জন্মগ্রহণ করিবার কিছুদিন পরেই নলিন পণ্ডিত ও তাঁহার সহধর্ম্মিণী পরলোকে গমন করেন। শুনা যায়, পিতৃ-মাতৃবিয়োগকালে নারায়ণীর বয়স মাত্র এক বৎসর হইয়াছিল। নলিন পণ্ডিতের পরলোকগমনের পর শ্রীবাসপ্রমুখ তাঁহার চারি ভ্রাতা নবদ্বীপের বাটীতে বাস করিতে আরম্ভ করেন। শ্রীবাসের পত্নী মালিনীদেবীই নারায়ণীকে লালন-পালন করেন। শ্রীবাস পণ্ডিত প্রথমবয়সে নিষ্ঠাবান্ ভগবদ্ভক্ত ছিলেন না। কিন্তু কিছু কাল পরেই তিনি জানিতে পারেন যে, তাঁহার আয়ু অল্প—স্বপ্নযোগে জানিতে পারেন যে—বড়্বিংশ বৎসর বয়সে কোনও এক নির্দ্দিষ্ট দিনে তাঁহার মৃত্যু হইবে। এইরূপে মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী জানিয়া তিনি শ্রীভগবন্নামজপে কালাতিপাত করিতে থাকেন। ঐ সময়ে নবদ্বীপে দেবানন্দ পণ্ডিত নামক এক জন অধ্যাপক শ্রীভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করিতেন। তখনও নবদ্বীপে অদ্বৈতাচার্য্যের আগমন হয় নাই। তাৎকালিক দেশপ্রচলিত প্রথানুসারে দেবানন্দ পণ্ডিত পাণ্ডিত্যের বলেই ভাগবতের ব্যাখ্যা করিতেন—ভাগবত যে ভগবানের ও ভক্তের মহিমাব্যঞ্জক ভক্তিরসপ্রধান গ্রন্থ এবং শ্রীভগবদ্ভক্তিই যে ভাগবতের প্রতিপাদ্য, তাহা দেবানন্দ জানিতেন না। তথাপি মৃত্যু অবধারিত জানিয়া শ্রীবাস পণ্ডিত দেবানন্দসকাশে ভাগবতের ব্যাখ্যা শুনিবার জন্য মৃত্যুর নির্দ্দিষ্ট দিনে উপস্থিত হইলেন। দেবানন্দের ভাগবতের ব্যাখ্যা শুনিয়া শ্রীবাস প্রেমভরে মূর্চ্ছিত হন, দেবানন্দ ও তাঁহার শিষ্যগণ তাঁহার প্রেমমূর্চ্ছার মর্ম্ম না বুঝিয়া তাঁহার এই প্রকার ভাবের দ্বারা ভাগবতপাঠের বাধা হইতেছে মনে করিয়া মূর্চ্ছিত শ্রীবাসকে ভাগবতপাঠের স্থান হইতে দূরবর্ত্তী স্থানে ধরাধরি করিয়া রাখিয়া আসেন। ঐ সময়ে শ্রীবাসের মৃত্যুকাল সমুপস্থিত হয়। কিন্তু শ্রীবাস স্বপ্নাবস্থায় দেখিতে পান, ঐ সময়ে এক জন তেজঃপুঞ্জ-কলেবর অলৌকিকপ্রভাবশালী মহাপুরুষ আসিয়া তাঁহার জীবন রক্ষা করেন। অনতিকাল পরেই তাঁহার চৈতন্য লাভ হইলেই তিনি উঠিয়া ভগবৎকৃপা স্মরণ করিয়া প্রেমভরে ভগবন্নাম কীর্ত্তন করিতে করিতে স্বীয় আবাসে ফিরিয়া আসিলেন। শ্রীবাস তদবধি ঐকান্তিকভাবে শ্রীভগবচ্চর্চ্চাতে দিনাতিপাত করিতে লাগিলেন। উহার কিছুদিন পরেই শ্রীল অদ্বৈতাচার্য্য নবদ্বীপে আসিয়া চতুষ্পাঠী স্থাপন করিয়া শ্রীভগবদ্গীতা প্রমুখ গ্রন্থের ভক্তিমূলক মর্ম্ম উদ্ঘাটন করিতে আরম্ভ করেন। এই প্রস্ফুটিত ভক্তি-সরোজের গন্ধ পাইয়া হরিদাস, শ্রীবাস প্রমুখ ভক্তমধুপগণ অদ্বৈতাচার্য্যের আশ্রয়ে সমবেত হইতে লাগিলেন। অদ্বৈতাচার্য্যও এই সকল ভক্তসঙ্গ লাভ করিয়া, ইহাকে ভগবদবতরণের পূর্ব্বাভাসরূপে অবগত হইয়া, দ্বিগুণ উৎসাহে ভক্তিশাস্ত্রের ব্যাখ্যা করিয়া ভক্তবৃন্দের প্রাণে অলৌকিক আনন্দের সঞ্চার করিতে লাগিলেন।

গদাধর পণ্ডিত

যে শুভদিনে শ্রীচৈতন্যদেব জন্মগ্রহণ করিয়া বাঙ্গালাদেশ ও বাঙ্গালীকে ধন্য করেন, অদ্বৈতাচার্য্য তাহা বুঝিতে পারিলেও, হরিদাস প্রমুখ দুই এক জন মর্ম্মী ভক্ত ভিন্ন আর কাহারও নিকট তাহা প্রকাশ করেন নাই। শ্রীচৈতন্যদেবও বাল্যকাল হইতে বিদ্যাশিক্ষায় মত্ত হইয়া তাঁহার প্রকৃত স্বরূপ ভক্তগণের নিকট প্রকাশ করিতে

কিঞ্চিৎ বিলম্ব করিয়াছিলেন। গদাধর পণ্ডিত শ্রীচৈতন্যের অন্তরঙ্গ পার্ষদ হইলেও শ্রীচৈতন্যদেব প্রথমেই ইঁহাদিগের নিকট আত্ম-প্রকাশ করেন নাই। গদাধর শ্রীচৈতন্যদেব অপেক্ষা কিঞ্চিৎ বয়ঃকনিষ্ঠ। কিন্তু গদাধর শিশুকাল হইতেই সুশীল এবং ভগবদ্ভক্ত। এই জন্যই অল্পবয়স হইতেই ইনি অদ্বৈতাচার্য্য ও শ্রীবাসের সাহচর্য্য লাভ করেন। গদাধরের বংশপরিচয় অনুসন্ধান করিয়া জানা যায় যে, বারেন্দ্র ব্রাহ্মণকুলে সুবিখ্যাত উদয়নের বংশে গদাধর পণ্ডিত জন্মগ্রহণ করেন। উদয়নের দ্বিতীয়া পত্নীর গর্ভে পশুপতি নামক যে পুত্র জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহারই দ্বিতীয় পুত্র ঘগাইএর পুত্র কামাই। এই কামাইয়ের বহু পুত্রের মধ্যে বিলাসাচার্য্য নামক এক পুত্র পাণ্ডিত্যে অতুলনীয় ছিলেন। ইনি চট্টগ্রামের তাৎকালিক রাজা চিত্রসেনের সভাপণ্ডিতপদ গ্রহণ করিয়া বেলেটীতে বাস করেন। বিলাসাচার্য্যের পুত্র মাধব মিশ্রই গদাধর পণ্ডিতের পিতা; গদাধরের মাতার নাম রত্নাবতী এবং তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নাম জগন্নাথ বা বাণীনাথ। * বাণীনাথ চট্টগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পরবর্ত্তী কালে মাধব মিশ্র নবদ্বীপে বাস করিবার সময় আনুমানিক ১৪০৯ শকের বৈশাখ মাসের অমাবস্যা তিথিতে শ্রীল গদাধর পণ্ডিতের জন্ম হয়। গদাধর শৈশবকাল হইতেই শ্রীকৃষ্ণভজনে নিষ্ঠাশীল। শ্রীচৈতন্যদেবের প্রতি ইঁহার অসাধারণ আকর্ষণ হেতু ইঁহাকে শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ শ্রীরাধিকারই অবতার বলিয়া মনে করিয়া থাকেন। শ্রীচৈতন্যদেবের প্রতি ইঁহার অনুরাগ এত দৃঢ় ছিল যে, ইনি বিবাহ না করিয়া সর্ব্বদা শ্রীচৈতন্যদেবের পরিচর্য্যায় রত থাকিতেন। শ্রীচৈতন্যদেব সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া শ্রীপুরীধামে গমন করিলে ইনি পুরীধাম কখনও ত্যাগ করিবেন না, এই সংকল্পাত্মক ক্ষেত্রসন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া সমুদ্রতীরে শ্রীগোপীনাথ নামক বিগ্রহ স্থাপন করিয়া আজীবন শ্রীচৈতন্যদেবের সন্নিধানে অবস্থান করিয়া শ্রীশ্রীগোপীনাথের সেবায় রত থাকিতেন। ইনি যেরূপ সুললিত কণ্ঠে প্রেমময় ভাবে শ্রীভাগবত ব্যাখ্যা করিতেন, তাহাতে শ্রীভাগবতের ভক্তিরস মূর্ত্তিমান হইয়া উঠিত—এই জন্য পুরীতে শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার পরিকরবর্গ ইঁহার নিকট শ্রীভাগবতের পাঠ ও ব্যাখ্যা শুনিয়া পরিতৃপ্তি লাভ করিতেন।

গদাধর পণ্ডিত চট্টগ্রামের জমিদার সুপ্রসিদ্ধ ভক্ত শ্রীচৈতন্যদেবের একান্ত অনুগত শ্রীল পুণ্ডরীক বিদ্যানিধির নিকট মন্ত্রদীক্ষা গ্রহণ করেন। শুনা যায়, এই পুণ্ডরীক বিদ্যানিধিও শ্রীল মাধবেন্দ্র-পুরীর শিষ্য। নবদ্বীপে পুণ্ডরীকেরও একটি বাড়ী ছিল। পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি বাহ্যভাবে বিলাসী জমিদারের ন্যায় এই বাড়ীতে বাস করিতেন—কিন্তু তাঁহার অন্তর ভক্তিরসে পরিপূর্ণ ছিল। একদা প্রসিদ্ধ ভক্ত দর্শন মানসে গদাধর মুকুন্দ দত্ত নামক এক জন সুপ্রসিদ্ধ ভক্তের সহিত শ্রীপুণ্ডরীক বিদ্যানিধিকে দেখিতে যান। তাঁহার বিলাসিতাপূর্ণ বাহ্যভাব দেখিয়া গদাধরের মনে পুণ্ডরীকের প্রতি অশ্রদ্ধার সঞ্চার হয়। সুকণ্ঠ ভাবরসজ্ঞ মুকুন্দ তাহা বুঝিয়া সুকণ্ঠে শ্রীভাগবতের শ্রীকৃষ্ণের রূপবর্ণনাসূচক একটি শ্লোক পাঠ করেন। এই শ্লোক শুনিবামাত্রই প্রেমে বিহ্বল হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে যখন বিদ্যানিধি ধূলায় গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন, তখন গদাধরের ভুল ভাঙ্গিয়া গেল; তিনি এইরূপ ভক্তকে মনে মনে অশ্রদ্ধা করিয়াছেন বলিয়া অনুতাপানলে দগ্ধ হইতে লাগিলেন। পরে ইঁহার নিকট মন্ত্রদীক্ষা গ্রহণ করিয়া ইনি ইঁহার প্রতি অশ্রদ্ধা দেখাইবার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করেন। শ্রীচৈতন্যদেব ইহাতে গদাধরের উপর বিশেষ সন্তুষ্ট হন। বৈষ্ণবশাস্ত্রে শ্রীল গদাধরকে "পণ্ডিত গোস্বামী" নামে অভিহিত করা হইয়া থাকে।

শ্রীচৈতন্যদেবের নবদ্বীপলীলায় আরও অগণিত ভক্ত যোগদান করিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে তাঁহার মাতৃষসা শ্রীসর্ব্বজয়া দেবীর স্বামী শ্রীল চন্দ্রশেখর আচার্য্য, শ্রীল মুরারি গুপ্ত, শ্রীল শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী, শ্রীল মুকুন্দ দত্ত, শ্রীল বাসুদেব দত্ত, শ্রীল গোবিন্দ ঘোষ, শ্রীল মাধব ঘোষ, শ্রীল বাসুদেব ঘোষ প্রমুখ ভক্তগণের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। নবদ্বীপলীলায় শ্রীচৈতন্যদেবের যে কার্য্য, তাহা ইঁহাদিগের সাহায্যেই পরিপূর্ণ হইয়াছিল। এই জন্যই শ্রীচৈতন্যদেবের জীবনকথা বুঝিবার জন্য ইঁহাদিগের কিঞ্চিৎ পরিচয়ের প্রয়োজন।

শ্রীচৈতন্যদেবের জীবনকথাকে শ্রীচৈতন্যভাগবতকার শ্রীল বৃন্দাবনদাস ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার আদি লীলা, মধ্যলীলা ও অন্ত্যলীলা এই তিন ভাগে বিভক্ত করিয়াছিলেন। আমরা অতি সংক্ষেপে শ্রীচৈতন্যদেবের জীবনকথার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছি, এই জন্য আমরা শ্রীচৈতন্যদেবের জীবনকথাকে শ্রীনবদ্বীপলীলা বা গৃহস্থলীলা ও সন্ন্যাসলীলা বা প্রচারলীলা এই দুই ভাগে ভাগ করিয়া তাহার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব। প্রথমে শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার পরিকরবর্গের ও সুপ্রসিদ্ধ বৈষ্ণবাচার্য্যগণের জীবনকথার আলোচনা না করিলে গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের, সাহিত্যের তুলনা-মূলক সমালোচনার পথ প্রশস্ত হয় না, এই জন্যই আমরা প্রথমে ইঁহার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছি।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু (এম, এ, বি-এল)।

* বাণীনাথ পরবর্ত্তী কালে বর্দ্ধমান জিলায় চম্পকহট্ট বা চাঁপাহাটী নামক স্থানে বাস করেন। বৈষ্ণবেতিহাসে ইঁহার দুইটি পুত্রের সন্ধান পাওয়া যায়, জ্যেষ্ঠ নয়নানন্দ কালনায় সুবিখ্যাত গৌরীদাস পণ্ডিতের প্রধান শিষ্য এবং উড়িষ্যার প্রথিতকীর্ত্তি শ্যামানন্দ ঠাকুর বা দুঃখী কৃষ্ণদাসের গুরু। কনিষ্ঠ নয়নানন্দ উত্তরকালে ভরতপুরে বাস করেন।

স্বয়ংসিদ্ধা

[উপন্যাস]

সপ্তম উল্লাস

১

যে গুরুতর অপরাধের অজুহতে বিচারক আসামীর প্রতি দণ্ডবিধানে সমুৎসুক, আসামী কথার সূত্রে অপূর্ব্ব কৌশলে সেই অপরাধ বিচারকের উপর চাপাইয়া তাঁহাকেই প্রশ্ন করিয়া বসিল,—আপনিই বলুন, অপরাধ কার,—অন্যায় কোথায়?

এ ক্ষেত্রে উদ্ধত আসামীর স্পর্দ্ধা, সাহস ও ধৃষ্টতায় বিচারকের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিবারই কথা। কিন্তু বধূর তরফ হইতে এমন প্রচণ্ড আঘাত পাইয়াও কোপনস্বভাব কর্ত্তার ধৈর্য্য-বোমা ফাটিয়া উঠিল না, দুই চক্ষু পাকাইয়া তর্জ্জন তুলিতেও শোনা গেল না; বরং তাঁহার মুখের পূর্ব্ব ভাবটুকু আশ্চর্য্যরূপে পরিবর্ত্তিত হইতে দেখা গেল। বাহিরে যে জীবটির অপূর্ব্ব সাহস ও শক্তির পরিচয় পাইয়া তিনি তাহাকে নিজ গৃহে আশ্রয় দিয়াছেন, প্রতিপালক-স্থানীয় হইয়াছেন, অন্যের সম্বন্ধে সে যতই উদ্ধত হউক, তাঁহার নিকট মুখ নীচু করিয়াই থাকিবে, পীঠে চাবুক পড়িলেও তাহার ত চোখ পাকাইয়া চাহিবার কথা নহে! কিন্তু সেই জীবই আজ তাঁহাকে তাহার সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ কঠিন ও রূঢ় হইতে দেখিয়া, সুকৌশলী আততায়ীর ক্ষিপ্রতায় তাঁহার চিত্তের ক্ষতস্থানটুকু লক্ষ্য করিয়া এমন ভাবে যে আক্রমণ করিয়া বসিবে, তাহা তিনি ধারণাও করেন নাই। সুতরাং দারুণ বিরক্তিজনিত রূঢ়তার ছায়াটুকু তৎক্ষণাৎ মুখেই মিলাইয়া গেল ও সেই স্থলে ফুটিয়া উঠিল বিস্ময়ের গভীর রেখা।

দুর্ম্মুখ শ্বশুর ও মুখরা বধূ উভয়েই ক্ষণকাল নীরব,—কাহারও মুখে কথা নাই। কর্ত্তাই এই নীরবতা ভাঙ্গিয়া দিলেন, গম্ভীরভাবেই কহিলেন,—খাসা! বাঃ! হাঁ, নিজের কথার খেইটুকু যদিও আমি হারিয়ে ফেলেছি তোমার মুখের কথার তোড়ে, বৌমা, তবুও তোমাকে বাহোবা না দিয়ে পারছি না!

যদিও কর্ত্তার মুখ দিয়া নরম সুরেই কথাগুলি বাহির হইল, কিন্তু বধূর কাণে সেগুলি যেন বিদ্রূপের মতই শুনাইল; দুই চক্ষুর দৃষ্টি তীক্ষ্ণ করিয়া সে শ্বশুরের মুখের দিকে চাহিল।

চোখোচোখি হইতেই শ্বশুর কথার সুর অপেক্ষাকৃত সহজ করিয়া কহিলেন,—একটা গল্প তা হ'লে বলি শোনো, তা হলেই আমার কথাটা তুমি বুঝতে পারবে, বৌমা!—এক ভারী যোদ্ধা ছিল, তলোয়ার চালাতে তার মত ওস্তাদ সে অঞ্চলে আর দুটি ছিল না। এক দিন হঠাৎ খবর এল, আর এক যোদ্ধা এসে তার ভাইকে কেটে ফেলেছে। কথাটা শুনেই তার মাথায় খুন নেচে উঠল,—তলোয়ার নিয়ে তৈরী হয়ে তখনই ছুটলো সেই ভ্রাতৃঘাতী দুষমনের সন্ধানে। খানিক দূর যেতেই ভায়ের দেহ তার চোখে পড়ল; সে স্তব্ধ হয়ে দেখলে, আততায়ী তার তলোয়ারের একটি চোটেই কাঁধ থেকে কোমর পর্য্যন্ত একেবারে পৈতে-কাটা ক'রে তাকে কেটেছে! দেখেই তার মাথার খুন আর মনের রাগ কোথায় যেন মিলিয়ে গেল; বাহোবা দিয়ে ব'লে উঠলো সেই দুর্জ্জয় যোদ্ধা—'ক্যেয়া হাতকা

সাফাই!—এখন তোমার সম্বন্ধে আমার মনের অবস্থাও হয়েছে কতকটা এই রকমেরই, বুঝেছ?

বধূ শ্বশুরের এই মন্তব্য শুনিয়া তৎক্ষণাৎ উত্তর দিল,—কিন্তু আমার মনে হয়, বাবা, এটুকু সাময়িক মোহ ছাড়া আর কিছু নয়! একটু পরেই সেই যোদ্ধা নিশ্চয়ই তাঁর ভ্রাতৃঘাতীকে শাস্তি দিয়েছিলেন, আর এখানেও আমার মুখের দুটো কথায় এ মামলা অবশ্য ফেঁসে যায় নি, এর নিষ্পত্তি একটা হবেই।

কিন্তু মামলার মোড় ত তুমিই ফিরিয়ে দিয়েছ, বৌমা। তোমার বিরুদ্ধে যে নালিশ চলছিল, তুমি ত সে নালিশ আমার ওপরেই চালিয়ে দিলে!

অনেক নালিশের নিষ্পত্তি ত আপনাকে করতে হয়েছে, বাবা, আপনি নিশ্চয়ই জানেন, যে মামলার বাঁধুনীতে গলদ থাকে, শেষ পর্য্যন্ত তা গোপে টেঁকে না,—ফাঁস হয়ে যাবেই; আর, এমন অনেক মামলার কথাও শোনা গিয়েছে, যেখানে কেঁচো খুঁড়তে গিয়ে জাত-সাপ বেরিয়ে প'ড়ে সমস্তই ওলটপালট ক'রে দিয়েছে!

কি রকম?

এই ধরুন, খুনী আসামীর বিচার চলেছে: সাক্ষীদের কথায় প্রমাণ হয়ে গেল, সেই খুন করেছে; হাকিমের মনেও সেই বিশ্বাস; ফাঁসীর হুকুম হয় আর কি! এমন সময়, যাকে খুন করা হয়েছে ব'লেই মামলা, সেই মরা মানুষ সশরীরে আদালতে এসে হাজির! সবাই অবাক, এক মিনিটেই মামলার গতি ঘুরে গেল।

বধূর কথাগুলি নিবিষ্টভাবেই শুনিয়া কর্ত্তা একটু শ্লেষের সুরেই প্রশ্ন করিলেন,—কিন্তু যে হাকিম ঐ মামলার বিচার করতে বসেছিল, এত বড় গলদটা পাণ্টা নালিশের মতই বোধ হয় তারই ঘাড়ে আসামী চাপিয়ে দেয় নি?

কি সুত্রে এই শ্লেষাত্মক প্রশ্ন, তাহা বুঝিতে বধূর বাধিল না, শ্বশুরের মুখের দিকে একটিবার চাহিয়াই সে সহজকণ্ঠে উত্তর দিল,—হাকিমের ত কোনো দোষ ছিল না; যা নিয়ে মামলা, তার সঙ্গে বিচারকের নিজের সম্বন্ধ যদি না থাকে, তাঁর বিরুদ্ধে কেনই বা নালিশ উঠবে বলুন। পাণ্টা নালিশ অবশ্য উঠেছিল সেই লোকটার বিরুদ্ধে, যে খুনের এজেহা দিয়ে মামলার তদ্বির করেছিল। আর, আপনি যা বললেন বাবা, একখানা বিলিতি কেতাবে তার কথাও পড়েছি।

বিস্ময়ের সুরে কর্ত্তা প্রশ্ন করিলেন,—কি?

বধূ পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে শ্বশুরের মুখের দিকে চাহিয়া কহিল,—ও দেশের এক বড়লোকের ছেলে নাম ভাঁড়িয়ে কলেজের একটা মেয়ের সর্ব্বনাশ করে, তার পর একটি বছর তার সঙ্গে ঘরকন্না ক'রে স'রে পড়ে। মেয়েটা তখন মনের দুঃখে পাপের পথেই এগিয়ে যায়। বিশ বছর পরে সেই মেয়েটিই এক খুনী মামলার আসামী হয়ে কাঠগড়ায় দাঁড়ায়; বিচারক তার সুচেহারা ও উচ্চশিক্ষার পরিচয় পেয়ে তাকে জিজ্ঞাসা করলেন,—এ কায তুমি কেন করলে? মেয়েটি তখন তার পূর্ব্বকথা সমস্তই প্রকাশ ক'রে বললে,—আমার এই অধঃপতনের মূলে সেই প্রতারক; আপনিও ত বিচারক, আমার অপরাধের বিচার করতে বসেছেন, কিন্তু আমি যার বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলেছি, সে যেখানেই লুকিয়ে থাকুক, তাকে ধ'রে এনে তারও বিচার করা কি আপনার কর্ত্তব্য নয়?

কৌতূহলের সুরে কর্ত্তা প্রশ্ন করিলেন,—বটে! সে ত আচ্ছা মেয়ে;—তা হাকিম কি করলেন তার পর?

বধূ কহিল,—সেই প্রতারকের নাম জানতে চাইলেন। মেয়েটি নাম তার বললে, কিন্তু সে নাম যে বাজে, তাও জানিয়ে দিলে। এইবার বিচারক সাধারণ চোখেই মেয়েটির দিকে ব্যগ্র দৃষ্টিতে চেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন,—তোমারও কি তখন এই নাম ছিল? সেই ঘটনার পর মেয়েটিও তার নাম পালটেছিল, বিচারকের প্রশ্নে মাথা নেড়ে তার আসল নামটি শুনিয়ে দিলে। তখনই বিচারকের হাত থেকে কলম প'ড়ে গেল; সঙ্গে সঙ্গে তিনি চেয়ার ছেড়ে উঠে বললেন,—আমিই সেই প্রতারক, এর পরও যদি এই মামলার বিচার আমাকেই করতে হয়, তা হ'লে বিচারাসন কলঙ্কিত হবে!

বিস্ময়ের আবেগে কর্ত্তা কহিলেন,—এমন! তার পর কি হ'ল তাদের?

বধূ কহিল,—মেয়েটার ফাঁসী হ'ল না বটে, কিন্তু জেল হ'ল; আর জজ সাহেব যথাসর্ব্বস্ব ছেড়ে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে একটা মিশনে ঢুকে পড়লেন।

বধূর দিকে চাহিয়া এইবার কর্ত্তা মন্তব্য প্রকাশ করিলেন,—তোমার দেখছি পড়াশুনাও বেশ আছে, বৌমা।

বধূ দৃষ্টি নত করিল, কোনও উত্তর দিল না।

ইংরেজিও তা হ'লে জান ?

সহজ কণ্ঠে বধূ উত্তর দিল,—আমার দাদামহাশয় অনেকগুলো ভাষাই জানতেন, ইংরেজিতেও তিনি পণ্ডিত ছিলেন। আমার যা কিছু শিক্ষা তাঁরই কাছে।

জোরে একটি নিশ্বাস ফেলিয়া কর্ত্তা কহিলেন,—ইংরেজিতেও যে তুমি লায়েক হয়ে আছ, তা আমি ভাবি নি!

বধূর কাণে শ্বশুরের এই কয়টি কথা যেন তীক্ষ্ণ হইয়াই বিঁধিল, কিন্তু এ সম্বন্ধে কোনও কথা না তুলিয়া, এই আলোচনার মোড় ফিরাইবার অভিপ্রায়েই সে কহিল,—তা হ'লে এখন আমার ওপর আর কি হুকুম, বাবা ?

বধূর মুখে ঈষৎ ক্ষোভের রেখাটুকু তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লক্ষ্য করিয়া সহসা কঠিন স্বরে কর্ত্তা কহিলেন,—আসল কাযের ত এখনও কিছু হয় নি, মাঝে থেকে কতকগুলো বাজে কথা তুলে সময়টা কাটিয়ে দিলে; ভেবেছিলে, ঐ সব নজীর দেখিয়ে তোমার মামলাটা চাপা দেবে। কিন্তু ভবী ভোলবার নয়,—তোমার কথায় আমি ভুলি নি, তোমার ঐ সব কথায় আমি কাণ দিয়েছি ব'লে তুমি যদি ভেবে থাক বিচারের কথা আমি ভুলে গিয়েছি, সে তোমার মস্ত ভুল।

শ্বশুরের এই কথায় বধূর মুখে ক্লেশের চিহ্ন ফুটিয়া উঠিল, কিন্তু তথাপি তাহাতে বিদ্যুতের মত হাসির একটু তীক্ষ্ণ ঝিলিক তুলিয়া সে কহিল,—এতক্ষণ পরে আমার সম্বন্ধে কি এই ধারণাটুকুই আপনি স্থির ক'রে নিয়েছেন, বাবা ?

হাঁ, যদি তাই করা হয়. সেটা কি অন্যায় হয়েছে তুমি বলতে চাও ?

এ ভাবে আপনার সঙ্গে কথা-কাটাকাটি করা আমার পক্ষে হয় ত অন্যায়, আমি শুধু বলতে চাই, আমার বিরুদ্ধে যে নালিশ আপনি শুনেছেন, আমি তা মেনে নিচ্ছি, আপনি আমাকে শাস্তি দিতে পারেন।

আর তুমি যে নালিশ তুলেছ আমার বিরুদ্ধে আমারই কাছে, তার কি হবে ?

আমি তা তুলে নিচ্ছি।

তা হয় না; যে কথা আমার বিরুদ্ধে তুমি বলেছ, তোমাকে তা প্রমাণ করতেই হবে। না পার, বাড়ীশুদ্ধ সকলের সামনে দাঁড়িয়ে ঘাড় হেঁট ক'রে তোমাকে বলতে হবে,—তুমি অন্যায় করেছ, মিথ্যে বলেছ।

তা হ'লে প্রকারান্তরে আমাকেই মিথ্যা বলতে হয়, কিন্তু ঐ কাযটি আমাকে দিয়ে হবে না, বাবা। আমি যা-যা বলেছি, তার কোনটি যে মিছে নয়, আমি যেমন জানি, আপনিও জানেন।

আমি জানি ?

হাঁ, জানেন আপনি।

বৌমা!

আপনি বৃথা উত্তেজিত হচ্ছেন, বাবা, কিন্তু আগেকার কথা সবই ভুলে গিয়েছেন! দু'বছরের কোলের ছেলেটিকে আপনার হাতে তুলে দিয়ে আমাদের মা—ঐ ঘরে দেবীর মত যাঁর ছবি এখনও জ্বল্-জ্বল্ করছে—স্বর্গে চ'লে যান!

হাঁ, স্বীকার করছি তোমার কথা; আর, বাগুলীশুদ্ধ সবাই এ কথা জানে। কিন্তু তাতে কি হয়েছে ?

মা এই অনুরোধটুকু যাবার সময় ক'রে যান, যেন তাঁর খোকার কোনও খোয়ার না হয়, তার ওপর বরাবর আপনার নজর থাকে, মা নেই ব'লে ছেলে যেন অনাদর না পায়। আপনি তাতে সায় দিয়েছিলেন।

সম্ভব; কিন্তু এ কথা আজ তোলবার মানে ? আর, তুমিই বা এ সব কথা জানলে কি ক'রে ?

কুলবধূর অধিকারটুকু দিয়ে এ বাড়ীতে আমাকে এনেছেন বলেই এ সব কথা জানা আমার পক্ষে প্রয়োজন হয়েছিল বাবা, আর জানতে পেরেছিলুম বলেই আপনার সামনে মুখ তুলে আজ বলতে সাহস পাচ্ছি, আমাদের মার মৃত্যুশয্যায় ব'সে আপনি যে তিনটি প্রতিশ্রুতি তাঁকে দিয়েছিলেন, তার কোনটিই রাখতে পারেন নি।

তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে বধূর মুখের দিকে চাহিয়া শ্লেষের সুরে শ্বশুর কহিলেন,—অথচ দু'বছরের সেই মাতৃহীন শিশুটি আজ যৌবনের সীমানায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে; আর তারই হাতখানি ধ'রে তুমি এ বাড়ীতে কুলবধূ হয়ে ঢোকবার অধিকারটুকু পেয়েছ!

শ্বশুরের এই রূঢ়-বিদ্রূপে কিছুমাত্র সঙ্কুচিত না হইয়া তেজোদৃপ্ত স্বরে বধূ কহিল,—ছেলেকে বড় ক'রে তুলেছেন, তারই গৌরব আপনি করছেন, বাবা! পরক্ষণে কি ভাবিয়া কণ্ঠের স্বর সহজ করিয়া বধূ কহিল,—বিনা অনারকে

াগানের ভেতর দু'একটা এমন গাছও থাকে, আর শটা গাছের আওতায় যারা বেড়ে ওঠে; কিন্তু সে ভাবে াদের বাড়াটা কি শ্রেয়স্কর, তাতে সার্থকতা কিছু আছে?

বৃদ্ধ এবার নির্ব্বাক্! কি কথায় কোন্ কথা আসিয়া াড়িল! স্তব্ধবিস্ময়ে তিনি বধূর মুখের দিকে তাকাইয়া িছলেন, এ কথার উত্তর তাঁহার মুখে তৎক্ষণাৎ যোগাইল া। শ্বশুরকে নিরুত্তর দেখিয়া বধূই পুনরায় কহিল,— ায়সের দিক দিয়ে ছেলেকে শুধু বাড়তেই দিয়েছেন, কেন া, সেটা দাবিয়ে রাখা যায় না। কিন্তু আর সব দিক দিয়েই তাকে ধরে-বেঁধে ছোট ক'রে রেখেছেন! এত বড় াপনার জমিদারী, সমস্তই আপনার নখদর্পণে, কিন্তু াড়ীর ভেতর থেকেও ঐ ছেলেটির দিকে আপনি দৃষ্টি দেবারও অবসর পান নি!

বিচলিত হইয়া এবার কর্ত্তা সজোরে উচ্চকণ্ঠে কহিলেন, —তুমি এ সব কথা আমাকে বলতে সাহস পাচ্ছ, বৌমা?

মুখের কথায় রীতিমত জোর দিয়াই বধূ কহিল,—সত্য কথা বলতে ত সাহসের অভাব হয় না, বাবা! আমি যে-সব কথা বলছি, হয় ত আপনার ভাল লাগবে না, কিন্তু সব কথাই সত্য। মা-হারা ছেলের কান্না আপনি বরদাস্ত করতে পারেন নি, মাইনে করা দাসীদের কাছে তাকে সঁপে দিয়েছিলেন। তারা সহরের ফেরত, ছেলে শান্ত করবার ওষুধ জানত! ছেলের কান্না আর কাণে বাজে না, আপনি খুসী হলেন; কিন্তু প্রহরে-প্রহরে বিষ গিলিয়ে যে তারা ছেলেকে ঘুম পাড়িয়ে রাখছিল, তার সন্ধান কোনও দিন নিয়েছিলেন, বাবা?

বিষ গিলিয়ে ঘুম পাড়াত!

দুধের সঙ্গে মরফিয়া খাওয়াত, ছেলে তাতে সহজে ঘুমিয়ে পড়ত, বায়না আর তুলত না;—এমনি ক'রে বছরের পর বছর দাসীদের আদর-যত্ন পেয়ে ছেলের মন দিন দিন মুসড়ে পড়ে, বাড়তে পারে নি!

বধূর এই অশ্রুতপূর্ব্ব কথায় অতীতের স্মৃতি যেন কর্ত্তার মস্তিষ্কে তাল-গোল পাকাইয়া নৃত্য জুড়িয়া দিল; মনের বিক্ষোভ সবলে দমন করিয়া প্রশ্ন করিলেন,—এ সব কি অদ্ভুত কথা তুমি বলছ, বৌমা, যা আর কেউ জানে না, আমি জানি না, তুমিই শুধু—

চিত্তের বিষম চাঞ্চল্যে কর্ত্তার মুখের কথা আর শেষ হইল না, বধূই সঙ্গে সঙ্গে কথার খেইটুকু ধরিয়া উত্তর দিল,—শুধু আমি নই বাবা, যারা এ কায করেছিল, তাদের মধ্যে রাখালী ম'রে গেছে, শ্যামা ম'রে গেছে, বেঁচে আছে শুধু নিস্তারিণী; পক্ষাঘাতে একটা অঙ্গ তার প'ড়ে গেছে, দিনও তার ফুরিয়ে এসেছে। তাকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেই সব জানতে পারবেন।

বধূর মুখের দিকে সবিস্ময়ে চাহিয়া কর্ত্তা কহিলেন,—তুমি এখানে এসেই এত খবর নিয়েছ,—অথচ এতগুলো বছরের ভেতর, এ সম্বন্ধে আমি কিছুই কোন দিন শুনি নি!

বধূ এবার একটু হাসিয়া কহিল,—আপনি যে এ সব কিছুই জানতেন না, সে কথা ঠিক; কিন্তু এর জন্যে যে অপবাদ, আপনি তা থেকে ত রেহাই পেতে পারেন না, বাবা! আপনার জমিদারীর হাজার হাজার প্রজার ঘরের সমস্ত খবরই আপনি রাখেন, সে দিকে আপনার কড়া নজর, তাতে সবাই ধন্য ধন্য করে; কিন্তু নিজের বাড়ীর ভেতরে এত বড় অনাচার, আপনি তার কোনও খবরই সংগ্রহ করতে পারেন নি! এই জন্যেই আমি বলতে সাহস পেয়েছি বাবা, আপনার আচরণে ওঁরা ঠকেছেন! এখন আপনিই বলুন, আমার বলাটা কি অন্যায় হয়েছে?

কর্ত্তা আড়-নয়নে বধূর উজ্জ্বল মুখের দিকে চাহিয়া তাহার স্পর্দ্ধার কথাগুলি সমস্তই শুনিলেন। পরক্ষণে দৃষ্টি ফিরাইয়া নীরবে মনে মনে কি ভাবিলেন, মুখে গাম্ভীর্য্যের রেখা ফুটিয়া উঠিল; সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার কণ্ঠস্বর বিকৃত হইয়া নির্গত হইল,—ন্যায়-অন্যায় বিচার হবে পরে, তার আগে তোমার তূণের সব কটা তীরই ছোড়া ত হয়ে যাক্!

শ্বশুরের মুখের কথাগুলি, বলিবার ভঙ্গীতে তীরের মতই বধূর মর্ম্মে বিঁধিল; কিন্তু মুখে ক্লেশের ভাবটুকু প্রকাশ না করিয়া বধূ সামান্য একটু হাসিয়াই উত্তর দিল,—আপনি গুরুজন, আদেশ যখন করছেন, বাবা, তূণ আমি খালি করবই; কিন্তু এখনই কি তার প্রয়োজন হবে?

দৃঢ়কণ্ঠে উত্তর হইল,—নিশ্চয়ই; এর নিষ্পত্তি আগে ক'রে তার পর অন্য কায; রেহাই কারুর নেই, তোমারও নয়, আমারও নয়।

বধূ শ্বশুরের কথার শেষাংশে সায় দিয়াই কহিল,—ভগবানের রাজ্যে কাযের জবাবদিহি যে সবাইকেই করতে হয়, রেহাই পাবার যো কি ! হিসেব ফেলে রাখলে, এক দিন সমস্ত জড় হয়ে গোল বাধায় ; কাযেই অনেকগুলো বছরের ফেলে-রাখা হিসেবের তলব যখন আজ পড়েছে বাবা, সহজে রেহাই পাবার ত উপায় নেই ; তবে ভয় হচ্ছে, পাছে এই সূত্রে মনে বেশী রকমের আঘাত পান।

বধূর কথাগুলি শ্বশুরকে যদিও অসহিষ্ণু করিয়া তুলিতেছিল, তথাপি শেষ পর্য্যন্ত শুনিবার কৌতূহলটুকুও তাঁহাকে ব্যগ্র করিতেছিল ; কথা শেষ হইতেই তিনি মনের ভাবটুকু প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপের ভঙ্গীতে তীক্ষ্ণ কণ্ঠে ব্যক্ত করিলেন,—আমি পাছে আঘাত পাই, সেই জন্মই তোমার ভাবনাটা বুঝি এখন বড় হয়ে উঠছে, বৌমা ! এটা বুঝি পাঞ্জাবী সভ্যতার কায়দা ?

গ্রীবা তুলিয়া বধূ রুক্ষস্বরে প্রশ্ন করিল,—এ কথা কেন বল্‌লেন, বাবা ?

কথাটা বধূকে আঘাত দিয়াছে বুঝিতে পারিয়াই কর্ত্তা গম্ভীর হইয়া কহিলেন,—শুনেছি, ওরা একখানা হাত পায়ে আর একখানা হাত গলায় রেখে লোকের সঙ্গে কথা কয়, ভদ্রতা রক্ষা করে।

বধূ তৎক্ষণাৎ দৃঢ়স্বরে উত্তর দিল,—সে হয় ত দেনা-পাওনার ব্যাপারে, যারা মহাজনী করে, তাদের সম্বন্ধে হয় ত এ কথা বলা চলে ; কিন্তু দেনা-পাওনা নিয়ে ত আমাদের কথা হচ্ছে না, বাবা। আর মহাজন হয়েও ত আমি আপনার সামনে দাঁড়িয়ে কথা কই নি !

কর্ত্তা এবার সহসা উত্তেজিত হইয়া উচ্চকণ্ঠে কহিলেন,—নিজের কথাতেই এবার ধরা প'ড়ে গিয়েছ তুমি ! একটু আগেই হিসেবের কথা তোমার মুখেই শুনেছি ; দেনা-পাওনা নিয়েই ত এই ঝঞ্ঝাট ! মহাজন হয়েই ত তুমি আমার সামনে আজ দাঁড়িয়েছ, বৌমা—তোমার পাওনা আদায় করতে।

বধূ কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া সপ্রতিভ কণ্ঠেই কহিল,—বেশ, আপনার কথাই আমি তা হ'লে মেনে নিচ্ছি, বাবা ; কিন্তু রাগ করবেন না, একটা কথা আমি জানতে চাইছি,—যে দেনা আপনি এ পর্য্যন্ত করেছেন আমাদের কাছে, পরিশোধ করতে পারবেন ?

বধূর এই প্রশ্নে স্তব্ধ হইয়া কর্ত্তা কয়েক মুহূর্ত্ত তাহার উৎসাহদীপ্ত মুখখানির দিকে চাহিয়া রহিলেন, তাহার পর আস্তে আস্তে কহিলেন,—কি চাও ?

উদ্দীপ্তকণ্ঠে বধূ এবার উচ্ছ্বাসের সুরে উত্তর দিল,—এতে চাইবার কি আছে ; যদি থাকত, আগেই চাইতুম, বধূর অধিকারটুকু যখন পেয়েছি—তার জোরেই ; কিন্তু এখন চাওয়া বৃথা,—কেন না, এ দেনা শোধ করবার সামর্থ্য আপনার নেই।

কণ্ঠস্বর অতিশয় কর্কশ করিয়া কর্ত্তা কহিয়া উঠিলেন,—আমার সামর্থ্য নেই ?

বধূ তাহার কোমল কণ্ঠস্বরে বিশেষভাবে জোর দিয়া কহিল,—না, বাবা, নেই।

স্বর অপেক্ষাকৃত কোমল ও মৃদু করিয়া কর্ত্তা কহিলেন,—আমার মুখের ওপর জোর ক'রে তুমি এ কথা বলছ ?

শ্বশুরের এ কথার উত্তরে বধূ গাঢ়স্বরে প্রতি কথাটি সুস্পষ্ট করিয়া কহিল, আপনিই আমাকে বলালেন যে, বাবা। আমার কি দোষ বলুন ! বেশ, দেনার ফিরিস্তি আমি দেখাচ্ছি শোধ করতে পারবেন ?—আপনার ত অর্থের অভাব নেই, ঐশ্বর্য্যও রাজার মতন, শক্তি-প্রতিপত্তি প্রচুর, তবুও আপনার উপযুক্ত ছেলের এ অবস্থা কেন ? শিক্ষা পায় নি, সহবত শেখান নি, বাহজগতের সঙ্গে পরিচিত হবার অবকাশটুকুও তাকে দেন নি ; অথচ ছেলের অবস্থা চেপে রেখে শুধু জমিদারী-চাল চেলে তাকে আমার সরল বাবার কাছে চালিয়ে দিয়েছেন ! আমার বাবা না জানলেও আমি ত জেনেছি, আমার কাছে আপনি কত বড় দেনা করেছেন, আপনিও মনে মনে জেনেছেন, আমাকে কি ভাবে ঠকিয়েছেন ! এর ক্ষতি আপনি পূরণ করতে পারবেন, আপনার জমিদারী—সঞ্চিত সমস্ত টাকাকড়ি, আর শক্তি-প্রতিপত্তি দিয়ে ?

অধৈর্য্যভাবে কর্ত্তা উত্তর দিলেন,—তুমি যে দেখছি আবল-তাবল যা' তা' ব'লে বক্তৃতা সুরু ক'রে দিলে, বৌমা ! মেয়েমানুষের জিবের এতটা দৌড় ত ভাল নয় !

বধূর উৎসাহ তখন প্রদীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে, শ্বশুরের বাধায় কর্ণপাত না করিয়া পূর্ব্ববৎ উচ্ছ্বাসের সুরেই কহিল—তা হ'লে একবার দয়া ক'রে ঐ ঘরে চলুন, বাবা, আমাদের মায়ের ছবি যেখানে জল্-জল্ করছে, তাঁর মুখের দিকে

যদি একটিবার চান, ঠিক এই প্রশ্নই আপনার মনের বন্ধ দরজায় আঘাত দেবে ; আপনাকে মানতেই হবে, ছেলের সম্বন্ধে অবহেলা ক'রে আপনি সেই সাধ্বীর অন্তিম অনুরোধ-টুকুও উপেক্ষা করেছেন, এখন আর কোনও প্রতীকার করতে পারেন না।

স্বর্গগতা সাধ্বী সহধর্ম্মিণীর কথাপ্রসঙ্গে সহসা কর্ত্তা যেন চমকিত হইয়া উঠিলেন, অতীতের বহু পুরাতন কথাই তাঁহার স্মৃতিপথে ভাসিয়া উঠিল, দুই চক্ষু অশ্রুভারাক্রান্ত ও কণ্ঠ যেন তাহার আবর্ত্তে রুদ্ধ হইয়া আসিল।

শ্বশুরের মুহ্যমান অবস্থা দেখিয়াও বধূ তাহার প্রহরণ সম্বরণ করিল না, কয়েক মুহূর্ত্ত চুপ করিয়া থাকিয়াই পুনরায় সে কহিল,—আর আপনার ছেলেও যদি এ সম্বন্ধে আপনার কাছে অভিমান ক'রে বলে—

ছেলের কথা উঠিতেই স্তব্ধ নীরব মেঘের বুক চিরিয়া সরব অশনি যেন হুঙ্কার দিয়া উঠিল। বিকৃত মুখে তিক্ত-স্বরে কর্ত্তা কহিলেন,—আমার ছেলে! অর্থাৎ তোমার স্বামী! কিন্তু তাঁরও অভিমান করবার এক্তিয়ার কিছু আছে না কি? আমরা ত জানি, ভগবান্ তাঁকে এ বংশের দুলাল ক'রে পাঠিয়েছেন—তাঁর মাথার ভেতর গোবর পূরে দিয়ে! এরই মধ্যে ঐ অসার পদার্থটুকু বুঝি সার হয়ে উঠেছে তোমারই সংস্পর্শে?

স্বামীর সম্বন্ধে পূজনীয় শ্বশুরের মুখে এই রূঢ় মন্তব্য শুনিয়া বধূ মনে মনে অত্যন্ত বিরক্ত হইলেও মুখে বা কথায় তাহা প্রকাশ না করিয়া অবিচলিত ধৈর্য্যের সহিত বেশ সহজ কণ্ঠেই এবার উত্তর দিল,—ভগবান্ সত্যই যার ওপর বিরূপ হয়ে অসার ক'রে সংসারে পাঠান, মানুষ কি কখনও তাকে শোধরাতে পারে, বাবা? যে অন্ধ হয়ে জন্মায়, কিম্বা কালা, বোবা বা বিকলাঙ্গ হয়ে দুনিয়ায় আসে, কেউ তাকে সারাতে পারে না। আমিও ত মানুষ, আমার শক্তি কতটুকু! হাঁ, তবে এ কথা আমি অস্বীকার করব না বাবা, তাঁর ভুলটুকু আমি ধরিয়ে দিয়েছি ; তাই তিনি আজ দেখতে পেয়েছেন, ভগবান্ তাঁর মাথার ভেতরে গোবর পূরে দেন নি, বাড়ীর মাতব্বররাই তাঁর মাথার উপরে গোবরের ঝোড়া চাপিয়ে দিয়েছেন।

কি রকম?

ভগবানপণ্ডিত দশচক্রে রাজার কাছে যে ভাবে ভূত সাব্যস্ত হয়েছিলেন, এঁরও অবস্থা অনেকটা সেই রকমই হয়ে দাঁড়িয়েছে, বাবা! গোড়াতেই আপনাকে বলেছি দাসীদের অত্যাচারের কথা ; একটু বড় হতেই যেমনই আর সব উপসর্গ এসে পড়ল, তখন সুরু হ'ল স্বার্থ নিয়ে তাঁর ওপর অত্যাচার।

স্বার্থ নিয়ে অত্যাচার! কাকে লক্ষ্য ক'রে এ কথা তুমি বললে শুনি?

আপনি কি মনে মনেও তা অনুমান করতে পারেন নি বাবা, যে, আমাকে আরও স্পষ্ট ক'রে বলতে হবে?

তা হ'লে তোমার নালিশ শুধু দাসীদের ওপর নয়, আরও ওপরে ছুটেছে? আস্পর্দ্ধা তোমার যে, আমাকে বিশ্বাস করাতে চাও—বড় হয়ে উঠলেও খোকাকে চক্রান্ত ক'রে বেকাম করা হয়েছে!

বিশ্বাস করা না করা আপনার ইচ্ছা ; কিন্তু কথার পিঠে কথা যখন উঠেছে, আর যে কথা আমি সত্য ব'লে জেনেছি, আমি কেন গোপন করব, বলুন!

ওঁকে বেকাম্ সাব্যস্ত ক'রে চক্রান্তকারীদের লাভ?

এ কথা জিজ্ঞাসা করাই যে বাহুল্য হচ্ছে, বাবা! আপনার জমিদারীর সাধারণ প্রজারাও জানে, ছেলে যদি বেকাম হয়, বড় হলেও সে জমিদারীর গদীর ওপর বসতে পারে না, তাকে ছোট ভায়েরই হাত-তোলা হয়ে থাকতে হয়!

বধূর এই নির্ভীক উক্তি শুনিয়া বৃদ্ধ আরাম-কেদারার হাতলটির উপর সবলে আঘাত করিয়া চীৎকার তুলিলেন,—উঃ, কি সর্ব্বনাশ! তুমি আমার এষ্টেট তছনছ করতে এসেছ,—গাঙ্গুলী-সংসার ভাঙ্গতে হাত তুলেছ!

বধূও সঙ্গে সঙ্গে দৃঢ়স্বরে উত্তর দিল,—না বাবা, আমি আপনার ভুলটুকুই শুধু ভেঙ্গে দিতে এমন মোরিয়া হয়ে উঠেছি।

বটে! কিন্তু ভুল শুধু আমি করিনি ; খোকা যে জড়-প্রকৃতি নিয়েই জন্মেছে, মাথায় তার বুদ্ধিশুদ্ধি কিছু নেই, কস্মিন্‌কালেও সে মানুষ হবে না,—বড় বড় বিদ্যাদিগ্‌গজরা তার ভার নিয়ে শেষে ঐ কথা ব'লে এলে দিয়ে গেছে।

যে-কোনও কারণেই হোক, তাঁরাও ভুল করেছেন ওঁর সম্বন্ধে।

আমি বাবা, আমি ভুল করেছি ; বছরের পর বছর

মোটা মোটা মাইনে নিয়ে যারা তাকে নাড়াচাড়া করেছে, তারাও ভুল করেছে, আর ক'টা দিনের চেনা-শুনায় তুমিই শুধু তাকে চিনেছ ?

বধূ নিরুত্তরে দৃষ্টি নত করিল, কিন্তু তাহার মুখে দৃঢ়তার রেখাগুলি আরও স্পষ্টভাবে ফুটিয়া উঠিল। বক্র-দৃষ্টিতে তাহা লক্ষ্য করিয়া কর্ত্তা কহিলেন,—তা হ'লে তুমি জোর করেই আমাকে বোঝাতে চাইছ যে, খোকার মাথার মধ্যে কোনও গোল নেই ; আমরা তাকে যতটা অপদার্থ মনে ক'রে আসছি, সে তা নয় ;—এই ত ?

বধূ সুস্পষ্টস্বরে উত্তর দিল,—আমার কথা ত আগেই বলেছি, বাবা !

অনেক কথাই ত তুমি বলেছ, বৌমা। কিন্তু একটা কথার সঙ্গে আর একটা কথার সামঞ্জস্য যদি না হয়, কোন কথার ওপরেই নির্ভর করা যায় না। প্রথমেই তুমি বলেছ, ঝুটো মাল আমি চালিয়ে তোমাকে ঠকিয়েছি !

মাল ঝুটো জেনেই ত আপনি চালিয়েছিলেন, বাবা। এখনও আপনার মনে দৃঢ় ধারণা, সে মাল ঝুটোই !

আমি না হয় এ কথা স্বীকার করছি ; কিন্তু তোমার মুখেই পুনরায় শুনতে পাচ্ছি, সে মাল ঝুটো নয়, আসল। তোমার কোন্ কথাটি তা হ'লে প্রকৃত ?

বধূ বুঝিল, বিচক্ষণ শ্বশুর তাহার কথার খুঁৎটুকু ধরিয়াই তাহাকে আঘাত করিতে যে অস্ত্র উদ্যত করিয়াছেন, তাহা অব্যর্থ। যে জন্য শ্বশুরকে সে অনুযোগ করিতে সাহস পাইয়াছিল, তাহারই শেষের কথায় তাহা খণ্ডন হইয়া যায়। কিন্তু অসাধারণ উপস্থিত-বুদ্ধির প্রভাবে বধূ তৎক্ষণাৎ দুইটি কথার সামঞ্জস্য করিতে প্রস্তুত হইল, কিছুমাত্র উত্তেজিত না হইয়া বেশ সহজকণ্ঠেই সে উত্তর দিল,—বিয়ের বাসরে সকলেই জেনেছিল, সোণা ব'লে আপনি পেতল চালিয়ে দিয়েছেন, বাবা। কিন্তু আমি তাদের সে ধারণা ঘুরিয়ে দিয়েছিলুম, নইলে সেখানেই একটা কেলেঙ্কারী কাণ্ড কিছু বেধে যেত।

বটে !

আমার দাদা মহাশয়ের আশীর্ব্বাদেই আমি বাসরেই জানতে পেরেছিলুম বাবা, আপনি আমাকে ঠকাবার চেষ্টা করলেও আমি ঠকি নি,—আসল বস্তু তার মধ্যে আছে, এক দিন সোণা হবেই। তাই কোনও গোল আর বাধে নি, আমারও নালিশ করবার প্রয়োজন হয় নি। আপনি জানতেন, কি আমাকে দিয়েছেন ; আমি জেনেছিলুম, কি ভেবে দিয়েছেন ; কিন্তু আমি কি পেয়েছি, সে কথা ত আমাকে জিজ্ঞাসা করেন নি কোনদিন, বাবা !

বক্রদৃষ্টিতে কিছুক্ষণ বধূর মুখের দিকে চাহিয়া কর্ত্তা সহসা প্রশ্ন করিলেন,—সেই সোণার চাবুকটা কি উদ্দেশ্যে আমি তোমাকে দিয়েছিলুম, মা ?

প্রশ্নের সঙ্গে সঙ্গে বধূ উত্তর দিল,—এখানেও সেই ভুল আপনি করেছিলেন বাবা, সেই জন্যই এ বাড়ীতে এসেই আমাকে স্বর্ণ-গর্দ্দভের সন্ধানে সমস্যায় পড়তে হয়েছিল।

আর, সে সমস্যা তোমার সোজা ক'রে দিয়েছিল নিবারণ! কিন্তু মা, তুমিও ঐখানে মস্ত ভুল করেছ, নিবারণ স্বর্ণ-গর্দ্দভ নয়, স্বর্ণ-সিংহ।

হাসিমুখেই বধূ কহিল,—সিংহের চামড়া প'রে একটা গর্দ্দভও কিছুকাল বনে রাজত্ব করেছিল, বাবা। কিন্তু বেশী দিন তার ধাপ্পাবাজী চাপা থাকে নি ;—এ গল্প আপনি অবশ্যই শুনেছেন !

সহসা অসহিষ্ণুভাবে রুক্ষস্বরে কর্ত্তা কহিয়া উঠিলেন,—কিন্তু তোমার সেই সত্যিকার সিংহটি কোথায় ? এক ঘণ্টার ওপর ত আমাদের তক্‌রার চলেছে, বাইরের দরজায় আমি যদি পাহারা বসিয়ে না আসতুম, মহলশুদ্ধ সবাই এখানে ছুটে আসত। কিন্তু তাঁর সাড়াশব্দই কিছু নেই,—নিজের গুহায় প'ড়ে ঘুমুচ্ছেন, কিম্বা ল্যাজ নাড়ছেন হয় ত ! আর, ও যদি নিবারণ হ'ত, তা হ'লে—

শ্বশুরের কথা শেষ করিবার অবসর না দিয়াই বধূ অসঙ্কোচে কহিল,—নিবারণের সঙ্গে ওঁর পার্থক্য এইখানেই, বাবা !

অতিশয় বিরক্ত ও অসন্তুষ্ট হইয়া জ্বলন্ত-দৃষ্টিতে কর্ত্তা বধূর মুখের দিকে চাহিলেন। এই ভয়াবহ দৃষ্টির আঘাত সহ্য করিয়া তাঁহার মুখের কথায় পুনরায় প্রতিবাদ তুলিবার মত সাহস কাহারও বড় একটা দেখা যায় নাই ; কিন্তু বধূ অকুতোভয়ে শ্বশুরের আরক্তমুখের দিকে চাহিয়া সহজ ভঙ্গীতে কোমল কণ্ঠে কহিল,—পরের মুখের কথা, আর নিজের মনের অনুমান, এদের ওপর এক তরফা জোর দিলে শেষকালে পস্তাতে হয় না, বাবা ?

ভ্রূকুটি করিয়া শ্বশুর জিজ্ঞাসা করিলেন,—এ কথার মানে ? কাকে লক্ষ্য ক'রে কথাগুলো বলা হ'ল, বৌমা ?

বধূ শ্বশুরের মুখের উপর অচঞ্চল দৃষ্টি স্থাপন করিয়া উত্তর দিল,—আমি খুব সোজা আর সত্য কথাই বলেছি, বাবা ! যে ভুল বরাবর হয়েছে, এখানেও যে ঠিক সেই ভুল হচ্ছে ; আপনি যখন বিচার করতেই এসেছেন, দলীল-দস্তাবেজ সবই যখন কাছে মজুত, তখন নিজের চোখে না দেখে ও-কথাগুলো বলা কি ঠিক হয়েছে ?

খুব জোরে একটা নিশ্বাস ফেলিয়া কর্ত্তা কেদারা ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন, দীর্ঘনিশ্বাসের সহিত রুদ্ধকণ্ঠ হইতে শুধু একটি অনুচ্চ স্বর নির্গত হইল,—হুঁ !

বধূ অপলক-নয়নে দেখিল, তাহাকে কোনওরূপ আহ্বান না করিয়াই তাহার শ্বশুর একাই অলিন্দের দরজা দিয়া তাহাদের পাঠাগারের দিকেই চলিয়াছেন !

পড়িবার ঘরখানির ভিতর এতক্ষণ কতকগুলি জটিল আঁকের সমাধান লইয়া একাগ্রচিত্ত গোবিন্দের অপূর্ব্ব সাধনা চলিয়াছিল ! অন্য কোন দিকেই তাহার ভ্রূক্ষেপ নাই, বধূ যে বাহিরের দ্বারে আঘাতশব্দ শুনিয়া উঠিয়া গিয়াছে ও এতক্ষণ কক্ষে অনুপস্থিত রহিয়াছে, তাহার সম্বন্ধেও সে সম্পূর্ণ অচেতন। টেবলের উপর প্রসারিত খাতাখানির পৃষ্ঠাতেই তাহার প্রাণশক্তি এমনভাবে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছিল, যেন খাতার বাহিরে আর কাহারও দিকে তাকাইবার বা খাতার আঁকগুলি সমাধা হইবার পূর্ব্বে অন্যদিকে মনকে চালাইবার তাহার নিজেরই কোনও সামর্থ্য নাই।

সহসা পরিপূর্ণ উল্লাসে করতালি দিয়া গোবিন্দ কহিয়া উঠিল,—ব্যস্ !—রুল অফ থ্রী ফিনিস্ !—এবার কি দেবে ?

আনন্দোচ্ছ্বসিতমুখে জিজ্ঞাসু নয়নে সে বধূর আসনের দিকে চাহিয়া দেখিল, বধূ সেখানে নাই এবং মুখখানি রীতিমত গম্ভীর করিয়া যিনি সে স্থলে দাঁড়াইয়া আছেন, এ সময় এ গৃহে এ অবস্থায় সে তাঁহাকে এ ভাবে দেখিবার কোনরূপ প্রত্যাশাই করে নাই ! তাহার মুখের হাসি ও মনের উল্লাস সেই মুহূর্ত্তেই কোথায় তলাইয়া গেল, এই অবস্থাতেও তাহার কর্ত্তব্যবুদ্ধি আজ সহসা সচেতন হইয়া উঠিল। তাড়াতাড়ি আসন ছাড়িয়া সে উঠিয়া দাঁড়াইল, এবং তাহার অজ্ঞাতেই যেন কণ্ঠ হইতে অনুচ্চ স্বর শ্রদ্ধাবিস্ময়ের সুরে বাহির হইয়া আসিল,—বাবা ! আপনি !

নিরুত্তরে বিস্ময়বিমূঢ় পুত্রের আপাদ-মস্তক তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিয়া বৃদ্ধ একখানা চেয়ার টানিয়া আস্তে আস্তে বসিলেন। সুবৃহৎ টেবলখানির উপর অনেকগুলি খাতা ও নানাবিধ কেতাব কেতাদুরস্তভাবেই রাখা ছিল। পর পর কয়েকখানি বাঁধানো বই হাতে লইলেন, খুলিয়া দুই চারিখানি পৃষ্ঠাও উল্টাইলেন, কিন্তু কোনও গ্রন্থের বিষয়বস্তু সম্ভবতঃ উপলব্ধি করিতে না পারিয়াই যথাস্থানে রাখিয়া দিলেন। অতঃপর যে খাতাখানি লইয়া গোবিন্দ ঘণ্টার পর ঘণ্টা গণিতের সাধনায় মগ্ন ছিল, সেইখানি তুলিয়া, ইংরেজিতে লেখা অঙ্কগুলির উপর বিস্মিতদৃষ্টি প্রসারিত করিয়া প্রশ্ন করিলেন,—এ সব তোমার লেখা, খোকা ?

খোকার মুখ হইতে মৃদুস্বরে উত্তর আসিল,—হাঁ।

পুনরায় প্রশ্ন হইল,—কি আঁক এগুলো ?

গোবিন্দ কহিল,—রুল অফ থ্রী ; আজ শেষ হয়ে গেল !

খাতার পাতাগুলি উল্টাইতে উল্টাইতে কৌতূহলের স্বরে পিতা জানিতে চাহিলেন,—তেরিজের কত পরে এ আঁকটা ?

পুত্রের মন পিতার প্রশ্নে উল্লাসে নাচিয়া উঠিল ; এমন ভাবে পিতা ত কখনও তাহার সহিত কথা কহেন নাই,—আজ তিনি তাহার খাতার আঁক দেখিয়া তাহার কাছেই জানিতে চাহিতেছেন—তেরিজের কত পরে এ আঁক !

উৎসাহের সুরে গোবিন্দ কহিল,—ওঃ ! তেরিজের অনেক পরে, বাবা ! তেরিজ ত য়্যাডিসন,—সে ত গোড়ায়, তার পর সবট্রাকসন, তার পর মল্টিপ্লিকেশন, তার পর ডিভিসন, তার পর—

পরবর্ত্তী অঙ্কের নামগুলি বলিবার অবসর পুত্রকে না দিয়াই পিতা পুনরায় প্রশ্ন করিলেন,—আচ্ছা, যে আঁক আজ তুমি শেষ করেছ বললে, ওর বাঙ্গালা নামটা কি ?

পুত্র তৎক্ষণাৎ উত্তর দিল,—ত্রৈরাশিক, বাবা !

মুখের ভাবটুকু পরিবর্ত্তন করিয়া পিতা কহিলেন,—ওঃ, বুঝিছি ; এ আঁক ত পাটীগণিতের প্রায় শেষের দিকেই ! তুমি ত্রৈরাশিক কষছ ! বটে !

অধিকতর উৎসাহভরে পুত্র কহিল,—শীগ্গীরই আমি পাটীগণিত শেষ ক'রে ফেলব। তখন, কি মজা !

আনন্দবিহ্বল পুত্রের মুখের দিকে দৃষ্টি বদ্ধ করিয়া পিতা

কহিলেন,—আমি ত শুনেছিলুম খোকা, তেরিজের কোটা তুমি পেরুতে পার নি, মাষ্টাররা হিমশিম খেয়ে এলে দিয়ে পালায়! অথচ, সেই তুমিই আজ ত্রৈরাশিক শেষ করেছ!

পিতার মুখের কথায় পুত্রের মুখখানি আপনিই হেঁট হইয়া পড়িল, সে মুখে যুগপৎ ব্যথা ও লজ্জার চিহ্ন প্রকাশ পাইল।

পুত্রের মুখভঙ্গী লক্ষ্য করিয়াই পিতা প্রশ্ন করিলেন,— কবে থেকে আবার কেঁচে-গণ্ডুষ আরম্ভ করা হয়েছে?

আনত-দৃষ্টি পিতার মুখের উপর স্থাপন করিয়া পুত্র নীরব রহিল। পিতা প্রশ্নটি পুনরায় পরিষ্কার করিয়া ব্যক্ত করিলেন,—আমার কথা কি বুঝতে পার নি, খোকা? আমি জিজ্ঞাসা করছি, লেখাপড়ার পাট ত চুলোয় গিয়েছিল, আবার সুরু করা হ'ল কবে থেকে?

ফুলশয্যার রাত থেকে।

বটে! ভাল, ভাল; আচ্ছা, শেখাচ্ছেন কে?

গোবিন্দ আবার মুখ হেঁট করিল, সুন্দর মুখখানি তাহার পিতার এই প্রশ্নে সহসা লাল হইয়া উঠিল। সহসা তাহার মনে পড়িয়া গেল বধূর কথা; সে দৃঢ়তার সহিত বলিয়াছিল, স্বামি-স্ত্রীর মধ্যে যে সব কথা হয়, তাহা কাহাকেও বলিতে নাই। কে তাহাকে পুনরায় লেখাপড়ায় ব্রতী করিয়াছে, আঁক শিখাইতেছে,—তাহা বলিতে হইলেই বধূর নাম তুলিবার কথা। কিন্তু তাহার যে নিষেধ! সুতরাং গোবিন্দ এ প্রশ্ন শুনিয়া নিরুত্তরে মুখ হেঁট করিয়াই রহিল।

পিতা আড়-নয়নে তাহা লক্ষ্য করিয়া মনে মনে হাসিলেন, পরক্ষণে পুনরায় প্রশ্ন করিলেন, এত কাল পরে হঠাৎ আঁকের উপর এ আগ্রহ কেন?

পুত্র দুই চক্ষু তুলিয়া কম্পিতকণ্ঠে গাঢ়স্বরে উত্তর দিল,— মানুষ হতে হ'লে আগেই যে আঁক শিখতে হয়, নইলে মাথা খোলে না।

পিতার পাকা মাথাটির ভিতর কে যেন সহসা একটি ছুঁচ ফুটাইয়া দিল! মনের ভাব গোপন করিয়া এবার একটু স্নেহের সুরেই তিনি কহিলেন,—বড় বড় মাষ্টারগুলো যখন তোমাকে পাটীগণিতখানা গুলে খাওয়াতে উঠে প'ড়ে লেগেছিল, তখন তোমার মাথার ভেতরে ও-কথাটা খেলে নি কেন?

পুত্র বালকের ন্যায় কোমলকণ্ঠেই উত্তর দিল,—ওঁরা ত কেউ আমাকে ও-কথাটা তখন বুঝিয়ে বলেন নি! খালি খালি বলতেন, আমি গাধা, আমার মাথার ভেতরটা খালি গোবরে ভরা, আমার কিছুই হবে না।

তার পর কেউ বুঝি তোমাকে বুঝিয়ে দিলে, তোমার মাথাটা খালি গোবরে ভরা নয়, চেষ্টা করলে তুমিও মানুষ হ'তে পার?

পুত্র নিরুত্তরে ঘাড়টি নাড়িয়া পিতার মন্তব্যে সায় দিল। সঙ্গে সঙ্গে এ সম্বন্ধে বধূর তীক্ষ্ণ কথাগুলি পিতার স্মৃতিপথে ভেরীর মত যেন ঝঙ্কার তুলিল,—ভগবান্ তার মাথার ভেতরে গোবর পুরে দেন নি, মাতব্বররাই তার মাথার ওপরে গোবরের বোঝা চাপিয়ে দিয়েছে!

অতঃপর নীরবেই তিনি কিছুক্ষণ ধরিয়া ঘরখানির সকল অংশই তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে দেখিলেন। বুঝিলেন, সত্যকার পড়াশুনাই এই ঘরে চলিয়াছে। টেবলের উপর পাশা-পাশি যে সকল বই ও খাতা ব্যবহার্য্য হিসাবে পড়িয়া ছিল, তাহাদের ভিতর হইতে একখানি খাতা তুলিয়া পিতা তাহার পাতায় পাতায় পরিষ্কার ছাঁদের লেখা দেখিলেন, পরক্ষণে পুত্রের দিকে চাহিয়া প্রশ্ন করিলেন,—এ লেখাও তোমার?

মাথা নাড়িয়া পুত্র জানাইল, না।

কার হাতের এ সব লেখা?

পুত্র নিরুত্তরে আবার মাথাটি হেঁট করিল। পিতা বক্রদৃষ্টিতে পুত্রের দিকে চাহিয়া প্রশ্ন করিলেন,—এ লেখা তা হ'লে বৌমার?

পুত্রের চিবুকটি বার দুই নড়িয়া উঠিল এবং তাহাতেই বুঝিতে পারা গেল, পিতার অনুমান সত্য।

খাতাখানির আদ্যোপান্ত দেখিয়া পিতা একটি সুদীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন,—তা হ'লে কেবল আঁকের রাস্তা দিয়েই এখন তোমার ছুটোছুটি চলেছে?

পুত্র দুই চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া কহিল,—আঁক ত খালি নয়, পড়তেও যে হয়।

বটে! তা' পড়াটা কি ভাবে চলেছে তোমার?

এই যে রুটিং দেখুন না।—কথার সঙ্গে সঙ্গে একখানি খাতার পাতাটি খুলিয়া পিতার হাতে তুলিয়া দিল। একটু বড় ছাঁদের বাঙ্গালা অক্ষরে খাতার পুরো পৃষ্ঠাটি ব্যাপিয়া

এই অপূর্ব্ব পড়ুয়ার অহোরাত্রের কর্ম্মধারা। স্তব্ধ বিস্ময়ে পিতা পড়িতে আরম্ভ করিলেন :—

ভোর পাঁচটা হইতে সাড়ে ছয়টা···	প্রাতঃকৃত্যাদি ও ব্যায়াম
সাড়ে ছয়টা হইতে সাতটা ···	মাতৃপূজা
সাতটা হইতে সাড়ে সাতটা ···	গীতাপাঠ
সাড়ে সাতটা হইতে আটটা	জলযোগ
আটটা হইতে দশটা	ইংরেজি সাহিত্য
দশটা হইতে বারোটা	স্নানাহার ও বিশ্রাম
বারোটা হইতে তিনটা	অঙ্ক
তিনটা হইতে পাঁচটা	বাঙ্গালা সাহিত্য
পাঁচটা হইতে সাড়ে সাতটা	জলযোগ, ব্যায়াম ও সায়াহ্নকৃত্যাদি
সাড়ে সাতটা হইতে আটটা	মাতৃপূজা
আটটা হইতে দশটা	সাময়িক পত্রিকা পাঠ ও বিবিধ আলোচনা
দশটা হইতে এগারটা ···	ভোজন ও বিশ্রাম
এগারোটা হইতে রাত্রি বারোটা	শাস্ত্রপাঠ

পড়া শেষ হইলে খাতাখানি পুত্রের হাতে ফিরাইয়া দিয়া শুধু একটি বিষয়ে পিতা প্রশ্ন করিলেন,—মাতৃপূজাটা কি ?

পুত্র কহিল,—ও-ঘরে মায়ের যে ছবি আছে, ঐ সময় তাতে ফুলের মালা পরিয়ে ধূপ-ধূনো গঙ্গাজল দিয়ে পূজো করি আর তাঁর কাছে এই ব'লে মানত করি,—মা গো! আমার মনের জড়তা ভেঙ্গে দাও, অজ্ঞানতার অন্ধকার দূর ক'রে দিয়ে বিবেকের আলো দেখাও, সত্যের পথ ধ'রে আমি যেন সত্যকার মানুষ হ'তে পারি।

দুই চক্ষু মুদিত করিয়া প্রার্থনার ভঙ্গীতে পুত্র পিতার সমক্ষে মাতৃপূজার পদ্ধতি বালকসুলভ সরলতায় ব্যক্ত করিল।

অতি কষ্টে এবার পিতাকে আত্মসম্বরণ করিতে হইল, উদগ্র অশ্রুধারাকে সবলে রুদ্ধ করিতে দুই চক্ষু তাঁহার স্ফীত হইয়া উঠিল; তাঁহার মনে হইল, বিবাহের দিনেও যুবক-পর্য্যায়ভুক্ত যে পুত্রের মনোবৃত্তি ছয় বৎসরের শিশুর অনুরূপ ছিল, আজ সে যেন সহসা কি এক অলৌকিক যাদুদণ্ডের স্পর্শের প্রভাবে যোড়শবর্ষীয় অধ্যয়নশীল কিশোরের প্রশংসিত মনস্বিতা অর্জ্জন করিয়া লইয়াছে;—এখনও যে কয়টি বৎসরের ব্যবধান রহিয়াছে, এই ভাবে উচ্চ সাধনা চলিলে, তাহার তিরোধানও দীর্ঘ সময়সাপেক্ষ নহে।

এই সময় পাঠাগারের ঘড়িতে তিনটা বাজিল,—সঙ্গে সঙ্গেই বাহিরের ঘণ্টাঘরের ঘোষণাও তাহার সমর্থন করিল। পিতা সচকিত হইয়া জোর করিয়া কণ্ঠ পরিষ্কার করিয়া কহিলেন,—তোমার ত এখন পড়বার সময় এল, খোকা। বেশ, তুমি পড়া আরম্ভ কর; আমি একবার ও-ঘরটা দেখে যাই।

কথা শেষ করিয়াই পিতা মধ্যের বড় ঘরখানির দিকে অগ্রসর হইলেন। সময়ের অপব্যয়ে পুত্র অধৈর্য্য হইয়া পড়িয়াছিল, এবার সে নিশ্চিন্ত হইয়া এ দিনের পাঠ্য বাঙ্গালা বইগুলি লইয়া বসিল।

মধ্যের কক্ষে প্রবেশ করিতেই সহধর্ম্মিণীর সুবৃহৎ আলেখ্য-খানির উপর হরিনারায়ণ বাবুর দৃষ্টি পড়িল।

স্বর্গীয়া পত্নীর এই আলেখ্যখানি বহুবারই তিনি দেখিয়াছেন; পত্নীর সহস্র স্মৃতিবিজড়িত এই কক্ষের এই স্থানটিতে দাঁড়াইয়া কত দিন অতীতের কত কথাই তিনি স্মরণ করিবার অবকাশ পাইয়াছেন, প্রিয়-বিরহের গভীর অনুভূতি কত সুদীর্ঘ নিঃশ্বাসেই ব্যক্ত করিয়াছেন!—কিন্তু আজ সেই পরিচিত কক্ষে, সেই আকাঙ্ক্ষিত আলেখ্য-সমীপে আসিয়া দাঁড়াইতেই তাঁহার মনে হইল, তিনি যেন কোনও সুপবিত্র পূজা-মন্দিরে এক অপূর্ব্ব দেবীপ্রতিমার সংস্পর্শে আসিয়াছেন! যদিও এই কক্ষের এক পার্শ্বে মহার্ঘ্য পালঙ্কে শুভ্র শয্যার নিদর্শন রহিয়াছে, তথাপি শুদ্ধাচারের শুচিতায় এখানকার প্রত্যেক বস্তুটিই যেন দেবতার নির্ম্মাল্যের মতই অনিন্দ্য ও অনবদ্য। অতীত জীবনের কত অহোরাত্রিই এই কক্ষে অতিবাহিত হইয়াছে, কিন্তু কোনও দিনই ত তিনি এখানে সুপবিত্র দেবালয়ের শাশ্বত গাম্ভীর্য্য অনুভব করেন নাই! আর, গৃহের এই পবিত্র সুন্দর পরিস্থিতি গৃহপ্রাচীরে অধিষ্ঠিতা স্বর্ণলতা গৃহিণীর প্রতিকৃতির উপরেও কি এক অনন্যপূর্ব্ব দ্যুতির বিকাশ করিয়া দিয়াছে! হরি-নারায়ণ বাবু দৃষ্টি প্রখর করিয়া দেখিলেন, আলেখ্যের অধিকারিণীর সীমন্তের যে অংশে সিন্দুর-রেখাটি নিতান্ত

ক্ষীণকায় ছিল, তাহা যেন কোনও সিদ্ধহস্তের তুলিকায় স্থূলতর হইয়া জল্-জল্ করিতেছে, শুধু এই পরিবর্তনটুকুতেই তৈলচিত্রের মুখখানির শোভা ও সৌন্দর্য্যের কতখানিই না উৎকর্ষ হইয়াছে! অথচ এই ত্রুটিটুকু ত এ পর্য্যন্ত তাঁহার চক্ষু দুটিকে পীড়া দেয় নাই। সীমন্তের এই সিন্দুরশোভা ও সুগন্ধ পুষ্পে নিপুণহস্তে রচিত অনুপম মালা চিত্রময়ীকে যেন প্রাণময়ী করিয়া তুলিয়াছে! অপলকনয়নে তিনি সেই দিকেই চাহিয়া রহিলেন। কিছুক্ষণ পরে দৃষ্টি নত করিতেই আলেখ্যখানির পাদপ্রান্তে শ্বেতপ্রস্তরের এক আধারের উপর নিবেদিত পুষ্পাঞ্জলির নিদর্শনও পাওয়া গেল; বুঝিলেন, চিত্রেশ্বরী দেবীর উদ্দেশে অর্ঘ্য ও পুষ্পসম্ভার শ্রদ্ধা সহকারে অর্পিত হইয়াছে; পুত্রের পড়াশুনার তালিকায় সকাল-সন্ধ্যায় মাতৃপূজার নির্দ্দেশ তৎক্ষণাৎ তাঁহার বিস্ফারিত চক্ষুর উপর ভাস্বর হইয়া উঠিল।

অতঃপর ধীরে ধীরে তিনি শয্যার দিকে অগ্রসর হইলেন। শয্যাটিও যে নির্দ্দিষ্ট স্থানটি হইতে সরিয়া গিয়া কক্ষের প্রান্তদেশে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দুইটি বাতায়নের মধ্যস্থলে আশ্রয় লইয়াছে, কক্ষে প্রবেশ করিয়াই তিনি তাহা লক্ষ্য করিয়াছিলেন। এখন নিকটে গিয়া দেখিলেন, শুধু স্থান নয়, তাহাতে আরও অনেক কিছুরই পরিবর্ত্তন হইয়াছে। শয্যার যে দুইটি সংযুক্ত আধার স্থূল গদি ও সুকোমল প্রচুর তোষকে আবৃত হইয়া কক্ষের শোভা ও চক্ষুর তৃপ্তি বাড়াইয়া তুলিত, তাহা দ্বিধা বিভক্ত হইয়া দুইটি আধারে পরিণত হইয়াছে, এবং গদী, তোষক প্রভৃতি সুকোমল আস্তরণের স্থলে স্থূল ও কর্কশ সতরঞ্চি আধারের মর্য্যাদা রক্ষা করিতেছে। মখমলের মত কোমল শুভ্র আচ্ছাদন-বস্ত্র অন্তর্হিত হইয়া তাহাদের স্থল অধিকার করিয়াছে একখানি মৃগচর্ম্ম। মধ্যে মাত্র একটি হাত ব্যবধানে এই ভাবে দুইটি শয্যা সন্ন্যস্ত। বিস্ময়-কৌতূহলে হরিনারায়ণ বাবু পাশাপাশি দুইটি শয্যাই হাত দিয়া টিপিয়া টিপিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন, কোনও পার্থক্যই কোনটির মধ্যে নাই; উভয় শয্যাই সুকঠিন ও শুচিতার প্রতীক। আরও লক্ষ্য করিয়া দেখিলেন, ভেলভেটের আস্তরণ-মণ্ডিত পালঙ্কের উপধানগুলির কোনও নিদর্শনই কোনও শয্যাতে নাই, শুধু প্রত্যেক শয্যার প্রান্তদেশে মাথা রাখিবার মোটা রকমের একটি করিয়া উপধান রহিয়াছে, শয্যার ন্যায় সেগুলিও কঠিন এবং তাহাদের আস্তরণ ভেলভেটের নহে; হাতে কাটা মোটা খদ্দরের ও সেগুলি গৈরিকবর্ণে রঞ্জিত; মৃগচর্ম্মের আস্তরণের উপর গেরুয়া উপধানগুলির সংস্থানে শয্যার সৌন্দর্য্য যেন আরও বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে।

আরও কিছুক্ষণ এই অপূর্ব্ব শয্যা দুইটির সম্মুখে স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া হরিনারায়ণ বাবু মনে মনে কি ভাবিলেন, তাহার পর আস্তে আস্তে পুনরায় স্বর্গীয়া সহধর্ম্মিণীর আলেখ্যখানির সান্নিধ্যে ফিরিয়া আসিয়া অনুচ্চস্বরে ডাকিলেন,—বৌমা!

আহ্বানধ্বনির অব্যবহিত পরেই বধূর সহজ কণ্ঠধ্বনি শুনা গেল,—ডাকছেন আমাকে, বাবা?

শ্বশুরের তীক্ষ্ণদৃষ্টি দ্বারের দিকেই পড়িয়াছিল; দেখিলেন, তাঁহার আহ্বানে সাড়া দিয়াই সপ্রতিভভাবে বধূ কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিতেছে, মুখে তাহার বিরাগ, বিক্ষোভ, অভিমান অথবা সংশয়ের কোন চিহ্নই নাই। কিয়ৎক্ষণ পূর্ব্বে দীর্ঘক্ষণ ধরিয়া যাহার সহিত তাঁহার বিষম বাদানুবাদ চলিয়াছিল, নিজে আঘাত পাইলেও, ক্ষমতার উৎকর্ষে তিনি যাহাকে কঠোরভাবে কথার আঘাত দিতে কৃপণতা করেন নাই এবং কথার শেষে ইচ্ছাপূর্ব্বক যাহাকে উপেক্ষা করিয়াই তাহার কক্ষে প্রবেশ করিয়াছিলেন, সেই অদ্ভুত মেয়েটি এমন সহজ ভঙ্গীতে তাঁহার আহ্বানে সাড়া দিয়া সম্মুখে আসিয়া জিজ্ঞাসু দুইটি চক্ষু তুলিয়া দাঁড়াইল, যেন কোনও অপ্রিয় ঘটনাই ইতঃপূর্ব্বে ঘটে নাই, আহ্বান পাইয়া আজ এইমাত্রই যেন সে ব্যগ্র হইয়া দেখা দিয়াছে।

মনের বিস্ময় মুখে প্রকাশ হইতে না দিয়াই বেশ গম্ভীরভাবে কর্ত্তা কহিলেন,—ও-ঘরে তোমার দলীল-দস্তাবেজ সমস্তই দেখে এলুম, বৌমা।

বধূ পলকের জন্য শ্বশুরের মুখের দিকে চাহিয়াই তৎক্ষণাৎ দৃষ্টি নত করিল, কোনও উত্তর দিল না।

আড়-নয়নে বধূর এই ভাব লক্ষ্য করিয়া শ্বশুর কথার সুর একটু বক্র করিয়াই কহিলেন,—কিন্তু এ-ঘরের কায়দা-কানুন হঠাৎ এ ভাবে পাণ্টানো হ'ল কেন, তা ত বুঝলুম না!

বধূ এবার চক্ষু তুলিয়া পুনরায় নিজের কণ্ঠকে শক্ত করিয়া আস্তে আস্তে উত্তর দিল,—পাণ্টাবার যে প্রয়োজন হয়েছিল, বাবা!

—প্রয়োজন হয়েছিল! তার মানে?

—মানে কি সত্যই বুঝতে পারেন নি বাবা,—ও-ঘরের দলীল-দস্তাবেজ সব দেখেও ?

বধূর স্পষ্ট কথায় শ্বশুরের মুখখানি সঙ্গে সঙ্গেই কঠিন হইয়া উঠিল; কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া সহসা বধূর মুখের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া রুক্ষকণ্ঠে তিনি কহিলেন, —এতক্ষণে তোমার মনের আসল উদ্দেশ্যটুকু আমি বুঝতে পেরেছি, বৌমা।

জিজ্ঞাসুনয়নে বধূ শ্বশুরের মুখের দিকে চাহিল। শ্বশুর কহিলেন,—বিয়ের রাতে তোমার বাবাকে আভাসে জানিয়েছিলুম, আমাদের কুলপ্রথা—গাঙ্গুলী-বাড়ীতে মেয়ে বধূ হয়ে প্রবেশ করলে, সম্বৎসরের মধ্যে ফেরবার উপায় থাকে না। তোমার বাবা এ নিয়ম পাণ্টাবার জন্য আপত্তি জানাতে, অনুরোধ করতে ক্রটি করেন নি, কিন্তু আমার সে কথা নড়ে নি। এখন আমার মনে হচ্ছে, আমার সেই কথাটা রদ করবার জন্যই তুমি এখানে বেপরোয়া হয়ে এই সব কাণ্ড বাধিয়েছ !

বধূর মুখে এতক্ষণে হাসির একটু ঝিলিক দেখা গেল, স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে শ্বশুরের মুখের দিকে চাহিয়া কোমলকণ্ঠে সে প্রশ্ন করিল,—এতে আমার লাভ কিছু খতিয়ে পেয়েছেন, বাবা ?

অসহিষ্ণুভাবেই শ্বশুর উত্তর দিলেন,—লাভ তোমার বাপের বাড়ী ফিরে যাওয়া ! তারা তোমাকে দেখেই যেই অবাক্ হয়ে তাকাবে, তুমিও তেমনি দম্ভ ক'রে শুনিয়ে দেবে,—এমন কাণ্ড সেখানে আরম্ভ ক'রে দিলুম যে, বুড়ো মুখের কথা পাণ্টাতে পথ পেলে না !

কিন্তু বৃথা বড়াই ত আমি কোনও দিন করিনি, বাবা। আর আমি ও জিনিষটা ভালোও বাসি না; আপনি তা হ'লে আমার সম্বন্ধে ভুল বুঝেছেন।

ভুল বুঝিছি ! সত্যি বলছ তুমি, বৌমা ?

আমি যদি বলি, আপনার ঐ কথাটাই আমার পক্ষে ঠিক 'শাপে বর' হয়ে গিয়েছে, তা হ'লে কি আপনি বিশ্বাস করবেন ?

মুখের কথার সুরটুকু পুনরায় নরম করিয়া শ্বশুর প্রশ্ন করিলেন,—কি রকম ?

বধূর মুখে দৃঢ়তার আভাস পাওয়া গেল, নিজের কণ্ঠ পরিষ্কার করিয়া সুস্পষ্টস্বরে সে কহিল,—বাসরে আপনার ছেলের পরিচয় পেয়েই আমি স্থির ক'রে নিয়েছিলুম, তাঁর মুক্তির জন্য সম্বৎসর ধ'রে এই-তপস্যাই আমি এখানে করব।

সংশয়ের সুরে শ্বশুর পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন,—সম্বৎসর তোমার বাপের বাড়ীর পথ বন্ধ জেনেও ?

গাঢ়স্বরে বধূ উত্তর দিল,—আমি ইচ্ছা ক'রে নিজেই সে পথ যে বন্ধ ক'রে এসেছি, বাবা !

তুমি বন্ধ ক'রে এসেছ, ইচ্ছা ক'রে ?

অশ্রুরুদ্ধ দুইটি স্ফীত চক্ষু শ্বশুরের মুখের উপর তুলিয়া বধূ কহিল,—সেই জন্যই তখন কনকাঞ্জলির বায়না তুলতে হয়েছিল,—আপনার দেওয়া মোহরের থালা মার আঁচলে ঢেলে দিয়ে সমস্ত বন্ধন ছিঁড়ে ফেলে শুধু একটি উদ্দেশ্যেই সমস্ত মন—সমস্ত লক্ষ্য আমার—

অন্তরের দুর্ব্বার উচ্ছ্বাসে বধূর কণ্ঠ সহসা রুদ্ধ হইল, পরের কথা কয়টি আর নির্গত হইল না।

শ্বশুর সহসা চমকিত হইয়া বিস্ময়ের সুরে কহিয়া উঠিলেন,—ও, বটে ! মনে পড়েছে ! পরক্ষণে মুখের ভাব ও কথার সুর পাণ্টাইয়া কহিলেন,—হ্যাঁ, তোমার লক্ষ্যটুকুও এবার ধরা প'ড়ে গিয়েছে ! ধ'রে নিলুম না হয় তোমার কথাতেই বাপের বাড়ীর পথ বন্ধ করেই এসেছ ; কিন্তু শ্বশুরবাড়ীতেও ক্রমশঃই ত আগড় বাঁধতে আরম্ভ করেছ ! কারুর তোয়াক্কা রাখতে চাও না, বাড়ীর বধূ তুমি, অথচ কারুর সঙ্গে তোমার সম্বন্ধ নেই, ভালমন্দ কোনও দিকেই দৃষ্টি নেই, সমস্ত কর্ত্তব্য ছেঁটে ফেলে শুধু নিজেই একটি লক্ষ্য বস্তু নিয়েই প'ড়ে আছ ! এ চমৎকার !

মুহূর্ত্তে বধূর মুখখানির উপর কে যেন কাঠিন্যের আবরণ পরাইয়া দিল, কণ্ঠ ও চক্ষুর দুর্ব্বলতা কোথায় পলকে নিশ্চিহ্ন হইয়া গেল, পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে শ্বশুরের মুখের দিকে চাহিয়া তেজোদৃপ্ত স্বরে বধূ কহিল,—এ প্রসঙ্গ ছেড়ে দিন বাবা, এর আলোচনা অপ্রিয় হবে।

শ্বশুরের আপাদমস্তক বধূর কথায় ক্রোধে কণ্টকিত হইয়া উঠিল, বধূ আজ অসীম স্পর্দ্ধায় আলোচনার ধারারও নির্দ্দেশ দিতে চায় ! বুঝিলেন, এই প্রসঙ্গটিই বধূর পক্ষে সাংঘাতিক হইয়া দাঁড়াইয়াছে, সুতরাং ইহাকেই অবলম্বন করিয়া তিনি বধূকে রীতিমত আঘাত দিতে উদ্যত হইলেন।

মুখের কথায় মনের ক্রোধটুকু ব্যক্ত করিয়া বিরক্তির

সুরে তিনি কহিলেন,—অন্যায়ের আলোচনা বরাবর অপ্রিয়ই হয়ে থাকে, বৌমা। এটা ঢাকবার চেষ্টা করাই মস্ত অন্যায়। আমি তোমাকে যা জিজ্ঞাসা করছি, তার উত্তর তোমাকে দিতেই হবে। তখনও তুমি জোর ক'রে বলেছ, কোন অন্যায় এ পর্য্যন্ত করনি তুমি, একটি মিথ্যা কথা কখনও বলনি!

বধূ মুখ হেঁট করিয়া নিরুত্তর রহিল, কিছুই বলিল না। কিন্তু তাহার এই নীরবতাই যেন প্রকাশ করিতেছিল,—এখনও সে উহাতে সায় দিতেছে।

কর্ত্তা এবার স্বরের উপর বিশেষ জোর দিয়াই কহিলেন, আমি বলছি বৌমা, নববধূর কোনও কর্ত্তব্যই তুমি এ পর্য্যন্ত করনি—বধূদের যেগুলো অবশ্য কর্ত্তব্য!

বধূ সেইভাবেই মুখখানি হেঁট করিয়া রহিল; শ্বশুরের কথায় কোনও প্রতিবাদ তুলিতে বা এ অভিযোগ অস্বীকার করিতে তাহাকে একটি কথাও বলিতে শুনা গেল না।

শ্বশুর এবার উৎসাহিত হইয়া কহিলেন,—বুঝিছি, তুমি 'না' বলতে পার না। তিনটে মাস পূরো হ'তে চললো, তুমি এ বাড়ীতে এসেছ; কিন্তু ব্যবহারে বাড়ীশুদ্ধ সকলকেই জানিয়েছ, তুমি তাদের কাউকে চাও না, আর কারুর দিকে তোমার লক্ষ্য নেই। অস্বীকার করবে তুমি এ কথা?

বধূ তথাপি নীরব, প্রস্তর-প্রতিমার মত একই ভাবে অপলক-নয়নে নতমুখে দাঁড়াইয়া রহিল।

শ্বশুর দৃঢ়স্বরে কহিলেন,—এ কথাও তুমি মেনে নিচ্ছ তা হ'লে। আমাকে আরও কঠিন হয়ে বলতে হচ্ছে বৌমা, কথাটা খুবই অপ্রিয়, কিন্তু সত্য,—তোমার শাশুড়ী, দেবর, ননদ,—এদের কারুর কোনও খবরই তুমি রাখ না, রাখা আবশ্যক মনে কর না,—আর, আর, এ কথাও সত্য যে, আমার দিকেও তোমার লক্ষ্য নেই!

বধূর মুখে কোনও পরিবর্ত্তনই দেখা গেল না, এমন কি, পর পর এরূপ অভিযোগেও তাহার মুখে চিন্তা বা আশঙ্কার কোন ছায়াও পড়িল না।

শ্বশুর মুখের স্বর এবার কিঞ্চিৎ নরম ও বিকৃত করিয়া কহিলেন,—এখন দুনিয়ার ভেতর তোমার একটি শুধু লক্ষ্য—স্বামী!

প্রস্তর-প্রতিমায় এতক্ষণে যেন প্রাণের স্পন্দন আসিল; সাড়ীর অঞ্চলটি গলায় ঘুরাইয়া শ্বশুরের পদতলে হেঁট হইয়া গড় করিয়া ভাবগদগদস্বরে বধূ কহিল,—আপনার এই অনুমানই আজ আমার পক্ষে পরম আশীর্ব্বাদ, বাবা!

একদৃষ্টে ক্ষণকাল বধূর দিকে তাকাইয়া শ্বশুর রুক্ষকণ্ঠে কহিলেন,—কিন্তু এইটিই নববধূর পক্ষে একমাত্র গৌরবের কথা নয়, বৌমা! সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী—এঁরাও বধূ ছিলেন, এঁদেরও স্বামী ছিল, শ্বশুর ছিল, সংসার ছিল—

বধূ বিনয়নম্রস্বরে কহিল,—কিন্তু কর্ত্তব্যের সমস্যা যখন এঁদের জীবনে ঝড় তুলেছিল, তখন স্বামী যে শুধুই এঁদেরও লক্ষ্য হয়েছিল, পুরাণেই ত সে পরিচয় পাওয়া যায়, বাবা!

বধূর এই প্রতিবাদে বিরক্ত হইয়া শ্বশুর কহিলেন,—পুরাণের কথা নিয়ে তোমার সঙ্গে তর্ক করবার আমার ইচ্ছা নেই, অবসরও নেই; আর তোমার এ কথার সমর্থন এ যুগে কেউ করবে না। তোমার দপ্তরখানায় ত দেখে এলুম, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কথামৃত রয়েছে; ও বই পড়েছ নিশ্চয়; তিনিই ত বলেছেন গো,—যে মেয়ে রাঁধে, সে কি চুল বাঁধে না! স্বামিভক্তি যেমন উচিত, লক্ষ্যও তেমনই সংসারের সব দিকে রাখা উচিত। যেমন, মাছ ধরতে ব'সে ছিপের ফাতনার দিকে লক্ষ্য থাকলেও, আর সব দিকেও তার নজর থাকে।

শ্বশুরের কথাগুলি নিবিষ্ট-মনে শুনিয়া বধূ মুখখানি তুলিয়া মৃদুকণ্ঠে কহিল, শ্রীরামকৃষ্ণদেব ও কথা সংসারীদের সম্বন্ধে বলেছেন বাবা, সংসারের নানা কাযে লিপ্ত থেকেও তাঁরা যাতে ভগবানের দিকে লক্ষ্য রাখতে পারেন; কিন্তু ধ্রুব, প্রহ্লাদ বা শুকদেবের সম্বন্ধে এ কথা ত বলা চলে না!

শ্লেষের সুরে শ্বশুর প্রশ্ন করিলেন,—তবে কি ওদের পথেই বেরিয়ে পড়া তোমারও বাসনা, মা!—সেই জন্যই কি সকলকে অবহেলা ক'রে একমুখী রুদ্রাক্ষ হয়ে উঠেছ?

বধূ এবার কণ্ঠস্বর দৃঢ় করিয়া কহিল,—একমুখী না হ'লে কোনও উচ্চ সাধনাই যে সিদ্ধ হয় না, বাবা!

শ্বশুরের মুখে বিস্ময়ের সুরে প্রশ্ন হইল,—সাধনা?

বধূ দৃপ্তস্বরে উত্তর দিল,—হাঁ বাবা, সাধনা; কিন্তু বাঙ্গালাদেশে আর কোনও বধূকে আমার মত এমন কঠিন সাধনা আরম্ভ করতে হয় নি! এমন কঠোর পরীক্ষাও আর কোনও দিন কোনও মেয়ের সামনে এসে বাধা তোলে নি; তাই বলি, বিয়ের রাতে

যে বস্তু আমি পেয়েছি, তাঁকেই পরম বস্তু ক'রে তুলতে শুধু তাঁরই দিকে লক্ষ্য আমাকে রাখতে হয়েছে। মহাভারতে পড়েছি, অস্ত্র-সাধনায় অর্জ্জুন চরম পরীক্ষা দেবার দিনটিতে শুধু ভাসপাখীর মাথাটার উপর লক্ষ্য রেখেছিলেন বলেই গুরু দ্রোণাচার্য্য তাঁকেই তীর ছোড়বার অধিকার দেন, অর্জ্জুনও সিদ্ধিলাভ করেন। যাঁকে নিয়ে আমার সাধনা, লক্ষ্য যে শুধু তাঁরই দিকে; তাঁকে সিদ্ধ ক'রে না তোলা পর্য্যন্ত এ লক্ষ্য যে ফেরাতে পারব, সে ভরসা কিছুতেই যে করতে পারি না, বাবা।

মুখখানি গম্ভীর করিয়া কর্ত্তা প্রশ্ন করিলেন,—তোমাদের এই সাধনা কত কাল চলবে?

বধূ কহিল,—আগেই ত বলেছি বাবা, সম্বৎসরের ব্রত নিয়েছি।

শ্বশুর কহিলেন,—বুঝেছি, কিন্তু সময়টা যে আপাততঃ সংক্ষেপ করবার প্রয়োজন হয়েছে।

বধূ দুই চক্ষুর উপর প্রশ্ন তুলিয়া নীরবে শ্বশুরের মুখের দিকে চাহিল।

শ্বশুর কহিলেন,—তোমার বিরুদ্ধে যখন নালিশ উঠেছে, সেটা ত অত দিন ফেলে রাখতে পারি না।

তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে শ্বশুরের মুখের দিকে চাহিয়া বধূ কহিল,—ঐ দিনগুলোর সঙ্গে আমার মামলার কি সম্বন্ধ, তা ত বুঝতে পারলুম না, বাবা! তবে কি বিচারের আগেই শাস্তির ব্যবস্থা হচ্ছে?

ঠিক তাই নয়, বরং তোমাকে বাঁচাবারই ব্যবস্থা করা হচ্ছে। এখন মামলা উঠলে, যে ব্রত তোমার আরম্ভ করেছ, তার ক্ষতি হ'তে পারে, লক্ষ্য অন্যদিকে পড়বারই সম্ভাবনা তাতে বেশী; সেই জন্যই তোমাকে ঐ কথাটা বলা হয়েছে। এখন আমার এই ইচ্ছা যে, আজ থেকে চারটি মাসের মধ্যেই তোমার ব্রতটার উদ্‌যাপন হয়ে যায়।

বধূর মুখের স্বর অর্দ্ধস্ফুট হইয়া বাহির হইল,—চারটি মাসের মধ্যে!

উৎসাহের সহিত কর্ত্তা মুখের কথার উপর জোর দিয়া কহিলেন,—হাঁ, চারটি মাস মাত্র সময় দেওয়া যাচ্ছে; আসছে আশ্বিনের দেবীপক্ষের প্রথম দিনটিতেই ব্রত তোমাকে উদ্‌যাপন ক'রে নিতে হবে। তার পরে বিচার তোমার আরম্ভ হবে। এখন শুধু তদন্তই চলবে দু'পক্ষের নালিশের।

বধূ সংযতস্বরে কহিল,—বিচারের জন্য আমার ভাবনা নয় বাবা, ভাবছি শুধু ব্রত পূর্ণ করবার দিন এত সংক্ষেপ হচ্ছে ব'লে।

শ্বশুর দৃঢ়কণ্ঠে কহিলেন,—তিনটে মাস ত ব্রতের কাযেই কাটিয়েছ বউমা, এখনও বাকি রইল চারটে মাস; এই কি কম? মাত্র ক'টা দিনের মধ্যেই যদি একটা ইমারত তৈরী ক'রে সাজিয়ে তোলা সম্ভব হ'তে পারে, এতগুলো মাস এখনও প'ড়ে রয়েছে, এর মধ্যে একটা মানুষ গ'ড়ে তোলা কেনই বা অসম্ভব হবে?

শ্বশুরের কথার সঙ্গে সঙ্গেই বধূর মুখখানি এক অপরিসীম উৎসাহের আভায় যেন প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। দুই চক্ষুর দৃষ্টি উজ্জ্বল করিয়া বধূ শ্বশুরের মুখের দিকে চাহিয়া দৃঢ়স্বরে কহিল,—আপনার যদি আশীর্ব্বাদ থাকে, এই অসম্ভব তা হ'লে সম্ভব হবে, বাবা!

বধূর কথায় এবার শ্বশুরের মুখে হাসি দেখা দিল, তার মধ্যেই একটু গর্ব্বের সুরেই তিনি কহিলেন,—এখন তবে বলি, ভবিষ্যৎ ভেবেই তখন সোণার চাবুকটি তোমার হাতে তুলে দিয়েছিলুম মা, সেইটির জোরেই এই অসম্ভবকে এক দিন তুমি সম্ভব ক'রে তুলতে পারবে জেনেই!

বধূর মনে হইল, শ্বশুরের কথার সহিত তাঁহার দেওয়া সেই সোণার চাবুকটির একটি আঘাত সজোরে তাহার পৃষ্ঠদেশ স্পর্শ করিল! সর্ব্বাঙ্গে একটা অসহ্য জ্বালার অনুভূতি সে প্রাণপণে সম্বরণ করিয়া, মুখের উপর ক্লেশের যে ভাবটুকু ফুটিয়া উঠিতেছিল, তাহা সবলে গোপন করিয়া, মিনতির সুরেই সে কহিল,—একটু অপেক্ষা করুন বাবা, আমি এখনি আসছি।

শ্বশুর তাঁহার দুই চক্ষুর দৃষ্টি প্রসারিত করিয়া দেখিলেন, বধূ ক্ষিপ্রপদে অপর পার্শ্বের সুসজ্জিত কক্ষটির ভিতর প্রবেশ করিল, ভিতর হইতে সামান্য যে শব্দ পাওয়া গেল, তাহাতে তিনি অনুমান করিলেন, বধূ তাঁহার তোরঙ্গ খুলিয়া কোনও কিছু বাহির করিতেছে। তাঁহার যুগল ভ্রূ সহসা কুঞ্চিত হইয়া উঠিল।

অতি অল্পক্ষণের মধ্যেই বধূকে ফিরিতে দেখা গেল; কিন্তু বধূর হাতের বস্তুটির উপর শ্বশুরের উৎসুক চক্ষু পড়িতেই তিনি অস্বাভাবিক স্বরে কহিয়া উঠিলেন,—আবার সেই সোণার চাবুক?

বধূ অতিশয় সহজ সুরেই উত্তর দিল,—হাঁ বাবা, যেমন আপনি দিয়েছিলেন, বাক্সেই তুলে রেখেছিলুম ; ব্যবহার করার প্রয়োজন হয় নি এ পর্য্যন্ত, তাই আপনার জিনিষ আপনাকে ফেরত দিচ্ছি।

দুই চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া বধূর দিকে চাহিয়া শ্বশুর সবিস্ময়ে কহিলেন,—ফেরত দিচ্ছ ?

বধূর ওষ্ঠপ্রান্তে হাসির একটি ক্ষীণ রেখা ফুটিয়া উঠিল, কহিল,—দেওয়াকে যদি একান্তই সার্থক ক'রে তুলতে না পারা যায়, রেখে ত কোনও লাভ নেই, বাবা। সেটা তখন বোঝা হয়েই দাঁড়ায়।

ম্লান দৃষ্টিতে বধূর দিকে চাহিয়া ভগ্নস্বরে শ্বশুর প্রশ্ন করিলেন,—তা হ'লে কি আমিই ভুল বুঝেছিলুম ?

বধূ সুসংযত দৃঢ়স্বরে উত্তর দিল,—আপনি যে এটি দেবার সময় ভাবতে পারেন নি বাবা, আসল যে বস্তুটি আমার জন্য তুলে রেখেছেন—সেটি মরচে পড়া লোহার, সোণার চাবুক দিয়ে ঘসে মেজে পিটে কস্মিন্‌কালেও তাকে সোণা ক'রে তোলা যায় না, তার জন্য প্রয়োজন—স্পর্শমণির। সেইটি পাবার জন্যই যে একমুখী রুদ্রাক্ষ হয়ে এই সাধনা, বাবা !

নিষ্পলকনয়নে শ্বশুর বধূর দৃপ্ত মুখখানির দিকে চাহিয়া রহিলেন।

বধূ সেই অবসরে সোণার চাবুকটি শ্বশুরের পদতলে রাখিয়া কণ্ঠস্বর গাঢ় করিয়া কহিল,—আমি এর মান রাখতে পারি নি বাবা, সেজন্য মাপ চাইছি।

হেঁট হইয়া সেই স্বর্ণময় প্রহরণটি তুলিয়া বিবর্ণমুখে শ্বশুর বধূর দিকে চাহিয়া কহিলেন,—সত্যই তুমি এর ভার বহন করতে অস্বীকার করছ, বৌমা ?

বধূ স্বচ্ছন্দে কহিল,—হাঁ বাবা, এ জিনিষটি সত্যই আমার পক্ষে দুর্ব্বহ। পরক্ষণেই বধূ কণ্ঠস্বর সহসা অস্বাভাবিকরূপে গাঢ় করিয়া কহিল,—আর এটি দেখলেই আমার সর্ব্বাঙ্গে জ্বালা ধরে।

নীরস স্বরে শ্বশুর কহিলেন,—বটে! ভাল, তা হ'লে এটার ভার না হয় নিবারণের হাতেই দেব।

বধূর মুখখানি মুহূর্ত্তের জন্য উত্তেজিত হইয়া উঠিল, জ্বলন্ত দৃষ্টিতে শ্বশুরের মুখের দিকে চাহিয়া এক নিশ্বাসে সে কহিয়া উঠিল,—তাই দেবেন ; কিন্তু আমাদের মায়ের দিকে ক্ষণকাল চেয়ে যদি জিজ্ঞাসা করতেন কোথায় ওটার স্থান, নিজের মনেই হয় ত তার অনুভূতি পেতেন, বাবা !

কথার সঙ্গে সঙ্গে বধূ যেন জোর করিয়াই দেহটাকে টানিয়া লইয়া পার্শ্বের ঘরখানির ভিতরে সবেগে প্রবেশ করিল।

শেষের কথাটায় যে খোঁচা ছিল, শ্বশুরের বুকে তাহা রীতিমত আঘাত দিল ; সঙ্গে সঙ্গে দুই চক্ষুর আর্ত্ত দৃষ্টি সহধর্ম্মিণীর আলেখ্যখানির উপর স্থাপন করিয়া উচ্ছ্বাসের সুরে তিনি কহিলেন,—যেখানেই তুমি থাক না কেন, সবই ত জানছ, যে অবিচার করেছি তোমার উপরে, তারই প্রতিক্রিয়া এত দিনে সম্ভব হয়েছে ; এখন তুমি যদি একটিবার নেমে এসে, এই সোণার চাবুক নিজের হাতে নিয়ে—গাঙ্গুলী-বংশের এই অযোগ্য স্বর্ণগর্দ্দভকে শাস্তি দিতে পার, তবেই হয় তার সত্যকার প্রায়শ্চিত্ত ! [ক্রমশঃ

শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়।

মোর পাশে রহ তুমি

প্রদীপ নিবিয়ে দাও—বসো বাতায়নে
প্রচুর ধবল জ্যোৎস্না রহে সঙ্গোপনে
প্রতীক্ষায় দ্বারে। বকুল-কুসুম সম
শুভ্র সাজে সর্ব্বতনু হবে নিরুপম।
শিথানে দাঁড়াও তুমি। নিষ্পলক চোখে
মুখে তব চেয়ে রই অর্দ্ধ ছায়ালোকে।

বেণুবন মর্ম্মরিবে শিহরিবে মন—
নির্জ্জন শয্যার 'পরে তন্দ্রায় মগন
রবে তুমি ; অশান্ত বাতাসে খনে খনে
এলো চুল চুমো খাবে তোমার নয়নে।
মাটির সোঁদাল গন্ধ নিস্তব্ধ নিশায়
পূবালী সমীর সাথে আসিবে হেথায়।

পূর্ণিমা-নিশীথে প্রিয়া—নভে ভরা চাঁদ
আজি তব মনে কোনো জাগে না কি সাধ !

বন্দে আলী মিয়া।

শ্রীরামকৃষ্ণ-দেব

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

ভক্ত-সমাগম—কামিনী-কাঞ্চন-ত্যাগ

১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে কলিকাতার ঠাকুরদের নৈনানের প্রমোদ-কাননে, শ্রীরামকৃষ্ণের সহিত দয়ানন্দ সরস্বতীর সাক্ষাৎ হয়। সঙ্গে ছিলেন কাপ্তেন বিশ্বনাথ উপাধ্যায়। দয়ানন্দ কেশবচন্দ্র সেনকে অতিশয় শ্রদ্ধা করিতেন। কেশব দেবতা মানিতেন না, তাই দয়ানন্দ কেশবের কথায় পোষকতা করিয়া বলিয়াছিলেন যে, ঈশ্বর যদি সর্ব্বশক্তিমান হন, তবে তিনি কি আর দেবতা সৃষ্টি করিতে পারেন না? নিরাকারবাদী দয়ানন্দ রূপে শ্রদ্ধাবান্ ছিলেন না, এই জন্য জপও মানিতেন না। কাপ্তেনকে 'রাম' নাম জপ করিতে দেখিয়া বলিলেন, "রাম রাম বলা আর সন্দেশ সন্দেশ বলার মধ্যে বিশেষ কোন তফাতই নাই। বরং সন্দেশ আমাদের জানা বা আস্বাদিত জিনিষ, কিন্তু রাম জিনিষ একেবারেই অজ্ঞাত, এইটুকুই তফাৎ।"

বিশ্বনাথ উপাধ্যায় শ্রীরামকৃষ্ণকে ১৮৭২-৭৩ খৃষ্টাব্দে দর্শন করেন। ইনি নেপালের রাজার কলিকাতার প্রতিনিধি বা Resident ছিলেন। ঠাকুর তাঁহাকে কাপ্তেন বলিয়া ডাকিতেন। তাঁহার পূর্ব্বকথা এইরূপ :— ইনি প্রথমে কলিকাতায় আসিয়া ঘুসড়ীতে নেপালের শালকাঠের গোলায় সামান্য বেতনে কর্ম্ম করিতেন। কাপ্তেন উত্তর-পশ্চিমের কনৌজী ব্রাহ্মণ ছিলেন—ভক্তবংশ। কাপ্তেনের পিতা ভারতীয় কোন এক ফৌজদলের সুবেদার ছিলেন। তিনি যুদ্ধক্ষেত্রেও এক হাতে যুদ্ধ অপর হাতে শিব-পূজা করিতেন। শাস্ত্রে বিশ্বনাথের বড়ই অনুরাগ ছিল। গীতা, অধ্যাত্ম ভাগবত, এমন কি, বেদান্ত পর্য্যন্ত তাঁহার এমন উত্তমরূপে জানা ছিল যে, যেন সে সব কণ্ঠস্থ। পূজা, জপ, আরতি, পাঠ, স্তব, এ সব নিত্যকর্ম্ম না করিয়া, তিনি জলগ্রহণ করিতেন না।

যখন ঘুসড়ীতে তিনি কর্ম্ম করেন, তখন এক দিন তিনি স্বপ্নে দেখেন যে, এক জন জ্যোতির্ম্ময় পুরুষ তাঁহাকে নিকটে ডাকিতেছেন। উপাধ্যায় এ আকর্ষণ অনুভব করিতে লাগিলেন, তবে তাহা তখনও তীব্র হয় নাই বলিয়া চুপচাপ রহিলেন। ইহার অল্পদিন পরে গঙ্গায় ভীষণ বান ডাকিল এবং সেই জলের তোড়ে, তাঁহার গোলার বহু শালকাঠ ভাসিয়া গিয়া অনেক টাকা লোকসান হইল। সে বৎসর আর বার্ষিক আয়ব্যয়ের কাগজ তিনি নেপাল সরকারে পেশ করিতে পারিলেন না। এ কারণ নেপাল-দরবার হইতে তাঁহার হাজিরা তলব হইল। ভয়ে বিশ্বনাথ অতিমাত্র বিচলিত হইলেন। স্বাধীন নেপালরাজ ইচ্ছা করিলে বিশ্বনাথের কঠোর শাস্তি হওয়া কিছুমাত্র আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। বিপদে ভগবান্‌কে ডাকিতে ডাকিতে বিশ্বনাথ নানা স্থানে সাধু দেখিয়া বেড়াইতে লাগিলেন; আশা, যদি কেহ তাঁহাকে অভয় দিতে পারেন। এইরূপে এক দিন উপাধ্যায় ঠাকুরের নাম শুনিয়া দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হইলেন। ঠাকুরকে দেখিয়া বিশ্বনাথ অতিমাত্র বিস্মিত হইলেন, কারণ, ইনিই তাঁহার সেই স্বপ্নদৃষ্ট পুরুষ। ঠাকুরের নির্জ্জন সঙ্গের আশায় সে রাত্রি বিশ্বনাথ দক্ষিণেশ্বরে রহিয়া গেলেন এবং ঠাকুরের সঙ্গে কথাবার্ত্তা কহিয়া ও তাঁহার ভাব দেখিয়া কাপ্তেন বুঝিলেন, ইনি সাধারণ ব্যক্তি নহেন। সাধারণ জটাধারী ও ভস্মাচ্ছাদিত সাধুর অনেক ঊর্দ্ধে ইঁহার স্থান। যাহা হউক, কাপ্তেন নিজের সঙ্কট-কথা ঠাকুরকে জানাইতে ভুলিলেন না এবং তাঁহার কৃপা প্রার্থনা করিলেন। ঠাকুর তাঁহাকে মা ভবতারিণীকে সমস্ত জানাইতে ও প্রার্থনা করিতে প্রথমে উপদেশ দিলেন এবং পরে নিজে অভয় দিয়া বলিলেন, রাজাকে সত্য কথা বলিও, তিনি তাহা অবিশ্বাস করিবেন, এমন মনে করিবার কোনই কারণ নাই। ঠিক ঠাকুরের কথাই ফলিয়া গেল। কাপ্তেনের প্রতি রাজা কাঠ ভাসিয়া যাওয়ার কোন দোষ দিলেন না, তাহা দৈব-দুর্ঘটনা বলিয়াই মানিয়া লইলেন। কিন্তু বিশ্বনাথের কপটতার অভাব—তাঁহার সততা, সত্যনিষ্ঠা

দেখিয়া তাঁহাকে কাপ্তেন এই উচ্চ উপাধিতে ভূষিত করিয়া অনেক অধিক বেতনে তাঁহাকে কলিকাতার রাজপ্রতিনিধি বা Resident করিয়া পাঠাইয়া দিলেন। বেতন হইল, ঠাকুর বলিতেন, "বছরে ছ হাজার টাকা।" ঠাকুরের কৃপাই তাঁহার পদোন্নতির কারণ, বিশ্বনাথ ইহা বিশ্বাস করিলেন এবং সেই জন্য তাঁহাকে সাতিশয় ভক্তি করিতে লাগিলেন। ঠাকুরের সেবা করিতে পারিলে কাপ্তেন নিজেকে কৃতার্থ বোধ করিতেন। ঠাকুর বরাহনগরের রাস্তা দিয়া এক দিন যাইতেছেন, এমন সময় বিশ্বনাথ আসিতেছিলেন। তিনি তাঁহাকে দেখিয়া তাঁহার মাথায় ছাতি ধরিয়া আতপ নিবারণ করিয়া সঙ্গে সঙ্গে যাইতে লাগিলেন। মধ্যে মধ্যে নিজের বাড়ীতে ঠাকুরকে নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া গিয়া কাপ্তেন স্বহস্তে তাঁহার পদসেবা করিতেন এবং নিজ হাতে বাতাস করিতেন। এমন কি, এক দিন পায়খানার মধ্যে ঠাকুর বেহুঁস হইয়া গিয়াছেন দেখিয়া, কাপ্তেন নিজে পায়খানায় প্রবেশ করিয়া, সযত্নে তাঁহাকে ছেলেমানুষের মত ঠিক করিয়া বসাইয়া, তাঁহাকে পায়খানা করাইয়া বাহিরে লইয়া আসিয়াছিলেন। ধন্য বিশ্বনাথের অকপট সাধুসেবা!

কাপ্তেনের স্ত্রী কাপ্তেনের মতই ঠাকুরকে ভক্তি করিতেন এবং নিজের হাতে নানাবিধ ব্যঞ্জন—পাটার চড়চড়ি রাঁধিয়া খাওয়াইতেন। ঠাকুর যতক্ষণ আহার করিতেন, ততক্ষণ তিনি বাতাস করিতেন। তিনিও গীতা পড়িয়াছিলেন। তাঁহার নিজের একটি ঠাকুর ছিল—গোপাল। কাপ্তেন কখনো কখনো স্ত্রীকে ও ছেলেমেয়েদের লইয়া ঠাকুরকে দেখিতে আসিতেন।

একবার কাপ্তেনের সঙ্গে নেপালের এক উচ্চপদস্থ ব্যক্তি জঙ বাহাদুরের ভাইপো—এক কর্ণেল ও তাঁর ছেলেরা ঠাকুরকে দক্ষিণেশ্বর দেখিতে আসেন। তাঁহারা পেণ্ট্‌লান বাহিরে খুলিয়া ধুতি পরিধান করিয়া তবে ঠাকুরের গৃহে প্রবেশ করিলেন, পাছে পেণ্ট্‌লান পরিধান করিয়া দর্শন করিলে সাধুর মর্য্যাদহানি ঘটে। আর একবার কাপ্তেনের সঙ্গে একটি নেপালী কুমারী ভক্ত মেয়ে দক্ষিণেশ্বরে আগমন করেন। তিনি ভাল গীতগোবিন্দ গান করিতে পারিতেন। তিনি গীত করিবেন শুনিয়া মথুরের পুত্র দ্বারিক বাবুরা—ঠাকুরের ঘরে আসিয়া বসিলেন। বাহিরের লোকের কাছে গান করিতে ইতস্ততঃ করায় ঠাকুর মেয়েটিকে বলিলেন, "এঁরা ভাল লোক, তুমি আমাকেও শুনাও, ওঁদেরও শুনাও।" তখন মেয়েটি গান গাহিল—সঙ্গে এসরাজ বাজাইয়া সঙ্গত করিল। সে মধুর গান শুনিয়া সকলে মোহিত হইলেন—দ্বারিকবাবু মধ্যে মধ্যে রুমালে অশ্রু মুছিতে লাগিলেন। দেবীকে যেমন সম্মান করা উচিত, নেপালীরা তাঁহাকে তেমনই সম্মান করিয়া, তাঁহার সঙ্গে কথা কহিত ও ব্যবহার করিত। ঠাকুর তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি বিবাহ কর নাই?" তাহার উত্তরে ভক্ত-মেয়েটি বলিলেন, "আমি এক ঈশ্বরের দাসী, আবার কার দাসী হব?"

ইহার কয়েক বৎসর পরে ঠাকুর যখন কেশব সেনের বাটী যাতায়াত করিতে আরম্ভ করিলেন, তখন কাপ্তেন কিন্তু তাহা পছন্দ করিলেন না। কেশব সেন ও তাঁহার দলের লোককে কাপ্তেন স্বেচ্ছাচার ও স্বেচ্ছাধর্ম্মী জ্ঞান করিয়া তাঁহাদিগের প্রতি শ্রদ্ধাহীন ছিলেন, তাই ঠাকুরকে বলিতেন যে, কেন তিনি ঐ ভ্রষ্টাচারী ব্যক্তিদের দলে মিশেন? তাহার উত্তরে ঠাকুর বলিয়াছিলেন যে, তিনি ত' কোন মতলব লইয়া কেশবের নিকট যান না। কেশব ভগবদ্ভক্ত, তিনি তাই তাঁহার মুখে ভগবানের কথা শুনিতে যান। তাহার পর ঠাকুর কাপ্তেনকে বলিলেন, তিনি যে কেশবের সঙ্গ করিতে বারণ কর্‌লেন, কিন্তু তিনি লাট সাহেবের বাড়ী যান ও তাহাদের সঙ্গ করেন কেমন করিয়া? কাপ্তেনের হিসাবে সাহেবরা ত' কেশব সেনের মতই ম্লেচ্ছ। তথাপি কার্য্যগতিকে ও চাকরীর খাতিরে তাঁকেও ত' লাট দরবারে যাইতে হয়, বসে-দাঁড়িয়ে থাকিতে হয়; রাজ-পুরুষদের সঙ্গে আলাপ করিতে হয়। এই কথা শুনিয়া অতঃপর কাপ্তেন এরূপ কথা ঠাকুরকে আর বলিতে পারেন নাই। সকল মানুষের এই স্বভাব—নিজের আচরণ ও ছিদ্র দেখে না—পরের ছিদ্র অনুসন্ধান করে। সেই জন্য ঠাকুর কাপ্তেনকে এই ঔষধ দিয়া তাঁহার চৈতন্য সম্পাদন করিয়া দিলেন। তা'ছাড়া কাপ্তেনের ধারণাও ভুল ছিল। ঠাকুর বলিতেন, 'আমি কুল খাই, কাঁটার খপরে আমার দরকার কি?' অর্থাৎ মধুকরের মত তিনি লোকের ভিতর হইতে তাহার ভাবের সারাংশমাত্র গ্রহণ করিতেন, বাকি ত্যাগ করিতেন। তাহাতে সঙ্গদোষ তাঁহাকে আক্রমণ করিতে পারিত না।

ঠাকুরের নিকটে তখনও অধিক ভক্ত-সমাগম হইতেছে না দেখিয়া কাপ্তেন কখনো কখনো দুঃখ করিয়া বলিতেন যে, বাঙ্গালীরা চোখ থাকিতেও অন্ধ। হাতের ধারে এমন অমূল্য রতন তাহাদের অপেক্ষায় বসিয়া থাকা সত্ত্বেও তাহারা এঁকে চিনতে পারলে না। কাপ্তেনের আর বিলম্ব সহ্য হইতেছিল না। তিনি ইচ্ছা করিতেছিলেন, যেন

সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর

ধর্মপিপাসুমাত্রেই আসিয়া এই রসসাগরে ঝাঁপাইয়া পড়ে। কাপ্তেন যদিও গান গাহিতে পারিতেন না, কিন্তু বেশ ভাল ভাল স্তব জানিতেন ও সুরলয়সহ সে সব স্তব ঠাকুরকে শুনাইতেন। ঠাকুরও বলিতেন, যখন কাপ্তেন পূজাতে বসিতেন, তখন তাঁহার ভাব দেখিলে বোধ হইত, তিনি ঠিক যেন একটি ঋষি। পূজান্তে উঠিলে বোধ হইত যেন কুর্দ্দয়ের পাতাতে পিঁপড়ে কামড়াইয়াছে অর্থাৎ ধ্যানজন্য চক্ষুর উপর পাতা দু'টি ফুলো-ফুলো দেখাইত। ঠাকুর তাঁহাকে কিন্তু আর অধিক পাঠ করিতে নিষেধ করিয়া দিয়াছিলেন। ঠাকুরের কোন সিদ্ধাই ছিল না দেখিয়া কাপ্তেন বলিতেন যে, ঠাকুর মাছ খান বলিয়া তাঁহার সিদ্ধাই হয় নাই। কাপ্তেনের মতে যাহারা আহার করেন, তাঁদের কাছে অষ্টসিদ্ধি থাকিতে পারে না। কাপ্তেনের সাতিশয় মাতৃভক্তি ছিল। মা'র সম্মুখে সর্ব্বদা নীচে বসিতেন, মাকে উচ্চ আসনে বসাইতেন। মাঝে মাঝে মাকে কাশীতে পাঠাইতেন এবং সঙ্গে দাস-দাসী যথেষ্ট সংখ্যায় পাঠাইতেন—যাহাতে মা'র সেবার কষ্ট না হয়। আলাপের পর প্রথম প্রথম ঠাকুর কাপ্তেন-দম্পতিকে একটু ব্যয়কুণ্ঠ দেখিয়াছিলেন, কিন্তু শেষে আয়-ব্যয় সম্বন্ধে আর তাঁহারা হিসাব করিতেন না। কাপ্তেন ঠাকুরকে গুরুবৎ ভক্তি করিতেন এবং ঠাকুরও বিশ্বনাথ উপাধ্যায়কে অতিশয় ভালবাসিতেন এবং তাঁহার গুণের সুখ্যাতি ভক্তগণের নিকট সর্ব্বদাই করিতেন।

কাপ্তেনের সঙ্গে শ্রীঠাকুর একবার রাজা সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের বাড়ীতে গিয়াছিলেন। শ্রীঠাকুর তাঁহাকে প্রথমেই কিন্তু বলিলেন যে, তাঁহাকে রাজা-টাজা ব'লে ডাকিতে পারিবেন না। কেন না, তা হইলে মিথ্যা কথা বলা হইবে। খেতাবী রাজা ঠাকুরের মতে সত্যকারের প্রজা-রঞ্জক রাজা নহেন, তাই তিনি এইরূপ বলিলেন। ঠাকুরের সঙ্গে তাঁহার কিছুক্ষণ ঈশ্বরীয় কথা হইয়াছিল। তাহার পর সাহেব ও অন্যান্য দর্শক আসাতে কথার গতি ভঙ্গ হইল। যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরকে এ স্থানে সাক্ষাৎ করিবার জন্য ডাকা হইলে তিনি সংবাদ পাঠাইলেন, তিনি আসিতে পারিবেন না, কারণ, তাঁহার গলায় বেদনা হইয়াছে।

এই সময় এক দিন কৃষ্ণদাস পাল ঠাকুরকে দর্শন করিতে দক্ষিণেশ্বরে আসিলেন। তিনি এক জন ভারত-বিখ্যাত

দেশ-প্রেমিক ছিলেন। তিনি ঠাকুরের বিষয় সংবাদপত্রে পাঠ করিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসেন।

তিনি "হিন্দু-প্যাট্রিয়ট্" নামক ইংরেজি সংবাদপত্রের সম্পাদক ছিলেন। ঘোর রজোগুণী হইলেও তাঁহার হিন্দুয়ানীতে নিষ্ঠা ছিল। একটু কথাবার্ত্তার পরই ঠাকুর

কৃষ্ণদাস পাল

বুঝিলেন যে, তাঁহার ভিতরে ধর্ম্মভাবের কোন উন্মেষই হয় নাই। ঠাকুর জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার মতে মানুষ-জীবনের কর্ত্তব্য কি?" উত্তর আসিল—'জগতের হিত'। তখন ঠাকুর যদিও তাঁহার বিদ্যা-বুদ্ধির কথা অনেক শুনিয়াছিলেন, তথাপি তাঁহার প্রশংসা করিতে পারিলেন না, বরং বলিলেন যে, তাঁহার বুদ্ধি অনেকটা রাঁড়ীপুতের বুদ্ধির মতই হীন। অতি দুঃখিনী বিধবার পুত্র যদি কোনক্রমে মানুষ হয়, তবে তাহার মন থাকে সামান্য ভোগের জিনিষের দিকে, যাহার অভাব সে আবাল্য অনুভব করিয়া কেবলই সেইগুলি পাইতে বাসনা পোষণ করিয়া আসিয়াছে। পাল মহাশয়ের জগতের হিত করা বুদ্ধি সম্বন্ধেও ঠিক ঐরূপ বলা যায় যে, তিনি জীবনের মহৎ লক্ষ্য ত্যাগ করিয়া ছোট জিনিষের দিকে চোখ রাখিয়াছেন। ভগবানলাভই জীবনের উদ্দেশ্য, অন্য কোন উদ্দেশ্যই মানুষের শ্রেয় হইতে পারে না। তাহাতে কৃষ্ণদাস বলেন যে, ধর্ম্ম ধর্ম্ম করিয়া ভারতবর্ষের এমন হীনদশা উপস্থিত হইয়াছে এবং ভারতীয় লোকরা বহু বিষয়ে ত্যাগ স্বীকার করিয়াছে, সেই জন্য ভারতবর্ষ বহুশতবর্ষ পরাধীন হইয়া রহিয়াছে। ধর্ম্ম ছাড়িয়া এখন দেশের লোকের সেবা দ্বারা লোক সংগ্রহ করা ও তাহাদিগকে জাগাইয়া তোলাই উপযুক্ত কার্য্য। উত্তরে ঠাকুর বলিলেন যে, পাল মহাশয়ের ভাবা উচিত যে, জগৎ এতটুকু স্থান নয় যে, জগতের উপকার করিব মনে করলেই করা যায়। জগৎ মানে অসংখ্য জীব ও অনন্ত কাণ্ড! ভগবানের ইচ্ছা ও শক্তি ছাড়া একটি সামান্য প্রাণীরও বিন্দুমাত্র উপকার করিবার ক্ষমতা কাহারও নাই। বর্ষাকালে গঙ্গার জলে এক প্রকার কাঁকড়ার বাচ্ছা দেখা যায়, তাহাদিগকে 'মেকুই পোকা' বলে। এই দর্শনসময়ে গঙ্গায় এই পোকা আসিয়াছিল। ঠাকুর তাই বলিলেন যে, ঐ একপ্রকার ক্ষুদ্র পোকারই গণনা হয় না। মানুষও ভগবানের সৃষ্টিতে ঐ পোকার মত আর একটা জীব ছাড়া কিছুই নয়। সেই ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কীটবৎ মানুষ আবার জগতের উপকার করিবে বলিয়া আস্ফালন করে! পাল মহাশয়কে এই কথাটা ঠাকুর তলাইয়া ভাবিতে বলিলেন। তাহা হইলে তিনি নিজেই বুঝিতে পারিবেন যে, তাঁহার কেবল অনধিকারচর্চ্চাই হইতেছে। তাহা না করিয়া মানুষ-জীবনলাভ করিয়া ঈশ্বরলাভের চিন্তা করাই বুদ্ধিমানের কার্য্য। জগতের উপকার যেখানে যাহা করা প্রয়োজন, তাহার জন্য মার সৃষ্টিতে কোন প্রকার উপায়, আয়োজন ও কর্ম্মীর অভাব নাই। তার পর দান কি সবই একপ্রকার? অন্নদান দান বটে, তার চেয়ে বড় দান বিদ্যাদান—সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দান জ্ঞানদান, ভক্তিদান। পাল মহাশয় এখন কি দান করিবেন, কি দিয়া জগতের উপকার করিবেন, তাহাও কি ভাবিয়া দেখিয়াছেন? ঠাকুরের কথা শুনিয়া পাল মহাশয় আর বাঙ্‌নিষ্পত্তি করিতে সমর্থ হইলেন না। তিনি মনে মনে কি ভাবিলেন বলা যায় না, তবে ঠাকুরকে প্রণাম

করিয়া তিনি প্রস্থান করিলেন এবং পরে আর তাঁহার সহিত ঠাকুরের সাক্ষাৎ ঘটে নাই।

মথুরের বিধবা পত্নী জগদম্বা দাসী এই সময়ে চানকে এক অন্নপূর্ণার মূর্ত্তি ধূমধাম সহকারে প্রতিষ্ঠা করিলেন। দ্বারিকা বাবু ঠাকুরকে প্রতিষ্ঠা উৎসব উপলক্ষে লইয়া গেলেন। তিনিও অনেক আনন্দ করিয়া ও সকলকে আনন্দ দান করিয়া উৎসব জমাইয়া দিলেন। ঠাকুর এই সময়ে প্রসঙ্গক্রমে দ্বারিক বাবুদের উপদেশ দিয়া বলিয়াছিলেন, "ভগবানের আনন্দলাভ করিতে হইলে ভক্তি-বিশ্বাসের চার দিতে হয়, তবে অগাধ জলের মাছরূপ সচ্চিদানন্দকে দেখতে পাওয়া যায়।"

পূর্ব্বেই বলা গিয়াছে যে, প্রথম বারে শ্রীমাতা-ঠাকুরাণী দক্ষিণেশ্বরে বর্ষাধিক কাল বাস করিবার পর পিত্রালয়ে ফিরিয়া গিয়াছিলেন। ১৮৭৪ (১২৮১) বৈশাখে শ্রীমা আবার দক্ষিণেশ্বরে আসিবার জন্য কামারপুকুর জয়রামবাটী হইতে যাত্রা করিলেন। সঙ্গে রামলালের ভগিনী ও ঠাকুরের ভ্রাতুষ্পুত্রী লক্ষ্মীদেবী ও আরও কয়েক জন সঙ্গী সঙ্গিনী। এই যাত্রায় পথিমধ্যে শ্রীশ্রীমা ভীষণ-দর্শন, রৌপ্যবলয়ধারী, কৃষ্ণকায় ও দীর্ঘ লগুড়বাহী ডাকাতি-ব্যবসায়ী এক বাগ্দীর বা ডুলের হাতে পড়িয়াছিলেন। তবে সৌভাগ্যক্রমে বাগ্দিনীও ঐ সঙ্গে ছিল। ঘটনার বিবরণ এইরূপ;—যাত্রার প্রথম দিন পথ চলার পর তাঁহার সঙ্গীরা তাঁহার মন্থর গমনে অধৈর্য্য হইয়া তাঁহাকে ও তৎসঙ্গে দুই বৃদ্ধা সঙ্গিনীকে ফেলিয়া অগ্রসর হন, ক্রমে অদৃশ্য হইয়া যান। এ দিকে বিরাট এক প্রান্তরমধ্যে দিনশেষে পথ হারাইয়া যখন শ্রীশ্রীমা প্রমাদ গণিতেছিলেন, তখন উপরি-উক্ত ঐ সঙ্গিদ্বয় তাঁহাদের দলে আসিয়া মিলিত হয়। তারকেশ্বরের পথে জনমানবের বাসহীন এই অসীম প্রান্তরমধ্যে তখন ডাকাতির ভয় খুবই ছিল। এই বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগেও সে ভয় সম্পূর্ণ অদৃশ্য হইয়াছে কি না সন্দেহ। এই সীমাহীন মাঠের মধ্যে সন্ধ্যায় এই ভীষণদর্শন সঙ্গীর সম্মুখে পড়িলে অতি সাহসীরও মনে ভয় হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু শ্রীমা ভীতা হইলেও ভয়ের সহিত প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব না হারাইয়া সেই পুরুষকে দর্শনমাত্রই বাবা ও স্ত্রীলোকটিকে মা বলিয়া ডাকিলেন এবং তাঁহারা সকলে পূবে অর্থাৎ বৈদ্যবাটী অভিমুখে যাইতেছেন, তাহাও জানাইলেন। কি আশ্চর্য্য, সদ্যঃ কন্যাহারা বাগ্দিনীর মনে এই জগজ্জননীর মা ডাকে হঠাৎ এমন বাৎসল্য সঞ্চার হইল যে, শ্রীমাকে ঠিক নিজ গর্ভজাত সেই বিবাহিতা কন্যার মতই সে বোধ করিল এবং মাকে অভয় দিয়া ডাকাত-পত্নী বলিল, "তোমার ভয় নাই মা, আমরা তোমার সঙ্গীদের ধরাইয়া দিব, তুমি নিশ্চিন্ত থাক, মা।" রাত্রে সেই ভীষণদর্শন অথচ স্নেহকোমল-হৃদয় দম্পতি শ্রীমার ও তাঁহার সঙ্গিনীদের যথাযোগ্য আহারের যোগাড় করিয়া কন্যার ন্যায় তাঁহাকে খাওয়াইয়া শোয়াইয়া নিজেরা সতর্ক প্রহরীর মত জাগিয়া রাত্রি কাটাইল। পরদিন তাঁহাকে লইয়া ধীরে পথ চলিয়া—কখন বৃক্ষতলে বিশ্রাম করাইয়া সমস্ত দিন হাঁটিয়া দিনান্তের পর নিরুদ্দেশে রাত্রি যাপন করিল। সঙ্গীদের এখনও দেখা নাই। তৃতীয় দিন তাঁহারা বৈদ্যবাটীতে পৌছিলে শ্রীমা সঙ্গীদের সহিত মিলিত হইলেন। দুই দিনের সাহচর্য্যে ও সেবার সুযোগ লাভ করিয়া এই বাগ্দী-দম্পতি শ্রীমার মধুর বাক্যে ও মিষ্ট স্বভাবে তাঁহার প্রতি এতই স্নেহপ্রবণ হইয়া পড়িয়াছিল যে, তাঁহার কাছে তাহাদের ডাকাতি ব্যবসার কথা স্বীকার করিল। তাহারা এমন কার্য্য আর করিব না বলিয়া তাঁহার কাছে এই প্রতিশ্রুতিও দিল। শেষে তাঁহাকে ছাড়িয়া বিদায় লইতে হইবে, এই চিন্তায় কাঁদিয়া আকুল হইল। তাঁহাকে ছাড়িতে তাহাদের মন যেন চাহিতেছিল না। শেষে একান্তই ছাড়িতে হইবে দেখিয়া মা'র আঁচলে কিছু জলপান ও কিছু কাঁচা মটরশুঁটী বাঁধিয়া দিয়া শ্রীমায়ের পাতান মা ও সেই ডাকাত বাবা সজল-নয়নে বিদায় গ্রহণ করিল। শ্রীমা তাহাদিগকে রাসমণির কালীবাড়ীতে তাহাদের জামাতাকে দেখিতে যাইতে নিমন্ত্রণ করিলেন এবং বিদায়কালে নিজের একখানি বস্ত্র বাগ্দিনীকে দান করিলেন। তদবধি ভক্তরাও শ্রীমার ডাকামত এই পুরুষকে "মার ডাকাত বাবা" এই আখ্যা দিয়াছেন—এবং ভক্তরা বিশ্বাস করেন যে, শ্রীমার আশীর্ব্বাদে সেই ডুলে দম্পতি এজন্মে শান্তি ও অন্তে পরমপদ লাভ করিয়া জীবন ধন্য করিয়াছে।

এবারে দক্ষিণেশ্বরে কিছু দিন বাস করিতে করিতে শ্রীমার পেটের পীড়া হয় এবং ক্রমে রোগ আমাশয়ে পরিণত

হইলে তিনি বাধ্য হইয়া জয়রামবাটীতে পিত্রালয়ে ফিরিয়া আসিলেন। এখানে আসিয়া তাঁহার আমাশয় রোগ এমন বৃদ্ধি পাইল যে, তাঁহার জীবনসঙ্কট অবস্থা হইল। এক দিন মা নিজ গ্রামস্থ সিংহবাহিনীদেবীর মন্দিরে হত্যা দিলেন। হত্যা দিবার ফলে তিনি ঔষধ প্রাপ্ত হন এবং সেই ঔষধ সেবন করিয়া আরোগ্য হন। ইহার কিছু দিন পরে শ্রীমার পিতৃবিয়োগ ঘটে।

মথুরের জীবিতকালে ঠাকুরকে মা দেখাইয়াছিলেন যে, তাঁহার শুদ্ধ-সত্ত্ব ভক্ত আছে, যথাসময়ে তাহারা আগমন করিবে। সেই জন্য ঠাকুর আরতির সময় কুঠীর ছাদে উঠিয়া ডাকিতেন, "ওরে তোরা শীঘ্র আয়, বিষয়ী লোকের সঙ্গ আর আমি সহিতে পারিতেছি না।" প্রথমেই শ্রীমা আসিয়াছেন। আমরা শ্রীমাকে ঠাকুরের সহিত এক আত্মা ও অভিন্ন—তাঁহার শক্তি বলিয়া উল্লেখ করিয়াছি। বাহ্য আচরণে শ্রীমাকে ঠাকুরের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভক্ত বলাই চলে। শ্রীমা ঠাকুরকে 'শ্রীগুরুদেব' এই নামেও ডাকিতেন এবং সাধারণতঃ নিজেকে ঠাকুরের শিষ্যা বলিয়াই মনে করিতেন। তবে তাঁহার ভাব বা সমাধি অবস্থায় শ্রীমা ঠাকুরকে নিজের সহিত যখন অভেদাত্মা দেখিতেন, তখনকার কথা স্বতন্ত্র। ঠাকুরের দেহান্তে শ্রীমা মধ্যে মধ্যে ভক্তদের বলিতেন, "ত্যাগ,—কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগ—এ কথা শাস্ত্রেই লেখে, তাহার স্বরূপ যে কি, তাহা শ্রীঠাকুরের আবির্ভাব ও লীলাজীবন না দেখিলে কেহই সম্যক্ ধারণা করিতে পারিতেন না। ঠাকুরের যে ত্যাগ, তাহা অলোক-সামান্য ও এই ত্যাগ-সম্পদে শ্রীরামকৃষ্ণ অবতার অন্যান্য সকল অবতারকে অতিক্রম করিয়া গিয়াছেন।"

ঠাকুরের সে অত্যুচ্চ ত্যাগের আদর্শ যাহাতে অটুট থাকে, সে বিষয়ে ঠাকুরের জীবিতকালে শ্রীমার অপেক্ষা সতর্ক বোধ হয় তাঁহার কোন ভক্তই ছিলেন না! লক্ষ্মীনারায়ণ নামক একজন ভক্ত মাড়োয়ারী এই সময় ঠাকুরের কাছে যাতায়াত করিতেন। ইঁহার একটু বেদান্ত-চর্চ্চা ছিল। ঠাকুরের সহিত কথা কহিয়া তিনি আনন্দ পাইতেন। তিনি এক দিন মন্দিরে আসিয়া দেখিলেন যে, ঠাকুরের শয্যার চাদর মলিন ও স্থানে স্থানে ছিন্ন। তখন মাড়োয়ারী দুঃখ করিয়া বলিতে লাগিলেন—"সাধুর সেবা এ দেশের লোক জানে না। সাধুর এরূপ অনাদর আমি চক্ষে দেখে—সহ্য করতে পারব না। আমার টাকা আছে, আমি আপনাকে দশ হাজার টাকা দিচ্ছি। এই টাকায় কাগজ কিনে রাখলে তার সুদে আপনার নিজের সেবার খরচের আর কোন অভাব হবে না।" ঠাকুর বলিতেন যে, সন্ন্যাসীর পক্ষে টাকার লোভ বা টাকা লওয়া বা রাখা, ঠিক যেন ব্রাহ্মণের বিধবা ব্রহ্মচারিণীর বার বছর ব্রহ্মচর্য্যের অধঃপতনের মত অশ্রদ্ধেয় কার্য্য। তিনি লক্ষ্মীনারায়ণের এই প্রস্তাবে এমন ভীত, ব্যথিত ও বিচলিত হইলেন যে, তাঁহার মূর্চ্ছার উপক্রম হইল। ঠাকুরের তৎকালীন অবস্থা হইল ঠিক যেমন কোন সুস্থ ব্যক্তিকে কেহ হঠাৎ লাঠি দিয়া মস্তকোপরি আঘাত করিলে তাহার যেরূপ সংজ্ঞালোপের অবস্থা হয় তেমনই। তাঁহাকে তদবস্থ দেখিয়া লক্ষ্মীনারায়ণ সাহস হারাইলেন, তবে আশা ছাড়িলেন না। ঠাকুর কিঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইলে তিনি তাঁহাকে বলিলেন, "কেন, আপনি ত ব্রহ্মজ্ঞানী—সব সমান আপনার কাছে। আপনার যদি এখনও ত্যাজ্য গ্রাহ্য থাকে, তবে আপনার পূর্ণ জ্ঞান হইয়াছে কেমন করিয়া বলা হয়?" ঠাকুর তাহার জবাবে বলিলেন যে, "হবেও বা, তাঁহার হয় ত পূর্ণ জ্ঞান হয় নাই, কিন্তু— হোক বা না হোক, তিনি কোন মতে মাড়োয়ারীর টাকা গ্রহণ করিতে পারিবেন না।" মাড়োয়ারীর স্বভাব নাছোড়বান্দা,—ইতিমধ্যেই পকেট হইতে দশ হাজার টাকার নোটের বাণ্ডিল বাহির করিয়া রাখিয়াছেন। তিনি বলিলেন, "তবে হৃদয়ের নামে টাকা রাখুন! আপনি নিজে ত তা হ'লে আর নিলেন না।" ঠাকুর বল্লেন, "ওটা বাহিরে দু'দিক রাখার মত কার্য্য হ'লেও ভিতরে ভিতরে আমার মনে মনে সর্ব্বদা খতান হবে, ঐ টাকা আমার জন্য প্রদত্ত এবং ঐ টাকার ব্যয় লইয়া হৃদয়ের সঙ্গে বিরোধ ও মতান্তর অনিবার্য্য।" এ মিথ্যাচারে তিনি সম্মত হইতে পারিবেন না। তখন মাড়োয়ারী শ্রীমাকে ঐ টাকা দিতে চাহিলেন। এবারে ঠাকুর বলিলেন, "বেশ, যাকে দিতে চাও, তাঁকে জিজ্ঞাসা ক'রে দেখি।" মাকে জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বলিলেন যে, যে ঠাকুরের জীবনের বৈশিষ্ট্য অপূর্ব্ব ত্যাগ—কামিনী ও কাঞ্চন ভোগ-ঐশ্বর্য্যের সঙ্গে যে জীবনের কোন সম্পর্ক নাই—সেই মহাপুরুষের সহধর্ম্মিণী তিনি; তিনি ঠাকুরের অপ্রীতিকর কার্য্য করিয়া তাঁহার উচ্চাদর্শকে খর্ব্ব করিয়া মাড়োয়ারীর টাকা

ত দূরের কথা, পৃথিবীর সমস্ত ঐশ্বর্য্য করতলগত অবস্থায় লাভ করিলেও তাহার প্রার্থিনী নহেন। তিনি যদি কিছু গ্রহণ করেন, তবে এ সম্বন্ধে লোকের এই ধারণা হইবে যে, ঠাকুরের ইচ্ছা অনুসারে কৌশলে শ্রীমাকে দিয়া এই টাকা গ্রহণ করানো হইয়াছে; সুতরাং মাড়োয়ারীর দান গ্রহণ তাঁহার পক্ষে একবারেই অসম্ভব। অগত্যা মাড়োয়ারীকে এই অপূর্ব্ব সন্ন্যাসীর ত্যাগের মহিমার নিকট পরাজয় স্বীকার করিয়া ফিরিতেই হইল। ঠাকুরও নিশ্চিন্ত হইলেন।

শ্রীদুর্গাপদ মিত্র।

বালাই—ষাট

ওষুধের শিশি সরাস্ কেন রে
　　ঘায়ের মলম রাখ্ না,
থার্মোমিটার নাড়িস্ না কেউ
　　ঐখানেতেই থাক্ না।
দে ত' একবার ভাল ক'রে দেখি
এই যে এখনও রয়েছে ত' একই,
আমার খোকার টেম্প্যারেচার
　　একশ' পয়েন্ট আট না?
নাড়িস্ না কেউ থারমোমিটার,
　　শিশিতে ঢাকা দে ঢাকনা।

আমার খোকার ভাতের বাসনে
　　কালি প'ড়ে গেছে কেন রে?
শত কাজ ফেলে আজ বৈকালে
　　মেজে দেয় খেঁদি যেন রে।
কাল রবিবার ধোবা এলে পর
খোকনমণির জামা ও কাপড়
নাম ধ'রে ধ'রে লিখে লিখে সব
　　বাসি হ'তে দেয় যেন রে,
ময়লা কাপড় খোকন আমার
　　পর্‌বে বল্ ত কেন রে।

আজকে খোকার জন্মদিন যে
　　কেন এলি তুই নাপতিনী,
ষাট—ষাট—ষাট অকল্যাণের
　　কথা কেন শুনি রাত-দিনই!

তোরা যা বলিস মিথ্যা কথা ও,
আমার খোকা কি হারাতে পারে গো,
শীতলা মায়ের পূজা মেনেছি যে,
　　জানি জাগ্রত যে তিনি,
ষাট—ষাট—ষাট আজকের দিনে
　　ফিরে যা লো তুই নাপতিনী।

আজকে মাসের সতেরো তারিখ,
　　দিতে যাবি কে রে মাইনে,
ইস্কুলে তার লাগবে এবার
　　পাখার ফি আর ফাইনে,—
সাড়ে তিন টাকা,—দিয়ে আয় গিয়ে
খোকনমণির নামে বিল নিয়ে;
নাম কেটে যেন না দেয় বাছার—
　　আর কিছু আমি চাইনে,
কামাই যতই হোক গে না কেন
　　দেব যা লাগে তা ফাইনে।

আমার ওপর রাগ ক'রে খোকা
　　পালিয়ে গেছে রে না ব'লে,
কাণ পেতে আছি আস্‌বে কখন্
　　নাচতে নাচতে মা ব'লে।
রাগ ক'রে কোলে না আসে রে পাছে
রথের পয়সা জমা করা আছে,
দু'টো চক্‌চকে দু'আনি রেখেছি
　　বেঁধে কাল থেকে আঁচলে,
খেলতে গিয়েছে, ষাট—ষাট—ষাট—
　　আর কিছু নয় তা ব'লে।

শ্রীঅনাথবন্ধু সেনগুপ্ত (বি এল)।

ছলনা

[বিদেশী গল্প]

—এক—
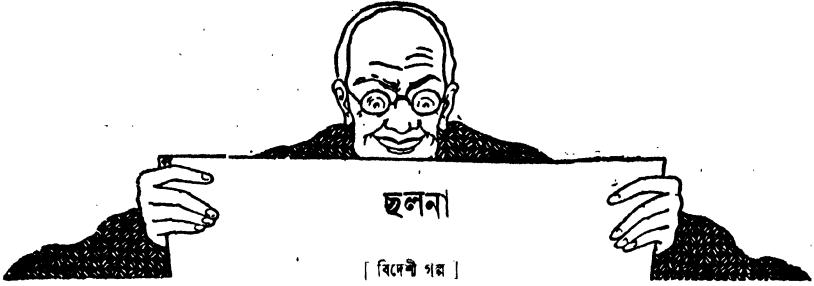
—"মিথ্যে ছলনা।"

—"চীৎকার করছ কেন? ওরা যে শুনতে পাবে।"

আবার সে মিথ্যা কথা বলিল। চীৎকার আমি মোটেই করি নাই। অতি শান্ত সুরেই ত বলিয়াছি। মৃদুস্পর্শে তাহার হাত দুইখানি ধরিয়া মৃদু সুরে কথা বলিতে বলিতে ক্ষুদ্র বিষধরের মৃদু স্বননের মত আমার কণ্ঠ হইতে বাহির হইয়া আসিল বিষবাণী—'ছলনা'!

তবু বলিল—"ভালবাসি, ওগো তোমায় ভালবাসি,—বিশ্বাস কর ভালবাসি!"

'ভালবাসি' বলিয়া চিবুক ধরিয়া চুম্বন করিল। হাতখানি ধরিতে যাইব, দেখি চলিয়া গিয়াছে, অর্দ্ধ-অন্ধকার বারান্দা হইতে কখন্ নিমিষে সরিয়া পড়িয়াছে। পিছু পিছু যাইয়া দেখি, হলে সমবেত উৎফুল্ল নরনারীর উৎসব প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। মিনা বলিয়াছিল, সমস্ত রাত সে নাচিবে। আমি ভাবিয়াছিলাম, সমস্ত রাত ধরিয়া তাহার সেই মোহন নৃত্যছন্দে আপনাকে ছন্দোময় করিয়া তুলিব।

ক্লান্ত উৎসবও বিশ্রাম চাহে। উৎসবক্লান্ত তরুণ তরুণীর কলকণ্ঠে তবু হাসি, তবু যৌবনের উচ্ছ্বাস। এই অজানা মানুষটাকে কেহ ফিরিয়াও পুছিল না, ডাকিয়া একটি কথাও জিজ্ঞাসা করিল না! কনসার্ট বাজিতেছিল হলের এক প্রান্তে, ধীরে ধীরে তাহারই নিকটে গিয়া এক কোণে বসিলাম। সোজা আমারই দিকে মুখব্যাদান করিয়া অতিকায় একটা বাঁশীর গভীর মুখবিবরে কে যেন আত্মগোপন করিয়া প্রতি মিনিটে আমাকে ব্যঙ্গ করিয়া হাসিতে লাগিল—হো-হো-হো!

মাঝে মাঝে এক একখানি মধুরগন্ধী ধবল মেঘ আমার কাছে আসিয়া আবার ফিরিয়া যাইতে লাগিল। মিনা বুঝি অলক্ষ্যে অলক্ষ্যে কেমন করিয়া আসিয়া আমায় আদর করিয়া যাইতে লাগিল। কিন্তু এক সেকেণ্ড—হাঁ, ছোট একটুখানি সেকেণ্ড—ঠিকই আমার কাঁধে তাহার কাঁধের স্পর্শ লাগিল। চোখ নীচু করিতেই দেখিলাম, একটি শুভ্র মরাল-গ্রীবা শুভ্রতম ভূষণসজ্জা ভেদ করিয়া জাগিয়াছে। বহুদিন বিস্মৃত সমাধি-বুকে ম্রিয়মাণ মর্ম্মর-মূর্ত্তির মুখখানি যেমন করুণ ও শান্ত, চাহিয়া দেখিলাম, সমাধি-মূর্ত্তির মতই তাহার মুখখানিতে শুভ্র-কঠোর বাস্তব রূপ। দেখিলাম, সুন্দর, শান্ত আয়ত, নয়নে অতৃপ্ত আলোকতৃষা, নীলাভ শ্বেত নয়নে কালোমণির কৃষ্ণদ্যুতি। যতই দেখিলাম, ততই মনে হইল, কালোমণি আরও কালো, আরও অতলস্পর্শী। নিমিষের দেখা, তাই বুঝি সেই দৃষ্টি একটুকুও আমাকে বিভ্রান্ত করিতে পারিল না। কিন্তু, অনন্ত অতলের অর্থ অত ভয়ানক ভীষণ করিয়া ইহার পূর্ব্বে আর বুঝি নাই। অনুভব করিলাম, আমার এই প্রাণটুকু ক্ষীণ-রশ্মি হইয়া তাহার নয়নে গিয়া মিলিতেছে, আর আমি হইয়া যাইতেছি মৌন ও মৃত; আমি আমাকেই চিনিতে পারিতেছি না। অনুভব করিয়া ভয় হইল, চিত্ত হইয়া উঠিল ব্যথাতুর। আমার প্রাণটুকু সঙ্গে লইয়া সে একটা দীর্ঘাকৃতি দাম্ভিক সুপুরুষের সঙ্গে গিয়া নাচিতে লাগিল।

লোকটার আপাদমস্তক প্রত্যেকটি ভাবভঙ্গি লক্ষ্য করিয়া দেখিলাম। তাহার জুতার গড়ন, তাহার ঈষৎ উচ্চ স্কন্ধের প্রশস্ততা, তাহার বিচ্ছিন্ন অলকগুচ্ছের স্বচ্ছন্দ আন্দোলন লক্ষ্য করিয়া দেখিলাম। উহার উদাসীন অলক্ষ্য দৃষ্টি আসিয়া আমাকে যেন প্রাচীরগাত্রে পিষিয়া মারিতে লাগিল; সেই আঘাতে মনে হইতে লাগিল, আমি যেন ঐ দেয়ালের মতই অচল ও প্রাণহীন হইয়া পড়িয়াছি।

হলঘরের বাতি উহারা নিভাইতে আরম্ভ করিল। আমি মিনার নিকটে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—"যাইবে না? আমি সঙ্গে আসি?"

অবাক্ হইল! ঐ দীর্ঘাকৃতি সুপুরুষটা অন্য দিকে চাহিয়াছিল। উহাকে দেখাইয়া মিনা বলিল—"আমি ত ওরই সঙ্গে যাব।"

আমাকে একটি নির্জ্জন কক্ষে লইয়া গিয়া চুম্বন করিল।

চুপি চুপি বলিলাম—"এ চুম্বন তোমার ছলনা, মিনা।"

বলিল—"কাল আবার দেখা হবে। এসো যেন।"

যখন বাসায় ফিরিলাম, তখন পথের উচ্চ গৃহগুলির পশ্চাৎ হইতে কুজ্ঝটিকাচ্ছন্ন উষা উঁকি দিতেছিল। জনমানবহীন পথে কেবল আমি আর আমার ড্রাইভার। ড্রাইভার মুখ জড়াইয়া মাথা নীচু করিয়া বসিয়া, আর পশ্চাতে আমি, আমারও চক্ষুর নীচু পর্য্যন্ত আবৃত। ড্রাইভার নিজের চিন্তায় মগ্ন, আমিও মগ্ন আমার চিন্তায়। আর ঐ পুরু পুরু দেওয়ালগুলির পশ্চাতে সহস্র নিদ্রিত নর-নারী, তাহারাও মগ্ন আপনাদের স্বপ্ন ও কল্পনায়। ভাবিলাম, মিনার কথা। ভাবিলাম, কি করিয়া সে মরিয়া গেল! মৃত্যুর কথা ভাবিতে ভাবিতে মনে হইল, যেন কুহেলি আলোকাচ্ছন্ন প্রাচীরগুলি নীরবে ঋজু হইয়া দাঁড়াইয়া নির্ব্বিকারভাবে আমার মৃত্যু নিরীক্ষণ করিতেছে। ড্রাইভার কি ভাবিতেছিল বলিতে পারি না, প্রাচীরগুলির পশ্চাতে লুক্কায়িত নরনারী—তাহারাই বা কিসের স্বপ্ন দেখিতেছিল বলিতে পারি না, আর আমি যে কি চিন্তায় মগ্ন, তাহাও উহারা কেহ জানে নাই।

সোজা ও সুদীর্ঘ পথ বাহিয়া গাড়ী চলিয়াছে। বাড়ীগুলির

পশ্চাৎ হইতে প্রভাতী আলো ফুটিয়া উঠিতেছে। একখানি শীতলগন্ধী মেঘ আমার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল, আর আমার কাণের কাছে অদৃশ্য কে যেন বিদ্রূপ করিয়া হাসিয়া গেল—হো—হো—হো!

—দুই—

মিনা ছলনাই করিল। সে আসে নাই। বৃথাই আমি তাহার জন্য প্রতীক্ষা করিলাম। কুহেলি গগন হইতে ধূসরবসনা তুহিন-তমসা নামিয়া আসিল। কখন্ যে গোধূলি সন্ধ্যা হইল আর সন্ধ্যা হইয়া গেল নিশীথ রাত্রি, তাহা বুঝিতে পারি নাই। গোধূলি, সন্ধ্যা, নিশীথ সব মিলিয়া আমার নিকট এক দীর্ঘ রজনীর সৃষ্টি করিল।

নিষ্ফল আশা বুকে লইয়া তবু আমি তাহারই প্রতীক্ষায় পথে পায়চারি করিতেছি। আমার প্রিয়তমা—হাঁ, হাঁ, আমারই প্রিয়তমা থাকে ঐ উচ্চ প্রাসাদে···

বাড়ীখানির নিকট যাইতে পারিলাম না। লৌহাস্তীর্ণ পথের শেষপ্রান্তে একখানি স্ফটিক দ্বার হইতে পীত আলোক উদ্ভাসিত হইতেছিল। ওখানেও যাইতে পারিলাম না। পথের এপারে মন্থর-পাদক্ষেপে চলিতেছি ও ফিরিতেছি, আসিতেছি আর যাইতেছি। আলোকিত দ্বারের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া করিয়া চলি আর তুষারকণা আমার চোখে কাণে তীক্ষ্ণ সূচি বিদ্ধ করিতে থাকে। সেই ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র হিমানী সূচি এত দীর্ঘ যে, উহা আমার হৃৎপিণ্ডে পর্য্যন্ত প্রবেশ করিল। নিষ্ফল প্রতীক্ষার দুঃখ ও ক্রোধের রূপ ধরিয়া সূচিগুলি আমার হৃদয় বিদ্ধ করিতে লাগিল। উত্তর দক্ষিণ উভয় দিক হইতে হিমবায়ু অবিরাম ফুৎকার দিতেছে। তুষারাচ্ছন্ন চালাগুলির উপর দিয়া বাতাস শিষ দিয়া খেলা করিয়া ফিরিতেছে, আর ঘুরিয়া ফিরিয়া তীক্ষ্ণ হিমখণ্ড দিয়া আমার মুখের উপর ছুরি চালাইতেছে। পথের ল্যাম্পগুলির চিমনীর উপর বাতাস করাঘাত করিয়া শিখাকে করে আহ্বান। পীত দীপশিখা কাঁপিতে থাকে। হতভাগ্য দীপশিখা! রাত্রির জন্যই উহাদের নির্জ্জনে নিভৃতে বাঁচিয়া থাকা।

দীপশিখার জন্য কষ্ট হইল। ভাবিলাম, যখন আমি চলিয়া যাইব, এই পথেই ত আমার জীবনের সব কিছু শেষ হইয়া যাইবে। তখন মাত্র ঐ হিমকণা শূন্যপথে করিবে ছুটাছুটি। তবু—তবু ঐ পীত দীপশিখা নির্জ্জনে নিভৃতে বাঁকিয়া হেলিয়া পড়িবে আর দারুণ শীতে থর-থরিয়া কাঁপিতে থাকিবে।

মিনার জন্য পথ চাহিয়া অপেক্ষা করিয়া রহিলাম, সে আসিল না। কেন যে ব্যথায় চোখের জল ফেলিলাম না, ডুকরাইয়া কাঁদিয়া উঠিলাম না, তাহা বলিতে পারি না। বলিতে পারি না, কেন আমি হাসিলাম, কেন আমি মনে মনে সুখী হইলাম, কেন অঙ্গুলীগুলিকে হিংস্র শ্বাপদের নখের মত বক্র করিয়া বজ্রমুষ্টি করিলাম! মনে হইল, সেই মুষ্টির ভিতর একটা ক্ষুদ্র বিষধর অবিরাম চুম্বন করিয়া যাইতেছে। না—না—মিথ্যা কথা! আমার মুষ্টির মধ্যে সর্পশিশু কিল-বিল করিয়া খেলা করিতেছে—আমার বুকের মধ্যে প্রবেশ করিয়া দংশন করিতেছে—সেই দংশনে আমার মাথা টলিতেছে—প্রকৃতিস্থ হইতে পারিতেছি না। না—না—মিথ্যা কথা। কাল আর আজ—আজ আর কাল, ভবিষ্যৎ আর বর্ত্তমান, বর্ত্তমান আর অতীত—এগুলির মধ্যে সীমারেখা যা ছিল, সমস্তই অন্তর্হিত হইল। আমার অস্তিত্বের পূর্ব্ব ও পর কোথায় যেন গিয়া লুকাইল। মনে হইল, আমি চিরকাল বাঁচিয়া রহিয়াছি, ইহা না হইলে আমার জীবনই সম্ভবপর হইত না। প্রাণ যখন ছিল না, আর প্রাণের সঞ্চার যখন আমাতে হইল, সর্ব্বসময় সে—মিনা—ঐ নারী আমার উপর প্রভুত্ব করিয়াছে।

অদ্ভুত! উহার আবার একটা নাম আছে? একটা দেহ আছে? ওর প্রাণেরও আবার আরম্ভ অবসান আছে? নারী বেনামা—কোনও নাম নাই ওর। চির দিন, চিরযুগ ও মিথ্যা বলিয়া আসিতেছে। চিরদিন, চিরকাল ও অপেক্ষা করাইয়া রাখে, কখনও আসে না।

বলিতে পারি না, কেন আমি হাসিলাম। কিন্তু আবার··· আবার ঐ হিমকণাগুলি সূচি হইয়া আমার বুকের মধ্যে প্রবেশ করিল। আর অদেখা কে যেন আমার কাণের কাছে আসিয়া তেমনই বিদ্রূপ করিয়া হাসিয়া যাইতে লাগিল—হো-হো-হো।

চোখ খুলিয়া উঁচু বাড়ীটার আলোকময় গবাক্ষগুলির দিকে চাহিলাম। উহারা আপনাদের নীল ও লাল ভাষায় চুপি চুপি আমাকে বলিল—"নারী তোমায় প্রতারিত করিয়াছে। তুমি পথে ঘুরিতেছ, প্রতীক্ষা করিতেছ, শীতে কষ্ট পাইতেছ, আর সে, ঐ লাবণ্যময়ী রূপসী, ঐ বিশ্বাসঘাতিনী ওখানে ঐ দীর্ঘাকৃতি রূপবান পুরুষের প্রেমগুঞ্জন উৎকর্ণ হইয়া শুনিতেছে। লোকটা তোমায় ঘৃণা করে। ওখানে ঢুকিয়া ঐ নারীকে গিয়া যদি হত্যা কর, ভাল কায করিবে—উহাতে মিথ্যা নিহত হইবে।"

হাতে ছুরিখানি শক্ত করিয়া ধরিয়া হাসিয়া জবাব দিলাম—"হাঁ! নারীকে আমি হত্যা করব।"

কেন যেন জানালাগুলি আবার করুণনেত্রে আমার দিকে চাহিয়া অতি দুঃখের স্বরে বলিল—"না-না—উহাকে খুন করিও না। তোমার হাতের ঐ ছুরি তাহার চুম্বনের মতনই মিথ্যা।"

আমারই মত হতভাগ্য যাহারা ঐ শীতের রাতে পথে বাহির হইয়াছিল, তাহাদের মৌন ছায়াগুলি অনেকক্ষণ অন্তর্হিত হইয়াছে। পথে আমি একা। এই নিরালা তুহিন-শূন্যে আমি মাত্র একা। শৈত্য ও নিরাশায় কাঁপিতেছি, মাত্র আমি আর নিঃসঙ্গ একলা ঐ হতভাগা দীপশিখা। নিকটের এক গির্জ্জা মিনারে ঘড়ী বাজিতে লাগিল, তাহার নিরাশ কম্পিত কাংস্য রোদনধ্বনি শূন্যে ছড়াইয়া পড়িয়া নীরব দিগন্তে মিলাইতে লাগিল। ঘড়ীর শব্দ এক দুই করিয়া গণিতে গণিতে হাসি আর চাপিয়া রাখিতে পারিলাম না। ১৫টা বাজিল! বৃদ্ধ ঘড়ীটা ঠিক সময়ই বাজায়, তবু মাঝে মাঝে এমন অবিরাম বাজিয়া যায় যে গির্জ্জার স্থবির ঘণ্টাওয়ালাকে উঠিয়া গিয়া হাত দিয়া ঘড়ীর পাগলা হাতুড়িটাকে চাপিয়া ধরিতে হয়। কিন্তু কাহার জন্য বৃদ্ধ ঘড়ী অমন বার্দ্ধক্যের কম্পিত করুণকণ্ঠে বাজে? ঐ আর্ত্তনাদ যে শীতে নিশীথের ঘনান্ধকারকে আলিঙ্গন করিয়া কণ্ঠরোধ করিতে চাহে, উহাও কি মিথ্যা? অপ্রয়োজনীয় এই মিথ্যা অতি ব্যর্থ,

· · · · :

ঘড়ীর শেষ মিথ্যা-ধ্বনি শেষ হইতে না হইতেই আলোকিত দ্বার খুলিয়া এক দীর্ঘাকৃতি মানুষ সিঁড়ি দিয়া নামিতে লাগিল। মাত্র পিঠটা দেখিলাম। মাত্র কাল সন্ধ্যায় দেখিয়াছি, তবু

চিনিলাম ঐ দাম্ভিক ঘৃণিত মানুষটাকে। সন্ধ্যার অপেক্ষা তাহার পাদক্ষেপ নিশ্চিন্ত ও সরল মনে হইল। কত বার ঐ দ্বার দিয়া অমন করিয়া আমিও বাহির হইয়া আসিয়াছি। নারীর কপট অধরের চুম্বন-পুলকে যেমন করিয়া মানুষ চলে, তেমনই পাদক্ষেপে সে চলিয়া গেল।

—তিন—

ভয় দেখাইলাম—মিনতি করিলাম—দাঁতে দাঁত নিষ্পেষিত করিয়া বলিলাম—

"বল—সত্য ক'রে বল।"

বরফের মত ঠাণ্ডা ওর মুখ! বিস্ময়-বিস্ফারিত ভ্রূ দুইটির নীচে ওর কাজল-কালো চোখে তেমনই নির্ব্বিকার ও তেমনই রহস্যময় দীপ্তি। বলিল—

"তোমার কাছে মিথ্যে আমি বলতে পারি ?"

সে জানে যে তাহার ছলনা আমি প্রমাণ করিতে পারিব না। সে জানে যে তাহার কথায়, তাহার একটুকু মাত্র কপট কথায় আমার পুঞ্জে পুঞ্জে সঞ্চিত এই সন্দেহ দুশ্চিন্তা একেবারে কোথায় উড়িয়া যাইবে। সেই কথাটুকুর জন্যই অপেক্ষা করিলাম। সে বলিল। তাহার ঠোঁট দুইটির উপরে সত্যের মোহন বর্ণচ্ছটা, কিন্তু অন্তরে অন্ধকার, ঘোর কৃষ্ণ অন্ধকার।

বলিল—"ভালবাসি—আমার সবই যে তোমার প্রিয়তম।"

তার পর দুই জনে মিলিয়া সহর হইতে বহুদূরে বেড়াইতে গিয়াছি। এক কক্ষে মাত্র আমি আর সে। অন্ধকার গবাক্ষগুলি দিয়া তুষারাবৃত নিম্নভূমি উঁকি দিতেছে। মাথার উপরে অন্ধকার, চারিদিকে অন্ধকার—নীরব নিথর জমাট অন্ধকার। তুষারাচ্ছন্ন ঐ নিম্নভূমি দেখিয়া মনে হইল, গভীর তমসা ভেদ করিয়া যেন একটা মড়ার মুখ দেখা যাইতেছে। অতি উত্তপ্ত কক্ষে একটিমাত্র মোমবাতী জ্বলিতেছিল। সেই দীপের রক্তাভ শিখার উপর সহসা আবির্ভূত হইল মৃত্যুসম বেদনার শ্বেত জ্যোতির্বেষ্টন।

"সত্য কথা শুনে দুঃখ পাই পাব, কিন্তু সত্য কথা তোমায় বলতেই হবে। তোমার মুখে ঐ সত্য শুনে হয় ত আমার মৃত্যু হবে। কিন্তু সত্য লুকিয়ে রাখার চাইতে মরণই যে ভাল, মিনা! তোমার চুমুতে—তোমার আলিঙ্গনে আমি কপটতার স্বাদ পেয়েছি। তোমার ঐ চোখেও দেখেছি ছলনা। বল মিনা, বল, সত্য প্রাণ খুলে বল। দেখো আমি তা শুনে চিরদিনের মত তোমায় ছেড়ে চ'লে যাব—আর আসব না!"

সে চুপ করিয়া রহিল। তাহার ভাবহীন সন্ধানী দৃষ্টি অন্তরের অতল তলে পর্য্যন্ত প্রবেশ করিয়া আমার চিত্তকে টানিয়া বাহির করিয়া অদ্ভুত কৌতূহল অনুভব করিতে লাগিল।

চীৎকার করিয়া বলিলাম—"উত্তর দাও—নৈলে হত্যা করব।"

শান্ত সুরে বলিল—"কর হত্যা! জীবনটা সময় সময় বড়ই দুর্ব্বিষহ হয়ে পড়ে। তবু সত্য ত আর ভয় দেখিয়ে টেনে বের করা চলে না!"

মিনার পা ধরিলাম। হাত দুইখানি ধরিয়া কত কাঁদিলাম, মিনতি করিলাম। সে মাত্র আমার মাথায় তাহার হাতখানি রাখিয়া বলিল—"আহা! বেচারী—বেচারী!"

প্রার্থনা করিলাম—"দয়া কর মিনা, সত্য কি তা বল।"

তাহার স্বচ্ছ সুন্দর ললাটের দিকে চাহিয়া মনে হইল, সত্য বুঝি ঐখানে, সত্য বুঝি ঐ ত্বগস্থির কোমল বেষ্টনীর পিছনে রহিয়াছে। উন্মাদনায় ইচ্ছা হইল, ঐ ললাট চূর্ণ করিয়া সত্যকে বাহির করিয়া আনি। ঐ শুভ্র বক্ষের পশ্চাতে একটা হৃৎপিণ্ড স্পন্দিত হইতেছে। উন্মাদ বাসনা হইল, আমার এই নখগুলি দিয়া উহার বক্ষ চিরিয়া অন্ততঃ একবারও অবগুণ্ঠনমুক্ত নারী-হৃদয় দেখিয়া লই।

বাতীর আয়ু শেষ হইয়া আসিল। নিষ্কম্প উন্নত দীপশিখা পীতাভ হইয়া আসিল। কক্ষপ্রাচীর ক্রমে অন্ধকার হইয়া আসিল, মনে হইল, দেয়ালগুলি দূরে দূরে সরিয়া গিয়াছে।

মিনা খালি বলিল—'আহা, বেচারী, বেচারী!'

প্রদীপের পীতাভ শিখা ভয়ে কাঁপিতে লাগিল। শিখা ক্ষুদ্র ও নীল হইল, তাহার পর নিবিয়া গেল। আমাদের উভয়ের চারিদিকে ঘন অন্ধকার ঘিরিয়া দাঁড়াইল। মিনার মুখ দেখিতে পাইলাম না, তাহার চোখ দেখিতে পাইলাম না, মাত্র অনুভব করিলাম, তাহার হাত দুইটি আমার মস্তককে আলিঙ্গন করিয়া রহিয়াছে। মন হইতে অসত্য বোধটা যেন কোথায় চলিয়া গেল। চক্ষু দুইটি বুজিয়া তাহার স্পর্শে মগ্ন হইয়া গেলাম। মনে হইল, আমার চিন্তাও নাই, আমার প্রাণও নাই। মনে হইল, মিনার ঐ স্পর্শই যেন সত্য। সেই অন্ধকারে এক অদ্ভুত ভীতি-বিজড়িত কণ্ঠে সে চুপি চুপি বলিল—"আমায় জড়িয়ে ধর, বড় ভয় পাচ্ছে।"

আবার সব নিস্তব্ধ। আবার এক শঙ্কা-বিজড়িত মৃদু কণ্ঠস্বর —"সত্য কি তুমি জানতে চাও? কিন্তু তা যে আমি জানিনে! জানতে কি ইচ্ছে আমারও হয় না? আমি বড় ভয় পেয়েছি—ওগো শোন!"

চোখ খুলিয়া চাহিলাম। কক্ষের জমাট অন্ধকার ভয়ে উচ্চ গবাক্ষপথে পলায়ন করিতে চেষ্টা করিল, পলায়ন করিতে না পারিয়া কতক অন্ধকার দেয়ালের কোণে গিয়া ভয়ে গুটি মারিয়া লুকাইল। কিন্তু জানালার মধ্য দিয়া মৃত্যু-শুভ্র অতিকায় কে যেন নীরবে চাহিয়া রহিল। মনে হইল, কাহারও যেন মৃত নয়ন দুইটি আমাদের সন্ধানে বাহির হইয়া তাহার তুষার-দৃষ্টি দিয়া আমাদের আবৃত করিয়া ফেলিতেছে। মিনা আমাকে জড়াইয়া ধরিল, আমিও মিনাকে নিকটে টানিয়া লইলাম। সে চুপি চুপি বলিল—"ওগো! আমার বড় ভয় পাচ্ছে।"

—চার—

তাহাকে হত্যা করিয়াছি। মিনাকে হত্যা করিয়াছি। জানালার পার্শ্বে তাহার প্রাণহীন স্তূপ পড়িয়া রহিল। জানালার ওপার হইতে মৃত্যু-শুভ্র গগন জ্বলিতে লাগিল। নারীর শবের উপর পাখানি তুলিয়া দিতে হাসিয়া ফাটিয়া পড়িলাম। না—না, পাগলের হাসি নয়! বুকের উপর হইতে একটা গুরুভার নামিয়া গিয়াছে, তাই আরাম ও স্বচ্ছন্দ ছন্দে আমার বক্ষ স্পন্দিত হইতে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে মনে হইল, বিশ্ব এক আনন্দময়, শান্তিময় মহাশূন্যে পরিণত হইয়াছে। একটা কীট আমার বুকের ভিতর কুরিয়া কুরিয়া খাইতেছিল, এখন কীটটা বুক হইতে পড়িয়া গিয়াছে।

ঝুঁকিয়া পড়িয়া উহার মৃত্যু-স্থির নয়ন দুইটির দিকে চাহিলাম। আলোক-লুব্ধ বিশাল নয়ন দুইটি বিস্ফারিত! মোমের পুতুলের

চোখ দুইটি যেমন গোলগোল, যেমন অস্বচ্ছ, তেমনই দেখিলাম মিনার নয়নমণির উপর অভ্রের আস্তরণ। উহা অঙ্গুলি দ্বারা স্পর্শ করিতে পারিলাম, খুলিলাম, বন্ধ করিলাম, মোটেই ভয় পাইলাম না। কপটতা ও সন্দেহরূপী যে দৈত্য এত দিন ধরিয়া পরম আগ্রহে আমার রক্ত শোষণ করিয়া খাইতেছিল, নয়নের ঐ কৃষ্ণমণিতে আর তাহার দর্শন পাইলাম না।

উহারা আসিয়া গ্রেপ্তার করিতেই হাসিয়া উঠিলাম। যাহারা ধরিতে আসিয়াছিল; তাহাদের নিকট সেই হাসি বড় ভীষণ এক শ্বাপদের হাসি। কেহ ভীতশ্রস্ত হইয়া দূরে সরিয়া গেল। কেহ ভয় দেখাইতে দেখাইতে, আমাকে ধিক্কার দিতে দিতে সোজা অগ্রসর হইল। কিন্তু যখনই আমার আনন্দোজ্জ্বল দৃষ্টি তাহাদের চক্ষুর উপর গিয়া পড়িল, তাহাদের মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল, তাহাদের পা আর নড়িল না।

বলিল—"পাগল!"

কথাটা উচ্চারণ করিয়া আরাম পাইল। আমি যাহাকে ভালবাসিতাম, তাহাকে হত্যাও করিলাম, আবার সেই হত্যার পর আবার হাসিতেছি, এই হেঁয়ালীর উত্তর উহারা পাইল ঐ 'পাগল' কথাটাতে। মাত্র এক প্রশান্ত ব্যক্তি আমাকে অন্য এমন এক নামে অভিহিত করিল, যাহা শুনিবামাত্র মনে হইল, আমায় কেহ যেন প্রহার করিল। দেখিতে দেখিতে আমার নয়নের জ্যোতিঃ নিবিয়া গেল।

শক্তিশালী প্রসন্ন ব্যক্তিটি ক্রুদ্ধ হয় নাই, সে সহানুভূতির স্বরে বলিল—"আহা বেচারী!"

বেচারী? চীৎকার করিয়া বলিলাম—"থাম, ও নাম ধ'রে আমায় ডেকো না, থাম!"

জানি না, কেন তাহার উপর ঝাঁপাইয়া পড়িলাম। তাহাকে হত্যা করিতে, এমন কি স্পর্শ করিতেও আমি চাহি নাই। কিন্তু ঐ সব কাপুরুষকে আমায় উন্মত্ত ও সয়তান মনে করিয়া ভয়ে চীৎকার করিতে দেখিয়া ভারি অদ্ভুত ঠেকিল।

কক্ষে মিনার মৃতদেহ পড়িয়া রহিল। উহারা আমাকে কক্ষ হইতে বাহির করিয়া লইয়া চলিল। বলবান ও প্রসন্ন লোকটির দিকে চাহিয়া অবিরাম চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিলাম—"সুখী, সুখী, আমি বড় সুখী।"

সত্য যে পাইয়াছি—উহাই যে সত্য!

—পাঁচ—

শিশুকালে চিড়িয়াখানায় বাঘ দেখিয়াছিলাম। বহুদিন যাবৎ সেই বাঘের কথাই আমি ভাবিয়াছি। অন্য সব জানোয়ার ঝিমোয় অথচ চিন্তা করে না, দর্শকদের দিকে লুব্ধ নেত্রে চাহে না পর্য্যন্ত। বাঘ তেমন নহে। ব্যাঘ্রকে সে দিন পিঞ্জরের এক প্রান্ত হইতে একই লাইন ধরিয়া মাপিয়া মাপিয়া যাইতে দেখিলাম। যাইতেছে, আর প্রত্যেকবার একই দিকে তাকাইতেছে, প্রত্যেকবার পিঞ্জরের একই লৌহদণ্ড গণনা করিতেছে। দেখিলাম, তাহার অবনত হিংস্র আননের দৃষ্টি ঠিক সম্মুখে, একবারও সে দক্ষিণে বা বামে তাকাইল না। সমস্ত দিন ধরিয়া কলরবমত্ত নরনারী তাহার পিঞ্জর ঘিরিয়া ভিড় করিয়াছে, তবু তাহার চলা একবারও থামে নাই, তবু সে একবারও দর্শকদের দিকে ফিরিয়া চাহে নাই। জনতার কেহ কেহ সে দিন হাসিয়াছিল, কিন্তু অনেককে বিষণ্ণ গম্ভীরও দেখিয়াছিলাম। দুর্ব্বিবহ নিষ্ফল চিন্তার সজীব-দৃশ্য দেখিয়া বেশীর ভাগ লোকই সে দিন দুঃখের শ্বাস ফেলিয়া চলিয়া গিয়াছিল—যাইবার সময় ঐ আবদ্ধ শার্দ্দূলের দিকে সন্দিগ্ধ ও জিজ্ঞাসু নেত্রপাত করিয়া আর একবার দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া গিয়াছিল। উহাদের সেদিন যেন মনে হয় যে, ঐ পিঞ্জরাবদ্ধ হতভাগ্য ব্যগ্র বন্য জানোয়ারের সঙ্গে মুক্ত তাহাদেরও নসীবের কোথাও যেন একটা মিল রহিয়া গিয়াছে।

তার পর আমি যখন বড় হইলাম, মানুষ ও কেতাব আমার কাণে যখন অসীম অনন্তের কথা শুনাইল, তখন মনে পড়িয়াছে, ঐ পিঞ্জরাবদ্ধ শার্দ্দূলের কথা। তখন যেন আমার মনে হইয়াছে—জানি, আমি জানি ঐ অসীমের ব্যথা।

কারাকক্ষের এই প্রস্তর-পিঞ্জরে আমিও যেন সেই ব্যাঘ্র হইয়া গেলাম। পায়চারি করি আর ভাবি। কারাকক্ষের এক কোণ হইতে অপর কোণ পর্য্যন্ত একই লাইন ধরিয়া আমিও পাদচারণা করি, একই লাইন ধরিয়া আমার চিন্তাও পাদচারণা করে। চিন্তা এত গুরু, যেন মনে হইতে লাগিল যে, স্কন্ধে আমার মাথা নাই, পরিবর্ত্তে রহিয়াছে সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ড। সেই বিশ্বে আর কিছুই নাই, আছে মাত্র একটি কথা—বিরাট বিশাল যন্ত্রণাদায়ক একটি অমঙ্গল শব্দ—ছলনা!

দেখিতেছি বড় ভয়ঙ্কর ভুল করিয়াছি, নারীকে হত্যা করিয়া আমি মিথ্যাকে অমর করিয়া ফেলিয়াছি। পূজা প্রার্থনায় হউক, অস্তরাগ্নির দাহে হউক, চিত্তযন্ত্রণার নিপীড়নে হউক, নারীর বুক হইতে তাহার সত্য আত্মাকে প্রথমে উৎপাটিত করিয়া লইও, তাহার পর তাহাকে হত্যা করিও—পূর্ব্বে যেন করিও না!

সেই কথাই ভাবিতে লাগিলাম, আর কারাকক্ষের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত পায়চারি করিতে লাগিলাম।

—ছয়—

মিনা সত্য ও মিথ্যাকে লইয়া যেখানে চলিয়া গিয়াছে, সে বড় তমসাবৃত ভীষণ স্থান! আমি সেখানেও যাইব। সয়তানের সিংহাসনের পাদমূলে গিয়া আমি তাহাকে ধরিব, আর তাহার পা দুইখানি ধরিয়া কাঁদিয়া বলিব,—

"ওগো বল, বল—সত্যি কি, তা বল!"

হা ভগবান্! এ-ও ছলনা? ঐ—ঐ গভীর তমসা! ঐ—ঐ যুগযুগের সীমাহীন শূন্য! ওখানে ত সে নাই! মিনা ত কোথাও নাই!

তবু মিথ্যা রহিয়া গেল। মিথ্যা অমর! বাতাসের প্রতি কণায় মিথ্যা। শ্বাসপ্রশ্বাসের সঙ্গে এই মিথ্যা সরীসৃপের মত হিস্ হিস্ করিতে করিতে আমার বুকের মধ্যে গিয়া প্রবেশ করিল, আর আমার বক্ষোদেশ ভাঙ্গিয়া গুঁড়াইয়া ফেলিল।

ওহো! মানুষ হইয়া সত্য খুঁজিতে যাওয়া কি বাতুলতা? ওগো! যন্ত্রণা—বড় যন্ত্রণা—

কে আছ রক্ষা কর—আমায় রক্ষা কর! *

শ্রীতারানাথ রায়।

* বিশ্ববিখ্যাত রুষ দার্শনিক, কবি ও গল্পলেখক আন্দ্রিভ অবলম্বনে।

হুগলী জেলার ইতিহাস

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

চুঁচুড়া

চুঁচুড়ার খাসমহল

চুঁচুড়ার ওলন্দাজদিগের অধিকারভুক্ত যে স্থান ছিল, তাহা হইতে তাহারা ১৩ হাজার ১ শত ২২৲ টাকা রাজস্ব আদায় করিত। এই রাজস্বের অধিকাংশই নানারূপ অযথা উপায়ে গৃহীত হইত। ওলন্দাজদিগের রাজস্ব-প্রণালী বিষয়ে কমিশনর বাহাদুর বলিয়াছেন যে, উহা অনির্দ্দিষ্ট ও যথেচ্ছ। জমির খাজনা ও নূতন পাট্টা করিবার সময় বা পাট্টা বদলাইবার সময় এবং জমি হস্তান্তর করিবার সময় যাহা কিছু আদায় হইত, তাহা রাজস্বমধ্যে পরিগণিত হইত। খাজনার হার বাস্তভিটাতে বিঘা প্রতি ২২৷৹ টাকা পর্য্যন্ত ছিল। এই বাস্তভিটা প্রায় সর্ব্বসমেত ৬৫৮ বিঘা হইবে। জিলার অন্যান্য স্থানে খাজনার হার ৫৲ টাকা হইতে ২০ টাকা পর্য্যন্ত ছিল। মোগলদের নিকট হইতে যখন ওলন্দাজরা চুঁচুড়ার অধিকার লয়, সেই সময় যেরূপ খাজনার বন্দোবস্ত ছিল, তাহারা সেই খাজনাই প্রচলিত করে। নষ্ট জমি বা যে সমস্ত জমিতে লোকের বাস ছিল না, সেই সমস্ত জমি উদ্ধার করায় রাজস্ব বৃদ্ধি হয়।

১৭৫৫, ১৭৬১ ও ১৮১৮ খৃষ্টাব্দের ওলন্দাজদের Dorp Bookএ খাজনার হারের বিষয় কোন উল্লেখ নাই। প্রত্যেক বসতবাড়ীর মূল্য ও তাহার খাজনা মাত্র দেওয়া আছে। ১৭৭৮ খৃষ্টাব্দে খাজনার পরিমাণ ছিল ২৪৬৯৲ টাকা ও ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে ঐ খাজনা দাঁড়াইয়াছিল ২৪৬১৲ টাকা। তবে পূর্ব্বোক্ত উপায়ে (পাট্টা বদল করার জন্য) ৬২৪৲ টাকা বেশী হয়। এই সমস্ত জমির মালিকদের জাতি ও ধর্ম্ম হিসাবে শ্রেণীবিভাগ করা হইত। চুঁচুড়ার কোষাধ্যক্ষ (fiscal) Mr. Herkloto হুগলীর কলেক্টর সাহেবকে ১৮২৭ খৃষ্টাব্দে এই সংবাদ দেন যে, তিনি ৪০ বৎসর পূর্ব্বের ওলন্দাজ দলিল পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে, প্রত্যেক জমির খাজনা তখনও যেমন ছিল, এখনও তেমনি আছে। নূতন জমি বিলির জন্য প্রথমে যে পাট্টা দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে যাহা কিছু খাজনা বাড়িয়াছে।

এইরূপ পাট্টাকে ঠিকা বলা হইত এবং সাধারণতঃ গঞ্জ বা বাজার স্থাপন বা এইরূপ কোন বিশেষ উদ্দেশ্যের জন্য দেওয়া হইত। পাট্টা দেওয়ার প্রণালী কলেক্টরের নিকট fiscalএর পত্রে এরূপ বর্ণিত আছে—"ডচ্ গবর্ণমেণ্টের অধীনে, জমি বিলির জন্য দুইটি আফিস ছিল, একটি দেশীয় বা জমিদারি কোর্ট, অপরটি য়ুরোপীয়ান কোর্ট। য়ুরোপীয়ান কোর্টে খারিজ ও জমি সম্বন্ধীয় কাযকর্ম্ম হইত এবং যাহারা জমি বন্ধক দিতে যাইত, তাহারা জমির বাস্তবিক অধিকারী কি না, তাহাও প্রমাণ করা হইত। পরে এই আফিস হইতে একটি দলিল দেওয়া হইত। সেই দলিল জমিদারী কোর্টে দাখিল করিলে পর একটি পাট্টা দেওয়া হইত এবং এই হস্তান্তর বিষয়টি Dorp Bookএ লিখিত থাকিত। জমিদারি কোর্টে বিক্রয় কোবালা, খারিজ, দানপত্র এই সকল বিষয়ের কায চলিত। কিন্তু ঐ সকল দলিল রেজেষ্টারি হইবার পূর্ব্বে দরখাস্তকারীর আবেদনের আপত্তিকারী কেহ আছে কি না, তাহা জানিবার জন্য প্রকাশ্যভাবে বিজ্ঞাপিত হইত। জমিদারি কোর্টে কেহ কোন আপত্তি না করিলে, হস্তান্তর কার্য্য সমাধা হইত ও নূতন পাট্টা দেওয়া হইত। এই কার্য্যের জন্য মালিককে জমির মূল্যের উপর শতকরা ৫৲ টাকা 'ফি' দিতে হইত। এই ফি না দিলে দলিল গ্রাহ্য হইত না।

জমি দান বা বিক্রয়ের সময়েই ঐরূপ ফি দিতে হইত; নূতন বা ঠিকা পাট্টার সময় দিতে হইত না। ঠিকা পাট্টায় (বিশেষ অনুগ্রহের ব্যাপার না হইলে) বেশী খাজনা লাগিত এবং পাট্টার ফি ও ষ্ট্যাম্প খরচ দিতে হইত। প্রত্যেক বিষয়ের দলিলেই ষ্ট্যাম্প খরচ লাগিত।

ওলন্দাজদিগের সময় জমির মাপ নিম্নলিখিত উপায়ে গ্রহণ করা হইত।—চারিটি ভাগ-যুক্ত একটি লাঠি থাকিত। প্রত্যেক ভাগের পরিমাণ ২১ ইঞ্চি এবং উহা John Dinksএর নামক এক ওলন্দাজের হাতের মাপ। সমস্ত লাঠিটি ৮৪ ইঞ্চি ও ইংরেজি মাপের ৪$\frac{2}{3}$ হাত। পরে লাঠিটি ৩ ইঞ্চি কমাইয়া দেওয়া হয়। তাহাতে লাঠির মাপ ৪$\frac{1}{2}$ হাত হয়। এই সম্পর্কে Rynland মাপ বলা হইত। ইংরেজি মাপ ১৮ ইঞ্চিতে এক হাত।

ইংরেজ কর্ত্তৃক ওলন্দাজ নিয়মের পরিবর্ত্তন:—পরিবর্ত্তন বেশী কিছু হয় নাই। ওলন্দাজদিগের সময় যে সমস্ত পাট্টা দেওয়া হইয়াছিল, সেগুলি অস্বীকার করা হয় নাই। যাহাদের পাট্টা ছিল না, তাহারা অনেক দিনের অধিকার প্রমাণ করাইলে পাট্টা পাইত। ইহার জন্য ১৷৹ ফি ও অন্য কেহ আপত্তি করে কি না, তাহার জন্য বিজ্ঞাপন খরচা ৷৷৹ আট আনা দিতে হইত। ওলন্দাজ গবর্ণমেণ্ট

স্থাপিত শতকরা ৫৲ টাকা ফি ছিল, তাহাও গ্রহণ করা হইত। পাট্টা নূতন করিয়া লওয়ার ফি ১৬০ স্থলে ১।০ হইয়াছিল।

Board of Revenueএর এই নিয়ম ছিল যে, জমি হস্তান্তরিত হইলেই, এমন কি, উত্তরাধিকারসূত্রে হস্তান্তরিত হইলেও ফি দিতে হইত। ইহাতে সাধারণে আপত্তি জানাইলে ১৮২৮ খৃষ্টাব্দের ২১শে আগষ্ট সপারিষদ গভর্ণর জেনারল কর্তৃক স্থিরীকৃত হয় যে, জমি দান বা বিক্রয় করিলে ফি দিতে হইবে। আরও জমির খাজনার পরিমাণ হইতে ফি ঠিক করা হইবে। জমির মূল্য ও জমির উপর যে ঘর-বাড়ী থাকিবে, তাহার সহিত এই ফিএর কোন সংস্রব থাকিবে না। ১৮৪১ খৃষ্টাব্দের ৩১শে মার্চ্চ ভারতসরকারের আদেশে জমির মূল্য ইহার বাৎসরিক খাজনার ২০ গুণ হিসাবে ধরা হইবে। ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দের ১২ই আগষ্ট হইতে লাখরাজ জমিতে একেবারে ১২ বৎসরের পূর্ণ অধিকার দেওয়া হইত। ১৮২৮ খৃঃ ২৪ অক্টোবর Board of Revenue হইতে ওলন্দাজ পাট্টা সকল ইংরেজ গভর্ণমেণ্টের পাট্টায় পরিণত করিবার জন্ত আদেশ হয়।

এই আদেশের বিরুদ্ধে চুঁচুড়াবাসীদের নিকট হইতে খুব জোর আপত্তি আসিতে লাগিল। ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে কলেক্টর সাহেব জানাইয়াছিলেন যে, ৮ বৎসর চেষ্টার ফলে পুরাতন ওলন্দাজ পাট্টার মাত্র এক-তৃতীয়াংশ পাইয়াছেন। ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দের জুন মাস পর্য্যন্ত ৪৩৭ খানি নূতন ইংরেজি পাট্টা বাহির হয়। ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে ২১০০ ওলন্দাজ পাট্টার মধ্যে ১১০০ খানি পরিবর্ত্তন করা হইয়াছিল। কড়া ব্যবস্থার ফলে ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দের শেষে ইংরেজি পাট্টার সংখ্যা ১৩১৪ হয়। ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত পাট্টার ফি হিসাবে ১১৮০০৲ টাকা আদায় হয়। এই উন্নতি উত্তরপাড়ার জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের চেষ্টার ফল। তিনি কলেক্টর আফিসের মহাফেজখানার কর্ত্তা ছিলেন এবং তাঁহারই উপর কার্য্যের ভার বিশেষভাবে ন্যস্ত ছিল। ১৮৪০ হইতে ১৮৪২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ইংরেজি পাট্টার সংখ্যা ৬৫৭ খানি এবং ফি হিসাবে ১৯২৲ টাকা হইয়াছিল। ওলন্দাজ পাট্টা হইতে ইংরেজি পাট্টা পরিবর্ত্তনের আপত্তি যাঁহারা করিয়াছিলেন, তাঁহাদের নেতা ছিলেন চুঁচুড়ার শীল পরিবার। শীল পরিবারের কাহারও কাহারও জরিমানাও হইত এবং জরিমানা না দিলে হাজতও হইত।

চুঁচুড়া খাস মহলে জমি হস্তান্তরের আধুনিক নিয়ম:—যিনি জমি দান বিক্রয় করিতে চান, তাঁহাকে ।০ আট আনা কোর্ট-ফি ষ্টাম্প দিয়া দরখাস্ত (এখন ৸০ আনা) করিতে হইবে। ঐ জমিতে কেহ কোন আপত্তি করে কি না, তাহা জানিবার জন্ত বিজ্ঞাপনের খরচ হিসাবে আরও ৸০ বারো আনা ফি দিতে হয়। তৎপরে তহশীলদার ঐ স্থানে অনুসন্ধান করিয়া ঐ জমি তাঁহার (আবেদনকারীর) অধিকারে আছে কি না এবং গত জরীপ লিখিত বিবরণের সহিত উহা মিলে কি না, তাহা সংবাদ দিবে। যদি হস্তান্তরের অনুমতি হয়, তাহা হইলে পাট্টাসেলামী ১।০ টাকা ও এক বৎসরের খাজনা দিতে হইবে।

চুঁচুড়ার সোম-বংশ

শ্রীপূর্ণচন্দ্র উদ্ভটসাগর মহাশয় বলেন, "চুঁচুড়ার সোমবংশ ও বাগবাজারের মহারাজ রাজবল্লভের বংশ একই। কারণ, লক্ষ্মীনারায়ণ সোম ও কৃষ্ণবল্লভ সোম এই দুই সহোদর যথাক্রমে উক্ত দুই বংশের পূর্ব্বপুরুষ।" বিশ্ববাণী ৪র্থ বর্ষ জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৭ সাল ২য় সংখ্যা হইতে উদ্ধৃত। চুঁচুড়ার সোম-বংশ অতি প্রাচীন বংশ। ইহাদের এক জন পূর্ব্বপুরুষের নাম ছিল রামচরণ সোম। তিনি ওলন্দাজদিগের দেওয়ান পদে নিযুক্ত ছিলেন। তাঁহার পুত্রের নাম শ্যামরাম সোম। ইনি ওলন্দাজ কৌনসিলের এক জন সদস্য ছিলেন। তিনি চুঁচুড়ার গঙ্গাতীরে এক প্রাসাদসম অট্টালিকা নির্ম্মাণ করেন। গঙ্গার উপর একটি ঘাট নির্ম্মাণ করেন। ঐ ঘাটের সিঁড়ি গঙ্গাগর্ভের অতি দূর হইতে আরম্ভ হইয়াছিল—অত্যন্ত ভাঁটার সময়ও সিঁড়ির শেষ হইত না। ঐ অট্টালিকার চারিদিকে ৪টি সিংহদ্বার ছিল। ঐ অট্টালিকা-নির্ম্মাণ শেষ হইলে শ্যামরাম কৌশল করিয়া নবাবের নহবৎ আনাইয়া নিজ বাড়ীতে নহবৎ বাজাইয়াছিলেন। নবাব এই সংবাদ পাইয়া কৌশলে শ্যামরামকে ধরিয়া লইয়া গিয়া বন্দী করেন। তিনি কোনরূপে বাড়ীতে সংবাদ দেন। পরে বাড়ী হইতে কতকগুলি মূল্যবান্ উপঢৌকন নবাবকে পাঠাইয়া দেওয়া হয়। নবাব উহা পাইয়া শ্যামরামকে ছাড়িয়া দেন। শুধু তাহাই নহে, শ্যামরামকে "বাবু" * উপাধি দিয়াছিলেন। 'শ্যামবাবুর ঘাট' অদ্যাপি চুঁচুড়ায় বিদ্যমান আছে। তাঁহার বংশধরেরা অনেকে আছেন। চুঁচুড়ার উকিল শ্রীনরেন্দ্রনাথ সোম ঐ বংশের। বরদাকান্ত সোম ঐ বংশের এক জন কৃতী সন্তান ছিলেন।

চুঁচুড়ার সোমবংশ ও সূর্য্যমূর্ত্তি সম্বন্ধে শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যো-পাধ্যায় ১৩১৮ সালের ৩য় সংখ্যা সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকায় যাহা লেখেন, তাহার সারাংশ লিখিতেছি। চুঁচুড়ার সোমবংশ ৬৯৯ বর্ষ (এখন ৭২২ বর্ষ) পূর্ব্বে বাঙ্গালায় আসিয়া বাস করেন। তখন গৌড়ে হিন্দু শাসন। তাঁহার পরবর্ত্তী বংশধর বলভদ্র সোম গৌড়েশ্বরের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। গৌড়েশ্বরের প্রধান কর্ম্মচারী পুরন্দর খাঁ (গোপীনাথ বসু) অত্যন্ত ধর্ম্মপরায়ণ ছিলেন। তিনি আবাল্য সূর্য্যমূর্ত্তির পূজা করিতেন। পুরন্দরের এক রূপবতী কন্যা ছিল। বলভদ্র ঐ কন্যা প্রার্থনা করেন। পুরন্দর বলভদ্রকে কন্যা সম্প্রদান করেন। বিবাহান্তে বলভদ্রও সূর্য্যোপাসক হইয়া গেলেন। বলভদ্রের প্রপৌত্র শ্যামরাম মন্ত্রান্তর গ্রহণ করেন। তদবধি তাঁহাদের গৃহস্থিত সূর্য্যমূর্ত্তি সম্পূজিত হইয়া থাকে। শ্যামবাবুর বাড়ীতে কোন বৃহৎ কার্য্য উপলক্ষে সূর্য্যমূর্ত্তিটি স্থানান্তরিত হইয়া তৎকর্তৃক নির্ম্মিত ঘাটে স্থান লাভ করেন। আমার বিশ্বাস, এই ঘাটে পড়া ঠাকুরটিকে কেহ কি ভাবিয়া পূজোপচার প্রদানের মধ্যে 'ষষ্ঠী' নাম দিয়া অশ্বত্থবৃক্ষতলে প্রতিষ্ঠা করিয়া থাকিবেন। তদবধি বোধ হয় বলভদ্রের তপনদেবের গাছতলা সার হইয়াছে।

চুঁচুড়ার সুবর্ণবণিক

চুঁচুড়ার ও হুগলীতে অনেক ধনবান্ সুবর্ণ-বণিকের বাস। সুতরাং সুবর্ণবণিকের সম্বন্ধে কিছু লিখিলে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

হৈববত কনকক্ষেত্রে ক্ষেত্রিণী কনকাদেবী ১৫০ বৎসর রাজত্ব করেন বলিয়া তাঁহার রাজধানীর নাম নারীপুর হইয়াছিল এবং

* বাবু উপাধি বাঙ্গালীর ভিতরই প্রচলিত আছে। হয় ত বর্ত্তমান 'বাবু' কথাটি ওলন্দাজদিগের সময় হইতেই চলিত হইয়াছে।

তদীয় রাষ্ট্র (যাহা এখন গাড়বাল ও কুমায়ুন নামে খ্যাত) কনক-ক্ষেত্রের নাম হইয়াছিল স্ত্রীরাজ্য। কনকা দেবীর স্বামীর নাম প্রসেন ও শ্বশুরের নাম সুষেণ। উত্তরকালে নারীপুর ব্রহ্মাপুর নামে খ্যাত হইয়াছিল।

সেকালে স্ত্রীরাজ্যে প্রচুর পরিমাণে স্বর্ণ ও অন্যান্য খনিজ দ্রব্য সকল পাওয়া যাইত। স্ত্রীরাজ্যনিবাসী রাজনক সনকের স্বজাতীয় কনকক্ষেত্রিগণ পূর্ব্ব হইতেই স্বর্ণাদি ধাতু, মণিরত্ন, উর্ণা, লবণ প্রভৃতি পার্ব্বত্য দ্রব্যের ব্যবসা করিত। উহারা কালিকা-পুরীতে প্রচুর পরিমাণে সুবর্ণের আমদানী করায় উহার নাম হইয়াছিল সুবর্ণপুরী। এইরূপ বাণিজ্যব্যবহার দ্বারা ক্ষেত্রিগণ 'বণিক' আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিল।

কোন সময়ে এক প্রবল জাতি স্ত্রীরাজ্য আক্রমণ করে। তৎকালে সনকের বংশধর যুদ্ধে পরাজিত হইয়া রাজ্যত্যাগ করিতে বাধ্য হন। রাজ্যচ্যুত শ্রীচন্দ্র পরিবারবর্গকে লইয়া সোনানদী-তীরস্থ রোহিতাশ্বগিরি নগরে আসিয়া বাস করেন। শ্রীচন্দ্রের অনুসরণ করিয়া এই সময় অনেক ক্ষেত্রী সপরিবারে রোহিতাশ্ব-গিরিতে আসিয়া বাস করে।

রোহিতাশ্বগিরিবাসী বণিক-বীর কিরণকর রত্নাকরে গিয়া বহুরত্ন উপার্জ্জন ইচ্ছা করিলে আপনাকে সার্থবাহ বলিয়া ঘোষণা করেন। তাঁহার ঘোষণা শুনিয়া নগরবাসী বহু বীর বণিক সোৎসাহে মহা-সাগর পার হইবার ইচ্ছা করিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইলেন এবং রত্নাকর গমনার্থ যাত্রা করিলেন। ইহারা তাম্রলিপ্তি বন্দরে যান আরোহণ করিয়া সুবর্ণদ্বীপে গমন করেন। সার্থপতি কিরণকর ঐ দ্বীপে বহুরত্ন আহরণ করেন এবং সার্থের সহিত নিরাপদে সমুদ্রপার হইয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন।

রোহিতাশ্বগিরিবাসী বণিকগণ বাণিজ্যার্থ মগধে যাতায়াত করিতেন। তাঁহারা কাণানদীর পরপারে বাস করেন এবং সোনানদী পার হইয়া আইসেন বলিয়া মগধের (বিহারের) লোকরা তাঁহাদের নাম দিল 'সোনাপার বেণিয়া।'

বহুকাল পরে রোহিতাশ্বগিরির সার্থ সপরিবারে ঐ স্থান হইতে দক্ষিণপূর্ব্বদিকে যাত্রা করেন। তাঁহারা মগধ অতিক্রম করিয়া বনভূমে প্রবেশ করিলেন। ঐ স্থানে তাঁহারা এক নগর প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহার নাম দিলেন 'অযোধ্যা' (ইহা রামচন্দ্রের অযোধ্যা নহে, এই অযোধ্যা বাঁকুড়া জেলার অন্তর্গত)। ৬৫৫ শকাব্দে ঐ স্থান হইতে পঞ্চবণিক বাণিজ্যার্থ কর্ণসুবর্ণ (রাঙ্গামাটির ধ্বংসবহুল স্থান প্রাচীন কর্ণসুবর্ণের স্থান অধিকার করিয়াছে) গমন করেন। মুরশিদাবাদ জেলার ভাগীরথীর দক্ষিণ তটে, বহরমপুরের প্রায় ৩ ক্রোশ দক্ষিণে গমন করিয়া বিবিধ উপঢৌকন সহিত রাজদর্শন করিলে রাজা আদিশূর ঐ সকল উপহার গ্রহণ করিয়া তাহার প্রতিদানে বণিকদিগকে শ্রীপট্ট আদিপ্রসাদ ও সুবর্ণবণিক এই উপাধি প্রদান করেন।

অনুমান ১০ম শতাব্দীতে উজানি বা উজ্জয়িনী নগরের রাজা বিক্রমকেশরী সুবর্ণের নিমিত্ত ধনপতি সদাগরকে আদেশ দেন। তিনি তন্নিমিত্ত গৌড় নগরে যাত্রা করেন। রাজা বিক্রমকেশরীর আহ্বানক্রমে অযোধ্যাবাসী ১৬ জন প্রধান বণিক এবং তাহাদের অনুগত আর ৩০ জন বণিক সপরিবারে উজ্জয়িনীতে গমন করে। জয়পতি চন্দ্র ইহাদের অগ্রণী হইলেন।

একাদশ শতাব্দীতে পগাসিল টগাসিল আদি মেঘসিলের দ্বাদশ সন্তান দক্ষিণ রাঢ়ে (হুগলী জেলা) স্বর্ণরেখা নদীতীরে কাঞ্চী-পুরীতে বাস করিতেছিলেন। বণিকগণ রাঢ় দেশে ৬টি সমাজভুক্ত হইয়া বাস করিতেছিলেন। ঐ ছয় সমাজের নাম—১। বিহরণ, ২। সপ্তগ্রাম, ৩। বর্দ্ধমান, ৪। নবগ্রাম ৫। আজাপুর, ৬। কর্জ্জনাপুর।

১৪১৪ শকাব্দে কর্জ্জনা-নিবাসী অমরাক্ষ মল্লিক এক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। কর্জ্জনার নিকটস্থ খড়্গেশ্বরী নদীর দক্ষিণ তটে এক ক্রোশ স্থান ব্যাপিয়া যজ্ঞভূমি, বাসভূমি, সভামণ্ডপাদি নির্ম্মিত হয়। ইঁহাদের পুরোহিত ছিলেন গোবর্দ্ধন মিশ্র। যজ্ঞদিনে সভামণ্ডপে ছয় সমাজের অন্তর্গত ৪০ খানি গ্রামে ৭৯২ ঘর বণিক আসিয়াছিলেন। ঐ সভায় কৌলীন্যের কথা হয়। পুরোহিত গোবর্দ্ধন মিশ্রের উপর ভার পড়িল। পুরোহিত সুবর্ণবণিকদিগকে ভগবানের আদেশ প্রার্থনার জন্য অনশন ব্রত গ্রহণ করিতে উপদেশ দিলেন। চতুর্থ দিবসে প্রত্যাদেশ পাইয়া উহাদের থাক বাঁধা হইল। ১২ জন কুলীন, ৮ জন রাঢ়ী, ৩৫ জন বংশজ, ৩৬ জন গৌণবংশজ, ২২৩ জন মৌলিক, ১২৮ জন অতিকষ্ট মৌলিক ও এক জন মাত্র সন্ন্যাসী স্থির হইল।

১৬৬৩ শকাব্দে রাঢ়দেশে বর্গীর হাঙ্গামা আরম্ভ হইলে বণিক-গণ অন্যত্র নিরাপদ স্থানে পলায়ন করেন। ঐ হাঙ্গামায় ২৭ গ্রামের মধ্যে ৯ খানি গ্রাম বণিকশূন্য হয়। বণিকগণ হুগলী, চুঁচুড়া, ঢাকা, মুর্শিদাবাদ, খাগড়া প্রভৃতি স্থানে গিয়া বাস করিতে লাগিলেন। ঢাকায় রাঢ়ী ও সপ্তগ্রামী বণিক আছেন, তদ্ব্যতীত বঙ্গজ নামে অপর এক শ্রেণীর সুবর্ণবণিক আছেন। বোধ হয়, বল্লালসেনের অত্যাচার ইঁহাদের পূর্ব্বপুরুষের উপর হইয়াছিল। বর্গীর হাঙ্গামার পর হইতে কর্জ্জনা সমাজের রাঢ়ীয়দিগের ও চুঁচুড়া সপ্তগ্রামীনদিগের হুগলী প্রধান সমাজস্থান হয়। কয়েক শতাব্দী পূর্ব্বে রাঢ়দেশে বাসকালে তদ্দেশীয় লোকে ইহাদের সোনার বাণিয়া বা সোনার বেণে নাম দিয়াছে।

"গৌড়ে সুবর্ণবণিক" পুস্তক হইতে সারাংশ গৃহীত—প্রণেতা শিবচন্দ্র শীল।

সুবর্ণবণিকদিগকে সমাজে পতিত করিয়াছিলেন রাজা বল্লালসেন। কেহ কেহ বলেন, বৌদ্ধদের সহায়তা ও রাজার সহায়তাই উহাদের পতিত হইবার কারণ। আবার কেহ বলেন, রাজা বল্লালসেন, বল্লভানন্দ শেঠের নিকট এক কোটি টাকা কর্জ্জ লইয়াছিলেন। উহা পরিশোধ করিবার জন্য বল্লভানন্দ তাগিদ দেন। সেই আক্রোশে তিনি সুবর্ণবণিকদিগকে সমাজচ্যুত করেন। যাহাই হউক, ঐ সামাজিক দুর্ঘটনার বিবরণ দিতেছি :—

"বল্লভানন্দ শেঠ নামে এক জন অতি ধনাঢ্য সুবর্ণ-বণিক ছিলেন। তাঁহার ১৬ কোটি টাকার সম্পত্তি ছিল। ঐ স্থানে কুন্দন আচার্য্য নামে এক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। এক দিন কুন্দন বাড়ী হইতে কার্য্যান্তরে অন্যত্র গমন করিয়াছিলেন—বাড়ীতে তাঁহার স্ত্রীমাত্র রহিলেন। ঐ দিনই হঠাৎ এক অতিথি রাত্রিতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। গৃহে এমন কিছু ছিল না যে, অতিথিকে সেবা করান; কিন্তু অতিথিকে বিমুখ করিতে পারিলেন না। এই সকল ভাবিয়া ঐ ব্রাহ্মণপত্নী, রাজা বল্লালসেনের দত্ত ১০৮ তোলা ওজনের একটি সুবর্ণগাভী বল্লভানন্দের ভাগিনের মণি দত্তের

নিকট বন্ধক দিয়া পঞ্চবুটিকা (এক পয়সা) লইলেন এবং অতিথি-সৎকার করিলেন। (ভাবিবার কথা এই যে, তখনকার দিনে এক পয়সায় আহার হইত)। পরদিন কুন্দন আচার্য্য বাড়ী আসিয়া ঐ ব্যাপার শুনিয়া মণি দত্তের নিকট ঐ বন্ধকী গাভী লইয়া আসিবার জন্ত গেলেন। মণি দত্ত ঐ বন্ধক অস্বীকার করিল এবং তাহা গলাইয়া ফেলিল। কুন্দন নগরপালকে সংবাদ দিলেন এবং পরে রাজাও ঐ সংবাদ পাইলেন। রাজা বিশেষজ্ঞ স্বর্ণকার দ্বারা ঐ সোণা পরীক্ষা করাইলেন। কিন্তু ঐ স্বর্ণকার উৎকোচ গ্রহণ করিয়া ঐ স্বর্ণের নিকৃষ্টতা প্রমাণ করিলেন অর্থাৎ রাজদত্ত সুবর্ণগাভীর স্বর্ণাপেক্ষা এই স্বর্ণ নিকৃষ্ট বলিল। রাজা তাহাতে বিশ্বাস না করিয়া, কাশী হইতে স্বর্ণকার আনিয়া পরীক্ষা করাইলেন। উহা রাজদত্ত সুবর্ণগাভীর স্বর্ণ ও এই স্বর্ণ এক দরের এবং উহার ওজন ১০৮ তোলা। বিচারে মণি দত্তের দোষ প্রমাণ হইল। রাজা তাহাদের (সমস্ত সুবর্ণ-বণিকদের) মাথা মুড়াইয়া রাজ্যের দক্ষিণদিকে নির্ব্বাসিত করিলেন। সেই সময় হইতেই সুবর্ণ-বণিকেরা সমাজে পতিত হইলেন।"

রাজদণ্ডের প্রতিশোধ :—এই নিদারুণ দণ্ডের প্রতিশোধ লইবার জন্ত বল্লভানন্দের কন্তা পদ্মিনী কৃতসঙ্কল্প হইলেন। রাজা বল্লালসেন যেমন অসাধারণ বীর, শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন, আবার তেমনি লম্পট ও কামুক ছিলেন। পদ্মিনী এই দুর্ব্বলতার সূত্র ধরিয়া এক দিন রাজার প্রমোদকাননের ভিতর প্রবেশ করিয়া রাজার নজরে পড়িলেন। কিছু দিন পরে পদ্মিনী প্রকাশ করিল যে, সে হাড়িনী। বল্লালসেনের পুত্র লক্ষ্মণসেন ঐ হাড়িনীকে তাড়াইবার জন্ত অনেক চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য্য না হইয়া, পিতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। বল্লাল পুত্রকে ডাকিয়া বলিলেন, "আমি যাহাকে আশ্রয় দিয়াছি, তাহাকে ত্যাগ করিতে পারিব না।" লক্ষ্মণসেন পিতাকে আর কিছু না বলিয়া আত্মীয়স্বজন ও লোকজন লইয়া রাঢ়ে আসিয়া রাজা হইলেন। বল্লাল তখন আত্মীয়স্বজনত্যক্ত হইলেন। তখন পদ্মিনী নিজের আসল পরিচয় দিয়া, প্রতিশোধ লইবার জন্ত হাড়িনী পরিচয় দিয়াছিল বলিয়া, আত্মহত্যা করিল। "বঙ্গের সামাজিক ইতিহাস" হইতে সারাংশ গৃহীত—প্রণেতা দুর্গাচন্দ্র সান্ন্যাল।

সুবর্ণবণিক সমাজ ঐ নির্য্যাতন ভোগ করিয়াছেন সত্য, কিন্তু এই সুবর্ণবণিক সমাজ সমাজের কল্যাণের জন্ত অনেক মহৎ কার্য্য করিয়াছেন। দুর্গাচরণ লাহা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ৫০ হাজার টাকা, মেও হাঁসপাতালে ৫ হাজার টাকা, ডিষ্ট্রিক্ট চ্যারিটেবল সোসাইটীতে ২৪ হাজার টাকা দান করেন। শ্যামাচরণ লাহা দাতব্য চক্ষু-চিকিৎসালয় (কলিকাতা) ডফরিণ হাঁসপাতালে ৫ হাজার টাকা দান করেন। জয়গোবিন্দ লাহা আলিপুর পশুশালায় সর্পগৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছেন এবং বঙ্গের দুর্ভিক্ষে ১ লক্ষ টাকা দান করেন। কৃষ্ণদাস লাহা চুঁচুড়ায় জলকলের জন্ত ১ লক্ষ টাকা. বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্ত ৭৫ হাজার টাকা, রিপণ কলেজের সাহায্যকল্পে ১৫ হাজার টাকা, খুলনার দুর্ভিক্ষে ১ হাজার টাকা দেন। মতিলাল শীল অবৈতনিক বিদ্যালয় স্থাপন করেন। সাগরচন্দ্র দত্ত অবৈতনিক হাসপাতাল ও স্কুল করিয়া দেন। নয়ানচাঁদ দত্ত জগন্নাথ মন্দির করিয়া দেন এবং ২০ হাজার টাকা প্রণামী দেন। টুনুমণি দাসী বল্লভপুরে বিস্তৃত গঙ্গার ঘাট নির্ম্মাণ করিয়া দেন। রাজা রাজেন্দ্রনাথ মল্লিকের বাড়ী প্রত্যহ শত শত দরিদ্র প্রতিপালিত হইতেছে। আর কত বলিব। এই সুবর্ণবণিক সমাজে বৈষ্ণবপ্রধান উদ্ধারণ দত্ত জন্মিয়াছিলেন। উচ্চবর্ণের হিন্দু, এ কথা কি অস্বীকার করিতে পার ?

পদ্মিনী-সংক্রান্ত ঘটনায় বল্লালের অপবাদ প্রচার হইলে, লক্ষ্মণসেন পিতাকে যে কয়টি কবিতা লিখিয়াছিলেন, তাহা নিম্নে দেওয়া গেল। কিন্তু উহা যে লক্ষ্মণসেনের ও বল্লালসেনের লেখা, তাহার বিশিষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় না। তবে এই কথা চলিয়া আসিতেছে।

লক্ষ্মণসেন :—

শৈত্যং নাম গুণস্তবৈব সহজঃ স্বাভাবিকী স্বচ্ছতা,
কিং ব্রূমঃ শুচিতাং ভবন্তি শুচয়ঃ স্পর্শেন যস্যাপরে।
কিং বাহ্যং কথয়ামি তে স্তুতিপদং ত্বং জীবনং দেহিনাং,
ত্বং চেন্নীচপথেন গচ্ছতি পয়ঃ কস্তাং নিরোদ্ধুং ক্ষমঃ ।১।

বল্লাল—

তাপো নাপগতস্তৃষা ন চ কৃশা ধৌতা ন ধূলিজালা
ন স্বচ্ছন্দমকারি কন্দকবলঃ কা নাম কেলিকথা ?
পুরোৎক্ষিপ্তকরেণ দৃপ্তকরিণা স্পৃষ্টা ন বা পদ্মিনী,
প্রারব্ধো মধুপৈরকারণমহো ঝঙ্কারকোলাহলঃ । ২ ।

লক্ষ্মণ—

পরীবাদস্তথ্যো ভবতি বিতথো বাপি মহতাং
অতথ্যাস্তথ্যো বা হরতি মহিমানং জনরবঃ।
তুলোত্তীর্ণস্যাপি প্রকটিতহতাশেষতমসঃ,
রবেস্তাদৃক্‌তেজো নহি ভবতি কন্যাং গতবতঃ । ৩ ।

বল্লাল—

সুধাংশোর্জ্জাতেয়ং কথমপি কলঙ্কস্য কণিকা,
বিধাতুর্দ্দোষোঽয়ং ন চ গুণনিধেস্তস্য কিমপি।
স কিং নাত্রেঃ পুত্রো ন কিমু হরচূড়ার্চ্চনমণিঃ
ন বা হন্তি ধ্বান্তং জগদুপরি কিং বা ন বসতি । ৪ ।

তোমার স্বভাবসিদ্ধ শীতলতা গুণ।
নির্ম্মলতা তোমার যে স্বভাব অগুন।
পবিত্রতা তব সে বাক্যের অগোচর।
তোমা স্পর্শ করিলে পবিত্র হয় নর।
কি স্তুতি করিব জল জীবের জীবন।
তুমি নীচগামী হইলে কে করে বারণ। ১।

না গেল তনুর তাপ তৃষ্ণা না ঘুচিল।
শরীরে যেমন ধূলি তেমনি রহিল।
স্বচ্ছন্দ হইবে কিসে মৃণাল ভক্ষণ।
ক্রীড়াকক্ষ কোথায় হইবে সংঘটন।
হায় হায় বিস্তার করিয়া দূরে কর।
পদ্মিনীকে স্পর্শ না করিল করিবর।
মধুকর মধুপানে হইয়া বিহ্বল।
আচরণ করিল ঝংকার কোলাহল। ২।

সত্য কিম্বা মিথ্যা যদি পরীবাদ হয়।
জনরবে মহতের হয় তেজক্ষয়।

কন্যারাশি গমন করিলে দিনকর।
লোকে বলে কন্যাগত হলেন ভাস্কর॥
এই মিথ্যা জনরবে হয় তেজোহানি।
পরীক্ষা করিতে তুলা যান মনে মানি॥
তুলাতে উত্তীর্ণ রবি হইলে পরে আর।
তথাপি তেমন তেজ না হয় তাহার॥ ৩॥

সুধাকর-কলঙ্ক কলায় যে আধার।
এ দোষ তাঁহার নহে দোষ বিধাতার।
তিনি কি নহেন অত্রি মুনির সন্তান।
জগতের উপর কি নহে তাঁর স্থান॥
অন্ধকার সংহার কি না করেন তিনি।
তিনি কি নহেন চন্দ্রচূড়চূড়ামণি॥ ৪॥

১৮।১।৩০ জানুয়ারী বাং ১২২৫।১৮ মাঘ "সমাচার-দর্পণ" হইতে উদ্ধৃত।

চুঁচুড়া হইতে প্রকাশিত পুরাতন সংবাদ-পত্র

১। এডুকেশন গেজেট—ভূদেবচরিত গ্রন্থের ১ম ভাগ পৃঃ ৩৪৩ লেখা আছে—"এডুকেশনগেজেট" সর্ব্বপ্রথম সংখ্যা ৪ঠা জুলাই ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দ বাং ২২শে আষাঢ় ১২৬৩ সালে প্রকাশিত হয়। বার্ষিক মূল্য ৩৲ টাকা। ইহা প্রথম সরকারী সংবাদপত্র ছিল। শিক্ষা-বিভাগের হজসন প্রাট সাহেবের পরিচালকতায় ইহা প্রকাশিত হয়। গভর্ণমেণ্ট ইহার ব্যয় নির্ব্বাহার্থ প্রতি মাসে ২০০৲ টাকা দিতেন। ইহার প্রথম সম্পাদক ওব্রায়েন স্মিথ। তিনি নামে মাত্র সম্পাদক ছিলেন। প্রকৃতপক্ষে সম্পাদকীয় কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। স্বাস্থ্যভঙ্গ হওয়ায় স্মিথ সাহেব সম্পাদকের পদ ত্যাগ করেন। তাঁহার স্থলে ১৮৬০ খৃষ্টাব্দের প্রথম ভাগে প্রেসিডেন্সী কলেজের তৎকালীন ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপক প্যারীচরণ সরকার নিযুক্ত হন। ব্রহ্মমোহন মল্লিকের স্মৃতিকথায় জানা যায় যে, প্যারীচরণ সরকারের পূর্ব্বে কানাইলাল পাইন ও ব্রহ্মমোহন মল্লিক উহা পরিচালনা করিতেন। প্যারী বাবু সম্পাদকতা ছাড়িয়া দিলে ভূদেবচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সম্পাদক হয়েন—১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে ডিসেম্বর মাসে। তাঁহার সম্পাদকতার প্রথম সংখ্যা বাহির হয় ৪।১২।৬৮ খৃষ্টাব্দে। গভর্ণমেণ্ট ঐ পত্রিকাখানির সর্ব্বস্বত্ব ভূদেববাবুকে দিয়াছিলেন।

২। চুঁচুড়া বার্ত্তাবহ—সাপ্তাহিক সংবাদপত্র - ১৮৯১ খৃঃ প্রকাশিত হয়। দীননাথ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক প্রবর্ত্তিত।

৩। বেঙ্গল ম্যাগাজিন—ন্যাশন্যাল পেপার লিখিতেছেন "We have much pleasure to publish the prospectus of magazine to be started from the month of August next by Rev. Lall Behari Day...The Bengali magazine will at first consist of 48 pages Demy octavo size...The rate of subscription will be six rupees a year.

Chinsura — Neemye Chund Seal.
June 20th. 1872 — Managing proprietor

৪। সুবোধিনী—১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে রামচন্দ্র দিক্ষিতের সম্পাদকতায় বাহির হয়। ইহা পাদরী লং সাহেব বলেন। কিন্তু উহা ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে ১৩ই জানুয়ারী প্রকাশিত হয়।*

৫। শিক্ষাদর্পণ—১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে ভূদেবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের সম্পাদকতায় পরিচালিত হয়।

৬। চিকিৎসাদর্পণ—১৮৭০ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। বাং ১২৮০ সাল।

৭। সাধারণী—১২৮০।১১ই কার্ত্তিক প্রকাশিত হয়। সম্পাদক অক্ষয়চন্দ্র সরকার (B.A,B.L)

৮। বিনোদিনী—"সাধারণীতে" ইহার বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়। "বিনোদিনী সাহিত্য বিজ্ঞান নীতি ইতিহাস সম্বন্ধীয় (ভ্রমরের আকারে) মাসিক পত্রিকা...শ্রীমতী ভুবনমোহিনী দেবী কর্ত্তৃক সম্পাদিত হইয়া 'সাধারণী' যন্ত্রে প্রকাশিত হইবে।"

"সাধারণী ১২৮১ ২২শে চৈত্র"

৯। জননী—সম্পাদক প্রসাদদাস গঙ্গোপাধ্যায়।

১০। নবজীবন—১২৯১ সালে অক্ষয়চন্দ্র সরকার দ্বারা সম্পাদিত হয়।

১১। জ্যোৎস্নাহার—সম্পাদক প্রসাদদাস গঙ্গোপাধ্যায়।

১২। সনাতন ধর্ম্মকথা—সম্পাদক কালীকুমার দত্ত।

১৩। সমাচার—পাক্ষিক পত্র—৩০শে আষাঢ়, ১৩৩৮ সালে প্রকাশিত হয়। সম্পাদক ব্রজবল্লভ রায়—৩ বৎসর চলিয়াছিল।

[ক্রমশঃ।

শ্রীউপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (জ্যোতীরত্ন)।

* "চুঁচুড়া নগরে প্রকাশিত সুবোধিনী নাম্নী এক পাক্ষিকী পত্রিকার প্রথম সংখ্যা আমরা প্রাপ্ত হইলাম, বর্ত্তমান মাঘ মাসের প্রথম দিবসে ইহার জন্ম হইয়াছে। সম্পাদকের নাম শ্রীরামচন্দ্র দিক্ষিত। পত্রিকার মাসিক মূল্য।০ আনা।"

২২শে জানুয়ারী ১৮২৮ খৃষ্টাব্দ "এডুকেশনগেজেট ও সাপ্তাহিক বার্ত্তাবহ।"

[উপন্যাস

১৪

কৃষ্ণা চতুর্দ্দশীর রাত্রি। অন্ধকার যেন সমস্ত পৃথিবীটাকে একখানি কৃষ্ণবসনে আবৃত করিয়া রাখিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে সন্ধ্যার পর হইতেই ভীষণ দুর্য্যোগ, ঝরঝর অবিশ্রান্ত জলধারার সহিত প্রভঞ্জন দেব প্রবলবেগে বহিতেছেন। এ দুর্য্যোগে পথে কুকুর-বিড়ালেরও দর্শন পাওয়া যায় না।

কিছুক্ষণ হইতে ঝড়বৃষ্টির বেগ মন্দীভূত হইয়া আসিতেছে। শেষে বায়ুর বেগ একবারেই স্বাভাবিক হইয়া গেল। কিন্তু তখনও টিপ-টিপ জল ঝরিতেছে। রাত্রি তখন গভীর হইলেও আকাশে ক্ষীণ চন্দ্রমার মৃদু জ্যোৎস্না মেঘের আড়াল হইতে মাঝে মাঝে উঁকি মারিতেছে।

এ দুর্য্যোগেও দুইটি মনুষ্যমূর্ত্তি নিঃশব্দে অসীমবিকাশের আবাসভবনের সন্নিহিত কৃত্রিম জঙ্গলের ঘনসন্নিবিষ্ট বৃক্ষরাজির মধ্যে অপেক্ষা করিতেছিল, তাহাদের দৃষ্টি অট্টালিকার পশ্চাৎ-দ্বারের প্রতি নিবদ্ধ। তাহারা অসীমবিকাশ ও চামেলী। এই গভীর নিশীথে বৃষ্টিবাদলের মাঝে তাহারা চোরের মত আত্মগোপন করিয়া রহিয়াছে। আশ্চর্য্য!

আকাশে ঘন ঘন বিজলী চমকিত হইতেছিল। চামেলী সেই বিজলীর আলোকে অন্দরের নির্গমপথ লক্ষ্য করিয়াছিল। হঠাৎ চামেলী অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিল, "ঐ, ঐ অন্দরের দরজার দিকে দেখুন চেয়ে, ঐ দেখুন আলো, আর—ঐ দেখুন কে বেরিয়ে যাচ্ছে—"

অসীমবিকাশ অজগরের মত ঘন ঘন শ্বাস ফেলিতেছিল। তাহার হস্তদ্বয় দৃঢ় মুষ্টিবদ্ধ, সর্ব্বাঙ্গ ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টির জলে ভিজিয়া যাইতেছিল, সে দিকে তাহার লক্ষ্যই ছিল না। সে প্রায় রুদ্ধ কণ্ঠে বলিল, "হুঁ। পিছনে ও কে?"

চামেলী চুপি-চুপি বলিল, "বোধ হয়, তিনি এগিয়ে দিতে আসছেন। ও কি, আপনি যাচ্ছেন কোথা? এই যে আমায় কথা দিলেন, কোন গোলমাল করবেন না? না, না, আপনি ও দিকে গেলে আমি চেঁচাবো, ওরাও সাবধান হয়ে যাবে, লোক-জানাজানি হয়ে যাবে। বরং এর পর এক দিন তৈরী হয়ে ঐ দরজার কাছেই লুকিয়ে থাকবেন, তা হ'লে হাতে-নাতে ধরতে পারবেন।"

অসীম কাঁপিতেছিল। ঘন ঘন শ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে বলিল, "রক্তমাংসের   উঃ চামেলী! পৃথিবীটা এত বিশ্রী?"

চামেলী তাহাকে একরূপ ধরিয়াই ষ্টুডিওর দিকে লইয়া গেল। যাইতে যাইতে বলিল, "এখান থেকে ঐ বাইরে যাবার ছোট দরজা কতটা দূর? এটুকু যেতে যেতেই ওরা পাঁচীলের বাইরে চ'লে যেতো। দৌড়ে ছুটে গেলেও ওরা দেখতে পেতো,—পেয়ে সামলে নিতো। লাভে হ'তে একটা হয় ত গোলমাল হ'ত। চলুন যাই।"

কম্পিতপদে অসীমবিকাশ চামেলীর উপর ভর দিয়া ষ্টুডিওর দ্বারসান্নিধ্যে উপনীত হইল। সেখান হইতে গাছের আড়ালে পূর্ব্বের দৃশ্য নয়নগোচর হইতেছিল না। চামেলী দ্বারের চাবী খুলিতে যাইবে, এমন সময় রজনীর ঘোর নীরবতা ভঙ্গ করিয়া অদূরে একটা পিস্তলের আওয়াজ গর্জ্জিয়া উঠিল, সে আওয়াজ সেই রজনীতে বজ্রনির্ঘোষের ন্যায় অনুমিত হইল, সঙ্গে সঙ্গে মনুষ্যকণ্ঠ হইতে একটা বিকট পরিত্রাহি চীৎকার আকাশ ছাইয়া ফেলিল।

মুহূর্ত্তে অসীমবিকাশের ভয়, ক্রোধ, উদ্বেগ, জড়তা অন্তর্হিত হইল। সে নিমেষে চামেলীর সঙ্গ ত্যাগ করিয়া লম্ফ দিয়া বাগানের দিকে অগ্রসর হইল এবং শব্দ লক্ষ্য করিয়া দৌড়িল। চামেলীরও আর দ্বার উন্মুক্ত করা হইল না, সেও ঊর্দ্ধশ্বাসে অসীমবিকাশের অনুসরণ করিল।

অস্পষ্ট চন্দ্রালোক অন্ধকার ভেদ করিতে পারিতেছিল

না ; কিন্তু সেই সময় হঠাৎ বিদ্যুৎবিকাশ হইল। সেই আলোকে সম্মুখে নাতিদূরে অসীমবিকাশ যে দৃশ্য দেখিল, তাহাতে শিহরিয়া উঠিল, চামেলীও সে দৃশ্য দেখিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িবার উপক্রম করিল। মূর্চ্ছিত হওয়ারই কথা বটে! একটা মানুষের রক্তাক্ত দেহ দ্বারসান্নিধ্যে পড়িয়া রহিয়াছে, বৃষ্টির জল তাহার রক্তে লাল হইয়া উঠিয়াছে। প্রাচীরের দ্বার উন্মুক্ত।

আহত মনুষ্যমূর্ত্তির পার্শ্বে নতজানু হইয়া বসিয়া অসীম চীৎকার করিয়া বলিল, "একটা আলো—কে আছ, একটা আলো"—

সেই সময়ে বৃষ্টির জলে ছপ ছপ আওয়াজ করিতে করিতে একটা লোক অট্টালিকার দিক হইতে ছুটিয়া আসিতেছিল। সে চীৎকার করিয়া বলিল, "কি, কি, কি হয়েছে ?"

অসীম ও চামেলী কণ্ঠস্বর শুনিয়া বুঝিল, সে শুভেন্দু। তাহাদের চোখে চোখে দৃষ্টি-বিনিময় হইয়া গেল।

শুভেন্দু আসিয়া সম্মুখের দৃশ্য দেখিয়া শিহরিয়া উঠিয়া বলিল, "ইস্! কি সর্ব্বনাশ! কে এ লোকটা ?"

এই আকস্মিক দুর্ঘটনার সময় কাহারও কোন দিকে দৃষ্টি ছিল না, সকলেই আহত ব্যক্তির প্রতিই সন্নিবদ্ধদৃষ্টি হইয়া ছিল। তাহারা মুহূর্ত্তেই লোকটাকে চিনিতে পারিল, সে মনুয়া। এই হতভাগ্য কুলী কিরূপে এখানে আসিল বা কাহার দ্বারা আহত হইল, সে চিন্তা কাহারও মনে উদয় হয় নাই। অসীম ও শুভেন্দু তখন তাহার হৃদয় ও নাড়ী পরীক্ষা করিতেছিল, আর চামেলী চীৎকার করিয়া সাহায্য প্রার্থনা করিতেছিল।

তখন অট্টালিকা ও ষ্টুডিও হইতে অনেক নরনারী ঘটনাস্থলে সমবেত হইতে আরম্ভ করিয়াছিল। যে যে অবস্থায় ছিল, সদ্যোনিদ্রোত্থিত হইয়া কোনমতে গাত্র আচ্ছাদন করিয়া তথায় ছুটিয়া আসিতেছে, তাহাদের মধ্যে ঊষা ও হিরণীও ছিল।

পরীক্ষা দ্বারা যখন স্থির হইল যে, লোকটি নিহত হইয়াছে, তখন অসীম চীৎকার করিয়া আদেশ করিল, "পুলিস, পুলিস,—এখনই পুলিসে ফোন ক'রে দাও।" পাঁচ সাত জন লোক প্রভুর আদেশ পালন করিতে ছুটিয়া গেল। একটা লোক একটা পিস্তল কুড়াইয়া আনিয়া অসীমবিকাশের হাতে দিল, পিস্তলটা দ্বারের পার্শ্বে ঝোপের ভিতরে পড়িয়াছিল, টর্চের আলোকে উহাকে চক্‌চক্ করিতে দেখিয়া লোকটি উহা কুড়াইয়া আনিয়াছিল। অসীম উচ্চৈঃস্বরে বলিল, "যেখানে যা আছে, কেউ তাতে হাত দিও না, পুলিস এসে যা হয় করবে।"

তখন বৃষ্টি একবারে ধরিয়া গিয়াছে, রাত্রিও প্রায় প্রভাতোন্মুখ হইয়া আসিয়াছে। শুভেন্দু অসীমকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "এ লোকটি আজ নূতন আসছে না এখানে। আশ্চর্য্য হচ্ছি, আসতো কি ক'রে ?"

অসীম সে কথার জবাব দিল না, সে যেন শুভেন্দুকে এড়াইয়া চলিবার চেষ্টা করিতেছিল। ক্ষণপরেই দ্বারসান্নিধ্যে মোটরের হরণ বাজিয়া উঠিল, সদলবলে পুলিস উপস্থিত হইল। পুলিস আসিয়াই নিহত ব্যক্তির সর্ব্বাঙ্গ ও অঙ্গাবরণ তন্নতন্ন করিয়া পরীক্ষা করিল, দ্বারের আশপাশের সমস্ত ঝোপ-জঙ্গল আলোড়ন করিয়া দেখিল, অন্দরের প্রাচীর-দ্বারও তাহাদের পরীক্ষা হইতে অব্যাহতি পাইল না। পিস্তলটি ও মৃত ব্যক্তির জিনিষপত্র হস্তগত করিবার পর পুলিস শব তুলিয়া লইয়া চলিয়া গেল, শবব্যবচ্ছেদের পর করোনারের তদন্ত হইবে। ইহার মধ্যে আর কিছু কায করিবার রহিল কি না, তাহা পুলিস ভিন্ন কেহ জানিল না। হত্যাকারী বলিয়া সন্দেহ করিবার মত পুলিস কাহাকেও পাইল না, কেন না, মৃত ব্যক্তির কাছে প্রথমেই গৃহস্বামী ও তাঁহারই দুই জন কর্ম্মচারী উপস্থিত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহই পুলিসের সন্দেহভাজন হন নাই। কিন্তু এই ব্যাপারের যবনিকাপাত এইখানেই হইল না।

১৫

সহরে খুবই হৈ-চৈ পড়িয়াছে। কয়দিন হইতে লোকের মুখে এই হত্যাকাণ্ডের কথা ব্যতীত আর কোন আলোচনা নাই। ট্রামে, বাসে, স্কোয়ারে, ময়দানে, ক্লাবে, বৈঠকখানায় —সকলেরই মুখে ঐ একই কথা। সম্রান্ত ভদ্রপরিবারের ঘরে এত বড় একটা রহস্যজড়িত হত্যাকাণ্ড সকলেরই যে বিস্ময় উৎপাদন করিবে, তাহাতে আশ্চর্য্যের বিষয় কিছুই ছিল না।

যে দিন অসীমবিকাশের আবাসভবনে এই হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হইয়াছিল, তাহার পরদিনই সহরের প্রত্যেক

দৈনিক সংবাদপত্রে বড় বড় হরপে ঘটনার কথা বড় বড় চমকপ্রদ শীর্ষলিপি দিয়া প্রকাশিত হইল। মোটের উপর ইহাই লেখা হইয়াছিল যে, বড় ঘরে এক মস্ত রহস্যজাল-জড়িত নরহত্যা সংঘটিত হইয়াছে। উহা যে স্বেচ্ছাকৃত আত্মহত্যা নহে, তাহা পুলিস মৃতদেহের গুলীর আঘাতের স্থান এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থা দেখিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছে। নিহত ব্যক্তি বেহারী কিম্বা উত্তরপশ্চিম-ভারতীয় এবং নিম্নশ্রেণীর শ্রমিকজাতীয় লোক বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে। মৃতদেহের নিকটে একটি পিস্তল পাওয়া গিয়াছে, উহাতে অসীম সিনেমা কোম্পানী লিমিটেডের স্বত্বাধিকারী প্রসিদ্ধ ধনী জমিদার গৃহস্বামী অসীমবিকাশ বাবুর নাম ক্ষোদিত আছে। মৃত ব্যক্তির মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই গৃহস্বামী এবং তাঁহার একটি পুরুষ অপর একটি নারী কর্ম্মচারী ঘটনাস্থলে প্রথমে উপস্থিত হইয়াছিলেন। মৃতদেহ শবব্যবচ্ছেদের জন্য যথাস্থানে প্রেরিত হইয়াছে। পুলিস কেবল গৃহস্বামীকে এইটুকু জানাইয়া রাখিয়াছে যে, তিনি ও তাঁহার যে দুইটি কর্ম্মচারী প্রথমে মৃতদেহের নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন, তাঁহারা যেন করোনারের বিচারের পূর্ব্বে স্থানত্যাগ না করেন। ইহা ছাড়া যতক্ষণ করোনারের সিদ্ধান্ত প্রকাশিত না হয়, ততক্ষণ পুলিস এ বিষয়ে কোন কথা প্রকাশ করিতে চাহিতেছে না। ঐ লোকটি কে, কোথা হইতে আসিল, আর কেনই বা ধনীর গৃহে নিহত হইল,—ইহা জানিবার জন্য সহরবাসী জনসাধারণ অতিমাত্র ব্যগ্র হইয়াছে। সহরে ইতিপূর্ব্বে আরও দুই তিনটি হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হইয়াছে। অদ্যাপি সে সকল হত্যাকাণ্ডের কোন কিনারা হয় নাই। আশা করা যায়, এই ব্যাপারটিরও উপরে ঐরূপে যবনিকাপাত হইবে না।

এই হত্যাকাণ্ডের পরদিনই হিরণী দেশে চলিয়া গেল, অসীমবিকাশও তাহাকে বিশেষ বাধা দিল না। এই বাড়ীটার উপরই যেন বিধাতার কোপদৃষ্টি পড়িয়াছিল। সুতরাং উহা হইতে হিরণী এখন যত দূরে সরিয়া যাইতে পারে, ততই মঙ্গল, হয় ত এই ভাবিয়াই অসীম তাহার যাত্রায় বাধা প্রদান করে নাই।

যাত্রার পূর্ব্বে ঊষা কেবল বলিয়াছিল, তাহাদের সংসারে যাহাই ঘটুক না কেন, সে জন্য হিরণীর লেখাপড়া ছাড়িয়া দেশে যাইবার প্রয়োজন কি? এ বাড়ীও যখন তাহাদের নিজের, তখন সেই বা কি জন্য বাড়ী ছাড়িয়া যাইবে? হিরণী অনর্থক কথা না বাড়াইয়া কেবল উত্তরে বলিয়াছিল, সে দিন কয়েকের জন্য হাওয়া বদলাইয়া আসিবে, সে ত জন্মের মত এ বাড়ী ছাড়িয়া যাইতেছে না। আর তাহাদের দেশও ন'মাস ছ'মাসের পথ নহে, প্রয়োজন হইলে তাহাকে খবর দিলেই সে তিন ঘণ্টার মধ্যে চলিয়া আসিবে।

হিরণী কিন্তু দেশে গিয়া এক দিনের জন্য নিশ্চিন্ত হইতে পারিল না, পূর্ব্বের সুখশান্তিও ফিরিয়া পাইল না। তাহার যেন কিছুতেই তৃপ্তি আসে না, সে কিছুতেই স্বস্তি অনুভব করে না। তাহার মন অনুক্ষণ কি যেন একটা মস্ত অভাব অনুভব করে, কি যেন সে হারাইয়াছে, চেষ্টা করিয়াও খুঁজিয়া পাইতেছে না। লেখাপড়ায় সে মোটেই মন দিতে পারে না, পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হওয়া ত দূরের কথা। যতটুকু সময় সে শয্যাশায়ী পিতার সেবা করে, ততটুকু সময়ই সে অন্যমনস্ক থাকে, অন্যথা অস্থির ও চঞ্চলভাবে এখানে সেখানে ঘুরিয়া বেড়ায়। অপরাহ্ণে সে যখন নদীর তীরে বেড়াইতে যায়, তখন প্রজারা জমিদার-কন্যাকে দেখিয়া সসম্ভ্রমে পথ ছাড়িয়া দিয়া অভিবাদন করিলে সে অনেক সময় প্রত্যভিবাদন করিতে ভুলিয়া যায়। হয় ত তখন সে অন্য কোন বিষয়ে মন দেয় বলিয়াই প্রত্যভিবাদন করে না, অন্যথা সে এ বিষয়ে অতিমাত্র মনোযোগী ছিল। বয়োবৃদ্ধ প্রজারা তাহার এই ব্যবহারে অতিমাত্র বিস্ময় অনুভব করিত। কোন কোন সময় তাহাকে নিকট-সম্পর্কের দুই একটি জ্ঞাতি-কন্যাকে লেখাপড়া শিখাইতে দেখা যাইত। কিন্তু জ্ঞাতিকন্যারাই অন্তরালে বলাবলি করিত যে, হিরণী দিদি এখন আর আগেকার মত মন দিয়া পড়ায় না, তাহার পদে পদে ভুল হয়, সে কথায় কথায় অন্যমনস্ক হয়। হিরণীর এ অভাবনীয় পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিবার মত তাহার আপনার জন সেখানে কেহ ছিল না।

প্রতিদিন বেলা ১০টার সময় সহর হইতে দৈনিক সংবাদপত্র জমিদারভবনে বিলি হইত। হিরণীর দৈনিক পত্র পাঠ করা নিত্য-নৈমিত্তিক ক্রিয়ার মধ্যে পরিগণিত ছিল। কলিকাতা হইতে আসিবার দিন দশ পরে হঠাৎ এক দিন সংবাদপত্র পাঠ করিতে গিয়া একটি সংবাদের জলজ্বলে

শীর্ষলিপি দেখিয়া তাহার মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল। সেই শীর্ষলিপির নিম্নের রচনা এইরূপঃ—অসীম সিনেমা লিমিটেড কোম্পানীর স্বত্বাধিকারী ধনবান্ জমিদার অসীমবিকাশের আবাসভবনের সংলগ্ন কৃত্রিম জঙ্গলে সে দিন যে ভীষণ রহস্যজনক হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হইয়াছিল, করোনারের বিচারকালে সরকারী ডাক্তারের পরীক্ষায় সপ্রমাণ হইয়াছে যে, উহা আত্মহত্যা নহে, নরহত্যাই বটে। আততায়ীর পিস্তলের গুলী নিহত ব্যক্তির বাম বক্ষ ভেদ করিয়া চলিয়া গিয়াছিল এবং মৃত্যুও তদ্দণ্ডেই সংঘটিত হইয়াছিল। পুলিসের সাক্ষ্যে প্রকাশ পাইয়াছে যে, মৃত্যুর পূর্ব্বে আততায়ীর সহিত তাহার অতি সামান্যক্ষণ ধস্তাধ্বস্তি হইয়াছিল। সেই স্থানের তৃণশষ্প যে ভাবে মর্দ্দিত হইয়াছিল, বৃষ্টির জল সত্ত্বেও তাহার পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। আততায়ীর পদে দামী জুতা এবং নিহত লোকটার পায়ে নাগরা জুতা ছিল। আততায়ীকেই নিহত ব্যক্তি প্রথমে অতর্কিতভাবে আক্রমণ করিয়াছিল এবং আততায়ী প্রাণভয়ে তৎক্ষণাৎ তাহার বক্ষঃস্থল লক্ষ্য করিয়া পিস্তলের গুলীবর্ষণ করিয়াছিল। এই জন্যই মনে হয়, আততায়ী কাহারও ভয়ে শঙ্কিত হইয়া পিস্তল হস্তেই সন্তর্পণে ফটকের দিকে অগ্রসর হইতেছিল। সে কোন্ দিক দিয়া আসিতেছিল, তাহার চিহ্ন পাওয়া যায় নাই, বৃষ্টির জল সে সব চিহ্ন ধুইয়া মুছিয়া দিয়াছে। নিহত ব্যক্তির অঙ্গে রেলের কুলীদের মত নীলরঙ্গের কোর্ত্তা ছিল, উহাতে 'আই আর' অক্ষর পাওয়া গিয়াছে। লোকটা পশ্চিমা হিন্দুস্থানী কুলী বলিয়া মনে হয়। ইহা ছাড়া তাহার অঙ্গাবরণের মধ্যে সামান্য দুই চারি আনা পয়সা, গোটা দুই বিড়ি ও দিয়াশালাই, একখানা হিন্দুস্থানী বর্ণমালার কেতাব ছিল; কিন্তু ঐ সকলের ভিতর হইতে তাহার নাম ও ঠিকানা পাওয়া যায় নাই। তবে মুঠার মধ্যে আততায়ীর এমন কোন জিনিষ কঠিনভাবে ধরিয়া রাখিয়াছিল যে তাহা আঙ্গুল কাটিয়া বাহির করিতে হইয়াছিল এবং উহা হইতে পুলিস আততায়ীর সন্ধান করিতে পারিবে বলিয়া আশা করিতেছে। ঐ জিনিষের কথা পুলিস করোনার সাহেবের অনুমতি লইয়া গোপন রাখিয়াছে।

আরও একটা বিষম রহস্যজালজড়িত ঘটনা করোনারের বিচারকালে প্রকাশ পাইয়াছে। এইটিই জনসাধারণের কৌতূহল উদ্রেক করিতেছে। যে পিস্তলটি নিহত ব্যক্তির দেহের কাছে কুড়াইয়া পাওয়া গিয়াছে, উহার পাঁচটি ঘরের একটি ঘর শূন্য, আর সবগুলিই গুলী-ভরা। নিহত ব্যক্তির বক্ষ হইতে যে গুলী বাহির করা হইয়াছে, তাহা অবশিষ্ট চারিটি গুলীর সমশ্রেণীর; সুতরাং ঐ পিস্তলের গুলীতেই যে মৃত ব্যক্তি নিহত হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। পিস্তলে গৃহস্বামীর নাম ক্ষোদাই ছিল। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলেন, তিনি ঐ পিস্তলটি বহুদিন পূর্ব্বে তাঁহার বন্ধু ও সহকর্ম্মী তাঁহার ফিল্ম কোম্পানীর আর্টিষ্ট ডিরেক্টর শুভেন্দু মিত্রের নিকট রাখিতে দিয়াছিলেন, কেমন করিয়া ঐ পিস্তল ঐখানে আসিল, তাহা তিনি বলিতে পারেন না। শুভেন্দু বাবু জিজ্ঞাসিত হইয়া করোনারকে বলেন যে, ঐ পিস্তলটি সিনেমার রিহার্সালে ব্যবহার হইত না, উহা তাঁহার দেরাজের টানার ভিতরে পড়িয়াছিল, কেমন করিয়া কে ড্রয়ারের চাবী খুলিয়া উহা বাহির করিয়াছে, তাহা তিনি বলিতে পারেন না। উহা তাঁহার টানাতেই আছে, তাঁহার এই ধারণাই ছিল।

তাঁহার এই কৈফিয়তে করোনারের কোর্টে একটা মহা চাঞ্চল্য উপস্থিত হয়. করোনার ও জুরীরাও তাঁহার কৈফিয়তে সন্তুষ্ট হন নাই। ইহার পর আর একটা চমকপ্রদ ঘটনার কথা জেরার মুখে প্রকাশ হইয়া পড়ে। গৃহস্বামী অসীমপ্রকাশ বসু বলেন, তিনি বন্দুকের আওয়াজ ও নিহত ব্যক্তির পরিত্রাহি চীৎকার শুনিয়া যখন ঘটনাস্থলের দিকে যান, তখন সেখানে নিহত ব্যক্তির পার্শ্বে শুভেন্দু বাবুকে দেখিতে পান নাই অথবা প্রাচীরের খোলা ফটকের দিক হইতেও বাগানে তাঁহাকে প্রবেশ করিতে দেখেন নাই। পরন্তু তিনি ও তাঁহার সিনেমার এ্যাকট্রেস শ্রীমতী চামেলীবালা যখন ষ্টুডিওর দিক হইতে আসেন, তখন ষ্টুডিওর বহির্গমনের সমস্ত দ্বার-গবাক্ষ রুদ্ধ ছিল, সে দিক দিয়া আসাও শুভেন্দু ব বুর পক্ষে সম্ভব ছিল না; বস্তুতঃ শুভেন্দু বাবু যে কোথা হইতে হঠাৎ আবির্ভূত হইলেন, তাহা তিনি কিছুতেই বুঝিতে পারেন নাই।

গৃহস্বামীর এই জবানবন্দীতে কোর্টে হুলস্থূল পড়িয়া যায়, বহু কষ্টে শান্তিরক্ষকদিগকে আদালতের শান্তিরক্ষা করিতে হয়। অতঃপর শ্রীমতী চামেলীবালার সাক্ষ্য গ্রহণ করা

িক মদ্যপানে

হয়। তিনিও গৃহস্বামীর কথার প্রতিধ্বনি করেন, পরন্তু বলেন যে, তিনি শপথ করিয়া বলিতে পারেন যে, শুভেন্দু বাবু ষ্টুডিও হইতে বাহির হন নাই অথবা প্রাচীরের ফটক দিয়াও প্রবেশ করেন নাই। তিনি নিশ্চিতই নিকটের কোন ঝোপ-জঙ্গলে লুকাইয়া ছিলেন এবং সেখান হইতেই বাহির হইয়াছেন।

কোর্টের চাঞ্চল্য অপসারিত হইতে না হইতেই আবার এক বিষম চাঞ্চল্য উপস্থিত হইল। কারণ, শুভেন্দু বাবু স্বয়ং জিজ্ঞাসিত হইয়া যে জবাব দিলেন, তাহা তাঁহারই সম্পূর্ণ বিপক্ষ প্রমাণ বলিয়া গৃহীত হইবার কথা। করোনার বার বার তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ঘটনার সময় তিনি কোথায় ছিলেন এবং কোথা হইতেই বা ঘটনার পর ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়াছিলেন? শুভেন্দু বাবু বার বার দৃঢ়স্বরে বলিলেন, এ কথার জবাবে তাঁহার কোন উত্তর নাই, তিনি কিছুই বলিতে পারিবেন না। আদালত শুদ্ধ লোক বিস্মিত স্তম্ভিত হইল। এই এক বৎসরে তিনি অতি উচ্চাঙ্গের আর্টিষ্ট বলিয়া কলিকাতায় সুনাম অর্জ্জন করিয়াছিলেন। সিনেমা জগতে এমন কোন প্রযোজক, গল্পলেখক, অভিনেতা-অভিনেত্রী ছিল না, যাহারা তাঁহার সৌজন্য, ভদ্রতা, বিনয়, নম্র-ব্যবহার এবং সর্ব্বোপরি আর্টে তাঁহার মৌলিকতা ও উদ্ভাবনী শক্তির প্রশংসা না করিত বা তাঁহার গুণে মুগ্ধ না হইত। করোনার রায় দিলেন যে, পশ্চিমা লোকটি অন্যের গুলীতে নিহত হইয়াছে। পুলিস যথানিয়মে ফৌজদারী আইনের মারফতে শুভেন্দুকে হাজতে রাখিবার আদেশ পাইল। উপযুক্ত আদালতে শুভেন্দুর ন্যায় জনপ্রিয় শক্তিশালী কলাবিদের নরহত্যার অভিযোগে বিচার হইবে।

কাগজখানা হিরণীর হস্তচ্যুত হইয়া পড়িয়া গেল। তাহার চক্ষুর সমক্ষে অক্ষরগুলা পিশাচের মত তাণ্ডব-নৃত্য করিতে লাগিল, বোধ হয়, ক্ষণকালের জন্য তাহার চিন্তাশক্তি বিলুপ্ত হইল। কিন্তু সে ক্ষণকালমাত্র। চরিত্রের দৃঢ়তা ছিল হিরণীর বৈশিষ্ট্য, সচরাচর নারীর মধ্যে তাহা লক্ষিত হয় না। কম্পিত হস্তে সে একখানি পকেট টাইম-টেবল লইয়া কলিকাতাযাত্রী রেলগাড়ীর সন্ধান করিতে লাগিল, দেখিল, আর পনেরো মিনিট পরে—বেলা এগারোটা আট মিনিটে একখানা গাড়ী যাইবে। দেখিবামাত্র সে ঘরের গাড়ী সজ্জিত করিতে আদেশ করিল।

অভুক্ত অবস্থায় নিমেষের মধ্যে জমিদার-কন্যা—স্বয়ং জমিদার বলিলেও হয়—একবস্ত্রে একাকিনী কলিকাতা যাত্রা করিলেন, ইহাতে ভৃত্য-পরিজনের বিস্মিত হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু তাহাদের গৃহকর্ত্রীর প্রকৃতিই ছিল ঐরূপ, তিনি কখনও বাঁধাধরা নিয়মের গণ্ডী মানিয়া চলিয়া আসিয়াছেন বলিয়া তাহারা মনে করিতে পারে না। হিরণী অতি প্রত্যূষেই প্রাতঃকৃত্য ও স্নান সমাপন করিয়া চা ও প্রাতরাশ গ্রহণ করিত, উহাই তাহার পক্ষে যথেষ্ট বলিয়া বিবেচিত হইল অথবা খেয়ালবশে তিনি আহার্য্য গ্রহণ করিলেন না, জমিদার-ভবনে এ কথা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিবার সাহসও কাহারও ছিল না।

প্রথম শ্রেণীর কামরায় সে একা। তাহার ললাট চিন্তারেখাগ্রস্ত, মাথার ভিতর তাহার আগুন জ্বলিতেছিল, সে কোন একটা সুসম্বদ্ধ সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার চেষ্টা করিয়াও তাহাতে উপনীত হইতে পারিতেছিল না। শুভেন্দু বাবুর এরূপ ব্যবহারের কারণ কি? মানুষ জীবন-মরণের সন্ধিস্থলে উপনীত হইয়া এমন করিয়া জীবন লইয়া খেলা করে কেন? কি গূঢ় রহস্য ইহার মধ্যে নিহিত?

তাহার সকল গুণের আধার দাদা জীবনে কখনও মিথ্যা বলিয়াছে বলিয়া সে মনে করিতে পারে না। চামেলীরই বা মিথ্যা সাক্ষ্য দিবার কি কারণ আছে? তবে? তবে কেন শুভেন্দু বাবু তাঁহার সম্বন্ধে সত্য ঘটনা প্রকাশ করিতে-ছেন না? অতি বড় নিগূঢ় কারণ না থাকিলে মানুষ নিজের প্রাণ লইয়া খেলা করে না।

চিন্তা—চিন্তা—চিন্তা—চিন্তার আর বিরাম নাই। কলিকাতার নিকটস্থ সহর-তলীর এক ষ্টেশন হইতে একটি হ্যাটকোটধারী বাঙ্গালী সাহেব এবং তাঁহার সঙ্গে একটি শামলা-চাপকানধারী বাঙ্গালী বাবু তাহার কামরায় উঠিয়া পড়িলেন। তাঁহারা পরস্পর কথা কহিতে কহিতে অন্যমনস্কভাবে গাড়ীতে উঠিয়া সম্মুখে হিরণীকে দেখিয়া নির্ব্বাক বিস্ময়ে একদৃষ্টে তাহার দিকে তাকাইয়া রহিলেন, মনে হইল, যেন এমন অদ্ভুত জিনিষ তাঁহারা জীবনে কখনও দেখেন নাই। মুহূর্ত্ত পরেই বাঙ্গালী

সাহেবটি মাথার হ্যাট খুলিয়া অভিবাদন করিয়া প্রশংসমান দৃষ্টিতে হিরণীর দিকে চাহিয়া বলিলেন, "আমরা বসতে পারি কি এই বার্থটাতে?"

স্বল্পভাষিণী হিরণী গম্ভীরস্বরে বলিল, "স্বচ্ছন্দে। এটা লেডিসদের জন্যে রিজার্ভ নয়।"

বাঙ্গালী সাহেব ও বাবু আসন গ্রহণ করিলে পর প্রথমোক্ত হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "গাড়ী ছেড়ে দিয়েছে, না বসেই বা করি কি? নামতে ত পারি নে।"

হিরণী কোন জবাব না দিয়া গম্ভীরভাবে গবাক্ষের বাহিরে চাহিয়া বসিয়া রহিল।

বোধ হয়, বাঙ্গালী সাহেব ও বাবু তাহার এই ঔদাসীন্য প্রদর্শনে অন্তরে চটিয়াছিলেন, তাই সাহেব বলিলেন, "দেখেছো অবনী- আজকাল কে ঘরের, কে বাইরের, তা আর চেনবার যো নেই। পোষাক প'রে সেজে থাকলে সবাই ভদ্দোর, সবাই গেরস্ত।"

হিরণীর অন্তরে চিন্তাসাগরের তুফান বহিতেছিল, তথাপি কথাটা তাহার কাণে গেল। কথাটা যে তাহাকে ঠেস দিয়া বলা হইয়াছে, তাহাও সে বুঝিল। অন্য সময় হইলে সে কি করিত বলা যায় না, কিন্তু আশ্চর্য্য, সে এখন নীরবে বসিয়া রহিল।

বাঙ্গালী বাবুটি বলিলেন, "তা ঠিকই বলেছেন। দেখেন না, ট্রামে বাসে যারা ওঠেন, তাঁদের কাপড়চোপড় পরা আর একলা বেড়ান দেখে বোঝা যায় না ত, কে ভদ্দর ঘরের মেয়ে, আর কে সিনেমা থিয়েটারের এ্যাকট্রেস।"

অতঃপর উভয়ে একসঙ্গে এই রসিকতায় হো হো হাসিয়া উঠিলেন। ঘৃণায় হিরণীর অন্তরটা ভরিয়া উঠিল। ইহারাই শিক্ষিত ভদ্রলোক—বাঙ্গালী? কিন্তু তাহাদের মত শিক্ষাপ্রাপ্তা বাঙ্গালী ভদ্রমহিলারাই বা এ সব ইতর সমালোচনার অবসর দেয় কেন? সত্যই তাহার বিক্ষিপ্ত মনের অবস্থায় তাড়াতাড়িতে একাকিনী আসা ভাল হয় নাই। সে ত এমন কখনও আসে না।

গর্ব্বিতা সহযাত্রিণীকে যথেষ্ট আঘাত দেওয়া হইয়াছে মনে করিয়া বাঙ্গালী সাহেব ও বাবু অতঃপর আপনাদের পূর্ব্ব-আলোচনার সূত্র পুনরায় গ্রহণ করিলেন। তাঁহাদের এক জনের হাতে সেদিনের একখানি ইংরেজি দৈনিকপত্র ছিল। তিনি বলিলেন, "এই সিনেমা এ্যাকট্রেসদের কথাই ধর না। আজকাল ধুয়ো উঠেছে, আমাদের গেরোস্তো ঘরের মেয়েদের সিনেমায় না নামালে আর চলছে না। কিন্তু যারা এ কথা লিখছে, তারা ত দেখে না, সিনেমা এ্যাকট্রেসরা কি ভাবে জীবন কাটাচ্ছে। এই ধর না আজকের কেসটা। ঐ যে চপলা না কি—"

দ্বিতীয় বাবুটি বলিলেন, "চামেলী।"

প্রথম বলিলেন, "হাঁ, চামেলী। তা অত রাতে অসীম বাবু আর ঐ চামেলী ষ্টুডিও থেকে বন্দুকের আওয়াজ শুনে বেরিয়ে এলেন। কেন, তার মানে কি? অত রাতে তাঁদের ষ্টুডিওতে কি দরকার ছিল?"

হিরণী এতক্ষণ নীরবে ছিল, এইবার মুখ ফিরাইয়া ক্রুদ্ধ উত্তেজিত স্বরে বলিল, "দেখুন, পরচর্চ্চায় আপনারা কেন এত আনন্দ পান বলুন দিকি? এইমাত্র ভদ্র মহিলাদের সম্বন্ধে যে আলোচনা করলেন, তা কোন ভদ্রলোক করে না। আবার যাদের সম্বন্ধে আপনারা কোন খবর রাখেন না, খবরের কাগজে এক খবর প'ড়ে তাদের ডিগ্রী ডিসমিস দিচ্ছেন! এই জন্যেই আপনাদের কোন উন্নতি হয় না।"

বাবুরা একবারে নির্ব্বাক—একটি অপরিচিতা অল্পবয়স্কা বাঙ্গালী তরুণীর কাছে এমন বোমাবিস্ফোরণের আশঙ্কা তাঁহারা অবশ্যই করেন নাই। উঃ, মেয়েটা কি বেহায়া! কি আশ্চর্য্য সাহস তাহার! তাঁহারা শ্লেষ ও বিদ্রূপের কশাঘাতে তাহাকে সায়েস্তা করিতে যাইবেন, এমন সময় গাড়ী প্লাটফরমে 'ইন' হইল। হিরণীও সকলের আগে নামিয়া পড়িয়া হন-হন করিয়া ছুটিয়া গিয়া একখানা ট্যাক্সিতে চাপিয়া বসিল। ট্যাক্সি তাহাকে লইয়া উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া চলিল। ট্রেণের বাবু দুইটি নির্ব্বাক নিস্তব্ধ হইয়া ফ্যাল-ফ্যাল নেত্রে তাহার দিকে চাহিয়া রহিলেন!

১৩

জগৎ যেমন চলে, তেমনি চলিতেছে। মানুষ যেমন নিত্য হাসে কাঁদে, তেমনি হাসিতেছে কাঁদিতেছে, কোথাও কোন ব্যতিক্রম নাই। তবে যে হিরণীর চোখে তাহার দাদার বৃহৎ পুরীটাকে এই প্রখর সূর্য্যকিরণেও নিষ্প্রভ ও অন্ধকার দেখাইতেছে, তাহার কারণ হয় ত তাহার

বর্ত্তমান মানসিক অবস্থা। ষ্টুডিওতে যেমন দৈনন্দিন কায হয়, তেমনি হইতেছে, অথচ হিরণী যেন তাহার মধ্যে কি একটা বিরাট অভাব অনুভব করিল—যেন কি একটা বিরাট শূন্যতা ও অপূর্ণতা বাড়ীটাকে রাক্ষসের মত গ্রাস করিয়া বসিয়াছে।

হঠাৎ অতর্কিতভাবে অসময়ে হিরণীর আগমন বাড়ীর লোকজনকে বিস্মিত করিল বটে, কিন্তু কেহ কোন কথা কহিতে সাহস করিল না। হিরণী সরাসরি আপনার ঘরে গিয়া হস্ত-মুখ প্রক্ষালন করিয়া বেশ পরিবর্ত্তন করিল। সে অল্পদিনই দেশে গিয়াছে, সেখানকার যাহা তাহা ঠিক তেমনি সাজান আছে। কান্তর মাকে আহ্বান করিতেই সে আসিয়া হাজির হইল। তাহাকে দেখিয়া তাহার বিস্ময় অপনোদিত হইতে না হইতেই সে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "দাদা কোথায়? বৌদি?—ঘুমুচ্ছে বুঝি?"

সৌদামিনী বলিল, "না, তানারা এইমাত্র সেবা ক'রে ঘরে গিয়ে শুয়েছেন। বাবু বার-বাড়ীতে আছেন বোধ হয়।"

হিরণী ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বলিল, "এইমাত্র? তার মানে? বেলা ত দুটো বাজে।"

সৌদামিনী বলিল, "এতক্ষণ রুগীর ঘরে বসেছিলেন কি না—"

হিরণী আরও বিস্মিত হইয়া বলিল, "রুগী? কে রুগী?"

সৌদামিনী বলিল, "ঐ যে তানার ভাই, হোটেলের দাদাবাবু—তানার ভারী অসুখ কি না—"

হিরণী আর দাঁড়াইল না, দ্রুতপদে তাহার ভ্রাতৃজায়ার শয়নকক্ষের দিকে চলিয়া গেল। এই দশ দিনে কি ঘটিয়াছে?

তখন উষারাণী শয্যার আশ্রয় গ্রহণ করে নাই, পাণ মুখে দিয়া চেয়ারে বসিয়া চুল এলাইয়া রৌদ্রে বাতাসে শুকাইতেছিল। তাহাকে দেখিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া বলিল, "ও মা! এ কে গো!"

হিরণী তাহার উচ্ছ্বসিত আনন্দে বাধা দিয়া বলিল, "বিভাসদার অসুখ? কি অসুখ? আমি ত শুনে যাইনি।"

মুহূর্ত্তে উষার মুখের হর্ষের দীপ্তি অন্তর্হিত হইল, ম্লানমুখে সে বলিল, "না, তা যাওনি। অসুখ আজ দুদিন হয়েছে—ব্রেণ ফিবার। হাঁসপাতালে না যেতে দিয়ে এখানে এনে চিকিৎসা করা হচ্ছে। এর আগে কদিন এমনই জ্বর ছিল, আজ দুদিন বাড়াবাড়ি।"

হিরণী বলিল, "হুঁ। বাড়ী এনেছ, ভালই করেছ। দাদা কোথায়? তিনি জানেন সব?"

উষা অবজ্ঞাভরে বলিল, "তা বল্‌তে পারি নি—তাঁকে জানাবার দরকার বোধ করিনি। আমার ভাইয়ের জীবন-মরণ নিয়ে খেলা হচ্ছে—আমি কারু অনুমতির অপেক্ষা করতে পারি নি, নিজেই নিয়ে এসেছি।"

হিরণী বলিল, "তা বেশ করেছ, এতে দাদাও কখনও অমত করতেন না। আমি সে জন্য বলিনি' দাদা জানেন কি না। আমি জানতে চাইছি, তিনি বিভাসদার চিকিৎসা-সেবার সমস্ত ব্যবস্থা ক'রে দিয়ে দেখাশোনা করছেন কি না?"

উষা বলিল, "হাঁ, নাও বটে। শুনেছেন তিনি সবই, ডাক্তার আর ওষুধপত্রের ব্যবস্থা ক'রে দিচ্ছেনও সবই, কিন্তু নিজে দেখাশোনা তিনি কিছুই করেন না। তিনি থাকেন হয় বারবাড়ী, না হয় ষ্টুডিওতে, অন্দরের সঙ্গে তাঁর কোন সম্পর্ক নেই।"

"হুঁ" বলিয়া হিরণী একটি দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিল। তাহার পর মাথা না তুলিয়াই ধীরে ধীরে অস্ফুট স্বরে বলিল, "বিভাসদার জীবনমরণের যুদ্ধ হচ্ছে ব'লে তুমি কারুর দিকে না চেয়ে তাকে নিজের কোলে আশ্রয় দিলে, কিন্তু আর এক জন নির্দ্দোষ মানুষের যে জীবন-মরণ নিয়ে খেলা হচ্ছে, তাতে কি করলে?"

উষা বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কার জীবন-মরণ নিয়ে খেলা হচ্ছে, হিরো? ওঃ, শুভেন্দু বাবুর কথা বলছিস? তা আমি কি করবো, মেয়েমানুষ—"

হিরণী এইবার মুখ তুলিয়া কঠোর কণ্ঠে বলিল, "মেয়ে-মানুষ? কেন, সহায়হীন—আশ্রয়হীন—বন্ধুবান্ধবহীন হয়ে তিনি হাজতে রয়েছেন, তোমরা কি একটা বড় ব্যারিষ্টার দিয়ে তাঁকে খালাস করিয়ে আনতে পারতে না? অন্ততঃ তাঁর সঙ্গে দেখা ক'রে তাঁকে ভরসা দিয়েও আসতে পারতে না? এখানে তাঁর কে আছে?"

উষা এত বিস্মিত বোধ হয় জীবনে কখনও হয় নাই। সে সেই সময়ে হিরণীর চোখে মুখে যে দয়ামায়ার দীপ্তি দেখিয়াছিল, তাহা ইহজীবনে ভুলিতে পারে নাই। সে

তাড়াতাড়ি বলিল, "কি করতে পারি আমরা? পুলিস যে পিস্তল কুড়িয়ে পেয়েছে—"

হিরণী বলিল, "হাঁ, সে পিস্তল দাদা তাঁকে দিলেও তিনি বলেছেন, সেটা দেরাজের টানাতেই ছিল। চোর ত চুরি করতে পারে সেটা। সেই চোর ত দোষী হ'তে পারে। ভেবে দেখো দিকি, এই কুলীটাকে খুন করবার তাঁর কি কারণ ছিল? তার সঙ্গে তাঁর কি মর্ম্মান্তিক ঝগড়া হয়েছিল?"

উষা অত্যন্ত ভীত হইয়া বলিল, "ও সব কি বলছ তুমি—"

হিরণী উঠিয়া বলিল, "বলছি ঠিকই! যাক, একবার দাদার খোঁজে যাচ্ছি, সন্ধ্যার পর দেখা করবো'খন।"

উষা বলিল, "কটার গাড়ীতে এলি? খাওয়া-দাওয়া হয়েছে ত?"

হিরণী ম্লান হাসিয়া বলিল, "তবু ভাল! না, সত্যিই দরকার নেই। তবে আমার ঘরে যদি এক কাপ চা পাঠিয়ে দিতে পার ত ভাল হয়। হাঁ, একটা কথা। যে দিন এই খুন হয়, সে দিন প্রায় শেষ রাত্রে চেঁচামেচি শুনে আমরা সবাই ঘুম ভেঙ্গে উঠে বেরিয়ে পড়েছিলুম বাগানে। কৈ, তখন ত শুনিনি, শুভেন্দু বাবু কোথা থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন ব'লে মস্ত একটা গোলমাল হয়েছে? এটা উঠলো কেন?"

উষা একটু বিভ্রান্তভাবে বলিল, "আমি? হাঁ, না, আমি তার কি জানি? শুভেন্দু বাবু কোথায় ছিলেন, তা তিনিই বলতে পারেন!"

এতক্ষণ হিরণীর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি তাহার উপরই ন্যস্ত ছিল, উষা দৃষ্টি অবনত করিয়াই তাহার কথার জবাব দিতেছিল। তাহার কথা শেষ হইলে হিরণী বলিল, "না, তাই বলছিলুম। আশ্চর্য্য! তিনি কি তবে আকাশ থেকে পড়লেন? কেউ জানে না, তিনি কোথায় ছিলেন?"

হিরণী সমস্ত অপরাহ্নটা ভ্রাতার জন্য অপেক্ষা করিল, কিন্তু তিনি কোনও কার্য্যে বাহিরে গিয়াছিলেন, সন্ধ্যার পূর্ব্বে ফিরিলেন না। হিরণী অস্থির হইয়া উঠিল, তাহার পক্ষে এক একটা ঘণ্টা যেন এক একটা দিনের মতই মনে হইতে লাগিল। আজই তাহার দাদার সহিত পরামর্শ করিয়া উকীল-ব্যারিষ্টার নিযুক্ত করার প্রয়োজন,—অনুক্ষণ এই চিন্তাই তাহার প্রবল হইয়া উঠিল। এমন কি, সে ভ্রাতৃজায়ার আহ্বানে একবার রোগীকে দেখিয়া আসিল বটে, কিন্তু সে দিকে মনোযোগ দিতে পারিল না, জলযোগে বসিয়া একটা দ্রব্যও স্পর্শ করিতে পারিল না।

রাত্রিতে ভ্রাতা-ভগিনী একসঙ্গে আহারে বসিল। হিরণী বসিল মাত্র। অন্য দিন হইলে অসীমের সে দিকে অবশ্যই দৃষ্টিপাত হইত এবং সেজন্য হিরণীকে অনুযোগও শুনিতে হইত; কিন্তু এবার তাহা হইল না, অসীমবিকাশ যেন সকল বিষয়েই একটা ঔদাসীন্য প্রদর্শন করিতেছিল, যেন কোন কিছুর সহিত তাহার সম্পর্ক নাই, যেন সে এই সংসারের অথবা পৃথিবীর কোন ধার ধারে না! হিরণীকে অপ্রত্যাশিতভাবে কলিকাতায় আসিতে দেখিয়াও তাহার কোনরূপ কৌতূহলের উদ্রেক হয় নাই, যেন হিরণী নিত্যনৈমিত্তিকভাবেই আহারে বসিয়াছে এবং তাহার এ বাড়ীতে বসবাসে অবিচ্ছিন্নতা অটুট রহিয়াছে, তাহার ব্যবহারে তাহার মনোভাব এইরূপই অনুমিত হইতেছিল।

আহারের পর অসীমের বসিবার কক্ষ নিৰ্জ্জন হইলে, যখন সে ও হিরণী ব্যতীত সে ঘরে আর কেহ রহিল না, তখন হিরণীই প্রথমে কথা পাড়িল। কথাটা বলিবার জন্য—তাহার ভ্রাতার নিকট মনের গুরু চিন্তাভার হাল্কা করিবার জন্য তাহার প্রাণ হাঁপাইতেছিল। অসীমবিকাশ গুম হইয়া বসিয়া সিগারেট-সেবা করিতেছিল।

হিরণী বলিল, "দাদা, তুমি কি হয়ে গেছ?"

অসীম যেন আকাশ হইতে পড়িল, এইরূপ ভাণ করিয়া বলিল, "কি হয়ে গেছি? কেন, কি হয়ে গেলুম আমি?"

হিরণী বলিল, "আমি এখান থেকে গেলুম এলুম, কি করলুম বা না করলুম, তা জিজ্ঞাসা করতেও কি ভুলে গেছ? আগে ত ভুলতে না কখনও।"

একরাশ ধূম উদ্গিরণ করিয়া অসীম বলিল, "তাই না কি? তা আগে ত তুমি যাওয়া-আসার কথা—আমায় না জানিয়ে কখনও যাওয়া-আসা কর নি। কাযেই তুমি কখন্ গেলে বা এলে, তা ত আমার জানবার সুযোগ হয়নি। তা ছাড়া এ বাড়ীতে এখন আর আমি ত কেউ নই!"

কথাটা এমন বিষাদ ও অভিমানে ভরা যে, হিরণীর মনে হইল, তাহার ভ্রাতার সমস্ত অন্তর কথাটা বলিবার সময় বেদনায় টন-টন করিতেছে। ব্যথিত হইয়া হিরণী

আসন ছাড়িয়া উঠিয়া আসিয়া অসীমের কাঁধের উপর এক-খানি হাত রাখিয়া কোমল কণ্ঠে বলিল, "দোষ যদি ক'রে থাকি, ছোট বোন ব'লে আমায় বকো না, দাদা—কিন্তু অমন ক'রে পর মনে করলে আমার কান্না পায় যে!"

হিরণীকে এমন নরম হইয়া যাইতে অসীম কখনও দেখে নাই। কিসের প্রভাবে তাহার এমন পরিবর্ত্তন, তাহা অসীম ভাবিয়া পাইল না সে'ও নরম হইয়া বলিল, "বোস হিরো। ভাবছিস, দাদা কেন এমন হলো? সত্যিই আমি আর এখন একটা মানুষ নই, কিম্ভূত-কিমাকার কি একটা হয়ে গেছি। চারদিক থেকে কি যেন একটা কি আমায় পিষে মারছে।"

একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল, "দাদা, আমাদের সোণার সংসারে এ কি হলো? আমার প্রাণ হাঁপিয়ে উঠছে এখানে থাকতে—কেবল ডাক ছেড়ে কান্না পাচ্ছে। কি করলে আবার যা ছিল, তা ফিরে আসে।"

অসীমের নিস্পন্দ প্রাণে যেন স্পন্দন ফিরিয়া আসিল। সে উঠিয়া বসিয়া উত্তেজিতস্বরে বলিল, "কি ফিরে আসবে, হিরো? আগেই ত তোকে বলেছিলুম, কাচ ভেঙ্গে গেলে আর জোড়া লাগে না। একবার যা হারিয়ে ফেলা যায়, তা কি আর ফিরে আসে?"

হিরণী বলিল, "কেন আসবে না? তুমি মনে করলেই আবার সব ফিরে আসে। কেন না ব'লে কয়ে ফিরে এসেছি জান? তোমার চোখের পরদা সরিয়ে দিতে—যে মিথ্যেকে আঁকড়ে ধ'রে তুমি আজ সব হারাতে বসেছ, সেই মিথ্যের পরদা ছিঁড়ে ফেলে দিতে।"

অসীম তাচ্ছীল্যভরে বলিল, "মিথ্যে? কি মিথ্যের পরদা সরিয়ে দেবে তুমি, হিরণী? আমার চোখকে ত আমি অবিশ্বাস করতে পারি নে। যাক, ও কথা থাক, তুমি হঠাৎ চ'লে গেলেই বা কেন আর হঠাৎ চ'লে এলেই বা কেন? শুধু ত আমার ভ্রম ঘোচাবে ব'লে আস নি, তোমার আরও কিছু উদ্দেশ্য আছে নিশ্চয়। এ কয় মাসে আমি বেশ বুঝে নিয়েছি যে, মানুষ যাই হোক, কোন স্বার্থ নইলে এক পাও চলে না।"

হিরণী ব্যথা পাইয়াও কঠোর আঘাতের কোন প্রতিঘাত করিল না, সে বলিল, "যদি তোমার তাই বিশ্বাস হয়, তবে তাই করতেই এসেছি, নিজের স্বার্থসাধনই করতে এসেছি। কিন্তু এটাও বিশ্বাস কর দাদা যে, সে স্বার্থের সঙ্গে তোমার স্বার্থ, এই বাড়ীর স্বার্থ—সবই জড়ান আছে। বলতে পার, কি মনে ক'রে তুমি শুভেন্দু বাবুর বিপক্ষে সাক্ষ্য দিয়েছিলে? চামেলীর কথা ধরি নে,—কিন্তু তুমি?"

অসীম এতক্ষণ স্বাভাবিকভাবেই কথা কহিতেছিল, এইবার কিন্তু হঠাৎ ধৈর্য্যচ্যুত হইয়া বলিল, "বিপক্ষে? তুমি যাকে বিপক্ষে সাক্ষ্য বলছ, তোমার চোখে হয় ত তা বিপক্ষ ব'লে মনে হ'তে পারে, কিন্তু আমি বিপক্ষ স্বপক্ষ কোন সাক্ষ্যই দিই নি, যা সত্য, তাই বলেছি। বলেইছি ত, চোখে যা দেখেছি, তা অবিশ্বাস করতে পারি নে।"

"কি দেখেছো চোখে তুমি—যা চামেলী তোমায় দেখিয়েছিল? না, নিজে দেখেছিলে কারও সাহায্য না নিয়ে—"

"আমি যা দেখেছি, তা বলেছি, এতে কারও সাহায্য নেই না নিই, তাতে কিছু এসে যায় না।"

"বেশ, তাই মেনে নিলুম। কিন্তু যাঁর নামে এত বড় একটা ভয়ানক অভিযোগ হয়েছে,—হয় ত যাঁকে এর জন্যে ফাঁসিকাঠে ঝুলতে হবে, তিনি না তোমার ছেলেবেলার বন্ধু? একসঙ্গে খেলেছ, লেখাপড়া করেছ, আবার তুমিই না তাঁকে এখানে নিয়ে এসেছ? তবে তাঁর রক্ষার জন্য কি বন্দোবস্ত করেছ? এখানে তাঁর কে আছে?"

অসীম অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিল। সে মৃদুস্বরে বলিল, "আমি কি করতে পারি—আদালতে হবে বিচার"—

"তুমি কি করতে পার, তাই জিজ্ঞাসা করছ? বৌদিও ঠিক ঐ কথা বলেছিল। কিন্তু সে ঘরের বউ, আর তুমি পুরুষ মানুষ—বাড়ীর কর্ত্তা। তুমি কিছু করতে পার না? কেন, বড় বড় উকীল-ব্যারিষ্টারের সাহায্য নেওয়া কি তোমার ধর্ম্ম নয়, তোমার উচিত নয়?"

অসীম বিস্ময়বিস্ফারিত নয়নে ফেল-ফেল করিয়া তাহার ভগিনীর তেজোদীপ্ত আগ্রহে বিস্ফারিত নয়নযুগলের দিকে চাহিয়া রহিল। পুনরায় তাহার মনে হইল, যাহাকে এখনও বালিকা-পর্য্যায়ভুক্ত ব্যতীত আর কিছু বলা যায় না, তাহার মধ্য হইতে এই প্রেরণা আসিল কোথা হইতে? কণ্ঠস্বর যথাসম্ভব গাঢ় ও গম্ভীর করিয়া সে বলিল, "আচ্ছা, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। সে না হয় আমার বন্ধু, কিন্তু

তার জন্যে তোমার এত মাথাব্যথা কেন? তুমি ত তার উপর অসন্তুষ্ট বই সন্তুষ্ট ছিলে না?"

হঠাৎ হিরণীর মুখচক্ষুতে অসম্ভব রক্তস্রোত ছুটিয়া আসিল, সে দৃষ্টি অবনমিত করিয়া লইল। তাহার পর অনুচ্চকণ্ঠে বলিল, "মানুষের বিপদে প্রত্যেক মানুষেরই একটা সহানুভূতি এসে থাকে, বিশেষ যদি সে মানুষ পরিচিত মানুষ হয়।"

অসীম দাঁড়াইয়া উঠিয়া দৃঢ়কণ্ঠে বলিল, "আর যদি বলি, তাকে আমার দোষী বলেই মনে হয়?"

হিরণীও দৃঢ়কণ্ঠে জবাব দিল, "তা হ'লে বুঝবো, তুমি অন্যায় রাগ আর হিংসার বশে এই বিশ্বাস করছ।"

অসীম ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া বলিল, "হুঁ! যদি তাই হয়, আমি তাকে রক্ষা করবার জন্য চেষ্টা করব কেন?"

হিরণী বলিল, "মনুষ্যত্বের খাতিরে, তোমার পূর্ব্ব-বন্ধুত্বের খাতিরে।"

অসীম বলিল, "যদি তা আমি না মানি? সে ত বল্‌লেই পারে, সে রাত্রে সে কোথায় ছিল, কোথা থেকে বেরিয়ে এসেছিল।"

হিরণী বলিল, "কেন তিনি তা বল্‌ছেন না, তা কি বুঝতে পারছ না? কার সুনাম বজায় রাখবার জন্যে আজ তিনি আপনার প্রাণ বলি দিতেও পেছুচ্ছেন না?"

হিরণীর কণ্ঠস্বরে অসীম আজ যে করুণ কাতর বেদনার সুর শুনিতে পাইল, তাহা জীবনে কখনও শুনে নাই। সে স্তম্ভিত হইল। এই নারীজাতির বুক ফাটিলেও মুখ ফুটে না, এই জনশ্রুতি কি মিথ্যা? তাহাদের অন্তরের অন্তস্থল দিয়া কি স্বচ্ছ শীতল মৃতসঞ্জীবনী সুধার মত ফল্গুস্রোত বহিয়া যায়, পুরুষের সাধ্য কি তাহার সন্ধান পাইবে?

বাহিরে কিছুই জানিতে না দিয়া অসীম বলিল, "আমি ও-সব হেঁয়ালি বুঝতে পারি নি! ধর, আমি যদি এ বিষয়ে কিছুই না করি?"

হিরণী গর্ব্বিতকণ্ঠে বলিল, "তা হ'লে আমিই তার ব্যবস্থা করবো, কর্ত্তব্য তোমার একার নয়।"

হিরণী মন্থরগমনে কক্ষ ত্যাগ করিয়া যাইতেছিল, অসীম ঈষৎ হাসিয়া বলিল, "ওরে, শোন হিরো, আমি যাই মনে করি, তার পক্ষে দাঁড়াবার ব্যবস্থা না ক'রে কি থাকতে পারি আমি? সে ব্যবস্থা আমি আগেই করেছি।"

হিরণী কোনও জবাব না দিয়াই চলিয়া গেল।

। ক্রমশঃ।

শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার বসু (সাহিত্যরত্ন)।

সবার উপর

(রবার্ট ব্রাউনিং)

সারা বছরের কুসুম বিলাস
একটি সমরে আহরে
একটি রতনেই করিছে বাস
সে বিস্ময় রয় আকরে।

আলো ও ছায়ার সে বৈভব
সারা সাগরে সন্তরে,
একটি মুকুতা গাঁথি লয় সব
নিজ গোপন অন্তরে।

আলো ও ছায়ার এ বৈভব,
কুসুম, মুকুতা, রতন সব—
ছোট হয়ে যায় যাদের কাছে,
ধরায় এমন কহ, কি আছে?

সত্য নয় কি রতনের চেয়ে উজ্জ্বল?
আস্থা নয় কি মুকুতার চেয়ে নির্ম্মল?

এমন সে সত্যমাঝে—সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সত্য মম
এমন সে আস্থা-মাঝে মোর আস্থা মহত্তম
এ বিশ্ব-ভুবনে—
কোন্ সে বালিকার
একটি চুম্বনে!

শ্রী:—

মোটর-চালিত বিচিত্র দ্বিচক্রযান

বৃটিশ রয়্যাল সিগ্ন্যাল সেনাবাহিনী এবার সমর-কৌশল প্রদর্শনের সময় চিত্রে বর্ণিত অপূর্ব্ব কৌশল দেখাইয়াছিল। মোটর-দ্বিচক্রযান
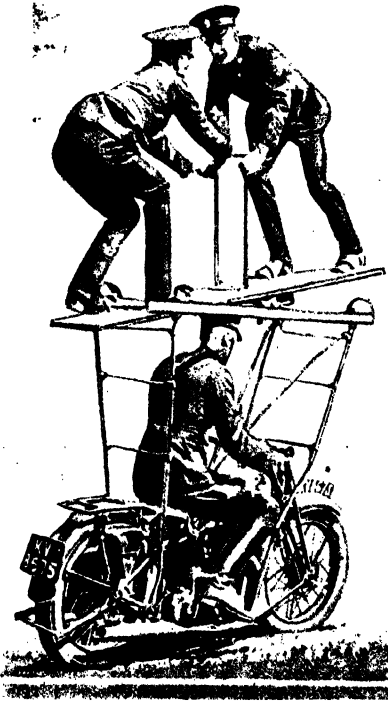
মোটর-চালিত বিচিত্র দ্বিচক্র-যান

দ্রুতবেগে চলিতেছে। আরোহীর মাথার উপরে দুই জন সৈনিক দণ্ড ধরিয়া দণ্ডায়মান। দ্রুত-ধাবনে কেহই পড়িয়া যায় নাই।

দ্বিতল বিমান

ইংলণ্ড হইতে অষ্ট্রেলিয়া এবং বৃটেনের অন্যান্য বিমানপথের জন্য ২৯ খানি বৃহদাকার বিমান নির্ম্মিত হইতেছে। দিবাভাগে প্রত্যেকটিতে ২৪ জন এবং রাত্রিকালে ১৬ জন যাত্রী যাহাতে নিদ্রা যাইতে পারেন, প্রত্যেক বিমানে তাহার ব্যবস্থা হইতেছে। বিমানগুলি দ্বিতল। ধূম-

মাঝখানে বিমানের চিত্র, উপরে ও নীচে বসিবার ও শয়নের ব্যবস্থার দৃশ্য
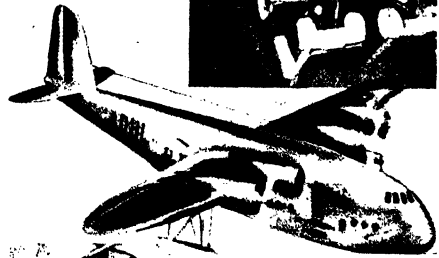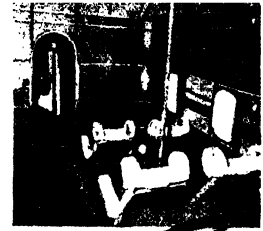
পানের জন্য স্বতন্ত্র কক্ষের ব্যবস্থা আছে। দ্বিতলে বিমানের নাবিকগণের এবং তিন টন ওজনের ডাক রাখিবার স্থান আছে। পুচ্ছের দিকে যাত্রীদিগের মালপত্র এবং ডানায় জ্বালানি তৈল রাখিবার সুব্যবস্থা হইয়াছে। প্রত্যেক বিমানে ৪ খানি শক্তিশালী এঞ্জিন—প্রত্যেকটি ৭ শত ৪০ অশ্বশক্তিবিশিষ্ট। এই বিমান ঘণ্টায় ২ শত মাইল পথ পর্য্যটন করিবে। রাত্রিকালেও এই বিমান আকাশপথে পরিচালিত হইবে। রেডিওর বন্দোবস্ত ইহাতে থাকিবে।

মৃত্যুর ফাঁদ

যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে এই গাছ বিদ্যমান। এই গাছের নাম "রতির মৃত্যু-ফাঁদ"। এই রাক্ষসী চারা-গাছের উপর কোনও পতঙ্গ আসিয়া বসিবামাত্র উহার উভয় পার্শ্বস্থ সূক্ষ্ম তন্তুগুলি কারাগারের গরাদের মত পতঙ্গকে চাপিয়া ধরে। উহার গ্রাস হইতে উদ্ধারের কোন সম্ভাবনা থাকে না, এক সপ্তাহ-

প্রথম দৃশ্যে পতঙ্গ আসিয়া বসিয়াছে, দ্বিতীয় দৃশ্যে তাহার বন্দী অবস্থা, তৃতীয় দৃশ্যে পতঙ্গ জীর্ণ হইতেছে

কাল ঐ চারা গাছ পতঙ্গটিকে নিজ জঠরে বন্দী করিয়া রাখে এবং তাহার শরীর হইতে যাবতীয় রস শোষণ করিয়া লয়। তার পর আবার সে তাহার মৃত্যু-ফাঁদ মুক্ত করিয়া অন্য শিকারের প্রতীক্ষায় থাকে। চলচ্চিত্রের ক্যামেরা ব্যতীত এই রাক্ষসীর মৃত্যু-ফাঁদের সমগ্র চিত্র গ্রহণ করিবার কোন উপায় নাই—এত দ্রুত রাক্ষসীর ক্রিয়া চলিতে থাকে।

স্বল্পমূল্যের ক্ষুদ্র মোটরগাড়ী

আমেরিকার এক জন কিশোর তিন ডলার মুদ্রা ব্যয়ে এই ছোট মোটরগাড়ী নির্ম্মাণ করিয়াছে। এক গ্যালন তৈলে ইহা ৮০ মাইল

স্বল্পমূল্যের ছোট মোটরগাড়ী

পথ অতিক্রম করিয়া থাকে। এই গাড়ীর গতিবেগ ঘণ্টায় ১০ মাইল। দেড় অশ্বশক্তিবিশিষ্ট মোটর ইহাতে সংলগ্ন আছে।

অন্ধের ছাপান লেখা পড়িবার ব্যবস্থা

নর্থ ওয়েষ্টারন্ বিশ্ববিদ্যালয়ের এক জন উচ্চশিক্ষিত ছাত্র বৈদ্যুতিক আলোকের সাহায্যে সাধারণ ছাপা গ্রন্থাদি যাহাতে অন্ধরা পড়িতে

অন্ধের ছাপা-লেখা পড়ার সুবিধা

পারে, তাহার উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন। ফটো ইলেকট্রিক সেল, আলোক এবং শক্তিশালী কাচ এই তিনটি পদার্থ লইয়া তিনি একটি যন্ত্র নির্ম্মাণ করিয়াছেন। একটি বাক্সের উপর এক থাক বোতাম বসান আছে। তড়িতালোক যখন একটি অক্ষরের উপর আসিয়া পড়ে, অমনই তাহার ছবি বড় হইয়া উঠে এবং যে বোতাম ঐ অক্ষরের দ্যোতক, তাহা ঠেলিয়া উঠিবে। অন্ধ হাত দিয়া সেই উত্থিত অক্ষরটি স্পর্শ করিয়া বুঝিতে পারিবে, কোন্ অক্ষর সেটা। উদ্ভাবয়িতা বিবেচনা করেন যে, পদ্ধতি অপেক্ষাকৃত জটিল হইলেও, কালে অন্ধগণ এই উপায়ে ছাপা বই প্রভৃতি পড়িতে পারিবে।

ভাঁজ করা দ্বিচক্রযান ও নৌকা

এক জন ফরাসী বৈজ্ঞানিক শিল্পী এক জনের উপযোগী একখানি ডোঙ্গা নির্ম্মাণ করিয়াছেন। উহা জলে ডুবিবে না। এই নৌকাকে ভাঁজ করিয়া দ্বিচক্রযানের সহিত সংলগ্ন করিয়া ইচ্ছামত স্থানে লইয়া যাওয়া যায়। জলভ্রমণকালে নৌকাখানিকে অল্পসময়ের মধ্যেই ব্যবহারোপযোগী করিয়া লইতে পারা চলে। নৌকাতে ফাঁপা নল এমনভাবে সন্নিবিষ্ট যে, উহা বায়ুপূর্ণ করিয়া লওয়া যায়। সুতরাং নৌকা জলে ডুবিবে না। ঐ বৈজ্ঞানিক শিল্পী একটি ভাঁজ করা দ্বিচক্রযানও নির্ম্মাণ করিয়াছেন। এই দুইটি

ভাঁজ করা ডোঙ্গা ও দ্বিচক্রযান
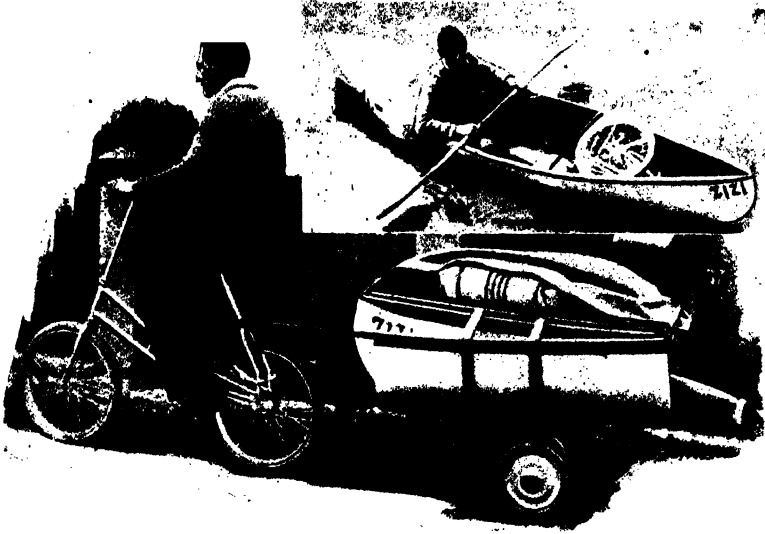
পদার্থের সাহায্যে জলে ও স্থলে উক্ত বৈজ্ঞানিক ভ্রমণ করিতে পারেন।

তিন হাজার বছরের পুরাতন গুঁড়ির মধ্যস্থ আস্তাবল

ক্যালিফোর্ণিয়ার এক জন ক্ষেত্রপতি একটা প্রকৃতি-জাত আস্তাবল একটা গুঁড়ির কোটরে আবিষ্কার করিয়াছেন। ঐ গুঁড়িটি ৩ হাজার বৎসরের পুরাতন। কোটরের ব্যাস ২৪ ফুট। ঐ কোটরে একটি অশ্ব ও একটি ষণ্ডকে অনায়াসে রাখা যায়।

মুদ্রাধার-সংলগ্ন ক্ষুদ্র ক্যামেরা

মুদ্রাধারের সহিত ক্ষুদ্র ক্যামেরাযন্ত্র এমনভাবে সন্নিবিষ্ট করিবার
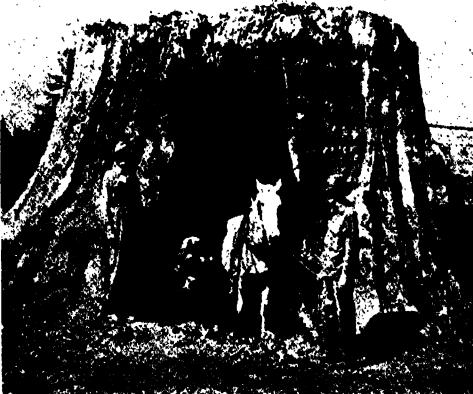
৩ হাজার বৎসরের পুরাতন গুঁড়ির অভ্যন্তরস্থ কোটর

মুদ্রাধার-সংলগ্ন ক্ষুদ্র ক্যামেরা

ব্যবস্থা হইয়াছে যে, গোপনে উহার সাহায্যে ছবি তোলা খুবই সহজ। ছবি দেখিলে ক্যামেরার অবস্থান বুঝিতে পারা যাইবে।

অপূর্ব্ব জলযান

ক্যালিফের অন্তর্গত স্যান্‌রাফেলের রবার্ট সিমপ্‌সন নামক এক ব্যক্তি একখানা পরিত্যক্ত দ্বিচক্রযান ও ৮০ সেণ্ট মুদ্রা ব্যয়ে এক অপূর্ব্ব

অপূর্ব্ব জলযান

জলযান নির্ম্মাণ করিয়াছেন। ছবি দেখিলেই বুঝা যাইবে, এই জলযানের আকার কিরূপ। তিনি উক্ত জলযান লইয়া সমুদ্রে ভাসিয়াছিলেন। যদি দৈবাৎ ঝড় ও সমুদ্রতরঙ্গে উক্ত জলযান নিমগ্ন হয়, এজন্য সম্মুখে একটা জীবনরক্ষক যন্ত্রও ঝুলাইয়া রাখিয়াছেন।

নূতন সামরিক ট্যাঙ্ক

আমেরিকার ফোর্ট বেনিংএ পদাতিক সৈন্যদলের জন্য নূতন ধরণের সামরিক ট্যাঙ্ক গাড়ী নির্ম্মিত হইয়াছে। অতি বন্ধুর পথেও এই ট্যাঙ্ক প্রতি মিনিটে এক মাইল পথ অতিক্রম করিয়া থাকে। এই ট্যাঙ্কের চাকাগুলি রবারনির্ম্মিত।

বৈদ্যুতিক ষ্টেথস্‌কোপ
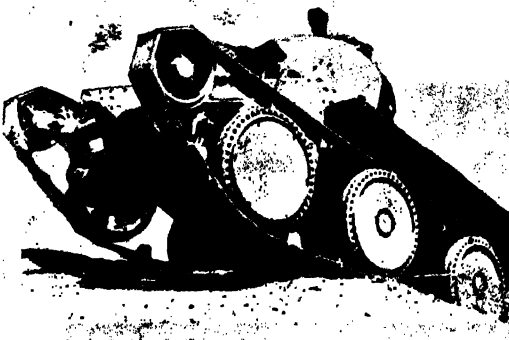
বৈদ্যুতিক ষ্টেথস্‌কোপের সাহায্যে চিকিৎসকগণ অতি সহজে ফুস্‌ফুস্‌ ও হৃদ্‌যন্ত্রের পীড়া নির্দ্দেশ করিতে পারেন। বৈদ্যুতিক

বৈদ্যুতিক ষ্টেথস্‌কোপ্‌

ষ্টেথস্‌কোপে হৃৎস্পন্দন ও বুকের অন্যান্য শব্দ বেশ সুস্পষ্টভাবে অনুভব করা যায়। এই নবোদ্ভাবিত ষ্টেথস্‌কোপ সাহায্যে দুই জন চিকিৎসক এক সঙ্গে হৃৎস্পন্দন শুনিতে পাইবেন।

বধিরের জন্য টেলিফোন যন্ত্র

যাঁহারা কাণে কম শোনেন, তাঁহাদের জন্য নূতন ধরণের টেলিফোন

নূতন সামরিক ট্যাঙ্ক

বধিরের জন্য নূতন টেলিফোন যন্ত্র

যন্ত্র নির্মিত হইয়াছে। যন্ত্রসংলগ্ন একটা ছোট বোতাম ঘুরাইলে ইচ্ছামত শব্দের গতি বর্দ্ধিত করিতে পারা যায়। যাঁহারা জন্মবধির, অবশ্য তাঁহাদের ইহাতে কোনও উপকার হইবে না, কিন্তু যাঁহারা কাণে কম শোনেন, তাঁহাদের পক্ষে টেলিফোনযন্ত্রে কথোপকথনের সুবিধা ইহাতে হইবে।

জুতার আকারবিশিষ্ট রেস্তোরাঁ

উটার অগডেন অঞ্চলে রাজপথের ধারে জুতার আকারবিশিষ্ট একটি পান্থশালা নির্ম্মিত হইয়াছে। ভ্রমণকারীরা এই বিচিত্রদর্শন পান্থশালা দেখিয়া তথায় গিয়া পান-ভোজন ও বিশ্রাম করিয়া থাকেন। এই পান্থশালাটি কংক্রিট-করা অট্টালিকা—তবে উহার আকার ঠিক জুতার ন্যায়।
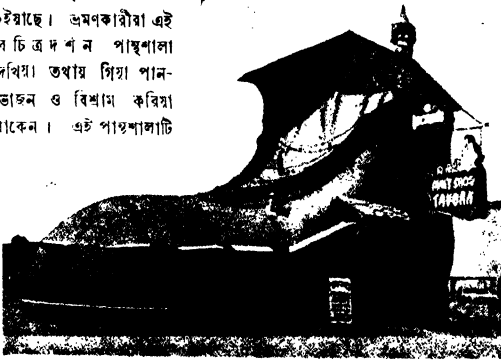
জুতার আকারবিশিষ্ট পান্থশালা

নারিকেল-মালারচিত চুরুটের আধার

হনলুলুর জনৈক শিল্পী নারিকেল মালা হইতে বিভিন্ন আকারের চুরুটের আধার নির্ম্মাণ করিয়াছেন। প্রত্যেকটিতে বিভিন্ন প্রকার হাস্যোদ্দীপক মুখের ছবি আছে। বহু পর্য্যটক এই আধার সংগ্রহ করিয়া আনেন, ইহাতে শিল্পী বেশ উপার্জ্জন করিয়া থাকে।

নারিকেল-মালার চুরুটের আধার

একশৃঙ্গবিশিষ্ট ষণ্ড

একশৃঙ্গ-বিশিষ্ট ষণ্ড

ডাঃ ডবলু, এফ, ডোভ মেইন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণিতত্ত্ববিদ্। একটি নবজাত ষণ্ডের মস্তক হইতে তিনি দুইটি কচি শৃঙ্গ অস্ত্রোপচার করিয়া অপসৃত করেন। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে উহারা শৃঙ্গে পরিণত হইত। উক্ত দুইটি কচি শৃঙ্গবৎ দ্রব্য তিনি ষণ্ডশিশুর ললাটে সন্নিবিষ্ট করিয়া দেন। তাহার ফলে একটি বৃহৎ শৃঙ্গ উহার ললাটদেশে বর্দ্ধিত হইতে থাকে। এখন ষণ্ডটির বয়স তিন বৎসর। উহাকে দেখিতে পৌরাণিক একশৃঙ্গ ষণ্ডের ন্যায়।

উভচর যান

এই উভচর যান শূন্যে ও জলে সমানভাবে চলিতে পারে। ইহার ওজন ২ শত ৬১ মণ। ইহাতে ১৫ জন যাত্রী ও ৩ জন নাবিক থাকিবার স্থান আছে। এই উভচর-যান ঘণ্টায় ১ শত ৯৮ মাইল পথ অতিক্রম করিয়া থাকে। দক্ষিণ-আমেরিকায় এই জাতীয় যান বাণিজ্যসম্ভার

উভচর যান
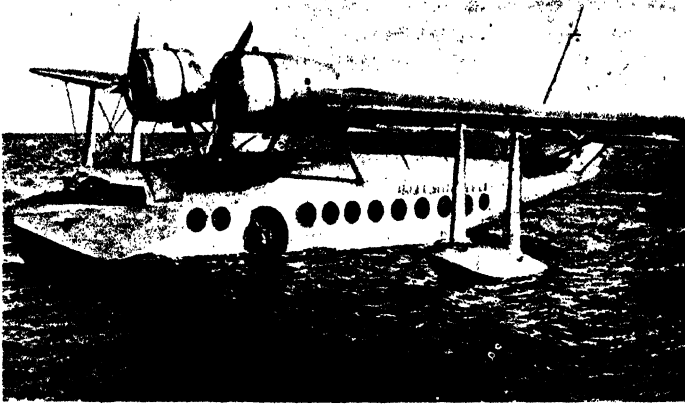
লইয়া শীঘ্রই গতায়াত করিতে থাকিবে। দুইটি মোটর-এঞ্জিন ইহাতে সংলগ্ন আছে।

পাদহীন চেয়ার

বাজারে পাদহীন একপ্রকার চেয়ার বাহির হইয়াছে। উহাতে বসা চলে এবং হেলান দেওয়াও সম্ভবপর। এই আসনে বসিয়া থাকিলে বহন করিয়া লওয়াও চলে। এই চেয়ার গুটাইয়া রাখা যায়। ছবি দেখিলেই বুঝিতে পারা যাইবে। সমুদ্র-সৈকতে উপবেশনের পক্ষে ইহা বিশেষ উপযোগী।

পাদহীন চেয়ার
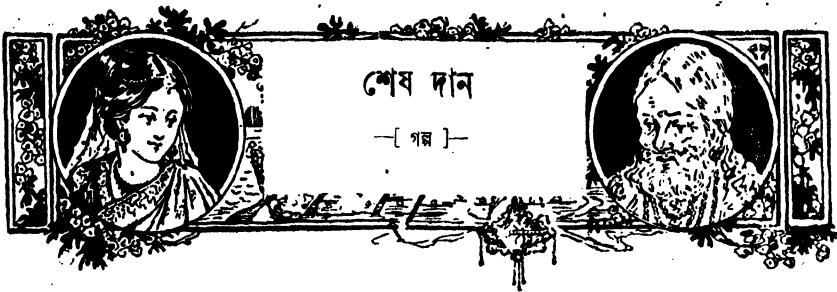
মাসের পয়লা তারিখ। নীহার স্বামীর মাহিনার টাকা আলমারীতে তুলিতে গেল। গণিয়া দেখিল, একখানা নোট কম। দেখিতে দেখিতে তাহার মুখ কালবৈশাখীর মেঘে যেন অন্ধকার হইয়া উঠিল। তীক্ষ্ণনেত্রে স্বামীর পানে চাহিয়া বিরক্তিপূর্ণ কণ্ঠে কহিল, "একখানা নোট কম হচ্ছে কেন?"

অনাদি গুছান আলনাটা ওলট-পালট করিতে করিতে উত্তর দিলেন,—"অ্যাঁ—! অ্যাঁ—!"

নীহারের ক্রোধ বাড়িয়া গেল। বর্শার চকচকে ফলার মত দুই চোখের দৃষ্টি কঠিন ও দীপ্ত হইয়া উঠিল। তীব্র স্বরে সে কহিল,—"ওখানে ঘাঁটছ কি? হারিয়েছে বলতে চাও না কি?"

অনাদি মাথা চুলকাইতে আরম্ভ করিলেন। আমতা আমতা করিয়া কহিলেন,—"দেখ, ঠিক তা নয়। কথাটা হচ্ছে—"

—"কি কথাটা হচ্ছে শুনি একবার।" ঝাঁঝের সহিত এইটুকু বলিয়া নীহার ফিরিয়া দাঁড়াইল। চোখের দৃষ্টিতে সে যেন আগুন ছড়াইতে চায়।

অনাদি বিপদ গণিলেন; বুঝিলেন, আর রক্ষা নাই। পত্নীর এই প্রচণ্ড মূর্ত্তি—ঝড়-ঝঞ্ঝা, বৃষ্টি সবই ইহার মাঝে অবস্থান করিতেছে। এখনই রুদ্রতাণ্ডবের সুরু হইবে। তাহার ফলাফল মনে হইতেই থার্ডক্লাশ যাত্রীর মত, পরস্পরকে দলিত-পিষ্ট করিয়া রকমারি বিপত্তিগুলা মুহূর্ত্তে একসঙ্গে অনাদির চোখের সম্মুখে ভাসিয়া উঠিল। ঘুম ভাঙ্গিয়া সকালের চা হইতে অফিসের ভাত-কাপড়, জামা, পাণ কত কি। অনাদি ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। এখন উপায়?

একটু কাসিয়া অনাদি কহিলেন,—"মানুষের ভাগ্য ব'লে একটা জিনিষ আছে, স্বীকার কর ত?" কথাটা শেষ হইতে পাইল না। কড়াৎ করিয়া আলমারী চাবিবন্ধ করিয়া নীহার ফিরিয়া দাঁড়াইল; তপ্তকণ্ঠে কহিল,—"আর শুনতে কিছু চাই না।"

অনাদি ভীত হইয়া পড়িলেন। ত্বরিতকণ্ঠে কহিলেন, "না গো না। তোমার সঙ্গে আর পারি না বাপু।"

দরজার নিকট হইতে পত্নী কহিল, "আর পারতেও হবে না, সেই ব্যবস্থাই এবার হবে।"

মিনতিভরা কণ্ঠে অনাদি কহিলেন, "একটা শুভ কাযে" —কথাটা অনাদি শেষ করিলেন না, কণ্ঠস্বর ভারি হইয়া আসিল।

নীহার দরজার নিকট হইতে গৃহের ভিতর ফিরিয়া আসিল। প্রচণ্ড ক্রোধে মানুষ যত উদ্দীপ্ত হইয়াই উঠুক, একান্ত নিকটতমের ক্ষুব্ধ কণ্ঠের ব্যাকুলতা অন্তরকে চকিতে বিচলিত করিয়া তুলে, অজ্ঞাত কোণ হইতে ক্ষমা কুণ্ঠিত-মুখে চাহিয়া দেখে।

স্বামীর নিকট সরিয়া আসিয়া নীহার কহিল,—"সত্য ক'রে বল, টাকা কি কল্লে? জান, আমি কত ক'রে চালাই!" তাহার স্বরে উত্তাপের পরিবর্ত্তে ফুটিয়া উঠিল—ক্ষোভ।

অনাদি কহিলেন,—"সব বুঝি; তবু মন মানে না। আজ অফিসের বড় সাহেব—" অনাদি থামিলেন।

অপ্রসন্ন মুখে নীহার কহিল,—"বড় সাহেব কি হয়েছে?"

খোলা জানালার দিকে চাহিয়া অনাদি কহিলেন,— "মানুষের অদৃষ্ট সম্বন্ধে অনেক কথা, তাই"—অনাদি আবার ঢোক গিলিয়া চুপ করিলেন। একটা কঠিন অপরাধের কঠোর বিচার যেন তাঁহার হইতেছে, এমনই করিয়াই তিনি মাথাটাকে অবনত করিলেন। নীহারেরই বা দোষ কি? সে বেচারা কত করিয়া এই সামান্য আয়েতে সংসারটাকে চালায়। তাহা হইতে এতটুকু

অপচয় সে কেমন করিয়া সহিবে ? অনাদি স্ত্রীর উপরও রাগ করিতে পারিলেন না, অথচ এক দিন এই অনাদি দত্তর—। না, যাক্ সে কথা। সে দুঃখ-স্মৃতি আর কেন স্মরণ করা ? অনাদি মেঝের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

স্বামীর অবনত মুখ, ম্লান মূর্ত্তির দিকে ক্ষণকাল চাহিয়া নীহার গম্ভীর কণ্ঠে কহিল, "ডার্ব্বির টিকেট কিনেছ বুঝি—? বুঝেছি, কিন্তু কার নামে কিনলে ? কার অদৃষ্টের উপর আস্থা এত বেশী হ'ল ?"

স্ত্রীর মুখের উপর বিষণ্ণ দুই চোখের দৃষ্টি তুলিয়া অনাদি কহিলেন, "খুকীর—"

সর্ব্বোত্তম বিস্ময়কে নিরীক্ষণ করার মত নীহার ক্ষণকাল স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। শেষে কহিল,—"অমলির নামে—? আর কি জগতে লোক পেলে না ? ওর চেয়ে যে রাস্তার মুটের নামে কেনা ছিল ভাল।"

* * *

প্রচণ্ড দুঃখের অসহনীয় বেদনা মানুষের মুখ দিয়া যে বিষ উদ্গিরণ করে, তাহার জ্বালা জড়াইয়া ধরে নিজেরই সারা অঙ্গে। আকস্মিক, অপ্রত্যাশিত ভাবে নীহারের মুখ দিয়া সন্তানের উপর যে অবজ্ঞা ঝরিয়া পড়িল, তাহারই আঘাত বাজিল নীহারের নিজের বুকে। দুই চোখে অশ্রু ভরিয়া আসিল। আঁচলে চোখ মুছিয়া সে কার্য্যান্তরে চলিয়া গেল।

অমলা ছিল বাপ-মায়ের প্রথম সন্তান। তাহার প্রথম আগমনে ক্ষুদ্র গৃহে আনন্দের বান ডাকিয়াছিল। সে কুড়ি বছর আগেকার কথা।

অমলার পিতামহী পাঁচ জনকে ডাকিয়া কহিয়াছিলেন, "মেয়ে নয়, ও আমাদের সাত বেটা ! বৌমার পেটে এসে অবধি সংসার আমার উথলে উঠেছে।"

কথাটায় অতিরঞ্জনের দোষ ছিল না। অভয়চরণ শেয়ার মার্কেটে তখন ধূলা-মুঠা ধরিয়া কড়ি-মুঠা করিতেছিলেন।

অন্নপ্রাশনে অভয় দত্ত অনেক ঘটা করিলেন। এই পৌত্রীর কল্যাণেই সে তাঁহার যাহা কিছু উপার্জ্জন। ভগবান্ যখন যাহাকে দেন, তখন সব দিকেই তাহাকে ভাল করিয়া দিয়া থাকেন। বিধাতা অমলার দেহে রূপ দিতেও কৃপণতা করেন নাই। সর্ব্বোপরি ছিল তাহার চোখ দু'টি, অনাদি গর্ব্বিত কণ্ঠে কহিতেন,—"তোমরা কাব্যেই উপমা পড়,—পদ্মপলাশনেত্র। আমার খুকু মা-মণির চোখ দুটা দেখ, সে জিনিষটি কি ?"

হাসিয়া অনাদির মা উত্তর দিতেন, "হবে না, ও যে সাক্ষাৎ লক্ষ্মী এসেছে।" অভয় দত্তের তখন প্রাসাদ নির্ম্মাণের মনোমত জমী ক্রয় করা হইয়া গিয়াছে।

জ্যোতিষীরা কোষ্ঠী বিচার করিয়া পুলকিত-কণ্ঠে জানাইল, "এই রকম অপূর্ব্ব গ্রহচক্রের সমাবেশ যাহার জন্মকুণ্ডলীতে দেখা যায়, সে কন্যা পিতৃ-গৃহের বিশেষ শুভকারিণী হয় বলিয়া জ্যোতিষশাস্ত্র নির্দ্দেশ করিতেছে। এই কন্যা ভূমিষ্ঠ হইবার সঙ্গে সঙ্গে পিতৃগৃহে ঐশ্বর্য্য-সম্পদ সৌভাগ্য দেখা দিবে। তবে আয়ু—তা ওটা কর্ম্মের দ্বারাই ক্ষয় বৃদ্ধি উভয়ই ঘটিয়া থাকে।"

অনাদির মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। পিতাকে তিনি কন্যার কোষ্ঠী বিচার দেখাইলেন। অভয়চরণ হাসিয়া কহিলেন, "যা প্রত্যক্ষ দেখছি, তা লেখার মধ্যে দেখবার আবশ্যক কি ?"

অমলার বয়স সাত বছর : গৃহ-প্রবেশ হইবে, অভয় দত্ত পৌত্রীকে কোলে লইয়া প্রাসাদে পদার্পণ করিলেন। লক্ষ্মীর সম্মান যে সকলের আগে।

* * *

তবে আবহমান কাল হইতে একটা কথা চলিয়া আসিতেছে ;—চিরদিন কাহারও সমান যায় না। তাহারই সত্যতা প্রমাণ করিতে অকস্মাৎ অনাদির সংসারের চাকা বিপরীত দিকে ঘুরিয়া গেল। পাটের ব্যবসায়ে হঠাৎ অভয় দত্ত এমন একটা ঘা খাইলেন—যাহাতে তাঁহার নূতন প্রাসাদের বনেদ অবধি কাঁপিয়া উঠিল। অভয় দত্ত কিন্তু ভয় পাইলেন না। দ্বিগুণ তুলিয়া লইবেন বলিয়া শেয়ার মার্কেটে তেমনই পড়িয়া রহিলেন। চোখ বুজিয়া ধরিলেন কোম্পানীর কাগজ। 'কপালে পুরুষ' বলিয়া নিজের অদৃষ্টকে তাঁহার ভয়ানক বিশ্বাস ছিল : কিন্তু সৌভাগ্যের মত দুর্ভাগ্যও আসে দশ দিক হইতে ছুটিয়া, কাগজের বাজার মন্দা পড়িল, এখানেও অনেকখানি লোকসান। অভয়চরণ লোকটা যেন ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিলেন। মজিলেন রেসের নেশায়। যে হাত দিয়া এক দিন তিনি সম্মান, সম্পদ, বৈভবকে বরণ করিয়া গৃহে আনিয়াছিলেন, সেই দুইখানি করের দশটি আঙুল দিয়াই একে একে তিনি সকলকে বিদায় দিতে লাগিলেন।

দুর্দিন বা সুদিনের দোহাই দিয়া সময় ত এক মুহূর্ত দাঁড়াইয়া থাকে না। দেখিতে দেখিতে অমলা পনেরর কোঠায় পা দিল। বিবাহ তাহার দিতে হইবে। কিন্তু কি দিয়া অনাদি তাহা সম্পন্ন করিবেন? অনাদি বিভ্রান্ত হইয়া পড়িলেন। এমনই সময়ে অনাদির গর্ভধারিণী করিলেন পরলোকযাত্রা, অত সাধের পৌত্রীর বিবাহ অবধি তিনি দেখিয়া যাইতে পারিলেন না! ইহার জন্য অনাদি কিন্তু ক্ষোভ বা আক্ষেপ করিতে পারিলেন না। কি জানি, দু'টা দিন আর বেশী বাঁচিয়া থাকিয়া গেলে মাকে যদি অন্য কিছু দুঃসহ দেখিতে হয়?

তা' অনাদিকে মেয়ের বিবাহ লইয়া বিস্তর দুঃখ বা অনেক ক্লেশ পাইতে হইল না। অমলার অতুলনীয় রূপ, কমনীয় মূর্ত্তি বিবাহটাকে সহজ করিয়া দিল। মনোনীত পাত্রেই অনাদি কন্যাদান করিলেন,—ধনীর একমাত্র পুত্র! রূপে-গুণেও যথেষ্ট খ্যাতি আছে।

গোটাকয়েক বছর পরে অনাদিদের নিরানন্দ গৃহে উৎসবের জোয়ার বহিল। গ্রীষ্মের গুমটভরা রাত্রি শেষ করিয়া ভোরের স্নিগ্ধ বাতাস যেন মধুর পরশ দিয়া সকল দুঃখ মুছিয়া দিল। কিন্তু সম্মুখে জাগিয়া আছে জ্যৈষ্ঠের উত্তপ্ত মধ্যাহ্ন।

আকস্মিকভাবে অভয়চরণকে ধরিল বেরি-বেরি রোগে। মৃত্যু সব সময়ে অকল্যাণের রূপে আসে না। পূর্ণচ্ছেদ-মূর্ত্তিতে নিশ্চিন্ততার আরাম, যন্ত্রণার শেষে গৃহদ্বারে আসিয়া দাঁড়ায়। দুর্ভোগের হাত হইতে নিষ্কৃতি দিতেই বেরি-বেরি রোগের মধ্য দিয়া মরণ তাহার শমন অভয় দত্তর উপর জারি করিয়া দিলেন। তাই এখানকার চারিপাশের মর্টগেজ, নালিশ, ডিক্রি ইত্যাদি রকমারি বিপদের ফেঁকড়াগুলাকে ফাঁকি দিয়া অভয় দত্ত মানুষের ক্ষমতার বহির্ভূত ঊর্দ্ধ আদালতের কাঠ-ঘেরায় হাজিরা দিতে ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া চলিয়া গেলেন। কিন্তু পিতামহের বেরি-বেরি রোগটা আসিয়া ধরিল,—আদরের পৌত্রীকে।

মৃত্যুর সহিত একটা তুমুল দ্বন্দ্ব আরম্ভ হইল। অনাদি, নীহার যেন উন্মত্ত হইয়া উঠিলেন। কেমন করিয়া মেয়ে রক্ষা পাইবে, ইহাই হইল তাঁহাদের একমাত্র চিন্তা। মৃত্যুর সব অলি-গলি বন্ধ করিতে চিকিৎসা, দৈব আরাধনা, শান্তি-স্বস্ত্যয়ন কিছুই বাকী পড়িল না। দেবদেবীর দুয়ারে রকমফের মানত করিয়া নীহার অনুক্ষণ মনে মনে কহিত, "ঠাকুর, আর কিছু চাই না! চাই শুধু অমলার আয়ু। একে আমার কোল-ছাড়া ক'র না।"

একান্ত প্রার্থনা নিষ্ফল হয় না। দেবতা কথা শুনিলেন, অমলা ধীরে ধীরে রক্ষা পাইল। কিন্তু যে দুরন্ত তাহাকে লইতে আসিয়াছিল, সে যেন শূন্য হাতে ফিরিবে না, এই ছিল তাহার কঠোর সঙ্কল্প। অমোঘ প্রতিজ্ঞা,—জীবনের বিনিময়ে তেমনই বুঝি বা ততোধিক মূল্যবান্ কিছু লইবেই সে। লইয়া গেলও তাহা। অমলার শোভন-সুন্দর পদ্ম-পলাশ নেত্র দু'টি হইল—দৃষ্টিহারা।

* * * * *

অন্ধ বধূ। শ্বশুর-শাশুড়ী আগুন হইয়া উঠিলেন। পাঁচটা নয়, সাতটা নয়, ঘরে মাত্র একটা বৌ। সে কি না কাণা? ছি, ছি, অন্ধ লইয়া ঘর করা সম্ভব নয়। একটা ত সুখ আনন্দ আছে!

মিনতি, বুকফাটা ক্রন্দন সব নিষ্ফল। পাথরে বীজ নিক্ষেপ করিলে তাহা ব্যর্থ হয়।

নীহার কাঁদিয়া ফেলিল, "ঠাকুর, এ কি কঠোর শাস্তি অমলিকে দিলে, দেবতা? কেন তাকে তুমি বাঁচালে?" নীহার চমকিয়া উঠিল। মাতৃপ্রাণের একান্ত ব্যাকুলতাই যে রক্ষাকবচের মত মৃত্যুর হাত হইতে সন্তানকে রক্ষা করিয়াছে! এমনই দুর্ভাগ্যের হাত হইতে মুক্তি দিতেই যে দেবতা তাহাকে কাছে টানিয়া লইতেছিলেন।

অনাদি পত্নীকে একান্তে ডাকিয়া বিষণ্নকণ্ঠে কহিলেন, "যা হবার, তা হয়ে গেল। খুকুর সামনে এ বিষয় নিয়ে তুমি কিছু আলোচনা ক'র না।"

নীহার ব্যাকুল দৃষ্টিতে একবার স্বামীর মুখের পানে চাহিয়া কহিল,—"বেহাই কি বল্লে? তুমি ত অনেক ক'রে—" কথাটা নীহার শেষ করিতে পারিল না। একটা দুর্নিবার আতঙ্ক তাহার কণ্ঠ রোধ করিল।

ঈষৎ তাপের সহিত অনাদি কহিলেন, "যা বলবার সবই বলেছিলুম। কিন্তু ভবী—ভোলবার নয়।" জ্বলন্ত অঙ্গারের মত অনাদির ভিতরটা তখন পুড়িতেছিল।

ভীতকণ্ঠে নীহার কহিল,—"কি উত্তর দিলে?" উত্তরটা অবশ্য নীহার অনেকবার শুনিয়াছিল। তথাপি স্নেহাস্পদের কঠিন অমঙ্গল অন্তর যে সহজে বিশ্বাস করিতে চাহে না।

ঘৃণার সহিত ওষ্ঠ-বিকৃতি করিয়া অনাদি কহিলেন, "ছেলের বিয়ে দেবে। কাণা বৌ তারা নেবে না।"

বিমানচারী পক্ষী বাণবিদ্ধ হইলে আগে লুটাইয়া পড়ে ধরণীর বুকে। প্রাণীর সকল বিপদ দুঃখ আর্ত্ততার একমাত্র আশ্রয় ধরিত্রীর বুক। নীহার মেঝের উপর বসিয়া পড়িল। আর্ত্তকণ্ঠে কহিল,—"ওগো, মেয়ের বাপ হ'লে সব সইতে হয়; সব করতে হয়। একবার কেন শ্বশুর মিত্রের কাছে হাত জোড় ক'রে—"

পত্নীকে বাধা দিয়া উগ্রকণ্ঠে অনাদি কহিলেন, "দেখ, তুমি আমায় কিছু শেখাতে এস না। আমি সব জানি; মেয়ে তোমার একলার নয়; আমার বুকেও ঠিক তোমারই মত বাজে। আমি পাষাণ নই!"

তথাপি নীহার কহিল, "তবু কাকুতি-মিনতিতে অনেক সময়ে—"

নৈরাশ্যের কঠোর পীড়ন মানুষকে অকারণ রুক্ষ করিয়া তোলে। উত্তাপের সহিত অনাদি কহিলেন, "ছাই হয়, নীহার, ছাই হয়। আমি আর লক্ষপতির ছেলে অনাদি দত্ত নই। এখন মার্চ্চেণ্ট অফিসের কেরাণী অনাদি দত্ত। আমার কথা তারা রাখ্‌বে কেন? তারা হ'ল বড়লোক!"

নিমজ্জিতের বাঁচিবার শেষ প্রয়াসটুকু করার মত আকুল হইয়া নীহার চাহিল। আর্ত্তকণ্ঠে কহিল,—"জামাই সুবোধ, তাকে একবার—"

অত্যন্ত ব্যথার স্থানে আঘাত পাইলে মানুষ যেমন মোরিয়ার মত একবার রুখিয়া উঠে, তেমনই করিয়া উগ্রকণ্ঠে অনাদি কহিলেন, "নীহার, তুমি কি পাগল হ'লে? বাপ-মায়ের সে অবাধ্য হবে কেমন ক'রে? তা আবার একটা গরীবের মেয়ের জন্য! জান, আমি সেই চামারের পায়ে ধরেছিলুম!"—

* * * *

দিন কাটে বলিয়াই অমলার দিন কাটিয়া যাইত। দৃষ্টিহীন হইলেও রোগমুক্তির পর শক্তি-সামর্থ্য ধীরে ধীরে দেখা দিল।

অমলা এ-ঘর ও-ঘর করে। মায়ের হাতের কায-কর্ম্মের দোসর হইবার জন্য ঘুরিয়া বেড়ায়। ছোট ছোট ভাই-বোনদের পড়ার কাছে নিঃশব্দে বসিয়া সে তাহাদের পড়া শুনিতে শুনিতে তন্ময় হইয়া পড়ে।

এক দিন মিণ্টু কহিল, "বড়দি, এই ছবিখানা দেখ! এ মাসের মাসিক বসুমতীতে বার হয়েছে।"

অমলা ছিল বসুমতীর গ্রাহিকা এক দিন। কিন্তু এখন? অনাদি সেই অমলার নামই গ্রাহিকা-শ্রেণীভুক্ত রাখিয়াছে।

রবি সেকেণ্ড ক্লাশে পড়িত,—সে সহোদরকে বকিয়া উঠিল, "মিণ্টু, মার খাবি, সবেতে তোর চালাকি—"

পড়ার ক্ষেত্রে যুদ্ধের উত্তেজনা জাগিয়া উঠিল। অমলা স্নেহকণ্ঠে সকলকে নিবৃত্ত করিল। রবিকে শান্ত করিবার জন্য মিণ্টুর দোষ স্খালন করিয়া কহিল, "ওর দোষ নেই, রবি। ছেলেমানুষ, অত কি মনে থাকে?"

শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়া পড়া-শুনা পূর্ণ উদ্যমে চলিতে লাগিল। মানুষ স্থির হইয়া কতক্ষণ বসিয়া থাকিতে পারে? অমলা একখানা মোটা বই লইয়া আপন মনে পাতা উল্টাইতে লাগিল। রবি হঠাৎ বলিয়া ফেলিল, "বেঙ্গলী সিলেকসনে যে কবিতাগুলা দিয়েছে, গান্ধারীর আবেদনটা ভারী চমৎকার লাগে। পড়েছ বড়-দি?"

তরু ভ্রূ কুচকাইয়া রুষ্টকণ্ঠে কহিল, "নিজের বেলা বুঝি দোষ নেই?"

লজ্জায় অপ্রতিভ রবির মুখ কালো হইয়া গেল। তাড়াতাড়ি সে কহিল,—"না, না! বলছি, বড়দি শুনবে তুমি? পড়ব কবিতাটা?"

এমনই করিয়াই কনিষ্ঠদের সদা সতর্ক স্নেহ-ভালবাসার মাঝে যে বেদনাটা রহিয়া রহিয়া জাগিয়া উঠে, সেইটাই আবার শীতল হইয়া দুঃখের মাঝে সুখের অনুভূতি একটুখানি দেয়! যেন বর্ষার মেঘাচ্ছন্ন আকাশের ফাটল দিয়া রৌদ্রের এতটুকু চিকিমিকি প্রকাশের মত!

সে দিন ভাই-বোনরা ঘিরিয়া ধরিল অমলাকে।

"বড়দি, বাবা তোমার নামে ডার্ব্বির টিকিট কিনেছেন—"

মিণ্টু সহোদরার গলা জড়াইয়া কহিল,—"বড়দি, তোমার নাম উঠলে আমায় কি দেবে?"

অমলা সস্নেহ হাস্যে কহিল,—"একটা মস্ত বড় ঘোড়া কিনে দেব।"

তরু কহিল,—"ঘোড়া নয়। মোটরকার। মা বলে, ঘোড়াতেই আমাদের সর্ব্বনাশ হয়েছে।"

কথাটার মর্ম্ম অমলা বুঝিল; ঈষৎ বেদনাও অনুভব করিল। কহিল,—"দূর, তা কি বলতে আছে?"

আপন কথাটাকে সত্য প্রতিপন্ন করিতে মানুষ সব চেয়ে ভালবাসে। দ্বিধাহীন কণ্ঠে তরু কহিল,—"কেন, আমাদের ত বাড়ী ঘর সব গেছে ঐ ঘোড়ার পিছনে। মা বলে, দাদামণি যদি অমন ক'রে রেস না খেলত, তা হ'লে আমরা আজ এমন গরীব হতুম না।"

এমনই একটা আলোচনা এ গৃহে সর্ব্বদাই চলিত। অমলা সবই জানিত। একটা তীব্র ক্ষুণ্ণতা, মর্ম্মান্তিক ক্ষোভ এই আক্ষেপমালা রচনা করিত! দুঃখের কত বড় উৎপীড়নে অজগরের বিষাক্ত নিশ্বাসের মত বর্ষণ করিত শুধু জ্বালা, তাহা অমলা বুঝিত, কিন্তু নিরুপায় সে! তথাপি কনিষ্ঠার কথাগুলি আজ কেমন গায়ে সহিল না! তাহার দৃষ্টিহীন নেত্রপথে দপ করিয়া ভাসিয়া উঠিল—পিতামহের সেই স্নেহমূর্ত্তি! অমলার সৌভাগ্য দুর্ভাগ্য যেন সেই অতীত লোকটির অতীতে গিয়া পড়িয়াছে।

ক্লিষ্টকণ্ঠে অমলা কহিল,—"তরু, ও-সব বলতে নেই। তিনি গুরুজন! মা লক্ষ্মী ওতে রাগ করেন।"

বাস্! এই শাসনটাই সব চেয়ে বড় শাসন! এই ক্ষুদ্র পরিবারের এর চেয়ে বড় দণ্ড আর কিছু নাই।

সকালবেলা ষ্টেট্স্‌ম্যান সংবাদপত্রখানা হাতে করিয়া, অনাদি ছোট ছেলের মত অধীরভাবে অন্দরের দিকে ছুটিয়া আসিলেন। অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া জোর-গলায় তিনি ডাকিলেন,—"ওগো, কোথা গেলে? আঃ, এমন সময়ে কলতলাতে—? খুকু-মা কোথা রে?"

ছেলেরা হৈ হৈ করিয়া হাঁকিতেছিল,—"বড়দি, বড়দি! হিপ হিপ হুরে! বড়দি, হিপ হিপ হুরে!"

নীহার কলঘর হইতে বাহির হইয়া আর্দ্র-বস্ত্রেই উপরে আসিল। কহিল,—"কি, বাড়ীতে ডাকাত পড়েছে না কি? এত হাঁকাহাঁকি কিসের?"

হর্ষভরা কণ্ঠে অনাদি কহিলেন, "কাগজখানা একবার নিজের চোখে দেখ!" বলিয়া পত্নীর দিকে সংবাদপত্রখানা বাড়াইয়া দিয়া কহিলেন, "কথায় বলে—আপন চোখে সুবর্ণ বর্ষে।"

নীহার ঈষৎ ভর্ৎসনার সুরে স্বামীকে কহিল,—"মিছে বাজে বকো না! কি যে বল?"

মিণ্টু মাকে জড়াইয়া কহিল, "আমার কিন্তু একটা ঘোড়া চাই, মা! ব'লে রাখছি। তখন 'না' বলতে পাবে না।"

রবি কহিল,—"না, না! মোটরগাড়ী, ড্রাইভার রাখতে হবে না, মা! আমি নিজেই ড্রাইভ করতে শিখে নেব।"

তরু কহিল, "লক্ষ্মীটি—মা, একটা লাউডস্পিকার কিনো। আর আমার একটা সিঙ্গার মেসিন—"

নীহার হাসিয়া কহিল, "সকালে তোদের মাথা খারাপ হ'ল না কি? কি, হয়েছে কি? আমার কি রাজত্ব এল এক্ষুণি—"

অনাদি হাসিতে হাসিতে কহিলেন, "এসেছে গো এসেছে! এখন খুকু কোথায় বল?'

"ঠাকুরঘরে পূজা কচ্ছে?"

"আচ্ছা, ঠাকুরকে এক টাকার কাঁচাগোল্লা দিও।"

আনন্দিত-মুখে নীহার কহিল,—"কি খবরটা শুনি আগে?"

অনাদি হাসিয়া কহিলেন, "খুকুর ঘোড়ার নাম উঠেছে। দেখলে ত আমি চিরকাল জানি, ও আমার পয়মন্ত মেয়ে।"

গর্ব্বে অনাদির মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। উচ্চকণ্ঠে হাঁকিলেন, "খুকু কোথা রে?"

একগাল হাসিতে গিয়া নীহারের চোখ দিয়া অশ্রু গড়াইয়া পড়িল, কহিল, "আহা! আজ যদি বাবা থাকতেন!"

পরিপূর্ণ সুখের মাঝে দুঃখের দিনটা উজ্জ্বল হইয়া উঠে। ব্যথা লইয়া যে চলিয়া যায়, সবার আগে মনে পড়ে তাহার কথা। ক্ষুব্ধ কণ্ঠে অনাদি কহিলেন, "বাবার রোগটা শেষকালে একরকম ঘোড়া ঘোড়া করেই বেড়ে গিয়েছিল।"

একটা নিশ্বাস ফেলিয়া নীহার কহিল, "যাক, অমলুর উপর তাঁর আশীর্ব্বাদ ছিল। অমলুকে তিনি বড্ড ভালবাসতেন।"

স্বামী ও স্ত্রী উভয়েরই দৃষ্টি বাষ্পাচ্ছন্ন হইয়া আসিল।

তরু চেঁচাইয়া উঠিল, "ঐ রে বড়দি আসছে!"

রবি হাততালি দিয়া লাফাইতে লাফাইতে কহিল, "বড়দি, তোমার ঘোড়ার নম্বর উঠেছে। এই দেখ, তোমার নম্বরের সঙ্গে নম্বর মিলে গেছে।"

অনাদি কহিলেন,—"কাগজখানা নিয়ে আফিসে যাই, সেখানেও হৈ হৈ হবে। বড় সাহেবের সঙ্গে দেখা করব। তিনি বলেছিলেন, দত্ত নিজের নামে কি ওয়াইফের নামে কিনলে না কেন? আমি বলেছিলুম, না সাহেব, এই মেয়ের আমার বড্ড পয় ছিল।"

* * *

অফিস হইতে অনাদি ফিরিলেন। শরতের সোনালী আলোমাখা আকাশের মত মুখ তাঁহার উজ্জ্বল। ওষ্ঠে হাসি।

পত্নীকে ডাকিয়া কহিলেন, "একটা নূতন খবর শুনেছ?"

প্রফুল্ল মুখে নীহার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল; কহিল,—"কি? সবাই ত খুব গোলমাল কচ্ছে?"

হাসিতে হাসিতে অনাদি উত্তর দিলেন, "তা আর বলতে, সারাদিন তারা আমায় কোন কাম কত্তে দেয় নি। বড় সাহেবের কাছে আজ অমলুর সব গল্প কল্লুম। তিনি শুনে বল্লেন, ভারি 'লকি' গার্ল। তার পর জীবন-কাহিনী শুনে বল্লেন, দত্ত, রোস এক কাম করি, তোমার মেয়ের স্বামীকে একটা খবর দিই। কথাটা এক নিমেষে অফিসে চাউর হয়ে গেল। কেসিয়ার বাবু বল্লে,—আমি ত হরি মল্লিকের ভাড়াটে, এক্ষুনি খবর দেব। সুবোধ যে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে কাযের জন্য মুরুব্বী খুঁজছে। ওর এবারের শ্বশুরও এক জন বড় উকীল। কিন্তু ওকালতিতে সুবোধের আস্থা নেই।"

রুদ্ধ নিশ্বাসে নীহার কহিল, "তার পর—"

অনাদি সহাস্য মুখে কহিলেন,—"কেমন প্ল্যান হচ্ছে বল দিকি?"

নিজের বুদ্ধির তারিপ শুনিতে সবাই ভালবাসে, অনাদি পত্নীর মুখের পানে চাহিলেন।

কপালে হাত দিয়া নীহার কহিল,—"সুবোধ আবার বিয়ে কল্লে? কিন্তু যাই হোক্, মেয়ে আর আমি তাদের বাড়ী পাঠাব না।"

অনাদি কহিলেন,—"পাগল, আমিই বা তাতে মত দেব কেন? তবে সুবোধ তখন ছোট ছিল। কলেজের ছেলে। ভালমন্দ বুঝবার অবকাশ কোথা?"

অমলা জানালার ধারে গরাদে মাথা হেলাইয়া বসিয়াছিল। এখন উঠিয়া দাঁড়াইতে পিতামাতার বিস্মিত দৃষ্টি একসঙ্গে তাহার মুখের উপর পড়িল।

মেয়ের মুখের দিক হইতে চোখ ফিরাইয়া নীহার স্বামীর চোখের দিকে চাহিল। অনাদি কহিলেন, "এই যে খুকু তুমি এখানে। আজ অফিসে যা হৈ হৈ! ভারী আমোদে সারাদিন আজ কেটেছে। হঁ্যা, কেউ কেউ পরামর্শ দিচ্ছে—টিকিটখানা বেচে দাও। কেন না, ঘোড়া যদি না ওঠে।"

নীহার ব্যস্ত হইয়া উঠিল, "না না, ও-সব কথা শুন না, আমি বরাত পরীক্ষা করব। যদি অদৃষ্টে পাওনা থাকে—"

অনাদি কহিলেন,—"খুকু, তোমার কি কোন অসুখ কচ্ছে? মুখখানা কেমন দেখাচ্ছে যেন!"

কপালে হাত বুলাইয়া, দীপ্তিহীন হাসির রেখা ওষ্ঠে টানিয়া ঔদাস্য সহকারে অমলা কহিল, "না, কিছু নয়, শরীরটা শুধু কেমন অবসন্ন বোধ হচ্ছে।"

* * * *

আজ কয়দিন হইল, অমলার কেমন হাঁপানির মত হইতেছিল। ডাক্তার আসিয়া বহুক্ষণ পরীক্ষা করিয়া মন্তব্য প্রকাশ করিলেন, বেরিবেরিতে দীর্ঘকাল ভুগিয়া থাকার দরুণ হৃদযন্ত্র দুর্ব্বল আছে। বিশেষ বিশ্রাম—মানসিক শারীরিক উভয় প্রকার বিশ্রাম গ্রহণ করিলে এবং যথানিয়মে ইন্জেক্সন্ ও ঔষধ ব্যবহার করিলে কোন ভয় থাকিবে না।

অনাদি কহিলেন, "টাকাটা পেলেই খুকুকে নিয়ে পুরী চ'লে যাব।"

নীহারের মুখ হর্ষোৎফুল্ল হইয়া উঠিল। সাগ্রহে কহিল—"আহা, পুরীর কথা মনে হ'লে মনটা আমার নেচে উঠে। সেই শেষবার যখন বাবার সঙ্গে যাই, অমলুর বয়স তখন দশ না এগার বছর এমনি হবে।"

অনাদি কন্যার পানে দৃষ্টিপাত করিয়া সস্নেহকণ্ঠে কহিলেন—"হ্যাঁরে খুকী, তোর পুরীর কথা মনে আছে, মা?"

একটু হাসিয়া অমলা কহিল, "আছে—কিন্তু—"

তাহার ক্লান্ত কণ্ঠস্বরে স্বামি-স্ত্রী উভয়েই চকিত হইলেন,—শীতের রৌদ্রোজ্জ্বল সকালে, আকস্মিক মেঘসঞ্চার হইলে যেমন সমস্ত প্রকৃতির রূপ পরিবর্ত্তিত হয়, উভয়ের মুখ তেমনই ম্লান হইল—গভীর অস্বস্তিতে একসঙ্গেই দুই জনের মন যেন ব্যাকুল হইয়া পড়িল।

কি যেন একটু বুঝিবার চেষ্টা করিয়াই অনাদি ঔদাস্য সহকারে কহিলেন,—"থাক গে, পুরীর চেয়ে দিন কতক কোন পাহাড়ে যাব।"

অমলা কোন সাড়া দিল না। জানালার ধারে ইজি চেয়ারে সে শুইয়াছিল। ধীরে ধীরে তাহার নয়নযুগল নিমীলিত হইল।

কন্যার ঘুম আসিতেছে অনুমান করিয়া পিতামাতা কক্ষ ত্যাগ করিলেন।

অমলা মুদিত-চোখে ভাবিতেছিল পুরীর কথা—সেই অশান্ত সমুদ্র-তরঙ্গ। শোভাসম্পদে ভরা সাগর-বক্ষ। মানসনেত্রে ভাসিতেছিল একটি চঞ্চলা বালিকা, ক্ষিপ্র গতিতে সমুদ্র-উপকূল হইতে ঝিনুক কুড়াইয়া আঁচলে ভরিতেছে, কখন নিবিষ্টমনে বসিয়া বালির পুতুল-মন্দির গড়িতেছে, আবার ভাঙ্গিয়া ফেলিতেছে।

পিতামহের সস্নেহ তিরস্কার, না বাপু, আমি ছোট গিন্নীর সঙ্গে আর পারি না। বেলা গেল, চল বাড়ী যাই। সেই পরিচিত কণ্ঠস্বর, দীর্ঘকাল পরে অমলার মনে হইল. তাহার কাণের কাছে যেন বাজিয়া উঠিল। সত্যই তাহাকে যাইতে হইবে। আঃ, পিতামহ-পিতামহীর সেই স্নেহ-ক্রোড় কত দিন অমলা পায় নাই! বাল্যের মত অমলার আবার ইচ্ছা হইল, পিতামহের গলা জড়াইয়া ধরে। অমলার চোখের কোণ বহিয়া অশ্রুবিন্দু গড়াইয়া পড়িল, 'হ্যাঁ! হ্যাঁ! পিতামহের গলা জড়াইয়া সে বলিবে,—দাদু! দাদু! তোমার ঘোড়ার দেনা আমি শুধে এলুম গো।'

একটা সুগভীর নিশ্বাস সারা চিত্ত মথিত করিয়া ফুলিয়া উঠিল। দুর্ব্বল বুকের মাঝে ব্যাধিগ্রস্ত হৃৎপিণ্ডটা একটু জোরে স্পন্দিত হইয়া যন্ত্রণায় পীড়া দিতে লাগিল। কিন্তু তখন অমলার কাণের কাছে কে যেন কত কথা কহিয়া চলিতে লাগিল। মানস দৃষ্টিতে ভাসিয়া উঠিল সেই সমুদ্র—সেই চাঁদের আলো! চাঁদ যেন সমুদ্রের বুকে গলিয়া রূপার মত সৌন্দর্য্য ছড়াইতেছে!

বাহিরে শুধু অন্ধকার—নিবিড় কালো ছায়া। আজ অমলাই শুধু দৃষ্টিহারা! বিড়ম্বিত জীবনে সে ভোগ করিতেছে শুধু জ্বালা!

স্বামীর গৃহ মনে পড়িল। সে ত একটা মাসের সম্বন্ধ। রূপ দেখিয়াই তাহারা বরণ করিয়াছিল। রূপের প্রশংসাও উঠিয়াছিল সেখানে শতমুখে। এমন সুন্দর চোখ ইতিপূর্ব্বে তাহারা না কি চোখেও দেখে নাই। নীলোৎপলনেত্র বধূ যে লক্ষ্মী-স্বরূপিণী।

সুগভীর নিশ্বাস ফেলিয়া অমলা ভাবিল, তাহার পাশে আজ আর কেহ নাই। ভবিষ্যতেও সে একা। দেখিতে দেখিতে হৃৎপিণ্ডের যন্ত্রণাটা কঠিন মূর্ত্তিতে অসহ্য বেদনায় অমলাকে অস্থির করিয়া তুলিল।

* * * *

সে দিন রুক্ষমূর্ত্তি অনাদি মৃদুপদে কক্ষে প্রবেশ করিলেন। মুখের চেহারা তাঁহার ম্লান! দৃষ্টিতে সুগভীর বিষণ্ণতা ফুটিয়া উঠিতেছে। আস্তে আস্তে তিনি গিয়া পত্নীর মাথার কাছে বসিলেন। ধীরে ধীরে কহিলেন, "ঘোড়াটা সেকেণ্ড প্রাইজ পেয়েছে। অফিস হতে সাহেব এখন টেলিফোন কল্লেন!"

নীহার চাদর মুড়ি দিয়া ভূমিতে শুইয়াছিল। শিয়রে উপবিষ্ট স্বামীকে কহিল, "আর কেন? আর ও সব কথা তুল না। মা লক্ষ্মী তার শেষ দান দিয়ে চ'লে গেছে! অমলু—মা রে!—"

শ্রীমতী পুষ্পলতা দেবী।

সীমান্তে মেলট্রেণ লুণ্ঠন

[সত্য ঘটনা]

ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের পুলিস-ইন্স্পেক্টার রঞ্জিৎ সিং বলিতেছেন,—ওয়ালি খাঁ পার্ব্বত্য পল্লীস্থিত বাসগৃহে বসিয়া চিন্তাকুল চিত্তে সেই পাহাড়ের পাদদেশে প্রসারিত সুবিস্তীর্ণ সমতল ভূখণ্ডের দিকে পুনঃ পুনঃ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছিল। সেই পাহাড়ের পাদদেশে সমতল ক্ষেত্রে যে সকল গ্রাম ছিল, তাহা লুঠ করিতে পারিলে কিরূপ লাভের সম্ভাবনা ছিল—তাহাই সে চিন্তা করিতেছিল। সে জানিত, সেই সকল গ্রামে অনেক স্থূলোদর বণিকের বাস, তাহারা ধনবান, বহু অর্থের অধিকারী; একবার তাহাদের উপর চড়াও করিতে পারিলে বিপুল অর্থ হস্তগত হয়,—সে বিষয়ে তাহার সন্দেহ ছিল না; কিন্তু অসুবিধা এই যে, ঐ সকল গ্রাম বৃটিশ সীমায় অবস্থিত। পাহাড়ের কোন অধিবাসী সেই সকল গ্রামে প্রবেশ করিয়া বৃটিশ প্রজার সম্পত্তি লুণ্ঠন করিলে তাহার বিপদ অনিবার্য্য। কিন্তু লুণ্ঠনের লোভ সংবরণ করাও দুরূহ। একবার চেষ্টা করিয়া দেখা মন্দ কি?

দীর্ঘকাল চিন্তার পর ওয়ালি খাঁ তাহার দুই পুত্র আমেদ খাঁ ও আলিকে, এবং দুই ভ্রাতুষ্পুত্র আবদুল্লা ও মীর আকবরকে ডাকিয়া তাহাদের সহিত পরামর্শ আরম্ভ করিল। ওয়ালি খাঁ উক্ত নিষিদ্ধ ভূখণ্ডের দিকে লুব্ধনেত্রে চাহিয়া, সমাগত যুবকগণকে বলিল, "সাহেবদের দেশ লুঠ করিবার জন্ম মমান্দরা প্রস্তুত হইয়াছে। তাহাদের মুল্লা কাল পুনর্ব্বার আমার সঙ্গে দেখা করিয়াছিল। আমাদিগকে হয় তাহাদের দলে যোগদান করিতে হইবে না হয় নিজেদেরই মাথা খাইতে হইবে। আমাদের এখন টাকার দরকার, এতদ্ভিন্ন, কয়েকটা রাইফেলও সংগ্রহ করিতে চাই। আমি মুল্লাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, রাইফেলগুলি কোন্ স্থান হইতে সংগৃহীত হইবে? আমার এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি নীচের ঐ গ্রামগুলির দিকে অঙ্গুলি প্রসারিত করিয়াছিলেন।"

ওয়ালি খাঁ বলিতে লাগিল, "কিন্তু যদি আমরা ঐ সকল গ্রাম লুঠ করি, তাহা হইলে সাহেবরা অবিলম্বে এখানে আসিয়া পড়িয়া আমাদের ঘর বাড়ী পুড়াইয়া দিবে। এ অবস্থায় আমি যাহা প্রস্তাব করি, তাহা মন দিয়া শোন। আমরা এই অঞ্চল আক্রমণ না করিয়া নিঃশব্দে পেশোয়ার ও আটকের মধ্যবর্ত্তী রেলপথের নিকট উপস্থিত হইব। সেই স্থানে যাইতে তিন দিন মাত্র সময় লাগিবে। আমরা সেই স্থানে গিয়া লুঠ করিব। তাহা হইলে সেই স্থানের অদূরে যাহাদের বাস—সেই জাকাখেলদের ঘাড়েই সকল দোষ পড়িবে; ইংরেজ সরকার আমাদিগকে সন্দেহ করিতে পারিবে না।"

দীর্ঘকাল তর্ক-বিতর্কের পর এই প্রস্তাবই গৃহীত হইল। স্থির হইল, দলের পাঁচ জনই পরদিন রাত্রিকালে গোপনে গৃহত্যাগ করিয়া তাহাদের রাজ্যসীমা অতিক্রম করিবে, এবং অন্য লোকের অলক্ষিতভাবে নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইবে।

যওলাই রেল ষ্টেশনের ষ্টেশন-মাষ্টার চন্দ্রলাল নৈশ মেল ট্রেণের প্রতীক্ষায় ষ্টেশনে সমাগত আরোহিগণের মধ্যে ব্যস্তভাবে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলেন। এই ট্রেণ প্রত্যহ রাত্রি সাড়ে নয়টার সময় ডাক লইয়া পেশোয়ার হইতে রাওয়ালপিণ্ডিতে যাত্রা করিত। প্রত্যেক ষ্টেশনে দৈনিক যত টাকা সংগৃহীত হইত, সেই টাকা এই ট্রেণে রাওয়ালপিণ্ডির সদর আফিসে প্রেরিত হইত।

মেল ট্রেণ ষ্টেশনের কিছু দূরে থাকিতে যাত্রিগণকে তাহার আগমন-সংবাদ জানাইবার জন্ম একখণ্ড লোহার রেলে ইস্পাত-নির্ম্মিত একটি ঠুক্নী দ্বারা আঘাত করা হইল। ঘণ্টাধ্বনি দ্বারা এই সংবাদ বিঘোষিত করা হয় না। এই সংবাদ শুনিয়া ট্রেণে আরোহণ-সমুৎসুক যাত্রীদের মধ্যে গোরগোল পড়িয়া গেল; যাহারা শয়ন করিয়া বা বসিয়া বিশ্রাম করিতেছিল, তাহারা লাফাইয়া উঠিল, এবং পরস্পর ঠেলাঠেলি করিতে করিতে ব্যস্তভাবে বোঁচকা-বাণ্ডিল ঘাড়ে লইয়া প্ল্যাটফর্ম্মের কিনারায় আসিল। ট্রেণ আসিয়া প্ল্যাট্ফর্ম্মে থামিলে দরজা খুলিয়া তাড়াতাড়ি গাড়ীতে উঠিয়া পড়িবে, এ জন্ম সকলেই প্রস্তুত। অনেকে আত্মীয়-বন্ধু-বর্গকে নিকটে না দেখিয়া, তাহাদের নাম ধরিয়া ডাকাডাকি করিতে লাগিল। সকলেই অত্যন্ত ব্যস্ত।

ট্রেণ প্ল্যাটফর্ম্মে আসিয়া থামিল। আরোহীরা বিভিন্ন কামরায় উঠিয়া বসিল। স্থূলকায় ষ্টেশন মাষ্টার তাঁহার তহবিলের টাকাগুলি যথানিয়মে ট্রেণের পশ্চাদ্বর্ত্তী গার্ডের গাড়ীতে তুলিয়া দিলেন। গার্ড বংশীধ্বনি করিয়া, হাতের নিশান আন্দোলিত করিলেন। ট্রেণ ভক্-ভক্ শব্দে ধূম্ররাশি উদ্গিরণ করিতে করিতে রাওয়ালপিণ্ডি অভিমুখে ধাবিত হইল।

ট্রেণ ষ্টেশনের প্ল্যাটফর্ম্ম অতিক্রম করিলে ষ্টেশন-মাষ্টার এবং তাঁহার সহযোগী কর্ম্মচারিবর্গ বিশ্রাম করিতে চলিলেন। ওয়ালি খাঁ ও তাহার অনুচররা ষ্টেশনের আলোকের বহির্ভাগে একটি অন্ধকারপূর্ণ স্থানে লুকাইয়াছিল। তাহারা সেই স্থানে সংগুপ্ত থাকিয়া ষ্টেশনের সকল ব্যাপারই লক্ষ্য করিতেছিল। অতঃপর তাহারা সেই গুপ্ত স্থান ত্যাগ করিয়া নিঃশব্দে কোনও আত্মীয়ের কুটীরাভিমুখে অগ্রসর হইল। সেই কুটীরে প্রবেশ করিয়া তাহারা সকলেই অগ্নিকুণ্ড বেষ্টন করিয়া বসিল। তাহার পর তাহারা ধূমপান করিতে করিতে ভবিষ্যৎ কার্য্যপদ্ধতি সম্বন্ধে পরামর্শ আরম্ভ করিল। তাহারা কোন্ পন্থা অবলম্বন করিবে, তাহা স্থির করিবার জন্ম পরামর্শ করাই কর্ত্তব্য মনে করিল। পরামর্শের সময় তাম্রকূট যে অপরিহার্য্য, ইহা কে অস্বীকার করিতে পারে?

ওয়ালি খাঁ তাহার পুত্র ও ভ্রাতুষ্পুত্রগণকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "ট্রেণ কি ভাবে আসে, এবং তাহার পর চলিয়া যায়, তাহা তোমরা দেখিয়া আসিলে। প্রতি রাত্রেই উহা এই নিয়মেই আসে ও ষ্টেশন ত্যাগ করে। মেল ষ্টেশনে আসিয়া ষ্টেশনের তহবিলের টাকাগুলি লইয়া চলিয়া যায়। এই টাকাগুলিতেই আমাদের প্রয়োজন। যেরূপে হউক, উহা আমরা দখল করিব।"

আবদুল্লা বলিল, "ট্রেণের আরোহীরা যদি আমাদের সঙ্গে লড়াই করে, তাহা হইলে আমরা কি করিব ?"

আমেদ খাঁ মাথা ঝাঁকাইয়া বলিল, "আমার সঙ্গে যদি কেহ লড়াই করিতে আসে, তাহা হইলে আমি তাহাকে ছোরা মারিয়া খা'ল করিব।"

আবদুল্লা বলিল, "ছোরা না হয় মারিলে, কিন্তু সাহেবরা যদি বন্দুক চালায় ?"

তাহার চাচা দলপতি ওয়ালি খাঁ বলিল, "খামকা বন্দুক চালাইবে ? সাহেবরা সাধারণতঃ বন্দুক সঙ্গে রাখে না। এখন যাহা বলি, তাহা তোমরা সকলে মন দিয়া শোন। কাল রাত্রিকালে আমরা রেল-ষ্টেশন লুঠ করিব। যদি তোমরা সকলে সতর্কভাবে আমার উপদেশ পালন কর, তাহা হইলে আমরা টাকাগুলি লুঠ করিয়া নির্ব্বিঘ্নে সরিয়া পড়িতে পারিব।

"কাল সন্ধ্যার অন্ধকার গাঢ় হইলে আমরা সকলে পৃথক্‌ভাবে ষ্টেশনে যাইব। আমরা কেহ কাহাকেও চিনি, এ ভাব প্রকাশ করিব না। আমাদের প্রতি কাহারও দৃষ্টি আকৃষ্ট হইতে পারে, এরূপ ভাবগুলিও প্রকাশ করিব না, সেরূপ কোন কায করা ত দূরের কথা। ষ্টেশনে এক জন পুলিস-প্রহরী থাকিবে; তাহাকে এড়াইয়া চলিবে, যেন ভবিষ্যতে সে তোমাদিগকে দেখিলে সনাক্ত করিতে না পারে।"

এই সকল উপদেশ দান করিয়া ওয়ালি খাঁ তাহার পুত্র আমেদ খাঁকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, "তুমি আওরাতদের এড়াইয়া চলিবে, আমি তোমাকে সতর্ক করিয়া দিলাম। তাহাদের কেহ না কেহ তোমাকে একদিন এরূপ ফ্যাসাদে ফেলিবে যে, তাহা হইতে তোমার উদ্ধার লাভ করা কঠিন হইবে, এ কথা স্মরণ রাখিও।"

অতঃপর ওয়ালি খাঁ বলিতে লাগিল, "ট্রেণ ষ্টেশনে আসিবার পূর্ব্বমুহূর্ত্তে মীর আকবর আমার সঙ্গে বাবুর অফিসে প্রবেশ করিবে। সেখানে আমরা সেই ভুঁড়িওয়ালা বাবুটাকে ধরিয়া বাঁধিয়া ফেলিব; এই কার্য্য শেষ হইলে আমি ইঙ্গিতে আমেদ খাঁকে এই সংবাদ জানাইবামাত্র সে সেই পুলিসম্যানটার কাছে গিয়া তাহাকে বলিবে—ষ্টেশন-মাষ্টার তাহাকে কোন জরুরি কাযের জন্ম ডাকিয়াছে। এই কথা শুনিয়া সে ষ্টেশন-মাষ্টারের ঘরে প্রবেশ করিবামাত্র তাহাকেও ধরিয়া আমরা সেইভাবে বাঁধিয়া ফেলিব। তাহার পর তোমরা সকলে একযোগে প্ল্যাটফর্ম্মের লোকগুলাকে তাড়াইয়া লইয়া গিয়া গুদামে পুরিবে, এবং গুদামের দরজা বন্ধ করিবে। প্ল্যাটফর্ম্ম এইভাবে নির্জ্জন হইলে আমরা ট্রেণ আক্রমণ করিয়া টাকাগুলি হস্তগত করিব।"

পরদিন সায়ংকালে পাঠান পাঁচ জন তাহাদের আড্ডা হইতে বাহির হইয়া ষ্টেশনে উপস্থিত হইল, এবং পুলিস-প্রহরীর অলক্ষিত-ভাবে অন্ধকারে লুকাইয়া বসিয়া রহিল।

ওয়ালি খাঁ সুযোগ বুঝিয়া উঠিয়া ষ্টেশন-মাষ্টারের আফিসের দিকে চলিল। মীর আকবর তাহার অনুসরণ করিল। মাষ্টার বাবু এবং তাঁহার সহকারী তখন আফিসের কার্য্যে ব্যস্ত ছিলেন, এজন্য আগন্তুকদ্বয়ের প্রতি তাঁহাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল না। মীর আকবর আফিসে ঘুরিতে ঘুরিতে আফিসের দেওয়াল-সংলগ্ন রেলপথের মানচিত্রখানির নিকট উপস্থিত হইল, এবং যেন গভীর মনোযোগ সহকারে তাহা দেখিতে লাগিল।

কয়েক মিনিট পরে উভয়ে ঠিক একসঙ্গেই ষ্টেশন-মাষ্টার ও তাঁহার সহকারীকে তাঁহাদের আসন হইতে এক ধাক্কায় নীচে ফেলিয়া তাঁহাদের মাথা হইতে পাগড়ী খুলিয়া লইয়া তদ্দারা মুখ ও হাত পা বাঁধিয়া ফেলিল; তাহার পর তাঁহাদের উভয়কেই টেবলের নীচে লুকাইয়া রাখিল। এই কার্য্য শেষ করিয়া ওয়ালি খাঁ সেই কক্ষের দ্বারের নিকট উপস্থিত হইয়া আমেদ খাঁকে পুলিস-প্রহরীর নিকট যাইতে ইঙ্গিত করিল।

পুলিস-প্রহরী সেই সময় এক জন পরিচিত লোকের সহিত আলাপ করিতেছিল; আমেদ খাঁ তাহার সম্মুখে গিয়া বলিল, "আমি মাষ্টার বাবুর আফিস হইতে আসিতেছি, তিনি তোমাকে ডাকিতেছেন।"

প্রহরী বলিল, "তিনি আমাকে ডাকিতেছেন ? আমাকে তাঁহার কি দরকার, তাহা ত বুঝিতে পারিতেছি না !"

প্রহরী ষ্টেশন-মাষ্টারের আফিস-কক্ষে প্রবেশ করিয়া কয়েক পদ অগ্রসর হইতেই পশ্চাৎ হইতে আক্রান্ত হইল; সঙ্গে সঙ্গে তাহার মুখের ভিতর একখান ন্যাকড়া প্রবিষ্ট হওয়ায় তাহার কণ্ঠরোধ হইল। মুহূর্ত্তমধ্যে তাহার হাত-পা রজ্জুবদ্ধ হওয়ায় তাহার আর নড়িবার শক্তি রহিল না। সে টেবলের নীচে ষ্টেশন-মাষ্টার ও তাঁহার সহকারীর পার্শ্বে নিক্ষিপ্ত হইল।

অতঃপর ওয়ালি খাঁ ও তস্য 'ভাতিজা' ষ্টেশন-মাষ্টারের আফিস-ঘরের দ্বার রুদ্ধ করিয়া যখন অন্য কার্য্যের ব্যবস্থা করিতে চলিল, সেই সময় অন্যান্য দস্যু ষ্টেশনের প্ল্যাটফর্ম্ম হইতে যাত্রিদলকে বিতাড়িত করিয়াছিল।

প্ল্যাটফর্ম্ম নির্জ্জন হইয়াছিল কি না, তাহা পরীক্ষার জন্য ওয়ালি খাঁ প্ল্যাটফর্ম্মে উপস্থিত হইয়া অদূরে ট্রেণের হুইশ্‌ল শুনিতে পাইল। সে তাহার সহযোগিবর্গকে ভবিষ্যৎ কর্ত্তব্য সম্বন্ধে উপদেশ দান করিয়া ট্রেণের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

মেল ট্রেণ ধীরে ধীরে ষ্টেশনে প্রবেশ করিল। ট্রেণের যে গার্ড সম্মুখের গাড়ীতে ছিল, প্ল্যাটফর্ম্মে লোকাভাব দেখিয়াও কোনরূপ সন্দেহ তাহার মনে স্থান পাইল না। পূর্ব্বেই ট্রেণের গতি হ্রাস হইয়াছিল, প্ল্যাটফর্ম্মে প্রবেশ করিয়া ট্রেণ থামিয়া গেল।

ট্রেণের প্রধান গার্ড পশ্চাতের গাড়ীতে ছিল। ট্রেণ ষ্টেশনে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে প্ল্যাটফর্ম্ম তাহার দৃষ্টিগোচর হয় নাই। সে তাহার গাড়ীর দ্বার খুলিয়া প্ল্যাটফর্ম্মে নামিবার জন্য পা বাড়াইল; কিন্তু তাহার পদদ্বয় প্ল্যাটফর্ম্ম স্পর্শ করিবার পূর্ব্বেই তাহার পশ্চাৎ হইতে এক জোড়া হাত লোহার সাঁড়াশীর মত এরূপ দৃঢ়রূপে তাহাকে চাপিয়া ধরিল যে, তাহার হাত দুইখানি নাড়িবারও সাধ্য হইল না ! অগত্যা সে পা ছুড়িয়া তাহার পশ্চাৎস্থিত আততায়ীকে লাথাইতে আরম্ভ করিল। আবদুল্লা তাহার জুতার আঘাতে অত্যন্ত বেজুত হইয়া সহযোগিবর্গের সাহায্য প্রার্থনায় চীৎকার করিতে লাগিল। তাহার চীৎকার শুনিয়া আমেদ খাঁ মুহূর্ত্তমধ্যে তাহার নিকট উপস্থিত হইল, এবং চক্ষুর নিমেষে গার্ডের বক্ষঃস্থলে এভাবে ছুরিকাঘাত করিল যে, সেই আঘাতেই কর্ত্তব্যনিষ্ঠ গার্ডের প্রাণ বাহির হইল। তাহার মৃত দেহ আমেদ খাঁর পদপ্রান্তে নিপতিত হইল।

ইতিমধ্যে ট্রেণের অন্য দিকেও অনুরূপ ঘটনা সংঘটিত হইল। সম্মুখের গাড়ীর গার্ড গাড়ী হইতে নামিবার সময় তিন জন

'নেটিভ'কে অদূরে দণ্ডায়মান দেখিল; কিন্তু তাহাদিগকে সন্দেহ করিবার কোন কারণ ছিল না। গার্ড প্ল্যাটফর্ম্মে নাবিমামাত্র সেই তিন জন লোক তাহাকে আক্রমণ করিল। গার্ড তাহাদের সুদৃঢ় বাহুপাশে বন্দী হইয়া মুক্তিলাভের জন্য ধস্তাধস্তি করিতে করিতে সাহায্য প্রার্থনার চীৎকার করিল; কিন্তু আততায়ী পাঠানের ছুরিকাঘাতে তাহার কণ্ঠ চিরনীরব হইল।

ট্রেণের এঞ্জিনচালক গার্ডের চীৎকার শুনিয়া তাহার সহকারিগণকে সাহায্যের জন্য আহ্বান করিল, এবং লোহার একটা গরাদে সংগ্রহ করিয়া ট্রেণের এঞ্জিন হইতে প্ল্যাটফর্ম্মে লাফাইয়া পড়িল। তাহার পর সে সেই গরাদে মাথার উপর তুলিয়া ওয়ালি খাঁকে আক্রমণ করিবার জন্য সম্মুখে ধাবিত হইল; কিন্তু সেই ধূর্ত্ত পাঠান ইহাদের দুই জন শ্বেতাঙ্গ; সুতরাং এই ব্যাপার লইয়া ভবিষ্যতে তুমুল কাণ্ড সংঘটিত হইবে। এ অবস্থায় লুণ্ঠিত অর্থসহ অতি শীঘ্র পলায়ন করাই তাহার সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য। ট্রেণের কোন আরোহী ট্রেণ হইতে নামিয়া যাইতে না পারে, এই উদ্দেশ্যে মীর আকবর ট্রেণের অন্য অংশে প্রেরিত হইল। অতঃপর প্ল্যাটফর্ম্মে দলের এক জনকে পাহারায় রাখিয়া অন্য তিন জন পশ্চাদ্বর্ত্তী গার্ডের গাড়ীতে প্রবেশ করিল। সেই ষ্টেশনের পূর্ব্ববর্ত্তী ষ্টেশন পর্য্যন্ত প্রত্যেক ষ্টেশন হইতে যে সকল টাকা সংগৃহীত হইয়াছিল, তাহা সেই গাড়ীতেই সঞ্চিত ছিল। তাহারা সেই টাকাগুলি হস্তগত করিল; তাহার পর ট্রেণের বিভিন্ন গাড়ীতে প্রবেশ করিয়া আরোহিগণের যথাসর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিতে লাগিল। যে সকল আরোহী তাহাদের মূল্যবান

দস্যু ওয়ালি খাঁ ও মেলট্রেণের এঞ্জিন চালক

এভাবে মাথা সরাইয়া লইয়া তাহার আক্রমণ ব্যর্থ করিল যে, এঞ্জিন চালক ঝোঁক সামলাতেই না পারিয়া সম্মুখে পতনোন্মুখ হইল। সেই সুযোগে মীর আকবর তাহার পশ্চাতে লাফাইয়া পড়িয়া তাহার উভয় বাহু বাহুপাশে আবদ্ধ করিল। আলি মুহূর্ত্তমধ্যে তাহার তীক্ষ্ণধার ভীষণ ছুরিকা ঊর্দ্ধে তুলিল, এবং তাহার অব্যর্থ আঘাতে হতভাগ্য এঞ্জিনচালক চক্ষুর নিমেষে ধরাশায়ী হইল!

কয়েক মিনিটের মধ্যে ট্রেণের তিন জন কর্ম্মচারী নিহত হইয়া তাহাদের দেহের উত্তপ্ত শোণিতে প্ল্যাটফর্ম্মের বিভিন্ন অংশ প্লাবিত করিল।

দস্যুদলপতি বুঝিতে পারিল, তাহার লোভ ও নিষ্ঠুরতায় রেল বিভাগের তিন জন সুদক্ষ ও বিশ্বস্ত কর্ম্মচারীকে নিহত হইতে হইল, দ্রব্যাদি দস্যুহস্তে অর্পণ করিতে আপত্তি করিল, পাঠান দস্যুগণের হস্তে তীক্ষ্ণধার ছোরার আস্ফালন দেখিয়া তাহাদের সকল আপত্তি শূন্যে বিলীন হইল। দস্যুর ছুরিকাঘাতে জীবনান্ত হইলে কে তাহাদের সম্পত্তি রক্ষা করিবে? সুতরাং দস্যুদলের আক্রমণে ট্রেণের আরোহীরাও সর্ব্বস্বান্ত হইল। দস্যুদের ধারণা হইল, অর্থোপার্জ্জনের এই উপায় যেমন সহজ, সেইরূপ প্রীতিকর। রেলওয়ের কয়েক জন কর্ম্মচারী তাহাদের ভাগ্যদোষে নিহত হইল বটে, কিন্তু এই পাঠান দস্যুরা তাহাদের জীবন মশা-মাছির প্রাণের ন্যায় তুচ্ছ মনে করিত।

কিন্তু লুণ্ঠন শেষ করিয়া পলায়নের পূর্ব্বেই সেই ট্রেণের অদূরে অন্য এঞ্জিনের হুইস্‌ল-ধ্বনি শুনিয়া দস্যুরা বিস্ময়াভিভূত হইল। তাহারা লুণ্ঠন-কার্য্যে বিরত হইয়া তাড়াতাড়ি ট্রেণ হইতে প্ল্যাটফর্ম্মে

লাফাইয়া পড়িল, এবং প্ল্যাট্‌ফর্ম্মের বাহিরে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া, লুণ্ঠিত মেল ট্রেণের ঠিক পশ্চাতে আর একখানি ট্রেণের মাথার আলো দেখিতে পাইল! এই দৃশ্য দেখিয়া দস্যুরা আতঙ্কাভিভূত হইল; তাহারা যে অর্থরাশি লুণ্ঠন করিয়াছিল, তাহা বহন করিয়া দ্রুতবেগে পলায়নের সুবিধা হইবে না বুঝিয়া, সেই পাঁচ জন দস্যু লুণ্ঠিত অর্থরাশি ফেলিয়া রাখিয়াই প্রাণভয়ে উর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল, এবং কয়েক মিনিটের মধ্যে নৈশ অন্ধকারে অদৃশ্য হইল।

ডাকগাড়ীর ঠিক পশ্চাতে আর একখানি ট্রেণ কিরূপে উপস্থিত হইল, দস্যুরা তাহা বুঝিতে না পারিয়া বিস্মিত হইয়াছিল; কিন্তু ইহাতে বিস্ময়ের কোন কারণ ছিল না। সেই দিন ডাক-গাড়ী ছাড়িবার অল্পকাল পরে মালগাড়ীর একখানি ট্রেণ ছাড়িবার প্রয়োজন হইয়াছিল। সেই ট্রেণ ডাক-গাড়ীর ঠিক পশ্চাতে চলিলে অনেক অসুবিধা দূর হইবে বুঝিয়া ষ্টেশনের কর্ত্তৃপক্ষ মাল-গাড়ীগুলিতে এঞ্জিন জুড়িয়া ডাক-গাড়ীর ঠিক পশ্চাতেই প্রেরণের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। ডাক-গাড়ী যখন প্রত্যেক ষ্টেশনে থামিয়া সেই দিনের সঞ্চিত টাকাগুলি সংগ্রহ করিতেছিল, সেই সময় মাল-গাড়ীর ট্রেণ তাহার পশ্চাতে আসিয়া দাঁড়াইতেছিল এবং ডাক-গাড়ী চলিতে আরম্ভ করিলে তাহার অনুসরণ করিতেছিল।

মাল-গাড়ীর ট্রেণের ড্রাইভার তাহার এঞ্জিন হইতে নামিয়া ষ্টেশনে প্রবেশ করিতেই প্ল্যাটফর্ম্মে প্রধান গার্ডের মৃতদেহ দেখিতে পাইল। সে তাহার ট্রেণের গার্ডকে সঙ্গে লইয়া ষ্টেশন-মাষ্টারের আফিসে প্রবেশ করিতে গিয়া বাহির হইতে আফিস-কক্ষের দ্বার রুদ্ধ দেখিল। তাহারা দ্বার খুলিয়া আফিস কক্ষে প্রবেশ করিল; কিন্তু ষ্টেশন মাষ্টার বা তাঁহার সহকারীকে দেখিতে পাইল না। অবশেষে তাহারা টেবলের নীচে মাষ্টার বাবুকে, তাঁহার সহকারী ও পুলিস-প্রহরীকে রজ্জুবদ্ধ অবস্থায় নিপতিত দেখিয়া তাঁহাদের বন্ধন মুক্ত করিল। ষ্টেশন-মাষ্টার দস্যুদের অত্যাচার সম্বন্ধে যাহা জানিতেন, তাহা বলিলেন। ড্রাইভার ও গার্ড ডাক-গাড়ীর আরোহিগণের নিকট তাহাদের দুর্দ্দশার বিবরণ শুনিয়া অন্যান্য ষ্টেশনে টেলিগ্রাম করিবার চেষ্টা করিল; কিন্তু দস্যুরা পলায়নের পূর্ব্বে টেলিগ্রাফের কলটি চূর্ণ করিয়াছিল, এ জন্য তাহারা কোন দিকেই সংবাদ পাঠাইতে পারিল না।

মেল-ট্রেণ আর অধিক কাল আটক রাখা অনুচিত মনে করিয়া মাল-গাড়ীর এঞ্জিনচালক ও গার্ড মাল-গাড়ী ষ্টেশনের বাহিরে ফেলিয়া রাখিয়া মেল-ট্রেণ লইয়া যাত্রা করিল, তাহারা মৃতদেহ-গুলিও একখানি গাড়ীতে তুলিয়া লইল। পরবর্ত্তী ষ্টেশনে উপস্থিত হইয়া তাহারা টেলিগ্রামে অন্যান্য ষ্টেশনে ডাকাতির সংবাদ প্রেরণ করিল। এই সংবাদ পাইয়া জফারপুর হইতে পুলিসবাহিনী ঘটনাস্থলে প্রেরিত হইল। তাহারা রেলের লাইন হইতে সীমান্তভূমি পর্য্যন্ত জিলার সর্ব্বস্থানে অনুসন্ধান করিয়া দস্যুদলের কোন বার্ত্তা জানিতে পারিল না। তাহাদের সকল চেষ্টা বিফল হইল।

মাল-গাড়ীর ট্রেণের ড্রাইভার রেল-ষ্টেশনের যে পুলিস-প্রহরীকে ষ্টেশন-মাষ্টারের আফিস-কক্ষের টেবলের তলা হইতে টানিয়া বাহির করিয়া তাহার বন্ধন মোচন করিয়াছিল, সেই প্রহরীর নাম নবিবক্স। নবিবক্স সেই রাত্রিতেই একখানি গাড়ী সংগ্রহ করিয়া সেই গাড়ীতে আমার (ইন্‌স্পেক্টার রঞ্জিৎ সিংএর) সদর আড্ডা চাকলালায় উপস্থিত হইল এবং আমার নিদ্রা ভঙ্গ করিয়া ডাকাতির সকল বিবরণ আমার নিকট বিবৃত করিল।

নবিবক্সের নিকট দস্যুদলের সম্বন্ধে যে সকল সংবাদ জানিতে পারিলাম, তন্মধ্যে একটিমাত্র সংবাদ নির্ভরযোগ্য বলিয়া আমার মনে হইল। সে বলিল, যে দস্যু তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া ষ্টেশন-মাষ্টার তাঁহার আফিস-কামরায় তাহাকে ডাকিয়াছিল বলিয়া ধাপ্পা দিয়াছিল, সেই দস্যু দীর্ঘদেহ খাট্টাক যুবক। প্রহরী ষ্টেশন-মাষ্টারের আফিস-কক্ষে প্রবেশ করিবামাত্র অন্য দুই জন দস্যু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াছিল; তাহারাও খাট্টাক। সেই তিন জন ব্যতীত আর কয় জন দস্যু সেই দলে ছিল, তাহা তখন জানিতে পারি নাই। যাহা হউক, ডাকাতি সম্বন্ধে যে অসম্পূর্ণ বিবরণ সংগ্রহ করিতে পারিলাম, তাহাতেই নির্ভর করিয়া তদন্তে প্রবৃত্ত হইলাম এবং কর্ত্তৃপক্ষের নিকট এই সংবাদ প্রেরণ করিয়া আমি তদন্ত ব্যাপারে কোন্ পন্থা অবলম্বন করিব, তাহাও তাঁহার গোচর করিলাম।

অতঃপর আমার তাঁবেদারবর্গের মধ্যে যতগুলি লোক সংগ্রহ করিতে পারিলাম, তাহাদিগকে সেই অঞ্চলে নবাগত খাট্টাকদিগের সন্ধানে নিযুক্ত করিলাম। ইত্যবসরে আমি নবি বক্সকে সঙ্গে লইয়া সরে-জমিনে তদন্ত করিতে চলিলাম। ষ্টেশনের কর্ম্মচারিগণকে জেরা করিয়া জানিতে পারিলাম, দস্যুরা সংখ্যায় পাঁচ জন ছিল।

আমার ধারণা হইল, তদন্ত ব্যাপারে আমরা ঠিক পথই অবলম্বন করিয়াছি। উক্ত পাঁচ জন দস্যুর মধ্যে ন্যূনকল্পে তিন জন যে খট্টাক, এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ হইলাম। আমি জানিতাম, সীমান্ত প্রদেশের দস্যুরা কোন স্থানে ডাকাতি করিতে যাইবার সময় তাহাদের নিজের সম্প্রদায়ের বহির্ভূত কোন সম্প্রদায়ের লোককে সেই দলে গ্রহণ করে না। আমার এই অভিজ্ঞতায় নির্ভর করিয়া স্থির করিলাম, সেই দলের পাঁচ জন দস্যুই খাট্টাক সম্প্রদায়ের লোক। রেলপথ হইতে সীমান্তভূমি পর্য্যন্ত যেখানে যত গ্রাম ছিল, সকল গ্রামেই পুলিসের খানাতল্লাসী চলিল; কিন্তু কোনও স্থানে দস্যুদলের কোন চিহ্ন মিলিল না; আমার কোন চেষ্টা সফল হইল না।

যে দিন রাত্রিযোগে দস্যুরা মেল-ট্রেণ লুণ্ঠন করিয়াছিল, তাহার পরদিন রাত্রি প্রায় নয়টার সময় আর একটি দুঃসংবাদ আমাদের কর্ণগোচর হইল। শুনিলাম, যওলাই ষ্টেশনের পরবর্ত্তী ষ্টেশনও লুণ্ঠিত হইয়াছে! সেই ষ্টেশনের ষ্টেশন মাষ্টারকে প্রহারে জর্জ্জরিত করিয়া দস্যুরা তাঁহাকে মৃতজ্ঞানে ফেলিয়া গিয়াছিল এবং সহকারী ষ্টেশন-মাষ্টারকে বোধ হয় মুক্তিপণ আদায় করিবার অভিসন্ধিতে বাঁধিয়া লইয়া গিয়াছিল। স্পষ্টই বুঝিতে পারিলাম, আমরা দস্যুদল গ্রেপ্তার করিবার জন্য যে চেষ্টা করিতেছিলাম, সেই চেষ্টা ব্যর্থ হওয়ায় উহারা আমাদিগকে উপহাস করিবার উদ্দেশ্যেই পরদিন পরবর্ত্তী ষ্টেশনে ডাকাতি করিয়াছিল। কিন্তু এই দ্বিতীয় ডাকাতি করিয়া তাহারা নিজেদেরই সর্ব্বনাশের পথ প্রশস্ত করিয়াছিল—'সর্ব্বমত্যন্তগর্হিতম্।'

এই সময় পর্য্যন্ত আমরা রেলপথ ও সীমান্ত প্রদেশের মধ্যবর্ত্তী স্থানসমূহেই দস্যুগণের অনুসন্ধানে রত ছিলাম।

আমরা যথাসম্ভব সতর্কতা সহকারে ঐ সকল স্থানে খানাতল্লাসী করিয়া ব্যর্থ-মনোরথ হওয়ায় এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলাম যে, দস্যুরা সম্ভবতঃ রেল-ষ্টেশনের সন্নিহিত কোনও স্থানে আড্ডা করিয়াছিল, এবং সেই স্থানে লুকাইয়া থাকিয়া, সুযোগ বুঝিয়া ঐ ভাবে ডাকাতি করিতেছিল।

আমি নবিবক্সকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "তুমি কোনও অপরিচিত বিদেশীকে কি ইদানীং এই অঞ্চলের কোনও স্থানে বাস করিতে দেখিয়াছ? 'লাইনের' অল্প ধারের কোন সংবাদ রাখ কি?"

নবিবক্স কয়েক মিনিট চিন্তা করিয়া বলিল, "সীমান্তের অল্প-ধারের এক জন অধিবাসী জনক সিংএর (দুই মাইল দূরবর্তী কোন গ্রাম) অদূরস্থিত একখানি কুটীরে বাস করিতেছে বটে। এখন আমার স্মরণ হইল, সেই খাটাক সম্প্রদায়ের লোক; আর যে লোকটা ষ্টেশনে আমাকে মাষ্টার বাবুর কাছে পাঠাইয়াছিল—সেও খাটাক!"

নবিবক্সের কথা শুনিয়া তাহাকে সঙ্গে লইয়া উক্ত কুটীরখানি পরীক্ষা করিতে চলিলাম; কিন্তু কুটীরে প্রবেশ করিয়া সেখানে কাহাকেও বাস করিতে দেখিলাম না। কুটীরের সর্ব্বস্থান পরীক্ষা করিয়া সন্দেহজনক কিছুই দেখিতে পাইলাম না; তবে কেহ যে সেখানে অল্পদিন পূর্ব্বে বাস করিয়াছিল, তাহা স্পষ্টই বুঝিতে পারিলাম, এবং যে কারণেই হউক, আমার ধারণা হইল সেই কুটীরই দস্যুরা সাময়িক আড্ডারূপে ব্যবহার করিয়াছিল। যদি সেখানে কোন সূত্র আবিষ্কার করিতে পারি—এই আশায় কুটীরখানি পুনর্ব্বার সতর্কভাবে পরীক্ষা করিলাম; কিন্তু কোন সূত্র আবিষ্কার করিতে না পারায় হতাশ হৃদয়ে আমার সদর আড্ডায় ফিরিয়া আসিলাম।

আমি নবিবক্সকে বলিলাম, "নবিবক্স, যে লোকটা তোমাকে মাষ্টার বাবুর নিকট যাইতে অনুরোধ করিয়াছিল, তাহাকে দেখিলে চিনিতে পারিবে?"

নবিবক্স উৎসাহভরে বলিল, "তাহাকে চিনিতে পারিব, এ বিষয়ে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। তাহাকে গ্রেপ্তার না করিলে আমি স্থির হইতে পারিব না; আমার ক্ষোভ দূর হইবে না। ধাপ্পা দিয়া আমাকে সেই ভুঁড়িওয়ালা বাবুর কাছে পাঠাইয়া সে যে 'ধাপ্পামি' করিয়াছে, সে জন্য আমি তাহাকে রীতিমত শিক্ষা দিব।"

নিকটে যে সকল গ্রাম ও কুটীর ছিল, সেই সকল স্থানে কোন অপরিচিত বিদেশী আসিয়া বাস করিতেছিল কি না, তাহা জানিবার জন্য এক দল লোক পাঠাইলাম; কিন্তু তাহারা অকৃতকার্য্য হইয়া ফিরিয়া আসিল। তথাপি সেই নির্জ্জন কুটীরের উপর আমার লক্ষ্য থাকিল। আমি সীমান্তবাসীদের মনোভাব এবং রুচি-প্রবৃত্তি সম্বন্ধে অভিজ্ঞ ছিলাম; এজন্য নূতন ধরণের একটা পরীক্ষার জন্য আমার আগ্রহ হইল, এবং সেই দিন সন্ধ্যার পূর্ব্বেই আমি গোপনে সকল আয়োজন শেষ করিলাম।

সন্ধ্যাসমাগমের কিছুকাল পূর্ব্বে স্থানীয় একটি মুসলমান রমণী নীলবর্ণ আঁট পায়জামা পরিধান করিয়া, এবং শালের অবগুণ্ঠনে মুখমণ্ডল আচ্ছাদিত করিয়া সেই কুটীরের অদূরবর্তী গ্রাম্য কূপ হইতে জল সংগ্রহ করিতে চলিল; জল আনিবার জন্য তাহার স্কন্ধে একটি মৃন্ময় কলস! তাহার প্রকোষ্ঠে রূপার চুড়ি, পদযুগলে রূপার তোড়া।

রমণী সেই কুটীরের নিকট উপস্থিত হইয়া এভাবে পদবিক্ষেপ করিতে লাগিল যে, তাহার পায়ের তোড়ার শব্দে চতুর্দ্দিক প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। কুটীরের নিকট দিয়া চলিবার সময় সহসা তাহার মস্তক হইতে শাল স্খলিত হওয়ায় রমণী তাহার স্কন্ধের কলস মাটীতে নামাইয়া শালখানি যথাস্থানে পুনঃস্থাপিত করিল, এবং হাতের চুড়িগুলি ঝঙ্কারিত করিয়া কলসটি পুনর্ব্বার কাঁধে তুলিয়া লইল। তাহার পর সে ঝম্-ঝম্ শব্দে অদূরবর্ত্তী কূপ অভিমুখে ধাবিত হইল।

রমণী কুটীরের কয়েক গজ দূরে গিয়াছে—সেই সময় পূর্ব্বোক্ত কুটীরের দ্বার ঈষৎ উদ্ঘাটিত হইল, এবং একটি পাঠান যুবক কুটীরের দ্বার হইতে মুখ বাড়াইয়া বাহিরে দৃষ্টিপাত করিল; কিন্তু সে সেই গজেন্দ্রগামিনী যুবতী ভিন্ন অন্য কাহাকেও কোন দিকে দেখিতে পাইল না। অতঃপর সে ধীরে ধীরে মুক্ত দ্বারপথে কুটীরের বাহিরে আসিল, এবং তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চারিদিকে চাহিয়া পশ্চাতে কুটীরদ্বার রুদ্ধ করিল। সেই সময় কুটীরের ভিতর হইতে সেই যুবককে লক্ষ্য করিয়া তীব্র তিরস্কার-ধ্বনি উত্থিত হইল, যেন কুটীরবাসীরা তাহার কার্য্যে বিরক্ত হইয়া ক্রোধ প্রকাশ করিল; কিন্তু আর কেহই যুবকের অনুসরণ করিয়া কুটীরের বাহিরে আসিল না।

পাঠান যুবক পশ্চাতে দৃষ্টিপাত না করিয়া মুসলমান-রমণীর অনুসরণ করিল। আমি আট জন অনুচর সহ কুটীরের অদূরে লুকাইয়া বসিয়াছিলাম; সেই গুপ্তস্থানে বসিয়া আমি সকলই দেখিতে ও শুনিতে পাইতেছিলাম। আমি সেই পাঠান যুবককে রমণীর অনুসরণ করিতে দেখিয়াও সেই স্থান ত্যাগ করিলাম না; অতঃপর কি কাণ্ড ঘটে, তাহা দেখিবার আশায় অনুচরবর্গ সহ নিস্তব্ধভাবে সেই স্থানেই বসিয়া রহিলাম।

রমণী কূপ-সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া, কলসটি কূপের নিকট রাখিয়াছে, সেই সময় পাঠান যুবক কূপের নিকট আসিয়া দাঁড়াইল, কিন্তু অবগুণ্ঠনবতী রমণীর মুখ দেখিতে না পাওয়ায় ঘুরিয়া তাহার সম্মুখে আসিল। রমণী তাহার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া, অবগুণ্ঠন একটু টানিয়া দিয়া সলজ্জভাবে সরিয়া দাঁড়াইল। যুবক নারীর এই প্রকার ছল-চাতুরীর সহিত পরিচিত, ইহা তাহাকে জানাইবার জন্য প্রগল্ভভাবে চুমকুড়ি ছাড়িয়া রমণীর প্রায় গায়ের উপর গিয়া পড়িল, এবং মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার নাম কি, বিবিজান?"

পুরুষের মোটা গলা হইতে উত্তর বাহির হইল, "নাম আমার নবিবক্স, শীঘ্র দুই হাত মাথার উপর তুলিয়া দাঁড়াও, নতুবা—"

তাহার কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই পুলিস-কনষ্টেবল নবিবক্সের হাতের টোটাভরা রিভলভার প্রেমিক যুবকের বক্ষঃস্থল স্পর্শ করিল! রিভলভারের ঘোড়ায় অঙ্গুলীর একটু চাপ পড়িলেই হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া প্রেমরস গড়াইতে আরম্ভ করিবে, এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রেমলীলারও অবসান হইবে, ইহা বুঝিতে পারিয়া যুবক কম্পিতবক্ষে উভয় হস্ত ঊর্দ্ধে তুলিয়া আতঙ্ক-বিস্ফারিতনেত্রে রমণীর মুখের দিকে চাহিলে, রমণী বাম হস্তে অবগুণ্ঠন অপসারিত করিতেই সে দেখিল, গুঁফো নবিবক্স আড়নয়নে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া তাহার বুকে রিভলভারের নলের এক খোঁচা দিল।

দস্যুদলপতি ওয়ালি খাঁর প্রেমিক পুত্র আমেদ খাঁর সর্ব্বাঙ্গ তখন আতঙ্কে কাঠ!

ষণ্ডওয়ালি রেলষ্টেশনের পুলিস-প্রহরী নবিবক্স অবগুণ্ঠনের শাল পদতলে নিক্ষেপ করিয়া তাহার সহযোগিবর্গকে ইঙ্গিত করিতেই

নারীর ছদ্মবেশে পুলিশ-কনষ্টেবল নবিবক্স

কূপের অদূরবর্ত্তী গুপ্তস্থান হইতে দুই জন কনষ্টেবল দ্রুতবেগে তাহাদের নিকট উপস্থিত হইয়া আমেদ খাঁর উভয় প্রকোষ্ঠে হাতকড়ি আঁটিয়া দিল।

আমেদ খাঁ শৃঙ্খলিত হইলে আমি অনুচরবর্গ সহ কুটীর-দ্বারে উপস্থিত হইয়া দ্বার ভিতর হইতে রুদ্ধ দেখিলাম। দ্বার ভাঙ্গিয়া ভিতরে প্রবেশ করা আমাদের পক্ষে কঠিন হইল না। কুটীরের ভিতর অবশিষ্ট চারি জন পাঠানকেই দেখিতে পাইলাম। পুনর্ব্বার সতর্কভাবে খানাতল্লাসের ফলে এবার একটি গুপ্তদ্বার আবিষ্কৃত হইল। এই দ্বারটি পূর্ব্বে আমাদের দৃষ্টি অতিক্রম করিয়াছিল। সেই দ্বার দিয়া আমরা ভূগর্ভস্থ একটি গুদামে প্রবেশ করিলাম। এই গুদামে আমরা সহকারী ষ্টেশন-মাষ্টারকে শৃঙ্খলিত অবস্থায় দেখিতে পাইলাম। দস্যুরা এই গুদামে লুকাইয়া থাকায় পূর্ব্বে আমরা তাহাদের সন্ধান পাই নাই।

দস্যুদলপতি দেখিতে পাইল, আমরা সংখ্যায় তাহাদের অপেক্ষা অনেক অধিক এবং সকলেই সশস্ত্র, সুতরাং তাহারা আমাদের সহিত যুদ্ধ না করিয়া সহজেই আমাদের হস্তে আত্মসমর্পণ করিল।

সেই সময় নবিবক্স অন্য কনষ্টেবলদ্বয় সহ শৃঙ্খলাবদ্ধ আমেদ খাঁকে সঙ্গে লইয়া কুটীরে প্রবেশ করিল। আমেদ খাঁকে দেখিয়া তাহার পিতা ক্রোধে গর্জ্জন করিয়া বলিল, "তোর নির্ব্বুদ্ধিতার জন্যই আমাদের এই বিপদ! আমি কি তোকে নারীজাতিকে এড়াইয়া চলিতে বলি নাই? আমি জানিতাম, স্ত্রীলোকের উপর লোভ করিতে গিয়াই তোর সর্ব্বনাশ হইবে।"

আমি বলিলাম, "তোমার কথা ফলিয়া গিয়াছে; কিন্তু পুলিসম্যানকে প্রেম নিবেদন করা তাহার পক্ষে বোধ হয় এই প্রথম!"

আমার কথা শুনিয়া ওয়ালি খাঁ ব্যর্থ ক্রোধে হুঙ্কার দিয়া উঠিল; মুক্তিলাভ করিতে পারিলে সে বোধ হয় আমাকে হত্যা করিত। আমি দস্যু পাঁচটাকে সদরে পাঠাইয়া আমার উপরওয়ালা সুপারিন্টেন্‌ডেন্টের নিকট রিপোর্ট করিলাম। যথাকালে আদালতের বিচারে তাহারা স্বাস্থ্যকর (Salutary) দণ্ড লাভ করিল।"

স্বাস্থ্যকর দণ্ডটা কিরূপ, ইনস্পেক্টার তাহা খুলিয়া লিখেন নাই। মেল ট্রেণে সরকারের সম্পত্তি লুণ্ঠন, তাহার উপর তিন জন রাজ-কর্ম্মচারী হত্যা; তন্মধ্যে দুই জন শ্বেতাঙ্গ! ভারতের অন্য কোন প্রদেশে, বিশেষতঃ বঙ্গদেশে ইহা অপেক্ষা লঘু অপরাধেও প্রাণদণ্ড অপরিহার্য্য; কিন্তু সীমান্ত প্রদেশের দুর্দ্ধর্ষ পাঠান অপরাধীদের বিচারের সময় অনেক কথা বিবেচনা করিতে হয়, এবং তাহার উপর দণ্ডের পরিমাণ নির্ভর করিলে বিস্ময়ের কোন কারণ থাকে না।

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়।

মন্ত্রবর্ণাৎ চ (২।৩।৪৪)

(শঙ্কর) বেদের মন্ত্র অংশ হইতেও জানা যায় যে, জীব ব্রহ্মের অংশ। পুরুষসূক্তে আছে,—

পাদোঽস্য সর্ব্বভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি।

"সর্ব্বভূত ব্রহ্মের একটি পাদ বা অংশ, ইহার আর তিন অংশ অমৃতস্বরূপ এবং স্বর্গলোকস্থিত।" এখানে "সর্ব্বভূত" এই শব্দে চরাচর বিশ্বকে লক্ষ্য করা হইয়াছে, যাহার মধ্যে জীবই প্রধান।

(রামানুজ) "ভূতানি" এই বহুবচন হইতে বুঝিতে হইবে যে, আত্মা বহুসংখ্যক। যদিও সকল আত্মাই জ্ঞান-স্বরূপ অতএব একরূপ, তথাপি বিভিন্ন আত্মার যে সকল বিভিন্ন আকার আছে, তাহা আত্মজ্ঞ ব্যক্তিগণ বুঝিতে পারেন। জীবের সংখ্যা যে বহু, তাহা নিম্নের শ্রুতিবাক্য হইতেও জানা যায়:—

নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানাং একো বহূনাং
যো বিদধাতি কামান্

অর্থাৎ বহু নিত্য ও চেতন জীবের মধ্যে এক নিত্য ও চেতন ব্রহ্ম আছেন, সেই এক ব্রহ্ম বহু জীবের কাম সম্পাদন করেন।

অপি চ স্মর্য্যতে (২।৩।৪৫)

"স্মৃতিতেও এ কথা বলা হইয়াছে।" মহাভারতের অন্তর্গত গীতা স্মৃতি-গ্রন্থের মধ্যে একটি প্রধান গ্রন্থ। তাহাতে ভগবান্ বলিয়াছেন,—

মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ অর্থাৎ জীব-সকল নিত্য এবং আমার অংশ। যদিও জীব ব্রহ্মের অংশ, তথাপি জীব ভৃত্য এবং ব্রহ্ম স্বামী, ইহাতে কোনও দোষ হয় না।

প্রকাশাদিবৎ ন এবং পরঃ (২।৩।৪৬)

(শঙ্কর) আশঙ্কা হইতে পারে যে, জীব যদি ব্রহ্মের অংশ হয়, তাহা হইলে জীবের দুঃখ হইলে ব্রহ্মেরও দুঃখ হইবে, যেমন কোনও ব্যক্তির দেহের অংশ (হস্তপদাদি) আহত হইলে সেই ব্যক্তির কষ্ট হয়। কিন্তু তাহা হয় না। "ন এবং পরঃ" জীব যেমন দুঃখী হয়, ব্রহ্ম সেরূপ হয় না। "প্রকাশাদিবৎ" সূর্য্যের আলোতে অঙ্গুলি ধরিলে সেই অঙ্গুলি বাঁকাইলে সূর্য্যের আলোও বক্র বলিয়া মনে হয়, কিন্তু সে বক্রতা সূর্য্যকে স্পর্শ করে না। সেইরূপ জীবের দুঃখ ব্রহ্মকে স্পর্শ করে না। ব্রহ্ম আনন্দস্বরূপ। জীব নিজকে দেহ বলিয়া ভ্রম করে বলিয়াই তাহার দুঃখ হয়, নচেৎ জীব যদি নিজ স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারে, তাহা হইলে তাহার দুঃখ হয় না। ব্রহ্মের কখনও দেহাত্মবোধরূপ ভ্রম হইতে পারে না। এজন্য ব্রহ্মের দুঃখ হইতে পারে না।

(রামানুজ) "ন এবং পরঃ" অর্থাৎ পরমাত্মা বা ব্রহ্ম এইরূপ (জীবের ন্যায় দোষযুক্ত) নহে। "প্রকাশাদিবৎ" সূর্য্যের প্রকাশ যে ভাবে সূর্য্যের অংশ, দেহ যেরূপ মনুষ্যের অংশ, বিশেষণ যেরূপ বিশেষ্যের অংশ, জীবও সেইরূপ ব্রহ্মের অংশ।

উপনিষদে বলা হইয়াছে "তৎ ত্বম্ অসি"—এখানে তৎ শব্দের অর্থ ব্রহ্ম; ত্বম্ শব্দেরও অর্থ ব্রহ্ম,—জীব যাহার শরীর। "অয়ম্ আত্মা ব্রহ্ম" এখানেও অয়ম্ ও আত্মা এই দুইটি শব্দও জীব-যুক্ত ব্রহ্মকেই বুঝাইতেছে।

স্মরন্তি চ (২।৩।৪৭)

(শঙ্কর) ব্যাসদেব তাঁহার প্রণীত গ্রন্থে বলিয়াছেন,

ন লিপ্যতে কর্ম্মফলৈঃ পদ্মপত্রম্ ইবাম্ভসা

"ব্রহ্ম কর্ম্মফলে লিপ্ত হন না। পদ্মপত্র যেরূপ জলের দ্বারা লিপ্ত হয় না।"

উপনিষদেও ইহা আছে :-

তয়োঃ অন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্ব্ অত্তি
অনশ্নন্ অন্যঃ অভিচাকশীতি

"ব্রহ্ম ও জীবের মধ্যে এক জন (জীব) পক্ব কর্ম্মফল ভক্ষণ করে। অপর (ব্রহ্ম) ভক্ষণ করে না, কেবল দর্শন করে।"

(রামানুজ) প্রভা এবং প্রভাযুক্ত বস্তুর মধ্যে যে সম্বন্ধ, জীব ও ব্রহ্মের মধ্যে সেইরূপ সম্বন্ধ, ইহা স্মৃতিগ্রন্থে উক্ত হইয়াছে :—

একদেশস্থিতস্যাগ্নের্জ্যোৎস্না বিস্তারিণী যথা।
পরস্য ব্রহ্মণঃ শক্তিস্তথেদম্ অখিলং জগৎ॥ (বিষ্ণুপুরাণ)

"অগ্নি এক স্থানে অবস্থান করিলে তাহার জ্যোতি যেরূপ চারিদিকে বিস্তৃত হয়, সেইরূপ নিখিল বিশ্ব পরব্রহ্মেরই শক্তি।" উপনিষদেও আছে—"যস্য আত্মা শরীরং" অর্থাৎ আত্মা (জীব) যাহার (ব্রহ্মের) শরীর।

অনুজ্ঞাপরিহারৌ দেহসম্বন্ধাৎ জ্যোতিরাদিবৎ (২।৩।৪৮)

(শঙ্কর) অনুজ্ঞা—যথা পশুং সংজ্ঞপয়েৎ (যজ্ঞে পশুবধ করিবে), পরিহার—যথা "মা হিংস্যাৎ সর্ব্বভূতানি" (কোন প্রাণীকে বধ করিবে না)। এই সকল বিধি নিষেধ "দেহসম্বন্ধাৎ" দেহের সহিত সম্বন্ধ হেতু ব্যবস্থত হয়।" "জ্যোতিরাদিবৎ।" জ্যোতি বা অগ্নি এক হইলেও পবিত্র অগ্নি আহরণ করা হয়, শ্মশানের অগ্নি পরিত্যাগ করা হয়। সেইরূপ আত্মা এক হইলেও বিভিন্ন দেহের সহিত সম্বন্ধে বিভিন্ন বিধিনিষেধ সঙ্গত হয়।

(রামানুজ) যদিও সকল আত্মাই ব্রহ্মের অংশ এবং জ্ঞাতাস্বরূপ, তথাপি ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্রাদি পবিত্র ও অপবিত্র দেহের সহিত সম্বন্ধ নিবন্ধন শাস্ত্রবিহিত বিধি-নিষেধগুলির সার্থকতা আছে।

অসন্ততেশ্চ অব্যতিকরঃ (২।৩।৪৯)

(শঙ্কর) অসন্ততেঃ (একটি জীবাত্মার বিভিন্ন দেহের সহিত সন্ততি বা সম্বন্ধ নাই বলিয়া), অব্যতিকরঃ (ব্যতিকর বা কর্ম্মফলের মিশ্রণ) হয় না—এক জনের কর্ম্মের ফল অপরকে ভোগ করিতে হয় না।

(রামানুজ) অদ্বৈতমতে যখন আত্মা এক, তখন সেই আত্মাকে সকল কর্ম্মের ফল ভোগ করিতে হইবে। কিন্তু বিশিষ্টাদ্বৈতমতে যখন জীবাত্মা বহু ও বিভিন্ন, তখন প্রত্যেকে নিজ নিজ কর্ম্মফল ভোগ করিবে,—কাহাকেও সকলের কর্ম্মফল ভোগ করিতে হইবে না।

আভাস এব চ (২।৩।৫০)

(শঙ্কর) জলে যেরূপ সূর্য্যের আভাস বা প্রতিবিম্ব পতিত হয়, সেইরূপ অবিদ্যায় ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব পতিত হয়,—তাহাই জীবাত্মা। একটি জলাশয়ে সূর্য্যের প্রতিবিম্ব কাঁপিলে, অপর জলাশয়ের প্রতিবিম্ব কাঁপে না। সেইরূপ একটি জীবাত্মা নিজ কর্ম্মফল ভোগ করিলে, অপর জীব সেই কর্ম্মফল ভোগ করে না।

(রামানুজ) অদ্বৈতবাদী বলেন, ব্রহ্মই কল্পিত উপাধি-ভেদে বিভিন্ন জীব বলিয়া প্রতীতি হয়। কিন্তু এই মত প্রকৃত যুক্তিসহ নহে, যুক্তির আভাস মাত্র। কারণ, ব্রহ্মের স্বরূপই প্রকাশ, সেই প্রকাশ যদি অবিদ্যা দ্বারা আবৃত হয়, তাহা হইলে ব্রহ্মের স্বরূপই বিনষ্ট হইবে।

অদৃষ্টানিয়মাৎ (২।৩।৫১)

পরপক্ষে অদৃষ্টের নিয়মের হেতু দেখা যায় না।

(শঙ্কর) সাংখ্যমতে জীবাত্মা বহু এবং সর্ব্বব্যাপক। তাহা হইলে প্রত্যেক দেহের সহিত সকল আত্মা সমভাবে সংবদ্ধ। অতএব প্রত্যেক দেহ পাপপুণ্য হেতু যে অদৃষ্ট অর্জ্জন করে, সেই অদৃষ্ট সকল আত্মার সহিত সমান ভাবে সংবদ্ধ হইবে। বিভিন্ন জীবের বিভিন্ন অদৃষ্ট থাকিবে, এরূপ কোনও নিয়ম পাওয়া যায় না। বৈশেষিক মতেও এই দোষ হয়।

রামানুজ বলেন যে, এই সূত্রে অদ্বৈতমতেরই দোষ দেখান হইয়াছে। বিভিন্ন জীবের অদৃষ্ট ভিন্ন বলিয়া ভোগ ভিন্ন হইবে, অদ্বৈত মতে ইহা বলা যায় না। কারণ, সকল অদৃষ্টই একমাত্র আত্মা ব্রহ্মেই আশ্রিত,— সুতরাং সকল অদৃষ্ট আত্মার সহিত সমভাবেই সংবদ্ধ থাকিবে।

অভিসন্ধ্যাদিষু অপি চ এবং (২।৩।৫২)

(শঙ্কর) সাংখ্যমতে ইহা বলা যায় না যে, বিভিন্ন আত্মার অভিসন্ধ্যা অর্থাৎ সংকল্প বিভিন্ন, সুতরাং ভোগও বিভিন্ন। কারণ, সকল আত্মাই যখন সর্ব্বব্যাপক, তখন প্রত্যেক সংকল্প সকল আত্মার সহিত সমানভাবে সংবদ্ধ থাকিবে।

(রামানুজ) অদৃষ্টের হেতু অদ্বৈত মতে আত্মা যখন এক, তখন প্রত্যেক সঙ্কল্পের ফল সকল জীবকে ভোগ করিতে হইবে।

প্রদেশাৎ ইতি চেৎ ন অন্তর্ভাবাৎ (২।৩।৫৩)

(শঙ্কর) সাংখ্যমতে ইহাও বলা যায় না যে, প্রত্যেক দেহে আত্মার যে প্রদেশ অবচ্ছিন্ন. সেই প্রদেশ অনুসারে বিভিন্ন জীবের বিভিন্ন সুখ-দুঃখ উপপন্ন হইবে। কারণ, আত্মা সর্ব্বব্যাপক হইলে সকল প্রদেশই তাহার অন্তর্ভুক্ত হইবে (অন্তর্ভাবাৎ)।

(রামানুজ) সকল প্রদেশই যখন ব্রহ্মের অন্তর্ভুক্ত, তখন বিভিন্ন প্রদেশ অনুসারে বিভিন্ন জীবের সুখ-দুঃখের ব্যবস্থা হইবে, ইহা অদ্বৈতবাদী বলিতে পারেন না।

দ্বিতীয় অধ্যায় তৃতীয় পাদ সমাপ্ত

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় (এম-এ)।

জয়ন্তী-বাসরে

ভারত আমার ! জননী আমার ! বলিতে গর্ব্বে ভরে যে বুক।
নিবিড় বেদনা, তমসার মাঝে সত্যকারের একটি সুখ।
শুভ জয়ন্তী, উৎসবে তোর, যোগ দিতে মোরে ডাকে নি কেউ।
তবু এ কি ভাব উছলে মরমে, ঢেউয়ের 'পরে যে উঠিছে ঢেউ।
ভুলিনি আমার শৈশব-স্মৃতি ভুলিনি জননি ! তোমার স্নেহ।
তব ধূলা-কাদা, মাখিয়া নিত্য, বর্দ্ধিত মোর এ ছার দেহ।
জননী-জঠর, হইতে যে দিন, পড়িনু তোমার বক্ষ চুমি।
আদরে সে দিন, হৃদয়ে লইলে, হে মোর জননি ! জন্মভূমি !
পল্লীর বুকে, তব নদীতীরে, কৈশোরে কত করেছি খেলা।
ভুলিনি জননি ! সে সকল স্মৃতি, নন্দিত সখা সখীর মেলা।
কমল কুমুদ, তুলিতে দীঘিতে, সাঁতার কাটিয়া সে কি মা যাওয়া।
আম কুড়ানোর সঙ্গী লগনো, বহিলে বশেখী উতল হাওয়া।
তব বন-জাত কুসুম-মালায়, যে দিন সাজিনু বধূ ও বর।
তোমারি ধান্য তোমারি দূর্ব্বা, আশিস বিছাল, মাথার'পর।
হইনু জননী, তোমার প্রতীক, মাতার গর্ব্বে ভরিল বুক।
শিশু সন্তান লভিয়া বক্ষে, সে কি মা আনন্দ সে কি মা সুখ !
তোমার আকাশ তোমার বাতাস, তব রবি-করে বাঁচিয়া আছি।
পদ-রেণু হতে, কোর না বঞ্চিত আকুল কামনা চরণে যাচি।
তোমার জীবন তোমারি খাদ্যে জীবন জোয়ার বহিছে দেবি !
সার্থক হোক জনম আমার, তোমার দুখানি চরণ সেবি।

শ্রীমতী চারুশীলা দেবী।

মোটর দ্বিচক্রযানে সিকিমযাত্রা

সিকিমের ইতিহাস সম্বন্ধে অতি অল্পই শুনিতে পাওয়া যায়। বিশেষতঃ সিকিমের প্রাচীন ইতিহাস জনপ্রবাদ হিসাবেই দেশে প্রচলিত আছে। তবে সিকিমের রাজবংশের সহিত তিব্বতের বিশেষ ঘনিষ্ঠতা আছে, ইহা সর্ব্বজনবিদিত। বহু পূর্ব্বে তিব্বতে অত্যাচারিত হইয়া কয়েক জন বৌদ্ধভিক্ষু য়ুকসম নামক স্থানে পলাইয়া আশ্রয় লয়। তৎকালে সিকিমে তিব্বতদেশীয় এক জন ক্ষমতাবান্ ব্যক্তি বাস করিতেন; তাঁহার নাম ছিল পেঁচু নামগৈ। বৌদ্ধ-ভিক্ষুগণ তাঁহার সহিত মিলিত হন এবং তাঁহাকে সিকিমের রাজা বলিয়া মানিয়া লন। তখন সিকিমের অধিবাসিগণ বেশীর ভাগ লেপচা সম্প্রদায়ভুক্ত ছিল। পেঁচু নামগৈ রাজার সুবিধা পাইয়া সিকিম-রাজ্যে অনেকে অনেকবার অভিযান করিয়াছিলেন। সিকিমের দ্বিতীয় এবং তৃতীয় রাজার সময় স্বধর্ম্মাবলম্বী ভূটানবাসীরা সিকিম আক্রমণ এবং লুঠতরাজ করিয়া চলিয়া যায়। তার পর নবম শতাব্দীতে গোর্খারা একবার সিকিম রাজ্যের ভিতর প্রবেশ করিয়া তাহার কিছু অংশ দখল করে। তিব্বতের সহায়তায় সিকিমরাজ তাহাদিগকে বিতাড়িত করিতে সমর্থ হন। কিন্তু তৎকালীন সিকিমরাজ না-বালক থাকায় তিব্বতীরা সুবিধা বুঝিয়া রক্ষকের পরিবর্ত্তে ভক্ষক হইয়া বসিল এবং উত্তরাঞ্চলের খানিকটা অংশ নিজ এলাকাভুক্ত করিয়া লয়। ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে ইংরেজদিগের সহিত নেপালের রাজার যখন প্রথম যুদ্ধ হয়, তখন সিকিমের

গংটক হইতে সিকিম উপত্যকার আর একটি দৃশ্য

উদ্দেশ্য ছিল যে, তিনি উল্লিখিত বৌদ্ধ-ভিক্ষুদের দ্বারা এই লেপচাদিগকে বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া লইবেন। সেই সময় হইতেই সিকিমের রাজা তিব্বতদেশীয় বৌদ্ধ-সম্প্রদায়ভুক্ত হইলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে অনেক অধিবাসীও বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী হয়। তবে সপ্তদশ শতাব্দী হইতেই সিকিমের সম্বন্ধে কিছু কিছু ইতিহাসে পাওয়া যায়। তাহার জন্যই ইতিহাসে চৈগয়াল ফুঁসগ নামগয়ালকেই সর্ব্বপ্রথম রাজা বলিয়া বর্ণিত আছে। শুনিতে পাওয়া যায় যে, তাঁহার পরবর্ত্তী রাজাদের সময় সিকিম রাজ্যের সীমানা দক্ষিণে প্রায় কিষণগঞ্জ পর্য্যন্ত বিস্তারলাভ করিয়াছিল। তবে সিকিমবাসী বৌদ্ধরা ধর্ম্মভীরু জাতি। তাহাদের রাজ্যলিপ্সা বড় বেশী ছিল না। সেই রাজা ইংরেজদিগের পক্ষ অবলম্বন করেন এবং ইহার কৃতজ্ঞতাস্বরূপ নেপালের খানিকটা অংশ সিকিম-রাজ্যভুক্ত করা হয়। ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে ইংরেজগণ যখন তিব্বতে সৈন্য প্রেরণ করেন, তখনও তাঁহারা সিকিমের সহায়তা পান। শেষে তিব্বতের অবস্থা সঙ্গীন হওয়ায় ভারত সরকার সিকিম-রাজের সহিত এক সন্ধি করেন (১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে) এবং তদনুযায়ী সিকিমের শাসনভার ভারত-সরকারের কর্ত্তৃত্বাধীনে আসে। তার পর ভারত সরকারের সহিত সিকিমের আর একটি সন্ধি অনুযায়ী দার্জ্জিলিং অঞ্চল ভারত সরকারের এলাকাভুক্ত হয় এবং তাহার বিনিময়ে সিকিম-দরবার বাৎসরিক বারো হাজার টাকা প্রাপ্ত হন। ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে ভারতসরকার

সিকিম উপত্যকা

পরিষ্কার এবং শুদ্ধভাবে ইংরেজি ভাষায় কথাবার্ত্তা বলিতে পারেন। সিকিম-রাজের সম্মানার্থ ভারত সরকার ১৫ বার তোপধ্বনি করিয়া থাকেন। মহারাজ দিল্লীস্থিত নরেন্দ্রমণ্ডলীর (Chamber of Princes) এক জন সভ্য।

মহারাজা স্বয়ং রাজ্যের সমস্ত কার্য্যের তদন্ত করেন। তাঁহার এক মন্ত্রণা-সভা আছে, তাহাতে তাঁহার চারি জন পারিষদ আছেন; প্রকৃতপক্ষে তাঁহারাই বিভিন্ন বিভাগের কার্য্য পরিচালনা করেন। কোনও জটিল কিম্বা বৈদেশিক ব্যাপারে ইংরেজ প্রতিনিধির পরামর্শ গ্রহণ করা হয়। সিকিম-দরবারের বাৎসরিক আয় ন্যূনাধিক সাড়ে পাঁচ লক্ষ টাকা। ইহার অধিকাংশ রাস্তাঘাট এবং শিক্ষাবিস্তারকার্য্যে ব্যয়িত হইয়া থাকে। মহারাজা নিজস্ব তহবিলে কিছু রাখিয়া বেশীর ভাগ অর্থ ধর্ম্ম এবং শিক্ষাপ্রচারকার্য্যে ব্যয় করেন। মোটামুটি দেখিতে পাওয়া যায় যে, এই ক্ষুদ্র পার্ব্বত্য-রাজ্যের যেমন আয়, তেমনভাবে হিসাব করিয়া মহারাজা ব্যয় করেন; এবং তাহার জন্যই রাজ-সরকারের তহবিলে কখনও টাকার ঘাট্‌তি পড়ে না।

গংটকস্থিত বৌদ্ধ-পল্লী

বর্ত্তমান মহারাজার হস্তে তাঁহার রাজ্যের সমস্ত শাসনভার ছাড়িয়া দেন এবং তখন হইতে সিকিমে অবস্থিত ইংরেজ প্রতিনিধির ক্ষমতা বহুল পরিমাণে হ্রাস করা হয়।

বর্ত্তমান মহারাজার নাম হিজ হাইনেস স্যর তাশী নামগয়াল। ইনি সিকিমের একাদশ নরপতি। এখন মহারাজার বয়স প্রায় ৪১ বৎসর। ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে তিব্বতের এক ধনী এবং সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির কন্যার সহিত ইঁহার পরিণয় হয়। এখন ইঁহাদের তিন পুত্র এবং তিন কন্যা বর্ত্তমান। মহারাজা এবং মহারাণী উভয়েই বেশ

তিব্বতী নাচ

সিকিমের নারীরা সম্প্রদায়-নির্ব্বিশেষে সকলেই স্বাধীন। যে সমস্ত পুরুষ বা নারী শুধু ধর্ম্মালোচনা করেন, তাঁহাদিগকে 'লামা' বলা হয় এবং তাঁহারা অবিবাহিত থাকেন।

বৌদ্ধ সম্প্রদায়ভুক্ত লোকরা ভূতপ্রেতবিশ্বাসী। ঔষধব্যবস্থাদির উপর ইহাদের ততটা আস্থা নাই। জনস্থানে বেশী রকম রোগবালাই বা অমঙ্গলের সৃষ্টি হইলে লামাগণ অহোরাত্র তাঁহাদের 'ত্রিপিটক' বা ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ করেন। সিকিমের কোন কোন স্থানে ডাক্তারখানা বা হাসপাতালের বন্দোবস্ত করা হইয়াছে; তন্মধ্যে গংটকস্থ 'স্যর থটুপ নামগয়াল হাসপাতাল' সম্পূর্ণরূপে আধুনিক ভাবে পরিচালিত হইতেছে। রংপুতে আর একটি বড় হাসপাতাল আছে, তাহার ব্যয়ভার ভারত সরকারের দ্বারা সরবরাহ করা হয়। গংটকে একটি পশু-চিকিৎসালয়ও আছে।

সিকিম-রাজ্যের লোকসংখ্যা ন্যূনাধিক এক লক্ষ এবং রাজধর্ম্ম বৌদ্ধ। কিন্তু নেপালের হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী লোকসংখ্যাই বেশী। রাজকার্য্য হিন্দী ভাষাতেই হয়, তবে তিব্বতী-ভাষারও প্রচলন আছে। এখানকার অধিবাসীদের মধ্যে নেপালী, ভুটিয়া এবং লেপ্চা সম্প্রদায় প্রধান। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, লেপ্চারা এখানকার আদিম অধিবাসী। তিব্বতী কিম্বা ভুটীয়াদের মধ্যে যাহারা অবস্থাপন্ন এবং বহুদিন যাবৎ সিকিমে ভূসম্পত্তি ভোগ করিতেছেন, তাঁহারা রাজ-দরবারে বিশেষ সম্মান পান এবং তাঁহাদিগকে 'কাজী' বলা হয়। প্রকৃতপক্ষে তাঁহারা এখানকার জমিদার। জমিদার-সম্প্রদায়ভুক্তদের মধ্যে অন্য এক শ্রেণীর সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি আছেন, তাঁহাদিগকে 'এলাখাদার' বলা হয়। এই শ্রেণীতে অনেক সিকিমের বহির্দ্দেশীয় লোকও আছেন। ইহাদের সিকিম-রাজ্যের ভিতর চিরস্থায়িভাবে জমির উপর দাবী-দাওয়া লইয়া অনেক বাদবিতণ্ডা চলিতেছে।

বৌদ্ধ শব-শোভা-যাত্রা

মহারাজার প্রাসাদের নূতন অংশ

সাধারণের জন্ম গংটকের নিকটে একটি কসাইখানা আছে। বৌদ্ধ সম্প্রদায়ভুক্ত লোকরা মাংস ভক্ষণ করে বটে; তবে নিজ হাতে পশু বধ করে না।

সিকিমের ভিতর অনেকগুলি প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে। ইহার বেশীর ভাগ সরকার দ্বারা পরিচালিত; মাত্র তিন চারিটি তত্রস্থিত খৃষ্টান মিশনারীদের হস্তে ন্যস্ত; তাহার জন্যও সরকার হইতে সাহায্য দেওয়া হয়। এই বিদ্যালয়ে ছোট ছোট মেয়েরাও অধ্যয়ন করে। গংটকে একটি ইংরেজি বিদ্যালয় আছে, তাহার নাম 'স্যর

গংটকে হোয়াইট হল তৈয়ারী অবস্থায়

তাসি নামগয়াল উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়'! ইহা ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এখন এই বিদ্যালয়ে প্রায় দুই শত ছাত্র অধ্যয়ন করে। ইহার প্রধান শিক্ষক এক জন ইংরেজ। ইনি General Secretary ভাবেও মহারাজার পরিষদের অন্যতম।

এখানকার বিচারকার্য্যে নিজ কার্য্যপদ্ধতি অবলম্বিত হয়। তবে ফৌজদারী ব্যাপারে বৃটিশ ভারতের নিয়মাবলী অবলম্বন করা হয়। সমস্ত দেশটি কয়েকটি 'এলাখায়' বিভক্ত করা হইয়াছে। এই 'এলাখা'গুলির 'এলাখাদার' বা সরকার মনোনীত ম্যানেজার স্ব স্ব 'এলাখা'র অল্প অর্থ সংক্রান্ত দেওয়ানী এবং ফৌজদারী বিচার-কার্য্য সম্পন্ন করেন। এই কার্য্যানুষ্ঠানের বৃত্তিস্বরূপ তাঁহারা
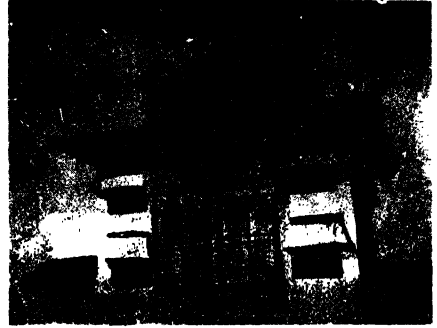
গংটকস্থিত পুরাতন বৌদ্ধমন্দির

সরকার হইতে কিছুই পান না; তবে বিচার বিষয়ে stamp-fee কিম্বা জরিমানার অর্দ্ধেক অংশ তাঁহারা গ্রহণ করেন—বাকি অর্দ্ধেক সরকারের তহবিলে জমা হয়। 'এলাখাদার'-পরিচালিত এইরূপ

কালী-বাড়ী

কাছারীর নাম 'আদ্য কাছারী'। ইহাদের উপরে একটি প্রধান কাছারী (chief court) আছে। 'আদ্য কাছারী'র কার্য্যকলাপ পরিদর্শন এবং তথা হইতে প্রেরিত আবেদনের শুনানী এই কাছারীতে হয়। প্রয়োজন বোধ করিলে প্রজাগণের এই কাছারীর প্রদত্ত রায়ের বিরুদ্ধে সপারিষদ মহারাজার নিকট আবেদন প্রেরণ করিবার অধিকার আছে।

এই দেশে দেওয়ানী মামলা কিছু কম; ফৌজদারী মামলাও বড় বেশী তালিকাভুক্ত হয় না। ইহার বেশীর ভাগ পঞ্চায়েতি দ্বারা বা আপোষেই নিষ্পত্তি হয়। ফৌজদারী মামলায় তত্রস্থ নেপালীরাই বেশীর ভাগ অভিযুক্ত হয়। এই দেশের প্রজারা সচরাচর গরীব হইলেও চুরি বা ডাকাতি খুব কম হয়। ভিক্ষুকের সংখ্যা একেবারে নাই বলিলেই হয়।

ইংরেজ প্রজাদিগের অপরাধের বিরুদ্ধে বিচারকার্য্যের অধিকার
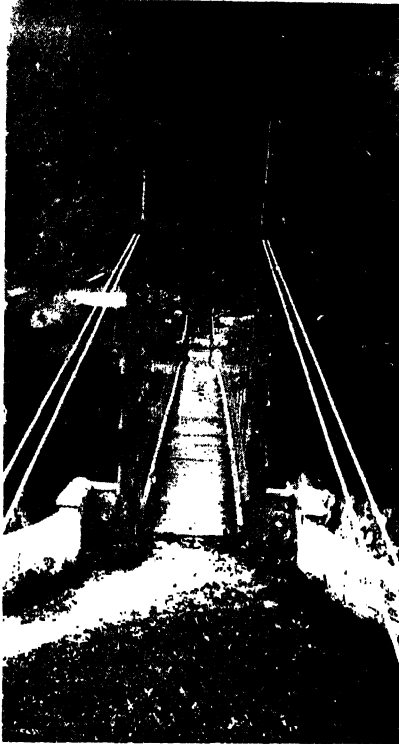
একটি ঝুলান সেতু

সিকিম দরবারের নাই। তবে তাহার দায়িত্ব তত্রস্থ ইংরেজ প্রতিনিধির ইচ্ছাধীন।

গংটকস্থিত পুরাতন বৌদ্ধ মন্দির দেখিয়া ফিরিবার পথে তত্রস্থ জেলখানা দেখিয়াছিলাম। 'জেলার' ভদ্রলোক, বেশ যত্নসহকারে আমাকে জেলের আভ্যন্তরীণ সমস্ত বিষয়ই প্রদর্শন করান। শুনিলাম, তখন জেলে প্রায় ৫০ জন কয়েদী আছে, তন্মধ্যে একটি স্ত্রীলোকও আছে।

সিকিম দরবারের অধীনে কোনও প্রকার সেনাদল নাই। পুলিসবাহিনীর সংখ্যা এক শতেরও কম। বহিঃশত্রুর আক্রমণের বিরুদ্ধে তিব্বত এবং নেপাল সীমানায় ইংরেজদিগের সেনানিবাস আছে।

সিকিমের ব্যবসায় বলিতে গেলে বেশীর ভাগ কাঠের এবং পশুর লোমের তৈয়ারী কম্বল ও গালিচাই প্রধান। কমলালেবুর চাষ যথেষ্ট হয় এবং ইহা বাহিরে রপ্তানী করিয়া সিকিম দরবার যথেষ্ট লাভবান হন। ধানের চাষ এখানে কিছু কম হওয়াতে বাহির হইতে চাল আমদানী করিতে হয়। ভুট্টার চাষ এখানকার লোকের প্রয়োজনের তুলনায় বেশী হয়। এ স্থানের বড় বড় ব্যবসায়গুলি প্রায় সমস্তই মাড়োয়ারীদের দ্বারা পরিচালিত।

অশ্বচলাচল-পথের একটি দৃশ্য

দেশের সমৃদ্ধি এবং উন্নতি রাস্তা-ঘাটের অবস্থা হইতেই প্রতীয়মান হয়। সিকিম রাজ্য যে ক্রমে উন্নতির দিকে অগ্রসর হইতেছে, তাহা রাস্তা-ঘাটের সুন্দর অবস্থা দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়। রংপু হইতে গংটক আসিবার রাস্তা (cart road) শীঘ্রই সম্পূর্ণ হইবে; গংটকের ভিতরের রাস্তাও অতি সুন্দর। এই উন্নতির প্রশংসা একমাত্র ফকিরচাঁদ জালি মহাশয়ের প্রাপ্য। রংপু হইতে গংটকের রাস্তা (২৫ মাইল), এবং রেণক-জালেপলা (৭০ মাইল), এবং রেণক-লাচেন (৫০ মাইল) রাস্তাদ্বয় ভারত সরকার দ্বারা পরিদর্শিত হয়। শেষোক্ত রাস্তাদ্বয় অশ্ব-চলাচলের উপযুক্ত (bridle path)। গংটকের ডাক-বাংলোয় অতি সুন্দর বন্দোবস্ত আছে। তথায় ১০।১২ জনের থাকিবার স্থান আছে।

গংটক হইতে ১৪ মাইল দূরে একটি বৃহৎ জলপ্রপাত

দূর হইতে জলপ্রপাতের দৃশ্য

তবে ডাক-বাংলো ব্যবহার করিতে জালি সাহেবের অনুমতি পূর্ব্বে লইতে হয়।

গংটকে বৈদ্যুতিক আলোর এবং জলের কলের বন্দোবস্ত আছে। রাজকর্ম্মচারীদের বাটীতে বিনামূল্যে উভয় জিনিষই সরবরাহ করা হয়। প্রধান প্রধান রাস্তাতেও আলো এবং জলের বন্দোবস্ত আছে।

গংটক হইতে ১৪ মাইল দূরে এক ঝোড়া আছে। ২০ মাইল দূরে একটি বৃহৎ হ্রদ আছে; ইহার নাম ছাঙ্গু এবং এই স্থানের উচ্চতা প্রায় বারো হাজার ফুট। শীতকালে ইহা বরফে জমিয়া থাকে। ইহার চতুষ্পার্শ্বের দৃশ্যও অতি মনোরম। শুনিলাম, এক বিদেশী ব্যবসায়ী এই হ্রদ হইতে বৈদ্যুতিক আলো (hydro electric) সমস্ত উত্তরবঙ্গে সরবরাহ করিবার জন্য কল্পনা করিয়াছিলেন। কিন্তু কোনও কারণ বশতঃ সে কায বন্ধ হইয়া যায়। এই হ্রদের নিকটবর্ত্তী স্থানে একটি বাংলো আছে। এই স্থানে যাইতে হইলেও অশ্বপৃষ্ঠে যাইতে হয়।

গংটকে আসিয়া একটি জিনিষের অভাব আশ্চর্য্য বলিয়া মনে হইল। ভারতবর্ষের অনেক স্থানে বাঙ্গালীর পরিচিত মুখ দেখিতে পাওয়া যায়। সিকিম বাঙ্গালা দেশের এত নিকটবর্ত্তী হইয়াও বহু দূরের যেন এক অজানা এবং অশ্রুত দেশ বলিয়া মনে হয়। পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে, যে কারণেই হউক, বাঙ্গালীদের সিকিম রাজ্যে প্রবেশাধিকার ছিল না। পরিশেষে উক্ত নিয়ম তুলিয়া দিলেও বাঙ্গালীদের সে স্থানে থাকিবার সুবিধা ঘটে নাই।

গংটকে সর্ব্বসমেত চার জন বাঙ্গালী ভদ্রলোক আছেন—তন্মধ্যে তিন জন তত্রস্থ স্কুলের শিক্ষক এবং অপরটি পোষ্ট মাষ্টার। আর এক জন ঢাকানিবাসী বাঙ্গালী মুসলমান তথায় একটি ছোট মনিহারীর দোকান করিয়া আছেন। বাঙ্গালীর উপর এত অবিশ্বাস—ভাবিয়া বড় দুঃখ অনুভব করিলাম; কিন্তু পরক্ষণেই এই চিন্তা করিয়া একটু হাসিতে চেষ্টা করিলাম যে, বাঙ্গালী যে কারণেই হউক, তাহার স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিয়াছে এবং অন্যদের নিকটে তাহার এক পরিচয়ের দাবীর উপর স্পর্দ্ধা করিয়া দাঁড়াইতে পারে।

গংটকে চার দিন থাকিয়া ৫ই নভেম্বর বেলা সাড়ে এগারটার সময় জালি সাহেবকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইয়া সহর ত্যাগ করিলাম। আমার তথায় অবস্থিতির সময় তত্রস্থ ইংরেজ প্রতিনিধি বদলি হইলেন। শুনিলাম, অবসরপ্রাপ্ত ইংরেজ কর্ম্মচারী ঐ দিনই তিস্তা গ্রামে নামিয়া যাইবেন। অতএব রাস্তা মেরামত সেই দিন বন্ধ ছিল এবং সিংটমের নিকটবর্ত্তী রাস্তা পরিষ্কার রাখা হইয়াছিল। সুতরাং আমার আসিবার সময় কোনওরূপ অসুবিধা হয় নাই, এবং

মল্লিগ্রাম হইতে তিস্তা নদীর দৃশ্য
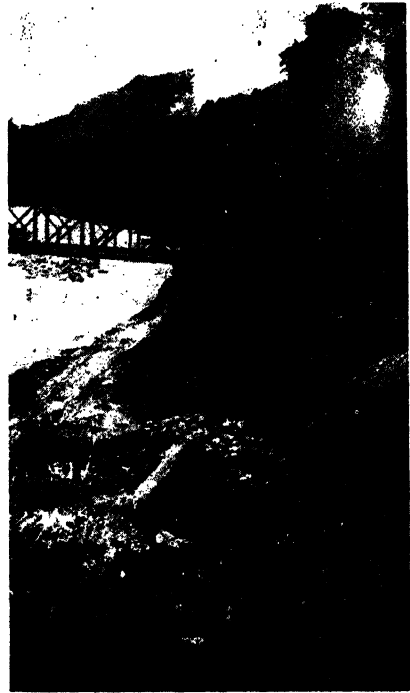
সিংটমের পূর্ব্বে লোহার পুল—পার্শ্বে প্রস্

বেলা প্রায় তিনটার সময় তিস্তা গ্রামে আসিয়া পৌঁছিলাম। ইংরেজ প্রতিনিধির জন্য তিস্তা নদীর পুলও খোলা রাখা হইয়াছিল। তবে এখানে আসিয়া শুনিলাম যে, শ্বেতাঙ্গ প্রতিনিধি আজ আসিবেন না, কাল আসিবেন।

তিস্তায় আসিয়া পেট্রল ভরিয়া লইলাম। গ্যাংটকে মাড়োয়ারী ব্যবসায়ীদিগের নিকটে মোটরগাড়ীর প্রয়োজনীয় যাবতীয় জিনিস পাওয়া যায় বটে; কিন্তু সেখানে প্রয়োজন বোধ না হওয়াতে তিস্তা গ্রামে এক টিন পেট্রল ভরিয়া লইলাম।

তিস্তা হইতে কালিংপঙ মাত্র দশ মাইল। কালিংপঙ পূর্ব্বে কখনও দেখা হয় নাই। সুতরাং এত নিকটবর্ত্তী স্থানে আসিয়াও কালিংপঙ না দেখিয়া যাওয়া বুদ্ধিমানের কাজ বলিয়া মনে হইল না। অতএব পূর্ব্বপথে আধ মাইল আসিয়া কালিংপঙের রাস্তা ধরিলাম। উঃ—সে রাস্তা কি চড়াই; তবে রাস্তা বেশ প্রশস্ত এবং বাঁকা। যাক—নির্ব্বিঘ্নে চালাইয়া ৫টার কিছু পূর্ব্বে কালিংপঙে আসিয়া পৌঁছিলাম।

কলিকাতার ইম্প্রুভমেণ্ট ট্রাষ্টের ঘোষ সাহেবের কথানুযায়ী আমি কালিংপঙে কলিকাতার প্রবীণ সুপ্রসিদ্ধ এটর্ণির বাটীতে গিয়া দেখা করিলাম। ইনি সাহিত্যিক হিসাবে আমার পিতার সহিত পরিচিত ছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ আমি তাঁহার বাটীতে রাত্রিবাস করিতে চাই শুনিয়া একটু ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। গতিক ভাল নহে বুঝিয়া আমিও শীঘ্র তাঁহাকে ধন্যবাদ জানাইয়া পলায়নতৎপর হইলাম এবং তত্রস্থ পূর্ত্ত বিভাগের Sub Divisional Officer শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ দাসগুপ্তের বাটীতে আসিয়া আতিথ্য গ্রহণ করিলাম। নগেন্দ্রবাবু তখনও তাঁহার আপিস হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন নাই। সন্ধ্যার কিছু পরেই নগেন্দ্রবাবু প্রত্যাবর্ত্তন করিলে তাঁহার সহিত পরিচয় হইল। তিনি তৎক্ষণাৎ আমার থাকিবার যথারীতি বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন।

কালিংপঙে Municipality না থাকায় সহরের যাবতীয় কায P. W. D. দ্বারা পরিচালিত হয়। এখানে বৈদ্যুতিক আলোর অভাবে রাত্রিতে সহরের দৃশ্য তৃপ্তিকর বলিয়া মনে হইল না। এই সহরের উচ্চতা পাঁচ হাজার ফুটের কিছু কম। সুতরাং ঠাণ্ডা বেশ অনুভূত হইয়াছিল। প্রাতঃকালে হিমালয়ের দৃশ্য উপভোগ্য। প্রত্যূষে শয্যাত্যাগ করিয়া সহর দেখিবার উদ্দেশে বাহির হইলাম। সহর এখনও তেমন ভাবে তৈয়ারী হয় নাই। ক্রমেই বাঙ্গালী ধনী ব্যক্তিরা এস্থানে আসিয়া ছোট বড় বাড়ী তৈয়ারী করিতেছেন। সহরের কিছু দূরে এবং অনেক উচ্চে Kalimpong Home অবস্থিত। এই স্থানটি কালিংপঙের প্রথম আড্ডা।

সহর দেখিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিবার সময় পথে হঠাৎ একটু দুর্ঘটনা ঘটিয়া গেল। নগেন্দ্রবাবুর বাটীর পথে একটি 'হোটেল'
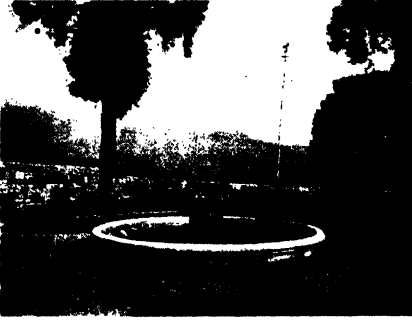
গংটকস্থিত সাধারণের ভ্রমণোদ্যান

সিংটমের উপরে এক স্থানের রাস্তা প্রশস্ত করা হইতেছে—দূরে পাহাড়ের গাত্রে চাষের জমি দ্রষ্টব্য

আছে। তাহার সম্মুখ দিয়া যাইবার সময় এক Greyhound কুকুর চীৎকার করিতে করিতে আমার পিছু লইল। কৌতূহল-বশতঃ আমার দৃষ্টি তাহার প্রতি দেওয়াতে, রাস্তার পার্শ্বস্থিত সরু নালাতে গাড়ীর সম্মুখের চাকা পড়িয়া গেল। তৎক্ষণাৎ engine বন্ধ করিয়া গাড়ীটি তুলিতে চেষ্টা করিলাম। বলা বাহুল্য, পার্শ্বে ফিরিয়া দেখি, কুকুরটি সেই অবসরে পলায়নে তৎপর হইয়াছিল। কিছুক্ষণ গাড়ী টানাটানির পর দেখি, চার জন বাঙ্গালী ভদ্রলোক সেই পথে আসিতেছেন। সাহায্য চাওয়া মাত্রই তাঁহারা গাড়ী টানিয়া তুলিলেন। গাড়ী পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম সম্মুখস্থ চাকার 'ব্রেক' ছিঁড়িয়াছে এবং এদিক-ওদিক সামান্য জখম হইয়াছে। সৌভাগ্য বশতঃ আমার শারীরিক ক্ষতি কিছু হয় নাই। ভদ্রলোকদিগকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইয়া, লজ্জায় শীঘ্র সে স্থান ত্যাগ করিলাম। এইটুকু ভাবিয়া
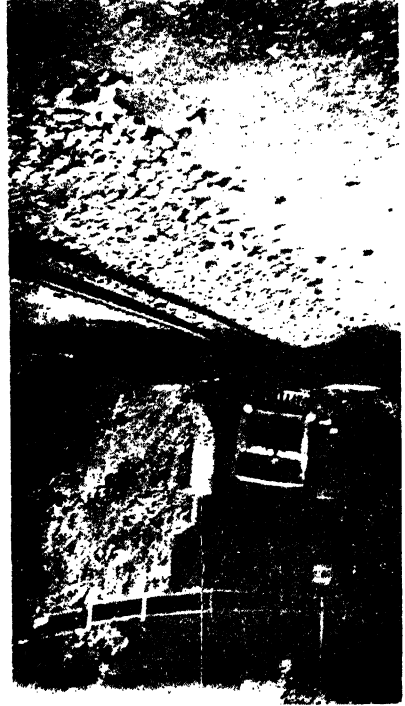
টানেলের মধ্য হইতে রেল-মোটর বাহির হইয়া আসিতেছে

তৃপ্তিবোধ করিলাম যে, এই লজ্জাকর ঘটনার সময় হাসিবার জন্য রাস্তায় কেহ ছিল না।

বেলা ন'টার মধ্যেই আহারাদি শেষ করিয়া নগেন্দ্রবাবুকে অশেষ ধন্যবাদ জানাইয়া কালিংপঙ ত্যাগ করিলাম! তিস্তায় পৌঁছাইয়া এবং তথা হইতে শিলিগুড়ির পথে প্রায় ৬ মাইল আসিয়া দক্ষিণদিকের অন্য এক সরু এবং ছোট রাস্তার উপরে উঠিতে লাগিলাম; উদ্দেশ্য—পুনরায় দার্জ্জিলিঙ যাওয়া। প্রায় দুই মাইল চড়াইয়ের পর দেখি, পশ্চাতের চাকার হাওয়া একবারে কমিয়া গিয়াছে। সুতরাং এইরূপ জনবিরল চড়াই এবং অপ্রশস্ত রাস্তায় আর উপরে উঠিবার

প্রয়াস না করিয়া ধীরে ধীরে ফিরিতে লাগিলাম। রাস্তার উপর পাথরের বড় ঢেলা রহিয়াছে, তাহা অবিরত বাঁচাইয়া চালান বিশেষ কষ্টকর। তিস্তা-শিলিগুড়ির Cart Roadএ পৌঁছিয়া মোটরগাড়ীর অপেক্ষায় প্রায় এক ঘণ্টার উপর বসিয়া রহিলাম। তার পর একটি গাড়ী নিকটবর্ত্তী হইলে চালককে দাঁড়াইবার জন্য হাত তুলিলাম। দুই সাহেব গাড়ীতে ছিলেন; তাঁহারা গাড়ী থামাইবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে আমি তাঁহাদের গাড়ীর air pump চাহিলাম। তাঁহারা তৎক্ষণাৎ তাঁহাদের চালককে আমার গাড়ীর চাকায় হাওয়া দিতে বলিলেন। তার পর আমার ভ্রমণ-বৃত্তান্ত শুনিয়া বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিলেন এবং উল্লিখিত খারাপ রাস্তা দিয়াই যাইতে উৎসাহিত করিলেন। তাঁহাদের এক জনের পরিচয় মিষ্টার কিবৃতি, অপরটি তাঁহার বন্ধু ক্যাপ্টেন কেলী। কার্য্য সমাধা হইলে তাঁহাদের ধন্যবাদ দিয়া বিদায় লইলাম।

পূর্ব্বোক্ত রাস্তার যেরূপ অবস্থা দেখিয়াছিলাম এবং গাড়ীর সম্মুখস্থ 'ব্রেক' না থাকায় যে অসুবিধা হইতেছিল, তাহা চিন্তা করিয়া পুনরায় ঐ রাস্তায় যাওয়ার জন্য ইতস্ততঃ করিতেছিলাম; কিন্তু সাহেবদ্বয়ের উৎসাহের কথা স্মরণ করিয়া ঐ পথেই যাওয়া স্থির করিলাম। আর একটি কারণ, এই পথে দার্জ্জিলিঙ পৌঁছাইতে তথা হইতে প্রায় ৩০ মাইল যাইতে হইবে; কিন্তু শিলিগুড়ি হইয়া যাইলে প্রায় ১০০ মাইল পড়িবে। সুতরাং পুনরায় ঐ পথেই উঠিতে সুরু করিলাম। এ যেন বে-পরোয়া নির্লজ্জতার ধৃষ্টতা—দুষ্টমতি ডানপিটে ছোকরার বেয়াদবী অভিযান!

সিংটম হইতে ৩ মাইল উপরে নূতন রাস্তা তৈয়ার হইতেছে—পার্শ্বে ৬০ ফুট নিম্নে সিংটম নদী

এই রিয়াঙের রাস্তায় প্রায় খাড়াই ৪ মাইল আসার পর অপেক্ষাকৃত ভাল রাস্তা পাইলাম। ইহার দু'মাইল পরে আবার খাড়াই। তার পর রাস্তা প্রায়ই চা-বাগানের ভিতর দিয়া আঁকিয়া-বাঁকিয়া ক্রমে উপরে উঠিতে আরম্ভ করিয়াছে। এই সমস্ত স্থানে রাস্তা অতিশয় অপ্রশস্ত। শুনিলাম, এই রাস্তায় Baby Austin যাতায়াত করে; হঠাৎ সম্মুখে পড়িলে পাশ কাটাইবার স্থান নাই। তিস্তার Cart Road হইতে প্রায় ১৩ মাইল আসার পর তাগ্দায় পৌঁছিলাম। এ স্থানে পূর্ব্বে গোরাদের একটি স্বাস্থ্যনিবাস ছিল। এখন বাঙ্গালীদের মধ্যে অনেকে এ স্থানে স্বাস্থ্যান্বেষণে আসিয়া থাকেন। তাগ্দা হইতে আরও প্রায় ১২ মাইল এক প্রশস্ত অথচ জনবিরল রাস্তায় চালাইয়া ঘুম বাজারের নিকট আসিয়া পৌঁছিলাম। প্রথমবারে তিস্তা যাওয়ার সময় লাডেনলা সাহেবের নির্দেশ মত এই স্থানে দক্ষিণ দিকে মোড় না লইয়া ভুলক্রমে সটান্ সোজা পথে পেশকের দিকে চলিয়া গিয়াছিলাম। তবে এই পেশকের রাস্তায় যাইতে পারিলে প্রায় ১২ মাইলের সুবিধা হয়—কিন্তু ঐ পথে যাওয়া নিষিদ্ধ। রিয়াঙের রাস্তাও মোটর-সাইকেলের পক্ষে বিপজ্জনক।
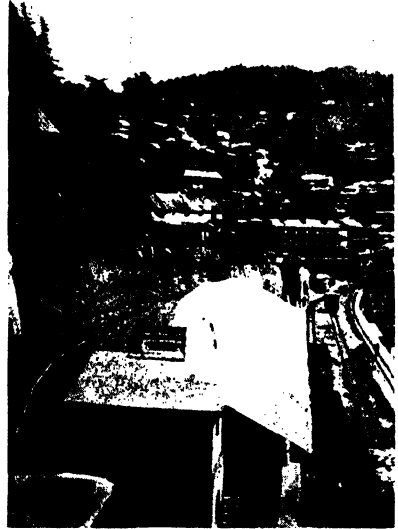
পাহাড়ের সাধারণ দৃশ্য

ঘুম পৌঁছিবার কিছু পূর্ব্ব হইতেই টিপ টিপ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছিল। যন্ত্রণাদায়ক এই অনভ্যস্ত শীতের প্রকোপে ক্ষত-বিক্ষত হইয়া ধীরে ধীরে চালাইয়া প্রায় সাড়ে তিনটার সময় পুনরায় দার্জ্জিলিঙে পৌঁছিলাম। দার্জ্জিলিঙে পুনরায় আসার কারণ শেষোক্ত তাগদা-রিয়াঙের রাস্তাটির সহিত পরিচয় রাখা।

পরদিন (৬ই নভেম্বর) কলিকাতা প্রত্যাবর্ত্তনের পালা। এদিক ওদিক করিতে করিতে দার্জ্জিলিঙ ছাড়িতে প্রায় সাড়ে চারটা বাজিয়া গেল। কার্সিয়াঙে পৌনে ছয়টায় পৌঁছিলাম। কার্সিয়াং ছাড়াইয়া কিছুদূর অগ্রসর হইবার পর হিম-কুহেলিকা-সমাচ্ছন্ন কৃষ্ণকায়া শীতরাত্রি সম্মুখের পথে গতিরোধ করিল। তার পর

নিদারুণভাবে ভীষণ বারিপাতের সূত্রপাত হইল। সেই অবিশ্রান্ত জলধারা এবং কুয়াসাভরা অন্ধকার রাত্রিতে আশে পাশে কোথাও আশ্রয়স্থান খুঁজিয়া পাওয়ার সম্ভাবনা নাই বুঝিলাম; এবং এই দুর্যোগে নীচের দিকে গাড়ী চালাইয়া যাওয়া সবিশেষ বিপজ্জনক ভাবিয়া কার্সিয়াঙের দিকেই ফিরিলাম এবং সাতটার সময় তথায় আসিয়া পৌঁছিলাম। তথায় Goenka & Coতে যাইয়া তাহার মালিকের খোঁজ লইয়া জানিলাম, তিনি স্বগৃহে চলিয়া গিয়াছেন। সুতরাং সে স্থানে আশ্রয় মিলিল না। তার পর তথায় এক জন বাঙ্গালী ভদ্রলোকের সহিত সাক্ষাৎ হইল; তিনি সন্নিকটস্থ তাঁহাদের 'মেসে' লইয়া গেলেন, এবং আমার ভিজা কাপড়গুলি বদলাইবার জন্য তাঁহাদের কাপড়-জামা দিলেন। বলা বাহুল্য, সেই বৃষ্টিতে আমার সহিত যাহা কিছু ছিল, সমস্ত ভিজিয়া গিয়াছিল।

পরদিন (৭ই নভেম্বর) ভিজা কাপড়গুলি রৌদ্রে শুকাইয়া লইয়া বেলা তিনটার সময় কার্সিয়াঙ ত্যাগ করিলাম। কার্সিয়াঙ পূর্ব্বে দেখা ছিল না—ওইটুকু সময়ের মধ্যে আশে পাশের যতদূর সম্ভবপর হইল দেখিয়া লইলাম।

নামিবার সময় তিনধরিয়ার কিছু পূর্ব্বে পাঁচটি বাঙ্গালী যুবকের সহিত সাক্ষাৎ হইল; ইহারা বাইসাইকেলে কলিকাতা হইতে দার্জ্জিলিঙে আসিয়াছিলেন, এখন ফিরিতেছেন। শিলিগুড়িতে সাড়ে চারটার সময় পৌঁছিয়া দেখিলাম, North Bengal Express-এর 'গার্ড' সাহেব গাড়ী ছাড়িবার জন্য বাঁশী বাজাইতেছেন। আমি

ইলিসিয়ম পাহাড়—সংউড হোটেল

রাত্রি ন'টা পর্য্যন্ত তথায় অপেক্ষা করিয়া দার্জ্জিলিং মেলে চড়িয়া পরদিন প্রাতঃকালে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরিলাম।

শ্রীপ্রণবেশচন্দ্র সিংহ।

ঝাড়গ্রাম

বনদেশ হ'তে রাঙ্গা পথ এসে মনোদেশে দেখি রয়েছে পাতা
জলে-ধোওয়া-শাল-বনের ছবিটি বহুদিন মনে রহিবে গাঁথা!
বন-মৃগ সম চঞ্চল ভীরু সাঁওতালী নর-নারীর দলে
যে মাদল বাজে, মনের গোপনে আজিও যে তার জলসা চলে!

কাণে গোঁজা ফুল, শিরীষের দুল! কবরীতে শোভে মালতী-মালা
সবল তনুর অণুতে অণুতে শ্যামল রূপের লাবণী ঢালা!
সরল জীবন সুখী অনুখন কত সামান্যে তুষ্ট সবে—
কবে আমাদের নগর—সৌধ ধূলিসাৎ হয়ে কানন হ'বে!

সাঁঝে ও সকালে বিটপীর ডালে শ্যামা ও দোয়েল তুলিয়া তান
দিবে ডুবাইয়া সভ্যতা-জাত কৃত্রিমতার যন্ত্রগান
যতন-লালিত মালঞ্চ ঢাকি' অযতনে ফোটা বনের ফুল
বনভূমি রাঙ্গি' কবে দিবে ভাঙ্গি' বৃথাভিমানীর মনের ভুল!

কবে নগরীর গগন-চুম্বী গরবী প্রাসাদ চুমিবে ধূলি
তাহারি শ্মশানে শাল ও পিয়াল দাঁড়াবে বিশাল শীর্ষ তুলি'!
সেই সু-দিনের শুভ-লগনের আশায় আবার জন্ম ল'ব
বন-পথে-পথে মাদল বাজায়ে বন-মৃগদের সঙ্গে র'ব।

শ্রীরমেন্দু দত্ত।

বাঙ্গলা বানানের নিয়ম

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বাঙ্গলা বানানের নিয়ম প্রচারিত হইয়াছে। ভাইস্ চ্যান্সেলার মহাশয় স্বয়ং ইহার ভূমিকা লিখিয়া দিয়া বলিয়াছেন যে, বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক প্রকাশিত ও অনুমোদিত পাঠ্য পুস্তকাদিতে ভবিষ্যতে এই নিয়মাবলী-সম্মত বানান গৃহীত হইবে।

বাঙ্গলা বানানের সমস্যা অল্পবিস্তর সকল সময়েই লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। কিন্তু সম্প্রতি বিশ্ববিদ্যালয় এ বিষয়ে যে ভাব অবলম্বন করিয়াছেন, তাহাতে সমস্যা গুরুতর হইয়াছে। কারণ, কেবল যে তাঁহাদের নিজেদের প্রকাশিত পুস্তকাদিতেই এই নিয়মাবলী অনুসৃত হইবে, তাহাই নহে, পরন্তু বোধ হয় যে, তাঁহারা এই নিয়মের বানানে লিখিত না হইলে কোনও পুস্তক পাঠ্যতালিকাভুক্ত করিবেন না। তবে বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র প্রভৃতির রচনা হইতে সংগ্রহাদিতেও তাঁহারা নূতন নিয়মের বানান চালাইবেন কি না বুঝা যাইতেছে না। সম্প্রতি বঙ্গভাষা শিক্ষার বাহন বলিয়া স্বীকৃত হওয়াতে বিশ্ববিদ্যালয়ের এই বাধ্যতামূলক নীতির ফল সুদূরপ্রসারী হইবে। অতএব এই বানানসমস্যার আলোচনা এক্ষণে কাহারও অবহেলার যোগ্য নহে। আলোচনার ফলে যদি প্রস্তাবিত নিয়মাবলীতে কোন ত্রুটি দেখা যায়, তবে তাহা পরিহার করিয়া ভবিষ্যতে বহু অনর্থের নিবারণ করা সম্ভব হইবে। কারণ, ভাইস্ চ্যান্সেলার আশ্বাস দিয়াছেন যে, আবশ্যক হইলে প্রচারিত নিয়মাবলী সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত হইতে পারিবে।

আলোচনার প্রারম্ভেই প্রশ্ন উঠে, এই নিয়মাবলীর কোন প্রয়োজন আছে কি না? বিশ্ববিদ্যালয় অবশ্য এই প্রয়োজন স্বীকার করিয়া লইয়াছেন, নতুবা তাঁহারা এই কার্য্যে কালক্ষয় করিতে উদ্যত হইতেন না। কিন্তু কেহ কেহ এই প্রয়োজন অস্বীকারও করিয়াছেন। [দৃষ্টান্ত স্থলে মাসিক (জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৩, পৃঃ ৩৫৫) ও দৈনিক (১৪ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৩) বসুমতীর উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই দুই পত্রিকায় সম্পাদকীয় প্রবন্ধে বাঙ্গলা বানান পরিবর্ত্তনের নিয়মাবলী গঠনের প্রয়োজন অস্বীকৃত হইয়াছে।] অধিকন্তু আপত্তি হইয়াছে যে, হাতে কায না থাকিলে খুড়োর গঙ্গাযাত্রা করার মত এই কার্য্য অনাবশ্যক ও ক্ষতিকর। এবং যে সকল পরিবর্ত্তন প্রস্তাবিত হইয়াছে, তাহাতে বাঙ্গলা ভাষার শব্দ গঠনপদ্ধতি ও কোবিদগণের ব্যবহৃত ভাষার ভিত্তির উপর নির্ভর করা হয় নাই, পরন্তু লাইনো টাইপের মেশিনে কম্পোজ করার সুবিধার দিকে দৃষ্টি রাখা হইয়াছে। এরূপ আভাসও দেওয়া হইয়াছে যে, এই সকল কারণে এবং উপযুক্ত শক্তির অভাবে এই প্রচেষ্টা সফল হইবার সম্ভাবনা নাই। প্রস্তাবিত নিয়মাবলীর কোন কোনটি সম্বন্ধে আপত্তি দর্শানও হইয়াছে।

এই সকল অভিযোগের বিচার করিতে হইলে প্রথমেই অনুসন্ধান করিতে হয়, বানানে যে বিশৃঙ্খলতা দেখা দিয়াছে, তাহা কি প্রকারের এবং তাহার কারণ কি? যে সকল শব্দের বানানে পূর্ব্বপ্রচলিত রীতির ব্যত্যয় ঘটিয়াছে, উহাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যায় যে, কতকগুলি ইচ্ছাকৃত এবং কতকগুলি অনিচ্ছাকৃত। ইচ্ছাকৃত পরিবর্ত্তন লেখকবিশেষের স্বীকৃত কোন নীতি অনুসারে করা হইয়াছে।• পরিবর্ত্তিত বানান সাধারণতঃ সঙ্গত বিবেচিত হউক বা না হউক, এই শ্রেণীর পরিবর্ত্তন নিছক খেয়ালের অনুসরণে করা হয় নাই, পরন্তু ভাষার বিশুদ্ধি বা সরলতা সংঘটনের উদ্দেশ্যে কোন বিশেষ নিয়ম মতে করা হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের গৃহীত 'বাংলা' 'আঙিনা' 'বাঙালী', 'কোনো', যোগেশচন্দ্রের প্রবর্ত্তিত 'কার্য', 'বর্ত্তমান', 'নির্মি́ত,, 'পূর্́', 'কর্́', সর্́', সুনীতিকুমারের 'নোতুন' প্রভৃতি বানান ইহার দৃষ্টান্ত।

আর এক শ্রেণীর বানানে প্রচলিত বানানের যে পরিবর্ত্তন দেখা যায়, তাহা লেখকের স্বেচ্ছাকৃত নহে। কোন নীতি অনুসারে না হইয়া লেখকের প্রায় অজ্ঞাতসারে, কখনও কেবল অনবধানতাবশতঃ কখনও বা অজ্ঞতাবশতঃ এই সকল পরিবর্ত্তন ঘটে। এখনও খ্যাতি লাভ করেন নাই অথবা খুব বেশী পরিমাণে লিখেন না, এরূপ লেখকের একই প্রবন্ধমধ্যে যখন 'উল্টো' ও 'উল্টা,' 'দেখলুম' ও 'বেরুলাম', 'নীচে নামে না' ও 'নাবিয়েছে' দেখিতে পাওয়া যায়, 'ধানভাঙতে' দেখা যায়, তখন বানানের পরিবর্ত্তন অনিচ্ছাকৃত বলিয়া বোধ হয়। 'হুদগুল', 'আমাদের সংস্পর্শে আসলে', 'কোলকাতা' প্রভৃতি বানান একই প্রবন্ধেই থাকাতে পরিবর্ত্তনগুলি কতকাংশে অজ্ঞতাপ্রসূত বলিয়া বোধ হয়। উপরে যাহা বলা হইল, তাহার অর্থ এরূপ নহে যে উল্লিখিতরূপে বানানের যে পরিবর্ত্তন দেখা যায়, তাহাব সকলগুলিই খ্যাতনামা লেখকগণের বেলায় ইচ্ছাকৃত ও কোন নীতিঘটিত এবং অখ্যাত লেখকগণের বেলায় অনিচ্ছাকৃত ও অজ্ঞতাপ্রসূত। বস্তুতঃ খ্যাতনামা লেখকদের রচনাতেও এমন অনেক পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করা যায় যে, অজ্ঞতাপ্রসূত না হইলেও তাহা যে অনবধানতার ফল, সে বিষয়ে বিশেষ সন্দেহের অবসর নাই। অতি প্রসিদ্ধ লেখকেরলেখায়ও একই প্রবন্ধে 'ঠিক-মতো', 'এখনো', ' তা হোলে', 'পূরো মাত্রা', 'ক্রমশ', 'স্বতই', 'ইস্কুল' আছে; আবার 'কার্য্য' 'বর্জ্জন'ও আছে। 'ভাঙন' আছে, কিন্তু 'সর্ব্বাঙ্গীন'ও আছে। 'গেছে' আছে, আবার 'গিয়েছিল', 'পৌছিয়ে দিয়েছিল'ও আছে। 'জানতেম'ও আছে, আবার 'পড়েছিলুম'ও আছে। আর একটি প্রবন্ধে 'বললেম'—'দেখলুম' দুইই আছে। 'ভালোবেসেচি', 'রেখেচে', 'ভুলিয়েচে'ও আছে, আবার 'ধরেছে', 'গেছে', 'পাচ্ছে'ও আছে এবং 'হচ্চে'ও আছে আর 'হয়েছে'ও আছে। যে প্রবন্ধে 'চললেম', দেখলুম' দুইই আছে, সেই প্রবন্ধেই 'বুড়ো', 'কোনো', 'হোক', 'চরানো', 'পাথরগুলো' 'কেমনতরো', এমন কি 'বড়ো'ও আছে; আবার 'উর্দ্ধ' 'ধৈর্য্য', 'সর্ব্বত্র', 'সৌন্দর্য্য', এমন কি 'কর্দ্দমাক্ত' পর্য্যন্ত আছে। 'স্বভাবত' 'সাধারণত' আছে, কিন্তু 'মূলতঃ'ও আছে। 'রেখেছে'ও আছে, আবার 'ধরেছে' 'পাচ্ছে'ও আছে; 'হচ্চেও' আছে, 'হয়েছে'ও আছে। অপর এক অতি বিশিষ্ট লেকেকর প্রবন্ধেও এইরূপ ক্রিয়াপদের বানানে অনৈক্য দৃষ্ট হয়। যথা—'এসেছেন' 'করেচেন'

'ভাসাচ্ছেন' 'করছেন' 'কাঁদচেন' 'হয়েচে' 'দেখেছিলুম' 'বলেছিলুম' 'গেচি' 'পেয়েচি'। এই প্রবন্ধেই 'পূর্ব্ব' 'অন্ততঃ' 'হয়ত'ও আছে; আবার 'হোক'ও আছে। এক জন সাবধানী বিশিষ্ট লেখকের একই রচনায় 'হচ্ছে', 'পুঁথি' 'সোণা' দেখা যায়। আবার 'কর্ম্ম' 'বর্ত্তমান', 'বাঙ্গালী, 'বাঙ্গলা' 'আন্তর্জ্জাতিক' দেখা যায়, কিন্তু 'অন্তর্বাণিজ্য'ও দেখা যায়। আর এক জনের প্রবন্ধে 'বাংলা' 'কলকেতা' 'পেলুম' 'ভালো' 'কুলো' 'আরো' 'আজো' এবং 'কেনো' (ক্রিয়াবিশেষণ) দেখা যায়। কিন্তু ইনি 'বেরুচ্চে' না লিখে 'বেরুচ্ছে' লিখেন; 'সর্ব্ব' 'ধর্ম্ম' এবং 'কথাগুলি' লিখেন; এবং 'তা হলে' ও 'তাহোলে' দুইই লিখেন। অপর এক জন সাবধানী লেখকের একই প্রবন্ধে 'বাংলা' ও 'বাঙলা' দুইই আছে। এই প্রবন্ধে তিনি 'রঙ' 'পুরো' 'তেমনি' 'কখনো' 'কান' 'স্রোত' 'ফোটানো' 'পড়ো' (ক্রিয়া) লিখিয়াছেন; কিন্তু কোনো না লিখিয়া কোন, আজো না লিখিয়া আজও, ভালো না লিখিয়া ভাল, বন্ধার মতো না লিখিয়া বন্যার মত' লিখিয়াছেন। করতুম লিখিয়াছেন বটে, কিন্তু হচ্চে লিখেন নাই, হচ্ছে লিখিয়াছেন এবং গেচে না লিখিয়া 'গিয়েছে', কলকেতা না লিখিয়া সোজা কলিকাতা লিখিয়াছেন, এবং ধর্ম্ম, বিশেষতঃ, সম্ভবতঃ লিখিতে ভয় পান নাই। অপর এক জন প্রসিদ্ধ লেখক তাঁহার প্রবন্ধে 'বাংলা','বাঙলা', কিন্তু 'তেলেঙ্গা' লিখেন। 'সোনা', 'কেরাণী', 'গবর্ণর' কিন্তু 'মডার্ণ' লিখেন। 'ক্রমশ', 'সাধারণত', 'আপাতত' লিখেন বটে, কিন্তু 'এবম্বিধ', 'সম্প্রতি'ই লিখেন। 'দুর্বাক্য' লিখেন, কিন্তু 'পূর্ব্ব', 'ধর্ম্ম', 'বর্ত্তমান', 'সর্ব্বত্র' ও 'নিশ্চিতই' লিখেন, ট্রষ্টী লিখেন, কিন্তু পুঁজী, মাটী, ইংরেজী এমন কি 'ষ্টেশন'ও লিখেন। 'মিউজিয়ামের মত' লিখেন, 'সেগুলি', 'একচেটিয়া,' 'ভালবাসিতেন' লিখেন এবং ক্রিয়াপদে কোনরূপ বৈচিত্র্য না ঘটাইয়া 'গিয়াছেন', 'করিলাম'ই লিখেন। এক জন পণ্ডিত ও বিখ্যাত লেখক 'লিখিতেছি', 'বুঝিতে হইবে', প্রভৃতি ক্রিয়াপদ ব্যবহার করেন এবং 'রাণী', 'জ্যোতির্বী', 'নূতন' লিখেন, কিন্তু স্বকীয় স্পষ্ট বিবৃত নীতি অনুসারে 'বর্তমান', 'নির্মিত', 'পূর্ব', 'কার্য', 'সর্বস্বান্ত' লিখেন। সুপ্রতিষ্ঠিতা লেখিকার রচনায় 'হইতেছে' 'ভালবাসিতাম' প্রভৃতি ক্রিয়াপদ দেখি, বিশেষতঃ, 'কর্ম্ম' এবং 'বাঙ্গলা' ও 'বাঙ্গালী'ও দেখি; কিন্তু 'তারাগো', 'বস্তুটাতো'ও দেখি। এই সকল লেখক-লেখিকা সকলেরই খ্যাতি আছে এবং বয়স পঞ্চাশ বৎসর পার হইয়াছে। ইঁহাদের অপেক্ষা অল্প বয়সের কিন্তু বেশ নাম করা লেখক-লেখিকা-দের গল্প-উপন্যাসাদিতে বানানের দিকে দৃষ্টি করিলে দেখিতে পাই, এক জন লিখিয়াছেন 'রং', 'ভাঙা', 'কালো', 'দুটো', 'বসানো', 'খোড়ো', 'হাটুরে': কিন্তু 'গেরুয়া', 'কুমড়া', 'চূড়াগুলি', খাট (হ্রস্বার্থে)। ইঁহার ঐ একই লেখাটিতে সত্ব, ইতস্তত, খোঁপা আছে বটে, কিন্তু শাড়ী, পূর্ব্ব, অর্জ্জন, কর্ত্তব্যই আছে; ক্রিয়াপদে গেল, করিয়াছিল প্রভৃতিই আছে। গল্প-উপন্যাসাদিতে অনেকে প্রায়ই কথাবার্ত্তার কালে মৌখিক ভাষার প্রয়োগ করিয়াছেন। তাহাতে বানানের বেলায় একজনের লেখায় 'বাঙালী', 'ক্রমশ','কান', 'ট্রেন' দেখিতে পাওয়া গেলেও 'উচ্চ', 'ধর্ম্ম'ই দেখা যায়। 'দুর্ব্বোধ্য'ও আছে, 'দুর্ব্বিপাক'ও আছে; 'শহর' আছে, কিন্তু 'ষ্টেশন', 'ষ্টুডেণ্ট' ও 'এ্যাপোপ্লেক্সি' আছে। আবার 'খাট'র স্থানে 'খাটো' আছে। 'সুচ', 'সুতা' আছে। এই লেখাটিতে কথাবার্ত্তার ক্রিয়াপদে বৈচিত্র্য দেখা যায়। 'বললাম', 'দেখলাম' আছে; 'গেছে', 'হচ্ছে', 'করেছি' আছে! 'ছেলে ছুটল'...'ঘুড়িখানা ধরলে', 'ঝুকল', 'পড়ল', ইত্যাদি আছে। এই শ্রেণীর এক জন বয়সে প্রবীণ লেখকের গল্পে কেবল কথাবার্ত্তায় নহে, সর্ব্বত্রই 'বাঙলা', 'রঙিন', 'বাড়ি', 'ক্রমশ', 'অন্তত' 'আপাতত', 'বাঁধাছাঁদাগুলো', 'কোনো', 'মতো', 'কী শোচনীয়', 'জানা নেই', 'আটকানো,' 'কোমোনা,' 'এসনা', 'ধারালো', 'বউ', এ সমস্তই আছে, কিন্তু 'পূর্ব্ব', 'ধর্ম্ম', 'সর্ত্ত', 'বারম্বার', 'গিয়েছে', 'পারছে', 'হ'লনা'ও আছে, 'গাড়িও' আছে, 'গাড়ীও' আছে। এই রচনাটিতে পূর্ব্বোক্ত ক্রিয়া-পদের 'ছুটল', 'ধরলে'র গোলমাল অতি প্রচুর। যথা—'দাঁড়িয়ে উঠল,......পা মুড়ে বসল......ভাব ব্যক্ত করলে......চুরুটটা ফেলে দিলে......হেসে উঠল, বললে... হাসি দেখা দিলে......চুপ করে রইল,......বললে। উচ্ছ্বসিত হ'য়ে রোদন করলে......স্তব্ধ হয়ে বসল। রোদন করতে লাগল।...তন্দ্রা......অচেতন করে দিলে।' এইরূপ গোলমালের প্রাচুর্য্য এক জন অতি প্রসিদ্ধ গ্রন্থকারের লেখাতেও রহিয়াছে। তাঁহার লেখায় দেখিতেছি—'উঠে বসলো......গম্ভীর মুখে বললে,......হাসলে, বললে, চেয়ে রইলো, বলতে লাগলো; চুপ করে রইলো, কথা কইলো না, বলতে লাগলো......সায় দিয়ে বললে।' এই বানানগুলি যে সকল প্রবন্ধ ও গল্প হইতে লওয়া হইয়াছে, তাহার সকলগুলিরই প্রকাশকাল এক বৎসরের মধ্যে।

উপরি-উক্ত বানানগুলির প্রকৃতি পর্য্যালোচনা করিলে বুঝা যাইবে কি কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ বানানের নিয়ম প্রবর্ত্তন অত্যাবশ্যক মনে করেন, অথচ উল্লিখিত আপত্তিকারিগণ উহা অনাবশ্যক মনে করেন। লেখকের অনবধানতা অথবা অজ্ঞতাপ্রসূত যে সকল বানান দেখা গিয়াছে, সেগুলির কথা ধরিলে প্রায় নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, এই সকল বানান সম্বন্ধে কোন নিয়মের প্রয়োজন নাই। লোকের অজ্ঞতার ফল অনুসরণ করা বুদ্ধিমানের কার্য্য নহে।

অবশ্য দেখা যায় যে, কোন কোন সময় অজ্ঞতার ফলও ভাষায় চলিত হইয়া গিয়াছে, কিন্তু এরূপ দৃষ্টান্তের সংখ্যা কম। ইহা নিয়মের ব্যতিক্রম বলিয়া গণ্য এবং এই অনুসারে অনুরূপ বানানের কোন নিয়ম নির্দ্ধারিত হইতে পারে না। যে সকল লেখকের পাণ্ডিত্য আছে, অথবা যাঁহাদের রচনা সাহিত্যে বিখ্যাত বা সংখ্যায় প্রচুর, তাঁহাদের বানানের বিশৃঙ্খলা অজ্ঞতাপ্রসূত নহে বটে, কিন্তু অনেক স্থলে অনবধানতাপ্রযুক্ত, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। এগুলি সম্বন্ধেও কোন নিয়মের আবশ্যকতা স্বীকার না করিলেও চলে, অধিকাংশ স্থলে এগুলি দেখাইয়া দিলেই সংশোধিত হয়। কিন্তু যে গুলির বেলা তাহার পরিবর্ত্তে কোন নীতির দোহাইতে উহাদের সমর্থন করা হয়, সেগুলি এবং আরও যে সকল বানানের পরিবর্ত্তন ঐরূপ নীতিমূলে ইচ্ছাপূর্ব্বক করা হয়, সেগুলির জন্য নিয়ম প্রণয়নের আবশ্যকতা স্বীকার না করিলে চলে না। রবীন্দ্রনাথ, যোগেশচন্দ্র, প্রমথনাথ ও সুনীতিকুমার কর্ত্তৃক বানানের এরূপ পরিবর্ত্তনের প্রস্তাব সুবিদিত।

এই আলোচনায় দেখা যাইতেছে, যে সকল বানানে বিশৃঙ্খলা আছে, উহাদের কতকগুলি সম্বন্ধে নিয়ম প্রণয়ন অনাবশ্যক; এবং কতকগুলি সম্বন্ধে আবশ্যক। অতএব বিশ্ববিদ্যালয় যদি নিয়ম প্রণয়নের ক্ষেত্র শেষোক্ত বানানগুলিতে সীমাবদ্ধ করিয়া থাকেন, তবে

আপত্তির কারণ নাই; কিন্তু যদি তাহা না করিয়া বানানের সকল রকম বিশৃঙ্খলা সম্বন্ধে নিয়ম রচনায় অগ্রসর হইয়া থাকেন, তবে তাহা অনেকাংশে অনর্থক বলিতে হইবে। কাজেই দেখা দরকার, বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ম প্রণয়নের ক্ষেত্র কতদূর বিস্তৃত।

এক্ষণে বিষয়টি যে ভাবে প্রচারিত হইতেছে, তাহাতে ধারণা হইতে পারে যে, বিশ্ববিদ্যালয় কেবল কতকগুলি শব্দের বানান নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিতে চাহেন। এই ধারণা ঠিক নহে। কিন্তু ইহা ঠিক বলিয়া ধরিয়া লওয়াতে বিতণ্ডার সৃষ্টি হইয়াছে। বস্তুতঃ ভাষার প্রকৃতি ও ব্যাকরণের দিকে দৃষ্টি না দিয়া কেবল শব্দের বানান নির্দ্ধারিত হইতে পারে না। বিশ্ববিদ্যালয়ও কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবার কালে ইহা স্বীকার করিয়া লইয়াছেন, কিন্তু শেষকালে কার্য্যতঃ অস্বীকার করিয়াছেন বলিয়া বোধ হয়। ইহার ফলেই আপত্তি উঠিয়াছে। বিশিষ্ট লেখকগণের অভিমত সংগ্রহ করণার্থ বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় পরিভাষা সমিতির সম্পাদক প্রথমে যে পুস্তিকা প্রচার করেন, তাহাতে লিখিয়াছেন, "আধুনিক বাঙলা সাহিত্যের ভাষায় দুই রীতি চলিতেছে—সাধু ও চলিত। বহুকাল বহু প্রচারের ফলে সাধুভাষায় প্রযুক্ত শব্দসমূহের বানান প্রায় সুনির্দ্দিষ্ট হইয়া গিয়াছে, কিন্তু চলিতভাষায় তাহা হয় নাই, বিভিন্ন লেখক বিভিন্ন রীতিতে বানান করেন। বিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তকে চলিত ভাষা স্থান পাইয়াছে। পরীক্ষার্থী প্রশ্নপত্রের উত্তরে চলিত ভাষায় লিখিতে পারে, এমন অনুমতিও কলিকাতা ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দিয়াছেন। বাঙলা শব্দের, বিশেষতঃ চলিত ভাষায় প্রযুক্ত শব্দের বানানপদ্ধতি নিরূপণ করা অত্যাবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে।"

দেখা যাইতেছে, সমস্যার বিচারের আদিতেই ভাষার 'সাধু' ও 'চলিত' দুই প্রকার রীতি স্বীকৃত হইয়াছে। আলোচনা ব্যপদেশে আরও একটি 'কথিত' রীতি স্বীকৃত হইয়াছে। কারণ, 'বানান যথাসম্ভব উচ্চারণসূচক হওয়া বাঞ্ছনীয়', 'পদের অন্তস্থিত ম্‌ স্থানে সর্ব্বত্র ং দিলে উচ্চারণে বাধিতে পারে', 'যদি ভুল উচ্চারণের সম্ভাবনা থাকে, তবে হস্‌ চিহ্ন বিধেয়'—কেবল যে এই সকলই স্বীকৃত হইয়াছে, তাহা নহে, পরন্তু বহুতর বানান * এবং বিশেষ করিয়া ক্রিয়াপদের বানান নিরূপণে 'কথিত' রীতির ভিত্তিতেই নিয়মের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এই শেষোক্ত প্রকরণের প্রারম্ভেই তাঁহারা লিখিয়াছেন, "সাধু ক্রিয়াপদের লাম বিভক্তিস্থানে চলিত ক্রিয়াপদেও লাম বিধেয়। কারণ, ইহা বহু অঞ্চলের মৌখিকরূপে প্রচলিত এবং সাধুরূপেরও অনুযায়ী।" অতএব তাঁহারা এ স্থলে স্পষ্টতঃই সাধু, চলিত ও মৌখিক বা কথিত ত্রিবিধ রীতিই স্বীকার করিতেছেন। ফলতঃ সমিতি বাঙ্গলা ভাষায় এই ত্রিবিধ রীতি স্বীকার করিয়া বলিতেছেন যে, তাঁহারা ইহার মধ্যে কেবল চলিত রূপের কতকগুলি শব্দের বানান নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিতেছেন। কিন্তু দেখা যাইতেছে যে, তাঁহারা যে সকল বানানের নিয়ম করিয়াছেন, তাহা কেবল চলিত ভাষায় নিবদ্ধ নহে, ঐ সকল শব্দ সাধু ভাষায়ও প্রযুক্ত হয় এবং উহাদের কতকগুলির বানানে সাধুভাষায় ব্যবহৃত রূপের পরিবর্ত্তে অপর যে রূপ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহা সাধুভাষায় ব্যবহারের জন্যও হইয়াছে। কার্য্যতঃ বলা হইতেছে যে ভাষার প্রোক্ত ত্রিবিধ রীতি-নির্ব্বিশেষে বাঙ্গলা ভাষায় সর্ব্বত্রই সমিতির নির্দ্দিষ্ট বানান ব্যবহৃত হইবে। অতএব দেখা যাইতেছে যে, 'চলিত ভাষায়' কতকগুলি শব্দসম্বন্ধে বানানের নিয়ম করিবেন, এই কথা বলিয়া নিয়ম করিয়া সেই নিয়মগুলি, সাধারণতঃ যাহাকে সাধুভাষা বলা হয়, সেই ভাষাতেও বিস্তৃত করা হইতেছে। বিশ্ববিদ্যালয়-প্রকাশিত বাংলা বানানের নিয়ম-পুস্তিকাতে ভাইস্‌চ্যান্সেলার মহোদয়ের ভূমিকাতে যে ভাবের কথা দেখা যায়, তাহাতে এরূপ সিদ্ধান্ত করা অন্যায় হইবে না। ইহাতে উক্ত হইয়াছে, "কিছুকাল পূর্ব্বে রবীন্দ্রনাথ চলিত বাংলা ভাষার বানানের রীতি নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিবার জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে অনুরোধ করেন। গত নবেম্বর মাসে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বানানের নিয়ম সংকলনের জন্য একটি সমিতি গঠিত করেন। সমিতিকে ভার দেওয়া হয় যে, সকল বানানের মধ্যে ঐক্য নাই, সে সকল যথাসম্ভব নির্দ্দিষ্ট করা এবং যদি বাধা না থাকে তবে কোন কোন স্থলে প্রচলিত বানান সংস্কার করা। * * * * * বিভিন্ন পক্ষের যুক্তিবিচারের পর সদস্যগণের মধ্যে যতটা মতৈক্য ঘটিয়াছে, তদনুসারেই বানানের প্রত্যেক বিধি রচিত হইয়াছে। * * * * কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক প্রকাশিত ও অনুমোদিত পাঠ্যপুস্তকাদিতে ভবিষ্যতে এই নিয়মাবলীসম্মত বানান গৃহীত হইবে।" তাহা হইলে এই নব-নির্দ্ধারিত বানান-রীতি যে সাধারণ সাহিত্যে সাধু ভাষার জন্য প্রস্তাবিত নহে, তাহা বলা হয় নাই। বস্তুতঃ ইতোমধ্যেই নানা স্থানে অনুরোধ করা হইতেছে যে, সকলে যেন রচনাতে এই প্রস্তাবিত রীতিতে বানান করেন। কোন কোন পত্রিকা-সম্পাদক এই কল্পনা করিয়া আনন্দিত হইয়াছেন যে, তদ্ভব, তৎসম, দেশজ ও বিদেশী শব্দ সমূহ বাংলাতে একটি নির্দ্দিষ্ট বানানে লেখা হইবে এবং "বাংলা শব্দের একটা বিশেষ রূপ আমরা সর্ব্বত্রই দেখিতে পাইব।" নব বানান-পদ্ধতিতে সম্পাদকীয় প্রবন্ধও রচিত হইয়াছে।* অতএব ফলতঃ নূতন বানান সাহিত্যে সর্ব্বত্র প্রচলিত হইবে ইহারই ব্যবস্থা হইয়াছে। কারণ, বর্ত্তমানে যখন বাঙ্গলা ভাষায় এম,এ পর্য্যন্ত পড়াইবার ব্যবস্থা আছে, তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তকাদির ভাষা সাধারণ সাহিত্যপদবাচ্য হইবে, ইহাতে সন্দেহ নাই! আমাদের মনে হয়, সমিতির উদ্দেশ্য ও কার্য্যের ফলের মধ্যে এই অসঙ্গতি রহিয়াছে এবং ইহা বহুজনগ্রাহ্য হইতে পারে না।

সমিতির কার্য্যফলে উদ্ভূত বানানের নিয়মাবলী সাধারণ সাহিত্যের জন্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, ইহা আমরা দেখিতেছি। কিন্তু ইহাও দেখা গিয়াছে যে, সমিতি এই উদ্দেশ্যে গঠিত হয় নাই। যদি ধরা যায় যে, ইহাই তাঁহাদের উদ্দেশ্য, তাহা হইলে, যে প্রয়োজনে বানানের নিয়ম-সংকলন আবশ্যক, সমিতির কার্য্যে তাহার অতিরিক্ত কার্য্য করা হইয়াছে এবং তাহার ফলেই এই কার্য্য খুড়ার

* কুয়া, সুতা, উঠান প্রভৃতি শব্দ সম্বন্ধে ৭ পৃষ্ঠায় ১৪ নিয়ম দ্রষ্টব্য।

* কিন্তু কয়েকটি নূতন বানান না থাকিলে ইহার ভাষাকে সাধু ভাষাই বলিতে হয়। এই প্রবন্ধে 'বাংলা বানানের নিয়মের' বিরুদ্ধে পুরাতন বানানসম্মত গৃহী, পিরমুরিদী, ষ্টিভেন্সন, দুর্ব্বল প্রভৃতি আছে। আবার নূতন নিয়মসম্মত পুরাতন বানানবিরুদ্ধ 'কোন' ও আছে, এবং ক্লাস, আওয়াদেশী, অর্বাচীন, প্রসঙ্গত, মুহূর্ত্ত প্রভৃতি নূতন নিয়মের বানানও আছে।

গঙ্গাযাত্রার সহিত তুলিত হইয়াছে। কারণ, সমিতির প্রথম প্রচারিত পত্রে লেখা হইয়াছে যে, আধুনিক বাঙ্গলা সাহিত্যের ভাষায় প্রচলিত দুই রীতির মধ্যে এক রীতিতে, অর্থাৎ চলিত ভাষায় শব্দের বানান নির্দ্দিষ্ট হয় নাই, এবং এই অবস্থায় "বাঙ্গলা শব্দের বিশেষতঃ চলিত ভাষায় প্রযুক্ত শব্দের বানানপদ্ধতি নিরূপণ করা অত্যাবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে।" অতএব "বাঙলা বানানের নিয়ম সংকলনের নিমিত্ত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় একটি সমিতি নিযুক্ত করিয়াছেন।" ইহা হইতে বুঝা যাইবে যে, সমিতি যাহাকে চলিত ভাষা বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, সেই ভাষারই শব্দের বানান নিরূপণ করা সমিতির বিশেষ উদ্দেশ্য অথবা বিশেষ উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। কারণ, ইহার অতিরিক্ত কোন প্রয়োজন নাই, যেহেতু সাধু ভাষা বলিয়া বর্ণিত অপর যে ভাষারীতি প্রচলিত, তাহাতে "প্রযুক্ত শব্দ-সমূহের বানান প্রায় সুনির্দ্দিষ্ট হইয়া গিয়াছে" ইহা এই সমিতিরই উক্তি। ইহার অতিরিক্ত যাহা কিছু সংস্কার প্রস্তাবিত হইয়াছে, তাহা উদ্দেশ্যের বহির্ভূত অথবা সমিতির মতেও অনাবশ্যক। আমরাও ইতঃপূর্ব্বে দেখিয়াছি, আজকালকার ভাষায় যে সকল বানানের বিশৃঙ্খলা রহিয়াছে, তাহার মধ্যে কেবল কতকগুলির জন্যই নিয়মের প্রয়োজন স্বীকার করা যায়। হইতে পারে যে, সমিতির কার্য্যের এই অসঙ্গতি তাঁহাদের অজ্ঞাতসারে ঘটিয়াছে, অথবা তাঁহারা তাঁহাদের প্রয়োজনের উপরি উক্ত সীমার কথা বিস্মৃত হইয়াছেন। ফলতঃ তাঁহাদের কার্য্য ধৃষ্টতার নিদর্শন এবং উহা পণ্ড-শ্রম হইয়াছে বলিয়া যে সমালোচনা হইয়াছে, তাহা এই কারণে ঘটিয়াছে। কারণ, কোনও বানানের পরিবর্ত্তন যদি প্রয়োজনীয় না হয়, তবে সকলের 'মতৈক্য' সত্ত্বেও উহা গ্রহণ করিবার প্রস্তাব উত্থাপিত হওয়া উচিত নহে এবং উত্থাপিত হইলেও তাহা গ্রাহ্য হইবে কি না সন্দেহ। অনাবশ্যক শ্রেণীর ত কথাই নাই, আবশ্যক শ্রেণীর বানানের পরিবর্ত্তনেও যদি বাঙ্গলা ভাষার ধাতের সঙ্গে মিল রাখা না হয়, তবে সেই পরিবর্ত্তন গৃহীত হইবে না। শব্দের বানানও ভাষাবিজ্ঞানের বহির্ভূত বিষয় নহে। উহা ভাষার স্বকীয় প্রকৃতি অনুসারে হয়। এই প্রকৃতি নির্দ্ধারণে যতই অসুবিধা থাকুক না কেন, কোন নূতন প্রস্তাব আসিলে উহার গ্রহণ বিষয়ে সকলে এই প্রকৃতির প্রভাবেই অনুপ্রাণিত হইবেন। সত্য বটে, ভাষা বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন মানব সমাজে প্রচলিত থাকে এবং ঐ কারণে মানব-সমাজের সমষ্টিবিশেষের ইচ্ছাকৃত কৃত্রিম নিয়মানুসারেও দু একটি বিষয়ে চালিত হইতে পারে। তাহা হইলেও, বর্ত্তমান বিষয়ে এরূপ ব্যবস্থা কতদূর কার্য্যকরী হইবে, তাহা বিবেচ্য। বাঙ্গলা ভাষার ব্যবহার যে মানবসমাজে প্রচলিত, তাহাতে বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়া আরও অনেক পক্ষ বিদ্যমান আছেন এবং তাঁহারা কিরূপ ভাষা ব্যবহার করিবেন, তাহাও বিবেচনার বিষয়। ঢাকাতে বিশ্ববিদ্যালয় আছে, তাঁহারাও পাঠ্যপুস্তক নির্ব্বাচন বা প্রণয়নকালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রস্তাবিত রীতি গ্রহণ না করিতে পারেন। টেক্‌স্‌ট বুক কমিটীও পুস্তকনির্ব্বাচনকালে কোন পৃথক্ বানানরীতি চাহিতে পারেন। সরকারের অনুবাদ বিভাগ হইতেও ক্রমশঃ অধিক পরিমাণে বাঙ্গলা ভাষার ব্যবহার হইতেছে। তজ্জন্যও পৃথক্ বানানরীতি গৃহীত হইতে পারে। সর্ব্বোপরি, বিশাল পণ্ডিত ও লেখক সমাজের অনেকে তাঁহাদের রচনায় এই নব-প্রস্তাবিত রীতি গ্রহণ না করিতে পারেন। যতদূর বুঝা যায়, পণ্ডিত ও লেখক সম্প্রদায়ের কেহ কেহ নূতন বানানে মত দিয়াছেন, কিন্তু তাঁহারা ছাড়া উল্লিখিত অন্য সকল পক্ষের ইহাতে মতৈক্য আছে, ইহার প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। এই সকল পক্ষ যদি প্রত্যেকে পৃথক্ বানানের রীতি প্রবর্ত্তন করেন, তবে ভাষা-শিক্ষার্থীর অতিশয় বিপদ হইবে। তাহা না হইলেও, যদি বানান সংস্কার সমিতিতে এই সকল পক্ষের লোক লওয়াও হইত, তথাপি দেশের বাঙ্গলা ভাষা-ভাষী অধিবাসীদের তুলনায় মুষ্টিমেয় কয়েক ব্যক্তির মত সাধারণের গ্রাহ্য হইতে হইলে, ঐ মত বাঙ্গলা ভাষার সাধারণ প্রকৃতির বিরুদ্ধ হইলে চলিবে না। প্রস্তাবিত বানানের নিয়মগুলির কয়েকটি আলোচনা করিয়া দেখা যাউক, পরিবর্ত্তনের প্রস্তাবে বাঙ্গলা ভাষার সাধারণ প্রকৃতি বিবেচনা করা হইয়াছে, অথবা কেবল কোন রকমে 'মতৈক্যে' আপোষের ব্যবস্থা মাত্র হইয়াছে।

বাঙ্গলা বানানের সাধারণ নিয়ম সম্বন্ধে সমিতি কতকগুলি মূল নীতি খ্যাপন করিয়াছেন। * এই সকল নীতিতে কাহারও আপত্তি হইবার কথা নাই। কিন্তু কার্য্যতঃ বানান নির্দ্দিষ্ট করিতে গিয়া সমিতি এই সকল নীতি লঙ্ঘন করিয়াছেন এবং তজ্জন্য যে ফলোৎপত্তি হইয়াছে, তাহাতে আপত্তির কারণ আছে। সাধারণ নিয়ম নির্দ্দেশ করিবার পর সমিতি বানানের বিশেষ নিয়মের আলোচনা ব্যাপারে শব্দগুলিকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করিয়াছেন। সংস্কৃত বা তৎসম, অসংস্কৃত অর্থাৎ তদ্ভব, দেশজ ও বিদেশী; এবং নবাগত ইংরেজি ও অন্যান্য বিদেশীয় শব্দ। একই বানান সম্বন্ধে কখন কখন শব্দের শ্রেণীভেদে বিভিন্ন নিয়ম করা হইয়াছে। যথা, রেফের পর ব্যঞ্জন বর্ণের দ্বিত্ব বিষয়ে নিয়ম হইয়াছে যে, সংস্কৃত বা তৎসম শব্দে, যদি শব্দের ব্যুৎপত্তির জন্য আবশ্যক হয়, তবেই দ্বিত্ব হইবে, যথা, কার্ত্তিক, নতুবা হইবে না, যথা অর্জুন, কার্য, কর্ম, সর্ব; অসংস্কৃত শব্দে দ্বিত্ব সর্ব্বত্র বর্জ্জনীয়। যথা—পর্দা, সর্দার, জার্মানি। এ স্থলে প্রথমেই বক্তব্য এই যে, ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় শব্দের জন্য ভিন্ন ভিন্ন রকমের নিয়ম করাতে সরলতার হানি হইয়াছে এবং ভবিষ্যৎ শিক্ষার্থীর পক্ষে অসুবিধার সৃষ্টি হইয়াছে। সমিতি দ্বিত্ববর্জ্জন হেতু সংস্কৃত ব্যাকরণের বিকল্প বিধানের শরণ লইয়াছেন, লেখা ও ছাপা সহজ হয় বলিয়াছেন, এবং 'হিন্দি,' 'মারাঠি' প্রভৃতি ভাষার দৃষ্টান্ত দিয়াছেন। এ স্থলে বক্তব্য এই যে, লেখা ও ছাপা সহজ হওয়ার যুক্তি বানান সম্পর্কে বিশেষ গুরুতর নহে। অপর দিকে, একেবারে বর্জ্জন করা না হইলে লেখা ও ছাপা এবং বুঝা প্রস্তাবিত নিয়মে সহজ হইবে, ইহা

* "বানান যথাসম্ভব সরল ও উচ্চারণসূচক হওয়া বাঞ্ছনীয়। কিন্তু উচ্চারণ বুঝাইবার জন্য অক্ষর বা চিহ্নের বাহুল্য এবং প্রচলিত রীতির অত্যধিক পরিবর্ত্তন উচিত নয়।...প্রচলিত শব্দের উচ্চারণ লোকে অর্থ হইতেই বুঝিয়া লয়। আমাদের ভাষায় বহু শব্দের বানানে ও উচ্চারণে মিল নাই।...এই প্রকার শব্দের বানান সংস্কার করিতে কেহই চান না, প্রদেশ ভেদে উচ্চারণের কিঞ্চিৎ ভেদ হইলেও ক্ষতি হয় না।...নবাগত বা অল্পপরিচিত বিদেশী শব্দ সম্বন্ধে...বানানের সরল নিয়ম গঠন করা কর্ত্তব্য।...সংস্কৃত শব্দের বানানে হস্তক্ষেপ অবিধেয়। কেবল বর্ত্তমান লেখক ও পাঠকগণের লাভালাভ হিসাব করিয়া বানানের নিয়ম গঠন করিলে সুবিচার হইবে না। ভবিষ্যতে যাহারা লেখাপড়া শিখিবে, তাহাদের যদি অধিকতর সুবিধা হয়, তবেই নিয়ম গঠন সার্থক হইবে।—"

স্বীকার করা যায় না। বরং এরূপ সকল রেফাক্রান্ত শব্দে দ্বিত্ব থাকিলেই নূতন শিক্ষার্থীর পক্ষে সরলতাসম্পন্ন হইবে, এ কথা বলা যায়। তারপর, হিন্দী ও মারাঠী প্রভৃতি ভাষায় কিছু থাকিলেই সে আমাদের ভাষার প্রকৃতিবিরুদ্ধ হইলেও তাহা করিতে হইবে, ইহা যুক্তিযুক্ত নহে। পক্ষান্তরে, সরলতা ও উচ্চারণের দিক দিয়া এরূপ তৎসম, তদ্ভব বা বিদেশী সকল শব্দেই দ্বিত্ব বিধান করাই উচিত বলিয়া বোধ হয়। কারণ, সংস্কৃত বা তৎসম শব্দ সম্পর্কে দ্বিত্বোচ্চারণ পক্ষেও সংস্কৃত ব্যাকরণের বিকল্প বিধান পাওয়া যায়। অধিকন্তু তৎসম বা তদ্ভব বা বিদেশী নির্ব্বিশেষে এই সকল শব্দে বাঙ্গালীর পক্ষে দ্বিত্বোচ্চারণই স্বাভাবিক। হিন্দীতে 'অর্জুন' লিখা স্বাভাবিক বটে, যেহেতু হিন্দুস্থানীরা 'অর্জ নই' উচ্চারণ করে। কিন্তু আমরা স্পষ্ট 'অর্জ্জুন' উচ্চারণ করি। হিন্দুস্থানীরা 'ধরম' 'করম' উচ্চারণ করে, আমরা 'ধর্ম্ম', 'কর্ম্ম', বা 'ধম্মো', 'কম্মো', উচ্চারণ করি। সাধু ভাষায়, ভদ্র সমাজে 'কর্ত্তা' উচ্চারিত হয়। অল্পশিক্ষিতের মধ্যে (অন্ততঃ পূর্ব্ববঙ্গে) 'কর্তা' উচ্চারণ দেখা যায় বটে, কিন্তু ভদ্র শিক্ষিত শ্রেণীর মুখে উচ্চারণ 'কর্ত্তা।' অতএব দ্বিত্বোচ্চারণ বাঙ্গালীর পক্ষে একটি প্রকৃত ব্যাপার। সর্ব্বোপরি, বিশেষ নীতির পরীক্ষা ব্যপদেশে ছাড়া, আমাদের সুপ্রসিদ্ধ লেখকগণের ব্যবহার দৃষ্টে আমাদেরও অর্জ্জুন, কার্য্য, সর্ব্ব, কর্ম্ম, পর্দ্দা, সর্দ্দার, জার্ম্মাণী প্রভৃতি শব্দে রেফের পরে ব্যঞ্জনবর্ণের দ্বিত্ব বানানই সুপ্রচলিত, অতএব সমিতির নিজেদের ব্যাখ্যাত সাধারণ নিয়মমতেই, বানান যথাসম্ভব সরল ও উচ্চারণসূচক করিতে হইলে, সুপ্রচলিত বানান বজায় রাখিতে হইলে, এবং ভবিষ্যৎ পাঠার্থীদের অধিকতর সুবিধা দেখিতে হইলে, রেফযুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণের বানান বাঙ্গলা ভাষায় দ্বিত্বই বিধেয়। এই সকল কারণে আমরা দ্বিত্বরহিত করার বিকল্প বিধানও বাঙ্গলা ভাষার পক্ষে অস্বাভাবিক মনে করি। কেবল বাহ্য দৃষ্টিতে ছাড়া ইহাতে কোন বিষয়ই সরল বা সহজও হইবে না।

বিসর্গান্ত পদ সম্বন্ধে সমিতির নিয়ম—"বাংলায় বিসর্গান্ত সংস্কৃত পদের শেষের বিসর্গ বর্জ্জিত হইবে, যথা—আয়ু, বক্ষ, মন, ইতস্তত, সদ্য ইত্যাদি; কিন্তু শব্দের মধ্যে বিসর্গসন্ধি যথানিয়মে হইবে, যথা—আয়ুষ্কাল, মনোযোগ, সদ্যোজাত।" যেরূপ শব্দগুলি সম্বন্ধে সমিতি শেষের বিসর্গ বাদ দিতে বলেন, উহারা দুই শ্রেণীর শব্দ। সে সম্বন্ধে সমিতি বলিতেছেন যে, 'আয়ুঃ, চক্ষুঃ, মনঃ প্রভৃতি সংস্কৃত পদ বাংলায় প্রায়শ বিসর্গ না দিয়া লেখা হয়, কিন্তু অব্যয় শব্দে কেহ বিসর্গ দেন, কেহ দেন না, যথা বিশেষতঃ, বিশেষত। সর্ব্বত্র একই নিয়ম বাঞ্ছনীয়।' অতএব সমিতি বলেন যে, এই রকম সকল শব্দেই বিসর্গ বাদ দিতে হইবে। এ স্থলে বক্তব্য এই যে, গত যে কয়েক বৎসরে বানান সম্বন্ধে ঘোরতর স্বেচ্ছাচার চলিতেছে, তাহার পূর্ব্বের কথা ধরিলে দেখা যাইবে যে, আয়ু, বক্ষ, মন প্রভৃতি শব্দের অবশ্য লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখকগণও প্রায় বিসর্গ দেন না; কিন্তু ইতস্ততঃ, সদ্যঃ প্রভৃতি অব্যয়গুলি মূল সংস্কৃত শব্দ এবং হুবহু সংস্কৃতের আকারেই বাঙ্গলায় গৃহীত হইয়াছে এবং এতাবৎ চলিয়া আসিতেছে। সমিতিও সন্ধির স্থলে বিসর্গ মানিয়া লইতে বলেন। এরূপ অবস্থায়, আয়ু, বক্ষ, মন প্রভৃতির মত অব্যয় শব্দেও বিসর্গ বাদের জন্য না করিয়া, সন্ধিস্থলের মত বিসর্গ মানার জন্যই 'সর্ব্বত্র একই নিয়ম গ্রহণীয়', এই নীতির প্রয়োগ করা বাঞ্ছনীয় মনে হয়। এরূপ করিলে, 'সংস্কৃত শব্দের বানানে হস্তক্ষেপ করা অবিধেয়' সমিতির গৃহীত এই সাধারণ নিয়মও ক্ষুণ্ণ হয় না। তস্ প্রত্যয়ান্ত করিয়া সংস্কৃত হইতে যত অব্যয় লওয়া হইবে, উহাদের সকলের বেলায়ই এরূপ করিলে ভবিষ্যতে পাঠার্থীরও সুবিধাই হইবে। অতএব আমাদের মতে এই অব্যয় শব্দগুলিতে বিসর্গ রাখাই বিধেয়।

শব্দের অন্তঃস্থ ঈ, ঊ সম্বন্ধে সমিতির মত এই যে, 'যদি মূল সংস্কৃত শব্দে ঈ বা ঊ থাকে, তবে তদ্ভব বা তৎসদৃশ শব্দে ঈ বা ঊ অথবা বিকল্পে ই বা উ হইবে, যথা, রাণী, রাণি; ময়রাণী, ময়রাণি; শীষ, শিষ; উনিশ, উনিশ, পূব, পুব ইত্যাদি। কিন্তু তদ্ভব ও তৎসদৃশ ভিন্ন অন্য শব্দে কেবল হ্রস্ব ই বা হ্রস্ব উ হইবে, যথা, দিদি, কাকি, ঢাকি, ঢুলি, বাঙ্গালি, ইংরাজি, হিন্দি, রেশমি, ওকালতি ইত্যাদি। প্রথমোক্ত শ্রেণীতে বিকল্প বিধানের জন্য সমিতির যুক্তি এই যে, বহু লেখক মূলানুসারে দীর্ঘস্বর রাখিতে চান; অনেকে সর্ব্বত্রই হ্রস্ব লেখা উচিত মনে করেন। অন্য শ্রেণীর শব্দগুলি সম্বন্ধে যুক্তি এই যে, এ স্থলে হ্রস্ব-দীর্ঘ ভেদের হেতু দেখা যায় না, কেবল ই উ লিখিলে বানান সরল হইবে। এই নিয়মগুলি সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে, প্রথম শ্রেণীর শব্দে বিকল্পে হ্রস্ব বিধানের কোন হেতু নাই, পরন্তু দীর্ঘবিধানই মূলানুগত। যদি নবাগত বিদেশী শব্দে মূলানুগত দীর্ঘবানান বিহিত হয়, তবে সংস্কৃত শব্দে তাহার ব্যত্যয় ঘটান কেন হইবে? অধিকন্তু 'সংস্কৃত শব্দের বানানে হস্তক্ষেপ অবিধেয়' সমিতির গৃহীত এই নীতি অনুসারেও তৎসদৃশ শব্দে দীর্ঘ স্বর বিহিত হয়। তার পর নবাগত বিদেশী শব্দ সম্বন্ধে প্রদত্ত নিয়ম দৃষ্টে এবং 'সর্ব্বত্র একই নিয়ম গ্রহণীয়' এই নীতি অনুসারেও দীর্ঘ বিধানেই বানানে সরলতা আনিবে এবং শিক্ষার্থীর সুবিধা হইবে অথচ কোবিদগণের পদাঙ্ক অনুসরণ করা হইবে। কেবল দীর্ঘ বিধানের স্বপক্ষে এই সকল কারণ থাকা সত্ত্বেও সমিতির কথার ভাবে বোধ হয় যে কতকটা অনুগ্রহ বশতঃই বিকল্পে দীর্ঘ বানান রাখিতে দেওয়া হইতেছে। অথচ হ্রস্ব বানানের পক্ষে সমিতি এই মাত্র যুক্তি দেন যে, অনেকে সর্ব্বত্র হ্রস্ব লেখা উচিত মনে করেন। ইহাতে কতকটা এই ভাব আসে যে, বানানের শুদ্ধাশুদ্ধি সম্পূর্ণরূপে লেখকগণের ভোটের দ্বারা স্থির করিতে হয়। অথচ অন্য সম্পর্কে এই নিয়মেই সমিতি এ বিষয়ে অপরবিধ যুক্তির অধিকারও স্বীকার করিয়া বলিতেছেন যে, তৎসদৃশ বা তদ্ভব শব্দ ব্যতীত অন্য স্থলে বিকল্পেও দীর্ঘস্বর স্বীকার করিবার কোন 'হেতু' নাই এবং কেবল হ্রস্ব লিখিলে বানান সরল হইবে। অতএব, কেবল উপরি-উক্ত স্থলে নহে, বহুস্থলেই সমিতি ভোটের সংখ্যাধিক্যেই নিয়ম প্রণয়ন করিয়া থাকিলেও, তাঁহারা নিজেরাই স্বীকার করিয়া লইয়াছেন যে, বানানের পরিবর্ত্তন করিতে হইলে অপরবিধ যুক্তিরও প্রয়োজন আছে। যাহা হউক, সমিতির দ্বিতীয় শ্রেণীর শব্দে কেবল হ্রস্ব রাখার সম্বন্ধে সমিতি যাহা বলিতেছেন, তাহা সম্পূর্ণ স্বীকার করা যায় না। ঢাক কি ঢোল আছে বলিয়াই ঢাকী কি ঢুলী, বাঙ্গলা দেশের অধিবাসী বলিয়াই বাঙ্গালী, ইংরাজের ভাষা বলিয়াই ইংরাজী ইত্যাদি শব্দে এইরূপ অর্থসহিত সংস্কৃতানুযায়ী প্রত্যয়গুলির যে একটা সঙ্গতি আছে, তাহা দীর্ঘস্বর না রাখিলে নষ্ট হইয়া যাইবে। ঝি দিদি প্রভৃতি কয়েকটি শব্দের কথা ছাড়িয়া দিলে, বানানের যথেচ্ছাচারিতার আধুনিক যুগের পূর্ব্বে শ্রেষ্ঠ লেখকগণের রচনায় এই

সকল শব্দে দীর্ঘ স্বরই প্রচলিত এবং উহাই বাঙ্গলা ভাষার প্রকৃতি-গত হিসাবে সাহিত্যবিহিত হওয়া উচিত।

প্রবন্ধ দীর্ঘ হইয়া পড়িয়াছে। অতএব সমিতির প্রস্তাবিত অন্যান্য নিয়মের আলোচনা করিবার স্থান নাই। যাহা করা হইয়াছে, তাহা হইতে দেখা যায় যে, অন্তরূপে শুদ্ধাশুদ্ধি বিচার না করিয়া কতকগুলি লেখক শব্দবিশেষের যে বানান করিতে চান, কেবল তাহাই গ্রহণ করিয়া সমিতি ঐ বানান চালাইয়া দিতে চান এবং পূর্ব্বের প্রচলিত বানান দু এক স্থলে বিকল্পে রাখিয়া দিয়া অধিকাংশ স্থলেই বাতিল করিয়া দিতে চান, ইহা কিছুতেই গ্রাহ্য হইতে পারে না। সন্দেহস্থলে শুদ্ধাশুদ্ধ বিচারে বাঙ্গালা ভাষার স্বকীয় প্রকৃতির যাহা অনুকূল, তাহাই শুদ্ধ, যাহা প্রতিকূল তাহা অশুদ্ধ ধরিতে হইবে। ভাষার স্বকীয় প্রকৃতি কি, তাহার সন্ধান করিতে হইলে একথা মনে রাখিতে হইবে যে, বাঙ্গালা ভাষা মাতা-পিতৃহীনা অনাথা নহে, ইহার পূর্ব্ব-পরিচয় আছে এবং বিদ্যাসাগর হইতে বঙ্কিমের সময় পর্য্যন্ত ইহার পরিণত-রূপ সুপরিচিত। অতএব এই যুগের প্রসিদ্ধ লেখকগণের ভাষার মধ্যেই বাঙ্গলা ভাষার প্রকৃতির পরিচয় পাওয়া যাইবে। ইহার অর্থ এরূপ নহে যে, কোন বিষয়েই ঐ যুগের তুলনায় নূতন কিছুই গ্রহণ করা হইবে না। পরন্তু অর্থ এই যে, নূতন প্রস্তাবের ফলে সুপ্রচলিত পুরাতনের লোপ করা হইবে না, দৃষ্টান্তস্থলে বলা যায় যে, অন্য কোন ভাষার রীতির দোহাইতেও ‘হওয়া’, ‘এডোয়ার্ড’ প্রভৃতির পরিবর্ত্তে ‘হওআ’, ‘এডওআর্ড’ প্রভৃতির প্রচলন বাঞ্ছনীয় নহে। সমিতি এরূপ শব্দস্থলে ও অন্যান্য স্থলে হিন্দী প্রভৃতির দোহাই দিয়াছেন, ইহাতে প্রস্তাবকগণের পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাওয়া গেলেও, আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে, অনাবশ্যক স্থলে অপরের অনুকরণ করা স্থিতধী ব্যক্তির লক্ষণ নহে এবং বর্ত্তমানের বিপ্লব-যুগে বরঞ্চ স্বাজাত্যাভিমানের মত মাতৃভাষার স্বকীয়ত্ব রক্ষার দিকেই একটু বেশী ঝোঁক রাখা উচিত। নচেৎ নিজস্ব সমস্তই নষ্ট হইয়া যাইবার সম্ভাবনা আছে। অতএব তদ্ভব, দেশজ ও বিদেশী শব্দের রূপ নির্দ্ধারণে বাঙ্গলা ভাষার প্রকৃতির সঙ্গে না মিলিলে নূতন কিছুই করা সঙ্গত নহে। বানান-সংস্কার বিষয়ে সমিতির উদ্দেশ্য যাহাই হউক, কার্য্যতঃ দেখা যায় যে, অনেক নিয়মেই শব্দের ‘কথিত’ ভাষায় বানান গ্রহণ করা হইয়াছে; কিন্তু প্রয়োগের ক্ষেত্র নির্দ্দিষ্ট করা হয় নাই, অথবা সর্ব্বত্র প্রয়োগের ব্যবস্থা করা হয় নাই, এরূপ নির্দ্দেশ নাই। দৃষ্টান্তস্থলে ১৪ নিয়মের (৭ পৃষ্ঠা) উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই বিষয়ে বিশদ আলোচনা করিতে হইলে সমিতির গৃহীত সাধু, চলিত ও মৌখিক বা কথিত এই তিন প্রকার ভাষারীতির উল্লেখের ঔচিত্যানৌচিত্যের বিস্তারিত বিচার করিতে হয়। তদভাবে এস্থলে সংক্ষেপে বলা যায় যে, এই জাতীয় শব্দের এই জাতীয় বানান ভাষার ‘কথিত’ রীতির রচনার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকা উচিত। অর্থাৎ গল্প উপন্যাসাদি রচনায় যে যে স্থলে স্পষ্টতঃ কথাবার্ত্তাই চলিতেছে, সেই সেই স্থলেই ‘কুয়ো’, ‘সুতো’ প্রভৃতি শব্দরূপ অথবা উত্তমপুরুষে ‘বললুম’, এবং প্রথম পুরুষে ‘বললে’ প্রভৃতি ক্রিয়ারূপ ব্যবহার করা যাইতে পারে, অন্যত্র নহে।

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র মজুমদার।

নয়নে-নয়নে

হৃদয় আমার হারিয়েছি আজ
শিউলী ফুলের বনে।
আপন ভুলে তাই রে আমি
ব’সে আছি আনমনে।

যাহার বাঁশীর সুরটি আমার বাজে হৃদয়-তলে,
যাহার প্রেমের প্রদীপখানি হিয়ার মাঝারে জ্বলে,
পথে যেতে যেতে চেয়ে গেছে সে যে
আকুল আঁখির কোণে—
শিউলী ফুলের বনে।

তা’রি তরে আজ গাঁথিয়াছি মালা,
তা’রি তরে ব’সে রই।
প্রভাতে গিয়াছে এই পথ দিয়া,
এখনো ফিরিল কই?

বৃথা-অভিমানে ভুল বুঝে সে কি চ’লে গেছে তাই?
প্রাণের দেবতা প্রাণের কথা কি কিছু বোঝে নাই?
নয়ন আমার কহিল যে-কথা
তা’র নয়নের সনে—
শিউলী ফুলের বনে?

মুখোপাধ্যায়।

আকবরের সমাধি

৩

কাউণ্ট ভন গেয়ার ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দের ২৪শে এপ্রিল আগ্রা হইতে আকবরের সমাধিসৌধ দেখিতে গিয়াছিলেন। তিনি লিখিয়াছেন—"আজ প্রভাতে অপেক্ষাকৃত শীতল সময়ে আমরা সিকন্দ্রায় আকবরের সমাধিসৌধে গোলাব (অর্ঘ্যরূপে) প্রদান জন্য গমন করিয়াছিলাম। আকবরের রাজত্বের ও তাঁহার সৃজনী প্রতিভার অসংখ্য নিদর্শন দেখিয়া তাঁহার বিরাটত্ব, সামর্থ্য ও সম্পদ সম্বন্ধে আমাদিগের মনে শ্রদ্ধা-সংযুক্ত বিস্ময় সমুদ্ভূত হইয়াছে।" পথে অগ্রসর হইতে চারিদিকে অতীত ঐশ্বর্য্যের স্মৃতিচিহ্ন নানা ভগ্ন গৃহাদি লক্ষ্য করা যায়। আর বিহিস্তাবাদের শ্যাম শোভার মধ্যে রক্ত-প্রস্তর-খচিত প্রাচীরমধ্যে শ্বেত মর্ম্মরের স্তম্ভ (মিনার) ও গম্বুজ প্রভাতের সূর্য্যালোকে সহজেই দৃষ্টি আকৃষ্ট করে। দূর হইতে এই সৌধ যত সুন্দরই কেন বোধ হউক না, নিকটে না আসিলে ইহার স্বরূপ উপলব্ধি করা যায় না। "It is however only in clos st neighbourhood to the building that one receives a just impression of it as a whole, with its magnificent height and with its amazing wealth and gracious variety of detail. Such is the enchantment of this reality that one seems face to face with some fairy castle of ancient legend."

তখন সৌধবেষ্টন উদ্যানটি হতশ্রী। কিন্তু ফোয়ারার আধার, প্রশস্ত রাস্তা ও জলের নালা দেখিয়া দর্শকের বুঝিতে বিলম্ব হয় নাই যে, এক সময় ইহা জলে, ফলে, ফুলে, ছায়ায় ও হরিৎ শোভায় অসাধারণ সৌন্দর্য্যময় ছিল। এই স্থানে মোগল সম্রাটদিগের জলের প্রতি অনুরাগের উল্লেখ করা আমরা প্রয়োজন মনে করি। মোগলরা যে দেশ হইতে আমাদিগের এই সুজলা সুফলা মলয়জশীতলা মাতৃভূমিতে আসিয়াছিলেন, সে দেশে জলের অভাবহেতু জলের প্রতি তাঁহাদিগের অনুরাগ নানারূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। যাঁহারা শাহজাহানের দিল্লীর দুর্গ-প্রাসাদে কক্ষ হইতে কক্ষান্তরে জল-প্রবাহ-প্রবর্ত্তনকৌশল লক্ষ্য করিয়াছেন;—আলিমর্দ্দন খাঁ কিরূপভাবে দূর হইতে খালে প্রাসাদের জন্য জল আনিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, তাহা বিবেচনা করিয়াছেন, দিল্লীর রঙ্গমহলের কেন্দ্রস্থলে ফোয়ারার আধার ও স্নানাগারের ব্যবস্থা বিচার করিয়াছেন, তাঁহারাই মোগল সম্রাটদিগের সলিল-প্রীতির পরিচয় পাইয়াছেন। দিল্লীর যে ইতিহাস-প্রসিদ্ধ স্নানাগারে ইংরেজ দূত সম্রাট্ জাহাঙ্গীরের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন, তাহার জল-প্রবাহের ব্যবস্থা এইরূপ ছিল যে, প্রণালীর মধ্যে সংলগ্ন রৌপ্যপত্রের উপর জল যখন প্রবাহিত হইত, তখন ভ্রম হইত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মৎস্যকুল জলে বিচরণ করিতেছে। সেইরূপ রঙ্গমহলের জলাধারটি জলপূর্ণ হইলে মনে হইত, জলতলে পুষ্প ও পত্র শোভা পাইতেছে। তাজমহলের উদ্যানেও জলপ্রবাহের ব্যবস্থা ছিল।

ইহা কেবল স্মৃতিসৌধ—সমাধি-ভবন নহে, ইহা শিল্পকলার অসাধারণ বিকাশও বটে। ইহা দেখিলে মনে হয়, যেন আকবরের ভাবে প্রভাবিত হইতেছি—("one feels breathed upon by the rare spirit of him whose husk it shrouds") ইহার সম্বন্ধে বিশপ হীবরের উক্তি বিশেষভাবে প্রযোজ্য—ইহা দানবদিগের দ্বারা কল্পিত এবং মণিকারদিগের দ্বারা গঠিত।

এই বিরাট সৌধমধ্যে—নিম্নতলে আকবরের দেহাবশেষ জননী বসুন্ধরার অঙ্কে শেষ শয়ন লাভ করিয়াছে। দ্বারপথে প্রবেশ করিয়া নিম্নগামী পথে অগ্রসর হইয়া সমাধিকক্ষে

উপনীত হইতে হয়। তথায় বাহিরের আলো নাই—কিন্তু অন্ধকার গাঢ় নহে। বাহিরের আলোক আর কক্ষের এই অন্ধকার যেন জীবনের সহিত মৃত্যুর প্রভেদ বুঝাইয়া দিতেছে। সমাধিটিতে কোনরূপ কারুকার্য্য নাই; কেবল আবরণ-প্রস্তরে "আকবর" ক্ষোদিত লিপিতে উৎকীর্ণ। ইহার দুই অর্থও হইতে পারে—(সম্রাট্) আর "ঈশ্বর মহান্।" ইহার আরও এক অর্থ হইতে পারে—"আকবর ঈশ্বর।" ইহা আকবর-প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মের মূল কথা হইলেও জাহাঙ্গীর যে ইহা সমাধিস্থ ব্যক্তির নির্দ্দেশ ব্যতীত অন্য কোন কারণে ব্যবহার করিয়াছিলেন, তাহা মনে হয় না। এই সমাধি দেখিয়া কর্ণেল শ্লীম্যান লিখিয়াছিলেন—"সকল বিষয়—স্থান ও কাল বিবেচনা করিলে আমার মনে হয়, কবিদিগের মধ্যে যেমন সেক্সপীয়র শ্রেষ্ঠ, সম্রাট্‌দিগের মধ্যে আকবর তেমনই। পৃথিবীর নাগরিকরূপে আমি আকবরের সমাধির আবরণ মর্ম্মর-প্রস্তর-ফলককে যে শ্রদ্ধা অর্পণ করিলাম, আমার জ্ঞাত পৃথিবীর আর কোন সম্রাটের সমাধির প্রতি আমি সে শ্রদ্ধা অর্পণ করিতে পারি না।"

সমাধি-সৌধ

আকবরের সমাধির সহিত কেহ যদি তাজমহলের তুলনা করেন, তবে এই সৌধের প্রতি একান্তই অবিচার করা হইবে; কারণ, দুইটির প্রকৃতিগত বিভিন্নতা বিবেচনা না করিলে অন্যায় হইবে। সিকন্দ্রায় যিনি সমাধিস্থ, তিনি বীর—যোদ্ধা—শাসক—সম্রাট্। পিতা যখন বিপন্ন, তখন পরাশ্রয়ে তাঁহার জন্ম, আর যুদ্ধ করিয়া তাঁহাকে রাজ্যোদ্ধার ও রাজ্যের বিস্তৃতিসাধন করিতে হইয়াছিল। ফতেপুর-সিক্রীর ত্যক্ত পুরীতে তাঁহার কল্পনাবিকাশ। তাঁহাকে রাজ্যরক্ষা ও প্রজাশাসন করিতে হইয়াছিল; আবার তাহার উপর তাঁহার আকাঙ্ক্ষারও অন্ত ছিল না—ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন সংস্কৃতির অধিকারী সম্প্রদায়দ্বয়কে বন্ধুত্বের বন্ধনে বদ্ধ করিয়া আপনার সিংহাসনের ভিত্তি দৃঢ় করিবেন এবং এক নূতন সমন্বয়-ধর্ম্ম প্রবর্ত্তন করিয়া অমরত্ব লাভ করিবেন। তাঁহার জীবনের এই স্বপ্ন ইংরেজ কবি টেনিসন অনিন্দ্যসুন্দর ছন্দে বর্ণনা করিবার উপযুক্ত মনে করিয়াছিলেন। তিনি যে ভোগবিরত বা বিরক্ত ছিলেন, তাহা নহে, কিন্তু বিশেষ বিলাসাসক্ত ছিলেন না।

আর তাজমহলে যিনি সমাধিস্থা—তিনি নারী; কোমলত্বেই তাঁহার সৌন্দর্য্য, বীরত্বে নহে। তিনি বহুবল্লভ

স্বামী সম্রাটের প্রেম আকৃষ্ট করিয়া আপনাতে কেন্দ্রস্থ করিয়াছিলেন—ভালবাসাকে একনিষ্ঠ করিতে পারিয়াছিলেন। তাঁহার রূপলাবণ্যের খ্যাতি তখন পূর্ণিমার পূর্ণচন্দ্রের স্নিগ্ধ কিরণের মত সকলের আলোচনার বিষয় ছিল। তাঁহার প্রতি স্বামীর ও সম্রাটের প্রেমের কালজয়ী নিদর্শন নির্ম্মাণের প্রবল কামনায় শাহজাহান তাজমহল কল্পনা করিয়াছিলেন। তাই শ্বেত মর্ম্মরই সে স্মৃতি-সৌধের উপযুক্ত উপকরণ—আর তাহার শিল্প-বৈচিত্র্য সেই সুন্দরীশ্রেষ্ঠা সাম্রাজ্ঞীর বহুমূল্য বেশ-বৈচিত্র্যের ও মূল্যবান অলঙ্কারসম্পদের নিদর্শন !

আকবরের সবল হস্তে যেমন তরবার শোভা পাইত, নিদর্শন, সিকন্দ্রায় আকবরের সমাধি-সৌধ তেমনই শক্তিশালী সম্রাটের অনন্যসাধারণ ক্ষমতার নিদর্শন।

জাহাঙ্গীর পিতার রাজনৈতিক বুদ্ধি ও মনীষার উত্তরাধিকারী হইতে পারেন নাই, তাই এই সৌধনির্ম্মাণেও তিনি পিতার কল্পনানুযায়ী কায করিতে না পারিয়া পিতার আরব্ধ কার্য্য অসম্পন্ন রাখিয়াছিলেন। এই সৌধ দেখিলে টেনিসনের কবিতায় আকবরের উক্তি মনে পড়ে—

> I watch'd my son
> And those that follow'd, loosen, stone
> from stone
> All my fair work."
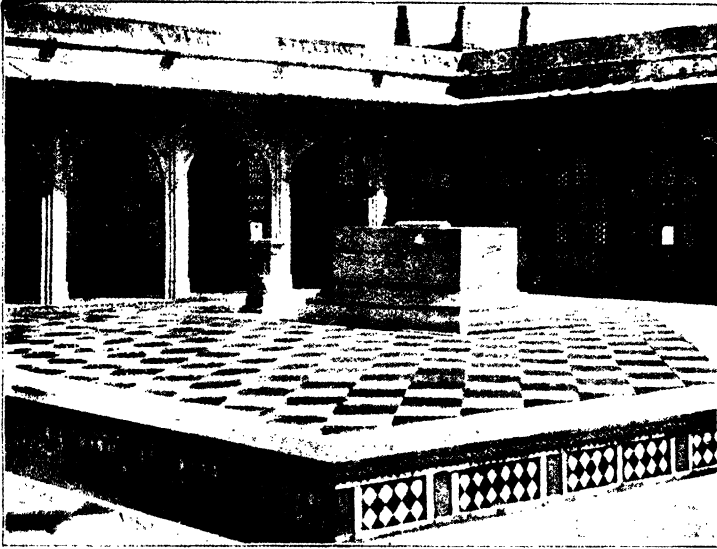
সমাধিসৌধের অভ্যন্তর

মমতাজের চম্পক অঙ্গুলীধৃত প্রস্ফুটিত গোলাব তেমনই তাঁহার উপযুক্ত ছিল। সুতরাং আকবরের স্বকল্পিত সমাধি-সৌধের সহিত পত্নীশোককাতর শাহজাহানের কল্পিত মমতাজের স্মৃতি-সৌধের তুলনা করা সঙ্গত হইবে

উভয়ে যে প্রভেদ, তাহা মূলগত—দুই ভাব হইতে দুইটির উৎপত্তি ; দুইটি দুই বিভিন্ন ভাবের অভিব্যক্তি। তাজমহল যেমন সম্রাট শাহজাহানের পত্নীপ্রেমের উপযুক্ত

এই সৌধের প্রবেশদ্বারের উপরে নক্করখানা (নহবতগৃহ)। পূর্ব্বে এই গৃহ হইতে মৃতের সম্মানার্থ নির্দ্দিষ্ট সময়ে নহবতের করুণ সুর শুনা যাইত। এই তোরণ-পথে প্রবেশ করিয়া উদ্যান অতিক্রম করিয়া সৌধের ভিত্তির সম্মুখে উপনীত হইতে হয়। এই ভিত্তি শ্বেত মর্ম্মর-প্রস্তরে নির্ম্মিত এবং ইহার দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ ৪ শত ফুট। এই ভিত্তি-মঞ্চের উপর কয় তল সৌধ রক্তপ্রস্তরে নির্ম্মিত।

প্রথম তল ৩০ ফুট উচ্চ এবং কয়টি খিলান। মিশরের পিরামিডের মধ্যে প্রবেশ করিতে হইলে যেরূপ ক্রম-নিম্ন পথে অগ্রসর হইতে হয়, তেমনই ক্রম-নিম্নগামী পথে অগ্রসর হইয়া শ্বেত মর্ম্মররচিত সমাধির সম্মুখে উপনীত হইতে হয়। এই কক্ষটি পূর্ব্বে নীলবর্ণে রঞ্জিত ও চূণের কায করা ছিল—তাহাতে সোনালী বর্ণের চিত্রাদি অঙ্কিত ছিল। এখন সে সৌন্দর্য্য আর নাই। মৃদু আলোকে কক্ষটি আলোকিত হওয়ায় ইহার গাম্ভীর্য্য বর্দ্ধিত হইয়াছে।

আকবরের বর্ম্ম, বেশ ও পুস্তক এই সমাধির পার্শ্বে রক্ষিত ছিল। ভরতপুরের জাঠরা সে সব লুণ্ঠনকালে লইয়া গিয়াছিল। তাহারা যখন আগ্রা আক্রমণ করে, সেই সময় (১৭৬৪ খৃষ্টাব্দ) ইহার দুইটি স্তম্ভশীর্ষও নষ্ট করে

সমাধির নিকটে যে মর্ম্মরনির্ম্মিত বেদী আছে—তাহাতে পূর্ব্বে স্বর্ণপাত্রে সুগন্ধিচূর্ণ পোড়ান হইত—সমগ্র কক্ষ তাহার মৃদু সৌরভে পূর্ণ থাকিত।

সৌধগাত্রে কোরাণের নানা কথা উৎকীর্ণ।

আকবরের চরিত্রে ও ধর্ম্মমতে যেমন বৈশিষ্ট্য ছিল, তাঁহার এই সমাধিসৌধও তেমনই বৈশিষ্ট্যবহুল। তিনিই ইহার কল্পনা করিয়াছিলেন এবং বোধ হয়, যাহাতে ভারতে হিন্দু ও বৌদ্ধ যুগের স্থাপত্যের সম্মিলন সাধন করিতে পারেন, তাহাই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল।

আকবরের দীর্ঘ রাজত্বকালের ঘটনাগুলির আলোচনা করিলে তাঁহার বৈশিষ্ট্য অতি সহজেই বুঝিতে পারা যায়। তিনি যখন জন্মগ্রহণ করেন, তখন তাঁহার পিতা—পিতৃরাজ্যের অধিকারী হইয়াও—শত্রুর আক্রমণে বিব্রত ও বিপন্ন। সেই দুর্দ্দশার মধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়া আকবর পিতৃরাজ্যের পুনরুদ্ধারসাধন করিয়াই নিরস্ত হয়েন নাই, পরন্তু তাহা এমন দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন যে, পুত্র জাহাঙ্গীরের বিলাস-লালসা ও পৌত্র শাহজাহানের ব্যয়বিলাস তাহা নষ্ট করিতে পারে নাই। শেষে তাঁহার প্রপৌত্র ঔরঙ্গজেবের পর ধর্ম্মদ্বেষিতার আঘাতে তাহা নষ্ট হয়। তিনি বুঝিয়াছিলেন, হিন্দুস্থানে হিন্দুর সহিত সখ্যসূত্রে বদ্ধ না হইলে বিদেশী বিজেতার প্রভুত্ব কখনই স্থায়ী হইবে না, পরন্তু রাজার সিংহাসন কণ্টকের আসনেই পরিণত হইবে। সেই জন্য

সমাধিসৌধের প্রবেশপথ

তিনি হিন্দুকে তুষ্ট করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন—হিন্দুকে বিশ্বাস করিয়া দায়িত্বপূর্ণ কার্য্যভার প্রদান করিয়াছিলেন। তিনি স্বয়ং সুশিক্ষিত ছিলেন না; কিন্তু সকল ধর্ম্মের প্রতি শ্রদ্ধা দেখাইতে ত্রুটি করিতেন না এবং ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মের স্বরূপ জানিবার আগ্রহে নানা ধর্ম্মে অভিজ্ঞ ব্যক্তিদিগের সহিত ধর্ম্মালোচনা করিতেন। তাহার ফলে তিনি সর্ব্বধর্ম্ম-সমন্বয়ের বাসনা মনে পোষণ করিতে আরম্ভ করেন এবং তাহার রাজনীতিক উপযোগিতা অনুভব করিয়া তাহার প্রচারচেষ্টাও করেন। কিন্তু তাঁহার সে চেষ্টা সফল হয় নাই—ধর্ম্ম কখন রাজনীতির সহায়রূপে কল্পিত হইতে পারে না। সে যাহাই হউক, বাহুবলে প্রতিষ্ঠিত প্রাধান্য যে লোকমত অবজ্ঞা করিয়া দীর্ঘকাল স্থায়ী হইতে পারে না, তাঁহার এই সত্যের অনুভূতি তাঁহার সময়ে তাঁহার দূরদর্শিতার ও রাজনীতিজ্ঞতার পরিচায়ক, সন্দেহ নাই। কালোচিত দৌর্ব্বল্য হইতে মুক্তিলাভ না করিলেও তিনি যে পারিপার্শ্বিক পরিবেষ্টনের সঙ্কীর্ণতা হইতে ঊর্দ্ধে উঠিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহাতেই তাঁহার গৌরব-পরিচয় পাওয়া যায়।

তাঁহার কল্পিত তাঁহার এই স্মৃতিসৌধও ভারতে ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মমতের মত ভিন্ন ভিন্ন যুগের স্থাপত্যের সম্মিলনে এক নূতন শিল্পাদর্শ স্থাপনের প্রচেষ্টা। ইহা যদি তাঁহার কল্পনানুসারে সম্পূর্ণ হইত, তবে হয় ত আমরা আরও সুন্দর একটি স্মৃতিসৌধ পাইতাম।*

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ।

* শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ ঘোষ 'মাসিক বসুমতীর' সম্পাদক মহাশয়কে আকবরের খৃষ্টান-পত্নী সম্বন্ধে এক প্রতিবাদপত্র পাঠাইয়াছেন। আকবরের পত্নী মিরিয়ম যে খৃষ্টান ছিলেন না, তাহা প্রতিপন্ন করিবার জন্যই পত্রখানি লিখিত। 'মাসিক বসুমতী' বাঙ্গালা মাসিক পত্র—লেখক উপেন্দ্রনাথ বাবুও বাঙ্গালী; সে অবস্থায় তিনি কেন যে সম্পাদক মহাশয়কে "পুনশ্চ" সংবলিত ইংরেজি পত্র লিখিলেন, তাহা আমরা বুঝিতে পারিলাম না। পত্রখানি যদি অবিশুদ্ধ ইংরেজিতে লিখিত না হইয়া বাঙ্গালায় লিখিত হইত, তবে তাহাতে নিশ্চয়ই লেখকের বা পত্রের গৌরব-হানি হইত না। পত্র-লেখক ভিনসেণ্ট স্মিথের উক্তিতে যতটা নির্ভর করিয়াছেন, ততটা নির্ভর যে সকলেই করিবেন, এমন না-ও হইতে পারে। আকবরের বহু পত্নীর মধ্যে কেহ খৃষ্টান ছিলেন কি না, তাহা আমার প্রবন্ধের আলোচ্য নয়। আমি কিম্বদন্তীর উল্লেখ করিয়াছি এবং যে "প্রচলিত মতের" উল্লেখ করিয়াছি, তাহার খণ্ডন করিবার জন্য যেরূপ প্রমাণের ও যুক্তির প্রয়োজন, পত্র-লেখক তাঁহার পত্রে তাহা উপস্থাপিত করেন নাই। তিনি যদি এ বিষয়ে গবেষণা করা প্রয়োজন মনে করেন, তবে ১৯১৮ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯২৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এ সম্বন্ধে যে সব সচিত্র প্রবন্ধ প্রধানতঃ 'ষ্টেটসম্যান' ও 'বেঙ্গলী' পত্রদ্বয়ে প্রকাশিত হইয়াছিল, তাঁহাকে সেগুলি—তিনি না দেখিয়া থাকিলে—দেখিতে অনুরোধ করি। ঐ সকল প্রবন্ধে আমার প্রবন্ধে প্রদত্ত চিত্রের বিষয়ও আলোচিত হইয়াছিল।—প্রবন্ধ-লেখক।

বনফুল

আমি বনফুল বনের মাঝারে
ফুটিয়া রয়েছি একা;
কত লোক আসে কত ফিরে যায়,
মোর পানে কেহ ফিরে নাহি চায়,
যার পথ চেয়ে ফুটে আছি, হায়,
পাই না তাহার দেখা।

দখিণ পবন মোরে বারে বারে
দোল দিয়ে দিয়ে যায়।
চুরি করি মোর মধু সুবাস
দিশি দিশি দেয় বিলায়ে বাতাস,
হৃদয়ে আমার যে মধু বিকাশ
চাহে নাক নিতে তায়।

এতদিন পরে ওগো মধুকর!
দাঁড়ালে কি হেথা এসে?
আমার হৃদয়ে আছে যেই মধু
না শুকাতে তারে নিয়ে যাও বঁধু,
যা আছে আমার সবি দিয়ে শুধু,
ঝরে যাব মৃদু হেসে।

শ্রীসুনীলকৃষ্ণ দত্ত।

দ্বাদশ পল্লব

নিস্‌বেট-ভবনে

প্যারাডাইনের অবসাদ-শিথিল দুর্ব্বল মস্তিষ্কে সকল চিন্তা তখন ধূম্রাকার ধারণ করিয়া যে নিবিড় কুজ্ঝটিকাজালের সৃষ্টি করিয়াছিল, তাহার ভিতর দিয়া সে মুক্তিলাভের কোনও পন্থা আবিষ্কার করিতে পারিল না। গাড়ীর কোণে সে অবসন্নভাবে দেহভার ন্যস্ত করিয়া মুদিতনেত্রে ভাবিতে লাগিল, মিঃ ব্লীডের নিকট যে সাহায্য লাভের আশা করিতেছিল, তাহার কি এই পরিণাম ? সে আশাহীন, নিরুপায় হইয়া, এবং কোথায় যাইবে, কি করিবে, তাহা স্থির করিতে না পারিয়া, তাহার পিতৃবন্ধু এই বহুদর্শী চতুর ব্যবহারাজীবের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। সে ভাবিয়াছিল, যে দুর্ভেদ্য ষড়যন্ত্রজালে তাহাকে পরিবেষ্টিত হইতে হইয়াছিল, তিনি তাহাকে তাহা হইতে উদ্ধার করিতে পারিবেন। মিঃ ব্লীডের শক্তি ও কৌশলের উপর প্যারাডাইনের অসাধারণ বিশ্বাস ছিল, এবং তাহার কিছু কিছু পরিচয়ও সে পাইয়াছিল। কিন্তু তাহাকে রক্ষা করা দূরের কথা, তিনি তাহাকে যে উপদেশ দান করিলেন, তাহা পালন করিলে তাহাকে নরহত্যার সন্দেহে কারাগারে আবদ্ধ হইতে হইবে। তাহার পর দায়রার বিচারে প্রাণদণ্ডেরও আশঙ্কা নাই কি ?

এই সকল চিন্তার পর প্যারাডাইন মাথা তুলিয়া মিঃ ব্লীডকে বলিল, "আপনি কি সত্যই আমাকে এই কার্য্য করিতে বলেন ? আমি আশা করিয়াছিলাম, আপনি এই সঙ্কট হইতে আমাকে উদ্ধার করিতে পারিবেন। অভিযোগ হইতে মুক্তিলাভ করিব।"

মিঃ ব্লীড বলিলেন, "আমিও ত সেইরূপই আশা করি। তোমাকে সঙ্কট হইতে উদ্ধার করিবার একটিমাত্র উপায় আছে। সেই রহস্যাবৃত লোকটিকে অর্থাৎ টেরিকে খুঁজিয়া বাহির করা দরকার। ইহারই উপর তোমার কল্যাণ নির্ভর করিতেছে ; কিন্তু এই কার্য্য করিতে হইলে মিঃ নিসবেটের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তোমার সকল অপরাধ তাঁহার নিকট মুক্তকণ্ঠে প্রকাশ করিতে হইবে ; কোন কথা গোপন করিলে চলিবে না।"

প্যারাডাইন বলিল, "আপনার আদেশপালনে আমার আপত্তি নাই ; কিন্তু আমি তাঁহার নিকট সকল অপরাধ স্বীকার করিবামাত্র তিনি কি করিবেন, তাহা কি বুঝিতে পারেন নাই ? তিনি তৎক্ষণাৎ পুলিসে সংবাদ দিবেন। তাহার পর আমাকে হাজতে পচিতে হইবে।"

শকটখানি মিঃ ব্লীড ও প্যারাডাইনকে বহন করিয়া বায়ুবেগে লণ্ডনের প্রায় কেন্দ্রস্থলে উপস্থিত হইল। মিঃ ব্লীড প্যারাডাইনকে বলিলেন, "সে কথা আমি নিঃসন্দেহে বলিতে পারি না, এদেশের পুলিস সম্বন্ধে তোমার ধারণা যাহাই হউক, তাহারা অত্যাচারী নহে, নিরপরাধেরও পীড়ন করে না ; তাহারা সাধ্যানুসারে ন্যায়েরই মর্য্যাদা রক্ষার চেষ্টা করে। আমরা আর কয়েক মিনিটের মধ্যেই মিঃ নিসবেটের বাড়ীতে উপস্থিত হইব। তুমি আনুপূর্ব্বিক সকল ঘটনার বিবরণ তাঁহার নিকট প্রকাশ করিবে ; যাহা সত্য, তাহার এক তিলও গোপন করিও না।"

একমাত্র আশ্রয়দাতা পিতৃবন্ধুর এই নিষ্ঠুর উক্তি শুনিয়া প্যারাডাইনের উদ্বেগব্যাকুল চিত্ত নিরাশার অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইল ; তাহার মনে হইল, এই ভীষণ সঙ্কটের সম্মুখীন হওয়া অপেক্ষা জলাশয়ের গর্ভে ডুবিয়া মরা শতগুণ অধিক প্রার্থনীয় ছিল। সে কি বলিয়া মিঃ ব্লীডের নিকট মনের দুঃখ প্রকাশ করিবে, তাহা স্থির করিতে পারিল না।

মিঃ ব্লীড পুনর্ব্বার বলিলেন, "আমিও তোমার সঙ্গেই যাইব বটে, হাঁ, তোমার উকিল হইয়া যাইব ; এবং যদি তোমার পক্ষে কোন সওয়াল-জবাব করিতে হয়, এই উদ্দেশ্যে অভ্যর্থনা-কক্ষে অপেক্ষা করিব। মিঃ নিসবেটের নিকট তুমি যে সকল কথা বলিবে, তাহা গোপনে বলাই উচিত।

তাহার পর যদি কোন কারণে প্রয়োজন হয়, তখন আমার সঙ্গে দেখা করিবে।"

প্যারাডাইন নিষ্কৃতিলাভের কোন উপায় দেখিতে পাইল না; গাড়ী ক্রমশঃ নিসবেটের বাসগৃহের সন্নিকটবর্ত্তী হইল। প্যারাডাইন গাড়ীর জানালা দিয়া ল্যাংফোর্ড গার্ডেন্‌সের সন্নিহিত দৃশ্যাবলী দেখিতে পাইল; ক্রমশঃ সেগুলি যেন তাহার নেত্রপথে অধিকতর পরিস্ফুট হইতে লাগিল। মিঃ গ্রীড ২২নং ভবনের সম্মুখে শকটের গতিরোধ করিলেন তাহার পর এঞ্জিনের 'সুইচ' বন্ধ করিয়া দ্বার খুলিয়া নীচে নামিয়া পড়িলেন; প্যারাডাইন মন্ত্রাভিভূতের ন্যায় নিঃশব্দে তাঁহার অনুসরণ করিল।

মিঃ গ্রীড চলিতে চলিতে প্যারাডাইনের বাহু স্পর্শ করিয়া বলিলেন, "কোনও মানববিদ্বেষী বলিয়াছিলেন, সত্য জিনিষটা প্রতিদিনের ব্যবহারের পক্ষে অসম্ভব মূল্যবান পণ্য। আমাকে তুমি পূর্ব্বে যে সকল কথা বলিয়াছ, আজ রাত্রিকালে মিঃ নিস্‌বেটের নিকট তাহার পুনরাবৃত্তি করিয়া এই উক্তির অসারতা প্রতিপন্ন করিবে। দেখিও, সাহস হারাইও না। ভয় পাইয়া কর্ত্তব্য বিস্মৃত হইও না।"

মিঃ গ্রীড যে ভাবে কথাগুলি বলিলেন, তাহাতে এরূপ আত্মপ্রত্যয় ও দৃঢ়তা, এবং উৎসাহের আভাস ছিল যে, প্যারাডাইনের মনে হইল, সে অকূল সমুদ্রে ডুবিতে ডুবিতে আশ্রয় লাভের জন্য একখানি ভেলা পাইয়াছে। মিঃ গ্রীড যে তাহাকে বিপদ-সমুদ্রে ডুবাইবার জন্য মিঃ নিস্‌বেটের গৃহে লইয়া আসিয়াছেন, ইহা বিশ্বাস করিতে আর তাহার প্রবৃত্তি হইল না। সে বিবর্ণ-মুখে ও মৌনভাবে সিঁড়ি দিয়া বারান্দায় উঠিয়া রুদ্ধ দ্বারের ঘণ্টায় আঘাত করিল। মুহূর্ত্তমধ্যে দ্বার খুলিয়া এক জন সুবেশধারী ভৃত্য মুক্তদ্বারের চৌকাঠে দাঁড়াইয়া প্যারাডাইনের মুখের দিকে চাহিল। প্যারাডাইনকে দ্বারপ্রান্তে দণ্ডায়মান দেখিয়া সেই ভৃত্যের ভাবসংস্পর্শবিহীন, অচঞ্চল দৃষ্টি বিস্ময় ও কৌতূহলে বিস্ফারিত হইল।

প্যারাডাইন ভৃত্যকে বিনীতভাবে বলিল, "মিঃ নিসবেট বাড়ী থাকিলে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিবে, তিনি কয়েক মিনিটের জন্য আমার সঙ্গে দেখা করিবেন কি না? আমার নাম প্যারাডাইন, তাঁহাকে বলিও, আমি তাঁহার আফিস হইতে তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছি।"

প্যারাডাইন যে স্বরে কথা বলিল, তাহা শুনিয়া তাহারই মনে হইল, সেই কণ্ঠস্বর তাহার নহে, তাহা অন্য কোন ব্যক্তির কণ্ঠনিঃসৃত।

ভৃত্য বলিল, "আপনি আমার সঙ্গে ভিতরে আসুন; মিঃ নিসবেট আপনার সঙ্গে আলাপ করিবেন কি না, তাহা আমি জানিতেছি।

ভৃত্য দরজার এক পাশে সরিয়া দাঁড়াইলে প্যারাডাইন ঘরের ভিতর প্রবেশ করিল। ভৃত্য দ্বারপ্রান্তে দৃষ্টিপাত করিয়া কিছু দূরে আর একটি ভদ্রলোককে অপেক্ষা করিতে দেখিল। সে প্যারাডাইনকে জিজ্ঞাসা করিল, "উনি কে?"

মিঃ গ্রীড দুই পা অগ্রসর হইয়া বলিলেন, "আমি মিঃ প্যারাডাইনের উকিল। মিঃ প্যারাডাইন যে সকল প্রসঙ্গের আলোচনা করিবার জন্য তোমার মনিবের সহিত দেখা করিতে আসিয়াছেন, তাহাতে আইনঘটিত তর্ক উঠিতে পারে। এই উপলক্ষে যদি আমার মক্কেলকে কোন প্রকার সাহায্য করিবার প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে আমার এখানে অপেক্ষা করা কর্ত্তব্য মনে করিয়াই উহার সঙ্গে এখানে আসিয়াছি।"

মিঃ গ্রীড ভৃত্যের উত্তরের প্রতীক্ষা না করিয়াই প্যারাডাইনের অনুসরণে হলঘরে প্রবেশ করিলেন, এবং একখানি চেয়ারে বসিয়া, টুপীটি মাথা হইতে খুলিয়া লইয়া জানুর উপর স্থাপিত করিলেন। প্যারাডাইনের ধারণা হইল, তাহার উদ্ধারের জন্য তিনি কোন না কোন উপায় অবলম্বন করিবেন।

ভৃত্য সেই কক্ষ হইতে প্রস্থান করিবার প্রায় পনের মিনিট পরে ফিরিয়া আসিয়া সংবাদ দিল, মিঃ নিসবেট তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন বলিয়াছেন।

প্যারাডাইন ভৃত্যের ইঙ্গিতে কম্পিত-বক্ষে হলঘর হইতে তাহার অনুসরণ করিয়া যে কক্ষের দ্বারে উপস্থিত হইল, সেই কক্ষটি যে লাইব্রেরী, ইহা প্যারাডাইন পূর্ব্ব হইতেই জানিত। প্যারাডাইন ভৃত্যের সহিত প্রস্থান করিলে মিঃ গ্রীড হলঘরের চেয়ারে স্থিরভাবে বসিয়া রহিলেন।

কয়েক মিনিট পরে ভৃত্য একাকী হলঘরে ফিরিয়া আসিল, এবং মিঃ গ্রীড্‌কে লক্ষ্য করিয়া বলিল, "মিঃ নিস্‌বেটকে আপনার এখানে আসিবার কথা জানাইয়াছিলাম; আমার কথা শুনিয়া তিনি আপনাকে মণিংরুম'

দেখাইতে আদেশ করিয়াছেন ; আপনি সেই কক্ষে বেশ আরামে থাকিবেন। আপনি আমার অনুসরণ করিলে আপনাকে সেই কক্ষে পৌঁছাইয়া দিতে পারি।

মিঃ ব্রীড তৎক্ষণাৎ উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, "এ ত ভাল কথাই ; চল যাই।"

ভৃত্য বলিল, "আপনার টুপী ও ছাতা কি লইয়া যাইতে পারি মহাশয় ?"

মিঃ ব্রীড বলিলেন, "না, ও সব তোমাকে লইতে হইবে না।"

ভৃত্য আর কোন কথা না বলিয়া মিঃ ব্রীডকে সঙ্গে লইয়া সুপ্রশস্ত সোপানশ্রেণীর সাহায্যে দোতলায় উঠিল। অনন্তর সে দোতালার বারান্দা অতিক্রম করিয়া তাহার প্রান্তভাগে অবস্থিত একটি কক্ষের দ্বার খুলিল। সে মুক্ত দ্বারের পাশে দাড়াইয়া মিঃ ব্রীডকে সেই কক্ষে প্রবেশের জন্য ইঙ্গিত করিলে, মিঃ ব্রীড সেই কক্ষে প্রবেশের চেষ্টা না করিয়া বা দ্বারের দিকে পদমাত্র অগ্রসর না হইয়া, হাতের টুপীটি মাথায় আঁটিয়া দিলেন, তাহার পর দৃঢ় স্বরে বলিলেন, "আমাকে তোমারই পিছনে যাইতে হইবে। তুমি আগে চল!"

"আমার পিছনে ?"—বলিয়া ভৃত্য ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া তাঁহার দিকে চাহিল ; সে সেই কক্ষের দ্বার খুলিবার পূর্ব্বে দেখিয়াছিল, তিনি দীর্ঘদেহ ভদ্র লোক ; তাঁহার আকৃতি ও পরিচ্ছদ দেখিয়া তিনি এক জন সম্ভ্রান্ত সজ্জন ব্যক্তি বলিয়াই তাহার ধারণা হইয়াছিল। তাঁহার হাতের ছাতার কাপড় গুটান অবস্থাতেই ছিল, এবং ছাতার দাণ্ডিটা তিনি ছড়ির মত ধরিয়া রাখিয়াছিলেন ; কিন্তু ভৃত্য যখন তাঁহার কথা শুনিয়া মুখ ফিরাইয়া তাঁহার দিকে চাহিল, তখন সে সবিস্ময়ে, সভয়ে দেখিল, তাঁহার ছাতার সাজ—শিক, কাপড় প্রভৃতি তাঁহার বাঁ হাতে ঝুলিতেছিল, এবং তাঁহার দক্ষিণহস্তে একখানি তীক্ষ্ণধার গুপ্তি, সেই গুপ্তির অগ্রভাগ তাহার পাঁজর ফুটা করিতে উদ্যত!

মিঃ ব্রীড ভৃত্যের আতঙ্কবিস্ফারিত চক্ষুর দিকে চাহিয়া মৃদুস্বরে বলিলেন, "কোন কথা বলিলে বিপদে পড়িবে ; আর যদি চীৎকার কর, তাহা হইলে সেই চীৎকারে কেহ সাড়া দেওয়ার পূর্ব্বেই তোমার মৃতদেহ এই দরজার গোড়ায় লুটাইতে থাকিবে। তুমি আমাকে সঙ্গে লইয়া যাইবে, আমার আগে আগে ঐ কক্ষে প্রবেশ করিবে।"

ভৃত্য বুঝিতে পারিল, তাঁহার আদেশ পালন না করিলে সেই তীক্ষ্ণধার গুপ্তি তাহার পঞ্জর বিদীর্ণ করিয়া উদরে প্রবেশ করিবে। সে নিরুপায় হইয়া সেই কক্ষের অর্দ্ধোদ্ঘাটিত দ্বারের চৌকাঠের উপর এক পা বাড়াইয়া দিল ; কিন্তু সম্মুখে অগ্রসর না হইয়া সেই স্থানেই দাঁড়াইয়া রহিল। মিঃ ব্রীড তাহার পশ্চাতে বারান্দায় দাঁড়াইয়া তাঁহার হাতের গুপ্তিতে একটু জোর দিলেন ; গুপ্তির অগ্রভাগের খোঁচা খাইয়া ভৃত্য অগ্রসর হইয়া কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিল। মিঃ ব্রীড তখনও সেই কক্ষের দ্বারের বাহিরে দাঁড়াইয়াছিলেন। ভৃত্য সেই কক্ষে প্রবেশ করিবামাত্র কক্ষের দীপালোক নির্ব্বাপিত হইল ; সঙ্গে সঙ্গে ধপ্ করিয়া একটা ভারী জিনিসের পতনশব্দ মিঃ ব্রীডের কর্ণগোচর হইল। একটা অস্ফুট আর্ত্তনাদও তিনি শুনিতে পাইলেন ; কিন্তু মুহূর্ত্তমধ্যে সেই কক্ষে নিস্তব্ধতা বিরাজ করিতে লাগিল।

মিঃ ব্রীড পদাঘাতে অর্দ্ধোন্মুক্ত কক্ষদ্বার সম্পূর্ণ উদ্ঘাটিত করিলেন। সেই সময় তিনি বারান্দার মৃদু আলোকে কক্ষাভ্যন্তরে দুই জন লোকের ছায়াবৎ মূর্ত্তি দেখিতে পাইলেন ; তাহারা একটি মৃতপ্রায় অসাড় দেহ সেই কক্ষের মেঝের উপর দিয়া টানিয়া লইয়া যাইতেছিল।

অন্ধকার হইতে কে দৃঢ়স্বরে আদেশ করিল, "দরজা বন্ধ কর।"

মিঃ ব্রীড তৎক্ষণাৎ সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া তাড়াতাড়ি দ্বার রুদ্ধ করিলেন, এবং রুদ্ধদ্বারে পিঠ দিয়া দাঁড়াইলেন। তাহার পর তিনি বাঁ হাত বাড়াইয়া দেওয়াল হাতড়াইতে হাতড়াইতে কিছু দূর অগ্রসর হইতেই সেই কক্ষের বৈদ্যুতিক দীপের 'সুইচ' তাঁহার হাতে ঠেকিল। পরমুহূর্ত্তেই সেই কক্ষ উজ্জ্বল বিদ্যুতালোকে উদ্ভাসিত হইল।

মিঃ ব্রীড সেই কক্ষের চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিলেন ; দেখিলেন, কক্ষটি মূল্যবান্ ও সুদৃশ্য আসবাবপত্র দ্বারা সুসজ্জিত। তিনি দুই জন লোককে মেঝের উপর নিপতিত ভৃত্যের অসাড় দেহের দিকে চাহিয়া থাকিতে দেখিলেন। তাহাদের এক জন ভূপতিত দেহটি লক্ষ্য

করিয়া অস্ফুটস্বরে বলিল, "কি সর্ব্বনাশ, এ কাহার মাথা ভাঙ্গিয়াছি! এ যে উইলিয়াম্‌স্‌!"

মিঃ গ্রীড তৎক্ষণাৎ তাহাদের পশ্চাতে লাফাইয়া পড়িয়া দৃঢ়স্বরে বলিলেন, "তোমরা দুই হাত মাথার উপর তুলিয়া, আমার দিকে পিছন ফিরাইয়া, যেখানে আছ, ঐখানেই দাঁড়াইয়া থাক, নতুবা তোমাদের দুই জনকেই এখনই এই ঘরের মেঝের উপর মরিয়া পড়িয়া থাকিতে হইবে।"—উজ্জ্বল বিদ্যুতালোকে তাঁহার হাতের প্রসারিত গুপ্তি ঝক্‌মক করিয়া উঠিল, যেন বিদ্যুতের লোল জিহ্বা!

উভয় ব্যক্তি তৎক্ষণাৎ মাথার উপর দুই হাত তুলিয়া সোজা হইয়া দাঁড়াইল; তাহাদের এক জনের উৎক্ষিপ্ত হাত হইতে একটি লৌহ-মুদ্গার খসিয়া পড়িল। মিঃ গ্রীড বামহস্ত প্রসারিত করিয়া তাহাদের উভয়েরই বুকের পকেট হইতে রিভলভার বাহির করিয়া লইলেন। তাহারা উভয়েই মিঃ গ্রীডের আকস্মিক আক্রমণে এরূপ ভীত ও বিচলিত হইয়াছিল যে, পকেটে পিস্তল থাকিতেও তাহারা তাহা বাহির করিয়া লইয়া ব্যবহার করিবার সুযোগ পায় নাই; বিশেষতঃ, গৃহস্বামীর বিনানুমতিতে তাহা ব্যবহার করিবে—তাহাদের সেরূপ সাহসও ছিল না। যাহারা বহু অপরাধে অপরাধী, তাহারা সাধারণতঃ কাপুরুষ হইয়া থাকে।

মিঃ গ্রীড তাহাদিগকে নিরস্ত্র করিয়া আদেশ দিলেন, "যখন যে ভাবে চলা উচিত, সেই ভাবে তোমরা চলিতে জান দেখিতেছি। চমৎকার পোষ মানিতে শিখিয়াছ, এখন যাহা বলি, তাহাই কর। ঐখানে উপুড় হইয়া শুইয়া মেঝের উপর মুখ গুঁজিয়া পড়িয়া থাক।"

তাহারা উভয়েই বিনা প্রতিবাদে তৎক্ষণাৎ তাঁহার আদেশ পালন করিল। তাহাদিগকে সেই স্থানে মুখ গুঁজিয়া পড়িয়া থাকিতে দেখিয়া মিঃ গ্রীড মেঝের উপর হইতে পূর্ব্বোক্ত লৌহ-মুদ্গারটি তুলিয়া লইলেন, এবং তাহা উর্দ্ধে তুলিয়া তদ্দ্বারা তাহাদের ঘাড়ের উপর প্রচণ্ডবেগে আঘাত করিলেন যে, সেই আঘাতে উভয়েরই চেতনা বিলুপ্ত হইল।

অনন্তর মিঃ গ্রীড সেই কক্ষ পরীক্ষা করিয়া বাতায়নের নিকট সুরঞ্জিত রজ্জু প্রসারিত দেখিলেন; সেই রজ্জুর সাহায্যে রেশমী পর্দাগুলি গুটাইয়া রাখা হইত। মিঃ গ্রীড সেই রজ্জু খুলিয়া লইয়া তাহার দৃঢ়তা পরীক্ষা করিলেন; তিনি উভয় হস্তে ধরিয়া ঝ্যাট্‌কা টানেও তাহা ছিঁড়িতে পারিলেন না। তখন সেই রজ্জু দ্বারা সংজ্ঞাহীন লোক দুইটির হাত-পা দৃঢ়রূপে বাঁধিয়া ফেলিলেন। যে ভৃত্য তাঁহাকে সেই কক্ষের সম্মুখে লইয়া আসিয়াছিল, তাহার অসাড় দেহ মেঝের এক পাশে পড়িয়াছিল; তাহারও হাত-পা তিনি রজ্জুবদ্ধ করিলেন। এই সকল কার্য্য শেষ হইলে মিঃ গ্রীড সেই কক্ষের দীপ নির্ব্বাপিত করিয়া কক্ষ ত্যাগ করিলেন, এবং বারান্দা দিয়া সিঁড়ির মাথায় আসিয়া দাঁড়াইলেন। তিনি কোনও দিকে কোন শব্দ শুনিতে পাইলেন না; সর্ব্বত্র তখন গাঢ় স্তব্ধতা বিরাজিত: কিন্তু দুই এক মিনিট পরে একটা মর্ম্মভেদী আর্ত্তনাদ হঠাৎ নৈশ-নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিল।

ত্রয়োদশ পল্লব

ফাঁদে পা!

প্যারাডাইন মিঃ নিস্‌বেটের লাইব্রেরী-কক্ষে প্রবেশ করিলে ভৃত্য তাহার নাম উচ্চারণ করিয়া তাহার আগমন-সংবাদ ঘোষণা করিবামাত্র তাহার পশ্চাতে লাইব্রেরীর দ্বার রুদ্ধ হইল। সে একাকী অসহায় অবস্থায় ব্যাঘ্রের গুহায় প্রবেশ করিয়াছে মনে করিয়া আতঙ্কে ও দুশ্চিন্তায় অভিভূত হইল। তাহার বক্ষঃস্থলে যেন হাতুড়ি পড়িতে লাগিল। সেই কক্ষ তাহার সুপরিচিত; সে তাহার মনিবের আদেশ শ্রবণের জন্য বহুবার সেই সুসজ্জিত কক্ষে প্রবেশ করিয়াছিল; কিন্তু আর কোনও দিন সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া তাহার মন এ ভাবে আতঙ্কপূর্ণ হয় নাই, আর কোনও দিন প্রভুর আদেশ শুনিতে আসিয়া তাহার হৃদয় কম্পিত হয় নাই বা সে এরূপ অস্বচ্ছন্দতা অনুভব করে নাই।

প্যারাডাইনের ধারণা হইল, তাহার মস্তকের উপর যে বিপদের মেঘ ঘনীভূত হইয়াছে, তাহা হইতে অশনিপাত অপরিহার্য্য। এই বিপদ হইতে তাহার নিষ্কৃতি নাই। সামান্য অর্থের লোভে সে বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছিল; সে রিপোর্টখানি আফিসের সিন্দুকে আবদ্ধ না করিয়া

তাহা পকেটে ফেলিয়া আফিসের বাহিরে লইয়া গিয়াছিল, তাহার পর সহসা সুবুদ্ধির উদয় হওয়ায় সে তাহা লইয়া ট্রেণে চাপিয়া মিঃ গার্ভিনের বাড়ীতে গিয়াছিল, এবং তাহার উপরওয়ালা মিঃ গার্ভিনকে মিথ্যা কথায় ভুলাইয়া তাহা তাঁহার হস্তে অর্পণ করিয়াছিল; এ সকল কথাই তাহাকে তাঁহার মনিবের নিকট প্রকাশ করিতে হইবে। তাহাকে স্বীকার করিতে হইবে—সে বিশ্বাসঘাতক, মিথ্যাবাদী, তস্কর, প্রতারক! বিশেষতঃ মিঃ নিস্‌বেটের ধারণা হইয়াছিল, গার্ভিনের হত্যাকারীই সেই রিপোর্ট হস্তগত করিয়াছিল। গার্ভিনের হত্যাকারীর সহিত তাহার ষড়যন্ত্র ছিল না, ইহা সে কিরূপে মিঃ নিস্‌বেটের নিকট প্রতিপন্ন করিবে?—প্যারাডাইনের ধারণা হইল, মিঃ নিস্‌বেট অবিলম্বে পুলিসের নিকট সংবাদ প্রেরণ করিবেন, পুলিস আসিয়া সেই স্থানেই তাহাকে গ্রেপ্তার করিবে; তাহাকে বিচারালয়ে অর্পণ করা হইবে। তাহার পর বিচারের কি ফল হইবে, তাহা চিন্তা করিয়া প্যারাডাইনের মূর্চ্ছার উপক্রম হইল। তাহার একমাত্র সম্বল—মিঃ প্রীডের আশ্বাসবাণী; কিন্তু তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করিলেও কিরূপে তাহাকে রক্ষা করিবেন, তাহা সে বুঝিয়া উঠিতে পারিল না। তিনি কি উদ্দেশ্যে তাহার সঙ্গে মিঃ নিস্‌বেটের গৃহে উপস্থিত হইয়াছিলেন, তাহাও সে অনুমান করিতে পারিল না। মিঃ নিস্‌বেটের নিকট তাহার পক্ষে ওকালতি? আইনের তর্ক উঠিলে তাহার পক্ষ সমর্থন করিবেন? কিন্তু সে মনিবের নিকট অপরাধ স্বীকার করিতে আসিয়াছে, নিজের সকল দোষ মুক্তকণ্ঠে প্রকাশ করিতে আসিয়াছে, তাহার অনুকূলে আইনের কি তর্ক থাকিতে পারে?

প্যারাডাইন আরও ভাবিল, সে যে সাধু উদ্দেশ্যেই রিপোর্টখানি মিঃ গার্ভিনের হস্তে অর্পণ করিয়াছিল, ইহা সে কিরূপে প্রতিপন্ন করিবে? গার্ভিন নিহত হইয়াছেন। টেরির গল্পই বা কে বিশ্বাস করিবে? যদি টেরিকে হাজির করিবার জন্য তাহাকে আদেশ করা হয়, তাহা হইলে সে কিরূপে তাহাকে হাজির করিবে? সে কোথায় তাহার সন্ধান পাইবে? মিঃ প্রীড তাহাকে আশ্রয় দান করিয়া তাহার কি উপকার করিলেন?—ইহাই কি উপকারের নিদর্শন?

সে সম্মুখে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া মিঃ নিস্‌বেটকে দেখিতে পাইল। নিস্‌বেট তখন সেই কক্ষের মধ্যস্থলে আরাম-কেদারায় উপবিষ্ট; তাঁহার হাতের কাছে হুইস্কির ডিকেণ্টার, গ্লাস প্রভৃতি সুসজ্জিত; তাঁহার মুখে একটি চুরুট শোভা পাইতেছিল। মিঃ নিস্‌বেটের চেয়ারের পশ্চাতে একখানি পর্দ্দা প্রসারিত; তাঁহার ঠাণ্ডা না লাগে; এই উদ্দেশ্যেই বোধ হয় পর্দ্দাখানি সেইভাবে প্রসারিত ছিল, প্যারাডাইনের তখন এইরূপই ধারণা হইল।

মিঃ নিস্‌বেট প্যারাডাইনকে দেখিয়া মুখের চুরুট সরাইয়া লইয়া কোমলকণ্ঠে সদয়ভাবে বলিলেন, "এসো বাবা প্যারাডাইন, এসো, তুমি এই অসময়ে কি মতলবে আমার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছ বল শুনি, আফিসের কোন কাযে গোলমাল হইয়াছে কি?"

প্যারাডাইন মনিবের এই প্রকার সদয় সম্ভাষণে বিস্মিত হইল; প্রভু ও ভৃত্যের মধ্যে কি বিশাল ব্যবধান বর্ত্তমান, তাহা সে জানিত। বিশেষতঃ নিস্‌বেট আর কোন দিন এরূপ সহানুভূতিভরে কোমল স্বরে তাহাকে সম্বোধন করিয়াছেন, ইহা তাহার স্মরণ হইল না। সে দেখিল, মিঃ নিস্‌বেট চেয়ারে ঠেস দিয়া কুণ্ডলীকৃত ধূমরাশির ভিতর দিয়া তাহাকে লক্ষ্য করিতেছিলেন। প্যারাডাইন তাঁহার সুকোমল দয়ার্দ্র কণ্ঠস্বর শুনিয়াও আশ্বস্ত হইতে পারিল না। নিরুৎসাহচিত্তে ধীরে ধীরে তাঁহার নিকট অগ্রসর হইতে লাগিল।

প্যারাডাইন তাঁহার দিকে অগ্রসর হইতে হইতে শুনিল, "উইলিয়ামস্ আমাকে বলিয়াছিল, তুমি এক জন মুরুব্বী সঙ্গে লইয়া আমার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছ; লোকটা তোমার মুরুব্বী না কি? উইলিয়ামস্ যেন বলিয়াছিল—সে তোমার উকীল। কিন্তু তুমি আসিয়াছ তোমার মনিবের সঙ্গে দেখা করিতে, সম্ভবতঃ আফিস-সংক্রান্ত কোন কথা বলিবার উদ্দেশ্যে; এ অবস্থায় একটা উকীল লেজে বাঁধিয়া এখানে আসিবার কি প্রয়োজন ছিল বাপধন, তাহা ত আমি ঠাহর করিতে পারিতেছি না! যাহা হউক, তুমি বলিতে পার। আফিসের বাহিরে আমি আমার কর্ম্মচারীদের সঙ্গে সাধারণ ভদ্রলোকের মতই ব্যবহার করি; তোমার সঙ্কোচের কোন প্রয়োজন নাই, তুমি ঐ চেয়ারে বসিয়া পড়।"

কিন্তু প্যারাডাইন চেয়ারে বসিল না ; তাহার মনে হইল, সে যাহা বলিতে আসিয়াছিল, তাহা বসিয়া বলিবার মত কথা নহে। সে মনিবের সম্মুখে দাঁড়াইয়া সেই সকল কথা অপেক্ষাকৃত সুস্পষ্টভাবে বলিতে পারিবে বলিয়াই তাহার ধারণা হইল।

প্যারাডাইন ভয়-কম্পিত-কণ্ঠে বলিতে লাগিল, "আমার উকিলের উপদেশেই আজ এখানে আপনার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছি। আজ সন্ধ্যার সময় তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে গিয়াছিলাম, এবং—"

প্যারাডাইন লিঙ্কন্‌স ইন্ ফীল্ডস্‌এ গমন করিয়া তাহার পিতৃবন্ধু উকিল মিঃ প্রীডের সহিত সাক্ষাতের পর হইতে যে সকল কাণ্ড ঘটিয়াছিল, তাহা তাহার চিত্তপটে প্রতিফলিত হইল ; তাহার মনে হইল তাহার পর যেন বহু বৎসর অতীত হইয়াছে।

সে ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া পুনর্ব্বার বলিতে লাগিল, "আরানা স্বর্ণক্ষেত্রের রিপোর্ট সম্বন্ধে আমার যে সকল কথা বলিবার আছে, তাহাই আপনাকে বলিতে আসিয়াছি, মহাশয়! গত শনিবার অন্যান্য দিন অপেক্ষা অনেক পূর্ব্বেই আফিস বন্ধ হইলেও, সেই দিন বিকালে পশ্চিম-আফ্রিকার ডাক বিলি হইবার কথা ছিল ; এই জন্য আফিসের পরও আমাকে সেই ডাকের প্রতীক্ষায় আফিসে থাকিতে হইয়াছিল। আমি সেই রিপোর্টখানি পকেটে লইয়া আফিস ত্যাগ করিয়াছিলাম।"

নিস্‌বেট বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বলিলেন, "তুমি বলিতেছ কি? সেই রিপোর্ট তুমিই লইয়াছিলে, গার্ভিন লয় নাই? সেই রিপোর্ট ডাক-পিয়ন বিলি করিলে তাহা লইয়া আফিসের সিন্দুকে রাখিতে হইবে, এই আদেশই ত দান করা হইয়াছিল ; তুমি তাহা আফিসের সিন্দুকে না রাখিয়া পকেটে রাখিয়াছিলে, ইহার কারণ কি?"

প্যারাডাইন বিবর্ণ মুখ অবনত করিয়া ভাবিতে লাগিল, এইবার তাহার বিশ্বাসঘাতকতা, লোভ ও কলঙ্কের কথা প্রকাশ করিতে হইবে। সেই সকল অপরাধ স্বীকার করিতে সে এতই কুণ্ঠা বোধ করিল যে, কথাগুলি হঠাৎ তাহার মুখ হইতে বাহির হইল না।

নিস্‌বেট প্রশ্নসূচক দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিলেন। প্যারাডাইন মুখ তুলিয়া কাতর কুণ্ঠিত দৃষ্টিতে তাহার মনিবের মুখের দিকে চাহিল, তাহার পর দৃষ্টি অবনত করিয়া বলিতে লাগিল, "আমি অত্যন্ত অর্থকষ্টে পড়িয়াছিলাম, মহাশয়, এই জন্য এক জন সুদখোর মহাজনের কবলে আমাকে আত্মসমর্পণ করিতে হইয়াছিল। আমি তাহার ঋণ পরিশোধ করিতে না পারায় সে আমাকে ভয় দেখাইয়াছিল, আমি তাহাকে তাহার প্রাপ্য টাকাগুলি সুদে-আসলে পরিশোধ না করিলে, সে আপনাকে পত্র লিখিয়া সকল কথা জানাইবে, এবং আমার চাকরীর মাথা খাইবে। আমার পিতা কঠিন রোগে আক্রান্ত হওয়ায় অর্থাভাবে তাঁহার চিকিৎসার ব্যবস্থা করিতে না পারায় সেই মহাজনের নিকট পঞ্চাশ পাউণ্ড কর্জ্জ লইয়া তাঁহার চিকিৎসা চালাইয়াছিলাম, কিন্তু আমার দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁহার প্রাণ রক্ষা করিতে পারি নাই। ঋণ-পরিশোধের জন্য আমি কিস্তীবন্দী করিয়াছিলাম ; কিন্তু কিস্তী খেলাপ হইয়াছিল ; তথাপি কয়েক কিস্তীর টাকা ও তাহার সুদ, ধার-কর্জ্জ করিয়াও তাহাকে দিয়াছিলাম ; কিন্তু অবশেষে সে আমার নিকট দুই শত পাউণ্ড দাবী করিয়া বসিল।"

নিস্‌বেট প্যারাডাইনের এই আত্মকাহিনী শুনিয়া কোন মন্তব্য প্রকাশ করিলেন না ; কিন্তু তাঁহার মুখ গম্ভীর, চক্ষুতে বিরক্তি পরিস্ফুট।

প্যারাডাইন হতাশভাবে নিস্‌বেটের মুখের দিকে চাহিয়া বলিতে লাগিল, "এই প্রকার সঙ্কটে পড়িয়া আমি কি করিব, তাহা স্থির করিয়া উঠিতে পারিলাম না! আমি হতাশ হইয়া পড়িলাম, কোনও দিকে আশার ক্ষীণ রশ্মিও দেখিতে পাইলাম না! সেই সময় একটি লোকের সঙ্গে হঠাৎ এক দিন আমার পরিচয় হইল। তাহার নাম মিঃ টেরি। উহা তাহার প্রকৃত নাম কি না জানিতে পারি নাই ; কিন্তু সেই নামেই সে আমার নিকট নিজের পরিচয় দিয়াছিল। সে আমার বিপদের কথা শুনিয়া আমার দেনার দুই শত পাউণ্ড দান করিয়া আমাকে এই বিপদ হইতে উদ্ধার করিতে সম্মত হইল ; কিন্তু আমাকে একটি সর্ত্তে রাজী হইতে হইল। সর্ত্তটি এই যে, আরানা স্বর্ণক্ষেত্রের রিপোর্টখানি ডাকঘর হইতে যে দিন আমাদের আফিসে বিলি হইবে, সেই দিনই তাহা তাহার হাতে দিতে হইবে, সে তাহা দেখিয়া লইয়া আমাকে ফেরত দিবে। রিপোর্টখানি হাতে পাইলেই দুই শত পাউণ্ড দিয়া সে আমাকে সাহায্য করিবে। রিপোর্টখানি তাহাকে

প্রদান করিবার উদ্দেশ্যেই আমি তাহা শনিবার অপরাহ্নে আফিস হইতে লইয়া গিয়াছিলাম।"

প্যারাডাইনের কথা শুনিয়া নিস্বেট চেয়ারের উপর সোজা হইয়া বসিলেন, তাহার পর আতঙ্কাভিভূত প্যারাডাইনের মুখের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া তীব্রস্বরে বলিলেন, "তুমি ঘুসের লোভে রিপোর্টখানা চুরি করিয়াছিলে? দুই শত পাউণ্ড উপার্জ্জনের আশায় এই দুষ্কর্ম্ম করিয়াছিলে—ইহা তুমি স্বীকার করিতেছ?"

প্যারাডাইন আড়ষ্ট স্বরে বলিল, "হাঁ, স্বীকার করিতেছি। আমি অপরাধ স্বীকার করিব, কোন কথা গোপন করিব না, এই উদ্দেশ্যেই ত আপনার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছি। বিশেষতঃ আমার উকিল আপনার নিকট সরলভাবে সকল কথা স্বীকার করিতেই উপদেশ দিয়াছেন। তবে আরও কথা আছে; সে সকল কথা আপনি ধৈর্য্যধারণ করিয়া শ্রবণ করুন। এই ভাবে দুই শত পাউণ্ড সংগ্রহ করিব—ইহাই প্রথমে আমি স্থির করিয়াছিলাম। কিন্তু রিপোর্টখানি আমি ঐ ভাবে লইয়া যাইলেও তাহার বিনিময়ে টেরির নিকট হইতে টাকা লই নাই, হাঁ, আপনি বিশ্বাস করুন, আমি সেই সঙ্কল্প ত্যাগ করিয়াছিলাম। আমি তাহার নিকট টাকাগুলি গ্রহণ করি নাই। টেরির সঙ্গে কথা ছিল, আমি রিপোর্ট সহ ভিক্টোরিয়ায় উপস্থিত হইয়া তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিব এবং রিপোর্টখানি সেই স্থানেই তাহাকে প্রদান করিব। কিন্তু ভিক্টোরিয়ায় উপস্থিত হইয়া তাহার জন্য প্রতীক্ষা করিতে করিতে আমি এ সম্বন্ধে নানা কথা চিন্তা করিতে লাগিলাম। আমি বুঝিতে পারিলাম, যাহার অন্নে প্রতিপালিত হইতেছি, তাঁহার প্রতি এই প্রকার বিশ্বাসঘাতকতা করা অত্যন্ত গর্হিত কাজ; এই কাজ করিলে আমি ভদ্রসমাজে মুখ দেখাইতে পারিব না, আমার বংশের সুনাম নষ্ট হইবে। এই অপকার্য্যের জন্য চিরজীবন আমাকে অনুতাপানলে দগ্ধ হইতে হইবে। আমার ভাগ্যে যাহা থাকে ঘটিবে, আমি টেরিকে রিপোর্টখানি দিব না। এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া রিপোর্টখানি আফিসের সিন্দুকে রাখিবার জন্য উৎসুক হইলাম। কিন্তু তখন সন্ধ্যা অতীত হইয়াছিল, আফিস বন্ধ হইয়া গিয়াছিল; এই জন্য তাহা আফিসের সিন্দুকে রাখিয়া দেওয়া অসাধ্য হইল। সেই সময় আমার মনে পড়িল, আমার উপরওয়ালা আফিসের হেড ক্লার্ক মিঃ গার্ভিন উইনগেট্‌সএ বাস করেন; রিপোর্টখানি তাঁহার হস্তে প্রদান করিলে আমার ভ্রম সংশোধিত হইতে পারে। তখনও ট্রেণের সময় ছিল; আমি তাড়াতাড়ি ষ্টেশনে প্রবেশ করিয়া টিকিট লইয়া ট্রেণে উঠিয়া পড়িলাম। সন্ধ্যা সাতটা সাতান্ন মিনিটের ট্রেণ যথাসময়ে উইন্‌গেটস্ ষ্টেশনে থামিলে আমি ট্রেণ হইতে নামিয়া মিঃ গার্ভিনের বাড়ীর দিকে চলিলাম। তাঁহার বাড়ীতে উপস্থিত হইয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলাম। তিনি তখন বাড়ীতে একাই ছিলেন। আমি তাঁহার পাঠকক্ষে প্রবেশ করিয়া রিপোর্টখানি তাঁহার হাতে দিলাম। আমি তাঁহাকে বলিলাম, রিপোর্টখানি ভ্রমক্রমে পকেটে রাখিয়াছিলাম এবং আফিসের সিন্দুকে তাহা রাখিতে ভুলিয়া গিয়াছিলাম বলিয়াই তাহা তাঁহাকে দিতে আসিয়াছি। আমার এই কৈফিয়ৎ তিনি সম্ভবতঃ সত্য বলিয়াই বিশ্বাস করিয়াছিলেন। তিনি আমার নিকট হইতে রিপোর্টখানি লইয়া তাঁহার পাঠকক্ষস্থ অগ্নিকুণ্ডের বামভাগে সংরক্ষিত কাবোর্ডের ভিতর তুলিয়া রাখিয়া কাবোর্ডের চাবি বন্ধ করিলেন।

"পরে আমার মনে হইল, আমি উইন্‌গেটস্‌এ যাইবার সময় টেরিকে যেন দেখিয়াছিলাম; সে মিঃ গার্ভিনের বাড়ী পর্য্যন্ত আমার অনুসরণ করিয়াছিল কি না, তাহা আমি জানিতে পারি নাই। কিন্তু সে আমার অনুসরণ করিয়া থাকিলে, রিপোর্টখানি যে সময় মিঃ গার্ভিনের হস্তে প্রদান করি—সে সময়ে সে তাঁহার পাঠকক্ষের খোলা জানালা দিয়া তাহা দেখিয়া থাকিতে পারে; এই সন্দেহ আমার মনে বদ্ধমূল হইল। আমি কি উদ্দেশ্যে গার্ভিনের সঙ্গে সে সময় দেখা করিতে গিয়াছিলাম, তাহা অনুমান করা তাহার পক্ষে কঠিন হয় নাই, এইরূপই আমার ধারণা হইয়াছিল। সেই রিপোর্টখানি হস্তগত করিবার জন্য তাহার আগ্রহ কিরূপ প্রবল হইয়াছিল, তাহাও আমার অজ্ঞাত ছিল না। রিপোর্টখানির প্রতি তাহার প্রবল লোভ না হইলে সে তাহা একনজর দেখিবার জন্য আমাকে দুই শত পাউণ্ড পুরস্কার প্রদানের অঙ্গীকার করিবে কেন? যাহা হউক, আমি গার্ভিনের গৃহত্যাগের পর মনে মনে এই সকল কথার আলোচনা করিয়া মিঃ গার্ভিনকে আমার সন্দেহের কথা জানাইয়া সতর্ক করিবার জন্য পুনর্ব্বার তাঁহার বাড়ীতে ফিরিয়া আসিলাম।"

নানী

এই পর্য্যন্ত বলিয়া প্যারাডাইন নীরব হইল, এবং তাহার কথাগুলি শুনিয়া নিস্‌বেটের মনের ভাব কিরূপ হইল, তাহার কথাগুলি তিনি বিশ্বাস করিলেন কি না, ইহা বুঝিবার জন্য প্যারাডাইন মুখ তুলিয়া তাঁহার মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিল। কিন্তু সে দেখিল, নিস্‌বেটের মুখকান্তি যেন নিদাঘাপরাহ্নের বিদ্যুদ্‌গর্ভ মেঘের ন্যায় গম্ভীর, এবং তাঁহার ভ্রুকুটিকুটিল নেত্রে অবিশ্বাসের ছায়া পরিস্ফুট। প্যারাডাইন বুঝিতে পারিল—নিস্‌বেট তাহার কথা বিশ্বাস করেন নাই। যে আশায় সে তাঁহার নিকট আসিয়াছিল, তাহা সম্পূর্ণ বিফল হইবে। প্যারাডাইন তাঁহার স্ফুরিত অধরে অবজ্ঞা, তাচ্ছীল্য এবং বিরাগ অঙ্কিত দেখিল।

কিন্তু প্যারাডাইন সত্য কথা বলিবার সঙ্কল্প করিয়াই নিস্‌বেটের সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছিল। মনিবের মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া তাহার মন নিরাশায় পূর্ণ হইলেও সে বলিতে লাগিল, "আমি দ্বিতীয়বার মিঃ গার্ভিনের বাড়ীতে উপস্থিত হইয়া দরজায় ঘণ্টাধ্বনি করিলাম তাঁহার সাড়া না পাইয়া গলির ভিতর দিয়া তাঁহার খিড়কীর বাগানের দিকে চলিলাম। তাঁহার ঘরের সেই দিকের জানালা খোলা ছিল; আমি সেই জানালার বাহির হইতে মুখ বাড়াইয়া ঘরের ভিতর যে লোমহর্ষণ দৃশ্য দেখিলাম, তাহা দেখিয়াই আমার মূর্চ্ছার উপক্রম হইল। দেখিলাম, তাঁহার অসাড়দেহ ঘরের মেঝের উপর পড়িয়াছিল; দেহে প্রাণ ছিল না। বুঝিলাম, তিনি সেই স্থানে আক্রান্ত হইয়া নিহত হইয়াছিলেন।"

প্যারাডাইন এই পর্য্যন্ত বলিয়া নীরব হইল। তাহার আর কোন কথা বলিবার ছিল না। তাহার যাহা কিছু অপরাধ, তাহার কোন অংশ গোপন না করিয়া সমস্তই সে তাহার মনিবের নিকট প্রকাশ করিল। সে মিথ্যা কথা একটিও বলে নাই, কোনও কথা অতিরঞ্জিত করে নাই। তাহার অপরাধ সে সরলভাবে স্বীকার করিল। নিস্‌বেট কি তাহার অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন, না, তাহার প্রতি কঠোর দণ্ডের ব্যবস্থা করিবেন? প্যারাডাইন তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া নিস্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া রহিল।

নিস্‌বেট তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে প্যারাডাইনের মুখের দিকে চাহিয়া নড়িয়া চড়িয়া চেয়ারে সোজা হইয়া বসিলেন। তাহার পর নীরস স্বরে বলিলেন, "তুমি কি সত্যই আশা কর, তোমার এই আশ্‌মানী কেচ্ছা আমি বিশ্বাস করিব? যদি তোমার এইরূপ ধারণা হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমাকে স্বীকার করিতে হইবে যে, তুমি আমাকে একটি নিরেট গাধা বলিয়াই সিদ্ধান্ত করিয়া রাখিয়াছ। কিন্তু সত্যই আমি গর্দ্দভ নহি; আমার কাণ্ডজ্ঞান আছে, সত্য মিথ্যা বুঝিবারও শক্তি আছে। সত্য মিথ্যা মিশাইয়া যে গল্প রচিত হয়, তাহার কতটুকু সত্য, এবং তাহার কোন্ অংশ মিথ্যা, তাহা নিরূপণ করা আমার পক্ষে কঠিন নহে।

"শোন প্যারাডাইন, তুমি মহাজনের নিকট টাকা কর্জ্জ করিয়াছিলে, তাহা আমি জানিতাম না, এরূপ মনে করিও না; সে সংবাদ আমি পাইয়াছিলাম। গত কল্য মিঃ ফারমিন আমাকে যে পত্র লিখিয়াছিল, সেই পত্রে সে তোমার দেনার কথা আমাকে জানাইয়াছিল। সুতরাং তুমি তোমার গল্পে তোমার ঋণ সম্বন্ধে যে সকল কথা বলিলে, তাহা যে সত্য, এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ। এতদ্ভিন্ন, তুমি ঘুসের লোভে আরানা স্বর্ণক্ষেত্রের রিপোর্ট চুরি করিয়াছিলে, ইহাও সত্য ঘটনা; এবং তাহাও আমি বিশ্বাস করিয়াছি। কিন্তু তাহার পর যে সকল কথা বলিলে, তাহা নির্ভেজ মিথ্যা; তাহাতে এক বিন্দু সত্য নাই। এই মিথ্যা কথাগুলি সত্যের সহিত মিশাইয়া গল্পটিকে এরূপ কৌশলে গড়িয়া তুলিয়াছ, এবং এরূপ দক্ষতার সঙ্গে বিবৃত করিলে যে, তাহা শুনিয়া আমারই তাক লাগিয়া গিয়াছিল! এক একবার মনে হইতেছিল, হয় ত তাহার মধ্যে কিছু কিছু সত্যের বুক্‌নী থাকিতেও পারে; কিন্তু মিথ্যা কথাকে সত্যের আকার দান করিয়া তাহা সত্য বলিয়া প্রতীতি জন্মাইতে হইলে যেরূপ চাতুর্য্যের প্রয়োজন, যেরূপ সুতীক্ষ্ণ স্মৃতিশক্তি থাকা প্রয়োজন, তাহা তোমার নাই; এই জন্য তুমি যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও আমাকে প্রতারিত করিতে পার নাই; বিশেষতঃ তোমার ঐ সকল কথা যে মিথ্যা, তাহার প্রমাণও কিছু কিছু পাইয়াছি। সেই সকল প্রমাণ বর্ত্তমানে, তোমার মিথ্যা কথাগুলি কি করিয়া সত্য বলিয়া স্বীকার করি? নিজের জ্ঞানবুদ্ধি উড়াইয়া দিয়া তোমার মিথ্যা রচনাকে সত্য বলিয়া স্বীকার করিব, আমাকে ততখানি নির্ব্বোধ মনে করিলে আমার প্রতি অবিচার করা হইবে, প্যারাডাইন।"

প্যারাডাইন আতঙ্কাভিভূত হৃদয়ে, বিস্ময়-বিস্ফারিতনেত্রে

নিস্‌বেটের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। সে নিস্‌বেটের এই সকল কথার মর্ম্ম বুঝিতে পারিল না; ইহা দুর্ব্বোধ্য রহস্য বলিয়াই তাহার ধারণা হইল।

নিস্‌বেট তাহাকে হতবুদ্ধির ন্যায় বিহ্বল ভাবে চাহিয়া থাকিতে দেখিয়া গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "গত শনিবার পশ্চিম-আফ্রিকার ডাক আসিলে ডাক-পিয়ন তাহা বিলি করিবার জন্য অপরাহ্নে যখন আমাদের আফিসে আসিয়াছিল, মিঃ গার্ভিন সেই সময় আফিসে উপস্থিত ছিলেন, এ কথা তুমি গোপন করিয়াছ; কিন্তু ইহা সম্পূর্ণ সত্য। কারণ, আমি তাঁহাকে সেই সময় আফিসে উপস্থিত থাকিয়া সেই ডাক গ্রহণ করিবার জন্য টেলিফোনে আদেশ করিয়াছিলাম। তোমার গল্প শুনিয়া মনে হয়, তিনি আমার সেই আদেশ অগ্রাহ্য করিয়া আফিস বন্ধ হইলে অন্যান্য কর্ম্মচারীর ন্যায় বাড়ী চলিয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু ইহা কি সম্ভব? তিনি আফিসে উপস্থিত থাকিয়া আমার আদেশ পালন করিলে তোমার গল্পটির অবশিষ্টাংশ কিরূপে সত্য হইতে পারে? মিঃ গার্ভিন সেই জরুরী রিপোর্ট আফিসে রাখিতে ভরসা না পাওয়ায় তাহা উইনগেট্‌সএ তাঁহার নিজের বাড়ীতে লইয়া গিয়াছিলেন; কারণ, তিনি জানিতেন, যদি উহা আফিস হইতে অপহৃত হয়, তাহা হইলে সেজন্য তাঁহাকেই দায়ী হইতে হইবে। তুমি দেখিলে, মিঃ গার্ভিন ঐরূপ করায় তোমার দুই শত পাউণ্ড ঘুস মাঠে মারা গেল! তোমার মুখের গ্রাস হাত-ছাড়া হইল। কিন্তু উৎকোচের লোভ ত্যাগ করিতে না পারিয়া তুমি তাঁহার অনুসরণ করিলে, তাঁহার বাড়ীর কোনও অংশে লুকাইয়া থাকিয়া দেখিলে, রিপোর্টখানা তিনি কোথায় রাখিলেন। তিনি তাহা কোথায় রাখিয়াছিলেন, তাহা যে তুমি দেখিয়াছিলে, ইহা তুমি আমার নিকট স্বীকার করিয়াছ। তাহার পর তাঁহার অজ্ঞাতসারে তাঁহাকে আক্রমণ করিয়া হত্যা করিয়াছ, এবং রিপোর্টখানি চুরি করিয়া আনিয়া টাকার লোভে যে নরপিশাচের হস্তে প্রদান করিয়াছ, সে সেই রিপোর্টের সাহায্যে আমাদের সর্ব্বনাশ করিয়াছে। তোমার মিথ্যা গল্প অপেক্ষা এই সত্য ঘটনা যে অধিকতর বিশ্বাসযোগ্য এবং স্বাভাবিক, ইহা কি কোন বিচারক অস্বীকার করিতে পারিবেন?"

নিস্‌বেটের কথা শুনিয়া প্যারাডাইনের সংযম, সহিষ্ণুতা বিলুপ্ত হইল; সে উত্তেজিত স্বরে বলিল, "মিথ্যা কথা, এ কথা সম্পূর্ণ মিথ্যা। আপনি আমার মনিব হইলেও আমি অসঙ্কোচে বলিব, আপনি মিথ্যাবাদী। জানি না, ইহা আপনার ভ্রম কি স্বেচ্ছাপ্রণোদিত মিথ্যা উক্তি। আপনার কথা সত্য হইলে সেই দুই শত পাউণ্ড আমার হস্তগত হইত, এবং সেই টাকায় ফার্মিনের ঋণ সুদে-আসলে পরিশোধ করিতে পারিতাম। কিন্তু আপনি জানেন, আপনি স্বীকারও করিয়াছেন—আমি ফার্মিনের ঋণ পরিশোধ করিতে পারি নাই।"

নিস্‌বেট ক্রোধে কাঁপিতে কাঁপিতে কঠোর স্বরে বলিলেন, "আমি মিথ্যাবাদী? আমার একটা নগণ্য ভৃত্যের মুখে এ কথা অদ্ভুত শুনায় বটে! দেখিতেছি, তোমার স্পর্দ্ধার সীমা নাই; কিন্তু যে নরপিশাচ যৎসামান্য অর্থের লোভে নরহত্যা করিতেও কুণ্ঠিত নহে, সে জিহ্বা সংযত করিতে শিখিবে—ইহা কে প্রত্যাশা করিতে পারে?"

নিস্‌বেটের চেয়ারের পশ্চাতে যে পর্দ্দা প্রসারিত ছিল, নিস্‌বেট মাথা ঘুরাইয়া সেই পর্দ্দার দিকে চাহিয়া বলিলেন, ডিটেক্টিভ সার্জ্জেণ্টরা, তোমরা যাহা শুনিতে চাহিয়াছিলে, অদৃশ্য থাকিয়া তাহা সমস্তই শুনিয়াছ; এখন আমার সম্মুখে আসিয়া তোমাদের কর্ত্তব্য পালন কর।"

নিস্‌বেটের কথা শুনিয়া প্যারাডাইন আত্মরক্ষার জন্য সতর্ক হইবার পূর্ব্বেই পুলিসের সার্জ্জেণ্ট-বেশধারী দুই জন লোক পর্দ্দা ঠেলিয়া প্যারাডাইনের সম্মুখে লাফাইয়া পড়িল; এবং তাহাদের এক জন প্যারাডাইনের স্কন্ধ স্পর্শ করিয়া কঠোর স্বরে বলিল, "জন প্যারাডাইন, গত ৬ই সেপ্টেম্বর শনিবার রাত্রে উইনগেট্‌সএর প্রিটোরিয়া ক্রেসেণ্ট-নিবাসী হেনরী গার্ভিনকে ইচ্ছাপূর্ব্বক হত্যা করিয়াছ বলিয়া তোমাকে গ্রেপ্তার করিলাম। আমি তোমাকে সতর্ক করিবার জন্য বলিতেছি, তুমি এখন যে সকল কথা বলিবে, তাহা তোমার বিরুদ্ধে প্রমাণস্বরূপ ব্যবহৃত হইতে পারিবে।"

দ্বিতীয় সার্জ্জেণ্ট পকেট হইতে হাতকড়ি বাহির করিয়া প্যারাডাইনকে শৃঙ্খলিত করিতে উদ্যত হইল।

[ক্রমশঃ

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়।
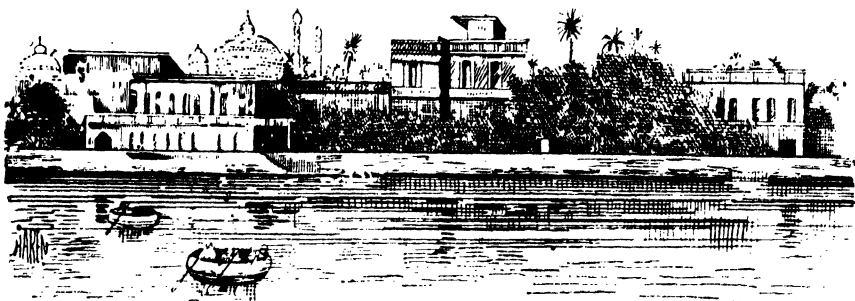
স্পেন

স্পেনে এখন ঘরোয়া যুদ্ধ বাধিয়াছে। এই যুদ্ধ উপলক্ষে সমগ্র য়ুরোপে সংগ্রামের কালানল জ্বলিয়া উঠিয়া বর্ত্তমান যান্ত্রিক সভ্যতার ধ্বংসসাধন করিবে কি না, তাহা বলা কঠিন। সে যাহা হউক, এই সময় স্পেন সম্বন্ধে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় "মাসিক বসুমতীর" পাঠকপাঠিকাগণের সম্মুখে উপস্থিত করা বাঞ্ছনীয়।
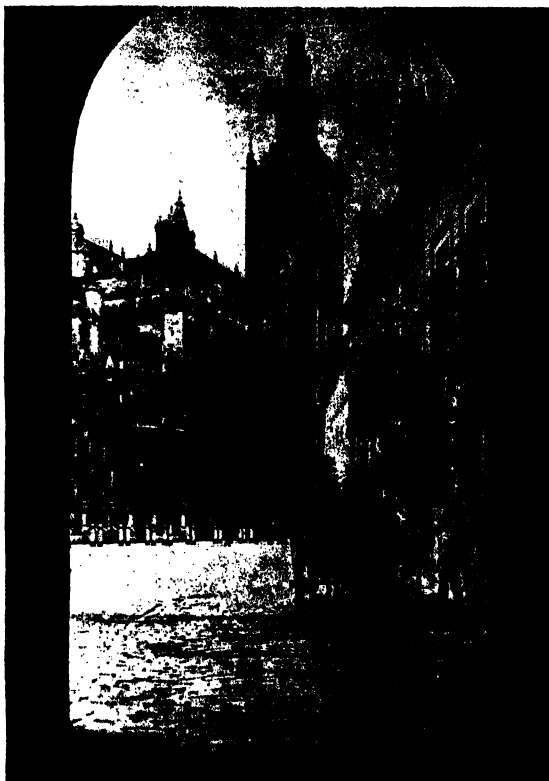
পূর্ব্বে গিরাল্ডা মুসলমান মসজিদ ছিল, অধুনা খৃষ্টীয় ধর্ম্মমন্দির

ফ্রান্স হইতে স্থলপথে যাত্রা করিলে পিরিনিজ পর্ব্বতমালা অতিক্রম করিতে হয়। পর্ব্বতমালা অতিক্রম করিয়া রেলপথ স্পেনে চলিয়া গিয়াছে।

পার্ব্বত্য নগরসমূহ কাষ্টাইল নামে পরিচিত। এই নগরগুলি যেমন চিত্তাকর্ষক, তেমনই চমৎকার। বার্গোস সহরের গির্জ্জার চূড়া যেন নীল গগনকে স্পর্শ করিতেছে। এল্ এস্কোরিয়াল সন্ন্যাসীদিগের দুর্গ, এখানে নৃপতিদিগের সমাধি বিরাজিত। ঈষৎ রক্তাভ পাহাড়ের সানুদেশে সান্ লরেঞ্জোর বিরাট মঠ যেন সগর্ব্বে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। সেগোভিয়ায় পাহাড়ের উপর প্রসিদ্ধ ধর্ম্মমন্দির, তাহার পাদনিম্নে সহরের নিম্নভাগ অবস্থিত। টলেডোর নিম্নদেশ দিয়া টেগস্ বা টাজো নদ বহিয়া চলিয়াছে।

মাদ্রিদ অপেক্ষাকৃত আধুনিক। এই সহরের রাজপথগুলি বিস্তৃত। পথে জনকোলাহল। সহরের মধ্যে চলচ্চিত্র এবং রঙ্গালয়-সমূহ ভিড় করিয়া

স্পেনীয় বুল ফাইটার

সেভিলার নারী

অশ্বসহ স্পেনীয় রাখালবালক

স্পেনের সুন্দরী

মনটিহার মোসোর মহিলাবৃন্দ

স্পেন—সালামান্কার বিয়ের কনে

পশ্চিম-স্পেনের তরুণী

অবগুণ্ঠনাবৃতা মন্টিহার মোসো মহিলা

রহিয়াছে। সহরের মধ্যে এল্‌প্রাডো যাদুঘর পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া পরিগণিত। এই যাদুঘরে বিশ্ব-বিখ্যাত চিত্রশিল্পী—এল্ গ্রেকো, মুরিলো, ভেলা-কোয়েজ, গোইয়া, জুরবারান্ প্রভৃতি স্পেনিস্, ফ্রেঞ্চ, ডচ, জার্ম্মাণ ও ইটালীয় চিত্রকরগণের চিত্রাবলী সংরক্ষিত আছে।

দক্ষিণাঞ্চলে কর্ডোবা সহর প্রথমেই দৃষ্টি আকৃষ্ট করে। প্রাচ্যভাবে গঠিত এই নগরের সৌন্দর্য্য অতুলনীয়। এখানে আরব মসজেদ সূর্য্যালোকে ঝলসিত হইয়া খৃষ্টান স্পেনকে যেন বিদ্রূপ-কশাঘাত করিতেছে!

সেভিলা সহরে বহু সভ্যতার নিদর্শন পাওয়া যাইবে। বহু জাতি, বহু সভ্যতার সহিত স্পেনের সংস্রব ঘটিয়াছিল। আইবেরিয়ান্, কেল্ট, বাস্‌ক্, ফিনি-সীয়ান্, কার্থেজীয়ান, গ্রীক, রোমান্, ভিসিগথ ও মুর। উল্লিখিত জাতি-সমূহ স্পেনে আসিয়াছিল। এখনও পর্য্যন্ত ঐ সকল জাতির ধারা স্পানিয়ার্ডদিগের মধ্যে বিস্ময়কররূপে আবিষ্কার করা যায়।

পিরিনিস্ উপত্যকাভূমির মহিলারা

ইহা ব্যতীত স্পেনিস্ বেদিয়া আছে। এরূপ বেদিয়া জাতি জগতের কোথাও নাই। সে বেদিয়া বটে, তথাপি ভবঘুরে বেদিয়া নহে। তাহাকে স্পেনীয় বলিতে হইবে, অথচ সে স্পেনীয় নহে। মধ্য-য়ুরোপের যাযাবর রোমানী বেদিয়ার মত তাহারা সহরে পর্ব্বতগুহায় বাস করিয়া থাকে। স্পেনের এই বেদিয়া জাতি যেন স্বতন্ত্রভাবে একা এই বিশ্বে দাঁড়াইয়া আছে। সকলে বলে, সহস্র বৎসরেও তাহাদের আচার-ব্যবহার, চালচলন, ভাবধারার কোনও পরিবর্ত্তন ঘটে নাই। জগতের কোনও বিষয়ে তাহারা কাহারও সহিত রফা করিতে রাজি নহে। তাহারা ভাবের আতিশয্যেই জীবন ধারণ করে—তাহাদের আত্মা পোষ মানে নাই, তাহারা যেমন উচ্ছৃঙ্খল, তেমনই আপনার ভাবে বিভোর।

স্পেনের প্রবীণ নাবিক

স্পেনের ধীবর

অনেক বেদিয়া ইতিহাসপ্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। বেদিয়া-বালিকার নৃত্য চরমোৎকৃষ্ট। যে সকল ভিখারী সাফল্যলাভ করিয়াছে, তাহারা সকলেই বেদিয়া।

কেহ যদি প্রশ্ন করেন, স্পেনের স্বরূপ কি? ইহাকে দেখিলে বিংশ শতাব্দীর প্রতিবাদ বলিয়া মনে হইবে। আবার ইহা আধুনিক। স্পেন অত্যন্ত পুরাতনপন্থী, আবার প্রগতিবাদীও বটে। অনেক বিষয়ে স্পেন সভ্য জাতির বহু পশ্চাতে পড়িয়া আছে বলিয়া মনে হইবে, ইহাকে প্রাচ্য দেশ বলিয়াও ভ্রম জন্মিবে। স্পেনকে পুরুষও বলা যায়, আবার ইহাকে নারীভাবাত্মক বলিলেও ভুল হইবে না। স্পেন যেন বিমর্ষতার দ্যোতক, আবার মনে হইবে, না, ইহাতে আনন্দোচ্ছ্বাস অপরিমিতভাবেই রহিয়াছে। যাহাই বলা হউক না কেন, স্পেন দেখিলে মনে হইবে না, ইহা নীরস স্থান—সৌন্দর্য্য ইহাতে ওতপ্রোত হইয়া রহিয়াছে।

সেভিলা সহর যেমন দেখিতে বিচিত্র, তেমনই মধুর ইহার সূর্য্যালোক। কিন্তু এখানে যখন বারিপাত হয়, তখন আর থামিতে চাহে না। হয় ত এক পশলা বৃষ্টি হইয়া আকাশ পরিষ্কার হইয়া গেল, পরমুহূর্ত্তেই ঘন মেঘজাল আকাশ ছাইয়া ফেলিয়া মুষলধারে বৃষ্টি হইতে লাগিল। রাজপথসমূহ জলে ডুবিয়া গেল—পথে শুধু কাদা ও জল। সে সময়ে নগরবাসীদিগের বিরক্তির সীমা থাকে না। এমনই ভাবে সপ্তাহব্যাপী বর্ষণ চলিতে থাকে। তার পর সহসা আকাশ নির্ম্মল হইয়া আবার প্রদীপ্ত সূর্য্যালোক দেখা দিবে।

স্পেনের পল্লীবাসী

বৃষ্টির পরই পর্ব্বোৎসবের দিন. পূর্ণিমার চাঁদ আকাশে দেখা দিবার সঙ্গে সঙ্গে কমলা লেবুর ফুল গাছে গাছে দেখা দিবে। বাতাস লেবু-ফুলের সুমিষ্ট গন্ধে

ভারী হইয়া উঠিবে। এরূপ ব্যাপার অন্যত্র নাই।

পর্ব্ব উপলক্ষে সেভিলার প্রত্যেক ধর্ম্মমন্দির হইতে দারুনির্ম্মিত বৃহদাকার খৃষ্ট ও খৃষ্টজননীর মূর্ত্তি বাহির হইয়া আবার নগর-প্রদক্ষিণের পর স্ব স্ব ধর্ম্মমন্দিরের বেদীতে প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকে।

ঐ মূর্ত্তি একটা বৃহৎ পাদপীঠের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়। মূর্ত্তির অঙ্গে মূল্যবান্ পরিচ্ছদ—মণিমুক্তা-খচিত সে পরিচ্ছদ চক্ষু ঝলসাইয়া দেয়। বেদীর চারিদিকে পাঁচ ছয় ফুট দীর্ঘ বাতী শত শত সংখ্যায় জ্বলিতে থাকে। কোন কোন মূর্ত্তির উপরে মূল্যবান্ রত্নখচিত চন্দ্রাতপ শোভা পাইতে থাকে।

যে পাদপীঠের উপর মূর্ত্তিগুলা সংস্থাপিত হয়, তাহা নগ্নপদ বাহকদিগের দ্বারা ধীরে ধীরে বাহিত হইয়া থাকে। বাহকগণ সেই গুরুভার পদার্থ বহন করিয়া গলদ্‌ঘর্ম্ম হইয়া উঠে—সময়ও ইহাতে অনেক লাগে।

ধীবর ও ধীবর-গৃহিণীরা

পথে যখন শোভাযাত্রা বাহির হয়, তখন তাহার পুরোভাগে ও পশ্চাতে পরিচ্ছদে ভূষিত বহু লোক থাকে। তাহাদের মস্তকে কোণাকার শিরোভূষণ-সমন্বিত অবগুণ্ঠন থাকে। প্রত্যেকেরই বিভিন্ন রঙ্গের পোষাক। প্রত্যেকেরই হাতে ছয় ফুট দীর্ঘ বাতী—বাতাসে বাতীর আলোক আন্দোলিত হইতে থাকে।

শোভাযাত্রার পুরোভাগে এক জন লোক একটি বড় ধুনুচী ধরিয়া থাকে; তাহাতে সুগন্ধ দ্রব্য ইন্ধনস্বরূপ ব্যবহৃত হইতে থাকে। সহস্র সহস্র দর্শক শোভাযাত্রার অনুবর্ত্তী হইয়া ভক্তিভরে সে দৃশ্য উপভোগ করিতে থাকে।

সেভিলার নারীরা রাজপথে নৃত্য করিতেছে

ডবল্‌ ল্যাংডন কিন নামক জনৈক মার্কিণ চিত্রকর সেভিলায় চিত্রাঙ্কনকার্য্যব্যপদেশে গমন করিয়াছিলেন। তিনি উল্লিখিত উৎসব দর্শন করিবার সংকল্প করেন। পথে আসিয়া উৎসব দেখিতেছিলেন, এমন সময় তিনি জানিতে পারিলেন যে, বেদিয়ারা তাহাদের ধর্ম্মমন্দির হইতে বাহির হইয়া গোয়াডল কুইভার পার হইয়া আসিতেছে। উহা শুনিয়া তাঁহারা নদীর ঘাটে গমন করেন।

পাহাড়ের ধারের কুটীরশ্রেণী

বিদ্যমান। নিম্নে নদীর জলে চাঁদের আলো পড়িয়াছিল, সে দৃশ্য অতি মধুর।

তিনি দেখিলেন, বহুদূরে আলোক-শিখা চলিতেছে, হেলিতেছে। তখন বুঝা গেল, বেদিয়ারা প্রজ্বলিত বর্ত্তিকা সহ আসিতেছে। অতি মন্থরগতিতে তাহারা আসিতেছিল। শান্ত জল-স্রোতের উপর ছায়া ও আলোর চমৎকার লীলা তখন চলিতেছিল। নদীর জলে যেন সোনা গলিয়া একটা স্বর্ণ রেখা টানিয়া দিয়াছে। অত লোক আসিতেছিল, অথচ তেমন গোলমাল নাই।

চিত্রকর অন্যান্য সঙ্গীর সহিত বেদিয়াদিগের পশ্চাতে চলিতে লাগিলেন। জনতাও ক্রমশঃ বাড়িতে লাগিল। এই ভাবে চলিতে চলিতে জনতার সহিত তাঁহারা এক স্থানে উপনীত হইলেন। সে স্থানে দর্শকের অসম্ভব ভিড়।

পার্কের এক পার্শ্বে একটা বৃহৎ ধর্ম্মমন্দির। অপর তিনটা দিকে চূণকাম করা অনতি উচ্চ অট্টালিকা-সমূহ দণ্ডায়মান। রাজপথের প্রদীপ্ত আলোকশিখা চারিদিক সমুদ্ভাসিত করিয়া তুলিয়াছিল। সেই ক্ষুদ্র উদ্যানমধ্যে বহু সহস্র দর্শক সমবেত হইয়াছিল। সকলেই শান্তভাবে আনন্দ করিতেছিল।

তখন রাত্রি ৩টা। গির্জ্জার ঘড়ীতে সুমধুর স্বরে তিনটা বাজিয়া গেল। জনতার মধ্য হইতে একটা মৃদুশব্দ হইবার পর সম্পূর্ণ নীরবতা বিরাজ করিতে লাগিল। ঘটিকাযন্ত্রের শেষ শব্দ বাতাসে বিলীন হইতে না হইতেই, একসঙ্গে সমস্ত আলোক নির্ব্বাপিত হইল। সহস্র সহস্র দর্শকের উপর তখন চাঁদের আলো পড়িয়াছে। গির্জ্জাঘরের প্রকাণ্ড দ্বার তখনই খুলিয়া গেল। সেই সময় দেওয়ালে সোনালী বাতীর আলোকধারা নির্গত হইতেছে।

বর-কনে বিবাহের যৌতুক গ্রহণ করিতেছে

তখন পূর্ণিমা রজনী। চন্দ্রালোকে চারিদিক হাসিতেছে। নদীর উপর একটা প্রাচীন সেতু—বহু খিলান সেই সেতুতে

একটী অলিন্দ-বেষ্টিত বাতায়ন-পথে ঘণ্টার সুস্পষ্ট ধ্বনি

পল্লীনারীরা সঙ্গিসহ অশ্বপৃষ্ঠে চলিয়াছে

শাবলধারী পুরুষ ও নারী—নারীদের শ্বেত শিরোভূষণ

পিরিনিস পর্ব্বত পার হইয়া স্পানিসরা আসিতেছে

নির্গত হইয়া রাত্রির বাতাসে নিস্তব্ধ জনসমূহের দিকে ছুটিয়া আসিল। সমগ্র সেভিলা যেন সেই শব্দ শুনিবার জন্য উৎকর্ণ হইয়া রহিয়াছে। সে শব্দটি প্রার্থনাজনিত।

প্রার্থনার শেষ শব্দ বাতাসে মিলাইয়া যাইতে না যাইতেই বজ্র-নির্ঘোষে জনসমুদ্র হইতে আনন্দের বার্ত্তা ঘোষিত হইল। সমবেত জনতা বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল, সকলেরই কণ্ঠ হইতে চীৎকার ও নানাবিধ শব্দ বহির্গত হইতে লাগিল।

আধুনিকা স্পেনীয় তরুণী

আবার আলোক জ্বলিয়া উঠিল। তখন জনতা ধীরে ধীরে সে স্থান ত্যাগ করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিল।

[ক্রমশঃ।

শ্রীসরোজনাথ ঘোষ

পাহাড়ে ঝড়

১৩

মানুষ যখন সুখে থাকে, তখন তাহার মনই নিত্য নূতন আনন্দের উৎসের সন্ধান পায়। সরলকুমারের ও মণিকার তাহাই হইল। তাহারা পরস্পরকে লইয়াই সুখী।

কিন্তু সেই সুখের ও আনন্দের মধ্যে তাহারা কল্পনা করিতে পারে নাই, সংসারে সুখের সঙ্গে দুঃখও থাকে এবং কলিকাতাতেই তাহাদিগের জন্য হতাশা ও বিস্ময় সঞ্চিত ছিল। পিতার বন্ধুদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইয়াই সরলকুমার তাহা বুঝিল এবং সে বুঝিল বলিয়াই মণিকাও বুঝিল; কারণ, মণিকার নিকট সে কোন বিষয় গোপন রাখিত না।

সরলকুমার সাক্ষাৎ করিতে যাইয়া পিতৃবন্ধুদিগের অধিকাংশেরই নিকটে আশানুরূপ ব্যবহার পাইল না। তাঁহাদিগের মধ্যে কন্যাদায়গ্রস্ত কেহ কেহ প্রথমে তাহাকে যে আদর দেখাইয়াছিলেন, সে বিবাহিত জানিতে পারিবার সঙ্গে সঙ্গেই তাহার ঔজ্জ্বল্য ম্লান হইয়া গেল। সে হিন্দুমতে বিবাহ করে নাই জানিয়া কেহ কেহ মুখ গম্ভীর করিলেন। এই অবস্থায় সে বৃদ্ধ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইবে কি না, ভাবিল এবং ভাবিল বলিয়াই তাঁহার নিকট যাইতে বিলম্ব হইল। চট্টোপাধ্যায় মহাশয় যখন আফিসে 'বড় বাবু', তখন তাহার পিতা চাকরীতে প্রবেশ করেন—তাঁহার অধীনে কায শিখেন। তিনি চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে "দাদা" বলিতেন এবং সেইজন্য সরলকুমার তাঁহাকে "জ্যেঠামহাশয়" ও তাঁহার পত্নীকে "জ্যেঠাইমা" বলিত। তাঁহারা স্বামি-স্ত্রী হিন্দুর আচার-ব্যবহার নিষ্ঠা সহকারে পালন করিতেন। তিনি হয়ত তাহার মণিকাকে বিবাহে বিরক্ত হইবেন মনে করিয়া সে কয় দিন চিন্তার পর এক দিন প্রাতে নিতান্ত কুণ্ঠিতভাবে—আদর পাইবে না স্থির করিয়া, চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের গৃহে গমন করিল। তিনি বাহিরে বৈঠকখানার সম্মুখে বারান্দায় বসিয়া সংবাদপত্র পাঠ করিতেছিলেন—সরলকুমারকে দেখিয়া মুখ তুলিলেন এবং চশমা খুলিয়া টেবলে রাখিলেন। সরলকুমার প্রণাম করিল; কিন্তু তাঁহাকে স্নাত দেখিয়া তাঁহার চরণ স্পর্শ করিবে কি না, স্থির করিতে পারিল না। তাহাকে তাহা স্থির করিবার সময় না দিয়া বৃদ্ধ উঠিয়া দাঁড়াইয়া "এস, বাবা, এস!" বলিয়া তাহাকে বুকে টানিয়া লইলেন এবং তাহাকে বসিতে বলিবার পূর্ব্বেই—"বাবা, এত দিন এসেছ—একবার বুড়া জ্যেঠামশাইকে আর জ্যেঠাইমা'কে দেখতে আসতে পার নি! আমরা আর ক' দিন!" বলিয়া অনুযোগ করিলেন।

আপনার কার্য্যের সমর্থনচেষ্টা করিতে সরলকুমারের প্রবৃত্তি হইল না। বৃদ্ধের স্নেহের পরিচয়ে সে অগাধ তৃপ্তি অনুভব করিতেছিল। সে বলিল, "আমার অপরাধ হয়েছে।"

"আরও বড় অপরাধ করেছ, এসেছ—অথচ বৌমা'কে নিয়ে আসনি।"

কুণ্ঠিতভাবে সরলকুমার বলিল, "আমি সাহস করিনি —কারণ, হিন্দুমতে—"

তাহার কথায় বাধা দিয়া বৃদ্ধ বলিলেন, "আমি বেণীর কাছে সব শুনেছি। চল—আগে তোমার জ্যেঠাইমাকে প্রণাম ক'রে আসবে। আমি তোমার বড় অপরাধটা ক্ষমা করলেও তিনি করবেন কি না, জানি না। শাশুড়ীর বৌ'র উপর অভিমান—মা'র ছেলের উপর অভিমান—বুড়া হ'লেও যায় না।" বলিয়া তিনি হাসিতে লাগিলেন।

"কই গো! কোথায়?"—বলিতে বলিতে বৃদ্ধ বাড়ীর ভিতরের অংশে প্রবেশ করিলেন—সরলকুমার সঙ্গে গেল।

গৃহিণী তখন পূজা শেষ করিয়া ভাণ্ডার-ঘরে যাইবার আয়োজন করিতেছিলেন। তিনি "কি?" বলিতেই বৃদ্ধ বলিলেন, "এই যে, তোমার সরল এসেছেন। এত দিনে ছেলের আমাদের মনে পড়ল!"

বৃদ্ধা ফিরিয়া আসিলেন। সরলকুমার দেখিল, কয় বৎসরে পরিবর্ত্তনের মধ্যে কেবল তাঁহার কেশরাশি শুভ্র হইয়াছে। মধ্যস্থলে বিভক্ত কেশরাশির মধ্যে চওড়া সিন্দুরের রেখা—পরিধানে চওড়া লাল পাড় গরদের শাড়ী—আর মুখে সেই পরিচিত স্নিগ্ধ মধুর হাসির ভাব!

সরলকুমার প্রণাম করিয়া বলিল, "জ্যেঠাইমা, আমি কিন্তু পা'র ধূলা নেব।" সে তাঁহার চরণ স্পর্শ করিল।

বৃদ্ধ বলিলেন, "বৌমাকে কেন নিয়ে এলে না, জিজ্ঞাসা করলে বললে কি জান?—ও হিন্দুমতে বিয়ে করে নি বলে যেন ও অস্পৃশ্য হয়ে গেছে!" তিনি সরলকুমারকে বলিলেন, "চাকরী শেষ ক'রে এসেছি, কিন্তু এখনও লাট-বাড়ীতে নিমন্ত্রণে লাটপত্নী সেকহ্যাণ্ড করলে আপনাকে অপবিত্র মনে করি না। আর বৌমা আমার বাড়ীতে এলেই বাড়ী অপবিত্র হ'বে? তোমরা ইংরেজি লেখাপড়া শিখেছ, কিন্তু দেশের আচার-ব্যবহারের স্বরূপ অধ্যয়ন কর নি; তাই বুঝ না—হিন্দুর 'অস্পৃশ্যতা' অহিন্দুর কল্পনা। পাতের অর্থাৎ খাবার বিচার আঁতের অর্থাৎ অন্তরের বিচার থেকে ভিন্ন।"

বৃদ্ধা বলিলেন, "কেমন আছ, বাবা? বৌমা কেমন আছেন?"

সরলকুমার "ভাল" বলিলে তিনি বলিলেন, "মিষ্টিমুখ না ক'রে যেন যেও না।"

সরলকুমার হাসিয়া বলিল, "কখন কি গেছি, জ্যাঠাইমা?"

"তা' যাওনি; কিন্তু, বাবা, তখন ত তোমার এ সঙ্কোচও ছিল না।"

বৃদ্ধ বলিলেন, "ওকে জব্দ করতে হ'বে। কাল সকালে গঙ্গাস্নান করতে যা'বার পথে বৌমাকে আশীর্ব্বাদ ক'রে যা'ব।"

সরলকুমার বলিল, "আপনারা কেন কষ্ট করবেন—আমি নিয়ে আসব।"

"কষ্ট! বাড়ী কি তোমার? আমার বাড়ী আমি যা'ব—তুমি তা'তে কিছু বলবার কে?"

বৃদ্ধা বলিলেন, "ছেলেমানুষ, অত সকালে কি উঠবে?"

সরলকুমার বলিল, "জ্যেঠাইমা, আমরা খুব সকালে উঠি।"

"বেশ। বেশ।"

বৃদ্ধ জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাড়ীর নম্বরটা কত?"

সরলকুমার উত্তর দিল, "১২"

"বাঃ! তা হ'লে সুভীর বাড়ীর দু'খানা বাড়ী পরেই।"

তিনি সরলকুমারকে বলিলেন, "আমাদের বড় মেয়ে দয়াময়ী—যা'কে তুমি 'বড়দি' বল—তারই মেয়ে সুভাষিণী।"

গৃহিণী বলিলেন, "বেশ হয়েছে, সর্ব্বদা যা'বে আসবে। বৌমা একা—মুখটি বুজে থাকতে ভাল লাগবে কেন? আর তিনি মামী—ওদের দেখবেন। ওরাও ত বাড়ীতে কেবল দুই যা', আমি পরিচয় করিয়ে দিয়ে আসব। দয়াময়ীও যে দিন মেয়ের বাড়ী যাবে, সে দিন ওবাড়ী হয়ে আসবে।"

"নিশ্চয়।"

"বাবা, তোমার বাপ-মার কথা মনে হ'লে এখনও আমরা চোখের জল রাখতে পারি না।"—বৃদ্ধার গলাটা ধরিয়া আসিল।

তিনি তাহার মাতাকে কিরূপ স্নেহ করিতেন, তাহা সরলকুমারের অজ্ঞাত ছিল না।

যখন নানা স্থানে লব্ধ ব্যবহারে হতাশাই সৃষ্ট হইয়াছিল, তখন এই নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ-দম্পতির স্নেহমধুর ব্যবহারে সরলকুমার ও মণিকা যে বিশেষ প্রীতিলাভ করিল, তাহা বলাই বাহুল্য।

চট্টোপাধ্যায় মহাশয় যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাই করিলেন—পরদিন প্রাতে গঙ্গাস্নানে যাইবার সময় সস্ত্রীক নাতিনীকে ও তাহার যা'কে সঙ্গে লইয়া সরলকুমারের গৃহে আসিলেন। বৃদ্ধ-বৃদ্ধা পূর্ব্বদিন অনেক বিবেচনা করিয়া স্থির করিয়াছিলেন, বালা দিয়াই বৃদ্ধা মণিকাকে দেখিবেন। সে বধূ, তাহার শাশুড়ী নাই। সেই বালা দিয়া তিনি মণিকাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন এবং সে প্রণাম করিলে তাঁহার দক্ষিণ হস্তে চিবুক স্পর্শ করিয়া তাহাকে আদর করিয়া বলিলেন, "বেঁচে থাক, মা আমার—চিরসুখী হও। তোমাদের আসবার দিনের সংবাদ পেলে আমিই এসে তোমাকে বরণ ক'রে নিতাম। তা' আমার দুষ্টু ছেলে সংবাদ দেয়নি।" তিনি সরলকুমারের জনক-জননীর কথার উল্লেখ করিয়া অনেক দুঃখ প্রকাশ করিলেন এবং সুভাষিণীকে ও তাহার যা' কনকলতাকে বলিলেন, "এই নতুন মামীর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়ে গেলাম; সর্ব্বদা মামামামীর খোঁজ নেবে—এখানে আসবে।"

তিনি মণিকাকে বলিলেন, "বৌমা, শুনেছি, তুমি বড় পণ্ডিতের মেয়ে; বেহাই মশাই তোমাকে খুব যত্ন ক'রে লেখাপড়া শিখিয়েছেন। ভালই করেছেন। এখন

সমাজের যে অবস্থা দাঁড়াচ্ছে, তা'তে ভগবান না করুন—মেয়েদেরও দরকার হ'লে, আপনাদের আর সংসারের ভার নিতে হ'তে পারে। বিশেষ ছেলেমেয়েদের শিক্ষার ভার তা'রা নিলে শিক্ষাও ভাল হ'বে—খরচও বাঁচ্‌বে। কালের সঙ্গে সঙ্গে ব্যবস্থা না বদলালে হয় না। ঘর-সংসার যেমন দেখ্‌তে হ'বে, ছেলে যেমন পালন করতে হ'বে, তেমনই কালের সঙ্গে সঙ্গে ব্যবস্থারও পরিবর্ত্তন করতে হ'বে।"

তাঁহারা চলিয়া যাইলে মণিকা সরলকুমারকে বলিল, "বাবা যে বলেন, প্রকৃত ধর্ম্মানুরক্তি মানুষের মনের বিস্তৃতি সাধন করে—সঙ্কীর্ণতা দূর করে, তা' বেশ বুঝা গেল।"

ইহার পর হইতে চট্টোপাধ্যায়-দম্পতি তাহাদিগের সহিত বিশেষ ঘনিষ্ঠতা করিতে লাগিলেন এবং সুভাষিণী ও কনকলতা প্রায়ই মণিকার কাছে আসিতে লাগিল। কনকলতা একটি পুত্র লাভ করিবার পর পড়া ছাড়িয়া দিয়াছিল, সুভাষিণী তখনও পড়িত। মণিকা উভয়কেই পড়াইবার ভার লইল এবং তাহাতে তাহাদিগের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা আরও বাড়িতে লাগিল।

রাজনীতিক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া তথায় সঙ্কীর্ণতা ও দলাদলি দেখিয়া সরলকুমার বিস্মিত ও ব্যথিত হইল। তখন দলাদলি যেন দেশ-সেবাকে বিদলিত করিতে উদ্যত হইয়াছে। শাসন-সংস্কারে প্রদত্ত অধিকার ভারতবাসীর গ্রহণের অযোগ্য বলিয়া ঘোষণা করিয়া যে দল ব্যবস্থাপক সভাসমূহ বর্জ্জন করিয়াছিলেন, তাঁহারাই "ভিতর হইতে সরকারকে আক্রমণ" করিবার নামে পুনরায় ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশের জন্য বিশেষ আগ্রহশীল হইয়াছিলেন। তাঁহারা যেরূপ দলাদলির সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহাদিগের দলভুক্ত না হইলে—তাঁহাদিগের মতই সর্ব্বথা অভ্রান্ত—না বলিলে, কাহারও পক্ষে ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশ যেমন দুঃসাধ্য তেমনই ব্যয়সাধ্য হইয়া উঠিয়াছিল। রাজনীতিক্ষেত্রে যে নূতন "কর্ত্তাভজার" দল সৃষ্ট হইয়াছিল, তাহাতে যোগ দিবার প্রবৃত্তি সরলকুমার অনুশীলন করিতে পারে নাই। তাহার যেন মনে হইতে লাগিল, তাহার শিক্ষা ও প্রকৃতি পারিপার্শ্বিক অবস্থায় কেবলই বিব্রত ও বিপন্ন হইতেছে।

এই অবস্থায় সে যদি রাজনীতিক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠালাভের বাসনা বর্জ্জন করিতে পারিত—যদি পারিবারিক জীবনে ও সাহিত্য-চর্চ্চায় যে সুখ তাহার পক্ষে সুলভ ছিল, তাহাতেই শান্তির ও তৃপ্তির সন্ধান করিত, তবে সে যে সুখী হইতে পারিত, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু যে স্থানেই প্রতিভা থাকে, সেই স্থানেই তাহার সঙ্গে গর্ব্ব থাকে। সেই গর্ব্বই তাহাকে পীড়িত করিতে লাগিল।

মণিকা পিত্রালয়ে অতি স্বল্পপরিসর পরিবেষ্টনে আপনাকে অভ্যস্ত করিয়াছিল—এখন তাহার নূতন জীবনই সে পরিবেষ্টন যথেষ্ট বিস্তৃত করিয়া দিয়াছিল এবং মহিলা-সমাজের কোন কোন জনহিতকর অনুষ্ঠানে সে কাযের প্রকৃত সুযোগ লাভ করিতে লাগিল। স্বামীর ভালবাসা পাইয়া এবং স্বামীকে ভালবাসিয়া সে হৃদয়ে তৃপ্তি লাভ করিত—অশান্তির কোন কারণ সে পাইত না।

সরলকুমারের বাল্যবন্ধুদের মধ্যে কেহ কেহ পুরাতন বন্ধুত্ব পুনর্গঠিত করিতেছিল এবং মধ্যে মধ্যে মণিকা যখন স্বামীর সহিত আগ্রায় পিতাকে দেখিতে যাইত, তখন তাঁহার উপদেশে সে যেন আনন্দের অফুরন্ত ভাণ্ডার লইয়া আসিত।

১৪

আট মাসের মধ্যে যখন বাঙ্গলো নির্ম্মাণ শেষ হইল, তখন মণিকার ও সরলকুমারের কি আনন্দ! সেখানিকে আগ্রার "ছোট সাহেবের" বাঙ্গলোর মত করিয়া সাজাইবার জন্য সরলকুমার বিশেষ যত্ন করিল এবং সাজান যে আরও ভাল হইল, তাহা বলাই বাহুল্য। দিল্লী, আগ্রা, মোরাদাবাদ, জয়পুর, ফরকাবাদ, কাশ্মীর প্রভৃতি স্থানের শিল্পজ পণ্য আনিয়া গৃহ সাজান হইল। আর গৃহসংলগ্ন উদ্যানের সৌন্দর্য্যসাধনেও যত্নের ত্রুটি হইল না। বাঙ্গালার—বিশেষ কলিকাতার ভূমি ও জলবায়ু গোলাপের পক্ষে আগ্রার ভূমি ও জলবায়ুর মত অনুকূল না হইলেও মণিকা গোলাপের বড় পক্ষপাতী বলিয়া যুক্ত-প্রদেশ হইতে বাছিয়া বাছিয়া গোলাপের "কলম" আনান হইল। যে দিন সেগুলি রোপণ করা হইল, সেই দিন সন্ধ্যার পর গৃহকার্য্য শেষ করিয়া আসিয়া মণিকা দেখিল, সরলকুমার

কি লিখিতেছে। সে যে তাহার পদশব্দ শুনিতে পাইল না, তাহাতেই মণিকা বুঝিতে পারিল, সে কবিতা রচনা করিতেছে। কৌতুহলবশে মণিকা মৃদুপদসঞ্চারে আসিয়া সরলকুমারের পশ্চাতে দাঁড়াইয়া তাহার রচনা পাঠ করিতে লাগিল :—

"এন না গাথিয়া মালা শুভ্র যূথিকায়,
পরিব না গলে ;—
সরস পরশে লাজে ম্লান হয়ে যায়—
মরে করতলে।
এন না চম্পক-কলি সোণার বরণ
শাখা হ'তে তুলি' ;
সে না শুনে ভ্রমরের প্রণয়-গুঞ্জন
হৃদয় আকুলি'।
বকুল থাকুক ফুটি' শাখা আলো করি'
সৌরভে—শোভায় ;
পবন-সঞ্চারে পড়ে বৃন্ত হ'তে ঝরি'—
ভূমিতে লুটায়।
এন না অপরাজিতা—ম্লান রবি-করে,
কুটজ কোমল,
শেফালী—তপনে হেরি' সরমে শিহরে—
খুঁজে ভূমি-তল।
এন না কমলদল—দিবসের সনে
ম্লান হয়ে যায়,
কুমুদ—প্রভাত হেরি' সলিল-শয়নে
মিশাইতে চায়।
আনিও গোলাপ—প্রেমগন্ধে ঢলঢল—
রক্ত অভিমানে।
অভিমানহীন প্রেম কোথা সমুজ্জ্বল
সুখদীপ্তি আনে ?

মণিকা আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না ; বলিল, "আচ্ছা, আমি কালই গোলাপ গাছ সব তুলে ফেল্‌ব !"

সরলকুমার বামবাহু বাড়াইয়া মণিকাকে নিকটে টানিয়া আনিয়া বলিল, "তুমি যে সেই গোবিন্দ অধিকারীর যাত্রার কথা মনে ক'রে দিলে।"

"সে কি ?"

"সেকালে বাঙ্গালায় কৃষ্ণরাধার লীলাবিষয়ক অনেক যাত্রা গান হ'ত। গোবিন্দ অধিকারীর যাত্রার একটি পালায় ছিল, রাধা এক দিন কৃষ্ণের উপর অভিমান ক'রে বললেন, তিনি কালো রূপ আর দেখবেন না। আদেশ হ'ল—কুঞ্জে আর কোকিল, ভ্রমর আসতে পারবে না—এমন কি, সখীরা আর নীল কাপড়ও পরতে পারবে না। বৃন্দা সখী ছিল সবার চেয়ে দুষ্ট। সে বললে, 'রাই, তোমার মাথার চুল যে কালো !' রাধা বললেন, মাথা মুড়িয়ে ফেলবেন। বৃন্দা বলল, 'আর চোখের তারা ?' রাধা না ভেবেই বললেন, চোখ উপড়ে ফেলবেন। তখন বৃন্দা বললে, 'তা' হ'লে যে কানা হয়ে যাবে ?' রাধা ভুলে গেলেন—কৃষ্ণের এক নাম —কানাই। তিনি বললেন, 'আমার কানাই ভাল।' বৃন্দা তখন হাসিয়া বলিল, 'কানাই যদি ভাল, তবে আর অভিমান কেন ?' তুমি ত গোলাপ গাছ তুলে ফেলবে, কিন্তু নিজের মুখখানা কি আয়নায় দেখা বন্ধ করেছ ? টেনিসনের 'মডের' কথা মনে আছে ত—

'পশ্চিমাকাশে গোলাপী বরণ,
দক্ষিণাকাশে গোলাপী কিরণ ;
দুই গণ্ডে তার গোলাপ মোহন—
গোলাপে উপমা যে চারু আনন।'

কি সুন্দর !"

মণিকা বলিল, "বাবার ঐ কবিতা পড়া আমি কখন ভুল্‌তে পারব না।"

"তাঁর কোন্ কবিতা পড়া ভুলা যায় ?"

"কবিতা লিখতে বাধা দিলাম।"

সরলকুমার মণিকাকে আরও কাছে টানিয়া লইয়া বলিল, "নিজ্জীব কবিতার চাইতে সজীব কবিতা ঢের ভাল—ঢের বাঞ্ছিত।"

"কিন্তু সজীব কবিতার আদর ক'দিন ? হায়েনের সেই কথা—

নিদাঘ-গোলাপী আভা শোভিছে ও গণ্ড'পরে,
শীতের শীতল ভাব জাগে শুধু ও অন্তরে ;
এ ভাব র'বে না—যা'বে বর্ষ পরে বর্ষ য'বে—
ও গণ্ডে আসিবে শীত—ও হৃদে নিদাঘ র'বে।'

তাই কি নয় ?"

"ও-বিষয়ে আমি ওমর খৈয়ামের মতাবলম্বী—
গৌরবের তরে কেহ ফেলে দীর্ঘশ্বাস,—
কেহ খুঁজে মৃত্যুপারে স্বরগ-আবাস
নগদ যা কিছু পাও
তাই সাথে নিয়ে যাও
ধারে কায বৃথা বলি' গণি—
কি কায শুনিয়া কোথা দূরে উঠে দুন্দুভির ধ্বনি?
আমরা আছি বর্ত্তমানে।"

মণিকা অনুভব করিল, সরলকুমারের বাহুবেষ্টনের আকর্ষণ নিবিড়তর হইল—তাহার দেহ মন প্রস্ফুটিত গোলাপেরই মত পুলকে পূর্ণ হইয়া উঠিল—সে স্বামীর উর্দ্ধোৎক্ষিপ্ত আননের দিকে চাহিয়া সাগ্রহে তাহা চুম্বন করিল। যে আনন্দের অনুভূতি মন হইতে দেহে ও দেহ হইতে মনে সঞ্চারিত হইয়া মানুষের দেহমন পূর্ণ করে, উভয়েই সেই আনন্দ অনুভব করিল।

পদার্থমাত্রেরই মধ্যে যেমন বৈদ্যুতিক শক্তি থাকে, তেমনই মানুষমাত্রেরই মনে প্রেম থাকে—তাহা অনুভব-যোগ্য প্রবল করিবার জন্য তাহাকে প্রেমের দ্বারাই পুষ্ট করিতে হয়। সরলকুমারের প্রেম মণিকার হৃদয়ের প্রেমকে প্রবল করিয়াছিল।

বাগানের মধ্যে বাঙ্গলো রচিত হইবার পর সরলকুমার ও মণিকা মধ্যে মধ্যে তথায় যাইয়া বাস করিত—যেন ছুটী লইত। কিন্তু মণিকা নানা অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানে যোগদান করায় তাহাদিগের পক্ষে একসঙ্গে অধিক দিন তথায় বাস করা সম্ভব হইত না; আর, বোধ হয়, সেই জন্যই মধ্যে মধ্যে তথায় বাস তাহাদিগের নিকট বিশেষ সুখের ও তৃপ্তির হইত।

এইরূপ একটা "ছুটীর" সময় তাহারা দুই জন যখন বাগানে বেড়াইতে বেড়াইতে রাস্তার নিকটে আসিয়া পড়িয়াছিল, তখন একখানি মোটরের যাত্রীরা তাহাদিগকে দেখিয়া গাড়ী থামাইয়া—নামিয়া তাহাদিগের নিকটে আসিল। সরলকুমার আগন্তুক পুরুষকে ও মণিকা তাহার সহগামী মহিলাকে চিনিতে পারিল। পুরুষটি ডাক্তার—সরলকুমারের সহিত প্রায় দুই বৎসর এক ছাত্রাবাসে বাস করিয়াছিল; সে সরলকুমারকে বলিল, "অনেকদিন পরে দেখা। ইনি—"

সরলকুমার হাসিয়া বলিল, "নিশ্চয়ই আমার উত্তমার্দ্ধ।" সে মণিকাকে বলিল, "মণিকা, পুষ্কর বাবু ডাক্তার,—আমরা একই ছাত্রাবাসে থাকতাম।"

মণিকা তাহাকে নমস্কার করিল।

পুষ্করকুমারের স্ত্রী সুনীতি হাসিয়া স্বামীকে বলিল, "তোমার আর তোমার বন্ধু-পত্নীর সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিতে হ'বে না। আমাদের পরিচয় অনেক দিনের।"

পুষ্কর বলিল, "এ যেন একখানা মিলনান্ত নাটকের উপসংহার।"

সুনীতি বলিল, "বাবা যখন আগ্রায় চাকরী করতেন, সেই সময় আমরা দু'জনই এক স্কুলে—খৃষ্টান মিশনারীদের মেয়ে স্কুলে পড়তাম। তখন আমাকে বাধ্য হয়ে মণিকাকে গুরু করতে হয়েছিল।"

"এ ত তুমি কোন দিন বল নি!"

মণিকা বলিল, "এ সব বাজে কথা।"

সুনীতি বলিল, "বাজে কথা! স্কুলে বাইবেল পড়ান হ'ত। শিক্ষয়িত্রীরা ভাঙ্গা হিন্দীতে ইংরেজির মানে বুঝাবার চেষ্টা করতেন। আমি ইরেজিতে যেমন হিন্দীতে আবার তা'র চেয়েও পণ্ডিত; কাযেই মণিকার কাছে মানে বুঝিয়ে নিতে হত। ও 'ছোট সাহেবের'—আগ্রার সব চেয়ে বড় পণ্ডিতের—মেয়ে; ইংরেজীতে শিক্ষয়িত্রীরাও ওকে হারাতে পারতেন না; আবার ও পশ্চিমে জন্মেছিল—হিন্দী খুব ভাল জানত; অথচ বাঙ্গালী—বাঙ্গালায় বুঝাতে পারত।"

সরলকুমার বলিল, "একাধারে এত গুণ! কিন্তু রাস্তায় দাঁড়িয়ে কথা কেন?"

মণিকা আগন্তুকদ্বয়কে বারান্দায় যাইয়া বসিতে অনুরোধ করিল এবং তাঁহারা উপবিষ্ট হইলে সরলকুমারকে বলিল, "আমি একটু চা আনি।"

তখন সূর্য্য পশ্চিম দিগন্তের দিকে অগ্রসর হইতেছে—আর ছায়ার কালীতে গৃহবেষ্টন-প্রাচীরের উপর গাছের ছবি অঙ্কিত করিতেছে।

ভৃত্যকে চা'র যোগাড় করিতে উপদেশ দিয়া আসিয়া মণিকাও বারান্দায় বসিবার উদ্যোগ করিলে সুনীতি বলিল, "বেশ! ঘরকন্না দেখা'বে না?"

মণিকা হাসিয়া বলিল, "এটা আমাদের ছুটী কাটাবার

জায়গা—ঘরকন্না যে বিশেষ সম্পূর্ণ, তা' নয়। চল—" সে সুনীতিকে সঙ্গে লইয়া যাইয়া ঘরগুলি দেখাইয়া আনিল।

তখন পুষ্কর সরলকুমারকে বলিতেছে, "সত্যই কবিতার রাজ্য রচনা ক'রে—মূর্ত্তিমতী কবিতাকে সেই রাজ্যের সিংহাসনে বসিয়েছ।"

সুনীতি মণিকাকে বলিল, "শুনছ ত?"

মণিকা বলিল, "উনিও কি কবিতা লিখেন?"

সকলে হাসিল।

তখন পরিচয়ের পালা আসিল। পুষ্কর মেডিক্যাল কলেজে ডাক্তারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বিলাতে ও জার্ম্মাণীতে যক্ষ্মারোগ চিকিৎসার পদ্ধতি অধ্যয়ন করিয়া ফিরিয়া আসিয়াছে। সে যাদবপুরে যক্ষ্মারোগীদিগের হাসপাতালে অবৈতনিক পরিদর্শক চিকিৎসক। আজ সে সস্ত্রীক তথায় যাইতেছিল—পথে সরলকুমারকে দেখিতে পাইয়াছে। সে কলিকাতার দক্ষিণাঞ্চলে বাস করে।

ভৃত্য চা'র সরঞ্জাম লইয়া আসিলে মণিকা চা প্রস্তুত করিয়া বলিল, "উপযুক্তরূপ অতিথিসৎকার করতে পারি, এমন কিছুই আমাদের এ খেলা-ঘরে নাই; কাযেই আমাদের ত্রুটি নিজ গুণে আপনাদের উপেক্ষা করতে হ'বে।"

পুষ্কর বলিল, "খেলা-ঘর কেমন?"

"আমরা ত এখানে স্থায়ী হয়ে বাস করি না।"

"তাই মনে হচ্ছে, যেন শোভা-ঘর সাজান আছে। থাকা হয় কোথায়?"

বাগানবাড়ী দূর বলিয়া সে সহরে কোথায় বাসা লইয়াছে, সরলকুমার তাহা বলিল এবং মণিকা সুনীতিকে এক দিন তথায় যাইতে নিমন্ত্রণ করিল।

চা পান করিতে করিতে পুষ্কর ঘড়ী দেখিল। সুনীতি বলিল, "তোমার নির্দ্দিষ্ট সময় হ'ল। অন্য ডাক্তাররা অপেক্ষা করবেন। চল।"

"তাই বটে"—বলিয়া পুষ্কর উঠিয়া পড়িল এবং মণিকাকে নমস্কার করিয়া বলিল, "আজ একটি রোগী দেখবার জন্য আমরা ক'জন ডাক্তার সেখানে যা'ব; সুতরাং আর দেরী করতে পারব না। ক্ষমা করবেন।"

সুনীতি মণিকাকে বলিল, "রোগীর জন্য ডাক্তারের দরদ কত প্রবল, তা' দেখ্‌লে?" তাহার উক্তির মধ্যে যে ব্যঙ্গ ছিল, মণিকার কাছে তাহা ব্যর্থ হইল।

মণিকা সুনীতিকে বলিল, "তুমি যাচ্ছ কোথায়?"

"হাসপাতালে।"

"কেন?"

"রোগীর স্ত্রীকে দেখতে। এ রোগীর ইতিহাস আছে। সে আর এক দিন বলব।"

গাড়ীতে উঠিবার সময় পুষ্কর স্ত্রীকে বলিল, "রোগীর স্ত্রীকে ত সরলও জানে।"

সরলকুমার ও মণিকা তাহা শুনিল; কিন্তু তখন আর কিছু জিজ্ঞাসা করা হইল না।

[ক্রমশঃ।

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ।

ভুলায় সকল ব্যথা

তব নিঠুরতা হৃদয়ে যখন
কণ্টক সম ফুটে,
অসহ ব্যথায় কম্পিত তনু
যখন শিহরি উঠে;
অতীত দিনের মধুময় স্মৃতি,
দু'টি আদরের কথা
স্মরণের তীরে, ধীরে জেগে উঠে
ভুলায় সকল ব্যথা।

শ্রীমতী অমিয়া সেন।

য়ুরোপের অবস্থা

য়ুরোপের রাজনৈতিক অবস্থা যে শঙ্কাজনক, এ কথা আমরা বরাবরই বলিয়া আসিতেছি। গত মাসে যাহা বলিয়াছি, পাঠক তাহা স্মরণ করিয়া দেখিবেন। সম্প্রতি একটা ব্যাপার য়ুরোপের রাজনৈতিক অবস্থাকে আরও শঙ্কনীয় করিয়া তুলিয়াছে। সে ব্যাপারটি স্পেনের বিদ্রোহ। স্পেনে সমাজতন্ত্রবাদীদিগের সহিত রাজতন্ত্রবাদীদিগের বিরোধ বাধিয়াছে। এই বিরোধ বড়ই ভীষণ আকার ধারণ করিয়াছে। এখন এই ব্যাপার লইয়া য়ুরোপে আবার একটা প্রবল যুদ্ধ বাধিবার সম্ভাবনা জন্মিয়াছে। য়ুরোপীয় রাজনীতির গহনা গতি বুঝিবার সাধ্য আমাদের নাই। তবে এ কথা ইতিহাসপাঠকমাত্রই অবগত আছেন যে, ১৮৭০-৭১ খৃষ্টাব্দে যে ফ্রাঙ্কো-জার্ম্মাণযুদ্ধ হইয়াছিল, তাহার কারণ এই স্পেনের গৃহবিবাদ। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে স্পেনে একটা বিদ্রোহ উপস্থিত হয়। স্পেনের অধিবাসীরা তদানীন্তন বৃদ্ধ রাণী ইজেবলাকে তাড়াইয়া দিয়া তাঁহার স্থানে আর এক জনকে সিংহাসনে বসাইবার জন্য চেষ্টা করিতেছিলেন। শেষে হোহেনজোলার্ণ গোষ্ঠীর এক ব্যক্তিকে সিংহাসনে বসান হইবে বলিয়া সাব্যস্ত হয়। ফরাসীরা ঐ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করাতে জার্ম্মাণীর সহিত ফ্রান্সের যুদ্ধ বাধিয়াছিল। এবারও যে কতকটা সেইরূপ অবস্থা হইয়াছে, তাহা দেখা যাইতেছে। এবার ফ্রান্স স্পেনের কমিউনিষ্ট বা সর্ব্বস্বত্ববাদী সরকারের পক্ষসমর্থন করিতেছেন এবং তাঁহাদের সহিত সহানুভূতি দেখাইতেছেন,—আর জার্ম্মাণী এবং ইটালী রাজতন্ত্রী বা ফাসিষ্টদিগকে তলে তলে সাহায্য করিতেছেন। ফলে অবস্থাটা অনেকটা পূর্ব্ববৎই হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এ দিকে এখন পাকা রকম সংবাদ পাওয়া যাইতেছে যে, ইটালী,জার্ম্মাণী এবং অষ্ট্রিয়া পরস্পর সম্মিলিত হইয়াছেন। কাযেই ব্যাপারটা শঙ্কাসঙ্কুল হইয়া দাঁড়াইয়াছে। রুসিয়ার সহানুভূতি স্পেনের সর্ব্বস্বত্ববাদী সরকারের দিকে। তবে ফ্রাঙ্কো-জার্ম্মাণযুদ্ধের সময় বৃটিশসিংহ যেরূপ নির্লিপ্তভাবে দূরে দাঁড়াইয়া ব্যাপারটা দেখিয়াছিলেন, এবার তাঁহারা ততটা নির্লিপ্তভাবে এই ব্যাপার দেখিতে সমর্থ হইবেন কি না, সে বিষয়ে অনেকে সন্দেহ করিতেছেন। বৃটিশ জাতি আপনাদিগকে এই ব্যাপার হইতে যথাসম্ভব দূরে রাখিয়াছেন সত্য, কিন্তু ফ্রাঙ্কো-জার্ম্মাণ সংগ্রামে তাঁহারা যতটা নির্লিপ্ত ছিলেন, এবার ঠিক ততটা নির্লিপ্ত থাকিতে পারিবেন কি না, সে বিষয়ে সন্দেহ বিদ্যমান। কারণ, সেবারকার যুদ্ধে বৃটিশ জাতির কোন দিকে কোন স্বার্থই বিজড়িত ছিল না, এবার কিন্তু ভূমধ্যসাগরের দিকে বৃটিশ জাতির স্বার্থ বিশেষভাবে জড়িত রহিয়াছে। বিজয়দৃপ্ত ইটালী এখন ভূমধ্যসাগরে স্বীয় একচ্ছত্র অধিকার প্রতিষ্ঠিত করিতে অভিলাষী। ইটালী ভূমধ্যসাগরের উপান্তবাসী। ভূমধ্যসাগরে তাহার স্বার্থ আছে। ইংরেজের কিন্তু তাহাতে ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা অল্প নহে। কারণ, ভূমধ্যসাগরের ভিতর দিয়া ইংরেজকে ভারতে আসিতে হয়। এখন কথা হইতেছে,—ইটালী ইংরেজ জাতির বিরুদ্ধে যাইবেন কি না? ভাব দেখিয়া ত কিছুই বুঝিবার উপায় নাই। ইটালীর সহিত জার্ম্মাণীর মিত্রতা কতকটা পাকা-পাকি হইয়াছে,—এবং যদি কোনরূপ মিত্রতা হইয়া থাকে, তাহা হইলে তাহার সর্ত্ত কি কি হইয়াছে, তাহা না জানিলে কোন কথাই বলা যাইতেছে না। আবার এরূপ গুজবও শুনা যাইতেছে যে, স্পেনের বিদ্রোহী দলের নেতা সেনাপতি ফ্রাঙ্কো সিনিওর মুসোলিনীকে বলিয়াছেন যে, তাঁহারা যদি এই যুদ্ধে জয়লাভ করেন, তাহা হইলে তাঁহারা ইটালীর সাহায্য দানের জন্য জিব্রাল্টার বন্দরের অদূরে অবস্থিত কিউটা বন্দরটি ইটালীকে প্রদান করিবেন। বন্দরটি পাইলে ভূমধ্যসাগরে ইটালীর বেশ জোর দাঁড়াইবে। ইংরেজদিগের জিব্রাল্টার বন্দরের পরপারে মাত্র ১৬ মাইল দূরে এই বন্দরটি অবস্থিত। ইহা পাইলে ইটালী ইচ্ছা করিলে বৃটিশ তরীগুলির ভূমধ্যসাগরে প্রবেশপথ রুদ্ধ করিবার চেষ্টা করিতে পারিবেন। সেই চেষ্টায় সাফল্য লাভ করিতে পারিলে ইটালীর ভূমধ্যসাগরে একচ্ছত্র অধিকার প্রতিষ্ঠিত করিবার সুবিধা হইবে। কিন্তু সে চেষ্টা সফল হওয়াও সম্ভব বলিয়া মনে হয় না। কারণ, বৃটিশ কেশরী উহাতে পূর্ণমাত্রায় বাধা দিবেন। স্পেনের বিদ্রোহী দলের সেনানায়ক জেনারাল ফ্রাঙ্কো বিশেষ বিপদে পড়িলে বেলিয়ারিক দ্বীপপুঞ্জের দুই একটা দ্বীপও হয় ত ইটালীকে ও জার্ম্মাণীকে দিতে সম্মত হইতে পারেন। তাহা হইলে জিব্রাল্টারের প্রতিকূলে ডবল জোর পড়িবে। ইটালী এখন রণসজ্জায় সম্পূর্ণ সজ্জিত। মুসোলিনী আবিসিনিয়ার অধিকার রক্ষা করিবার জন্য এক লক্ষ কৃষ্ণ সৈনিক শিক্ষিত করিয়াছেন। ইটালী ইদানীং ভ্রূভঙ্গীর দ্বারা গ্রেটবৃটেনের এবং জাতিসঙ্ঘের উপর বেশ একটি চাল দিয়াছেন। ইহাতে ইটালীর পসার পাশ্চাত্যখণ্ডে কিছু বৃদ্ধি পাইয়াছে।

ইটালী ভূমধ্যসাগরে স্বীয় অধিকার সুদৃঢ় করিবার জন্য সর্ব্বতোভাবে চেষ্টা পাইতেছেন, এ কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। ইটালী তাহার নৌশক্তি বর্দ্ধিত করিয়াছেন। তবে তাঁহারা যে নৌশক্তিতে গ্রেটবৃটেনের সমকক্ষতালাভে সমর্থ হইয়াছেন, ইহা মনে হয় না। অবশ্য এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞরাই প্রকৃত অবস্থা বলিতে পারেন, আমাদের ন্যায় আদার ব্যাপারীর সে বিষয়ে আলোচনা করিতে যাওয়াই বিড়ম্বনা। এ কথা সোজা বুদ্ধিতে বুঝা যায় যে, ইটালীর নির্ম্মিত জাহাজগুলি নূতন, সুতরাং হাল আমলের ও উন্নতধরণের। গ্রেটবৃটেন ইদানীং কিছুকাল রণতরী সঙ্কোচনের সমর্থক বলিয়া নূতন রণতরী নির্ম্মিত করেন নাই। ইটালীর আর্থিক অবস্থা ভাল না হইলেও এত অধিক অর্থ ব্যয় করিয়া রণপোত প্রভৃতি নির্ম্মাণের একটা লক্ষ্য আছে। সে লক্ষ্য আর কিছুই নহে,—কেবল ভূমধ্যসাগরে স্বীয় প্রতাপের প্রতিষ্ঠা। বৃটিশ জাতি এই ব্যাপারটা নিশ্চিতই দার্শনিকের ন্যায় উদাসীনভাবে দেখিতে পারেন না। কারণ, এই ব্যাপারে ইংরেজ জাতির স্বার্থ যেরূপ বিজড়িত,—অতীতের গৌরবস্মৃতিও সেইরূপ বিজড়িত। এই ভূমধ্যসাগরেই নেলসন নেপোলিয়ান বোনাপার্টের গর্ব্ব খর্ব্ব করিয়া দিয়া ইংরেজের

পৃথিবীব্যাপী সাম্রাজ্যস্থাপনের পথ পরিষ্কৃত করিয়া দিয়াছিলেন। নেপোলিয়ান যদি নীল নদের যুদ্ধে জয়লাভ করিতে সমর্থ হইতেন, তাহা হইলে বর্ত্তমান সময়ে এত বিস্তীর্ণ বৃটিশ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিত না। বিশেষতঃ সুয়েজ খাল প্রস্তুত হইবার পর ইংরেজের পক্ষে প্রাচ্যখণ্ডে যাতায়াত করিবার বিশেষ সুবিধা ঘটিয়াছে। সুতরাং সেই ভূমধ্যসাগরে ইংরেজ কখনই স্বীয় অধিকার এবং ক্ষমতা খর্ব্ব হইতে দিতে পারেন না। এখন যদি ভূমধ্যসাগরের ভিতর দিয়া ইংরেজের জাহাজ যাতায়াত বন্ধ করিবার সম্ভাবনা জন্মে, তাহা হইলে ইংরেজ তাহা সহ্য করিবেন বলিয়া মনে হয় না। ইংরেজের জাহাজকে যদি উত্তমাশা অন্তরীপ ঘুরিয়া ভারতে আসিতে হয়, তাহা হইলে চারি হাজার মাইল পথ বাড়িয়া যায়। ইহা নিশ্চিতই একটা তুচ্ছ ব্যাপার নহে। যদি একবার ইংরেজ জাতি ভূমধ্যসাগরে স্বীয় প্রভাব হারাইয়া বসেন, তাহা হইলে সেই প্রভাবের পুনঃ প্রতিষ্ঠা করা সহজ হইবে না। এই স্বার্থময় জগতে সকল জাতিই নিজ নিজ স্বার্থ রক্ষা করিতে অবহিত। সুতরাং উহার ফলে হয় ত প্রাচীতে ইংরেজের বাণিজ্য এবং অধিকার ক্ষুণ্ণ হইতে পারে। ইংরেজ তাহা বিলক্ষণ বুঝেন। সেই জন্য মনে হয় যে, ৬৫ বৎসর পূর্ব্বে ফ্রাঙ্কো-জার্ম্মাণ যুদ্ধের সময় ইংরেজ যতটা নিরপেক্ষ এবং উদাসীন থাকিতে পারিয়াছিলেন, এখন যদি সত্য সত্যই ইটালী বৃটিশ জাতির ঘোর বিরোধী হইয়া দাঁড়ান এবং ভূমধ্যসাগরে নিজ প্রভাব প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহেন, তাহা হইলে, ইংরেজ যতই শান্তিকামী হউন না কেন, কিছুতেই এই ব্যাপারে ততটা উদাসীন থাকিতে পারিবেন না।

এখন প্রশ্ন হইতেছে, ইটালীর কি সত্য সত্যই এমনই দুর্ম্মতি হইবে যে, সে প্রবলপ্রতাপ বৃটিশ কেশরীর সহিত সংগ্রাম করিতে যাইবে? সহজ বুদ্ধিতে ত সেরূপ আশঙ্কা করিবার কোন সম্ভাবনা দেখা যায় না। কেবল জার্ম্মাণীর ভরসায় সেরূপ দুঃসাহসিক কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া যেন দূর হইতে বাতুলতার লক্ষণ বলিয়া মনে হয়। ইটালী জানে যে, বিরোধ বাধিলেই গ্রেট বৃটেন, ফ্রান্স এবং রুসিয়া একদিকে হইবেই। অবশ্য ইটালী জার্ম্মাণী এবং জাপানকে আপনার দিকে পাইবেন বলিয়া হয় ত আশা করিতে পারেন। কিন্তু তাহা যদি ইটালী পায়, তাহা হইলে ইটালীর জয়লাভের আশা থাকে কি? অবশ্য বিধাতার মনে যাহা আছে, তাহাই ঘটে। মানুষ অনেক সময়ে বিবেচনার ত্রুটিতে অথবা আত্মম্ভরিতার প্রভাবে ভুল করে। বিগত য়ুরোপীয় মহাযুদ্ধ যে কাহার দোষে এবং কি জন্য ঘটিয়াছিল, তাহা লইয়া যে কত কথাই শুনা গেল, তাহার আর ইয়ত্তা নাই। সেই জন্য অনেকে মনে করেন যে, যুদ্ধ প্রভৃতি ব্যাপার যেন লোকাতীত কারণেই সঙ্ঘটিত হয়। আমরা যাহাই ভাবি না কেন, কাযে তাহা হয় না। নতুবা কে ভাবিতে পারিয়াছিল যে, সেরাজেভোতে এক কাপুরুষোচিত হত্যাকাণ্ডের ফলে সমস্ত য়ুরোপে ভীষণ দাবানল জলিয়া উঠিবে এবং লক্ষ লক্ষ গৃহে শোকার্ত্তের আর্ত্তনাদ উঠিবে? মানুষের অহমিকাই অনেক সময় বহু অনর্থের কারণ হইয়া দাঁড়ায়।

প্রস্তাব করা হয় যে, কোন রাজ্যই স্পেনের বিবদমান কোন পক্ষকেই কোনরূপ সহায়তা করিতে পারিবেন না। ফ্রান্স এই প্রস্তাব করেন, ইটালী তাহাতে সম্মত হন। কিন্তু ইহার পর ইটালী এবং জার্ম্মাণী উভয়ে একবাক্যে বলিতে থাকেন, যদি রুসিয়া কোমিণ্টার্ণের মারফতে স্পেনের সরকারকে অর্থ দিয়া, তৈল দিয়া এবং বেতার বার্ত্তাবহ মারফতে উপদেশ দিয়া সাহায্য করিতে থাকেন, তাহা হইলে ঐরূপ সর্ত্ত সম্যক্ প্রকারে নিরর্থক হয়। কোমিণ্টার্ণ যে এই কার্য্য করিতেছেন, সোভিয়েট সরকার তাহা অস্বীকার করেন নাই। তাঁহারা বলিয়াছেন, কোমিণ্টার্ণ প্রচার-কার্য্যের উপর সোভিয়েট সরকারের কোন হাত নাই। এই উক্তি যে নিতান্ত অবিশ্বাস্য, তাহা বলাই বাহুল্য। গ্রেট বৃটেন এই ব্যাপারে নিশ্চিতই নিরপেক্ষ থাকিবেন। কারণ, সংগ্রাম হইলে গ্রেট বৃটেনের বাণিজ্য প্রভৃতি ক্ষুণ্ণ হইবার সম্ভাবনা। কিন্তু কেবল স্বার্থের দিক দিয়া সংগ্রামবিমুখতা দেখাইলে তাহাতে সুবিধা ঘটে না। সুদৃঢ় নৈতিক বেদীর উপর দাঁড়াইয়া মানুষ যাহা করে, তাহাই পরিণামে শুভজনক হইয়া থাকে। ভূমধ্য-সাগরে গ্রেট বৃটেনের স্বার্থ নিহিত রহিয়াছে বলিয়াই শঙ্কা হয়, ইটালী যদি ভূমধ্যসাগরে পূর্ণমাত্রায় স্বীয় প্রভাব প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা করেন, তাহা হইলে হয় ত গ্রেট বৃটেনের যুদ্ধ করিবার অপ্রবৃত্তি ঘুচিয়া যাইতে পারে। ইচ্ছা করিয়া কোন প্রকৃতিস্থ ব্যক্তি অনলে হাত দিতে যায় না। কোন জাতি অহঙ্কারে আত্ম-হারা না হইলে পরাজয়ের সম্ভাবনা কতখানি, তাহা না দেখিয়া যুদ্ধে নামে না। যাহা হউক, এখন জার্ম্মাণীর সহিত ইটালীর ঠিক কোন্ কোন্ সর্ত্তে সন্ধি হইয়াছে, তাহা না জানিলে আসল ব্যাপারটা বুঝা যাইতেছে না। তবে দেখা যাইতেছে যে, জার্ম্মাণী ও রুসিয়া উভয়ে সমরায়োজন করিতেছেন। জার্ম্মাণী ১০ লক্ষ সৈন্য শিক্ষিত করিতেছেন। তাঁহারা বলিতেছেন যে, তাঁহারা সোভিয়েট সরকারের আক্রমণ ভয়েই ঐরূপ করিতেছেন! ইউনিয়ন অব সোভিয়েট সোস্যালিষ্ট রিপাবলিক (U. S. S. R.) এখন ১ কোটি ৩০ লক্ষ সৈন্য রণক্ষেত্রে উপস্থিত করিতে পারেন, এ কথা মঁসিয়ে এডুয়ার্ড হেরিওর মুখে শুনা গিয়াছে। ইহা অতিরঞ্জিত হইতে পারে। কারণ, অনেক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্টই হইয়া থাকে। যাহা হউক, এখন সকল দেশই তাঁহাদের সৈন্যসংখ্যা অত্যন্ত বৃদ্ধি করিতেছেন। ইহা যেন রণচণ্ডীর যূপকাষ্ঠে অধিক-সংখ্যক নরবলি দিবার ব্যবস্থা বলিয়াই মনে হইতেছে। সম্প্রতি সকলেই যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত, কিন্তু যুদ্ধ করিবার ইচ্ছা কাহারও নাই। সকল জাতিই অধিকসংখ্যক সৈনিক, অধিক দুর্গ, অধিক রণপোত, অধিক রণবিমান রাখিতেছেন। ইহা দেখিয়াই লোক বলিতেছে যে, সমস্ত য়ুরোপ এখন একটি বিশাল এবং বিস্তীর্ণ বারুদ-স্তূপে পরিণত হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু মানুষ সকল সময় ভবিষ্যৎ ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারে না। তবে গতিক দেখিয়া শঙ্কার কারণ আছে বলিয়াই অনুমান হইতেছে।

প্রাচীতে ঝটিকা-কেন্দ্র

বর্ত্তমান সময়ে মধ্য-য়ুরোপে যেরূপ একটি ঝটিকা-কেন্দ্র রহিয়াছে, সুদূর প্রাচীতেও তাহা রহিয়াছে। জাপান মধ্য-মঞ্চুরিয়া অঞ্চলে স্বীয় অধিকার প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। য়ুরোপীয় শক্তিপুঞ্জ তাহা সুনজরে দেখিতে পারিতেছেন না। ইহাতে জাপানের

শক্তি বৃদ্ধি পাইবে। জাপান এখন একটি শিল্পপ্রধান দেশে পরিণত হইয়াছে। জাপানী কলে অনেক কার্পাস-বস্ত্র ও সূত্র প্রস্তুত হইতেছে। কিন্তু জাপানের কার্পাস চাষ করিবার ভাল ক্ষেত্র নাই। অন্যান্য জাতিরা পূর্ব্ব হইতে প্রায় সকল স্থান অধিকৃত করিয়া লইয়াছেন। জাপানের পণ্য বিক্রয় করিবার স্থানেরও অভাব। ওসেকার কলগুলির খোরাক যোগাইতে হইলে জাপানে প্রভূত তুলার প্রয়োজন। মার্কিণে ১ কোটি ৩০ লক্ষ গাঁইট তুলা উৎপন্ন হয়। তন্মধ্যে মার্কিণ ৭৫ লক্ষ গাঁইট তুলা বিদেশে রপ্তানী করে। জাপানই মার্কিণের সর্ব্বাপেক্ষা বড় খরিদদার। তন্মধ্যে ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে জাপান লইয়াছিল ১৮ লক্ষ ৪৫ হাজার ৬ শত ১ গাঁইট। জার্ম্মাণী ১৩ লক্ষ ১৮ হাজার ৬৬ গাঁইট। ইংলণ্ড ১২ লক্ষ ৭৮ হাজার ৬৬ গাঁইট, এবং চীন ৩ লক্ষ ৭৫ হাজার গাঁইট। মার্কিণ ঐ বৎসর ৪২ কোটি ডলার মূল্যের তুলা বিক্রয় করিয়াছিল। তাহার মধ্যে জাপান এবং চীন উভয়ে শতকরা ৩০ ডলার মূল্যের কার্পাস কিনিয়াছিল। জাপান দেখিল, তাহাদের অত্যন্ত দূরদেশ হইতে তুলা আনিতে হয়, উহাতে খরচ অত্যন্ত অধিক পড়ে। সেই জন্য সে নিকটেই এমন একটি স্থান লইবার বাসনা করে যে, তাহাতে সে স্বচ্ছন্দে ভাল তুলা উৎপাদন করিতে সমর্থ হয়। নিকটস্থ অন্য সকল দেশে যাইবার পথ রুদ্ধ দেখিয়া সে প্রথমে মাঞ্চুরিয়া অধিকার করিয়া লয়। কিন্তু তাহাতে তাহার সুবিধা হইল না। কারণ, তথায় যে তুলা উৎপন্ন হইল, তাহা ভাল হইল না। জাপান তাহার পর দেখিল যে, উত্তর-চীনে আমেরিকার তুলার ন্যায় খুব ভাল তুলা উৎপাদন করা যায়। অগত্যা জাপান উত্তর-চীনে আপনার অধিকার প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছে। কিন্তু অন্যান্য শ্বেতাঙ্গরা এই ব্যাপার সুনজরে দেখিতে পারিলেন না। জাপান যদি এই স্থানে প্রভূত পরিমাণে উৎকৃষ্ট তুলা উৎপাদন করিতে পারে, তাহা হইলে তাহারা ভারত বা মার্কিণ হইতে তুলা লইবে না। ভারতে যত তুলা উৎপন্ন হয়, তাহার অর্দ্ধেক লয় জাপান। এখন জাপান যদি উত্তর-চীনে উৎকৃষ্ট তুলা উৎপাদন করিতে সমর্থ হয়, তাহা হইলে তাহারা আর ভারতের তুলা কিনিবে না। ইহাতে ভারতের বিশেষ ক্ষতি হইবে। দ্বিতীয়তঃ জাপান যদি নিকটে সুবিধামত ভাল তুলা উৎপাদন করিতে পারে, তাহা হইলে তাহারা বস্ত্রের বাজারে অন্যান্য কার্পাস পণ্য উৎপাদনকারী জাতির সহিত বিশেষভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে সমর্থ হইবে। ফলে এই ব্যাপারটা কেহই বিশেষ সুনজরে দেখিতে পারিতেছেন না।

চীনারাও ইহা একেবারেই চাহেন না। চীনাদের রাজ্য অন্যে অধিকার করে, বা তথায় জাপান যাইয়া নিজ প্রভাব বিস্তার করে, ইহা চীন কি করিয়া সহ্য করিতে পারেন? সেই জন্য চীনের তরুণদল জাপানের উপর অত্যন্ত বিক্ষুব্ধ হইয়া পড়িয়াছেন। জাপান তাহার অতি নিকটে আসিয়া পড়ে, সোভিয়েট সরকারও ইহা চাহেন না। সেই জন্য সোভিয়েট সরকারও ভিতরে ভিতরে চীনকে জাপানের বিরুদ্ধে দাঁড়াইবার জন্য উৎসাহ দিতেছেন। গত মার্চ্চ মাসে রুসিয়ার ষ্টেলিন জনৈক মার্কিণ সাংবাদিকের নিকট বলিয়াছিলেন যে, যদি জাপান বাহির-মঙ্গোলিয়ার প্রজাতন্ত্রের উপর কোনরূপ প্রভাব বা প্রভুত্ব বিস্তৃত করিবার প্রয়াস পান, তাহা হইলে সোভিয়েট সরকার কোনমতেই তাহা সহ্য করিবেন না, তাঁহারা জাপানের সহিত যুদ্ধ করিবেন। জাপান বলিতেছেন, ওটা রুসিয়ার ধাপ্পাবাজী। জাপানীরা এখন তাহাদের আভ্যন্তরীণ হাঙ্গামা লইয়াই ব্যস্ত, এখন তাহাদের বাহির-মঙ্গোলিয়ায় যাইয়া হাঙ্গামা করিবার সময় নহে। গত ফেব্রুয়ারী মাসে জাপানে যে সৈনিক-বিদ্রোহ হইয়াছিল, জাপান সেই কথাই বলিয়াছেন।

এখানে বলা আবশ্যক যে, চীনে এখন দুইটি সরকার বিদ্যমান; একটি ক্যাণ্টন সরকার, আর একটি নান্‌কিন সরকার। ক্যাণ্টন সরকার দক্ষিণে অবস্থিত। ঐ সরকার দক্ষিণ-চীনের কার্য্য নির্ব্বাহ করেন। আর একটি সরকার উত্তর-চীন বা সমস্ত চীনের উপর প্রভুত্ব বিস্তার করিয়া আছেন। ইহার রাজধানী ইয়াংসিকিয়াং নদীতীরে অবস্থিত নাঙ্কিন সহরে। ইহাই হইল চীনের কেন্দ্রী সরকার। ক্যাণ্টন বৃটিশ অধিকৃত হংকং বন্দর হইতে অধিক দূরে নহে; ক্যাণ্টন অঞ্চলে সর্ব্বস্বত্ববাদী অর্থাৎ কমিউনিষ্টদিগের প্রভাব অত্যন্ত প্রবল। এখানকার লোক জাপানীদিগের ঘোর বিরোধী। পক্ষান্তরে, নান্‌কিন সরকার চীন হইতে কমিউনিজম্ বা সর্ব্বস্বত্ববাদ উচ্ছিন্ন করিতে বদ্ধপরিকর। ষ্টেলিনের উক্তি পাঠ করিয়া ক্যাণ্টন অঞ্চলের সর্ব্বস্বত্ববাদী-দিগের উৎসাহ বৃদ্ধি পায়। ঠিক ঐ সময়েই জাপানে সৈনিক-বিদ্রোহ ঘটে। চীনের Red বা সর্ব্বস্বত্ববাদীরা চীনে সোভিয়েট সরকারের মতলব হাসিল করিবার পক্ষপাতী। পক্ষান্তরে, নাঙ্কিন সরকার বলসেবিকদিগের অভিসন্ধিসিদ্ধির ঘোর বিরোধী। চীন-সেনাপতি এবং নাঙ্কিন সরকারের মূল গায়েন চিয়াংকাইসেক সর্ব্ব-স্বত্ববাদীদিগের অভিসন্ধি বেশ বুঝেন। ইহা চীনের সর্ব্বস্বত্ববাদীরা একেবারেই দেখিতে পারে না। তাঁহাকে পদচ্যুত এবং সংহার করিবার জন্য তাহারা অতিশয় ব্যস্ত। এখন জাপান পাছে বাহির-মঙ্গোলিয়া আক্রমণ করে, এই ছলে ক্যাণ্টন সরকার চীনের উত্তর অঞ্চলে বহু সৈন্য প্রেরণ করেন। ঐ সৈন্যদল শানসী বিভাগের টাইয়ুয়ান পর্য্যন্ত ভীমবেগে অগ্রসর হয়। তাহারা ঐ স্থানের আরও উত্তরে চীনের প্রাচীরের সন্নিহিত সুইয়ুয়ান নামক স্থানে যাইবে বলিয়া প্রকাশ করে। তাহারা বলে যে, ঐ স্থানে যাইলেই তাহারা বাহির-মঙ্গোলিয়ার দিকে জাপানী সৈন্যের অভিযান রুদ্ধ করিয়া দিতে পারিবে। ইহার ফলে নান্‌কিনের সৈন্যদলের সহিত ক্যাণ্টনী সৈন্যদলের সংঘর্ষ ঘটে। ফলে ক্যাণ্টনী সৈন্যগণ পরাভূত হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিতে বাধ্য হয়। চীনের সর্ব্বস্বত্ববাদী সেনাপতি মাও-সি-টুঙ্গের (Mao She Tung) সৈন্যদল জেচুয়ানের দুর্গম পর্ব্বতের দিকে আশ্রয় লইবার জন্য চলিয়া যায়। ইহার পরই সংবাদ পাওয়া যায়, চীনের বলশেবিক সৈন্যদল শানসি অঞ্চলে আটক হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু তাহারা কি জানি কি প্রকারে ঐ অঞ্চল হইতে তিব্বতের সীমান্তের দিকে সরিয়া পড়ে। ঐ অঞ্চলে রুসিয়ার প্রভাব পূর্ণ মাত্রায় প্রতিষ্ঠিত। ইহার পরই গত আষাঢ় মাসের প্রথমেই আবার চীনে ভীষণ গৃহযুদ্ধ বাধিবার লক্ষণ দেখা দিয়াছিল। কেবলমাত্র চীনের সর্ব্বস্বত্ববাদীরাই জাপানের শত্রু নহে। তথাকার অধিকাংশ লোকই মনে মনে জাপানের উপর বিরক্ত এবং বিদ্বিষ্ট। এই সময়ে উভয় দলই চাংশা অভিমুখে অভিযান করিল। এই স্থানটি হেংকিয়াং নদতীরে অবস্থিত এবং হুনান পরগণার অন্তর্ভুক্ত। ক্যাণ্টনী সৈন্যদল মুখে প্রকাশ করে যে, জাপানের বিরুদ্ধেই তাহাদের অভিযান প্রচালিত। নান্‌কিন্ সরকার

সে কথা বিশ্বাস করেন নাই। তাঁহাদের ধারণা, সেনাপতি চিয়াং কাইসেককে পদচ্যুত এবং বিতাড়িত করিবার জন্য ক্যাণ্টনী সরকার গৃহযুদ্ধ করিতে বসিয়াছেন। ক্যাণ্টনী সরকার সে কথা একেবারেই অস্বীকার করিতেছেন। তাঁহারা বলিতেছেন যে, তাঁহারা কয়েক বৎসর ধরিয়া বলিয়া আসিতেছেন যে, বৈদেশিক ব্যাপারে একটু দৃঢ়নীতি অবলম্বন করা আবশ্যক, কিন্তু সেনাপতি চিয়াং কাইসেক সে কথায় কর্ণপাতও করিতেছেন না। কিন্তু সেনাপতি চিয়াং কাইসেককে যে কত অসুবিধার ভিতর দিয়া কার্য্য করিতে হইতেছে, তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। তিনি জানেন যে, জাপানের সহিত যুদ্ধ করিতে যাইলেই, তিনি এত কষ্ট করিয়া যে চীনের স্বাধীনতা এবং স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়াছেন, তাহা বিলুপ্ত হইবে। কারণ, চীন এখনও জাপানের সহিত যুদ্ধ করিয়া জয়লাভ করিবার সামর্থ্য অর্জ্জন করেন নাই।

চিয়াং কাইসেক

এ কথা চীনের অজ্ঞ কেহ যে না বুঝেন, তাহা নহে। কিন্তু জাপান উত্তর-চীনকে নিজ পদানত করিবে, ইহা তাঁহাদের পক্ষে অসহ্য। কাযেই তাঁহারা দিশাহারা হইয়া পড়িয়াছেন। চীনের ভিতরকার গলদ অনেক। তথাকার এক এক পরগণার শাসন-কর্ত্তারা বিষম স্বৈরাচারী। তাহাদের দেশাত্মবোধ অপেক্ষা নিজ নিজ স্বার্থবোধ এবং ক্ষমতাপ্রিয়তা অত্যন্ত অধিক। সেইজন্য চিয়াং কাইসেক বিশেষ কিছুই করিয়া উঠিতে পারিতেছেন না। এ দিকে জাপান চীনে একটা অতি প্রবল গৃহযুদ্ধ বাধিলে যেন আনন্দিত হন। কারণ, তাহা হইলে তাঁহার মনের বাসনা পূর্ণ করিবার বিশেষ সুবিধা জন্মে। জাপান অবশ্য সে কথা স্বীকার করিতে চাহেন না। উত্তর চীনের প্রাদেশিক অধিপতি-দিগের পরস্পরের মধ্যে বিবাদ এবং ঈর্ষা আছে। দেশের কল্যাণকল্পে তাঁহারা যে সে বিবাদ মীমাংসা করিবেন, সেরূপ মনোবৃত্তি তাঁহাদের নাই। চিয়াং কাইসেকও তাঁহাদিগকে সে কথা বুঝাইয়া দিতে পারিতেছেন না। দেশের দুর্ভাগ্য হইলে যাহা হয়,—চীনের এখন তাহাই হইয়াছে। ভি... বাহিরে শত্রু।

এ দিকে জাপান উত্তর-চীনের কতকগুলি বিভাগ লইয়া একটি স্বতন্ত্র স্বায়ত্ত-শাসনাধিকারসম্পন্ন রাজ্য গঠিবার চেষ্টা পাইতে-ছেন। সেই রাজ্যের সিংহাসনে তাঁহারা মাঞ্চুকুয়োর শাসক হেনরী পুয়ীকে (Puyi) বসাইবেন বলিয়া সঙ্কল্প করিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ। যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে উত্তরচীন, চীনসাম্রাজ্য হইতে একেবারে বিচ্ছিন্ন হইয়া জাপানের ইঙ্গিতে পরিচালিত একটি রাজ্যে পরিণত হইবে। তবে চীনের সকল সংবাদ পাওয়া যাইতেছে না, ভিতরে ভিতরে কি হইতেছে, তাহা বলা কঠিন। এ কথাও শুনা যাইতেছে, জাপানীরা জলপথে অনেক পণ্য আনিয়া ডেইরেণ বন্দরে ফেলিতেছেন এবং তথা হইতে উহা পূর্ব্ব হোপেই (Hopei) অঞ্চলে উপনীত করিতে-ছেন। শুল্ক না দিয়া ঐ সকল মাল এখন উত্তর-চীনের সর্ব্বত্রই ছড়াইয়া পড়িতেছে; নাঙ্কিন সরকার উহাতে বাধা দিতে পারিতেছেন না। চিয়াং কাইসেককে সে জন্যও বিষম সঙ্কটে পড়িতে হইয়াছে। উহাতে চীনের কেন্দ্রী সরকারের শুল্ক-সম্পর্কিত আয় অনেক কমিয়া যাইতেছে। আবার জাপান রাশিন নামক আর একটি বন্দর খুলিতেছেন। এখান হইতেও মাঞ্চুকুয়োতে এবং ভিতর-মঙ্গোলিয়ায় জাপানী পণ্য লইয়া যাইবার সুবিধা ঘটিবে। যে সকল শ্বেতকায় জাতির স্বার্থ এই স্থানে নিহিত রহিয়াছে, তাহারা এই ব্যাপার সুনজরে দেখিতেছে না। কাযেই এ দিকে চীন ও জাপান লইয়া যে একটা অতি প্রবল ঝটিকা-কেন্দ্র সৃষ্ট হইতেছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

সাগরবক্ষে ঝটিকা-কেন্দ্র

আমরা এ পর্য্যন্ত চীন এবং জাপানে একটা ঝটিকাকেন্দ্রের উদ্ভব হইতেছে বলিয়াছি,—কিন্তু অন্যের অলক্ষ্যে বারিধিবক্ষে যে আর একটা ঝটিকাকেন্দ্র উদ্ভূত হইতেছে, তাহা কেহই লক্ষ্য করিতেছেন না। বিগত যুরোপীয় মহাযুদ্ধের পর জার্ম্মাণীর উপনিবেশগুলি যখন সকলে ভাগাভাগি করিয়া লইতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তখন মাইক্রোনেসিয়া বলিয়া কতকগুলি দ্বীপ জাপান জাতিসঙ্ঘের নিকট হইতে আদেশাত্মকভাবে শাসন করিবার অধিকার পাইয়াছিলেন। এই দ্বীপপুঞ্জ ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের পূর্ব্বদিকে অবস্থিত। এই দ্বীপগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রবালদ্বীপ। ইহার মধ্যে কেরোলাইনস্, লাড্রোন্স্ এবং পিনিউ দ্বীপ কিছু বড়। মানচিত্রে উহার অস্তিত্বও দেখিতে পাওয়া যায় না। উহার মধ্যে আবার একটি ছোট দ্বীপ আছে, সেটি মার্কিণের। দ্বীপগুলির মধ্যে কতকগুলি এত ক্ষুদ্র যে, তথায় পূর্ব্বে জন-মানব প্রায় দেখা যাইত না। এখনও বোধ হয় নাই। জাতিসঙ্ঘ যখন জাপানকে এই দ্বীপপুঞ্জ দিয়াছিলেন, তখন তাঁহারা এই সর্ত্ত করিয়াছিলেন যে, জাপান তথায় কোনরূপ দুর্গ নির্ম্মাণ করিতে পারিবেন না। দ্বীপগুলি প্রবালরচিত বলিয়া গিরি-সঙ্কুল। সম্প্রতি মার্কিণে একটা জনরব উঠে যে, জাপান এই স্থানে দুর্গ নির্ম্মাণ করিতেছেন। মিষ্টার উইলার্ড প্রাইস

... যাইয়া দেখিয়া আসিয়াছেন যে, তথায় ... নির্ম্মাণ করে নাই। তবে তাঁহারা উহার ... তরী ভিড়াইবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। তাহাতে সর্ত্তের কোন খেলাপ হয় নাই। কিন্তু ইতিপূর্ব্বে জাতিসঙ্ঘ জাপানের নিকট এক কৈফিয়ৎ চাহিয়া বসিয়াছেন যে, তাঁহারা তথায় কি করিতেছেন? জাপান তাহার যে জবাব দিয়াছেন, তাহা নাকি তেমন স্পষ্ট হয় নাই।

এই ব্যাপার লইয়া বেশ একটু হৈ-চৈ করিবার চেষ্টা হইতেছে। জাপান সেইপান (Saipan) বন্দরকে নৌবাহিনীর একটা আড্ডায় পরিণত করিবার চেষ্টা করিতেছেন বলিয়া কথা উঠিয়াছে। এ কথা কত দূর সত্য, তাহা বলা যায় না। তবে ইহাতে কাহারও কোন ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা নাই। এখন যাঁহারা জাপানের অভ্যুদয়ে শঙ্কিত, তাঁহারা বলিতেছেন যে, এদিক হইতে চীনের দিকে জাহাজে করিয়া যাইতে হইলে আড়াই হাজারের অধিক ঘাঁটি পার হইয়া যাইতে হইবে। জাপানের জন্য যে সীমারেখা চিহ্নিত করিয়া দেওয়া হইয়াছে, তাহার এক কোণে পেনিউ বলিয়া একটি ক্ষুদ্র দ্বীপ বিদ্যমান। সেটা না কি সামরিক হিসাবে বড় গুরু। এখান হইতে ফিলিপাইন নিকট, সিঙ্গাপুরও দূরে নহে। আবার বলা হইতেছে, জাপান এখানে দুর্গ নির্ম্মাণ করে নাই সত্য, কিন্তু এখানে দুর্গ নির্ম্মাণ করিবার কোন প্রয়োজনই হয় না। এখানে অনেক দ্বীপকে প্রকৃতি দুর্ভেদ্য দুর্গ করিয়া নির্ম্মাণ করিয়াছেন। এ কথা সত্য কি না, তাহা আমরা বুঝি না, জানিও না। তবে যখন এই দ্বীপপুঞ্জ জাপানের হাতে সমর্পণ করা হইয়াছিল, তখন তাহা দেখা উচিত ছিল। যাহা হউক, এখন এই ব্যাপার লইয়া যেরূপ রব তোলা হইতেছে, তাহাতে মনে হইতেছে, এদিকেও একটা ঝটিকা-কেন্দ্র উদ্ভব হইবার শঙ্কা জাগিতেছে। এখানকার কতগুলি দ্বীপ না কি যুদ্ধ-জাহাজ, ডুব-জাহাজ, রণ-বিমান প্রভৃতির স্বাভাবিক আড্ডা হইতে পারে। ট্রুক (truk) নামক একটি ক্ষুদ্র দ্বীপ নৌবাহিনীর সুন্দর আড্ডা হইতে পারে। এ সকল কথা এখন উঠিতেছে, পূর্ব্বে উঠে নাই। এখন দেখা যাইতেছে যে, বিগত মহাযুদ্ধের পর জনৈক গ্রহাচার্য্য গণনা করিয়া বলিয়াছিলেন যে, ইহার পর প্রশান্ত মহাসাগরের বক্ষে একটা বড় রকম যুদ্ধ হইবে, তাহা সম্পূর্ণ নিষ্ফল না হইতেও পারে।

ইঙ্গ-মিশরীয় মিতালি

ইটালী কর্ত্তৃক আবিসিনিয়া অধিকারের পর য়ুরোপের এবং আফ্রিকার রাজনীতিক অবস্থায় একটা নূতন পরিস্থিতি উপস্থিত হইয়াছে। ব্যাপারটা সকলে ঠিক বুঝিয়াই উঠিতে পারিতেছেন না। কারণ, ঘটনাচক্র এত দ্রুত আবর্ত্তিত হইতেছে যে, কে কোথায় কি ভাবে যাইয়া দাঁড়াইবে, তাহা এখনও ঠিক বুঝিবার সময় হয় নাই। ইটালী আবিসিনিয়া দখল করিয়া লইয়াছে। টানা হ্রদ এবং তাহার পার্শ্ববর্ত্তী স্থানগুলি ইটালীর দখলেই আসিয়াছে। টানা হ্রদ নীল নদের প্রাণ, সুতরাং সুদান এবং মিশরের জীবন। উহা এখন যাইয়া পড়িয়াছে ইটালীর হাতে। ইটালী এখন বলদর্পে দর্পী। কিন্তু তাহার অর্থবল অধিক নহে। সে এখন বিত্তশালী বৃটেনের সহিত বল পরীক্ষা করিবার ক্ষমতা পায় নাই। যাহা হউক, ইটালী বৃটিশ কেশরীকে আশ্বাস দিয়াছেন যে, তাঁহারা কোন দিকে কোনখানেই বৃটিশ স্বার্থের হানি করিবেন না। কিন্তু য়ুরোপীয় ডিপ্লোম্যাসীর যেরূপ গতি, তাহাতে শেষ পর্য্যন্ত বিভিন্ন জাতির স্বার্থসংঘর্ষে পরিণাম কি দাঁড়াইবে, তাহা বুঝিবার উপায় নাই। অতএব বৃটিশ কেশরীকেও পূর্ব্ব হইতে সাবধান হইতে হয়। সেই জন্য বৃটিশরাজ মিশরের ওয়াফদল বা জাতীয় দলকে তুষ্ট করিবার জন্য এই মৈত্রী-বন্ধনের ব্যবস্থা করিয়াছেন, এখন অনেকেরই এই বিশ্বাস জন্মিতেছে। এই মৈত্রীবন্ধনে বৃটিশ জাতি তাঁহাদের আন্তর্জাতিক স্বার্থ বজায় রাখিয়া মিশরকে অনেকটা স্বাধীনতা দিয়াছেন। লণ্ডনের পররাষ্ট্র বিভাগের কার্য্যালয়ের লোকার্ণো প্রাসাদকক্ষে এই নূতন ইঙ্গ-মিশরীয় সন্ধি স্বাক্ষরিত হইয়া গিয়াছে। বৃটিশ সরকারের পক্ষ হইতে স্বাক্ষর করিয়াছেন—মিষ্টার এন্থনী ইডেন, লর্ড হ্যালিফ্যাক্স, সার জন সাইমন, মিষ্টার র‍্যামজে ম্যাক-ডোনাল্ড এবং সার মাইলস্ ল্যাম্পসন; আর মিশরের পক্ষে স্বাক্ষর করিয়াছেন, মিশরের প্রধান মন্ত্রী নাহাস্ পাশা; এবং মিশরের তের জন প্রতিনিধি। এই ব্যাপারে মিশরের রাজনীতিক ভাগ্যের অনেকটা পরিবর্ত্তন ঘটিল। সার এন্থনী ইডেন এই উপলক্ষে যে বক্তৃতা করিয়াছেন, তাহাতে তিনি বলিয়াছেন যে, গত ১৬ বৎসর ধরিয়া মিশরে যে সমস্যা প্রকট হইয়া রহিয়াছে, এইবার তাহার

মিষ্টার এন্থনী ইডেন

লর্ড হ্যালিফ্যাক্স

সমাধান হইবে। এই সন্ধির মূলে রহিয়াছে যে বৃটিশ এবং মিশরের স্বার্থ অভিন্ন এবং অচ্ছেদ্য। নাহাস পাশার নেতৃত্বে মিশরের প্রতিনিধিরা যে মিত্রভাবের পরিচয় দিয়াছেন, তাহার ফলেই এই সন্ধিপত্র স্বাক্ষর করা হইল। এই সন্ধি উভয় দেশেই নবযুগের প্রবর্তন করিয়া দিবে এবং এই সন্ধির সর্তগুলি উভয় জাতির সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ করিয়া তুলিবে। যে সুদীর্ঘকাল ধরিয়া মিশরের সহিত ইংরেজ জাতির সম্পর্ক স্থাপিত হইয়াছে, তাহাতে ইংরেজ জাতি মিশরকে অনেক সম্পদ দান করিয়াছেন। সে জন্য ইংরেজ জাতি আজ শ্লাঘা অনুভব করিতেছেন।

সন্ধির যে সর্ত হইয়াছে, তাহাতে মিশরবাসীরা যে অনেকটা স্বাধীনতা পাইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। ইংরেজ অবশ্য হাতের পাঁচ ছাড়েন নাই। এদিকে ইংরেজের প্রধান স্বার্থ সুয়েজ খাল। এই

সার জন সাইমন

সার মাইল্‌স্‌ ল্যাম্পসন

নাহাস্‌ পাশা

মিষ্টার ম্যাকডোনাল্ড

সুয়েজ খাল রক্ষার্থ ইংরেজ এখন কায়রো ছাড়িয়া তাঁহাদের সেনাবাস ইস্মেলিয়ায় লইয়া যাইবেন। তথায় তাঁহারা দুই বৃগেড সৈন্য রাখিবেন। এই পরিমাণ সৈন্যই ইদানীং তথায় রক্ষিত হইয়া আসিতেছে। ইংরেজ ইদানীং আলেকজান্দ্রিয়াতে যুদ্ধের সময় বা যুদ্ধের শঙ্কা ঘটিলে তাঁহাদের রণতরী রাখিতে পারিবেন। দুর্গাদি সুদৃঢ় করিবার জন্য যে অর্থ ব্যয় হইবে, তাহার আংশিক ও গ্রেটবৃটেন লইবেন। ১৯৩০ খৃষ্টাব্দের সন্ধির সর্ত অনুসারে রণ-বিমান চলাচলের যে বাঁধাবাঁধি নিয়ম ছিল, তাহা তুলিয়া দেওয়া হইল। এখন মিশরের আকাশের যে কোন স্থানে বৃটিশ রণবিমান উড়িবে এবং যে কোন বিমানাশ্রয়ে উহা নামিবে—তথায় আশ্রয় লইয়া থাকিতে পারিবে। ইংরেজ আপাততঃ আলেকজান্দ্রিয়ায় এবং তাহার সন্নিহিত জনপদ ও ভূভাগ অধিকার করিয়া থাকিতে পারিবেন। যত দিন ইস্মেলিয়ায় গোরাবারিক প্রভৃতি নির্ম্মিত না হইতেছে, তত দিন গোরা সৈন্য কতক আলেকজান্দ্রিয়ায় থাকিতে পারিবে। এত দিন যে অশ্বারোহী সৈন্যদল মিশরে ছিল, তাহা তথা হইতে সম্ভবতঃ সরাইয়া লইয়া যাইয়া দক্ষিণ-প্যালেষ্টাইনে, সুদানে, সাইপ্রাসে এবং জিব্রাল্টারে রক্ষিত হইবে। ফলে সুয়েজ খাল রক্ষার সমস্ত ভারই ইংরেজদিগের হস্তে থাকিবে বটে, কিন্তু মিশরও সে বিষয়ে ইংরেজের সহায়তা করিবেন। মিশরীয় সৈন্যদল একটি ইংরেজ সামরিক মিশনের দ্বারা গঠিত এবং পরিচালিত হইবে। সুদানের ব্যাপারেও মিশরের কিছু হাত থাকিবে। মিশর অতঃপর স্বাধীন রাজ্য বলিয়াই বিঘোষিত হইল। মিশর রক্ষার ভার প্রধানতঃ মিশরের অধিবাসীরাই পাইলেন। মিশরে যে সকল য়ুরোপীয় বসবাস করিতেছেন, তাঁহাদের বিচারভার আর য়ুরোপীয় বিচারকদিগের হাতে থাকিবে না। মিশরপ্রবাসী য়ুরোপীয়গণ স্বেচ্ছায় তাঁহাদের অধিকার ত্যাগ করিতে সম্মত কি না, তাহা বিদেশী একটি কমিশনের দ্বারা সিদ্ধান্ত হইবে। যদি তাঁহারা স্বেচ্ছায় সে অধিকার ত্যাগ করিতে সম্মত না হন, তাহা হইলে মিশরের কর্তৃপক্ষ এক বৎসরের নোটিশ দিয়া তাঁহাদের সে অধিকার বিলুপ্ত করিয়া দিতে পারিবেন। মিশরের রাজা এখন স্বাধীন দেশের রাজা হইলেন, সেই জন্য তিনি 'হিজ ম্যাজেষ্টি' নামে অভিহিত ও সম্মানিত হইবেন।

ফলে মিশর এখন কার্য্যতঃ স্বাধীন হইল। উহার সৈন্যবিভাগ এখন ইংরেজ কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হইবে সত্য, কিন্তু তাহাতে উহার লাভ হইবে। কারণ, তাহা হইলে মিশরীয় সৈন্য যে রণকুশল হইবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।
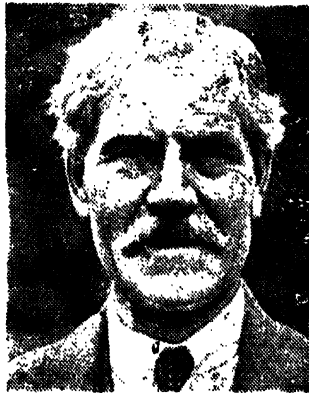
স্পেনে গৃহযুদ্ধ

স্পেনে গৃহযুদ্ধ বাধিয়া উঠিয়াছে। প্রথমে শুনা গিয়াছিল যে, স্পেনের এই হাঙ্গামাটা সৈনিকদিগের বিদ্রোহমাত্র, কিন্তু এখন যেরূপ সংবাদ পাওয়া যাইতেছে, তাহাতে বেশ বুঝা যাইতেছে, ইহা বিদ্রোহ নহে, ইহা একটা প্রবল গৃহযুদ্ধ। অর্থাৎ স্পেনের অধিবাসীরা এখন পরস্পর দুই ভাগে বিভক্ত হইয়াছে, এবং তাহারা তাহাদের দেশে কি প্রকার শাসনযন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করিবে, তাহা লইয়া পরস্পর পরস্পরের সহিত বল পরীক্ষা করিতেছে। স্পেনের সরকারী দল Government are valuable only where they are products of national character. No cunningly devised political arrangements will of themselves do anything. ইহার মর্ম্মার্থ এই যে, "যদি শাসনযন্ত্রের আকার জাতীয় চরিত্রের ফলস্বরূপ হয়, তাহা হইলেই তাহার মূল্য থাকে। নতুবা যতই চতুরতার সহিত রাজনীতিক বন্দোবস্ত কর না কেন, তাহাতে কিছুই হইবে না।" তিনি এইখানেই বলিয়াছেন যে, ফ্রান্সের নূতন গণতন্ত্রবাদ পুরাতন স্বৈর শাসনের ভিন্ন মূর্ত্তি মাত্র। (New Democracy is but old Despotism differently spelt)
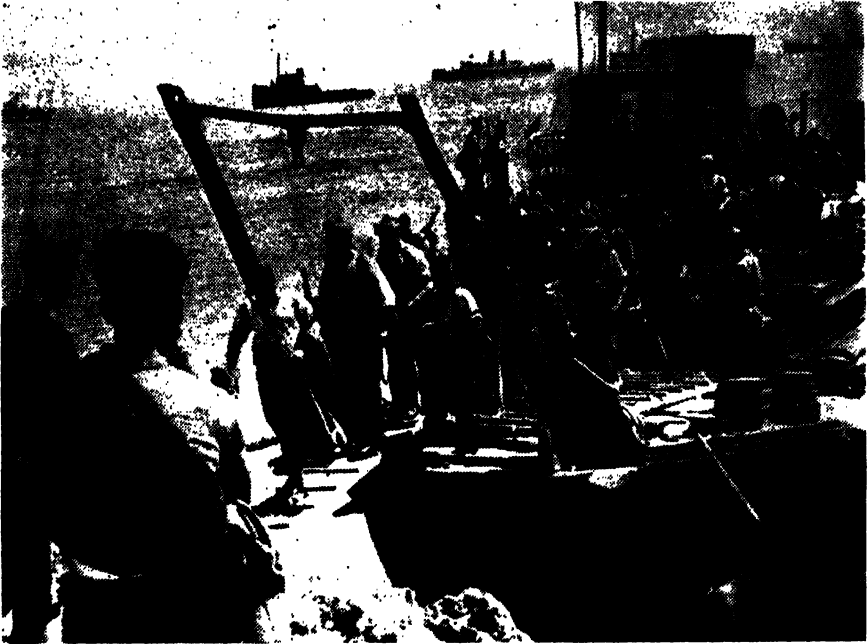
ম্যাজোরোকা ফ্যাসিষ্ট বিদ্রোহীদের শক্তিকেন্দ্র

কমিউনিষ্ট বা সর্ব্বস্বত্ববাদী; বর্ত্তমান যুগে গণতন্ত্রের যেরূপ প্রভাব, তাহাতে সর্ব্বস্বত্ববাদীদিগের সহিত বাহিরের অনেকেরই বিশেষ সহানুভূতি বিদ্যমান। কিন্তু যুরোপে যেন একটা প্রতিকূল হাওয়া বহিয়া যাইতেছে। কতকগুলি লোক এবং দেশ এখন গণতন্ত্র পরিহার করিয়া স্বৈরতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করাই শ্রেয় বলিয়া মনে করিতেছেন। ইটালীতে এবং জার্ম্মাণীতে এখন স্বৈরতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, এবং আরও কয়েকটি দেশে স্বৈরতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পক্ষপাতী লোক দেখা দিতেছে। তাহার কারণ, এই গণ-শাসনে স্বৈর-শাসনের ন্যায় অত্যাচার হয় না, এ ধারণা ভুল। বরং স্বৈর-শাসনের অত্যাচার অপেক্ষা গণ-শাসনের অত্যাচার অধিক হইয়া থাকে। হার্ব্বার্ট স্পেন্সার যথার্থই বলিয়াছেন যে—Forms of

সেই জন্য অনেকে গণতন্ত্র ততটা ভালবাসেন না। সেই জন্যই তথায় উহার প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হইয়াছে। স্পেনে সমাজতন্ত্রী দল কিছুকাল শাসনযন্ত্র পরিচালিত করিয়াছিলেন, তাঁহাদের অবিমৃষ্য-কারিতার ফলে এই গৃহযুদ্ধ বাধিয়াছে কি না, তাহা এখন বলা কঠিন। কিন্তু কেবল সৈনিকরাই এই যুদ্ধ বাধাইয়াছে বলিলে ব্যাপারটার স্বরূপ বলা হয় না। কারণ, এখন দেখা যাইতেছে, কেবল সৈনিকরা বিদ্রোহী হইলে এমন ব্যাপকভাবে সেই বিদ্রোহ গৃহযুদ্ধে পরিণত হইতে পারিত না। এ কথা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, ঐ হাঙ্গামার সংবাদ ঠিকমত পাওয়া যাইতেছে না। যাহা পাওয়া যাইতেছে, তাহা অত্যন্ত অসম্বদ্ধ, বিক্ষিপ্ত এবং পরস্পর-বিরোধী। উহা হইতে প্রকৃত অবস্থা বুঝা অসম্ভব। তবে

স্পেন বিদ্রোহে বোমা-বর্ষণে বিধ্বস্ত টলেডো সহরের একটি দৃশ্য

বে-সামরিক স্বেচ্ছা-সৈনিকরা সরকার পক্ষে যুদ্ধ করিবার জন্য বার্সিলোনা হইতে ট্রেণে সারাগোসায় যাইতেছে

কোন পক্ষের অস্ত্রাদির অভাবের লক্ষণ দেখা দেয় নাই। যুদ্ধ চলিতেছে। প্রত্যেক পক্ষই জয়লাভ করিতেছে বলিয়া ঘোষণা করিতেছে। আমরা নিম্নে যুদ্ধের মোটামুটি সংবাদ সঙ্ক্ষেপে প্রদান করিলাম।

পূর্ব্বে সামান্য বিদ্রোহীদিগের সহিত স্পেনের সরকার যুদ্ধকার্য্যে ব্যাপৃত আছেন বলিয়া যে সংবাদ পাওয়া গিয়াছিল, জুলাই মাসের একেবারে শেষভাগে সংবাদ পাওয়া যায় যে, সেই বিদ্রোহীরা খুব বীরত্বের সহিত যুদ্ধ করিতেছে; কিন্তু কোন পক্ষই বিশেষভাবে জয়লাভ করিতে পারিতেছে না। মাদ্রিদ, বার্সিলোনা এবং অনেক বড় বড় সহরের ভাগ্যে কি হয় বলা যায় না। তাহার কয়েক দিন পরে আগষ্ট মাসের প্রথম সপ্তাহেই সংবাদ আসিয়াছিল যে, উভয় পক্ষই প্রচণ্ডবিক্রমে লড়াই করিতেছে। মাদ্রিদের উত্তরে গুয়াডারামা পাহাড়-অঞ্চলে উভয় পক্ষের তুমুল সংগ্রাম চলিতেছে।

এইটুকু সত্য যে, বিদেশীরা আর কোন পক্ষেই অস্ত্রশস্ত্রাদি দিয়া সাহায্য করিবেন না বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। কিন্তু এখনও ত

বিপ্লবী সৈন্তরা মাদ্রিদ অভিমুখে অগ্রসর হইবার সঙ্কল্প করিয়াছে। এই সময় স্পেনের সরকারী সৈন্যদল উত্তর অঞ্চলে জয়লাভ করিয়াছিল বলিয়া প্রকাশ করা হয়, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সংবাদ পাওয়া যায়, কামেরেজ এবং সিউদাজের মধ্যবর্ত্তী অঞ্চলে এক প্রচণ্ড সংগ্রাম হইয়া গিয়াছে; সেই যুদ্ধে সরকারী সৈন্যদল পরাজিত হইয়াছে। এই সময়ে বার্সিলোনা হইতে সংবাদ পাওয়া যায় যে, এক দল ফরাসি সৈন্য (উহারা অবশ্য ফ্রান্সের সরকারী সৈন্য নহে) স্পেনের সরকারী পালমেণ্টনে যোগ দিবার জন্য বার্সিলোনায় উপস্থিত হইয়াছে। ঐ সপ্তাহে আর বড় বিশেষ উল্লেখযোগ্য সংবাদ পাওয়া যায় নাই। কেবল ভ্যালেন্সিয়া হইতে এক দল শক্তিশালী সৈন্য গুয়াডারামা অভিমুখে অগ্রসর হইতেছিল বলিয়া খবর আসে। এই সময়ে ফ্যাসিষ্ট দল খবর দেয় যে, তাহারা বাডাজোজ অভিমুখে অনেকটা অগ্রসর হইয়াছে। আবার সরকার পক্ষ বলে যে, তাহারা গুইসারজন ধ্বংস করিয়া সানসাবষ্টিয়ান হইতে বিদ্রোহীদিগের সাগর-পথ বহিয়া পলাইবার পথ বন্ধ করিয়া দিয়াছে।

ইহার পরবর্ত্তী সংবাদে প্রকাশ পায় যে, বিদ্রোহীরা মাদ্রিদ সহর অধিকার করিবার জন্য অগ্রসর হইতেছে, সরকারী সৈন্যদল উহাদের গতিরোধ করিতে পারিতেছে না। কয়েক দিন রব উঠিয়াছিল, মাদ্রিদ বুঝি শত্রুকরতলগত হয়। এই সময়ে অর্থাৎ আগষ্ট মাসের মধ্যভাগে এই প্রকার সংবাদ পাওয়া যায়। কিন্তু এ পর্য্যন্ত বিদ্রোহীরা মাদ্রিদ দখল করিতে সমর্থ হয় নাই। ইহার পরই সংবাদ পাওয়া গিয়াছিল যে, বিদ্রোহীরা গুয়াদারামার পরিখা প্রভৃতি খনন করিয়া আপনাদের স্থান সুদৃঢ় করিয়া লইয়াছে। অস্ত্রশস্ত্রের প্রধান কারখানাগুলি বিদ্রোহীদিগের কর্ত্তৃত্বাধীনে রহিয়াছে। পরে সংবাদ পাওয়া যায় যে, যে কোন মুহূর্ত্তে মাদ্রিদের সহিত ভ্যালেন্সিয়ার যোগসূত্র ছিন্ন হইতে পারে। ইহার পর সংবাদ আসে যে, বিদ্রোহীরা অনেক দিন যুদ্ধ করিয়া বাডাজোজ অধিকৃত করিয়া লইয়াছে। সানসাবষ্টিয়ান অধিকারের জন্য বিদ্রোহীরা বিশেষভাবে চেষ্টা করিতেছে। এইরূপ নানা সংবাদই পাওয়া যাইতেছে। যুদ্ধের সংবাদ পূর্ব্ববৎই। তবে কোন পক্ষই যে বিশেষ জয়লাভ করিতে পারিতেছে, তাহা মনে হয় না। এমনও সংবাদ পাওয়া যাইতেছে যে, স্পেনের উত্তর-পূর্ব্ব সীমান্তস্থিত ইরুন (Irun) নামক স্থানে এবং মাদ্রিদের উপর বিদ্রোহীরা ভীমতেজে বোমা বর্ষণ করিতেছিল, তাহারা বুরুষ্টিয়া পর্ব্বতের এক বিশেষ সুবিধাজনক স্থান অধিকার করিয়া লইয়াছে। ফলে যুদ্ধের অবস্থা যথাপূর্ব্বং তথা পরম্। উভয় পক্ষই তুল্য বলশালী মনে হইতেছে। এ দিকে কিছুদিনের জন্য যুদ্ধ স্থগিত রাখিবার কথা চলিতেছে। একটি সংবাদে প্রকাশ—মাদ্রিদের অবস্থা বড়ই সঙ্কটাপন্ন। তথায় যেন কোনরূপ শাসন নাই। শ্রমিক এবং আইরিয়ান বিপ্লবপন্থীরা তথায় সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া দাঁড়াইতেছে। একটি মিটমাটের বৈঠকে সেনাপতি মোলা উপস্থিত ছিলেন।

মনোময়ী

হে রুদ্রাণি, মোর চিত্তে নাহি জাগে ভয়
তোমার কটাক্ষপাতে। শুধু মনে হয়,—
আমার হারানো-সুরে গাঁথিয়া কবিতা
এসেছ দিনের শেষে তুমি দীপান্বিতা
করিতে গৌরব দান।

বাজিতেছে কাণে,—
'যে বাণী তোমার নয়, তারে কোনোখানে
না করো প্রকাশ যেন আপন বলিয়া
হীনতার অন্তরালে নিজেরে ছলিয়া।'
সে-কথা ভুলিনি কভু, জেগে আছে মনে
তোমার প্রহরী হয়ে সতর্ক-নয়নে।
যে-গান আজিকে তাই গাহিব উল্লাসে
সুদূর পল্লীর এক অখ্যাত-আবাসে,—
ধরণীর ধারাপাতে মেলি শতদল,
করে যেন পথিকের স্বপন সফল।

শ্রীপ্রমথনাথ কুণ্ডার।

জলধর-স্মৃতি-সম্বর্দ্ধনা

তৃতীয় প্রস্তাব

'মাসিক বসুমতীর' আষাঢ় ও শ্রাবণ সংখ্যায় রায় জলধর সেন বাহাদুরের স্মৃতি-তর্পণ-মহাভারতের আদি-সভা বন-বিরাট পর্ব্বের মহিমা-বিশ্লেষণ পাঠ করিয়া, কোন কোন সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক অনুযোগ বা অনুরোধ জানাইয়াছেন যে, তাঁহাদের সার্ব্বজনীন "দাদা" জলধরবাবু বৃদ্ধ হইয়াছেন—তিনি শেষ জীবনে যে পাথেয় সঞ্চয় করিতেছেন, তাহাতে বাধা দেওয়া সমীচীন নহে। রায় বাহাদুর নিজেও প্রতিবাদ-সূচনায় লিখিয়াছেন,—

"বয়স আমার আশীর কোঠায় গড়িয়ে আসছে। জীবন প্রদীপ স্তিমিতপ্রায়। এ সময়ে এরূপ অকারণ বাদ-প্রতিবাদে লিপ্ত হবার মত উৎসাহ বা প্রবৃত্তি কোনটাই আমার নেই।"

('মাসিক বসুমতী', ১৩৪৩ শ্রাবণ, ১২০ পৃষ্ঠা)

কিন্তু বৃদ্ধত্বের দাবী কাহাকেও অনর্গল মিথ্যা কথা লিখিবার নিরঙ্কুশ অধিকার প্রদান করে বলিয়া আমাদিগের জানা নাই। বোধ হয়, সাহিত্য-সুরসিক—সুধীজনসমাজও এ বিষয়ে আমার সহিত একমত হইয়া, 'বৃদ্ধস্য বচনং গ্রাহ্যম্' নীতির অনুসরণে জলধরবাবুর মিথ্যার প্রবলধারা বর্ষণে বিভ্রান্ত হইবেন না।

আর অনৃতের কুহকজাল বিস্তারের সময় ত' জলধরবাবুর উৎসাহের অন্ত ছিল না। এখন সত্যের দিব্যপ্রভায় সে মায়া-প্রহেলিকা অপসারিত হইতে দেখিয়াই কি রায় বাহাদুরের উৎসাহের সঙ্গে সঙ্গে প্রবৃত্তিও অন্তর্হিত হইল?

জলধরবাবু "স্মৃতি তর্পণ সম্বন্ধে দু'একটি কথায়" আমার "জন্য একান্ত অনুকম্পাবোধ" করিয়া লিখিয়াছেন—

"আমার স্মৃতিতর্পণে বহু স্থলে বার বার আমি একথা বলেছি যে অর্দ্ধশতাব্দীর ও অধিককাল পরে 'স্মৃতিতর্পণ' লিখতে বসে আমি কোন ঘটনারই সন তারিখ সঠিক বলতে পারবো না। ...মাঝে মাঝে দু'একটা বিষয়ে পারিপার্শ্বিক ঘটনা আলোচনা করে কোন কোন প্রসঙ্গের একটা সময় নির্ণয়ের চেষ্টা করেছি বটে, কিন্তু সেটা যখন নিতান্তই আন্দাজি তখন ভ্রম প্রমাদপূর্ণ হওয়া কিছুমাত্র বিচিত্র নয়।...কিন্তু এ সব কথা স্পষ্ট কবুল থাকা সত্ত্বেও দীনেন্দ্রবাবু দেখছি এই অশীতিপর বৃদ্ধের ক্ষীণস্মৃতি প্রসূত দুর্ব্বল সন তারিখ গুলোকেই আঁকড়ে ধরে অকারণ অনেকখানি উৎসাহ ও সময় নষ্ট করেছেন।"

('মাসিক বসুমতী' ১৩৪৩ শ্রাবণ, ১২০ পৃষ্ঠা)

অথচ জলধরবাবু ১৩৪০ সালের আশ্বিন-সংখ্যা 'মাসিক বসুমতীতে'—সুবিনয়ে অহঙ্কার প্রকাশ করিয়াছেন, "এই বৃদ্ধ বয়স পর্য্যন্ত উচ্চ গণিতের চর্চ্চা ক'রে আনন্দ পাই।"

তাঁহার এই সদম্ভ স্বীকার-উক্তি পড়িয়া, তিনি নিজে যে শট্‌কে গণিতে হাঁপাইয়া উঠেন, এমন অনুমান করা যায় কি? যিনি অঙ্কশাস্ত্র-বিশারদ—সাইমাল্‌টেনিয়াস্ ইকোয়েসন প্রভাবে অনায়াসে দু'তিনটি সংখ্যা নির্ণয়ে সমর্থ, তিনি দুইটি ঘটনার সন তারিখ মিলাইয়া কতটা পার্থক্য তাহা নিরিখ করিতে পারেন না—সম্ভব অসম্ভব বুঝিয়া উঠিতে পারেন না, ইহা বিশ্বাস করিতে বলিতেও তিনি লজ্জিত হন নাই! অবশ্য জলধরবাবু যেমন হলপ করিয়া বলিয়াছেন যে, চোদ্দ গণিয়া কোন দিন দু'লাইন পদ্যও তিনি লিখিতে পারেন নাই, তেমনই যদি স্বীকার পাইতেন যে, শট্‌কের নাম শুনিলেই তিনি সট্‌কাইয়া পড়েন, তাহা হইলে আর কোন বালাই থাকিত না।

কিন্তু জলধরবাবু যে, রীতিমত ডায়েরী রাখিয়া হিমালয় পরিভ্রমণ করিয়াছেন—তাহা ত' কোন মতেই তাঁহার অস্বীকার করিবার উপায় নাই। তাঁহার স্বনামে প্রচারিত 'হিমালয়', 'হিমাদ্রি' 'পথিক' পুস্তক-সূচনায় খৃষ্টাব্দ মুদ্রিত—প্রতি পৃষ্ঠায় তারিখ ও বার সন্নিবেশিত। হিমালয়-ভ্রমণ সময়ে কাঙ্গাল হরিনাথের গানের বহির সহিত বাঁধান সাদা কাগজে তিনি যে ডায়েরী লিখিয়াছিলেন, তাঁহার সেই তারিখযুক্ত দিনলিপির সংক্ষেপ দিক্‌নির্ণয়মাত্র অবলম্বন করিয়াই ত' উক্ত ভ্রমণ-কাহিনীত্রয় কল্পনার বর্ণচ্ছটায় সুরঞ্জিত করিয়া বিরচিত—মুদ্রিত—প্রকাশিত হইয়াছে। রায় বাহাদুর ১৩৪০ সালের আশ্বিন-সংখ্যা 'মাসিক বসুমতীতে'—১৩২৩ সালের বৈশাখ-সংখ্যা 'ভারতীতে'—'হিমালয়' পুস্তকের ৩য় পৃষ্ঠায়—'হিমাদ্রির' (জলধর গ্রন্থাবলী ১ম খণ্ডের) ২য় পৃষ্ঠায়—'পথিক' পুস্তকের ১০ম পৃষ্ঠায় নিজেই ইহা স্বীকার করিয়াছেন। সেই ডায়রীখানি আজও ত'

জলধরবাবুর সঙ্গের সাথী। তাঁহার স্বনামে প্রচারিত 'পথিক' পুস্তকের 'যাত্রা আরম্ভে' প্রকাশ—

"এই অদৃশ্যপ্রায় হস্তলিপি হিমালয়ের সেই সুন্দর মনোমোহন ছবি নয়ন সম্মুখে অতুল শোভার ভাণ্ডার উন্মুক্ত করিয়া দেয়। এখনও এই শস্য-শ্যামলা জন্মভূমির একপ্রান্তে বসিয়া যখনই আমার সেই জীর্ণ খাতাখানি খুলিয়া বসি, তখনই তাহার প্রত্যেক অক্ষর আমার মানস নয়নে হিমালয়ের পবিত্র দৃশ্য প্রসারিত করিয়া দেয়;......এই ক্ষুদ্র খাতার মধ্যে আমার জীবনের কত সুখ দুঃখ, কত বিরহ কাতরতা, কত বেদনা বিষাদের সুদীর্ঘ কাহিনী অব্যক্ত অলিখিত ভাষায় লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। বিশালদেহ, উন্নতশীর্ষ বৃক্ষমূলে কত বিনিদ্র রজনী যাপনের মৌন ইতিহাস ইহার পৃষ্ঠায়-পৃষ্ঠায় অঙ্কিত।"

তবে রীতিমত সন তারিখযুক্ত দিনলিপি রাখিয়া—পরে অন্যের "যৌবনসুলভ উচ্ছ্বাসে" সুসজ্জিত করাইয়া—প্রতি পৃষ্ঠায় তারিখ বারের বাহার দিয়া, যিনি তিনখানি ভ্রমণকাহিনী ছাপাইয়াছেন—সেই "অশীতিপর বৃদ্ধের ক্ষীণস্মৃতি প্রসূত দুর্ব্বল সন তারিখ গুলোর" স্মৃতি বিচ্যুত হইবার অবকাশ কোথায়? জলধরবাবু "মাঝে মাঝে দু'একটা বিষয়ে পারিপার্শ্বিক ঘটনার আলোচনা করে কোন কোন প্রসঙ্গের একটা সময় নির্ণয়ের" যে চেষ্টা করিয়াছেন তাহার অনুসরণ করিয়া, অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বে—পরিণত যৌবনে যখন তাঁহার স্মৃতি-দৌর্ব্বল্যের কোন সম্ভাবনা হয় নাই—তখন তিনি হিমালয়-ভ্রমণের ডায়েরীতে যে সকল সন তারিখের নজীর মুদ্রিত করাইয়াছেন, তাহারই অনুশীলনে কি তাঁহার স্মৃতিতর্পণের মাহাত্ম্য বিশ্লেষণ করি নাই? আর মিথ্যা কথা চালাইয়া ধরা পড়িবার আশঙ্কায় সন তারিখ ভুলিয়া যাইবার অভ্যাস ত' জলধরবাবুর নূতন নহে—চিরাচরিত। চল্লিশ বৎসর পূর্ব্ব হইতে—যখন তাঁহার বয়স "আশীর কোঠায় গড়িয়ে" আসে নাই, তখন হইতেই ত' তিনি এ কসরতি দেখাইতেছেন।

"'শুক্রবার'—একখানি অতি ক্ষুদ্র খাতায় এ পথের সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলাম। যখন খাতাখানিতে পেন্সিল দিয়া লিখি, তখন হয় ত মনে করিয়াছিলাম, 'শুক্রবার' লিখিয়া রাখিলেই মাস বৎসর তারিখ সমস্ত স্মরণ হইবে; এখন দেখিতেছি তাহার কিছুই মনে নাই।

('পথিক' ৩য় সং, ১০ পৃষ্ঠা)

কিন্তু এ বার যে সীমাবদ্ধ গণ্ডীর ভিতর তিনি আত্ম-প্রশংসার উল্লাসে প্রমত্ত হইয়া নৃত্য করিতেছেন, তাহাতে যে সে মামুলী কৌশল প্রয়োগের সুযোগ নাই, তাহাও কি তাঁহার মত সুচতুর-চূড়ামণিকে স্মরণ করাইয়া দিতে হইবে?

আদালতে মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে গিয়া জেরার দাপটে ধরা পড়িলে, শত মিথ্যা কথা বলিয়াও যেমন সে মিথ্যার সংশোধন করা যায় না—জলধর বাবুর সেইরূপ বে-সামাল অবস্থা কি না—তাঁহার "স্মৃতি তর্পণ সম্বন্ধে দু'একটি কথার" প্রতি কথার উত্তরে তাহাই পর পর দেখাইবার প্রয়াস পাইতেছি।

অর্দ্ধ শতাব্দীর অধিককাল দীনতার অভিনয়ে সিদ্ধিলাভে ধন্য—সুদক্ষ অভিনেতা রায় বাহাদুর উচ্ছ্বসিত অশ্রুর অদম্য আবেগ রোধ করিতে গিয়া, স্বরভঙ্গ-বিকম্পিত-কণ্ঠে প্রশ্ন করিয়াছেন,—

"এমন কি অনেক স্থলে আমি ঘটনার পারম্পার্য্য পর্য্যন্ত যথাযথভাবে রক্ষা করতে পারিনি।...সন্তানের জন্মতারিখ যদি কোন পিতার স্মরণ না থাকে তাহলে পিতৃ পরিচয় থেকে তাঁকে কি বঞ্চিত হতে হবে? কোন্‌টা আগে ঘটেছিল আর পরে ঘটেছিল কোনটা—এ যদি আমি গুছিয়ে বলতে না পেরে থাকি সে জন্য কি ঘটনাগুলিও মিথ্যা হয়ে যাবে?"

এই সঙ্গে জলধর বাবু ত' অনায়াসেই তাঁহার পকেটস্থ অশ্রু-পাম্প টিপিয়া, চার্লি চাপলিনের মত চোখের জলের অজস্রধারায় বক্ষ ভাসাইয়া বলিতে পারিতেন;—"স্বামী বিবেকানন্দ! হৃষীকেশের গঙ্গাতীরের ক্ষুদ্র কুটীরে...সংজ্ঞা শূন্য"—এ দুঃসংবাদ কে যেন বে-তার বার্ত্তাবর্ত্তে আমার শিরায় শিরায় বিদ্যুৎ শক্তি সঞ্চালিত করেছিল—আমি পায়ে পাখা বেঁধে, দিক্‌বিদিক জ্ঞানহারা হ'য়ে হিমালয়ের জঙ্গলের কাঠকাটবার সঙ্কীর্ণ, বন্ধুর, 'একপেয়ে' পথ ধরে যেন বায়ুমার্গে উড়ে ছুটেছিলাম হৃষীকেশে;—গ্রীষ্মের "প্রায়ান্ধকার গঙ্গার বালুকাময় চড়ায় সেই গাছের অনুসন্ধান করে সৌভাগ্যক্রমে অনতিদূরেই সেই গাছ পাই; তারি ২।৩টী পাতা এনে হাতে রগড়ে রস বের করে স্বামীজীর মুখে দেই—প্রায় আধঘণ্টা পরে স্বামীজী চৈতন্যলাভ করলেন";—বৃদ্ধত্বের দাবীতে ইহার গৌরব-গর্ব্বমাত্র আমার প্রাপ্য; কিন্তু সে জন্য ঠিক সেই সময়ে স্বামী বিবেকানন্দ হৃষীকেশে অচৈতন্য হ'তে যাবেন কেন?—আর মহাত্মা ভূদেব কুমারখালির বঙ্গবিদ্যালয়ে ছাত্রবৃত্তি প্রথম শ্রেণীতে, কাঙ্গাল হরিনাথের নির্দ্দেশে, আমার কবিতা

আবৃত্তি শুনে কেঁদে আকুল হ'য়েছিলেন—অশ্রু-নিদর্শন স্বরূপ 'স্পেক্টেটর' বইখানি উপহার দিয়ে এসেছিলেন—"বই আর নেই -জ্যেঠাইমার পুরাতন কাঠের সিন্দুকে পোকায় কেটে তাকে একেবারে শেষ করেছে; বইখানি থাকলে আজ আমি পরম গর্ব্বভরে আমার জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুরস্কার সকলকে দেখাতাম;"—কিন্তু সে জন্য ভূদেববাবুকে পরিদর্শন-কেন্দ্রসীমা অতিক্রম ক'রে কুমারখালির বঙ্গবিদ্যালয়েই বা যেতে হবে কেন?

একটু বেশীমাত্রায় চোখের জল প্রবাহিত করিতে পারিলেই যখন সকল আপদের শান্তি হয়—সকল তর্কের অবসান হয়—আর সেই অশ্রু-নির্ঝরধারা যখন জলধর বাবুর চুরুটের ধোঁয়ার মত অফুরন্ত—মিথ্যা কথার মত অজস্র—তখন তিনি এমন সঙ্কটকালে সেই চির-আজ্ঞাবহ অশ্রু-বন্যাকে সুনিয়োগ করিতে বিস্মৃত হইলেন কেন?

"সন্তানের জন্ম তারিখ যদি কোন পিতার স্মরণ না থাকে তাহলে পিতৃ-পরিচয় থেকে তাঁকে বঞ্চিত হতে" হয় না সত্য,—কিন্তু জলধরবাবু অনেকগুলি সন্তানের পিতা বলিয়া, কোন্‌টির পর তাঁহার কোন্ পুত্রটি জন্মিয়াছেন, তাহাও কি তিনি বলিতে পারিবেন না? সত্য ঘটনা লিখিতে গিয়া কোন্ ঘটনার পর কোন্‌টি ঘটিয়াছিল, তাহা বিস্মৃত হওয়া সম্ভব হয় কি?

বনপর্ব্ব—হিমালয়ে—স্বামীজীর জীবনদান পর্ব্বাধ্যায়

সংসারের কর্ম্মকোলাহল হইতে বহুদূরে—তপস্যার নিভৃত নিকেতন আলমোড়া মায়াবতীর তপোবনে দ্বাদশবর্ষ-ব্যাপী একনিষ্ঠ সাধনায় আত্মনিবেদন করিয়া, ত্যাগ-বৈরাগ্যসম্পন্ন সন্ন্যাসিগণ, স্বামীজীর তপস্যাসঙ্গী—লীলা-সহচর—গুরুভ্রাতৃবৃন্দ—প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের বিশিষ্ট ভক্তগণের নিকট হইতে তথ্য সংগ্রহ করিয়া, বিশ্ববরেণ্য স্বামী বিবেকানন্দের যে প্রামাণ্য জীবনী সঙ্কলন করিয়াছেন—সেই অতুলনীয়, অমূল্য মহাগ্রন্থ হইতে স্তরে স্তরে নিদর্শন উদ্ধৃত করিয়া যাহা সুপ্রমাণিত করিয়াছি—তাহা মিথ্যা প্রতিপন্ন করিবার দুরাশায় রায় বাহাদুর অসীম স্পর্দ্ধা প্রকাশ করিয়া লিখিয়াছেন:—

"আমি শুধু দৃঢ়তার সঙ্গে এই একটি কথাই বলতে চাই যে আমার বর্ণিত ঘটনাগুলি, বিশেষতঃ পূজ্যপাদ স্বামী বিবেকানন্দের সম্বন্ধে বর্ণিত ব্যাপার দিবালোকের ন্যায় সম্পূর্ণ সত্য। উহার মধ্যে কোথাও বিন্দুমাত্র অতিরঞ্জন নাই।"

কিন্তু স্বামীজীর জীবনদানের গৌরবলাভের আশায় উদ্‌ভ্রান্ত জলধর বাবুর কল্পিত বিবরণ "দিবালোকের ন্যায় সম্পূর্ণ সত্য";—না, তাঁহার মিথ্যার কুহেলিকা-বিস্তার সত্য-সূর্য্য সমুদয়ে মুহূর্ত্তে অপসারিত—তাহা আষাঢ়-সংখ্যা 'মাসিক বসুমতীতে' জলধর স্মৃতি-সম্বর্দ্ধনার প্রথম প্রস্তাবে বিস্তৃত ভাবে সুপ্রমাণিত হইয়াছে—সেই জন্য এ বার সংক্ষেপে নিবেদন করিতেছি। রায় বাহাদুর-কল্পিত মৃত-সঞ্জীবন গাছের ২।৩টি পাতার রস খাওয়াইয়া স্বামীজীর চৈতন্য-সঞ্চারের কাহিনীটি এমনই নিদারুণ সত্য যে, প্রতিবাদে তিনি আর দ্বিতীয় বার কাহিনীটির উল্লেখ করিতে সাহস পান নাই—"স্বামী বিবেকানন্দ সম্বন্ধে বর্ণিত ব্যাপার" বলিয়াই সারিয়াছেন।

রায় বাহাদুরের শ্রীমুখনিঃসৃত কথা—অলীক—অলৌকিক—অসম্ভব—কল্পনাতীত—ধারণাতীত হইতেই পারে না—তাঁহার শ্রীকথা অতুল্য—অমূল্য—বেদবাক্যেও উপমার যোগ্য কি না সন্দেহ—তাহাতে কোনরূপ প্রমাণ প্রয়োগের বালাই থাকিতেই পারে না। আর 'অতিরঞ্জনে'—রায় বাহাদুর আকাশ-কুসুমের বর্ণভাতি ব্যতীত অন্য কোন রং যে 'বিন্দুমাত্র' ব্যবহার করেন নাই, আশা করি, তাহা সকলেই স্বীকার করিতে পারিবেন।

অলৌকিক সুতীব্র অনুভূতি-প্রভাবে স্বামীজীর জীবন-সঙ্কট বুঝিয়া, জীবনদানের জন্য ব্যাকুল জলধর বাবু 'পায়ে পাখা বেঁধে' কি ভাবে পুরাকালে প্রসিদ্ধ 'টেঁস্‌কেল দে কটক' যাইবার মত সহজ সঙ্কীর্ণ পথে উড়িয়া, হিমালয় অতিক্রম করিয়াছিলেন দেখুন:—

"হৃষিকেশ যাবার একটি প্রসস্ত পথ ছিল, যে পথে গাড়ী-ঘোড়া, লোক-জন ও মালপত্র যাতায়াত করত'। এ ছাড়া জঙ্গলের ভিতর দিয়ে আর একটা 'একপেয়ে' সোজাপথ ছিল, কাঠুরিয়ারা জঙ্গলে কাঠ কাটবার জন্য এই সঙ্কীর্ণ পথ ধরেই বনের মধ্যে যেত। সাহসী গ্রামবাসীরাও অনেকে প্রয়োজন হলে এ পথ ব্যবহার করত। আমি একাধিকবার এই পথ বেয়ে বেলা একটা দেড়টায় বেরিয়ে দেরাদুন থেকে হৃষিকেশে পৌঁছিছি সন্ধ্যার প্রাক্কালেই। এ পথ সুরু হয়েছে দেরাদুনের 'দহিয়ালা' বা ঐরূপ একটা কি নামের গণ্ডগ্রাম থেকে। এ পথের দৈর্ঘ্য হবে

অনুমান ২৫।২৬ মাইল মাত্র ! আমি সে বয়সে ঘণ্টায় পাঁচ ছয় মাইল পথ অবলীলায় চলে যেতে পারতেম এটা কিছুমাত্র বাহাদুরীও নয়, কারণ, আমারই জানিত একাধিক সাধু প্রতি ঘণ্টায় গড়ে এর চেয়েও দীর্ঘতর বন্ধুর পথ অনায়াসে অতিক্রম করে যেতেন। দীনেন্দ্র বাবুও এরূপ কাহিনী জানেন বলেই আমার বিশ্বাস।"

উঃ! কি দুর্দান্ত দুঃসাহস! অতঃপর কোন্ ভরসায় বলিব, সে যুগে বাঙ্গালীর জীবনে adventure ছিল না! গাছের পাতার প্রাণদায়িনী সুধারসে মুমূর্ষু স্বামী বিবেকানন্দের জীবনদানের জন্য জলধরবাবু উন্মত্ত আবেগে, পায়ে পাখা বাঁধিয়া, শ্বাপদসঙ্কুল জঙ্গলাকীর্ণ বন্ধুর পার্ব্বত্য-পথে একাকী উড়িয়া চলিয়াছেন! যৌবনকালে পৃথিবীর অদ্বিতীয় মহাবীর নেপোলিয়ানের আল্পস্ উল্লঙ্ঘন—রুসিয়া-অভিযান কাহিনীর অনুবাদ করিয়াছিলাম—আর এই বৃদ্ধ বয়সে রায় বাহাদুরের হিমালয় অভিযানের অসম্ভব অসমসাহস দেখিবার সৌভাগ্যলাভে ধন্য হইলাম। বিশেষতঃ নেপোলিয়ান সশস্ত্র—বীরেন্দ্রবৃন্দ-পরিবৃত—তেজস্বী অশ্বে আরোহী—আর আমাদের জলধরবাবু একাকী—পদচারী—লাঠিকম্বলমাত্র-সম্বল। কিন্তু তাঁহার হিমালয় ভ্রমণ-কাহিনীতে তিনি অন্য কোন বার একাকী অভিযান করিয়াছেন বলিয়া প্রমাণ পাই নাই। বিলাতী উপন্যাসের আজগুবি প্রহেলিকার কল্পনালীলা অপেক্ষা—এ বাস্তব কাহিনী কত বড় মিথ্যার হিমালয়—অসম সাহসের গৌরীশঙ্কর অভিযান!

জলধরবাবুর দৌড়বাজির বিক্রম আমি জানি বলিয়া অসঙ্কোচে নজীর দিয়াছেন। কিন্তু তিনি যে প্রতি "ঘণ্টায় পাঁচ ছয় মাইল" বেগে জঙ্গলময় পার্ব্বত্য পথে "অবলীলায় চলে যেতে পারতেন", আমি বাঙ্গালার সমতল প্রদেশেও তাঁহার সঙ্গের সাথী হইয়া কোন দিন তাহা প্রত্যক্ষ করিবার সৌভাগ্য লাভ করি নাই।

ডেরাডুন হইতে হৃষীকেশের দূরত্ব কমাইবার জন্য গণিত-বিশারদ মাষ্টার মহাশয় লিখিয়াছেন ;—

"এ পথ সুরু হয়েছে দেরাডুনের 'দহিয়ালা' বা ঐরূপ একটা কি নামের গণ্ডগ্রাম থেকে। এ পথের দৈর্ঘ্য হবে অনুমান ২৫।২৬ মাইল মাত্র।"

এই কৌশলে জলধরবাবু ডেরাডুন হইতে 'দহিয়ালার' দূরত্বটা অনুগ্রহ করিয়া অসঙ্কোচে বাদ দিয়াছেন। কিন্তু Mr. H. G. Walton I. C. S. সঙ্কলিত ডেরাডুন জেলার সরকারী গেজেটিয়ারের ২২৫ পৃষ্ঠায় প্রকাশ—

"Doiwala—a villago…It has given its name to a station of the Dehra-Hardwar railway, about 12 miles from the former place."

এই ১২ মাইল রাস্তা জলধর বাবুর বর্ণিত '২৫।২৬ মাইল মাত্রের' সহিত যোগ করিলে কত মাইল হয়?

সরকারী গেজেটিয়ারের পরিশিষ্টে ডেরাডুন হইতে হৃষীকেশের রাস্তার দূরত্বের যে ৬ষ্ঠ শ্রেণীর গমনযোগ্য পার্ব্বত্য পথের—"6th class road, cleared only"—তালিকা প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে দেখা যায়—

ডেরাডুন হইতে ভোগপুর—	১৫ মাইল
ভোগপুর হইতে রাণীপুকরী—	৮ মাইল
রাণীপুকরী হইতে হৃষীকেশ—	১০ মাইল
	মোট ৩৩ মাইল।

দুরধিগম্য জঙ্গলাকীর্ণ পথের দূরত্ব—যাহা গেজেটিয়ারে উল্লিখিত হয় নাই—তাহা ইহার সহিত যোগ করিলে নিশ্চয়ই ৩৭।৩৮ মাইলের উপরই হইবে।

কলিকাতার অটোমোবাইল এসোসিয়েশন মোটর অভিযানের জন্য পথঘাটের মানচিত্র ও পরিমাপ সঙ্কলন করিয়াছেন। অনুরোধক্রমে তাঁহারা ১০ই আগষ্ট তারিখের পত্রে জানাইয়াছেন—ডেরাডুন হইতে হৃষীকেশ ৩৩ মাইল। ইহার সহিত করণপুরের দূরত্ব যোগ করিলে ৩৬।৩৭ মাইলই হইবে।

ডেরাডুনের কোন লব্ধপ্রতিষ্ঠ ডাক্তার অনুগ্রহ করিয়া ১৭ই আগষ্ট তারিখের পত্রে জানাইয়াছেন :—

"ডেরাডুন থেকে দইয়ালা ১২ মাইল। তার পর দইয়ালা থেকে দুইটি রাস্তা, একটি District Board Road এবং অপরটি Forest Road ; এই Forest Road দুইটির (2a) একটি Borkot forest হ'য়ে সত্যনারায়ণ এবং (2b) অপরটি Kansrao এর আগে হয়ে ফিরে হৃষীকেশ। (2a) দইয়ালা দিয়ে রাণীপোখরী—ভোগপুর—বরকোট দিয়ে সত্যনারায়ণের পাশ দিয়ে হৃষীকেশ। রাস্তা এখনি ভীষণ জঙ্গল ; ৩৫ বৎসর আগে কি ছিল জানি না—Tiger infested (ব্যাঘ্রভীতিসঙ্কুল)। (2b) রাস্তা District Board এ পরে যেটা Kansrao Forest Road এ মিলে বড় রাস্তা যেটা Roywalla station থেকে হৃষীকেশে যায়—তাতে পড়েছে। (2a) এখান থেকে দইয়ালা ১২ মাইল এবং তার পর ২০ মাইল, একুনে ৩২ মাইল। (2b) দইয়ালা ১২ মাইল—D. B. Road হয়ে হৃষীকেশ ২৫ মাইল একুনে ৩৭ মাইল। কাজেই রাস্তা খুব জানা না থাকলে এবং quickness না থাকলে ৬।৭ ঘণ্টায় যাওয়া খুবই মুস্কিল। আর

quick march এর অভ্যাস থাকা দরকার।...মানুষ নিজেকে একটা হোমরা-চোমরা কর্ত্তে সব কর্ত্তে পারে।"

আর জলধরবাবুর এই ৩৭ মাইল জঙ্গলময় পার্ব্বত্য পথ অতিক্রম করিতে ৬৷৭ ঘণ্টা কেন—সাড়ে তিন ঘণ্টার বেশী সময় যে লাগে নাই—তাহা পরে দেখাইতেছি।

• সে যুগে যে সকল তপস্যাব্রতী সন্ন্যাসী ডেরাডুন হইতে হৃষীকেশে পদব্রজে আসিয়াছিলেন, তাঁহাদের নিকট সন্ধান লইয়া জানিয়াছি যে, তাঁহারা কেহই দুই দিনের কমে এই জঙ্গলময় পথ অতিক্রম করিতে পারেন নাই। হরিদ্বারে সেবাব্রতে আত্মনিবেদিত কোন সন্ন্যাসী অনুগ্রহ করিয়া জানাইয়াছেন—করণপুর হইতে হৃষীকেশ ৩৮ মাইল—সাধুরাও কেহ এই সুদীর্ঘ পথ ৯-১০ ঘণ্টায় অতিক্রম করিতে পারেন না।

জলধরবাবুর মত মিথ্যাশ্রয়ী যখন মায়াবতী-সংস্করণ স্বামীজীর প্রামাণ্য জীবনী বিশ্বাস করিয়া উঠিতে পারেন নাই—তখন সরকারী গেজেটিয়ার,—ডেরাডুনের সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তারের উক্তি,—সন্ন্যাসীদের কথা যে অনায়াসে হাসিয়া উড়াইয়া দিতে পারিবেন, তাহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই। বদ্রিনারায়ণ যাত্রাকালে জলধর বাবু দুই দিনে—অন্ততঃ ১৮ ঘণ্টায়—তাঁহার পাথাবাঁধা পাদুখানি সবেগে চালাইয়া ডেরাডুন হইতে হৃষীকেশে পৌঁছিয়াছিলেন—সে বিবরণ তাঁহার স্বনামে প্রকাশিত 'হিমালয়' পুস্তক হইতে 'মাসিক বসুমতীর' আষাঢ় সংখ্যায় ৩৭১ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত করিয়াছি। এ বার তাঁহার স্বনামে প্রচারিত 'পথিক' পুস্তক হইতে হৃষীকেশ অভিযান-কাহিনী সংক্ষেপে সঙ্কলন করিতেছি:—

"হৃষীকেশ হরিদ্বার হইতে বার মাইল উপরে, একটী পার্ব্বতীয় তীর্থস্থান। কিন্তু সাধারণতঃ যে সকল যাত্রী তীর্থ দর্শনোপলক্ষে হরিদ্বার পর্য্যন্ত গমন করেন, তাঁহারা হৃষীকেশ পর্য্যন্ত যাইতে চাহেন না; কেন না পথ বড়ই দুর্গম;...আমি যেখানেই যাই, আমার প্রধান আড্ডা দেরাডুন।...বহু প্রলোভনে এক জন হিন্দুস্থানী বন্ধুকে হস্তগত করা গেল এবং একখানা বয়েল গাড়ী ভাড়া করিয়া, বেলা দুই প্রহরের সময় কম্বল ও লোটা লইয়া **যানারোহণ** করিলাম।

"দেরাডুন হইতে হরিদ্বার যাইবার একটি ভাল রাস্তা আছে। সে রাস্তাটা বারমাস থাকে না, বৃষ্টির সময় ঝরণাগুলি প্রবল হইয়া উঠিলে সে রাস্তা বন্ধ হইয়া যায়।...এ পথ ছাড়া হৃষীকেশ যাইবার আরও একটা পথ আছে, হরিদ্বারের রাস্তায় ১৪ মাইল আসিয়া তাহার পর জঙ্গলে নামিয়া যাইতে হয়। জঙ্গলে রাস্তা নাই। জঙ্গল হইতে কাঠ কাটিয়া আনিবার জন্য কণ্ট্রাক্টরেরা গাড়ী লইয়া যায়।...তাহা ছাড়া অরণ্য-প্রদেশে লোকজনের দেখা-সাক্ষাৎ পাওয়া একরকম অসম্ভব বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

"বেলা **দুই প্রহরের** সময় বাসা হইতে বাহির হইয়া অপরাহ্ন **প্রায় ৪ টার** সময় হরিদ্বারের রাস্তা ত্যাগ করিয়া জঙ্গলে নামিলাম। সম্মুখে একটা প্রকাণ্ড ঝরণা;...কোন রকমে স-গাড়ী ঝরণা পার হওয়া গেল। আমরা যেখানে পার হইলাম, সেখানে মানুষের হাটিয়া পার হইবার যো নাই, জলের এত তেজ। ঝরণা পার হইয়া রাস্তা পাওয়া গেল; রাস্তা ত ভারি—সেই চক্রনেমির দাগ। সম্মুখে জঙ্গল দেখিলাম,...মধ্যাহ্ন সূর্য্যের রশ্মিও তাহার ভিতর কদাচ প্রবেশ করিতে পারে।...

"... দেখিতে দেখিতে সন্ধ্যা হইয়া আসিল, এই অরণ্য-পথ আমাদের গাড়োয়ানের বিশেষ পরিচিত; তাই সে কোনরকমে পথ না হারাইয়া এই জঙ্গল উত্তীর্ণ হইয়া সন্ধ্যার পর 'রাণীপুকুর' নামক একটা গ্রামে গাড়ী লইয়া উপস্থিত হইল।...আহারান্তে আমরা শয়ন করিতে গেলাম।

"প্রভাতে উঠিয়া বিদায় গ্রহণ করিতে আমাদের একটু বিলম্ব হইয়া গেল...কিন্তু গাড়োয়ান খুব জোরে গাড়ী হাঁকাইতে লাগিল; তখন **পূর্ব্বদিক ফরসা** হইয়াছে মাত্র। সম্মুখে প্রকাণ্ড জঙ্গল। আমরা শীঘ্রই মহারণ্যে প্রবেশ করিলাম।...এই সুবিশাল অরণ্যে প্রবেশ করিয়া আমার মনে হইল, পৃথিবী ত্যাগ করিয়া সহসা যেন চির-অন্ধকার-সমাচ্ছন্ন, অনন্ত-স্তব্ধতা-পরিব্যাপ্ত পাতালপুরে প্রবেশ করিয়াছি।...

"আমি চলিতে আরম্ভ করিলাম, গাড়ী পিছনে পিছনে আসিতে লাগিল। চারিদিকে যে কি নিবিড় অরণ্য, তা বর্ণনা করা যায় না, উপন্যাসে বড় বড় জঙ্গলের বর্ণনায় তাহার একটু ক্ষীণ আভাস অনুভব করা যায় মাত্র। হিমালয়ের পাদদেশে আগাগোড়া এই রকম বহুদূর বিস্তৃত জঙ্গল; কিন্তু...হৃষীকেশের এই জঙ্গলের ন্যায় ভয়ানক জঙ্গল প্রায় দেখা যায় না।...জঙ্গল দেখিয়া প্রাণে...ভয়ের সঞ্চার হইয়াছিল,...একে গাছগুলি খুব ঘন-সন্নিবিষ্ট বলিয়া তাহাদের মাথায় মাথায় ঠেকাঠেকি হইয়া আছে, তাহার উপর আবার নানারকমের পরগাছা তাহাদের মাথাগুলি জড়াইয়া ফেলিয়াছে।...এই অরণ্যে নানাপ্রকার তৃণ এবং অন্যান্য ক্ষুদ্রকায় লতাগুল্মের এমন একটা সমাবেশ, আর সেগুলি এত উচ্চ যে, তাহার ভিতর হাতী লুকাইয়া থাকিলেও বুঝিবার যো নাই। শুনিয়াছি এ অরণ্যে সকল রকম জন্তুই বাস করে; আমার সৌভাগ্য যে দূরে হস্তিযূথ ছাড়া আমার অদৃষ্টে আর কোন ভীষণ জন্তু দর্শন ঘটে নাই। এ নিবিড় বনে অনেকে হিংস্র জন্তুর হাতে প্রাণ হারাইয়াছেন,...এমন কি আমার পরিচিত কয়েকজন বাঙ্গালীও প্রাণ হারাইতে বসিয়াছিলেন...। এই সকল কথা মনে হইতে লাগিল। তখন আরও ভীত হইয়া পড়িলাম। খানিকদূর অগ্রসর হইয়া দেখি গাড়ী নাই। ...পথে জনমানবের সম্পর্ক নাই; বনের মধ্যে একটু শব্দ হইলেই গা কাঁপিয়া উঠে।...কিন্তু যত চলি, পথ কিছুতেই সংক্ষেপ হয় না; আমি প্রাণপণ শক্তিতে দ্রুতপদে সোজা চলিতে লাগিলাম। ...ক্ষুধা-তৃষ্ণায় অধীর হইয়া ক্ষিপ্তের ন্যায় ছুটিতে লাগিলাম। হঠাৎ দূরে একটা শব্দ শুনিয়া আমি থমকিয়া দাঁড়াইলাম।...এ কি

কোন ভৌতিক ব্যাপার ?...কিয়দ্দূরে গিয়া দেখিলাম অদূরে... একটি রোরুদ্যমানা বালিকা।...আমি নিজে পথভ্রান্ত, আমার স্কন্ধে একটি ষোল সতের বৎসরের পথভ্রান্তা সুন্দরী। অনেক ঘুরিতে ঘুরিতে শেষে এক কাঠুরিয়ার আড্ডায় উপস্থিত; তাহারা একজন লোক সঙ্গে দিয়া পথ দেখাইয়া দিলে তবে অপরাহ্ণ তিনটার পর হৃষীকেশে পৌঁছান গেল।"

('পথিক', ৩য় সং, ৮৩ হইতে ৯৩ পৃষ্ঠা)

তাহা হইলে জলধর বাবু গাড়ী করিয়াও ত' এই সংক্ষেপ জঙ্গল-পথ দুই দিনে ১৮ ঘণ্টার কমে অতিক্রম করিতে পারেন নাই। অথচ তিনি প্রতিবাদেও লিখিতেছেন—

"আমি একাধিকবার এই পথ বেয়ে বেলা একটা দেড়টায় বেরিয়ে দেরাদুন থেকে হৃষীকেশে পৌঁছেছি সন্ধ্যার প্রাক্কালেই।"

এই 'একাধিকবারের'—তাঁহার এক বারের অভিযানে 'হিমালয়' হইতে দেখাইয়াছি যে, তিনি দুই দিনে অন্ততঃ ১৮ ঘণ্টায় ডেরাডুন হইতে হৃষীকেশে পৌঁছিয়াছিলেন। তাঁহার স্বনামে প্রচারিত—জলধর গ্রন্থাবলীর ১ম খণ্ডের অন্তর্ভুক্ত—'হিমাদ্রি' পুস্তক—যাহার সম্বন্ধে জলধর বাবুর প্রখ্যাতনামা উকিল শ্রীযুত নরেন্দ্র দেব অনুগ্রহ করিয়া স্বীকার করিয়াছেন :—

"সুসাহিত্যিক শ্রীযুক্ত সুবোধচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সে ভার লইয়া হিমালয়ের একটি সাধুভাষার সংস্করণ সঙ্কলন করিয়া দেন। এবং তাহা 'হিমাদ্রি' নামে প্রকাশিত হয়।"

('মাসিক বসুমতী' ১৩৪০, মাঘ, ৬৪৯ পৃষ্ঠা)

তাহাতেও দুই দিনে ১৮ ঘণ্টায় ডেরাডুন হইতে হৃষীকেশে জলধরবাবুর শুভাগমনের বিবরণ সমর্থিত। 'পথিক' পুস্তকেও দেখা যায়, "সংক্ষেপ জঙ্গল পথে খুব জোরে গাড়ী হাঁকাইয়া" এবং "প্রাণপণ শক্তিতে দ্রুতপদে—ক্ষিপ্তের ন্যায় ছুটিয়াও" জলধর বাবু দুই দিনে ১৮ ঘণ্টার পূর্ব্বে ডেরাডুন হইতে হৃষীকেশে উপনীত হইতে পারেন নাই। তবে এই ব্রাহ্মস্পর্শের পরও এক শনিবারের বারবেলায় তিনি "এই পথ বেয়ে বেলা একটা দেড়টায় বেরিয়ে দেরাদুন থেকে হৃষিকেশে সন্ধ্যার প্রাক্কালেই" পৌঁছিলেন কিরূপে ?

ইহার পর মায়াবতী-সংস্করণ স্বামীজীর জীবনীর অসঙ্গতি প্রতিপন্ন করিবার জন্য রায় বাহাদুর লিখিয়াছেন :—

"এক জন পীড়িত সন্ন্যাসীকে নিয়ে স্বামীজীকে আশ্রয়ের জন্য সে যুগে দেরাদুনের দ্বারে দ্বারে ঘুরে হতাশ হ'তে হয়েছিল, একথা মেনে নেওয়া কঠিন। কারণ নিজ জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে আমি জোর করেই বলতে পারি যে গৈরিকধারীকে অবজ্ঞা বা অশ্রদ্ধা করবার মত নাস্তিক্য বুদ্ধি সে যুগের ভারতবাসী হিন্দুদের মধ্যে তখনও দেখা দেয়নি।"

কোন ধর্ম্ম বা কোন সমাজের প্রতি কোনরূপ বিদ্বেষ ভাব—অশ্রদ্ধা প্রকাশ না করিয়াও অনায়াসে বলা যাইতে পারে—ডেরাডুনে ব্রাহ্মসমাজ ও আর্য্যসমাজের প্রভাব অত্যধিক। জলধরবাবু ব্রাহ্ম-পরিচয়ে, এবং সে সময় করণপুর স্কুলে সুযোগ্য শিক্ষকের অভাবে ব্রাহ্ম পরিবারে আশ্রয় লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু স্বামীজী ও তাঁহার গুরুভ্রাতৃগণ সে সুবিধা পান নাই। আর "গৈরিকধারীকে অবজ্ঞা বা অশ্রদ্ধা করবার মত নাস্তিক্য বুদ্ধির" যে প্রকৃষ্ট পরিচয় জলধরবাবুর স্বহস্ত-লিখিত ডায়েরী অবলম্বনে রচিত 'হিমালয়'—'হিমাদ্রি' পুস্তকের প্রতি পৃষ্ঠায় প্রকটিত হইয়াছে—তাহাই ইহার শ্রেষ্ঠতম নিদর্শন—যথাযোগ্য উত্তর। অন্য প্রসঙ্গে জলধর বাবুর সেই নাস্তিক্য বুদ্ধির পরিচয় তাঁহার স্বনামে প্রচারিত পুস্তক হইতে সঙ্কলন করিয়া দিবার বাসনা রহিল।

জলধরবাবু শুনিয়া নিশ্চয়ই আরও বিস্মিত হইবেন যে, সেযুগে—চিকাগোর ধর্ম্ম-মহাসম্মেলনের পূর্ব্বে—স্বামী বিবেকানন্দের নাম জগতে সুপ্রচারিত হইবার পূর্ব্বযুগ ত' দূরের কথা—কিছুদিন পূর্ব্বে ডেরাডুনে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ-দেবের যে শতবার্ষিক উৎসব হইয়াছিল—স্থানীয় হিন্দুস্থানী ভক্তগণ ব্যতীত মাত্র দুই জন ডেরাডুনবাসী বাঙ্গালী ভক্ত তাহার উদ্যোগী হইয়াছিলেন।

ইহার পর—স্বামীজী জলধরবাবুর মত সুবিধা গ্রহণের মনোবৃত্তি লাভ করিতে পারেন নাই বলিয়া, রায় বাহাদুর উল্লসিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছেন :—

"...পণ্ডিত আনন্দনারায়ণ দেরাদুনে স্বামী অখণ্ডানন্দকে একখানি পৃথক্ বাড়ী ভাড়া করে রাখলেন, উপযুক্ত পথ্য ও গরম কাপড় সরবরাহ করলেন। আর তাঁর গুরুভাইরা তাঁকে সেই বাড়ীতে একলা রেখে—"the other stayed else where and begged their meals as fortune favoured them.' এ কেমন করে সম্ভব হতে পারে ?"

ডেরাডুনে স্বামীজী কেবল তাঁহার অসুস্থ গুরুভ্রাতা—স্বামী অখণ্ডানন্দের জন্যই আশ্রয় ও পথ্য ভিক্ষা করিয়াছিলেন। আমরা পরম বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হইয়াছি—ডেরাডুনের বহু গৃহে তাঁহারা নিরাশ হইলে স্বামীজীর

অনুরোধে পণ্ডিত আনন্দনারায়ণ তাঁহার বাড়ীর সন্নিকটবর্ত্তী একখানি ছোট ভাড়াটিয়া বাড়ীর একটি প্রকোষ্ঠে স্বামী অখণ্ডানন্দকে আশ্রয় প্রদান করেন। পণ্ডিতজী তাঁহার গৃহ হইতে স্বামী অখণ্ডানন্দের জন্য দুইবেলা খাবার পাঠাইতেন, এবং প্রয়োজনীয় শীতবস্ত্র দিয়াছিলেন। স্বামীজী ও অপর গুরুভ্রাতৃত্রয় প্রথমে গঙ্গামন্দিরে—পরে স্থানীয় এক লালা ও বেণের বাড়ীতে অবস্থান করিয়া, স্থানীয় ভদ্রলোকদের গৃহে আহার্য্য ভিক্ষা করিতেন। রাত্রিতে এক জন গুরুভ্রাতা আসিয়া স্বামী অখণ্ডানন্দের নিকট শয়ন করিতেন। স্বামী অখণ্ডানন্দও প্রায় প্রত্যহ দিনমানে স্বামীজী ও গুরুভ্রাতৃগণের নিকট বেড়াইতে যাইতেন।

স্বামীজী যে এই শুভ সুযোগে সদলে এবং সবলে পণ্ডিত আনন্দনারায়ণের দীর্ঘকালব্যাপী আতিথ্য গ্রহণ করেন নাই—ইহাতে জলধরবাবু "নিজ জীবনের অভিজ্ঞতা" স্মরণ করিয়া অবশ্যই বিচলিত হইতে পারেন। এমন সুবিধা গ্রহণে স্বামীজীর অক্ষমতা দেখিয়া রায় বাহাদুরের উল্লসিত—বিস্মিত হইবারই কথা। বেকার অবস্থায় জলধর বাবু 'সাহিত্য'-সুহৃদ—সমালোচক স্বর্গীয় নলিনীভূষণ গুহ মহাশয়ের চেতলার বাড়ীতে সানুনয়ে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। ক্রমে জলধর বাবু বন্ধুত্বের অভিনয়ে পসার জমাইয়া, তাঁহার গৃহে সপুত্র—সময় সময় সস্ত্রীক ভাবে চার পাঁচ বৎসর অধিষ্ঠান করেন। নলিনীবাবু তাঁহাকে আশ্রয় ও আহার প্রদান করিয়াই নিষ্কৃতি পান নাই—পরিধেয় হইতে পকেট খরচা পর্য্যন্ত যোগাইয়া ধন্য হইতে পারিয়াছিলেন। তিনি এখন স্বর্গীয় হইলেও তাঁহার পুত্র পরিজন এবং চেতলাবাসী বহু প্রবীণ ভদ্রলোক জলধর বাবুর সে পরম আতিথ্য-গ্রহণের আনুপূর্ব্বিক বিবরণ সু-অবগত আছেন। স্পর্দ্ধার শিখরে উঠিয়াই—প্রতিদানে রায় বাহাদুর একখানি উপন্যাসে এই সম্ভ্রান্ত পরিবারের অতি কুৎসিত চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। আমরা এই ভদ্র-পরিবারের সম্ভ্রমহানির আশঙ্কায় জলধর বাবুর সেই উপন্যাসখানির নামোল্লেখ করিয়া লেখনী কলঙ্কিত করিলাম না। ৪।৫ বৎসর সপুত্র আতিথ্যগ্রহণের বিনিময়ে এমন কৃতঘ্নতার নিদর্শন বঙ্গসাহিত্যে আর কখনও দেখিয়াছেন কি? 'সাহিত্যিকদিগের ইতিহাসের কিছু মাল-মসলা জমা' করিবার প্রয়াসে জলধর বাবু পরম অনুকম্পায় স্মৃতি-তর্পণে নলিনী বাবুর নাম পর্য্যন্ত উল্লেখ করিতে বিস্মৃত হইয়াছেন। আশা করি, এখন তিনি পূজনীয় সুরেশচন্দ্র সমাজপতি মহাশয়ের সেই পরম বন্ধুর কথা বেশ স্মরণ করিতে পারিবেন।

অতঃপর রায় বাহাদুর লিখিয়াছেন :—

"দেরাদুনের করণপুরে তখন অনেক বাঙ্গালীর বাস ছিল। আমরা যেই শুনলেম যে, স্বামীজী কয়েকজন সন্ন্যাসীদের নিয়ে দেরাদুনের কালীবাড়ীতে অবস্থান করছেন, আমরা তৎক্ষণাৎ ছুটে গেছলেম তাঁদের নিয়ে আসতে। সুতরাং তিনি দ্বারে দ্বারে আশ্রয়ের জন্ম ব্যর্থকাম হোয়েছিলেন, এ কথা কিরূপে স্বীকার করা যেতে পারে?"

জলধর বাবু নিশ্চয়ই স্বীকার করিবেন—সে যুগে ডেরাডুন অপেক্ষা কলিকাতায় অধিক সংখ্যক বাঙ্গালী বাস করিতেন। কিন্তু ঠাকুরের লীলা-সম্বরণের পর, ভক্তপ্রবর সুরেশচন্দ্র মিত্র এবং তাঁহার দেহান্তের পর বলরাম বাবু ব্যতীত অপর কেহই ত' সে যুগে বরাহনগর মঠে শ্রীরামকৃষ্ণপদে সমর্পিতপ্রাণ—কঠোর তপস্যানিষ্ঠ এই নবীন সন্ন্যাসিগণকে সাহায্য করিতে অগ্রসর হন নাই। স্বামীজীর শ্রীমুখ-নিঃসৃত কথায় তাহার পরিচয় দিতেছি :—

"We are sannyasins,…We never thought of the morrow. We used to live on what little came by begging. To-day Suresh Babu is not with us, and Balaram Babu has also passed away. Had these two been alive they would have danced with joy at the sight of this Math !…You have heard of Suresh Babu's name. …know him to be the source of this Math. It was he who helped to found the Baranagore Math. O it was Suresh Mittra who at that time was most anxious to meet our needs !…There were days at the Baranagore Math when we were so much in want that we had nothing to eat If the rice was procured by begging, there was no salt. On some days, we had only rice and salt, but no one would mind that."…

(Life of the Swami Vovekananda,
vol II, page 27-28.)

কিন্তু জলধর বাবু নিশ্চয়ই চুরুটের ধোঁয়ার মতই এ সকল বিবরণ উড়াইয়া দিবেন। সে যুগে ডেরাডুনে

কালীবাড়ী প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। 'মাসিক বসুমতীর' আষাঢ় সংখ্যায় প্রকাশিত 'জলধর-স্মৃতি-সম্বর্দ্ধনার' উত্তরে জলধর বাবু তাঁহার অনেকগুলি মিথ্যা উক্তির প্রতিবাদ করিতেও সাহস করেন নাই। সেগুলির ভিতর ৩৮২ পৃষ্ঠার প্রথম প্যারায় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম—সে যুগে —"জলধর বাবু কোন্ কোন্ সংবাদপত্র পাঠে ও কোন্ কোন্ বন্ধুর নিকট স্বামী বিবেকানন্দের নাম জানিতে পারিয়াছিলেন"? এই প্রসঙ্গে তিনি ইহার সদুত্তর দিবেন কি?

ইহার পর রায় বাহাদুর লিখিয়াছেন :—

"সম্ভবতঃ মায়াবতীর জীবনী লেখক স্বামীজীর সমভিব্যাহারী সে দিনের কোন সন্ন্যাসীর নিকট দেরাদুনের কাহিনী সংগ্রহ করবার চেষ্টা করেন নি। করলে এত বড় ভুল কখনই হ'তে পারত না।"

না, জলধর বাবু যখন বলিতেছেন, তখন নিশ্চয়ই মায়াবতীর সন্ন্যাসিগণ স্বামীজীর জ্ঞান-কর্ম্ম-ভক্তি-সাধনার জ্যোতির্বিবম্বিত পরিব্রাজক-জীবন-কাহিনী আকাশে ফাঁদ পাতিয়া ধরিয়া—এই ১৭০০ পৃষ্ঠাব্যাপী বিরাট ইংরেজী গ্রন্থ চারিখণ্ডে সুসম্পূর্ণ করিয়াছেন। রায় বাহাদুর কৃপা করিয়া, এই মহাগ্রন্থখানি এক বার উল্টাইয়া দেখিলে কখনই এমন দুঃসাহস প্রকাশের ভরসা পাইতেন না। স্বামীজী যখন যে স্থানে গিয়াছেন—তাঁহার তপস্যাসঙ্গী গুরুভ্রাতৃগণ—সেই স্থানের বিশিষ্ট ভক্তগণের নিকট হইতে সে সকল তথ্য সংগ্রহ করিয়া, মায়াবতীর সন্ন্যাসিগণ দ্বাদশবর্ষব্যাপী সুকঠোর সাধনায় যে তাঁহার এই প্রামাণ্য জীবনী সঙ্কলন করিয়াছেন;—তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ এই গ্রন্থের বহু পৃষ্ঠায় দেদীপ্যমান। রায় বাহাদুরের প্রয়োজন হইলে তাহার তালিকা সঙ্কলন করিয়া দিব। এই প্রামাণ্য গ্রন্থের মুখবন্ধ মাত্র পাঠ করিলেই তিনি এ কথার যথার্থতা উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

বিশেষতঃ স্বামীজীর সে বারের হিমালয়ের সাধনসঙ্গী গুরুভ্রাতৃচতুষ্টয়ের মধ্যে—'শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের' সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের বেদান্ত-অধ্যাপক—পূজ্যপাদ স্বামী তুরীয়ানন্দ—হৃষীকেশে সে দিনের তপস্যাসঙ্গী হরি মহারাজ এই প্রামাণ্য জীবনী সঙ্কলন-সময়ে আলমোড়া ও মায়াবতীতে অবস্থান করিতেছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের সুযোগ্য সেক্রেটারী—'লীলাপ্রসঙ্গ'-রচয়িতা—পরম পূজনীয় স্বামী সারদানন্দ—হৃষীকেশে স্বামীজীর সাধনসঙ্গী শরৎ মহারাজ 'উদ্বোধন' কার্য্যালয় হইতে স্বামীজীর পরিভ্রমণ বিবরণ পাঠাইয়াছিলেন। বেলুড়মঠের বর্ত্তমান ধর্ম্মগুরু—সর্ব্বজনবরেণ্য স্বামী অখণ্ডানন্দ—স্বামীজীর হিমালয়সাথী পরিব্রাজক গঙ্গাধর মহারাজ, যিনি সে সময়ে অসুস্থ হইয়া ডেরাডুন হইতে মীরাটে গিয়াছিলেন, তিনি আজও সশরীরে বিদ্যমান। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কৃপালাভে ধন্য—কৃপানন্দ—স্বামীজীর হৃষীকেশের অন্যতম তপস্যাসঙ্গী পূজনীয় শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ সান্যাল মহাশয়— জলধর বাবুর আকাঙ্ক্ষামত আজও স্বর্গীয় হইতে পারেন নাই। তাঁহার স্বহস্তলিখিত পত্র পড়িলেই জলধরবাবুর সকল ইন্দ্রজাল মুহূর্ত্তে অপসারিত হইবে। ইহার পরও জলধর বাবু বলিয়াছেন :—

"যে সন্ন্যাসী হৃষীকেশে মুমূর্ষু স্বামীজীকে ঔষধ সেবন করিয়েছিল সে আজ বৃদ্ধ হয়েছে......বাংলায় 'পিপুল মধুর' উল্লেখ নাই কিন্তু ইংরাজিতে আছে এখন কোন্‌খানিকে তিনি প্রামাণ্য বলে মানতে চান?"

মায়াবতীর অদ্বৈতাশ্রম-প্রকাশিত স্বামীজীর জীবনী ইংরেজী ছোট অক্ষরে ১৭০০ পৃষ্ঠায়, ৪ খণ্ডে সম্পূর্ণ। 'উদ্বোধন' কার্য্যালয় হইতে শ্রীযুক্ত ইন্দ্রদয়াল ভট্টাচার্য্য প্রণীত 'স্বামী বিবেকানন্দ' পুস্তকখানি বাঙ্গালা বড় অক্ষরে মাত্র ৭০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। এই ক্ষুদ্র পুস্তকে মায়াবতী হইতে প্রকাশিত স্বামীজীর সুবৃহৎ জীবনী গ্রন্থের বিশদ বিবরণের সকল কথা সবিস্তারে অনূদিত হওয়া সম্ভবপর কি? জলধরবাবুর শ্রমকাতরতার কথা বিশেষভাবে জানি বলিয়া আমরা আষাঢ়ের প্রবন্ধে বলিয়াছিলাম—

"এই সংক্ষিপ্ত জীবনী ··হইতে সম্ভবতঃ জলধরবাবু এই কাহিনীটি আত্মসাৎ করিয়াছেন।"···"কিন্তু তাহাতেও দেখা যায়," প্রাচীন সাধু এবং তিনিও ঔষধ দিয়াই স্বামীজীর চৈতন্যসঞ্চার করিয়াছিলেন,—তাহা জলধরবাবু কল্পিত গাছের ২।৩টি পাতার রস নহে। বিশদ ইংরেজী জীবনীতে পিপুলচূর্ণ ও মধুর উল্লেখ থাকিলেও তাহা কি ঔষধ নামে অভিহিত হইতে পারে না? এই সুযোগে জলধরবাবু স্বামীজীর কোন্ জীবনীখানিকে অপ্রামাণ্য করিয়া ফেলিলেন?

তাহার পর 'তুলসী পাতা' প্রসঙ্গে রায় বাহাদুর বলিতেছেন :—

…"সেই সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক আমার একজন বহুদিনের পরিচিত বন্ধু।…তুলসী পাতার নামটা যে রহস্যচ্ছলেই বলেছিলাম, আশা করি, এটুকু বোঝবার মত বয়স দীনেন্দ্র বাবুর হয়েছে।"

বয়স আমার যতই হউক, এখনও বাহাত্তরের বিশিষ্টতা রক্ষা করিয়া, 'আশীর কোঠায় গড়িয়ে' আসে নি, এবং সেই উপলক্ষে 'অশীতিপর' হইবার সুযোগ গ্রহণেরও বিলম্ব আছে। জলধরবাবু অতি সাবধানে—পরম গম্ভীরভাবে—অন্যের শুনিবার আশঙ্কায় চারিদিক নিরীক্ষণ করিয়া, তুলসী-পাতার নামটি বেফাঁস করিয়াছিলেন বলিয়াই শুনিয়াছি। তাঁহার 'বহুদিনের পরিচিত বন্ধু'কে ধাপ্পা দিবার জন্য রহস্য করিবার মত প্রীতি-মধুর সম্বন্ধের কথা বুঝিতে পারি নাই। বরং ভাবিয়াছিলাম, হাতে রগড়ে দু'তিনটি তুলসী পাতার রস—তাহা বিন্দুমাত্র হইলেও—সেইটুকু মুখে দিয়াই যখন মুমূর্ষু স্বামী বিবেকানন্দ জীবন লাভ করিয়াছিলেন, তখন অন্তিমকালে তুলসীতলায় শেষ শয্যা পাতিয়া তুলসী গাছের হাওয়ায় নিশ্চয়ই নব-জীবন লাভ করিতে পারিব। জলধরবাবু সে আশায় নিরাশ করিলেন। এখন বেশ বুঝিলাম, জলধরবাবুর এই ধাপ্পা-বাজিও মিথ্যারই একটা রকমফের।

কিন্তু তিনি ত' সে প্রাণ-সঞ্চারক গাছের নাম জানেন—সন্ধানও লইয়াছেন—গাছও বিশেষভাবে চেনেন। কলিকাতায় বা বাঙ্গালা দেশে জলধরবাবু-বর্ণিত সে গাছ নিশ্চয়ই পাওয়া সম্ভব নহে। আমি অক্ষম সাহিত্যিক হইলেও—জলধরবাবু যদি "প্রশান্ত অন্তরে গ্রহণ" করেন, তাঁহাকে হৃষীকেশে যাইবার রেলভাড়া দিতে সম্মত আছি। তিনি অনুগ্রহ করিয়া হিমালয় হইতে সেই মৃত-সঞ্জীবন গাছ আনিয়া তাঁহারই হাতে রগড়ে তাহারই ২।৩টি পাতার রসে হাসপাতালের কোন মুমূর্ষু রোগীর জীবন দান করুন। এই প্রকৃষ্ট নিদর্শনে সকল তর্কের অবসান—তাঁহার কথায় সকল অবিশ্বাস মুহূর্ত্তে দূর হউক। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার এই বিশাল দানে চিকিৎসা-বিজ্ঞান সমৃদ্ধ—উদ্ভিদ্-বিদ্যা গৌরবান্বিত হউক। রায় বাহাদুরের অপরিসীম করুণায় বিশ্বের মুমূর্ষু মানবগণ পুনর্জীবন লাভ করিয়া, তাঁহার মহিমা-গানে জগৎ মুখরিত করুক। অতুল ঐশ্বর্য্য ও যশের অধীশ্বর হইবার জন্য তিনি কি মানব-সমাজের এই পরম কল্যাণ সংসাধন করিবেন না? তাঁহার এই ভূতলে অতুল আবিষ্কার-প্রভাবে আগামী বর্ষের নোবেল প্রাইজের বিজয়মাল্যও ত' বিনা আয়াসে রায় বাহাদুরের পদপ্রান্তে লুণ্ঠিত হইয়া সম্মানিত হইতে পারিবে। আর তাঁহার এই বিস্ময়াবহ আবিষ্কারে যে সমৃদ্ধিলাভ সহজসাধ্য, তাহার তুলনায় নোবেল প্রাইজের লক্ষাধিক মুদ্রাও নিতান্ত তুচ্ছ—উপেক্ষার যোগ্য।

মায়াবতী সংস্করণের একটি মাত্রও অসঙ্গতি সপ্রমাণ করিতে না পারিলেও রায় বাহাদুর অসঙ্কোচে বলিয়াছেন—

"মায়াবতী প্রকাশিত স্বামীজীর জীবনী যে আদ্যোপান্ত নির্ভুল বলে মেনে নেওয়া চলে না, তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ আমি একাধিক পাচ্ছি, তাছাড়া 'ভারত' নামক সাপ্তাহিক পত্রে প্রকাশিত বিবেকানন্দ মিশনের সন্ন্যাসী স্বামী অমৃতানন্দের লেখা 'শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘের ইতিহাস' শীর্ষক ধারাবাহিক প্রবন্ধগুলির মধ্যে সে দিন চোখ বুলুতে গিয়ে দেখেছিলেম, তিনিও মায়াবতীর প্রকাশিত এই বইটির কয়েকটি অসঙ্গতির দিকে সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।"

কিন্তু এই প্রমাণগুলি এতই ভঙ্গুর যে, জলধরবাবুও তাহা উদ্ধৃত করিতে সাহস পান নাই। এই প্রসঙ্গে স্বামী অমৃতানন্দের পরিচয় জানিতে আগ্রহ হওয়া স্বাভাবিক। স্বামী অমৃতানন্দের পূর্ব্ব-পরিচয়—তিনি বিজ্ঞ-সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র দেবের সহোদর শ্রীযুক্ত নলিনী দেব। মত-বিরোধের ফলে যে সকল নবীন সন্ন্যাসী বেলুড় মঠ ত্যাগ করিয়া, বাগবাজারের বিবেকানন্দ মিশনে যোগদান করিয়াছেন—ইনি তাঁহাদের অন্যতম। কিন্তু সে জন্য আমরা তাঁহার বা তাঁহাদের প্রতি কোনরূপ অশ্রদ্ধা—অসম্মান প্রদর্শন করিতেছি, এমন কথা মনে করিবার কোন সঙ্গত কারণ নাই। তাঁহারাও সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী—ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পরম ভক্ত—পূজ্যপাদ শ্রীমৎ ব্রহ্মানন্দ স্বামী—মহাপুরুষ শ্রীমৎ শিবানন্দ স্বামী ও পূজনীয় শ্রীমৎ সারদানন্দ স্বামীর শিষ্য। কিন্তু জলধর-বাবু উল্লিখিত 'ভারত' পত্রের ২২ ও ৩৩ সংখ্যায় স্বামী অমৃতানন্দ সমালোচনা প্রসঙ্গে বহু-সাধনা-সংগৃহীত মায়া-বতী-সংস্করণ হইতে শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘ সংগঠনের তথ্যনিচয় সঙ্কলন করিয়াছেন বলিয়াই ত' বোধ হইল। 'ভারত' পত্রের ২২ সংখ্যায় তিনি বলিয়াছেন—মায়াবতী-সংস্করণ স্বামীজীর জীবনীর ১ম খণ্ডের ২৮৮-২৮৯ পৃষ্ঠায় "স্বামী

বিজ্ঞানানন্দের নাম নেই।" এরূপ সুপ্রকাণ্ড গ্রন্থ সুদূর মায়াবতী হইতে কলিকাতার প্রেসে ছাপাইতে সন্ন্যাসিগণের নাম ও পরিচয়-তালিকা হইতে মুদ্রাকর-প্রমাদে একটি নাম ছাড় হওয়া বিচিত্র নহে। কিন্তু এই গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণের ১ম খণ্ডের ২০২ পৃষ্ঠায় এই ছাড়টি সংযোজিত হইয়াছে। স্বামী অমৃতানন্দের এই প্রবন্ধটি 'ভারত' পত্রে ১৩৪২ সালের ১২ই অগ্রহায়ণ অর্থাৎ ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দের ২৮শে নবেম্বর তারিখে প্রকাশিত হইয়াছে। সুতরাং তিনি ইচ্ছা করিলে অনায়াসে ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত এই মহাগ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণটি দেখিতে পারিতেন। 'ভারত' পত্রিকার ৩৩ সংখ্যায় তিনি লিখিয়াছেন, স্বামীজীর জীবনীর দ্বিতীয় খণ্ডের ৩৯৭ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত স্বামীজীর পত্রে "(in that sense)" কথাটি প্রক্ষিপ্ত। কিন্তু স্বামী অমৃতানন্দ এক্ষণে নূতন দল সংগঠনের পক্ষপাতী বলিয়াই কি ঐ প্রক্ষিপ্ত অংশ যে বন্ধনীমধ্যস্থ, তাহা লক্ষ্য করিতে বিস্মৃত হইয়াছেন? উদ্ধৃত অংশের ভিতর বন্ধনী দিয়া স্বরূপ অর্থব্যঞ্জক শব্দ-সংযোগরীতি ত' সাহিত্যে সুপ্রচলিত আছে বলিয়াই জানি।

বলা বাহুল্য, স্বামী অমৃতানন্দের সমালোচিত অংশের সহিত স্বামীজীর হৃষীকেশে তপস্যার সময়ের বা পরিব্রাজক-জীবনকাহিনীর কোনরূপ সংস্রব নাই। রায় বাহাদুর যে 'অবধূতাচার্য্য শ্রীভগবান পুরী' সাজিয়া হৃষীকেশে ২১৩টি গাছের পাতার রস খাওয়াইয়া স্বামী বিবেকানন্দের জীবন দান করিয়াছিলেন, এ কথা মুক্তিকামী সন্ন্যাসী স্বামী অমৃতানন্দও নিশ্চয়ই অসঙ্কোচে স্বীকার করিতে পারিবেন না।

ইহার পর, টাউনহলে স্বামীজীর স্মৃতিসভার প্রসঙ্গে রায় বাহাদুর লিখিয়াছেন:—

"স্বামীজীর জীবন সঙ্কটকালে, তাঁর কাছে যে আমি দৈবাৎ উপস্থিত হয়েছিলেম এবং সামান্য কিছু তাঁর সেবা করবার সৌভাগ্য লাভ করেছিলেম, এই কাহিনী আমি 'স্মৃতিতর্পণে' উল্লেখ করবার ৩৫ বৎসর পূর্ব্বেও টাউন হলে তাঁর স্মৃতিসভায় উল্লেখ করেছিলেম, একথা দীনেন্দ্র বাবুও তাঁর স্বকীয় ভঙ্গীতে কতকটা স্বীকার কর্ত্তে বাধ্য হয়েছেন দেখলুম।"

আষাঢ় সংখ্যা 'মাসিক বসুমতী' আজও দুষ্প্রাপ্য নহে—পাঠক মহাশয়গণকে এক বার 'জলধর-স্মৃতি-সম্বর্দ্ধনা' প্রবন্ধের ৩৮২ পৃষ্ঠাটি অনুগ্রহ করিয়া পড়িয়া দেখিতে অনুরোধ করি। ১৯০২ খৃষ্টাব্দের ১৯শে সেপ্টেম্বর শুক্রবার অপরাহ্ণে টাউন হলে স্বামীজীর শোক-সভায় জলধরবাবু বলিয়াছিলেন, "হিমালয়ে এক দিন স্বামী বিবেকানন্দ আমার উরুর উপর মাথা রেখে আটদশ ঘণ্টা বড় আরামে ঘুমিয়েছিলেন"। ইহাও যে জলধর-বাবুর মিথ্যা কথা, তাহা প্রকাশ করিয়া বলা প্রয়োজন বলিয়া মনে করি নাই। মহাবীর কর্ণের ক্রোড়ে মস্তক স্থাপন করিয়া তাঁহার অস্ত্রগুরু পরশুরামের দীর্ঘ নিদ্রার পর আর এমন কথা শুনা যায় নাই। কিন্তু টাউন হলে জলধরবাবুর শ্রীমুখের উক্তি হিমালয়ে তাঁহার ক্রোড়ে স্বামীজীর ৮।১০ ঘণ্টা ব্যাপী পরম আরামের নিদ্রা—৩৫ বৎসর পরে স্মৃতি-তর্পণ সময়ে সহসা যে কেমন করিয়া হৃষীকেশে জলধরবাবু সংগৃহীত গাছের ২১৩টি পাতার রসে চৈতন্য-সঞ্চারে পরিণত হইল, তাহা—"স্বকীয় ভঙ্গীতে স্বীকার কর্ত্তে বাধ্য" হওয়া দূরের কথা—মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতেছি, রায় বাহাদুরের সে ভেল্কী বুঝিবার মত বুদ্ধিও আমার নাই।

এই প্রসঙ্গে তিনি "শ্রীমান গণেন্দ্র মহারাজকে" সাক্ষ্য মান্য করিয়াছেন। কিন্তু আমরা বিশেষভাবে জানি, শ্রীযুক্ত গণেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ-মিশনের কার্য্যে তখনও যোগদান করেন নাই। ইহার পর গগনস্পর্দ্ধিনী স্পর্দ্ধা প্রকাশ করিয়া রায় বাহাদুর লিখিয়াছেন:—

"স্বামী অখণ্ডানন্দ বসুমতী আফিসে এসে দীনেন্দ্রবাবুর কল্পিত ওরূপ কোন অশিষ্ট উক্তি আমার প্রতি প্রয়োগ করতেই পারে না। কেন না, হৃষিকেশের ঘটনার সময় স্বামী অখণ্ডানন্দ সেখানে উপস্থিত ছিলেন না। তিনি যে সে সময়ে শাহারানপুর হয়ে মীরাটে যাত্রা করেছিলেন একথা দীনেন্দ্রবাবুর আলোচনার মধ্যেই রয়েছে।"

জলধর বাবু 'অতিথি' শব্দের অর্থবিপর্য্যয় করিয়া সত্যের প্রতীক, বিশ্ববরেণ্য স্বামী বিবেকানন্দের মুখে যখন অসঙ্কোচে মিথ্যা কথার আরোপ করিতে পারিয়াছেন, তখন শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্ত-সম্প্রদায়পূজ্য স্বামী অখণ্ডানন্দের কথাকে তিনি যে অনায়াসে 'অশিষ্ট উক্তিতে" বিশেষিত করিয়া ধৃষ্টতার পরিচয় প্রকট করিবেন, তাহাতে বিস্ময়ের অবকাশ কোথায়? আমরা আষাঢ়ের প্রবন্ধে টাউন হলে স্বামীজীর স্মৃতিসভা প্রসঙ্গেই পূজ্যপাদ স্বামী

অখণ্ডানন্দের নাম উল্লেখ করিয়াছিলাম। তাহাতে জলধর-বাবুর কোনরূপ সন্দেহের অবকাশ থাকিলে স্বামী অখণ্ডানন্দের মত ব্রহ্মজ্ঞ সন্ন্যাসীর প্রতি এরূপ অসম্মানকর সদম্ভ উক্তি প্রয়োগ না করিয়া, তাঁহাকে একখানি পত্র লিখিয়া সত্য নির্ণয় করিলেই শোভনীয় হইত না কি?

হৃষীকেশে অচৈতন্য হইবার পর স্বামীজী মীরাটে আসিয়া স্বামী অখণ্ডানন্দ—স্বামী তুরীয়ানন্দ—স্বামী ব্রহ্মানন্দ—স্বামী সারদানন্দ—স্বামী কৃপানন্দ—স্বামী অদ্বৈতানন্দ প্রভৃতি গুরুভ্রাতৃগণের সহিত তিন মাসের অধিক কাল পরমানন্দে ধর্ম্মালোচনা করিয়াছিলেন। সেই সময়েও কি কোন দিন তাঁহারা হৃষীকেশে জলধরবাবুর করুণায় স্বামীজীর জীবনলাভের কথার আলোচনা করেন নাই?

ইহার পর রায় বাহাদুর লিখিয়াছেন:—

"সুতরাং বেলুড় মঠের বর্ত্তমান ধর্ম্মগুরু স্বামী অখণ্ডানন্দ মহারাজকে এর মধ্যে টেনে আনার চেষ্টা করাটা বা স্বামী অভেদানন্দের নাম উল্লেখ করে তাঁর উক্তিতে একটা গুরুত্ব আরোপের চেষ্টা করাটা নিতান্ত অবান্তর হয়ে পড়েছে। আমার যতদূর স্মরণ আছে, দেরাদুনে স্বামীজীর সঙ্গে কালী মহারাজ (স্বামী অভেদানন্দ) ছিলেন না। সুতরাং তিনি এসম্বন্ধে কিছু বলতেই পারেন না।"

স্বামী অভেদানন্দ সে বার যে হৃষীকেশে স্বামীজীর তপস্যাসঙ্গী ছিলেন, এ কথা আমরা আষাঢ়ের প্রবন্ধে কোথাও উল্লেখ করি নাই। তথাপি জলধরবাবু তাঁহার মিথ্যাভার-প্রপীড়িত দুর্ব্বল স্মৃতি আলোড়নের সুযোগ লইলেন কেন? কিন্তু স্বামী অভেদানন্দ তাহার পরে ত' বহুদিন স্বামীজী ও তাঁহার গুরুভ্রাতৃগণের সঙ্গ করিয়াছেন—সেই সূত্রেও কি হৃষীকেশে জলধরবাবুর পরম কীর্ত্তির কথা জানিবার অবকাশ পান নাই?

যাহা হউক, অসঙ্কোচে স্বীকার করিতেছি যে, আত্ম-প্রশংসার দম্ভে আত্মহারা জলধরবাবুর বেপরোয়া মিথ্যা-রাশির প্রতিবাদ প্রসঙ্গে আমরা এই সকল সর্ব্বজনবরেণ্য—ব্রহ্মবিদ্ সন্ন্যাসীর নামোল্লেখ করিয়া—তাঁহাদের অসম্মাননার কারণ হইয়া অত্যন্ত অন্যায় করিয়াছি।

স্বামীজীর পরম ভক্ত শ্রীযুত শরৎচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয়ও ত' দীর্ঘকাল স্বামীজীর সঙ্গলাভ করিয়া, তাঁহার শ্রীমুখ-নিঃসৃত প্রসঙ্গগুলি সঙ্কলন করিয়া দুই খণ্ডে 'স্বামি-শিষ্যসংবাদ' প্রকাশ করিয়াছেন—তিনিও ত' হৃষীকেশে স্বামীজীর জীবনদানে জলধরবাবুর মহিমময় কীর্ত্তির কথা জানিতে পারেন নাই।

জলধরবাবু যদি সত্যই হৃষীকেশে স্বামীজীর প্রাণ দান করিতেন, তাহা হইলে স্বামীজী—তাঁহার গুরুভ্রাতৃগণ—বিরাট শিষ্য-সম্প্রদায় নিশ্চয়ই রায় বাহাদুরকে তাঁহার প্রাপ্য সম্মানে বঞ্চিত করিতেন না—চিরদিন তাঁহাকে পরম সমাদর করিতেন। স্বামী বিবেকানন্দ ও তাঁহার গুরু-ভ্রাতৃগণ কখন কাহারও নিকট সামান্য উপকার পাইলে তাহা স্বীকার করিতে—প্রত্যুপকার করিতে কোন দিন কুণ্ঠিত হইয়াছেন কি?

জলধরবাবু Eye witness চান, তাঁহার নিকট যখন Hearsay is no evidence, তখন শোনা কথায় আর কাজ নাই। জলধরবাবুর এই মহিমময় কাহিনী এক জন জানেন বলিয়া রায় বাহাদুরও স্বীকার করিয়াছেন:—

"যাঁরা ছিলেন তাঁদের মধ্যে একজনের কথা আমার অস্পষ্ট মনে পড়ে। ইনি স্বামীজীর অসুস্থতাকে তাঁর 'সমাধি অবস্থা' বলে গুরুভাইদের প্রবোধ দেবার জন্য বিসেষ চেষ্টা করছিলেন। আমার নামধাম জানবার জন্যও তিনি একান্ত আগ্রহ প্রকাশ করছিলেন। কিন্তু পাছে আমায় তাঁরা চিনতে পারেন এই আশঙ্কায়—আমার যতদূর মনে পড়ে, আমি তাঁকে আমার নামের পরিবর্ত্তে আমারই তদনীন্তন এক পরিচিত সাধুর নাম বলেছিলেম। তিনি যুক্ত প্রদেশের প্রসিদ্ধ অবধূতাচার্য্য—'শ্রীভগবান পুরী'।"

জলধরবাবু যাঁহার কথা বলিয়াছেন, ঠাকুরের কৃপা-লাভে ধন্য সেই স্বামী কৃপানন্দ—পূজনীয় শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ সান্ন্যাল মহাশয় প্রথমে স্বামী সারদানন্দের সঙ্গী হইয়াছিলেন। পরে তাঁহারা উভয়ে যে আলমোড়া হইতে স্বামী বিবেকানন্দ ও স্বামী অখণ্ডানন্দ মহারাজের হিমালয়ের তপস্যা-সঙ্গী হইয়াছিলেন, তাহা আষাঢ় সংখ্যার ৩৭৮ পৃষ্ঠায় বিবৃত করিয়াছি। ব্রহ্মচারী প্রকাশচন্দ্র সঙ্কলিত 'স্বামী সারদানন্দ' জীবনী গ্রন্থের ১২ পৃষ্ঠায় ১৮৯০ খৃষ্টাব্দের ২৯শে আগষ্টের আলমোড়া পোষ্টাফিসের শীলমোহরের প্রতিলিপি-যুক্ত যে পত্রখানি প্রকাশিত হইয়াছে—তাহা "শরৎ ও সান্ন্যাল" মহাশয়ের স্বাক্ষরযুক্ত। সুতরাং জলধরবাবুর উল্লিখিত ব্যক্তি যে শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ সান্ন্যাল, তাহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই। মায়াবতী-সংস্করণ স্বামীজীর জীবনীর ২য় খণ্ডের ১২০ পৃষ্ঠায় প্রকাশ:—

"The Swami remained at Dehra Dun for about three weeks, and then advising

Akhandananda to go to a friend's house in Allahabad, and leaving Kripananda to look after him, he with the others went to Hrishikesh. Kripananda joined them a few days later, when Akhandananda went down to Saharanpur on his way to Allahabad."

স্বামী কৃপানন্দ নামে স্বামীজীর তপস্যাসঙ্গী পূজনীয় সান্যাল মহাশয় যে হৃষীকেশে স্বামীজীর জীবনসঙ্কট অবস্থায় উপস্থিত ছিলেন, এ বিষয়ে জলধরবাবুও নিঃসন্দেহ হইতে পারিয়াছেন; এবং তাঁহার নিকট "তিনি যুক্তপ্রদেশের প্রসিদ্ধ অবধূতাচার্য্য—শ্রীভগবানপুরী" নামে আত্মপরিচয় দিয়া মিথ্যানিষ্ঠা প্রকট করিয়াছিলেন। জলধরবাবু দীর্ঘকাল 'বসুমতী' 'হিতবাদী' প্রভৃতি সংবাদপত্রের সম্পাদক নামে অভিহিত হইয়াও কোন দিন—সম্পাদকীয় প্রবন্ধ—মন্তব্য রচনা না করিয়া—কেবল সংবাদ-সঙ্কলনে সহযোগী সম্পাদকের কার্য্য করিতেন। এই সূত্রে জলধরবাবু অসংখ্য ফৌজদারী মামলার বিবরণের অনুবাদ করিয়াছেন। কিন্তু "যুক্তপ্রদেশের প্রসিদ্ধ অবধূতাচার্য্য শ্রীভগবান পুরীর নাম" গ্রহণ করা যে **"False personation"**—ফৌজদারী দণ্ডবিধি আইনের ৪১৯ ধারায় নির্দ্দেশিত অপরাধ এবং ফৌজদারীর আইনে যে তামাদি নাই, ইহাও কি তিনি জানেন না? আর দায়ে পড়িয়া তাঁহাকে যখন অন্যের নাম গ্রহণ করিতেই হইল—তখন ভিক্ষালব্ধ অর্থে যিনি সমগ্র হিমালয়ে পথ, সেতু, চটি নির্ম্মাণ করিয়াছেন,—হৃষীকেশে—স্বর্গাশ্রমে—বদরিকাশ্রমের পথে অসংখ্য ধর্ম্মশালা—সদাব্রত প্রতিষ্ঠা করিয়া অমর কীর্ত্তি অর্জ্জন করিয়াছেন—সাধুসেবা-ব্রতে আত্মনিবেদিতপ্রাণ সেই বাবা কালীকমলীওলার নামটি গ্রহণ করিলেই ত' পারিতেন। তিনিও ত' সে যুগে বিদ্যমান ছিলেন এবং সম্প্রতি হাইকোর্টে তাঁহার প্রতিষ্ঠিত সদাব্রত—ধর্ম্মশালাগুলি পরিচালনার জন্য যে মামলা চলিতেছে, জলধরবাবু তাহাতে হাজির হইয়া, ভাওয়াল সন্ন্যাসীর মামলার মত সেই মামলাটিকে চমকপ্রদ করিয়া, হয়ত বা তাহার গতি পরিবর্ত্তিত করিতে পারিতেন।

স্বামীজীর জীবনদান-কাহিনীটি 'স্মৃতি-তর্পণে' প্রথম প্রকাশের সময় জলধরবাবু লিখিয়াছিলেন—

"আমি দুয়ারের কাছ থেকে এই কথা শুনে, ভগবানের উদ্দেশ্যে প্রণাম করে আবার সদাব্রতে এসে উপস্থিত হলাম।"

এ বার তিনি বলিয়াছেন—"অবধূতাচার্য্য শ্রীভগবান পুরী" "এক পরিচিত সাধুর নাম বলেছিলেম"—ইহার কোনটি সত্য? পরমহংস অবস্থার মত অবধূতও সন্ন্যাসীর একটি মায়ামুক্ত অবস্থা। অব-ধৌতিক চিকিৎসকের সাইন-বোর্ড দেখিয়াই কি জলধরবাবু 'অবধূতাচার্য্য' নামটি গ্রহণ করিয়াছিলেন?

ইহার পর সত্য প্রতিষ্ঠার জন্য ব্যাকুল রায় বাহাদুর লিখিয়াছেন:—

"স্বামীজীর সেই সঙ্গীটি আজও জীবিত আছেন কি না জানি না। বহুকাল পূর্ব্বে একবার তাঁদের খবর নিতে গিয়ে শুনেছিলাম তিনি নাকি সন্ন্যাস-আশ্রম পরিত্যাগ কোরে গৃহস্থাশ্রমে ফিরে গেছেন। তিনি জীবিত থাকলে হয়ত এ ঘটনা সম্বন্ধে সাক্ষ্য দিতে পারতেন।"

রায় বাহাদুর শুনিয়া পরম আশ্বস্ত—আনন্দিত হইবেন যে, তিনি এখনও স্বর্গীয় হইয়া জলধরবাবুকে মিথ্যাকথা প্রচারের সুযোগ দিতে পারেন নাই। তিনি তাঁহার কলিকাতার নিজ বাটীতে—বাগবাজার ১০ নং বসুপাড়া লেনে উনআশী বৎসর বয়সে সুস্থ শরীরে—ঠাকুরের লীলা-ধ্যানে পরমানন্দে অবস্থান করিতেছেন। জলধরবাবুর সন্দেহভঞ্জনের জন্য—পূজনীয় শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ সান্যাল মহাশয়ের স্বহস্ত-লিখিত পত্রখানির প্রতিলিপি প্রকাশ করিলাম।

২০শে সেপ্টেম্বর [illegible]

[illegible]

ইহার পরই রায় বাহাদুর সার্কাসের ক্লাউনের মত একটি প্রচণ্ড ডিগবাজি খাইয়া উঠিয়া, আমাকে সার্কাসী কেতায় সুদীর্ঘ অভিবাদন করিয়া, কৃতজ্ঞতা প্রকাশের অন্তরালে নূতন মিথ্যার কসরতি দেখাইতেও বিস্মৃত হন নাই। কিন্তু এক ডিগবাজি কৌশলে এই সর্ব্ববিধ মিথ্যা কি "দিবা-লোকসম সত্যে" পরিণত হইবে? তিনি বলিয়াছেন :—

"আমি আমার বার্দ্ধক্যজনিত দুর্ব্বল স্মৃতির দোষে এই ঘটনাটা উল্টে ফেলে আগে পরে করে বসেছিলাম—এজন্য আমি লজ্জিত।"

পাহাড়ে মিথ্যাবাদী জলধরবাবুর প্রতি নিশ্চয়ই "Liar must have strong memory"—মিথ্যাকথার সেই প্রসিদ্ধ নীতি প্রযুক্ত হইতে পারে না। ডেরাডুনে স্বামীজীর আতিথ্যগ্রহণ প্রসঙ্গে 'স্মৃতিতর্পণে' পূর্ব্বে তিনি লিখিয়াছিলেন :—

"এ স্মৃতি কি ভুলবার। এই যে আমাদের সেদিনকার এত আনন্দ—এর মধ্যে কিন্তু ঘুণাক্ষরেও হৃষীকেশে আমার সেই অভাবনীয় বা অপ্রত্যাশিত ভাবে স্বামীজীর দর্শনলাভের কথার উল্লেখ করি নি। স্বামিজী ত ন'নই, তাঁর সঙ্গীরাও আমাকে চিনতে পারেন নি—পারবার কথাও নয়; তখন আমি নগ্নপদ কম্বল সম্বল সন্ন্যাসী, আর ডেরাডুনে আমি ভদ্রবেশী, প্রকাণ্ড পাগড়ীধারী মাষ্টারজী।"

কিন্তু জলধরবাবুর ললাটে জয়টীকা-স্বরূপ যে বিশেষ চিহ্নটি পরিস্ফুট—তাঁহার ভ্রূযুগলমধ্যে অবস্থিত যে বর্ত্তুলাকার আবটি শ্রীমুখের শোভা শতগুণে বৃদ্ধি করিয়াছে, তাহা তিনি কিরূপে ঢাকিয়াছিলেন, তাহা ত' এই প্রসঙ্গে

বিবৃত করা উচিত ছিল। পাগড়ী দিয়া তাহা ঢাকিতে হইলে চোখের উপরাংশ পর্য্যন্ত যে আচ্ছাদিত করিতে হয়। জলধরবাবু এ বার বলিতেছেন :—

"আমি বদরিকা ঘুরে দেরাদুনে ফিরে আসবার পর স্বামীজী দেরাদুনে এসেছিলেন এবং দেরাদুন থেকেই তিনি হৃষিকেশে গেছলেন।"

'হিমালয়ে' প্রকাশিত জলধরবাবুর ডায়েরীর অনুসরণে 'মাসিক বসুমতীর' আষাঢ় সংখ্যার ৩৮১ পৃষ্ঠায় প্রমাণ করিয়াছি যে, জলধরবাবু ১৮৯০ খৃষ্টাব্দের ২৪শে জুন বদরিকা হইতে ডেরাডুনে ফিরিয়াছিলেন—এবং তিনি যে গ্রীষ্মকালের প্রায়ান্ধকার সন্ধ্যায় হৃষীকেশে সহসা উপস্থিত হইয়া স্বামীজীর জীবন দান করিয়াছিলেন, বারংবার উল্লেখে তাহা সকলেরই বেশ স্মরণ আছে। বিভিন্ন প্রদেশের লাটসাহেবগণ বর্ষাসমাগমে প্রতি বৎসর জুলাই মাসের দ্বিতীয় বা তৃতীয় সপ্তাহে গ্রীষ্মের শৈলাবাস হইতে নামিয়া আসেন। জলধরবাবুর 'পথিক' পুস্তকের ৮৫ পৃষ্ঠায় হৃষীকেশ প্রবন্ধে প্রকাশিত হইয়াছে :—

সে রাস্তাটি বারমাস থাকে না, বর্ষার সময় ঝরণাগুলি প্রবল হইয়া উঠিলে সে রাস্তা বন্ধ হইয়া যায়।

সুতরাং ডেরাডুনে জলধরবাবুর সহিত স্বামীজী ও তাঁহার গুরুভ্রাতৃগণকে দেখা করিতে হইলে ১৮৯০ খৃষ্টাব্দের জুন মাসের ২৪শে হইতে জুলাই মাসের তৃতীয় সপ্তাহের ভিতর স্বামীজীকে গুরুভ্রাতৃগণসহ ডেরাডুনে যাইতে হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে স্বামীজী সদলে ১৮৯০ খৃষ্টাব্দের ১৩ই অক্টোবর ডেরাডুনে পৌঁছিয়া প্রায় তিন সপ্তাহ অর্থাৎ ৪ঠা নভেম্বর পর্য্যন্ত ডেরাডুনে ছিলেন, মায়াবতীর প্রামাণ্য জীবনী হইতে তাহাও উক্ত প্রবন্ধের ৩৮১ পৃষ্ঠায় সুপ্রমাণিত করিয়াছি।

জলধরবাবু মায়াবতী-সংস্করণ স্বামীজীর প্রামাণ্য জীবনী বিশ্বাস করেন না। কিন্তু 'স্বামী সারদানন্দ' গ্রন্থের ৭৫ পৃষ্ঠায় স্বামীজীর হিমালয় যাত্রার সূচনায়, পূজনীয় শরৎ মহারাজের স্বহস্ত-লিখিত যে পত্রখানি—আলমোড়া ডাকঘরের শীলমোহরের প্রতিলিপিতে ৫ই সেপ্টেম্বর ১৮৯০ খৃষ্টাব্দ—তারিখ যুক্ত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে এবং যে পত্রখানি আমরা ৩৭৮ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত করিয়াছি—জলধরবাবু তাহা অস্বীকার করিবেন কিরূপে? জলধরবাবু ইচ্ছা করিলে এই পত্রখানি বেলুড় মঠে দেখিয়া আসিতে পারেন।

আর জলধরবাবু "গ্রীষ্মের···সন্ধ্যার প্রাক্কালে" হৃষীকেশে সহসা উড়িয়া আসিয়া গঙ্গার বালুকাময় চড়ায় সংগৃহীত গাছের ২।৩টি পাতার রসে স্বামীজীর জীবন দান করিয়াছিলেন;—কিন্তু স্বামীজী যে ৪ঠা হইতে ১২ই নভেম্বরের মধ্যে হৃষীকেশে অচৈতন্য হইয়া ছিলেন, তাহাও ঐ প্রবন্ধের ৩৮১ পৃষ্ঠাতেই দেখাইয়াছি। এখন ডিগবাজীর কৌশলে জলধরবাবু যদি "গ্রীষ্মের সন্ধ্যার প্রাক্কাল" অতিক্রম করিয়া নভেম্বর মাসের হিমালয়ের প্রচণ্ড শীতেই স্বামীজীর জীবনদানের দাবী করেন, তাহা হইলে "গ্রীষ্মের সন্ধ্যার প্রাক্কাল"—৭টায় পরিবর্ত্তে ৫টা—জোর ৫।। টা পর্য্যন্ত শীতকালের "প্রায়ান্ধকার সন্ধ্যা" বলিয়া ধরা যাইতে পারে। জলধরবাবু "প্রায় শনিবারই অপরাহ্ণ দু'টার সময় স্কুল থেকে ফিরে এসে···মহানন্দে বেরিয়ে" পড়তেন। এই শনিবার যদি স্বামীজীর জীবনদান-পর্ব্ব উপলক্ষে তিনি ব্যস্ত হইয়া "একটা দেড়টায় বেরিয়ে দেরাডুন থেকে হৃষিকেশে···সন্ধ্যার প্রাক্কালেই" পৌঁছিয়া থাকেন, তাহা হইলে সাড়ে তিন ঘণ্টা, জোর চার ঘণ্টায় তাঁহাকে ৩৬।৩৭ মাইল পার্ব্বত্য পথ অতিক্রম করিতে হয়। ইহা কেবল যে কল্পনাবলে সম্ভব, তাহা পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি।

জলধরবাবু "সে বয়েসে ঘণ্টায় পাঁচ ছয় মাইল পথ অবলীলায় চলে যেতে" পারতেন। কিন্তু তার বেশী পারিতেন কি? তাঁহার ভ্রমণ-ডায়েরী হইতে সঙ্কলিত 'পথিক' পুস্তক হইতে উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছি যে, তিনি দুই দিনে আঠারো ঘণ্টায় 'বয়েলগাড়ী' করিয়া ডেরাডুন হইতে হৃষীকেশ অভিযান করিয়াছেন। তাঁহার 'হিমালয়ের' ৩য় পৃষ্ঠায় প্রকাশ—

"সামান্য দূরে ক্ষুদ্র এক চড়াইয়ে উঠ্‌তে হ'লেই আমার ডাণ্ডীর দরকার হয়।"

অন্য যাত্রায় তিনি তিহরী হইতে মসুরীতে কি ভাবে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন দেখুন :—

"আজ পাহাড়ী ডাণ্ডীতে চড়িয়া চলিতেছি।···চারিজন প্রকাণ্ডকায় পাহাড়ী আমার ডাণ্ডীবাহক।···একখানি মোটা লম্বা বাঁশ, অবশ্য বাঁধুনী খুব দৃঢ়, আর একখানি কম্বল, আর দুইগাছি শক্ত

দড়ি, এই তিনটি দ্রব্য আমার ডাণ্ডীর উপকরণ। পর্ব্বতবাসিগণ সেই বাঁশের দুই দিকে খানিকটা স্থান বাড়িয়ে রাখিয়া কম্বলখানি দড়ি দিয়া সেই বাঁশের সঙ্গে বেশ করিয়া বাঁধিয়া লইল। আমি সেই কম্বলের মধ্যে বসিয়া বুকের মধ্যে বাঁশটি লইয়া দুই হাত দিয়া চাপিয়া, বসিয়া রহিলাম।" ('পথিক' ৩য় সং, ৬৫-৬৬ পৃষ্ঠা)

"ডাণ্ডীওয়ালারা আমাকে তাহাদের একজনের পিঠে চড়িয়া গলা জড়াইয়া ধরিতে বলিল; কিন্তু আমি…সে ভাবে যাইতে অস্বীকৃত দেখিয়া তাহারা আমাকে কম্বলে জড়াইয়া একজন তাহার পিঠের সঙ্গে বাঁধিল। ('পথিক' ৩য় সং, ৮১ পৃষ্ঠা)

ইহাতে তিনি অবশ্যই সদম্ভে বলিতে পারেন—"গর্ব্ব ক'রে বলতে পারি যে হাঁটার সব প্রতিযোগিতায় ফার্ষ্ট ক্লাস ফার্ষ্ট হতাম।"

আর "অসংখ্য বাক্‌বিস্তারের" প্রয়োজন নাই—গৌরব-গর্ব্বে আত্মবিস্মৃত জলধরবাবুর লিখিত "পূজ্যপাদ স্বামী বিবেকানন্দ সম্বন্ধে বর্ণিত ব্যাপার" যে কিরূপ ভাবে "দিবালোকের ন্যায় সম্পূর্ণ সত্য"—বোধ হয়, তাহাতে কাহারও লেশমাত্র সন্দেহের কোন অবকাশ আর নাই! আত্মপ্রশংসার উন্মাদনায় হিমালয়সম মিথ্যার এমন বিরাট বাহার যে আর কখনও দেখেন নাই, আশা করি সকলেই তাহা অসঙ্কোচে স্বীকার করিতে পারিবেন। একটা মিথ্যা ঢাকিতে গিয়া অন্য মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণের দৃষ্টান্ত রায় বাহাদুরের এই প্রতিবাদের ছত্রে ছত্রে বিরাজিত; কিন্তু নূতন মিথ্যার সাহায্যেও যাহা ঢাকা পড়িবার সম্ভাবনা নাই, সে স্থানে তিনি সম্পূর্ণ নীরব; সে সকল কথার প্রতিবাদ করিতেও জলধরবাবু সাহস পান নাই। অতঃপর জলধরবাবুর অপর তিনটি কথার উত্তর দিতেছি।

আদিপর্ব্ব—ছাত্র-জীবনে—
ব্রিলিয়াণ্ট পর্ব্বাধ্যায়

রায় বাহাদুর লিখিয়াছেন:—

"আমার এই 'স্মৃতি-তর্পণের' মধ্যে কোথাও আমি একথা বলিনি যে, আমি ছাত্রবৃত্তি পাশ করেছিলেম।…ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষা না দিয়েও যে 'মাইনর' পরীক্ষায় পাশ করা যায়, আশা করি দীনেন্দ্রবাবু এটা এখনও বিস্মৃত হন নি।"

'ব্রিলিয়াণ্ট' জলধর সেনের পক্ষে নিয়মের ব্যতিক্রম থাকিতে পারে; কিন্তু সাধারণ নিয়ম, ছাত্রবৃত্তি পাশের নম্বর রাখিতে না পারিলে, উহার অতিরিক্ত কেবল ইংরেজি প্রশ্নপত্রের উত্তরে পাশের নম্বর রাখিয়া 'মাইনর পরীক্ষায় পাশ করা যায়' না। 'ব্রিলিয়াণ্ট' জলধর সেন বার্দ্ধক্যে ইহাও কি বিস্মৃত হইয়াছেন?

সমালোচনার প্রয়োজনে বার বার তিন বার জলধর-বাবুর যে উক্তিটি উদ্ধৃত করিয়াছি—আবার তাহাই উদ্ধৃত করিতেছি—

"আমি যখন বঙ্গবিদ্যালয়ের প্রথম শ্রেণীতে পড়ি,…আমাদের সময়ে ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার পাঠ্য ছিল পরলোকগত রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় প্রণীত 'মিত্রবিলাপ কাব্য'।"

"আমি বাল্যকাল থেকেই গোয়ালন্দে ছিলাম। গোয়ালন্দের মাইনর স্কুল থেকেই পরীক্ষা দিয়ে পাঁচ টাকা বৃত্তি পাই।"

পাঠকগণকে জিজ্ঞাসা করি, ইহা পড়িয়া জলধরবাবু যে ছাত্রবৃত্তি বা মাইনর পাশ করেন নাই—অনুমান করিতে পারেন কি?—ছাত্রবৃত্তি বা মাইনর পাশ না করিয়াই তিনি কি বৃত্তিলাভ করিয়াছিলেন? আবার সেই বৃত্তি মাসিক ৪৲ নহে, সৃষ্টিছাড়া ৫৲ টাকা! ইহা ডবল মিথ্যার উপর মিথ্যার অভ্রভেদী মনুমেণ্ট নহে কি?

এই প্রসঙ্গে জলধরবাবু আরও বলিয়াছেন:—

"আমার আবৃত্তি শুনে ভূদেব বাবু আমাকে যে পারিতোষিক দিয়েছিলেন, তাঁর সেই ব্যক্তিগত উপহারকে, 'ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার প্রাইজ' বলে চালাবার দুশ্চেষ্টা দীনেন্দ্রবাবু তাঁর প্রয়োজনের অনুরোধে করতে পারেন,…"

কিন্তু রায় বাহাদুরের পূর্ব্ব-বর্ণনার অনুসরণ করিয়া মনীষী ভূদেব বাবু যে কুমারখালির বঙ্গবিদ্যালয়ে জলধর-বাবুর কবিতা আবৃত্তি শুনিয়া অশ্রু-নিদর্শন 'স্পেক্টেটর' পুস্তকখানি দিয়া আসিয়াছিলেন, তাহা কি বারংবার উদ্ধৃত করি নাই? আর ইহারই সমালোচনায় কি ভূদেব বাবুর পক্ষে জলধরবাবুর ছাত্র-গৌরবের যশঃসৌরভে আকৃষ্ট হইয়া, পরিদর্শন-সীমা অতিক্রম করিয়া, জলধরবাবুর কবিতা আবৃত্তি শুনিয়া কাঁদিয়া ভাসাইয়া দেওয়া সম্ভব নহে—এই কথাই বলি নাই? তাহাকে যে কোথায় তাঁহার 'ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার প্রাইজ' বলে চালাবার দুশ্চেষ্টা করিয়াছি—পাঠকমহোদয়গণ অনুগ্রহ করিয়া দেখাইয়া দিবেন কি?

"এক ব্র্যাকেটে স্কলারশিপ" প্রসঙ্গে রায় বাহাদুর লিখিয়াছেন:—

"এ ভ্রান্ত ধারণার জন্য স্বর্গগত বন্ধু দ্বিজেন্দ্রলালই দায়ী।…বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যালেণ্ডার হাতড়ে দেখিনি বা কলিকাতা গেজেটের ফাইল খুঁজিনি।…"

কিন্তু 'ব্রিলিয়াণ্ট' জলধরবাবু, বোধ হয়, তাঁহার প্রবেশিকা-পরীক্ষার ফল বা স্কলারশিপ-তালিকাটিও কোন সংবাদপত্রে দেখিবার প্রয়োজন বোধ করেন নাই। মহিষাদলে কাকার বাসায় কবিবরের অভ্যর্থনার মজলিশে তিনি যে অমর কবি দ্বিজেন্দ্রলালের সহিত জলধরবাবুর পরিচয় করিয়া দিয়াছিলেন, তাহা এখনও আমার বেশ মনে আছে। ১৩৪০ সালের ভাদ্র-সংখ্যা 'মাসিক বসুমতীতে' আমার 'সেকালের স্মৃতি' কথায় এই কাহিনীটি প্রকাশের ২৬ মাস পরে জলধরবাবু তাঁহার 'স্মৃতি-তর্পণে' এই নিমন্ত্রণ-প্রসঙ্গ সমাবেশ করিয়াছেন। কিন্তু সে সময় আমি সে মজলিসে উপস্থিত ছিলাম বলিয়া জলধরবাবু দ্বিজেন্দ্রলালের মুখ দিয়া সে সভায় "এক ব্র্যাকেটে স্কলারশিপ" মাহাত্ম্যটি প্রচার করাইতে ভরসা পান নাই। তাহার পর যখনই দ্বিজেন্দ্রলালের সহিত তাঁহার দেখা হইয়াছে, তখনই তিনি সকলকে শুনাইয়া 'ব্র্যাকেট'-মহিমা ঘোষণা করিয়াছেন। শুনিয়াছি, তিনি উহা 'মটো' রূপে ছাপাইয়া বৈঠকখানায় বাঁধাইয়া রাখিয়াছিলেন। জলধরবাবু বোধ হয় ভুলিয়া গিয়াছেন, স্থাকামীরও একটা সীমা আছে।

এই সূত্রে জলধরবাবুর 'স্মৃতি তর্পণের' আর একটা কথার অনুশীলন শেষ করিয়া রাখি। আমাদের পাঠক মহাশয়গণের ভিতরও অনেক ব্রিলিয়াণ্ট ষ্টুডেণ্ট আছেন—কিন্তু তাঁহারা ১৯ বৎসর বয়সে এন্ট্রেন্স পরীক্ষা দিতে গিয়া—সম্পূর্ণ অপরিচিত "শৈশবের বন্ধুর" নিকট হইতে "তোমার মত ব্রিলিয়াণ্ট ছেলে…কখন দেখেন নি"—উচ্চ প্রশংসার সঙ্গে অযাচিতভাবে প্রতিদিন ঠোঙ্গাভরা এবং ফিরিবার দিন হাঁড়িভরা সরপুরিয়া—সরভাজা পাইয়াছেন কি?

সভাপর্ব্ব—কংগ্রেসে—ভূস্বামী ও প্রতিনিধি-পরিচয় পর্ব্বাধ্যায়

এই প্রসঙ্গে রায় বাহাদুর প্রতিবাদে বলিয়াছেন :—

"তবে কংগ্রেসের কর্তৃপক্ষ গভর্ণমেণ্টকে তাঁদের এই অধিবেশনের গুরুত্ব সম্বন্ধে সচেতন করবার উদ্দেশে যদি কোন রিপোর্টে সমবেত প্রতিনিধিবর্গের জমকালো ও ভড়কালো পরিচয় দিয়ে সভার মর্য্যাদা বৃদ্ধি করে থাকেন,…"

কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশনে মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, মহারাজা দুর্গাচরণ লাহা, উত্তরপাড়ার সুপ্রবীণ জমিদার জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র, রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও কংগ্রেসের কর্তৃপক্ষ কি কারণে যে, গোয়ালন্দ স্কুলের মাসিক ত্রিশ টাকা বেতনের মাষ্টারের পদগৌরব বৃদ্ধি করিয়া—'ভূস্বামী' ও 'গোয়ালন্দ-শাখার প্রতিনিধি'রূপে জলধরবাবুর "জমকালো ও ভড়কালো" মিথ্যা পরিচয় দিয়া "সভার মর্য্যাদা" বৃদ্ধি করিবেন, তাহা আমাদের বুদ্ধির অগম্য। প্রতিনিধিগণ নিজে ডেলিগেট ফরমে যে পরিচয় লিখিয়া দেন, তাহাই ত' কংগ্রেসের রিপোর্টে মুদ্রিত হয়। সে যুগের কংগ্রেসে, মহারাজা, জমিদারের কোন অভাব ছিল না, বরং এক জন সাধারণ স্কুল মাষ্টারও তাঁহাদের সহিত যোগদান করিয়াছিলেন—জনমত সংগঠনপ্রয়াস প্রতিপন্ন করিবার জন্য ইহাই ত' তাঁহাদের বিশেষ প্রয়োজন। আমাদের পল্লী অঞ্চলে একটি গল্প সুপ্রচলিত আছে—"দাদা, আমি ত' গাঁজা খাই নি, আমি ঘুমিয়েছিলাম, আমার হাতে জোর ক'রে কল্কে গুঁজে দিয়ে কে গাঁজা খেয়েছে জানি নে।" ইহা কি তাহারই ভদ্রসংস্করণ?

'স্মৃতি-তর্পণের' ১৭৮ পৃষ্ঠায় জলধরবাবু নিজেই যে লিখিয়াছেন :—

"সেই অধিবেশনে আমি গোয়ালন্দের জনসাধারণ কর্ত্তৃক প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হ'য়ে যাই।"…

ইহাতেও বোধ হয় জলধরবাবু অসঙ্কোচে স্বর্গীয় ডি, এল, রায় কথিত 'স্কলারশিপ ব্র্যাকেটের' অনুরূপ কৈফিয়ৎ দিতে পারিবেন :—কংগ্রেসের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা—সভাপতি—দেশপূজ্য উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের একান্ত অনুরোধক্রমেই—তিনি গোয়ালন্দ শাখার প্রতিনিধি সাজিয়াছিলেন ও আপনার ভূস্বামী পরিচয় লিখিয়াছিলেন।

বিরাটপর্ব্ব—মহিষাদলরাজ্যে অজ্ঞাতবাসে—চুরুট সেবন-পর্ব্বাধ্যায়

'মাসিক বসুমতীর' ১৩৪০ সালের ভাদ্র-সংখ্যায় মহিষাদলে 'হিমালয়' রচনার ইতিহাস প্রসঙ্গে আমার 'সে কালের স্মৃতিকথায়' লিখিয়াছিলাম :—

"মাষ্টার মহাশয় চুরুটের ধোঁয়ার সঙ্গে আমার কথা হাসিয়াই উড়াইয়া দিলেন।"

আমার কথা মিথ্যা প্রতিপন্ন করিবার জন্য, ইহার প্রতিবাদে শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র দেব 'মাসিক বসুমতীর' ১৩৪০ সালের মাঘ সংখ্যায় লিখিয়াছিলেন :—

"আমরা শুনিয়াছি, জলধর বাবু তখনও ধূমপানে অভ্যস্ত হন নাই।...বসুমতীর প্রতিষ্ঠাতা ৺ উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ই তাঁহাকে চুরুট ধরাইয়াছিলেন। সে মহিষাদল আসিবার অনেক পরে।"

রায় বাহাদুর নিজেও 'স্মৃতিতর্পণের' ১২৫ লিখিয়াছেন :—

"এই বৃদ্ধ দাদার প্রসিদ্ধ চুরুট-খোর বলে যে একটা সুনাম বা বদ্‌নাম রটে গিয়েছে, সেই চুরুট ধরিয়েছিলেন কে জানেন? —'বসুমতীর' মাসিক স্বর্গীয় উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়। 'বসুমতী অফিসে প্রবেশ করবার দুই তিন মাসের মধ্যেই তিনি প্রথম আমার হাতে চুরুট তুলে দেন। এ নেশায় তিনিই আমার গুরু।..."

দ্বিজেন্দ্রলাল প্রসঙ্গে 'স্মৃতি-তর্পণের' ৭১৫ পৃষ্ঠায় মাষ্টার মহাশয় লিখিয়াছেন :—

"সে, বোধ হয় ১৮৯৫ কি ৯৬ অব্দে। আমি তখন মহিষাদল স্কুলে মাষ্টারি করি। মহিষাদলের রাজার ম্যানেজার আমার পরম হিতৈষী সুহৃদ্ পরলোকগত যদুনাথ রায় মহাশয়ের বাসায় থাকি; তাঁর ছেলেটিকে পড়াই, আর তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র সুহৃদবর দীনেন্দ্রকুমার রায়ের সহিত অবসর-সময় যাপন করি।"

আর জলধরবাবু ১৩০৬ সালের ১৫ই বৈশাখ—২৭শে এপ্রেল ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে সুপ্রসিদ্ধ সাংবাদিক পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের গণেশরূপে বসুমতী কার্য্যালয়ে যোগদান করেন।

জলধরবাবু চুরুট সেবনের নজীর তাঁহার স্বনামে প্রকাশিত 'পথিক' পুস্তকের 'দারজিলিংয়ের পথে' প্রবন্ধে সন—তারিখ—মাস—বার—ঘণ্টা ধরিয়া এই ভাবে প্রচারিত করিয়াছেন :—

"১৮৯৫ খৃষ্টাব্দের ১৯এ মে রবিবার রাত্রি ১১টার সময়" পার্ব্বতীপুর জংশন হইতে যাত্রা করিয়া দার্জ্জিলিংএ পৌছিয়া ·· "অনিদ্রা, অনাহার ও গাড়ীতে দারুণ কষ্টের পর স্নানাহারশেষে কোথায় চুরট টানিতে টানিতে খোসগল্প করিব—"

ইহার পরও কি রায় বাহাদুর বলিবেন, তিনি মহিষাদলে চুরুট খাইতেন না,—'বসুমতী' কার্য্যালয়ে স্বর্গীয় উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহাকে চুরুট ধরাইয়াছিলেন? এরূপ সামান্য কথাতেও জলধরবাবু মিথ্যার আশ্রয় লইতে লজ্জিত হন নাই। তাঁহার ধারণা, একটা মিথ্যাকথা কোনক্রমে চালাইয়া দিতে পারিলেই তাহা কালক্রমে সত্যে পরিণত হইবে।

অবশেষে জানিয়া প্রীতিলাভ করিলাম, আমার সমালোচনাটি জলধরবাবু "তাঁর বৃদ্ধ বয়সের শ্রদ্ধাপ্রদত্ত 'গুরুদক্ষিণা' বলেই প্রশান্ত অন্তরে গ্রহণ" করিয়াছেন। কিন্তু গুরু—মুক্তিমন্ত্রদাতা—সাধনার পথ নির্দ্দেশকারী বলিয়াই ত' জানি। রায় বাহাদুর যে কোন্ অধিকারবলে আমার গুরুর আসন বেপরোয়া ভাবে দখল করিয়া বসিলেন, তাহাও ত' বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না। মহিষাদলে তৃতীয় মাষ্টাররূপে শিক্ষকতার জন্য তিনি মাসিক ৪০ টাকা বেতন পাইতেন। সেই সময়ে কিছুদিন—অনুমান ছয় সাত মাস—আমাকে অঙ্ক শিখাইবার নামে দুইখানি পুস্তক লেখাইয়া লইয়াছেন। ছয় সাত মাস আমাকে অঙ্ক শিক্ষা দিবার জন্য তাঁহার বেতন মাসিক ১০৲ টাকা হিসাবে ৬০৲ টাকা—জোর ৭০৲ টাকা প্রাপ্য হইতে পারিত। সেস্থলে আমার লিখিত দুইখানি পুস্তক তিনি স্বনামে প্রচার করিয়া বিভিন্ন সংস্করণে ১০।১২ হাজার টাকা পাইয়াছেন। ইহাতেও কি তাঁহার শিক্ষকতার প্রাপ্য বহুগুণ পরিশোধ করা হয় নাই?

মহালয়ার তর্পণ-পর্ব্বের পূর্ব্বেই রায় বাহাদুর স্মৃতিতর্পণ সমাপন করিতে বাধ্য হইলেন বলিয়া মনে হইতেছে। অতঃপর 'মাসিক বসুমতীতে' যদি জলধরবাবুর জীবনস্মৃতি-মহাভারতের উদ্যোগপর্ব্ব হইতে গদাপর্ব্ব পর্য্যন্ত—বিভিন্ন সংবাদপত্রে তাঁহার শিখণ্ডীলীলার মহিমা বিশ্লেষণের সুযোগ না পাই—অন্যত্র প্রয়াস পাইব।

জলধর বাবু!—

"কতক্ষণ জলের তিলক থাকে ভালে।
কতক্ষণ রহে শিলা শূন্যেতে মারিলে?"

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়।

প্রতিবাদ পত্র

মাননীয় শ্রীযুক্ত "মাসিক বসুমতী" সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু—
সবিনয় নিবেদন,

শ্রাবণ-সংখ্যা "মাসিক বসুমতীতে" শ্রীযুক্ত দীনেন্দ্রকুমার রায় মহাশয় "জলধর-স্মৃতি সম্বর্দ্ধনা" (দ্বিতীয় প্রস্তাব)'প্রবন্ধে আমার প্রতি একটু কটাক্ষপাত করিয়াছেন। আমার অপরাধ, আমি শ্রদ্ধেয় রায় শ্রীযুক্ত জলধর সেন বাহাদুরের 'বাল্যজীবন ও ছাত্রজীবনের কথা' লিখিয়া রাখিয়াছি। দীনেন্দ্রবাবু লিখিয়াছেন—

"শ্রীমান্ নরেন্দ্রনাথ বসুর সাহিত্য-প্রতিভার পরিচয় এখনও পাই নাই—তিনি কোন্ শ্রীমান নরেন্দ্রনাথ তাহা জানিবার সৌভাগ্য আজও হয় নাই। তবে তিনি যে কীর্ত্তিমান সাহিত্যিক, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই—নচেৎ বিশ্ববিজয়ী সাহিত্য-দিগ্‌গজ জলধর বাবুর 'বাল্যজীবন ও ছাত্রজীবন' লিখিবার ভার পাইতেন না। তাঁহার প্রতিভা-রঞ্জিত জলধর বাবুর 'বাল্যজীবন ও ছাত্রজীবন' প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বে"—ইত্যাদি।

আমি আপনাকে এবং মাসিক বসুমতীর পাঠক পাঠিকাগণকে জানাইতে বাধ্য হইতেছি যে, দীনেন্দ্রবাবুর মত আমার কোন 'সাহিত্য-প্রতিভা' না থাকিলেও এবং তাঁহার মত 'কীর্ত্তিমান সাহিত্যিক' না হইলেও আমি ১২।১৩ বৎসর যাবৎ তাঁহার সহিত ব্যক্তিগতভাবে পরিচিত। আমার সম্পাদিত (অধুনালুপ্ত) "বাঁশরী" পত্রিকায় প্রকাশের জন্য তিনি লেখাও দিয়াছেন। পূর্ব্বে তাঁহার সহিত আমার পত্র-ব্যবহারও চলিত। কয়েকবার তিনি আমার নিকট 'কলিকাতা হোটেলে' শুভাগমন করিয়াছেন। তাঁহাকে আমি কখনও আদর অভ্যর্থনার ত্রুটি করি নাই। তিনি কলিকাতায় আসিয়া শ্রীযুক্ত জলধর সেন মহাশয়ের বাসাতেই থাকিতেন, সেখানেও অনেকবার তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ ও কথা-বার্ত্তা হইয়াছে। আমি দীনেন্দ্রবাবুকে একাধিকবার জানাইয়াছি যে, সেন মহাশয়ের মুখ হইতে শুনিয়া তাঁহার বাল্যজীবনের কথা লিখিয়া রাখিতেছি। শুনিয়া দীনেন্দ্রবাবু তখন আনন্দই প্রকাশ করিয়াছেন। সব জানিয়া শুনিয়াও "তিনি কোন্ শ্রীমান্ নরেন্দ্রনাথ, তাহা জানিবার সৌভাগ্য আজও হয় নাই।" এইরূপ স্পষ্ট মিথ্যা বলায় তাঁহার যে কি লাভ তাহা বুঝিতে পারিলাম না। যদি স্বভাবের দোষ হয়, অথবা পূর্ব্বেকার মস্তিষ্কের দুর্ব্বলতা বৃদ্ধি পাইয়া মতিভ্রম ঘটিয়া থাকে, তবে পৃথক কথা। অযথা আমার নাম উল্লেখ করিয়া অজ্ঞতার ভাণ বা কটাক্ষপাত না করিলেও, তাঁহার 'জলধর-স্মৃতি-সম্বর্দ্ধনা' প্রবন্ধ প্রকাশের উদ্দেশ্য সিদ্ধির কোনই ব্যাঘাত ঘটিত না। প্রবন্ধে যত ইচ্ছা মিথ্যা চালাইলেও, আমি কখনও কোন প্রতিবাদ করিতে যাইতাম না।

আশা করি, ভাদ্রের মাসিক বসুমতীতে এই প্রতিবাদ পত্রখানি প্রকাশ করিয়া বাধিত করিবেন। ইতি—২রা ভাদ্র, ১৩৪৩।

বিনীত
শ্রীনরেন্দ্রনাথ বসু।

প্রতিবাদ পত্রের উত্তর

'কলিকাতা হোটেলের' অন্যতম স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ বসু যে, সাহিত্য-দিগ্‌গজ রায় জলধর সেন বাহাদুরের 'বাল্যজীবন ও ছাত্রজীবন' লিখিবার ভার গ্রহণ করিয়াছেন, পূর্ব্বে কোনদিন তাহা জানিবার সৌভাগ্য আমার হয় নাই। "শ্রীমান নরেন্দ্রনাথ বসু" নামটি যে তাঁহারই একচেটিয়া—অন্য কাহারও প্রতি প্রযুক্ত হইতে পারে না, তাহাও আমার জানা ছিল না। তবে নরেন্দ্র বাবুর 'কলিকাতা হোটেলে' নৈশ-ভোজন সমাপনের জন্য রায় বাহাদুর যে অপরাহ্ণ হইতে রাত্রি দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত বহুদিন অপেক্ষা করিতেন, তাহা জানি। জলধরবাবুর 'বাল্যজীবন ও ছাত্রজীবন' প্রণয়নে নরেন্দ্র বাবুর যোগ্যতার কল্পনা করিয়া, তাঁহার প্রতিভার প্রশংসাই ত' করিয়াছি।

শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র বাবু জানিয়া বিশেষ আনন্দিত হইবেন যে, মেহেরপুর হইতে কলিকাতায় আসিয়া জলধরবাবুর আগ্রহে যে কয় বার তাঁহার বাসায় থাকিয়াছি—প্রতিবারেই আমাকে প্রবন্ধ—অভিভাষণ প্রভৃতি লিখিয়া দিতে হইয়াছে এবং আমার সে রচনাগুলি মাষ্টার মহাশয়ের নামেই প্রকাশিত হইয়া ধন্য হইয়াছে। সুতরাং নরেন্দ্র বাবুর বন্ধু জলধর বাবুর কোনবারে অন্নদানই ব্যর্থ—অপব্যয় হয় নাই—বিনিময় গ্রহণে সার্থক হইয়াছে; যথাসময়ে সেই প্রবন্ধ-তালিকা প্রকাশের বাসনা রহিল।

যাহা হউক, রায় বাহাদুরের বাল্যলীলা কীর্ত্তনের মহিমা গানে, প্রতিভাবান সাহিত্যিক নরেন্দ্র বাবুর লুপ্ত 'বাঁশরীর' অনুপম মূর্চ্ছনা-রেশের সহিত, আমার মত অক্ষম সাহিত্যিকের বেতালা শ্রীখোলের চাঁটি, আশা করি, অতি পরিপাটীই হইবে।

বিনীত
শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়।

খোর্দ্দ গোবিন্দপুর

বাঙ্গালার ইতিহাসে খোর্দ্দ-গোবিন্দপুরের পৈশাচিক অনাচারের কাহিনী চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। খোর্দ্দ গোবিন্দপুরে প্রায় দেড়শত পরিবারের বাস, তন্মধ্যে ২০।২৫ ঘর হিন্দু। একটি হিন্দু পরিবারের উপর দিনের আলোতে দলবদ্ধ হইয়া মুসলমানগণ অত্যাচার করিয়াছিল। প্রথমবার বিচারে দায়রা জজ অভিযুক্ত ৪২ জনের মধ্যে ২ জনকে মুক্তি দিয়া বাকি ৪০ জনের মধ্যে ৮ জনের প্রতি যাবজ্জীবন নির্ব্বাসন দণ্ড এবং বাকি ৩২ জনের ১০ বৎসর করিয়া সশ্রম কারাদণ্ড প্রদান করেন। ইহা এক বৎসর পূর্ব্বের ঘটনা।

কলিকাতা হাইকোর্টে আপীলের শুনানি হইলে দুই জন জজ মতপ্রকাশ করেন—মামলার পুনর্ব্বিচার হইবে। কারণ, জুরর-দিগকে মামলা বুঝাইবার ব্যাপারে ত্রুটি ছিল। সুতরাং পুনর্ব্বিচার হইবে, রাজসাহীতে নহে—জলপাইগুড়ীতে। বিচারক খৃষ্টান জজ হইবেন এবং জুররের পরিবর্ত্তে এসেসর নিয়োগ করিতে হইবে।

য়ুরোপীয় খৃষ্টান জজ, ১ জন হিন্দু ও বাকি মুসলমান এসেসর লইয়া মামলার বিচার শেষ করিয়াছেন। মূল মামলার বিচার-কালে সরকারী উকিল রায় বাহাদুর এস্, এন্, ভাইয়া বলিয়াছিলেন, "যখন এই অত্যাচার চলিয়াছিল, তখন যেন খোর্দ্দ গোবিন্দপুর বৃটিশ-শাসনের বাহিরে ছিল।" তিনি বিচারককে বলিয়াছিলেন যে তিনটি বিষয় বিবেচনা করিয়া কঠোর দণ্ড প্রদান করাই কর্ত্তব্য। (১) অভিযুক্ত মুসলমান অত্যাচারীদিগের উত্তেজিত হইবার কোন কারণ ছিল না; (২) তাহারা পূর্ব্ব হইতেই সঙ্কল্প-বদ্ধ হইয়া অত্যাচার করিয়াছিল; (৩) অত্যাচার নৃশংস।

জলপাইগুড়ীর খৃষ্টান বিচারক মিঃ ম্যাকশার্প রায় দিয়াছেন—দুই জনের ৪ বৎসর করিয়া সশ্রম কারাদণ্ড, ১০ জনের ৩ বৎসর এবং বিশ জনের ২॥ বৎসর হইতে ৬ মাস সশ্রম কারাদণ্ড হইল। ৬ জনকে বেকসুর খালাস দেওয়া হইয়াছে। নারীধর্ষণ (৩৭৬ ধারা) ও নারীহরণের (৩৬৬ ধারা) অভিযোগ হইতে আসামী-দিগকে সন্দেহের সুযোগ দিয়া কোনও দণ্ড প্রদত্ত হয় নাই।

রায়ে জজ ম্যাকশার্প বলিয়াছেন, "মোটের উপর প্রমাণ যথেষ্ট হইয়াছে এবং তাহা বিশ্বাসযোগ্য। আসামীর দল যে দাঙ্গা করিয়াছিল, রাধাবল্লভের গৃহস্থদিগকে প্রহার করিয়াছিল ও তাহাদিগকে বিশেষ-ভাবে অপমানিত করিয়াছিল এবং কুসুমের শ্লীলতাহানি করিয়াছিল, তাহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই। তাহারা যে কায করিয়াছিল, তাহার সমর্থন করিবার কোন কারণ নাই।"

মফিজান নাম্নী ৬।৭ সন্তানের জননী নারীর সহিত হরেন্দ্রের অবৈধ প্রণয় ঘটে এবং তাহার ফলে মফিজান সন্তানসম্ভবা হয়, এই অভিযোগে মুসলমানরা গোলাবাড়ীতে হরেন্দ্রকে লইয়া গিয়া যথেষ্ট নির্য্যাতন করে। অথচ মফিজানকে ডাকিয়া সত্যাসত্য নির্ণয়ের কোন ব্যবস্থাও হয় নাই। সে গ্রামে তাহাকে পাওয়া যায় নাই। এরূপ অবস্থায় হরেন্দ্র দোষী কি নির্দ্দোষ, তাহার প্রমাণ কোথায়? আর যদিও মফিজানের সহিত তাহার প্রণয় ঘটিয়া থাকে এবং হরেন্দ্র ব্যভিচার করিয়া থাকে, সে জন্য সকলেই তাহাকে ঘৃণা করিবে। রায়ে জজ বলিয়াছেন, "হরেন মণ্ডলের ব্যবহার সম্বন্ধে তাহাদিগের আপত্তি করিবার যদি কোন কারণ থাকিয়া থাকে, তবে গোলাবাড়ীতে তাহারা যথেষ্ট প্রতিকার করিয়াছিল। যে হিন্দু দম্পতি (হরেন্দ্রের পিতা ও মাতা) তাহা-দিগের উত্তেজনার কোনও কারণ দেন নাই, তাঁহাদিগের সম্বন্ধে তাহাদিগের ব্যবহারে উচ্ছৃঙ্খলতার ভাবই প্রকাশ পাইয়াছে।"

বিচারকের এইরূপ নির্দ্ধারণ সত্ত্বেও, নারীধর্ষণ ও নারীহরণের অভিযোগ বাদ দিলেও, প্রকাশ্য দিবালোকে নিরীহ গৃহস্থগণের উপর দলবদ্ধভাবে, পূর্ব্ব-সংকল্প অনুসারে অনুষ্ঠিত অত্যাচারের জন্য ঐ প্রকার লঘু দণ্ড প্রদত্ত হওয়ায় কোন হিন্দু এবং নিরপেক্ষ ভদ্রলোক সন্তুষ্ট হইতে পারেন কি? বিশেষতঃ বিচারক মিঃ ম্যাকশার্প নিজেই বলিয়াছেন যে, এই অপরাধীরা যে মনো-ভাবের পরিচয় দিয়াছে, তাহা দমিত না হইলে, সে অঞ্চলে শান্তি থাকিবে না—অধিবাসিগণের মধ্যে নিরাপদ ভাব রাখাও অসম্ভব হইবে। তাঁহার উক্তি, "Would seriously interfere with the peace of the locality and with that harmony which should prevail among neighbours irrespective of caste or creed."

বিচারকের এই প্রকার তীব্র মন্তব্যের সঙ্গে তুলনা করিয়া দেখিলে দণ্ডাদেশ যে অত্যন্ত লঘু হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহের অবকাশ কোথায়? বিনা উত্তেজনায় দলবদ্ধভাবে নৃশংস পশুর ন্যায় যাহারা দিবালোকে অনাচারের অনুষ্ঠান করে, এই প্রকার দণ্ডদানে তাহাদিগের মনোভাবের পরিবর্ত্তন কি সম্ভবপর? সমাজ ও সভ্যতার উপর অত্যাচার অনুষ্ঠানের প্রবৃত্তি হ্রাস করার পক্ষে এই দণ্ড পর্য্যাপ্ত হয় নাই, এ কথা নিশ্চয়ই মুক্তকণ্ঠে বলা যাইতে পারে।

তার পর, নারী-নির্য্যাতন ও নারীধর্ষণ সম্বন্ধে বিচারক নিঃসন্দেহ হইতে পারেন নাই। অর্থাৎ তাহারা যে বলাৎকার করে নাই, তাহাও তিনি পূর্ণমাত্রায় বিশ্বাস করেন নাই, আবার সে কার্য্য যে তাহারা করিয়াছিল, ইহাও তিনি সিদ্ধান্ত করেন নাই। এ ক্ষেত্রে একটা প্রধান বিষয় বিবেচ্য। যখন পশুপ্রকৃতি মানুষ কোনও নারীকে ধর্ষণ করে, তখন প্রত্যক্ষ সাক্ষী কেহ থাকে না। অপরোক্ষ প্রমাণ বা অবস্থাঘটিত প্রমাণই এরূপ ক্ষেত্রে বিচারকের মনকে ন্যায় বিচারে প্রবৃত্ত করিয়া থাকে। কুসুমকুমারীকে বহু জন-সমক্ষে উলঙ্গ অবস্থায় হলুদবনের দিকে কয়েক জন দুর্ব্বৃত্ত টানিয়া লইয়া গিয়াছিল, তাহার বক্ষ মর্দ্দিত পিষ্ট করিয়াছিল, বিচারক বহু ব্যক্তির সাক্ষ্যে তাহা জানিতে পারিয়াছিলেন। তার পর বহু ব্যক্তির সাক্ষ্যে এরূপও প্রমাণ তিনি পাইয়াছিলেন যে, প্রকাশ্যভাবে কেহ কেহ প্রশ্ন করিয়াছিল, "মাগীকে লইয়া কি করিয়াছিস্?" উত্তর হইয়াছিল, "যাহা করিবার সবই করা হইয়াছে।" তখন তাঁহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া নিগৃহীতা নারীকে পুনর্ব্বার ঘাব ভাঙ্গিয়া প্রকাশ্য

স্থানে আনিয়া বলাৎকারের প্রস্তাব হইয়াছিল। কুসুম গোলমালে অন্য আশ্রয়ে পলায়ন না করিলে, পথের উপরেই হয়ত সে অত্যাচার অনুষ্ঠিত হইতে পারিত। নারীহরণ ও নারীধর্ষণের পক্ষে ইহার অপেক্ষা পর্য্যাপ্ত প্রমাণ কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে পাওয়া যায়? অবশ্য দারোগার নিকট গভীর ক্ষোভ ও লজ্জাবশতঃ কুসুম প্রথমে বলাৎকারের কথা প্রকাশ করে নাই। কিন্তু পরে আদালতে তাহা বলিয়াছিল। কি কারণে প্রথমে সে বলে নাই, তাহাও কি বিবেচনার যোগ্য নহে? সমাজচ্যুতি এবং আরও অনেক প্রকার পরিণামের আশঙ্কায় হিন্দু নারী যে সহজে ধর্ষিত করার কথা বলিতে চাহে না, ইহা বিবেচনা করিয়া দেখিবার বিষয় নহে কি?

সুতরাং খোদ্দ গোবিন্দপুরের পুনর্ব্বিচারের ফলে যে দণ্ড প্রদত্ত হইয়াছে, তাহাতে হিন্দু অসন্তুষ্ট, ইহা অত্যন্ত সত্যকথা। নারীর উপর অত্যাচার ইংরেজ জাতি সহ্য করে না। মিস্ এলিসের কাহিনী মনে পড়িতেছে। কোন পাঠান এই কুমারীকে অপহরণ করিয়া লইয়া যায়। কিন্তু এই অপমানে সমগ্র বৃটিশ ক্ষাত্রশক্তি জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছিল। সেই পাঠানের গ্রাম সমভূমি করিয়া কুমারী এলিসের উদ্ধারসাধন ঘটিয়াছিল। অথচ, কুমারী এলিসের উপর কোন প্রকার অত্যাচার হইয়াছিল কি না, তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ কোনও আদালতে গৃহীত হয় নাই। শুধু নৃশংস বর্ব্বরতার শাস্তি ও নারীহরণ অপরাধের দণ্ডদানের জন্যই বৃটিশ শক্তির এই সুসঙ্গত ব্যবহার। তার পর মিস্ সারউডের উপরে নানা কারণে ক্ষুব্ধ অমৃতসরের জনতা অত্যাচার করিয়াছিল বলিয়া তাহার প্রতিশোধকল্পে পঞ্জাবে কি হইয়াছিল, তাহা আজ মনে পড়িতেছে। নারীর প্রতি সে দিন যে অত্যাচার হইয়াছিল, তাহাতে ভারতবাসী মর্ম্মাহত—ক্ষুব্ধ হইয়াছিল। এক জন ভারতবাসীই মিস্ সারউডকে রক্ষা করিয়াছিল। তথাপি মিস্ সারউডের উপর জনতার অত্যাচারের প্রতিশোধকল্পে জালিয়ানাবাগের হত্যাকাণ্ড এবং আনুষঙ্গিক বুকে হাঁটান ও অন্যপ্রকার ব্যবস্থার কাহিনী ইতিহাসের পৃষ্ঠায় চিরমুদ্রিত হইয়া আছে।

খোদ্দ গোবিন্দপুরের মামলায় বিচারক যে দণ্ডেরই ব্যবস্থা করুন, এখন বাঙ্গালার হিন্দুদিগের পক্ষে অনেকগুলি বিশেষ বিবেচ্য বিষয় রহিয়াছে। পূর্ব্ব ও উত্তরবঙ্গের অধিকাংশ স্থানেই হিন্দু বাঙ্গালী সংখ্যা-লঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ে পরিণত। খোদ্দ গোবিন্দপুরে যেরূপ পৈশাচিক অত্যাচার অনুষ্ঠিত হইয়াছে, তাহাতে অতঃপর সংখ্যা-লঘিষ্ঠ হিন্দুগণের ঐরূপ স্থান পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র দলবদ্ধভাবে বাস করা সম্ভবপর কি না। অবশ্য বাড়ী-ঘর, বিষয়-সম্পত্তি ত্যাগ করিয়া পিতৃ-পিতামহের গ্রাম হইতে চলিয়া যাওয়া সহজ ব্যাপার নহে। কিন্তু হিন্দুর পক্ষে বিষয়টি বিশেষ গুরু। সুতরাং বিশেষভাবে বিবেচনার যোগ্য।

যদি গ্রাম ত্যাগ করা অসম্ভবই হয়, তাহা হইলে কিরূপে আত্মরক্ষা, সম্ভ্রম রক্ষা করিয়া সংখ্যা-লঘিষ্ঠ শান্তিপ্রিয় হিন্দুকে বাস করিতে হইবে, তাহাও বিশেষভাবে বিবেচ্য। কারণ, অনুরূপ অত্যাচার ভবিষ্যতে কোথাও কখনও ঘটিবে না, এ কথা এখন আর কল্পনা করা চলে না। সেজন্য বাঙ্গালী হিন্দুকে এখন হইতেই প্রস্তুত হইতে হইবে। কিরূপ সঙ্ঘবদ্ধতা অবলম্বন করিলে, পশুপ্রকৃতি গুণ্ডাদিগের আক্রমণ হইতে ধন, প্রাণ, ইজ্জত রক্ষা করা যায়, তাহা ভাবিয়া ব্যবস্থা করিতে হইবে।

আর একটা কথা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। হিন্দুরা নারী জাতিকে মাতৃজাতি মনে করিয়া শ্রদ্ধা করিয়া থাকে। সেই মাতৃজাতির সম্মান রক্ষার জন্য জীবনদানও অকিঞ্চিৎকর। খোদ্দ গোবিন্দপুরে কুসুমের উপর যে নির্লজ্জ অত্যাচার অনুষ্ঠিত হইয়াছিল—তাহাকে বলপূর্ব্বক নগ্নাবস্থায় হলুদবনের দিকে যখন পাষণ্ডগণ টানিয়া লইয়া যাইতেছিল, তখন সেখানে উপস্থিত যাহারা ছিল, তন্মধ্যে কয়েকজন হিন্দুও ত বিদ্যমান ছিল। তাহারা কি করিয়া সে দৃশ্য দর্শন করিল? মাতৃজাতির ইজ্জৎ রক্ষার জন্য তাহারা পুরুষের ন্যায় কর্ত্তব্যপালন করিয়াছিল কি? কোন স্বাধীন জাতি এরূপ ক্ষেত্রে সংখ্যা-লঘিষ্ঠ হইয়াও চুপ করিয়া থাকিত না। কোন ইংরেজ এরূপভাবে তাহার মাতা, জায়া, ভগিনীর প্রতি পাশবিক অত্যাচার নীরবে সহ্য করিত না। বাঙ্গালী হিন্দুর সে কথাটাও ভাবিয়া দেখা উচিত।

খোদ্দ গোবিন্দপুর মামলার পুনর্ব্বিচারের ফলে হিন্দু সন্তুষ্ট হয় নাই। মুসলমান পত্রিকা অথবা, নেতৃস্থানীয় মুসলমানদিগের মধ্যে কাহারও কণ্ঠ হইতে খোদ্দ গোবিন্দপুরের অত্যাচার-কাহিনীর বিরুদ্ধে তীব্র অভিমত প্রকাশ পাইতে দেখা যায় নাই। যে সকল মুসলমান দিবালোকে এই প্রকার পশুপ্রকৃতির পরিচয় দিয়াছে, তাহাদের কার্য্য যে অত্যন্ত বর্ব্বরোচিত, কোনও নেতৃস্থানীয় মুসলমান তাহা এ পর্য্যন্ত বলেন নাই। হানাফী, ষ্টার অব ইণ্ডিয়া প্রভৃতি মুসলমান-পরিচালিত বা মুসলমানপক্ষের সংবাদপত্র বরং পুনর্ব্বিচারের ফল দেখিয়া আনন্দ প্রকাশই করিতেছে। ইহাতে অল্পবুদ্ধি মুসলমানগণের মনে কোন্ ভাবের উদয় হইবে? জলপাইগুড়ীর বিচার-ফল আদৌ সন্তোষজনক নহে। এখন দেখা যাউক, সার জন এণ্ডারসনের সরকার এ বিষয়ে কি করেন। রায়ের বিরুদ্ধে বাঙ্গালা সরকার আপিল করেন কি না, তাহা বাঙ্গালী হিন্দু লক্ষ্য করিতেছে।

ভাওয়াল সন্ন্যাসীর মামলা

প্রায় দুই বৎসর আট মাস পরে ভাওয়াল সন্ন্যাসীর মামলায় ঢাকার অস্থায়ী জেলাজজ শ্রীযুক্ত পান্নালাল বসু রায় প্রদান করিয়াছেন। প্রায় ১৫ শত সাক্ষীর জবানবন্দী ও ২ হাজার একজিবিট পরীক্ষা করিয়া জজ রায় দিয়াছেন, সন্ন্যাসীই ভাওয়ালের মধ্যমকুমার। অনুরূপ এক মামলা হুগলী আদালতে শতবর্ষ পূর্ব্বে হইয়াছিল। গত শ্রাবণ সংখ্যার "মাসিক বসুমতীতে" "জাল প্রতাপচাঁদের" মামলার ইতিহাস "হুগলী জেলার ইতিহাস" শীর্ষক প্রবন্ধে বিশদভাবে প্রদত্ত হইয়াছে। "জাল প্রতাপচাঁদের" মামলা যেমন ইতিহাস প্রসিদ্ধ, ভাওয়াল সন্ন্যাসীর মামলাও তদ্রূপ। বর্দ্ধমানের প্রতাপ-চাঁদ "জাল রাজা" বলিয়াই সাব্যস্ত হইয়াছিলেন; কিন্তু ভাওয়াল সন্ন্যাসী প্রকৃত মধ্যমকুমার বলিয়াই নিম্ন আদালতে সাব্যস্ত হইয়াছেন।

ভাওয়ালের রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণের তিন পুত্র। মধ্যমকুমার পীড়িত হইয়া পত্নী বিভাবতী, শ্যালক ও অন্যান্য লোকের সহিত ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে দার্জ্জিলিং গমন করেন। তাহার কিছুদিন পরে আকস্মিকে পীড়া বৃদ্ধি পায় এবং চিকিৎসা চলিতে থাকিলেও তাঁহার মৃত্যু হয় বলিয়া প্রকাশ পায়।

ভাওয়ালের কুমারত্রয়

দীর্ঘ দ্বাদশ বৎসর পরে গত ১৯২১ খৃষ্টাব্দে এক সন্ন্যাসী ঢাকায় উপস্থিত হন। তখন রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণের অপর দুই পুত্র মৃত। কনিষ্ঠের বিধবা পত্নী সে সময় পোষ্যপুত্র গ্রহণ করিবার আয়োজন করিতেছিলেন। সন্ন্যাসীকে দেখিয়া স্বর্গীয় রাজেন্দ্রনারায়ণের মাতা, রাজেন্দ্রনারায়ণের কন্যারা, তাঁহাকে মধ্যমকুমার বলিয়া চিনিতে পারেন এবং কুমার রমেন্দ্রনারায়ণ হিসাবে তাঁহাকে গ্রহণ করেন। সন্ন্যাসী তখন আদালতে মামলা দায়ের করেন। এই ব্যাপারে ঢাকায় ভীষণ উত্তেজনার সৃষ্টি করে। মধ্যমকুমারের পত্নী বিভাবতী কিন্তু সন্ন্যাসীকে মধ্যমকুমার বলিয়া স্বীকার করেন নাই। বরং তিনি বলেন যে, বাদী পাঞ্জাবের এক জন মহিষপালক। তাঁহার স্বামীর দার্জ্জিলিংএ মৃত্যু হইয়াছে।

এই মামলা সমগ্র বঙ্গদেশে বিশেষ চাঞ্চল্য ও কৌতূহলের সৃষ্টি করিয়াছিল। সুবিজ্ঞ বিচারক যে রায় প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা অত্যন্ত দীর্ঘ! রায়ের সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম অনুসরণ করিলে দেখা যায় যে, মধ্যমকুমার ভাওয়ালে ফিরিয়া আসিয়া নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিলে, তাঁহারই অর্থের বলে তাঁহাকে জাল প্রতিপন্ন করিবার ভীষণ চেষ্টা হইয়াছিল।

জজের রায় আলোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, বিগত ১৯০৯ খৃষ্টাব্দের ৮ই মে তারিখে দার্জ্জিলিং হইতে সংবাদ বাহির হয় যে, মধ্যমকুমারের মৃত্যু হইয়াছে। তখনই অনেকের মনে এই ব্যাপারে সন্দেহ জন্মে। যাঁহারা সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছিলেন, প্রকাশ, তাঁহাদের মধ্যে মধ্যমকুমারের অগ্রজ এক জন। সুদীর্ঘ একযুগ—দ্বাদশ বৎসরের পরে সন্ন্যাসীর আবির্ভাব হইলে, অনেকেই তাঁহাকে মধ্যমকুমার বলিয়া চিনিতে পারেন! প্রজারাও চিনিতে পারিয়া টাকা সংগ্রহ করিয়া তাঁহার মোকদ্দমার খরচ দিবার আয়োজন করে। ঘটনায় প্রকাশ পায়, মধ্যমকুমারের শ্যালক রেভিনিউ বোর্ডের সেক্রেটারীর কাছে গিয়া মধ্যমকুমারের মৃত্যুর প্রমাণ রক্ষার জন্য বলেন। কুমারের মৃত্যুর সম্বন্ধে যে সকল এফিডেভিট তিনি সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিলেন, তাহা বোর্ডের সেক্রেটারীর কাছে অর্পণ করেন। মধ্যমকুমারের শ্যালক রায় বাহাদুর সত্যেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, কুমারের সম্পত্তি সম্ভোগ করিতেছিলেন।

শিকারী-বেশে মধ্যমকুমার (২৫ বৎসর বয়স)

মিঃ লিণ্ডসে (রেভিনিউ বোর্ডের সেক্রেটারী) মধ্যমকুমারের শ্যালক-প্রদত্ত প্রমাণাদির বলে, সন্ন্যাসীকে জাল বলিয়া ঘোষণা করেন। সরকারের কর্তৃত্বাধীন কোর্ট-অব ওয়ার্ডসই কুমারের স্ত্রী বিভাবতীর পক্ষে মামলার সমস্ত ব্যয়-ভার বহন করিয়া আসিয়াছেন। কুমার অতি কষ্টে অন্যের সাহায্যের উপর নির্ভর করিয়া মামলা পরিচালনা করিয়াছিলেন।

মিঃ লিণ্ডসে সন্ন্যাসীর সম্বন্ধে তদন্ত করিবেন বলিয়া আশ্বাস দিয়াছিলেন। মিঃ কিরণচন্দ্র দেও তদন্ত হইবে বলিয়া ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে সন্ন্যাসীকে আশ্বস্ত করেন। কিন্তু সরকার পক্ষ হইতে কোনও তদন্ত হয় নাই। জজ রায় প্রদান উপলক্ষে এ সম্বন্ধে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন।

জজ স্পষ্ট বলিয়াছেন যে, সন্ন্যাসীকে বঞ্চিত করিবার জন্য ষড়যন্ত্রের প্রচেষ্টা হইয়াছিল। সে ষড়যন্ত্র উপন্যাসের পক্ষেও বিস্ময়কর এবং ব্যাপক। আসামীর পক্ষ হইতে ফটোগ্রাফ পরিবর্ত্তিত করিবার চেষ্টা পর্য্যন্ত হইয়াছিল। বাঙ্গালা সরকারের

পক্ষ হইতে মিঃ লিণ্ডসে সুদূর পাঞ্জাবে তদন্ত আরম্ভ করেন। ইহার এই কারণ যে, প্রতিবাদী পক্ষ হইতে বলা হইয়াছিল, সন্ন্যাসী মধ্যমকুমার নহেন, এক জন পাঞ্জাবী ধাপ্পা দিয়া জুড়িয়া বসিবার চেষ্টা করিতেছে। কিন্তু কাহার পরামর্শে এরূপ ব্যবস্থা হইয়াছিল?

রায়ে জজ বলিয়াছেন, বিভাবতী বার্ষিক লক্ষ টাকা পাইতেন। এই টাকাটা বিভাবতীর সহোদর সত্যেন্দ্র বাবুই সম্পূর্ণ ভোগ করিতেন। বিভাবতী টাকাকড়ির কোনও হিসাব রাখিতেন না, অথবা রাখিবার অনুমতিও পাইতেন না। সুতরাং ইহা হইতে সহজেই অনুমেয় যে, সন্ন্যাসী যদি জাল প্রমাণিত না হন, তাহা হইলে সে বিপুল অর্থ আর ভোগ করা চলিবে না, এবং তাহাতে সমূহ ক্ষতি কাহার? জজ রায়ে যে অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহাতে এই ষড়যন্ত্রের মূলে তিনি মধ্যমকুমারের শ্যালককে দেখিয়াছেন।

১৯২১ খৃষ্টাব্দে ভাওয়াল মধ্যমকুমারের প্রথম জয়দেবপুরে আগমন

মোকদ্দমায় প্রকাশ পাইয়াছিল, মধ্যমকুমারকে দার্জ্জিলিংএ বিষ-প্রয়োগে হত্যা করা হইয়াছিল। অবশ্য বিষের ক্রিয়া ঝড়-বৃষ্টিতে সম্পূর্ণ হয় নাই। তাই চৈতন্য লাভের পর সন্ন্যাসী, অপরিচিত স্থানে নিজেকে সন্ন্যাসিবেষ্টিত হইয়া থাকিতে দেখিয়াছিলেন। সন্ন্যাসীদিগের চেষ্টাতেই তিনি জীবন লাভ করেন। তার পর তাঁহার পূর্ব্ব-স্মৃতি বিলুপ্ত হওয়ায় দীর্ঘকাল সন্ন্যাস-জীবনেই অভ্যস্ত হইয়া পড়েন। দ্বাদশবর্ষ অতিক্রম করিবার পূর্ব্বে গুরুর নির্দ্দেশে মধ্যমকুমার দেশে ফিরিয়া আসিয়া নিজের অধিকার দাবী করেন।

মোকদ্দমায় জটিল অবস্থায় বিষ-প্রয়োগে মধ্যমকুমারকে হত্যা করা প্রমাণিত হইলে বিষম বিপদ উপস্থিত হইবে। তাই প্রতিবাদী পক্ষ প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াছিল, সন্ন্যাসীকে জাল প্রতিপন্ন করা। পাঞ্জাবের তদন্ত সেই ফলই প্রসব করিয়াছিল। জজ রায়েই বলিয়াছেন, "There were agents at work to make every enquiry yeild a given result."—ষড়যন্ত্রকারীরা এমন সাক্ষ্য-প্রমাণ সৃষ্টি করিয়াছিল যে, সন্ন্যাসী জাল—সে পাঞ্জাবী মহিষ-চালক।

জজ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার করিয়া সন্ন্যাসীকে প্রকৃত মধ্যমকুমার বলিয়া সাব্যস্ত করিয়াছেন। অবশ্য নিম্ন আদালতের এই বিচারের পর হয় ত হাইকোর্টে আপীল হইতে পারে। সে যাহা হউক, যদি আপীল না হয়, তাহা হইলে, এত দিন পর্য্যন্ত মধ্যমকুমারকে জাল বলিয়া রেভিনিউ বোর্ড যে ঘোষণা করিয়াছিলেন, তাহা প্রত্যাহার করিয়া লওয়া উচিত কি-না? সরকার অবশ্যই এখন বিবেচনা করিয়া দেখিবেন, খাজনা এখন কাহার প্রাপ্য—মধ্যমকুমারের নহে কি? আরও একটি বিবেচ্য বিষয়, বিভাবতীর পক্ষ হইতে যদি আপীল হয়, তাহার জন্য যে ব্যয় হইবে, তাহা কোর্ট-অব ওয়ার্ডস্ হইতে দেওয়া সঙ্গত হইবে কি না?

জজের রায় অনুসারে যাহারা ষড়যন্ত্রকারী, তাহাদের সম্বন্ধে সরকার তদন্ত করিয়া যথাকর্ত্তব্য পালন করিবেন কি না? যাহারা জীবিত ব্যক্তিকে মৃত মনে করিয়া এতবড় ষড়যন্ত্র পাকাইয়া তুলিয়াছিল, তাহাদিগের স্বরূপ প্রকাশিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। এ বিষয়ে সরকারী তদন্তের বিশেষ অবকাশ আছে।

মোটের উপর ভাওয়াল সন্ন্যাসীর মামলায় অভাবনীয় ব্যাপার প্রকাশ পাইয়াছে। এরূপ ঘটনা উপন্যাস-জগতেও সাধারণতঃ ঘটে না। সত্য যে কল্পনার অপেক্ষাও বিচিত্র, তাহা এই ঘটনা হইতেই

ভাওয়ালের মধ্যমকুমার (ষ্টেট পাইবার পর)

হইয়া ভারতে আসিয়াছিলেন। সেই সময়ে তিনি ভারতীয় কৃষির অবস্থার সহিত বিশেষভাবে পরিচিত হইতে পারিয়াছেন। এবার তিনি ভারতে আসিয়া ভারতীয় কৃষির উন্নতি-সাধনে বিশেষ অবহিত হইয়াছেন। শিল্পপ্রধান দেশের পক্ষে একটা বিস্তীর্ণ কৃষিপ্রধান রাজ্য অধীনে রাখা আবশ্যক, ইহা সাধারণ বুদ্ধি-সম্পন্ন মানুষমাত্রেই বুঝিতে পারে। কারণ, কৃষির দ্বারাই পণ্যের উপাদান কাঁচা মাল উৎপাদন করা যায়। বহুদিন পূর্ব্বে মিষ্টার টিয়ার্ণী (Tierney) কমন্স সভায় ভারত-বাসীর প্রতি ইংলণ্ডের অধিবাসী-দিগের বাক্য হিসাবে যে কথা বলিয়াছিলেন, তাহাই বোধ হয় এখনও বৃটিশ জাতির মনোভাব। তিনি বলিয়াছিলেন—Leave off weaving : supply us with the raw material and we will weave for you. তোমরা বস্ত্রবয়ন ত্যাগ কর, আমাদিগকে কাপাস দাও, আমরা তোমাদিগকে বস্ত্র বয়ন করিয়া দিব। তখন কথা ছিল, ইংলণ্ড ভারতের নিকট হইতে তাঁহাদের প্রয়োজনীয় সমস্ত তূলা গ্রহণ করিবেন। কিন্তু তাঁহারা তাহা করেন নাই। ম্যাঞ্চেষ্টারের তাঁতিরা শস্তায় দক্ষিণ মার্কিণ হইতে ভাল তূলা পাইয়াছিলেন বলিয়া তাঁহারা ভারত হইতে তূলা লওয়া বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। তাহার ফলে ভারতীয় কৃষীবলের বিশেষ ক্ষতি হইয়াছিল। এখন মার্কিণীরা তাঁহাদের দেশের তূলা হইতে বস্ত্র নির্ম্মাণে আত্মনিয়োগ করিতেছেন, সেই জন্ত এবং অন্য বহু কারণে ভারতে উৎপন্ন কাঁচা মালের দিকে বৃটিশ জাতির দৃষ্টি পড়িয়াছে। আজ প্রায় ছয় বৎসর Imperial Council of Agricultural Research নামক একটি প্রতিষ্ঠান ভারতে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। উহাতে কৃষির উন্নতিসাধনকল্পে অনেক গবেষণা করা হইতেছে। সম্প্রতি এই সমিতির ১৯৩৫-৩৬ খৃষ্টাব্দের রিপোর্টও বাহির হইয়াছে। সরকারী যানি যেরূপ ধীরে ধীরে চলে, তাহাতে এবার এই রিপোর্ট সত্বর বাহির হইয়াছে সন্দেহ নাই।

এ দিকে বিলাতের 'টাইম্‌স্‌' পত্রে উহার ভারতীয় লেখক কৃষকদিগের এবং পল্লীর অবস্থা সম্বন্ধে এক সুদীর্ঘ পত্র লিখিয়াছেন সঙ্গে সঙ্গে নবাগত বড়লাট লর্ড লিনলিথগো পল্লীর এবং কৃষি

বুঝা যায়। ভাওয়াল ব্যাপারে যাহারা অপরাধী, তাহাদিগের অপরাধের অনুসন্ধান হওয়া অতীব বাঞ্ছনীয়। ভাওয়াল মামলার কাহিনী বাঙ্গালার লোক আগ্রহ সহকারে পূর্ব্বাবধি অনুসরণ করিয়া আসিয়াছে। এই মামলায় জজ যে রায় প্রদান করিয়াছেন, তাহাতে জনসাধারণ উল্লাস প্রকাশ করিয়াছে। সাধারণের ধারণা, সত্য এ ক্ষেত্রে জয়লাভ করিয়াছে।

কৃষিকথা

ভারতের নূতন বড় লাট লর্ড লিনলিথগো কৃষিকার্য্যে বিশেষ পারদর্শী। কিছুদিন পূর্ব্বে তিনি ভারতীয় কৃষিকমিশনের কর্ত্তা

উন্নতিসাধনকল্পে যাহা করিতেছেন, তাহারও উজ্জ্বল বৃত্তান্ত প্রদান করিয়াছেন। 'টাইমস্' সেই পত্র অবলম্বন করিয়া যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে কৃষির জন্ম বৃটিশ সরকার যাহা করিয়াছেন, তাহা যতদূর সম্ভব উজ্জ্বল ভাষায় বলিয়াছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় রাজনীতিকদিগের নিন্দা করিবার সুযোগ পরিত্যাগ করেন নাই। 'টাইমস্' বলিয়াছেন, "ভারতের বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রে ৫ লক্ষ গ্রাম এবং গণ্ডগ্রাম বিক্ষিপ্তভাবে বিরাজ করিতেছে বটে, কিন্তু কৃষীবলরা অনেক সময় উপেক্ষিত; বহু ভারতীয় রাজনীতিক তাহাদের পক্ষ হইয়া কথা বলিবার দাবী করিলেও তাহারা সমসাময়িক জৈবনিক প্রবাহ হইতে দূরে পড়িয়া রহিয়াছে।" ভারতবাসী কৃষকদিগের উপর ভারতীয় রাজনীতিকদিগের বিশেষ কোন দরদ নাই, ইহা বলিবার 'টাইমসের' বিশেষ কারণ থাকিতে পারে, কিন্তু এ কথা যে সর্ব্বথা সত্য, তাহা নহে। বৃটিশ রাজ আজ প্রায় পৌনে দুই শত বৎসর শাসকরূপে ভারতের ভাগ্যাকাশে বিরাজ করিতেছেন বটে, কিন্তু আমরা জিজ্ঞাসা করি, এই পৌনে দুই শত বৎসর তাঁহারা ভারতীয় কৃষকদিগের এবং কৃষীবলের কতখানি উন্নতি করিয়াছেন? বৃটিশ রাজপুরুষরা ভারতবাসীর উপর,—বিশেষতঃ ভারতীয় কৃষীবলের উপর কতটা দরদী, তাহা সার উইলিয়ম হাণ্টারের লিখিত আর্ল অব মেয়োর একটিমাত্র ছত্র পাঠ করিলে বুঝা যায়। তিনি লিখিয়াছেন যে,—"In 1866 when famine burst upon the Bengal seaboard, the Government remained unaware that the calamity was imminent until it had become irremediable and scarcity had passed into starvation. অর্থাৎ ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে যখন বাঙ্গালার বেলাভূমিতে (অর্থাৎ উড়িষ্যায়) দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়াছিল, তখন ঐ বিপদ যে আসন্ন হইয়া পড়িয়াছিল, তাহা সরকার জানিতে পারেন নাই। যতক্ষণ ঐ অজন্মা দুর্ভিক্ষে পরিণত হইয়া প্রতীকারের অসাধ্য না হইয়াছিল, তাহার পূর্ব্বে তাঁহারা উহা বুঝিয়া উঠিতেই পারেন নাই।" শত বর্ষ বাঙ্গালায় রাজত্ব করিবার পরও যে দেশের শাসকগণ দেশবাসীর প্রকৃত অবস্থা সম্বন্ধে এতটা অজ্ঞ থাকেন, তাঁহারা কৃষীবলের দুঃখে কতটা দুঃখিত, তাহা সকলেই বুঝিতে পারে। লর্ড মেয়ো ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে ভারতে কৃষি এবং বাণিজ্য বিভাগ খুলিয়াছিলেন। তৎপূর্ব্বে কোন সরকারী কর্ম্মচারীই কৃষির উন্নতিসাধনে বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় না। ঐ বিভাগ সৃষ্ট হইবার পরও উহার দ্বারা ভারতীয় কৃষীবলের বিশেষ কোন উন্নতি সাধিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। উহার কাগজ-পত্র, রিপোর্ট প্রভৃতি ইংরেজি ভাষাতেই প্রকাশিত হয়, দেশের নিরক্ষর চাষীরা তাহা বুঝিতেই পারে না। সুতরাং উহা থাকা আর না থাকা তাহাদের নিকট দুই-ই সমান। মান্ধাতার আমল হইতে ভারতে যে কৃষিপদ্ধতি চলিয়া আসিয়াছে, জিজ্ঞাসা করি, তাহার কিছু পরিবর্ত্তন হইয়াছে কি? লর্ড মেয়ো রাজপুরুষদিগকে দুইটি বিষয়ে সাবধান হইতে বলিয়াছিলেন,—"(১) দেশীয়রা যাহা যুগযুগান্তর ধরিয়া করিয়া আসিতেছে, তাহাদিগকে তাহাই করিবার জন্য জাঁকালরূপে উপদেশ দিও না, (২) যাহা তাহাদের করার সামর্থ্য বা সঙ্গতি নাই, তাহা তাহাদিগকে করিতে বলিও না।" কিন্তু সরকারী কৃষি বিভাগই ঐ দুইটি কার্য্য ভিন্ন আর অধিক কিছু করিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। পরীক্ষাকার্য্যে নিযুক্ত সরকারী কৃষিক্ষেত্র (Experimental firm) হইতে যে সকল তথ্য প্রচারিত হয়, তাহা চাষীরা জানিতেও পারে না, তাহাদিগকে তাহা জানাইয়া দিবার ব্যবস্থাও কিছু করা হয় নাই। সুতরাং এ পর্য্যন্ত বৃটিশ সরকারের পক্ষ হইতে যে কৃষির উন্নতি-সাধনকল্পে বিশেষ কিছু করা হইয়াছে, সত্যের অনুরোধে, আমরা তাহা স্বীকার করিয়া উঠিতে পারিলাম না।

ভারতীয় রাজনীতিকগণ যে এ বিষয়ে বিশেষ কিছু করিতে পারিয়াছেন, তাহাও আমরা বলিতে পারি না। উহার কারণ তাঁহাদের কৃষকদিগের উপর দরদের অভাব কি না, বলা কঠিন; তবে ঐ বিষয়ে জ্ঞানের অভাবই যে একটা প্রবল কারণ, তাহা অস্বীকার করা যায় না। ব্যবহারশাস্ত্রে অথবা রাজনীতিবিদ্যায় বৃহস্পতি জন্মিলে যে কৃষিবিষয়ক জ্ঞান আপনা-আপনিই গজাইয়া উঠিবে, এমন কোন কথা নাই। সত্য বটে, সরকার কতকগুলি ছাত্রকে কৃষি-বিদ্যা শিক্ষার্থ বৃত্তি দিয়া সিসিষ্টার (Cirencester) কলেজে পড়াইয়া আনিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহারা উপযুক্ত কর্ম্মক্ষেত্র না পাইয়া কেহ ডেপুটীগিরি, কেহ কলেজে শিক্ষকতা প্রভৃতি করিয়া জীবিকার্জ্জন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। এরূপ অবস্থায় আসলে বৃটিশ রাজত্বকালে ভারতীয় কৃষির বিশেষ উন্নতি হইয়াছে, তাহা মনে হয় না। জমিতে গড়ে ফসলের ফলন পূর্ব্বাপেক্ষা কম হইয়াছে কি বাড়িয়াছে, তাহার কোন সরকারী হিসাব পাওয়া যায় না। তবে লোকের মুখে বিক্ষিপ্ত এবং ব্যক্তিগতভাবে যাহা শুনা যায়, তাহাতে মনে হয়, জমির ফলন পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক কমিয়া গিয়াছে। যে অঞ্চলে ম্যালেরিয়ার প্রাবল্য লক্ষিত হয়, সে অঞ্চলে জমির উৎপাদিকা শক্তি হ্রাস পায়, ইহা অভিজ্ঞতার দ্বারা জানা গিয়াছে। স্বনামধন্য ডাক্তার বেণ্টলী ঐ কথা স্বীকার করিয়াছেন। তবে এ বিষয়ে বিশেষভাবে তথ্য সংগৃহীত হয় নাই। এ বিষয়ে কৃষি বিভাগের অনুসন্ধান ও তথ্য সংগ্রহ করা কর্ত্তব্য ছিল। কিন্তু তাঁহারা তাহা করিয়াছেন কি? ডাক্তার বেণ্টলী এ দিকে তাঁহাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন, তথাপি এ দিকে কর্তৃপক্ষের বা উক্ত বিভাগের দৃষ্টি পড়ে নাই। সুতরাং বৃটিশ রাজত্বকালে কৃষির উন্নতি সাধিত হইয়াছে বলিয়া 'টাইমসের' গর্ব্ব করিবার কি আছে?

সত্য বটে,—সরকার ভারতে সেচের খালের কিছু ব্যবস্থা করিয়াছেন। কিন্তু দেড় শত বৎসর ধরিয়া তাঁহারা যাহা করিয়াছেন, তাহা পর্য্যাপ্ত বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে কি? অন্ততঃ বাঙ্গালায় ত তাহা পর্য্যাপ্ত বলিয়া মনে হইতে পারে না। বরং যে সকল নদনদী বাঙ্গালায় সমৃদ্ধিবর্দ্ধনের হেতু ছিল, তাহা হাজিয়া মজিয়া যাওয়াতে বাঙ্গালার ম্যালেরিয়া বৃদ্ধি এবং সম্পদের হ্রাস হইয়াছে,—তাহা অস্বীকার করিতে পারা যায় না। সুতরাং এ বিষয়ে 'টাইমসের' গর্ব্ব করিবার কিছুই থাকিতে পারে না।

ভারতীয় রাজনীতিকগণ কৃষীবলের উন্নতিসাধনে অবহিত নহেন বলিয়া 'টাইমস্' যে অনুযোগ করিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণ নিরর্থক। মহাত্মা গান্ধী যখন উন্নতিসাধন কার্য্যে আত্ম-নিয়োগ করিয়াছিলেন, তখন সরকার কর্ত্তৃক যে হাসেট সার্কুলার জারি করা হইয়াছিল, তাহাতে এই বিষয়ে সরকার-প্রদত্ত বাধা কিরূপ, তাহা সহজে বুঝা যায়। যাহা হউক, লর্ড লিন্‌লিথগো এখন কেবল এ দেশে আসিয়া কার্য্যারম্ভ করিয়াছেন। এখন

তিনি এই কার্য্য কি ভাবে সম্পাদন করেন, তাহা না দেখিয়া আমরা কোন কথা বলিতে পারিতেছি না।

রাজা-মুঞ্জে বিবাদ

সরকারী তালিকাভুক্ত জাতিগুলির (Scheduled castes) স্বপ্রসিদ্ধ নেতা মিষ্টার এম সি রাজার সহিত ডাক্তার মুঞ্জের একটু 'মনান্তর' ঘটিয়াছে। ঘটিবারই কথা। ভোটাভুটি ও সদস্য নির্ব্বাচন লইয়া এক সম্প্রদায়ের সহিত অন্য সম্প্রদায়ের যেরূপ আড়াআড়ি এবং কাড়াকাড়ি চলিতেছে, তাহাতে এইরূপ হওয়াই মানুষের প্রকৃতিসিদ্ধ। আজকাল সম্প্রদায় হিসাবে সদস্য নির্ব্বাচনের অধিকার দানের ব্যবস্থা সরকার করিয়াছেন। সেই জন্য সকল সম্প্রদায়ই চোখ রাঙ্গাইয়া উচ্চবর্ণ হিন্দুদিগের নিকট হইতে যতদূর সম্ভব অধিকার কাড়িয়া লইবার চেষ্টা করিবেন, ইহা স্বাভাবিক। সেই জন্য সরকারের তালিকাভুক্ত কোন কোন জাতি এই বলিয়া ভয় দেখাইতে আরম্ভ করিয়াছেন যে, হয় উচ্চবর্ণের হিন্দুরা সব ত্যাগ করিয়া রাজনীতিক্ষেত্র হইতে বানপ্রস্থ অবলম্বন করুন, যদি না করেন, তাহা হইলে তাঁহারা বলুন, আমরা অন্য ধর্ম্ম গ্রহণ করিব। এরূপ উৎকট আব্দার পূর্ণ করা সহজ নহে। জগতে কোন ধর্ম্মই রাজনীতিক দর কষাকষি করিবার জন্য প্রবর্ত্তিত হয় নাই। ধর্ম্ম আধ্যাত্মিক ব্যাপার। আধ্যাত্মিক পিপাসা শান্তি করিবার জন্যই সুধীগণ ধর্ম্মের সেবা করিয়া থাকেন। যাঁহাদের আধ্যাত্মিক পিপাসা নাই,—আত্মিক সংবেদনা নাই,—তাঁহারা ধর্ম্মকে রাজনীতির হাটে একটা পণ্যবস্তু বা বিকিকিনির জিনিষ বলিয়া মনে করিবেন, ইহাতে বিস্ময়ের বিষয় কিছুই নাই। সম্প্রতি কতকগুলি সরকারী তফসিলভুক্ত জাতি সেই জন্য সাম্যবাদমূলক ধর্ম্ম গ্রহণ করিবেন বলিয়া হুমকী দিতেছেন। ডাক্তার মুঞ্জে সেই জন্য মিষ্টার রাজাকে একখানি অপ্রকাশ্য পত্রে লিখিয়াছিলেন যে, যদি তফসিলভুক্ত কোন জাতি অন্য ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে তাঁহারা বৈষম্য-বিহীন শিখধর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারেন। ডাক্তার মুঞ্জের তাঁহাদিগকে বিনামূল্যে এই উপদেশ প্রদানের কি প্রয়োজন পড়িয়াছিল, তাহা আমরা বুঝি না। তাঁহারা যদি হিন্দুধর্ম্মের গণ্ডী ছাড়িয়া অন্য ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে চাহেন, তাহা হইলে উঁহারা ব্রাহ্মধর্ম্ম, শিখধর্ম্ম, বৌদ্ধধর্ম্ম, খৃষ্টানধর্ম্ম প্রভৃতি যে কোন সাম্যবাদমূলক ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারেন। সে বিষয়ে বাহিরের লোকের কোন উপদেশ দিবার অধিকার আছে বলিয়া আমাদের মনে হয় না। ডাক্তার মুঞ্জে ঐ বিষয়ে উপদেশ দিতে যাইয়াই বিপদে পড়িয়াছেন। এখন মিষ্টার রাজা ঐ পত্রখানি প্রকাশ করিয়া দিয়া এই কথা বলিতেছেন যে, ডাক্তার মুঞ্জে ঐ সকল জাতিকে হিন্দুদের গণ্ডী হইতে বাহির করিয়া দিয়া শিখধর্ম্মে দীক্ষিত করিতে চাহেন। ডাক্তার মুঞ্জের অবশ্য সেরূপ কোন অভিসন্ধি ছিল না। কিন্তু কোন কোন ব্যক্তিকে অযাচিতভাবে উপদেশ দিতে গেলেই অধর্ম্মের ফল ফলে। ডাক্তার মুঞ্জের পত্রখানি অবশ্য, confidential বলিয়া চিহ্নিত ছিল। সুতরাং লেখকের অনুমতি ভিন্ন উহা প্রকাশ করা ভদ্রতা-বিরুদ্ধ। কিন্তু মিষ্টার রাজা সে ভদ্রতার বাধাটুকু মানেন নাই। ইহাতে আর বলিবার কি আছে ?

কংগ্রেস বর্জ্জন

মিষ্টার রাজাগোপাল আচারিয়া মাদ্রাজের এক জন প্রগতিশীল ব্রাহ্মণ, তিনি মহাত্মাজীর বৈবাহিক। মহাত্মাজী যখন কংগ্রেসের সর্ব্বেসর্ব্বা, তখন তস্য বৈবাহিক শ্রীযুত মিঃ রাজাগোপাল আচারিয়া কংগ্রেসের যে এক জন "কেষ্টবিষ্টু" হইবেন, ইহাই সংসারের সাধারণ নিয়ম। মহাত্মাজী কয়েক বৎসর যাবৎ বাহ্যতঃ কংগ্রেসের সহিত সম্পর্ক ছাড়িয়া দিয়াছেন। এইবার তাঁহার বৈবাহিকের পালা। তাই তিনি সম্প্রতি অনেক চিঠি-পত্র লিখিয়া কংগ্রেসের সহিত সম্পর্ক ছাড়িয়া দিয়াছেন। অজুহত—যাঁহারা কংগ্রেসের দলভুক্ত, তাঁহারা কংগ্রেসের নিয়ম-কানুন মানেন না। সেই অজুহতে যদি কংগ্রেসের সহিত সংস্রব বর্জ্জন করিতে হয়, তাহা হইলে মিষ্টার আচারিয়ার বহুকাল পূর্ব্বেই কংগ্রেসের সহিত সম্বন্ধ ত্যাগ করা কর্ত্তব্য ছিল। মোটামুটি মতের মিল থাকিলে লোক যে কোন প্রতিষ্ঠানে যোগ দেয়। এমনও অবস্থা হইতে পারে যে, কংগ্রেসের মূলনীতির সহিত কাহারও মতের মিল আছে,—কিন্তু শাখাপল্লবে মতের ভিন্নতা লক্ষিত হয়। এরূপ লোক কংগ্রেসে যোগ দিবে কি না, তাহাই বিবেচ্য। বিশেষ ব্যাপারে মতভেদ ঘটিতেই পারে। এখন কথা হইতেছে, কোন বিশেষ বিষয়ে যদি একই প্রতিষ্ঠানের দুই জন সদস্যের কোন বিষয়ে দুই মত দেখা যায়, তাহা হইলে কেহ কি তাঁহার বিবেকানুমোদিত মত বিসর্জ্জন করিয়া দলের মতে মত দিবেন ? এ বিষয়ে মতভেদ বিদ্যমান। যদি একই প্রতিষ্ঠানের সকল সদস্যের সর্ব্ববিষয়ে একমত হইতে হইত, তাহা হইলে কোন প্রস্তাব ঐ প্রতিষ্ঠানে উপস্থিত হইলে আর সেই প্রস্তাব সম্বন্ধে ভোট লইবার ব্যবস্থা থাকিত না। সঙ্ঘের বা সমিতির যে মত, সেই মতই সকলে একবাক্যে স্বীকার করিত। বিচার-বিবেচনার বা যুক্তি-তর্কের বালাই-ই থাকিত না। সুতরাং বুঝা যাইতেছে যে, ভিন্ন মত প্রকাশের এবং বিশেষ বিষয়ে ভিন্নভাবে কার্য্য করিবার অধিকার সকলেরই আছে এবং থাকা উচিত। যদি তাহা না থাকিত, তাহা হইলে একই কালে কংগ্রেসের অঙ্কে, নোচেঞ্জার এবং প্রোচেঞ্জার নামক দুইটা বিরুদ্ধবাদী দল ছিল কি করিয়া ? যাহা হউক, এই সব বড় কথা ছাড়িয়া দিয়া মোটের উপর এ কথা বলা যাইতে পারে যে, গান্ধীর বৈবাহিক আচারিয়া মহাশয় একটা তুচ্ছ বিষয় লইয়া এই চলানটা চলাইয়াছেন। ডাক্তার রাজন কংগ্রেসের এক জন সদস্য। তাঁহার নিবাস মাদ্রাজে। ত্রিচিনপল্লী মিউনিসিপ্যালিটার সভাপতি নির্ব্বাচনে ডাক্তার রাজন যাহাকে ভোট দিয়াছেন, তিনি কংগ্রেস নির্ব্বাচিত সদস্য নহেন। কিন্তু কংগ্রেসের লোকের পক্ষে কংগ্রেসের মনোনীত ব্যক্তিকে ভোট দিতে হইবে, ইহাই হইল কংগ্রেসের নীতি ও নিয়ম। ডাক্তার রাজন সে নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া ভোট দিয়াছিলেন। এক জন কংগ্রেসকর্ম্মীর এত বড় গোস্তাকি কি কংগ্রেসের একমাত্র মুখপাত্র মহাশয়ের "মদেকসদয়" বৈবাহিকের সহ্য হয় ? বিশেষ তিনিই যখন কংগ্রেসের মনোনীত ব্যক্তিকে বিশেষ বিবেচনাপূর্ব্বক মনোনীত করিয়াছেন। অতএব তিনি গোসাভরে কংগ্রেসের সহিত সর্ব্ব-সম্বন্ধ ছিন্ন করিবার সঙ্কল্প জানাইয়া নিজ বৈবাহিককে, বল্লভভাই

প্যাটেলকে, জহরলালজীকে আর, বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদকে পত্র পাঠাইলেন। আর অমনই শোকের ঝড় বহিল চৌভিতে। পবন সেই শোকের স্বনন গভীর রণনে দশদিকে ব্যাপ্ত করিয়া দিল। রাজেন্দ্র, প্যাটেল প্রভৃতি মহাত্মার পার্শ্বচরগণ "হায় কি হলো হায় কি হলো" বলিয়া ভূমিশয্যা গ্রহণ করিলেন। কিন্তু শোক করিবারও কি ছাই ফুরসৎ আছে? মহাত্মাজীর আহ্বানে রাজেন্দ্রপ্রসাদ, জহরলালজী প্রভৃতিকেও ওয়ার্দ্ধা অভিমুখে ছুটিতে হইল। শেষটা মান ভাঙ্গিবার জন্ম সাধাসাধি, তবে লক্ষণ দেখিয়া মনে হইয়াছিল মান ভাঙ্গিবে। কিন্তু এই দুর্জ্জয় মান ভাঙ্গে নাই। এখন আমাদের একটা কথা জিজ্ঞাস্য এই যে, কংগ্রেসের এই সকল নিয়ম-কানুন কি সকল সদস্যের মত লইয়া করা হয়? তাহা যদি না হয়, এবং যদি তাহা কয়েক জন নেতার মতানুসারে প্রবর্ত্তিত হয়, তাহা হইলে কংগ্রেসকে কি গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান বলা যাইতে পারে? আর মিষ্টার রাজাগোপালের এই কার্য্য কি নিয়মানুগত হইয়াছিল? তাঁহার এই সামান্ত বিচারের ভার কি তামিল নাইডু কংগ্রেস কমিটীর হাতে দেওয়া উচিত ছিল না? এই আচরণে তাঁহার স্বৈরিতা বুদ্ধির বিলক্ষণ পরিচয় পাওয়া যায়। যাহা হউক, তাঁহার পদত্যাগপত্র গৃহীত হইয়াছে। তিনি এবং ডাক্তার রাজন উভয়েই কংগ্রেস ত্যাগ করিয়াছেন।

বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী ছাত্রদিগের জন্ম বিভিন্ন পাঠ্যপুস্তক অধ্যয়ন করিবার ব্যবস্থা করা আবশ্যক হইবে। নতুবা ধর্ম্মশিক্ষাপ্রদান সম্পূর্ণ নিস্ফল হইয়া দাঁড়াইবে। বিশেষতঃ কোন কোন ধর্ম্মাবলম্বীরা বলিবে যে, তাহাদের ধর্ম্মপুস্তকের কাহিনী তাহাদিগের ছাত্রদিগকে পড়াইতে হইবে। বিশেষতঃ হিন্দুধর্ম্ম আচারমূলক এবং অনুষ্ঠান-সাপেক্ষ। উহার প্রকৃত তথ্য এবং উপকারিতা বুঝিতে হইলে আচার এবং অনুষ্ঠান দ্বারাই তাহা করিতে হয়। শিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্যই বল, আর তারাকিশোর চৌধুরীই (সন্তদাস বাবাজী) বল, ইঁহারা সকলেই আনুষ্ঠানিক হইয়া তবে ধর্ম্মবিষয়ে উচ্চস্থান অধিকার করিয়াছিলেন; স্বামী বিবেকানন্দও ঐশী শক্তিসম্পন্ন গুরুর নিকট প্রাপ্ত উপদেশের অনুষ্ঠান দ্বারাই ধর্ম্মজগতে শীর্ষস্থান অধিকৃত করিয়াছিলেন। গৃহস্থ লোকের মধ্যেও সার গুরুদাস এবং স্বর্গীয় ভূদেব মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি ধর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারাই স্বধর্ম্মে দৃঢ়-প্রতিষ্ঠ হইয়াছিলেন। তাই বলি, হিন্দু বালকদিগকে স্বধর্ম্ম শিক্ষা দিতে হইলে তাহাদিগকে আচারানুষ্ঠানপরায়ণ করিতে হইবে। সাধারণের বিদ্যালয়ে তাহা সম্ভব নহে। তবে সাধারণ বিদ্যালয়ে সাধারণভাবে ধর্ম্মনীতি ও পৌরাণিক ভক্তদিগের উপাখ্যান শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে। কিন্তু হিন্দু-মুসলমানে এখন যেরূপ সম্প্রীতি দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে উভয়ের পক্ষে ধর্ম্মবিষয়ে একই পুস্তক পাঠ্য করা কখনই চলিবে না।

প্রাথমিক শিক্ষাসমিতি

বঙ্গীয় সরকার প্রাথমিক শিক্ষা সম্বন্ধে কি করা কর্ত্তব্য, তাহা অবধারণ করিয়া সেই সম্বন্ধে রিপোর্ট দিবার জন্ম কিছুদিন পূর্ব্বে একটি কমিটী গঠিত করিয়াছেন। কমিটী এ পর্য্যন্ত কি করিয়াছেন এবং কোন্ কোন্ বিষয়ে অনুসন্ধান করিয়া তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহা আমরা জানিতে পারি নাই। বিষয়টি যখন সাধারণের পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়, তখন এ বিষয়ে প্রকাশ্যভাবে তথ্যের অনুসন্ধান ও আলোচনা হওয়া উচিত। তবে শুনিতে পাইতেছি যে, কমিটীকে একটা বিষয় বিশেষভাবে পরামর্শ দিবার কথা বলা হইয়াছে। বিষয়টি এই,—যে সকল বিদ্যালয়ে নানা ধর্ম্মাবলম্বী ছাত্র অধ্যয়ন করে, সে সকল বিদ্যালয়ে ধর্ম্ম শিক্ষা প্রদান করা উচিত কি না, এবং যদি উহাতে ধর্ম্মশিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করা হয়, তাহা হইলে তাহাতে যাহাতে অকল্যাণ হইতে না পারে, এমন ভাবে কি ব্যবস্থা করা যাইতে পারে, কমিটীকে তাহা নির্দ্ধারণ করিয়া দিতে হইবে। সমস্যাটি বড়ই জটিল। এ কথা সত্য যে, বাল্যকালেই বালক-বালিকাদিগকে ধর্ম্মশিক্ষা এবং ধর্ম্মনীতি শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য। নতুবা লোকের মনে ধর্ম্মভাব স্বাভাবিকভাবে বিকাশলাভ করে না। কিন্তু আজকাল আমাদের এই হতভাগ্য দেশে যেরূপ সাম্প্রদায়িক ভাব গজাইয়া উঠিয়াছে, তাহাতে একই শিক্ষক বা উপদেষ্টার দ্বারা সকল সম্প্রদায়ের বালক-বালিকাকে ধর্ম্ম এবং ধর্ম্মনীতি সম্বন্ধে উপদেশ দেওয়া সম্ভব হইবে না, দেওয়া সম্ভব হইলেও উহা করা সমীচীনও হইবে না। বরং তাহাতে হিত না হইয়া ঘোর অহিত হইবে। অবশ্য প্রাথমিক শিক্ষার্থী শিশুরা ধর্ম্মতত্ত্ব এবং ধর্ম্মনীতির ভাব কখনই বুঝিতে পারিবে না। তাহাদিগকে ভগবদ্ভক্তিপূর্ণ পৌরাণিক উপাখ্যানাদি পাঠ করিতে দেওয়াই সঙ্গত। তাহা করিতে হইলে

লর্ড জ্যেটল্যাণ্ডের উত্তর

ভারত-সচিব লর্ড জ্যেটল্যাণ্ডের বরাবরে বাঙ্গালার বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ যে দরখাস্ত করিয়াছিলেন, তাহার উত্তর তিনি দিয়াছেন, তাহার কথা আমরা গত মাসেই পাঠকদিগকে জানাইয়াছি; এবং সে সম্বন্ধে আমরা সংক্ষেপে আমাদের মন্তব্যও প্রকাশ করিয়াছি। এবার সে সম্বন্ধে আরও দুই চারিটি কথা বলিব। লর্ড জ্যেটল্যাণ্ড বলিয়াছেন যে, উভয় সম্প্রদায়ের সম্মতি এবং আবেদন ব্যতীত উহার পরিবর্ত্তন করা হইবে না। সকল সম্প্রদায়ের লোক যদি পরিবর্ত্তন করিতে চাহে, তাহা হইলেও পার্লামেণ্টের বিশেষ সম্মতি ভিন্ন উহার পরিবর্ত্তন করা যাইতে পারিবে না। এক কথায় এই সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা সম্পর্কিত ব্যাপার বদল করিতে হইলে দুইটি ব্যাপার অত্যাবশ্যক হইবে। একটি ব্যাপার, হিন্দু মুসলমান প্রভৃতি সকল সম্প্রদায় সম্মিলিত হইয়া পরিবর্ত্তন প্রার্থনা আবশ্যক। আর একটি, উহা উঠাইয়া দিবার পক্ষে পার্লামেণ্টের বিশেষ সম্মতি চাই। দুইটিই চাই। একটির অভাব হইলে ঐ ব্যবস্থা বিধাতার বিধানের মত অটল রহিবে। আইনে কিন্তু সে কথা নাই। আইনে এমন কথা আছে যে, কোন পক্ষ অনুরোধ না করিলেও দশ বৎসরের পূর্ব্বেই সম্রাট ঐ ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন করিয়া দিতে পারিবেন। (ভারত শাসন ৩০৮ ধারার ৪ উপধারা)। ঐ ৪ উপধারায় (i) চিহ্নিত অনুধারাতে বলা হইয়াছে যে, যে সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের স্বার্থ ইহার সহিত জড়িত, তাহাদের মত লইয়াই উহার পরিবর্ত্তন করা যাইবে। ভারত-সচিব লর্ড জ্যেটল্যাণ্ড ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দের ৮ই জুলাই তারিখে বিলাতের লর্ড সভায় সে কথা স্পষ্টাক্ষরেই বলিয়াছিলেন। উদাহরণস্বরূপ তিনি দেশীয় খৃষ্টানদিগের কথা বলিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি বাঙ্গালার

বিশিষ্ট হিন্দুদিগের আবেদনের উত্তরে বলিয়াছেন যে, হিন্দু এবং মুসলমানরা একমত হইয়া সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার পরিবর্ত্তন করিতে সম্মত না হইলে আর উহার পরিবর্ত্তন করা হইবে না। ফলে সাত মণ তেলও পুড়িবে না, রাধাও নাচিবে না। মুসলমান-দিগের যেরূপ মনোভাব, তাহাতে তাঁহারা কস্মিন্‌কালেও স্বতন্ত্র নির্ব্বাচকমণ্ডলী ছাড়িতে সম্মত হইবেন না। জিন্নার ন্যায় ব্যক্তির ভাব দেখিয়া তাহা যাঁহারা না বুঝিবেন, তাঁহারা কল্পান্তকাল পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিলেও তাহা বুঝিবেন না। শাসকজাতিও ইচ্ছা করিয়া অথবা ন্যায়বিচারের অনুরোধে তাহা করিবেন না। যদি বল, শাসক জাতি তবে আইনে ঐ পথ খোলসা রাখিয়াছেন কেন? তাহার অনেক কারণ হইতে পারে। একটি কারণ, তাঁহারা যখন মনে করিবেন বা কর্ত্তব্য বলিয়া বুঝিবেন, তখন তাঁহারা তাহা করিতে পারিবেন। সেই জন্য তাঁহারা আইনের দিক দিয়া ঐ পথে কোন বাধা রাখেন নাই। পাশ্চাত্য ডিপ্লোম্যাসীর স্বরূপ কি, তাহা যাঁহারা জানেন, তাঁহারাই তাহা বুঝিবেন। অধ্যাপক কার্ভেথ রীড পাশ্চাত্য জাতির ডিপ্লোম্যাসীর সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে, চাতুরী বা ছলনাই উহার সার ভাগ (I am forced to judge that deceit is the essence of it)। পাশ্চাত্য জাতিরা মনে করেন, যে ক্ষেত্রে কোন আইন নাই, সে ক্ষেত্রে অবিচার হইতে পারে না। অতএব তথায় কোনরূপ নৈতিক বাধ্যবাধকতা নাই। সুতরাং এ ক্ষেত্রে নীতিধর্ম্মের বা যুক্তিতর্কের অবতারণা করিলে কোন ফল পাওয়া যাইবে বলিয়া আশা করা যায় না।

এখন ব্যাপার দেখিয়া মনে হইতেছে যে, বাঙ্গালার উচ্চ বর্ণের হিন্দুদিগের সহিত এইরূপ ব্যবহার করিবার আয়োজন লর্ড কর্জ্জনের আমল হইতে চলিয়া আসিতেছে। লর্ড কর্জ্জন যখন বঙ্গ-ভঙ্গ করিয়াছিলেন, তখন তিনি পূর্ব্বতন বাঙ্গালা প্রদেশটি অত্যন্ত বৃহৎ বলিয়া উহাকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছিলেন। উহার পূর্ব্বাংশ বাঙ্গালার চট্টগ্রাম বিভাগ, ঢাকা বিভাগ, (দার্জ্জিলিং ভিন্ন) মালদহ জিলা আসামের সহিত সংযুক্ত করিয়া উহার নাম দিয়াছিলেন পূর্ব্ববঙ্গ এবং আসামপ্রদেশ। মিষ্টার ব্যামফিল্ড ফুলার উহার প্রথম ছোট লাট হইয়াছিলেন। ইনিই বলিয়াছিলেন যে, মুসলমান সম্প্রদায় ইহার সুয়ো রাণী। এই প্রদেশটি হইয়াছিল মুসলমানপ্রধান। তাহার পর বাঙ্গালার পশ্চিমাংশ উড়িষ্যা ও বিহারের সহিত সংযুক্ত করিয়া দিয়া উহাতে বাঙ্গালীদিগকে সংখ্যার সম্প্রদায়ে পরিণত করেন। তাহার পর যখন ভাঙ্গা বাঙ্গালাকে সংযুক্ত করা হয়, তখন বাঙ্গালার সিংভূম, মানভূম, শ্রীহট্ট, কাছাড় প্রভৃতি জিলাকে বাঙ্গালা হইতে বহির্ভূত করিয়া দিয়া জোড়া বাঙ্গালাকে মুসলমানপ্রধান করিয়াছেন। যে সময়ে লর্ড কর্জ্জন বঙ্গ ভঙ্গ করিয়াছিলেন, সে সময়ে তিনি সম্বলপুর জিলাকে মধ্যপ্রদেশ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া উড়িষ্যার সহিত মিলাইয়া দিয়াছিলেন। কারণ, এ দেশের লোক উড়িয়া ভাষায় কথা বলে। কিন্তু যখন ভাঙ্গা বাঙ্গালা আবার যুক্ত করিয়া দেওয়া হইল, তখন সিংভূম, মানভূম, শ্রীহট্ট, কাছাড় জিলার অধিবাসীদিগের ভাষা বাঙ্গালা হইলেও সে বিবেচনা না করিয়া ঐ জিলাগুলিকে বাঙ্গালা হইতে বাহির করা হইল। ভাষার দিকটা আর বিবেচনা করা হয় নাই। সেই জন্য আমাদের মনে হয় যে, লর্ড মর্লির settled fact লর্ড হার্ডিংএর শাসনকালে unsettled হইলেও বৃটিশ সরকারের settled policy ঠিক unsettled হয় নাই; সুতরাং এ বিষয়ে আমাদের গর্ব্ব করিবার বিশেষ কিছুই নাই। এখন সাম্প্রদায়িক নির্ব্বাচকমণ্ডলী রহিত করিবার জন্য যে আন্দোলন করিবার কথা হইতেছে,—আমরা তাহার সর্ব্বতোভাবে সমর্থন করিলেও উহা যে সর্ব্বতো-ভাবে সহজে সফল হইবে, তাহা আমরা আশা করিতে পারি না। কিন্তু তাহা হইলেও এ বিষয়ে নিশ্চেষ্ট থাকা উচিত নহে। এ বিষয়ে খুব সাবধানে কার্য্য করিতে হইবে। লর্ড জেটল্যাণ্ড উত্তরদানকালে বিশেষ কোন যুক্তি প্রদর্শন করেন নাই, তাহার কারণ, তিনি মনে মনে বুঝেন যে, সে বিষয়ে তাঁহার উপস্থিত বিশেষ প্রবল যুক্তি নাই। তিনি বৃটিশ সরকারের নীতিই পরিচালিত করিতেছেন। মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করাতে তিনি তাহা করিতে বাধ্য। এখন আন্দোলন করিয়া বৃটিশ-মন্ত্রিমণ্ডলীকে সেই নীতি বর্জ্জন করাইতে হইবে। সে কায বড় সহজ হইবে না। আন্দোলন দ্বারা ব্যক্তি-বিশেষের মত পরিবর্ত্তিত করা সম্ভব হইতে পারে, কিন্তু কোন সঙ্ঘের বা জনমণ্ডলীর মত সহজে পরিবর্ত্তন করা যায় না।

মুসলমানদের একতাসাধন

মিষ্টার মহম্মদ আলি জিন্না বোম্বায়ের এক জন খ্যাতনামা ব্যারিষ্টার। দাদাভাই নাওরোজীর নিকট ইনি রাজনীতিতে দীক্ষা গ্রহণ করেন এবং কিছুকাল তাঁহার সেক্রেটারীর কায করিয়াছিলেন। ইনি প্রথমতঃ সাম্প্রদায়িকতার ঘোর বিরোধী ছিলেন। গোলটেবল বৈঠকে যাইয়া ইনি সাম্প্রদায়িক মতে দীক্ষিত হইয়াছেন। ইহার পরই ইনি ১৪ দফা দাবী উপস্থিত করেন। সম্প্রতি তিনি বাঙ্গালী মুসলমানদিগের মধ্যে একতা প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। এক্ষণে বলা আবশ্যক যে, সম্প্রতি ইনি একটি কেন্দ্রী পার্লামেণ্টারী বোর্ড সমেত নিখিল ভারতীয় মোস্লেমলীগ গঠন করিয়াছেন। বাঙ্গালার সকল অঞ্চল হইতেই মুসলমান নেতারা ইঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন। ইঁহার মত হইতেছে যে, বাঙ্গালায় মুসলমানদিগের বিভিন্ন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান রাখিবার প্রয়োজন নাই। সব একীভূত করিয়া মুসলমানদিগের মধ্যে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। ইঁহারা সকলেই ঠিক এক-মতাবলম্বী মুসলমানদিগকে ব্যবস্থাপক সভায় নির্ব্বাচনে সদস্য-রূপে উপস্থিত করিবেন। এ প্রস্তাবে সকলেই সম্মত হইয়াছেন। এ জন্য যোগাড়যন্ত্রও খুব চলিতেছে। কংগ্রেস যেমন পার্লামেণ্টারী বোর্ড গঠন করিয়াছিলেন, ইঁহারা এখন সেইরূপ পার্লামেণ্টারী বোর্ড গঠন করিতেছেন। ইহা কংগ্রেস-ওয়ালাদিগের উপর একটা পাল্টা চা'ল, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। সুতরাং স্বর্গীয় চিত্তরঞ্জন দাশের সময়ে মুসলমান সদস্যগণের মধ্যে যে কতকগুলি স্বরাজী দেখা গিয়াছিল, এবার আর তাহা দেখা যাইবে না। অতএব কংগ্রেস মুসলমানদিগের সন্তোষ-সম্পাদনের জন্য যে "না গ্রহণ না বর্জ্জন নীতি" গ্রহণ করিয়াছেন, তাহার ফল কতটা পাইলেন, তাহা ভাবিয়া দেখুন। নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ!

কংগ্রেসের ইস্তাহার

কংগ্রেস নির্ব্বাচনের জন্য এক ইস্তাহার প্রচার করিয়াছেন। যাঁহারা কংগ্রেস বর্জ্জন করিয়াছিলেন, তাঁহারা কংগ্রেসে প্রবেশ করিতেছেন বলিয়া দেশের লোকের নিকট একটা কৈফিয়ৎ দেওয়া, বোধ হয় কর্ত্তব্য মনে করিয়াছিলেন, সেই জন্য এই ইস্তাহার প্রচার করিয়াছেন। ১৯২৬ খৃষ্টাব্দের ৮ই মার্চ্চ তারিখে পণ্ডিত মতিলাল নেহেরুর নেতৃত্বে যখন কংগ্রেসওয়ালারা ব্যবস্থা-পরিষদ পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছিলেন, তখন পণ্ডিতজী বলিয়াছিলেন যে, "স্বরাজীরা আড়াই বৎসর ধরিয়া ভারত সরকারের সহিত সহযোগিতা করিয়া আসিতেছেন এবং শাসন-সংস্কার সফল করিবার জন্য সরকারকে সাহায্য করিয়াছেন, কিন্তু তাহার পরিবর্ত্তে তাঁহারা অবমাননা (humiliation) ভিন্ন আর কিছু পান নাই।" এই কথা বলিয়া পণ্ডিতজী সমস্ত স্বরাজী দলবল সহ ব্যবস্থা-পরিষদ পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছিলেন। এখন আবার সেই স্বরাজী দলই কংগ্রেসে যাইতেছেন এবং হয় ত বা মন্ত্রিত্ব-গ্রহণের সঙ্কল্প করিতেছেন। কাযেই একটা কৈফিয়ৎ দিবার প্রয়োজন হইয়াছে। তাঁহারা বলিয়াছেন যে, তাঁহারা সরকারের সহিত সহযোগিতা করিতে যাইতেছেন না, ভারত-সংস্কার আইনে বাধা দিয়া উহা ধ্বংস করিবার জন্য যাইতেছেন। অসহযোগ আন্দোলনের পর চিত্তরঞ্জন দাশের নেতৃত্বে যখন তাঁহারা ব্যবস্থাপক প্রতিষ্ঠানগুলিতে প্রবেশ করিয়াছিলেন, তখনও তাঁহারা বলিয়াছিলেন যে, তাঁহারা সরকারের সহিত সহযোগিতা করিতে যাইতেছেন না,—শাসনযন্ত্র অচল করিতে যাইতেছেন। বাঙ্গালায় স্বর্গীয় চিত্তরঞ্জন দাশ তাহা করিয়াছিলেন সত্য,—কিন্তু ব্যবস্থা-পরিষদে স্বর্গীয় পণ্ডিত মতিলাল নেহেরুর কথাতেই প্রকাশ যে, তাঁহারা সরকারের সহিত আড়াই বৎসর ধরিয়া সহযোগিতা করিয়াছিলেন এবং তাহার বিনিময়ে কেবল অবমাননাই পাইয়াছিলেন। এবার ত তাঁহারা অনেক রকম অঙ্গীকার করিয়াছেন, যায় বেকার-সমস্যার সমাধান, শিল্প-সংস্থাপন, কৃষির উন্নতি প্রভৃতি করিবেন,—কিন্তু ব্যবস্থাপক সভাগুলির সাহায্য ভিন্ন কি তাহা করিতে পারিবেন? ঐ বিষয়গুলি সম্বন্ধে আইন করিতে হইলেও সরকারের সহযোগিতা চাই। তাঁহারা মন্ত্রিত্ব লইবেন কি না, তাহা নির্ব্বাচনের পর সাব্যস্ত করিবেন। অর্থাৎ তাঁহারা সুবিধা বুঝিয়া কায করিবেন, একটা মূল নীতির অনুসরণ করিয়া কায করিবেন না। সাম্প্রদায়িক নির্ব্বাচন সম্বন্ধে তাঁহারা ঘোষণা করিয়াছেন যে, তাঁহারা উহার বিরোধী বটেন,—তবে উহা উঠাইয়া দিতে হইলে সর্ব্ব সম্প্রদায়ের একযোগে কার্য্য করা চাই। সরকারও ঠিক সেই কথা বলিয়াছেন। সুতরাং যদি চন্দ্র-সূর্য্য ভূতলে খসিয়া পড়ার মত অসম্ভব কাণ্ড ঘটে, মুসলমানরা সকলে মিশ্র নির্ব্বাচন চাহেন, তাহা হইলে কংগ্রেসের চেষ্টার প্রয়োজন কি, সরকারই তাহা করিয়া দিবেন। তাঁহারা বলিয়াছেন যে, শাসন-সংস্কার আইন ঘুচিয়া যাইলে, এই স্বতন্ত্র নির্ব্বাচনপদ্ধতিও ঘুচিয়া যাইবে। ঘুচাইবে কে? এ কথা স্থিরমতে জানিয়া রাখা উচিত যে, ব্যবস্থাপক সভাগুলিতে, মুসলমানগণ আসল কাযের বেলায় এককাট্টা হইবেন। সেই জন্যই ত জিন্নার বাঙ্গালায় আগমন। দুই একটা ছোট-খাট ব্যাপারে ব্যবস্থা পরিষদে সরকারের সহিত ভোটযুদ্ধে জয়লাভ করিলেই শাসনসংস্কার আইন ভাঙ্গিবে না, উঠিবেও না। কিন্তু আসল ব্যাপারে তোমরা যে জয়লাভ করিতে পারিবে, তাহা মনে করিও না। আর তোমরাও বলিতেছ এবং মুসলমানরাও বুঝিতেছেন যে, শাসন-সংস্কার আইন ধ্বংস হইলে তাঁহাদের এত সাধের সাম্প্রদায়িক নির্ব্বাচন লোপ পাইবে, সুতরাং তাঁহারা তোমাদের সহিত যোগ দিয়া শাসন-সংস্কার আইন নষ্ট করিয়া দিতে সম্মত হইবেন কি? কখনই না। মনে রাখিও, দ্বিতীয় গোল-টেবল বৈঠকে যখন মহাত্মাজী মুসলমানদিগকে বলিয়াছিলেন যে, তোমরা যাহা চাও, আমরা তোমাদিগকে তাহাই দিতে সম্মত আছি, তোমরা মিশ্র-নির্ব্বাচনে সম্মত হও, তাহাতে তাঁহারা সম্মত হন নাই। ইহাতেও যে তোমাদের চৈতন্য হইতেছে না, ইহা অপেক্ষা বিস্ময়ের বিষয় আর কি হইতে পারে?

ডাক্তার শ্রীযুক্ত অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়

সুপ্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র ডাক্তার শ্রীযুক্ত অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় এম, বি, গত কয় বৎসর কলিকাতার ট্রপিক্যাল স্কুল অফ মেডিকেলে "হুক ওয়াম" সম্বন্ধে গবেষণা করিতেছিলেন। ইনি রকফেলার ফাউণ্ডেশনের বৃত্তি পাইয়া গত ২রা ভাদ্র চিকিৎসাবিদ্যা সম্বন্ধে গবেষণার জন্য আমেরিকা যাত্রা করিয়াছেন। আমরা তাঁহার সাফল্য কামনা করি।

শ্রীযুক্ত অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়

হাইকোর্টে নূতন জজ

ডাক্তার শ্রীযুত বিজনকুমার মুখোপাধ্যায় কলিকাতা হাইকোর্টের অতিরিক্ত জজ নিযুক্ত হইয়াছেন। বিজন বাবু ১৯১১ খৃষ্টাব্দে

শ্রীযুত বিজনকুমার মুখোপাধ্যায়

বি, এল, পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়া ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে ইতিহাসে এম, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে এম, এল, পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন ও ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে "ডক্টর অব ল" হয়েন। তিনি এখন সিনিয়ার সরকারী উকীলের কায করিতেছেন। বিজন বাবুর বয়স ৪৫ বৎসর। তিনি অল্পবয়সে বিপত্নীক হইয়া অনাড়ম্বর জীবন যাপন করেন এবং তাঁহার দানশীলতা তাঁহার আইন-জ্ঞানেরই মত লোকের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছে। আমরা আশা করি, তিনি পদের গৌরব বর্দ্ধিত করিবেন।

দিল্লীতে ম্যালেরিয়া

যে সময়ে কর্ত্তৃপক্ষ ভারতের রাজধানী কলিকাতা হইতে দিল্লীতে অপসারিত করয়াছিলেন, সেই সময়ে ভারতবাসীরা প্রাচীন ভারতীয় রাজগণের মহাশ্মশানে ভারতের রাজধানী লইয়া যাইবার প্রস্তাবে বিশেষ আপত্তি করিয়াছিলেন। তবে সেই সময়ে ভাঙ্গা বাঙ্গালা কতকটা জোড়া দেওয়াতে লোক আনন্দে এতই অধীর হইয়াছিল যে, তাহারা উহাতে তাদৃশ আপত্তি করিবার অবকাশ পায় নাই। এখন দেখা যাইতেছে যে, তাহাদের সে আপত্তি ঠিকই হইয়াছিল। এই রাজধানী নির্ম্মাণে সরকারের যে টাকা ব্যয় হইয়াছে, তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। কিন্তু তাহা হইলেও এই স্থান এখনও সুবিধাজনক হয় নাই। এই স্থানে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ অত্যন্ত অধিক। সম্প্রতি ভারত সরকার এই স্থানের ম্যালেরিয়ার প্রশমনকল্পে ১৫ হাজার টাকা ব্যয় মঞ্জুর করিয়াছেন। বলা বাহুল্য, ইহা প্রাথমিক ব্যয়। এখন এইরূপ কত দফায় কত লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে, তাহা বলা কঠিন। এ পর্য্যন্ত শুনা গিয়াছিল যে, তথাকার বাসগৃহগুলির সান্নিধ্যে এনোফিলিস নামক ম্যালেরিয়াবাহী মশকের জন্মস্থান থাকাতে তথায় ম্যালেরিয়ার প্রকোপ দেখিতে পাওয়া যায়। এখন শুনা যাইতেছে যে, সমস্ত নূতন দিল্লীই ম্যালেরিয়াবাহী মশকের জন্মস্থান দ্বারা পরিবেষ্টিত। যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে এই ১৫ হাজার টাকা ত সমুদ্রে পাদ্য-অর্ঘ্যস্বরূপ হইবে। কারণ, সমস্ত নূতন এবং পুরাতন দিল্লীতে মশক-মারণ কার্য্য রীতিমতভাবে চালাইতে হইবে। পুরাতন দিল্লীর মশককুল আসিয়া নূতন দিল্লীতে আশ্রয় লয়। ইহা করিতে হইলে ধীরে ধীরে কার্য্য করিতেই হইবে। কোন্ স্থানে কিরূপ প্রতীকারের উপায় অবলম্বন করিলে তাহা সফল হইবে, তাহা নির্দ্ধারণ করিয়া কার্য্য করা আবশ্যক। যে সময়ে নূতন দিল্লীর গঠন-কার্য্য প্রায় শেষ হইয়াছিল, সেই সময়ে অনেক বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিই কর্ত্তৃপক্ষকে বলিয়াছিলেন যে, সমস্ত দিল্লীর স্বাস্থ্য এবং বিস্তার-ব্যবস্থা পরিদর্শনের জন্য সরকার একটি ডেভলপমেণ্ট ট্রাষ্ট বসান, কিন্তু সে সময়ে সরকার সে কথা কাণে তুলেন নাই। এখন যখন কিছুতেই কিছু হইতেছে না, তখন সরকার অনন্যোপায় হইয়াই এরূপ ব্যবস্থা করিতে চাহিতেছেন। ভারতের করদাতা গৌরীসেনরা যখন আছে, তখন খরচের বিষয় ভাবিবার প্রয়োজন নাই। তাহাদের নিকট হইতে প্রাপ্ত টাকা দরিয়ায়ে ঢালিলে কে-ই বা আপত্তি করিবে, আর সে আপত্তি শুনিবেই বা কে?

শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত
কলিকাতা, ১৬৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, বসুমতী রোটারী মেসিনে শ্রীশশিভূষণ দত্ত মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

"ততঃ সোঽপি পদাক্রান্তস্তয়া নিজমুখাত্ততঃ।
অর্দ্ধনিষ্ক্রান্ত এবাসৌ দেব্যা বীর্য্যেণ সংবৃতঃ॥"

—শ্রীশ্রীচণ্ডী, মহিষাসুরবধঃ॥ ৪১॥

আশ্বিন, ১৩৪৩] [শিল্পী—শ্রীচারুচন্দ্র সেনগুপ্ত

১৫শ বর্ষ]　　আশ্বিন, ১৩৪৩　　[৬ষ্ঠ সংখ্যা

শরৎ

শরৎ, তোমারে কি দিয়ে এবার জীবনে বরি ?
কমল কুমুদ শেফালি ছাতিম ? তুমিই এনেছ সঙ্গে করি।
তুমিই রচেছ মরালের মালা,
তুমিই সাজালে কমলার থালা,
তোমারে বরিতে জীবনের ডালা কোন্ উপচারে বল্ গো ভরি ?

সারা বরষের দিনগুলি আজি তন্নতন্ন বৃথাই খুঁজি,
তোমারে অর্ঘ্য দেবার মতন কিছুই সেখানে নাইক পুঁজি।
পাই শুধু খুঁজি শুকানো কুসুম,
নিবানো-বাতির কালি আর ধূম,
পোকায় কেটেছে চামরের লোম, কিসে তব পথ-ক্লান্তি হরি ?

গেছে অজন্মা সারাটি বরষ, ফসল ফলেনি প্রাণের ক্ষেতে,
কুসুমের বন ভরেছে আগাছা শেয়ালকাঁটায়, ভরেছে বেতে।
রিক্ত হস্তে তোমারে বরণ,
করিনু এবার হে মনোহরণ,
তব আবাহনে বিরসকণ্ঠে নীরস এ গান তাই ত ধরি।

শ্রীকালিদাস রায়।

উমা ব্রহ্ম (শ্রুতিসিদ্ধান্ত)

"দুর্গাং শিবাং শান্তিকরীং···প্রণতোঽস্মি সদা উমাম্ ॥"

উমা যে ব্রহ্ম, তাহা বলিবার পূর্ব্বে একটু মুখবন্ধ করিতে হইতেছে—

স্বর্গ, মর্ত্ত, পাতাল—ভোগের রাজ্য। দেবতা, মানুষ, অসুর—সকলেই সুখের কাঙ্গাল। এই সুখেরই জন্য দেবতা-অসুরে যুদ্ধ, মনুষ্যে-মনুষ্যে যুদ্ধ,—আবার মনুষ্য,—দেবতা বা অসুরের উপাসক। কিন্তু সুখ যে কি, তাহা ইঁহারা অবগত নহেন, একটা কল্পনায় বা একটা মোহে, সুখের মূর্ত্তি ইঁহারা নির্ম্মাণ করিয়াছেন। সেই মূর্ত্তি ভোগ বা ভোগের উপায় লাভ। ভোগস্থান, ঐ—ত্রিলোক—স্বর্গ, মর্ত্ত, পাতাল। মর্ত্ত আমাদিগের প্রত্যক্ষ, স্বর্গ ও পাতালের বর্ণনা শাস্ত্রে আছে। সর্ব্বত্রই ভোগ—মর্ত্তে দুঃখভোগও হয়; স্বর্গ ও পাতালে সুখভোগই হয়। স্বর্গের দেবতার ও পাতালের অসুরের দুঃখভোগ মর্ত্তে আসিয়াই করিতে হয়। সুখ-সাগরমধ্যে যখন দেবতা বা অসুর নিমগ্ন থাকেন, তখন তাঁহাদিগের চিন্তাজনিত দুঃখকণা তেমন অনুভূত হয় না। যদি বা জয়-পরাজয়-জনিত দুঃখ কখনও কখনও হয়, তাহা সুখের তুলনায় নিতান্ত অল্প, বিশেষতঃ বিজিতের দুঃখ মর্ত্তলোকেই হয়।

'স্বর্গান্নিরাকৃতাঃ সর্ব্বে তেন দেবগণা ভুবি। বিচরন্তি যথা মর্ত্ত্যা সম্ভিক্ষণণ্ডরাত্মনঃ।' মার্কণ্ডেয় পুরাণ।

স্বর্গ ও পাতালের ব্যাখ্যা করিবার স্থান ইহা নহে,—অতএব পুরাণের ইঙ্গিতমাত্রই এ স্থলে প্রদত্ত হইল। এখন আসল কথা বলিতেছি—

স্বর্গের দেবতাগণ এক যুদ্ধে অসুরগণকে পরাজিত করেন,—তাহাতে তাঁহাদিগের কল্পিত ভোগসুখের মাত্রা-বৃদ্ধি হইয়াছিল। ভোগসুখের মাত্রাবৃদ্ধি বা তৎসম্ভাবনার সহিত গর্ব্বের একটা অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ। ভোগসুখ-মাত্রা বৃদ্ধি বা তৎসম্ভাবনা, গর্ব্বের কারণ হইয়া থাকে; এই কার্য্য-কারণভাবই সেই অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ। দেবগণ তখন বিজয়-গর্ব্বে গর্ব্বিত। আমরা অসুর-বিজয়ী—এই গর্ব্বও তাঁহা-দিগের একটা কাল্পনিক সুখের হেতু হইয়াছিল।

মানবের যাঁহারা উপাস্য, তাঁহাদিগেরও এই গর্ব্ব, এই মোহ; জগতের প্রকৃত কল্যাণ কিরূপ হইবে?

গর্ব্ব ও মোহ জ্ঞানীর হয় না, যাঁহার তত্ত্বজ্ঞান হয় নাই, তাঁহারই গর্ব্ব ও মোহ হইতে পারে। ভোগসুখও তাঁহারই কল্পিত। ত্রিলোকের দেবতা মনুষ্য ও অসুর কেহই যখন তত্ত্বজ্ঞান লাভ করেন নাই, তখন, ইন্দ্র অগ্নি-বায়ু-প্রমুখ দেবগণও যে মোহবশতঃ গর্ব্বযুক্ত হইবেন, তাহাতে বিস্ময় করিবার কারণ নাই। হাঁ, বিস্ময়ের কারণ এইটুকু থাকিতে পারে বটে যে, এই ইন্দ্র অগ্নি বায়ু বাগ্বেদের যজ্ঞীয় দেবতা, কেবল যজ্ঞীয় দেবতা বলিলেও ঠিক হয় না, যজ্ঞীয় প্রধান দেবতা; তাঁহারাও মোহগ্রস্ত। কিন্তু বিশেষ বিচার করিলে বুঝা যায়, ইহাও বিস্ময়াবহ নহে—কীটপতঙ্গ, পশুপক্ষী, মনুষ্যের ন্যায়—দেবতারাও যে অজ্ঞানের উপরে প্রতিষ্ঠিত।

এই অজ্ঞান কি?—আত্মার স্বরূপবিষয়ে ভ্রম,—মর্ত্তস্থ প্রাণিবৃন্দ—তৃণগুল্ম কীটপতঙ্গ প্রভৃতি ক্ষুদ্র প্রাণী হইতে মনুষ্য পর্য্যন্ত—সকলেরই দেহকে আত্মা বলিয়া জ্ঞান সাধারণতঃ আছে। আমি রুগ্ন, আমি সুস্থ, আমি যুবা, আমি বৃদ্ধ, আমি বলবান্, আমি দুর্ব্বল—এই জ্ঞান মনুষ্যমধ্যে প্রায় সর্ব্বত্রই বিদ্যমান। তৃণ-গুল্ম-বৃক্ষাদিও নিজ নিজ শরীর-পোষণে ব্যাপৃত, শরীরহানি-ভয়ে ভীত, শারীরিক দুঃখে ম্রিয়মাণ—যত স্বল্পজ্ঞানই উহাদিগের থাকুক না কেন,—তন্মধ্যেই শরীরকে আমি বলিয়া বোধটুকু স্পষ্ট বা অস্পষ্টভাবে আছে। কৃমিকীটাদির ত আছেই, দেহ রক্ষার জন্য তাহারা সদা ব্যস্ত, দেহহানি-ভয়ে ভীত, মরণভয়ে কিরূপ ব্যাকুল হয়—তাহা সকলেরই প্রত্যক্ষ। মনুষ্যের মধ্যে যাঁহারা শাস্ত্রজ্ঞ—আত্মা দেহ হইতে ভিন্ন ইহা শাস্ত্রকথায় জানেন, তথাপি তাঁহারা নাম গোত্র উল্লেখ দ্বারা 'অহং' নির্দ্দেশ করার মোহের মধ্যে তাঁহারাও জড়িত; একালে যাঁহারা 'শিক্ষিত' বা যাঁহারা সুসভ্য নামে পৃথিবীতে পরিচিত, তাঁহাদিগের দেহে 'অহং'বুদ্ধি অধিক-তর,—দেহই যে আত্মা—অথবা দেহেরই অংশবিশেষ যে

আত্মা—জড়বিজ্ঞানবিদ্ বহু প্রতীচ্য গ্রন্থকার এই মত পোষণ করেন।

দেহে যে আত্মজ্ঞান, ইহা অজ্ঞান ভ্রম। সেই ভ্রম হইতেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অসংখ্য মোহ উপস্থিত হয়,—তাহা মানুষের গর্ব্বেরও হেতু। মানুষের—এবং পৃথিবীস্থ অপর প্রাণীর দেহ পার্থিব আকাশ, বায়ু, তেজ ও জলের সম্বন্ধও এই পার্থিব দেহে থাকে।

দেবতাদিগের দেহ পার্থিব নহে,—সাধারণতঃ তাঁহাদিগেরও সেই তৈজস দেহে 'অহং'-জ্ঞান থাকে,—প্রধান প্রধান দেবতাগণের বাহ্য ইন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণে 'অহং'-জ্ঞান থাকে। বাহেন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণের দুই প্রকারে পরিচয় আছে—ব্যষ্টি ও সমষ্টি। প্রত্যেক জীবের যে বাহেন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণ, যথা ক চিহ্নিত ১টি প্রাণীর—চক্ষুরিন্দ্রিয় শ্রবণেন্দ্রিয় ইত্যাদি তাহাই ব্যষ্টি এবং এই জগতে যত প্রাণী আছে, তৎসমুদয়ের যে চক্ষুরিন্দ্রিয়সমূহ—শ্রবণেন্দ্রিয়-সমূহ ইত্যাদি প্রত্যেক সমূহই এক একটি সমষ্টি—এক এক ইন্দ্রিয়সমষ্টিতে এক এক দেবতার অহংজ্ঞান থাকে; ইন্দ্রিয়ব্যষ্টিই হউক, আর ইন্দ্রিয়সমষ্টিই হউক,—কিছুই 'আত্মা' নহে;—আত্মাতে অহংবুদ্ধি না হইয়া অন্যত্র অহংবুদ্ধি হইলেই তাহাকে ভ্রম বলিতেই হইবে। এক বস্তুকে অন্য বস্তুরূপে বুঝাই ত ভ্রম। ভ্রম থাকিলেও দেবতাগণের শক্তি মনুষ্যাপেক্ষা অধিক,—যেমন অপর ভূচর প্রাণী অপেক্ষা মনুষ্যের শক্তি অধিক, তদ্রূপ। সেই শক্তির সহায়তায় মনুষ্য নিজ নিজ ইষ্ট সিদ্ধ করিবার আকাঙ্ক্ষা করিয়া দেবতার উপাসনা করে; রাজা, মহারাজ ও যোগ্যতা-সম্পন্ন মনুষ্যের উপাসনাই ঐ সকল দেবতোপাসনার উদাহরণ, সুতরাং ইন্দ্রাদি দেবতার ভ্রম বলিলে বিস্মিত হইবার কারণ নাই, তাঁহাদিগের উপাসনাও বিফল নহে।

এস্থলে ইহাও বক্তব্য যে, উপাসক যদি দেবতার আত্ম-তত্ত্বের উপাসনা করে—তাহাতে মুক্তিলাভ হইতে পারে, অতএব উপাসকের ভাবানুসারেই ভোগ সুখ বা মুক্তিলাভ হয়। উপনিষদ্ সেই আত্মতত্ত্বকেই ব্রহ্ম বলিয়াছেন। (শ্রুতি) বৃহদারণ্যক উপনিষদের একটি স্থান উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছি,—

(১) "য আদিত্যে তিষ্ঠন্নাদিত্যাদন্তরো যমাদিত্যোন
বেদে যস্যাদিত্যঃ শরীরং য আদিত্য-
মন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মান্তর্যাম্যমৃতঃ"

২।৮ ব্রাহ্মণ।

অর্থাৎ "যিনি আদিত্যে থাকিলেও আদিত্য হইতে পৃথক্, আদিত্য যাঁহাকে জানেন না, আদিত্য যাঁহার শরীর, অন্তরস্থ থাকিয়া যিনি আদিত্যের নিয়ামক, এই তিনি তোমারই অন্তর্য্যামী অমৃত আত্মা।"

আর একটি স্থল—

(২) "দেবাস্তং পরাদুর্যোঽন্যত্রাত্মনো দেবান্ বেদ।"

বৃহ ৪।৫ ব্রাহ্মণ।

যে ব্যক্তি আত্মা ব্যতীত দেবগণকে পৃথক্ দর্শন করে, দেবগণের নিকট তাহারা হীন হইয়া থাকে।

আরও একটি—

(৩) "য এবং বেদাহং ব্রহ্মাস্মীতি স ইদং
সর্ব্বং ভবতি তস্য হ দেবাশ্চ নাভূত্যা
ঈশতে আত্মা হ্যেষাং স ভবতি, অথ
যোঽন্যাং দেবতামুপাস্তেঽন্যোসাবন্যোঽ-
হমস্মীতি ন স বেদ যথা পশুঃ"

(বৃহ, ১।৪।১০)

অর্থাৎ যিনি আমি ব্রহ্ম এইরূপ অপরোক্ষ অনুভব করেন, তিনি সর্ব্বস্বরূপ, দেবগণেরও তিনি আত্মা, তাঁহাদিগের প্রতি প্রভুত্ব করিবার সামর্থ্য দেবগণের থাকে না, যে আপনাকে পৃথক্ ও উপাস্যকে পৃথক্ চিন্তা করে, সে ব্যক্তি ভ্রান্ত পশুবৎ।"

অতএব উপাসক ব্রহ্মজ্ঞ হইলে—পৃথক্ কথা, সাধারণতঃ ফলকামী উপাসক দেবতার মোহ থাকিলেও দৈবীশক্তির নিকট হইতে সেই ফল লাভ করে, কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞ উপাসক দেবতারও আত্মা বলিয়া দৈবীশক্তি তাহার উপর প্রভুত্ব করিতে পারে না।

এই পর্য্যন্ত যাহা আলোচিত হইল,—তাহার মর্ম্মার্থ এই যে, দেবতারা ব্রহ্মজ্ঞ না হইলেও দৈবী শক্তি দ্বারা ভেদবুদ্ধি-সম্পন্ন উপাসকের অভীষ্ট সিদ্ধি করিতে পারেন। অভেদ-বুদ্ধিসম্পন্নের নিকটে তাঁহাদিগের প্রভুত্ব থাকে না,—দেবতা স্বয়ং আত্মতত্ত্ববিষয়ে অভ্রান্ত না হইলেও তাঁহার

যিনি বাস্তবিক আত্মা, তিনি আর অভেদবুদ্ধি-সম্পন্ন উপাসকের আত্মা ত ভিন্ন নহেন,—যে বাস্তব আত্মার সাহায্যে দৈবীশক্তির বিকাশ, সেই আত্মাকেই দৈবীশক্তি দ্বারা উন্নীত বা অভিভূত করা যায় না। ঐন্দ্রজালিক আপনাকে ইন্দ্রজালে মুগ্ধ করিতে পারে না। ইন্দ্রাদি দেবগণও ব্রহ্মজ্ঞানের অর্থাৎ আত্মতত্ত্বজ্ঞানের অভাবেই অসুরজয়ে গর্ব্বযুক্ত—আত্মাভিমানে স্ফীত হইয়াছিলেন, এই যে উপনিষদের উক্তি, তাহার সত্যতা এবং ঐরূপ দেবতাগণের বেদোক্ত উপাসনার আবশ্যকতা প্রদর্শনের জন্যই উপরিভাগের আলোচনা।

উমাই যে ব্রহ্ম, ইহা যে উপনিষদের উক্তি দ্বারা প্রমাণিত হইবে—সেই উপনিষদের তৃতীয় খণ্ডের আরম্ভ উক্ত আলোচনা ভিত্তিতেই প্রতিষ্ঠিত, যথা—

শ্রুতি—কেনোপনিষদ তৃতীয় খণ্ড—'ব্রহ্মহ দেবেভ্যো বিজিগ্যে তস্য হ ব্রহ্মণো বিজয়ে দেবা অমহীয়ন্ত ত ঐক্ষন্ত অস্মাকমেবায়ং বিজয়োঽস্মাকমেবায়ং মহিমেতি।

ব্রহ্ম বা আত্মাই দেবগণের জয়োদ্দেশে জয়যুক্ত হন এবং পূজিত হন। কিন্তু দেবতারা দেখিলেন—এই জয় আমাদিগেরই, এ মহিমা আমাদিগেরই, এইরূপ আত্মশ্লাঘাযুক্ত হইলেন।

তাৎপর্য্য এই যে, ব্রহ্ম আত্মাই একমাত্র চেতন। তদ্ভিন্ন সকল বস্তুই মায়িক। অতএব জড়পদার্থ,—চেতনের অধিষ্ঠান ব্যতীত জড়ের কোন শক্তিরই স্ফুরণ হয় না। এখন জড়বিজ্ঞানের জয় জয়কারের সময়; এখনও তাহার শক্তিবিকাশের মূলে চেতনই বর্ত্তমান। আবিষ্কর্ত্তা, পরিচালক ও ভক্ত সকলেই চেতন। এই যে আবিসিনিয়া জয়ে ইটালীর দম্ভ—গর্ব্ব অহঙ্কার, ইহার মূলে চেতনশক্তিই অবস্থিত। সেই চেতনশক্তির তত্ত্ব অজ্ঞাত বলিয়াই দম্ভ-গর্ব্ব; দেবগণের গর্ব্বও সেই জন্যই হইয়াছিল।

এই চেতন এক—অখণ্ড—অদ্বিতীয়, বিজেতা দেবগণের অহংভাব সেই অখণ্ড অদ্বিতীয় চেতনকে আশ্রয় করিয়া অবস্থিত নহে। অনেকে যেমন স্থূল দেহকে 'অহং' আত্মা মনে করে—দেবগণও অনেকে তাঁহাদিগের তৈজস দেহকে কেহ বা সমষ্টি ইন্দ্রিয়বিশেষকেই 'অহং' মনে করেন,—বাস্তবিক উহা অহং বা আত্মা নহে, উহা জড়পদার্থ মাত্র। যিনি আত্মা, বাস্তব 'অহং'—তিনি বিজেতা ও বিজিত সর্ব্বত্রই এক। তাঁহারই চেতন প্রকাশ—অন্যত্র প্রতিফলিত হইয়া জড় বায়ুকেও ক্রিয়াশীল করিয়া থাকে। ঘড়ি, এঞ্জিন ইত্যাদি শত শত দৃষ্টান্ত এখন সম্মুখে।

যে চেতন বিজেতা ও বিজিত সর্ব্বত্রই সমান, তাঁহাকে যদি ঠিক অনুভব করা যায়, তাহা হইলে গর্ব্ব, অভিমান থাকিতে পারে না। এই একত্ব একমাত্র চেতনেই সম্ভব। জড়ে এই একত্ব নহে। এই জন্য অহঙ্কার-বিমূঢ় ব্যক্তি বর্ণ-পরিপূর্ণ সমাজে একত্ববাদ প্রচার সত্যের অপলাপ মাত্র কিছুই নহে। চেতনের যে একত্ব তাহা সত্য—এই সত্য জ্ঞান প্রতিষ্ঠিত হইলে—তাহার শোক, দুঃখ থাকে না, অভাব অভিযোগ থাকে না, গর্ব্ব অভিমান থাকে না, তাহার দৃষ্টিতে সব সমান—এক অখণ্ড আনন্দময় জ্ঞান সমুদ্রেই সমস্ত পূর্ণ।

দেবগণের যে অসুরবিজয়, তাহার মূলে ঐ চেতনশক্তি বর্ত্তমান বলিয়া উপনিষদে তাহা ব্রহ্মেরই বিজয় বলিয়া ঘোষিত হইয়াছে। সে বিজয়ে দেবগণের কোনই দাবি নাই। কারণ, দেবতারা ত আপনাদিগকে সেই অখণ্ড চেতন বলিয়া জানেন না, তাঁহারা ভেদজ্ঞানসম্পন্ন, আমি ইন্দ্র দেবরাজ, আমি অগ্নি—বিশ্বদাহক, আমি বায়ু—বিশ্বসঞ্চালক। এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আমি অখণ্ড ব্রহ্ম নহে, বিশ্ববিস্তীর্ণ আনন্দসমুদ্র নহে। কিন্তু কোন্ জীব, মায়াপাশে বদ্ধ—দেহধারী প্রাণী এই গভীর তত্ত্ব বিনা উপদেশে অবগত হইতে সমর্থ? কেই বা প্রথম উপদেষ্টা হইবে? যদি তাহা না হয়, তবে এই সত্য চিরদিনের জন্য কি লুকায়িত থাকিবে?

এই সমস্যার সমাধান শ্রুতিতেই আছে—

"যমেবৈষবৃণুতে তেন লভ্য-
স্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনূং স্বাম্।"

(কঠোপনিষদ ১।২)

অর্থাৎ এই আত্মা (ব্রহ্ম) যাঁহাকে বরণ করে,—আত্মপ্রকাশের উপযুক্ত অধিকারী বুঝেন, তাঁহার নিকট নিজ শরীর প্রকাশ করেন। তাৎপর্য্য এই যে, শরীর গ্রহণ না করিলে উপদেশ প্রদান করা যায় না—উপদেশ দিবার জন্য তিনিই শরীরীরূপে প্রকাশিত হন; এবং উপাসকের উপাসনা সিদ্ধির অভিলাষের জন্যও তিনি শরীর পরিগ্রহ

করেন। এই মন্ত্র ব্যাখ্যায় কোন কোন আচার্য্য বলিয়াছেন, 'স্বাং তনুং' ইহার অর্থ আপনার স্বরূপ,—তনু শব্দের প্রসিদ্ধ অর্থ যে শরীর, তাহা এ স্থলে গৃহীত হয় নাই। ব্রহ্ম অসঙ্গ অপ্রাণঃ, অমনঃ, অকায়া বলিয়া তাঁহার শরীর হইতে পারে না। কিন্তু এই ভাব বহু আচার্য্যের অভিমত নহে। কারণ, 'স্বাং তনুং' এইরূপ বাক্য না থাকিয়া 'স্বং' মাত্র থাকিলেই ত চলিত। ব্যর্থ 'তনুং' আর তাহার বিশেষণরূপে 'স্বাং' যোজিত করা অনুচিত হয়। শ্রুতিমধ্যে প্রবিষ্ট অর্থ পরিত্যাগ করিয়া মানব-কল্পনাকে গ্রহণ করা উচিত নহে। শ্রুতিতে যে অপ্রাণঃ 'সমনাঃ' আছে, যাহাতে শরীরী মাত্রে যে প্রাণ ও মন থাকে, এ শরীরে তাহা নাই। আর তাঁহাকে যে অকার 'অসঙ্গ' বলা হইয়াছে, দেহাভিমান তাঁহার নাই, বা তাত্ত্বিকভাবে প্রাণ মন বা দেহসম্বন্ধ নাই, মায়িক সম্বন্ধ আছে।

ব্রহ্মের যে মায়িক দেহসম্বন্ধ, তাহাতে প্রতিবাদী কেহই নাই। ভগবান শঙ্করাচার্য্য এই মায়াকে অনির্ব্বচনীয় ব্রহ্মশক্তি বলিয়াছেন। শাক্ত মতে মায়া প্রকৃতি, চেতন ব্রহ্ম-পুরুষ, নিত্য সম্বন্ধযুক্ত প্রকৃতি পুরুষ পূর্ণব্রহ্ম। কেবল প্রকৃতি অচেতন, ব্রহ্ম নহেন। পূর্ণব্রহ্মের পুরুষভাগ আত্মা বা চিৎ কোন স্থলে ব্রহ্ম নামে গৃহীত হইলেও তাহা গ্রামাংশের গ্রাম সংজ্ঞার ন্যায় বুঝিতে হইবে। প্রকৃতিতে গুণ থাকিলেও প্রকৃতি-পুরুষ উভয়ে কোন গুণ না থাকায় তিনি নির্গুণ। এ বিষয়ে পূর্ণ-বিচার আমার ব্রহ্মসূত্র দেবীভাষ্যে আছে। এ স্থলে বাহুল্য অনাবশ্যক। যাহা হউক, অদ্বৈতবাদেও ব্রহ্মের বাস্তব শরীর না থাকিলেও মায়া-কল্পিত শরীর আছে, ইহা স্বীকৃত। আমি বলিতেছি—ব্রহ্মজ্ঞানের অধিকারীর নিকট ব্রহ্ম নিজতত্ত্বজ্ঞানার্থ উপদেশ দিবার জন্য শরীর ধারণ করিয়া উপস্থিত হন এবং উপাসকের অধিকারানুসারে উপাস্য মূর্ত্তিতে আবির্ভূত হন, ইহাই কঠোপনিষদের মন্ত্রার্থ।

ইন্দ্রাদি দেবগণের সত্ত্বপ্রধান অদৃষ্টবশে ব্রহ্মজ্ঞান লাভের উপযোগিতা ছিল—কিন্তু তাহার বাধক ছিল—গর্ব্ব অহঙ্কার। ব্রহ্ম প্রথমতঃ এক বিকট জীবরূপে আবির্ভূত হইয়া তাঁহাদিগের গর্ব্বনাশ করিলেন। শ্রুতি বলিতেছেন,—

"তদেষাং বিজজ্ঞৌ তেভ্যো হ প্রাদুর্ব্বভূব তন্ন ব্যজনান্ত কিমেতদ্ যক্ষমিতি"।

অর্থাৎ সর্ব্বভূতের আত্মা যে ব্রহ্ম, তাঁহার অবিদিত কি থাকিতে পারে। ইন্দ্রাদি দেবগণের বাস্তব আত্মা বলিয়া তাঁহাদিগের মনোভাব সম্পূর্ণই জানিতে পারিলেন, তখন এক অদ্ভুত রূপ ধারণ করিয়া তাঁহাদিগের অনতিদূরে দেখা দিলেন। কিন্তু সেই রূপ দেবগণের অপরিজ্ঞাত।

"তেঽগ্নিমব্রুবন্ জাতবেদ এতদ্বিজানীহি।"

দেবগণ অগ্নিকে বলিলেন, হে জাতবেদঃ—এই সম্মুখস্থ অদ্ভুত আকৃতিবিশিষ্ট প্রাণীর তত্ত্ব অবগত হন।

"তথেতি তদভ্যদ্রবৎ। তমব্রবীৎ কোঽসীতি
অগ্নির্ব্বাহমস্মি জাতবেদা বাহমস্মি।"

অগ্নি স্বীকার করিয়া সেই প্রাণীর সমীপে উপস্থিত হইলে প্রাণী বলিলেন, কে তুমি? অগ্নি উত্তর করিলেন, আমি অগ্নি অথবা নামান্তরে জাতবেদা।

"ত্বয়ি কিং বীর্য্যং? ইত্যপীদং সর্ব্বং দহেয়ং যদিদং পৃথিব্যামিতি।"

প্রাণী জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তোমার ক্ষমতা কিরূপ?' অগ্নি বলিলেন, পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে, সমস্তই দগ্ধ করিবার ক্ষমতা রাখি।

"তস্মৈ তৃণং নিদধাবেতদ্দহেতি তদুপপ্রেয়ায় সর্ব্বজবেন দগ্ধুং তন্ন শশাক"

অগ্নির জন্য একগাছি তৃণ রাখিয়া বলিলেন, ইহা দগ্ধ কর। অগ্নি সম্পূর্ণ ক্ষমতা প্রয়োগ করিয়াও তাহা দগ্ধ করিতে পারিলেন না। অগ্নি অকৃতকার্য্য হইয়া প্রত্যাবৃত্ত হইলে, বায়ু প্রেরিত হইলেন,—

'তদভ্যদ্রবৎ তমভ্যবদৎ কোঽসীতি বায়ুর্বা অহমস্মীত্য-ব্রবীন্মাতরিশ্বা বা অহমস্মীতি।'

বায়ু প্রাণীর নিকটে আসিলেই তখন বায়ুকে সেই প্রাণী জিজ্ঞাসা করিলেন, কে তুমি? বায়ু উত্তর করিলেন, আমি বায়ু বা মাতরিশ্বা।

ত্বয়ি কিং বীর্য্যমিত্যপীদং
সর্ব্বমাদদীয় যৎকিঞ্চ পৃথিব্যামিতি।

প্রাণী জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তোমার ক্ষমতা কিরূপ?' (বায়ু উত্তর করিলেন) 'পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে, তৎসমস্তই আমি আত্মসাৎ করিতে পারি।'

তৃণং নিদধাবেতদ্দহেতি তদুপপ্রেয়ায় সর্ব্ব-জবেন তন্ন শশাকাদাতুং।”

বায়ুর জন্য একগাছি তৃণ রাখিয়া বলিলেন, ইহা আত্মসাৎ কর। বায়ু সম্পূর্ণ বেগেও তাহা আত্মসাৎ করিতে পারিলেন না।

তিনি অকৃতকার্য্য হইয়া প্রত্যাবৃত্ত হইলে, দেবরাজ ইন্দ্র দেবগণের প্রার্থনায় উপস্থিত হইলেন।

অগ্নি এবং বায়ুর গর্ব্বনাশ হইল বটে, কিন্তু স্বয়ং ব্রহ্ম তাঁহাদিগের সমক্ষে শরীরীরূপে আবির্ভূত হইয়া উপদেশ করিবেন, এতটা উৎকর্ষ তাঁহাদিগের ছিল না—তাই ইন্দ্র উপস্থিত হইলেই সেই প্রাণী যক্ষ অন্তর্হিত হইলেন—

স তস্মিন্নেবাকাশেস্ত্রিয়মাজগাম বহু শোভমানা-
মুমাং হৈমবতীং তাং হোবাচ কিমেতদ্ যক্ষমিতি।
সা ব্রহ্মেতি হোবাচ ব্রহ্মণো বা এতদ্ বিজয়ে মহীয়ধ্বমিতি
ততো হৈব বিদাঞ্চকার ব্রহ্মেতি।

কেন উপনিষৎ ৩।৪ খণ্ড।

ইন্দ্র সেই আকাশেই—অন্তর্দ্ধানস্থানেই (আকাশ শব্দের অর্থ ব্রহ্ম, “আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ” (তৈঃ উঃ ২।৭) ইত্যাদি শ্রুতিপ্রমাণ আছে) স্ত্রীমূর্ত্তি উপস্থিত দেখিলেন—তিনি বহু শোভমানা হৈমবতী উমা। বহু শোভমানা—যে কেবল বসন ভূষণ ও দৈহিক সৌন্দর্য্য, তাহা নহে—অন্তরের করুণা প্রসন্নতা প্রভৃতিও তাঁহাকে শোভিত করিয়াছিল, ব্রহ্ম তখন সর্ব্বসৌন্দর্য্যময়ী করুণাময়ী উমামূর্ত্তিতে আবির্ভূতা হইলেন, জগতের কল্যাণের জন্য, সত্য ব্রহ্মতত্ত্ব প্রকাশের জন্য। ইন্দ্র সেই প্রাণীর অন্তর্দ্ধানে তাঁহার আবির্ভাব দর্শনে পুলকিত হইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, এই প্রাণীটি কে?—

উমা বলিলেন,—ব্রহ্ম; ইঁহারই এই বিজয়ে তোমরা বিজয়ী এবং মহিমান্বিত।

উপদেশ সংক্ষিপ্ত হইলেও ইন্দ্র সেই উপদেশেই দেব-গণের মধ্যে প্রথম ব্রহ্মজ্ঞ, এই জন্য শ্রেষ্ঠ। যথা—

“তস্মাদ্ বা ইন্দ্রোঽতিতরামিবান্যান্ দেবান্ স
হ্যেনন্নেদিষ্ঠং পস্পর্শ—স প্রথমোবিদাঞ্চকার ব্রহ্মেতি।”

কেন উপনিষৎ ৪ খণ্ড।

এই সংক্ষিপ্ত উপদেশে কিরূপে ইন্দ্রের ব্রহ্মজ্ঞান হইল, এই প্রশ্ন সহজে উপস্থিত হয়। কিন্তু ইহাই, উমা যে ব্রহ্ম, তাহার বিশিষ্ট প্রমাণ, ব্রহ্ম স্বয়ং উপদেষ্টৃপদে আরূঢ় হইয়া যতটুকুই উপদেশ প্রদান করুন না কেন, অন্তরের শক্তি সংবর্দ্ধনে তাহাই ইন্দ্রের ব্রহ্মাপরোক্ষজ্ঞানের হেতু হইয়াছিল। উপদেশ প্রদানের প্রয়োজনীয়তা ভবিষ্যৎ ব্রহ্মজ্ঞানার্থীর শিক্ষার্থ, তাই শ্রুতি বলিয়াছেন,—“আচার্য্যবান্ পুরুষো বেদ”—আচার্য্যমুখে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিতে হয়।

প্রাণিস্বরূপধারী ব্রহ্মের আকাশে অন্তর্দ্ধান, সেই আকাশেই উমার আবির্ভাব, সেই প্রাণীর শক্তি দেব-শক্তিকে অকর্ম্মণ্য করিয়াছে,—অথচ ইন্দ্রের প্রত্যক্ষ দৃষ্ট দেবশক্তির নিকট অসুরের পরাভব অথচ তাহা ব্রহ্মেরই বিজয়, এই সমস্ত আলোচনা করিলে বুঝা যায়,—ব্রহ্ম আকাশবৎ সর্ব্বব্যাপী, দেবগণ তাঁহারই সত্তার অন্তর্গত, দেবতাশক্তি ক্ষুদ্র সীমাবদ্ধ, ব্রহ্মশক্তি অসীম, ব্রহ্মোপদেশ প্রাপ্তির পরে—এই সব তত্ত্বস্মৃতি মিলিত হইয়া উত্তমাধি-কারীর যে ব্রহ্মাত্মসাক্ষাৎকার সম্পাদন করিবে—ইহাতে সন্দেহের অবসর নাই।

ব্রহ্ম স্বয়ংই তাঁহার তত্ত্ব জ্ঞাত আছেন,—এই জন্য প্রথম সেই তত্ত্বোপদেশক যে স্বয়ং ব্রহ্ম, ইহাও নিঃসন্দেহ, এই কারণে হৈমবতী উমাই শ্রুতিসম্মত ব্রহ্ম। ঋগ্বেদ ৪র্থ মণ্ডল—৪০ সূক্তে যে ‘অদ্রিজা ঋতং বৃহৎ’ আছে, তাহার সহিত এই হৈমবতী উমাকে একীভূত করাই শ্রুতিসিদ্ধান্ত, ইহা শাক্ত সম্প্রদায়ের প্রচলিত মত। সেই ব্রহ্ম ইন্দ্রের উপদেষ্ট্রীরূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তিনি সময়ে সমস্ত দেবগণের উপাস্যরূপেই আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন ‘এবং স্তবাদিযুক্তানাং দেবানাং তত্র পার্ব্বতী স্নাতুমভ্যা-যযৌ তোয়ে জাহ্নব্যা নৃপনন্দন।’ শুম্ভাদি অসুর-পরাজিত দেবগণ স্তব করিলে পার্ব্বতী দেবলোকে দর্শন দিয়াছিলেন।

অদ্রিজা ও পার্ব্বতী শব্দের একই অর্থ। হৈমবতী বলিয়াই তিনি পার্ব্বতী। হৈমবতী শব্দের অর্থ হিমালয়-দুহিতা। অতএব অদ্রিজা ও হৈমবতীকে ভিন্নভাবে গ্রহণ অকর্ত্তব্য। তিনিই ‘বৃহৎ ঋতং’ বৃহত্বাৎ বৃংহণত্বাচ্চ ব্রহ্মেত্যাম্নৈব গীয়তে। ঋতমেকাক্ষরং ব্রহ্ম—তিনিই পরব্রহ্ম।

সেই পরব্রহ্ম হৈমবতী উমা প্রতি শুভ্র শরতের শুভ্র

পক্ষে হাস্যশুভ্র বাঙ্গালীর গৃহে, চিরদিন আরাধিতা হইয়া আসিতেছেন, শত কষ্ট শোক দৈন্যমধ্যেও এই কয় দিনের আনন্দ বাঙ্গালী আজও পোষণ করে। এই যে আনন্দপোষণ, ইহা বাঙ্গালীর গুণে নহে—তুমি যে আনন্দময়ী, তুমি যে সত্যং বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম। তাই শ্রুতি গাহিয়াছেন "কোহন্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ যদ্যাকাশ আনন্দো ন স্যাৎ।" হে আনন্দময়ি, তুমি জগতের জীবন হইলেও তাহা জ্ঞানগম্য এবং ধ্যানগম্য। কিন্তু মুমূর্ষু বাঙ্গালী যে এখনও জীবিত আছে, তাহা তোমারই আনন্দামৃতধারা-বর্ষণের প্রভাবে। যত দিন উমা মাএর আগমনানন্দ বাঙ্গালী পাইবে, তত দিন তাহার মৃত্যু নাই, অদৃষ্টের বৈগুণ্যে যদি কখন সে আনন্দ হইতে বঞ্চিত হয়—তখন "কোহন্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ"—শান্তং পাপং এমন দুরদৃষ্ট যেন না হয়—মা তোমার চরণে এই প্রার্থনা, তোমার ঐ উমা নামে তোমার ঐ দুর্গানামের আনন্দে বাঙ্গালী যেন কখন বঞ্চিত না হয়।

শ্রীপঞ্চানন তর্করত্ন।

কাজের কথা

সহজ ভাষায় বলতে পারো আজব তোমার অভিধানে,
কি লিখেছে "কাজ" কথাটার সরল অর্থ, কি তার মানে?
করবে যে কাজ চাকর ঝিয়ে,
চলবে না তা আমায় দিয়ে,
অষ্টপ্রহর ঘ্যানঘ্যানানি সয় বল ত কার পরাণে?

ঝিয়ের ছুরি কথার ছিরি শুনলে দুখে পায় যে হাসি,
খেয়েছ কি লাজের মাথা? আমি কি ছাই বাঁদী দাসী।
আছে তোমার ভগ্নী মা ভাজ,
তাতেও যদি না চলে কাজ,
খুশমেজাজে পুষতে পারো না হয় দুজন পিসী মাসী।

রাখতে নারো চাকর-বাকর, অপরাধটা আমার নাকি?
ওজন তোমার বেশ বুঝেছি, জানতে মুরদ নাইকো বাকি।
ঢাকতে নিজের অক্ষমতা,
শিখেছ খুব প্যাঁচের কথা,
চোখ-রাঙানোর দিন গিয়েছে চলবে না আর সে সব ফাঁকি।

এঁটো-কাঁটা ঘুচোও, কাচো কাপড় চোপড় বাসন মাজো,
বোলবে ঝাড়ু বালতি নিয়ে এর পরে মেথরাণী সাজো।
রসুই-ঘরে হাঁড়ি ঠেলে,
পাকাও পেটের লিভার পিলে,
তপ্ত খোলায় দিয়ে বালি বোলবে কবে মুড়ি ভাজো।

উবু হোয়ে পিঁড়েয় বোসে হেঁট কোরে ঘাড় বাটনা বাঁটো,
কাটতে আনাজ বঁটির ধারে ঘ্যাচাং কোরে আঙুল কাটো।
রোদ্দুরে দাও তোষক বালিশ,
করো পায়ে তৈল মালিশ,
নাই সোয়াস্তি আরাম বিরাম ভূত খাটুনি সদাই খাটো।

প্রসাধনের আয়াস স্বীকার নাটক নভেল পড়াশোনা,
উল দিয়ে ফুল তুলে রঙিন কারপেটেতে আসন বোনা।
গল্প ফল্প চিঠি লেখা
সবই কোরে যাচ্ছি একা,
সাঁজ সকালে মাখতে সাবান স্নানের ঘরে আনাগোনা।

আরো কত কি যে করি সব কথা কি রয় স্মরণে?
এ সব ছাড়া কত কথাই ভাবতে যে হয় মনে মনে।
নাই মেহনত এ সব কাজে?
ভাবছো বুঝি কতই বাজে,
বুঝেও যদি না বোঝে কেউ বোঝানো দায় তেমন জনে।

শ্রীসৌরেশচন্দ্র চৌধুরী।

(উপন্যাস)

১৭

অসীম সিনেমা ষ্টুডিওর কৃত্রিম জঙ্গলে হত্যাকাণ্ডের জন্য সহরে যে বিষম হুলস্থূল পড়িয়াছিল, তাহার রেশ মিলাইতে না মিলাইতে তাহারও অপেক্ষা চিত্তচমকপ্রদ আর এক ঘটনায় সারা সহর উন্মাদগ্রস্তের মত চঞ্চল ও আলোড়িত হইয়া উঠিল। এমন ঘটনা এদেশের আদালতে কখনও ঘটিয়াছে বলিয়া কেহ মনে করিতে পারে না।

শুভেন্দু নরহত্যাপরাধে বিচারার্থ উপযুক্ত আদালতে আসামীর কাঠগড়ায় নীত, আদালতগৃহ ও প্রাঙ্গণ লোকে লোকারণ্য, শান্তিরক্ষকরা অতি কষ্টে আদালতের শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা করিতেছে। অসীম যাহাই বিশ্বাস করুক, পূর্ব্ববন্ধুর পক্ষসমর্থনের জন্য বহু অর্থব্যয়ে প্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার ও এ্যাটর্ণি নিযুক্ত করিয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে একাধিক উকীলও তাঁহাদের সাহায্য করিতে নিযুক্ত হইয়াছেন।

আসামীর বিপক্ষে সাক্ষ্যপ্রমাণ অভেদ্য, দুর্লঙ্ঘ্য; আসামীর দণ্ডের আর কোন সন্দেহ নাই। বিচারক ও ব্যারিষ্টাররা বার বার জিজ্ঞাসা করিয়াও কিছুতেই তাহার মুখ হইতে বাহির করিতে পারিলেন না—ঘটনার দিন সে রাত্রিকালে কোথায় ছিল এবং কোথা হইতে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়াছিল। সাক্ষীদের সওয়ালজবাব জেরা—সব হইয়া গিয়াছে। ফরিয়াদী সরকারের পক্ষের উকীল তাঁহার মামলা এইবার গুছাইয়া বলিবেন, এবং পুলিসের সংগৃহীত একটি একজিবিট দেখাইয়া আদালতশুদ্ধ লোককে চমকাইয়া দিবেন বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন, এমনই সময়ে আদালতের অনুমতিক্রমে একটি নূতন সাক্ষী, সাক্ষীদের কাঠগড়ায় আসিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া সারা আদালতের লোক বিস্ময়ে অবাক, সকলের চেয়ে বিস্মিত শুভেন্দু স্বয়ং এবং অসীমবিকাশ। হিরণী সাক্ষীর কাঠগড়ায় ? প্রকাশ পাইল, শেষ মুহূর্ত্তে এক নবনিযুক্ত ব্যারিষ্টারের মধ্যস্থতায় হিরণী অযাচিতভাবে আসামীর পক্ষে সাক্ষ্য দিবার জন্য আদালতের অনুমতি প্রাপ্ত হইয়াছিল।

সাক্ষ্য অতি সামান্য, কিন্তু সামান্য হইলেও অপ্রত্যাশিত, অভাবনীয়, অচিন্তনীয়।

হিরণী অবিকম্পিতকণ্ঠে সাক্ষ্য দিয়া গেল। সে কি ভীষণ সাক্ষ্য! হিরণী বলিল, ঘটনার দিন রাত্রিকালে আসামী তাহারই কক্ষে গিয়াছিল। সে তাহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার বন্ধু। বাল্যকাল হইতেই তাহার সহিত তাহার জানাশুনা ছিল এবং গত এক বৎসরে একত্র বসবাসের ফলে তাহাদের উভয়ের মধ্যে প্রীতির বন্ধন স্থাপিত হইয়াছিল। কিন্তু আসামী দরিদ্র বলিয়া, হিরণীর আত্মীয়রা তাহার হস্তে তাহাকে সমর্পণ করিতে সম্মত হয় নাই। এই হেতু তাহারা গোপনে বিবাহ এবং গৃহত্যাগের সঙ্কল্প করিয়াছিল। ঘটনার ঠিক পূর্ব্বে আসামী বোম্বাই যাত্রা করা স্থির করে এবং সেখানে কর্ম্মগ্রহণ সম্পর্কে তাহার সহিত বোম্বাইএর বিখ্যাত সিনেমা স্বত্বাধিকারীদের অনেক চিঠিপত্র এখনও তাহার জিনিষপত্রের মধ্যে খুঁজিলেই পাওয়া যাইবে। ঘটনার দিন রাত্রিকালে তাহার কক্ষে উভয়ের মধ্যে ঐ সম্বন্ধেই নিভৃতে কথাবার্ত্তা হইতেছিল, তৎপরদিন তাহাদের গোপনে প্রস্তুত হইয়া বোম্বাই যাত্রার কথাও স্থির হইয়াছিল। হঠাৎ একটা বন্দুকের আওয়াজে তাহারা চমকিয়া উঠে এবং আসামী তৎক্ষণাৎ দ্রুতপদে কক্ষত্যাগ করিয়া আওয়াজ লক্ষ্য করিয়া দৌড়িয়া যায়। হিরণী তাহার পর অন্যান্য লোকের সহিত বাহিরে গিয়াছিল।

আদালতে একটি সূচি-পতনের শব্দও তখন শুনিতে পাওয়া সম্ভব ছিল না। হিন্দু বাঙ্গালী ভদ্র সম্ভ্রান্ত গৃহস্থ-গৃহের অনূঢ়া তরুণী কন্যা অধুনা এই প্রকৃতির স্বীকারোক্তি

প্রকাশ্য আদালতে করিতে আরম্ভ করিয়াছে বটে, কিন্তু ঠিক এই ভাবের সাক্ষ্য এযাবৎ শোনা গিয়াছে বলিয়া কেহ মনে করিতে পারিল না। তাই সকলে বিস্মিত, স্তম্ভিত হইয়া ক্ষণকাল দাঁড়াইয়া রহিল। ইতিমধ্যে আসামী দুই তিনবার "মিথ্যা, মিথ্যা, সম্পূর্ণ মিথ্যা" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিয়াছিল, অসীমও সেই চীৎকারে যোগদান করিয়াছিল, কিন্তু আদালত কঠোরস্বরে উহা নিবারণ করিয়া দিলেন।

এই সময়ে সরকারী উকীল বলিলেন যে, সাক্ষী যাহা বলিলেন, তাহা তিনি সম্পূর্ণ অনুমোদন করিতেছেন এবং বলিতেছেন যে, আসামী নির্দোষ, তাঁহার বিপক্ষে সরকার মামলা তুলিয়া লইতেছেন। তাহার কারণ এই যে, তিনি এখন যে একজিবিট প্রদর্শন করিবেন, তাহা হইতেই প্রমাণ হইবে যে, এই খুনের জন্য দায়ী যেই হউক, আসামী দায়ী নহেন। কেন না, পুলিস নিহত শ্রমিকের বদ্ধমুষ্টির মধ্য হইতে যে দ্রব্য সংগ্রহ করিয়াছিল, তাহা হত্যাকারীর বস্ত্রাংশ মাত্র; বহু পরীক্ষার পর স্থির হইয়াছে যে, ঐ বস্ত্রাংশ নেকটাই হইতে ছিন্ন সামান্য একটু খণ্ড মাত্র। আসামী ঘটনার দিন রাত্রিকালে যখন পিস্তলের আওয়াজ ও নিহতের পরিত্রাহি চীৎকারের অব্যবহিত পরে প্রথম ও দ্বিতীয় সাক্ষীর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন, তখন তাঁহার অঙ্গে য়ুরোপীয় পরিচ্ছদ অর্থাৎ নেকটাই কলার প্রভৃতি ছিল না, তিনি দেশীয় বস্ত্রেই ভূষিত ছিলেন। যদি তিনিই হত্যাকারী হইতেন, তবে তাঁহার পক্ষে হত্যা করিয়াই তত শীঘ্র বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া আসা সম্ভবপর হইত না। সুতরাং হত্যাকারী যে অন্য ব্যক্তি এবং সে যে প্রাচীরদ্বার দিয়াই পলায়ন করিয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। মামলা গুছাইয়া বলিবার সময়ে তাঁহারা এজন্য অন্ততঃ সন্দেহের সুযোগ দিয়া আসামীকে অব্যাহতি দিবার জন্য আদালতকে অনুরোধ করিতেন। কেন না, যতক্ষণ পর্য্যন্ত আসামীর অধিকারভুক্ত পিস্তলের উপস্থিতির কারণ নিঃসন্দেহে জানিতে পারা না যায়, ততক্ষণ সন্দেহের সুযোগ ব্যতীত তাঁহাকে আর কোন উপায়ে অব্যাহতি দেওয়া যায় না। এখন পুলিসের উপর সেই কর্ত্তব্য পালনের ভার অর্পিত হইল। শেষ সাক্ষীর সাক্ষ্যে সম্পূর্ণ সপ্রমাণ হইল যে, আসামী সেই রাত্রিতে ঘটনার সময় তাঁহার কক্ষে কোনও গুরু প্রয়োজনে উপস্থিত ছিলেন এবং পিস্তলের আওয়াজ শুনিয়া বাহিরে আসিয়াছিলেন। সাক্ষী সম্ভ্রান্ত শিক্ষিত ভদ্রমহিলা, তাঁহার সাক্ষ্যে অবিশ্বাস করিবার কোন কারণ নাই। এই সকল কারণে সরকার সানন্দে আসামীর বিপক্ষে মামলা প্রত্যাহার করিয়া লইতেছেন এবং তাঁহাদের ভ্রম-ত্রুটির জন্য তাঁহার নিকট তাঁহাদের আন্তরিক দুঃখ প্রকাশ করিতেছেন।

আদালত অতঃপর আসামীকে মুক্তিদান করিলেন। তখন আদালতের দৃশ্য বর্ণনাতীত। শুভেন্দু জনপ্রিয় ছিল। অনেক লোক তাহার মুক্তিতে আনন্দ জ্ঞাপন করিতে লাগিল, অনেকে তাহাকে শুভেচ্ছা জানাইয়া করমর্দ্দন করিল। শুভেন্দু বহুকষ্টে এই অযাচিত প্রীতি-জ্ঞাপনের আতিশয্য হইতে আপনাকে মুক্ত করিয়া কোনরূপে আদালতের বাহিরে আসিতেই দেখিল, অসীম তাহার জন্য অপেক্ষা করিতেছে। প্রথমটা অসীমের সংস্পর্শে আসিতেই তাহার সমস্ত অন্তর বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। তাহার পর কি ভাবিয়া সে তাহার মোটরে গিয়া উঠিয়া বসিল। তাহার উৎসুক নয়ন চারিদিকে কাহারও অন্বেষণ করিতে লাগিল। অসীম ঈষৎ হাসিয়া মৃদুস্বরে জানাইল, সে যাহাকে খুঁজিতেছে, সে সকলের আগে চলিয়া গিয়াছে, কোথায় গিয়াছে, সে জানে না।

১৮

দীর্ঘ পত্র—

পত্রখানি এই ভাবের,—

অসীম বাবু, জীবনের পরপারে যাইবার পূর্ব্বে তোমার কাছে কোন কথা গোপন রাখিয়া যাইব না। জীবনে অনেক পাপ করিয়াছি, এ অপদার্থের জীবনদানই তাহার পাপের প্রায়শ্চিত্ত। অল্পবয়সে মাতৃহীন, তাই আদর আবদার ছিল অফুরন্ত, সংসারে কেহ আমার অনাচারে শাসন করিবার ছিল না। পিতা ছিলেন আফিসের কেরাণী, সারাদিন হাড়ভাঙ্গা খাটুনীর পর আমাদের কোন তত্ত্ব লইতে পারিতেন না, অথবা নিত্য অভাব অনটনের তাড়নায় ইচ্ছা থাকিলেও সকল বিষয়ে তত্ত্ব-তাবাস লইবার সুযোগ-সুবিধাও করিয়া উঠিতে পারিতেন না। কাযেই আমি বাল্য হইতেই উচ্ছৃঙ্খল, অবাধ্য, আত্মসুখসর্ব্বস্ব ও দুর্নীতিপরায়ণ হইয়া উঠিয়াছিলাম। আর

এ বিষয়ে আমার অন্যায় আবদার বাহানার অনলে ইন্ধন যোগাইতেন আমার প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তমা ভগিনী উষারাণী। তাহার কাছে আমি অনেক অপরাধ করিয়াছি, তাহাকে অনেক কষ্ট দিয়াছি, সে যেন তাহার গুণহীন ভ্রাতাকে ক্ষমা করে।

এক বৃন্তে আমরা দুইটি ফুল, উভয়ের মধ্যে মাত্র এক বৎসরের ব্যবধান। কিন্তু সে নারী, আমি পুরুষ। আমার সকল আবদার অভিমানের দৌরাত্ম্য তাহাকেই অল্প বয়স হইতে সহ্য করিতে হইত। সে আমার দোষ দেখিতে অন্ধ ছিল, আমার দোষ তাহার কাছে গুণ বলিয়াই গৃহীত হইত। সে আমার হইয়া নিত্য অপরের সহিত কলহ করিত। অথচ তাহার গুণধর ভ্রাতার যে গুণের অন্ত ছিল না, এ কথা তাহাকে কেহ চোখে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া দিলেও সে বিশ্বাস করিত না, বরং তৎপরিবর্ত্তে তাহার সহিত তুমুল কলহ করিত।

আমি তাহার দোষ দিতেছি না। সে রূপে ছিল যেমন সাক্ষাৎ লক্ষ্মী, গুণও ছিল তেমনি তাহার অনন্ত। একসঙ্গে উভয়ে স্কুলে ভর্ত্তি হইয়াছিলাম। সে স্কুলে প্রথম বা দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিত, আর আমি স্কুল পালাইতাম, ইতর শ্রেণীর বালকদের সহিত সারা দিন খেলার মাঠে অথবা ঘোড়দৌড়ের মাঠে ঘুরিয়া বেড়াইতাম। উহা হইতেই যে পরে আমার রেশের নেশা ও চরিত্রদোষ ঘটিয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু উষারাণীর অন্তরটি ছিল স্নেহ-প্রেমে ভরা, সে স্নেহে অন্ধ হইয়া আমার সকল দোষ ঢাকিয়া রাখিত। তাহার স্বভাবই ছিল ভালবাসা, উদ্দেশ্য ছিল মহৎ; কিন্তু আমি তাহার সদ্ব্যবহার করি নাই। বরং তাহার বিবাহিত জীবনে পদে পদে তাহাকে বিপদে ফেলিয়াছি, তাহার সোনার সংসারে আগুন জ্বালাইয়াছি।

মধুপুরের ব্যাপার আমার পক্ষে নূতন নহে, এমন অনেক ব্যাপারই পূর্ব্বে ঘটিয়া গিয়াছে। এই ঘৃণিত পাপ হইতেও উষা আমাকে রক্ষা করিবার জন্য স্বামীর সন্দেহের দৃষ্টিতে পড়িয়াছে, আর নিষ্পাপ সরলমতি পরোপকারী শুভেন্দুবাবুও আমার জন্য বন্ধুবিচ্ছেদ সহ্য করিয়াছেন। তিনি আমার জন্য কি না করিয়াছেন? আজ আমারই পাপে তাঁহার শাস্তি হইতেছে। আর হিরণী? সেও তাঁহাকে বাঁচাইবার জন্য অনেক কিছু ত্যাগ স্বীকার করিয়াছে। তাই মুক্তকণ্ঠে সমস্ত পাপ স্বীকার করিয়া যাইতেছি। আমার এই স্বীকারোক্তি সংলগ্ন পত্রে আছে, প্রয়োজন হইলে যথাস্থানে দেখাইতে পারেন।

ঘটনার রাত্রে শুভেন্দুবাবু আমাকে উষারাণীর সহিত শেষ দেখা করাইতে লইয়া গিয়াছিলেন। পরদিনই তাঁহার সহিত জন্মের মত আমার কলিকাতা ছাড়িয়া বোম্বাই যাইবার কথা। শুভেন্দুবাবু মনের দুঃখে বোম্বাই যাইতে স্থিরসংকল্প হইয়াছিলেন এবং আমাকেও আপনার সংসারের সুখশান্তির কণ্টক জানিয়া সঙ্গে লইবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন। যদি সেই কাল রাত্রে মনুয়া আমায় ফটকের কাছে আক্রমণ না করিত, তাহা হইলে ঘটনাচক্র অন্য খাতে চালিত হইত। মনুয়ার ভয়ে আমি পূর্ব্বে শুভেন্দুবাবুর অজ্ঞাতে তাঁহার দেরাজের টানা হইতে সিনেমা কোম্পানীর পিস্তল চুরি করিয়াছিলাম, ঐ পিস্তলটার দরকার হইত না বলিয়া খোঁজ হইত না। কিন্তু আমি উহার সন্ধান জানিতাম। আমি যখনই পথে বাহির হইতাম, তখনই আমার পকেটে ঐ পিস্তল লুকাইয়া রাখিতাম। মনুয়া আক্রমণ করিলে আত্মরক্ষার্থ উহা ব্যবহার করিয়াছিলাম।

এই নরহত্যার জন্য দায়ী ঘটনাচক্র, নতুবা মনুয়াকে হত্যা করিবার আমার বিন্দুমাত্র ইচ্ছা ছিল না। সে যদি ঐ কালরাত্রিতে না আসিত!

আমি হত্যার পর পলাইয়া আত্মরক্ষা করিলাম বটে, কিন্তু শত বৃশ্চিকের জ্বালায় জ্বলিতে লাগিলাম। এই অপদার্থ কাপুরুষের জন্য একটা মানুষের প্রাণ গেল, তাহার উপর আমার প্রাণাপেক্ষা প্রিয় সহোদরার সোণার সংসার কলঙ্ককালিমালিপ্ত হইল, তাহার ও তাহার স্বামীর মনের সুখ ছারেখারে গেল,—আর সকলের চেয়ে যেটা বড়, এক নিরীহ নির্দোষ মহাপ্রাণ মানুষের প্রাণ লইয়া টানাটানি চলিল। আমি জানিতাম, সে নির্দোষ, তাই আমার প্রাণটা পুড়িয়া পুড়িয়া উঠিতে লাগিল, আমার আহার-নিদ্রা দূরে গেল, আমি জানোয়ারের মত কেবল হোটেল-ঘরে পাদচারণা করিয়া বেড়াইতাম আর সিগারেটের পর সিগারেট ফুঁকিতাম, পেগের পর পেগ

চালাইতাম। শেষে আমার ব্রেণ জ্বলিয়া যাইতে লাগিল, আমি শয্যাশায়ী হইলাম। তাহার পরে কয় দিন কি হইল, কিছুই স্মরণ নাই।

যখন চৈতন্য হইল, তখন উৎকণ্ঠায় প্রাণ শুকাইয়া উঠিতে লাগিল। সকলের অজ্ঞাতে লুকাইয়া খবরের কাগজ পড়িতাম, মামলার বিষয় জানিতাম। দেখিতেছি, শুভেন্দুবাবুর নিস্তার নাই। সে দিন রাত্রে তিনি যে আমারই মঙ্গলের জন্য আমায় লইয়া আমার ভগিনীর কক্ষে গিয়াছিলেন, তাহা মুখ ফুটিয়া প্রকাশ করিতেছেন না, করিলে আমি মরিব, ঊষা মরিবে। এ মানুষকে কি দিয়া পূজা করিতে ইচ্ছা করে? এ কি মানুষ, না দেবতা?

আমার জ্ঞানচক্ষু এই মানুষই ফুটাইয়া দিয়াছে। আজ আমি তাই তাহার ঋণ কথঞ্চিৎ পরিশোধ করিবার চেষ্টা করিতেছি। আমার অকর্ম্মণ্য অপদার্থ জীবনের এ সংসারে কোন প্রয়োজন নাই। বিশেষতঃ আমি নরহন্তা, আমার জীবনের মূল্য রাজদ্বারে নাই। তাই আজ আমি এই পৃথিবী হইতে নিজেই বিদায় গ্রহণ করিতেছি। আমার স্নেহের ভগিনী ঊষারাণী আমার জন্য প্রথমে বড় ব্যথা পাইবে, কিন্তু আপনার মত স্বামী যে নারী সৌভাগ্যগুণে লাভ করিয়াছে, তাহার ব্যথা স্থায়ী হইবে না।

আর শুভেন্দু বাবু? আমার পরম বন্ধু, শিক্ষক, সহোদরাধিক শুভেন্দুবাবু বড় ভাগ্যবান পুরুষ—তাঁহার জন্য অনন্ত সুখস্বর্গের দ্বার উন্মুক্ত রহিয়াছে, তিনি একটু আপনভোলা না হইয়া ভাল করিয়া খুঁজিলেই সেই স্বর্গের সন্ধান পাইবেন। আমি দিব্য চক্ষে দেখিতেছি, তিনি তাঁহার ঈপ্সিত ধন লাভ করিয়া সংসারে অশেষ সুখ-সম্পদ ও যশোমান লাভ করিবেন।

আমার সমস্ত অপরাধ ও ত্রুটি নিজ গুণে মার্জ্জনা করিবেন। ইতি

আপনার স্নেহাস্পদ—বিভাসচন্দ্র।

দুই তিনবার একমনে পাঠ করিবার পর অসীমবিকাশ ভাবিতেছিল, এই মানুষ,—ইহার কত পরিবর্ত্তনই না ঘটে! জীবনে যে বিভাসচন্দ্র অকর্ম্মণ্য অলস বিলাস-পরায়ণ ও কাপুরুষ ছিল, মরণে সে মৃত্যুকে জয় করিয়া কি মহত্ব দেখাইয়া গেল! এই মানুষই পশু, আবার এই মানুষই দেবতা।

আত্মহত্যা মহাপাপ, মানুষ কাপুরুষ হইলে আত্মহত্যা করে,—এ কথা অসীম স্বীকার করিত না। জীবন যখন মানুষের দুর্ব্বহ হয়, তখন এই পৃথিবীতে থাকিবার তাহার প্রয়োজন? বিশেষ যখন সে পরের মঙ্গলার্থে আপনার জীবন বলি দেয়, তখন ত কথাই নাই। বিভাসচন্দ্র পৃথিবীতে আসিয়া অবধি আপনার সুখই খুঁজিয়াছিল, আপনার সুখের জন্য পরকে বলি দিতে কখনও কাতরতা প্রদর্শন করে নাই। এমন কি, যে স্নেহময়ী ভগিনী জননীর অধিক যত্নে তাহাকে পক্ষপুটে আশ্রয় দিয়া রক্ষা করিয়াছিল, আত্মসুখসাধনের জন্য সে তাহারও সুখের সংসারে আগুন জ্বালিয়া দিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা বা সঙ্কোচ বোধ করে নাই। দারুণ রোগের কবলে জীবন-মরণের সন্ধিস্থলে উপনীত হইয়া যখন তাহার জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হইল, যখন বিবেকের তাড়নায় সে অস্থির হইয়া উঠিল, তখন রোগশয্যায় শায়িত থাকিয়াও সমস্ত দিনে কম্পিত হস্তে সে আপনার কৃত কর্ম্মের কথা লিপিবদ্ধ করিয়া অসীমবিকাশের উদ্দেশ্যে রাখিয়া গেল, আর যে জীবন-প্রদীপ আপনিই নির্ব্বাপিত হইয়া আসিতেছিল, স্বহস্তে তাহার অবসান করিল। সুযোগও মিলিয়াছিল ভাল। সে দিন ছিল শুভেন্দুর মামলার দিন, বাড়ীর সকলেই আদালতে ছিল। সাত দিনের পর তাহার জ্বর বিরাম হইয়াছিল, সে অপেক্ষাকৃত একটু সুস্থ ছিল এবং ঘুমাইতে-ছিল, সকলের সহিত সহজভাবেই কথা কহিতেছিল। ঊষারাণী ইহা দেখিয়া খুবই চিন্তাশূন্য ও প্রফুল্ল মনে আর সকলের মত আদালতে গিয়াছিল। যাইবার আগে বেতনভুক্ নার্শকে ভাল করিয়া রুগ্ন ভ্রাতার তত্ত্বাবধান করিতে বলিয়া গিয়াছিল। সে তখন জানিত না যে, আপনার জনে ও ভাড়াটিয়া নার্শে কত প্রভেদ!

তন্দ্রাচ্ছন্নতার ভাণ করিয়া সে নির্জ্জনে থাকিবার ইচ্ছা জানাইয়া নার্শকে বিদায় করিয়া দিয়া বহুক্ষণ ধরিয়া পত্র লিখিল। তাহার পর? তাহার পর এক মুহূর্ত্তের দুর্ব্বলতার জন্য অথবা সরলতার জন্য সে স্বহস্তে আপনার জীবনমরণের ভার গ্রহণ করিল। টেবলের উপর বিষ ঔষধের অভাব

ছিল না, তাহাই অত্যধিক মাত্রায় গ্রহণ করিয়া বিভাসচন্দ্র পরপারে যাত্রার জন্ম প্রস্তুত হইল।

চিঠিখানা হাতে লইয়া অসীমবিকাশ এই সকল কথাই ভাবিতেছিল। শুভেন্দুকে ষ্টুডিওতে রাখিয়া বাড়ী আসিয়াই সে সংবাদ লইয়া জানিয়াছিল, তখনও উষারাণী অথবা হিরণী ঘরে ফিরেন নাই, তাঁহাদের লইয়া মোটর ষ্টেশনে চলিয়া গিয়াছে। অসীম বিস্মিত হয় নাই। সে বুঝিয়াছিল, আদালতের ঘটনার পর হিরণী কখনও কলিকাতার বাসায় ফিরিবে না, সরাসরি দেশে চলিয়া যাইবে। তবে উষা? বোধ হয়, অনেক করিয়া হিরণীকে বাসায় ফিরাইয়া আনিবার চেষ্টা করিয়া ব্যর্থমনোরথ হইয়া তাহাকে ষ্টেশনে গাড়ীতে তুলিয়া দিতে গিয়াছে। এ দিকে বাড়ীতেও একটু গোলযোগ উঠিয়াছে। নার্শ নাকি দুই তিনবার রোগীর ঘরে প্রবেশ করিতে গিয়া দ্বার খোলা পায় নাই, দ্বার ভিতর হইতে রুদ্ধ। দাসদাসীরাও বিস্তর চেষ্টা করিয়া দ্বার মুক্ত করাইতে পারে নাই।

অসীম বিস্মিত হইয়াছিল। রোগী কি এমনই নিদ্রাচ্ছন্ন যে, এত গোলমালেও নিদ্রাভঙ্গ হয় না? অথবা দুর্ব্বল শরীরে সে মূর্চ্ছা যায় নাই ত? যখন গৃহকর্ত্তার আদেশে বলপূর্ব্বক দ্বার উন্মুক্ত করা হইল, তখন সব শেষ!

টেবলের উপর দুইখানি পত্র;—একখানি পুলিস কমিশনারের নামে, অপরখানি অসীমের নামে। দুইখানি খোলা চিঠি। পুলিস কমিশনারকে বিভাসচন্দ্র লিখিয়াছে যে, সে রোগের যন্ত্রণা সহ্য করিতে না পারিয়া আত্মহত্যা করিয়াছে, তাহার মৃত্যুর জন্ম কেহ দায়ী নহে। আর সে-ই স্বয়ং পিস্তল চুরি করিয়া মনুয়াকে হত্যা করিয়াছে। মনুয়ার পত্নীকে সে হরণ করিয়াছিল বলিয়া মনুয়া তাহাকে আক্রমণ করিয়াছিল। সে বহু দিন হইতেই তাহার পিছনে পিছনে ফিরিত। অসীমবিকাশের পত্রের প্রথমেই সে ভগিনীকে লিখিয়া গিয়াছে, তাহাকে ক্ষমা করিতে, সে তাঁহাকে অনেক কষ্ট দিয়াছে, এখন সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতেছে, তাহার আশা, মরণে সে তাহাকে সুখী করিতে পারিবে।

অসীম তাহার দীর্ঘপত্রে যে কাহিনী পাঠ করিল, তাহা অপ্রত্যাশিত, উপন্যাসের ঘটনার ন্যায় চমকপ্রদ। ছত্রে ছত্রে তাহাতে তাহার অন্তরের অনুতাপ ফুটিয়া বাহির হইয়াছে। যখন অসীম পত্রে পাঠ করিল, অপদার্থ ভ্রাতাকে স্বামীর ক্রোধ ও ঘৃণা হইতে রক্ষা করিবার জন্ম স্নেহময়ী ভগিনী স্বামীর বন্ধু শুভেন্দুর শরণাপন্ন হইয়াছিল এবং শুভেন্দু প্রথমে কিছুতেই বন্ধুর অজ্ঞাতসারে কোন কায করিতে সম্মত হয় নাই, কিন্তু পরে বন্ধুপত্নীর সজল কাতর নয়নের ভিক্ষা প্রার্থনা এড়াইতে না পারিয়া বন্ধুর অপ্রীতিভাজন হইবার আশঙ্কাসত্ত্বেও তাহাকে এযাবৎ প্রাণপণে সাহায্য করিয়া আসিয়াছে, পরন্তু বন্ধুকে না জানাইয়া তাহাকে গোপনে বন্ধুর অন্দরে ভগিনীর কাছে পৌঁছাইয়া দিয়াছে ও সেখানে গোপনে কিছুদিন লুকাইয়া রাখিয়া তাহার বাহিরে বসবাসের ব্যবস্থার কথা বুঝাইয়া দিবার জন্ম গোপনে তাহাদের কাছে অন্দরে যাতায়াত করিয়াছে,—তখন অনুতাপানলে অসীমের অন্তর পুড়িয়া যাইতে লাগিল—অন্ধ সে, পতিপ্রাণা পত্নীর প্রতি, সোদরোপম বন্ধুর প্রতি সে মিথ্যা সন্দেহ করিয়াছে, এত ক্ষুদ্র—এত নীচ তাহার প্রাণ!

তাহার পর অসীম যখন পাঠ করিল, তাহার স্নেহময়ী ভগিনী হিরণী ভ্রাতৃজায়ার প্রতি অন্ধ ভালবাসা হেতু এ সকল জানিয়াও প্রতিশ্রুতিভঙ্গের ভয়ে তাহার নিকট কোনও কথা প্রকাশ করে নাই, তখন তাহার মনের অন্ধকার কাটিয়া গেল, সে বুঝিতে পারিল, কেন হিরণী তাহার ভ্রাতৃজায়ার পক্ষ গ্রহণ করিয়া সকল কথা গোপন করিয়াও তাহার ভ্রম ঘুচাইবার জন্য সাধ্যমত প্রয়াস পাইয়াছিল। তাহার পর যখন হিরণীকেও লুকাইয়া উষারাণী ভ্রাতার জন্ম শুভেন্দুকে তাহার অনিচ্ছা ও প্রতিবাদ সত্ত্বেও কাঁদিয়া কাটিয়া গোপনে ভ্রাতার সাহায্যের জন্ম সম্মত করিয়াছিল এবং শুভেন্দুকে সেই হেতু অনেক সময়ে অতি সন্তর্পণে অতি গোপনে অন্তঃপুরে যাতায়াত করিতে হইয়াছিল, তখন শুভেন্দুকে যে কত বিপদ অনিচ্ছায় বরণ করিয়া লইতে হইয়াছিল, তাহা সে-ই জানে। সে বিপদ সে পরের জন্ম বরণ করিয়াছিল!

বিভাসচন্দ্র মধুপুরের মনুয়ার পত্নী জানকীকে কুলের বাহির করিবার কথা পত্রে স্বীকার করিয়াছিল এবং সে জন্ম যথেষ্ট অনুতাপ প্রকাশ করিয়াছিল। সে তাহাকে আনাইয়া কোথায় রাখিয়াছিল, তাহাও সে গোপন করে নাই। মৃত্যুর পূর্ব্বে সে তাহার সকল পাপ সকল অপরাধই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার

করিয়াছিল। সে চরিত্রহীন, মত্তপ, মিথ্যাবাদী, জুয়াচোর—তাহার দ্বারা কোন অপকর্ম্ম অসম্ভব ছিল না, একথা সে নিজেই জানাইয়া পাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্য প্রস্তুত হইয়াছিল। মনুয়া যখন তাহাকে হত্যা করিবার চেষ্টা করিয়াছিল, তখন সে শুভেন্দুর দেরাজের টানা হইতে গোপনে পিস্তল সংগ্রহ করিয়াছিল এবং অনুক্ষণ গুলীভরা পিস্তল লইয়া ভয়ে ভয়ে কালযাপন করিত। ঘটনার দিন শুভেন্দু তাহাকে তাহার ভগিনীর কাছে গভীর রজনীতে লইয়া গিয়াছিল, সে য়ুরোপীয় পরিচ্ছদে ভূষিত হইয়া গিয়াছিল। তাহার ভগিনী ও শুভেন্দু তাহাকে শুভেন্দুর সহিত বোম্বাই যাইবার জন্য অনেক করিয়া অনুরোধ করে। সেও তাহাতে অবশেষে সম্মত হইয়াছিল, তবে জানকীর সম্বন্ধে একটা সুব্যবস্থা করিয়া দিতে তাহাদিগকে অনুরোধ করিয়াছিল। যদি সেই কাল রাত্রিতে আর কোন ঘটনা না ঘটিত, তাহা হইলে সে নিশ্চিতই শুভেন্দুর সহিত বোম্বাই চলিয়া যাইত, আর তাহা হইলে তাহাকে অনর্থক নরহত্যা করিতে হইত না, অথবা অকালে স্বহস্তে আপনাকেও হত্যা করিতে হইত না। কিন্তু বিধির বিধান অন্যরূপ। শুভেন্দু তাহাকে গোপনে অন্দরের বাহির করিয়া দিয়া উষারাণীকে পৌঁছাইয়া দিতে গেল। সে কৃত্রিম জঙ্গলের নিকটবর্ত্তী প্রাচীরের ফটকের কাছে উপনীত হইয়াছে, এমন সময়ে জঙ্গলের মধ্য হইতে মনুয়া বাঘের মত তাহার উপর লাফাইয়া পড়িল, তাহার হস্তে শাণিত ছুরিকা। সে পূর্ব্ব হইতেই গোপনে বাগানে প্রবেশ করিবার কৌশল আয়ত্ত করিয়াছিল। প্রাণভয়ে সে মনুয়ার সহিত ধস্তাধস্তি করে। ধস্তাধস্তির সময় তাহার নেকটাইয়ের ছিন্ন অংশ তাহার মুষ্টির মধ্যেই রহিয়া যায়। মনুয়াকে হত্যা করিবে বলিয়া সে সঙ্কল্প করে নাই, মৃত্যুর পূর্ব্বে সে একথা মুক্তকণ্ঠে বলিয়া যাইতেছে। কিন্তু পূর্ব্বের অভ্যাস অনুসারে সে গুলীভরা পিস্তল হস্তে লইয়াই অন্ধকারে যাতায়াত করিত। ধস্তাধস্তিতে হাতের পিস্তলের আওয়াজ হইয়া গেল, পিস্তলের ঘোড়ার উপরেই তাহার আঙ্গুল ছিল। মনুয়া মাংসপিণ্ডের মত পড়িয়া গেলেই সে মুক্ত ফটক দিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করে। তৎপূর্ব্বে সে হাতের পিস্তল ফেলিয়া দিয়াছিল। হোটেলের দ্বারপাল তাহার কাছে অর্থে বশীভূত ছিল, এজন্য সময়ে অসময়ে যখনই হউক তাহার হোটেলে প্রবেশে অন্তরায় ছিল না। তাহার কাছে তাহার রুমের চাবী থাকিত। সে ঘরে গিয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া শুইয়া পড়িয়াছিল, শয়নের পূর্ব্বে সে তাহার ছিন্ন নেকটাই পুড়াইয়া বাথরুমের ড্রেণে ফেলিয়া দিয়াছিল। পরদিন বেলা দশটার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সে বেহুঁস হইয়া ঘুমাইয়াছিল, তাহার পর খানসামাদের ডাকাডাকিতে উঠিয়া হাত-মুখ ধুইয়া চা খাইয়া সেই যে শুইয়াছিল আর উঠে নাই, তাহার পর আর তাহার জ্ঞান ছিল না। কখন্ যে তাহার ভগিনীর আলয়ে হোটেল হইতে নীত হইয়াছিল, তাহা সে কিছুই জানে না।

বিভাসচন্দ্রের সাত দিন সঙ্কটসঙ্কুল অবস্থা ছিল। তাহার মধ্যে কি হইয়াছিল, তাহা সে কিছুই জানিত না। জ্বরবিকারের ঘোরে সে কি বলিয়াছিল, তাহাও তাহার মনে নাই। জ্বরত্যাগ হইবার পর কিঞ্চিৎ সুস্থ হইলে সে শুনিল, নরহত্যার অপরাধে শুভেন্দু ধৃত ও আটক হইয়াছে, শীঘ্রই তাহার বিচার হইবে। তাহার দুর্ব্বল মস্তিষ্ক এ আঘাত সহ্য করিতে পারিল না। অসুস্থ অবস্থায় সে কেবল সম্মুখে হত্যার দৃশ্যের স্বপ্ন দেখিয়াছে। তাহারই হস্তে নিহত মানুষের জন্য সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ শুভেন্দুর দণ্ড হইবে—হয় ত—না, সে ভীষণ কল্পনা সে করিতেই পারে না—সে ভয়ে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া চিন্তার হাত এড়াইবার চেষ্টা করিয়াছিল। কিন্তু বিধাতা তাহাকে সে শান্তি দেন নাই, সে অহরহ শুভেন্দুর মৃতদেহ ফাঁসিকাষ্ঠে দোদুল্যমান হইতে দেখিয়াছিল এবং মানসিক যন্ত্রণায় পরিত্রাহি চীৎকার করিয়াছিল।

যে দিন শুভেন্দুর বিচার, সে দিন সে স্থির অচঞ্চল, সে মন স্থির করিয়া ফেলিয়াছিল। সে নিজের অসার অকিঞ্চিৎকর জীবন দান করিয়া নির্দ্দোষ শুভেন্দুর মূল্যবান জীবন রক্ষা করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিল। শুভেন্দু তাহার কি করিয়াছে, তাহাকে সৎপথে ফিরাইবার জন্য কত ত্যাগ স্বীকার করিয়াছে, সে তাহা মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিয়াছে। পাছে সে ধরা পড়ে, পাছে সে জন্য তাহার ভগিনী মৃতকল্প হয়, পাছে তাহার ভগিনীর সংসারে কলঙ্ক-কালিমা লিপ্ত হয়, এই ভয়ে শুভেন্দু প্রকৃত সত্য গোপন করিয়া আপনার অমূল্য জীবনও আহুতি দিতে প্রস্তুত হইয়াছে,—শুভেন্দুর মত মানুষ কয় জন হয়? আজ তাহার জন্য সে হাসিমুখে তাহার অপদার্থ জীবন উৎসর্গ করিয়া পাপের

প্রায়শ্চিত্ত করিতেছে, তাহার জন্ম কেহ দায়ী নহে, কেহ দুঃখ করিবার নাই।

পুনঃপুনঃ পত্র পাঠ করিয়া অসীমবিকাশের অন্তর আলোড়িত হইয়া উঠিল। অন্ধ সে, স্নেহময়ী দেবীরূপিণী নারীর অন্তরের রুদ্ধ ভালবাসা, ব্যথা-বেদনা, হর্ষ-উল্লাসের সন্ধান সে পাইবে কিরূপে? সে কেবল স্বার্থান্ধের মত আপনার মনের মাপকাঠি দিয়া স্নেহময়ী জননীসমা ভগিনীর ভালবাসাকে মাপিতে গিয়াছিল। ব্যর্থ তাহার চেষ্টা,—কি ভীষণ ভুল করিয়াই সে সর্ব্বস্ব হারাইতে বসিয়াছিল!

মৃতের কক্ষদ্বার তালাবদ্ধ করিয়া অসীম বহির্ব্বাটীতে আসিয়া পুলিসে ফোন করিয়া দিল। ষ্টেশনে ছুটিয়া যাইবার জন্ম তাহার প্রাণ আকুলি-বিকুলি করিতে লাগিল,—কতক্ষণে উষারাণীর সাক্ষাৎ পায় এবং তাহার কৃত অপরাধের জন্ম ক্ষমা প্রার্থনা করে! কিন্তু পুলিস যতক্ষণ না আসে, ততক্ষণ তাহার গুরু কর্ত্তব্য পড়িয়া রহিয়াছে, সে কর্ত্তব্য ত সে অবহেলা করিতে পারে না। অস্থির হইয়া এটা ওটা সেটা নাড়াচাড়া করিতেছে, এমন সময়ে অন্দরে নারীকণ্ঠে মর্ম্মভেদী ক্রন্দনের রোল উঠিল;—অসীমের বুঝিতে বাকী রহিল না যে, উষারাণী ফিরিয়া আসিয়াছে। প্রায় উন্মত্তের মত সে অন্দরের দিকে ছুটিয়া চলিল।

নিভৃত কক্ষে বিগতচেতনা সহধর্ম্মিণীকে বক্ষে ধারণ করিয়া অসীমবিকাশ নানা প্রিয়সম্ভাষণে তাহার চৈতন্ম উদ্রেকের চেষ্টা করিতে লাগিল। ক্ষণপরে উষা নয়নকমল উন্মীলিত করিয়া সভয়ে বলিল, "ওঃ, তুমি, তুমি? তুমি এখানে কেন? ওগো, তোমার দুটি পায় পড়ি, আমরা তোমার বাড়ীতে থাকতে চাইবো না, তুমি আমার দাদাকে ফিরিয়ে দাও।"

উষার মর্ম্মভেদী ক্রন্দনে বাতাস ভরিয়া গেল। বহুকষ্টে অসীম পত্নীকে শান্ত করিল, বহুকষ্টে বুঝাইল, তাহার ভ্রাতা পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিয়া যে লোকে গিয়াছে, সেখান হইতে আর ফিরিবে না, তাহার আত্মা শান্তিলাভ করিয়াছে। পত্নীকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া তাহার নয়নাশ্রু মুছাইয়া দিয়া অসীম বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে বলিল,—"উষা, আমাকেও পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে দাও, বল আমায় ক্ষমা করবে, আমি তোমার অধম স্বামী।"

উষা কথঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইয়া সবিস্ময়ে বলিল, "ক্ষমা? আমি তোমায় ক্ষমা কোরবো? কিছুই ত বুঝতে পারছি না।"

অসীম বলিল, "না, তা পারবে না। সে আমি পরে বোঝাবো। এখন বল, আমার যে দোষই হয়ে থাক্, ক্ষমা করবে? উঃ, একটা ভুলে আমি কি সর্ব্বনাশই না ক'রে বসেছিলুম!"

এইরূপে বিভাসচন্দ্র জীবন বলি দিয়া স্বামি-স্ত্রীর পুনর্ম্মিলনের পবিত্র বেদী নির্ম্মাণ করিয়া দিল। এ জগতে কত ক্ষুদ্র হইতেই না মহতের অভ্যুদয়ের সম্ভাবনা হয়!

১৯

রেলের প্রথম শ্রেণীর কামরায় দুটি যাত্রী—অসীমবিকাশ ও শুভেন্দু। এক বৎসর পূর্ব্বে দুই বন্ধু বোম্বাই মেলের প্রথম শ্রেণীর যাত্রিরূপে কলিকাতায় আসিয়াছিল, আজ আবার দুই বন্ধু এক বৎসর পরে প্রথম শ্রেণীর যাত্রিরূপে যাইতেছে; তবে এবার যাত্রা দীর্ঘ নহে, মাত্র তিন ঘণ্টার, অসীমবিকাশের পিতৃপিতামহের অধ্যুষিত জমিদার-ভবনে।

শুভেন্দু মামালার পরদিনই বোম্বাই যাত্রার জন্ম নির্ব্বন্ধাতিশয্য প্রকাশ করিয়াছিল; কিন্তু অসীম তাহাকে নানা অজুহাতে যাইতে দেয় নাই। প্রথমতঃ উষার অসুস্থতা, দ্বিতীয়তঃ ষ্টুডিও ভাঙ্গিয়া দিবার ব্যবস্থা। দুইটিতেই শুভেন্দুর উপস্থিতি একান্ত প্রয়োজনীয় ছিল। অসীম বুঝাইল, যে ভ্রাতা তাহারই মঙ্গলের জন্ম প্রাণ দিল, তাহার ভগিনী সুস্থ হইলে তাহার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না করিয়া তাহার চলিয়া যাওয়া সঙ্গত নহে। ভ্রাতার আত্মহত্যায় উষা যে দারুণ আঘাত পাইয়াছিল, তাহাতে যে শয্যাশায়িনী হইবে, আশ্চর্য্য কি? কেবল অসীমের প্রাণঢালা ভালবাসা ও সেবাবলেই সে উঠিয়া বসিতে সমর্থ হইয়াছিল। তাহার পর অসীম আর স্বীয় আবাসভবনের সহিত ষ্টুডিও সংলগ্ন রাখিবে না বলিয়া কৃতসংকল্প হইয়াছিল। এই এক বৎসরের অভিজ্ঞতায় সে বিলক্ষণ বুঝিয়াছিল যে, ষ্টুডিওর আর্টের চর্চ্চা ও নায়ক নায়িকার দূষিত বায়ু সংসার পরিবার হইতে যত দূরে রাখা যায়, ততই মঙ্গল। সে আরও বুঝিয়াছি-

যে, আকর যাহার মন্দ, তাহার সাময়িক চরিত্র-পরিবর্ত্তন হইলেও তাহার সংসর্গ গৃহস্থের সংসার পরিবারের পক্ষে আদৌ মঙ্গলদায়ক নহে। শুভেন্দুকে সে তাহার বোম্বাই ষ্টুডিওর সর্ব্বময় কর্ত্তা করিয়া দিবে বলিয়া বিস্তর অনুরোধ ও কাকুতিমিনতি করিয়াছিল। কিন্তু শুভেন্দু কিছুতেই তাহাতে সম্মত হয় নাই। সে বলিয়াছিল, সে যেমন চিত্রকর, গল্পলেখক ও প্রয়োজক ছিল, তেমনই থাকিবে, নায়ক-নায়িকার সহিত সরাসরি অভিনয় বা পোজের সম্পর্ক সে আর রাখিবে না; পরন্তু অসীমের ষ্টুডিওতেও কোন কর্ম্ম গ্রহণ করিবে না; তবে বোম্বাই সহরে তাহার ষ্টুডিও প্রতিষ্ঠায় যথাসাধ্য সাহায্য করিবে। এই অঙ্গীকারে অসীম শুভেন্দুকে ধরিয়া রাখিয়াছিল। বোম্বাই যাত্রার আর দুইটি দিন মাত্র বাকী, এমন সময়ে একদিন উষারাণী শুভেন্দুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেল। তখন উষা অল্প-স্বল্প চলাফিরা করিতে পারে। কিন্তু তথাপি শুভেন্দু তাহাকে দেখিয়া বিস্মিত হইল, অনুযোগের সুরে বলিল, "একটু খবর দিয়ে পাঠালে হোত না? আমি ত না ডাকলেও দেখতে গিয়ে থাকি।"

উষারাণী মৃদু হাসিয়া বলিল, "তা জানি, কিন্তু গরজ বড় বালাই। মশাই যে আমাদের ছেড়ে জন্মের মত চলে যাচ্ছেন, তার মানে কি? আমরা কি কেউ নই তোমার, শুভেন্দু বাবু? দাদা—"

কথাটা বলিতেই উষার কণ্ঠ বাষ্পরুদ্ধ হইয়া আসিল, নয়নকমল অশ্রুসিক্ত হইল।

শুভেন্দু তাড়াতাড়ি বলিল, "হ্যাঁ, সে ত মানুষ নয়, দেবতা! তার মধ্যে যে এত মহত্ব লুকিয়ে ছিল, তা ত কেউ বুঝতে পারি নি। কিন্তু দিদি, সে গেছে, আমরা ত রইছি"—

উষা ধরা গলায় বলিল, "তাই ত বলতে এসেছিলুম, কেন আমাদের ফেলে পালাচ্ছ তুমি? এই আঘাতের উপর আরও আঘাত দিতে চাও?"

শুভেন্দু ঘাড় হেঁট করিয়া নীরবে বসিয়া রহিল, একটি কথাও কহিতে পারিল না। কেবল তাহার অন্তস্তল হইতে একটি দীর্ঘশ্বাস বাহির হইয়া গেল।

উষা পুনরায় বলিল, "কিসের জন্য সর্ব্বত্যাগী হচ্ছ ভাই? অতৃপ্ত তেষ্টা—অথচ হাতের কাছে ঠাণ্ডা মিষ্টি জল—হাত বাড়িয়েও নেবে না?"

শুভেন্দু অস্ফুটস্বরে বলিল, "আমি নগণ্য—অকর্ম্মণ্য—"

উষা বাধা দিয়া উত্তেজিত কণ্ঠে বলিল "আচ্ছা, বোনের একটি কথা রাখো—যাবার আগে দেশে গিয়ে হিরণীর কাছে একবার বিদেয় নিয়ে এস। বল, আমার এই ছোট অনুরোধটা রাখবে? মরবার আগে আমার যে দাদা এমন ক'রে আত্মবলি দিলে আমাদের জন্যে, সেও তোমায় ঐ অনুরোধ ক'রে গিয়েছে। বল, তার অনুরোধ রাখবে?"

পথে যাইতে যাইতে সহসা সম্মুখে বিবর হইতে বিষধর কালসর্পকে বাহির হইতে দেখিলে পথিক যেমন চমকিত হইয়া উঠে, শুভেন্দুর ঠিক সেইরূপ অবস্থা হইল; তাহার অন্তরাত্মা শুকাইয়া উঠিল, সে বিষম বিপদে পড়িয়া একবারে ঘামিয়া উঠিল। তখন উষা বুঝাইল যে, যে নারী হইয়াও তাহার মঙ্গলের জন্য এত বড় ত্যাগ-স্বীকার করিতে পারে, যাহার অধিক ত্যাগ-স্বীকার নারী করিতে পারে না,—তাহার নিকট একবার বিদায় না লইয়া, অন্ততঃ একবার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না করিয়া যাওয়া মনুষ্যত্বের পরিচায়ক নহে।

শুভেন্দু মহা ফাঁপরে পড়িয়া আজ তাই অসীমের সহিত তাহার পিতৃপিতামহের আবাসভবনে যাইতেছিল। তাহার মনটা আজ ইচ্ছা-অনিচ্ছার ঘাত-প্রতিঘাতে মথিত হইতেছিল। হিরণীর সহিত আবার সাক্ষাতের কথা মনে করিয়া তাহার বুক গুরু গুরু কাঁপিতেছিল, আবার আর একবার জন্মের মত হিরণীকে দেখিয়া যাইতে পারিবে, এই আশায় সে আনন্দের সপ্তম স্বর্গে নীত হইতেছিল।

শুভেন্দু অসম্ভব গম্ভীর হইয়া বাহিরের খামার ক্ষেত গাছপালার দিকে চাহিয়াছিল। বাঙ্গালার সবুজ মাঠ, সবুজ ধান, আর কানায় কানায় খাল নদী পুকুর ডোবার জল তাহার নয়নের দৃষ্টি ভরাইয়া দিতেছিল, তাহার মন কিন্তু কোথায় ছিল, তাহা কেহ বলিতে পারে না।

হঠাৎ অসীমের একটা প্রশ্নে সে চমকিয়া উঠিয়া বলিল, "এ্যাঁ, কিছু বলছো তুমি?"

অসীম বিদ্রূপের ভঙ্গীতে বলিল, "তবু ভাল, হুঁস হ'ল

বাবুর। এক বছর আগে ঠিক এমনি দু'জনে রেলে আসছিলুম মনে পড়ে?"

শুভেন্দু গম্ভীরস্বরে বলিল, "হুঁ, পড়ে।"

অসীম বলিল, "তখন কন্তুর ধারা দেখে কি বলেছিলুম মনে নেই বোধ হয়? যাক্ সে কথা। উষা যে আসবার আগে তোকে অন্ধ বলেছিল, তা মিথ্যা নয়। আমি ত বলি, তুই শুধু অন্ধ নয়, একটা নিরেট গাধা।"

শুভেন্দু ম্লান হাসি হাসিয়া বলিল, "তা ঠিক। তুমি কি তা আজ জানলে? গাধা যদি না হবো, তা হ'লে ছিলুম বোম্বায়ের অনন্ত সমুদ্রের মুক্ত বিহঙ্গ, যেচে কলকাতার খাঁচায় এসে ঢুকলুম কেন?"

অসীম বলিল, "তুই মস্ত কাপুরুষের মত কথা বলছিস। মানুষের জীবন-নাটকে সুখ-দুঃখ, সম্পদ-বিপদ, আশা-নিরাশা দুই-ই আছে, মানুষকে মানুষ হয়ে সংসারে থাকতে গেলে সেটার সঙ্গে সম্পর্ক রাখ্তে হয়। যারা কাপুরুষ, তারা জীবন-সমুদ্রের ঢেউএর গণ্ডী থেকে দূরে থাকতে চায়, কোন ঝক্কি পোহাতে চায় না। সে জীবন ত পশুর জীবন। কিন্তু বল দিকি, এই সুখ-দুঃখের ধাক্কা খেতে খেতে তার মধ্যে এমন কোন জিনিষ কুড়িয়ে পাস নি কি, যার তুলনায় সমস্ত দুঃখ-কষ্ট বিপদ-আপদ তুচ্ছ ব'লে মনে হয়?"

শুভেন্দুর মুখ-চক্ষু রাঙ্গা হইয়া উঠিল, সে দৃষ্টি অবনত করিয়া লইল, কোন জবাব দিল না। অসীম তাহার ভাব দেখিয়া হাসিয়া বলিল, "স্বীকার করিস না করিস, তোর মুখচোখই ব'লে দিচ্ছে তোর মনের কথা। দেখ্, গল্প আছে, একটা অন্ধের মাথায় পারিজাতমালা ছুড়ে দিয়েছিল ব'লে সে সাপ মনে ক'রে মালাটিকে পথের কাদায় ফেলে দিয়েছিল। এ গল্প শুনেছিস?"

শুভেন্দু বলিল, "হাঁ, শুনেছি, কেন?"

অসীম উত্তেজিত হইয়া বলিল, "কেন? উষা যা তোকে ইসারায় বুঝিয়ে দিয়েছিল, তুই তাও বুঝতে পারিস নি, এত বড় অন্ধ নিরেট গাধা তুই!"

শুভেন্দু বলিল, "উষা কি বলেছিল, আমি ত ভাল ক'রে শুনি নি।"

অসীম বলিল, "না, তা শুনবি কেন? আজ আবার ভাই হয়ে তোর অন্ধ চোখে খোঁচা দিয়ে তা বোঝাতে হচ্ছে, এটা কি কম লজ্জার কথা?"

শুভেন্দু বিস্মিত হইয়া বলিল, "কি বলছো ভাই, কিছুই ত বুঝতে পারছি না।"

অসীম এইবার ক্রুদ্ধ হইয়া চীৎকার করিয়া বলিল, "ওরে গাধা! হিরণী আদালতে দাঁড়িয়ে তোর জন্যে যা বলেছিল, ভদ্র বাঙ্গালীর ঘরের শিক্ষিত অবিবাহিত মেয়ে কি কারুর জন্যে তা বলতে পারে? কেন সে ও-কথা বলেছিল?"

শুভেন্দুর চোখের সম্মুখ হইতে যেন একখানা গাঢ় মসীলিপ্ত যবনিকা সরিয়া গেল। মূর্খ অন্ধ সে, সত্যই দেবভোগ্য নির্ম্মাল্য অযাচিতভাবে তাহার মস্তকে পতিত হইলেও সে সেই দেবতার দানকে অজ্ঞানে দূরে নিক্ষেপ করিয়াছে; যখন তাহার জীবন সূক্ষ্ম সূত্রে ঝুলিতেছিল, তখন কে আত্মবলি দিয়া সেই জীবন রক্ষা করিয়াছিল? হিরণীর সাক্ষ্যদান ত নারীর পক্ষে আত্মবলিদানের সমতুল।

শুভেন্দু দুই হাতে চক্ষু আচ্ছাদন করিয়া গাড়ীর গবাক্ষের উপরে মাথা গুঁজিয়া পড়িয়া রহিল। অসীম স্নেহভরে তাহার কাঁধের উপর হাত রাখিয়া বলিল, "এই জন্যেই ত তোকে নিয়ে যাচ্ছি, ভাই।"

শুভেন্দু মুখ তুলিয়া গভীর নৈরাশ্যজড়িতস্বরে বলিল, "আমি বামন হয়ে চাঁদে হাত দেবার স্পর্দ্ধা করছি, অসীম। আমি কত ক্ষুদ্র, কত নীচু! আমি দরিদ্র—"

অসীম বলিল, "বলেছি ত তুই নিরেট গাধা। ওরে মূর্খ, ভালবাসায় কি গরীব বড়লোক আছে? কতখানি ভালবাসলে সে আদালতে ও কথা বলতে পারে, তা কি ভেবে দেখেছিস একবার? জানিস, তুই যখন হাজতে, তখন সে দেশ থেকে ছুটে এসে আমায় কি বলেছিল? না যাক, ও কথায় আর কায নেই। ভাবছি, সৌভাগ্য কার বেশী, আমার না তোর? উষা বলেছিল, তোর মত সৌভাগ্য কারুর নয়। আমি দেখছি, আমার সৌভাগ্যও কম নয়, না হ'লে আমি উষাকে আবার ফিরে পাবো কেন?"

শুভেন্দু বলিল, "ফিরে পাওয়া? তার মানে?"

অসীম বলিল, "ফিরে পাওয়া না? আমি ত উষাকে হারাতে বসেছিলুম এক অন্ধ ভুলের জন্যে। দেখ, ঐ নারী জাতটাকে যে দেবতারাও বুঝতে পারেন না বলে, তা ঠিক। ওদের বাইরেটা হয় ত কঠিন নীরস, কিন্তু ভেতরটায় কি মন্দাকিনীর ধারা বয়, তা ক্ষুদ্র মানুষ আমরা, আমাদের বোঝবার সাধ্য কি? ঐ অন্তঃসলিলা কন্তুর ধারা যেদিন

আমরা বোঝবার সুযোগ পাবো, সেদিন এ পৃথিবী থেকে অনেক মনের অমিল আর দুঃখকষ্ট ঘুচে যাবে।"

শুভেন্দু এইবার হাসিয়া বলিল, "এদ্দিন পরে যে তুই মস্ত বদল করেছিস, এতে আমি খুবই খুসি হলুম। মানুষ দেখে শেখে, আর ঠেকে শেখে বটে।"

অসীম বিস্মিত হইয়া বলিল, "তার মানে? আমি কি মত বদলালুম, তা ত বুঝতে পারছি না. হেঁয়ালিটে না হয় ব্যাখ্যা করেই বল্।"

শুভেন্দু বলিল, "মনে নেই, আমাদের এই মায়ের জাতের সম্বন্ধে তোর কি ধারণা ছিল?"

অসীম বলিল, "কি ধারণা ছিল, তা ত মনে নেই।"

শুভেন্দু বলিল, "বা রে রসকে! তুই না বল্‌তিস্, ওদের বার ভেতর আলাদা, কেউ বুঝতে পারে না।"

অসীম বহুদিন শুভেন্দুর এমন আনন্দ ও স্ফূর্ত্তির আলাপ শুনে নাই। মনে মনে বিশেষ প্রীতিলাভ করিয়া বলিল, "তা ত এখনও বলি। সত্যিই ওদের বোঝবার আমাদের সাধ্য নেই—তবে—তবে ভালবাসা ওদের অনেকটা বুঝিয়ে দেয় বটে। আমি তা ব'লে তোর মত ওদের নাম হলেই অজ্ঞান হয়ে পড়ি নে।"

শুভেন্দু উচ্চহাস্য করিয়া বলিল, "তাই না কি?"

অসীম বলিল, "নয় ত কি? আচ্ছা, সত্যি ক'রে বল দিকি, তুই হিরণীকে কি চোখে দেখিস—যেন তোর চেয়ে কত উঁচু, কত বড়, যেন তুই এত ছোট যে ওর নাগাল পাসনি, ঠিক এই ভাবেই ওকে দেখে আসছিস না? তুইও মানুষ, ও-ও মানুষ—তবে?"

শুভেন্দু কিছুক্ষণ গম্ভীর হইয়া বসিয়া রহিল, তাহার পর ধীরে ধীরে বলিল, "স্বর্গের দেবী কখনও দেখিনি, তবে তাদের কথা বইয়ে পড়েছি বটে। কিন্তু ভাই, হিরণী?—সে ত"—

অসীম হো হো হাসিয়া কামরার গাম্ভীর্য্য ভাঙ্গিয়া দিয়া বলিল, "কি রে, সত্যি চোখে জল এনে ফেল্‌লি যে, গলাও যে ব'সে আসছে—দেখ, এতটা বাড়াবাড়ি ভাল না। দেখছি, আর্টিষ্টরা মোটেই প্রাকটিক্যাল ম্যান হ'তে পারে না। এর পর ঘরসংসার করবি কি ক'রে?"

শুভেন্দুর স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল, সে লজ্জিত হইয়া মুখ লুকাইয়া রহিল।

অসীম তাহার অবস্থা দেখিয়া তাড়াতাড়ি কথাটার মোড় ফিরাইয়া লইয়া বলিল, "ঐ যা, সিগারেট-কেসটা ভ'রে আনতে ভুলে গেছি, আর একটাও নেই এতে। তোর কাছে আছে দু'একটা?"

শুভেন্দু তাহার সিগারেটের কেসটা খুলিয়া ধরিল, অসীম তাহা হইতে একটি তুলিয়া ধরাইয়া লইল। তখনও শুভেন্দু কেসটা ধরিয়াছিল, তাহার মনটা তখন যেন সেই কামরার ভিতরে ছিল না।

অসীম তাহাকে দেখিয়া মৃদু মৃদু হাসিতেছিল। বলিল, "না, তোদের আর্টিষ্টদের নিয়ে চলাফেরাও মুস্কিল দেখছি! আচ্ছা, ওটা খুলে ধ'রে রেখেছিস কেন বল দিকি?"

শুভেন্দু অপ্রতিভ হইয়া তাড়াতাড়ি সিগারেট-কেসটা মুড়িয়া ফেলিয়া পকেটে পুরিল।

অসীম দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল, "নে, এইবার অন্তাকে ডাক দে, গাড়ী ত ষ্টেশনে এসে পড়লো।"

ষ্টেশনে গাড়ী 'ইন' হইতেই অসীম নামিয়া পড়িল, শুভেন্দুও তাহার অনুসরণ করিল, অনন্ত বেহারা আসিয়া তাহাদের সুটকেস দুইটা নামাইয়া লইল। শুভেন্দু সবিস্ময়ে দেখিল, ষ্টেশন-মাষ্টার এবং ষ্টেশনের কুলীরা সসম্ভ্রমে অসীমকে অভিবাদন করিল! মাষ্টার মহাশয় অগ্রসর হইয়া বিনীতকণ্ঠে বলিলেন, "বাবুর জন্যে ত গাড়ী আসেনি বাড়ী থেকে,—একখানা ভাড়া গাড়ী ঠিক ক'রে দেব কি?"

অসীম হাসিয়া বলিল, "না, কোন দরকার নেই, আমরা হেঁটেই যাবো। আপনারা ভাল আছেন ত? নে রে অন্তা, একটা কুলী ডেকে, ও দুটো নিয়ে আসিস তোরা। নমস্কার, মাষ্টার মশাই।"

কথাটা বলিয়া লম্বা লম্বা পা ফেলিয়া প্রফুল্লমনে শিষ দিতে দিতে অসীমবিকাশ শুভেন্দুর হাত ধরিয়া ষ্টেশন হইতে বাহির হইয়া গেল। বাজারের পথে নামিতেই পথিক ও দোকানদারদের মধ্যে যাহারা সম্মুখে পড়িল, সকলেই সসম্ভ্রমে তাহাদের অভিবাদন করিতে লাগিল এবং অসীমও হাসিমুখে সকলকে প্রত্যভিবাদন ও কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া গ্রাম্য পথে অগ্রসর হইল।

শুভেন্দুর বুঝিতে বাকী রহিল না, এতদঞ্চলে জমীদার অসীমবিকাশের সম্মান ও প্রতিপত্তি কত অধিক।

২০

জমিদারভবনে একটা তাড়া-হুড়া পড়িয়া গেল। ভৃত্য-পরিজন এবং আমলা-মুহুরীরা সকলেই শশব্যস্ত, সকলেই জমিদারের একটা না একটা কাযে লাগিবার জন্য । কিন্তু যাহার জন্য এত তাড়াহুড়া, সে ত একবস্ত্রে বন্ধু সমভিব্যাহারে আসিয়াছে, সে ত কাহারও সেবা বা সাহায্য প্রার্থনা করে না।

সকলকে হাসিমুখে আপ্যায়িত করিয়া সে সরাসরি একবারে খুল্লতাতের শয়নকক্ষে গিয়া হাজির হইল। শুভেন্দু প্রথমে ভিতরে যাইতে চাহে নাই, তাহার কেমন যেন একটা বাধ বাধ ঠেকিতেছিল। কিন্তু অসীম কিছুতেই তাহাকে অপরিচিত অতিথির মত থাকিতে দিল না, বুঝাইয়া দিল যে, সেও তাহাদের পরিবারের পাঁচ জনের এক জন।

খুল্লতাত শয্যাশায়ী, সন্ন্যাস রোগে আক্রান্ত হওয়ার পর হইতে তাঁহার এক অঙ্গ পড়িয়া গিয়াছে। প্রথমে কিছুদিন তাঁহার বাক্‌শক্তিও অন্তর্হিত হইয়াছিল, এখন কথা কহিতে পারেন বটে, কিন্তু জিহ্বার জড়তা কতকটা দূর হইলেও এখনও কথার অস্পষ্টতা কিছু আছে। হিরণী তাঁহার শয্যাপার্শ্বে বসিয়া মহাভারতের বিরাট পর্ব্ব পাঠ করিয়া শুনাইতেছিল।

অসীম শুভেন্দুকে লইয়া খুল্লতাতের পাদবন্দনা করিয়া কুশল জিজ্ঞাসা করিতেই হিরণী চমকিত হইয়া কেতাব হইতে চোখ তুলিয়া 'দাদা' বলিয়া হর্ষধ্বনি করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। কিন্তু ভ্রাতার পশ্চাতে শুভেন্দুকে দেখিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল, তাহার সর্ব্বস্ত শরীরের রক্তটা যেন তাহার মুখে চোখে আসিয়াই আশ্রয় গ্রহণ করিল। অপ্রত্যাশিতভাবে চারি চক্ষুর মিলন হইল! শুভেন্দুর দৃষ্টিতে এমন কিছু ছিল, যাহার জন্য হিরণী তাড়াতাড়ি দৃষ্টি অবনমিত করিয়া লইল।

অসীম হিরণীর এক রাশ কালো মেঘের মত চুলের উপর সস্নেহে হাত রাখিয়া বলিল, "কেমন আছিস, হিরো? না বলে পালিয়ে এলি কেন?"

হিরণী আনতনয়নে প্রায় অস্ফুটস্বরে বলিল, "বাবার সঙ্গে কথা কও দাদা, আমি খাবার-দাবারের যোগাড় করি'গিয়ে। বৌদি এল না?"

অসীম বলিল, "না, তার শরীরটা ভাল না—এত বড় একটা আঘাত পেয়েছে। তা, তোর বাড়ীতে এক জন অতিথিকে আনলুম, তাকে ত একটি কথাও বললিনি? তুই কি হয়ে গেছিস রে? আগে ত এমন ছিলি নি।"

হিরণীর মুখচোখ আবার রাঙ্গা হইয়া উঠিল। সে বিষম অস্বস্তি বোধ করিতেছিল। দুই হাত যোড় করিয়া কপালে ঠেকাইয়া সে শুভেন্দুকে একটি ছোট নমস্কার করিল, তাহার পর অতি মৃদু কম্পিত কণ্ঠে "ভাল আছেন? বসুন," বলিয়া দ্রুতপদে কক্ষ ত্যাগ করিয়া গেল। শুভেন্দুর কাছে ঘরের সমস্ত আলোটাই যেন নিভিয়া গেল! রেলগাড়ীতে তাহার চিত্ত যেন সপ্তম স্বর্গে উঠিয়াছিল, কিন্তু সাক্ষাতে সেও কম অস্বস্তি বোধ করে নাই।

অসীম তাহাদের অস্বস্তিতে পরম আনন্দ উপভোগ করিয়া মৃদু হাস্য করিতেছিল। প্রফুল্লমুখেই খুল্লতাতের সহিত শুভেন্দুর পরিচয় করাইয়া দিয়া বলিল, "এইটিই আমার বন্ধু শুভেন্দু মিত্র, এরই কথা আপনাকে জানিয়েছিলুম।"

হিরণীর পিতা বলিলেন, "বাঃ, দিব্বি ছেলেটি ত। তা ওঁদের গাড়ীতে কষ্ট হয়েছে, নিয়ে গিয়ে স্নানাহার করিয়ে নাও, এর পর কথা হবে'খন।"

ঘরের বাহিরে আসিয়া অসীম বলিল, "কেমন, যা বলেছিলুম, দেখ্‌লি ত?"

শুভেন্দু বলিল, "কি দেখ্‌লুম? আমি ত কিছু নূতন দেখ্‌লাম না।"

অসীম বিরক্তি প্রকাশ করিয়া বলিল, "নেকু! ভাজা মাছটি উলটে খেতে জানেন না! চল্, তোর বুঝে কায নেই!"

শুভেন্দু বলিল, "সত্যিই বুঝলুম না কিছু।"

অসীম হাসিয়া বলিল, "কেন ছুটে পালালো বল দিকি? তুই ভাবছিস, আমাদের খাবার-দাবারের তদ্বির করতে গেল ত? মোটেই না।"

শুভেন্দু বলিল, "তবে? উনি যে খাবার-দাবার ভাল করতে পারেন, তার প্রমাণ ত এক দিন নয়, অনেক দিনই পেয়েছি।"

অসীম তাহার পিঠে একটা ছোট চড় বসাইয়া বলিল, "বা রে, তোর এত বুদ্ধি? ও যে খুকো বয়েস থেকে আরম্ভ

ক'রে পোলাও কালিয়া পর্য্যন্ত সমস্ত রাঁধতে পারে, এতটা যখন আবিষ্কার ক'রে ফেলেছিস, তখন ও যে এখন ছুটে গেল তোর জন্যে হাঁড়ী চড়াতে, তাতে আর সন্দেহ কি? ইডিয়ট! চল্, চান করি গিয়ে।"

শুভেন্দু যন্ত্রচালিত পুতুলের মত তাহার অনুসরণ করিল বটে, কিন্তু কিছুতেই বুঝিতে পারিল না, সে কোথায় বুদ্ধির দৈন্য প্রকাশ করিয়া ইডিয়ট আখ্যা লাভের যোগ্যতা অর্জ্জন করিয়াছে। যাইতে যাইতে মৃদুস্বরে বলিল, "তোর সব কথাই হেঁয়ালি। আচ্ছা, সত্যি বল দিকি, হিরণী খুব সুন্দর রাঁধতে পারে না?"

অসীম ছোট একটা ধাক্কা দিয়া বলিল, "পেটকো, কেবল পেটের চিন্তা নিয়েই আছিস! কেন যে ভগবান তোকে আর্টিষ্ট করেছিলেন, বুঝতে পারি না। পুকুরে যাবি, না বাথ-রুমে?"

শুভেন্দু বলিল, "রাম! পুকুর যখন বাড়ীর গায়ে, তখন আবার বাথ-রুম? দূর!"

অসীম বলিল, "তবে চল্, পুকুরপাড়েই তেল মাখা যাবে'খন।"

*　　　*　　　*　　　*

আহার ও বিশ্রামান্তে দুই বন্ধুতে অসীমের বসিবার ঘরে কথা হইতেছিল। ইহার মধ্যে হিরণী একবারও তাহাদের দেখা দেয় নাই; কেবল একবার আহারের সময় দেখা দিয়াই অন্তর্ধান করিয়াছিল। অসীম গম্ভীর-ভাবে বলিতেছিল, "দেখ্, সোজা কথা বলি। তোদের দুজনের বিয়ে হলে আমি যত আনন্দ পাব, এত আর কেউ নয়। উষারও ঐ কথা। কাকাবাবুরও এতে খুব মত আছে। কাযেই তোর পক্ষে এতে কোন বাধা নেই। কিন্তু তবুও একটা মস্ত বাধা রয়েছে, সেটা তোকেই দূর করতে হবে।"

শুভেন্দু বিস্মিত হইয়া বলিল, "আমাকে?"

অসীম বলিল, "হাঁ, তোকেই। তোর মত ভীরু কি করবে, তাই ভাবছি। দেখ্, অনেক দিন আগে তোকে একটা কথা বলেছিলুম, বোধ হয় তোর মনে নেই।"

শুভেন্দু অস্ফুটস্বরে বলিল, "কি?"

অসীম বলিল, "হিরোর যোগ্য পাত্র আমি খুঁজে পাইনি। রাগ করিস নি, প্রথমে তোকেও আমি তার যোগ্য বর ব'লে মনে করতে পারিনি। হয় ত ভাববি, আমার এটা অন্যায় আবদার—আমার বোন ব'লে"—

শুভেন্দু বাধা দিয়া বলিল, "না, না, যা বলছো, সত্যিই তাই।"

অসীম বলিল, "যাই হোক, আমি তখন কাউকে হিরণীর যোগ্য ব'লে মনে করতে পারি নি, তা এতে আমায় লোকে যাই বলুক, ক্ষতি নাই। ঐ সঙ্গে আরও একটা কথা বলেছিলুম মনে আছে কি? আমার বিশ্বাস ছিল, এখনও আছে যে, হিরো যাকে মন না দেবে, জগতে কেউ তাকে ওর সঙ্গে বিয়ে দিতে পারবে না। বরং ও থুবড়ো আইবুড়ো হয়ে থাকবে, তবু ভাল না বাসলে কাউকে বিয়ে করবে না। তাই বলছিলুম কি, আমাদের যতই মত থাক্, তোমাকে ওর মন জানতে হবেই আগে, যদিও আমি তা খুব ভাল করেই জেনেছি।"

শুভেন্দুর মুখ শুকাইল, ললাটে স্বেদবিন্দু দেখা দিল, সে করুণকণ্ঠে বলিল, "আমাকে"?

অসীম বলিল, "হাঁ, তোমাকে। ভাল গর্দ্দভের পাল্লায় পড়েছি বটে! ওরে গাধা, কতবার বোলবো যে, আমি ভাই হয়ে তোর জন্যে যা করছি, কোন ব্যবসাদার ঘটকেও তা করে না? কেন করছি জানিস? তোদের দুজনের সুখশান্তির কথা ভেবে, নইলে আমার কি বয়ে গেছে রে! সাধে কি উষা অসুখ শরীরেও এখানে আসতে জেদ ধরেছিল, বললে পুরুষমানুষের দ্বারা ঘটকালি হয় না!"

শুভেন্দু শুষ্ক কণ্ঠে বলিল, "আমায় কি করতে বল?"

অসীম বলিল, "তোমায় বলি, আমার কোলে শুয়ে পড়ো, আমি ঝিনুকে ক'রে দুধ খাইয়ে দিই! নেকা! দেখ, আমাদের সমাজে বাপ-ভাইরাই দেখে শুনে মেয়ের বিয়ে দেয়, এ কথা ঠিক। কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি, আমরা হিরোকে সে রকম ক'রে মানুষ করি নি, লেখা-পড়া শেখাইনি। কাযেই ওর মতামত না জেনে"—

শুভেন্দু উত্তরোত্তর অস্বস্তি বোধ করিতেছিল, মৃদুস্বরে বলিল, "কি ক'রে জানবো? ভেবে রাখি অনেক কথা বোলবো, কিন্তু ওর সামনে গেলেই আমার সব কথা গুলিয়ে যায়।"

অসীম খুব এক চোট হাসিয়া লইল, ভাবিল, এ লোককে

লইয়া সে কি করিবে। শেষে বলিল, "তুই না পুরুষ-মানুষ? এত ভয় একটা মেয়ের কাছে? দূর দূর? ড্রাইডেন প্রড়িস নি? এদিকে ত আর্টিষ্ট কবি:—None but the brave deserves the fair! বীরভোগ্যা বসুন্ধরা কথাটাও ভেবে দেখ না। যা, যা, এই সন্ধ্যার আগে সে বাগানে বেড়ায়, একলা থাকে। যা।"

* * *

হিরণী একটা যামিনী-ঝাড়ের পাশে দাঁড়াইয়া তাহার ক্ষুদ্র শাখা লইয়া খেলা করিতেছিল। শুভেন্দুর বুক কাঁপিতেছিল; কেবল বুক নয়, হাত-পাও কাঁপিতেছিল। বহু কষ্টে মৃদুস্বরে সে বলিল, "হিরণী!"

হিরণী চমকিয়া পশ্চাতে ফিরিয়া চাহিয়াই দৃষ্টি অবনত করিয়া কাঠ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

শুভেন্দু সাহসে বুক বাঁধিয়া বলিল, "বোম্বাই যাবার আগে শেষ বিদায় নিতে এসেছিলাম। বল, বোম্বাই যাব, কি এখানে থাকব?"

হিরণী দৃষ্টি অবনত রাখিয়াই মৃদুকণ্ঠে বলিল, "আমি কি বলব?"

শুভেন্দু বলিল, "হাঁ, তুমিই বলবে, তুমি যদি আমায় থাকতে বল, তা হ'লে থাকবো, নইলে চিরজন্মের মত চ'লে যাব।"

হিরণী ক্ষণেক নীরব থাকিয়া বলিল, "কারুর কোথাও যাওয়া আসার উপর আমার কি হাত থাকতে পারে?"

শুভেন্দু বলিল, "কারুর সম্বন্ধে হয় ত না থাকতে পারে, কিন্তু আমার সম্বন্ধে খুবই আছে। তুমি যদি আমায় থাকতে বল, তা হ'লে আমি হাতে স্বর্গ পাব—কেবল তোমার একটি মুখের কথা!"

হিরণী নীরবে নত নয়নে আড়ষ্ট হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল, কোন উত্তর দিল না।

শুভেন্দু আবার বলিল, "একটা কথা জিজ্ঞাসা করব হিরণী, বল সোজা জবাব দেবে?"

হিরণী বলিল, "বলুন।"

শুভেন্দু বলিল, "তুমি আদালতে আমার হয়ে মিথ্যা সাক্ষ্য দিলে কেন? মিথ্যে কলঙ্কের বোঝা মাথায় ক'রে নিলে কেন?"

হিরণী যেন মাটীর সহিত মিশাইয়া গেল। তাহার মুখ-চক্ষু দেখা যাইতেছিল না, নতুবা শুভেন্দু দেখিতে পাইত, সেই মুখে তখন কি ভাবান্তর উপস্থিত হইয়াছে! ক্ষণপরে প্রকৃতিস্থ হইয়া হিরণী পরিষ্কার স্বরে বলিল, "মানুষের প্রাণ নিয়ে যখন টানাটানি, তখন সবাই ত এমন ক'রে থাকে।"

শুভেন্দু কাতর-করুণ কণ্ঠে বলিল, "সত্যিই তাই—আর কিছু না?"

হিরণী অস্ফুট স্বরে বলিল, "হাঁ, সত্যিই তাই, আর কি হ'তে পারে?"

শুভেন্দু হতাশস্বরে আবার বলিল, "সত্যিই তাই—এক জন মানুষের প্রাণরক্ষার জন্যে মিথ্যে বলেছিলে? ওঃ, তবে আমি মিথ্যে স্বপ্ন দেখছিলুম? তা হ'লে চললুম। হিরণী, যাবার আগে এই বিদায় নিচ্ছি, যদি ভুলেও কখনও কোন মনঃকষ্টের কারণ হয়ে থাকি ক্ষমা ক'র।"

শুভেন্দু আর দাঁড়াইল না, দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া ধীরপাদবিক্ষেপে উদ্যানের ফটকের দিকে অগ্রসর হইল। সে কামিনীঝাড়ের অন্তরালে অদৃশ্য হইলে একটি নারীমূর্ত্তি দ্রুতপদে পশ্চাৎ হইতে অগ্রসর হইয়া হিরণীকে জড়াইয়া ধরিয়া কপট অনুযোগের সুরে বলিল, "পোড়ারমুখী বাঁদরী! তেজও দেখাবেন, আবার কেঁদেও মরবেন! নে, চল, পায়ে ধ'রে ফিরিয়ে আনবি চল্।"

হিরণী উষারাণীর বুকে মুখ লুকাইয়া ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিতেছিল। উষা যে সরাসরি মোটরে করিয়া চুপি চুপি চলিয়া আসিয়াছে, তাহা সে জানিতে পারে নাই উষা থাকিতে পারে নাই, দাসদাসী দারপাল প্রভৃতিকে সঙ্গে লইয়া আসিয়াছে।

উষা ডাকিল, "শুভেন্দু বাবু!"

শুভেন্দু বিস্মিত হইয়া পশ্চাতে চাহিতেই আনন্দে অধীর হইয়া ছুটিয়া আসিল, হর্ষগদগদকণ্ঠে বলিল, "আপনি? আপনি কখন্ এলেন?"

উষা কৃত্রিম কোপ দেখাইয়া বলিল, "আপনি? আবার আপনি হলুম কবে থেকে? তা হবেই ত, ভুল এমনি এখন, আহ্লাদে কি আর মাথার ঠিক আছে? নাও ভাই, তোমার জিনিষ তুমি বুঝে নাও। কবে সংসারের মানুষ হবে বল দিকি? ভালবাসার জিনিষকে ভালবাসাই জানাতে হয়, তাকে কি জোরায় ফেলতে হয়?"

হাসিতে হাসিতে হিরণীকে একরূপ ঠেলিয়া দিয়া উষা চলিয়া গেল।

শুভেন্দু আর এখন সে শুভেন্দু নাই, সে এইবার কোন দ্বিধাবোধ না করিয়া হিরণীর করকমল দুই হাতে চাপিয়া ধরিয়া আকুল আনন্দভরা গাঢ় স্বরে বলিল, "হিরণী! বৌদি যা ব'লে গেল, তা সত্যি?"

হিরণীর চোখে জল টলটল করিতেছে, কিন্তু তাহার মুখের দুরন্ত হাসি সে চাপিয়া রাখিতে পারিতেছিল না। শুভেন্দুকে জ্বালাতন করিবার দুষ্টবুদ্ধি তখনও সে ত্যাগ করিল না, হাসিয়া বলিল, "আমার বৌদিকে বৌদি বলছ তুমি কোন্ অধিকারে? কে তোমায় সে অধিকার দিয়েছে?"

শুভেন্দুর আজ মুখ ফুটিয়াছে, হিরণীর এ শান্ত প্রেমের মূর্ত্তি ত সে কখনও দেখে নাই। সে তাহাকে আরও কাছে টানিয়া আনিয়া বলিল, "ভালবাসাই আমায় এই অধিকার দিয়েছে, হিরণী! বল না, বৌদি যা ব'লে গেল, তা সত্যি কি না? এই—তুমি সত্যিই আমার জিনিষ কি না?"

হিরণী হাসিয়া বলিল, "মানুষ আবার জিনিষ হয় না কি, বা রে!"

শুভেন্দু ভাবিতেছিল, এই হিরণী কি সেই আগের হিরণী? সে তখন জানিত না বোধ হয়, ভালবাসা মানুষের কি পরিবর্ত্তন করিতে পারে! প্রকাশ্যে শুভেন্দু বলিল, "তোমাদের ভেতরটা এত মিষ্টি? উঃ, বাইরেটা কি ভয়ঙ্কর!—সত্যিই ভয় করে!"

হিরণী বলিল, "ভয় করে? উঃ, খুব পুরুষমানুষ ত।"

শুভেন্দু গম্ভীরভাবে বলিল, "সত্যিই মীরাবাই বলেছিল, প্রেমের রাজ্যে এক প্রেমের ঠাকুরই পুরুষমানুষ, আর সবাই মেয়েমানুষ। যাক্, এইবার বল, আমি বোম্বাই যাব, কি এখানেই থাকব? স্বর্গ, না নরক,—আমার জন্যে কি ব্যবস্থা করছ?"

হিরণীর চোখের পাতা আবার ভিজিয়া আসিল। হাসি-কান্নার মাঝে সে শুভেন্দুর বুকে মুখ লুকাইয়া মধুর মৃদুকণ্ঠে বলিল, "তুমি বোম্বাই গেলে আমিও যাব!"

সমাপ্ত

শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার বসু (সাহিত্যরত্ন)।

সংসারের সিন্ধুতীরে

সে কোন্ নিষ্ঠুর পতি স্বার্থ-সিদ্ধি-প্রয়োজনে, করুণ সঙ্গীতে
পুত্রহারা রক্ষোবধূ সরমার হৃদয়ের চিতাটি জ্বালায়।
দুর্ব্বাসার কোপানলে দুষ্মন্তের উপেক্ষিতা বসন্ত-নিশীথে
ভূতলে লুটায় কোথা? পুষ্পগুলি শুষ্কতার বিচ্ছেদ-মালায়।
কোথায় অহল্যা কাঁদে পাষাণের অন্ধকারে আর্ত্তনাদ করি'
সীতার নয়ন-জল উথলিছে দূর কোন্ অশোক কাননে,
দ্রৌপদীর হাহাকারে ঝরিতেছে ধরণীর আশার মঞ্জরী
বিরলে বসিয়া রহে দগ্ধভাগ্য দময়ন্তী বিশুষ্ক আননে;
কোথা নর-নারায়ণ সর্ব্বহারা বুভুক্ষায় হয়েছে উতল,
তোর কি পশে না কাণে, অন্তরে ওঠে না ব্যথা-বেদনা-লহর?
অশান্ত শিশুর মত তুই শুধু কল্পনায় কুড়ায়ে উপল
সংসারের সিন্ধুতীরে কাটাইলি জীবনের সারাটি প্রহর!
ওই যে ক্রন্দন-রোল দিক্ হ'তে দিগন্তরে উঠিছে ফুলিয়া,
তারি মাঝে আয় তুই, অকারণে রয়েছিস্ সবারে ভুলিয়া।

শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য।

"কড়ি দিয়ে কিনলুম"

(গল্প)

"কলকাতায় উমির জন্ম একটি পাত্র দেখে এলাম। এখন প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ।"

স্বামীর মুখে কন্যার জন্ম একটি পাত্রের সন্ধানের সংবাদ পাইয়া গৃহিণী মহামায়া বলিলেন, "তাদের মত আছে? অবস্থা কেমন? ছেলেটি কি করে? ছেলের বাপ মা আছে? ছেলেটি দেখতে কেমন?"

পত্নীর মুখে একেবারে প্রশ্নমালা শ্রবণ করিয়া জগদীশ পাল বলিলেন, "কাপড়-চোপড় ছেড়ে, মুখ-হাত ধুয়ে সব কথা বলছি। উমা, এক কল্কে তামাক সাজ দেখি।"

বিবাহের নামে কন্যা অদৃশ্য হইয়াছিল। এখন পিতার আহ্বান শুনিয়া ঘরের বাহিরে আসিল এবং পিতার হুঁকা হইতে কলিকাটি তুলিয়া লইয়া দেওয়ালের কুলঙ্গি হইতে তামাক ও টিকা লইয়া রান্নাঘরে প্রবেশ করিল। জগদীশ হাত-মুখ ধুইয়া বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিলেন, উমা কলিকায় ফুঁ দিতে দিতে হুঁকাটি আনিয়া পিতার হাতে প্রদান করিল এবং উপরের ঘরে চলিয়া গেল। গৃহিণী ইতিমধ্যে দুই চারিটা সাংসারিক কায শেষ করিয়া স্বামীর নিকটে আসিয়া বলিলেন, "তাদের অবস্থা কেমন?"

জগদীশ বলিলেন, "অবস্থা মাঝামাঝি। কর্ত্তার ঐ একটি ছেলে আর একটি মেয়ে। মেয়েটি ছোট, বছর আট হবে। ছেলে একটা পাশ করে কলেজে পড়ে। ছেলের বাপ একটা সাহেবের আফিসে কায করে, টাকা সত্তর মাইনে পায়। কলকাতায় চাঁপা-তলায় নিজের বাড়ী আছে। নীচের তলা ভাড়া দেওয়া, ক'খানা দোকান আছে, মাসে টাকা চল্লিশ ভাড়া পায়। মোটের উপর শ'খানেক টাকা মাসিক আয় আছে। ছেলেটির বয়স বছর কুড়ি হবে; বেশ মোটা-সোটা, রং বেশ ফর্শা। যদি হয়, তবে উমার সঙ্গে বেশ মানাবে। ছেলের নাম ভোলানাথ। নামেও উমার সঙ্গে বেশ মিলন হবে। ভোলানাথ আর উমা।"

গৃহিণী একটু হতাশভাবে বলিলেন, "তা' ত হ'ল, কিন্তু মিন্‌ষে চাকরি করে শুনে মনটায় কেমন খট্‌কা লাগল। সাহেবের আফিসে চাকরি, পদ্মপাতায় জল, এই আছে এই নেই। গন্ধবেণের ছেলে, একটা দোকান-টোকান করেনি কেন?"

"ব্যবসাবুদ্ধি কি সকলের থাকে? যে ব্যবসা বোঝে না, সে ব্যবসাতে গেলে ঠকতেই হবে। ছেলেবেলা থেকে শিক্ষা না হ'লে কি ব্যবসাতে কেউ লাভ কর্ত্তে পারে?"

"বিয়ে দিতে তাদের মত আছে?"

"এখনও পাকা কথা কিছু হয় নি। বলেছে, মেয়ে দেখে পছন্দ হলে, তবে অন্য কথা হবে। তারা চায় ফর্শা মেয়ে। আমাদের জাতে বামুন কায়েত বদ্দি কি সোনারবেণের মত ফর্শা মেয়ে কটা আছে? তাই মনে হয় উমাকে দেখে তাদের পছন্দ হবে। নিজের মেয়ে বলে নয়, আমাদের জাতে উমার মত সুন্দরী মেয়ে কটা দেখতে পাওয়া যায়? উমা ত সাক্ষাৎ উমা।"

গৃহিণী কন্যার রূপের গৌরবে গৌরব অনুভব করিয়া বলিলেন, "তা' সত্যি কথা। মা'র আমার যেমন মুখ তেমনি রং—যেন কাঁচা হলুদ। এক এক দিন মনে হয়, এমন সোনার বরণ উমা, হয় ত কপালক্রমে কালো ছেলের হাতে পড়বে।"

"তাই যদি হয়, তা' মন্দ কি? রাম-সীতার মিলন হবে। কিন্তু চাঁপাতলার ছেলেটির সঙ্গে যদি বিয়ে হয়, তা হ'লে একেবারে রাজযোটক—যেন হরগৌরীর মিলন হবে।"

"তারা মেয়ে দেখতে কবে আসবে?"

"চাকরে মানুষ, রবিবার ভিন্ন কি আসতে পারবে? রজনী বলেছে, তারা যে রবিবারে আসবে, তার আগে আমাকে খবর দেবে।"

"এ জোগাড় হ'ল কি করে?"

"রজনীর এক বন্ধু এর ঘটক। সেই বন্ধুটি বরের বাপের সঙ্গে এক আফিসে কায করে।"

"দেখ কি হয়। মেয়ের কপাল, যার হাঁড়িতে চাল দিয়ে এসেছে, তার ঘরে যেতেই হবে।" এই বলিয়া মহামায়া রান্নাঘরে গমন করিলেন, জগদীশ আপন মনে ধূমপান করিতে লাগিলেন।

জগদীশ পালের পৈতৃক নিবাস সপ্তগ্রামের সন্নিহিত হলুদপুর নামক গ্রামে। তাঁহার পিতা চুঁচুড়াতে আসিয়া বাস করেন চুঁচুড়ার খোড়ো বাজারে তিনি একখানা মশলার দোকান করিয়া ছিলেন। প্রথম কয়েক বৎসর তিনি একাকী চুঁচুড়াতে থাকিতেন, দোকানের উন্নতি হওয়াতে তিনি চুঁচুড়াতেই গৃহ নির্ম্মাণ করাইয়া হলুদপুর হইতে পরিবারবর্গকে চুঁচুড়াতে লইয়া আসেন। জগদীশ তাঁহার একমাত্র সন্তান। তিনি পুত্রকে লেখাপড়া শিখাইতে ইচ্ছুক হইয়া হুগলী কলেজের স্কুল বিভাগে ভর্ত্তি করিয়া দিয়াছিলেন। জগদীশ বাল্যকাল হইতে বুদ্ধিমান ও গম্ভীর-প্রকৃতি ছিলেন। ক্লাসে তিনি ভাল ছেলে বলিয়াই গণ্য ছিলেন। জগদীশের পিতা সর্ব্বদাই পুত্রকে বলিতেন, "বাবা, তিনটে পাশই কর আর চারটে পাশই কর, বেণের ছেলে যেন বামুন-কায়েতের মত গোলামি করতে যেও না। মা গন্ধেশ্বরীর টাট বজায় রেখ, যার আশীর্ব্বাদে দশ জনকে প্রতিপালন করতে পারবে।" জগদীশকে কিন্তু তিনটে বা চারটে পাশ করিতে হইল না, আই-এ পাশ করিবার এক বৎসর পরেই তাঁহার পিতৃবিয়োগ হইল। জগদীশও পিতার উপদেশ অনুযায়ী 'গন্ধেশ্বরীর টাট' পৈতৃক দোকানে গিয়া বসিলেন।

স্কুলে পড়িবার সময় রজনীকান্ত ঘোষ নামক এক কায়স্থ সন্তান

তাঁহার সতীর্থ ছিলেন। রজনীর সহিত জগদীশের বিশেষ সখ্যতা ছিল। প্রত্যহ ক্লাসে দুই জনে একত্র বসিতেন, তাই ক্লাসের ছাত্ররা তাহাদিগকে 'মাণিকযোড়' বলিত। পিতৃবিয়োগ হওয়াতে জগদীশ সরস্বতীর আশ্রয় ত্যাগ করিয়া লক্ষ্মীর শরণ লইতে বাধ্য হইয়াছিলেন, রজনী সরস্বতীর সেবাতেই প্রবৃত্ত রহিলেন এবং যথাসময়ে হুগলী কলেজ হইতে বি, এ পাশ করিলেন। রজনীর পিতা মধ্যবিত্ত গৃহস্থ ছিলেন, তাঁহার দুই বিবাহ ছিল। রজনী প্রথমা স্ত্রীর গর্ভজাত। রজনীর মাতার মৃত্যুর পর তাঁহার পিতা পুনরায় বিবাহ করিয়াছিলেন এবং এই দ্বিতীয়া পত্নীর গর্ভে তাঁহার দুইটি পুত্র ও একটি কন্যা হইয়াছিল। রজনীর মাতামহ কলিকাতার লোক, তাঁহার অবস্থাও বেশ ভাল ছিল। রজনীর মাতা তাঁহার একমাত্র সন্তান ছিলেন, সুতরাং মাতামহের সম্পত্তি পরে রজনীই পাইয়াছিলেন। রজনী বি, এ পাশ করিবার পর তাঁহার মাতামহের মৃত্যু হইল। তখন রজনী চুঁচুড়ায় পৈতৃক বাটীর অংশ ও অন্যান্য সম্পত্তি বৈমাত্রেয় ভ্রাতাদিগকে দান করিয়া কলিকাতায় গিয়া বাস করিলেন। রজনীর সহিত জগদীশের বাল্যসখ্যতা কিন্তু অক্ষুণ্ণই রহিল।

জগদীশের পিতার সময়ে তাঁহার দোকানে কেবল মশলাই বিক্রয় হইত। জগদীশ দোকানের অনেক উন্নতি করিলেন। দোকানে পৈতৃক আমলের মশলা ত রহিলই, তাহার উপর জগদীশ কাগজ, কালি, কলম, পেন্সিল, সূচ, সূতা নানাপ্রকার বিলাতী ও দেশী ঔষধ, বিলাতী মাটী প্রভৃতিও বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিলেন, ফলে দুই তিন বৎসরের মধ্যে জগদীশের দোকানই খোড়োবাজারে বড় দোকান বলিয়া গণ্য হইল। সুতরাং দোকানে তিন চারিজন কর্ম্মচারীও রাখিতে হইল। চুঁচুড়ার সকলেই জানিত—জগদীশ এক কথার মানুষ, তাঁহার দোকানে কোন জিনিষের দরদস্তুর করিতে হয় না। জগদীশ পিতার নিকট বহু বার শুনিয়াছিলেন "খরিদ্দারই দোকানদারের লক্ষ্মী। খরিদ্দারকে ঠকাইলে মা-লক্ষ্মীকে ঠকান হয়।" তাই জগদীশ নিজে ঠকিলেও কখনও খরিদ্দারকে ঠকাইবার কল্পনাও করিতে পারিতেন না।

দোকানের প্রয়োজনীয় পণ্যদ্রব্য ক্রয় করিবার জন্য জগদীশকে প্রতি সপ্তাহেই একবার বা দুইবার কলিকাতায় যাইতে হইত; সেই সময় তিনি রজনীর সঙ্গে দেখা করিতেন। রজনীকে সংসারের ভাবনা ভাবিতে হইত না, মাতামহের আশীর্ব্বাদে বেশ স্বচ্ছন্দভাবেই তাঁহার সংসার চলিয়া যাইত।

এইরূপে কিছুকাল অতিবাহিত হইবার পর, রজনীর পরামর্শে জগদীশ কলিকাতার বড়বাজারে একখানা ঔষধের দোকান করিলেন। দোকানের জন্য আবশ্যক মূলধন জগদীশ দিলেন, রজনী সেই দোকানের কর্ম্মকর্ত্তা হইলেন এবং দোকানের চারি আনা অংশী হইলেন। কলিকাতার এই নূতন দোকানের কথা জগদীশ কাহারও কাছে—এমন কি, মহামায়ার কাছেও প্রকাশ করেন নাই। তিনি স্থির করিয়াছিলেন যে, যদি দোকানে লাভ হয় এবং দোকান স্থায়ী হয়, তাহা হইলেই তিনি দোকানের কথা পত্নীর নিকটে প্রকাশ করিবেন, যদি ক্ষতি হয়, তাহা হইলে দোকান তুলিয়া দিবেন।

ব্যবসায়ে জগদীশের উন্নতি হইলেও তিনি চাল বদলান নাই। শীতকালে একটা ফ্লানেলের হাতকাটা মিরজাই গায়ে দিয়া এবং অন্য ঋতুতে তিনি অনাবৃত শরীরে দোকানে বসিয়া থাকিতেন। মোটের উপর চুঁচুড়ার সেই পুরাকালের বেণের দোকানই ছিল, সে দোকানে টেবল চেয়ার প্রবেশ করে নাই। কলিকাতার দোকান কিন্তু সম্পূর্ণ অন্যরূপ ছিল। সে দোকানে ইংরেজের দোকানের অনুরূপ সকল ব্যবস্থাই ছিল। সে দোকানের কর্ম্মচারীরা রজনী বাবুকেই দোকানের স্বত্বাধিকারী বলিয়া জানিত, সে দোকানের প্রকৃত মালিক যে জগদীশ পাল, তাহা কেহই জানিত না। জগদীশ কলিকাতার দোকানে প্রায়ই যাইতেন না, যাইলেও আধঘণ্টা বা এক ঘণ্টার অধিক থাকিতেন না। কলিকাতার দোকান সম্বন্ধে যাহা কিছু আলোচনা বা পরামর্শ সমস্তই রজনী বাবুর বাটীতে হইত।

২

জগদীশ পত্নীর নিকটে বলিয়াছিলেন, চাঁপাতলায় উমার বিবাহের প্রস্তাব হইয়াছে। পাত্রের নাম ভোলানাথ। ভোলানাথের পিতা অবিনাশচন্দ্র দত্ত কলিকাতার Landroff Slimann নামক এক জার্ম্মাণ কোম্পানির আফিসে কার্য্য করিতেন। ঐ কোম্পানি জার্ম্মাণি হইতে রেশমি ও পশমি কাপড়, ঔষধ, নানাপ্রকার কলকব্জা প্রভৃতি বিবিধ দ্রব্য কলিকাতায় আমদানি করিতেন। অবিনাশ ঐ আফিসে ঔষধ বিভাগের "বড়বাবু" ছিলেন। রজনীর বন্ধু হরিপ্রসন্ন ঐ আফিসে অন্য এক বিভাগের বড়বাবু ছিলেন। তিনি একদিন কথায় কথায় রজনীকে বলিলেন যে, তাঁহাদের আফিসের অবিনাশ বাবু পুত্রের জন্য একটি গৌরাঙ্গী সুশ্রী পাত্রী অন্বেষণ করিতেছেন। তাহা শুনিয়া রজনী বলিলেন যে, চুঁচুড়াতে তাঁহার এক বন্ধুর বিবাহযোগ্যা একটি সুন্দরী মেয়ে আছে। অবিনাশ সেই কথা শুনিয়া বলিলেন, আগে মেয়েটিকে দেখে যদি পছন্দ হয়, তবে অন্যান্য কথাবার্ত্তা হইবে। তিনি অনেক পাত্রীই দেখিয়াছেন, কিন্তু কোন পাত্রীই তাঁহার মনোনীত হয় নাই। জগদীশ কলিকাতায় গিয়া রজনীর নিকটে ঐ কথা শ্রবণ করিলেন ও একদিন চাঁপাতলাতে গিয়া অবিনাশের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন এবং পাত্রী দেখিবার জন্য আমন্ত্রণ করিয়া আসিলেন।

আট দশ দিন পরে জগদীশ অবিনাশের নিকট হইতে একখানা পত্র পাইলেন। অবিনাশ লিখিয়াছেন যে, তিনি পরবর্ত্তী রবিবারে অপরাহ্নকালে হরিপ্রসন্ন এবং অপর দুই জন আত্মীয় সহ পাত্রী দেখিতে চুঁচুড়ায় যাইবেন। যদি পাত্রী পছন্দ হয়, তাহা হইলে সেই দিনই বিবাহের দিন স্থির করিয়া আসিবেন। জগদীশ যখন অবিনাশের পত্র পাইলেন, তখন রজনী কলিকাতায় ছিলেন না, ঔষধের দোকানের কার্য্য-উপলক্ষে এলাহাবাদ যাইতে হইয়াছিল। তিনি মধ্যে মধ্যে এইরূপ কার্য্য-উপলক্ষে বিদেশে যাইতেন।

নির্দ্দিষ্ট দিনে অবিনাশ হরিপ্রসন্ন এবং অন্য দুই জন ভদ্রলোকের সহিত জগদীশের বাটীতে উপস্থিত হইলেন। জগদীশ বিলাস-বিমুখ ছিলেন। তাঁহার বাটীটি বেশ পরিষ্কার ঝরঝরে হইলেও তাহাতে কোনরূপ বিলাসোপকরণ ছিল না। সদরে বৈঠকখানা-ঘরে ঘরজোড়া তক্তাপোষ, তাহার উপর সতরঞ্চ ও জাজিম পাতা এবং তিন চারিটা তাকিয়া ছিল। জগদীশ সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত দোকানে থাকিতেন, বৈঠকখানাতে তাঁহার বসিবার

অবকাশই ছিল না। বাটীতে অন্য কোন পুরুষ না থাকাতে দিনমানে বৈঠকখানা বন্ধই থাকিত।

যথাসময়ে অবিনাশ সদলে জগদীশের বাটীতে উপস্থিত হইলে জগদীশ করযোড়ে সকলকে অভ্যর্থিত করিলেন। আগন্তুকগণের মধ্যে একজন বয়োবৃদ্ধ ব্রাহ্মণ ছিলেন, জগদীশ তাঁহাকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিলেন। প্রতিবেশী তিন চারি জন ভদ্রলোক পূর্ব্ব হইতেই বৈঠকখানাতে বসিয়াছিলেন। জগদীশ বাটীর ভিতর হইতে একখানা আসন আনাইয়া জাজিমের এক পার্শ্বে পাতিয়া আগন্তুক ব্রাহ্মণকে সেই আসনে বসিতে বলিলেন।

প্রায় আধ ঘণ্টা নানারূপ আলাপ আলোচনা ও ধূমপানে অতীত হইলে অবিনাশ বলিলেন, "পাল মহাশয়, এইবার আপনার কন্যাকে আনান, আমরা দেখি।"

বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বলিলেন, "এখন সময় ভাল আছে, এরপর আবার বারবেলা পড়বে।"

জগদীশ প্রতিবেশী একটি বালককে বলিলেন, "বাবা উমেশ, তুমি গিয়ে উমাকে সঙ্গে করে এইখানে নিয়ে এস।"

হরিপ্রসন্ন সহাস্যে বলিলেন, "আপনার কন্যার নাম বুঝি উমা? তা বেশ হয়েছে, অবিনাশ বাবুর ছেলেও ভোলানাথ।"

বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ উচ্চ হাস্য করিয়া বলিলেন, "বাঃ বাঃ, এ যে নামের রাজযোটক। অঁ্যা, উমা আর ভোলানাথ! বেশ বেশ।"

ক্ষণকাল পরে সেই বালকের সঙ্গে উমা বৈঠকখানায় প্রবেশ করিল এবং প্রথমে ব্রাহ্মণকে ও পরে অপর সকলকে প্রণাম করিয়া জড়সড় হইয়া এক পার্শ্বে উপবেশন করিল। হরিপ্রসন্ন বলিলেন, "এইখানে জানালার দিকে মুখ করে বস ত, মা।"

উমা সরিয়া গিয়া নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপবেশন করিলে সকলে বিস্ময়-বিমুগ্ধ নেত্রে বালিকার রূপরাশি দর্শন করিতে লাগিলেন। বাস্তবিকই উমা নিখুঁত সুন্দরী। মাথার চুল হইতে পায়ের নখ পর্য্যন্ত সমস্তই সুন্দর। কিয়ৎক্ষণ পরে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বলিলেন, "অবিনাশ, মেয়ের রূপ দেখ, যেন সাক্ষাৎ মা গৌরী হিমালয় থেকে নেমে এসেছেন। এ মেয়ে যার ঘরে যাবে, তার পরম সৌভাগ্য। দেখি দিদি তোমার হাত দেখি।" এই বলিয়া ব্রাহ্মণ উহার বাঁ হাতখানি ধরিয়া নিবিষ্টচিত্তে করবেখা দেখিতে লাগিলেন এবং মধ্যে মধ্যে মাথা নাড়িয়া আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। অবশেষে উমাকে বলাইয়া, তাহার কণ্ঠস্বর শুনিয়া, তাহার হাস্যভঙ্গী দেখিয়া বৃদ্ধ বলিলেন, "সর্ব্বসুলক্ষণা কন্যা। স্বয়ং লক্ষ্মী। এ মেয়ে যে ঘরে যাবে, সে ঘরে লক্ষ্মী অচঞ্চলা হ'য়ে থাকবেন।"

উমাকে যাহা কিছু পরীক্ষা করিবার, সেই বৃদ্ধই করিলেন, জগদীশের প্রতিবেশীরা উমার ধীরবুদ্ধি, দয়া, দাক্ষিণ্য প্রভৃতির উল্লেখ করিয়া মধ্যে মধ্যে মন্তব্য প্রকাশ করিতে লাগিলেন। অবশেষে অবিনাশ বলিলেন, "যাও মা তুমি বাড়ী যাও, এখানে আর কষ্ট করে আড়ষ্ট হয়ে বসে থাকতে হবে না।"

উমা প্রস্থান করিলে সকলেই একবাক্যে উমার রূপের প্রশংসা করিতে লাগিলেন। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বলিলেন, "ও গো, কেবল রূপ দেখে সুখ্যাতি করে কি হবে? মেয়ের লক্ষণালক্ষণ দেখতে হয়। আমার বয়স ষাট পার হয়েছে, কিন্তু এমন সুলক্ষণা মেয়ে কখন দেখিনি।"

তখন জগদীশ অবিনাশকে বলিলেন, "দত্ত মহাশয় কি বলেন?"

অবিনাশ বলিলেন, "আমি আর কি বলব? মেয়ে পছন্দ হয়েছে, তা বলাই বাহুল্য। এখন অন্যান্য বিষয়ের মীমাংসা হলেই বিবাহের দিন স্থির করা যায়।"

জগদীশ বলিলেন, "অন্যান্য বিষয় কি? দেনা পাওনা? আমার ঐ একটি মেয়ে। ওর আগে অনেকগুলি সন্তান হয়েছিল, কিন্তু ভগবান তাদের পরমায়ু দেন নাই। এই কন্যাটিই শেষ। দেবতা-ব্রাহ্মণের আশীর্ব্বাদে এইটিই আমার সম্বল। আমার যা কিছু খুদ কুঁড়ো আছে, সবই ঐ মেয়ের।"

হরিপ্রসন্ন বলিলেন, "সে ত ঠিক কথা। তবে কি না, আজ কালকার একটা প্রথা হয়েছে, বিবাহের পূর্ব্বে দেনা-পাওনা সম্বন্ধে একটা মীমাংসা—"

অবিনাশ পকেট হইতে একখানা ফর্দ্দ বাহির করিয়া হরিপ্রসন্নর হাতে দিয়া বলিলেন, "এই কাগজটা দেখলেই দত্ত মশাই সব জানতে পারবেন।"

জগদীশ হরিপ্রসন্নর হাত হইতে ফর্দ্দখানা লইয়া একবার আগাগোড়া দেখিয়া বলিলেন, "এই আপনারা চান? আমি এর চেয়ে ঢের বেশী দেব। আর কোন কথা আছে?"

অবিনাশ অপ্রস্তুত হইয়া বলিলেন, "আর কি কথা? হাঁ, একটা কথা আছে। আমি এই ফাল্গুন মাসেই বিবাহ দিতে চাই: কারণ, বৈশাখ মাসটা ভোলার জন্মমাস। তার পর জ্যৈষ্ঠ মাস থেকে অকাল। শ্রাবণ মাসের শেষে বিবাহের দিন আছে বটে, কিন্তু বর্ষা-বাদলে বড়ই অসুবিধা—বিশেষতঃ কলকেতায়। তাই আমি এই মাসেই বিবাহ দিতে চাই।"

জগদীশ বলিলেন, "বেশ। তাই হবে। এখন অনুগ্রহ করে গা তুলে একবার ভিতরে যেতে হবে। শুভ কায মিষ্টমুখে আরম্ভ করতে হয়।"

অনন্তর জলযোগের পর, বৈঠকখানায় আসিয়া পঞ্জিকা লইয়া বিবাহের লগ্ন স্থির করা হইল। অনেক আলোচনা ও তর্ক-বিতর্কের পর ২৭শে ফাল্গুন শনিবার বিবাহের দিন স্থির করা হইলে অবিনাশ সদলে প্রস্থান করিলেন।

৩

পরদিন জগদীশ, এলাহাবাদে রজনীকে একখানি সুদীর্ঘ পত্র লিখিলেন। পত্রে প্রথমে কায-কর্ম্মের কথা লিখিয়া পরে উমার বিবাহের কথা লিখিলেন। পত্রের উপসংহারে লিখিলেন, "অবিনাশ বাবু লোক মন্দ নহেন, তবে আমরা পাড়াগাঁয়ের দোকানদার, তিনি সহরের চাকরে বাবু। তাঁর কথার ভঙ্গীতে ও চালচলনে কেমন কেমন যেন একটু দেমাক মাখান। তিনি মেয়ে দেখতে এসে পকেট থেকে একখানা ফর্দ্দ বার করে আমাকে দেখালেন। সেই ফর্দ্দে বরাভরণ, গহনা, ফুলশয্যা প্রভৃতির একটা হিসাব ছিল। আমি ফর্দ্দ দেখে যখন বললাম যে, আমি আপনার ফর্দ্দ অপেক্ষা অনেক বেশী দিব, তখন তিনি অপ্রস্তুত হয়ে ফর্দ্দখানা পকেটে রেখে দিলেন। বিবাহে, বরপক্ষ হইতে এইরূপ ফর্দ্দ দেওয়া বা টাকা-কড়ি সম্বন্ধে দর-কষাকষি করা আমি পছন্দ করিনে। যাহা হউক, কথাবার্ত্তা পাকা হয়ে, ২৭শে ফাল্গুন শনিবার বিবাহের দিন স্থির হয়েছে। এখন মেয়ের বয়াত! বিবাহের অন্ততঃ এক সপ্তাহ

পূর্ব্বে তোমার আসা চাই। তুমি না এলে আমি বড়ই মুস্কিলে পড়ব।”

চারি দিন পরে রজনীর পত্রের উত্তর আসিল। উমার বিবাহের সম্বন্ধ স্থির হইয়াছে জানিয়া তিনি আনন্দ প্রকাশ করিয়া পত্র লিখিয়াছেন। অবিনাশের সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছেন—“অবিনাশ বাবুর ব্যবহারে তুমি ক্ষোভ প্রকাশ করেছ, কিন্তু আমি ত ক্ষোভের কারণ কিছু দেখি না। তুমি অবিনাশ বাবুর যে দোষের কথা লিখেছ, সেটা তাঁর দোষ নয়, কলিকাতার আবহাওয়ার দোষ। কলিকাতা অঞ্চলে শতকরা নিরানব্বই জন লোক ছেলের বাপ হলে মনে করে যে, তারা মেয়ের বাপের হাতে মাথা কাটিতে পারে। আমি হরিপ্রসন্ন বাবুর মুখে শুনেছি, অবিনাশ বাবু লোক মন্দ নহেন। তাঁর প্রাণটা সাদা, তবে দোষের মধ্যে একটু বদমেজাজী, খড়ের আগুন এক কথায় জ্ব'লে ওঠে, তবে সে আগুন বেশীক্ষণ থাকে না। হরিপ্রসন্ন বাবু বলেন যে, অবিনাশ বাবুর স্ত্রী একেবারে মাটীর মানুষ। মুখে সর্ব্বদা হাসি লেগে আছে, তাঁর মুখ দিয়ে কখনও একটা কড়া কথা বেরোয় না। ভোলা তাঁদের একমাত্র সন্তান, তাঁদের কাছে উমার কোন অনাদর হবে না, বরং শাশুড়ীর কাছ থেকে উমা অতিরিক্ত আদরই পাবে। উমাকে সেই ছোটবেলায় দেখেছি, তাতেই আমার ধারণা হয়ে আছে যে, সে কখনও অসুখী হবে না। অবিনাশ বাবুর সঙ্গে আমার একদিনও চাক্ষুষ আলাপ হয় নাই, হরিপ্রসন্ন বাবুর মুখেই তাঁর কথা শুনেছি। কলিকাতায় গিয়ে এইবার আলাপ-পরিচয় করব। উমার বিবাহে আমি নিশ্চয়ই উপস্থিত থাকব, সে বিষয়ে তুমি নিশ্চিন্ত থাকিও। আজ রাত্রেই আমি কানপুর যাব, সেখানে দিন দুই থেকে আমি লক্ষ্ণৌ যাব। এই পত্রের উত্তর তুমি লক্ষ্ণৌ-হজরতগঞ্জে ঔষধ-বিক্রেতা হামিদ মহম্মদের দোকানে দিও। লক্ষ্ণৌএ বোধ হয় পাঁচ সাত দিন থাকিব। লক্ষ্ণৌ হইতেই কলিকাতায় যাইবার ইচ্ছা আছে। ইতি।”

অবিনাশ চুঁচুড়া হইতে কলিকাতায় ফিরিয়া গিয়াই পত্নী গিরিবালার নিকটে শতমুখে উমার রূপের প্রশংসা করিলেন। বলিলেন, “এত মেয়ে দেখলুম, কিন্তু আজ যে মেয়ে দেখে এলুম, তেমন সুন্দরী মেয়ে আমাদের গন্ধবেণে ত দূরের কথা, বামুন-কায়েতের ঘরেও বড় দেখতে পাওয়া যায় না। বৌ দেখে লোকে বলবে—হাঁ, একটা মেয়ে বটে। মা দুর্গার কাছে যেমন লক্ষ্মী সরস্বতী করে দেয়, এ মেয়ে ঠিক তেমনি।”

গিরিবালা বলিলেন, “তারা লোক কেমন?”

“লোক মন্দ বলে ত মনে হ'ল না। তবে পাড়াগেঁয়ে দোকানদার, আমাদের কলকাতার লোকের মত সভ্য ভব্য কি ফিট ফাট নয়। ইংরেজি লেখা পড়া জানে বলে মনে হল না, আমি যখন হরিপ্রসন্ন বাবুর সহিত ইংরিজিতে কথাবার্ত্তা কইতেছিলাম, তখন মেয়ের বাপ বোকার মত হাঁ করে আমাদের মুখপানে চেয়েছিল। তাইতেই মনে হল, ইংরিজি জানে না, সামান্য বাঙ্গালা কিছু শিখেই দোকান ক'রে বসেছে।”

“বাড়ী ঘর কেমন দেখলে? কোঠা বাড়ী না খোড়ো বাড়ী?”

“খোড়ো বাড়ী নয় কোঠা বাড়ী, বাড়ীর অন্দরটা দোতলা। বাড়ী খুব বড় নয়, বরঞ্চ বেশ বড় বড়, কলকাতার বাড়ীর মত পায়রার খোপ নয়। খিড়কীতে পুকুরে সানবাঁধান ঘাট, বাগান, তা মন্দ নয়।”

“দেনা পাওনার কথা কিছু হল?”

“হাঁ, সব কথা আমি মিটিয়ে এসেছি। আমার ফর্দ্দ দেখে বললে—‘এর চেয়ে আমি বেশী দেব, আমার ঐ একটা মেয়ে, আমাকে কিছু বলতে হবে না।’ হরিপ্রসন্ন বাবু ও চক্কোত্তী খুড়ো পাঁজি দেখে একেবারে বিয়ের দিন পর্য্যন্ত ঠিক করেছেন। এই ২৭শে তারিখে বিয়ে।”

গিরিবালা বলিলেন, “তবে আর দেরী কোথা? মাঝে ত পনর ষোল দিন। পাকা দেখা, গায়ে হলুদ এসব কবে হবে?”

“সে সেই বিয়ের সময় সময় হবে। তুমি এখন থেকে উদ্যোগ আয়োজন কর।”

“তা কর্ত্তে হবে বৈ কি। একলা লোক, দিনও বেশী নেই।”

উদ্যোগ আয়োজন উভয় পক্ষেই হইতে লাগিল। বিবাহের দিনও ক্রমশঃ নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল। ২০শে ফাল্গুন জগদীশ, পুরোহিত এবং চার পাঁচ জন আত্মীয়-বন্ধুকে সঙ্গে লইয়া পাত্র আশীর্ব্বাদ করিয়া আসিলেন। আশীর্ব্বাদ বা “পাকা দেখা” উপলক্ষে অবিনাশ আহার্য্যের যেরূপ আয়োজন করিয়াছিলেন, তাহা দেখিয়া জগদীশ বিস্মিত হইলেন। অবিনাশ মধ্যবিত্ত গৃহস্থ, কোনরূপে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করেন, কিন্তু খাদ্যের আয়োজন করিয়াছেন রাজা-রাজড়ার মত। জগদীশ আসনে উপবেশন করিয়া বলিলেন, “দত্তমশাই, এ করেছেন কি? আমরা পাড়াগাঁয়ের সামান্য দোকানদার, আমাদের জন্য এত বাহুল্য ক'রে আয়োজন করেছেন কেন?”

অবিনাশ সবিনয়ে বলিলেন, “কি আর আয়োজন করেছি? পাকা দেখায় আজকালকার ব্যবস্থাই এই রকম হয়েছে। এ রকম না করলে নিন্দে হয়।”

জগদীশ বলিলেন, “কে জানে মশাই আপনাদের কলকাতার ব্যবস্থা, আমাদের ওদিকে এখনও এতটা বাড়াবাড়ি হয় নাই।”

পরদিন অবিনাশ উমাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া আসিলেন। জগদীশ ভাবী জামাতাকে একখানা মোহর দিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন, অবিনাশ একখানা গিনি দিয়া উমাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। জগদীশ, আশীর্ব্বাদের দিন আগন্তুকদিগের জন্য সাধাসিধা আহার্য্যের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, অবিনাশের মত “আজকালকার” ব্যবস্থা অনুযায়ী ছত্রিশ প্রকার ব্যঞ্জন, পাঁচ সাত প্রকার চাটনী এবং ত্রিশ প্রকার মিষ্টান্নের ব্যবস্থা করেন নাই। লুচি, শাকভাজা, একটা নিরামিষ ও একটা মাছের তরকারি, ছোলার ডাল, একটা চাটনী, দধি, ক্ষীর, সন্দেশ, রসগোল্লা ইহাই করিয়াছিলেন। কলিকাতা হইতে সমাগত ব্যক্তিরা আহার্য্যে বাহুল্যের অভাব দেখিয়া মনে মনে ক্ষুণ্ণ হইলেও আহার করিয়া বেশ পরিতৃপ্ত হইয়াছিলেন।

আরও তিন চারি দিন কাটিয়া গেল, রজনী ফিরিলেন না। তিনি লক্ষ্ণৌ হইতে পত্র লিখিলেন,“মীরাট ক্যাণ্টনমেণ্ট হাঁসপাতালে ঔষধ সরবরাহ করিবার একটা কণ্ট্রাক্ট পাইয়াছি। ঠিক সময়ে ঔষধ পাঠাইতে পারিলে আমাদের বিশেষ লাভ হইবে। আমি আজই মীরাট যাইতেছি, তথা হইতে একেবারে তোমার বাড়ীতে

যাইব। অন্ততঃ বিবাহের দিন প্রাতঃকালে যাহাতে তোমার ওখানে যাইতে পারি, সে চেষ্টা করিব।"

রজনীর স্ত্রী হেমাঙ্গিনী ও পুত্রগণ, বিবাহের দুইদিন পূর্ব্বে চুঁচুড়ায় আসিয়াছিলেন। রজনীর চুঁচুড়ার বাটী জগদীশের বাটীর নিকটেই ছিল। হেমাঙ্গিনী পুত্র দুইটিকে লইয়া চুঁচুড়ার বৈমাত্রেয় দেবরদিগের নিকট আসিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য যে, জগদীশ রজনীর বৈমাত্রেয় ভ্রাতাদিগকেও নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। হলুদপুর হইতেও জগদীশের জ্ঞাতিকুটুম্বগণ আসিয়াছিলেন। জগদীশের একমাত্র সন্তানের বিবাহ, সুতরাং তিনি নিকট এবং দূর সকল আত্মীয়-কুটুম্বকেই নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন।

বিবাহের দিন সকলেই উপস্থিত হইলেন, কেবল আসিতে পারিলেন না রজনী। তাঁহার পত্র আসিল—তিনি যে কার্য্যের জন্য মীরাট গিয়াছেন, সে কার্য্য এখনও শেষ হয় নাই।

শনিবার সন্ধ্যার পূর্ব্বে প্রায় সত্তর পঁচাত্তর জন বরযাত্রী সহ অবিনাশ বর লইয়া বিবাহ-বাটীতে উপস্থিত হইলেন। সন্ধ্যার পরই বিবাহের লগ্ন ছিল, শুভলগ্নে জগদীশ ভোলানাথের হস্তে উমাকে সম্প্রদান করিলেন, নির্ব্বিবাদে শুভকর্ম্ম সম্পন্ন হইয়া গেল। সন্ধ্যার পরই বরযাত্রীরা আহারাদি করিয়া রাত্রির ট্রেণে কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। তিন চারি জন বরযাত্রী হাওড়া ষ্টেশনে ট্রেণে উঠিয়াছিল, অনেকেই দেখিয়াছিল, কিন্তু চুঁচুড়া ষ্টেশনে কেহ তাহাদিগকে নামিতে দেখে নাই। অবিনাশের মামাত ভগিনীপতি হরনাথ এই নিরুদ্দিষ্ট বরযাত্রীদের অন্যতম। বিবাহ-বাটীতে হরনাথকে না দেখিয়া অবিনাশ একটু চিন্তিত হইলেন। তাহাকে গাড়ীতে উঠিতে দেখিয়াছিলেন, কিন্তু চুঁচুড়ায় নামিবার সময় কে নামিল কে না নামিল, সে দিকে তত লক্ষ্য করেন নাই, তিনি বর, পুরোহিত এবং দুই একটি বালককে নামাইতেই ব্যস্ত ছিলেন।

অবিনাশ বিবাহের পূর্ব্বে যেদিন উমাকে আশীর্ব্বাদ করিতে চুঁচুড়ায় আসিয়াছিলেন, সে দিন জগদীশ অভ্যাগতদিগের জন্য খাদ্য-দ্রব্যের বিশেষ আড়ম্বর করেন নাই, এ কথা বলা হইয়াছে। সেদিন খাদ্যদ্রব্যের আয়োজন দেখিয়া অবিনাশ জগদীশকে একটু কৃপণ-স্বভাব বলিয়াই মনে করিয়াছিলেন। কিন্তু উমার বিবাহের রাত্রিতে ভোজ্যদ্রব্যের আয়োজন দেখিয়া অবিনাশ বিস্মিত হইলেন। জগদীশের কৃপণস্বভাব সম্বন্ধে তাঁহার পূর্ব্বের ধারণা দূর হইল। বরযাত্রীরাও আহারকালে, ভোজ্য দ্রব্যের অশেষ প্রশংসা করিল। জগদীশ সকল বিষয়েই এরূপ সুন্দর ব্যবস্থা করিয়াছিলেন যে, কি বরপক্ষ আর কি কন্যাপক্ষ, নিমন্ত্রিত, অনিমন্ত্রিত কেহই কোন বিষয়ে কণামাত্র ত্রুটি দেখিতে পাইল না।

পুরোহিত পঞ্জিকা দেখিয়া বলিয়াছিলেন যে, পরদিন রবিবার প্রাতে সাড়ে আটটার মধ্যে বরকন্যাকে লইয়া যাত্রা করিতে হইবে, সাড়ে আটটার পর দিন ভাল নহে। সেইজন্য জগদীশ রবিবার খুব প্রাতে উঠিয়া যাহাতে বরকন্যা আটটার মধ্যেই শুভযাত্রা করিতে পারে, তাহার উদ্যোগ আয়োজন করিতে লাগিলেন। অবিনাশ প্রাতে শয্যাত্যাগের পর প্রাতঃকৃত্য শেষ করিয়া বৈঠকখানাতে বসিয়া ধূমপান করিতেছিলেন, এমন সময় জগদীশ তাঁহার নিকটে গিয়া বলিলেন, "বেয়াই মহাশয়ের রাত্রে বোধ হয় নিদ্রা ভাল হয় নাই। একে ছোট বাড়ী, তার উপর কাযের গোলযোগে ভাল ঘুম না হইবারই কথা।"

অবিনাশ বলিলেন, "আজ্ঞে না, ঘুম বেশ হইয়াছে, কোন ব্যাঘাত হয় নাই। এখন যাতে আমরা একটু সকালে সকালে যাত্রা করিতে পারি, তার ব্যবস্থা করে দিন।"

"সে ব্যবস্থা সমস্ত ঠিকই আছে। এতক্ষণ বোধ হয় কন্যা-জামাতা বরণ হইতেছে, গাড়ীও ডাকিতে লোক পাঠাইয়াছি। একটা বিষয়ে আমার একটু ত্রুটি হয়েছে। গহনা সব এখনও তৈয়ারী হয় নাই, তাই সব গহনা আজ সঙ্গে দিতে পারলাম না। স্যাকরা বলেছে, দু'তিন দিনের মধ্যেই বাকি সমস্ত গহনা দিবে।"

সব গহনা প্রস্তুত হয় নাই, এই কথা শুনিয়া অবিনাশের মুখ গম্ভীর হইল। তিনি কিয়ৎক্ষণ নীরব থাকিয়া বলিলেন, "সেটা কি ভাল কথা? গহনা শুদ্ধ কন্যা দান করাই ত নিয়ম। কাল রাত্রে বিবাহের পূর্ব্বে সে কথা আপনার বলা উচিত ছিল; তা হলে যা হয় ব্যবস্থা করা যেত।"

"ব্যবস্থা আর কি করতেন? গহনা প্রস্তুত হয়নি, তাই দিতে পারা গেল না, ইহার উপর আর কি ব্যবস্থা করতে পারতেন? একটা ব্যবস্থা আপনার হাতে ছিল—বিবাহ না দিয়ে বরকে আসন থেকে উঠিয়ে নিয়ে যাওয়া। সেটা কি ভদ্রলোকের কায হ'ত?"

অবিনাশ একটু গরম হইয়া বলিলেন, "আর বিবাহ-রাত্রিতে গহনা না দিয়ে ফাঁকি দিয়ে কন্যা পার করাটাই খুব ভদ্রআনা হয়েছে নয়? ওসব দোকানদারী চাল আমার কাছে খাটবে না। আমরা কলকাতার লোক, পাড়াগেঁয়ে জুয়াচুরি আমাদের কাছে খাটবে না, তা মনে রাখবেন।"

"কি! আমি জুয়াচোর? আমি আমার একমাত্র কন্যার গহনা ফাঁকি দিচ্ছি?"

অবিনাশ সক্রোধে বলিলেন, "তা নয় ত আর কি বলব? কুড়িদিন আগে বিয়ের সম্বন্ধ স্থির হয়েছে, এখনও সমস্ত গহনা তৈয়ারী হ'ল না, তাই আমাকে বোঝাতে এসেছ? ওসব চালাকি তোমার এই পাড়াগেঁয়ে ম্যাড়াদের কাছে ক'র, আমার কাছে নয়?"

জগদীশ সহজে ধৈর্য্য-চ্যুত হইতেন না, কিন্তু অবিনাশ তাঁহাকে বারংবার জুয়াচোর, চালবাজ প্রভৃতি বলায় তাঁহারও ধৈর্য্য-চ্যুতি হইল, তিনিও সক্রোধে উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, "জগদীশ পাল জুয়াচোর কি না, তা এই চুঁচুড়া সহরের ইতর ভদ্র সকলে জানে। আমার চাল দোকানদারী চাল? গন্ধবেণের ছেলে হয়ে যে সাহেবের গোলামি করে, পরের পা চাটে, সে দোকানদারের মর্য্যাদা বুঝবে কি?" অবিনাশও তদপেক্ষা উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, "ওসব ফাঁকা আওয়াজে আমি ভুলিনে। যতদিন না সমস্ত গহনা বুঝিয়ে দিবে, ততদিন তোমার মেয়েকে পাঠাব না, এই আমার কথা।"

"আমার মেয়েকে পাঠাবে না? উমা আর আমার মেয়ে আছে নাকি? কাল যখনই ওকে তোমার ছেলের হাতে সম্প্রদান করেছি, তখনই ও তোমার বৌ হয়েছে, ও আর আমার মেয়ে নয়। ওর উপর আমার আর জোর কি? মেয়ে পাঠাবে না! বেশ, পাঠিও না। তবে আমার কথা শুনে রাখ—আমি যদি গন্ধবেণের ছেলে হই, যদি মা গন্ধেশ্বরীর পদে আমার ভক্তি থাকে, তবে আমার এই কথা যে, কখনও যদি তোমাকে আমি কিনতে পারি—আমার গোলাম করতে পারি, তবে আমার মেয়েকে আমি ঘরে আনব। যত দিন তা না পারব,

ততদিন জানব আমার মেয়ে জন্মায়নি, আমি নিঃসন্তান, এই আমার কথা।"

উভয় বৈবাহিকের কলহ যখন চরম সীমায় উপনীত হইল, ঠিক সেই সময় বাটীর বাহিরেও একটা গোলমাল শুনিতে পাওয়া গেল। এক জন লোক জড়িতকণ্ঠে বলিতেছিল—"কি বাবা, জগা পালের বাড়ী কেউ আমাকে দেখিয়ে দিবি না? জগা—জগা পাল—জগা বেণে—আমার বেয়াই শালার বাড়ী তোরা কেউ জানিস না? সে কি বাবা—"

বাহিরে গোলমাল শুনিয়া অবিনাশ জানালা দিয়া দেখিলেন, তাঁহারই ভগিনীপতি, পূর্ব্বরাত্রির সেই নিরুদ্দিষ্ট হরনাথ মাতাল অবস্থায় দ্বারে দাঁড়াইয়া চীৎকার করিতেছে। তাহার জামা-কাপড় কর্দ্দমাক্ত, পায়ে জুতা নাই, গলায় চাদর নাই। একপাল বালক তাহাকে ঘিরিয়া কোলাহল করিতেছে। কেহ তাহার গায়ে ধূলি দিতেছে, কেহ পশ্চাৎ হইতে তাহাকে ধাক্কা দিতেছে। অবিনাশ তাহাকে দেখিয়াই বাহিরে আসিয়া বলিলেন,—"এ কি? হরনাথ? তোমার এদশা কেন? কাল কোথায় ছিলে?"

হরনাথ অবিনাশকে দেখিয়া বলিল, "এই যে চাঁদ, তুমি এখানে! এই বুঝি জগা বেণের বাড়ী? কাল রাত্তিরে বাবা ফরাসডাঙ্গায় খাসা মাল, খুব সস্তা। শালা বলে নটার পর দোকান বন্ধ হবে, বেরোও তুমি। অত রাত্তিরে কোথা যাই, বাবা? কোন বেটা জগা বেণের বাড়ীর পথ দেখিয়ে দিলে না। তাই সেই ফরাসডাঙ্গা থেকে এই চুঁচুড়ো—সারা পথ সেই জগা শালার বাড়ী খুঁজতে খুঁজতে আসছি। দু'খানা বাসি লুচি-টুচি দে বাবা, বড় ক্ষিদে পেয়েছে"—এই বলিয়াই সে কাঁদিয়া ফেলিল।

জগদীশও জানালা হইতে মাতালটার কাণ্ড দেখিতেছিলেন। মাতালটার ক্ষুধার কথা শুনিয়া তিনি এক জন ভৃত্যকে বলিলেন, "বাড়ীর ভিতর থেকে কিছু খাবার এনে ওকে খেতে দে। ঐ রাস্তার পাশে বসে খাক, খবরদার যেন বাড়ীতে মাথা না গলায়। মাতলামি করবার আর জায়গা পায় নি?"

অবিনাশ হরনাথকে বলিলেন, "এখানে কিছু খেতে হবে না, আমার সঙ্গে চল, দোকান থেকে খাবার কিনে দেব।"

জগদীশ বাড়ীর মধ্যে গমন করিয়া দেখিলেন, বরণ ও অন্যান্য মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান শেষ হইয়াছে, বর-কন্যা যাত্রা করিলেই হয়। তিনি গম্ভীরভাবে উমার কাছে গিয়া তাহার মাথায় হাত দিয়া বলিলেন, "মা উমা, আজ তোমার নিজের ঘরে যাচ্ছ, এত দিন পরের ঘরে ছিলে। শ্বশুরবাড়ী গিয়ে শ্বশুর, শাশুড়ী, স্বামী, এঁদের আত্মীয়স্বজন সকলকে প্রাণপণে সেবা করবে, আমার কথা, তোমার গর্ভধারিণীর কথা ভুলে যেয়ো। তোমাকে এখন কিছুদিন—হয় ত অনেক দিন আনতে পারব না। সেজন্য মনে দুঃখ কর না। তোমার শ্বশুর-শাশুড়ী এবং স্বামী যদি আপত্তি না করেন, তা'হলে মাঝে মাঝে চিঠিপত্র দিও। বাবা ভোলানাথ, আমার একমাত্র মেয়েকে তোমার হাতে দিয়েছি; তোমাকে কিছু বলবার নাই, তুমি বুদ্ধিমান, বিদ্বান, দেখো বাবা, উমা যেন সুখী হয়।"

ভোলানাথ ও উমা জগদীশকে প্রণাম করিল। জগদীশ বলিলেন, "বাবা ভোলানাথ, আমি মেয়ে দিয়ে ছেলে পেয়েছি। তবে আজ বেয়াই মহাশয়ের কথায় বড়ই মনে ব্যথা পেয়েছি। সে সব কথা পরে তুমি বাড়ীতে গিয়ে শুনবে। আজ আর সে কথায় কায নাই—"

এমন সময় অবিনাশ বাহির হইতে ডাকিয়া বলিলেন, "ভোলা, আর সময় নাই, এখনই বেরিয়ে পড়তে হবে।"

অবিনাশের কথা শুনিয়া মহামায়া অবগুণ্ঠন টানিয়া দিয়া উমাকে কোলে লইলেন এবং হেমাঙ্গিনী ও অন্যান্য পুরমহিলা সমভিব্যাহারে সদরদ্বারে গাড়ীর নিকট গমন করিলেন। গাড়ীর মধ্যে ভোলানাথ ও উমা উপবেশন করিলে অবিনাশও গাড়ীতে উঠিলেন। অবিনাশ গাড়ীতে উঠিলে জগদীশ গাড়ীর নিকটে গিয়া কন্যা-জামাতার মাথায় হাত দিয়া আর একবার আশীর্ব্বাদ করিলেন এবং অবিনাশকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "বেয়াই মশাই, জগদীশ পাল মিথ্যা বড়াই করে না। যেই কথা, সেই কায।"

অবিনাশ কোন উত্তর করিলেন না। গাড়ী ছাড়িয়া দিল।

বরপক্ষের পুরোহিত, নাপিত, হরনাথ এবং অন্য একজন বরযাত্রী দ্বিতীয় একখানা গাড়ীতে আরোহণ করিলে, সে গাড়ীও ষ্টেশন অভিমুখে যাত্রা করিল।

৪

কন্যা-জামাতাকে বিদায় দিয়া মহামায়া, হেমাঙ্গিনী প্রভৃতি পুরমহিলারা অশ্রুমোচন করিতে করিতে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। জগদীশ বৈঠকখানাতে প্রবেশ করিয়া গম্ভীরভাবে ধূমপান করিতে লাগিলেন। তাঁহার মনে হইল, আজ রজনী যদি উপস্থিত থাকিতেন, তাহা হইলে হয় ত ব্যাপারটা এত গুরুতর হইত না। রজনী বিদ্বান, ধীর, বিবেচক, তিনি উপস্থিত থাকিলে প্রথমেই একটা সুমীমাংসা করিয়া দিতে পারিতেন। হয় ত হরিপ্রসন্ন উপস্থিত থাকিলেও একটা মীমাংসা করিতে পারিতেন। কিন্তু হরিপ্রসন্ন বাবু পূর্ব্বরাত্রিতেই, আহারাদির পর কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলেন। ঘটনাস্থলে দুই জনের এক জনও উপস্থিত না থাকাতে একটা তুচ্ছ বিষয়, নূতন কুটুম্বের নিকটে এমন গুরুতর ঘটনায় পরিণত হইল। তিনি শুনিয়াছিলেন বটে যে, অবিনাশ বদ্-মেজাজী রগচটা লোক। কিন্তু বিবাহের পরদিনই যে তিনি সহসা এরূপ বদ্‌মেজাজের পরিচয় দিতে পারিবেন, তাহা জগদীশ স্বপ্নেও মনে করেন নাই। বিবাহের রাত্রিতে প্রতিশ্রুত গহনা ত অনেকেই দিতে পারে না, কিন্তু সেজন্য ত নূতন বৈবাহিকের নিকট এরূপ লাঞ্ছিত কেহ হয় না। বিশেষতঃ অবিনাশ যেরূপ দান-সামগ্রী, বরাভরণ, ও গহনা আশা করিয়াছিলেন, জগদীশ তাহা অপেক্ষা অনেক উৎকৃষ্ট, অনেক মূল্যবান দ্রব্য দিয়াছেন। যিনি স্বেচ্ছায় এইরূপ মূল্যবান দ্রব্য জামাতাকে উপহার দিয়াছেন, তিনি নিজের একমাত্র কন্যাকে অলঙ্কার সম্বন্ধে প্রতারণা করিবেন, এ কথা অবিনাশ কল্পনা করিলেন কিরূপে?

তিনি এইরূপ চিন্তা করিতেছিলেন, এমন সময় মহামায়া এবং হেমাঙ্গিনী সেই কক্ষে প্রবেশ করিলেন। হেমাঙ্গিনী জগদীশের সমক্ষে এবং মহামায়া রজনীর সমক্ষে অর্দ্ধাবগুণ্ঠনবতী হইয়া বাহির হইতেন এবং পরোক্ষভাবে কথাও কহিতেন। মহামায়া কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া বলিলেন, "হ্যাঁ গা, যখন আমি মেয়ে-জামাই বরণ করছিলাম, তখন বাইরে হাঁকাহাঁকি হচ্ছিল কেন? তোমার গলা

শুনতে পেলাম, আরও একজনের গলা শুনতে পেলাম, কার সঙ্গে ঝগড়া হচ্ছিল ?"

জগদীশ ধীরগম্ভীরভাবে বলিলেন, "বেয়ায়ের সঙ্গে।"

"বেয়ায়ের সঙ্গে ? সে কি কথা ? নতুন কুটুম, তার সঙ্গে কিসের ঝগড়া ?"

এই বলিয়াই তিনি হেমাঙ্গিনীকে বলিলেন, "দিদি বস। ঝগড়া কেন হ'ল ?"

"বিয়ের সময় সব গহনা তৈয়ার হয়নি শুনে তিনি আমাকে জুয়াচোর, বদমাস, পাড়াগেঁয়ে ম্যাড়া প্রভৃতি যা'নয় তাই বলতে লাগ্‌লেন। আমার বাড়ীতে বসে শেষে আমাকে শাসিয়ে বললেন —যতদিন আমি সমস্ত গহনা না দিব, ততদিন তিনি উমাকে পাঠাবেন না।"

মহামায়া বলিলেন, "কি সর্ব্বনাশ। তা তুমি কি বল্লে ?"

"তাঁর কথা শুনে আমারও মাথা গরম হয়ে গেল। আমি বল্লেম, গহনা ত' পরের কথা, যদি কখনও তাকে কেনা গোলাম করতে পারি ত মেয়েকে বাড়ীতে আনব। যতদিন তা' না পার্ব্ব, ততদিন তাঁর বৌকে আমি আনবার নামও মুখে আনব না।"

জগদীশের কথা শুনিয়া মহামায়া শিরে করাঘাত করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। তিনি জানিতেন যে, জগদীশের কথার কখনও অন্যথা হয় না, সুতরাং ইহজীবনে কন্যাকে যে কখনও দেখিতে পাইবেন, তাঁহার সে আশা অন্তর্হিত হইল। এ কি সর্ব্বনাশের কথা ! শুভকার্য্যের পরিণামে এ কি অশুভ ঘটনা !

হেমাঙ্গিনী মৃদুস্বরে বলিলেন, "তোমার ওকথা বলা ভারি অন্যায় হয়েছে, ঠাকুরপো। এখন উপায় ?"

জগদীশ বলিলেন, "উপায় ভগবান। উপায় মা গন্ধেশ্বরী। ক্রোধ চণ্ডাল, তাই চণ্ডালের মত কথা মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল। এর প্রায়শ্চিত্ত আমাকে করতেই হবে। মেয়েকে এখন কিছুতেই আনতে পারব না।"

"তুমি পুরুষমানুষ, তোমাদের মন আলাদা, কিন্তু দিদি কি করে মেয়েকে না দেখে থাকবে ?"

জগদীশ হতাশভাবে বলিলেন, "এখন কিছুদিন থাকতেই হবে। উপায় কি ? রজনী এলে তার সঙ্গে পরামর্শ করে যা হয় করা যাবে।"

"তিনি কি উপায় করবেন ? তিনিও ত জানেন যে তোমার কথার নড়চড় হয় না। তিনি আর কি পরামর্শ দেবেন ?"

"আমার চেয়ে রজনী ঢের বুদ্ধিমান, তার উপর বিদ্বান। দেখা যাক সে কি বলে।"

"তাঁরও ত দেখা নাই। তাঁর জন্য বড় ভাবনা হচ্ছে। উমার বিয়েতে তাঁর নিশ্চিত আসবার কথা, কিন্তু তাঁর কোন খবরই নেই।"

"কালও তাঁর চিঠি এসেছে, ভালই আছেন, বোধ হয় কাযের গতিকে আসতে পারেন নি।"

মহামায়া এতক্ষণ নীরবে বসিয়া উভয়ের কথাবার্ত্তা শুনিতেছিলেন এবং অনর্গল অশ্রুমোচন করিতেছিলেন। হেমাঙ্গিনী তাঁহার হাত ধরিয়া বলিলেন, "চল দিদি, ভিতরে চল। বাড়ীতে সব কুটুম-সাক্ষত রয়েছে, তাদের দেখাশুনা করবে চল। তোমার কোন ভাবনা নেই। আমার মন বলছে, তোমার ঠাকুরপো এলে সব মিটে যাবে।"

"তাই বল দিদি, তোমার মুখে ফুল-চন্দন পড়ুক। মাকে আমার কতদিন দেখতে পাব না, তা ভগবানই জানেন।"

"পাবে, ভাই, পাবে। তার জন্যে ভেব না। ভগবানকে বল, উমা যেন সোয়ামি-পুত্তুর নিয়ে সেই ঘর চিরকাল করে।"

এই বলিয়া হেমাঙ্গিনী মহামায়াকে লইয়া অন্তঃপুরে গমন করিলেন।

কিন্তু মহামায়ার মন কিছুতেই প্রবোধ মানিল না, তাঁহার রোদনের আর বিরাম হইল না। বিবাহ-বাটীতে সমাগতা কুটুম্বিনীগণ মনে করিলেন যে, একমাত্র কন্যাকে শ্বশুর-বাড়ী পাঠাইয়া মহামায়া শোকে কাতর হইয়াছেন। জামাতার সহিত কন্যা আবার অষ্টাহ পরে ফিরিয়া আসিবে এই কথা বলিয়া সকলে মহামায়াকে প্রবোধ দিতে লাগিলেন। তখন বুদ্ধিমতী হেমাঙ্গিনী, তাঁহাদিগকে নিরস্ত করিবার জন্য বলিলেন, 'আট দিন পরে ত মেয়ে-জামাই আসবে না। সকালে বেয়াই মশাই বলে গেছেন যে, তাঁদের জোড়ে বৌ-বেটা পাঠাতে নেই। তাঁদের বংশের নিয়ম যে, যতদিন বোয়ের কোলে একটি খোকা কি একটি খুকী না হয়, ততদিন বৌ পাঠাতে নেই। পাঁচ বছরের মধ্যে হয়ত ভালই, যদি না হয়, তবে পাঁচ বছর পরে পাঠালে কোন দোষ হয় না। তোমরা পাঁচ জনে বল, যেন উমা একটি খোকা কোলে করেই আসে।"

নূতন কুটুম্ব বাড়ীর এই অদ্ভুত এবং অশ্রুতপূর্ব্ব ব্যবস্থার কথা শুনিয়া সকলেই বিস্ময়প্রকাশ করিলেন।

জগদীশ সেই সকাল হইতে গম্ভীর হইয়া বসিয়াছিলেন, কাহারও সহিত অধিক কথাবার্ত্তা কহেন নাই। তাঁহারও এই ভাব দেখিয়া সকলে মনে করিল যে, তিনিও কন্যার জন্য অত্যন্ত বিচলিত হইয়া পড়িয়াছেন।

সন্ধ্যার সময় রজনী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়াই জগদীশ বলিয়া উঠিলেন, "কি হে, ব্যাপার কি ? তুমি কাল নিশ্চিত আসবে বলে পত্র দিয়ে একেবারে ডুব দিলে, কাল এলে না কেন ?"

রজনী বলিলেন, "বৃহস্পতিবার রাত্রিতে মীরাট ত্যাগ করব স্থির করেছিলাম। বৈকালে ক্যান্টনমেন্টের Chief medical officer এক পত্র দিয়ে, শুক্রবার সকালে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে হুকুম করলেন। কাযেই বৃহস্পতিবারে আর রওনা হতে পারলেম না। শুক্রবার সকালে সাহেবের কাছ থেকে আবার একটা হাজার আষ্টেক টাকার অর্ডার জোগাড় ক'রে আসছি। জান ত ভাই business is business 'আগে কায পিছে সেলাম'। তা না হলে কি আর সাধ করে মীরাটে বসেছিলাম ?"

"সে ত ঠিক কথা। এখন চল বাড়ীর ভিতর। হেম বড়ই অস্থির হয়েছে।"

"তা' ত হবারই কথা। আমিই কি সুস্থির আছি ?"

উভয় বন্ধুতে বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিলে রজনীকে দেখিয়া হেমাঙ্গিনী ও মহামায়া যেন হাতে স্বর্গ পাইলেন। তাঁহাদের কেমন ধারণা হইয়াছিল যে, রজনী আসিলেই প্রাতঃকালের সেই অপ্রিয় ঘটনার যাহা হয় একটা মীমাংসা হইবে।

মহামায়া অগ্রে রজনীকে হস্ত-মুখাদি প্রক্ষালন পূর্ব্বক আহার করিতে বলিলেন। দুই দিন রজনীর উদরে অন্ন নাই, আপনার দারুণ মনঃকষ্টের মধ্যেও মহামায়া তাহা বিস্মৃত হয়েন নাই। আহারাদির পর হেমাঙ্গিনী স্বামীকে নির্জ্জনে লইয়া গিয়া প্রাতঃকালের ঘটনার কথা বিবৃত করিলেন এবং বলিলেন, "তুমি এর যা হয় একটা বিহিত কর। দিদি ত' সমস্ত দিন কেঁদে কেঁদে সারা হচ্ছে, ঠাকুরপো মুখে কিছু বলছেন না বটে, কিন্তু মুখ দেখে ত বুঝতে পাচ্ছি, উনিও কম কান্না কাঁদছেন না। এখন উপায় ?"

রজনী সমস্ত কথা শুনিয়া কয়েক মুহূর্ত্ত স্তম্ভিত হইয়া বসিয়া রহিলেন। তাহার পর একটা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, "বটে ? ব্যাপার তা'হলে বেশ গুরুতরই হয়েছে। জগদীশকেও ছেলেবেলা থেকে জানি, ওর কথার কখনও নড়চড় হয় না। যা বলে, তা না করে ক্ষান্ত হয় না। যদি অবিনাশবাবু বলতেন যে, তিনি বৌ পাঠাবেন না, তা হ'লে তাঁর হাতে পায়ে ধরে, যেমন ক'রে পারি মেয়েকে আনতে পারতেম। কিন্তু এ যে উল্টা ঘটনা। জগদীশ প্রতিজ্ঞা করেছে—তার মেয়েকে আনবে না। এক্ষেত্রে করা যায় কি ?"

"এখন উপায় ? উমাকে না পেলে ত দিদি বাঁচবে না।"

"তা ত বুঝছি, কিন্তু উপায় ত আমার হাতে নয়, ভগবানের হাতে। সে উপায়টা কি ভেবে চিন্তে ঠিক করতে হবে। তাড়াতাড়ির কায নয়; দুই চার দিনের কায নয়। কলকাতায় গিয়ে সব দিক দেখে উপায় স্থির করতে হবে। তুমি মহামায়াকে ভাবতে বারণ কর। তাঁকে বল যে, আমি প্রতি সপ্তাহে উমার খবর নিয়ে তাঁকে জানাব। আপাততঃ এতেই তাঁকে সন্তুষ্ট থাকতে হবে।"

সেদিন জগদীশ বা রজনী কেহই এই অপ্রিয় বিষয়ের কোন আলোচনা করিলেন না,—দীর্ঘ পথ রেলগাড়ীতে আসিয়া রজনী অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন বলিয়া জগদীশ তাঁহাকে সকাল করিয়া নিদ্রা যাইতে বলিলেন। রজনীও আহারের পর শয়ন করিলেন এবং দুই রাত্রি জাগরণের জন্য অচিরে গভীর নিদ্রায় মগ্ন হইলেন।

বেলা প্রায় এগারটার সময় অবিনাশ বরবধূ লইয়া চাঁপাতলার বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন। রবিবারে, শাশুড়ীকে নিজ বাটীতে নববধূর মুখ দর্শন করিতে নাই, সেই জন্য অবিনাশের পত্নী গিরিবালা, পুত্রবধূর মুখ দেখিবার জন্য একখানা স্বর্ণালঙ্কার লইয়া বেলা দশটার সময় হইতেই উদ্গ্রীব হইয়া প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। অবিনাশের গাড়ী বাটীর দ্বারে উপস্থিত হইবামাত্র গিরিবালা বহুসংখ্যক স্ত্রীলোক-পরিবেষ্টিতা হইয়া পথে, গাড়ীর নিকটে উপস্থিত হইলেন এবং গাড়ীর মধ্যে ভোলানাথের পার্শ্বে উপবিষ্টা উমার মুখ দেখিয়া তাহাকে অলঙ্কারখানি পরাইয়া দিলেন। ইতিমধ্যে একজন স্ত্রীলোক এক ঘড়া জল আনিয়া দ্বারের সম্মুখে ঢালিয়া দিলে গিরিবালা উমাকে ক্রোড়ে করিয়া গাড়ী হইতে নামাইলেন, "গাঁটছড়ায়" আবদ্ধ ভোলানাথও উমার পশ্চাতে গাড়ী হইতে নামিল এবং জননীর পশ্চাতে পশ্চাতে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিল। সকলের শেষে অবিনাশ গাড়ী হইতে নামিলেন, দানসামগ্রীর তৈজসপত্র প্রভৃতি নামাইয়া বাটীর মধ্যে পাঠাইয়া দিলেন।

বাটীর মধ্যে আবার একদফা বরণ, কড়িখেলা প্রভৃতি স্ত্রী-আচারের অনুষ্ঠান হইবার পর সমাগত স্ত্রীলোকরা নববধূর রূপের সমালোচনা আরম্ভ করিল। সমালোচনার পর সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিল যে, উমার মত রূপবতী কিশোরী বামুন-কায়েতের বাড়ীতেও বড় দেখিতে পাওয়া যায় না। যেমন মুখ, চোখ, চুল, তেমনই গড়ন আর তেমনই গায়ের রং, কোথাও কি একটু খুঁত নাই ? উমা ত সাক্ষাৎ উমা! অবিনাশের এক দূর-সম্পর্কীয়া ভগিনী গিরিবালাকে বলিলেন, "হাঁ বৌ, দাদা গন্ধ বেণের মেয়ে আনতে সোনার বেণের মেয়ে আনেননি ত ? আমাদের জাতে এমন রূপ—এমন রং কখনও চোখে পড়েনি।"

বলা বাহুল্য যে, উমার রূপের সমালোচনায় সঙ্গে সঙ্গে তাহার পিতৃদত্ত অলঙ্কারের ও দানসামগ্রীরও সমালোচনা হইল এবং সে সমালোচনা জগদীশের প্রতিকূল হয় নাই।

চুঁচুড়া হইতে আসিবার সময় গাড়ীতে পুত্রের নিকটে অবিনাশ জগদীশের সহিত বিবাদসংক্রান্ত কোন কথা বলেন নাই! রজনী জগদীশকে লিখিয়াছিলেন, অবিনাশ ক্রোধপরায়ণ, তবে তাঁহার ক্রোধ তালপাতার আগুন, জ্বলিয়া উঠিয়া তখনই নিবিয়া যায়। সেটা ঠিক কথা। ট্রেণে আসিবার সময় তাঁহার মাথা অনেকটা শীতল হইল। উমার সাক্ষাতে তিনি ঐ প্রসঙ্গ উত্থাপন করা সঙ্গত বলিয়া মনে করিলেন না। গাড়ী হাওড়া ষ্টেশনে আসিবার পূর্ব্বেই তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, প্রাতঃকালের ঘটনায় জগদীশের কোন অপরাধ নাই, জগদীশকে তিনি অকারণে অপমান করিয়াছেন। বিবাহের রাত্রিতে অনেক কন্যাকর্ত্তাই প্রতিশ্রুত সমস্ত অলঙ্কার দিতে পারেন না। প্রধানতঃ সেটা কন্যাকর্ত্তার ত্রুটি নহে, অলঙ্কার-নির্ম্মাতার ত্রুটি। সুতরাং জগদীশের সহিত কলহ করা তাঁহার যৎপরোনাস্তি অন্যায় হইয়াছে। তবে তিনি নিজের মনকে এই বলিয়া প্রবোধ দিতে চেষ্টা করিলেন যে, অবিনাশকে কিনিতে না পারিলে তিনি কন্যাকে লইয়া যাইবেন না, এ কথা বলা জগদীশের ভাল হয় নাই।

মধ্যাহ্নকালে আহারাদির পর অবিনাশ পত্নী ও পুত্রকে অন্তরালে ডাকিয়া বলিলেন, "আজ সকালে যখন বেয়ান বর-কন্যা বরণ করিতেছিলেন, তখন বৈঠকখানাতে বেয়াই মশায়ের সঙ্গে আমার একটু ঝগড়া হয়েছিল!"

গিরিবালা সবিস্ময়ে বলিলেন, "ঝগড়া আবার কি হ'ল ? শুভকাযে কি আবার গোলযোগ বাধিয়ে এলে ?"

"একটা তুচ্ছ কথা নিয়ে কথা কাটাকাটি হ'ল। সকালে বেয়াই আমাকে বল্লেন যে, মেয়ের সব গহনা এখন হয়ে উঠল না, পরে হ'লে পাঠিয়ে দিব—"

"তা' এ ত ভাল কথা, এমন ত আকছার হয়েই থাকে। এতে ঝগড়ার কথা কি আছে ?"

"আমি সেই কথা শুনে বল্লেম যে, যতদিন গহনা না দেবেন, ততদিন বৌমাকে পাঠাব না। তাই না শুনে বেয়াই একেবারে তেলে বেগুনে জ্বলে উঠে বল্লেন—'আমি যদি গন্ধ বেণের ছেলে হই, তা'হলে যত দিন তোমাকে কিনতে না পারব, তত দিন তোমার বৌকে বাড়ীতে আনব না।'

গিরিবালা সক্ষোভে গালে হাত দিয়া বলিলেন, "সর্ব্বনাশ, একটি ছেলে, বিয়ে দিয়ে বেয়াই বেয়ান নিয়ে কোথায় আমোদ

আহ্লাদ করব, তাদেরও একটি মেয়ে, তারা কোথায় জামাই বেয়াই নিয়ে সাধ আহ্লাদ করবে, না তুমি সে পথে কাঁটা দিয়ে এলে? গহনা না দিলে মেয়ে পাঠাব না, একথা কেন তুমি বলতে গেলে? তবে কি বৌভাত, ফুলশয্যায় তারা কেউ আসবে না? ফুলশয্যা পাঠাবে ত?"

অবিনাশ বলিলেন, "কি ক'রে জানব? যা হ'ক, যা হবার তা হয়ে গেছে, বৌমা যেন এ বিষয়ের বিন্দুবিসর্গ জানতে না পারেন। ছেলেমানুষ, কেঁদেই সারা হবেন।"

গিরিবালা বলিলেন, "তা হলে বৌভাতের পর বৌ-ব্যাটায় জোড়ে যাওয়া হবে না।"

"তাই বা কি ক'রে বলব? যদি তারা নিয়ে যাবার কথা বলে কি নিয়ে যেতে লোক পাঠায়, তখন পাঠাতে আপত্তি করব না।"

গিরিবালা সদুঃখে বলিলেন, "বেয়াই যে নিয়ে যাবার কথা বল্‌বে, তা ত মনে হয় না। অমন কটু দিব্যি ক'রে কেউ কি কথার নড়চড় করে?"

ভোলানাথ সমস্ত কথা শুনিল, কিন্তু কোন মন্তব্য প্রকাশ করিল না। অপরাহ্নকালে সে জননীকে একান্তে ডাকিয়া বলিল, "বাবা ত বল্লেন যে, উনি কেবল বলেছিলেন যে 'বৌ পাঠাব না' আর শ্বশুর মশাই বলেছিলেন 'মেয়ে নিয়ে আসব না', এ ছাড়া আর কোন কথা হয়নি। কিন্তু আমার ত মনে হয়, অনেকক্ষণ ধ'রে কথা-কাটাকাটি হয়েছিল। কারণ, আমি বাড়ীর ভিতর থেকে বাবার গলা অনেকক্ষণ ধরে শুনেছি।"

গিরিবালা বলিলেন, "দেখ দেখি কি বিভ্রাট ঘটিয়ে বসলেন। ওঁর স্বভাব ত জানাই আছে, তুচ্ছ কারণে তেলে-বেগুনে জ্ব'লে উঠে তিলকে তাল ক'রে তোলেন।"

পরদিন অপরাহ্নকালে কুড়ি-পঁচিশ জন লোক ফুলশয্যার দ্রব্যাদি লইয়া চুঁচুড়া হইতে অবিনাশের বাটীতে উপস্থিত হইল। ফুলশয্যার দ্রব্যাদি দেখিয়া সমবেত কুটুম্বিনী ও প্রতিবেশিনীরা একবাক্যে প্রশংসা করিতে লাগিল। গিরিবালা কুটুম্ববাড়ীর লোকদিগকে পরিতোষ সহকারে ভোজন করাইলেন এবং সকলকে পাথেয় এবং তাহাদের আশানুরূপ পুরস্কার দিয়া বিদায় করিলেন।

পাকস্পর্শ উপলক্ষে ভোজ হইল পরবর্তী শনিবার রাত্রিতে। সে দিন চুঁচুড়া হইতে মধ্যাহ্নকালে, জগদীশের দোকানের এক জন বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী, অবশিষ্ট অলঙ্কার লইয়া অবিনাশের বাটীতে উপস্থিত হইল এবং অবিনাশকে অলঙ্কারগুলি বুঝাইয়া দিয়া তাঁহার নিকট হইতে রসিদ লইয়া প্রস্থান করিল। অবিনাশ তাহাকে সন্ধ্যার পর আহারাদি করিয়া যাইবার জন্য সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিলেন, কিন্তু সে কিছুতেই সম্মত হইল না। তখন অবিনাশ তাহাকে একটু জলযোগ করাইয়া ছাড়িয়া দিলেন। জগদীশ বা তাঁহার কোন আত্মীয় আসিলেন না।

বিবাহের গোলমাল মিটিয়া গেল, অবিনাশ যথারীতি আফিসে যাতায়াত আরম্ভ করিলেন, ভোলানাথও নিয়মিতরূপে কলেজে যাইতে লাগিল। শ্বশুরবাটীতে উমা সকলেরই চক্ষুর পুত্তলি হইল। তাহার শান্ত স্বভাব, মধুর বচন এবং সাংসারিক সকল কার্য্যেই শাশুড়ীকে সাহায্য করিবার আগ্রহ দেখিয়া তাহার শাশুড়ী ত একেবারে সানন্দে গলিয়া গেলেন। শ্বশুর আফিস হইতে আসিয়াই দেখিতে পাইতেন, তাঁহার হস্তমুখ প্রক্ষালনের জল, গামছা এবং হুঁকা লইয়া উমা প্রস্তুত হইয়া আছে। তিনি বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিয়া বিশ্রাম করিতে বসিবামাত্র উমা পাখা লইয়া বাতাস করিতে বসিত। ভোলানাথের সহোদরা উষা, উমা অপেক্ষা চারি বৎসরের ছোট ছিল, উমা তাহার কেশ-বিন্যাস, বেশ-পরিধান করাইয়া দিত, তাহার পড়া বলিয়া দিত, তাহাকে শান্ত-মধুরভাবে শিষ্টাচার শিখাইত। উমা প্রত্যহ প্রাতে শয্যাত্যাগের পর তুলসীতলায় প্রণাম করিয়া শ্বশুর ও শাশুড়ীকে প্রণাম করিত। তাহাকে দেখিতে দেখিতে গিরিবালা যেন স্বর্গে যাইতেন, কেবল মনে মনে বলিতেন,—"মা কালী, আমার বৌ-ব্যাটা যেন এমনি সুখে থাকে।"

উমা একবারও পিত্রালয়ে যাইবার কথা মুখে আনিত না, যখন পিতামাতার জন্য বড় মন কেমন করিত, অন্যের অগোচরে নির্জ্জনে অশ্রুমোচন করিত এবং কাহারও সাড়া পাইলে তৎক্ষণাৎ চোখ মুছিয়া হাসিমুখে তাহার সম্মুখে যাইত। তাহার ব্যবহার দেখিয়া গিরিবালা সর্ব্বদাই বলিতেন, "ভদ্রলোকের মেয়ে বটে, এমন সুন্দর-স্বভাব মেয়ে কখনও দেখি নাই।" স্ত্রীর কথা শুনিয়া অবিনাশ মনে মনে বলিতেন—"এই মেয়ের বাপকে আমি জুয়াচোর ছোটলোক বলিয়া গালি দিয়া আসিয়াছি।" অনুতাপে তাঁহার অন্তর দগ্ধ হইত।

জগদীশ প্রতি মাসে অন্ততঃ দুইবার করিয়া কন্যা-জামাতার সংবাদ লইবার জন্য লোক পাঠাইতেন এবং প্রতিবারই সেই লোকের হাতে নানাপ্রকার মিষ্টান্ন ও ফলমূলাদি পাঠাইতেন। ইহার উপর আমের তত্ত্ব, কাঁঠালের তত্ত্ব, ইলিশ মাছের তত্ত্ব, জামাইষষ্ঠীর তত্ত্ব, পূজার তত্ত্ব, শীতের তত্ত্ব, দোলের তত্ত্ব ত ছিলই। মধ্যে মধ্যে চুঁচুড়া হইতে জগদীশ কন্যা-জামাতা, জামাতার ভগিনী এবং বেয়ানের জন্য নানাপ্রকার মূল্যবান জামা-কাপড় পাঠাইতেন। ইহা ব্যতীত পুষ্করিণীর মাছ, বাগানের ফল ও তরি-তরকারী লইয়াও চুঁচুড়া হইতে লোক আসিত। পর্ব্ব উপলক্ষে তত্ত্ব ব্যতীত অন্য সময় যে সকল তত্ত্ব আসিত, তাহার বাহক বা বাহিকারা অবিনাশের নিকট হইতে পাথেয় বা পারিশ্রমিক লইত না। অবিনাশ দিতে গেলে তাহারা বলিত—"আমরা যাতায়াতের টিকিট ক'রে এসেছি। আর এখন ত হামেসা আমাদের আসতেই হবে. রোজ রোজ মজুরি নিতে গেলে চলবে কেন? আর কিই বা জিনিষ এনেছি? এর দাম কতই হবে? ফি হাত মজুরি দিতে গেলে আপনাদের লোকসান হবে কত?"

ভোলানাথের বিবাহের এক মাস পরেই অবিনাশের পনর টাকা বেতন বৃদ্ধি হইল। তাঁহার বেতন সত্তর টাকা হইতে পঁচাশী টাকা হইল। এই বেতনবৃদ্ধি যে সুপয়া নববধূর জন্যই হইয়াছে, তাহাতে কাহারও কণামাত্র সন্দেহ রহিল না। এমন সুলক্ষণা ও সুপয়া বধূ, শ্বশুর শাশুড়ী এবং স্বামীর আদরিণী হইবে না কেন? পিতামাতার অদর্শন-জনিত বেদনা ব্যতীত উমার শ্বশুরালয়ে আর কোন কষ্টই রহিল না। শ্বশুর-শাশুড়ীর আদর-যত্ন এবং স্বামীর প্রাণঢালা ভালবাসায় উমার সে কষ্টও শীঘ্র অন্তর্হিত হইল।

৬

উমার বিবাহের পরদিন জগদীশের সহিত অবিনাশের বিবাদের কথা শুনিয়া মহামায়া শিরে করাঘাত করিয়া বলিয়াছিলেন,

“এখন উপায় ?” তাহাতে জগদীশ বলিয়াছিলেন, উপায় ভগবান। হেমাঙ্গিনী রজনীর নিকট ঐ অপ্রিয় ঘটনার উল্লেখ করিয়া বলিয়াছিলেন, “এখন উপায় কি ?” তাহাতে রজনীও জগদীশের বাক্যের প্রতিধ্বনি করিয়া বলিয়াছিলেন—“উপায়, ভগবান করবেন।” ভগবান উপায় করিলেন, কিন্তু অনেক বিলম্বে।

উমার বিবাহের আড়াই বৎসর পরে য়ুরোপে মহাসমর আরম্ভ হইল, ফলে সমস্ত পৃথিবীর ব্যবসায়-বাণিজ্য বিশৃঙ্খল এবং কক্ষচ্যুত হইল। য়ুরোপ ও আমেরিকার নৌ-বাণিজ্য বন্ধপ্রায় হইল। এই সুযোগে জাপান আপনার বাণিজ্য-বুদ্ধির পরিচয় দিয়া পৃথিবীর বাজার হস্তগত করিল। ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জার্ম্মাণী, ইটালী প্রভৃতি দেশের কত বড় বড় ব্যবসায়ী কোম্পানি দেউলিয়া হইল, আবার অনেক দেশের কত ছোট ছোট দোকানদার ধন-কুবের হইয়া গেল। সেই বাণিজ্য-বিপ্লব হইতে কলিকাতার বাজারও অব্যাহতি পাইল না। লোহাপটি, কাচপটি এবং ঔষধ-পটির ব্যবসায়ীদের প্রতি লক্ষ্মীর কৃপাদৃষ্টি পতিত হইল। অধিকাংশ ব্যবসায়ী রাতারাতি “আঙ্গুল ফুলে কলাগাছ” হইল। যাঁহারা দুই তিন হাজার টাকা মূলধন লইয়া ব্যবসায় করিতেছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই এক বৎসরের মধ্যে দুই তিন লক্ষ টাকার মালিক হইলেন। জগদীশের পরামর্শ অনুসারে রজনী যুদ্ধের প্রায় ছয় মাস পূর্ব্বে অনূন চল্লিশ হাজার টাকার ঔষধ কিনিয়া গুদামজাত করিয়া রাখিয়াছিলেন। তখন যুদ্ধের কথা কেহ কল্পনাও করে নাই। ছয় মাস পরে যুদ্ধ আরম্ভ হইতেই সেই সকল ঔষধের মূল্য বৃদ্ধি হইতে লাগিল। অবশেষে এক টাকার ঔষধ পনর ষোল এমন কি কুড়ি টাকা দিয়াও পাওয়া কষ্টকর হইল। এই সুযোগে জগদীশের ঔষধের দোকানে প্রায় আট লক্ষ টাকা লাভ হইল। রজনী দোকানখানি অপেক্ষাকৃত বড় ও ভাল করিয়া সুসজ্জিত করিলেন। দোকানে কর্ম্মচারীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাইল, রজনীর পক্ষে একাকী দোকানের কাষ চালান দুর্ঘট হইল। জগদীশ চুঁচুড়ার দোকান পৈতৃক আমলের “গন্ধেশ্বরীর টাট” ছাড়িয়া কলিকাতার দোকানে আসিয়া বসিতে সম্মত হইলেন না। তিনি রজনীকে বলিলেন, “একজন ভাল দেখে কাষের লোক নিযুক্ত কর।”

যুদ্ধের জন্য ভারতবর্ষে অকস্মাৎ জার্ম্মানপরিচালিত ব্যবসায়-গুলি বন্ধ হইয়া গেল! কলিকাতার বহু পুরাতন “শোডার স্মিথ” প্রভৃতি জার্ম্মান আফিসগুলির সঙ্গে অবিনাশের অন্নদাতা “লানড্রফ ব্লিমান” কোম্পানির ব্যবসায় বন্ধ হইল! চাকরী যাওয়াতে অবিনাশ চারিদিক অন্ধকার দেখিলেন। তাঁহার মাসিক পঁচাশী টাকা আয় বন্ধ হইল। যে চল্লিশ টাকা বাটীভাড়া পাইতেন, তাহার উপর নির্ভর করিয়া সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ অসম্ভব। অবিনাশের মত শত শত বাঙ্গালী কেরাণীর ঐরূপ অবস্থা হইল!

বিনা মেঘে বজ্রপাতের মত অবিনাশের সংসারে তাঁহার কর্ম্মচ্যুতির সংবাদ আসিল। সেদিন রাত্রিতে অবিনাশ, গিরিবালা বা ভোলানাথ কাহারও নিদ্রা হইল না। ভবিষ্যৎ চিন্তায় সকলেই বিনিদ্র রজনী যাপন করিলেন।

উমা সকল কথা শুনিয়া তাহার শাশুড়ীকে বলিল, “আচ্ছা মা, আপনারা এত ভাবছেন কেন? বাবা কেন একখানা দোকান করুন না।”

গিরিবালা পুত্রবধূকে কোলের কাছে টানিয়া লইয়া বলিলেন, “পাগলী বেটী, দোকান কি অমনি হয়? দোকান কর্ত্তে যে এক হাজার দু'হাজার টাকা চাই, সে টাকা কোথা?”

“কেন—আমার ত এত গয়না রয়েছে, বিক্রী করলেই ত টাকা পাওয়া যাবে।”

“বালাই ষাট, ওকথা মুখে আনতে নেই। তোমার গয়না জন্ম জন্ম তুমি পরে থাক।”

অবিনাশ গিরিবালার মুখে, উমার প্রস্তাবের কথা শুনিয়া বলিলেন, “বৌমা পাকা কথাই বলেছেন। যদি চাকরীর মায়া ত্যাগ করে একখানা দোকান কর্ত্তেম, তাহলে আজ আমার ভাবনা কি? কিন্তু টাকা যোগাড় করতে পারলেই ত ব্যবসা চালান যায় না, ব্যবসার শিক্ষা চাই।” একদিন অবিনাশ যে দোকানদারকে বুদ্ধির দোষে ঘৃণা ও করুণার পাত্র বলিয়া মনে করিয়াছিলেন, আজ সেই দোকানদারকে তিনি ঈর্ষার পাত্র বলিয়া মনে করিলেন।

চাকরী যাওয়ায় পুত্রের বিদ্যাশিক্ষা বন্ধ হইল, কলেজের বেতন যোগাইবার ক্ষমতা আর রহিল না। অনূঢ়া কন্যা উষা বার বৎসরের হইল, আগামী বৎসর না হয় পর বৎসর তাহার বিবাহ দিতেই হইবে, অথচ হাতে একটি পয়সা নাই, বাড়ীভাড়া চল্লিশটি টাকা মাত্র সম্বল!

ভাবনায় ভাবনায় দিন কাটিতে লাগিল। মাস দুই পরে অবিনাশের সহিত পথিমধ্যে হরিপ্রসন্নর সাক্ষাৎ হইলে অবিনাশ নিজের সাংসারিক দুরবস্থার কথা উত্থাপন করিয়া বলিলেন, “রোজই ভাত মুখে দিয়ে চাকরির চেষ্টায় আফিসে আফিসে ঘুরে ঘুরে বেড়াই, কোথাও টাকা পঞ্চাশের মতও একটা চাকরি জোগাড় করতে পারলাম না।”

হরিপ্রসন্ন বলিলেন, “বড়বাজারে 'ইউনিভার্সেল মেডিকেল ষ্টোরে' একবার চেষ্টা করে দেখুন দেখি, শুনেছি সেখানে এক আধ জন লোক নিচ্ছে।”

এই সংবাদ পাইয়া অবিনাশ সেই দিনই উল্লিখিত স্থানে অর্থাৎ রজনী-পরিচালিত জগদীশের ঔষধের দোকানের উদ্দেশ্যে গমন করিলেন। যথাসময়ে দোকানে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, একটা প্রকাণ্ড হলঘরের মধ্যে চারিদিকে বড় বড় কাচের 'শো-কেস' সজ্জিত, দশ বার জন কর্ম্মচারী নানা কাযে ব্যস্ত। পাশের একটা ঘরে কম্পাউণ্ডাররা ঔষধ প্রস্তুত করিতেছে, কোন স্থানে বিদেশে চালান দিবার জন্য নানাপ্রকার ঔষধ বাক্সবন্দী করা হইতেছে। তিনি এক জন কর্ম্মচারীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “ম্যানেজার বাবু কোথা?”

সেই কর্ম্মচারী পর্দ্দার অন্তরালে একটা কক্ষ দেখাইয়া দিলেন। অবিনাশ সেই কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিতে যাইতেছিলেন, এমন সময় এক জন সাহেব সেই কক্ষ হইতে বাহির হইয়া আসিলেন। অবিনাশ কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, এক জন গৌরবর্ণ, প্রশস্ত ললাট, ক্ষৌরিত মুখমণ্ডল মধ্যবয়স্ক বাঙ্গালী ভদ্রলোক একটা প্রকাণ্ড সেক্রেটারিয়েট টেবলের এক পার্শ্বে বসিয়া আছেন, টেবলের অন্য পার্শ্বে দুই তিনখানা খালি চেয়ার।

অবিনাশ কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিবামাত্র তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, “কি চান?”

অবিনাশ নমস্কার করিয়া পকেট হইতে একখানা আবেদনপত্র বাহির করিয়া তাঁহার হাতে দিয়া নীরবে দণ্ডায়মান রহিলেন। সেই ভদ্রলোক প্রতি নমস্কার করিয়া একখানা চেয়ার দেখাইয়া দিলেন এবং নীরবে দরখাস্তখানা পড়িতে লাগিলেন। পড়া শেষ হইলে তিনি বলিলেন, "আপনি 'ল্যাণ্ডুক ব্রীমানের' আফিসে কায কর্তেন? কত দিন সেখানে ছিলেন?"

"প্রায় একুশ বৎসর।"

"আপনি ঔষধ বিভাগে ছিলেন, ঔষধের কায সম্বন্ধে নিশ্চয়ই আপনার জ্ঞান আছে।"

"সে কায আমার একেবারে অজানা নয়।"

"সেখানে কত বেতন পেতেন?"

"পঁচাশী টাকা।"

"আজ শুক্রবার, আপনি একবার সোমবার আসবেন। আরও ক'খানা দরখাস্ত আছে, দেখে স্থির করা যাবে। এ দরখাস্ত-খানা রেখে যেতে পার্বেন?"

"আপনি রেখে দিন। পরশু কখন্ আসব?"

"এম্নি সময় আসবেন।"

"যে আজ্ঞা" বলিয়া অবিনাশ নমস্কার পূর্ব্বক বিদায় গ্রহণ করিলেন। অবিনাশ প্রস্থান করিবামাত্র ম্যানেজার বাবু একখানা চিঠির কাগজ লইয়া লিখিলেন,

"ভাই জগদীশ,

আজ বেয়াই মশাই এইমাত্র চাকরির উমেদার হয়ে এসে-ছিলেন, তাঁকে সোমবারে আসতে বলে দিয়েছি। তাঁর সঙ্গে আমার চাক্ষুষ আলাপ-পরিচয় না থাকাতে ভালই হয়েছে। উমার মুখে আমার নাম হয় ত শুনে থাকতে পারেন, তাই মনে করছি, বেয়ায়ের কাছে আর পিতৃদত্ত নামে আত্মপ্রকাশ করব না, কি বল? রবিবার এখানে এসে আহার করবে, আমি তোমার জন্য অপেক্ষা ক'রে থাকব! এ দিকের সংবাদ সব মঙ্গল। ইতি।

তোমার রজনী।"

রবিবারে জগদীশ রজনীর বাটীতে আসিলে, উভয় বন্ধুতে মিলিয়া অনেক কথা-বার্ত্তা ও পরামর্শ হইল। জগদীশ বলিলেন, "তোমার নাম বদল ক'রে কায নাই। বেয়াই দোকানের অন্য লোকের মুখে তোমার প্রকৃত নাম জানতে পারেন, চিঠি-পত্রে তোমার নাম ধরা পড়তে পারে। রজনী নামেই থাক, কলকাতায় হাজার হাজার রজনী থাকতে পারে।"

সোমবারে অবিনাশ নূতন কার্য্যক্ষেত্রে গিয়া ম্যানেজারের কক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, ম্যানেজার বাবুর টেবলের দক্ষিণ পার্শ্বে আর একটা বড় সেক্রেটারিয়েট টেবল ও চেয়ার প্রভৃতি রহিয়াছে। অবিনাশ অফিস ঘরে ঢুকিয়া রজনীকে নমস্কার করিলে তিনি প্রতিনমস্কার করিয়া বসিতে বলিলেন, এবং ক্ষণকাল পরে বলিলেন, "আপনাকে লওয়াই আমরা স্থির করেছি। ঔষধের কায সম্বন্ধে আপনার অভিজ্ঞতা আছে, অন্য দরখাস্তকারীদের তা নাই। আপনি কবে কাযে যোগদান কর্তে পারেন?"

"আমি ত এখন বেকার, বলেন ত আজ থেকেই কাযে লাগতে পারি।"

"আজ দিন ভাল নয়। আপনি কাল থেকে আসবেন। আপনি কোথায় থাকেন?"

"—নং অখিল মিস্ত্রীর লেন, চাঁপাতলা।"

"তবে ত আমার বাড়ীর কাছে, আমি থাকি স্কটস্ লেনে। তা বেশ হ'ল, কাল বেলা এগারটার সময় আপনি প্রস্তুত হয়ে থাকবেন, আমি আসবার সময় আপনাকে ডেকে আনব।"

ম্যানেজার বাবুর সহৃদয়তা ও ভদ্রতায় রজনী আপ্যায়িত হইয়া গেলেন। পরদিন রজনী আফিসে যাইবার সময় অবিনাশের বাটীর সম্মুখে গাড়ী দাঁড় করাইবামাত্র দেখিতে পাইলেন, অবিনাশ প্রস্তুত হইয়াই বৈঠকখানাতে বসিয়া আছেন। তিনি ম্যানেজার বাবুকে দেখিয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া আসিলেন এবং গাড়ীতে উঠিয়া সম্মুখের আসনে বসিতে উদ্যত হইলে রজনী তাঁহার হাত ধরিয়া জোর করিয়া নিজের পার্শ্বে বসাইলেন এবং বলিলেন, "আপনি আমা অপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ, আপনি ওখানে ব'সে আমাকে অপরাধী করবেন না।"

রজনীর অমায়িকতায় অবিনাশ মুগ্ধ হইলেন। পথে আসিতে অবিনাশ জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ গাড়ী কি আপনার?"

"আফিসের গাড়ী। আফিসের কাযেই ব্যবহার হয়। সকালে আমাকে বাড়ী থেকে নিয়ে যায় আবার সন্ধ্যার সময় রেখে যায়। আপনাকে আর চ'লে কিম্বা ট্রামে যাতায়াত কর্তে হবে না, এক সঙ্গেই যাতায়াত করা যাবে। আমাকে মাঝে মাঝে কলকাতার বাইরেও দশ-পনর দিনের জন্য যেতে হয়, সে সময় আপনি একলাই এই গাড়ীতে যাতায়াত কর্বেন।" আফিসে উপস্থিত হইয়া অবিনাশ দেখিলেন যে, ম্যানেজারের কক্ষে যে নূতন টেবলটা আনা হইয়াছে, সেটা অবিনাশের ব্যবহারের জন্য। রজনী তাঁহাকে সেই টেবল দেখাইয়া দিয়া বলিলেন, "আপনি এইখানে আমার পাশেই বসবেন, দু'জনে পরামর্শ করে কায করা যাবে।"

অবিনাশ বলিলেন, "আগে কিছুদিন আপনার সাক্‌রেদি ক'রে কায-কর্ম্ম শিখে নিই, তারপর পরামর্শ করবেন।"

সে দিন এবং তাহার পর কয়েক দিন ধরিয়া যে সকল সাহেব, মাড়োয়ারী বা বাঙ্গালী দালাল রজনীর নিকট আসিয়াছিলেন, রজনী তাহাদের নিকটে অবিনাশকে সহকারী ম্যানেজার বলিয়া পরিচিত করাইয়া দিলেন। আগন্তুকদিগের মধ্যে কয়েকজন অবিনাশের পূর্ব্বপরিচিতও ছিলেন, তাঁহারা 'ল্যাণ্ডুক ব্রীমানের' আফিসে পূর্ব্বে অবিনাশকে দেখিয়াছিলেন। অবিনাশ যে কত বেতন পাইবেন, তাহা কিছুই জানিতে পারিলেন না, অনুমান করিলেন যে, যখন ম্যানেজার বাবু তাঁহাকে সহকারী ম্যানেজার বলিয়া সকলের নিকট পরিচয় দিতেছেন, তখন বোধ হয় পঞ্চাশ সাট টাকার কম হইবে না।

অবিনাশ ইংরেজী মাসের ৯ই তারিখে নূতন কার্য্যে যোগদান করিয়াছিলেন। সে মাস শেষ হইলে পর মাসের ১লা তারিখে দোকানের এক জন কর্ম্মচারী আফিসের "পে-বুক" বা বেতনের হিসাব পুস্তক অবিনাশের নিকট আনিয়া বিনয় সহকারে বলিলেন, "এয়ে আপনার নামটা সই ক'রে আপনার বেতনের টাকাটা বুঝে নিন।"

অবিনাশ দেখিলেন, কর্ম্মচারীদের নামের তালিকায় প্রথমেই তাঁহার নাম এবং নামের পার্শ্বে বেতনের পরিমাণ একশত টাকা

লেখা আছে। উপরন্তু তিনি যে প্রথম আট দিন আফিসে যোগদান করেন নাই, সেই আট দিনের বেতন ধরিয়া পূরা একশত টাকাই তাঁহাকে দেওয়া হইল। তিনি পে-বুকে সই করিলে কর্ম্মচারী তাঁহাকে দশখানা দশ টাকার নোট দিয়া প্রস্থান করিলেন।

কর্ম্মচারী চলিয়া গেলে অবিনাশ রজনীকে বলিলেন, "মহাশয়, একটা কথা আমি বুঝতে পারছি না। পূর্ব্ব আফিসে আমার বেতন ছিল পঁচাশী টাকা, সুতরাং এখানে আমি পঞ্চাশ ষাট টাকার অধিক আশা করিনি, এখন দেখছি আমার বেতন একশত টাকা নির্দ্দিষ্ট হয়েছে। ইহার কারণ কি? দ্বিতীয়, আমি ৯ই তারিখে কাযে নিযুক্ত হয়েছি। অথচ আমাকে পূরা মাসের বেতন দেওয়া হ'ল কেন? এটা বোধ হয় ভুল হয়েছে?"

রজনী হাসিয়া বলিলেন, "না, ভুল হয় নাই। আমি পূরা মাসের বেতন দিবারই ব্যবস্থা করেছি। আপনি কায করেন নি ব'লে সামান্য কুড়ি পঁচিশ টাকা কেটে আফিসের কি লাভ হবে, অথচ এই কুড়ি পঁচিশ টাকায় আপনার উপকার হবে। তারপর আপনার বেতন? আপনি সাহেবের আফিসে যে কায করতেন, যদি এক জন সাহেব সেই কাযে নিযুক্ত থাকতেন, তা হলে তাঁর কত বেতন হত? বোধ হয় তিনশত টাকার কম নয়। কিন্তু আপনি সাহেব নন বলেই আপনাকে মাত্র পঁচাশী টাকা দেওয়া হত। সাহেবরা এ দেশে টাকা লুঠ করতে আসে, তারা এ দেশের টাকা স্বদেশে নিয়ে যেতে চায়, তা' স্বদেশবাসীর বেতন হিসাবেই হ'ক আর আফিসের লাভ হিসাবেই হ'ক। আমাদের এটা বাঙ্গালীর আফিস, আমরা বাঙ্গালার টাকা বাঙ্গলাতে রাখতে চাই, তা' আমার ঘরেই হ'ক কি আপনার ঘরেই হ'ক। আজ যদি এক জন পার্শি বা মাদ্রাজীকে আপনার পরিবর্ত্তে লওয়া হত, তা হ'লে তার বেতন পঞ্চাশ ষাট টাকাই হ'ত।"

অবিনাশ রজনীর কথা শুনিয়া অনেকক্ষণ নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন, তার পর ধীরে ধীরে বলিলেন, "আপনাকে আমি আর কি বলব, আপনার সদাশয়তায় ও মহানুভবতায় আমি আপনার কেনা গোলাম হয়ে রইলাম। জানি না, কি ব'লে আপনার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করব।"

রজনী বলিলেন, "আমাকে অমন কথা বলবেন না। আমরা কেউ কারও গোলাম নাই, আমরা সকলেই সেই এক জনের গোলাম। যদি কারও কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে হয়, তবে তাঁর কাছে করবেন, তাঁর ধন্যবাদ করবেন, আমি ত উপলক্ষ মাত্র।"

আরও তিন বৎসর অর্থাৎ উমার বিবাহের পর সাড়ে পাঁচ বৎসর অতীত গর্ভে বিলীন হইয়া গেল। উমা এখন উনিশ বৎসর বয়সে পদার্পণ করিয়াছে। তাহার আজ দেড় বৎসর হইল একটি পুত্র হইয়াছে। কন্যার পুত্র-সম্ভাবনার সংবাদে মহামায়া যৎপরোনাস্তি আনন্দ প্রকাশ করিলেন, কিন্তু পরমুহূর্ত্তে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, "প্রথম পোয়াতী মার কাছে বাপের বাড়ীতে প্রসব হলেই বেশ হ'ত।"

জগদীশ সে কথা শুনিয়া বলিয়াছিলেন, "প্রথম পোয়াতী কলকাতায় প্রসব হওয়াই ভাল। সেখানে পাকা দাই আছে, মেয়ে ডাক্তার আছে, বড় বড় ডাক্তার আছে, কোন ভাবনা নাই।"

উমার সাধের সময় জগদীশ স্বর্ণালঙ্কার এবং বহুমূল্য বস্ত্র পাঠাইয়াছিলেন। দৌহিত্রের অন্নপ্রাশনের সময়েও শিশুর স্বর্ণ ও রৌপ্য অলঙ্কার, একসেট রূপার বাসন এবং নগদ এক শত টাকা পাঠাইয়াছিলেন, কিন্তু নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে কেহই আসেন নাই। সেই বিবাহের পর হইতে দুই বৈবাহিকের মধ্যে আর দেখা-সাক্ষাৎ হয় নাই।

উমার পুত্রের অন্নপ্রাশনের কিছু পূর্ব্বে তাহার ননদ উষারও বিবাহ হইয়াছিল। রজনী অবিনাশকে বলিয়াছিলেন যে, উষার বিবাহ যেন ভাল জায়গায় দেওয়া হয়, টাকার জন্য কোন চিন্তা নাই। উষাও ধনবানের বাটীতেই পড়িয়াছিল, সেও দেখিতে বেশ সুশ্রী ছিল। কন্যার বিবাহে অবিনাশ প্রায় তিন হাজার টাকা ব্যয় করিয়াছিলেন, তার মধ্যে আড়াই হাজার টাকা অবিনাশ আফিস হইতে ঋণ করিয়াছিলেন। কন্যার বিবাহে অবিনাশ জগদীশকেও নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন, জগদীশ 'আইবুড় ভাতে' বস্ত্র ও মিষ্টান্ন আদি পাঠাইয়াছিলেন।

আড়াই বৎসরে অবিনাশের বেতন এক শত হইতে আড়াই শত হইয়াছিল। তিনি বুদ্ধিমান ও কার্য্যদক্ষ ছিলেন, রজনী সর্ব্বদা তাঁহার সহিত পরামর্শ করিয়া কায করিতেন। ভোলানাথ বি-এ পাশ করিবার পর, রজনীর অনুরোধে পিতার সঙ্গে কাযে বাহির হইয়াছিল, তাহারও আশী টাকা বেতন হইল।

এই কয় বৎসরে অবিনাশের সহিত রজনীর নিবিড় ঘনিষ্ঠতা হইয়াছিল। এক দিন হেমাঙ্গিনী উপযাচক হইয়া অবিনাশের বাড়ীতে গিয়া গিরিবালার সহিত আলাপ করিয়া আসিলেন, গিরিবালার আনন্দ আর ধরে না। হেমাঙ্গিনী উমাকে কাছে টানিয়া লইয়া কত আদর করিলেন। উমা তাঁহাকে দেখিয়া অনেকক্ষণ বিস্মিত নেত্রে চাহিয়া চাহিয়া বলিল, "আমি আপনাকে যেন কোথায় দেখেছি বলে মনে হয়।"

হেমাঙ্গিনী বলিলেন, "আমাকে আর কোথায় দেখবে, মা? তোমার বাপের বাড়ী কোথা?"

গিরিবালা বলিলেন, "বৌমার বাপের বাড়ী চুঁচুড়ো।"

হেমাঙ্গিনী বলিলেন, "তবে ঠিক হয়েছে, আমার এক যমজ বোন আছে, তার বিয়ে হয়েছে চুঁচুড়ায় বড় বাজারে ঘোষেদের বাড়ী।" এই বলিয়া তিনি স্বীয় বৈমাত্রেয় দেবরের নাম করিলেন। উমা বলিল, "তাঁর নাম শুনেছি। আপনার বোন আমার বিয়ের সময় আমাদের বাড়ীতে এসে দু' তিন দিন ছিলেন। আমি তাঁকে কাকী-মা বলতুম।"

"তুমি আমাকেও কাকী-মা বোল, আমিও তোমাকে উমা বলে ডাকব।"

অল্পদিনের মধ্যেই এই দুই পরিবারের মধ্যে যথেষ্ট ঘনিষ্ঠতা হইল। হেমাঙ্গিনী ও গিরিবালা পরস্পরকে 'দিদি' বলিয়া সম্বোধন করিতেন।

ইতিমধ্যে জগদীশ একবার সস্ত্রীক তীর্থ করিয়া আসিলেন। কলিকাতার ব্যবসায়ের কার্য্য উপলক্ষে তাঁহাকে দিল্লী যাইতে হইয়াছিল, সে সময় রজনী কলিকাতার কার্য্যে বিশেষ ব্যস্ত থাকাতে তাঁহার যাওয়া হইল না, অগত্যা জগদীশকেই যাইতে

হইল। জগদীশ মহামায়াকে লইয়া দিল্লী, আগরা, মথুরা, বৃন্দাবন, মীরাট, লক্ষ্ণৌ, কাণপুর, এলাহাবাদ, কাশী ও গয়া হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। প্রয়াগে তিনি মস্তক মুণ্ডন ও গুম্ফ ত্যাগ করিলেন। জগদীশের গোঁফ যেমন বড়, তেমনই মোটা ছিল, সেরূপ গোঁফ বাঙ্গালীর বড় কমই দেখা যায়। গোঁফ কামাইয়া ফেলাতে তাঁহার মুখশ্রীর পরিবর্ত্তন হইল। এক একজন লোক থাকে, যাহারা গোঁফ কামাইলে সম্পূর্ণ নূতন লোক বলিয়া মনে হয়। জগদীশেরও তাহাই হইল। তিনি ত্রিবেণী-সঙ্গমে যখন কেশ ও গুম্ফ ত্যাগ পূর্ব্বক পিতৃ-পুরুষের শ্রাদ্ধ করিয়া বাসাতে ফিরিয়াছিলেন, তখন তাঁহার সমভিব্যাহারী কর্ম্মচারী, পাচক ও ভৃত্যও সহসা তাঁহাকে চিনিতে পারে নাই।

ব্যবসায়ে প্রচুর লাভ হইবার পর জগদীশ, রজনীর পরামর্শে হলুদপুরের পুরাতন বাটী ভাঙ্গিয়া তথায় নূতন বাটী নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। পুরাতন বাটীটি ছোট ছিল, নূতন বাটী খুব বড় এবং দ্বিতল হইল। অন্তঃপুরের সংলগ্ন একটা প্রকাণ্ড বোধ হয় আট দশ বিঘা আমবাগান ও বাগানে দুই তিনটা পুষ্করিণী ছিল, সে সকলের সংস্কার করা হইল, বাগানের চতুর্দ্দিক উচ্চ প্রাচীর দিয়া ঘেরা হইল। বাটীর সম্মুখে একটা বড় পুষ্করিণী ছিল, তাহার পঙ্কোদ্ধার ও ঘাট বাঁধান হইল। এই সকল কার্য্যে রজনী কলিকাতা হইতে দরজা, জানালা, লোহার কড়ি, বরগা, রেলিং প্রভৃতি এবং সুদক্ষ রাজমিস্ত্রি পাঠাইয়াছিলেন।

বাটীর নির্ম্মাণকার্য্য শেষ হইলে, রজনী কলিকাতা হইতে গৃহ-সজ্জা কিনিয়া পাঠাইয়া দিলেন। প্রত্যেক কক্ষ সুন্দর ছবি, দর্পণ, চেয়ার, টেবল, সতরঞ্চ গালিচায় সুসজ্জিত করা হইল। কলিকাতায় কোন নার্সারিকে সদর পুকুরের তিন দিকে এবং খিড়কীতে ফুলবাগান করিবার কণ্ট্রাক্ট দিয়া সুন্দর ফুলবাগান করা হইল।

এই সকল কার্য্য সম্পন্ন হইলে রজনী জগদীশকে ধরিয়া বসিলেন—এ বৎসর পৈতৃক ভিটায় দুর্গোৎসব করিতে হইবে। জগদীশ প্রথমে একটু আপত্তি করিয়া শেষে সম্মত হইলেন। বলা বাহুল্য যে, রজনীর অনুরোধ মহামায়াও সমর্থন করিয়াছিলেন। জন্মাষ্টমীর দিন "কাটাম" পূজা হইল, যথাসময়ে কুম্ভকার আসিয়া প্রতিমা নির্ম্মাণ আরম্ভ করিল।

পূজার কয়েক দিন পূর্ব্বে, একটা রবিবার মধ্যাহ্নকালে আহারাদির পর রজনী ও হেমাঙ্গিনী অবিনাশের বাটীতে উপস্থিত হইলেন। এইরূপ যাতায়াত এই দুই পরিবারে সর্ব্বদাই হইত।

রজনী অবিনাশকে লইয়া বৈঠকখানাতে প্রবেশ করিলেন, হেমাঙ্গিনী অন্তঃপুরে গিরিবালার নিকট গমন করিলেন। রজনী বৈঠকখানাতে উপবেশন করিয়া বলিলেন, "দাদা, আজ আপনাকে নিমন্ত্রণ করতে এসেছি।"

ইদানীং রজনী অবিনাশকে "দাদা" বলিয়া সম্বোধন করিতেন। রজনী অপেক্ষা অবিনাশ পাঁচ ছয় বৎসরের বড় ছিলেন। রজনীকে অবিনাশ 'ম্যানেজার বাবু' বলিয়া ডাকিতেন। রজনীর কথা শুনিয়া অবিনাশ সহাস্যে বলিলেন, "কি রকম? আপনারই ত খাচ্ছি। আবার নিমন্ত্রণ কি?"

"সে খাওয়া নয়, এবার সত্য নিমন্ত্রণ। এ বৎসর মা দশভুজাকে বাড়ীতে আনবার ব্যবস্থা করেছি!"

"বেশ কথা, বড় আনন্দের কথা। কিন্তু আপনার বাড়ীতে দুর্গাপূজার স্থান কোথায়?"

"এ বাড়ীতে নয়, আমাদের দেশের বাড়ীতে।"

"দেশের বাড়ীতে? আপনার ত এখানেই বাড়ী, আবার দেশ কোথা?"

"এখানকার বাড়ী আমার মাতামহের, আমি তাঁর উত্তরাধিকারী বলে এই বাড়ী পেয়েছি। আমাদের আসল বাড়ী হুগলী জেলায়, সপ্তগ্রামের কাছে হলুদপুর।"

"হলুদপুর? দেবানন্দপুরের কাছে?"

"আপনি জানেন নাকি? হলুদপুরে কখনও গিয়েছিলেন?"

"না, যাইনি কখনও। শুনেছি আমার বেয়াই—ভোলার শ্বশুরের পৈতৃক বাস হলুদপুর।"

"ভোলার শ্বশুরবাড়ী চুঁচুড়ায় না?"

"হাঁ, ভোলার দাদাশ্বশুর হলুদপুর থেকে চুঁচুড়ায় এসে বাস করেছিলেন।"

"আমাদের গ্রামে কয়েকঘর আপনাদের স্বজাতি আছেন বটে। আপনার বেয়ায়ের নাম কি?"

"জগদীশ পাল।"

"কৈ, হলুদপুরে জগদীশ পাল বলে কাকেও দেখেছি বলে মনে হচ্ছে না। তবে সেখানে পালেদের একটা ভাঙ্গা বাড়ী এবং মস্ত একটা বাগান আছে বটে।"

"হয় ত সেইটাই হবে। তা' আপনার বাড়ী যাব, এর আর কথা কি? কবে যেতে হবে?"

"আমি সপরিবারে দুই চার দিন আগে যাব। আপনি ষষ্ঠীর দিন বেলা ১টার সময় আফিস বন্ধ ক'রে বৌদিদি, ভোলা এবং বৌমাকে নিয়ে যাবেন। বৈকালে ৪টার সময় ব্যাণ্ডেলে আফিসের রাম সিং কি শিবরতন যে হয় থাকবে, সেই আপনাদের সঙ্গে ক'রে নিয়ে যাবে। বিদেশে গোলমালের বাড়ীতে আপনাদের হয় ত অনেক কষ্ট অনেক অসুবিধা হবে, তবে সেটা আপনার নিজের বাড়ী মনে ক'রে সব সহ্য করতে হবে। আমার স্ত্রীও, বৌদিদি আর বৌমাকে বলতে এসেছেন।"

"বিলক্ষণ, এ আর বলাবলি কি? আমি ত পূর্ব্বেই বলেছি, আপনি আমাকে কিনে রেখেছেন, আপনি কাকের মুখে খবর—"

"কাকের মুখে কেন, নিজের মুখেই খবর দিচ্ছি। আর কেনা কিনি বলছেন, যাঁর কেনবার তিনিই কিনেছেন, আমরা উপলক্ষ মাত্র।"

অবিনাশ বুঝিলেন, রজনী ভগবানের কথাই বলিতেছেন। তাই বলিলেন, "সে ত ঠিক কথা, তাতে আর সন্দেহ কি আছে? উষার শ্বশুরবাড়ীতে পূজা, তার বোধ হয় যাওয়া হবে না।"

"সে ত বটেই। তা' উষাকে আর জামাই বাবাজীকে এর পর এক সময় নিয়ে গেলেই হবে।"

রজনী চতুর্থীর দিন আফিসের পর সস্ত্রীক হলুদপুরে গমন করিলেন। অবিনাশ ষষ্ঠীর দিন প্রাতে, হলুদপুরে যাইবার সমস্ত আয়োজন করিয়া আফিসে যাইলেন। পত্নীকে বলিয়া গেলেন যে, ১টার পর ভোলা আফিস হইতে বাটীতে আসিয়া গিরিবালা ও উমাকে লইয়া একবারে ষ্টেশনে যাইবে, তিনি নিজে ২টার সময় আফিস বন্ধ করিয়া সোজা ষ্টেশনে যাইবেন। আফিসের গাড়ী

রজনী হলুদপুরে লইয়া গিয়াছিলেন, অবিনাশ ও ভোলানাথ ট্যাক্সি করিয়া ষ্টেশনে যাইবেন, এইরূপ ব্যবস্থা হইল।

ষষ্ঠীর দিন অবিনাশ দুইটার সময় আফিস বন্ধ করিয়া হাওড়া ষ্টেশনে গমন করিলেন। ষ্টেশনে গিয়া দেখিলেন যে, ভোলানাথ কিছু পূর্ব্বে ষ্টেশনে আসিয়াছে এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর টিকিট কিনিয়া পিতার জন্য অপেক্ষা করিতেছে। অবিনাশ সকলকে লইয়া ট্রেণে আরোহণ করিলেন, গাড়ী ছাড়িয়া দিল।

ট্রেণ চন্দননগরে উপস্থিত হইলে উমার মন একটু চঞ্চল হইয়া উঠিল, পরের ষ্টেশন চুঁচুড়া, উমার পিত্রালয়। কত দিন উমা পিতামাতাকে দেখে নাই! সেই বিবাহের পরদিন নববধূ স্নেহময়ী জননীর ক্রোড় পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছে, তাহার পর সুদীর্ঘ পাঁচ বৎসর অতীত হইয়াছে, সে জনক-জননীর চরণ দর্শন করে নাই! গিরিবালা পুত্রবধূর মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া বলিলেন, "বৌমার মায়ের জন্য মন কেমন করছে? তা' করবারই কথা। কি করব মা, আমাদের কি অসাধ? তোমার বাবাই ত নিয়ে যান না। দেখি ওঁকে বুঝিয়ে যদি মত করতে পারি, তা' হলে ফেরবার মুখে না হয় তোমাকে ভোলার সঙ্গে চুঁচড়ায় নামিয়ে দিয়ে যাব।"

চারিটার কিছু পূর্ব্বে ট্রেণ ব্যাণ্ডেলে উপস্থিত হইল। সকলে গাড়ী হইতে নামিয়া দেখিলেন, দোকানের বেহারা শিবশরণ প্লাটফরমে দাঁড়াইয়া আছে। তাঁহাদিগকে গাড়ী হইতে অবতরণ করিতে দেখিয়া সে তাড়াতাড়ি তাঁহাদের নিকটে গিয়া তাঁহাদের দ্রব্যাদি নামাইয়া লইল এবং কুলির মাথায় তাহা চাপাইয়া দিয়া 'খোকাবাবুকে' কোলে লইয়া অগ্রসর হইল। অবিনাশ ষ্টেশনের বাহিরে আসিয়া দেখিলেন, দোকানের গাড়ী তাঁহাদের জন্য অপেক্ষা করিতেছে। সকলে গাড়ীতে আরোহণ করিলে গাড়ী ছাড়িয়া দিল। শিউশরণ গাড়ীর উপরে, কোচম্যানের পার্শ্বে উপবেশন করিল।

গিরিবালা কলিকাতার মেয়ে, কলিকাতার বৌ, কখনও কলিকাতার বাহিরে যান নাই। পল্লীগ্রাম যে কিরূপ, সে সম্বন্ধে তাঁহার কোন ধারণাই ছিল না। উমারও তথৈব চ, সে চুঁচুড়ার মেয়ে হইলেও কখনও পল্লীগ্রামে যায় নাই! ভোলানাথেরও পল্লীগ্রাম সম্বন্ধে কোন অভিজ্ঞতা ছিল না, সে রেলের গাড়ী হইতে দূরে বা নিকটে পল্লীগ্রাম দেখিয়াছিল, কিন্তু কখনও পল্লীগ্রামের ভিতর দিয়া গমন করে নাই। সুতরাং ঘোড়ার গাড়ী করিয়া যাইবার সময় সকলেই পল্লীগ্রামের বাহ্য সম্পদ ও সৌন্দর্য্য দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন। কিন্তু ঐ "ধনধান্য-পুষ্পভরা" গ্রামের ভিতরে যে ম্যালেরিয়া, ঋণভার, জমিদারের কর্ম্মচারীর এবং মহাজনের অত্যাচার কিরূপ বদ্ধমূল হইয়া গ্রামবাসীদিগকে তিল তিল করিয়া ধ্বংসমুখে ঠেলিয়া লইয়া যাইতেছে, সে সম্বন্ধে তাঁহাদের কোন ধারণাই ছিল না। তাঁহারা শরৎকালে মাঠে বঙ্গলক্ষ্মীর "অনিল-বিকম্পিত শ্যামল অঞ্চল" দেখিয়াই মুগ্ধ হইলেন।

পথের পার্শ্বে একটা জলাশয়ে শত শত শ্বেত ও লাল পদ্ম ফুটিয়া ছিল, তাহা দেখিয়া গিরিবালা বলিলেন, "কি সুন্দর পদ্মফুল ফুটে রয়েছে দেখ। ইচ্ছে হয় তুলে নি।"

ভোলানাথ তাহা শুনিয়া গাড়ী থামাইতে বলিল এবং গাড়ী হইতে নামিয়া ফুল তুলিতে অগ্রসর হইল। তাহা দেখিয়া শিউশরণ কোচবাক্স হইতে লাফাইয়া পড়িল এবং বলিল, "আপ্‌নে গাড়ী পর বৈঠেন বাবু, হামি ফুল এনে দিচ্ছে।" এই বলিয়া সে এক উরু জলে নামিয়া অনেকগুলা শ্বেত ও লাল পদ্ম তুলিয়া আনিয়া ভোলানাথের হাতে দিল এবং একটা লাল পদ্ম খোকার হাতে দিয়া বলিল, "খোকাবাবু ফুল লিবে?"

খোকাবাবু সানন্দে হাত বাড়াইয়া ফুলটি লইল এবং মুহূর্ত্ত-মধ্যে তাহা ছিঁড়িয়া টুকরা টুকরা করিল। ভোলানাথের ইচ্ছা হইল কয়েকটা ফুল উমার হাতে দেয়, কিন্তু পিতামাতার সম্মুখে লজ্জায় দিতে পারিল না, সে সব ফুলই গিরিবালার হাতে দিল। গিরিবালা তাহা উমার হাতে দিয়া বলিলেন, "বৌমা, ফুলগুলো রেখে দাও, কাল মায়ের চরণে পুষ্পাঞ্জলি দেব।"

বেলা পাঁচটার পর একটা দূরবর্ত্তী গ্রামে একটি সুন্দর দ্বিতল অট্টালিকা দেখিতে পাওয়া গেল।

গিরিবালা বলিলেন, "হাঁগা, ওটা কাদের বাড়ী? কি সুন্দর দেখতে, যেন ছবিটি।"

অবিনাশ বলিলেন, "বোধ হয় কোন জমিদারের হবে।"

কিয়দ্দূর গিয়া গাড়ী মোড় ফিরিয়া সেই অট্টালিকার দিকেই যাইতে লাগিল। তখন অবিনাশ বলিলেন, "গাড়ী বোধ হয় ঐ গ্রামের কাছ দিয়ে কি ভিতর দিয়েই যাবে।"

আরও প্রায় দশ মিনিট পরে গাড়ী ধূলি-সমাচ্ছন্ন বন্ধুর কাঁচা রাস্তা ছাড়িয়া একটা প্রকাণ্ড পুষ্করিণীর পাশ দিয়া পাকা রাস্তা ধরিয়া চলিল। সেই পুষ্করিণীও পদ্মফুলে আবৃত। সকলে একদৃষ্টে সেই পুষ্করিণীর শোভা দেখিতেছিলেন, এমন সময় গাড়ীর গতি বন্ধ হইল, তখন সকলে গাড়ী থামিবার কারণ জানিবার জন্য গাড়ীর অপর পার্শ্বের দ্বারে দৃষ্টিপাত করিবামাত্র দেখিতে পাইলেন, রজনী এবং তাঁহার পশ্চাতে অর্দ্ধাবগুণ্ঠনবতী হেমাঙ্গিনী দাঁড়াইয়া আছেন!

সহিস গাড়ীর দ্বার খুলিবামাত্র হেমাঙ্গিনী আসিয়া খোকাকে কোলে লইলেন এবং গিরিবালা ও উমাকে লইয়া বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন, অবিনাশ ও ভোলানাথও রজনীর সহিত সেই অট্টালিকায় প্রবেশ করিলেন। বাটীর প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইয়া সকলে দেখিলেন, সম্মুখে সুন্দর দক্ষিণ-দ্বারী দালানে দশভুজা দুর্গা লক্ষ্মী সরস্বতী ও কার্ত্তিক গণেশসহ দালান আলো করিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। সকলে প্রতিমাকে প্রণাম করিলে হেমাঙ্গিনী গিরিবালা ও উমাকে লইয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন, রজনী অবিনাশ ও ভোলানাথকে লইয়া উপরের বৈঠকখানায় গমন করিলেন। তাঁহারা উপরে উঠিয়া তিন চারিটি কক্ষ অতিক্রম পূর্ব্বক বৈঠকখানাতে উপস্থিত হইলে অবিনাশ ও ভোলানাথ বৈঠকখানার সজ্জা দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। যে সকল কক্ষ তাঁহারা পার হইয়া আসিলেন, সেই সকল কক্ষও সুন্দররূপে সজ্জিত, কিন্তু বৈঠকখানাই সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দররূপে সজ্জিত। চারি দিকে দেওয়ালে সুন্দর সুন্দর চিত্র এবং বড় বড় আয়না, দেওয়ালের নিকটে স্প্রিংওয়ালা কৌচ, চেয়ার, মধ্যস্থলে একটি প্রকাণ্ড মার্ব্বেল পাথরের টেবল। টেবলের উপরে ছাদ হইতে একটা ঝাড় ঝুলিতেছে। কক্ষতল বহুমূল্য গালিচায় আবৃত। রজনী

সেই কক্ষে আগন্তুকদ্বয়কে বসাইয়া বলিলেন, "আপনারা একটু বসুন, আমি এখনই আসছি।"

পার্শ্ববর্ত্তী একটা দ্বার দিয়া তিনি কক্ষান্তরে চলিয়া গেলেন।

রজনী প্রস্থান করিলে ভোলানাথ নিম্নস্বরে পিতাকে বলিল, "বাবা, রজনী কাকা দেখছি এক জন বিশেষ ধনী লোক। ওঁর অবস্থা আর আমাদের অবস্থা আকাশ-পাতাল তফাৎ।"

অবিনাশ বলিলেন, "তাই ত দেখছি। এর পর ওঁর সঙ্গে সমানভাবে কথা কইতে সঙ্কোচ বোধ হবে—"

এমন সময় রজনী আসিয়া বলিলেন, "কি সঙ্কোচ হবে, দাদা?"

অবিনাশ অপ্রস্তুত হইয়া বলিলেন, "আপনাকে আমার সমপদস্থ মনে ক'রে আপনার প্রাপ্য মর্য্যাদা দিই নি, সে জন্য আমি আপনার কাছে শত অপরাধী। আপনি আমার যে উপকার করেছেন, তাতে আমি চিরদিনের জন্য আপনার কেনা গোলাম হয়ে আছি। আর বেশী কি বলব?"

রজনী সহাস্যে বলিলেন, "আপনি আমার কেনা গোলাম নন! আপনি যাঁর কেনা গোলাম, আমিও তাঁর কেনা গোলাম। এই যে তিনি খোকা বাবুকে নিয়ে আসছেন।"

জগদীশ দৌহিত্রকে বুকে লইয়া কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া বলিলেন, "বেহাই মশাই, চিনতে পারেন? নমস্কার, আমি আপনার সেই পাড়াগেঁয়ে ম্যাড়া—জগদীশ।"

শ্বশুরের পরিচয় পাইবামাত্র ভোলানাথ গিয়া শ্বশুরকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল, অবিনাশও তাড়াতাড়ি ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিতে যাইতেছিলেন, জগদীশ তাড়াতাড়ি দুই পা পিছু হটিয়া গিয়া বলিলেন, "হাঁ হাঁ, করেন কি? আপনি আমার বয়োজ্যেষ্ঠ, আমাকে অপরাধী করবেন না, আমিই আপনাকে প্রণাম করছি। এখন বোধ হয় বুঝতে পেরেছেন যে, জগদীশ পাল মিথ্যাবাদী জুয়াচোর নয়, মুখে যা বলে, কাযেও তা' করে?"

অবিনাশ সলজ্জে বলিলেন, "আর আমাকে লজ্জা দেবেন না। আমি এই পাঁচ বছর ধ'রে অনুতাপে জ্বলে মরছি। আপনার কাছে যে ক্ষমা চাইব, সে সাহসও কর্ত্তে পারি নি।"

"বেয়াই মশাই, ক্রোধ চণ্ডাল। সে দিন আমরা দুজনেই চণ্ডাল হয়েছিলাম। আমিই কি এই ক বছর শান্তিতে আছি? আপনার চেয়ে আমি আরও বেশী অপরাধী। এতদিন পরে সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করেছি।"

রজনী বাধা দিয়া বলিলেন, "তুমি প্রায়শ্চিত্ত পরে ক'র এখন, আগে আমাকে আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে দাও।"

অবিনাশ সবিস্ময়ে বলিলেন, "আপনার আবার কি পাপ?"

"আমার পাপ মিথ্যা কথা বলা। সব কথা খুলে বললে আপনি বুঝবেন, আমারও প্রায়শ্চিত্ত দরকার কি না। জগদীশ আমার বাল্যবন্ধু, চুঁচুড়ায় এক পাড়াতেই বাড়ী। হুগলী কলিজিয়েট স্কুল থেকে আরম্ভ করে কলেজ ক্লাস পর্য্যন্ত একসঙ্গে পড়েছি। পিতৃবিয়োগে জগদীশ কলেজ ছেড়ে দোকানে গেল, আমি বি, এ পাশ করে, কলকাতায় মাতামহের সম্পত্তি পেয়ে কলকাতায় গেলাম। চুঁচুড়ার পৈতৃক বাড়ী আমার বৈমাত্রেয় ভাই দুটিকে দান ক'রে আমি কলিকাতাবাসী হলেম। জগদীশ বি, এ পাশ করেনি বটে, কিন্তু লেখাপড়া ছাড়ে নি, বিদ্যাচর্চ্চা এখন পর্য্যন্ত সমান রেখেছে। এখনও আমার ইংরেজি মুসবিদায় ভুল ধরে। সে কথা যাক্। আমার পরামর্শে জগদীশ কলকাতায় ওষুধের দোকান করে, আমাকে চার আনার অংশী করে, আমার উপর দোকানের ভার দিলে। সেই দোকান আমাদের "Universal Medical Store" জগদীশ চুঁচুড়ার সেই বেণের দোকান নিয়েই রইল। আমাদের দোকানের যে মালিক জগদীশ, তা' আমি ছাড়া আর কেউ জানে না। উমার বিবাহের পরদিন আমি চুঁচুড়ায় গিয়ে আমার স্ত্রীর মুখে আপনাদের কলহের কথা শুনে স্তম্ভিত হলেম। শেষে প্রতিজ্ঞা করলাম যে, যেমন ক'রে পারি, আপনাদের এই মনোমালিন্য মিটিয়ে দিব, অথচ জগদীশের জেদ, ওর প্রতিজ্ঞাও বজায় রাখতে হবে। সেই জন্য কলিকাতায় গিয়েই আপনার গতিবিধির উপর নজর রাখবার জন্য হরিপ্রসন্ন বাবুর উপর গোয়েন্দাগিরির ভার দিলেম। তাঁর মুখেই আপনার কার্য্যচ্যুতির সংবাদ পাই, আবার তাঁকে দিয়েই আপনাকে, আমাদের দোকানে কর্ম্মখালির সংবাদ দিয়ে আপনাকে দোকানে আনাই। তার পর সব কথাই আপনি জানেন। এ বাড়ী আমার নয়, জগদীশের। আমি রাজাবিশেষ লোক নই, আপনারই মত মধ্যবিত্ত গৃহস্থ। এখন আপনিই ভেবে দেখুন, আপনি কার কেনা গোলাম।"

জগদীশ বলিলেন, "আমার প্রায়শ্চিত্তের শেষটাও শুনিয়ে দাও। বেয়াই মশাই, যে দিন আপনি আমাদের দোকানে যোগ দিয়েছেন, সেই দিন থেকেই আপনাকেও আমি চার আনার অংশী ক'রে নিয়েছি। আপনার মাইনে টাইনে কিছুই নয়, ওসব ভুয়ো, লোক-দেখান। এই তিন বৎসরে আপনার অংশের হাজার পাঁচশেক টাকা আপনার নামেই আফিসে জমা আছে, তাই থেকে আপনার মেয়ের বিবাহে কিছু আপনাকে দেওয়া হয়েছে। আজ থেকে আমাদের দোকানের ছয় আনার অংশী আমি অর্থাৎ খোকাবাবু। রজনী ছয় আনার, আর আপনি চার আনার মালিক। আমার চুঁচুড়ার পৈতৃক দোকান—'গন্ধেশ্বরীর টাট' বজায় থাকুক, আমি আর কিছুই চাই না, শেষ বয়সে বুড়-বুড়ীর ওতেই বেশ চলে যাবে। এই বাড়ী, বাগান, পুকুর আমি ভোলানাথ আর উমার নামে রেজিষ্টারী ক'রে দিয়েছি; রজনী তাতে সাক্ষী আছে। ভোলানাথ, তোমার বাবাকে নিয়ে আমার সঙ্গে বাড়ীর ভিতরে এসে, তোমাদের ঘর দোর বাগান পুকুর সব দেখে নাও। চল রজনী, এ বাড়ীতে তুমিও যেমন পর, আমিও তেমনি পর।"

জগদীশ পুনরায় খোকাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "আমার সোনার দাদু, তোমার ঐ বুড়ো দাদু আমায় বলে পাড়াগেঁয়ে ম্যাড়া, দাও ত ওর কাণ মলে—"

খোকাবাবু এ কথাটার অর্থ সম্পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়া পিতামহের কোলে দাঁড়াইয়া উঠিল এবং আপনার কুসুমপেলব দুইখানি ছোট ছোট হাত দিয়া অবিনাশের দুইটি কাণ ধরিয়া মাথা দোলাইতে দোলাইতে সুর করিয়া বলিল, "দোএ দোএ দাদু দোএ।"

খোকাবাবুর কাণ্ড দেখিয়া সকলে হাসিয়া উঠিলেন।

শ্রীযোগেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়।
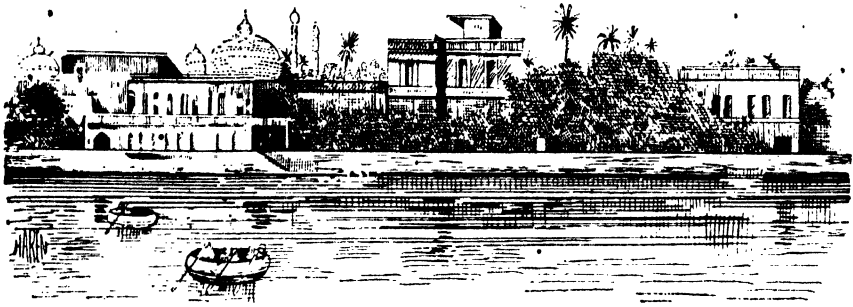
স্পেন

চিত্রকর বলিয়াছেন, "আমরাও সেখান হইতে ফিরিলাম এবং গির্জ্জার দিকে চলিলাম। এই বিস্ময়কর নাটকের অভিনয় দেখিয়া তাহার বিভিন্ন দৃশ্যে এমনই মুগ্ধ হইয়া পড়িয়াছিলাম যে, আমাদের মন ও চিন্তা তখন সেই বিষয়েই পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। কিছুদূর যাইতে না যাইতেই আমরা আর একটা শোভাযাত্রার সম্মুখীন হইলাম। এই শোভাযাত্রা তখন বিশ্রামার্থ স্থির হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। আমরা যখন ভার্জ্জিন মেরীর মূর্ত্তির সম্মুখে আসিয়া পড়িলাম, তখন দেখিলাম, কতকগুলি বাহক যবনিকার অন্তরাল হইতে দ্রুতবেগে নির্গত হইয়া সন্নিহিত পানাগারে ছুটিয়া গেল। সকলেই এক এক পাত্র বীয়ার মদ্য লইয়া স্ব স্ব স্থানে ফিরিয়া আসিল।

১২২১ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মিত গির্জ্জা

"সিরাল্ডায় পৌঁছিয়া অতিকষ্টে জনতা ভেদ করিয়া আমরা প্রকাণ্ড ধর্ম্মমন্দিরের তোরণসম্মুখে উপস্থিত হইলাম। রাজপথে আর একটি ভার্জ্জিন মূর্ত্তি রক্ষকবেষ্টিত হইয়া অবস্থান করিতেছিল। ধর্ম্ম-মন্দিরের দ্বারপথে একটা অস্পষ্ট আলোকধারা বাহিরে আসিতেছিল। পাদ-পীঠসহ মাতৃমূর্ত্তি উত্তোলিত হইল। শোভাযাত্রা ধীরে ধীরে চলিতে লাগিল। পাদপীঠ তখন

আন্দোলিত হইতেছিল! কিন্তু আবার সোজা হইয়া বাহিত হইতে লাগিল।

"তখন দিক্‌চক্রবালে তরুণ অরুণ উদিত হইয়াছে। বেদিয়ারা সেই সময় গোয়াডালকুইভার উত্তীর্ণ হইয়া অপর পারে ফিরিবার জন্য মোড় বাঁকিয়াছে। বিষণ্ণ ও ক্ষুণ্ণচিত্তে আমরা বিশ্রামার্থ হোটেলে ফিরিয়া আসিলাম। শ্রান্তদেহ শয্যায় এলাইয়া দিলাম—নিদ্রাভারে চক্ষু যখন নিমীলিত-প্রায়, তখন বাতির তীব্র গন্ধ সহ কমলা লেবুর মিষ্ট ফুলের গন্ধ বাতাসে ভর করিয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল।"

স্পেন দেশে পানালয়ে গিয়া এক গ্লাস সুরা ক্রয় করিলে সঙ্গে সঙ্গে বিনা মূল্যে আহার্য্য প্রদান করিয়া থাকে। তন্মধ্যে চিংড়ী মাছ ও বাদাম পর্য্যন্ত থাকে। স্পেনের সুরা বিখ্যাত।

সেভিলার একটি রাজপথের নাম ক্যালে সায়ের পেম্। উহা বহুশতাব্দীর পুরাতন রাজপথ। সেভিলার বক্ষোদেশ বিদীর্ণ করিয়া এই পথ চলিয়া গিয়াছে। মিং ল্যাংডন কিন্ গ্রানাডা দেখিতে গিয়া কিরূপ অপূর্ব্ব অনুভূতি লাভ করিয়াছিলেন, তাহার বিবরণ পাঠকবর্গের কৌতূহল বর্দ্ধন করিবে।

তিনি লিখিয়াছেন, "সমগ্র য়ুরোপের মধ্যে এই উদ্যানটি চমৎকার স্থান। এমন মনোরম উদ্যান অন্যত্র নাই। এই স্থানটি দেখিবার জন্য আগ্রহ স্বাভাবিক। বিশেষতঃ আমরা জানিতে পারিয়াছিলাম যে, এখানে একটা সঙ্গীতোৎসব হইবে। কতকগুলি বন্য মুরজাতিকে স্পানিস মরক্কো হইতে সংগ্রহ করিয়া আনা হইয়াছিল।

"এ প্রলোভন দমন করা অসাধ্য। তাই একখানি গাড়ী ভাড়া করিয়া প্রাতঃকালেই যাত্রা করিলাম। আকাশ মেঘ-লেশশূন্য, রৌদ্রকরোজ্জ্বল। সমতল ভূমি দিয়া অগ্রসর হইলাম। পথে অনেকগুলি সুদর্শন কৃষকপল্লী ও ছোট ছোট সহর পড়িল। পল্লী অঞ্চলের বিচিত্র সৌন্দর্য্য দর্শনে চিত্ত পুলকিত হইল। ক্রমশঃ জমি উচ্চাবচ হইতে লাগিল। আমাদের গাড়ী অরণ্য-সঙ্কুল পাহাড়ের পার্শ্ব দিয়া চলিতে লাগিল। ক্রমে উপত্যকাভূমির মধ্য দিয়া গাড়ী চলিল—চারিদিকে কৃষকদিগের কুটীর। কর্ষিত ক্ষেত্র এবং জল-

মাদ্রিদের ন্যাশনাল মিউজিয়ম

পাইয়ের বাগান নেত্রপথে পড়িল। ক্রমেই জমি বন্ধুর বলিয়া মনে হইতে লাগিল। হয় ত এইভাবে দীর্ঘ পথ পাহাড় ও অরণ্যের মধ্য দিয়া যাইতে হইত; কিন্তু সহসা একটা বিরাট শস্যক্ষেত্রের কাছে আসিয়া গাড়ী দাঁড়াইল। এই তৃণশ্যামল ক্ষেত্রের ধারে ধারে বহু কৃষক-কুটীর, উদ্যান দৃষ্টিগোচর হইল। প্রত্যেক কুটীর সুদর্শন, মনোরম। চাহিয়া দেখিলাম, সম্মুখে দিগন্ত-বিস্তৃত অনুরূপ ক্ষেত্র। অপরাহ্ণ-কালে আমরা সায়েরা নেভাডার নীল পাহাড়শ্রেণী দেখিতে পাইলাম।

"সন্ধ্যার পূর্ব্বে আমরা মোটরে করিয়া গ্রানাডায়

পৌঁছিলাম। উৎসব সম্বন্ধে সমস্ত সংবাদ জানিবার জন্য আমরা সোজা কর্তৃপক্ষের আপিসে গমন করিলাম।

"সেখানে সংবাদ পাইলাম যে, উৎসব এখন বন্ধ থাকিবে। কবে উহা আরম্ভ হইবে, কত দিন বন্ধ থাকিবে, তাহা কেহই বলিতে পারিল না। মাদ্রিদ হইতে এ সম্বন্ধে সংবাদের প্রতীক্ষা করা হইতেছে; কিন্তু তখনও পর্য্যন্ত কোনও সংবাদ আসে নাই।
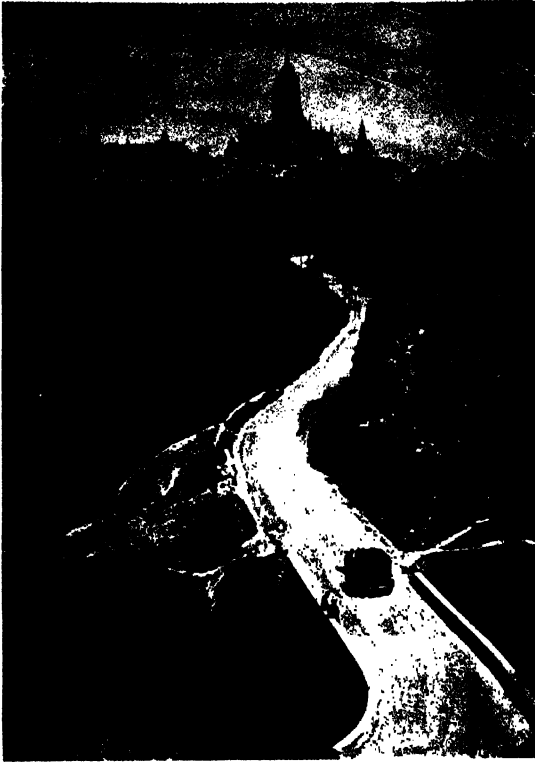
সেগোভিলার রাজপথ

"এ সংবাদ শুনিয়া আমরা বিস্মিত ও নিরাশ হইলাম। আমি ভাবিতেছিলাম, অতঃপর কি করা যায়। এমন সময় এক জন বয়স্ক ভদ্রলোক আমাদের কাছে আসিলেন। এই ব্যক্তি পরিষ্কার ইংরেজি বলিতে পারেন।

"পরিচয়ে জানিতে পারিলাম, এই ব্যক্তিই সমস্ত উৎসবসংক্রান্ত সূচী ঠিক করিয়াছেন। বহুদিন ধরিয়া তিনি এই উৎসব সম্পাদন করিবার প্রচেষ্টা করিয়া আসিতেছেন। এখন অস্থায়িভাবে উহা বন্ধ থাকায় তাঁহার ক্ষোভের অন্ত নাই।

"সহসা তিনি আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন যে, তিনি মুরদিগকে ট্যাক্সি করিয়া আলাহামব্রায় লইয়া যাইতেছেন। সেখানে ৬টার সময় আমরা যেন যাই। তিনি নিজের দায়িত্বে ও ব্যয়ে এই কার্য্য করিবেন।

"ওয়াশিংটন আরভিং আলাহাম্ব্রা সম্বন্ধে দুইখানি মোটা গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। তাহা প্রত্যেকের পড়িয়া দেখা উচিত।

"আমরা যখন নির্দ্দিষ্ট স্থানে পৌঁছিলাম, তখন মুররা প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিতেছিল। তাহাদের সংখ্যা ২৫।৩০ জন হইবে—পুরুষ ও নারী। সকলেরই অঙ্গে পূর্ণ পরিচ্ছদ। আমার সমস্ত শরীরে শিহরণ জাগিল। পাঁচ শতাব্দীর পূর্ব্বে খৃষ্টানরা যখন আরবদিগকে বহিষ্কার করিয়া দেয়, তখন তাহারা যেরূপ বেশে ছিল, আজ যেন সেইভাবেই তাহারা রহিয়াছে। সে দৃশ্য যেমন চিত্তাকর্ষক, তেমনই ঐতিহাসিকতাপূর্ণ। যেন কোন পৌরাণিক দৃশ্য দেখিতেছি!

"তাহারা বেশ আগ্রহভরে সমস্ত দেখিয়া বেড়াইতেছিল। সেখানকার সৌধগাত্রে যে সব আরবী অক্ষর ও লেখমালা ছিল, তাহারা তাহা পাঠ করিতেছিল। মিনারসমূহের কারুকার্য্য দেখিয়া তাহারা যেন মন্ত্রমুগ্ধ হইয়া পড়িতেছিল।

"অবাক্ বিস্ময়ে তাহারা মনোরম উদ্যান ও প্রাঙ্গণের চারিদিকে পর্য্যটন করিতেছিল। কোথাও সুদীর্ঘ, উন্নত সাইপ্রেস, বৃক্ষশ্রেণী, কোথাও কমলালেবুর কুঞ্জ, কোথাও

লা আলবার্কার তরুণী

ধর্ম্মযাজক ও ধনী মহিলা

গ্রাম্য বাদকদল

বিলাসিনী স্পেনীয় মহিলা
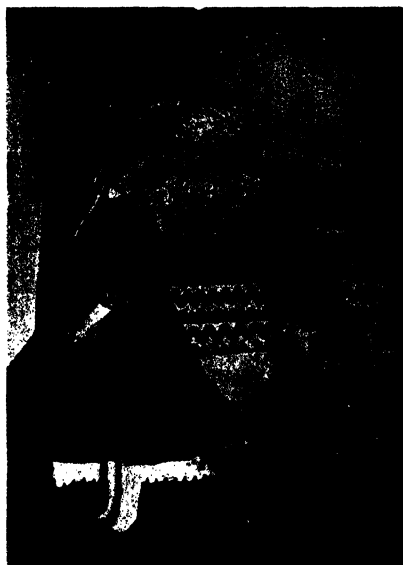
সেগোভিল্লা গ্রামের নারী মেয়র

বেদিয়া দম্পাতি

কর্ডোবার প্রসিদ্ধ মুরনির্ম্মিত মসজেদ

পাহাড়ের ধারে বেদিয়া-পল্লী
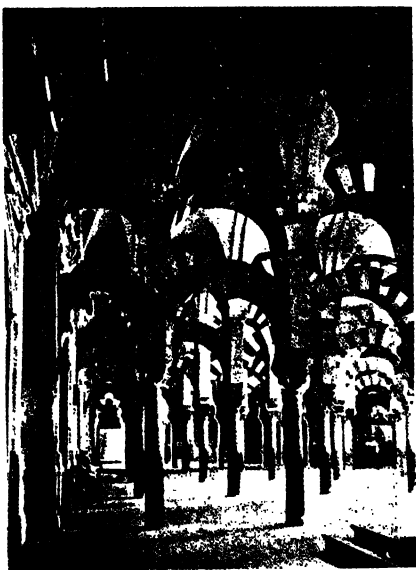
আলহাম ব্রা প্রাসাদ

আপেল নৃত্য

নৃত্যের অপর দৃশ্য

যূথিকা ফুল ফুটিয়া রহিয়াছে, রোডোডেনড্রনের বাহার বাগানকে আলোকিত করিয়া রাখিয়াছে! মাঝে মাঝে কৃত্রিম উৎস হইতে জলধারা উৎসারিত হইয়া সৌন্দর্য্যকে অভিনব করিয়া তুলিতেছিল।

এইখানে রাজা দ্বিতীয় ফিলিপ দণ্ডজীবন যাপন করিতেন

"মুরদিগের অঙ্গে রঙিন ও বিবিধবর্ণের অঙ্গবাস। তাহারা সোপানপথে আরোহণ অবরোহণ করিয়া কক্ষমধ্যে নানাবিধ দৃশ্য দর্শন করিয়া বেড়াইতেছিল; ঠিক তাহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ এই প্রাসাদে এইভাবেই ঘোরাফেরা করিত।

প্রসিদ্ধ চিত্র-শিল্পী এল্ গ্রেকোর ষোড়শ শতাব্দীর ভবন

"আলহামব্রা দুর্গের ছাদের উপর আমরা যখন উঠিলাম, তখন সুবর্ণপ্রতিম সূর্য্যদেব আবীর ছড়াইয়া দিক্‌চক্রবালে অস্ত যাইবার উপক্রম করিতেছিলেন। আমাদের সম্মুখে সায়রানেভাডার তুষার-কিরীটী শৃঙ্গসমূহ যেন গগন-প্রান্ত স্পর্শ করিতেছে। বিবিধবর্ণের মেঘমালা অদ্রিমালার কাছে কাছে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। আমাদের পদতলে গ্রানাডা সহর। উহার ক্ষুদ্র অট্টালিকাসমূহ দূরে যেন জ্যামিতিক রেখার মত দেখাইতেছিল। আমাদের দক্ষিণভাগে
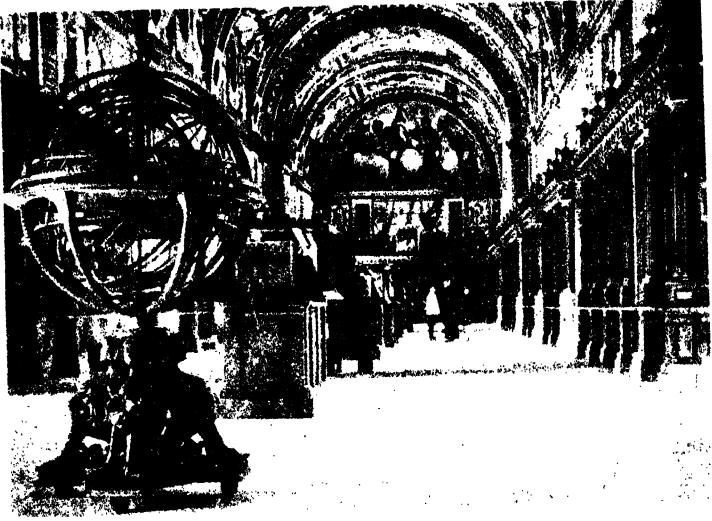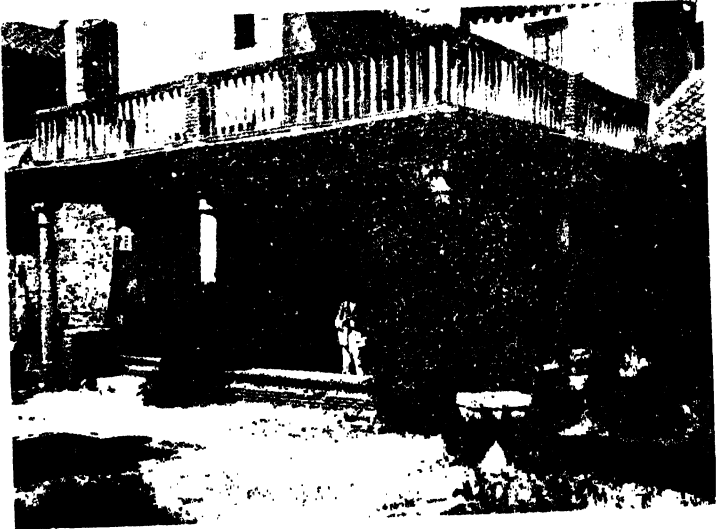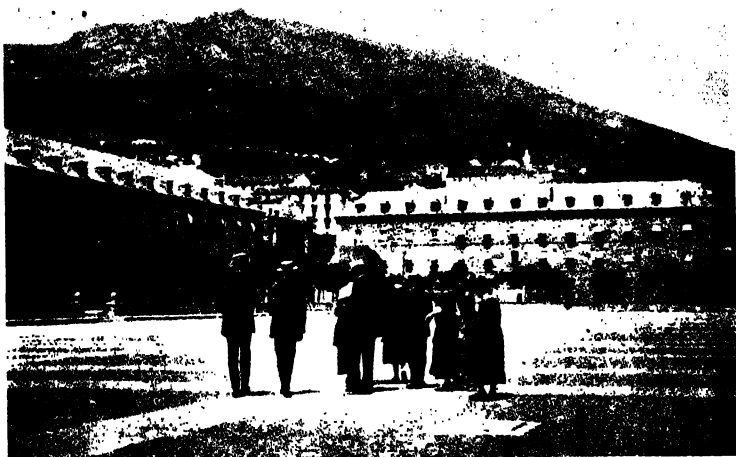
পাহাড়ের ধারে বিরাট মঠ

উৎসব শোভাযাত্রা

"উৎসব-সভায় সেভিলানা" নৃত্য

বেদিয়া নারী ও জলপূর্ণ কুম্ভ

উপত্যকাভূমির ও-পারে যাযাবর বেদিয়াদিগের গুহা-সমন্বিত সহর।

"এই অপূর্ব্ব, চমৎকার দৃশ্য দেখিয়া আমরা মন্ত্রমুগ্ধ হইয়া পড়িলাম। অদূরে মধুর সঙ্গীতধ্বনি হইতেছিল। তাহার বিচিত্র ঝঙ্কার আমাদের কাছে বাতাসে ভর করিয়া ভাসিয়া আসিতে লাগিল। এক জন মূর গান গাহিতে আরম্ভ করিয়া দিয়াছে।

"নীল গগনপথে একটা বিমান সশব্দে উড়িয়া আসিতেছিল। আমাদের মাথার উপর একটা বৃহৎ পক্ষীর ন্যায় সে উড়িতে লাগিল। বিমান হইতে কতকগুলি সাদা জিনিষ ছড়াইয়া পড়িল—সেগুলি বিজ্ঞাপন।

"আমরা আলহাম্‌ব্রা প্রাসাদ-শীর্ষে মুরদিগের সঙ্গে দাঁড়াইয়াছিলাম। তাহাদেরই পূর্ব্বপুরুষরা এই প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়াছিল।"

শান্তিপূর্ণ স্পেনরাজ্যে এখন অশান্তির কালানল জ্বলিয়া উঠিয়াছে। ইহার ফলে স্পেনের পরিণাম কি দাঁড়াইবে, কে বলিতে পারে?

শ্রীসরোজনাথ ঘোষ।
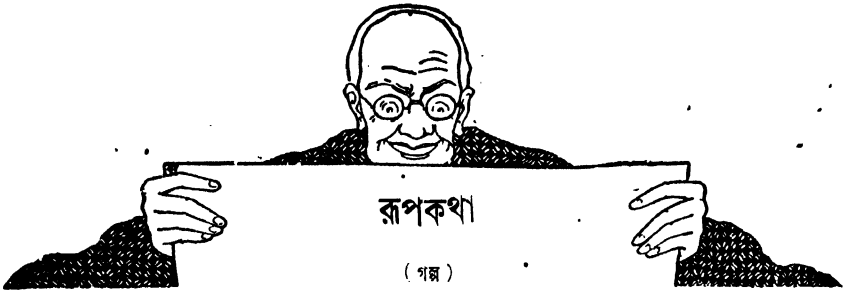
(গল্প)

"কি আনন্দের কথা উমে !
লোকের মুখে শুনি, সত্য বল শিবানি,
অন্নপূর্ণা নাম তোর কি কাশীধামে ?
অপর্ণে যখন তোমায় অর্পণ করি,
ভোলানাথ ছিলেন মুষ্টির ভিখারী,
এ কি কথা আজ শুনি শুভঙ্করি,
বিশ্বেশ্বরি তুই কি বিশ্বেশ্বরের বামে ?
ক্ষেপা ক্ষেপা আমার বল ত দিগম্বরে,
গঞ্জনা সয়েছি কত ঘরে পরে,
এখন দ্বারী নাকি ফেরে বিশ্বেশ্বরের দ্বারে,
ডরে যেতে নারে ইন্দ্র চন্দ্র যমে ॥"

শারদীয়া সপ্তমীর সুপ্রভাত। বাবাজী গানটি গাহিয়া একটান্ গঞ্জিকার পিয়াসে জমীদারবাড়ীর দেউড়ীতে আসিয়া বসিল। সেখানে পাইক নগ্‌দী প্রভৃতি সমধর্ম্মী ত্বরিতানন্দসেবক নানা সাজে নানা কাযে আলস্য-যাপন করিতেছে। বাবাজীকে দেখিয়া তাহারা আহ্লাদে গদ্‌গদ হইয়া উঠিল। তাহাদের সর্দ্দার ষষ্ঠী তাহাকে আনন্দে আলিঙ্গন করিল। মোধো বলিল, বাবাজী, ব্যাং মারবে না কি ?

ষষ্ঠী বলিল, তা আবার জিজ্ঞ্যেস্‌ছিস্ ? তরিবৎ করে সাজ। বাবাজী, ছোঁড়াটা বোকা বটে, কিন্তু বুটি চেনে ! মোধো, তোয়াজ করে দরদ দিয়ে তৈরি কর।

মোধো গাজা প্রস্তুত করিল। বাবাজী ব্যাং মারিল।

ষষ্ঠী বলিল, কেমন বাবাজী !

বাবাজী ভাবে গদ্‌গদ হইয়া উত্তর দিল, একেবারে ক্ষীর—ক্ষীরখণ্ড !

কলিকা জ্বলিয়া উঠিল দেখিয়া ষষ্ঠী মোধোকে ইঙ্গিত করিল। মোধো প্রস্তুত ছিল।

বাবাজী দ্বিতীয় কলিকায় শেষ টান দিয়া গান ধরিল—

"কি শুনি কি শুনি ওহে চিন্তামণি,
তুমি নাকি হও নেশার শিরোমণি !
ভাঙ খাও নাকি গাঙ্গাটি মল,
আফিং না কি তুমি বাটিতে গোল,
তোমার নেশার অন্ত কে পায় উমাকান্ত—
ছিপি খুলে দেখি ভাঁড়ে মা ভবানী।"

তৃতীয় কলিকা তৈরী হইবার পর ষষ্ঠী বাবাজীর হাতে তুলিয়া দিয়া বলিল, এবার একটু মায়ের কথা বল !

গঞ্জিকারক্ত চক্ষু তুলিয়া বাবাজী জিজ্ঞাসা করিল, কি বল্‌লে, যেটের বাছা ষষ্ঠীদাস ? আগে সাবাড় কর গঞ্জিকার চাষ, তার পর যাওয়া যাবে কৈলাস ! আহা ! বাবা আমার দিগম্বর, নেশার প্যাকম্বর ! গঙ্গাধর ত্বরিতানন্দদায়িনীকে জটারূপে মাথায় ধরেছেন ! কৈলাস ধোঁয়ায় ধোঁয়াকার—নন্দী-ভৃঙ্গী ঐ কাযেই আছেন ! পোড়া কল্‌কে ঝাড়্‌ছেন আর বাবার গায় সেই ছাই মাখাচ্ছেন !

মোধো প্রশ্ন করিল, যদি গাজা শিবের জটা হয়, তা হলে গঙ্গা কি ?

বাবাজী উৎসাহিত হইয়া বলিলেন, সাধু, মধু—সাধু ! তবে যে ষষ্ঠী বল্‌ছিলে, মোধো বোকা ? কি জানো মধু, গঙ্গা হচ্ছেন কারণানন্দদায়িনী, তিনিই ভাঁড়ে মা ভবানী। নইলে ভগীরথকে অত তপস্যা করতে হয় ? ভাগীরথী দেবলোকে সোমরস, আর মর্ত্তে—ভাঁড়ে মা ভবানী।

মধু ভক্তিভরে প্রণাম করিল। বাবাজী গান ধরিল—

"আয়ি তুই শয্যেধরা জ্যান্তেমরা
হ'য়ে আছিস্ যার তরে।
তোর সেই ধিঙ্গী মেয়ে সিঙ্গী চড়ে
এল এত দিন পরে ॥

রাজ-দুয়ারে বাঁধা হাতী—
চেয়ে দেখ্ তোর নাত্নী নাতী,—
কেউ বসেছেন পেঁচার ওপর
কারুর বাহন হাঁস।

যে নাতীর বরণ গৌর
করেছে বাহন ময়ূর,
এরা একস্তরে উড়লে পরে
বয় ঝোড়ো বাতাস।

আর যেটা হাতী-শুঁড়ো রংটা সিঁদূর
ধ'রে এক ধেড়ে ইঁদুর—
জিন্ কষে তার পিঠে ব'সে
বাগিয়ে ধরে রাশ।

ঘর-বাড়ী চিড়িয়াখানা
হবে যে তা ছিল জানা,
পেটের মেয়ে বিলিয়ে দিলি
বলদ-চাপা ক্ষেপা বরে॥"

ঠিক বলেছ, বাবাজী, ঠিক বলেছ, বলিতে বলিতে সম্প্রতি যিনি দেউড়ীতে প্রবেশ করিলেন, তিনি এ অঞ্চলে বিশেষ পরিচিত। কেহ বলে সাধক, কেহ বলে মাতাল। নাম তন্ত্রবিনোদ। তবু এই মাতালকে দেখিয়া সকলে সসম্ভ্রমে পথ দিতে লাগিল। কিন্তু ব্রাহ্মণ কোন দিকে লক্ষ্য না করিয়া দালানে দেবী-সমক্ষে দণ্ডায়মান হইলেন। কিছুক্ষণ প্রতিমা নিরীক্ষণ করিয়া বলিলেন, এখনও প্রাণ-প্রতিষ্ঠা হয় নি।

জমিদার রাজা রাজচন্দ্র তখন দালানে উপস্থিত। একে প্রবল প্রতিষ্ঠাশালী জমিদার, তায় যজমান, অধিকন্তু রাজা। পুরোহিত ভাবিলেন, বেটা যজমান-ঘরটা দখল করবার ফন্দি করেছে। দারুণ বিরক্ত হইয়া বলিলেন, না। সেটা তোমার জন্যে বাকি রেখেছি। তুমি আর দু'-পাত্তর কারণ ক'রে ভক্তিটা একটু বাড়িয়ে এসো! প্রতিষ্ঠা করবে। প্রতিষ্ঠার মন্ত্র জানো?

মা-ই জানেন—বলিয়া তন্ত্রবিনোদ গান ধরিলেন—

দীন-দুঃখ-হারিণী তারা।
কে জানে জননী তুমি সাকারা কি নিরাকারা॥

ভবরাণী ভয়হরা,
নির্গুণে ত্রিগুণধরা,
এলোকেশী, শশিশেখরা!
যাবে ত' দিন দুখে-সুখে,
দুর্গা দুর্গা বল মুখে—
অকূল পাথার দেখ সুমুখে,
সাধের গোলকধাঁধায় ঢুকে
হয়েছি মা দিশাহারা।
দুর্গমে ত্রাহি মে দুর্গে ভবানী
ভবেশদারা॥

সহসা এক কাণ্ড ঘটিয়া গেল। সকলেরই মনে হইল, শ্রীমন্দির যেন দুলিতেছে! মায়ের মুখ অপূর্ব্ব আভায় দীপ্ত! অধরে ঈষৎ হাসি, ত্রিনয়ন করুণায় ঢল ঢল; দেবগৃহ যেন কোন অলৌকিক সত্তায়, দিব্য চেতনায় জম্জম্ করিতেছে—কার শ্রীঅঙ্গ-সৌরভে পরিপূর্ণ! এখানে কলুষিত চিন্তার স্থান নাই; রাগ-দ্বেষ-হিংসা, বিষয়-বাসনা যেন চিরতরে নির্ব্বাসিত, আর তার স্থলে যেন কোন্ দৈবী মায়াবলে প্রেম-ভক্তি-অনুরাগ, প্রীতি-করুণার হিল্লোল বহিতেছে! সকলেরই চক্ষে অশ্রু, মুখে 'মা মা' রব!

সেই সময় চণ্ডীপাঠ হইতেছিল—

"বার্ত্তা চ সর্ব্বজগতাং পরমার্ত্তিহন্ত্রী।"

রাজা রাজচন্দ্র 'মা-মা' বলিতে বলিতে ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিলেন।

তন্ত্রবিনোদ তৎক্ষণাৎ তাঁহার হৃদয়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন, রাজা, স্থির হও।

রাজচন্দ্র ও তন্ত্রবিনোদ প্রায় সমবয়সী। উভয়ে এক পাঠশালায় পড়িতেন। সেই ক্রীড়াচঞ্চল বাল্যকালে দু'জনে যে প্রীতিবন্ধন হইয়াছিল, কাল তাহা ছিন্ন করিতে পারে নাই। উপনয়নের পর দু'জনের জীবনগতি ভিন্ন ধারায় প্রবাহিত হইল, কিন্তু বন্ধন টুটিল না। এক জন বিষয়ের সেবক হইলেন। এক জন সাধক।

এই জমিদার-বংশের আদি ইতিহাস যেমন বিচিত্র, তেমনি বিস্ময়কর। কুল-প্রতিষ্ঠাতা লক্ষ্মীপতি নিরতিশয় দরিদ্র ছিলেন। পত্নী কমলা অতিশয় সরলা, অসামান্যা রূপসী, একান্ত পতিভক্তিপরায়ণা। বয়স যৌবনের

উপান্তে উপস্থিত হইয়া যেন স্থির, নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। এই অমেঘবাহিনী দামিনীকে দেখিলে মনে হইত অনন্তযৌবনা। শরীর অনাহার-শীর্ণ, পরিধান জীর্ণ-বাস, তবু সহাস মুখকমল চিরপ্রফুল্ল। এই শরীরিণী লাবণ্য-প্রতিমা যে দেখিত, তাহারই মনে হইত, এ অলৌকিক সৌন্দর্য্য বুঝি দেবলোকেও দুর্ল্লভ। এই পূজার্হা নারীর পায় পুষ্পাঞ্জলি দিয়া জীবন ধন্য করি। আহা, এ নারী ভাগ্যহীনা! মরি, মরি, এ যে চিত্রকরের ধ্যানাতীত সুষমা!

কমলার জীবনের কার্য্য পতিসেবা আর সাধ অন্ততঃ জীবনে এক দিন মনের মতন ক'রে মা লক্ষ্মীর পূজা। কিন্তু বছরের পর বছর ফিরিতেছে; দারিদ্র্যের সঙ্গে নিত্য প্রাণপণ রণ নিত্য নিত্য জীবন ক্ষয় করিতেছে। কবে আর মনের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হবে? প্রতিদিন প্রভাতে উঠিয়া পতিপদে প্রণাম করিয়া প্রার্থনা করে, আমায় আশীর্ব্বাদ কর, যেন এক দিনের তরে মনের মত ক'রে তোমায় অন্ন-ব্যঞ্জন ধ'রে দিতে পারি। মা, লোকে বলে স্ত্রীভাগ্যে ধন। আমারই কপালদোষে আমার স্বামী দরিদ্র। মা লক্ষ্মি, এক দিনের জন্য সদয় হও. আমি এক দিন, ওঁকে পেট ভরে তৃপ্তি ক'রে খেতে দেখি! মা, গয়না-কাপড়, লোক-জন, দাস-দাসী, ঐশ্বর্য্য,—আমার জন্য আমি কিছুই চাই না। তোমার কৃপায় উনি সুখী হবেন, হা-অন্ন, হা-অন্ন ক'রে বেড়াতে হবে না, এইটুকু জেনে যেতে পারলে আমি অনন্ত নরক বরণ করতে রাজি আছি। কমলা প্রতি বৎসর আশা করে, প্রতি বৎসর নিরাশ হয়। আশা ফুরায় না, আশা হৃদয়-বাসা ছাড়ে না, দিনে দিনে বাড়ে।

আজ কয়দিন লক্ষ্মীপতি অসুস্থ, বাহির হইতে পারেন না। উপার্জ্জনের পথ বন্ধ। তাঁহার সততায় দোকান-দারগণ বিশ্বাস করে; বিনা মূল্যে কিছু কিছু পণ্য ছাড়িয়া দেয়, লক্ষ্মীপতি তাহাই ফেরি করিয়া যাহা উপার্জ্জন করেন, তাহাতেই অতিকষ্টে জীবিকা-নির্ব্বাহ হয়। কোন দিন কমলার চিত্রিত দেবদেবীর পট; কোন দিন কমলার হাতে তৈরি মাটীর খেলনা-পুতুল; কোন দিন কমলা চাল, ছোলা, ডাল, চিঁড়ে, চীনের বাদাম প্রভৃতি ভাজিয়া তৈল-লবণ মাখিয়া শালপাতার ছোট ছোট পুরিয়া করিয়া দেয়, খরিদ্দারের ভিড় লাগে। এমনিভাবে দুঃখী দম্পতির দিন চলে। গুণবতী পত্নীর সেবায়, যত্নে, প্রসন্ন হাস্যে, মিষ্ট কথায় লক্ষ্মীপতি সকল কষ্ট ভুলিয়া যান।

কিন্তু যাঁহারা দুর্দ্দিনের বন্ধুর পথ বাহিয়া দারিদ্র্যের শেষসীমায় উপস্থিত হন, অর্থ যাঁহাদের আকাশকুসুম, স্বাস্থ্যই তাঁহাদের পরম সম্পদ্—জীবনযাত্রার মূলধন। কয়দিন শয্যাশায়ী লক্ষ্মীপতির ঔষধ ত দূরের কথা, পথ্য পর্য্যন্ত জুটিতেছে না। কমলা চোখের জল গোপন করিয়া আশ্বাসবাক্য প্রয়োগ করে, কেন ভাবছ? মা একটা উপায় করবেনই।

লক্ষ্মীপতি কহিলেন, কবে? মরণ হবে যবে?

বালাই! তা কেন?

তবে? কমলা, কত লোক না খেতে পেয়ে মরছে, কার উপায় হচ্ছে?

তা জানি নি। পরের কথা বল্‌তে পারি নি। আমি আমাদের কথা জানি। তুমি জীবনে কখনো মিথ্যা কথা কওনি, কাউকে প্রবঞ্চনা করনি। চিরদিন সততা আশ্রয় ক'রে আছ। সাধ্যমত লোকের উপকার করেছ—অর্থে নয়, সামর্থ্যে। তোমার দিন একদিন আস্‌বেই, আশা ক'রে থাক, বিশ্বাস কর।

বাহির হইতে কে ডাকিল, লক্ষ্মীপতি বাবু আছেন?

ক্ষুদ্র একখানি কুটীর, সামনে একটু দাওয়া, তাহাতেই রন্ধন হয়। তাহার ভিতর-বাহির নাই। লক্ষ্মীপতি বলিলেন, আছি। কিন্তু অসুস্থ। আপনার দরকার?

বল্‌ছি। ভিতরে যেতে পারি?

স্বচ্ছন্দে।

আগন্তুক ভিতরে আসিয়া বলিল, ইনি আপনার স্ত্রী? আমি একজন চিত্রকর। আমি মায়ের একখানি তৈল-চিত্র আঁক্‌তে ইচ্ছা করি।

কার দরকার?

কারুর নয়, আমারই। এ আদর্শ সৌন্দর্য্য পৃথিবীতে দুর্ল্লভ। আমি সেই আদর্শ চিরস্থায়ী ক'রে ধন্য হব! আপনি অস্বীকার করবেন না। আমি মাকে যথাসাধ্য প্রণামী দিয়ে আঁক্‌ব। সৌন্দর্য্য আমি অনেক দেখেছি। পায়ের নখাগ্র থেকে মাথার চুল পর্য্যন্ত এমন নিখুঁত সৌন্দর্য্য দেখিনি। আরও স্বীকার করছি, যে আদর্শ আমি আঁক্‌ব, তা চিরদিন লোকচক্ষুর আড়ালেই থাক্‌বে।

আবশ্যক হলে মায়ের হাত, পা, চোখ, কাণ, মুখের গঠন আদর্শরূপে আমি ভিন্ন ভিন্ন চিত্রে অঙ্কিত করব। মা, একবার দাঁড়াও ত।'

কমলা উঠিলে চিত্রকর পাঁচটি মোহর দিয়া প্রণাম করিল।

কমলা বলিল, বাবা, আমি সম্মত, কিন্তু আমার গয়না-কাপড় ত' কিছু নেই।

আমি তা চাই-ও না। কেবল একটা কষ্ট কিছুদিন তোমাকে করতে হবে। আমি একটি উপযুক্ত বাড়ী ঠিক করব। বাবাকে নিয়ে কিছুদিন তোমাকে সেখানে স্থানান্তরিত হতে হবে।

তৈলচিত্র শেষ হইল। লক্ষ্মীপতি পুনরায় নিজ কুটীরে ফিরিয়া আসিলেন। কিন্তু লক্ষ্মীপতি লক্ষ্য করিলেন, কমলা দিন দিন কেমন অন্যমনা ও উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিতেছে।

এক দিন কারণ জিজ্ঞাসা করিলে কমলা বলিল, দেখ, আমার আজীবনের সাধ আমি এক দিন মা-লক্ষ্মীর পূজা করি।

লক্ষ্মীপতি কহিলেন, তা বেশ ত'! চিত্রকরের প্রসাদে ত' দিন এক রকম চ'লে যাচ্ছে। তা আমরা দুঃখী, দুঃখীর মত পূজা করব। বনে ফুল আছে, নদীতে জল আছে, ছোট একখানি চিনির নৈবেদ্য ক'রে দেবে। ভক্তিই সার।

পাগল! মায়ের দয়া না হলে কার সাধ্য তাঁর পূজা করে! তা তোমার যতই কেন ভক্তি থাক না।

লক্ষ্মীপতি বলিলেন, তাই ত'! সে সত্য কথা।

ও গো, তোমায় বলতে ভুলে গেছি। আমি তখন রাঁধছি, দুটো কাকে ঝগড়া করতে করতে এসে আমাদের চালের ওপর কি ফেলে গেছে। আমি কাগজ মুড়ে তুলে রেখেছি।

কমলা কাগজের মোড়কটি আনিয়া স্বামীর হাতে দিয়া প্রশ্ন করিল, কি, বল দিকি?

লক্ষ্মীপতি মোড়ক খুলিয়া দেখিতে দেখিতে জিনিষটির উপর তাঁহার দৃষ্টি স্থির হইয়া গেল।

ও কি?

বড় 'কি' নয়, কমলা এ অমূল্য রত্নহার!

জড়োয়া হার! কাক কোথা পেলে?

আশ্চর্য্য কি! কাকের মত চোর আর ধূর্ত্ত প্রায় কোন জানোয়ার নেই! আজ দু'দিন ধ'রে শুনছি, বেগমের হার হারিয়েছে। যে খুঁজে দিতে পারবে, নবাব তাকে পুরস্কার দেবেন।

তুমি এখনি দিয়ে এস।

তা আর বলতে!

কিন্তু দেখ, নবাব যদি কিছু পুরস্কার দিতে চান, জিজ্ঞাসা করেন, কি চাও? বোলো, আমার স্ত্রী জানে।

রত্নহার সত্যই অমূল্য। বহু ব্যয়ে প্রস্তুত হইয়াছে। বেগমের অতি পেয়ারের অলঙ্কার। এ হার অদৃশ্য হইবার পর, দুই দিন ধরিয়া নবাব-বাড়ীতে হুলস্থূল হইতেছে।

হার হাতে পাইয়া নবাব আনন্দে অধীর হইয়া বলিলেন, ও হি চিজ্! তোমকে ক্যায়সে মিলা?

লক্ষ্মীপতি বর্ণনা করিলেন। নবাব বলিলেন, তাজ্জব্! কেয়া বখ্সিস্ মাঙো?

জনাব! সে আমার পরিবার জানে।

পরিবার কেয়া! তোমারা জরু? আচ্ছা, তোম্ যাও, পুছ করকে আও। যো মাঙ্গেগা, মিলেগা।

এক জন পারিষদ বলিল, জনাব! তাঁবেদারের কসুর মাপ হয়, এই গরীব আদমী যদি আবুহোসেনের মত বাদশাহী সখ্ করে, পাবে?

নবাব হাসিয়া বলিলেন, বেশখ্!

লক্ষ্মীপতি তৎপূর্ব্বেই কুটীরে ফিরিয়া কমলাকে প্রশ্ন করিলেন, কি চাও? তুমি যা চাইবে, সদাশয় নবাব তাই দেবেন।

দেবেন? তুমি প্রার্থনা কোরো, এই কোজাগর লক্ষ্মীপূজার রাত্রিতে আমার এই কুটীর ছাড়া এ সহরে আর কোথাও কোন বাড়ীতে আলো জ্বলবে না। এমন কি, নবাব-বাড়ীতেও নয়।

বখ্সিস্ প্রার্থনা শুনিয়া নবাব বিস্মিত হইয়া বলিলেন, নবাব-কোঠিসে বি? বহুৎ আচ্ছা! ঐ হোগা।

প্রধান মন্ত্রী তখন জোড়হস্তে কহিলেন, বন্দে নেওয়াজ! এ দুষমনের চর, এর সয়তানী মৎলব আছে! সমস্ত সহর অন্ধকার ক'রে কি মৎলব হাসিল করবে। জাঁহাপনার বাড়ী পর্য্যন্ত কোথাও বাতি জ্বলবে না!

এক জন পারিষদ বলিলেন, উসমে ডর কেয়া খামিন্? জনাবকা মৌলুমসে সব্ রৌসনী হো যাগা।

মিষ্টভাবে পরিতুষ্ট হইয়া জনাব পারিষদকে একটি উৎকৃষ্ট আতরের ফাহা বখ্‌সিস্ করিলেন।

গরীব পরোয়ার! বান্দার আরজ,—

বস্ উজীর! যো হুয়া সো চুকা—

কোজাগর নিশীথে ভক্তের আকুল আহ্বানে লক্ষ্মীদেবী আসিয়া দেখিলেন, সমস্ত জনপদ অন্ধকার, কেবল এক দরিদ্র-কুটীরে দীপ জ্বলিতেছে। সে শিখা মলিন করিয়া এক রমণী দ্বারে দণ্ডায়মানা। উভয়ের মুগ্ধদৃষ্টি উভয়ের মুখে আবদ্ধ। কমলা সাষ্টাঙ্গে প্রণত হইয়া পরমযত্নে দেবীকে পিঁড়ির উপর বসাইয়া পুনরায় প্রণতঃ হইয়া কহিল, মা বোস; আমি স্নান ক'রে আসি। আমি না ফিরে এলে যেয়ো না। দেবী বলিলেন—তথাস্তু।

কমলা চলিয়া গেল, কিন্তু আর ফিরিল না। চঞ্চলা অচলা হইয়া রহিলেন।

কমলা চলিয়া যাইবার পর, লক্ষ্মীপতি নিদারুণ শোকে অভিভূত হইয়া রহিলেন। ক্রমে ঐশ্বর্য্যের বন্যা বহিল। কিন্তু এ বৈভব কাহার সঙ্গে ভোগ করিবেন? কমলা বিহনে সকলই বিস্বাদ।

আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব জোর করিয়া আবার তাঁহার বিবাহ দিলেন। বংশ লোপ হইলে এ বৈভব ভোগ করিবে কে? কিন্তু কমলা তাঁহার হৃদয় ও স্মৃতি জুড়িয়া রহিল।

ইহাই এ বংশের আদি ইতিহাস। কমলার আত্মদানে এ বংশের ঐশ্বর্য্য অক্ষয়। আশ্চর্য্য! পুরুষানুক্রমে এ বংশে একটি বই পুত্র জন্মে না, বিষয় ভাগ হয় না।

যে কুটীরে দেবীর প্রথম আবির্ভাব হইয়াছিল, তাহা এখনও পূর্ব্বস্থান অধিকার করিয়া আছে। তাহার চারিপাশে বিশাল অট্টালিকা উঠিয়াছে; কুটীরের উপর কত ঝঞ্ঝা বহিয়া গিয়াছে, কত শিলাপাত, বারিবর্ষণ, তাহাকে বার বার বেদনা দিয়েছে; কত ভূকম্পন তাহাকে নিশ্চিহ্ন করিবার নিমিত্ত প্রাণপণ প্রয়াস পাইয়াছে; কতদিন ধরিয়া ধরণী এই কালজয়ী কুটীরবরের আলিঙ্গন-লাভের জন্য উগ্র আকাঙ্ক্ষায় কালক্ষেপ করিতেছে; ইহার চতুর সমক্ষে কমলা-চরণাশ্রিত এই রাজবংশের কত ভাগ্যধর ধুরন্ধর কালস্রোতে আসিয়া ভাসিয়া গিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই; কিন্তু এই অবিনশ্বর কুটীর-প্রবর সমভাবে এবং প্রভাবে বিরাজমান!

যাঁহারা পূর্ব্বকর্ম্মফলে এই 'শ্রীমতাং গেহে' জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহাদের জীবনের প্রধান কর্ত্তব্য এই কুটীরখানির রক্ষণাবেক্ষণ। কোন্ বৎসর মাটী, কোন বৎসর খুঁটি, কোন বৎসর বাতা, কোন বৎসর চাল বদলানো হয়; রায়বংশ-বধূ, লক্ষ্মীর কৌটা, ধান, কড়ি, শঙ্খ, পিঁড়িখানি সযত্নে রক্ষা করেন। পূজার কোন আড়ম্বর নাই। সেই কোন্ পুরাকালে কমলা-নাম্নী কোন্ দরিদ্র-বধূ যে সকল উপাদানে লক্ষ্মী-প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, যে সকল উপকরণে মায়ের পূজা করিয়াছিলেন, তাহার কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই। কিন্তু পরম বিস্ময়ের বিষয় এই, এখনও সেই নির্দ্দিষ্ট ক্ষণে পদ্মগন্ধে কুটীর আমোদিত করে; কোথা হইতে কোন্ স্বর্গীয় ধূপ-সৌরভ ভাসিয়া আসে এবং স্থূল-দৃষ্টির অগোচর এক দিব্যসত্তা ও রুচির প্রভায় কুটীর ঝলমল করিতে থাকে।

সপ্তমীপূজা শেষ হইয়াছে। রাজা রাজচন্দ্র ও তন্ত্রবিনোদ এখনও পূজার দালানে বসিয়া কথাবার্ত্তা কহিতেছেন। রাজার চক্ষু অশ্রুভারাক্রান্ত। তন্ত্রবিনোদ বলিতেছেন, রাজা, ধৈর্য্য! 'সহনং সর্ব্বদুঃখানামপ্রতীকারপূর্ব্বকম্'। যে সয়, সে রয়, যে না-সয়, সে নাশ হয়। ঐ দেখ রাজা, তোমারই এক প্রজা! ও গৃহহীন, সম্পত্তিহীন, একমাত্র পুত্র গত, সম্প্রতি গৃহশূন্য হয়েছে। মায়ের পাদপদ্মে যেন হৃদয়ভার ঢেলে দেবার জন্য ছুটে আস্‌ছে।

প্রজা আসিয়া প্রতিমার সম্মুখে লুটাইয়া পড়িল। কিছুক্ষণ পরে যুক্তকরে কাতরস্বরে গাহিল—

"এখনো কি ব্রহ্মময়ি হয়নি মা তোর মনের মত।
অকৃতী সন্তানে মা গো দুখ দেবে বল কত॥
সংসার-বিষে জ্বলি যত
দুর্গা দুর্গা বলি তত,
বিষহর মা বিষহরী মৃত্যুঞ্জয়ের বিষহত॥"

প্রজা একটু শান্ত হইয়া তন্ত্রবিনোদ ও রাজচন্দ্রকে প্রণাম করিল।

রাজা প্রশ্ন করিলেন, তোমার নাম কি?

প্রজা জিজ্ঞাসা করিল, বলুন বাবাঠাকুর?

নাম বল্‌বে না কেন?

সাধারণতঃ প্রজারা রাজা রাজচন্দ্রকে 'মহারাজ' বলিত। বলিল, মহারাজ, নামে আমার ধিক্কার জন্মে গেছে। আমার জন্ত অভিধানের নূতন সংস্করণ করতে হবে। 'আনন্দ' মানে যে দুঃখ, এ ত' কোন অভিধানেই লেখে না। মহারাজ, 'রাম' মানে সব অভিধানেই বলে 'শ্রেষ্ঠ'। কিন্তু 'রাম' মানে শ্রেষ্ঠও বটে, অপকৃষ্টও বটে। এটা আমার জীবনের অভিজ্ঞতা।

রাজা বলিলেন, তা হ'ক! তোমার, শুন্‌ছি, কেউ নেই। তুমি খাও কোথা?

আনন্দরাম বলিল, যেথা সেথা।

রাজা বলিলেন, বেশ কথা! এখন থেকে রাজবাড়ীতে খাবে।

মহারাজ, এত দুঃখ পেয়েও জন্মভূমিতে প'ড়ে আছি। আপনি দেখ্‌ছি, শেষটা আমায় দেশ-ছাড়া করলেন! আমি এক জায়গায় খাই না, খাব না।

কেন?

কেন? মহারাজ, 'অভাগা যগুপি চায়, সাগর শুকায়ে যায়।' আমি ভর করলে রাজবাড়ী মাঠ হবে। রাজাদেশ লঙ্ঘন করা পাপ, বিশেষ আপনার মতন দয়ার্দ্র, ধার্ম্মিক রাজার। তাই মানে মানে স'রে পড়াই ভাল। আমার ছোঁয়াচ লাগলে আপনার বিশাল রাজপাট—একদিনে ধাঁই ফুট্‌ফাট্! মহারাজ, লোকে বলে, আমাকে শনিতে ঘোরাচ্ছে! শনির বাবারও সাধ্য নেই। ঘোরাচ্ছেন যিনি, তিনি আজ পরমানন্দে হেথা রাজভোগ খেতে এসেছেন। একটি মজা দেখেছ, বাবাঠাকুর! গোষ্ঠীশুদ্ধ কেঁটিয়ে এনেছেন, আনেন-নি কেবল ভিখারীটাকে। যাক্ রাজ্য, বেটী কত দুঃখ দিতে পারে, আমিও মরিয়া হয়েছি। দেখে নোব।

তন্ত্রবিনোদ বলিলেন, পারবে না, আনন্দ! এ সাগরের তল নেই। পাতালেরও রসাতল আছে। নইলে রাজ-রাজেশ্বরীর ঘরে শঙ্কর ভিখারী বিষ খেয়ে মোলো না।

সে যাই হ'ক, আনন্দ! আজকে তোমায় রাজবাড়ীতে মায়ের প্রসাদ পেতে হবে।

বাবাঠাকুর, স্ত্রী পুত্র, বিষয়-বৈভব, সব ঘুচে যায়, কিন্তু খাওয়া-দাওয়ার হাঙ্গাম ঘোচে না। রাজাদেশ শিরোধার্য্য, আমি একটা ডুব দিয়ে আসি।

তন্ত্রবিনোদ হাসিয়া বলিলেন, একেবারে ডুব মেরো না যেন।

সাধ্য কি, বলিয়া আনন্দ চলিয়া গেলে, তন্ত্রবিনোদ বলিলেন, রাজা, দেখছ, এ কত সইছে।

বটে, বিনোদ, বটে! কিন্তু এ ব্যক্তি মরিয়া হয়েছে। এর আর ভাবনার কিছু নেই। এ মাথার বোঝা নামিয়েছে, আশা-নিরাশার হাত এড়িয়েছে। এ দুঃখ-সাগরে ভাস্‌ছে, কিন্তু তরঙ্গে আর নাচে না। আমার অবস্থা ভেবে দেখ। আমি দৈবকোপে পতিত। এ বংশে একটি ক'রে পুত্র জন্মে, আমি নিঃসন্তান। তিনটি বড় বড় পরগণা আমার জমিদারীর অন্তর্গত—তার একটা বন্যায় ভেসে গেছে, একটা ভূমিকম্পে বিলুপ্ত, একটা মহামারীতে জনশূন্য।

তন্ত্রবিনোদ বলিলেন, রাজা, সিকস্তি-পয়স্তি মহলের চিরকালই ঐ দশা, জান ত', রাজা! আজ ধুয়ে মুছে নিয়ে গেল, কাল ফিরে দিল। এক দিক ভাঙে, এক দিক গড়ে। দু'পারই ত' তোমার জমিদারীভুক্ত। গেছে, আবার হবে।

হয়ে লাভ? আমি নিঃসন্তান। ভোগ করবে কে?

বধূর এখনও বয়স পেরয় নি। সন্তান হতে পারে।

কোনকালে নয়, বিনোদ! তুমি কি জান না, সে পাগল?

পাগল কেন বল্‌ছ? পাগল নয়।

তুমি ত' তার মুখ দেখেছ? যেন সর্ব্বদাই আবিষ্ট, আচ্ছন্ন। যেন উপদেবতা-আশ্রিত।

রাজা, এক মায়ের মুখ ছাড়া জ্ঞান হয়ে অবধি কোন স্ত্রীলোকের মুখ দেখি নি। কিন্তু তুমি পাগল বল্‌ছ কেন?

বল্‌ছি কেন? এক এক সময় এক একটা এমন আন্‌কো কথা ক'য়ে বসে—তার না আছে মাথা, না আছে মুণ্ড! ছাঁদনা-তলায় শুভদৃষ্টির সময় ব'লে উঠল—'ও গো, একে আমি চিনি। এর সঙ্গে আবার বিয়ে কেন?' বাসরে আমার তৃষ্ণা পেলে, নিজে ছুটে গিয়ে আমায় জল এনে দিলে। নববধূর লজ্জাজড়িত সে সঙ্কোচভাব নাই। এক জন বল্‌লে, হ্যা লো, বরকে তোর লজ্জা করছে না? বল্‌লে, ও-ত বরাবর আমারি বর। আমি লজ্জা করব কেন? তোদের সঙ্গে নূতন পরিচয়, তোরা লজ্জা কর গে যা।

তন্ত্রবিনোদ বলিলেন, কিছু বুঝ্‌তে পারলেম না। এ লজ্জাহীনতা অতিমাত্রায় সরলতাও হ'তে পারে!

অলৌকিক রূপ দেখে বাবা মা একেবারে ঝুঁকে পড়লেন। কোষ্ঠী-বিচার অবধি করলেন না যে, বধূর আয়-পয় সন্তান-ভাগ্য আছে কি না। কেবল বল্‌তেন, সুলক্ষণা বধূ।

সুলক্ষণা বধূর আগমনের পর পিতা-মাতা স্বর্গারোহণ করলেন। ক্রমে ক্রমে তিনটে মহল উবে গেল—যেন ভোজ-বাজি। পিতৃপুরুষের পিণ্ডও লোপ হ'ল।

কিন্তু রাজা, সবাই ত' সুখ্যাতি করে; বলে, যেমন রূপ, তেমনি গুণ!

সে কথা সত্য। ভালবাসায় সে সবাইকে জয় করেছে।

তোমাকেও?

আমাকেও! আর আশ্চর্য্য এই, বিনা আয়াসে। কখনো একখানা ভাল কাপড় কি গয়না পরে না। সেই যে লোহা, রুলি, কড় পরে এসেছিল, এখনও তাই। বলে—কেন, তুমি ত' চিরদিন এমনি নিরাভরণাকেই ভাল-বেসেছ! আমি তোমাকে ঐশ্বর্য্য দেখাতে আসিনি, তোমার ঐশ্বর্য্য দেখ্‌তে এসেছি। বিবাহের বধূ, বাড়ীতে পা দিয়েই কি বল্‌লে জান, বিনোদ? বল্‌লে, এখানে ত' আগে আমি এসেছি। আমার সে কুটীর কোথা?

কি বল্‌লে?

সে কুটীর কোথা?

তন্ত্রবিনোদ বলিলেন, রাজা, বধূ পাগল নয়। সে কথা পরে বল্‌ব। মাকে ভাল ক'রে দেখে কতকগুলি লক্ষণ মিলিয়ে বল্‌ব।

বিনোদ, মেলাবে আর ছাই। ফুলশয্যার প্রথম আলাপ কি জানো? জিজ্ঞাসা করলে, 'হাঁ গা, সত্যি কি আমায় চিন্‌তে পারছ না? একেবারে ভুলে গেছ?' আমি বল্‌লেম, 'আমি ত' মনে করতে পারছি না।' বল্‌লে, সে কি?

এই সময় রাজবধূ দেবী-মণ্ডপে পুষ্পাঞ্জলি দিতে আসিলে অতর্কিতে তন্ত্রবিনোদের দৃষ্টি তাঁহার উপর পড়িল। তন্ত্র-বিনোদ চমকাইয়া উঠিলেন। মনে মনে বলিলেন, এ কি আশ্চর্য্য সাদৃশ্য!

সপ্তমী-পূজার ভোগারতি প্রায় শেষ হইয়াছে। বেলা প্রায় অপরাহ্ন। রাজা রাজচন্দ্র আহারান্তে বিশ্রাম করিতেছেন। সংবাদ দিয়া একখানি সুবৃহৎ তৈলচিত্র হস্তে তন্ত্রবিনোদ কক্ষে প্রবেশ করিলেন।

কি ও, বিনোদ?

উঠে ব'সে দেখ।

আবরণ মুক্ত করিয়া তন্ত্রবিনোদ চিত্রখানিকে অনুকূল আলোকে স্থাপন করিলেন।

বহু দিনের অঙ্কিত চিত্র। কিন্তু এখনও বর্ণ পর্য্যন্ত মলিন হয় নাই।

একবার চিত্রের প্রতি, একবার বধূর প্রতি দৃষ্টি-নিক্ষেপ করিতে করিতে রাজচন্দ্র বলিলেন, কি অদ্ভুত সাদৃশ্য বিনোদ? চিত্র দেখে বুঝা যায় না, সত্যদর্শী শিল্পীর অঙ্কিত এই অপার্থিব সৌন্দর্য্য কি ধ্যানকল্পিত, না চিত্রের কোন প্রত্যক্ষ আদর্শ ছিল!

তন্ত্রবিনোদ বলিলেন, ব্রহ্মা ব্যতীত মানব-ধ্যানে এ মূর্ত্তির কল্পনা অসম্ভব। এ চিত্রের প্রত্যক্ষ আদর্শ ছিল। রাজবধূ জাতিস্মরা।

বধূ বলিল, রাজা, ও আমারই ছবি। তখন আমার নাম ছিল কমলা, নীচে লেখা আছে, দেখ।

রাজচন্দ্র দেখিলেন—সত্য।

কিন্তু এ ছবি তুমি কোথা পেলে, বিনোদ?

কেমন ক'রে যে আমাদের বাড়ী এ ছবি এল, জানা নাই। আমার কোন পূর্ব্বপুরুষ চিত্রকর ছিলেন। তাঁর হাতে আঁকা আরও অনেক ছবি আছে, সে সকলের মধ্যে এখানিও ছিল।

বধূ বলিল, রাজা, বিবাহের আগে মা-লক্ষ্মী আমায় স্বপ্ন দিয়েছিলেন, বাছা, আমি চঞ্চলা, চিরদিন কোথাও একাদিক্রমে আবদ্ধ থাক্‌তে পারি না। তুমি আত্মদানে আমাকে সত্যবদ্ধ ক'রে এসেছিলে, তুমি ফিরে না এলে আমি মুক্তি পাব না।

আমি বল্‌লেম, আমি কার কাছে যাব?

মা বল্‌লেন, জানি, মা, জন্মে জন্মে সতীর এক পতি। তোমার স্বামী ছিলেন, লক্ষ্মীপতি, আমি তোমার জন্য তাকেও পাঠাচ্ছি। চল, মা, আমায় সত্যে মুক্ত কর।

বধূ বলিল, রাজা, সেবার এসেছিলেম, তোমায় প্রতিষ্ঠা করতে। এবার এসেছি, তোমার ঐশ্বর্য্য দেখ্‌তে,

তোমায় নিয়ে যেতে। আমি আস্‌বার কিছুদিনই পরেই মা-লক্ষ্মী প্রস্থান করেছেন। রায়-বংশের বিপুল বৈভব ক্রমে ক্রমে ভাঙ্‌তে সুরু হয়েছে। আমার সন্তান হয়নি যে, তার জন্য ভেবো না। নইলে বংশধরকে ভিখারী দেখ্‌তে হ'ত। রাজা, চারিদিকে চেয়ে দেখ, কত ধন-কুবের নিরন্ন, কত রাজপ্রাসাদ চূর্ণ-বিচূর্ণ, কত জনপদ জনশূন্য হয়েছে, লক্ষ্মী কোথাও চিরস্থায়ী ন'ন্‌। রাজা, মনে ক্ষোভ কোরো না। বিষয়-বৈভব, ঐশ্বর্য্য, সুখসম্পদ্‌ এই আছে, এই নেই। সব ভোজবাজি—ভোজ-বাজি! কালে উদয়, কালে বিলয়—

"যে স্রোতে মিলায় আনি,
সেই পুনঃ লয় টানি,
সম্পদ্‌ জীবন-আগে ধায়,
কভু বা সম্পদ্‌ ফেলে জীবন পালায়॥"

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বসু।

অমারে করিল জয় অতীতের আমি

তখনো অতসী নামে ঘটেনি বিপ্লব, অতসী ডাকিত তারে সবে;
তখনো সহজ তার বালিকা অন্তর ভরিয়া উঠেনি কলরবে।
জাপানী ফানুসগুলির রঙিন আলো
তখনো তাহার কাছে লাগেনি ভালো,
তখনো তাহার চলা খায়নি মোচড় ধরেনি তাহারে কোন নেশা,—
দ্বিবিধ অন্তর লয়ে পল্‌কা ব্যসন হয়নি তখনো তার পেষা।

ড্রইং রুমের আলো লয়নি টানিয়া সিনেমা পার্টি আর গানে,
অজ্ঞার স্মৃতির কথা পুরুষ বান্ধব কহেনি তখনো তার কাণে।
মিশিয়া পুরুষ সাথে অকুণ্ঠ হয়ে,
মনের সহজ ভাব যায়নি ক্ষয়ে;
সামান্য জ্ঞানের মাঝে অসংখ্য বাসনা তখনো হয়নি জানাজানি,—
প্রসারি অনন্ত বাহু বিশাল পৃথিবী তাহারে দেয়নি হাতছানি!

অত্যল্প জ্ঞানের কোণে অস্ফুট কল্পনা, ছিল না অনেক কিছু আশা,
অল্পতে হইত সুখী অতসী সেদিন, অল্পতে সম্ভব ছিল হাসা।
সামান্য স্বামীরে লয়ে পল্লীর মাঝে,
পল্লীর বধূটি হয়ে প্রত্যহ সাঁঝে,
প্রদীপ দেখায়ে দিয়ে তুলসীতলায় প্রণাম করিত খুব সুখে।
সেদিন অতসী কিন্তু সামান্য কিছুতে থাকিতে পারিত ভরা বুকে।

আজি সে অতসী কোথা? ঘটেছে বিপ্লব, প্রগতি করেছে তারে জয়!
অতসী নোয়ালো মাথা হ'লাম অসি, তাহার ঘটিল পরাজয়।
অতসী মরিয়া গেল আমার মাঝে,
পূর্ণ হয়েছি আজ অসির সাজে;
আমারি শৈশব আমি ফেলেছি হারায়ে অতসী হয়েছি শুধু আমি,—
আমারি-আমাকে আমি করেছি নিহত, অতসী গিয়াছে আজ থসি।

ড্রইং রুমের আলো আমার চোখেতে খেলেছে আশার ঝকমকি,
বৃহৎ বাসনা কত করেছি লালন ঠুকিয়া জ্ঞানের চকমকি।
আজের পৃথিবী আর নহেকো সহজ,
অল্প কিছুতে হায় নাহি যে গরজ,
আজিকে পাইতে চাই প্রকাণ্ড প্রসার অনেক বাসনা জাগে মনে,—
বিরাট সিডান কার বৃহৎ প্রাসাদ নতুন ঘটনা প্রতি ক্ষণে।

যাদের রয়েছে খ্যাতি জগৎ জুড়িয়া তাহারা থাকিবে মোরে ঘিরি,
সৌভাগ্য মানিবে মনে সে জন তখন যখন যাহার দিকে ফিরি।
আমারে স্ত্রীরূপে পেয়ে তাদেরি কেহ
স্তবন করিবে ঘুরে আমারি দেহ,
স্বরূপ স্বামীটি হবে থাকিবে সম্পদ মনের প্রসার তার সনে,—
আমার স্বাধীন মতে হবে না ব্যাঘাত বিরাগ রবে না তার মনে।

বৃহৎ আকাঙ্ক্ষাগুলি রহিল বাঁচিয়া, বাসনা রহিল খুব বড়;
তাহারা রহিল বটে ভরিয়া অন্তর কিন্তু রহিল জড়সড়।
জীবন-সায়াহ্ন ক্রমে ঘনায়ে আসে,
আকাশকুসুম সম কল্পনা ভাসে,
কোথায় রহিল সেই বিরাট প্রত্যাশা সময় বৃথাই গেল বয়ে;—
অনন্ত প্রতীক্ষা আর প্রচণ্ড কামনা লাজেতে রহিল নত হয়ে।

বৃহৎ প্রাসাদ সাথে সিডান মোটর প্রেমিক স্বামীও হ'ল ফিঁকা,
কেহই এল না তারা করিল ছলনা, বৃথাই দেখালো মরীচিকা!
আলেয়া আলোর মত প্রগতি আলো
হঠাৎ নিভিয়া গেল, রহিল কালো—
নির্বোধ অতসী মেয়ের সমাধি কঙ্কাল আমার অন্তরমাঝে হাসে,
শিক্ষিতা অসিরে আজ নির্বোধ অতসী জিতিয়া লইল অনায়াসে!

শ্রীহেমদাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়।

বাজী রাখা

(চেকভের গল্প হইতে অনূদিত)
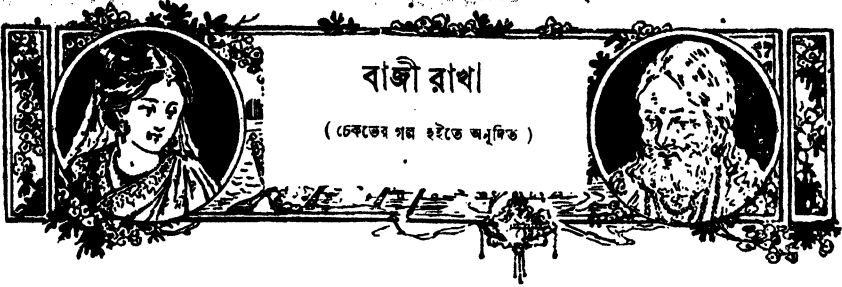
শরৎকাল। অন্ধকার রাত্রি। বৃদ্ধ মহাজন লাইব্রেরী ঘরে পায়চারী করিয়া বেড়াইতেছিল। তাহার মনে পড়িতেছিল পনের বছর পূর্ব্বের এক সান্ধ্য-ভোজের কথা। অনেক লোক উপস্থিত ছিল, অনেক রকমের কথাবার্ত্তা হইতেছিল। প্রাণদণ্ড সম্বন্ধে কথা উঠিল। অতিথিগণের কয়েক জন ছিল কলেজের প্রফেসার ও সংবাদপত্র-লেখক, তাহারা কেহই প্রাণদণ্ডের অনুমোদন করিল না। সকলেই বলিল, এটা একটা বর্ব্বরোচিত শাস্তি, সভ্যজগতের নিতান্ত অযোগ্য, নৈতিকতার দিক দিয়াও কোনমতে সমর্থন করা যায় না। কেহ কেহ বলিল, প্রাণদণ্ডের পরিবর্ত্তে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের ব্যবস্থা হওয়া উচিত।

গৃহস্বামী বলিয়া উঠিল, "মহাশয়গণ, আপনাদের সহিত আমি একমত হইতে পারিলাম না। প্রাণদণ্ড বা আজীবন কারাবাস—কোনটাতেই আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা না থাকিলেও সহজ বুদ্ধিতে আমার মনে হয়, জীবনব্যাপী কারাবাস অপেক্ষা প্রাণদণ্ড অনেকাংশে ভাল। এক মুহূর্ত্তেই জীবনলীলা শেষ হইয়া যায়—তিল তিল করিয়া মরিতে হয় না। মুহূর্ত্তমধ্যে জীবনের পরপারে উপস্থিত হওয়া, আর এ পারে বসিয়াই রহিয়া রহিয়া পিষিয়া পিষিয়া মরা—এই দু'টোর মধ্যে কোন্‌টাকে আপনারা ভাল মনে করিবেন?"

অতিথিদের মধ্যে এক জন বলিল, "দু'টোই অন্যায়, কেন না, উদ্দেশ্য একই—জীবন লওয়া। গভর্ণমেণ্ট ত ভগবান নন্! যে জীবন ইহার দান করিবার ক্ষমতা নাই, সে জীবন নেওয়ার অধিকারও ইহার থাকা উচিত নয়।"

উপস্থিতের মধ্যে এক জন ছিল আইন-ব্যবসায়ী, বছর পঁচিশেক বয়স। তাহার মতামত জিজ্ঞাসা করা হইলে সে বলিল, "প্রাণদণ্ড বা জীবনভর কারাদণ্ড, দু'টোর একটাও উচিত শাস্তি নয়। তবু একটাকে যদি বাছিয়া লইতে হয়, তবে দ্বিতীয়টাই ভাল। কেন না, মরার চেয়ে কোনমতে বাঁচাই ভাল; ইহা বোধ হয় কেহ অস্বীকার করিবেন না।"

তার পর কৌতুকজনক আলোচনা সুরু হইল। মহাজনের বয়স ছিল সে সময়ে অল্প, রক্ত ছিল গরম। উত্তেজিত হইয়া টেবলের উপর সশব্দে মুষ্ট্যাঘাত করিয়া চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল, "মিথ্যা কথা! আমি দশ লক্ষ টাকা বাজী রাখিতে রাজী আছি। আপনি পাঁচ বছর একটা অন্ধকার কারাগৃহে থাকিতে পারিবেন?"

উকিলটি বলিল, "দশ লক্ষ টাকা দিবেন? ঠিক বলছেন? তা হ'লে আমিও বাজী রাখতে রাজী আছি। পাঁচ বছরের যায়গায় পনের বছর ওখানে থাকতে রাজী আছি।"

মহাজন বলিল, "পনের? আচ্ছা, মহাশয়গণ আপনারা সাক্ষী রহিলেন, আমি দশ লক্ষ টাকা বাজী রাখিলাম।"

"স্বীকৃত হইলাম," উকিল বলিল, "আপনি বাজী রাখিলেন দশ লক্ষ টাকা, আমি বাজী রাখিলাম আমার স্বাধীনতা।"

দুই জনেই এই অদ্ভুত বাজী রাখিল। মহাজন ধনী, ধনীর মন খেয়ালে পরিপূর্ণ। দশ লক্ষ টাকা তাহার কাছে কিছুই নয়। আনন্দে আত্মহারা হইয়া উকিলের দিকে ফিরিয়া সে বলিল, "দেখুন, এখনও সময় আছে, আপনার কথা ফিরিয়ে নিন। দশ লক্ষ টাকায় আমার কিছু যায় আসে না। কিন্তু আপনি জীবনের মূল্যবান তিন চারিটা বছর হারাইবেন। তিন চার বছর বলিতেছি, কেন না, এর বেশী আপনি কোনমতেই থাকিতে পারিবেন না। আরো মনে করিয়া দেখুন, বাধ্য হইয়া কারাদণ্ড ভোগ করা অপেক্ষা স্বেচ্ছায় কারাবাস সহ্য করা আরো ভয়ঙ্কর। ইচ্ছা করিলেই স্বাধীন হইতে পারি, এই চিন্তা আপনার সমস্ত জীবনটাকে অস্থির করিয়া তুলিবে। বাস্তবিকই আপনার জন্য দুঃখ হইতেছে।"

মহাজন পায়চারি করিতে করিতে এই অতীত ঘটনার আলোচনা করিয়া আপনা আপনি প্রশ্ন করিতেছে—"আচ্ছা, আমিই বা কেন এমন বাজী রাখিতে গেলাম? কি লাভ হ'ল এতে? উকিলটি তার জীবনের পনের বছর হারাইল, আর আমি আমার দশ লক্ষ টাকা বৃথায় ফেলিলাম। এর দ্বারা লোকে কি বুঝবে প্রাণদণ্ড ভাল, না জীবনব্যাপী কারাবাস ভাল? না না, এ শুধু মূর্খের খেয়াল। আমার দিক দিয়া অর্থের বিকার, আর উকিলটির পক্ষে অদম্য অর্থের স্পৃহা।"

তাহার আরও স্মরণ হইল, সে দিন সান্ধ্য-ভোজের পরে কি কি হইয়াছিল। ঠিক হইল, মহাজনেরই বাড়ীর অতি নির্জ্জন একটা ঘরে কড়া নজরবন্দীতে উকিলকে তাহার কারাবাস-জীবন কাটাইতে হইবে। ঠিক হইল, এই পনের বছরের মধ্যে সে প্রাঙ্গণে নামিতে পারিবে না, জীবিত মনুষ্যের মুখ দেখিতে পাইবে না, মানুষের কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইবে না, চিঠিপত্র বা সংবাদপত্র কিছুই পাইবে না। সে বাদ্যযন্ত্র বাজাইতে পারিবে, বই পড়িতে পারিবে, পত্র লিখিতে পারিবে, মদ্যপান ও ধূমপান করিতে পাইবে। সর্ত্ত অনুসারে সে ছোট একটি জানালার ভিতর দিয়া বাহির জগতের সহিত সংবাদ আদানপ্রদান করিতে পারিবে—কিন্তু কেবল সঙ্কেতে ইসারায়, কথাবার্ত্তা দ্বারা নহে। সর্ত্তে খুঁটিনাটি সবই লেখা হইল। একেবারে নির্জ্জন কারাবাস; ১৮৭০ খৃষ্টাব্দের ১৪ই নভেম্বরের বেলা ১২টা হইতে ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের ১৪ই নভেম্বরের

বেলা ১২টা পর্য্যন্ত। যদি বন্দী এই সমস্ত সর্ত্তের কোনটা উল্লঙ্ঘন করিতে চেষ্টা করে, এমন কি, মুক্তির নির্দ্দিষ্ট দিনের দুই মিনিট পূর্ব্বে পলাইয়া যায়, তাহা হইলেও মহাজনকে আর দশ লক্ষ টাকা দিতে হইবে না।

বন্দি-জীবনের প্রথম বৎসরে নির্জ্জনতা এবং শ্রান্তি এমনিভাবে উকিলকে চাপিয়া ধরিল যে, তাহার জীবন দুর্ব্বহ হইল। তাহার জানালা হইতে দিবানিশি পিয়ানোর শব্দ শোনা গেল। মদ বা তামাক সে কিছুই স্পর্শও করিল না। সে লিখিল, "মদে শুধু বাসনা জাগাইয়া তুলে—নির্জ্জন বন্দীর পক্ষে তাহা অতি ভয়ঙ্কর। বিশেষতঃ একাকী বসিয়া মদ খাওয়ার চেয়ে বিরক্তিজনক ব্যাপার আর নাই।" তামাকুর ধূম তাহার গৃহের নির্ম্মল বায়ু দূষিত করে, প্রথম বৎসরে সে যৌন সম্বন্ধ বিষয়ক নভেল, প্রহসন ইত্যাদি হালকা রকমের বই পড়িয়া কাটাইল।

দ্বিতীয় বৎসরে তাহার ঘর হইতে পিয়ানোর আওয়াজ আর শোনা যায় নাই। সে কেবল চিন্তাশীল প্রবন্ধপূর্ণ বই চাহিয়া পাঠাইয়াছে। পঞ্চম বৎসরে আবার সঙ্গীতচর্চ্চা এবং মদ্যপান। যাহারা তাহার পাহারায় নিযুক্ত ছিল, তাহারা লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছে, সমস্ত বৎসরটাই পান-ভোজন করিয়া বিছানায় শুইয়া থাকিয়া কাটাইয়াছে। বই সে পড়ে নাই। কোন কোন সময়ে রাত্রিতে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত লিখিয়া কাটাইয়া প্রাতঃকালে তাহা ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়াছে। অনেকবার তাহাকে কাঁদিতেও দেখা গিয়াছে।

ষষ্ঠ বৎসরের শেষভাগে বন্দী উৎসাহভরে সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস পড়িয়াছে। এমনই তাহার উৎসাহ—এমনই তাহার আগ্রহ যে, মহাজনের পক্ষে বই জোগাইয়া উঠা ভার। ঠিক এই সময়টাই মহাজন তাহার নিকট হইতে নিম্নলিখিত চিঠিখানি পাইল, "প্রিয় কারারক্ষক, আমি এই লাইন কয়টা অন্ততঃ ছয়টা ভাষায় লিখিয়া পাঠাইতেছি। অভিজ্ঞদের দেখাইলে যদি তাঁহারা বলেন যে, ইহা নির্ভুল, তবে আপনাকে অনুরোধ করিতেছি, সঙ্কেতস্বরূপ বাগানের মধ্যে একটা বন্দুকের আওয়াজ করিবেন। সেই শব্দেই আমি বুঝিব, আমার পরিশ্রম ব্যর্থ যায় নাই। সকল যুগের সকল দেশের মনীষিগণ বিভিন্ন ভাষায় কথা বলিয়া থাকেন—বাহন পৃথক্; কিন্তু ভিতরের সার বস্তুটি এক। খোসা ছাড়াইয়া সেই বস্তুটির আস্বাদন পাইয়া আমার কি যে স্বর্গীয় আনন্দ, তাহা যদি আপনাকে বুঝাইতে পারিতাম!" বন্দীর ইচ্ছা পূর্ণ করা হইল। একটা বন্দুকের আওয়াজে তাহার সফলতার সংবাদ বন্দীকে জানান হইল।

আরও পরে, দশম বৎসরে, উকিল তাহার টেবলের ধারে নিশ্চল হইয়া বসিয়া কেবল বাইবেল পাঠ করিল। যে ব্যক্তি চারি বৎসরে ছয় শত এমন বিদ্যাবত্তাপূর্ণ বড় বড় বই শেষ করিতে পারে, সে সমস্ত গোটা বৎসরে বাইবেলের মত এত সোজা ও ছোট বই পড়িয়া কাটাইল কেন, ভাবিয়া মহাজন অতি বিস্মিত হইল।

শেষের দুই বৎসর উকিল স্তূপীকৃত পুস্তকরাশি শেষ করিয়া ফেলিল—নানা ধরণের বই, কখনও প্রকৃতি-বিজ্ঞান, কখনও বা সেক্সপীয়র, বাইরন, কখনও বা রাসায়নিক গ্রন্থ, চিকিৎসাশাস্ত্র, নভেল, দর্শন বা ধর্ম্মগ্রন্থ। মনে হয়, সে যেন ভাসমান জাহাজ,[illegible]ের মধ্যে অসীম সমুদ্রে হাবুডাবু খাইতেছে—আর জীবন রক্ষার চেষ্টায় একটার পর একটা ধরিয়া মৃত্যুর গ্রাস হইতে উদ্ধার পাইবার প্রয়াস করিতেছে মাত্র।

এই সমস্ত পনের বছর আগের কথা মহাজনের মনে আসিতে লাগিল, আর সে ভাবিল, "কাল বেলা বারোটায় সময় তার মুক্তি। সর্ত্ত অনুসারে তাকে দশ লক্ষ টাকা দিতে হবে। যদি দেই, আমার আর কিছুই থাকিবে না, একেবারে সর্ব্বস্বান্ত হইব।"

পনের বছর আগে দশ লক্ষ টাকা তাহার গ্রাহ্যের মধ্যেই ছিল না। কিন্তু এখন তাহার ভাবিতেও ভয় করে, তাহার দেনা বেশী না আয় বেশী। নিজের উচ্ছৃঙ্খলতা প্রভৃতি নানা কারণে তাহার কারবার খারাপ হইয়া পড়িতেছিল। বহু লক্ষপতির অবস্থা হইতে সে এখন সামান্য নগণ্য কারবারী হইয়া পড়িয়াছে।

নিদারুণ দুশ্চিন্তায় কপালে করাঘাত করিতে করিতে সে আপন মনে বলিয়া যাইতে লাগিল, "কি অশুভক্ষণে বাজী রাখিয়াছিলাম। লোকটা যদি মরিয়া যাইত, তবুও হইত! এখন তার মাত্র ৪০ বৎসর বয়স। আমারই শেষ কপর্দ্দকটি লইয়া, আমাকেই পথের ভিখারী করিয়া দিয়া সে পরম আরামে নিশ্চিন্ত সুখে জীবন অতিবাহিত করিতে থাকিবে, আর আমার সঙ্গে কালেভদ্রে দেখা হইলে হয় ত প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গের সুরে আমাকে বলিবে, 'মহাশয়, আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ। আপনার হ'তেই আমার এই সুখ, এই সম্পদ। আপনাকে আমি সাহায্য করিতে পারি কি?' না, না, না—এ অসহ্য। লজ্জা, অপমান, দেউলিয়া অবস্থা হইতে ত্রাণ লাভ করিবার একমাত্র উপায়—উহাকে মারিতেই হইবে।"

ঘড়িতে ৩টা বাজিয়া গিয়াছে। সমস্ত বাড়ীটা নিস্তব্ধ। মহাজন চাবিটা লইয়া সেই বন্দিগৃহের দিকে ধাবিত হইল। বাহিরে ভীষণ শীত, ভীষণ অন্ধকার। ভিজা, কন্‌কনে বায়ু গর্জ্জন করিয়া বেড়াইতেছে। কোন রকমে হাতড়াইতে হাতড়াইতে সেই কারাগৃহের নিকট আসিয়া পাহারাওয়ালাটাকে ডাকিল। সাড়া পাইল না, বোধ হয়, কোথাও না কোথাও ঘুমাইয়া পড়িয়া থাকিবে। মহাজন ভাবিল, "যদি আমার মনের সংকল্প কার্য্যে পরিণত করিতে পারি, সন্দেহটা নিশ্চয়ই পাহারাওয়ালার উপর পড়িবে।"

সেই ঘরের বারান্দাটার উপর উঠিয়া দিয়াশালাই জ্বালাইয়া দেখিল, কোণে একটা বিছানা পড়িয়া আছে, শয্যায় কেহ নাই। জানালার ভিতর দিয়া বন্দীর কামরার ভিতরে দৃষ্টিপাত করিল, দেখিল, মিটমিটে একটা আলো জ্বলিতেছে। বন্দী নিজে টেবলের ধারে বসিয়া আছে; কেবল তাহার পিঠ, চুল, এবং হাত দেখা যায়। টেবলের উপর, চেয়ারের উপর, ঘরের মেজের উপর এলোমেলোভাবে বই ছড়ান রহিয়াছে।

এইরূপে মিনিট পাঁচেক অতীত হইল, কিন্তু বন্দী একটুও নড়িল না। পনের বছরের বন্দিজীবন তাহাকে নিশ্চল হইয়া বসিয়া থাকিতে শিখাইয়াছে। মহাজন জানালার উপর অঙ্গুলি দ্বারা শব্দ করিল, কিন্তু বন্দী যেমন ছিল, তেমনই বসিয়া রহিল। তার পর মহাজন সতর্কতার সহিত তালা খুলিল। মরচেপড়া তালায় খট্ করিয়া শব্দ হইল। পনের বছরের রুদ্ধ দুয়ার ধাক্কা পাইয়া ক্যাঁচ করিয়া আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল। মহাজন মনে করিয়াছিল, একটা বিস্ময়ের চীৎকার শুনিতে পাইবে, আর সঙ্গে সঙ্গে মনুষ্যের পদক্ষেপ তাহার দিকে অগ্রসর হইয়া আসিবে। মিনিট তিনেক

গেল। কামরার ভিতরে পূর্ব্বের ন্যায় নিস্তব্ধতা বিরাজ করিতে লাগিল। মহাজন ভিতরে প্রবেশ করিল।

টেবলের সম্মুখে একজন লোক বসিয়াছিল। একখানা চর্ম্মাবৃত কঙ্কাল—কোঁকড়া কোঁকড়া লম্বা চুল—লম্বা দাড়ি। মুখের রং হল্‌দে—একটু মেটে। গাল বসিয়া গিয়াছে, হাত একখানি হাড় মাত্র—দেখিতে ভয় হয়। চুল পাকিতে আরম্ভ করিয়াছে। চেহারা দেখিয়া কেহ বলিবে না যে, মাত্র ৪০ বৎসর বয়স। টেবলের উপর তাহারই লেখা একখানা কাগজ পড়িয়াছিল।

মহাজন ভাবিল, "আহা, বেচারী বোধ হয় ঘুমাইয়া ঘুমাইয়া লক্ষ টাকার স্বপ্ন দেখিতেছে। একটা ধাক্কা মারিয়া বিছানার উপর ফেলিয়া গলাটা টিপিয়া দিলেই সব শেষ। অস্বাভাবিক মৃত্যুর কোন চিহ্নও কেহ খুঁজিয়া পাইবে না। মনে করিবে, হার্টফেল্ করিয়া মরিয়াছে। আচ্ছা, আগে দেখা যাক্ কাগজখানায় কি লিখে রেখেছে।"

বলিয়াই টেবলের উপর হইতে কাগজখানা তুলিয়া ধরিয়া সে পড়িতে আরম্ভ করিল—

"কাল বেলা বারোটার সময় আমি আমার স্বাধীনতা, লোক-জনের সহিত দেখাশুনা, মেলামেশা করিবার অধিকার ফিরিয়া পাইব। কিন্তু এই কক্ষ ত্যাগ করিয়া সূর্য্যালোকে বাহির হইবার পূর্ব্বে তোমাদের নিকট কয়েকটা কথা বলা বিশেষ আবশ্যক মনে করি। আমার মধ্যে যদি কিছু সত্য থাকে তাহারই আজ আমি দোহাই দিয়া বলিতেছি, তোমরা যাহাকে স্বাধীনতা, জীবন, স্বাস্থ্য এক কথায় জগতের সুখ সম্পদ বল, আমি তাহাকে অন্তরের সহিত ঘৃণা করি।

"এই পনের বৎসর ধরিয়া আমি—এই পার্থিব জীবনটাকে বিশেষ যত্নের সহিত পাঠ করিয়া আসিতেছি। সত্য বটে, এই দীর্ঘ-কাল মধ্যে আমি পৃথিবীর রূপ কেমন বা জীবন্ত মনুষ্যের রূপ কিরূপ, তাহা দেখি নাই। কিন্তু বইয়ের ভিতর দিয়া পান-ভোজন, আমোদ-প্রমোদ, প্রেম, ভালবাসা, বন্ধুত্ব—সকল জিনিষের সহিতই আমার পরিচয় ঘটিয়াছে। তোমাদের কবিগণের অদ্ভুত সৃষ্টি স্বর্গের অপ্সরাগণের ন্যায় সুন্দরী সুন্দরী রমণীগণ রাতে আমার নিকট আসিয়া—অমৃতগুঞ্জনে আমার হৃদয়কে আনন্দরসে সিক্ত করিয়াছে, তোমাদেরই বইয়ের সাহায্যে অতি উচ্চ পর্ব্বতের চূড়ায় উঠিয়া আমি দেখিয়াছি, তরুণ অরুণ কেমন করিয়া ঊষার অবগুণ্ঠন মোচন করিয়া দেয়,—সায়াহ্নের সূর্য্য কেমন করিয়া আকাশ নদ নদী সমুদ্রে স্বর্ণালোকের সৌন্দর্য্য ঢালিয়া দেয়। দেখিয়াছি, মাথার উপরের মেঘাবরণ ভেদ করিয়া কেমন করিয়া চপল হাসির দীপ্তিতে দিগ্‌দিগন্ত উদ্ভাসিত করিয়া, চলিয়া যায় চপলা। তোমাদেরই বইয়ের ভিতর দিয়া কত অসাধ্য সাধন করিয়াছি—কত সমৃদ্ধিশালী নগরকে জ্বালাইয়া পোড়াইয়া মরুভূমিতে পরিণত করিয়াছি—কত নূতন ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছি, কত শত দেশের উপর দিয়া বিজয়ী বাহিনী চালাইয়া আসিয়াছি।

"তোমাদের বই-ই আমাকে বিদ্যা দিয়াছে। শতাব্দীর সঞ্চিত জ্ঞানভাণ্ডার আজ আমার এই ক্ষুদ্র মগজের মধ্যে। আমি জানি, তোমাদের সকলের চেয়ে আমি জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান।

"এখন আমি তোমাদের বইগুলিকে ঘৃণা করি, জগতের সুখ-সম্পদ জ্ঞান সকলকে ঘৃণা করি। সকলই অসার, ক্ষণস্থায়ী, কাল্পনিক, মরীচিকার ন্যায় অমূলক। তোমরা ধনের, জ্ঞানের, সৌন্দর্য্যের অহঙ্কার কর। কিন্তু মনে রেখ, মৃত্যু আসিয়া একদিন তোমাদের গর্ব্ব দূর করিয়া দিবে—তোমাদের সকল গরিমা সেই মহাদিনে তাসের ঘরের মত সহজে ধূলিসাৎ হইয়া যাইবে।

"তোমরা পাগল, ভুল পথ ধরিয়া চলিয়াছ। তোমাদের মত্ততায় মিথ্যাকে সত্য বলিয়া মনে কর, কদর্য্যকে সুন্দর বলিয়া ধারণা কর। স্বর্গসুখের পরিবর্ত্তে পৃথিবীর তিক্ত আনন্দকে আলিঙ্গন কর। তোমাদের দেখিয়া আমি বিস্ময়ে মরিয়া যাই। আমি তোমাদের বুঝিতে চাই না, বুঝাইতেও চাই না।

"যে স্বর্ণমৃগের পশ্চাতে অহরহ তোমরা ছুটিয়া বেড়াইতেছ, আমিও যাহাকে একদিন জীবনের শ্রেষ্ঠ সাধনার ধন বলিয়া ভাবিতাম, তাহার প্রতি আন্তরিক ঘৃণা দেখাইবার জন্য আমি বলিতেছি, আমার দাবী দশ লক্ষ টাকা ছাড়িয়া দিলাম। আমার দাতাকে সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিন্ত করিবার জন্য সর্ত্তের নিয়ম উল্লঙ্ঘন করিয়া কাল নির্দ্দিষ্ট সময়ের পাঁচ মিনিট পূর্ব্বে বাহির হইয়া আসিব।"

পড়া শেষ হইলে মহাজন কাগজখানি টেবলের উপর রাখিয়া এই অদ্ভুত প্রকৃতির লোকটার দিকে এক দৃষ্টে তাকাইয়া রহিল। চোখের জল বাধা মানিল না—টপ টপ করিয়া টেবলের উপর পড়িতে লাগিল। কিছুকাল এইভাবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে সে ঘরের বাহির হইয়া গেল। জীবনে কখনই তাহার নিজের প্রতি এমন তীব্র ধিক্কার জন্মায় নাই। নিজের ঘরে আসিয়া সে নিঃশব্দে বিছানায় শুইয়া পড়িল। গ্লানি ও অনুশোচনার তীক্ষ্ণ কশাঘাতে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত সে ঘুমাইতে পারিল না।

পরদিন পাহারাওয়ালা দৌড়াইয়া আসিয়া সংবাদ দিল, সে বন্দীকে জানালা দিয়া সম্মুখের প্রাঙ্গণে বাহির হইতে দেখিয়াছে। তার পর ফটক পর্য্যন্ত আসিয়া কোথায় অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে।

মহাজন তৎক্ষণাৎ পাহারাওলার সঙ্গে সঙ্গে আসিয়া তাহার কথার সত্যতা পরীক্ষা করিল। বন্দী নির্ভুল পলাইয়াছে, অনাবশ্যক গুজব এড়াইবার জন্য বন্দীর সেই ত্যাগ-পত্রখানা টেবলের উপর হইতে উঠাইয়া লইয়া বাড়ী আসিয়া আপন সিন্দুকে বন্ধ করিয়া রাখিয়া দিল।

শ্রীকেশবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

জন্মতিথি

[গল্প]

"রায় মশাই !—রায় মশাই, বাড়ী আছেন ?"

সঙ্গে সঙ্গে বাহিরের দরজার কড়া ঝন্-ঝন্ করিয়া বাজিয়া উঠিল।

হিমাংশুকুমার সবে গৃহদেবতা রাধামাধবের পূজা সারিয়া বাহিরে বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। ভাদ্রের আকাশ আজ যেন মেঘমূর্চ্ছিত—এখনই হয় ত ধারাবর্ষণ আরম্ভ হইবে। তিনি উদাস-দৃষ্টিতে আকাশের দিকে চাহিয়া নিজের অদৃষ্টের কথা ভাবিতেছেন, এমন সময় কড়া নাড়ার শব্দ বজ্রনির্ঘোষের ন্যায় তাঁহার বুকে আসিয়া বাজিল।

"রায় মশাই আছেন ?—"

এ কণ্ঠস্বর পরিচিত। হিমাংশুকুমার স্খলিত চরণে সিঁড়ি দিয়া নীচে নামিতে লাগিলেন।

সতের বৎসর বয়স্ক পুত্র সীতাংশু আসিয়া বলিল, "বাবা, মাখমবাবু ডাকছেন আপনাকে।"

হিমাংশু বলিলেন, "তাঁকে বাইরের ঘরে বসাও, আমি যাচ্ছি।"

স্বামীর মলিন মুখের দিকে চাহিয়া পত্নী হেমপ্রভা উৎকণ্ঠিতস্বরে বলিলেন, "কি হবে ?"

মুখে উত্তর জোগাইল না। উপরের দিকে হাত তুলিয়া হিমাংশুকুমার ধীরে ধীরে বাহিরের ঘরের দিকে চলিলেন।

পঞ্চদশী কন্যা বীণা ছল-ছল নেত্রে মাতার পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। উভয়েরই দৃষ্টি গমনোন্মুখ পুরুষটির প্রতি স্থির-নিবদ্ধ।

বাহিরের ঘরে একখানি জীর্ণপ্রায় তক্তপোষের উপর অর্দ্ধছিন্ন একখানা মাদুর পাতা। তাহারই উপর বসিয়া সীতাংশু পড়াশুনা করিত। হিমাংশুপ্রকাশ দেখিলেন, মাখমবাবু তাহাতে না বসিয়া বাতায়নের ধারে দাঁড়াইয়া আছেন।

শিষ্টাচারের বাহ্য আদান-প্রদানের পর মাখমবাবু বলিলেন, "তা হ'লে রায় মশাই, কালই ত বাড়ী ছেড়ে দিচ্ছেন ? দেখুন, আপনি এক কথার মানুষ, আর অনেক দিন আপনার সঙ্গে কারবার করেছি, তাই আদালতে আর যাবার ইচ্ছে নেই।"

হিমাংশুকুমার শুষ্ককণ্ঠে বলিলেন, "আদালতের কথা কেন তুলছেন, মাখমবাবু ? আমার কথার খেলাপ ত হবে না।"

আগন্তুক মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "তা জানি। আপনি কথার খেলাপ জীবনে কখনও করেন নি। তা হ'লে, কাল কখন্ বাড়ী খালি ক'রে দেবেন ? দলিলে লেখা মত সর্ত্তে বারো বছর কাল শেষ হবে। এর মধ্যে আমার প্রাপ্য গণ্ডা মায় সুদ শোধ ক'রে দিতে পারতেন যদি, তা হ'লে বাড়ী ত আপনাদেরই থাক্ত। তা যখন—"

বাধা দিয়া বিনীতকণ্ঠে হিমাংশুপ্রকাশ কহিলেন, "কিন্তু কাল ভাদ্র সংক্রান্তি। আপনিও হিন্দু, আমিও তাই। দয়া ক'রে কাল পরশু দু'দিন আমায় সময় দিন। ২রা আশ্বিন আপনি বাড়ীর দখল পাবেন।"

শেষের দিকে হিমাংশুপ্রকাশের কণ্ঠস্বর ভারী হইয়া আসিল। আসন্ন নিঃসহায় ও নিরাশ্রয় অবস্থার কথাও বোধ হয় মনে পড়িল।

মাখমবাবু কয়েক মুহূর্ত্ত নীরবে কি ভাবিলেন। তার পর ধীরে ধীরে বলিলেন, "আচ্ছা, তাই হবে। কিন্তু দোহাই আপনার, এর পর আর কোন ওজর-আপত্তি যেন করবেন না। আপনার কথায় আমি বিশ্বাস করি। দেখবেন, যেন আইন-আদালত আর না করতে হয়।"

হিমাংশুপ্রকাশ মুহূর্ত্তের জন্য যেন উত্তেজিত হইয়া পড়িলেন। তিনি দৃঢ়কণ্ঠে বলিলেন, "পৈতৃক ভিটের মোহ সামান্য নয়, কিন্তু পরশুদিন বিকেলবেলা—সন্ধ্যার আগেই আমি বাড়ী খালি ক'রে দেব, মাখমবাবু। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। আমার কথার নড়-চড় হবে না।"

"আচ্ছা দেখ্‌বেন। খুব দুঃখের সঙ্গেই আমাকে এ কায করতে হচ্ছে। কারও ভিটেবাড়ী নেবার আগ্রহ আমার নেই। কিন্তু বারো বছরেও আপনি পারলেন না। কি করি বলুন, হিমাংশুবাবু, আমার অপরাধ নেবেন না।"

"না, না, এতে আপনার ত কোন দোষ নেই। আমার ভাগ্য, মাখমবাবু।"

নমস্কার জানাইয়া মাখমবাবু বিদায় লইলেন।

হিমাংশুপ্রকাশ স্থাণুর মত ঘরের মাঝখানে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

পুত্র সীতাংশু অনেকক্ষণ সে ঘর হইতে বাহির হইয়া গিয়াছিল। হিমাংশুপ্রকাশ ধীরে ধীরে তক্তপোষে মাদুরের উপর বসিয়া পড়িলেন।

ভবানীপুরের এই পৈতৃক বাড়ীখানিই শেষ অবলম্বন ছিল। তাই মহা দুর্দ্দিনে এত কাল শোক-কাতরা জননী, পত্নী হেমপ্রভা ও পুত্র-কন্যাকে লইয়া তিনি মাথা গুঁজিয়া থাকিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। আর দুই দিন পরে সে সুযোগও থাকিবে না।

কঠোর জীবন-সংগ্রামে অনবরত যুদ্ধ করিয়া হৃদয় ক্ষত-বিক্ষত হইলেও বলিষ্ঠহৃদয় হিমাংশুপ্রকাশ বাহিরে এতটুকু বিচলিত ভাব প্রকাশ করিতেন না।

পিতা স্বচ্ছন্দ জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া যথেষ্ট অর্থ-সম্পদ রাখিয়া গিয়াছিলেন। এলাহাবাদে ব্যবসায় উপলক্ষে সপরিবারে দীর্ঘকাল বাস করিয়া যথেষ্ট অর্থোপার্জ্জন করিয়াছিলেন। পিতার মৃত্যুর পর হিমাংশু-প্রকাশ পৈতৃক ব্যবসায়কে উন্নতির উচ্চশিখরে তুলিয়া-ছিলেন। বাড়ী গাড়ী সবই তাঁহার ছিল। ব্যবসার প্রতিষ্ঠানে মাসিক সাতাশ শত টাকা কর্ম্মচারীদিগের বেতন বাবদই তিনি দিতেন। ভাগ্যাকাশে দীপ্ত সূর্য্যের কিরণোচ্ছ্বাস—দুশ্চিন্তার কোন হেতুই ছিল না। কনিষ্ঠ সহোদর তখন বালকমাত্র। সুধাংশু তাহার দাদাকে দেবতার মত ভক্তি করিত। পুত্র সীতাংশু তিন বৎসরের বালক। বীণা এক বৎসরের শিশু।

অকস্মাৎ মেঘলেশহীন আকাশে প্রলয়-জলদ-জাল দেখা দিল। যে কর্ম্মচারীর উপর বিশ্বাস ন্যস্ত করিয়া বড় বড় কণ্ট্রাক্ট, প্রতিষ্ঠানের নামে চুক্তি করা হইত, তাহার লুব্ধ চিত্তের বিশ্বাসঘাতকতায় একটি বড় চুক্তিতে লক্ষাধিক টাকা লোকসান দিতে হইল। শুধু তাহাই নহে, আরও কয়েকটি চুক্তির হিসাব-নিকাশ করিতে গিয়া, ভোজ-বাজির ন্যায় অল্পদিনের মধ্যেই ব্যবসায় ত বন্ধ হইলই, এলাহাবাদের বাড়ী, গাড়ী, তৈজসপত্র এমন কি, যথাসর্ব্বস্ব দিয়া অপমান ও লাঞ্ছনার দায় হইতে নিষ্কৃতি পাইলেন।

ইন্দিরা যখন দয়া করিয়া গৃহীর মাথায় সোনার ঝাঁপি ঢালিয়া দিয়া আশীর্ব্বাদ করেন, তখন যেমন চারিদিক হইতে অযাচিতভাবে অর্থ-সম্পদ ভাণ্ডার পূর্ণ করিয়া ফেলে, আবার যখন চঞ্চলচরণে তিনি গৃহীর আশ্রয় ত্যাগ করেন, তখন বানের জল শেষ হওয়ার মত, স্রোতের টানে পূর্ব্ব-সঞ্চিত যাহা কিছু থাকে, তাহাও নিঃশেষে অন্তর্হিত হয়। জননী ও স্ত্রীর স্বর্ণালঙ্কারগুলিও সঙ্গে সঙ্গে পাওনা-দারদিগের দাবী মিটাইতে বিদায় গ্রহণ করিল।

এই অভাবনীয় পরিবর্ত্তন পাঁচ বৎসরের মধ্যেই ঘটিয়া গেল।

উপায়ান্তর না দেখিয়া হিমাংশুপ্রকাশ এলাহাবাদের মায়া ত্যাগ করিয়া ভবানীপুরের পৈতৃক বাড়ীতে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। তখন কনিষ্ঠ সহোদর সুধাংশুর লেখা-পড়ার দিকেই তাঁহার একান্ত দৃষ্টি পড়িল।

অনেক পরিচিত পিতৃবন্ধুর সহায়তায় একটি সওদাগরী আপিসে হিমাংশুপ্রকাশ একশত টাকা বেতনে একটি চাকরী পাইলেন। সুধাংশু তখন মিত্র ইনষ্টিটিউশনে ম্যাট্রিক ক্লাশের ছাত্র। পড়াশুনায় অখণ্ড মনোযোগ থাকায় সে প্রথম শ্রেণীর বৃত্তি লইয়া ম্যাট্রিক পাশ করিল।

যথাসময়ে আই, এস, সি, ও বি, এস, সিতে সর্ব্বোৎকৃষ্ট ছাত্ররূপে সে জননী ও দাদার প্রাণে আনন্দের বন্যা বহাইয়া দিল। ঠিক এই সময়ে আর একটি ঋণের বোঝা হিমাংশু-প্রকাশকে অস্থির করিয়া তুলিল।

সেই ঋণভার হইতে মুক্তিলাভের জন্য পৈতৃক বাড়ী বন্ধক পড়িল। উত্তমর্ণ দলিল করাইয়া লইল, বারো বৎসরের মধ্যে সুদসহ আসল টাকা শোধ দিতে না পারিলে, দ্বাদশ বৎসর অন্তে বাড়ীটি তাহারই হইবে। হিমাংশুপ্রকাশের আশা ছিল, সুধাংশু তত দিনে মানুষ হইবে, তাঁহার নিজের অবস্থারও পরিবর্ত্তন সম্ভব হইতে পারে। সুতরাং বাড়ী বিক্রয় করিয়া ফেলিলে হয় ত ঋণ-শোধের পর কিছু অর্থ পাওয়া যাইত, কিন্তু তাহার অপেক্ষা এ ব্যবস্থা ভাল। কারণ, বারো বৎসরে কি দেনা শোধ দিয়া পৈতৃক ভিটাকে ফিরাইয়া আনা যাইবে না?

আশাতেই মানুষ বাঁচে—নানা প্রকার ভাঙ্গাগড়া করে। ভ্রাতার সহিত পরামর্শ করিয়া হিমাংশুপ্রকাশ ঐ সর্ত্তেই ঋণ গ্রহণ করিয়া দেনার দায় হইতে মুক্ত হইলেন। উভয় ভ্রাতাই সেই দলিলে স্বাক্ষর করিয়া দিলেন।

হয় ত বিধাতার আশীর্ব্বাদে সুদিনের আনন্দোচ্ছল মূর্ত্তি দেখা দিত, কিন্তু তাহা ঘটিল না। এম, এস, সি পরীক্ষায় রসায়নে সর্ব্বপ্রথম স্থান অধিকার করার কয়েক মাস পরেই সুধাংশুপ্রকাশ নিরুদ্দেশ হইয়া গেল। সে আজ প্রায় ৮ বৎসরের কথা। যাইবার সময় সংক্ষিপ্ত পত্রে সে শুধু দাদার চরণে সহস্র প্রণাম জানাইয়া লিখিয়া গিয়াছিল, মার জন্য চিন্তা নাই, তাহার দাদা আছেন। যদি অবস্থার মোড় ফিরাইতে পারে, সে তখন ফিরিবে। দাদা যেন তাহার সহস্র অপরাধ ক্ষমা করেন। বাঙ্গালাদেশে হিন্দু বাঙ্গালীর অন্নসংস্থানের উপায় নাই বুঝিয়াই সে এই পথ অবলম্বন করিয়াছে।" মা, দাদা ও বৌদিদি যেন তাহার উদ্দেশে আশীর্ব্বাদ বর্ষণ করেন।

সেই দিন হইতে বিধবা জননী শয্যা লইয়াছেন। তাঁহার নয়নের অশ্রুধারা হিমাংশুপ্রকাশ মুছাইতে পারেন নাই। আজ পর্য্যন্ত পরম স্নেহাধার সুধাংশুর কোনও সংবাদই তিনি পান নাই—অথচ সংবাদ পাইবার জন্য তাঁহার চেষ্টার কোন ক্রটিই তিনি করেন নাই।

ভাদ্রের আসন্ন বর্ষণোন্মুখ প্রভাতে বাহিরের ঘরে বসিয়া কনিষ্ঠের কথা মনে করিয়া জ্যেষ্ঠের আননে ধারা নামিয়া আসিল। সে যখন দেশত্যাগ করিয়াছিল, তখন হিমাংশুর মাসিক এক শত টাকা আয় সে দেখিয়া গিয়াছিল। সেই টাকায় সংসার সচ্ছলই ছিল। কিন্তু আজ তিন বৎসর হইল, সদাগরী আপিসের সে চাকরী হিমাংশুপ্রকাশ হারাইয়াছেন। অর্থনৈতিক দুর্দ্দশার চাপে কোম্পানী বহু লোক কমাইয়া দিয়াছিল। সেই সূত্রে হিমাংশুরও চাকরী গিয়াছিল।

জীবনসংগ্রামের বিভীষণ রূপ তার পর হিমাংশু-প্রকাশকে কিরূপ শঙ্কিত করিয়া তুলিয়াছিল—দিনের পর দিন অর্দ্ধাশন ও অনশনের মধ্য দিয়া কি অগ্নিপরীক্ষা আরম্ভ হইয়াছিল, সুধাংশু, স্বেচ্ছানির্ব্বাসিত কনিষ্ঠ সহোদর ত তাহার কোনও আভাসই পায় নাই। সে বাঁচিয়া আছে কি না, তাহাই বা কে জানে?

সহোদরের কথা মনে হইতে হিমাংশুপ্রকাশ বালকের ন্যায় কাঁদিয়া উঠিলেন। শোক-পীড়িতা মাতা এখনও জানেন না যে, আর দুই দিন পরেই এ গৃহ হইতে তাঁহারা নির্ব্বাসিত হইবেন। সংসারের দুঃখ-দৈন্যের, অভাব-অনটনের আভাসমাত্র তাঁহারা কেহই বৃদ্ধাকে জানিতে দিতেন না। শোকবিমূঢ়া জননী নিজের দ্বিতলস্থ এক প্রান্তস্থিত কক্ষে থাকিতেন। কদাচিৎ বাহিরে আসিতেন। আট বৎসর এমনই ভাবে চলিতেছে।

আজ মাস পাঁচেক হইল, একটি মাড়োয়ারীর আপিসে হিমাংশুপ্রকাশ ত্রিশ টাকা বেতনে একটি কায জুটাইয়া লইয়াছেন। কিন্তু মাসিক বেতন অগ্রিম লইয়াই তাঁহার দুঃখময় দিন অতিকষ্টে চলিতেছিল। বাড়ীর মূল্যবান আসবাবপত্র সবই জঠরজ্বালা নিবারণের জন্য একে একে গৃহের মায়া ত্যাগ করিয়া পাত্রান্তর আশ্রয় করিয়াছিল। কিন্তু প্রতিবেশী কাহারও নিকট মুহূর্ত্তের জন্য অভিমানী হিমাংশুপ্রকাশ হাত পাতেন নাই। নিজের পারি-বারিক অবস্থার কথা ভ্রমেও তিনি কাহাকেও জানিতে দিতেন না।

বাড়ীর যাবতীয় কর্ম্ম হেমপ্রভা ও বীণার নিপুণ হস্তে সম্পাদিত হইত। প্রতিবেশীদিগের অধিকাংশই ভাড়াটিয়া—সুতরাং কাহারও সহিত আলাপ-পরিচয়ের প্রবৃত্তি এবং অবকাশ তাঁহাদের কাহারও ছিল না।

আপনাকে বহু আয়াসে সংযত করিয়া লইয়া হিমাংশু-প্রকাশ স্তব্ধভাবে বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন।

এমন সময় প্রায় নিরাভরণা কন্যা বীণা আসিয়া পিতার পার্শ্বে দাঁড়াইল। ধীরে ধীরে পিতার কাঁচা-পাকা

কেশরাজির মধ্যে তাহার কোমল হাতের অঙ্গুলিগুলি চালনা করিয়া বলিল, "বাবা, মা তোমাকে ডাকছেন।"

মুহূর্ত্তমাত্র সেই কিশোরী কন্যার ম্লান মুখের দিকে চাহিয়া হিমাংশু বলিলেন, "অমন ক'রে থেক না, মা। আমাদের ভরসা রাধামাধব।"

যুক্তকর তিনি ললাটে ঠেকাইলেন

কিশোরীর আয়ত নেত্রপথে ঝর ঝর করিয়া ধারা নামিয়া আসিল।

রাধামাধব! রাধামাধব! বাবাকে রক্ষা করবে না?

সন্ধ্যা হইতেই ঝম্ ঝম্ করিয়া বৃষ্টি আরম্ভ হইয়াছিল।

ঠাকুর-ঘরে সন্ধ্যারতি করিবার জন্য হিমাংশুপ্রকাশ প্রবেশ করিয়াছিলেন।

পিতৃ-পিতামহের পূজিত, দীর্ঘ দিনের প্রতিষ্ঠিত গৃহ-দেবতার দিকে নিবদ্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া হিমাংশুপ্রকাশ আসনে বসিলেন।

রাধামাধবের মাথায় সোনার মুকুট ও সোনার ময়ুর-পুচ্ছ, গলদেশে সোনার কদম্বমালা, পায়ে সোনার নূপুর। মাধবের হাতে সোনার বাঁশী। স্বর্ণ-সিংহাসনের উপর বিগ্রহ মূর্ত্তি শত বৎসরাধিক কাল পূর্ব্বে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। অবস্থার নিদারুণ পীড়ন, সংসারের ভীষণ ঝটিকাবর্ত্ত মাথার উপর দিয়া চলিয়া গিয়াছে, কিন্তু বিগ্রহকে কিছুই স্পর্শ করিতে পারে নাই। পিতামহ, অতিবৃদ্ধ-পিতামহ স্বহস্তে দেবতার অঙ্গে রত্নালঙ্কারগুলি পরাইয়া দিয়াছিলেন—স্বহস্তে তাঁহারা গৃহদেবতার পূজা করিয়া গিয়াছেন। স্বর্গীয় পিতৃদেবের শেষ আমলে বিশ্বস্ত পূজারীর পূজায় বিগ্রহকে সন্তুষ্ট থাকিতে হইত। কিন্তু কলিকাতায় আসিয়া হিমাংশু-প্রকাশ স্বহস্তে পূজার ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন।

পূজার আসনে বসিয়া হিমাংশুপ্রকাশ চারি দিকে চাহিয়া দেখিলেন। না—উদ্যানের ফুল ও তুলসীপত্র এবং গঙ্গাজল, ইহা ছাড়া কোন উপচারই আজ রাধামাধবের জন্য নাই।

একটা প্রচণ্ড হাহাকার তাঁহার বুকের মধ্যে দীর্ঘশ্বাস ফেলিল।

"ঠাকুর, আজ তোমাদের শেতল দেবার জন্য এই গঙ্গাজলই ভরসা। এই নিয়েই সন্তুষ্ট হও, রাধামাধব! কাল থেকে এই হতভাগা এ-ও যোগাড় কর্ত্তে পার্ব্বে না।"

হ্যাঁ, কালই ২রা আশ্বিন। এ বাড়ী ছাড়িতে হইবে। কিন্তু রাধামাধবকে কোথায় রাখা হইবে? এখনও পর্য্যন্ত কোনও বাড়ী ঠিক হয় নাই। কাল বৈকালের মধ্যে যেমনই হউক, একটা কুটীর খুঁজিয়া লইতেই হইবে।

উপায় নাই, উপায় নাই!

মা কিন্তু এখনও কিছুই জানেন না। কাল সকালে তাঁহাকে বলিতেই হইবে। দুঃখিনী জননী; পুত্র-শোকাতুরা মা আমার!—

বাহুর তাড়নায় চোখের জল মুছিয়া হিমাংশুপ্রকাশ আচমন করিয়া স্তব্ধ হইয়া বসিলেন।

না, দেবতার অর্চ্চনার সময় দুর্ব্বল হৃদয়ের এমন অভিব্যক্তি শুধু অশোভন নহে—অমার্জ্জনীয় অপরাধ।

ক্ষমা কর, দয়াল ঠাকুর! রাধামাধব, অপরাধ লইও না!

কিন্তু ধ্যান একাগ্র হইতে চাহে না। রাধামাধবের মুখে কি বিদ্রূপের হাস্য? নিমীলিত নয়নের সম্মুখেও বিগ্রহের দীপ্তমূর্ত্তি যেন হাসিতেছে—জ্যোৎস্নাধারা ঝরিয়া পড়িতেছে না কি?

হাস ঠাকুর, তোমার হাসিবারই কথা। অক্ষম সেবকের দৈন্য দেখিয়া বিশ্ব হাসিতেছে। তুমি বিশ্বেশ্বর, কৌতুক হাস্য নিশ্চয়ই তোমার আননে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিবেই! কিন্তু অগ্নিধারা ত নহে! এ যে অনন্ত জ্যোৎস্নার প্লাবন বহিয়া চলিয়াছে!

প্রবলবেগে জলধারা নামিয়া আসিল। মাঝে মাঝে আকাশের বুক চিরিয়া দামিনীর ললিত-নৃত্য চলিয়াছে। উন্মুক্ত বাতায়ন-পথে এক একটা দম্‌কা বাতাস ছুটিয়া আসিতেছে।

একটি তামার পাত্রে গঙ্গাজল ঢালিয়া হিমাংশুপ্রকাশ বলিলেন, "সারা বিশ্বের বিচিত্র খাদ্য ভক্ত তোমায় নিবেদন ক'রে ধন্য হয়। এই দীন, অক্ষম সেবকের ঘরে আছ বলে, আজ এই গঙ্গাজলেই তোমাদের ক্ষুন্নিবৃত্তি হোক্, রাধামাধব! এ শাস্তি আমার জন্যই রয়েছে। আমারই কর্ম্মফল। তুমি অনন্ত প্রেমময়—তোমার কাছে শেষ ভিক্ষা, কাল থেকে নিজের ব্যবস্থা তুমি নিজে ক'রে নিও।"

পঞ্চপ্রদীপ জ্বালাইয়া ঘণ্টাধ্বনি করিতে করিতে হিমাংশুপ্রকাশ নিষ্পলক-নেত্রে বিগ্রহের পানে চাহিয়া রহিলেন।

ভক্তিভরে প্রণাম করিয়া তিনি আপন মনে বলিলেন, "আমার সব গেছে, রাধামাধব! কিন্তু কথার মর্য্যাদা রাখ্‌তে কখনো ভুলিনি। যদি আশীর্ব্বাদ করবার যোগ্যপাত্র ব'লে তোমার বিবেচনায় হয়, ঠাকুর, তা হ'লে কালও যেন, কথার খেলাপ না ক'রে বসি। শুধু এইটুকু তুমি দেখো।"

পূজা সারিয়া নিঃশব্দে হিমাংশুপ্রকাশ বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইলেন! কেহ কোথাও নাই। শুধু অন্ধকার আকাশ ভাঙ্গিয়া প্লাবন নামিতেছিল।

রন্ধনাগারের আলোক নির্ব্বাপিত। রাঁধিবার মত কিছু নাই, তাই রান্না চড়ে নাই। বাকি যে কয়েকটা পয়সা পকেটে পড়িয়াছিল, মাতার জন্য কিছু ফল ও মিষ্ট তিনি কিনিয়া আনিয়া ওবেলা ঠাকুরকে নিবেদন করিয়া দিয়াছিলেন। তাহাতেই মার এবেলা চলিবে।

ঐ ত দূরে তাঁহার জননীর শয়ন-কক্ষ। না, এখন নহে। কাল সকালেই নিদারুণ সংবাদ দিলেই হইবে। অন্ততঃ রাত্রির মত তাঁহার শোককাতর অন্তর বিশ্রাম-সুখ লাভ করুক।

৪

শরতের প্রসন্ন আকাশে তখনও তরুণ-অরুণের দীপ্তি ফুটিয়া উঠে নাই। গত রজনীতে যে প্রচুর বারিপাত হইয়াছিল, প্রভাতের মেঘশূন্য সুনীল আকাশ দেখিয়া তাহা অনুমান করা যায় না।

হিমাংশুপ্রকাশ বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। তাঁহার শ্রান্ত নয়নযুগল দেখিলেই স্পষ্ট বুঝা যাইবে, সারারাত্রি তিনি নিদ্রা যাইতে পারেন নাই।

নৈরাশ্যপূর্ণ দৃষ্টিতে তিনি আকাশের দিকে চাহিলেন।

হ্যাঁ, আজ ২রা আশ্বিন। তাঁহার নিজের জীবনের স্মরণীয় তারিখ এই ২রা আশ্বিন। এমনই কর্ম্মফলের অমোঘ ব্যবস্থা যে, এই স্মরণীয় তারিখেই তাঁহাকে পৈতৃক বাসভবন ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতে হইবে। কোনও উপায় নাই।

কিন্তু কোথায় যাইবেন? আর কয়েক ঘণ্টা মাত্র সময় আছে। ইহারই মধ্যে যে কোনও স্থান খুঁজিয়া লইয়া সেইখানেই মাথা গুঁজিতে হইবে। সত্য বটে, দুই দিন ধরিয়া তিনি অনেক স্থানে অনুসন্ধান করিয়াছেন, কিন্তু মাত্র ৩০৲ টাকা উপার্জ্জন যাহার, পাঁচটি বুভুক্ষু প্রাণীর জীবন ধারণের উপযোগী অবশ্য প্রয়োজনীয় খাদ্য সংগ্রহ করিয়া মাথা গুঁজিবার মত, কুটীরের ভাড়া যোগাইবার মত যে অর্থ কোনও মতে ব্যয় করা চলে, তাহার উপযোগী একটি ক্ষুদ্র কুটীরের সন্ধান তিনি এখনও পান নাই। যাহা পাইয়াছেন, তাহার ভাড়া যোগাইবার সামর্থ্যও তাঁহার নাই।

তথাপি অপেক্ষা করিলে চলিবে না। এখনই তাঁহাকে বাহির হইতে হইবে। কাল পুত্রকন্যা ও স্ত্রীর সহিত সমস্ত রাত্রি তাঁহাদের অনশনে কাটিয়াছে। মাড়োয়ারী মনিবের নিকট হইতে ভাদ্র মাসের পূরা বেতনই দফায় দফায় অগ্রিম লওয়ার পর আর এখন কিছুই পাওনা নাই। অত্যন্ত কাতরভাবে গতকল্য ৫টি টাকা অগ্রিম চাহিয়াছিলেন। মাড়োয়ারী অপ্রসন্ন মুখে বলিয়াছিল যে, এমন ভাবে প্রতি মাসে অগ্রিম মাহিনা সে দিতে পারিবে না। বাবুর যদি না পোষায়, এ চাকরী তিনি ছাড়িয়া দিতে পারেন। বহু সুবিধা সে তাঁহাকে এই কয় মাস দিয়া আসিয়াছে। আর সে এমন আবদারের প্রশ্রয় দিবে না। পূরা মাস কাজ করিলে পর তবে বেতন সে দিবে।

এই উক্তিতে যে অপমানের জ্বালা ছিল, হিমাংশুপ্রকাশ নীরবেই তাহা সহ্য করিয়াছেন। বাড়ীতে আসিয়া কাহারও কাছে ঘুণাক্ষরেও তাহার আভাস মাত্র দেন নাই।

অনাহার ত আছেই, কিন্তু বাড়ী ছাড়িয়া না দিলে ত চলিবে না। এখন সেই চেষ্টাই করিতে হইবে।

কলতলার কায সারিয়া হিমাংশু আবার বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইলেন। অর্দ্ধমলিন জামাটা রেলিংএর উপর রাখিয়া আবার তিনি নীল আকাশের দিকে চাহিলেন। নাই!—নাই!—কোথাও কোন আশার আলোক-রেখা-পাতের সম্ভাবনা নাই।

সহসা তাঁহার কাণে গেল, বীণা মৃদুস্বরে তাহার মাকে উদ্দেশ করিয়া বলিতেছে, "আজ বাবার জন্মদিন, না, মা?"

একটা তিক্ত হাসির ক্ষীণরেখা হিমাংশুপ্রকাশের ওষ্ঠাধরে মুহূর্ত্তের জন্য দেখা দিল। একবার প্রাণ ভরিয়া

হো হো শব্দে হাসিবার ইচ্ছা তাঁহার মনে জাগিয়া উঠিল। হ্যাঁ, অনশনে যাহারা দিন কাটায়, গৃহত্যাগ করিবার শমন যাহার শিয়রে, তাহার জন্মতিথি—জন্মদিনের আলোচনা অতি শোভন ব্যাপারই বটে!

কিন্তু অন্তরের উচ্ছৃঙ্খল দানবটাকে চাপিয়া ধরিয়া হিমাংশুপ্রকাশ নীরবেই দাঁড়াইয়া রহিলেন।

সহসা মনে হইল, আসন্ন বিপদের কথাটা জননীকে এই সময় জানাইয়া রাখাই ভাল। কারণ, যাহা অনিবার্য্য, যে দুঃখকে অতিক্রম করিবার কোনও পথ নাই, তাহাকে শীঘ্র শীঘ্র বরণ করিয়া লওয়াই যুক্তিসঙ্গত। সমস্ত দিনে জননী এ আঘাতকে সহ্য করিবার মত অবকাশ পাইতে পারেন।

যে ঘরে মা শয়ন করেন, হিমাংশু সেই দিকে চলিলেন।

না, এখনও তিনি উঠেন নাই। সাড়া শব্দ পাওয়া যাইতেছে না। থাক্, না হয়, আর একটু অপেক্ষাই করা যাউক।

ধীরে ধীরে তিনি বারাণ্ডার পূর্ব্বপ্রান্তে আসিয়া দাঁড়াইয়া চারি দিকে চাহিলেন। পিতৃ-পিতামহের স্মৃতিমাধুর্য্যপূর্ণ এই ভিটা! ইহাকে ছাড়িয়া যাইতে হইবে!

বলিষ্ঠহৃদয় হিমাংশুপ্রকাশ, বক্ষের দ্রুত স্পন্দনকে যেন দুই হাতে চাপিয়া নিঃশেষ করিতে চাহিলেন।

"ওঃ!—ওঃ!—"

সহসা তিনি পৃষ্ঠদেশে দুইখানি পেলব করের স্পর্শ অনুভব করিলেন। মাথা তুলিয়া চাহিয়া দেখিলেন, এক পার্শ্বে পত্নী, অপর পার্শ্বে কন্যা বীণা।

"ওগো!—ওগো!—তুমি যদি অমন কর, তা হ'লে—"

অশ্রুবাষ্পে কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হইয়া গেল।

বীণা আর্ত্তকণ্ঠে বলিল, "বাবা! বাবা—"

প্রচণ্ড বলে আপনাকে সংযত করিয়া হিমাংশুপ্রকাশ সোজা হইয়া দাঁড়াইলেন। অধীর হইয়া পড়িলে নিয়তির আক্রমণ হইতে ত নিস্তার নাই।

রাধামাধব! রাধামাধব!—

এমন সময় বাহিরের রুদ্ধ দরজায় কড়া সজোরে বাজিয়া উঠিল।

এত সকালেই কি আবার শমনের বার্ত্তা আসিল?

হিমাংশুপ্রকাশের চরণযুগল আর দেহভার বহন করিতে পারিল না। তিনি সেইখানে বসিয়া পড়িলেন।

মনুষ্যকণ্ঠস্বর ও সেই সঙ্গে সোপানে দ্রুত সবল পদধ্বনি শোনা গেল।

"দাদা! দাদা! বৌদি!—"

এ কাহার কণ্ঠস্বর!

তাড়িতস্পৃষ্টের ন্যায় হিমাংশুপ্রকাশ উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার চরণতলে আট বৎসরের নির্ব্বাসিত সহোদর সুধাংশু-কুমারের নত দেহ সবলে তুলিয়া ধরিয়া হিমাংশুপ্রকাশ তাহাকে বুকে জড়াইয়া ধরিলেন।

"ফিরে এলি ভাই আমার!"

"এসেছি, দাদা, আর যাব না। আমার শত দোষ ক্ষমা করুন। বৌদি, তুমিও ক্ষমা কর।"

"ওরে হিমু, এইমাত্র স্বপ্ন দেখলাম, আমার সুধা ফিরে এসেছে।"

বৃদ্ধা জননী দ্বারের বাহিরে আসিবার পূর্ব্বেই সুধাংশু মাতার চরণ বন্দনা করিয়া তাঁহার অবশ দেহ দুই হাতে শক্ত করিয়া ধরিল।

"ফিরে এলি, বাপধন! ওরে, ওরে!—"

শয্যার উপর মাতাকে সন্তর্পণে বসাইয়া দিয়া সুধাংশু বলিল, "মা গো, আর আমি তোমার কাছ ছেড়ে যাব না। যে জন্যে গিয়েছিলুম, রাধামাধব তা আমাকে আশার অতিরিক্ত দিয়েছেন।"

"দাঁড়া, বাবা, তোর চাঁদ মুখ ভাল ক'রে দেখি।"

জননীর অশ্রুধারা মুছাইয়া দিয়া সুধাংশু বলিল, "মা, অনেক কায বাকি, আমি সেগুলো সেরে তোমার কাছেই এসে বস্‌ব'খন। তুমি আর চোখের জল ফেল না।"

বাহিরে জ্যেষ্ঠের কাছে আসিয়া একবার সে চারিদিকে চাহিয়া দেখিল। তাড়াতাড়ি পকেট-বইখানি খুলিয়া কি দেখিয়া বলিল, "বৌদি, আজ দাদার জন্ম দিন না? আট বছর ধরে এই দিনটিকে আমি রোজ প্রণাম করতাম, বৌদি!"

সীতাংশু কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। সে বলিল, "কাকাবাবু, বাবার জন্মদিনেই আমাদের এ বাড়ী ছেড়ে চলে যেতে হবে। কাল থেকে—"

"ওরে তুই চুপ কর, সীতু। জানি, ৩১শে ভাদ্র বারো

বছর পূর্ণ হয়ে গেছে। আমার নোট-বইয়ে তা লেখা আছে। দাদা, এত চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু কোনমতেই পরশু এসে পৌঁছুতে পারিনি। তিন বছর জার্ম্মাণী, ফ্রান্স, ইটালী, ইংলণ্ডে ছিলাম। পাঁচ দিন হ'ল বোম্বে এসে নেমেছি। একটা জরুরী কায রেজেষ্ট্রী করতে দুদিন দেরী না হ'লে ঠিক এসে পড়তাম।"

বাহিরে ট্যাক্সিওয়ালা তাগাদা দিতেছিল সুধাংশু বলিল, "চল সীতু, আগে জিনিষগুলো নামিয়ে নেই।"

খুড়া-ভাইপোতে নীচে নামিবার সময় কি কথা হইল। ট্যাক্সীকে দাঁড় করাইয়া সুধাংশু উপরে উঠিয়া আসিল। কয়খানা-ঘর চকিতে দেখিয়া সে বীণা ও বৌদিদির আপাদ-মস্তক নিরীক্ষণ করিল। এক জনের হাতে শাঁখা, অপরের হাতে কয়গাছা কাচের চুড়ী তাহার দৃষ্টি অতিক্রম করিল না।

"দাদা, এমন অবস্থা হয়েছে, এ' ামি জান্‌তাম না। তা হ'লে —"

কথা শেষ না করিয়াই সুধাংশু ডাকিল, "সীতু, চট্‌ ক'রে একবার এদিকে আয়, বাবা।"

নিজের সুটকেস খুলিয়া জিনিষপত্র হাঁটকাইয়া কি একটা সে বাছিয়া লইয়া পকেটে রাখিল। এক তাড়া নোট দাদার হাতে গুঁজিয়া দিয়া সে তাড়াতাড়ি নীচে নামিয়া গেল। ট্যাক্সি ষ্টার্ট দিয়া শৃঙ্গধ্বনি করিতে করিতে খুড়া-ভাইপোকে লইয়া দ্রুতবেগে চলিয়া গেল

এক ঘণ্টার মধ্যে ট্যাক্সি-বোঝাই নানাবিধ শাক-সব্‌জি ফলমূল, চাউল, ডাইল, ঘৃত, তৈল প্রভৃতি সহ তাহারা ফিরিয়া আসিল।

"বৌদি, অনেকদিন তোমার হাতের অমৃত-স্বাদে বঞ্চিত। এ-বেলা ভাল করে রান্না কর।"

তার পর দাদার হাতে একখানি দলিল দিয়া বলিল, "এই নিন্‌ আপনার মর্টগেজ দলিল। মাখমবাবুর সব টাকা শোধ দিয়ে এটা ফিরিয়ে আনলুম। যা যা লিখে নেওয়া দরকার এই কাগজে সব করিয়ে নিয়েছি। হাজার টাকা তাঁকে পুরস্কার-স্বরূপ দিয়েছি। কারও পৈতৃক ভিটে নিতে তিনিও রাজী ছিলেন না। কিন্তু দাদা, আপনি এত সহজে বাড়ী ছেড়ে দিতে রাজী হয়েছিলেন কেন? আদালতে গেলে মাখমবাবুকে অন্ততঃ দুটি বছর অপেক্ষা করতে হ'ত।"

হিমাংশুপ্রকাশ বলিলেন, "সে কথা ঠিক। কিন্তু ভাই, আমি কথা দিয়েছিলাম যে। কথার দাম যে অনেক ভাই।"

উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে সুধাংশু বলিল, "আপনার পায়ের তলায় বসে ঐ মন্ত্র শিখেছিলাম বলেই আজ আমাদের অবস্থা ফিরে গিয়েছে, দাদা। আপনার ঐ মন্ত্রবলেই সব লোভ দমন করতে পেরেছিলাম। শুনুন দাদা, আমি যাঁর কাছে বোম্বাই সহরে প্রথম কায নেই, তিনি মস্ত ধনী ব্যবসায়ী। অনেক রকম কারবার তাঁর। প্রথম একশ টাকা মাইনেতে তাঁর ল্যাবরেটারিতে রাসায়নিক হয়ে ঢুকি। কথা দিয়েছিলাম, গবেষণায় যে সব জিনিষের ফরমূলা বেরোবে, তার মালিক হবেন তিনি। অনেকগুলো দরকারী জিনিষ আমি খুব কম খরচে তৈরী করবার উপায় আবিষ্কার করেছিলাম। তা থেকে তিনি প্রচুর লাভ পান সে ফরমুলা আমি তাঁকে না দিলেও পারতাম। কিন্তু কথার দাম সব চেয়ে বড়, আপনারই জীবনের শিক্ষা আমি ভুলিনি। তার ফলে কি হয়েছে জানেন, দাদা? আমাকে তিনি কারবারের একটা অংশ দিয়েছেন। তিন বছর সাগর-পারে পাঠিয়ে নানা বিষয় শিখিয়ে এনেছেন তিনি। কিন্তু আমি নিজেকে ক্ষমা করতে পারছি না। এত কষ্ট দাদা পেয়েছেন, জান্‌লে আগেই প্রতিকারের ব্যবস্থা করতাম।"

অস্থির চরণে সুধাংশু বারাণ্ডায় কয়েকবার পায়চারি করিল। তার পর বলিল, "বৌদি, সব কথা পরে হবে। দাদার জন্মদিনের উৎসব-ভোজ আশ মিটিয়ে করতে হবে: কোন চিন্তা নেই, আমার বন্ধু সুকুমার ও যোগেশকে আস্‌তে বলে দিয়েছি। তারা এল বলে। খুব কাজের লোক তারা। সীতু, তুই আমাদের যে সব আত্মীয়-বন্ধু আছে, তাদের বাড়ী নেমন্তন্ন ক'রে আয়। হ্যাঁ, সন্ধ্যার পর ভোজ। ঢের সময় আছে, সব ঠিক হয়ে যাবে। আমি এখুনি আসছি, দাদা

হিমাংশু বলিলেন, "চা খেয়ে নিয়ে তবে বেরিও, ভাই।"

"দাদা, আপনিও আদেশ করবেন না। আপনার হুকুম আমি ফেল্‌তে পারব না। চা পরে হবে, তার চেয়েও দরকারী জিনিষ আছে দাদা, সেটা আগে সেরে আসি।"

* * * *

সন্ধ্যার সময় সমস্ত বাড়ীটা সুসজ্জিত হইয়া আলোক-মালায় হাসিয়া উঠিয়াছিল। সুধাংশু লরী করিয়া প্রত্যেক ঘরকে সজ্জিত করিবার উপযোগী দ্রব্য-সম্ভার কিনিয়া আনিয়াছিল।

হেমপ্রভার কর-প্রকোষ্ঠে সোনার চুড়ী, গলায় হার, বীণারও তাহাই। সারাদিন সুধাংশু এই সব কাযেই নিশ্বাস ফেলিবার অবকাশ পায় নাই। বন্ধুদিগের তদ্বিরে উপাদেয় আহার্য্য-সম্ভার প্রস্তুত হইয়াছিল। যেন ইন্দ্রজাল-স্পর্শে কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই রূপান্তর ঘটিয়া গেল।

আত্মীয়-স্বজনগণ ভূরি ভোজনে পরিতৃপ্ত হইয়া যখন বিদায় লইলেন, তখন রাত্রি দশটা। রাধামাধবের পূজার্চ্চনা সারিয়া হিমাংশুপ্রকাশ আহারে বসিলেন। মাতা আসিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন, পত্নী, পুত্র, কন্যা আসিয়া হিমাংশুর পদধূলি গ্রহণ করিলেন।

সকলের শেষে সুধাংশু দাদাকে প্রণাম করিয়া বলিল, "দাদা, আপনার পঁয়তাল্লিশ বছরের জন্মদিনে ছোট ভায়ের এই প্রণামীটা নিতে হবে।"

একখানি চমৎকার রেশমী বস্ত্রের সুদৃশ্য মুদ্রাধার।

"এটা আমি ইটালী থেকে আপনার জন্যই এনেছি। এ জিনিষ আর কোথাও পাওয়া যায় না, দাদা।"

ঘরের মধ্যে বৃদ্ধা জননী, হেমপ্রভা, বীণা ও সীতাংশু ছাড়া আর কেহ ছিল না।

সুধাংশু বলিল, "দাদা, বড় দুঃখ সামনে দেখেই পালিয়েছিলাম। প্রতিজ্ঞা করেছিলেম, দাদার দুঃখ দূর করব, মা! তাই সকলের মনে কষ্ট দিয়ে সোজা বোম্বাই গেলাম। অনেক কষ্টে চাকরী হ'ল, মাইনে একশ টাকা। কিন্তু তাতে ত সকলের দুঃখ দূর করা যাবে না। চুপ ক'রে নির্ব্বাসিতের মতই রইলাম। মনিব নিজে সুশিক্ষিত, উদার এবং ভারী বুদ্ধিমান। আমার গবেষণার ফলে প্রথম বছরেই তাঁর বহু লক্ষ টাকা লাভ হ'ল। এম্নি ক'রে পাঁচ বছর গেল। তখন গেলাম বিলেতে। কারখানায় কারখানায় ঘুরে অনেক নতুন জিনিষ শিখে নিলাম। ফিরে যখন এলাম, মনিব কি বল্‌লেন জান? লাভের শতকরা পাঁচ টাকা ক'রে তিনি আমার জন্য আলাদা করে রেখেছিলেন। আর আমার মাইনে ৫শ টাকা করে হিসেব ধরেছিলেন। কথার মর্য্যাদা রেখেছিলাম বলে, তিনি আমারও মর্য্যাদা রেখেছেন। দেখ্‌লাম, কয় বছরে পাঁচ লাখ টাকা আমার মাইনে ও বোনাস্। তাঁর যে কত লাভ হয়েছে, তার হিসেব করা যায় না।"

হিমাংশুপ্রকাশের নেত্র ছলছল করিয়া উঠিল। তিনি বলিলেন, "চমৎকার ভদ্রলোক ত তিনি!"

"হ্যাঁ, দাদা। ভাল লোকও অনেক আছেন বৈ কি, তাঁরা পরিশ্রমের মূল্য দিতে জানেন। আমার ধারণা, যারা সৎপথে থেকে প্রাণপণ পরিশ্রম ও বুদ্ধির পরিচয় দিতে পারে, ভগবান তাদের দয়া করেন। বোম্বাইয়ে ফিরে এলে মনিব বললেন, কলকাতায় একটা নতুন আফিস খুলতে হবে। আমার ৩ লাখ ও তাঁর ৯ লাখ—১২ লাখ টাকার মূলধনে কারবার। আমি তার ম্যানেজিং ডাইরেক্টার, অংশ চার ভাগের এক ভাগ। বাকি ২ লাখ টাকা আমি সঙ্গে তুলে এনেছি। সে টাকা দাদা আপনার। অবশ্য যা খরচ হয়ে গেছে আজ, তা বাদে। ঐ রেশমী থলেতে বাকি টাকার নোট আছে।"

"না, ভাই, অত টাকা আমার কি হবে? তোমার মত ভাই যার আছে, তার টাকার দরকার নেই।"

জ্যেষ্ঠের চরণে হাত রাখিয়া সুধাংশু বলিল, "সে হবে না, দাদা। যদি এতটুকু স্নেহ থাকে, ছোটর প্রণামী জন্মদিনে নিতেই হবে। আপনি ছাপাখানার কায ভাল বোঝেন, একটা ভালরকম ছাপাখানা খুলুন।"

সীতাংশু বলিল, "কাকাবাবু, আমায় আপনাদের কারবারে টেনে নিন।"

"পাগল, তুই এখন লেখাপড়া কর। ব্যবসা ত আছেই। রসায়নে তোকে এম এ পাশ করতেই হবে।"

শ্রীসরোজনাথ ঘোষ
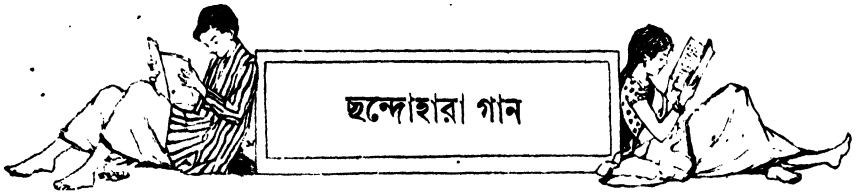
ছন্দোহারা গান

স্বাধীন ব্যবসা! চমৎকার এই স্বাধীনতা! জীবন-যাপনের রূঢ় তাড়না যেখানে দিন-দিন হৃদয়ের যত কিছু উচ্চ প্রবৃত্তির শ্বাসরোধ করিতেছে, সেখানে কি না স্বাধীনতা!

চুপ করিয়া একাকী বসিয়া-বসিয়া ভাবিতেছিল নীতীশ। ঘরের পয়সা খরচ করিয়া কায শেষ করিয়া বিল্ দিয়াছে, আজ চার-মাসের উপর হইয়া গেল, সে-বিলের এখনো টাকা পাওয়া গেল না। এই ত স্বাধীন ব্যবসা!

লেখা-পড়া শিখিয়া কোন দিকেই যখন কোন ভরসা দেখা গেল না, তখন ঘরের যৎসামান্য পুঁজি খাটাইয়া নীতীশ কণ্ট্রাক্টরী কাযে নামিয়া পড়িয়াছিল। কত কথাই মনে হইয়াছিল সে দিন! ব্যবসা করিয়া যাঁহারা জগদ্বিখ্যাত হইয়াছেন, মনে জাগিয়াছিল তাঁহাদের কথা। এক দিন হয় ত এম্‌নি সামান্য ভাবে ব্যবসা শুরু করিয়াছিলেন সার আর এন্—মুখার্জ্জিও!

সে-সব কথা আজ স্মরণ করিতেও নীতীশের হাসি আসে। মানুষের মনটা এমনি অদ্ভুত বস্তুই বটে! কল্পনায় সে যে কি ভাঙ্গা-গড়া করিতে না পারে!

—ওগো, শুন্‌ছো!—বাড়ীর ভিতর হইতে ডাক আসিল।

নীতীশ ভিতরে আসিয়া দাঁড়াইল।

স্ত্রী অনুযোগের সুরে বলিল,—বাপ্ রে বাপ! সারা দিনটা ত টো-টো ক'রে ঘুরে বেড়িয়ে এতক্ষণে বাড়ী ঢুকলে, তাও ভেতরে মন বসে না। কি-যে মধু আছে ঐ বাইরের ঘরটিতে! ঘর-বোঝাই ত কতকগুলো ভাঙ্গা কাঠ, লোহার গরাদে আর চটের থলে। মা গো! আমার ত ও-ঘরে ঢুকতেই গা ঘিন্-ঘিন্ করে। ভালোও লাগে ত!

নীতীশ খানিকটা ক্লান্তির হাসি হাসিয়া বলিল,—বক্তৃতা ত খুব ঝাড়ছো। শুধুই ওই পর্য্যন্ত, না, চা-টায়ের ব্যবস্থা আছে?

উঠানের এক ধারে বসিয়া কণিকা তরকারী কুটিতেছিল। ছোট ছেলেমেয়ে দুটি সামনে বসিয়া তরকারীর ডালা হইতে এটা সেটা তুলিয়া লইয়া খেলা করিতেছিল। কণিকা বঁটি কাৎ করিয়া উঠিয়া বলিল,—সেই জন্যেই ত ডাকলুম। একটু দেখো এদের, আমি চট্ ক'রে পরটা-ক'খানা সেঁকে চায়ের জলটা চড়িয়ে দিই।

নীতীশ ছোট ছেলেটাকে কোলে তুলিতে যাইতেছিল, কণিকা বলিল,—উঁহু, কোলে তুলো না। খেলা করুক; তুমি শুধু একটু আগলে থেকো।

তাওয়ার উপর পরটা সেঁকিতে সেঁকিতে কণিকা হাসিয়া বলিল,—আজ দুপুরবেলা রেখা এসেছিল। দিব্যি আছে ওরা।

—কেন?

—কাল আমাদের নেমন্তন্ন ক'রে গেল। আমি যত বলি, ছেলে-পুলে নিয়ে—তত সে রাগ করে! সত্যি, কি ক'রে যাওয়া হবে, তুমিই বল না!

—কেন, তুমি যেয়ো শুধু খোকাকে নিয়ে। ওরা সব আমার কাছে থাক্‌বে'খন্।

কণিকা একমুখ হাসিয়া বলিল,—বা রে! তুমি বুঝি যাবে না? সে হয় ত কর্ত্তাকে পাঠিয়ে দেবে তোমার কাছে, দেখো। কাল যে তাদের বিবাহ-তিথি!

—বিবাহ-তিথি?

—হ্যাঁ গো। দু'বছর আগে এই তারিখে ওদের বিয়ে হয়েছিল, তাই।

—ওঃ! ইংরিজিতে যাকে বলে marriage anniversary! দেশটা ইংরিজি আদব-কায়দায় ভ'রে উঠলো।

কণিকা তাহার মুখের পানে একবার চাহিয়া লইয়া বলিল,—কেন, বেশ ত লোকে যেমন জন্ম-তিথির উৎসব করে?

নীতীশ বলিল,—ওদের এখন সবই বেশ! দিব্যি মোটা মাইনের চাকরী পেয়েছে, ও-দিকে ছেলে-মেয়ের ঝঞ্ঝাট নেই। ওদের সবই সাজে! ওরা এখন ইচ্ছা করলে সারা জীবনটাই এরোপ্লেনে হনিমুন ক'রে কাটাতে পারে!

কণিকা বলিল,—তোমার অম্‌নি চোখ টাটাচ্ছে! ভাবছো, আমিও ত এত লেখাপড়া শিখ্‌লুম—

স্ত্রীর কথাগুলো নীতীশের ভাল লাগিল না। মুখে কি একটা শক্ত কথা ঠেলিয়া আসিল, কিন্তু সেটা সে চাপিয়া গেল। ছোট ছেলেটা ততক্ষণে মা-বাপের নজর এড়াইয়া ডালা হইতে একটা আলু তুলিয়া লইয়া বঁটিতে কাটিবার জন্য কসরৎ করিতেছিল, হঠাৎ নীতীশের সে দিকে নজর পড়িতেই সে ছেলের পিঠে একটা চড় বসাইয়া দিয়া বলিল,—আরে গেল যা! মরবি যে হাত কেটে, হতভাগা!

ছেলে ডাক ছাড়িয়া কাঁদিয়া উঠিল। কণিকা গালে হাত দিয়া বলিল,—বাবাঃ! অম্‌নি করে' মারে!

চট্ করিয়া উঠিয়া সে খোকাকে কাঁখে তুলিয়া লইয়া মুখখানা গুম্ করিয়া আবার খাবার সেঁকিতে বসিল।

নীতীশ বলিল,—দাও আমার কোলে।

কণিকা বলিল,—না, থাক্। খুব হয়েছে!

—তবে থাক্। বলিয়া নীতীশ আবার বৈঠকখানায় গিয়া বসিল।

রেখা কণিকার একটু দূর-সম্পর্কের বোন্। তাহার স্বামী দেবনাথ ইন্‌কাম-ট্যাক্স অফিসার, সম্প্রতি এখানে বদলী হইয়া আসিয়াছে। প্রথম প্রথম নীতীশদের বাড়ীতে খুব ঘনঘন যাতায়াত চলিয়াছিল; কিন্তু তারপর হাকিম-মহলে তাহাদের আসর জমিয়াছে, সুতরাং এখানে আসাটা কমিয়াছে। কণিকা এক দিন বলিয়াছিল,—রেখা ত আর বড় আসে না কৈ!

নীতীশ জবাব দিয়াছিল,—কি ক'রে আস্‌বে! তার বর এক জন হাকিম, আর তোমার—

কণিকা ঠোঁট বাঁকাইয়া বলিয়াছিল,—হ'লেই বা হাকিম গো! আমার বর ত কারু তাঁবের চাকর নয়!

প্রকাশ্যে কোন প্রতিবাদ না করিলেও নীতীশ নিজের মনে মনে বলিয়াছিল, চাকর অবশ্য নয়, কিন্তু, তাঁবেদার বহু লোকের।

আজ সেই কথাটাই বার বার মনে পড়িতেছিল। মনে মনে সে বলিতেছিল,—চাকুরেকে তবু এক জন নির্দ্দিষ্ট উপরওয়ালার মন যোগাইতে হয়, কিন্তু তাহাদের এই স্বাধীন ব্যবসা? নিত্য নূতন নূতন মনিবের মন জোগাইতে জোগাইতে তাহাদের মনুষ্যত্বটুকুও বুঝি খর্ব্ব হইয়া গেল। তাহার সঙ্গে ঐ দেবনাথের তুলনা? অথচ, এক দিন গিয়াছে, যে দিন অমন চাকরীর সম্ভাবনাকে সে রীতিমত অবহেলা করিয়াছে বৈ ত' নয়! জীবনে ছিল কত বড় আদর্শ—কত মনোরম কল্পনার রঙ্গে সে আদর্শের প্রাণপ্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। ঠিক কবে—কোন্ দিনটিতে যে সেই বিরাট আদর্শ চুরমার হইয়া ভাঙ্গিয়া একেবারে নিশ্চিহ্ন হইয়া গেল, তাহাও আজ মনে পড়ে না। আজ শুধু কোনি রকমে বাঁচিয়া থাকাটাই হইয়াছে জীবনের মূল মন্ত্র। আজ আর কণিকা সে প্রাণময়ী জীবন-সঙ্গিনী নয়, জীবনধারণের নিতান্ত মামুলী একটা প্রয়োজন মাত্র। নর ও নারীর এই বিবাহ-ব্যাপার লইয়া কত গভীর তথ্যপূর্ণ কাব্য তাহার মনে জাগিত, কিন্তু আজ? আজ হাসি আসে রেখাদের ঐ আজগুবি কল্পনায়! বিবাহ-তিথি! যেন উহাদের বিবাহ-ব্যাপারটা পৃথিবীর ভিতর কত বড় স্মরণীয় একটা ঘটনা!

বন্ধুরা বলিত, ওহে নীতীশ, তুমি দিন দিন একটি রীতিমত সিনিক্ হয়ে উঠ্‌ছো!

এ কথাটা নীতীশও মনে মনে ভাবে। সত্যই হয় ত সে সিনিক্ হইয়া পড়িতেছে। নিজের মনেই এক-একবার বলে, তাতেই বা ক্ষতি কি? বরং সিনিকের দৃষ্টি দিয়া বাস্তব জীবনের রূঢ় সত্যটা উপলব্ধি করা যায়।

পরের দিন রেখাদের বাড়ীতে যাইতে হইল তাহাদের বিবাহ-তিথির উৎসবে। নীতীশ যাইতে চাহে নাই; কণিকা বলিয়াছিল, কি যে তুমি দিন দিন হয়ে যাচ্ছো! তুমি না গেলে ওরা যে কত বেশী দুঃখিত হবে, তা বুঝি বুঝতে পার্‌ছো না? এর পর লোকে বল্‌বে, তুমি যে এই সব আমোদ-আহ্লাদে যোগ দিতে চাও না, এটা তোমার হিংসুটেপনা ছাড়া আর কিছুই নয়।

সুতরাং যাইতেই হইল।

প্রচুর আয়োজন করিয়াছিল বেচারা। গান-বাজনা, হাসি-গল্প, আহার-আপ্যায়ন, সবের মধ্যেই যেন কেমন একটা বিশেষত্ব আছে। কোন-কিছুতেই যেন এতটুকু অবসাদের গ্লানি নাই, আগাগোড়া সমস্ত অনুষ্ঠানটিতেই

যেন একটা তাজা প্রাণের স্পর্শ রহিয়াছে। ফুলে-ফুলে হলঘরখানি ভরিয়া দেওয়া হইয়াছে; কোনখানে একটি ফুলের একটি পাপড়িও যেন ক্লান্ত হইয়া হেলিয়া পড়ে নাই। প্রত্যেক মানুষটির মুখে এক অপূর্ব্ব সজীবতা। যেন গৃহস্বামী দম্পতির দাম্পত্য-জীবনের শুভ কামনা সকলেরই অন্তরের ভিতর হইতে স্বতঃই উৎসারিত হইয়া উঠিতেছে।

নীতীশ সত্যই অবাক্ হইয়া গেল। এই কলুষলেশহীন আনন্দ-মেলার মাঝখানে নিজেকে যেন তাহার অত্যন্ত বে-মানান্ বিসদৃশ ঠেকিতে লাগিল। মনে মনে সে বলিল,—সত্যই হয় ত ইহার ভিতর সুন্দর কিছু একটা আছে, যা' অতিবড় সিনিকের চক্ষুও ধাঁধিয়া দিবে। মনে পড়িল কণিকার কথাটা; 'এর পর লোকে বল্‌বে, তুমি যে এই সব আমোদ-আহ্লাদে যোগ দিতে চাও না, সেটা তোমার হিংসুটেপনা ছাড়া আর কিছুই নয়।' তা, সত্যই যদি লোকে তাই মনে করে, অনুযোগ করিবার—রাগ করিবার বোধ হয় বিশেষ কিছু থাকে না। সত্যই হয় ত তাহার অন্তরের ভিতর একটা হিংসুটে বীজ ঢুকিয়া দিন দিন ডাল-পালা বিস্তার করিতে সুরু করিয়াছে, এবং এমন এক দিন আসিবে, যে দিন তাহার ডালপালার অন্তরালে এতটুকু মুক্ত স্বচ্ছ আলোও আর চোখে পড়িবে না।

রেখা এক সময় আব্দারের সুরে বলিল,—আপনাকে কিন্তু ছাড়্‌ছি নে, জামাই বাবু! অনেক দিন আপনার গান শুনিনি। আজ গাইতে হবে।

নীতীশ যেন নিজের মধ্যেই চমকিয়া উঠিল। সে গান গাহিবে? এক দিন অবশ্য ছিল, যে দিন নীতীশের গান একটা শুনিবার মত জিনিষ বলিয়া আদর পাইয়াছে, কিন্তু আজ?

রেখা কিন্তু নাছোড়বান্দা। তা ছাড়া, আজ রাত্রিটিতে কেমন করিয়া নীতীশেরও মনে হইতেছিল, তাহার বাহিরের শুষ্ককঠোর আবরণ ভেদ করিয়া বহুদিনের নিরুদ্ধ একটা রসধারা আপনা-আপনি উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতে চাহিতেছে। সুতরাং, আবার যদি জীবনে কোন দিন গান গাহিতেই হয়, আজই তাহার সবচেয়ে শুভক্ষণ।

বহুদিন পরে নীতীশ আজ হারমোনিয়ম কোলে তুলিয়া গান গাহিল। গান নেহাৎ মন্দ জমিল না। আর অপরে কে কি মনে করিল, সে দিকে নীতীশের দৃক্‌পাতও ছিল না। নিজের আনন্দেই আচ্ছন্ন হইয়া সে গাহিয়া গেল; এবং আর একজন পর্দ্দার আড়ালে দাঁড়াইয়া রুদ্ধনিশ্বাসে শুনিল তাহার গান, সে কণিকা।

কোলেরটি ছাড়া অপর ছেলেমেয়ে তিনটিকে কণিকা অনেক আগেই চাকরের সঙ্গে বাড়ীতে পাঠাইয়া দিয়াছিল। সে তাহাদের গল্প বলিয়া ঘুম পাড়াইয়া রাখিয়াছিল।

তাহারা যখন বাড়ী ফিরিল, তখন রাত্রি এগারোটা বাজে।

কণিকা বলিল,—তুমি যেতে চাচ্ছিলে না। আমাদের দেখে রেখা কত খুসীই যে হয়েছে!

নীতীশ বলিল,—খুসী আমি নিজেও কম হইনি, কণা! এখন বেশ বুঝ্‌তে পার্‌ছি, না গেলে লোকসান্ হ'তো রীতিমত।

ছেলেকে বিছানার ভিতর শোয়াইয়া দিয়া কণিকা বলিল,—এম্‌নি চমৎকার রাত্রিটা আজ! ইচ্ছে হচ্ছে, বাইরে বসি একটু।

নীতীশ বলিল,—ব'সো না!—একটু দাঁড়াও, এই চাতালটার উপর ঐ সতরঞ্চিখানা বিছিয়ে নিই—

কণিকা বলিল,—তোমার ঘুম পায়নি?

নীতীশ বলিল,—একেবারেই না। ঘুম যেন চোখ থেকে বহু-বহুদূরে স'রে গিয়েছে। আজ মনে হচ্ছে, এম্‌নি ক'রে ব'সে-ব'সে সারারাত কাটিয়ে দিতে পারি।

কণিকা বলিল,—তোমার গানখানি আজ এমন মিষ্টি লাগলো আমার! অথচ, আমি ব'লে ব'লে ম'রে গেলেও গান গাও না। আমি যে কত ভালবাসি তোমার গান!

নীতীশ হাসিয়া বলিল,—দূর্ পাগল কোথাকার! আমার আবার গান! করি ত ঠিকেদারী, গান গাইবো কখন্ বল ত?

—তবে আজ গাইলে যে?

—আজ? আজ যেন আমার কি হয়েছে! সেই যে গানে আছে না,—'তুমি যে সুরের আগুন লাগিয়ে দিলে মোর প্রাণে!' আমারও আজকের অবস্থা ঠিক তাই! আজ আমার পুরোণো দিনের কত কথা যে মনে আস্‌ছে। এ-সব কথা মনে হয়েছে আগেও কত দিন, কিন্তু অন্য দিন সে-স্মৃতির সঙ্গে যে বুকভাঙ্গা বেদনা মেশানো

থাকে, আজ যেন তার এক বিন্দুও নেই। আজ মনে হচ্ছে, মনের আমার যে-সম্পদ এক দিন ছিল, তা আজও হারিয়ে যায়নি। নিঃস্ব আমি হতে যাব কেন, হৃদয় আমার যে কানায়-কানায় পূর্ণ হয়ে আছে সর্ব্বক্ষণ! এই ত তুমি আমার পাশে ব'সে রয়েছ; সেই তুমি, যে আমার কল্পনার রামধনু-রঙে মূর্ত্তিমতী হয়ে এসে আমার কাছে ধরা দিয়েছিলে, একটুও ত তার বদল হয় নি!

কণিকা বলিল,—তুমি দিন দিন একটা পাগল হচ্ছো।

বলিতে বলিতে গভীর একটা তৃপ্তির নিশ্বাসকে চাপিবার চেষ্টা করিতে করিতে স্বামীর আরো কাছে সরিয়া আসিয়া বলিল,—আচ্ছা, আমাদের বিয়ে হয়েছে কবে গা?

—কেন, তুমি ভুলে গেছ? ২৩শে শ্রাবণ। আজ হ'লো ১২ই।

—ও হ্যাঁ, ২৩শে শ্রাবণই ত! বলিতে বলিতে কণিকা স্বামীর একখানি বাহুর উপর চিবুকটি রাখিয়া তাহার মুখের পানে নিষ্পলক দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল।

নীতীশ হাসিয়া বলিল,—কেন বল ত? মৎলবটা তোমার আমিও যেন আন্দাজ করতে পার্ছি—

কণিকা খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া বলিল,—কি বল দিকিন?

নীতীশ বলিল,—মুখ ফুটে না-ই বা বল্লুম! কিন্তু, আজ এই বারো বছর বিয়ে হয়েছে—এতকাল পরে বুঝি—

কণিকা বলিল,—বা রে, তা কেন হবে না! বরং আমার ত মনে হয়, বিবাহ-তিথির উৎসব করা আমাদেরই সাজে।

নীতীশ সাগ্রহে বলিল,—তার মানে?

—মানে এই যে, বারো বছর আমাদের বিয়ে হয়েছে; বিয়ের পরের প্রথম ক'বছরের পাগলামীটা আমাদের কেটে গিয়েছে। এই বারো-বছরের দাম্পত্য-জীবনে এটুকু আমরা প্রমাণ করতে পেরেছি—বিবাহ আমাদের সার্থক হ'য়েছে সব-দিক দিয়ে। সুতরাং—

নীতীশ বলিল,—চুপ করলে যে? চমৎকার লাগছে তোমার কথাগুলি! তার পর বল, 'সুতরাং—'?

কণিকা লজ্জিতা হইয়া বলিল,—সত্যি, তুমি অমন করে আমায় ঠাট্টা করো না! ভুল আমি কিছু বলিনি। রেখাদের বিয়ে হয়েছে মোটে আজ দু'বছর—জীবনকে ওরা কতটুকুই বা দেখেছে বল ত! জীবনের সত্যিকার চেহারা হয় ত এখনো ওদের চোখেই পড়েনি; সত্যিকার দাম্পত্য-জীবন বলতে যা বোঝায়, তার ত সব-কিছুই বাকী! মোটে এই দুটো বছরের জীবনে হয় ত ওরা পরস্পরকে চেন্‌বারই সুযোগ পায়নি। কিন্তু আমরা—

নীতীশ অন্যমনস্কতার সুরে বলিল,—আমরা পেরেছি। তা হয় ত পেরেছি। দু'জনে হাত-ধরাধরি করে জীবনের যাত্রাপথে এতটা এগিয়ে এসিছি যে, এখন হয় ত ভরসা ক'রে বলতে পারি, বাকী পথটুকু যেতে পারব—তা সে পথ যতই বন্ধুর হোক—যতই দুর্য্যোগ থাকুক্ আমাদের পথ-চলার রাত্রিটুকুতে। নয় কি বল?

যেন নিজের অজ্ঞাতেই দু'খানি বাহু দিয়া স্বামীকে ধীরে ধীরে বেষ্টন করিয়া কণিকা বলিল,—নিশ্চয়।

দু'জনে অনেকক্ষণ যেন তন্ময় হইয়া বসিয়া রহিল। কণিকা হঠাৎ মুখ তুলিয়া সোজা হইয়া বসিয়া বলিল,—সত্যি, আসছে ২৩শে শ্রাবণ হবে আমাদের প্রথম বিবাহ-তিথির উৎসব; এবং এর পর যত দিন বাঁচবো—

নীতীশ চুপ করিয়া তাহার মুখের পানে চাহিয়া রহিল। বুকখানি তাহার সত্যই আজ কানায় কানায় ভরিয়া উঠিয়াছিল। সে পূর্ণতার ভারে সে নির্ব্বাক হইয়া রহিল।

কণিকা বলিল,—রেখাদের নেমন্তন্ন করতে হবে কিন্তু। আর তোমার খুব অন্তরঙ্গ বন্ধু দু'চার জনকে। বেশী লোক ত আমাদের এখানে ধরবে না! যে বাড়ী!

নীতীশ বলিল,—বেশী লোকের দরকারই বা কি? ধর, বাইরের ঘরটার ঐ জঞ্জালগুলো সরিয়ে যদি ভালো ক'রে চূণকাম ক'রে নেওয়া যায়—বেশী ক'রে খানিকটা ব্লু দিয়ে—তার পর ঘর-জোড়া ফরাস্ পেতে দিলে মন্দ হবে না। আর ফুল কিছু; তা সে আনিয়ে নেবার লোক পাবো। এক জন আছে, রোজ সে কলকাতা যায়।

কণিকা মুখে-চোখে উৎসাহের হাসি ফুটাইয়া বলিল,—তবে ত খুব চমৎকার হবে! রেখা গান গাইবে, আর তুমিও—

—দূর পাগল! আমার বাড়ীতে আমিই গান গাইব কি?

ঘরের ভিতর হইতে খোকার ফোঁপানো কান্নার শব্দ পাওয়া গেল। কণিকা ধড়মড় করিয়া উঠিয়া একবার ঘরের ভিতর গিয়া তখনই আবার ফিরিয়া আসিয়া বলিল,—খোকার কিন্তু একটা ভালো সিল্কের জামা কিনে দেওয়া চাই, তা' ব'লে রাখ্‌ছি; আর ইলার একখানা ভালো শাড়ী—

সে দিন জ্যোৎস্নায় ধোওয়া সেই মুক্ত আকাশের নীচে বসিয়া বসিয়া এবং তার পর বিছানায় পড়িয়া পড়িয়াও তাহাদের আগামী বিবাহ-বার্ষিকী সম্বন্ধে জল্পনা যে কত রাত্রি পর্য্যন্ত চলিয়াছিল, তাহা দুই জনের কাহারও খেয়াল ছিল না। শেষে যখন নীতীশ বলিয়াছিল,—'আর না, আলোচনাটা আজ এইখানেই মুলতুবী রইল,' তখন ঘুমের সাধনায় দু'জনেই চোখ বুজিয়া এই একটা কথাই ভাবিয়াছিল যে, আজিকার মত সুখনিদ্রা বহুদিন তাহাদের জীবনকে অভিসিক্ত করে নাই।

সকালে যখন কণিকা ডাকিল,—ওগো, ওঠো ওঠো, চা হয়ে গেছে। নীতীশ চোখ মেলিয়া দেখিল, রীতিমত বেলা হইয়াছে। ধড়ফড় করিয়া উঠিয়া বসিয়া বলিল,—এঁ্যা! ক'টা বেজেছে বল দিকিন? সাতটা বেজে গেছে না কি?

সেল্‌ফের উপর ছোট টাইম-পিস্‌টা টিক্‌টিক্ করিতেছিল। কণিকা সে দিকে তাকাইয়া বলিল,—দশ মিনিট এখনো বাকী আছে।

নীতীশ তাড়াতাড়ি বিছানা ছাড়িয়া উঠিয়া মুখে-হাতে এলোমেলো খানিকটা জল দিয়া কাপড়ের খুঁটে তাহা মুছিতে মুছিতে বলিল,—আঃ, জামা-কাপড়গুলো আবার কোথায় গেল? সাতটা বেজে গেলে আর দেখা পাব না এঞ্জিনিয়ার বাবুর।

কণিকা হতবুদ্ধির মত বলিল,—চা খাবে না?

—আরে, রাখো তোমার চা ঢাকা দিয়ে। চা খেতে গিয়ে আমি হাজার টাকার কাযটা হারাই আর কি!

কোন রকমে জামা-জুতা পরিয়া নীতীশ এক রকম ছুটিতে ছুটিতে বাড়ী হইতে বাহির হইয়া গেল। দুর্গা দুর্গা বলিয়া কণিকা দেয়ালের ছবিখানির উদ্দেশ্যে কয়েকবার প্রণাম করিল।

মিনিট পনেরোর মধ্যেই তাহাকে ঘুরিয়া আসিতে দেখিয়া কণিকা বলিল,—দেখা হ'লো?

—ঘোড়ার ডিম। তিনি ছ'টার ট্রেণেই টুরে বেরিয়ে গেছেন। কাযটা হাতছাড়া হ'লো দেখ্‌ছি। কৈ দাও, চা দাও—বলিয়া এমন ভাবে ক্যাম্বিশের ইজি চেয়ারখানায় গা এলাইয়া বসিল যে, দেখিলে মনে হয়, লোকটার ভিতর আর সামান্য একটু উদ্যমও অবশিষ্ট নাই।

কণিকা চায়ের পেয়ালা হাতে দিয়া বলিল,—টুরে বেরুলেই বা! ফিরে এলেও ত তোমার কাযটুকু হ'তে পারবে।

পেয়ালায় ছোট্ট একটা চুমুক দিয়া নীতীশ নিদারুণ হতাশার সুরে বলিল,—অত সোজা যদি এর মীমাংসা হ'তো গো, তা হ'লে আর ভাবনা কি ছিল বল! এঞ্জিনিয়ার বাবু ফিরে এলে তাঁর সঙ্গে আমি দেখা করবার ঢের আগে সে-সব অন্য লোকের সঙ্গে ব্যবস্থা হয়ে যাবে। সবাই ত আর আমার মত অকর্ম্মণ্য নয়। তারা জানে, কি ক'রে কায করতে হয়!

ও-পাশে বড় ছেলেমেয়ে দুটিতে ততক্ষণে খাবার লইয়া রীতিমত একটা খণ্ডযুদ্ধ বাধাইয়া বসিয়াছিল, কণিকাকে তাহারই খবরদারী করিতে হইল। তা ছাড়া তাহার স্বামী সম্বন্ধে এটুকু সে জানিত, নিজে সে যতক্ষণে না বুঝিবে, কাহারও সাধ্য নাই তাহাকে কোন জিনিষ বুঝাইয়া দেওয়ার। সুতরাং ওদিকে সময় নষ্ট করিয়া লাভও নাই।

বেলা বারোটার সময় নীতীশ আহারাদি সারিয়া বাহির হইয়া গেলে কণিকা একখানা মাসিকপত্র টানিয়া লইয়া তক্তপোষের উপর উপুড় হইয়া শুইল। ছোট ছেলেটা চাকরের কাছে আছে, বড় মেয়ে ইলা স্কুলে গিয়াছে, অপর দুইটি ঘুমাইয়াছে। সুতরাং তাহার উপবাস-খিন্ন সাহিত্য-তৃষাকে সামান্য একটু খোরাক দিবার এই প্রকৃষ্ট অবসর। কিন্তু পড়া তাহার বেশী দূর আগাইল না। বিগত রজনীর স্মৃতিটুকু এক অপূর্ব্ব রসধারা লইয়া তাহার হৃদয়কে অভিষিঞ্চিত করিল। ফুল বাসি হইয়াছে, কিন্তু তাহারই সুগন্ধে হৃদয় যেন দিশাহারা হইতে চায়। সত্যই, কাল তাহার স্বামীর যে মূর্ত্তি সে দেখিয়াছিল, সে মূর্ত্তিটাকে যেন সে বহুদিন হইল ভুলিয়াই গিয়াছিল। কাল হঠাৎ সেই ভুলিয়া-যাওয়া

মানুষটির সহিত অকস্মাৎ তাহার দেখা হইয়া গেল। কিন্তু, আজ সে কোথায়? যে বিশুষ্ক নির্ঝরধারা হঠাৎ কাল প্রবল জলোচ্ছ্বাসে দুকূল প্লাবিত করিয়া ছুটিয়াছিল, রাত্রি অবসানের সঙ্গে সঙ্গে তাহার চেহারার কেমন করিয়া এতখানি বদল হইয়া গেল? কাল গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত তাহাদের সেই অদ্ভুত জল্পনা-কল্পনাগুলা মনের মাঝে টানিয়া আনিতে গিয়া কণিকার মনে হইতে লাগিল, আসলে ও-সব কোন-কিছুই বুঝি ঘটে নাই, আগাগোড়া সে একটা দুঃসহ সুখস্বপ্ন বই আর কিছুই নয়! তেইশে শ্রাবণ হইবে তাহাদের বিবাহ-তিথির উৎসব! দিনের আলোর মাঝে বসিয়া কথাটাকে কতখানি উদ্ভট আর আজগুবি বলিয়া মনে হইতেছে! অথচ, এ-সম্বন্ধে তাহাদের দুজনের প্রত্যেকটি কথা এখনও তাহার বুকের মাঝে গাঁথা রহিয়াছে। বিবাহ-তিথির কল্পনাটা যত অদ্ভুতই হউক, তবু সেই কথা-গুলিকে ঘিরিয়াই কি-যেন সুরের মূর্চ্ছনা বাজিতেছে, একটা যেন অপূর্ব্ব সুবাস জড়াইয়া আছে তাহাদের গত-রজনীর কল্পনাগুলিকে!

সন্ধ্যার সময় নীতীশ বাড়ী ফিরিয়া বৈঠকখানাঘরে জুতা খুলিতে-খুলিতেই হাঁকিয়া বলিল,—কৈ গো, চা তৈরী, না, এখনও তোমার উনুন ধরেনি? বাপ্ রে বাপ্, ক্ষিদের জ্বালায় নাড়ী-ভুঁড়িগুলো পর্য্যন্ত—

কণিকা মুখ ভার করিয়া বলিল,—খেতে ত আর আমি বারণ করিনি! আমার সাম্‌নে এসে বল্‌লে তবে ত খেতে দেব, না, মাঠে—তোমার মিস্ত্রী-মজুরদের সাম্‌নে আমি যাব—

নীতীশ মুহূর্ত্তকাল স্ত্রীর মুখের পানে চাহিয়া থাকিয়া পরে বলিল,—ও! তা বটে—বটে—

পরে হঠাৎ একমুখ হাসিয়া কণিকার একখানা হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিল,—বেশ আছি আমরা দু'টিতে, না? আমি যত গরম হব, তুমি হবে নরম, আমি যত নরম হব, তুমি হবে—

কণিকা ফিক্ করিয়া হাসিয়া ফেলিয়া কহিল,—খুব হয়েছে। থামো। উনি নরম হবার মানুষই বটেন্! আমি যাই চুপ্‌চাপ্ ক'রে থাকি। নইলে—

তাহার মুখের কথা কাড়িয়া লইয়া নীতীশ বলিল—নইলে অন্য কার সাধ্যি হ'তো না আমার সঙ্গে ঘর করবার? একশোবার মান্‌ছি। তোমাকে না পেলে আমার জীবনে বিয়ে করাই হ'তো না!—

কণিকা বলিল,—তা কেন হবে না গো। আমি ম'রে গেলেও এখন বহুৎ মিল্‌বে—

—তাও মিল্‌বে? সত্যি বলছো? আঃ, বাঁচলুম—

কণিকা একবার ক্রুদ্ধ কটাক্ষে স্বামীর দিকে চাহিয়া বলিল,—কত রঙ্গই যে জানা আছে!

নীতীশ ততক্ষণে জামা ছাড়িয়া মুখ ধুইতে ধুইতে বলিল,—জানা হয় ত অনেক রকম আছে। কিন্তু উপস্থিত জঠরজ্বালার সঙ্গে অসহযোগ ক'রে রঙ্গ করবার বাসনা নেই। সত্যি বল্‌ছি।

খাইতে বসিয়া নীতীশ বলিল,—আজ সেই বিলের চেক্‌টা পাওয়া গেল। মনে করেছিলুম, মোটা রকমের কাটছাঁট দেবে, তা ছিট পাই পেমেণ্ট হ'লো!

কণিকা বলিল,—আমার টাকাগুলো দাও দেখি! আমার সেভিং-ব্যাঙ্কের সব টাকাগুলি বার করে ত কাযে লাগানো হয়েছে; এবার আমার চাই—আজই চাই—

নীতীশ বলিল,—মূলেই ভুল করছো। আজ টাকা নেই, আছে শুধু একখানা কাগজ। টাকা পাব কাল। কিন্তু পাব—ঐ পর্য্যন্তই! এই টাকাটার জন্যে কত কায যে আটক প'ড়ে আছে! টাকার অভাবে মামুদপুরের রাস্তার কাযটা শেষ করতেই পার্‌ছি নে।

কণিকা মুখ ভার করিতেছে দেখিয়া নীতীশ তাড়াতাড়ি কথা ঘুরাইয়া বলিল,—আরে হ্যাঁ, আসল কথাই যে মনে পড়েনি! তুমিও ত বেশ! বৈঠকখানাঘরটা হোয়াইট-ওয়াস্ কর্‌তে হবে যে! আজ হলো তেরই, আর ত মোটে দশটা দিন বাকী! তুমি ত এক রাত্তিরের মধ্যেই দিব্যি সব ভুলে ব'সে আছ!

মুখখানিকে আরও একটু গম্ভীর করিয়া কণিকা বলিল, ভুল্‌বো না ত কি হবে? আমাদের আবার বিবাহ-তিথি, তার আবার উৎসব!

—হলেই বা! লোকে কাণা ছেলেরও ত কল্যাণ কামনা করে! ধর না তেম্‌নিই—

চাকর আসিয়া খবর দিল, বাহিরে মিস্ত্রীরা বসিয়া আছে।

যাই—বলিয়া নীতীশ আহারাদি শেষ করিয়া বাহিরের ঘরে যাইতেছিল, কণিকা তাহার হাতে মসলা দিয়া বলিল,—মিস্ত্রীদের তা হ'লে ব'লে দিও ঠিক করে ক'বে আসবে!

নীতীশ তাহার মুখের পানে চাহিয়া একটু হাসিয়া চলিয়া গেল।

পরের দিন সকাল হইতেই কণিকা চাকরকে দিয়া বৈঠকখানাঘরের জিনিষপত্র বাহির করিতে আরম্ভ করিয়া দিল। নীতীশ ইটখোলায় ইটের সন্ধানে গিয়াছিল; ফিরিয়া আসিয়া দেখিল, ভাঙ্গা কাঠ, লোহা-লক্কড়, সীমেণ্টের খালি থলি হইতে আরম্ভ করিয়া চেয়ার, টেবল, কাগজ-পত্র সব বাহিরের চাতালটায় রাখা হইয়াছে। নীতীশ বলিল,—এগুলো সব এখানেই বার ক'রে রাখলে? ভালো মুস্কিল! বৃষ্টি হ'লেই বিপদ হবে যে!

কণিকা বলিল,—বিপদ কিছু হবে না গো, কিছু না! কৈ, মিস্ত্রী এলো না?

নীতীশ বলিল,—এ বেলা কোথায় আসবে? কায সেরে যদি সময় থাকে ত ও-বেলা আসবে'খন। কোথাও কিছু নেই, তুমি হুট ক'রে সব টেনে-টুনে একাকার করলে!

কণিকা বলিল,—বেশ করেছি। নইলে বুঝি ও আর কোনোকালে হবে? তোমার কাণ্ড ত!

কণিকার তাগিদে বৈঠকখানাঘরখানি খুব ভাল করিয়া চূণকাম করা হইল। প্রায় বছর দশের উপর হইয়া গেল, দেওয়ালে চূণ পড়ে নাই। সাদা দেওয়াল রীতিমত হলুদ-বর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল, তার উপর চারিদিকে পেরেক, পেরেকের গর্ত্ত, এবং সেই গর্ত্তের অধিবাসী ছারপোকা-গুলিকে নির্ম্মূল করিবার ব্যর্থ প্রচেষ্টার দাগ দেওয়ালের যেখানে সেখানে! কণিকা দাঁড়াইয়া থাকিয়া তিনবার করিয়া চূণকাম করাইল এবং বেশী করিয়া নীল রঙ ধরাইল। নীতিশ বাড়ী আসিলে বলিল,—দেখেছো, কি চমৎকার হ'য়েছে! নিজে দাঁড়িয়ে না থাকলে এমনটি হ'তো কি না! দেখ, ঐ দেয়ালটায় পাশাপাশি থাকবে আমার সেই ছুঁচে-বোনা ছবি-দুখানি, আর এ-দেয়ালে থাকবে ফটোগুলি! আচ্ছা, এখানে বিলিতী ঝাউয়ের আর বিলিতী খেজুরের পাতা পাওয়া যাবে না? ঐ দেয়ালটাতে—

বাধা দিয়া নীতীশ বলিল,—কিন্তু, এই সব জিনিষপত্রগুলো—

কণিকা বলিল,—ভয় নেই গো, টেবল-চেয়ার ঘরে তুলে রাখব। আর সব থাকবে এইখেনে প'ড়ে। দেয়ালে যদি একটু কিছু দাগ পড়ে ত ভালো হবে না, তা ব'লে রাখছি কিন্তু!

নীতীশ বলিল—তথাস্তু।

তেইশে শ্রাবণের আর দিন চার মাত্র বাকী।

সেদিন দুপুরে কণিকা গিয়াছিল রেখাদের বাড়ীতে বেড়াইতে। কথায় কথায় রেখাদের বিবাহ-তিথির উৎসবের প্রসঙ্গটা উঠিয়া পড়িল। রেখা বলিল,—এখনও জামাইবাবুর গলাটি কি মিষ্টি! ও বলছিল তাই—

কণিকা তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল—কি বলছিলেন? নিন্দে করছিলেন বুঝি?

—য্যাঃ, নিন্দে করবার মত গান নাকি জামাইবাবুর? আর নিন্দে করলেই নাকি আমি ছেড়ে কথা কইতুম!

কণিকা হাসিয়া বলিল,—বা রে! খারাপ হ'লে খারাপ বলবেন না? তার জন্যে তুমি নাকি কোমর বেঁধে ঝগড়া করবে বরের সঙ্গে? আর সত্যিই ত এখন ওর সে গলার আর কিছু নেই। সত্যি ক'রে বল না, কি বলছিলেন জামাইবাবু?

—বলছিলেন, দিদিই সত্যি সুখী! গান জিনিষটা যে গায়, তার আর আনন্দ কি? শোনার সৌভাগ্য যার, সে-ই ত সত্যিকার সুখী!

কণিকা হাসিয়া বলিল,—যেমন সুখী তিনি নিজেও, কেন না, তোমার মত গাইয়ে বউ পেয়েছেন।

রেখাও একটু সলজ্জ হাসি হাসিয়া বলিল,—সেইটুকুই ঠেসিয়ে বলা হোলো আর কি!

কণিকা বলিল,—তোমরা বুঝি ভাবো, ও আজকাল গান গায়? কিছু না হবে ত এই পাঁচ-ছ' বছর পরে সেদিন তোমাদের ওখানে ওর গান শুনলুম—

—কেন? গায় না কেন, দিদি? তুমিও ত শিখতে পারো?

কণিকা হাসিয়া বলিল,—বাস্ রে, আমিও শিখবো? ইলা বড় হচ্ছে, তাকেই বড় শেখাচ্ছে?

রেখা বলিল,—সত্যি, তোমরা যেন দিন দিন কি হ'য়ে যাচ্ছো। না আছে কোনো সখ, না আছে কিছু!

কণিকার একবার ইচ্ছা হইল, বলে, আগামী তেইশে তারিখে তাহাদের বিবাহ-তিথি, যাওয়া চাই। কিন্তু কথাটা অধর পর্য্যন্ত আসিয়াও যেন কেমন বাধিয়া গেল। মনে মনে বলিল,—থাক্। সে আবার পরে এক দিন আসিলেই চলিবে।

হঠাৎ এক সময় ঝমঝম্ করিয়া জোরে বৃষ্টি নামিয়া পড়িল। রীতিমত শ্রাবণের ধারা। কিছুতেই আর থামিতে চায় না, একঘেয়ে বিরক্তিকর বৃষ্টি। বাতাসের একটু সম্পর্ক নাই—সমস্ত প্রকৃতি যেন নির্ব্বিরোধ গোবেচারাটির মত দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া ভিজিতেছে।

কণিকা বলিল,—মুস্কিলে পড়লুম ত ভাই! বাড়ী যাই কি ক'রে!

রেখা বলিল,—মুস্কিল আবার কি গো! জলে পড়েছ বুঝি? ব'সো, একবারে ও-বেলা খাওয়া-দাওয়া করে' তবে যাবে।

কণিকা বলিল,—পাগল আর কি! আমি খেলেই বুঝি হ'য়ে গেল?

রেখা বলিল,—কেন, আমি চাপরাশী পাঠিয়ে জামাই-বাবুকেও না-হয় নেমন্তন্ন ক'রে পাঠাচ্ছি। তা হ'লে ত হবে!

কণিকা অপ্রতিভের হাসি হাসিয়া বলিল,—তোমার জামাইবাবু যেন এখন বাড়ীতেই ব'সে আছেন! কোথায় কোন মাঠের ধারে কুলী খাটাতে খাটাতে হয়তো গাছ-তলাতে দাঁড়িয়ে কাক-ভেজা হয়ে ভিজছে!

রেখা খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া বলিল,—হ্যাঁ গো, তাই আবার ভেজে না কি কেউ? দিদির আমার মন কেমন করছে বলে' যা খুসী তাই বলতে সুরু করেছে!

—হ্যাঁ, বলছে যা খুসী তাই! খুব মেয়ে বাবা!

কণিকা যখন বাড়ী ফিরিল, তখন সন্ধ্যা হয় হয়। আকাশে একটু ধরণ করিলেও ফিস্‌ফিস্ করিয়া তখনো বৃষ্টি পড়িতেছে। নীতীশ তখনো বাড়ী ফেরে নাই। ইলা রাগ করিয়া একপাশে গুম্ হইয়া বসিয়া আছে। কণিকা তাহার চিবুক ধরিয়া তুলিয়া বলিল,—হ্যাঁ রে, ইস্কুল থেকে এসে খেয়েছিস্ তো? ও মা, রাগ হ'য়েছে বুঝি?

চাকর মধু বলিল,—খাবার যে তুমি ঢাকা দিয়ে রেখেছিলে মা, তাই আমি দিয়েছি। কিছুতেই খাবে না, কেঁদে-কেঁদে চোখ ফুলিয়েছে' দেখ না!

তাহাকে কোলে তুলিয়া আদর করিতে করিতে কণিকা বলিল,—মধু, তুমি বাবা ষ্টোভটা জ্বেলে ফেল। মরতে আজ কেন যে গিয়েছিলুম!

আবার বৃষ্টি নামিয়াছিল। মনে হইল, এ-বৃষ্টি আজ আর সারারাত্রি থামিবে না। নীতীশ বাড়ী ফিরিল, আগাগোড়া জলে ভিজিয়া; মাথার চুলগুলি বাহিয়া টস্ টস্ করিয়া জল পড়িতেছে। কণিকা গালে হাত দিয়া বলিল,—অবাক কাণ্ড! করেছ কি গো! অসুখ হ'য়ে সর্ব্বনাশ হবে যে!

নীতীশ বলিল,—অসুখ একটু হ'তেও পারে, তবে সর্ব্বনাশ কিছু হবে না, তার ভয় নেই।

কণিকা ঝঙ্কার দিয়া বলিল,—মুখে কি কিছু আট-কায় না?

—সত্যি কথা বলতে আটকাবে যে কেন, তাও তো কিছু বুঝিনে। পচা গরমের দিনে মানুষের প্রাণান্ত হয়, কিন্তু ছারপোকার বংশবৃদ্ধি হয়। দুঃখ-দুর্দ্দশাতে মানুষ যারা—তারাই কাবু হয়, আমাদের পরমায়ু বাড়ে।

—খুব হয়েছে। কথাতে তো পারবার যো নেই!

—সত্যি কথা মানতে চাও না, ঐ তো তোমার দোষ, কণা!

কণিকা খুব ভালো সূচের কায জানিত। তার নিজের হাতের দু-খানি সূচীচিত্র একবার কোন্ প্রদর্শনীর শিল্প-বিভাগে প্রথম পুরস্কার পাইয়াছিল—কালো জমীর উপর রকমারি রঙের রেশম দিয়া একটি ফুলের তোড়া, এবং অপরটিতে—পুকুরের স্বচ্ছ হিল্লোলিত জলে তিনটি রাজহংস বেড়াইতেছে। এ-সংসারের মধ্যে কণিকার সবচেয়ে প্রিয় বস্তু এই দুটি। ফ্রেমে বাঁধা ছবি দু'খানি তাহার শোবার ঘরে টাঙ্গানো ছিল। এমন দিন কদাচিৎ আসিত, যে দিন কণিকা তাহার সংসারের সব ঝঞ্ঝাটকে একটুখানি আড়াল করিয়া ইহাদের একটু ঝাড়ামোছা না করিত।

পরদিন সকালে রাঁধাবাড়ার কায শেষ করিয়া কণিকা সেই ছবি দু'খানি খুলিয়া লইয়া বৈঠকখানা-ঘরের সম্মুখে

আসিয়াই রীতিমত অবাক্ হইয়া গেল। যে ভাঙ্গা-কাঠ লোহা-লক্কড় ইত্যাদি দ্রব্যগুলো সে টানিয়া চাতালে বাহির করাইয়াছিল, সেগুলো অবশ্য সেখানেই আছে। কিন্তু নূতন কতকগুলা অদ্ভুত মালপত্রে ঘর যেন বোঝাই হইয়া গিয়াছে। কয়েকখানা নূতন ও পুরাতন জানালা-দরজা, কয়েক বস্তা সীমেণ্ট, কতকগুলো জং-ধরা লোহার পাইপ ইত্যাদি। মেঝের উপর দু'খানা ছেঁড়া সতরঞ্চি ও চট্ এলোমেলো ভাবে ছড়ানো। ঘরের ভিতর যেন কিসের একটা দুর্গন্ধ। ভিতরে ঢুকিতে গিয়া কণিকার নজরে পড়িল, এক কোণে কতকগুলো টিকের গুঁড়ো, পোড়া তামাক, দেশলাইয়ের ভাঙ্গা বাক্স, পোড়া কাঠি, এবং পোড়া কাগজের কুচি ইতস্ততঃ ছড়াইয়া আছে। এক যায়গায় দেয়ালের নূতন চূণকামের উপর খানিকটা ধোঁয়ার কালো দাগ অতি বিশ্রী ভাবে লাগিয়া রহিয়াছে।

কণিকার মাথা ঘুরিতে লাগিল। এ সব কি যে কাণ্ড এবং কাহার দ্বারা সংঘটিত হইল, তাহা সে বুঝিতে পারিল না। অত্যন্ত রুক্ষস্বরে মধুকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করায় সে জানাইল, কাল দুপুরবেলা বাবুর লোকজন আসিয়া ঐ জিনিষগুলো রাখিয়া গিয়াছে এবং রাত্রিতে তিন জন মিস্ত্রী ঐ বৈঠকখানাতেই শয়ন করিয়াছিল।

কণিকা রুদ্ধনিশ্বাসে বলিল,—আমাকে বল্‌তে পারোনি?

মধু নির্ব্বাক্ অপরাধীর দৃষ্টিতে কণিকার মুখের পানে চাহিয়া রহিল; বেচারা যেন বলিতে চায়, তাঁহাকে জানাইতে হইবে, এ কথাটাও তো তাহার জানা ছিল না। সে কথা ঘুরাইবার জন্য বলিল,—আর তাই যদি একটু ভালো ক'রে রাখ্‌তো, মা! দেখ না, জানলা-দরজাগুলো এমন ভাবে রেখেছে যে, ওদিকের দেয়ালের এতবড় এক চোক্‌লা চূণ-বালি খসে' গেছে।

দুপুরবেলা নীতীশ বাড়ী আসিতেই কণিকা বলিল,—রাজ্যিসুদ্ধ ধাঙ্গড়-চোয়াড়কে ঐ বৈঠকখানা-ঘরে শুতে দেওয়া আর ঐ সব ছাই-ভস্মগুলো দিয়ে ঘর বোঝাই করা হোলো কার হুকুমে তাই শুনি?

নীতীশ প্রথমটা হতবুদ্ধি হইয়া গেল। বিস্ময়ের কণ্ঠেই জবাব দিল,—কেন! আমিই তো ব'লেছিলুম। অপরাধটা কি হোলো?

কণিকা ঝঙ্কার দিয়া বলিল,—অপরাধ আবার কি? তোমার বাড়ী, তোমার সব; আমি তো দাসী-বাঁদী বই আর কিছু না! তবে, এম্‌নি লক্ষ্মীছাড়ার মত কাণ্ড দেখ্‌লেই বলতে হয়। চূণকাম-করা ঘরটার আর কিছু বাকী রাখো নি যে!

মামুদপুরের রাস্তার কাযটায় লাভ তো থাকিবেই না, বরং লোক্‌সানই হইবে রীতিমত; কেন না, গত কয়দিনের প্রচুর বর্ষায় নিকটের খাঁড়োড় ছাপাইয়া জলের স্রোতে রাস্তার অনেকখানি অংশ ধ্বসিয়া গিয়াছে। নীতীশ আজ বরাবর সেখান হইতে মনে-মনে তাহার লোকসানের অঙ্কটা হিসাব করিতে-করিতে বাড়ী ফিরিতেছিল; এবং বাড়ীতে পা দিতে না দিতেই এই বিপত্তি। সে আর তাহার মেজাজকে বশে রাখিতে পারিল না। বেশ গম্ভীরভাবেই বলিল,—তা আর কি হবে বল! লক্ষ্মীশ্রী এতে না থেকে যদি শুধু সৌখীনভাবে ব'সে ব'সে উপোস কর্‌লেই থাকে, তা হলে সেটা আমার জানা ছিল না; স্বীকার কর্‌ছি।

কণিকার ত কথাই নাই। একে সে রীতিমত সপ্তমে চড়িয়াই ছিল, তার উপর এই শ্লেষের কথায় সে একবারে জ্ঞান হারাইল।

—হ্যাঁ গো! সৌখীনগিরিই দিনরাত কর্‌ছি দেখছো না! তোমার সংসারে এনে আমাকে বসিয়ে বসিয়ে রাণী-গিরির আদরেই খাওয়াচ্ছো ত! সকাল থেকে রাত্রি ৯টা পর্য্যন্ত রীতিমত নাকে দড়ি দিয়ে ঘানি টানিয়ে নিয়ে তবে দু'মুঠো করে খেতে দিচ্ছো। বল্‌তে গেলে আর বাকী থাকে না!

নীতিশ জবাব দিল,—বিয়ের আগে এটুকু খবর নিয়ে তবে এই হা-ঘরের ঘরে পা বাড়াতে হয়! রাণীগিরির আদর খাওয়ার বাসনা যদি ছিল ত তার স্থান এখানে নয়, সেটা তোমার বাবা-মা ভালো রকমই জান্‌তেন।

কণিকা অগ্নিমূর্ত্তির মত সোজা হইয়া দাঁড়াইল। —ইতরের মত বাপ-মা তুলে কথা কইতে লজ্জা করে না?

নীতীশ ছোট্ট করিয়া বলিল,—না। কারণ, আমিও যে ধাঙ্গড়-চোয়াড়দের এক জন!

কথাতে যদিও আছে, 'দাম্পত্যকলহে চৈব বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া!' এবার কিন্তু ইহাদের দাম্পত্য-কলহটা যেন

একটু সীমা ছাড়াইয়া গিয়াছিল। তাই তাহার ফল যাহা হইল, তাহাকে নিতান্ত 'লঘুক্রিয়া' বলা চলে না। জীবনে কণিকা ও নীতীশের যত বেশীই ঝগড়া-ঝাটি হউক, এক বেলার বেশী কথা বন্ধ থাকে নাই, কিন্তু এবার তাহার এতখানি ব্যতিক্রম হইল যে, এক দিন দুই দিন করিয়া পূরা চার দিন কাটিয়া গেল, তবু কেহ কাহারও কাছে কথা কহিবার এতটুকু আগ্রহ দেখাইল না।

আজ তেইশে শ্রাবণের রাত্রি কি অসম্ভব রকম মুষলধারে বৃষ্টি হইতেছে সারারাত! ধরিত্রী যেন কাঁদিয়া কাঁদিয়া সারা হইতেছে। খোকাকে বুকের ভিতর টানিয়া লইয়া নিজের ছোট বিছানাটির উপর বিনিদ্র-নেত্রে পড়িয়া পড়িয়া কণিকা সারাটি রাত সেই অশরীরিণীর কান্না শুনিয়াছে এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে নিজের চোখের জলে বালিশ ভিজাইয়াছে। আজ তাহাদের বিবাহ-তিথি! এই ত তাহার উৎসব! উৎসবের আর বাকী রহিল কি?

শ্রীপ্রফুল্লকুমার মণ্ডল।

বায়ু পরিবর্ত্তন

মধুপুরে আসি ভাড়াটে বাড়ীর দেওয়ালেতে দেখিলাম,
বিমলা কমলা বিভা রেবা আশা লেখা আছে কত নাম।
শুনিলাম তারা দশ বারো জন কোন কলেজের ছাত্রী,
বড় দিনে বুঝি এসেছিল হ'য়ে দেশ-ভ্রমণের যাত্রী।
চাকর বামুন সঙ্গে লইয়া হাওয়া বদলাতে আসি,
শয়নকক্ষে দশখানি মুখ উঠিল মধুর হাসি;
আধেক নিশিতে স্বপ্ন বীণায় মৃদু ঝঙ্কার তুলি,
আমার নিদ্রা হরিতে লাগিল কলেজের মেয়েগুলি।
আমার মনের উপবনে তারা গন্ধে মধুতে ভ'রি,
শিহরি' শিহরি' উঠিতে লাগিল প্রভাত পুষ্পপরী।
কুসুমের নিঃশ্বাসে—
বিভোল করিল মধু-রাতে মোরে মধুপুরে মধুমাসে।

ডাক্তার আসি বক্তৃতা দিয়ে স্বাস্থ্যতত্ত্ব নানা,
কহিলেন কালই চূণকাম করি' ফেলা চাই বাড়ীখানা।
ভাবিলাম আহা কেমন করিয়া টানিয়া চূণের তুলি,
মুছিয়া ফেলিব নির্ম্মম হাতে এই চাঁদ মুখগুলি!
দুনিয়ার যত কাঠ প্রাণী ওই ডাক্তারগুলো সব,
জীবনের কোন রূপ-রস নারে করিবারে অনুভব!
চামড়ার নলে শোনে শুধু ওরা ধুক-ধুক করে প্রাণ,
শুনিতে পায় না ওঠে নামে সেথা কত তারে কত তান।
জ্বরের প্রদাহ বুঝিবারে দেখে কত বেগে নাড়ী চলে,
বুঝে না কত যে শিরায় শিরায় বাসনা-বহ্নি জ্বলে।
ঘুমের ওষুধে নাশ করে ওরা নিশীথ জাগার জ্বালা,
বেঁধে আনা ঘুম ছিঁড়ে দেয় কত স্বপন মাধবী মালা।
"হৃদয়-যন্ত্র" যারা,—
পেশা করিয়াছে, বুঝিবে কি ছাই হৃদয়-তত্ত্ব তারা।

যা হোক তথাপি চূণকাম হ'ল আমার ভাড়াটে বাসা,
অভিমান করি ঢাকা দিল মুখ সেই বিভা রেবা আশা।
ভাবিলাম পোড়া স্বাস্থ্যের দায়ে হ'ল চির বিচ্ছেদ,
মোর তরে স্মৃতি লিখে যাওয়া সখী-সাথে, এ কি কম খেদ!
পর দিন দেখি চূণের পোঁচড়া শুকায়ে হ'য়েছে সাদা,
তাহারি আড়ালে বিভা রেবা আশা ফুটিয়াছে আধা আধা।
কালো পেন্সিলে স্মৃতি লেখা পরে সাদা চূণকাম টানি',
কালো চুলে যেন তুলেছে তাহারা সাদার ঘোমটাখানি।
কালিকার সেই জুতা-টুতা পরা কলেজের মেয়েগুলি,
মধু ভরা বধূ সেজেছে আজিকে সিঁথিতে ঘোমটা তুলি।
আমারে ভোলেনি এক জনও তারা ঘোমটার আড়ে আড়ে,
সরম-নম্র নয়ন তুলিয়া চাহে যেন ধীরে ধীরে।
বিভা রেবা আর আশা,
গোপনে গোপনে বেঁধেছে সবাই আমার এ বুকে বাসা।

পা টিপে পা টিপে চলে গেল শীত গরম পড়িল ভারি,
পোঁটলা-পুঁটলি বাঁধি এক দিন গুটালাম পাততাড়ি।
সন্ধ্যার গাড়ী ধরি তাড়াতাড়ি ছাড়িলাম মধুপুর,
এক্সপ্রেসখানা কহিতে লাগিল, ছাড়িয়া মামুলি সুর,—
বিমলা কমলা—বিমলা কমলা—বিভা রেবা আশা সই,
ভুলোনা ভুলোনা আমায় ভুলোনা—তোমাদের ছাড়া নই।
তন্দ্রার ঘোরে কাণে কাণে মোরে কহিল তাহারা যেন,
ওগো নিষ্ঠুর, ফিরে এস, এস,—ফেলে চ'লে যাও কেন?
স্বজন বন্ধু কহিল সবাই,—শরীর সারেনি কিছু,
কেমনে সারিবে? পুরো দুটো মাস ফিরেছি হাওয়ার পিছু!
যত বার ভাবি অজানা অচেনা তারা ছাই মোর কেবা,
তত মন প্রাণ ডেকে ওঠে হায়, কোথা বিভা আশা রেবা।

বায়ু বদলাতে গিয়ে—
ফিরে এনু হায় কাঁচা বয়সেতে পাকা বায়ুরোগ নিয়ে!

শ্রীঅনাথবন্ধু সেনগুপ্ত, (বি-এল)।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-দেব

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন ও ব্রাহ্ম-ভক্তগণের সহিত ঠাকুরের মিলন—খৃষ্টান ধর্ম্ম সাধন

শ্রীমার পরে ঠাকুরের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভক্ত ও ভক্ত-সংগ্রাহক, ভক্তচূড়ামণি ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের সহিত শ্রীঠাকুরের মিলনকথা এইবার বর্ণিত হইতেছে। 'নব-বিধান' ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক, অদ্বিতীয় বাগ্মী, উনবিংশ

কেশবচন্দ্র সেন

শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মপ্রচারক কেশবচন্দ্রের জন্ম হয় ২৪ পরগণার অন্তর্গত গরিফা গ্রামে। কেশবচন্দ্রের পিতা প্যারীমোহন এক জন ধর্ম্মসাধননিষ্ঠ ভক্ত ছিলেন। তাঁহার পিতামহ রামকমল সেন পরম বৈষ্ণব ছিলেন। তিনি তুলসীকানন রচনা করিয়া তাহার মধ্যে বসিয়া ধ্যানজপাদি করিতেন। কেশবের জন্ম হয় ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে। কেশব ও ঠাকুরের প্রথম মিলন হয় ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে, তখন কেশবের বয়ঃক্রম ৩৭, ঠাকুরের বয়স ৪২।৪৩ বৎসর।

বাল্যে কেশব সর্ব্বাঙ্গে ছাপ পরিয়া, হরিসঙ্কীর্ত্তনে খোলের সঙ্গে তালে তালে নাচিতেন। বাল্যকালেই কেশবের ধর্ম্মভাব উদ্দীপিত হইয়াছিল। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে ১৯ বৎসর বয়সে ইনি ব্রহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করেন। ধর্ম্মান্তর গ্রহণ জন্য—কেশবের আত্মীয়স্বজনগণ তাঁহাকে অনেক পীড়ন করেন। কেশব প্রথমে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আদি সমাজে যাতায়াত আরম্ভ করেন। ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে ইনি আদি সমাজের এক জন আচার্য্য নিয়োজিত হন এবং দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁহাকে 'ব্রহ্মানন্দ' উপাধি দেন। ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে ঠাকুর মথুরের সঙ্গে আদি সমাজে গমন করিয়া কেশবকে প্রথম দর্শন করেন। পূর্ব্বে তিনি পঞ্চবটীতে ভাবাবেশে দর্শনাদির মধ্যে কেশবকে জ্যোতিঃরাশির অভ্যন্তরে দর্শন করিয়াছিলেন, সে কথা আমরা যথাস্থানে বলিয়াছি। ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে কেশব আদি সমাজ ত্যাগ করিয়া, ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে ২২শে আগষ্ট 'ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম-সমাজ' প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে কেশব ইংলণ্ডে গমন করেন! সেখানে তিনি অসামান্য বাগ্মিতায় ইংলণ্ডের ধর্ম্মপিপাসুগণকে মুগ্ধ করেন, এমন কি, মহারাণী ভিক্টোরিয়াও তাঁহার সহিত আলাপে তৃপ্তিলাভ করিয়া, কেশবকে পরোক্ষে নানা ভাবে সম্মানিত করেন। ভারতবর্ষে ফিরিয়া আসিয়া কেশব নানা হিতকর কার্য্যে আত্মনিয়োগ করেন। তিনি Indian Reform Association স্থাপন করেন—সুলভ সমাচার নামে একখানি সংবাদপত্র প্রচার করেন। ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে ২৮শে কার্ত্তিক কেশবচন্দ্র "কমল কুটীর" নামক অপার সার্কিউলার রোডস্থ বৃহৎ বাড়ীতে আসিয়া বাস করিতে আরম্ভ করেন। ইহার পূর্ব্বে তিনি কলুটোলায় বাস করিতেছিলেন।

কেশব সেনকে দেখিবার আগে ঠাকুর নারায়ণ শাস্ত্রীকে কেশবকে পরখ করিতে পাঠাইয়াছিলেন। নারায়ণ শাস্ত্রী ফিরিয়া আসিয়া ঠাকুরকে বলিয়াছিলেন যে, কেশবের বরাং ভাল। পাঠক এ কথা পূর্ব্বেই জানিয়াছেন। এইবার ঠাকুর স্বয়ং কেশবকে দেখিতে যাইতে ইচ্ছা করিলেন। ১৮৭৫, মার্চ্চ মাসে কেশবচন্দ্র মাথাঘসা গলি নিবাসী জয়গোপাল সেনের বেলঘরের বাগানে একান্তে ধ্যানজপ করিবার জন্য অবস্থান করিতেছিলেন। সেই সময়ে হৃদয়ের সঙ্গে ঠাকুর এক দিন বৈকালে কাপ্তেনের গাড়ীতে চড়িয়া ঐ বাগানে উপস্থিত হইলেন। হৃদয় অগ্রগামী হইয়া সভক্ত কেশবকে বলিলেন, তাঁহার মামা শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস কেশবচন্দ্রকে দেখিতে আসিয়াছেন। ঠাকুর ধুতিপরা, ধুতির অগ্রভাগ কাঁধের উপরে ফেলা। তাঁহাকে দেখিয়া প্রথমে কেশবশিষ্য ব্রাহ্মগণ সামান্য ব্যক্তি বোধে তাঁহার প্রতি আদৌ শ্রদ্ধাশীল বা অবহিত হন নাই। ঠাকুর তথাপি অগ্রসর হইয়া বলিলেন, "বাবুরা, তোমরা নাকি ঈশ্বরকে দেখ্‌তে পাও, তাই শুনে তোমরা ঈশ্বরকে কেমন দেখ, তাই শুন্‌তে এসেছি।" তাহার পর কেশবকে দেখাইয়া হৃদয়কে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "ওরে হৃদে, ওঁরই ল্যাজ খসেছে।" এই কথা শুনিয়া সভার সকলে উহা পাগলের প্রলাপ মনে করিয়া উচ্চ হাস্য করিতে লাগিলেন। কিন্তু কেশব তাঁহাদিগকে হাস্য করিতে বারণ করিয়া, ঠাকুরকে এই কথা বলিবার অর্থ জিজ্ঞাসা করিলেন। ঠাকুর তখন বুঝাইয়া বলিলেন যে, সাধারণ মায়াবদ্ধ জীব সংসারজলে বেঙাচির মত ভাসিয়াই ঘুরিয়া বেড়ায়, সচ্চিদানন্দরূপ আড়ায় বা ডাঙ্গায় উঠিতে পারে না। কিন্তু লেজ খসিয়া গেলে তখন জলেও থাকে, ইচ্ছা করিলে লাফাইয়া ডাঙ্গায়ও উঠিতে পারে। কেশবের মায়ার লেজ খসায় তিনি সাধারণভাবে সংসারেও থাকিতে পারেন এবং ইচ্ছা করিলে সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মেরও রস আস্বাদ করিতে সমর্থ। এই বেঙাচির দৃষ্টান্তে ও তাঁহার মধুর ব্যাখ্যায় কেশব মুগ্ধ হইলেন। তাহার পর ঠাকুর একটি শ্যামাবিষয়ক গান করিলেন এবং গানের শেষে সমাধিস্থ হইয়া গেলেন। সেই অবস্থায় হৃদয় তাঁহার কর্ণে 'ওম্' 'ওম্' মন্ত্র উচ্চারণ করিতে করিতে যখন আবার তাঁহার ক্রমশঃ সহজ অবস্থা হইতে লাগিল, তখন সশিষ্য কেশবের বিস্ময়ের সীমা রহিল না। তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, ইনি সাধারণ সাধক বা ভক্তের মত নহেন, ইনি ভগবানের নামে আত্মবিস্মৃত হন। নিশ্চয়ই ইনি উন্নত স্তরের মহাপুরুষ—ইঁহাকে উপেক্ষা করার সাধ্য কাহারও নাই। সে দিন আর একটু কথাবার্ত্তার পর ঠাকুর প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন, কিন্তু কেশব তাঁহার কথা—ভাব—ভগবদ্ভক্তি মনে করিয়া রাখিয়া দিলেন। তাহা তাঁহার হৃদয়ে গভীরভাবে অঙ্কিত হইয়া রহিল।

ইহার পর কেশবচন্দ্র, প্রসন্ন সেন প্রমুখ তাঁহার তিন জন শিষ্যকে দক্ষিণেশ্বরে পাঠাইলেন। উদ্দেশ্য—তাঁহারা তিন দিন দক্ষিণেশ্বরে থাকিয়া দিবারাত্র ঠাকুরকে লক্ষ্য করিবেন, তিনি স্থিতধী হইয়াছেন কি না। গীতায় এই স্থিতধীর কথা আছে। তাঁহারা কিন্তু রাত্রিকালে ঠাকুরের ঘরে থাকিয়া কেবল মধ্যে মধ্যে "দয়াময়", "দয়াময়" বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন; সেই সঙ্গে ঠাকুরকে বুঝাইতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন, তিনি যেন পারত্রিক কল্যাণের জন্য কেশবকে গিয়া ধরেন—কেশব তাহা হইলে তাঁহার একটি গতি করিয়া দিতে পারেন। ঠাকুর যত বলেন যে, তিনি মুক্তি চান না, তিনি সাকার বিশ্বাসী—মা-ই তাঁহার সর্ব্বস্ব, ততই তাঁহারা "দয়াময়" "দয়াময়" করেন। তখন ঠাকুরের ভাবাবস্থা হইল। সেই ভাবাবস্থায় তিনি তাঁহাদের বলিলেন—"যা শ্যালারা এখান থেকে বেরিয়ে—এ ঘরে থাক্‌তে পাবি না।" ঠাকুরের তৎকালীন দৃঢ়তা ও সিংহতুল্য প্রভুত্বের ভাব দেখিয়া ভয়ে বাধ্য হইয়া অগত্যা তাঁহারা বাহিরে গিয়া রাত্রি যাপন করিলেন—'দয়াময়' নাম ঘন ঘন উচ্চারণ করাও বন্ধ রাখিলেন।

ইহার পর এক দিন কেশব শম্ভু মল্লিককে সঙ্গে লইয়া ঠাকুরের সঙ্গে দেখা করিতে দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে আগমন করিলেন। এ দিনে কথা-প্রসঙ্গে Free Willএর কথা উঠিল—ইংরেজিপড়া লোকদের মত, মানুষের ইচ্ছা স্বাধীন। ঠাকুর তখন কেশবকে বলিলেন যে, স্বাধীন ইচ্ছা-টিচ্ছা কোন জীবেরই নাই। গাছের পাতাটি যে নড়ে, তাও ঈশ্বরের ইচ্ছায়। সবই ঈশ্বরের ইচ্ছাধীন। মানুষ মায়ের হাতের যন্ত্র মাত্র। তিনি মানুষকে যাহা করান, মানুষ তাহাই করে—যাহা বলান, মানুষ তাই বলে, মানুষকে যেমন

রাখেন, মানুষ তেম্নি থাকে। কেশব বলিলেন, তবে ত' মানুষের দায়িত্ব থাকে না। ঠাকুর বলিলেন, যত দিন মানুষ ঠিক ঠিক ঈশ্বরের পূর্ণ কর্ত্তৃত্ব অনুভব করিতে পারে না, তত দিন তাহার ভাল-মন্দ, পাপ-পুণ্য, আলো-আঁধার বোধ থাকিবেই এবং ভাল কায করিলে যেমন মানুষের মন উল্লসিত হয়, মন্দকর্ম্ম করিলে তেমনি মানুষের মন 'ধুক্‌পুক্' করে। এই বৈষম্যবুদ্ধি কাঁচা মানুষের মধ্যে মা-ই রাখিয়া দিয়াছেন। নচেৎ মন্দ কর্ম্মের প্রসার হইত। ঠিক যে জানে আমি যন্ত্র, মা যন্ত্রী, তাহার আর বেতালে পা পড়ে না, সে আর কাহারও অকল্যাণকর কোন কায করিতে পারে না।

সে দিন বেলা চারিটার সময় কেশব ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, সাধু-ভোজন কখন্ হবে। মন্দিরে সদাব্রত যে বন্ধ হইয়াছে, কেশব তাহা জানিতেন না, সেই জন্য এই প্রশ্ন করিয়াছিলেন। এই সরল প্রশ্নে ঠাকুর তাঁহাকে বড়ই পছন্দ করিলেন এবং কেশবের এই সরলতার কথা ভক্তদিগকে দৃষ্টান্তস্বরূপ প্রায় বলিতে ভালবাসিতেন। পরে ঠাকুর কেশবকে শ্রীমন্দিরে গিয়ে মাকে দর্শন করিতে বলিলেন। কিন্তু কেশবের তখন খৃষ্টান ধর্ম্মের প্রতি অতিশয় শ্রদ্ধা—তিনি যিশুর মত বলিলেন. "আমি মাকে ত' জানি না আমি যে বাবাকে নিজ মনপ্রাণ সব অর্পণ করেছি।" তখন ঠাকুর তাহাকে নানা উপমা দিয়া বুঝাইতে লাগিলেন,—ব্রহ্ম ও শক্তি অভেদ এবং এক জনকে মান্‌লে অপরকেও মানতে হবে—যেমন দুগ্ধ যেখানে, ধবলত্ব সেইখানে; অগ্নি যেখানে, দাহিকাশক্তি সেইখানে, বিরাট সমুদ্র যেখানে, "হিল্লোল কল্লোলও" সেইখানে। বাবা ও মা একই স্থানে,—অভেদাত্মা। নানা কথাবার্ত্তার পর ঠাকুর কেশবকে মিষ্টিমুখ করাইয়া সে দিনের মত বিদায় দিলেন।

ইহার পর আর এক দিন ঠাকুর বেলঘরের ঐ বাগানে আবার কেশবকে দেখিতে যান। কেশববাবু এই বাগানে ১৮৭৫, এপ্রেল মাসের শেষ পর্য্যন্ত ছিলেন। সে দিনে ঠাকুর বেশ টকটকে লালপাড় ধুতি পরিয়া গিয়াছিলেন। তাহা দেখিয়া কেশবচন্দ্র বলিয়াছিলেন "আজ এত কাপড়ের বাহার কিসের জন্য?" ঠাকুরও উত্তর দেন "কেশবের মন ভুলাতে আজ আগমন কি না, তাই এত বেশভূষার পারিপাট্য!" কেশব তাহা শুনিয়া হাসিতে লাগিলেন। ঠাকুর রসিকচূড়ামণি ছিলেন, রসের অবতারণা করিয়া শ্রোতাদিগকে মুগ্ধ করিয়া দিতে পারিতেন।

এইরূপে যাতায়াতে কেশবের সহিত ঠাকুরের ঘনিষ্ঠতা বাড়িতে লাগিল। কেশব সেন প্রথমে খুবই রজোগুণী ছিলেন। সাধুসঙ্গ করিবার প্রয়োজনীয়তা তত বিশ্বাস করিতেন না—সেই জন্য সাধুসঙ্গও তেমন করেন নাই। তাঁহার কলুটোলার বাড়ীতে ঠাকুর এক দিন হৃদয়কে লইয়া গিয়াছিলেন। ঠাকুর যখন পৌছিলেন, তখন কেশবচন্দ্র টেবিলে কি লিখিতেছিলেন। ঠাকুরকে আসিতে ও অপেক্ষা করিতে দেখিয়াও তিনি লেখা বন্ধ করিলেন না। ঠাকুর যে সে ঘরে বসিয়া অপেক্ষা করিতেছেন, সে দিকে ভ্রূক্ষেপও করিলেন না। লেখা শেষ করিয়া তিনি নীচে নামিয়া ফরাসে গিয়া বসিলেন। ঠাকুরকে প্রণাম নমস্কার কিছুই করিলেন না। এই সব দেখিয়া ঠাকুর তখন এক কার্য্য আরম্ভ করিলেন। কেশব দক্ষিণেশ্বরে গেলেই তিনি আগে কেশবকে মাথা নীচু করিয়া নমস্কার করিতেন। এইরূপ করিতে করিতে তবে কেশব ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিতে শিখিলেন। প্রথম প্রথম কেশবচন্দ্র ঠাকুরের সম্মুখেই পায়ের উপর পা তুলিয়া বসিতেন। তাহা দেখিয়া ঠাকুর বলিতেন যে, ঐরূপ করিয়া বসিতে নাই, উহাতে রজোগুণ বর্দ্ধিত হয়। তখন আবার কেশবচন্দ্র পা নামাইয়া বসিতে শিখিলেন। এইরূপে ঠাকুর নিজ আচরণ দেখাইয়া কেশবচন্দ্রকে এবং ঐরূপ ভাবের রজোগুণী ভক্তগণকে শিক্ষা দিতেন। 'আপনি আচরি ধর্ম্ম অপরে শিখায়।'

ঠাকুরকে প্রথম দর্শনের পর কেশব ১৮৭৫, ২৮ মার্চ্চ তারিখের 'মিরর' (Indian Mirror) পত্রে ইংরেজিতে এই মর্ম্মে লিখিয়াছিলেন—"আমরা সম্প্রতি দক্ষিণেশ্বরের পরমহংসদেবকে দেখিয়াছি। তাঁহার অনাড়ম্বর ভাব, ধর্ম্মজীবনের গভীরতা ও সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টিতে মুগ্ধ হইয়াছি। তাঁহার অফুরন্ত উপমাগুলি যাহা তিনি প্রসঙ্গতঃ ব্যবহার করেন, তাহা যেমন সুন্দর, তেমনি দেশকাল উপযোগী। পরমহংসদেবের মানসিক অবস্থা দয়ানন্দ সরস্বতীর মানসিক অবস্থার বিপরীত। পরমহংসদেব শান্ত, অপর ব্যক্তি উগ্রভাবাপন্ন। এই মহাপুরুষকে দেখিয়া আমাদের বোধ

হইতেছে যে, হিন্দুধর্ম্মে না জানি কত সৌন্দর্য্য ও সত্যই না নিহিত রহিয়াছে!" ঠাকুরের ভালবাসা যেমন কেশবের প্রতি দিন দিন বর্দ্ধিত হইতে লাগিল, কেশবের ভক্তিও ঠাকুরের প্রতি তেমনি দিন দিন বাড়িয়া যাইতে লাগিল।

১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে ফাল্গুন মাসে, শুক্লা দ্বিতীয়ার দিনে ঠাকুরের জন্মতিথিতে, ঠাকুরের জননী চন্দ্রমণি দেবী দেহত্যাগ করিলেন। তাঁহার শেষ জীবনে হৃদয় ও ঠাকুরের ভ্রাতুষ্পুত্র রামলাল তাঁহার অতিশয় সেবা করিতেন। দেহত্যাগের পর ঠাকুর মাতাকে ফুল-চন্দনাদি দিয়া সাজাইয়া শ্রীচরণপূজা করিলেন এবং রামলালকে দিয়া এঁড়েদহের ঘাটে মাতার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়াদি সম্পন্ন করাইলেন। নিজে বৈধকর্ম্ম কিছুই করিতে পারিলেন না, এমন কি, জলাঞ্জলি দিবার চেষ্টা করিয়াও দেখিলেন যে, হাতের আঙ্গুল বাঁকিয়া গিয়া অঞ্জলির মধ্য দিয়া জল বাহির হইয়া যায়, কিছুই হাতে রাখিতে পারেন না। মা'র কোন কার্য্যেই লাগিলেন না বলিয়া তিনি দুঃখে কাঁদিতে লাগিলেন। হলধারী এই সময়ে তথায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি এত দিনে বুঝিয়াছিলেন যে, শ্রীরামকৃষ্ণদেব যে সে ব্যক্তি নহেন, ক্ষণজন্মা—মহাপুরুষ। তিনি ঠাকুরকে বলিলেন যে, এরূপ খেদ করা তাঁহার উচিত নয়। ঈশ্বর দর্শন যাঁহারাই করেন, তাঁহাদের এই 'গলিত হস্ত' অবস্থা হয়:—তাঁহারা আর কোন বৈধকর্ম্ম করিতে পারেন না। এরূপ ব্রহ্মজ্ঞগণ ধর্ম্মাধর্ম্ম কর্ম্মাকর্ম্মের পার হইয়া যান, এ কথা শাস্ত্র বলিয়াছেন।

ঠাকুর এই কারণে গয়াধামে মাতার বা পিতার কার্য্য করিতে যাইতে পারেন নাই:—মথুরের সঙ্গে তীর্থ হইতে প্রত্যাবর্ত্তনকালেও গয়াতে নামেন নাই। সেই জন্য শ্রীমাকে বলিয়াছিলেন, তিনি যেন ঐ বৈধ কার্য্যগুলি করিবার চেষ্টা করেন। ঠাকুরের দেহত্যাগের পর শ্রীমা গয়ায় গিয়া ঐ সমস্ত কার্য্য তাঁহার নির্দ্দেশমত নিজেই সম্পন্ন করিয়াছিলেন।

এ দিকে কেশবের যাতায়াত ক্রমশই বেশী বেশী চলিতে লাগিল এবং ঠাকুরকেও তিনি নিজ গৃহে লইয়া যাইতে ত্রুটি করিতেন না। কেশবের ওখানে গিয়া ক্রমে ঠাকুরের সঙ্গে বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, শিবনাথ শাস্ত্রী, মণিলাল মল্লিক, বেণী পাল, অমৃতলাল বসু, ত্রৈলোক্যনাথ সান্ন্যাল, প্রতাপচন্দ্র মজুমদার প্রভৃতির আলাপ-পরিচয় হইতে লাগিল। তাঁহারাও মধ্যে মধ্যে ঠাকুরের কাছে দক্ষিণেশ্বরে গমনাগমন করিতে লাগিলেন। কেশবও সুলভ সমাচার, ইণ্ডিয়ান মিরর, রিভিউ প্রভৃতি কাগজে ঠাকুরের নাম ও ভাব কিছু কিছু লিখিতে আরম্ভ করিলেন। এইরূপে ভক্ত-সংগ্রহ কার্য্য আরম্ভ হইল। ইংরেজি-শিক্ষিতগণ কেশব বাবুর কাগজ পড়িয়া জানিতে পারিলেন যে, দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরে এক জন অসাধারণ সাধু অবস্থান করিতেছেন, যাঁহার নাম শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস। এইরূপ প্রচারের ফলে দক্ষিণেশ্বরে দর্শকের সংখ্যা ও ভীড় ক্রমশঃ বাড়িতে আরম্ভ হইল। কেশবরূপ যন্ত্রের সাহায্যে মা এইবার ঠাকুরের আগমনের আসল উদ্দেশ্য—কলিতে জীবোদ্ধার, সেই মহান উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত উত্তরসাধক কর্ম্মিগণকে আকর্ষণ করিবার জন্য প্রচারকার্য্য আরম্ভ করিলেন। ঠাকুরও বলিয়াছিলেন, তিনি পূর্ণব্রহ্ম; রাজা যেমন ছদ্মবেশে নিজ রাজ্য দর্শন করেন, সেইমত গুপ্তবেশে আসিয়াছেন। কেশবচন্দ্র সংবাদপত্রে লিখিয়া ঠাকুরের আগমনসংবাদ প্রচার করিতে আরম্ভ করিলেন। কেশব স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া ঠাকুরকে বলিয়াছিলেন, "আপনার মত মহাপুরুষের আগমন ব্যর্থ হইতে দিব না—আমি লোক যোগাড় করিব।"

শম্ভুচন্দ্র মল্লিক দেহত্যাগ করিয়াছেন, এখন যদুলাল মল্লিক আনাগোনা করিতেছেন। ইহাঁরা সব খৃষ্টান মতের—বা ঐ ভাবে সহানুভূতিসম্পন্ন লোক। কেশবের সঙ্গে আলাপ হইবার পর ঠাকুর দেখিলেন, কেশবও যিশুখৃষ্টের কথা বলেন, তাঁরই ঢং ঢাং অনুসরণ করেন। ঠাকুরের মন এই সব কারণে এইবার খৃষ্টানভাবের দিকে ঝুঁকিল। সর্ব্বভাবময় ঠাকুর কোন ভাব তাঁহার কাছে অপরিচিত থাকিতে দিবেন না—তাই এইবার যিশুর ভাব চিন্তা করিবেন ইচ্ছা করিলেন। যদুলাল মল্লিকের বাগানে মেরী মায়ের ক্রোড়ে শিশুপুত্র যিশুর প্রতিমূর্ত্তির একখানি পট ছিল। এক দিন কার্য্যোপলক্ষে ঠাকুর যদুলালের বাগানে গিয়া ঐ পটের দিকে চাহিতে চাহিতে ভাবাবিষ্ট হইলেন। ক্রমে সেই শিশুমূর্ত্তি হইতে জ্যোতির্নিঃসরণ হইতে লাগিল এবং ঐ জ্যোতিঃস্রোত ঠাকুরের অঙ্গে আসিয়া প্রবেশ করিতে লাগিল। ভাব উপশম হইলে দেখা গেল, কি আশ্চর্য্য, ঠাকুরের মধ্যে তৎকালে হিন্দুয়ানীর ভাব চলিয়া গিয়াছে, খৃষ্টান ভাব প্রবেশ করিয়াছে। তিন দিন

তিনি আর মন্দিরে গমন করিলেন না, নিজের ঘরের মধ্যে রহিলেন এবং ভাবে নানা গীর্জ্জায় উপাসনার দৃশ্য দেখিতে—ঘণ্টাধ্বনি শুনিতে লাগিলেন। এই সময় তিনি দেখিয়াছিলেন যে, এ দেশীয় লোক ব্যতীত তাঁহার বহু পরিচিত শিষ্য ভক্ত অন্যান্য খৃষ্টান দেশে—খৃষ্টীয়ান জাতির মধ্যেও রহিয়াছে। ইহার পর তিনি, যিশু জলমগ্ন পিটারকে উদ্ধার করিতেছেন খৃষ্টীয়ান ধর্মভাবের এই ছবিখানি নিজের ঘরে আনাইয়া রাখিয়া দিয়াছিলেন।

Mr. William নামে এক ভক্ত পাদ্রী সাহেব এই সময় ঠাকুরকে দর্শন করিয়াছিলেন। ঠাকুরের

যীশুখৃষ্ট

ভিতর যিশুর আবির্ভাব দেখিয়া ভক্ত উইলিয়ামের মনে বৈরাগ্য জাগিয়া উঠিল। শেষ জীবনে তিনি হিমালয় প্রদেশে কোন এক নিভৃত স্থানে নিরবচ্ছিন্ন ঈশ্বরচিন্তায় কাল কাটাইয়াছিলেন। এইভাবে ঠাকুরের খৃষ্টান সাধনা শেষ হইল।

খৃষ্টান সাধনা ভিন্ন তিনি বুদ্ধদেবের বিশেষ ভজন—আরাধনা করিয়াছিলেন কি না, জানা যায় নাই। তবে তাঁহার ঘরে একটি শ্বেত প্রস্তরের বুদ্ধমূর্ত্তি ছিল, এখনও আছে দেখা যায়। কোথা হইতে এই মূর্ত্তি আসিয়াছিল, তাহা ঠিক বলা যায় না। সম্ভবতঃ কোন বৌদ্ধ সাধু বা ভক্ত তাঁহাকে ইহা দান করিয়া থাকিবেন। কিন্তু আমরা ধরিয়া লইতে পারি যে, ঠাকুর ধ্যানে বুদ্ধমূর্ত্তি দর্শন করিয়াছিলেন; নচেৎ ১৮৮৬, ৯ই এপ্রেল তারিখে কাশীপুর বাগানে নরেন্দ্রের সঙ্গে কথাপ্রসঙ্গে বুদ্ধমূর্ত্তির মাথার উপরে চুলের ঝুঁটী বাঁধা কি না—তাঁহার চক্ষু সমাধিস্থ কি না জিজ্ঞাসা করিবেন কেন? তা ছাড়া ঠাকুর বুদ্ধদেবের মত সম্বন্ধেও বলিয়াছিলেন যে, বুদ্ধ নিরীশ্বরবাদী ছিলেন না। স্ব স্বরূপকে চিন্তা করিয়া তিনি নিজে বোধস্বরূপ হইয়া গিয়াছিলেন, তাই মুখে সে অবস্থার কথা বলিতে পারেন নাই। তাঁহার অবস্থা ছিল অস্তি ও নাস্তির মধ্যের অবস্থা—ইহাই শ্রীঠাকুরের মত।

এতদ্ভিন্ন ঠাকুর যে নানকপন্থী হাবিলদার কুমারসিংহের সঙ্গে খুব মিশিতেন, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। কাশীতে ঠাকুর যে নানক পন্থী সাধুদের মঠে কিছুদিন যাতায়াত করিয়াছিলেন, তাহাও আমরা দেখিয়াছি। কিন্তু তিনি শিখধর্ম্মের সাধনা করিয়াছিলেন কি না জানা যায় নাই। শিখমতের কথা তিনি মধ্যে মধ্যে বলিতেন, কবীরের কথাও প্রায় বলিতেন এবং তিনি যে কবীরের জীবন-সাধনার কথা সুবিদিত ছিলেন, তাহাও বেশ বুঝা যায়। তুলসী দাসের ও কবীর দাসের দোঁহা তিনি অনেক সময় ব্যবহার করিতেন। কবীরের দোঁহা—

সাকার মেরীপিতা, নিরাকার মাহোতারী,—
কাকো নিন্দো কাকো বন্দো দোনো পাল্লাভারী।

তুলসীদাসের দোঁহা—

ও হি রাম দশরথকো বেটা, ও হি রাম ঘট ঘটমে লেটা,
ও হি রাম জগৎপশেরা, ওহি রাম সবসে নিয়ারা—

এইগুলি ঠাকুর সর্ব্বদাই ব্যবহার করিতেন।

[ক্রমশঃ

শ্রীদুর্গাপদ মিত্র।

চতুর্দ্দশ পল্লব

হতাশের আর্ত্তনাদ

প্যারাডাইন স্তম্ভিতভাবে বসিয়া রহিল ; সার্জ্জেণ্ট তাহাকে গ্রেপ্তারের জন্য প্রস্তুত হইয়া আসিয়া, গোপনে বসিয়া তাহার অপরাধ স্বীকার-কাহিনী শুনিতেছিল, ইহা তাহার চিন্তার অতীত ছিল। সে হতাশভাবে সার্জ্জেণ্টটার মুখের দিকে চাহিতেই একটি যুবক লাইব্রেরীর দ্বার খুলিয়া অত্যন্ত ব্যগ্রভাবে তাহাদের সম্মুখে অগ্রসর হইল।

আগন্তুক নিসবেট্‌কে সম্বোধন করিয়া ব্যাকুল স্বরে বলিল, "উইলিয়ামস্ কোথায় ? আমি কোথাও তাহাকে খুঁজিয়া পাইলাম না। আমি এই বাড়ীর সর্ব্বস্থানে তাহাকে খুঁজিয়াছি। সে কোথায়, নিস্‌বেট ?"

আগন্তুকের কণ্ঠস্বর শুনিয়া প্যারাডাইনের যেন স্বপ্নভঙ্গ হইল। এ কণ্ঠস্বর যে তাহার সুপরিচিত! সে বিস্ফারিত-নেত্রে আগন্তুকের মুখের দিকে চাহিল। প্যারাডাইন যাহাকে খুঁজিয়া তাহার সন্ধান পায় নাই, এ যে সেই টেরি! টেরিই যে মিঃ গার্ভিনকে হত্যা করিয়া তাহার কাবোর্ড হইতে স্বর্ণক্ষেত্রের রিপোর্ট চুরি করিয়াছিল—এ বিষয়ে তাহার সন্দেহ ছিল না। সেই টেরি এই রাত্রিকালে সহসা নিস্‌বেটের লাইব্রেরী-কক্ষে উপস্থিত! নিসবেটকে সে নিতান্ত পরিচিত ব্যক্তির ন্যায় সম্বোধন করিল! এ কি রহস্য, ইহার মর্ম্মোদ্ঘাটন করা তাহার অসাধ্য হইল। কিন্তু প্যারাডাইন নিজের চক্ষুকে অবিশ্বাস করিতে পারিল না। সেই পরিচিত মূর্ত্তি—যে আরানা স্বর্ণখনির রিপোর্টখানির পরিবর্ত্তে তাহাকে দুই শত পাউণ্ড পুরস্কার প্রদানের অঙ্গীকার করিয়াছিল।

প্যারাডাইনের বিস্ময় কথঞ্চিৎ প্রশমিত হইলে, সে লাফাইয়া উঠিল, এবং স্থানকাল বিস্মৃত হইয়া, তাহার সকল বিপদ ও লাঞ্ছনার জন্য দায়ী টেরিকে ধরিবার জন্য তাহার দিকে ধাবিত হইল ; কিন্তু সে কয়েক পদ অগ্রসর হইতেই কি একটা জিনিস তাহার পশ্চাৎ হইতে নিক্ষিপ্ত হইয়া 'ঝনাৎ' শব্দে তাহার মাথায় পড়িল। সেই আঘাতে সে স্খলিতপদে পড়িতে পড়িতে সামলাইয়া লইল, এবং পদপ্রান্তে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিল—তাহা এক জোড়া লোহার হাতকড়ি। সার্জ্জেণ্ট এই হাতকড়ি দ্বারা তাহাকে বাঁধিতে উদ্যত হইয়াছিল, এবং তাহাই সে তাহার মস্তক লক্ষ্য করিয়া নিক্ষেপ করিয়াছিল।

হাতকড়ির আঘাতে প্যারাডাইন ঈষৎ আহত হইলেও তাহার গতিরোধ হইল না দেখিয়া সার্জ্জেণ্টদ্বয় তাহাকে ধরিবার জন্য সবেগে তাহার নিকট অগ্রসর হইল। সেই মুহূর্ত্তে নিস্‌বেট গম্ভীর-স্বরে আদেশ করিল, "দরজাটা শীঘ্র বন্ধ কর।"

নিস্‌বেটের আদেশে টেরি দ্বারের নিকট ফিরিয়া গেল, এবং দরজার চাবি বন্ধ করিয়া রুদ্ধদ্বারে পিঠ দিয়া দাঁড়াইল ; তাহার পর সে অবজ্ঞাভরে প্যারাডাইনের মুখের দিকে চাহিয়া নিস্‌বেটকে বলিল, "এই অভিনয় শীঘ্র বন্ধ কর, নিসবেট! বিলম্বে সে কি অসুবিধায় পড়িতে হইবে, কিরূপ বিপদ ঘটিতে পারে—আমি তাহা অনুমান করিতে না পারিলেও বুঝিতে পারিয়াছি—আজ রাত্রে আমাদের অজ্ঞাতসারে কোনও একটা বিভ্রাট ঘটিয়াছে। ল্যাংহাম দুই তিন ঘণ্টা পূর্ব্বে এই সয়তানটাকে উহার কায়েমী মোকামে পাঠাইয়া ফিরিয়া আসিতে পারিত ; কিন্তু সে যে এই কায শেষ করিতে পারে নাই, সম্মুখেই তাহার উজ্জ্বল প্রমাণ জাজ্বল্যমান। অথচ এখন পর্য্যন্ত সে ফিরিয়া আসিয়া কোন কৈফিয়ৎ দিল না! আবার উইলিয়ামস্‌কে কোথাও পাওয়া যাইতেছে না, সে পর্য্যন্ত ফেরার!"

টেরির কথায় সেই কক্ষস্থ তিন ব্যক্তি—নিস্‌বেট এবং সার্জ্জেণ্টদ্বয় আতঙ্কাভিভূত হইয়া বিস্ফারিত-নেত্রে তাহার

মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, যেন কোন অজ্ঞাত বিপদের আশঙ্কায় তাহারা অভিভূত হইল। প্যারাডাইনও তাহার বিপদের ভীষণতা বুঝিতে পারিল; কিন্তু কিরূপ ষড়যন্ত্রের ফলে তাহাকে এই ফাঁদে বন্দী হইতে হইয়াছে, এবং ইহার পরিণাম কি, তাহা ধারণা করা তাহার অসাধ্য হইল।

প্যারাডাইন তাহার হিতৈষী মুরুব্বী মিঃ গ্রীডের উপদেশে তাহার মনিব মিঃ নিসবেটের নিকট অপরাধ স্বীকার করিতে আসিয়া হঠাৎ জানিতে পারিল, যে টেরি নিসবেটের আফিসের গুপ্ত রিপোর্ট হস্তগত করিবার জন্য তাহাকে উৎকোচ দানে বশীভূত করিবার চেষ্টা করিয়াছিল এবং তাহাতে অকৃতকার্য্য হওয়ায় নিসবেটের বিশ্বস্ত কর্ম্মচারীকে হত্যা করিয়া সেই রিপোর্ট চুরি করিতেও কুণ্ঠিত হয় নাই, সেই নরপিশাচ টেরি নিসবেটের বন্ধু! সে নিসবেটকে তাহার সমকক্ষের ন্যায় সম্বোধন করিল, এবং যে ভাবে আলাপ করিল—তাহা শুনিয়া কেবল প্যারাডাইনের নহে, যে শুনিত, তাহারই ধারণা হইত, টেরি নিসবেটের কোন গুপ্ত ষড়যন্ত্রের সহযোগী! কেবল তাহাই নহে, প্যারাডাইনকে জলে ডুবাইয়া হত্যা করিবার জন্য যে চেষ্টা হইয়াছিল, টেরি নিসবেটকে সেই চেষ্টার ব্যর্থতার কথা জানাইয়া উৎকণ্ঠা প্রকাশ করিল; প্যারাডাইন বুঝিতে পারিল, তাহাকে হত্যা করিবার জন্য কেবল যে টেরিই সচেষ্ট ছিল, এরূপ নহে, নিসবেটও তাহা জানিত, এবং তাহারই ইঙ্গিতে তাহার অনুচররা তাহাকে হত্যা করিবার জন্য পুষ্করিণীর জলে নিক্ষেপ করিয়াছিল। তাহার ন্যায় নিম্নপদস্থ নগণ্য কর্ম্মচারীকে হত্যা করিবার জন্য এই প্রকার প্রতিষ্ঠাপন্ন ধনাঢ্য ব্যক্তিগণের এরূপ আগ্রহের কারণ কি, 'সান্‌কীতে' বজ্রাঘাতের জন্য তাহারা কেন এত ব্যস্ত হইয়াছিল, প্যারাডাইন তাহা তাহার বুদ্ধির অগম্য বলিয়াই মনে করিল, কিন্তু ইহারা একযোগে যে একটা ভীষণ ষড়যন্ত্রে সাফল্যলাভের চেষ্টা করিতেছিল, এবং সেই ষড়যন্ত্রের সাফল্যের জন্য তাহার মৃত্যু অপরিহার্য্য,—প্যারাডাইন ইহা সুস্পষ্টরূপেই বুঝিতে পারিল।

এই সকল কথা মনে মনে আলোচনা করিয়া প্যারাডাইনের সর্ব্বাঙ্গ ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিল, অতঃপর আত্মসংবরণ করা তাহার অসাধ্য হইল। তাহার স্মরণ হইল, সেই দিন সায়ংকালে একটা জাল ডিটেকটিভ তাহাকে স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডে যাইতে হইবে বলিয়া ভুলাইয়া রেস্তরাঁর বাহিরে লইয়া গিয়াছিল এবং একখান গাড়ীতে পুরিয়া হত্যা করিতে উদ্যত হইয়াছিল। আবার এই গভীর রাত্রিতে আর দুই জন ইতর চক্রী পুলিসের সার্জ্জেণ্ট সাজিয়া তাহার মনিবের লাইব্রেরীতে তাহাকে বন্দী করিতে উদ্যত! পুলিসের সহিত ইহাদের কোন সম্বন্ধ নাই, এ বিষয়ে প্যারাডাইন নিঃসন্দেহ হইল। সে বুঝিতে পারিল—ইহারা টেরি এবং নিসবেটের সহযোগী, তাহাদের চক্রান্তের চক্রী।

প্যারাডাইন ভাবিল, প্রাণরক্ষা করিতে হইলে তাহাকে সেই কক্ষ ত্যাগ করিতে হইবে, পলায়ন ভিন্ন তাহার নিষ্কৃতি নাই। নিসবেটও তাহাকে হত্যা করিবার জন্য কৃতসঙ্কল্প হইয়াছে, ইহার কারণ জানিবার জন্য তাহার আগ্রহ হইলেও সর্ব্বাগ্রে এই সঙ্কট হইতে মুক্তিলাভই যে তাহার প্রধান কর্ত্তব্য, এ বিষয়ে সে নিঃসন্দেহ হইয়াছিল।

কিন্তু কি উপায়ে সে পলায়ন করিবে? টেরি নিসবেটের আদেশে সেই কক্ষের দ্বার চাবি দিয়া বন্ধ করিয়াছিল, এবং রুদ্ধদ্বারে পিঠ দিয়া দাঁড়াইয়াছিল। সেই কক্ষে একটিমাত্র বাতায়ন ছিল, সেই বাতায়নপথে পলায়নের জন্য তাহার আগ্রহ হইল। প্যারাডাইন আর সময় নষ্ট না করিয়া দ্রুতবেগে সেই বাতায়নের নিকট উপস্থিত হইল। সে বাতায়নের সম্মুখস্থিত প্রসারিত পর্দ্দা ক্ষিপ্রহস্তে অপসারিত করিয়া দেখিল, বাতায়নও রুদ্ধ। সে যে তাহা উদ্ঘাটিত করিয়া পলায়ন করিবে, তাহারও সুযোগ হইল না; কারণ, সেই মুহূর্ত্তেই সে পশ্চাতে একাধিক ব্যক্তির দ্রুত পদধ্বনি শুনিতে পাইল। দুই তিন জন আততায়ী তাহাকে ধরিতে আসিতেছে দেখিয়া এবং আত্মরক্ষার আর কোন উপায় নাই বুঝিয়া প্যারাডাইন ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া সম্মুখে যে চেয়ারখানা দেখিতে পাইল, তাহা উভয় হস্তে মাথার উপর তুলিয়া ধরিল।

জাল ডিটেকটিভদ্বয় তাহার সম্মুখে আসিয়া পড়িয়াছিল। টেরিও তাহার অনুসরণ করিয়াছিল, কিন্তু সে একটু দূরে ছিল। প্যারাডাইন তাহার আততায়িদ্বয়ের হস্তে একটি লৌহদণ্ড ও রজ্জুবদ্ধ একটা ভারী ডাণ্ডা দেখিতে পাইল। প্যারাডাইন বুঝিতে পারিল, তাহারা সেই উভয় অস্ত্র দ্বারা মুহূর্ত্তমধ্যে তাহাকে আক্রমণ করিবে; সেই ভারী অস্ত্রের

আঘাতে তাহার মৃত্যু হইলেও তাহা প্রয়োগ করিতে তাহারা কুণ্ঠিত হইবে না, তাহাদের চোখ-মুখের ভঙ্গী দেখিয়া এ বিষয়ে প্যারাডাইন নিঃসন্দেহ হইল।

জাল ডিটেকটিভদ্বয় তাহার সম্মুখে পাশাপাশি হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। প্যারাডাইন তাহাদের মস্তক লক্ষ্য করিয়া সবেগে চেয়ারখানি নিক্ষেপ করিল; এক জন চক্ষুর নিমেষে বসিয়া পড়ায় নিক্ষিপ্ত চেয়ার তাহার দেহ স্পর্শ করিতে পারিল না বটে, কিন্তু দ্বিতীয় ব্যক্তি সতর্ক হইবার পূর্ব্বেই চেয়ার প্রচণ্ড বেগে তাহার মাথার এক পাশে আছড়াইয়া পড়িয়া গেল। সেই আঘাতে লোকটা মেঝের উপর ঘুরিয়া পড়িয়া গেল। সেই মুহূর্ত্তে অন্য লোকটা প্যারাডাইনের উপর লাফাইয়া পড়িয়া দুই হাতে তাহাকে জড়াইয়া ধরিল; তাহার পর উভয়ে মেঝের উপর পড়িয়া ধস্তাধস্তি করিতে লাগিল। উভয় পক্ষ হইতে অবিশ্রান্ত ধারায় কিল ঘুসি চড় বর্ষিত হইতে লাগিল, সেই সঙ্গে উভয়ের পাদতাড়নারও বিরাম রহিল না।

কিন্তু উভয়ের এই সঙ্ঘ দীর্ঘকালস্থায়ী হইল না। কয়েক মিনিটের মধ্যেই টেরি ও নিস্‌বেট উভয়েই তাহাদের অনুচরকে সাহায্য করিতে আসিল। তিন জন আততায়ীর বিরুদ্ধে প্যারাডাইন একাকী কি করিতে পারে? প্যারাডাইন আহত হইয়া হস্তপদচালনায় অসমর্থ হইল, সে অতি কষ্টে টানিয়া টানিয়া নিশ্বাস ফেলিতে লাগিল।

টেরি বলিল, "নিস্‌বেট, কাযটা বড় নোংরা রকমের হইতেছে; আমি ইহার সমর্থন করিতে পারি না, ইহার শেষ ফল ভাল হইবে না।"

নিসবেট কোন কথা না বলিয়া দাঁড়াইয়া হাঁপাইতে লাগিল।

টেরি পুনর্ব্বার বলিতে লাগিল, "রকম বড় ভাল মনে হইতেছে না; আজ রাত্রে আমাদের সকল কাযই যেন ভণ্ডুল হইয়া গিয়াছে! গলদটা কোথায়, তাহা ঠিক ধরিতে পারিতেছি না; কিন্তু ল্যাংহাম ফিরিয়া আসিল না; তাহার নিকট যে সকল সংবাদের প্রত্যাশা করিতেছিলাম, তাহার কিছুই জানিতে পারিলাম না। তাহার উপর উইলিয়াম্‌সেরও দেখা নাই। সে কোন্ চুলোয় গিয়াছে, তাহা বুঝিতে পারিতেছি না।"

নিস্‌বেট বলিল, "ব্যাপার দুর্ব্বোধ্য বটে, এই সয়তানটার এতক্ষণ পুষ্করিণীর জলে ডুবিয়া অক্কালাভ করা উচিত ছিল; কিন্তু সে ভাবে না মরিয়া হতভাগা পথ ভুলিয়া এখানে আসিয়া পড়িয়াছে; ইহার কারণ বুঝিতে পারিতেছি না। আমার সন্দেহ, আমরা যে যন্ত্র পরিচালিত করিয়াছিলাম, তাহার কোন অংশের একটা স্ক্রু আলগা হওয়াতে কল ঠিক চলে নাই, ব্যবস্থাটা ওলটপালট হইয়া গিয়াছে। ইহা আমাদের সঙ্কল্পসিদ্ধির অনুকূল নহে। কিন্তু উইলিয়াম্‌সের জন্য তোমার এত ব্যাকুল হইবার প্রয়োজন নাই। সে হয় ত সেই উকিল বেটার অভ্যর্থনার জন্য ব্যস্ত আছে। ইনি একটা উকিল লেজে বাঁধিয়া আমার কাছে উহার প্রভুভক্তির হিসাব দিতে আসিয়াছিলেন কি না; প্রভুভক্ত ভৃত্যের আশা ছিল, উকিলটা উহার চুরি ও নরহত্যার অপরাধ তুড়ি দিয়া উড়াইয়া দিয়া এখান হইতে উহাকে উদ্ধার করিয়া লইয়া যাইবে! তবে ল্যাংহাম কোথায় গিয়া আটকা পড়িল, তাহা অনুমান করিতে পারিতেছি না। ফারিনির সঙ্গে তাহার দেখা হয় নাই।"

টেরি বলিল, "দুশ্চিন্তার কথা বটে।"

নিস্‌বেট মাথা নাড়িয়া বলিল, "তত্তোর দুশ্চিন্তা! দুশ্চিন্তা করিয়া লাভ কি? আর দুশ্চিন্তাই বা কেন? আমাদের মাথা উঁচু করিয়া নির্ভীকচিত্তে চারিদিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। ভয় করিবার কারণ নাই। আগামী শুক্রবার শেষ বন্দোবস্তের দিন, শুক্রবারের পূর্ব্বে কিছুই হইতেছে না। সেই সময়ের পূর্ব্বে আরানা সম্বন্ধে কোন ব্যবস্থাই হইবে না। আমাদিগকে কেবল লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে, তাহার পূর্ব্বে যেন কেহ রহস্যভেদ না করে। তবে এই হতভাগাটাই কিঞ্চিৎ দুশ্চিন্তার কারণ হইয়াছে বটে।" নিস্‌বেট প্যারাডাইনের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিল।

টেরি বলিল, "দুশ্চিন্তা! এ দুশ্চিন্তা শেষ করিতে কতক্ষণ? উহাকে এই রাত্রেই সাবাড় করিয়া দাও, উহার মুখ চিরদিনের জন্য বন্ধ হইয়া যাইবে। একটা মশা মারিতে উদ্যোগ-আয়োজনের প্রয়োজন নাই। কয়েক ঘণ্টা পূর্ব্বে জলে ডুবিয়া মরিয়া যে আমাদিগকে নিশ্চিন্ত করিত, কয়েক ঘণ্টা পরে না হয় সে এখানেই মরিল। জল স্থল সব সমান, আমি বলিতেছি—যে মরে তাহার পক্ষে!"

নিস্‌বেট বলিল, "তা বটে, কিন্তু কাযটা কিরূপে শেষ করা যায়? এখানে উহাকে হত্যা করা কঠিন না হইতে

পারে; কিন্তু আমার ঘরের ভিতর উহার প্রাণ-বিহঙ্গকে খাঁচা-ছাড়া করিয়া খাঁচোটার কি ব্যবস্থা করিব? তাহা সরাইয়া ফেলিবার পূর্ব্বে যদি কোন বাধা-বিঘ্ন ঘটে, তখন সেই ফ্যাসাদ সামলাইবার উপায় কি?"

সমস্যা জটিল বটে; মানুষের মৃতদেহ সরাইয়া ফেলিবার সময় কোন বিঘ্ন ঘটিবে না, নির্ব্বিঘ্নে কার্য্যোদ্ধার হইবে, ইহার নিশ্চয়তা কি? তাহার উপর প্যারাডাইন একটা উকিল সঙ্গে আনিয়াছিল, যদি তাহাকেও হত্যা করা হইয়া থাকে, এবং উহারা আসিবার পূর্ব্বে যদি পুলিসে সংবাদ দিয়া আসিয়া থাকে, তাহা হইলে দু'জন মানুষকে খুন করিয়া তাহা হজম করা এখানে নিতান্ত সহজ নহে। সুতরাং উভয়কেই সকল অবস্থার কথা চিন্তা করিতে হইল।

জাল সার্জ্জেণ্টদ্বয়ের যে ব্যক্তি চেয়ারের গুঁতা খাইয়া অজ্ঞান হইয়া মেঝের উপর নিস্পন্দভাবে পড়িয়াছিল, চেতনা লাভ করিয়া কয়েক মিনিট পূর্ব্বে সে উঠিয়া বসিয়াছিল। সে নিস্‌বেট ও টেরির পরামর্শ শুনিয়া বলিল, "এই সামান্য বিষয়ের জন্য আপনাদের এত দুশ্চিন্তা হইল কেন? আমি সদুপায় বলিতেছি, শুনুন। আপনারা এই সয়তানের শিরা ফুঁড়িয়া কোন একটা উগ্র মাদক দ্রব্য উহার রক্তের সঙ্গে মিশাইয়া আমার হাতে উহাকে ছাড়িয়া দিন; আমি উহাকে গাড়ীতে তুলিয়া লইয়া মাঠের কোন নির্জ্জন অংশে নামাইয়া দিব। সেই উকিলটার সম্বন্ধেও ঐ রকম ব্যবস্থা করিবার পরামর্শ ত আপনিই দিয়াছিলেন, কর্ত্তা! উহাদের দুই জনকেই নিরাপদে রাখিয়া আসিবার ভার লইতে রাজী আছি। উকীল ও মক্কেল দু'জনেই একসঙ্গে আর এক আদালতে হাজির হইয়া আশ মিটাইয়া মামলা করিবে। সেই আদালতের মামলার আপীল নাই।"

অনুচরের যুক্তি শুনিয়া নিস্‌বেট যেন অকূল সমুদ্রে কূল দেখিতে পাইল। সে খুসী হইয়া বলিল, "ঠিক কথা বলিয়াছ, এ অতি চমৎকার উপায়, এক ঢিলে দুই পাখী মরিবে, অথচ কোথা হইতে ঢিল পড়িল, তাহা কেহই জানিতে পারিবে না। আমার বাড়ী হইতে উহারা চলিয়া গিয়াছে, তাহা প্রমাণ করা কঠিন হইবে না। তবে উহাদিগকে এক স্থানে নামাইয়া দিও না। উহাদের এক জনকে যেখানে নামাইবে, তাহার পঞ্চাশ ষাট মাইল দূরে আর এক জনকে বিসর্জ্জন দিবে। কিন্তু আর অধিক বিলম্ব করা সঙ্গত নহে, এই সয়তানটাকে শীঘ্র পিচকিরি দেওয়ার ব্যবস্থা কর। এই হাঙ্গামা যত শীঘ্র মিটিয়া যায়, ততই ভাল।"

নিস্‌বেট একটা আরোকের শিশি, এবং সূক্ষ্মাগ্র একটা পিচকিরি সংগ্রহ করিয়া আনিয়া তাহা টেরির হাতে দিলে টেরি প্যারাডাইনের পাশে বসিয়া জাল ডিটেক্টিভদ্বয়কে ইঙ্গিত করিল। তাহারা উভয়ে প্যারাডাইনকে সেই কক্ষের মেঝের উপর চাপিয়া ধরিয়া তাহার কোটের আস্তিন বাহুমূলে গুটাইয়া তুলিল। প্যারাডাইন তাহাদের সকল কথাই শুনিয়াছিল, সে তাহাদের কবল হইতে মুক্তিলাভের জন্য ধস্তাধস্তি করিতে লাগিল; কিন্তু সে তিন জনের সহিত দীর্ঘকাল যুদ্ধ করিয়া পরিশ্রান্ত হইয়াছিল; তাহার সকল চেষ্টা বিফল হইল। টেরি আরোকপূর্ণ পিচকিরির অগ্রভাগ তাহার উন্মুক্ত বাহুমূলে স্পর্শ করিল। প্যারাডাইন প্রাণভয়ে কাতর হইয়া এরূপ আর্ত্তনাদ করিল যে, তাহার হতাশ আর্ত্তনাদ গভীর রাত্রিতে সেই নিস্তব্ধ অট্টালিকার প্রতি কক্ষে প্রতিধ্বনিত হইল।

পঞ্চদশ পল্লব

শেষ বাকী

প্যারাডাইন প্রাণভয়ে ভীত হইয়া এবং জীবনের আশা ত্যাগ করিয়াই কাতর-কণ্ঠে আর্ত্তনাদ করিয়াছিল, শত্রু-পুরীতে সেই আর্ত্তনাদ কাহারও কর্ণগোচর হইলে সে যে তাহাকে রক্ষা করিতে আসিবে, এরূপ আশা তাহার মনে স্থান পায় নাই। যে ব্যক্তি তাহার হাত ধরিয়াছিল, প্যারাডাইন তাহার হাতে এরূপ প্রচণ্ডবেগে ধাক্কা দিল যে, সেই ধাক্কায় সে দুই হাত দূরে ছিটকাইয়া পড়িল। পিচকিরি ভাঙ্গিয়া যাইতে পারে, এই আশঙ্কায় টেরি হাত টানিয়া লইয়া, বাঁ হাত দিয়া প্যারাডাইনের মুখে সবেগে এক গুঁতা মারিল। তাহার পর তাহাকে ধমক দিয়া বলিল, "মুখ বুজিয়া বসিয়া থাক্ গাধা, ও রকম চ্যাচাইলে মুখের ভিতর রুল গুঁজিয়া দিব।"

প্যারাডাইন আততায়ীর কবল হইতে যে হাত মুক্ত

করিয়াছিল, সেই হাত দিয়া সে দেহের অন্তিম শক্তি প্রয়োগ করিয়া দ্বিতীয় ব্যক্তির চুয়ালে এরূপ এক ঘুসি মারিল যে, সেই ঘুসি খাইয়া সে প্যারাডাইনের অন্য হাত ছাড়িয়া দিয়া আঘাতযন্ত্রণায় দুই হাতে মুখ ডলিতে লাগিল। সেই সুযোগে প্যারাডাইন টেরির হাত লক্ষ্য করিয়া এক ঘুসি মারিতেই টেরি পিচকিরি ভাঙ্গিবার ভয়ে সরিয়া বসিল।

এই ভাবে মুক্তিলাভ করিয়া প্যারাডাইন দুই হাতে চারি দিকে ঘুসি চালাইতে লাগিল। তাহাকে মুক্তিলাভ করিতে দেখিয়া তাহার চারি জন শত্রুই একসঙ্গে তাহার উপর লাফাইয়া পড়িল; তাহারা তাহাকে মেঝের উপর ফেলিয়া, কেহ তাহার বুকে হাঁটু চাপাইয়া দিয়া তাহার দুই হাত চাপিয়া ধরিল, দুই জনে তাহার উভয় পায়ের উপর চাপিয়া বসিল, এক জন তাহার গলা দুই হাতে ধরিয়া চাপ দিতে লাগিল। তাহার শ্বাসরোধের উপক্রম হইল।

প্যারাডাইন বুঝিতে পারিল, আর তাহার নিষ্কৃতি নাই, তাহার অন্তিমকাল ঘনাইয়া আসিয়াছে; কিন্তু সেই সঙ্কট-জনক অবস্থাতেও তাহার মনে হইল, বিনা দোষে তাহাকে অকালে এই ভাবে প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে হইতেছে—ইহার কারণ কি? তাহাকে হত্যা করিবার জন্য ইহাদের সকলেরই এত আগ্রহ কেন? সে দেখিল—তাহার মনিব নিস্‌বেট তাহার গলা চাপিয়া ধরিয়া শ্বাস রুদ্ধ করিয়া তাহাকে হত্যা করিবার চেষ্টা করিতেছিল, কিন্তু নিস্‌বেটকে সে চিরদিন শ্রদ্ধা ও সম্মান করিয়া আসিয়াছে, অভাবে পড়িয়া মোহে ভুলিয়া এক দিন সে কর্ত্তব্যপথভ্রষ্ট হইয়াছিল বটে, কিন্তু সে কোন দিন তাহার অনিষ্টচেষ্টা করে নাই, প্রাণপণে তাহার সেবা করিয়া আসিয়াছে; তাহার কি এই পুরস্কার? যে টেরি নিস্‌বেটের অনিষ্ট-চেষ্টা করিয়া আসিয়াছে, তাহার কর্ত্তব্যনিষ্ঠ কর্ম্মচারীকে হত্যা করিয়াছে, তাহার রিপোর্ট চুরি করিয়া তাহার ব্যবসায় নষ্ট করিতে উদ্যত হইয়াছে, সেই টেরির সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া সে তাহাকে হত্যা করিতে উদ্যত হইয়াছে। প্যারাডাইনের মনে হইল, এই রহস্য-ভেদের পূর্ব্বে তাহার মৃত্যু হইলে মৃত্যুর পরও সে শান্তিলাভ করিতে পারিবে না।

নিস্‌বেট বলিল, "টেরি, এইবার তোমার হাতের কায শেষ কর। অনেক সময় নষ্ট হইয়াছে, আর বিলম্ব করা সঙ্গত হইবে না।"

টেরি এবার প্যারাডাইনের বামহস্ত টানিয়া ধরিয়া তাহার কোটের আস্তিন বাহুমূলে ঠেলিয়া দিল। প্যারা-ডাইন বুঝিতে পারিল, আর তাহার নিস্তার নাই, মুহূর্ত্ত পরেই সে পিচকিরি বিঁধাইবার যন্ত্রণা বুঝিতে পারিবে, উগ্র মাদকদ্রব্য তাহার দেহশোণিতের সহিত সংমিশ্রিত হইবে, তাহার পরই তাহার চেতনা বিলুপ্ত হইবে, আর তাহা ফিরিয়া আসিবে না। তাহার পর তাহার দেহের কি গতি হইবে, সে চিন্তা তাহার মনে স্থান পাইল না। চেতনা-বিলোপের পর মৃত্যু, ইহাই তাহার শেষ চিন্তা।

কিন্তু সেই মুহূর্ত্তে সেই কক্ষে এক অভাবনীয় কাণ্ড ঘটিল। যেন একটা বোমা মহাশব্দে সেই কক্ষে বিদীর্ণ হইয়া কক্ষস্থ আসবাব-পত্রগুলি চূর্ণ করিল। যাহারা তাহাকে ধরিয়াছিল, তাহারা প্রচণ্ড ধাক্কায় কে কোথায় সরিয়া পড়িল, প্যারাডাইন তাহা বুঝিতে পারিল না, তাহার মনে হইল, ভীষণ বিস্ফোরণে তাহার সর্ব্বাঙ্গ চূর্ণ হইয়া গিয়াছে। নিস্‌বেট তাহার কণ্ঠনালী সজোরে চাপিয়া ধরিয়াছিল, সে দূরে ছিটকাইয়া পড়িয়া আর উঠিতে পারিল না। টেরির হাত হইতে পিচকারি খসিয়া পড়িল এবং সে সবেগে দেওয়ালের গায়ে নিক্ষিপ্ত হইল। প্যারাডাইন যে মুহূর্ত্তে বুঝিতে পারিল, আত-তায়ীদের কবল হইতে সে মুক্তিলাভ করিয়াছে, সেই মুহূর্ত্তে সে লাফাইয়া উঠিল। সে চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিতে পাইল, তাহার আততায়ীরা সকলেই সেই কক্ষের মেঝের উপর কুষ্মাণ্ডের ন্যায় গড়াইতেছে, এক জন গড়াইতে গড়াইতে আসিয়া দুই হাতে তাহার একখানি পা চাপিয়া ধরিল। প্যারাডাইন পদাঘাতে তাহাকে দূরে নিক্ষেপ করিয়া মাতালের মত টলিতে টলিতে সেই কক্ষের দ্বারের দিকে অগ্রসর হইল।

প্যারাডাইন দ্বারের দিকে চাহিয়া মুহূর্ত্তমধ্যে সেই কক্ষে সংঘটিত বিভ্রাটের প্রমাণ দেখিতে পাইল। সে দেখিল, দ্বারে চাবি লাগাইবার জন্য যে কল ছিল, সেই কলখান চূর্ণ হইয়া কোথায় উড়িয়া গিয়াছে, কপাটের সেই স্থানে একটি প্রকাণ্ড ফুকর! কপাটের কব্জাগুলি চূর্ণ হওয়ায় কপাট কাত হইয়া চৌকাঠের গায়ে ঝুলিতেছিল। দুই এক স্থানে অল্প বাধিয়া থাকায় তাহা সমভূমি হয় নাই।

প্যারাডাইন দ্বার অতিক্রম করিবামাত্র যাহাকে সে

দেখিবার প্রত্যাশা করে নাই, তাঁহাকেই সেই কক্ষের দিকে অগ্রসর হইতে দেখিল। মিঃ ব্লীডকে দেখিয়া সে তাঁহার ভাবভঙ্গীর কোন পরিবর্ত্তন বুঝিতে পারিল না, সে তাঁহার আফিসে তাঁহাকে যেরূপ অচঞ্চল ও প্রকৃতিস্থ দেখিয়াছিল, তখনও তাঁহার সেই প্রকার সংযত ভাব। যেন তিনি তাঁহার কোন মক্কেলকে আইনসংক্রান্ত উপদেশ দান করিতে করিতে হঠাৎ সেখানে উঠিয়া আসিয়াছেন।

কিন্তু প্যারাডাইন তাঁহার একটা পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিল; সে তাঁহার বামহস্তে একটি অটোমেটিক পিস্তল দেখিতে পাইল; তাঁহার দক্ষিণ হস্তে তীক্ষ্ণধার সুদীর্ঘ গুপ্তি, দীপালোকে তাহা ঝকমক করিতেছিল। আত্মশক্তিতে প্রত্যয়শীল সমরবিজয়ী সেনাপতির ন্যায় দৃঢ়পদে তিনি অগ্রসর হইতেছিলেন।

মিঃ ব্লীডকে সেই কক্ষে প্রবেশ করিতে দেখিয়া প্যারাডাইন তাঁহার অনুসরণ করিয়া সেই কক্ষে প্রত্যাগমন করিল। মিঃ ব্লীড যেন তাহাকে দেখিয়াও দেখেন নাই, তিনি তাহাকে সেই কক্ষে তাঁহার অনুসরণের জন্য ইঙ্গিতও করেন নাই; তথাপি তাঁহাকে দেখিয়া তাহার মনে হইল, তাঁহার সঙ্গে শত্রুসমাকীর্ণ রণক্ষেত্রে যাইতেও তাহার আশঙ্কার কোন কারণ নাই।

প্যারাডাইন সেই কক্ষে পুনঃপ্রবেশ করিয়া দেখিল, টেরির হাত হইতে পিচকিরিটা গালিচার উপর খসিয়া পড়িয়াছে, সে তাহার বুকের পকেটে হাত পুরিয়া ব্যগ্রভাবে কি খুঁজিতেছিল। সেই মুহূর্ত্তে মিঃ ব্লীডের হাতের গুপ্তি তাহার সেই হাতে বিদ্ধ হইল। টেরি যন্ত্রণায় আর্ত্তনাদ করিয়া গালিচার উপর চিত হইয়া পড়িয়া গেল।

গোয়েন্দাদ্বয়ের এক জন উঠিবার চেষ্টা করিতেই তাহার ঘাড়ে মিঃ ব্লীডের অব্যর্থ গুপ্তির এক খোঁচা লাগিল; তাহার হাত পকেটে ছিল, হাতের চাপে তাহার পকেটেই পিস্তলের গুলী বাহির হওয়ায় তাহার কোটে আগুন ধরিয়া গেল, এবং পশমী কাপড় পুড়িবার দুর্গন্ধ বাহির হইল। প্যারাডাইন সেই সময় তাহাকে আক্রমণ করিয়া তাহার নাকে মুখে ঘুসি মারিতে লাগিল। ইতিমধ্যেই মিঃ ব্লীড অন্য গোয়েন্দাকে আক্রমণ করিয়া তাহারও স্কন্ধে গুপ্তি বিদ্ধ করিলেন। আঘাত-যন্ত্রণায় সে আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল।

মিঃ ব্লীড প্যারাডাইনকে সঙ্গে লইয়া যেখানে দাঁড়াইয়াছিলেন, সেই স্থান লক্ষ্য করিয়া কাগজ চাপা, রুল, বোতল ও গ্লাস প্রভৃতি নিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল। মিঃ ব্লীড টেরি ও জাল সার্জ্জেণ্টদ্বয়কে জখম করিয়া গালিচার উপর ফেলিয়া রাখিয়া তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সেই কক্ষের সকল অংশ পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। যে দিক হইতে কাগজ চাপা, বোতল প্রভৃতি বর্ষিত হইতেছিল, তিনি সেই দিকে চাহিয়া নিসবেটকে দেখিতে পাইলেন; সে তখন সেই কক্ষের বাতায়নের অদূরে একটি ডেস্কের সম্মুখে ঝুঁকিয়া পড়িয়া তাহার দেরাজ খুলিবার চেষ্টা করিতেছিল। নিসবেটই ডেস্কের উপর হইতে কাগজ চাপা, রুল প্রভৃতি লইয়া তাঁহার দিকে নিক্ষেপ করিতেছিল, ইহাও তিনি বুঝিতে পারিলেন।

মিঃ ব্লীড সেই ডেস্কের দিকে অগ্রসর হইয়া বলিলেন, "আমি তোমাকেই চাই, নিসবেট!"

নিসবেটের লাইব্রেরীতে প্রবেশ করিয়া মিঃ ব্লীড এই সর্ব্বপ্রথম কথা কহিলেন; কিন্তু তাঁহার কণ্ঠস্বরে উত্তেজনার আভাসমাত্র ছিল না। তিনি নিসবেটকে নিরুত্তর দেখিয়া একলম্ফে ডেস্কের নিকট উপস্থিত হইলেন, এবং নিসবেটকে ডেস্কের অন্তরালে ঝুঁকিয়া পড়িয়া তাহার দেরাজ হাতড়াইতে দেখিয়া তাঁহার হাতের সুতীক্ষ্ণ গুপ্তিখানি তাহার দিকে প্রসারিত করিলেন। নিসবেট তাঁহার আচরণ লক্ষ্য না করিয়া, এমন কি, তাঁহাকে কোনও কথা না বলিয়া দেরাজ হইতে একটা ক্ষুদ্র কৌটা সংগ্রহ করিল, এবং সেই কৌটা খুলিয়া একটি শাদা বড়ি বাহির করিয়া তাহা মুখের ভিতর নিক্ষেপ করিল।

নিসবেট সেই ডেস্কের আড়ালে দাঁড়াইয়া এই কার্য্য করিলেও সেই কক্ষের বিদ্যুতালোকে এই দৃশ্য মিঃ ব্লীডের তীক্ষ্ণদৃষ্টি অতিক্রম করিল না। তিনি তৎক্ষণাৎ ডেস্ক ঘুরিয়া নিসবেটের চেয়ারের পার্শ্বে উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহার হাতের গুপ্তি নিসবেটের স্কন্ধে স্পর্শ করিয়া গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "ও কি করিলে?"

নিসবেট উন্মত্তের ন্যায় হাঁ হাঁ করিয়া হাসিয়া অবজ্ঞাভরে তাঁহার মুখের দিকে চাহিল। তাহার মুখে বিজয়ীর গর্ব্ব পরিস্ফুট!

[ক্রমশঃ

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়।

রুম-অঙ্গনা

রুম—আধুনিক নাম আনাতোলিয়া বা এশিয়া-মাইনর।

কৃষ্ণ-সাগর (Black Sea) এবং ভূমধ্য সাগরের অন্তবর্ত্তী যে দীর্ঘ ভূখণ্ড গিয়া য়ুরোপের পূর্ব্ব-সীমানায় মিশিয়াছে, তাহার নাম এশিয়া-মাইনর। এই এশিয়া-মাইনরকে পৃথিবীর সংক্ষিপ্ত-সার বলিলে অত্যুক্তি হয় না। এশিয়া-

গ্রীক-জাতের মেয়ে

মাইনরে সর্ব্ব-জাতির মিলন ঘটিয়াছে। এই প্রদেশ অটোমান বা ওশমানলি তুর্কির অধীনে আছে প্রায় চারশো বৎসর ধরিয়া।

এখানকার অধিবাসীদের মধ্যে কতক বিদেশী বিজয়ী জাতির বংশধর; কতক বা পূর্ব্ব-বিজয়ীদের বংশ-জাত; বাকী প্রাগৈতিহাসিক বিভিন্ন জাতির বংশ সম্ভূত।

ধর্ম্ম-বিশ্বাস হিসাবে ইহাদের জাতি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এখানে বেশীর ভাগ লোকই হয় মুসলমান, নয় খৃষ্টান, নয় ইহুদী। এশিয়া-মাইনর বা রুমের নারী সমাজের আলোচনা করিতে হইলে এই বিভিন্ন ধর্ম্ম-বিশ্বাস ধরিয়াই তাহা করিতে হইবে।

এখানকার গভর্ণমেণ্ট কোনো ধর্ম্মে হস্তক্ষেপ করে না। সেজন্য সর্ব্বধর্ম্মের লোকেই নিরুপদ্রবে বাস করে। তবে খৃষ্টান ও ইহুদী—এ দুই জাতিকে মাঝে মাঝে অসুবিধা ভোগ করিতে হয় না, এমন নয়!

মুসলমানদের মধ্যে প্রধান—ওসমানলি সম্প্রদায়। মুসলমানদের আরো কয়টি সম্প্রদায় আছে—সার্কেশিয়ান, জর্জ্জিয়ান, কুর্দ্দ, তাতার, তুর্কোমান, য়ুরুক প্রভৃতি। খৃষ্টানদের মধ্যে আছে আর্ম্মাণী, গ্রীক ও রোমান-কাথলিক।

বনিয়াদী মুসলমান ও খৃষ্টান ঘরের মেয়েরা অপরূপ রূপসী। বস্‌ফরাস-তীরবর্ত্তী স্মির্ণার মেয়েদের মতো রূপসী দুনিয়ায় আর নাই! এখানকার মেয়েদের চোখ চমৎকার—ভ্রূ যেন তুলির রেখায় লেখা। গায়ের বর্ণ স্বচ্ছ, স্নিগ্ধ, গৌর।

ওসমানলি-জাতের মেয়েদের বর্ণে ও গঠনে পার্থক্য দেখা যায়। তার কারণ, নানা জাতির মিশ্রণে ওশমানলি-জাতির সৃষ্টি! দু'জাতের ঘরের মেয়েরাই অঙ্গ সজ্জা সম্বন্ধে খুব সচেতন—কি বেশে, কি ভূষায়!

সাজিলে-গুজিলে রূপের জলুশ বাড়িবে, তাই বিদ্যার মতো এই সজ্জা-বিধির তাঁরা সাধনা করেন। মাথার চুলে নানা রকম রঙ মাখেন, কশমেটিক্স ব্যবহার করেন।

মুসলমান-জাতের মেয়েদের স্নানের ব্যবস্থায় রীতিমত সমারোহ ঘটে। নিত্য-স্নান করেন; তবু সে স্নান চলে

খৃষ্টান-কিশোরী

দীর্ঘ-কাল ধরিয়া। সংসার হাজিয়া যাক, মজিয়া যাক—স্নান-বিলাসে কোনো কালে মুসলমান-ঘরের মেয়েদের শৈথিল্য বা ঔদাস্য দেখা যায় না। স্নান করিতেই অনেকের দিন 'ভোর' হইয়া যায়।

মুসলমানের ঘরে মেয়েরা আজো য়ুরোপীয় পোষাক-পরিচ্ছদ গ্রহণ করেন নাই। হ্যাটের নামে তাঁদের নাসিকা এখনো কুঞ্চিত হয়। মুখে-মাথায় ঘোমটা বা ওড়নার রেওয়াজ এখনো আছে। তবে সেকালে ফৈরিজী নামে ঘাগরা কোমর হইতে পায়ের তলা পর্য্যন্ত বিলম্বিত থাকিত, এখন সে ঘাগরার ঝুল কমিয়া হাঁটুর খানিক নীচে পর্য্যন্ত উঠিয়াছে। মাথায় অনেকে ওড়নার উপর সুদৃশ্য 'কেপ' ব্যবহার করেন—এ কেপের ঝুল পিঠের দিকে ঝুলাইয়া দেন। এই কেপের জন্য তাঁরা খুব গাঢ় রঙের সাটীন বা তাসের কাপড় ব্যবহার করেন। কেপের ব্যবহার ধনীর ঘরেই প্রচলিত দেখা যায়। এই ওড়না ও কেপের জন্যই ধনী ও নির্ধনের ঘরে মেয়েদের পরিচ্ছদে যা তারতম্য! কেপ ও ওড়না ফেলিয়া দিলে, দু'ঘরের মেয়েদের বেশে কোনো স্বাতন্ত্র্য উপলব্ধি হয় না।

মুশ্‌লিম্-রমণী

পিকনিকে কিম্বা মুক্ত প্রান্তরের মিলন-মেলায় মেয়েরা পরিচ্ছদের উপর গায়ে লম্বা কোট চড়ান। এ কোট ড্রেসিং-গাউনের অনুরূপ। সিল্ক, আলপাকা বা কোনো রকম হালকা রঙীন কাপড়ে এ কোট তৈরী হয়। বাহিরে সাদা মশলিনের ওড়না পরেন; কালো কেশের শোভা বাড়াইয়া তোলেন মণিরত্নখচিত চিরুণী ও পিন আঁটিয়া! তবে মুখ কখনো ঘোমটায় ঢাকিয়া রাখেন না! মুখেই তাঁদের যা কিছু শোভা-মাধুরী!

একালে নারী-সমাজে প্রাথমিক শিক্ষার প্রবর্ত্তন হইয়াছে। তবে সাধারণ গৃহস্থ ও দরিদ্র-ঘরে শিক্ষার তেমন সমাদর এখনো ঘটে নাই। ছেলেদের শিক্ষা-সম্বন্ধে যে

ব্যবস্থা আছে, তাও পর্য্যাপ্ত নয়। ধনী মুসলমানেরা উচ্চ শিক্ষার জন্য ছেলেদের য়ুরোপে পাঠান। মেয়েদের পাঠানো চলে না, সে-রীতি এখনো প্রচলিত হয় নাই। বনিয়াদী ঘরে গভর্ণেশ বহাল হইতেছে—তাহাদের সাহচর্য্যে মেয়েরা য়ুরোপীয় ভাষায় কথা কহিতে, চিঠি-পত্র লিখিতে শেখে। য়ুরোপীয় সাহিত্যে এমনি করিয়া তাদের জ্ঞান-লাভ হয়।

ইহার ফলে ওশমানলি-ঘরে লেখিকার আবির্ভাব ঘটিয়াছে। য়ুরোপীয় সাহিত্যের বহু তুর্কি-অনুবাদ করিয়া মেয়েরা তুর্কি-সাহিত্য পরিপুষ্ট করিতেছেন। হালি হালুম নামে একজন মহিলা স্কুটারির আমেরিকান উয়োমেন্‌স্‌ কলেজের গ্রাজুয়েট। তাঁর লিখিত য়ুরোপীয়-গ্রন্থের তুর্কি-অনুবাদ রাজ-দরবারে সমাদর লাভ করিয়াছে এবং সুলতান তাঁহাকে উপাধি-ভূষণে ভূষিত ও সম্মানিত করিয়াছেন।

মুসলিম কৃষাণের মেয়ে

বেদুইন-রমণী

খৃষ্টান ও ইহুদী-সমাজে বিদ্যা-চর্চ্চার জন্য স্কুল আছে অনেক-গুলি। এ দুই জাতের ছেলে-মেয়েরা লেখা-পড়ার চর্চ্চা ভালো করিয়াই করে।

ক্ষেতের কাজে

রুমের সমুদ্র-তীরবর্ত্তী প্রদেশ-গুলিতে ওশমানলি সম্প্রদায়ের বাস। বিদেশী-বিবাহের ফলে এ জাতের রক্তে খাঁটী রুম-রক্ত আজ নাই। সমুদ্র হইতে দূরবর্ত্তী অন্তঃপ্রদেশ-গুলিতে সার্কেশিয়ান এবং অপর সম্প্রদায়ের রক্তে বিদেশী রক্তের সংস্রব ঘটে নাই। বিবাহ-বিধি সম্বন্ধে তারা চিরদিন নিয়ম মানিয়া চলিয়াছে—এজন্য প্রাচীন আচার-রীতি এ-সব সমাজে এখনো প্রায় অক্ষুণ্ণ অক্ষত রহিয়া গিয়াছে।

তুর্কোমান কৃষাণ-মেয়ে

ক্রিমিয়া ও বালকান্ রাজ্যে পুরাকালে বিপ্লব বাধিলে সেখানকার বহু নর-নারী পলাইয়া এশিয়া-মাইনরে আসিয়া আশ্রয় লয়। সেই সব জাতির বংশধর এবং সার্কেশিয়ানরা খুব কর্ম্মশীল ও পরিশ্রমী। পুরুষেরা ক্ষেত-খামারে কাজ করে। গ্রাম ও ক্ষেত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখিবার দিকে তাহাদের যত্নের সীমা নাই। এজন্য গ্রামগুলি দেখায় ছবির মতো। কৃষাণের ঘরে কাজ-কর্ম্ম করে মেয়েরা; পুরুষদের কাজ-কর্ম্ম বড় থাকে না! মেয়েরা ক্ষেত-খামার দেখে; গৃহে বসিয়া চরকা ও তাঁত চালাইয়া পশমী ও সূতির কাপড় বোনে; কার্পেট তৈয়ার করে।

পরিবারস্থ সকলের পরণের উপযোগী কাপড়-চোপড়—এমন কি, থলি ও তাঁবু তৈয়ার করাতেও মেয়েদের পটুতা অসাধারণ। ধান কোটা, ধান ছাঁটা, দুধ দোহা, দধি, ননী, ছানা তৈয়ার করা এবং রন্ধনাদি—সব কাজ মেয়েরা করে। আলস্য এ-জাতের মেয়েদের অবিদিত। পুরুষের দল বলদ লইয়া মাঠে লাঙ্গল দেয়, ফসল বোনে—অবশিষ্ট যা কিছু কাজ, তা মেয়েরা করে।

বাড়ী-ঘর মাটীর তৈরী। আমাদের দেশের মতো ছাঁচা-বেড়ায় মাটী লেপিয়া বাড়ী-ঘর তৈয়ার হয় না।

সেখের হারেম-বাসিনী

মাটীর ইট রচিয়া রৌদ্রে বেশ করিয়া তাতাইয়া শুকাইয়া তাহা দিয়া দেওয়াল নির্ম্মাণ করে।

যে সব গ্রামে গাছপালা নাই, মেয়েরা সেখানে ঘুঁটে দেয়, জ্বালানি সংগ্রহ করিয়া বেড়ায়। ঘুঁটে দিবার ব্যবস্থা হুবহু আমাদের দেশের মতো—গোবরের তাল চটকাইয়া হাতে করিয়া বাড়ী-ঘরের দেওয়ালে 'পিষ্টক'-লেপন!

এশিয়া-মাইনরের যে-সব গ্রামে ঘুঁটের ব্যবস্থা আছে, সে-সব গ্রাম বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। সেখানে সকলের স্বাস্থ্যও ভালো। যে-সব গ্রামে গাছপালা আছে, সেখানে কাঠ দিয়া জ্বালানির কাজ চলে, ঘুঁটের রেওয়াজ নাই; কাজেই গোবর ও রাজ্যের আবর্জ্জনা পাড়ায় পাড়ায় জমিয়া পাহাড় গড়িয়া ওঠে এবং দুর্গন্ধ ও রোগ সে সব গ্রামের মাটী কামড়াইয়া, আকাশ-বাতাস ছাইয়া রীতিমত উৎপাত-বিভীষিকার সঞ্চার করিয়া তোলে।

এদেশের পুরুষ মেয়েদের অধিকার বা ব্যক্তিত্ব একেবারে উড়াইয়া দেয় নাই। তাদের মতো মেয়েদেরও দেহ-মন আছে, স্বাধীন সত্তা আছে। পুণ্য করিলে মেয়ে-জাতেরও বেহেস্তে জায়গা মিলিবে,—এ জাতের পুরুষ তাহা স্বীকার করে। সেজন্য বহু ব্যাপারে মেয়েদের বঞ্চনা সহিতে হয় না। পুরুষদের মতো মেয়েরাও তীর্থে যায়; পুণ্য-কামনায় উপবাসাদি করে। নিত্য পূজা-প্রার্থনাতেও মেয়েদের এক্তিয়ার আছে।

মৃতের কল্যাণ-কামনায় মেয়ে-পুরুষে প্রার্থনা করে। মেয়েরা নিত্য মসজিদে গিয়া উপাসনা না করিলেও মসজিদে তাদের প্রবেশ নিষিদ্ধ নয়। মসজিদে মেয়েদের উপাসনার জন্য স্বতন্ত্র স্থান নির্দ্দিষ্ট ও নির্দ্ধারিত আছে। এ জাতের ছেলে মেয়েরা শৈশব হইতে কোরাণ মুখস্থ করে। তাহাদিগকে কোরাণ আবৃত্তি করিতে হয়। কোরাণ পড়িয়া তাহাতে জ্ঞান লাভ করিলে মেয়ে ও ছেলে—উভয়কে 'হাফেজ' উপাধি দেওয়া হয়।

এশিয়া-মাইনরের মুসলমান-সমাজে হারেমের ব্যবস্থা এতটুকু স্বতন্ত্র নয়! স্বামী ও নিকট-আত্মীয় ভিন্ন অপর পুরুষ-মানুষের সঙ্গে মেয়েদের দেখাশুনা, আলাপ-পরিচয়, মেলামেশা নিষেধ। এতখানি শাসন থাকিলেও গৃহের কর্ত্রী কিন্তু নারী। গৃহে নারীর স্বাধীনতা অবাধ। কাহারো কাছে তাঁকে সংসারের কাজ-কর্ম্ম সম্বন্ধে কোনো কৈফিয়ৎ দিতে হয় না। নিজ-সম্পত্তিতে এবং নিজের দাসী-বাঁদীর উপর তাঁর অধিকার অবাধ অব্যাহত।

এখানকার মুসলিম-সমাজে বহু-বিবাহ নিন্দিত।

অধিকাংশ পুরুষই একটিমাত্র বিবাহ করে। কাজেই স্বামীর উপর সপত্নীর অংশীদারীর কোনো আশঙ্কা নাই; এবং স্বামি-স্ত্রীর মধ্যে সহজেই প্রীতি-ভালোবাসার সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ নিবিড় হইয়া ওঠে।

এখানকার মুসলিম-সমাজ মেয়েদের স্বাধীন-সত্তা এত-খানি মানিয়া চলে যে, ঘরের কোনো বাঁদী যদি মালিকের দৌলতে সন্তানের মাতা হয় তো সে বাঁদীকে কোনো গৃহস্থ বেচিতে পারে না—তাকে বেচিবার অধিকার লুপ্ত হয়। সে বাঁদীকে ও বাঁদীর সে-সন্তানকে পালন করিতে সে বাধ্য এবং সে সন্তান বৈধ সন্তানের তুল্য পিতৃ-সম্পত্তিতে অধিকার পায়।

বিবাহ এদেশে চুক্তি-নামার মতো—কনট্রাক্ট। চুক্তি-নামা লিখিয়া স্বামী বিবাহ করে। দলিলে লিখিতে হয়, নিজের বংশ-মর্য্যাদা-হিসাবে স্ত্রীকে স্বামী যাবজ্জীবন পোষণ করিবে। ডিভোর্স ঘটিলে স্ত্রীর যাবতীয় সম্পত্তি (personal properties) শুধু স্ত্রীকে প্রত্যর্পণ করিবে না—বিবাহের সময় যে দেন-মোহর দিবার সর্ত্ত থাকে, স্ত্রীর হাতে পুরাপুরি তাহা বুঝাইয়া দিতে হইবে—যাহাতে গ্রাসাচ্ছাদনে কোনো-রূপ অসুবিধা বা কষ্ট তাঁহাকে ভোগ করিতে না হয়।

ডিভোর্সের বিধি খুব সহজ। শুধু ক'জন সাক্ষী ডাকিয়া তাদের সামনে স্ত্রীকে সম্বোধন করিয়া স্বামী তিন-বার 'তালাক' কথাটি উচ্চারণ করিবে।

ইহুদী-জাতের মধ্যে বহু-বিবাহ প্রচলিত আছে। তবে তার বিধি অভিনব। অর্থাৎ দ্বিতীয়া পত্নী-গ্রহণে পুরুষের অধিকার মিলে যদি প্রথমা স্ত্রীর গর্ভে সন্তান না থাকে, তবেই; নচেৎ নহে। প্রথমা পত্নীর সন্তান জন্মিলে দ্বিতীয় পত্নী-গ্রহণে স্বামীর কোনো অধিকার থাকে না।

শিক্ষিত ইহুদী-সমাজে বহু-বিবাহ নিন্দনীয়। নিঃসন্তান হইলে স্বামি-স্ত্রী প্রায় পোষ্যপুত্র গ্রহণ করে।

ইহুদীদের বিবাহ কন্ট্রাক্টের ধরণে এবং ডিভোর্স-বিধি মুসলিম-ডিভোর্সের অনুরূপ। এক্ষেত্রেও সেই স্ত্রীর গ্রাসাচ্ছাদনের সুব্যবস্থা-কল্পে দেন-মোহর চুকাইয়া দিতে হয় এবং স্ত্রী তার নিজস্ব সম্পত্তি লইয়া স্বামি-গৃহ ত্যাগ করিয়া চলিয়া আসে। স্ত্রীর নিজস্ব সম্পত্তি স্বামী আটকাইয়া রাখিতে পারে না।

এশিয়া-মাইনরে—মুসলিম ও ইহুদী উভয় সমাজেই মেয়েদের বিবাহ দিতে হয় অল্প বয়সে—যৌবনোদয়ের পূর্ব্বে। বিবাহের সম্বন্ধ স্থির করে মা-বাপ—মেয়েদের সে বিষয়ে কোনো কথা বলা চলে না।

নানান্ জাত! তাই বিবাহের বিধিতে বহু পার্থক্যও দেখা যায়। তবে সকল বিবাহেই অর্থ-ব্যয় হয় প্রচুর—উৎসবাদি চলে সপ্তাহ-কাল ব্যাপিয়া। বিবাহে বহু আচার-রীতি আছে, সেগুলি নিখুঁতভাবে পালন করিতে হয়।

ইহুদী-রূপসী

ইহুদী, গ্রীক ও আর্ম্মানি বিবাহের বিধি জটিল এবং সে বিবাহ-বিধির সঙ্গে নানা ধর্ম্মানুষ্ঠান বিজড়িত আছে। খৃষ্টান ও ইহুদী সমাজে কন্যার পিতাকে বিবাহ-কালে কন্যাকে রীতিমত যৌতুক দিতে হয়—মেয়ের পোষাক-পরিচ্ছদ এক প্রস্থ,—তার উপর বিছানা, কার্পেট, তৈজস-পত্রাদি এবং সংসারের প্রয়োজনীয় আরো বিবিধ সামগ্রী।

রুশ টুপির কারখানা

রেশমের কারখানা

স্বতন্ত্র। পুরাকালের ধরণে বাঁদী-প্রথা রহিত হইয়াছে এবং এশিয়া-মাইনরে আজ বাঁদীর হাট বা বাঁদী বাজার নাই সত্য—তবু গোপনে বাঁদী কেনা-বেচা আজো চলিতেছে।

শ্বেতাঙ্গিনী-বাঁদীর আমদানি এখনো প্রবল। পুরাকালে শ্বেতাঙ্গিনী-বাঁদীর কারবার বেশ সমারোহে চলিত এবং সেই সব শ্বেতাঙ্গিনী-বাঁদীর গর্ভজাত পুত্র-কন্যাদের দৌলতেই সাকেশিয়ান, জর্জ্জিয়ান ও কুর্দ্দ জাতির সৃষ্টি! এসব বাঁদীর আদর-যত্ন ছিল অপরিসীম। তাদের ভালো বেশ ভূষা মিলিত—উৎকৃষ্ট আহার্য্য মিলিত; পারিবারিক আমোদ-প্রমোদেও তাদের সাদর-নিমন্ত্রণ মিলিত।

বাঁদী-বিবাহে তখন অগৌরব ছিল না—এখনো নাই। রূপসী-মেয়েকে এদেশে কখনো দুর্ভাগ্য বরণ করিতে হয় নাই। রূপসী নারীর আদর এদেশে চিরদিন! ধনীদের তারা মাথার মণি! তার উপর বাঁদী-বিবাহে অর্থ-ব্যয়

এদেশের মুসলিম-সমাজে মেয়ে-জাতের সম্বন্ধে কয়েকটি বিধি-নিষেধ আছে। বাঁদীর গর্ভে যে সব মেয়ের জন্ম, তারা ছাড়া অনাত্মীয় কোনো পরিবারে কোনো মেয়ে দাস্যবৃত্তি করিবে না। কারণ, অনাত্মীয় পুরুষ যেন মেয়েদের মুখ না দেখে! বাঁদী বা বাঁদী-বংশীয়াদের কথা

অল্প; সদ্বংশ-জাতা বধূ-বিবাহে উৎসব সমারোহ করা চাই—তাহাতে অনেক ব্যয়। এ জন্য বহু পুরুষ শস্তায় বিবাহ-ব্যবস্থা সারে বাঁদীকে বধূত্বে গ্রহণ করিয়া! বিবাহের পর বাঁদীদের শিক্ষার সুব্যবস্থা করা হয়।

ছেলের বাঁদীদের উপর বাপের কোনো অধিকার নাই। রুমের বহু বনিয়াদী হারেমে এখনো পুরুষ-ভৃত্যের প্রবেশাধিকার নাই—অন্দরে খোজা ভৃত্য দাস্য করে।

আর্মান-রূপসী

এশিয়া-মাইনরের সিল্কের বাজারের খ্যাতি বিশ্ববিশ্রুত। রুমে সমারোহে গুটির চাষ হয়। মেয়েরা গুটি পালন করে, তাহা হইতে রেশমী সূতা বাহির করে—তাঁতে সিল্কের কাপড় বোনে। এখন সিল্কের ফ্যাক্টরি বসিয়াছে। সে ফ্যাক্টরিতে মেয়ে-কারিগর নহিলে সুশৃঙ্খলভাবে কাজ চলে না।

তুর্কির বিখ্যাত ফেজ টুপির মস্ত বাজার আছে স্মির্ণায়। এখন যন্ত্রপাতি বসিয়াছে। মোজা-গেঞ্জির কল লইয়া এখানকার বহু গৃহের মেয়েরা যেমন মোজা-গেঞ্জি তৈয়ার করেন, সে দেশের মেয়েরাও তেমনি ঐ কল লইয়া ফেজ-টুপি তৈয়ার করেন।

এক কথায় এ দেশের মেয়েরা খুব বেশী রকম কর্ম্মশীলা—আলস্য তাঁরা জানেন না!

এশিয়া-মাইনরে ছেলেমেয়ের আদর অত্যধিক। অপত্য-হীনতা—খৃষ্টান, মুসলিম ও ইহুদী—সকল সমাজই দুর্ভাগ্য ও চরম অভিশাপ বলিয়া মনে করে। ছেলে-মেয়ের আদরে কোনো প্রভেদ নাই। পুত্র-সন্তান জন্মিলে গৃহে যেমন আনন্দ-কলরব ওঠে, মেয়ের জন্মেও তেমনি। তবে ছেলের আদর সাধারণতঃ বেশী এই কারণে যে, ছেলে বংশ-ধারা রক্ষা করিবে—পর-গৃহে গিয়া পর হইয়া যাইবে না; অর্থ উপার্জ্জন করিবে, বিষয় রক্ষা করিবে।

যারা কন্যা বিক্রয় করে, কন্যার জন্মে তাদের খুব আনন্দ। কুর্দ্দ জাতি মেয়ে বিক্রয় করে। তাদের কাছে মেয়ের আদর খুব বেশী। এক একটি মেয়ে বেচিয়া ৭০ পাউণ্ড দাম আদায় করা—সেখানে নিত্যকার ব্যাপার! মেয়ের বাজার-দরও তাই।

পুত্র-কন্যা জন্মিলে—পাঁচ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত তাদের বড় সাবধানে রাখিতে হয়—পাছে কারো নজর লাগে—পাছে ভূতে পায়! পাঁচ জনের কাছে ছেলে মেয়ের রূপ, বুদ্ধি বা স্বাস্থ্যের স্তুতি করিতে নাই—তাহা হইলে নজর লাগে! এ বিশ্বাস খৃষ্টান, মুসলিম ও ইহুদী—তিন সমাজেই সমভাবে বিদ্যমান।

ছেলে-মেয়ের মৃত্যু ঘটে একটু বেশী মাত্রায়। মা-বাপ শোকের সে ব্যথা প্রকাশ করেন সমাধি-ফলকে। একটি শিশু-সমাধি-লেখার পরিচয় দিয়া আমাদের এ প্রসঙ্গের উপসংহার করি।

একটি মেয়ে! তার সমাধি-স্তম্ভে শোকার্ত্ত পিতা-মাতা লিখিয়া রাখিয়াছেন—

ফুটিবার পূর্ব্বে এ কুসুম বৃন্তচ্যুত করিয়া কে ছিঁড়িয়া লইয়া গেল! লইয়া গেল সেই অমর-কুঞ্জে গোলাপের পাপড়ি যেখানে কখনো ঝরে না; যে কুঞ্জে মা-বাপের শোকাশ্রু অমল শিশিরের মতো তাকে সজীব স্নিগ্ধ রাখিবে। এ কুসুম-কলিকার জন্য তোমরা একটিবার প্রার্থনা করো!

দেহ-ছন্দ

এক জন সুরসিক ইংরেজ লেখক বলিয়াছেন, ভালো ঘোড়া এবং সত্যকার সুন্দরী নারী—উভয়ের পা হইবে সুছাঁদে গঠিত!

অঙ্গে রূপের জ্যোৎস্না বহিয়া গেলেও যদি নারীর হাত-পা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের গঠনে ছন্দ বা সামঞ্জস্য না থাকে, তাহা হইলে তাঁকে সুন্দরী বলা চলে না। কেহ তা বলিবে না। যে-নারীর সৌন্দর্য্য-সাধনা নাই, তাঁর নারী-জন্ম বৃথা!

দেহ-চর্য্যার আলোচনা আমরা পূর্ব্বে করিয়াছি। আজ চরণচর্য্যার কথা বলিব।

নারীর চরণ তুচ্ছ করিবার বস্তু নয়। স্বয়ং নারায়ণ নর-দেহ ধারণ করিয়া যেদিন পুরুষের আদর্শ বুঝাইতে পৃথিবীতে আসিয়াছিলেন, সে-দিন তিনি রূপসী শ্রীমতীর চরণ ছন্দে বিমুগ্ধ হইয়া গাহিয়াছিলেন,—'দেহি পদপল্লবমুদারম্!

পদ-পল্লব উদার হোক—সেই সঙ্গে পদ-পল্লবে মাধুরী থাকা চাই! ফাটা চ্যাপটা বে-ছাঁদের চরণ—সে চরণের উদারতা পদাঘাতে প্রকাশ পাইতে পারে, প্রেম-প্রীতির রাজ্যে সে পায়ের কোনো দাম নাই!

নারীর রূপশ্রী বিকাশ পায় তাঁর সারা অঙ্গের গঠন-সামঞ্জস্যে। ইংরেজিতে একটা কথা আছে—shapeliness. এ কথার বাঙলা প্রতিশব্দ—সুছাঁদ; অর্থাৎ হাত-পা প্রভৃতি বিবিধ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যেন বেরূপ না হয়! মুখখানি খাশা বা দেহের রূপ গোলাপ ফুলের মতো—সেই সঙ্গে হাত দুখানি যদি হয় খাটো, চরণ বেয়াড়া-গোছের,—অর্থাৎ অপর অঙ্গ যদি বেতালা-ছন্দে পিণ্ডবৎ গড়িয়া ওঠে, তাহা হইলে কোন্ রমণী না লজ্জায়-সঙ্কোচে জীবন্মৃতা থাকেন! মুখে দুঃখ প্রকাশ না করুন, মনের সঙ্গে ছলনা চলে না!

আমাদের দেশে শাস্ত্রকারেরা পুণ্য সংস্কৃত-ভাষায় নারীর শ্রীসৌন্দর্য্যের বহু হদিশ দিয়া গিয়াছেন। দেহ-চর্য্যা ও অঙ্গ-প্রসাধন সে-কালে ছিল কলাবিদ্যার অন্তর্ভুক্ত। তার শিক্ষা চলিত পরম নিষ্ঠাভরে। আজ অজ্ঞতার জন্য বা যে-কারণেই হোক, বাঙালীর সংসারে মেয়েদের দেহ-চর্য্যার প্রথা উঠিয়া গিয়াছে। ফলে বাঙালীর গৃহে সত্যকার সুন্দরী আজ দুর্লভ। বাঙলার কমল-বন কি সত্যই শেয়ালকাঁটা-বনে পরিণত হইবে? না। আমরা চাই, বাঙলার মেয়ের বিশ্ব-ভরা সে সৌন্দর্য্য-খ্যাতি আবার সমুজ্জ্বল হোক!

বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে দেহ-চর্য্যার যে বিধি দেহ-ছন্দ-গঠনে—বিশেষ করিয়া চরণ-ছাঁদ-গঠনের পক্ষে সব-চেয়ে উপযোগী, আজ আমরা সেই বিধির কথা বলিব।

কি সাধনায় নারীর দেহ সুডৌল গড়িয়া উঠিতে পারে? গালে মাংস জমিবে না; মাথায় কেশ অল্প হইবে না; বাহু হইবে নিটোল; রম্ভোরু; সুছাঁদের চরণ; বক্ষ পীনোন্নত,—প্রাচীন চিত্রে সুন্দরীর যে-মূর্ত্তির পরিচয় আমরা পাই, সে মূর্ত্তি লাভ করিতে হইলে আমাদের সঙ্কলিত প্রণালী সহায় হইবে, সে সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র সংশয় নাই। তবে কথায় বলে, মানুষ ভিন্ন-রুচি; এবং নারীর সৌন্দর্য্য বা সজ্জা—প্রিয়জনের চিত্ত-বিনোদনের জন্য। এই ভিন্ন রুচি লক্ষ্য করিয়াই রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—

যার অদৃষ্টে যেমনি জুটুক, তোমরা সবাই ভালো!

ভিন্ন রুচির কথা ছাড়িয়া নারী-দেহের যে-আদর্শ সর্ব্ববাদিসম্মত, সেই আদর্শের প্রতি আমরা লক্ষ্য রাখিয়াছি।

সৌন্দর্য্য-সাধনার গোড়ার কথা, ভালো স্বাস্থ্য। সে কথা বারান্তরে বলিব। স্বাস্থ্য ভালো—মানিয়া লইয়া আমরা এই ব্যায়ামের কথা বলিতেছি।

সুদক্ষ শিল্পী-রচিত ভেনাস-মূর্ত্তির ছবি অনেকে দেখিয়াছেন। সামান্য সাধনায় ঘরে ঘরে মেয়েরা তেমনি সুছন্দে-গঠিত দেহের অধিকারিণী হইতে পারেন। এইসঙ্গে যে ক'খানি ছবি ছাপা হইল, সেই ছবিগুলি দেখিয়া, সকলের দৃষ্টির অন্তরালে ঘরে বসিয়া ছবির ভঙ্গীতে দেহ-চর্য্যা করুন। হাত-পা, সেই সঙ্গে সারা অঙ্গ সুছন্দে গঠিত হইবে। যদি সুছন্দে দেহ গড়িতে পারেন, তাহা হইলে স্বাস্থ্য-সম্বন্ধে চিন্তার কারণ বড় একটা থাকিবে না।

১ নম্বর ছবি। তিনখানি বাঁধানো বই দু'হাতে চাপিয়া ধরিয়া অর্দ্ধ-বর্ত্তুল-ভঙ্গিমায় বই-সমেত হাত দুখানি সামনের দিকে মাথার উপর দিয়া বেগে ঘুরাইবেন। হাত বেশ সিধাভাবে প্রসারিত রাখিতে হইবে।

২ নম্বর ছবি। বক্ষযুগ নিটোল সুগঠিত করিতে—সিধা খাড়া হইয়া দাঁড়ান। ঘাড়ের পিছন দিক দিয়া দুই হাত ঘুরাইয়া পাণি অঙ্গুলি বদ্ধ করুন। তার পর ছবির ভঙ্গীতে সামনের দিকে মাথা ঝুঁকাইয়া দিন—দুই কনুই

বাঁধানো বই ২ বক্ষ নিটোল

ভর দিয়া চলিতে হইবে, মনে রাখিবেন ; এবং চলিবেন ধীর-ভাবে।

৪ নম্বর ছবি। পিঠওয়ালা চেয়ারে বসুন ; বসিয়া চেয়ারের পিছন দিক (দুই দিক) দুই হাতে ধরুন ; তার পর বুক সিধা রাখিয়া শুধু ঘাড় ফিরাইবেন—যতদূর পর্য্যন্ত ঘাড় ফিরানো চলে। একবার ডাহিনে, পরক্ষণে বাঁ দিকে ঘাড় ফিরাইবেন। চক্ষু মুদিবার প্রয়োজন নাই।

৫ নম্বর ছবি। চেয়ারের পিছনে গিয়া দাঁড়ান। চেয়ারের মাথা ধরুন শুধু বাঁ হাত দিয়া (ছবির ভঙ্গীতে)—তার পর চেয়ারের মাথায় বাঁ পা তুলিয়া দিন ; চেয়ারে পা ঠেকিবে না। যখন বাঁ হাতে চেয়ার ধরিবেন, তখন বাঁ পা তুলিতে হইবে। তার পর ঠিক এমনি ভাবে ডান হাতে চেয়ারের মাথা ধরিয়া ডান পা তুলিতে হইবে। এ ক্রিয়া চলিবে বেশ দ্রুত-তালে ; পা তুলিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইবেন না।

৬ নম্বর ছবি। সিধা খাড়া হইয়া দাঁড়ান। দুই হাত
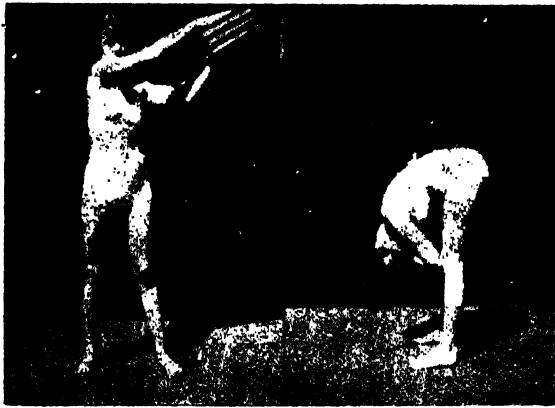
দুই হাঁটু স্পর্শ করিবে। স্পর্শ না করিলেও কনুই দুটিকে যথাসাধ্য দুই হাঁটুর কাছাকাছি আনা চাই। হাঁটু বাঁকিবে না বা দুমড়াইবে না, হুঁশিয়ার !

৩ নম্বর ছবি। দুই হাত পিছন দিকে ঝুলাইয়া কোমরের কাছে পুটবদ্ধ করুন ; এবং এক পা তুলিয়া ধীরে ধীরে হাঁটুন। হাঁটু যেন চিবুক স্পর্শ করে। পর-পর দু'পা তুলিয়া এ ব্যায়াম করিতে হইবে। দশ বার হইতে বিশ বার এ ব্যায়াম অভ্যাস করা চাই। এক-পায়ে

৩ দুই হাত পিছনে

৪ চেয়ারে বসুন ৫ পিছনে দাঁড়ান

৬ খোঁপার নীচে

৭ উঁচু ধাপ

মাথার খোঁপার নীচে পুটবদ্ধ করুন। দুই পা পাশাপাশি না রাখিয়া ছবির ভঙ্গিমায় রক্ষা করুন। তার পর বাঁ পা পিছনে বাড়াইয়া পায়ের আঙুলে ভর রাখুন—সঙ্গে সঙ্গে ডান পায়ের হাঁটু মুড়িয়া নতজানু হইবার ভঙ্গীতে থাকিতে হইবে। তার পর ঠিক এমনি ভাবে ডান পা পিছন দিকে বাড়াইয়া বাঁ পায়ের হাঁটু মুড়িয়া অবস্থান করিতে হইবে। এ ব্যায়াম চলিবে দশ-বারো বার।

৭ নম্বর ছবি। সিঁড়িতে বা উঁচু ধাপে বসিয়া একবার বাঁ হাত, পরের বার ডান হাত সিধা প্রসারিত করিয়া দিন। দশবার এই ব্যায়াম করা চাই।

পর-পর যে ক্রিয়ার উল্লেখ করিলাম—এমনি ভাবে পর্য্যায়ক্রমে এ ব্যায়াম নিত্য অভ্যাস করা চাই। এক মাসেই সুফল মিলিবে।

যাহাদের দেহে মেদ জন্মিতেছে, কিম্বা জন্মিয়াছে, তাঁহারা একটা লাঠি বা ছড়ি লইয়া ৮ নম্বর ছবি দেখিয়া এমনি ভঙ্গিমায় ব্যায়াম-চর্চ্চা করিলে মেদ ঝরিয়া দেহ সুছন্দে গঠিত হইবে
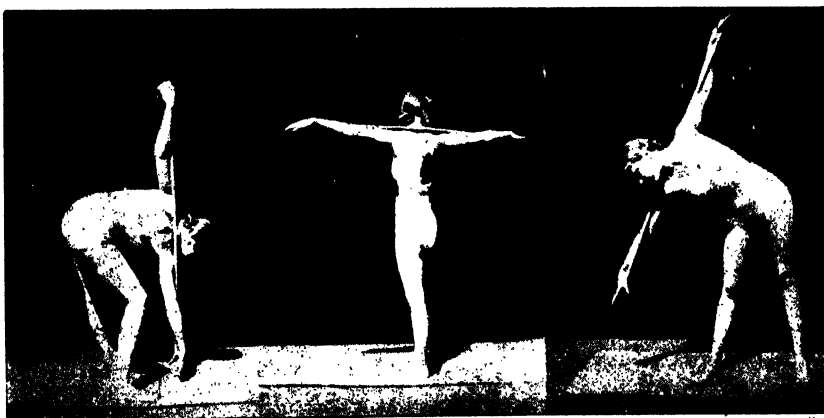
৮ লাঠির ব্যায়াম
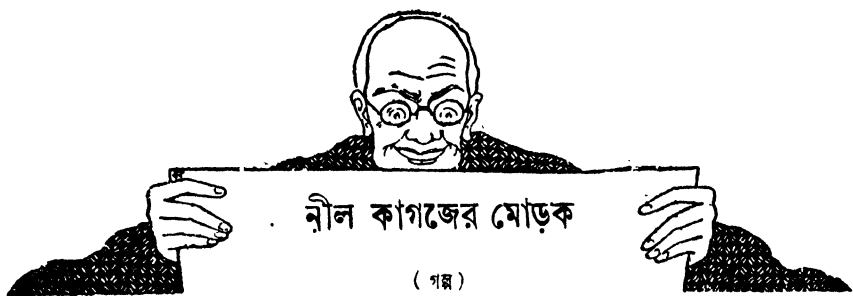
নীল কাগজের মোড়ক

(গল্প)

গোড়ার দিকের অনেক কথাই বলিতে পারা যায়; কিন্তু তাহা সব বলিতে গেলে অপ্রাসঙ্গিক হইয়া পড়িবে, কিন্তু কিছু না বলিলেও প্রসঙ্গটা বুঝিবার পক্ষে সুবিধা হইবে না।

বর্ত্তমানের শ্রীযুত রেবতীমোহন অতীতে যখন শ্রীমান্ রেবতী ছিল এবং যখন তাহার বয়স ছিল পঁচিশ কি ছাব্বিশ, তখন তাহার বৃদ্ধ পিতা তাহার বিবাহ দিবার জন্য কনে খুঁজিতে খুঁজিতে হঠাৎ গেলেন মারা। সুতরাং কাজটা ঐখানেই বন্ধ হইয়া গেল। অর্থাৎ পিতার মৃত্যুর পর বিয়ের জন্য ব্যস্ত না হইয়া, রেবতীমোহন তখন হইতে বৈষ্ণব-গ্রন্থাবলী লইয়া ব্যস্ত হইয়া পড়িল। কনে খোঁজার বদলে, সে তখন ভাগবত, চৈতন্যচরিতামৃত, বৈষ্ণবপদাবলী প্রভৃতি খোঁজাখুঁজি সুরু করিতে লাগিল। এই ভাবে বছর দশেক কাটিবার পর যখন তাহার বৃদ্ধা জননীও তাহার আলোচনা এবং গবেষণার মধ্যে তাহাকে একলা ছাড়িয়া দিয়া স্বর্গারোহণ করিলেন, তখন রেবতীমোহনের বহুদিনের পতিত হৃদয়ক্ষেত্রে হঠাৎ কোথা হইতে প্রেমের বীজ পড়িয়া অঙ্কুরিত ও সঙ্গে সঙ্গেই তাহা তরুর আকার ধারণ করিয়া ফলে-ফুলে মুঞ্জরিত হইয়া উঠিল। শ্রীযুত রেবতী তখন বাধ্য হইয়া কিছুদিনের জন্য তাহার গ্রন্থ-গবেষণা স্থগিত রাখিয়া, স্ত্রী অন্বেষণে মনোযোগ দিল। ক্ষেত্রে নামিয়া রেবতীমোহন দেখিল, বঙ্গদেশে বন্যা-প্রবাহের ন্যায় কন্যা-প্রবাহ বর্ত্তমান। তাহার অনুসন্ধিৎসু চক্ষু চারিদিকে একবার ফিরাইতেই রাশি-রাশি কুমারী কন্যার সংবাদ তাহার নিকট আসিয়া পড়িল। রেবতীমোহন অতি যত্নে তন্মধ্য হইতে বাছিয়া লইল ফরিদপুর নাজির-পাড়ার শ্রীমতী নবদুর্গা দাসীকে। সেই সময় নবদুর্গার বয়স কুড়ি এবং রেবতীর বয়স ছাব্বিশ আর দশ অর্থাৎ ছত্রিশ।

বিবাহের পর একটি যুগ কাটিয়া গিয়াছে। সুতরাং এখন শ্রীমতী নবদুর্গা কুড়ি ছাড়াইয়া—এ দেশের হিসাবে বত্রিশ বছরের বুড়ী হইয়াছে এবং রেবতীমোহনকেও উনপঞ্চাশীতে ধরি ধরি করিতেছে। এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে উভয়ের সুখের অপেক্ষা দুঃখে, শান্তির অপেক্ষা অশান্তিতে এবং ভাবের অপেক্ষা অ-ভাবেই কাটিয়াছে। কোথায় কিছু ত্রুটি হয় ত 'শুভদৃষ্টির' সময় অজ্ঞাতে ঘটিয়া গিয়াছিল, কোথায় কি-একটু কোষ্ঠির হয় ত গরমিল ছিল, যাহার ফলে এই দ্বাদশ বৎসরকাল ধরিয়া উভয়ের মধ্যে কলহের আর কামাই নাই। সে দিন নবদুর্গা স্বামীর অজ্ঞাতে এক জন দাড়িওয়ালা পাগড়া বাঁধা পাঞ্জাবী গণৎকারকে ডাকিয়া ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিয়াছিল। পাঞ্জাবাটি গণিয়া বলিয়াছিল যে, অষ্টোত্তরশতবার কলহের পর তবে কলহের নিবৃত্তি হইবে। কতবার ঝগড়া হইয়াছে, তাহার একটা সঠিক হিসাব নবদুর্গার কাছে আছে। নবদুর্গা দেখিল, একশ ছয়বার হইয়া গিয়াছে, আর তাহা হইলে দুইটিবার মাত্র বাকী। উভয়েরই অন্তরে এই দ্রব্যটির প্রবৃত্তি এরূপ প্রবল যে, আর মাত্র দুইটিবারেই তাহার নিবৃত্তি হইবে, ইহা ভাবিতে বিস্ময়ে ও সংশয়ে মন ভরিয়া উঠে।

যাহা হউক, বাকী দুইটির মধ্যে একটির শুভঘটনা সেই দিনই মহা সমারোহে সংঘটিত হইল। কারণটি খুব তুচ্ছ হইলেও ঝগড়াটি হইল খুব উচ্চশ্রেণীর। রাত্রিতে খাইতে বসিয়া রেবতী তরকারীতে হাত দিয়া কহিল, এটা কিসের তরকারী গা? নবদুর্গা কহিল, ঝিঙে পোস্ত।

মুখটা বিকৃত করিয়া রেবতী কহিল আবার ঝিঙে? যেটা একটা অখাদ্য বলুলেই হয়, সেইটেই রোজ রাঁধবে? কথায় বলে—

'পাখীর ওঁচা ফিঙে,
আর তরকারীর ওঁচা ঝিঙে।'

একটু শ্লেষের ফোড়ন দিয়া নবদুর্গা কহিল, ঝিঙেটা আমি একটু বেশি ভালবাসি—সেই জন্যে ঐ কার্ত্তিক মালীকে একটা ঝিঙে-ক্ষেত করতে বলেছি। তা যত দিন না সেটা তৈরী হয়, তত দিন এই রোজ মোটে আড়াই-সের করে বাজার থেকে—

রেবতী কট্‌মট্ করিয়া নবদুর্গার দিকে চাহিয়া রহিল।

নবদুর্গা একটু বিষাক্ত হাসি হাসিয়া কহিল, ভস্ম করবে না কি?

ভস্ম তুমি হোতে পারলেই তোমার পক্ষে ছিল ভাল? তা হোলে আর রোজ দুবেলা এই ছাই-ভস্মগুলো আমাকে খেতে হোত না। বলিয়া ঝিঙের তরকারিটা রেবতী থালা হইতে মাটীতে ফেলিয়া দিল।

নবদুর্গার সর্ব্বশরীর রাগে রি-রি করিয়া উঠিল। কহিল, রান্নাটা কাল থেকে নিজেই তা হোলে কোরো, আমি আর পারব না। আমি ত রাঁধুনী হিসেবে মাস-মাইনেতে বাবু-সাহেবের সংসারে আসি নি!

ধোঁয়া হইতে দপ্ করিয়া আগুন জ্বলিয়া উঠিল।

ভাতগুলা থালা উল্টাইয়া ফেলিয়া দিয়া, তরকারিটা নবদুর্গার গায়ে ছড়িয়া দিয়া, দুধের বাটিটায় লাথি মারিয়া রেবতী গর্জ্জাইল, তাই এনেছি—তাই এনেছি—তাই এনেছি।

সমস্ত ঘরখানা ভাতে, তরকারিতে, দুধে, জলে একাকার হইয়া গেল। বাড়া ভাত আর রেবতীর পেটে গেল না। হাত ধুইয়া আসিয়া সে আলো নিভাইয়া শয্যায় শুইয়া পড়িল। নবদুর্গাও অভুক্ত থাকিয়া, মেঝের একধারে স্বতন্ত্র শয্যা রচনা করিয়া শুইয়া পড়িল।

কয়েক দিন হইল ফরিদপুর হইতে নবদুর্গার পিতামহী তাহাকে দেখিতে আসিয়াছিলেন। নবদুর্গার কনিষ্ঠ সহোদর নিশিকান্ত ওকালতী উপলক্ষে কলিকাতার শ্যাম-বাজারে বাসা করিয়া থাকে। নবদুর্গার বাসায় পাঁচ সাত দিন থাকিয়া গঙ্গাস্নান করিয়া এখন তিনি সেইখানে গিয়া আছেন। কয়েক দিন সেখানে থাকিয়া দেশে চলিয়া যাইবেন, ১০৭ নম্বরের ঝগড়াটার ওজন বেশ একটু ভারি গোছেরই হইয়াছিল; সুতরাং তাহার ভারে পরদিন নবদুর্গা ভাইয়ের বাসায় চলিয়া গেল এবং সেখান হইতে পিতামহীর সঙ্গে একবার ফরিদপুর গিয়া হাজির হইল।

আষাঢ় মাসটা রাগের উপরই কাটিল। শ্রাবণ মাসের গোড়াতেই রেবতী নবদুর্গাকে পত্র দিল। তাহাতে লিখিল —১১ বছর বয়সেও তোমার ছেলেমানুষী গেল না। ঘর-সংসার করতে গেলে একটু-আধটু কথা-কাটাকাটি হয়ই। দুটো বাসন এক যায়গায় থাকলে ঠোকাঠুকি লাগেই, তাই বোলে কি রাগ করে সাত-সমুদ্দুর তের নদীর পার গিয়ে আমায় কাঁদিয়ে ব'সে থাকতে হয়? ধন্য তোমায়, দুর্গা! তোমার কঠিন প্রাণটাকেও ধন্য! আমি শয়নে-স্বপনে তোমাকেই খালি ভাবছি। আর পাগলামী কোরো না। সামনে ভাদ্র মাস; সুতরাং শীঘ্রই চলিয়া আসিবে।

নবদুর্গারও আসিবার জন্য প্রাণ ছটফট করিতেছিল। সে নিজের মনে বলিল, বাস্তবিক চ'লে আসাটা ভাল হয় নি। ১০৮ বার ঝগড়া ত হবেই! এ যখন বিধির বিধান, তখন এতে ত আর কারও হাত নেই। যা হোক, আর একবার বাকী। এবার কোন রকমে চোখ-কাণ বুজে চুপ ক'রে থাকব।

একটা ভাল দিন দেখিয়া নবদুর্গা কলিকাতা চলিয়া আসিল। ঠাকুরমা সঙ্গে কিছু আমচুর আর আমসত্ত্ব দিয়াছিলেন। সেইগুলির কিছু ভাইকে দিবার জন্য শিয়ালদ' হইতে চেতলা না গিয়া বরাবর শ্যামবাজারে ভাইয়ের বাসাতেই নবদুর্গা আসিল। তোরঙ্গের মধ্য হইতে আমচুর ও আমসত্ত্বগুলি বাহির করিল, ভাই নিশিকান্ত জিজ্ঞাসা করিল, ও কাঁথাখানা কিসের দিদি? নবদুর্গা কহিল, তলায় লেগে আমসত্ত্বগুলো খারাপ হয়ে যাবে ব'লে তোরঙ্গের নীচে ঠাকুরমা ওখানা পেতে দিয়েছিল। ও বহুকালের কাঁথা—ঠাকুরমার ছেলেবেলাকার। তার নিজের হাতের তৈরী।

নিশিকান্ত কহিল, বহুকালের যে, তা ত দেখেই জানা যাচ্ছে। কিন্তু নতুন বেলায় বেশ ছিল ত?

হ্যাঁ। ভারি সূক্ষ্ম কারিকুরি। দাদামশাই না কি এই কাঁথা গায়ে দিয়েই কত বড় বড় জায়গায় যেত। তুই রাখিস ত রাখ্। কিন্তু এতে আর কিছু পদার্থ নেই; যেখানে ধরবি, সেইখানেই খসে পড়বে; নইলে আর ঠাকুমা তোরঙ্গের তলায় পেতে দিয়েছে?

অতি সন্তর্পণে কাঁথাখানা ধরিয়া নিশিকান্ত দেখিতে লাগিল।

২

কয় দিন হইতে একটি লোক রেবতীর কাছে আসা-যাওয়া করিতেছে। মনে হয়, যেন ঐ লোকটি কোন দ্রব্য বিক্রয় করিবে এবং রেবতী তাহা কিনিবে। বিক্রেয় বস্তুটি কোন জমি-যায়গা নয়, কোন বাড়ী-ঘরও নয়, কিম্বা কোন বাগান, পুকুর, গরু, ছাগল, আলমারি, দেরাজ, ঘড়ি, বই, ছাতা, ছড়ি, গদি, তোষক, বাসন-কোসন, চাল-ডাল, দুধ-ঘি, কয়লা-ঘুঁটে, টিকে-তামাক প্রভৃতি কোন দ্রব্য নয়। হাত-খানেক লম্বা, মোটা নীল কাগজে জড়ান ছোট একটা মোড়ক। বস্তুটি তাহারই মধ্যে সযত্নে রক্ষিত। বোধ হয়, আসন্ন পূজার উপহারস্বরূপ নবদুর্গার জন্য কোন স্বর্ণালঙ্কারের পেটিকা। নেকলেস্, কি হার কি আর কিছু। কিম্বা তাহার জন্য কোন মূল্যবান সাড়ী, কি ব্লাউজ! কিন্তু—না না, তাহা ত নহে! তাহাই যদি হইবে, তাহা হইলে তাহা নবদুর্গার সম্মুখে না আনিয়া তাহাকে না দেখাইয়া, এইরূপ গোপনে দেখাশুনা এবং দর-কষাকষি কেন হইবে? তাহা হইলে কি কোন চোরাই-মাল; গোপনে আনিয়া, গোপনে বসিয়া, গোপনে গোপনে তাহার দর-দস্তুর হইতেছে?

যাহাই হউক, দুই দিন আনা-গোনার পর তাহার মূল্য স্থির হইয়া গেল এবং রেবতী নগদ এক শত এক টাকা দিয়া দ্রব্যটি ক্রয় করিয়া তাহা পরম ভক্তিভরে মাথায় ঠেকাইল। লোকটিকে কহিল, একখানা রসিদ দিতে হবে। লোকটি রসিদ দিলে, সেখানিও ঐ মোড়কের মধ্যে রাখিয়া আর একবার তাহা মাথায় ঠেকাইয়া আপাততঃ বৈঠকখানারই এক স্থানে অতি যত্ন সহকারে রেবতী রাখিয়া দিল।

সন্ধ্যার পর রেবতী নবদুর্গাকে কহিল, আজ একটি অমূল্য দ্রব্য কিনেছি।

নবদুর্গা কহিল, কি? রাগের ওপর আবার রাগিণী-টাগিনী কিছু যোগাড় ক'রে ফেলে না কি? শুধু রাগে হয় ত আর কুলুচ্ছে না।

রেবতী কহিল, ঠাট্টা নয়; দুষ্প্রাপ্য জিনিষ—অমূল্য বস্তু। এ দ্রব্য ঘরে থাকলে আর ঝগড়া-ঝাটি, দুঃখু-অশান্তি কিছুই থাকবে না, দুগ্‌গা! কিন্তু এখন আর বলছি না, পরে বোলবো। —আমার বহুদিনের সাধ যে হঠাৎ এমন ভাবে—

বহুদিনের সাধ ত তোমার একখানা বাড়ী কেনা। কিনলে না কি?

কলকাতায় বাড়ী কেনা কি আর আমার হয়ে উঠবে? আমার দু'চার হাজার পুঁজিতে আর এখানে বাড়ী করার আশা নেই। অথচ, চিরকাল ধ'রে এই রকম ভাড়া করেও আর আমি থাকছি না। ভূতের নাতির মত বাসাড়ে নাম আমি শীগ্‌গীরই ঘোচাব।

ভূতের নাতি মানে?

ভূতের নাতি মানে, একটা কথা আছে জান না?

'বাবাগের বেটা ভূত।
ভূতের বেটা—বিতিকিচ্ছি।
বিতিকিচ্ছির তিন ছেলে—
চোয়াড়ে, জোয়াড়ে, আর বাসাড়ে।'

নবদুর্গা কহিল, তা হ'লে বাড়ী করবে কোথায়?

কোল্‌কাতার বাইরে কোথাও। মনে করছি, হয় নবদ্বীপ, নয় অন্ততঃ খড়দ'।

ও-সব যায়গায় আমি থাকতে পারব না, তা কিন্তু আগে থাকতেই ব'লে রাখছি।

কেন? অপরাধ?

অপরাধ-টপরাধ জানি না; তবে মানে—কথা হচ্ছে, যে, সে আমি থাকতে পারব না। পাড়া-গাঁ; জল-কাদা, বন-জঙ্গল—

কিন্তু, কথা হোচ্ছে যে, চৌরঙ্গীতে কি গড়ের মাঠে বাড়ী করবার মত ত টাকা আমার নেই;—রেবতীর কণ্ঠ একটু তীব্র এবং চক্ষুর্দ্বয় অপেক্ষাকৃত বড় হইয়া উঠিল।

নবদুর্গা তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িয়া কহিল, পালাই বাবা এখান থেকে, এই নিয়েই হয় ত এখনই কুরুক্ষেত্রকাণ্ড বাধবে। বলিয়া দালানের দিকে চলিয়া গেল; যাইতে যাইতে কহিল, সেই অমূল্য বস্তুটি এই বেলা শীগ্‌গির একটুখানি গুলে খেয়ে ফেল।

রেবতী তাহার পিছন পিছন আসিয়া অতি মৃদু অতি মোলায়েম, এবং অতি অদ্ভুত ভঙ্গীতে কহিল, ফরিদপুরে নাজিরপাড়া বলে যে গ্রামটা আছে, সেটা বোধ হয়, বালী-গঞ্জ এভেনিউ বা লেক রোডের ওপরে নয়। সেখানে বোধ হয় যথেষ্ট বন-জঙ্গল এবং জল-কাদা। আর রাস্তা সেখান-কার পিচ ঢালা নয়। আর তার দু'ধারে সন্ধ্যার পর ইলেক্‌ট্রিক্ জলে না।

অনুরূপ ভঙ্গীতে নবদুর্গা কহিল, জন্মভোর সেখানে ত আমার কাটেনি! কেটেছে এইখানেই। তা কাটুক আর না কাটুক, আমি কলকাতা ছেড়ে কোথাও গিয়ে থাকতে পারব না; স্পষ্ট কথা।

থাকতে পারবে না?—রেবতীর চোখের দৃষ্টি ও মুখের ভিতর দিয়া যেন আগুন ছিট্‌কাইল।

না, পারব না। বলিয়া নবদুর্গা দালান হইতে আবার শয়নঘরের জানালার ধারে আসিয়া বসিল। পিছন পিছন রেবতীও আসিয়া দাঁড়াইল। ঝড়ের পূর্ব্ব-লক্ষণ। তাহার ভাব—গুরু-গম্ভীর; মুখে কথা নাই; ঝড় উঠিল বলিয়া।—ব্যাপার দেখিয়া নবদুর্গা কহিল, তোমার মৎলবখানা কি শুনি?

কট্‌মট্ করিয়া নবদুর্গার মুখের দিকে চাহিয়া রেবতী জিজ্ঞাসা করিল, খড়দায় গিয়ে যদি থাকি, তা হলে তুমি সেখানে গিয়ে থাকতে পারবে না?

না।

বলি, তুমি আমায় বিয়ে করেছ—না, আমি তোমায় বিয়ে করেছি?

দু'জনেই দু'জনকে বিয়ে করেছি।

সহসা ঘর ফাটাইয়া রেবতী চীৎকার করিয়া উঠিল, বলি—আমি স্বামী, না—তুমি স্বামী?

মুখখানা বিকৃত করিয়া নবদুর্গা উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, তুমি খড়দার গো-স্বামী।

ঝড় উঠিল।

রেবতী ক্ষিপ্তের মত সমস্ত ঘরের মধ্যে ছুটাছুটি করিয়া এটা-ওটা-সেটা টানিয়া টানিয়া মেঝের উপর ছুড়িয়া ফেলিতে লাগিল। বিছানার বালিশ ফেলিল, চাদর ছিঁড়িল, আলো ভাঙ্গিল, ফুলদানী উল্টাইয়া দিল, সুটকেশ ধরিয়া আছাড় মারিল, আলনা হইতে নবদুর্গার কাপড় লইয়া তাহা ফালা-ফালা করিয়া ছিঁড়িল; তার পর দেরাজে দুই চারিবার লাথি মারিয়া, ধড়াস্ করিয়া সশব্দে ঘরের দরজায় একটা ধাক্কা দিয়া, বাসা হইতে বাহির হইয়া গেল।

দালানের দেওয়ালে ঠেসান দিয়া বসিয়া নবদুর্গা মনে মনে হিসাব করিল, এই হ'ল—১০৮।

১০৮এর পর এক সপ্তাহ কাটিয়া গিয়াছে, কিন্তু এখনও উভয়ের মধ্যে বাক্যালাপ হয় নাই। নবদুর্গা ঘরের কাম-কর্ম্ম করে, রাঁধে-বাড়ে, রেবতীকে দেয়, নিজে খায়; তার পর মেঝের এক ধারে পৃথক শয্যা পাতিয়া শুইয়া পড়ে। আর রেবতী প্রায় সারাদিনই বাহিরের বৈঠক-খানাঘরে কাটায়, সেইখানেই কোশা-কুশী লইয়া জপ-তপ করে, পদাবলীর বই পড়ে, আর ভাবে। ভাবে যে, নবদ্বীপে যদি পাঁচ-সাতশ টাকার মধ্যে সুবিধামত কোন বাড়ী কিনতে পাই, তাহা হ'লে চমৎকার হয়। সুন্দর যায়গা। পবিত্র স্থান। জিনিষ-পত্র সস্তা। জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত দিব্য সুখ-শান্তিতে তা'হলে কেটে যাবে।

পরক্ষণেই ভাবে—কিন্তু তা কাটবে কি? 'আমি যাই বঙ্গে—আমার কপাল যায় সঙ্গে'। যে স্ত্রীটি আছেন, তাঁকে নিয়ে নবদ্বীপ ছেড়ে শান্তিপুর গিয়ে থাকলেও শান্তি পাবার জো নেই।—আবার কখনো ভাবে, নবদ্বীপে যদি সুবিধে না হয়ে ওঠে, তা হ'লে—খড়দা। একটা সমাজ যায়গা! কলকাতাও কাছে হবে। দিব্য গঙ্গার ধার। চমৎকার শোভা। সকাল বিকেল গঙ্গার ধারে এসে বসলে প্রাণ ঠাণ্ডা হয়ে যাবে!

বাবু, চিঠি আছে।

দুপুরবেলা আহারাদির পর রেবতী বৈঠকখানায় শুইয়া ঐ রকম সাত-পাঁচ চিন্তা করিতেছিল, সেই সময় পিয়ন আসিয়া একখানি পত্র দিয়া গেল। পত্রখানা পড়িয়া আনন্দে তাহার হৃদয় নাচিয়া উঠিল। মহা সুখবর! মৃত্যুসংবাদ!

নবদুর্গার পিতামহীর মৃত্যু হইয়াছে।

সঙ্গে সঙ্গেই রেবতী হিসাব করিয়া ফেলিল, তিন বছর অর্থাৎ ৩৬ মাসে ৩৬ টাকা প্রিমিয়ম দেওয়া হইয়াছে, অন্ততঃ শ'দুই টাকা ত পাওয়া যাইবেই।

ব্যাপারটা এই যে, নবদুর্গার পরামর্শে তাহার বৃদ্ধা পিতামহীর নামে কি একটা ইন্‌সিউর‍্যান্স কোম্পানীতে আজ বছর তিন হইল, 'ডেথ্ বেনিফিট' ইনসিওর করা হইয়াছিল। নবদুর্গাকে 'নমিনি' করিয়া রেবতী মাসে মাসে একটা করিয়া টাকা এই তিন বৎসরকাল যোগাইয়া আসিয়াছে। বুড়ী মরিলে পর একটা মোটা টাকা, অর্থাৎ

দুই শ'য়ের কম নয় এবং পাঁচ শ'য়ের বেশী নয়—নবদুর্গার অর্থাৎ রেবতীর হস্তগত হইবে। সেই শুভক্ষণ আজ উপস্থিত। সামনে পূজা। এই সময় এই রকম একটা দাও—। রেবতী যাহা ভাবিতেছিল, সে সব কথা ভুলিয়া গেল। মনের আনন্দ মনে লুকাইয়া, মলিন মুখে সে তখনি, যেখানে নবদুর্গা বসিয়া সুপারি কুঁচাইতেছিল, সেইখানে আসিয়া চিঠিখানা তাহার কোলের উপর ফেলিয়া দিল; কহিল, নাজিরপাড়া থেকে এসেছে।

চিঠিখানা পড়িয়া নবদুর্গার চোখ ছলছল্ করিয়া উঠিল। রেবতী একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কহিল, ভগবান কখন্ যে কাকে হঠাৎ টান্ দিয়ে টেনে নেন, তা আর বোঝবার জো নেই। এই ত তাঁর জগৎ! সবই বৃথা—ছুটো-ছুটি, লাফালাফি, বকাবকি, রাগা-রাগি—মানুষের এ সব কতক্ষণের জন্যে! আহা, বুড়ী ছিল, তবু—। অন্যদিকে রেবতী মনে মনে হিসেব করিতে লাগিল, দুশোর বেশীও পাওয়া যেতে পারে। দুশ' থেকে পাঁচ শ'র মধ্যে। তা দু'শোও পেতে পারি, তার বেশীও পেতে পারি। ভগবানের কি দয়া! সেদিনকার ১০১ টাকা সঙ্গে সঙ্গেই তিনি তুলে দেওয়ালেন। জয় গুরু!

কোলের উপর সুপারি ও জাঁতি রাখিয়া নবদুর্গা শাড়ীর আঁচলে ঘন ঘন চোখ মুছিতে লাগিল। রেবতী বিমর্ষ মুখে এক পা এক পা করিয়া চলিয়া আসিয়া বৈঠকখানায় প্রবেশ করিল।

দিন চার পাঁচ পরে রেবতী নবদুর্গাকে কহিল, পূজোয় এবার কি কাপড় তোমার পছন্দ বল? আর ব্লাউজ সেদিন একটা দোকানে যা দেখে এসেছি, তেমন আর দেখি নি। ভারি চমৎকার। সেই ব্লাউজ একটা তোমার জন্যে আমি কিনবোই। তোমাকে মনোমত ক'রে সাজাতে আমার যে কত সাধ, তা আর কি বলব তোমায়, দুর্গা। তুমি ত বুঝতে পার না যে, এই এতবড় বুকখানার সবটাই তুমি জুড়ে আছ!—ক'দিন হোল, তোমার চেহারাটা যেন একটু খারাপ হয়েছে। স্নান ক'রে মিছরির সরবৎ রোজ হয় খাও না? খেও একটু করে। নিজের শরীরটার ওপর একটু লক্ষ্য রেখো। আমাকে আর ভাবিয়ে তুলো না। যাক্, কি কাপড় এবার তোমার কিনবো বল দেখি?

নবদুর্গা কহিল, এবার তোমার টানাটানি, এবার আমার জন্যে আর তোমায় বিশেষ কিছু খরচ করতে হবে না। তোমার শরীরটাও যেন আগের চেয়ে খারাপ হয়ে গেছে। এত ক'রে বলি, আধসেরের ওপর আর এক পো করে দুধ খাও, তা ত কিছুতেই খাবে না তুমি! তোমাকে নিয়ে কি মুস্কিলেই যে পড়েছি আমি!

রেবতী হর্ষ-গদগদ স্বরে কহিল, জগতে স্বামি-স্ত্রীর সম্বন্ধ যে কি মধুর, কত ঘনিষ্ঠ, তা কি সকলে বোঝে? স্বামীর স্ত্রী আর স্ত্রীর স্বামী, এ ছাড়া জগতে আর কে আছে? একটা পরের মেয়ে আর একটা পরের ছেলে—কি ক'রে যে এমন এক হয়ে মিশে যায়, আমি তাই ভাবি।

নবদুর্গা কহিল, সকলেরই কি তাই হয়? আমরা মনে করেছি, সব স্বামি-স্ত্রীই আমাদের দু'জনের মত পরস্পর পরস্পরকে এই রকম ক'রে ভালবেসে এই রকম প্রাণে প্রাণে মিশে এক হয়ে আছে। কিন্তু তাই কি? যাক,—এবার আর আমার জন্যে তোমাকে এক পয়সাও খরচ করাব না। যা হোক কিছু আমি পাব ত?

কোত্থেকে?

কেন, ঐ ঠাকুমার দরুণ টাকাটা?

রেবতী যেন একটা হঠাৎ ধাক্কা খাইল। বলিল, কি বলছ, কিছু বুঝলুম না।

বলছি যে, আমি ত 'নমিনি'। সুতরাং যা পাবার, সে ত আমিই পাব। তুমি যে ৩৯৲ টাকা দিয়েছ, সেইটে তোমায় দিয়ে যা থাকবে, তাই থেকেই এবার সাড়ী ব্লাউজ কিনবো। তার পর যা থাকবে, সেটা আমার থাকবে।

থাকবে?

হ্যাঁ।

এক মিনিট রেবতী চুপ করিয়া রহিল। তার পর দেখিতে দেখিতে তাহার মুখখানা যেন ফুলিয়া উঠিল, চোখ দুইটা উজ্জ্বল হইল। গা-ঝাড়া দিয়া উঠিয়া বসিয়া কহিল, বুড়ীর দরুণ ও টাকাটা তোমার, না?

আমার নামেই ত আছে।

তা হোলে, ওটা তোমারই ত?

হ্যাঁ, আমার।

একটা বিকৃত, দুষ্ট হাসি হাসিয়া রেবতী কহিল, তা হ'লে ঐ গলার হারছড়াটা—ওটা তোমার? ওই অনন্ত-জোড়াটা—ওটাও তোমার? ঐ চুড়ি ক'গাছা, ঐ বালা, ঐ কাণের দুল, আলমারীভরা সব কাপড়-চোপড়—সবই তোমার? তুমি ঐ সব ব্যবহার কর ব'লে—ঐ সবই তোমার? এই বিছানা তোমার? ঐ সব ঘটি-বাটী, বাসন-কোসন, বাক্স-তোরং, চেয়ার-টেবিল, আলমারি—সব তোমার?—বলিতে বলিতে সহসা গলার আওয়াজ একেবারে পঞ্চমে তুলিয়া রেবতী চীৎকার করিয়া উঠিল, বল না; চুপ ক'রে ব'সে রইলে কেন? ব্যবহার কর ব'লে এ সমস্ত কি তোমার?—রেবতী শেষ কথাটায় এরূপ ভীষণ গর্জ্জন করিয়া উঠিল যে, মনে হইল, ঘরের ছাদ বুঝি বা ফাটিয়া গেল।

নবদুর্গা সেই পাঞ্জাবী গণৎকারকে মনে মনে গালি দিয়া, মনে মনেই তাহার উদ্দেশ্যে কহিল, মুখপোড়ার পোড়ার মুখে ছাই। আর একবার তাকে দেখতে পাই ত মুখেও তার খানিকটা উনুনের ছাই দিয়ে দি।

অর্থাৎ ১০৮ ছাড়াইয়া, আজ হইল ১০৯।

নবদুর্গাকে নীরব থাকিতে দিল না। রেবতী ভীমনাদে গর্জ্জাইল, তোমার-তোমার-তোমার। আমার-আমার-আমার!—তার পর তীব্র শ্লেষের সহিত ব্যঙ্গচ্ছলে বলিল, কি গো, তুমি ভাল আছ ত, নবদুর্গা? এই আমি—রেবতীমোহন বেশ ভাল আছি; তুমি কোন্ দেশ থেকে আসছ? আমি আসছি সেই আমীরনগর থেকে! তুমি-তুমি-তুমি, আমি-আমি-আমি? তোমার-তোমার-তোমার! আমার-আমার-আমার!

উঠিয়া দাঁড়াইয়া নবদুর্গা কহিল, একেবারে যে উন্মাদ হয়ে উঠলে? রক্ষে কর, টাকা আর আমি চাই না; আমার চোদ্দ পুরুষের ঘাট হোয়েছে! উঃ! কি সাংঘাতিক রাগ রে বাবা। আমার পূজোর কাপড়-ব্লাউজও চাই না, টাকাও চাই না। কিছু চাই না।

লাফাইয়া উঠিয়া রেবতী বলিল, তা কি হয়? টাকা যে তোমার! তোমার যে ঠাকুমা-মরা টাকা। আমাকে খালি ৩৬ টাকা দিয়ে দিলেই হবে'খন। আর তার সঙ্গে আড়াই পয়সা সুদ। টাকা এনে কোথায় রাখবে? তোমার বাক্সে, না আমার বাক্সে? হাঃ হাঃ হাঃ! তোমাদের বাড়ী কোথা? আমাদের বাড়ী সেই নবদ্বীপ—খড়দা!

নবদুর্গা রান্নাঘরে পলাইয়া গেল। যাইতে যাইতে বলিল, মাথায় একটু পেকো পুকুরের জল ঢেলে ঠাণ্ডা কর। গতিক খারাপ!

চোখ-মুখ লাল করিয়া রাগে ফুলিতে ফুলিতে রেবতী রান্নাঘরের দিকে ছুটিল। তাহার পর যে কাণ্ড হইল, তেমন বোধ হয় দু'এক মাসের মধ্যে ঘটে নাই। ঝগড়া-ঝাটি করারও যেমন শক্তি আবশ্যক, তা শোনারও তেমনি শক্তির দরকার। রেবতীর ঝগড়া শুনিতে আর আমাদের শক্তি নাই। সুতরাং সে দিনের কাণ্ডর কথা আর নাই-বা বলিলাম। তবে এইটুকু বলার দরকার যে, সেই দিনই বৈকালে ট্যাক্সি আনাইয়া নবদুর্গা শ্যামবাজারে তাহার ভাইয়ের বাসায় চলিয়া গেল এবং রেবতীও পরদিন প্রত্যূষে সংসার ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবার সঙ্কল্প করিল।

রাত্রিতে রেবতী কিছু না খাইয়া যখন শয্যায় গিয়া শুইয়া পড়িল, তখন হইতে বহুক্ষণ পর্য্যন্ত তাহার নিদ্রা আসিল না। সে শুইয়া থাকিয়া নানারূপ চিন্তা করিতে লাগিল। রাগের ভাবটা যদিও তাহার কমিয়া আসিয়াছিল বটে, কিন্তু বিরাগের ভাবটা সেইখানে এখন জাঁকিয়া বসিল। রেবতী ভাবিল, সংসার ত্যাগ করেই যেতে হবে, তবে তার আগে আর একটা কায ক'রে দেখলে হয়। দিনকতক কোথাও গিয়ে লুকিয়ে থাকলেই হয়। তা' হোলেই বিবিজান্ বুঝবে এখন, কত ধানে কত চাল। নাঃ—তাই করতে হবে। একটু জব্দ হওয়ার দরকার।

প্রভাতে শয্যাত্যাগ করিয়াই রেবতী চলিল—ভবানীপুরের দিকে লুকাইয়া থাকিবার জন্য বাসা খুঁজিতে। বাসা অনেক মিলিল, কিন্তু সুবিধামত মিলিল না। হয়—ভাড়া বেশী, নয় ত—এক বাড়ীতে ৫।৭ জনের সঙ্গে থাকিতে হইবে। অবশ্য আলাদা একটা বাড়ী লওয়া চলিবে না। তার ভাড়াও বেশী, দরকারও নাই। কাহারও বাড়ীর মধ্যে একখানা ঘর হইলেই তাহার চলিবে। দু'একটা মাস কোন প্রকারে সে অজ্ঞাতবাসে কাটাইবে। আর দুই বেলা হোটেল

হইতে খাইয়া আসিবে। কিন্তু বহুলোকের সঙ্গে এক বাড়ীতে কাটান—সে মহা অসুবিধা। সুতরাং সে একটা চায়ের দোকানে প্রবেশ করিয়া, সেখানে পবিত্রভাবে মাটীর ভাঁড়ে এক কাপ চা খাইয়া লইয়া আবার ঘরের খোঁজে বাহির হইল।

রমেশ মিত্র রোড, হরিশ চ্যাটারজী ষ্ট্রীট, বকুল-বাগান বাই লেন, মহিম হালদার ষ্ট্রীট, নন্দন লেন, বলরাম বসু ঘাট রোড, রোল্যটন ষ্ট্রীট প্রভৃতি খুঁজিয়া তাহার পছন্দমত অনেকগুলি বাটীতে খালি ঘর পাইল বটে, কিন্তু একটি মুস্কিল হইল যে, শুধু বেটাছেলেকে থাকিবার জন্য কেহই ঘর দিতে রাজী হয় না। এক যায়গায় রেবতী বলিল, একলা আমাকে ঘরভাড়া দেবেন না?

না।

না-দেবার হেতুটা কি?

হেতু আছে বই কি।

শুনতে পাই না?

অর্থাৎ—আপনি এক জন অজানা বেক্তি Third person, তাতে একলা, অর্থাৎ কি না singular number, জানেন ত, third person singular হোলেই verb-এর গায়ে s যোগ হয়। তার মানে বুঝতে পেরেছেন ত? অর্থাৎ Third person একলা হোলেই—বিপদ; তাঁর হরেক রকমের ক্রিয়াকাণ্ড ঘটবে। Third person, plural হলে আর কোন হাঙ্গামা নেই, তাঁদের ক্রিয়া singular; যেমন He বা She—goes, কিন্তু They—go সুতরাং, বুঝলেন না? একলা He-কে বা She-কে সহজে কেউ ঘর-ভাড়া দেবে না; They হতে হবে।

বাঃ! চমৎকার! আপনি দেখছি একজন মহাপণ্ডিত লোক!

চড়কডাঙ্গা হাইস্কুলে 5th classটি 'লিজ' নিয়ে ফেলেছিলুম। ইচ্ছে করলে তুড়ি দিয়ে ঐ গিয়ে পি, আর, এস পর্য্যন্ত হোতে পারতুম; কিন্তু ও-সব বাজে সখ আমাদের ছিল না।

চমৎকার! আপনি দেখছি, এক জন মহাশয় লোক। আপনার সঙ্গে দুটো কথা কোয়ে আজ ধন্য হোলুম।

তার পর ঘুরিতে ঘুরিতে আরও কয়েকটি ঘর রেবতী পছন্দমত পাইল, কিন্তু সর্ব্বত্র ঐ এক সুর;—একলা পুরুষ মানুষকে ভাড়া দেওয়া হইবে না। মনে মনে রেবতী সকলের উপর বিষম চটিয়া গেল। সকলের ত আর স্ত্রী থাকে না, তাহা হইলে তাহারা আর ঘর পাইবে না? খৃষ্টানদের স্বর্গীয় পিতা সেই যে ইভটিকে আদমের সঙ্গে গেঁথে পাঠিয়েছিলেন, এখনও পর্য্যন্ত তার আর ব্যতিক্রম ঘটাবার জো নেই! সম্প্রতি থিয়েটারে সে কি-একখানা বইয়ের অভিনয় দেখিয়াছিল;—যাতে এক যুবকের অনেকটা এই ধরণের বিপদের ব্যাপারই ছিল। সেই কথা ভাবিতে ভাবিতে শেষ যে বাড়ীটায় রেবতী গেল, সেখানে কহিল, দেখুন, ঘর আমার পছন্দ হয়েছে; কিন্তু আমি স-স্ত্রীক নই, অ-স্ত্রীক। আমাকে ভাড়া দিতে কোন আপত্য-টাপত্য হবে না ত?

বাড়ীওয়ালা বলিল, আপনি একলা থাকবেন? মেয়ে-ছেলে কেউ নেই?

একটি মেয়ে আছে। সেই মেয়ে—সেই ছেলে। অর্থাৎ বিধবা হয়ে এখন ছেলের মতই পিত্রালয়ে বাস। বুঝলেন না?

বুঝিছি। তা আপনার কন্যাকে নিয়ে যখন থাকবেন, তখন আর—

আপত্য কিছু নেই ত?

আজ্ঞে না।

রেবতী নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল। কিন্তু বাঁচার আরও একটু দেরী আছে। একটি কন্যা ত যোগাড় করিতে হইবে। তবে অ-স্ত্রীকের ঘর পাওয়ার মত নি-কন্যার কন্যা পাওয়া তত শক্ত হইবে না।

বেলা হইয়া পড়িয়াছিল। ঘুরিতেও হইয়াছে অনেক। সুতরাং স্নানটাকে সে-দিন মুলতুবী রাখিয়া রেবতী একটা 'কেবলমাত্র ভদ্রলোকের জন্য' ছাপ মারা হিন্দু হোটেলে প্রবেশ করিল। সেখানে আহারাদি সারিয়া পাণ চিবাইতে চিবাইতে দেখিল, একটি বছর ২৫।২৬ বৎসরের বিধবা যুবতী হোটেলের ঠাকুর-মশায়ের কাছে চুপটি করিয়া বসিয়া আছে। ঠাকুর-মশাইকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিল যে, মেয়েটি ব্রাহ্মণের মেয়ে, তিন কুলে আর কেউ নেই, এক যায়গায় রান্নার কায করিত; সেই কাযটি সম্প্রতি গিয়াছে, তাই ঠাকুর-মশাইকে আসিয়া সুপারিশ ধরিয়াছে, কোথাও যদি

একটু কায-কর্ম্ম···ইত্যাদি ইত্যাদি। রেবতী দেখিল, ভগবানের দয়া তাহার প্রতি অসীম। সে মেয়েটিকে বলিল, দেখ মা-লক্ষ্মি, রান্নার জন্যে আমার একটি লোক দরকার। আমি এই একলা লোক। দু'বেলা দুটি রেঁধে খাওয়া'তে পারবে, মা? কিন্তু ব'লে রাখি, মা-লক্ষ্মি, আমার বাসাতেই চব্বিশ ঘণ্টা তোমায় তা হোলে থাকতে হবে। রাজী আছ?

ঠাকুরমশাই কহিল, সে ত ওর পক্ষে ভালই হবে। ঘরভাড়াটা বেঁচে যাবে; দিব্যি মেয়ের মত থাকবে।

হাঁা বাবা; ঠিক ঐ নিজের মেয়ের মতই ভেবে থাকতে হবে। কারণটাও আমি তা হোলে খুলে বলি। —বলিয়া রেবতী ঘর ভাড়ার সম্বন্ধে আনুপূর্ব্বিক ব্যাপারটা খুলিয়া বলিল। সমস্ত শুনিয়া মেয়েটি রাজী হইল। কহিল, হাঁা বাবা, সে আমি বেশ থাকব।

ঠাকুর মশাই কহিল, তোমার বরাত ভাল; বেশ থাকবে তুমি। যাও, এখনি বাবুর সঙ্গে তা'হোলে চ'লে যাও।

তাহাই হইল। তখনি দু'জনে সেই বাড়ীতে আসিল। রেবতী বাড়ীওয়ালাকে ডাকিয়া কহিল, আজ থেকেই তা হোলে আপনার ঘর ভাড়া নিলুম। আমার মেয়ে হরিদাসীকে নিয়ে এলুম। ঘর আর দালানটা ও ঝাঁট্-টাট্ দিয়ে পরিষ্কার করুক, আমি জিনিষপত্রগুলো নিয়ে আসি।

রেবতী ঠিক করিয়াছিল, বেশী কিছু জিনিষপত্র আনিবার কোন আবশ্যক নাই। বড় জোর দুইটা কি তিনটা মাস অজ্ঞাতবাসে থাকিয়া নবদুর্গাকে একটু জব্দ করা মাত্র। সুতরাং তাহার চেতলার বাসা হইতে খালি লইয়া আসিল—একখানি ছোট তক্তাপোষ, সেই উপযোগী বিছানা, দু'চারিটা থালা বাসন, নিজের ব্যবহারের জামা কাপড়, দুই চারিখানা বই আর একটি ট্রাঙ্ক। ট্রাঙ্কের মধ্যে খরচের মত কিছু টাকা আর নীল কাগজের মোড়ক—সেই অমূল্য বস্তুটি।

রেবতী তাহার মা-লক্ষ্মীকে লইয়া নূতন বাসায় দিব্য দিন কাটাইতে লাগিল। মেয়ে রান্না-বান্না করে, বাপে-ঝিয়ে খায়। মেয়ে শোয় দালানে, বাপ শোয় ঘরের মধ্যে। বাপ মেয়েকে ডেকে বলে, হাঁা গা মা, কি আজ রাঁধবে বল দেখি? মেয়ে বলে, জগুবাবুর বাজারে কপি কড়াইশুঁটি না কি উঠেছে বাবা, নিয়ে এস; বড্ড খেতে ইচ্ছে করছে। রেবতী কন্যার জন্য তাহাই আনে।

বাড়ীওয়ালার গৃহিণী দুপুরবেলা মেয়ের সঙ্গে কথা-বার্ত্তা কয়। জিজ্ঞাসা করে, আর ভাই-বোন কেউ নেই?

একটি ভাই ছিল, ছোটবেলাতেই মারা গিয়েছে।

মা?

মা মারা গিয়েছে, এই বছর কতক হোলো।

তুমি বিধবা হয়ে থেকে পর্য্যন্তই বুঝি বাপের কাছে?

হাঁা; নইলে বাবাকে আর কে দুটি রেঁধে দেবে বলুন।

এইভাবে চলে।' দিন ১৪।১৫ পরে এক দিন সকালে বাড়ীওয়ালা-গৃহিণী তাহাকে বলিল, আজ আমরা সব দক্ষিণেশ্বর বেড়াতে যাব; যাবে তুমি?

হরিদাসী কহিল, কি ক'রে যাব বলুন? বাবা আজ দুপুরবেলা থাকবেন না, কোথায় যাবেন। ঘর ফেলে কোথাও যেতে বাবা বারণ করেছেন।

দ্বিপ্রহরে আহারাদির পর রেবতী কোথাও বাহির হইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া হরিদাসীকে কহিল, ওরা সব দক্ষিণেশ্বর গেল, তুমিও মা-লক্ষ্মী গেলে পারতে?

আমি অনেকবার গিয়েছি। ঘরে তালা দিয়ে দিলেন, বাবা? চাবিটা একবার দিন ত, আপনার গামছাটা বার ক'রে রাখি। বড্ড ময়লা হয়েছে, আজ কেচে দেবো। বলিয়া হরিদাসী রেবতীর হাত হইতে চাবি লইয়া ঘর খুলিল এবং গামছাখানি লইয়া পুনরায় তালা লাগাইয়া দিয়া রেবতীর হাতে চাবি দিয়া দিল।

অপরাহ্ণ পাঁচটার সময় রেবতী বাসায় ফিরিয়া আসিল। কিন্তু আসিয়া যাহা দেখিল, তাহাতে তাহার চক্ষু স্থির! ঘরের তালা খোলা, ঘর হাঁ-হাঁ করিতেছে। তাহার মা-লক্ষ্মীটি নাই এবং সেই সঙ্গে বাসন-কোসনগুলির একখানিও নাই, বিছানার চাদরখানা নাই, মশারিটা নাই, আর সকলের উপর ষ্টীল-ট্রাঙ্কটা নাই—যাহার মধ্যে টাকা কড়ি ছাড়া, নীল কাগজে মোড়া সেই অমূল্য বস্তুটি ছিল। আর কি আছে বা নাই, তাহা দেখিবার মত মনের অবস্থা বা অবসর তাহার ছিল না। সে তখনি হোটেলের সেই ঠাকুরমশায়ের কাছে ছুটিল।

ঠাকুরমশাই সমস্ত শুনিয়া কহিল, সে ত আমার জানা-শোনা কেউ নয় বাবু। কোথায় তার বাসা, কি

তার নাম, কিছুই জানি না। দিন দু'তিন আমার কাছে কাযের জন্য সে আসা-যাওয়া করেছিল।

রেবতী বাসায় ফিরিয়া আসিয়া মাথায় হাত দিয়া বসিল! সে বুঝিতে পারিল যে, হরিদাসী তাহার নিকট হইতে ঘরের চাবি চাহিয়া লইয়া তালা খুলিয়াছিল, কিন্তু তালা আর বন্ধ করে নাই। তালা বন্ধ করিবার ভাণ করিয়া খুব চতুরতার সহিত তাহা কোন রকমে লাগাইয়া রাখিয়াছিল মাত্র। যাহা হউক—বাসন-কোসন-গুলোর জন্যেও কিছু নয়, বিছানার চাদর বা মশারির জন্যেও কিছু নয়, গোটা পঞ্চাশ টাকা ট্রাঙ্কের মধ্যে যাহা ছিল, তার জন্যেও ততটা নয়, কিন্তু—সেই জিনিষটি! সেই নীল কাগজের মোড়ক!

রেবতীর চোখে জল আসিবার উপক্রম হইল।

শ্যামবাজার। নিশিকান্তর বাসা।

নবদুর্গা বসিয়া রেবতীর কথা ভাবিতেছিল,—আজ আঠার দিন হোল, তবুও দেখছি, রাগ এখনও পড়েনি। নেভবার আগে পিদ্দিম যেমন বেশী করে জ্বলে ওঠে, বোধ হয় এ-ও তাই হবে। গণৎকারটার কথাই বোধ হয় ঠিক; এইবার ঝগড়ার বোধ হয় শেষ। তবে ১০৮এর যায়গায় ১০৯ হোল এই যা। তা ফাউ বলে একটা জিনিষ আছে ত? ১০৮এর একটা ফাউ হওয়া ত উচিত। এ-ও তাই।

সেই সময় নিশিকান্ত আসিয়া সম্মুখে দাঁড়াইল। তাহার হাতে সেই নীল কাগজের মোড়কটি। নবদুর্গা জিজ্ঞাসা করিল, কি ওটা নিশিকান্ত? নিশিকান্ত কহিল, এটি একটি দুষ্প্রাপ্য জিনিষ। বলিয়া দিদির হাতে মোড়কটি দিয়া, সেইখানে মেজের উপর বসিয়া পড়িল। নবদুর্গা মোড়কটি খুলিতেই দেখিল, উপরে একখানি হাতে লেখা রসীদ রহিয়াছে। বিক্রেতা শ্রীনিবারণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ক্রেতা শ্রীযুক্ত রেবতীমোহন ঘোষের নিকট হইতে এক শত এক টাকা নগদ বুঝিয়া লইয়া······ইত্যাদি ইত্যাদি। নবদুর্গা কহিল, হ্যাঁ হ্যাঁ—আমায় বলেছিল বটে যে ১০১৲ টাকা দিয়ে এক মহামূল্য জিনিষ কিনিছি। তা, এ কি ব্যাপার বল্ দেখি?

নিশিকান্ত বলিল, ব্যাপারটা—ভাল করে একটু ভেবে না দেখলে ঠিক বুঝে উঠতে পাচ্ছি না, দিদি। এখন এটা পেলুম—রাজারামের ঘরে।

রাজারামটা কে রে?

রাজারাম হচ্ছে—সুরেশের ঐ টীনের বাড়ীর ভাড়াটে; একখানা ঘর নিয়ে থাকতো। ওর ভাড়া আদায়ের ভার ত আমারই ওপরে কি না। ব্যাটার কাছে আট মাসের ভাড়া ২৮ টাকা বাকী। রাজই বলে—আজ দোবো, কাল দোবো। সেদিন বল্লে, দেশ থেকে আমার ছোট ভগিনী এসেছে: ভবানীপুরে কোথায় রান্নার কায পেয়েছে। এইবার সব আপনার চুকিয়ে দিয়ে দোবো।—আজ গিয়ে দেখি, বেটা জিনিষপত্র সব নিয়ে পালিয়েছে। কোন্ ফাঁকে যে সরেছে, অন্য ভাড়াটে কেউ জানতেও পারেনি। ঘরে একটা পাঁচ পয়সার তালা লাগান ছিল। এখন গিয়ে সেটা ভেঙ্গে ফেল্লুম।

সেই ঘরেই বুঝি এটা পেলি?

হ্যাঁ, ঘরের একধারে পড়েছিল—এই নীল কাগজখানায় এলোমেলোভাবে জড়ানো; আমি গুছিয়ে-গাছিয়ে, এই রকম প্যাক্ করে নিয়ে এলুম।

লোকটা কি জাত?

বোল্‌তো ত ব্রাহ্মণ। গলায় পৈতেও একগাছা ছিল, কিন্তু আমার ত বিশ্বাস হয় না।

ভ্রাতা-ভগিনীতে তখন এই নীল-কাগজের মোড়ক লইয়া কথা-বার্ত্তা হইতে লাগিল।

* * * *

চেত্‌লা হইতে রেবতীর পত্র পাইয়াই আজ সকালে নবদুর্গা শ্যামবাজার হইতে চলিয়া আসিয়াছে। রেবতী লিখিয়াছিল, তাহার অসুখ।

স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া নবদুর্গা কহিল, তা'হোলে অসুখ-টসুখ সবই মিছে। তা মিছে কথা বলে আমায় আনলে কেন; আবার দুদিন বাদে ত ঝগড়া বাধিয়ে বিদেয় করে দেবে?

রেবতী কহিল, না দুর্গা, আর ঝগড়া করব না। আর অসুখ বলে যে লিখেছি, তা সত্যিই লিখেছি। শরীরে কোন অসুখ নেই বটে, কিন্তু মনের মধ্যে আমার ভয়ানক অসুখ; এক ত তুমি নেই—সে একটা মহা অসুখ, তার ওপর

আমি নেই, সেটা ত মহাসুখ ! ও বাজে কথা রেখে দাও। তার ওপর কি—সেইটে বল।

তার ওপর, ১০১ টাকা দিয়ে যে অমূল্য দ্রব্যটি পেয়েছিলুম, সেইটি আমার চুরি গেছে। লাভ করেও, কি জিনিস যে হারালুম, দুর্গা, তা আমিই জানি।

জিনিষটা কি বল দেখি ?

জিনিষটা ? সে আর কি বোলবো !—রেবতীর অন্তর ভেদ করিয়া একটি দুঃখের নিঃশ্বাস বাহির হইল। তার পর স-বিষাদে কহিল, শ্রীগৌরাঙ্গ যে কাঁথাখানি গায়ে দিতেন,—সেই কাঁথা। অমূল্য জিনিষ। দুষ্প্রাপ্য বস্তু।

তা, অত যে ঝগড়াটে, তার কাছে কখনো তেমন জিনিষ থাকে !

স-খেদে রেবতী কহিল, ঠিকই বোলেছ তুমি। মহাপাপীর কাছে সে পুণ্যময় জিনিষ থাকবে কেন ? আর আমি তোমার সঙ্গে ঝগড়া করব না।

তুমি যদি গৌরাঙ্গদেবের নাম নিয়ে দিব্যি করে বল যে, আর কখনো আমার সঙ্গে অন্যায় ঝগড়া করবে না, তা হোলে সেই কাঁথা আমি তোমায় এখনি দিতে পারি। সে কাঁথা আমার হাতে এসেছে।

লাফাইয়া উঠিয়া রেবতী কহিল, শ্রীগৌরাঙ্গের সেই কাঁথা ?

হ্যাঁ।—বলিয়া নিজের তোরঙ্গ হইতে সেই নীল-কাগজের মোড়কটি বাহির করিয়া বলিল, এই ত ?

মহা-উল্লাসে নবদুর্গার হাত হইতে মোড়কটি ছিনাইয়া লইয়া রেবতী বলিয়া উঠিল, এই—এই—এই—দুর্গা ! এই সেই জিনিষ !

তা, চুরি হোয়েছিল কি ক'রে ?

কি করে ?—ভয়ানক গরম ; রাত্রে দরজা খুলে শুয়েছিলুম। হঠাৎ দেখি, একটা হিন্দুস্থানী গোছের লোক, ঝাঁকড়া চুল,———সে সব ধীরে সুস্থে তোমায় বলব এখন। তা, তুমি কোথা থেকে পেলে, দুর্গা ?

আমি প্রথমে পেয়েছিলুম সেবার ঠাকুমার কাছ থেকে। তোরঙ্গে আরশুলার দাগ লাগবে বলে তলায় পেতে দিয়েছিলেন। আমি দিয়ে আসি—নিশিকান্তকে। নিশির একটা নতুন মক্কেল ওর সুক্ষ্ম সুচের কাজ দেখে অনেক করে ওটা চেয়ে নিয়ে যায় ! সেই লোকটাই সম্ভবতঃ ঐ জাল নিবারণ বন্দ্যোপাধ্যায়, যে তোমার কাছ থেকে ঠকিয়ে একশো একটি টাকা নিয়ে গিয়েছে। দুঃখের বিষয়—লোকটা একটা ছুটো মক্কেল ; নিশির সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ হবার কোন সম্ভাবনা নেই। তা থাকলে, হয় ত টাকাটা তোমার আদায় হোয়ে যেত।

রেবতী হাঁ করিয়া নবদুর্গার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল !

নবদুর্গা কহিল, তার পর তোমার কাছ থেকে কি করে চুরি হয়, তা জানি না। অবশেষে গিয়ে পড়ে ওটি ——— রাজারাম কিম্বা তার বোনের হাতে। সেখান থেকে পায় নিশি। নিশির কাছ থেকে পাই আমি।—তা, এখন দিব্যি কর, আর ঝগড়া-টগড়া করবে না ?

রেবতী অতিমাত্রায় বিস্মিত হইয়া কহিল, গৌরাঙ্গের নাম নিয়ে দিব্যি করে বলছি দুর্গা, আর তোমার সঙ্গে ঝগড়া করব না। তোমার সঙ্গে ঝগড়া করে থাকা কি আমার চলে ; তুমি হোলে আমার অর্দ্ধাঙ্গিনী—আমার সাত রাজার———বলিতে বলিতে রেবতী নবদুর্গার কাঁধ ধরিয়া, মুখখানা তাহার মুখের কাছে লইয়া গেল। নবদুর্গা তাহাকে ঈষৎ ঠেলিয়া দিয়া কহিল, অত ভালবাসায় আর দরকার নেই। তা হোলে হয় ত আবার ঝগড়া বাঁধিয়ে ফেলবে। তা, ঝগড়াতে আমার সঙ্গে তুমি যতটা মজবুত, বুদ্ধি-সুদ্ধিতে ত তেমন মজবুত নও ?

কেন ?

নইলে, শ্রীগৌরাঙ্গের কাঁথা বলে ঠকিয়ে একশ একটা টাকা নিয়ে গেল। এটা তোমার মাথায় এলো না যে, সে জিনিস কি যার-তার কাছে আছে, না, ১০১ টাকায় তা পাওয়া যায় ? মহাপ্রভুর গায়ের কাঁথা যে অমূল্য সম্পত্তি ! হাজার টাকাতেও যে সে জিনিষ পাওয়া যায় না ! তার দাম কি টাকায় হয় ?

রেবতী বোকার মত নবদুর্গার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। হাতে তাহার সেই———নীল-কাগজের মোড়ক।

শ্রীঅসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়।

তন্ত্রশাস্ত্রে দেবীমহাত্ম্য

সদসতের পরস্পরে বর্ত্তমানা হ্রীঁকাররূপিণী মহামায়া, যিনি স্বীয় মহিমায় গুণময়ী হইয়া আপনাকে বহুধা রচনায় নাম-রূপ ধারণে ঘোরা ও সৌম্যা, এবং সম ও বিষম ভাবে সৃষ্টি-সামঞ্জস্য করিতেছেন,—যাঁহার আরাধনায় চতুর্ব্বর্গ অনায়াস-লভ্য—ইহা যে শাস্ত্রে গীত, তাহা আগম-শাস্ত্র। আর প্রবৃত্তিলুব্ধ মানবকে কৌশলে নিবৃত্তিমার্গে উপনীত করিবার উপায় যাহাতে উপদিষ্ট, তাহাই তন্ত্রশাস্ত্র। বিষয়-বিষদষ্ট মানবকে চিকিৎসা দ্বারা নিরাময়-পদ্ধতি যাহাতে প্রকাশিত, তাহারই নাম তন্ত্রশাস্ত্র।

করুণাই যাঁহার মূর্ত্তি, এবং ত্যাগ যাঁহার ভূষণ, যিনি জগৎ-অমঙ্গল হলাহল পানে নীলকণ্ঠ, এবং জীব-শুভচিন্তায় যাঁহার অঙ্গকান্তিও শুভ্র, সেই মঙ্গলময় অঘোরনাথ-শ্রীমুখ-নিঃসৃত এই তন্ত্রশাস্ত্র পশুপতিমত বলিয়া প্রসিদ্ধ।

মনকে ত্রাণ করেন বলিয়াই মন্ত্র বা মহাবাক্য, গুরু ও ইষ্টসহ অভেদ ভাবনায় তন্ময়চিত্তে আবৃত্তির নাম জপ। হিংসা ও আড়ম্বরবিহীন এই জপযজ্ঞ তন্ত্রমতে শ্রেষ্ঠ সাধন। বিন্দু বিন্দু বারিপাতে কঠিন পাষাণ যেমন ক্ষয় পায়, তেমনই জপানন্দ ক্ষরণে চিত্ত বিগলিত হইয়া জগন্মাতার পাদপদ্মে বিলীন হয়। ইহাই শিববাক্য, এবং ইহা নিঃসংশয়। ঠাকুর বলেন—ডুবুরিরা শিকল ধ'রে যেমন সাগরতলে নেমে যায়, সেইরূপ নাম অবলম্বন ক'রে নামীর কি না ভগবৎপাদপদ্মে মন ডুবে যায়।

দ্বিজাতিগণ বৈদিকমার্গ অনুসরণে অপবর্গ লাভ করিবে; কিন্তু যাহারা দ্বিজ নহে বা দ্বিজকুলোদ্ভব হইয়াও পথিভ্রষ্ট, তাহাদের এবং সকল বর্ণের নরনারীর পরিত্রাণ বাসনায়, কর্ম্ম, জ্ঞান, ভক্তি ত্রিধারা মিলনে করুণাময় সদাশিব সুখ-সাধ্য যে তন্ত্রমত প্রচার করিয়াছেন, অর্ব্বাচীনের অপচেষ্টায় বিবৃত হওয়ায় অধুনা অনেকে তন্ত্রনাম শ্রবণে নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া থাকেন। কিন্তু তাঁহাদের ভাবা উচিত—এই দোষ তন্ত্রের না অপদার্থ অসংযমী উপাসকের?

আবার প্রকৃত তথ্য না জানিয়া কোন কোন পণ্ডিত কহিয়া থাকেন যে, বৌদ্ধধর্ম্মের বিকৃত অবস্থায় তন্ত্রের উৎপত্তি। এ মতও সমীচীন নহে। যদি কিছু হইয়া থাকে, তাহা উপতন্ত্র। ঋগ্বেদে "অহং রুদ্রেভির্ব্বসুভিশ্চরাম্যহমাদি-ত্যৈরুত বিশ্বদেবৈরিত্যাদি" দেবীসূক্ত ও "তামগ্নিবর্ণাং তপসা জ্বলন্তীং বৈরোচনীং কর্ম্মফলেষু জুষ্টাং", "দুর্গাং দেবীং শরণমহং প্রপদ্যে" রাত্রি-সূক্ততে মহাদেবীর আরাধনা বিশেষরূপে বর্ণিত। আবার কেনোপনিষদেও জানা যায়, দেবরাজ মহামায়াকে উমাং হৈমবতীং রূপে দর্শন করিয়া কৃতার্থ হন। পুরাণপাঠেও জানা যায়, ব্রহ্মা, ইন্দ্র, রাজা সুরথ ও অবতার পুরুষ শ্রীরামচন্দ্রও ভগবতীর আরাধনায় অভীষ্ট লাভ করিয়াছেন।

মহাভারত মোক্ষধর্ম্মপর্ব্বাধ্যায়ে দেখা যায় যে, ভূত-ভাবন ভবানীপতি মানবকল্যাণকামনায় যে পশুপতিমত প্রকাশ করেন, প্রসন্নচিত্তে প্রজাপতি দক্ষরাজকে উপদেশ করিতেছেন। এই সমস্ত আলোচনায় হৃদয়ঙ্গম হয় যে, মহা-দেবীর উপাসনাপদ্ধতি তন্ত্রশাস্ত্র অতীব প্রাচীন ও অশেষ-কল্যাণকর।

ভগবান্ কপিলদেব তাঁহার সাংখ্য-শাস্ত্রে চতুর্বিংশতি তত্ত্ব-প্রসবিনী যে অব্যক্ত প্রকৃতির মহত্ত্ব গান করিয়াছেন, তিনিই ভগবতী। আবার প্রবীণ পাশ্চাত্য দার্শনিকগণও একবাক্যে কহিয়াছেন—যাঁহা হইতে চরাচর বিশ্বসৃষ্টি, তিনিই অনির্ব্বচনীয় শক্তি, (force unspeakable)। তবে তাঁহারা মহাশক্তির উপাসনা সম্বন্ধে কোন বিশেষ প্রকরণ প্রকাশ করেন নাই। কিন্তু আর্য্যঋষিগণ যে পদ্ধতি অবলম্বনে সেই আদ্যাশক্তি অনির্ব্বচনীয় মহামায়ার সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছেন, তাহাই তন্ত্রশাস্ত্র।

যাঁহার পুণ্য প্রচেষ্টায়, অনুমান তিন শত বৎসর পূর্ব্বে, বাঙ্গালাদেশে আদ্যাশক্তি কালী ও জগদ্ধাত্রী দুর্গার প্রতীক (মূর্ত্তি) পূজার প্রচার হয়, সেই ভগবতীনন্দন কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ সমগ্র বাঙ্গালীর পূজনীয় ও চিরস্মরণীয় হইয়া আছেন, তিনিই নবদ্বীপধামে পশুপতিমত সাধনায় শিবত্ব লাভ করেন। তাঁহারই পদাঙ্কানুসরণে রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত প্রভৃতি সাধক মহাত্মারা তন্ত্রশাস্ত্র সাধনে

ভগবতীর দর্শন লাভ করিয়া, যখন দেশকে ধন্য করিয়াছেন, তখন মহান্ তন্ত্রশাস্ত্রকে কি করিয়া (নব্য-মতে) নিন্দনীয় বলা যায়?

অবিমুক্তক্ষেত্র বারাণসীতে সাধনপ্রভাবে নির্দ্বন্দ্ব হইয়া যিনি দ্বিতীয় বিশ্বনাথরূপে পূজা পাইয়াছেন, ঠাকুর বলেন—সেই সুদুর্লভ মহাপুরুষ ত্রৈলঙ্গস্বামী আদ্যাশক্তির উপাসনায় শিবত্ব লাভ করিয়াছেন। দেখিয়াছি, তাঁহার সমাধির উপর কালীমাতার প্রতিমা প্রতিষ্ঠিত।

পরিশেষে জগন্মঙ্গল ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণ যোগেশ্বরী ভৈরবী ব্রাহ্মণীর সহায়তায় বিল্বমূলে তন্ত্রসাধনায় শিবত্ব লাভ করিয়া তন্ত্রশাস্ত্রকে সমুদ্ভাসিত করিয়াছেন—শ্রদ্ধাবান্ পাঠক ইহাই অবধারণা করুন। ঠাকুর বলিতেন—মহাশক্তির আরাধনা বিনা কেহ শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিতে পারে না। শ্রীকৃষ্ণের ইষ্টদেবতা ত্রিপুরা ভৈরবী, ভগবান্ শঙ্করের অন্নপূর্ণা, নবদ্বীপচন্দ্রের অন্নপূর্ণা এবং নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর রাজরাজেশ্বরী।

বেদান্তশাস্ত্রে "সদেব সৌম্যেদমিদগ্রমাসীৎ একোমেবাদ্বিতীয়ং" বলিয়া পরব্রহ্মের মহিমা কীর্ত্তন করা হইয়াছে; কিন্তু কোথা হইতে আবার মায়া অবতারণা করিয়া মায়াকে ব্রহ্মের অবরোধক বলা হইয়াছে, অল্পবুদ্ধিতে তাঁহা বুঝা যায় না। তন্ত্রশাস্ত্র বলেন, যিনি সগুণ অবস্থায় পরমা প্রকৃতি (গণেশজননী), দুর্গা, রাধা, লক্ষ্মী, সরস্বতী প্রকৃতি পঞ্চধা ইতি বলিয়া আরাধিতা, তিনিই তুরীয় অবস্থায় পরব্রহ্ম। ইহাই তন্ত্রের মহত্ব। আবার সপ্তশতী শ্রীচণ্ডীতেও বর্ণিত আছে—"সা বিদ্যা পরমা মুক্তের্হেতুভূতা সনাতনী। সংসারবন্ধহেতুশ্চ সৈব সর্ব্বেশ্বরেশ্বরী॥" আবার "একৈবাহং জগত্যত্র দ্বিতীয়া কা মমাপরা।" বাস্তবিক পরব্রহ্মের পূর্ণভাব প্রকাশ দেবীমাহাত্ম্য ভিন্ন অন্য কোন শাস্ত্রে দেখা যায় না।

ঠাকুর তাঁহার সন্ন্যাসদাতা গুরু ন্যাংটাকে গুরুদক্ষিণা দানস্বরূপ বলিয়াছিলেন—পুরীজী! ব্রহ্ম ও শক্তি অভেদ, যেমন অগ্নি ও তার দাহিকাশক্তি, জল ও তার শৈত্য এবং পুষ্প ও তার সৌরভ—এক হতে অন্যকে প্রভেদ করা যায় না। আবার একই সাপ যেমন স্থির ও গতিশীল, অভেদ। যখন স্থির তখন ব্রহ্ম, যখন গতিশীল অর্থাৎ সৃষ্ট্যাদি কার্য্যতৎপরা, তখনই শক্তি; সুতরাং ব্রহ্ম ও শক্তি অভেদ।

শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ সান্ন্যাল।

আগমনী

নেহার নবীন উষা নব নীল গগনে।
(মায়ের) রাতুল চরণ-রাগ ফুটিয়াছে যতনে॥
তরুণ কিরণ মাখি
সমীরে খেলিছে পাখী,
প্রেমের পুলকে পাখী কুজনিছে কাননে—
জাগ রে জাগ রে নর
কুস্বপন পরিহর
প্রেমানন্দ হৃদে ধর দুর্গা বলো বদনে॥
শ্রীপদ পরশ আশে
সলিলে নলিনী হাসে
রাঙা জবা রক্তবাসে দুলিতেছে পবনে॥
বলে ফুল কুতূহলে—
তুলে দাও পদতলে
ধন্য হও, ধন্য কর ক্ষণিকের জীবনে॥

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বসু।

স্ত্রিয়াশ্চরিত্রং

(গল্প)

রূপ তরুণীর এবং রূপা তরুণের। তরুণের নাম সুশীল। তরুণী গীতা।

সুশীল বড়লোক,—তার অনেক টাকা। তিন পুরুষ ধরিয়া ষ্টক্-এক্সচেঞ্জে টাকার বনিয়াদ গাড়িয়াছে।

তরুণী গীতা আই-এ পাশ করিয়াছে। বেচারী! বালিগঞ্জ অন্নপূর্ণা বালিকা-বিদ্যালয়ে টীচারী করিয়া অন্ন-সংস্থান করিতে হয়। থাকে এভেন্যুয়ের কাছাকাছি ফ্ল্যাটের তিন-তলায় দেড়খানি কামরা ভাড়া করিয়া।

সুশীল তিন পুরুষ ধরিয়া টাকার চাষ করিতেছে। টাকার দাম সে জানে এবং মনটাকেও টাকা-পয়সার কোটিং দিয়া শক্ত করিয়া ফেলিয়াছে। সে-মন বাতাসে দোলে না, টলে না। টাকা রোজগার করিতে বসিয়া কোথায় কার মনে আঘাত দিতেছে, সেদিকে লক্ষ্য নাই।

পয়সার জন্য ষ্টক্-এক্সচেঞ্জকেই যারা সার বলিয়া জানে, মানুষ মারিতে তাদের হাত বা বুক কাঁপে না। তিন পুরুষের রক্তের গুণে সুশীলেরো বুক-হাত কাঁপে না। স্বার্থ যার মনে সিংহাসন পাতিয়া বসে, বিবেকের সে ধার ধারে না। সুশীলেরও তাই ঘটিয়াছে।

এখনো সে বিবাহ করে নাই। না করার বিশেষ হেতু ছিল না। করে নাই তার কারণ, কেহ বলে অবসরের অভাব! কেহ বলে, এদিক পানে চাহিবার···

যে যাই বলুক, বিবাহ হয় নাই, শুধু এইটুকু জানিয়া রাখা দরকার।

গীতার সঙ্গে সুশীলের প্রথম দেখা— ঠিক যেন সিনেমার ছবির মতো! অকস্মাৎ!

গীতা গিয়াছিল বালিগঞ্জ ষ্টেশনের ও-ধারে স্কুলের একটি মেয়ের জন্মতিথির ভোজে নিমন্ত্রণ।

রবিবার। বেলা তখন দুটা। রেলওয়ে-লাইন পার হইয়া গীতা ফিরিতেছিল। সহসা পথে একদল দুরন্ত মহিষ। সুশীল আসিতেছিল এই পথে টু সীটার মোটর হাঁকাইয়া—একা।

সহসা দুটা মহিষ শিঙ বাঁকাইয়া রুখিয়া দাঁড়াইল মোটরের সামনে। গাড়ী বাঁচাইতে গিয়া সুশীল একটা প্রকাণ্ড অশথ গাছের গুঁড়িতে খাইল ধাক্কা। গাড়ী উল্‌টাইল, সঙ্গে সঙ্গে সুশীল ছিটকাইয়া পড়িল। মাথায় চোট! গীতার আর্ত্ত চীৎকার···

চকিতে এতগুলা ব্যাপার ঘটিয়া গেল—ঠিক সিনেমার ছবির দৃশ্য···গোড়া হইতে যেন রিহার্শাল দেওয়া ছিল।

সেখানে আর কোনো লোক নাই। আই-এ পাশ করিলেও গীতা নারী। কাজেই সে ছুটিয়া গেল সুশীলকে দেখিতে।

সুশীল তখন উঠিয়া বসিয়াছে। তার মাথা কাটিয়া রক্ত ঝরিতেছে।

নিরুপায় দৃষ্টিতে গীতা চারিদিকে চাহিল। যে-লোকটার মহিষ, সে আসিয়া দেখা দিল। তাকে দেখিয়া গীতা কহিল,—বেহুঁশিয়ার হয়ে মোষ চালাস্। যা, শীগগির যা, যেখান থেকে পাস, জল নিয়ে আয়!

লোকটা ভয়ে হতভম্ব! গীতার কথায় জল আনিতে ছুটিল।

জল আসিলে মাথায়-মুখে জল দিয়া গীতা সুশীলের সেবা করিল। সুশীল প্রকৃতিস্থ হইল। গীতা তার মাথায় ভিজা রুমাল দিয়া পটী বাঁধিল। সুশীলের মুখে কথা নাই—চাহিয়া রহিল গীতার পানে। মনে হইতেছিল, এঞ্জেল।

পটী বাঁধিয়া দিয়া গীতা বলিল—আপনার গাড়ী তো চলবে না ?

নিশ্বাস ফেলিয়া সুশীল বলিল,—না। বলিয়া সে চাহিল গীতার পানে। ভাবিল, গাড়ী না চলুক, ক্ষতি নাই। এইখানে পথেই না হয় পড়িয়া থাকিবে! পথে চোট খাইয়া আজ যা পাইয়াছে···

সে-পাওয়ার কাছে আঘাতের বেদনা যেন উবিয়া গেছে!

গীতা বলিল,—আপনি কোথায় থাকেন ?

সুশীল বলিল—অনেক দূর···শ্যামবাজারে।

গীতা কহিল—সঙ্গে লোকজন নেই। গাড়ী চলবে না। কি করে আপনি বাড়ী যাবেন ?

একটা ঢোক গিলিয়া সুশীল বলিল—তাই ভাবচি। সুশীল চাহিল পথের প্রান্তে···

গীতাও চিন্তা করিতেছিল। এই বিপদ···জখম! কি করিয়া ভদ্রলোক···

সে বলিল—পথের চোট! একজন ডাক্তারের কাছে যাওয়া দরকার আগে।

সুশীল কোনো জবাব দিল না; সকৌতূহলে গীতার পানে চাহিয়া রহিল।

যত দায় এখন গীতার। সে বলিল—আমি থাকি পার্কের কাছে ফ্ল্যাটে। আমার ফ্ল্যাটে একজন ডাক্তার থাকেন। তাঁর কাছে অন্ততঃ··

সুশীল আরাম বোধ করিল। এখনি চোখের অন্তরাল নয়! তার উপর এঞ্জেলের ঠিকানাও জানিতে পারিবে।

একখানা ট্যাক্সি ডাকাইয়া সুশীলকে লইয়া গীতা আসিল তার ফ্ল্যাটে। ডাক্তার পরিতোষ বাবু গৃহে ছিলেন। তিনি ঔষধ দিলেন; সেই সঙ্গে একটা ইন্জেক্শন। পথের চোট···কি জানি, যদি টেটানাস··· সাবধানের মার নাই!

এ পরিচর্য্যা চলিল গীতার ঘরে।

ঘরখানি ছোট হইলেও সাজানো। এ যুগের রুচির নিখুঁৎ আদর্শ! গীতা শুধু দেখিতে শুনিতে ভালো, তা নয়, তার টেষ্টও ভালো!

সুশীল বলিল—আমি এবার আসি।

গীতা বলিল—বেয়ারাকে বলি একখানি ট্যাক্সি ডেকে দিক।

সুশীল বলিল—আপনাকে বড় বিব্রত করলুম!

গীতা সে কথা কাণে তুলিল না, ভৃত্যকে বলিল ট্যাক্সি ডাকিতে।

গীতা বলিল--আপনার গাড়ী ?

মৃদু হাস্যে সুশীল বলিল,—বাড়ী থেকে লোক পাঠিয়ে দেবো। তারা এসে কারখানায় গাড়ী নিয়ে যাবে।···ভাবনা নেই। গাড়ী ইন্‌শিওর করা আছে।

বেয়ারা আসিয়া বলিল, ট্যাক্সি আসিয়াছে।

সুশীল বলিল—যিনি আমার প্রাণ বাঁচালেন, তাঁর নাম জানতে পারি ?

—গীতা।

—এক সময় এসে আলাপ করবো। অপরাধ নেবেন না।

গীতা জবাব দিল না। তার মুখে সার্থকতার স্নিগ্ধ মৃদু হাসি।

সুশীল কহিল—ধন্যবাদ। নমস্কার!

—নমস্কার!

সুশীল চলিয়া গেল। খোলা খড়খড়ির সামনে গীতা চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। আকাশে-বাতাসে আজ যেন নূতন কিসের হিল্লোল বহিয়া চলিয়াছে!

পরের দিন সন্ধ্যার সময় সুশীল আসিয়া দেখা দিল। চায়ের পেয়ালাকে কেন্দ্র করিয়া মৃদু আলাপের সূত্রপাত!

সুশীল কহিল,—আপনাকে চাকরী করতে হয় ?

হাসিয়া গীতা বলিল—আত্মীয়ের বাড়ী গলগ্রহ হয়ে থাকার চেয়ে ভালো নয় ?

তার পর সুশীল আসিতে লাগিল নিত্য!

চায়ের পেয়ালা···এবং গল্প-স্বল্প।

এক সপ্তাহ পরে সুশীল বলিল—একটু বেড়াতে যাবেন ? অবশ্য এ অনুরোধে যদি অপরাধ না হয়···

হাসিয়া গীতা বলিল—কেন যাবো না? আপনি বলচেন···বেশ।

এক মাস পরে সুশীল আসিয়া কথায় কথায় জানাইল, এমন হইয়াছে যে এখানে না আসিলে সুশীলের সন্ধ্যা যেন বিফল হইবে, মনে হয়! সারা দিন কাজ কর্ম্মের মধ্যে মনে হয়, কখন্ সন্ধ্যা হইবে, কখন্ আসিবে লেক রোডে!

সে যে অনেক টাকার মালিক। জীবনটা কি করিয়া উপভোগ করিতে হয়, তা সে জানে। এ কয় দিনে সে ভালো করিয়া গীতাকে বুঝাইয়াছে···ইঙ্গিতে ভঙ্গীতে এ কথা জানাইয়াছে, সে বিবাহ করে নাই শুধু একটি কারণে। অর্থাৎ এ পর্য্যন্ত দেখা পায় নাই···কোথাও নয়, সে যেমন চায়···

কিন্তু এ সব কথায় গীতার দিক হইতে তেমন সাড়া জাগে না! এত বড় ধনী···তরুণ সুশীল···গীতাকে সে কামনা করিতেছে···তার দ্বারে নিত্য আসিতেছে···

কেন? কিসের আশায়? কি বাসনা মনে লইয়া···

গীতা তা বোঝে না? নিশ্চয় বোঝে!

গীতার ঘরের এই সজ্জা · পরিপাটী বেশ-ভূষা···এ সব দেখিয়া বুঝিতে বাকী নাই, গীতা চায় বাঁচার মতো বাঁচিতে—জীবনকে উপভোগ করিতে! ফিটফাট··· কোথাও এতটুকু clumsy নয়···

তার উপর এ-কালের মেয়ে! পাশ করিয়াছে··· টিচারী করে পয়সা-রোজগারের জন্য। তার সঙ্গে এমন অসঙ্কোচে বসিয়া হাসি-গল্প করিতেছে···

এ কথা বোঝে না···যে সুশীলকে বিবাহ করিলে গোলামী করিতে হইবে না, দুঃখ-অভাব ঘুচিবে? রাণীর মতো ঐশ্বর্য্য ··

কথায় বলে, রমণীর মন! তাই কি খেলিয়া খেলাইতে চায়?

কিন্তু সুশীল···তার যে কি হইয়াছে!

সুশীল আনিতে লাগিল উপহার···নিত্য। চকোলেট··· ফুল···স্ক্রীন-ষ্টারের ছবি···সেফটি পিন···কাণের দুল···

গীতা কোনোদিন অনুযোগ তোলে না···প্রত্যাখ্যানও করে না।

শিকারী? কিন্তু মন-বিহঙ্গ যে এ-ফাঁদের মায়া কাটিতে পারে না!

দুজনে বসিয়া গল্প করে। গীতা বলে, তার স্কুল-সেক্রেটারির বিরক্তি··মেয়েদের ফন্দি, অভিসন্ধির কথা। সুশীল বলে তার ষ্টক-এক্সচেঞ্জের গল্প। রণছোড়দাস গম্ভীর-মলের কাণ মলিয়া কেমন করিয়া দশ হাজার টাকা···

রাত্রি আটটা বাজে। গীতা বলে—আমার সেই নিত্য কাজ···মেয়েদের ট্রান্সলেশনের খাতা!

সুশীল ওঠে অনিচ্ছায়। কোনোদিন বলিতে পারিল না, আর একটু বসি।

গীতার কথার সুর সহজ হইলেও···কেমন যেন সুদৃঢ় আদেশের আমেজ-মিশানো···

কথায় কথায় গীতা বলিতেছিল—দুনিয়ায় বাস করতে হলে সব আগে চাই টাকা। টাকা না থাকলে জীবন মিথ্যা হয়। জ্যোৎস্না বলুন, জল-কল্লোল বলুন, মলয়-বাতাস বলুন, আর গজল-গানই বলুন—টাকা না থাকলে সব অচল, সব মিথ্যে।

এ-কথায় সুশীলের মনে প্রচণ্ড উৎসাহ জাগিল। সে বলিল—তাহলে গীতা দেবী, আমার আর্জ্জি? সোনার সিংহাসনে তুমি বসে থাকবে রাণী হয়ে···

দু'চোখে হাসির প্রদীপ জ্বালিয়া গীতা চাহিল সুশীলের পানে। সুশীলের শিরায়-শিরায় রক্ত নাচিয়া উঠিল।

সুশীল বলিল—আমি ভালোবাসি গীতা দেবী···

গীতা হাসিল, হাসিয়া বলিল,—ভালোবাসেন?··· আমাকে?

সুশীলের চোখে স্বপ্নাবেশ! সুশীল বলিল,—তাই···

গীতা বলিল—আমায় আপনি আশ্চর্য্য করলেন, সুশীল বাবু! ভালোবাসেন!···কিন্তু আমার কতটুকু আপনি জানেন? আমি কার মেয়ে? কেমন মেয়ে? আমার কি দাম? আমার কোনো ইতিহাস আছে কি না? এ বয়সে একলা বাস করি···চাকরি করি···এগুলো আমাদের দেশে সার্টিফিকেট পাবার মতো মোটেই নয় যে! তাছাড়া জীবনে আমি কি চাই? সে-সব কোনো পরিচয় না জেনে···?

সুশীল বলিল—তোমায় যেটুকু জেনেছি, সে জানা

আমার চরম জানা, গীতা দেবী ! তার বেশী জানতে আমি চাই না···জানবার দরকার নেই ।

সুশীলের স্বরে প্রচুর আবেগ ! সে আবেগের ঘোরে 'আপনি' ভুলিয়া সে একেবারে তুমি বলিয়া ফেলিয়াছে ।

গীতা বলিল—কিন্তু আর কাকেও যদি আমি হৃদয় দিয়ে থাকি ?

—না, তা হতে পারে না, গীতা দেবী । হৃদয় দিয়ে তুমি থাকবে বসে···যাকে হৃদয় দেবে, সে দূরে সরে থাকবে—তা হতে পারে না ।

গীতার দুই হাত নিজের হাতে চাপিয়া ধরিয়া সুশীল বলিল,—তুমি বলো, আমার আশা দুরাশা নয় ?

হাত ছাড়াইয়া লইয়া শান্ত স্বরে গীতা বলিল—শুনুন আমার কথা···স্থির হোন্···

উচ্ছ্বসিত আবেগে সুশীল বলিল—না না, আমি স্থির থাকতে পারবো না ! ··একটি কথা শোনো···তুমি যে বলো, টাকাই এ জীবনে সব-চেয়ে কামনার ধন ! সে টাকা তোমার হবে । আমি তোমায় এ-ক'দিনে কি ভালো-বেসেছি···

গীতা বলিল—আর যদি এ-কথা সত্য হয়, অন্য কারো সঙ্গে আমার বিয়ে হবে···স্থির হয়ে আছে ?

সুশীল বলিল—আমি বিশ্বাস করি না । তোমায় নেবার যোগ্যতা ক'জনের আছে ? তোমায় কে কি দিয়েছে ? কি দিতে পারে ? গহনা ? দামী শাড়ী ? মোটর ? মান-সম্ভ্রম ? ··আমার মতো ভালোবাসা···?

গীতা ক্ষণেক গম্ভীর হইয়া রহিল ; পরে বলিল—চট্ করে এ-কথার মীমাংসা হতে পারে না । দুদিন সময় দিন আমায়···একটু ভাবি ! ··ভালো কথা, এসে আমায় বললেন, সিনেমায় নিয়ে যাবেন ; ভালো ছবি আছে । প্রেমের কথা এখন থাক্···সিনেমায় চলুন । আমি আসি···এখনি তৈরী হবো'খন !

গীতা চলিয়া গেল ··বিদ্যুৎ-রশ্মির মতো !

সুশীল গুম হইয়া বসিয়া রহিল···পাষাণ···পাষাণ-প্রতিমা ! গীতা যে কি চায়···অথচ এমন সহজ অসঙ্কোচ কথাবার্ত্তা !

পাঁচ মিনিটের মধ্যে গীতা আসিয়া দাঁড়াইল দিব্য বেশে সাজিয়া । সে মূর্ত্তি দেখিয়া সুশীল বিহ্বল !

গীতা কহিল—উঠুন ।

সুশীল বলিল—একটা সামান্য জিনিষ নিয়ে এসেছিলুম··· যদি অনুমতি পাই ?

গীতার চোখের দৃষ্টিতে যেন তীক্ষ্ণ ছুরি ঝক্‌ঝকিয়া উঠিল···

গীতা বলিল—কি জিনিষ ? শুনি ।

—একটি আংটি ।

কেস্ খুলিয়া সুশীল আংটি বাহির করিল । হীরায়-খচিত । হীরার দীপ্তি যেন ঠিকরিয়া পড়িতেছে !

গীতা বলিল—পকেটে রেখে দিন । বলেচি তো—ও সব কথা আর নয় । আমি ভেবে দেখি : চলুন এখন সিনেমায়···

সিনেমায় গীতা কোনো কথা কহিল না । প্রেমের এক প্রগাঢ় দৃশ্য যখন পর্দ্দায় ফুটিয়াছে, সুশীল ডাকিল,—গীতা দেবী···

গীতা কহিল,—চুপ !···

সুশীলের সমস্ত আবেগ এই ছোট কথার আঘাতে ঝরিয়া মরিয়া গেল ।

সিনেমায় আর কোনো কথা হইল না ।

তিন দিন পরের কথা । স্থান,—লেকের দোলন-পুলের উপর ।

পশ্চিম-আকাশ রাঙা হইয়া উঠিয়াছে । সূর্য্য অস্ত গিয়াছে অনেকক্ষণ—তাহারি রক্ত-রাগ আকাশ কোথায় লুকাইয়া রাখিয়াছিল । সূর্য্য অস্তাচলে গেলে সেই রক্ত-রাগ চাদরের মতো নিজের গায়ে মেলিয়া ধরিয়াছে । একটা পাখী সে রঙ দেখিয়া মশগুল হইয়া পাতার আড়ালে ডাকিয়া উঠিয়াছে···গীতা চাহিয়াছিল সেই রাঙা আকাশের পানে···

তার হাতখানি চাপিয়া ধরিয়া সুশীল ডাকিল, —গীতা দেবী···

আবেগে গাঢ় গদগদ ভাষা ! দুই চোখে তীব্র ভর্ৎসনা ভরিয়া গীতা বলিল—আপনি পাগল করে তুললেন, দেখচি ! পথে-ঘাটে এ ভাবে কেউ প্রেম নিবেদন করে না !

সুশীল বলিল—আমার দুঃখে তোমার দয়া হয় না ?

—না ।···আপনি ভুল-পথে আমার মনে প্রবেশ করবার চেষ্টা করচেন । ফুল, চকোলেট, শাড়ী, দুল,

পিন এনে আমায় আপনি উপহার দিচ্ছেন! সেজন্য আমার কৃতজ্ঞতার সীমা নেই। এ সব জিনিষের সখ আমার খুব—তাও মানি। কিন্তু স্ত্রীলোকের মন কি এই দিয়েই পাওয়া যায়?···আপনার পয়সা আছে অঢেল··· তা থেকে দু'চার পয়সা খরচ করে যে-সব উপহার আপনি আনেন, আমার মনে হয়, যেন কৃপা-বৃষ্টি করচেন! ছেলেখেলার মতো! কিন্তু এর চেয়েও বেশী যদি আমি চাই?···দিতে পারেন?

সাগ্রহে সুশীল বলিল,—কি তুমি চাও, বলো··· মোটর-গাড়ী?

হাসিয়া গীতা বলিল—না। মোটরে চড়ার সখ আপনার দৌলতে আমার মিটেচে।

—তবে?···আমায় বিয়ে করলে জগতে তোমার কোনো অভাব থাকবে না, গীতা দেবী!···না, আমি মরীচিকার পিছনে আর ছুটতে পারবো না। বলো তুমি···আমার এ-আশা···

গীতা বলিল—বেশ, এ কথার জবাব আমি দেবো··· তবে এই লোকারণ্যে নয়।···একটা কথা শুধু এখন বলে রাখি সুশীল বাবু, যদি যথার্থ আমায় ভালোবাসেন, তাহলে এ সব তুচ্ছ উপহারে সে ভালোবাসা নিবেদন করবেন না। উপহার যদি দিতে চান···এমন উপহার দিন, যার জন্য আমার মন কাঙাল হয়ে আছে।

—কি সে···বলো আমায়!

গীতা বলিল—আপনাকে আমি বলেচি তো···গোপনতা রাখিনি···আমি বাঁচার মতো বাঁচতে চাই। এবং··· বেশ, কি আমি চাই, বলচি। আপনি দেখেচেন, আমার ড্রেশিং টেবলের উপর একটা ফুলদানী আছে। সে ফুলদানী কাশ্মীরী···পুরোনো জিনিষ! আমার বাবা ওটি কিনে-ছিলেন··যখন কাশ্মীরে যান, তখন। একটি নয়, একজোড়া। তিনি মারা যান অনেক দুঃখ পেয়ে··সে সময় পয়সার অভাব হয়। ফুলদানীর একটি তিনি বেচে দেন। সেটি বেচে যে ব্যথা পান, সে ব্যথা সইতে পারেননি—সে ব্যথা বুকে নিয়ে তিনি মারা যান। সে ফুলদানী কোথায়, আমি সন্ধান জানি। আমার সাধ, সেটি কিনি। কিন্তু যে লোকের কাছে সে ফুলদানী আছে, সে পণ করেছে, সেটা বেচবে না।···সেজন্য আমার কি দুঃখ···

গীতা নিশ্বাস ফেলিল।

সুশীল বলিল,—এই কথা! সে ফুলদানী আমি এনে দেবো। যত টাকা দাম লাগে। তুমি বলো, কার কাছে সে ফুলদানী আছে···

গীতা বলিল—ঠিকানা লেখা আছে আমার ডায়েরিতে। বাড়ী ফিরে আপনাকে ঠিকানা দেবো।

সুশীলের মনে হইল, মনের আকাশে এতকাল ধরিয়া যে-মেঘ জমিয়া আছে, এবারে সে মেঘ কাটিবে!

সুশীল বলিল,—সে ফুলদানী এনে দিলে আমার আশা তুমি পূর্ণ করবে? আমার স্ত্রী···

বাধা দিয়া গীতা বলিল—এ জবাব পাওয়া শক্ত হবে না, সুশীল বাবু।

সুশীল ভাবিল, তুচ্ছ একটা ফুলদানী! একখানি চেক কাটিবার ওয়াস্তা শুধু!

সেই রাত্রেই নাম-ঠিকানা মিলিল। মহা-উৎসাহে সুশীল বলিল—কাল তুমি এ ফুলদানী পাবে। যদি সে লোক ফুলদানীটি না বেচে থাকে···একটা নিশ্বাস ফেলিল; ফেলিয়া বলিল—তুচ্ছ ফুলদানী! হুঁঃ! এ-কথা এতদিন কেন বলোনি গীতা দেবী?

গীতা বলিল—এতদিন কি-চেষ্টাই করেছি সে ফুল-দানীর জন্য!

—আর ভাবনা নেই। কাল তুমি এ ফুলদানী পাবে।

গীতা বলিল—কিন্তু তার একেবারে ধনুর্ভঙ্গ পণ!

হাসিয়া সুশীল বলিল—হরধনু ভেঙ্গেছিলেন রামচন্দ্র··· আর এ ফুলদানী-ধনু ভাঙ্গবে শ্রীমান্ সুশীল। রামচন্দ্র হরধনু ভেঙ্গে পেয়েছিলেন সীতা দেবীকে···আমি পাবো গীতা দেবীকে!···কিন্তু মনে থাকে যেন, ফুলদানীর বিনিময়ে পাণি-বিনিময়!

গীতা বলিল—আগে ফুলদানী সংগ্রহ করুন···

উৎসাহ-ভরে সুশীল বলিল,—না, আমি চাই স্পষ্ট কথা।···রাজি?

গীতা বলিল,—বেশ, রাজি। যদি জেতেন···

হাসিয়া সুশীল বলিল,—গীতা দেবী নাম বদলে তুমি হবে শ্রীমতী সুশীলা দেবী।

একটা তুচ্ছ ফুলদানী !

সুশীল ভাবিল, রূপার টাকা ! তার জোরে কি না পাওয়া যায় ! ফুলদানী···নারীর রূপ···

ষ্টক-এক্সচেঞ্জের পথে চিত্তরঞ্জন এভেন্যুর উপর জীর্ণ একটা ফ্ল্যাট। ড্রাইভারকে পাঠাইয়া সুশীল সংবাদ লইল, এ ফ্ল্যাটের চার তলায় মেশ। সেই মেশের ঘরে থাকে অমরেশ।

অমরেশকে চাই। গীতা নাম-ঠিকানা দিয়াছে,—অমরেশ সামান্য টুকিটাকি বেচিয়া দিনাতিপাত করে। তার কাছে আছে ফুলদানী।

সুশীল ভাবিল, অবস্থা দেখিয়া মনে হয়, তার জয় নিশ্চিত। এই ভাঙা বাড়ীর তিন তলার মেশে যে বাস করে, তার খাঁই কতই বা ! পাঁচ টাকা ? দশ টাকা ? বড় জোর, পঞ্চাশ ? ফুলদানীটি দিবার পথ পাইবে না ! তখন···

বুকের মধ্যে হাইল্যাণ্ডার দলের ব্যাগ-পাইপ বাজিয়া উঠিল···বিজয়-উল্লাসে !

সুশীল তিন তলায় উঠিল। অমরেশকে পাওয়া গেল।

ছোট ঘর—রাজ্যের টুকিটাকি দ্রব্যে ঘর ভরিয়া আছে।

সরু একখানা তক্তাপোষে বসিয়া এক জন যুবক নিবিষ্টমনে কতকগুলা কাগজ লইয়া হিসাব লিখিতেছে···

সুশীল সে-ঘরে ঢুকিয়া প্রশ্ন করিল—অমরেশ কার নাম ?

যুবক ফিরিয়া চাহিল, পরে উঠিয়া দাঁড়াইল ; তার পর কহিল,—আমার নাম অমরেশ।

সুশীল কহিল,—হুঁ !···

ক্ষণেক তাকে লক্ষ্য করিল ; তার পর বলিল,—তোমার কাছে একটা কাশ্মীরী ফুলদানী আছে ?

—আছে।

—দেখি।

অমরেশ ফুলদানী বাহির করিল। সুশীল ফুলদানীটি হাতে লইয়া দেখিল, দেখিয়া বলিল—ঠিক ! এটি আমি কিনতে চাই। কত হলে দেবে ? এক-দর বলো···

মৃদু হাস্যে অমরেশ বলিল,—কিন্তু এটি আমি বেচবো না।

বেচিবে না ! পাগল আর কাহাকে বলে ! ফুলদানীর চেয়ে নগদ টাকার দাম অনেক বেশী !

সুশীল কহিল—তুমি ব্যবসা করো তো ?

—করি।

—তবে ?···ফুলদানীতে ফুল শুঁকে কারো পেট ভরে না বাপু !

কথা শুনিয়া অমরেশ চমকিয়া উঠিল। জানা নাই, শুনা নাই, খরিদদার ! সে আসিয়া একেবারে হিতোপদেশ-গ্রন্থ রচিতে বসিয়া যায় ! আশ্চর্য্য লোক !

সুশীল কহিল—এই নাও পাঁচ টাকা···দাও ও-ফুলদানী !

অমরেশ কহিল—কিন্তু···

—বেশ, বেশ।' দর বাড়াতে চাও ? এই দশ টাকা দিচ্ছি···আর কথা কয়ো না···

অমরেশ বলিল—ও-ফুলদানী আমি বেচবো না।

—বেচবে না ? সুশীল ক্ষণেক স্তব্ধ রহিল, তার পরে বলিল,—সেন্টিমেন্ট ! ব্যবসা করতে বসে সেন্টিমেন্ট দেখলে চলে না। বেশ, পনেরো টাকা দিচ্ছি···

অমরেশ বলিল—কিন্তু !···

আবার কিন্তু ?···

সুশীলের রোখ চড়িয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে দাম চড়িতে লাগিল···

চড়িয়া উঠিল তিনশো টাকায়।

অমরেশ কুণ্ঠা-ভরে কহিল—আজ্ঞে···

সুশীল রাগিয়া গেল ; কহিল—ও, সাধচি বলে' তোমার খাঁই বেড়ে চলেছে ! বেশ, আমি চাই না ও-ফুলদানী··· বিলিতি দোকানে ওর চেয়ে ঢের ভালো ফুলদানী পাবো'খন এবং কম দামে। নেহাৎ জোড়-ভাঙ্গা হয়ে আছে বলেই খপর পেয়ে এসেছিলুম···

সুশীল নামিয়া আসিল···ঝোঁকের মাথায় একেবারে একতলায়···

তার পর দাঁড়াইয়া কি ভাবিল। ভাবিয়া আবার সিঁড়ি বহিয়া তিন তলায় উঠিল। উঠিয়া অমরেশের ঘরে···

অমরেশ তখনো দাঁড়াইয়া আছে···তার হাতে ফুলদানী।

সুশীল কহিল—শোনো, পাঁচশো টাকা পর্য্যন্ত দিতে রাজি। নগদ···আর কথা কয়ো না···পাঁচশো টাকায় ব্যবসা ফ্যালাও করে তুলতে পারবে'খন ! নেহাৎ আমার ঝোঁক পড়েচে···

অমরেশ তবু নড়িতে জানে না। সে জবাব দিল না।

সুশীল ভাবিল, লোকটা ভয়ঙ্কর ফন্দীবাজ তো! কি ভাবিয়াছে?

সুশীলের আপাদ-মস্তক জ্বলিয়া উঠিল। এমন বেয়াদব! কিন্তু বাজি রাখিয়াছে গীতার কাছে···তার এত বড় মুখ ছোট হইবে? পরাজয়ের কালি মাখিয়া সেখানে গিয়া কি বলিয়া দাঁড়াইবে? লেখাপড়া-জানা এ-কালের মেয়ে···তার বচনে ধার আছে! না···

সুশীল উঠিল দেড় হাজার টাকায়···অমরেশ তবু কাঠ!

সুশীল পার্শ বাহির করিল···নোটের তাড়া গণিয়া দু'হাজার টাকা···

সে তাড়া অমরেশের হাতে গুঁজিয়া দিয়া বলিল,—এই নাও দু'হাজার। জন্মে কখনো এত টাকার মুখ দেখবে না।···নাও, হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলো না। হিঁদুর ছেলে তো···মা-লক্ষ্মীর অপমান করো না।

একটা নিশ্বাস ফেলিয়া অমরেশ কহিল—আপনার যখন এত ঝোঁক···বেশ, নিন ফুলদানী···

ফুলদানীটি হাতে লইয়া দুই চোখে অগ্নিবৃষ্টি করিয়া সুশীল চাহিল অমরেশের পানে···তীব্র আক্রোশভরা স্বরে কহিল—Downright cheating···এ-ভাবে ব্যবসা করলে একদিন জেলে যাবে···বুঝলে!

কথাটা বলিয়া সুশীল এক-মুহূর্ত দাঁড়াইল না···চলিয়া আসিল।

অমরেশ তক্তাপোষের উপর পড়িয়া হা-হা উচ্চহাস্যে আপনাকে একেবারে লুটাইয়া দিল।

গাড়ীতে উঠিয়া সুশীল ভাবিল, এবারে তুমি গীতা···রূপ-যৌবনের মায়ায় তাকে মুগ্ধ করিয়া···দু'হাজার···দু'হাজার টাকা তোমার দাম···নারী!

ড্রাইভার কহিল—অফিস যাবো?

সুশীল বলিল—হ্যাঁ···

ভাবিল, এ দু'হাজার টাকা তুলিতে কতক্ষণ!

তার পর···

সন্ধ্যার সময় গীতার ঘর।

সুশীল আসিয়া বলিল—চলো সিনেমায়···সাড়ে নটার শো···

গীতা বলিল—আজ যাবার উপায় নেই। কাল স্কুলে প্রাইজ আছে। আমায় আজ এখনি স্কুলে যেতে হবে। কখন্ ফিরবো, জানি না। সারা দিন কাজে ব্যস্ত থাকবো। পরশুর আগে ছুটী মিলবে না।

সুশীল বলিল—কিন্তু তোমার সঙ্গে যে আমার খুব দরকারী কথা ছিল। জীবন-মরণের কথা···

কুতূহলী দৃষ্টিতে গীতা চাহিল সুশীলের পানে।

সুশীল বলিল,—সেই ফুলদানী আর তার সঙ্গে যে বাজি···

—পেয়েছেন ফুলদানী?

গীতার স্বরে কি উল্লাস!

সুশীল বলিল—পেয়েছি। সে ফুলদানী তোমায় দেবো শুভ লগ্নে···যে লগ্নে তুমি তোমার কথা রক্ষা করবে। যে কথা আছে···

গীতা বলিল,—কিন্তু ফুলদানী! সে লোকটি বেচেছে আপনাকে! আশ্চর্য্য···

হাসিয়া বিজয়-দৃপ্ত স্বরে সুশীল কহিল—রূপোর টাকা···তার শক্তি অমোঘ, গীতা দেবী!

—তাই দেখচি। কিন্তু আমায় ক্ষমা করবেন সুশীল বাবু, আমাকে এখনি স্কুলে যেতে হবে···

—বেশ···পরশু এসে দেখা করবো।

মাথা নাড়িয়া গীতা বলিল,—তাই আসবেন। এখন আমার কোনো দিকে চাইবার সময় হবে না। ফুলদানী সেই দিনই আনবেন।

সুশীল বিদায় লইল। পাষাণী!···শুধু টাকা চিনিয়াছ! এ বয়সে তোমার মনে ভালোবাসার রেখাও পড়ে নাই! এত দিনের এতখানি অন্তরঙ্গতা···

মরীচিকা!···

সুশীল নিশ্বাস ফেলিল!

দু' দিন কাটিয়া গেল। কি করিয়া কাটিল···সুশীল ভাবিয়াছিল, এ দুটা দিন কোনো কালে কাটিবে না!···

কথা-মতো সেদিন সন্ধ্যায় সুশীল আসিয়া দেখা দিল গীতার ফ্ল্যাটে···ঘরের দ্বারে তালা।

গীতা?

সংবাদ মিলিল, গীতা এখানকার বাস। তুলিয়া চলিয়া গিয়াছে।

চলিয়া গিয়াছে!

পাশের ঘরের ভদ্রলোক বলিলেন,—আপনার নাম সুশীল বাবু? আপনার আজ আসবার কথা ছিল?

ঢোঁক গিলিয়া সুশীল বলিল,—হ্যাঁ।

—ও! তা আপনার জন্য একখানি চিঠি রেখে গেছেন। আনি…

একটু আরাম! সুশীল স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিল। গীতা তবে ভোলে নাই!

ভদ্রলোক খামে-মোড়া চিঠি আনিয়া সুশীলের হাতে দিলেন; বলিলেন—বসবেন? আসুন আমার ঘরে…পাশেই।

—না।

বারান্দায় আলো জ্বলিতেছিল। খাম ছিঁড়িয়া সুশীল চিঠি পড়িল।

লেখা আছে—

সুশীলবাবু

ক্ষমা করিবেন। টাকার শক্তি অমোঘ—এ কথা আপনি বলিতেন সকল সময়ে। বলিতেন, টাকায় কি না পাওয়া যায়!

কথাটা যত বড় সত্য বলিয়াই জানিয়া রাখুন, এ কথাও সত্য বলিয়া জানিবেন, নারীর মন টাকার মূল্যে পাওয়া যায় না।

অমরেশ বাবুকে আপনি চিনিতে পারেন নাই!' তাঁর বাবার নাম পরেশ বাবু। পরেশ রায়; ষ্টক এক্সচেঞ্জে আপনার বাবার হাতে তিনি সর্ব্বস্বান্ত হন। এ কথা অমরেশ বাবু জানেন। কিন্তু আপনারা বড় লোক—টাকার সিংহাসনে বসিয়া আছেন। আপনার বাবা অমরেশবাবুর বাবাকে সর্ব্বস্বান্ত করিয়াছিলেন।

তাই আপনার পরিচয় পাইয়া তার একটু শোধ লইবার সাধ তাঁর মনে জাগে।

অমরেশবাবুর সঙ্গে আমার বিবাহের কথা পাকা হইয়া আছে।

আপনি যেভাবে আমায় মৃগয়া করিবার বাসনায় মত্ত হইয়াছিলেন…

কিন্তু সে সব কথা নূতন করিয়া তুলিবার প্রয়োজন নাই।

ফুলদানীটি আপনি রাখিয়া দিন। আমার সঙ্গে যে প্রণয়-লীলার অভিনয় করিয়াছেন, তার স্মৃতি!

ভাবিয়াছিলেন, আমি এমন অসঙ্কোচে আপনার সহিত মিশিতেছি, বুঝি আপনার ঐশ্বর্য্যে ভুলিয়া! আমার মনকে আমি জানি বলিয়াই আপনার সঙ্গে এমন ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা করিয়াছি…

ও ফুলদানীর জুড়ি নাই। আপনার কাণ্ড দেখিয়া আমার ঘরের ফুলদানীটি অমরেশ বাবুর কাছে পাঠাইয়াছিলাম।

আমরা বাহিরে যাইতেছি। বাহিরে ভালো চাকরি পাইয়াছি। অমরেশ বাবুও চাকরি পাইয়াছেন।

আপনাকে ধন্যবাদ! বিবাহ করিয়া ঐ দু'হাজার টাকায় সংসার পাতিবার সুবিধা হইবে।

আপনার ভালোবাসার কথা জীবনে ভুলিব না।

গীতা

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

"বিদায় বেলা"

ঘৃণা যদি কর যাবার বেলা,
অবহেলায় মুখটি রাখ ফিরে,
কেমন করে হবে আমার বলা,
না বলা সেই গোপন বাণীটিরে?
দুঃখে আমার বিদায় লগন ভরি
পড়বে অশ্রু বিন্দু বিন্দু ঝরি;
মুখের ভাষা হারিয়ে যাবে মোর—
কইবে কথা কাতর দুটি চোখে,
এমনি করে তোমার পানে চাবে
দুঃখ যাতে বাজে তোমার বুকে।
ডাকবে তখন জানি আদর করে,
তোমার দেওয়া প্রিয় নামটি ধরে।
বইবে অশ্রু দুটি নয়ন ছাপি,
হিয়ার বাঁধন উঠবে কাঁপি কাঁপি,
রাগ-অভিমান সব ভুলিয়া আমি
তোমায় চেয়ে রইবো দিবস-যামি।

কুমারী কমলরাণী চট্টোপাধ্যায়।

শেফালী

[গল্প]
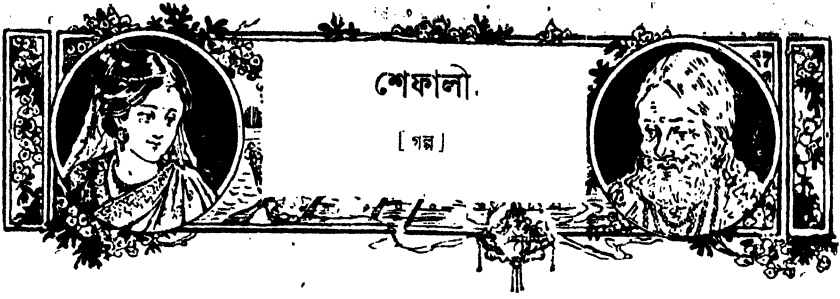
১

"ওঠ, মা, ওঠ, মা,—বাঁধ, মা,

ঐ এল তোর ঈশানী—পাষাণী।"

শরতের দিন প্রভাত হইতেছে। কলিকাতার উপকণ্ঠে—জাহ্নবীর কূলে প্রভানাথ রায় চৌধুরীর গৃহে দুর্গোৎসবের সময় শানাই ঐ গানের সুর তুলিতেছিল। কৃত-গঙ্গাস্নান বৃদ্ধ চৌধুরী মহাশয় পূজামণ্ডপেই বসিয়া ছিলেন। আর তাঁহার নিকট হইতে অদূরে এক প্রৌঢ়া, এক যুবতী ও এক বিধবা কিশোরী পূজার সব আয়োজনে ব্যস্ত ছিলেন।

এক যুবক গৃহদ্বারের নিকটে বার বার যাইতেছিল আর আসিতেছিল। দুইটি বালক চৌধুরী মহাশয়ের কাছে বসিয়া প্রতিমা ও "চালচিত্র" দেখিতেছিল ও মধ্যে মধ্যে বৃদ্ধকে নানা প্রশ্ন করিতেছিল।

গৃহস্বামী চৌধুরী মহাশয়ের মুখে গাম্ভীর্য্যের ভাব বিষাদে নিবিড়তর হইয়াছে। তিনি বঁড়িশার চৌধুরী-বংশোদ্ভূত—বাল্যে মাতৃহীন হইয়া মাতামহীর নিকট লালিত-পালিত হইয়াছিলেন। মাতামহ তখন পশ্চিমে রসদ-বিভাগে চাকরী করিতেন। তাঁহার এক সন্তান—চৌধুরী মহাশয়ের মাতা। পশ্চিমেই শিক্ষালাভ করিয়া চৌধুরী মহাশয় মাতামহের চেষ্টায়, ভারত সরকারের হিসাব বিভাগে চাকরী পাইয়াছিলেন। মাতামহীর মৃত্যুর পর তাঁহার মাতামহ কাশীতে আসিয়া দেহরক্ষা করিবার ও শেষে মণিকর্ণিকার মহাশ্মশানে ভস্মীভূত হইবার বাসনায় কাশীবাসী হইয়াছিলেন। কাশীবাসী হইবার সময় তিনি দীর্ঘজীবনের সমগ্র সঞ্চয় দৌহিত্র প্রভানাথকে দিয়া কেবল রাজরাজেশ্বর শালগ্রাম শিলা সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলেন। অবসর পাইলেই প্রভানাথ সপরিবারে বৃদ্ধের নিকট আসিতেন। বৃদ্ধের নির্দ্দেশ ছিল, "রাজরাজেশ্বরকে আমার

আপনার নিকট হইতে দূরে কলিকাতায় বিদ্যালয়ের ছাত্রাবাসে রাখিয়াছিলেন—সে উকীল হইবে। তিনি শেষ জীবনে তাহার নিকট কলিকাতায় আসিয়া বাস করিবেন মনে করিয়া কলিকাতায় একখানি বাড়ী করাইয়া তাহা রাজরাজেশ্বরের সেবার জন্য দিবেন, স্থির করিয়াছিলেন।

এমন সময় এক দিন তিনি পুত্র ধরানাথের এক পত্র পাইলেন—সে ব্যারিষ্টার হইবার জন্য বিলাত যাত্রা করিল। সংবাদ পাইবার পর প্রথমেই প্রভানাথের মনে পড়িল, দাদামহাশয়ের সেই কথা—আজকাল লোক বিগ্রহ নিগ্রহ মনে করিতেছে। রাজরাজেশ্বরের সেবার ব্যবস্থা কি হইবে? তিনি মাতামহের নির্দ্দেশানুসারে রাজরাজেশ্বরকে গঙ্গায় সমর্পণ করিতে পারেন; কিন্তু বৃদ্ধের নিকট তিনি যে অর্থ পাইয়াছেন, তাহা কি তিনি আচারভ্রষ্ট—পিতামাতার অনুমতির অপেক্ষা রক্ষায় অনবহিত পুত্রের ভোগের জন্য দিতে পারেন? তাঁহার মন বলিল—না।

মাতামহের পৈতৃক গৃহ কলিকাতার উপকণ্ঠে—গঙ্গার কূলে। সে গৃহে দোল, দুর্গোৎসবের জন্য ব্যবস্থা ছিল এবং সেজন্য যে সম্পত্তি ছিল, তাহা হইতে পুরোহিত-গোষ্ঠী সেই ভগ্নপ্রায় গৃহের চণ্ডীমণ্ডপে সে সব পূজার যেমন-তেমন ব্যবস্থা করিতেন। অন্য সরিকরা কেহ বাড়ীতে থাকিতেন না—দেবার্চ্চনার কোন সংবাদও লইতেন না।

প্রভানাথ কয় দিনের জন্য কলিকাতায় আসিলেন—মাতামহের পৈতৃক গৃহের সরিকদিগের সন্ধান করিয়া তাঁহাদিগকে প্রাপ্যাতিরিক্ত কিছু দিয়া গৃহে তাঁহাদিগের স্বত্ব কিনিয়া লইলেন এবং গৃহটির সংস্কারের যে ব্যবস্থা করিলেন, তাহাতে তাহা পুনর্নির্ম্মিত হইবে। তিনি স্থির করিলেন, তাঁহার সঞ্চিত অর্থের অর্দ্ধাংশে তিনি ধরানাথকে বঞ্চিত করিবেন না বটে, কিন্তু মাতামহদত্ত সমস্ত সম্পদ তিনি দেবসেবার জন্য প্রদান করিবেন।

ফিরিয়া যাইয়া তিনি সে কথা স্ত্রীকে বলিলেন; তাহার পর জ্যেষ্ঠ পুত্রকে তাহা বলিয়া বলিলেন, "আমি সুখচরে যাইয়াই বাস করিব। তুমি কি করিবে?"

নরনাথ ক্ষণমাত্র চিন্তা না করিয়া বলিল, "যে স্থানে আপনি আর মা রাজরাজেশ্বরকে লইয়া যাইবেন, সেই স্থানেই আমার আশ্রয়—আপনাদের চরণে।"

"কিন্তু চাকরী?

"আপনাদের সেবা অপেক্ষা চাকরী বড় নয়।"

"ভাল করিয়া ভাবিয়া দেখ।"

"ভাবিবার কিছুই নাই। টাকা? আপনি যে আপনার বাবার এক পয়সাও পান নাই—কিন্তু আপনার কি কোন অভাব হইয়াছে?"

তখন স্থির হইল, প্রভানাথই চেষ্টা করিয়া দেখিবেন, যদি নরনাথের চাকরী বাঙ্গালা সরকারে বদল করা যায়। তাহা হইলে সে সুখচরেই থাকিয়া চাকরী করিতে পারিবে। তাহা না হয়—সে চাকরী ত্যাগ করিবে।

যখন এই সব ব্যবস্থা হইতেছিল, সেই সময় প্রভানাথের কনিষ্ঠা কন্যা শেফালীর বিবাহ হইল। মল্লীনাথ "পাত্রে" যে সব গুণ কন্যার, মাতার, পিতার ও বান্ধবের বাঞ্ছিত বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, সেই রূপ, বিত্ত, বিদ্যা ও কুল—সবই সে পাত্রে ছিল। কিন্তু বিবাহের পর এক বৎসরও কাটিবার পূর্ব্বে ট্রেন-দুর্ঘটনায় যুবকের জীবনান্ত হইল। বিনামেঘে বজ্রাঘাতে দুইটি পরিবারের সুখ বিনষ্ট হইয়া গেল। চৌধুরী মহাশয়ের পত্নীকে অত্যন্ত কাতর দেখিয়া চৌধুরী মহাশয় স্বয়ং দৃঢ় হইয়া তাঁহাকে বুঝাইলেন—তিনি যদি ধৈর্য্যধারণ করিতে না পারেন, তবে কন্যাকে কে ধৈর্য্যদান করিবে?

এক দিন উপবাসী থাকিয়া সমস্ত দিন জপে কাটাইয়া সন্ধ্যারতি শেষ করিয়া প্রভানাথ ঠাকুরঘরের দ্বারে যাইয়া শয়ন করিলেন—কাহাকেও সে দিকে আসিতে নিষেধ করিলেন।

তিনি কি করিলেন বা কি পাইলেন, তাহা কেহ জানিল না। প্রভাতে তিনি গৃহিণীকে বলিলেন, তিনি সুখচরে যাইবেন—রাজরাজেশ্বরকে, তাঁহাকে ও শেফালীকে লইয়া যাইবেন। গৃহিণী কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলেন না।

শুনিয়া নরনাথ একমাস ছুটীর দরখাস্ত করিল—কলিকাতায় চাকরী বদল হয়, ভাল; না হয়—চাকরী ত্যাগ করিবে; সে পিতামাতার সঙ্গে যাইবে।

পক্ষকালের মধ্যেই সকলে পরিচিত স্থান ত্যাগ করিয়া গঙ্গাতীরে মাতামহের ভিটায় নবনির্ম্মিত গৃহে আসিলেন; নূতন জীবন আরম্ভ হইল—প্রাতে সকলে একসঙ্গে গঙ্গাস্নান, তাহার পর পূজার্চ্চনা, প্রভানাথ

এক জন বৃদ্ধ পণ্ডিত নিযুক্ত করিয়া বিধবা কন্যাকে সংস্কৃত শিক্ষা দিতেছিলেন—আপনিও তাহাকে শাস্ত্রোপদেশ দিতেন। যতক্ষণ পণ্ডিত মহাশয় পড়াইতেন, ততক্ষণ তিনি তাঁহার কাছে থাকিতেন। গৃহে আমিষ ও নিরামিষ রন্ধনের ব্যবস্থা স্বতন্ত্র হইয়াছিল—প্রথমোক্ত ব্যবস্থা কেবল নরনাথ, তাহার স্ত্রী ও পুত্রদ্বয়ের জন্য। রাজরাজেশ্বরের সেবাভার প্রভানাথের কৌশলে দিন দিন শেফালীর উপর অধিক ন্যস্ত হইতেছিল। পিতার উপদেশে ও আগ্রহে সে সেই ভাবের যেন অগাধ তৃপ্তি লাভ করিতেছিল।

সৌভাগ্যক্রমে নরনাথ বাঙ্গালা সরকারে চাকরী পাইয়াছিল। সে সুখচর হইতে যাতায়াত করিত। শোক যেন সে পরিবারকে পুণ্যপূত করিয়া দিয়াছিল।

অল্পক্ষণ পরে একখানি মোটরের বংশীধ্বনি অদূরে শুনা গেল। নরনাথ ব্যস্ত হইয়া গৃহদ্বারে গেল। স্বামিসহ ভগিনী ললিতা আসিয়া উপস্থিত হইল। ছোট ছেলেটিকে নরনাথ বুকে লইয়া নামাইল—বড় ছেলেটি—মেয়েটি নামিয়া আসিয়া সোনালী রৌদ্রে ভরা প্রাঙ্গণ হইতে চণ্ডীমণ্ডপে দেবী-প্রতিমা দেখিতে দেখিতে মণ্ডপের সোপানে উপস্থিত হইল। ললিতা ততক্ষণে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। সে উদ্দেশে প্রতিমা ও পিতাকে প্রণাম করিয়া ছেলেদিগকে বলিল, "চল, আগে স্নান ক'রে তবে ঠাকু-দালানে উঠবি।" ততক্ষণে গৃহিণী ও শেফালী—তাহাদিগের আগমনে,—মণ্ডপে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। প্রভানাথ জিজ্ঞাসা করিলেন, "সব ভাল?" জামাতা সুধাংশু বলিল, "আপনার আশীর্ব্বাদে সব মঙ্গল।" ললিতা কোন কথা বলিতে পারিল না—ভগিনীর বেশ দেখিয়া তাহার চক্ষু অশ্রুতে ভরিয়া আসিয়াছিল।

এই সময় অদূরে আবার মোটরের বাঁশী বাজিল। নরনাথ আবার দ্বারের দিকে গেল। এই মোটরে ধরানাথ আসিল। সে তাহার পূর্ব্বদিন বিলাত হইতে ফিরিয়াছে। সে বলিল, "দাদা, খুঁজে খুঁজে বাড়ী ঠিক বার করেছি।"

নরনাথ বলিল, "খুঁজে পেতে কি কষ্ট হয়েছে? আমি ত রাস্তার নক্সা পত্রে এঁকেই দিয়েছিলাম।"

"তা' না হ'লে পেতে আরও দেরী হ'ত।"

ধরানাথ নামিয়া ট্যাক্সি-চালককে ভাড়া দিল;—দিতে দিতে সঙ্গী যুবককে বলিল, "কিন্তু, তুমি ফিরবে কিসে?"

নরনাথ বলিল, "এখান থেকে বাস যায়। আমার গাড়ীও রয়েছে।" সে ভ্রাতাকে জিজ্ঞাসা করিল, "সঙ্গে কে?"

ধরানাথ বলিল, "আমার বন্ধু। বিলাতে আমরা এক পরিবারে ছিলাম। মিষ্টার-ব্যানার্জ্জীর বাড়ী খুলনা জিলায়।"

সঙ্গী যুবক বলিল, "বরং বল—বাড়ী ছিল খুলনা জিলায়।"

নরনাথ জিজ্ঞাসা করিল, "কেন?"

"আমরা বহুদিন বাড়ী-ছাড়া।"

সকলে প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিলে প্রভানাথ মুখ তুলিয়া দেখিলেন, বিদেশীর বেশে পুত্র—সেই বেশধারী আর এক জনের সহিত পূজার দিন গৃহে প্রবেশ করিল। তাঁহার মন যে প্রসন্ন হইল না, তাহা বলাই বাহুল্য।

লতিকা তখনও প্রাঙ্গণেই ছিল। সে ভ্রাতার সঙ্গে অপরিচিত যুবককে দেখিয়া মাথার উপর কাপড় আরও একটু টানিয়া দিয়া মৃদুস্বরে নরনাথকে জিজ্ঞাসা করিল, "দাদা, কোন্ পথে যা'ব?"

নরনাথ, "আয়" বলিয়া তাহাকে পথ দেখাইয়া বাড়ীর মধ্যে লইয়া গেল।

সুধাংশু ধরানাথকে জিজ্ঞাসা করিল, "ভাল ত?"

ধরানাথ বলিল, "হাঁ।"

গৃহিণী ও শেফালী ধরানাথের সঙ্গী যুবককে দেখিয়া পূর্ব্বেই মণ্ডপ হইতে পূজার সামগ্রী রাখিবার ঘরে ফিরিয়া গিয়াছিলেন।

ভ্রাতার ব্যবহারে নরনাথ বিশেষ শঙ্কিত হইতেছিল। সে পিতার মুখে অপ্রসন্নভাব লক্ষ্য করিয়াছিল। সে দৃঢ়চিত্ত পিতার প্রকৃতি বিশেষরূপ জানিত—স্বভাবতঃ তাহা যেমন কোমল, আবার প্রয়োজনে তেমনই কঠিন হইতে পারে। ধরানাথের ব্যবহারে তিনি যে বিরক্ত হইয়াছিলেন, সে বিরক্তি তিনি কখন গোপন করেন নাই, তবুও নরনাথের আশা ছিল, সে ফিরিয়া আসিলে পিতার স্নেহ হয়ত সে বিরক্তি প্রক্ষালিত করিতে পারিবে। কিন্তু কং

মাস পূর্ব্বে সে আশাও নির্ম্মূল হইয়াছিল। কারণ, ধরানাথ পিতাকে না জানাইয়া বিলাত যাত্রা করিবার বহু দিন পূর্ব্বেই প্রভানাথ তাহার বিবাহ-সম্বন্ধ স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন। পাত্রীর মাতামহ তাঁহার সহিত দীর্ঘকাল এক স্থানে চাকরী করিয়াছিলেন এবং বাঙ্গালার বাহিরে প্রবাসী বাঙ্গালীদিগের মধ্যে তখন যে ঘনিষ্ঠতাই নিয়ম ছিল—উভয়ের প্রকৃতিগত সাদৃশ্যের জন্য সে ঘনিষ্ঠতা বিশেষ বর্দ্ধিত হইয়াছিল। এই বালিকাটি শৈশবে মাতৃহীনা হইয়া মাতামহীর নিকট পালিতা এবং বাল্যাবধি সে শেফালীর খেলার সঙ্গী ছিল। তাহার বিবাহের বয়স হইবার অনেক পূর্ব্বেই প্রভানাথ ও কনকের পিতামহ এই সম্বন্ধ স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন। প্রভানাথ "এক কথার মানুষ"—যে কথা দিতেন, তাহা রক্ষা করিবার জন্য কোনরূপ ত্যাগ-স্বীকারে কুণ্ঠিত হইতেন না। কাযেই এ সম্বন্ধ যে ভাঙ্গিতে পারে, এ ধারণা তাঁহারও যেমন ছিল না, কনকের মাতামহেরও তেমনই ছিল না। বলা বাহুল্য, ধরানাথও কনককে বাল্যাবধি দেখিয়া আসিয়াছিল এবং জানিত, তাহার সহিত কনকের বিবাহ হইবে। সে বিলাতে যাইবার পরই প্রভানাথ তাঁহার বন্ধুকে বলিয়াছিলেন, জীবনে তিনি কখন প্রতিশ্রুতিভঙ্গ করেন নাই বটে, কিন্তু পুত্রের জন্য তাঁহাকে তাহাই করিতে হইতেছে—ধরানাথের সহিত কনকের বিবাহ দিবার প্রতিশ্রুতি রক্ষার দায়িত্ব আর তিনি স্বীকার করিতে পারেন না; কিন্তু কনকের মাতামহের বিশ্বাস ছিল, ধরানাথের পুত্র কখনই পিতার প্রতিশ্রুতি-ভঙ্গের কারণ হইবে না। সে বিশ্বাস হয়ত প্রভানাথেরও ছিল। বিশেষ কনক বাল্যাবধি জানিয়াছে, ধরানাথই তাহার স্বামী হইবে। সেই জন্য উভয়েরই সে সম্বন্ধ ভঙ্গ করিতে অনিচ্ছা ছিল।

নরনাথ ভ্রাতাকে প্রতি সপ্তাহে যে পত্র লিখিত, তাহাতে অন্যান্য সংবাদের সঙ্গে, ইচ্ছা করিয়াই, কনকের সংবাদ দিত। শেফালী বিধবা হইলে কনক কয়দিন আসিয়া তাহার কাছে ছিল এবং নরনাথের মাতার আহ্বানে তাহার মাতামহ ও মাতামহী এক বার কলিকাতায় তাহাকে লইয়া আসিয়া তাঁহার আতিথ্য-স্বীকারও করিয়া গিয়াছেন। সেই বার প্রভানাথ গৃহিণীকে বলিয়াছিলেন,"তুমি আর অতটা ঘনিষ্ঠতা করবার অভ্যাস ছেড়ে দাও। যে ছেলে পেটে ধরেছ, তা'তে কি কথা রাখতে পারবে?" কিন্তু মা'র মন—তখনও কোনরূপ অবিশ্বাস স্থান দিতে চাহে নাই। কনককে তিনি যে শেফালীরই মত স্নেহের দৃষ্টিতে দেখিয়া আসিয়াছেন—সে তাঁহার পুত্রবধূ হইবে, এ ধারণা যে তিনি সযত্নেই পুষ্ট করিয়া আসিয়াছেন।

কিন্তু নরনাথের নিকট এক পত্রে ধরানাথ পিতার আশঙ্কা সত্য প্রতিপন্ন করিয়া মাতার বিশ্বাস চূর্ণ করিয়া দিয়াছে। মিষ্টার এস, কে, মুখার্জ্জী (ওরফে শ্রীকুমার মুখোপাধ্যায়) ব্যারিষ্টার, পশারও আছে। তিনি সপরিবারে বিলাতে গিয়াছিলেন। সে এক বৎসর পূর্ব্বের কথা। সেই সময় তাঁহার দ্বিতীয়া কন্যার সহিত ধরানাথের পরিচয় হয়। সেই পরিচয় তাহাকে সেই যুবতীটির প্রতি আকৃষ্ট করে এবং মুখোপাধ্যায়-পরিবার হাইকোর্টের ছুটীশেষে দেশে ফিরিবার পরও তাহার সহিত তাঁহাদিগের ঘনিষ্ঠতার অবসান হয় নাই। ধরানাথ জ্যেষ্ঠকে লিখিয়াছিল, তাহার বিশ্বাস, সে মিষ্টার মুখার্জ্জীর কন্যাকে বিবাহ করিলে তাহার পশার জমিবার সুবিধা হইবে এবং সেই জন্য সে স্থির করিয়াছে, দেশে ফিরিয়া মিস্ আইভী মুখার্জ্জীকে বিবাহ করিবে।

নরনাথ স্বভাবতঃ কোন কথা পিতার নিকট গোপন করিত না। কিন্তু ভ্রাতার পত্রে এই দুঃসংবাদ পাইয়া সে ভাবিয়াছিল—এ সংবাদ পিতাকে দিবে, কি না দিয়া ধরানাথকে মতপরিবর্ত্তন করিবার জন্য লিখিবে? কারণ, সে জানিত, এ সংবাদ পিতার পক্ষে যেমন বেদনার কারণ হইবে, ভ্রাতার পক্ষেও তেমনই অনিষ্টকর হইতে পারে। কিন্তু অনেক ভাবিয়া সে স্থির করিল, এ সংবাদ—যত দুঃসংবাদই কেন হউক না, পিতার নিকট গোপন রাখা যখন সম্ভব হইবে না, তখন গোপন রাখিবার চেষ্টা না করাই সঙ্গত।

পত্র দেখিয়া প্রভানাথ—যেন আপনার মনে বলিলেন, ভার বাড়িতে বাড়িতে শেষ এমন হয় যে, একটি কুটার ভারেই উটের পীঠ ভাঙ্গিয়া যায়।

নরনাথ বলিল, "আমি তা'কে বুঝিয়ে চিঠি লিখব।"

প্রভানাথ দৃঢ়ভাবে বলিলেন, "না। তোমার ভাই যখন জীবনে সব কাযেই তোমার মতামতের অপেক্ষা রাখে না, তখন জানবে, সে তোমার উপদেশ দেবার অধিকার অস্বীকার করেছে।"

প্রভানাথ সেই দিনই তাঁহার বন্ধুকে—কনকের মাতামহকে এই সংবাদ জানাইয়া দিলেন।

গৃহিণী সংবাদ শুনিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন; রাজরাজেশ্বরের দ্বারে যাইয়া অন্তরের প্রার্থনা জানাইলেন—"ঠাকুর, এত বড় আঘাত ওঁকে দিও না।"

আর এক জন এই সংবাদ পাইয়া মর্ম্মাহতা হইল—সে শেফালী। কনকের সঙ্গে তাহার বাল্যাবধি যে ঘনিষ্ঠতা রহিয়াছে, তাহাতে এই সংবাদ তাহার পক্ষে বিশেষ বেদনার কারণ; কিন্তু কেবল তাহাও নহে। বিধবা হইয়া সে যে আগ্রহে ও যে বিশ্বাসে পরলোকগত স্বামীর সহিত মিলিত হইবার প্রতীক্ষা করিতেছিল, কনক যে সেইরূপ আগ্রহে ও বিশ্বাসেই ধরানাথের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিল! ধরানাথ যে তাহার সেই আগ্রহ ও বিশ্বাস বিনষ্ট করিয়া দিতে পারে, তাহা সে অনুমান করিতেও পারে নাই। কনক সুন্দরী, সুশীলা: হয় ত ধরানাথ আজকালের হাওয়ায় স্ত্রীকে তথা-কথিত শিক্ষায় শিক্ষিতা দেখিতে চাহিবে মনে করিয়া তাহার মাতামহ তাহাকে সে শিক্ষাও দিতেছিলেন। যদি ধরানাথ তাহাকে বিবাহ না করে, তবে তাহার যে আদর্শ ক্ষুণ্ণ হইবে, তাহা—শেফালী আর অশ্রু সম্বরণ করিতে পারে নাই।

অবস্থাটা নরনাথের কাছে বড়ই অস্বাভাবিক ও কষ্টকর মনে হইতেছিল। বাড়ীর ছেলে কয় বৎসর পরে বাড়ীতে ফিরিয়া আসিয়াছে। সে পিতামাতাকে প্রণাম করিতে পারিল না, মাতা তাহাকে বক্ষে লইতে পারিলেন না—ভগিনীরা তাহার কাছে ছুটিয়া আসিতে পারিল না। গৃহে পূজা—সে দেবী-প্রণাম করিল না। সে আসিয়াছে—এত দিন পরে, বিদেশীর বেশে, পরের মত!

সে তাহার পুত্রদ্বয়কে ইঙ্গিত করিলে তাহারা চণ্ডীমণ্ডপ হইতে নামিয়া আসিল এবং তাহার ইঙ্গিতে কাকাকে ও কাকার সঙ্গীকে প্রণাম করিল। ধরানাথ বলিল, "বাক্সগুলা আজ পা'ব—তা'ই এদের জন্য যা' এনেছি, তা' আনতে পারি নি।" সে তাহাদিগকে কিছুই বলিল না।

নরনাথ ভ্রাতাকে আর ভ্রাতার সঙ্গীকে লইয়া যাইয়া বৈঠকখানা-ঘরে বসাইল; ভ্রাতাকে জিজ্ঞাসা করিল, "কাপড় আননি?" পূর্ব্বে হইলে সে বলিত, "কাপড় আনিস্ নি?"

ধরানাথ হাসিয়া বলিল, "কেন, একখানা কাপড় কি দেবে না?"

নরনাথ চলিয়া গেল এবং দুই জনের জন্য কাপড়, জামা ও চটি জুতা আনিয়া দিয়া বলিল, "স্নান করবে ত?"

"স্নান আমরা সেরে এসেছি।"

সম্মুখে গঙ্গার জলপ্রবাহ দেখা যাইতেছিল, ধরানাথ বলিল, "বাড়ীটি বেশ যায়গায়!"

একটা অস্বাভাবিক অবস্থার অনুভূতি নরনাথকে পীড়িত ও উৎকণ্ঠিত করিতে লাগিল। এ যেন বৈশাখের তাপতপ্ত অপরাহ্নে কাল-বৈশাখীর আশঙ্কাজনিত আতঙ্ক। কি জানি, কি হয়!

সে দিনের একখানি সংবাদপত্র ভ্রাতাকে দিয়া নরনাথ চলিয়া গেল। বাড়ীতে পূজা—ভগিনী, ভগিনীপতি ও তাহাদিগের পুত্রকন্যারা আসিয়াছে। মা ও শেফালী ত পূজার ঘরেই কাযে ব্যস্ত। কেবল তাহার স্ত্রী সুরমা সংসারের নিত্যনৈমিত্তিক কাযে আছে।

নরনাথ যাইয়া দেখিল, ভগিনী ও ভগিনীপতি গঙ্গাস্নানে যাইবার আয়োজন করিতেছে। সুরমা তাহাদিগের আয়োজনে সাহায্য করিতেছে। স্বামীকে দেখিয়া সুরমা মাথার উপর কাপড় টানিয়া দিল। নরনাথ ভগিনীপতিকে বলিল, "বাড়ীতেই স্নান কর না কেন?"

সুধাংশু বলিল, "তোমার ভাইটিই ত দেখলাম 'সাহেব' সেজে পূজা দেখতে এসেছেন। তুমি আবার 'সাহেব' হ'লে কবে? তুমি ধুতিপরা তেলমাখা বাঙ্গালী, তুমি কি মনে কর, এমনই পাপ করেছি যে, সম্মুখে গঙ্গা আর স্নান করব না?"

ললিতা সুরমাকে বলিল, "এ শালা-ভগিনীপতির ঝগড়া, ওতে কাণ দিতে হ'বে না। তুমি তেল নিয়ে এস।"

সুরমা মৃদুস্বরে বলিল, "ছেলেদের কি আমি বাড়ীতে স্নান করিয়ে দেব?"

"চলুক না, এক একটা ডুব দিয়ে আসবে। এখনও ঠাকরুণ প্রণাম করতে পেলাম না—বাবার মা'র পায়ের ধুলা নিতে পারলাম না। শীঘ্র কর।"

নরনাথ সঙ্গে যাইয়া ভগিনী, ভগিনীপতি ও

ভাগিনেয়-ভাগিনেয়ীদিগকে স্নান করাইয়া আনিল। সুরমা সকলের জন্য খাবার গুছাইয়া রাখিল।

ফিরিয়া আসিয়া ললিতা সুরমাকে বলিল, "তোমার নন্দাই আর ছেলেদের তোমার জিম্মায় রেখে আমি ঠাকুর-দালানে চল্লাম।"

সুধাংশু বলিল, "উঃ, কি স্বার্থপর! আমি কি ঠাকরুণকে আর বাবা-মা'কে প্রণাম করব না?" বলিয়া সে হাসিতে লাগিল।

উভয়ে ঠাকুরদালানের দিকে চলিয়া গেলে সুরমা স্বামীকে বলিল, "ঠাকুরপোর আর তাঁর সঙ্গের লোকটির খাবার পাঠিয়ে দেব ত?"

নরনাথ "হাঁ" বলিয়া বাহিরে চলিয়া গেল।

সুরমা ধরানাথের ও তাহার বন্ধুর জন্য খাবার পাঠাইয়া দিয়া ললিতার ছেলেমেয়েদের খাবার দিল।

নরনাথ ঘুরিয়া যখন বৈঠকখানায় আসিল, তখন দেখিল, ধরানাথ ও তাহার বন্ধুর সম্মুখে খাবার সাজানই রহিয়াছে, তাহারা খায় নাই। সে ভ্রাতার বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করিল, "খেলেন না?"

বন্ধু বলিলেন, "আমরা কিছু খেয়েই এসেছি।"

"কিন্তু পূজার বাড়ী, ভাত খেতে একটু দেরী হ'বে।"

বন্ধু ধরানাথকে বলিলেন, "তবে খেয়েই নেয়া যা'ক! কখন্ ফিরা যা'বে?"

ধরানাথ উত্তর দিবার পূর্ব্বেই নরনাথ ভ্রাতাকে জিজ্ঞাসা করিল, "সে কি, তুমি থাকবে না?"

ধরানাথ উত্তর দিল, "আজ থাকা হ'বে না। কাল না হয় আবার আসব।"

নরনাথ বিস্মিত হইল। সে জানিত না, ভ্রাতা আসিবার পূর্ব্বেই আইভীকে পত্র লিখিয়া আসিয়াছিল, পৌঁছিয়াই তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইবে!

বন্ধু রণেন্দ্র তাহা জানিত; তাই নরনাথ চলিয়া গেলেই সে বন্ধুকে বলিল, "কলিকাতায় যে—there is metal more attractive—তা' কি দাদা জানেন না?"

ধরানাথ সে কথায় কেবল হাসিল—কোন উত্তর দিল না।

ধরানাথ আরও এক কারণে ফিরিতে ব্যস্ত হইয়াছিল। রণেন্দ্র যে দেখিল, গৃহে তাহার অভ্যর্থনাটা উল্লেখযোগ্যই হইল না—তাহাতে সে লজ্জিত হইতেছিল। এমন জানিলে সে কখনই পূজার দিন বাড়ীতে আসিত না—না হয় বিলাত হইতে এক সপ্তাহ পরে রওনা হইত বা বোম্বাইয়ে এক সপ্তাহ কাটাইয়া আসিত। কিন্তু সঙ্গে পঞ্জিকাও ছিল না—আর থাকিলেও এ কথা তাহার মনে হইত না।

৪

আহারের পূর্ব্বে নরনাথ আসিয়া ভ্রাতাকে ডাকিয়া বারান্দায় যাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, তাহার বন্ধুকে একা খাইতে দিলে কি দোষ হইবে? ধরানাথ বিরক্ত হইয়া বলিল, "কেন? না হয় আমাদের দু'জনকে আলাদা দাও।"

নরনাথ বলিল, "বলছিলাম, এত দিন পরে এলে; আজও মা'র কাছে খাবে না?"

ধরানাথ বলিল, "খেতে তোমরা আর দিচ্ছ কই?"

নরনাথ বুঝিল, সে যে ভাবে কথাটা বলিয়াছে, ধরানাথ সে ভাবে তাহা গ্রহণ করিল না। সে সে বিষয়ে আর কোন কথা না বলিয়া ধরানাথকে বলিল, "চল—মা ঠাকুরঘর থেকে এসেছেন—দেখা করবে।"

ধরানাথ যাইয়া পিতাকে ও মাতাকে প্রণাম করিল। দিদিকে ও বৌদিদিকে সে প্রণাম করিলে শেফালী আসিয়া তাহাকে প্রণাম করিল। শেফালীকে দেখিয়া ধরানাথের মনের মধ্যে দুঃখ সে আর রোধ করিতে পারিল না। সে ছোট ভগিনী—তাহার সৌন্দর্য্য দেখিয়া সে-ই তাহার নাম রাখিয়াছিল—শেফালী। আজ তাহার পরিধানে থান কাপড়, তাহার দেহ আভরণশূন্য।

প্রভানাথ কেবল জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভাল আছ?"

মা বলিলেন, "জিনিষপত্র নিয়ে এলে না?"

ধরানাথ বলিল, "না, মা। আমি মনে করেছিলাম, কলিকাতার বাড়ী এত দিনে হয়ে গেছে। কিন্তু তা' ত হয়নি; অথচ আমাকে ত সেখানেই থাকতে হ'বে—একটা ফ্ল্যাট—বাসা দেখে নিতে হ'বে।"

"সে না হয় পরেই নেবে।"

"কিন্তু আমার সঙ্গে এক বন্ধু এসেছেন, তাঁকে বলেছি, দু'জনে বিকেলেই ফিরে যাব।"

মা লক্ষ্য করিলেন, প্রভানাথের মুখে বিরক্তির ভাব ফুটিয়া উঠিতেছে। তিনি আর কিছু বলিলেন না। কিন্তু

তাঁহার বুকের মধ্যে যে ব্যথা অনুভূত হইল, তাহা গোপন করিতেই তাঁহাকে বিশেষ চেষ্টা করিতে হইল। তিনি বুঝিলেন, মাতৃস্নেহ তাঁহাকে পুত্রের প্রকৃতির স্বরূপ সম্বন্ধে অন্ধ করিয়া রাখিয়াছিল, কিন্তু তাহা প্রভানাথের মানব-চরিত্রজ্ঞানকে ভুলাইতে পারে নাই। প্রভানাথ পুত্রের সম্বন্ধে যে সব আশঙ্কা প্রকাশ করিয়াছিলেন, স সব বর্ণে বর্ণে সত্য হইতেছে! মা'র মনে তাহাতে যে বেদনার বিকাশ হইতেছিল, ধরানাথ কি তাহা অনুমানও করিতে পারিতেছিল না?

স্বতন্ত্র ঘরে ধরানাথের ও রণেন্দ্রের আহার্য্য প্রদত্ত হইল। নরনাথও সেই কক্ষে আহার করিতে বসিল। মা কিন্তু থাকিতে পারিলেন না—তাহাদিগের আহারের স্থানে পুনঃ পুনঃ আসিতে লাগিলেন।

আহারের পরই ধরানাথ ভ্রাতাকে বলিল, "দাদা, আমরা এখন যা'ব।"

নরনাথ আপনার মোটর বাহির করিতে বলিল।

যাইবার সময় ধরানাথ আবার পিতামাতাকে প্রণাম করিতে গেল। এ বার রণেন্দ্রও তাহার সঙ্গে যাইয়া তাঁহাদিগকে প্রণাম করিল।

তাঁহাদিগকে প্রণাম করিয়া ধরানাথ পার্শ্বের দালান হইতে বলিল, "দিদি, বৌদিদি, আমরা আজ চললাম।"

ললিতা অগত্যা বাহিরে আসিয়া বলিল, "কাল আসবে ত?" তাহার মাথায় কাপড় দেখিয়া ধরানাথ বলিল, "এসেছ বাপের বাড়ী—এখানেও ঘোমটা! ধন্য তোমরা!"

শেফালীও মাথার কাপড় টানিয়া আসিয়া তাহাকে প্রণাম করিয়া গেল।

মোটরে চড়িলে রণেন্দ্র বলিল, "তোমার ঐ ছোট বোনটির কথা তুমি বলতে?"

ধরানাথ বলিল, "হাঁ। দেখে মনটা এমন খারাপ হয়ে গেল! মনে হচ্ছে, বিদেশে ছিলাম—ছিলাম ভাল।"

"ঐটুকু মেয়ে আর কি সুন্দরী! সমাজের কি যে নিষ্ঠুর ব্যবস্থা!"

"ওই ছিল আমাদের সকলের সব চেয়ে স্নেহের।"

রণেন্দ্র বলিল, "বাস্তবিক!"

তাহার পর উভয়েই বহুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। শেষে রণেন্দ্র বলিল, "মন অন্তটা ভার ক'রে কিন্তু মিস্ মুখার্জ্জীকে দেখতে যেও না। যদি আমাদের মত অভ্যাস করতে, তবে তোমাকে পথ থেকে এক 'পেগ' পান করিয়ে নিয়ে যেতাম।"

ধরানাথ বলিল, "সত্যিই আমি ভাবছি—আজ মিষ্টার মুখার্জ্জীর বাড়ী যা'ব কি না।"

"বাঃ! চিঠি লিখে রেখে গিয়েছ। তা'রা—বিশেষ মিস মুখার্জ্জী কত আগ্রহে তোমার জন্য অপেক্ষা করছেন। আর তুমি যা'বে না?"

ধরানাথ ভাবিতে লাগিল। বোম্বাইয়ে পৌঁছিয়াই সে টেলিগ্রাম করিয়াছিল এবং আজ সকালে পিতামাতার কাছে যাইবার পূর্ব্বেই সে পত্র পাঠাইয়া আসিয়াছিল—সে আজই যাইবে। সুতরাং না যাইলে ভাল দেখায় না। কিন্তু ভাল দেখান না দেখানটাই যে তাহার একমাত্র বিবেচনার বিষয় ছিল, তাহা নহে; সেটা তাহার মনকে বুঝাইবার উপায় ব্যতীত আর কিছুই নহে। সে নিজে যে দিকে আকৃষ্ট হইতেছিল, বন্ধুর কথা সেই দিকে তাহার আকর্ষণ বিবর্দ্ধিতই করিল। সে স্থির করিল, সে যাইবে।

রণেন্দ্র যখন জিজ্ঞাসা করিল, "কি ঠিক করলে?"—তখন ধরানাথ বলিল, "যাব।"

রণেন্দ্র তাহার পিঠ চাপড়াইয়া বলিল, "এই ত ভাল ছেলের মত কথা—" বলিয়া হাসিয়া বলিল, "এই ত প্রেমিক যুবকের মত কথা।"

ধরানাথ কেবল একটু হাসিল।

রণেন্দ্র বলিল, "দেখ, একটা কায তোমাকে করতেই হ'বে।"

"কি কায?"

"সমাজের অত্যাচার থেকে তোমার বোনটিকে রক্ষা করতে হ'বে।"

ধরানাথ মনে মনে বলিল—আমি জানি, তাহা অসাধ্য-সাধন।

সে দিন মিষ্টার মুখার্জ্জীর গৃহে ধরানাথের আদর-যত্নের প্রাচুর্য্য যেন তাহাকে অভিভূত করিয়া ফেলিল। সে বাড়ীতে থাকিবে না শুনিয়া আইভীর মা বলিলেন, "দুষ্টু ছেলে, সে কথা তুমি আমাদের ঘুণাক্ষরেও জানাওনি!"

প্রসাদ গ্রহণ

[শিল্পী—শ্রীইন্দুভূষণ সেন

ধরানাথ বলিল, "জানালে কি হ'ত ?"

"আমরা ষ্টেশন থেকে তোমাকে এখানে আনতাম। তুমি আমাদের পর ভাবছ বটে, কিন্তু আমরা তোমাকে ঘরের ছেলেই মনে করি।"

আইভীর দিদি বলিল, "মিষ্টার রায় চৌধুরীর এখনও লজ্জা ভাঙ্গেনি।"

আইভীর ছোট ভগিনীটি (সে-ও দ্বাবিংশবর্ষীয়া) বলিল, "দেখুন, আপনি হয় 'রায়' হ'ন, নয় ত 'চৌধুরী' হ'ন—'রায় চৌধুরী' অকারণ বড্ড বড়।"

মিষ্টার মুখার্জ্জী হাসিয়া বলিলেন, "বেশ বলেছিস, বেবী! তোমরা জান না, ভবানীপুরে হরিশ মুখার্জ্জি রোডের যখন নামকরণ-প্রস্তাব মিউনিসিপ্যালিটীতে আলোচনা হয়, তখন মূল প্রস্তাব ছিল, নাম হবে 'হরিশচন্দ্র মুখার্জ্জি রোড'—তাহাতে এক জন ইংরেজ কমিশনার বলেছিলেন, 'বল কি—হরিশচন্দ্র মুখার্জ্জি রোড? কে এখানে বাস ক'রতে যা'বে? নাম কর হয় 'হরিশ রোড', নয় ত 'চন্দ্র রোড,' নয় ত 'মুখার্জ্জী রোড'। অত বড় নাম চলবে না'।"

ধরানাথ আসিতে চাহিল বটে, কিন্তু রাত্রিতে আহার না করিয়া ছুটী পাইল না এবং ছুটী যে পাইল, সে-ও একটা সর্ত্তে—সে পরদিন আসিয়া তাহাদিগের সহিত 'লাঞ্চ' খাইবে। সে বলিয়াছিল, সে তাহার বন্ধু রণেন্দ্রকে মধ্যাহ্নে তাহাদিগের বাড়ীতে লইয়া যাইবে; শুনিয়াই আইভীর মা বলিয়াছিলেন, তিনি তাহাকেও নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইবেন। বিদায় লইয়া—পরদিন আসিবার প্রতিশ্রুতি দিয়া ধরানাথ তাহার হোটেলে গেল।

৬

পরদিন ধরানাথ মিষ্টার মুখার্জ্জীর গৃহে উপস্থিত হইয়া দেখিল, রণেন্দ্র তাহার পূর্ব্বেই আসিয়াছে এবং আসর জমাইয়া লইয়াছে। সে আসিলেই বেবী বলিল, "আপনার কথাই হচ্ছিল।"

ধরানাথ বলিল, "আমার অপরাধ ?"

"অপরাধ ভয়ানক।"

"সকাল থেকে একটা ভাল ফ্ল্যাটের সন্ধানে ঘুরে ঘুরে হয়রান। তবুও"—সে ঘড়ী দেখিল—"আমার ত দেরী হয় নি!"

"সে কথা হচ্ছে না। আপনার বাড়ীতে পূজা; আর আপনি আমাদের পূজা দেখাতে নিয়ে যাবার কোন কথা 'স্পিকটি নট'!"

রণেন্দ্র বলিল, "সেটা আপনাদের অনধিকার চর্চ্চার কথা। আপনারা গঙ্গাস্নানও করবেন না—ঠাকুরদালানে উঠতেও পাবেন না। দেখে এলাম, ধরানাথের পরিবার খুব রক্ষণশীল।"

কথাটা কিন্তু মিসেস মুখার্জ্জীর খুব ভাল লাগিল না। তিনি ভয় পাইলেন—যদিও ধরানাথ বলিয়াছে, সে বিবাহের পর কলিকাতায় স্বতন্ত্রই থাকিবে, তবুও—কি জানি, তাহার পরিবারের রক্ষণশীলতায় যদি আইভী বাঁকিয়া বসে। তিন তিনটি মেয়ে—বহু দিন বিবাহযোগ্যা হইয়াছে; অনেক চেষ্টায় যদি বা একটির পাত্র সংগ্রহ করা গিয়াছে, সে যেন ফস্কাইয়া না যায়। তিনি বলিলেন, "সব পরিবারই প্রথমে রক্ষণশীল থাকে—তার পর পরিবর্ত্তন হয়।"

রণেন্দ্র বলিল, "যেমন গুটীপোকা প্রজাপতি হয়! কিন্তু আপনি যা মনে করছেন, তা নয়। আপনি ত জানেন, কথায় বলে, 'বিশ্বকর্ম্মা কত বড় শিল্পী, তা জগন্নাথের মূর্ত্তি দেখলে বুঝতে পারা যায়'; তেমনই আমি একটা ব্যাপারেই এঁদের রক্ষণশীলতার পরিচয় পেয়েছি।"

না জানি রণেন্দ্র কি বলিবে, সেই আশঙ্কায় ধরানাথ চঞ্চল হইয়া উঠিল। কুক্ষণে সে রণেন্দ্রকে সঙ্গে লইয়া গিয়াছিল।

রণেন্দ্র বলিল, "ধরানাথের ছোট বোনটির বয়স, বোধ হয় এখনও ১৬৷১৭ পায় হয়নি—কি সুন্দরী, আর কি সুশীলা। তার বিধবার বেশ।"

মিসেস মুখার্জী বলিলেন, "আহা! অমন বয়সে আজকাল বিয়েই হয় না। বিয়ের কত দিন পরে বিধবা হয়েছে ?"

ধরানাথ বলিল, "এক বৎসরের মধ্যে।"

রণেন্দ্র বলিল, "এমন অবস্থায় কি আবার বিয়ে দেওয়া উচিত নয় ?"

মিসেস মুখার্জ্জী বলিলেন, "অমন অবস্থায় বিয়ে যে হিন্দু-শাস্ত্রেও নিষিদ্ধ নয়, তা' ত এখন সকলেই জানে।"

"কি যে আপনি বলেন! আমাদের সমাজ কি শাস্ত্র মানে, না শাস্ত্রের কথা শুনতে চায়; সে তার আচারের নাগপাশেই বাঁধা প'ড়ে আছে।"

এই সময় মিষ্টার মুখাৰ্জ্জীর ইঙ্গিতে মিসেস মুখাৰ্জ্জী "খাবার দিতে বলি" বলিয়া উঠিয়া গেলেন এবং মিষ্টার মুখাৰ্জ্জীও কক্ষান্তরে গমন করিলেন। তাঁহারা যুবক-যুবতীদিগকে কথাবার্ত্তায় স্বাধীনতা দিবার জন্যই সে কায করিলেন।

আইভীর দিদি বলিল, "আচারের কি পরিবর্ত্তন হচ্ছে না?"

রণেন্দ্র বলিল, "কোথায় হচ্ছে? ধরানাথ বলেন, ঐ ভগিনীটি ওঁদের সকলের আদরের। উনি কি ত'র আবার বিয়ে দেবার চেষ্টা করতে পারেন?"

বেবী বলিল, "কেন পারবেন না?"

আলোচনাটা ধরানাথের প্রীতিপ্রদ হইতেছিল না। সে বলিল, "আমার চেষ্টাই কি সব? শেফালীর মত হওয়া চাই। আর তাকে বিয়ে করবার জন্য প্রস্তুত লোকও চাই।"

রণেন্দ্র তর্কের উত্তেজনার মুখে বলিল, "লোকের অভাব নাই।"

"কোথায় লোক?"

"আমিই প্রস্তুত আছি।"

রণেন্দ্রের কথায় ভগিনীত্রয়ের মধ্যে অর্থপূর্ণ দৃষ্টি-বিনিময় হইয়া গেল। তাহার কারণ, তাহারা জানিত, কন্যাত্রয়ের মধ্যে আইভীর সহিত ধরানাথের বিবাহ-সম্বন্ধ স্থির করিয়া তাহাদিগের পিতামাতা অবশিষ্ট দুইটি দুহিতার মধ্যে একটির জন্য রণেন্দ্রের অবস্থাদির সন্ধান লইতেছিলেন।

কিন্তু তাহারা বুঝিল, রণেন্দ্রের কথার একটা উত্তর না দিলে ভাল দেখায় না। তাই আইভী বলিল, "কথাটা পাকা ত?"

রণেন্দ্র বলিল, "নিশ্চয়।" তাহার পর সে হাসিয়া বলিল, "তা' হ'লে আপনি ধরাকে এ বিষয়ে অনুরোধ করবেন ত?"

"তা' করব। আমি অনুরোধ করছি।"

"বাস্।"

তাহার পর আহারের জন্য ডাক পড়িল। আহারের টেবলে বসিয়া বেবী সেই কথাটা কথায় কথায় পিতা-মাতাকে জানাইয়া দিল। তাঁহারা সে বিষয়ে আর কোন আলোচনা করিলেন না।

অপরাহ্ণে বিদায় লইবার পূর্ব্বে ধরানাথ আইভীকে বলিল, "আমি যে সব 'ফ্ল্যাট' দেখেছি, তা'র মধ্যে খান তিনেক ভাল, মনে হয়। এক বার দেখতে যাওয়ার সুবিধা হ'বে?"

আইভী কপট লজ্জার ভাব দেখাইয়া বলিল, "আপনি ভারী দুষ্টু। আমি কেন দেখতে যা'ব?"

"যাঁকে 'ঘর করতে' হ'বে, ঘরটা তিনি দেখবেন না?"

"কি যে বলেন।"

ধরানাথ তখন মিসেস্ মুখাৰ্জ্জীকে বলিল, "আমি ত বাঁশবনে ডোম কাণা হয়েছি; কোন্ 'ফ্ল্যাট' নেব, ঠিক করতে পারছি না। কোন্‌টা ভাল হ'বে, যদি দেখে দেন।"

মিসেস মুখাৰ্জ্জী বলিলেন, "বেশ ত—এখন গেলেই হয়।"

তাহাই হইল—মিসেস মুখাৰ্জ্জী আপনি যাইবেন; আইভী তাঁহার সঙ্গে যাইবে।

পূজার কয় দিন কাটিয়া গেল।

প্রভানাথের গৃহে ধরানাথের জন্য কেমন একটা বিষাদের ছায়াপাত হইয়াছিল। পূজার আনন্দও তাহা দূর করিতে পারিল না। প্রভানাথ কোন কথা প্রকাশ করিলেন না বটে, কিন্তু তাঁহার মনের ভাব তাঁহার মুখেই প্রকাশ পাইল। আর গৃহিণী বার বার দেবীর নিকট কামনা প্রকাশ করিলেন—পুত্রের মতিপরিবর্ত্তন হউক। সে কামনা দেবতার চরণে নিবেদন করিবার সময় তিনি উচ্ছ্বসিত অশ্রুধারা রুদ্ধ করিতে পারিলেন না। মাতায় ও পুত্রীদ্বয়ে এবং পুত্রবধূতে সেই বিষয়ে বহু আলোচনা হইল। এদিকে নরনাথ ভগিনীপতির সঙ্গে সে বিষয়ে বহু আলোচনা করিল; কিন্তু কেহই কর্ত্তব্য স্থির করিতে পারিলেন না।

বিজয়া দশমীর দিনও ধরানাথ আসিল না।

নরনাথ মনে করিল, সে অভিমান করিয়াছে—প্রথম দিন আসিয়াই সে যে মা'র কাছেও যাইতে পারে নাই, পিতা বিশেষ কোন কথা বলেন নাই, তাহাতে সে ব্যথিত হইয়াছে। প্রকৃত ব্যাপার কিন্তু তাহা নহে। সে "ফ্ল্যাট" ঠিক করিতে ও আসবাব বাছিতেই ব্যস্ত ছিল। প্রথম দিন "ফ্ল্যাট" দেখিবার কথায় আইভী যে কপট লজ্জা প্রকাশ

করিয়াছিল, তাহা কাটিয়া যাইতে বিলম্ব হয় নাই। তাহার পছন্দমতই জিনিষ ক্রয় করা স্থির হইতেছিল এবং কোন্ ঘর কিরূপে সাজান হইবে, সে-ই তাহা স্থির করিতে লাগিল। মিসেস মুখার্জ্জী সে বিষয়ে কন্যাকে উৎসাহিত করিতে লাগিলেন; আর রণেন্দ্র অযাচিতভাবে পরামর্শ দিতে লাগিল।

বিজয়াদশমীর পরদিন প্রাতেই ধরানাথ পিতৃগৃহে গেল। বিজয়ার পরদিন গুরুজনকে প্রণাম করা ও আশীর্ব্বাদীয়দিগের প্রণাম গ্রহণ করা বাঙ্গালায় হিন্দুদিগের মধ্যে পুরাতন—প্রচলিত রীতি। ধরানাথ সে রীতির ব্যতিক্রম করিতে চাহিল না। তদ্ভিন্ন তাহার অন্য প্রয়োজনও ছিল।

প্রভানাথ বিলাতে পুত্রকে লিখিয়াছিলেন, তিনি তাঁহার মাতামহের নিকট হইতে প্রাপ্ত সম্পত্তির অংশ নিষ্ঠাভ্রষ্ট পুত্রকে দিবেন না—ঐ সম্পত্তি রাজরাজেশ্বরের; তবে তাঁহার সঞ্চিত অর্থের অর্দ্ধাংশে তিনি তাহাকে বঞ্চিত করিবেন না—সে চাহিলেই তাহা পাইবে। এখন তাহার অর্থের প্রয়োজন। "ফ্ল্যাট" সাজাইতে, মোটর গাড়ী কিনিতে—তাহার পর সংসারের ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন টাকার। টাকা পিতার নিকট হইতেই পাইতে হইবে। তাঁহাকে সে কথা বলিতে হইবে। সে কথা সে নরনাথকে বলিবে।

তাহার অন্য প্রয়োজনের কথা সে কিরূপ বলিবে, তাহা সে স্থির করিতে পারিতেছিল না। অথচ রণেন্দ্র ও আইভী সেই কথা লইয়া বার বার তাহাকে বিদ্রূপ করিয়াছে—রণেন্দ্রের বিদ্রূপ আন্তরিক; কিন্তু আইভীর বিদ্রূপ তাহার মন বুঝিবার জন্য। সে শেফালীর বিবাহের কি করিল? সে কথা সে ত দাদাকেও বলিতে পারিবে না। রণেন্দ্র এক দিন মুখার্জ্জী ভগিনীত্রয়ের উপস্থিতিতেই বলিয়াছিল, "ধরানাথের বালবিধবা ভগিনীর বিয়ের কথা ব'লে আমরা দেখছি, ওকে বাড়ীছাড়া করলাম—ও আর বাড়ী যাচ্ছে না।" বেবী তাহাতে একটু ব্যঙ্গভরেই বলিয়াছিল, "আপনারই বা তা'তে অত ব্যস্ত বা ভাবিত হবার কারণ কি, বলুন ত!" কিন্তু সে কথার প্রচ্ছন্ন ভাব যে—

"আমারি বঁধুয়া আন বাড়ী যায়,
আমারি আঙ্গিনা দিয়া?"

তাহা কিন্তু ধরানাথ উপলব্ধি করিতে পারে নাই। কারণ, মুখার্জ্জী-পরিবারের সম্পর্কে আসিয়া এবং কয় বৎসর বিলাতে থাকিয়া সে তাহার রক্ষণশীল পরিবারে সৃষ্ট ও পুষ্ট মনোভাব ও সংস্কার হইতে একেবারে অব্যাহতি লাভ করিতে পারে নাই। সেই জন্য অতিপ্রগতিশীল মুখোপাধ্যায়-পরিবারের নকল বিলাতীভাব যেমন তাহাকে তাহার নূতনত্বে আকৃষ্ট করিত, তেমনই আবার যুবতী ও অতিক্রান্ত-প্রায়যৌবনাদিগের "গায়ে পড়া" ভাব তাহার নিকট কেমন যেন অশোভন মনে হইত। তবে ভাবটা মনে স্থায়ী হইত না—শরতের আকাশে শুভ্র অভ্রের মত আসিয়াই ভাসিয়া যাইত, সঞ্চিত হইতে পারিত না।

বিজয়াদশমীর পরদিন ধরানাথ আসিয়া যখন পিতাকে প্রণাম করিল, তখন পিতা পুত্রকে আশীর্ব্বাদ দিলেন, কিন্তু আলিঙ্গন দিলেন না। সে দিন সে বাঙ্গালীর বেশেই আসিয়াছিল। মা বলিলেন, "থাক না বাড়ীতে এসে।" ভগিনী ললিতাও তাহাই বলিল।

ধরানাথ বলিল, "তোমাদেরই অসুবিধা হবে।"

মা বলিলেন, "কিসের অসুবিধা?"

"বাবার—"

বাধা দিয়া মা বলিলেন, "ছেলের উপর রাগ—ও অভিমান কেটে যাবে।"

ললিতা বলিল, "না হয়, একটা প্রায়শ্চিত্তই করবে।"

ধরানাথ বলিল, "কি পাপ করেছি যে, আমাকে প্রায়শ্চিত্ত করতে হ'বে?"

মা বলিলেন, "তা সত্যি—এখন কোন্ ঘরে বিলেত যাওয়া নাই?"

শেফালী বলিয়া উঠিল, "ছোড়দা, যদি আর কোন পাপও না ক'রে থাক, তবে একটা যে মহাপাপ করেছ, তা' ত আর অস্বীকার করতে পারবে না।"

ললিতা ভগিনীকে জিজ্ঞাসা করিল, "কি?"

"বাবার মনে ব্যথা দেওয়া।"

কথাটার কোন সদুত্তর কেহই দিতে পারিল না—ধরানাথও পারিল না।

ধরানাথ শেষে বলিল, "আমি আজ বিকেলে যা'ব—আবার কাল সকালেই আসব।"

মা ভাবিলেন, মন্দের ভাল।

অপরাহ্নে কলিকাতায় যাইবার পূর্ব্বে ধরানাথ দাদাকে টাকার কথা বলিয়া গেল।

পরদিন ধরানাথ সকালেই আসিল।

গৃহিণী তাহার আগমনবার্ত্তা সানন্দে প্রভানাথকে জানাইলে তিনি একটু হাসিয়া বলিলেন, "কিন্তু তুমি যা' ভাবছ, তা' নয়। ও আসছে টাকা নিতে। কাল নরনাথকে আমাকে বলবার জন্য ব'লে গিয়েছিল, আজ উত্তর শুনতে এসেছে।"

গৃহিণী হতাশ হইলেন।

প্রভানাথ বলিলেন, "এই টাকাটি নিয়ে গিয়ে বিবাহ করবে। তা'র পর আর ছেলেকে দেখতে পা'বে না। গল্পে আছে, ব্রাহ্ম সমাজের শিবনাথ শাস্ত্রী যখন ব্রাহ্ম হ'ন, তখন তাঁ'র বাবা তাঁ'র বন্ধু বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কাছে সেই জন্য স্বয়ং সংসার ত্যাগ ক'রে কাশীবাসী হ'বার সঙ্কল্প জানালে বিদ্যাসাগর মহাশয় বলেছিলেন, 'ব্যস্ত হও কেন? দেখবে, মুড়কীর রস শুকিয়ে যা'বে।' কিন্তু তা'র পরই শাস্ত্রী মহাশয় যখন প্রচারক হ'বার জন্য চাকরী ছেড়ে দিলেন, তখন তাঁ'র বাপ বিদ্যাসাগর মহাশয়কে বললেন, "ঈশ্বর, এ যে রস মরা ত পরের কথা—একেবারে মোয়া পাকিয়ে গেল!' সে যা' হ'ক—আমি ত ছেলের ভরসা ছেড়েই দিয়েছি; তবে টাকাকড়ি নষ্ট ক'রে শেষে কষ্ট না পায়।"

টাকার সম্বন্ধে নরনাথ ভ্রাতাকে জানাইল, পিতা বলিয়াছেন, তিনি যে টাকা ধরানাথকে দিবেন, স্থির করিয়াছেন, তাহা সে ইচ্ছা করিলে সবও লইতে পারে। কিন্তু নরনাথ পরামর্শ দিল, "আমার মনে হয়, দরকারমত মাসে মাসে টাকা নিলেই ভাল হয়। কারণ, যে দেশ থেকে ফিরে এলে, সে আমাদের মত দরিদ্রের দেশ নয়, সে ঐশ্বর্য্যের দেশ—আমাদের ১৫ টাকা সে দেশে ১ টাকা। হাতে বেশী টাকা থাকলেই বেশী খরচের প্রলোভন সম্বরণ করা দুষ্কর হ'বে।"

ধরানাথ দাদার কথার যাথার্থ্য উপলব্ধি করিয়া বলিল, "বাড়ীর আসবাবপত্র কিনতে, মোটর গাড়ীতে প্রথমে ত বেশী টাকা লাগবে।"

নরনাথ বলিল, "যা' লাগে নিও; আমি জানি, বাবা কোন প্রশ্ন করবেন না।"

ধরানাথ তাহাই স্থির করিল।

নরনাথ বলিল, "আমি আজ বাবাকে ব'লে 'কোম্পানীর কাগজ' তোমার নামে সহি করিয়ে রাখব, কাল আসবে ত'?"

ধরানাথ বলিল, "হাঁ।"

টাকাটা পাইয়া সে আইভীকে কি উপহার দিবে, তাহাই সে ভাবিতে লাগিল। কিন্তু দাদার সহিত সে বিষয়ে পরামর্শ করিতে সে লজ্জা বোধ করিল, আর তাহার সহিত পরামর্শ করাও নিষ্ফল হইবে। সে পরামর্শ করিতে হইবে—রণেন্দ্রের সঙ্গে।

রণেন্দ্রের কথায় তাহার মনে পড়িল, সে তাহাকে আবার শেফালীর বিবাহের কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছে—সে কথা উত্থাপিত করিয়া আইভীর কাছে তাহাকে লজ্জা দিয়াছে। কিন্তু সে কিরূপে সে কথার উত্থাপন করিবে? এক একটা পরিবেষ্টন, এক একরূপ আলোচনার অনুকূল। মুখার্জ্জী পরিবারের পরিবেষ্টনে সেরূপ কথা বলিতে সঙ্কোচ হয় না; কিন্তু তাহার পিতৃগৃহের পরিবেষ্টনে সে কথা মনে হইলেও মুখে ফুটে না—শীতের বাতাস যেমন কোকিলের স্বর বন্ধ করিয়া দেয়—ঠিক তেমনই হয়।

অথচ আজ ফিরিয়া সে যখন মুখার্জ্জীদিগের গৃহে যাইবে, তখন হয় ত রণেন্দ্র তথায় থাকিবে এবং তাহাকে জিজ্ঞাসা করিবে, "কি ধরানাথ, তোমার প্রতিশ্রুতি-পালনের কি করলে?" আইভীও হয় ত তাহার কথায় যোগ দিবে।

ধরানাথ লক্ষ্য করিয়াছিল, সে শেফালীর বিবাহের প্রস্তাব করার পর হইতে মুখার্জ্জীদিগের গৃহে রণেন্দ্রের—তাহারই মত নিমন্ত্রণ হইতেছে এবং তাহার প্রতি সকলের মনোযোগের মাত্রাটাও কিছু অধিক হইতেছিল। রণেন্দ্র তাহার উল্লেখ করিয়া ধরানাথকে বলিয়াছিল, "ওঁরা মনে করেছেন, তোমাকে যেমন পাকড়েছেন, আমাকেও তেমনই পারবেন। কিন্তু—আমি গরিবের ছেলে, আমার পক্ষে ও পরিবারের ঐ সব 'ফ্যাশানেবল ফ্লার্ট' বিয়ে করা হ'বে—কাঙ্গালের ঘোড়ারোগ। তা'র পরে অবনিবনাও হ'বে, আর শেষ অবধি হয় ত ছাড়াছাড়ি—কেলেঙ্কারী। ওতে আমি নেই; আমি তেমন কাঁচা ছেলে নই যে ফাঁদে পা দেব।"

ধরানাথ জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, "তোমার এত আপত্তিই বা কেন?"

"আপত্তির কারণ অনেকগুলি। প্রথম কারণ, আর সর্ব্বপ্রধান কারণ, একই উৎস হ'তে উদ্গত। আজ-কাল আমাদের পরিচয়—তথা-কথিত 'বন্ধুত্ব' সবই ভাষা-ভাষা; তাই তুমি আমার জীবনের ইতিহাস জান না। আমার বয়স যখন তিন বছর, তখন মা মারা যান। বাবা আবার বিবাহ করেন। আমার এক পিসীমা ছিলেন—এখনও আছেন—তিনি বালবিধবা; তিনি কি পুরুষের কি স্ত্রীলোকের দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহের বিরোধী ছিলেন। তিনি কাশীবাসী হ'লেন, আমাকে সঙ্গে নিয়ে গেলেন। আমি তাঁর কাছে যে পরিবেষ্টনে লালিতপালিত, তা'তে আমার কাছে মুখার্জ্জী-কুমারীদের ভাবটা ভাল লাগে না। আর বড় কথা এই যে, যদি বিয়ে করি, তবে এমন মেয়ে বিয়ে করব যে, পিসীমা'র অসময়ে সেবা-শুশ্রূষা করবে এবং তিনি তা'র সেবা নিবেন।"

"তাই কি তুমি আসবার সময় কাশী হয়ে এলে?"

"হাঁ।"

"কিন্তু তুমি তবে কি ক'রে শেফালীর বিয়ের কথা বলছ?"

রণেন্দ্র হাসিয়া উঠিয়া বলিয়াছিল, "ওটা মুখার্জ্জী-কুমারীদের চটাবার জন্য আর—যদি তাঁ'দের অতিরিক্ত মনোযোগ হ'তে নিষ্কৃতি পাই, সেই আশায়।"

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া রণেন্দ্র বলিয়াছিল, "কিন্তু এ কথাও ঠিক যে, আমি মনে করি, তোমার ভগিনীর মত বালবিধবাদের বিয়ে হওয়া অন্যায় নয়; তবে সে তাদের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে।"

রণেন্দ্রের সে দিনের কথা ধরানাথের মনে একটা নূতন ভাবের প্রবেশপথ মুক্ত করিয়া দিয়াছিল। সে যাহা পূর্ব্বে ভাল লক্ষ্য করে নাই, তাহা লক্ষ্য করিয়াছিল—রণেন্দ্রের প্রতি মুখার্জ্জী-পরিবারের প্রবল মনোযোগ। সঙ্গে সঙ্গে বিলাতে তাঁহাদিগের তাহার সহিত ঘনিষ্ঠতার কথাও তাহার মনে পড়িয়াছিল।

কিন্তু—সে যে নূতনের আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়াছিল, সেই নূতনের মোহ তখনও তাহাকে অভিভূত করিয়া না থাকিলেও তাহার আকর্ষণ শিথিল হয় নাই। তাহার পর, সে তাহার কর্ম্মে বদ্ধ; সে কথা দিয়াছে, সে আইভীকে বিবাহ করিবে। তাহার মনে হইল না, আজ যদি তাহার তুলনায় অধিক অর্থশালী অথবা আই, সি, এস,—এমন কি, বড় ব্যারিষ্টারের পুত্র পাওয়া যায়, তবে মুখার্জ্জী-পরিবারের সব মনোযোগ সেই দিকে যাইবে এবং আইভীরও হয়ত তাহাতে উৎসাহের অভাব হইবে না।

বিধবা পিসীমা'র সম্বন্ধে রণেন্দ্রের সশ্রদ্ধ ভাবটি, "হেসে নাও দু'দিন বই ত নয়" মতের মূর্ত্তি রণেন্দ্রের মনের এই গোপন সম্পদটি, তাহার কাছে বড়ই ভাল লাগিয়াছিল। সে কি কতকগুলি সংস্কার আমাদিগের ধাতুগত বলিয়া?

রণেন্দ্রের কথা ধরানাথের মনে যে নূতন ভাবের প্রবেশপথ মুক্ত করিয়া দিয়াছিল, তাহা কিন্তু কি ভাবে তাহার মনে প্রবেশ করিতেছিল,—প্রবেশ করিতেছিল কি না—তাহা ধরানাথ আপনিও বুঝিতে পারিতেছিল না। কারণ, নির্দ্দিষ্ট সময়ে মিষ্টার মুখার্জ্জীর গৃহে যাইবার জন্য তাহার আগ্রহ বিন্দুমাত্র হ্রাস হইয়াছে, ইহা সে-ও অনুভব করিতে পারিত না; সে যতক্ষণ তথায় থাকিত, ততক্ষণ সময় কিরূপে কাটিয়া গেল, তাহা সে বুঝিতেই পারিত না—মনে হইত, সময় এত শীঘ্র অতিবাহিত হয়! আর সে যখন সে গৃহ হইতে ফিরিয়া আসিত, তখন সে তথায় অতিবাহিত সময়ের সুমধুর স্মৃতি লইয়া ফিরিত—বর্ণ যেমন রঞ্জকের হাতে তাহার রঞ্জন রাখিয়া যায়, সে স্মৃতি তেমনই তাহার মনে লাগিয়া থাকিত এবং সে আবার তথায় যাইবার জন্য নির্দ্দিষ্ট সময়ের প্রতীক্ষা করিত।

১০

কয়দিন ধরানাথ উপর্য্যুপরি পিতৃগৃহে আসিল। ললিতা যে দিন রাত্রিকালে প্রভানাথ আহারে বসিলে তাহাতে একটু আনন্দ প্রকাশ করিল, সে দিন প্রভানাথ বলিলেন, "আর আসবে না। আজ তা'র টাকা নিয়ে গেছে।"

কেহ আর কোন কথা বলিল না।

প্রভানাথই সে স্তব্ধতা ভাঙ্গিয়া বলিলেন, "এই বার বিয়ে করবে; তা'র পর আর তাকে বড় দেখতে পা'বে না।

নরনাথ একটু কৌশল করেছে—টাকাটা একেবারে নিতে বারণ করেছে; তাই কালে ভদ্রে আসবে।"

পরদিন ধরানাথ আসিল না; তাহার পরদিন আসিল। আসিয়াই সে দাদার ও ললিতার ছেলে-মেয়েদিগকে ডাকিল, বলিল, "চল্, সব, বেড়িয়ে নিয়ে আসি।" সে মোটর গাড়ী কিনিয়া আনিয়াছিল; তাহাতে তাহাদিগকে লইয়া খানিকটা ঘুরাইয়া আনিল। সে সকালেই গাড়ীতে আইভী ও তাহার ভগিনীদিগকে বেড়াইতে লইয়া গিয়াছিল—কথা ছিল, বৈকালেও তাহাদিগকে লইয়া যাইবে। সেই জন্যই সে ৩টা বাজিবার পূর্ব্বেই যাইবার জন্য ব্যস্ত হইল।

সে বিদায় লইতে আসিলে নরনাথের পত্নী বলিল, "ঠাকুরপো, গাড়ী ত দেখালেন; যাঁ'র জন্য গাড়ী, তাঁ'কে কবে দেখাবেন?"

ধরানাথ ব্যঙ্গ করিয়া বলিল, "সেটা ত ভাগ্যের কথা—যে দিন আপনাদের সে সৌভাগ্য হ'বে!"

ললিতা বলিল, "সত্যিই কি তুমি তা' হ'লে কনককে বিয়ে করবে না?"

ধরানাথ যেন একটু কুণ্ঠিতভাবে উত্তর দিল, "আমি ত দাদাকে সে কথা লিখে দিয়েছিলাম।"

"লিখেছিলে বটে, কিন্তু তবুও আমরা তা' বিশ্বাস করতে পারি নি।"

শেফালী বলিল, "আমরা মনেই করতে পারি নি, আমাদের ভাই এমন অন্যায় করতে পারবে।"

ধরানাথ বলিল, "কেন বল দেখি?"

"একটি মেয়ের জীবন ব্যর্থ করা কি মানুষের কায?"

"ব্যর্থ হবে কেন? তার কি আর বিয়ে হবে না? হয়ত আমার চেয়ে অনেক ভাল ঘরে বরেই পড়বে।"

"তুমি কি ক' বছর বিলাতে থেকে হিন্দুর সব সংস্কারও বিসর্জ্জন দিয়ে এসেছ? যে অতি অল্প বয়স থেকে তোমার সঙ্গে তা'র বিয়ের সম্বন্ধ স্থির আছে, জেনেছে; বাবা কথা দিয়েছেন—এই বিশ্বাসে নির্ভর ক'রে তা'র অভিভাবকরা সেই মা-হারা মেয়েটিকে তোমার মনের মত হ'বার জন্য প্রস্তুত করেছেন; যা'র মনের উপর তোমার ছাপ পড়েছে, তার যদি আর কোথাও বিয়ে হয়, তবে সে-ই আপনাকে ধিক্কার দেবে। যে সমাজ তুমি দেখে এসেছ, আর আজ দেখছ, সে সমাজের শিক্ষা-দীক্ষা যে রকম, তা'তে সে সমাজ আমাদের আদর্শ কল্পনা করতেও পারবে না। এ আদর্শ তা'দের ধারণার অতীত। তুমি কি বুঝতেও পারছ না, কত বড় অন্যায় করছ?"

বলিতে বলিতে শেফালী কাঁদিয়া ফেলিল।

ধরানাথ তাহার কথার ক্ষুরধার হইতে অব্যাহতি লাভ করিল। আপনাকে সামলাইয়া লইয়া সে বলিল, "তোর চির-কালই সমান গেল। ছেলেবেলা তোর জন্য আমাকে পাখী পোষা ছেড়ে দিতে হয়েছিল; একটা পাখী যদি মরত তবে তুই সে দিন কেবলই কাঁদতিস—খাওয়াও হ'ত না।"

শেফালী তখনও কাঁদিতেছিল।

ললিতা তাহাকে সান্ত্বনাদানের অভিপ্রায়ে বলিল, "কত ছোটবেলা থেকে ওরা দু'জন বন্ধু! আর ওর কত আশা আর সাধ কনক ওর ভাজ হবে! আমাদের সকলেরই সেই ইচ্ছা ছিল।"

ধরানাথ বলিল, "তোমরা ছোট ছোট বিষয় নিয়েই ব্যস্ত হও—বিচলিত হও; কিন্তু সমাজের বড় বড় অত্যাচার একেবারেই দেখ না। শেফালীর কথা কি তোমরা ভেবে দেখেছ? ওকে দেখে গিয়ে অবধি আমার বন্ধু রণেন বলছে আর তার সঙ্গে সঙ্গে মিস্ মুখার্জ্জীও বলছে—কেন আমি জিদ করছি না, ওর বিয়ে দিতেই হবে?"

নিদাঘ-দিনান্তের যে মেঘে ধারাবর্ষণ হইতেছে, সে যদি সহসা দীপ্ত-বিদ্যুতের বিস্তারে পরিণত হয়, তবে যেমন হয়—শেফালী তেমনই হইল।

সে বলিল, "তুমি আমার ভাই? ও কথা বলতে তোমার জিব আড়ষ্ট হয়ে গেল না? তুমি আমার ভাই—বড়, কোথায় তুমি আমার কোন ত্রুটি লক্ষ্য করলে আমাকে সদুপদেশ দেবে—শাসন করবে, বিপদে আমাকে রক্ষা করবে; না—তুমি এমন কুকথা বলতে পারলে? বাবা সত্যই বলেন, প্রবৃত্তিপরায়ণ—ইহকাল-সর্ব্বস্ব সমাজের সংস্কৃতি তোমার মনকে বিকৃত করেছে। তোমার যে বন্ধু এই কথা বলেছে, তা'কে নিয়ে এসে তুমি রাজরাজেশ্বরের এই মন্দির অপবিত্র করেছ। আর তোমার যে মিস মুখার্জ্জী তোমার এই কথায় সায় দিয়েছে, সে-ই তোমার সাধ্বী স্ত্রী হবে! এই মনোভাব নিয়ে সে স্ত্রীর ধর্ম্মে অবিচলিত থাকবে? ধিক্—তোমার শিক্ষায়।"

ঘৃণাভরে শেফালী সে কক্ষ ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। তাহার মনে হইল, সে কোন অপবিত্র স্পর্শ অনুভব করিয়াছে; গঙ্গাজল স্পর্শ করিয়া সে রাজরাজেশ্বরকে প্রণাম করিতে গেল।

কক্ষের সকলেরই মনে হইল যেন, একটি অগ্নিগোলক ঘর' হইতে বাহির হইয়া গেল। ঘরে তাহার বিকীর্ণ তাপ অনুভূত হইতে লাগিল।

কেহ কোন কথা বলিতে পারিল না। যেন শেফালীর কথায় সে কক্ষমধ্যে যে পরিবেষ্টনের সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহার মধ্যে কথা—অট্টহাস্যের মত শুনাইবে।

দেবায়তনে প্রবেশ করিয়া প্রহৃত হইলে সারমেয় যে ভাবে স্থান ত্যাগ করে, কিছুক্ষণ পরে ধরানাথ সেই ভাবে কক্ষ ত্যাগ করিল। নরনাথ তাহার সঙ্গে গেল।

ধরানাথ যাইয়া আপনার মোটর গাড়ীতে উঠিল। নরনাথ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি যাচ্ছ?"

সে শিরঃসঞ্চালনে জানাইল—হাঁ।

১১

মনের কি অবস্থা লইয়া ধরানাথ পিতৃগৃহ হইতে চলিয়া গেল, তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। শেফালী যাহা বলিয়াছে, তাহার পর সে আর কিরূপে পিতৃগৃহে যাইবে? সে পথ যেন তাহার পক্ষে চিরুদ্ধ হইয়া গেল। কিন্তু সে পথ রহিল, সেই পথেই তাহার সব আকর্ষণ।

কলিকাতার বাসায় যাইয়া বেশ পরিবর্ত্তন করিয়াই সে মিষ্টার মুখাৰ্জ্জীর গৃহে গেল; সে কথা দিয়া আসিয়াছিল, বৈকালে আইভীকে ও তাহার ভগিনীদ্বয়কে বেড়াইতে লইয়া যাইবে।

মিষ্টার মুখার্জ্জীর গৃহ শূন্য! পুরাতন ভৃত্য তাহাকে জানাইল, মিসেস মুখার্জ্জীর ভ্রাতার পীড়ার সংবাদ পাইয়া সাহেব ও মা জী তথায় গিয়াছেন। আর হরেন দত্তের সঙ্গে দিদিমণিরা বেড়াইতে গিয়াছেন।

সে জিজ্ঞাসা করিল, "হরেন দত্ত কে?"

"আপনি তাঁ'কে দেখেন নি। তিনি বিলেত থেকে ডাক্তার হয়ে এসে রেঙ্গুনে ডাক্তারী করছিলেন। 'মেজ বাবাকে' বিয়ে করবার জন্ত তিনি অনেক দিন যাতায়াত করেছিলেন। কিন্তু তাঁ'র টাকা নেই ব'লে সাহেব আর মা সে বিয়ের মত করেন নি। তিনি রেঙ্গুনে গিয়েছিলেন। একটা স্ফূর্ত্তি খেলায় নাকি অনেক টাকা পেয়েছেন। তাই আবার এসেছেন।"

"কেন?"

"হয়ত 'বড় বাবার' কি 'ছোট বাবার' সঙ্গে বিয়ের চেষ্টায়। 'আইভী বাবা'কে ত আর পাবেন না!"

শুনিতে শুনিতে ধরানাথ কেমন অন্যমনস্ক হইয়া পড়িল।

ভৃত্য বলিল, "আপনি বসবেন?"

"আচ্ছা"—বলিয়া ধরানাথ ড্রয়িং-রুমে প্রবেশ করিল।

ভৃত্য বলিল, "চাবি ত আমার কাছে নাই; চা—"

ধরানাথ বলিল, "দরকার নেই।"

ভৃত্য চলিয়া গেল। ধরানাথের মনে আবার শেফালীর সেই আগুনের মত মূর্ত্তি ফুটিয়া উঠিল। তাহার সেই কথা তাহার মনে পড়িল—এই মনোভাব লইয়া মিস্ মুখার্জ্জী তোমার সাধ্বী স্ত্রী হইবে!

ধরানাথ বসিয়া আইভীর আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিল আর ভাবিতে লাগিল—শেফালীর আদর্শে আর আইভীর আদর্শে কত প্রভেদ!

ক্রমে সন্ধ্যা হইল। ভৃত্য আসিয়া আলো জ্বালিয়া দিয়া বলিল, "অনেকক্ষণ অপেক্ষা করতে হচ্ছে।"

ধরানাথের মনে হইল, ভৃত্যও তাহার অবস্থায় সহানুভূতি করিতেছে। সে বলিল, "আমি এখন চল্লাম।"

ধরানাথ চলিয়া গেল।

কিন্তু খানিকটা ঘুরিয়া—একটা হোটেলে চা পান করিয়া সে আবার সেই গৃহে ফিরিয়া আসিল। মুখার্জ্জী-কন্যারা তখনও ফিরে নাই। ভৃত্য সংবাদ দিল—তাহারা কোন অজ্ঞাত স্থান হইতে টেলিফোন করিয়াছে—তাহারা বাড়ীতে খাইবে না। মিষ্টার ও মিসেস মুখার্জ্জীও ফিরেন নাই।

রাত্রি তখন প্রায় ৯টা।

ধরানাথ চলিয়া যাইবার উদ্যোগ করিতেছে, এমন সময় একখানা ট্যাক্সী আসিল—মিস মুখার্জ্জীত্রয়কে নামাইয়া দিয়া —"কাল আমি আসব," বলিয়া এক জন যুবক চলিয়া গেল।

ভগিনীত্রয় ড্রয়িং-রুমে প্রবেশ করিয়া দেখিল—ধরানাথ।

আইভী জিজ্ঞাসা করিল, "অনেকক্ষণ অপেক্ষা করতে হয়েছে?"

ধরানাথ বলিল, "আমার সঙ্গে ত কথা ছিল, বিকেলে আমি এসে বেড়াতে নিয়ে যা'ব।"

"আমি বড় দুঃখিত! কিন্তু কি করব—অনেক দিন পরে এক জন পুরাণ বন্ধু এলেন—জিদ ক'রে বেড়াতে নিয়ে গেলেন—তার পর হোটেলে না খাইয়ে ছাড়লেন না।"

"বন্ধুটি কে?"

"এক জন ডাক্তার—রেঙ্গুন থেকে এসেছেন।"

"পুরাতন বন্ধু—না পুরাতন প্রেমিক?"

ধরানাথের হাসিতে যে ঘৃণার ভাব ছিল; আইভী তাহা বুঝিতে পারিল না।

সে বলিল, "অনেক দিন তিনি প্রার্থী ছিলেন বটে।"

"আজ একলা তা'র সঙ্গে এত রাত অবধি কাটিয়ে আসতে তোমাদের কোন সঙ্কোচ হ'ল না?"—স্বরটা রুক্ষ।

কথাটা আইভার ভাল লাগিল না। সে বলিল, "তা'তে কি দোষ হয়?"

"কিছুই নয়?"

"ওঃ, রণেন বাবু ঠিকই বলেছিলেন, আপনাদের পরিবার অতিরিক্ত রক্ষণশীল। দেখছি, সে ভাব আপনারও পূরা-মাত্রায় আছে।"

"হয়ত তুমি আমাকে যা' ভেবেছিলে—আমি তা' নই; আর আমি তোমাকে যা' ভেবেছিলাম—তুমিও তা' নও।"

আইভীর ভগিনীরা নিস্তব্ধ হইয়া রহিল। আইভীর মনে হইল—তাহাদিগের সম্মুখে তাহার প্রতি ধরানাথের এই ব্যবহার অপমান। সে বলিল—"বোধ হয় তা'ই।"

ধরানাথ বলিল, "তা হ'লে আর অগ্রসর হ'বার আগেই আমাদের যে যার পথ দেখে নেওয়া ভাল হ'বে।"

সে যাইয়া গাড়ীতে উঠিল। গাড়ী চলিয়া গেল। মুখার্জ্জী কুমারীত্রয় পরস্পরের দিকে চাহিতে চাহিল, যেন পলকে প্রলয় হইয়া গিয়াছে।

* * * *

পরদিন প্রাতে মিসেস মুখার্জ্জী ধরানাথের সন্ধানে তাহার "ফ্ল্যাটে" যাইয়া তাহার চাকরের নিকট শুনিলেন, ধরানাথ প্রত্যুষে চলিয়া গিয়াছে—বলিয়া গিয়াছে, সে "ফ্ল্যাট" ছাড়িয়া দিবে।

মিসেস মুখার্জ্জী বুঝিলেন, অনেক চেষ্টায় যে শীকারটিকে জালে আনিতে পারিয়াছিলেন, মেয়েদের ভুলে সে জাল হইতে পলাইয়াছে। তবে হরেন ফিরিয়া আসিয়াছে সে সত্য সত্যই লটারীতে টাকা পাইয়াছে ত?

১২

সমস্ত রাত্রি ধরানাথ ঘুমাইতে পারে নাই। জীবনের কয়টা বৎসর তাহার যেন দারুণ দুঃস্বপ্ন মনে হইতেছিল। প্রত্যুষে উঠিয়া সে যখন গাড়ী বাহির করিয়া চলিয়া গেল, তখন কলিকাতা কেবল জাগিতেছে।

ধরানাথ পিতৃগৃহে প্রবেশ করিয়া শুনিল, প্রভানাথ সপরিবারে গঙ্গাস্নান করিতে গিয়াছেন। সম্মুখের ঘরে জামা ও জুতা ফেলিয়া সে ঘাটের দিকে গেল। স্নানার্থীরা তখন কেবল জলে নামিবার উদ্যোগ করিতেছেন—প্রভানাথ বলিলেন, "সব সাবধান, ভাঁটার টান ধরেছে।"

ধরানাথ যাইয়া প্রথমে পিতার ও তাহার পর মাতার পদধূলি গ্রহণ করিল। সকলে বিস্মিত হইলেন।

ললিতা বলিল, "তেলমাখা অবস্থায় কি প্রণাম করতে আছে?"

ধরানাথ বলিল, "ছেলের সকল অবস্থাতেই বাপ-মা'কে প্রণাম করতে আছে।"

সে সর্ব্বাগ্রে গঙ্গাজলে অবতরণ করিয়া ডুব দিল—উঠিয়া যুক্তকরে গঙ্গাপ্রণাম করিয়া উচ্চারণ করিল—ওঁ।

মা বলিলেন, "তুই গামছা আনিস নি?"

ধরানাথ বলিল, "না, মা।"

মা ছেলেকে আপনার গামছাখানি দিলেন।

* * * *

স্নান করিয়া ফিরিবার সময় ধরানাথ দাদাকে বলিল, "দাদা, পুরোহিত ঠাকুর মশাইকে ডেকে আমার প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা কর—আজই কর।"

তাহার পর সে বলিল, "কনকের কি বিয়ে হয়েছে?"

নরনাথ বলিল, "বোধ হয় না।"

"তুমি তাঁ'দের টেলিগ্রাম ক'রে দাও—যদি তাঁ'দের আপত্তি না থাকে, আমি বাবার কথার অবাধ্য হ'ব না।"

নরনাথ গৃহে ফিরিয়া যখন সকলকে সে কথা জানাইল, তখন মা'রও পূর্ব্বে শেফালী যাইয়া রাজরাজেশ্বরকে প্রণাম করিল—সবই তোমার কৃপা।

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ।

স্বয়ংসিদ্ধা

অষ্টম উল্লাস

১

বহির্ব্বাটীতে কর্ত্তার বিশাল খাস-কামরা যেমন সেরেস্তার সম্ভ্রম রক্ষা করিত, অন্তঃপুরে রাণীর মহলেও তাঁহার নিজস্ব কক্ষটি অন্তঃপুরিকাদের অহেতুকী উল্লাস ও অনর্থক উচ্ছ্বাসকে সংযত করিয়া রাখিত।

প্রায় ত্রিশ ফুট লম্বা একটি সুদীর্ঘ কক্ষ; তাহার এক ধারে পাশাপাশি অনেকগুলি সোফা, আরাম-কেদারা; তাহাদের পরেই একখানি কারুকার্য্যখচিত প্রকাণ্ড পালঙ্ক, তাহার উপর পালঙ্কের উপযুক্ত উচ্চাঙ্গের শয্যা আস্তৃত। অন্যদিকটি একেবারে শূন্য, শুধু কক্ষতলটি বরাবর কার্পেট-মণ্ডিত। এই দীর্ঘস্থানটি এই ভাবে খালি রাখিবার কারণ, কর্ত্তা এখানে প্রায়ই অপূর্ব্ব ভঙ্গীতে পদচারণা করিয়া থাকেন। কোনও কঠিন বিষয়ের মীমাংসা যখন তাঁহার মস্তিষ্কের মধ্যে আলোড়ন উপস্থিত করে, তখনই কর্ত্তাকে—সুদীর্ঘ হাত দুইখানি পীঠের দিকে আবদ্ধ করিয়া কক্ষের এই অংশটির এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত ক্রমাগতই পরিক্রমণ করিতে দেখা যায় এবং এই ভাবে ঘণ্টার পর ঘণ্টা অতিবাহিত হয়, ইহাই তাঁহার চিরন্তন অভ্যাস।

কিন্তু এ দিন যেন একান্ত অসহিষ্ণুভাবেই তিনি কক্ষের এই নির্দ্দিষ্ট অংশটির উপর পদচালনা করিতেছিলেন। প্রতি পদক্ষেপের সঙ্গে সঙ্গেই ললাট তাঁহার কুঞ্চিত হইতেছিল, প্রশান্ত মুখখানির সর্ব্বত্রই চিন্তার চিহ্ন সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল; এই কক্ষে এই ভাবে অবিরাম পরিক্রমণ তাঁহার নূতন নয়, কিন্তু চক্ষু ও মুখের ভঙ্গী অন্তর্নিহিত ভাবের যে আভাস দিতেছিল, তাহা সত্যই অভিনব।

অলিন্দের দিকের দরজার পর্দ্দা ঠেলিয়া মাধুরী দেবী বেশ গম্ভীরভাবেই কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলেন। কর্ত্তাও ঠিক এই সময় দ্বারের দিকেই মুখ ফিরাইয়াছিলেন; সহসা চোখোচোখি হইতেই উভয়ের ভাবান্তর উভয়ের চোখেই ধরা পড়িয়া গেল।

কর্ত্তা আত্মসংবরণের উদ্দেশে প্রথমেই তৎপর হইয়া কহিলেন,—এত দেরী যে? এক ঘণ্টার উপর হবে আমি তোমাকে ডেকেছি।

সহজকণ্ঠে রাণী কহিলেন,—খবর আমি ঠিক সময়েই পেয়েছি, তবে দেরী ক'রে আসাটা আমার ইচ্ছাকৃতই।

ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া কর্ত্তা রাণীর মুখের দিকে চাহিলেন, সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার অজ্ঞাতেই যেন কণ্ঠস্বর তীক্ষ্ণ হইয়া বাহির হইল,—বটে!

রাণী সুস্পষ্ট স্বরে বিলম্ব করিবার কারণটুকু নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন,—বউমার মহলে তিন ঘণ্টার ওপর তকরার চলবার পর ঘণ্টাখানেক নিরালায় বিশ্রামের খুবই প্রয়োজন ছিল।

কথাটা কর্ত্তার কাণে রসের আভাস না দিয়া বিরক্তির আঘাত দিল; রুক্ষস্বরে প্রশ্ন করিলেন,—কি ক'রে এ খবর এরই মধ্যে তোমার কাণে এসে পৌঁছাল?

রাণী কহিলেন,—তুমি যা মনে ক'রে এ কথা জিজ্ঞাসা করছ, তা ভুল; তুমি নিজেই জানো, দরজায় পাহারা বসিয়ে গিয়েছিলে; আর, এ বাড়ীর দাসী-বাঁদীদের কারুর ঘাড়ে দুটো মাথা নেই যে, তোমার হুকুমের একটুকু নড়চড় করতে পারে।

রূঢ়স্বরে কর্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন,—তবে তুমি ও কথা বললে কি সূত্রে শুনি ?

ঈষৎ বিদ্রূপের সুরে রাণী উত্তর দিলেন,—আমি যে এ বাড়ীর রাণী, সমস্তই আমাকে জানতে হয়; মানুষ না বললেও, বাতাস আমার কাণে কাণে সব শুনিয়ে দিয়ে যায়।

দুই চক্ষু উজ্জ্বল করিয়া তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে কর্ত্তা রাণীর মুখের দিকে চাহিয়া কহিলেন,—ভালো, ভালো, কথাটা যেন ভুলে যেয়ো না—এখনি যা বললে। এর পীঠে অনেক কথাই আমাকে তুলতে হবে, এখানেও ক' ঘণ্টা সময় কাটবে, তা কে জানে!

কথার সঙ্গে সঙ্গে একখানা সোফার দিকে অগ্রসর হইয়া কর্ত্তা কহিলেন,—কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবে তুমি, ব'স।

রাণী কহিলেন,—আমার বসবার দরকার হবে না, বসেই ছিলুম, তোমার বসাটাই প্রয়োজন হয়েছে, এক ঘণ্টা ধরেই দৌড়াদৌড়ি ক'রে যে কাহিল হয়ে পড়েছ, তা বুঝতে পারছি।

সোফার কোমল অঙ্কে দেহভার ন্যস্ত করিয়া কর্ত্তা কহিলেন,—এই একটি ঘণ্টা যে এখানে বিশ্রাম করিনি, এ কথা তা হ'লে স্বীকার করছ বল?

রাণী গম্ভীরমুখে উত্তর দিলেন,—চাবুকের ঘা পীঠে পড়লে স্থির হয়ে কেউ যে বিশ্রাম করতে পারে না, গায়ের জ্বালায় ছুটোছুটি করে, এ কথা এখন স্বীকার না ক'রে পাচ্ছি না।

একটা নিশ্বাস ফেলিয়া কর্ত্তা প্রশ্ন করিলেন,—ও ভাবে এ কথা বলবার মানে?

রাণী মুখের কথায় একটু জোর দিয়াই কহিলেন,—যে ভাবে নিশ্বেস ফেলে কথাটা তুমি বললে, তাতেই বোঝা যাচ্ছে, মানে তুমি বুঝতে পেরেছ। বেশী ক'রে বোঝাতে গেলেই গায়ের জ্বালাটুকু বাড়বে বই ত নয়!

সন্দিগ্ধভাবে রাণীর মুখের দিকে চাহিয়া কর্ত্তা কহিলেন, বউমার মহলে আমি গিয়েছিলুম জানা কথা, অনেকক্ষণ সেখানে থাকতে হয়েছিল আমাকে, সবাই জানে; কিন্তু কি কথাবার্ত্তা আমাদের মধ্যে হয়েছে, ঘুণাক্ষরে কেউ তার একটি বর্ণও শুনেছে, আমার ত মনে হয় না; তবে কি সূত্রে তুমি আমাকে খোঁটা দিলে যে—বউমার কথার ঘা বরদাস্ত করতে না পেরেই গায়ের জ্বালায় আমাকে ছুটোছুটি করতে হয়েছে?

স্বামীর কথার শেষ দিকে তীব্রতার আভাস পাইয়া রাণী ক্ষণকাল তাঁহার দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চাহিয়া সহসা কহিলেন,—বউমার সঙ্গে বোঝাপড়া করতে আট-ঘাট বেঁধেই গিয়েছিলে, কিন্তু ফেরবার সময় মুখ, চোখ, গলার স্বর এগুলোকে ত বাঁধতে পারনি, ওরাই যে স্পষ্ট জানিয়ে দিচ্ছে, ঘা খেয়েই ফিরে এসেছ তুমি, গায়ে জ্বালা ধরেছে।

কথাটা কর্ত্তাকে রীতিমত আঘাত দিল, তিনিও প্রতি-আঘাত দিতে অবহেলা করিলেন না; তীক্ষ্ণ বিদ্রূপের সুরে কহিলেন,—যার পাণ্ডু রোগ হয়, সে দুনিয়াশুদ্ধ সমস্তই পাণ্ডুবর্ণ দেখে। কে জ্বলছে, তা জানতে আমার বাকি নেই; কিন্তু এটা হচ্ছে সমুদ্দুর, কিছুতেই তাতে না।

ব্যঙ্গের ভঙ্গীতে একটু তীক্ষ্ণ হাসির ঝিলিক তুলিয়া রাণী কহিলেন,—কিন্তু নিষ্ফল গর্জ্জন করতেও ছাড়ে না!

কর্ত্তার মুখখানি হঠাৎ গম্ভীর হইয়া উঠিল; মনে মনে বুঝিলেন, এখানে প্রতিপক্ষ সমকক্ষের দাবী লইয়া প্রতি-উত্তর দিতে কিছুমাত্র দ্বিধা করিবে না; সুতরাং সন্ধির প্রত্যাশায় তিনি নিজেই কথার সুর নরম করিয়া কহিলেন,—অনুমানের উপর জোর ক'রে কিছু সাব্যস্ত করা ঠিক নয়, তাতে ঠকতে হয়।

রাণী এ কথায় সায় না দিয়া প্রতিবাদের ভঙ্গীতে কহিলেন,—কিন্তু এ পর্য্যন্ত যা কিছু সাব্যস্ত করা হয়েছে, সবই ত অনুমানের উপর নির্ভর করেই!

বিস্ময়ের সুরে কর্ত্তা কহিলেন,—তাই কি? এর নজীরও তা হ'লে নিশ্চয়ই আছে?

রাণী কহিলেন,—অনেক। প্রথম নজীরই ত আমি।

তুমি!

নিশ্চয়ই; শুধু বংশরক্ষার অভিপ্রায়েই যে রাজকন্যাকে ধরে আনা হয়নি, সে তুমিও জান, আমিও জানি; এর পেছনে ছিল একটা উচুদরের অনুমান।

বটে!

এক ঢিলে দুটো পাখী শিকার করবার অনুমান করেই তুমি নেচে উঠেছিলে।

বল কি!

আরও স্পষ্ট করেই বলছি; তোমার অনুমান ছিল, রাজসিংহের মত একটা কীর্তি অর্জ্জন করা, আর আমার বাবা সরকার-ঘেঁসা ব'লে তাঁকে জানিয়ে দেওয়া—ওর কোনও দাম নেই।

কৌতূহলাবিষ্ট হইয়া কর্ত্তা রাণীর দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া রহিলেন, তাহার পর একটু হাসিয়া কহিলেন,—এত কাল পরে এত বড় একটা তত্ত্ব তুমি আবিষ্কার ক'রে ফেলেছ! কিন্তু এর আগে ত কোন দিন এ সম্বন্ধে কোন কথাই আমাকে বলনি।

রাণী গাঢ়স্বরে কহিলেন, বলবার ত প্রয়োজন এ পর্য্যন্ত হয়নি। কথার পীঠে কথা উঠতেই আমাকে বলতে হ'ল যে, অনুমানের উপর নির্ভর করেই যত কিছু গুরুতর ব্যাপারেই তুমি মাথা দিয়েছ। একটা নজীর ত দেখালুম, আরও অনেক আছে।

কর্ত্তা কহিলেন,—থাক, আর শুনিয়ে কায নেই। বাজে কথায় আমরা কাযের কথা থেকে তফাতে এসে পড়েছি। যে জন্য তোমাকে ডেকেছি, সে সম্বন্ধে কোন কথাই এখনও হয়নি। কিন্তু তুমি বসবে না?

রাণী কহিলেন,—না, বসলে তোমার সঙ্গে কথায় আমি পেরে উঠব না; আমি বেশ বুঝতে পেরেছি, ও মহলে ঘা খেয়ে আমার ওপরেই তার শোধটা তুলবে বলেই তুমি তৈরী হয়ে এসেছ।

আবার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ঐ কথাই তুমি টেনে আনছ!

ঐ কথা ছাড়া নতুন কোন কথা সত্যই কি তোমার বলবার আছে? আমার ত মনে হয় না।

তোমার মনের কি ধারণা, তাই শুনি!

এ বাড়ীতে এসে অবধি কাযের কোন কৈফিয়ৎই আমাকে দিতে হয় নি, তলবও আসেনি, প্রয়োজনও দেখা দেয়নি। সেই কৈফিয়ৎ আজ আমাকে দিতে হবে। আমার এই ধারণা কি অমূলক?

উচ্ছ্বাসের সুরে কর্ত্তা কহিলেন,—চমৎকার, কিন্তু আমি ভেবে পাচ্ছি না, তারিফ করব কার? বৌমাও অসময়ে তাঁর মহলায় আমাকে দেখেই বলেছিলেন, আমি তাঁর বিচার করতে এসেছি। তুমিও আমার তলব পেয়েই সাব্যস্ত ক'রে নিয়েছ—তোমার কাযের কৈফিয়ৎ নিতেই ডেকেছি।

স্বামীর এই উচ্ছ্বাসে ভ্রূক্ষেপ না করিয়াই সহজকণ্ঠে রাণী কহিলেন,—আমি প্রস্তুত হয়েই এসেছি। তোমার যা কিছু জিজ্ঞাসা করবার আছে, তার কায আরম্ভ করতে পার, আমার পক্ষ থেকে কিছুমাত্র অবহেলা হবে না।

কর্ত্তা কণ্ঠের স্বরটুকু কৃত্রিম সহানুভূতিতে গাঢ় করিয়া কহিলেন,—তোমার যখন এত জেদ, তখন তোমার মুখ-রক্ষায় আমার পক্ষ থেকেও অবহেলা করা কিছুমাত্র উচিত নয়।' হাঁ, ভাল কথা, গোড়াতেই যে কথাটা তুমি জোর ক'রে বলেছিলে, হঠাৎ মনে প'ড়ে গেল,—এ বাড়ীর তুমি রাণী, সবই তোমাকে জানতে হয়, বাতাস তোমার কাণে কাণে সব কথাই শুনিয়ে দিয়ে যায়; এই কথাগুলিই ঠিক বলেছিলে না?

রাণী দুই চক্ষু মেলিয়া মুহূর্ত্তের জন্য স্বামীর মুখের দিকে চাহিলেন, পরক্ষণেই দৃষ্টি ফিরাইয়া কহিলেন,—এ কথা তোলবার কোনও প্রয়োজনই ছিল না, মুখের কথা অস্বীকার করবার শিক্ষা কখনও পাইনি।

কর্ত্তা কহিলেন,—তা আমি জানি, আর এ জন্য কতবার প্রশংসা করেছি, তুমিও তা জান। তবে ঐ কথাটা তোমার তোলা কতকটা সংস্কারের মতই; আদালতে হাকিমের সামনে অতি বড় সত্যবাদীকেও যেমন হলপ করতে হয়! হাঁ, এবার কাযের কথাই হোক। সত্যিই, চারদিকের অবস্থা এমনই তালগোল পাকিয়ে উঠেছে যে, কতকগুলো খবর না নিয়ে আমার আর নিষ্কৃতি নেই।

কথাগুলি শেষ করিয়াই কর্ত্তা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে রাণীর মুখের দিকে চাহিলেন; কিন্তু রাণীর নিকট হইতে কোনও উত্তর পাওয়া গেল না।

কর্ত্তা পুনরায় কহিলেন,—একটু আগেই তুমি আমার সম্বন্ধে বলেছ, রাজস্থানের রাজসিংহের মত বাহবা নেবার জন্যই আমি তোমাকে বিবাহ করেছি, আরও একটা অপবাদ চাপিয়েছ, সে কথা এখন থাক, প্রথমটার কথা তুলেই বলছি, সব দিক দিয়ে বিবেচনা করলে সবাই এ কথা বলবে যে, কাযটা ঠিক অন্যায় করিনি, আর এ কায-টুকু শেষ করতে ত্যাগস্বীকারও বড় অল্প করতে হয়নি। এখন এ সম্বন্ধে এইমাত্র বিচার্য্য যে, আমি তোমাকে অবহেলা করেছি কি না!

রাণী মর্ম্মস্পর্শী স্বরে কহিলেন,—এ অভিযোগ ত আমি কোনও দিন করিনি, বরং আমি মুক্তকণ্ঠেই বলব,

বিবাহের পর তুমি আমাকে যে মর্য্যাদা দিয়েছ, তা সামান্য নয়; তোমার সংসারে আমাকে সর্ব্বময়ী করেছ তুমি। যে অধিকার আমি পেয়েছি, আর সেই সূত্রে সংসারের সকলের ওপর এ পর্য্যন্ত যে ক্ষমতা চালিয়ে এসেছি, একটি দিনের জন্যও তুমি তাতে প্রতিবাদ তোলনি, কোনও বাধাই দাওনি।

রাণীর কথাতেই নিজের বক্তব্য বিষয়ের সূত্রটুকু পাইয়াই কর্ত্তার মুখখানি মুহূর্ত্তের জন্য হর্ষোৎফুল্ল হইয়া উঠিল, উৎসাহের সুরে তৎক্ষণাৎ কহিলেন,—বেশ, খুসী মনেই যে ভাবে তুমি ক্ষমতা পাওয়াটার কথা বললে, সেই পাওয়া ক্ষমতাটুকুও তুমি ওজন ক'রে সবার ওপর চালিয়ে এসেছ—এ কথা জোর ক'রে বলতে পারবে?

স্বামীর এই অপ্রত্যাশিত কঠোর প্রশ্নটি মুহূর্ত্তের জন্য যেন রাণীকে স্তব্ধ করিয়া দিল; কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই তিনি এই আঘাতটি একেবারেই অগ্রাহ্য করিয়াই দৃপ্তকণ্ঠে কহিলেন,—এ কথার উত্তর দেবার আগে আমি জানতে চাই, ক্ষমতা দেবার সময় সেটা প্রয়োগ করবার কোনও নির্দ্দেশ আমাকে দিয়েছিলে?

সেটা কেউ দেয় না।

দেয়। অন্যের কি কথা, শুনেছি, বড়লাটকে এ দেশে পাঠাবার আগে বিলেতের কর্ত্তারা ক্ষমতা চালানো সম্বন্ধে রীতিমত তালিম দিতে ভোলেন না। তোমার জমিদারীর কোনও মহালে যখন নতুন নায়েব বাহাল করা হয়, তাকেও কি কোনও নির্দ্দেশ দাও না—কি ভাবে সে প্রজাপালন করবে, তার ক্ষমতার এক্তিয়ার কতখানি?

স্বীকার করলুম, তোমাকে কোনও নির্দ্দেশ দেওয়া হয় নি; তুমি যেখানে সহধর্ম্মিণী, সংসারের গৃহিণী, সেখানে তোমার ক্ষমতা নিয়ন্ত্রিত করা আমি নিষ্প্রয়োজন মনে করেছিলুম। কিন্তু তোমারও ত কর্ত্তব্য তাতে যথেষ্ট ছিল!

নিশ্চয়ই। কর্ত্তব্যে যদি অবহেলা হ'ত আমার পক্ষ থেকে, তা হ'লে গোড়াতেই ঝড় উঠত; এতগুলো বছর নিরুদ্বেগে কাটবার পর আজ হঠাৎ কৈফিয়তের তলব আসত না।

তা হ'লে কেন তুমি বলতে কুণ্ঠিত হচ্ছ যে, সংসারের সবার ওপরেই তুমি ওজন ক'রে তোমার ক্ষমতা চালাও নি?

অনর্থক মিথ্যা ব'লে ত কোনও লাভ নেই। নিক্তির ওজনে সব কর্ত্তব্য পালন করা চলে না, বিধাতার সৃষ্টিতেও তারতম্যের অন্ত নেই, মানুষ সবাই সমান হয় না, চেহারায় স্বভাবে কত তফাতই দেখা যায়, একটা হাতের পাঁচটা আঙুলই সমান নয়; কাযেই কি ক'রে আমি বলতে পারি যে, ওজন করেই আমার ক্ষমতা চালিয়েছি?

এ কথার উত্তরে আমি যদি বলি, তা হ'লে তুমি ক্ষমতার অপব্যবহার করেছ; যারা চালাক, তারা তোমার তোষামোদ ক'রে তোমাকে ঠকিয়ে তাদের সুবিধে গুছিয়ে নিয়েছে, আর যারা বোকা, তোমার মন যোগাতে পারেনি, তারা বরাবরই অসুবিধে ভোগ করেছে, নিজেরা ঠকেছে?

গুরুতর অভিযোগ! কর্ত্তা ভাবিয়াছিলেন, বোমা এবার সশব্দে বিদীর্ণ হইবে ও সঙ্গে সঙ্গে একটা কদর্য্য আবহাওয়ার আবর্ত্ত বহিবে। কিন্তু রাণীর ধৈর্য্য কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হইল না, বা তাঁহার কণ্ঠস্বরে তীব্রতার কোনও আভাস পাওয়া গেল না। সহজ কণ্ঠেই তিনি স্বামীর এই কঠোর মন্তব্যের উত্তরে কহিলেন,—সংসারের সকল ক্ষেত্রেই আবহমানকাল থেকে এই যোগাযোগ চ'লে আসছে। যারা চালাক, তারা জেতে; যারা বোকা, তারা ঠকে। ইতিহাসেও এর নজীর আছে।

কর্ত্তা বিস্ময়ের সুরে কহিলেন—তুমি যে দেখছি মস্ত মস্ত কথা তুলে আমাদের কথাটাকে গুলিয়ে দিতে চলেছ!

রাণী মৃদু হাসিয়া কহিলেন,—মস্ত বস্তু জলের ওপর জোর ক'রে পড়লেই জল গুলিয়ে ওঠে; সত্যকে খাটো ক'রে আমি ত তোমার মন যোগাতে বসি নি, মনের মস্ত কথাটাই সাহস ক'রে খুলে বলেছি।

কর্ত্তা ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া কহিলেন, তা হ'লে এ বাড়ীতে যারাই তোমার সো হতে পারে নি, তুমি তাদের সকলকেই কোণঠাসা করে রেখেছ বল?

রাণী সুস্পষ্ট স্বরে উত্তর দিলেন,—আমার মত অবস্থায় যে কোনও মেয়ে পড়ত, এ কাযটুকু না করলে তার নিস্তৃতিই ছিল না। এ বাড়ীতে এসেই আমি দেখলুম, বাড়ীশুদ্ধ সকলেই আগেকার রাণীর নামেই পাগল, তাঁর তুলনায় আমি যে কত ছোট, তা প্রমাণ করতে তাদের চেষ্টার অন্ত নেই। কাযেই আমারও প্রথম কায হ'ল, আমার সেই স্বর্গীয়া সতীনটির স্মৃতিটুকু পর্য্যন্ত মুছে ফেলা, আর আমি যে তাঁর চেয়ে সব দিক দিয়ে বড়, সেটা সব দিক দিয়ে প্রমাণ করা। আমার হাতে যখন এত ক্ষমতা,

আমার কর্মক্ষেত্রে আমি যখন কর্ত্রী, নিজেকে প্রতিষ্ঠা করবার এ সুযোগ কেন ত্যাগ করব ?

নিজের অজ্ঞাতেই কর্ত্তা যেন মনে মনে চমকিত হইয়া উঠিলেন। এত কাল বিবাহ হইয়াছে, কিন্তু সহধর্ম্মিণীর সহিত এভাবে কোনও দিন তাঁহার কথোপকথন হয় নাই, এমন সুস্পষ্টভাবে রাণী কোনও দিন তাঁহার মনের কথাগুলি ব্যক্ত করেন নাই। কিছুক্ষণ বদ্ধদৃষ্টিতে তিনি রাণীর মুখের দিকে তাকাইয়া রহিলেন, তাহার পর জোরে এক নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন,—হুঁ! আচ্ছা, এবার একটা শক্ত কথাই আমাকে তুলতে হচ্ছে; খোকার সম্বন্ধেও কি তুমি ও ক্ষমতা বরাবর চালিয়ে এসেছ? সতীনের স্মৃতি পর্য্যন্ত মুছে ফেলতে যখন তুমি চেষ্টার ত্রুটি করনি, সেই সতীনের ছেলেটিও কি তা হ'লে—

স্বর এখানে ভাবের উচ্ছ্বসিত আবর্ত্তে রুদ্ধ হইয়া গেল, স্ফীত দুইটি চক্ষু রাণীর মুখের দিকে তুলিয়া নিবিষ্টভাবে তিনি চাহিয়া রহিলেন, শীকরসিক্ত তারকা দুইটিই যেন অসমাপ্ত কথাগুলি ব্যক্ত করিয়া দিল।

রাণী অবিচলিত কণ্ঠে কহিলেন—খোকার কথা বলছ? কি সম্বন্ধে তোমার এই প্রশ্ন? তাকে আত্তি-যত্ন করবার, মানুষ ক'রে তোলবার, না আর কিছু?

কর্ত্তা অভিভূতের মত কহিলেন,—আমি কথাটার খেই হারিয়ে ফেলছি ক্রমাগতই, কোন্ কথাটা আমি জানতে চাই, সেটা আমি না বলেই তোমাকে জানাচ্ছি, তুমি তার সম্বন্ধে সবই যখন জান, তোমার যেটুকু বলবার আছে, তার সম্বন্ধে তাই বল।

রাণী কহিলেন,—সংসারের ভার আমার ওপর যতটা বিশ্বাস ক'রে তুমি দিয়েছিলে, খোকার ভার ত সে ভাবে আমাকে দাওনি, বরং ওদিক দিয়ে আমাকে অব্যাহতি দিয়ে তোমার আগেকার রাণীর দাসীদের হাতেই তাকে সমর্পণ করেছিলে।

হাঁ,—এ কথা আমি অস্বীকার করছি না। সপত্নীপুত্রের ঝঞ্ঝাট সহ্য করতে যদি তুমি বেজার হও, সেই জন্যই আমি তোমাকে অসুবিধায় ফেলিনি।

শুধু তাই কি? কিন্তু আমার মনে হয়, বিমাতার হাতে প'ড়ে পাছে খোকার অনিষ্ট হয়, এই আশঙ্কাতেই আমাকে অবহেলা করা হয়েছিল। আমিও ভেবেছিলুম, সেটা বিধাতারই আশীর্ব্বাদ। কেন না, খোকার ভার যদি আমাকেই দিতে, আর আমি প্রসন্ন হয়েই তাকে কোলে তুলতুম, তা হ'লে আজ সে জড়ভরতের মত অকর্ম্মণ্য হয়ে প'ড়ে থাকত না।

কিন্তু তবুও কি তার দিকে কৃপার দৃষ্টিতে চাওয়াটা তোমার উচিত ছিল না?

না। প্রথম দিকে আমি অভিমান করেই তার দিকে চাইনি, তার পর নিবারণ আসতে তার দিকেই আমাকে পুরোপুরিই চাইতে হয়েছিল। বড় হতে সবাই যখন বললে, খোকা একেবারে নীরেট, বুদ্ধিশুদ্ধি কিছু নেই, লেখাপড়া হবে না, আর নিবারণের সুখ্যেত তাদের মুখে ধরে না, তখন বোধ হয়, আমার মত খুসী আর কেউ হয়নি।

আর্ত্তস্বরে কর্ত্তা কহিলেন,—তুমি শুনে খুসী হয়েছিলে?

মৃদু সুরে রাণী কহিলেন—অত্যন্ত ব্যথা পেয়েছিলুম—এই কথাটা মিছে বানিয়ে বললে তুমি হয় ত খুসী হতে; কিন্তু আমি অকপটে সত্যই বলছি। আর, কেনই বা খুসী হব না? আমি ত মানুষ, খুব বেশী যে লেখাপড়া শিখে তত্ত্বজ্ঞান পেয়েছি, তাও নয়, রক্ত-মাংসের শরীর আমার, ষোল আনা স্বার্থ নিয়ে সম্বন্ধ। সতীনের ছেলে যাচ্ছেতাই হলেই আমার ছেলের অদৃষ্ট যখন খুলে যাবে, বাগুলীর গদিতে সেই বসবার যোগ্যতা পাবে, মায়ের পক্ষে এর চেয়ে খুসীর কথা আর কি থাকতে পারে? তবে এ কথা স্বীকার করবই, গল্প-উপন্যাসের সৎমাদের মত ঐ কাঁটাটাকে ভাঙ্গবার বা তোলবার কোনও চেষ্টাই যেমন করিনি, তেমনই তাকে শাণাবারও কোনও যত্নই এ পর্য্যন্ত নিইনি, ভোঁতা হয়েই যাতে বরাবর প'ড়ে থাকে, সেইটুকুই ছিল আমার আগ্রহ। এতে আমাকে তোমরা স্বার্থপরই বল, বা এই নিয়ে যে কোনও অপবাদই আমার ওপর চাপাও, আমি বরাবর জোর ক'রে ব'লে যাব—সন্তানের স্বার্থের দিকে চেয়ে আমি আমার কর্ত্তব্যই করেছি।

অসহিষ্ণুভাবে কর্ত্তা কহিলেন—আর যাকে বঞ্চিত করতে তুমি এই অনাচার করেছ, সেও কি তোমার সন্তান নয়?

রাণী কণ্ঠস্বরে রীতিমত জোর দিয়া কহিলেন—না। কাগজে, কেতাবে যেমন পড়া যায়—আমি মা, দেশময় আমার অসংখ্য সন্তান, এও ঠিক তাই! শুনতেই ভাল বাইরে থেকে, স্বার্থের সংস্রবে এলেই গোল বাধে। সন্তানের

মমতা নিয়ে আজ তুলছ তুমি সমস্যা, কিন্তু গোড়ায় বিশ্বাস করতে পারনি, তখন ছিলুম আমি বিমাতা! ব্যবধানের প্রাচীর তুলেছিল কে? অথচ, নিজেও ছিলে দিব্যি নিশ্চেষ্ট, একেবারে নির্ব্বিকার! তার পর, নিজেই বরাবর নিবারণকে প্রাধান্য দিয়েছ, নিজেই স্বীকার করেছ কতবার—সেই গদীতে বসবে। অথচ—

বিকৃতকণ্ঠে কর্ত্তা কহিলেন—থামলে কেন, বল; তোমার কথাটা ত এখনও শেষ হয়নি।

রাণী উচ্ছ্বাসের সুরে কহিলেন—সে মত এখন বদলে গিয়েছে। যে দিন কবরেজের মেয়েকে প্রথম দেখেছিলে, তার হাতের জোর দেখে নেচে উঠেছিলে এ বংশের বউ করতে, আমি গরীবের মেয়ে ব'লে রাজী হইনি—অমনি রোখ তোমার চেপে গেল, আর এত কাল পরে হঠাৎ খোকার জন্যে বুক অমনি টন্‌টন্ ক'রে উঠল! এখন নিবারণ হয়েছে যাচ্ছেতাই; দিনরাত স্বপ্ন দেখছ, বউ তোমার ইঞ্জিন হয়ে ঐ গাধাবোটখানাকে টেনে নিয়ে জমিদারী গদীর কিনারায় ভিড়িয়ে দেবে! এই স্বপ্নে বিভোর হয়েই তুমি থাক, আর যে কৈফিয়ৎ আমি দিলুম, যদি আমার দোষ তাতে থাকে, শাস্তির ব্যবস্থা স্বচ্ছন্দেই করতে পার, আমি তার জন্যে প্রস্তুত হয়েই এসেছি।

রাণীকে এবার উত্তেজিত দেখিয়া কর্ত্তা বিদ্রূপের ভঙ্গীতে কহিলেন,—এঃ! সেই মামুলী রাস্তাতেই শেষটায় গড়িয়ে পড়লে তুমি! শাস্তির কথাও ওঠেনি, আর বৌমার কথা আমি মোটেই তুলিনি, তুমি খামকা সেই ভদ্রলোকের মেয়েকে টেনে মামলাটা ভারী করতে চাইছ! তা হ'লে বেশ বোঝা যাচ্ছে, এখন বৌমাই হয়ে দাঁড়াচ্ছেন তোমার প্রতিদ্বন্দ্বী!

রাণী শ্লেষের সুরে উত্তর দিলেন,—এটা আমার দুর্ভাগ্য ছাড়া আর কি বলি!

কিন্তু ব্যাপারটাকে ঘুরিয়ে সৌভাগ্যের বিষয় ক'রে নেওয়া যায় না?

কি সূত্রে শুনি?

এই মুখরা মেয়েটিকে মায়ের স্নেহে তোমার কোলে টেনে নিয়ে?

উদ্দীপ্তকণ্ঠে রাণী কহিলেন—তা হয় না, কিছুতেই না। এমন অনুরোধ তুমি যেন দ্বিতীয়বার আমাকে আর ক'র না। তার চেয়ে, তোমার জড়ভরত খোকাটিকে যদি ওর কাঁধেই ভর দিয়ে বাগুলীর গদীতে বসাতে চাও, তাতেও আমার আপত্তি নেই, বাধা দিতে একটি কথাও আমি বলব না।

গম্ভীরমুখে কর্ত্তা প্রশ্ন করিলেন,—কিন্তু নিবারণকে ঠেকাতে পারবে?

দৃপ্তকণ্ঠে রাণী উত্তর দিলেন,—আমি তাকে জোর ক'রে টেনে আনব, বেঁধে রাখব—

তার পরে? বরাবর এই মেয়েটির প্রভুত্ব সইতে পারবে?

সে ভাবনা পরে। তোমার আর কিছু জিজ্ঞাসা করবার আছে?

কণ্ঠ পরিষ্কার করিয়া সুস্পষ্টস্বরে কর্ত্তা কহিলেন,—তুমি যে কথাগুলো এইমাত্র বললে, তার প্রতিবাদ করবার আছে। তুমি নিশ্চয়ই জান, বাগুলীর গদীতে এ পর্য্যন্ত গাঙ্গুলী-বংশের কোনও ছেলে অন্য বংশের কোনও মেয়ের কাঁধে ভর দিয়ে বসেনি; জ্যেষ্ঠের অধিকারে ওখানে একান্তই বসতে যদি হয়, খোকাকেই বসতে হবে; কিন্তু তার আগে মানুষ হবার যোগ্যতাটুকু অর্জ্জন করতে না পারলে ওটা তার পক্ষে দুরাশা ছাড়া কিছু নয়।

রাণী স্তব্ধভাবেই কথাটা শুনিলেন। কিছুক্ষণ কাহারও মুখে কথা নাই। কর্ত্তা একবার অপাঙ্গে রাণীর মুখের দিকে চাহিলেন, পরক্ষণে সমবেদনা উদ্রেকের ভঙ্গীতে কোমলকণ্ঠে কহিলেন,—তুমি এ ভারটুকু নিতে পার না? যে কোনও কারণেই হোক, যে অবহেলা তার সম্বন্ধে তার শৈশবের অসহায় অবস্থায় আমাদের পক্ষ থেকে হয়ে গেছে, এখন কি সেটা শুধরে নেওয়া যায় না?

ক্ষণকাল মনে মনে কি ভাবিয়া রাণী স্নিগ্ধস্বরে উত্তর দিলেন,—যদি সম্ভব হ'ত, তোমার এ অনুরোধ আমি মাথা পেতে নিতুম, কিন্তু এখন তা হবার নয়। পাথরকে চালানো যায়, কিন্তু জাগানো যায় না।

মুখে উৎফুল্লের ভাব প্রকাশ করিয়া জোরকণ্ঠে কর্ত্তা কহিলেন,—ঠিক! এটা সম্ভব কি না, জানবার জন্যই তোমাকে ডেকেছিলুম, আর এই সূত্রে এত বাজে কথার বৃথা চর্চ্চা করা গেল। কিন্তু আমি এই আসল তত্ত্বটুকু না বুঝেই নিজের খেয়ালে ঐ মেয়েটিকেই অগতির গতি ভেবে ওর হাতে আমার বড় সাধের সোণার চাবুকটি তুলে দিয়েছিলুম।

মৃদুকণ্ঠে রাণী কহিলেন,—সে কথা শুনেছি।

স্বর এবার দৃঢ় করিয়া উচ্ছ্বাসের সহিত কর্ত্তা কহিলেন,—কিন্তু আজ সে চারুকটি ফিরিয়ে দিয়েছে আমাকে, বলেছে, পাথরকে জাগাতে মানুষের মনের পরশই যথেষ্ট, সোণার সংস্রবের দরকার হয় না। আমি এ কথার উত্তরে কি সাব্যস্ত করেছি, শুনতে চাও?

জিজ্ঞাসুনয়নে রাণী কর্ত্তার মুখের দিকে তাকাইতেই তিনি উত্তেজিতকণ্ঠে গাঢ়স্বরে কহিলেন,—তার বিরুদ্ধে যে সমস্ত নালিশ আজ পর্য্যন্ত এসেছে, আমি সব মুলতুবী রেখেছি শুধু তার দিকে চেয়ে, যদি ঐ পাথরটাকে সে জাগাতে পারে, তার সাত খুন মাপ, সকলের ওপরে হবে তখন তার স্থান; কিন্তু যদি হারে, তা হ'লে ঐটিকেই অবলম্বন করেই তাকে শ্যামাপুরে ফিরে যেতে হবে। যাকে বলে—পুনর্মূষিকো ভব!

কথাটা শেষ হইতেই কর্ত্তার ওষ্ঠপ্রান্তে হাসির একটা তীক্ষ্ণ ঝিলিক দেখা দিল, সে হাসিটুকু প্রখর বিদ্যুতের মতই তীব্র। রাণী অপলকনেত্রে স্বামীর সেই বিচিত্র মুখখানির দিকে চাহিয়া রহিলেন।

শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়।

শরৎরাণী

অভ্র চিকণ রঙীন আঁচল চড়িয়ে দিয়ে নীল গগনে,
আস্‌ল রে ঐ শরৎরাণী শিউলি ফোটার শুভক্ষণে।
মেঘের ফাঁকে দাঁড়িয়ে সে আজ পিচকারী দেয় সবুজ—রঙের,
আয় রে তরুণ আয় রে সবুজ শরৎরাণী ডাক্‌ছে তোদের!
গাঙের চরে চখা-চখীর ব'স্‌ছে মেলা দেখ্‌ রে চেয়ে,
রামধনু-রং পের্‌জাপতির ঝাঁক চ'লেছে হর্ষে ধেয়ে;
কৃষ্ণচূড়ার শাখায় শাখায় এলিয়ে পড়ে ফুলের রাশি,
কাজ্‌লা দীঘির কমল'পরে বস্‌ছে কালো ভোমরা আসি;
ধানের শীষে উঠ্‌ছে বাজি কোন্ রাঙা পার সোনার নূপুর—
আয় রে ছুটে আয় রে তরুণ কাণ পেতে শোন্ ঝুমুর ঝুমুর!
ডালিম গাছের আগ্‌ডালেতে হোল্‌দে পাখী নাচ্‌ছে দোদুল্,
গার শাখেতে ডাহুক ডাকে পিক-পাপিয়া হর্ষে আকুল!
ঢেউ লেগেছে আজকে খুসীর সবার বুকে সবার মুখে,
ভুঁইচাঁপা কয়—"আয় রে হিজল্" নাচ্‌ব মোরা মনের সুখে।
সবুজ পাতায় সবুজ ঘাসে উড়্‌ছে সবুজ ওড়্‌নাখানি,
আয়্‌ রে তরুণ আয়্‌ রে সবুজ ডাক্‌ছে তোদের শরৎরাণী!

কাদের নওয়াজ

বৈদেশিক প্রসঙ্গ

শান্তি কোথায় ?

আমরা কয়েক মাস ধরিয়াই য়ুরোপের অবস্থা আলোচনা করিয়া আসিতেছি। ক্রমশঃই য়ুরোপের শান্তিভঙ্গের শঙ্কা যেন বৃদ্ধি পাইতেছে বলিয়া মনে হইতেছে। সে দিন জার্ম্মাণীর প্রধান পুরুষ হার হিটলার বলিয়াছেন যে, তিনি আত্মরক্ষার জন্ত তাঁহার দেশে ১ কোটি ২০ লক্ষ যুবককে প্রস্তুত রাখিয়াছেন। তাহারা ইঙ্গিত পাইলেই রুসিয়ার উপর যাইয়া ঝাঁপাইয়া পড়িবে। আবার তাহার পাল্টা জবাবে রুসিয়ার সেনানায়ক হার হিটলারকে বলিয়াছেন যে, তাঁহারা জার্ম্মাণীর আক্রমণ প্রতিহত করিয়া জার্ম্মাণীকে শিক্ষা দিবার জন্ত একেবারে সাজিয়া গুজিয়া বসিয়া আছেন। জার্ম্মাণী চাহেন ইউক্রেণ প্রদেশ আর য়ুরাল পর্ব্বতটি। রুস সেনাপতি পাল্টা জবাবে বলিয়াছেন—"অতদূর আসিতে হইবে না। তাহার পূর্ব্বেই আমরা তোমার সমর-সাধের অবসান করিয়া দিব।" ফলে এখন বাস্ফোটটা চলিতেছে সোভিয়েট-শাসিত রুসিয়ায় এবং নাৎসি শাসিত জার্ম্মাণীর সহিত। অন্ত সকলে চকিতনেত্রে ব্যাপারটা নিরীক্ষণ করিতেছেন। কারণ, সত্য সত্যই যদি এই দুইটি দেশের মধ্যে যুদ্ধ বাধে, তাহা হইলে তাহার তরঙ্গ-তাড়না কতদূর যাইয়া পড়িবে, তাহা কেহই বলিতে পারেন না। ইহারা পরস্পর নিজ নিজ শক্তির কথা যে কতটা বাড়াইয়া বলিতেছেন, তাহাও বুঝা যাইতেছে না। রুসিয়া রক্ত চক্ষু দেখাইয়া বলিতেছেন যে, আগামী যুদ্ধে তাঁহারা এমন ভীষণ অস্ত্র-শস্ত্র ব্যবহার করিবেন, যাহা ইতঃপূর্ব্বে কোন সংগ্রামেই ব্যবহার করা হয় নাই। এ কথাগুলি নিতান্তই ধাপ্পাবাজী বলিয়াই মনে হয়। কারণ, এ পর্য্যন্ত যুদ্ধে শত্রু-সংহারে যে সকল বিষাক্ত রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহার মারাত্মকতা যত ভীষণ বলিয়া শুনা গিয়াছিল, উহা না কি তত ভীষণ নহে। বিগত য়ুরোপীয় মহাযুদ্ধে প্রায় পৌনে ৭১ হাজার মার্কিণী সৈন্ত বিষাক্ত বাষ্প দ্বারা আহত হয়। তাহাদের মধ্যে অতি অল্পসংখ্যক লোকই রণক্ষেত্রে মরিয়াছিল, হাসপাতালে যাইয়া তাহা অপেক্ষা কিছু অধিক লোক মারা যায়। গড়ে লোক পিছু আড়াই টন করিয়া গ্যাস ব্যবহার করিবার ফলে শতকরা ৩ জন লোক মরিয়াছিল কি না সন্দেহ। ইটালী আবিসিনিয়ায় অত্যন্ত মারাত্মক গ্যাস ব্যবহার করিয়াছিল, শুনা গিয়াছিল। কিন্তু শেষে যতদূর জানিতে পারা গিয়াছে, তাহাতে মনে হইতেছে যে, গ্যাসের জন্ত হাবসীরা পরাজিত হয় নাই, ইটালী হাবসী সর্দ্দারদিগকে ভাঙ্গাইয়া লইয়াছিল বলিয়া তাহারা কতকটা পরাজিত হইয়াছে। ইটালী এখনও সমস্ত হাবসী-রাজ্য জয় করিতে পারে নাই; সুতরাং গ্যাসের মারাত্মকতা যে একেবারে অতি ভীষণ, তাহা নহে। কিন্তু যদি জার্ম্মাণীর সহিত রুসিয়ার বিবাদ বাধে আর সেই বিবাদ অন্ত দেশে সংক্রমিত হয়, তাহাই এখন সকলের চিন্তার বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বিগত য়ুরোপীয় মহাযুদ্ধে ১ কোটি ৭০ লক্ষ লোক রণক্ষেত্রে শয়ন করিয়াছিল। ইহা বড় সহজ কথা নহে। ইহা ভিন্ন কত টাকা ও ধন-সম্পত্তি যে ব্যয়িত এবং নষ্ট হইয়া গিয়াছে,—তাহার ইয়ত্তা হয় না। সেই ক্ষতির প্রভাব হইতে আজিও শিল্প ও বাণিজ্যজগৎ মুক্ত হইতে পারে নাই। ইহা সকলেই বুঝিতেছেন। কাযেই যদি যুদ্ধ বাধে, সেই শঙ্কায় সকলেই শঙ্কিত হইয়া উঠিতেছেন। এখন কাহারও যুদ্ধে লিপ্ত হইবার ইচ্ছা নাই সত্য, কিন্তু ইচ্ছা না থাকিলেও লোক অবস্থার ঘূর্ণাবর্ত্তে পড়িয়াও যুদ্ধে লিপ্ত হয়। বিগত য়ুরোপীয় মহাযুদ্ধে ইংরেজ সহসা লিপ্ত হইতে চাহেন নাই। শেষে অনেক চিন্তার পর তাঁহারা উহাতে লিপ্ত হইয়াছিলেন। ঐ সময় ঘোর চিন্তায় Earl Grey আর্ল গ্রের মস্তকের কেশগুলি কয়দিনে পাকিয়া গিয়াছিল। সুতরাং নিয়তির লীলা বুঝা ভার। এ দিকে জার্ম্মাণী পোলাণ্ডকে হাত করিবার জন্ত পূর্ণ-মাত্রায় চেষ্টা করিতেছেন। ফ্রান্সও সে চেষ্টা কম করিতেছেন না। পোলাণ্ড কি করিবেন, তাহাই গালে হাত দিয়া ভাবিতেছেন। অষ্ট্রীয়া ও হাঙ্গেরী জার্ম্মাণীর দিকে অনেকটা ঝুঁকিয়া পড়িয়াছেন। তাই মনে হইতেছে, য়ুরোপের অবস্থা বড় ভাল নহে। ছোট ছোট রাজ্যগুলিও প্রাণপণে আত্মরক্ষার জন্ত প্রস্তুত হইতেছেন। এরূপ অবস্থায় শান্তিরক্ষা সম্ভব কি না, তাহাই সকলে চিন্তা করিতেছেন।

সোভিয়েট সরকারের শাসন-সংস্কার

সোভিয়েট সরকার মানুষের অন্তর্নিহিত ভাবরাশিকে আমলে আনিতে চাহেন না। তাঁহারা ধর্ম্মকে বড় একটা গ্রাহ্যের মধ্যে আনিতে নারাজ। সে জন্ত তাঁহারা যে কত কাণ্ডই করিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। সে সকল কথা আমরা আর এ স্থলে বলিতে চাহি না। কিন্তু তাহা হইলেও রুসিয়ার জন-সাধারণ ধর্ম্মকে একেবারে তাহাদের হৃদয় হইতে নির্ব্বাসিত করিতে সম্মত হয় নাই। রুসিয়ার সর্ব্বস্বত্ববাদের প্রতিষ্ঠাতা লেনিন একবার তাঁহার এক বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন যে, ধর্ম্মটা মানুষের একটা ব্যক্তিগত ধারণার এবং ভাব-নিচয়ের অভিব্যক্তি মাত্র। উহা নিষিদ্ধ করা সম্ভব নহে,—ইহাই মনে করা বিধেয়। কিন্তু সে কথা সোভিয়েট সরকারের কতকগুলি অত্যুৎসাহী কর্ত্তার মনে স্থান পায় নাই। তাঁহারা মানুষের ধর্ম্ম-প্রবৃত্তিকে দমিত করিবার জন্ত অনেক উপায় দেখিয়াছিলেন; কিন্তু তাহা সফল হয় নাই। ইহা লইয়া কেবল অকারণ মানব-সমাজে কতকগুলি হ্যাঙ্গাম উপস্থিত হইয়াছিল। সম্প্রতি ষ্টেলিন রুসিয়ার শাসন-তন্ত্রের কিছু পরিবর্ত্তন করিয়াছেন। সে পরিবর্ত্তনটি এই যে,

তিনি নিয়ম করিয়াছেন যে, অতঃপর রুসিয়ার লোক অবাধে ধর্ম্ম-সাধনা করিতে পারিবে, কিন্তু উহা যাহাতে সর্ব্বস্বত্ববাদের কোনরূপ বাধা উপস্থিত করিতে পারে, সেরূপ ভাবে তাহা করিতে পারিবে না। সুতরাং রুসিয়ার শাসনতন্ত্রে ধর্ম্ম-সহিষ্ণুতা যৎকিঞ্চিৎ স্থান পাইল। নিকলাস ভোরিকাইন এই সংবাদটি প্যারিসের একখানি মাসিক পত্রে প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু কোন ধর্ম্মনীতিই যে সর্ব্বস্বত্ববাদের মূল নীতির সহিত খাপ খাইবে, তাহা আমাদের মনে হইতেছে না। এই পরিবর্ত্তনে আপাততঃ রুসিয়ার বহুলোক যে খুসী হইয়াছে, তাহা ঐ লেখকের কথাতেই প্রকাশ। সুতরাং সর্ব্বস্বত্ববাদ যে রুসিয়ার জন সাধারণের বিশেষ প্রীতিজনক, তাহা মনে হয় না।

বলসেবিক রুসিয়ায় আর একটি ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। তথায় ব্যবসায়ী প্রভৃতি মধ্যবর্ত্তী শ্রেণীর মধ্যে অবাধ প্রণয়-ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। পুরুষ এবং নারী পরস্পর পরস্পরকে মনোনীত করিয়া লইলেই তাহাদের বিবাহ হয়। এইপ্রকার বিবাহ আছে বলিয়া উহার যথেষ্ট অপব্যবহারও হইতেছে। তরুণরা তথায় এক বৎসরের মধ্যে পাঁচবার করিয়া বিবাহ করিয়া পাঁচবারই পত্নীকে তালাক দিতেছে। আর তরুণীরা প্রজাপতি যেমন একটি ফুল হইতে অন্য ফুলে উড়িয়া যায়, সেইরূপ স্বচ্ছন্দে এক পুরুষকে ছাড়িয়া ক্রমাগত পুরুষান্তরের অঙ্কশায়িনী হইতেছে। ইউনিয়ন অব-সোভিয়েট সোস্যালিষ্ট রিপাবলিকের মুখপত্র 'প্রাভদা' পত্র লিখিয়াছেন যে, এইরূপ করিলেও ঐ সকল উচ্ছৃঙ্খল নরনারী সমাজে সম্মানিত হইতেছেন। তাঁহাদের ঐরূপ আচরণে তাঁহাদের মর্য্যাদা ক্ষুন্ন হইতেছে না। সেইজন্য ঐ পত্র লিখিয়াছেন যে, এই আচরণ সমাজতন্ত্রবাদীদিগের মূলনীতির অনুগ নহে, এবং উহা তাহাদের নীতি-বিজ্ঞানের অনুযায়ীও নহে। কিন্তু সোভিয়েট সরকার লোকের ব্যক্তিগত জীবনে কোনরূপ হস্তক্ষেপ করিতে ইচ্ছা করেন না। তবে সোভিয়েট সরকার কোন নর বা নারীকে পিতৃত্ব এবং মাতৃত্বের গুণ বিস্মৃত হইতে দিবেন না। যেখানে ধর্ম্ম নাই, সেখানে নীতিবিজ্ঞান থাকিতে পারে না। উক্ত পত্র ঐ তারিখে বলিয়াছেন, জুয়েভা ঘোষণা করিয়াছেন যে parti committee পার্টি কমিটী যে সকল ক্ষেত্রে বিবাহ-বিচ্ছেদ করিবার জন্য লোককে উত্তেজিত করেন, তাহা অত্যন্ত অসঙ্গত। তাহা বন্ধ করিয়া দেওয়া আবশ্যক। অনেক সময় দেখা যায় যে, স্বামি-স্ত্রীতে বেশ সুখে স্বচ্ছন্দে সংসার করিয়া যাইতেছেন। তাহাদের মধ্যে প্রণয়ও জন্মিয়াছে। তাহার পর পার্টি কমিটী আবিষ্কার করিয়া ফেলিলেন যে, পতির পিতা সর্ব্বস্বত্ববাদের বিরোধী ছিলেন, অথবা পত্নীর জননী ছিলেন জনৈক ধর্ম্মযাজকের কন্যা। অমনই তাঁহারা পরস্পরকে তালাক দিবার হুকুম দিলেন। ইহাতে অনেক পরিবারে সুখ-শান্তির অবসান হইয়াছে এবং তাহারা অশেষ দুঃখে পতিত হইয়াছে। নিকিটিনা নামক এক জন ছাত্র বলিয়াছেন যে, "রুসিয়ায় যাঁহারা রাজকার্য্য চালাইতেছেন, তাঁহাদের পারিবারিক জীবনের প্রতি সম্মানবুদ্ধি থাকা আবশ্যক। তাঁহাদের যে তাহা নাই, তাহা তাঁহাদের ব্যবস্থাতেই সুপ্রমাণ। তাঁহারা পারিবারিক সুখ-স্বচ্ছন্দতার দিকে কোনরূপ দৃষ্টিদান করিতে সম্মত নহেন। সেই জন্য তাঁহারা স্বামীকে এক সহরে কায করিতে বলেন, আর স্ত্রীকে অন্য সহরে কায করিতে বলেন। ইহাতে স্বামী স্ত্রী এবং সন্তান-সন্ততিবর্গের যে ঘোর অসুবিধা ও কষ্ট হয়,—তাহা সহজেই বুঝা যায়। কর্ত্তৃপক্ষকে যদি পারিবারিক দিক্ দিয়া এই বিষয়টি বিচার করিতে বলা হয়, তাহা হইলে তাঁহারা সে কথা অবজ্ঞাসূচক হাস্য এবং মুখভঙ্গী করিয়া উড়াইয়া দেন।" ইহাতে বুঝা যাইতেছে যে, সোভিয়েট কর্ত্তৃপক্ষের খামখেয়ালীর জন্য অনেক লোক অসন্তুষ্ট। সোভিয়েট সরকার সমস্ত দেশ-বাসীকে কর্ম্ম প্রদান করেন। স্ত্রী-পুরুষ সকলকে তথায় সরকারী কায করিতে হয়। এরূপ অবস্থায় যদি তাঁহারা স্বামীকে এক সহরে কায দিয়া স্ত্রীকে ৫০ ক্রোশ দূরবর্ত্তী আর এক যায়গায় কায দেন, তাহা হইলে তাহাতে লোক অসন্তুষ্ট হইবে বৈ কি। তাঁহারা যে ঐরূপ দিয়া থাকেন, তাহা বিদ্যার্থী নিকিটিনার উক্তিতেই প্রকাশ। সোভিয়েট কর্ত্তৃপক্ষের ধর্ম্ম-বিদ্বেষ এত অধিক যে, যদি কাহারও শাশুড়ী ধর্ম্মযাজকের কন্যা হন,—তাহা হইলে পার্টি কমিটীর হুকুম মতে সে স্ত্রীকে তালাক দিতে বাধ্য হইবে। এ কথা তরুণ জুয়েভার (Zuyeva) উক্তি হইতেই জানা যায়। স্বামীর পিতা কিম্বা পিতামহ কোন কালে সর্ব্বস্বত্ববাদের বা সাম্যবাদের বিরোধী ছিল,—অতএব পার্টি-কমিটী স্ত্রীকে অমন স্বামী পরিত্যাগ করিতে বলিবেন বা বাধ্য করিবেন, ইহা কখনই সাধারণের পক্ষে সন্তোষজনক হইতে পারে না। কিন্তু এই সব কথা সোভিয়েট সমাজতান্ত্রিক সম্মেলনের প্রাভদা (Pravda) পত্রে গত মে মাসের শেষ ভাগে প্রকাশ পাইয়াছে। দেশে এই প্রকার যথেচ্ছাচার চালান হইতেছে বলিয়া সাইবিরিয়ার বন্দিবাসে প্রথমে তত লোক আটক হইয়াছিল, আর এখন দেশ শাসন করিবার জন্য সোভিয়েট সরকারের এত অধিক সৈন্য রাখিবার প্রয়োজন হইতেছে। সোভিয়েট-রাজত্ব যে রামরাজত্ব, ইহা মনে করিবার কোন কারণ নাই।

প্যালেষ্টাইনে অশান্তি

প্যালেষ্টাইনে অশান্তির কথা আমরা ইহার পূর্ব্বে কয়েকবার আলোচনা করিয়াছি। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে বালফুর যে ঘোষণা করিয়াছিলেন, তাহা হইতেই বর্ত্তমান অশান্তির উদ্ভব হইয়াছে। আরব জাতি আজ দেড় হাজার বৎসর ধরিয়া ঐ দেশে যাইয়া বসবাস করিতেছেন। সুতরাং তাঁহারা ঐ দেশে একটা কায়েমী স্বত্ব প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন বলিয়া মনে করিতেছেন। এ দিকে জার্ম্মাণীতে হিটলারের ইহুদীবিদ্বেষ ঐ অঞ্চলে ইহুদীদিগের পক্ষে থাকা অসম্ভব করিয়া তুলিয়াছে। বালফুরের ঘোষণায় উৎসাহিত হইয়া ইহুদীরা দলে দলে তাহাদের পিতৃভূমি প্যালেষ্টাইনে আসিয়া বাস করিতেছে। ইহুদীরা আসিয়া এই অঞ্চলটি বিশেষ সমৃদ্ধিশালী করিয়া তুলিয়াছে। যেখানে বিস্তীর্ণ মরুকান্তার ছিল,—সেইখানে ইহুদীরা সুন্দর সুন্দর নগর প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে ও করিতেছে। টেল আভিব ঐরূপ ইহুদীদিগের রচিত একটি সুন্দর নগর। ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে এই নগরে মাত্র ৬০ হাজার লোক ছিল। এখন তথাকার স্থায়ী বাসিন্দা হইয়াছে দেড় লক্ষ।

এখন এই নগর এত সুন্দর হইয়াছে যে, য়ুরোপের যে কোন সুন্দরী নগরীর সহিত ইহার তুলনা হইতে পারে। এইরূপ অনেক নগর তথায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এ দিকে নানা স্থান হইতে ইহুদীরা এই দেশে আসিয়া বসবাস করিতেছে দেখিয়া আরবরা শঙ্কিত হইয়া মনে করিতেছে যে, তাহাদিগকে এখন নিজ বাসভূমিতে পরবাসী হইয়া থাকিতে হইবে। সেই জন্য তাহারা বিদ্রোহী হইয়া উঠিতেছে। ইহার পূর্ব্বে তাহারা দুইবার বিদ্রোহ উপস্থিত করিয়াছিল,—কিন্তু এবারকার বিদ্রোহ সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল বলিয়া মনে হইতেছে। উভয় পক্ষে মারামারি কাটাকাটি পূর্ব্বাপেক্ষা প্রবলবেগে চলিতেছে বলিয়া মনে হইতেছে। উহা সহজে প্রশমিত হইবে, এরূপ লক্ষণ দেখা যাইতেছে না। খৃষ্টান-জাতিরা ইহুদীদিগের সহিত অধিক সহানুভূতিসম্পন্ন হইবারই কথা। আরবজাতিরা অত্যন্ত দুর্দ্ধর্ষ। তাহারা একেবারে মোরিয়া হইয়া ইহুদীদিগকে খুন জখম করিতেছে। ইহুদীরা অপেক্ষাকৃত শান্ত হইলেও উহার পাল্টা জবাবে খুন জখম করিতে কসুর করিতেছে না। ইংরেজ বলিতেছেন যে, তোমরা ক্ষান্ত হও; আমরা অগ্রে ন্যায়তঃ কি করা কর্ত্তব্য, তাহা বিচার করিয়া দেখি। কিন্তু আরবজাতিরা ক্ষান্ত হইতে চাহিতেছে না। তাহারা স্থির করিয়াছে যে, ইহুদীদিগকে উচ্ছেদ না করিয়া ছাড়িবে না। ইংরেজ সেই জন্য এই অঞ্চলে সামরিক আইন জারি করিবেন বলিয়া ভয় দেখাইতেছেন। কিন্তু আরবরা তাহাতে ভয় পাইতেছে না। তাহারা মোরিয়া হইয়া সুবিধা পাইলেই ইংরেজ সৈনিকদিগকে ও ইহুদীদিগকে হতাহত করিতেছে। আবার ইহুদীরাও সুবিধা পাইলেই আরবদিগকে হত্যা করিতেছে। ইহুদীরা ইংরেজ-সৈন্যদিগকে হত্যা করিতেছে না। এ দিকে বিলাত হইতে দলে দলে সৈনিক প্যালেষ্টাইন অভিমুখে যাত্রা করিতেছে। তথাপি প্রতিদিনই হত্যার সংবাদ পাওয়া যাইতেছে। আরবরা কিরূপ ভাবে হত্যাকাণ্ড চালাইতেছে, তাহার একটি দৃষ্টান্ত এ স্থানে দেওয়া গেল। ১লা সেপ্টেম্বর এক দল হাইল্যাণ্ডার সৈন্য নাবুলাস এবং জেরুজালেমের মধ্যবর্ত্তী অঞ্চলে বিদ্রোহী আরবদিগকে দমন করিবার জন্য নিযুক্ত ছিল। আরবরা রাস্তার উপরে ফাঁদ পাতিয়া রাখিয়াছিল। একটি সৈন্যপূর্ণ বাসগাড়ি উহার উপর দিয়া চলিয়া যায়। ফাঁদের মধ্যস্থ বিস্ফোরক বিদীর্ণ হয়। কিন্তু আরোহী-সৈন্যদিগের মধ্যে কেহ হতাহত হয় নাই। দুই জন হাইল্যাণ্ডার অপর একটি ফাঁদের উপর যাইয়া পড়ে। তাহারা আহত হইয়াছিল। এইরূপ ভাবে স্থানে স্থানে আরবদিগের ফাঁদে পড়িয়া বৃটিশসৈন্য হতাহত হইতেছে; তাহার উপর গুলীর আঘাতে বহু আরব, ইহুদী, এবং কতকগুলি করিয়া গোরা-সৈনিক আহত এবং নিহত হইতেছে। যাহা হউক, এখন বহু বৃটিশ-সৈন্য প্যালেষ্টাইনে প্রেরিত হইতেছে। প্রায় প্রতি সপ্তাহেই এক একখানি সৈনিকপূর্ণ জাহাজ বিলাত হইতে প্যালেষ্টাইন অভিমুখে যাত্রা করিতেছে। কিন্তু হাঙ্গামাটি যে সহজে নিবৃত্তি পাইবে, তাহা মনে হইতেছে না।

প্যালেষ্টাইনের এই ব্যাপারটি অত্যন্ত জটিল হইয়া দাঁড়াইয়াছে। প্রকাশ, ইটালী ভিতরে ভিতরে আরবদিগকে ইংরেজের এবং ইহুদীদিগের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিতেছে। 'হেরাল্ড' পত্রিকার জেরুজালামস্থিত সংবাদদাতা সংবাদ দিয়াছেন যে, আরবজাতি এখন পূর্ণ স্বাধীনতা প্রাপ্তির দাবী করিতেছেন। তাঁহাদিগকে অধিক ক্ষমতা না দিলে আর শান্তি রাখা সম্ভব হইবে না। ইটালী উগ্রপন্থী আরবদিগকে অস্ত্র-শস্ত্র এবং অর্থ দিয়া সাহায্য করিতেছেন। উক্ত সংবাদদাতা বলিয়াছেন যে, ইহার মধ্যে তাঁহারা বিদ্রোহী আরবদিগকে ২ লক্ষ লীরা দিয়া সাহায্য করিয়াছেন। এরূপ কথা না কি প্রকাশ পাইয়াছে যে, ইটালী আবিসিনিয়ায় ইহুদীদিগকে স্থান দিয়া তাহাদিগকে স্বমতে আনিবার জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু ইহুদীরা সে প্রস্তাবে সম্মত হয় নাই। ইরাক জাতিসঙ্ঘের পরিষদে প্যালেষ্টাইনের কথা তুলিবে বলিয়া আরব-সংবাদপত্রগুলি সংবাদ প্রকাশ করিয়াছে। আরবরা নানা দিক্ হইতে বৃটিশবাহিনীকে আক্রমণ করিতেছে। নাবালস এবং জেনিনের মধ্যবর্ত্তী এক স্থানে আরবরা ইংরেজদিগের প্রহরী সৈন্যদিগকে আক্রমণ করে। কিন্তু তাহাতে বৃটিশ প্রহরী সেনার বিশেষ কোন ক্ষতি হয় নাই। ইহুদীদিগের নূতন বৎসর আরম্ভ হইবার পর হইতেই আরবরা খুব উৎসাহ সহকারে ইহুদীদিগকে আক্রমণ করিতে আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। এক রাত্রিতে আরবরা ইহুদীদিগের নয়টি কেন্দ্রস্থলে আক্রমণ চালায়। মামাথের নিকট ইহুদীদিগের এক ময়দার কল আরবরা ভস্মীভূত করিয়া দিয়াছে। উহাতে ৫ হাজার পাউণ্ড আন্দাজ ক্ষতি হইয়াছে। গত ১৮ই সেপ্টেম্বর শুক্রবার লণ্ডনের ডাউনিং ষ্ট্রীটে বৃটিশ মন্ত্রিসভার এক বৈঠক বসিয়াছিল, ঐ বৈঠকে প্যালেষ্টাইন সম্বন্ধে আলোচনা হইয়াছিল বলিয়া সকলে অনুমান করিতেছেন। ফলে প্যালেষ্টাইন সম্বন্ধে নিত্যই নূতন নূতন হাঙ্গামা উপস্থিত হইতেছে। আরবরা যদি ধর্ম্মঘট ত্যাগ না করে, তাহা হইলে শীঘ্রই তথায় সামরিক আইন জারি হইবে বলিয়া মনে হইতেছে।

শান্তির আকাঙ্ক্ষা

য়ুরোপের অবস্থা যেরূপ দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে পদে পদে তথায় শান্তিভঙ্গের আশঙ্কা ঘটিতেছে। এমন কি, যদি য়ুরোপীয় জাতিবর্গের বিগত যুদ্ধের ভীষণতা সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা না থাকিত, তাহা হইলে বোধ হয়, এতদিন যুদ্ধ বাধিয়া যাইত। কারণ, য়ুরোপে এখন স্বার্থ লইয়া বিশেষ কাড়াকাড়ি চলিতেছে। সকল জাতিই প্রায় সর্ব্বস্বপণ করিয়া যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতেছে। কাজেই যাঁহারা শান্তিকামী, তাঁহারা এ অবস্থায় নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিতেছেন না। সেই জন্য গত ৩রা সেপ্টেম্বর ধরাপৃষ্ঠে কি উপায়ে শান্তি স্থাপন করা সম্ভব হইতে পারে, সেই বিষয়ে একটা পরামর্শ স্থির করিবার জন্য বেলজিয়মের ব্রুসেলস্ সহরে বহু হোমরা-চোমরা রাজনীতিক মিলিত হইয়া শান্তিস্থাপনের উপায় সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছিলেন। তাঁহারা যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন,—তাহাতে আসল কথা বাদ দিয়া একটা ফতোয়া দিয়া বসিয়াছেন। তাঁহারা বলিয়াছেন যে, জাতি-সঙ্ঘের বল ও শক্তি বৃদ্ধি করিতে হইবে। এই কার্য্য করিতে সকল শক্তিরই একজোট হইয়া কার্য্য করিতে হইবে। সকল জাতিকেই সন্ধির সর্ত্তগুলি মানিয়া চলিতে হইবে। সকল জাতিকেই যুদ্ধের সাজসরঞ্জামগুলি কমাইতে হইবে। সব কথা বলা হইয়াছে, কিন্তু আসল কথাটি বলা হয় নাই। আসল কথা, পশুবল দ্বারা

মানুষ বা জাতি নিজ ইষ্টসাধনকল্পে যে অসঙ্গত ব্যবস্থা বা অন্য জাতির সহিত অন্যায় সর্ত্ত করিয়াছে, তাহা সমস্তই বাতিল করিয়া দিতে হইবে। যাহা প্রত্যেক জাতির বা দেশের ন্যায়সঙ্গত অধিকার, তাহার সম্মান পূর্ণমাত্রায় বজায় রাখিতে হইবে,—তাহাদের সে অধিকার বিন্দুমাত্রও ক্ষুণ্ণ করা হইবে না। এই প্রকার সাত্ত্বিক সমদর্শিতাই কেবল মানব-সমাজে শান্তি-প্রতিষ্ঠায় একমাত্র সমর্থ। ডাক্তার উড্রো উইলসন যখন জাতিসঙ্ঘের পরিকল্পনা করিয়াছিলেন, তখন তিনি সমগ্র জাতিকে আত্ম-নিয়ন্ত্রণের অধিকার দানের কথা বলিয়াছিলেন। কিন্তু জাতিরা সেই ব্যাপারটি এমনভাবে দাঁড় করাইলেন যে প্রেসিডেণ্টের পরিকল্পিত জাতিসঙ্ঘ হইতে মার্কিণই আপনাকে দূরে রাখিয়া দিয়াছেন। আন্তর্জ্জাতিক সম্বন্ধ এবং ব্যবহার ঠিক ব্যক্তিগত সম্বন্ধ এবং ব্যবহারের ন্যায় নহে। উহার সম্বন্ধে সর্ব্বজন-স্বীকৃত কোন আইন নাই। সাধারণ লোকের ব্যক্তিগত ব্যবহারে লোক রাজ আইনের এবং সামাজিক প্রশংসা ও নিন্দার দ্বারা প্রভাবিত হয়। কিন্তু আন্তর্জ্জাতিক ব্যবহারে সে বালাই একেবারেই নাই। তাহার পর ভগবানের ভয় এ যুগে কেহ করে না। ব্যক্তিগত জীবনেও আমরা দেখিতে পাই, অত্যাচারী এবং অত্যাচারে পীড়িত উভয় পক্ষই ভগবানের কৃপা ভিক্ষা করে। আর অত্যাচারী যদি যোগাড়ের জোরে জয়লাভ করে, তাহা হইলে সেও জোড়া পাঁঠা দিয়া কালীপূজা দেয় বা গীর্জ্জায় যাইয়া ভগবানকে ধন্যবাদ দেয়। আন্তর্জ্জাতিক ব্যাপারেও ঠিক তাহাই। আবিসিনিয়া সংগ্রামের সময় হাবসীরাও ভগবানের কৃপা চাহিয়াছিল,—ইটালীয়রাও চাহিয়াছিল। সুতরাং সে ভয় আন্তর্জ্জাতিক ব্যবহারের উপর কোনরূপ প্রভাব বিস্তৃত করিতে পারে না। ফল কথা, আন্তর্জ্জাতিক ব্যাপারে ন্যায়ের ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হইতে বহু বিলম্ব আছে। পণ্ডিতরা একসঙ্গে জড় হইয়া যতই জটলা করুন না কেন, তাঁহারা সাম্রাজ্যবাদের সহিত কিছুতেই শান্তির গাঁইটছড়া বাঁধিতে পারিবেন না। এ সকল শান্তিসংসদে কেবল অজা-যুদ্ধের ন্যায় বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়াই হইবে। ইহা প্রকৃতির প্রতিশোধ।

ত্রিশক্তির সম্মেলন

এ কথা পাকাভাবে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, শীঘ্রই ভিয়েনা সহরে ইটালী, অষ্ট্রীয়া এবং হাঙ্গেরী এই তিন রাজ্যের পররাষ্ট্র-সচিবরা সম্মিলিত হইবেন। কি বিষয়ে পরামর্শ হইবে, তাহা প্রকাশ নাই। তবে ইটালীর একখানা পত্রে সিনিওর গায়দা লিখিয়াছেন যে, এই তিনটি শক্তিকে একত্র হইয়া কায করিতে হইবে, সকলকেই অস্ত্রসজ্জা করিতে হইবে, সকলকে একসঙ্গে কায করিতে হইবে এবং তাহাদের সকলের রাজ্যের বাহিরে যদি কোন শঙ্কাজনক অবস্থার আবির্ভাব হয়, তাহা হইলে সে জন্য তাঁহাদিগের সকলকেই প্রস্তুত হইতে হইবে। ইহাতে বেশ বুঝা যাইতেছে যে, যুদ্ধের পূর্ব্বে বিভিন্ন জাতি যেরূপ সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া পরস্পর শক্তির সমতা রক্ষা করিবার চেষ্টা করিতেন,—এখনও সেইরূপ চেষ্টা করা হইতেছে। কিন্তু মহাযুদ্ধের পর শুনা গিয়াছিল যে, আর শক্তির সমতা সাধন করিবার প্রয়োজন হইবে না, উড্রো উইলসনের পরিকল্পিত জাতিসঙ্ঘের ন্যায়বিচার দ্বারা সকল বিবাদের মীমাংসা হইবে। সেই জাতিসঙ্ঘও প্রতিষ্ঠিত হইল, কিন্তু উহা যেমনটি করিয়া গড়িয়া তুলিবার কথা, তেমনটি হইল না। কাযেই আবার সেই পুরাতন ব্যবস্থার পুনরাবর্ত্তন ঘটিল।

ম্যাকমেহনের দণ্ড

জর্জ্জ এণ্ড্রু ম্যাকমেহন নামক জনৈক ইংরেজ যুবক সম্রাট অষ্টম এডওয়ার্ডের দিকে একটা গুলীভরা পিস্তল নিক্ষেপ করিয়াছিল বলিয়া ওল্ড বেইলী আদালতে অভিযুক্ত হইয়াছিল। সম্রাট যখন হাইড পার্ক হইতে ফিরিতেছিলেন, তখনই এই কাণ্ড ঘটে। শ্রাবণ মাসের 'মাসিক বসুমতীর' বৈদেশিক প্রসঙ্গে আমরা সে কথা বলিয়াছি। গত ১৪ই সেপ্টেম্বর (২৯শে ভাদ্র) তাহার অপরাধের বিচার হয়। তাহার বিরুদ্ধে তিন দফা অভিযোগ উপস্থিত করা হয়, যথা (১) মানব-জীবন বিপন্ন করিবার জন্য পিস্তল প্রভৃতি রাখা, (২) রাজার নিকট পিস্তল উপস্থিত করা এবং রাজাকে ভয় দেখাইবার জন্য বে-আইনী-ভাবে এবং ইচ্ছাপূর্ব্বক তাঁহার দিকে পিস্তল নিক্ষেপ করা। প্রথম দুইটি অভিযোগ সপ্রমাণ হয় নাই বলিয়া সে অব্যাহতি পাইয়াছে এবং (৩) অভিযোগে সে দোষী সাব্যস্ত হইয়াছে বলিয়া তাহাকে মাত্র এক বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হইয়াছে। বিচারকালে আসামী ম্যাক্‌মেহন নানা কথাই বলিয়াছে। সে ওল্ড বেইলী আদালতে বলিয়াছে যে, কোন একটি বৈদেশিক জাতির প্রতিনিধিরা তাহাকে অর্থ দিয়া রাজাকে হত্যা করিবার জন্য নিয়োগ করিয়াছিল। যে ব্যক্তি তাহাকে অর্থ দিয়া এই দুষ্কর্ম্মে নিয়োগ করিয়াছিল, বিদেশী দূতাবাসের সেই লোকটির নাম সে একখানি কাগজে লিখিয়া তাহা বিচারপতিকে দিয়াছিল। উহা জজ, জুরী এবং এটর্ণি জেনারাল দেখিয়াছিলেন। তাহার উক্তিতেই প্রকাশ পাইয়াছিল যে, সে যে ষড়যন্ত্রের কথা বলিয়াছিল, "সেই ষড়যন্ত্রের উদ্দেশ্য ছিল যে, রাজাকে হত্যা করিলে বৃটিশ সাম্রাজ্য ছিন্নভিন্ন হইয়া যাইবে। সুতরাং সেই সাম্রাজ্যের অংশ-বিশেষ অপর দেশকে দেওয়া হইবে।" এই কথা শুনিয়া আদালত-শুদ্ধ লোক স্তম্ভিত হইয়া উঠে। জজ এবং জুরী ম্যাক্‌মেহন-কথিত ঐ ষড়যন্ত্রের কথা বিশ্বাস করেন নাই। কিন্তু সে বার বার উত্তেজিত হইয়া বলে, তাহার কথা একটুও মিথ্যা নহে। সম্রাটকে হত্যা করা সম্ভবতঃ তাহার উদ্দেশ্য ছিল না; ঐরূপ উদ্দেশ্য থাকিলে, সে ঐরূপভাবে পাগলের মত সম্রাটের দিকে পিস্তলটি নিক্ষেপ করিবে কেন? সে কঠোর শাস্তিই প্রার্থনা করিয়াছিল; কিন্তু বিচারপতি তাহাকে কঠোর শাস্তি দেন নাই। বিচারপতি বলিয়াছেন যে, তিনি বুঝিতে পারিয়াছেন যে, আসামীর রাজাকে খুন করিবার ইচ্ছা ছিল না। অন্যথা তিনি তাহাকে কঠোর দণ্ড দিতেন। এই দণ্ডাদেশ শুনিয়া এ দেশের লোক একটু বিস্মিত হইয়াছে। এদেশে এইরূপ কাণ্ড কেহ করিলে হয় তাহার প্রাণ-দণ্ড অথবা তাহার যাবজ্জীবন নির্ব্বাসন দণ্ডই হইত। এরূপ কঠোর দণ্ড যে অনেক হইয়াছে,—তাহার দৃষ্টান্ত ভারতের সর্ব্বত্রই আছে। আমরা তাহা উদ্ধৃত করিয়া এই মন্তব্য দীর্ঘ করিতে চাহি না। সামান্য বক্তৃতায় বা লেখায় বেফাঁস কথা বাহির হইলেও এদেশে বক্তার এবং লেখকের ইহা অপেক্ষা অনেক কঠোর দণ্ড হয়। ইহা স্বাভাবিক। কারণ, স্বাধীন জাতিমাত্রই মনে করে

যে, তাহাদের রাজা যদি অত্যাচারী না হন,—তাহা হইলে প্রজাদিগের স্নেহ এবং প্রীতির উপর রাজার নির্ব্বিঘ্নতা সম্পূর্ণ নির্ভর করে। কিন্তু বিজিত রাজ্যের প্রজারা যতই রাজভক্ত হউক না কেন,—তথাকার বিদেশী ব্যুরোক্রেসী কিছুতেই তাহা মনে করিতে পারেন না। সীলী (Sheeley) যথার্থই বলিয়াছেন যে, যখন কোন রাজ্য নিজ জাতীয়তার গণ্ডী ছাড়িয়া তাহার ক্ষমতা প্রসারিত করে, তখন তাহার ক্ষমতা হইয়া দাঁড়ায় অনিশ্চিত এবং কৃত্রিম (precarious and artificial)· (Expansion of England 3rd lec)। সেই জন্ত তাঁহারা স্বতঃই বিদেশী প্রজাকে প্রাণ খুলিয়া বিশ্বাস করিতে পারেন না। ইহা সাম্রাজ্যবাদীদিগের দুর্ব্বলতা। এই দুর্ব্বলতা যদি তাঁহারা পরিহার করিতে পারিতেন, তাহা হইলে তাঁহারা অনেক দুর্ভোগ এবং দুশ্চিন্তা হইতে নিস্তার পাইতেন।

সিরিয়ায় স্বায়ত্ত-শাসন

কাগজে-কলমে সিরিয়ায় স্বায়ত্ত-শাসন প্রতিষ্ঠিত হইল। গত ৯ই সেপ্টেম্বর ফ্রান্সের পররাষ্ট্রসচিবের গৃহে ফ্রান্সের সহিত সিরিয়ার শাসন সম্বন্ধে চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হইয়া গিয়াছে। এই চুক্তিতে সর্ত্ত করা হইয়াছে যে, তিন বৎসরের মধ্যে সিরিয়া স্বাধীনতা লাভ করিবে। ইংলণ্ডের সহিত ইরাকের যে সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হইয়াছে, ফ্রান্সের সহিত সিরিয়ার চুক্তিপত্র অনেকটা তাহারই আদর্শে রচিত হইয়াছে। তবে শুনা যাইতেছে যে, ইঙ্গো-ইরাকীয় চুক্তিপত্রের কতকগুলি দোষ এই চুক্তিপত্রে পরিহার করা হইয়াছে। ফ্রাঙ্কো-সিরিয়ার চুক্তিতে খৃষ্টান এবং অন্ত সকল সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের স্বার্থ যাহাতে ক্ষুণ্ণ না হয়, তাহার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ইদানীং সিরিয়ার জাতীয়দল স্বাধীনতা লাভের জন্ত বিশেষভাবে আন্দোলন করিতেছিল, সে কথা পূর্ব্বেই আমরা প্রকাশ করিয়াছি। এই উপলক্ষে মারামারি ও হাঙ্গামাও অনেক হইয়াছে। সিরিয়া অত্যন্ত প্রাচীন রাজ্য। ইহা পূর্ব্বে এসিরিয়ান রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ইহার অধিকাংশ অধিবাসীই আরামিয়ান এবং আরবদিগের বংশধর। আরামিয়ান প্রাচীন এসিরিয়ার অধিবাসী। ইহারা এখন মুসলমানধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে। ১৫১৬ খৃষ্টাব্দে এই রাজ্যটি তুরস্ক সাম্রাজ্যের অধীন হয়। কিন্তু তুরস্কের শাসনাধীনে ইহা বিশেষ উন্নতিলাভ করিতে পারে নাই। বিগত য়ুরোপীয় মহাযুদ্ধের পর এই রাজ্যটি ফ্রান্সের তত্ত্বাবধানে রক্ষা করা হইয়াছে। এখন আরও তিন বৎসর পরে সিরিয়া স্বাধীন হইবে। এখন এই চুক্তিপত্রের সর্ত্ত এবং সিরিয়ার প্রকৃত অবস্থা না জানিতে পারিলে ইহার ফল কিরূপ হইবে, তাহা অনুমান করা কঠিন।

—

জাতি-সঙ্ঘ

জেনিভায় জাতি-সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠিত হইবার পর হইতে এই প্রতিষ্ঠানটি কখনই বিশেষ ক্ষমতাশালী বলিয়া গণ্য হয় নাই। হেগের আন্তর্জ্জাতিক সালিসী আদালত যে কারণে নিষ্ফল হইয়াছে,—জেনিভার জাতি-সঙ্ঘও অনেকটা সেই কারণেই নিষ্ফল হইয়া গিয়াছে। আবিসিনিয়া-ইটালীর সংগ্রামে জাতি-সঙ্ঘের মর্য্যাদা বিশেষভাবে ক্ষয় পাইয়াছে। এখন ইংরেজ ও ফরাসী এই দুই জাতি মিলিয়া জাতি-সঙ্ঘকে মর্য্যাদাশালী করিবার চেষ্টা করিতেছেন। তাহা করিতে হইলে এখন যাঁহারা জাতি-সঙ্ঘের বাহিরে আছেন, তাঁহাদিগকে জাতি সঙ্ঘে যোগ দিবার জন্ত চেষ্টা করিতে হয়। ইটালী জাতি-সঙ্ঘ হইতে নাম কাটাইবেন বলিয়া মধ্যে মধ্যে হুমকী দিতেছেন। সে দিন আবিসিনিয়ার প্রতিনিধিকে জাতিসঙ্ঘে আসন দিবার প্রস্তাবে ক্রুদ্ধ হইয়া ইটালী বলিয়াছিল যে, সে জাতি-সঙ্ঘ বর্জ্জন করিবে। যে প্রতিষ্ঠান লোক কথায় কথায় বর্জ্জন করিতে পারে, সে প্রতিষ্ঠান কখনই বলশালী হইতে পারে না। জার্ম্মাণী এখন আর সেই ধূল্যবলুণ্ঠিত জাতি নাই। তাহার নষ্ট শক্তি সে কতকটা ফিরিয়া পাইয়াছে বলিয়াই মনে হয়। সেই জার্ম্মাণী এখন জাতিসঙ্ঘের ভিতর নাই। জার্ম্মাণীকে এখন জাতিসঙ্ঘের ভিতর লইয়া আসিবার জন্ত বিশেষ চেষ্টা হইতেছে। সেই জন্ত লয়েড জর্জ্জ, উইনষ্টন চার্চহিল প্রভৃতি ইংলণ্ডের হোমরা-চোমরা রাজনীতিকরা এখন হিটলারের গুণগানে রত হইয়াছেন। কিন্তু একটা ব্যাপার বড় জটিল হইয়া উঠিতে পারে। জার্ম্মাণী তাহার নষ্ট উপনিবেশগুলি ফিরিয়া পাইবার দাবী করিবেন। এইখানেই যোল আনা গোল বাধিবার সম্ভাবনা। কাযেই জার্ম্মাণীকে কোণ-ঠাসা করিয়া রাখিবার চেষ্টাও ইংলণ্ড প্রভৃতি কয়েকটি শক্তির পক্ষে স্বাভাবিক। হের হিটলার, মুসোলিনী এবং সেনাপতি আরসি প্রভৃতি উপনিবেশ লাভের দাবী উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করিতেছেন। ইংলণ্ডের ধর্ম্মবিশ্বাসী মিষ্টার ল্যান্সবারি স্পষ্টাক্ষরেই বলিতেছেন যে, উপনিবেশগুলিই যদি যত অনিষ্টপাতের মূল হয়, তাহা হইলে ঐ সকল উপনিবেশ হইতে কাঁচা মাল বণ্টনের একটা সুব্যবস্থা কর, আর উপনিবেশগুলি শক্তিবিশেষের হাতে না রাখিয়া একটা আন্তর্জ্জাতিক সমিতির হাতে আদেশাত্মকভাবে শাসন করিবার জন্ত ছাড়িয়া দাও। তাহা হইলেই চমৎকার হইবে। যেমন অধীন ব্যক্তির পক্ষে এক নায়ক অপেক্ষা বহু নায়ক কষ্টকর, সেইরূপ অধীন জাতির পক্ষে এক জাতি অপেক্ষা বহু জাতির নায়কত্ব অধিক কষ্টকর হইবেই। যাহা হউক, উপনিবেশ এবং অধিকার লইয়া যত দিন সাম্রাজ্যবাদী জাতিদিগের মধ্যে আঁচড়া-আঁচড়ি ও কামড়া-কামড়ি চলিবে, তত দিন তাহাদের মধ্যে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হইবে না; জাতিসঙ্ঘও যে উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, সে উদ্দেশ্য সাধন করিতে পারিবে না। কারণ, স্বার্থের টান ন্যায়বিচারকে যতটা ক্ষুণ্ণ করিতে পারে, এমন আর কিছুতেই পারে না। মার্কিণও এখন একটি অতি প্রবল শক্তিশালী জাতি। সেই মার্কিণীরাই ত জাতিসঙ্ঘের বাহিরে রহিয়াছেন। তাঁহাকেও জাতি-সঙ্ঘের ভিতর গ্রহণ না করিলে জাতিসঙ্ঘের বলাধান হইবে না।

পাছে য়ুরোপে একটা যুদ্ধ বাধিয়া উঠে, এই শঙ্কায় ইংলণ্ড প্রভৃতি জাতিসঙ্ঘের সদস্যগণ ইটালীর সহিত যুদ্ধ করিতে সাহসী হন নাই। কিন্তু জার্ম্মাণীর সহিত যদি রুসিয়ার যুদ্ধ বাধে, তাহা হইলে ইংলণ্ড কি করিবেন? সম্ভবতঃ তাঁহারা ঐ যুদ্ধে লিপ্ত হইবেন না। কিন্তু পশ্চিম-য়ুরোপে যদি অশান্তি উপস্থিত হয়, তাহা হইলে ইংলণ্ড নিরপেক্ষ ও নির্লিপ্ত হইয়া থাকিতে পারিবেন বলিয়া মনে হয় না। আসল কথা, রাষ্ট্র-সঙ্ঘ এখন কেবল কয়েকটি প্রবল শক্তির যন্ত্রস্বরূপ হইয়া পড়িয়াছে। এরূপ অবস্থায় ইহার দ্বারা ইহার প্রকৃত উদ্দেশ্য কখনই সিদ্ধ হইতে পারে না।

মিশরে শিক্ষা-বিস্তারের পরিকল্পনা

মিশরের কায়রো সহর হইতে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, মিশরের শিক্ষা বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষ তথাকার বালক-বালিকাদিগের শিক্ষাদান বাধ্যতামূলক করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। তাঁহারা শিক্ষাদান কার্য্যের জন্ত একটা কার্য্যতালিকা প্রকাশ করিয়াছেন। আগামী জানুয়ারী মাস হইতে ঐ কার্য্যতালিকা অনুসারে কায আরম্ভ হইবে। তদনুসারে সমস্ত মিশরে ১ হাজার ৩ শত বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইবে। ঐ বিদ্যালয়গুলিতে ১৫ লক্ষ বালক-বালিকা শিক্ষালাভ করিবে। সুসংবাদ তাহাতে সন্দেহ নাই। মিশরের বিস্তার সাড়ে ৩ লক্ষ বর্গ-মাইল। লোকসংখ্যা ১ কোটি সাড়ে ২১ লক্ষ; সুতরাং সমস্ত বিদ্যালয়ে তথাকার সমস্ত বালক-বালিকার স্থান সঙ্কুলান হওয়া সম্ভব হইবে বলিয়া মনে হয় না। তথায় কিরূপ বয়স পর্য্যন্ত বালক-বালিকাগণ বিদ্যালয়ে যাইবার উপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হইবে, তাহা ঠিক বুঝা যাইতেছে না। যাহা হউক, স্বাধীনতাপ্রাপ্তির অল্পদিন পরেই মিশরবাসীরা যে এই কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন, তাহা তাঁহাদের পক্ষে প্রশংসনীয়, তাহাতে সন্দেহ নাই।

স্পেনের বিদ্রোহ

স্পেনের গৃহযুদ্ধ পূর্ব্ববৎই চলিতেছে। যেরূপ সংবাদ পাওয়া যাইতেছে, তাহাতে মনে হইতেছে, তথায় বিদ্রোহীরাই অধিকাংশ যুদ্ধে জয়লাভ করিতেছে। তবে মোটের উপর মনে হইতেছে যে, উভয় পক্ষই তথায় তুল্য বলশালী। কখন শুনা যাইতেছে যে, বিদ্রোহীরা বা ফাসিষ্ট দল সরকারী সৈন্তদিগকে এক স্থান হইতে বিতাড়িত করিতেছে, তাহার পর আবার কয়েক দিন পরেই সংবাদ আসিতেছে যে, বিদ্রোহীরা সেই স্থান হইতে সরকারী বাহিনী কর্ত্তৃক বিতাড়িত হইতেছে। সান সাবষ্টিয়ান ও আলকাজার দুর্গ বিদ্রোহীরা দখল করিয়াছে বলিয়া প্রকাশ পাইয়াছে। আলকাজারের পতন সম্বন্ধে নানারূপ সংবাদ পাওয়া যায়। এখন শুনা যাইতেছে যে, বিদ্রোহীরা ঐ স্থান অধিকার করিয়াছে। সেপ্টেম্বর মাসের শেষভাগে সংবাদ আসে যে, বিদ্রোহী সৈন্তরা প্রচণ্ড-বিক্রমে যুদ্ধ করিয়া টলিডো দখল করিয়াছে এবং তথা হইতে অগ্রসর হইয়া তাহারা আলকাজার হইতে সরকারী সৈন্তদিগকে বিতাড়িত করিয়া অবরুদ্ধ ফ্যাসিষ্ট সৈন্তদিগকে উদ্ধার করিয়াছে। মধ্যে বিদ্রোহীরা যাহাতে অগ্রসর হইতে না পারে, তাহার জন্ত সরকার পক্ষ এক কৌশল অবলম্বন করিয়াছিল। তাহারা আলবাসে নদীর বাঁধ খুলিয়া দেয়। ফাসিষ্ট বা বিদ্রোহী সৈন্তদল আলবাসে নদীর শুষ্ক খাত বহিয়া অগ্রসর হইতেছিল। হঠাৎ তাহাদের উপর জলপ্রবাহ আসিয়া পড়াতে তাহাদের কতক সৈন্ত ভাসিয়া যায় আর কতক সৈন্ত প্রধান সৈন্তদল হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে। মাদ্রিদের নিকটস্থ মাকেদা নামক স্থানে স্বয়ং স্পেনের প্রেসিডেণ্ট আজানা সরকারী সৈন্তদল পরিচালিত করেন। কিন্তু তিন দিন অবিশ্রাম যুদ্ধের পর সরকারী সৈন্ত পরাজিত হয়। এখনও মাদ্রিদ দখল করিবার জন্ত বিদ্রোহী পক্ষ সরকার পক্ষের সহিত যুদ্ধ করিতেছে। সময় সময় যুদ্ধের সংবাদ বন্ধ থাকিতেছে। সরকার পক্ষ বলিতেছেন যে, বিদ্রোহীরা অন্ত শক্তির নিকট হইতে সাহায্য পাইতেছে বলিয়া তাহারা এরূপভাবে যুদ্ধ করিতে পারিতেছে। বিদ্রোহীদিগের বোমা এবং রণবিমান যেরূপ কার্য্য করিতেছে, তাহা দেখিয়াই সরকার পক্ষ ঐরূপ সন্দেহ করিতেছেন। আবার কেহ কেহ বলিতেছেন যে, রুসিয়া ভিতরে ভিতরে সরকার পক্ষকে উৎসাহ দিতেছেন এবং সাহায্য করিতেছেন। ফলে এই গৃহবিবাদে স্পেন ভূমি একেবারে উৎসন্ন যাইতে বসিয়াছে। উভয় পক্ষই উভয় পক্ষের সহিত অত্যন্ত নিষ্ঠুর ব্যবহার করিতেছে। এক জন বিশেষজ্ঞ বলিয়াছেন যে, এই গৃহযুদ্ধে যত লোক মরিতেছে, তাহার অধিক লোক শত্রুপক্ষ কর্ত্তৃক বন্দী হইয়া নৃশংসভাবে নিহত হইতেছে। কেহ কেহ বলিতেছেন যে, স্পেনের এই গৃহযুদ্ধ যুরোপকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া দিবে। যাঁহারা সর্ব্বস্বত্ববাদী, তাঁহারা এক পক্ষ হইবেন, আর যাঁহারা রাজতন্ত্রবাদী, তাঁহারা আর এক পক্ষ হইবেন। অর্থাৎ ইটালী জার্ম্মাণী প্রভৃতি যাঁহারা ব্যক্তিগত শাসনের পক্ষপাতী, তাঁহারা হইবেন এক পক্ষ, আর অপর পক্ষে থাকিবেন ফ্রান্স এবং রুসিয়া। অন্তান্ত শক্তিরা কতক এ পক্ষ, কতক ও পক্ষ অথবা কেহ বা নিরপেক্ষ থাকিবেন। অবশ্য এই হাঙ্গামা যদি অধিক দিন চলে, তাহা হইলে ইহা হইতে একটা জটিলতার উদ্ভব যে না হইতে পারে, তাহা নিশ্চিতভাবে বলা যায় না। যদি স্পেনে সমাজতন্ত্রবাদীদিগের জয় হয়, তাহা হইলে পশ্চিম-যুরোপে গণতন্ত্রের প্রভাব বৃদ্ধি পাইবে। বিদ্রোহীরা জয়লাভ করিলে যাঁহারা রাজনীতিক এবং অন্ত কারণে এক ব্যক্তির দ্বারা পরিচালিত নিয়মতন্ত্রমূলক শাসন চাহেন,—তাঁহাদেরই বল বৃদ্ধি পাইবে। স্পেনের ফাসিষ্টদিগের মত ইটালীয় এবং জার্ম্মাণীর ফাসিষ্টদিগের মত হইতে স্বতন্ত্র। তাহারা চাহে ধর্ম্মযাজকদিগের অধীনে শক্তিশালী ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক পরিচালিত শাসনতন্ত্র। তাহারা রক্ষণশীল। তাহাদের মনোভাব যুরোপের অন্তান্ত দেশের লোকের মনোভাব হইতে স্বতন্ত্র। রুসিয়ায় ঠিক মধ্যবর্ত্তী শ্রেণী বলিয়া স্বতন্ত্র শ্রেণী নাই। স্পেনে তাহা আছে। এক জন বিশিষ্ট রাজনীতিক লেখক বলেন, স্পেনের ফাসিষ্ট নামে অভিহিত শ্রেণীরা ধর্ম্মকে বিসর্জ্জন করিবার পক্ষপাতী নহেন।

আর্থিক ব্যাপারে নূতন চা'ল

সম্প্রতি পাশ্চাত্য-খণ্ডে আর্থিক ব্যাপারে একটা নূতন কাণ্ড ঘটান হইতেছে। মার্কিণ, ইংলণ্ড এবং ফ্রান্স এই তিন জাতি মিলিয়া তাঁহাদের দেশের প্রচলিত মুদ্রাগুলির মূল্য সমানুপাতিক হিসাবে কমাইয়া দিয়াছেন। ইহার ফলে বিদেশে, অর্থাৎ এসিয়ায়, আফ্রিকায় এবং আমেরিকায় ঐ তিনটি দেশের উৎপন্ন পণ্য সুলভ মূল্যে বিক্রয় করিতে পারা যাইবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। এখন হলণ্ড যদি ফ্রান্সের দৃষ্টান্ত অনুসারে তাহাদের দেশের মুদ্রামূল্য হ্রাস করিয়া দেয়, তাহা হইলে ভারতীয় শর্করা-শিল্পের বিশেষ ক্ষতি হইবে বলিয়া অনেকে অনুমান করিতেছেন। গিল্ডারের মূল্য কমিলে জাভার চিনি, কার্পাস প্রভৃতির মূল্য কমিবে। কিন্তু ভারতীয় টাকার মূল্য যখন বিলাতী পাউণ্ড ষ্টার্লিংএর মূল্যের সহিত গাঁথা রহিয়াছে, তখন ষ্টার্লিংএর মূল্য কমিলেই টাকার মূল্য কমিবে। সুতরাং সে দিকে আশঙ্কার কারণ কতটা আছে, তাহা কিছু দিন না

যাইলে ঠিক বুঝা যাইতেছে না। ভারতীয় সুগার মিলস্ এসোসিয়েশন কিন্তু এজন্য ইহার মধ্যেই আতঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছেন। এ বিষয়ে এখনও বিস্তৃত সংবাদ পাওয়া যায় নাই। এ ব্যাপার লইয়া শীঘ্রই বিলাতী পার্লামেণ্টে আলোচনা হইবে। এ ব্যাপারের সহিত ভারতবাসীর স্বার্থ নানাভাবে জড়িত রহিয়াছে। এই সম্পর্কে সকল কথা না জানিতে পারিলে এ সম্বন্ধে বিস্তৃতভাবে মত প্রকাশ করা চলে না। ইহার পূর্ব্বে ফ্রান্স মুদ্রা বিষয়ে স্বুবর্ণ-মান পরিত্যাগ করিবেন না স্থির করিয়াছিলেন। ইহা লইয়া ফ্রান্সে অনেক তর্কবিতর্কও হইয়া গিয়াছে। তবে এ সম্বন্ধে একটা কথা বলা হইয়াছে যে, এই ব্যবস্থায় বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হইবে। এ অনুমান সত্য বলিয়া মনে হয় না। এখন এই ব্যাপার দেখিয়া জার্ম্মাণী, ইটালী প্রভৃতি কি করেন, তাহাও দ্রষ্টব্য।

চীন-জাপানে হাঙ্গামা

চীনের সহিত জাপানের একটা হাঙ্গামা বাধিবার সম্ভাবনা জন্মিয়াছে। আশ্বিন মাসের প্রথমেই সংবাদ পাওয়া যায় যে, হাঙ্কোস্থিত জাপানী দূতাবাসের এক জন জাপানী পুলিস-প্রহরী গুলীর আঘাতে নিহত হইয়াছিল। সেই উপলক্ষে জাপানীরা ঐ স্থান দখল করে এবং তাহার ফলে জাপানীদের সহিত চীনাদিগের মনের মালিন্য অত্যন্ত অধিক মাত্রায় বৃদ্ধি পায়। তাহার পর এই ব্যাপার সম্বন্ধে বিশেষ কোন সংবাদ পাওয়া যায় না। সম্প্রতি আচম্বিতে এক সংবাদ আসিয়াছে যে, তথায় অবস্থা বড়ই সঙ্গীন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। জাপানীরা চীনের নিকট হইতে কতকগুলি বিষয় দাবী করিয়াছিল, তাহার পাল্টা জবাবে চীনারা জাপানীদিগের নিকট হইতে কতকগুলি বিশেষ দাবী করিয়াছে। চীনাদিগের সে দাবীগুলি অসঙ্গত নহে। যথা, জাপানীরা শুল্ক না দিয়া কোন পণ্যাই চীনদেশে লইয়া যাইতে পারিবেন না, উত্তর-চীন হইতে অতিরিক্ত জাপানী সৈন্য সরাইয়া লইয়া যাইতে হইবে, চীনের কোন ব্যাপারে জাপানী সৈনিকরা হস্তক্ষেপ করিতে পারিবেন না, টাঙ্কী সাংহাই চুক্তি বাতিল করিতে হইবে ইত্যাদি। চীনাদের এই দাবীর কথায় তাহাদের বিশেষ দৃঢ়তার পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। ইহা দেখিয়া জাপানীরা বিস্মিত। ইহার পরই সংবাদ আসিয়াছে যে, সাংহাই অঞ্চলে লোকের ত্রাস উপস্থিত হইয়াছে। চীনারা সাংহাই এবং নাঙ্কিনের মধ্যবর্ত্তী স্থানে ৭ হাজার সৈন্য এবং নাঙ্কিন্ সাংহাই এবং হেংচাউ-সাংহাই রেলপথে ১৫ হাজার সৈন্য মোতায়েন করিয়াছেন। এদিকে বৃটিশ নৌবিভাগের কর্ত্তৃপক্ষ ইংরেজ নারী ও বালক-বালিকাদিগকে হাংকো ও অন্যান্য ইয়াংসি বন্দর হইতে স্থানান্তরিত করিবার ব্যবস্থা করিতেছেন। ইংরেজ বলিতেছেন, এ জন্য ত্রস্ত হইবার কোন কারণ ঘটে নাই। এটা কেবল সাবধানতা অবলম্বন হিসাবেই করা হইতেছে। অনেকে শঙ্কা করিতেছেন যে, জাপান সম্ভবতঃ ইয়াংসি বন্দরগুলি অবরুদ্ধ করিতে পারেন। সুতরাং কখন্ কি হয় বলা যায় না। অবস্থা সঙ্গীন। তবে যুদ্ধ যে বাধিবেই, এমন অবস্থা এখনও হয় নাই।

নারী

অতৃপ্ত-তরঙ্গ-ক্ষুব্ধ আকাঙ্ক্ষা-সাগরে
তৃপ্তি-শষ্প-শ্যাম-কূল তুমি হে কল্যাণি !
মোহ-মুগ্ধ-ভ্রষ্ট-পথ পান্থ শিরোপরে
ধ্রুব তারা সম তব দীপ্ত দৃষ্টিখানি ।

তোমার হৃদয় সে যে পারিজাত সম
রূপে রসে গন্ধে আনে ত্রিদিব ধরায়
সদা সেবা-ব্রত-লিপ্ত হস্ত নিরুপম
অসীম আশ্বাস আনে আতুর হিয়ায় ।

সুচির-রহস্যময়ী তুমি নিত্য নব,
আনন্দের উৎস বহে তব পদ চুমি
পুরুষ পৌরুষ-দৃপ্ত স্পর্শ লভি তব,—
আদ্যাশক্তি নিখিলের হে কল্যাণি, তুমি ।

তোমারে বন্দনা করে সপ্তদ্বীপবাসী
স্বেচ্ছায় পরেছে বিশ্ব তব প্রেমফাঁসী ॥

শ্রীযজ্ঞেশ্বর রায় ।
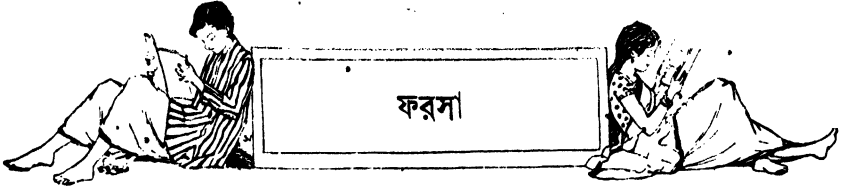
(গল্প)

১

আমার বয়স যখন সাত বছর, সেই সময় আমার ছোট ভাই দুই বৎসরের শিশু ভুলুকে আমাদের সংসারের কর্ত্রী বিধবা পিসীমার হাতে সঁপিয়া দিয়া মা আমার সংসারের খেলা শেষ করিলেন। সেকালের কথা। বাবা নবাব সরকারের জমিদারী ডিহি দুর্গাপুর কাছারীর নায়েব ছিলেন। সেকালে আমাদের পল্লী অঞ্চলের কোন গৃহস্থ ঘর-দরজা চাবিবন্ধ করিয়া, বা তাহা কাহাকেও ভাড়া দিয়া পরিজনবর্গকে চাকরীস্থানে লইয়া যাইতেন না; আত্মীয়স্বজন ও পাড়া-পড়সীরা এরূপ কার্য্যের নিন্দা করিতেন। সেকালের বাঙ্গালা-নবীশ, পাড়াগেঁয়ে লোক-গুলির এরূপ নৈতিক সাহস ছিল না যে, সেই নিন্দা অগ্রাহ্য করিয়া ঐ প্রকার সামাজিক প্রথা-বহির্ভূত কায করিবেন। বিশেষতঃ, আমার ঠাকুরদাদা তখনও জীবিত—সংসারের কর্ত্তা। আমার ঠাকুরমা আমার জন্মের পূর্ব্বেই পতিপুত্র রাখিয়া, পাকা চুলে সিঁদুর পরিয়া, পতিপরায়ণা হিন্দু-নারীর চির-আকাঙ্ক্ষিত সতীলোকে প্রস্থান করিয়াছিলেন। বার্দ্ধক্যে বিপত্নীক বৃদ্ধ শ্বশুরের সেবা-শুশ্রূষা আমার মায়ের জীবনের প্রধান ব্রত হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। কিন্তু মা'ও সংসারের মায়া কাটাইয়া অকালে জগজ্জননীর ক্রোড়ে আশ্রয় লইলেন। সেই দুর্দ্দিনের কথা এত কাল পরেও ভুলিতে পারি নাই। মনে পড়িতেছে, পাড়ার কয়েক জন লোক আমাদের বাড়ীর আঙ্গিনার তুলসীতলা হইতে মাকে খাটিয়ায় তুলিয়া হরিবোল দিতে দিতে গ্রামের পথ দিয়া কোথায় লইয়া গেল। আমি 'মা, মা' বলিয়া কাঁদিয়া মাটীতে গড়াইতে লাগিলাম। ঠাকুরদাদা আমাকে কোলে তুলিয়া লইয়া, ঘরের দাওয়ায় বসিয়া চোখের জলে আমার বুক ভাসাইতে লাগিলেন; কিন্তু তাঁহার মুখ হইতে একটা কথাও বাহির হইল না। পিসীমা ভুলুকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া মাটীতে পড়িয়া হাহাকার করিতে লাগিলেন। সোনার সংসার শ্মশান হইল। মায়ের আকস্মিক মৃত্যুর সংবাদ পাইয়া বাবা তিন দিন পরে তাঁহার কর্ম্মস্থল হইতে, বাড়ী আসিলেন। তখন সব শেষ হইয়া গিয়াছিল।

২

বাবা পরের চাকর; চাকরীর খাতিরে তিনি মায়ের সাংঘাতিক পীড়ার সংবাদ পাইয়াও তাড়াতাড়ি বাড়ী আসিয়া মাকে শেষ দেখা দেখিতে পারিলেন না। তাঁহার এই দুঃখ কিরূপ দুঃসহ হইয়াছিল, তাহা বুঝিতে পারি, আমার সে বয়স হয় নাই। কিন্তু এই দুর্ঘটনার পর কোন দিন বাবার মুখে হাসি দেখিয়াছি বলিয়া মনে পড়ে না। কয়েক দিন পরে এক দিন সন্ধ্যার পর আমাদের প্রতিবেশী মাণিক ঘোষের গরুর গাড়ীতে চড়িয়া বাবা আবার চাকরী করিতে চলিলেন।

তিনি গাড়ীতে উঠিলে আমি গাড়ীর কাছে দাঁড়াইয়া হতাশভাবে বলিলাম, "তোমার সঙ্গে যাব, বাবা! আমার বড় মন কেমন করছে।" আমার দুই চোখের জল গাল বহিয়া গড়াইয়া পড়িল।

বাবা বলিলেন, "সেখানে গিয়ে ত থাক্‌তে পারবে না, আবার বাড়ী আস্‌বার জন্যে কান্নাকাটি করবে। বাড়ীতে ঠাকুরদাদা আছেন, পিসীমা আছেন, তাঁদের কাছে থাক্‌বে, ভুলুর সঙ্গে খেলা করবে। আর রোদে রোদে বেড়িও না, অসুখ করবে। আবার আমি আস্‌বো।"

আমি বলিলাম, "মা'র কাছে যাব বাবা, মা কবে আস্‌বে?"

আমার বয়স তখন সাত বৎসর উত্তীর্ণ হইয়াছে মাত্র। মা মরিলে আর ফিরিয়া আসেন না, এ জ্ঞান তখনও লাভ করিতে পারি নাই। বাবা আমার প্রশ্নের উত্তর দিলেন না। পিসীমা ভুলুকে কোলে লইয়া গাড়ীর অদূরে দাঁড়াইয়া আঁচলে চোখ মুছিতেছিলেন; বাবা বলিলেন, "দিদি,

কালুকে ঘরে নিয়ে যাও, আর দেখো, যেন মা মা ক'রে কেঁদে না বেড়ায়, সময়ে দুটো খাইয়ে দিও; আর ত কেউ ওর মুখের দিকে চাইবার নেই। উঃ, কি কষ্ট!"

দেখিলাম, বাবা গাড়ীর ভিতর বসিয়া তাঁহার গায়ের চাদর দিয়া চোখ মুছিলেন।

মাণিক ঘোষ উঠানের গাবগাছের গোড়া হইতে দড়ি-বাঁধা বলদ জোড়াটা খুলিয়া আনিয়া গাড়ীর যোয়ালে যুতিয়া দিল।—গাড়ী উঠান হইতে অদূরবর্ত্তী পথে নামিল।

আমি মাটীতে পড়িয়া ধূলায় গড়াইতে গড়াইতে "বাবা গো, আমাকে নিয়ে যাও, আমি মা'র কাছে যাব" বলিয়া হাত-পা ছুড়িয়া কাঁদিতে লাগিলাম।

সে দিনের কথা মনে হইলে এই বুড়া বয়সেও চোখ ফাটিয়া জল পড়ে। শৈশবে মাতৃহীন হওয়া যে কি কষ্ট, তা যে আমার বয়সে মা হারাইয়াছে—সেই জানে।

৩

সুখের দিন কাটে, দুঃখের দিনও পড়িয়া থাকে না। বাবা মনের সকল দুঃখ-কষ্ট মনের ভিতর চাপিয়া রাখিয়া, একাকী বিদেশে বৈচিত্র্যহীন জীবন বহন করিয়া কি ভাবে অর্থোপার্জ্জন করিতেন—তাহা বুঝিতে পারিব, তখনও আমার সে বয়স হয় নাই। তিনি ঠাকুরদাদাকে মাসে মাসে সংসার-খরচের জন্য চিঠির ভিতর নোট পাঠাইতেন, একালের মত তখন মণিঅর্ডারে টাকা পাঠাইবার নিয়ম ছিল না। সংসারে পরিবার মাত্র চারি জন,—ঠাকুরদাদা, পিসীমা, আমি আর ভুলু। আমি মাকে হারাইবার পর ঠাকুরদাদার কাছ-ছাড়া হইতাম না। সন্ধ্যার পর আমাদের বৈঠকখানায় তাঁহার পাশে বসিয়া 'একে চন্দ্র দুইএ পক্ষ' প্রভৃতি আবৃত্তি করিতে করিতে কখন্ ঘুমাইয়া পড়িতাম, তাহা জানিতে পারিতাম না। ভুলু পিসীমার কোলে মানুষ হইতে লাগিল।

এই ভাবে সুখে দুঃখে সাত আট বৎসর কাটিয়া গেল। পনের বৎসর বয়সে গ্রামের এণ্ট্রান্স স্কুলের দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়ি। সেকেলে হেড্ মাষ্টার রাখাল বাবুকে যমের মত ভয় করিতাম; তাঁহার মন্ত্রী ছিলেন জানকী মাষ্টার। ছেলেরা তাঁহাকে 'জানকী বাঘ' বলিত, এবং 'জানকী বাঘের দাঁত কিটিমিটি' বলিয়া দূর হইতে তাঁহাকে ক্ষেপাইত। তিনি আমাদিগকে আঁক কষাইতেন, এবং বলিতেন, উচ্চশ্রেণীর গণিতের আলোচনা করিয়া বড়ই আনন্দ লাভ করেন, তাঁহার শিক্ষা-কৌশলেই আঁকে আমরা এক একটি 'গৌরীশঙ্কর' বনিয়া গিয়াছিলাম। হেড্ মাষ্টার রাখাল বাবু যখন আমাদের গ্রামের সেকালের আবগারী দোকানের 'ভেণ্ডার' মহেশ সা'র ধান্যেশ্বরীর বোতল শূন্যগর্ভ করিয়া প্রতি শনিবার অপরাহ্ণে ছাত্র-সভায় সুনীতি প্রচার করিতেন, তখন দীনবন্ধুর 'সধবার একাদশী'র নিমে দত্তের কথা কথা মনে পড়িত। 'সধবার একাদশী' সেই সময় নূতন প্রকাশিত হওয়ায় আমাদের গ্রামের 'বান্ধব রঙ্গালয়ে' তাহার 'রিহার্সেল' চলিতেছিল।

'লেখাপড়া করে যেই, গাড়ী-ঘোড়া চড়ে সেই' এই আদর্শেই সে যুগে আমরা শিক্ষালাভ করিতেছিলাম। ব্যায়ামচর্চ্চা সেই যুগে 'গোঁয়ার্ত্তুমি' বলিয়া গণ্য হইত, এবং যদি কোনও দিন সন্ধ্যার পূর্ব্বে স্কুলের হাতায় আমরা চামচু—হাডু-ডুডু খেলিতে খেলিতে রাখাল বাবুকে কালো দাড়ির নিশান উড়াইয়া সেই পথে আসিতে দেখিতাম, তাহা হইলে খেলা ছাড়িয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিতাম, এবং মাধব চাটুয্যে মশায়ের অন্তঃপুরে আশ্রয় গ্রহণ করিতাম।

সেকালে আমাদের গ্রামের ছেলেদের মধ্যে ঘুড়ি উড়াইবার অভ্যাস সংক্রামিত হইয়াছিল। এ বিষয়ে ছোট-বড় ইতর-ভদ্র কাহারও উৎসাহের অভাব ছিল না। স্কুলের অধিকাংশ ছাত্র পড়াশুনা ছাড়িয়া, ঘুড়ি নাটাই লইয়া ক্ষেপিয়া উঠিত। তবে বাতিক বৃদ্ধি হইত শ্রাবণ মাসে ঝুলন পূর্ণিমার পর হইতে। গ্রামের দুই তিন জন বেকার এই সময় নানাবর্ণের পাতলা কাগজে ঘুড়ি নির্ম্মাণ করিয়া তাহা বিক্রয়ে কয়েক মাসে যে অর্থ সংস্থান করিত, তাহাতে তাহারা সংবৎসরকাল সংসার-প্রতিপালনে সমর্থ হইত!

কিন্তু ছেলেদের উৎসাহ দুর্দ্দমনীয় হইয়া উঠিত। তাহারা নূতন নাটাই সংগ্রহের জন্য ছুতোর বাড়ীতে

ধরণা দিয়া বসিয়া থাকিত, কাটিমের সূতা কিনিয়া তাহাতে মাঞ্জা দেওয়ার জন্য ঘরে ঘরে শিশি-বোতল ভাঙ্গিয়া সারাদিন হামানদীস্তায় তাহা চূর্ণ করিবার শব্দ! গাবগাছ হইতে গাব পাড়িবার জন্য ছেলেরা পড়াশুনা বন্ধ করিয়া বাগানে বাগানে ঘুরিয়া বেড়াইত। গাব সংগৃহীত হইলে খৈএর মণ্ডের সহিত বোতল-চূর ও গাবের আটা মিশাইয়া মধ্যাহ্নরৌদ্রে এক এক দল ছেলের সূতায় মাঞ্জা দেওয়ার ঘটার কথা মনে পড়িলে সেকালের সেই তরুণ-জীবন লাভ করিবার জন্য প্রাণ ব্যাকুল হইয়া উঠে।

সেই সকল ঘুড়িই বা কত রকম! কোনখানি উদ্যত-ফণা সাপের মত, সুদীর্ঘ লাঙ্গুল বায়ুপ্রবাহে আন্দোলিত করিতে করিতে তাহাকে ঊর্দ্ধ হইতে ঊর্দ্ধতর আকাশে ধাবিত হইতে দেখিতাম। কোনখানির আকার মানুষের ন্যায় হস্তপদ-বিশিষ্ট; কোনখানির হস্তীর আকার। গ্রাম-প্রান্ত হইতে দুই একখানি 'আগুড়ে' ঘুড়ি উড়িত, সেগুলি বাঁশের চ্যাটাই বা তালাই-নির্ম্মিত; দুই হাত আড়াই হাত দীর্ঘ, তাহার অনুরূপ প্রশস্ত। ঢেরায় কাটা মোটা পাটের বা শণের দড়ির সাহায্যে সেই ঘুড়ি উড়াইতে হইত; ঊর্দ্ধাকাশে উড়িবার সময় বায়ু-তরঙ্গে প্রতিহত হওয়ায় তাহা বন্ বন্ শব্দ করিত, একালের গগনবিহারী এরোপ্লেনের শব্দের অনুরূপ। কাগজ-নির্ম্মিত বড় বড় 'ধাউই' ঘুড়িগুলির গুঞ্জনধ্বনিতে আকাশ পূর্ণ হইত। এই সময় প্রতিদিন অপরাহ্নে মিউনিসিপাল অফিসের অদূরবর্ত্তী গড়ের মাঠ ও তাহার সন্নিহিত দীঘির পাড় বালক, যুবক ও পল্লীর সৌখীন বৃদ্ধের দলে পূর্ণ হইত। গ্রামের জমিদার মহাতাপ মুখুয্যে, রামচরণ মল্লিক পর্য্যন্ত ঘুড়ি নাটাই লইয়া সেই উৎসবে যোগদান করিতেন। তাঁহাদের ঘুড়ির সূতা 'অকাট্য' ছিল। অনেকে তাঁহাদের সূতায় সূতা ফেলিয়া তাহা কাটিবার চেষ্টা করিত। উভয় পক্ষের সূতায় 'প্যাঁচ' লাগিলে দলের কি উৎসাহ! দর্শকগণ স্পন্দিত বক্ষে ঊর্দ্ধদৃষ্টিতে সেই দৃশ্য নিরীক্ষণ করিত। উভয় পক্ষ বন্-বন্ শব্দে নাটাই ঘুরাইয়া সূতা ছাড়িতেছে, ঘুড়ি লাট খাইতে খাইতে ঠুলি করিয়া পঞ্চাশ হাত নীচে নামিয়া পড়িয়া আবার হাউইএর মত সবেগে ঊর্দ্ধে উঠিতেছে; উভয় পক্ষই হাতের নানাপ্রকার ভঙ্গী করিয়া সূতা ছাড়িতেছে। হঠাৎ চারিদিকে মুহুর্মুহু করতালি-ধ্বনির সহিত শত শত কণ্ঠে উচ্চারিত হইল 'ফরসা!' ছিন্ন-সূত্র ঘুড়িখান ঘুরিতে ঘুরিতে শূন্যমার্গে ছুটিয়া চলিল। গ্রামের পঞ্চাশ জন বালক যুবক সেই দুই পয়সা মূল্যের ঘুড়ি ধরিবার জন্য প্রাণের মায়া বিসর্জ্জন দিয়া দৌড়াইতে লাগিল। বিজয়ী জমিদার বাবু সগর্ব্বে অধিক উৎসাহে তাঁহার নাটাইয়ের সূতা ছাড়িতে লাগিলেন। তাঁহার বিজয়গর্ব্ব-প্রদীপ্ত ঊর্দ্ধোৎক্ষিপ্ত চক্ষুর দিকে চাহিলে মনে হইত—চক্ষু নীরব ভাষায় বলিতেছিল, "আমার ঘুড়ির সঙ্গে প্যাঁচ? হতভাগার আস্পর্দ্ধাও কম নয়!"—হতভাগ্য নবাব সিরাজউদ্দৌলাকে পলাশীর যুদ্ধে পরাজিত করিয়া ক্লাইভও বোধ হয় সেইরূপ আত্মপ্রসাদ লাভ করিতে পারেন নাই!

আমাদের ক্লাশের অনেক ছাত্রেরই ঘুড়ি উড়াইবার সখ ছিল। তাহারা পড়াশুনা ছাড়িয়া ঘুড়ি নাটাই এবং সূতার মাঞ্জা লইয়া ক্ষেপিয়া উঠিয়াছিল দেখিয়া হেড্ মাষ্টার রাখাল বাবু কঠোর শাসন আরম্ভ করিয়াছিলেন। এই অপরাধে তাঁহার 'পিনাল কোডে' শারীরিক ও মানসিক উভয়বিধ শাস্তিরই ব্যবস্থা ছিল। যাহাদের ঘুড়ির বাতিক অধিক ছিল, শাস্তিস্বরূপ তাহাদিগকে প্রত্যহ দশখান 'রাইটিং' (হস্তলিপি) কাপিবুক দেখিয়া লিখিয়া আনিতে হইত, এবং তাঁহার আদেশে থার্ড মাষ্টার জানকী অধিকারী পি, ঘোষের পাটীগণিত হইতে দশটি আঁক বাড়ীতে বসিয়া কষিবার ভার দিতেন। কেহ এই আদেশ অগ্রাহ্য করিলে, বা কোন রকমে দায় সারিলে শারীরিক দণ্ডের ব্যবস্থা ছিল। সেই ব্যবস্থাও নানাপ্রকার; নির্দ্দিষ্ট সময়ে ক্লাশে দাঁড়াইয়া থাকিতে হইত, পরে হাঁটুভাঙ্গা নীল ডাউন, তাহাতে ফল না হইলে 'ষ্ট্যাণ্ডাপ্ অন দি বেঞ্চ।'—অতঃপর বেঞ্চির উপর এক পা তুলিয়া দাঁড়াইবার আদেশ। ছুটীর পর এক ঘণ্টা ক্লাশে আটক। এই ভাবে 'ইম্‌টার্ণ' করিয়াও কোন ফল না হইলে উভয় করতলে পাঁচ ঘা করিয়া বেত্রাঘাত।

কিন্তু এই কঠোর দণ্ডও অনেক সময় নিষ্ফল হইত।

জানকী মাষ্টারের বেতের আস্বাদন-মাধুর্য্য তাঁহার ছাত্রগণের অনেকে বুড়াবয়সে কর্ম্মক্ষেত্র হইতে বিদায় গ্রহণের পরেও ভুলিতে পারেন নাই, এইজন্য তিনি কোন কোন কৃতবিদ্য ও কর্ম্মজীবনে লব্ধপ্রতিষ্ঠ ছাত্রের প্রসঙ্গে বলিতেন, গাধা পিটিয়া তিনি ঘোড়া করিতেন। আমার কখনো ঘোড়া হইবার সুখ হয় নাই, এবং ঘুড়িরোগও কোন দিন আমাকে স্পর্শ করিতে পারে নাই।

আমার ছোট ভাই ভুলুর বয়স তখন নয় দশ বৎসর। বৎসরের অধিকাংশ সময় বাবাকে চাকরী উপলক্ষে দুর্গাপুর কাছারীতেই বাস করিতে হইত। ঠাকুরদাদা ও পিসীমা আমাদের দুই ভাইয়ের লালনপালনের ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। ভুলু তখন গ্রামের স্কুলে নীচের ক্লাশে পড়িত। তাহার সহপাঠিগণের দেখাদেখি ঘুড়ি, সুতা ও নাটাই সংগ্রহের জন্য সে ক্ষেপিয়া উঠিয়াছিল। সে নাটাই ও সুতা কিনিবার পয়সার জন্য ঠাকুরদাদার নিকট আব্দার আরম্ভ করিয়াছিল। কিন্তু পাছে সে লেখাপড়ায় তাচ্ছীল্য প্রকাশ করিয়া ঘুড়ি লইয়া মাতামাতি করে—এই আশঙ্কায় ঠাকুরদাদা তাহার খেয়ালের সমর্থন করেন নাই। কিন্তু তাঁহার নিকট পয়সা সংগ্রহ করিতে না পারিলেও তাহার উৎসাহ শিথিল হইল না।

পাড়ার রমণীসমাজ জানিত—পিসীমা মহাজনী করেন। তাঁহার যে কিছু অলঙ্কার ছিল, বিধবা হইবার পর তাহা সমস্তই তিনি বিক্রয় করিয়া যে টাকা সঞ্চয় করিয়াছিলেন, উচ্চ সুদে তাহা তিনি পল্লীরমণীগণকে ধার দিতেন। কাহাকেও তিনি খালি হাতে টাকা ধার দিতেন না; থালা, ঘটি, বাটি বা অলঙ্কার-পত্র বন্ধক রাখিয়া তিনি টাকা ধার দিতেন, এবং এক পয়সাও সুদ ছাড়িতেন না। কিন্তু সময়ে সময়ে সুদের লোভে তাঁহাকে ক্ষতিগ্রস্তও হইতে হইত। একবার তাঁহার 'মহাপ্রসাদের' এক পুত্র হাঁদা চাটুয্যে তাঁহার নিকট এক সেট্ সোনার বোতাম বন্ধক রাখিয়া কুড়িটি টাকা ধার করিয়াছিল। সুদে-আসলে দেনা ত্রিশ টাকা বার আনায় দাঁড়াইলে, তিনি ঋণ-পরিশোধের জন্য হাঁদাকে পীড়াপীড়ি করিয়া ধরিলেন। হাঁদা জবাব দিয়াছিল, তাহার ঋণ পরিশোধের সামর্থ্য নাই; পিসীমা তাহার বোতাম বিক্রয় করিয়া লইতে পারেন। পিসীমা আমাদের প্রতিবেশিনী স্যাকরা-বৌকে বোতাম-ছড়াটা গলাইতে দিলে স্যাকরা-বৌ বোতামগুলি পিসীমাকে ফেরৎ দিয়া বলিল—গিল্টির বোতাম, তাহার স্বামী বলিয়াছে—উহার মূল্য চারি পয়সাও নহে! পিসীমা হাঁদাকে ফৌজদারীতে ফেলিয়া দণ্ডদানের ভয় দেখাইয়া শুনিতে পাইলেন—সেই বোতাম যে হাঁদাই তাঁহার নিকট বন্ধক রাখিয়াছিল, তাহা তাঁহাকে সপ্রমাণ করিতে হইবে, এবং তাঁহাকে আদালতে সাক্ষীর কাঠরায় উঠিতে হইবে। অগত্যা তাঁহাকে সুদের লোভে আসলের মায়া বিসর্জ্জন করিতে হইল। লাভের মধ্যে তাঁহার মহাপ্রসাদের সঙ্গে বাক্যালাপ বন্ধ হইল। বার্দ্ধক্যে তীর্থধর্ম্ম করিয়া যদি কিছু টাকা অবশিষ্ট থাকে, তবে তাহা মাতৃহীন ভুলুর বিবাহের সময় তদ্দারা নববধূর জন্য দুই একখানি অলঙ্কার প্রস্তুত করাইবেন—পল্লীর রমণীসমাজে তিনি এই অভিপ্রায় প্রকাশ করিতেন। তাঁহার এই আকাঙ্ক্ষার পরিচয় পাইয়া বিধাতা অলক্ষ্যে থাকিয়া হাসিতেন কি না, তাহা তিনিই জানেন।

৬

পিসীমা পাড়ার মুচিরাম ঘোষের স্ত্রী নেত্য ঘোষাণীর একগাছা রূপার খাড়ু বন্ধক রাখিয়া, টাকায় মাসিক এক আনা সুদে পাঁচটি টাকা ধার দিয়াছিলেন। ঘোষাণী দুধ বিক্রয় করিয়া প্রতিমাসে পাঁচ আনা সুদ দিয়া যাইত। আসল টাকা পরিশোধ করিতে বিলম্ব হইলেও ক্ষতি নাই, কিন্তু প্রতিমাসে সুদের পয়সা নগদ দিতে হইবে—এই 'করারে' তিনি ঘোষাণীকে টাকা পাঁচটি ধার দিয়াছিলেন।

পিসীমা এক দিন সায়ংকালে তাঁহার ঘরের দাওয়ায় বসিয়া, হরিনামের ঝুলিটি হাতে লইয়া মালা ফিরাইতেছিলেন, ভুলু তাঁহার কোলে মাথা রাখিয়া বিশ্রাম করিতেছিল। সেদিন সন্ধ্যার পূর্ব্বে সে প্যাঁচে-কাটা একখান ঘুড়ির লোভে বহুদূর পর্য্যন্ত দৌড়াদৌড়ি করিয়া পরিশ্রান্ত হইয়াছিল। কিন্তু তাহার চেষ্টা সফল হয় নাই। একটি নাটাই ও সুতা সে কিরূপে সংগ্রহ করিবে, এই চিন্তায় তাহার নিদ্রার ব্যাঘাত হইতেছিল।

সেই সময় নেত্য ঘোষাণী পূর্ব্বমাসের সুদের পাঁচ আনা—দুইটি দুয়ানী ও চারিটি পয়সা আনিয়া পিসীমার পদপ্রান্তে রাখিয়া গেল। পিসীমা সেগুলি তুলিয়া লইয়া.

হরিনামের ঝুলির ভিতর রাখিয়া দিলেন কিছুকাল পরে তাঁহার জপ শেষ হইলে, তিনি ঝুলিটি মস্তকে স্পর্শ করিয়া তাহার আংটাটি ঘরের দেওয়ালের পেরেকে ঝুলাইয়া রাখিলেন। ঘোষাণী-প্রদত্ত সুদের পয়সাগুলি ঝুলির ভিতর হইতে লইয়া বাক্সে রাখিতে হইবে, এ কথা তিনি বিস্মৃত হইয়া ভুলুকে ভাত বাড়িয়া দিবেন বলিয়া রান্নাঘরে চলিলেন।

ভুলু কিন্তু পিসীমার ঝুলির ভিতর পয়সা রাখিবার কথা বিস্মৃত হয় নাই; পিসীমা প্রস্থান করিলে সে একখানি টুল হাতে লইয়া দেওয়ালের নিকট রাখিল, এবং তাহার উপর উঠিয়া দাঁড়াইয়া পিসীমার ঝুলির ভিতর হইতে পয়সাগুলি বাহির করিয়া লইল। সে তাহা কোঁচার খুঁটে বাঁধিয়া পিসীমার আহ্বানে রান্নাঘরে খাইতে চলিল।

পরদিন প্রভাতে স্নানের পর আহ্নিক করিতে গিয়া ঘোষাণী-প্রদত্ত সুদের কথা পিসীমার স্মরণ হইল। কিন্তু ঝুলিটি ওলট্-পালট্ করিয়া তিনি একটি পয়সাও আবিষ্কার করিতে পারিলেন না। পয়সাগুলি কি ভাবে অদৃশ্য হইয়াছিল—তাহা জানিবার জন্য নিধিরাম ঘোষকে ডাকিবার প্রয়োজন হইল না; নিধে হাত চালাইতে ও 'চাল পড়িতে' জানিত। নিধিরাম ঘোষের চালপড়া অব্যর্থ; চোর তাহার পড়া চাল খাইলে তিন রাত্রির মধ্যে রক্ত বমন করিয়া মরিত। সে কথা স্মরণ হওয়ায় পিসীমা ভয়ে শিহরিয়া উঠিলেন। তিনি জানিতেন—তাঁহার হরিনামের ঝুলির ভিতর পয়সা রাখিতে কেবল ভুলুই দেখিয়াছিল। বিশেষতঃ, বাড়ীতে তখন আর কেহই ছিল না। 'ভৈরবী' ঝি সংসারের সকল কাষ শেষ করিয়া চলিয়া গিয়াছিল।

কিন্তু ভুলু পয়সাচুরি স্বীকার করিল না। পিসীমা তাহাকে বলিলেন, "পয়সাগুলো ভুলোই নিয়েছে। এক মুঠো পয়সা! ভুলো কি কেনে দেখিস্ ত, বাবা!"

৭

গোয়েন্দাগিরির জন্য আমাকে অধিক পরিশ্রম করিতে হইল না পরদিন শনিবার বেলা দেড়টার সময় স্কুলের ছুটী হইলে ভুলুকে বাড়ীতে দেখিতে পাইলাম না। আশ্বিন মাস, মেঘমুক্ত নির্ম্মল আকাশ। রৌদ্রের তেজ অত্যন্ত প্রখর। ঠাকুরদাদা ভুলুকে চোখে চোখে রাখিতেন। স্কুল হইতে তাহাকে বাড়ী ফিরিতে না দেখিয়া তিনি আমাকে ভুলুর সন্ধানে পাঠাইলেন।

আধঘণ্টা পরে দত্তপাড়ার তেঁতুলতলায় ভুলুকে গ্রেপ্তার করিলাম। দেখিলাম, ভুলু দত্তপাড়ার চার পাঁচটি সমবয়স্ক সঙ্গীর সাহায্যে ঘুড়ির সুতায় গাবের আটা ও বোতলচূরের মাঞ্জা দিতেছিল। পিসীমার সুদের আট পয়সা দিয়া নূতন একটা নাটাই, এবং দুই আনার কাটিমের সুতা কিনিয়া সেই সুতায় মাঞ্জা দেওয়া হইতেছিল। অবশিষ্ট চারি পয়সা দিয়া শ্রীহরি সরকারের নিকট দুইখানি তিনরঙ্গা কাগজের ঘুড়ি সংগ্রহ করা হইয়াছে। অনুষ্ঠানের ক্রটি নাই। রৌদ্রে দাঁড়াইয়া সুতায় মাঞ্জা দিতে দিতে তাহার মুখ লাল হইয়া গিয়াছিল। কপাল বহিয়া টস্‌টস্ করিয়া ঘাম ঝরিতেছিল। আমাকে হঠাৎ সেখানে উপস্থিত দেখিয়া ভুলুর লাল মুখ কালো হইয়া গেল।

মাতৃহীন ছোট ভাই, কোন দিন তাহার প্রতি কঠোর ব্যবহার করি নাই; কিন্তু ক্রমাগত আদর পাইয়া তাহার পরকাল নষ্ট হইবার উপক্রম! পিসীমার পয়সা চুরি করিয়া এই কাণ্ড! তাহার উপর আশ্বিনের রৌদ্রে গলদ্-ঘর্ম্ম। আমার বড় রাগ হইল। নাটাইটা তাহার হাত হইতে কাড়িয়া লইয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিলাম; সুতার তারগুলি ছিঁড়িয়া ফেলিয়া তাহার গালে এক চড় মারিলাম, এবং তাহাকে কাণে ধরিয়া বাড়ী আনিলাম। ভুলুর চোখ দিয়া জল ঝরিয়া গাল দুইখানি প্লাবিত করিল; চড় খাইয়া সে 'মা গো' বলিয়া একবার কাঁদিয়া উঠিয়াছিল। তাহার সেই আর্ত্তনাদ ছুরীর মত আমার বুকে বিঁধিল। সেই ক্ষত এতকাল পরেও আমার বুকের ভিতর টাট্‌কা আছে।

অভিমানী ভুলু অভিমান-ভরে সেই রাত্রে ভাত খাইল না। নাটাই ও সুতা নষ্ট হওয়ায় সেই রাত্রে যতক্ষণ সে না ঘুমাইল, ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিল। পিসীমা সকল কথা শুনিয়া আমাকে তিরস্কার করিলেন। আমি বলিলাম, "তোমরাই আদর দিয়ে ওর মাথা খেলে। এখন বুঝতে পারছ না, বড় হয়ে তোমার আদুরেগোপাল লোকের ঘরে সিঁদ কাটবে।"

দীর্ঘকাল রোদে পুড়িয়াই হউক, আর মনে আঘাত

লাগিবার ফলেই হউক, সেই দিন শেষ রাত্রে ভুলুর জ্বর হইল। জ্বরটা বাঁকা; প্রথম হইতেই ডাক্তার ঔষধ দিলেন, কিন্তু পাঁচ দিনের মধ্যে জ্বরের বিরাম হইল না। ডাক্তার আসিয়া নানাভাবে রোগ পরীক্ষা করিলেন—তাহার পর গম্ভীর মুখে বলিলেন, "বোধ হয় টাইফয়েডে দাঁড়াবে।"

শুনিয়া ভয়ে আমাদের প্রাণ উড়িয়া গেল। সংবাদ পাইয়া বাবা বাড়ী আসিলেন। আশ্বিন মাস, পূজা আসিল। কিন্তু পূজা কোন্ দিক দিয়া গেল, তাহা আমরা জানিতে পারিলাম না। আমরা সকলে আহার-নিদ্রা ত্যাগ করিয়া, ভুলুকে বাঁচাইবার জন্য যমের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলাম। ভুলুর ঘোর বিকার! বিকার-ঘোরে তাহার মুখে কেবল লাটাই, সুতা ও ঘুড়ির কথা। কখন বলে, 'আমার লাটাই ভেঙ্গো না দাদা, আর আমি পিসীমার পয়সা চুরি করবো না।'

আমার বুকের রক্ত যেন চোখ ফাটিয়া অশ্রুরূপে গড়াইয়া পড়িল।

বাবা ভুলুর জন্য ভাল জামা, কাপড়, জুতা আনিয়াছিলেন। ভুলু আরক্ত-নেত্রে বিকারঘোরে সেগুলি চাহিয়া দেখিল। তাহার দুই চোখ দিয়া জল ঝরিতে লাগিল।

ক্রমে সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী কাটিল। দশমীর অপরাহ্ণে দত্তবাড়ী মা দুর্গার বরণ আরম্ভ হইয়াছে; বরণের তালে তালে বাজনা বাজিতেছে, শানাই কাঁদিয়া কাঁদিয়া জননী দশভুজার বিদায়-গীতি গাহিতেছে।

আর কোন আশা নাই। পিতৃবন্ধু ডাক্তার রোগীর অবস্থা দেখিয়া সজলনেত্রে নির্ব্বাকভাবে প্রস্থান করিলেন। "ভুলু, বাপ আমার, সোনা আমার, মাণিক আমার, আমাকে দুঃখের সাগরে ভাসিয়ে কোথায় যাচ্ছিস্, বাবা!"

ভুলু অতি কষ্টে পাশ ফিরিবার চেষ্টা করিয়া অন্তিম হিক্কার সঙ্গে বলিল, "লোট, লোট, ফরসা!"

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়।

তর্পণ

আমার হাতের তর্পণ-বারি করিতে পান
জাগহ সকল লোক,
ব্রহ্ম হইতে স্তম্ব অবধি—নিখিল প্রাণ
সবারি তৃপ্তি হোক,
আমার পূর্ব্ব-পুরুষ যাঁহারা সংবরি ভবখেলা
পিতৃলোকের উজল কক্ষে করে আনন্দ মেলা,
তাদেরি তৃপ্তি চিত্তে মাগিয়া আজিকে পুণ্যবেলা
রচি এ দিব্য শ্লোক,
সবারি তৃপ্তি হোক্।

কোথা রে অমর, এ মর বিশ্বে উরহ আজি তর্পণ-বারি লহ,
যক্ষ দানব পন্নগ তরু উরগরাজি, কেহ আজ পর নহ,
নিখিল বিশ্বে যে আছ যেথায় ক্ষুদ্র বৃহৎ সব,
এই ধরণীর উপকূলে আজি জাগাও মহোৎসব,
আমার প্রাণের মন্ত্র আরাবে বাজে প্রেম জয়রব,
—বিচিত্র প্রাণ যোগ,—
সবারি তৃপ্তি হোক!

আমি যে মানব, পূর্ণ-প্রাণেরে করিতে ভোগ
ভ্রমেছি লক্ষ যোনি,
উদ্ভিদ কীট পশু বিহঙ্গ সবারি যোগ
আপন চিত্তে গুণি,

সারা-মনে আজি জাগিতেছে গত কোটি জনমের কথা
অনুভব করি সারা সৃষ্টির সুখ, দুঃখ, হাসি, ব্যথা,
সকল ধরার তৃপ্তি মাগিয়া রচি তর্পণ-গাথা
মন্ত্রের সংযোগ,
সবারি তৃপ্তি হোক্।

অন্ন-বসন-বিহীন যে কাঁদে গোপন পুরে, দুঃখ ঘুচুক তার,
বিলাস-মগন যে জন শান্তি আশায় ঘুরে—লভুক শান্তি-ধার,
এতটুকু প্রাণ কণিকার লাগি যে করিছে হাহাকার
ইহ-পরলোকে কাঁদিছে যাহারা—যাচি প্রেম সুধাধার,
আজি এ মন্ত্র-মহিমা পুলকে চিত্ত ভরুক তার,
যাক্ সন্তাপ শোক,
সবারি তৃপ্তি হোক্।

মানুষে মানুষে বিভেদ-বুদ্ধি বিদূরি আজি
বিমল হউক প্রাণ,
হৃদয়ে হৃদয়ে বিপুল আবেগে উঠুক বাজি
মিলন-মন্ত্র গান,
ন্যায় ও ধর্ম্ম প্রেমের রাজ্য স্থাপিতে নিখিল ভবে,
আজি শুভখণে মন্ত্র-পুলকে জাগহ জাগহ সবে,
অমর পক্ষে মরণ জিনিয়া আনন্দ-কলরবে,
চিত্ত পূরিত হোক্,
সবারি তৃপ্তি হোক্!

শ্রীহরিকৃপা বর্ম্ম-চৌধুরী।

বনের পাখীর গান লিপিবদ্ধ করার উপায়

বনের পাখী কিছুমাত্র সন্দেহ করিতে পারিবে না যে, মানুষ কিছু দূর হইতে তাহার কলকাকলী যন্ত্রের সাহায্যে তুলিয়া লইতেছে, এমন ব্যবস্থা এখন সম্ভবপর হইয়াছে। একটা ত্রিকোণাকার যন্ত্রে
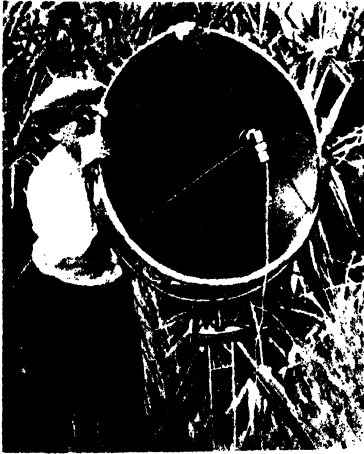
বনের পাখীর গান লিপিবদ্ধ করার উপায়

গোলাকার শব্দসংগ্রাহক যন্ত্র সন্নিবিষ্ট থাকে। উহার ঠিক মাঝখানে মাইক্রোফোন যন্ত্রটি অবস্থিত। পাখী যখন নিশ্চিন্তমনে গান করিতে থাকে, তখন তাহার গান এই যন্ত্রে সংগৃহীত হইয়া থাকে।

রূপার পাতের উপর অঙ্গুলীর ছাপ

রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় যে কোন তৈলাক্ত স্থান ও অন্যান্য কঠিন স্থান হইতে অঙ্গুলীর ছাপ সংগ্রহ করা সম্ভবপর হইয়াছে। কালিফের পালাভোনাস্থিত পুলিস বিভাগের কোনও রাসায়নিক আইওডিন বাষ্প সাহায্যে অঙ্গুলীর অস্পষ্ট ছাপকে সুস্পষ্ট করিবার প্রণালী উদ্ভাবন করিয়াছেন। এই আইওডিন বাষ্প বন্দুকের সাহায্যে প্রয়োগ করা হয়। বন্দুকও ঐ উদ্দেশ্যে বিশেষভাবে নির্ম্মিত। এই উপায়ে অঙ্গুলীর ছাপ সুস্পষ্ট হইলে একখানি রূপার পাত ঐ অঙ্গুলীর ছাপের সংস্রবে রাখা হয়। তার পর উহার উপর প্রবল আলোকরশ্মি নিপাতিত করার ব্যবস্থা করা হয়।

রূপার পাতে অঙ্গুলীর ছাপ

ইহার ফলে রূপার পাতে যে ছাপ পড়ে, তাহা চিরস্থায়ী, কখনও বিলুপ্ত হইবে না। এই প্রণালীতে বারবার ছাপ লইলেও মৌলিক ছাপ ক্ষতিগ্রস্ত হইবে না।

তৈল-নিষেক যন্ত্র

তৈলনিষেক যন্ত্র

তৈল-নিষেকের জন্য এক-প্রকার নূতন যন্ত্র উদ্ভাবিত হইয়াছে। ফাউণ্টেন পেনের ন্যায় এই যন্ত্র পকেটে আঁটিয়া রাখা যায়। এই যন্ত্র এমন স্বচ্ছ যে, উহার অভ্যন্তরে কতখানি তৈল আছে, তাহা অনায়াসে বুঝিতে পারা যায়। মাথার দিকে স্ক্রু আঁটা ছিপি থাকায় তৈল ঝরিয়া পড়িবার কোনও আশঙ্কা নাই।

ভ্রমণকারীদিগের জন্য বড় মোটর-গাড়ী

ই গাড়ীতে ৮ জনের বসিবার আসন আছে। চাকাগুলি ায়ুপূর্ণ। ইহা সমভাবে রাজপথে এবং রেল-লাইনের উপর দিয়া

ভ্রমণকারীদিগের জন্য বড় মোটরগাড়ী

দ্রুত ধাবিত হইতে পারে, এমন ব্যবস্থা ইহাতে আছে। গাড়ীর মধ্যে লিখিবার সরঞ্জাম সহ টেবল রাখিবার বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। তাস বা বিলিয়ার্ড খেলার ব্যবস্থাও আছে।

গাছের গুঁড়ির মধ্যে ফটোগ্রাফের ঘর

দুই জন ফটোগ্রাফার মোটরচালিত যানের উপর গাছের গুঁড়ির ফটোগ্রাফের ঘর লইয়া দেশভ্রমণ করিতেছেন। এক হাজার
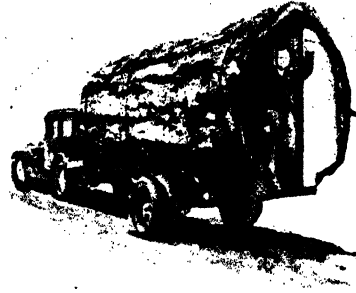
গাছের গুঁড়ির মধ্যে ফটোগ্রাফের ঘর

বৎসরের এক প্রাচীন গাছের গুঁড়ি সংগ্রহ করিয়া তন্মধ্যে তাঁহারা ঘর নির্ম্মাণ করিয়াছেন। এই গুঁড়িটা লম্বে ষোল ফুট এবং ইহার ব্যাস ৮ ফুট। আলোকচিত্র গ্রহণের পর অন্ধকার ঘরে তাঁহারা ফটোগ্রাফের যাবতীয় প্রয়োজনীয় কার্য্য সম্পন্ন করেন। ফটোগ্রাফীর যাবতীয় সাজসরঞ্জামও ইহার মধ্যে আছে।

বিমানবিহারীর জন্য ঘড়ী

দক্ষিণ-আফ্রিকার জোহানসবার্গে যে সকল বিমানবিহারী বিমানসহ শূন্যমার্গে উড়িতে থাকেন, তাঁহারা ভূতলে যাহাতে নির্দ্দিষ্ট সময়ে অবতরণ করিতে পারেন, সেজন্য একটা প্রকাণ্ড ঘটিকাযন্ত্র র‍্যাণ্ড বিমানপোতাশ্রয়ে স্থাপন করা হইয়াছে। বিমানবিহারীরা ৩ হাজার ফুট উর্দ্ধ হইতে এই ঘটিকা-যন্ত্র দেখিয়া সময়

বিমানবিহারীর জন্য ঘটিকাযন্ত্র

নির্দ্দেশ করিতে পারেন। এই ঘটিকা-যন্ত্রের ব্যাস ত্রিশ ফুট, বৈদ্যুতিক শক্তিতে উহা পরিচালিত হইয়া থাকে। উহার মিনিট-জ্ঞাপক কাঁটাটি ১৭ ফুট দীর্ঘ, ঘণ্টানির্দ্দেশক কাঁটার দৈর্ঘ্য ১২ ফুট।

অষ্ট্রেলিয়ার হাস্যকারী পক্ষী

অষ্ট্রেলিয়ার কুকাবুরা পাখী হাস্যসহকারে গান গাহে। অন্য কোনও পাখী তাহা পারে না। অষ্ট্রেলিয়ার চলচ্চিত্র বা রেডিওতে এই পাখীর হাসি শুনিতে পাওয়া যাইবে। অষ্ট্রেলিয়া-সংক্রান্ত কোনও চলচ্চিত্র প্রদর্শনকালে আগেই এই পাখীর গান বা হাসি দর্শকদিগকে শুনাইয়া দিবার ব্যবস্থা আছে। এই পাখী অষ্ট্রেলিয়া ছাড়া আর কোথাও পাওয়া যায় না। ইন্দুরকুল ধ্বংসে ইহার জুড়ি আর নাই। জনসাধারণ এই পাখীর গান শুনিতে খুব ভালবাসে। ইহার আকার কাক-পক্ষীর ন্যায়। পাশুটে রং—ডানায় ঈষৎ নীলের ছিট আছে।

অষ্ট্রেলিয়ার হাস্যকারী পক্ষী

দোদুল্যমান কাফে

রাইননদের উপর দিয়া যাঁহারা ষ্টীমারে জলভ্রমণ করেন, তাঁহারা যখন তীরভূমির উর্দ্ধে আলোকমালা দেখিতে পান, তখনই
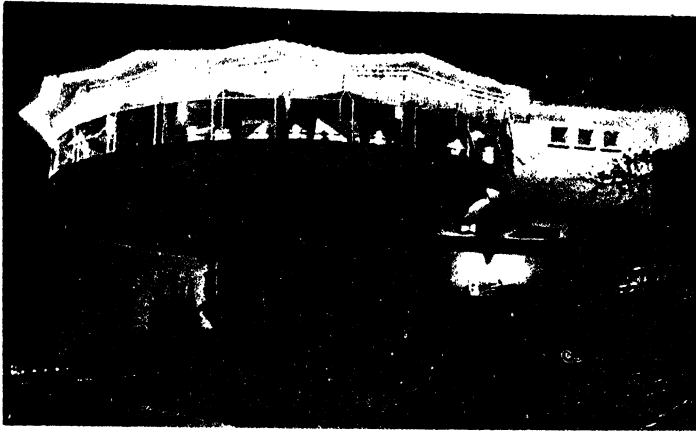
দোদুল্যমান আলোকিত কাফে

বুঝিতে পারেন, কলোন আর বেশী দূরে নাই। এই কাফে বা রেস্তোরাঁ দেখিতে অনেকটা বিদ্যুৎপাখার ন্যায়। উহার উপরিভাগে আলোকদীপ্তি। এই রেস্তোরাঁ বা পান্থশালার উপরের অংশ নদীগর্ভের অনেক দূর পর্য্যন্ত প্রসৃত। দেখিলেই মনে হইবে, রেস্তোরাঁটি যেন শূন্যে দুলিতেছে।

তিন চাকার দ্রুতগামী মোটর-গাড়ী

ক্যালিফোর্ণিয়ায় তিন চাকার মোটর গাড়ী দেখা দিয়াছে। ইংলণ্ডেও এইরূপ তিন চাকার গাড়ী আছে। শুল্ক অধিক দিতে
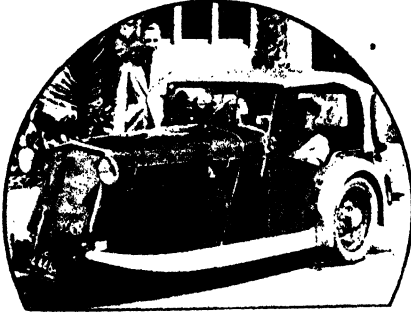
তিন চাকার দ্রুতগামী মোটর-গাড়ী

হইবে না বলিয়াই তিন চাকার মোটর গাড়ীর প্রচলন। চারি চাকার মোটর-গাড়ীর ট্যাক্স বেশী দিতে হয়। এই গাড়ীর ওজন ৯ শত ৫০ পাউণ্ড। এক গ্যালন তৈলে এই গাড়ী ৬০ মাইল ধাবিত হইয়া থাকে। উহা ঘণ্টায় ৭০ মাইল পর্য্যন্ত দৌড়িতে পারে।

মরুহ্রদে চারি চাকার পালযুক্ত গাড়ী

ক্যালিফোর্ণিয়ায় একটি শুষ্ক হ্রদ আছে। এই হ্রদে জলের চিহ্নমাত্র নাই, আছে শুধু বিস্তীর্ণ বালুকারাশি। একখানি ৪ চাকার
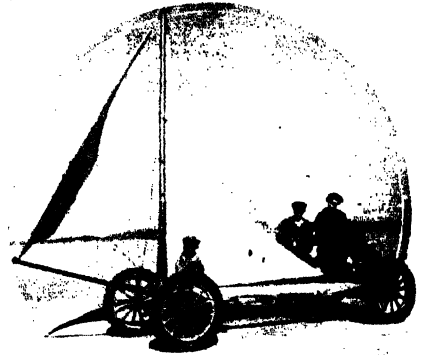
মরুহ্রদে চারি চাকার পালযুক্ত গাড়ী

পালবিশিষ্ট যান নির্ম্মিত হইয়াছে। পাল খাটান হইলে, বাতাসের বেগে এই যান ঘণ্টায় ৪০ মাইল বেগে মরুহ্রদের উপর দিয়া চলিতে থাকে। সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে বালুকারাশি উত্তপ্ত হইতে থাকে। তখন উত্তাপতরঙ্গ বালুকারাশির উপর দিয়া বহিতে থাকে। এই ভাবে বায়ু-চালিত হইয়া যানখানি মরুহ্রদের উপর দিয়া যখন চলিতে থাকে, তখন মনে হইবে, খাঁটি হ্রদের উপর দিয়া পালের সাহায্যে যেন জলযান চলিতেছে।

বক্তৃতাকারী যান্ত্রিকমূর্ত্তি

টেক্সাসে শ্রমিক প্রদর্শনীতে যুক্তরাষ্ট্রের শ্রমিক বিভাগ একটি অপূর্ব্ব মূর্ত্তি সংগ্রহ করিয়া দেখাইতেছেন। ষ্ট্রসবার্গের কারখানায়
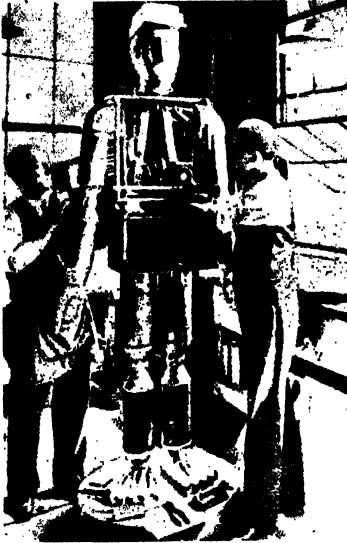
বক্তৃতাকারী যান্ত্রিকমূর্ত্তি

এই মূর্ত্তিটি নির্ম্মিত হইয়াছে। এমন কলকব্জা ইহাতে সন্নিবিষ্ট করা হইয়াছে যে, এই যান্ত্রিকমূর্ত্তি ৪ মিনিট ধরিয়া শ্রমিক ও যন্ত্র সম্বন্ধে বক্তৃতা দিয়া শ্রোতৃবৃন্দকে আনন্দ প্রদান করে।

সাধারণ বিমান রণবিমানে পরিণত

জার্ম্মাণীর সাধারণ ডিসেল মোটর-চালিত যাত্রিবাহী বিমানকে রণবিমানে পরিণত করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। এই বিমানে যে তৈল ব্যবহৃত হয়, তাহার মূল্য অল্প। এই বৃহৎ বিমানে যাত্রীদিগের জন্য নীচের পাখার কাছে কামরা আছে। দুই জোড়া চাকার সাহায্যে এই বিমান মাটীতে অবতীর্ণ হয়।
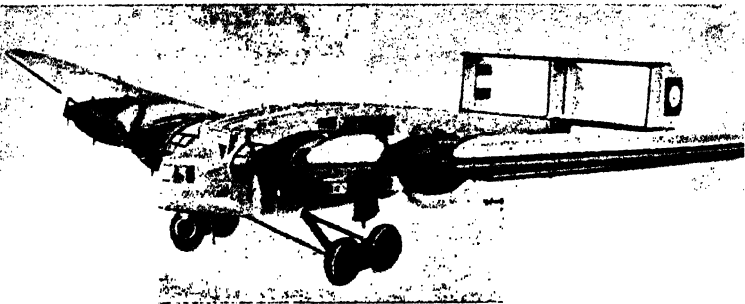
সাধারণ বিমান রণবিমানে পরিণত

বিচিত্র বাদ্যযন্ত্র

এই বিচিত্র বাদ্যযন্ত্রটিতে বীণার মত তার আছে। পদ দ্বারা পাদানীতে চাপ দিয়া অঙ্গুলির সাহায্যে এই যন্ত্র বাজাইতে হয়।

বিচিত্র বাদ্যযন্ত্র

এই নূতন বাদ্যযন্ত্র যেন সেলাইয়ের কলের ন্যায় চালাইতে হয়। যন্ত্রটির নাম রাখা হইয়াছে "রথোলিন"। এই যন্ত্র-সাহায্যে সুমিষ্ট স্বরলহরী উত্থিত হয়।

একবিংশ পরিচ্ছেদ
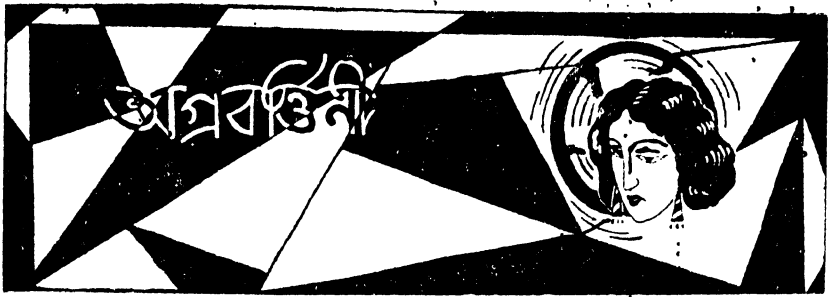
চক্র

ঝাঁজিয়া বকিয়া নাচিয়া মাতিয়া রোজা একশা করিয়া দিল; তার পর কৌচে বসিয়া পড়িল। বসিয়া ফুল্লরার পানে চাহিয়া ফুঁশিতে লাগিল—দুই চোখে যেন মশাল জ্বলিতেছে!

ফুল্লরা তার পানে চাহিয়াছিল। প্রশান্ত দৃষ্টি। চিন্তার পর চিন্তা হু-হু বেগে তার মনের উপর দিয়া যেন উড়িয়া চলিয়াছে···

এমনিভাবে প্রায় পাঁচ মিনিট কাটিল। রোজা দু'হাতে মুখ ঢাকিল। একটা নিশ্বাস ফেলিয়া ফুল্লরা ডাকিল,—রোজা···

রোজা ফুঁপাইতেছিল,—ফুল্লরার আহ্বানে মুখ তুলিল, বলিল—কি!···বকবে?

ফুল্লরা কহিল—বকবো না। বকিনি। ও-সব চিঠি যদি আমায় তুমি দেখাতে, তাহলে লজ্জা পেতে!···আমি দেখেচি বলেই তুমি লজ্জা বোধ করচো! তাহলে বুঝচো, এ চিঠি তোমার পাবার মতো নয়!···

রোজা বলিল—আমার বয়স হয়েচে। কি চিঠির কি মানে হয়, তা আমি বুঝি।

—বোঝো যদি, তাহলে ও চিঠি জমিয়ে রেখো না। পুড়িয়ে ফ্যালো। ও-সব চিঠি রাখবার নয়। পুড়িয়ে চিঠির কথা ভুলে যাও।

রোজা কোনো জবাব দিল না···তার দুই ঠোঁট কাঁপিতেছিল।

ফুল্লরা রোজার পাশে বসিল, তাকে এক-রকম বাহুর ঘেরে ঘিরিয়া কহিল—ও চিঠি তোমাকে যারা লেখে, তারা তোমার অপমান করে—এটুকু এখন ঝোঁকের মাথায় বুঝতে পারচো না···কিন্তু পরে বুঝবে। আমি তোমায় বকিনি।···তুমি এখনো ছেলেমানুষ—পৃথিবীর খপর কতটুকু জানো?···

ফুল্লরা চুপ করিল; একটা নিশ্বাস ফেলিল।

রোজা এবারও কোনো জবাব দিল না।

ফুল্লরা বলিল—একটা কথা না বললে নয় রোজা, তাই বাধ্য হয়ে বলতে হচ্ছে।···

আবার খানিক চুপ-চাপ···তার পর বলিল—তোমার মায়ের জন্য মন কেমন করে না? তোমার বাবার কথা মনে হয় না?

মা···বাবা···তাহাদের কথা কেন আসে? রোজা কুতূহলী দৃষ্টিতে ফুল্লরার পানে চাহিল। ফুল্লরা বলিল—তোমার বাবাকে তুমি ভালোবাসো নিশ্চয়। তিনিও তোমায় ভালোবাসেন। এখানে টাকা পাঠাচ্ছেন তোমার জন্য। ভালো যদি না বাসবেন, তাহলে টাকা কেন পাঠাবেন? তোমার কোন খপর না নিলেই পারতেন!···

এ কথার অর্থ রোজা বুঝিল না।

ফুল্লরা বলিল—তোমার মা তোমায় ছেড়ে চলে গেছেন···কেন? কার সঙ্গে?···তোমার কি সে সব ভালো লাগে? আজ তোমার মা যদি কাছে থাকতেন···?

মায়ের কথা রোজার মনে পড়িল। প্রায় ভুলিতে বসিয়াছে। সত্য, মা যদি চলিয়া না যাইত! মা চলিয়া গেছে বলিয়াই চারিদিককার সব বাঁধন শিথিল হইয়া কাটিয়া গিয়াছে। কিন্তু এ সব কথা পিশিমা কেন তোলে?

ফুল্লরা বলিল—তোমার বাবা তোমাকে সেখানে নিজের কাছে না রেখে এখানে রেখে গেলেন কেন? তিনি একা···তোমায় দেখতে পারবেন না বলেই তো? ছেলেমানুষ···

তোমাদের দেখা দরকার, তাই।…এখানে তোমার কোনো ব্যাপারে নিষেধ বা শাসন নেই।…কিন্তু যাক্, বেশী কথা বলবার দরকার নেই…শুধু এইটুকু জেনে রাখো, যারা তোমায় এ রকম চিঠি লেখে, তাদের সঙ্গে মেশা উচিত নয়। তুমি ভদ্র-ঘরের মেয়ে…তোমার নিজের মান-ইজ্জৎ আছে। বন্ধু-পরিচয়ে তোমার সে মান-ইজ্জতে এরা আঘাত দেবে—সেটা গৌরবের কথা নয়।

এবারে রোজা কথা কহিল, বলিল,—মান-ইজ্জতে আঘাত?

ফুল্লরা বলিল,—তাই।

রোজা কহিল—আমরা পরস্পরে বন্ধু!

ফুল্লরা বলিল—এ বন্ধুত্ব হলো কোথায়? কি করে? তারা তোমার সঙ্গে এক ক্লাশে পড়ে না।

রোজা বলিল—আমার ক্লাশে যে-সব মেয়ে পড়ে, এদের মধ্যে কেউ তাদের ভাই, কেউ বা ভাইয়ের বন্ধু। একসঙ্গে গান-গল্প হয়। আমাদের ভালো লাগে…

ফুল্লরা অবিচল দৃষ্টিতে রোজার পানে চাহিয়া রহিল; কোনো জবাব দিল না।

রোজা বলিল,—মানুষ একলা ঘরের কোণে বসে থাকতে পারে না। সে সঙ্গী চায়, বন্ধু চায়।

বাধা দিয়া ফুল্লরা বলিল—একটা কথা…

রোজা কহিল,—কি?

ফুল্লরা বলিল—এ সব বন্ধু তোমাদের স্কুলের কম্পাউণ্ডে গিয়ে তোমাদের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় করতে পারে?

রোজা বলিল—স্কুলে ক্লাশ চলছে—সেখানে আলাপ করবার অবসর কোথায়?

ফুল্লরা কহিল—তোমাদের স্কুল থেকে মেয়েরা যে সে দিন স্টীমারে করে শিবপুরে গিয়েছিলে পিকনিক করতে—এ সব বন্ধুকে নিয়ে যেতে পেরেছিলে? না, স্কুল-অথরিটি এদের সঙ্গে নিয়ে যেতে দিত?

রোজা জবাব দিল না।

ফুল্লরা বলিল—দিত না। কেন না, তোমাদের বয়সে অনাত্মীয় ছেলেমেয়েদের একা-একা ছেড়ে দেওয়া হয়তো উচিত নয়।…কিন্তু সে কথা যাক,—তোমায় যে ভাবে ওরা চিঠি লিখেচে, সে-রকম চিঠি বন্ধুকে কেউ লেখে না। বিশেষ, ভদ্র-ঘরের মেয়েদের।

—তুমি পড়েচো সে-চিঠি?

—না। চিঠি পড়িনি। এক-আধ ছত্র মাত্র চোখে পড়েছে। ওদের ফটোগ্রাফ ওরা তোমায় কেন পাঠায়, বলতে পারো, রোজা?

—তাতে কি ক্ষতি হয়েছে? বন্ধুর ফটো বন্ধুকে পাঠিয়েচে।

ফুল্লরা কহিল—আমি তোমায় প্রশ্ন করেচি…বলো, কেন পাঠায়? আগে তার জবাব দাও। ক্ষতি আছে কি না, সে কথা পরে হবে।…আমি তোমার শত্রু নই…তোমার ভালোই চাই!… এদের সঙ্গে তুমি যদি হল্লা করে বেড়াও, তাতে আমার কোনো ক্ষতি বা অনিষ্ট হয় না—তাও বোঝো! এখন আমার কথার জবাব দাও…এরা ফটো পাঠায় কেন?

কথা বাধিয়া গেল…মাথায় যেন রক্ত-স্রোত উছলিয়া উঠিল! ফুল্লরার পানে সে চাহিতে পারিল না—মুখ ফিরাইল।

ফুল্লরা কহিল,—বলো,—কেন?

রোজা বলিল—তুমি জিজ্ঞাসা করচো…কিন্তু না, নিশ্চয় তুমি আমার চিঠি পড়েচো।…পড়োনি? বলো সত্য করে…

রুক্ষ গম্ভীর স্বরে ফুল্লরা কহিল—আমি মিথ্যা কথা বলি না, রোজা।…

রোজা সে স্বরে ভড়কাইয়া চুপ করিয়া রহিল।

ফুল্লরা কহিল—তুমি যখন বলতে পারচো না, তখন আমার উচিত, ও-চিঠি পড়া।…পড়বো?

—না, না…

রোজার স্বর উচ্ছ্বসিত। সে কহিল—না। ও-সব আমার প্রাইভেট চিঠি। প্রাইভেট চিঠি আমি তোমায় দেখাবো কি করে?…না…

রোজা উঠিল, উঠিয়া একেবারে গিয়া দাঁড়াইল খোলা খড়খড়ির ধারে…রোজাকে বুকের কাছে টানিয়া শান্ত স্বরে ফুল্লরা কহিল,—শোনো রোজা, এ চিঠি তুমি নিজে আমাকে দাও, আমি পড়ি।…চিঠি পড়ে বুঝতে পারবো, বাইরের অজানা পুরুষমানুষের সঙ্গে এ-রকম চিঠিপত্র চলা উচিত কি না। যদি বুঝি, তাহলে তোমায় আমি বুঝিয়ে দিতে পারবো, এ চিঠি লেখা অন্যায় কেন। একটা কথা ভেবে ছাখো, শুধু…এ-সব বন্ধুর সঙ্গে নিত্য তোমার দেখা হচ্ছে…

কথাবার্ত্তাও চলছে···তবু এমন কি কথা থাকতে পারে, যে-কথা সে দেখায় হতে পারে না? যে কথার জন্য এত আয়োজন করে চিঠি লিখতে হবে? যে চিঠি তুমি তোমার আপনার লোক-জনের সামনে বার করতে পারো না?···

রোজা শুনিল···সব কথা। কোনো জবাব দিল না; শুধু অবিচল স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল।

ফুল্লরা বলিল—এ চিঠি যদি আমায় দেখাতে না পারো, তাহলে আমার চোখের সামনে এ-সব চিঠি পুড়িয়ে ফ্যালো। এখনি।

রোজা আবার ফুঁশিয়া উঠিল এবং ফুল্লরার বাহু-পাশ হইতে নিজেকে মুক্ত করিয়া সঝঙ্কারে বলিল—না, ও চিঠি আমি দেখাবো না।

—তাহলে পুড়িয়ে ফ্যালো।

রোজার চোখে আবার সেই অগ্নিময় দৃষ্টি! ঘরের চারিদিকে সে তাকাইল, কহিল—এখানে কোথায় চিঠি পুড়োবো?

ফুল্লরা বলিল—চলো বারান্দায়। আমি দিয়াশলাই আনিয়ে দিচ্ছি!···রোজা···

রোজা নিশ্বাস ফেলিল; তার পর চিঠির রাশি জড়ো করিয়া ফুল্লরার পানে চাহিল।

ফুল্লরা বলিল—ফটোগ্রাফগুলোও ঐ সঙ্গে। কোথাকার কে কক্স, হার্ড, সনাতন হাজরা, কার্ল স্টুইনটন—এরা তোমার বন্ধু হতে পারে না···তোমায় এভাবে চিঠি লিখে ছবি পাঠিয়ে অপমান করতে পারে না!

রোজা যেন কি-মন্ত্রে বশীভূত হইয়াছে! নিঃশব্দে সে ফটোগুলো হাতে লইল।

ফুল্লরা বলিল—এসো।

রোজা আসিল ফুল্লরার ইঙ্গিতে। বারান্দায় আগুন জ্বলিল এবং সে আগুনে রোজা চিঠির রাশি ছিঁড়িয়া কুচি কুচি করিয়া আহুতি দিল। সেই সঙ্গে দুখানা ফটো-গ্রাফও একখানা সেই এন কক্সের—শীষ দিতে দিতে যে ছোকরা এ বাড়ীর ফটকে আসিয়া কার্ড পাঠাইতে দ্বিধা করে নাই।

নিমেষে সব পুড়িয়া ছাই হইয়া গেল···উজ্জ্বল অগ্নিশিখা চকিতে কালো ভস্মরাশিতে মিলাইয়া অদৃশ্য হইল। রোজা কাঁপিয়া উঠিল। এ সে কি করিয়াছে? নিমেষের খেয়ালে তার জীবনের আনন্দ-দীপ এমন ভাবে নিবাইয়া দিল! কাণের কাছে সেই অজস্র স্তুতি···ভালোবাসা···ভালোবাসা ···বাহুর উদগ্র আবেগ···.

রোজার মনে হইল, নিমেষের দুর্ব্বলতায় নিজেকে সে এমন করিয়া নিজের সব পাওয়া-সমেত বিসর্জ্জন দিয়া বসিল!

ক্ষোভে অপমানে কাঁদিয়া সেইখানে সে লুটাইয়া পড়িল।

ফুল্লরা ডাকিল,—রোজা···

রোজাকে বুকে টানিয়া লইবার জন্য ফুল্লরা দু'হাত বাড়াইল। সবলে ফুল্লরার হাত সরাইয়া দিয়া রোজা বলিল—না, না···কোনো কথা শুনবো না আমি··· তোমাদের বাড়ীতে আছি···তোমার হুকুম তো আমি তামিল করেছি! আবার কেন? আরো কি চাও? দাও, আমার হাত ছেড়ে দাও···

কথাটা বলিয়া চকিতে উঠিয়া বারান্দা ছাড়িয়া ঘর ছাড়িয়া ছুটিয়া সে সেদিক হইতে প্রস্থান করিল।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ

নিঃসঙ্গ

গৃহে রহিল না। পায়ে হাঁটিয়া রোজা বাড়ী ছাড়িয়া বাহির হইয়া গেল। নিরুপায় দৃষ্টিতে একতলার বারান্দায় থাকিয়া ফুল্লরা সে দৃশ্য দেখিল।

না, এ যেন দু'পেনি দামের লক্ষ্মীছাড়া উপন্যাসের ঘটনা গৃহমধ্যে ঘটিয়া চলিয়াছে!

বারান্দার রেলিঙে হাতের ভর রাখিয়া ফুল্লরা দাঁড়াইয়া ভাবিতে লাগিল, এ কি, এ কি কাণ্ড! মেয়েরা স্বাধীন-ভাবে বিচরণ করিবে, তার স্বাধীন সত্তা থাকিবে—সে দাসী নয়, বাঁদী নয়,—এ-কথা কে না স্বীকার করে? তা বলিয়া এমন বেচাল, বিশ্রী আচরণ! নিজের মান-ইজ্জতের পানে লক্ষ্য নাই! যার-তার সঙ্গে হল্লা করিয়া বেড়ানো!

রোজা যদি নিজের মেয়ে হইত? কথাটা মনে উদয় হইবামাত্র ফুল্লরা শিহরিয়া উঠিল। রোজা পর নয়,—মায়ের পেটের ভাই নিশানাথ···তার মেয়ে রোজা! নিজের মেয়ে আর দাদার মেয়ে—দুজনে তফাত্ কতটুকু!

এ কথা স্বামীকে খুলিয়া বলা প্রয়োজন। তাঁর সঙ্গে পরামর্শ···

নিরুপায় বিপদে স্বামীর কথা মনে পড়িল। স্বামী ছাড়া এ সম্বন্ধে কাহারও সঙ্গে পরামর্শ চলে না।

সন্ধ্যার পর সুশীল চাটার্জ্জী ফিরিলেন, কিন্তু তাঁকে পাওয়া গেল না। তাঁর পিছনে আসিল দু'তিন জন এটর্নি ও মক্কেল। তাঁদের পরামর্শ চুকিল, রাত্রি তখন দশটা।

বসিয়া বসিয়া ফুল্লরা শ্রান্ত হইয়া পড়িল। দশটার পর সুশীল চাটার্জ্জী আসিয়া বলিলেন—চুপ করে বসে আছো যে!

ভোজন-কামরা। ফুল্লরা বলিল,—এমনি···

সুশীল চাটার্জ্জী বলিলেন—আজ বড্ড খাটুনি গেছে··· কাল যাবে···পরশুও! মানে, তিন দিন এখন···

ভোজনে তিনি মনোনিবেশ করিলেন। ফুল্লরা চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। নিঃসঙ্গতার বেদনা কাঁটার মতো বুকে বিঁধিতে লাগিল।

নিঃসঙ্গ সে চিরদিন। তবু আজ সারাক্ষণ স্বামীর সঙ্গ-কামনায় মন কি ভয়ঙ্কর আকুল অধীর হইয়া আছে।

সে দিকে স্বামীর লক্ষ্য নাই। দেখিলেন, ফুল্লরা ম্লান মুখে বসিয়া আছে। তবু···

আয়নায় সে নিজের মুখ দেখিয়াছে—এমন পাণ্ডু মলিন ছায়া পড়িয়াছে তার মুখে, সারা অবয়বে···স্বামীর সেদিকে লক্ষ্য পড়িল না! নারী ও পুরুষের সাম্য! পুরুষও এ-কথা বলে। মুখের কথা! বলে, শরীর মন প্রাণ, স্বাধীন সত্তা! সব শুধু মুখের কথা! এই যে ফুল্লরা চুপ করিয়া বসিয়া আছে ম্লান মলিন মুখে, জগতের বিপুল নিঃশব্দতার আবরণে নিজেকে ঢাকিয়া মুড়িয়া···স্বামী তো দ্বিতীয় প্রশ্ন তুলিলেন না···কেন? তোমার কি হইয়াছে?

বুকখানা প্রচণ্ড ব্যথায় দুলিয়া উঠিল।

সুশীল চাটার্জ্জী বলিলেন,—খুব একটা complicated মকর্দ্দমা···আইনের ভয়ঙ্কর technicality···রীতিমত পরিশ্রম করতে হচ্ছে।

ফুল্লরা যেন কাঠের পুতুল···কথাগুলা তার মনের কোণেও প্রবেশ করিল না।

সুশীল চাটার্জ্জী তার পানে চাহিলেন, বলিলেন—কি ভাবচো?

ফুল্লরা একটা নিশ্বাস ফেলিল, বলিল—একটা কথা ছিল···

সুশীল চাটার্জ্জী বলিলেন—কি কথা, ফুল?

ফুল্লরা বলিল—রোজার সম্বন্ধে···

সুশীল চাটার্জ্জী বলিলেন,—হ্যাঁ, ভালো কথা, আজ কোর্টে তোমার দাদার টেলিগ্রাম পেয়েছি···তিনি দু'তিন দিনের মধ্যে এখানে আসচেন। দেবো তোমায় সে টেলিগ্রাম?···আর কোন কথা নেই···শুধু আসচেন—এই খপরটুকু মাত্র।···তা, রোজা কি করেচে?

কথার স্বরে তেমন আবেগ নাই। ফুল্লরা বুঝিল, মকর্দ্দমার খুঁটিনাটী কথায় স্বামীর মন এখন ভরিয়া আছে।

ফুল্লরা বলিল—থাক, অন্য সময় বলবো'খন।

—তাই বলো। মনে আজ আর কোন কথা ঢুকচে না যেন···

স্বামী আহার করিতে লাগিলেন। ফুল্লরা বসিয়া রহিল।

ভোজন-শেষে স্বামী উঠিলেন, বলিলেন,—তুমি শুয়ে পড়ো গে···আমার আজ নিয়মের ব্যতিক্রম, এখনো দু'চারখানা বই ঘাঁটতে হবে।

স্বামী চলিয়া গেলেন। ফুল্লরা কিছুক্ষণ গুম হইয়া বসিয়া রহিল, তার পর ধীরে ধীরে দোতলায় আসিল।

ঘরের সামনে প্রশস্ত বারান্দা। জ্যোৎস্নার আলোয় ভরিয়া গিয়াছে।

ফুল্লরা চুপ করিয়া বারান্দার কোচে বসিয়া রহিল। সমস্ত পৃথিবী রূপ-রস-গন্ধের স্পর্শহারা হইয়া যেন পাথরের কঠিন গোলার মতো দুই চোখের সামনে ঘুরিতেছে ঘুরিতেছে! সে পৃথিবীর কোথাও যেন এতটুকু প্রাণ নাই···কিছু নাই!···

সুশীল চাটার্জ্জীর আহ্বানে ফুল্লরা ধড়মড়িয়া উঠিয়া বসিল।

সুশীল চাটার্জ্জী কহিলেন—এখানে বসে ঘুমোচ্ছ?

ফুল্লরা কহিল—বড্ড ক্লান্তি বোধ করছিলুম!

সুশীল চাটার্জ্জী কহিলেন—গিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়ে ···ঘুমোলে আরাম পাবে।···

ফুল্লরা বলিল—একটু পরে শুতে যাবো। এখানে বেশ ভালো লাগচে। বাতাস আছে···জ্যোৎস্না···

হাসিয়া সুশীল চাটার্জ্জী বলিলেন,—সত্যি, you look so tempting…

সুশীল চাটার্জ্জী মুখ আনত করিলেন। ফুল্লরা চমকিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

সুশীল চাটার্জ্জী কহিলেন—Hearts divided.

কথাটা ফুল্লরার মনের কোথায় যে বিঁধিল…নিশ্বাস ফেলিয়া সে বলিল—No hearts…we are more heads… without hearts.

কথাটা বলিয়া ফুল্লরা চলিয়া গেল নিজের ঘরে।

…সুশীল চাটার্জ্জী চুপ করিয়া ক্ষণেক দাঁড়াইয়া রহিলেন। মনে হইতেছিল, স্বামি-স্ত্রী…পাশাপাশি বাস করিয়াও ঢুজনে রহিয়া গেলেন যেন ক্ষণেকের বন্ধু! জীবনে কি চাহিয়াছিলেন? কি পাইলেন?

টাকা-রোজগারের যন্ত্র-মাত্র! টাকা আসিতেছে হুড়হুড় করিয়া…সে টাকার বিপুল ভারে মন চাপা পড়িয়া গিয়াছে! এই কি জীবন?

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ

নব সমস্যা

সকালে নূতন উপদ্রব। ছবি আসিয়া হাজির। ফুল্লরার মনের অবসাদ এখনো কাটে নাই।

রোজার ঘরের দ্বার ভিতর হইতে বন্ধ। রোজা এখনো বিছানায় পড়িয়া ঘুমাইতেছে।

সত্য, সেই যে বাহির হইয়া গেল, কখন বাড়ী ফিরিল?

সংবাদ লইবার উদ্যোগ-আয়োজন করিতেছে, এমন সময় ছবি আসিয়া উপস্থিত। তার সঙ্গে একগাদা লগেজ।

ছবি বলিল—দু'দিন আশ্রয় দিতে হবে, ভাই। আমি শুধু শ্রান্ত নই…আর্ত্ত, আতুর!

সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে ফুল্লরা তার পানে চাহিয়া রহিল। মুখ দিয়া কোনো কথা বাহির হইল না।

ছবি বলিল,—একটু নিশ্বাস নিতে দে…যে-ঝড়ের মধ্য থেকে আসছি…

ব্যাপার কি? পৃথিবীর বুকখানা ফাঁশিয়া গিয়াছে? সে রন্ধ্র-পথে রাজ্যের অঘটন মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে চায়?

শান্ত হইয়া ছবি তার কাহিনী বলিল।

ক'মাস পূর্ব্বের কথা। ছবির একটি ছেলে হইয়াছিল। সে ছেলে ক'দিন মাত্র বাঁচিয়াছিল। কিন্তু সেই ক'দিনেই ছবির মনে যে-রেখা টানিয়া গিয়াছে!…

এক মাস পূর্ব্বে লাহোরের এক ফিল্ম-কোম্পানি আসিয়া ছবিকে বলে, তাদের ছবিতে নায়িকার ভূমিকায় নামিতে হইবে। পাঁচ হাজার টাকা দিবে। ছবিতে ও-অঞ্চলে ছবি খুব খ্যাতি লাভ করিয়াছে।

ছেলেটি মারা যাইবার পর ছবির মন ভাঙ্গিয়া যায়; পড়িয়াছিল নিজের ঘরে…বাহিরের সঙ্গে সব সম্পর্ক কাটিয়া দিয়া। লাহোরের আহ্বানে সে ভাবিল, শোকের মোহ ঘুচাইয়া আবার উঠিয়া দাঁড়াইবে! আনওয়ার আপত্তি তুলিল, বলিল—ছেলে হইবার পর আনওয়ার ঠিক করিয়াছে, ছবি তার স্ত্রী হইয়া ঘরে থাকিবে—লোকের ভিড়ে আর অভিনয় করিতে নামিবে না! স্ত্রীকে আনওয়ার অভিনয় করিতে দিবে না। বিশেষ তার সঙ্গে যে-কোম্পানির যোগ নাই, তাদের দলে মিশিয়া।

ইহা লইয়া রীতিমত তর্ক চলে। আনওয়ার বলিল,—আমার মান-মর্য্যাদার কথা ছেড়ে দি…মনে আঘাত লাগবে।

ছবি জবাব দিল—তোমার নিজের কাজ নিয়ে তুমি থাকতে পারো—আর আমি স্ত্রীলোক বলে আমার এ-শক্তি নিয়ে আমি পড়ে থাকবো পুতুলের মতো ঘরের কোণে?

আনওয়ার বলিল,—আমি থাকবো বোম্বাইয়ে, তুমি থাকবে লাহোরে…সংসার?

ছবি বলিল—থাকবে। যখন ফিরে আসবো, তখন সে সংসারে আবার দুজনে পাশাপাশি মিলবো।

আনওয়ার বলিল—না, তোমার যাওয়া হবে না।

ছবি বলিল—গেলে কি অপরাধ হবে?…আমার কোনো স্বাধীনতা থাকবে না…তোমার স্ত্রী হয়েছি বলে…? আমি স্ত্রীলোক…কিন্তু আমার যে-শক্তি আছে, তার জোরে খ্যাতি পেয়েছি। পুরুষ হলে যেতে কোনো বাধা থাকতো না! মেয়ে-মানুষ বলেই হাত-পা মাথা আমি খাটাতে পাবো না?

আনওয়ার বলিল—পুরুষ-মানুষ চির যুগ ধরে কাজ করে আসছে। দুজনের আশা-আকাঙ্ক্ষা, জীবন-ধারা ভিন্ন রকমের।

ছবি বলিল—পুরুষ বলে জীবনকে নানা দিক দিয়ে তোমরা সার্থক করবে! আর আমি মেয়ে-মানুষ, তাই···

অর্থাৎ ছবি নারী, তাই তাঁর নিজের শক্তি, সাধ, আশা, আকাঙ্ক্ষা থাকিলেও সে শক্তি, সাধ-আশা তাকে বিসর্জ্জন দিতে হইবে! নিজের সব সাধ-আশাকে স্বামীর সাধ-আশা-আকাঙ্ক্ষার নীচে চাপিয়া রাখিয়া শুধু স্বামীর আরাম আর মান-সম্ভ্রম রক্ষা করিয়া চলিবে!

ছবি বলিল—আমার ভবিষ্যতের দ্বারে তালা বন্ধ করে আমায় থাকতে হবে! আমি মেয়ে-মানুষ, তাই সে দ্বার খুলে চলায় আমার নিষেধ। মেয়ে-মানুষের সামনে ফটক বন্ধ! পুরুষের সামনে শত ফটক খোলা! পঞ্চাশ বৎসর বয়সেও পুরুষ যে কোনো ফটকে ঢুকতে পারে বিশ বৎসর বয়সের আশা আকাঙ্ক্ষা মনে নিয়ে। মেয়েমানুষ তা পারে না! সে যেন পোষা কুকুর···তার গলায় থাকবে শিকল···তার গতি হবে মনিবের ইচ্ছাধীন!···

এমনি তর্কে বিব্রত হইয়া লাহোরের লোককে সে বিদায় দিয়াছে। স্বামী আনওয়ার বলে,—এখন বয়স হইতেছে—এখন অভিনয় করিয়া টো-টো করিয়া ঘুরিলে চলিবে না! সংসারের দিকে মন দিতে হইবে। সংসার গড়িয়া তুলিতে হইবে। তার উপর মেয়েমানুষের একা পথ চলায় নানা বিপদ! অর্থাৎ···

কথাটা বলিয়া ছবি হাসিল।

এ-সব কথা তার ভালো লাগে না। তাই স্বামী পুনা চলিয়া যাইবামাত্র সে এখানে আসিয়াছে। দুদিন এখানে থাকিয়া শ্রান্ত অবসন্ন দেহ-মনকে সঞ্জীবিত করিয়া তুলিবে; তার পর ভাবিয়া-চিন্তিয়া···

ছবি বলিল, মামুলি ধরণে ঘরের কোণে বসিয়া থাকা··· আর যে থাকিতে পারে, থাকুক! সে পারিবে না।

এ-কথার উপর বলিবার কিছু নাই···ছবি আশ্রয় চাহিতেছে। বলিবার কথা থাকিলেও এখন কোনো কথা বলা চলে না। ফুল্লরা কোনো কথা বলিল না!

ছবি রহিয়া গেল।

থাকিয়া থাকিয়া ফুল্লরার মনে দারুণ অবসাদ জাগে। এত লেখাপড়া শিখিয়াও জীবনটা কি হইয়া গেল! একেবারে এলোমেলো! চিরদিনের মতো সংসারকে আশ্রয় করিয়া যারা পড়িয়া থাকে, তাদের পানে করুণার দৃষ্টিতে চাহিত। জীবনের অর্থ বোঝে না, উদ্দেশ্য বোঝে না,—কোনোমতে দাস্য করিয়া মুখ গুঁজিয়া পড়িয়া আছে। এত জানিয়াও সে নিজে কি পাইয়াছে?

স্কুলের কাজ, সভা-সমিতির কাজ, দেশের কাজ—কোন্‌টায় না হাত দিয়াছে! যেন যন্ত্রের মতো!···একটা উত্তেজনা···একটা হুজুগ···একটা মাতন! দেশ যেখানকার সেইখানে আছে; সভা-সমিতিতে সেই একই ধারায় বক্তৃতা আর চাঁদা চলিয়াছে! তাহাতে কার লাভ? নারী-রক্ষা-সমিতি! এ-সমিতিই বা কি করিয়াছে? কোনো বুদ্ধিহীনা নারীকে নিজের দেহ-মনের ইজ্জৎটুকু পর্য্যন্ত শিখাইতে পারিল না! স্কুল? মন যেখানে ছোট রহিয়া গেল, কতকগুলা বইয়ের পড়া সেখানে জোর করিয়া গিলাইয়া দিলে কি লাভ হইবে? ছবি! লেখাপড়া যতখানি করিয়াছে, তার ফলে নিজের জীবনকে লইয়া যেন এই তো ফুটবল খেলিয়া বেড়াইতেছে! ইভা! কোনোদিন ইন্‌সিওরেন্সের কাজ করিতে চলিয়াছে, কোনোদিন বা বন্যার স্রোতে গা ভাসাইয়া চলিয়াছে। আর রোজা?

ফুল্লরা শিহরিয়া উঠিল। নিজেকে কোন্ পথে মত্ত আবেগে ছুটাইয়া দিয়াছে?

রোজা বলে, আরাম পায়! কিসের আরাম? সিনেমা···মোটরে বেড়ানো! সে আমোদ তো তার নিজের আয়ত্তে আছে! তবু···

একদল পুরুষ কাণের সামনে স্তুতি-গান করে—তাহাতে ভুলিয়া এমন করিয়া···

নিজের মনের অলি-গলির সে সন্ধান লইল। জীবনকে গুছাইয়া চালাইতে পারিয়াছে, এ-কথা বলা চলে না! তবু এমন উত্তেজনার ঝোঁকে উহাদের মতো···

গোড়া হইতে ভুল করিয়া বসিয়াছে? হয়তো তাই সংসারে পা দিতে আসিয়া শিক্ষার গর্ব্বে স্বামীকে বলিয়াছিল, equal partnership!

কিন্তু ঘর-সংসার কি সত্যই দোকানের পার্টনারশিপ? স্নেহ, মায়া, মমতা···

সেগুলা নিষ্ফল হইবে বলিয়া মানুষের মনে স্থান পায় নাই, সত্য!

স্বামীই বা তাকে কবে কাছে ডাকিয়াছেন? প্রেমের কথা আবেগ-ভরে কবে বলিয়াছেন? বিবাহ হইয়া অবধি দেখিতেছে, স্বামী তাঁর ব্রীফ আর মক্কেল লইয়া মত্ত আছেন সারাক্ষণ! এ সংসারের প্রবেশ-পথ-মুখে বলিয়াছিল—equal partnership! জীবনকে না জানিয়া জীবনের সব হিসাব-নিকাশ সে সারিতে বসিয়াছিল…তা কখনো হয়?

নক্সা কাটিয়া জীবনের পথ এখানে একেবারে নির্দ্দেশ করা আছে…একটু সরিয়া চলিয়াছ, কোথায় কতদূরে গিয়া পড়িবে, তার আর ঠিক-ঠিকানা নাই!

পাশ করিয়া অর্থোপার্জ্জনে মন দিয়া নিজেকে যদি সকলের সহিত সম্পর্কবিহীন রাখিত, হয়তো আজ এতখানি অস্বস্তি সহিতে হইত না! বিবাহ করিয়া সংসারকে উপেক্ষা করা চলে না!…

বনলতা! তাদের স্কুলে টীচারী করিত। ধ্যানে-জ্ঞানে জানিয়াছিল—স্বামী, সংসার। হাসি-মুখে কতখানি তৃপ্তি বুকে লইয়া সে-সংসারে সে প্রবেশ করিয়াছে!

জীবনকে সার্থক তৃপ্ত করিতে আদর, সোহাগ, ভালোবাসা, প্রেমের মধুবাণী—এ-গুলার প্রয়োজন আছে বৈ কি… নহিলে যুগ-যুগ ধরিয়া এগুলাকে মানুষ এমন আদরে শিরোধার্য্য করিবে কেন?…

দু'দিন পরে নিশানাথ আসিল। তখন সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে।

সুশীল চাটার্জ্জী বলিলেন—ভগ্নীর সঙ্গে আলাপ করুন। আমি আজ সকাল-সকাল অতিথি বিদায় করে' আপনাদের দলে যোগ দেবো'খন।

ফুল্লরা কহিল—দু'চার দিন থাকবে তো এবারে?

নিশানাথ বলিল—চেষ্টা করচি, যাতে এখানে বাকী ক'টা দিন থাকতে পারি!

ফুল্লরা দাদার পানে চাহিল—দু'চোখে সপ্রশ্ন দৃষ্টি।

নিশানাথ মৃদু হাসিল, হাসিয়া বলিল,—অফিসের ব্রাঞ্চ খুলচে কলকাতায়। আমরা তিন জন এসেছি সে অফিসের ব্যবস্থা করতে। সীলোনের মায়া কেটেছে। বলেছি, আমার বাড়ী কলকাতায়; কলকাতাতেই যদি আমায় রাখেন… বড় উপকার হবে। ডিরেক্টর বলেছে, সে ব্যবস্থা করবে।

ফুল্লরা কহিল—বড় ভালো হয় তাহলে। সত্যি, একা পড়ে আছো কোথায় কত দূরে। তার উপরে এক জায়গায় থাকা নয়। আজ আছো ক্যাণ্ডিতে, কাল কলম্বো, পরশু চললে কোথায় সেই মরিশস! কেনই বা এমন ভবঘুরের মতো থাকা!

হাসিয়া নিশানাথ বলিল—না রে, এ হলো এ্যাডভেঞ্চার। জানিস তো, এ্যাডভেঞ্চারের নেশা আমার ছেলেবেলা থেকে!

ফুল্লরা বলিল—ছোটদার কোনো খপর জানো?

—না।…তুই জানিস?

—কার কাছ থেকে জানবো? জানতে ইচ্ছা করে। ভাই-বোন তো…কিছুদিন থেকে সকলকে কাছে পাবার জন্য মন এমন লালায়িত হয়!…

নিশানাথ সিগার ধরাইল, তার পর বলিল,—রোজা বোধ হয় খুব জ্বালাতন করছে?

ফুল্লরার বুকখানা ধ্বক করিয়া উঠিল। সে বলিল—এইখানেই তুমি থাকবে তো?

নিশানাথ কহিল—থাকবো?

—থাকো বড়দা, সত্যি…

ফুল্লরার স্বরে মিনতি। নিশানাথ বলিল—আমরা তিন জনে উঠেছি ত্রিশকো হোটেলে।…তা বেশ। তোর এখানেই বরং থাকবো। জিনিষপত্রগুলো তাহলে আনাতে হবে।

নিশানাথ কহিল—রোজা জানে আমি আসবো?

ফুল্লরা বলিল—জানে। তবে কবে আসবে, তা কারো জানা ছিল না তো…

—কোথায় সে?

ফুল্লরা বলিল—কি জানি! বোধ হয়, সিনেমায় গেছে। প্রায় যায়।

—হুঁ! এখানেও সিনেমা! আমার ভাবনা হয় ফুলু… সেই কথা আছে sins of fathers…ওর মায়ের কথা মনে হলে রোজার জন্য আমার সত্যি ভয় হয়। কিছু বললে রোজা বলে, আমরা pioneers on the path of emancipation. [ক্রমশঃ

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

হঠাৎ

কনফুসিয়াস্-পূর্ববর্তী চৈনিক দর্শনশাস্ত্রে উল্লিখিত আছে যে, 'হঠাৎ' বস্তুটা যোগ নহে, বিয়োগ। স্থান, কাল ও পাত্রের বিচিত্র সমন্বয়ে হঠাৎ কিছু ঘটা সম্ভব নহে; সমবেত বস্তু, শক্তি ও বিষয়ের মধ্যে এক বা একাধিকের অন্তর্দ্ধানেই 'হঠাতে'র আবির্ভাব বা উৎপত্তি। এই বিয়োগ বা অন্তর্দ্ধান স্থান, কাল ও পাত্রভেদে হাস্যকর করুণ বা মারাত্মক হইতে পারে। চীনারা অত্যন্ত কম কথা বলে, ইঙ্গিতমাত্র দিয়াই চৈনিক দার্শনিক 'হঠাৎ' প্রসঙ্গের শেষ করিয়াছেন।

কামস্কাটকার কবি-দার্শনিক কুচাহো সম্পূর্ণ অন্য কথা বলেন। এই বিষয়ে চৈনিক মতাবলম্বী র‍্যাডিভোষ্টকের কবি বিথলোতেলাচুংভিস্কির সহিত 'তেরপুন্-তাস্কি' (সান্ধ্য-সংবাদ) পত্রিকায় তাঁহার যে বৈজ্ঞানিক আলোচনা দীর্ঘকাল চলিয়াছিল এবং পরে যাহা 'বিস্তাসাং' (অর্থাৎ পয়জার) নামক সাপ্তাহিকে জঘন্য খেউড়ে রূপান্তরিত হইয়া শুচি-বায়ুগ্রস্ত কামস্কাটীয়ানদের ভীতির উদ্রেক করিয়াছিল সে সকলের উল্লেখ করিবার প্রয়োজন নাই; এইটুকুমাত্র বলিলে যথেষ্ট হইবে যে, কুচাহো 'হঠাৎ'কে যোগ বলেন, বিয়োগ নহে। চলিত (existing) বস্তু ও ঘটনা সমন্বয়ে বহির্ঘটনা বা বহির্বস্তুর যোগ না ঘটিলে 'হঠাতে'র উদ্ভব হইতে পারে না। দৃষ্টান্তস্বরূপ তিনি ধূমকেতুকে (পুচ্ছসমেত) 'হঠাতে'র পর্য্যায়ে ফেলিয়াছেন। তিনি বলেন, অনন্ত নভোমণ্ডলে সূর্য্য প্রভৃতি নক্ষত্রমণ্ডলী; শুক্র, মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি প্রভৃতি গ্রহ এবং চন্দ্রজাতীয় উপগ্রহ সর্ব্বদা বর্ত্তমান; এই চলিত বস্তু ও ঘটনাসমন্বয়ে ধূমকেতুর যোগ ঘটিয়া 'হঠাতে'র আবির্ভাব হয়। ফলে রাষ্ট্রে, সমাজে ও সাহিত্যে গোলযোগ অবশ্যম্ভাবী।

জাপানীরা মুহুর্মুহু ভূমিকম্পপীড়িত, টাইফুনক্লিষ্ট, 'হঠাৎ'ই তাঁহাদের নিত্য বর্ত্তমান, সুতরাং 'হঠাৎ' বলিয়া কোনও শব্দ তাঁহাদের অভিধানে নাই।

আর্কিমিডিস হইতে আইনষ্টাইন পর্য্যন্ত য়ুরোপের বৈজ্ঞানিক সম্প্রদায় 'হঠাৎ' লইয়া দীর্ঘ বাইশ শতাব্দী যে কোলাহল সৃষ্ট করিয়াছেন ও তাহা উত্তরোত্তর যেরূপ বৃদ্ধি পাইতেছে, তাহাতে এ বিষয়ে হঠাৎ কিছু বলা উচিত হইবে না। কোন পক্ষই হটিতেছে না, এবং পরস্পর তর্ক-বিচারের মধ্যে হঠকারিতা এরূপভাবে আত্মপ্রকাশ করিতেছে যে, মনে হয়, আর একটা মহাযুদ্ধ না ঘটিলে এই আন্দোলনের পরিসমাপ্তি হইবে না। য়ুরোপকে আমরা বাদ দিতেছি।

আমেরিকায় 'হঠাতে'র একটিমাত্র দৃষ্টান্ত আছে, তাহা কলম্বসের আমেরিকা আবিষ্কার; ইণ্ডিয়ার খোঁজে রেড 'ইণ্ডিয়া'র সন্ধান হঠাৎ ঘটিয়াছিল, সুতরাং ইয়াঙ্কি অভিধানে 'হঠাৎ' শব্দের অর্থে একটু ভুলের সংজ্ঞা জড়িত আছে। আমেরিকায় 'হঠাতে'র হুল্লোড় যে পরিমাণ হয়, তাহাতে 'হঠাৎ' লইয়া আলোচনা তাহারা বরদাস্ত করিবেন বলিয়া মনে হয় না, হঠাৎ কিছু একটা করিয়া বসিতে তাঁহারা ইতস্তত করেন না।

আফ্রিকার অরণ্য, পর্ব্বত ও প্রান্তরনিবাসীদের মধ্যে সিংহ, ব্যাঘ্র, গরিলা, হস্তী, অজগর প্রভৃতি অতিকায় বন্য জন্তু হঠাৎ আবির্ভূত হয়, এই জন্য 'হঠাৎ'কে তাহাদের বড় ভয়। য়ুরোপ-আমেরিকার শ্বেতাঙ্গ অধিবাসীদিগকেও তাহারা 'হঠাতে'র পর্য্যায়ে ফেলিয়াছে।

কিন্তু প্রসঙ্গ দীর্ঘ করিয়া লাভ নাই। ভারতবর্ষের ঋষি বলিয়াছেন, সহসা বিদধীত ন ক্রিয়াম্—হঠাৎ কিছু করিবে না। ইহাতে প্রতীতি হয় যে, প্রাচীন ঋষিরা 'হঠাৎ'কে যোগের পর্য্যায়ে ফেলিয়াছিলেন। যাহা চলিতেছে তাহার ব্যতিক্রম ঘটানই হঠাৎ কিছু করা। প্রচলিত মত ও রীতির ব্যতিক্রম, কিছু না করিলে ঘটা সম্ভব নহে; সুতরাং কোনও ক্রিয়া বা ঘটনার উপর 'হঠাতে'র নির্ভর।

হঠাৎ কিছু বলিতে চাহি না বলিয়াই আমাদের এই ভূমিকার অবতারণা, আসলে জীবনে আমরা 'হঠাৎ'কে প্রাক্-কনফুসিয়াস চৈনিক ঋষিদের দৃষ্টিতেই দেখিয়া থাকি। যেমন ধরুন, ট্রেন ঝড়ের বেগে ছুটিতেছে, চাকা সরাইয়া

ফেলুন কিম্বা উহার গতিবেগ একেবারে বাদ দিন, কি ঘটিবে? যাহা ঘটিবে, তাহা কল্পনা করিলেই 'হঠাতে'র ক্ষমতা বুঝিতে পারিবেন।। প্রশান্ত মহাসাগরে জাহাজ ভাসিতেছে —তলদেশের খানিকটা অংশ সরিয়া গেল, হঠাৎ জাহাজডুবি হইবে। লিফ্‌টে চাপিয়া দ্বারভাঙ্গা বিল্ডিং-এ উঠিতেছেন, মাঝখানে বৈদ্যুতিক শক্তি অপসারিত হইল, আপনি না যাইতে পারিতেছেন, কন্ট্রোলার্স অফিসে, না নামিতে পারিতেছেন নীচে, সঙ্গে এম-এ ক্লাসের এক জন ছাত্রীও থাকিতে পারেন। লিফ্‌টম্যান্? আলোকরশ্মি সেকেণ্ডে ১ লক্ষ ৮৬ হাজার মাইল বেগে তাহার রেটিনায় অন্তত সেই সময়ের জন্য ধাক্কা দিতেছে না……

সুবিমল দত্ত ছাত্র ও অধ্যাপক মহলে কাণাঘুষায় শুনিয়াছে, এই বৎসর এম-এ পরীক্ষায় ইংরেজি বি-গ্রুপে প্রায় প্রত্যেক পেপারেই সে রেকর্ড মার্ক পাইয়া প্রথম হইয়াছে, একুনে প্রথম তো বটেই। সত্যাসত্য নির্দ্ধারণের জন্য সে কন্ট্রোলারের কাছে যাইতেছিল। খবরটা যে তাহার মনে বিশেষ উৎসাহের সৃষ্টি করিয়াছিল তাহা নহে, তবু মা ভাবিতেছেন। দেশে তাঁহাকে খবর পাঠাইতে হইবে। মাটি হইতে মাঝ পথে উঠিতে লিফ্‌ট বেশী সময় লয় নাই, ইহারই মধ্যে সে অনেক কিছুই ভাবিয়াছে ; পড়াশুনা লইয়া বেশ ছিলাম, সে পাট তো চুকিল, এখন চাকুরির জোগাড়ে দরজায় দরজায় ঘুরিতে হইবে, ফার্ষ্ট ক্লাশ ফার্ষ্টের চাকরি হয়তো একটা জুটিবে, হয়তো যত্ন করিয়া বি-সি-এস দিলে ডেপুটিগিরিও জুটিতে পারে। কিন্তু ঘৃণার কথা বাদ দিলেও চাকরিকে তাহার বড় ভয়, কত রকমের লোকের সহিত কারবার করিতে হইবে! অথচ মামাদের স্কন্ধে আর চাপিয়া থাকিলে অন্যায় হয়, মা তো পাকাপাকি রকমেই সেখানে বাসা বাঁধিয়াছেন, তাহার পড়ার খরচও এত কাল মামারাই জোগাইয়া আসিয়াছেন, আর ভাল দেখায় না। চাকরি লইয়া মাকে কাছে আনিতে হইবে, প্রোফেসারি চাকরিটা ভাল, ঝঞ্ঝাট কম, তাহার মনের মতও বটে; লেখাপড়া লইয়াই থাকিতে পারিবে। এ দিকে মা আবার বিয়ের জন্য পীড়াপীড়ি সুরু করিয়াছেন, পাত্রীও না কি দেখিয়াছেন অনেকগুলি, একটিকে তাঁহার পছন্দ হইয়াছে, মায়ের কাছে গিয়াই তাহাকে পাত্রী দেখিতে ছুটিতে হইবে—

তেতলা কিম্বা চারতলা হইতে কে যেন বেল টিপিতেছিল, ক্রিং ক্রিং করিয়া দুইবার ঘণ্টা বাজিয়াই চুপ, ঝড়াং করিয়া মাঝ রাস্তায় লিফ্‌ট থামিয়া গেল, কারেণ্ট বন্ধ হইয়াছে। আচমকা একটা ধাক্কার মত, 'অন্যমনস্ক সুবিমল বিহ্বলভাবে চাহিয়া দেখিল, তাহার সহযাত্রী এক জন মেয়ে, এতক্ষণ সে তাহাকে লক্ষ্যই করে নাই। হঠাৎ লিফ্‌ট থামাতে সে প্রায় তাহার ঘাড়ের উপর পড়িয়াছে।

অপ্রস্তুত সুবিমল আপনাকে সামলাইয়া লইয়া কি করা উচিত ঠিক করিতে না পারিয়া বিনীতভাবে শুধু একটি নমস্কার করিল।

বড় গরম, লিফ্‌টম্যান শুদ্ধ ভ্যাবাচ্যাকা খাইয়া ঘামিয়া উঠিয়াছে, হাতল ধরিয়া এ দিকে ঘুরাইতেছে, ওদিকে ঘুরাইতেছে কিন্তু বিকল কল কথা বলে না, নড়ে না। চার দিকে দেয়াল, আলোহীন অন্ধকার।

মেয়েটি কথা বলিতে চেষ্টা করিল। সুবিমলকে সে চেনে, বিদ্যাসাগর কলেজে একসঙ্গে বি-এ পড়িত, ফেল করিয়া এক বৎসর পিছাইয়া পড়িয়াছে। নাম কল্যাণী সোম। গানের বাজারে নাম আছে। সুবিমল চোখ তুলিয়া সহপাঠিনী মেয়েদের কখনও দেখে নাই, সুতরাং অন্য সকলের মত কল্যাণীও তাহার সম্পূর্ণ অপরিচিত। কিন্তু ফার্ষ্ট ক্লাস ফার্ষ্টকে চেনা অসঙ্গত নয়।

কল্যাণী কথা বলিতে চেষ্টা করিল বটে, কিন্তু মুখ দিয়া বাহির হইল শুধু, সুবিমল বাবু?

ত্রিশঙ্কুর মত আকাশের মাঝখানে অবস্থিত সুবিমল যেন আকাশ হইতে পড়িল। তাহার অবাক হওয়ার ভাব দেখিয়া কল্যাণী ততক্ষণে সাহসী হইয়া উঠিয়াছে। বলিল, আশ্চর্য্য, আপনি আমায় চেনেন না দেখছি, বিদ্যাসাগরে আমরা একসঙ্গে পড়তাম। আমার নাম কল্যাণী।

স্মৃতিভ্রংশ হইবার পর মানুষ প্রথম যখন অস্পষ্টভাবে পূর্ব্বস্মৃতি ফিরিয়া পাইতে থাকে, সেই ধরি-ধরি-ধরিতে পারি-না অবস্থা হইল সুবিমলের। একবার নজর দিয়া কল্যাণীকে দেখিল।

—কল্যাণী সোম? ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউটে—

লজ্জা হইল কল্যাণীর, মুখ নীচু করিয়া প্রসঙ্গটা চাপা দিবার জন্যই বলিল, আপনি তো এবারে রেকর্ড—

কিন্তু ব্যাপারটা কি? গরমে ও অন্ধকারে দম প্রায় বন্ধ হইয়া আসিল যে! আলো নিভিবার জন্য চারি দিকে কোলাহল সুরু হইয়াছে, বারান্দায় ও প্যাসেজে সকলে হল্লা সুরু করিয়াছে, পাঁচ মিনিটের উপর হইল কারেণ্ট ফেল করিয়াছে।

লিট্‌ল সাহেব এবং অক্ষয় মৈত্রেয় মহাশয় প্রমাণ করিয়াছেন, অন্ধকূপহত্যা নিছক গল্পমাত্র। জোর করিয়া সুবিমল কিছু বলিতে পারে না, ইতিহাসের ছাত্র নয় সে,

হঠাৎ লজ্জা আসিয়া তাহার ক্লান্ত মুখখানিকে রাঙাইয়া দিল

কিন্তু ঐরূপ হওয়া কিছুমাত্র অসম্ভব নয়। মিস কেরী নাকি বাঁচিয়াছিলেন, কল্যাণীও বাঁচিয়া থাকিবে, কিন্তু সে মরিতে বসিয়াছে।

আর সোজা দাঁড়াইয়া থাকা যায় না, লিফ্‌টের একটা দেওয়ালের গায়ে হেলান দিলে কি রকম হয়! কিন্তু ও কি, কল্যাণী যে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে, মূর্চ্ছা গেল না কি?

লিফ্‌টম্যান ধরিতে যায়, এ অবস্থাতেও সুবিমলের ততটুকু ক্ষাত্রবীর্য্য ছিল, সে একবার গা-ঝাড়া দিয়া দাঁড়াইল এবং কল্যাণীকে পিঠে একটা—কোমরে একটা হাত দিয়া শূন্যে তুলিতে চেষ্টা করিল।

হঠাৎ—

কিন্তু এবার যোগ। অবিরাম বিদ্যুৎপ্রবাহ, আলো, পাখা, ক্রিং ক্রিং—কোলাহল।

লিফ্‌টম্যানের দিকে চাহিয়া সুবিমল শুধু বলিল, নীচে নামাও।

আঃ—বলিয়া কল্যাণী চোখ খুলিল, এ কি, আমি কোথায়?

হঠাৎ—

লজ্জা আসিয়া তাহার ক্লান্ত মুখখানিকে রাঙাইয়া দিল। সুবিধা থাকিলে মাথায় ঘোমটা টানিয়া দিত। ক্ষীণকণ্ঠে শুধু বলিল, আমার শরীরটা কেমন করছে, বাড়ি পৌঁছে দেবেন আমায়?

রেস্তোরাঁ-লোলুপ সহপাঠীরা তো ছিলই—ফিফ্‌থ ইয়ার, সিক্‌সথ ইয়ার, ল ক্লাস, কেরাণী—ভানুমতীর খেল দেখিতেও মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীটে এত লোক চট করিয়া জড় হয় না। সুবিমল মালকোঁচা মারিল।

সহানুভূতি, হাসি, উপহাস—প্যারীচরণ সরকার ষ্ট্রীটের মুখ পর্য্যন্ত—মেরিয়াসকে কাঁধে তুলিয়া জিন ভলজিন (জাঁ ভালজাঁ লিখিতে সাহস হয় না) প্যারিসের সুড়ঙ্গপথে চলিতে এতখানি কষ্ট পায় নাই, কল্যাণী কিন্তু নিজেই হাঁটিয়া চলিয়াছিল।

ট্যাক্সি।

মোড়ে মোড়ে বিদ্যুৎ-প্রবাহ বন্ধ হওয়ার ব্যাপার লইয়া গুলতানি চলিতেছে। দুপুর না হইলে দুই একটা ডাকাতির খবরও হয়তো এতক্ষণ বাজারে ছড়াইয়া পড়িত। কিন্তু সুবিমল ইংরেজী কাব্য পড়িয়াছে অথচ মোটে কল্পনাপ্রবণ নয়। আকস্মিক এবং অভাবনীয় ঘটনা তাহার মনে কোনও রসসৃষ্টিই করিল না। বাইনোমিয়াল থিয়োরেমের মত অতি সংক্ষেপে সে প্রশ্ন করিল, কেমন বোধ হচ্ছে? এইবার বাঁয়ে যাব তো?

অসুস্থ অবস্থাতেও কল্যাণীর কি বাঁয়ে বসিতে ইচ্ছা

হইতেছিল? ভাল ছেলে, চেহারাও নিন্দার নয়, চোখে চশমা পর্য্যন্ত নাই; তা ছাড়া এমন নাইভ অ্যাণ্ড আন্‌য়্যাম্যুউমিং—বাংলা বিশেষণগুলা গালির মত শুনায়। একবার ডিক্সনারি দেখিতে হইবে।

মেজ কাকা বৈঠকখানার ফরাসে তাকিয়া হেলান দিয়া পেসেন্স খেলিতেছিলেন, দুই তিন বৎসরের আধ-উলঙ্গ একটি শিশু তাঁহার পাশে উপুড় হইয়া ঘুমাইতেছিল; ভিতরের বারান্দায় মা হরিমতি-ঝিয়ের সঙ্গে বঁটিতে তেঁতুল ছাড়াইতেছিলেন। কল্যাণী কলেজ হইতে ফিরিয়া সুজির রুটি খায়, পাশে তোলা উনানে এলুমিনিয়ামের বাটিতে সুজি সিদ্ধ হইতেছিল।

দরজায় ট্যাক্সি থামিতেই মেজ কাকা ভ্রূকুটি করিলেন, হরতনের 'সার্ট'টা প্রায় মিলিয়া আসিয়াছিল, এ সময়ে কাহারা আবার জ্বালাইতে আসিল!

সুবিমলই ভাড়া দিল, কল্যাণী তখনও ক্ষীণকণ্ঠে বলিল, দাঁড়ান, মায়ের কাছ থেকে আসি—

মেজ কাকা হাঁকিলেন, কে রে, রাণী না? এত সকাল সকাল যে! ট্যাক্সিতে কে এল রে?

কল্যাণীর পিছনে পিছনে সুবিমল বৈঠকখানায় ঢুকিল।

কল্যাণীর পিছনে পিছনে সুবিমল বৈঠকখানায় ঢুকিল

তাসগুলি দুই হাতে ঠেলিয়া সরাইয়া দিয়া মেজকাকা বিস্মিতভাবে কল্যাণীর মুখের দিকে চাহিলেন। কল্যাণীর লজ্জা যেন দ্বিগুণ হইয়া আসিল, সহসা কোনও জবাব না দিয়া সে মেজ কাকার পাশে শায়িত ঘুমন্ত শিশুকে কোলে তুলিয়া নাচাইতে সুরু করিল এবং একটু দম লইয়া হাসিতে হাসিতে সুবিমলকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, আমার দিদির ছেলে, আর ইনি মেজ কাকা।

সঙ্কুচিত সুবিমল বিনীতভাবে নমস্কার করিল, ইত্যবসরে দিদির ছেলের গালে একটা কামড় দিয়া তাহাকে জাগাইতে চেষ্টা করিতে করিতে কল্যাণী বলিল, ইনি সুবিমলবাবু, এবার এম-এতে ইংরেজিতে ফার্ষ্ট হয়েছেন। বলিয়া সে আজিকার লিফ্‌ট ও কারেন্টঘটিত ব্যাপারটা বলিতে যাইতেছিল, বৈঠকখানার ভিতরের দরজার পাশে মা আসিয়া দাঁড়াইলেন। মেজ কাকা তিনপুরুষে কেরানি, রিটায়ার করিয়া সম্প্রতি পেসেন্স খেলিতেছেন। ফার্ষ্ট ক্লাস ফার্ষ্ট ছেলের মধ্যে ভাবী হাকিমের গন্ধ পাইয়া তিনি যুগপৎ পুলকিত ও সঙ্কুচিত হইতে লাগিলেন।

মা প্রশ্ন করিলেন, কি রে রাণী?

মায়ের মন স্বতই স্নেহার্দ্র। সমস্ত ব্যাপার শুনিয়া মেয়ের বিপদে এভাবে সাহায্যে করিবার জন্য সুবিমলকে তিনি আশীর্ব্বাদ করিলেন' সুবিমল আগেই প্রণামটা সারিয়া লইয়াছিল।

কল্যাণীর দিদি আসিলেন, বি-এ পাস, অত্যন্ত সু-রসিকা। স্বামী রেঙ্গুনে এডভোকেট; খবর পাঠাইয়াছেন' এইবার আসিয়া পত্নীকে লইয়া যাইবেন। তিনি সুবিমলকে ইতিমধ্যেই কল্যাণীর ঘনিষ্ঠ ঠাওরাইয়া কয়েকটি রসাল রসিকতা করিতে চেষ্টা করিলেন। কল্যাণী চটিয়া আড়াল হইতে ইঙ্গিতে তাঁহাকে নিরস্ত করিতে চেষ্টা করিল। তিনি কিন্তু সুবিমলকে ছাড়িলেন না, চা খাওয়াইয়া এবং চায়ের পেয়ালার মত তাহার ক্ষুদ্র মস্তিষ্কে তুফান তুলিয়া দিয়া যখন কল্যাণীকে গানের ফরমাস

করিলেন, তখন মা ও মেজ কাকার পরামর্শ সুরু হইয়া গিয়াছে।

পরীক্ষায় বরাবর ফার্স্ট হইলেও সুবিমল বোকা ছিল না। হাসি ও ইঙ্গিত তীরের মত তাহার বুকে বিঁধিতে লাগিল। না হয়, মূর্চ্ছাপন্ন কল্যাণীকে সে বাড়ি পর্য্যন্ত পৌঁছাইতেই আসিয়াছে, কিন্তু সহৃদয়তা কি অপরাধ?

সে দিনের পর্ব্ব শেষ হইল। খুশি হলাম বাবা, আবার কবে আসছ?—মায়ের সস্নেহ অনুরোধ; দেখবেন, ভুলে যাবেন না, আসবেন কিন্তু—দিদির সকৌতুক আহ্বান; এবং স্বয়ং কল্যাণীর আনত দৃষ্টিক্ষেপ—সুবিমল পরদিনই মায়ের কাছে চলিয়া যাইবে স্থির করিয়া ফেলিল। কলিকাতায় আর নয়।

সুবিমলের ফার্স্ট হওয়ার কথাটা ঠিক, দেশে একটু দম লইয়া আসিয়া চাকুরির সন্ধান করিতে হইবে।

এ পক্ষের এই কথা। কিন্তু সেদিনকার সেই হঠাতের আক্রমণে ও পক্ষে ভাঙাচোরা সুরু হইয়াছে। দিদি বলিলেন, কোনও খবর নেওয়া নেই, মরবি যে! হয়তো—

কল্যাণী দিদির মুখ চাপিয়া ধরে, কলেজের খাতাগুলি গুছাইয়া লইতে লইতে লজ্জিতভাবে বলে, তুমি কি কাণা দিদি?

তুমি কি কাণা, দিদি

কিন্তু সে ইউনিভার্সিটি আর নাই, সেই প্রফুল্ল ঘোষ, সেই জয়গোপাল ব্যানার্জ্জি, সেই সুনীতি চ্যাটার্জ্জী, সেই কমন রুম! তেতলার ব্যালকনিতে দাঁড়াইলে গাছের ফাঁকে ফাঁকে গোলদীঘির জল, বিদ্যাসাগরের ষ্ট্যাচুটাও যেন বদলাইয়া গিয়াছে; ওই চওড়া কপাল, রুক্ষতার অন্তরালে হৃদয় বলিয়া কি কিছু ছিল না? নিশ্চয়ই ছিল, নহিলে লোকে তাঁহাকে দয়ার সাগর বলিত কেন?

পড়িতে ভাল লাগে না, বি এ পাস করিতে তিন বৎসর লাগিয়াছিল, এম-এটা পাস করা অসম্ভব। আর পাস করিয়াই বা হইবে কি! দিদি সঙ্গে লইয়া যাইতে চাহিতেছেন, রেঙ্গুন যাওয়াই ভাল।

* * *

খাইতে বসিলে মায়ের ঘ্যানঘ্যানানি যেন বাড়িয়া যায়, এটা খা, ওটা খা, মাছের মুড়োটা—মানুষে কি অত খাইতে পারে? শুধু না খাইয়া খাইয়া শুধু না-খাওয়াটাই অভ্যাস হইয়াছে, একটা কেমন গন্ধ—

মা বলেন, মেয়েটি ভাল বাবা, ফটোগিরাপ তো দেখলি! শুনেছি স্কুলে পড়েছেও। এক রকম কথা দিয়ে ফেলেছি।

সুবিমল কখনও মায়ের অবাধ্য নয়, পৃথিবীতে মা-ই তাহার একমাত্র আরাধ্য দেবতা। মামারা তার পর। পাত্রী ছোট মামীর কোন আত্মীয়ের কন্যা। ছোট মামী বাপের বাড়ি গেলেন, মামাত ভাইকে সঙ্গে করিয়া সুবিমল পাত্রী দেখিতে গেল। দরদালানে একটি সতরঞ্চি বিছাইয়া দিয়াছে, সামনে একটি আসন পাতা। ছোট মামীমা মেয়েটিকে সঙ্গে করিয়া আসিতেছেন। সুবিমল লজ্জায় মুখ তুলিতে পারিতেছে না, ছোট্ট দুটি পা, দেখিতে মন্দ নয়, মেয়েরা আলতা কেন পরে এত দিন সে বুঝিতে পারিত না, আলতা জিনিসটা নেহাৎ অনর্থক নয়।

মেয়েটি নমস্কার করিয়া সামনের আসনে বসিল, মামীমা তাহার পিঠে হাত দিয়া একটু ঝুঁকিয়া দাঁড়াইয়া মেয়েটিকে সম্বোধন করিয়া ব্যঙ্গের ভঙ্গীতে প্রশ্ন করিল, গান গাইতে পার তুমি? নাচতে জান?

গান গাইতে পার তুমি? নাচতে জান?

ছোট মামীমার হাত কাঁপিল, মনে মনে বলিলেন, ধরণী দ্বিধা হও!

আসে পাশে, ঘরের ভিতরে ও বাহিরের বারান্দায়, দরজা ও জানালা পথে কৌতূহলী ছেলেমেয়ের দল উঁকি দিতেছে, বৌদিদিরা আছেন, পিসিমাও কাণ পাতিয়া আছেন নিশ্চয়ই। সুবিমলের কত প্রশংসাই তিনি করিয়াছেন, এমন ছেলে এ যুগে হয় না, চোখ তুলিয়া কথা বলিতে জানে না। ইহার পর তিনি আর এখানে মুখ দেখাইবেন কি করিয়া?

কিন্তু ব্যাপার কি? বেশী লেখাপড়া করিয়া ছোঁড়াটা ক্ষেপিয়া গেল না কি! কিংবা কলিকাতায় ডাইনিদের পাল্লায় পড়িয়া—দুইটার একটাও সত্যি হইলে তো জানিয়া শুনিয়া উহার হাতে কমলাকে দেওয়া চলিবে না। তিনি আর সেখানে দাঁড়াইলেন না, যথেষ্ট অপমানিত হইয়াছেন। একেবারে পিসিমার কাছে গিয়া কাঁদিতে বসিলেন।

মামাত ভাই শিশির তাহার হাত ধরিয়া টানিতে লাগিল। কমলা ভয়ে কাঁপিতেছে। আর কি বিশ্রী প্রশ্ন করা যায় সুবিমল ভাবিতে লাগিল, যখন আরম্ভ করা গিয়াছে শেষ করাই ভাল। দীনবন্ধুর হেমচাঁদ নদেরচাঁদের লীলাবতী-সন্দর্শন পড়া ছিল, শেষ মার দিবার জন্য প্রশ্ন করিল, তুমি বিদ্যাসুন্দর পড়েছ?

প্রবীণাদের চাঞ্চল্যে ছেলেমেয়েরা ছত্রভঙ্গ হইয়া

সস্নেহে বলিলেন, কি বাবা, বিমল, কিছু জিজ্ঞেস কর, চোখ তুলে দেখ—কমলা আমাদের লক্ষ্মী মেয়ে।

পাশের কোনও বাড়ি হইতে গ্রামোফোনের গান ভাসিয়া আসিতেছিল—বুকে দোলে তার বিরহ-ব্যথার মালা।

সেই গান!

হঠাৎ—

পৃথিবীর রং বদলাইয়া গেল, ভূমিকম্প, ওলটপালট! লিফ্‌টের ভিতর কল্যাণীর মূর্চ্ছাহত মুখ, বিদায় মুহূর্তে তাহার লজ্জানত কাতর দৃষ্টি। দিদির 'আসবেন কিন্তু—'

অসম্ভব অসম্ভব! মাকে মনে মনে প্রণাম করিয়া সুবিমল মরিয়া হইয়া উঠিল। পৃথিবীতে তখন আর কোথায়ও কিছু নাই, সব লেপিয়া মুছিয়া গিয়াছে, শুধু সে আর দিদির হাত ধরিয়া কল্যাণী। চিরকালের ভদ্র, সংযত, নম্র সুবিমল এক নিমিষে নিয়ম রূঢ় হইয়া গেল।

পড়িল, ভূমিকম্প হইলেও এমন হইত না। এক জন আধা-বয়সী মহিলা চিলের মত ছোঁ মারিয়া কমলাকে তুলিয়া লইয়া গেলেন। নিমেষ মধ্যে অন্দর হইতে সদর পর্য্যন্ত খবর ছড়াইয়া পড়িল, সুবিমল প্রকৃতিস্থ অবস্থায় আসে নাই।

মামাত ভাই শিশির রাগে গোঁ গোঁ করিতে করিতে এক রকম টানিতে টানিতেই সুবিমলকে বাহিরে লইয়া গেল; দু'ঘা দিতে পারিলেই তাহার যেন তৃপ্তি হইত।

সুবিমল আর সেখানে দাঁড়াইল না, হাঁটিয়া ষ্টেশন এবং সেখান হইতে মায়ের কাছে পৌঁছিতে পাঁচ ঘণ্টা লাগিল। নিজের ঘরে ঢুকিয়া সুটকেস গুছাইয়া লইতে মিনিট বিশেক মাত্র; মা শশব্যস্তে আসিয়া নানা প্রশ্ন করিলেন। সুবিমল বেশি কথা না বলিয়া শুধু এক কাপ চা চাহিল। মা খাবার আনিলেন, খাইতে খাইতে সুবিমল বলিল, বিয়ে ভেঙে দিয়ে এলাম মা, আমাকে মাপ কর। আমি ন'টার ট্রেনে কলকাতা যাচ্ছি, চাকরি করব।

বিস্মিত মাকে আর কিছু জানিবার বা বুঝিবার অবসর না দিয়া সুবিমল কলিকাতা চলিয়া গেল। একেবারে ল্যান্সডাউন রোড। মেজ কাকা পূর্ব্ববৎ পেসেন্স খেলিতেছেন।

—এই যে বাবা সুবিমল, এস, এস। ওরে রাণী—

ডাক শুনিয়া দিদি আসিলেন, খোকাকে কোলে লইয়া পিছনে পিছনে কল্যাণী।

দিদি বলিলেন, আমি জানতাম—

কল্যাণী দিদির মুখে হাত-চাপা দিতে গেল, দিদির ছেলে দেখাদেখি মাসির মুখের উপর হাত রাখিল। কল্যাণী মুখ ফিরাইয়া খোকার চুমু খাইতে যাইবে, দিদি তাহাকে টানিয়া ধরিয়া বলিলেন, থাম্ থাম্, ট্রান্সফার্ড এপিপেট হচ্ছে, দে আমার ছেলে দে—

* * * *

মা মর্ম্মাহত হইয়াছেন, কিন্তু ছেলের উপর রাগ করিয়া থাকা অসম্ভব। হোক ছোট বউয়ের অপমান! ছেলে অনেক বড়।

ছেলে চিঠি লিখিয়াছে। কলিকাতার সরকারী কলেজে চাকরি হইতে পারে, ডেপুটি হইবার জন্য পরীক্ষাও দিবে। সমস্ত ঘটনা সে লিখিয়াছে, কল্যাণীরা ব্রাহ্ম নয়, স্বজাতি। মন্দের ভাল, ছেলের মত হইলেই হইল, বউ এক জন চাই, কল্যাণী হইলেই বা দোষ কি?

ছেলেকে ঘর ভাড়া করিতে বলিয়া শিশিরের সঙ্গে তিনি কলিকাতায় আসিলেন। কল্যাণীর মেজ কাকা ষ্টেশনে তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিতে আসিয়াছেন, ভদ্রলোককে ভালই লাগিল।

মা মেয়েদের লইয়া ভাবী বেয়ানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। কল্যাণী তাঁহার পায়ে হাত দিয়া প্রণাম করিতেই তাঁহার সমস্ত রাগ মুহূর্ত্ত মধ্যে জল হইয়া গেল। ভোলানাথ হইলে কি হয়—ছেলের পছন্দ আছে।

* * * *

হঠাৎ—

বিবাহের পর বাসর-ঘরে বর-কনে পাশাপাশি বসিয়া আছে। কল্যাণী ও দিদির বন্ধুভাগ্য ভাল, মেয়েরা গিজগিজ করিতেছে। দিদি চরকির মত ঘুরিতেছেন, কর্ত্তা তো তবু রেঙ্গুন হইতে আসিয়া পৌঁছেন নাই।

কল্যাণীর এক বন্ধু গান গাহিতেছে। সেই গান!

বুকে দোলে তার বিরহ-ব্যথার মালা—

হঠাৎ আলো নিবিয়া গেল। দিদি না ফিউজ, শেষ পর্য্যন্ত বুঝা গেল না।

শ্রীসজনীকান্ত দাস।

সাময়িক প্রসঙ্গ

রাজবন্দীদিগের শিক্ষা

১৯৩৫ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে বাঙ্গালার লাট সার জন এণ্ডার্সন এই মর্ম্মে এক ঘোষণা করেন যে, তাঁহারা কতকগুলি রাজবন্দীকে বাছিয়া তাহাদিগকে কৃষি এবং শিল্প শিক্ষা দিবেন। তাহাদিগের শিক্ষা সমাপ্ত হইলে তাহাদিগকে কতকগুলি সর্ত্তে ছাড়িয়া দেওয়া হইবে। তাহাদের উপর তখন আর বঙ্গীয় সংশোধিত ফৌজদারী আইন বর্ত্তিবে না। তদনুসারে সরকার গৌরীপুরে এবং সুখচরে ছোট ছোট শিল্প শিখাইবার কারখানা এবং মসলন্দপুরে কৃষি বিদ্যা শিখাইবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। এই কারখানা হইতে যাহারা শিল্প শিখিয়া বাহির হইয়া যাইবে, সরকার তাহাদিগকে কিছু কিছু মূলধন দিয়া কার্য্য আরম্ভ করিবার সুযোগ দিবেন। বলা বাহুল্য, এই মূলধন সরকার উহাদিগকে ঋণস্বরূপ দিবেন, তাহার জন্য তাহাদিগকে বার্ষিক শতকরা ৬ টাকা হারে সুদ দিতে হইবে। মসলন্দপুর (ই, বি, রেলওয়ের) ষ্টেশনের অনতিদূরে সরকার কৃষি শিক্ষাদানের জন্য ৬ শত বিঘা জমি লইয়া তাহাতে ৬০ জন রাজবন্দীকে কৃষিশিক্ষা দিতেছেন। যাহাদিগকে শিল্প-শিক্ষা দেওয়া হইতেছে, তাহাদের অনেকের শিক্ষা সমাপ্ত হইয়াছে; যাহারা কৃষি-শিক্ষা করিতেছে, আগামী জানুয়ারী মাসে তাহাদের শিক্ষা সমাপ্ত হইবার কথা। এখন দেখা যাউক, ইহার ফল কি হয়। কারণ, এইবারই ত কার্য্যারম্ভের সময়।

আপাতদৃষ্টিতে সরকারের এই পরিকল্পনা ভাল বলিয়াই মনে হইতেছে। অবশ্য হিংসামূলক বিপ্লববাদ বুভুক্ষিতের জঠর হইতেই বাহির হয়। কিন্তু তাই বলিয়া বুভুক্ষাই বিপ্লববাদ উদ্ভবের একমাত্র কারণ নহে। অসন্তোষও উহার অন্যতম প্রবল কারণ। একজন খ্যাতনামা ইংরেজ লেখক বলিয়াছেন যে, Hungry masses and discontented classes are the seed-beds of revolution ক্ষুধার্ত্ত জনসাধারণ এবং অসন্তুষ্ট উচ্চশ্রেণীর লোকরাই বিপ্লবের নিলয়। সুতরাং লোকের—বিশেষতঃ বেকার লোকদিগের জীবিকা অর্জ্জনের একটা উপায় করিয়া দিলেই বিপ্লববাদ নিরস্ত হইতে পারে। এখন সরকারের এই পরিকল্পনাটি পরীক্ষাধীন রহিয়াছে। সুতরাং আপাতদৃষ্টিতে উহা যতই ভাল বলিয়া মনে হউক না কেন, কার্য্যক্ষেত্রে উহার ফল কিরূপ হয়, তাহা না জানিলে কিছুই বলা যাইতেছে না। সকল সময়ে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে মতের এবং কাযের মিল করা যায় না। আজকাল ভদ্রশ্রেণীর লোকরা তাঁহাদের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের মানদণ্ডটি যেরূপ ভাবে বৃদ্ধি করিয়াছেন,—তাহাতে এই সকল কায করিয়া যদি তাঁহাদের স্বচ্ছন্দে জীবিকা অর্জ্জনের উপায় হয়, তাহা হইলে ইহাতে সুবিধা হইবে বলিয়া আশা করা যায়। সরকার বলিয়াছেন, এই সকল শিক্ষিত শিল্পী হাতে-হাতিয়ারে কায করিবে,—ইহাই তাঁহাদের পরিকল্পনার মুখ্য লক্ষ্য। তাঁহারা শ্রমিক রাখিয়া কায চালান, ইহা তাঁহাদের ইচ্ছা নহে। ইহার কারণ কি, তাহা আমরা ঠিক বুঝিতে পারিলাম না। যদি ঐ সকল বন্দী বন্দিদশা হইতে মুক্ত হইয়া অন্য লোককে কাজ শিখাইয়া একটু বড় করিয়া কায করে এবং তাহাতে কিছু অধিক লাভ পায়, তাহা হইলে সে বিষয়ে বরং সরকারের বিশেষ উৎসাহ দেওয়া উচিত। উহাদিগকে যে টাকাটা ধার দিবার ব্যবস্থা হইয়াছে, তাহার সুদের হারটা কিছু অধিক হইয়াছে মনে হয়। বর্ত্তমান সময় টাকার বাজার বড় মন্দা। কোম্পানীর কাগজের সুদও অল্প। এরূপ অবস্থায় উহাদিগের ঋণের টাকার সুদ কিছু কমাইয়া দেওয়াই কি সঙ্গত নহে? যাহারা চাষকার্য্য করিবে, তাহারা যদি স্থানে স্থানে যাইয়া উন্নতভাবে চাষ করে, তাহা হইলে তাহাদের দৃষ্টান্ত দেখিয়া অনেক চাষী ভাল ভাবে চাষ করিতে শিখিবে। সুতরাং এই দিকটাও বিশেষ ভাবে ভাবিয়া দেখা আবশ্যক।

রহিমী অনুশাসন

সার আব্দার রহিম ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থা-পরিষদের সভাপতি। তাঁহার কার্য্য বিলাতী কমন্সসভায় স্পীকারের অনুরূপ। অর্থাৎ তিনি পরিষদের কার্য্য যাহাতে সুচারুরূপে নির্ব্বাহিত হয়, তাহাই করিয়া থাকেন। কোন সদস্য যাহাতে অনাবশ্যক, বাগ্‌বহুল, পুনরাবৃত্তিপূর্ণ কথা বলিয়া সভার সময় নষ্ট করিতে না পারেন, সে জন্য তিনি যুক্তিসঙ্গত নিয়মকানুন প্রবর্ত্তিত করিতে পারেন। কংগ্রেসের সদস্যদিগের ভোটের জোরে তিনি পরিষদের তক্তে বসিয়াছেন। তাঁহার হাতে নগদ ক্ষমতা কিছু আছে। সম্প্রতি তিনি নিয়ম করিয়াছেন যে—"যে সকল প্রশ্ন সংবাদপত্রের কোন সম্পাদকীয় প্রবন্ধের ভিত্তির উপর অবস্থিত, সে সব প্রশ্ন আর ব্যবস্থাপক সভায় জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারিবে না।" তাঁহার এই ফতোয়া শুনিয়া আমরা বিস্মিত। এমন বেয়াড়া এবং বিদ্‌কুটে নিয়ম বিলাতের পার্লামেণ্টে ত নাই-ই, কোন দেশের কোন পার্লামেণ্টের আছে কি না, তাহা আমরা জানি না; শুনিও নাই। সার আব্দারের সংবাদপত্র-বিদ্বেষ এবং সাম্প্রদায়িকতা-প্রীতি বোধ হয় সর্ব্বজনবিদিত। একবার মুর্শিদাবাদের নবাবের কলিকাতাস্থিত ভবনে তিনি সংবাদপত্র সম্বন্ধে উদ্ধত এবং অবজ্ঞা-সূচক মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন বলিয়া অপমানিত এবং শেষটা ক্ষমা প্রার্থনা করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। আজ মথুরার রাজপাটে বসিয়া তিনি ব্রজের সে "দু হাতে দু পায়ে ধরার" কথা ভুলিয়া গিয়াছেন,—কিন্তু দেশের লোক তাহা ভুলে নাই। তাঁহার এই নিয়মের মূলে যে কোন যুক্তিযুক্ততা বা প্রয়োজনীয়তা আছে, তাহা মনে হয় না। তিনি কি কারণে এই বেয়াড়া নিয়ম করিয়াছেন, তাহা বলেন নাই। তাঁহার হস্তে নিয়ম করিবার ক্ষমতা আছে বলিয়া তিনি এইরূপ একটা ফতোয়া জারি করিয়া লোককে চমকিত করিলেন! কিন্তু তিনি কি বলিতে পারেন যে, বিলাতের যে কমন্স সভার আদর্শে (অন্ততঃ দৃশ্যতঃ) এই ব্যবস্থা পরিষদ গঠিত, সে কমন্সসভার কোন স্পীকার কি এইরূপ কোন ফতোয়া দিয়াছেন? কমন্স সভায় ত মন্তব্য-সম্বলিত অনেক সংবাদকে

ত্তিতে করিয়া অনেক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হইয়া থাকে। তিনি কমন্স সভার কার্য্যবিবরণী দেখিলেই তাহা বুঝিতে পারিবেন। সাধারণের প্রতিষ্ঠান ব্যক্তিগত খেয়াল চরিতার্থ করিবার স্থান নহে। কিন্তু সার আব্দারের সে আক্কেল আছে কি ?

সতীত্বরক্ষার্থ নরহত্যা

দাক্ষিণাত্যে বোম্বাই প্রদেশের অন্তর্গত পশ্চিম খান্দেশ অঞ্চলে দেশওয়াল গ্রাম। পাণ্ডু ঐ গ্রামের রাজস্ব-পাতিল বা মণ্ডল। সেইজন্য গ্রামে তাহার যথেষ্ট প্রভাব এবং প্রতিপত্তি ছিল। লোক তাহাকে ভয়ও করিত। কিন্তু সেই গ্রামের সোম সাধু নামক জনৈক ব্যক্তির স্ত্রী যশোদার উপর তাহার লোলুপ দৃষ্টি পড়ে। গত ৯ই ডিসেম্বর পাণ্ডু মদ খাইয়া মত্ত অবস্থাতেই যশোদার গৃহে প্রবেশ করে। যশোদা এবং তাহার স্বামী সোমসাধু পাপিষ্ঠ পাণ্ডুকে তাহার পাপ চেষ্টা হইতে বিরত করিবার জন্য অনেক চেষ্টা করে। কিন্তু সে কিছুতেই বিরত হইতে চাহে না। তখন তাহারা উভয়ে মিলিত হইয়া পাণ্ডুকে হত্যা করে। খুনের দায়ে সোমসাধু এবং যশোদাকে অভিযুক্ত করিয়া চালান দেওয়া হয়। তাহারা স্বামি-স্ত্রী উভয়ের মধ্যে কেহই এই খুনের কথা অস্বীকার করে নাই। তাহারা বলে যে, যশোদার সতীত্ব রক্ষার অন্য উপায় না দেখিয়া তাহারা পাণ্ডুকে খুন করিয়াছে। প্রথমে পশ্চিম খান্দেশের দায়রা জজের নিকট এই মামলার বিচার হয়। অধিকাংশ এসেসরের সহিত একমত হইয়া দায়রা জজ আসামীদ্বয়কে মুক্তিপ্রদান করেন। কিন্তু এইখানে এই ব্যাপারের যবনিকা পতন হয় নাই। বোম্বাই সরকার এই বিচার-ফলে সন্তুষ্ট হইতে না পারিয়া দায়রা জজের আদেশের বিরুদ্ধে বোম্বাই হাইকোর্টে আপীল করেন। আপীল মামলায় বিচার করেন বোম্বাই হাইকোর্টের বিচারপতি মিষ্টার ব্রুমফিল্ড এবং শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র সেন। তাঁহারা উভয়ে একমত হইয়া আসামী দুইজনকে যাবজ্জীবন নির্ব্বাসন দণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহারা মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন যে, ঘটনাটি যেরূপ, তাহাতে সরকারের পক্ষে আসামী দুইজনের উপর দয়া প্রকাশ করা কর্ত্তব্য।

বিচারপতিদ্বয় রায়ে বলিয়াছেন, যদি সর্ব্ববিধ উপায় অবলম্বন করিয়াও তাহাদের পক্ষে যশোদার সতীত্ব রক্ষা করা অসম্ভব হইত, তাহা হইলে তাহারা পাতিলকে হত্যা করিলে দণ্ডের দায় হইতে অব্যাহতি পাইতে পারিত। আমরা দুই জন বিচারপতির এই সিদ্ধান্ত পড়িয়া বিস্মিত। তাঁহারা কি দেশের প্রকৃত অবস্থা কিছুই জানেন না? এখন বোম্বাই সরকার এই আসামী দুই জনের উপর দয়া প্রকাশ করেন কি না, তাহাই দ্রষ্টব্য।

নিম্নপদে য়ুরোপীয় নিয়োগ

মিষ্টার শ্রীপ্রকাশ কিছুদিন পূর্ব্বে ব্যবস্থা পরিষদে এই মর্ম্মে এক প্রস্তাব উপস্থিত করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, সরকারী নিম্নপদে য়ুরোপীয়দিগকে নিযুক্ত করা হউক। ঐরূপ করা হইলে সরকারী কায ভাল এবং সরকারের আত্মসম্মান বজায় থাকিবে। প্রস্তাবটি পরিহাসজনক বলিয়া সার আব্দার রহিম উহা ব্যবস্থা পরিষদে পেশ করিতে দেন নাই। প্রস্তাবটা যতই উপহাস করিয়া উপস্থিত করা হউক না কেন, শেষ পর্য্যন্ত ঐরূপ ব্যবস্থা হওয়াও বিচিত্র নহে! আমাদের এক জন সহযোগী লিখিয়াছেন যে, "কোম্পানীর আমলে গোড়ার দিকে যখন কোম্পানীর ইংরেজ কর্ম্মচারীরা বেতন কম পাইত, তখন তাহারা ঘুষ লইত এবং অন্য উপরি রোজগার অনেক অধিক করিত বলিয়া কর্ত্তৃপক্ষ তাহাদের বেতন বাড়াইয়া দেন।" ঠিক কথা। কিন্তু এখনই কি ঘুষ লওয়া খুব অধিক কমিয়াছে? অল্প বেতনই কি ঘুষ লওয়ার একমাত্র কারণ? যে ব্যক্তি যে পদে নিযুক্ত হয়, সে ব্যক্তি যদি সে পদের যোগ্য না হয়, তাহা হইলেও সে অনেক ক্ষেত্রে ঘুষ লইয়া থাকে, অথচ সকলেই যে তাহা লয়, তাহা আমরা বলিতেছি না। সকল ব্যাপারেরই ব্যতিক্রম আছে। এ সম্বন্ধে আমরা অধিক কথা বলিতে চাহি না। যাঁহারা শাসনকার্য্য চালাইবেন, তাঁহারাই তাহা বুঝিবেন। ব্যবস্থা পরিষদের অন্যতম সদস্য মিষ্টার শ্যামলালও আর একটি এই ধরণের প্রস্তাব উপস্থিত করিতে চাহিয়াছিলেন। সে প্রস্তাবটির মর্ম্ম এই যে আণ্ডামান যখন বিশেষ ভাল স্থান, তখন ভারতের রাজধানী তথায় লইয়া যাওয়া হউক। পরিষদের সভাপতি এই প্রস্তাবটিও পরিহাসাত্মক বলিয়া উহা পরিষদে উপস্থিত করিতে দেন নাই। সার আব্দার উহা পরিহাসাত্মকই মনে করিয়াছিলেন। তবে তিনি কি আণ্ডামান সম্বন্ধে সরকারী উক্তিতে বিশ্বাস করেন না? দিল্লীতে ত ম্যালেরিয়ার আড্ডা। আর আণ্ডামান যখন স্বাস্থ্য-সম্পদে সুসম্পন্ন, তখন তথায় ভারতের রাজধানী লইয়া যাইতে আপত্তি কি?

কংগ্রেস-নেতার সদুপদেশ

কর্ণাট দেশের রাজনীতিক জন-নায়ক শ্রীযুক্ত গঙ্গাধর দেশপাণ্ডে পুণার কংগ্রেস নির্ব্বাচন সভায় ভারতবাসীকে এক দফা সদুপদেশ দিয়াছেন। তাহার মর্ম্ম এই যে, সর্ব্বপ্রকার দলাদলি ভুলিয়া সকল ভারতবাসীর কংগ্রেসের সহিত মিশিয়া যাইতে হইবে, তাহা হইলে কংগ্রেস ভারতের একমাত্র রাজনীতিক দল হইয়া আগামী নির্ব্বাচনে সরকারের সহিত সংগ্রাম করিতে পারিবেন।" উপদেশটি সাধু! কিন্তু লোক চিরকাল হইতে এবং পুরুষ-পুরুষানুক্রমে উহা শুনিয়া আসিতেছে। মায় কথামালার গল্পেও তাহা আছে। United we stand, divided we fall. ইহা যাহারা ইংরেজি পড়িয়াছে, তাহারাই জানে। তবে সংসারে এত দলাদলি কেন? হীন স্বার্থের সেবা আর অহমিকাই এই দলাদলির কারণ। দলাদলি সকল দেশেই আছে। তবে পরাধীন দেশে ভেদের ও অনৈক্যের মাত্রা একটু গভীর হয়। কারণ, তাহাদের দেশাত্মবোধ কমে, ব্যক্তিগত এবং সম্প্রদায়গত ক্ষুদ্র স্বার্থের অনুভূতি বাড়িয়া উঠে। তাহার উপর কংগ্রেস সাম্প্রদায়িক রোয়দাদ প্রভৃতি সম্বন্ধে যে নীতি অবলম্বন করিয়াছেন, তাহাতে তাহার সূত্র ধরিয়া আবার ভেদবুদ্ধি অতি দ্রুতবেগে গজাইয়া উঠিতেছে। যাঁহারা মনে করেন যে, সরকারের মতানুবর্ত্তী হইয়া চলিলে তাঁহাদের ব্যক্তিগত এবং সম্প্রদায়গত

বিশেষ অধিকারগুলি বজায় থাকিবে, তাঁহারা একভাব মগ্ন মুস্লিমদের একতা-প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিবেন না। কংগ্রেস সংস্কৃত শাসনযন্ত্র ধ্বংস করিবার জন্য বদ্ধপরিকর। কিন্তু সকলেই সংস্কৃত শাসনযন্ত্র ধ্বংস করিলেই মঙ্গল হইবে,—এ কথা কায়মনোবাক্যে বিশ্বাস না করিতে পারেন। যাঁহাদের ঐরূপ বিশ্বাস, তাঁহারা কি এখন দেশপাণ্ডের বা জওহরজীর হুকুমমতে আত্মমত ভুলিয়া—আত্ম-অভিমান ভাসাইয়া দিয়া কংগ্রেসের মতে মত দিয়া চলিবেন? সরকারী পক্ষের গাঁর দল এবং যাঁহারা কংগ্রেসের সুপারিশে পার্টিফণ্ডে টাকা দিয়া নির্ব্বাচন-দরিয়া একেবারে অনায়াসেই পার হইয়া যান, তাঁহারা কি আত্মস্বার্থের সন্ধানরূপ মহাপুণ্য ব্রত পরিহার করিয়া দেশের স্বার্থরূপ বকাণ্ড প্রত্যাশায় ঘুরিয়া বেড়াইবেন? তাঁহারা নিশ্চিতই কংগ্রেসওয়ালা বলিয়া নক কলাইবেন আর বিশেষ প্রয়োজনীয় ব্যাপার সম্বন্ধে ভোট দিবার সময় অপরিহার্য্য কারণে পরিষদে গরহাজির হইবেন। সুতরাং দেশপাণ্ডে মহাশয়ের সদুপদেশ সত্ত্বেও সকলে দলাদলি ভুলিয়া কংগ্রেসের সহিত মিলিত হইবে না।

ক্ষয়রোগের বৃদ্ধি

আমাদের দেশের লোকের ধারণা, আজকাল আমাদের দেশে ক্ষয়রোগ দ্রুত বিস্তারলাভ করিতেছে। ৫০ বৎসর পূর্ব্বে বঙ্গে ক্ষয়রোগের কথা অতি অল্পই শুনা যাইত। এখন এ রোগ যথা-তথা। বঙ্গীয় টিউবারকুলোসিস সমিতির জার্ণালে সম্প্রতি যে তথ্য প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা শুনিলে শরীর শিহরিয়া উঠে। এই কলিকাতা সহরে ৫০ হাজার যক্ষ্মাগ্রস্ত রোগী বিদ্যমান, তাহাদের মধ্যে প্রতিদিন ৮ জন রোগী যমালয় যাত্রা করে। নিখিল বঙ্গে ১০ লক্ষ যক্ষ্মারোগগ্রস্ত ব্যক্তি আছে,—কিন্তু রোগিনিবাস বা হাসপাতালে কেবলমাত্র ২ শত ৮৪টি রোগী রাখিবার স্থান বর্ত্তমান। অতএব অবস্থা কিরূপ শোচনীয়, তাহা সকলে চিন্তা করিয়া দেখুন। যক্ষ্মারোগাক্রান্ত ব্যক্তিরা যেখানে নিষ্ঠীবন ত্যাগ করে, সেখান হইতে ইহা বিস্তার লাভ করে; সুতরাং ইহাদিগকে যত্রতত্র অবাধে বিচরণ করিতে দেওয়া সঙ্গত নহে। কলিকাতা সহরে চিকিৎসাধীন নহে, এরূপ রোগীর সংখ্যা নাকি ২৭ হাজার। ইহারা যে সকলেই শয্যাশায়ী তাহা নহে; সুতরাং ইহারা সর্ব্বত্র বিচরণ করে। ইহাতে এই রোগ দ্রুত বৃদ্ধি পায়। বাঙ্গালার টিউবারকুলোসিস সমিতির বিভিন্ন ঔষধালয় হইতে ৩ হাজার রোগীকে ঔষধ দেওয়া হয়। হাসপাতালে মোট ২ শত ৮৪ জন রোগীর শয্যা আছে। বহু রোগী ব্যক্তিগত হিসাবে কবিরাজ প্রভৃতি দ্বারা চিকিৎসিত হইয়া থাকে। এই রোগ পূর্ব্বে পল্লীগ্রামবাসীদিগের মধ্যে প্রায় দেখা যাইত না। এখন তথায় ইহার বেশ প্রাদুর্ভাব দেখা যাইতেছে। দরিদ্র লোকদিগের মধ্যেই ইহা বিশেষভাবে দেখা যায়। যাহা হউক, সকল সভ্য দেশেই এই রোগাক্রান্তদিগের জন্য রোগিনিবাস আছে। আমাদের দেশে নাই। এ সম্বন্ধে সরকারের এবং সাধারণের বিশেষ অবহিত হওয়া আবশ্যক।

মহাত্মাজী এবং রাজনীতি

হরিজনপত্রে এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন যে, জনৈক চীনদেশীয় ভদ্রলোক মহাত্মা গান্ধীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন। তাঁহার সহিত কথাপ্রসঙ্গে মহাত্মাজী বলিয়াছিলেন যে,—"আমি রাজনীতি বিষয়ে প্রামাণ্য ব্যক্তি নহি। আমি প্রায় দুই বৎসর পূর্ব্ব হইতেই কংগ্রেস হইতে বিদায়-গ্রহণ করিয়াছি। এখন আমি বর্ত্তমানকাল হইতে পিছাইয়া পড়িয়াছি।" উত্তরে সেই চীনা ভদ্রলোকটি জিজ্ঞাসা করেন যে, আপনি কি অন্য লোককে সুবিধা দিবার জন্য কংগ্রেস হইতে বিদায় গ্রহণ করেন নাই? উত্তরে মহাত্মাজী বলেন যে, "আমি ঐরূপ করি না। আমি সত্যাশ্রয়ী লোক। যে সময়ে আমি কংগ্রেস হইতে এবং রাজনীতিক্ষেত্র হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছিলাম, তখন আমি সম্পূর্ণভাবে রাজনীতি ক্ষেত্র হইতে সরিয়া পড়িয়াছিলাম। ভবিষ্যতে আমার কপালে কি আছে, তাহা ভগবানই জানেন।" মহাত্মাজীর কথার মর্ম্ম এই যে, বর্ত্তমান সময়ে তিনি রাজনীতির সহিত সমতানতা রক্ষা করিয়া চলিতে পারিতেছেন না, —সেই জন্য তিনি রাজনীতিক্ষেত্র হইতে সরিয়া দাঁড়াইয়াছেন। কিন্তু তিনি পূর্ণমাত্রায় সরিয়া দাঁড়াইতে পারিয়াছেন কি? তাঁহার দলস্থ কোন ব্যক্তি বলিয়াছেন যে, তিনি জওহরলালজীকে কংগ্রেসের সভাপতি করিবার জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং গতবার কংগ্রেসে উপস্থিত হইয়াছিলেন। ইহাতে তিনি যে রাজনীতিক্ষেত্র হইতে সম্পূর্ণ সরিয়া দাঁড়াইয়াছেন,—ইহা মনে করিতে পারা যায় কি? যাহা হউক, মহাত্মাজী যদি সত্য সত্যই চিরদিনের জন্য রাজনীতিক্ষেত্র হইতে সরিয়া দাঁড়াইয়া থাকেন,—তাহা হইলে সেটা দেশের পক্ষে দুর্দ্দৈব বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। কারণ, ভারতের রাজনীতিক্ষেত্রে তাঁহার ন্যায় শক্তিশালী এবং প্রভাবশালী ব্যক্তি আর নাই।

মিলনের প্রয়াস

মুসলমানগণ সম্পূর্ণ সাম্যবাদী, তাঁহাদের মধ্যে জাতিভেদ নাই, সুতরাং তাঁহাদের মধ্যে একতা প্রতিষ্ঠিত করা অতি সহজ, এ বিশ্বাস অনেকেরই ছিল। কিন্তু তাহা হইলেও মুসলমানদিগের পরস্পরের মধ্যে দলাদলি ও আড়াআড়ি অল্প নাই। ভারতেও নানা জাতির ও নানা ধর্ম্মাবলম্বী লোকের অভাব নাই,—কিন্তু পারস্যে, আফগান রাজ্যে এবং ইরাকে মুসলমানদিগের পরস্পরের মধ্যে আড়াআড়ি আছে, তাহা শুনিতে পাওয়া যায়। বাঙ্গালার মুসলমানদিগের মধ্যেও দলাদলির অভাব নাই। কিন্তু এখন আবার নির্ব্বাচন-গাজনের ঢাক বাজিয়া উঠিয়াছে,—আর ভোটপ্রার্থীদিগের মনে ভোটদাতাদিগের কথা জাগিয়াছে। ঢাকার নবাব খাজা হবিবুল্লা এবং বোম্বাইয়ের সাম্প্রদায়িকতার পৃষ্ঠপোষক মিষ্টার জিন্না সম্মিলিত হইয়া বাঙ্গালার মুসলমানদিগকে এককাট্টা করিবার চেষ্টা করিবার জন্য অনেক বাক্যব্যয় করিয়া গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে সার আবদুল হালিম গজনভী সাহেবও সানাইয়ে পোঁ ধরিয়াছেন। ইঁহারা মুসলমানদিগকে সব 'এক দিল' করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছেন কিন্তু অন্য রকম সুর যে শুনা না যাইতেছে, তাহা নহে। সা

আবদুল হালিম গজনভী কলিকাতা ইস্‌লামিয়া কলেজের ছাত্রদিগকে উপদেশ-দানপ্রসঙ্গে বলিয়াছেন, "সাম্প্রদায়িক স্বার্থকে দেশের এবং সমগ্র জাতির স্বার্থের উপর বলিয়া গণ্য করিলে, একটা বড় ভুল এবং অদূরদর্শী নীতির অনুসরণ করা হইবে।" ইহা ত মুখের সভাশোভন কথা। তিনি বলিয়াছেন, তাঁহাদিগকে যাহারা সাম্প্রদায়িকভাবে ভাবিত বলে, তাহারা মিথ্যাবাদী। এই সত্যসন্ধ ব্যক্তি এ পর্য্যন্ত জাতীয়তার পরিবর্দ্ধনকল্পে কি কি কায করিয়াছেন, তাহা বলিয়া দিবেন কি? কেবল কথায় চিঁড়া ভিজিবে না। মুখে জাতীয়তা জাতীয়তা বলিয়া চীৎকার করিলে জাতীয়তাবাদী হওয়া যায় না। যাহা হউক, ঢাকার নবাব এবং বোম্বাইয়ের জিন্না সাহেবও সব মুসলমানকে 'এক দিল' করিয়া গেলেন। এদিকে প্রজাদলের নায়ক মিষ্টার ফজলল হক তাঁহাদের দলে ভিড়িবেন কি না, তাহাই চিন্তা করিতেছেন। তিনি নবাব সাহেবের দলকে বলিতেছেন যে, এ পর্য্যন্ত তোমরা মন্ত্রী সাজিয়া বৎসর বৎসর অনেক টাকা উদরস্থ করিতেছ,—কিন্তু প্রজার জন্য তোমরা এ পর্য্যন্ত কি করিয়াছ? হক সাহেবের এই প্রশ্নের সদুত্তর নবাবী দল দিতে পারেন নাই। সুতরাং হক সাহেব ব্যাপার কি হয় দেখিয়া তবে নবাবী দলে যোগ দিবেন স্থির করিয়াছেন। কাযেই সমস্ত মুসলমানের 'এক দিল' হইবার সম্ভাবনা মাঠে মারা যাইবার আশঙ্কা উপস্থিত হইয়াছে। এখন সার আবদুল হালিম গজনভী সাহেব নবাবী সাম্প্রদায়িক দলে ভিড়িবেন, না জাতীয়তার সম্মান রক্ষা করিবেন? দুই নৌকায় পা দিলে মাঝ দরিয়ায় পড়িয়া ডুবিয়া মরিতে হয়।

অন্যায় সার্কুলার

আগামী এপ্রিল মাস হইতে ভারতের প্রদেশগুলিকে "তথাকথিত" স্বায়ত্ত-শাসনাধিকার দেওয়া হইবে; সুতরাং তাহার পূর্ব্বেই বিভিন্ন প্রদেশের ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নির্ব্বাচিত করিতে হইবে। সংস্কৃত শাসনপদ্ধতি মতেই সেই নির্ব্বাচন কার্য্য পরিচালিত হইবে। সুতরাং আর কালবিলম্ব করিবার সময় নাই। সেই জন্য সকল দলেই সাজ সাজ রব উঠিয়াছে। ভারতের মুসলমানগণ 'এক দিল' হইয়া কায করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছেন। মডারেট বা উদারনৈতিক দল কি করিতেছেন, তাহা জানিতে পারা যায় নাই। কংগ্রেস ভারতের সর্ব্বাপেক্ষা শক্তিশালী রাজনীতিক প্রতিষ্ঠান। ইহারা বলিতেছেন যে, সংস্কৃত ভারত-শাসন আইন অচল করিবার জন্য ইহারা ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশ করিতেছেন। শুনা যাইতেছে, সরকারী কর্ম্মচারীদিগের মধ্যে কেহ কেহ আগামী নির্ব্বাচনে কংগ্রেস দলভুক্ত ব্যক্তিরা যাহাতে অধিক সংখ্যায় নির্ব্বাচিত হইতে না পারেন, তাহার জন্য চেষ্টা করিতেছেন। সম্প্রতি জওহরলাল নেহেরু একখানি সার্কুলারের সন্ধান পাইয়াছেন যে, কোর্ট অব ওয়ার্ডসের সেক্রেটারী যুক্তপ্রদেশের সমস্ত ডিষ্ট্রিক্ট অফিসারকে একখানি করিয়া সার্কুলার দিয়াছেন; সেই সার্কুলারে লিখিত আছে যে, আগামী নির্ব্বাচনে কংগ্রেসের মনোনীত সদস্যগণ যাহাতে নির্ব্বাচিত হইতে না পারেন, তাহার যোগাড় করিতে হইবে। অধিকন্তু যে সকল নির্ব্বাচনপ্রার্থী নির্ব্বাচিত হইলে কংগ্রেসের নির্দ্ধারিত কার্য্যসূচীর বিরোধিতা করিবেন, তাঁহারা যাহাতে নির্ব্বাচিত হইতে পারেন, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে।" কোর্ট অব ওয়ার্ডসের সেক্রেটারী সত্য সত্যই এইরূপ এক সারকুলার জারি করিয়াছেন কি না, তাহা আমরা জানি না। তবে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু উহা আবিষ্কার করিয়াছেন। এখন জিজ্ঞাস্য, যুক্তপ্রদেশের সরকারের সম্মতি লইয়াই কি ঐ সার্কুলার জারি করা হইয়াছে? যদি ঐরূপ সার্কুলার জারি করা না হইয়া থাকে, তাহা হইলে যুক্তপ্রদেশের সরকারের ঐ সংবাদের প্রতিবাদ করা উচিত। কারণ, সরকারের পক্ষে নির্ব্বাচনে এরূপভাবে হস্তক্ষেপ করা সম্পূর্ণ অন্যায়। উহাতে ভোটারদিগের স্বাধীনভাবে নির্ব্বাচনে বাধা দেওয়া হয়। এ দেশের ভোটদাতারা অনেকেই অশিক্ষিত অথবা এত অল্প শিক্ষিত যে, তাঁহারা ভোটদানের গুরুত্ব বুঝিতে অসমর্থ। জুরীকে যেমন তাঁহার জ্ঞান ও বিশ্বাসমতে ভোটদানে বাধা দিলে বা অনুরোধ করিলে দোষ হয়, ভোটারকেও তেমনই তাহার জ্ঞান ও বিশ্বাসমতে যে ব্যক্তি ভোট পাইবার পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক যোগ্য, সেই ব্যক্তিকে ভোট দিতে না দেওয়া বা তাহাকে ছাড়িয়া অন্য ব্যক্তিকে ভোট দিতে অনুরোধ করা কোনমতেই সঙ্গত হইতে পারে না। উহা অতিশয় দোষের। আমরা সেজন্য এই সার্কুলারের কথা সত্য কি না, তাহা জানিতে ইচ্ছা করি। কিন্তু জওহরজী যখন উহা আবিষ্কৃত করিয়াছেন, তখন অনেকেই মনে করিতেছেন যে, 'সন্ন্যাসী চোর নয় বোচকায় দাগ।' যুক্তপ্রদেশের কোর্ট অব ওয়ার্ডসের সেক্রেটারী যদি এইরূপ সার্কুলার প্রচার করিয়া থাকেন—তাহা হইলে ঐ প্রদেশের সরকার তাঁহাকে সেজন্য উপযুক্ত দণ্ড দিবেন কি?

পণ্ডিত জওহরলালের আহ্বান

কংগ্রেসের সভাপতি পণ্ডিত জওহরলাল সম্প্রতি এই কথা তাঁহার দেশবাসীদিগকে বুঝাইবার চেষ্টা করিতেছেন যে, "বর্ত্তমান অবস্থায় আমাদের দেশে দুইটা ভিন্ন তিনটা দল থাকা উচিত নহে। এক দলে থাকিবেন বিদেশী শাসকবর্গ ও তাঁহাদের অনুচরগণ, আর অপর দিকে থাকিবেন দেশের স্বরাজকামী লোক। ইহাই হইল প্রকৃত দল-বিভাগ। ইহার মাঝখানে একটা বা একাধিক দল থাকা ভাল নহে; উহাতে দেশের ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা। কিন্তু কংগ্রেসী দল ও সরকারী দলের মধ্যে অন্য কতকগুলি দল যে আছে, তাঁহাদের মধ্যে অনেক ভাল লোকও আছেন। কোন কোন দলের আদর্শ এবং লক্ষ্য যে কংগ্রেসের আদর্শ ও লক্ষ্যের প্রায় অনুরূপ—তাহাও স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু দেশে এই সকল মধ্যবর্ত্তী দল থাকাতে দেশের শক্তি বিভক্ত হইয়া যায় এবং দেশের লোকের দৃষ্টি আদর্শ এবং লক্ষ্য হইতে ভ্রষ্ট হইয়া সঙ্কীর্ণ স্বার্থের দিকে নিবদ্ধ হয়।" জওহরজী যে কথাগুলি বলিয়াছেন, তাহা মোটের উপর সত্য। তাহাতে আর সন্দেহ নাই। কিন্তু দেশের সকল লোকই সব বিষয়ে একমত হইতে পারিয়াছেন, এরূপ দৃষ্টান্ত পৃথিবীর কোন দেশেই নাই। সর্ব্বদেশে এবং সর্ব্বকালেই চিন্তাশীল ব্যক্তিদিগের মধ্যে কোন কোন জটিল বিষয়ে মতভেদ ঘটিয়া আসিতেছে। কিন্তু এই মতভেদের এবং দলভেদের জন্য কেবল অন্যদলের লোকদিগকে আক্রমণ করা সঙ্গত নহে। এ বিষয়ে কংগ্রেসেরও দোষ আছে। কংগ্রেস এমন কতকগুলি কায করিতেছেন, তাহা সকল লোক •